বিশ্ব নবীর সাহাবী

১

তালিবুল হাশেমী

বিশ্বনবীর সাহাবী

প্রথম খণ্ড

তালিবুল হাশেমী

অনুবাদ ঃ আবদুল কাদের

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১৩৫

সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল ১৯৮৯
৭ম প্রকাশ

শাবান	১৪৩২
আষাঢ়	১৪১৮
জুলাই	২০১১

বিনিময় ঃ ২০০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

BISHA NABIR SAHABI-1st Volume by Talibul Hashemy.
Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane,
Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 200.00 Only.

অনুবাদকের কথা

সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের সম্পর্কে জানার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা ছাত্র জীবন থেকেই ছিলো। সে আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখেই বিভিন্ন সময় সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের ব্যাপারে জানার চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলা ভাষায় সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের জীবনালেখ্য জানার সুযোগ খুবই সীমিত। এক সময় নির্ভরযোগ্য বই-পুস্তক পাওয়াই যেতনা বলা চলে। বর্তমানে কিছু পুস্তক-পুস্তিকা বাজারে পাওয়া যায়। এ সকল পুস্তকেও সকল সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের জীবনী পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায়, তাও মানুষ সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের জীবন খণ্ডিতভাবে বিবৃত। এতে পাঠকের তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। প্রসঙ্গত প্রশ্ন হলো, সাহাবী কারা ? এ প্রশ্নের সহজ-সরল জবাব হলো, সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নিবেদিত প্রাণ সঙ্গী-সাথীদেরকেই সাহাবী বলা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তি থেকে ওফাত পর্যন্ত আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র পূর্ণ জীবন বিধান, ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যে সকল মহান সন্তান জীবনের সবকিছু উৎসর্গ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে কাজ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাদেরকেই আমরা সাহাবীরূপে জানি। এসব সাহাবীর সংখ্যা কত ? এ প্রশ্নের জবাব খুবই কঠিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তি জিন্দেগীর প্রথম পর্বে এ সংখ্যা কম ছিলো। পরবর্তী পর্যায়ে, এ সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সর্বশেষে এ সংখ্যা হাজার হাজার দাঁড়ায়। হাজার হাজার সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের সম্মিলিত প্রয়াসে ইসলামী বিপ্লব সাধিত হয়। ইসলাম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের ভূমিকা অনন্য সাধারণ ছিলো। তাদের গুরুত্বও অপরিসীম। ইসলামের বাস্তব নমুনা ছিলেন সাহাবীবৃন্দ। এ হাজার হাজার সাহাবীদের কর্ম এবং জীবন সকল যুগেই অনুপ্রেরণার উৎস।

হাজার হাজার সাহাবীর জীবনী সংগ্রহ করা অত্যন্ত দুরূহ এবং কঠিন কাজ। কোনো একজন গবেষক অথবা লেখকের পক্ষে এ কর্ম সম্পাদন আরো দুরূহ এবং অসম্ভব। বিশেষ করে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বেকার মহান সন্তানদের জীবনী রচনা যে কত বড় কঠিন কাজ তা বলাই বাহুল্য। শ্রদ্ধেয় জনাব তালিবুল হাশেমী উর্দু ভাষায় এ অসাধ্য সাধনের আংশিক প্রয়াস চালিয়েছেন। গভীর সমুদ্রের তলদেশ হতে মণি-মুক্তা আহরণের যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বন পূর্বক একাগ্রচিত্তে তিনি এ অসাধ্য সাধনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছেন। এ পর্যন্ত তিনি আটটি পুস্তকে প্রায় পাঁচ শ' সাহাবী এবং মহিলা সাহাবীর কর্ম ও জীবনী রচনা করে উর্দু ভাষী পাঠকদের উপহার দিয়েছেন।

যতদূর জানা যায় তিনি এখনো এ কাজ অব্যাহত রেখেছেন। জনাব হাশেমীর রচনায় মানুষ সাহাবীর জীবনালেখ্য বিধৃত হয়েছে। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি পবিত্র কুরআন শরীফ হাদীস সহ বহু আরবী এবং অন্য ভাষার গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন। এ কারণেই তাঁর গ্রন্থ যুক্তিসিদ্ধ এবং গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে। তবুও তিনি বিনীতভাবে আরজ করে বলেছেন, তাঁর মন্তব্যে কোনো পাঠক একমত না হলে যেন ক্ষমা করেন এবং সে প্রশ্নে যা সঠিক তাই যেন গ্রহণ করেন। তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেছেন, সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করতে হবে। নির্বিশেষে সকলকেই শ্রদ্ধা জানাতে হবে এবং কোনো অবস্থাতেই তাঁদের প্রতি অশোভন ভাষা প্রয়োগ ও অসুন্দর ধারণা পোষণ করা যাবে না। আল্লাহ পাক শ্রদ্ধেয় জনাব হাশেমীর এতবড় প্রচেষ্টা কবুল করে নিন এবং দীর্ঘ জীবন দান করুন যাতে তিনি গবেষণালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে আরো সাহাবীর জীবনী পাঠকদের কাছে উপস্থাপনের সুযোগ পান। আর এ খিদমতের বিনিময়ে আল্লাহ তাঁকে জান্নাত নসীব করুন।

আলহামদুলিল্লাহ। জনাব তালিবুল হাশেমীর 'পঞ্চাশজন সাহাবী'র প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। তার বইটির নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। বর্তমানে বইটির নামকরণ করা হয়েছে 'বিশ্বনবীর সাহাবী'। 'পঞ্চাশজন সাহাবী'র প্রথম খণ্ড 'বিশ্ব নবীর সাহাবী'র প্রথম খণ্ড হিসেবে প্রকাশিত হলো। পাঠক সমাজ সানন্দচিত্তে বইটি গ্রহণ করবেন বলে আশা রইলো। এতবড় কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য আল্লাহ পাক আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃপক্ষ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে সুন্দর প্রতিদান দিন এ দোয়া করি।

বইটির দ্বিতীয় সংস্করণেও কিছু ভুল-ভ্রান্তি থেকে যেতে পারে। পাঠকবর্গ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দিয়ে বইটি গ্রহণ করবেন বলে আশা করি। অন্য দিকে ভুল-ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে কৃতজ্ঞ চিত্তে তা শুধরে নেয়ার চেষ্টা করবো। অনুবাদসহ অন্যান্য কাজে অনেকেই সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের প্রতি আমি চির কৃতজ্ঞ। আমার এ নগণ্য প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষী পাঠক-পাঠিকা যদি সামান্যতম উপকৃত হন তাহলে সার্বিক প্রয়াস সার্থক হবে।

পরিশেষে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে মুনাজাত, হে আল্লাহ ! আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস কবুল করুন। আখিরাতের মুক্তিই আমার একান্ত কামনা।

বিনয়াবনত

আবদুল কাদের

ঢাকা, ৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৪০০ সাল।
১৯শে জমাদিউস সানি, ১৪১৪ হিজরী।
১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৯৩ সন।

সূচীপত্র

১. হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহ আনহু ৩৫
২. সাইয়েদেনা হযরত আবু ওয়াহাব শুজা রাদিয়াল্লাহ আনহু ৫৪
৩. হযরত আকিল রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন বাকির লাইসী ৫৮
৪. হযরত ওয়াকিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবদুল্লাহ ইয়ারবুয়ীত তামিমী ৬১
৫. হযরত আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ বিন সোহায়েল রাদিয়াল্লাহ আনহু ৬৫
৬. হযরত আবু বুরযাহ আসলামী রাদিয়াল্লাহ আনহু ৭৩
৭. হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ বিন সোহায়েল রাদিয়াল্লাহ আনহু ৭৭
৮. হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ৮০
৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু ১০২
১০. হযরত আবু হুরাইরাহ দাওসী রাদিয়াল্লাহ আনহু ১৩১
১১. হযরত শাকরান সালেহ রাদিয়াল্লাহ আনহু ১৬২
১২. হযরত ছাওবান রাদিয়াল্লাহ আনহু ১৬৫
১৩. হযরত ইয়াসার নওবী রাদিয়াল্লাহ আনহু ১৭১
১৪. হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি ফাতিমাতাদ দাওসী ১৭৪
১৫. হযরত জাকওয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জুনদুব আসলামী ১৭৯
১৬. হযরত উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন উসাইদ ছাকাফী ১৮৪
১৭. হযরত মুগিরাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন শু'বা ছাকাফী ১৮৯
১৮. হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আস সাহমী ২১৪
১৯. হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ—সাইফুল্লাহ ২১৮
২০. হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস ৩০৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কুরআনে হাকিম ও সাহাবীদের মর্যাদা

সারওয়ারে কায়েনাত, ফখরে মওজুদাত, রহমতে আলম মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন মানবকুলের শ্রেষ্ঠতম মানব। তিনি ছিলেন কামিল ইনসান। সার্বিক গুণাবলীর সমাহার ঘটেছিলো তাঁর মধ্যে। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের মর্যাদা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সমাসীন। নবীদের (আ) পর তাঁদের মত উন্নত মানব আজও বিশ্বে আবির্ভূত হয়নি। এসব মহান মানব যাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ মানব রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দর্শনে নিজেদের চক্ষুকে আলোকিত করেছিলেন। তাঁরা সর্বোত্তম চরিত্রবানের উপর নিষ্ঠার সাথে ঈমান এনেছিলেন। সরাসরি সুহবতের ফায়েজও তাঁরা হাসিল করেছিলেন এবং তাঁর উত্তম আদর্শকে জীবনের অনির্বাণ শিখা বানিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁরা নভোমণ্ডলীয় হেদায়াতের প্রোজ্জ্বল তারকা সদৃশ। তাঁদের সত্যবাদিতা ও ইখলাস, দিয়ানত এবং আমানত, শুভকামনা ও ত্যাগ এবং খোদাভীতি অতুলনীয়। তাঁদের পূত-পবিত্র আত্মা থেকে আজ পর্যন্তও সৌভাগ্য এবং সফলতার দীপ্তি বিচ্ছুরিত হয়। তাহযিব-তামাদ্দুনের গুচ্ছ তাঁরা সজ্জিত করেছিলেন। তাঁরাই রাজনীতি এবং অর্থনীতির ঔজ্জ্বল্য প্রদান করেছিলেন। জাহেলিয়াতের তমসা এবং কুফর ও শিরকের অন্ধকার গহ্বরে তাঁরাই হেদায়াতের প্রদীপ জ্বেলেছিলেন। আল্লাহর নাম বুলন্দ করার জন্যে তাঁরা জান-মাল, সন্তান-সন্ততি তথা প্রয়োজনের মুহূর্তে সবকিছুই হাজির করেছিলেন।

•

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার লোকদের সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউই মু'মিন হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং অন্যান্য লোকদের চেয়ে আমার সাথে তাঁর ভালোবাসা বেশী না হয়।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ইরশাদের সত্যতা সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের নিজেদের আমল দিয়ে এমনভাবে প্রমাণ করেছেন, যা বিশ্বের ইতিহাসে নজিরবিহীন। রিসালাত প্রদীপের এসব পতঙ্গ ন্যায় বা সত্য পথে যে ধরনের দুঃখ-মুসিবত ও নির্যাতন সহ্য করেছেন তা পাঠ করলে শরীরের প্রতিটি লোমকূপ খাড়া হয়ে যায়। গা শিউরে উঠে। সত্য দীনের

প্রসার ও প্রচার এবং হক ঝাণ্ডার শির উন্নত করার লক্ষ্যে তাঁরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে কুরবানী দিয়েছিলেন তা ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে কিয়ামত পর্যন্ত তাওহীদ পন্থীদের জন্যে মশাল স্বরূপ হয়ে থাকবে। এসব পবিত্র নফসের মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে মাতা-পিতাকে পরিত্যাগ করেছেন। পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করেছেন। স্বদেশ ভূমি ও গোত্রের লোকজনকে বিদায় জানিয়েছেন। ঘর-বাড়ী পরিত্যাগ করেছেন। ক্ষুধা সয়েছেন। সব ধরনের শারীরিক নির্যাতন সহ্য করেছেন। এমনকি প্রয়োজনে হক পথে নিজের জীবনকেও নজরানা হিসেবে পেশ করতেও কুণ্ঠিত হননি। শুধু মাত্র প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশাতেই নয় বরং তাঁর ওফাতের পর সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের আল্লাহর দীনের প্রতি যে ধরনের দরদ দেখিয়েছেন ও নিষ্ঠার সাথে খেদমত, হিফাযত ও প্রসারের কাজ করেছেন তার স্বীকৃতি প্রদান আমাদের ঈমানেরই দাবী। এ সকল পবিত্র আত্মা ইসলামী উম্মাহর কল্যাণকামী। এ উম্মাহ তাঁদের ইহসানের বোঝা থেকে কখনো অব্যাহতি পেতে পারে না। কোনো নবী এবং রাসূল শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের মত জীবন উৎসর্গকারী সাথী পাননি। বাস্তব কথা হলো, প্রত্যেক সাহাবীই ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর নিদর্শন ছিলেন। আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত এসব মহান ব্যক্তির মাধ্যমেই আমাদের কাছে পৌঁছেছে। তাঁদের চারিত্রিক দৃঢ়তার মাধ্যমে এ উম্মাত সাফল্য এবং কল্যাণের পথে ধাবিত হতে পারে। তাঁরা হলেন সুউচ্চ সত্যবাদিতার আলোকজ্জ্বল তারকা। তাদেরকে প্রত্যক্ষ করে মুসলিম উম্মাহ জীবন তরীর মনযিলে মাকসুদ নির্ধারণ করতে পারে। আল্লাহ পাকের এসব পবিত্র এবং নির্বাচিত ব্যক্তির ত্যাগের আবেগ মহান স্রষ্টার এত পসন্দনীয় ছিলো যে, কুরআনে পাকের স্থানে স্থানে তাঁদের গুণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের প্রশংসা করা হয়েছে এবং সরাসরি তাদেরকে বেহেশতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। যখন আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের শান বর্ণনা করেন তখন সেইসব পবিত্র নফসের মর্যাদা প্রমাণে আর কোনো দলিলের প্রয়োজন হয় না। কুরআনে হাকিম সাহাবা কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের গুণাবলী, তাদের স্থান, মান ও মর্যাদা সম্পর্কে কি ধরনের বর্ণনা দিয়েছে তা দেখা যাক। সূরা ফাতাহ'তে ইশরাদ হয়েছে ঃ "মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। আর যাঁরা তাঁর সাথে রয়েছেন তাঁরা কাফেরদের উপর কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পর রহমশীল। তোমরা যখনই দেখবে তখনই তাদেরকে রুকূ', সিজদা, আল্লাহর ফযিলত এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রচেষ্টায় মশগুল পাবে। সিজদাহর চিহ্ন তাঁদের চেহারায় মওজুদ রয়েছে। যা থেকে

তাঁদেরকে পৃথকভাবে চেনা যায়। ইঞ্জিল এবং তাওরাতেও তাঁদের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের উদাহরণ এভাবে দেয়া হয়েছে যে, যেমন একটি ক্ষেত। ক্ষেতে বীজ অংকুরিত হলো। পরবর্তীতে তা শক্তিশালী হলো। এরপর আরো খানিকটা বর্ধিত হলো। অতপর নিজের কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে গেল। এ ক্ষেত কৃষককে খুশী করে। অন্যদিকে কাফেররা ফুলে ফলে সুশোভিত ক্ষেত দেখে জ্বলে যায়। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে আল্লাহ তাদের মাগফিরাত এবং বড় সওয়াবের ওয়াদা করেছেন।"–(সূরা আল ফাতাহ ঃ ২৯)

এ আয়াতসমূহে সাহাবায়ে কিরামের তিনটি গুণের কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। গুণ তিনটি হলো ঃ কাফেরদের উপর কঠোর, পরস্পর রহমশীল এবং এ ধরনের ইবাদাত গুজার যে তাদের চেহারায় সিজদার নিদর্শন সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠতো। কাফেরদের উপর কঠোর অর্থ এই নয় যে, তাঁরা কাফেরদের সাথে তিক্ত ব্যবহার করতেন। বরং তার অর্থ হলো, কাফেরদের মুকাবিলায় তাঁরা ছিলেন পাথরের মতো কঠিন। কোনো ধমক, কঠোরতা, চাপ অথবা লোভ-লালসা তাদেরকে হক পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারতো না। তাঁরা ছিলেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষে কাফেরদের বিরুদ্ধে মাথায় কাফন বাঁধা জীবন উৎসর্গকারী মানুষ।

পরস্পর রহমশীলের অর্থ হলো মু'মিনরা একে অপরের ভাইয়ের মূর্তিমান প্রতিচ্ছবি। একে অপরের প্রতি দরদ পোষণ এবং দুঃখে দুঃখীত হয়। একজন আরেকজনকে সালাম, সদালাপ এবং হাসি-খুশী ব্যবহার প্রদর্শন করে। একে অন্যের সাথে পরামর্শ করে। পরস্পর সাহায্য করে এবং অপরের ব্যথায় ব্যথিত হয়। একে অন্যের খুন নিজের উপর হারাম মনে করে। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা, যুলুম, প্রতিশোধ গ্রহণ, অন্যায় প্রতিশ্রুতি, খারাপ ধারণা, অপবাদ দেয়া, বিদ্রূপ এবং ফেতনা-ফাসাদ থেকে তারা দূরে থাকে। তাদের পরস্পর রহমশীল হওয়া অথবা ভ্রাতৃত্বের জযবার চূড়ান্ত অবস্থা এই ছিলো যে, হযরত আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আওফ মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা এলেন। মদীনা এসে তিনি হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন রবি আনসারীর বাড়ী উঠলেন। হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর দু'জন স্ত্রী ছিলো। তিনি হযরত আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বললেন, আমার সকল ধন-সম্পদ আপনি অর্ধেক ভাগ করে নিন। এমনকি আমি নিজের স্ত্রীর একজনকে তালাক দিচ্ছি। ইদ্দতের পর আপনি তাকে শাদী করবেন।

হযরত আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর অন্তরেও হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর মতই ভ্রাতৃত্বের আবেগ ছিলো। তিনি নিজের ভাইকে এ

ধরনের পরীক্ষায় ফেলা পসন্দ করলেন না। তাঁর ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বললেন, আল্লাহ পাক তোমার সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে বরকত দিন এবং তোমার উপর রহমত নাযিল করুন। আমার আর কিছু প্রয়োজন নেই। বাজারের রাস্তা কোন্ দিকে শুধু এতটুকু বলে দাও। ব্যবসা করে আমি আমার রুজী কামাই করবো।

সিজদার নিদর্শন অর্থ কপালের সেই দাগ নয় যা সিজদা করার কারণে নামাযীদের কপালে পড়ে থাকে। বরং তার অর্থ খোদাভীতি, বিনয়, সত্যবাদিতা, শারাফত এবং সচ্চরিত্রের সেইসব চিহ্ন যা আল্লাহর সামনে অবনত হওয়ার কারণে মানুষের চেহারায় দীপ্যমান হয়ে উঠে। একজন অহংকারী, দুঃস্বভাব এবং বেশরম মানুষের চেহারা একজন শরীফ পবিত্র এবং বিনয়ী মানুষের চেহারা থেকে অবশ্যই পৃথক ধরনের হয়। কুরআনে কারীমে সাহাবাদের গুণ-বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তাদের চেহারা আলোয় প্রদীপ্ত থাকে। ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এ গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, সাহাবায়ে কিরামের বাহিনী সিরিয়া প্রবেশ করলো। এ সময় সেখানকার খৃষ্টানরা বলতে লাগলো, ঈসা আলাইহিস সালামের অনুগামীদের যে গুণ আমরা কিতাবে পড়েছি অথবা নিজেদের আলেমদের কাছে শুনেছি, আরব থেকে আগত লোকদেরও একই গুণে গুণান্বিত মনে হয়।

সূরা আল আনফালে সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের এ গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে ঃ "ঈমানদার তারাই যাদের অন্তর আল্লাহর নাম নেয়ার সাথে সাথে কেঁপে ওঠে এবং যখন তাদের সামনে আল্লাহর কালাম পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা নিজের রবের উপর ভরসা রাখে। সেই মানুষ যারা নামায কায়েম রাখে এবং আমরা তাদেরকে যে রুজী দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। তারাই সত্যিকারের ঈমানদার। তাদের জন্যে নিজের রবের কাছে মর্যাদা রয়েছে। অধিকন্তু মাগফিরাত এবং ইজ্জতের রুজীও রয়েছে।"

সূরা আত তাওবাতে ইরশাদ হয়েছে ঃ এবং ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার মহিলা একে অপরের সাহায্যকারী। নেক কথা শিক্ষা দেয় এবং খারাপ কথা থেকে বিরত রাখে। নামায কায়েম রাখে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশ মুতাবেক চলে। আল্লাহ এসব লোকের উপর রহম করবেন। অবশ্যই আল্লাহ সবচেয়ে বড় বিজ্ঞ।

সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের গুণই হলো তাঁদের অন্তর আল্লাহ ভীতিতে পরিপূর্ণ। তাদের সামনে কুরআনে হাকিমের আয়াত পঠিত হলে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে কাফেরদের সামনে আল্লাহর কালাম পঠিত

হলে তারা তাতে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাঁরা নিজের প্রকৃত স্রষ্টার উপর ভরসা রাখে। নামাযের পাবন্দী করে এবং নিজের হালাল আয় থেকে আল্লাহর পথে অকাতরে ব্যয় করে। একে অপরকে সাহায্য করে। ভালো কাজের নির্দেশ দেয় এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায পড়ে, রোযা রাখে, যাকাত প্রদান করে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ মুতাবিক চলে।

সূরা আত তাওবার অন্য এক স্থানে আল্লাহ পাক মুহাজির এবং আনসার সাহাবা রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের প্রতি নিজের সন্তুষ্টির সুসংবাদ এ ভাষায় দিয়েছেন ঃ

"যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে ও নিজেদের জান এবং মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে, আল্লাহর কাছে তাঁরা সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে সমাসীন এবং তাঁরা সফলতা লাভকারী। তাদের রব তাদেরকে তাঁর রহমাত, সন্তুষ্টি এবং এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। যাতে তাঁদের জন্যে স্থায়ী নিয়ামতসমূহ থাকবে। চিরকালের জন্যে তাঁরা সেখানে অবস্থান করবে। অবশ্যই আল্লাহর কাছে তাদের জন্য বড় প্রতিদান রয়েছে।"

সূরা আল আনফালেও একই ধরনের কথা বলা হয়েছে ঃ "যারা ঈমান এনেছে ও যারা আল্লাহর রাস্তায় ঘর-বাড়ী পরিত্যাগ করেছে এবং জিহাদ করেছে, যারা আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে তারাই সত্যিকারের মু'মিন। তাদের জন্যে গুণাহ খাতার ক্ষমা এবং সুন্দর রিয্ক রয়েছে। এবং যারা পরে ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে ও তোমাদের সাথে একত্রিত হয়ে জিহাদ করেছে তারাও তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত।"–(আয়াত ঃ ৭৪-৭৫)

এ পবিত্র আয়াতসমূহে আল্লাহ পাক বিশেষ করে সেসব মুহাজির এবং আনসারের কথা উল্লেখ করেছেন যাঁরা ইসলাম গ্রহণ প্রশ্নে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করেছেন। আর এভাবেই তারা 'আস সাবিকুনাল আওয়ালুন'-এর মহান উপাধির যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছেন। আস সাবিকুনাল আওয়ালুন' অর্থাৎ ইসলামের প্রথম যুগের সাহাবীদেরকে এ মর্যাদা ও স্থান দেয়া হয়েছে। এতে তাদের সাথেই শুধু জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়নি, বরং তাদের পদাংক অনুসরণ করে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবা রাদিয়াল্লাহ আনহুমদেরও বেহেশতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। অগ্রগামীদের দলে সেসব মুহাজির সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুম রয়েছেন, যাঁরা নবুয়াত প্রাপ্তির প্রথম যুগে কঠিন অবস্থায় ঈমান আনার সৌভাগ্য লাভ এবং হক পথে চলার জন্যে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছিলেন। এমনকি তাঁরা নিজের ঘর-বাড়ীও পরিত্যাগ করেন। তাদের এসব কুরবানী আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হয় এবং তাঁরা তাঁর কাছে সাচ্চা মু'মিন এবং

জান্নাতী হিসেবে অভিহিত হন। হক পথে তাঁরা যে নজীরবিহীন কুরবানী স্বীকার করেন তার কতিপয় দৃষ্টান্ত পরখ করুন ঃ

নবুয়াত প্রাপ্তির প্রথম তিন বছরে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে তাবলীগের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে থাকেন। নবুয়াত প্রাপ্তির চতুর্থ বছরের শুরুতে 'ফাসদা বিমা তুমারু ওয়া আরিজ আনিল মুশরিকিনা' (অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশাবলী প্রকাশ্য শুনান এবং মুশরিকদের কোনো পরওয়া করবেন না) এ হুকুম নাযিল হলো। এ নির্দেশানুসারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকাশ্যে হকের তাবলীগ শুরু করেন। ফলে মক্কার মুশরিকদের ক্রোধ ও গোস্বার আগুন পূর্ণ শক্তির সাথে ফেটে পড়লো। তাওহীদের দাওয়াত গ্রহণকারীদের উপর তারা এমন এমন লোমহর্ষক নির্যাতন চালালো যে তাতে মানবতা মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো।

হযরত বেলাল হাবশী রাদিয়াল্লাহ আনহু মক্কার এক মুশরিক সরদার উমাইয়াহ বিন খালফের গোলাম ছিলেন। ইসলামের আহ্বান শুনতেই তিনি সাচ্চা অন্তরে ঈমান আনেন। তাঁর মুসলমান হওয়ার কথা শুনেই উমাইয়াহ অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো। সত্য গ্রহণের অপরাধে হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহ আনহুর জন্যে সে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি আবিষ্কার করলো। তাঁর গলায় রশি বেঁধে মাস্তান যুবকদের হাতে তা দিয়ে দিতো। আর তারা সে রশি ধরে তাঁকে মক্কার পাহাড়ী এলাকায় টেনে নিয়ে বেড়াতো। অতপর উত্তপ্ত বালিতে এনে উপুড় করে শুইয়ে দিতো এবং পাথর এনে শরীরের ওপর চাপা দিতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবি হযরত হাসসান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন সাবিত বলেন, আমি জাহেলী যুগে হজ্জ অথবা উমরার জন্য মদীনা থেকে মক্কা গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম যে, ছেলেরা বেলাল রাদিয়াল্লাহ আনহুকে রশি দিয়ে বেঁধে এদিক-ওদিক টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এ সত্ত্বেও সে লাত, উজ্জা, হুবল, আসাফ, নায়েলাহ এবং বাওয়ানাহকে (মূর্তি ও দেব-দেবীর নাম) সরাসরি অস্বীকার করছে।

কখনো কখনো উমাইয়াহ স্বয়ং হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যেতো এবং হিরার উত্তপ্ত বালুর উপর শুইয়ে দিয়ে ভারী পাথর তার বুকের উপর বেঁধে দিতো। যাতে নড়াচড়া করতে না পারে। অতপর বলতো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য প্রত্যাহার কর এবং লাত ও উজ্জাই প্রকৃত স্রষ্টা তার প্রতিশ্রুতি দাও। নচেৎ এভাবেই পড়ে থাকবে। এর জবাবে হক পুরস্ত হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহ আনহুর মুখ দিয়ে আহাদ আহাদ শব্দ বেরুতো। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহ আনহুকে

এ অবস্থায় দেখলেন যে, উমাইয়া তাঁকে উত্তপ্ত শক্ত মাটিতে শুইয়ে রেখেছে। মাটিও এমন উত্তপ্ত যে, তার উপর যদি গোশত রাখা হতো তাহলে তা গলে যেত। কিন্তু তিনি সে অবস্থাতেও লাত এবং উজ্জাকে অস্বীকার করে চলেছেন।

কোনো কোনো দিন বনু জুমাহর ছোকড়ারা হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহ আনহুকে মারাত্মকভাবে প্রহার করতো। দিনের বেলায় কাপড় খুলে লোহার জিরাহ পরাতো এবং রোদে রেখে দিতো। সন্ধায় হাত-পা বেঁধে এক প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ এবং রাতে চাবুক দিয়ে কষাঘাত করতো। এ সত্ত্বেও তাঁর কদম হক পথ থেকে বিচ্যুত হয়নি। মুখ দিয়ে আহাদ আহাদ শব্দ ছাড়া আর কিছুই বের হতো না।

আবু ফাকিহাহ ইয়াসার ইযদী রাদিয়াল্লাহ আনহু ও উমাইয়াহ বিন খালফের গোলাম ছিলেন। তিনিও ইসলাম গ্রহণ করলেন। এতে উমাইয়া তাঁকেও যুলুম-নির্যাতনের নিশানা বানালো। উত্তপ্ত বালুর উপর মুখ উবু করে তাঁকে শুইয়ে দিতো এবং পিঠের উপর রেখে দিত ভারী পাথর। ভয়াবহ গরম ও বোঝার কারণে তিনি বেহুঁশ হয়ে যেতেন। একদিন পাষাণ হৃদয় উমাইয়াহ হযরত আবু ফাকিহা রাদিয়াল্লাহ আনহুর দু' পায়েই রশি বাঁধলো এবং তাঁকে নির্দয়ভাবে টেনে বাইরে নিয়ে গেল। সেখানে উত্তপ্ত বালুর উপর শুইয়ে দিলো এবং এতো জোরে তার গলার উপর চাপ দিলো যে জিহ্বা বেরিয়ে এলো। তিনি নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইলেন। উমাইয়াহ ভাবলো কারবার খতম। কিন্তু তখনো তিনি জীবিত ছিলেন। ঘটনাক্রমে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি হযরত আবু ফাকিহা রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওপর এ নির্যাতনের মর্মন্তুদ চিত্র দেখলেন। তাঁর অন্তর কেঁদে উঠলো এবং সে সময়ই আবু ফাকিহা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে উমাইয়ার কাছ থেকে ক্রয় করে আযাদ করে দিলেন। কিন্তু সে যুগে কাফেরদের যুলুম-নির্যাতন থেকে কোনো স্বাধীন মুসলমান অথবা গোলাম কেউই মুক্ত ছিলো না। হযরত আবু ফাকিহা রাদিয়াল্লাহ আনহু মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কাফেরদের নির্যাতনের শিকার হয়ে রইলেন। ফলে নবুয়াতের ৬ষ্ঠ বছরে তিনি হিজরত করে হাবশা চলে গেলেন। হক পথে নির্যাতন সইতে সইতে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিলো। বদরের যুদ্ধের কিছু দিন পূর্বে তিনি ইনতিকাল করেন।

কুরাইশ সরদার সুহাইল বিন আমরের নেক প্রকৃতির সন্তান হযরত আবু জান্দাল রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু নবুয়াতের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাতে পিতা এতো ক্রোধান্বিত হলেন যে, দুই পুত্রের পায়ে বেড়ি লাগিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করলো। তাঁরা সেখানে বছরের পর বছর ধরে বন্দীত্বের নির্যাতন সইতে থাকেন।

হযরত ইয়াসির রাদিয়াল্লাহ বিন আমের, তাঁর পত্নী হযরত সুমাইয়াহ রাদিয়াল্লাহ বিনতে খাবাত এবং দুই পুত্র আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ এবং আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু জেহেল তাদের উপর প্রচণ্ড নির্যাতন চালায়। তাদের অবস্থা পড়ে শরীরের লোমকূপ খাড়া হয়ে যায়। সে তাদেরকে পানিতে ডুবিয়ে রাখতো। উত্তপ্ত বালু এবং প্রজ্জ্বলিত আগুনের উপর শুইয়ে দিতো। মক্কার প্রখর রোদে দুপুরে দাঁড় করিয়ে রাখতো। বেত দিয়ে পিটাতো। মোটকথা সে নির্যাতন চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছলো। একদিন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে কঠিন নির্যাতন সহ্য এবং মার খেতে দেখলেন। তিনি বললেন, "হে ইয়াসিরের খান্দান ! ধৈর্য ধর। নিসন্দেহে তোমাদের স্থান জান্নাত।"

যালেম আবু জেহেল একদিন হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর গোপন নাজুক স্থানে এতো জোরে নিযাহ মারলো যে, তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। অতপর আর একদিন সে হতভাগা হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে তীর মেরে শহীদ করে ফেললো। হযরত ইয়াসির রাদিয়াল্লাহ আনহুও বৃদ্ধ অবস্থায় নির্যাতন সইতে সইতে ওফাত পেলেন। হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর হায়াত ছিলো, এজন্যে তিনি বেঁচে গেলেন। নচেৎ আবু জেহেল তাঁকেও মেরে ফেলতে দ্বিধা করতো না।

হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আওয়াম ঈমান আনলেন। এতে তাঁর অভিভাবক চাচা নওফিল বিন খুয়ায়েলদ ক্রোধে ফেটে পড়লো। হাফিজ ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে লিখেছেন, নওফিল হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে চাটাইতে শুইয়ে দিতো। এরপর আগুন জ্বালিয়ে তাতে ধুনি দিতো এবং যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আ-নহুকে বলতো, নিজের বাপ-দাদার ধর্মে ফিরে আয়। কিন্তু যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু বার বারই বলতেন, "কখনই নয় কখনই নয়। এখন আর আমি কুফরী গ্রহণ করবো না।"

হযরত মাসআব রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন উমাইর বনু আবদিদ্দার গোত্রের এক সচ্ছল পরিবারের সন্তান ছিলেন। মক্কায় তাঁর মতো সুদর্শন যুবক দ্বিতীয় আর কেউ ছিলো না। সে সর্বোত্তম মানের পোশাক পরতো এবং উন্নত ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করতো। যে রাস্তা দিয়ে হাঁটতো তা সুবাসিত হয়ে যেতো। পায়ে জরিদার হাজরামী জুতা পরিধান করতো। পিতা-মাতার এ আদুরে সন্তান বেশীর ভাগ সময় সাজ-গোজ, আরাম-আয়েশ এবং সুন্দর চুলের যত্ন করেই কাটাতো। এ সত্ত্বেও আল্লাহ পাক তাঁকে সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির প্রথম যুগে যেই তাওহীদের

অমীয় বাণী তাঁর কর্ণ কুহরে প্রবেশ করলো তখনই নির্দ্বিধায় তাকে স্বাগত জানালো। বাড়ীর লোকেরা এ খবর পেয়ে ইসলাম গ্রহণের অভিযোগে হাত-পা বেঁধে তাঁকে নির্জন স্থানে আটক করে রাখলো। কিন্তু তিনি কোনো অবস্থাতেই হক পথ থেকে বিচ্যুত হলেন না। অবশেষে তাঁকে বাড়ী থেকে বহিষ্কার করা হলো। নবুয়াত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইঙ্গিতে হিজরত করে হাবশা চলে গেলেন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর যুলুম-নির্যাতন সইতে সইতে তাঁর সুশ্রী নিঃশেষ হয়ে গেল। রেশমের পোশাকের পরিবর্তে একটি কম্বলের অর্ধেক পরিধান করতেন এবং বাকী অংশ গায়ে জড়াতেন। পরিধেয় অংশটুকু বাবলার কাঁটা দিয়ে আটকে রাখতেন। নবুয়াত প্রাপ্তির ১২ বছর পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ইসলামের প্রথম শিক্ষক বানিয়ে মদীনা প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে ইসলামের তাবলীগ করতে থাকেন। তৃতীয় হিজরীতে ওহোদের যুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে শাহাদাত প্রাপ্ত হন। এতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুবই দুঃখিত হলেন। তিনি তাঁর লাশের কাছে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

> "মু'মিনদের মধ্যে বহু এমন লোক রয়েছে যে, তারা আল্লাহর সাথে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো তা সত্যভাবে পালন করে দেখিয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকে নিজের সময় পুরো করেছে এবং অনেকে ইন্তেজার বা অপেক্ষা করছে এবং নিজের ইচ্ছার কোনো পরিবর্তন সাধন করেনি।"–(সূরা আল আহযাব ঃ ২৩)

এরপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিহ্বল চিত্তে বললেন ঃ "মক্কায় আমি তোমার মতো সুদর্শন এবং সুন্দর পোশাক পরিধানকারী আর কাউকে দেখিনি। কিন্তু আজ দেখছি যে, তোমার চুল অবিন্যস্ত ও মাটিতে লেপ্টে রয়েছে এবং তোমার শরীরের উপর একটি চাদর। আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কিয়ামাতের দিন তোমরা আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হবে।"

হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল ইরত ইসলাম গ্রহণ করলেন। কাফেররা তাঁর উপর মারাত্মক নির্যাতন শুরু করলো। তাঁরা তাঁর কাপড় খুলে আগুনের উপর শুইয়ে দিতো এবং বুকের ওপর রাখতো ভারী পাথর। কখনো দগদগে আগুনের ওপর শুইয়ে ভারী দেহের মানুষ তাঁর বুকের উপর বসতো। যাতে তিনি পাশ ফিরতে না পারেন। খাব্বাব রাদিয়াল্লাহ আনহু অটল ধৈর্যের সাথে সে আগুনে কাবাব হতেন। এমনকি জখমের রক্ত এবং পুঁজ গলে গলে সেই আগুন নিভে যেত। ইবনে সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেছেন, খাব্বাব রাদিয়াল্লাহ আনহু পাষণ্ড এক মহিলা উম্মে আনমারের গোলাম ছিলেন।

মহিলাটি ইসলাম গ্রহণের অভিযোগে তাঁকে কখনো লোহার যিরাহ পরিয়ে রোদে শুইয়ে দিতো এবং কখনো গরম লোহা দিয়ে তাঁর মাথায় দাগ দিতো। এ ধরনের ভয়ংকর নির্যাতন সহ্য করতে করতে হযরত খাব্বাব কিছুদিন অতিবাহিত করলেন। এরপর একদিন ফরিয়াদ নিয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হলেন।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বার দেয়ালের ছায়ায় শুয়েছিলেন। হযরত খাব্বাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আরয করলেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি আল্লাহ পাকের কাছে আমাদের জন্য কেন দোয়া করেন না ?' একথা শুনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে বসলেন। তাঁর পবিত্র চেহারা লাল হয়ে গেল এবং বললেন ঃ

"তোমাদের আগে অতীতকালে এমন লোকও ছিলো, লোহার চিরুনী দিয়ে যাদের গোশত চেঁছে ফেলা হয়েছিলো। হাড্ডি ছাড়া তাদের শরীরের আর কিছুই ছিলো না। এ কঠোর অবস্থায়ও তাঁরা নিজের দীনের উপর থেকে আস্থা হারাননি। তাদের মাথার উপর করাত চালান হয়েছে। করাত দিয়ে চিরে তাদেরকে দু' ভাগ করা হয়েছে। এ সত্ত্বেও তাঁরা দীন পরিত্যাগ করেননি। আল্লাহ এ দীনকে অবশ্যই বিজয়ী করবেন এবং তোমরা দেখতে পাবে যে, সওয়ার একাকী ইয়েমেন থেকে হাজরা মাওত পর্যন্ত যাবে ও আল্লাহ ছাড়া কাউকেই ভয় করবে না।"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ শুনে হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহ আনহু আল্লাহর অভিপ্রায় বুঝে ফেললেন এবং নীরবে ফিরে গেলেন। আল্লামা ইবনে আসির রাহমাতুল্লাহ আলাই বলেছেন, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের খেলাফতকালে একবার হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহ আনহুকে তাঁর নির্যাতনের কাহিনী শুনানোর নির্দেশ দিলেন। তিনি কাপড় উঠিয়ে আমীরুল মু'মিনিনকে নিজের পিঠ দেখালেন। পিঠ দেখে তিনি থ' মেরে গেলেন। কোনো শ্বেত রোগীর চামড়া যেমন সাদা হয়ে যায় তেমনি তাঁর সারা পিঠ সাদা হয়ে গিয়েছিলো। হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন ঃ

"আমীরুল মু'মিনিন, আগুন জ্বালিয়ে তার উপর আমাকে শুইয়ে দেয়া হতো। এমনকি আমার পিঠের চর্বি সে আগুন নিভিয়ে দিতো।"

হযরত আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের দেশ থেকে মক্কা এসে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন। এ সময় মুশরিকরা চার দিক থেকে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং মার মার ধর ধর করে রক্তাক্ত করে ফেললো।

হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু এসে যদি তাদের হাত থেকে ছাড়িয়ে না নিতেন তাহলে সেদিনই তাঁর ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যেতো।

হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মাজউন ইসলাম গ্রহণ করলেন। মুশরিকরা তাঁকে বিভিন্ন ধরনের যুলুম-নির্যাতন, হাসি-ঠাট্টা, বিদ্রূপ এবং অর্থনৈতিক চাপে নিক্ষেপ করলো। অবশেষে বাধ্য হয়ে তিনি ঘর-বাড়ী ত্যাগ করে হাবশায় হিজরত করলেন।

হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মাসউদ ইসলাম গ্রহণের পর মুশরিকদের সামনে কুরআন তেলাওয়াত করলেন। এতে সেই যালেমরা এমন নিষ্ঠুরভাবে মারলো যে, তাঁর চেহারা ফুলে গেলো এবং শরীরের কয়েক স্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগলো। কিন্তু তাতে তিনি ভ্রূক্ষেপও করলেন না। একদিকে যালেমরা তাঁকে প্রহার করছিলো অন্যদিকে তিনি কুরআন তেলাওয়াত অব্যাহত রেখেছিলেন। যখন তাঁর উপর কাফেরদের যুলুম-নির্যাতন সীমাহীন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছলো তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইশারায় তিনি হাবশায় হিজরত করলেন।

হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহ আনহু ইসলাম গ্রহণ করলেন। এ অপরাধে তাঁর চাচা তাঁকে বেঁধে মারলো। তাঁর ওপর এত নির্যাতন চালানো হলো যে, অবশেষে তিনি স্ত্রী হযরত রোকাইয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু বিনতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহ স্বদেশ ভূমি ত্যাগ করে হাবশা গিয়ে উপস্থিত হলেন।

হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহ আনহু ঈমান আনলেন। এ কারণে মক্কার কাফেররা তাঁর উপর সীমাহীন অত্যাচার চালালো। সে সময় তাঁর মাতা ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনিও পুত্রের ইসলাম গ্রহণে অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তারিখুস সগীর গ্রন্থে মাসউদ বিন খারাশের একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। এ বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তাঁরা সাফা এবং মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে চক্কর মারছিলেন। তাঁরা দেখলেন অনেক মানুষ একজন যুবককে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি ঘটনা ? মানুষেরা বললো, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ বেদীন হয়ে গেছে। একজন মহিলা সে যুবকের পেছনে পেছনে গড় গড় করতে করতে এবং গালি দিতে দিতে যাচ্ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মহিলাটি কে ? লোকজন জবাবে বললো সে তার মা সায়বাহ বিনতে হাজরামী। হাফেজ ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থে লিখেছেন, নওফিল বিন খুয়াইলদ আদবিয়া কুরাইশের বাঘ খিতাবে মশহুর ছিলো। হযরত তালহা

রাদিয়াল্লাহ আনহুর ইসলাম গ্রহণে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলো। সে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত তালহাকে (উভয়ই বনু তামিম গোত্রের এবং পরস্পর আত্মীয় ছিলেন) এক রশিতে বাঁধলো এবং নির্যাতন চালালো।

ইবনে আসির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এবং ইমাম হাকিম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন, হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহ আনহুর ইসলাম গ্রহণের খবর যখন তাঁর চাচা এবং বড় ভাই ওসমান বিন ওবায়দুল্লাহ পেলেন তখন তারা হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহ আনহু ও হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুকে দড়ি দিয়ে বেঁধে খুব পিটালো। এর উদ্দেশ্য ছিলো যাতে তাঁরা ইসলাম পরিত্যাগ করেন। কিন্তু নির্যাতন যতই করা হোক না কেন ইসলাম থেকে তাঁদের সমান্যতম বিচ্যুতিও ঘটলো না।

হযরত আমের রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ফাহিরাহ হযরত আয়েশাহ সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহ আনহার এক ধরনের ভাই তোফায়েল বিন আবদুল্লাহর গোলাম ছিলেন। তিনি ঈমান আনলেন। এতে মক্কার মুশরিকদের রাগ ও ক্রোধের তুফান তাঁর উপরে গিয়ে আপতিত হলো। এ হতভাগারা যাবতীয় নির্যাতনই তাঁর উপর চালালো। কখনো তাঁকে নৃশংসভাবে মারা হতো। কখনো উত্তপ্ত বালিতে এবং কাটার উপর টেনে হিঁচড়ে নিয়ে বেড়ানো হতো। একদিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু দেখলেন যে, কাফেররা তাঁর শরীরে কাঁটা বিধিয়ে দিচ্ছে এবং দাড়ি ধরে থাপ্পর মারছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে ক্রয় করে আযাদ করে দিলেন। এ সত্ত্বেও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হিজরত করে মদীনা না যাওয়া পর্যন্ত কাফেররা তাঁর উপর নির্যাতন চালাতে কসুর করেনি।

হযরত আয়াশ বিন আবু রবিয়াহ, হযরত সালমাহ রাদিয়াল্লাহ আনহা বিন হিশাম এবং হযরত ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ ইসলাম গ্রহণ করলেন। কাফেররা তাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করলো। সেখানে তাঁরা বছরের পর বছর ধরে নিঃসঙ্গ জীবন অতিবাহিত করেন।

হযরত যিন্নিরাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু কুরাইশের মখজুম বংশের দাসী ছিলেন। দাওয়াতে হকের প্রথম যুগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। সত্য গ্রহণের অপরাধে আবু জেহেল তাঁর ওপর নিত্য নতুন নির্যাতন চালাতো। তিনি জীবন দিতে রাজী ছিলেন, কিন্তু আল্লাহর একত্ববাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে কোনো -ক্রমেই প্রস্তুত ছিলেন না। আল্লামা বালাজুরী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বর্ণনা করেছেন, হক পথে চরম নির্যাতন সইতে সইতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে

আসছিলো। এতে আবু জেহেল ভৎর্সনা করে বললো লাত এবং উজ্জা তোমাকে অন্ধ করে দিয়েছে। তিনি নির্দিধায় জবাব দিলেন, লাত এবং উজ্জা পাথরের মূর্তি। তাদেরকে পূজা করছে সে কথা তারা কি করে জানবে। আমার দৃষ্টিশক্তি চলে গিয়ে থাকলে তা আমার আল্লাহর তরফ থেকে মুসিবত হিসেবে এসেছে তিনি চাইলে আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়েও দিতে পারেন। আল্লাহ তাঁর এ দৃঢ়তাকে অত্যন্ত পসন্দ করলেন। পরের দিন তিনি যখন ঘুম থেকে জাগলেন তখন তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন। ইবনে হিশাম লিখেছেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকেও ক্রয় করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

হযরত লুবাইনাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু কুরাইশের বনু আদি গোত্রের একটি শাখা বনি মুয়াক্কালের দাসী ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির প্রথম বছরগুলোতেই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন। এতে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন খাত্তাব (নিজের জাহেলী যুগে) এত উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে, তাঁর উপর প্রতিদিন নির্যাতন চালাতেন। মারতে মারতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়তেন তখন বললেন, আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এজন্যে তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি। এখনো সময় আছে, নতুন ধর্ম ত্যাগ করো। তিনি জবাবে বলতেন, "অবশ্যই নয়। তুমি যত ইচ্ছা যুলুম করে নাও।" অবশেষে তাঁকেও হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু খরিদ করে স্বাধীন করে দেন।

হযরত নাহদিয়াহ রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং তার কন্যা বনু আবদিন দার গোত্রের এক মহিলার ক্রীতদাসী ছিলেন। নবুয়াত প্রাপ্তির প্রথম যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর প্রভু তাঁর ওপর কঠিন নির্যাতন চালান। কিন্তু তিনি এ নির্যাতন উপেক্ষা করে হক পথে অটল ছিলেন।

হযরত উম্মে উবাইস রাদিয়াল্লাহ আনহু বনু যোহরাহ গোত্রের বাঁদী ছিলেন। হক দাওয়াতের প্রতি সাড়াদানকারী প্রথম মুসলমানদের অন্যতম ছিলেন। হক পথে চলার অপরাধে মক্কার মশহুর মুশরিক সরদার আসওয়াদ বিন আবদে ইয়াগুছ তার ওপর চরম নির্যাতন চালাতো। কিন্তু তিনি কোনো অবস্থাতেই ইসলাম থেকে মুখ ফিরাননি। শেষে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে এ নির্যাতনের পাঞ্জা থেকে মুক্তি দেন।

হযরত হুমামাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত বিলাল হাবশী রাদিয়াল্লাহ আনহুর মা ছিলেন। হাফিজ ইবনে আবদুল বার রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আল ইসতিয়াব গ্রন্থে লিখেছেন, তিনিও পুত্রের মতো দাওয়াতে হকের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। মুশরিকরা তাঁর পুত্রের ওপর

যেমন নির্যাতন চালাতো তেমনি তাঁকেও শাস্তি দিতো। কিন্তু তিনি ইসলামের ওপর অটল ছিলেন।

এ হলো মক্কায় ইসলাম গ্রহণকারী সাবিকুনাল আওয়ালুনদের ওপর যুলুম-নির্যাতনের মাত্র কতিপয় উদাহরণ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির প্রথম যুগে তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহীদের কোনো শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণকারীই কাফেরদের যুলুম-নির্যাতন ও অত্যাচারের হাত থেকে নিস্তার পাননি। যখন তাদের নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে গেলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মযলুম মুসলমানদেরকে হাবশার দিকে হিজরত করার পরামর্শ দিলেন। বস্তুত নবুয়াত প্রাপ্তি ৫ এবং ৬ বছর পর অনেক মুসলমান পুরুষ এবং মহিলা মক্কা থেকে হিজরত করে হাবশা চলে গেলেন। প্রতিটি মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই স্বদেশ এবং নিজের ঘর-বাড়ীকে ভালোবেসে থাকে। এসব পরিত্যাগ করে যাওয়া তাদের জন্য এক বিরাট পরীক্ষা। কিন্তু আল্লাহর এ পবিত্র বান্দারা সে পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হন। তাদের মধ্যে একদল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের পূর্বেই মক্কা ফিরে আসেন এবং অন্য দলটি খায়বারের যুদ্ধ ৭ হিজরী পর্যন্ত হাবশার মুহাজিরের জীবনের মুসিবত সহ্য করতে থাকেন। নবুয়াত প্রাপ্তির ১৩ বছর পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুমদেরকে মদীনায় হিজরতের নির্দেশ দেন। নির্দেশ প্রাপ্তির সাথে সাথে হকপন্থীরা তাতে সাড়া দিলেন এবং প্রিয় স্বদেশ ভূমি, ধন-সম্পদ এবং ঘর-বাড়ীকে বিদায় জানিয়ে মদীনা গিয়ে পৌঁছলেন। আল্লাহ পাক তাঁদের এ কুরবানী অত্যন্ত পসন্দ করলেন। শুধু এ কুরবানীই নয় বরং পরবর্তীতে তাদের পদাংক অনুসরণ করে যাঁরা এসেছেন তাঁদেরকেও আল্লাহ তায়ালা নিজের সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিয়েছেন। যদিও পরবর্তীতে আগমনকারীরা অগ্রগামীদের মত যুলুম-নির্যাতন সহ্য করেননি, তবুও তাঁরা নিজের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও জীবন হক পথে বিলিয়ে দিয়েছেন এবং হকের ঝাণ্ডা উড্ডীন রাখার জন্যে যে কোনো ধরনের কুরবানী দিতে পিছপা হননি। আল্লাহ পাক নিজের বিশেষ ফযিলতে তাদেরকেও সাবিকুনাল আওয়ালুনের পবিত্র দলের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হাঁ, কিছু পার্থক্যও সূচীত করেছেন। মক্কা বিজয়ের পূর্বে ঈমান আনয়নকারীদেরকে মক্কা বিজয়ের পরে ঈমান গ্রহণকারীদের চেয়ে আফজাল বা উত্তম বলা হয়েছে। যেমন সূরা আল হাদীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিজয়ের (মক্কা) পূর্বে ব্যয় করেছে এবং লড়াই করেছে (আর যে এ কাজ পরে করেছে) তা বরাবর হতে পারে না। যারা পরে ব্যয় (ধন-সম্পদ) এবং জিহাদ ও কিতাল (কাফেরদের) করেছে তাদের মর্যাদা

পূর্বে ব্যয়কারীদের চেয়ে কম। আল্লাহ পাক সবার সাথেই নেক ওয়াদা করেছেন এবং যে কাজ তোমরা সম্পাদন করো সে সম্পর্কে আল্লাহ ওয়াকিবহাল।"

–(সূরা আল হাদীদ ঃ ১০)

কুরআনে কারীমে মুহাজিরদের সাথে সাথে আনসারদের উঁচু মর্যাদার কথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরাও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখিরাতে সমান সমান সওয়াবের অংশীদার হবেন। সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের পবিত্র কাতারে আনসারদের এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। এ সকল পবিত্র আত্মার লোক মক্কা থেকে তিনশ' মাইল দূরে এক পুরোনো শহর ইয়াসরাবে বসবাস করতেন। তাঁরা সেখানে অত্যন্ত নির্ঝণঝাট এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে জীবন অতিবাহিত করছিলেন। এসব মানুষের ইসলাম গ্রহণেরও প্রয়োজন ছিলো না এবং মক্কার হকপন্থীদের আশ্রয় প্রদানেও বাধ্য ছিলেন না। শুধুমাত্র সৎ প্রকৃতির কারণে তাঁরা হক দাওয়াতের প্রতি সাড়া দিয়েছিলেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির ১১ বছর পর হজ্জ মওসুমে ৬জন ভদ্র স্বভাবের খাজরাজী মক্কা এলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সামনে ইসলাম পেশ করলেন। তাঁরা নির্দিধায় তা কবুল করলেন। ইয়াছরাব ফিরে গিয়ে অন্যান্যদের কাছেও তাঁরা তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। নবুয়াত প্রাপ্তির ১২ বছর পর দ্বিতীয়বার তাঁরা মক্কা এলেন। এ সময় তাঁদের সাথে আরো ৬জন হকপন্থী এসেছিলেন। তাঁরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইয়াত হলেন। তাঁদের আবেদন অনুযায়ী প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন উমায়েরকে ইসলামের প্রথম দায়ী বানিয়ে ইয়াসরাব প্রেরণ করলেন। তাঁদের তাবলিগী প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে ইয়াসরাবের ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা হতে লাগলো। নবুয়াত প্রাপ্তির ১৩ বছর পর ইয়াসরাবের ৭৫জন হকপন্থী (৭৩জন পুরুষ এবং ২জন মহিলা) মক্কা এলেন এবং কাফেরদের অগোচরে রাতের বেলা আকাবার ঘাঁটিতে বিশ্ব নেতা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করলেন। তাঁর হাতে বাইয়াত হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইয়াসরাব তাশরীফ নেয়ার দাওয়াত দিলেন। এ সময় এ ওয়াদাও করলেন যে, তাঁরা নিজের জীবন, সন্তান এবং সম্পদ দিয়ে তাঁকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হেফাজত ও সাহায্য করবেন। এ বাইয়াত ইতিহাসে বাইয়াতে উকবায়ে সানিয়াহ, বাইয়াতে লাইলাতুল উকবাহ অথবা বাইয়াতে উকবায়ে কাবিরাহ নামে স্মরণ করা হয়। এ বাইয়াত ইসলামের ইতিহাসে মাইল ফলকের মর্যাদা রাখে। প্রকৃতপক্ষে এ বাইয়াত আরব ও আযম এবং জ্বিন ও ইনসানের কাছ থেকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করার বাইয়াত

ছিলো। সে সময় আরবের প্রতিটি অণু-পরামাণু হকের নিশানবাহীদের খুন পিপাসু ছিলো। ইয়াসরাব ভূখণ্ডের এ সকল পূত-পবিত্র মানুষ উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজের জীবন, সম্পদ এবং সন্তানদেরকে মক্কায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদতলে এনে রাখলেন। এসব পবিত্র ব্যক্তিত্ব নিজেদের সবকিছু হক পথে নিয়োজিত করলেন এবং ভয়-ভীতি ও গালমন্দের পরওয়া করলেন না। এ বাইয়াতের কারণে আনসাররা এমন এক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হলেন, যার ওপর তাঁরা চিরকাল ফখর করতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুমদেরকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন। অনুমতি পেয়ে প্রায় সকল পুরুষ ও মহিলা সাহাবীই রাদিয়াল্লাহ আনহাই মক্কাকে বিদায় জানিয়ে মদীনা গিয়ে পৌছলেন। আনসাররা তাঁদেরকে আহলান-সাহলান ওয়া মারহাবা বলে স্বাগত জানালেন এবং অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে তাঁদের মেহমানদারী করলেন। কিছুদিন পর স্বয়ং হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও হযরত আমের রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ফাহিরাহসহ ইয়াসরাবে তাশরীফ আনলেন। এ সময় আনসাররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন উষ্ণ সম্বর্ধনা জানালো যার নজীর বিশ্বের ইতিহাসে পাওয়া ভার। সেদিন "ইয়াসরাব" "মদীনাতুন নবীতে" রূপান্তরিত এবং তার ভূমি নভোমণ্ডলীর ঈর্ষায় পরিণত হলো।

মুহাজিরীনে কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুম বছরের পর বছর ধরে বিষবৎ অকথ্য যুলুম-নির্যাতন সহ্যের পর নিজের পরিবার-পরিজন, ঘর-বাড়ী এবং ধন-সম্পদ ত্যাগ করে যখন মদীনা পৌছলেন, তখন তাঁদের কাছে আল্লাহর নাম ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। কিন্তু মদীনার আনসাররা যে ভালোবাসা এবং নিষ্ঠা ও সততার সাথে সে দেশ ত্যাগীদের মেহমানদারী করলেন, তা এক ঈমান প্রজ্জ্বলিত কাহিনী। ইসলামের ইতিহাসে এ কাহিনী চিরকালের জন্যে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটাবে।

প্রকৃতিগতভাবে আনসাররা ছিলেন অত্যন্ত শরীফ, সাদাসিধে এবং রুচিশীল ও দরাজ দিলসম্পন্ন মানুষ। কিন্তু শত শত বছরের পুরনো পারস্পরিক মুনাফিকী ও শত্রুতা তাদের শরীফ চরিত্রকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছিলো। ইসলাম আনসারদের পারস্পরিক মুনাফিকীকে খতম এবং যারা একে অপরের রক্ত পিপাসু ছিলো তাদেরকে দীনের মযবুত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে। আল্লাহ পাক এভাবে আনসারদেরকে ভয়াবহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। সূরা আলে ইমরানে ইরশাদ হয়েছে ঃ "আল্লাহর রজ্জু ঐক্যবদ্ধভাবে দৃঢ়তার সাথে ধারণ করো এবং বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করো না। আর আল্লাহর সে নিয়ামত

স্মরণ করো যখন তোমরা পরস্পর শত্রু রূপে পরিগণিত ছিলে। অতপর তিনি তোমাদের অন্তরে (পারস্পরিক) ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিলেন। ফলে পরস্পর তোমরা ভাই হয়ে গেলে। প্রকৃতপক্ষে তোমরা অগ্নি গহ্বরের কিনারায় দণ্ডায়মান ছিলে। আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তা থেকে বাঁচিয়ে নিলেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের কাছে নিজের নিদর্শনাবলী প্রকাশ্যভাবে বর্ণনা করেন। যাতে করে তোমরা পথ পাও।"(–আয়াত ১০৩)

আনসাররা আল্লাহ তায়ালার এ মহান ইহসানের পুরোপুরি শোকর আদায় করলেন। তাঁরা নিজের জীবন, সম্পদ এবং সন্তানদেরকে হক পথে ওয়াকফ করে দিলেন এবং নিজেদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও নিষ্ঠার এক উজ্জ্বল নিদর্শন ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ করে দিলেন। হিজরতের কয়েক মাস পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন কায়েম করলেন। এ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা শুধুমাত্র এক জরুরী পরিস্থিতির ফলশ্রুতি ছিলো না বরং এর মধ্যে বিশেষ হিকমত এবং মুসলিহাত ছিলো। এর ফলে একদিকে মুহাজিরদের অন্তর থেকে স্বদেশ ত্যাগের অনুভূতি বিদূরিত হচ্ছিলো। দ্বিতীয়তঃ মুহাজিররা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং যুলুম-নির্যাতনের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়ে খাঁটি সোনায় রূপান্তরিত হয়েছিলেন। তাঁদের প্রশিক্ষণ এবং সংশোধন স্বয়ং বিশ্ব নবী মুস্তফা সাল্লাল্লা হুআলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছিলেন। এ খাঁটি সোনা সদৃশ মুহাজিররা যাতে নওমুসলিম আনসার ভাইদের প্রশিক্ষণ দিতে পারেন, সে ব্যবস্থাই এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছিলো। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টির পূর্বেই আনসাররা মুহাজিরদের প্রতি ছিলেন দয়ার্দ্র বা সেবাগত প্রাণ। কিন্তু এ সম্পর্ক সৃষ্টির পর তাঁরা পাতানো ভাইদের সাথে আপন ভাইয়ের চেয়েও সুন্দর ব্যবহার করলেন। তাঁরা তাদেরকে নিজেদের ঘরে নিয়ে গেলেন এবং সকল ধন-সম্পদ ও আসবাব পত্রসহ ঘরের প্রতিটি জিনিস গুণে গুণে তার অর্ধেক দিয়ে দিলেন। আনসারদের মালিকানা দানের আবেগ ছিলো চূড়ান্ত পর্যায়ের। হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন রাবি' আনসারী নিজের দু' স্ত্রীর একজনকে নিজের মুহাজির ভাইয়ের জন্যে পৃথক করার প্রস্তুতি নিয়েই ফেলেছিলেন। এর বিশদ বিবরণ পূর্বেই দেয়া হয়েছে।

আনসাররা নিজের খেজুর বাগান এবং জমি মুহাজির ভাইদেরকে পেশ করলেন। বাগান পরিচর্যা এবং কৃষি বিষয়ে ওয়াকিবহাল না থাকার কারণে তাঁরা তা গ্রহণ করতে আপত্তি জানালেন। তখন আনসারদের ঈমানী জোশ উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। তাঁরা বললেন, এ খেজুরের বাগান ও জমি আমরা অবশ্যই আপনাদেরকে দিবো। তাতে কৃষি ও সেচ কাজ আমরাই করবো এবং উৎপাদিত শস্যের অর্ধেক আপনাদেরকে নিতে হবে। মুহাজিররা আন্তরিকতার

সাথে নিজের আনসার ভাইদের এ প্রস্তাব কবুল করলেন। খায়বার যুদ্ধ পর্যন্ত মুহাজিররা এ সকল খেজুর বাগান থেকে উপকৃত হতে থাকলেন। খায়বার যুদ্ধের পর তাঁরা এসব বাগান কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আনসারদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

সহীহ আল বুখারীতে বর্ণিত আছে, বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ভ্রাতৃত্ব সহোদরের মতই আত্মীয় হয়ে গিয়েছিলো। এমনকি কোনো আনসার ইন্তিকাল করলে মুহাজির ভাই তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হতেন এবং মরহুমের নিকটাত্মীয় তা থেকে বঞ্চিত হতেন। বদরের যুদ্ধের পর মুহাজিরদের আর্থিক অবস্থা ভালো হয়ে গেলে সূরা আল আনফালের এ আয়াত নাযিল হলো ঃ "নিকটাত্মীয় পরস্পরের বেশী হকদার।"–(আয়াত ঃ ৭৫)

বস্তুত আল্লাহ এ ফরমান বাস্তবায়নে আনসার এবং মুহাজিরদের পারস্পরিক উত্তরাধিকারের বিধান বাতিল করা হয় এবং শুধুমাত্র নিকটাত্মীয়ের মধ্যেই উত্তরাধিকারের নীতি চালু হয়।

আনসারদের ত্যাগ ও সততা নিজেদের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ভাইদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং যখনই প্রয়োজন হয়েছে তখনই তাঁরা হক পথে নিজের সাধ্যের বাইরেও কুরবানী পেশ করেছেন। হযরত হারিসাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন নু'মান আনসারী নিজের কয়েকটি বাড়ী প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাওয়ালা করে দিয়েছিলেন। এমনিভাবে আসহাবে সুফফার ভরণ-পোষণের বিষয়টিও নিজেদের দায়িত্বে নিয়েছিলেন। জিহাদের ডাক এলেই তাঁরা নিজেদের জান এবং মাল সমেত ইসলামের জন্যে দণ্ডায়মান হয়ে যেতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের যুদ্ধের পূর্বে আনসারদের ইচ্ছা বিশেষ করে অবহিত হলেন। কেননা তাঁরা মদীনার বাইরে গিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলো না। মুহাজিরদের সাথে পরামর্শের পর যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এখন অন্যরাও পরামর্শ দিন। আওস গোত্রের সরদার হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মায়াজ তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন এবং আবেগময় ভাষায় আরজ করলেন ঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি। আপনার রিসালাতের সত্যতা স্বীকার করেছি। আপনার আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। সুতরাং যা মর্জি হয় তাই করুন। সেই মহান আল্লাহর শপথ, যিনি আপনাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বানিয়ে প্রেরণ করেছেন। আপনি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলে আমরা তাই করবো। আমাদের একজন শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণকারীও পেছনে থাকবে না। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাদেরকে

যুদ্ধের ময়দানে অটল এবং বাহাদুর হিসেবেই পাবেন। আল্লাহ্ আমাদের তরফ থেকে আপনার চক্ষু শীতল করবেন।"

অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে, সেই সময় খাজরাজ গোত্রের সরদার হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহ্ আনহু বিন উবাদাহ্ এ বক্তৃতা করেছিলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! সম্ভবতঃ আপনি আনসারদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আপনি যদি সমুদ্রের নির্দেশ দেন, তাহলে আমরা তা পদদলিত করবো। আর যদি শুকনো স্থানের নির্দেশ দেন, তাহলে বারকে গামমাদ পর্যন্ত (হাবশাহ অথবা ইয়েমেনের একটি স্থানের নাম) উটের কলিজা গলিয়ে ফেলবো।"

আনসারদের জিহাদের আবেগ এবং ত্যাগের জযবাহ দেখে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা মুবারক আনন্দে ঝলমল করে উঠলো।

শুধু বদরের যুদ্ধেই নয় বরং আনসাররা প্রত্যেক যুদ্ধেই এবং সবসময়ই মুহাজিরদের পাশে থেকে হক পথে জীবন কুরবানীর চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। সত্য পথে তাদের জীবন দান এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেমের কতিপয় উদাহরণ এখানে পেশ করা হলো ঃ

হযরত হিন্দ রাদিয়াল্লাহ্ আনহা বিনতে আমর বিন হারাম আনসারীয়াহর স্বামী হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ্ আনহু বিন জামুহর সন্তান হযরত খাল্লাদ রাদিয়াল্লাহ্ আনহু বিন আমর রাদিয়াল্লাহ্ আনহু এবং ভাই হযরত আবদুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহ্ আনহু বিন আমর বিন হারাম ওহোদের যুদ্ধে বাহাদুরীর সাথে লড়াই করতে করতে শাহাদাত প্রাপ্ত হন। হযরত হিন্দ রাদিয়াল্লাহ্ আনহা স্বামী, সন্তান এবং ভাইয়ের শাহাদাতের খবর শুনে কোনো দুঃখ প্রকাশ না করে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কি অবস্থা আমাকে তা বলো। তাঁর তো কোনো ক্ষতি হয়নি ?"

লোকেরা যখন বললো, আল্লাহর ফযলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভালো আছেন, তখন তাঁর চেহারা আলোকোজ্জল হয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে তিনি যুদ্ধের ময়দানের দিকে রওয়ানা হলেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলেন, তখন অযাচিতভাবে মুখ দিয়ে একথা বেরিয়ে গেলো ঃ "আপনি ভালো থাকলে সব মুসিবতই তুচ্ছ ব্যাপার।"

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহ্ আনহু বিন নজর আনসারী ওহোদের যুদ্ধে কতিপয় বাহাদুর মুসলমানদেরকে অস্ত্র ফেলে দিয়ে বিষন্ন অবস্থায় বসে থাকতে দেখলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা যুদ্ধ ছেড়ে এখানে বসে আছো কেন ? তাঁরা বললেন, আফসোস ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদ

হয়ে গেছেন। হযরত আনাস বললেন, তাহলে তোমরা জীবিত থেকে কি করবে! ওঠো এবং হক বা সত্যের জন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন জীবনদান করেছেন তেমনি তোমরাও কাফেরদের সাথে লড়াই করে জীবন বিলিয়ে দাও। একথা বলেই অত্যন্ত জোশের সাথে তরবারি চালাতে চালাতে কাফেরদের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং ৭০টি আঘাত খেয়ে শহীদ হয়ে গেলেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মালেক খাদেমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, সূরা আল আহযাবের এ আয়াত হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন নজরের প্রসঙ্গেই অবতীর্ণ হয় ঃ "ঈমানদারদের মধ্যে এমনও আছেন যাঁরা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা সত্য করে দেখিয়েছেন। তাদের মধ্যে কেউ নিজের সময় পূর্ণ করেছে এবং কেউ সময় আসার অপেক্ষায় আছেন।"–(আয়াত ঃ ২৩)

হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আদী আনসারী এবং হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন দাছনা আনসারীকে যাদল ওকারাহর লোকেরা বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজি নামক স্থানে গ্রেফতার করলো। অতপর মক্কার কুরাইশদের হাওয়ালা করে দিলো। এ যালেমরা তাঁদের দু'জনকেই শূলে চড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলো। উরওয়াহ রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং মূসা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন উকবাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, মুশরিকরা যখন হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহ আনহুকে শূলে চড়াচ্ছিলো তখন তাঁকে উচ্চস্বরে ডেকে এবং কসম খেয়ে জিজ্ঞেস করলো, তোমার পরিবর্তে যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শূলে চড়ে এ সময় তুমি নিজের গৃহে আরামে অবস্থান কি পসন্দ করবে? হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন ঃ "আল্লাহর কসম ! মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র পায়ে যদি কাঁটাও ফোঁটে, আর আমি নিজের গৃহে আরামে বসে থাকবো—এটা আমার সহ্যের বাইরে।"

এমনিভাবে হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন দাছনাকে শূলে চড়ানোর আগে আবু সুফিয়ান (তখনও ঈমান আনেননি) জিজ্ঞেস করলো, "হে যায়েদ ! আল্লাহর কসম ! তুমি সত্যি সত্যি বলো, যদি তোমার পরিবর্তে মুহাম্মাদের গর্দান উড়িয়ে দেয়া হয়, তাহলে কি তুমি নিজের পরিবার-পরিজনসহ খুশীতে থাকবে ?"

এ হকপন্থী বীরপুরুষ আবু সুফিয়ানকে ঠিক একই জবাব দিয়েছিলেন যা খুবাইব রাদিয়াল্লাহ আনহু মুশরিকদের দিয়েছিলেন। অর্থাৎ আমিতো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পায়ে কাঁটা ফোঁটাও সহ্য করতে পারি না। তাঁর জবাব শুনে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো ঃ

"মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথী তাঁকে যেভাবে ভালোবাসে, দুনিয়ার আর কোনো ব্যক্তিরই এমন প্রেমিক নেই।"

ওহোদের যুদ্ধে হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন রবী' আনসারী মুশরিকদের বিরুদ্ধে বাহাদুরী প্রদর্শন করে মারাত্মকভাবে আহত হলেন। এক রাওয়ায়েত মতে তিনি ১২টি আঘাত পেয়েছিলেন এবং অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও তাঁর সাথে গভীর সম্পর্ক ছিলো। যুদ্ধের পর তিনি সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে দেখলেন না। সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুমদেরকে সম্বোধন করে বললেন, "এমন কি কেউ আছে যে, সায়াদ বিন রবী'র খবর আনবে?"

হযরত উবাই রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন কাআব আনসারী আরজ করলেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি যাচ্ছি। একথা বলে তিনি যুদ্ধের ময়দানে গেলেন এবং লাশের মধ্যে ঘুরে ঘুরে হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন রবীকে খোঁজ করতে লাগলেন। বার বার তাঁর নাম ধরে ডাকছিলেন, কিন্তু কোনো জবাব পাচ্ছিলেন না। অবশেষে তিনি উচ্চস্বরে একথা বললেন, "সায়াদ যদি জীবিত থাকো, তাহলে জবাব দাও—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন।"

সে সময় হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন রবী'র মুমূর্ষু অবস্থা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম শুনে শরীর ও রূহের সকল শক্তি একত্র করে তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিলেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র খিদমতে আমার সালাম পেশ করবে এবং আমার আনসার ভাইদেরকে বলবে, আল্লাহ না করুন আজ যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদ হয়ে থাকেন, আর তোমাদের মধ্যে যদি কেউ জীবিত থাকে, তাহলে আল্লাহর কাছে অবশ্যই মুখ দেখাতে পারবে না এবং তাঁর কাছে তোমাদের কোনো ওযরই গ্রহণীয় হবে না। আমরা লাইলাতুল আকাবাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আত্মোৎসর্গের ওয়াদা করেছিলাম।" একথা বলেই আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন।

আনসারদের এ কুরবানীর কারণেই আল্লাহর কাছে মুহাজিরদের মত তারাও মর্যাদার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিলেন। তাদেরকে সাচ্চা মু'মিন উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন এবং জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

কুরআনে কারীমে সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের মর্যাদা বিভিন্ন ভাবে বর্ণিত হয়েছে। কোথাও সকল সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের উচ্চমর্যাদার কথা সামষ্টিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং কাউকে বাদ না দিয়ে সবার জন্যে মাগফিরাত এবং বেহেশতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। কোথায়ও কোনো বিশেষ ঘটনা অথবা স্থান ও কাল হিসেবে সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুমের কোনো বিশেষ দলকে আল্লাহর সন্তুষ্টির সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। কোনো কোনো স্থানে এমন আয়াতও আছে, যা কোনো বিশেষ সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুর শানে নাযিল হয়েছে। এমন অনেক আয়াতও আছে যা পূর্বে নাযিল হয়েছিলো। এ সত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোনো সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুর কোনো বিশেষ নেক কাজ দেখেছেন তখন এসব আয়াত তিলাওয়াত করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি এটাই বলতে চেয়েছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অমুক সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুর এ কাজ আল্লাহর কাছে এত পসন্দনীয় যে, তাঁর উপর এ আয়াত প্রযোজ্য।

যেসব আয়াতে সকল সাহাবীকে জান্নাতী বলা হয়েছে, তার মধ্যে কতিপয় উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। এখন অন্য ধরনের কিছু উদাহরণ এখানে পেশ করা হলো ঃ

৬ষ্ঠ হিজরীর ১লা যিলকদ সারওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওমরাহর ইরাদা করলেন এবং ১৪শ সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহু সহ মদীনা মুনাওয়ারাহ থেকে মক্কা যাত্রা করলেন। তিনি সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুমদেরকে তরবারি ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র সাথে নিতে নিষেধ করলেন এবং তরবারিও খাপে ভরে নিতে বললেন। জুল হুলাইফা পৌঁছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুম ইহরাম বাঁধলেন। এদিকে মক্কার কুরাইশরা মুসলমানদের আগমনের খবর পেয়ে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খবর পেলেন যে, কুরাইশরা বাধা দিতে প্রস্তুত তখন তিনি হুদাইবিয়া পৌঁছে তাঁবু খাটালেন এবং সেখান থেকে কুরাইশদের কাছে এক পয়গাম প্রেরণ করলেন। পয়গামে তিনি জানালেন যে, আমরা শুধু ওমরাহ করতে এসেছি। লড়াই করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কুরাইশরা দু'দিন পর উরওয়াহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মাসউদ সাকাফীকে (তিনি তখনো ঈমান আনেননি) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আলোচনার জন্যে পাঠালো। তিনি আলাপ-আলোচনার পর ফিরে গিয়ে কুরাইশদেরকে আলোচনার বিস্তারিত জানালেন এবং সাথে সাথে আরো বললেন ঃ

"হে কুরাইশ ভাইয়েরা ! দুনিয়ার বড় বড় রাজা-বাদশাহদের দরবারে যাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে। আমি কাইসার ও কিসরা এবং নাজ্জাশীর

দরবারের শান-শাওকাত দেখেছি। কিন্তু আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথীরা তাঁকে যে ইজ্জত এবং সম্মান করে তা কোনো ক্রয়কৃত গোলামও সেসব রাজা-বাদশাহদের সাথে করে না। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের থু থু ফেললেও এসব মানুষ অগ্রসর হয়ে সে থু থু নিজের হাতে নেয় এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে তা মুখে এবং হাতে লাগায়। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওযু করলে এসব মানুষ ব্যবহৃত পানির প্রতিটি ফোটার উপর এমনভাবে ঝাপিয়ে পড়ে, যেন তাঁরা পরস্পর এজন্যে লড়াই করে জীবন দেবে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো নির্দেশ দিলে তা পালনের জন্যে সবাই এগিয়ে আসে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো কথা বললে সকলেই চুপ মেরে যায়। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন মর্যাদা যে, কোনো সাথী তাঁর প্রতি তাকাতেও সাহস পায় না। আমার কথা যদি তোমরা শোন, তাহলে তোমরা তাঁর সাথে সন্ধি করে নাও।"

কুরাইশরা যদিও উরওয়াহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মাসউদকে বুযর্গ ব্যক্তি হিসেবে মানতো কিন্তু তাঁর পরামর্শের প্রতি কর্ণপাত করলো না। ওদিকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উরওয়াহ রাদিয়াল্লাহ আনহুর ফিরে যাওয়ার পর হযরত ওসমান যুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুকে নিজের দূত হিসেবে কুরাইশদের কাছে প্রেরণ করলেন। কুরাইশরা হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুকে মক্কায় আটকে ফেললো। যখন তিনি ফিরে এলেন না তখন মুসলমানদের মধ্যে প্রচারিত হলো যে, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুকে মুশরিকরা শহীদ করে ফেলেছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "যদি এ খবর সঠিক হয়, তাহলে আমরা ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর বদলা নেয়া ছাড়া এখান থেকে ফিরে যাবো না।" সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুম যদিও সরঞ্জামহীন ছিলেন তবুও সবাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথায় সাড়া দিলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি বাবলা বৃক্ষের নীচে বসে পড়লেন এবং মুসলমানদের কাছ থেকে দেহে জীবন থাকা অবস্থায় কাফেরদের সাথে লড়াই করার ও পেছনে না হটার বাইআত নিলেন।

সকল সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুম অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে জীবন কুরবানী করার বাইআত করলেন। ইসলামের ইতিহাসে এ বাইআত "বাইআতে রিদওয়ান" নামে প্রসিদ্ধ। এ সময় সূরায়ে আল ফাতাহর এ আয়াত নাযিল হয় ঃ "আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। যখন তারা বৃক্ষের নীচে তোমার কাছে বাইআত করছিলেন। তাদের অন্তরের অবস্থা তিনি জানতেন।"–(আয়াত ঃ ১৮)

হিজরতের সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু গারে ছুর এবং মদীনা সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে থাকার মহান মর্যাদা লাভ করেছিলেন। এ কাজটি ছিলো জীবন বাজী রাখার কাজ। কেননা, সে সময় মক্কার কাফেররা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাথীদের জীবন হননের অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিলো। আল্লাহ পাক হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর জীবন কুরবানী করার আবেগ এত পসন্দ করলেন যে, এ আয়াত নাযিল করলেন ঃ তোমরা যদি রাসূলকে সাহায্য না করো, তাহলে আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেছে। যে সময় কাফেররা তাঁকে বহিষ্কার করেছিলো তখন সে দু'জনের দ্বিতীয় ছিলো। যখন তাঁরা গার এ ছিলেন তখন তিনি নিজের সাথীকে বলছিলেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ৪০)

যেন স্বয়ং আল্লাহ পাক হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুকে দু'জনের একজনের মর্যাদাপূর্ণ খিতাবে ভূষিত করলেন।

যখন সূরা আল হাদীদের এ আয়াত নাযিল হলো ঃ "কে আছো যে, আল্লাহকে কর্জ দেবে ? ভালো কর্জ। যাতে আল্লাহ তাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে ফেরত দেবে এবং তার জন্যে উত্তম বদলা রয়েছে।"–(আয়াত ঃ ১১)

এ আয়াত শুনে হযরত আবুদ দাহদাহ আনসারী রাদিয়াল্লাহ আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহ কি আমাদের কাছে কর্জ চান ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আবুদ দাহদাহ ! হ্যাঁ। তিনি আরজ করলেন, "আপনার হাতটা আমাকে একটু দেখান।" হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পবিত্র হাত তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। তিনি তা নিজের হাতে নিয়ে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি আল্লাহকে আমার বাগান কর্জ দিয়ে দিয়েছি।" হযরত আবুদ দাহদাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু যে বাগানটি আল্লাহর রাহে দিলেন তাতে ৬শ খেজুরের গাছ ছিলো এবং সেখানে তাঁর বাড়ী ছিলো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথা বলে তিনি সোজা বাড়ী গেলেন এবং স্ত্রীকে ডেকে বললেন, "দাহদাহর মা ! বেরিয়ে এসো। আমি এ বাগান আল্লাহকে কর্জ দিয়ে দিয়েছি।"

স্ত্রীও নেকবখত ছিলেন। বললেন, হে আবুদ দাহদাহ, তুমি লাভের বাণিজ্য করেছো।" এবং তৎক্ষণাৎ সামান নিয়ে বাগান থেকে বের হয়ে এলেন।

একদিন সারওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের এক দলের মধ্যে মধ্যমণি হিসেবে বসেছিলেন।

এ সময় এক ব্যক্তি পেরেশান অবস্থায় তাঁর খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! আমি একজন মুসাফির। মদীনায় আমার থাকা ও খাওয়ার কোনো বন্দোবস্ত নেই। আপনার সাহায্যের মুখাপেক্ষী।"

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৎক্ষণাৎ আজওয়াজে মুতাহিরাতের (স্ত্রীদের) কাছে ঘরে কিছু খাবার আছে কিনা তা জিজ্ঞেস করে পাঠালেন। সবদিক থেকেই উত্তর এলো যে, আজ সবাই ভুখা। তখন তিনি সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের দিকে তাকালেন এবং বললেন ঃ "এমনকি কেউ আছে, যে আল্লাহর বান্দাহকে মেহমান বানাবে ?"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ শুনে হযরত আবু তালহা আনসারী রাদিয়াল্লাহ আনহু উঠে দাঁড়ালেন এবং আরজ করলেন ঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তাকে আমার সাথে নিয়ে যাবো।" একথা বলেই তিনি বাড়ী গেলেন এবং স্ত্রীকে মেহমান আগমনের খবর দিলেন। তিনি জানালেন, "বাচ্চাদের জন্য কিছু পাকানো হয়েছে। এছাড়া আল্লাহর কসম ঘরে কিছুই নেই।"

হযরত আবু তালহা রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, "এতে ক্ষতির কিছু নেই। বাচ্চাদেরকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে শুইয়ে দাও। যখন তারা শুয়ে পড়বে তখন আমরা তাদের খাবার মেহমানের সামনে দেব। তুমি চেরাগ ঠিক করার বাহানায় উঠে তা নিভিয়ে দেবে। অন্ধকারে মেহমান খাবার খেয়ে নেবে এবং আমরাও এমনি এমনি মুখ চালাতে থাকবো।"

মোটকথা, এভাবে মেহমানকে খাবার খাইয়ে স্বামী-স্ত্রী দু'জন এবং বাচ্চারা রাতে অভুক্ত অবস্থায় কাটালেন। সকালে যখন এ অপরিচিত মেহমান হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হলেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে সূরা আল হাশরের এ আয়াত উচ্চারিত হচ্ছিলো ঃ "এবং সে ব্যক্তি নিজের ওপর অন্যদের অগ্রাধিকার প্রদান করে। যদিও তাঁরা ক্ষুধাতুর থাকে।"-(আয়াত ঃ ৯)

আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছিলেন, "রাতে মেহমানের সাথে তোমাদের ব্যবহার আল্লাহ খুব পসন্দ করেছেন।"

এভাবে আরো একদিন এই হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহ আনহুই রাসূলের কাছে উপস্থিত ছিলেন। ঠিক এমনি সময় সূরা আলে ইমরানের এ আয়াত নাযিল হলো ঃ "যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ না করবে ততক্ষণ তোমরা কখনই সওয়াব পাবে না।"-(আয়াত ঃ ৯২)

মসজিদে নববীর সামনে এক প্রশস্ত ও সুন্দর বাগানের মালিক ছিলেন হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহ আনহু এ বাগানের কূপ "বিরহার" পানি অত্যন্ত পরিষ্কার, সুমিষ্ট ও খোশবুদার ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত উৎসাহের সাথে কূপের পানি পান করতেন। মদীনায় এ ধরনের সম্পদ অত্যন্ত মূল্যবান বলে পরিগণিত হতো। কিন্তু হযরত আবু তালহা উঠে দাঁড়ালেন এবং আরয করলেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ হলো 'বিরহা'। আমি তা আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করছি। আল্লাহর কসম ! যদি একথা গোপন রাখা যেতো তাহলে তা কখনো প্রকাশ করতাম না।"

আল্লাহর পথে তাঁর খরচের জযবাহ দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা মুবারক আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তাঁর জন্যে দোয়া করলেন এবং বললেন, নিজের নিকটাত্মীয়দের মধ্যে এ বাগান বণ্টন করে দাও। তিনি তৎক্ষণাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পালন করলেন এবং সমগ্র বাগান আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।

কুরআনে হাকীমে সাহাবা কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের ভালো কাজের আকাঙ্ক্ষা, ত্যাগ ও আল্লাহর পথে ব্যয়ের প্রশংসা প্রায়ই করা হয়েছে ; আল্লাহর পথে ব্যয়ের একটি চূড়ান্ত নজীর হলো ঃ তাবুকের যুদ্ধের সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুমদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয়ের আহ্বান জানালেন। এ সময় অন্যান্য সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুম নিজেদের সামর্থের চেয়ে বেশী সম্পদের কুরবানী দিলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু এক ইতিহাস সৃষ্টি করলেন।

তিনি ঘরের সেলাইয়ের সুতা পর্যন্ত এনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পেশ করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, আবু বকর, ঘরে কিছু রেখে এসেছো তো ? জবাবে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম ছাড়া আর কিছুই রেখে আসিনি। আর তাই আমার জন্যে যথেষ্ট।"

সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুম এমনি ধরনের উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ পাক তাদের পথকে অনুকরণীয় পথ হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁদের বিরোধিতাকে রাসূলের বিরোধিতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সূরায়ে আন নিসাতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

"তাদের সামনে হিদায়াতের রাস্তা খুলে যাওয়ার পরও যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করে এবং মু'মিনদের রাস্তা

পরিত্যাগ করে চলে ; আমরা তাদেরকে সে দিকে ফিরিয়ে দেব যেদিকে তারা ফেরে এবং কিয়ামাতের দিন জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। আর জাহান্নাম অত্যন্ত খারাপ স্থান।"–(আয়াত ঃ ১১৫)

মুফাসসিরদের কাছে এখানে 'মু'মিনদের রাস্তা'র অর্থ হলো সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুমের রাস্তা বা পথ, আর সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুম সেই পবিত্র নফস সম্পর্কে কুরআনে হাকীমে বার বার তারিফ এবং প্রশংসা করা হয়েছে। সাহাবীগণের উন্নত চরিত্র ও সুন্দর সুষ্ঠু কাজের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে হলে ভারি ভারি কিতাব রচনা করতে হয়। এখানে তাদের কতিপয় গুণাবলীর কথা উল্লেখ করা হলো।

সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুম ছিলেন আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের অনুগত, সত্য ঈমানের অধিকারী, নেক নিয়তধারী, নেকীর প্রতি অগ্রগামী, প্রতিটি ভালো কাজে আগুয়ান, হকের জন্য জীবন বাজী রাখা, হকের জন্যে আত্মীয়-স্বজন, স্বদেশ, ঘর-বাড়ী, ধন-সম্পদ সবকিছুই কুরবানী করা, হালাল কামাই এবং হালাল খাওয়া, হারাম থেকে বিরত থাকা, ন্যায়পরায়ণ, আমানতদার, প্রতিশ্রুতি পূরণকারী, হক পথে সব ধরনের মুসীবতে ধৈর্য এবং স্থৈর্যের সাথে মুকাবিলাকারী, মুখলিস, হক পথে বেশী বেশী সম্পদের কুরবানী করা, নিজের প্রয়োজনের উপর অন্যের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার প্রদান, নিজের জবানকে আয়ত্বে রাখা, পরস্পর রহমশীল, কাফেরদের ওপর কঠিন, কবীরাহ গোনাহ এবং বে-শরমী থেকে বেঁচে থাকা, নিজেদের গুপ্তস্থান হেফাযত করা, রাগের সময় ক্ষমা করা, নামায কায়েম করা, হজ্জ করা, রোযা রাখা, যাকাত প্রদান করা, জ্ঞান আহরণ করা, নেক কাজের নির্দেশ দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা, সত্য সাক্ষ্য প্রদান করা, আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করা, মুসীবতে ধৈর্যধারণ, ফখর এবং আত্মম্ভরিতা থেকে দূরে থাকা, গরীব, মিসীকন ও সওয়ালকারীকে সাহায্য করা, প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করা, পিতা-মাতার খিদমত করা রাতের নির্জনত্বে বেশী বেশী সেজদা করা সহ এ ধরনের বহু গুণের আধার ছিলেন তাঁরা।

সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুম এ গুণের বদৌলতেই আল্লাহর প্রিয় ও পসন্দীয় হতে পেরেছিলেন। তাঁদের মর্যাদার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এর থেকে আর কি হতে পারে যে, কুরআনে পাকে তাঁদেরকে ইহ ও পরকালে সফলতায় অভিষিক্ত মানুষ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং প্রকাশ্য ভাষায় বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে।"

একজন মুসলমানের জীবনের লক্ষ্যই হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং পরকালীন মুক্তি। কিন্তু যেসব মহান নফসকে স্বয়ং আল্লাহ নিজের সন্তুষ্টির সুসংবাদ দেন ; তাদের মরতবা ও মর্যাদার আন্দাজ কে করতে পারে ? নিসন্দেহে নবী আলাইহিস সালামদের পর তাঁরাই হলেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। আর যে ব্যক্তি তাদের পদাংক অনুসরণ করে চলে তার ভাগ্যবান হওয়া সম্পর্কে কোনো কথাই উঠতে পারে না। আল্লাহ পাক সকল মুসলমানকে সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের পদাংক অনুসরণ করার তাওফীক দিন।—আমীন।

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহ আনহু

বিশ্ব নেতা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন স্বগৃহে অবস্থান করছিলেন। সে সময় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় সুঠাম ও লম্বাদেহী, প্রশস্ত বুক এবং নার্গিস ফুল সদৃশ চক্ষু সম্বলিত এক সুদর্শন ব্যক্তি তাঁর কাছে ভেতরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আইহিহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র চেহারা প্রফুল্লতায় ছেয়ে গেলো এবং বললেন ঃ

"মারহাবা বিত তাইয়িবুল মুতাইয়িব"—খোশ আমদেদ ! পবিত্র ও পূত-পবিত্র মানুষ। সৃষ্টির সেরা, বিশ্বের গর্ব ও সাইয়্যেদুল আম্বিয়া যাঁকে তাইয়িবুল মুতাইয়িব উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন তিনি ছিলেন হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহ আনহু।"

হযরত আবুল ইয়াকজান আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবীদের মধ্যে গণ্য হতেন। তাঁর পিতা ইয়াসির রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আমের এবং মাতা সুমাইয়া বিনতে খিয়াতও সাহাবীয়া হওয়ার গৌরব পেয়েছিলেন। তাঁর বংশধারা নিম্নরূপ ঃ

আম্মার বিন ইয়াসির বিন আমের বিন মালিক কিনানা বিন কায়েস বিন আল হাসিন বিন লাওজিম বিন আওফ বিন আমের আল-আকবার বিন ইয়াম বিন উনুস।

হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর পিতা হযরত ইয়াসির রাদিয়াল্লাহ্ আনহু বিন আমের কাহতানী বংশোদ্ভূত এবং ইয়েমেনের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি তাঁর নিখোঁজ ভাইয়ের খোঁজে মক্কায় আসেন। তাঁর সাথে দু' ভাই মালিক এবং হারিসও ছিলেন। মক্কায় নিখোঁজ ভাইয়ের কোনো সন্ধান না পেয়ে মালিক এবং হারিস ফিরে যান। কিন্তু ইয়াসির বিন আমের আবু হুজাইফা বিন আল মুগিরা মাখজুমীর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কস্থাপন করে মক্কাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এটা ছিলো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির প্রায় ৪৫ বছর পূর্বেকার ঘটনা। আবু হুজাইফা বিন আল মুগিরা নিজের দাসী সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহ আনহা বিনতে খাবাতের সাথে হযরত ইয়াসির বিন আমেরের বিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর ঔরষে হযরত সুমাইয়ার দুই পুত্র হযরত আম্মার এবং আবদুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন। আবু হুজাইফা এ সমগ্র পরিবারটিকে

অত্যন্ত স্নেহের সাথে দেখতেন। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুয়াত পেলেন এবং সত্যের দাওয়াত প্রদান শুরু করলেন। নবুয়াত প্রাপ্তির প্রথম যুগেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতে সাড়া দিয়েছিলেন সজ্জন চরিত্রের এ পরিবারটি। তাঁদের ইসলাম গ্রহণের সঠিক কাল কোন্‌টি ছিলো ? মশহুর বর্ণনা মতে হযরত আম্মার নবুয়াতের প্রথম তিন বছরের কোনো এক সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

সহীহ আল বুখারীর এক বর্ণনা মতে হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু ঈমান আনার পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু ছাড়া শুধু পাঁচজন গোলাম এবং দু'জন মহিলাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দেখেছিলেন। অন্য এক বর্ণনা মতে হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে শুধু সাতজনই ইসলাম কবুল করেছিলেন। কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ফাতহুল বারি এবং আল্লামা ইবনে আসির "উসুদুল গাব্বা" গ্রন্থে লিখেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে সে সময় ৩০জনেরও বেশী লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মুশরিকদের ভয়ে ভীত হয়ে অবশ্য তাঁরা ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেননি। এটা ছিলো সেই যুগ যখন বিশ্বনেতা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে তাবলীগের দায়িত্ব আঞ্জাম দিচ্ছিলেন। তখনো তিনি সাধারণ্যে দাওয়াতের কাজ শুরু করেননি।

ইবনে সায়াদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহির বর্ণনা মতে, হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর ইসলাম গ্রহণের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আরকাম রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি আরকামের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন। হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত সোহায়েব বিন সানান রুমী এক সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। স্বয়ং হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকেই বর্ণিত আছে যে, "আমি সোহায়েব রাদিয়াল্লাহ আনহুকে আরকাম বিন আবি আরকামের দরযায় দেখে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি উদ্দেশ্যে এসেছো ? সোহায়েব রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, আগে তুমি তোমার উদ্দেশ্য বর্ণনা করো। আমি বললাম, আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দেখা করে তাঁর কথা শুনতে চাই। (অর্থাৎ তাঁর দাওয়াতের অবস্থা জানতে চাই)। সোহায়েব রাদিয়াল্লাহ আনহু বললো, আমারও একই উদ্দেশ্য। সুতরাং আমরা দু'জন এক সাথে ভেতরে প্রবেশ করলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করে ইসলাম গ্রহণ করলাম।" হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে অথবা কিছু আগে পরে তাঁর পিতা-মাতা এবং ভাই ঈমান এনেছিলেন।

ইবনে সায়াদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বললেন, আবু হুজাইফা হযরত আম্মারকে শৈশবকালেই স্বাধীন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহ আনহাকে নিজের দাসীত্বে রেখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর উত্তরাধিকারদের (আবু জেহেল প্রমুখ) দাসত্বে এসেছিলেন। হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর ভাই আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুর প্রশ্ন কেউই স্পষ্ট করে বলেননি যে, তাঁকে এতদিনে আযাদ করে দেয়া হয়েছিলো অথবা তিনি গোলামই ছিলেন। মোটকথা এ পরিবার বনু মাখজুমের সাথেই সম্পৃক্ত ছিলেন। হক বা ন্যায়পন্থীদের জন্যে এটা ছিলো এক ভয়ংকর যুগ। মক্কার যে ব্যক্তিই ইসলাম গ্রহণ করতো সে কুরাইশ মুশরিকদের ক্রোধ এবং যুলুম-নির্যাতনের শিকার হতো। মুশরিকরা এ ব্যাপারে নিজের নিকটতম বন্ধুরও কোনো তারতম্য করতো না। এ প্রবাসী বন্ধুহীন পিতা-পুত্র এবং হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহ আনহার উপর মুশরিকরা ইসলাম গ্রহণের অপরাধে লোমহর্ষক নির্যাতন চালিয়েছিলো। এ নির্যাতনের কাহিনী শুনে মানবতার মস্তক অবনত না হয়ে পারেনি। হযরত ইয়াসির রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহ আনহা উভয়ই অত্যন্ত দুর্বল এবং বয়স্ক মানুষ ছিলেন। কিন্তু কাফেরদের সব ধরনের যুলুম-নির্যাতন সত্ত্বেও তাঁদের কদম মুহূর্তের জন্যেও হক থেকে এদিক ওদিক হয়নি। তাঁদের পুত্রদের বেলায়ও একই অবস্থা ছিলো। তাঁদেরকে লৌহ বর্ম পরিয়ে জলন্ত উত্তপ্ত বালিতে শুইয়ে দেয়া এবং তাঁদের পেছনে আগুন দিয়ে দাগ দেয়া কাফেরদের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। কিন্তু তাওহীদের নেশা তাদেরকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিলো যে, সত্য পথ থেকে বিচ্যুতির কথা তারা মুখেও আনতো না।

বালাজুরী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হযরত উম্মে হানী রাদিয়াল্লাহ আনহা থেকে এ বর্ণনা নকল করেছেন যে, একদিন এ চার পবিত্র আত্মার ব্যক্তি কাফেরদের হাতে ভয়ানক নির্যাতন ভোগ করছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁদের উপর কঠিন নির্যাতন প্রত্যক্ষ করে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং বললেন ঃ "ধৈর্য ধর হে ইয়াসিরের বংশধর ! তোমাদের জন্যে বেহেশতের ওয়াদা রয়েছে।"

ইবনে সায়াদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সে স্থান অতিক্রম করছিলাম যেখানে এ পরিবারটিকে শাস্তি দেয়া হচ্ছিলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমালেন ঃ "ধৈর্য ধর–হে আল্লাহ ! ইয়াসিরের বংশধরদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং তুমি তো তাদেরকে ক্ষমা করেই দিয়েছো।"

বৃদ্ধ ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু এ নির্যাতন সইতে সইতে একদিন আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। অতপর একদিন আবু জেহেল হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার নাজুক স্থানে বর্শা নিক্ষেপ করলো। বর্শার আঘাতের ব্যথায় কাতর হয়ে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। ন্যায় ও সত্যের পথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এটাই হলো প্রথম শাহাদাতের ঘটনা। যালেম আবু জেহেল হযরত আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিরকেও তীর মেরে শহীদ করলো। এখন শুধুমাত্র আম্মার বাকী রইলেন। মায়ের যন্ত্রণা দেখে তাঁর কলিজা ছিঁড়ে যেতে লাগলো। কাঁদতে কাঁদতে হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে তাঁর মায়ের কাহিনী শুনিয়ে আরজ করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! যুলুম তো এখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।" হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ধৈর্য অবলম্বনের নির্দেশ দিলেন এবং বললেন ঃ "হে আল্লাহ ! ইয়াসিরের পরিবারকে দোযখের আগুন থেকে নিষ্কৃতি দাও।"

পিতা-মাতা এবং ভাইয়ের শাহাদাতের পরও হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু যথারীতি কাফেরদের যুলুম-নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তু হয়ে রইলেন।

ইবনে সায়াদ বর্ণনা করেছেন ঃ একবার এক ব্যক্তি হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুর গায়ের জামা খুলে ফেললেন। তিনি তাঁর পিঠে শুধু দাগ আর দাগ দেখতে পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, একি ? তিনি বললেন, মক্কার উত্তপ্ত বালির উপর আমাকে যে শাস্তি দেয়া হতো এটা তারই নিদর্শন।

এরপর মুশরিকরা হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আগুনের উপর শুইয়ে দিলো। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর মাথার উপর হাত রাখলেন এবং বললেন ঃ হে আগুন ! আম্মারের উপর তুমি এমনভাবে শীতল হয়ে যাও যেমন তুমি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের উপর হয়েছিলে।"

একবার মুশরিকরা হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পানির মধ্যে এমনভাবে ডুবিয়ে দিলো যে, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। এ অবস্থায় সেসব যালেমরা তাঁর মুখ দিয়ে এমন সব অশোভনীয় কথা বলিয়ে নিলো যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অস্বীকৃতি এবং মূর্তিদের (মুশরিকদের মাবুদ) প্রশংসাসূচক ছিলো। যখন তিনি এসব হতভাগার কাছ থেকে মুক্তি পেলেন তখন কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাজির হলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি ব্যাপার ! তোমার কি হয়েছে যে কাদছো ? তিনি আরজ করলেন ঃ হে

আল্লাহর রাসূল ! অত্যন্ত খারাপ কথা। আপনার ব্যাপারে অশোভনীয় কথা এবং মুশরিকদের মাবুদদের প্রশ্নে প্রশস্তি না গাওয়া পর্যন্ত আমাকে তারা ছেড়ে দেয়নি।"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার অন্তরের অবস্থা কি ? তিনি আরজ করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহর ফযলে আমার অন্তর আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমানে অবিচল রয়েছে।"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত স্নেহের সাথে তাঁর চোখের পানি মুছে দিলেন এবং বললেন ঃ কোনো ভয় নেই। ভবিষ্যতেও যদি তারা তোমার ওপর নির্যাতন চালায় এবং একই ধরনের দাবী করে, তাহলে জীবন রক্ষার জন্যে তুমি এ ধরনের করো।"

অসংখ্য মুফাসসির লিখেছেন যে, যে ব্যক্তি ঈমান গ্রহণের পর কুফরী করে, সে যদি বাধ্য হয়ে গিয়ে থাকে, অথচ তার অন্তর ঈমানের প্রতি পূর্ণ আস্থাবান ও অবিচল থাকে" (তবে কোনো দোষ নেই)। সূরা আন নাহালের ১০৬)। এ আয়াত সে প্রসঙ্গেই নাযিল হয়েছে।

হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু মদীনায় হিজরত পর্যন্ত অব্যাহতভাবে মক্কায় অবস্থান করে কাফেরদের নির্যাতন সহ্য করতে থাকেন। অথবা তিনি কিছু দিনের জন্যে হাবশাহ গিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে মতভেদ রয়েছে। কতিপয় ইতিহাসবিদ লিখেছেন যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইঙ্গিতে দ্বিতীয় হিজরতে হাবশায় (নবুয়াত প্রাপ্তির ৬ বছর পর) চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থানের পর মক্কায় ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু বেশীর ভাগ ইতিহাসবিদ হাবশায় দ্বিতীয় হিজরতে অংশগ্রহণকারী যেসব মুহাজিরের তালিকা দিয়েছেন তাতে হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর নাম নেই। যা হোক, এ ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করে থাকেন যে, হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু সেসব সাহাবার অন্তর্ভুক্ত যাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের কিছু আগে (এক-দুই মাস) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। সহীহ আল বুখারীর মতে যেসব পূত-পবিত্র ব্যক্তি সর্বপ্রথম মক্কা থেকে মদীনার দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন তাঁরা হলেন ঃ হযরত আবু সালমাহ আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবদুল আসাদ মাখজুমী, হযরত আমের রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন রবিয়াহ আনজী, [হযরত আমের রাদিয়াল্লাহ আনহুর পত্নী] হযরত লায়লা রাদিয়াল্লাহ আনহা বিনতে আবি হাসমা, হযরত সাদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি ওক্কাস, হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন রাবাহ।

হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রথমে কুবা গমন করলেন। এখানে বনি আমর বিন আওফ গোত্রের হযরত মুবাশশির রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবদুল মানযার তাঁকে নিজের মেহমান বানিয়ে নিলেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও মক্কা থেকে হিজরত করে কুবাতে শুভ পদার্পণ করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে কুবার ভিত্তিস্থাপন করলেন। এ সময় হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুও অন্যান্য সাহাবাদের সাথে মসজিদের নির্মাণ কাজে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নিলেন। ইমাম হাকিম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি নিজের পুস্তক 'মুসতাদরাক' এ এও লিখেছেন যে, কুবা মসজিদের জন্যে হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুই পাথর একত্রিত করেছিলেন এবং তার নির্মাণ কাজও তিনিই আঞ্জাম দিয়েছিলেন। কিছুদিন পর হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমভিব্যাহারে কুবা থেকে মদীনা চলে আসেন। ইবনে সায়াদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্যে হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুকে এক টুকরো জমি দিয়েছিলেন। ধারণা করা হয় যে, হিজরতের অব্যবহিতি পরেই তাঁকে এ জমি দেয়া হয়নি। বরং কিছুদিন পর তাঁকে জমি দেয়া হয়েছিলো। কেননা হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু কিছুদিনের জন্যে আসহাবে সুফ্ফারও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

মদীনা মুনাওয়ারাতে আগমনের কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আইমানের ইসলামী ভাই হলেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ শুরু করলেন। সব সাহাবা এ কাজে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নিলেন। দোজাহানের নেতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যান্যদের মত স্বয়ং ইট ও অন্যান্য বস্তু বহন করে আনতেন। সাহাবারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ কষ্ট না করার মিনতি জানালেন এবং বললেন, আমরাই এ কাজ করবো। কিন্তু তিনি এ প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন।

এ সময় হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু ইট এনে এনে দিতেন এবং এ কবিতা আবৃত্তি করতেন ঃ "আমরা মুসলমান, আমরা মসজিদ বানাই।"

সহীহ বুখারীতে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা একটি করে ইট আনছিলাম আর আম্মার আনছিলো দু'টি

করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে দেখে তাঁর শরীর থেকে মাটি পরিষ্কার করতে লাগলেন এবং বললেন, হায় আম্মার তাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।

তবকাতে ইবনে সায়াদে (র) একটি বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এ বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, একদিন জনৈক ব্যক্তি হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর মাথার ওপর এমন এক বোঝা এনে চাপিয়ে দিলেন যে, তা দেখে লোকজন চেঁচিয়ে উঠে বললো, "এ বোঝা আম্মারকে মেরে ফেলবে।" আগেও তিনি এ ধরনের অভিযোগ করেছিলেন (সামর্থের বেশী বড় বোঝা তাঁর ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা শুনলেন এবং কিছু ইট নামিয়ে ফেলে দিলেন। এরপর বললেন ঃ "আফসোস হে ইবনে সুমাইয়াহ! এক বিদ্রোহী গ্রুপ তোমাকে হত্যা করবে।"

হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু সত্য পথের এক নির্ভীক সেনানী ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলো তাঁর নিখাদ সম্পর্ক। তিনি বদর থেকে শুরু করে তাবুক পর্যন্ত সকল যুদ্ধেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহগামী ছিলেন এবং প্রত্যেক যুদ্ধেই জীবন বাজী রেখে লড়াই করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে সম্ভবতঃ এমন কোনো মর্যাদা নেই যা তিনি লাভ করেননি। নামকরা যুদ্ধসমূহ ছাড়াও তিনি ছোট ছোট যুদ্ধেও অংশ নিয়েছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীনের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা এবং ত্যাগের আবেগের স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তাঁকে অত্যন্ত সম্মান দিতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে এক অভিযানের আমীর বানিয়ে প্রেরণ করলেন। তাঁর অধীনের সৈন্যদের মধ্যে হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহ আনহুও ছিলেন। এ বাহিনী রওয়ানা হলো। যাদের বিরুদ্ধে সকালে যুদ্ধ করার কথা সে গোত্রের কাছে পৌঁছলো এবং রাতের শেষের দিকে সেখানে তাঁবু ফেললো। সে গোত্রের কোনো ব্যক্তিই মুসলমানদের আগমনের কথা জানলো এবং তারা পালিয়ে গেলো।

অবশ্য এক ব্যক্তি সেখানেই রয়ে গেলো। কেননা সে এবং তার স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। তবুও তার স্ত্রী পালিয়ে যাওয়ার জন্যে সওয়ারীর ওপর আসবাবপত্র বোঝাই করলো। এ অবস্থায় সে ব্যক্তি তাকে বললো, আমার ফিরে আসা পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করো। এরপর সে মুসলমানদের তাঁবুতে এসে হযরত আম্মারের সাথে সাক্ষাত করলো এবং বললো, হে আবুল ইয়াকজানা। আমি এবং আমার পত্নী ইসলাম গ্রহণ করেছি। একথা কি

কোনো উপকারে আসবে ? আমার গোত্রের লোকেরাতো তোমাদের আগমনের কথা শুনে পালিয়ে গেছে ? হযরত আম্মার বললেন, তুমি থাক। তোমার নিরাপত্তা দিচ্ছি। বস্তুতঃ সে ব্যক্তি এবং তার পত্নী নিজের বস্তিতেই রয়ে গেলো। সকালে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু সে বস্তিতে অভিযান চালালেন। কিন্তু দেখলেন, সবাই পালিয়ে গেছে। তাঁরা সেই ব্যক্তি এবং তার পত্নীকে আটক করলেন। হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বললেন, তুমি এ ব্যক্তির সাথে কঠোর আচরণ করো না। কেননা সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, এ ব্যক্তির সাথে তোমার সম্পর্ক কি ? তুমি কি তাকে আশ্রয় দেবে। প্রকৃতপক্ষে আমি বাহিনীর নেতা।

হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, হ্যাঁ, যদিও তুমি নেতা তবুও আমি তাকে আশ্রয় দেবো। এ ব্যক্তি ঈমান এনেছে। যদি চাইতো তাহলে তার গোত্রের অন্যান্য লোকের মতো সে-ও পালিয়ে যেত। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে আমি তাকে এখানে থেকে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছি। এভাবে কথা কাটা-কাটির উপক্রম হলো। যখন এ বাহিনী মদীনা ফিরে এলো তখন হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু দু'জনেই হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে উপস্থিত হলেন। হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু পুরো ঘটনা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে পেশ করলেন। তিনি হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর নিরাপত্তা ও আশ্রয়দান সম্পর্কিত ব্যাপারটি বহাল রাখলেন। অবশ্য হেদায়াত দিলেন যে, ভবিষ্যতে কেউ আমীরের (পরামর্শ অথবা অনুমতি ব্যতিরেকে) বিরুদ্ধে কাউকে যেন আশ্রয় না দেয়। এরপরও তাদের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনেই তর্ক-বিতর্ক হলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ক্রুদ্ধাবস্থায় বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনার সামনেই এ গোলাম আমাকে কঠিন এবং তেড়া কথা বলছে। খোদার কসম ! যদি আপনি না থাকতেন, তাহলে তার এ সাহস হতো না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, খালিদ ! আম্মারের ব্যাপারে থেমে যাও। যে আম্মারকে মন্দ বলে, আল্লাহ তাকে মন্দ বলেন। যে আম্মারকে ঘৃণা করে, সে আল্লাহর কাছে ঘৃণার পাত্র হয় এবং যে আম্মারকে অবজ্ঞা করে আল্লাহর কাছে সে ঘৃণিত হয়।"

এরপর হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু উঠে দাঁড়ালেন এবং সেখান থেকে রওয়ানা দিলেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর পিছু পিছু গেলেন এবং কাপড় ধরে ফেললেন। অতপর তাঁর কাছে মিনতি

জানাতে লাগলেন। অবশেষে হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন।-(ইবনে আসাকির)

মুসতাদরাকে হাকিম গ্রন্থে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, এ দিনটি ছিলো আমার জন্যে অত্যন্ত কঠিন দিন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন করলাম যে, আমার জন্যে ইসতিগফার করুন এবং হযরত আম্মারের কাছেও ক্ষমা চাইলাম।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু খলিফা নির্বাচিত হলেন। এ সময় প্রায় সমগ্র আরবেই স্বধর্ম ত্যাগের ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু নজীরবিহীন সাহস এবং ধৈর্যের সাথে এ ফেতনার মুকাবিলা করেন। এজন্যে কয়েকটি রক্তাক্ত সংঘর্ষও সংঘটিত হলো। হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু অধিকাংশ অভিযানে মুরতাদদের বিরুদ্ধে বাহাদুরী প্রদর্শন করলেন। মুসায়লামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে পরিচালিত ইয়ামামার যুদ্ধেও তিনি শরীক ছিলেন। তাবারীর বর্ণনা মতে স্বধর্ম ত্যাগী বা মুরতাদদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল যুদ্ধের মধ্যে এটি ছিলো সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধ। হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু এ যুদ্ধে চরম বাহাদুরীর পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, ইয়ামামার যুদ্ধে হযরত আম্মারের একটি কান শহীদ হয়ে গিয়েছিলো। পাশেই কান ছিঁড়ে পড়েছিলো। কিন্তু তিনি বেপরোয়া হয়ে হামলার পর হামলা চালিয়ে গেলেন। যেদিকেই অগ্রসর হচ্ছিলেন শত্রুর ব্যূহ নাস্তানাবুদ হচ্ছিলো। এক সময় মুসলমানদের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে দাঁড়ালো। তিনি মরুময় প্রান্তরের এক উঁচুস্থানে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে আহ্বান জানালেন ঃ হে মুসলমানরা ! তোমরা কি জান্নাত থেকে পালিয়ে যাচ্ছো ? দেখ, আমি আম্মার বিন ইয়াসির। এসো, আমার দিকে এসো।"

তার আহ্বানে মুসলমানরা মযবুত হয়ে দাঁড়ালো এবং হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু সহ ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে হামলা চালালো। অবশেষে মুসলমানদের বিজয় ঘটলো। ১১ হিজরীতে সংঘটিত ইয়ামামার যুদ্ধের সময় হযরত আম্মারের বয়স প্রায় ৬৫ বছর ছিলো। কিন্তু শৌর্যবির্যে তিনি যুবকদেরকেও হার মানিয়েছিলেন।

আমিরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং সম্মান করতেন। একবার কুরাইশ সরদার হযরত আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন হারব, হযরত হারিস

রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন হিশাম এবং হযরত সোহায়েল রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আমর খলিফা হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে সাক্ষাতের জন্যে এলেন। ঠিক একই সময় হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহ আনহু ও হযরত সোহায়েব রাদিয়াল্লাহ আনহু একই উদ্দেশ্যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে পৌছলেন। আমীরুল মু'মিনীন এ খবর পেলেন এবং তিনি প্রথমে হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহ আনহু ও হযরত সোহায়েব রাদিয়াল্লাহ আনহুকে সাক্ষাতের জন্যে ভেতরে ডাকলেন। তাঁদের সাথে আলোচনার পর তিনি কুরাইশ সরদারদের সাক্ষাতদান করলেন। হযরত আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু ব্যাপারটি অনুভব করলেন এবং আমীরুল মু'মিনীনের কাছে অভিযোগ করে বললেন যে, গোলামদেরকে তো তাৎক্ষণিকভাবে সাক্ষাতদান করা হয়। আর আমাদের মত কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে বসে বসে অপেক্ষা করতে হয়।

আমীরুল মু'মিনীন বললেন, এর জবাব আপনাদের অন্তরের কাছেই জিজ্ঞেস করা উচিত। ইসলাম সবার সাথে আপনাদেরকেও ডেকেছে। কিন্তু এসব মানুষ আপনাদের আগে ইসলামের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে।

২০ হিরজীতে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহ আনহুকে কুফার গভর্নর করেন। এ সময় তিনি কুফাবাসীদের নামে এ ফরমান প্রেরণ করেন ঃ

"আমি তোমাদের কাছে আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহ আনহুকে আমীর এবং ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে শিক্ষক ও উপদেষ্টা (মন্ত্রী) হিসেবে প্রেরণ করছি। এ দু'জন হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাছাইকৃত সাথী এবং বদরের মুজাহিদ। তাদের আনুগত্য করো এবং নির্দেশ মেনে চলো। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে আমার চেয়েও শ্রেষ্ঠ হিসেবে তোমাদের কাছে প্রেরণ করলাম এবং তাঁকে তোমাদের খাজাঞ্চীখানার রক্ষক বা কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেছি। ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন হুনাইফকে পশ্চিম ইরাকের পরিমাপক ও জমির খাজনা নিরুপণের পরিচালক নিয়োগ করেছি। এ তিনজনের রসদ হিসেবে প্রতিদিন একটি বকরী ঠিক করে দিয়েছি। বকরীর পেটসহ অর্ধেক আম্মারের জন্য এবং অবশিষ্টাংশ ইবনে মাসউদ ও ওসমানের জন্য।"

কুফায় হযরত আম্মারের শাসনকালে নাহাওন্দ নামক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর নির্দেশ মুতাবিক হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু কুফা থেকে সাহায্যসহ নাহাওন্দ পৌছলেন। ইত্যবসরে যুদ্ধ শেষ হয়ে

গিয়েছিলো এবং মুসলমানরা বিজয়ী হয়েছিলো। ইমাম বাইহাকী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ও শামসুল আইম্মা সারাখসী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের সৈন্যদের জন্যে গনিমাতের মালের অংশ দাবী করলেন। বিজয়ী সৈনিকদের অনেকেই এ দাবীতে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। তাঁরা বললেন, আপনি যুদ্ধে অংশ নেননি। এজন্যে গনিমাতের মালের মুসতাহিক বা যোগ্য নন। একজন গ্রাম্য সৈনিক ক্রোধান্বিত হয়ে গালাগালি করে বললো," কান কাটা গোলাম। (ইয়ামামার যুদ্ধে হযরত আম্মারের রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি কান কেটে গিয়েছিলো) তুমি আমাদের গনিমাতের মালে অংশীদার হতে চাও (এ মাল আমরা যুদ্ধের আগুনে জ্বলে হাসিল করেছি)। হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত ধৈর্যশীল মানুষ ছিলেন। তিনি কারোর সাথে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়া সঠিক মনে করলেন না। অবশ্য আমিরুল মু'মিনীন রাদিয়াল্লাহ আনহুকে অভিযোগ পত্র লিখলেন। সেখান থেকে জবাব এলো ঃ "নিসন্দেহে গনিমাতের মাল তাদের যারা প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশ নিয়েছে।"

মুসলমানরা সে যুগে মাদায়েনে একটি কবরে মূল্যবান কাপড়ে জড়ানো একটি লাশ পেলো। এ লাশের পাশে অনেক অর্থও ছিলো। কাফনের কাপড় এবং অর্থ হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে কুফায় আনা হলো। তিনি আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুকে চিঠি লিখে জানতে চাইলেন যে, এ কাপড় এবং অর্থ কোষাগারে জমা করে নেব না তাকে (প্রাপকদেরকে) দিয়ে দিবো। আমীরুল মু'মিনীন জবাব দিলো, এসব বস্তু প্রাপকদেরকে দিয়ে দাও এবং তাদের কাছ থেকে আর ফেরত নেবে না।"

হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু এক বছর নয় মাস পর্যন্ত অত্যন্ত সুচারুরূপে কুফার ইমামাতের দায়িত্ব পালন করলেন। কিন্তু সে যুগেই কুফা এবং বসরাবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ তুঙ্গে উঠলো। অন্যদিকে হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর পক্ষপাতহীন আচরণে কুফাবাসীকে ক্ষুব্ধ করে তুললো। ইবনে জারির তাবারি বলেছেন, খুজিস্তান বিজয়ের পর বসরাবাসী মাহ অথবা মাস পন্দান পরগণা এবং আরো কিছু দখলকৃত এলাকা বসরার সাথে সংযুক্ত করে দেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলো। কেননা বসরা প্রদেশের আয়তন জনসংখ্যার তুলনায় অত্যন্ত ছোট ছিলো। কিন্তু কুফাবাসী সেসব এলাকা বসরার সাথে সংযুক্ত করার বিরোধী ছিলো। বসরার গভর্নর হযরত আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহ আনহু এলাকাসমূহ বসরার সাথে সংযুক্ত করার জন্যে খলিফার কাছে দাবী জানালেন। পক্ষান্তরে কুফাবাসী নিজেদের গভর্নর হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর উপর চাপ সৃষ্টি করলো যে, তিনি যেন এ

দাবীর বিরোধিতা করেন। কিন্তু হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করলেন এবং বললেন, "আমার এ বিসম্বাদে জড়িয়ে পড়ার কি প্রয়োজন রয়েছে।" তাঁর জবাব শুনে কুফার এক সরদার আতারদ অগ্নিশর্মা হয়ে বললো ঃ হে কানকাটা ! এরপর তুমি আমাদের কাছ থেকে রাজস্ব কিভাবে চাও।"

কুফার সবচেয়ে বড় শাসক ছিলেন হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু। তিনি ইচ্ছা করলে আতারদের এ ঔদ্ধত্যের শাস্তি দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দিলেন এবং শুধু এটুকু বললেন ঃ "আফসোস ! তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় কানকে গালি দিলে।"

হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর নিরপেক্ষতার ফলশ্রুতিতে উল্লেখিত এলাকা বসরা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হলো। এতে কুফাবাসী খলিফার দরবারে হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর বিরুদ্ধে অভিযোগের ফিরিস্তি তুলে ধরলো এবং বার বার লিখে পাঠালো যে, আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু একজন দুর্বল আমীর। তিনি রাজনীতি বুঝেন না। এর পূর্বে কুফাবাসী হযরত সাদ বিন আবি ওক্কাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রেরণ করে তাঁকে বরখাস্ত করিয়েছিলো। আল্লামা বালাজুরী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ফতহুল বুলদান নামক গ্রন্থে লিখেছেন, কুফাবাসীর এ কার্যকলাপে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু দুঃখিত হলেন এবং বললেন, "কুফাবাসীর মধ্যে কে আছে যে, আমাকে অক্ষম করে রাখে। আমি যদি কোনো শক্তিশালী ব্যক্তিকে তাদের শাসক বানাই তাহলে তারা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পক্ষান্তরে যদি কোনো দুর্বল ব্যক্তিকে তাদের আমীর নিযুক্ত করি তাহলে তাহলে তারা তাকে অপমানিত করে।"

এ সত্ত্বেও তিনি হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বরখাস্ত করে তাঁর স্থলে হযরত মুগিরাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন শোবাকে কুফার গভর্নর নিয়োগ করলেন।

ইবনে আসির (র) বলেছেন, বরখাস্তের পর হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "বরখাস্তের নির্দেশে তুমি অসন্তুষ্ট হওনি তো ?" হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু জবাবে বললেন, "আপনি যখন জিজ্ঞেস করেছেন তখন প্রকৃত কথা হলো যে, এ পদে নিয়োগে আমি যেমন খুশী হইনি, তেমনি তা থেকে বরখাস্তেও অসন্তুষ্ট নই।"

হযরত ওসমান জুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাসনকালের দ্বিতীয়ার্ধে দেশে ফেতনা ও বিশৃংখলা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। ৩৫ হিজরীতে আমীরুল মু'মিনীন রাদিয়াল্লাহ আনহু এ বিশৃংখলার কারণ জানার জন্যে একটি তদন্ত

কমিটি নিয়োগ করেন। হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু এ কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। এ কমিটিকে বিশৃংখলা ও ফেতনার মূল কেন্দ্র মিসরে পাঠানো হলো। তদন্ত কমিটির অন্যান্য সদস্য শীঘ্রই ফিরে এসে স্ব স্ব এলাকার অবস্থা সম্পর্কে আমীরুল মু'মিনীনকে অবহিত করলেন। কিন্তু হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর ফিরতে অস্বাভাবিক দেরী হলো। কিছুদিন পর তিনি সেখান থেকে মদীনায় ফিরে বিপ্লবপন্থীদের কিছু দাবী এবং অভিযোগের প্রকাশ্য সমর্থন জানালেন। এজন্যে তাঁকে একবার অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করতে হয়। মাওলানা হাজী মুঈনুদ্দীন নদভী মরহুম "সিয়ারুস সাহাবা" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"একবার হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর গোলামরা হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুকে এমনভাবে প্রহার করলো যে, তাতে সারা শরীর ফুলে গেলো। পেটে নখের আচর বসে গেলো এবং পাঁজরের হাড়ে ব্যথা অনুভূত হতে লাগলো। জাহেলী যুগে বনি মাখজুম গোত্রের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিলো। একথা শুনে গোত্রের লোকেরা খিলাফত ভবন ঘিরে নিলো এবং হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহ আনহু যদি সুস্থ না হয়ে ওঠেন তাহলে তারা অবশ্যই প্রতিশোধ নেবে বলে হুমকি দিলো।"–(সিয়ারুস সাহাবা দ্বিতীয় খণ্ড)

যদি এ বর্ণনা সঠিক হয় তাহলে বিশ্বাস করতে হবে যে, যা কিছু ঘটেছে তা আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওসমান জুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুর অজ্ঞাতে এবং বিনা ইঙ্গিতেই ঘটেছে। কারণ, তিনি ছিলেন সৎ স্বভাব, ধৈর্যের আঁধার এবং উম্মাহর কল্যাণকামী। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগের অনুমতি দেননি। সলফে সালেহীনরা সাহাবাদের রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের ঝগড়া-বিবাদ প্রশ্নে কোনো উক্তি না করাকেই উত্তম বলে মনে করেছেন। খুব বেশী হলেও এতটুকু বলা যায় যে, কিছু কিছু ব্যাপারে হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে আমীরুল মু'মিনীন হযরত জুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুর মতবিরোধ ছিলো।

খলিফায়ে রাশেদ সাইয়েদেনা হযরত ওসমান জুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুর মর্মান্তিক শাহাদাতের পর সাইয়েদেনা হযরত আলী কাররামুল্লাহ ওয়াজহাহু খলিফা নির্বাচিত হলেন। হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে পুরোপুরি সমর্থন এবং তার দক্ষিণ বাহু হিসেবে প্রমাণিত করলেন। উষ্ট্রের যুদ্ধের পূর্বে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু কুফাবাসীর সমর্থন লাভের জন্যে তাঁকে সাইয়েদেনা হযরত হাসানের রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে কুফা প্রেরণ করলেন। কুফার গভর্নর হযরত আবু মূসা আশআরীর রাদিয়াল্লাহ আনহু ভূমিকা ছিলো নিরপেক্ষ। হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু এটা পসন্দ করতেন না। তিনি এক সভায় কুফার জনগণকে নিরপেক্ষ

থাকার উপদেশ দিচ্ছিলেন। এমন সময় হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহ আনহু ও হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু সেখানে উপস্থিত হলেন। হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আবু মূসা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে পেছনে সরিয়ে দিয়ে মিম্বরে উঠে দাঁড়ালেন এবং জনগণকে তাঁর প্রতি সমর্থনের জন্য উদ্বুদ্ধ করণের লক্ষ্যে এক উদ্দীপনাময় বক্তৃতা দিলেন। হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুও তাঁর সাথে মিম্বরে উঠে দাঁড়ালেন এবং বক্তৃতা করতে গিয়ে বললেন ঃ হে মানুষেরা ! উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহাকে ইহ ও পরকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন সঙ্গিনী হিসেবে আমি জানি। কিন্তু এখন তোমরা আল্লাহর না হযরত আয়েশার আনুগত্য করবে তার পরীক্ষা তিনি নিচ্ছেন।"

কুফার একজন প্রভাবশালী সদস্য হযরত হুজর রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আদী হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুকে পুরোপুরি সমর্থন জানালেন। এভাবে কুফার প্রায় ১০ হাজার মানুষ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাহিনীতে যোগদানের জন্যে হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর সহযোগী হয়ে গেলো।

উষ্ট্রের যুদ্ধ শুরু হলো। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুকে মাইসারার অফিসার নিয়োগ করলেন। কেননা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর হকপন্থী হওয়ার ব্যাপারে তাঁর পুরো বিশ্বাস ছিলো। এজন্যে তিনি অসাধারণ উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং অবিচলভাবে যুদ্ধ করলেন। অবশেষে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর বিজয় হলো। ৩৬ হিজরীর জমাদিউস সানীতে এ ঘটনা ঘটেছিলো।

উষ্ট্রের যুদ্ধের পর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর মধ্যকার মতবিরোধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করছিলো। এরই ফলশ্রুতিতে সিফফীনের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এ যুদ্ধেও হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর পক্ষ নিলেন। ইবনে সায়াদের বর্ণনা মতে, যখন তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধের ময়দানের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন বারংবার বলছিলেন, হে আল্লাহ ! পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে, পানিতে ডুবে অথবা আগুনে জ্বলে জীবন দান যদি তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে হবে বলে আমি জানতাম তাহলে যে কোনোভাবে আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করতাম। এখন আমি যুদ্ধ করতে যাচ্ছি। তোমার সন্তুষ্টি অর্জনই একমাত্র কাম্য। আশা করি তুমি আমার এ কামনা ব্যর্থ করে দেবে না। এ সময় তাঁর বয়স ছিলো ৯০ বছরেরও বেশী। (বিভিন্ন মত অনুযায়ী ৯১, ৯৩ অথাব ৯৪ বছর)। কিন্তু আবেগ ও উদ্দীপনা কানায় কানায় পূর্ণ ছিলো। দেহ ছিলো বলিষ্ঠ এবং মযবুত। এজন্যে

যুদ্ধে অচিন্তনীয় বাহাদুরী প্রদর্শন করলেন। যেদিকে অগ্রসর হতেন, বিপক্ষের ব্যূহ বিশৃংখল ও এলোমেলো হয়ে যেতো। যুদ্ধকালীন সময়ে একবার আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর সেনাপতি হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসের প্রতি দৃষ্টি পড়লো। আবেগ ও ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন এবং তাঁর মুখ দিয়ে একথাগুলো বের হয়ে পড়লো ঃ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহযোদ্ধা হয়ে এ সেনাপতির সাথে আমি তিনবার যুদ্ধ করেছি। এখন চতুর্থবার তাঁর মুখোমুখি হচ্ছি। আল্লাহর কসম ! সে যদি আমাদেরকে পরাজিত করে মকামে হিজর পর্যন্তও পেছনে হটিয়ে দেয় তাহলেও আমি মনে করবো যে, আমরা হকের উপর রয়েছি এবং সে ভুল পথে চলছে।"

একদিন সন্ধ্যায় সূর্য ডুবে যাচ্ছিলো এবং প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছিলো। হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু কয়েক চুমুক দুধ পান করলেন এবং বললেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমায়েছিলেন, সর্বশেষ চুমুক তুমি যা পান করবে তা হবে দুধ।" একথা বলে বাঘ যেমন শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়লেন। এ সময় তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হচ্ছিলো, "আজ আমি বন্ধুদের সাথে মিলিত হবো। আজ আমি আমার বন্ধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর জামায়াতের সাথে মিলিত হবো।"

হযরত হাশিম রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন উতবা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর ঝাণ্ডা উঁচু করে ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর দিকে দৃষ্টি পড়তেই বলে উঠলেন ঃ হে হাশিম ! সামনে অগ্রসর হও। বেহেশত তলোয়ারের ছায়ার নীচে এবং মৃত্যু নেজার কিনারায় অবস্থান করে। বেহেশতের দরযা খোলা হয়েছে এবং সেখানকার হুররা সজ্জিত হয়ে অপেক্ষা করছে।" অতপর এতো বেপরোয়া হয়ে লড়াই করলেন যে, কাতারের পর কাতার সিরীয় সৈন্য সাফ হয়ে গেলো। অবশেষে একজন সিরীয় সিপাহী নিজের বল্লম দিয়ে তাঁকে আহত করে মাটিতে ফেলে দিলো এবং একজন সিরীয় সৈন্য তাঁর শরীর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেললো।-(ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন)

আল্লামা ইবনে আসির (র) এবং হাফেজ ইবনে কাসিরের (র) বর্ণনা মতে, হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাহাদাতের খবর আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুকে পৌছানো হলো। এ সময় তাঁর পাশে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস এবং তাঁর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আমরও উপস্থিত ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত মুয়াবিয়া এবং নিজের পিতাকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামের ইরশাদ স্মরণ করালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুকে এক বিদ্রোহী গ্রুপ হত্যা করবে। একথা শুনে হযরত আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন ঃ আমরা কি আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুকে হত্যা করেছি ? তাঁকে তো সে-ই হত্যা করেছে, যে তাঁকে যুদ্ধের ময়দানে এনেছে।" তাঁর ইঙ্গিত ছিলো হযরত আলী কাররামুল্লাহ ওয়াজহাহু রাদিয়াল্লাহ আনহুর দিকে। তাঁর সমর্থনে যুদ্ধ করতে করতে হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু শাহাদাত প্রাপ্ত হন।

ইবনে আসির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি উসুদুল গাব্বাহ নামক গ্রন্থে লিখেছেন, দু'জন ঝগড়া করতে করতে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসের কাছে এলো। উভয়েই দাবী করলো যে, সে-ই আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুকে হত্যা করেছে। এজন্যে তাদেরকে পুরস্কার দিতে হবে। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস বললেন, "আল্লাহর কসম ! এ দু' ব্যক্তি । াযখের জন্যে বিবাদ করছে। আল্লাহর কসম ! আজ থেকে ২০ বছর আগে মরে যাওয়াই আমি পসন্দ করতাম।

ইবনে সায়াদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, এ ঘটনা হযরত আমীর মুয়াবিয়ার সামনে পেশ করা হলো। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস যখন বললেন, এ দু' ব্যক্তি হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর হত্যার দাবীদার জাহান্নামের জন্যে ঝগড়া করছে, তখন আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন ঃ আমর তুমি কি বলছো। যারা আমাদের জন্যে জীবন উৎসর্গ করছে তাদেরকে তুমি এ ধরনের কথা বলছো।"

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস বললেন ঃ "আল্লাহর কসম ! এটাই ঠিক। আহা ! আজ থেকে ২০ বছর আগে যদি আমার মৃত্যু হতো।"

অন্যান্য বর্ণনা থেকে জানা যায়, হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাহাদাতের পর নিরপেক্ষ সাহাবা রাদিয়াল্লাহ আনহুমও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর সমর্থক হয়ে গিয়েছিলেন।

হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাহাতাদের খবর শুনে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। যখন তাঁর রক্তাক্ত লাশ যুদ্ধের ময়দান থেকে উঠিয়ে আনা হলো তখন শেরে খোদা রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ "আম্মার যেদিন ঈমান এনেছিলো সেদিন আল্লাহ তাঁর উপর রহম করেছিলেন। যেদিন তিনি শহীদ হলেন সেদিনও তিনি তাঁর উপর রহম করেছেন। যেদিন তাঁর পুনরুত্থান ঘটবে সেদিনও তিনি তাঁর উপর রহম করবেন। যখন চার অথবা পাঁচজন সাহাবা ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা

করেছিলেন তখন আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দেখেছিলাম। পুরাতন সাহাবাদের মধ্যে কেউই তাঁর মাগফিরাত প্রশ্নে সন্দেহ করতে পারবে না। আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হক পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। এজন্যে তাঁর হত্যাকারী অবশ্যই জাহান্নামী হবে।"

এরপর নিজে তাঁর জানাযার নামায পড়ালেন এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবীকে কুফায় দাফন করলেন।

হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহ আনহু দীর্ঘদিন যাবত নবুয়াতের প্রস্রবণে সরাসরি অবগাহন করেছিলেন। এজন্যে তিনি জ্ঞানের ক্ষেত্রে খুব উঁচু মর্যাদা রাখতেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত কম কথা বলতেন এবং হাদীস বর্ণনায় সীমাহীন সতর্ক ছিলেন। এ কারণেই তাঁর থেকে মাত্র ৬২টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবাদের মধ্যে তাঁকে চতুর্থ পর্যায়ের বর্ণনাকারী হিসেবে গণ্য করা হয়।

হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর জীবনী পুস্তকে তাঁকে ইসলামের প্রতি অগ্রগমন, উদ্যমশীল, ধৈর্য, স্থৈর্য, রাসূলের প্রতি ভালোবাসা, জিহাদের প্রতি উদ্দীপনা, ইবাদাতে নিবেদিত প্রাণ, আল্লাহ ভীতি, ভদ্রতা ও নম্রতা, সরলতা ও অনাড়ম্বরতা এবং বিনয়ের আধার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

তিনি সত্যের দাওয়াতের প্রতি সে সময় লাব্বাইক বলেছিলেন বা সাড়া দিয়েছিলেন যখন এ সাড়াদানের অর্থই ছিলো তলোয়ার গর্দানের ওপর আপতিত করে নেয়া। সত্যের পথে চলার জন্যে তাঁর ওপর যে ধরনের নির্যাতন চালানো হয়েছিলো তা পড়লে শরীরের লোম খাড়া হয়ে যায়। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ছিলো তাঁর গভীর ভালোবাসা। তাঁর জন্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করার প্রশ্নে সবসময় প্রস্তুত থাকতেন। জীবন উৎসর্গের আবেগের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। বদরের যুদ্ধে আবু জেহেল নিহত হলে তিনি হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ডেকে বললেন ঃ "আল্লাহ তোমার মায়ের হত্যাকারীকে হত্যা করেছেন।"

জিহাদের প্রতি এত অনুরাগ ছিলো যে, তিনি সবসময় প্রস্তুত থাকতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের সব যুদ্ধেই তিনি শরীক হয়েছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকালে মুরতাদ বা ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জীবন বাজী রাখার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। কতিপয় বর্ণনায় আছে যে, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ

আনহুর খেলাফতকালে তিনি সিরিয়া ও ইরানের কয়েকটি যুদ্ধেও অত্যন্ত বাহাদুরী দেখিয়েছিলেন।

তিনি আল্লাহভীতি এবং ইবাদাত প্রীতির এক নমুনা ছিলেন। শুধু হারামই নয়, সন্দেহজনক বস্তু থেকেও তিনি নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এক সময় তাঁকে "তাইয়িবুল মুতাইয়িব" উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত আছে, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি যে, আম্মারের শরীরের হাড্ডি পর্যন্ত ঈমানে ভরপুর।" হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, আম্মারের আপাদমস্তক ঈমানে ভরপুর। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মালিক বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে. বেহশত অবশ্যই চার ব্যক্তির জন্যে আগ্রহী। তারা হলেন ঃ "আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু, আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু, সালমান রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং মিকদাদ রাদিয়াল্লাহ আনহু।"

পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ছাড়াও হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু সারারাত নামায এবং ওজিফা পাঠে মশগুল থাকতেন। কুরআনের ভাষ্যকার হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেছেন, কুরআন শরীফের সূরা আয যুমারের ৯ নম্বর আয়াত–"যে ব্যক্তি রাতে মাটিতে কপাল লাগিয়ে এবং দাঁড়িয়ে ইবাদাত করে এবং পরকালের ভয় করে ও নিজের রবের রহমতের প্রত্যাশা করে।" হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর শানেই নাযিল হয়েছিলো।

অনন্যোপায় বা মাজুর অবস্থাতেও তিনি নামায কাযা করতেন না। একবার সফরে গোসল ওয়াজিব হয়ে গেলো। পানি পাওয়া গেলো না। এজন্যে সর্বাঙ্গে মাটি লাগিয়ে নামায পড়ে নিলেন। মদীনা ফিরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে এ ঘটনা পেশ করলেন। তিনি বললেন ঃ "এ অবস্থাতেও শুধু তাইয়াম্মুমই যথেষ্ট ছিলো।" সহীহ আল বুখারী ও মুসলিমে স্বয়ং হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর ভাষায় এ ঘটনাকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ "এক ব্যক্তি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহ আনহুর খিদমতে উপস্থিত হয়ে মাসায়ালা জিজ্ঞেস করলেন যে, আমার গোসল ওয়াজিব হয়ে গেলো এবং পানি পেলাম না, তাহলে কি করবো।"

হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বললেন, আপনার কি স্মরণ নেই যে, একবার আমি এবং আপনি সফরে ছিলাম। আমাদের দু'জনেরই গোসল ওয়াজিব হয়ে গেলো। এ অবস্থায় আপনি নামায পড়লেন না। আর আমি "মাটির ওপর লুটোপুটি

খেলাম। কেননা আমার ধারণা ছিলো যে, জানাবাতের তাইয়াম্মুমও গোসলের মত সারা শরীরেই প্রযোজ্য। অতপর আমরা যখন সফর থেকে ফিরে এলাম তখন আমি একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বললাম। তিনি বললেন, "মাটির ওপর লুটোপুটি খাওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। তোমাদের জন্যে এতটুকুনই যথেষ্ট ছিলো। এ বলে তিনি মাটির ওপর দু' হাত মারলেন এবং তাতে ফুঁ দিলেন। (যাতে ধুলো মাটি যা লেগেছিলো তা উড়ে যায়) অতপর তিনি দু' হাত নিজের চেহারা ও হাতে লাগিয়ে নিলেন।"

জুমআর দিন খুতবার আগে মিম্বরে বসে সাধারণত সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করতেন। খুতবা সংক্ষিপ্ত হলেও তা হতো সুন্দর ও স্বচ্ছ। একবার এক ব্যক্তি সংক্ষিপ্ত খুতবা প্রশ্নে অভিযোগ করলো। তিনি বললেন ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নামায দীর্ঘ করা এবং খুতবা সংক্ষিপ্ত করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।"

তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে এবং অল্পে তুষ্ট মানুষ ছিলেন। জীবনভর কোনো বাড়ী বানাননি। হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মাসউদ নিজের বাড়ী বানানোর পর তাঁকে দেখানোর জন্য একবার নিয়ে এলেন। বাড়ী দেখে তিনি বললেন—"কঠিন জিনিস বানিয়েছ এবং বিরাট আশা করেছ।"

হযরত ওমর ফারুকের শাসনামলে তিনি কুফার আমীর ছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় সব জিনিস নিজে বাজারে গিয়ে কিনতেন, বোঝা বাঁধতেন এবং নিজের পিঠে অথবা কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে আসতেন। ঘরের অন্যান্য কাজও নিজের হাতে করতেন। কতিপয় বর্ণনায় আছে যে, তিনি অক্ষম ব্যক্তিদের বাজারও করতেন এবং নিজে তাদের বাড়ী পৌঁছে দিতেন। পোশাকও অত্যন্ত সাদাসিধে ছিলো। ছিঁড়ে গেলে তাতে পট্টি লাগাতেন। এতে লজ্জা অনুভব করতেন না।

তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও সহনশীল ছিলেন। একবার একজন কানকাটা বলে তাঁকে রাগান্বিত করতে চাইলো। তিনি অত্যন্ত নরমভাবে বললেন ঃ "হে ভালো কানওয়ালা ! আমাকে কেন লজ্জা দিচ্ছো। আমার এ কানতো আল্লাহর পথে কাটা গেছে।"

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাঁর প্রসঙ্গে কারো মুখ দিয়ে কটু কথা শুনতে পারতেন না। যা সত্য এবং হক মনে করতেন তা তিনি নির্দ্বিধায় বলে দিতেন। এ ব্যাপারে তিনি কোনো ভয়-ভীতির পরোয়া করতেন না। প্রত্যেক কাজেই আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ত করতেন। বস্তুগত লাভের জন্যে তিনি কোনো কাজ করতেন না।

সাইয়েদেনা হযরত আবু ওয়াহাব শুজা রাদিয়াল্লাহ্ আনহু

সাইয়েদেনা হযরত আবু ওয়াহাব শুজা রাদিয়াল্লাহ্ আনহু বিন ওয়াহাব ছিলেন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি জীবন উৎসর্গকারী সাহাবীদের অন্যতম। তিনি এমন বিপদ সংকুল যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন যখন আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি সাড়াদান মুশরিকদের কাছে ছিলো ঘোরতর অপরাধ। বুন আসাদ বিন খুজাইমাহ গোত্রের সাথে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। জাহেলী যুগে তাঁর বংশ বনু আবদি শামসের মিত্র ছিলো। তাঁর বংশ তালিকা নিম্নরূপ ঃ

শুজা রাদিয়াল্লাহ্ আনহু বিন ওয়াহাব বিন রবিয়াহ বিন আসাদ বিন সুহাইব বিন মালিক বিন কাসির (কবির) বিন গানাম বিন দাওদান আসাদ বিন খুযাইমাহ।

তাঁর বংশ এবং রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশ খুযাইমাহর সাথে এসে মিশে গেছে। নবুয়াত প্রাপ্তির তিন বছর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কাবাসীদেরকে প্রকাশ্যে তাওহীদের দাওয়াত প্রদান শুরু করেন। এ সময় হযরত শুজা রাদিয়াল্লাহ্ আনহুর সবেমাত্র গোঁফ গজাতে শুরু হয়েছে। খেলাধুলা ও আনন্দ ফূর্তি করে বেড়ানোর সময় ছিলো এটা। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে সৌভাগ্যবান করেছিলেন। যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে সে মুশরিকদের যুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়। একথা জেনেও তাওহীদের বাণী কানে আসতেই নিঃসংকোচ ও নির্দ্বিধায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কার কাফেররা একথা পরিজ্ঞাত হতেই তাঁর ওপর সীমাহীন নির্যাতন শুরু করলো। যখন এ নির্যাতন চরম পর্যায়ে পৌছলো তখন তিনি নবুয়াত প্রাপ্তির ৬ বছর পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইঙ্গিতে হাবশার মুহাজিরদের দ্বিতীয় কাফেলায় শরীক হয়ে হাবশা গমন করেন।

হাফিজ ইবনে আবদুল বার রাদিয়াল্লাহ আনহু "আল ইসতিয়াব" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "কিছুদিন পর এক গুযব রটে গেলো। মক্কাবাসীরা মুসলমান হয়ে গেছে এ ছিলো গুযবের সারমর্ম। একথা শুনে হযরত শুজা রাদিয়াল্লাহ্ আনহু হাবশা থেকে মক্কা ফিরে এলেন। মক্কা পৌছে জানতে পারলেন যে, গুজবটি মিথ্যা। মক্কার কুরাইশদের কোনো পরিবর্তন হয়নি। চরম ধৈর্য ধরে তিনি চুপ মেরে গেলেন এবং মুশরিকদের নির্যাতন সইতে লাগলেন। কিছুদিন পর নবী

করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবা রাদিয়াল্লাহ আনহুমদেরকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন। এ সময় তিনি তাঁর আপন ভাই উকবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়াহাবের সাথে মক্কাকে বিদায় জানিয়ে মদীনা চলে গেলেন।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে হিযরত করে মদীনা তাশরীফ আনলেন। এ সময় খাজরাজ গোত্রের এক সম্মানিত ব্যক্তি আওস রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন খাওলী তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলামের পেয়ালা পান করে মুসলমান হলেন। এ ব্যক্তি অশ্বারোহন, লিখন এবং সাঁতারে পূর্ণ নিপুণতা রাখতেন। এ ভিত্তিতে তাঁকে "কামেল" বলা হতো। হিজরতের পাঁচ মাস পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক কায়েম করলেন। এ সম্পর্কের ফলে হযরত আওস রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন খাওলী হযরত শুজা রাদিয়াল্লাহ আনহুর দীনি ভাই হলেন। কেননা উভয়ের প্রকৃতিতে বড় ধরনের মিল ছিলো। হযরত আওস রাদিয়াল্লাহ আনহু যেমন উঁচু শ্রেণীর অশ্বারোহী এবং তীরন্দাজ ছিলেন তেমনি হযরত শুজা রাদিয়াল্লাহ আনহুও উঁচুমানের অশ্বারোহী ও শত্রুর ব্যূহ ভেদকারী ছিলেন।

যুদ্ধসমূহ শুরু হলো। হযরত শুজা রাদিয়াল্লাহ আনহুর তলোয়ার সর্বপ্রথম বদরের যুদ্ধে চমকে উঠলো। এভাবেই তিনি ইসলামে অগ্রগামী দু' হিযরতকারী এবং বদরী সাহাবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। বদরের যুদ্ধের পর তিনি ওহোদ, খন্দক এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে সংঘটিত অন্যান্য বিশেষ বিশেষ যুদ্ধে বাহাদুরীর চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন।

অষ্টম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর পেলেন যে, বনু হাওয়াজেন গোত্রের শাখা বনু আমেরের লোকজন মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। মদীনার পাঁচ মনযিল দূরে বনু আমেরের লোকজন মক্কা এবং বসরার সড়কে নজদের সাইয়ি নামক স্থানে বসবাস করতো। এখানকার এ নামের একটি পুকুর অথবা কূপ তাদের দখলে ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত শুজা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বনু আমেরকে উৎখাতের জন্য প্রেরণ করলেন। তাঁর সাথে ছিলেন আরো ২৪জন মুজাহিদ। হযরত শুজা রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং তাঁর সঙ্গীরা মদীনা থেকে সাইয়ি পর্যন্ত অত্যন্ত সংগোপনে এগুলেন। তাঁরা দিনে পাহাড়, বালির টিলা অথবা বৃক্ষের আড়ালে লুকিয়ে থাকতেন এবং রাতে বিদ্যুৎ বেগে সফর করতেন। এভাবে তারা হঠাৎ করে বনু আমেরের মাথার ওপর গিয়ে উপস্থিত হলো। তারা নিজেদের মাথার ওপর এভাবে মুসলমানদেরকে দেখে

হকচকিয়ে গেলো এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে পালিয়ে বাঁচলো। গনিমাতের মালের মধ্যে মুসলমানরা অন্যান্য মাল ছাড়া অসংখ্য উট এবং ভেড়া বকরী পেলেন। এসব মাল নিয়ে তাঁরা মদীনা ফিরে গেলেন। ইবনে সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেছেন, গনিমাতের মাল বন্টন করা হলো। প্রত্যেক মুজাহিদ ১৫টি করে উট নিজের অংশে পেলেন। কোনো কোনো মুজাহিদ নিজের উটের পরিবর্তে ভেড়া বকরী নিলেন। বিনিময় হার হিসেবে এক উটের পরিবর্তে বিশটি ভেড়া এবং বকরী ধার্য করা হয়েছিলো।

হুদায়বিয়ার সন্ধির (৬ষ্ঠ হিজরী) পর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চারদিকের শাসক ও নেতৃবৃন্দের নামে ইসলামের দাওয়াতের পত্রাবলী প্রেরণ করলেন। এ সময় তিনি হযরত শুজাকে হারেস বিন আবি সামার গাসসানী এবং জাবালা বিন আইহামের কাছে দূত হিসেবে পাঠালেন।

হাফিজ ইবনে কাইয়েম 'যাদুল মায়াদ" গ্রন্থে লিখেছেন, হারেস বিন আবি সামার গাসসানী দামেশকের নিকটবর্তী গুতার রইস ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে যে পত্র হযরত শুজা রাদিয়াল্লাহ আনহুর মাধ্যমে প্রেরণ করেছিলেন তার প্রথম স্তবকে লিখা ছিলো ঃ আল্লাহর নামে যিনি অত্যন্ত দয়ালু এবং মেহেরবান, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরফ থেকে হারেস বিন আবিসামারের নামে—তার ওপর 'সালাম'। যে হেদায়াতের আনুগত্য করে—ঈমান আনে এবং তার সত্যতা স্বীকার করে। অবশ্যই আমি তোমাকে সে আল্লাহর ওপর ঈমান আনার দাওয়াত দিচ্ছি যিনি এক এবং তাঁর কোনো অংশীদার নেই। এ অবস্থায় তোমার সালতানাত কায়েম থাকবে (যদি তুমি এক খোদার ওপর ঈমান আনো)।

আল্লামা ইবনে সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেছেন, হারেস বিন আবি সামারের ওপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ পত্রের কোনো প্রভাব পড়লো না এবং নিজের ধর্মের ওপর সে বলবৎ রইলো। কিন্তু তার মন্ত্রী এ পত্রে অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হলো। মাররী নামক সজ্জন প্রকৃতির এ মন্ত্রী মনে মনে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান আনলেন। তবে এ হকের ঘোষণা দানের মতো পরিবেশ অনুকূলে ছিলো না। তিনি তাখলিয়ায় হযরত শুজার রাদিয়াল্লাহ আনহু সাথে সাক্ষাত করলেন। তাঁর সামনে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করলেন এবং আবেদন জানালেন যে, তিনি যেন তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে পৌঁছে দেন। তিনি এ আবেদনও জানালেন যে, তিনি নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং ইনশাআল্লাহ মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের ওপর কায়েম থাকবেন।

জাবালা বিন আইহাম আরবের উত্তরে তাবুকের উপকণ্ঠ এলাকার শাসক ছিলেন। সে সময় সে ইসলাম কবুল করেননি। কিন্তু কয়েক বছর পর হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকালে হন্তদন্ত হয়ে মদীনা গমন করেন এবং হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর আমীরুল মু'মিনীন রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে হজ্জের জন্য মক্কা যান। তাওয়াফের সময় তার পরিধেয় কাপড়ের নীচের এক কোণার ওপর মাটিতে ঘসা অবস্থায় বনু ফাজারাহর এক গরীব মুসলমানের পা পড়ে যায়। জাবালা তার মুখের ওপরে এত জোরে এক থাপ্পড় মারলো যে, তার নাক ফেটে রক্ত পড়তে লাগলো। গরীব মুসলমানটি খলিফা সমীপে অভিযোগ উত্থাপন করলো। খলিফা জাবালার কাছে এর জবাব চাইলেন। সে অত্যন্ত অহংকারের সাথে বললো এটাতো শুধুমাত্র থাপ্পড় ছিলো। এ ঘটনা যদি কাবার পাশে না ঘটতো, তাহলে সে অধমের গর্দান উড়িয়ে দিতাম। বাদশাহর কাপড়ের ওপর পা রাখার সাহস তার কোত্থেকে হলো। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, ইসলাম তোমাকে এবং ঐ গরীব মুসলমানকে সমান করে দিয়েছে। এখন শুধু তাকওয়া বা খোদাভীতিই মর্যাদার মাপকাঠি। তুমি হয় সেই গরীব মুসলমানকে রাজী করিয়ে নিবে অথবা কিসাস দিবে। জাবালা বললো, আগামীকাল পর্যন্ত আমাকে সময় দিন। আমীরুল মু'মিনীন তার এ আবেদন মেনে নিলেন। সে রাতের মধ্যে নিজের সঙ্গী-সাথীসহ মক্কা থেকে পালিয়ে গেলো এবং রোমে গিয়ে হিরাক্লিয়াসের আশ্রয় নিলো। এভাবে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী অবস্থাতেই তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছিলো।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিরোধানের পর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু খলিফা নির্বাচিত হলেন। এ সময় সমগ্র আরবে স্বধর্ম ত্যাগের এক হিড়িক পড়ে গেলো। সিদ্দিকে আকবার রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত ধৈর্য, স্থৈর্য এবং দৃঢ়তার সাথে এ ফেতনার মুকাবিলা করলেন। তিনি বিভিন্ন দিকে ১১টি বাহিনী প্রেরণ করে কয়েক মাসের মধ্যে সব মুরতাদকে উৎখাত করলেন। এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে ঘোরতর এবং কঠিন যুদ্ধ হয়েছিলো মুসাইলামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামার ময়দানে। মুসাইলামাকে উৎখাতের জন্য হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে নিযুক্ত করা হয়েছিলো। হযরত শুজা রাদিয়াল্লাহ আনহুও তাঁর বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন এবং ইয়ামামার ময়দানে অত্যন্ত বাহাদুরীর সাথে লড়াই করে শহীদ হয়ে যান। সে সময় তার বয়স ছিলো ৪০ বছরের কিছু বেশী।

হযরত আকিল রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন বাকির লাইসী

নবুয়াত প্রাপ্তির আড়াই বছর পর বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরকামের গৃহকে তাবলিগ ও হেদায়াতের কেন্দ্র বানালেন। এ কেন্দ্র বানানোর পর সর্বপ্রথম বনু লাইস গোত্রের ৪জন যুবক তাঁর খেদমতে সমুপস্থিত হয়ে বিনীতভাবে আরজ করলো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার দাওয়াতের ওপর ঈমান এনেছি। আমাদেরকে আপনার দলে অন্তর্ভুক্ত করে নিন। এ চারজন সহোদর ছিলো এবং কুরাইশের বনু আদী বিন কা'ব বিন লুব্বী গোত্রের মিত্র ছিলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলাম গ্রহণে তাদের এ অগ্রগামী ভূমিকাকে অত্যন্ত সুনজরে দেখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন তোমাদের নাম কি। জবাবে একজন বললো তার নাম খালেদ। দ্বিতীয়জন বললো তার নাম আমের। তৃতীয়জন নিজেকে আয়াস হিসেবে পরিচয় দিলো। চতুর্থজন বললো, তার নাম গাফিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চতুর্থজনকে সম্বোধন করে বললেন, 'গাফিল' নয়, আজ থেকে তোমার নাম আকিল।"

তিনি বললেন, "ঠিক আছে তাই।"

সেদিন থেকেই মানুষ গাফিলকে আকিল বলতে লাগলো। আর এ নামেই তিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। হযরত আকিল রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশ তালিকা নিম্নরূপ ঃ আকিল রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন বাকির (অন্যমতে আবি বকির) বিন আবদি ইয়া লাইল বিন নাশিব বিন গাইরাহ বিন সায়াদ বিন লাইস বিন বকির বিন আবদি মানাত বিন কিনানাহ।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদেরকে মদীনায় হিজরত করার অনুমতি দিলেন। বছরের পর বছর ধরে মক্কার মুশরিকদের যুলুম-নির্যাতনের শিকার হকপন্থীরা আস্তে আস্তে কাফেরদের নজর এড়িয়ে মদীনা পৌঁছতে লাগলেন। কেননা হকপন্থীরা কাফেরদের যুলুম-নির্যাতনের পাঞ্জা থেকে বের হয়ে বাইরে চলে যাক এটা তারা চাইতো না। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেছেন, মক্কা হতে হিজরত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিলো। এজন্যে সকলেই চুপিসারে হিজরত করেছিলেন। কিন্তু হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু যেদিন হিজরতের ইচ্ছা করলেন সেদিন তিনি প্রথমে সকলের সামনে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করলেন। অতপর দু' রাকাআত নামায পড়লেন এবং এরপর কুরাইশদের সামনে গিয়ে ঘোষণা করলেন ঃ

"হতভাগারা ! যদি কারোর মাকে নিঃসন্তান করার এবং নিজের সন্তানকে ইয়াতীম করার এবং নিজের স্ত্রীকে বিধবা করার ইচ্ছা থাকে তাহলে সে যেন আমার পিছু নেয়। আমি এখান থেকে মদীনা যাচ্ছি।"

মুশরিকরা হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর ঘোষণা শুনলো। কিন্তু কারোরই তার পিছু ধাওয়া করার সাহস হলো না। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে অন্য বিশজন তাওহীদ পন্থীও মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা গেলেন। তাদের মধ্যে হযরত আকিল রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং তার তিন ভাইও ছিলেন। কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, এ চার সহোদর পরিবার-পরিজনসহ এক সাথে হিজরত করেন এবং মক্কায় তাদের ঘরের (অথবা ঘরসমূহ) দরযা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেলো।

মদীনা পৌঁছে চার ভাই হযরত রিফায়া রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবদুল মানযার আনসারীর মেহমান হলেন। হযরত আকিল হযরত মুজাফফর বিন যিয়াদের দীনি ভাই হলেন।

হিজরতের পর হক এবং বাতিলের প্রথম যুদ্ধ (১৭ই রমযান, ২ হিজরী) বদরের ময়দানে সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে হযরত আকিল রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং তাঁর তিন ভাই অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নেন। হযরত আকিল রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদের মধ্যে সৌভাগ্যবান ছিলেন। তিনি দুনিয়ার সবকিছু ভুলে যুদ্ধে প্রচণ্ড বাহাদুরী প্রদর্শন করতে থাকেন। এ সময় মালিক বিন যহীর নামক এক মুশরিক তাক করে তার ওপর বর্শা নিক্ষেপ করলে অথবা তলোয়ার দিয়ে পূর্ণ শক্তিসহ আঘাত করলে তিনি শহীদ হয়ে যান। সাবিকুনাল আওয়ালুনের অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম অগ্রগামী দলের এবং প্রথম মুহাজিরদের পবিত্র দলের তিনিই প্রথম সদস্য ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধের শহীদদের দলভুক্ত হয়ে এত উঁচু মর্যাদার অধিকারী হয়ে গেলেন যে, অন্যান্য সাহাবা তার প্রতি ঈর্ষা করতেন।

হযরত আকিল রাদিয়াল্লাহ আনহুর ভাই হযরত খালেদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন বকির বদরের পর ওহোদের যুদ্ধেও বাহাদুরী প্রদর্শন করেন এবং রাজির অভিযানে শাহাদাত বরণ করেন। হযরত আমের রাদিয়াল্লাহ আনহু বদরের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে অন্যান্য সকল যুদ্ধে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথী ছিলেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকালে ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাতের পিয়ালা পান করেন।

হযরত আয়াস রাদিয়াল্লাহ আনহুও রাসূলের যুগে সকল যুদ্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথী হওয়ার গৌরব লাভ করেছিলেন।

ইবনে আসির "উসুদুল গাব্বা" গ্রন্থে লিখেছেন, তিনি ৩৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

হযরত ওয়াকিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবদুল্লাহ ইয়ারবুয়ীত তামিমী

হযরত ওয়াকিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবদুল্লাহ অত্যন্ত উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের দলভুক্ত ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির প্রাথমিক যুগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইবনে সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর বর্ণনা মতে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দারে আরকাম অর্থাৎ আরকামের গৃহে তখনো আশ্রয় নেননি। এ সময়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এ বর্ণনা থেকে জানা গেলো যে, নবুয়াত প্রাপ্তির তিরিশ মাসের মধ্যেই হযরত ওয়াকিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ঈমান এনেছিলেন। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুয়াত প্রাপ্তির আড়াই বছর পর আরকামের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

আরবের মশহুর কবিলা বা গোত্র বনু তামিমের সাথে হযরত ওয়াকিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর সম্পর্ক ছিলো। ইতিহাস বেত্তারা পরিষ্কার করে বলেননি যে, হযরত ওয়াকিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু কখন থেকে মক্কায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। কেননা মক্কা বনু তামিম গোত্রের দেশ ছিলো না। হতে পারে হযরত ওয়াকিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুর পিতৃ পুরুষদের কোনো ব্যক্তি মক্কায় এসে বসবাস শুরু করেন এবং তিনি সেখানে লালিত পালিত হন। কিছু বর্ণনায় জানা যায় যে, হযরত ওয়াকিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর পিতা খাত্তাব নিজের মিত্র এবং পালক পুত্র বানিয়ে রেখেছিলেন। সম্ভবত সে কুরাইশের শাখা বনু আদির মিত্র ছিলো।

তাঁর বংশ তালিকা নিম্নরূপ ঃ

ওয়াকিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবদুল্লাহ বিন আবদি মান্নাফ বিন উরিন বিন ছায়ালাবা বিন ইয়ারবু বিন হানজালাহ বিন মালিক বিন যায়েদ মানাত বিন তামিম। নিজের গোত্রের যে শাখার সাথে হযরত ওয়াকিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর সম্পর্ক ছিলো তাকে ইয়ারবুয়ী এবং হানজালীও বলা হয়ে থাকে।

অন্যান্য মুসলমানদের মত হযরত ওয়াকিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুও কয়েক বছর পর্যন্ত কুরাইশ মুশরিকদের যুলুম-নির্যাতনের শিকার হন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন। এ সময় অধিকাংশ সাহাবী সংগোপনে মদীনায় হিজরত করে চলে গেলেন। কিন্তু হযরত ওয়াকিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবদুল্লাহ হযরত ওমর

ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে প্রকাশ্যে হিজরত করেন। মদীনা পৌঁছে তিনি হযরত রাফায়া রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবদুল মানযার আনসারীর গৃহে উঠলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় শুভাগমন ঘটলো। কয়েক মাস পর মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে তিনি ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করলেন। হযরত ওয়াকিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবদুল্লাহকে হযরত বাশার বিন বারায়া রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মারুর আনসারীর দীনি ভাই বানিয়ে দিলেন।

দ্বিতীয় হিজরীর জমাদিউস সানীতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জাহাশকে আট অথবা ১২জন সাহাবী সহ কুরাইশদের তৎপরতা পর্যবেক্ষণের জন্য নিয়োগ করলেন। হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জাহাশের অধীন হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি ওয়াককাস, হযরত উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন গাজওয়ান, হযরত উক্কাছা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মুহসিন এবং হযরত ওয়াকিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবদুল্লাহর মতো অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী ছিলেন। তাঁদের রওয়ানার সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি পত্র লিখিয়ে হযরত আবদুল্লাহ বিন জাহাশকে দিলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, দু'দিন সফরের পর পত্রটি খুলে পড়তে হবে ও পত্রের নির্দেশ মত কাজ করতে হবে। হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ মুতাবিক দু'দিন সফরের পর পত্র খুলে পড়লেন। তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ফরমান লিপিবদ্ধ ছিলো ঃ

"এ চিঠি পাঠের পর তোমরা সোজা মক্কা এবং তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলা নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান নেবে। সেখান থেকে কুরাইশদের বাণিজ্যিক কাফেলার ওপর কড়া নজর রাখবে এবং কাউকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাথে নেবে না। কেউ চাইলে তোমাদের সাথে যাবে এবং না চাইলে ফিরে আসবে।"

হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জাহাশ নিজের সাথীদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্রের বিষয়বস্তু অবহিত করলেন এবং বললেন, আমার সাথে যাওয়া না যাওয়া তোমাদের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। কারো ওপর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। সবাই ঐকমত্য হয়ে বললেন, হে আমীর ! আমরা আপনাকে ছেড়ে যাচ্ছিনে। এরপর তাঁরা বাতনে নাখলার দিকে রওয়ানা দিলেন। পথিমধ্যে হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি ওক্কাস এবং হযরত উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন গাজওয়ানের উট হারিয়ে গেলো। এ দু'জন হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জাহাশের কাছ

থেকে অনুমতি নিয়ে নিখোঁজ উটের সন্ধানে গেলেন এবং তাঁদের সাথীদের থেকে দূরে রয়ে গেলেন। হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জাহাশ নাখলাহ পৌঁছে কুরাইশদের বাণিজ্যিক কাফেলা পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। হঠাৎ করে কুরাইশদের একটি কাফেলা মুসলমানদের অবস্থান স্থলের কাছে এসেই তাঁবু ফেললো। এ কাফেলা তায়েফ থেকে কাঁচা চামড়া, মুনাক্কা এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক পণ্য নিয়ে আসছিলো। কাফেলাটির সাথে ওসমান বিন আবদুল্লাহ মাখজুমী, নওফেল বিন আবদুল্লাহ মাখজুমী, হাকাম বিন কাইসান এবং আমর বিন হাজরামীর মত কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও ছিলেন।

মুসলমানরা এ কাফেলার ব্যাপারে শলা-পরামর্শ করলেন। দিনটি ছিলো রযবের প্রথম তারিখ। কিন্তু মুসলমানদের ধারণা ছিলো যে দিনটি জমাদিউস সানীর শেষ দিন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আজই কাফেলার ওপর এক হাত নেয়া হবে। নচেৎ আগামীকাল রযবের মাস শুরু হয়ে যাবে। আর যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম ঘোষিত মাসের অন্যতম মাস হলো রযব। সুতরাং মুসলমানরা কাফেলার দিকে অগ্রসর হলেন। হযরত ওয়াকিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবদুল্লাহ বাহাদুরীর আবেগে আমর বিন হাজরামীকে তীরে নিশানা বানিয়ে শেষ করে দিলেন। আমর বিন হাজরামীই প্রথম মুশরিক যে একজন মুসলমানের [হযরত ওয়াকিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু] হাতে নিহত হয়েছিলো। হাকাম বিন কাইসান এবং ওসমান বিন আবদুল্লাহকে মুসলমানরা গ্রেফতার করলো। কাফেলার অন্যান্য সদস্য পালিয়ে গেলো। হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জাহাশ এবং তাঁর সাথীরা গনিমাতের মাল ও দু'জন কয়েদীসহ মদীনা পৌঁছলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র ঘটনা অবহিত হলেন। তিনি হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জাহাশকে নিষিদ্ধ মাসে রক্তারক্তির অনুমতি দেননি বলে বললেন। হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জাহাশ তারিখের ভুল ধারণার ওজর পেশ করলেন। পক্ষান্তরে কুরাইশরা এ ঘটনাকে রং চং দিয়ে প্রচার করলো। তারা বলতে লাগলো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাথীরা নিষিদ্ধ মাসের মর্যাদা ক্ষুণ্ন, রক্তারক্তি, মাল লুট এবং আমাদের মানুষ আটক করেছে। মদীনার ইহুদী এবং অমুসলিমরাও বিদ্রূপ করে বলতে লাগলো যে, তোমরা হারাম মাসকে হালাল করে নিয়েছো। স্বয়ং মুসলমানরা পর্যন্ত এ অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের কাজে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলো এবং বললো তোমরা ঠিক কাজ করোনি। এতে হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জাহাশ এবং অভিযানে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য সাহাবী অত্যন্ত মনোক্ষুণ্ন হলেন। আল্লাহর শাস্তির ভয়ে তাঁরা ভীত হয়ে পড়লেন। ইত্যবসরে আল্লাহ মেহেরবান এ আয়াত নাযিল করলেন ঃ

"হে নবী ! নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ প্রশ্নে মানুষ আপনাকে প্রশ্ন করে। আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, এ মাসে যুদ্ধ করা বড় পাপ। কিন্তু আল্লাহর রাস্তা থেকে বিরত রাখা এবং মানুষদেরকে হারামে যেতে না দেয়া ও যারা এর যোগ্য (মুসলমান) তাদেরকে তা থেকে বের করে দেয়া আল্লাহর কাছে আরো বড় গোনাহ। এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করা কতল থেকেও বেশী গোনাহের কাজ।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২১৭)

এ আয়াত মুসলমানদের জন্য এক ধরনের ক্ষমা ছিলো। যদিও তারা ভুল করেছিলেন। (দ্বিধা ও সন্দেহের ভিত্তিতে।) কিন্তু মুসলমানদেরকে মসজিদে হারামে প্রবেশে বাধাদান অথবা মসজিদে হারাম থেকে তাদেরকে বের করে দেয়া এমন ধরনের ফেতনা যা নিষিদ্ধ মাসে রক্তারক্তির চেয়েও বড় ধরনের পাপ। বস্তুত কাফেররা কোন্ মুখে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঠাট্টা-বিদ্রূপের ভাষা ব্যবহার করে থাকে।

আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণে অভিযানে অংশগ্রহণকারী মুসলমানরা সান্ত্বনা পেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে গনিমাতের মাল খরচ করার অনুমতি দিলেন। ইবনে জারির তাবারির মতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও এ গনিমাতের মালের পঞ্চমাংশ গ্রহণ করেছিলেন। কয়েদীদের মধ্য থেকে হাকাম বিন কাইসান ইসলাম গ্রহণ করলেন। মক্কাবাসীরা ফিদিয়া প্রেরণ করে ওসমান বিন আবদুল্লাহকে মুক্ত করে নিলো। এক বর্ণনা মতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমর বিন হাজরামীর উত্তরাধিকারদেরকে দিয়ত আদায় করে দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে হক ও বাতিলের মধ্যে প্রথম সংঘর্ষ ঘটে বদরের ময়দানে। এ যুদ্ধে হযরত ওয়াকিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুও অংশগ্রহণ করেন। তিনি সবসময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। এভাবে তিনি অন্যতম মর্যাদাবান সাহাবী হওয়ার গৌরব লাভ করেন।

বদরের যুদ্ধের পর হযরত ওয়াকিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ওহোদ, খন্দক, হুনাইন, তাবুক, মক্কা বিজয় প্রভৃতি যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিরোধানের পর তাঁর তৎপরতা সম্পর্কে আর কিছু জানা যায়নি। আল্লামা ইবনে সায়াদের (র) বর্ণনা মতে তিনি হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাসনামলে ইন্তেকাল করেন। তাঁর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা নীরব।

আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন সোহায়েল রাদিয়াল্লাহ আনহু

হযরত জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহুর প্রকৃত নাম ছিলো আস। কিন্তু ইতিহাসে তিনি আবু জানদাল উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁর বংশ তালিকা হলো ঃ আবু জানদাল আস রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন সোহায়েল রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আমর বিন আবদি শামস বিন আবদি ওয়াদ বিন নাসার বিন মালিক বিন হাসাল বিন আমের বিন লুব্বী।

হযরত আবু জানদালের পিতা সোহায়েল রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আমর কুরাইশের অন্যতম সরদার ছিলেন এবং নিজের বাগ্মীতার জন্যে "খতিবে কুরাইশ" উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তিনি সুন্দর স্বচ্ছ ও সাবলীল বক্তৃতা দিয়ে জনগণের মধ্যে আবেগ সৃষ্টিতে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর এ শক্তিশালী বক্তৃতা মক্কা বিজয় পর্যন্ত ইসলামের বিরুদ্ধেই ব্যয়িত হয়েছিলো। মহান আল্লাহর এক অসাধারণ কুদরত যে সোহায়েল রাদিয়াল্লাহ আনহু যেমন ইসলাম বিরোধী ছিলেন, তেমনি তাঁর পুত্ররা ইসলামের প্রতি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। তাঁর দু' কন্যা সাহলাহ রাদিয়াল্লাহ আনহা ও উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহ আনহা এবং দু' পুত্র আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু ও আবু জানদাল আস রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত সৌভাগ্যবান ছিলেন। তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির প্রথম যুগেই হক দাওয়াত কবুল করেছিলেন। হযরত আবু জানদালের পিতা তাঁকে ইসলাম গ্রহণের অপরাধে প্রচণ্ড শাস্তি দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর পায়ে বেড়ি দিয়ে অন্তরীণ করে রেখেছিলেন। বছরের পর বছর তিনি কারারুদ্ধ অবস্থায় নির্যাতিত হন এমনকি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা তাশরীফ নেন এবং বদর, ওহোদ ও পরিখার যুদ্ধেরও সমাপ্তি ঘটে। তবুও তাঁর ওপর নির্যাতন শেষ হয়নি।

৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকাদ মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১৪শ সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুম সমভিব্যাহারে ওমরাহ করার জন্যে মদীনা থেকে মক্কা রওয়ানা হলেন। একথা জানতে পেরে কুরাইশরা মুসলমানদেরকে মক্কা প্রবেশে বাধাদানের সিদ্ধান্ত নিলো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে এক মনজিল আগে হুদাইবিয়া নামক স্থানে তাঁবু ফেললেন এবং কুরাইশদেরকে পয়গাম প্রেরণ করে বললেন যে, আমরা শুধু ওমরাহ আদায় করার জন্যে এসেছি। যুদ্ধ-বিগ্রহ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং

কিছু দিনের জন্যে আমাদের সাথে সন্ধি করে নেয়াই কুরাইশদের উত্তম কাজ হবে। এর জবাবে কুরাইশরা ওরয়াহ বিন মাসউদ সাকাফীকে দূত হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আলোচনার জন্যে প্রেরণ করলেন। তিনি ফিরে গিয়ে বললেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথীরা তাঁর প্রতি এত গভীর অনুরক্ত যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যে তাঁরা নির্দ্বিধায় নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিতে পারেন। এজন্যে মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে নেয়াই উত্তম কাজ হবে। কিন্তু কুরাইশরা ওরওয়াহর কথা মানলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় আরেকজন দূত প্রেরণ করলেন। কুরাইশরা তাঁর সাথেও দুর্ব্যবহার করলো এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে একটি বাহিনী পাঠালো। মুসলমানরা তাদেরকে আটক করলো। কিন্তু রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন এবং শেষ সুযোগদানের জন্যে নিজের দূত হিসেবে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুকে কুরাইশদের কাছে প্রেরণ করলেন। কুরাইশরা তাঁকে মক্কায় আটক করলো।

এদিকে মুসলমানদের মধ্যে রটে গেলো যে, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুকে শহীদ করে ফেলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর খুনের বদলা নেয়ার জন্যে নিজের সাথে আগত সকল সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছ থেকে জীবন উৎসর্গের বাইয়াত নিলেন। এ বাইয়াত ইতিহাসে 'বাইয়াতে রেদওয়ান' নামে পরিচিত। কেননা আল্লাহ তায়ালা বাইয়াতকারীদেরকে নিজের সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিয়েছিলেন। পরে জানা গেলো যে, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাহাদাতের খবর সঠিক ছিলো না। তবুও মুসলমানদের আবেগ উদ্দীপনার সংবাদ পেয়ে মক্কার মুশরিকদের সাহসে ভাটা পড়লো এবং মুসলমানদের সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেলো। তাদের তরফ থেকে হযরত আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহুর পিতা সোহায়েল বিন আমর সন্ধির শর্তাবলী নির্ধারণের জন্যে হুদাইবিয়া এলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী কাররামুল্লাহ ওয়াজহাহুকে সোলেহ বা চুক্তিনামা লেখার নির্দেশ দিলেন। প্রথমে 'রাহমান' ও 'রাসূলুল্লাহ' শব্দাবলী নিয়ে কথা কাটাকাটি হলো। এ ব্যাপারে ফায়সালা হওয়ার পর প্রথম শর্ত হিসেবে লেখা হলো যে, মুসলমানরা এ বছর ওমরাহ করা ছাড়াই ফিরে যাবে। অবশ্য আগামী বছর তারা এ উদ্দেশ্যে আসতে পারবে।

এরপর সুহাইল রাদিয়াল্লাহ আনহু দ্বিতীয় শর্ত পেশ করলেন। এ শর্তে বলা হলো যে, মক্কার কোনো ব্যক্তি যদি পালিয়ে মুসলমানদের কাছে চলে যায়, আর

সে যদি মুসলমানও হয়, তবুও তাকে কুরাইশদের কাছে ফেরত পাঠাতে হবে। পক্ষান্তরে কোনো মুসলমান যদি মক্কাবাসীদের কব্জায় আসে তাহলে কুরাইশরা তাকে ফেরত পাঠাবে না। মুসলমানদের কাছে এ শর্ত অত্যন্ত আশ্চর্যের মনে হলো। তাঁরা এক বাক্যে এ শর্তকে 'ইনসাফ বিরোধী' এবং 'অগ্রহণীয়' বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু সুহাইল পীড়াপীড়ি করছিলেন যে, এ শর্ত অবশ্যই লিখতে হবে। এ শর্ত নিয়ে বাদানুবাদ চলছিলো। ইত্যবসরে এক প্রাণ স্পর্শী ঘটনা ঘটে গেলো। হযরত আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহু কোনো উপায়ে কারাগার থেকে বেরিয়ে পড়ি কি মরি অবস্থায় হুদাইবিয়া এসে পৌছলেন। তাঁর হাটু থেকে রক্ত নির্গত হচ্ছিলো। পায়ে বেড়ি লাগানোই ছিলো এবং তিনি ডেকে ডেকে মুসলমানদের কাছে এ ভাষায় ফরিয়াদ জানাচ্ছিলেন।

"হে মুসলমানরা ! দেখ, ইসলাম গ্রহণের অপরাধে আমার পিতা আমার এ অবস্থা করে ছেড়েছে। তোমরা কি আমাকে এ মুসিবত থেকে পরিত্রাণের ব্যবস্থা করবে না।" তাঁর এ অবস্থা দেখে মুসলমানদের মধ্যে ক্রন্দনের রোল পড়ে গেলো। কিন্তু সুহাইল এসব দেখে বলতে লাগলেন ঃ "হে মুহাম্মাদ ! আবু জানদালের প্রত্যার্পণের মাধ্যমেই এ সন্ধির বাস্তবায়ন শুরু হবে। শর্ত পূরণের এ প্রথম সুযোগ।"

হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "ভাই, এ শর্ত তো এখনো লিখাই হয়নি। এজন্যে আবু জানদালের ওপর তা কি করে কার্যকর হতে পারে? সুহাইল চমকে উঠলো। তিনি বললেন, "যাই হোক, আবু জানদালকে আমাদের কাছে প্রত্যার্পণ না করা পর্যন্ত আমরা কোনো শর্তেই সন্ধিতে উপনীত হবো না।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবা রাদিয়াল্লাহ আনহুম তাঁকে বোঝানোর অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি কোনোক্রমেই মানলেন না। অবশেষে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুহাইলের শর্ত কবুল করে নিলেন এবং বললেন ঃ "ঠিক আছে, আবু জানদালকে তুমি তোমার সাথে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।"

তখন আবু জানদাল চীৎকার করে করে কাঁদতে লাগলেন এবং উচ্চস্বরে বললেন ঃ

"হে মুসলমানদের দল ! মুশরিকরা একজন মুসলমানদের ওপর যুলুম-নির্যাতনের পাহাড় আপতিত করতে পারে। একথা জেনেও তোমরা তাকে তাদের কাছে হস্তান্তর করছো ? আমার শরীরের দিকে একটু তাকিয়ে দেখ। তাদের অত্যাচারের কারণে আমার শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে রক্তের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে।"

তাঁর এ ফরিয়াদ শুনে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি কি সত্য পয়গম্বর নন ?" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন ঃ "নিসন্দেহে আমি সত্য পয়গম্বর।"

হযরত ওমর জিজ্ঞেস করলেন ঃ "আমরা কি সত্যের ওপর এবং আমাদের শত্রুরা কি মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় ?"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন ঃ "নিসন্দেহে।" হযরত ওমর আরজ করলেন ঃ "তাহলে আমরা নতি স্বীকার করে সন্ধি করবো কেন।"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "আমি আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর নির্দেশ অমান্য করতে পারি না। তিনিই আমার সমর্থক এবং সাহায্যকারী।"

হযরত ওমর ফারুক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য শুনে চুপ মেরে গেলেন। অতপর হযরত আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহু আবারো ফরিয়াদ করলেন ঃ "হে মুসলমানেরা ! তোমরা কি আমাকে এজন্যে কুরাইশদের কাছে ন্যস্ত করছো যাতে তারা আমাকে সত্য দ্বীন থেকে পেছনে ঠেলে দিতে পারে।"

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু জানদালকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "আবু জানদাল। ধৈর্যধারণ করো। আমাদের কর্মপদ্ধতির ফল খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে (তিনি এটা ইঙ্গিত বা ইশারা দিয়ে বললেন)। আল্লাহ তোমার এবং অন্যান্য মযলুম মুসলমানের জন্যে কোনো রাস্তা তৈরি করে দেবেন। মোটকথা, জিঞ্জিরাবদ্ধ অবস্থায় হযরত আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহুকে সুহাইল রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে হস্তান্তর এবং সন্ধিনামায় দস্তখত হলো।

রহমতে আলম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওমরাহ করা ছাড়াই সাহাবা রাদিয়াল্লাহ আনহুম সহ মদীনার দিকে রওয়ানা দিলেন। তখন আল্লাহর তরফ থেকে ইরশাদ হলো ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা তোমাকে প্রকাশ্য বিজয় দিয়েছি)।

আল্লাহ পাকের এ ইরশাদে প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের ভবিষ্যত বিজয়-সমূহের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। আল্লাহ যদি সেই মুহূর্তে এ আয়াত নাযিল না

করতেন তাহলে অধিকাংশ সাহাবীই ধারণা করে নিয়েছিলেন যে, তাঁরা নতি স্বীকার করে সন্ধিতে সম্মত হয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়া থেকে মদীনা ফিরে এলেন। এ সময় বনি সাকিফ গোত্রের একজন মযলুম মুসলমান হযরত আবু বাসির রাদিয়াল্লাহ আনহু কোনোক্রমে মক্কার কাফেরদের নির্যাতনের পাঞ্জা থেকে বের হয়ে মদীনা এসে উপস্থিত হলেন। মক্কার মুশরিকরা তাঁকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য দু'জনকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রেরণ করলো। তিনি হুদাইবিয়ার সন্ধি অনুসারে হযরত আবু বাসির রাদিয়াল্লাহ আনহুকে তাদের কাছে প্রত্যার্পণ করলেন। পথিমধ্যে হযরত আবু বাসির রাদিয়াল্লাহ আনহু দু'জনের একজনকে হত্যা করলেন এবং অপরজন পালিয়ে মদীনা উপস্থিত হলো। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলো। ইত্যবসরে হযরত আবু বাসির রাদিয়াল্লাহ আনহুও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছলেন এবং আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহ আপনাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। কেননা আপনি চুক্তির শর্ত পূরণ করেছেন। আল্লাহ পাক আমাকে মুশরিকদের নির্যাতনের থাবা থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন এটা ভিন্ন কথা।"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবা রাদিয়াল্লাহ আনহুমদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "এ ব্যক্তি যদি আরো কয়েকজন সাথী পায় তাহলে যুদ্ধের দাবানল প্রজ্জ্বলিত করতে পারে।"

হযরত আবু বাসির রাদিয়াল্লাহ আনহু বুঝে নিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশ্যই তাঁকে মক্কা ফেরত পাঠিয়ে দিবেন। তিনি চুপিসারে মদীনার উপকণ্ঠের দিকে চলে গেলেন এবং মক্কা থেকে সিরিয়া গমনকারী বাণিজ্যিক সড়কের কাছে একটি স্থানে অবস্থান শুরু করলেন।

কিছুদিন পর হযরত আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহুও কোনোভাবে সুযোগ পেয়ে কারাগার থেকে পালিয়ে হযরত আবু বাসির রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। এভাবে আরো কতিপয় মযলুম মুসলমানও মক্কার কুরাইশদের নির্যাতনের থাবা থেকে বের হয়ে সেখানে এলেন। ধীরে ধীরে আবু বাসির রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে বেশ কিছু লোক একত্রিত হলেন। তাঁরা এখন কুরাইশদের বাণিজ্যিক কাফেলার ওপর অতর্কিতে হামলা শুরু করলো। এ হামলা ক্রমে বেড়েই যেতে লাগলো। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ালো যে, কুরাইশদের পক্ষে কোনো বাণিজ্যিক কাফেলা প্রেরণই কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। এমনিভাবে

তাদের জীবন জীবিকাই মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়লো। অবস্থা বেগতিক দেখে তারা সবাই একত্রে বসলো এবং এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, মুসলমানদের প্রত্যার্পণ না করার শর্তের কারণে এসব ঘটছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এ শর্ত বলবৎ থাকবে ততক্ষণ তাদের পাঞ্জা থেকে বেরিয়ে যাওয়া মুসলমান কুরাইশদের বাণিজ্য প্রশ্নে হুমকি হয়ে থাকবেন। অতএব, এ শর্ত বাতিল করাই উত্তম হবে। সুতরাং তারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একজন দূত প্রেরণ করে আবেদন জানালো যে, খোদার কসম ! উক্ত শর্ত বাতিল করে দিন এবং আবু বাসির রাদিয়াল্লাহ আনহু, আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহু ও তাদের সাথীদেরকে আপনার কাছে ডেকে পাঠান। ভবিষ্যতে কোনো মুসলমান পালিয়ে গেলে সে স্বাধীন হয়ে যাবে। তাঁকে ফেরত পাঠানোর প্রশ্নে আপনার কোনো দায়-দায়িত্ব থাকবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের এ আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং হযরত আবু বাসির রাদিয়াল্লাহ আনহুর দলকে একটি পত্র পাঠালেন। পত্রে তিনি আবু বাসির এবং আবু জানদালকে মদীনায় তাঁর কাছে চলে আসতে বললেন। অন্যান্যদেরকে স্ব স্ব গৃহে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। এ পবিত্র পত্র যখন হযরত আবু বাসির রাদিয়াল্লাহ আনহু পেলেন তখন তিনি মৃত্যু শয্যায় শায়িত ছিলেন। পত্র পড়তে পড়তে তিনি ইন্তেকাল করলেন। হযরত আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর নামাযে জানাযা পড়ে সেখানেই দাফন করলেন এবং নিজে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পালনার্থে মদীনা চলে এলেন। মদীনা আসার পর তিনি মক্কা বিজয়, হুনাইন, তায়েফ ও তাবুক প্রভৃতি সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহযোদ্ধা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

হযরত আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিরোধান পর্যন্ত মদীনাতেই অবস্থান করেছিলেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাসনামল পর্যন্ত এখানেই কাটান। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাসনামলে সিরিয়া গমনকারী মুজাহিদদের দলে যোগ দেন এবং রোমীয়দের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুদ্ধে বাহাদুরী প্রদর্শন করেন। ঐতিহাসিকরা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি অব্যাহতভাবে ছ' বছর সিরিয়ার ময়দানে জিহাদে তৎপর ছিলেন। ১৮ হিজরীতে মহামারী আকারে প্লেগ দেখা দিলে অন্যান্য হাজার হাজার মুজাহিদদের মত হযরত আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহুও তাতে আক্রান্ত হন এবং আপন গৃহ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে জিহাদের ময়দানে ওফাত পান।

ইবনে জারির তাবারী হযরত আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহুর সিরিয়া অবস্থানকালীন যুগের এক আশ্চর্য ধরনের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, একবার কতিপয় মুজাহিদদের তরফ থেকে শরাব পানের মত বিচ্যুতি ঘটে গেলো। হযরত আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহুও তাঁদের মধ্যে ছিলেন। সিরিয়ার আমীর হযরত আবু ওবায়দাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল জাররাহ আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর নির্দেশ মতো তাদের ওপর প্রকাশ্যে হদ বা দণ্ড কার্যকর করলেন (প্রত্যেককে ৮০ করে বেত্র দণ্ড প্রদান করা হলো)।

এসব মুজাহিদ নিজের বিচ্যুতি এবং তার জন্য প্রাপ্ত শাস্তিতে এত লজ্জিত হলেন যে, মুখ ঢেকে বসে পড়লেন এবং বাইরে বেরুনো ছেড়ে দিলেন। হযরত আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ ছিলেন। তাঁর চিন্তায় বেশী প্রভাব পড়লো। হযরত আবু ওবায়দাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুকে তার অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত করালেন এবং আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহুর নামে একটি সান্ত্বনামূলক পত্র প্রেরণের আবেদন জানালেন। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহুর নামে এ চিঠি প্রেরণ করলেন ঃ

"ওমরের কাছ থেকে হযরত আবু জানদালের নামে—আল্লাহর সাথে যারা অন্যকে শরীক করে তাদের ভুল-ভ্রান্তি আল্লাহ কখনো মাফ করবেন না। এর চেয়ে কম ভুল-ভ্রান্তিকারীদেরকে আল্লাহ চাইলে মাফ করে দেবেন। অতএব, তুমি তাওবাহ করো। মাথা উঠাও। বাইরে বের হও এবং নিরাশ হয়ো না। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আমার বান্দাহ ! যারা নিজের নফসের সাথে বাড়াবাড়ি করেছে তারা যেন আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হয়। তিনি সকল পাপ মার্জনা করেন এবং অত্যন্ত দয়ালু ও মেহেরবান।"

এ বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মানবীয় ভিত্তিতে যদি কোনো সাহাবীর ত্রুটি-বিচ্যুতিও হয়ে থাকে, তাহলেও তিনি স্বয়ং নিজের ওপর দণ্ডও কার্যকর করিয়ে নিতেন এবং প্রচণ্ড লজ্জা অনুভব করতেন। এজন্যে আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বিশেষভাবে চিঠি লিখে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা শির্ক ছাড়া সকল গুণাহই মার্জনা করবেন। এজন্য তুমি পশ্চাৎগামিতা থেকে বিরত হও। এ পত্রে এও প্রমাণিত হয় যে, হযরত আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহু মুসলমানদের মধ্যে অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী ছিলেন এবং হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে তাঁর অত্যন্ত মর্যাদা ছিলো।

হাফেয ইবনে আবদুল বার (র) লিখেছেন, হযরত আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহু কবিতা এবং কাব্যেও দখল রাখতেন এবং সুন্দর কবিতা লিখতেন। তিনি "আল ইসতিয়াব" গ্রন্থে হযরত আবু জানদালের রাদিয়াল্লাহ আনহু কিছু কবিতাও সংকলিত করেছেন।

হযরত আবু বুরযাহ্ আসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু

হিজরী প্রথম শতাব্দীর ৬ষ্ঠ দশকের কথা। বসরার গভর্নর ওবায়েদুল্লাহ বিন যিয়াদের একবার হাওজ কাওসারের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোনো ব্যক্তি কি হাওজ কাওসার সম্পর্কে তাঁর মনে সৃষ্ট সন্দেহ দূর করতে পারে? জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিরা তাঁকে বসরায় বসবাসরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অত্যন্ত বয়োঃবৃদ্ধ একজন সাহাবীর ঠিকানা দিলেন। ইবনে যিয়াদ তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তাশরীফ আনলেন। তাঁকে দেখে তিনি ঠাট্টা করে বললেন ঃ

"এ কি তোমাদের সেই-মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী ইবনে যিয়াদের কথা শুনলেন। তিনি মনে অত্যন্ত দুঃখ পেলেন। তিনি ক্রোধ মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন ঃ

"এ ধরনের চিন্তাও করতে পারি না। আমি কখনো এ ধরনের লোকও দেখবো যে আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী হওয়া সম্পর্কে লজ্জা দেবে।"

অতপর তিনি অগ্রসর হয়ে যিয়াদের সিংহাসনের সামনা সামনি বসে গেলেন। ইবনে যিয়াদ কথা পাল্টে বললেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্য তো আপনার জন্যে কোনো দোষের নয়, বরং সৌভাগ্যের। এরপর তিনি তাঁকে হাওজ কাওসার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাওজ কাওসার সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, একবার নয় দু'বার নয়, তিনবার নয়, চারবার নয়, বরং বারবার। যে ব্যক্তি হাওজ কাওসারকে অস্বীকার করবে আল্লাহ তাকে তার কাছেও ঘেষতে দেবেন না এবং তার পানিও পান করতে দেবেন না।" একথা বলে তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

এ সাহাবী যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যকে নিজের জীবনের প্রাপ্তি হিসেবে মনে করতেন এবং হক কথা বলতে শাসকেরও পরোয়া করতেন না।

সাইয়েদেনা হযরত আবু বুরযাহ'র নাম ছিলো নাজলা। আসলাম বিন আফসা গোত্রের সাথে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর বংশ তালিকা নিম্নরূপ ঃ

নাজলা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবদুল্লাহ বিন হারেস বিন হাবাল বিন রবিয়া বিন ওয়ায়িল বিন আনাস বিন খোজায়মাহ বিন মালিক বিন সালামান বিন আসলাম বিন আফসা।

বনু আসলাম গোত্র মাররে জাহরান এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাস করতো। হযরত আবু বুরযাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুর প্রাথমিক জীবনের ঘটনাবলী সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। তিনি কবে নাগাদ মক্কা এসেছিলেন তাও নির্দিষ্ট করা যায়নি। তবে আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং হিজরতের পর প্রায় সকল যুদ্ধেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অংশ নিয়েছিলেন।

অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ক'জন ব্যক্তিকে হত্যা করা ওয়াজিব বলে নির্ধারণ করেছিলেন তাদের মধ্যে একজন ছিলো আবদুল্লাহ বিন খাতাল। এ লোকটি ইসলামের ঘোরতর শত্রু ছিলো। ইসলাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে তার শত্রুতা এত প্রকট ছিলো যে, সে নিজের দু'জন বাঁদীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাহাবীদের গালাগাল সম্বলিত কবিতা মুখস্ত করিয়ে রেখেছিলো। তারা এ কবিতা গান আকারে বাদ্যযন্ত্র সমেত গাইত। মুসনাদে আবু দাউদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন আবদুল্লাহ বিন খাতাল কা'বা শরীফের গেলাফ ধরে রইলো। মনে করলো যে, এভাবেই সে নিরাপত্তা পাবে। কিন্তু তার অপরাধ ছিলো অত্যন্ত ভয়ংকর। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সে কোনোক্রমেই নিরাপত্তা পাওয়ার জন্য যোগ্য ছিলো না। সুতরাং তিনি হযরত আবু বুরযাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে খাতালের ভবলীলা সাঙ্গ করার নির্দেশ দিলেন। হযরত আবু বুরযাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু অগ্রসর হয়ে তাকে যমের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে হযরত আবু বুরযাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু মদীনাতেই কাটিয়ে ছিলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাসনামলেও তিনি সেখানেই অবস্থান করেন। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর খিলাফতকালে বসরায় বসতিস্থাপন শুরু হয়। এ সময় তিনি সেখানে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর মধ্যে বিরোধ শুরু হলে তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুকে পুরোপুরি সমর্থন করেন এবং সিফফীনের যুদ্ধে সিরীয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করেন। এরপর নাহারওয়ানের

যুদ্ধে খারেজীদের বিরুদ্ধে বাহাদুরীর পরিচয় দেন। হাফিজ ইবনে হাজর (র) ইসাবাহ নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, হযরত আবু বুরযাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু খুরাসানের বিজয়সমূহে অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পরিষ্কার করে বলেননি যে, হযরত আবু বুরযাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু কোনো সময়ে এবং খোরাসানের কোনো যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ধারণা করা হয় যে, তিনি খোরাসানের সেসব অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন যা আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর যুগে প্রেরণ করা হয়েছিলো।

হযরত আবু বুরযাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু ৬৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি মুগিরাহ নামক এক পুত্র রেখে যান।

নবুয়াতের প্রস্রবনে অবগাহন করার যথেষ্ট সুযোগ হয়েছিলো হযরত আবু বুরযাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুর এজন্যে জ্ঞান ও ফযিলাতের দিক দিয়ে তিনি উঁচু মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি ৬৪টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে ২৭টি ঐকমত্যের হাদীস। দু'টিতে ইমাম বুখারী এবং ৪টিতে ইমাম মুসলিম ভিন্নমত পোষণ করেন।

তাঁর অসংখ্য শিষ্যের মধ্যে আবু ওসমান নাহদী (র), আবু মিনহাল রিয়াহী (র), আরযাক বিন কায়েস (র), আবু তালুত (র), মুগিরাহ (র), আবুল আলিয়া রিয়াহী (র), কিনানাহ বিন নয়ীম (র), রাবেসী (র) এবং আবুস সাওয়ারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হযরত আবু বুরযাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। ইসলামের প্রতি অগ্রগামিতা, জ্ঞান পিপাসা, জিহাদের প্রতি অনুরাগ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালোবাসা, বদান্যতা ও দানশীলতা এবং সাদাসিধে জীবনযাপন তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো। ইবনে সায়াদের (র) মতে সকাল-সন্ধ্যায় গরীব-মিসকীনদের আহার করানো তাঁর অভ্যাস ছিলো। হাসান বিন হাকিম (র) নিজের আম্মার জবানীতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু বুরযাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু সারিদের (আরববাসীদের প্রিয় খাবার) এক পুরো বড় পাত্র প্রত্যেক দিন সকাল ও সন্ধ্যায় বিধবা, এতীম এবং মিসকীনদের খাওয়াতেন।

আল্লাহ পাক হযরত আবু বুরযাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে অনেক কিছু দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিরাসক্ত জীবনযাপন করতেন। জীবনে কোনো দিন তিনি আড়ম্বর পূর্ণ পোশাক পরিধান করেননি। শুধু মাত্র গেরুয়া রংয়ের দু'টি কাপড় পরতেন। ঘোড়ায় সওয়ার হওয়াও তিনি এড়িয়ে চলতেন। তাঁর সমকালীন এক সাহাবী হযরত আয়েজ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওমর ভালো

কাপড়ও পরতেন এবং ঘোড়াতেও সওয়ার হতেন। একজন এ দু' বুযর্গ ব্যক্তির মধ্যে কলহ সৃষ্টির লক্ষ্যে হযরত আয়েজ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বললো, আবু বুরযাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু তো আপনার বিরোধিতায় এক পায়ে খাড়া হয়ে রয়েছে। আপনি খাজ (এক ধরনের অত্যন্ত মূল্যবান কাপড়) ব্যবহার করেন এবং ঘোড়াতেও সওয়ার হন। কিন্তু আবু বুরযাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু এ দু' বস্তুই এড়িয়ে চলেন। হযরত আয়েজ রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, আল্লাহ তাআলা আবু বুরযাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওপর স্বীয় রহমত নাযিল করুন। আজ আমাদের মধ্যে কে শত্রুতা সৃষ্টি করতে পারে ? সে ব্যক্তি হযরত আয়েজ রাদিয়াল্লাহ আনহুর জবাবে নিরাশ হয়ে হযরত আবু বুরযাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে গেলো এবং তাকে বললো, দেখুন আয়েজ কেমন ধরনের ঠাটের সাথে জীবনযাপন করে। খাজের পোশাক পরিধান করে এবং ঘোড়াতেও সওয়ার হয়। হযরত আবু বুরযাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু জবাবে বললেন, আল্লাহ তাআলা আয়েজের ওপর রহম করুন। আমাদের মধ্যে তার মত মর্যাদার কে আছেন।"

হযরত আবু বুরযাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু নিসন্দেহে সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর পক্ষ নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে তিনি মুসলমানদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে অংশগ্রহণ পসন্দ করতেন না। সুতরাং পরে তিনি মুসলমানদের পারস্পরিক বিরোধে কখনই অংশ নেননি।

হযরত আবদুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহ্ আনহু বিন সোহায়েল রাদিয়াল্লাহ্ আনহু

হযরত আবু সোহায়েল আবদুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহ্ আনহুর পিতা ছিলেন কুরাইশদের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তিনি ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী। তাঁকে কুরাইশদের খতিব উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিলো। তিনি এত শক্তিশালী বক্তা ছিলেন যে, বড় বড় সমাবেশে বক্তৃতাকালে মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে দিতেন। শুধু বক্তৃতাই নয়, তাঁর বিচক্ষণতা ও পরিস্থিতির উপলব্ধি কুরাইশদের কাছে স্বীকৃত ছিলো। এ খতিবে কুরাইশের নাম ছিলো সোহায়েল রাদিয়াল্লাহ্ আনহু বিন আমর। প্রকৃতির বিস্ময়কর ব্যাপার হলো যে, সোহায়েল রাদিয়াল্লাহ্ আনহুর বিচক্ষণতা, জ্ঞানবুদ্ধি ও বিশ্ব দ্রষ্টা হওয়া সত্ত্বেও মক্কা বিজয় পর্যন্ত কুফর ও শির্কের অন্ধ গলিতে হোচট খেয়েছেন। কিন্তু তাঁর সন্তানরা (ছেলে মেয়ে) এমন সৌভাগ্যবান ছিলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির প্রথম যুগেই ঈমান এনে অগ্রগামী দলের সুমহান মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহ্ আনহু সোহায়েল রাদিয়াল্লাহ্ আনহু বিন আমরেরই সন্তান ছিলেন। তাঁর সম্পর্ক ছিলো আমের বিন লুব্বী গোত্রের সাথে। তাঁর বংশ তালিকা নিম্নরূপ ঃ

আবদুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহ্ আনহু বিন সোহায়েল রাদিয়াল্লাহ্ আনহু বিন আমর বিন আবদে শামস বিন আবদে ওয়াদ বিন নাজার বিন মালিক বিন হাসাল বিন আমের বিন লুব্বী। মাতার নাম ছিলো ফাখনাহ্ বিনতে আমের (বিন নওফেল বিন আবদে মান্নাফ বিন কুসাই)। এভাবে পিতা ও মাতা উভয়ের দিক থেকে তাঁর বংশ ধারা ওপরের দিকে গিয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশের সাথে মিশে গেছে।

সত্যের দাওয়াতের প্রথম যুগেই হযরত আবদুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহ্ আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন। এতে তাঁর পিতা ভয়ানক ক্রোধান্বিত হন। তাঁকে মারধোর করেন। একাকীত্বের অন্তরীণে রাখা হয়। কিন্তু তিনি হক থেকে বিন্দুমাত্রও টলেননি। এজন্যে তাঁর পিতা তাঁর অভিভাবকত্ব পরিত্যাগ করেন। এর ফলশ্রুতিতে মক্কার মুশরিকরাও ইসলাম গ্রহণের অভিযোগে তাঁর ওপর নির্যাতন চালাতে থাকে। অবশেষে নবুয়াত প্রাপ্তির ৬ষ্ঠ বছরে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইঙ্গিতে হাবশায় হিজরতকারী দ্বিতীয় দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে হাবশায় গিয়ে উপস্থিত হন। ইবনে আসির রাদিয়াল্লাহ্ আনহুর

বর্ণনা মতে কিছুদিন পর তিনি হাবশা থেকে মক্কা ফিরে আসেন। পিতা তখন তাঁর ওপর আরো বেশী নির্যাতন চালাতে থাকেন। তাঁর হাত পা বেঁধে এক প্রকোষ্ঠে অন্তরীণ করে রাখলেন এবং পরিষ্কার বলে দিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীন পরিত্যাগ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্তরীণ এবং ক্ষুৎ পিপাসার মুসিবত বরদাশত করতে থাকবে। হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বাধ্য হয়ে প্রকাশ্যত পিতার নির্দেশ মেনে নিলেন এবং মুক্তি পেলেন। কিন্তু অন্তরের দিক থেকে তিনি সাচ্চা ও পাক্কা মুসলমানই রয়ে গেলেন।

দ্বিতীয় হিজরীতে কুরাইশের মুশরিকরা বদরের যুদ্ধের জন্যে মক্কা থেকে রওয়ানা হলো। এ সময় তারা হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন সোহায়েল রাদিয়াল্লাহ আনহুকেও নিজেদের সৈন্য দলে অন্তর্ভুক্ত করে নিলো। যখন বদরের প্রান্তরে হক ও বাতিল পন্থীরা পরস্পরের মুকাবিলায় দণ্ডায়মান হলো তখন হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রকাশ্যে শির্কের পোশাক ছিন্ন করে তাওহীদবাদীদের পতাকা তলে গিয়ে দণ্ডায়মান হলেন। তা দেখে তাঁর পিতা অগ্নিশর্মা হয়ে দাঁত কাটতে লাগলেন। কিন্তু ততক্ষণে তীর ধনু থেকে বের হয়ে গেছে।

হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত বাহাদুরীর সাথে মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করলেন। এমনিভাবে তিনি নিজেকে বদরের যুদ্ধে সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত করার সৌভাগ্য অর্জন করলেন।

বদরের যুদ্ধের পর হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু ওহোদ, খন্দক, হুদাইবিয়া, মক্কা, বিজয় এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের মশহুর যুদ্ধসমূহে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহগামী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। বাইয়াতে রেদওয়ানেও (৬ষ্ঠ হিজরী) তিনি শরীক ছিলেন এবং হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্রেও সাক্ষী হিসেবে নিজের নাম দস্তখত করেন।

মক্কা বিজয়ের (৮ম হিজরী) সময় হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুর পিতা সোহায়েল রাদিয়াল্লাহ আনহু ঘরের দরযা বন্ধ করে বসে গেলেন এবং হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বলে পাঠালেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে তাঁর জীবন বাঁচিয়ে দাও। নচেত তাঁর জীবনের আশংকা রয়েছে। পিতার অসহায়ত্বে হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুর অন্তরে দয়ার উদ্রেক হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমার পিতাকে নিরাপত্তা দিন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রহমতের

দরিয়া তখন তুঙ্গে। তিনি বললেন, তাঁকে নিরাপত্তা দেয়া হলো। নির্ভয়ে ঘর থেকে বের হয়ে তিনি ঘুরাফেরা করতে পারেন।"

"মুসতাদরাকে হাকিম" গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, সে সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে সোহায়েল রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে কঠোরতা অবলম্বন থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিলেন। আল্লাহর কসম ! তিনি একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি। এ ধরনের প্রজ্ঞা সম্পন্ন মানুষ ইসলাম থেকে দূরে থাকতে পারেন না। এভাবে নিজের ভাগ্যবান সন্তানের বদৌলতে সোহায়েল রাদিয়াল্লাহ আনহু নিরাপত্তা পেলেন এবং সাথে সাথেই তিনি ঈমান আনলেন। এরপর তাঁর সমগ্র জীবন অতীত কার্যাবলী সংশোধনেই কেটেছিলো।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিরোধানের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাসনামলে ইসলাম ত্যাগের ফেতনা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এ সময় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত খালেদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে মুসায়লামা কাজ্জাবকে উৎখাতের জন্যে একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। এ বাহিনীতে হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন সোহায়েল রাদিয়াল্লাহ আনহুও ছিলেন। মুসলমান এবং মুসায়লামার মধ্যে ইয়ামামাহ নামক স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হলো। হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত বাহাদুরীর সাথে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিলো ৩৮ বছর।

ইবনে সায়াদের (র) বর্ণনা মতে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর পিতা হযরত সোহায়েল রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে শোক জ্ঞাপন করলেন। এ সময় তিনি বললেন, "আমি শুনেছি যে, শহীদ নিজের পরিবারের ৭০ ব্যক্তির জন্যে সুপারিশ করতে পারে। আমি আশা করি যে, আমার শহীদ সন্তান সর্বপ্রথম আল্লাহ পাকের দরবারে আমার জন্যে সুপারিশ করবে।"

হযরত আবদুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহ্ আনহু বিন ওমর রাদিয়াল্লাহ্ আনহু

হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) ইমাম শা'বী থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার কুরাইশের চার যুবক হেরেম শরীফে একত্রিত হলো। তারা স্থির করলো তারা প্রত্যেকেই কা'বার দক্ষিণ স্তম্ভ ধরে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে। দোয়ায় তারা নিজের জীবনের সবচেয়ে বড় সাধ পূরণের আকাংখা প্রকাশ করবে। সুতরাং একজন যুবক উঠে দাঁড়ালো এবং দোয়া করলো ঃ

"হে খোদা ! তুমিতো বিরাট। তোমার কাছে বড় জিনিসই চাওয়া হয়। এজন্য আমি তোমার আরশ, তোমার হেরেম, তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তোমার মর্যাদার মাধ্যম দিয়ে দোয়া করছি। তুমি আমাকে সেই সময় পর্যন্ত জীবিত রেখো, যতক্ষণ না সমগ্র হেজাজে আমার শাসন কায়েম হয়।"

এরপর দ্বিতীয় যুবক দক্ষিণ স্তম্ভ ধরে দোয়া করলো ঃ

"হে খোদা ! তুমি সৃষ্টিজগতের সকল কিছুর স্রষ্টা। সবশেষে প্রত্যেক বস্তুকে তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তোমার যে শক্তির অধীন সমস্ত বিশ্ব সেই শক্তির মাধ্যম দিয়ে আমি দোয়া করছি। আমাকে সেই সময় পর্যন্ত জীবিত রেখো, যতক্ষণ না আমি ইরাকের গভর্নর হই।"

অতপর তৃতীয় যুবক দোয়া করলো ঃ

"হে যমিন ও আসমানের মালিক ! আমি তোমার কাছে এমন জিনিস চাই, যা তোমার অনুগত বান্দাহরা তোমার নির্দেশে চেয়েছে। আমি তোমার বিরাট সত্তা, তোমার সৃষ্টি এবং হেরেমবাসীর হকের মাধ্যম দিয়ে দোয়া করছি, তুমি আমাকে দুনিয়া থেকে সে সময় পর্যন্ত উঠিয়ে নিও না, যতক্ষণ না পূর্ব ও পশ্চিমে আমার শাসন কায়েম হয় এবং যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে তার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেই।"

এরপর চতুর্থ যুবক উঠে দাঁড়ালো এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এ দোয়া করলো ঃ

"হে আল্লাহ ! তুমি রাহমান এবং রাহীম। আমি তোমার সেই রহমতের মাধ্যম দিয়ে দোয়া করছি যা তোমার ক্রোধের ওপর বিজয়ী। আখিরাতে তুমি আমাকে লজ্জিত করো না এবং সেই জগতে তুমি আমাকে বেহেশত নসীব করো।"

প্রথম যুবক ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের রাদিয়াল্লাহ আনহু দ্বিতীয়জন ছিলেন, তার ভাই মুসয়াব বিন যোবায়ের রাদিয়াল্লাহ আনহু তৃতীয় যুবক ছিলেন আবদুল মালিক বিন মারওয়ান। চতুর্থ যুবক যার জীবনের সবচেয়ে বেশী কাম্য ছিলো শুধুমাত্র পরকালীন কল্যাণ। তাঁর নাম হলো ফাকিহুল উম্মাহ হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু।

সাইয়েদেনা হযরত আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু উম্মাহর অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে পরিগণিত। তিনি সাধারণভাবে ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু নামে প্রসিদ্ধ। অর্থাৎ সেই ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর পুত্র যার সম্পর্কে নবীকুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিরোমনি বলেছিলেন ঃ "আমার পরে যদি কেউ নবী হতো, তাহলে ওমর হতো। কিন্তু আমার পর আর কোনো নবী নেই।"

হযরত ইবনে ওমরের বংশ তালিকা হলো ঃ

আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন খাত্তাব বিন নুফায়েল বিন আবদুল উজ্জা বিন রাবাহ বিন কুরত বিন জারাহ বিন আদি বিন কাব বিন লুব্বী।

কা'ব বিন লুব্বীতে এসে তাঁর বংশ ধারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশের সাথে মিলে যায়।

মাতার নাম ছিলো হযরত জয়নব রাদিয়াল্লাহ আনহু বিনতে মাজউন। তিনি বনু জুমাহ গোত্রের ছিলেন এবং সাহাবিয়াহ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহ আনহা বিনতে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর সহোদরা ছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইসলামের ইতিহাসের চার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বের অন্যতম ছিলেন। অন্য তিনজন ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের রাদিয়াল্লাহ আনহু। এ চারজন ছিলেন অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

বিশ্বস্ত বর্ণনা মতে, হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির দু' বছর পর জন্মগ্রহণ করেন। নবুয়াত প্রাপ্তির ছ' বছর পর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন। এ সময় হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর বয়স ছিলো প্রায়

পাঁচ বছর। পিতার ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে এমনি এমনি তিনি নিজেও ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে চলে এলেন এবং নির্ভেজাল ইসলামী পরিবেশেই লালিত-পালিত হলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির ১৩ বছর পর হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের পরিবার-পরিজনসহ মদীনা হিজরত করলেন। হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু পিতার সাথে মদীনা পৌছলেন। এ সময় তার বয়স ছিলো ১১ বছর। যুদ্ধসমূহ শুরু হলো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের যুদ্ধে রওয়ানা হলেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু জিহাদের আবেগে অস্থির হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী তিনি ১৫ বছর বয়সের কম বয়স্ক বালকদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দিতেন না। বস্তুত সে সময় হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর বয়স মাত্র ১৩ বছর ছিলো। এজন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ফিরিয়ে দিলেন। ওহোদের যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ছিলো ১৪ বছর। এজন্য এ যুদ্ধেও তিনি শরীক হতে পারলেন না।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু সর্বপ্রথম পরিখার যুদ্ধে (৫ হিজরী) বাহাদুরীর চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। এ সময় তাঁর বয়স যুদ্ধের উপযোগী হয়ে গিয়েছিলো।

৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদাইবিয়ার সন্ধির পূর্বে বাইয়াতে রেদওয়ানে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিলো। এভাবে তিনি আসহাবিস সাজারাহ (বৃক্ষের সাথীসমূহ) মধ্যে পরিগণিত হন। আল্লাহ তাআলা প্রকাশ্য ভাষায় এসব সাহাবীকে নিজের সন্তুষ্টি প্রাপ্ত সাহাবী হিসেবে সুসংবাদ দিয়েছেন। সহীহ আল বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, ঘটনাক্রমে বাইয়াতে রেদওয়ানের সৌভাগ্য তাঁর মর্যাদাবান পিতার পূর্বেই ঘটেছিলো। ঘটনাটি এভাবে ঘটেছিলো যে, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে এক আনসারীর কাছে ঘোড়া আনার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তিনি অগ্রসর হয়ে প্রথমে নিজে বাইয়াত হন। অতপর পিতাকে গিয়ে খবর দেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌছেন এবং বাইয়াতের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

বাইয়াতে রেদওয়ানের পর হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু খাইবার, মক্কা বিজয়, হুনাইন, তায়েফ এবং তাবুকের যুদ্ধসমূহে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহগামী ছিলেন।

ইমাম বুখারী (র) মক্কা বিজয় প্রসঙ্গে প্রাণস্পর্শী ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, মক্কা বিজয়ের সময় হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর বয়স ছিলো মাত্র ২০ বছর এবং তিনি একরোখা দ্রুতগামী অশ্বে চড়ে আসছিলেন। তাঁর গায়ে ছিলো ছোট্ট একটি চাদর এবং হাতে একটি বল্লম। এক স্থানে ঘোড়া থেকে নেমে তিনি ঘাস কাটতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টি তার ওপর পড়লো এবং অত্যন্ত প্রশংসার সুরে তিনি বললেন, এতো আবদুল্লাহ। এরপর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছু পিছু মক্কায় প্রবেশ করলেন। হযরত উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হুজুরের সাথে ছিলেন। হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন তালহাও একই সাথে আসছিলেন। কা'বা শরীফের উঠানে উট বসিয়ে চাবি চেয়ে আনা হলো এবং কা'বার দরযা খুলে তিনজন একই সাথে প্রবেশ করলেন। তাদের পর কা'বা শরীফে সর্বপ্রথম প্রবেশের সৌভাগ্য হয়েছিলো হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর।

১০ম হিজরীতে হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর বিদায় হজ্জে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহগামী হওয়ারও সৌভাগ্য লাভ করেন।

১১ হিজরীতে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওফাত পান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতে হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু এত শোকাভিভূত হয়েছিলেন যে, আজীবন তিনি বাড়ীও বানাননি এবং কোনো বাগানও আবাদ করেননি। যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা স্মরণ হতো তখনই তিনি অস্থির চিত্তে ক্রন্দন করতেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর অন্তরে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর অপরিসীম আবেগ ছিলো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাসনামালে বিভিন্ন কারণে তিনি মদীনার বাইরে যেতে পারেননি। কিন্তু হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাসনকালে ইরান, সিরিয়া এবং মিসরের বিজয়সমূহে জীবন বাযী রেখে অংশ নিয়েছিলেন। পিতা ছিলেন বিশাল ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা। তবুও তিনি একজন সাধারণ মুজাহিদ হিসেবে ইসলামী বাহিনীতে যোগ দেন এবং কখনো কোনো পদের খাহেশ করেননি। ওয়াকেদী কয়েকটি যুদ্ধে তাঁর প্রদর্শিত বাহাদুরী এবং অকুতোভয় কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

২৩ হিজরীর শেষ দিকে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওপর হত্যামূলক হামলা চালানো হলো এবং তার জীবিত থাকার আর কোনো আশাই রইলো না। এ অবস্থায় তিনি তার নিজের উত্তরাধিকার নির্বাচন প্রশ্নটি মুসলমানদের কাছে একটি জামায়াতের ওপর ন্যস্ত করলেন। এ দল বা জামায়াতে বড় বড় সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুম ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু যদিও নিজের জ্ঞান, মর্যাদা ও অন্যান্য যোগ্যতার দিক থেকে খলিফা হওয়ার যোগ্য ছিলেন। কিন্তু হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাকওয়ার এত উচ্চাসনে আসীন ছিলেন যে, স্বীয় পুত্রকে খলীফা হিসেবে মনোনীত করা কোনোক্রমেই পসন্দ করতেন না। তিনি অসিয়াত করলেন যে, সে খলীফা নির্বাচনে পরামর্শদাতা বা উপদেষ্টা হিসেবে অংশ নিতে পারে। কিন্তু খলীফা হিসেবে তাঁর নাম কিছুতেই চিন্তা করা যাবে না। হযরত ওসমান জুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের শাসনামলে হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বিচারপতির পদ দেয়ার প্রস্তাব পেশ করলেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ না করে ক্ষমা চাইলেন। আল্লামা বালাজুরী (র) ফতহুল বুলদান নামক গ্রন্থে লিখেছেন, ২৭ হিজরীতে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু আফ্রিকায় (তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া এবং মরক্কো) সৈন্য প্রেরণ করলেন। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইসলামী বাহিনীতে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নিয়েছিলেন। ইবনে আসীরের (র) বর্ণনা মতে, ৩০ হিজরীতে তিনি খোরাসান এবং তাবারিস্তান যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন।

হযরত ওসমান জুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাসনামলে ফেতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। এ সময় হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু নির্জনবাসী হয়ে গেলেন। কেননা তিনি মুসলমানদের একে অপরের বিরুদ্ধে হানাহানি করা কিছুতেই পসন্দ করতেন না। ইবনে সায়াদের (র) বর্ণনা মতে, আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাহাদাতের পর জনগণ তাঁকে খেলাফতের আসনে আসীন করতে চাইলেন। কিন্তু তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ প্রশ্নে সরাসরি অস্বীকৃতি জানালেন।

ইমাম হাকিম (র) নিজের পুস্তক মুসতাদরাকে গাসসান বিন আবদুল হামিদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী কাররামুল্লাহ ওয়াজহাহু খেলাফতের আসনে আসীন হলেন। তখন হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু এ শর্তে তাঁর হাতে বাইয়াত বা আনুগত্য প্রকাশ করলেন যে, হযরত আলী গৃহযুদ্ধে অংশ নেবেন না। বস্তুত তিনি উষ্ট্র ও সিফফিনের যুদ্ধে কোনো পক্ষই সমর্থন করেননি। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুকে কার্যতঃ সহযোগিতা না করার ব্যাপারে সবসময় আফসোস এবং দুঃখ

প্রকাশ করেছেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাহাদাত ও হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহ আনহুর খিলাফত থেকে সরে দাঁড়ানোর পর তিনি হযরত আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর আনুগত্য প্রকাশ করেন। তিনি কাসতানতুনিয়ার যুদ্ধে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নিয়েছিলেন। হযরত আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর পর ইয়াযিদ সিংহাসনে বসলো। ইবনে সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর বক্তব্য অনুসারে তিনি এ সময় উম্মাহর মতবিরোধ থেকে বাঁচার জন্য ইয়াজিদের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু আনুগত্য প্রকাশের সময় বলেছিলেন যে, যদি এটা মঙ্গলের হয়, তাহলে আমি সন্তুষ্ট। আর যদি তা মুসবিতের হয় তাহলে আমি ধৈর্যধারণ করবো। অতপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ "অতপর যদি তুমি মুখ ফিরাও, তাহলে যে বোঝা তার ওপর রাখা হয়েছে তার দায়িত্ব তার-যে বোঝা তোমার ওপর রাখা হয়েছে সে দায়িত্ব তোমার।"

ইয়াযিদের পর দ্বিতীয় মুয়াবিয়া এবং মারওয়ান ইবনুল হাকাম ক্ষমতার আসনে বসলেন। ৬৫ হিজরীতে মারওয়ানের মৃত্যুর পর তার পুত্র আবদুল মালিক খলিফা হলো। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু তাকে লিখিত আনুগত্যনামা পাঠিয়ে দিলেন। এ আনুগত্য নামায় লেখা ছিলো যে, আমি এবং আমার পুত্র আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের সুন্নাতের ওপর সামর্থানুযায়ী আমীরুল মু'মিনীন আবদুল মালিকের কথা শ্রবণ ও আনুগত্যের অঙ্গীকার করছি।

হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু আবদুল মালিকের শাসনামলে ৭৪ হিজরীতে ৮৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। চরিতকাররা তাঁর ইন্তেকাল প্রসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা পেশ করেছেন। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, একবার হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খুতবা দিচ্ছিলেন। খুতবায় সে প্রতিপক্ষ হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহুর বিরুদ্ধে তোহমত আরোপ করলো। সে বললো, হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু কুরআনে হাকিমের আয়াতের অক্ষর পরিবর্তন করেছে। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু একথা শুনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং জনাকীর্ণ সমাবেশে প্রতিবাদ করে বললেন, তুমি মিথ্যা বলছো। ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং তোমার মধ্যে এমন শক্তি নেই যে, তোমরা আল্লাহর কালামে পরিবর্তন সাধন করতে পারো। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর এ ধমক হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে অত্যন্ত কঠিন এবং অসহনীয় মনে হলো। কিন্তু প্রকাশ্যে তাঁর ওপর হাত তোলার সাহস হলো না। অবশ্য প্রতিশোধ নেয়ার জন্য একজন সিরিয়াবাসীকে নিয়োগ করলো। নিয়োগকালে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাকে বললো, হজ্জের সময় বর্শার মাথায় বিষ লাগিয়ে হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর পায়ে ঢুকিয়ে দিতে হবে।

সে যথাযথভাবেই কাজ করলো। তাঁর সারা শরীরে বিষের ক্রিয়া শুরু হলো এবং তিনি তা সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

ইমাম হাকিম (র) স্বলিখিত গ্রন্থ "মুসতাদরাকে" বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য হাজ্জাজ মক্কা এলো এবং কামান ফিট করে কা'বা শরীফের ওপর গোলা বর্ষণের জন্য প্রস্তুতি নিলো। তখন ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত ভীত বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তিনি হাজ্জাজকে গালমন্দ করলেন। এতে সে ক্রোধান্বিত হলো এবং তাঁর ইঙ্গিতে একজন সিরিয়বাসী তার বিষ মিশ্রিত বর্শা দিয়ে তাঁকে আহত করলো। যখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন হাজ্জাজ তাঁকে দেখতে এসে বললো, আহা ! অপরাধীর ঠিকানা যদি সে জানতো তাহলে তার মাথা উড়িয়ে দিতো। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, এসব তোমারই কীর্তি। তুমি যদি হেরেম শরীফে অস্ত্র আনার অনুমতি না দিতে তাহলে এ ঘটনা ঘটতো না।

ইবনে আসির (র) বর্ণনা করেছেন যে, একদিন হাজ্জাজ খুতবা দিচ্ছিলো। খুতবা এত লম্বা হচ্ছিলো যে, আসরের নামাযের ওয়াক্ত প্রায় যায় যায়। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, সূর্যতো তোমার জন্য অপেক্ষা করতে পারে না। এতে হাজ্জাজ অত্যন্ত রাগান্বিত হলো এবং তাঁর শত্রু হয়ে গেলো।

ইবনে খালকান লিখেছেন ঃ

আবদুল মালিক ফরমান জারি করলো। এ ফরমানে হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর নেতৃত্বে হজ্জের আহকাম পালনের নির্দেশ ছিলো। এ নির্দেশ হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মনঃপুত হলো না। কিন্তু খলিফার নির্দেশ পালনে বাধ্য ছিলো। তাই হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বিষ মিশ্রিত বর্শা দিয়ে আহত করে সে মনের ঝাল মিটালো।

ইবনে সায়াদ (র) এ ঘটনাও বর্ণনা করেছেন যে, একবার হাজ্জাজ বক্তৃতা দিচ্ছিলো। বক্তৃতা দিতে দিতে সন্ধা হয়ে গেলো। নামাযের ওয়াক্ত এসে পড়লো। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, হে ব্যক্তি ! নামাযের সময় হয়েছে। এখন বসে যা।" এ কথাটি তিনবার বললেন। কিন্তু সে বক্তৃতা অব্যাহতই রাখলো। চতুর্থবার তিনি উপস্থিত লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি যদি উঠে যাই তাহলে তোমরা কি উঠে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আছো ? তারা বললো, হ্যাঁ, আমরা প্রস্তুত আছি। একথা বলেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং হাজ্জাজকে বললেন যে, তোমার নামাযের প্রয়োজন নেই বলেই আমার মনে হয়। এতক্ষণে হাজ্জাজ মিম্বর থেকে নেমে এলো এবং নামায পড়লো। নামাযের পর হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ডেকে জিজ্ঞেস

করলো, আপনি এ রকম কেন করলেন ? তিনি বললেন, আমরা সময় হলে যথাযথ সময়ে নামায আদায়ের জন্য এসে থাকি, এর পর যা ইচ্ছে তা বলতে পার।

হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর এ স্পষ্টবাদিতার কারণে হাজ্জাজ শত্রুতে পরিণত হলো এবং বিষ মিশ্রিত বর্শা দিয়ে হজ্জের ভীড়ে তাঁকে আহত করলো।

হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর অন্তরের আকাংখা ছিলো যে, তিনি মদীনা মুনাওয়ারাতে ইন্তেকাল করবেন। কিন্তু মক্কা মুয়াজ্জামাতে ইন্তেকাল করাই তার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ ছিলো। মৃত্যুর পূর্বে তিনি পুত্র সালেম রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ওয়াসিয়াত করলেন যে, এখন আমি এখানেই ইন্তেকাল করছি। আমাকে হেরেম শরীফের সীমানার বাইরে দাফন করো। তিনি পিতার ওসিয়াত অনুযায়ী কাজ করতে চাইলেন। কিন্তু হাজ্জাজ তাতে বাধা দিলো এবং জানাযার নামায পড়িয়ে "ফাখখে মুহাজিরিনের করবস্থানে দাফন করলো।"

জ্ঞান ও মর্যাদার দিক দিয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু সেসব মহান সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের দলভুক্ত ছিলেন যাঁরা দীনি জ্ঞানের ক্ষেত্রে গভীর সমুদ্র হিসেবে বিবেচিত হতেন। তিনি শুধুমাত্র বছরের পর বছর ধরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সরাসরি সান্নিধ্য লাভের সুযোগই পাননি বরং সাইয়েদেনা ফারুকে আজম রাদিয়াল্লাহ আনহুর মত অভিজ্ঞ পিতার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করার সৌভাগ্যও তাঁর হয়েছিলো। এভাবে তিনি মর্যাদা ও পূর্ণতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত উঁচুস্থানে সমাসীন হয়েছিলেন। তাঁর এমর্যাদায় অনেক বড় বড় সাহাবীও ঈর্ষা করতেন। কুরআনে হাকিম এবং তাফসীরের সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিলো। তিনি বেশীর ভাগ সময়ই কুরআনের বিভিন্ন সূরা ও আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে কাটাতেন। ইমাম মালিকের (র) মুয়াত্তায় বর্ণিত আছে যে, তিনি শুধুমাত্র সূরা আল বাকারার ওপরই ১৪ বছর চিন্তা-গবেষণা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধিকাংশ জ্ঞানের মজলিশে অংশগ্রহণের সুযোগ পেতেন। এভাবে তিনি কুরআনে হাকিমের তাফসীরের ওপর অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে উঠেছিলেন।

সহীহ আল বুখারীতে উল্লেখ আছে যে, একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সমাবেশে সমুপস্থিত ছিলেন। এ সমাবেশে হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুও ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনে হাকিমের এ আয়াত পড়লেন ঃ

"তোমরা কি দেখনি যে, আল্লাহ পবিত্র কথার কেমন উদাহরণ পেশ করেছেন। যেমন পবিত্র বৃক্ষ। যার শিকড় মযবুত এবং শাখাসমূহ আকাশে। নিজের স্রষ্টার নির্দেশে সবসময় ফল দান করে।"-(সূরা ইবরাহীম ঃ

অতপর তিনি সাহাবাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে, এ আয়াতে কোন্ বৃক্ষের উদাহরণ দেয়া হয়েছে ? সকল সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহু চুপ রইলেন। তখন তিনি নিজে বললেন যে, এটা খেজুর বৃক্ষ। পরে হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু পিতা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বললেন, এটা খেজুর গাছের উদাহরণ তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু বুযর্গ সাহাবা রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের নিশ্চুপ থাকার কারণে আমি চুপ মেরে ছিলাম। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, বেটা ! তুমি যদি এ মজলিশে বলে দিতে।

কুরআন হাকীমে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া ছাড়াও হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসের সাথেও গভীর সম্পর্ক ছিলো। তার থেকে ১ হাজার ৩৬টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে ১৭০টি ঐকমত্যের হাদীস। বুখারী ৮১টিতে এবং মুসলিম ৩১টিতে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে সরাসরি যেসব কথা শুনেছেন তা অন্তরের সাথে গেঁথে রাখতেন। এছাড়া অন্যদের মাধ্যমে যা তাঁর কাছে পৌঁছতো তাও স্মরণ রাখতেন। এভাবে হাদীসে হাফেজদের মধ্যেও তাঁর এক বিশেষ স্থান ছিলো। অধিকন্তু তিনি হাদীস বর্ণনাতে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন এবং কমবেশী না হওয়ার পূর্ণ আস্থার পরই তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন। এ কঠিন ভিত্তিতে বর্ণিত তাঁর হাদীসগুলো অত্যন্ত বিশুদ্ধ বলে মানা হয়।

তাঁর শিক্ষক মণ্ডলীর মধ্যে রয়েছেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত ওসমান জুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত আলী কাররামাল্লাহ ওয়াজহাহু রাদিয়াল্লাহ আনহু, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহ আনহা, উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসাহ রাদিয়াল্লাহ আনহা, হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মাসউদ, হযরত বেলাল হাবশী রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত সোহায়েব রুমী রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন সাবিত এবং হযরত রাফে রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন খুদায়েজের মতো মহান মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবাহ ও সাহাবিয়াহ। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে রয়েছেন সালেম রাদিয়াল্লাহ আনহু, ওবায়দুল্লাহ (র), মুহাম্মদ (র), নাফে (র), হাফস (র), ওরওয়াহ (র) বিন যুবায়ের রাদিয়াল্লাহ আনহু, মুসা বিন তালহা (র), আবু সালমাহ (র), বিন আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ আনহু, সাঈদ (র), বিন মুসাইয়্যিব রাদিয়াল্লাহ আনহু, কাসেম (র), আবু বুরদাহ (র) বিন আবু মূসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহ

আনহু, সাঈদ বিন ইয়াসার (র), আকরামাহ (র), মুজাহিদ (র), সাঈদ বিন জুবাইর (র), তাউস (র), আতা (র), আবু জুবায়ের (র) এবং আবি মালিকাহার (র) মত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ।

ফিকাহ ইসলামী শরীয়াতের স্থিতিস্থাপক। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু এ শাস্ত্রেও সমুদ্রের মত গভীরতা রাখতেন। তিনি জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই শিক্ষাগ্রহণ, শিক্ষা প্রদান এবং ফতোয়াদানের মধ্য দিয়ে কাটিয়েছেন। হাফেজ ইবনে কাইয়েম (র) বলেছেন ঃ "হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর প্রদত্ত ফতোয়া যদি একত্রিত করা হয়, তাহলে এক বিপুলাকৃতির পুস্তক তৈরি হতে পারে।" হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর ফতওয়াবলীর ওপরই মালেকী ফিকাহ নির্ভরশীল। ইমাম মালেক (র) বলেছেন, হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু অন্যতম দীনি ইমাম ছিলেন। তাফাককুহ ফিদ্দীন বা দীনের ওপর গভীর জ্ঞানের ভিত্তিতে হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ফকীহ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। এ সত্ত্বেও তিনি ফতওয়াদানের ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতেন। যদি কোনো প্রশ্নে সামান্যতম সন্দেহও দেখা দিতো, তাহলে তিনি কোনোক্রমেই ফতোয়া দিতেন না। এবং যিনি ফতোয়া চাইতেন তাকে এই বলে ফিরিয়ে দিতেন যে, তিনি সে মাসয়ালা সম্পর্কে জানেন না। কিয়াস এবং ইজতিহাদেও আল্লাহ প্রদত্ত প্রভূত যোগ্যতা ছিলো। কিন্তু কিয়াস ও ইজতিহাদ তখনই প্রয়োগ করতেন যখন কোনো মাসয়ালার ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহতে স্পষ্ট কোনো নির্দেশ না পেতেন। এ ধরনের ফতওয়া প্রদানের সময় তিনি ফতওয়া তলবকারীকে পরিষ্কার বলে দিতেন যে, এটা তার কিয়াস। এ সত্ত্বেও তাঁর মত প্রদানের পর বড় বড় ইমাম দ্বিতীয় মতের প্রয়োজন অনুভব করতেন না।

দীনি জ্ঞান ছাড়াও হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু আরবের কাব্য, ভাষণ এবং বংশ তালিকা শাস্ত্রে প্রভূত দখল রাখতেন। কিন্তু এসব শাস্ত্রে সময় ব্যয় পসন্দ করতেন না। সামগ্রিকভাবে তিনি জ্ঞান ও মর্যাদার দিক দিয়ে দু' সমুদ্রের এক গভীর সমুদ্র ছিলেন। ইবনে সায়াদের (র) বর্ণনা মতে এক যুগে মানুষ এ বলে দোয়া করতো যে, হে আল্লাহ ! আমাদের জীবদ্দশায় ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে জীবিত রেখো যাতে আমরা তাঁর জ্ঞান সমুদ্র থেকে পিপাসা মেটাতে পারি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ সম্পর্কে বর্তমানে তাঁর চেয়ে বেশী ওয়াকিবহাল আর কেউ নেই।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ছিলেন অত্যন্ত আকর্ষণীয় চরিত্রের ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ। বহুবিধ গুণাবলীর সমাহার তাঁর মধ্যে ঘটেছিলো। এ সকল গুণের জন্য তিনি সুশোভিত ও সুবাসিত ফুলের বাগানের

সাথে তুলনীয়। রাসূল প্রেম, সুন্নাহর অনুসরণ, খোদাভীতি, জিহাদ ও ইবাদাতের প্রতি উৎসাহ, আল্লাহর প্রতি ভক্তি, বদান্যতা ও আত্মত্যাগ, বিনয়, মুখাপেক্ষহীনতা, অল্পে তুষ্টি, সহজ-সরলতা, হক কথন ও স্পষ্টবাদিতার গুণে তিনি গুনান্বিত ছিলেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে তিনি বেশীর ভাগ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যে কাটানোর চেষ্টা করতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালে তিনি গভীরভাবে শোকার্ত এবং ভগ্ন হৃদয় হয়ে পড়েছিলেন। এ কারণে তিনি আজীবন বাড়ী তৈরি করেননি। যখনই মুখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম উচ্চারিত হতো তখনই চোখ দিয়ে অশ্রু অঝোর ধারায় ঝরে পড়তো। যখনই রাসূলের যুগে সংঘটিত যুদ্ধসমূহের স্থান অতিক্রম করতেন তখনই রিসালাতকালের চিত্র সামনে সমুপস্থিত হতো। তিনি কাঁদতেন। কেউ তাঁর কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা উল্লেখ করলেই তিনি অস্থির চিত্তে ক্রন্দন শুরু করতেন। ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (র) নিজের ওস্তাদের উদ্বৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, অনেকে হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর রাসূল প্রেমের অবস্থা দেখে তাঁকে পাগল বলেও আখ্যায়িত করতেন। প্রকৃত কথা হলো, তিনি রাসূল প্রেমের অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন ছিলেন। ছোটখাটো বিষয়েও তিনি রাসূলের সুন্নাত অনুসরণে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। এমনকি মানবীয় ব্যাপারেও তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদাংক অনুসরণ করার চেষ্টা চালাতেন। সফর ও মুকিম অবস্থায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানেই নামায আদায় করেছেন সেখানেই তিনি নামায পড়তেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে বিশ্রাম নিয়েছেন সেখানে তিনিও বিশ্রাম নিতেন। যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বল্প সময়ের জন্যও অবস্থান করেছেন সেখানে তিনি অবশ্যই অবস্থান করেছেন। যেসব বৃক্ষের ছায়াতলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো বিশ্রাম নিয়েছেন সেসব বৃক্ষ যাতে শুকিয়ে না যায় সে জন্যে তিনি তাতে পানি সিঞ্চন করতেন এবং তিনি তার ছায়াতলে বিশ্রাম নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের আনুগত্য প্রকাশ করতেন। যে কোনো সফর থেকে ফিরেই সর্বপ্রথম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযায় উপস্থিত হয়ে সালাম বলতেন। মদীনা মুনাওয়ারার প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিলো। কোনো অবস্থাতেই সেখান থেকে বাইরে যেতে চাইতেন না। একবার তাঁর ভৃত্য অভাবের কারণে মদীনা পরিত্যাগের অনুমতি চাইলো। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মদীনায় মুসবিতে ধৈর্যধারণ করবে কিয়ামতের দিন আমি তাঁর জন্যে সুপারিশ করবো।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার-পরিজনের প্রতিও তাঁর প্রগাঢ় ভালোবাসা ছিলো। তিনি প্রায়ই মানুষের কাছে তাদের মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা দিতেন। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু হজ্জের নিয়মাবলী সম্পর্কিত সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন। এর কারণ হলো তিনি হজ্জে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সব সুন্নাতের যথাযথ ও সার্বিকভাবে পালন করতেন। এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে যেখানে তাহারাত বা পবিত্র হয়েছিলেন সেখানে তিনিও তা অবশ্যই হতেন। হজ্জের সফরে সেই সড়ক ধরেই আসতেন সে সড়কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন ঘটতো। হুজুর জুল হালিফায় অবতরণ করে নামায পড়তেন। হজরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু জুলহালিফাতে অবশ্যই নামায পড়তেন। যেসব স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনযিল বানিয়েছিলেন সেসব স্থানে তিনিও তাই করেছিলেন। সহীহ আল বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো পদব্রজে আবার কখনো সওয়ারীতে মসজিদে কুবাতে তাশরীফ আনতেন। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুও একই কাজ করতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা প্রবেশের আগে বাতহা নামক স্থানে শুইতেন। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুরও একই নিয়ম ছিলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জীবন উৎসর্গকারী সাহাবীদের দাওয়াত সবসময়ই কবুল করতেন। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুও কারো দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করতেন না। এমনকি রোযা অবস্থাতে দাওয়াতে যেতেন। যদিও খানা-পিনায় অংশ নিতেন না। মোটকথা তিনি সকল কাজেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ সামনে রাখতেন।

হযরত ইবনে ওমর ছিলেন কোমল অন্তরের মানুষ। আল্লাহভীতি এবং শেষ বিচারের দিনের ভয়ে তিনি সদাভীত সন্ত্রস্ত থাকতেন। আখিরাতের হিসাব-নিকাশ সম্পর্কিত কোনো আয়াত শুনতেই তিনি ভীত হয়ে পড়তেন এবং কাঁদতেন। একদিন ওবায়েদ বিন ওমর থেকে এ আয়াত শুনলেন ঃ

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَابِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا -

"হে রাসূল ! আখিরাতের সে দিনে কি অবস্থা হবে, যখন আমরা প্রত্যেক উম্মতের তরফ থেকে এক সাক্ষী এনে দাঁড় করবো এবং আপনাকে তাদের ওপর সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করাবো।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৪১)

এ আয়াত শুনতেই তিনি কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দাড়ি এবং বুকের কাপড় ভিজে গেলো।

খোদাভীতি তাঁর অন্তরে জিহাদ এবং ইবাদাতের প্রতি প্রচণ্ড অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছিলো। তিনি জিহাদ এবং ইবাদাত ছাড়া থাকতেই পারতেন না। পনের বছর বয়স থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত অব্যাহতভাবে জিহাদে অংশ নিয়েছেন। ইবাদাতের অবস্থা এমন ছিলো যে, তিনি সারারাত নামায পড়তেন এবং লাগাতার রোযা রাখতেন। কোনো কোনো সময় এক রাতে পুরো কুরআন শরীফ পড়ে নিতেন। প্রত্যেক নামাযের জন্যে নতুন করে অযু করতেন। তিনি জীবনে ৬০ বার হজ্জ এবং এক হাজার বার ওমরাহ করেছিলেন।

তাকওয়ার প্রশ্নে তিনি ছিলেন উদাহরণ স্বরূপ। হাফেজ ইবনে হাজর (র) তাহজিবুত তাহজিব গ্রন্থে লিখেছেন, যুবক কুরাইশদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের চেয়ে নিজের ওপর আধিপত্য বিস্তারকারী আর কেউ ছিলো না।

সহীহ আল বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু যৌবনের প্রারম্ভকালেই মসজিদে গিয়ে শুয়ে থাকতেন। একবার তিনি স্বপ্নে দোযখের ফেরেশতাদের দেখলেন। পরদিন সহোদরা উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসার কাছে স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলেন। হযরত হাফসা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ঘটনা উল্লেখ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "আবদুল্লাহ একজন সত্যবাদী নওজোয়ান।"

হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবদুল্লাহ আনসারী রাদিয়াল্লাহ আনহু বলতেন যে, আমাদের মধ্যে শুধুমাত্র ইবনে ওমরই রাদিয়াল্লাহ আনহু একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন, যাকে পার্থিব কোনো কিছুই আকর্ষণ করতে পারেনি। নবীজির ইন্তেকালের পর যদি কোনো ব্যক্তি পরিবর্তন ছাড়া এমন কোনো সাহাবীকে দেখতে চায়, তাহলে সে যেন ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে দেখে।

একবার এক ব্যক্তি ওষুধসহ তাঁর খেদমতে হাজির হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ একি ? সে বললো, খাদ্য হজমকারী ওষুধ। তিনি বললেন, তার এ ওষুধ প্রয়োজন নেই। কারণ, তিনি মাসের পর মাস পেট ভরে খাবার খাননি।

একবার জনৈক ব্যক্তির কাছে পানি চাইলেন। সে কাঁচের পাত্রে পানি এনে দিলেন। তিনি এ পাত্রে পানি পান করতে অস্বীকৃতি জানালেন। অতপর কাঠের পাত্রে পানি এনে তাঁর সামনে পেশ করা হলো। তিনি তা পান করলেন। পানি পান করে অযু করার জন্য পাত্র চাইলেন। তার সামনে বদনা এনে রাখা হলো। তিনি এ বদনার পানি দিয়ে অযু করতে কিছুতেই রাজী হলেন না এবং লোটার পানি দিয়ে অযু করলেন।

মাইমুন বিন মাহরান (র) বর্ণনা করেছেন, একবার তাঁর খিদমতে হাজির হলাম। তার গৃহের সব জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করলাম। একশ' দিরহামের বেশী মূল্যের আসবাবপত্র ছিলো না। এ আসবাবের মধ্যে বিছানাও ছিলো।

অঢেল পার্থিব বিত্ত-বৈভব লাভের সুযোগ হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর সামনে কয়েকবারই এসেছিলো। কিন্তু তিনি সেদিকে চোখ তুলেও তাকাননি। অনেকবারই তিনি বড় বড় সুযোগ পেয়েছেন। বড় পদ থেকে নিয়ে খিলাফত পর্যন্ত তিনি লাভ করতে পারতেন। স্বর্ণ এবং রৌপ্য যদি কামাই করতে চাইতেন তাহলে সমকালীন সবচেয়ে বড় ধনী হওয়ারও সুযোগ ছিলো। কিন্তু তিনি পার্থিব জগত থেকে পরকালকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং তাকওয়ার গণ্ডী থেকে নিজের পা বাইরে বের করেননি। তাঁর সময়ে যে রাজনৈতিক সংঘাত হয়েছিলো তাতে তিনি কোনোক্রমেই অংশ নেননি। গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আশংকায় প্রত্যেক আমীরের হাতেই বাইয়াত করে নিতেন এবং এর পরিণাম আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিতেন।

তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। প্রায় সব কাজ নিজের হাতে করতেন। এমনকি উট বসানোর কাজেও অন্যের সাহায্য নিতেন না। একদম সাধারণ পোশাক পরতেন। এ ব্যাপারেও বিশেষ উদ্দেশ্য ছিলো। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনি দু'বার ভালো পোশাক পরিধান করতে দেখেছিলেন। পোশাকের মধ্যে ছিলো কামিজ, ইজার এবং কালো পাগড়ী। নিসফ সাক পর্যন্ত ইজার পরিধান করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলুদ রং পসন্দ করতেন। এজন্যে তাঁরও এ রং অত্যন্ত প্রিয় ছিলো।

দস্তরখান লৌকিকতা মুক্ত ছিলো। কোনো কোনো সময় বড় পাত্রে খাবার রেখে দেয়া হতো। পরিবার-পরিজনসহ তার চারপাশে বসে খেয়ে নিতেন। প্রদর্শনী এবং লৌকিকতামূলক সকল জিনিসই তাঁর অপসন্দনীয় ছিলো। এমনকি জুমায়ার দিন ছাড়া কখনো মাথা, দাড়ি এবং কাপড়ে খোশবু লাগাননি।

পার্থিব দিক থেকে ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত সচ্ছল ছিলেন। দীনি খিদমতের ভিত্তিতে মাসিক আড়াই হাজার করে বৃত্তি পেতেন। এছাড়া সহীহ আল বুখারীর মতে তিনি অনেক আবাদী জমির মালিক ছিলেন। তিনি নিজের সম্পদকে নির্দ্বিধায় খোদার রাস্তায় লুটিয়ে দিতেন। বদান্যতা এবং উদারতা তাঁর চরিত্রের অন্যতম বস্তু ছিলো। কোনো ফকির বা সওয়ালকারীকে নিজের দরযা থেকে খালি হাতে ফিরে যেতে দিতেন না। বিশজনের মত ফকির তাঁর দস্তরখানে লালিত-পালিত হতো। সাধারণত কোনো ফরিককে নিজের দস্তরখানে না বসিয়ে খাবার খেতেন না। বরং অনেক সময় নিজের অংশের

খাবারও মিসকীনদের খাইয়ে দিতেন এবং নিজে অভুক্ত থাকতেন। একবার তাঁর মাছ খাওয়ার ইচ্ছে হলো। যখন মাছ ভেজে তাঁর সামনে রাখা হলো, তখন এক ফকির এসে উপস্থিত। তিনি মাছ ফকিরকে দিয়ে দিলেন।

একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এক দিরহামের আঙ্গুর তাঁর জন্যে কিনে আনা হলো। ঘটনাক্রমে এ সময় এক ফকির এসে উপস্থিত। তিনি ফকিরকে এ আঙ্গুর দিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। পরিবারের লোকজন আঙ্গুরগুলো খেয়ে নিতে এবং ফকিরের জন্যে অন্য আঙ্গুর দেবেন বলে আরজ করলো, কিন্তু কোনোক্রমেই তিনি তা শুনলেন না। বাধ্য হয়ে ফকিরকে তা দিয়ে দিতে হলো এবং পুনরায় কিনে এনে তাঁর সামনে পেশ করা হলো।

একবার রাস্তায় একটি খেজুর পেলেন। মুখে তা না পুরতেই একজন ফকির এসে হাজির। তিনি এ খেজুর তাকে দিয়ে দিলেন।

তাবকাতে ইবনে সায়াদে হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর গোলাম এবং শিষ্য নাফে (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার তাঁর কাছে এক হাজার দিরহাম অথবা দিনার (তা স্পষ্ট করা হয়নি) এলো। তিনি দু' হাতে লোকদেরকে তা দেয়া শুরু করলেন এবং শেষ হয়ে গেলো। বণ্টনের পর যারা এলো তাদেরকে অন্যান্যদের (যাদের আগে দিয়েছিলেন) কাছ থেকে ধার করে প্রদান করলেন।

কোনো স্থানে অবস্থান করলে বেশীর ভাগ রোযা রাখতেন। কিন্তু কোনো মেহমান এসে গেলে রোযা ভেঙ্গে ফেলতেন এবং বলতেন মেহমানের উপস্থিতিতে নফল রোযা রাখা বদান্যতা বিরোধী কাজ।

হাফেজ ইবনে হাজার (র) "ইসাবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু দু' দু' তিন তিন হাজার প্রতিদিনই দান করতেন। আবার অনেক সময় বিশ বিশ ত্রিশ ত্রিশ হাজারের মতো পরিমাণ মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিতেন।

যদি কোনো দাস অথবা দাসী পসন্দ হতো অথবা নিজের কোনো দাসকে বেশী বেশী ইবাদাতে মশগুল দেখতেন, তাহলে তাকে আযাদ বা স্বাধীন করে দিতেন। এভাবে তিনি নিজের জীবনে এক হাজারেরও বেশী গোলাম আযাদ করেছেন।

একবার হজ্জের সফরের জন্য এক উটনী কিনলেন। তাতে সওয়ার হলেন। উটনির চলন অত্যন্ত পসন্দ হলো। তৎক্ষণাৎ তিনি নেমে পড়লেন এবং উটনীর ওপর থেকে সকল জিনিসপত্র নামানোর নির্দেশ দিলেন। এ উটনীকে তিনি কুরবানীর পশুর অন্তর্ভুক্ত করারও আদেশ দিলেন।

একবার কতিপয় বন্ধুর সাথে মদীনার উপকণ্ঠে গেলেন। এক স্থানে দস্তরখান বিছানো হলো। তখন এক রাখাল সেখানে এসে উপস্থিত। সে সালাম করলো। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ্ আনহু তাঁকে খাবার দাওয়াত দিলেন। সে রোযা রাখার ওজর পেশ করলো। তিনি বললেন, এত গরমে রোযাও রাখো, আবার বকরীও চরাও ? অতপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ বকরীগুলো কি আমাদের কাছে বিক্রি করতে পারো ? আমরা নগদ মূল্য ও ইফতারের জন্য গোশতও দিবো।

রাখাল আরজ করলো, এ বকরী আমার নয়। বকরীগুলোর মালিকতো আমার প্রভু। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ্ আনহু তার তাকওয়ার পরীক্ষা স্বরূপ বললেন, তাহলে তোমার প্রভু কি করবে ?

রাখাল আকাশের দিকে আঙ্গুল উঠালো এবং আল্লাহ্ কোথায় আল্লাহ্ কোথায় এ বলে রওয়ানা দিলো। (এর অর্থ আল্লাহ্ তো এ খেয়ানতের কথা জেনে ফেলবে)। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ্ আনহুর রাখালের একথা অত্যন্ত পসন্দ হলো এবং একথা বার বার বলতে লাগলেন। বস্তুত তিনি তার আমানতদারী ও খোদাভীতির জন্যে অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন। এজন্যে যখন মদীনা এলেন তখন তার মালিকের কাছ থেকে তাকে বকরী সমেত কিনে আযাদ করে দিলেন এবং সব বকরী তাকে দান করলেন।

একবার কোথাও যাচ্ছিলেন। রাস্তায় এক গ্রামবাসীর সাথে দেখা। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ্ আনহু তাকে সালাম দিলেন এবং সওয়ারীর গাধা ও মাথার পাগড়ী খুলে তাকে দিয়ে দিলেন। ইবনে দিনার (র) সাথে ছিলেন। তিনি আরজ করলেন, আল্লাহ্ আপনার যোগ্যতা দিক। এ গ্রামবাসী তো সাধারণ জিনিসেই খুশী হয়ে যায়। গাধা এবং পাগড়ী দানের কি প্রয়োজন ছিলো। তিনি বললেন, তার পিতা আমার পিতার বন্ধু ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, নিজের পিতার বন্ধুদের সাথে ভালো আচরণ করাই সবচেয়ে বড় নেকীর কাজ।

হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ্ আনহুর কয়েকজন গোলাম আযাদ হওয়ার জন্য অত্যন্ত ইবাদাতগুজার হয়ে যেতো। তাঁর কতিপয় বন্ধু বললেন, এসব গোলাম ইবাদাতে নিষ্ঠ নয় এবং তারা আপনাকে ধোঁকা দিতে চায়। তিনি বললেন, যারা আমাকে আল্লাহর মাধ্যমে ধোঁকা দেয় আমি তাদের কাছে ধোঁকা খেয়ে যাই।

তাঁর হাত থেকে যে সম্পদ বেরিয়ে যেত তা তিনি কখনই ফিরিয়ে নিতেন না। আতা (র) বর্ণনা করেছেন, একবার আমি তাঁকে দু' হাজার দিরহাম ঋণ

দিয়েছিলাম। তিনি যখন ঋণ পরিশোধ করলেন, তখন আমি তাঁর দিরহামগুলো ওজন করলাম। ওজনে দু'শ' দিরহাম বেশী পাওয়া গেলো। আমি এ দু'শ' দিরহাম ফিরিয়ে দিতে চাইলাম। তিনি বললেন, এখন তা তোমার।

বেশীর ভাগ খাদ্য মিসকীনদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। এজন্যে তাঁর শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলো। লোকজন তাঁর স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করলো। তারা বললো আপনি ভালোভাবে তাঁর খেদমত করেন না। তিনি বললেন, আমি কি করবো। যখন তাঁর জন্যে কোনো খাবার রান্না করা হয়, তখন তিনি তা মিসকীনদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। এ অভ্যাসের কারণে তিনি যখন মসজিদ থেকে বের হন তখন ফকির-মিসকীনরা ঘিরে ধরে। তিনি তাদেরকে নিজের সাথে নিয়ে আসেন এবং খাবার খাইয়ে ফেরত পাঠান। এজন্যে একদিন তার স্ত্রী সেই ফকিরদের ঘরে খাবার পাঠিয়ে দিলেন এবং বলে পাঠালেন যে, তাঁর রাস্তায় যেন বসে থাকা না হয়। তিনি যদি ডাকেনও তাহলে যেন আসা না হয়।

হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু সেদিন মসজিদ থেকে বের হলেন। কিন্তু রাস্তায় কোনো ফকির বসা পেলেন না। ঘরে ফিরে ঘটনা জানতে পারলেন। ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, ফকিররা আমার দস্তরখানে না বসুক এবং আমি অভুক্ত থাকি এটাই কি তুমি চাও? বস্তুত তিনি অভুক্ত থাকলেন।

নিজের মহত্ব ও মর্যাদা থাকা সত্বেও হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বিনয়, নম্রতা এবং উত্তম চরিত্রের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতেন। তিনি সবসময় মানুষকে আগে সালাম করতেন। এ ব্যাপারে আমীর গরীবের মধ্যে কোনো পার্থক্য করতেন না। লোকজনদেরকে সালাম দেয়ার জন্যেই তিনি বাইরে বেরুতেন। যদি কাউকে সালাম দেয়া ভুলে যেতেন তাহলে ফিরে গিয়ে সালাম দিতেন।

মুজাহিদ (র) বলেন, আমি তাঁর সাথে সফরে থাকতাম। যতদূর সম্ভব তিনি নিজের কাজ স্বহস্তে করতেন। এমনকি নিজে উটের পা ধরে বসাতেন এবং আমি তখন তাতে উঠতাম।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে যে, নিজের প্রশংসা তিনি কখনই পসন্দ করতেন না। একবার এক ব্যক্তি তাঁর প্রশংসা করছিলেন। এ সময় তিনি তাঁর মুখের ওপর মাটি নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুখের ওপর প্রশংসাকারীদের (তোষামোদকারীদের) মুখের ওপর মাটি নিক্ষেপ করো।

হাফিজ ইবনে হাজার (র) লিখেছেন, একবার এক ব্যক্তি তাঁকে গালাগাল করতে লাগলো। তিনি জবাবে শুধু এতটুকুন বললেন যে, ভাই আমরাতো উঁচু বংশের মানুষ। অতপর চুপ মেরে গেলেন।–(আল ইসাবাহ)

একবার এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে ? জবাবে তিনি বললেন, তুমি যা বলো আমি তাই। সে বললো, আপনি দৌহিত্র। আপনি কেন্দ্র। একথা শুনে তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ দৌহিত্র তো বনি ইসরাঈলরা ছিলেন। আর সকল উম্মতে মুহাম্মদীয়াই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন্দ্র। অবশ্য আমরা মুদীর গোত্রের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এর থেকে বেশী মর্যাদা কেউ আমাদেরকে দিলে তাহলে সে মিথ্যা।

একবার কেউ তাঁকে উপঢৌকন হিসাবে অত্যন্ত মূল্যবান কাপড় দিলো। তিনি তা এ বলে ফিরিয়ে দিলেন যে, তিনি তা পরিধানে অন্যায় কিছু মনে করেন না। কিন্তু তাকাব্বরীর ভয়ে তিনি এ কাপড় পরতে পারেন না।

একবার ইহরাম অবস্থায় সর্দি অনুভূত হলো। নিজের শিষ্য কারয়া আকিলীকে বললেন, আমার ওপর চাদর দিয়ে দাও। তিনি চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। ঘুম থেকে জেগে চাদরের বুটিদার রেশমের কারুকাজ দেখতে লাগলেন এবং বললেন, এ বুটি যদি না হতো তাহলে তা ব্যবহারে অন্যায়ের কিছু ছিলো না।

এমন স্থানে তিনি যেতেন না, যেখানে লোকজন তাকে দেখলেই সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যেত।-(ইবনে সায়াদ)

গোলামদের সাথে তাঁর ব্যবহার ছিলো অত্যন্ত বন্ধুভাবাপন্ন। তাঁদেরকে নিজের সাথে দস্তরখানে বসিয়ে খাবার খাওয়াতেন এবং নিজের পরিবার-পরিজনের মত তাদের খাওয়া পরার খেয়াল রাখতেন। একবার তাদের খাবার দিতে দেরী হয়ে গেলো। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু একথা জানতে পেরে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাদেরকে খাবার দেয়ার নির্দেশ দিলেন। এরপর বললেন, গোলামের খানাপিনার খেয়াল না রাখা মানুষের জন্য বড় গোনাহ।-(মুসলিম)

দস্তরখানে বসা অবস্থায় অন্য কারো গোলাম সেখানে উপস্থিত হলে তাকেও খাবারে শরীক করাতেন। তিনি নিজের গোলামদের একটি নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। নির্দেশে তিনি বলেছিলেন যখনই তারা তাঁকে চিঠি লিখবে তখনই তারা তাঁর নামের আগে নিজের নাম লিখবে। প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন রেওয়াজ মুতাবিক প্রভুর নাম আগে লিখা হতো।-(ইবনে সায়াদ)

গোলামদের কখনই কঠিন কথা বলতেন না এবং তাদের ওপর কোনোদিন হাতও তুলতেন না। ক্রোধান্বিত অবস্থায় এক আধবার কখনো কঠিন ব্যবহার করে বসলে কাফফারা হিসেবে তাকে আযাদ করে দিতেন।-(সহীহ মুসলিম)

নিজের উত্তম চরিত্র, নম্রতা ও বিনয়ের কারণে সাধারণ মানুষ তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। ঘর থেকে বাইরে বেরুলেই পদে পদে মানুষ তাকে সালাম করতো। একবার হযরত মুজাহিদ সাথে ছিলেন। তিনি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, মানুষ আমাকে এত ভালোবাসে যে স্বর্ণ ও রৌপ্য দিয়েও এ ভালোবাসা তুমি যদি কিনতে চাও তাহলে তুমি তা থেকে বেশী পাবে না।–(তাবকাতে ইবনে সায়াদ)

মুখাপেক্ষীহনতা এবং অল্পে তুষ্টি হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর প্রকৃতিতে পুরোপুরিই ছিলো। যদিও তিনি নবীর সুন্নাত মুতাবিক উপঢৌকন গ্রহণ করতেন, কিন্তু কারো কাছে হাত পাতেননি। আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) তাঁর এ বক্তব্য উদ্বৃত করেছেন ঃ "আমি কারো কাছে চাই না, তবে আল্লাহ যা দেন তা ফেরতও দেই না। একবার তাঁর ফুফু রামলাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু দু'শ' দিনার প্রেরণ করলেন। তিনি শুকরিয়ার সাথে তা গ্রহণ এবং দোয়া করলেন।

একবার আবদুল আজীজ বিন হারুন তাঁকে লিখলেন যে, তাঁর যা প্রয়োজন তা যেন তার কাছে চায়। তিনি এর জবাব লিখে পাঠালেন। তিনি লিখলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, নিজের পরিবার-পরিজন থেকে (লেনদেন) শুরু করো এবং উপর হাত নীচের হাত হতে উত্তম। আমার ধারণা দানকারী হাত উপরের এবং গ্রহণকারী হাত নীচের। আমি আপনার কাছে সাওয়াল করবো না এবং সেই মাল প্রত্যার্পণও করবো না যা আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন।

আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু একবার এক বিশেষ উদ্দেশ্যে এক লাখ পরিমাণ তাঁর কাছে প্রেরণ করলেন। তিনি এ অর্থ গ্রহণে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করলেন।

ধন-সম্পদ তাঁর কাছে সম্পূর্ণ তাৎপর্যহীন বস্তু ছিলো। সামান্যতম সন্দেহ হলেই তিনি আর্থিক উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান করতেন। কেউ কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থে অথবা কপটতার সাথে যদি উপঢৌকন পাঠাতেন তাহলে তা তিনি গ্রহণ করতেন না। এভাবে কোনো বস্তুতে সাদকার সন্দেহ হলেই তা ব্যবহার করতেন না। একবার তিনি নিজের মায়ের নামে এক গোলাম সাদকাহ করলেন। ঘটনাক্রমে সে গোলামের সাথে তিনি বাজারে গেলেন। সেখানে এক দুধালো বকরী বিক্রি হচ্ছিলো। তিনি গোলামকে বললেন, নিজের অর্থ দিয়ে এটা কিনে নাও। সে কিনে নিলো এবং ইফতারের সময় সেই বকরীর দুধ তাঁর সামনে পেশ করলো। তিনি বললেন, এ দুধ বকরীর। বকরী গোলামের অর্থে কেনা এবং গোলাম হলো সাদকার। দুধ সরিয়ে নাও। আমি পান করবো না।

সন্দেহযুক্ত দ্রব্যাদি সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে চলতেন। একবার একজন খেজুরের সিরকা উপঢৌকন হিসেবে প্রেরণ করলো। জিজ্ঞেস করলেন, কি জিনিস। জানতে পারলেন যে, খেজুরের সিরকা। তিনি তৎক্ষণাৎ তা ফেলে দেয়ালেন। কেননা তা ব্যবহারে মাতলামির আশংকা থাকে।

ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, তিনি শসা এবং খরবুজাহ (এক ধরনের জলজ ফল) খেতেন না। কেননা এতে দুর্গন্ধযুক্ত বস্তুর ভেজাল মিশ্রণ করা হয় (এটা তাঁর কঠিন সাবধানতার ফলশ্রুতি ছিলো)। বস্তুত এসব জিনিস ব্যবহার দোষের কিছু নয়।

মারওয়ান ইবনুল হাকাম নিজের যুগে সড়কে মাইল ফলক স্থাপন করান। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু এসব পাথরের দিকে দাঁড়িয়ে নামায পড়া মাকরূহ মনে করতেন। এবং তা থেকে সরে নামায পড়তেন। কেননা সেদিকে মুখ করে নামায পড়ায় পাথর পূজার সন্দেহ বিদ্যমান ছিলো।

হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর জীবন পারস্পরিক আপোষ কামনায় পূর্ণ ছিলো। তিনি মুসলমানদের পারস্পরিক বিরোধের আপোষ কাজে অংশ নিয়েছেন। কিন্তু সমকালীন শাসকের বিরুদ্ধে কোনো তৎপরতায় অংশ নেননি। তবে যা হক হিসেবে মনে করতেন তা খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করতেন। এতে সমকালীন শাসকের কপাল কুঁচকে গেলেও তিনি কোনো পরওয়া করতেন না। তার সত্য কথন এবং স্পষ্টবাদিতার কিছু ঘটনা ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে তাঁর এ হক কথনই তাঁর শাহাদাতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, একবার এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, মশার খুনের কাফফারা কি ? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে ? সে বললো, ইরাকী। তিনি বললেন, তোমরা এ ব্যক্তিকে দেখ। সে আমার কাছে মশার রক্তের কাফফারা কি তা জিজ্ঞেস করছে। প্রকৃতপক্ষে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কলিজার টুকরাকে শহীদ করেছে। যাদের ব্যাপারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, এ দু'জন (হাসান ও হোসাইন) দুনিয়ার বাগানে দু'টি ফুল।

কারবালার ঘটনার ব্যাপারে এ ধরনের আবেগ প্রকাশ ক্ষমতাসীন মহলকে উত্তেজিত করতে পারতো। কিন্তু হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু এ ব্যাপারে কোনো পরওয়া করেননি। অন্তরে যা থাকতো নির্দ্বিধায় তা প্রকাশ করতেন।

হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত সঠিক রায় সম্পন্ন এবং বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। চরিতকাররা তাঁর বেশ কিছু অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন ঃ

০ সবচেয়ে সহজ নেকী হলো প্রফুল্লমুখ এবং মিষ্টি কথা।

০ শত্রুর কাছ থেকে হলেও জ্ঞান অর্জন করো।

০ অন্যের দোষ খোঁজার আগে নিজের দোষের প্রতি নজর দাও।

০ যেভাবে মিষ্টি শরবত পান করে থাকো, তেমনি ক্রোধ হজম করো।

০ আল্লাহর কাছে কোনো বান্দাহ যতই প্রিয় হোক না কেন, কিন্তু সে যখন পার্থিব কিছু পায় তখন আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা নিসন্দেহে কমে যায়।

০ মানুষ সেই সময় জ্ঞানীদের দলভুক্ত হতে পারে, যখন সে নিজের চেয়ে উঁচু লোককে শত্রু ঠাওরাবে না এবং নিজের চেয়ে কম জ্ঞানসম্পন্নকে অবজ্ঞা করবে না। আর নিজের জ্ঞানের মূল্য নেবে না।

০ চরিত্র খারাপ হলে ঈমানও খারাপ হবে।

০ পাপ করতে চাইলে সেই স্থান তালাশ করো যেখানে আল্লাহ নেই।

০ ইবাদাতের স্বাদ হাসিল করতে চাইলে একাকীত্ব তালাশ করো। বন্ধু এবং ওয়াকিবহাল লোকদের থেকে পৃথক হয়ে যাও। কিন্তু এটা রুজী তালাশের পর এবং পরিবার-পরিজনকে মিষ্টি ঘুমের ব্যবস্থা করে দেয়ার পর।

০ আমি প্রথম হাদীসের ওপর আমল করি। তারপর তা মানুষকে শুনাই।

সাইয়েদেনা ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু আকার ও আকৃতিতে নিজের মর্যাদাবান পিতা হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর মতো ছিলেন। লম্বা দেহ, গমের মতো রং এবং হৃষ্টপুষ্ট শরীর ছিলো। কাঁধ পর্যন্ত চুল ছিলো। কখনো কখনো সিঁথি কাটতেন। এক মুঠো দাড়ি এবং পাতলা করে মুচ রাখতেন। ইবনে সায়াদের বর্ণনা মতে হলুদ খেজাব মাখতেন।

যেসব সাহাবী এবং তাবেয়ী হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে দেখেছেন তারা এক বাক্যে তাঁর সচ্চরিত্রাবলী, জ্ঞানের গভীরতা এবং মর্যাদার প্রশংসা করেছেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহ আনহা বলেছেন, নবী যুগের অনুসরণ প্রশ্নে তাঁর মতো আর কেউ ছিলো না। হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর প্রত্যেক ব্যক্তিই কিছু না কিছু বদলে গিয়েছিলো। কিন্তু ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং তাঁর পুত্রের কোনো পরিবর্তন হয়নি। হযরত

সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব রাদিয়াল্লাহ আনহু বলতেন, আমি একমাত্র ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর জান্নাতী হওয়ার সাক্ষী দিতে পারি। মাইমুন বিন মিহরান (র) বলতেন, আমি ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বড় কোনো মুত্তাকী ও পরহেযগার মানুষ দেখিনি। হযরত সালমা (র) বিন আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ আনহু বলতেন, ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মৃত্যুর পর আমি তার মতো আর কাউকে দেখিনি। মর্যাদার দিক থেকে তিনি নিজের পিতার কাছাকাছি ছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু

উম্মুল মু'মিনীন হযরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহার একজন ভাগিনেয় ছিলো। এ কিশোর ভাগিনেয়কে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ভাগিনেয়ও শুধু খালাকেই ভালোবাসতেন না বরং উচ্চতম মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত খালু হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও অত্যন্ত ভালোবাসতো এবং সীমাহীন মর্যাদা দিতো। এজন্যে সে শ্রদ্ধেয় খালার বাড়ীতে যেতো। অত্যন্ত ব্যস্ততার সাথে সেখানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছোটখাটো কাজও করে দিতো এবং তাঁর কাছ থেকে দোয়া নিতো। কোনো কোনো সময় খালার বাড়ীতেই কাটাতো। এভাবে সে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য লাভের সুবর্ণ সুযোগ পেতো। একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের শেষাংশে নামাযের জন্য দাঁড়ালেন। সে সময় এ সৌভাগ্যবান যুবকও তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে গেলো। তিনি তার হাত ধরে নিজের বরাবর দাঁড় করিয়ে দিলেন। যুবকটি তাঁর বরাবরই দাঁড়িয়ে গেলো। কিন্তু যেই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায শুরু করলেন, তখনই সে পিছনে হটে গেলো। সালাম ফেরানোর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি তোমাকে আমার সাথে দাঁড় করালাম, তুমি পেছনে হটে গেলে কেন ? সে অত্যন্ত আদবের সাথে আরজ করলো ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! কে এত বড় সাহসী যে, সে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরাবর দাঁড়িয়ে নামায পড়ে। আমি কি করে হুজুরের বরাবর দাঁড়িয়ে নামায পড়ি ? আমার এ ধরনের সাহস ও শক্তি নেই। তার জবাব শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত খুশী হলেন এবং আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি এ ছেলেকে প্রভুত জ্ঞানে বিভূষিত করো এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বিচক্ষণতা দান করো।"

উম্মুল মু'মিনীন হযরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহার এ ভাগিনেয়—যার ব্যাপারে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে জ্ঞান, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা প্রদানের দোয়া করছিলেন তিনি ছিলেন হাশেমী বংশের উজ্জ্বল প্রদীপ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু।

যেসব সাহাবী জ্ঞান ও মর্যাদার দিক থেকে উম্মাহর স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত হতেন সাইয়েদেনা হযরত আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সেসব সাহাবীর মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। তাঁর বংশীয় মর্যাদা সম্পর্কে

এতটুকু লেখাই যথেষ্ট যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় চাচা হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবদুল মুত্তালিবের সন্তান ছিলেন। তাঁর মাতা হযরত উম্মুল ফজল লুবাবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহাও অত্যন্ত মর্যাদাবান মহিলা সাহাবী ছিলেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহ আনহা মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহ আনহার পরেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহ আনহা হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুর আপন খালা ছিলেন। এ সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের চাচাতো ভাই ছাড়াও খালুও হতেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর মশহুর উপাধিগুলো হলো ঃ আল হিবর (একজন বিরাট জ্ঞানী), আল বাহর (জ্ঞানের সমুদ্র), তরজুমানুল কুরআন (কুরআনের ভাষ্যকার) এবং মুফাসসিরদের ইমাম।

হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর আরও কয়েকজন সন্তান ছিলেন। কিন্তু যখনই ইবনে আব্বাস বলা হয় তখনই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকেই বুঝানো হয়।

হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু নবীর হিজরাতের তিন বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। সে যুগে কুরাইশের মুশরিকরা বনু হাশেম এবং বনু মুত্তালিব গোত্রকে শেয়েবে আবি তালিবে আটক করে রেখেছিলো। হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু এ আটক অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। ইবনে আসির (র) উসুদুল গাব্বাহ গ্রন্থে লিখেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু তাকে কোলে করে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবজাতকের জন্য দোয়া করলেন। বহু ঐতিহাসিক এবং চরিতকার লিখেছেন, হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরাতের পূর্বে মুসলমান হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রেখেছিলেন। মক্কা বিজয়ের (৮ম হিজরী) কিছুদিন পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন এবং সাথে সাথে নিজের পরিবার-পরিজনসহ হিজরত করে মদীনা গমন করেন। অবশ্য তাঁর পত্নী হযরত উম্মুল ফজল রাদিয়াল্লাহ আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির প্রথম যুগেই প্রকাশ্যভাবেই মুসলমান হয়েছিলেন। বস্তুত হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের জন্মের প্রথম দিন থেকেই তাওহীদের ছায়াতলে

লালিত-পালিত হন। পিতা-মাতার সাথে হিজরতের সময় তাঁর বয়স ছিলো প্রায় ১১ বছর। মদীনায় পৌঁছে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমত এবং সাহচর্য লাভের সুযোগ পান। তাছাড়া তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। পিতার নির্দেশ অনুযায়ী অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কাটাতেন এবং তাঁর বাণীসমূহ শোনার সুযোগ পেতেন। একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে ফিরে এসে হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বললেন, আজ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে এমন এক ব্যক্তিকে দেখলাম যাকে আমি চিনি না। তার সম্পর্কে জানতে পারলে কতই না ভালো হতো।

হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুর কথা উল্লেখ করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ডেকে পাঠালেন এবং স্নেহের সাথে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং দোয়া করলেন ঃ

"হে আল্লাহ, তার ওপর বরকত অবতীর্ণ করুন এবং তাকে জ্ঞানের আলো বিতরণের মাধ্যম বানিয়ে দিন।"–(আল ইসাবাহ)

হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির ছিলেন। কিন্তু তবুও শৈশবকাল। এজন্যে মাঝে মধ্যে সম বয়সী বালকদের সাথে খেলাধুলা করার জন্যে মদীনার অলিগলিতে চলে যেতেন। এ যুগের একটি ঘটনা তার সারা জীবন স্মরণ ছিলো। নিজেই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন ঃ

ছেলেদের সাথে গলিতে খেলাধুলা করতাম। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাশরীফ আনতে দেখলাম। এ অবস্থায় দৌড়ে এক বাড়ীর দরজার পেছনে পালালাম। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখে ফেলেছিলেন। তিনি অগ্রসর হয়ে আমাকে ধরে ফেললেন এবং মাথার ওপর হাত বুলিয়ে বললেন, যাও, মাবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ডেকে আনো। মাবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু কাতিবে (লেখক) অহী ছিলেন। আমি দৌড়ে দৌড়ে হযরত মাবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে গেলাম এবং তাঁকে ডেকে আনলাম।"–(মুসনাদে আহমাদ)

হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু অধিকাংশ সময় খালা উম্মুল মু'মিনীন হযরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহ আনহার কাছে কাটাতেন। এবং কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাড়ীতেই শুয়ে থাকতেন।

একবার খালার কাছে শুয়েছিলেন। এ সময় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ আনলেন এবং চার রাকাআত নামায পড়ে আরাম করলেন। তখনো কিছু রাত বাকী ছিলো। তিনি ঘুম থেকে জাগলেন এবং মশকের পানি থেকে অযু করে নামায শুরু করলেন। তিনিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি মাথা ধরে তাকে ডান দিকে দাঁড় করিয়ে দিলেন।-(সহীহ আল বুখারী)

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের জন্যে ঘুম থেকে জাগলেন। এ সময় তিনি পাত্র ভরা পানি পেলেন। অযু করার পর তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহ আনহাকে জিজ্ঞেস করলেন, অযুর পানি কে এনেছিলো ? তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের দিকে ইঙ্গিত করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত খুশী হলেন এবং দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ ! তাকে দীনের সমঝ দান করো এবং তার ব্যাখ্যার পদ্ধতিও শিখিয়ে দাও।"

মোটকথা শৈশবকালেই তিনি কয়েকবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতের মাধ্যমে দোয়া নেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের বয়স সবেমাত্র ১৩ বছর হয়েছিলো। ঠিক এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত হয়ে গেলো। বস্তুত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে তার বয়স ছিলো কম। এজন্যে তিনি কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বয়স কমপক্ষে ১৫ বছর নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফাতকালেও তিনি এ ব্যাপারে কোনো কৃতিত্ব দেখানোর সুযোগ পাননি। এ সত্ত্বেও তিনি বড় বড় সাহাবার কাছ থেকে জ্ঞানের জগতে উপকৃত হতে থাকলেন এবং তাঁর খ্যাতি একজন তীক্ষ্ণ ধী ও মেধাসম্পন্ন যুবক হিসেবে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু খেলাফাতের দায়িত্ব পেলেন। এ সময় তিনি হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর যোগ্যতার প্রকাশ্য স্বীকৃতি দিলেন এবং তার সাহস, বুদ্ধি ও প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষ নজর দিলেন। তিনি নিজের জ্ঞানের সাহচর্যের জন্য যেখানে বড় বড় সাহাবা রাদিয়াল্লাহ আনহুমদেরকে ডাকতেন সেখানে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ডেকে পাঠাতেন। এ কারণে তাঁকে অনেকেই ঈর্ষা করতেন। সহীহ আল বুখারীতে স্বয়ং হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু আমাকে বদরী সাহাবীদের সাথে বসাতেন। একবার কতিপয় বুযর্গ

আশ্চর্য হয়ে বললেন যে, আপনি এ যুবককে আমাদের সাথে বসান। তার সমান তো আমাদের ছেলেরা (অথবা তার সমবয়সী আমাদের ছেলেদেরকে তো এখানে বসার সুযোগ দেন না)। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, এ সেই ব্যক্তি যার যোগ্যতা সম্পর্কে তোমরা অবহিত আছো।

হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর মজলিসে কোনো কোনো সময় এমন মাসয়ালা উত্থাপিত হতো যার জবাব হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু দিতে চাইতেন। কিন্তু নিজের কম বয়সের কারণে বড় সাহাবাদের সামনে কথা বলতে সংকোচবোধ করতেন। এ অবস্থায় আমীরুল মু'মিনীন স্পষ্ট ভাষায় তাঁকে সাহস যোগাতেন। তিনি বলতেন, ইবনে আব্বাস, জ্ঞান বয়স কমবেশী হওয়ার ওপর নির্ভর করে না। তুমি নিজেকে অবজ্ঞার পাত্র মনে করো না। যা সঠিক মনে করো অথবা অন্তরে যে ধারণার উদ্ভব হয় তা নির্দ্বিধায় বলে দেবে।"–(সহীহ আল বুখারী)

হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) "আল ইসতিয়াব" গ্রন্থে লিখেছেন, আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুকে অত্যন্ত মর্যাদা দিতেন এবং খুব ভালোবাসতেন।

বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় চরিতকারের উদ্বৃতি দিয়ে "দায়েরায়ে মায়ারেফে ইসলামিয়া" গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সুন্দর আচার-আচরণ, চেহারার ঔজ্জ্বল্য এবং আল্লাহর কিতাবের সমঝের কারণে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুকে অত্যন্ত মর্যাদা দিতেন এবং কঠিন সমস্যায় তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন ও তাঁর মতের ভিত্তিতেই কাজ করতেন। তিনি বলতেন যে, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী ও আলেম। সে প্রৌঢ়দের যুবক অথবা নওজোয়ান বুযর্গ ব্যক্তি। তিনি বেশীর ভাগ প্রশ্ন করেন এবং অন্তর বুদ্ধিদীপ্ত।

কতিপয় বর্ণনায় আছে যে, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু মিসর করায়ত্ব করার জন্যে হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহ আনহুকে নিয়োগ করেন। এ সময় হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুও জিহাদের জন্যে মিসর গমন করেন। (১৮-২১ হিজরীর মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে)।

–(দায়েরায়ে মায়ারেফে ইসলামিয়া)

হযরত ওসমান জুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকালে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি সারায়াহর নেতৃত্বে আফ্রিকায় সেনাবাহিনী প্রেরণ করা (২৭ হিজরী) হয়। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুও

একটি দলের সাথে এ অভিযানে অংশ নেন। একবার তাঁকে দূত বানিয়ে আফ্রিকার শাসক গ্রেগরীর কাছে প্রেরণ করা হয়। হাফেজ ইবনে হাজার "ইসাবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, তিনি গ্রেগরীর সাথে অত্যন্ত সুন্দরভাবে কথা বলেন। গ্রেগরী তাঁর অসাধারণ মেধা ও যোগ্যতায় অভিভূত হয়ে পড়েন এবং তিনি অকপটভাবে বলে ফেলেন ঃ "আপনি হাবারে আরব অর্থাৎ আপনি আরবের একজন বড় আলেম বা জ্ঞানী।"

২৯-৩০ হিজরীতে হযরত ওসমান জুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুর নির্দেশে কুফার গভর্নর হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আস জারজান এবং তাবারিস্তানের ওপর চড়াও হন। ইবনে আসির (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আসের বাহিনীতে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহ আনহু ও হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুর মত কুরাইশদের সব যুবক অন্তর্ভুক্ত ছিলো।-(উসুদুল গাব্বাহ)

২৫ হিজরীতে বিবাদকারীরা মদীনা ঘিরে নিলো এবং অবরোধ করলো। এ সময় হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু যথাসাধ্য আমীরুল মু'মিনীনকে সমর্থন দিলেন। এক বর্ণনা মতে তিনি কুরাইশের অন্যান্য যুবকসহ খলিফার দরজাতে গিয়ে পাহারাও দিয়েছিলেন। এ সময় হজ্জের মওসুম এসে পড়লো। বস্তুত আমীরুল মু'মিনীন অবরুদ্ধ ছিলেন এবং মক্কা যেতে পারছিলেন না। এজন্যে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে আমীরে হজ্জ হিসেবে নিয়োগ করলেন এবং যথাযথ নির্দেশসহ হজ্জের কাফেলার সাথে মক্কা মোয়াজ্জামা প্রেরণ করলেন। এভাবে আমীরুল মু'মিনীন যেন হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুকে নিজের স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে দিলেন। তিনি মক্কাতেই ছিলেন এমন সময় আমীরুল মু'মিনীনের শাহাদাতের মত হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে গেলো। হজ্জে নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনের পর মদীনায় ফিরে এলেন। তখন সেখানে কিয়ামাতের মত অবস্থা বিরাজ করছিলো। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাহাদাতের পর জনগণ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুকে খেলাফাতের দায়িত্ব প্রদানের জন্যে বাধ্য করছিলো। তিনি এ প্রশ্নে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর পরামর্শ চাইলেন। তিনি বললেন, এখন যাকেই খেলাফাতের দায়িত্ব দেয়া হবে, তাকেই হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর হত্যার অপবাদ সইতে হবে। কিন্তু এখন আপনার প্রয়োজন। এজন্যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে আপনি এ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিন।

অন্য এক রাওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে এ বাক্যাবলী সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। "আপনি ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকুন অথবা

আপনি জায়গীরে (সরকার প্রদত্ত জমিদারী) চলে যান এবং নীরবতার ভূমিকা পালন করুন। এসব মানুষ সারা দুনিয়া তন্ন তন্ন করে ফিরবে।

কিন্তু আপনি ছাড়া কাউকেই তারা খেলাফাতের দায়িত্ব বহনের যোগ্য পাবে না। আল্লাহর কসম, আপনি যদি মিসরীয়দেরকে নিজের সাথে নেন, তাহলে মানুষ অবশ্যই আপনাকে ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর হত্যার অপবাদ দেবে।"

হযরত আলী কাররামুল্লাহ ওয়াজহাহু নির্জনত্ব অবলম্বন ঠিক মনে করলেন না এবং মদীনাবাসীদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে খেলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। নতুনভাবে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হলো। এ সময় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু সিরিয়ার গভর্নর আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর পরিবর্তে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুকে নিয়োগ করতে চাইলেন। তিনি এ পদ গ্রহণে ওজর পেশ করলেন এবং আমীরুল মু'মিনীনকে পরামর্শ দিয়ে বললেন ঃ "আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বর্তমান পদে বহাল রাখুন ও তাঁকে আপনার সমর্থক বানিয়ে নিন। তিনি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাল থেকেই সিরিয়ার গভর্নর হিসেবে কাজ করে আসছেন।"

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু এ পরামর্শ গ্রহণ করলেন। তবে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুকেও সিরিয়া যেতে বাধ্য করলেন না। যাহোক হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর হাতে বাইয়াত করলেন এবং তাঁকে সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

৩৬ হিজরীতে দুঃখজনক উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর পক্ষ থেকে অত্যন্ত বাহাদুরীর সাথে লড়াই করলেন। কতিপয় নেতৃস্থানীয় চরিতকার লিখেছেন, তিনি হযরত আলী মুরতাজা রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাহিনীর হেজাজবাসীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহুর সমর্থকরা বসরা দখল করে নিয়েছিলেন। উষ্ট্রের যুদ্ধে হযরত আলী বিজয়ী হলেন। এ সময় তিনি বসরা পুনর্দখল করলেন এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুকে সেখানকার গভর্নর বানিয়ে দিলেন।

উষ্টের যুদ্ধের পর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর মধ্যে মতপার্থক্য ব্যাপক আকার ধারণ করলো। এমনকি সিফফিনের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বসরাবাসীদের সৈন্যসহ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাহায্যের জন্য উপস্থিত হলেন। তিনি হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুকে নিজের

বাহিনীর অফিসার বানালেন। তিনি অত্যন্ত বাহাদুরীর সাথে যুদ্ধ করলেন। যুদ্ধকালে উভয় পক্ষ সালিসীতে ঐকমত্য হলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুও সালিসনামায় অন্যতম দস্তখতকারী ছিলেন। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর পক্ষ থেকে হযরত আমর ইবনুল আস এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর পক্ষ থেকে হযরত আবু মুসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহ আনহু সালিস হিসেবে নিয়োজিত হয়েছিলেন।

এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু সালিস হিসেবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বিরোধী পক্ষ আপত্তি তুলে বলেছিলেন যে, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং আপনি মূলতঃ এক। প্রকৃতপক্ষে সালিস বা তৃতীয় পক্ষ একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি হওয়া উচিত।

সালিসীতে তেমন কোনো সন্তোষজনক ফল হলো না। তবুও যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেলো। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু কুফা প্রত্যাবর্তন করলেন এবং হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু দামেস্ক ফিরে গেলেন। ইত্যবসরে খারেজীরা নাহরোয়ানে একত্রিত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। কথিত আছে যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর সালিসী কবুল করার কারণেই তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলো। তাদের কাছে দীনের ব্যাপারে সালিস নিয়োগ ছিলো কুফুরী।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু খারেজীদেরকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এবং আলাপ-আলোচনা করে তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুকে প্রেরণ করলেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু খারেজী বাহিনীতে পৌঁছলেন। এ সময় ইবনুল কাওয়াহ নামক তাদের এক সরদার বক্তৃতা দেয়ার জন্য দাঁড়ালেন এবং বললেন ঃ

"হে কুরআন বহনকারীরা ! ইনি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস। আমি তাঁকে খুব ভালোভাবে চিনি। তাঁকে তাঁর দোস্তের [আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু] দিকে ফিরিয়ে দাও। আমাদের আলোচনার প্রয়োজন নেই।" একথার পর খারেজীদের আরও কতিপয় খতিব দাঁড়িয়ে গেলো এবং বললো, আমরা অবশ্যই তাঁর সাথে আলোচনা করবো। যদি তিনি হক কথা বলেন এবং আমরা তা বুঝতে সক্ষম হই, তাহলে আমরা তাঁর আনুগত্য করবো। আর যদি তিনি অসত্য কিছু বলেন, তাহলে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করবো। বস্তুত তিনদিন পর্যন্ত হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং খারেজীদের মধ্যে কুরআনের উদ্ধৃতি সহকারে আলোচনা হলো। এর ফলে চার হাজার মানুষ নিজের ধারণা ত্যাগ করে তাওবা করলো।

তাদের মধ্যে ইবনুল কাওয়াহ ছিলো। হযরত ইবনে আব্বাস তাদেরকে কুফায় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে নিয়ে এলেন, কিন্তু অবশিষ্ট খারেজী নিজেদের মতের ওপর স্থির হলো। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদের কাছে বাণী প্রেরণ করে বললেন, তোমরা যদি হত্যা কাণ্ড, ডাকাতি এবং জিম্মী প্রতিবেশীদের ত্যক্ত বিরক্ত না করো তাহলে যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারো। অন্যথায় আমি তোমাদের সাথে লড়াই করবো।"

খারেজীরা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর কথা শুনলেন না। সুতরাং আমীরুল মু'মিনীন রাদিয়াল্লাহ আনহু কুফা থেকে তাদেরকে উৎখাতের জন্যে রওয়ানা হলেন। অন্যদিকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বসরা থেকে সাত হাজার মানুষসহ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাহায্যের জন্যে রওয়ানা করলেন এবং নাখলিয়াহ নামক স্থানে তাঁর বাহিনীর সাথে মিলিত হলেন। নাহরোয়ানের কাছে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর এবং খারেজীদের মধ্যে রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এ যুদ্ধে খারেজীদের শিক্ষণীয় পরাজয় ঘটলো। যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত বাহাদুরী প্রদর্শন করলেন।

নাহরোয়ানের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর বেঁচে যাওয়া খারেজীরা ইরানে প্রবেশ করে এবং সেখানকার জিম্মীদেরকে সাথে নিয়ে হৈ চৈ ও গণ্ডগোল শুরু করে দিলো। ইরানবাসীরা অধিকাংশ প্রদেশ থেকে সরকারী কর্মচারীদের বের করে দিলো এবং খিরাজ ও জিযিয়া প্রদানে অস্বীকৃতি জানালো। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের সকল রাজস্ব আদায়কারী ও কর্মচারীদেরকে ডেকে পাঠালেন এবং তাদের কাছে এ বিশৃঙ্খলার প্রশ্নে মত চাইলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু আরজ করলেন ঃ "ইরানের অবস্থা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি।"

বস্তুত বসরার সীমানা ইরানের বিদ্রোহী জেলাসমূহের সীমানার সাথে মিলিত ছিলো এবং হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বসরার নেতৃত্বের দায়িত্ব খুব ভালোভাবেই আনজাম দিচ্ছিলেন। এজন্যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে সমগ্র ইরানের শাসনও অর্পণ করলেন এবং সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার সকল দায়িত্বও তাঁর ওপরই ন্যস্ত করলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বসরা ফিরে যিয়াদ বিন আবিয়াহর নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী ইরানে প্রেরণ করলেন। এ বাহিনী প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিলো বিদ্রোহীদের উৎখাত। অল্প সময়ের মধ্যেই যিয়াদ বিদ্রোহীদেরকে দমন করলো এবং কারমান, ফারিস এবং ইরানের অন্যান্য সকল প্রদেশে পূর্ণ শান্তি ও শৃংখলা ফিরিয়ে আনলেন।

কিছুদিন পর হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বসরার ইমারতের পদ থেকে পদত্যাগ এবং মক্কা মোয়াজ্জামা গিয়ে নির্জন বাস শুরু করলেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বসরার ইমারত থেকে কখন পদত্যাগ করেছিলেন, এ ব্যাপারে বিভিন্ন রাওয়ায়েত রয়েছে। কেউ লিখেছেন যে, এ ঘটনা ৩৮ হিজরীতে ঘটে। কেউ বলেছেন, এ ঘটনা ঘটে ৩৯ এবং ৪০ হিজরীতে। এক বর্ণনায় এও বলা হয়েছে যে, তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাহাদাত (৪০ হিজরী) পর্যন্ত বসরার ইমারাতের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। "দায়েরায়ে মায়ারেফে ইসলামিয়া"তে বর্ণিত আছে ঃ "এ বিচ্ছিন্নতা (বসরার ইমারাত) ৩৮ হিজরীতেই ঘটেছিলো। এ মত গ্রহণ প্রশ্নে শক্তিশালী কারণসমূহ রয়েছে।"

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বসরার ইমারাত থেকে কেন বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন ? এ প্রশ্নেও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ এ কারণ হিসেবে লিখেছেন যে, বসরার কাজী আবুল আসওয়াদ দাওয়েলী তাঁর বিরুদ্ধে বাইতুল মালের অপচয়ের অভিযোগ এনেছিলেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর কাছে এর জবাব চেয়েছিলেন।

জবাবে তিনি লিখেছিলেন ঃ "আমীরুল মু'মিনীন ! আপনাকে যাকিছু বলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমার কাছে যাকিছু আছে আমি তার রক্ষক। আপনি কোনো ধরনের খারাপ চিন্তা অন্তরে স্থান দিবেন না।"

এ চিঠি প্রাপ্তির পর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর কাছে বাইতুল মালের পুংখানুপুংখ হিসাব চেয়ে পাঠালেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের এটা খুব মনে লাগলো এবং আমীরুল মু'মিনীনকে লিখে পাঠালেন ঃ "বসরাবাসীদের সম্পদ আমি অপচয় করেছি এ অভিযোগ আপনি বেশী গুরুত্ব দিতে চান বলে আমি অনুভব করছি। এজন্যে আপনি এ পদে যাকে উপযুক্ত মনে করেন তাকেই নিয়োগ করুন। আমি এ পদ ছেড়ে দিচ্ছি।"

এ ধরনের আরও কিছু বর্ণনা আছে, যা নিয়ে পাশ্চাত্য বিশারদরা খুব কাদা ছোঁড়াছুড়ি করেছেন। কিন্তু আমরা যখন দেখি যে, হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুকে মৃত্যু পর্যন্ত সবসময় মুসলমানরা অত্যন্ত মর্যাদা এবং সম্মান করেছেন তখন একথাই বলতে হয় যে, ঐসব বর্ণনায় বেশী রং ছড়ানো হয়েছে। হতে পারে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে কোনো ব্যাপারে তাঁর মতবিরোধ হয়েছিলো। কিন্তু তিনি বাইতুল মালের সম্পদ অপচয় করেছিলেন একথা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাহাদাতের পর হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহ আনহু খেলাফাতের দায়িত্ব পেলেন। এ সময় তিনি হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুকে সেনাপতি নিয়োগ করলেন। দায়েরায়ে মায়ারেফে ইসলামীয়াতে বর্ণিত আছে যে, ইতিমধ্যে তিনি (ইবনে আব্বাস) আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে আপোষ প্রচেষ্টা শুরু করলেন। কিন্তু একথা পরিষ্কার করে বলা হয়নি যে, তিনি এ কাজ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে করেছিলেন। অথবা ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহ আনহুর বলার পর করেছিলেন। খুব সম্ভব তিনি ইবনে আব্বাসই ছিলেন, যিনি খেলাফাতের দুই দাবীদারের মধ্যে আপোষ করিয়েছিলেন।

ঘটনা যাই হোক, এটা বাস্তব যে, সাইয়েদেনা হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফত থেকে সরে দাঁড়ানোর আগেই হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুকে চিঠি লিখে জান ও মালের নিরাপত্তা নিয়ে নিয়েছিলেন এবং মক্কা গিয়ে নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন।

আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর সুদীর্ঘ খেলাফাতকালে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু হেজাজেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। কিন্তু এ যুগে তিনি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রায়ই দামেস্ক যেতেন। বনু হাশেমের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি সেখানে গমন করতেন। সাইয়েদেনা হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহ আনহুর ইন্তেকালের সময় তিনি দামেস্কেই ছিলেন। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে সাক্ষাত হলো। তিনি ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহ আনহুর ইন্তেকালে তাঁর কাছে গভীর শোক প্রকাশ করলেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) আল ইসতিয়াবে বর্ণনা করেছেন যে, এ সময় উভয় বুযর্গের মধ্যে নিম্নলিখিত কথোপকথন হয়েছিলো ঃ

হযরত আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ! আল্লাহ তোমাদেরকে আবি মুহাম্মাদুল হাসান বিন আলীর মৃত্যুতে সওয়াব দিক।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস অশ্রু সংবরণ করতে করতে বললেন ঃ ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহর কসম ! তাঁর মৃত্যুতে আপনার কবর পূর্ণও হবে না এবং দীর্ঘায়ু হবেন না। আল্লাহর কসম ! তাঁর মৃত্যুতে আমাদেরকে মহান ব্যক্তির মৃত্যুর দুঃখ পেতে হয়েছে। আল্লাহর কসম! তাঁর পরে আমাদের কিইবা করার ছিলো।

হযরত আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু ঃ সে কতো বয়সের হয়েছিলো ?

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু ঃ তাঁর জন্মের ঘটনা এত মশহুর যে, তাঁর বয়স জিজ্ঞেস করা আপনার প্রয়োজন নেই।

হযরত আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু ঃ আমার ধারণা, তিনি ছোট ছোট শিশু রেখে গেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু ঃ আমরা সবাই ছোট ছিলাম। অতপর বড় হয়েছি। আল্লাহ নিজের রহমতের সুশীতল ছায়াতলে আবি মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে টেনে নিয়েছেন। তবে, এখনো আবু আবদুল্লাহকে [হুসাইন রাদিয়াল্লাহ আনহু] জীবিত রেখেছেন এবং তাঁর মতো ব্যক্তিরা সালেহ হিসাবেই পরিগণিত।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু যখনই হযরত আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে মিলিত হতেন তখনই তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করতেন এবং তোহফা ও উপঢৌকন দিতেন।

প্রখ্যাত শিয়া ঐতিহাসিক মুহাম্মদ বিন আলী বিন তাবা (ইবনে তাকতাকী) বর্ণনা করেছেন ঃ

আশরাফ কুরাইশদের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু, আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু, আবদুল্লাহ বিন জাফর রাদিয়াল্লাহ আনহু, আবদুল্লাহ বিন ওমর, আবদুর রহমান বিন আবি বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু, আবান বিন ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং আবি তালিবের বংশধররা আমীর মুয়াবিয়ার কাছে গমন করতেন। তিনি তাদেরকে অত্যন্ত খাতির এবং মেহমানদারী করতেন। তাঁদের সকল প্রয়োজন পূরণ করতেন। পক্ষান্তরে এ সকল ব্যক্তি তাঁর সাথে কঠিন ভাষায় কথা বলতেন। কিন্তু আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁদের কথা হেসে উড়িয়ে দিতেন অথবা এড়িয়ে যেতেন এবং তাদেরকে মূল্যবান উপঢৌকন ও বিরাট অংকের অর্থ দিতেন।"–(আল ফাখরী)

৪৯-৫০ হিজরী অথবা অন্য বর্ণনা মতে ৫১-৫২ হিজরীতে আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু কাসতানতুনিয়া দখল করার জন্যে সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু কুরাইশ যুবকদের সাথে এ বাহিনীতে যোগ দেন এবং রোমীয়দের বিরুদ্ধে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর সৌভাগ্য অর্জন করেন। এ বাহিনী সম্পর্কে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন যে, আমার উম্মতের যে প্রথম বাহিনী কাইসারের শহরে জিহাদ করবে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।

৬০ হিজরীতে আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর মৃত্যুর পর ইয়াজিদ সিংহাসনে বসলো। অন্যদিকে সাইয়েদিনা হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহ আনহু

কুফাবাসীর পীড়াপীড়িতে মক্কা থেকে বের হবার প্রস্তুতি নিলেন। এ সময় হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে এলেন এবং বললেন—"হে চাচাত ভাই ! আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি নাকি কুফা যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করো ?" হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহ আনহু জবাব দিলেন, "ইচ্ছাতো তাই।"

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন ঃ "হে চাচার পুত্র ! আমি আল্লাহর কাছে তোমার জন্যে ক্ষমা চাই। এ ইচ্ছা পরিত্যাগ করো।"

সাইয়েদেনা হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহ আনহু জবাবে বললেন ঃ "আমি দৃঢ়ভাবেই ইচ্ছা করেছি। এখন যেতেই হবে।"

হযরত ইবনে আব্বাস বললেন ঃ "তুমি কি সেই জাতির কাছে যেতে চাও, যারা নিজেদের ওয়ালিকে শহর থেকে বের করে দিয়েছে এবং আইন-শৃংখলা নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যদি তারা এ কাজ করেই থাকে তাহলে তুমি অবশ্যই তাদের কাছে চলে যাও। আর যদি তাদের ওয়ালি তাদের ওপর যথাযথ শাসন কাজ চালায় এবং তাদের কাছ থেকে রাজস্ব ইত্যাদি আদায় করে তাহলে তার অর্থ হলো যে, তারা তোমাকে যুদ্ধের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার দাওয়াত দিচ্ছে। আমার আশংকা যে, তারা তোমাকেও সেভাবেই পরিত্যাগ করবে যেভাবে তোমার পিতা এবং ভাইকে পরিত্যাগ করেছিলো।"

সাইয়েদেনা হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন ঃ "হে চাচার পুত্র ! আপনার বক্তব্য আমি চিন্তা করবো।"

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু সেই সময় ফিরে গেলেন। কিন্তু যখন তিনি জানতে পারলেন যে, হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের ইচ্ছার ওপর দৃঢ় রয়েছেন তখন তিনি তৃতীয়বার তাঁর কাছে গেলেন এবং বললেন ঃ হে চাচার পুত্র ! আমি এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার জন্য অনেক চেয়েছি। কিন্তু অন্তর মানে না। আমি আবারো বলছি, তুমি কুফা যেয়ো না। এতে তোমার ক্ষতির আশংকা রয়েছে। কুফাবাসী বিশ্বাসঘাতক। তাদের ওপর ভরসা করো না। তুমি এ শহরের বাসিন্দাদের নেতা। একথা যদি তুমি না মান, ইয়েমেন চলে যাও। সেখানে দুর্গ, ঘাটি এবং সুড়ঙ্গ রয়েছে। এলাকাও দৈর্ঘ এবং প্রস্থে বিশাল ও সংরক্ষিত। সেখানে তোমার পিতার সমর্থনকারীরাও আছে। এমনিতে তুমি সেখানে মানুষের কাছ থেকে দূরে থাকবে। তবে তুমি মানুষের কাছে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করতে পারবে। সেখান থেকেই তুমি নিজের প্রতিনিধিদেরকে সমগ্র দেশে প্রেরণ করতে পারো। যদি তুমি এ কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করো তাহলে তুমি তোমার উদ্দেশ্য সফল হবে বলে আশা করি।"

সাইয়েদেনা হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহ আনহু জবাব দিলেন ঃ "হে চাচার পুত্র ! আল্লাহর কসম ! আমি জানি আপনি আমার সত্যিকার শুভাকাংখী এবং বন্ধু। কিন্তু আমি এখন দৃঢ়ভাবে কুফা যাওয়ার ইরাদাহ করে ফেলেছি।"

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন ঃ "তুমি যদি একান্তই যেতে চাও তাহলে মহিলা ও শিশুদেরকে সাথে নিও না। আল্লাহর কসম ! আমার ভয় হয় যে, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুকে যেভাবে পরিবার-পরিজনের সামনে শহীদ করা হয়েছিলো সেভাবে তোমাকেও না শহীদ করে ফেলা হয়।"

সাইয়েদেনা হুসাইন রাদিয়াল্লাহ আনহু জবাব দিলেন ঃ "হে চাচার পুত্র ! আমিতো পরিবার-পরিজন সহই যাবো।"

এবার হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু চুপ মেরে গেলেন। আল্লাহর ইচ্ছা এবং বিধিলিপিও ছিলো কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটার। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন। পথে হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে সাক্ষাত হলো। তাঁর ধারণা ছিলো যে, হযরত ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু খেলাফতের দাবীদার। এজন্যে তিনি হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুর মক্কা ত্যাগে খুশী হবেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা ছিলো অন্যরূপ। স্বয়ং ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু সাইয়েদেনা হুসাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুকে মক্কায় অবস্থান করার এবং কুফায় না যাওয়ার পরামর্শ ইতিমধ্যেই দিয়েছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের ধারণা অনুযায়ী ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ "হুসাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুর গমনে তোমার অন্তর ঠাণ্ডা হয়েছে।" অতপর এ কবিতা আবৃত্তি করলেন। কবিতার ভাবার্থ হলো ঃ

"হে পাখী ! এখনতো সমগ্র ময়দানের মালিক তুমি ! ডিম পাড়ো, তা দাও এবং যা যতক্ষণ চাও করো।"

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর সন্দেহ সঠিক বলে প্রমাণিত হলো। সাইয়েদেনা হুসাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুকে কারবালার ময়দানে নিজের অনেক আত্মীয়-স্বজন এবং সমর্থক ও সাহায্যকারীসহ শিশু এবং মহিলাদের সামনে শহীদ করে ফেলা হলো। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু এ হৃদয়বিদারক ঘটনা শুনে এত দুঃখিত হয়েছিলেন যে, সমগ্র জীবনই কেঁদে কেঁদে কাটিয়েছিলেন।

হযরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাহাদাতের পর হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু মক্কায় খেলাফাতের দাবী এবং জনগণের কাছ থেকে খেলাফাতের বাইয়াত নেয়া শুরু করলেন। হেজাজের বিরাট সংখ্যক মানুষ তাঁর হাতে হৃষ্টচিত্তে বাইয়াত করলো। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর হাতে বাইয়াতে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহুর শত্রু হয়ে গিয়েছিলেন, তা নয়। বরং এর অন্য কারণ ছিলো। ইতিমধ্যে তিনি রাজনৈতিক ঝগড়া-বিবাদ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করেছিলেন। আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের জীবদ্দশায় তাঁকে ইয়াজিদের আনুগত্য প্রকাশের কথা বলেছিলেন। এ সময়ও তিনি তা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে বাইয়াতের ওপর জোর দিলেন। কিন্তু তিনি তা মানলেন না।

কতিপয় বর্ণনায় আছে যে, বাইয়াত প্রশ্নে অব্যাহত অস্বীকৃতির কারণেই ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে এবং মুহাম্মদ বিন হানফিয়াকে গ্রেফতার করেছিলেন। ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহুর অন্য বড় শত্রু মুখতার বিন আবি ওবায়েদ ছাকাফি এ খবর পেলো। সে কুফা থেকে এক বড় বাহিনী প্রেরণ করলো। এ বাহিনী হঠাৎ করে আক্রমণ করে তাদেরকে মুক্ত করলো। এ বাহিনী ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহুর সৈন্যদের সাথেও সংঘর্ষে লিপ্ত হতে চাইলো। কিন্তু ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু নিষেধ করলেন এবং বললেন আমি হেরেমে রক্তারক্তি পসন্দ করি না। এ প্রসঙ্গে ইবনে আসির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মুখতারের দূত ও সে বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত এক ব্যক্তির জবানীতে দু'টি আশ্চর্য ধরনের কথা বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে একটি হলো ঃ হযরত ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এবং ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুকে জীবন্ত জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এ লক্ষ্যে তিনি তাঁর অবস্থান গৃহের (যেখানে তিনি আটক ছিলেন) চারপাশে স্তুপাকৃতির লাকড়ী জড়ো করেছিলেন।

দ্বিতীয়টি হলো ঃ যখন এ বাহিনী মক্কা পৌছলো তখন ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু কা'বার গিলাফ ধরে আশ্রয় চাইলো। মনে হয় ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহুর বিরোধীরা তাঁর দুর্নামের লক্ষ্যে কথা দু'টি রচনা করেছিলো। বুদ্ধি ও বিবেকের সাথে পর্যালোচনা করলে ব্যাপারটি নিসন্দেহে ভুল বলে প্রমাণিত হবে। হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু যদিও বয়সের দিক দিয়ে ছোট ছিলেন, তবুও জ্ঞান, মর্যাদা ও মধুর চরিত্রের দিক থেকে তিনি বড় বড় সাহাবা রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের মধ্যে পরিগণিত

হতেন। বাইয়াতের অস্বীকৃতির কারণে তিনি কাউকে জীবিত জ্বালিয়ে দেয়ার কথা চিন্তাও করতে পারতেন না। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত মুহাম্মদ বিন হানফিয়া (র) কোনো মামুলি ধরনের ব্যক্তিত্ব ছিলেন না যে, তাদেরকে জ্বালিয়ে দেয়া যেতো। আর মক্কাবাসী তা শুধু তামাসার সাথে দেখতো। হযরত ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু আরবের অন্যতম বাহাদুর ছিলেন। বিরোধীদের একটি বাহিনী দেখে তিনি কা'বার গিলাফ ধরে আশ্রয় চেয়েছিলেন একথা নির্ভেজাল মিথ্যা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

বিভিন্ন বর্ণনা সামনে রাখলে ঘটনাটি এ দাঁড়ায় ঃ

১. ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও মুহাম্মদ বিন হানফিয়াহকে (র) বাইয়াত বা আনুগত্যের দাবী জানিয়েছিলেন। যখন তাঁরা তা মানলেন না তখন তাঁদেরকে তাঁদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিলেন।

২. মুখতার বিন আবি ওবায়েদ ছাকাফি হুসাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুর হত্যাকারীদের প্রতিশোধ নিলো। এতে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং মুহাম্মদ বিন হানফিয়া রাহমাতুল্লাহ আলাইহি খুশী প্রকাশ করেছিলেন। পরে মুখতার ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহুর সন্দেহ হলো যে, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু ও মুহাম্মদ বিন হানফিয়া রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তাকে সমর্থন করছেন। তিনি সাবধানতা স্বরূপ উভয় বুযর্গকেই ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুকে নিজের গৃহে এবং মুহাম্মদ বিন হানফিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুকে জমজমের চার দেয়ালের মধ্যে নজর বন্দী করে রাখলেন। কিন্তু তাঁরা সবসময়ই মক্কার বাইরে যাওয়ার শক্তি রাখতেন। হযরত মুহাম্মদ বিন হানফিয়াহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কুফা গমনের ইচ্ছাও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কুফা আগমন মুখতার পসন্দ করতো না। এজন্যে তিনি মক্কাতেই অবস্থান করেছিলেন।

৩. মুখতার সেনাবাহিনীর একটি সশস্ত্র দলকে মক্কা প্রেরণ করলো। তারা দুই বুযর্গকেই মিনা নিয়ে এলো। এরপর তাঁরা ফিরে গেলো। মিনায় কিছুদিন অবস্থানের পর তাঁরা দু'জনেই তায়েফ চলে গেলেন। এক বর্ণনা মতে তায়েফ গমনের পূর্বে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু কঠিন ভাষায় হযরত ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে কথা বললেন। এ সত্ত্বেও ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর সাথে বাদানুবাদ করলেন না। মুখতার প্রেরিত বাহিনীর বিরুদ্ধে ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু মুখোমুখি হননি। কারণ, হেরেম শরীফে তিনি প্রথম রক্তারক্তি করতে চাননি।

৪. এটা ঠিক যে, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাইয়াত বা আনুগত্য করেননি। তাই বলে তিনি ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহুর শত্রু ছিলেন না। তিনি প্রকাশ্যে তাঁর গুণ ও মর্যাদার স্বীকৃতি দিতেন। তিনি বলতেন, যদি তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামায প্রত্যক্ষ করতে চাও, তাহলে ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহুর নামায প্রত্যক্ষ করো।–(মুসনাদে আহমাদ)

সহীহ আল বুখারীতে ইবনে আবি মালিকা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললাম, আপনি কি ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে লড়াই করে আল্লাহর হেরেমকে হালাল করতে চান ? জবাবে বললেন, আল্লাহর কসম ! হেরেমে রক্তারক্তি করা বনু উমাইয়া এবং ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহুর ভাগ্যে লেখা রয়েছে। আল্লাহর কসম ! আমি এ ধরনের সাহস করতে পারি না।

আমি বললাম, জনগণ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহুর হাতে বাইয়াত করছে। জানি না, তিনি কিসের ভিত্তিতে খেলাফতের দাবী করছেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, কেন করবেন না। তাঁর পিতা যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহচর ছিলেন। তাঁর নানা আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হেরা গুহার সাথী ছিলেন। তাঁর মা আসমা রাদিয়াল্লাহ আনহা প্রিয় নবীর যুক্তিবাদী সাহাবিয়াহ ছিলেন। তাঁর খালা আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহা উম্মুল মু'মিনীন ছিলেন। তাঁর পিতার ফুফু খোদায়জা রাদিয়াল্লাহ আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন সঙ্গিনী ছিলেন এবং তাঁর দাদী সুফিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফু ছিলেন। উপরন্তু তিনি স্বয়ং ইসলামের একজন পবিত্র ব্যক্তিত্ব এবং কুরআনের কারী। আল্লাহর কসম ! তিনি যদি আমার সাথে কোনো ইহসান করেন, তাহলে তা হবে আত্মীয়তার ইহসান। আর তিনি যদি আমাকে লালন-পালন করেন, তাহলে তা হবে নিজের একজন মর্যাদাবান প্রতিবেশীর লালন-পালনের মতো।

ইমাম জাহাবী (র) এবং অন্যান্য চরিতকার বর্ণনা করেছেন যে, জীবনের শেষ পর্যায়ে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছিলো। তায়েফে অবস্থানকালেই (৬৮ হিজরী ৬৮৭ খৃঃ) কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। যখন জীবনের আর কোনো আশা রইলো না তখন মৃত্যু শয্যার

চারপাশে একত্রিত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও অনুরাগীদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"আমি এমন একটি দলের মধ্যে দুনিয়া থেকে বিদায় নেব, যারা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় ও অধিক নিকটবর্তী। এজন্যে আমি যদি তোমাদের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করি তাহলে নিসন্দেহে তোমারই সেই দল বা জামায়াত।"

সাতদিন রোগ ভোগের পর জ্ঞান ও মর্যাদার এ সূর্য আল্লাহর দরবারে হাজির হলেন। মৃত্যুর খবর প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে চারদিকে বিলাপ ও ক্রন্দন ধ্বনি শুরু হলো। শেষ নজর দেখার জন্য মানুষের ঢল নামলো। হযরত মুহাম্মদ বিন হানফিয়া (র) জানাযার নামায পড়ালেন এবং মুফাসসিরদের নেতাকে তায়েফে দাফন শেষে বললেন ঃ "আল্লাহর কসম ! উম্মতের একজন অত্যন্ত বড় আলেম দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন।"

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু ছিলেন গভীর জ্ঞানের অধিকারী। তাঁর জীবন ইতিহাসের সবচেয়ে আলোকোজ্জল অধ্যায় ছিলো এটি। এদিক থেকে প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন বিরাট জ্ঞানী বা জ্ঞান সমুদ্র। বড় বড় মর্যাদাবান সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহু তাবেয়ীন (র), তাবে তাবেয়ীন (র) এবং অতীতের সকল আলেম তাঁর জ্ঞান, শ্রেষ্ঠত্ব মেধা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং প্রশংসা করেছেন। সাইয়েদেনা হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে তাঁর যে স্থান এবং মর্যাদা ছিলো তার উল্লেখ ওপরে করা হয়েছে। হযরত আলী কাররামুল্লাহ ওয়াজহাহু বলতেন, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু কুরআনের তাফসির কালে মনে হয় যেনো তিনি স্বচ্ছ পর্দার নেপথ্য থেকে অদৃশ্য বস্তুসমূহ দেখছেন।

হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মাসউদের বক্তব্য হলো, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু ছিলেন কুরআনের অতি উত্তম ভাষ্যকার।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বলতেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাকিছু অবতীর্ণ হয়েছে তা উম্মতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে ইবনে আব্বাসই বেশী জানেন।

হযরত ওবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে কাউকেই বেশী সুন্নাতের আলেম, তাঁর চেয়ে বেশী সঠিক রায় সম্পন্ন এবং তার থেকে বড় সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন কাউকেই দেখিনি।

হযরত উবাই রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন কায়াব আনসারীর পুত্র মুহাম্মদ (র) বর্ণনা করেছেন, একদিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু আমার পিতার কাছে বসেছিলেন। তিনি চলে গেলে আমার পিতা বললেন, একদিন এ ব্যক্তি এ উম্মাতের বড় আলেম বা জ্ঞানী হবেন।

হযরত তাউস তাবেয়ী (র) বলেছেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ৭০জন সাহাবী দেখেছি। তাঁরা যখন কোনো সমস্যা বা মাসয়ালার ব্যাপারে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে আলাপ করতেন এবং মতপার্থক্য সৃষ্টি হতো, তখন অবশেষে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর মতের ওপরই সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো।

হযরত কাসেম বিন মুহাম্মদের (র) বর্ণনা আছে যে, তিনি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর মজলিসে কখনো কোনো অপ্রয়োজনীয় কথা শুনেননি। তাঁর ফতওয়াই সুন্নাতে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বেশী সাদৃশ্য রাখতো।

"দায়েরায়ে মায়ারেফে ইসলামীয়া" গ্রন্থে আল্লামা মুহাম্মদ হুসাইনুজ জাহাবীর (র) একটি বর্ণনা উদ্বৃত করা হয়েছে। এ বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর জ্ঞান ও মর্যাদার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পাঁচটি কারণ ছিলো।

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্যে দোয়া করেছিলেন যে, হে আল্লাহ তাকে কিতাব এবং হিকমাতের জ্ঞান, দীনের সমঝ এবং কুরআন ব্যাখ্যার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দান করো।

২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারে তিনি প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন।

৩. তিনি বড় বড় সাহাবা রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের সাহচর্য লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন।

৪. মুখস্ত শক্তির সাথে অভিধান এবং আরবের সাহিত্যও তাঁর নখদর্পণে ছিলো (তিনি ওমর বিন রবিয়ার ১৮০টি কবিতা পংক্তি শুধু একবার শুনেই মুখস্ত করে নিয়েছিলেন)।

৫. তিনি ইজতিহাদের যোগ্যতা লাভ করেছিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু দীনি জ্ঞান ছাড়াও অন্যান্য প্রচলিত জ্ঞানেরও জ্ঞান সমুদ্র হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন সকল

জ্ঞানের আধার। কুরআন, তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ ও ফারায়েজের সাথে সাথে সাহিত্য, ভাষা, অভিধান, চরিত ও যুদ্ধের ইতিহাস, নসবনামা, কাব্য ও কবি এবং অংকে পারদর্শী ছিলেন। মুহাদ্দিসবৃন্দ ও নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা তাঁর কুরআন সম্পর্কিত পাণ্ডিত্যের অসংখ্য ঘটনা পেশ করেছেন। এ সকল ঘটনা থেকে জানা যায় যে, তিনি কুরআনে হাকিমের সব আয়াতের খুঁটিনাটি বিষয়েও সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল ছিলেন। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু যখন কুরআন মজীদের কোনো আয়াতের প্রশ্নে অনুসন্ধান-মূলক কোনো কিছু জানতে চাইতেন তখন সাহাবা কেরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুমকে সে ব্যাপারে প্রশ্ন করতেন। কিন্তু যখন তিনি সন্তোষজনক জবাব পেতেন না, তখন তিনি হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর স্মরণাপন্ন হতেন এবং তাঁর তাফসীরের ওপর আস্থা আনতেন। কুরআন মজীদের অপরিচিত বাক্য হৃদয়ঙ্গম করার জন্য তিনি প্রাচীন আরব কবিদের কাব্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেন। যদিও অন্যান্য সাহাবা রাদিয়াল্লাহ আনহুমও এ পদ্ধতি অবলম্বন করতেন, কিন্তু ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু এ ব্যাপারে বেশী প্রসিদ্ধ ছিলেন।

কুরআনে হাকীমের তাফসীর ও ব্যাখ্যার প্রশ্নে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর অসাধারণ পারদর্শীতা ছিলো। এ নৈপুণ্যতা এবং পারদর্শীতার ব্যাপারে সকল চরিতকারই ঐকমত্য পোষণ করেন। এমনিভাবে কুরআনের আয়াতের শানেনুযুল এবং নাসেখ ও মানসুখের বিদ্যায় তিনি গভীর পাণ্ডিত্য রাখতেন। এ বিদ্যাতেও সমকালীন যুগে তাঁর সমকক্ষ খুব কম সাহাবীই ছিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে তাফসীরের একটি কিতাব সংশ্লিষ্ট করা হয়। এ কিতাবের নাম "তানবিরুল মিকবাস মিন তাফসীর ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু।" এ তাফসীরকে "আল কামুসুল মুহিত" গ্রন্থের সংকলনকারী আবু তাহের মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব ফিরোজাবাদী (৮১৭ হিজরীতে মৃত্যু) একত্রিত করেছেন। মিসরে তা কয়েকবার প্রকাশিত হয়েছে।

হাদীসের ব্যাপারেও ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর ব্যাপক অনুসন্ধিৎসা ছিলো। রিসালাত যুগে তিনি অল্প বয়স্ক ছিলেন। তবে তাঁর মুখস্ত শক্তি ছিলো অসাধারণ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে যাকিছু শুনতেন তা মুখস্ত করে ফেলতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর তিনি বড় বড় সাহাবা রাদিয়াল্লাহ আনহুমের সাহচর্য গ্রহণ করেন এবং তাঁদের হাদীস শোনা ও তা মুখস্ত করার বিশেষ ব্যবস্থা নেন। তিনি সবসময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকতেন।

যখনই খবর পেতেন যে, অমুক ব্যক্তির কাছে কোনো হাদীস আছে, তাহলে নিজেই তার কাছে যেতেন এবং তা সংগ্রহ করতেন।

হযরত আবু সালমাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বলতেন, যার ব্যাপারেই আমি শুনতাম যে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো হাদীস শুনেছে তাহলে আমি স্বয়ং তার বাড়ীতে গিয়ে তা হাসিল করতাম। প্রকৃতপক্ষে আমি চাইলে বর্ণনাকারীকে নিজের কাছে ডেকে পাঠাতে পারতাম।

হযরত আবু রাফে রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোলাম ছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু কাতিব বা লিখককে সাথে নিয়ে তাঁর কাছে যেতেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৈনন্দিন তৎপরতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। যে তথ্য তাঁর কাছে পেতেন তা লিখককে দিয়ে লিখিয়ে নিতেন। এ অনুসন্ধানের কারণে তিনি হাজার হাজার হাদীস মুখস্ত করে ফেলেছিলেন। কিন্তু তিনি হাদীস বর্ণনায় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। এমনকি এক যুগ এমনও এসেছিলো যে, তিনি হাদীস বর্ণনা পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, যখন থেকে মানুষ রসনা তৃপ্তির জন্যে হাদীস বর্ণনা শুরু করে তখন থেকে আমি হাদীস বর্ণনা করা ছেড়েই দিই। এত সতর্কতা সত্ত্বেও তিনি দু' হাজার ছ' শত ষাটটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদীস বর্ণনাকারীদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত। বেশী হাদীস বর্ণনাকারীর মধ্যে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর পর তাঁর নামই এসে থাকে। তাঁর হাদীস বর্ণনাকারী এবং শিষ্যের সংখ্যা হাজার পর্যন্ত ছিলো। কতিপয়ের নাম ঃ

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত মিসওয়ার বিন মাখরামাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত আবু আবুত তোফায়েল রাদিয়াল্লাহ আনহু, ভাই হযরত কাসির বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু, পুত্র মুহাম্মদ (র) বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু, পুত্র আলী (র) বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু, নাতি মুহাম্মদ (র) বিন আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু, ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল্লাহ (র) বিন ওবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত সাঈদ (র) বিন মুসাইয়িব রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত আবু সালমাহ (র) বিন আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত কাসিম (র) বিন মুহাম্মদ, হযরত আতা (র), হযরত সাঈদ (র) বিন জাবির, হযরত আকরামাহ (র), হযরত তাউস (র), হযরত সোলায়মান বিন ইয়াসার (র), হযরত আমীরুশ শাবী (র), হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি মালিকাহ (র), হযরত আমর বিন মায়মুন (র), হযরত নাফে বিন জাবির (র), হযরত মুহাম্মদ বিন সিরিন (র), হযরত ইয়াজিদ বিন আসাম (র), হযরত

মুজাহিদ (র), হযরত আবুল আলিয়া (র), হযরত আমর বিন দিনার (র), হযরত আম্মার বিন আবি আম্মার (র), হযরত ইয়াহিয়া বিন ইয়ামার (র), হযরত আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদ (র), হযরত কুরাইব (র) ও হযরত আবু রাজা আতারদী (র)।

ফিকাহ এবং ইজতিহাদে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর অত্যন্ত উঁচু স্থান ছিলো। হাফেজ ইবনে হাজার (র) "তাহজীবুত তাহজীবে" লিখেছেন, ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ বিন মূসা (র) (খলিফা মামুনুর রশীদের প্রপৌত্র) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর ফতওয়াসমূহ ২০ খণ্ডে একত্রিত করেছেন।" এ থেকে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর দীনের সমঝ ও জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই আন্দাজ করা যায়। ইবনে আসির (র) বর্ণনা করেছেন, "তিনি ফারায়েজ এবং অংকেও প্রসিদ্ধ ছিলেন।"

কবিতা এবং কাব্যেরও তিনি যোদ্ধা ছিলেন। অনেক সুন্দর কবিতা রচনা করতেন। ইবনে রাশিক (র) "কিতাবুল উমদাতে" তাঁর কতিপয় কবিতা নমুনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি ভাষাবিদ ছিলেন। জাহেলী যুগের কবিদের হাজার হাজার ভালো কবিতা তাঁর নখদর্পণে ছিলো। ভাষা, অভিধান এবং বংশনামার ওপরও তিনি গভীর জ্ঞান রাখতেন। মোটকথা তিনি সকল ধরনের জ্ঞানের এক প্রতিষ্ঠান বা আধার ছিলেন। কথা ছিলো সুমিষ্ট। কথাবার্তায় ছিলেন অত্যন্ত মার্জিত রুচিসম্পন্ন। তাঁর বক্তৃতা ছিলো অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। শাকীক তাবেয়ী (র) বর্ণনা করেছেন, একবার ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু হজ্জের সময় ভাষণ দিলেন। এ ভাষণে সূরা আন নূরের তাফসীর এমনভাবে পেশ করলেন যা আমি কোনোদিন শুনিওনি এবং দেখিওনি। ভাষণটি যদি রোম এবং পারস্যবাসীরা শুনতো তাহলে সেখানকার কোনো বস্তুকেই ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রাখা যেতো না। ইবনে আবি শাইবার (র) বর্ণনায় আরো খানিক এগিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি বললো, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর সুন্দর ও মিষ্টি বর্ণনায় আমি তাঁর মাথা চুম্বন করতে চাইতাম।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু ছিলেন জ্ঞানের ভাণ্ডার। কিন্তু তিনি এ জ্ঞান ভাণ্ডার নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং সমগ্র জীবন তা খোদার সৃষ্টির মধ্যে বিতরণ করে গেছেন। তাঁর শিক্ষার পরিসর ছিলো ব্যাপক। হাজার হাজার ছাত্র তাঁর শিক্ষায় সমৃদ্ধ হয়েছেন। "মুসতাদরাকে হাকিমে" আবু সালেহ (র) তাবেয়ী থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর গৃহের সামনে বিরাট ভীড় দেখলেন।

ভীড়ও এমন ভীড় যাতে মানুষের যাতায়াতের পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। তিনি এ ভীড়ের খবর ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুকে দিলেন। খবর পেয়ে তিনি অযুর পানি চাইলেন। অযুর পর আমাকে বললেন, কুরআনে কারীমের তাফসীর অথবা তার গূঢ় অর্থ সম্পর্কে যারা জানতে চায় তাদেরকে ভেতরে ডেকে আনো। আমি তাদেরকে ডাকলাম। মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র ঘর এবং পার্শ্ববর্তী কামরা পূর্ণ হয়ে গেলো। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু এক এক করে প্রত্যেকের প্রশ্নের জবাব দিলেন এবং প্রত্যেককে খুশী করে বিদায় করলেন। এরপর তিনি আমাকে বললেন, ফিকাহ, হাদীস এবং হারাম-হালাল সম্পর্কে যারা জানতে চায় তাদেরকে ডাকো। আমি তাদেরকে ডাকলাম। তাদের আগমনেও ঘর ভরে গেলো। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদেরকে সন্তোষজনক জবাব দিয়ে বিদায় দিলেন। অতপর বললেন, এখন ফারায়েজ প্রভৃতি বিষয়ে যারা জানতে চায় তাদেরকে ডাকো। তাদের ভীড়েও ঘরে তিল ধারণের স্থান রইলো না। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদের প্রশ্নের এবং সমস্যার সমাধান করলেন। সর্বশেষ আরবী ভাষা, সাহিত্য, কাব্য এবং ভাষা সম্পর্কিত প্রশ্নকারীদের ডেকে পাঠালেন। তাদের সংখ্যাধিক্যের অবস্থাও একই ধরনের ছিলো। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদের প্রশ্নাবলীরও জবাব দিলেন এবং সন্তুষ্ট করলেন। আবু সালেহ (র) বলেন, আমি কোনো ব্যক্তির এতবড় মজলিশ কখনো দেখিনি।

ইবনে আসির (র) বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি জ্ঞানের কোনো শাখা সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুকে জিজ্ঞেস করতেন, তাহলে তিনি তার জবাব অবশ্যই পেতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু কোনো কোনো সময় জ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনার জন্যে দিন নির্দিষ্ট করে দিতেন। কোনোদিন তাফসীর সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন। কোনোদিন হাদীস এবং ফিকাহ। কোনোদিন কুরআনের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত বিষয়ে আলোকপাত করতেন। কোনোদিন আরবের কাহিনী বর্ণনা করতেন এবং কোনোদিন যুদ্ধ সংক্রান্ত ঘটনাবলী শুনাতেন। কোনোদিন ভাষা এবং সাহিত্য সম্পর্কে বর্ণনা দিতেন। কোনোদিন কবি এবং কাব্যের মজলিশ সুশোভিত করতেন। কোনোদিন নসবনামা বা বংশ তালিকার ফিরিস্তি তুলে ধরতেন। মোটকথা তাঁর মজলিশ ছিলো জ্ঞানের সাগর সদৃশ।

পাঠদান ছাড়াও তিনি কখনও কখনও নামাযের পর খুতবার মাধ্যমেও মানুষকে শিক্ষা দিতেন। সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ বিন শাকিক (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু আসরের নামাযের পর আমাদের সামনে ভাষণ শুরু করলেন। ইত্যবসরে সূর্য ডুবে

গেলো এবং তারা ঝলমলিয়ে উঠলো। মানুষ উচ্চস্বরে নামাযের কথা বলতে লাগলো। বনু তামিমের এক ব্যক্তি অব্যাহতভাবে নামাযের জন্যে চেঁচানো শুরু করলো। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু তার ওপর ক্রোধান্বিত হলেন। তিনি তার দিকে ঘুরে দেখলেন এবং বললেন, তোমার মায়ের মৃত্যু হোক। তুমি আমাকে সুন্নাতের তালিম দিচ্ছো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি কখনও কখনও জোহর, আসর এবং মাগরিব ও এশার নামায এক সাথে পড়তেন।

বর্ণনাকারী (আবদুল্লাহ বিন শাকিক) বলেন, এ কথায় আমার অন্তরে খটকা লাগতে লাগলো। আমি হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর কথার সত্যতা স্বীকার করলেন এবং বললেন তিনি যা কিছু বলেছেন তা সঠিক।

এক স্থানে অবস্থান ছাড়া সফরেও হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে মানুষ অবগাহন করতো। মক্কা মুকাররমার বাইরে অবস্থান করলে এবং হজ্জের সময় মক্কায় এলে জ্ঞান পিপাসু ছাত্ররা তাঁকে ঘিরে ধরতো এবং জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করতো।

মক্কায় স্থায়ীভাবে বসবাসের সময় মদীনা মুনাওয়ারা গমন করলে সেখানকার বাসগৃহও জ্ঞান পিপাসুদের দ্বারা পূর্ণ থাকতো। বসরা, কুফা, দামেস্ক, তায়েফ যেখানেই যেতেন সেখানেই মানুষ তাঁর জ্ঞান সমুদ্র থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য ঘিরে ধরতো।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, ইসলাম বিজয়ের পরিধি যখন বিস্তৃত হলো তখন ভিন্ন ভাষী লোকজনও মাসয়ালা তাহকীক করা অথবা জ্ঞান অর্জনের জন্যে ইবনে আব্বাসের খিদমতে হাজির হওয়া শুরু করলো। তিনি তাদের সুবিধার্থে কতিপয় ভাষ্যকার নিয়োগ করলেন। এসব ভাষ্যকার একদিকে যেমনি আরবী জানতেন তেমনি অপরদিকে তাদের ভাষাও জানতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু তাকদীরের মত নাজুক ও সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করাকে খুবই অপসন্দ করতেন। কেননা স্বয়ং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের তর্ক-বিতর্ক নিষেধ করেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত ছিলো যে, তাকদীরের ওপর ঈমান আনা প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য ফরয। এ প্রশ্নে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় টেনে বের করায় পথ ভ্রষ্টতা বা গোমরাহীর পথ খুলে যায়। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে বর্ণিত আছে, একবার হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু খবর পেলেন যে, জনৈক ব্যক্তি তাকদীর অস্বীকার করে থাকে। সে যুগে তিনি অন্ধ হয়ে

গিয়েছিলেন। এ সত্ত্বেও তিনি বললেন, আমাকে সেই ব্যক্তির কাছে নিয়ে চলো। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, আপনি তার কাছে গিয়ে কি করবেন ? তিনি বললেন, যদি হয় তাহলে তার নাক কেটে ফেলবো। আর যদি গর্দানে হাত পড়ে যায়, তাহলে তা উড়িয়ে দেবো। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, "আমি বনু ফাহরের মহিলাদেরকে কা'বা তাওয়াফ করতে দেখেছি এবং তাদের সবাই শিরক পূর্ণ কাজে ব্যাপৃত রয়েছে।" তাকদীরের অস্বীকৃতি এ উম্মতের শিরকে ব্যাপৃত হওয়ার প্রথম আলামত। স্রষ্টার কসম ! যাঁর হাতে আমার জীবন রয়েছে, এ ধরনের মানুষের ফেতনা-ফাসাদ এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং যেভাবে তারা তাকদীরের অমঙ্গল বা মন্দের অস্বীকৃতি জানিয়েছে, তেমনি তার খোদার মঙ্গলের তাকদীরেরও অস্বীকারকারী হয়ে যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত শরীফ ও বিনয়ী স্বভাবের মানুষ ছিলেন। মর্যাদাবান ও গুণীদেরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। বসরার গভর্নর থাকাকালে হযরত আবু আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর কাছে তাশরীফ আনলেন এবং নিজের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করলেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু অন্তর খুলে তাঁকে সাহায্য করলেন। কেননা হিজরতের পর তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেযবান ছিলেন। হাফেজ জাহাবী (র) বলেছেন, তিনি ৪০ হাজার দিরহাম এবং ২০জন খাদেম ছাড়াও ঘরে যত আসবাবপত্র ছিলো তা তাঁকে সোপর্দ করে দিলেন।

–(সিয়রে আ'লামুন নাবলা)

অপর এক রাওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, হযরত আবু আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহ আনহু বসরা গমন করলেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর সামনে ঘরের সবকিছু এনে রাখলেন এবং বললেন, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থানের জন্যে নিজের ঘর যেভাবে খালি করে দিয়েছিলেন, আমিও আপনার জন্যে নিজের ঘর খালি করে দিতে চাই। অতপর তিনি নিজের পরিবার-পরিজনকে অন্য ঘরে স্থানান্তর করলেন এবং ঘর ও ঘরের সকল আসবাবপত্র হযরত আবু আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহ আনহুকে দিয়ে দিলেন।–(সিয়রে আনসার প্রথম খণ্ড)

একবার হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন সাবেত আনসারী সওয়ার হলেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু শিষ্টাচার ও আদব হিসেবে তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরলেন। হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন সাবেত বললেন ঃ

"হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচার পুত্র ! এ ধরনের করবেন না। এ করা ঠিক নয়।" হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, "জ্ঞানী ও আলেমদেরকে আমাদের এ ধরনের আদব ও সম্মান করা প্রয়োজন।" (হযরত যায়েদ বিন সাবেত রাদিয়াল্লাহ আনহু বড় আলেম, অহীর লেখক এবং হাবারুল উম্মতের খিতাবে মশহুর ছিলেন)।

হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন সাবেত তাঁর হস্ত চুম্বন করলেন এবং বললেন ঃ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহলে বাইয়াতকে এ ধরনের শ্রদ্ধা প্রদর্শন আমারও উচিত।"–(মুসতাদরাকে হাকেম)

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর একবার হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু একজন আনসারী সাহাবীকে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকাল হয়ে গেছে। তাঁর সাহাবী এখনও আমাদের মধ্যে বর্তমান রয়েছেন। চলো তাঁদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করি। আনসারী সাহাবা রাদিয়াল্লাহ আনহুম বললেন, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু ! আমি তোমার ব্যাপারে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়ি। তুমি জানো মানুষ তোমার জ্ঞানেরই মুখাপেক্ষী। অথচ তুমি অন্যের কাছে যেতে চাও ?

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু একথা শুনে সেই সাহাবীকে ছেড়ে দিলেন। অতপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে একাকী গমনের নিয়ম বানিয়ে দিলেন। তিনি যখনই শুনতেন যে, অমুক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস শুনেছেন, তখনই তিনি তাঁর কাছে গমন করতেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু তার দরজায় নক করতেন। তিনি ঘর থেকে বের হলে তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন, আপনি কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে কোনো হাদীস শুনেছেন ? তিনি বলতেন, হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচার পুত্র ! আপনি এখানে আগমনের কষ্ট কেন স্বীকার করেছেন ? অন্য কাউকে পাঠিয়ে দিতেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বলতেন, না এটা আমার দায়িত্ব।

এ উদ্দেশ্যে তিনি সেসব সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে নির্দ্বিধায় চলে যেতেন, যাদের মর্যাদা তাঁর থেকে বেশী ছিলো না। এসব সাহাবী ইঙ্গিত বা নির্দেশ পেলে দৌড়ে তাঁর কাছে পৌঁছে যেতেন।

হাদীস ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্যেও অন্যদের কাছে গমনে তিনি লজ্জা অনুভব করতেন না। হযরত আবু কায়েস সারমাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি আনাস আনসারী মদীনার একজন অত্যন্ত উঁচু মর্যদার কবি ছিলেন এবং নৈতিকতা সম্পন্ন ভালো কবিতা লিখতেন। ইবনে আসির রাদিয়াল্লাহ আনহু "উসুদুল গাব্বাহ" গ্রন্থে লিখেছেন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর কাছে যেতেন এবং তাঁর কাছ থেকে কবিতা হাসিল করতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর প্রগাঢ় ভক্তি এবং ভালোবাসা ছিলো। রিসালাতকালে বেশীর ভাগ সময় তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পালন করতেন এবং অনেক সময় তাঁর নির্দেশ ছাড়াই এমন কাজ করতেন যাতে তিনি খুশী হয়ে যেতেন ও তাঁর জন্যে দোয়া করতেন। এ ধরনের কতিপয় ঘটনার কথা ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পরও তাঁর প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা একইভাবে বজায় ছিলো। মুসনাদে আহমদে (র) হযরত সাঈদ (র) বিন জুবায়ের থেকে বর্ণিত আছে, একবার হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, "পাঞ্জ শোম্বাহর দিন, কোনো পাঞ্জ শোম্বাহ" এতটুকুন বলেই তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং অপ্রতিরোধ্যভাবে রোদন করলেন। তাঁর অশ্রুতে মাটিতে পড়ে থাকা পাথর গলে গেলো। রোদন থামলে এবং একটু প্রকৃতিস্থ হলে উপস্থিত আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু ! পাঞ্জ শোম্বার দিনের এমনকি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো ? তিনি বললেন, সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছিলো।

হাদীস বর্ণনাকালে অত্যন্ত সতর্ক থাকতেন। যাতে কোনো ভুল রাওয়ায়েত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সংশ্লিষ্ট না হয়ে যায়। এ ধরনের সামান্যতম সন্দেহের উদ্রেক হলেই তিনি তা বর্ণনা করতেন না। একবার জানতে পেলেন যে, কতিপয় মানুষ ভুল কথা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সংশ্লিষ্ট করছে। তিনি বললেন, তোমরা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন একথা বলতে আযাব নাযিলের অথবা মাটি বিভক্ত হয়ে যাবে এবং তোমরা তাতে সেঁধিয়ে যাওয়ার ভয়ে ভীত হও না !

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এত সমীহ করতেন যে, ফতওয়া দানকালে তাঁর নাম মুখে উচ্চারণ করতেন না। তাঁকে সংশ্লিষ্ট করার দায়িত্ব যাতে নিতে না হয় সে জন্যেই তিনি এ ধরনের করতেন।

মুসনাদে দারেমীতে বর্ণিত আছে, যখন তিনি জানতে পেলেন যে, কিছু মানুষ মিথ্যে হাদীস বর্ণনা শুরু করেছেন তখন তিনি হাদীস বর্ণনাই পরিত্যাগ করলেন।

উম্মুহাতুল মু'মিনীনকেও সীমাহীন শ্রদ্ধা করতেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত মাইমুনাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর খালা ছিলেন। তাঁর কাছে প্রায়ই যেতেন। তাঁর কাছে হাদীস শুনতেন। তিনি কোনো নির্দেশ দিলে তা পালন করতেন। হযরত মাইমুনাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু ৫১ হিজরীতে ওফাত পান। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুই তাঁর নামাযে জানাযা পড়ান এবং লাশ কবরে নামান। সহীহ আল বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, যখন তাঁর লাশ দাফনের জন্যে কাঁধে উঠানো হলো তখন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, ইনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন সঙ্গিনী ছিলেন। লাশকে বেশী নাড়িও না, আদবের সাথে আস্তে আস্তে নিয়ে চলো।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহ আনহাকে সবসময় সম্মান ও সমীহ করতেন। তবে বিভিন্ন কারণে তিনি একবার তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহা কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু এ খবর পেলেন। খবর প্রাপ্তির সাথে সাথে তিনি তাঁর গৃহে পৌছলেন এবং ভেতরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। উম্মুল মু'মিনীন প্রথমত অনুমতি প্রদানে চিন্তা-ভাবনা করলেন। কিন্তু যখন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন ঃ

"আম্মা ! আপনার ভাগ্যবান পুত্র আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু আপনাকে সালাম এবং আপনার খিদমতে হাজির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। তাঁকে অনুমতি দিন।" এ সময় উম্মুল মু'মিনীন বললেন, "ভালো কথা, তুমি চাইলে তাকে ডেকে আনো।"

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু ভেতরে এসে সালাম করলেন। উম্মুল মু'মিনীনের কাছে এসে বসে পড়লেন এবং বললেন, "আপনার প্রতি সুসংবাদ।"

উম্মুল মু'মিনীন রাদিয়াল্লাহ আনহাও জবাবে এ উত্তম বাক্যই বললেন। অতপর হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু আরজ করলেন ঃ

"এখন আপনার ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ও অন্যান্য (মরহুম) আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সেই পর্দাই বিরাজিত, যা শরীর এবং আত্মার মধ্যে বাধা সৃষ্টি করে। এ বাধা অপসারিত হতেই তাঁদের সবার সাথে আপনার সাক্ষাত হবে।"

এরপর তিনি উম্মুল মু'মিনীন রাদিয়াল্লাহ আনহার ফযিলত বর্ণনা শুরু করলেন এবং বললেন ঃ

"আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয়তম পত্নী ছিলেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র বস্তুকেই ভালোবাসতেন।"

এভাবে তিনি উম্মুল মু'মিনীন রাদিয়াল্লাহ আনহাকে আখিরাতের সফরের প্রতি প্রথমে রাজি করালেন।

সাইয়েদেনা হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু আমাদের ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ। তাঁর থেকে ফযিলত ও বরকতের প্রস্রবণের যে ধারা শুরু হয়েছিলো তা আজও প্রবাহিত হয়ে চলেছে। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের সামর্থ অনুযায়ী এ প্রস্রবণ থেকে অবগাহিত হতে পারে।

হযরত আবু হুরাইরা দাওসী রাদিয়াল্লাহ আনহু

উম্মার মহান আলেম হযরত যায়েদ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেছেন, একদিন আমি মসজিদে নববীতে দোয়া এবং আল্লাহর জিকিরে মশগুল ছিলাম। আমার সাথে আরও দু' ব্যক্তি আল্লাহর জিকির করছিলেন। তাদের মধ্যে একজন ইয়েমেনের দাওস গোত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ আনলেন। আমরা চুপ হয়ে গেলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নিজেদের কাজ চালিয়ে যাও। এ নির্দেশের পর আমি এবং অন্য ব্যক্তি দাওসী যুবকের সামনে উচ্চস্বরে দোয়া করতে লাগলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের প্রত্যেক বাক্যের শেষে আমীন উচ্চারণ করছিলেন। আমাদের দোয়া শেষ হলে দাওসী যুবক হাত উঠালেন এবং আল্লাহর দরবারে এই আরজ পেশ করলেন ঃ "হে আল্লাহ ! আমার সাথী আগে যাকিছু প্রার্থনা করেছে তা আমাকেও দান করো। এছাড়া এমন জ্ঞান দান করো যা কখনও ভুলে যাবো না।" একথা বলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমীন বললেন। এরপর আমি এবং আমার অন্য সাথী আরজ করলাম ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আমরাও এমন জ্ঞান চাই যা কখনও ভুলে যাবো না।"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "তাতো ঐ দাওসী যুবকের অংশে এসেছে।"

দাওস গোত্রের এ ভাগ্যবান যুবক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ মতো খোদার তরফ থেকে কখনো ভুলে না যাওয়ার জ্ঞান বিশেষভাবে যাকে প্রদত্ত হয়েছিলো—তিনি ছিলেন হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু।

সাইয়েদেনা হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু সেই সব বুযর্গ সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন, যাঁরা স্বদেশ থেকে মদীনা আগমনের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত থাকাকে সমগ্র বিশ্বের মান-ইজ্জতের চেয়েও অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন এবং নবুয়াতের প্রস্রবণ থেকে এমনভাবে অবগাহিত হয়েছিলেন যে, নিজেই জ্ঞানের সাগর হয়ে গিয়েছিলেন। এমন সাগর যা থেকে আল্লাহর লাখ লাখ বান্দাহ নিজের জ্ঞান পিপাসা মিটিয়েছেন।

হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু উম্মার সেই সাত স্তম্ভ তালিকার প্রথম দিকে স্থান পেয়েছিলেন যাদের কাছ থেকে সহস্রাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা পাঁচ হাজার তিন শ' চুয়াত্তর (৫৩৭৪)। অন্যদিকে আরো ৬জন বুযর্গ বেশী সংখ্যায় হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের নাম এবং বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা নীচে দেয়া হলো ঃ

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু-২,২৬০, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহা-২,২১০, হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু-১,৬৩০, হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ আনসারী রাদিয়াল্লাহ আনহু-১,৫৪০, হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মালিক আনসারী-১,২৮৬, ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহ আনহু-১,১৭০।

একবার কতিপয় লোক হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর সামনে অভিযোগ উত্থাপন করে বললো যে, আপনি বেশী হাদীস বর্ণনা করেন। প্রকৃতপক্ষে মুহাজির এবং আনসাররা এসব হাদীস বর্ণনা করেননি। এর জবাবে তিনি বললেন ঃ

"আমার মুহাজির ভাইয়েরা ব্যবসা-বাণিজ্য এবং আনসার ভাইয়েরা কৃষি কাজে ব্যস্ত থাকতেন। আর আমি ক্ষুণ্নি বৃত্তি নিবারণের জন্যে সবসময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির থাকতাম। এ কারণে যখন তারা চলে যেতেন তখন আমি তাঁর খিদমতে উপস্থিত থাকতাম। আমি ছুফফার ফকির দলের একজন ছিলাম। যখন এ সকল লোক ভুলে যেতেন তখন আমি স্মরণ করে নিতাম।"-(সহীহ আল বুখারী)

প্রথম প্রথম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু কিছু ইরশাদ হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিস্মৃত হতেন। ব্যাপারটি তাঁর কাছে অত্যন্ত দুঃখজনক ছিলো। একদিন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আপনার কিছু কিছু ইরশাদ ভুলে যাই।"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "চাদর প্রসারিত করো।"

তিনি চাদর প্রসারিত করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাতে নিজের পবিত্র হাত রাখলেন। অতপর বললেন, একে বুকের সাথে লাগাও। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু হুকুম পালন করলেন। তিনি নিজে বলেছেন, এ ঘটনার পর তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো ইরশাদ আর কখনো ভুলেননি।"–(সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল ইলম)

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর বংশীয় নাম ছিলো আবদি শামস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন মত অনুযায়ী তাঁর ইসলামী নাম দিয়েছিলেন আবদুর রহমান অথবা উমায়ের। কিন্তু ইতিহাসে তিনি নিজের পদবীযুক্ত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু নামে খ্যাত হয়েছিলেন। দাওস গোত্রের (ইজদ-এর একটি শাখা) সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিলো। গোত্রটি ইয়েমেনে বসবাস করতো। তাঁর বংশনামা নিম্নরূপ ঃ

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু আবদুর রহমান (উমায়ের) বিন আমের বিন আবদি জিশশারা বিন তোরায়েফ বিন গিয়াস বিন হানিয়াহ বিন সায়াদ বিন ছা'লাবাহ বিন সালিম বিন গানাম বিন দাওস।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের পদবীর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, আমি একটি বিড়াল (হিররাহ) পালন করতাম। রাতে তাকে একটি গাছের ওপর রেখে দিতাম এবং সকালে যখন বকরী চরাতে যেতাম তখন বিড়ালটি সাথে নিয়ে যেতাম ও তার সাথে খেলতাম। বিড়ালের সাথে অসাধারণ সম্পর্ক দেখে মানুষেরা আমাকে আবু হুরাইরা বলা শুরু করে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, একবার হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যে, আপনার এ পদবী কে দিয়েছিলেন। জবাবে তিনি বললেন, একবার আমি একটি বিড়াল পেলাম। আমি বিড়ালটিকে আস্তিনের মধ্যে নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম। সেই সময় হতে আমাকে আবু হুরাইরা বলা শুরু হয়।

সহীহ আল বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে "আবুহার" অথবা "আবু হুরাইরা" বলে ডাকতেন।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু শৈশবকালেই পিতৃ স্নেহ থেকে বঞ্চিত হন এবং অত্যন্ত দারিদ্রতার মধ্যে লালিত-পালিত হন। প্রতিদিন তিনি বাড়ীর বকরী জঙ্গলে নিয়ে যেতেন এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত চরাতেন। ধীরে ধীরে তাঁর অবস্থার পরিবর্তন হতে লাগলো। এক পর্যায়ে তিনি একটি গোলাম রাখার যোগ্য হয়ে গেলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার অবস্থার কথা খুবই কমই জানা

যায়। তবে, তিনি সেই যুগে লেখাপড়া শিখে ছিলেন এবং কবিতাও লিখতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির পর দাওস গোত্রের এক ভাগ্যবান নেতা তোফায়েল রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আমর মক্কা গমন করেন এবং সেখানে ইসলাম গ্রহণ করে দেশে ফিরেন। তিনি দেশে ফিরে নিজের সম্প্রদায়ের কাছে ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু চার ব্যক্তি ছাড়া কেউ তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়নি। এ চার ব্যক্তি ছিলেন ঃ হযরত তোফায়েলের পিতা, মাতা, পত্নী এবং হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু। কয়েক মাস দিনরাত প্রচেষ্টার পরও যখন দাওস গোত্রের অন্যান্য ব্যক্তি ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হলো না তখন হযরত তোফায়েল রাদিয়াল্লাহ আনহু ভগ্ন হৃদয়ে পুনরায় মক্কা গমন করলেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন ঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আমার সম্প্রদায় অত্যন্ত বক্র। আমি অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু তারা হক দাওয়াত কবুল করতে আগ্রহ দেখায়নি। আপনি এ বদবখত সম্প্রদায়ের জন্য বদদোয়া করুন।"

রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদদোয়ার পরিবর্তে দোয়া করলেন ঃ

"হে আল্লাহ ! দাওস গোত্রকে হেদায়াত দান করো।"

অতপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত তোফায়েল রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ফিরে গিয়ে তাবলিগ অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিলেন। এবার হযরত তোফায়েল রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের গোত্রের কাছে ফিরে গিয়ে তাবলীগ শুরু করলেন। তাঁর কথা মানুষেরা অত্যন্ত যত্নের সাথে শুনতে লাগলো এবং আস্তে আস্তে ইসলামের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠলো। অতপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দোয়ার এত প্রভাব হলো যে, কয়েক বছরের মধ্যেই দাওস গোত্রের অনেক পরিবার ইসলাম গ্রহণ করলেন। এ যুগে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা তাশরীফ আনেন এবং বদর, ওহোদ ও খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সপ্তম হিজরীর প্রথম দিকে হযরত তোফায়েল রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের গোত্রের ৮০জনকে সাথে নিয়ে মদীনায় পৌছেন। এ কাফেলায় হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুও নিজের মাতাসহ শরীক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই সময় খাইবার যুদ্ধে গমন করেছিলেন এবং সেখানেই অবস্থান করছিলেন। হযরত তোফায়েল রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু ও কাফেলার অন্যান্য পুরুষদের সাথে নিয়ে

মদীনা থেকে খাইবার পৌছেন। পথিমধ্যে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে এ কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

ইয়া লাইলাতা মিন তাওলিহা ওয়া আনাইহা/আলা আন্নাহা মিন দারিল কুফরি নাজাতি।

(রাতের দীর্ঘত্ব ও কষ্ট কতইনা খারাপ, তবুও তিনি আমাকে দারুল কুফর থেকে মুক্তি দিয়েছেন।)

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু স্বদেশ ত্যাগের সময় একজন গোলামকেও সাথে নিয়েছিলেন। রাস্তায় সেই গোলাম হারিয়ে যায়। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু খাইবার পৌছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিদার এবং বাইয়াত হলেন। এ সময় হঠাৎ করে তাঁর গোলামও সেখানে উপস্থিত হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আবু হুরাইরা ! তোমার গোলাম এসে গেছে।"

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু আরজ করলেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর রাস্তায় আমি তাকে আযাদ করে দিলাম।"

বাইয়াত গ্রহণের পর হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্য এমনভাবে অবলম্বন করলেন যে, মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর কাছেই থেকে যান। হাফেজ ইবনে কাসির "আল বিদায়া ওয়ান নেহায়া" গ্রন্থে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর মুখে এ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন ঃ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাইবার তাশরীফ নিয়েছিলেন। আমি সে যুগে মদীনা এসেছিলাম। সাবা' রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আরফাতার গিফারীর ইমামতিতে ফযরের নামায পড়লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে মদীনায় নিজের নায়েব হিসেবে রেখে গিয়েছিলেন। সাবা' প্রথম রাকায়াতে সূরা মারইয়াম এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে ওয়াইলুললিল মুতাফফিফিন পড়লেন। আমি মনে মনে বললাম, "অমুক ব্যক্তির সর্বনাশ হোক ! সে দু' পাল্লা বানিয়ে রেখেছে। এক পাল্লা দিয়ে কম মেপে অন্যকে দেয় এবং অন্য পাল্লা দিয়ে মানুষের কাছ থেকে বেশী নেয়।"

ফযরের নামাযের পর হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু খাইবার রওয়ানা হয়ে গেলেন। সেখানে পৌছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হলেন। নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা বললেন এবং তাঁর সামনে নিজের খাবার রেখে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনন্দ চিত্তে তা গ্রহণ করলেন। এরপর তিনি অন্যান্য দাওসী মুহাজিরদের সাথে খাইবারের যুদ্ধে অংশ নিলেন। আল্লামা ইবনে সায়াদ (র)

বর্ণনা করেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওসী মুজাহিদদেরকে খাইবার আক্রমণকারী বাহিনীর ডানদিকে মোতায়েন করলেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাইবারের যুদ্ধ শেষে মদীনা ফিরে গেলেন। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুও তাঁর সাথে ফিরলেন এবং মদীনায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন।

মদীনা মুনাওয়ারা ফিরে আসার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত কাল পর্যন্ত (৭ হিজরী-১১ হিজরী) হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু জীবনের সবকিছু হাসিল করেন। এ যুগের বেশীর ভাগ সময় তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যে কাটান। একদিকে দারিদ্রের কারণে অন্যদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফয়েজ বেশী বেশী লাভের আশায় তিনি আসহাবে সুফফা রাদিয়াল্লাহ আনহুর পবিত্র জামায়াতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। সফর হোক বা মুকিম, একাকীত্ব হোক বা মানুষের ভীড়, রাত হোক বা দিন, হজ্জ হোক বা যুদ্ধ হোক তিনি সবসময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যে থাকার চেষ্টা করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্দর অবয়ব দর্শনে নিজের চক্ষু উজ্জ্বল করা এবং নবুয়াতের জ্ঞানের প্রস্রবণ অবগাহন করাই তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে বর্ণিত আছে, একবার তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আপনার সুন্দর চেহারা দর্শন আমার অন্তরের প্রশান্তি এবং চক্ষুর শীতলতা আনে।"

উম্মাহর ফকীহ হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বলতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবু হুরাইরাই রাদিয়াল্লাহ আনহু আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী উপস্থিত থাকতেন।

একবার হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে কোনো এক ব্যক্তি বললেন ঃ "আবু মুহাম্মাদ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এরশাসমূহ এ ইয়েমেনীই (আবু হুরাইরা) বেশী জানে, না আপনারা বেশী জানেন, তা আমরা জানি না।" হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন ঃ

"এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে এমন অনেক কথা শুনেছেন যা আমরা শুনিনি। তার কারণ হলো, আমরা ঘর-বাড়ী, পরিবার-পরিজন ও সম্পদশালী ছিলাম। এসব দেখা শুনার পর সকাল-সন্ধায় যে সময় পেতাম সেই সময়ে আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কাটাতাম।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু মিসকীন ছিলেন। তিনি ধন-সম্পদ এবং বিবি-বাচ্চার ঝঞ্ঝাট মুক্ত ছিলেন। এজন্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতের ওপর হাত রেখে তাঁর সাথে সাথে থাকতেন। ফলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বেশী বেশী ইরশাদ শোনার সুযোগ তাঁর হয়েছিলো। আমাদের মধ্যে কেউই তাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করেননি যে, তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে না শুনেই হাদীস বর্ণনা করেছেন।"

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এত সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন যে, অন্যান্য সাহাবী যেখানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে ইতস্ততঃ করতেন সেখানে তিনি তা নির্দ্বিধায় জিজ্ঞেস করতেন।

"মুসতাদরাকে হাকিমে" হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রশ্ন করার ব্যাপারে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত নির্ভিক ছিলেন। সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এমন প্রশ্ন করতো যা আমরা পারতাম না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস বর্ণনার আগ্রহের কথার স্বীকৃতি দিয়েছেন। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "ইয়া রাসূলুল্লাহ ! কিয়ামতের দিন কোন্ ভাগ্যবান আপনার সুপারিশের বেশী যোগ্য হবে ?"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "হাদীসের প্রতি তোমার লোভ দেখে প্রথম থেকেই আমার ধারণা ছিলো যে, এ প্রশ্ন তোমার আগে আর কেউ করবে না।"

দিনরাত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যের ফায়েজ থেকে উপকৃত হওয়ার কারণ তিনি বিপুল পরিমাণে হাদীস নিজের অন্তরে সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এজন্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ "আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু জ্ঞানের আধার।"–(সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল ইলম)

জ্ঞান অর্জনের অসীম উৎসাহ হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে জীবিকা অর্জনের চিন্তা বিমুক্ত করে রেখেছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের খিদমতে প্রতিটি মুহূর্ত উপস্থিত থাকার ফলে তিনি দারিদ্র ও বুভুক্ষার মুসিবত বরদাশত করেন। এক নাগাড়ে কয়েকদিন ভুখা থাকতেন। ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করতেন। এ সত্ত্বেও তিনি জীবিকার জন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্য ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। জ্ঞান অর্জনের জন্যে ভুখা নাঙ্গা থাকার কষ্ট স্বীকার করা এবং দারিদ্র ও বুভুক্ষার জীবন গ্রহণ করা সহজ কাজ নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে এ কাজ সম্ভবও নয়। কিন্তু হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুই এ কাজ করতে পেরেছিলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জনের প্রশ্নটি দুনিয়ার প্রতিটি বস্তুর ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

হাফেজ ইবনে হাজার (র) "আল ইসাবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, "একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গনিমাতের সম্পদ এলো। তিনি স্নেহ করে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমিও কি কিছু পাওয়ার আশা করো ?"

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করাই আমার একমাত্র সাধ। সম্পদ আমার কোন্ কাজে আসবে।"

ইবনে সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহু "তাবকাতে" হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর এ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন ঃ

"যখনই পেটে কিছু পড়তো, তখনই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হতাম। এ কারণেই কোনো সময় মিহি আটার রুটি খাইনি। ভালো পোশাক পরিনি। কোনো দাস-দাসীও ভাগ্যে জোটেনি। (কেননা এসব কিছু আয়ের ওপর নির্ভরশীল) যখন ক্ষুধা লাগতো তখন কাউকে কুরআনের কোনো আয়াত পাঠ এবং তার তাফসীর বর্ণনার অনুরোধ করতাম। প্রকৃতপক্ষে সে আয়াত আমি জানতাম। উদ্দেশ্য থাকতো এভাবে সে ব্যক্তি আমাকে সাথে নিয়ে যাবে এবং খানা খাইয়ে দেবেন। আমি সে ৭০ আসহাবে সুফফাহার অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যাদের কারোরই গায়ের চাদর পর্যন্ত ছিলো না। শুধু ধারীদার কাপড় অথবা কম্বল ছিলো। তারা তা গলায় জড়িয়ে নিতো। যখন ক্ষুধার তাড়নায় ছটফট করতো তখন ঘর থেকে বেরিয়ে মসজিদে এসে উপস্থিত হতো।"

হাফেজ জাহাবী (র) "সিয়রে আ'লামুন নুবলা" গ্রন্থে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর দারিদ্র সম্পর্কে এক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। একবার কয়েক দিন পর্যন্ত তাঁর ভাগ্যে খাবার জুটলো না। ক্ষুধায় অস্থির হয়ে বাইরে বেরুলেন

এবং কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে সড়কের ওপর প্রায় সটান হয়ে পড়লেন। ইত্যবসরে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু সে পথে যাচ্ছিলেন। মনে চাইলো যে, তিনি তাঁকে বলেন, "ক্ষুধায় অস্থির আছি, কিছু খাওয়ান।" কিন্তু সাহস হলো না, অবশ্য কুরআনে করীমের একটি আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞেস করলাম। এ আয়াতে গরীব-মিসকীনদের সাহায্যের তাকীদ দেয়া হয়েছে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু সেই আয়াতের মর্মার্থ বলে চলে গেলেন। তারপর হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু এলেন। তিনিও একই ধরনের করলেন। এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন ঘটলো। তিনি তাঁর চেহারা দেখেই অনুমান করলেন যে, চরম ক্ষুধায় কাতর রয়েছে। তিনি তাঁকে সাথে করে বাড়ী নিয়ে গেলেন। সেখানে দুধে পরিপূর্ণ এক বড় পাত্র ছিলো। উপঢৌকন স্বরূপ তা কেউ পাঠিয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বললেন, যাও সকল আহলে সুফফাহকে ডেকে আনো। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পালন করলেন। অতপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সেই দুধ সবাইকে দিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি তাই করলেন এবং প্রত্যেকেই আসুদাহ হয়ে পান করলেন। অবশিষ্টটুকু তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে পেশ করলেন। তিনি বললেন, এটুকু তুমি পান করো। তিনি পান করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতপর বললেন, পান করো। তিনি আবার পান করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে বারবার বলতে লাগলেন, পান করো। আর তিনি পান করতে লাগলেন। অবশেষে তিনি আরজ করলেন, সেই সত্বার শপথ যিনি হকসহ আপনাকে প্রেরণ করেছেন ; আমার পেটে আর জায়গা নেই। অতপর বাকী দুধ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিলেন এবং স্বয়ং তা পান করলেন।

নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু সম্পর্কে এ ধরনের আরো অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। নিসন্দেহে একথা বলা যায় যে, সক্ষম সাহাবীরা হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং অন্যান্য আসহাবে সুফফাহর খোঁজ খবর নিতেন। সর্বোপরি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের ব্যাপারে খেয়াল রাখতেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা ছিলো যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ক্ষুধার তাড়না থেকে রেহাই পেতেন না। তাঁর কাছে কখনো খাবার থাকতো। আবার কখনো থাকতো না। যখন থাকতো সবাইকে বন্টন করে দিতেন। যখন থাকতো না তখন হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর মত জ্ঞান পিপাসুরা অবশ্যই কষ্ট ভোগ করতেন।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু হিজরতের সময় নিজের আম্মাকেও সাথে নিয়ে এসেছিলেন। বিভিন্ন রাওয়ায়েত অনুসারে তাঁর নাম ছিলো মাইমুনাহ অথবা উমাইমাহ। যৌবনকালেই তিনি বিধবা হয়েছিলেন। অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টে তিনি হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে লালন-পালন করেন। এজন্যে তিনি তাঁর মায়ের প্রতি অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। দুঃখজনক ঘটনা হলো, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু মদীনা আসার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আম্মা মদীনা আসার পরও নিজের বাপ-দাদার ধর্মের ওপর কায়েম ছিলেন। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু মায়ের শিরকের কারণে অন্তরে অন্তরে খুব কষ্ট পেতেন। যখনই আম্মাকে তাওহীদের দাওয়াত দিতেন তখনই তিনি তা প্রত্যাখ্যান করতেন। একদিন তিনি ইসলামের দাওয়াতের জবাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে একদম অযাচিত বাক্য ব্যবহার করে বসলেন। এতে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত মনোকষ্ট পেলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হলেন এবং ঘটনা বলে আরজ করলেন ঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার আম্মার জন্যে দোয়া করুন। যাতে আল্লাহ পাক তাঁকে হক কবুলের তাওফিক দেন।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৎক্ষণাৎ দোয়া করলেন ঃ হে খোদা ! আবু হুরাইরার মাকে হেদায়াত দিন।"

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু খুশী চিত্তে বাড়ী ফিরে গেলেন। গিয়ে দেখলেন কপাট বন্ধ এবং মা গোসল করছেন। গোসল শেষে দরযা খুললেন এবং বললেন ঃ

হে পুত্র ! সাক্ষী থেকো যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর সত্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনলাম।"

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন এবং আনন্দাশ্রু ফেলতে ফেলতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আপনার প্রতি সুসংবাদ। আপনার দোয়া কবুল হয়েছে। আল্লাহ আমার মাকে হেদায়াত দিয়েছেন।" হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খবর শুনে খুশী হলেন।

এখন হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! দোয়া করুন, আল্লাহ যেন সব মু'মিনের অন্তরে আমার এবং আমার আম্মার জন্যে মুহাব্বত সৃষ্টি করে দেন।"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করলেন।

এ দোয়ার আসর হলো। স্বয়ং হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেছেন, যে মু'মিন ব্যক্তি তাদের ব্যাপারে শুনতেন তিনিই তাদেরকে ভালোবাসতেন।-(আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, হাফিজ ইবনে কাসির)

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের আম্মাকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। যখন তিনি ঘরে আসতেন তখন বলতেন ঃ "আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া আমতাহ ওয়া রাহমাতুল্লাহু ওয়া বারাকাতুহু।"

তিনি জবাবে বলতেন ঃ "ওয়া আলাইকাসসালাম ইয়া বুনাইয়া ওয়া রাহমাতুল্লাহু ওয়া বারাকাতুহু।"

অতপর হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বলতেন, "আল্লাহ তাআলা আপনার ওপর সেই ধরনের রহমত বর্ষণ করুন যেভাবে আপনি শৈশবকালে আমার ওপর রহম করেছিলেন এবং আমাকে লালন-পালন করেছিলেন।"

তিনি জবাব দিতেন, "হে পুত্র ! তুমি জওয়ান হয়ে আমাকে যেভাবে খিদমত করেছো তেমনি যেন আল্লাহ পাক তোমার ওপর রহমত বর্ষণ করেন।"

মাতার সাথে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর কি ধরনের বিশেষ সম্পর্ক ছিলো তা এ ঘটনা থেকেই অনুমান করা যায়। একবার তিনি কয়েকজন আসহাবে সুফফাহর সাথীসহ ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ "এখন কিভাবে এলে ?"

তিনি আরজ করলেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ ! ক্ষুধায় টেনে নিয়ে এসেছে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি খেজুরের কাঁধি আনলেন এবং প্রত্যেককে দু'টি করে খেজুর প্রদান করে বললেন ঃ "এ খেজুর দু'টি খাও এবং তারপর পানি পান করো। এ দু'টি খেজুরই আজকের জন্য তোমাদের যথেষ্ট হবে। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু একটি খেজুর খেলেন এবং অপরটি রেখে দিলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু খেজুর কেনো রেখে দিলে ?" তিনি বললেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মায়ের জন্যে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি এ খেজুর খেয়ে নাও। তোমার মায়ের জন্যও আমি দু'টি খেজুর দিবো।" তিনি নির্দেশ পালন

করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মায়ের খিদমতে পেশ করার জন্যে তাঁকে আরো দু'টি খেজুর প্রদান করলেন।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু আজীবন মায়ের খিদমত করেছেন এবং জীবিত অবস্থায় তাঁর একাকীত্বের ভয়ে হজ্জ আদায়ের জন্যেও যাননি।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে একজন দরবেশ ছাত্রই ছিলেন না। বরং একজন মুজাহিদও ছিলেন। খাইবারের যুদ্ধের পর তিনি মক্কা বিজয়, হুনাইন এবং তাবুকের যুদ্ধেও বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহযাত্রী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

কিছু কিছু সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বিশেষ কোনো অভিযানের দায়িত্বও অর্পণ করেছিলেন। মুসনাদে আহমদে হযরত সুলাইমান বিন ইয়াসার রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর মুখ দিয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এক বাহিনীর সাথে প্রেরণ করলেন এবং কুরাইশের দু'জনের নাম নিয়ে (ইসলামের দুশমন) বললেন, তাদেরকে পেলে আগুন দিয়ে পুড়ে দিও। কিন্তু আমরা যখন যাত্রা শুরু করলাম তখন বললেন, আমি তোমাদেরকে অমুক অমুককে জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু আগুনের শাস্তি প্রদান একমাত্র আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট। যদি তাদেরকে পাও তাহলে না পুড়িয়ে তরবারী দিয়ে হত্যা করো।"

সুনানে ইবনে মাযাতেও বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো একবার এক বিশেষ অভিযানে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে প্রেরণ করেন। যখন তিনি রওয়ানা দিচ্ছিলেন তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং তাঁকে বিদায় জানান এবং বলেন, আমি তোমাকে খোদার আমানতে সমর্পণ করছি। তাঁর আমানত কখনো নষ্ট হয় না।

নবম হিজরীতে তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনশ' মুসলমানের এক কাফেলা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর ইমারতে হজ্জের জন্যে মক্কা প্রেরণ করেন। তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুকে এ কাফেলার নকিব এবং হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি ওয়াক্কাস, হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ আনসারী রাদিয়াল্লাহ আনহু ও হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে আহ্বানকারী এবং মুয়াল্লিম নিয়োগ করেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের (১১ হিজরী) পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় সমগ্র আরবে ধর্মদ্রোহিতার আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু নজীরবিহীন হিম্মত এবং আস্থার সাথে এ ফেতনার বিরুদ্ধে জিহাদ করেন ও কয়েক মাসের মধ্যে তা উৎখাত করেন। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু সিদ্দিকে আকবার রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে একাত্ম হয়ে ধর্মদ্রোহিতার বিরুদ্ধে পরিচালিত জিহাদে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে স্বয়ং তার থেকে বর্ণিত আছে ঃ

"যখন ধর্মদ্রোহিতার ফেতনা শুরু হলো তখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বললেন, আপনি ধর্মদ্রোহী বা মুরতাদদের সাথে লড়াই করতে চান। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একথা শুনেছি। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ফরমালেন, আমি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবো না এবং যে ব্যক্তি এর মধ্যে পার্থক্য করবে আমি তার বিরুদ্ধে লড়াই করবো। বস্তুত আমরা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর নেতৃত্বে মুরতাদদের (যাকাত অস্বীকারকারী) বিরুদ্ধে জিহাদ করলাম এবং তাতে মঙ্গল পেলাম।"

হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের খিলাফাতকালে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বাহরাইনের গভর্নর নিযুক্ত করলেন। এর পূর্বে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবদুল্লাহ হাজরামীর সাথে বাহরাইন গিয়েছিলেন এবং সেখানকার মানুষকে দীনি হুকুম-আহকাম ও মাসয়ালা-মাসায়েল শিক্ষা দিয়েছিলেন। গভর্নর নিযুক্ত হওয়ার কারণে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর ক্ষুধা ও দারিদ্রের যুগ সমাপ্ত হয়।

হাফেজ ইবনে হাজার (র) আল ইসাবাহ গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বাহরাইন থেকে ফিরে এলেন। এ সময় তাঁর কাছে দশ হাজার দিরহাম বা দিনার ছিলো। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের গভর্নরদের ওপর কড়া দৃষ্টি রাখতেন। তিনি যখন জানলেন তখন হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এতো অর্থ কোথায় পেলে ? তিনি বললেন, আমার কয়েকটি মাদী ঘোড়া ছিলো তাদের বাচ্চা হয়েছিলো। কিছু গোলামদের আয় ছিলো এবং কিছু অর্থ পর্যায়ক্রমিক-ভাবে আমি জমিয়েছিলাম। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করালেন এবং হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বাহরাইনের

আমীর বানিয়ে পুনরায় প্রেরণ করতে চাইলেন। কিন্তু তিনি এ পদ গ্রহণে আপত্তি করলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, তুমি ইমারতের পদ গ্রহণ পসন্দ করছো না। অথচ ইউসুফ আলাইহিস সালাম এ পদের জন্য আকাংখা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি তোমার চেয়ে উত্তমও ছিলেন।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু আরজ করলেন, "আমীরুল মু'মিনীন। ইউসুফ আলাইহিস সালাম নবীর পুত্র নবী ছিলেন। আর আমি বেচারা হলাম উমাইয়ার পুত্র। আমি পাঁচটি জিনিসে ভয় পাই। এ কারণেই ইমারতের পদে সমাসীন হওয়াকে অপসন্দ করি। সেই পাঁচটি জিনিস হলো ঃ জ্ঞান ছাড়া কিছু বলা, শরয়ী দলীল ছাড়া কোনো ফায়সালা করা, আমাকে প্রহার করা, আমাকে অসম্মান করা এবং আমার সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া।"

হাফেজ জাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহু 'সিয়ারে আলামুন নুবলা' গ্রন্থে ভিন্ন ধরনের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু চার লাখ দিনার অথবা দিরহাম বাহরাইন থাকাকালে জমা করে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কারো ওপর যুলুম করোনিতো ? হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, "না"। অতপর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রশ্ন করলেন, "তুমি নিজের জন্য সেখান থেকে কি এনেছো ?" তিনি বললেন, "বিশ হাজার।" হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু জিজ্ঞেস করলেন, এ সম্পদ তুমি কেমন করে হাসিল করেছ ? তিনি জবাব দিলেন। ব্যবসার মাধ্যমে।" আমীরুল মু'মিনীন বললেন, "নিজের মূল পুঁজি রেখে দাও এবং অবশিষ্ট অর্থ বাইতুল মালে জমা দাও।"

ইবনে আসাকির (র) 'তারিখে দামেশকে' লিখেছেন, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু ইয়ারমুকের যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন।

হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকালে ইয়ারমুকের যুদ্ধ অত্যন্ত রক্তাক্ত যুদ্ধ হিসেবে পরিগণিত। এ যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ে সিরিয়ার খৃষ্টানদের ভাগ্যের প্রায় ফায়সালা হয়ে গিয়েছিলো। এ সংঘর্ষে কয়েকবার রোমীয়রা মুসলমানদের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছিলো। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং তাঁর মত অন্যান্য বাহাদুররা যদি এ যুদ্ধে সে চাপ রুখে না দাঁড়াতেন তাহলে মুসলমানরা পরাজিত হতেন। এ ধরনেরই এক হামলার সময় রোম পক্ষ মুসলমানদের ওপর প্রচণ্ড বেগে আপতিত হলো। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর গোত্র ইজদ অটল থেকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সেই হামলা প্রতিহত করলো। হযরত জুন্দুব রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আমর ইজদি নিজের পতাকা ক্ষিপ্রতার সাথে উড়িয়ে উচ্চস্বরে বললেন ঃ

"হে ইজদ কাওম ! তোমাদের মধ্যে কেউই চিরকাল বেঁচে থাকবে না। তোমরা যদি পুরো দৃঢ়তার সাথে দুশমনের বিরুদ্ধে মুকাবিলা না করো, তাহলে মান-ইজ্জত নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না। কান খুলে শোন, মৃত্যুবরণ-কারীদের জন্য জিল্লতী অবধারিত।"

এ সময় হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু অগ্রসর হলেন এবং নিজের গোত্রকে আহ্বান জানিয়ে বললেন ঃ

"হে বাহাদুররা ! বেহেশতের হুররা তোমাদের প্রতীক্ষায় রয়েছে। তাদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে নিজেদের শহীদ করে নাও। আল্লাহর সান্নিধ্য এবং সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে কোমর বাঁধ। তোমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছো সেই স্থান ছাড়া আল্লাহর কাছে নেকীর বেশী পসন্দনীয় স্থান আর নেই।"

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর আহ্বানে ইজদ গোত্রের বাহাদুররা তাঁর চারপাশে একত্রিত হলো এবং সবাই মিলে এমন প্রচণ্ড জবাবী হামলা চালালো যে, রোমীয়দের ব্যূহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো। একথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, দাওস গোত্র ইজদেরই একটি শাখা। এজন্যে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে দাওসী অথবা ইজদী যাই বলা হোক না কেন তাতে কিছু এসে যায় না।

চরিতকাররা ব্যাখ্যা না করলেও কার্যকরণ থেকে জানা যায় যে, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু সিরিয়ার আরও কয়েকটি যুদ্ধে বাহাদুরী প্রদর্শন করেছিলেন।

ইবনে আসির (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর খিলাফতের শেষ পর্যায়ে আজারবাইজানে সৈন্য প্রেরণ করা হয়। এ সময় হযরত আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন রবিয়াহ তুর্কীদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হন। এ সৈন্য বাহিনীতে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুও শরীক ছিলেন। কিন্তু এ অভিযান সমাপ্ত না হতেই হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু শহীদ হন এবং হযরত ওসমান জুন্নুরাইন খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর খিলাফতকালে হযরত আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন রবিয়াহ বালনজরের ওপর হামলা করেন। এ যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। শাহাদাতের পর তাঁর ভাই সালমান বিন রবিয়াহ (র) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর সাথে বালনজর থেকে জিলান হয়ে জারজান গমন করেন এবং এসব শহর পদানত করার জন্য সংঘটিত সংঘর্ষসমূহে জীবন পণ লড়াই করেন।

হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাসনামলের প্রথমার্ধে পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহে সংঘটিত যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণের পর হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ

আনহু মদীনা মুনাওয়ারাতে ফিরে আসেন এবং নীরবে হাদীস প্রচারের কাজে ব্যাপৃত হন। যখন হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহ আনহুর বিরুদ্ধে হৈ চৈ শুরু হলো এবং বিদ্রোহীরা তাঁর গৃহ অবরোধ করলো তখন হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত উৎসাহের সাথে জনগণকে আমীরুল মু'মিনীনের সাহায্য-সহযোগিতার ব্যাপারে প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছিলেন।

হাফিজ ইবনে হাজার (র) এবং হাফিজ ইবনে কাসির (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু সেই সকল সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুকে রক্ষার জন্য এসেছিলেন এবং তাঁর গৃহে উপস্থিত ছিলেন। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন ঃ

"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি, তোমরা আমার পর ফেতনা এবং মতবিরোধে লিপ্ত হবে। মানুষেরা জিজ্ঞেস করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এ ফেতনার যুগে আমাদেরকে কি করতে হবে। তিনি বললেন, তোমাদেরকে আমানতদার ও তার সহযোগীদের সাথে থাকতে হবে।"

একথায় হযরত ওসমান জুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুর প্রতিই ইঙ্গিত ছিলো।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত শরীফ মানুষ ছিলেন। তিনি এ নাজুক সময়েও নিজের সমর্থকদেরকে তলোয়ার উঠানোর অনুমতি দেননি। এ সত্বেও ইবনে সায়াদ (র) ও ইবনে আসিরের (র) বর্ণনা মতে আমীরুল মু'মিনিনের কতিপয় সমর্থক বিদ্রোহীদেরকে পিছ পা করার জন্যে তরবারী ব্যবহার করেই ছেড়েছিলো। তাঁদের মধ্যে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুও ছিলেন। কিন্তু বিধি লিপি কে খণ্ডাতে পারে ! কতিপয় বিদ্রোহী পেছনের দিক থেকে প্রাচীর টপকিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো এবং বয়সের ভারে নুব্জ আমীরুল মু'মিনীনকে কুরআন তেলাওয়াতরত অবস্থায় অত্যন্ত নৃশংসভাবে শহীদ করে ফেললো। এ লোমহর্ষক ঘটনায় হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু খুবই দুঃখ পেলেন এবং তিনি সম্পূর্ণ নির্জনত্ব অবলম্বন করলেন। হযরত আলী কাররামুল্লাহ ওয়াজহাহুর খিলাফতকালে সংঘটিত যুদ্ধসমূহে (উষ্ট্র ও সিফফিনের যুদ্ধ) তিনি সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করলেন। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আমার পরে অনেক ফেতনা সৃষ্টি হবে। এ ফেতনায় বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি অপেক্ষা অনেক উত্তম এবং দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি চলাচলকারীর থেকে শ্রেষ্ঠ। যারা এ ফেতনাসমূহের প্রতি

আকৃষ্ট হবে, ফেতনাও তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। কেউ যদি এ ফেতনাসমূহ থেকে বাঁচার স্থান পায়, তাহলে সে যেন সেখানে আশ্রয় নেয়।

–(মুসনাদে আহমদ)

কতিপয় রাওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকালে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু কোনো কোনো সময় মদীনাবাসীদেরকে নামায পড়িয়েছেন।

৪০ হিজরীতে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু শহীদ হন এবং হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহ আনহু খিলাফতের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি কয়েক মাস পর আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর পক্ষে খিলাফত ছেড়ে দেন। এ সময় হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর আনুগত্য বা বাইয়াত হন। আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু বিভিন্ন প্রদেশে গভর্নর নিয়োগ করেন। তিনি মারওয়ান ইবনুল হাকামকে মদীনার গভর্নর নিযুক্ত করলেন। তিনি যখন মদীনার বাইরে যেতেন তখন হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে নিজের স্থলাভিষিক্ত বা ভারপ্রাপ্ত নিয়োগ করতেন।

তাবারী (র) বর্ণনা করেছেন, মারওয়ান নিজের ইমারতকালে ৪৪ এবং ৫৫ হিজরীতে দু'বার হজ্জের জন্যে মক্কা মুয়াজ্জামা গিয়েছিলেন। এ সময় সে এক অথবা দু'বারই হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে মদীনা মুনওয়ারাতে নিজের স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন।

ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বল (র) এবং হাফিজ জাহাবী (র) ভিন্ন ধরনের কথা বলেছেন। তাঁরা বলেন, মদীনার গভর্নর মারওয়ানের ওপর যখন আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু অসন্তুষ্ট হতেন তখন তাকে বরখাস্ত করতেন এবং তার স্থলে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে গভর্নর নিযুক্ত করতেন। আবার যখন হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওপর নারাজ হতেন তখন তার স্থানে মারওয়ানকে মদীনার গভর্নর বানিয়ে দিতেন।

–(মুসনাদে আহমদ এবং সিয়রে আ'লামুননুবলা)

যাহোক, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু কয়েকবার অবশ্যই মদীনার ইমারতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

–(আমীরে মুয়াবিয়ার খিলাফতকাল দ্রষ্টব্য)

৫৮ হিজরীতে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। এমনকি বাঁচার আর আশা রইলো না। মানুষ সেবা-শুশ্রূষার জন্যে আসতো। এ অবস্থাতেও তিনি ন্যায় কাজের নির্দেশ এবং অন্যায় কাজ

থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়ার দায়িত্ব পালন করতেন। দুনিয়া সম্পর্কে অন্তর বিতৃষ্ণায় ভরে গিয়েছিলো। হযরত আবু সালমাহ (র) বিন আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ আনহু শুশ্রূষার জন্যে এলেন এবং তাঁর সুস্থতার জন্যে দোয়া করলেন। তখন তিনি বললেন ঃ

"হে আল্লাহ ! আমাকে আর দুনিয়াতে রেখো না।" দু'বার তিনি একথা দোহরালেন। অতপর হযরত আবু সালমাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ

"আবু সালমাহ সেই সত্বার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন রয়েছে। সেদিন আর সুদূর নয় যখন মানুষ মৃত্যুকে লাল স্বর্ণের খনির চেয়েও বেশী প্রিয় মনে করবে। তুমি জীবিত থাকলে দেখবে যখন মানুষ কোনো মুসলমানের কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে তখন আকাংখা প্রকাশ করে বলবে, হায় ! তার পরিবর্তে আমাকে যদি এ কবরে দাফন করা হতো।"

মৃত্যু যন্ত্রণায় একদিন কাঁদতে লাগলেন। লোকজন এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন ঃ

"দুনিয়ার চাকচিক্য থেকে বিদায় নেয়ার জন্যে কাঁদছি না। আমি কাঁদছি অন্য কারণে। সফর দীর্ঘ। অথচ সেই সফরের কোনো পুঁজি বা সম্বল নেই। আমি এখন বেহেশত ও দোযখের চরাই উতরাইয়ে আছি। জানি না কোন্ রাস্তায় যেতে হয়।"

মারওয়ান ইবনুল হাকাম শুশ্রূষার জন্যে এলো এবং তাঁর সুস্থতার জন্যে দোয়া করলো।

তিনি বললেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার দিদার বা সাক্ষাত চাই। তুমিও আমার সাক্ষাত পসন্দ করো।"

যখন শেষ সময় এলো তখন ওসিয়ত করলেন ঃ

"আমার কবরের ওপর তাঁবু টাংগিয়ো না। জানাযার পেছনে আগুন নিয়ে যেও না এবং তাড়াতাড়ি জানাযাহ নিয়ে যেও। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, যখন মু'মিনকে লাশ বহনকারী খাটিয়ার ওপর রাখা হয় তখন সে বলে যে, আমাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে যাও। আর যখন কাফের এবং ফাজেরকে খাটিয়ার ওপর রাখা হয়, তখন সে বলে আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছো।"

এরপর তিনি আল্লাহর দরবারে হাজির হলেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো ৭৮ বছর। এক রাওয়ায়েতে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর

মৃত্যু সন ৫৭ হিজরী বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ওয়াকেদী (র), আবু ওবায়েদ (র) এবং অন্যান্য চরিতকারের মতে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহ আনহার নামাযে জানাযা পড়িয়েছিলেন এবং তিনি ৫৮ হিজরীতে ওফাত পেয়েছিলেন। এ মতের আলোকে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওফাতের তারিখ ৫৮ হিজরীর রমযানে মানতে হয়। হাফিজ ইবনে কাসির (র) এবং হাফেজ ইবনে হাজরের (র) মতে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওফাতের সাল হলো ৫৯ হিজরী।

তৎকালীন মদীনার আমীর ওলিদ বিন উতবাহ হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর জানাযার নামায পড়িয়েছিলেন। বড় বড় সাহাবীর মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহ আনহু জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু জানাযার অগ্রভাগে যাচ্ছিলেন এবং হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর মাগফিরাত কামনা করছিলেন। জানাযার নামাযের পর হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের পুত্ররা খাটিয়া কাঁধে নিয়ে জান্নাতুল বাকীতে পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং ইসলামের এ মহান ব্যক্তিত্বকে ফাখখে মুহাজিরিনে সমাধিস্থ করা হয়।

ইবনে সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেছেন, ওলিদ বিন উতবাহ আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুকে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর মৃত্যু সংবাদ প্রেরণ করলো। এ সংবাদ পেয়ে তিনি ওলিদকে লিখলেন, আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু উত্তরাধিকারদেরকে দশ হাজার দিরহাম দেবে এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। কেননা আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর সমর্থনকারীদের মধ্যে ছিলেন এবং অবরোধের সময় তাঁর গৃহে উপস্থিত ছিলেন।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু এক বিধবা স্ত্রী ও চার সন্তান রেখে যান। [তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর বিয়ে করেছিলেন] সন্তানদের মধ্যে ছিলো তিনজন পুত্র এবং একজন কন্যা। পুত্রদের নাম ছিলো আল মুহাররার, আবদুর রহমান এবং বেলাল। কন্যার নাম জানা যায়নি। অবশ্য এতটুকু জানা যায় যে, তাবেয়ী সরদার হযরত সাঈদ (র) মুসাইয়িব রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে তাঁর শাদী হয়েছিলো। বড় পুত্র আল মুহাররার (র) নিজের পিতা, হযরত ওমর ও হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হযরত ওমর বিন আবদুল আজীজের (র) খেলাফতকালে ওফাত পান।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু জ্ঞান ও ফযীলতের দিক দিয়ে অত্যন্ত উঁচু মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন। তিনি সৃষ্টির সেরা হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদসমূহের এতবড় ভাণ্ডার উম্মতকে উপহার দিয়েছেন যার ইহসান কখনো এ উম্মত ভুলে যেতে পারে না। তাঁর থেকে বর্ণিত ৫,৩৭৪টি হাদীসের মধ্যে ৩২৫টি ঐকমত্যের হাদীস। বুখারী ৭৯টিতে এবং মুসলিম ৯৩টিতে ভিন্নমত পোষণ করেন।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বহুসংখ্যক হাদীস সরাসরি বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও তিনি অনেক সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহ আনহা এবং মহান সাহাবীরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সেসব সাহাবী হলেন ঃ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত উবাই বিন কা'ব আনসারী, হযরত উসামাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন যায়েদ হিব্বুননবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত ফযল রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকেও উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহ আনহা ছাড়া হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহা, হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত আবু মূসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত আবু রাফে' রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত ওয়াসেলাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকা, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ আনসারী রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মালেক এবং হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন সাবিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও এক বিরাট সংখ্যক বড় বড় তাবেয়ী তাঁর থেকে হাদীস রাওয়ায়েত করেছেন। তাদের মধ্যে কতিপয়ের নাম হলো ঃ

সাঈদ (র) বিন মুসাইয়িব রাদিয়াল্লাহ আন, আবু ইদরিস খাওলানী (র), আবু ওসমান নাহদী (র), আবু জারয়া (র), আবু সালমাহ (র) বিন আবদুর রহমান (র), বিন আওফ, হাসান বসরী (র), মুহাম্মদ (র) বিন সিরিন, সুলাইমান বিন ইয়াসার (র), তাউস (র), মুজাহিদ (র), আতা (র), আমের শা'বী (র), আকরামাহ (র) উরওয়াহ (র), বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু, নাফে বিন জাবির (র), কাবিসাহ বিন জাবির (র), হাফস (র), বিন আসেম

(র), বিন ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু, আরাজ (র) এবং আমের (র) বিন সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি ওয়াক্কাস প্রমুখ।

ইমাম বুখারী (র) বলেছেন, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে হাদীস বর্ণনাকারীর সংখ্যা আটশ'রও বেশী। তাদের মধ্যে বড় বড় জলিলুল কদর সাহাবী ও তাবেয়ীও রয়েছেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বলতেন, আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু আমাদের সবার চেয়ে বেশী হাদীস জানতেন। হাফিজ ইবনে কাসির (র) 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থে লিখেছেন, একবার হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যে, আপনি নিজেও সাহাবী এবং আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে রাওয়ায়েত করে থাকেন। সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কেন রাওয়ায়েত করেন না ? জবাবে তিনি জানান, আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু যাকিছু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন, আমরা তা শুনতে পারিনি। যে হাদীস আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে শুনতে পারিনি তা তাঁর পরিবর্তে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণনা করা পসন্দ করি।

মদীনার গভর্নর মারওয়ান ইবনুল হাকাম হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর উচ্চমর্যাদার স্বীকৃতি দিতেন এবং তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু কোনো কোনো সময় রাগান্বিত হয়ে তাঁর সাথে কথা কাটাকাটিতে লেগে যেতেন। এর কারণও ছিলো। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু তার কোনো অন্যায় কাজ দেখলে নির্দ্বিধায় তাতে বাধা দিতেন। একবার কোনো কথায় মারওয়ান অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বললো ঃ

"লোকে বলে, আপনি অনেক বেশী হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের সামান্য কিছুদিন আগেই মদীনা এসেছিলেন।"

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন ঃ "আমি যখন মদীনায় আসি তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাইবার তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন। সে সময় আমার বয়স ৩০ বছরের কিছু বেশী ছিলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হওয়ার পর আমি তাঁর সাথে ছায়ার মতো থাকতাম। তাঁর সাথে আজওয়াজে মুতাহহিরাতের গৃহে যেতাম। তাঁর খিদমত করতাম। তাঁর সাথে যুদ্ধসমূহে অংশ নিতাম। হজ্জেও তাঁর সাথী হতাম। এজন্যে আমি অন্যান্যদের চেয়ে বেশী হাদীস জানি।

আল্লাহর কসম ! আমার পূর্বে যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যে এসেছিলেন তাঁরাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমার থাকার কথা স্বীকার করেছেন এবং আমার কাছ থেকে হাদীস জিজ্ঞেস করতেন। তাদের মধ্যে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।" তার এ জবাব শুনে মারওয়ান চুপ হয়ে গেলো।

ইমাম হাকিম (র) নিজের গ্রন্থ "মুসতাদরাকে" বর্ণনা করেছেন, একবার মারওয়ান হযরত আবু হুরাইরার পরীক্ষা নিতে চাইলো। সে একজন কাতিবকে গোপনে বসিয়ে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ডেকে বিশেষ বিষয়ের ওপর হাদীস জিজ্ঞেস শুরু করলো। তিনি বর্ণনা করে গেলেন এবং পর্দার আড়ালে থেকে কাতিব তা লিখে নিলেন। দ্বিতীয় বছর সে একই পদ্ধতিতে হাদীস জিজ্ঞেস করলো। এবারও তিনি কমবেশী সেভাবেই হাদীস বর্ণনা করলেন যেমন গত বছর করেছিলেন। এমনকি ধারাবাহিকতায়ও কোনো পার্থক্য হলো না।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বলতেন, আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস ছাড়া কোনো ব্যক্তিই আমার চেয়ে বেশী হাদীস জানে না। কেননা আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদসমূহ লিখে নিতেন। আর আমি লিখতাম না।-(সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল ইলম)

"মুসতাদরাকে হাকিমের" এক বর্ণনা মতে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুও হাদীস লিখতেন। এভাবে তিনি একটি কিতাব সংকলন করেন। হাদীস ব্যাখ্যাকারীরা এ দু' বর্ণনার মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যে, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর নিজের মুখস্তকৃত সকল হাদীস লিখে এক কিতাবে একত্রিত করেছিলেন।

মজার কথা হলো, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত আবদল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আসকে নিজের চেয়ে বেশী হাদীসের আলেম মনে করতেন। অথচ তাঁর থেকে মাত্র ৭ শত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু অধিক বর্ণনা করা সত্ত্বেও হাদীসের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর কলংক লেপন করে বা তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয় সে ব্যক্তি নিজেকে জাহান্নামের উপযুক্ত বানিয়ে নেয়। ইবনে আসাকির (র) বলেছেন, বাজার দিয়ে অতিক্রমের সময় হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু লোকদেরকে উদ্দেশ করে বলতেন, হে মানুষেরা ! যে ব্যক্তি আমাকে চিনে সেতো চিনেই, আর যে ব্যক্তি আমাকে চিনে না, সে যেনো চিনে নেয় যে, আমি আবু হুরাইরা। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি জেনেবুঝে আমার ওপর মিথ্যা অপবাদ দেয়, সে দোযখে নিজের ঘর বানিয়ে নেয়। আর এ ধরনের বলা তিনি সাধারণ নিয়ম বানিয়ে নিয়েছিলেন।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু শুধু হাদীসেরই আলেম ছিলেন না। তিনি ফিকাহ এবং ইজতিহাদেও পারদর্শী ছিলেন। তিনি মদীনার অন্যতম ফকিহ হিসেবে পরিগণিত ছিলেন। তিনি অন্যান্য ফকিহ সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুমের মতো ফতওয়াও দিতেন।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর মাতৃভাষা ছিলো আরবী। এছাড়া তিনি ফারসীও জানতেন। হাফিজ ইবনে হাজার (র) বলেছেন, তাওরাতের ব্যাপারেও তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ছিলো।

আল্লাহ পাক যে উদারতার সাথে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে জ্ঞান সম্পদ দান করেছিলেন, তিনিও জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত উদারতার সাথেই সে সম্পদকে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করে গেছেন। তিনি চলা-ফেরায়, উঠা-বসায় এবং যেখানেই কিছু মুসলমান পেতেন তাদের কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী পৌঁছে দিতেন। "মুসতাদরাকে হাকিমে" বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রতি জুমার নামাযের পূর্বে ইমাম হুজরা থেকে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত হাদীস বর্ণনা করতেন।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জ্ঞান অর্জন ও তা প্রসারের ইচ্ছা, রাসূল প্রেম, সুন্নাতের আনুগত্য, ইবাদাতের প্রতি নিষ্ঠা, হক কথন, সরলতা এবং উদারতা ছিলো সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক। তিনি জ্ঞান অর্জনের জন্যে যে ধরনের দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছেন এবং এ ব্যাপারে দিন ও রাতকে একাকার করে দিয়েছেন ইতিহাসের পাতায় তার উদাহরণ খুব কমই পাওয়া যায়। এরপরও সে জ্ঞানকে তিনি নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং আজীবন অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে তা প্রচার করেছেন।

বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এত অধিক অনুরক্ত ছিলেন যে, বেশীর ভাগ সময়ই তিনি তাঁর কাছে কাটাতেন। তাঁর সাথে অবস্থান এবং খিদমতকে জীবনের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য বলে মনে করতেন। যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় ছিলেন তাদেরকেও তিনি ভালোবাসতেন। একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সামনে নিজের নাতি হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহ আনহুকে কোলে বসিয়ে বললেন, "হে আল্লাহ ! আমি তাকে ভালোবাসি। তুমিও তাকে ভালোবাস এবং তাকে যারা ভালোবাসে তাদেরকেও ভালোবাস।" এরপর হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু যখনই হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহ আনহুকে দেখতেন তখনই স্নেহের আতিশয্যে তার চক্ষু মুদে আসতো।

"মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে" উল্লেখ আছ যে, একবার হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে সাক্ষাত করলেন এবং বললেন, শরীর থেকে একটু কাপড় সরান যাতে আমি সে স্থানে চুমু দিতে পারি যেখানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুমু দিতেন। তিনি কাপড় সরিয়ে দিলেন এবং হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর নাভিতে চুমু খেলেন।

প্রতিটি কাজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত ও আদর্শ অনুসরণ করতেন। ইবাদাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদাংক অনুসরণ করতেন এবং মুয়ামেলাতেও তিনি তাঁর নির্দেশ পুংখানু-পুংখরূপে পালন করতেন। সাথে সাথে তিনি তা জনগণকেও পালনের পরামর্শ দিতেন। কাউকে কোনো সুন্নাত বিরোধী কাজে লিপ্ত দেখলে তৎক্ষণাৎ তাকে বাধা দিতেন এবং সে প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন তা শুনিয়ে দিতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর উত্তম খাবার শুধু এজন্যই খেতেন না যে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো আসুদাহ হয়ে বা পেট পুরে খাবার খাননি। একবার তাঁর সামনে বকরীর ভুনা গোশত পরিবেশন করা হলো। তিনি তা না খেয়ে ক্ষমা চাইলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন। তিনি কখনো পেট পুরে যবের রুটিও খাননি।

ইবাদাত এবং জিকরে বিশেষ সম্পর্ক ছিলো। রাতে উঠে স্বয়ং ইবাদাত করতেন ও পরিবার-পরিজনদেরকেও রাত্রি জাগরণকারী বানিয়ে দিতেন। হাফিজ জাহাবী (র) "সিয়রে আলামুননুবলা" গ্রন্থে আবু ওসমান নাহদীর (র) একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তিনি সাত দিন হযরত

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুর মেহমান ছিলেন। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু, তাঁর পত্নী এবং তাদের গোলাম পালাক্রমে রাত জেগে ইবাদাত করতেন।

রমযানের রোযা ছাড়া প্রত্যেক মাসের শুরু ও শেষে নিয়মিত তিনটি রোযা রাখতেন। বেশীর ভাগ সময় তাসবীহ-তাহলিলে মশগুল থাকতেন। একটি থলিতে পাথর ও ফলের আটি ভরা থাকতো। তা দিয়ে তিনি তাসবীহ পড়তেন। যখন থলি নিঃশেষ হয়ে যেতো তখন পুনরায় ভরে নিতেন। প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত আকরামাহ (র) বলেন, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রতিদিন ১২ হাজার বার তাসবীহ পাঠ করতেন। কোনো কোনো সময় রাতে উচ্চস্বরে তাকবীর বলতেন। একদিন মাজারিব বিন জুজদা রাতে বাইরে বেরুলেন। তিনি হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর তাকবীর শুনলেন এবং কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন এ সময় আপনি কেন তাকবীর ধ্বনি দিচ্ছেন ? জবাবে বললেন, আল্লাহর শোকর আদায় করছি। এমন এক সময় ছিলো যখন আমি বসরাহ বিনতে গাজওয়ানের পেট ভাতায় চাকরী করতাম। এরপর এমন একদিন এলো যখন আল্লাহ পাক তাকে আমার স্ত্রী বানিয়ে দিলেন।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইবাদাতের রুকনসমূহ সম্পূর্ণরূপে আদায় করতেন এবং অন্যান্যদেরকেও এভাবে পালনের নির্দেশ দিতেন।

হক কথা বলতে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু কাউকেই পরোয়া করতেন না। একদিন তিনি মদীনায় আমীর মারওয়ান ইবনুল হাকাম নির্মিতব্য বাড়ীতে অংকিত ছবি দেখে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে শুনেছি, সে ব্যক্তি থেকে বড় যালেম কে আছে, যে আল্লাহর সৃষ্ট জীবের অনুরূপ জীব সৃষ্টি করে। সামান্য একটা পিঁপড়েই বানিয়ে দেখাও না। (দানা পরিমাণ খাদ্য অথবা যবই না হয় সৃষ্টি করে দেখাও)।

সহীহ মুসলিমে উল্লেখ আছে, মারওয়ানের ইমারাতকালে (খাদ্য খেজুর ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় প্রশ্নে) হুণ্ডির প্রচলন শুরু হয়েছিলো। ব্যাপারটি জানতে পেরে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু তৎক্ষণাৎ মারওয়ানের কাছে গেলেন এবং বললেন, তুমি সুদ হালাল করে দিয়েছো। সে বললো, আল্লাহ ক্ষমা করুন। এ কাজ আমি কি করে করতে পারি। তিনি বললেন, তুমি হুণ্ডির প্রচলন করেছো। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্রেতাকে খাদ্য দ্রব্য মেপে-জুকে না নেয়া পর্যন্ত তা বিক্রি নিষিদ্ধ করেছেন। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর এ ইরশাদ শুনে মারওয়ান হুণ্ডি ব্যবসা বাতিল ঘোষণা করেন।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর জীবনের প্রথম যুগ কঠিন দারিদ্রের যুগ ছিলো। দ্বিতীয় যুগ ছিলো সচ্ছলতার যুগ। প্রথম যুগে তিনি কঠিন মুসিবত ও দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছেন। কিন্তু সবর ও অল্পে তুষ্টি গুণে গুনান্বিত ছিলেন। খাওয়ার জন্যে যা পেতেন তাতেই তিনি তুষ্ট থাকতেন। যখন কিছুই পেতেন না তখন অভুক্ত থাকতেন অথবা রোযা রাখতেন। একদিন তাঁর কাছে ১৫টি খেজুর ছিলো। তিনি ৫টি দিয়ে ইফতার করলেন। পাঁচটি সাহরীর সময় খেলেন এবং অবশিষ্ট পাঁচটি ইফতারের জন্য রেখে দিলেন। তাঁর জামাতা হযরত সাঈদ (র) বিন মুসাইব থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বাড়ী আসতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন খাওয়ার কোনো কিছু আছে কি ? নেতিবাচক জবাব পেলে তিনি বলতেন, আমি রোযা রেখেছি। আল্লাহ পাক তাঁকে যখন সচ্ছলতা দিলেন তখন উত্তম রেশমের কাপড়ের উপর থু থু ফেলতেন। (অথবা ভিন্ন রাওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, কাতানের কাপড় পরে তা দিয়ে নাক সাফ করতেন) এবং বলতেন আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু আজ রেশমের কাপড়ের ওপর থু থু ফেলছে (অথবা কাতান দিয়ে নাক পরিস্কার করছে) এক যুগ এমন ছিলো যখন তুমি হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহ আনহা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিম্বরের মধ্যে মুর্ছা যেতে। এ সময় মানুষেরা তোমার ঘরে পা রেখে বলতো, আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু পাগল হয়ে গেছে। অথচ ক্ষুধার তাড়নায় তোমার এ অবস্থা হতো।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রকৃতিগতভাবেই অত্যন্ত সাদাসিদে ছিলেন। সচ্ছলতা আসার পরও তাঁর এ অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। মদীনার ইমারাতকালে তিনি এত সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন যে, যখন শহর থেকে বেরুতেন তখন গাধায় চড়ে বেরুতেন। গাধার পিঠে অত্যন্ত নিম্নমানের পালান থাকতো। খেজুর গাছের ছাল দিয়ে লাগাম বানানো হতো। অন্য কোনো সওয়ারী সে রাস্তায় এলে তার চালক হেসে বলতো রাস্তা ছেড়ে দাও। আমীরের সওয়ারী আসছে।

সে যুগেও স্বয়ং কাঠের বোঝা বয়ে বাড়ী নিয়ে যেতেন। একদিন কাঠের বোঝা মাথায় করে বাজার অতিক্রম করছিলেন। রাস্তায় ছা'লাবা বিন আবি মালেকুল কারজীর সাথে সাক্ষাত। তাকে বললেন, আবু মালেক তোমাদের আমীরের জন্যে রাস্তার ভীড় কমার জন্যে জায়গা করে দাও। তিনি বললেন, আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন। পথ তো অনেক দূর। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, তোমাদের আমীরের কাধে কাঠের বোঝা তাঁর জন্যে পথ প্রশস্ত করো।–(তাবকাতে ইবনে সায়াদ)

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু পরকাল ভীতিতে সবসময় ভীত থাকতেন। একবার শাকইয়া আসবাহী (র) মদীনা এলেন। এ সময় হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু কিছু লোকের সামনে হাদীস বর্ণনা করছিলেন। শাকইয়াও তাদের কাছে গিয়ে বসলেন। তাঁর হাদীস বর্ণনা শেষ হলে লোকজন চলে গেলো। শাকইয়া (র) আরজ করলেন, হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী ! আমাকে এমন হাদীস বলুন, যা আপনি স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে শুনেছেন এবং বুঝেছেন।" হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু ফরমালেন এমন হাদীসই বর্ণনা করবো। একথা বলেই চীৎকার দিয়ে বেহুঁশ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর হুঁশ ফিরে এলে বললেন, আমি তোমাকে এমন হাদীস শুনাবো যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন সময় বর্ণনা করেছিলেন যখন আমি ছাড়া আর কেউ সেখানে উপস্থিত ছিলো না। একথা বলেই তিনি চীৎকার দিলেন এবং মুর্ছা গেলেন। হুঁশ ফিরে এলে আগের কথাই পুনরুক্তি করে তৃতীয়বার বেহুঁশ হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। শাকইয়া (র) তাঁকে উঠালেন এবং মুখের ওপর হাত ফিরালেন। জ্ঞান ফিরে এলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আল্লাহর কাছে তিন ব্যক্তিকে পেশ করা হবে। প্রথম কুরআনের আলেম, দ্বিতীয় জিহাদের ময়দানে লড়াই করে মারা যাওয়া ব্যক্তি এবং তৃতীয় বিত্তশালী ব্যক্তি। আল্লাহ পাক কুরআনের আলেম ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি কি তোমাকে কুরআন তালিম দেইনি? সে বলবে, জী। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি তার ওপর আমল করেছো ? সে বলবে, দিনরাত কুরআন তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যুক। তেলাওয়াত আমার জন্য করোনি। তোমাকে মানুষ যাতে কারী বলে সে জন্যে তেলাওয়াত করেছো এবং সে খিতাব তুমি পেয়েছো। অতপর আল্লাহ পাক জিহাদের ময়দানে নিহত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করবেন, তুমি নিহত হয়েছ কেন ? সে বলবে, তুমি তোমার পথে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছো। আমি জিহাদ করেছি এবং মৃত্যুবরণ করেছি। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি আমার রাহে জিহাদ করোনি। বরং মানুষ যাতে তোমাকে বাহাদুর বলে সে জন্যে লড়াই করেছো। আর এ উপাধি মানুষের কাছ থেকে পেয়ে গেছ। এরপর ধনাঢ্য ব্যক্তিকে প্রশ্ন করবেন, আমি কি তোমাকে ধন-সম্পদ দান করে মানুষের মুখাপেক্ষীহীন করিনি ? সে বলবে, হে আল্লাহ ! অবশ্যই তা করেছ। আল্লাহ পাক জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এ সম্পদ কিভাবে ব্যয় করেছ ? সে বলবে, আমি আত্মীয়দের প্রতি অনুগ্রহ করেছি। সাদকাহ দিয়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যাবাদী। সাদকাহ ও খয়রাতে তোমার উদ্দেশ্য ছিলো লোকে যাতে তোমাকে দাতা বলে এবং মানুষেরা তোমাকে তা বলেছেও। এ হাদীস বর্ণনা

করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাঁটুর ওপর হাত মেরে বললেন, আবু হুরাইরা এ তিনজনের জন্যে সর্বপ্রথম জাহান্নামের আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হবে।

উদারতা হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো। নির্দ্বিধায় তিনি নিজের সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করতেন এবং দান খয়রাতে আত্মিক প্রশান্তি অনুভব করতেন। একবার মারওয়ান তাঁর কাছে একশ' দিনার প্রেরণ করলো। তিনি তা সবই সাদকা করে দিলেন। পরের দিন মারওয়ান সে দিনার ফেরত চেয়ে পাঠালেন। সে জানালো দিনারগুলো অন্যের জন্য নির্দিষ্ট ছিলো। ভুলবশতঃ আপনার কাছে চলে গেছে। তিনি বলে পাঠালেন, দিনারগুলো আমি কাউকে দিয়ে দিয়েছি। আমার বেতন থেকে তা কেটে নিও। তাঁকে পরীক্ষা করাই মারওয়ানের উদ্দেশ্য ছিলো। মেহমানদারীতেও তিনি নজীরবিহীন ছিলেন। কোনো কোনো লোক তাঁর কাছে এসে কয়েক সপ্তাহ অবস্থান করতো এবং তিনি তাদেরকে প্রশস্ত অন্তরে খাতির যত্ন করতেন।

নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর অবয়বের বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন ঃ

গোধুম বর্ণ, প্রশস্ত বুক, মাথায় ঝাকড়া চুল, চকচকে দাঁত, প্রথম দু'টি দাঁত চওড়া–চুলে লাল অথবা যরদ রঙের খিজাব ব্যবহার করতেন।

তাবারুকান হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত কতিপয় হাদীস এখানে উল্লেখ করা গেলো ঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

০ আল্লাহ তাআলা তোমাদের শরীর এবং চেহারা দেখেন না। বরং তাঁর দৃষ্টিতো তোমাদের অন্তরের ওপর।–(মুসলিম)

০ কুস্তিতে অন্যকে পটকান দিয়ে ফেলে দেয়াই বাহাদুরী নয়। বরং প্রকৃত বাহাদুরতো সে ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজের নফসকে আয়ত্বে রাখতে পারে।–(বুখারী)

০ আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত মর্যাদাবান। তিনি এটা চান না যে, তার বান্দাহ তার নিষিদ্ধ কাজ করুক।–(বুখারী)

০ সুস্থ ও সবল এবং সম্পদের প্রয়োজন অবস্থায় তুমি দান খয়রাত করো। এ ধরনের সাদকাতে বেশী সওয়াব। কিন্তু মুমূর্ষু অবস্থায় তুমি যদি বলো আমার মৃত্যুর পর অমুক অমুককে এত এত দিও। এ ধরনের দানে সে সওয়াব

নেই। কেননা তখন তুমি না দিলেও মৃত্যুর পর তোমার সম্পদ ওয়ারিসরাই নিয়ে নেবে। তোমার কাছ থেকে যেভাবেই হোক সে সম্পদ বেরিয়ে যাবে।
–(বুখারী)

০ সফররত অবস্থায় এক ব্যক্তির প্রচণ্ড পিপাসা লাগলো। এ অবস্থায় সে পানি পেলো। তাতে নেমে সে পানি পান করে বেরিয়ে এলো। বাইরে এসে দেখলো একটি কুকুর মারাত্মক পিপাসায় কাতর হয়ে মাটি চাটছে। পিপাসায় তার যে অবস্থা হয়েছিলো কুকুরেরও একই অবস্থা। সে ব্যক্তি পানিতে নেমে নিজের মোযা পানিতে ভরে তা মুখে করে হাতের সাহায্যে কূপ থেকে উঠে এসে পিপাসার্ত কুকুরকে পান করালো। তার এ কাজ আল্লাহর খুব পসন্দ হলো এবং তার সব গুনাহ মাফ করে দিলেন। সাহাবীরা আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! পশুদের সাথে ভালো ব্যবহার করলেও কি সওয়াব পাওয়া যায় ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। প্রতিটি জীবের সাথে ভালো ব্যবহার করলে তার সওয়াব পাওয়া যায়।–(বুখারী)

০ মুনাফিকের আলামত তিনটি। যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে। ওয়াদাহ করে তা পূরণ করে না এবং আমানত রাখলে তার খিয়ানত করে।
–(মুসলিম)

০ মানুষের নামায পড়ালে তা হাল্কা করে পড়াতে হবে। কেননা নামায আদায়কারীদের মধ্যে কেউবা অসুস্থ, কেউবা বৃদ্ধ আবার কেউবা দুর্বল থাকতে পারে। যখন একা একা নামায পড়বে তখন যত ইচ্ছা দীর্ঘ করবে।–(বুখারী)

০ এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। অতএব, ভাই এর আমানতের খিয়ানত করা যাবে না। তার কাছে মিথ্যা বলা যাবে না। তাকে অসহায় হিসেবে পরিত্যাগ করা যাবে না এবং প্রত্যেক মুসলমানের খুন, ইজ্জত এবং সম্পদ অন্য মুসলমানের ওপর হারাম। হে মানুষেরা ! তাকওয়াতো অন্তরের ব্যাপার। স্মরণ রেখো, অন্যের প্রতি অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার মানুষের জন্যে খুবই খারাপ ব্যাপার।–(মুসলিম)

০ মানুষেরা ! মুসিবত, দুর্ভাগ্য এবং শত্রুর হাসির পাত্র হওয়া থেকে ক্ষমা চাও।–(বুখারী)

০ বিদ্বেষ থেকে বেঁচে থাকো। কেননা ঘৃণা বিদ্বেষ নেকীকে খেয়ে ফেলে। যেমন আগুন লাকড়ী খেয়ে ফেলে।–(বুখারী)

০ দু'টি বস্তু জাহেলীর মধ্যে পরিগণিত। এক, কারোর বংশের ওপর বিদ্রূপ করা। দ্বিতীয়, মৃতের ওপর বিলাপ করা।–(মুসলিম)

০ মিথ্যা কসম খাওয়াতে মাল বিক্রয় হয়ে যায়, কিন্তু ব্যবসায়ীর আয়ে বরকত হয় না।–(বুখারী)

০ সবচেয়ে দুর্ভাগা সে ব্যক্তি যার কাছে আমার কথা বলা হয় অথচ সে আমার জন্য শুভ কামনা করে না। অর্থাৎ আমার ওপর দরূদ প্রেরণ করে না।–(মুসলিম)

০ বিছানায় গমনের সময় প্রত্যেকের উচিত নিজের কাপড়ের আঁচল দিয়ে বিছানা ঝাড়া। কেননা তার খালি বিছানায় কীট-পতঙ্গ আছে কিনা তা সে জানে না। অতপর তাকে বলতে হবে, হে আমার রব ! তোমার নাম নিয়ে আমার শরীর বিছানায় রাখছি এবং তোমার মেহেরবানীতেই ঘুম থেকে জাগবো। হে আল্লাহ ! ঘুমন্ত অবস্থায় তুমি যদি আমার রূহ কবজ করো তাহলে এ শরীরের ওপর রহম করো এবং যদি তা না করো তাহলে ঘুম থেকে জাগার পর তা হেফাজত করো। যেমন করে তুমি তোমার নেক বান্দাদেরকে হেফাজত করে থাকো।–(বুখারী)

০ যখন কেউ মৃত্যুবরণ করে তখন তার আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু তিন ধরনের কাজ অবশিষ্ট থাকে। প্রথম, সাদকাহ। এর কল্যাণ জারি থাকে। দ্বিতীয়, তার ইলম। যা দিয়ে অন্যরা উপকৃত হয় এবং তৃতীয়, সুসন্তান। যারা তার জন্যে দোয়া করে।–(মুসলিম)

০ এক ব্যক্তি মানুষকে ঋণ দিতো এবং তার কর্মচারীদেরকে বলতো, যদি কোনো ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হয়, তাহলে তার ঋণ মাফ করে দিও। যাতে আল্লাহও আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন। যখন সে মারা যায় তখন আল্লাহও তাকে ক্ষমা করে দেন।–(মুসলিম)

০ যে মহিলা আল্লাহ এবং কিয়ামতের ওপর ঈমান এনেছে তার জন্য নিজের স্বামী অথবা নিষিদ্ধ আত্মীয় ছাড়া একদিন এবং রাতও সফর করা জায়েয নয়।–(বুখারী)

০ তোমাদের মধ্যে কাউকে দাওয়াত দেয়া হলে তা কবুল করো। যদি রোযা রেখে থাক তাহলে সেখানে শুধু দোয়াই লও। আর যদি রোযা না রাখো তাহলে খাওয়ায় শরীক হও।–(মুসলিম)

০ দু'জনের খাদ্য তিন এবং তিনজনের খাদ্য চারজনের জন্য যথেষ্ট।
–(বুখারী)

০ যখন নামাযের (জামায়াত) শুরু হয় তখন তোমরা দৌড়ে এসো না বরং হেঁটে হেঁটে এসো এবং গাম্ভীর্য ও নীরবতা অবলম্বন করো। নামাযের যে

অংশ পাও তা ইমামের সাথে পড়ো। আর যা ছুটে যায় তা পরে পুরো করো।–(বুখারী)

০ তোমাদের মধ্যে কেউ কখনো মৃত্যুর আকাংখা করবে না। কেননা সে ব্যক্তি নেককার হলে (জীবিতাবস্থায়) আরো বেশী নেক কাজের সুযোগ লাভ ঘটতে পারে। আর যদি খারাপ হয় তাহলে তাওবার সুযোগ এসে যেতে পারে। –(বুখারী)

০ দান করলে কখনো সম্পদ কমে যায় না এবং মানুষের কসুর ক্ষমা করলে তা কখনো জিল্লতির কারণ হতে পারে না। বরং এ ধরনের মানুষের সম্মান আল্লাহ্ পাক বৃদ্ধি করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয়ানবত হয় তার মর্যাদা তিনি বৃদ্ধি করবেন।–(মুসলিম)

০ যে ব্যক্তি সম্পদ জমা করার লক্ষ্যে মানুষের কাছে হাত পাতে, মাল কম বা বেশী পাক সে যেন আগুনের অঙ্গার যাঞ্চা করে।–(মুসলিম)

০ অধিক ও কম বিত্তের নাম ঐশ্বর্যশালী হওয়া নয়। বরং অন্তরের ঐশ্বর্যকেই ঐশ্বর্যশালী বলে।–(বুখারী)

০ নিজের চেয়ে কম মর্যাদার লোকের অবস্থা পর্যবেক্ষণ কর এবং নিজের চেয়ে বেশী মর্যাদার মানুষের অবস্থা বেশী দেখ না। তার পরিণাম এ হবে যে, আল্লাহ তোমাকে যে ইনয়াম দিবেন তার অমর্যাদা করতে পারবে না। –(মুসলিম)

০ যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং কিয়ামতের ওপর ঈমান এনেছে তার উচিত নিজের প্রতিবেশীকে কোনো ধরনের কষ্ট না দেয়া এবং যার আল্লাহ ও কিয়ামতের ওপর ঈমান আছে তার উচিত মেহমানের সম্মান করা। যে আল্লাহ এবং কিয়ামতের ওপর ঈমান রাখে তার ভালো কথা বলা উচিত। নচেৎ সে যেন চুপ থাকে।–(বুখারী)

০ যে ব্যক্তি বিধবা এবং মিসকীনদের খোঁজ-খবর নেয় সে আল্লাহর পথে জিহাদকারী, সারারাত তাহাজ্জুদ আদায়কারী এবং সারা জীবন রোযা পালনকারীর সম্মান লাভ প্রাপ্ত হবে।–(বুখারী)

০ এক মুসলমানের অন্য মুসলমানের ওপর পাঁচটি হক রয়েছে—(১) সালামের জবাব দেয়া, (২) রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করা, (৩) জানাযার সাথে যাওয়া, (৪) দাওয়াত কবুল করা, (৫) হাঁচি দিলে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা।

হযরত শাকরান সালেহ রাদিয়াল্লাহ আনহু

হযরত শাকরান সালেহ রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন। তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে এতটুকুন বলাই যথেষ্ট যে, তিনি ফখরে মওজুদাত সারওয়ারে কায়েনাত রহমতে দো আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোলাম ছিলেন। তাঁর নাম ছিলো সালেহ এবং লকব ছিলো শাকরান। পিতার নাম ছিলো আদি। পিতৃ পুরুষের নিবাস ছিলো হাবশায়।

হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানী (র) "আল ইসাবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, তিনি প্রথম হযরত আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আওফের গোলাম ছিলেন। পরে তিনি তাঁকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপঢৌকন হিসেবে পেশ করেন। এক রাওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে নিজের খিদমতের জন্য পসন্দ করেছিলেন এবং হযরত আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আওফকে মূল্য দিয়ে কিনে নিয়েছিলেন। কিন্তু এ রাওয়ায়েত বিশ্বস্ত সনদ সম্বলিত নয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো গোলাম অর্থ দিয়ে ক্রয় করেছিলেন এ ধরনের কোনো রাওয়ায়েত বিশ্বস্ত সনদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে, হযরত শাকরান সালেহ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরাধিকার হিসেবে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এ রাওয়ায়েতের সনদও শক্তিশালী নয়। এটাই সঠিক যে, তাঁকে হযরত আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আওফ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পেশ করেছিলেন। এক রাওয়ায়েত মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে তৎক্ষণাৎ আযাদ করে দিয়েছিলেন। অন্য এক রাওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, বদরের যুদ্ধের পর তাঁকে স্বাধীন করে দেয়া হয়েছিলো। যাহোক, তিনি সবসময়ই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে থাকাটা পসন্দ করতেন এবং তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইনতিকাল পর্যন্ত রিসালাত প্রদীপের পতঙ্গ হিসেবে বিরাজিত ছিলেন।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত শাকরান সালেহ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বিশেষভাবে একটি দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। সে দায়িত্ব হলো গজওয়ায় (যুদ্ধসমূহে) প্রাপ্ত গনিমাতের মাল এবং কয়েদীদের তত্ত্বাবধান করা। বদরের যুদ্ধে তিনি অত্যন্ত নরম ও স্নেহের সাথে কয়েদীদের তত্ত্বাবধান করেছিলেন। তাতে কয়েদীরা খুশী হয়ে তাঁকে প্রচুর প্রতিদান দিয়েছিলেন। ইবনে সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর মতে এ প্রতিদান

এতবেশী ছিলো যে, তাঁর গনিমাতের মালের অংশ নেয়ার প্রয়োজনই ছিলো না। বরং যারা গনিমাতের মালের অংশ পেয়েছিলেন তাঁদের চেয়েও তিনি বেশী লাভবান হয়েছিলেন। অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে দায়িত্ব পালনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু মুসতালিকের যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত শত্রুর যুদ্ধের সামান, মাল ও আসবাবপত্র এবং পশু প্রভৃতি একত্রিত করা ও তা তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এ দায়িত্বও তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সতর্কতার সাথে আঞ্জাম দেন।

হযরত শাকরান সালেহ রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং তিনি তাঁর প্রতিটি নির্দেশ তাড়াতাড়ি পালনে নিজের জীবন বাজী রাখতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যক্তিগত কাজের নির্দেশ দিতেন অথবা কোনো দীনি খিদমত অর্পণ করতেন, নিষ্ঠা ও দিয়ানতদারীর সাথে তা পালন করাকে তিনি ঈমানের অংশ হিসেবে মনে করতেন। এ কারণেই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। এবং তাঁকে তিনি অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য মনে করতেন। এমনকি তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের ওফাতের পূর্বে তাঁর সাথে বিশেষ সুন্দর ব্যবহারের ওসিয়ত করেন।

ইবনে আসির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বর্ণনা করেছেন, একটি ব্যাপারে হযরত শাকরান সালেহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বেশী সৌভাগ্যবান ছিলেন। তিনি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাফন দাফনে আহলে বাইত এবং কতিপয় সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুমের সাথে শরীক ছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজর রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মতে যখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র দেহ কবরে রাখা হয়, তখন হযরত শাকরান সালেহ রাদিয়াল্লাহ আনহু উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাদর মুবারক নিজের হাতে ধরেছিলেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর হযরত শাকরান সালেহ রাদিয়াল্লাহ আনহু কোথায় অবস্থান করতেন এবং কতদিন জীবিত ছিলেন তার জবাব নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা নিশ্চিতভাবে দেননি। কেউ লিখেছেন যে, তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মদীনাতেই অবস্থান করেছিলেন। আবার কেউ বলেছেন যে, তিনি বসরায় গিয়ে নিজস্ব বাড়ী বানিয়ে নিয়েছিলেন। মৃত্যু স্থান ও মৃত্যুর সাল সম্পর্কেও সবাই নিশ্চুপ। অবশ্য একথা অত্যন্ত জোরের সাথেই বলা যায় যে, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকালে

তিনি বসরায় বসতিস্থাপন করেন এবং কিছুদিন পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। হযরত শাকরান সালেহ রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে কতিপয় হাদীসও বর্ণিত আছে। হাফেজ ইবনে হাজর রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মতে উবায়দুল্লাহ বিন আবু রাফে রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু

একদিন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারার কোনো এক স্থানে সমুপস্থিত। এ সময় এক ইহুদী আলেম এসে বললো, "আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া মুহাম্মদ।" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন জীবন উৎসর্গকারী সাহাবী সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইহুদী আলেমটির এ ধরনের সম্বোধনে তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন। তিনি তাকে এমন জোরে ধাক্কা দিলেন যে, পড়তে পড়তে কোনোক্রমে রক্ষা পেলো। নিজকে সামলে নিয়ে সে এর কারণ জিজ্ঞেস করলো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই জানবাজ সাহাবী রাগতঃস্বরে বললেন, তুমি ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন বললে না ? সে বললো, আমি তো তার বংশীয় নাম নিয়েছি। এতে অপরাধের কি ছিলো। নবীকুলের নেতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত নরম সুরে বললেন, হ্যাঁ, আমার বংশীয় নাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

জীবন উৎসর্গকারী এ সাহাবীর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি কি ধরনের গভীর ভালোবাসা ছিলো তা সহজেই অনুমান করা যায়। তিনি কোনো মানুষের মুখ দিয়ে হে আল্লাহর রাসূল এ সম্বোধন ব্যতিরেকে হে মুহাম্মদ শ্রবণও সহ্য করতে পারতেন না। তিনি ছিলেন হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহ আনহু। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোলাম ছিলেন।

হযরত আবু আবদুল্লাহ সাওবান রাদিয়াল্লাহ আনহুর বংশনামা সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তাতে দেখা যায় যে, তার পিতার নাম ছিলো বাজদদিয়া জাজদার। তিনি ইয়েমেনের প্রখ্যাত হিমাইরী খান্দানের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এ বংশ শাসন, সিংহাসন এবং উঁচু মর্যদায় সমাসীন ছিলো। কোন্ বিপাকে পড়ে হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহ আনহুকে অন্যের দাসত্ব করতে হয়েছিলো তা জানা যায়নি। এ অবস্থায়ই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে উপস্থিত হন। তাঁর চেহারা ও অবয়বে শরাফত ও মর্যাদার নিদর্শন দেখে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে রহমতের দরিয়া উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। তিনি তাঁকে ক্রয় করে আযাদ করে দিলেন এবং বললেন ঃ

"চাইলে তুমি নিজের পরিবার-পরিজনের কাছে চলে যেতে পারো। আর আমার সাথে যদি থাকতে চাও, তাহলে তোমাকে আমার পরিবারের সদস্য হিসেবেই মনে করা হবে।"

আল্লাহ পাক সাওবান রাদিয়াল্লাহ আনহুকে সচ্চরিত্র দান করেছিলেন। তিনি নিজের পরিবার-পরিজন এবং স্বদেশ ভূমি থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যকেই অগ্রাধিকার দিলেন এবং আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আমি আপনার সাথেই থাকবো।" এরপর তিনি সকল অবস্থাতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অবস্থান করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে আযাদ করে দিলেও তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে তাঁর গোলামী অবলম্বন করেন। আর এভাবেই তিনি আজীবন দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য লুটতে থাকেন।

হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহ আনহু শুধুমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যেক নির্দেশ আগ্রহসহ পালনই করতেন না। বরং তার জীবনের অবলম্বন বানিয়ে নিতেন এবং ব্যক্তিগত জীবনে তার ওপর আমল করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাতেন। মুসনাদে আবু দাউদে স্বয়ং তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি এ ওয়াদা করে (এবং তা পূরণ করে) যে সে কখনো মানুষের কাছে হাত পাতবে না। তাহলে আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। আমি আরজ করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি কখনো কারো কাছে কিছু চাইবো না।

নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা বর্ণনা করেছেন, হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহ আনহু আজীবন এ ওয়াদা কঠোরভাবে পালন করেছিলেন। এমনকি সওয়ারী অবস্থায় লাঠি তাঁর হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেলেও নিজে সওয়ারী থেকে অবতরণ করে তা তুলতেন এবং অবশ্যই কাউকেও এ কাজ করতে বলতেন না।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) "আল ইসাবাহ" গ্রন্থে এর সাথে সদৃশ রাওয়ায়েত এভাবে বর্ণনা করেছেন, একবার রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহলে বাইতের জন্য দোয়া করলেন। সে সময় হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহ আনহুও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলেন। তিনি আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমিও কি আহলে বাইতের মধ্যে পরিগণিত ?" ইরশাদ হলো ঃ হ্যাঁ, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি কোনো আমীরের কাছে সওয়ালকারী হিসেবে না যাবে অথবা কোনো দরযার চৌকাঠ না মাড়াবে।"

হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহ আনহু এরপর জীবনে কোনোদিন কারো কাছে হাত পাতেননি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওফাত পর্যন্ত হযরত সাওবান

রাদিয়াল্লাহু আনহু অব্যাহতভাবে তাঁর খিদমত করেছিলেন। তারপর সম্ভবত হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে তিনি সিরিয়া গমন করেন এবং রামলাহতে অবস্থান গ্রহণ করেন। আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মিসর অভিযানে নিযুক্ত করেন। এ সময় হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু মিসরগামী মুজাহিদদের দলে অন্তর্ভুক্ত হন এবং সেখানে কয়েকটি যুদ্ধে বাহাদুরী প্রদর্শন করেন। মিসর থেকে প্রত্যাবর্তন করে হিমসে ঘর-বাড়ী বানান এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোলাম বলাকে অত্যন্ত গৌরবের ব্যাপার বলে মনে করতেন এবং অন্যরাও তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোলাম বলুক তা তিনি আন্তরিকভাবে চাইতেন। মুসনাদে আহমদ (র) বিন হাম্বলে বর্ণিত আছে, একবার হিমসে অবস্থানকালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সে সময় আবদুল্লাহ বিন কুরত ইজদী হিমসের গভর্নর ছিলেন। কোনো কারণে তিনি সেবা-শুশ্রূষার জন্য এলেন না। হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর এ ব্যবহার কঠোরভাবে নিলেন এবং তাঁকে এ চিঠি লিখলেন–

"মূসার (আ) গোলাম যদি তোমার রাজত্বে থাকতো তাহলে তুমি কি তার শুশ্রূষার জন্য আসতে না ?" আবদুল্লাহ বিন কুরত এ চিঠি পেয়ে নিজের গাফিলতির জন্য খুবই লজ্জিত হলেন এবং দোষ স্খলনের জন্য হন্তদন্ত হয়ে ঘর থেকে এমনভাবে ছুটে এলেন যে, সবাই মনে করেছিলো কোনো অঘটন ঘটে গেছে। অতপর তিনি হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিদমতে হাজির হয়ে নিজের ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাইলেন এবং দীর্ঘক্ষণ তাঁর কাছে বসে খোঁজ খবর নিলেন।

"মুসতাদরাকে হাকিম" গ্রন্থ মতে হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু ৫৪ হিজরীতে (আমীর মুয়াবিয়ার খেলাফতকালে) হিমসে ইন্তেকাল করেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নৈকট্য এবং অসাধারণ ভালোবাসা হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ফযীলাতের খনিতে পরিণত করেছিলো। তাঁর থেকে ১২৭টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর হাদীস বর্ণনাকারী এবং শিষ্যদের মধ্যে মে'দান বিন তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু, আবু ইদরিস খাওলানী (র), রাশেদ বিন সায়াদ (র), আবদুর রহমান বিন গানাম (র), আবু আমেরু ইলহানী (র) এবং যুবাইর বিন নুফায়ের (র)-এর মতো বড় বড় আলেম ছিলেন। তাঁর সমকালীন কেউ অন্য কোনো সাহাবীর কাছ থেকে

কোনো হাদীস শুনলে হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দিয়ে তার সত্যতাও যাচাই করে নিতেন।

মুসনাদে আবু দাউদে আছে যে, মে'দান বিন তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু যিনি হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছাত্র এবং উঁচু মর্যাদা সম্পন মুহাদ্দিস ছিলেন। একবার উম্মাহর ফকীহ হযরত আবুদারদা আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি হাদীস শুনলেন। এরপর তিনি হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিদমতে হাজির হয়ে হাদীসটির সত্যতা যাচাই করে নিলেন। হাদীস প্রচারে হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু খুব আগ্রহী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে নিজের প্রভু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস মানুষের কাছে পৌছাতেন। হাফিজ ইবনে আবদুল বার (র) "আল ইসতিয়াব" গ্রন্থে লিখেছেন, "হযরত সাওবান সেসব সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত যাঁরা হাদীস সংরক্ষণ করেছেন এবং তার প্রসার ঘটিয়েছেন।" হাদীস প্রেমিকরা পীড়াপীড়ি করে তাঁর কাছ থেকে হাদীস শুনতেন।

হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত কতিপয় হাদীস এখানে উল্লেখ করা গেলো ঃ

(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে সালাম ফিরিয়ে যখন এক পাশে বসতেন তখন তিনবার ইসতিগফার পড়তেন এবং বলতেন ঃ আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু ওয়া মিনকাস সালামু তাবারাকতা ইয়া জালজালালি ওয়াল ইকরাম।–(সহীহ মুসলিম)

(২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন কোনো মুসলমান অন্য কোনো মুসলমান ভাইকে সেবা শুশ্রূষা করে তখন সে যেন বেহেশতের মেওয়াহ খুরীতে থাকে (অর্থাৎ বেহেশতের মেওয়াহ খুরীর যোগ্য হয়ে যায়)। সেবা শুশ্রূষা থেকে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত সে এ অবস্থায় থাকে।–(সহীহ মুসলিম)

(৩) একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এক জানাযায় শরীক হলাম। আমরা দেখলাম কিছু মানুষ সওয়ারীর ওপর বসে আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের কি লজ্জা হয় না যে, আল্লাহর ফেরেশতারা পায়ে হেঁটে চলছে আর তোমরা জানোয়ারের পিঠে সওয়ার হয়ে আছ।–(তিরমিযী ইবনে মাযাহ)

(৪) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে মুসলমান আল্লাহর জন্য এক সিজদা করে আল্লাহ তার জন্য এক দরযা বুলন্দ করেন এবং তার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেন।–(মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল)

(৫) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, নেককার ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসন্ধানে থাকে এবং সবসময়ই এ অবস্থায় কাটায় তখন আল্লাহ পাক জিবরাঈলকে বলেন, আমার অমুক বান্দাহ আমার সন্তুষ্টির অনুসন্ধানে রয়েছে। জেনে রেখ, তার জন্য আমার রহমত বর্ষিত হয়েছে। অতপর জিবরাঈল বলেন, আল্লাহর রহমতও অমুক ব্যক্তির ওপর রয়েছে। অতপর একথা আরশে উম্মিতকারী ফেরেশতারা বলতে থাকেন এবং তাদের নিকটবর্তী ফেরেশতারাও একথা বলতে থাকেন। এমনকি সাত আসমানের ফেরেশতারাও একই কথা বলতে থাকেন। এরপর সে ব্যক্তির জন্য জমিনের ওপর রহমত বর্ষিত হয়।-(মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল)

(৬) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমিয়েছেন, যে মুসলমান সকাল-সন্ধ্যা, "রাদিইতু বিল্লাহি রাববান ওয়াবিল ইসলামী দিনান ওয়াবিমুহাম্মাদিন নাবিয়ান" এ বাক্য উচ্চারণ করে, আল্লাহ অবশ্যই সে মুসলমানকে কিয়ামতের দিন খুশী করবেন।-(মুসনাদে আহমদ ও জামে তিরমিযী)

(৭) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সঠিক রাস্তার ওপর অবিচল থাকো। কিন্তু তার হক আদায় করতে পারো না। খুব ভালোভাবে বুঝে নিও যে, তোমাদের দীনে সবচেয়ে উত্তম আমল হলো নামায। আর অযুর তত্ত্বাবধান পূর্ণ মু'মিন ছাড়া কেউই করতে পারে না।-(মুয়াত্তা ইমাম মালেক, মুসনাদে আহমদ ও মুসনাদে দারেমী)

(৮) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমিয়েছেন ঃ প্রসারিত সমগ্র ভূখণ্ড আল্লাহ আমাকে দেখিয়েছেন। পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতি আমি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। সন্দেহাতীতভাবে আমার উম্মত এসব ভূখণ্ড দখল করবে যা আমায় দেখানো হয়েছে। লাল এবং সাদা ও এ দু' পদার্থের স্বর্ণ ও রৌপ্য সম্পদও আমার প্রতি রহমত হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। সাধারণ দুর্ভিক্ষে নিক্ষেপ করে আমার উম্মাতকে যাতে হালাক না করা হয় সে দোয়া আমি করেছি। কোনো শত্রু যাতে এমনভাবে তাদের ওপর বিজয়ী না হয় যাতে তারা তাদের বংশকে খতম করে ফেলে এ দোয়াও করেছি। আমার রব এর জবাবে বলেছেন, হে মুহাম্মাদ ! আমি যখন কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তখন তার ওপর অটল থাকি। সাধারণ দুর্ভিক্ষে তোমার উম্মতকে হালাক করবো না, তোমার এ আবেদন আমি মঞ্জুর করেছি। এছাড়া তারা নিজেরাই পরস্পরকে নিশ্চিহ্ন এবং গ্রেফতারীর জন্য উদ্যত না হলে শত্রুকে এমনভাবে বিজয়ী করবো না যাতে তারা তাদের বংশ নিপাত করে ফেলে।-(সহীহ মুসলিম)

(৯) ওয়াল্লাজিনা ইয়াকনিযুনাজ জাহাবা ওয়াল ফিদদাতা (অর্থাৎ যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে) এ আয়াত নাযিল হয় তখন আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সফরে ছিলাম। কতিপয় সাহাবী বললেন, এ আয়াত শুধুমাত্র স্বর্ণ ও রৌপ্যের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। হায় ! আমরা যদি জানতে পারতাম যে, কোন্ ধরনের সম্পদ ভালো, (অর্থাৎ স্বর্ণ ও রৌপ্য ছাড়া) যা জমা করা যায়। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহর জিকরকারী জবান এবং আল্লাহর শোকর আদায়কারী অন্তর সবচেয়ে উত্তম সম্পদ। আর সেই মু'মিন স্ত্রী যে স্বামীর দীন ও ঈমানের সাহায্যকারী।–(আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

হযরত ইয়াসার নওবী রাদিয়াল্লাহু আনহু

হযরত ইয়াসার নওবী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা সম্পর্কে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, তিনি সারওয়ারে কায়েনাত রহমতে দোআলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোলাম ছিলেন। চরিতকাররা লিখেছেন যে, তিনি নওবাহর (সুদান) বাসিন্দা ছিলেন। কিন্তু বিশেষ করে বলেননি যে, তিনি কখন মদীনা এসেছিলেন এবং কোন সময় ঈমান এনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রহমতের প্রস্রবণের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন। কোনো পুস্তকে তাঁর বংশ তালিকা সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। অবশ্য কতিপয় রাওয়ায়েতে এতটুকু শুধু অবগত হওয়া যায় যে, তিনি অত্যন্ত পাক্কা ও সাচ্চা মুসলমান ছিলেন এবং আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি ছিলেন একনিষ্ঠ। নামাযের আরকানসমূহ অত্যন্ত সুন্দরভাবে আদায় করতেন। একদিন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন যে, তিনি খুব ইতমিনান এবং শান্তচিত্তে নামায পড়ছেন। তাঁর নামায আদায়ের ধরন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এত পসন্দ হলো যে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে আযাদ করে দিলেন। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তাঁর ছিলো গভীর ভালোবাসা। হাজার আযাদীর চেয়েও তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোলামীকে অগ্রাধিকার দিলেন। তিনি আরজ করলেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনার গোলামীর মর্যাদা থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না। আজীবন আমি আপনার খিদমত করে কাটাতে চাই।"

ইখলাসের জজ্‌বাহ দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদকার উট চরানোর দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করলেন। সুতরাং তিনি কুবার সাথে মিলিত একটি চারণভূমিতে (নাহিয়ায়ে জিল হাদর) চলে গেলেন এবং অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পালনে ব্যস্ত রইলেন।

৬ষ্ঠ হিজরীতে উকাল ও উরিনা গোত্রের ৮ ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হলো এবং ইসলাম গ্রহণ করলো। এক বর্ণনা মতে তারা প্লীহা রোগে আক্রান্ত ছিলো নিজেদের দেশ থেকেই তারা অসুস্থ অবস্থায় এসেছিলো।

অন্য এক বর্ণনা মতে, মদীনার আবহাওয়া তাদের খাপ খায়নি এবং তাদের পেট ফুলে যায়। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে নাহিয়ায়ে জিল হাদর যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি আরো বললেন,

সেখানকার আবহাওয়া স্বাস্থ্যসম্মত এবং আমাদের উট-উটনিও রয়েছে। খুব ভালো করে তাদের দুধ খাও। ইনশাআল্লাহ তোমাদের স্বাস্থ্য ঠিক হয়ে যাবে।

তারা সেখানে চলে গেলো। হযরত ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে নিজের প্রভুর মেহমান মনে করে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে মেজবানী করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তারা সুস্থ হয়ে উঠলো। এখন আল্লাহর শোকর আদায় ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এবং হযরত ইয়াসারের ইহসানের প্রতি কৃতজ্ঞ না হয়ে তারা নিজেদের বদ নিয়তের ভিত্তিতে ইরতিদাদ বা ধর্মদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতার পথ বেছে নিলো। একদিন ভোরে ১৫টি উট হাকিয়ে নিয়ে চললো। হযরত ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের এ তৎপরতা অবলোকন করলেন এবং এ কাজ থেকে বিরত থাকতে বললেন। যখন তাঁরা নিষেধ শুনলো না তখন তাদের পেছনে পেছনে গেলেন এবং বাধা দিতে লাগলেন। এ গাদ্দাররা হযরত ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গ্রেফতার করলো। অতপর অত্যন্ত নৃশংসভাবে তাঁর হাত-পা কেটে ফেললো এবং চক্ষু ও জিহ্বাতে কাটা ঢুকিয়ে দিলো। এ কষ্ট সহ্য করতে না পেরে হযরত ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হয়ে গেলেন।

এ ঘটনার খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি হযরত কুরাজ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন জাবের ফাহরীকে বিশটি সওয়ারী সমেত সেই বদবখত লুটেরাদের ধাওয়া করতে পাঠালেন। পথিমধ্যে একজন মহিলার সাথে হযরত কুরাজ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাক্ষাত হলো। মহিলাটি উটের একটি অংশ নিয়ে যাচ্ছিলো। হযরত কুরাজ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ গোশত কোথায় পেয়েছ? সে বললো, আমি এদিক আসছিলাম। একস্থানে কতিপয় লোক দেখলাম। তারা একটি উট যবেহ করে গোশত তৈরি করছিলো। তারা এ অংশ আমাকে দিয়েদিলো। তারা সামনের তাবুতে অবস্থানরত আছে। হযরত কুরাজ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিদ্যুৎ বেগে সেদিকে অগ্রসর হলেন এবং তাদেরকে গ্রেফতার করে অবশিষ্ট ১৪টি উটসহ ফিরে এলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সময় চারণ ভূমিতে অবস্থান করছিলেন। গাদ্দারদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পেশ করা হলো। হযরত ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তারা যে ধরনের আচরণ করেছিলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথেও একই ধরনের আচরণের নির্দেশ দিলেন। সুতরাং তাদের হাত-পা কাটা হলো এবং চক্ষুতে সিলাই দেয়া হলো। অতপর তাদেরকে হাররাতে নিক্ষেপ করা হলো। সেখানে তারা তড়পিয়ে তড়পিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করলো।

কতিপয় মুফাসসির লিখেছেন যে, সূরা আল মায়েদার এ আয়াত তাদের প্রসঙ্গেই অবতীর্ণ হয়েছিলো ঃ

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ط (المائدة : ٣٣)

"যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে লড়াই করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি হচ্ছে হত্যা কিংবা শূলে চড়ানো ; অথবা তাদের হাত ও পা উল্টো দিক হতে কেটে ফেলা, কিংবা দেশ হতে নির্বাসিত করা।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৩৩)

হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি ফাতিমাতাদ দাওসী

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির প্রথম যুগে কতিপয় সচ্চরিত্র ও সৌভাগ্যবান ব্যক্তি নিশ্চিন্তায় এবং নির্দ্বিধায় তাওহীদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। শুধু সাড়াই দেননি সত্যের পথে সব ধরনের দুঃখ-মুসিবত তারা হাসিমুখে বরদাশত করেছেন। আল্লাহ পাক তাদেরকে আস-সাবিকুনাল আওয়ালুন লকব দিয়ে প্রকাশ্যভাবে নিজের সন্তুষ্টি এবং বেহেশতের সুসংবাদ দিয়েছেন। হক গ্রহণকারী এসব অগ্রগামী পবিত্র আত্মার মর্যাদা সেই সকল সাহাবীর চেয়ে বেশী যারা তাদের পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সাবিকুনাল আওয়ালুন অর্থাৎ অগ্রগামী এ পবিত্র জামায়াতে মক্কার কতিপয় নেক স্বভাবের সাহাবী যেমন ছিলেন তেমনি সেখানে প্রবাসী কিছু দরিদ্র সাহাবীও ছিলেন। এসব দরিদ্র সাহাবী নিরুপায় হয়ে অথবা প্রয়োজনে (গোলামী অথবা জীবিকান্বেষণে) মক্কায় এসে বসবাস শুরু করেন। মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি ফাতিমা এমনি ধরনের এক নেক্কার যুবক ছিলেন। তিনি ইয়েমেনের বাসিন্দা ছিলেন এবং সম্পৃক্ত ছিলেন ইজদ গোত্রের শাখা বনু দাওসের সাথে। কিন্তু জীবিকা অন্বেষণে বনু আবদি শামসের মিত্র হয়ে মক্কায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সকল নেতৃস্থানীয় চরিতকার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহু তাওহীদের দাওয়াতের (নবুয়াত প্রাপ্তির) একদম প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে ইসলাম গ্রহণের পর খায়বার যুদ্ধ (সাত হিজরীর প্রথম দিকে) পর্যন্ত তাঁর জীবন কোথায় এবং কিভাবে কেটেছিলো সে সম্পর্কে চরিতকারদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এতবড় মর্যাদাবান সাহাবী যিনি শুধুমাত্র সাবিকুনাল আওয়ালুন দলের সম্মানিত সদস্যই ছিলেন না, বরং খাতিমে বরদারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হওয়ার সৌভাগ্যও অর্জন করেছিলেন। তাঁর প্রশ্নে চরিতকারদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা বাস্তবতঃ আশ্চর্য ব্যাপারই বটে। চৌদ্দশ বছর পর তাঁর সম্পর্কে পুংখানুপুংখ পর্যালোচনাও কঠিন ব্যাপার। এজন্যে কোনো বিশেষ বর্ণনার ওপর জোর না দিয়ে সব ধরনের বর্ণনা উল্লেখ করাই যুক্তিযুক্ত হবে।

হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহুর বংশ তালিকা সম্পর্কে সকল চরিতকারই নীরব ছিলেন। শুধু এতটুকু জানা যায় যে, তিনি আবি ফাতিমাতাদ দাওসীর সন্তান ছিলেন। এটা স্পষ্ট যে, "আবি ফাতিমা" তাঁর পিতার কুনিয়াত ছিলো। প্রকৃত নাম কেউই বর্ণনা করেননি। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন,

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির প্রথম যুগে তিনি মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন। অতপর তিনি নিজের দেশে ফিরে যান। কিন্তু হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) এবং হাফিজ ইবনে আবদুল বার (র) লিখেছেন যে, তিনি মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হাবশায় দ্বিতীয় হিজরতে (নবুয়াত প্রাপ্তির ৬ বছর পর) অংশগ্রহণ করেন। নেতৃস্থানীয় চরিতকারদের অধিকাংশই এ মত সমর্থন করেছেন। ইসলাম গ্রহণের ফলে হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহুও অন্যান্য হকপন্থীদের মত কুরাইশ মুশরিকদের যুলুম-নির্যাতনের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হন। নবুয়াত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইঙ্গিতে মুসলমানদের একটি ছোট দল হাবশায় হিজরত করেন। এরপর ৬ষ্ঠ সালে মযলুম হকপন্থীদের একটি বড় কাফেলা হিজরত করে হাবশা গমন করেন। হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহু এ কাফেলায় শরীক ছিলেন। কতিপয় রাওয়ায়েতে আছে যে, তিনি বদরের যুদ্ধের পূর্বে হাবশা থেকে ফিরে এসেছিলেন এবং বদর থেকে শুরু করে সকল যুদ্ধেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহযোদ্ধা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তিনি বাইয়াতে রেদওয়ানেও অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু হিশাম এবং আরো অনেক চরিতকার বলেছেন, হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহু হাবশায় হিজরতকারী এক দলের সাথে হাবশা থেকে মদীনা ফিরে এসেছিলেন। এ সময় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বারের যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। এসব সাহাবী বছরের পর বছর বিচ্ছিন্ন থাকার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। এজন্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত তাঁরা অপেক্ষা করতে পারেননি এবং সোজা খায়বার পৌঁছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করে নিজেদের অন্তর ঠাণ্ডা করেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত খুশীর সাথে তাদেরকে স্বাগত জানালেন এবং প্রত্যেকের সাথে মুয়ানিকা এবং মুসাফিহা করলেন। সে সময় খায়বারের যুদ্ধে বিজয় লাভ ঘটেছিলো। এসব সাহাবীর এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ ঘটেনি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবাইকেই গনিমাতের মাল দিয়েছিলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা ফিরে এলেন। হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহুও তাঁর সাথে মদীনা এলেন এবং এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেলেন।

খায়বারের পর মক্কা বিজয়, হুনাইন, তায়েফ এবং তাবুকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহু এসব যুদ্ধে অংশ নেন। বিদায় হজ্জেও তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথী ছিলেন। মদীনা মুনাওয়ারায় হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহুর বিশেষ মর্যাদা ছিলো। এ

মর্যাদার কারণ হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পবিত্র সীলমোহর তাঁর রক্ষণাবেক্ষণে রেখেছিলেন। এ পবিত্র সীলমোহর রৌপ্যের আংটির আকারে ছিলো। এ আংটির ওপর 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এ শব্দটি খোদাই ছিলো। তিনি চিঠিপত্র এবং ফরমানসমূহে এ সীল মারার জন্যে বানিয়েছিলেন। তিনি কখনো কখনো বাম হাতের আঙ্গুলে তা পরতেন। কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ই তা হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে থাকতো। এভাবে তিনি খাতিমে বরদারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আংটি বহনকারীর উপাধিতে ভূষিত হন। এটা একটা এক ধরনের বড় উপাধি। এর তাৎপর্য প্রসঙ্গে বলা যায় যে, তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একজন আমানতদার ও দায়িত্ববান ব্যক্তি ছিলেন। এ কারণেই সকল সাহাবাই হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহুকে অত্যন্ত মর্যাদা দিতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কতিপয় কাতিব ছিলেন। তাঁর মধ্যে কয়েকজন অহী লিখতেন। কেউ কেউ আমীর ও সুলতানদেরকে পত্র লিখতেন। কেউ বা সাদকার মালের হিসেব রাখতেন। হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহু এ হাতে গোনা কয়েকজন সাহাবীর অন্যতম ছিলেন। তিনি লেখা-পড়ায় পারদর্শী ছিলেন। এজন্যে স্থায়ী অহীর কাতিবদের অনুপস্থিতিতে কোনো কোনো সময় তিনি অহী লেখার সৌভাগ্যও লাভ করেছিলেন।

বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুও হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহুর মর্যাদা বহাল রেখেছিলেন। তাকে সম্পদ বিষয়ক তত্ত্বাবধায়ক বানান এবং লেখার কাজও দেন।

হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুও মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহুকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। তিনি নিজের খেলাফতকালে বায়তুল মাল কায়েম করেন এবং হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আরকামকে তার অফিসার ও তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করেন। হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন উবাইদুল কারীকে বাইতুল মালের সহকারী বানান। আল্লামা শিবলী নুমানী "আল ফারুক" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত মর্যাদাবান সাহাবী আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আরকামকে কোষাগারের অফিসার নিয়োগ করেন। তিনি লেখা-পড়ায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। এর সাথে তাঁর অধীন যোগ্য লোকও নিয়োগ করেছিলেন। নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে আবদুর রহমান বিন

উযাইদুলকারীও ছিলেন। মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আংটি বহনের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এ কারণে তাঁর বিশ্বস্ততা এবং আমানতদারী সম্পূর্ণ বিতর্কের উর্ধে ছিলো।"

কতিপয় রাওয়ায়েতে আছে যে, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহুকে হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন সাবিতের সহকারী বানিয়ে ছিলেন। হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহু লেখকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সম্ভবত হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহু কোষাগার ও লেখন দু' দায়িত্বই আঞ্জাম দিতেন।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহুকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। ইবনে সায়াদ রহমাতুল্লাহ আলাই বলেছেন, তাঁর খেলাফতকালে হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহু কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হন। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর চিকিৎসায় বিশেষভাবে মনোযোগ দেন। সমকালীন যুগের খ্যাতনামা চিকিৎসকদের ডেকে তাঁর চিকিৎসায় নিয়োগ করেন। কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। অবশেষে দু'জন ইয়েমেনী চিকিৎসকের চিকিৎসায় এটুকু লাভ হয় যে, সম্পূর্ণ আরোগ্য না হলেও রোগ আর বাড়েনি। সাধারণত এ ধরনের রোগীদের সাথে মানুষ মেলা-মেশা এবং খাওয়া-দাওয়া করে না। কিন্তু হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে নিজের সাথে দস্তরখানে বসিয়ে খাবার খাওয়াতেন এবং বলতেন এ ব্যবহার শুধু তোমার জন্যই নির্দিষ্ট।

মুসনাদে আবু দাউদে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের সহায়-সম্পদ ওয়াকফকালে হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহুকে দিয়েই ওয়াকফনামা রচনা করেন।

হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর পর আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহ আনহু সাবেক খলিফাদের মত হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহুকে তাজীম করতেন।

ইবনে আসিরের (র) বর্ণনা মতে, হযরত ময়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফাতকালের শেষ সময় ইনতিকাল করেন।

তাঁর সন্তান-সন্ততির মধ্যে শুধুমাত্র এক পুত্র মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহুর সন্ধান পাওয়া যায়। হাফিজ ইবনে হাজারের (র) মত অনুযায়ী তিনি নিজের পিতার কাছ থেকে হাদীসও বর্ণনা করেছেন।

হাদীসের কিতাবসমূহে হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত কতিপয় হাদীস বর্তমান আছে। তাঁর বর্তমান হাদীসসমূহের মধ্যে দু'টির ব্যাপারে ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম ঐকমত্য পোষণ করেন এবং ইমাম মুসলিম একটি হাদীসের ব্যাপারে ভিন্নমত ব্যক্ত করেছেন।

হযরত জাকওয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জুনদুব আসলামী

হযরত জাকওয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জুনদুব প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসীম আস্থাশীল সাহাবী ছিলেন। তিনি তাঁর ওপর এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। দায়িত্বটি ছিলো কুরবানীর পশুর তত্ত্বাবধান। এ পশুকে আরবী ভাষায় 'বুদন' বলা হয়। এজন্যে হযরত জাকওয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু "সাহিবুল বুদুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম"-এর উপাধিতে বিখ্যাত ছিলেন। "নাজিয়াহ" তাঁর খেতাব ছিলো এবং মানুষ সাধারণত তাঁকে "জাকওয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জুনদুবের" পরিবর্তে "নাজিয়াহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জুনদুব বলে ডাকতো। বনু আসলাম বিন আফসা গোত্রের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিলো। তাঁর বংশনামা নিম্নরূপ ঃ

জাকওয়ান (নাজিয়াহ) বিন জুনদুব বিন উমাইর বিন ইয়ামার বিন দারিম বিন আমর বিন ওয়াছিলাহ বিন সাহাম বিন মাযান বিন সালামান বিন আসলাম বিন আফসা।

দীনের প্রতি হযরত জাকওয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহুর ছিলো উৎসর্গীকৃত মনোভাব এবং প্রচণ্ড নিষ্ঠা। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, চরিতকাররা তাঁর জীবনের কতিপয় ঘটনা ছাড়া বেশী কিছু বর্ণনার প্রয়োজন মনে করেননি। হতে পারে কতিপয় ঘটনা ছাড়া তাঁরা আর অতিরিক্ত কিছু পাননি। যা হোক তাঁর সম্পর্কে যাকিছু জানা গেছে তাই তাঁর মর্যাদা নিরূপণে যথেষ্ট।

হযরত জাকওয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু কখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এ ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। তবে এটা প্রতিষ্ঠিত যে, তিনি ৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মাররে জাহরান এবং তার আশেপাশে তাঁর গোত্র বসবাস করতো। বিভিন্ন কার্যকারণে মনে হয়, তিনি ইসলাম গ্রহণের পর মরুভূমির আবাসস্থল পরিত্যাগ করে মদীনা চলে গিয়েছিলেন। ৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চৌদ্দশ জীবন উৎসর্গকারী সাহাবী সমেত পবিত্র কা'বা ঘর জিয়ারত এবং তাওয়াফের উদ্দেশ্যে মক্কা রওয়ানা হন। এ সাহাবীদের মধ্যে জাকওয়ান বিন জুনদুব রাদিয়াল্লাহ আনহুও ছিলেন। ইবনে সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কুরবানীর পশুর তত্ত্বাবধানে নিয়োগ করেছিলেন। অন্যদিকে কোনোভাবে মক্কায় কুরাইশরা মুসলমানদের

মক্কা রওয়ানার কথা জানতে পারে। তাদের অনুমতি ছাড়া তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহীরা কি করে মক্কা প্রবেশ করতে পারে? এটা যেনো তাদের মান-সম্ভ্রমের পরিপন্থী ব্যাপার ছিলো। সুতরাং তারা মুসলমানদের বাধাদানের সিদ্ধান্ত নিলো এবং এ লক্ষ্যে খালেদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদকে (তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি) সশস্ত্র লড়াকু বাহিনীসহ মক্কা থেকে রওয়ানা করে দিলো। সহীহ আল বুখারীতে আছে, বনু খাজায়া গোত্রের সরদার বাদিল রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ারকা (যদিও তিনি সে সময় মুসলমান হননি, তবে মুসলমানদের শুভাকাংখী ছিলেন) পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মিলিত হলেন এবং কুরাইশ মুশরিকদের দুরভিসন্ধির কথা ব্যক্ত করলেন এবং এও বললেন যে, মুশরিকদের একটি দল খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে এসেছে। মক্কায় কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করার ইচ্ছা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছিলো না। এজন্যে তিনি সহগামী সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"তোমাদের মধ্যে এমন কি কেউ আছে, যে মক্কা গমনের সকল রাস্তা চিনে এবং আমাদেরকে কুরাইশদের রাস্তা বাঁচিয়ে অন্য রাস্তায় নিয়ে যাবে। (উদ্দেশ্য হলো, যুদ্ধে আগ্রহী কুরাইশ দলের সামনা সামনি যাতে মুসলমানরা না হয়)।"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ শুনে হযরত জাকওয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জুনদুব দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক, এ দায়িত্ব আমি পালন করবো।"

সুতরাং তিনি কুরাইশদের রাস্তা বাদ দিয়ে অন্য রাস্তায় মুসলমানদেরকে নিয়ে গেলেন এবং কোনো বাধা ছাড়াই তাদেরকে হুদাইবিয়া পৌঁছে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে মুসলমানদেরকে তাঁবু ফেলার নির্দেশ দিলেন। সহীহ আল বুখারীতে হযরত বারা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আযিব থেকে বর্ণিত আছে যে, হুদাইবিয়াতে একটি কূপ ছিলো। মুসলমানরা কূপের সব পানি তুলে ফেললো। ফলে কূপটি শুকিয়ে গেলো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ খবর দেয়া হলো। তিনি কূপের কাছে বসে পড়লেন। কিছু পানি আনালেন এবং কুলি করে কূপের মধ্যে ফেললেন। কিছুক্ষণ পর কূপে অঢেল পানি হয়ে গেলো। এ পানি সবাই এবং উটগুলোও পান করলো।

সহীহ আল বুখারীতেই হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ আনসারী থেকে বর্ণিত আছে যে, হুদাইবিয়াতে পানির স্বল্পতার কারণে আমরা পিপাসার্ত হয়ে

পড়লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ছোট্ট পাত্র দিয়ে অযু করছিলেন। সকলেই ঘাবড়াতে ঘাবড়াতে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার ? তাঁরা আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাদের পানি নিঃশেষ হয়ে গেছে। আপনার সামনের পাত্রই এখন সম্বল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে পাত্রে নিজের পবিত্র হাত রাখলেন। রাখার সাথে সাথে তার আঙ্গুলের মাঝ দিয়ে ঝরণার মতো পানি প্রবাহিত হয়ে গেলো। এ পানি সকলেই পান ও অযু করলেন।

অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে, হুদাইবিয়াতে যত্রতত্র শুকনো গর্ত ছিলো। সাহাবা রাদিয়াল্লাহ আনহুম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পানি দুষ্প্রাপ্যতার কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তুনীর থেকে একটি তীর বের করে হযরত জাকওয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহুকে দিলেন এবং তীরটি কোনো গর্তে গেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি তা একটি গর্তে গেড়ে দিলেন এর বরকতে শুকনো গর্তে পানির ধারা প্রবাহিত হতে লাগলো।

হুদাইবিয়াতে অবস্থানকালেই একদিন হযরত জাকওয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আরজ করলেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার অনুমতি হলে কুরবানীর পশুগুলোকে হেরেমে নিয়ে গিয়ে আমি যবেহ করে দেবো।"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "কুরাইশ মুশরিকরা মুসলমানদেরকে মক্কা প্রবেশে বাধাদানের জন্যে লড়াই করে মরার প্রতিজ্ঞা নিয়ে বসে আছে। এ অবস্থায় তুমি কিভাবে পশু হেরেমে নিয়ে গিয়ে যবেহ করতে পারো।"

তিনি আরজ করলেন, "আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর উৎসর্গ হোক। আমি পশুগুলোকে এমন রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাবো যে, কুরাইশরা তার সন্ধানই পাবে না।"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "ঠিক আছে। তুমি পশুগুলো নিয়ে যাও।"

হাফিজ ইবনে হাজার (র) ইসাবাহ গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত জাকওয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত সতর্কতা এবং গোপনভাবে পশুগুলোকে হেরেমে নিয়ে গেলেন ও সেখানে যবেহ করে ফিরে এলেন।

"হুদাইবিয়াতে বাইয়াতে রেদওয়ানের" বিরাট ঘটনা সংঘটিত হলো। হযরত জাকওয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহুও অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে প্রিয়

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে লড়াই করে মৃত্যুর বাইয়াত নিলেন। এভাবে তিনি সেসব ভাগ্যবান সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন যাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক এ ভাষায় নিজের সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিয়েছেন ঃ

"আল্লাহ অবশ্যই ঈমানদারদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা এ বৃক্ষের নীচে তোমার হাতে বাইয়াত হচ্ছিলেন।"

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর খায়বারের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এ যুদ্ধে হুদাইবিয়াতে উপস্থিত সকল সাহাবীই অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত জাকওয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জুনদুবও এতে অংশ নেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্র অনুসারে চুক্তি হয়েছিলো যে, মুসলমানরা আগামী বছর কোনো অস্ত্র ছাড়াই মক্কা এসে ওমরাহ আদায় করতে পারবে। বস্তুত সপ্তম হিজরীর জিলকদ মাসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের এক বড় দল সমভিব্যহারে ওমরাহ পালনের জন্যে মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন। ইতিহাসে এ ওমরাহ "ওমরাতুল কাযা" নামে প্রসিদ্ধ। এবারও হযরত জাকওয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জুনদুবকে কুরবানীর পশু নিয়ে যাওয়া ও তার তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব সমর্পণ করা হয়। সুতরাং তিনি মুসলমানদের বড় কাফেলা রওয়ানা হওয়ার আগেই নিজের গোত্রের চারজন যুবককে সাথে নিয়ে কুরবানীর পশু মক্কা মুয়াজ্জমা নিয়ে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় এলেন। হযরত জাকওয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু সহ সব মুসলমান অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে ওমরাহ আদায় করলেন এবং ওয়াদা অনুযায়ী তিনদিন পর মক্কা মুয়াজ্জমা থেকে ফিরে এলেন।

অষ্টম হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা মুয়াজ্জমাতে ইসলামের পতাকা উড্ডীন এবং বায়তুল্লাহ শরীফকে মূর্তি থেকে পবিত্র করলেন। মক্কা বিজয়ের সময় ১০ হাজার জীবন উৎসর্গকারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। এ ধারণাই সঙ্গত যে, হযরত জাকওয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জুনদুবও তাঁদের সাথে শরীক ছিলেন এবং হুনাইনের যুদ্ধেও তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহগামী ছিলেন।

দশম হিজরীর জিলকদ মাসে সারওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের জন্যে মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন। আল্লামা ইবনে সায়াদের (র) বর্ণনা মতে, এবারও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পশুর তত্ত্বাবধানের দায়িত্বভার হযরত জাকওয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওপরই ন্যস্ত করেছিলেন। সহীহ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ

আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তির সাথে (বিদায় হজ্জের সময়) ১৬টি উট প্রেরণ এবং তাকেই তার তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করলেন। তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এ সকল উটের কোনোটি যদি রোগ অথবা ক্লান্তিজনিত অবসাদে পথ চলতে না পারে, তাহলে আমি কি করবো ? তিনি বললেন, উটটি যবেহ করে ফেলবে এবং তার গলার জুতোগুলো তার রক্তে ডুবিয়ে চুটের ওপর সিল মেরে দেবে। তার গোশত তুমি এবং তোমার সাথী খাবে না।

এ রাওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু উটের তত্ত্বাবধায়কের নাম উল্লেখ করেননি। কিন্তু মুয়াত্তায় ইমাম মালেক, মুসনাদে আবু দাউদ, মুসনাদে দারেমী ও জামে তিরমিযির এক হাদীসে প্রমাণিত হয় যে, এ তত্ত্বাবধায়ক হযরত জাকওয়ানই (নাজিয়াতুল আসলামী) ছিলেন। এ হাদীস স্বয়ং হযরত জাকওয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জুনদুব থেকেই বর্ণিত। তাতে তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! কুরবানীর পশুর মধ্যে যদি কোনো পশু মুমূর্ষু অবস্থায় এসে পৌছে তাহলে আমি কি করবো ? তিনি বললেন সে পশুকে যবেহ করে ফেলবে এবং তার রক্ত দিয়ে তার ঘাড়ে সীল মেরে দেবে। অতপর তা মানুষের খাওয়ার জন্য দিয়ে দেবে।

বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর হযরত জাকওয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু দীর্ঘ দিন জীবিত ছিলেন। কিন্তু তার কোনো তৎপরতার খবর পাওয়া যায়নি। ইবনে সায়াদ (র) বলেছেন, তিনি আমীরে মুয়াবিয়ার খেলাফতকালে ওফাত পান।

হযরত উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন উসাইদ সাকাফী

নবুয়াত প্রাপ্তির প্রথম যুগে একদল সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হক দাওয়াতের প্রতি লাব্বাইক বা সাড়া দিয়েছিলেন। তাঁরা কুরাইশ মুশকিরদের ক্রোধ ও গোস্বার স্বীকার হন। কিন্তু আল্লাহর এ সকল পবিত্র বান্দাহ কোনো ধরনের ভয়-ভীতি, চাপ ও যুলুম-নির্যাতনে হক পথ থেকে বিচ্যুত হননি এবং তাঁরা বছরের পর বছর ধরে বিভিন্নমুখী যুলুম-নির্যাতন সবর ও দৃঢ়তার সাথে সইতে থাকেন। হযরত উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুও ইসলামের এ পবিত্র দলের একজন সদস্য ছিলেন। ইতিহাসে তিনি নিজের কুনিয়াত "আবু বুসাইর" নামে খ্যাত।

তার সম্পর্ক তায়েফে বসবাসকারী বনু সাকিফের লড়াকু গোত্রের সাথে ছিলো। কিন্তু কুরাইশের সাথে নিকট সম্পর্কের ভিত্তিতে তারা মক্কায় স্থায়ী বাসীন্দা হয়ে যায়। তার বংশ তালিকা নিম্নরূপ ঃ

আবু বুসাইর উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন উসাইদ বিন জারিয়াহ বিন উসাইদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবি সালমাহ বিন আবদুল্লাহ বিন গাইরাহ বিন আওফ বিন সাকিফ।

মায়ের নাম ছিলো সালিমাহ। তাঁর বংশনামা হলো ঃ সালিমাহ বিনতে আবদ বিন ইয়াজিদ বিন হাশিম বিন মুত্তালিব।

হযরত উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু সজ্জন প্রকৃতির লোক ছিলেন। হক দাওয়াতের আওয়াজ তাঁর কানে প্রবেশ করতেই তিনি বিনা চিন্তায় এবং নির্দ্বিধায় ইসলাম কবুল করেন। মক্কার মুশরিকদের কাছে তাঁর এ "তৎপরতা" অসহনীয় ব্যাপার ছিলো। তারা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে যুবক উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। সেখানে তিনি দীর্ঘকাল ধরে অবর্ণনীয় মুসিবতের বোঝা বইতে থাকেন।

৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদাইবিয়ার সন্ধির পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারা তাশরীফ আনলেন। এ সময় হযরত উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু একদিন সুযোগ পেয়ে কাফেরদের কারাগার থেকে ভেগে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে গিয়ে হাজির হন।

হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্রে কয়েকটি শর্ত ছিলো। তার মধ্যে একটি শর্ত এও ছিলো যে, কোনো মুসলমান মুশরিকদের কাছ থেকে পালিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে পৌছলে তাকে তিনি ফিরিয়ে দেবেন। মক্কার মুশরিকরা হযরত উতবাহ্ রাদিয়াল্লাহ আনহুর পলায়নে চেঁচিয়ে গাঁ মাথায় করলো। যখন তারা শুনলো যে, সে মদীনা পৌছে গেছে, তখন তৎক্ষণাৎ তারা দু' ব্যক্তিকে হুজুরের কাছে প্রেরণ করলো। এ দু' ব্যক্তির কাছে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লিখে পাঠালো যে, চুক্তি মুতাবিক আপনি আমাদের লোককে ফেরত পাঠিয়ে দিবেন।

হযরত উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে মক্কায় ফেরত পাঠানোর অর্থই ছিলো তাঁকে পুনরায় মুশরিকদের যুলুম-নির্যাতনের পাঞ্জায় নিক্ষেপ করা। কিন্তু রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অঙ্গীকার ও চুক্তি পালনকে ঈমানের অংশ হিসেবে আখ্যায়িত করতেন। এজন্যে তিনি হযরত উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বললেন ঃ

"আবু বুসাইর, তুমি জানো যে, সন্ধিপত্রের শর্ত অনুযায়ী তোমাকে আমার কাছে রাখতে পারি না। যদি রাখি তাতে চুক্তি ভঙ্গ হবে। আর চুক্তি ভঙ্গ আমাদের দীনে জায়েয নয়। এজন্যে তুমি এখন ফিরে যাও। অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ পাক তোমার এবং অন্যান্য মযলুম মুসলমানদের মুক্তির কোনো পথ করে দেবেন।"

হযরত উতবাহ আরজ করলেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি আমাকে পনুরায় মুশরিকদের কাছে পাঠাচ্ছেন। এতে তারা আমাকে হক পথ থেকে বিচ্যুত করবে।"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আবু বুসাইর যাও। শীঘ্রই আল্লাহ পাক তোমার এবং অন্যান্য মুসলমানের মুক্তির একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।"

হযরত উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পালনার্থে কুরাইশদের লোকদের সাথে রওয়ানা দিলেন। জুল হালিফাহ পৌছে তাঁর তত্ত্বাবধায়ক দু'জন খেজুর খাওয়ার জন্যে যাত্রা বিরতি করলো। হযরত উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদের একজনকে বললেন ঃ

"জানে বিরাদার ! (প্রাণের ভাই) তোমার এ তরবারী খুবই ভালো মনে হয়।"

তরবারীর মালিক নিজের তরবারীর প্রশংসা শুনে অত্যন্ত খুশী হয়ে বললো, "অবশ্যই এ তরবারী খুবই ভালো, আমি বহুবার তা পরীক্ষা করেছি।"

হযরত উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, "একটু দেখাওনা ভাই।"

সে তৎক্ষণাৎ খাপ থেকে বের করে হযরত উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুর হাতে দিলো। উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পালনার্থে অবশ্য কুরাইশের লোকদের সাথে চলে এসেছিলেন। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে তিনি কাফেরদের যুলুম-নির্যাতনের শিকার ছিলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে কোনো অবস্থাতেই তিনি দ্বিতীয়বারের মতো তাদের কাছে ফিরে যেতে চাইছিলেন না। সুতরাং তরবারী হাতে আসতেই তিনি তার মালিকের মাথা উড়িয়ে দিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে মদীনায় মসজিদে নববীতে গিয়ে উপস্থিত হলো। মসজিদে নববীতে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাকে অপ্রকৃতিস্থ দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তুমি এত পেরেশান হয়েছো কেন এবং ফিরেই বা এসেছো কেনো?" সে সকল ঘটনা বর্ণনা করলো। এতক্ষণে হযরত উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে উপস্থিত হলেন।

তিনি আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি চুক্তির শর্ত পূরণ করেছেন এবং নিজের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। আল্লাহ আমাকে হিম্মত দিয়েছেন এবং স্বাধীন হয়ে গিয়েছি।"

কুরাইশের লোককে হত্যা করে হযরত উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুর এভাবে প্রত্যাবর্তন কুরাইশদের উত্তেজিত করার কারণ হতে পারতো। এজন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

"এ ব্যক্তি (উতবাহ) যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলনের অস্ত্র। সে যদি কতিপয় সাহায্যকারী এবং সাথী যোগাড় করতে পারে তাহলে যুদ্ধ বাধিয়ে বসবে।"

হযরত উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ দিয়ে উচ্চারিত এ বাক্য শুনলেন। এতে স্থির বিশ্বাস হলো যে, মদীনায় আর তাঁর পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। তিনি নীরবে সেখান থেকে বের হয়ে সমুদ্রপোকূলের দিকে রওয়ানা দিলেন।

হযরত আবু বুসাইর উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু উপকূলবর্তী স্থান "আইসে" গিয়ে অবস্থান নিলেন। আইসের কাছে ছিলো একটি সড়ক। এ সড়ক দিয়েই কুরাইশদের বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়া যাতায়াত করতো। কিছুদিন পর আরো একজন নির্যাতিত সাহাবী হযরত আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন সুহায়েলও মক্কার মুশরিকদের কারাগার থেকে পালিয়ে আইস এসে উপস্থিত হলেন। অন্যান্য নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য এখন পথ খুলে গেলো। যে-ই সুযোগ পেত সে-ই কুরাইশদের নির্যাতনের পাঞ্জা থেকে পালিয়ে সোজা আইস

এসে পৌঁছতো। কিছুদিনের মধ্যেই হযরত উতবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে মুসলমানদের একটি দল একত্রিত হলো। তাঁরা মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের এক আশ্চর্য ধরনের পরিকল্পনা নিলো। কুরাইশের কোনো বাণিজ্যিক কাফেলা এ পথ দিয়ে অতিক্রম করলেই তারা তার ওপর আক্রমণ করে নাস্তানাবুদ করে ছাড়তো। কুরাইশের মুশরিকরা হযরত উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুর এ অতর্কিত আক্রমণে খুব অস্থির হয়ে পড়লো। কেননা তাদের বাণিজ্যই বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। অবশেষে তারা নিরুপায় হয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পয়গাম প্রেরণ করলো। এ পয়গামে তারা জানালো, আগামীতে যে মুসলমান ভেগে যাবে, সে স্বাধীন হয়ে যাবে। তাকে ফিরিয়ে দেয়ার দায়-দায়িত্ব আর আপনার ওপর বর্তাবে না। এ সাথে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আরো একটি নিবেদন পেশ করলো। আইসে অবস্থানরত মুসলমানরা আর যাতে তাদের বাণিজ্যিক কাফেলার ওপর হামলা না করে সেই ব্যবস্থা গ্রহণের কথা নিবেদনে উল্লেখ করা হলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশের এ প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন এবং আইসের স্বাধীন মুসলমানদেরকে লিখে পাঠালেন যে, আবু বুসাইর উতবাহ এবং আবু জানদাল মদীনা চলে আসবে। অবশিষ্টরা বিচ্ছিন্নভাবে নিজেদের বাড়ী পৌঁছে যাবে। সহীহ আল বুখারীতে আছে—এ সময় কুরআন পাকের এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

"আল্লাহ সেই সত্বা যিনি মক্কার উপত্যকায় দুশমনের হাত তোমাদের দিয়ে এবং তোমাদের হাত তাদের দিয়ে রুখে দিয়েছেন, তাদের ওপর বিজয়ী হওয়ার পর।"

অন্য এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী এ আয়াত তখন নাযিল হয় যখন মুসলমানরা ৮০জন মুশরিককে গ্রেফতার করে। এ মুশরিকরা মুসলমানদের ওপর হামলার ইচ্ছা নিয়ে এসেছিলো। রহমতে দো আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দয়াপরবশ হয়ে তাদের সবাইকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফরমান যখন হযরত উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু পেলেন তখন তিনি মুমূর্ষ অবস্থায় ছিলেন। পবিত্র চিঠি হাতে নিয়ে পড়তে লাগলেন এবং পড়তে পড়তেই আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে চলে গেলেন।

হযরত আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহু জানাযার নামায পড়ালেন এবং আইসেই তাঁর লাশ দাফন করলেন এবং স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ কাছেই একটি

মসজিদ নির্মাণ করালেন। এরপর তিনি মদীনা মুনাওয়ারা চলে এলেন। অন্যান্য মুসলমানরা যার যার বাড়ী চলে গেলেন।

হযরত আবু বুসাইর উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে চরিত গ্রন্থগুলো নীরব রয়েছে। অবশ্য এতটুকু জানা যায় যে, তিনি লেখাপড়া জানতেন এবং একজন বাহাদুর ও চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিঠি থেকে প্রকাশ পায় যে, তিনি তাঁর স্বাধীন চেতা মনোভাবকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। এজন্যেই তিনি তাঁকে মদীনা ডেকে পাঠিয়েছিলেন। যদি জীবিত থাকতেন তাহলে হযরত আবু জানদালের মতই পরের যুদ্ধসমূহে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহগামী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারতেন।

হযরত মুগিরাহ্ রাদিয়াল্লাহ্ আনহু বিন শু'বা সাকাফী

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১১ হিজরীতে এ নশ্বর জগত থেকে বিদায় নিলেন। তাঁর ইনতিকালে সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুমের ওপর যেন কিয়ামত আপতিত হলো। দুনিয়াটা তাঁদের কাছে তমসাচ্ছন্ন হয়ে গেলো। শোকে দুঃখে তাঁরা মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছার কাছে মাথানত করা ছাড়া আর কিইবা করার ছিলো। জানাযার নামায পড়ে অন্তরের ওপর পাথর চাপা দিয়ে তাঁরা ভালোবাসার আধার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র লাশ কবরে নামিয়ে দিলেন। এ সময় উসকো খুসকো চুল সম্বলিত লম্বা ও সুঠাম দেহী একজন সাহাবীর দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ের এক আশ্চর্যজনক অবস্থা পরিলক্ষিত হচ্ছিলো। শোক-দুঃখে ম্লান এক প্রতিচ্ছবি যেনো। অস্থিরতা এবং অশান্তিতে বার বার হাত ডলছিলেন। হঠাৎ করে আঙ্গুল থেকে আংটিটি খুলে পবিত্র কবরে পড়ে গেলো। হযরত আলী কাররামুল্লাহু ওয়াজহাহু কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন, কবরে নেমে নিজের আংটি বের করে নাও। তিনি কবরে নামলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র পায়ে হাত লাগালেন। অতপর বললেন, মাটি নিক্ষেপ করো। যখন কিছু মাটি ফেলা হলো, তখন তিনি অশ্রুসজল নেত্রে অনন্যোপায় হয়ে পবিত্র কবর থেকে বেরিয়ে এলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ সাহাবী সবার শেষে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়েছিলো। এ সাহাবী ছিলেন হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন শু'বা।

হযরত আবু আবদুল্লাহ মুগিরাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন শু'বা তাঁর যুগে একজন নামকরা রাজনৈতিক পরামর্শদাতা ছিলেন। তিনি তায়েফে বসবাসকারী মশহুর কবিলাহ "বনু সাকিফের" আশা-আকাংখার আলোকবর্তিকা স্বরূপ ছিলেন। তাঁর বংশ নামা হলো ঃ

মুগিরাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন শু'বা বিন আবি আমের বিন মাসউদ বিন মুয়াত্তাব বিন মালিক বিন কায়াব বিন আমর বিন আওফ বিন কায়েস।

কতিপয় রাওয়ায়েতে তাঁর কুনিয়াত আবু আবদুল্লাহ ছাড়া আবু ইসাও বর্ণনা করা হয়েছে।

বনু সাকিফ গোত্রের লোকেরা বিদ্রোহী প্রকৃতির এবং লড়াকু ছিলো। সবুজ-শস্য-শ্যামল ভূমি, বাগান এবং ধন-সম্পদের আধিক্য তাদেরকে অহমিকার তুঙ্গে তুলে রেখেছিলো। নবুয়াত প্রাপ্তির দশম বছরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওহীদের দাওয়াতদানের জন্যে তায়েফে তাশরীফ নেন। এ সময় তারা আরবদের প্রথাগত মেহমানদারীকে "তাকে" উঠিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এমন অসদাচরণ করলো যে, মানবতা মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো। নবম হিজরীর আগে তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করতে পারেননি। অবশ্য দু' একজন সৌভাগ্যবান সাহাবী এর আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত মুগিরাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন শু'বা এমনি ভাগ্যবান সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হাফিজ ইবনে আবদুল বার (র) "আল ইসতিয়াবে" লিখেছেন, হযরত মুগিরাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন শু'বা পঞ্চম হিজরীতে ঈমান আনেন এবং সে বছরই হিজরত করে মদীনা গমন করেন। কতিপয় রাওয়ায়েতে আছে, তিনি জাহেলী যুগে কয়েকজন লোককে হত্যা করেছিলেন। যদিও বনু সাকিফ গোত্রের প্রখ্যাত সরদার উরওয়াহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মাসউদ তাঁর তরফ থেকে এ হত্যার দিয়ত বা খেসারত আদায় করেছিলেন তবুও তিনি স্বদেশে অবস্থান করেননি। পালিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে মদীনা চলে আসেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইয়াত ও ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর সেখানেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত মুগিরাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের সময়ের বেশীর ভাগ অংশই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কাটাতেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফয়েজ লাভ করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তাঁর ছিলো সীমাহীন ও অগাধ ভালোবাসা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতের জন্যে তিনি এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো নির্দেশ দিলেই তৎক্ষণাৎ তিনি তা পালন করতেন। তাঁর অযুর পানি এনে দিতেন। তাঁর জন্যে পবিত্র আবাসস্থল রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও তিনিই আনজাম দিতেন। তাঁর উট চরাতে নিয়ে যেতেন। বস্তুত তিনি ছিলেন শিক্ষিত মানুষ। এজন্যে কোনো কোনো সময় অহী লেখার সৌভাগ্যও তাঁর হতো।

৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওমরাহর উদ্দেশ্যে মক্কা রওয়ানা হলেন। এ সময় ১৪শ সাহাবী তাঁর সাথে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত মুগিরাহ বিন শু'বাও অন্তর্ভুক্ত হন। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর পেলেন যে, মক্কার মুশরিকরা

মুসলমানদেরকে বাধা দিতে চায় এবং তারা একটি সেনাদল এ উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে পাঠিয়েও দিয়েছে। এ অবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিচিত রাস্তা ছেড়ে অন্য এক রাস্তা দিয়ে হুদাইবিয়া পৌঁছে তাঁবু খাটালেন। কেননা তিনি তো লড়াই করতে চাননি। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়া থেকে একজন দূত কুরাইশদের কাছে প্রেরণ করলেন। তিনি দূতের মাধ্যমে বলে পাঠালেন যে, তাঁরা লড়াই করতে চান না। ওমরাহ আদায় করে ফিরে যাবেন। এর জবাবে কুরাইশরা উরওয়াহ বিন মাসউদ সাকাফীকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আলোচনার জন্যে প্রেরণ করলেন। উরওয়াহ সে সময় ইসলাম গ্রহণ করেননি। যদিও তিনি তায়েফের বাসিন্দা ছিলেন, তবুও মক্কার কুরাইশরাও তাঁকে খুব মানতো এবং নিজেদের একজন বুযর্গ হিসেবে সমীহ করতো। উরওয়াহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছে আলোচনা শুরু করলো। আরবের সাধারণ প্রথা অনুসারে বারবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র দাড়ির দিকে হাত এগিয়ে নিচ্ছিলো। এ সময় হযরত মুগিরা বিন শু'বা রাদিয়াল্লাহ আনহু দাড়ি ঊর্ধমুখী রাখার জন্যে মুখের ওপর কাপড় বেঁধে এবং অস্ত্র সজ্জিত হয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিঠের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। উরওয়ার আলাপ-আলোচনার ধরন তিনি বরদাশত করতে পারছিলেন না। বারবার নিজের তলোয়ারের হাতলের দিকে হাত বাড়াচ্ছিলেন। অবশেষে ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো এবং ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন ঃ "তুমি জানো না, কার সাথে কথা বলছো। খবরদার ! হাত আর আগে বাড়িও না।"

উরওয়াহ তাঁর কণ্ঠস্বর চিনতে পারলেন এবং বললেন, "হে দাগাবাজ ! তুমি কি আমার ইহসান ভুলে গেছো ? এখানে একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যে ঘটনায় উরওয়াহ রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত মুগিরা তরফ থেকে খুনের বদলা আদায় করেছিলেন।

হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, তুমি যেই হও না কেনো, নিজের হাত পেছনে রাখো।"

উরওয়াহ কুরাইশদের কাছে ফিরে গেলো এবং তাদেরকে একত্রিত করে এ বক্তব্য পেশ করলেন ঃ

"হে কুরাইশ ভাইয়েরা ! আমি বিশ্বের বড় বড় রাজা-বাদশাদের (রোমের কাইসার, ইরানের কিসরা, হাবশার নাজ্জাশীর) কাছে গমন করেছি—কিন্তু মুহাম্মদের সাথীরা যেভাবে তাঁর প্রতি অনুরক্ত এবং যেভাবে তাঁর তাজিম ও সম্মান করে এ ধরনের আমি কোনো বাদশার দরবারে প্রত্যক্ষ করিনি। মুহাম্মদ

থুথু নিক্ষেপ করেন। এসব সাহাবীর সে থুথু নিজের হাতে নেয় এবং তা শরীরে ও চেহরায় মেখে নেয়। মুহাম্মদ অযু করেন। এসব মানুষ ব্যবহৃত পানির প্রতি ফোটার দিকে এমনভাবে ধাবিত হয় যে, তারা যেন পরস্পর লড়াই করে মারা যাবেন। মুহাম্মদ কোনো নির্দেশ দিলে তা প্রত্যেকেই পালনের জন্যে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। তাঁর সামনে কেউ উচ্চস্বরে কথা বলে না এবং তাঁর দিকে কেউ চোখ তুলে তাকায়ও না। আমার কথা যদি শোনো, তাহলে মুহাম্মাদের সাথে সন্ধি করে ফেলো।"

কুরাইশরা উরওয়াহর কথায় প্রভাবিত হলো, কিন্তু সন্ধির দিকে অগ্রসর হলো না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ওসমান জুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুকে দূত বানিয়ে প্রেরণ করলেন। কুরাইশরা মক্কায় তাঁকে আটক করলো। যখন তিনি ফিরলেন না তখন মুসলমানদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুকে কুরাইশ মুশরিকরা শহীদ করে ফেলেছে। এতে মুসলমানদের মধ্যে আবেগ উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর খুনের বদলা নেয়া ফরয। একথা বলেই তিনি একটি বাবলা বৃক্ষের নীচে বসে পড়লেন এবং সাহাবা রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের কাছ থেকে জীবন উৎসর্গ করার বাইয়াত গ্রহণ করলেন। এ বাইয়াতের নামই বাইয়াতে রিদওয়ান অর্থাৎ খোদার সন্তুষ্টির বাইয়াত। কেননা এ বাইয়াতে অংশগ্রহণকারী সাহাবা রাদিয়াল্লাহ আনহুমদেরকে আল্লাহ পাক প্রকাশ্য ভাষায় নিজের সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিয়েছেন। সূরা আল ফাতাহতে এসব পবিত্র আত্মার সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ

"অবশ্যই আল্লাহ ঈমানদারদের ব্যাপারে খুশী হয়েছেন যখন তারা এ বৃক্ষের নীচে তোমার কাছে বাইয়াত নিচ্ছিলেন।"

হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন শু'বারও বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছিলো। এদিক দিয়ে তিনি 'আসহাবিশ শাজারাহ'র" মহান মর্যাদায় দলভুক্ত। এসব সাহাবী ঈমানের আবেগ এবং ত্যাগের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। কুরাইশরা যখন একথা জানতে পারলো তখন তাদের সাহসে ভাটা পড়লো। তারা হযরত ওসমান জুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ফেরত পাঠিয়ে দিলো এবং সন্ধির দিকে অগ্রসর হলো। বস্তুতঃ সন্ধিনামা লিখিত হলো এবং মুসলমানরা আল্লাহর তরফ থেকে প্রকাশ্য বিজয়ের সুসংবাদ পেয়ে হুদাইবিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু খায়বার, মক্কা বিজয়, তাবুক এবং আরো কয়েকটি যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নবম হিজরীর শাবান অথবা রমযান মাসে তায়েফবাসী কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তির একটি প্রতিনিধি দল আবদি ইয়ালিলের নেতৃত্বে মদীনা প্রেরণ করলো। এ দল মদীনার অদূরে 'জি হারছ' নামক স্থানে পৌছলে মুগিরা বিন শু'বা রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে সাক্ষাত হলো। তিনি সেখানে উট চরাচ্ছিলেন। তিনি সাকাফী ভাই-বন্ধুদের আগমনের হেতু জানতে পেরে খুব খুশী হলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ খবর দেয়ার জন্যে মদীনার দিকে দৌড় দিলেন। রাস্তায় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে দেখা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার ? এ রকম দৌড়াচ্ছো কেন ? হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু সাকিফ প্রতিনিধি দলের আগমনের খবর দিলেন। এ খবর পেয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে কসম দিয়ে বললেন, এ সুসংবাদ আমাকে পৌছাতে দাও।

হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে অত্যন্ত সমীহ করতেন। তিনি তাঁর কথা মেনে নিলেন এবং রাস্তা থেকেই প্রতিনিধি দলের কাছে ফিরে গেলেন।

সাইয়েদেনা সিদ্দিকে আকবার রাদিয়াল্লাহ আনহুকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাকিফ প্রতিনিধি দলের আগমনের সংবাদ দিলেন। খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও খুব খুশী হলেন। ইত্যবসরে হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রতিনিধি দলের সদস্যদেরকে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হলেন। হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌছে কিভাবে সালাম দিতে হবে তা তাদেরকে শিক্ষা দিলেন। কিন্তু তাদের হাড় এবং শিরা-উপশিরায় জাহেলিয়াত বাসা বেঁধে ছিলো। তারা নিজেদের জাহেলী নিয়ম মুতাবেক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামকে সাল্লাম করলো। এজন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতি বিরক্ত হলেন না। হযরত মুগিরাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবানী হোক। এরা আমার কাওমের মানুষ। আপনি অনুমতি দিলে তাদেরকে আমার মেহমান বানাতে এবং যত্ন-আত্তির করতে পারি।"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

"নিজের কাওমের সম্মান করতে আমি তোমাকে নিষেধ করবো না। কিন্তু তাদেরকে এমন স্থানে রাখবে যেখানে তাদের কানে কুরআনের আওয়াজ পৌছতে পারে এবং তারা মুসলমানদের নামায পড়া দেখতে পারে।"

বস্তুত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইঙ্গিতে মসজিদে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চত্বরে তাঁবু টাঙিয়ে সাকিফ প্রতিনিধি দলকে রাখা হলো।

মদীনায় অবস্থানকালে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা কুরআন পাঠ শুনে এবং মুসলমানদেরকে নামায পড়তে দেখে খুব প্রভাবিত হলো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও প্রতিদিন ইশার নামাযের পর তাদের কাছে তাশরীফ নিতেন এবং বহুক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলতেন। অবশেষে প্রতিনিধিদল শর্ত সাপেক্ষে হক গ্রহণে তৈরি হয়ে গেলো। কিন্তু নিজেদের মাবুদ "লাতের" ব্যাপারে তাদের অন্তরে কঠিন ভয় বিরাজমান ছিলো। ইসলাম গ্রহণের শর্ত নিরূপিত হয়ে যাওয়ার পর তারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো ঃ "আমাদের মূর্তি লাতের ব্যাপারে আপনার অভিপ্রায় কি ?" হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "লাতকে ভেঙ্গে ফেলা হবে।"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ শুনে তারা মূর্ছা যাওয়ার উপক্রম হলো। তারা বললো, "লাত যদি আপনার অভিপ্রায়ের কথা জানতে পারে, তাহলে সে আমাদেরকে ধ্বংস করে ফেলবে।"

হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুও সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আর ক্রোধ সম্বরণ করতে পারলেন না। তিনি তাদেরকে তিরস্কার করে বললেন, "তোমরা একটি জীবনহীন পাথরকে এত ভয় করো ?" প্রতিনিধি দলের সদস্যরা অসন্তুষ্ট হয়ে বললো ঃ "ওমর তুমি কথা বলো না, আমরা তোমার কাছে আসিনি।" একথা বলেই তারা হুজুরের খিদমতে আরজ করলো ঃ "আমাদের তো লাতের গায়ে হাত দেয়ার মতো সাহস নেই। আপনি যা ইচ্ছা তাই করুন।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশী হয়ে বললেন ঃ "ঠিক আছে মূর্তি ভাঙ্গার দায়িত্ব আমাদের। তোমরা এ কাজ করো না।"

এরপর প্রতিনিধি দলের সকল সদস্য ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং স্বদেশে ফিরে গেলেন। সাকিফ প্রতিনিধি দলের প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন শু'বা এবং হযরত আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন হারবকে [অন্য এক রাওয়ায়েত মুতাবিক হযরত খালেদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদকেও] তায়েফ প্রেরণ করলেন। লাত এবং তার ইবাদাতখানাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যেই তাঁদেরকে সেখানে পাঠানো হয়। প্রতিনিধি দলের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর অধিকাংশ বনি সাকিফ এবং তাদের মিত্ররা ইসলাম গ্রহণ

করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের অন্তর থেকে "লাতের" ভীতি দূর হয়নি। আল্লামা তাবারী বলেছেন, বনু সাকিফের মহিলাদের অন্তর থেকে কুফর ও শিরকের রং দূর করতে অনেক সময় লেগেছিলো। তারা লাতকে খুব মান্য করতো। তার কাছে অন্তরের কামনা-বাসনা প্রার্থনা করতো। হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন শু'বা তায়েফ পৌঁছেই পাথরের মূর্তি "লাত" ভাঙ্গার কাজ শুরু করলেন। এতে সাকাফী মহিলারা কাঁদতে কাঁদতে বুকের ছাতি ফাটাতে ফাটাতে এবং মাথার কাপড় ফেলে ঘর থেকে বের হয়ে এলো এবং এ কবিতা আবৃত্তি করে নিজেদের পুরুষদেরকে ভর্ৎসনা করতে লাগলো ঃ

"সেসব ভীরুদের জন্য ক্রন্দন করো যারা নিজেদের মূর্তিকে শত্রুর কাছে ন্যস্ত করে দিয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াইও করেনি।" হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদের এ শোরগোলের কোনো পরওয়া করলেন না। প্রথমে লাতের মূর্তি ভাঙ্গলেন। তারপর মন্দিরের প্রাচীরের উপর চড়ে ভাঙ্গা শুরু করলেন। তাঁর সাথীরাও তাঁকে সাহায্য করলেন এবং সবাই মিলে শুধুমাত্র ভবনের প্রতিটি পাথরই ভাঙ্গলেন না বরং ভিত্তি পর্যন্ত খুঁড়ে ফেললেন। মন্দিরের ধ্বংসের পর তায়েফবাসীর অন্তর থেকে ভয় দূর হলো এবং তাদের মধ্যে তাওহীদের ভিত্তি মযবুত হলো। এখন তারা ইসলামের তরবারী হিসেবে আবির্ভূত হলেন। দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জের সময় সকল বনী সাকিফই অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে হজ্জে অংশগ্রহণ করলেন। হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন শু'বা এবারও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহযাত্রী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।"

বিশ্বনেতা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতেকালের পর তাঁর পবিত্র কবরে হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর আংটি পতিত হওয়ার ঘটনা উপরে বর্ণিত হয়েছে। কতিপয় চরিতকার ধারণা প্রকাশ করেছেন যে, হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের আংটি পবিত্র কবরে ফেলে দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে সবার শেষে তিনিই বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন, এ মর্যাদায় স্মরণ করার আশায় তিনি এ কাজ করেছিলেন। ইবনে আসয়াদের (র) বক্তব্য অনুসারে তিনি সবসময় জনসমক্ষে এ ব্যাপারে ফখর করতেন। তিনি বলতেন আমি তোমাদের সবার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে সবার পরে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলাম।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতেকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু খেলাফতের দায়িত্বে সমাসীন হন। এ সময় হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন শু'বা সকল মুসলমানের মত আনন্দচিত্তে

তার বাইয়াত করেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাসনামলের প্রথম দিকে ধর্মদ্রোহিতার ফেতনা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নেন। ইমাম হাকিম (র) নিজের "মুসতাদরাকে" লিখেছেন, হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু ইয়ামামার মুরতাদদের উৎখাতে অগ্রগামী ছিলেন। মুরতাদদের সম্পূর্ণরূপে উৎখাতের পর তিনি মদীনায় ফিরে এসেছিলেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওফাতের পর হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু খেলাফতের দায়িত্ব লাভ করেন। তিনি সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহ আনহুর শুরু করা কাজকে সামনের দিকে অগ্রসর করেন এবং ইরাক ও সিরিয়ায় যুদ্ধের তৎপরতা বাড়িয়ে দেন। হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন শু'বা সে সময় আরবের ইরাক অভিযানে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের দলে অন্তর্ভুক্ত হন।

১৪ হিজরীর রমযানে মুসলমানরা "বুয়ায়েব" নামক স্থানে ইরানীদেরকে চরমভাবে পরাজিত করেন। এ পরাজয়ে ইরানের পারসিক যাজকদের মর্যাদা ধূলায় লুণ্ঠিত হয় এবং তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ায়। আরবের ইরাকের যেসব এলাকা মুসলমানরা দখল করে নিয়েছিলো সেখানেও বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু এ অবস্থার খবর পেয়ে ইরাকে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি হযরত মুছান্না রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন হারিছাকে এক নির্দেশ পাঠালেন। এ নির্দেশে তিনি সকল সৈন্যকে একত্রিত করে আরব সীমান্তের দিকে হটে আসতে বললেন। একই সাথে তিনি সমগ্র আরবে জিহাদের দুন্দুভী বাজিয়ে দিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই চারদিকে জিহাদের আবেগে মদীনায় জীবন উৎসর্গকারী মুজাহিদদের প্লাবণ এসে উপস্থিত হলো। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি ওয়াক্কাসকে ইরাকের এ অভিযানের সেনাপতি নিয়োগ করলেন এবং যথার্থ হিদায়াত দিয়ে তাঁকে মদীনা থেকে রওয়ানা করিয়ে দিলেন। হযরত মুছান্না রাদিয়াল্লাহ আনহুর অধীন সৈন্যও "শাররাফ" নামক স্থানে এসে তাঁর সাথে যোগ দিলো। [সে সময় হযরত মুছান্না রাদিয়াল্লাহ আনহু জাসারের অভিযানে আহত হওয়ার কারণে ওফাত পেয়েছিলেন।] এ স্থানে হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর পত্র পেলেন। এ পত্রে তিনি তাঁকে "শাররাফ" থেকে অগ্রসর হয়ে কাদেসিয়াতে অবস্থান নেয়ার নির্দেশ দিলেন। কাদেসিয়া হলো ইরানের প্রবেশ দ্বার। এ পত্র পেয়েই হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহু

"শাররাফ" থেকে রওয়ানা হয়ে কাদেসিয়ায় গিয়ে তাঁবু স্থাপন করলেন। পক্ষান্তরে ইরানী শাসক ইয়াজদজরদ একজন নামকরা ইরানী জেনারেল রুস্তম বিন ফররুখ যাদকে একটি বিরাট বাহিনী দিয়ে মুসলমানদের সাথে লড়াইয়ের নির্দেশ দিলো। রুস্তম সব ধরনের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ৬০ হাজার ইরানী লড়াকু সৈন্যসহ মাদায়েন থেকে রওয়ানা হলো এবং মাদায়েনের সন্নিকটে সাবাতের ফওজী ঘাঁটিতে তাঁবু ফেললো। "সাবাত" অবস্থানকালে সে ইরানের সকল একালায় ঢেঁড়া পিটিয়ে দিলো। ফলে সকল স্থান থেকেই দলে দলে সৈন্য উপস্থিত হতে লাগলো। ইরানী বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ সাবাতেই অবস্থান করছিলো। ইত্যবসরে হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহু আমীরুল মু'মিনীন রাদিয়াল্লাহ আনহুর নির্দেশ অনুসারে ১৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল সরাসরি ইয়াজদজরদের কাছে মাদায়েন প্রেরণ করলেন। এ প্রতিনিধি দলের একজন সদস্য হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন শু'বাও ছিলেন। হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু সহ এ প্রতিনিধি দলের সকল সদস্যই চেহারার ঔজ্জ্বল্য, বাহাদুরী, বক্তৃতা এবং আলোচনায় অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের লোক ছিলেন। এ প্রতিনিধি দল কিসরার দরবারে পৌছে অত্যন্ত সুন্দরভাবে আলাপ-আলোচনা করলেন এবং তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। ইয়াজদজরদ মুসলমানদের কথা শুনে রুষ্ট হলো এবং অত্যন্ত রুক্ষতার সাথে প্রতিনিধি দলকে বের করে দিলো। এমনকি তাদের একজনের মাথায় মাটি ভর্তি একটি টুকরি রেখে বললো, তোমরা আমাদের দেশ জয় করতে এসেছো। কিন্তু এখানে এ মাটি ছাড়া আর কিছুই পাবে না। মাদায়েন থেকে ইসলামী প্রতিনিধি দলের যাওয়ার সাথে সাথেই ইয়াজদজরদ রুস্তমকে নির্দেশ প্রেরণ করলো। নির্দেশে "সাবাত" থেকে রওয়ানা হয়ে কাদেসিয়ায় পৌছে মুসলমানদেরকে উৎখাতের কথা বলা হলো।

রুস্তুম এক লাখ ৮০ হাজার সৈন্য এবং তিনশ' যোদ্ধা হাতী সমেত সাবাত থেকে কাদেসিয়া অভিমুখে যাত্রা করলো এবং অত্যন্ত ধীরে-সুস্থে কাদেসিয়ার সামনে গিয়ে "আতিক" নামক স্থানে তাঁবু ফেললো। সে ছিলো একজন বিশ্বদ্রষ্টা এবং দূরদর্শী জেনারেল এবং আরবদের বাহাদুরী সম্পর্কেও সে সম্যক অবহিত ছিলো। মুসলমানদের সাথে কোনো ধরনের সন্ধির ব্যাপারে সে আগ্রহী ছিলো যাতে তারা যুদ্ধ ছাড়াই ফিরে যেতে পারে। এজন্য সে হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি ওয়াক্কাসের কাছে পত্র পাঠালো এবং সন্ধির আলোচনার জন্য কোনো বিশ্বস্ত লোক প্রেরণের অনুরোধ জানালো।

হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রথমে হযরত রাবয়ী বিন আমের রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং পরে হযরত হুযাইফা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মুহসিনকে

দূত হিসেবে রুস্তমের কাছে প্রেরণ করলেন। কিন্তু এ দু' দূতের সাথে আলোচনায় কোনো ফলোদয় হলো না। তৃতীয়বার হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন শু'বাকে দূত হিসেবে পাঠালেন। রুস্তম অত্যন্ত শান-শাওকাতের সাথে দরবার সাজালো। অনেক দূর পর্যন্ত কার্পেটের বিছানা বিছালো। রাস্তার দু' পাশে অত্যন্ত উঁচু দরের উর্দি পরিহিত সৈন্যের দল খাড়া করে দিলো এবং স্বয়ং আমীরদের মধ্যে স্বর্ণখোচিত মুকুট মাথায় দিয়ে স্বর্ণ সিংহাসনে বসলো। হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু সাধারণ পোশাক পরে বেপরোয়াভাবে রুস্তমের দরবারে প্রবেশ করলেন এবং সোজা রুস্তমের সিংহাসনে উঠে তার উরুর সাথে উরু মিলিয়ে বসে গেলেন। এতে সমগ্র দরবার হতভম্ব হয়ে পড়লো এবং দূতেরা অগ্রসর হয়ে হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিলো। মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইরানবাসী অত্যন্ত ভদ্র এবং সতর্ক মানুষ বলে শুনেছিলাম। কিন্তু আমি জানতাম না যে, তারা এক ব্যক্তিকে খোদা বানিয়ে সিংহাসনে বসায় এবং তার পূজা করে। আল্লাহর শোকর যে, আরবদের মধ্যে এ নিয়ম নেই। তোমরা স্বয়ং আমাকে এখানে মেহমান হিসেবে ডেকে এনেছো। এজন্য আমার সাথে তোমাদের এ রকম ব্যবহার উচিত নয়। তোমাদের চরিত্র যদি এ-ই হয়, তাহলে বুঝে নিও যে, তোমাদের শেষ দিন ঘনিয়ে এসেছে।

রুস্তম হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা শুনে অত্যন্ত লজ্জিত হলো এবং বললো, আমি তোমাকে আমার কাছ থেকে উঠানোর নির্দেশ দেইনি। কর্মচারীদের এটা ভুল ছিলো। কিন্তু তুমিই বলো, তোমার ধারহীন তরবারী এবং ছোট ছোট তীর দিয়ে আমাদের সাথে কি যুদ্ধ করবে?'

হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, "আমার তরবারী দেখলে অবশ্যই মনে হবে যে, কিছুই নয়। কিন্তু তার তীক্ষ্ণতা সম্পর্কে আমার পুরো আস্থা আছে। তীরের কথা মনে রেখো, আগুনের ফুলকি ছোট হলেও আগুনই। আর তার চরিত্রই হলো জ্বালানো।"

এ তর্ক-বিতর্কের পর রুস্তম কাজের কথা শুরু করলো এবং তার সালতানাতের শান-শাওকাত ও অসীম সামরিক শক্তির কথা উল্লেখ করে বললো, তোমরা এখনো ফিরে গেলে আমরা তোমাদের পিছু নেব না। বরং তোমাদের সেনাপতি এবং সেনাবাহিনীর সকল অফিসার এবং সিপাহীকে মর্যাদা অনুযায়ী পুরস্কার দেয়া হবে।

হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত আবেগের সাথে জবাবী বক্তৃতা দিলেন এবং অবশেষে তরবারীর হাতলে হাত রেখে বললেন, তোমরা যদি দীনে

হক কবুল না করো, তাহলে জিজিয়া প্রদান কবুল করো। নচেৎ আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে তরবারীই ফায়সালা করবে।

রুস্তম হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর জবাব শুনে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো এবং তাকে আহ্বান জানিয়ে বললো ঃ

"সূর্যের কসম ! এখন আর তোমাদের সাথে কোনোক্রমেই সন্ধি হবে না। কাল তোমাদের সবাইকে শেষ করে ফেলবো।" হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, "ঠিক আছে। আল্লাহ যা চান তাই হবে।"

এরপর তিনি নিজের বাহিনীতে ফিরে এলেন এবং হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে রুস্তমের অভিপ্রায়ের কথা অবহিত করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মুজাহিদদেরকে যুদ্ধের প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। পরের দিন মুসলমান এবং ইরানীদের মধ্যে কাদেসিয়ায় ঘোরতর লড়াই আরম্ভ হলো। এ যুদ্ধ তিনদিন স্থায়ী হয় এবং ইরানীদের শিক্ষণীয় পরাজয় বরণ করতে হয়।

কাদেসিয়ার পর হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু ইরাকের আরো কয়েকটি যুদ্ধে বাহাদুরী প্রদর্শন করেন। ১৫ হিজরীতে নবনির্মিত বসরাহ শহরের গভর্নর হযরত উতবা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন গাযওয়ান ইন্তেকাল করেন। আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত মুগিরাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বসরার গভর্নর নিয়োগ করেন। বসরার গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেন। মিসান ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা তরবারীর মাধ্যমে পদানত করেন। অতপর সেখানে একটি দফতর প্রতিষ্ঠা করেন। এ দফতর থেকে সিপাহীরা বেতন এবং বৃত্তি ও পেনশনধারীরা পেনশন পেতেন। যথাযথভাবে বৃত্তি ও পেনশনধারীদের তালিকা রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করা হতো। সে যুগে উম্মে-জামিল নাম্নী এক মহিলা হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন শু'বার কাছে প্রায়ই যাতায়াত করতো। এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সাথে তার সম্পর্ক ছিলো এবং তার স্বামী যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। স্বামীর শাহাদাতের পর আর্থিক সংকটে নিপতিত হয়ে সে বসরার বড় বড় পরিবারে সাহায্যের প্রত্যাশায় আসা যাওয়া করতো। একই উদ্দেশ্যে হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছেও তার গমনাগমন ছিলো। কিন্তু কিছু লোক মহিলাটি সম্পর্কে তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করে। এ অভিযোগ পেয়ে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আবু মূসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে হযরত মুগিরা বিন শু'বা রাদিয়াল্লাহ আনহুর স্থলে বসরার গভর্নর নিয়োগ করেন। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু এ সময় তার মাধ্যমে একটি চিঠি প্রেরণ করেন। এছাড়া

মুগিরাহকে সত্বর মদীনা পাঠিয়ে দেয়ার নির্দেশও প্রদান করেন। সে চিঠিতে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে লিখেছিলেন ঃ

"আমি একটি দুঃসংবাদ পেয়েছি। আবু মূসাকে বসরার গভর্নর নিয়োগ করে প্রেরণ করছি। তাঁকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে অবিলম্বে মদীনা পৌছবে।"

হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু আমীরুল মু'মিনীনের নির্দেশ পালন করলেন এবং বসরার শাসনভার হযরত আবু মূসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওপর অর্পণ করে মদীনা মুনাওয়ারায় এসে পৌছলেন। আমীরুল মু'মিনীন তাঁর ওপর আরোপিত অপবাদ যাচাই বা তাহকীক করলেন। কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণে এ অপবাদ প্রমাণিত হলো না। তাঁর অপবাদ মুক্তির ফলে আমীরুল মু'মিনীন খুব খুশী হলেন। কিন্তু তিনি দ্বিতীয়বার হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বসরার গভর্নর নিয়োগ করা সঠিক মনে করলেন না। তবে কিছুদিন পর তিনি তাঁকে হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহ আনহুর স্থলে কুফার গভর্নর নিয়োগ করলেন। ২১ হিজরীর ঘটনা। নাহাওন্দের যুদ্ধও এ সালেই সংঘটিত হয়েছিলো। চরিতকাররা সে যুদ্ধে হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর অংশগ্রহণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। বাস্তবতঃ যুদ্ধটি ছিলো ইয়াজদজরদের শেষ প্রচেষ্টা। সে মুসলমানদেরকে ইরান থেকে বহিষ্কার করতে চেয়েছিলো। এ লক্ষ্যে সে একজন অভিজ্ঞ ইরানী জেনারেল মারদান শাহর নেতৃত্বে দেড় লাখ সৈন্যের বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে দাঁড় করিয়ে দেয়। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু ইরানীদের এ বিরাট বাহিনী মোতায়েনের খবর পেলেন এবং স্বয়ং ইরানীদের মুকাবিলায় যেতে চাইলেন। কিন্তু হযরত আলী কাররামুল্লাহ ওয়াজহাহু তাঁকে মদীনা ত্যাগ না করার পরামর্শ দিলেন। দ্বিতীয় কোনো অফিসারের নেতৃত্বে সৈন্য প্রেরণের কথা বললেন। অধিকন্তু তিনি ইয়েমেন, সিরিয়া, কুফা ও বসরার গভর্নরদের নামে নিজ নিজ বাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য নাহওন্দের দিকে অগ্রসর হওয়ার ফরমান জারী করতে বললেন। এ নাহাওন্দেই ইরানী বাহিনীর সমাবেশ ঘটেছিলো। আমীরুল মু'মিনীন এ পরামর্শ মেনে নিলেন এবং হযরত নু'মান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মুকাররানকে সেনাপতি নিয়োগ করে নাহাওন্দের দিকে যাত্রার নির্দেশ দিলেন। আল্লামা বালাজুরী (র) "ফতহুল বুলদান" গ্রন্থে লিখেছেন, সেই সময়ে তিনি যুদ্ধে যদি নু'মান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মুকাররান শহীদ হন তাহলে তাঁর স্থলে হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামন রাদিয়াল্লাহ আনহুকে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করার হেদায়াত দিয়েছিলেন। যদি তিনিও শহীদ হন তাহলে জারির রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবদুল্লাহ বাজালী নেতা হবেন। আর যদি তিনিও শহীদ

হন তাহলে মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন শু'বা সেনাপতি হবেন বলে হেদায়েতে উল্লেখ ছিলো।

ইসলামী বাহিনী নাহাওন্দ থেকে কয়েক মাইল দূরে "আসপদহান" নামক স্থানে তাঁবু ফেললো। সেখানেই হযরত নু'মান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মুকাররান মারদান শাহর একটি চিঠি পেলেন। চিঠিতে আলোচনার জন্য দূত পাঠানোর অনুরোধ জানালো। হযরত নু'মান রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন শু'বাকে দূত হিসেবে প্রেরণ করলেন। কেননা এর পূর্বে তিনি কাদেসিয়াতে এ দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করেছিলেন। তাঁর যাওয়ার আগেই মারদান শাহ সাড়ম্বরে দরবার সাজালো। নিজে মুকুট পরে সিংহাসনে বসলো এবং তার ডাইনে এবং বামে বিভিন্ন স্থানের আমীর ও যুবরাজ আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক পরিধান এবং হাতে সোনার কাঁকন পরে বসে গেলো। তাদের পিছনে বহুদূর পর্যন্ত সশস্ত্র সৈন্যরা কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালো। তাদের চমকদার নাঙ্গা তলোয়ার চোখ ঝলসে দিচ্ছিলো। হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত সাধারণ পোশাক পরিহিত অবস্থায় সোজা দরবারে ঢুকে সামনের দিকে অগ্রসর হলেন। রাস্তার দরবারীরা তাকে বাধা দিতে চাইলে তিনি বললেন, দূতদের সাথে এ আচরণ করা ঠিক নয়। দরবারীরা রাস্তা থেকে সরে দাঁড়ালে তিনি এদিক ওদিক লক্ষ্য না করে মারদান শাহর সামনে গিয়ে বসলেন।

মারদান শাহর দোভাষীর মাধ্যমে আলোচনা শুরু করলো। সে বললো, তোমরা হলে আরব জাতি। আর আরব জাতির মতো ভুখানাঙ্গা, বদবখত এবং অপবিত্র জাতি আর ভূপৃষ্ঠে নেই। আমার সিংহাসনের চারপাশে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা কবে তোমাদেরকে খতম করে দিতো। কিন্তু তোমরা এত নীচু যে, তাদের তীর তোমাদের অপবিত্র শরীর ভেদ করুক তা আমার পসন্দনীয় নয়। এখনও যদি তোমরা এখান থেকে ফিরে যাও তাহলে আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবো। নচেৎ তোমাদেরকে শিক্ষণীয় পরিণাম ভোগ করতে হবে।

হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু মারদান শাহর দর্পপূর্ণ বক্তৃতায় মোটেই ভীত না হয়ে তার চোখে চোখ রেখে বললেন, তোমার বর্ণনামত এক যুগে অবশ্যই আমরা নীচ ছিলাম। কিন্তু শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবির্ভূত হয়ে আমাদেরকে হেদায়াতের পথ দেখিয়েছেন এবং আমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দিয়েছেন। এখন আমাদের জন্য ময়দান পরিষ্কার। যুদ্ধের ময়দানে আমাদের লাশের স্তুপ না হওয়া পর্যন্ত আমরা তোমাদের দেশ ছেড়ে যেতে পারি না। মোটকথা আলোচনা ব্যর্থ হলো এবং উভয় পক্ষের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী এ যুদ্ধে হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু ইসলামী বাহিনীর ডান দিকের অফিসার ছিলেন। যদিও

ইসলামী বাহিনীর সভাপতি হযরত নু'মান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মুকাররান যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন তবুও মুসলমানদের ধৈর্য ও স্থৈর্য মোটেই ভাটা পড়েনি। তারা ইরানীদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। এ যুদ্ধের পর ইরানীরা আর কখনও উঠে দাঁড়াতে পারেনি। এজন্য আরবরা এ বিজয়ের নাম "বিজয়সমূহের বিজয়" নামে আখ্যায়িত করেছে। হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন শু'বার গোলাম আবু লু'লু ফিরোজ এ যুদ্ধে গ্রেফতার হয়েছিলো। উল্লেখ্য যে, এ আবু লু'লুর হাতেই হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু শহীদ হন। হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু কিছুদিন পর প্রত্যহ দু' দিরহাম খিরাজ প্রদানের শর্তে তাকে আযাদ করে দিয়েছিলেন। নাহাওন্দ যুদ্ধের পর ইরানের ওপর অভিযান পরিচালিত হয়। আল্লামা বালাজুরীর (র) বর্ণনা অনুযায়ী হামদান বিজয়ের দায়িত্ব হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওপরই অর্পিত হয়েছিলো। তিনি অগ্রসর হয়ে হামদান ঘিরে ফেললেন। হামদানবাসী হিম্মত হারিয়ে ফেললো এবং সন্ধির আবেদন জানালো। হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু আবেদন মঞ্জুর করলেন। [কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন হযরত নঈম রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মুকাররান হামদান জয় করেছিলেন]।

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে কুফার গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন। তিনি কুফা পৌঁছে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। আমীরুল মু'মিনীন তাঁকে একটি চিঠি পাঠালেন। চিঠিতে তিনি নগরীর কবিদেরকে ডেকে জাহেলী যুগ ও ইসলামী কালের কবিতা শুনাতে বললেন এবং তাদের অবস্থা লিখে পাঠানোর নির্দেশ দিলেন। এ চিঠি প্রাপ্তির পর তিনি সকল কবিকে একত্রিত করলেন। যখন প্রখ্যাত কবি লবিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন রাবিয়াকে তাঁর কবিতা শুনাতে বলা হলো, তখন তিনি বললেন, সূরা আল বাকারা এবং সূরা আলে ইমরান প্রাপ্তির পর কবিতা এবং কাব্যের প্রতি তাঁর আর কোনো আকর্ষণ থাকেনি। এরপর হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু অন্য একজন কবি আগলাব আজলীকে তাঁর কবিতা শুনাতে বললেন। সে বললো, যুদ্ধের কবিতা বলবো, না কাসিদাহ শুনাবো ? আমার কাছে সব ধরনের কবিতাই বর্তমান আছে। দু' কবির জবাব সম্পর্কে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুকে অবহিত করা হলো। তিনি হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে লিখলেন, আগলাবের বেতন ৫শ দিরহাম কমিয়ে লবিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর বেতন বাড়িয়ে দাও।" আমীরুল মু'মিনীনের এ নির্দেশে আগলাব অত্যন্ত ব্যথিত হলো এবং সে খেলাফতের দরবারে উপস্থিত হয়ে নির্দেশ পালনের প্রতিদান সম্পর্কে ফরিয়াদ জানালো। সে বললো, নির্দেশ পালনের জন্য আপনি আমার বেতন কমিয়ে দিয়েছেন। এতে হযরত

ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা করলেন এবং হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে লিখলেন, আগলাবের বেতন পুনর্বহাল করো। অবশ্য লবিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর বর্ধিত বেতন ঠিক রেখো।

ঐতিহাসিকগণ সাধারণভাবে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের খেলাফতকালে হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে প্রথমে বসরার ও পরে কুফার গভর্নর বানিয়েছিলেন। এ পদে তিনি শাহাদাত পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু হাফিজ ইবনে হাজর (র) "আল ইসাবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু একবার তাকে বাহরাইনের গভর্নরও নিয়োগ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি এক চিত্তাকর্ষক কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কাহিনীটি হলো ঃ বাহরাইনবাসী কয়েকটি কারণে তাঁর প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিলো। এজন্যে তারা দরবারে খেলাফতে অভিযোগ দায়ের করলো। সেখানকার এক জমিদার এক লাখ পরিমাণ অর্থ জমা করে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর খিদমতে পেশ করলো এবং বললো, মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু এ পরিমাণ অর্থ সরকারী রাজস্ব থেকে আত্মসাৎ করে আমার তহবিলে দিয়েছিল। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বরখাস্ত করলেন এবং মদীনা মুনাওয়ারায় ডেকে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। বাহরাইনবাসী হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর বিরুদ্ধে যে অপবাদ দিয়েছিলো তা ছিলো সম্পূর্ণ বানোয়াট। কিন্তু তারা তাঁর বিরুদ্ধে কয়েকটি মিথ্যা সাক্ষী পেশ করলো। হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি তাঁর বিরুদ্ধে কৃত ষড়যন্ত্রের গভীরে পৌঁছলেন এবং সাথে সাথে বললেন, তিনি দু' লাখ জমা করেছিলেন। এক লাখ সে জমিদার হজম করে ফেলেছে। একথা শুনে জমিদারের বুদ্ধি চুপসে গেলো। সে হলফ করে নিজের সাফাই পেশ করলো। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু সমগ্র ব্যাপারটি অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করলেন। এতে জানা গেলো যে, হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর বিরুদ্ধে দুর্নাম আরোপের জন্যেই এসব করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি নির্দোষ ছিলেন। এ সত্ত্বেও তিনি হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি দু' লাখ আত্মসাতের স্বীকৃতি কেনো দিয়েছিলে ? তিনি আরজ করলেন, আমীরুল মু'মিনন ! তারা আমার প্রতি অপবাদ আরোপ করেছিলো। তাদের মিথ্যার চক্রান্ত ফাঁস করার জন্যে এছাড়া আমার আর কোনো গত্যন্তর ছিলো না।

২৪ হিজরীর মুহররম মাসের শুরুতে আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু আবু লু'লু ফিরোজের আঘাতে আহত হয়ে শাহাদাত প্রাপ্ত হন এবং হযরত ওসমান জুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহ আনহু খেলাফাতের দায়িত্ব

লাভ করেন। সে সময় হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন শু'বা কুফার গভর্নর ছিলেন। আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন এবং বিভিন্ন প্রদেশে নতুন গভর্নর নিয়োগ করেন। তিনি হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন শু'বাকে বরখাস্ত করে তার স্থলে ইরাক বিজয়ী সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি ওয়াকক্বাসকে (এছাড়াও তিনি আশারায়ে মুবাশশারাহ ছিলেন) কুফার গভর্নর নিয়োগ করেন। কতিপয় নেতৃস্থানীয় চরিতকার লিখেছেন বরখাস্তের পর হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু আর্মেনিয়া চলে যান এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থান করে মদীনা মুনাওয়ারাহ ফিরে আসেন। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা অবশ্য ব্যাখ্যা করেন যে, হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু কোনো উদ্দেশ্যে আর্মেনিয়া গমন করেছিলেন। বিভিন্ন কার্যকারণে জানা যায় যে, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু কর্তৃক প্রেরিত বাহিনীতে যোগ দিয়ে তিনি আর্মেনিয়া গিয়েছিলেন। তিনি আর্মেনীয়দের বিদ্রোহ দমনার্থে এ বাহিনী প্রেরণ করেন। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাহাদাতের ফায়দা উঠিয়ে তারা খিরাজ আদায় বন্ধ করে দিয়েছিলো। সহীহ আল বুখারীতে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মালিক থেকে বর্ণিত এক হাদীসে জানা যায়, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহ আনহুকে আর্মেনিয়া অভিযানের নেতা বানিয়েছিলেন। ধারণা করা হয় যে, হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুও জিহাদের জন্যে আর্মেনিয়া গমন করেন এবং অভিযানে সফলতার পর মদীনা মুনাওয়ারা ফিরে আসেন। এরপর তিনি হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকালে নির্জনত্ব অবলম্বন করেন। জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকতেন এবং বেশীর ভাগ সময় মসজিদে কাটাতেন। ৩৫ হিজরীর শেষের দিকে বিশৃংখলাকারী বিদ্রোহীরা আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর গৃহ অবরোধ এবং চরম দুর্ব্যবহার শুরু করে। হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন শু'বা যদিও মনে-প্রাণে আমীরুল মু'মিনীনের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু বাস্তবত কিছু করার ব্যাপারে অক্ষম ছিলেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে বর্ণিত আছে, অবরোধ চলাকালে একদিন তিনি আমীরুল মু'মিনীনের খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ

"আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি সাধারণের বরহক নেতা ! আর আপনি এ কঠিন অবস্থার সম্মুখীন। এ থেকে পরিত্রাণের জন্যে আমি তিনটি প্রস্তাব পেশ করছি। এর মধ্যে যে কোনো একটি গ্রহণ করুন। অবরোধকারীদের সাথে যুদ্ধ করুন। আপনার সমর্থক এবং জীবন উৎসর্গকারীদের একটি শক্তিশালী দল এখানে বর্তমান আছে। আপনি তাদের সহ বের হোন এবং বিদ্রোহীদেরকে শক্তিপ্রয়োগ করে বের করে দিন। আপনি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন এবং

অবরোধকারীরা অন্যায় বা অসত্যের সমর্থক। সাধারণ মানুষ সত্যের বা হকের সমর্থন করবে।

এ প্রস্তাব যদি আপনি অনুমোদন না করেন, তাহলে প্রাচীর ভেঙ্গে দ্বিতীয় আরেকটি দরযা বের করুন এবং সে দরযা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যান। সেখানে আপনি উট তৈরি পাবেন। তাতে চড়ে মক্কা মুয়াজ্জামা চলে যান। সেখানে তারা যুদ্ধ করতে পারবে না। কারণ, সেখানে আল্লাহর হেরেম শরীফ রয়েছে।

তৃতীয় প্রস্তাব হলো, "আপনি সিরিয়া চলে যান। সেখানকার মানুষ বিশ্বাসঘাতক নয় এবং সেখানে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্তমানে আছেন।"

হযরত ওসমান বললেন ঃ

"বাইরে বেরিয়ে আমি যুদ্ধ করতে চাই না। এতে উম্মাহর মধ্যে হত্যাকাণ্ডের ভিত্তি স্থাপিত হবে। আমি এর ভিত্তিস্থাপন করতে চাই না। যদি মক্কা মুয়াজ্জামাতে চলে যাই, তাহলেও তারা যে কা'বা শরীফের অমর্যাদা এবং খুন খারাবি থেকে বিরত থাকবে এমন আশা নেই। আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী মুতাবিক সে ব্যক্তি হতে চাই না, যে মক্কা মুয়াজ্জামার অমর্যাদার কারণ হবে। সিরিয়া গমন প্রশ্নে ওজর হলো, দারুল হিজরত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিবেশীদেরকে পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে অসহনীয় ব্যাপার।

পবিত্র আত্মা আমীরুল মু'মিন রাদিয়াল্লাহ আনহুর জবাব শুনে হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু চুপ মেরে গেলেন। কিন্তু আফসোস যে, হতভাগা বিদ্রোহীরা আমীরুল মু'মিনীন রাদিয়াল্লাহ আনহুর পবিত্র নফস ও উম্মার শুভাকাংখার কদর করেনি এবং ৩৫ হিজরীর ১৮ই জিলহাজ্জ প্রাচীর টপকে নৃশংসভাবে তাঁকে শহীদ করে ফেলে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

হযরত ওসমান জুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাহাদাতের পর হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজাহাহু রাদিয়াল্লাহ আনহু খেলাফাতের দায়িত্বে সমাসীন হন। হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রথম দিকে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর সমর্থক এবং পক্ষে ছিলেন। তিনি আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর খিদমতে উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত ইখলাসের সাথে পরামর্শ দিলেন ঃ

"হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনার আনুগত্য এবং শুভ কামনা আমার ওপর ফরয এবং মানুষের মধ্যে আপনিই উত্তম ও সঠিক হিসেবে অবশিষ্ট রয়েছেন। বর্তমান দিয়ে ভবিষ্যত অনুমান করা যায়। আজ হারানো অর্থই আগামীকাল খোয়ানো। মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু, আবদুল্লাহ বিন আমের রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু কর্তৃক নিয়োগকৃত

অন্যান্য গভর্নরকে তাঁদের পদে বহাল রাখুন। অন্ততঃ তাঁদের বাইয়াত ও আনুগত্য লাভ পর্যন্ত এ কাজ করুন। এরপর যাঁকে ইচ্ছা বরখাস্ত এবং যাঁকে ইচ্ছা বহাল রাখবেন।"

হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর পরামর্শ গ্রহণ করলেন না এবং বললেন ঃ "দীনের ব্যাপারে আমি চাটুকারিতা ও মুনাফেকীর প্রবক্তা নই।"

হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন ঃ "আপনি যদি আমার পরামর্শ না মানেন, তাহলে যাকে ইচ্ছা বরখাস্ত করুন। তবে, মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুকে সিরিয়ার গভর্নর হিসেবে বহাল রাখুন। কেননা তিনি বাহাদুর মানুষ। ইয়েমেন ও সিরিয়ার জনগণ তাঁকে মান্য করে। তাকে বহাল রাখার প্রশ্নে আপনি এ দলীল পেশ করুন যে, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন খাত্তাব তাকে সিরিয়ার গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন।"

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, "না, খোদার কসম ! আমি মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুকে দু' দিনও থাকতে দিবো না।"

হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু আমীরুল মু'মিনীন রাদিয়াল্লাহ আনহুর জবাব শুনে চুপচাপ চলে গেলেন। এক রাওয়ায়েত অনুসারে দ্বিতীয়দিন তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর ইচ্ছানুসারে নিজের মত প্রকাশ করলেন। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তিনি পূর্বের দিন যে কথা ব্যক্ত করেছিলেন দ্বিতীয় দিনও একই কথার পুনরুক্তি করলেন। কেননা তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর হিকমতের সাথে ঐকমত্য পোষণ করতেন না। এজন্যে তিনি নীরবে মক্কা মুয়াজ্জমা চলে গেলেন এবং কিছুদিন পর সেখান থেকে তায়েফে গিয়ে সেখানকার বাসিন্দা হয়ে গেলেন। তিনি হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর খেলাফতকালে (৩৫-৪০ হিজরী) সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে কাটান। উষ্ট্র এবং সিফফীনের যুদ্ধে তিনি কোনো পক্ষই অবলম্বন করেননি।

আবু হানিফা দিনাওয়ারী "আল আখবারুত তাওয়াল" গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর মধ্যে সালিসের চুক্তি হলো। হযরত আবু মূসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহ আনহু (হযরত আলীর সালিস) এবং হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস (আমীর মুয়াবিয়ার সালিস) দুমাতাল জানদালে একত্রিত হলেন। এ সময় হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু তায়েফ থেকে দুমাতাল জানদাল পৌঁছলেন এবং সালিসীদের ফায়সালার অপেক্ষা করতে থাকলেন। যখন ফায়সালায় বিলম্ব হলো তখন তিনি দুমাতাল জানদাল থেকে দামেস্ক গেলেন এবং আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ

আনহুর সাথে সাক্ষাত করলেন। আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে বললেন, আপনি নিজের মত অনুসারে আমাকে পরামর্শ দিন।

হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন ঃ "আমি যদি আপনার পরামর্শদানকারী হতাম তাহলে আপনার সাথে থেকে যুদ্ধ করতাম। অবশ্য উভয় সালিসের অবস্থা যদি আপনি জানতে চান তাহলে বলতে পারি।"

আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন ঃ "অবশ্যই বলুন" হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন ঃ আমি আবু মূসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে নির্জনে মিলিত হয়েছি এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি যে, সে ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার কি রায় যিনি পক্ষপাতহীন এবং রক্তারক্তি ও হত্যাকাণ্ডের প্রতি ঘৃণার কারণে গৃহে বসে রয়েছেন।"

তিনি জবাব দিলেন ঃ "এ ধরনের ব্যক্তিরা উত্তম মানুষ। তাঁদের পিঠে নিজের ভাইয়ের রক্তের দাগ নেই এবং তাদের ওপর নিজের ভাইয়ের সম্পদের বোঝা নেই।"

অতপর আমি আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসের সাথে পৃথকভাবে মিলিত হয়েছি এবং তাকে জিজ্ঞেস করেছি ঃ

"হে আবু আবদুল্লাহ ! সেই ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার কি ধারণা, যিনি এসব যুদ্ধ থেকে বিরত থেকেছেন।"

তিনি জবাব দিলেন ঃ "এরা হলো নরাধম। তারা সত্যেরও সমর্থক নয়। আবার বাতিলেরও বন্ধু নয়।

আমার ধারণা, আবু মূসা রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের সাথীকে (হযরত আলী) খেলাফত থেকে সরে দাঁড়াতে বলবে এবং এমন এক ব্যক্তিকে মনোনীত করবেন যিনি এসব যুদ্ধে অংশ নেননি। সম্ভবতঃ তিনি আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে মনোনয়ন দেবেন। রইলো আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসের কথা। হতে পারে সে নিজেকে অথবা নিজের পুত্র আবদুল্লাহকে খেলাফতের হকদার হিসেবে ঘোষণা দিতে পারে।

আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর কথায় খুব প্রভাবিত হলেন এবং তার মত সঠিক বলে উল্লেখ করলেন। কিন্তু তিনি একজন ধৈর্যশীল ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। সে সময় তিনি সালিসীতে কোনো পরিবর্তন সাধন ঠিক মনে করলেন না এবং হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে চুক্তি অনুসারে নিজের সালিস হিসেবে বহালই রাখলেন। আফসোস ! সালিসীতে সন্তোষজনক কোনো ফল লাভ হলো না এবং হযরত

আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর মধ্যে দ্বন্দ্ব অব্যাহত রইলো। ৪০ হিজরীতে হযরত আলী কাররামুল্লাহু ওয়াজহাহু রাদিয়াল্লাহ আনহু আবদুর রহমান বিন মালজাম নামক একজন খারেজীর হাতে শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন। তাঁর পর সাইয়েদেনা হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহ আনহু খেলাফতের দায়িত্ব পেলেন। কিন্তু ৬ মাস পর পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর পক্ষে খেলাফত থেকে সরে দাঁড়ালেন। এভাবে ৪১ হিজরীতে আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু কারোর অংশগ্রহণ ছাড়াই ইসলামী বিশ্বের শাসক বনে গেলেন।

হযরত আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু ছিলেন মহান নৃতত্ত্ববিদ এবং দূরদর্শী শাসক। খেলাফতের মসনদে আসীন হওয়ার পর তিনি বিভিন্ন প্রদেশের জন্যে প্রভাবশালী, সুচতুর ও অভিজ্ঞ শাসকের প্রয়োজন অনুভব করতে থাকেন। এজন্যে তিনি এমন সব লোক বাছাই করলেন যারা বুদ্ধির দূরদর্শিতা এবং রাজনৈতিক বিচক্ষণতার দিক থেকে তুলনাহীন ছিলেন। তিনি হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন শু'বার যোগ্যতা সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল ছিলেন। এজন্যে তিনি তাঁকে কুফার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত করেন। কুফার নেতৃত্বে আসীন হওয়ার পর তিনি নিজের দায়িত্ব অত্যন্ত সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেন এবং খুব বিচক্ষণতার সাথে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের গ্রন্থি উন্মোচন করেন। সর্বপ্রথম তিনি শাবিব বিন বাজরাহ খারেজীর ফেতনার সম্মুখীন হন। এ ব্যক্তি হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুকে শহীদ করার ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলো। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাহাদাতের পর আমীর মুয়াবিয়ারাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে গিয়ে বললো, সে এবং ইবনে মালজাম একত্রে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুকে হত্যা করেছে। এজন্যে সে পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্য। আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু তার কথা শুনে বাড়ী চলে গেলেন এবং আশজা' গোত্রকে বলে পাঠালেন যে, শাবিবকে অবিলম্বে শহর থেকে বের করে দাও নচেৎ তোমাদের অমঙ্গল হবে। [এ সময় আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু কুফা অবস্থান করছিলেন] শাবিবের কানে আমীর মুয়াবিয়ার নির্দেশ গেলো এবং সে ফেরার হয়ে গেলো। এরপর সে রাতে তার অবস্থান স্থল থেকে বের হতো এবং যাকেই সামনে পেতো তাকেই হত্যা করে পালিয়ে যেতো। হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু কুফার ইমারতি বুঝে নেয়ার পর পরই খালিদ বিন আরফতাহকে একটি বাহিনী দিয়ে শাবিবকে উৎখাতের জন্যে নিয়োগ করলেন। খালিদ শাবিব এবং তার সাথীদেরকে ঘিরে ফেললো। তাদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। কিন্তু একে একে সবাই মারা গেলো।

কুফার ইমারাতকালে যিয়াদ বিন আবিহকে আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর অনুগত বানানো হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর এক বিরাট সাফল্য।

যিয়াদ আরবের একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি ছিলেন। তিনি আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর কট্টর বিরোধী এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর পক্ষ থেকে পারস্যের গভর্নর নিয়োগ প্রাপ্ত হন। সাইয়েদেনা হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহ আনহু খেলাফত থেকে সরে দাঁড়ানোর পর যদিও আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু সমগ্র ইসলামী দুনিয়ার খলীফা হয়েছিলেন তবুও যিয়াদ তার হাতে বাইয়াত করতে অস্বীকার করেন। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে অনুগত বানানোর জন্যে বুছর বিন আরতাতকে দায়িত্ব দেন। কিন্তু তিনি তাতে ব্যর্থ হন। এরপর আমীর মুয়াবিয়া তার ব্যাপারে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। একবার হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু তার সাথে সাক্ষাতের জন্যে দামেস্ক গেলেন। আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু তখন যিয়াদের ব্যাপারে তার আশংকার কথা ব্যক্ত করলেন।

হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, যিয়াদকে অনুগত বানানোর কাজ আমার ওপর ছেড়ে দিন।

এরপর তিনি যিয়াদের কাছে গেলেন। তার সাথে কথা-বার্তা বললেন। তাকে বুঝালেন। তাকে বললেন, হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহ আনহু খেলাফত থেকে সরে দাঁড়ানোর পর সমগ্র ইসলামী বিশ্ব আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতের স্বীকৃতি দিয়েছে। এখন তোমার তাঁর আনুগত্য না করাটা কোনো যুক্তিযুক্ত ব্যাপার হতে পারে না। বরং তুমি তাঁর সাথে আপোষ করে ফেলো। তিনি অবশ্যই তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করবেন।

যিয়াদ হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর পরামর্শ মেনে নিলেন এবং তাকে বললেন, আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু তাকে নিরাপত্তা প্রদানমূলক লিখিত চিঠি প্রেরণ করলে সে তার কাছে গমন করবে। হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে গেলেন এবং যিয়াদের সাথে তাঁর আলোচনার কথা অবহিত করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ লিখিতভাবে তাকে নিরাপত্তামূলক পত্র পাঠালেন। এ পত্র পেয়েই যিয়াদ আমীর মুয়াবিয়ার খিদমতে উপস্থিত হলো এবং তাঁর বাইয়াত করলো। অতপর সে তার কাছে কুফায় বসবাসের অনুমতি প্রার্থনা করলো। তিনি অনুমতি দিলেন। কিন্তু যিয়াদ এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর অন্যান্য সমর্থক যেমন হাজার রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আদী, সুলাইমান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ছারদুল খাজায়ী, শিশ বিন রবয়ী প্রমুখদের ব্যাপারে হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে সতর্ক থাকার জন্যে লিখে পাঠালেন। এটা ৪২ হিজরীর ঘটনা।

হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু ৪১ হিজরীতে কুফার আমীর নিযুক্ত হয়ে আসেন। এ সময় কুফাবাসী তিন ভাগে বিভক্ত ছিলো।

১. **বনু উমাইয়ার সমর্থক ঃ** তারা সত্যিকারভাবে আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর অনুগত ছিলো।

২. **শিয়ানে আলী ঃ** তারা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং তার সন্তানদেরকেই খেলাফতের একমাত্র হকদার মনে করতো। তাদের কাছে হযরত মুয়াবিয়া যদিও বৈধ খলিফা ছিলেন না। কিন্তু সময়ের মুসলিহাতের কারণে তারা আনুগত্যের মাথা নত করে নিয়েছিলো।

৩. **খাওয়ারেজ ঃ** তারা বনি উমাইয়া এবং শিয়ানে আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু উভয়েরই বিরোধী ছিলো এবং তাদেরকে দীন থেকে খারিজ বলে মনে করতো।

হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু কুফা পৌছে নমনীয় কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করলেন। তিনি কোনো ব্যক্তির সাথে তার আকীদা-বিশ্বাস অথবা রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে তর্ক-বিতর্ক করতেন না। অবশ্য কেউ শান্তি-শৃংখলায় বিঘ্ন সৃষ্টির চেষ্টা করলে সর্ব শক্তি দিয়ে তাতে বাধা দিতেন। মানুষজন এসে তাঁকে বলতো, অমুক ব্যক্তি খারেজী আকীদা রাখে অথবা শিয়া মতাবলম্বী। তিনি জবাবে বলতেন, "এটা আল্লাহর ইচ্ছা। কারণ, তার বান্দার ধ্যান-ধারণায় মতদ্বৈধতা রয়েছে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক স্বয়ং এসব মতদ্বৈধতার ফায়সালা করবেন।"

হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর নমনীয় কর্মপদ্ধতি সত্ত্বেও খারেজীরা নিশ্চিন্তে বসে রইলো না। ৪৩ হিজরীতে তারা মুসতাওরাদ বিন আলকামার নেতৃত্বে এক বিরাট ফেতনার সৃষ্টি করলো। ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, তারা হাইয়ান বিন জবিয়ানের বাড়ীতে একত্রিত হলো। এ বৈঠকে তারা ঈদুল ফিতরের (৪৩ হিজরী) দিন সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদের পরিকল্পনার কথা অবহিত হলেন এবং তাঁর নির্দেশে হাইয়ান বিন জবিয়ানের গৃহ অবরোধ করা হলো। মুসতাওরাদ এবং তার সাথীরা পালিয়ে গেলো এবং অবশিষ্টরা গ্রেফতার হলো।

মুসতাওরাদ কুফা থেকে বের হয়ে সমর্থকদেরকে একত্রিত করলো এবং বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিলো। হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু কুফাবাসীদেরকে একত্রিত করে খারেজীদের বিরুদ্ধে আবেগময় বক্তৃতা করলেন এবং এ ফেতনা নির্মূলের জন্যে তাদের সাহায্য চাইলেন। অতপর তিনি এমন এক কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করলেন, যাতে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর সমর্থকরা খারেজীদের উৎখাতে বেশী তৎপর হয়ে পড়লো এবং তারা বেশ কয়েকটি সংঘর্ষের পর মুসতাওরাদ এবং তার অধিকাংশ সাথীকে নির্মূল করে সাময়িকভাবে এ ফেতনার অবসান ঘটায়।

হযরত হাজার রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আদি কুফার হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর অন্যতম প্রভাবশালী সমর্থক ছিলেন। তাঁর স্পষ্টবাদিতা হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ সত্ত্বেও তিনি তাঁর তৎপরতা উপেক্ষা করে চলে ছিলেন। একদিন হযরত মুগিরা খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় হাজার রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আদি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং উচ্চস্বরে বললেন ঃ

"ওহে ! তুমি আমাদের বৃত্তি বন্ধ করে দিয়েছো। এটা তোমার অনধিকার চর্চা। তুমি আমাদের বৃত্তি চালু করো এবং আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর বিরুদ্ধে কোনো কথা বলো না।"

এ কথায় দু-তৃতীয়াংশ নামাযী দাঁড়িয়ে গেলো এবং বলতে লাগলো হাজার ঠিকই বলেছে। আমাদের বৃত্তি চালু করো।

হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু চুপচাপ মিম্বর থেকে নেমে এলেন। এমনভাবে মিম্বর থেকে নেমে আসা তাঁর সাথীদের পসন্দ হলো না। তারা বললো, আপনার নরম ব্যবহারের কারণে হাজার রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আদী খুব সাহসী হয়ে গেছে। এ ধরনের নরম ব্যবহারের ফলে সরকার ভীতি বিপর্যস্ত হবে। আমীরুল মু'মিনীন আপনার এ সীমাহীন শরীফ ব্যবহারের কথা জানতে পারলে তিনিও তা পসন্দ করবেন না।

হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু জবাব দিলেন ঃ "তোমরা বুঝতে পারোনি। আমি তো হাজারকে হত্যা করেছি। আমার নরম ব্যবহারের ফলে সে সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেছে। আমার পর যিনি আমীর হয়ে আসবেন, সে আমলেও সে একই ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করবে। আর সে আমীর তাকে হত্যা না করে ছাড়বে না। আমি নিজের হাত হাজার এবং তার সাথীদের রক্তে রঞ্জিত করে তাকে সৌভাগ্যবান ও নিজেকে হতভাগা করতে চাই না।"

এ ঘটনার কিছুদিন পরই কুফায় মহামারী আকারে প্লেগ দেখা দিলো। হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুও এ রোগে আক্রান্ত হলেন এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন (৫০ হিজরী)। এ সময় তার বয়স ছিলো ৭০ বছর। তিনি উরওয়াহ (র) হামজা (র) এবং উক্কার (র) নামক তিন পুত্র রেখে যান।

হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেধাবী দূরদর্শী ও রাজনৈতিক বিচক্ষণ সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের অন্যতম। ঐতিহাসিকরা তার পক্ষে এবং বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। জ্ঞান ও দূরদর্শিতার দিক থেকে তিনি আরবের পহেলা কাতারের লোক ছিলেন এবং নিজের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার কারণে—"মুগিরাতুর রায়" নামে খ্যাত ছিলেন।

"মুসতাদরাকে হাকিমে" উল্লেখ করা হয়েছে যে, কঠিন থেকে কঠিনতর এবং জটিল থেকে জটিলতর সমস্যা সমাধানে তিনি অসাধারণ যোগ্যতা রাখতেন। কোনো বিষয়ে কোনো মত স্থাপন করলে তাই সঠিক বলে প্রতিভাত হতো।

হাফিজ ইবনে হাজার (র) "তাহজিবুত তাহজিব" গ্রন্থে কবিসাহ বিন জাবেরের এ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন ঃ দীর্ঘদিন যাবৎ আমি মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে ছিলাম। তাঁর অত্যন্ত বিচক্ষণতা ছিলো। কোনো শহরের ৮টি দরযার কোনোটি দিয়েই চিন্তা-ভাবনা এবং সতর্কতা ছাড়া পার হওয়া অসম্ভব হলেও মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু ৮টি দরযা দিয়েই বের হয়ে যেতেন।

অনেক ঐতিহাসিক লিখেছেন কুফার ইমারাতকালে তিনি একবার দামেস্ক গমন করেন। সে সময় তিনি আমির মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুকে পরামর্শ স্বরূপ বলেছিলেন, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাহাদাতের পর মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্ট অনৈক্য এবং রক্তারক্তির ব্যাপারে সকলেই ওয়াকিবহাল। জীবদ্দশাতেই আপনি আপনার পুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকার মনোনীত করুন। যাতে আপনার মৃত্যু হলে সে মুসলমানদের আশ্রয়স্থল হতে পারে এবং দেশ শাসনে অনৈক্য ও রক্তারক্তির আশংকা দূর হয়।

আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু সে সময় এ পরামর্শ গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু কয়েক বছর পর যখন মুগিরাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু ওফাত পেলেন তখন তিনি সে অনুযায়ীই কাজ করেছিলেন।

কতিপয় ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন যে, বিভিন্ন কারণে আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে কুফার গভর্ণর পদ থেকে বরখাস্ত করার ইচ্ছা পোষণ করতেন। হযরত মুগিরাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর ইচ্ছার কথা জানতে পেরে পদচ্যুতি থেকে বাচাঁর জন্যে দামেস্ক গিয়ে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুকে পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং সাথে সাথে পরামর্শের পক্ষে কুফাবাসীকে সম্মত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। নিসন্দেহে ব্যাপারটির এটি একটি অন্ধকার দিক। পক্ষান্তরে এর উজ্জ্বল দিকও হতে পারে। হযরত মুগিরাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু নেক নিয়তের সাথেই মনে করতেন যে, ইসলামী দুনিয়ার ঐক্য দামেস্কের কেন্দ্রীয় শক্তি অক্ষুণ্ন রাখার মাধ্যমেই সম্ভব। আমির মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু হঠাৎ করে ওফাত পেলে তাঁর উত্তরাধিকার প্রশ্নে বিবাদ এবং রক্তারক্তির সমূহ আশংকা বিদ্যমান ছিল। ফলে মুসলমানদের শক্তি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। যা হোক. তিনি নিজের মত অনুসারে নেক

নিয়তের সাথে এ ধারণা পেশ করেছিলেন। এ পরামর্শ ভুল ছিল না সঠিক ছিল তা ভিন্ন আলোচনার বিষয়।

হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু ৯ বছর কুফার গভর্নর ছিলেন। এ সময়কালে তিনি সবসময় নরম ও আপোষমূলক কর্মনীতি অবলম্বন করেন। খারেজীরা যখন আইন-শৃংখলা লণ্ডভণ্ড করে ফেলেছিলো তখনই কেবল তিনি তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন।

হযরত হাজার রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আদি প্রকাশ্যে সরকার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তাঁর বিরোধিতা শুধুমাত্র কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। এজন্য হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর বিরুদ্ধে কোনো কঠোর আচরণ করেননি। এ সত্ত্বেও তিনি হযরত হাজার রাদিয়াল্লাহ আনহু সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছিলো। তাঁর ইন্তেকালের পর কুফাকে বসরার গভর্নর যিয়াদের অধীন করে দেয়া হয়। যিয়াদ হযরত হাজার রাদিয়াল্লাহ আনহুকে গ্রেফতার করে দামেস্ক প্রেরণ করে এবং সেখানেই তাঁকে হত্যা করা হয়।

কুফার ইমারাতকালে হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু স্বয়ং বলতেন, আমি কুফাবাসীদের রক্তে নিজের হাত রঞ্জিত করে তাদেরকে ভাগ্যবান এবং নিজেকে হতভাগা বানাতে চাই না। আমি নেককারদেরকে ভালো প্রতিদান দিবো এবং যারা ভুল পথে চলে তাদের ক্ষমা করে দিবো। যারা ভালো কথা বলে তাদের প্রশংসা করবো এবং নাদানদেরকে বুঝাবো। ইত্যবসরে আমি দুনিয়া ত্যাগ করে চলে যাবো। আমার পর কুফাবাসীদেরকে অন্য শাসক যখন শাসন করবে তখন তারা আমাকে খুব স্মরণ করবে।

তাঁর ওফাতের পর কুফার এক শেখ বললেন, খোদার কসম ! পরীক্ষাকালে আমরা তাঁকে উত্তম আমীর হিসেবে পেয়েছি। তিনি নেককারদের প্রশংসাকারী এবং ভুলকারীদের ক্ষমা প্রদর্শনকারী ছিলেন। তিনি ওজরকারীদের ওজর কবুল করতেন।

হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আস সাহম

বনু সহিম সরদার আস বিন ওয়ায়েল (বিন হাশিম বিন সাঈদ বিন সাহাম বিন আমর বিন হাসিস বিন কা'ব বিন লুব্বী) ধন-সম্পদ এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক থেকে মক্কার কুরাইশদের মধ্যে উঁচু মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন। আপাতঃ দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন হলেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কাবাসীকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন তখন তার বুদ্ধিমত্তা অচল হয়ে পড়লো। হক গ্রহণ প্রশ্নে শুধু নিজেই অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো না বরং অন্যদেরকেও হক ও সত্য গ্রহণ থেকে বিরত রাখার জন্য শক্তিও প্রয়োগ করলো। দুষ্ট প্রকৃতির এ লোকটি কুরআনের আয়াতের প্রতি বিদ্রূপবান নিক্ষেপ করলো। আখেরাতের বিচারকে উপহাসের বস্তুতে পরিণত এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নিকৃষ্ট ও গরীব হওয়ার অপবাদ আরোপ করলো ঃ "আরে তার কথা রাখ। সে তো একজন গরীব (শিকড়হীন) মানুষ। তার কোনো পুত্র সন্তান নেই। মরে গেলে নাম নেয়ারও কেউ থাকবে না।"

আস বিন ওয়ায়েলের দুর্ভাগ্য এমন যে, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্তও সে হিদায়াত থেকে বঞ্চিত রয়ে গেলো। কিন্তু স্রষ্টার কুদরাতের বিস্ময়কর ব্যাপার হলো যে, এ হতভাগার দু' পুত্র হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু শুধু ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্যই লাভ করেননি, বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখনিসৃত মু'মিন খেতাবেও ভূষিত হয়েছিলেন।

হযরত আবু মুয়িত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের ভাই আমর ইবনুল আস থেকে বয়সে ছোট ছিলেন। তবে বড় ভাইয়ের চেয়েও তার মর্যাদা ছিলো বেশী। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস পরিখার যুদ্ধের (৫ম হিজরী) পর ঈমান এনেছিলেন। কিন্তু হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহু সব ধরনের ভয়-ভীতির মুখোমুখি অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির একদম প্রথম যুগে তাওহীদের আহ্বানের প্রতি সাড়া দিয়েছিলেন। এমনিভাবে তিনি জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত আসসাবিকুনাল আওয়ালিন দলের একজন সদস্য হিসেবে পরিগণিত হন। চরিতকাররা বর্ণনা করেছেন, তাওহীদের দাওয়াতের প্রথম তিন বছরে যে ১৩৩জন পবিত্র আত্মা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহু ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। এ তিন বছর গোপনভাবে তাবলীগের কাজ চলছিলো। এজন্য

মুশরিকরা কোনো বিশেষ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেনি। অবশ্য নবুয়াত প্রাপ্তির আড়াই বছর পর মুশরিকদের একদল কতিপয় মুসলমানকে এক বিজন স্থানে নামায পড়তে দেখে অন্যান্য মুশরিককে হকপন্থীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে শুরু করে। পরিস্থিতি সঙ্গীন রূপ নিলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবন উৎসর্গকারী সাহাবীদেরকে নিয়ে আরকাম গৃহে স্থানান্তরিত হন। নবুয়াতের ৪র্থ সালের শুরুতে "ফাসদা বিমা তু'মারু ওয়া আ'রিজ আনিল মুশরিকিনা' (আল্লাহর নির্দেশ প্রকাশ্যে শুনান এবং মুশরিকদের বিরোধিতার পরওয়া করবেন না)। এ আয়াত নাযিল হলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওহীদের দাওয়াতের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিলেন এবং খোলাখুলিভাবে মানুষদেরকে হকের দিকে ডাকতে শুরু করলেন। সাথে সাথে মুশরিকদের ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধ ফেটে পড়লো এবং তারা মুসলমানদের ওপর সীমাহীন যুলুম-নির্যাতনের তাণ্ডব বইয়ে দিলো। হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহুও তাঁর মাতা-পিতা এবং খান্দানের অন্যান্যদের নির্যাতনের শিকার হলেন। কয়েক বছর তাঁর ওপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন চললো। কিন্তু তিনি হক পথ থেকে সরে দাঁড়ানোর কল্পনাও করেননি। যখন মুসলমানদের ওপর কাফেরদের নির্যাতন সহ্যের বাইরে চলে গেল তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে হাবশায় হিজরতের নির্দেশ দিলেন। সুতরাং নবুয়াত প্রাপ্তির ৫ বছর পর মুসলমানদের একটি ছোট দল হাবশায় হিজরত করলেন। নবুয়াতের ৬ষ্ঠ বছরের পর একটি বড় কাফেলা হাবশায় রওয়ানা দিলো। হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহুও এ দলে শামিল হয়ে হাবশা চলে গেলেন। হাবশায় হিজরতকারী একটি দল হযরত জাফর তাইয়ার রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি তালিবের সাথে ১২/১৩ বছর সেখানেই অবস্থান করেন এবং খায়বার যুদ্ধের (৭ম হিজরীর প্রথম দিকে) ফিরে আসেন। কিন্তু এছাড়াও অনেক মুহাজির হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় হিজরতের আগে মক্কা প্রত্যাবর্তন করেন। হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহুও প্রত্যাবর্তনকারী সাহাবীদের দলভুক্ত ছিলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুমকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন। এ সময় হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহুও মদীনা গমনের জন্য তৈরি হলেন। পরিবারের লোকজন একথা জেনে তাঁকে বন্দী করলো এবং কঠোর পাহারায় রাখলো। এমনিভাবে ৫/৬ বছর কেটে গেলো। ইত্যবসরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় তাশরীফ নিলেন। এর মধ্যে বদর, ওহোদ এবং পরিখার যুদ্ধ সংঘটিত হলো। পরিখার যুদ্ধের পর একদিন হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহু সুযোগ পেয়ে কারাগার থেকে পালিয়ে সংগোপনে মদীনায় পৌঁছে গেলেন।

হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হলেন। তাঁকে দেখে তিনিও খুব খুশী হলেন। ইমাম হাকিম (র) স্বগ্রন্থ "মুশতাদরাকে" লিখেছেন মদীনা আগমনের পর যত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো, হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহু সব যুদ্ধেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহযোদ্ধা হিসেবে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলেন এবং প্রত্যেক যুদ্ধেই বাহাদুরীর চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকালে রোমের কাইসারের সাথে যুদ্ধ শুরু হলো। হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহু যুদ্ধের আবেগে অস্থির হয়ে পড়লেন এবং সিরিয়া গমনকারী মুজাহিদদের দলে শামিল হলেন। রোমিয়রা দু' তিনটি যুদ্ধে পরাজিত হলো। কাইসার তাযারক এবং কাবকালী নামক দু' প্রখ্যাত রোমীয় জেনারেলকে এক বিরাট বাহিনী দিয়ে মুসলমানদের মুকাবিলায় প্রেরণ করলো। এ বাহিনী আজনাদাইন নামক স্থানে তাঁবু ফেললো। সে সময় ইসলামী বাহিনী সিরিয়ার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো। তারাও সবাই একত্রিত হয়ে আজনাদাইন এসে উপস্থিত হলো এবং রোমীয় বাহিনীর মুকাবিলায় তাঁবু খাটালো। ১৩ হিজরীর ২৮শে জমাদিউল উলা রোমীয় এবং মুসলমানদের মধ্যে ঘোরতর লড়াই হলো। এ যুদ্ধে হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহু বীরের হক আদায় করলেন। এক সময় মুসলমানদের মধ্যে সামান্যতম দুর্বলতার ভাব পরিলক্ষিত হলো। ঈমানের আবেগে উদ্বেলিত হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহু আহ্বান জানিয়ে বললেন, "হে মুসলমানরা ! এ খাতনাহীনরা আমাদের তরবারীর সামনে টিকতে পারে না। আমি যা করি তোমরাও তাই করো।" এ বলে বাহাদুরীর সাথে তরবারী চালাতে চালাতে রোমীয়দের ব্যূহে ঢুকে পড়লেন এবং নিধন করতে করতে তাদের বাহিনীর কেন্দ্রস্থলের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। এ সময় তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হচ্ছিলো ঃ

"হে মুসলমানরা ! আমি আস বিন ওয়ায়েলের পুত্র হিশাম। এসো আমার সাথে এসো। বেহেশত তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমার সাথে না এলে তোমরা যেনো বেহেশত থেকে পলায়ন করছো।" যুদ্ধে তিনি জীবন বাজী রেখে বাহাদুরী প্রদর্শন করছিলেন। তাঁর আক্রমণে ভীত হয়ে রোমীয়রা চারদিক থেকে তরবারীর বৃষ্টি বর্ষণ শুরু করলো। এভাবে তিনি শাহাদাতের পেয়ালা পান করে জান্নাতুল ফেরদাউসে গিয়ে উপস্থিত হলেন। হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং তার মত অন্য মুজাহিদদের আত্মদান ও বীরত্বের ফলশ্রুতিতে রোমীয়দের শিক্ষামূলক পরাজয় ঘটলো। ইমাম হাকিম (র), ইবনে আসির (র) এবং বালাজুরী (র) হযরত হিশামের শাহাদাতের এ কাহিনী

বর্ণনা করেছেন। ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম (র) বলেছেন, হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহু বীরত্ব প্রদর্শন করতে করতে একটি অপরিসর ঘাঁটিতে শহীদ হন। সে ঘাঁটি শুধুমাত্র একজন মানুষই অতিক্রম করতে পারতো। ঘাঁটির অন্যদিকে কতিপয় মুসলমান রোমীয়দের এক বিরাট বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করছিলেন। তাঁরা তাঁকে সাহায্য করতে চাইছিলেন। কিন্তু হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহুর লাশের ওপর দিয়ে অতিক্রম করা ছাড়া ঘাঁটির অপর প্রান্তে যাওয়া সম্ভব ছিলো না। হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহুর বড় ভাই হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস ঘটনাক্রমে সেখানে এসে পড়লেন। তিনি অবস্থা দেখে মুসলমানদের সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে মুসলমানরা ! আল্লাহ পাক আমার ভাইকে শাহাদাতের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন এবং তার রূহ নিজের কাছে ডেকে নিয়েছেন। এখানে শুধু তার দেহ রয়েছে। এজন্য তোমরা তার লাশের ওপর দিয়ে অগ্রসর হও।"

একথা বলেই তিনি স্বয়ং ঘোড়া ছুটালেন। সাথে সাথে তাঁর পেছনে অন্য মুজাহিদরা অগ্রসর হলেন। এভাবে হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহুর দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলো। যুদ্ধ শেষ হলে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস ভাইয়ের লাশের অংশসমূহ বস্তায় ভরে দাফন করলেন।

ইবনে সায়াদ (র) বলেছেন, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত হিশামের শাহাদাতের খবর শুনলেন এবং তাঁর মুখ দিয়ে একথাগুলো বেরিয়ে এলো ঃ

"আল্লাহ তাআলা হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওপর নিজের রহমত বর্ষণ করেছেন। তিনি ইসলামের মহান সাহায্যকারী ছিলেন।" এ ঘটনার কয়েক বছর পর মক্কার এক বৈঠকে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হলো। প্রশ্নটি হলো— হিশাম উত্তম ছিলো, না আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস ? সেখানে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে একটা ঘটনা শুনাই। তা থেকেই তোমরা আন্দাজ করতে পারবে যে, আমাদের মধ্যে কে উত্তম ছিলো। আমি এবং হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহু দু'জনই যুদ্ধে (আজনাদাইন) অংশ নিয়েছিলাম। যুদ্ধের পূর্বের রাতে আমরা উভয়েই শাহাদাতের জন্য দোয়া করেছিলাম। সকালে হিশামের দোয়া কবুল হলো এবং আমি শাহাদাতের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত থাকলাম। এখন তোমরা বুঝে নাও যে, আল্লাহ কাকে ফযীলত দিয়েছিলেন।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ সাইফুল্লাহ

সাইয়েদেনা হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ ছিলেন ইসলামের এক মহান সেনাপতি এবং ইতিহাস সৃষ্টিকারী বিজেতা। তাঁর উজ্জ্বল কীর্তি এবং হক পথে জীবন উৎসর্গীকৃত মনোভাবের কথা পাঠ করে প্রত্যেক মুসলমানের দ্রুত হৃৎকম্পন শুরু হয় এবং রক্ত টগবগিয়ে ওঠে।

খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু সেই ব্যক্তি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাঁর জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলেছিলেন ঃ "হে আল্লাহ ! তুমি তাঁকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসার সুযোগ দাও।"

খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তো সেই ব্যক্তি ঃ যখন তিনি হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস এবং হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন তালহা সমভিব্যাহারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইয়াত নিলেন। এ সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুমদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "মক্কা নিজের কলিজাকে তোমাদের দিকে নিক্ষেপ করেছে।"

খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তো তিনি ঃ যিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে 'সাইফুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর তরবারী উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন এবং তাঁর সম্পর্কে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ

"খালিদ আল্লাহর এক অন্যতম তরবারী। তিনি এ তরবারীকে কাফেরদের বিরুদ্ধে খাপ থেকে বের করেছেন।"

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ সাইফুল্লাহ আমাদের ইতিহাসের এক মহান মর্যাদাবান বীর। তাঁর নজীরবিহীন বাহাদুরী এবং অত্যাশ্চর্যজনক সামরিক নিপুণতা ও যোগ্যতার স্বীকৃতি দুনিয়ার সকল চরিতকারই দিয়েছেন। আরবের মরু প্রান্তরের এ উজ্জ্বল সন্তান যদিও যুদ্ধ বিষয়ক কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছিলেন না, তবুও যুদ্ধের ময়দানে তাঁর অশ্ব চালনা, নিপুণতা, নেতৃত্ব, বাহাদুরী, বিচক্ষণতা এবং ব্যূহ রচনার প্রত্যুৎপন্নমতিতার কথা পাঠ করলে সন্দেহাতীতভাবে স্বীকার করতে হয় যে,

দুনিয়ার কোনো বড় জেনারেল এবং বিজয়ী সামরিক যোগ্যতায় তার সমকক্ষতা দাবী করতে পারেন না।

মিসরের একজন ঐতিহাসিক আব্বাস মাহমুদুল উকাদ নিজের রচিত গ্রন্থ "আবকারিয়াতু খালিদ"-এ হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদের সামরিক ব্যক্তিত্বের পর্যালোচনা করে বলেছেন ঃ

"সামরিক নেতৃত্বের সব গুণাবলীই খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর মধ্যে ছিলো। বাহাদুরী, সাহসিকতা, উপস্থিত বুদ্ধি, ক্ষিপ্রতা এবং শত্রুর ওপর অকল্পনীয় আঘাত হানার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় এবং মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধের পট পরিবর্তন করে দেয়া তাঁর জন্যে খেলার বস্তু ছিলো।

সন্দেহ নেই যে, খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু সাইফুল্লাহ আমাদের ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ নির্দ্বিধায় আমরা তাঁর ওপর গৌরব করতে পারি এবং হকের শত্রুর মুকাবিলায় তাঁর জীবন বাজী রাখার গুণ আমরা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদের সম্পর্ক কুরাইশের "বনু মাখজুম" গোত্রের সাথে ছিলো। জাহেলী যুগ থেকেই গোত্রটি অত্যন্ত মর্যাদাশীল গোত্র হিসেবে পরিচিত। কুরাইশরা মক্কায় নগর প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলো। এ প্রশাসনের সামরিক নেতৃত্ব ছিলো বনু মাখজুমের হাতে। সামরিক নেতৃত্বের দু'টি পদ "আল কুববাহ" যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় তাঁবু খাটানো কুরাইশদের একটি নিয়ম ছিলো। এ তাঁবুতে প্রত্যেকেই সামর্থ অনুযায়ী যুদ্ধের সরঞ্জাম এনে জমা দিতো। এবং "আল ইয়ান্নাহ" (অশ্বারোহী বাহিনী) এ গোত্রেরই করায়ত্বে ছিলো। গোত্রটি শরাফত, বাহাদুরী এবং যুদ্ধ অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে কুরাইশদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী ছিলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর বংশনামা নিম্নরূপ ঃ

খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ বিন মুগিরা বিন আবদুল্লাহ বিন উমার (ভিন্ন রাওয়ায়েতে আমর) বিন মাখজুম বিন ইয়াকজাহ বিন মাররাহ বিন কা'বা বিন লুববীউল কারাশী।

তাঁর বংশ ধারা উর্ধতন সপ্তম স্তরে গিয়ে (অর্থাৎ মাররাহ বিন কা'ব) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর বংশের সাথে মিলে যায়।

মাতার নাম ছিলো লুবাবাতুস সুগরা। তিনি ছিলেন হারিছ বিন হাযন হিলালীর কন্যা।

লুবাবাতুস সুগরা উম্মুল মু'মিনীন হযরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহ আনহা বিনতে হারিস এবং হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবদুল মুত্তালিবের স্ত্রী হযরত উম্মুল ফজল লুবাবাতুস কুবরার সহোদরা ছিলেন। এ সম্পর্কের কারণে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর খালু হতেন।

লুবাবাতুস সুগরার ইসলাম গ্রহণ প্রশ্নে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কারণ, তিনি হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফাতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কিন্তু অন্যান্যরা তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা স্বীকার করেন না।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদের মশহুর কুনিয়ত (পারিবারিক নাম) ছিলো আবু সুলাইমান। কতিপয় লোক অবশ্য তাঁর দ্বিতীয় কুনিয়াত হিসেবে আবুল ওয়ালিদও উল্লেখ করেছেন।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর পিতা ওয়ালিদ বনু মাখজুমের সরদার ছিলেন এবং কুরাইশদের অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে পরিগণিত হতো। সে সেসব "বড় লোকের" দলে ছিলো যাদের ব্যাপারে কুরাইশরা বলতো, কুরআন তাদের ওপর কেন অবতীর্ণ হয়নি। সূরা 'আয যুখরুফে' এ দিকেই ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে ঃ

"কাফেররা বলে, এ কুরআন সেই দু' বস্তির কোনো বড় মানুষের ওপর কেন অবতীর্ণ হয়নি।" মুফাসসিরগণ দু' বস্তির মর্মার্থ হিসেবে মক্কা মুয়াজ্জামা এবং তায়েফ শহরকেই গ্রহণ করেছেন। কুরাইশরা ওয়ালিদ বিন মুগিরা এবং তায়েফের উরওয়াহ বিন মাসউদ সাকাফিকে "মহান" ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করতেন। তাদের ধারণায় আকাশ থেকে যদি অহী নাযিলের প্রয়োজনই ছিলো, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বাদ দিয়ে (নাউজুবিল্লাহ) তা তাদের ওপর অবতীর্ণ হওয়াই যথার্থ ছিলো।

শুধুমাত্র ধন-সম্পদের দিক থেকেই নয় বরং ওয়ালিদ বিন মুগিরাহ বাস্তবতঃ মেধা ও ধীশক্তি, বদান্যতা ও দানশীলতা, অধিক সন্তান এবং বাগ্মীতার দিক থেকেও কুরাইশদের মধ্যে অনন্য মর্যাদাশীল আল আদল (ইনসাফ প্রিয়) এবং আল-ওয়াহিদ (একতা) উপাধিতে ভুষিত ছিলো। কথিত আছে যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্বেই সে মদপান সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেছিলো। সে হজ্জের সময় মিনায় হাজীদের খাবার খাওয়াতো এবং কাউকেই সেখানে খাদ্য রান্নার জন্যে আগুন জ্বালানোর অনুমতি দিতো না। এক বছর সে একাই কা'বা শরীফের গিলাফ চড়াতো। পরের বছর

কুরাইশের সবাই মিলে এ কাজ করতো। ধন-সম্পদের এত প্রাচুর্য ছিলো যে, সবসময় তার কাছে ১২ হাজার দিনার মওজুদ থাকতো। মক্কা এবং তায়েফে তার অসংখ্য বাগান ছিলো। সারা বছর এসব বাগানে ফল পাওয়া যেত। তার ১০টি পুত্র (অন্য রাওয়ায়েত মতো ১৪ অথবা ৮) ছিলো। পুত্ররা মজলিশে তার সাথে উপস্থিত থাকতো। খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদের মত যোগ্য সন্তানও তাদের মধ্যে ছিলেন। শক্তি এবং ক্ষমতার দিক থেকে সকল কুরাইশ সরদারের মধ্যে সে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলো। এ কারণেই হযরত আবদুল মুত্তালিবের পর কুরাইশের নেতৃত্বের যারা দাবীদার ছিলো তাদের মধ্যে সে-ও অন্যতম ব্যক্তিত্ব বলে পরিগণিত। সে ছিলো দৃঢ় সংকল্প সম্পন্ন এবং সাহসী। প্রসঙ্গত একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। কুরাইশরা যখন (রাসূলের নবুয়াত প্রাপ্তির ৫ বছর পর) সম্পূর্ণরূপে কা'বা ঘরের পুনঃ নির্মাণের ইচ্ছা ব্যক্ত করলো তখন কেউই তার কোনো অংশ ভাঙ্গার জন্যে এগুলো না। অবশেষে ওয়ালিদ বিন মুগিরাহ কোদাল হাতে নিয়ে ভবন ভাঙ্গতে শুরু করলো। এ সময় সে বলেছিলো, "হে কাবা ওয়ালারা ! আমরা যাকিছু করছি তাতে কোনো খারাপ নিয়ত নেই। আমাদের নিয়ত পবিত্র।"

ওয়ালিদ কা'বাকে অত্যন্ত তাজিম করতো। সে কখনো জুতা পায়ে সেখানে প্রবেশ করতো না। চরিতকারদের বর্ণিত গুণাবলীর দাবী অনুযায়ী তার ইসলাম গ্রহণ আবশ্যিক এবং কুরআনে করীমের স্বীকৃতিতেও অগ্রগামী হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বংশীয় অহমিকা এবং বিত্ত ও ক্ষমতা এ পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। নিজের শাসন এবং মর্যাদা বহাল রাখার উদ্দেশ্যে সে শুধু ইসলাম থেকে বঞ্চিতই থাকেনি বরং ইসলাম প্রসারে বাধাদানের জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলো।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওহীদের দাওয়াত প্রদান শুরু করলেন। এতে কুরাইশের মুশরিকরা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো। তারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার অনুসারীদের ওপর নির্যাতন চালানো এবং হক দাওয়াতে বাধা সৃষ্টির জন্যে কোমর বেঁধে লাগলো। এ কাজে আবু জেহেল, আবু লাহাব, আস বিন ওয়ায়েল, উমাইয়া বিন খালফ, উকবাহ বিন আবু মুয়িত এবং ওয়ালিদ বিন মুগিরা প্রমুখ অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হকের তাবলীগ থেকে বিরত রাখার জন্যে শক্তি প্রয়োগ করলো। কিন্তু তিনি তাদের কোনো পরোয়া না করে হকের তাবলীগের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে চললেন।

নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা বলেছেন, কুরাইশের মুশরিকদের কয়েকটি প্রতিনিধিদল বিভিন্ন সময়ে জনাব আবু তালিবের কাছে গমন করে। এসব দল

তাঁকে জানায়, হয় আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে [মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] হকের তাবলীগ থেকে বিরত রাখুন অথবা তাকে সমর্থন দান থেকে সরে পড়ুন। এ প্রতিনিধি দলগুলোতে ওয়ালিদ বিন মুগিরাও ছিলো। তার আরেক কাণ্ড খুবই স্মরণীয়। নিজের পুত্র আম্মারাহকে (হযরত খালিদের সহোদর) মুশরিকদের কাছে সমর্পণ করলো। আম্মারাহকে আবু তালিবের হাওলায় দিয়ে তার পরিবর্তে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চেয়ে নেয়ার জন্যে সে অনুরোধ জানালো। সুতরাং মুশরিকদের একটি দল জনাব আবু তালিবের কাছে গিয়ে বললো ঃ

"হে আবু তালিব ! আম্মারাহ বিন ওয়ালিদ কুরাইশের অত্যন্ত সুদর্শন ও তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন যুবক। তুমি তাকে নিজের পুত্র বানিয়ে নাও। আর তার পরিবর্তে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মাদকে আমাদের কাছে ন্যস্ত করো। এ মুহাম্মাদ তোমার বাপ-দাদার ধর্মের বিরোধিতা এবং তোমার কাওমের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া সে আমাদের সবাইকে আহাম্মক আখ্যা দিয়েছে। আমরা একজনকে দিয়ে দ্বিতীয়জনকে নিচ্ছি। যাতে তাকে আমরা হত্যা করতে পারি।"

জনাব আবু তালিব তাদের এ প্রস্তাব তাচ্ছিল্যভরে প্রত্যাখ্যান করলেন এবং কোনো মূল্যেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সমর্থন দান থেকে সরে দাঁড়ালেন না।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত আছে, কুরাইশ মুশকিরদের প্রতিনিধিদলসমূহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সরাসরিও সাক্ষাত করলো এবং তাঁকে বললো, আপনার যদি ধন-সম্পদের প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা আপনাকে এত ধন-সম্পদ প্রদান করবো যে, আপনি মক্কার সবচেয়ে বড় ধনী হয়ে যাবেন। আপনি যদি বাদশাহ এবং সরদার হতে চান তাহলে আমরা আপনাকে আমাদের সরদার ও বাদশাহ বানাতে প্রস্তুত আছি। আপনি যদি শাদী করতে চান, তাহলে যে মহিলাকেই পসন্দ করবেন তার সাথেই আপনার বিয়ে দিয়ে দিবো। কিন্তু শর্ত হলো, আপনাকে আমাদের মাবুদসমূহকে খারাপ বলা পরিত্যাগ করতে হবে। আপনি যদি এটা না মানেন তাহলে আমাদের অন্য প্রস্তাব আছে। প্রস্তাবটি হলো, এক বছর আমরা আপনার দীন গ্রহণ করবো এবং অন্য বছর আপনি আমাদের দীন গ্রহণ করবেন।

বিশ্বনবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কোনো কথাই মানলেন না এবং বললেন, আমি তোমাদের কাছে যে বস্তু এনেছি তা তোমাদের কাছ থেকে সম্পদ চাওয়ার জন্যে নয়। অথবা তোমাদের মধ্যে

মর্যাদাবান হওয়ার জন্যেও নয়। এমনকি তোমাদের বাদশাহ হওয়ার জন্যেও নয়। বরং আল্লাহ আমাকে তোমাদের কাছে নিজের রাসূল বানিয়ে প্রেরণ করেছেন এবং আমার ওপর একখানা কিতাব নাযিল করেছেন। তোমাদের প্রতি সুসংবাদদান এবং ভীতি প্রদর্শনের জন্যেও আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। বস্তুতঃ আমি আমার রবের বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। এখন যদি তোমরা তা কবুল করো তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতে সফল হবে। আর যদি তা প্রত্যাখ্যান করো তাহলে আমার এবং তোমাদের মধ্যে আল্লাহর ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত আমি ধৈর্যধারণ করবো।

কতিপয় রাওয়ায়েতে আছে, ওয়ালিদ বিন মুগিরা কুরআন আল্লাহর কালাম হওয়ার কথা স্বীকার করেছিলেন এবং দু' একবার অস্ফুট স্বরে তা প্রকাশও করেছিলেন। কিন্তু আবু জেহেল তাকে ঈমান গ্রহণের সৌভাগ্য থেকে বিরত রাখে। ইবনে ইসহাক (র), হাকিম (র) বাইহাকী (র) বর্ণনা করেছেন, একবার কুরাইশ নেতৃবৃন্দ (হজ্জের পূর্বে) এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিল যে, যখন সমগ্র আরব থেকে হাজীদের কাফেলা মক্কা আসবে তখন তাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে সন্দেহ ও ঘৃণা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালানো হবে। তখন ওয়ালিদ বিন মুগিরা তাদেরকে বললো, আমরা যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে লোকদেরকে বিভিন্ন কথা বলি, তাহলে তারা তা বিশ্বাস করবে না। এজন্যে চিন্তা-ভাবনা করে এক কথা বলার সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন। যাতে সবাই তা একমত হয়ে বলতে পারে। কিছু লোক বললো, আমরা মুহাম্মাদকে গণক বলবো। ওয়ালিদ বিন মুগিরা বললো, খোদার কসম! সে গণক নয়। আমরা গণক দেখেছি। গণকরা যে ধরনের কথা বলে কুরআনের সাথে তার দূরতম কোনো সম্পর্কও নেই।

কিছু লোক বললো, আমরা তাঁকে উন্মাদ বলবো। ওয়ালিদ বললো, আল্লাহর কসম ! সে উন্মাদও নয়। ভালো, মুহাম্মদ যে কালাম পেশ করেছেন, তা কোনো উন্মাদ কি পেশ করতে পারে ! অন্য কতিপয় লোক বললো, আমরা তাঁকে কবি বলবো। ওয়ালিদ বললো, তিনি কবিও নন। আমরা কাব্যের নখ দর্পণ সম্পর্কে অবহিত আছি। তাঁর বাণীকে কাব্য বলা যায় না।

মানুষেরা বললো, ঠিক আছে, তাহলে তাঁকে আমরা যাদুকর বলবো।

ওয়ালিদ একথায়ও একমত না হয়ে বললো, আমরা ওপরে বর্ণিত যে কথাই বলি না কেন, মানুষ তা কখনই গ্রাহ্য করবে না। আল্লাহর কসম ! এ কালামে অত্যন্ত মিষ্টতা আছে। তার মূল অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত এবং শাখা-সমূহ খুবই ফলবান।

এ কথায় আবু জেহেল রাগতস্বরে বললো, হে আবু আবদুস শামস (ওয়ালিদের কুনিয়াত)। হাজীদের সামনে গিয়ে আমরা কি বলবো তা তুমিই বলে দাও।

ওয়ালিদ বহুক্ষণ ধরে চিন্তা করে বললো, হাজীদের কাছে আমরা আপাততঃ তাকে যাদুকর হিসেবে চিত্রিত করতে পারি। কারণ, তাঁর কথায় স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র এবং ভাই-ভাইয়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়।

সুতরাং ওয়ালিদের কথায় সকলেই ঐকমত্যে পৌঁছলো এবং মুশরিকরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে অভিযানের ভিত্তি হিসেবে এ বানোয়াট কাহিনীই ঠিক করলো।

ওয়ালিদ বিন মুগিরার ভূমিকা প্রসঙ্গে সূরা মুদ্দাসসিরে এ পর্যালোচনা করা হয়েছে ঃ

"(হে পয়গাম্বর) ! আমাকে ছেড়ে দাও, আর সেই ব্যক্তিকে যাকে আমি একা সৃষ্টি করেছি। বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ তাকে দিয়েছি। তার সাথে সদা উপস্থিত থাকা বহু পুত্র দিয়েছি। আর তার জন্যে নেতৃত্ব কর্তৃত্বের পথ সুগম করে দিয়েছি। তা সত্ত্বেও সে লালসা পোষণ করে এজন্যে যে, আমি তাকে আরো অধিক দেব। কখনও নয়, আমাদের আয়াতসমূহের প্রতি সে অত্যন্ত শত্রু মনোভাবাপন্ন। আমি তো তাকে শীঘ্রই একটা কঠিন চড়াইতে চড়াবো। সে চিন্তা করেছে এবং কিছু কথাবার্তা রচনার চেষ্টা করেছে। হ্যাঁ, খোদার মার তার ওপর, কি রকমের কথা রচনার চেষ্টা করেছে। পরে (লোকদের প্রতি) তাকালো, পরে কপাল সংকুচিত করলো, মুখ বাঁকা করলো, পরে ফিরে গেলো ও অহংকারে পড়ে গেলো। শেষ পর্যন্ত বললো, এ কিছুই নয়, শুধু যাদু মাত্র, এতো পূর্বে থেকেই চলে আসছে। এতো একটা মানবীয় কালাম।"–(সূরা আল মুদ্দাসসির ঃ ১২-২৫)

কতিপয় মুফাসসির কুরআনে হাকীমের আরো কিছু আয়াত বিশেষ করে ওয়ালিদ বিন মুগিরা সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন।

ওয়ালিদ বিন মুগিরা কুফরী অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের তিন মাস পর ৯৫ বছর বয়সে মারা যায়।

কোনো পুস্তকে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদের জন্ম তারিখ সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু বিভিন্নভাবে জানা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির সময় তাঁর বয়স ২৪-২৫ বছর ছিলো। কেননা অধিকাংশ ঐতিহাসিক ২১ অথবা ২২ হিজরীতে তাঁর

বয়স ৬০ বছর ছিলো বলে বর্ণনা করেছেন। ইবনে আসাকির বলেছেন, হযরত খালিদ হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর সমবয়সী ছিলেন। শৈশবকালে একবার তিনি কুস্তি খেলতে গিয়ে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর পায়ের গোছা ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। বহু চিকিৎসার পর তা ঠিক হয়। এ হিসেব অনুযায়ী তিনি নবুয়াত প্রাপ্তির প্রায় ২৭ বছর পূর্বে ও নবীর হিজরতের প্রায় ৪০ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২১-২২ হিজরীতে তাঁর বয়স ৬০ বছরের বেশী ছিলো। (আল্লাহই এ ব্যাপারে ভালো জানেন)।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু মুখে সোনার চামচ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতা ছিলো সরদারদের সরদার। তার কাছে ধন-সম্পদ, দাস, উট, ঘোড়া, বাড়ী, বাগান মোটকথা সব জিনিসেরই প্রাচুর্য ছিলো। এজন্যে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত শান-শাওকাত এবং প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত-পালিত হন। যৌবনকালে জীবিকার প্রশ্নে নিশ্চিন্ত ছিলেন। প্রকৃতি তাঁকে 'সাইফুল্লাহ' হওয়ার জন্যে সৃষ্টি করেছিলো। এজন্যে তিনি আরাম-আয়েশে মশগুল হননি এবং এমন সব বৃত্তি বা কাজ অবলম্বন করেছিলেন যাতে সুস্থতা, শক্তি, বাহাদুরী, হিম্মত, শ্রম এবং উদ্যমশীল হয়ে গড়ে ওঠার পক্ষে সহায়ক হয়েছিলো। এসব বৃত্তির বিশদ বর্ণনা হলো ঃ

১- কুস্তি লড়া—হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু খুব কসরত করতেন এবং সমবয়সী যুবকদের সাথে কুস্তি লড়তেন।

২- অশ্বারোহণ—ঘোড়া তত্ত্বাবধান, ঘোড় দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ এবং (একজন ভালো অশ্বারোহী হওয়ার জন্যে) বেশী বেশী ঘোড়ায় সওয়ার হওয়া।

৩- যুদ্ধ ক্যাম্পের (আলকুব্বাহ) ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ।

৪- সেনা কৌশল প্রশিক্ষণ (তরবারী চালনা, নেযাবাজী প্রভৃতি)।

এ সামরিক প্রশিক্ষণ তিনি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রহণ করেননি। বরং খোলা ময়দান এবং প্রস্তরময় ঘাঁটিতেই তা লাভ করেছিলেন। অভিজ্ঞ বয়স্কদের তত্ত্বাবধান এবং কাওমের সামরিক ট্রাডিশনই শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছে।

প্রকৃতিগতভাবেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাসম্পন্ন, সতেজ মনের অধিকারী, বীর এবং ভয়হীন। দৃষ্টি ছিলো ঈগলের। আর অন্তর ছিলো বাঘের। কোনো কঠিন বিষয় এবং ভয়কে মোটেই পরোয়া করতেন না। তিনি যুদ্ধ সংক্রান্ত খোদা প্রদত্ত মন ও মনন লাভ করেছিলেন। বংশীয় ঐতিহ্য তার প্রকৃতিগত যোগ্যতাবলীকে আরো প্রোজ্জ্বল করে তুলেছিলো। এভাবে তিনি বিরাট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নিপুণ যোদ্ধা এবং মহান সেনাপতি হন। যুদ্ধে পারদর্শিতার

কারণে তিনি বিশ্বের ইতিহাসে প্রখ্যাত ও চিরকালীন মর্যাদায় ভূষিত হন। পিতার মৃত্যুর পর 'আল কুব্বাহ' এবং 'আলইয়ান্নাহ'র দায়িত্ব ও নেতৃত্ব তাঁর ওপরই অর্পিত হয়। তিনি এ দায়িত্ব সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পালন করেন। পিতা অগাধ ধন-সম্পদ রেখে গিয়েছিলো। এজন্যে তিনি ও তাঁর ভাইয়েরা রুটি-রুজির জন্যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হননি। ব্যবসা-বাণিজ্যও তিনি কর্মচারীদের দ্বারা সম্পাদন করতেন। কুরাইশের অনেক সরদারই বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে দূর-দূরান্তের (সিরিয়া, মিসর ইত্যাদি) সফরে যেতেন। কিন্তু বাণিজ্য ব্যাপদেশে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মক্কার বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হয়নি।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যের দাওয়াত প্রদান শুরু করলেন। এ সময় হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর এক সৌভাগ্যবান সহোদর ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন ওয়ালিদ নবীর নবুয়াত প্রাপ্তির প্রথম দিকেই (ভিন্ন রাওয়ায়েত অনুযায়ী বদরের যুদ্ধের অব্যবহিত পরই) সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু পিতার অনুসরণ করলেন এবং মুশরিকদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলাম বিরোধিতায় কোমর বেঁধে দাঁড়ালেন। এ সত্ত্বেও তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যুলুম-নির্যাতন প্রশ্নে কোনো নীচতা অবলম্বন করেননি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় হিজরত এবং পিতার মৃত্যুর পরও ৭ বছরের বেশী সময় ধরে তিনি মুশরিকদের সমর্থক ছিলেন। বদরের যুদ্ধে (দ্বিতীয় হিজরী) মুশরিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত থেকেও কোনো কৃতিত্ব প্রদর্শনের সুযোগ পাননি। ওহোদের যুদ্ধে (তৃতীয় হিজরী) মক্কার অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহোদ পাহাড়ের ফটকের রাস্তায় ৫০জন তীরন্দাজ মোতায়েন করেন। উদ্দেশ্য ছিলো যাতে কাফেররা এ পথ অতিক্রম করে পেছনের দিক থেকে মুসলমানদের ওপর হামলা করতে না পারে। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে কাফেররা পরাজিত হয় এবং ফটকের রাস্তায় মোতায়েনকৃত বেশীর ভাগ তীরন্দাজই [হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশের পরিপন্থী] নিজেদের স্থান পরিত্যাগ করে। তখন ঈগল দৃষ্টি সম্পন্ন খালিদ মুসলমানদের দুর্বলতা অনুমান করতে সক্ষম হন এবং নিজের বাহিনীসহ সেই ফটকের রাস্তায় মুসলমানদের পিছন দিক থেকে হামলা করে বসেন। এ অপ্রত্যাশিত হামলায় মুসলমানদেরকে সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।

খন্দকের যুদ্ধে (পঞ্চম হিজরী) খালিদ মক্কার অশ্বারোহী বাহিনীর অন্যতম ছিলেন। এ বাহিনী পরিখার পাশে পাশে টহল দিয়ে ফিরতো। যাতে পরিখার কোনো অংশ দুর্বল হয়ে পড়লে অথবা মুসলমানরা অসতর্ক হলে তিনি পরিখা

অতিক্রম করে মুসলমানদের ওপর হঠাৎ করে হামলা করে বসতে পারেন। কিন্তু মুসলমানদের সজাগ দৃষ্টি তাঁকে সেই সুযোগ দেয়নি। দু' তিন সপ্তাহ পর কাফেরদের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি হলে খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ ও আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে তারা তাদের পেছনের দিক হেফাজতের অনুরোধ জানায়। সুতরাং তাঁরা দু'জন দু'শ অশ্বারোহী সহ কাফের বাহিনীর পেছনের দিক রক্ষার দায়িত্ব নেন।

৬ষ্ঠ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১৪শ সাহাবী সমভিব্যাহারে কা'বা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে মক্কা রওয়ানা হলেন। কাফেররা এ খবর পেয়ে মুসলমানদের বাধাদানের ইচ্ছা ব্যক্ত করলো এবং খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদকে দু'শ অশ্বারোহী সহ মুসলমানদের বাধা (অথবা আরো যাচাই) দানের জন্যে মক্কা থেকে রওয়ানা করেছিলো। "কিরাগুল গামিম" নামক স্থানে পৌছলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আগমনের খবর পেলেন। বস্তুতঃ তিনি যুদ্ধ করতে চাননি। এজন্যে রাস্তা পরিবর্তন করে হুদাইবিয়া পৌছলেন এবং সেখানে তাঁবু স্থাপন করলেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধি পরবর্তী বছরে (৭ হিজরী) চুক্তি অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবন উৎসর্গকারী সাহাবীদের সহ যখন কাযা ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কা প্রবেশ করলেন, তখন খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ মক্কার বেশীর ভাগ লোকের সাথে শহরের বাইরে বেরিয়ে গেলেন। কেননা তিনি মুসলমানদের মক্কায় প্রবেশের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। মক্কায় তিন দিন অবস্থানকালে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর সহোদর ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদকে (যিনি অত্যন্ত মুখলিস মুসলমান ছিলেন) বললেন— "আফসোস ! খালিদ আমার কাছে এলো না। যদি সে আসতো তাহলে আমরা তাকে উষ্ণ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করতাম। খালিদের মত ব্যক্তির ইসলাম থেকে দূরে থাকা উচিত নয়।" এক রাওয়ায়েতে আছে, সে সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর ইসলাম কবুলের জন্যে দোয়াও করেছিলেন।

হযরত ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের ভাইয়ের আন্তরিক শুভাকাংখী ছিলেন। তিনি মদীনা ফিরে গিয়ে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে এ পত্র লিখলেন ঃ

"বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম—তোমার ইসলাম বিরোধিতায় আমি বিস্মিত। তোমার মতো একজন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ইসলামের সত্যতা

সম্পর্কে বেখবর থাকতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে তোমার ব্যাপারে জানতে চেয়েছেন যে, খালিদ কোথায় ? আমি আরজ করেছি, খালিদকে আল্লাহই আনতে পারেন। তিনি বলেছেন, খালিদের মত বুদ্ধিমান মানুষ ইসলামের তাৎপর্য সম্পর্কে অনবহিত থাকতে পারে না। সে যদি মুসলমানদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো, সেটাই তার জন্যে উত্তম হতো। ভাই আমার ! দীর্ঘদিন যাবত তুমি পথভ্রষ্ট থেকেছো। এখন হক সম্পর্কে অবহিত হও এবং ইসলামের রজ্জু মযবুতভাবে আকড়ে ধরো।"

এ পত্র হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ইসলামের প্রতি আসক্ত করে তুললো। কিছুদিন পরই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে ঈমান আনলেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ স্বয়ং তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"ওয়ালিদের চিঠি আমার অন্তরের ওপর আচ্ছাদিত তমসার জাল ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেললো এবং আমি ইসলামের প্রতি অগ্রসর হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার সম্পর্কে যা কিছু বলেছিলেন তাতে অত্যন্ত খুশী হলাম এবং তাঁর খিদমতে উপস্থিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। তৎকালীন সময়ে এক স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি অপ্রশস্ত এবং বিরাণ স্থান থেকে বের হয়ে এক প্রশস্ত ও সবুজ এবং শ্যামল প্রান্তরে এসে পড়েছি। (এ স্বপ্ন দেখার পর) মদীনা গমনের সম্পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে প্রথমতঃ সাফওয়ান বিন উমাইয়া ও ইকরামাহ বিন আবু জেহেলের সাথে সাক্ষাত করলাম এবং তাদেরকে বললাম, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরব ও আযমের ওপর বিজয়ী হতে চলেছে। আমরা যদি তাঁকে সাহায্য করি তাহলে যে মর্যাদায় তিনি ভূষিত হতে চলেছেন তাঁর অংশীদার আমরাও হবো। তারা উভয়েই আমার কথা মানতে পরিষ্কার অস্বীকৃতি জানালো। অতপর আমার বন্ধু ওসমান বিন তালহার সাথে সাক্ষাত করলাম এবং বললাম, ওসমান ! আমাদের অবস্থা সেই খেঁকশিয়ালের মতো যে নিজের আবাসস্থলে লুকিয়ে বসে থাকে। সেখানে যদি পানি ঢেলে দেয়া হয়, তাহলে সে সেখান থেকে বের হতে বাধ্য হয়। আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, মুসলমানরা আমাদের ওপর বিজয়ী হবে। সেই সময় আগমনের পূর্বেই কি আমাদের ইসলাম গ্রহণ উত্তম নয় ?

আমি অত্যন্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে ওসমানকে একথা বলেছিলাম। কেননা তার পিতা এবং চার ভাই ওহোদের যুদ্ধে মারা গিয়েছিলো। আমার ধারণা ছিলো, সেও সাফওয়ান এবং ইকরামার মতো আমার কথা মানবে না। কিন্তু আমি চরমভাবে বিস্মিত হলাম। ওসমান নির্দ্বিধায় আমার প্রস্তাব মেনে নিলো।

পরবর্তী দিন আমরা দু'জন প্রত্যুষে মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলাম। "হাদাহ" নামক স্থানে আমর ইবনুল আসের সাথে আমাদের সাক্ষাত হলো। তিনি হাবশা থেকে আসছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, সুলাইমান কোথায় যাচ্ছো ? আমি বললাম, খোদার কসম ! খুব হয়েছে। আমার দৃঢ় আস্থা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। ইসলাম গ্রহণের জন্যে আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি। বস্তুতঃ আমরা এক সাথে মদীনা পৌছলাম। আমাদের আগমনের খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত খুশী হলেন এবং মুসলমানদেরকে বললেন, মক্কা নিজের কলিজার টুকরা তোমাদের সামনে এনে দিয়েছে। আমি নতুন কাপড় পরিধান করলাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবাসস্থলের দিকে রওয়ানা হলাম। রাস্তায় আমার ভাই ওয়ালিদের সাথে দেখা হলো। সে বললো, তাড়াতাড়ি চলো। তোমাদের আগমনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব খুশী হয়েছেন এবং তোমাদের জন্যে প্রতীক্ষা করছেন। আমরা তাড়াতাড়ি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হলাম। আমাদেরকে দেখে তাঁর চেহারা হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আমি কাছে গিয়ে সালাম করলাম। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তার জবাব দিলেন। আমি আরজ করলাম, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউই ইবাদাতের যোগ্য নয় এবং আপনি তার রাসূল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহর শোকর, তিনি তোমাকে হিদায়াত নসীব করেছেন। আমারও এটাই আশা ছিলো যে, তোমার অন্তর্দৃষ্টি একদিন তোমাকে অবশ্যই সোজা রাস্তা দেখাবে।

আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ! কয়েকবার আমি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গোনাহর কাজ করে ফেলেছি। আল্লাহর কাছে আপনি আমার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করুন। তিনি বললেন, ইসলাম পূর্বেকার সকল গোনাহকেই অস্তিত্বহীন করে দেয়। আমি (বিস্মিত হয়ে) বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! ইহাই কি যথার্থ ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

এরপর তিনি দোয়া করলেন। তিনি বললেন, হে খোদা ! অতীতে তোমার দীনের বিরোধিতায় খালিদ যাকিছু করেছে তা ক্ষমা করে দাও।

আমার পর আমর ইবনুল আস এবং ওসমান বিন তালহাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাইয়াত নিয়েছিলো।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ মদীনা মুনাওয়ারাতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এভাবে তিনি হিজরতের মর্যাদাও লাভ করেন। এ ঘটনা মক্কা বিজয়ের ৬ মাস পূর্বে ঘটেছিলো। হযরত খালিদ

রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেন, ঈমান আনার পর অবস্থানের জন্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে একটি বাড়ী দান করেছিলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ ইসলামের তরবারীধারী বাহুতে পরিণত হলেন। তিনি তরবারীর মাধ্যমে প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্রে খোদাদ্রোহী বা তাগুতী শক্তিকে নাকানি-চুবানি খাইয়ে ছেড়েছিলেন। সর্বপ্রথম মুতার যুদ্ধে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর তরবারী ঝলসে উঠেছিলো। আর তাঁর ইসলাম গ্রহণের দু' মাস পরেই এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুলতান এবং আমীরদের নামে ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্রাবলী প্রেরণ করেন। এ ধরনের একটি তাবলিগী পত্রসহ তিনি হযরত হারিস রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন উমাইর ইজদীকে বসরার শাসকের কাছে প্রেরণ করেন। হযরত হারিস রাদিয়াল্লাহ আনহু মুতা নামক স্থানে পৌছলে বলকার শাসক শুরাহবিল বিন আমর গাস্সানি তাঁকে শহীদ করে ফেলে। এর প্রতিশোধ গ্রহণার্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন হারেসার নেতৃত্বে তিন হাজার সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরণ করেন। বাহিনীটি রওয়ানার প্রাক্কালে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, যদি যায়েদ শহীদ হয়ে যায়, তাহলে জাফর রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি তালিব সেনাপতি হবেন। যদি তিনিও শাহাদাত প্রাপ্ত হন, তাহলে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন রাওয়াহা আনসারী সেনাবাহিনী প্রধান হবেন।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ এ বাহিনীতে একজন সাধারণ সিপাহী হিসেবে যোগ দেন। মুসলমানদের আগমনের সংবাদ পেয়ে বসরার শাসক মিত্র গোত্রদের মিলিয়ে এক বিরাট বাহিনী একত্রিত করলো। ঘটনাক্রমে রোমের কাইসারও উক্ত এলাকার "মুয়াব" নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন করেছিলো। সে হাজার হাজার রোমীয় সিপাহীকে বসরার শাসকের সাহায্যের জন্যে প্রেরণ করলো। এভাবে শত্রুর সংখ্যা দেড় লাখ গিয়ে পৌছলো। মুসলমান এবং শত্রু সৈন্যের সংখ্যার অনুপাত ছিলো ১ ঃ ৬০। (অন্য রাওয়ায়েত মুতাবিক ১ ঃ ৮৩)। এ সত্ত্বেও মুসলমানরা আল্লাহর ওপর ভরসা করে খোদাদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন।

মুতার রণ ক্ষেত্রে উভয় বাহিনীর মধ্যে ঘোরতর লড়াই হলো। এ যুদ্ধে হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন হারেসা হযরত জাফর রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি তালিব এবং হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন রাওয়াহা একের পর এক অত্যন্ত বাহাদুরীর সাথে লড়াই করে শহীদ হন। এরপর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ বাহিনীর কমাণ্ড হাতে নিলেন এবং

নিজের নজীর বিহীন বাহাদুরী ও সামরিক যোগ্যতার বদৌলতে মুসলমানদেরকে শত্রুর ঘেরাও থেকে বের করে আনলেন। যদিও শত্রুর সংখ্যাধিক্য এবং সাজ-সরঞ্জামের (এ কারণেও যে মুসলমানেরা নিজেদের কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে ছিলেন) কারণে তাদেরকে পদানত করা যায়নি। তবুও মাত্র তিন হাজারের একটি ক্ষুদ্র দলের বেঁচে যাওয়াটাই বাস্তবে তাদের বিজয় বলে অভিহিত করতে হয়। (অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে, মুসলমানরা শত্রু পক্ষের অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলো)। এ প্রচণ্ড লড়াইয়ে মুসলমানদের মাত্র ১২ ব্যক্তি শহীদ হন। পক্ষান্তরে শত্রু পক্ষের হাজার হাজার মানুষ ময়দানে লাশ হয়ে পড়েছিলো।

সকল নেতৃস্থানীয় চরিতকার বিশ্বস্ততা ও ধারাবাহিকতায় এ রাওয়ায়েত নকল করেছেন যে, মুসলমানেরা মুতার যুদ্ধে জীবন মরণ লড়াইয়ে লিপ্ত। সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের একটি দল সহ মসজিদে নববীতে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ করে তিনি বললেন ঃ

"যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহু নিশান হাতে নিয়েছে এবং শহীদ হয়ে গেছে। এরপর জাফর রাদিয়াল্লাহ আনহু ঝাণ্ডা হাতে নিলো এবং সে-ও শহীদ হয়ে গেলো। অতপর আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন রাওয়াহা পতাকা গ্রহণ করলো এবং সেও শাহাদাত প্রাপ্ত হলো। এখন সেই ব্যক্তি ঝাণ্ডা হাতে নিলো যে আল্লাহর অন্যতম তরবারী।"

অন্য এক রাওয়ায়েতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এ বাক্যাবলী সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে ঃ

"তাদের (যায়েদ, জাফর এবং আবদুল্লাহ) পর খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ ঝাণ্ডা হাতে নিলেন। হে খোদা ! সে তোমার তরবারীসমূহের অন্যতম। তাকে সাহায্য করো।"

সেদিন থেকেই হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তরবারী) উপাধিতে ভূষিত হলেন।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেছেন, মুতার যুদ্ধে তার হাতে ৯টি তরবারী ভেঙ্গেছিলো। শুধুমাত্র একটি ইয়েমেনী তরবারী অবশিষ্ট ছিলো। মুতার যুদ্ধের সময় রণ ক্ষেত্রের চিত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পেশ করা হয়েছিলো। অথবা অহীর মাধ্যমে সকল খবর অবহিত করা হয়েছিলো। এ দু'য়ের যেটিই ঘটুক না কেন চরিতকাররা এ ব্যাপারে একমত যে, মুজাহিদদের মদীনা প্রত্যাবর্তনের বেশ কিছুদিন আগেই হুজুর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত জাফর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও হযরত আবদুল্লাহর শাহাদাতের খবর সাহাবীদেরকে প্রদান করেছিলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর অসাধারণ তৎপরতা এবং কৃতিত্বের কথাও তিনি উল্লেখ করেছিলেন। এ ঘটনাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুজিযার মধ্যে গণ্য করা হয়।

মক্কা বিজয়কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলো ১০ হাজার সাহাবী। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদও তাদের সাথে ছিলেন। মক্কা বিজয়ের কথা শতাব্দী বছর পূর্বে তাওরাতে (কিতাবে ইসতিসনা) এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ "খোদাওন্দ সিনা থেকে এলেন। শায়ীর থেকে সেখানে আবির্ভূত হলেন এবং ফারান পর্বত থেকে চমকিত হলেন এবং ১০ হাজার পবিত্র আত্মাসহ এসেছিলেন তাঁর দক্ষিণ হস্তে নুরানী শরীয়াত ছিলো।"

মদীনা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ইসলামী বাহিনীর দক্ষিণ দিকের অফিসার নিয়োগ করলেন। এ বাহিনীতে সুলাইম, মাযিনা, আসলাম, গিফার, জাহিনা প্রভৃতি আরব গোত্রসমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র হেরেম শরীফে যুদ্ধ করতে চাননি। এজন্য কাফেররা বাধা না দেয়া পর্যন্ত তিনি কারোর ওপর তরবারী না ওঠানোর জন্য মুসলমান বাহিনীর প্রতিটি সদস্যের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলেন। মক্কার মুশরিকরা সামষ্টিকভাবে মুসলমানদের বাধা দেয়ার হিম্মত করেনি। অবশ্য ইকরামাহ বিন আবু জেহেল এবং সাফওয়ান বিন উমাইয়া বনি বকর এবং আহাবিশ গোত্রের কিছু লোকজনকে একত্রিত করে মুসলমানদের সে বাহিনীর ওপর হামলা (তীর নিক্ষেপ) করে বসলো, যার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ। তিনি উঁচু অংশ দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। বাধ্য হয়ে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং তার সাথীরা তরবারী খাপ থেকে বের করলেন। তাঁরা মুশরিকদেরকে ভালোমতো ধোলাই দিলেন। শেষে তারা পালিয়ে গেলো। এ সংঘর্ষে তাদের ২৮জন মারা গেলো (তাদের মধ্যে ২৪জন ছিলো কুরাইশ এবং ৪জন ছিলো হাযিল গোত্রের) এবং মুসলমানদের ২জন (অন্য রাওয়ায়েত মতে তিনজন) শহীদ হলেন। অন্য আর এক রাওয়ায়েতে আছে, শাহাদাত প্রাপ্ত দু' মুসলমান হযরত কুরয রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জাবের ফাহরী এবং হাবিশুল আশয়ার রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য কোনো রাস্তায় গিয়ে পড়েছিলেন। মুশরিকরা একাকী পেয়ে তাদেরকে শহীদ করে ফেলে।

সহীহ আল বুখারীতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ঘটনার কথা জানতে পেরে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! প্রথমে তারাই আমাদের ওপর আক্রমণ করেছিলো। আমরা আত্মরক্ষামূলক সেই হামলার জবাব দিয়েছিলাম।"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "ভালো, আল্লাহর যা মর্জি।"

মক্কা বিজয়ের ৫দিন পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ৩০জন অশ্বারোহী সহ নাখলাহ উপত্যকায় অবস্থিত কুরাইশদের এক বড় মূর্তি "আল উজ্জা"কে মিসমার করার জন্য প্রেরণ করলেন। কিনানার কুরাইশ এবং মুদির প্রভৃতি গোত্রের লোকেরা এ মূর্তিকে সীমাহীন সম্মান করতো। উজ্জার মন্দিরের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বভার ন্যস্ত ছিলো বনু শাইবানের ওপর এবং মক্কা থেকে ১০ মাইল দূরে এক বাগানে (আমেরের বাগান) তা অবস্থিত ছিলো। এ বাগানের সংশ্লিষ্টতার কারণে তা নাখলাহ উপত্যকার নামে বিখ্যাত ছিলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ৮ম হিজরীর ২৫শে রমযান সেখানে পৌছে উজ্জা এবং তার মন্দির ধ্বংস করে ফেললো। সেখান থেকে মক্কা ফিরে এসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাড়ে তিন'শ সাহাবীসহ ইসলামী দাওয়াতের লক্ষ্যে তাঁকে বনু জাযিমার দিকে প্রেরণ করলেন। তারা ছিলো বনু কিনানার একটি শাখা। ইয়ালামলামের দিকে মক্কা থেকে একদিনের দূরত্বের পথে তারা বসবাস করতো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ মত তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা আগেই ইসলাম কবুল করেছিলেন কিন্তু তাদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি অজ্ঞতার কারণে সঠিক বাক্যে নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করতে পারলো না এবং আসলামনা (অর্থাৎ আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি)—এর পরিবর্তে "সাবানা" (অর্থাৎ আমরা দীন পরিবর্তন করেছি) বললেন। এর আসল মর্মার্থ ছিলো আমরা পিতার ধর্ম পরিত্যাগ করে নতুন দীন (ইসলাম) গ্রহণ করেছি। বস্তুত কুরাইশ মুশরিকরা মুসলমানদেরকে সাবি বলতো। এজন্য বনু জাযিমার ঐ লোকেরাও ইসলাম গ্রহণের কথা "সাবি" শব্দ দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু মনে করলেন, তারা বেদীন হওয়ার কথা প্রকাশ করছে। সুতরাং তিনি তাদেরকে হত্যা করালেন। কতিপয় রাওয়ায়েতে আছে, হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বনু জাযিমার সকলকে গ্রেফতার করে নিয়ে সাথীদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। অতপর তাদের হত্যার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু হযরত আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ আনহু

বিন আওফ, হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবু কাতাদাহ এবং অন্যান্য অনেক সাহাবী নিজেদের কয়েদীকে ছেড়ে দিলেন। অবশ্য বনু সুলাইম নিজের কয়েদীদেরকে হত্যা করে ফেললো।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ঘটনার খবর পেয়ে খুবই দুঃখিত হলেন এবং আকাশের দিকে হাত তুলে বললেন, "হে আল্লাহ ! খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ যাকিছু করেছে তা থেকে আমি মুক্ত।" অতপর হযরত আলী কাররামুল্লাহ ওয়াজহাহুকে তাদের সবার শোণিত পাতের মূল্য বা খেসারত দিয়ে প্রেরণ করলেন। তিনি বনু জাযিমার কাছে গমন করলেন এবং যত মানুষ নিহত হয়েছিলেন তাদের সবার খেশারত বা দিয়াত আদায় করলেন। এমনকি কারোর কুকুরের মূল্যও তিনি আদায় করেছিলেন। এরপর যত মাল বেঁচে ছিলো তাও তিনি তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেন।

বনু জাযিমার অভিযানের পর ৮ম হিজরীর শাওয়াল মাসে হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ ইসলামী বাহিনীর অগ্রবর্তী দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বনু সুলাইম গোত্রের একশ' সোয়াশ সৈন্য এ দলে ছিলো। বনু হাওয়াযেন গোত্র নিজেদের অবস্থান থেকে মুসলমানদের ওপর তীব্রভাবে তীর নিক্ষেপ করলো। তাতে তাদের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি হলো। কিন্তু অবিলম্বে পরিস্থিতি সামলে নিয়ে মুসলমানরা প্রচণ্ডভাবে জবাবী হামলা করলো। ফলে বনু হাওয়াযেন গোত্র এবং তাদের সাথীদের পরাজয় ঘটলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ এ যুদ্ধে জান-প্রাণ দিয়ে লড়াই করলেন এবং কয়েকটি আঘাত পেলেন। যুদ্ধ শেষ হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সেবা শুশ্রূষার জন্য তাশরীফ আনলেন। ইবনে আসির রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ক্ষতস্থানসমূহে ফুঁ দিলেন এবং তিনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠলেন।

ইবনে বুরহান উদ্দীন হালাবী (র) "আস সিরাতুল হালাবিয়া" গ্রন্থে লিখেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর সেবা শুশ্রূষার জন্যে বিভিন্ন নির্দেশ দিয়েছিলেন।

হুনাইনের যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফ অবরোধ করলেন। এবারও তিনি হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ইসলামী বাহিনীর অগ্রবর্তী দলের অফিসার নিয়োগ করলেন। অবরোধকালে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহ আনহু অবরুদ্ধ মুশকিরদের যুদ্ধের আহ্বান জানালেন। কিন্তু কেউই তাঁর মুকাবিলা করতে বের হয়ে আসার সাহস করলো না। প্রায় এক

মাস পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন কারণে অবরোধ প্রত্যাহার করে নিলেন।

নবম হিজরীর প্রথম দিকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু মুসতালিক গোত্রের মুরতাদ হয়ে যাওয়ার খবর পেলেন। এ গোত্র দু' বছর আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। তাদেরকে শিক্ষাদানের জন্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে প্রেরণ করলেন। প্রেরণের মুহূর্তে তারা নামায পড়ে কিনা তা ভালোভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করার নির্দেশও তিনি তাঁকে দিলেন। যদি নামায পড়ে তাহলে তাদের ওপর আক্রমণ থেকে বিরত থাকতে বললেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের বাহিনীসহ বনু মুসতালিক গোত্রের বস্তিতে পৌঁছলেন। এ সময় রাত হয়ে গিয়েছিলো। কতিপয় ব্যক্তিকে তিনি বনু মুসতালিকের অবস্থা অবহিত হওয়ার জন্য প্রেরণ করলেন। তাঁরা ফিরে এসে জানালো, সমগ্র গোত্রই ইসলামের ওপর কায়েম আছে। তারা নিয়ম মত আযান দেয় এবং নামায পড়ে। সকালে সকালে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বস্তিতে প্রবেশ করলেন। বনু মুসতালিক গোত্রের লোকেরা তাঁকে উষ্ণ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন এবং খুব খাতির আত্তির করলো। সুতরাং তিনি তাদের সাথে কোনো সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন না এবং ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সব অবহিত করলেন।

নবম হিজরীর রযব মাসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোমীয়দের আশংকামূলক হামলা মুকাবিলার জন্য ৩০ হাজার সাহাবী সমেত তাবুক তাশরীফ নিলেন। এ দীর্ঘ কঠিন সফরে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহযাত্রী ছিলেন। তাবুক পৌঁছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে কোনো রোমীয় সৈন্য পেলেন না। তবুও তিনি সেখানে সাবধানতামূলকভাবে ২০ দিন অবস্থান করলেন। তিনি এ সময় আশেপাশের খৃষ্টান সরদারদেরকে অনুগত বানানোর দিকে মনোযোগ দিলেন। তারা রোমের কাইসারের করদাতা ছিলো এবং মুসলমানদের বিরোধিতায় রোমীয়দের সাহায্য করতো। আইলাহ ও আজরাহর সরদাররা কোনো বাধা ব্যতিরেকেই আনুগত্য কবুল করলো। শুধুমাত্র দাওমাতুল জানদালের সরদার একিদর বিল আবদুল মালিক নাছরানী আনুগত্য করলো না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদকে চার শ'র কিছু বেশী লোক দিয়ে তাকে অনুগত করার কাজে নিয়োগ করলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু দাওমাতুল জানদালের কাছে পৌঁছলেন। এ সময় একিদরের সহোদর হাসান এবং অন্যান্য বহু লোক সহ শিকারে বেরিয়েছিলো। জঙ্গলেই তাদের সাথে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ

আনহুর সংঘর্ষ হয়ে গেলো। হাসান সংঘর্ষে মারা গেলো এবং হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু একিদরকে গ্রেফতার করলেন। বাকীরা পালিয়ে দুর্গে আশ্রয় নিলো। একিদর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌছে জিযিয়া প্রদান, দুই হাজার উট, আটশ' ঘোড়া, চারশ' যিরা এবং চারশ' নিযাহ দেয়ার প্রস্তাব পেশ করলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এ প্রস্তাব মেনে নিলেন। সুতরাং একিদর এবং তার অন্য সহোদর মাছাদিয়া জিনিসপত্তর নিয়ে তাবুক পৌছলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে অবস্থান করছিলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু একিদরকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে পেশ করলেন। সে আনুগত্য কবুল করে হাদীয়া পেশ করলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিযিয়া কবুল করে নিলেন এবং তার জান ও মালের লিখিত নিরাপত্তা দান করলেন। এভাবে সে দাওমাতুল জানদালের ওপর ইসলামী রাষ্ট্রের একজন করদাতা সরদার হিসেবে বহাল হলো।

দশম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদকে চারশ' অশ্বারোহী সহ ইসলামের দাওয়াত প্রদানের জন্যে বনু আবদুল মাদানের দিকে নাজরান প্রেরণ করলেন। এ গোত্র বনু হারিস বিন কাবের একটি শাখা। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সময় তাঁকে তাদের প্রতি তিনবার ইসলামের দাওয়াত দানের হেদায়াত দিলেন। তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে সেখানে কিছুদিন অবস্থান করে তাদেরকে ইসলামের হুকুম-আহকামের শিক্ষাদানের নির্দেশ প্রদান করলেন। আর যদি তারা বিদ্রোহ করে, তাহলে তাদের সাথে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে যুদ্ধের ইখতিয়ার দিয়ে দিলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু নাজরান পৌছে বনু আবদুল মাদানকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। এ দাওয়াত তারা হৃষ্টচিত্তে কবুল করলো এবং ঈমান আনলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ মুতাবেক হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু সেখানে অবস্থান করলেন এবং তাঁদেরকে কুরআন, সুন্নাহ ও আহকাম এবং মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কিত শিক্ষাদানে মশগুল হয়ে পড়লেন। কিছুদিন পর তিনি এক পত্রে সকল অবস্থা লিখে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করলেন। জবাবে তিনি লিখলেন, বনু আবদুল মাদানের একটি প্রতিনিধিদলসহ তুমি মদীনা চলে এসো। সুতরাং হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদের একটি প্রতিনিধিদলসহ মদীনা পৌছলেন এবং সেই দলকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির করলেন। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের দর্শন এবং বাইয়াতের গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে স্বদেশ ফিরে গেলেন।

ইবনে জারীর তাবারী (র) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশম হিজরীতে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদকে ইসলামের তাবলীগের জন্যে ইয়েমেন প্রেরণ করেছিলেন। তিনি সেখানে ৬ মাস অবস্থান করে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকলেন। কিন্তু তাদের ওপর কোনো প্রভাব পড়লো না। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী কাররামাল্লাহ ওয়াজহাহুকে সেখানে পাঠালেন। তাঁর তাবলীগের ফলে ইয়েমেনের অধিকাংশ মানুষ অল্প দিনেই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

ইবনে সায়াদ (র) এবং ইবনে হিশাম (র) এ ঘটনাকে অন্যভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর নেতৃত্বে ইয়েমেনে একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। অন্যদিক থেকে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদকেও একটি বাহিনীসহ পাঠালেন এবং বললেন, তুমি যখন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে মিলিত হবে তখন সম্মিলিত বাহিনীর নেতা হবেন আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু। তিনি তাদেরকে প্রথমে হামলা না করার নির্দেশও দিলেন। যদি ইয়েমেনবাসীরা তোমাদের ওপর হামলা করে বসে তাহলে তোমরা আত্মরক্ষা করতে পারো। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ইয়েমেন পৌঁছে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তার জবাবে ইয়েমেনবাসীরা মুসলমানদের ওপর পাথর এবং তীর নিক্ষেপ করলো। হকপন্থীরা প্রথম জবাবেই তাদেরকে পিছু হটিয়ে দিলো। কিন্তু তাদের ওপর কোনো কঠোর আচরণ করলেন না এবং দ্বিতীয়বার তাদের সামনে ইসলাম পেশ করলেন। এবার তারা স্বেচ্ছায় এবং আনন্দচিত্তে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিলেন।

মিসরীয় ঐতিহাসিক আবু যায়েদ শালবী নিজের পুস্তক "খালিদ সাইফুল্লাহতে" তাবারীর (র) রাওয়ায়েতের সমালোচনা করেছেন। তিনি এ বর্ণনাকে জ্ঞান এবং ইতিহাস উভয় দিক থেকেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে অভিহিত করেছেন।

দশম হিজরীতেই হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিদায় হজ্জে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহযাত্রী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

মখদুম মুহাম্মদ হাশিম সিন্ধী (র) নিজের পুস্তক "বাযলুল কুওয়াতে" লিখেছেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১১ হিজরীতেই

(ইন্তেকালের কিছুদিন পূর্বে) হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর নেতৃত্বে একটি বাহিনী বনু খাছয়ামের দিকে প্রেরণ করেছিলেন। তারা ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশের পরিবর্তে সেজদায় অবনত হয়ে পড়েছিলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে তাদের কিছু লোককে হত্যা করে ফেলেন। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খবর পেয়ে নিহতদের অর্ধেককে দিয়াত আদায় করেছিলেন।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু খলিফা নির্বাচিত হন। এ সময় মিথ্যা নবুয়াতের অনুসরণকারীরা এবং ধর্মদ্রোহীরা সমগ্র আরবে এক বিশৃংখলার রাজত্ব কায়েম করে। বিশৃংখলাকারীদের মধ্যে তিন শ্রেণীর লোক ছিলো। কোনো নবুয়াতের দাবীদারের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করে এক শ্রেণীর লোক সম্পূর্ণরূপে ইসলাম পরিত্যাগ করেছিলো। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিলো নামায এবং যাকাতে কম ও মাফ চাওয়ার দাবীদার ব্যক্তিরা। যাকাত অস্বীকারকারী ছিলো তৃতীয় দলে। তারা যাকাতকে খিরাজ মনে করে একে নিজের স্বাধীনতা বিরোধী মনে করতো। এ তিন দলের বিরুদ্ধে জিহাদ প্রশ্নে আল্লাহ তাআলা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর বুক প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ এ ভয়াবহ এবং নাজুক পরিস্থিতিতে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মত পূর্ণ ঈমান, দৃঢ় ও স্থিরচিত্ত এবং নির্ভীক ব্যক্তিত্বেরই প্রয়োজন ছিলো। মুরতাদ অথবা ধর্মদ্রোহীদের সামনে তিনি কোনোক্রমেই মাথানত করলেন না। ভয়ংকর পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কতিপয় সাহাবী তৃতীয় দলভুক্তদের (যাকাত অস্বীকারকারী) সাথে নরম ব্যবহারের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তিনি বললেন ঃ

"[রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর] অহীর সিলসিলা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।—দীন পূর্ণত্বে পৌঁছেছে। আমার জীবনেই কি তা খণ্ডিত এবং কর্তিত করা হবে ? আল্লাহর কসম ! যদি (ফরয যাকাত থেকে) সামান্য রশির অংশ দিতেও কেউ অস্বীকার করে তাহলে আমি তার বিরুদ্ধে জিহাদ করবো।"

তিনি যা বলেছিলেন অতপর তা বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন। ঈমানী শক্তি এত প্রবল ছিলো যে, এ নাজুক পরিস্থিতিতেও তিনি হযরত উসামা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে সাতশ' সাহাবী সমেত সিরিয়ার সীমান্তের দিকে (রোমীয়দের বিরুদ্ধে মুতার যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণার্থে) প্রেরণ করলেন। সে মুহূর্তে মদীনা থেকে এত সংখ্যক সাহাবীকে বাইরে প্রেরণের ভয়াবহতা সম্পর্কে যখন তাঁকে পরামর্শ দেয়া হলো। তখন তিনি বললেন ঃ

"সেই সত্বার কসম ! যার কব্জায় আমার জীবন রয়েছে। আমি যদি এটাও বুঝতাম যে, হিংস্র প্রাণী আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। তবুও আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পালনার্থে উসামা বাহিনীকে অবশ্যই প্রেরণ করতাম। বস্তিতে যদি আমি ছাড়া একজন শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণকারীও অবশিষ্ট না থাকতো তাহলেও উসামা বাহিনী প্রেরণের নির্দেশ অবশ্যই দিতাম।"

উসামা বাহিনী প্রেরণের পর বনু আসাদ, ফাযারাহ, গাতফান, ছা'লাবাহ, মাররাহ, আবাছ, কিনানাহ এবং জবিয়ানের মুরতাদ গোত্রসমূহ মদীনা মুনাওয়ারার ওপর হামলার পরিকল্পনা করলো। তাদের এক অংশ 'আবরাক' এবং অপর অংশ 'জুল কিসসা'তে তাঁবু ফেললো। উভয় স্থানই মদীনার উপকণ্ঠে ছিলো। মুরতাদরা জুল কিসসা থেকে একটি প্রতিনিধি দল হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে প্রেরণ করলো। প্রতিনিধি দলটি যাকাত মাফ চাওয়ার বক্তব্য নিয়ে এসেছিলো। কিন্তু রাসূলের খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদেরকে পরিষ্কার জবাব দিলেন। প্রতিনিধি দলের ফিরে যাওয়ার তৃতীয় দিনে মুরতাদরা মদীনার ওপর হামলা করে বসলো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু মদীনাবাসীর একটি দল সহ তাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে মুকাবিলা করলেন এবং তাদের ভেগে যেতে বাধ্য করলেন। মুসলমানরা তাদের পেছনে পেছনে জি হাসসা পর্যন্ত ধাওয়া করলো। সেখানে তারা নিজেদের অনেক লোক রেখে এসেছিলো। তারা মশকে বাতাস ভরে রেখেছিলো। ধাওয়া করতে করতে উষ্ট্রারোহী মুসলমানরা যখন সেখানে পৌছলো তখন তারা মশকগুলোকে উটের সামনে ঝুলিয়ে দিলো এবং সাথে সাথে নেচে কুঁদে ঢাক ও ঢোল প্রভৃতি বাজানো শুরু করলো। এতে উট ভড়কে গেলো এবং পিছনে হটতে আরম্ভ করলো। মুরতাদরা মনে করলো যে, মুসলমানরা পালিয়ে গেছে। তারা জি হাসসার পশ্চাতে জুল কিসসায় অবস্থানরত সাথীদেরকে ডেকে আনলো এবং পুনরায় মদীনার ওপর হামলার পরিকল্পনা আঁটতে লাগলো। এদিকে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু উষ্ট্রবাহিনী মদীনা ফিরে আসার সাথে সাথে দ্বিতীয়বার হামলার ব্যবস্থা করলেন এবং রাতেই রওয়ানা করে অতি প্রত্যুষে মুরতাদদের ওপর হঠাৎ করে হামলা করে বসলেন। হোবাল বাহিনীর সরদার (নবুয়াতের দাবীদার তোলায়হার ভাই) মারা গেলো এবং অবশিষ্ট সৈন্য স্তম্ভিত হয়ে পালিয়ে গেলো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু জুল কিসসা পর্যন্ত তাদেরকে ধাওয়া করলেন। অতপর নু'মান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মুকাররানকে কিছু সৈন্যসহ সেখানে রেখে মদীনা ফিরে এলেন। তাঁর প্রত্যাবর্তনেব পর বনু জবিয়ান এবং আবাছের মুরতাদরা সুযোগ পেয়ে বহু মুসলমানকে নৃশংসতার সাথে শহীদ করে ফেললো। (এক

রাওয়ায়েত অনুসারে এ যালেমরা মুসলমানদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলেছিলো এবং তাদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিলো)। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু এ নির্যাতনের খবর পেয়ে কসম খেয়ে বললেন, মুরতাদদের কাছ থেকে মুসলমান হত্যার প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত তিনি শান্তির সাথে বসবেন না। ইত্যবসরে হযরত উসামা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহু অভিযানে সফল হয়ে মদীনা ফিরে এসেছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করলেন এবং স্বয়ং একটি বাহিনী নিয়ে মুরতাদদের মুকাবিলার জন্য রওয়ানা হয়ে গেলেন। 'আবরক' নামক স্থানে আবাছ, জবিয়ান, বকর এবং ছালাবার মুরতাদরা তাঁর মুখোমুখি হলো। মুসলমানদের কাছে তারা পরাজিত হলো এবং আবরক থেকে বিতাড়িত হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলীফার নির্দেশ মুতাবিক আবরাককে (বনি জবিয়ানের আবাসস্থল) মুজাহিদদের ঘোড়ার চারণ ভূমিতে পরিণত করা হলো।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু মদীনা ফিরে এলেন। ফিরে এসে আরবের ব্যাপক এলাকায় ছড়িয়ে থাকা মুরতাদদেরকে পুরোপুরি উৎখাতের চিন্তা করলেন। এ লক্ষ্যে তিনি ১১টি বাহিনী গঠন করলেন এবং প্রত্যেক বাহিনীকে বিভিন্ন এলাকার মুরতাদ ও বিদ্রোহীদের উৎখাতে নিয়োগ করলেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুও এক বাহিনীর আমীর নিযুক্ত হলেন। তুলাইহা বিন খুয়ায়েলদ আসদী এবং তারপর মালিক বিন নুয়াইরাহ বাতাহীকে উৎখাতের জন্যে তাঁকে নিয়োগ করা হলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের বাহিনীসহ বাযাখার দিকে অগ্রসর হলেন। স্থানটি ছিলো তুলাইহা বিন খুয়ায়েলদের আবাসস্থল। লোকটি বনু আসাদ বিন খুযায়মার গোত্রভুক্ত এবং আরবের অন্যতম বাহাদুর হিসেবে পরিগণিত হতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বিদায় হজ্জের পর তার ধ্যান-ধারণা পাল্টে যায় এবং নিজেই নবুয়াতের দাবী করে বসে। বনু আসাদ এবং অন্যান্য গোত্রের বহু মানুষ তার অনুসারী হয়ে পড়ে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খবর পেয়ে হযরত জিরার রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আযুওয়ারকে তাকে উৎখাতের জন্যে নিয়োগ করেন। হযরত জিরার রাদিয়াল্লাহ আনহু "ওয়ারদাত" নামক স্থানে তুলাইহাকে পরাজিত করেন। যুদ্ধের সময় একবার তুলাইহা হযরত জিরার রাদিয়াল্লাহ আনহুর সামনে এসে পড়লো। তিনি তার ওপর তরবারী চালালেন। কিন্তু সে বেঁচে গেলো। এতে তার অনুসারীদের মধ্যে (পরাজিত হওয়ার পরও) এ খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো যে, তুলাইহার শরীরের ওপর কোনো অস্ত্র কাজ করে না।

এদিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওফাত পেলেন। হযরত জিরার রাদিয়াল্লাহ আনহু মদীনা ফিরে এলেন। তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর তুলাইহার শক্তি আরো বেড়ে গেলো। আসাদ, আবাছ, গাতফান, জবিয়ান এবং তাই গোত্রসমূহ তাকে সমর্থন করলো। অবশ্য তাই গোত্রের নেতা হযরত আদি রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন হাতেম ইসলামের ওপর কায়েম রইলেন। তিনি মদীনা গিয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুকে নিজের গোত্রের পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে অবহিত করলেন। এ সময় তিনি হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর রওয়ানা হওয়ার আগেই হযরত আদি রাদিয়াল্লাহ আনহুকে তাঁর গোত্রে প্রেরণ করলেন। যাতে তিনি নিজের গোত্রের লোকদেরকে বুঝিয়ে শুনিয়ে পুনরায় ইসলামে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে পারেন। এমন যাতে না হয় যে, হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদেরকে ধ্বংস এবং উৎখাত করে ছাড়ে।

হযরত আদি রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের গোত্রে পৌঁছে সবাইকে একত্রিত করলেন এবং সবাইকে বুঝালেন যে, ইসলামী বাহিনী এখানে আসার জন্যে এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে। এটাই উত্তম যে, তাদের আগমনের পূর্বেই তোমরা ইসলামে ফিরে এসো। নচেৎ তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু বাদ-প্রতিবাদের পর তারা হযরত আদি রাদিয়াল্লাহ আনহুর কথা মেনে নিলো এবং আনুগত্যের অঙ্গীকারের সাথে সাথে তিনদিনের সময় চেয়ে তাঁর কাছে এক আবেদন পেশ করলো। আবেদনে তারা জানালো, তাই গোত্রের যারা তুলাইহার বাহিনীতে রয়েছে তাদের কাছে তারা যাবে এবং তাদেরকে ফিরিয়ে আনবে। অন্যথা আনুগত্যের ঘোষণা তাদেরকে মুসিবতে নিক্ষেপ করবে। তুলাইহা তাদেরকে হত্যা করবে অথবা জেলে প্রেরণ করবে। হযরত আদি রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদের বক্তব্য অনুযায়ী হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে গমন করলেন এবং তাঁকে তিনদিন পর্যন্ত তাই আগমন ঠেকিয়ে রাখলেন। ইত্যবসরে তাই গোত্রের লোকেরা নিজের সাথীদেরকে তুলাইহার বাহিনী থেকে কোনো বাহানা বানিয়ে ফিরিয়ে আনলো এবং সবাই পুনরায় মুসলমান হয়ে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

এরপর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু জাদিলা গোত্রের ওপর হামলার ইরাদা করলেন। হযরত আদি রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে বললেন, তাই গোত্র একটি পাখীর মতো। তার এক বাহু বা ডানা হলো জাদিলা। আপনি একটু অপেক্ষা করুন তাঁদেরকেও পুনরায় ইসলামে ফিরিয়ে আনার জন্য আমি চেষ্টা করে দেখি। আল্লাহ পাক যেভাবে তাই গোত্রকে হেদায়াত দিয়েছিলেন সম্ভবতঃ সেভাবে তাদেরকেও দিতে পারেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আদি রাদিয়াল্লাহ আনহুর দরখাস্ত আনন্দচিত্তে মঞ্জুর করলেন। সুতরাং হযরত

আদি রাদিয়াল্লাহ আনহু জাদিলা গোত্রের কাছে গেলেন এবং বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ প্রচেষ্টায় তাদেরকে পুনরায় ইসলামে ফিরিয়ে আনলেন। এভাবে তাদের এক হাজার সওয়ার ইসলামী বাহিনীতে শামিল হলো।

অতপর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত উক্কাসা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মিহসান এবং হযরত সাবিত রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আকরাম আনসারীকে শত্রুর খোঁজ নেয়ার জন্যে বাযাখার দিকে প্রেরণ করলেন। ঘটনাক্রমে তাঁরা তুলাইহার এক ভাইকে পেলেন এবং তাঁকে হত্যা করে ফেললো। (কতিপয় রাওয়ায়েতে তার নাম হোবাল বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু অন্য রাওয়ায়েত মুতাবিক মুরতাদরা মদীনার ওপর যখন তার নেতৃত্বে হামলা করে তখন সে নিহত হয়) তুলাইহা যখন এ খবর পেল তখন সে নিজের অন্য ভাই সালমাকে নিয়ে বের হলো। সালমা হযরত সাবিত রাদিয়াল্লাহ আনহুকে এবং তুলাইহা হযরত উক্কাসা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে শহীদ করে ফেললো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু অগ্রযাত্রা করে সেই স্থানে পৌঁছে তাদের উভয়ের লাশ দেখে তাই গোত্রে ফিরে এলেন। কেননা তুলাইহার অবস্থা না জেনে তার ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানা অনুচিত। কিছুদিন সেখানে অবস্থানের পর তিনি শত্রু শক্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করলেন এবং তাই গোত্রের কাছে আরো সাহায্য কামনা করলেন। তারা বললো, বনু কায়েসের সাথে মুকাবিলায় আমরা আপনাকে অতিরিক্ত সাহায্য দিতে পারি। কিন্তু বনু আসাদের সাথে আপনাকেই মুকাবিলা করতে হবে। কেননা তারা আমাদের মিত্র।

নিজের গোত্রের এ বক্তব্য হযরত আদি রাদিয়াল্লাহ আনহুর মনঃপুত হলো না। তিনি বললেন, খোদার কসম ! আমি বনু আসাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে কোনোক্রমেই দ্বিধা করবো না। তারা যখন ইসলামের দুশমনই হয়ে গেছে তখন আমাদের মিত্র থাকলো কি করে ?

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারে খুব ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি হযরত আদি রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বললেন, বনু কায়েস এবং বনু আসাদ যে কোনো গোত্রের সাথে লড়াই করাই জিহাদ। এজন্যে তুমি তোমার গোত্রের মতের বিরোধিতা করো না। তারা সন্তুষ্টচিত্তে যাদের সাথে যুদ্ধ করতে চায় তাদেরই মুকাবিলায় অগ্রসর হও।

অতপর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তুলাইহার মুকাবিলার জন্যে বাযাখার দিকে অগ্রসর হলেন। তুলাইহার বাহিনীতে বনু ফাযারার সাত শ' মুরতাদসহ আইনিয়াহ বিন হাসান ফাযারীও শরীক ছিলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বাযাখা পৌঁছলেন। এ সময় আইনিয়াহ বিন হাসান নিজের

গোত্রসহ তাঁর সামনাসামনি হলো এবং উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হলো। তুলাইহা একদিকে (মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে) অহীর অপেক্ষার বাহানা বানিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে গেল। আইনিয়াহ যখন স্ববাহিনীতে দুর্বলতার লক্ষণ দেখতে পেল তখন দৌড়ে তুলাইহার কাছে এলো এবং জিজ্ঞেস করলো ঃ "জিবরাঈল (আ) এসেছেন কি ?"

সে বললো ঃ "না"।

আইনিয়া একথা শুনে পুনরায় যুদ্ধে চলে গেলো। যখন মুসলমানদের চাপ আরো বেড়ে গেলো তখন সে পুনরায় তুলাইহার কাছে এলো এবং জিজ্ঞেস করলো, "জিবরাঈল (আ) এসেছেন কি ?" তুলাইহা বললো, এখনো আসিনি। আইনিয়া বললো, মুসিবত চরমে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত জিবরাঈল (আ) কবে আসবেন। একথা বলে আবারো যুদ্ধের ময়দানে চলে গেলো। এতক্ষণে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর চাপ এতো বেড়ে গেলো যে, তাদের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে উঠলো। আইনিয়া তৃতীয়বার দৌড়াতে দৌড়াতে তুলাইহার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো এখনো জিবরাঈল (আ) আসেননি ? তুলাইহা বললো, হ্যাঁ এসেছিলেন। আইনিয়া বললো, কোনো অহী এনেছিলেন ? তুলাইহা বললো, অহী এনেছিলেন যে, "তোমার কাছেও সে ধরনের পেষণ যন্ত্র আছে যে ধরনের পেষণ যন্ত্র মুসলমানদের কাছে আছে এবং তোমার স্মরণ সে ধরনের যা তুমি কখনো ভুলবে না।" অন্য কথায় মুসলমানরা যে ধরনের সংঘর্ষে লিপ্ত সে ধরনের সংঘর্ষ তোমাদেরকেও করতে হবে এবং এ যুদ্ধের কাহিনী তোমরা কখনো ভুলতে পারবে না।

একথা শুনে আইনিয়া ক্রোধে ফেটে পড়লো এবং বললো ঃ "অবশ্যই আল্লাহ জেনে গেছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে এমন ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে যা তুমি কখনো ভুলবে না।" একথা বলেই সে যুদ্ধের ময়দানে এলো এবং তার স্বরে বললো ঃ

"হে বনি ফাযারা ! খোদার কসম ! তুলাইহা নবী নয়। বরং সে একজন মিথ্যুক। আমি ফিরে যাচ্ছি। তোমরাও যুদ্ধ থেকে হাত গুটিয়ে নাও এবং স্বগোত্রে ফিরে যাও।"

বনু ফাযারা। একথা শুনেই পলায়নপর হলো। অবশিষ্টদের মধ্যে কিছু পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেলো এবং কিছু মুসলমান হয়ে গেলো। তুলাইহা প্রথম থেকেই ঘোড়া প্রস্তুত রেখেছিলো। তাতে নিজের স্ত্রীসহ সওয়ার হয়ে পালিয়ে গেলো। পালানোর সময় নিজের অনুসারীদের বললো, তোমাদের মধ্যে যারা পরিবার-পরিজনসহ পালাতে পার তারা পালাও। এভাবে মুহূর্তের মধ্যে ময়দান

পরিষ্কার হয়ে গেলো। তুলাইহা বনু কালাবে গিয়ে আশ্রয় নিলো। পরে তুলাইহা দ্বিতীয়বার ইসলাম গ্রহণ করেছিলো এবং হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকালে ইরানীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুদ্ধে জীবন পণ অংশ নিয়ে নিজের বিচ্যুতির খেসারত দেন। বলা হয়ে থাকে যে, এ ধরনের এক যুদ্ধেই সে অত্যন্ত বাহাদুরীর সাথে লড়াই করে শহীদ হন।

বাযাখা থেকে তুলাইহার পলায়ন সুদূরপ্রসারী ফল দিয়েছিলো। অনেক গোত্র (বনু আমের বিন ছা'ছায়া, বনু সলিম, বনু হাওয়াযিন, বনু কাব প্রভৃতি) ধর্মদ্রোহিতা থেকে তাওবাহ করে দ্বিতীয়বার ইসলামের দুর্গে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে তুলাইহার প্রতি এসব গোত্রের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো। তারা অপেক্ষা করছিলো কোন্ পক্ষ বিজয়ী হয়। তুলাইহার পরাজয়ে তাদের সাহসে ভাটা পড়লো এবং হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর খিদমতে হাজির হয়ে তারা আনুগত্য প্রকাশ করলো। আনুগত্য প্রকাশকালে তারা তাঁর কাছে বাইয়াত করলো যে, তারা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান আনছে। তারা নামায পড়বে এবং যাকাত দেবে। এ সকল বিষয়ে তারা তাদের পরিবার-পরিজনের পক্ষ থেকেও বাইয়াত করছে। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বাইয়াত গ্রহণ করে তাদের সবাইকে নিরাপত্তা দিলেন।

আসাদ, গাতফান এবং তাদের মিত্র গোত্রসমূহকেও হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ক্ষমা করে দিলেন। কিন্তু তাদের তাওবাহর সময় একটি শর্ত আরোপ করলেন। শর্তটি হলো ধর্মদ্রোহিতা কালে যারা নির্মমভাবে বহু মুসলমানকে হত্যা করেছিলো তাদেরকে মুসলমানদের কাছে ন্যস্ত করতে হবে। বস্তুত তাদেরকে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর সামনে হাজির করা হলো। তিনি তাদেরকে হত্যা করালেন। অবশ্য তাদের দু' নেতা কুররাত বিন হাইবিরাহ এবং আইনিয়াহ বিন হাসান ফাযারীকে গ্রেফতার করে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে প্রেরণ করা হলো। কতিপয় রাওয়ায়েত মতে তিনি তাদেরকে হত্যা করান এবং কতিপয় রাওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ বাযাখায় এক মাস অবস্থান করলেন। এ সময়ে তিনি সেখানে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা এবং যাকাত আদায়ের কাজে ব্যস্ত রইলেন। ইত্যবসরে তিনি একটি খবর পেলেন। খবরের সারমর্ম হলো, বনু ফাযারার এক মহিলা উম্মে যুমাল সালামা বিনতে মালিক বিন হুজাইফা একটি বাহিনী সমেত মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ মহিলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে গ্রেফতার হয়ে মদীনা এসেছিলো এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহ আনহার

সুপারিশে মুক্তি পেয়েছিলো। মুসলমান হয়ে সে নিজের কবিলায় ফিরে যায় এবং সেখানে গিয়ে মুরতাদ বা ধর্মদ্রোহী হয়। তুলাইহার পরাজিত বাহিনীর কিছু সদস্য তার কাছে গিয়ে আশ্রয় নেয়। পূর্ব থেকেই মুরতাদদের একটি দল তার সাথে ছিলো। এভাবে বড় একটি বাহিনী তার পতাকাতলে সমবেত হলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে উৎখাতের জন্যে হাওয়াবের দিকে অগ্রসর হলেন। সেখানেই উম্মে যুমাল অবস্থান করছিলো। স্বয়ং উটে চড়ে মুকাবিলার জন্যে বের হলো। মুরতাদরা তার উটের চারপাশে একত্রিত হয়ে ভয়ানক যুদ্ধ করলো। উম্মে যুমালও অত্যন্ত বাহাদুরীর সাথে লড়াই চালালো। অসংখ্য মুরতাদ তাকে উৎসাহদানের জন্যে পতঙ্গের মত জীবন বাজী রেখে ঝাঁপিয়ে পড়লো। অবশেষে মুসলমানরা উটের কুঁচ কেটে মাটিতে শুইয়ে দিলো এবং উম্মে যুমালকে হত্যা করলো। এরপরই সব মুরতাদ কোনো মতে জীবন নিয়ে পালিয়ে গেলো।

তুলাইহা এবং উম্মে যুমালকে উৎখাতের পর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন ওয়ালিদ মালিক বিন নুয়াইরাতুল ইয়ারবুয়ীর সাথে লড়াইয়ের জন্যে বাতাহর দিকে অগ্রসর হলেন। বনু তামিম গোত্রের শাখা বনু ছালাব বিন ইয়ারবুর সরদার ছিলো মালিক বিন নুওয়াইরাহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে সে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু তামিমের বিভিন্ন শাখার আমীর নিয়োগ করেছিলেন। এ সময় মালিক বিন নুওয়াইরাহ বনু ছালাবাহ বিন ইয়ারবুর আমীর নিয়োগপ্রাপ্ত হন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর ধর্মদ্রোহিতার ফেতনা শক্তিশালী হয়ে উঠলে মালিক বিন নুওয়াইরাহ এক আশ্চর্য ধরনের ভূমিকা অবলম্বন করে। সে পুরো মুরতাদও ছিলো না। আবার পাক্কা মুসলমানও ছিলো না। তার এ ভূমিকায় মনে হতো যে, মুসলমানরা সফল হলে সে মুসলমান থাকবে। আর মুরতাদরা সফল হলে মুরতাদ হয়ে যাবে। তাকে উৎখাত আবশ্যিক হয়ে পড়েছিলো। কেননা সে যাকাত প্রেরণ বন্ধ করে দিয়েছিলো। অন্যদিকে বনু তামিমের অন্যান্য শাখার নেতা যবরকান রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন বদর, সাফওয়ান বিন সাফওয়ান এবং ওয়াকি বিন মালিক প্রমুখ খেলাফতের দরবারে যাকাতের অর্থ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মালিক বিন নুওয়াইরাহ কিছুদিন পূর্বে নবুয়াতের মিথ্যা দাবীদার জনৈক ছাজাহকে সমর্থন করেছিলো এবং তার কাছে মুরতাদদের যাতায়াত ছিলো। এক রাওয়ায়েতে আছে, রাহরাহানের ঝর্ণার কাছে কতিপয় সাথী নিয়ে সে যাকাতের উটের ওপর হামলা চালিয়ে তা লুটে নেয়। হামলার সময় চেঁচিয়ে সে নিজের সাথীদের বলেছিলো ঃ

"এ উট তোমাদের সম্পদ। লুট করো। কাল কি হবে সে ব্যাপারে কোনো পরওয়া করবে না।"

ছাজাহ মুছাইলামা কাজ্জাব থেকে পৃথক হয়ে নিজের গোত্রে ফিরে গেলো এবং বেশীর ভাগ লোক তাওবা করে পুনরায় মুসলমান হলো। এতে মালিক বিন নুওয়াইরাহ অত্যন্ত ঘাবড়ে গেলো। তার কাছে অবস্থানরত মুরতাদদেরকে তার কাছে গমনাগমন নিষেধ করলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বাতাহ পৌঁছে মুজাহিদদেরকে বিভিন্ন গ্রামের দিকে প্রেরণ করলেন। প্রেরণের সময় তাদেরকে হেদায়াত দিলেন। হেদায়াতে তিনি বললেন, গ্রামে পৌঁছেই প্রথমে তোমরা আযান দেবে। আযানের জবাবে গ্রামবাসীরাও আযান দিলে তাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না। আর যদি কেউ আযানের জবাব না দেয় এবং তোমাদের বাধা দেয় তাহলে তাদের সাথে লড়াই করবে। মুজাহিদরা টহল দিতে দিতে মালিক বিন নুওয়াইরাহর গ্রামের কাছে পৌঁছে আযান দিলো। এ সময় গ্রামবাসীর আচরণ সম্পর্কে মুজাহিদদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হলো। কোনো কোনো সাহাবী জানান, তারা জবাবে গ্রাম থেকে আযানের আওয়াজ শুনেছেন। অন্যান্যরা জানান যে, গ্রামবাসীরা কোনো জবাব দেয়নি। সুতরাং তারা মালিক বিন নুওয়াইরাহ এবং তার সাথীদেরকে গ্রেফতার করে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে এনে হাজির করলো এবং সকল ঘটনা অবহিত করলো। তিনি তাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে আটক রাখার নির্দেশ দিলেন এবং পরের দিন সকালে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে জানালেন। রাতে অত্যন্ত ঠাণ্ডা পড়েছিলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু কয়েদীদের প্রশ্নে এক নির্দেশে বললেন ঃ "দাফিয়ু আছরাকুম" অর্থাৎ কয়েদীদেরকে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচাও। কতিপয় আরব কবিলার ভাষায় বাক্যটির অর্থ কয়েদীদের হত্যা করো এও হতে পারতো। প্রখ্যাত সাহাবী জিরার রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আযুর এ অর্থই বুঝলেন এবং মালিক বিন নুওয়াইরাহ ও তার সাথীদের হত্যা করে ফেললো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু শুনে বললেন, "আল্লাহ যা চান তাই হয়।"

অন্য এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে মালিক বিন নুওয়াইরাহ অশোভন কথাবার্তা বলেছিলো এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে বেআদবীমূলক উক্তি করেছিলো। এজন্যেই তাকে হত্যা করা হয়। কথিত আছে যে, হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে কথোপকথনের সময় সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বার বার "ছাহিবুকা" অর্থাৎ তোমার সাহেব এ বাক্য উচ্চারণ করেছিলো। আরো স্পষ্ট করে বললে বলা যায় যে, সে বলেছিলো তোমার সাহেব এটা

বলতো। তোমার সাহেব তোমাকে এ নির্দেশ দিয়েছিলো ইত্যাদি। এতে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত রাগান্বিত হয়েছিলেন এবং বলেছিলেনঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের সাহেব নন।" এরপর উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত তিক্ত বাক্য বিনিময় হয়। মালিক বিন নুওয়াইরাহর বাচন ভঙ্গীতে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু উপসংহারে পৌঁছেছিলেন যে, সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত অস্বীকারকারী এবং ইসলাম ত্যাগ করেছে। সুতরাং তিনি তাকে হত্যা করান।

হযরত আবু কাতাদাহ আনসারী রাদিয়াল্লাহ আনহুও হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি মালিক বিন নুওরাইরাহকে হত্যা করা পসন্দ করেননি। কেননা তাঁর ধারণায় মালিকের গ্রাম থেকে আযানের আওয়াজ এসেছিলো। এজন্যে তাঁকে হত্যা করা বৈধ ছিলো না। বস্তুত তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে মদীনা চলে আসেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর ব্যাপারে অভিযোগ করেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে মদীনা ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তিনি আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা তাঁর কাছে পেশ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলীফা তাঁর ওজর কবুল করে নিলেন। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হযরত আবু কাতাদাহর মতের প্রতি সমর্থন দিলেন এবং হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বরখাস্ত ও তাঁর থেকে কিসাস নেয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, যে তরবারীকে আল্লাহ কাফেরদের ওপর নিক্ষেপ করেছেন তা আমি পুনরায় খাপে ভরতে পারি না।"

একথা বলে ব্যাপারটি শেষ করে দিলেন। তিনি অবশ্য বাইতুল মাল থেকে মালিক বিন নুওয়াইরাহর উত্তরাধিকারদেরকে রক্তের বদলা আদায় করেছিলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এ ব্যাপারে যদি কোনো কঠোরতা করেও থাকেন তাহলে সম্ভবতঃ তা ছিলো তাঁর ইজতিহাদি ভুল। এজন্যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে দায়িত্বমুক্ত বলে অভিহিত করেছিলেন।

ধর্মদ্রোহিতার ফেতনা প্রশ্নে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু আরোপিত দায়িত্ব হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত সফলতার সাথে আঞ্জাম দেন। এরপর খেলাফত থেকে তিনি নতুন নির্দেশ লাভ করেন। নির্দেশে মুসায়লামা কাজ্জাবকে উৎখাতের দায়িত্বও তাঁর ওপর ন্যস্ত করা হয়। মুসায়লামা বিন হাবিবের সম্পর্ক ছিলো ইয়ামামার (নাজদ) বনু হানিফা গোত্রের সাথে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের শেষ দিকে সে বনু

হানিফা গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে মদীনা আসে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করে। সাক্ষাতকালে সে এক অভিনব কথা বললো। সে জানালো, আপনার পর যদি আপনি আমাকে আপনার স্থলাভিষিক্ত করেন, তাহলে আমি এখনই আপনার হাতে বাইয়াত করছি।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র হাতে একটি লাঠি ছিলো। তিনি তা উঠিয়ে বললেন ঃ "উত্তরাধিকার নিয়োগ বা স্থলাভিষিক্তকরণ তো বড় জিনিস, আমি তোমাকে এ লাঠি দানও পসন্দ করি না। আল্লাহ তোমার জন্যে যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তাই ঘটবে।"

অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে, মুসায়লামা মুসলমান হয়েছিলো। কিন্তু স্বগোত্রে ফিরে মুরতাদ হয়ে গেলো এবং বলতে লাগলো যে, আমিও নবী। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের নবুয়াতে আমাকে অংশীদার বানিয়ে নিয়েছে। এজন্যে তাকে কাজ্জাব বা মিথ্যাবাদী বলা হয়। সে ইয়ামামাহ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে এ চিঠি লিখলো ঃ খোদার রাসূল মুসায়লামা খোদার রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরফ থেকে আসসালামু আলাইকা। আমি আপনার কাজে অংশীদার হয়েছি। অর্ধেক রাজত্ব আমার এবং অর্ধেক কুরাইশদের। কিন্তু কুরাইশরা হলো এক চরমপন্থী জাতি।"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এ জবাব প্রেরণ করলেন ঃ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। "আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের চিঠি মুসায়লামা কাজ্জাবের নামে। যে ব্যক্তি হেদায়াতের আনুগত্য করে তার ওপর সালাম। অতপর তুমি জেনো যে, রাজত্ব আল্লাহর। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে ওয়ারিশ বানান এবং পরকালীন মঙ্গল পরহেযগারদের জন্যে।"

এ পত্র প্রেরণের কিছুদিন পরই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত হয়। তখন মুসায়লামা অত্যন্ত জোরেশোরে নিজের নবুয়াতের প্রচার শুরু করে। বনু হানিফার এক ব্যক্তির নাম ছিলো আয়াছ বিন আনফুরা। ইসলাম গ্রহণের পর সে ইয়ামামা থেকে হিজরত করে মদীনা গিয়েছিলো এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র খিদমতে কুরআন ও হাদীস শিক্ষা লাভ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরফ থেকে ইয়ামামাবাসীর জন্যে শিক্ষক নিয়োগ প্রাপ্ত হন। এ হতভাগা ইয়ামামা পৌঁছে মুসায়লামার সাথে মিলিত হয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণায় বললো যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াতে মুসায়লামা অংশীদার। রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে সে স্বয়ং একথা শুনেছে। তার কথায় হাজার হাজার মানুষ পথভ্রষ্ট হলো এবং মুসায়লামার দাবী মেনে নিলো। মুসায়লামা অনেক সাজানো এবং ভারী ভারী কথা প্রণয়ন করলো। এসব কথা সে লোকদেরকে শুনাতো এবং বলতো এসব হলো অহী। শঠতা এবং প্রতারণার জোরে সে আশ্চর্য ধরনের বস্তু প্রকাশ এবং তাকে তাঁর মুজিযা হিসেবে চিত্রিত করতো। মদ এবং বদ কাজকে হালাল আখ্যায়িত করতো। এভাবে মুসায়লামার শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগলো। খেলাফতের পক্ষ থেকে মুসায়লামাকে উৎখাতের জন্যে দু'টি বাহিনী প্রেরণ করা হয়েছিলো। দু' বাহিনীর একটির নেতৃত্বে ছিলো হযরত ইকরামা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি জেহেলের ওপর। অপরটির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হযরত শুরাহ বিল হাসনাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুর। উভয় বাহিনী ঐকবদ্ধ্যভাবে মুসায়লামার ওপর হামলার পরিবর্তে পৃথক পৃথক যুদ্ধ করলো এবং পরাজিত হলো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু পরাজয়ের খবর পেয়ে হযরত ইকরামা রাদিয়াল্লাহ আনহু ও হযরত শুরাহবিল রাদিয়াল্লাহ আনহুকে অন্য অভিযানে নিয়োগ করলেন এবং হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে মুসায়লামার বিরুদ্ধে মুকাবিলার নির্দেশ দিলেন। এ সাথে তাঁর সাহায্যার্থে মুহাজির এবং আনসার সমন্বয়ে গঠিত নতুন বাহিনী প্রেরণ করলেন। এক রাওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ মালিক বিন নুওয়াইরাহকে হত্যার প্রশ্নে জবাবদিহি শেষে মদীনা থেকে রওয়ানা দিচ্ছিলেন। এমন সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাকে মুসায়লামার সাথে যুদ্ধের জন্যে ইয়ামামা গমনের নির্দেশ দেন এবং মুহাজির ও আনসারদের একটি বাহিনী তাঁর সাথে প্রেরণ করেন। এ সময় হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন খাত্তাব (হযরত ওমর ফারুকের ভাই) মুহাজিরদের এবং হযরত সাবিত রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন কায়েস আনসারী আনসারদের আমীর ছিলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ইয়ামামা পৌছলেন। মুসায়লামার নেতৃত্বে সে সময় ৪০ হাজার লোক একত্রিত হয়েছিলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর আগমনের খবর পেয়ে সে অগ্রসর হলো এবং আকরাবা (ইয়ামামার একটি বস্তি) নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন করলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুও নিজের বাহিনীসহ সেখানে পৌছলেন। উভয় বাহিনী যখন পরস্পরের সামনা সামনি হলো তখন সর্বপ্রথম আয়াস বিন আনফুয়াহ ময়দানে এলো এবং মুসলমানদেরকে যুদ্ধের আহ্বান জানালো। হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন খাত্তাব তাঁর মুকাবিলায় সামনে এলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাকে হত্যা করলেন। সাধারণ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। মুসায়লামার পুত্র শুরাহবিল নিজের কবিলাকে সম্বোধন করে বললো, হে বনু আবু হানিফা ! আজ জাতীয় মান- মর্যাদার দিন। জান-প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ

করো। মুসলমানরা বিজয়ী হলে তোমাদের পরিবার-পরিজন তাদের কব্জায় চলে যাবে। এজন্যে নিজেদের মাল-ইজ্জত রক্ষা করো।

শুরাহবিলের ডাকে বনু হানিফার লোকজন চরমভাবে উত্তেজিত হলো এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে মুসলমানদের ওপর হামলা করে বসলো। তাদের প্রচণ্ড হামলায় মুসলমানদের ব্যূহে বিশৃংখলা দেখা দিলো এবং পেছনে হটতে লাগলো।

ঐতিহাসিক তাবারি লিখেছেন, "মুসলমানরা এ ধরনের ঘোরতর যুদ্ধের সম্মুখীন কখনো হয়নি।" এ সঙ্গীন মুহূর্তে মুসলমান অফিসারবৃন্দ চিন্তাশক্তি লোপ পাওয়ার মতো অবর্ণনীয় বাহাদুরী, ধৈর্য ও স্থৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তাদের অধিকাংশই দীনে হকের জন্যে বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে শাহাদাত প্রাপ্ত হন। তাদের বীরত্বব্যঞ্জক এ ত্যাগ দেখে মুসলমানদের ফসকে যাওয়া কদম আবার অটল হয়ে উঠলো এবং নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়ে মুরতাদদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। এ সময় হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এমন প্রচণ্ড হামলা চালালো যে, শত্রুর পা থরথর করে কাঁপতে লাগলো। তারা পিছু হটতে থাকলো। হটতে হটতে মুসায়লামার মশহুর সরদার মুহকাম বিন তোফায়েলের অবস্থানস্থলে গিয়ে পৌছলো। সে তার বাহিনীকে উৎসাহ যোগালো এবং মুসলমানদের ওপর প্রচণ্ড জবাবী হামলা চালালো। হযরত আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ আনহু তার দিকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করলেন। তীর ঘাড়ে গিয়ে লাগলো এবং তৎক্ষণাৎ লাশ হয়ে সে মাটিতে পড়ে গেলো। এ ঘটনায় মুসলমানদের হিম্মত আরো বৃদ্ধি পেলো এবং চারদিক প্রকম্পিত করে মুরতাদদেরকে আরো পিছনে হটিয়ে দিলো। তখন উভয় পক্ষই জীবন বাজী রেখে যুদ্ধে লিপ্ত। কখনও এক পক্ষ পিছনে হটে। আবার কখনো অপর পক্ষ। এমনি মুহূর্তে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রত্যেক গোত্রকে পৃথক হয়ে যাওয়ার এবং স্ব স্ব পতাকাতলে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন। এ কৌশলের মাধ্যমে তিনি মুসলমানদের দুর্বলতা কোন্ গোত্রের কারণে প্রকট হচ্ছে তা অনুধাবন করতে চাইলেন। কৌশলটি খুবই ফলবান ছিলো। প্রত্যেক গোত্র নিজের মান-ইজ্জত বজায় রাখার জন্যে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই চালিয়ে যেতে লাগলো। কিন্তু মুসলমানদের প্রচণ্ড হামলা সত্ত্বেও মুসায়লামা ময়দানে দৃঢ়তার সাথে টিকে রইলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বুঝে নিলেন যে, মুসায়লামার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সাফল্য সম্ভব নয়। তিনি ব্যূহ ভেদ করে মুসায়লামার কাছে পৌছলেন এবং মুকাবিলার জন্যে আহ্বান জানালেন। সে দৃকপাত করতেই হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তার সামনে সন্ধির শর্তাবলী পেশ করা শুরু করলেন। মুসায়লামা প্রত্যেক শর্তেই মুখ এমনভাবে ফিরিয়ে

নিলো যেনো, অহীর অপেক্ষা করছে। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এ অবস্থায়ই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং মুসলমানদেরকেও হামলার আহ্বান জানালেন। মুসায়লামা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পালালো এবং "হাদিকাতুর রাহমান" নামক নিজের বাগানে ঢুকে পড়লো। তার বাহিনীও বাগানে প্রবেশ করলো এবং চতুর্বেষ্টনীর প্রাচীরের দরযা বন্ধ করে দিলো। মুসলমানদের মধ্যে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মালিকের [রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদেম] সহোদর হযরত বারা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মালিকও ছিলেন। তাঁর এক আশ্চর্য ধরনের অভ্যাস ছিলো। তিনি যখন আবেগাপ্লুত হতেন তখন তাঁর শরীর কাঁপতে থাকতো। এ অবস্থায় কয়েকজন তাঁকে জাপটে ধরতো। যখন তাঁর শরীরের কাঁপন শেষ হতো তখন তিনি বাঘের মতো শত্রুর ওপর ঝাপিয়ে পড়তেন। এ যুদ্ধেও তাঁর একই অবস্থার উদ্ভব হলো। দুশমনকে মেরে কেটে একাকার করার জন্যে তিনি বাগানের প্রাচীরের দরযায় উপস্থিত হলেন। কিন্তু দরযা তাঁর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। তিনি মুসলমানদেরকে তাঁকে উঠিয়ে বাগানের মধ্যে নিক্ষেপের কথা বললেন। অবশেষে মুসলমানরা তাঁকে প্রাচীরের ওপর দাঁড় করিয়ে দিলো এবং তিনি বাগানে লাফিয়ে পড়লেন। অসংখ্য মুরতাদ তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিন্তু তিনি লড়াই করতে করতে বাগানের ফটকে পৌঁছে তা খুলে দিলেন। বাইরে অবস্থানরত ইসলামী বাহিনী ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং উভয় পক্ষের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ হতে লাগলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু মুসলমানদেরকে আহ্বান জানিয়ে বললেন ঃ মুসলমানরা ! দৃঢ় এবং স্থির থাকো। আর মাত্র তোমাদের একটি হামলা বাকী। এরপরই শত্রুপক্ষ উৎখাত হবে। এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুসলমানরা কিয়ামাতের মত শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো দুশমনরা যুদ্ধের ময়দানে আর কোনোক্রমেই তিষ্টাতে পারলো না। মুসায়লামা পালাতে শুরু করলো। এ সময় তাঁর সাথীরা বললো, তোমার খোদার সে ওয়াদার কি হলো, যা তোমার সাথে করতো। সে বললো, এখন সে কথার সময় নয়। নিজের জীবন যদি বাঁচাতে চাও তাহলে বাঁচাও। ইত্যবসরে দু'টি বর্শা এক সাথে এসে তার ওপর পড়লো। হযরত হামযা রাদিয়াল্লাহ আনহুর হত্যাকারী ওয়াহশী রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন হারব একটি নিক্ষেপ করেছিলেন। অপরটি নিক্ষেপ করেছিলেন হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন যায়েদ বিন আছেম আনসারী। কিছুক্ষণ পূর্বে মুসায়লামা তাঁর ভাই হযরত হাবিব রাদিয়াল্লাহ আনহু যায়েদকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সাথে হত্যা করেছিলো। বর্শার আঘাত লাগতেই মুসায়লামার ভবলীলা সাঙ্গ হলো এবং মুরতাদরা দিগ্বিদিকজ্ঞান শূন্য অবস্থায় পালানো শুরু করলো। মুসায়লামা কাজ্জাবের নিহত হওয়াটা বাস্তবত ধর্মদ্রোহী যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ছিলো। এ যুদ্ধ "ইয়ামামার যুদ্ধ" নামে প্রসিদ্ধ। মুরতাদদের ১০

হাজার (অন্য এক রাওয়ায়েত ২১ হাজার) লোক নিহত হয়েছিলো এবং যে স্থানে মুসায়লামা নিহত হয়েছিলো সে স্থানের নাম "হাদিকাতুল মওত" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলো। মুসলমান শহীদদের সংখ্যা ছিলো প্রায় এক হাজার তাঁদের মধ্যে তিনশ' মুহাজির এবং আনসার ছিলেন। অবশিষ্ট সাতশ' ছিলেন কুরআনে পাকের হাফেজ। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ এক দূতের মাধ্যমে বিজয়ের সুসংবাদ মদীনা প্রেরণ করলেন। তার সাথে বনু হানিফার একটি প্রতিনিধি দলও ছিলো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রতিনিধি দলটির সদস্যদেরকে বললেন, আফসোস ! তোমরা মুসায়লামা কাজ্জাবের ধোঁকায় কিভাবে পড়লে ? তারা এজন্যে লজ্জা প্রকাশ এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, তার শিক্ষা কি ছিলো ?

তাঁরা বললো, তার অহীর নমুনা এই, "হে ব্যাঙ ! তুমি পবিত্র। পানি পানকারীদেরকে বাধা দাও না এবং পানি অপরিষ্কারও করো না। দেশের অর্ধেক আমাদের এবং অর্ধেক কুরাইশদের। কিন্তু কুরাইশরা একটি যালেম জাতি।" হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু এ বাজে কথা শুনে বললেন ঃ "সুবহান আল্লাহ ! তোমাদের অবস্থার জন্যে আফসোস। এ বাণীতে আল্লাহর কোনো শান নেই—তোমরা কোথায় গিয়ে উপনীত হয়েছো ?"

প্রতিনিধি দলটি মদীনা মুনাওয়ারা থেকে ফিরে যেতে প্রস্তুত হলো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদেরকে হেদায়াত দিয়ে বললেন, এখন চিরদিনের জন্যে ইসলামের ওপর কায়েম থাকবে এবং এমন কাজ করবে যাতে আল্লাহ এবং রাসূল সন্তুষ্ট হন। ধর্মদ্রোহীতার ফেতনা অবসানের পর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ ইয়ামামার এক উপত্যকা 'আল ওবোরে' মুকিম হলেন। সেখানে অবস্থান করছিলেন। ১২ হিজরীর ১২ই মুহাররাম হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর একটি নির্দেশ পেলেন। নির্দেশে হযরত মুছান্না রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন হারিছাকে সাহায্যের জন্যে ইরাক রওয়ানা এবং উব্বুলা সীমান্ত থেকে হামলার কথা বলা হয়েছিলো।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু আরবের আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা (ধর্মদ্রোহীতার ফেতনা) আয়ত্বে এনেই অবিলম্বে বাইরের দু'টি বৃহৎ শত্রুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। শত্রু দু'টি ইসলামকে ধ্বংসের চিন্তায় লিপ্ত ছিলো। শত্রু দু'টি হলো রোম এবং পারস্য (ইরান)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলীফার কাছে এ দু' বহিঃশত্রুর উৎখাত কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিলো —তা এ ঘটনার মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়। সে সময় একজন সাহাবী নিজের গোত্রের কোনো একটি বিষয় তাঁর সামনে পেশ করতে চাইলেন। কিন্তু তিনি

রাগান্বিত হয়ে জবাব দিলেন, আমি তো সে দু' বাঘ কাবু করার চিন্তায় আছি। যারা মুসলমানদেরকে তাক করে বসে আছে। আর তোমরা আমাকে সাধারণ কাজে ব্যস্ত রাখতে চাও।

ইসলামের অভ্যুদয়কালে (আরবের ইসলামী রাষ্ট্র) উত্তর সীমান্ত সে যুগের দু'টি বৃহৎ রাষ্ট্রের সীমান্তের সাথে সংযুক্ত ছিলো ইরাক থেকে পূর্ব দিকের এলাকা (সিরিয়া) রুমাতুল কুবরা বায নতিনী শাসকদের শাসনাধীন ছিলো এবং পশ্চিম দিকের এলাকা ইরানী বাদশাহীর দখলে ছিলো। ইরাকের সংযুক্ত এলাকায় বসবাসরত আরব গোত্রসমূহ ইরানী শাসনাধীন থাকতো এবং সিরিয়া সংযুক্ত এলাকায় বসবাসরত আরব কবিলাগুলো রোমীয় শাসনের আনুগত্য করতো।

এ দু' শক্তির ইচ্ছা বা প্রভাবের বাইরে আরবরা নিজেদের কোনো শক্তিশালী ও স্বাধীন রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন ঘটাক তা তারা কোনোক্রমেই চাইতো না। বস্তুত কিসরা (ইরানের বাদশাহ) এবং কাইসার (রোমের বাদশাহ) উভয়ের চোখেই আরবের নতুন ভূমিষ্ঠ ইসলামী রাষ্ট্র কাঁটার মতো বিদ্ধ হতো। এ কারণেই আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান শুরু করলেন।

ইরানী শাসনাধীন গোত্রসমূহের মধ্যে একটি গোত্রের নাম ছিলো "বনু শাইবান"। নবম হিজরীতে এ গোত্র নিজের এক সরদার হযরত মুছান্না রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন হারেছার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল মদীনা প্রেরণ করেন। প্রতিনিধি দলটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। ১১ হিজরীতে বাহরাইন ধর্মদ্রোহীতার ফেতনায় জড়িয়ে পড়ে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বাহরাইনের মুরতাদদের উৎখাতের জন্যে হযরত আলা' হাজরামী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রেরণ করেন। এ সময় ইরানী শাসক বাহরাইনের মুরতাদদের সাহায্য করেছিলো। কিন্তু "বনু শাইবান" গোত্র সে সময় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পুরোপুরি সহযোগিতা করেছিলো। মুরতাদ বা ধর্মদ্রোহীরা যখন সম্পূর্ণরূপে উৎখাত হলো এবং ইসলামী শাসন সমগ্র আরবে বহাল হলো তখন হযরত মুছান্না রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের কবিলাকে সাথে নিয়ে ইরানী শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপক তৎপরতা শুরু করলেন। এ তৎপরতার কয়েকটি কারণ ছিলো। সবচেয়ে বড় কারণ হলো, ইরানী শাসকরা নিজেদের অধীন আরব এলাকার বাসিন্দাদের ওপর অমানবিক ব্যবহার করতো। তাদের ফসল কাটার সময় হলে ইরানী শাসকরা আসতো এবং পুরো খাদ্যশস্য নিয়ে যেতো এবং বখশিশ হিসেবে আরবদেরকে কিছু মুদ্রা দিয়ে যেতো।

দ্বিতীয়তঃ ইরানী সাম্রাজ্য রাজনৈতিক বিশৃংখলার শিকার হয়েছিলো। চার বছরের মধ্যে ন'জন বাদশাহ একের পর এক ইরানের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলো।

আরবে একটি মযবুত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছিলো তৃতীয় কারণ। এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে আরবরা ইরানী নির্যাতনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার সাহস পেয়েছিলেন। হযরত মুছান্না রাদিয়াল্লাহ আনহু কয়েক মাস পর্যন্ত গেরিলা তৎপরতার মাধ্যমে ইরানী শাসকদেরকে অত্যন্ত পেরেশান করে রাখেন। কিন্তু কয়েক শতাব্দীর পুরাতন একটি বিশাল সাম্রাজ্যকে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে পরাজিত করা ছিলো অসম্ভব ব্যাপার। এজন্যে তিনি খেলাফতের দরবারে উপস্থিত হয়ে ইরানের রাজনৈতিক বিশৃংখলা এবং নিজের তৎপরতার কথা বিশদভাবে বর্ণনা করলেন এবং সাহায্যের আবেদন জানালেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর কথা অত্যন্ত মনোযোগ ও হামদরদীর সাথে শুনলেন এবং বড় বড় সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের সাথে পরামর্শক্রমে তাঁকে ফিরে যেতে বললেন। ফিরে গিয়ে বনু শাইবান এবং তার মিত্র গোত্রসমূহকে সুসংগঠিত করার নির্দেশ দিলেন। শীঘ্রই সাহায্য পৌঁছে যাবে বলে আশ্বাসও দিলেন। এ সাহায্য না পৌঁছা পর্যন্ত ইরানীদের সাথে কোনো বড় যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ার পরামর্শও দিলেন। মুছান্না রাদিয়াল্লাহ আনহুর ফিরে যাওয়ার পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদকে মুছান্না রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাহায্যার্থে অবিলম্বে ইরাক পৌঁছার এবং ইরানীদের বিরুদ্ধে অভিযানের নেতৃত্ব স্বহস্তে নেয়ার নির্দেশ দিলেন।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ধর্মদ্রোহিতার যুদ্ধসমূহ সবেমাত্র শেষ করেছিলেন। এ অবস্থায় তাঁর অধীন সৈন্য সংখ্যা খুব কম ছিলো। ইয়ামামার যুদ্ধে এক হাজার লোক শহীদ হয়েছিলেন। বিরাট সংখ্যক ছিলো আহত। বহুসংখ্যক মুসলমান নিজের গোত্রে ফিরে গিয়েছিলেন। উপরন্তু যারা একবার মুরতাদ হয়ে দ্বিতীয়বার মুসলমান হয়েছিলেন তাদেরকে সেনাবাহিনীতে না নেয়ার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলিফা রাদিয়াল্লাহ আনহুর নির্দেশ ছিলো। কিন্তু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ছিলেন বিরাট সাহসী জেনারেল। পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক না কেন তিনি তা কোনোক্রমেই ভ্রূক্ষেপ করতেন না। তিনি শুধুমাত্র দু' হাজার মুজাহিদসহ এ অভিযানে রওয়ানা হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে মুদার ও রবিয়া গোত্রের অতিরিক্ত আট হাজার সৈন্য যোগ করলেন এবং এমনিভাবে ১০ হাজার সৈন্যের বাহিনী নিয়ে ইরাকের সীমান্তে পৌঁছে গেলেন। সেখানে হযরত মুছান্না রাদিয়াল্লাহ আনহু

'নাবাজ' নামক স্থানে আট হাজার সৈন্যসহ তাঁর অপেক্ষা করছিলেন। এভাবে ইসলামী বাহিনীর মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছিলো ১৮ হাজার। এ পুরো বাহিনীর নেতৃত্ব হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ গ্রহণ করলেন।

ইরাকের প্রাথমিক যুদ্ধসমূহ বিন্যস্তকরণ প্রসঙ্গে দু' ধরনের বর্ণনা বা রাওয়ায়েত পাওয়া যায়। এক রাওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু সর্বপ্রথম 'উব্বুলাহ' পৌছেন। উব্বুলাহ ছিলো ইরানের এক গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। আরব এবং ভারতের জল ও স্থলের সংযোগ স্থান ছিলো এটা। এজন্যে স্থানটি জাকজমকপূর্ণ। এখানেই ইরানী বাহিনী ও মুজাহিদিনে ইসলামের মধ্যে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর নেতৃত্বে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে ইরানীরা পরাজিত হয়।

দ্বিতীয় রাওয়ায়েতে আছে, হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বানকিয়া ও বারসুমাকে পদানত করে উব্বুলাহর দিকে অগ্রসর হন। এর পূর্বে তিনি সেখানকার শাসক হুরমুজকে একটি পত্র প্রেরণ করেন। পত্রে তিনি লিখেন ঃ

"তোমরা যদি ভালো চাও তাহলে ইসলাম গ্রহণ করো। যদি এ প্রস্তাব না মানো তাহলে জিযিয়া দিয়ে মুসলমানদের আশ্রয়ে এসে যাও। যদি এ প্রস্তাবও মঞ্জুর না করো, তাহলে পরিণামের জন্যে তোমরাই দায়ী হবে। আমি এমন এক জাতি সাথে নিয়ে এসেছি যারা মৃত্যুকে এত ভালোবাসে যেমন তোমরা বেঁচে থাকাকে ভালোবেসে থাকো।"

হুরমুজ ইরানী সাম্রাজ্যের প্রথম শ্রেণীর আমীরদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে এক লাখ দিরহাম মূল্যের মুকুট পরিধান করতো। সে ছিল চরম বদ স্বভাব এবং যালেম। নিজের এলাকার আরবদের ওপর বিভিন্নমুখী নির্যাতন চালাতো। এজন্যে সে আরবদের চক্ষুশুল ছিল। এমন কি কোন খারাপ লোকের তুলনা করতে হলে তারা বলতো ঃ "অমুক ব্যক্তি তো হুরমুজের চেয়েও খারাপ প্রকৃতির লোক।"

হুরমুজ হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর পত্র পেয়ে সকল অবস্থা লিপিবদ্ধ করে ইরানী দরবারে প্রেরণ করলো এবং স্বয়ং এক বিরাট বাহিনীসহ মুসলমানদের মুকাবিলার জন্যে অগ্রসর হলো। ইরানীরা এত আবেগাপ্লুত হয়েছিলো যে, কয়েকটি দল পরস্পর জিঞ্জিরাবদ্ধ করে রেখেছিলো। যাতে কোনো কিছু ঘটে গেলে যুদ্ধের ময়দান থেকে তারা পিছপা হতে না পারে। কাজেমার সন্নিকটে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু শত্রুর সামনাসামনি হলেন। ইরানীরা জলভাগ কব্জা করে নিয়েছিলো। এজন্যে মুসলমানরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের বাহিনীকে সম্বোধন

করে বললেন, আমার জীবনের কসম ! দু' বাহিনীর যারাই স্থিরতা ও বাহাদুরীর প্রমাণ দিতে পারবে তাদের কব্জাতেই জলভাগ থাকবে।

অতপর তিনি সেখানেই নেমে লড়াই করে জলভাগ দখলের নির্দেশ দিলেন। মুসলমানরা এ নির্দেশ পেয়েই শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ধোঁকাবাজ হুরমুজ এ সময় একটি চাল চাললো। সে কয়েক শ' সৈন্য গুপ্তস্থানে লুকিয়ে রেখে আগে অগ্রসর হয়ে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে মুকাবিলার হুংকার দিলো। এর উদ্দেশ্য ছিলো, যেই খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের ব্যূহ থেকে বের হয়ে সামনে অগ্রসর হবেন অমনি গুপ্তস্থানে লুকায়িত সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে হত্যা করবে। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হুরমুজের মুকাবিলার জন্যে অগ্রসর হলেন। এ সময় হুরমুজের লোকেরা গুপ্তস্থান থেকে বের হয়ে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। হযরত কা'কা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আমর তামিমি শত্রুর ওপর কড়া নজর রেখেছিলেন। তিনি হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বিপদের মধ্যে দেখতে পেলেন। অতপর নিজের বাহিনীর একটি দল নিয়ে ইরানী অশ্বারোহীদেরকে ঘিরে ফেললেন। এদিকে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হুরমুজের ওপর হামলা চালিয়ে মুহূর্তের মধ্যে তার জীবনলীলা সাঙ্গ করে ফেললেন। তার হত্যার কারণে ইরানীদের মধ্যে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হলো এবং তারা উন্মাদের মত মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। দীর্ঘক্ষণ প্রচণ্ড যুদ্ধ হতে থাকলো। কিন্তু সেনাপতির অনুপস্থিতির কারণে অবশেষে ইরানীদের মধ্যে পরাজয়ের আলামত প্রকট হয়ে উঠলো। এমনকি তাদের ডান ও বামের বাহিনী সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়লো। অবশিষ্ট সৈন্যরা নিরুপায় হয়ে পালিয়ে গেলো।

এ যুদ্ধে প্রচুর সম্পদ গনিমাতের মাল হিসেবে মুসলমানদের হস্তগত হলো। ইরানীরা যে জিঞ্জির দিয়ে নিজেদেরকে বেঁধে রেখেছিলো তা যুদ্ধের ময়দান থেকে সংগ্রহ করে একত্রিত করা হলো। এর ওজন হয়েছিলো সাড়ে সাত মণ। এ কারণে এ যুদ্ধকে "জাতুসসালাসিল"ও বলা হয়ে থাকে। মদীনায় প্রেরিত গনিমাতের মালের অংশের মধ্যে একটি হাতীও ছিলো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর নির্দেশে হাতীটিকে শহরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখানো হলো। মহিলারা হাতীটি দেখে বলতে লাগলেন ঃ আমাদের চোখের সামনে যে জন্তুটি রয়েছে তাকি আল্লাহর সৃষ্ট জীব ?

প্রদর্শনীর পর হাতীটি ইরাকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হলো। গনিমাতের মালের মধ্যে হুরমুজের মাথার মুকুটও ছিলো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু এ মুল্যবান মুকুট হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে প্রদান করলেন। কেননা তিনিই হুরমুজকে হত্যা করেছিলেন।

এ যুদ্ধকে কাজেমার যুদ্ধ এবং জাতুস সালাসিল ছাড়াও হাফিরের যুদ্ধও বলা হয়ে থাকে। কেননা কতিপয় ঐতিহাসিকের কাছে এ যুদ্ধ হাফিরের সন্নিকটে সংঘটিত হয়েছিলো। আর হাফির বসরা থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। এ যুদ্ধ হাফির এবং কাজেমার মধ্যবর্তী কোনো এক স্থানেও সংঘটিত হতে পারে।

কাজেমার যুদ্ধের পর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু খবর পেলেন যে, একটি বিরাট ইরানী বাহিনী মাযারে তাঁবু ফেলেছে এবং মুসলমানদের ওপর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে ইরানী বাদশাহ কারেন বিন কারইয়ানিস নামক এক জেনারেলের নেতৃত্বে হুরমুজের সাহায্যার্থে এ বাহিনী প্রেরণ করেছিলো। ওয়াসিত এবং বসরার মধ্যবর্তী মাযার নামক স্থানে পৌছেই কারেন হুরমুজের হাশর এবং পরাজয়ের খবর পেয়ে মাযারের সন্নিকটে নাহারে ছানির তীরে তাঁবু স্থাপন করলেন। হুরমুজের পরাজিত বাহিনীর দু'জন অফিসার কুবাজ এবং আনুশাজান বেঁচে এসেছিলো। কারেন তাদেরকে স্ব বাহিনীর ডান ও বামের অফিসার নিয়োগ এবং মুসলমানদের ওপর প্রচণ্ড হামলার প্রস্তুতি নিলো। কিন্তু মুসলমানদের ওপর কারেনের হামলার পূর্বেই হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু অগ্রসর হয়ে মাযার পৌছে ইরানীদের মুখোমুখী হলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এ যুদ্ধে কারেন, কুবাজ ও আনুশাজানসহ ৩০ হাজার ইরানী সৈন্য নিহত হয়। অবশিষ্টরা পালিয়ে যায়। তাদের মধ্যে কিছু নাহার ছানিতে ডুবে মারা গেলো এবং অন্যান্যরা অতিকষ্টে জীবন বাঁচালো। এ যুদ্ধে মুসলমানদের প্রভূত গনিমাতের মাল হস্তগত হয়েছিলো। হিসেবে প্রত্যেক অশ্বারোহী ৩০ হাজার দিরহাম পেয়েছিলেন।

ইরানের বাদশাহ ইরদেশের মাযারে ইরানীদের শিক্ষণীয় পরাজয়ের খবর যখন অবহিত হলো। তখন সে মুসলমানদের অগ্রযাত্রা প্রতিরোধের জন্যে অভিজ্ঞ দু' জেনারেল আন্দর যা'বার ও বাহমনকে একের পর এক বিরাট বাহিনীসহ প্রেরণ করলো। এ দু' বাহিনী ওয়ালাজাহ নামক স্থানে পরস্পর মিলিত হলো। হিরাহ এবং কাসকারের মধ্যবর্তী স্থানে বসবাসরত আরবী বংশোদ্ভূত বিরাট সংখ্যক খৃষ্টান ও কৃষকও ইরানীদের সাহায্যের জন্যে ময়দানে এসে উপস্থিত হলো। এভাবে এক বিরাট বাহিনী 'ওয়ালজাহ'তে সমবেত হলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ইরানীদের এ বিরাট সমাবেশের খবর পেলেন। তিনি সুয়াইদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মুকাররান রাদিয়াল্লাহ আনহুকে কিছু সৈন্যসহ মাযারে রেখে এবং অবশিষ্ট সৈন্যসহ ওয়ালাজাহ রওয়ানা হলেন। ওয়ালাজাহর কাছে পৌছে তিনি দেখলেন যে, সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকার স্থানে স্থানে কাটা এবং ঢালু। এ অবস্থায় বিপুল সংখ্যক শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করার জন্যে তিনি এক সুন্দর কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি কিছু সৈন্যকে

ঢালু স্থানে লুকিয়ে থাকতে বললেন এবং নিজে শক্তিশালী কতিপয় দলসহ শত্রুর সামনাসামনি হলেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে ঘোরতর যুদ্ধ হতে থাকলো। ইরানীদের মধ্যে যখন দুর্বলতার লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠলো তখন তিনি ঢালু স্থানে লুকায়িত সৈন্যদেরকে যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। এসব সৈন্য কালবিলম্ব না করে মুহূর্তের মধ্যে শত্রুর ওপর আল্লাহর গযব হিসেবে ঝাঁপিয়ে পড়লো। অসংখ্য ইরানী নিহত হলো এবং অবশিষ্টরা অনন্যোপায় হয়ে পালিয়ে গেলো। আন্দর যা'যও এ পলায়নরত সৈন্যদের মধ্যে ছিলো। মরুভূমিতে সে পানির পিপাসায় কাতরাতে কাতরাতে মারা গেলো। অবশ্য বাহমান যুদ্ধে বেঁচে গিয়েছিলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু যুদ্ধের পর সাধারণ নাগরিকদের ওপর জিযিয়া আরোপ করলেন এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন।

ওয়ালাজাহর যুদ্ধে আরবী বংশোদ্ভূত খৃষ্টান গোত্রসমূহের বহু লোক নিহত হয়েছিলো। তারা এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে উলাইইসে (কুফার সন্নিকটে ইরাকী সীমান্তের একটি স্থান) সমবেত হয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলো। ওদিকে বাহমন ইরানের দরবারে পৌঁছলো এবং সেখান থেকে বিরাট বাহিনী নিয়ে উলাইইস উপস্থিত হলো। সে এ বাহিনী স্থানীয় ইরানী শাসক জাবানের হাতে সোপর্দ করলো এবং সে পুনরায় পরামর্শের জন্যে ইরানের শাহের কাছে গমন করলো। ফিরে না আসা পর্যন্ত যেন সে যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে পড়ে এ নির্দেশও সে দিলো। ইত্যবসরে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু উলাইইস পৌঁছে গেলেন এবং অবসর নেয়া ছাড়াই খৃষ্টান গোত্রসমূহের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। সে সময় জাবান বাহিনী নিশ্চিন্তে খাওয়ায় মশগুল ছিলো। কেননা বাহমন ফিরে না আসা পর্যন্ত তাদের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার নির্দেশ ছিলো না। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু পূর্ণ শক্তির সাথে হামলা করে খৃষ্টান ও ইরানী সৈন্যদেরকে গাজর কাটার মতো কাটলেন। বলা হয়ে থাকে যে, এ যুদ্ধে ৭০ হাজার খৃষ্টান ও ইরানী নিহত হয়েছিলো।

উলাইইস যুদ্ধের পর হযরত খালিদ আমগেশিয়ার দিকে অগ্রসর হলেন। সেখানকার অধিবাসীরা মুসলমানদেরকে তাদের দিকে আসতে দেখে ঘাবড়ে গেলো এবং শহর ছেড়ে চলে গেলো। সুতরাং হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিনা বাধায় তা দখল করে নিলেন। সেখান থেকে বহু গনিমাতের মাল লাভ হলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তার পঞ্চমাংশ বিজয়বানীসহ খেলাফতের দরবারে প্রেরণ করলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু খুব খুশী হলেন এবং তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো ঃ

"হে কুরাইশ ! তোমাদের বাঘ আরেক বাঘের ওপর হামলা করে তার গর্তে ঢুকে তার ওপর বিজয় লাভ করেছে। এখানকার মহিলারা খালিদের মত সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম।"

আমগেশিয়ার কাছেই ঐতিহাসিক হিরাহ শহর। সেখানকার ইরানী শাসক আজাদবিহ (অথবা আরাজবিহ) জানতে পারলো যে, মুসলমানরা এখন হিরার ওপর সৈন্য পরিচালনা করবে। এ অবস্থায় সে নিজের পুত্রকে একটি শক্তিশালী বাহিনী সমেত মুসলমানদের প্রতিরোধের জন্যে সম্মুখে রওয়ানা করিয়ে দিলো এবং নিজেও স্ববাহিনীসহ শহরের বাইরে বেরিয়ে তাঁবু স্থাপন করলো। যাতে প্রয়োজনে অবিলম্বে পুত্রের সাহায্যে এগিয়ে যেতে পারে। আমগেশিয়া এবং হিরার মধ্যবর্তী স্থানে ছিলো ফোরাত নদী। ইবনে আযাদ বিহ নদীতে বাঁধ বেঁধে তা থেকে পানি বের হওয়ার নহরে প্রবাহিত করলো। মুসলমানরা নৌকায় চড়ে নদী পথে হিরার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। এ অবস্থায় তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লো। কেননা পানির গতি পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার ফলে তাদের নৌকাগুলো কাদায় আটকে গেলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু মুসলমানদেরকে সেখানেই নৌকা রেখে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে শত্রুর ওপর হামলার নির্দেশ দিলেন। মুসলমানরা নির্দেশ পালন করে ঘোড়ায় চড়ে এক পক্ষীয়ভাবে ইবনে আযাদ বিহর বাহিনীর ওপর ঝাপিয়ে পড়লো। তারা ফোরাত নদীর ওহানার, কাছে তাঁবু স্থাপন করেছিলো। ইবনে আযাদ বিহ এ হঠাৎ আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিলো না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় সৈন্য সহ নিহত হলো। মুসলমানরা বাঁধ ভেঙ্গে নদীকে স্বাভাবিক গতিতে প্রবাহিত করলো এবং হিরার দিকে অগ্রসর হলো। একই সময় ইরানের শাহ ইরদশেরের মৃত্যু হলো। আযাদ বিহ ইরানের শাহের মৃত্যু এবং নিজের পুত্রের নিহত হওয়ার খবর একই সাথে পেলো। এ খবরে সে হতোদ্যম হয়ে পড়লো এবং নিজের লোক লশকরসহ পালিয়ে গেলো। বস্তুত মুসলমানরা বিনা বাধায় হিরার কাছে পৌছলেন এবং গারিয়াইন ও কাছরে আবইয়াজের মধ্যবর্তী স্থানে তাঁবু স্থাপন করলেন। এখানে আযাদ বিহ অবস্থান করছিলো। হিরাতে যারা ছিলো তারা দুর্গ বন্ধ করে বসে রইলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদের কাছে প্রেরিত এক পয়গামে জানালেন যে, তোমরা যদি জিযিয়া প্রদানে সম্মত হও এবং দুর্গের দরযা খুলে দাও তাহলে তোমাদের কিছু করা হবে না। তোমাদের হেফাজত করা আমাদের কর্তব্য হয়ে পড়বে। হিরাবাসীরা এ পয়গামের জবাবে মুসলমানদের ওপর পাথর নিক্ষেপ শুরু করলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু মুসলমানদেরকে তাদের ওপর অব্যাহতভাবে তীর নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন। মুসলমানরা বৃষ্টির মতো তীর নিক্ষেপ শুরু করলো। এতে হিরার অসংখ্য বাসিন্দা মারা গেলো। শহরের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও পাদরীরা দুর্গের সরদারদের প্রতি মুসলমানদের ওপর

পাথর নিক্ষেপ বন্ধ এবং দুর্গবাসীকে মুসলমানদের তীর নিক্ষেপ থেকে রক্ষার আহ্বান জানালো। নেতৃবৃন্দ বাধ্য হয়ে তাদের একটি প্রতিনিধিদল সন্ধি প্রশ্নে আলোচনার জন্য হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে দেখা করার কথা বলে পাঠালো এবং যুদ্ধ বন্ধের অনুরোধ জানালো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদের অনুরোধ মঞ্জুর করলেন। সুতরাং তাদের পাঁচজন সরদার আদি, আমর, পাসরানে আদি, হাইরী বিন উকাল, আমর বিন আবদুল মাসিহ এবং আয়াস বিন কাবিসা সমন্বয়ে গঠিত প্রতিনিধি দল হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদের খিদমতে হাজির হলো এবং বার্ষিক এক লাখ নব্বই হাজার দিরহাম জিযিয়া প্রদান মঞ্জুর করিয়ে সন্ধি করে ফেললো। এ সময় যে সন্ধিনামা লিখিত হয়েছিলো তার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

"বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।" এটা সে চুক্তি। যা খালিদ বিন ওয়ালিদ আদি, হাইরী বিন উকাল, আমর বিন আবদুল মাসিহ এবং আয়াস বিন কাবিসার সাথে সম্পাদন করেছেন। এসব ব্যক্তি হিরাবাসীদের পক্ষ থেকে চুক্তিটি বাস্তবায়নের গ্যারান্টি দাতা হিসেবে সম্মতি দিয়েছেন। চুক্তি অনুযায়ী হিরাবাসী প্রতি বছর এক লাখ নব্বই হাজার দিরহাম জিযিয়া প্রদান করবে। এ জিযিয়া সন্যাসী এবং পাদরীদেরকেও আদায় করতে হবে। অবশ্য যারা গরীব, অভাবগ্রস্ত, দুনিয়াত্যাগী সন্যাসী এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীরা এ জিযিয়ার আওতামুক্ত থাকবে। এ জিযিয়া যদি নিয়ম মত আদায় করা হয় তাহলে হিরাবাসীর হিফাজতের দায়িত্ব আমার (খালিদ বিন ওয়ালিদ অথবা মুসলমানদের) ওপর যদি আমি (অথবা মুসলমান) তাদের হিফাজত করতে না পারি তাহলে জিযিয়া নেয়া হবে না। আর যদি হিরাবাসী কাজে অথবা কথায় চুক্তি ভঙ্গ করে তাহলে তারা আমাদের আশ্রয় (হিফাজত) থেকে বের হয়ে যাবে। এ চুক্তি ১২ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে লিপিবদ্ধ হয়।"

হিরার সন্ধির পর আশেপাশের এলাকার বাসিন্দারাও বার্ষিক ২০ লাখ দিরহাম প্রদানের শর্তে সন্ধি করলো। হিরাহ এবং সংলগ্ন এলাকার ওপর মুসলমানদের পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত কা'কা' রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আমর তামিমি, হযরত জারার রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আযুর, হযরত মুছান্না রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন হারিছাহ এবং সৈন্য বাহিনীর আরো কতিপয় অফিসারকে সীমান্ত হিফাজতের কাজে নিয়োগ করলেন এবং শত্রুর ওপর অব্যাহত আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। যাতে তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে না পারে। সুতরাং এসব অফিসার নিজেদের সীমান্তসমূহ হতে অগ্রসর হয়ে দজলা নদীর তীর পর্যন্ত দুশমনদের সমগ্র এলাকা ছিনিয়ে নিলো।

এছাড়াও হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিভিন্ন বিজিত এলাকায় শাসক নিয়োগ করলেন এবং তাদের স্ব স্ব এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা কায়েম রাখা ও

জিযিয়া আদায়ের দায়িত্ব দিলেন। কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন, সে সময়ই বানকিয়াদ ও বারুসমার বাসিন্দা পাদরী সলুবা বিন নাসতুনাকে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে প্রেরণ করলো এবং বার্ষিক ১০ হাজার দিরহাম প্রদানের চুক্তিতে আবদ্ধ হলো। এর বিনিময়ে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বানকিয়া ও বারুসমারের হিফাজতের দায়িত্ব নিলেন এবং লিখিত চুক্তি লিখে দিলেন। হিরাবাসীদের কৃত চুক্তিতে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছিলো এ চুক্তিও অনুরূপই ছিলো। অন্য এক রাওয়ায়েতে এও বলা হয়েছে যে, বানকিয়া ও বারুসমাবাসীরা হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর মুকাবিলা করেছিলো। কিন্তু যখন দেখলো যে, মুসলমানরা তাদের উৎখাত করে ছাড়বে তখন তারা সন্ধির দিকে অগ্রসর হলো এবং এ উদ্দেশ্যে দিরানতিফের পাদরী সলুবাকে নিজেদের প্রতিনিধি বানিয়ে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে প্রেরণ করেছিলো।

এসব ব্যবস্থা সম্পাদনের পর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত কা'কা' রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আমরকে হিরাতে নিজের নায়েব নিয়োগ করলেন এবং স্বয়ং ইরানীদের মযবুত ঘাঁটি আম্বারের দিকে অগ্রসর হলেন। আম্বারবাসীরা হযরত খালিদের আগমনের খবর পেয়ে দুর্গ বন্ধ করে বসে গেলো। মুসলমানরা শহরের কাছে পৌছলে আম্বারবাসীরা তীর নিক্ষেপ শুরু করলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু দুর্গের চারদিকে চক্কর লাগিয়ে ইরানীদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পরীক্ষা করে দেখলেন। পরীক্ষার পর তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌছলেন যে, আম্বারবাসী যুদ্ধের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে অবহিত নয়। এজন্যে খুবই সহজে তাদেরকে তীরের নিশানা বানানো যায়। বস্তুত তিনি শত্রু সৈন্যের চোখ তাক করে তীর নিক্ষেপের জন্য মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ দিলেন। তারা নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করলেন এবং মুহূর্তের মধ্যে শত্রুর এক হাজার সৈন্যের চোখ অকেজো করে দিলেন। আম্বারবাসী এ ধরনের মুসিবতের সম্মুখীন আগে কখনও হয়নি। তাদের মধ্যে চরম বিশৃংখলা দেখা দিলো। আম্বারের ইরানী সেনাপতি শেরজাদ সেনাবাহিনীতে অস্বাভাবিক অবস্থা প্রত্যক্ষ করে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে সন্ধির আলোচনা শুরু করলো। কিন্তু এমন শর্ত আরোপ করলো যে, হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর পক্ষে তা গ্রহণ করা সম্ভব ছিলো না। সুতরাং আলাপ-আলোচনায় কোনো ফল হলো না। ইতিমধ্যে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু সৈন্য বাহিনীকে এমন স্থানে নিয়ে এসেছিলেন যে, সেখানে পরিখার প্রশস্ততা সামান্যই ছিলো। তিনি অসুস্থ এবং অকেজো উট যবেহ করে পরিখা বা খন্দকের মধ্যে নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন। এভাবে খন্দকের এক অংশ ভরে গেলো এবং পুলের মত তৈরি হলো। ইসলামী বাহিনী এর ওপর দিয়ে অতিক্রম করে পরিখার অপর পাশে পৌছে

গেলো। মুসলমানদের চাপ সহ্য করা এখন ইরানীদের সাধ্যাতীত হয়ে উঠলো। বাধ্য হয়ে তারা হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর শর্তে সন্ধি করলো এবং মুসলমানরা শহর কবজা করে নিলো। আম্বারের পতনের পর আশেপাশের এলাকার পাশের বাসিন্দাদের হিম্মতেও ভাটা পড়লো এবং কোনো বাধা ছাড়াই তারা আনুগত্য কবুল করে নিলো।

এরপর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত যবরকান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন বদরকে আম্মারে নিজের নায়েব বানালেন এবং আইনুত তামারের দিকে অগ্রসর হলেন। সেখানে প্রখ্যাত এক ইরানী জেনারেল মেহরান পসর বাহরাম চোবিন ইরানীদের এক বিরাট বাহিনীসহ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। তার সাহায্যার্থে তাগলাব, আয়াদ এবং নামর প্রভৃতি অসংখ্য আরবী বংশোদ্ভূত গোত্রও আকাহ বিন আকার নেতৃত্বে উপস্থিত হয়েছিলো। মেহরান এক বাস্তব কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে এসব আরব বংশোদ্ভূত খৃষ্টান গোত্রসমূহকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সামনে এগিয়ে এনেছিলো। আকাহ কুরখ নামক স্থানে নিজের বাহিনীর ব্যূহ রচনায় ব্যস্ত ছিলো। এমন সময় হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তার মাথার ওপর গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং বিশ্রাম গ্রহণ ছাড়াই আকার বাহিনীর ওপর হামলা করে বসলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ব্যূহ ভেদ করে আকার কাছে পৌঁছে গেলেন এবং তাঁকে গ্রেফতার করলেন। নিজের সরদারের গ্রেফতারীর কারণে সৈন্যরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো এবং পালিয়ে গেলো। মুসলমানেরা পিছু ধাওয়া করে হাজার হাজার লোককে গ্রেফতার করলো। যারা বেঁচে গেলো তারা আইনুত তামার দুর্গে আশ্রয় নিলো। মেহরান আরব খৃষ্টানদের হাশর দেখে দুর্গ ছেড়ে পালিয়ে গেলো। হযরত খালিদ দুর্গ অবরোধ এবং শত্রুর ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করলেন। এতে তারা দুর্গের দরযা খুলে দিতে বাধ্য হলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু সকল আরব খৃষ্টানকে গ্রেফতার করলেন। তিনি তাদের অপকর্মে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। এজন্যে আকাহ সমেত সকলের গর্দান উড়িয়ে দিলেন।

যে সময় হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ইরাকের অভিযানসমূহে ব্যস্ত ছিলেন, ঠিক তখনই দাওমাতুল জানদালে বিদ্রোহ হয়ে গেলো। কালাব, বাহরা, গাসসান, তানুখ এবং দাজাআম গোত্রসমূহ একিদার ও জুদিকে সরদার বানিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা তুলে ধরলো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আয়াজ বিন গানাম রাদিয়াল্লাহ আনহুকে এ বিদ্রোহ দমনের জন্যে দাওমাতুল জানদালে প্রেরণ করলেন। তিনি সেখানে পৌঁছে শত্রু পক্ষকে খুব শক্তিশালী বলে মনে করলেন এবং সাহায্যের জন্যে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদকে ডেকে পাঠালেন।

অন্য এক রাওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে হযরত আয়াজ রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাহায্যার্থে সেখানে পৌঁছার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যা হোক, আইনুত তামারের যুদ্ধ শেষ করে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু আবিম বিন কাহেল আসলামীকে সেখানে রেখে এক বাহিনীসহ দাওমাতুল জানদালের দিকে রওয়ানা হলেন। যখন দাওমাতুল জানদালের কাছে পৌঁছলেন তখন একিদার খালিদ বিন ওয়ালিদের সাথে যুদ্ধ করার অক্ষমতার কথা বলে অপর বিদ্রোহী নেতা জুদীকে পরিত্যাগ করে চলে গেলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু একিদারের পলায়নের কথা অবহিত হয়ে একটি সৈন্যদল তার পেছনে প্রেরণ করলেন। এ দল তাকে গ্রেফতার করলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু চুক্তি ভঙ্গ এবং বিদ্রোহের অপরাধে তাকে হত্যা করলেন। [একিদার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আনুগত্য কবুল করেছিলো। কিন্তু পরে সে বিদ্রোহে অংশ নেয়]। অতপর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ও হযরত আয়াজ রাদিয়াল্লাহ আনহু দু' দিক থেকে দাওমাতুল জানদাল ঘিরে নেন। বিদ্রোহীদের সাহায্যের জন্য আরব বংশোদ্ভূত কয়েকটি খৃষ্টান গোত্রও উপস্থিত হয়েছিলো। তারা সবাই মিলে জুদী বিন রবিয়া, ওদিয়া কালবী, ইবনে রুমানস কালবী, ইবনুল আইহাম এবং ইবনে হাদারজানের নেতৃত্বে মুসলমানদের সামনাসামনি হলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ও হযরত আয়াজ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদেরকে পরাজিত করলেন। জুদী এবং ওদিয়া মুসলমানদের হাতে গ্রেফতার হলো। অবশিষ্ট সৈন্য পিছপা হয়ে দুর্গের দিকে যাত্রা করলো। যখন দুর্গ পূর্ণ হয়ে গেলো তখন অভ্যন্তরের লোকেরা দরযা বন্ধ করে দিলো এবং বনু কালাবের সাথে সংশ্লিষ্ট নিজের সাথীদেরকে মুসলমানদের রহম-করমের ওপর ছেড়ে দিলো। বনু কালাব হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাহিনীর এক সরদার আছেম রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আমর তামিমীর কাছে দয়ার আবেদন জানালো। কেননা তাঁরা তামিম গোত্র বনু কালাবের মিত্র ছিলো। হযরত আছেম রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদেরকে নিরাপত্তা দিলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদের চুক্তির মর্যাদা দিলেন এবং বনু কালাবের লোকদের ক্ষমা করে দিলেন। এরপর তিনি দুর্গের ফটক উপড়ে ফেললেন এবং অবস্থানরত সকল বিদ্রোহীদেরকে গ্রেফতার করলেন। তারপর তিনি সেখানে জুদীসহ তাদের সবাইকে বিদ্রোহের অপরাধে হত্যা করলেন।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু দাওমাতুল জানদালেই ছিলেন। ঠিক এমনি সময়ে ইরাকে ইরানীরা পুনরায় বিশৃংখলার সৃষ্টি করলো। তাদের দু' সরদার রোযবিহ ও যাররে মাহর হাছিদ এবং খানাফসের ওপর হামলা করে বসলো। আম্মারের শাসনকর্তা হযরত যবরকান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন বদর

ইরানীদের তৎপরতার খবর পেয়ে হিরার শাসনকর্তা হযরত কা'কা' রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আমর তামিমীর কাছে সাহায্য চাইলেন। হযরত কা'কা রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর পয়গাম পেয়েই আ'বাদ বিন ফাদকীস সা'দী ও উরওয়াহ বিন জা'দুলবারেকীর নেতৃত্বে পৃথক দু'টি বাহিনী হাছিদ এবং খানাফসের দিকে রওয়ানা করিয়ে দিলেন। ইরানীদের অগ্রযাত্রা রোধ করার লক্ষ্যেই বাহিনী দু'টি প্রেরণ করা হয়েছিলো। তারা রিফে রোযবিহ এবং যাররে মাহরের রাস্তা অবরোধ করলো। এখানে তারা বনু রবিয়ার অপেক্ষায় ছিলো। বনু রবিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলো। ইত্যবসরে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ আয়াজ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন গানামকে সাথে নিয়ে দাওমাতুল জানদাল থেকে হিরাহ ফিরে এলেন। পৌঁছেই তিনি ইমরুল কায়েস কালবীর পত্র পেলেন। পত্রে তিনি জানান যে, হাযিল বিন ইমরান মুছাইয়াখে এবং রবিয়া বিন বাশার আছছানি ও আল-বাশার নামক স্থানে সৈন্য একত্রিত করছে এবং শীঘ্রই এ সৈন্য সমেত রোযবিহ ও যাররে মাহারের সাহায্যের জন্যে রওয়ানা হচ্ছে। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এ পত্র পেয়েই হযরত কা'কা রাদিয়াল্লাহ আনহু ও আবু লাইলাকে রোযবিহ এবং যাররে মাহরের মুকাবিলার জন্যে রওয়ানা করলেন। অতপর হিরাতে হযরত আয়াজ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন গানামকে রেখে স্বয়ং তাদের পেছনে রওয়ানা হলেন। হযরত কা'কা রাদিয়াল্লাহ আনহু ও হযরত আবু লায়লা রাদিয়াল্লাহ আনহু সবেমাত্র আইনুত তামার পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুও এসে তাদের সাথে মিলিত হলেন। এখান থেকে তিনি হযরত কা'কা' রাদিয়াল্লাহ আনহুকে হাছিদ ও হযরত লায়লা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে খানাফসের দিকে প্রেরণ করলেন। রোযবিহ এবং যাররে মাহার সম্মিলিতভাবে হাছিদে হযরত কা'কা' রাদিয়াল্লাহ আনহুর মুকাবিলা করলেন। কিন্তু যুদ্ধে উভয়ই নিহত এবং তাদের সৈন্য শোচণীয়ভাবে পরাজিত হলো। পরাজিত বাহিনী পালিয়ে খানাফসে আশ্রয় নিলো। ইতিমধ্যে হযরত আবু লায়লা রাদিয়াল্লাহ আনহু খানাফসে গিয়ে পৌঁছলেন। ইরানী শাসক মাহবুজান মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহস পেলো না। সে নিজের সৈন্যসহ খানাফস থেকে বের হয়ে মুছাইয়াখ চলে গেলেন। বস্তুত হযরত আবু লায়লা রাদিয়াল্লাহ আনহু কোনো বাধা ছাড়াই খানাফস দখল করে নিলেন। এরপর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত কা'কা' রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আবু লায়লা রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত আ'বাদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত উরওয়াহ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে মুছাইয়াখের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। সাথে সাথে হেদায়াত দিলেন যে, তাঁরা যেন অমুক রাতে অমুক স্থানে সকলেই একত্রিত হয়। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুও স্বয়ং নির্ধারিত রাতে তাঁদের

কাছে পৌঁছে গেলেন। অতপর সম্মিলিত ইসলামী বাহিনী ইরানী এবং তাঁদের আরব মিত্রদের ওপর আঘাত হানলেন। খৃষ্টান আরবদের সরদার হাযিল বিন ইমরান কোনোমতে জান নিয়ে পালালো। কিন্তু মুছাইয়াখে অবশিষ্ট অন্যান্য সকল খৃষ্টান আরব ও ইরানীরা যমদূতের সম্মুখীন হলো।

মুছাইয়াখ অভিযান শেষে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বনু তাগলাবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। গোত্রটি কয়েকবার ইরানীদের সাথে ঐকবদ্ধ্য হয়ে মুসলমানদের ওপর হামলা চালিয়েছিলো। তিনি হযরত কা'কা' রাদিয়াল্লাহ আনহু ও হযরত আবু লায়লা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বনু তাগলাবের বস্তি আছছানী এবং আল-বাশারের ওপর মারাত্মক আঘাত হানার নির্দেশ দিলেন। এখানে রবিয়া বিন বুজায়ের তাগলাবী সৈন্য সমেত উপস্থিত ছিলো। তাদের পেছনে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুও নিজের বাহিনীসহ রওয়ানা হলেন। একটি নির্দিষ্ট রাতে মুজাহিদরা তিন দিক থেকে আছ ছানির ওপর হামলা করে বসলো এবং সকল শত্রুকে (মহিলা, শিশু এবং বৃদ্ধ ছাড়া) মৃত্যুর দরযায় পৌঁছে দিলো। আছছানীর পর আল বাশার (যার অপর নাম আযযামিল)-এর পালা এলো। সেখানেও তাগলাবীদের একটি বাহিনী মওজুদ ছিলো। হাযিল বিন ইমরান মুছাইয়াখ থেকে পালিয়ে সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এক ধাওয়াতেই আল-বাশার দখল করে নিলেন এবং শত্রু বাহিনী পরিষ্কার করে ফেললেন। এরপর তিনি আর-রিজাবের দিকে অগ্রসর হলেন। এখানে আকাহর (নিহত) পুত্র হিলাল সৈন্যসহ উপস্থিত ছিলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর আগমনের সংবাদ পেয়ে সে শহর ছেড়ে পালিয়ে গেলো। এভাবে আর-রিজাবও মুসলমানরা পদানত করলো।

আর-রিজাব দখলের পর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু আল ফারাজের দিকে এগিয়ে গেলেন। ইরাক, সিরিয়া এবং আলজীরিয়ার সীমান্ত এখানে এসে মিলিত হয়েছিলো। যুদ্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে স্থানটি ছিলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু আল ফারাজ পৌঁছলে তাঁর মুকাবিলায় শুধুমাত্র ইরানী এবং সিরীয়বাসীরাই ঐকবদ্ধ্য হলো না, বরং তাগলাব, নামর এবং আয়াদের আরবী বংশোদ্ভূত গোত্রসমূহও তাদের সাথে একত্রিত হলো। এ সম্মিলিত বাহিনী ফোরাত নদী পার হয়ে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে মুসলমানদের ওপর হামলা করে বসলো। মুসলমানরা হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর নেতৃত্বে এমন দৃঢ়তা এবং বাহাদুরীর সাথে হামালার জবাব দিলো যে, যুদ্ধ কাকে বলে তা শত্রু পক্ষ সম্যক উপলব্ধি করতে পারলো। তারা পিছু হটতে বাধ্য হলো। এ সময় হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হুংকার ছেড়ে বললো, মুসলমানরা ! তাদেরকে ঘিরে নাও এবং কাউকেই বেঁচে যেতে দেবে না। তাঁর হুংকারে মুসলমান জানবাজরা শত্রু সৈন্য ঘিরে ঘিরে মারা শুরু

করলো। এভাবে তাদের বেশীর ভাগ সৈন্যই মুসলমানদের তরবারীর শিকারে পরিণত হলো। অল্প সংখ্যক যারা পিছু হটতে পেরেছিলো তারা ফোরাত নদীতে ডুবে মারা গেলো। বিজয়ের পর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু সৈন্যদেরকে কয়েকদিন বিশ্রাম গ্রহণের কথা বললেন। সুতরাং সমগ্র বাহিনী আল ফারাজেই থেমে গেলো। ১০ দিন পর ১২ হিজরী ২৫শে জিলকদ হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু সৈন্য বাহিনীকে হিরার দিকে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং নিজে পশ্চাত বাহিনীর সাথে যাবেন বলে ঘোষণা করলেন। বাহিনী রওয়ানা হতেই তিনি অত্যন্ত সংগোপনে কয়েকজন ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে বিদ্যুৎ বেগে মক্কা মুয়াজ্জামা পৌঁছে পবিত্র হজ্জ সমাপন করে একই গতিতে ফিরে এলেন। বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, আল-ফারাজ থেকে আগত বাহিনীর শেষ অংশ তখনো হিরাহ পৌঁছেনি। বস্তুত তিনি গোপন হজ্জ থেকে ফিরে সেই বাহিনীর পশ্চাত ভাগের সাথে এসে মিলিত হলেন। সৈন্যদের কেউই তাঁর হজ্জ গমন সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলো না। প্রত্যাবর্তনের পর যখন তারা হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং তাঁর সাথীদের মস্তক মুণ্ডন অবস্থায় দেখলো তখন উপলব্ধি করতে পারলো যে, তাঁরা হজ্জ করে এসেছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর গোপন হজ্জের খবর পেয়ে লিখলেন, ভবিষ্যতে আর এ রকম করো না। কেননা নিজের বাহিনী থেকে সেনাপতির একা একা অনুপস্থিত হয়ে যাওয়ায় বিভিন্ন ধরনের ভীতির কারণ হতে পারে।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু সবেমাত্র হিরাহ পৌঁছে ছিলেন। ঠিক তখনি খেলাফতের দরবার থেকে সিরিয়া গমনের নির্দেশ পেলেন। সুতরাং তিনি ইরাকের বিজয়কৃত এলাকাসমূহের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হযরত মুছান্না রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন হারেছার ওপর অর্পণ করে সিরিয়া রওয়ানা হয়ে গেলেন।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এক বছর ২ মাস ইরাকে অতিবাহিত করেন। এ সময় তিনি ১৫টি যুদ্ধে অংশ নেন এবং সবক'টিতেই জয় লাভ করেন।

যে সময় হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু আরব ইরাকে ইরানী শাহানশাহীর ওপর আঘাত হানছিলেন, ঠিক সে সময় রোমের বাদশার সাথেও সংঘর্ষ শুরু হয়েছিলো এবং চারটি ইসলামী বাহিনী হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল জাররাহ, হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস, হযরত ইয়াযিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত শুরাহ বিল রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন হাসানা রাদিয়াল্লাহ আনহুর নেতৃত্বে সিরিয়ার বিভিন্ন স্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। রোমীয়রা পূর্ণ শক্তি দিয়ে পদে পদে তাদেরকে বাধা দিয়ে যাচ্ছিলো। ফলে মুসলমানদের অগ্রযাত্রা

খুবই কঠিন হয়ে পড়েছিলো। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু ফলপ্রসূভাবে অগ্রগমনের উদ্দেশ্যে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে অবিলম্বে সিরিয়ায় জিহাদরত মুসলমানদের সাহায্যে পৌছার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পেয়েই হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলিফা রাদিয়াল্লাহ আনহুর নির্দেশ অনুযায়ী অর্ধেক সৈন্যসহ আরব ইরাক থেকে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু সিরিয়ার রণক্ষেত্রে পৌছার জন্যে এক ভয়ংকর ও বিপদসংকুল পথ বেছে নিলেন। তিনি পাঁচ ছ'দিনে অতিক্রম যোগ্য পরিচিত ও সহজ পথ ছেড়ে দারুজ (হাওরান) পর্বতের পূর্বে দিগন্ত প্রসারিত বিরাট মরুভূমির (বাদিয়াতুশ শাম অথবা হামাদ) দীর্ঘ পথ ধরে এগুলেন। ঐতিহাসিকরা হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর এ কর্মপদ্ধতির বিভিন্ন বিশ্লেষণ করেছেন। বিশ্লেষণের সার সংক্ষেপ এ দাঁড়ায় যে, হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজস্ব রণনীতির ভিত্তিতেই এ পথ অবলম্বন করেছিলেন এবং ১৮ দিন ব্যাপী কঠিন পথ পরিক্রমার পর সাওয়া (বর্তমান নাম সিবা কূপ) নামক স্থানে পৌছে গেলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাহিনীকে দেখে সাওয়াবাসী হতভম্ব হয়ে পড়লো। তারা চিন্তাই করতে পারেনি যে, এ ভয়াবহ মরুভূমি অতিক্রম করে কোনো বাহিনী তাদের ওপর হামলা করতে পারে। যখন তারা হঠাৎ করে ইসলামী বাহিনীকে নিজেদের মাথার ওপর দেখতে পেলো তখন তারা হতবাক হয়ে পড়লো এবং সাধারণ বাধাদানের পর অস্ত্র সমর্পণ করলো। সাওয়া থেকে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ইরক, তাদমোর (পালমোরাহ), কারইয়াতাইন, হাওয়ারিন ও কাছামকে পদানত করে সোজা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হলেন এবং দামেস্ককে এক পাশে রেখে মারজে রাহিত গিয়ে পৌছলেন। এখানে রোমীয়দের একটি বাহিনী হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হলো কিন্তু পরাজিত হলো। মারজেরাহিত থেকে তিনি ইয়ারমুক উপত্যকার দাররে জারয়ায় প্রবেশ করলেন এবং হাওয়ান পর্বতের পাশ দিয়ে অগ্রসর হতে হতে সিরিয়ায় অবস্থানরত প্রথম ইসলামী বাহিনীর সাথে মিলিত হলেন। জারয়ার কাছে রোমীয়দের এক শক্তিশালী বাহিনী মওজুদ ছিলো। তাদের ধারণাতীত ব্যাপার ছিলো যে, কোনো শত্রু হামাদ মরুভূমি অতিক্রম করে তাদের পেছনে এসে পড়বে। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর আগমনের খবরে তারা হতভম্ব হয়ে পড়লো এবং তাঁকে মুকাবিলা প্রশ্নে হিম্মত হারিয়ে ফেললো। সুতরাং হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিনা বাধায় নিজের ভাইদের কাছে পৌছলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু সিরিয়ার ওপর অভিযানের জন্যে চার বাহিনীর

প্রধান সেনাপতি হিসেবে হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল জাররাহকে নিয়োগ করেছিলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু সেখানে পৌঁছতেই হযরত আবু ওবায়দাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু সমগ্র সৈন্যের নেতৃত্ব তার হাতে সোপর্দ করলেন। ইবনে আসির (র) এবং বালাজুরী (র) বর্ণনা করেছেন, এরপর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বসরার শহরের ওপর হামলা করলেন। বসরার শাসক এক ঝাঁকুনিতেই হিম্মত হারিয়ে ফেললো এবং জিযিয়া প্রদান করে মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে নিলো।

ওদিকে রোমের বাদশাহ হিরাক্লিয়াস সিরিয়ায় মুসলমানদের অগ্রযাত্রার খবর পেয়ে তাদের মুকাবিলার জন্যে পৃথক পৃথক বাহিনী প্রেরণ করলো। পৃথক পৃথক বাহিনী প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিলো যাতে করে ইসলামী বাহিনী পরস্পর মিলিত হতে না পারে। রোমীয় বাহিনীসমূহের নেতৃত্ব করছিলো দু' অভিজ্ঞ জেনারেল কাবকালা ও তাজারক। তারা উভয়ই ফিলিস্তিনের আজনাদাইন নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন করলো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু ফিলিস্তিন পদানত করার জন্য হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে নিয়োগ করেছিলেন। তিনি সে সময় উরবাতে অবস্থান করছিলেন। রোমীয় বাহিনীর আগমনের খবর পেয়ে তিনি আজনাদাইনের দিকে অগ্রসর হলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু ও বুসরার অভিযান শেষ করে তাঁর সাহায্যে পৌঁছে গেলেন।

১৩ হিজরীর জমাদিউল আখিরে আজনাদাইন নামক স্থানে রোমীয় এবং মুসলমানদের দু'দিন ধরে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হলো। যুদ্ধে তাজারক ও কাবকালা নিহত হলো এবং রোমীদের শিক্ষণীয় পরাজয় ঘটলো।

আজনাদাইনে রোমীয়দের পরাজিত করার পর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু রোমীয়দের সেই বাহিনীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন, যে বাহিনী ওয়ারয়ার কাছে দারুজ পর্বতের পাদদেশে এবং ইয়ারমুক নদীর গভীর পাহাড়ী উপত্যকার মধ্যবর্তী ঘাঁটিতে মযবুতভাবে অবস্থান করছিলো। এ বাহিনীকে উপেক্ষা করে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক অভিমুখে অগ্রসর হওয়াটা ছিলো খুবই কঠিন এবং বিপদসংকুল। সুতরাং হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে সিবাকুপে রেখে এবং অবশিষ্ট সৈন্য সমেত অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে ওয়ারয়া পৌঁছলেন। এখানে রোমীয় এবং মুসলমানদের মধ্যে প্রচণ্ড ও রক্তাক্ত যুদ্ধ হলো এবং রোমীয়রা পরাজয় বরণ করলো। তারা ওয়ারয়া থেকে পিছু হটে গেলো। এভাবে ইসলামী বাহিনীর জন্যে দামেস্কের রাস্তা পরিষ্কার হলো। সেখান থেকে দামেস্কের দূরত্ব ছিলো ৬৫ মাইল।

এটা ছিলো ইয়ারমুকের প্রথম যুদ্ধ। এ যুদ্ধ অব্যাহত ছিলো। এমন সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু ওফাত পেলেন। তাঁর স্থলে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু খলিফা নির্বাচিত হলেন।

যুদ্ধের মধ্যেই মদীনা মুনাওয়ারাহ থেকে দূত পৌঁছলেন। তিনি মুসলমানদেরকে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওফাত এবং হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর খলিফা নির্বাচিত হওয়ার খবর দিলেন। একই দূত হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর ফরমানও নিয়ে গিয়েছিলেন। সে ফরমানে তখন থেকে হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল জাররাহকে সিরিয়ার রণক্ষেত্রের ইসলামী বাহিনীর কমাণ্ডার ইনচীপ নিয়োগ এবং হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদকে তাঁর অধীন একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। এ ফরমানের ঘোষণা বিজয়ের পর দেয়া হয়। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু আনন্দচিত্তে ইসলামী বাহিনীর কমাণ্ড হযরত আবু ওবায়দার হাতে ন্যস্ত করলেন।

এখানে এটা পরিষ্কার করা প্রয়োজন যে, সিরিয়ার মশহুর যুদ্ধসমূহ সংঘটিত হওয়ার কাল নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য রয়েছে। এমনিভাবে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর পদচ্যুতির সাল প্রশ্নেও ঐতিহাসিকদের মধ্যে ভিন্নমত পাওয়া যায়। কেউ কেউ লিখেছেন, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু খলিফার দায়িত্ব পেয়েই (১৩ হিজরী) হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে পদচ্যুত করেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ১৭ হিজরীতে তিনি পদচ্যুত হন। এ প্রসঙ্গের যাবতীয় রাওয়ায়েত গভীর দৃষ্টি দিয়ে পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর পদচ্যুতি দু'বার ঘটেছিলো। প্রথমবার ১৩ হিজরীতে তাঁর মর্যাদা (RANK) খাটো করা হয়। এ সত্ত্বেও তিনি হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহুর নায়েব অথবা সেনাবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ অফিসার হিসেবে অব্যাহতভাবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। দ্বিতীয়বার ১৭ হিজরীতে তাঁকে সম্পূর্ণরূপে পদচ্যুত করা হয়। অন্য কথায় তাঁকে অফিসারের পদমর্যাদা থেকে হটিয়ে সাধারণ সৈনিক বানিয়ে দেয়া হয়।

প্রথমবার হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর মর্যাদা এজন্য খাটো করেছিলেন যে, তিনি আমিনুল উম্মাত হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল জাররাহকে প্রধান সেনাপতি পদে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর চেয়ে বেশী যোগ্য মনে করতেন। কেননা হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু কোনো সময়ে সীমাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী বা বাহাদুরীর আবেগে এমন পদক্ষেপ নিয়ে ফেলতেন যা সতর্কতার পরিপন্থী হিসেবে বিবেচিত হতো।

যেসব কারণে দ্বিতীয়বারের পদচ্যুতি ঘটে তার বর্ণনা যথাস্থানে আসবে। আমাদের বিচার-বিশ্লেষণ অনুযায়ী যুদ্ধসমূহের ধারাবাহিকতা বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের বিশ্লেষণ ও ধারাবাহিকতায় ভিন্ন মত পোষণ করা যেতে পারে কিন্তু এসব যুদ্ধ ১৩ থেকে ১৭ হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে নেতিবাচক কিছু বলার নেই। এ যুদ্ধে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু একজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী হিসেবে পুরোপুরি অংশ নিয়েছিলেন। বরং সত্য কথা হলো, এসব যুদ্ধের বেশীর ভাগ (বিশেষ করে ইয়ারমুকের দ্বিতীয় যুদ্ধ) তাঁরই পরিকল্পনা এবং বাস্তব কৌশলের ভিত্তিতে সংঘটিত হয়েছিলো। হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু তাকে নায়েব নয় বরং ভাই মনে করতেন এবং যুদ্ধ প্রশ্নে তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছিলেন।

প্রথম ইয়ারমুকের যুদ্ধের পর মুসলমানরা দামেস্কের দিকে অগ্রসর হলেন এবং চারদিক থেকে তা অবরোধ করলেন। হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু বাবুল যাবিয়ার সামনে তাঁবু স্থাপন করলেন। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস বাবেতুমা, হযরত শুরাহ বিল রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন হাসানা বাবুল ফারাদিস এবং হযরত ইয়াজিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বাবে কাইসানে মোতায়েন করা হলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু শহরের পূর্ব দরযার এক মাইল দূরে এক শূন্য খানকাতে ডেরা স্থাপন করলেন। এ ডেরা 'দিরে খালিদ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। যদিও দামেস্কের ঠাণ্ডা আরব মুজাহিদদের পক্ষে অসহনীয় ছিলো তবুও তারা অত্যন্ত দৃঢ়তার ও আস্থার সাথে অবরোধ অব্যাহত রাখলেন। এ অবরোধ বিভিন্ন মত অনুযায়ী দু' মাস দশ দিন, তিন মাস অথবা ছয় মাস অব্যাহত ছিলো। এ সময় দামেস্কবাসী শহর থেকে বের হয়ে যুদ্ধের হিম্মত দেখাতে পারেনি। অবশ্য তারা প্রাচীরের ওপর থেকে মুসলমানদের ওপর তীর ও পাথর নিক্ষেপ করতো। এক রাতে তাদের পক্ষ থেকে খুব কম তৎপরতা পরিলক্ষিত হলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বেশীর ভাগ সময়েই সারারাত জেগে থাকতেন এবং সামরিক ব্যবস্থাপনার সাথে সাথে শত্রুর তৎপরতার সন্ধানে মশগুল থাকতেন। সে রাতে তিনি শহরে কোনো হাঙ্গামা বা শোরগোল শুনতে না পেয়ে নিজের মাধ্যমসমূহ দিয়ে তার কারণ অবহিত হওয়ার চেষ্টা করলেন। জানা গেলো যে, দামেস্কের শাসক বুতরিকের গৃহে পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে। এ আনন্দে সেদিন শহরবাসীকে দাওয়াত দেয়া হয়েছিলো। তারা দাওয়াতে খুব মদ পান করে এবং সন্ধ্যা থেকেই বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলো। এ খবর পেয়েই হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের বিশেষ বাহিনীসহ শহরের দিকে অগ্রসর হলেন এবং পানিতে পূর্ণ পরিখা পার হয়ে শহরের পাদদেশে পৌঁছে গেলেন। সেখান থেকে তিনি কতিপয় মুজাহিদসহ রশির সাহায্যে শহরের ভিতরের দিকে অবতরণপূর্বক

পাহারাদারদের হত্যা করে দরযা খুলে দিলেন। সাথে সাথে তিনি তাকবির ধ্বনি উচ্চারণ করলেন। তাকবির শুনে বাইরে অবস্থানরত সৈন্যরা একযোগে শহরে প্রবেশ করলো। দামেস্কবাসীরা তখনও মদে চুর হয়েছিলো। হঠাৎ করে এ হামলায় তারা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো এবং নিজেরাই শহরের দ্বিতীয় দরযা খুলে দিলো। দরযা খুলে তারা হযরত আবু ওবায়দার কাছে সন্ধির আবেদন জানালো। সন্ধির আবেদন তিনি মঞ্জুর করলেন। অবস্থা এ দাঁড়ালো যে, একদিকে হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহুর সন্ধি মঞ্জুর করে শহরের অভ্যন্তরে অগ্রসর হতে লাগলেন। অন্যদিকে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিজয়সূচক অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখলেন। শহরের মধ্যস্থলে উভয়ের সাক্ষাত হলো। বস্তুত হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু সন্ধি মঞ্জুর করে ফেলেছিলেন। এজন্যে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুও তরবারি খাপে ঢুকিয়ে ফেললেন।

কতিপয় ঐতিহাসিক (তাদের মধ্যে "আরবের তামাদ্দুন" পুস্তকের লেখক ফরাসী দার্শনিক গুস্তাভলীবানও অন্তর্ভুক্ত) লিখেছেন, যেদিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু ওফাত পান সেদিনই দামেস্ক বিজয় হয়েছিলো। কিন্তু এ বর্ণনা বা মত গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওফাতের তারিখ হলো ১৩ হিজরীর ২২শে জমাদিউল আখির। পক্ষান্তরে ১৪ হিজরীর রজব মাসে দামেস্ক বিজয় হয়েছিলো।

দামেস্ক অবরোধকালে মুসলমানরা যে পরিস্থিতির মুকাবিলা করেছিলো তার কয়েকটি ঘটনার কথা বিভিন্ন ঐতিহাসিক ব্যাপকভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের বর্ণনায় ব্যাপক মতপার্থক্য রয়েছে এবং প্রকৃত অবস্থা কি ছিলো তা উদ্ঘাটন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ ধরনের বর্ণনার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

১-হিরাক্লিয়াস অবরুদ্ধ দামেস্কবাসীর সাহায্যার্থে একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু সামনে অগ্রসর হয়ে রাস্তা অবরোধ করেন এবং বাহিনীটিকে দামেস্ক পৌছতে বাধাদান করেন।

২-হিরাক্লিয়াস প্রেরিত সাহায্যকারী বাহিনীকে বাধাদানের জন্যে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত জিরার রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আযুরকে পাঁচ শ' সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। হযরত জিরার রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে পৌছে অবহিত হন যে, শত্রু বাহিনীর সংখ্যা (প্রায় ১০ হাজার) অনেক বেশী। হযরত জিরার রাদিয়াল্লাহ আনহু বাহাদুরীর আবেগে শত্রু বাহিনীর ওপর হামলা করে বসলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর ঘোড়া আঘাত প্রাপ্ত হলো এবং তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। রোমীয়রা তাঁকে এবং অন্য কতিপয় মুসলমানকে গ্রেফতার করলো।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত জিরার রাদিয়াল্লাহ আনহুর আটকের খবর পেয়ে মাইছারাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মাছরুককে এক হাজার সৈন্যসহ দামেস্কের পূর্ব দরযায় প্রেরণ করলেন এবং নিজের অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে হযরত জিরার রাদিয়াল্লাহ আনহু ও অন্য মুসলমানদেরকে রোমীয়দের পাঞ্জা থেকে মুক্ত করার জন্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তিনি বিদ্যুৎ বেগে অগ্রসর হয়ে রোমীয় সৈন্যদের মুখোমুখি হলেন। উভয় বাহিনী পরস্পরের সামনাসামনি তাঁবু ফেললো। ইত্যবসরে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু জানতে পারলেন যে, রোমীয় সেনাপতি মুসলমান কয়েদীদেরকে একশ' অশ্বারোহী হেফাজতে হিমসের দিকে রওয়ানা করে দিয়েছে। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু রাফে' বিন উমাইরাহ তায়ীকে একশ' অশ্বারোহীসহ হিমসের দিকে প্রেরণ করলেন। যাতে তাঁরা মুসলমান বন্দীদেরকে রোমীয়দের কাছ থেকে মুক্ত করে আনতে পারে। রাফে' রাদিয়াল্লাহ আনহু রোমীয়দের ধাওয়া করার জন্যে রওয়ানা দিলেন এবং খুব তাড়াতাড়ি তাদের মাথার ওপর গিয়ে উপস্থিত হলেন। রোমীয়রা প্রচণ্ড শক্তিতে বাধা দিলো। কিন্তু মুসলমানরা মুহূর্তের মধ্যে তাদেরকে খতম করে দিলো এবং হযরত জিরার রাদিয়াল্লাহ আনহু ও তার সাথীদেরকে সাথে নিয়ে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাহিনীর সাথে মিলিত হলেন। পরের দিন হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু রোমীয় বাহিনীর ওপর হামলা করে বসলেন এবং তাদেরকে পরাজিত করে পালিয়ে যেতে বাধ্য করলেন।

৩-হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু খবর পেলেন যে, রোমীয়দের বিরাট এক বাহিনী আজানাদাইনে একত্রিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত রয়েছে। তিনি সাময়িকভাবে দামেস্ক অবরোধ প্রত্যাহার করে নিলেন এবং আজনাদাইন পৌঁছে রোমীয়দের চরমভাবে পরাজিত করলেন। এ যুদ্ধে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুও অত্যন্ত বাহাদুরীর সাথে অংশ নিয়েছিলেন এবং প্রতিটি পর্যায়ে অন্যান্য অফিসারদেরকে যথাযথ হেদায়াত দিয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষে দ্বিতীয়বারের মতো তাঁরা দামেস্ক অবরোধ করে নেন।

৪-হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু জানতে পারলেন যে, হিরাক্লিয়াস দূররে নাজ্জার নামক একজনের রোমীয় জেনারেলের নেতৃত্বে বিরাট এক বাহিনী দামেস্কবাসীর সাহায্যে প্রেরণ করেছে এবং এ বাহিনী মারজুস সফর নামকস্থানে অবস্থান নিয়েছে। হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত ইয়াযিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহুকে সেখানে রেখে অবশিষ্ট সৈন্য সাথে নিয়ে শত্রুর দিকে অগ্রসর হলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুও তার সাথে ছিলেন। মারজুস সফরে উভয় বাহিনীর মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু রোমীয় বাহিনীর বামদিক

চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেললেন এবং হযরত মায়াজ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জাবাল ডানদিকের বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়লেন। এভাবে রোমীয়দের পরাজয় ঘটলো। মুসলমানরা বিজয়ীর বেশে ফিরে এসে পুনরায় দামেস্ক অবরোধ করলো।

এ ধরনের আরো কিছু ঘটনা বিভিন্ন কিতাবে পাওয়া যায়। এসব ঘটনা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু তা কখন ঘটেছিলো এবং তার ধারাবাহিকতাই বা কেমন ধরনের ছিলো তা বিশ্বস্ততার সাথে বলা কঠিন। প্রকৃতপক্ষে চার পাঁচ বছরে রোমীয় এবং মুসলমানদের মধ্যে এত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো যে, এসব ঘটনাবলী একাকার হয়ে গেছে। যা হোক, হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এসব যুদ্ধের বেশীর ভাগ অভিযানেই চরম বাহাদুরী প্রদর্শন করেছিলেন এবং বিপক্ষকে যুদ্ধের সাধ মিটিয়ে দিয়েছিলেন।

দামেস্ক বিজয়ের কারণে রোমীয়দের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনা দেখা দেয়। তারা জর্দানের বিসান শহরে একত্রিত হয়ে অত্যন্ত জোরেশোরে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। ইতিপূর্বে হিরাক্লিয়াস অবরুদ্ধ দামেস্কবাসীর সাহায্যে একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলো। কিন্তু সে বাহিনী দামেস্ক পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। এ বাহিনীও বিসান এসে উপস্থিত হলো। এভাবে ৪০-৫০ হাজার সৈন্য একত্রিত হলো। এ বাহিনীর সেনাপতি ছিলো সকলার নামক একজন রোমীয় অফিসার। হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু এ সৈন্য সমাবেশের খবর পেলেন এবং তিনি ও হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজেদের বাহিনীসহ জর্দানের দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁরা বিসানের সামনে ফাহল (PELLA) নামক স্থানে তাঁবু ফেললেন। রোমীয়রা মুসলমানদের সাহস, ধৈর্য ও স্থৈর্য দেখে সন্ধির ইচ্ছা প্রকাশ করলো। হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত মায়াজ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জাবালকে দূত হিসেবে প্রেরণ করলেন। রোমীয়রা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র এবং সৈন্যের সংখ্যাধিক্যের কথা বলে হযরত মায়াজ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ভীতবিহ্বল করতে চাইলো। কিন্তু হযরত মায়াজ রাদিয়াল্লাহ আনহু নির্ভিক চিত্তে বললেন, যদি ইসলাম গ্রহণ করো, তাহলে তোমরা আমাদের ভাই। যদি এ শর্ত মঞ্জুর না হয়, তাহলে তোমাদেরকে জিযিয়া দিতে হবে। আমরা তোমাদের হেফাজতের দায়িত্ব নেবো। যদি এ শর্ত না মানো, তাহলে তরবারীই সিদ্ধান্ত দেবে। তোমরা আমাদেরকে সংখ্যাধিক্যের ভয় দেখাও। তোমাদের সংখ্যা যদি আকাশের তারার সমানও হয়, তাহলেও কোনো পরওয়া নেই। আমাদের আল্লাহ বলেন, "কখনও অল্প সংখ্যকও বহু সংখ্যকের ওপর বিজয়ী হয়ে থাকে।"

মোটকথা সন্ধির শর্তে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলো না। হযরত মায়াজ রাদিয়াল্লাহ আনহু ফিরে এলেন। পরের দিন রোমীয়রা হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে দূত প্রেরণ করলো। দূত প্রস্তাব করলো যে, রোমীয়রা প্রতি মুসলমান সৈন্যকে দু' দিনার করে দেবে। এ দিনার পেয়ে তারা যেনো সে স্থান ছেড়ে চলে যায়।

হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং সৈন্যদেরকে প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। কিন্তু রোমীয়রা মুকাবিলায় অগ্রসর হলো না। দ্বিতীয় দিন হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে ময়দানে বের হলেন। রোমীয়রা নিজেদের বাহিনীকে তিন ভাগে ভাগ করলো এবং তাদেরকে পালাক্রমে ময়দানে প্রেরণ করলো। তাদের প্রথম দল হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর দিকে অগ্রসর হলে তিনি কায়েস রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন হাবিবাকে সামনে এগিয়ে তার মুকাবিলার ইঙ্গিত দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো। এ সময় রোমীয়দের দ্বিতীয় দল ময়দানে সমুপস্থিত হলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর নির্দেশে মাইছারাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মাছরুক তাদেরকে প্রতিরোধ করলেন। সাথে সাথে রোমীয় বাহিনীর বিরাট তৃতীয় অংশটি অগ্রসর হলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদের হামলা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ঠেকালেন। দীর্ঘক্ষণ ঘোরতর লড়াই হতে লাগলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদের দুর্বলতা আঁচ করতে পারলেন এবং নিজের বাহিনীকে আহ্বান জানিয়ে বললেন, রোমীয়রা নিজেদের শক্তি প্রয়োগ করে ফেলেছে। এখন তোমাদের পালা। তাঁর আহ্বান শুনে মুসলমানরা এত প্রচণ্ড শক্তিতে হামলা করলো যে, রোমীয়রা ভেগে নিজেদের তাঁবুর দিকে চলে গেলো। ততক্ষণে রাত হয়ে গেছে। এজন্য মুসলমানরা ফিরে এলো। পরবর্তী দিন উভয় পক্ষের মধ্যে পুনরায় প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু শত্রুর ডান দিক উৎখাত করে ফেললেন এবং তাদের এগারজন বড় বড় অফিসার হত্যা করলেন। কায়েস বিন হাবিবাহ রোমীয়দের বাম বাহিনীকে পরাজিত করলেন এবং হাশেম রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন উতবাহ যুদ্ধ করতে করতে শত্রুর মধ্যখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এখানে দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। এ যুদ্ধে সমগ্র ময়দানে খুনের নালা প্রবাহিত হতে লাগলো অবশেষে রোমীয়দের কদম থর থর করে কেঁপে উঠলো এবং মুসলমানরা লাভ করলেন বিরাট বিজয়। এ সংঘর্ষের পর জর্দানের অন্যান্য সব শহর খুব সহজেই বিজিত হলো।

এরপর ইসলামী বাহিনী হিমসের দিকে অগ্রসর হলো। হিমস ছিলো সিরিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। হিরাক্লিয়াস এ খবর পেয়ে এক বিরাট বাহিনী

দামেস্কের দিকে প্রেরণ করলো। মুসলমানদেরকে হিমস পর্যন্ত পৌছার সুযোগ না দেয়া এবং সম্ভব হলে দামেস্ক থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করে পুনর্দখল করার জন্যে এ বাহিনী প্রেরিত হয়েছিলো। তুজার নামক এক ব্যক্তি বাহিনীটির সেনাপতি ছিলো। সে দামেস্কের পশ্চিমে মারজুররুম নামক স্থানে তাঁবু ফেললো। হিরাক্লিয়াস আরো একটি বাহিনী তুজারের সাহায্যার্থে তার পেছনে প্রেরণ করলো। এ বাহিনীর সেনাপতি ছিলো সানাছ নামক এক রোমক। হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে তুজারের সাথে লড়াইয়ের জন্যে প্রেরণ করলেন এবং নিজে সানাছের বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্যে বের হলেন।

তুজার মারজুররুম থেকে দামেস্কের দিকে অগ্রসর হলো। এ সময় হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তার পেছনে অনুসরণ করলেন। দামেস্কের শাসক হযরত ইয়াযিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু যেই তুজারের অগ্রসর হওয়ার খবর পেলেন, অমনি নিজের বাহিনী সাথে নিয়ে তাকে প্রতিরোধ করার জন্যে অগ্রসর হলেন। দামেস্কের কাছে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। ইত্যবসরে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু পশ্চাত দিক থেকে তুজারের ওপর হামলা করে বসলেন। এভাবে দু'দিক থেকে ইসলামী বাহিনী রোমীয়দের ধ্বংস করে ফেললো। আঙ্গুলে গোনা কয়েকজন ছাড়া সকল রোমীয়ই যুদ্ধের ময়দানে লাশ হয়ে পড়ে রইলো। তাদের মধ্যে তুজারও ছিলো।

হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু মারজুররুমের কাছে সানাছকে বাধা দিলেন এবং তুমুল লড়াইয়ের পর তাকে পরাজিত করলেন। অসংখ্য রোমীয়দের সাথে সানাছ নিহত হলো। যারা বাঁচলো তারা পালিয়ে হিমসে গিয়ে আশ্রয় নিলো।

তুজার এবং সানাছকে পরাজিত করার পর হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু হিমসের দিকে অগ্রসর হলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের বাহিনীসহ আগে আগে ছিলেন। পথিমধ্যে বাকা' এবং বা'লাবাক শহর পড়লো। বাকা'বাসী কোনো বাধা ছাড়াই আনুগত্য কবুল করলো। অবশ্য বা'লাবাকের অধিবাসীরা মুকাবিলা করতে চাইলো। কিন্তু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদের ওপর এমন মরণ আঘাত হানলেন যে, তারা অবিলম্বে আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য হলো।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হিমস থেকে কয়েক মাইল দূরে ছিলেন। এ সময় রোমীয়দের বিরাট এক বাহিনী হিমস থেকে বের হয়ে তাদের মুখোমুখী হলো। কিন্তু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর প্রথম আঘাতেই

তাদের পদতল থেকে মাটি সরে গেলো এবং তারা পালিয়ে শহরে ঢুকে পড়লো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু মাইসারাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মাছরুকের নেতৃত্বে একটি দলকে সামনের দিকে অগ্রসর করালেন। পথিমধ্যে রোমীয়দের ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত দলের সাথে সংঘর্ষ হলো। এসব সংঘর্ষে মুসলমানরা বিজয়ী হলো এবং হিমসের একদম কাছে পৌছে গেলেন। হযরত মাইসারাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মাছরুকের পেছনে পেছনে হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুও হিমসের বাইরে এসে পৌছলেন। তাঁরা হিমসের বড় দরজা 'রাস্তান'-এর সামনে তাঁবু ফেললেন এবং শহরের চতুর্দিকে সৈন্য ছড়িয়ে দিলেন।

প্রথমে হিরাক্লিয়াস হিমসেই অবস্থান করছিলো। কিন্তু তুজার এবং সানাছ নিহত হওয়ার পর হিমস থেকে আরহা চলে গেলো। সেখান থেকে সে জাযিরাহবাসীকে হিমসবাসীদেরকে সাহায্যের নির্দেশ দিলেন। সুতরাং জাযিরাহ থেকে একটি বিরাট বাহিনী হিমসবাসীর সাহায্যে রওয়ানা হলো। কিন্তু ইরাকের অভিযানে নিযুক্ত হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি ওয়াক্কাস কিছু সৈন্য পাঠালেন। এ বাহিনী তাদের অগ্রগমনে বাধা দিলেন।

মুসলমানরা যখন হিমস অবরোধ করে রেখেছিলো তখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ছিলো। হিমসবাসীদের ধারণা ছিলো যে, আরবের লোক এ ঠাণ্ডা বরদাশত করতে পারবে না এবং খোলা ময়দানে তারা বেশীক্ষণ টিকতে পারবে না। কিন্তু তাদের ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হলো। মুসলমানরা অত্যন্ত দৃঢ়তার পরিচয় দিলেন এবং অত্যন্ত কঠোরতার সাথে অবরোধ অব্যাহত রাখলেন। অবশেষে রোমীয়রা হিম্মত হারিয়ে বসলো এবং সন্ধির আবেদন জানালো। একটি রাওয়ায়েতে এও বর্ণিত হয়েছে যে, মুসলমানরা আশ্রয়ের জন্য শহরের বিভিন্ন স্থান ধ্বংস করতে সফল হলেন। এতে রোমীয়রা ঘাবড়ে গিয়ে আনুগত্য স্বীকার করে নিলো এবং মুসলমানদের কাছে শহর ন্যস্ত করলো।

হিমস বিজয়ের পর হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু সেখানেই মুকিম হয়ে গেলেন। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস জর্দানে অবস্থান নিলেন এবং হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এক হাজার সৈন্যসহ দামেস্ক চলে গেলেন।

রোমীয়দের অব্যাহত পরাজয়ে হিরাক্লিয়াস অত্যন্ত বিচলিত হলো। সে সাম্রাজ্যের সকল শক্তি ব্যয় করে সিরিয়া থেকে আরবদেরকে বহিষ্কার করার সংকল্প নিলো। বস্তুত সে নিজের অধীনস্ত আরমেনীয়া, আলজাযিরাহ, কাসতান, তুনিয়া প্রভৃতি এলাকা থেকে সৈন্য তলব করলো। এসব সৈন্য ইন্তাকিয়াতে

একত্রিত হলো। এ বাহিনীতে বড় বড় অভিজ্ঞ সিপাহী এবং জেনারেল ছিলো। এমনকি সন্যাসব্রতে নিয়োজিত রাহিব এবং পাদরীরাও স্ব স্ব খানকাহ ও গির্জা পরিত্যাগ করে এ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলো। ধর্মের দোহাই দিয়ে রোমীয়দের মধ্যে আবেগ এবং উত্তেজনা সৃষ্টিই তাদের একমাত্র কাজ ছিলো। সেনাবাহিনীটি ইন্তাকিয়া থেকে যাত্রা করলো। এতে চারদিকে হৈ চৈ পড়ে গেলো। মুসলমানরা দু' লাখেরও বেশী যোদ্ধার এ বাহিনীর অগ্রযাত্রার খবর পেয়ে পরস্পর পরামর্শ বৈঠকে মিলিত হলেন। বৈঠকে সিরিয়ার বিজিত শহরগুলো থেকে সৈন্য হটিয়ে একস্থানে একত্রিত হয়ে রোমীয়দের মুকাবিলা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। সাথে সাথে খেলাফতের দরবার থেকে সাহায্য চাওয়ার সিদ্ধান্তও নেয়া হলো। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুসলমানরা হিমস, দামেস্ক প্রভৃতি শহর খালি করলো। এরপর তারা সেখানকার অধিবাসীদের কাছ থেকে আদায়কৃত জিযিয়ার সকল অর্থ এ বলে ফিরিয়ে দিলেন যে, এখন আর তারা তাদেরকে রক্ষা করতে পারছেন না। চুক্তি পালন এবং উদারতার এমন উদাহরণ বিশ্বের কোনো জাতির ইতিহাসে পাওয়া যায় না। মুসলমানদের এ চারিত্রিক গুণাবলীই চরম দুশমনের অন্তরও জয় করে রেখেছিলো। এ সুন্দর আচরণে সেসব শহরের খৃষ্টান এবং ইহুদীরা অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হয়েছিলো। তারা কেঁদে কেঁদে এ দোয়া করছিলো যে, আল্লাহ যেনো মুসলমানদেরকে শীঘ্র ফিরিয়ে আনেন।

সমগ্র ইসলামী সৈন্য সিরিয়ার শহরসমূহ থেকে বের হয়ে ইয়ারমুক উপত্যকায় রোমীয় বাহিনীর সামনাসামনি হলো। ইয়ারমুক নদী এবং জর্দান নদীর মিলনস্থল থেকে ৩০ মাইল উজানে ইয়ারমুক নদীর অর্ধবৃত্তের ঘূর্ণনে সৃষ্ট ময়দানে রোমীয় বাহিনীর তাঁবু স্থাপন করা হয়েছিলো। তার পশ্চাতদেশে ওয়াকুসার সংকীর্ণ ঘাঁটি ছিলো। সামনে ছিলো ওয়াকুসা উপত্যকা। পাশে ছিলো ইয়ারমুক নদী। এভাবে বাহিনী তিন দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত হয়ে গিয়েছিলো। ইসলামী বাহিনী সরাসরি তার সামনে এসে তাঁবু ফেলেছিলো। রোমীয়দের ধারণায় তারা নিজেদের তাঁবুর জন্যে উত্তম স্থান নির্বাচন করেছিলো। কিন্তু এ ধরনের স্থান বিজয়ের অবস্থায় উত্তম বলে বিবেচিত হতে পারে। পরাজয়ের অবস্থায় এ স্থান তাদের জন্যে ধ্বংসের কারণ হতে পারতো। কিন্তু তারা এটা চিন্তাও করতে পারেনি যে, সব ধরনের যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত এতবড় বাহিনী পরাজয়ের মুখও দেখতে পারে। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস রোমীয়দের অবস্থান স্থল দেখে চীৎকার দিয়ে উঠলেন ঃ "হে মানুষেরা ! সুসংবাদ। আল্লাহর কসম, রোমীয়রা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। আর অবরুদ্ধ বাহিনী কমই মুক্তি পায়।"

রণনীতি অনুসারে মুসলমানদের স্থাপিত তাঁবুর স্থান ছিলো উত্তম স্থান। সেখান থেকে তারা কেন্দ্রীয় খেলাফতের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম ছিলো ও যুদ্ধ সরঞ্জাম এবং রসদও খুব সহজে পৌঁছতে পারতো। পরাজিত অবস্থায় তারা মরুভূমির দিকে পিছপাও হতে পারতো। পক্ষান্তরে পরাজিত অবস্থায় রোমীয়দের আর কোনো আশ্রয়স্থল ছিলো না। দুই আড়াই লাখ রোমীয়দের মুকাবিলায় মুসলমানদের সংখ্যা সব মিলিয়ে ৪৬ হাজারের মতো ছিলো। কিন্তু তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিলো তুঙ্গে।

ইতিপূর্বে সিরিয়ার সকল যুদ্ধে মুসলমানরা রোমীয়দের পরাজিত করেছিলো। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যাধিক্য ও সাজ-সরঞ্জাম সত্ত্বেও রোমীয়রা যুদ্ধ যাতে না হয় তা অন্তর দিয়েই চেয়েছিলো। মুসলমানরা কিছু নিয়ে যদি ফিরে যায় তাতেও তারা সম্মত ছিলো। বস্তুত তাদের সেনাপতি বাহান অর্থকড়ি নিয়ে ফিরে যাওয়ার জন্যে মুসলমানদের কাছে প্রস্তাব পেশ করলো। কিন্তু মুসলমানরা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং যুদ্ধ অবধারিত হয়ে উঠলো। বিভিন্ন রাওয়ায়েত অনুযায়ী উভয় পক্ষ দু' তিন অথবা পাঁচ মাস পর্যন্ত মুখোমুখি হয়ে রইলো। এ সময় ছোটখাটো সংঘর্ষ হলো। কিন্তু বড় ধরনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। অবশেষে ১৫ হিজরীর জমাদিউল আখির অথবা রজব মাসে উভয় পক্ষ পূর্ণ শক্তিসহ একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের বাহিনীকে ৩৬ (অন্য রাওয়ায়েত অনুযায়ী ৩৮ অথবা ৪০) গ্রুপে বিভক্ত করলেন। এ বিভক্তির কারণ হলো যাতে শত্রুরা প্রকৃত সংখ্যা থেকে বেশী মনে করে। এসব গ্রুপের সরদার এমন ব্যক্তিবর্গ ছিলেন যারা বাহাদুরী এবং সাহসিকতায় প্রভূত খ্যাতি লাভ করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ হযরত কা'কা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আমর তামিমি, হাশিম রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন উতবাহ, জিরার রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আযুর, ইকরামাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি জেহেল, আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন খালিদ প্রমুখ। কেন্দ্রে ১৮টি গ্রুপ ছিলো এ সকল গ্রুপের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু। ডান দিকের ১০ গ্রুপের নেতৃত্ব হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস এবং হযরত শুরাহবিল রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন হাসানাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু দিচ্ছিলেন। আর বাম দিকের ১০ গ্রুপের অফিসার ছিলেন হযরত ইয়াযিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর কমাণ্ডে ছিলো যোগাযোগ বিষয়ক বাহিনী। এর সাথে যুদ্ধের পরিকল্পনা এবং সাধারণ তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও তাঁর হাতে ন্যস্ত ছিলো। হযরত মিকদাদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসওয়াদ সৈন্যদের অগ্রভাগে সূরা আনফাল তেলাওয়াত করেছিলেন। এবং হযরত আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু মুজাহিদদের সামনে

দাণ্ডায়মান হয়ে জিহাদের জোশ পুনরুজ্জীবিত করছিলেন। তিনি প্রতিটি গ্রুপের সম্মুখে যাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন ঃ

"তোমরা হলে আরবের সাহসী পুরুষ এবং ইসলামের সাহায্যকারী— তারা হলো রোমীয়দের সাহসী পুরুষ এবং শিরকের মদদগার।

"হে আল্লাহ ! আজকের দিন হলো যুদ্ধের দিন। হে আল্লাহ ! তোমার সাহায্য তোমার নিজের বান্দাদের ওপর নাযিল করো।"

সৈন্যদেরকে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করার উদ্দেশ্য বিভিন্নস্থান থেকে লড়াই করা ছিলো না। বরং হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদেরকে কেন্দ্র, ডান এবং বামের সরদারদের নির্দেশাবলী লাভ এবং সে মুতাবিক কাজ করাকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছিলেন।

ইসলামী বাহিনীতে এক হাজার সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে এক শ' সম্মানিত বদরী সাহাবী অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ব্যূহ রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। এমনি সময়ে একজনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো রোমীয়দের মুকাবিলায় আমাদের সংখ্যা অনেক কম। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন ঃ

"চুপ কর। জয়-পরাজয় সৈন্যের কম-বেশী হওয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। বরং আল্লাহর সাহায্যেই তা হয়। আল্লাহর কসম ! আমার ঘোড়ার ক্ষুর যদি ঠিক থাকতো তাহলে আমি রোমীয়দেরকে এ পরিমাণ সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করতে বলতাম।"

ব্যূহ রচনা শেষে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত কা'কা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আমর তামিমী ও হযরত ইকরামাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি জেহেলকে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে দুশমনের ওপর হামলার নির্দেশ দিলেন। তাঁরা দু'জন স্ব স্ব বাহিনীর সাথে যুদ্ধ গাথা পড়তে পড়তে শত্রুর ওপর ঝাপিয়ে পড়লেন এবং সেই সাথে ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। এ যুদ্ধ তিনদিন (অন্য রাওয়ায়েত অনুযায়ী কয়েকদিন) যাবত অব্যাহত রইলো। ঐতিহাসিকরা এ যুদ্ধের বর্ণনা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ধারাবাহিকতায় মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কোনো ঘটনা প্রথম দিনের যুদ্ধের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। অন্যরা আবার সেই একই ঘটনা দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিনের ঘটনাবলীতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কয়েকটি বিশেষ ঘটনার বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

১। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু একদিন শুধুমাত্র ৬০জনের একটি অশ্বারোহী বাহিনী তৈরি করলেন এবং রোমীয় বাহিনীর ৬০ হাজার আরব

খৃষ্টান সৈন্যের ওপর এমনভাবে হামলা করে বসলেন যে, একবার এক অংশে এবং অন্যবার অন্য অংশে হামলা করতে থাকলেন। এভাবে তিনি সন্ধ্যা পর্যন্ত শত্রুকে ব্যস্ত রাখলেন এবং নিজের বড় বাহিনীর দিকে অগ্রসর হওয়া থেকে তাদেরকে বিরত রাখলেন। এ অপূর্ব এবং আশ্চর্যজনক যুদ্ধে শত্রুর হাজার হাজার সৈন্য নিহত হলো। পক্ষান্তরে মুসলমানদের মাত্র ১০ ব্যক্তি শহীদ এবং পাঁচজন শত্রুর হাতে বন্দী হলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু পরের দিন তাদেরকে মুক্ত করে আনলেন।

২। রোমীয়দের আবেগ এবং উদ্দীপনাও চরম পর্যায়ে এসে পৌছে ছিলো। তাদের ৩০ হাজার মানুষ পায়ে শৃংখল লাগিয়ে রেখেছিলো। যাতে তারা পেছনে হটা অথবা পালানোর ধারণাও করতে না পারে। হাজার হাজার পাদরী হাতে ক্রুশ নিয়ে অগ্রভাগে উপস্থিত থেকে স্ব বাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করছিলো।

৩। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু নির্দেশ জারী করলেন। নির্দেশে সকল অফিসারকে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদের নির্দেশ মেনে চলার কথা বলা হলো। অতপর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু সকল সৈন্য পরিদর্শন করলেন। তিনি যে পতাকার কাছেই পৌছতেন সেই বাহিনীর জওয়ানদের উদ্দেশ্যে এ ভাষণ দিতেন ঃ

"হে মুসলমানগণ ! অটলতার মাধ্যমেই বিজয় লাভ সম্ভব। দুর্বলতার পরিণাম হলো চিরকালীন বরবাদী। ভালোভাবে বুঝে নাও, স্থির চিত্ততা এবং অটলতার সাথে যারা কাজ করবে তারাই বিজয়ী হবে। দুর্বলতা তাদেরই পেয়ে বসে যারা বাতিলের পূজারী। হকের ঝাণ্ডাবাহীরা কখনো দুর্বলতা প্রদর্শন করে না। কেননা তারা আল্লাহর ওপর ভরসা করে থাকে। তারা আল্লাহর সীমাসমূহ হেফাজত করে এবং তার রাস্তায়ই লড়াই করে। তাদের পূর্ণ আস্থা বা ইয়াকীন থাকে যে, শহীদ হয়ে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবে।"

৪। প্রথম দিন জনৈক রোমক নিজের ব্যূহ থেকে বের হয়ে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের আহ্বান জানালো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু কায়েস রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন হাবিরাহকে তার মুকাবিলায় যাওয়ার ইঙ্গিত দিলেন। কায়েস রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন হাবিরাহ সম্মুখে অগ্রসর হয়ে এক আঘাতেই সেই রোমককে লাশ বানিয়ে ফেললেন। মুসলমানরা নারায়ে তাকবির ধ্বনি উচ্চারণ করলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, শুরুটা শুভ হয়েছে। এখন বিজয় বাকী।

৫। রোমক সেনাপতি বাহান জর্জাহ (জর্জ) নামক এক দূত হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে প্রেরণ করলো। এ দূত মুসলমানদের কোনো

সম্মানিত অফিসারকে সন্ধির আলাপ-আলোচনার জন্যে তাদের কাছে প্রেরণের বাণী নিয়ে এসেছিলো। জর্জাহ যখন ইসলামী বাহিনীতে পৌছলো তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছিলো। কিছুক্ষণ পরই মাগরিবের নামায শুরু হলো। মুসলমানদের জামায়াতের সাথে নামাযের অন্তস্পর্শী দৃশ্য জর্জাহর অন্তর ঈমানের আলোয় অত্যুজ্জ্বল করে ফেলেছিলো। মুসলমানরা নামায থেকে ফারেগ হলে জর্জাহ হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহুর খিদমতে হাজির হয়ে কতিপয় প্রশ্ন করলো। এসব প্রশ্নের মধ্যে মুসলমানরা হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে তাও ছিলো। হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, আল্লাহর সে ইরশাদের প্রতিই আমরা আস্থা স্থাপন করেছি ঃ

"হে আহলে কিতাব ! নিজের দীন এবং আল্লাহর ব্যাপারে অতিরঞ্জন করো না। যা কিছু বলো, সত্য বলো। ঈসা আলাহিস সালাম বিন মরিয়ম আলাহিস সালাম শুধুমাত্র আল্লাহর রাসূল এবং তার বাণী যা তিনি মরিয়ম আলাইহিস সালামের ওপর অবতীর্ণ করেছেন ও তার তরফ থেকে এক আত্মা। সুতরাং আল্লাহ এবং তার রাসূলের ওপর ঈমান আন ও তিন খোদা বলো না। তিন খোদা বলা পরিত্যাগের মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আল্লাহ একক মা'বুদ। সন্তান হওয়ার কথা থেকে তিনি পবিত্র। আসমান এবং যমীনে যাকিছু আছে সবই তার। মসীহ খোদার বান্দাহ হওয়ার ব্যাপারে লজ্জা অনুভব করেন না এবং নিকটবর্তী ফেরেশতারাও নয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর বন্দেগীতে লজ্জা অনুভব করে এবং অহমিকার সাথে কাজ করে তাহলে মানুষেরা যেনো শুনে নেয় যে, আল্লাহ তাদের সবাইকেই নিজের কাছে একত্রিত করবেন।"

জর্জাহ হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহুর জবাব শুনে নির্দ্বিধায় বলে উঠলো, নিসন্দেহে এসব গুণই হযরত ঈসা (আ)-এর এবং অবশ্যই তোমাদের পয়গাম্বর সত্যবাদী। একথা বলেই সে কালেমায়ে তাওহীদ পাঠ করলো এবং মুসলমান হয়ে গেলো। তিনি নিজের জাতির কাছে আর ফিরে যেতে চাইলেন না। রোমকরা যাতে চুক্তিভঙ্গের ধারণার বশবর্তী হতে না পারে সে জন্যে হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু তাকে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন এবং বললেন, আগামীকাল যে দূত এখান থেকে যাবেন তার সাথে তুমি চলে এসো।–(আল ফারুক শিবলী নোমানী)

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান খান শিরওয়ানী (র) (নওয়াব ছদর ইয়ার জঙ্গ) নিজের কিতাব "সিরাতুস সিদ্দিকে" এ ঘটনাকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন.। তিনি লিখেছেন ঃ

"যুদ্ধের সময় রোমক সরদার জর্জাহ বিন তুজার ময়দানে এসে উচ্চস্বরে আহ্বান জানিয়ে বললো, খালিদ আমার সামনে আসুন। হযরত খালিদ

রাদিয়াল্লাহ আনহু অগ্রসর হয়ে উভয় বাহিনীর মধ্যে জর্জাহর সাথে মিলিত হলেন। প্রথমে উভয়েই একে অপরকে আশ্রয় দিলো। অতপর এমনভাবে দাঁড়ালেন যে, এক ঘোড়া অপর ঘোড়ার সাথে মিশে গেলো।

জর্জাহ ঃ খালিদ ! সত্য কথা বলবে। মিথ্যা বলবে না। স্বাধীন মানুষ মিথ্যা বলে না। ধোঁকা দেবে না। ধোঁকা শরীফদের রীতি নয়। আমি একথা জিজ্ঞেস করছি যে, আল্লাহ তোমাদের নবীর কাছে আসমান থেকে তলোয়ার প্রেরণ করেছিলেন। সে তলোয়ার তুমি পেয়েছো। তার প্রভাবেই তুমি সর্বত্র বিজয়ী হয়ে থাকো।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ঃ না।

জর্জাহ ঃ তাহলে, তোমার উপাধি সাইফুল্লাহ কেন ?

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ঃ আল্লাহ পাক আমাদের কাছে নিজের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেরণ করেছিলেন। তিনি আমাদের সামনে ইসলাম পেশ করেছিলেন। প্রথমতঃ আমরা সবাই ভেগে এক প্রান্তে উপনীত হয়েছিলাম। কতিপয় ব্যক্তি নবীর কথায় আস্থাস্থাপন করে আনুগত্য করেন। কেউ কেউ দূরে দূরে থেকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে থাকে। আমিও মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের মধ্যে ছিলাম। অতপর আল্লাহ পাক আমাদের অন্তর ফিরিয়ে দিলেন। মাথানত এবং হেদায়াত দান করলেন। আমিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য কবুল করলাম। এ সময় এরশাদ হলো ঃ

"হে খালিদ ! তুমি আল্লাহর তরবারীসমূহের মধ্যে অন্যতম। আর সেই তরবারীকে মুশরিকদের মুকাবিলায় খাপ থেকে বের করা হয়েছে।" ফলতঃ সকল মুসলমান থেকে আমি মুশরিকদের বড় দুশমন।

জর্জাহ ঃ তুমি সত্য বলেছ। এখন বলো, ইসলামের দাওয়াত কি ?

হযরত খালিদ ঃ এ বস্তুর বিশ্বাস যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বান্দাহ ও রাসূল। আর সেই পয়গামের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন, যা তিনি খোদার কাছ থেকে এনেছেন।

জর্জাহ ঃ যদি কেউ তা না মানে।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ঃ জিযিয়া দেবে।

জর্জাহ ঃ এও যদি গ্রহণ না করে।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ঃ আমরা যুদ্ধের ঘোষণা দেব।

জর্জাহ ঃ তোমাদের অন্তর্ভুক্তদের মর্যাদা কি ?

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ঃ আল্লাহর ফরমান হলো, সব মুসলমান মর্যাদার দিক দিয়ে সমান। ছোট হোক বা বড় হোক প্রথম হোক বা শেষ হোক।

জর্জাহ ঃ কেউ আজ ঈমান আনলেও কি মর্যাদায় সমান হবে ?

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ঃ সমান বরং আফজাল বা বেশী মর্যাদাবান হবে।

জর্জাহ ঃ এটা কেমন করে ?

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ঃ আমাদের ইসলাম গ্রহণকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিত ছিলেন। অহী নাযিলের ধারা অব্যাহত ছিলো। তিনি আসমানী নির্দেশের খবর দিতেন। আমরা মুজিযাসমূহ প্রত্যক্ষ করতাম। সে অবস্থায় মুসলমান হওয়াটা আমাদের জরুরী ছিলো। এখন তোমরা সেসব বস্তু দেখতে পাও না। তারপরও তোমরা ঈমান এনে থাকো। এজন্যে তোমরা আমাদের চেয়ে বেশী মর্যাদাবান।

জর্জাহ ঃ তুমি কসম দিয়ে বলছো যে, যাকিছু বলেছো তা সম্পূর্ণ সত্য। ধোঁকা দাওনি। বা মনতুষ্টির জন্য একথা বলোনি।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ঃ আল্লাহর কসম ! আমি মিথ্যাও বলিনি। তোমার প্রতি অথবা তোমাদের কারও প্রতি আমার ঘৃণা বা বিদ্বেষও নেই। যা তুমি জিজ্ঞেস করেছো তার সত্য জবাব আমি দিয়েছি। আল্লাহ আমার সাহায্যকারী।

জর্জাহ ঃ অবশ্যই তুমি সত্য বলেছো।

একথা বলেই সে নিজের ঢাল পেছনে ফেলে দিলো এবং তাকে ইসলামের তালকীন দানের কথা বললো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে নিজের তাঁবুতে নিয়ে গেলেন। প্রথমতঃ গোসল করালেন। অতপর ইসলামের তালকীন বা শিক্ষাদানের পর জর্জাহকে মুক্তাদী বানিয়ে দু' রাকাআত নামায আদায় করলেন। জর্জার এ অবস্থা দেখে রোমকরা সাধারণ আক্রমণ শুরু করে দিলো। সে সময় হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু জর্জাহকে নিয়ে তাঁবু থেকে বের হলেন তখন রোমকরা মুসলমানদের ব্যূহে ঢুকে পড়েছিলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু উচ্চস্বরে আহ্বান জানালেন। ফলে মুসলমানরা বাহাদুরীর সাথে হামলা করে দুশমনকে পিছনে হটিয়ে দিলো।

অতপর সাইফুল্লাহ আক্রমণ করলেন এবং তরবারীর পরীক্ষা শুরু হলো। সূর্যদয় হতে দ্বিপ্রহরের সময় অর্থাৎ চাশ্‌ত থেকে সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত যুদ্ধের

ময়দান একাধারে উত্তপ্ত রইলো। এমনকি আসরের নামায ইশারায় আদায় করা হলো। এটা দর্শনীয় ব্যাপার ছিলো যে, যে জর্জাহ সকালে মুসলমানদের দুশমন ছিলো সে জর্জাহ এখন হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর পাশে দাঁড়িয়ে ঈমানের পূর্ণ দীপ্তিতে বলীয়ান হয়ে রোমকদের ওপর তরবারীর আঘাত হেনে চলেছিলেন। আর তিনি কত বড় ভাগ্যবান যে, সংঘর্ষে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর মাত্র দু' রাকাআত নামায পড়ে রক্তাক্ত অবস্থায় আল্লাহর সান্নিধ্যে হাজির হয়েছিলেন।

৬। জর্জাহর দূতগিরির জবাবে পরবর্তী দিন হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে দূত বানিয়ে বাহানের কাছে প্রেরণ করলেন। বাহান নিজের শান-শাওকাত এবং সেনাধিক্য ও শক্তি প্রদর্শনের বিশেষ ব্যবস্থা নিলো। রাস্তার দু' ধারে পদাতিক বাহিনীর দশ দশটি ব্যূহ ছিলো। তাদের পিছনে অশ্বারোহীদের সুদীর্ঘ কাতার খাড়া করা হলো। স্বসৈন্য যিরাহসহ সম্পূর্ণ সশস্ত্র ছিলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওপর এ প্রদর্শনীর কোনো প্রভাব পড়লো না। তিনি রোমকদের মধ্য দিয়ে এমনভাবে অতিক্রম করলেন, যেমন ভেড়া ও বকরীর পালের মধ্য দিয়ে বাঘ অতিক্রম করে। বাহানের তাবুর কাছে পৌঁছলে সে উষ্ণ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলো এবং তাঁবুতে নিয়ে নিজের বরাবর বসালো। দোভাষীর মাধ্যমে প্রথমে কিছু আনুষ্ঠানিক কথাবার্তা হলো। অতপর বাহান হযরত ঈসা (আ)-এর প্রশংসা দিয়ে বক্তৃতা শুরু করলো এবং বললো ঃ

"আমাদের বাদশাহ সকল বাদশার শাহানশাহ এবং আমাদের জাতি বিশ্বের সকল জাতি থেকে উত্তম।"

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বাধা দিয়ে বললেন ঃ

"তোমাদের বাদশাহকে যা ইচ্ছে তাই মনে করো। কিন্তু আমরা যাকে নেতা বানিয়েছি সে যদি অন্তরে এক মুহূর্তের জন্যেও বাদশাহীর খেয়াল করে, তাহলে তৎক্ষণাৎ তাকে বরখাস্ত করে থাকি।"

বাহান পুনরায় বক্তৃতা শুরু করলো এবং স্বদেশের সচ্ছলতা ও অঢেল সম্পদের উল্লেখ করে বললো ঃ "আরববাসী স্বাধীনভাবে এ দেশে গমনাগমন করতো। তাদের মধ্য থেকে যারা এখানে বসতিস্থাপন করেছে তাদের সাথে আমরা সুন্দর ব্যবহার করেছি। কিন্তু তোমরা আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে এ দেশের ওপর চড়াও হয়ে বসেছো। তোমাদের জানা নেই যে, তোমাদের পূর্বেও আরো কয়েকটি জাতি এ দেশ জয় করতে চেয়েছিলো। কিন্তু সবাই উচিত শিক্ষা পেয়ে গেছে। এরপর তোমাদের মত জাহেল, বন্য

এবং সরঞ্জামহীন দুর্ভিক্ষ পীড়িত জাতি কি করে আর এ দেশ জয় করবে। সম্ভবতঃ তোমরা দারিদ্রের কারণে বাধ্য হয়ে এ দেশে প্রবেশ করেছো। তোমাদের সাহসের বলিহারি। তবে, তোমাদেরকে আমরা ক্ষমা করে দিচ্ছি এবং প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, যদি তোমরা আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাও তাহলে আমরা তোমাদের সেনাপতিকে ১০ হাজার, প্রত্যেক অফিসারকে ১ হাজার এবং প্রতিটি সিপাহীকে একশ দিনার করে দেয়ার ব্যবস্থা করবো।"

বাহান বক্তৃতা শেষ করলে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হামদ ও নাতের পর বললেন ঃ

"তুমি স্বজাতির অঢেল সম্পদ ও শান-শাওকাতের যে বর্ণনা দিয়েছো তা আমরা জানি। তোমরা নিজের প্রতিবেশী আরবদের সাথে যে ব্যবহার করেছো তাও আমরা অবহিত আছি। কিন্তু এটা তোমাদের কোনো ইহসান ছিলো না। বরং এটা তোমরা করেছো তোমাদের সাম্রাজ্য এবং ধর্ম বিস্তারের জন্যে। তারই ফলশ্রুতিতে তাদের বহু লোক খৃষ্টান হয়ে গেছে। আর আজ তারা তোমাদের সাথে একত্রিত হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে লড়ছে।

এটা ঠিক যে, আমরা অত্যন্ত দরিদ্র, অক্ষম এবং বেদুঈন ছিলাম। আমাদের অজ্ঞতা এতদূর গড়িয়েছিলো যে, শক্তিশালী মাত্রই দুর্বলদেরকে চিবিয়ে খেত। গোত্রসমূহ পরস্পরের সাথে লড়াই করে ধ্বংস হয়ে যেতো। আমরা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে অনেক মাবুদ বানিয়ে নিয়েছিলাম। স্বহস্তে মূর্তি তৈরি করতাম। আল্লাহ আমাদের ওপর রহম করেছেন এবং এক পয়গাম্বর প্রেরণ করেছেন। তিনি আমাদের জাতিরই মানুষ। তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী শরীফ, সবচেয়ে বেশী উদার এবং সবচেয়ে বেশী পূতপবিত্র ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তিনি আমাদেরকে একক খোদার দিকে ডাকলেন এবং শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদাতের শিক্ষা দিলেন। কাউকে তার অংশীদার বানাতে নিষেধ করলেন এবং মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করতে বললেন। সে আল্লাহর স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি নেই। তিনি আমাদেরকে এ নির্দেশও দিয়েছেন যে, আমরা তাঁর আনীত দ্বীনকে দুনিয়াতে প্রসারিত করবো। যে এ দীন মেনে নেবে সে আমাদের ভাই। যারা দীনে প্রবেশ করেনি তবে জিযিয়া প্রদান কবুল করেছে, আমরা তাদের হেফাজতের জিম্মাদার। যারা উভয়টিই অস্বীকার করবে, তারা যেনো এটা বুঝে নেয় যে, তারা এমন সব লোকের সম্মুখীন হয়েছে, যারা মৃত্যুকে জীবনের মত ভালোবাসে। সাম্রাজ্য আল্লাহর। যাকে ইচ্ছা দান করেন। কিন্তু এটা বুঝে নাও যে, যারা আল্লাহকে ভয় করে তারাই পরিণামে সফল হবে।"

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর বক্তৃতা শুনে বাহান বললো ঃ

"আমাদের মধ্যে কেউই তোমাদের দীন কবুল করবে না এবং জিযিয়া দানেও অগ্রসর হবে না। আমরা জিযিয়া নেই, দেই না।

মোটকথা, সন্ধির আলোচনা ব্যর্থ হয়ে গেলো এবং হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের বাহিনীতে চলে এলেন।

৭। একবার রোমকরা মুসলমানদের দক্ষিণ দিকে এমন প্রচণ্ড আঘাত হানলো যে, তারা সৈন্য বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অত্যন্ত বিশৃংখল অবস্থায় পিছু হটতে লাগলো। এমনকি পিছুতে পিছুতে তারা মহিলাদের তাঁবুর কাছে পৌছলো। মহিলারা নিজেদের পুরুষদের পেছনে হটতে দেখে ক্রোধে ফেটে পড়লো। ইসলামের এসব মহিলারা তাঁবুর খুঁটি উপড়ে ফেললো এবং যারা পেছনে হটে আসছিলো তাদেরকে উচ্চস্বরে ডেকে বললো, তোমরা যদি এদিকে আসো, তাহলে এ খুঁটি দিয়ে তোমাদের মাথা ফাটিয়ে দেবো।

কিছু মহিলা সেই খুঁটিসহ রোমকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং অনেক রোমকের ভবলীলা সাঙ্গ করে ফেললো। মহিলাদের ঈমানী জোশ দেখে পিছনে হটনেওয়ালা মুজাহিদদের কদম স্থির হয়ে গেলো এবং তারা অত্যন্ত উদ্দীপনার সাথে যুদ্ধ করতে লাগলো। ঠিক সেই সময় হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে এসে এমন প্রচণ্ড হামলা করলেন যে, রোকমদের কয়েকটি কাতার খতম হয়ে গেলো। কিন্তু তাদের চাপ কোনোমতেই কম ছিলো না। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ইসলামী বাহিনীর দক্ষিণ দিকে গিয়ে পৌছলেন এবং নতুন করে ঢেলে সাজালেন। অতপর মুসলমানদেরকে উচ্চস্বরে বললেন ঃ "হে মুসলমানরা ! শত্রুর উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং বাহাদুরী তোমরা দেখেছো। এখন পুরো শক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো। আল্লাহ তোমাদেরকে কামিয়াব এবং সফল করবেন।"

হযরত খালিদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুসলমানরা অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলেন। হযরত ইকরামা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি জেহেল একা একা নিজের ঘোড়াকে অগ্রসর করলেন এবং রোমকদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "হে রোকমরা ! কোনো এক সময় (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। আজ তোমাদের সামনে থেকে পিছু হটে যাবো ? আল্লাহর কসম ! কখনো তা হবে না।"—একথা বলে নিজের বাহিনীর দিকে তাকালেন এবং বললেন ঃ "এসো ! কে আমার হাতে মৃত্যুর বাইয়াত করবে।"

তাঁর আহ্বানে চারশ জানবাজ সামনে অগ্রসর হলেন এবং তার হাতে মৃত্যুর বাইয়াত করলেন। তারপর এসব জীবন উৎসর্গকারী হযরত খালিদ

রাদিয়াল্লাহ আনহুর তাঁবুর সামনে অকুতোভয়ে লড়াই শুরু করলেন। এমন কি তাঁরা একে একে সবাই শহীদ হয়ে গেলেন। হযরত ইকরামার দেহ শহীদের স্তুপের মধ্যে পাওয়া গেলো। তখনো জীবনের স্পন্দন অবশিষ্ট ছিলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর মাথা নিজের উরুর ওপর রাখলেন এবং হলকে পানি দিয়ে বললেন ঃ

"খোদার কসম ! ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর ধারণা ভুল ছিলো। তাঁর আরণা ছিলো যে, আমরা বনু মাখজুম শাহাদাত থেকে বঞ্চিত থাকবো।"

মোটকথা হযরত ইকরামা রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং তাঁর সাথী শহীদ হয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি রোমকদের হাজার হাজার লোক হত্যাও করেছিলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর প্রচণ্ড হামলায় তাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো এবং পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদের সেনাপতিকে ধাওয়া করতে করতে দূররে নাজ্জার পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু যখন তার কাছে পৌঁছেন তখন সে বলছিলো ঃ

"আমার চক্ষু ও মাথার ওপর কাপড় মুড়িয়ে দাও। হায় ! আমি যেনো মুসলমানদেরকে অগ্রসর হতে না দেখি।" শেষ পর্যন্ত দূররে নাজ্জার মুসলমানদের অবরোধে নিপতিত হলো এবং সে মারা গেলো।

সংক্ষিপ্ত কথা হলো, উভয় পক্ষের মধ্যে তিন দিন অব্যাহতভাবে ঘোরতর লড়াই হতে লাগলো। তৃতীয় দিনে রোমকরা বার বার হামলা চালালো। কিন্তু মুসলমানরা অটলতার পরিচয় দিলেন। প্রতিটি হামলা তারা বাহাদুরীর সাথে মুকাবিলা করলেন। অবশেষে তারা তরবারীর খাপ দূরে নিক্ষেপ করলেন। নিযাহ সিধা করে আপাদমস্তক শত্রুর ব্যূহে ঢুকে পড়লেন এবং এমন প্রচণ্ড হামলা চালালেন যে, শত্রুর কদম টলটলায়মান হয়ে উঠলো। ঠিক এমনি সময় হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু কর্তৃক ময়দানের বাম পাশে নিয়োজিত হযরত হাবিরাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু পশ্চাত দিক থেকে রোমকদের ওপর বিদ্যুৎ বেগে হামলা করে বসলো। সাথে সাথে হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন যায়েদ সেনাবাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু থেকে বের হয়ে রোমকদের ওপর আপতিত হলেন। এসব হামলায় রোমকরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো। তাদের প্রায় অর্ধেক সৈন্য নিহত অথবা আহত হলো এবং অবশিষ্টরা পালিয়ে গেলো। এমনিভাবে মুসলমানদের বিরাট বিজয় ঘটলো। এটা ছিলো সিরিয়ায় সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ। এরপর রোমকরা এ সংখ্যায় আর কোনোদিন একত্রিত হতে পারেনি। ইন্তাকিয়ায় অবস্থানরত হিরাক্লিয়াস পরাজয়ের সংবাদ পেলেন। পরাজয়ের খবরে তার মুখ দিয়ে অযাচিত বেরিয়ে এলো ঃ "বিদায় ! হে, সিরিয়া !"

এরপর বাস্তবিকই সিরিয়া ছেড়ে সে কাসতানতুনিয়ার দিকে চলে গেলো।

ইয়ারমুক বিজয়ের পর হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে 'কানসারিন' বিজয়ের জন্য প্রেরণ করলেন। পথিমধ্যে 'হাজির' নামক স্থানে এক প্রখ্যাত রোমক জেনারেল মিনাস বিরাট বাহিনীসহ হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বাধা দিলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাকে পরাজিত করলেন এবং সেখান থেকে কানসারিনের দিকে অগ্রসর হলেন। কানসারিনবাসী কয়েকদিন দুর্গ বন্ধ করে বাধা দিতে থাকলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদের কাছে পয়গাম পাঠালেন ঃ

"তোমরা যদি মেঘমালার মধ্যে গিয়েও লুকোও, তাহলে আল্লাহ পাক আমাদেরকে উঠিয়ে নিয়ে তোমাদের কাছে পৌছে দেবেন অথবা তোমাদেরকে আমাদের কাছে নিক্ষেপ করবেন।"

এ পয়গাম পেয়ে অবরুদ্ধরা হিম্মত হারিয়ে ফেললো এবং সন্ধির দরখাস্ত করলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু শহরের প্রাচীর ধ্বংস করার শর্তে সন্ধি মঞ্জুর করলেন।

কানসারিনের পর মুসলমানরা হালব, ইন্তাকিয়া, মামবাজ, মারয়াশ, হাছান, হারছ এবং অন্যান্য অনেক স্থান খুব সহজেই জয় করলেন। এসব স্থানের মধ্যে মারয়াশ হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর হাতে জয় হয়।

অতপর মুসলমানরা বায়তুল মুকাদ্দাসের (জেরুজালেম) দিকে রওয়ানা হলো এবং তা অবরোধ করলো। খৃষ্টানরা সাধারণভাবে বাধা দিলো এবং মুসলমানদের খলীফা স্বয়ং এসে সন্ধিনামায় স্বাক্ষর করবেন এ শর্তে সন্ধি করতে রাজি হলো। হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুকে চিঠি লিখলেন। বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় তাঁর আগমনের ওপর নির্ভর করছে বলে তিনি চিঠিতে জানালেন। বাইতুল মুকাদ্দাস খৃষ্টানদের দীনি কা'বা ছিলো। আর মুসলমানদের কাছে কেবলমাত্র প্রথম কিবলা হওয়ার জন্যেই নয়, বরং বনি ইসরাঈলের নবীদের কিবলা এবং বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ স্থান থেকেই মিরাজের সফরের দ্বিতীয় মনযিলের যাত্রা শুরু করার কারণে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ স্থান ছিলো। বস্তুত হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু সেখানে তাশরীফ নিলেই খুন-খারাবী ছাড়াই এ পবিত্র শহর মুসলমানদের হস্তগত হওয়ার কথায় তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস গমনে আগ্রহী হলেন। ১৬ হিজরীর রজব মাসে কতিপয় মুহাজির ও আনসারসহ তিনি মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন। জাবিয়াহ পৌছলেই হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন

ওয়ালিদ, হযরত ইয়াজিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং সেনাবাহিনীর অন্যান্য অফিসার তাঁকে স্বাগতঃ জানালেন। তাঁরা রেশমের অত্যন্ত মূল্যবান কুবা পরিধান করেছিলেন। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদের এ বেশভূষা দেখে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন এবং মাটি থেকে পাথর উঠিয়ে নিক্ষেপ করতে করতে বললেন ঃ

"তোমাদের কি হয়েছে ! তোমরা এ আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক পরে আমাকে স্বাগত জানাতে এসেছ ? দু' বছরের মধ্যেই তোমরা সাদাসিধে জীবন পরিত্যাগ করে আজমী বেশভূষা অবলম্বন করে ফেলেছ ?

তাঁরা আরজ করলেন ঃ

"আমীরুল মু'মিনীন ! আমরা আমাদের সিপাহী সুলভ আচরণ পরিত্যাগ করিনি। এ কুবার নীচে আমাদের হাতিয়ারসমূহ মওজুদ রয়েছে।"

একথা শুনে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন ঃ তাহলে ক্ষতির কোনো কারণ নেই। এরপর তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসে তাশরীফ নিলেন এবং সন্ধিনামা লিখে খৃষ্টানদের হাওলা করে দিলেন। তারা হৃষ্টচিত্তে মুসলমানদের হাতে শহর অর্পণ করলো।

১৭ হিজরীর প্রথম দিকে রোমের কায়সার দ্বিতীয়বার হিমসের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালায়। যাজিরাবাসীই তাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। তারা কায়সারকে লিখেছিলো, আপনি হিমসে সৈন্য প্রেরণ করুন। আমরা আপনাকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত রয়েছি। তাদের কথায় কায়সার এক বিরাট বাহিনী হিমসের দিকে প্রেরণ করলেন। এদিকে যাজিরাবাসীও ৩০ হাজার সৈন্যসহ হিমসের দিকে অগ্রসর হলো। হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহুও এদিক ওদিক থেকে যত সৈন্য সংগ্রহ করতে পারলেন, তা নিয়ে হিমসের বাইরে অবস্থান নিলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু সে সময় কানসারিন ছিলেন। তিনিও তাঁর কাছে পৌছে গেলেন। হযরত আবু ওবায়দাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু পরিস্থিতির চিত্র হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুকে অবহিত করলেন। খবর পেয়ে তিনি সর্বস্থানে দূত প্রেরণ করলেন এবং বলে পাঠালেন যেসব স্থান থেকে সৈন্যের একটি অংশ সাহায্যের জন্যে পৌছবে। হযরত সোহায়েল বিন আদি রাদিয়াল্লাহ আনহুর প্রতি নির্দেশ দেয়া হলো যে, সে যেনো যাজিরাহ পৌছে যাজিরাবাসীকে হিমসের দিকে অগ্রসর হওয়া থেকে বাধা প্রদান করে। সাথে সাথে ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন উকবাহকে যাজিরা পৌছে সেখানে বসবাসরত আরব গোত্রসমূহকে বিরত রাখার কাজে নিয়োগ করা হলো। হযরত সোহায়েল রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং ওয়ালিদ

রাদিয়াল্লাহ আনহু যাজিরার দিকে অগ্রসর হলেন। এ সময় যাজিরাবাসী অবরোধের দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলো এবং হিমসের আশা পরিত্যাগ করে ফিরে গেলো। রোমকদের সাহায্যার্থে আগত আরব গোত্রসমূহও লজ্জিত হলো। তারা গোপনে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে পয়গাম প্রেরণ করে জানতে চাইলো যে, তারা এখনই রোমকদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে, না যুদ্ধের সময় তাদের পরিত্যাগ করবে। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু জবাবে জানালেন যে, তিনি তাদের অবস্থান করা অথবা রোমকদের পরিত্যাগ করা কোনোটাই পরোয়া করেন না। তবে, যদি তারা সত্যবাদী হয়, তাহলে যথাসময়ে যেনো রোমক বাহিনী হতে পৃথক হয়ে কোনো দিকে চলে যায়।

যাজিরাবাসীর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কারণে রোমকদের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়লো। ওদিকে মুসলমানরা হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে রোমকদের ওপর হামলার দাবী জানালো। তিনি হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে পরামর্শ করলেন। তিনিও হামলার পক্ষেই অভিমত প্রকাশ করলেন এবং বললেন, রোমকরা সবসময়ই সংখ্যাধিক্যের ওপর ভরসা করে যুদ্ধ করে। কিন্তু এখন তাও তাদের নেই। এজন্যে হামলায় বিলম্ব করা ঠিক হবে না। বস্তুত হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু সৈন্যদের সামনে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন। অতপর রোমকদের ওপর হামলা করে বসলেন। রোমকরা এ হামলা সামলে নিলো। কিন্তু কয়েকবার আরব গোত্রসমূহ [হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে কৃত ওয়াদার কারণে] রোমক বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে পিছু হটে গেলো। এভাবে রোমকরা কঠিন ধাক্কা খেলো এবং অসহায় হয়ে পলায়ন করলো।

আল্লামা শিবলী (র) "আল ফারুকে" লিখেছেন ঃ "এটিই ছিলো শেষ সংঘর্ষ। খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে এ সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটানো হয়েছিলো এবং এরপর আর কখনো তাদের সামনে অগ্রসর হওয়ার সাহস হয়নি।"

আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পরই (১৩ হিজরীতে) হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদকে সিরিয়ার কমাণ্ডার ইন চীফ পদ থেকে পদচ্যুত করে হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল জাররাহর অধীনস্ত করে দিয়েছিলেন। বিভিন্নজন ধারণা করে থাকেন যে, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেই হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে সম্পূর্ণরূপে পদচ্যুত করেন। কিন্তু এটা ভুল ধারণা। বাস্তব ঘটনা হলো, প্রথমবার (১৩ হিজরীতে) হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে সেনাপতির পদ থেকে পদচ্যুত করেন।

কিন্তু সেনাবাহিনীর একজন পদস্থ অফিসার হিসেবে বহাল রাখেন। অবশ্য ১৭ হিজরীতে তাকে সম্পূর্ণরূপে পদচ্যুত করে একজন সাধারণ সিপাহী বানিয়ে দেন। ইসলামের এ মহান জেনারেলের পদচ্যুতির কি কারণ ছিলো। ঐতিহাসিকরা এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের ধারণা পেশ করেছেন। কেউ কেউতো এ পর্যন্তও লিখেছেন যে, ব্যক্তিগতভাবে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে পসন্দ করতেন না এবং শৈশবকাল থেকেই তাঁর অন্তর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর ব্যাপারে পরিষ্কার ছিলো না। কিন্তু এটা নিরেট ভুল ধারণা। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু দিয়ানত এবং তাকওয়ার ক্ষেত্রে এত উঁচু মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন যে, রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যক্তিগত পসন্দ বা অপসন্দের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত নিতেন না। বরং সবসময়ই ইসলামী রাষ্ট্র এবং উম্মাহর ব্যাপক কল্যাণের প্রশ্নটিই সামনে রাখতেন।

বিভিন্ন রাওয়ায়েতে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর পদচ্যুতির বেশ কিছু কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। এসব কারণের মধ্যে যেসব কারণ বিবেক সম্মত তা নিম্নরূপ ঃ

১. হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু সৈনিক মেজায পেয়েছিলেন। তিনি প্রায় সবসময়ই যেখানে নরম ও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে কাজ নেয়া যেতো সেখানেও কঠোরতার সাথে কাজ নিতেন। পক্ষান্তরে হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন এবং কৌশল ও বাহাদুরীর গুণেও পূর্ণভাবে গুণান্বিত ছিলেন।

২. কোনো কোনো সময় হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বাহাদুরীর ভাবাবেগে এমন সব পদক্ষেপ নিয়ে বসতেন যা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে অসতর্কতার সংজ্ঞায় পড়তো।

৩. হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু মালিক বিন নুওয়াইরাহকে হত্যা করেন এবং পরে তার স্ত্রীকে বিয়ে করেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু সহ কতিপয় সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর এ কাজ পসন্দ করেননি। তাঁরা হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে পদচ্যুতির জন্য হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু এ পরামর্শ গ্রহণ করেননি এবং হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওজর গ্রহণ করে বলেছিলেন ঃ "আমি আল্লাহর তরবারীকে খাপে ঢুকাতে পারি না।" অনেকের মতে হযরত সিদ্দিকে আকবার রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর এ কাজকে ইজতিহাদী ভুল হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন এবং তাঁকে দায়মুক্ত বলে

ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু এ ব্যাপারে মুতমায়েন ছিলেন না।

৪. হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু কোনো কোনো সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর অনুমতি ছাড়া কোনো কাজ করে বসতেন। ১২ হিজরীতে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে গোপনভাবে হজ্জ করা তাঁর এ ধরনের একটি কাজ ছিলো। যদিও হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু এটাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, তবুও তিনি তাঁকে ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু এ ধরনের কাজ বরদাশত করতে পারতেন না।

৫. হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু জিযিয়া ও বিভিন্ন ধরনের করের যথাযথ হিসেব খেলাফতের দরবারে প্রেরণ করতেন না। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে এ কাজ অবশ্যই জবাবদিহির যোগ্য ছিলো।

৬. হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু রণনীতি সম্পর্কে খেলাফত থেকে পদে পদে নির্দেশ ও অনুমতি লাভ আবশ্যক মনে করতেন না। তাঁর ধারণা ছিলো রণনীতি প্রশ্নে অকুস্থলে উপস্থিত অফিসারবর্গই ভালো বুঝতে সক্ষম। এজন্যে যে কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপক ক্ষমতা তাদের থাকা উচিত। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর এ মতের সাথে একমত ছিলেন না। তিনি নিজেকে সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্যের সালামতি এবং নিরাপত্তার জিম্মাদার মনে করতেন। সুতরাং বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে তাঁর সাথে পরামর্শ করার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন।

৭. মুসলমানদের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল হতে যাচ্ছিলো যে, হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর রণনৈপুন্যতা এবং বাহুবলের ওপর ইসলামী বিজয়সমূহ নির্ভরশীল। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু এ ধারণাকে মুসলিম উম্মার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক মনে করতেন। নশ্বর মানুষের ওপর সীমাতিরিক্ত ভরসা করাকে তিনি শুধুমাত্র ঈমানী শক্তিকে দুর্বল করার কারণই মনে করতেন না, বরং তাতে মুসলমানরা আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হতে পারে বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। বস্তুত মুসলমানদের অন্তর থেকে সে বদ্ধমূল ধারণাকে নির্মূল করার জন্যে তিনি নিজের যুগের সবচেয়ে বড় বিজয়ী জেনারেলকে পদচ্যুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বর্ণিত কারণসমূহ স্ব স্ব স্থানে যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু ১৩ হিজরীতে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর পদমর্যাদা (RANK) শুধুমাত্র খাট করেছিলেন। অতপর চার বছর থেকে কিছু

বেশী সময় পর্যন্ত আর কোনো কথা বলেননি। ১৭ হিজরীতে তিনি তাঁকে পুরোপুরি পদচ্যুত করেন। এ পদচ্যুতির কারণ কি ছিলো সে ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এক কবিকে (আশায়াছ বিন কায়েস) এক হাজার দিনার (অথবা দশ হাজার দিরহাম) ইনয়াম দিয়েছিলেন। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের কর্মচারী এবং কর্মকর্তাদের প্রতিটি কথার ওপর কড়া নজর রাখতেন এবং ইসলামী চেতনার সাথে সংঘর্ষশীল কোনো বস্তুকেই তিনি বরদাশত করতে পারতেন না। তিনি হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর এ "বাদশাহী দরাজ দিলের" খবর পেয়ে হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে চিঠি লিখলেন যে, যদি খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এ অর্থ সরকারী তহবিল থেকে দিয়ে থাকে তাহলে সে আমানতের খেয়ানত করেছে। আর যদি নিজের তহবিল থেকেও দিয়ে থাকে, তাহলে অপচয় করেছে। উভয় অবস্থাতেই সে পদচ্যুত হওয়ার যোগ্য। যে দূত এ পত্র নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁকে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সাধারণ্যে খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে জিজ্ঞেস করবে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ পুরস্কার আপনি কোথা থেকে দিয়েছেন ? যদি সে ভুল স্বীকার করে নেয়, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেবে। নচেৎ দস্তুর অনুযায়ী সর্বাসাধারণ্যে তাকে পদচ্যুত করবে।

দূত মনযিলে মাকসুদে পৌঁছে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর ফরমান সর্বসাধারণ্যে পাঠ করে শুনালেন এবং হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এতবড় পুরস্কার কোথা থেকে দিয়েছেন ? হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু জবাব দিলেন যে, এ পুরস্কার আমি আমার সম্পদ থেকে দিয়েছি এবং আমি কোনো ভুল করিনি। বস্তুত তিনি ভুল স্বীকার করলেন না। দূত বললেন, আপনি অপচয় করেছেন। এজন্যে আমীরুল মু'মিনীনের নির্দেশে আপনাকে পদচ্যুত করা হচ্ছে। সুতরাং তিনি পদচ্যুতির নিদর্শন স্বরূপ তার মাথা থেকে টুপি নামিয়ে নিলেন এবং ঘাড়ের ওপর পাগড়ী রাখলেন।

এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু এ কাজ সম্পাদন করেছিলেন। সে সময় হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেছিলেন, আমি ফরমান শুনলাম এবং মেনে নিলাম। আমি এখনো অফিসারদের নির্দেশাবলী মানা এবং আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত আছি।

অন্য এক রাওয়ায়েতে তাঁর সম্পর্কে এ বাক্যাবলী সংশ্লিষ্ট রয়েছে ঃ "আমি নিজের নফসকে আল্লাহর কাছে হিবা করে দিয়েছি।"

আল্লামা শিবলী "আল ফারুকে" লিখেছেন ঃ

"এ ঘটনা কম আশ্চর্যের নয় যে, এমন একজন বড় সেনাপতি—যাঁর নজীর ইসলামী বিশ্বে দ্বিতীয় আর নেই—যাঁর তরবারী ইরাক ও সিরিয়ার ব্যাপার ফায়সালা করে দিয়েছেন—তাঁকে এভাবে অপমানিত করা হচ্ছে—অথচ সে নির্বাক। এ ঘটনায় একদিকে খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর পূন্য আত্মা এবং সত্য পূজার স্বাক্ষ্য পাওয়া যায়। অন্যদিকে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর প্রভাব এবং মর্যাদার আন্দাজ করা যায়।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর ফরমান বা নির্দেশের সামনে মাথানত করে দিলেন। কিন্তু তিনি নিজেকে নির্দোষ মনে করতেন। এজন্যে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর অন্তরে কিছুটা আঁচড় পড়লো। তিনি হিমস চলে গেলেন এবং সেখানে জনতার সামনে এক ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন ঃ

"আমীরুল মু'মিনীন আমাকে সিরিয়া বাহিনীর অফিসার বানিয়েছিলেন যখন আমি সমগ্র সিরিয়া জয় করলাম তখন তিনি আমাকে পদচ্যুত করলেন।"

তাঁর এ দুঃখ প্রকাশে একজন মুজাহিদ উঠে দাঁড়ালেন। এবং বললেন এ ধরনের কথা প্রকাশ না করাই ভালো। এতে ফেতনা সৃষ্টি হতে পারে।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, "আমার ভাই ! ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু থাকতে কোনো ফেতনার আশংকা নেই।" [কিতাবুল খিরাজ ঃ কাজী আবু ইউসুফ রাদিয়াল্লাহ আনহু]।

ইবনে আসির (র) বর্ণনা করেছেন, পদচ্যুতির পর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হিমস হয়ে মদীনা মুনাওয়ারা গেলেন এবং হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর খিদমতে হাজির হয়ে অভিযোগ করে বললেন, আপনি আমার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছেন।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে এত সম্পদ কোথা থেকে এলো ?

তিনি বললেন, গনিমাতের মালের অংশ থেকে আমার কাছে ৬০ হাজারের বেশী যাকিছু বেরুবে তা আপনি নিয়ে নিন।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু তৎক্ষণাৎ হিসেব করালেন। বিশ হাজার পরিমাণ বেশী হলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু সন্তুষ্টচিত্তে তা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর হাওয়ালা করে দিলেন। তিনি তা বাইতুল মালে জমা দিলেন এবং হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে খালিদ ! তুমি আমার বুযর্গ ও শ্রদ্ধাস্পদ হওয়ার সাথে সাথে আমার প্রিয় এবং স্নেহাস্পদও।"

তাবারি (র) বর্ণনা করেছেন, এ সময় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু এ কবিতাও আবৃত্তি করেন।

(তুমি অনেক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছ। তোমার মতো কোনো ব্যক্তিই কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেনি। কিন্তু বাস্তব হলো যে, জাতিসমূহ কিছুই করে না। যাকিছু করেন আল্লাহই করেন।)

এরপর আমীরুল মু'মিনীন রাদিয়াল্লাহ আনহু সমগ্র বিজিত দেশসমূহে এক ফরমান পাঠিয়ে বললেন ঃ

"খালিদকে আমি অসন্তুষ্টি অথবা খেয়ানতের কারণে পদচ্যুত করিনি। শুধুমাত্র এ কারণে পদচ্যুত করেছি যে, মুসলমানেরা জেনে নিক যে, খালিদের শক্তির ওপর ইসলামের বিজয়সমূহ নির্ভরশীল নয়। বরং ইসলামের বিজয় আল্লাহর মদদ ও সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল।"

'মুসতাদরাকে হাকিমে' বলা হয়েছে, পদচ্যুতির কিছুদিন পর হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে রাহা, হিরান, আমদ এবং লারতার এলাকাসমূহের গভর্নর নিয়োগ করেন। তিনি এক বছর পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালনের পর পদত্যাগ করেন। পদত্যাগের সামান্য কিছুদিন পর তিনি অসুস্থ অবস্থায় ২১ হিজরীতে (অন্য রাওয়ায়েত মতে ২২ হিজরী ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে) ইন্তেকাল করেন। এ সময় তার বয়স ছিলো ৬০ বছর।

হাফিজ ইবনে আবদুল বার (র) "আল ইসতিয়াব" গ্রন্থে লিখেছেন, ওফাতের কিছুদিন পূর্বে দুঃখ ও হতাশা ভারাক্রান্ত চিত্তে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেছিলেন ঃ

"আমি আমার জীবনে প্রায় তিনশ' (অন্য রাওয়ায়েত মতে একশ'র বেশী) যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। আমার শরীরের প্রতিটি অংশ তীর, তরবারী এবং বর্শার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। কিন্তু শাহাদাত ভাগ্যে জোটেনি। আর আজ বিছানায় উটের মতো জীবন দিচ্ছি। আল্লাহ বুজ দীলদেরকে কখনো শান্তি দেন না।"

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওফাত ও দাফন স্থল নিয়ে চরিতকারদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ লিখেছেন যে, তিনি মদীনা মুনাওয়ারাতে ওফাত পান এবং হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর জানাযাতে শরীক হন।

সেদিন মদীনার মহিলা সমাজ বিশেষ করে বনি মুগিরা গোত্রে বিলাপের ধ্বনি অনুরনিত হচ্ছিলো।

এক রাওয়ায়েতে আছে যে, তাদেরকে শোকে শোকাভিভূত দেখে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, বনু মুগিরার মহিলারা কাঁদতে বাধ্য। কিন্তু তারা যেন বুকের ছাতি পিটিয়ে না কাঁদে। কিন্তু বেশীর ভাগ চরিতকার বর্ণনা করেছেন, তিনি মদীনায় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে সাক্ষাত করে হিমস চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানেই ওফাত পান। এসব চরিতকারের মধ্যে রয়েছেন ওয়াকেদী (র), তাবারী (র), ইবনে আসাকির (র), ইবনে আসির (র), হাফেজ জাহাবী (র) এবং আল্লামা আইনী (র) প্রমূখ। ইবনে আসাকির (র) এ পর্যন্তও লিখেছেন যে, "হিমসে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর কবর রয়েছে। আমি এও জানি যে, তাঁর মৃতদেহ কে কে গোসল করিয়েছিলেন এবং কারা কারা তাঁর নামাযে জানাযায় উপস্থিত ছিলেন।"

হাফিজ জাহাবী (র) বলেছেন ঃ "এটিই ঠিক যে, হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হিমসে ওফাত পেয়েছিলেন এবং তার কবর জিয়ারাত স্থল হিসেবে সর্বসাধারণ্যে পরিচিত।"-(সিয়রে আলামুন নুবলা)

হাফিজ ইবনে আবদুল বার (র) "আল ইসতিয়াবে" লিখেছেন, ওফাতের পূর্বে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ওসিয়াত করেছিলেন যে, তাঁর হাতিয়ার এবং সওয়ারের ঘোড়া যেন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে ওয়াকফ্ করে দেয়া হয়।

হাফিজ জাহাবি (র)-এর মতে তাঁর সম্পদ বলতে ছিলো একটি গোলাম, একটি ঘোড়া এবং অস্ত্রশস্ত্র।

ইবনে আসাকির (র) বলেছেন, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুকে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর মৃত্যু পরবর্তী ধন-সম্পদ সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ আবু সুলায়মানের ওপর রহম করুন। আমরা আশা করিনি যে, তিনি এত দারিদ্রতার মধ্যে জীবনযাপন করতেন।

অন্য আর এক রাওয়ায়েতে ইবনে আসাকির (র) বলেছেন, হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওফাতে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং বললেন ঃ

"খালিদের মৃত্যুতে ইসলামের প্রাচীরে এমন এক ফাটল দেখা দিয়েছে, যা আর কখনো পূরণ হবে না। হায় আল্লাহ! যদি তাকে আরো দীর্ঘদিন জীবিত রাখতেন।"

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু কয়েকটি বিয়ে করেছিলেন। তাঁর সন্তানও বেশী ছিলো। কিন্তু তাদের সংখ্যা এবং নাম সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। চরিতকাররা তাঁর চার পুত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এক পুত্রের নাম ছিলো সুলাইমান। এ নামানুসারে হযরত খালিদের কুনিয়াত ছিলো আবু সুলাইমান। আবদুল্লাহ নামক পুত্রটি ইরাকের কোনো যুদ্ধে শহীদ হন। সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধ করতে করতে মুহাজির নামক ছেলেটি শহীদ হন। আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ আনহু তো বাপকা বেটা ছিলেন। বাহাদুরী, অশ্বারোহন এবং দানের ক্ষেত্রে তিনি মহান পিতার উত্তরাধিকারী ছিলেন। হযরত ওসমান জুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকালে তিনি সিরিয়ার গভর্নর আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর অধীন হিমসের আমীর ছিলেন। হযরত আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ আনহু সে প্রখ্যাত বাহিনীর একজন অফিসার হিসেবে ছিলেন, যে বাহিনী আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর যুদ্ধে সর্বপ্রথম কাসতান তুনিয়ার ওপর অভিযান চালিয়েছিলো। আর এ বাহিনী সম্পর্কে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'মাগফুর' হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছিলেন। ইবনে কুতাইবা রাদিয়াল্লাহ আনহুর বর্ণনামতে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর কয়েকটি ছেলে এবং নাতি ১৮ হিজরীর প্লেগের প্রকোপে মারা গিয়েছিলো।

ইবনে আসির (র) এবং কতিপয় ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন যে, দু' পুরুষের পর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদের সকল সন্তান-সন্ততি শেষ হয়ে যায়। এরপর আল্লাহর নাম ছাড়া পূর্ব-পশ্চিমে তাঁর আর কোনো সন্তান-সন্ততি অথবা বংশধারা অবশিষ্ট ছিলো না। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর বংশ অবশিষ্ট না থাকলেও তিনি যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন তাই তাকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

প্রখ্যাত চরিতকার এবং ইতিহাসবিদরা বলেছেন, হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ আকৃতি, সুরত দেহের উচ্চতা এবং কণ্ঠস্বর হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর গভীর সাজুয্য রাখতেন। এমনকি অনেকে ভুল করে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু মনে করে বসতেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর অবয়ব যেনো হযরত ওমর ফারুকের রাদিয়াল্লাহ আনহুর অবয়ব ছিলো। আল্লামা শিবলী 'আল ফারুক' গ্রন্থে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর অবয়ব এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"গোধূম বর্ণ, লম্বা আকৃতি এমনকি হাজার হাজার মানুষের মধ্যে দাঁড়ালেও তাঁর মাথা সবার ওপরে থাকতো, গণ্ডদেশে অল্প গোশত, ঘন দাড়ি, মোচ বড় বড় এবং মাথার চুল সামনের দিক থেকে উড়ে যেতো।"

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ নীরেট সামরিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কিন্তু ইলম ও ফযীলত থেকে তিনি একদম শূন্য ছিলেন না। তাঁর থেকে ১৮টি হাদীস বর্ণিত আছে। এর মধ্যে দু'টি হাদীসে হযরত ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম ঐকমত্য পোষণ করেন এবং একটি ইমাম বুখারী (র) ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। হাফিজ ইবনে হাজার (র) 'আল ইসাবাহ' এবং তাহজিবুত তাহজিব' গ্রন্থে লিখেছেন হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসের সনদে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু, মিকদাম বিন মা'দিকারাব (র), কায়েস বিন আবিহাজম (র), আশতার নাখয়ী (র), আলকামা (র), বিন কায়েস (র), জুবায়ের (র) বিন নুফায়ের এবং আবুল আলিয়া (র) প্রমুখ ছিলেন।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ফিকাহতেও পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু জিহাদে মশগুল থাকার কারণে ফতওয়ার মসনদে আসীন হননি। তাঁর ফতওয়ার সংখ্যা তিন চারের বেশী নয়।

দীনি হুকুম-আহকাম এবং মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কেও হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিজ্ঞ ছিলেন। এ কারণেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে কয়েকবার তাবলীগ এবং দীনের প্রচার কাজে নিয়োগ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দায়িত্ব তাঁদেরকেই দিতেন, যাঁরা ইসলামী আকায়েদ, আমল এবং দীন সম্পর্কে পূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল এবং সার্বিকভাবেই মুবাল্লিগ হওয়ার যোগ্য হতেন। বনু জাজিমা, বনু আবদিল মাদান, বনু হারিস বিন কায়াব প্রভৃতি গোত্র হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর তাবলীগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। এমনিভাবেই ধর্মদ্রোহীতার ফেতনায় বনু হাওয়াযেন, বনু আমের, বনু সুলায়েম, বনু তাই প্রভৃতি গোত্র তাঁর প্রচেষ্টাতেই দ্বিতীয়বার ইসলাম গ্রহণ করেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধে রোমক দূত জর্জার কাছে তিনি এমন প্রভাবপূর্ণভাবে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন যে, সে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেয়।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদের চারিত্রিক বাগিচায় জিহাদের উদ্দীপনা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তুষ্টি এবং তাঁর প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শন, বাহাদুরী ও তারুণ্য, সত্য-নিষ্ঠা ও অপরিমিত দানশীলতা উল্লেখযোগ্য রঙীন ফুল সদৃশ। জিহাদের উদ্দীপনা তাঁর জীবনের সবচেয়ে বেশী প্রোজ্জ্বল দিক। এ প্রসঙ্গে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। তিনি অষ্টম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তারপর প্রায় ১৪ বছর জীবিত ছিলেন। এ সময়ের বেশীর ভাগ অংশই তিনি জিহাদের ময়দানে কাটিয়েছেন। প্রায় সোয়াশ' (অন্যান্য রাওয়ায়েত

মতে তিনশ') যুদ্ধে অংশ নেন এবং প্রতিটি যুদ্ধেই সফল হন। শরীরের প্রতিটি অংশেই হাতিয়ারের আঘাত এবং যখম ছিলো। তিনি বলতেন, মধুচন্দ্রিমার রাতের চেয়েও তাঁর কাছে শত্রুর সাথে যুদ্ধের রাত বেশী প্রিয়। শাহাদাত লাভের প্রবল ইচ্ছা ছিলো। কিন্তু দুনিয়ায় এমন কোনো হাতিয়ার তৈরিই হয়নি যা যুদ্ধের ময়দানে 'আল্লাহর তরবারীকে ভাঙ্গতে পারে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা ছিলো। কারো মুখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রসঙ্গে কোনো বেয়াদবী বরদাশত করতে পারতেন না। একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিছু সোনা এলো। সে সময় নাজদের কিছু লোক তাঁর খিদমতে উপস্থিত ছিলো। তিনি সব সোনা তাদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। কিন্তু এক ব্যক্তি নিজের অংশে খুশী না হয়ে বললো ঃ "মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহকে ভয় করো।"

রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে বললেন ঃ "আমি যদি আল্লাহর নাফরমানি করি তাহলে তার আনুগত্য করে কে ?"

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি নাজদীর এ বেয়াদবীতে পুরোপুরি অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। খাপ থেকে তলোয়ার বের করলেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়ার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু তিনি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে বললেন, খালিদ ছেড়ে দাও।

একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে এক অভিযানে আমীর বানিয়ে প্রেরণ করলেন। হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহ আনহুও এ অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে জিজ্ঞেস ছাড়াই এক ব্যক্তিকে ইসলাম গ্রহণের ভিত্তিতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে তাঁর কথা কাটাকাটি হয়ে গেলো এবং কটু বাক্য বিনিময়ও হলো। হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু মদীনা পৌঁছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করলেন। ইত্যবসরে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুও সেখানে পৌঁছলেন এবং নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনে হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুকে কটু কাটব্য করলেন। এতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, যে ব্যক্তি আম্মারের সাথে শত্রুতা পোষণ করে সে আমার সাথেও শত্রুতা রাখে। আর যে ব্যক্তি আমার সাথে শত্রুতা রাখে সে খোদার সাথেও শত্রুতা রাখে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ইরশাদ শুনে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু কেঁপে উঠলেন। সে সময়ই তিনি আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে বার বার ক্ষমা চাইতে লাগলেন। কিন্তু তিনি এত মনোকষ্ট পেয়েছিলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিশ থেকে উঠে চলে গেলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুও তাঁর পেছনে পেছনে চললেন এবং অনুনয় বিনয় করলেন যে, তিনি অবশেষে রাজী হয়ে গেলেন। স্বয়ং তিনিই বলেছেন, যখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে উঠলাম তখন আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুকে রাজী করার চেয়ে বেশী প্রিয় কাজ আর আমার কাছে ছিলো না।

ধর্মদ্রোহিতার ফেতনায় তিনি মালিক বিন নুওয়াইরাহকে যেসব কারণে হত্যা করেছিলেন তার অন্যতম কারণ হলো, সে আলাপ-আলোচনায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রসঙ্গে বার বার 'সাহিবুকা' বলেছিলো। এতে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু উত্তেজিত হয়ে বললেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের সাহিব ছিলেন না?"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিলো। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এতো গভীরভাবে ভালোবাসতেন যে, তাঁর কয়েকটি পবিত্র চুল নিজের টুপিতে সেলাই করে নিয়েছিলেন এবং তা মাথায় দিয়ে যুদ্ধের ময়দানে যেতেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধে একবার এ টুপি কোথায়ও পড়ে গিয়েছিলো। ফলে তিনি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। দৌড়াদৌড়ি করে এদিক সেদিক খোঁজাখুঁজির পর সে টুপি পেয়ে তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়েন।

তাঁর বাহাদুরী, সাহসিকতা এবং সামরিক যোগ্যতা লৌহ সদৃশ শত্রুরাও স্বীকার করতো। সৈন্যদেরকে এমনভাবে সাজাতেন এবং যুদ্ধ করাতেন যে, বিজয় সুনিশ্চিত হয়ে যেতো। যুদ্ধ কৌশলেও অত্যাশ্চর্যজনক নিপুণতা রাখতেন। তাঁর সামরিক কৌশলে শত্রু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়তো এবং অস্ত্র পরিত্যাগ করতে বাধ্য হতো। তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ ছিলো যে, যুদ্ধের ময়দানে স্বয়ং সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিতেন এবং প্রথম ব্যূহে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতেন।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এক বড় ধনী পরিবারে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁকে আরাম-আয়েশে বিভোর হওয়া থেকে রক্ষা করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই তিনি কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। আর ইসলাম গ্রহণের পর কঠোর পরিশ্রমকে তিনি অভ্যাসে পরিনত করেছিলেন। জিহাদের ময়দানে রাতের পর রাত জেগে জেগে কাটাতেন। নিজেও নিদ্রা

যেতেন না এবং সাথীদেরকেও নিদ্রা যেতে দিতেন না। নিজেকে এবং তাদেরকেও সবসময় সতর্ক রাখতেন। শত্রুর সংখ্যা, শক্তি ও তৎপরতা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়ার বিশেষ ব্যবস্থা করতেন এবং তাদের কোনো কথা তাঁর কাছে গোপন থাকতে পারতো না।

অধীনস্তদের সাথে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বন্ধু ভাবাপন্ন। তিনি তাদের মুরুব্বীও ছিলেন। এ কারণেই সৈন্যরা তার জন্য জীবন দিতেও কুণ্ঠবোধ করতো না। তাঁর ইঙ্গিতেই মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থাকতো।

আল্লাহ পাক হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর প্রকৃতিতে 'আল্লাহর পথে খরচ' এবং দানশীলতার আবেগ ও আমানত রেখেছিলেন। তাঁর কাছে প্রচুর যুদ্ধ সরঞ্জাম মওজুদ ছিলো। ইসলাম গ্রহণের পর তা আল্লাহর রাহে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন। বস্তুত বেশীর ভাগ সময় যুদ্ধেই মশগুল থাকতেন। এজন্যে প্রচুর গনিমাতের মালও পেতেন। এর বেশীর ভাগই তিনি অভাবগ্রস্ত, গরীব এবং অধীনস্তদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন ও নিজে সাধাসিধে জীবনযাপন করতেন। তাঁর এ দান-দক্ষিণা কবিরাও পেতেন। এক কবিকে বিরাট অংকের পুরস্কার দেন। আর এ ব্যাপারেই তাঁর পদচ্যুতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের সামরিক মেজাজ সত্ত্বেও অত্যন্ত হকপ্রিয় ছিলেন এবং আল্লাহকে ভয় করতেন। কোনো ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসন্তোষ প্রকাশ করার সাথে সাথে তা দূর করার চেষ্টায় লেগে যেতেন এবং আর কখনো সেই কাজ করতেন না। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে সে সময় পদচ্যুত করেন যখন তাঁর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে ছিলো। জনসাধারণ্যে তাঁর টুপি খুলে নেয়া হয় এবং পাগড়ী ঘাড়ের ওপর রেখে দেয়া হয়। কিন্তু তিনি আমীরুল মু'মিনীনের নির্দেশের সামনে টু শব্দটি করেননি।

ঈমানী শক্তি এত প্রবল ছিলো যে, এক যুদ্ধের সময় কোনো এক ব্যক্তি বললো, রোমকদের সংখ্যা কতবেশী। আর মুসলমানরা কত কম। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন ঃ

"রোমকরা কত কম এবং মুসলমানরা কত বেশী ? আল্লাহর সাহায্যের সাথে সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহ যখন লজ্জিত করেন, তখন তা কমে যায়। মানুষের সংখ্যার ওপর তা নির্ভরশীল নয়। আল্লাহর কসম! আমার এ ঘোড়া যদি দুলকি চাল ছেড়ে দিতো এবং মুসলমানদের সংখ্যা আরো কম হতো, তাহলে আমি খুশী হতাম।"–(তারিখে তাবারী)

একবার (ইরাকের যুদ্ধসমূহের যুগে) হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হিরাতে বনি মিরাজ বিহর আমীরের কাছে অবস্থান করছিলেন। মুসলমানরা তাঁকে বললো, বিষ থেকে সাবধান। আজমীরা আপনাকে বিষ না খাইয়ে দেয়। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু লোকদের কাছে বিষ চাইলেন। বিষ আনা হলে তিনি তা হাতের ওপর রাখলেন অতপর বিসমিল্লাহ বলে তা গিলে ফেললেন। আল্লাহ পাক ঈমানী শক্তির বদৌলতে তাঁকে বিষের ক্রিয়া থেকে মাহফুজ রাখলেন।

অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে যে, বিষ খাওয়ার সময় হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এও বলেছিলেন ঃ "মৃত্যু না আসা পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি অবশ্যই মরে না।"

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর মর্যাদার চেয়ে বড় দলীল আর কি হতে পারে যে, স্বয়ং রহমতে দোআলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বাহাদুরী এবং সাহসিকতার স্বীকৃতি ও প্রশংসা করেছেন। এ কারণেই তিনি তাঁকে 'সাইফুল্লাহর' মতো উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

মক্কা বিজয়ের সময় হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিজয়ীর বেশে এক ঘাঁটি থেকে বের হয়ে এলেন। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, সামনে খালিদ আসছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এ আল্লাহর বান্দাহ কত ভালো মানুষ।"–(মুসনাদে আহমদ)

অন্য একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ

"তোমরা খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে কোনো ধরনের কষ্ট দিও না। কেননা সে আল্লাহর তরবারীসমূহের অন্যতম। এ তরবারী আল্লাহ কাফেরদের ওপর মেরেছেন।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে একবার হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু যাকাত আদায়ের ব্যাপারে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওপর বাড়াবাড়ি করলেন। একথা শুনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

"তোমরা খালিদের ওপর বাড়াবাড়ি করো। অথচ সে তার সকল যুদ্ধ সরঞ্জাম আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্ফ করে দিয়েছে। এখন তাঁর ওপর আবার যাকাত কিসের ?"

স্বয়ং হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বলতেন, যেদিন থেকে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি সেদিন থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার এবং অন্যান্য সাহাবীর মধ্যে কোনো পার্থক্য করতেন না।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু' তিনবার হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে কয়েকজন জলিলুল কদর সাহাবীর ওপর অফিসার বানিয়েছেন। এমনিভাবে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুও ইরাক এবং সিরিয়ার যুদ্ধসমূহে তাঁকে অসংখ্য মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীর ওপর আমীর নিয়োগ করেছিলেন।

সাইয়েদেনা হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদের চরিত্র, কাজ এবং মহান সাফল্যসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করতে হলে হাজার হাজার পৃষ্ঠার প্রয়োজন। এখানে সংক্ষিপ্তাকারে যাকিছু বলার ছিলো তা বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা এ আলোচনা 'খালিদ সাইফুল্লাহ'র লেখক আবু যায়েদ শালবীর সে বাক্য দিয়ে সমাপ্ত করছি ঃ

"আল্লাহ পাক হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদের ওপর নিজের রহমত এবং বরকত নাযিল করেছেন। তিনি ইসলামের জন্যে যে খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তা এমন যা কখনো ভুলা যায় না। আমাদের প্রত্যেকের ফরয হলো, আমরা যেনো তার জীবনের ঘটনাবলী নিয়ে চিন্তা করি এবং নিজেদের মধ্যে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর গুণাবলীর সমাবেশ ঘটানোর চেষ্টা করি। কেননা ইসলাম এবং মুসলমানদের জীবনে তাঁর গুণাবলীর অবলম্বনের মধ্যেই যথার্থ সার্থকতা নিহিত রয়েছে।"

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ্ আনহু ইবনুল আস

একবার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো এক অভিযানে সৈন্য প্রেরণ করতে চাইলেন। কিন্তু চাইলেই তো আর সৈন্য প্রেরণ করা যায় না। সৈন্য প্রেরণের জন্যে প্রয়োজন এমন জীবন উৎসর্গকারী সাহাবীর নেতৃত্ব যিনি একদিকে যেমন হবেন সামরিক বিষয়াবলীতে নিপুণ, তেমনি নেতৃত্বের যোগ্যতায় হবেন পরিপূর্ণ। তিনি যাকে এ ব্যাপারে যোগ্য মনে করলেন তাঁকে এক বাণী পাঠালেন। বাণীতে বললেন, পোশাক পরিবর্তন করে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে অবিলম্বে চলে এসো। ক্ষুদ্র আকৃতির এ সাহাবী অস্ত্র সজ্জিত হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাজির হলেন। এ সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অযু করছিলেন। তিনি চোখ তুলে দেখলেন। অতপর চোখ নামিয়ে বললেন ঃ

"আমি তোমাকে অমুক অভিযানে আমীর বানিয়ে প্রেরণ করতে চাই। ইনশাআল্লাহ তুমি মাহফুজ থাকবে এবং গনিমাতের মালও হস্তগত হবে। এ মালের একটি সঙ্গত অংশ তুমি পাবে।"

তিনি অত্যন্ত তা'জিমের সাথে বললেন ঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। ধন-সম্পদের লালসায় আমি ইসলাম গ্রহণ করিনি। বরং খালেস অন্তরে ইসলাম গ্রহণ করেছি।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "ভালো সম্পদ ভালো মানুষের জন্যে উত্তম।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখনিসৃত এ বাণী শুনে সে ব্যক্তি হৃষ্টচিত্তে সে অভিযানে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহু যাঁর ওপর সাইয়েদুল মুরসালিনের এতো গভীর আস্থা ছিলো যে, তাঁকে বিশেষ অভিযানের জন্যে নির্বাচিত এবং সালেহ মানুষের উপাধিতে ভূষিত হওয়ার যোগ্য মনে করতেন। তিনি ছিলেন হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস।

সাইয়েদেনা হযরত আবু আবদুল্লাহ আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস প্রথম যুগের সেসব মহান সেনাপতি এবং চিন্তানায়কের মধ্যে পরিগণিত যাঁরা নিজের নজিরবিহীন বাহাদুরী, সমর নিপূণতা এবং উত্তম কার্যপ্রণালী দিয়ে

ইসলামী রাষ্ট্রকে অত্যন্ত শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছিলেন। কুরাইশের বনু সাহাম খান্দানের সাথে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁর বংশ তালিকা নিম্নরূপ ঃ

আমর রাদিয়াল্লাহ্ আনহু ইবুনল আস ইবনুল ওয়ায়েল বিন হাশিম বিন সাঈদ বিন সাহাম বিন আমর বিন হাছিছ বিন কায়াব বিন লুব্বী বিন গালিব।

মাতার নাম ছিলো নাবিগাহ বিনতে হারমালাহ বিন হারিছ। তিনিও আদনান পরিবারভুক্ত ছিলেন।

জাহেলী যুগে মামলা-মোকদ্দমা ফায়সালার দায়িত্ব বনু সাহামের ওপর ন্যস্ত ছিলো। এ দিক থেকে কুরাইশদের মধ্যে তাদের অত্যন্ত গুরুত্ব ছিলো।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ্ আনহুর পিতা আস বিন ওয়ায়েল নিজের খান্দানের সরদার ছিলো। প্রভূত বাণিজ্যিক কারবার এবং ধন-সম্পদের ভিত্তিতে সে নেতৃস্থানীয় কুরাইশের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলো। এতো ধন-সম্পদ ছিলো যে, সে রেশমের পোশাক পরতো। এ ব্যক্তি ইসলামের জঘন্যতম শত্রু ছিলো। কুরাইশের যেসব সরদার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্য দাওয়াতের প্রতি উপহাস করতো সে-ও তাদের একজন ছিলো। সে-ও আখিরাত অস্বীকার এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করতো। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুত্র হযরত কাসেম রাদিয়াল্লাহ আনহু অতপর হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু ওফাত পেলে আস বিন ওয়ায়েল মুশরিক কুরাইশদেরকে সম্বোধন করে এ ভাষায় উল্লাস করেছিলো ঃ

"মুহাম্মদ শিকড় কাটা (নাম নিশানাহীন) লোক। স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মত তার কোনো পুত্র নেই। সে মারা গেলে তোমরা তার অনুসরণ পরিত্যাগ করবে।"

একথার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা আল কাওসার অবতীর্ণ হয়েছিলো। এ সূরায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুশমনদেরকে শিকড় কাটা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

বুখারী, মুসলিম এবং তিবরানী বর্ণনা করেছেন যে, প্রখ্যাত সাহাবী হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহ আনহু কর্মকার ছিলেন। তাঁর কিছু অর্থ আস বিন ওয়ায়েলের জিম্মায় রাখা ছিলো। তিনি সে অর্থ দাবী করলে আস বললো, ইসলাম পরিত্যাগ এবং মুহাম্মদের প্রতি অসন্তুষ্টির প্রকাশ না করা পর্যন্ত তোমার অর্থ দিবো না।

হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, সত্য দীন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কখনই বিশ্বাঘাতকতা করতে পারবো না। আমার স্থির বিশ্বাস যে, কিয়ামতের দিনে এ দীন হকের ওপরই পুনরুত্থিত হবো।

আস হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উপহাস করে বললো, সবাই যদি মৃত্যুর পর জীবিত হবে মনে করো, তাহলে তুমি এবং আমি যখন দ্বিতীয়বার জীবিত হবো তখন আমার কাছে তুমি তোমার অর্থ দাবী করো। সেদিন আমার কাছে অঢেল ধন-সম্পদ এবং অসংখ্য সন্তান থাকবে। তোমার অর্থ কালবিলম্ব না করে আদায় করে দিবো।

একথার ওপর সূরা মরিয়ামের ৭৮-৮১ আয়াত নাযিল হয়। এতে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

"ভালো, আপনি কি সে ব্যক্তিকে (অবস্থা) দেখেছেন, যে আমার আয়াতের সাথে কুফুরী করে এবং (উপহাস করে) বলে আমি (আখেরাতের দিন) অফুরন্ত সম্পদ ও অসংখ্য সন্তানের মালিক হবো। সে ব্যক্তির কি অদৃশ্য বা গায়েব সম্পর্কে জ্ঞান আছে অথবা সে কি আল্লাহর সাথে এ ব্যাপারে কোনো ওয়াদা করেছে ? কখনই নয়। আমরা কার্যতঃ তার কথা লিখে নিয়ে থাকি এবং সময় আসলে এমন শাস্তি দিবো যে, তার সে শাস্তি বাড়িয়েই যাবো এবং তার বর্ণিত বস্তুর মালিক আমরাই থেকে যাবো। সে আমাদের কাছে নীরেট একাকীই উত্থিত হবে।"

হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের অর্থের দাবী নিয়ে অতপর আরেকবার আসের কাছে গমন করলেন। এ সময় আস বললো ঃ

"তোমরা মুসলমানরা ধারণা করেছ যে, মানুষ মাটির সাথে মিশে যাওয়ার পর পুনরায় জীবিত হবে। আমি কসম খেয়ে বলছি, মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব ব্যাপার।"

হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তার কথার যুক্তিপূর্ণ জবাব দিলেন এবং ফিরে এলেন।

মৃত্যু পর্যন্ত আস বিন ওয়ায়েলের সত্য দীন গ্রহণের ভাগ্য হয়নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াতের কয়েক বছর পরই সে কাফের অবস্থায়ই মারা যায়। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস এ ইসলামের দুশমনের সন্তান ছিলেন। ফিল বা হস্তী বিষয়ক ঘটনার ৬ বছর পর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এমনিভাবে তিনি বয়সে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামের ছ' বছরের ছোট ছিলেন। তাঁর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পিতা খুব উৎসব করেছিলো। দশটি উট যবেহ করে সকল কুরাইশ সরদারকে দাওয়াত দিয়ে খাইয়েছিলো। সে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। এরই ফলশ্রুতিতে তিনি বড় হয়ে সফল ব্যবসায়ী, উত্তম সিপাহী এবং উঁচুস্তরের চিন্তানায়ক হতে পেরেছিলেন। সারওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হক দীনের দাওয়াত প্রদান শুরু করলেন। এ সময় আস বিন ওয়ায়েল এ হক দীনের জোরেশোরে বিরোধিতা করলো। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুও পিতার অনুসরণ করে বছরের পর বছর ধরে কুফর এবং শিরকের অন্ধকারে বিপথগামী হয়ে রইলেন। অবশ্য তাঁর ছোট ভাই হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আসের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিলো। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির প্রাথমিক যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আর ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁর ওপর মুসিবতের পাহাড় আপতিত হয়েছিলো। হকপন্থীদের ওপর যখন কুরাইশ মুশরিকদের নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে গেলো তখন নবুয়াত প্রাপ্তির ৫ অথবা ৬ বছর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইঙ্গিতে অনেক মুসলমান হিজরত করে হাবশা চলে গেলেন। কুরাইশরা তাদেরকে বহিষ্কারের জন্য হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর কাছে এক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করলো। এ প্রতিনিধি দলের সবচেয়ে তৎপর সদস্য ছিলেন হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস। তিনি হাবশা পৌঁছে সেখান থেকে মুসলমানদের বহিষ্কারের জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালালেন। কিন্তু নাজ্জাশী তাদের কোনো কথাই শুনলেন না এবং প্রতিনিধি দলটি ব্যর্থ হয়ে সেখান থেকে ফিরে এলো। সময় এভাবেই অতিবাহিত হতে লাগলো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা তাশরীফ নিলেন। এরপর বদর, ওহোদ এবং পরিখার যুদ্ধও শেষ হলো। তখনো হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস সম্পূর্ণরূপে মুশরিকদের সাথে ছিলেন। পরিখার যুদ্ধে মুশরিকদের যখন নাস্তানাবুদ অবস্থা তখন তিনি হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদের সাথে একত্রিত হয়ে দু' শত অশ্বারোহীর একটি দল নিয়ে মুশরিক বাহিনীর পশ্চাতভাগ রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু পরিখার যুদ্ধে (৫ হিজরী) মুশরিকদের পরাজয়ে তাঁর মন ও মস্তিষ্ক ওলট-পালট হয়ে গেলো। তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন।

তিনি বলেছেন ঃ

"পরিখার যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে আমি ইসলাম সম্পর্কে চিন্তা শুরু করলাম। এ চিন্তার ফলশ্রুতিতে ইসলামের প্রকৃত তাৎপর্য আমার কাছে

পরিষ্কার হতে লাগলো এবং চিন্তার জগতে প্রভাব বিস্তার শুরু হলো। এমনকি আমি মুসলমানদের বিরোধিতা থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিলাম। আমার ভূমিকা দেখে কুরাইশরা প্রকৃত অবস্থা জানার জন্যে একজন লোক প্রেরণ করলো। সে এসে আমার সাথে তর্ক জুড়ে দিলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমরা সত্যের ওপর আছি না, পারস্য ও রোমকরা। সে বললো, আমরা। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, ধন-সম্পদ এবং আরাম-আয়েশ তাদের আয়ত্বাধীনে না, আমাদের ? সে বললো, তাদের আয়ত্বে। আমি বললাম, আমাদের এ হকপন্থী (অর্থাৎ মূর্তিপূজা) হওয়া কবে কাজে আসবে। আমরাতো পরকালেই বিশ্বাস করি না। এ দুনিয়াতেও আমরা বাতিল পন্থীদের মুকাবিলায় দরিদ্র হিসেবে পরিগণিত থাকলাম। এজন্যেই আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা কতখানি সঠিক তা চিন্তা-ভাবনা করছি। তিনি বলেছেন, মৃত্যুর পর আর এক জগত হবে। যেখানে প্রতিটি মানুষ তার কাজ হিসেবে বদলা পাবে।–(আল ইসাবহ লি ইবনে হাজার)

এ বর্ণনা থেকে অনুমিত হয় যে, পরিখার যুদ্ধের পর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সঠিক খাতে চিন্তা-ভাবনা শুরু করে দিয়েছিলেন। তার চিন্তা জগতের এ পরিবর্তনই তাঁকে ইসলাম গ্রহণের মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস ইসলাম গ্রহণের ঘটনা নিজেই বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে তাঁর নিজের ভাষ্য নিম্নরূপ ঃ

"আমরা পরিখার যুদ্ধ থেকে মক্কা ফিরে আমার অধীনস্থ লোকদের ডেকে পাঠালাম। যখন তারা এলো তখন বললাম, খোদার কসম ! তোমরা বিশ্বাস করো যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা সকল কথার ওপর মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আমার একটি রায় আছে। জানি না তোমরা তা কেমনভাবে গ্রহণ করবে। তারা জিজ্ঞেস করলো, কি রায় ? আমি বললাম, আমার ধারণা আমরা হাবশা গিয়ে নাজ্জাশীর কাছে অবস্থান নিই। যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জাতির ওপর বিজয়ী হন, তাহলে আমরা সেখানেই নাজ্জাশীর কাছে থেকে যাবো। কেননা নাজ্জাশীর কাছে অবস্থান করা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধীনে থাকার চেয়ে উত্তম। আর যদি আমাদের জাতি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর বিজয়ী হয়, তাহলে আমাদের সাথে তার ব্যবহার ভালোই হবে। কেননা আমরা সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত মানুষ। আমার মতের সাথে সবাই ঐকমত্য পোষণ করলো। অতপর পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হলো যে, আমরা নিজেদের এখানকার সর্বোত্তম সওগাত চামড়া নিয়ে যাবো এবং তা নাজ্জাশীর খিদমতে পেশ করবো। এতে সে খুব

খুশী হবে। বস্তুত আমরা অনেক চামড়াসহ হাবশা পৌঁছলাম এবং সেখানে অবস্থান করতে লাগলাম। আমরা সেখানে অবস্থানকালেই আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন উমাইয়া জুমরী এলো। কোনো প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বাদশাহর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। তার আগমনের কথা জ্ঞাত হয়ে আমরা নাজ্জাশীর খিদমতে হাজির হলাম। আমি নিয়ম মতো তাকে সেজদা করলাম। তিনি আমাকে স্বাগত জানালেন এবং বললেন, দেশ থেকে কোনো তোহফা এনেছো ? আমি বললাম, হুজুর অনেক চামড়া তোহফা হিসেবে এনেছি। একথা বলেই আনিতো সব চামড়া তার সামনে পেশ করলাম। সে খুব পসন্দ করলো। অতপর আমি আরজ করলাম, জাঁহাপনা ! আপনার কাছে আমাদের শত্রু প্রেরিত এক ব্যক্তি এসেছে। তাকে আমরা দরবার থেকে বের হতে দেখেছি। তাকে কতল করার জন্য আমাদের হাওলা করে দিন। সে আমাদের অনেক সম্মানিত ব্যক্তিকে দুঃখ-কষ্ট দিয়েছে। আমার কথা শুনে নাজ্জাশী অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলো এবং এমন জোরে আমার নাকের ওপর ঘুষি লাগিয়ে দিলো যে, মনে হলো নাক বুঝি ভেঙ্গে গেছে। বাদশাহর এ ভূমিকা দেখে আমি এমন লজ্জিত হলাম যে, ধরণীতে সেঁধিয়ে যেতে চাইলাম। এরপর আমি আরজ করলাম, হে বাদশাহ ! যদি জানতাম যে, আমার কথা আপনার পসন্দ হবে না, তাহলে আমি অবশ্যই মুখ দিয়ে তা বের করতাম না।

বাদশাহ বললেন, তোমরা এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য আমার কাছে চেয়েছো, যে সেই মহান ব্যক্তিত্বের দূত। যার কাছে হযরত জিবরাঈল আলাহিস সালাম আগমন করে থাকেন। আর এ ফেরেশতা হযরত মূসা আলাহিস সালামের কাছেও আগমন করতেন।

আমি আরজ করলাম, জাঁহাপনা ! সত্যিই কি এ ধরনের ঘটনা ?

বাদশাহ বললেন, আমর ! তোমার জন্যে দুঃখ হয়। আমার কথা যদি শুনতে চাও, তাহলে তাঁর আনুগত্য করো খোদার কসম ! তিনি হকের ওপর রয়েছেন। আর হযরত মূসা আলাহিস সালাম যেমন ফেরাউনের ও তার বাহিনীর ওপর বিজয়ী হয়েছিলেন, তেমনি তিনিও তাঁর বিরোধীদের ওপর বিজয়ী হবেন। আমি বললাম, তাহলে অতপর আপনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরফ থেকে আমার ইসলামের বাইয়াত নিয়ে নিন। সুতরাং নাজ্জাশী হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং আমি ইসলামের বাইয়াত গ্রহণ করলাম। এখান থেকে যখন আমি আমার সাথীদের কাছে ফিরে গেলাম, তখন আমার চিন্তার রাজ্যে সম্পূর্ণরূপে বিপ্লব এসে গেছে। কিন্তু আমি তা প্রকাশ করলাম না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে

যথারীতি ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলাম। পথিমধ্যে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন ওয়ালিদের সাথে সাক্ষাত হলো। সে মক্কা থেকে আসছিলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু সুলাইমান ! কোথায় যাচ্ছো ? খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, আল্লাহর কসম ! ভালোই হলো। ওয়াল্লাহ এ ব্যক্তি [মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] অবশ্যই নবী। এজন্যে আমি ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। আর কতদিন আমরা কুফরীর অন্ধকারে পথভ্রষ্ট হয়ে চলতে থাকবো। আমি বললাম, খোদার কসম! আমিও একই উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। বস্তুত আমরা দু'জনই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হলাম। প্রথম হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন ওয়ালিদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইয়াত হলেন। অতপর আমি কাছে গিয়ে আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার হাতে বাইয়াত করার জন্যে হাজির হয়েছি। কিন্তু আগে আমার অতীতের গোণাহসমূহ ক্ষমা করে দিন। তিনি বললেন, আমর ! বাইয়াত করো। ইসলাম অতীতের গোনাহসমূহ মিটিয়ে দেয় এবং হিজরতও ভবিষ্যত গোনাহ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে।

তাঁর ইরশাদ শুনে আমি মুতমায়েন হয়ে গেলাম। আর বিলম্ব না করে আমি তাঁর হাতে বাইয়াত হলাম এবং মক্কা ফিরে এলাম।

ইমাম হাকিম (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইনবুল আসের সাথে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন ওয়ালিদ ছাড়া হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন তালহা আবদারীও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

–(মুসতাদরাকে হাকিম)

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস মক্কা ফিরে সেখানে বেশীদিন থাকলেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুহবত থেকে এমন দূরে থাকা তাঁর জন্যে অসম্ভব হয়ে পড়েছিলো। কিছুদিন পর হিজরত করে মদীনা এসে গেলেন। মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পূর্বে এ ঘটনা ঘটেছিলো।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস মদীনা আগমনের পর কতিপয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। চরিতকাররা এসব যুদ্ধে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অংশগ্রহণ এবং কৃতিত্বের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেননি। কিন্তু ধারণা করা যায় যে, তিনি এসব যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। কেননা তাঁর অংশগ্রহণ না করার কোনো কারণ ছিলো না। তাঁর ওপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গভীর আস্থা ছিলো। এজন্যে তাঁর নেতৃত্বে কয়েকটি অভিযান প্রেরিত হয়। এসব অভিযানের মধ্যে জাতুস সালাসিল এবং ছুয়া অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য অভিযান।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর পেলেন যে, বনু কাজায়া গোত্রের একটি দল কুরা উপত্যকায় একত্রিত হয়ে মদীনার ওপর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। স্থানটি মদীনা থেকে দশ দিনের দূরত্বের পথে অবস্থিত ছিলো। অষ্টম হিজরীর জমাদিউল আখিরে তিনি হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে মুহাজির ও আনসারের তিন শ' সদস্যের একটি বাহিনীসহ তাদেরকে উৎখাতের জন্যে প্রেরণ করলেন। এক রাওয়ায়েতে আছে যে, হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু কুরা উপত্যকার বাসিন্দা এবং এ এলাকা সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল ছিলেন। এজন্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ অভিযানের নেতৃত্বের জন্যে তাঁকেই বিশেষভাবে নির্বাচিত করেছিলেন। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু দুষ্কৃতকারীদের কাছে পৌছে জানতে পারলেন যে, সংখ্যায় তারা বিপুল। সুতরাং তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আরও সৈন্য চেয়ে পাঠালেন। তিনি হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল জাররাহকে দু'শ সৈন্যসহ তাঁকে সাহায্যের জন্যে প্রেরণ করলেন। কথিত আছে যে, দুষ্কৃতকারীরা পরস্পর জিঞ্জিরাবদ্ধ করে রেখেছিলো। যাতে তারা একত্রে লড়াই করতে পারে। এজন্যে এ অভিযান জাতুস সালাসিল (জিঞ্জির বা শিকলের) অভিযান বলে খ্যাত হয়। হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু পৌছার পর অভিযানের নেতৃত্ব নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়। কিন্তু অবশেষে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর নেতৃত্বের ওপরই মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মুজাহিদরা দুশমনের ওপর মরণ আঘাত হেনে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ফেললো। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস সাফল্যের মুকুট পরে মদীনা ফিরে এলেন।-(ইবনে সায়াদ)

ইবনে আসির রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকৃতপক্ষে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে বাল্লী ও আজরাহ গোত্রের কাছে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তিনি সেখানে পৌছে জ্ঞাত হলেন যে, তাঁরা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত। সুতরাং হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। এরই ফলশ্রুতিতে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

হাজিল গোত্রের মূর্তির নাম ছিলো ছুয়া। মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে রুহাত নামক স্থানে মূর্তিটি স্থাপিত ছিলো। মক্কা বিজয়ের পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে মূর্তিটি অপসারণের কাজে নিয়োগ করলেন। তিনি যখন সেখানে পৌছলেন, তখন মূর্তির রক্ষক বললো, তুমি কোন্ উদ্দেশ্যে এসেছো? তিনি বললেন, ছুয়াকে অপসারণের জন্যে এসেছি। রক্ষক অত্যন্ত খন খনে গলায় বললো, তুমি এটা

করতে পারো না। ছুয়া নিজেই নিজেকে রক্ষা করবে। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, তোমার ঘিলু বলতে কিছু আছে বলে মনে হয় না। একটা মূর্তি যে দেখতেও পায় না এবং শুনতেও পারে না সে নিজের হেফাযত কিভাবে করবে?

অতপর তিনি মুহূর্তের মধ্যে ছুয়াকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেন এবং রক্ষককে বললেন, তুমি কি তার অসহায়ত্ব দেখেছো। এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে সে খুব প্রভাবিত হলো এবং তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলো।

আল্লামা বালাজুরী (র) 'ফতহুল বুলদান' গ্রন্থে লিখেছেন, মক্কা বিজয়ের কিছু দিন পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস এবং হযরত আবু যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহু আনসারীকে ইসলামের পয়গাম সম্বলিত পত্র দিয়ে আম্মান প্রেরণ করেছিলেন। সেখানকার সরদার ওবায়েদ ও জিফারের নামে এ পত্র প্রেরণ করা হয়েছিলো। তারা দু'জন সহোদর এবং অগ্নি উপাসক ছিলো। ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্র পেয়ে তারা দু'জন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাদের উৎসাহ প্রদানের কারণে সেখানকার অন্যান্য লোকও ইসলামে দীক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে আম্মানের গভর্নর নিয়োগ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত পর্যন্ত তিনি সেখানেই অবস্থান করেছিলেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতের শুরুতে ধর্মদ্রোহিতার ফেতনার আগুন প্রজ্জলিত হয়ে ওঠে। এ সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকাল ও ধর্মদ্রোহিতার খবর জানালেন এবং তাঁকে মদীনা ডেকে পাঠালেন। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বাহরাইনের পথে মদীনা রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে বনি আমের সরদার কুররাহ বিন হাবিরাহর কাছে যাত্রা বিরত করলেন। সে অত্যন্ত খাতির যত্ন ও মর্যাদার সাথে নিজের কাছে রাখলো। যখন তিনি রওয়ানা দেয়ার প্রস্তুতি নিলেন, তখন তাঁকে নির্জনে ডেকে নিয়ে বললেন, আপনি অত্যন্ত হুঁশিয়ার এবং বুদ্ধিমান মানুষ। বর্তমানে আরবের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলিফাকে এ মর্মে পরামর্শ দিবেন যে, যদি আরবের কাছ থেকে যাকাত আদায় করা হয়, তাহলে তারা কারোর ইমারতই কবুল করবে না। হাঁ, যদি যাকাত মাফ করে দেয়া হয়, তাহলে তারা অনুগত থাকবে। এজন্যে যাকাতের আইন বাতিল করাই উত্তম হবে।

কুররার কথা শুনে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্রোধান্বিত হয়ে বললেনঃ

"কুররাহ ! তুমি কি কাফের হয়ে গিয়েছো ? নচেৎ এ ধরনের কথা কেনো বলছো এবং আমাকে আরবদের ভয় দেখাচ্ছো। আল্লাহর কসম ! আমি যাকাত অস্বীকারকারীদেরকে ঘোড়ার খুরের নীচে পিষে ফেলবো।"

মুখের ওপর একথা বলে তিনি মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলেন। ইবনে আসির (র) বর্ণনা করেছেন, পরে কুররাহ বিন হাবিরাহকে যাকাত অস্বীকারের অভিযোগে গ্রেফতার এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামনে পেশ করা হয়। এ সময় সে জানায় যে, যাকাতের ব্যাপারে নেক নিয়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং ইসলাম থেকে সে খারিজ হয়ে যায়নি। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস তার বিবৃতির সত্যতা স্বীকার করলেন। ফলে তাকে মুক্তি দেয়া হলো। অন্য এক রাওয়ায়েতে এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, ধর্মদ্রোহিতায় লিপ্ত হওয়ার কারণে তাকে হত্যা করা হয়।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস মদীনা পৌঁছলে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বনু কাজয়ার মুরতাদদের উৎখাতের কাজে নিয়োগ করলেন। তিনি নিজের প্রচেষ্টায় তাদেরকে ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং যাকাত উসুল করে মদীনা ফিরে এলেন। ইবনে জারীর (র) তাবারী বর্ণনা করেছেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বপদে পুনরায় তাঁকে আম্মান গমনের নির্দেশ এবং খোদাভীতির সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনের পরামর্শ দিলেন। বস্তুত তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে কমবেশী সোয়া বছর আম্মানের গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন এবং সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে তা আঞ্জাম দেন।

১২ হিজরীতে ইরান ও রোকমদের সাথে সংঘর্ষ শুরু হলো। এ সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আসকে সিরিয়া প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তাকে এ বলে একটি পত্র প্রেরণ করলেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে জাতুস সালাসিল অভিযানের আমীর বানিয়ে বনু কাজায়ার প্রতি প্রেরণ করেছিলেন। এজন্যে আমিও ধর্মদ্রোহিতার ঘটনায় তাদের কাছেই তোমাকে প্রেরণ করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে আম্মানের গভর্নর বানিয়েছিলেন। এজন্যে আমি (ধর্মদ্রোহিতার ফেতনা নির্মূলের পর) তোমাকে দ্বিতীয়বার আম্মানের ইমারতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। এখন আমি তোমার ওপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করতে চাই, যা তোমার ইহ ও পরকালের জন্য উত্তম হবে।"

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর জবাবে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে লিখেছিলেন ঃ

"আমি আল্লাহর একটি তীর। আর আপনি সেই তীরের তীরন্দাজ বা পরিচালক। এজন্যে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে তা নিক্ষেপের অধিকার আপনার রয়েছে।"

সুতরাং হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাকে আম্মান থেকে ডেকে ফিলিস্তিনে (সে সময় সিরিয়ার অংশ ছিলো) প্রেরণ করলেন। তাঁর অধীন সৈন্য সংখ্যা ছিলো ৯ হাজার। এসব সৈন্যের মধ্যে হাওয়াজন, সাকিফা এবং বনি কিলাব গোত্রের লোকজন অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তাঁর হাতে ঝাণ্ডা প্রদানের সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু এ নসিহত করেছিলেন ঃ

"তুমি এখন ফিলিস্তিন রওয়ানা হয়ে যাও। তুমি তোমার বাহিনীর আমীর। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তুমি আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল জাররাহর সাথে চিঠি-পত্র আদান-প্রদান এবং পরামর্শ করবে এবং যখন তিনি তোমার সাহায্যের প্রয়োজন মনে করবেন তৎক্ষণাৎ তাঁকে সাহায্য করবে। আর প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য উভয় অবস্থাতেই আলিম ও খাবির খোদাকে ভয় করবে। আমি তোমাকে সে সকল লোকের ওপর প্রাধান্য দিয়েছি যারা তোমার আগে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তোমার সকল তৎপরতা ইহকালের জন্যে নয় বরং পরকালের জন্যে ওয়াক্‌ফ থাকা চাই এবং জিহাদের উদ্দেশ্য শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই হওয়া দরকার। তোমার সাথীদের মধ্যে মুহাজির, আনসার এবং বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরাও রয়েছেন। আর তুমি তাদের আমীর। তাদের মান-মর্যাদার প্রতি খেয়াল রাখবে। তুমি আমীর হওয়ার কারণে তাদের ওপর কর্তৃত্ব জাহির করো না। এ শয়তানী অহমিকা কখনো নিজের কাছে ঘেঁষতে দিও না। এটা শুধুমাত্র নফসের একটি ধোঁকা। মিলেমিশে থাকবে এবং সকল কাজ পরস্পর পরামর্শ করে করবে। জামায়াতের সাথে নামায আদায়ে গাফিলতি করো না। সৈন্যদের প্রতি কোনো হেদায়াতের প্রয়োজন হলে সংক্ষিপ্ত নসিহতের মাধ্যমেই তা করবে। যুদ্ধকালে ধৈর্য, স্থৈর্য এবং বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করবে এবং কোনো অবস্থাতেই পশ্চাদাপসরণ করবে না। বাজে কথা থেকে দূরে থাকবে। যাতে তুমি সালেহ এবং হেদায়াতদানকারী হিসেবে পরিগণিত হও। দুশমনের সকল তথ্য অব্যাহতভাবে যাতে পাও সে চেষ্টা করবে এবং পাহারাদাররা যাতে নিজেদের কাজে সজাগ থাকে সে ব্যবস্থা করবে।"-(ফতহুল বুলদান-বালাজুরী)

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস তাঁর এ হেদায়াতের ওপর আমল করার ওয়াদাহ করলেন এবং নিজের বাহিনীসহ ফিলিস্তিন রওয়ানা হয়ে গেলেন। এ সময় আরো কিছু ইসলামী সৈন্যও বিভিন্ন অফিসারের নেতৃত্বে

সিরিয়া প্রবেশ করেছিলো। হিরাক্লিয়াস মুসলমানদের অগ্রযাত্রার খবর পেয়ে তাদের মুকাবিলার জন্যে পৃথক পৃথক বাহিনী প্রেরণ করলো। এসব বাহিনীর মধ্যে একটি শক্তিশালী দলের নেতৃত্ব করছিলো তার দু'জন অভিজ্ঞ জেনারেল। তাদের নাম ছিলো তাযারক ও কাবকালার। তারা ফিলিস্তিনের আজনাদাইন নামক স্থানে এসে তাঁবু ফেললো। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস সেখানে পৌঁছে নিজের বাহিনীর চেয়ে কয়েক গুণ বেশী সৈন্যের প্রতিপক্ষ পেলো। এ পরিস্থিতি মুকাবিলার জন্যে সিরিয়ায় অবস্থানরত অন্যান্য ইসলামী বাহিনীও হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল জাররাহ, হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল ওয়ালিদ, হযরত শুরাহবিল রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন হাসানাহ এবং হযরত ইয়াযিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি সুফিয়ানের নেতৃত্বে আজনাদাইন পৌঁছে গেলেন। এ সময় রোমক সেনাপতি এক আরবকে গোয়েন্দাগিরির কাজে নিয়োগ করলো। সে দেখে শুনে ফিরে গেলে রোমক সেনাপতি জিজ্ঞেস করলো, ইসলামী বাহিনী সম্পর্কে কি খবর এনেছো ? সে বললো ঃ

"তারা রাতে ইবাদাতকারী এবং দিনে যুদ্ধের ময়দানে অশ্বারোহী। তাদের কোনো যুবরাজও যদি অপরাধ করে, তাহলে তাঁকেও নিজের শরীয়াত অনুযায়ী দণ্ড দেয়।"

একথা শুনে রোমক সেনাপতি বললো, "যদি তারা সত্যিই এ ধরনের হয়, যেমন তুমি বর্ণনা করেছো, তাহলে তাদের মুকাবিলার পরিবর্তে মাটিতে দাফন হয়ে যাওয়াই উত্তম।" কিন্তু তখন যুদ্ধ থেকে বিরত থাকা রোমক সেনাপতির সাধ্যের বাইরে ছিলো। উভয় বাহিনীর মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হলো এবং রোমকদের শিক্ষণীয় পরাজয় ঘটলো। তাযারক এবং কাবকালা সমেত তাদের হাজার হাজার মানুষ লাশ হয়ে মাটিতে পড়ে রইলো।

এ যুদ্ধে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর ছোট ভাই হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আস বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন। তিনি এক অপরিসর ঘাঁটিতে শহীদ হয়ে পড়ে গেলেন। ফলে মুসলমানদের অগ্রগামী কদম থমকে দাঁড়ালো। কেননা তাঁর লাশের ওপর দিয়ে ঘোড়া অতিক্রম করা ছাড়া ঘাঁটির বিপরীত দিকে যুদ্ধরত মুসলমানদের সাহায্য করা সম্ভব ছিলো না। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু এ পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে মুসলমানরা ! হিশামের রূহ আল্লাহর কাছে পৌঁছে গেছে। এখানে শুধু তার মাটির দেহ অবশিষ্ট রয়েছে। এ দেহের জন্য অন্যান্য মুসলমানের জীবনকে আশংকায় নিক্ষেপ করো না।"

একথা বলেই তিনি স্বয়ং ঘোড়া অগ্রসর করলেন এবং হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহুর লাশের ওপর দিয়ে অতিক্রম করে চলে গেলেন। অন্যান্য মুজাহিদরাও তাঁর অনুসরণ করলো। এভাবে হক পথের শহীদ হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহুর লাশ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো। যুদ্ধ শেষে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু খণ্ড-বিখণ্ড দেহকে বস্তায় ভরে দাফন করলেন। সহোদরের শাহাদাতের ঘটনা হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর স্মৃতিপটে সবসময় জাগরুক ছিলো। তিনি বলতেন, আমরা উভয়েই সারারাত ধরে শাহাদাতের জন্যে দোয়া করেছিলাম। ভোর হলে হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহুর দোয়া কবুল হয়ে গেলো এবং আমার দোয়া কবুল হলো না। এভাবেই হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহু আমার ওপর অগ্রাধিকার পেলো।

আজনাদাইন যুদ্ধের পর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস ও হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল জাররাহ হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদের বড় বাহিনীতে যোগদান করেন। এ বাহিনীতে তাঁর একজন অফিসারের মর্যাদা ছিলো। বাহিনীর সামনে অগ্রসর হয়ে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক অবরোধ করলো। শহরের বড় বড় দরযায় পৃথক পৃথক অফিসার মোতায়েন করা হলো।

আল্লামা বালাজুরী (র) বলেছেন, হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস, 'বাবে তুমাতে' মোতায়েন ছিলেন। তিনি রোমকদের ওপর অব্যাহতভাবে চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। এ অবরোধ কয়েক মাস চলেছিলো। এ সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু ইন্তেকাল করেন এবং হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু খেলাফতের দায়িত্ব পান। তিনিও এ অভিযান অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিলেন। অবশেষে মুসলমানদের বিজয় ঘটলো এবং তারা শহর দখল করে নিলো।

দামেস্ক বিজয়ের পর মুসলমানরা ফাহাল ও বিসানের অভিযানে রোমকদেরকে শিক্ষণীয়ভাবে পরাজিত করলো। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু এসব অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। উপর্যুপরি পরাজয়ে রোমকরা চমকে উঠলো। বস্তুত তারা ইন্তাকিয়াতে বিরাট বাহিনী একত্রিত করে মুসলমানদেরকে সিরিয়া থেকে বহিষ্কারের শপথ নিলো। এ বাহিনীতে প্রায় দু' লাখ অভিজ্ঞ সিপাহী এবং অফিসার অন্তর্ভুক্ত ছিলো। মুসলমানদের নির্মূল করার লক্ষ্যে তারা ইন্তাকিয়া থেকে রওয়ানা হলো। মুসলমানরাও এ সময় সিদ্ধান্ত নিলো যে, দখলকৃত শহরগুলো থেকে সৈন্য অপসারণ করে সম্মিলিতভাবে রোমকদের মুকাবিলা করতে হবে। সুতরাং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করা হলো। এ সময় তাঁরা অত্যাশ্চর্যজনক পন্থা অবলম্বন করলেন। দামেস্ক

এবং হিমস প্রভৃতি শহর ছেড়ে দেয়ার সময় তাঁরা জিযিয়ার অর্থ ফিরিয়ে দিলেন। তাঁরা সেখানকার বাসিন্দাদেরকে বললেন যে, এখন আর তাদের নিরাপত্তা দান সম্ভব নয়।

বর্ণিত আছে যে, মুসলমানদের এ পদক্ষেপ শহরবাসীদের ওপর হৃদয়গ্রাহী প্রভাব ফেলেছিলো। মুসলমানদের প্রস্থানে তারা কেঁদে কেঁদে দোয়া করেছিলো যে, খোদা, তুমি তাদেরকে পুনরায় ফিরিয়ে এনো।

মুসলমান মুজাহিদরা সিরিয়ার শহরসমূহ থেকে বের হয়ে ইয়ারমুক পৌছলেন। সেখানে পৌছে ইয়ারমুক নদীর তীরে খোলা ময়দানে তাঁবু ফেললেন। দু' লাখ রোমকদের মুকাবিলায় তাদের সংখ্যা ছিলো সব মিলিয়ে ৪০ থেকে ৫০ হাজার। কিন্তু তাদের উদ্দীপনা ছিলো তুঙ্গে। প্রথমে দু' পক্ষের দূতদের গমনাগমন চললো। রোমকদের ধারণা ছিলো যে, মুসলমানরা অর্থ কড়ি নিয়ে ফিরে যাবে। মুসলমানরা এ প্রস্তাবে কোনোক্রমেই রাজী হলো না। সর্বশেষ উভয় পক্ষের সৈন্যরা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লো। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস এ যুদ্ধে ইসলামী বাহিনীর দক্ষিণ দিকের কমাণ্ডার ছিলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে কয়েক দফা রক্তাক্ত সংঘর্ষ সংঘটিত হলো। উভয় পক্ষই প্রচণ্ডভাবে হামলা পরিচালনা করলো। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস প্রতিটি সংঘর্ষে বাহাদুরীর চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন। তিনি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে সৈন্যদের মধ্যে আগুন লাগিয়ে দিতেন। দু' একবার রোমকরা মুসলমানদের পেছনে ঠেলতে ঠেলতে মহিলাদের তাঁবু পর্যন্ত পৌছে গেলো। কিন্তু ইসলামের মর্যাদাশীল কন্যারা তাঁবুর খুঁটি উঠিয়ে প্রত্যাঘাত হেনে রোমকদের ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এবং পশ্চাদ পদ মুসলমানদেরকে লজ্জা দিয়ে যুদ্ধের ময়দানে ফিরে যেতে বাধ্য করেছিলেন।

মুসলমানরাও কয়েকবার জীবন বাজী রেখে হামলা চালালেন। কিন্তু রোকমরা তাদেরকে হটিয়ে দিলো। শেষে মুসলমানদের অটলতা এবং জীবন বাজী কাজে লাগলো। মুসলমানদের বাহিনীর এক অংশ যুদ্ধের শেষ দিকে বিদ্যুৎ বেগে রোমকদের পেছন দিক থেকে হামলা করে বসলো। ফলে তাদের ব্যূহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো। তাদের অর্ধেক সৈন্য যুদ্ধের ময়দানে পড়ে থাকলেও বাকী অর্ধেক জীবিত অবস্থায় পলায়ন করলো।

দামেস্ক বিজয়ের পূর্বে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস ফিলিস্তিনের কিছু অংশ পরাভূত করেছিলেন। অতপর তাঁকে দামেস্ক, ফাহাল এবং ইয়ারমুক প্রভৃতি যুদ্ধে অংশ নিতে হয়। এজন্যে যে বিশেষ অভিযানে তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছিলো তা অসমাপ্ত রয়ে যায়। ইয়ারমুক যুদ্ধের পর তিনি

আবার সেদিকে খেয়াল দিলেন এবং গাজাহ, নাবলুস, লুদ, বাইতে হাবারাইন ও আমওয়াছ প্রভৃতি একের পর এক জয় করে বায়তুল মুকাদ্দাস ছাড়া সমগ্র ফিলিস্তিনকে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করলেন। এখন তিনি রোমক সেনাপতি আরতাবুনকে পত্র লিখে জানালেন যে, বাইতুল মুকাদ্দাস আমাদের হাওয়ালা করে দাও এবং এ পবিত্র শহরে রক্ত বইতে দিও না। কিন্তু আরতাবুন এর অত্যন্ত অপমানজনক জবাব দিলেন এবং বললেন যে, আমর ইবনুল আসকে এ যমীনের ক্ষুদ্রতম অংশও আর দখল করতে দেয়া হবে না। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস অগ্রসর হয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস অবরোধ করলেন। ইসলামী বাহিনীর সেনাপতি হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল জাররাহও কানসারীনের অভিযান শেষ করে বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছে গেলেন। কথিত আছে যে, রোমক সেনাপতি আরতাবুন নিজের বাহিনী নিয়ে মিসর চলে গিয়েছিলো। এজন্যে বাইতুল মুকাদ্দাসে বেশী সৈন্য ছিলো না। বস্তুত বাইতুল মুকাদ্দাসবাসীরা খুব তাড়াতাড়ি হিম্মত হারিয়ে ফেললো এবং শর্ত সাপেক্ষে বিনা বাধায় মুসলমানদের হাতে শহর পত্যার্পণের ইচ্ছা ব্যক্ত করলো। শর্তে মুসলমানদের খলিফা সেখানে গিয়ে তাদের সাথে লিখিত সন্ধিনামায় স্বাক্ষর দানের কথা বলা হয়েছিলো। আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বিষয়টি অবহিত করা হলো। তিনি এ শর্ত কবুল করে নিলেন এবং কতিপয় আনসার ও মুহাজিরসহ বাইতুল মুকাদ্দাস গমন করলেন। সেখানে খৃষ্টানদের ইচ্ছানুযায়ী সন্ধিপত্র লিখে তাদের হাওয়ালা করা হলো। এভাবে এ পবিত্র শহর কোনো রক্তারক্তি ছাড়াই মুসলমানদের দখলে এলো এবং ফিলিস্তিন সহ সমগ্র সিরিয়া মুসলমানদের করতলগত হলো।

কিছুদিন পর সিরিয়ায় মহামারী আকারে প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়লো। এ প্লেগ 'তাউনে আমওয়াছ' নামে খ্যাত। সিরিয়ার গভর্নর হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল জাররাহ এবং হাজার হাজার মুসলমান এ মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন। ওফাতের পূর্বে হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল জাররাহ হযরত মায়াজ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জাবাল আনসারীকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করলেন। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস তাঁকে সেখান থেকে সৈন্য অপসারণের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তিনি এ পরামর্শ মানলেন না এবং নিজেও প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। তাঁর ওফাতের পর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস প্লেগ আক্রান্ত স্থানসমূহ থেকে সৈন্য অপসারণ করে পাহাড়ী এলাকায় নিয়ে গেলেন। এভাবে তারা মহামারী থেকে রক্ষা পেলো।

সিরিয়ার জিহাদের পর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসের জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হয়। আর এ অধ্যায়েই তিনি বিশ্বের প্রখ্যাত

বিজেতার কাতারে আবির্ভূত হন। এ সময় তিনি শুধুমাত্র বিস্তীর্ণ সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা মিসরের ওপরই ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেননি বরং ইসলামী বিজয়কে পশ্চিমে ত্রিপোলী পর্যন্ত পৌঁছে দেন। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস মিসরে কেন হামলা চালিয়ে ছিলেন ? এ প্রসঙ্গে তিন ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রথম বর্ণনা হলো, মিসর রোমের কাইসারের কর দিতো। সিরিয়া মুসলমানদের করতলগত হওয়ার পর কাইসারের মিসরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়ার আশংকা ছিলো। অনেকেই বলেছেন সে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। দ্বিতীয় বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, মিসরীয়রা সিরিয়ায় প্রবেশ করে মুসলমানদের ওপর গেরিলা হামলা চালাচ্ছিলো। তৃতীয় বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস জাহেলী যুগে বাণিজ্য প্রসঙ্গে মিসর গিয়েছিলেন। তিনি সে দেশের সম্পদ ও শ্যামলিমা সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত ছিলেন। দেশটি ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হোক এটা তাঁর বাসনা ছিলো। আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর সিরিয়ায় শেষ সফরের সময় তিনি তার সাথে একাকীত্বে মিলিত হন এবং মিসরে সৈন্য প্রেরণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রথমে উল্লিখিত কারণের ভিত্তিতে অনুমতিদানের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করলেন। তিনি চিন্তা করে দেখলেন যে, সিরিয়া বিজয়ের পর ইসলামী বাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিশ্রামও নিতে পারেনি। দ্বিতীয় প্লেগে ২৫ হাজার মুসলমান মারা গেছেন এবং মুসলমানদের সামরিক শক্তি সন্তোষজনক ছিলো না। তৃতীয়ত দূর-দূরান্তের সফর ছিলো এবং রাস্তায়ও কয়েকটি বাধা ছিলো। চতুর্থত মিসরের গভর্নর মাকুকাসের সামরিক শক্তির সঠিক ধারণা ছিলো না। কিন্তু হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস বড় বাহাদুর এবং সাহসী পুরুষ ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে এত একাগ্রতা প্রকাশ করলেন যে, অবশেষে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে মিসরের দিকে অগ্রযাত্রার অনুমতি প্রদান করলেন। কিন্তু এজন্যে মাত্র ৪ হাজার সৈন্য পাওয়া গেলো।

১৮ হিজরীর শেষ দিকে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস সে সৈন্যসহ মিসরের দিকে অগ্রসর হলেন। সর্বপ্রথম ব্যাবিলন নামক স্থানে একটি মিসরীয় সৈন্যদল তাঁকে বাধা দিলো। কিন্তু হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁদেরকে পরাজিত করলেন। এরপর সামনে অগ্রসর হয়ে তিনি আল-আরিশ পৌঁছলেন। সেখানেই অবস্থান করছিলেন এমন সময় তিনি হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর পত্র পেলেন। পত্রে তিনি লিখেছিলেন যে, যদি মিসর সীমানায় প্রবেশ না করে থাকো, তাহলে ফিরে এসো। আর যদি প্রবেশ করে থাকো, তাহলে আল্লাহর ওপর ভরসা করে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখো। বস্তুত আল-আরিশ মিসরের সীমানার মধ্যে অবস্থিত। এজন্যে হযরত আমর

রাদিয়াল্লাহ আনহু পত্র পাঠ করে বললেন, আমরা তো মিসরের সীমানার মধ্যে এসে পড়েছি। মোটকথা আল-আরিশ থেকে সামনে এগিয়ে ফারমা পৌছলেন। ফারমা নীল নদের তীরে অবস্থিত একটি পুরাতন বড় শহর। শহরটি রক্ষার জন্যে একটি শক্তিশালী বাহিনী মোতায়েন ছিলো। তারা এক মাস পর্যন্ত মুসলমানদের মুকাবিলা করলো। কিন্তু অবশেষে পরাজিত হলো। এরপর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বিলবিস এবং উম্মে ওনিন প্রভৃতি স্থান জয় করতে করতে আইনে শামস পৌছে গেলেন। প্রাচীন যুগে এটি একটি বড় শহর ছিলো। কিন্তু সে সময় তা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো।

ঐতিহাসিক মাকরিজী বলেছেন, পরে এ স্থান দ্বিতীয়বার আবাদ হয়ে "ফুসতাত" নামে খ্যাত হয়। এ স্থানে দিগন্ত প্রসারিত ক্ষেত ও চারণভূমির মধ্যে একটি মযবুত দুর্গ ছিলো। এ দুর্গকে "কাসরে শামা' বলা হতো। এ দুর্গে সরকারী সৈন্য এবং মিসরের বড় বড় অফিসার বাস করতো। দুর্গটির নীচ দিয়ে প্রবাহিত হতো নীল নদ। জাহাজ এবং কিশতী এসে ভীড়তো দুর্গের দরজায়। এজন্যে স্থানটি ছিলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তা দখল করা ছাড়া মিসরের দিকে অগ্রসর হওয়া ছিলো কঠিন ও ভয়ের ব্যাপার। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস দুর্গটি অবরোধ করলেন। মিসরীয় বাহিনী অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে মুকাবিলা করলো। এক রাওয়ায়েতে আছে যে, স্বয়ং মাকুকাস দুর্গে পৌছে তা রক্ষায় ব্যাপৃত হয়েছিলো। অবরোধ দীর্ঘতর হলে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস খেলাফতের দরবারে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আওয়ামের নেতৃত্বে ১০ হাজার সৈন্য (অন্য রাওয়ায়েতে ১২ হাজার) প্রেরণ করলেন। এ বাহিনীর অন্যান্য কর্মকর্তা ছিলেন হযরত মিকদাদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসওয়াদ, হযরত উবাদা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ছামেত আনসারী এবং হযরত মাসলামাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মুখাল্লাদ আনসারী।

হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে লিখলেন, হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং এ তিন অফিসার এক এক হাজার অশ্বারোহীর সমান। হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহুর উঁচুমর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু অবরোধ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তাঁর ওপরই ন্যস্ত করলেন। তিনি পরিখার চারপাশে চক্কর দিলেন এবং বিশেষ বিশেষ স্থানে অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী মোতায়েন করলেন। সাথে সাথে কামানের সাহায্যে দুর্গের প্রাচীরের ওপর প্রচণ্ডভাবে পাথর বর্ষণ শুরু করলেন। কিন্তু এতসব ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও সাত মাসেও যখন দুর্গ জয় করা সম্ভব হলো না তখন একদিন মুসলমানদের ওপর কসম খেয়ে হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহ

আনহু নাঙ্গা তরবারী হাতে নিয়ে সিঁড়ির সাহায্যে দুর্গের প্রাচীরের ওপর চড়ে বসলেন। আরও কতিপয় মুজাহিদ তাঁর সাথী হলেন। তাঁরা প্রাচীরে চড়ে এতো উচ্চস্বরে নারায়ে তাকবির ধ্বনি উচ্চারণ করলেন যে, মিসরীয়রা হতচকিত হয়ে পড়লো। তারা মনে করলো মুসলমানরা বুঝি দুর্গের ভিতরে ঢুকে পড়েছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তারা এদিক ওদিক পালাতে থাকলো। ওদিকে হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রাচীরের ওপর থেকে নেমে দুর্গের দরজা খুলে দিলেন এবং সমগ্র ইসলামী বাহিনী ভেতরে প্রবেশ করলো। এ অবস্থা দেখে মিসরীয়রা অস্ত্র ফেলে দিয়ে সন্ধির আবেদন জানালো। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সাধারণ শর্তেই সন্ধি করলেন এবং সমগ্র দুর্গবাসীকেই নিরাপত্তা দিয়ে দিলেন। বালাজুরী (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফরমান অনুযায়ী ঐ এলাকার ভূমি জমিদারদের হাতেই ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো এবং ভূমির ওপর কর আরোপ করা হয়েছিলো।

কতিপয় ঐতিহাসিক এ ঘটনাবলী ব্যাবিলন পদানত করা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমরা তাবারী, বালাজুরী এবং মাকরিজীর (র) বর্ণনাসমূহকে প্রাধান্য দিয়েছি।

শামা দুর্গে কিছুদিন অবস্থানের পর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস আমীরুল মু'মিনীনের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে মিসরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর ইসকান্দারিয়ার দিকে অগ্রসর হলেন। পথিমধ্যে আশমুন, আলিয়া, কুম, মাফকু, ক্রিউন এবং অন্যান্য স্থানে মিসরীয় সৈন্যের সাথে ইসলামী বাহিনীর সংঘর্ষ হলো। কিন্তু প্রত্যেক স্থানেই তারা পরাজিত হয়ে পিছু হটে গেলো এবং হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে ইসকান্দারিয়ার প্রাচীরের কাছে পৌঁছে গেলেন। ইসকান্দারিয়াতে ৫০ হাজার রোমক সৈন্য মোতায়েন এবং একটি শক্তিশালী নৌবাহিনীও তাদের রক্ষায় নিয়োজিত ছিলো। শহরে অস্ত্র এবং রসদের বড় বড় ভাণ্ডার ছিলো। এজন্যে রোমকদের উদ্দীপনা ছিলো তুঙ্গে এবং তারা দুর্গ বন্ধ অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত মুকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলো। আল্লামা বালাজুরী (র) এবং মাকরিযী (র) বর্ণনা করেছেন, মাকুকাস মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে চাননি। কিন্তু প্রকাশ্যে যুদ্ধ থেকে সরেও পড়তে পারছিলো না। কেননা তাতে কাইসারের ক্রোধের শিকার হওয়ার আশংকা ছিলো। পক্ষান্তরে মাকুকাস একথাও বিশ্বাস করতো যে, যে মুসলমানরা সিরিয়া থেকে কাইসারকে বহিষ্কার করেছে অবশেষে তারা মিসরকেও পদানত করে ছাড়বে। সুতরাং সে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আসের সাথে গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। চুক্তিতে বলা হয় যে, এ যুদ্ধ তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হচ্ছে এবং তারা অনিচ্ছায়

তাতে অংশ নিচ্ছে। এজন্যে মুসলমানদের হাতে তার কাওমের (কিবতী) যেনো কোনো ক্ষতি না হয়, সে খেয়াল রাখতে হবে। মুসলমানরা বিজয়ী হয়ে গেলে শিশু, মহিলা এবং প্রতিবন্ধী ছাড়া প্রত্যেক কিবতী বাৎসরিক দু' দিনার করে জিযিয়া আদায় করবে এবং যেখানে মুসলমান বাহিনী গমন করবে কিবতীরা তাদের জন্যে সড়ক ও পুল মেরামত এবং খাদ্যের ব্যবস্থা করে দেবে। সর্বোপরি কিবতীরা মুসলমানদেরকে সার্বিকভাবে সাহায্য করবে।

বালাজুরী (র) বর্ণনা করেছেন, যুদ্ধের পূর্বে মাকুকাস শহরের সকল নারী-পুরুষকে সামরিক পোশাক পরিয়ে ইসকান্দারিয়ার প্রাচীরের ওপর দাঁড় করিয়ে দিলেন। যাতে তাদের সংখ্যাধিক্য দেখে মুসলমানরা ভীত হয়ে পড়ে। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু এ দৃশ্য দেখলেন এবং মাকুকাসকে বলে পাঠালেন যে, আমরা এতোদিন যত দেশ জয় করেছি তা সৈন্যের সংখ্যাধিক্যের শক্তিতে জয় করিনি। তোমাদের বাদশাহ হিরাক্লিয়াস কি ধরনের বিপুল সাজ-সরঞ্জামসহ আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলো তা তোমার জ্ঞাত থাকার কথা। আর সেই যুদ্ধের কি ফলাফল হয়েছিলো তাও তোমার জানা আছে। মাকুকাস এ পয়গাম পেয়ে ইস্কান্দারিয়াবাসীদেরকে তা অবহিত করালো এবং বললো সন্দেহাতীত-ভাবে এটা ঠিক যে, আরবরা আমাদের বাদশাহকে সিরিয়া থেকে বহিষ্কার করে কাসতানতুনিয়াতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলো। আমরা এ মুসলমানদের সামনে তো নস্যি সমতুল্য। এ কথায় রোকমরা অত্যন্ত উষ্মা প্রকাশ করলো এবং মাকুকাসকে খুব করে শুনিয়ে দিলো। মাকুকাস আপাততঃ চুপ হয়ে গেলো। যুদ্ধে কিবতীরা কোনো তৎপরতা প্রদর্শন করলো না। বরং যুদ্ধ থেকে বিরতই রইলো। এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী পর্দার অন্তরালে তারা মুসলমানদেরকে সাহায্যই করলো। (সড়ক পরিষ্কার এবং পুল মেরামতের কাজ)।

রোমকদের অহমিকা দেখে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস অত্যন্ত কঠোরতার সাথে ইসকান্দারিয়া অবরোধ করলেন। রোমকদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা খুব মজবুত ছিলো। এজন্যে তারা মুকাবিলা অব্যাহত রাখলো। সাধারণত তারা শহরের অভ্যন্তরেই থাকতো। তবে, কখনো কখনো তাদের কোনো দল শহর থেকে বের হয়ে মুসলমানদের সাথে এক হাত নিয়ে আসতো। একদিন এমনি এক সংঘর্ষে ১২জন মুসলমান শহীদ হয়ে গেলো। অন্য আরো একদিন রোমকরা এক মুসলমানকে শহীদ করে তাঁর মাথা কেটে নিজেদের সাথে নিয়ে গেলো। এর জবাবে মুসলমানরাও এক খৃষ্টানের মাথা কেটে নিলো এবং তাকে সেই সময় রোমকদের হাওয়ালা করলো যখন তারা শহীদ মুসলমানের মাথা ফিরিয়ে দিলো।

আরও এক ঘটনায় রোমকরা মুসলমানদের এক বিরাট সংখ্যককে শহীদ করে ফেললো। এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী এ সংখ্যা ছিলো ৪৩৬। তবে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস তৎক্ষণাৎ তার বদলা নিলেন এবং হামলাকারীদেরকে তছনছ করে ফেললেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিক লিখেছেন, রোমের কাইসার প্রচুর সাজ-সরঞ্জামসহ স্বয়ং ইসকান্দারিয়া গমনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। ঠিক এমনি সময়ে তার পরপারে যাত্রার ডাক এলো। তবুও ইসকান্দারিয়ায় মওজুদ রোমকরা অব্যাহতভাবে হামলা চালিয়ে যেতে লাগলো।

একদিন রোমকদের একটি দল শহর থেকে বেরিয়ে এলো। এ সময় তাদের মধ্যে থেকে জনৈক যুদ্ধবাজ সামনে অগ্রসর হয়ে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের আহ্বান জানালো। হযরত মাসলামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন মুখাল্লাদ তার মুখোমুখি হলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে তিনি ঘোড়ার ওপর থাকতে পারলেন না এবং রোমক ব্যক্তিটি তাকে মাটিতে ফেলে দিলেন। সে তাঁকে কতল করার জন্যে তলোয়ার উঠিয়েছিলো। এমন সময় একজন মুসলমান অশ্বারোহী বিদ্যুৎ বেগে সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁকে রক্ষা করলেন।

এ ঘটনা দেখে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন এবং অযাচিতভাবে বলে ফেললেন, "এ ধরনের নপুংসকদের যুদ্ধের ময়দানে আসার কি প্রয়োজন।" তাঁর কথা শুনে হযরত মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। কিন্তু তিনি খুব ধৈর্য্যের সাথে কাজ করলেন। ততক্ষণে সাধারণ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। মুসলমানরা বাঘের মত রোমকদের ওপর হামলা চালালো। হামলায় তিষ্টাতে না পেরে তারা পিছু হটতে হটতে দুর্গের ভেতরে গিয়ে আশ্রয় নিলো। মুসলমানরা তাদের পিছু নিলো। বহুক্ষণ ধরে দুর্গের অভ্যন্তরে যুদ্ধ চললো। অবশেষে রোমকরা সামলে নিয়ে এমন জবাবি হামলা পরিচালনা করলো যে, মুসলমানদেরকে দুর্গের বাইরে চলে আসতে হলো। অবশ্য চারজন মুজাহিদ দুর্গের অভ্যন্তরে রয়ে গেলেন। তাদের মধ্যে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস এবং হযরত মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন মুখাল্লাদও ছিলেন। কিন্তু রোমকরা তাঁদেরকে চিনতো না। তারা এ চারজনকে জীবিত গ্রেফতার করতে চাইলো। কিন্তু যখন দেখলো যে, তারা মরতে এবং মারতে প্রস্তুত এবং কোনোক্রমেই জীবিত ধরা দিতে রাজী নয় তখন তারা দ্বন্দ্ব যুদ্ধের প্রস্তাব দিলো। তারা আরো বললো যে, তোমাদের কেউ বিজয়ী হলে ছেড়ে দেয়া হবে।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস এ শর্ত মঞ্জুর করলেন এবং স্বয়ং একজন রোমক যুদ্ধবাজের সাথে মুকাবিলা করতে চাইলেন। কিন্তু হযরত মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আপনি সেনাবাহিনীর নেতা। খোদা

লাখাত্তা আপনার যদি ক্ষতি হয় তাহলে সৈন্যদের কি হবে। আপনি থাকুন। আমিই রোমককে মুকাবিলার জন্য গমন করছি। একথা বলেই তিনি ঘোড়া ছুটালেন এবং রোমক যুদ্ধবাজের সামনে গিয়ে পৌছলেন। উভয়েই দীর্ঘক্ষণ ধরে পরস্পরের বিরুদ্ধে তরবারী চালালেন। অবশেষে হযরত মাসলামা রাদিয়াল্লাহ আনহু এমন আঘাত হানলেন যে, রোমক ব্যক্তিটি মাটিতে লাশ হয়ে পড়ে গেলো। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রোমকরা দুর্গের দরজা খুলে দিলো এবং চারজনই বাইরে বেরিয়ে এলেন। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস হযরত মাসলামা রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাহাদুরীতে খুব প্রভাবিত হলেন এবং পূর্বেকার কথায় লজ্জা প্রকাশ করলেন ও ক্ষমা চাইলেন। তিনি সরল অন্তরে ক্ষমা করে দিলেন। এভাবেই বেশ কিছুদিন ধরে উভয় পক্ষের মধ্যে বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ চললো এবং অবরোধ দীর্ঘায়িত হতে থাকলো। এমনকি এ অবস্থায় দু' বছর কাটলো। এদিকে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু এ বিলম্বে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। বস্তুত তিনি হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে কঠোর ভাষায় এক চিঠি লিখলেন। তিনি বললেন, সম্ভবতঃ তোমরা সেখান থেকে রোমকদের মতই বিলাসী হয়ে গেছো। নচেৎ বিজয়ে এত দেরী হতো না। যেদিন আমার চিঠি পৌছবে সেদিন সকল সৈন্য একত্রিত করে জিহাদের ফযীলাত সম্বলিত ভাষণ দেবে এবং যে চার ব্যক্তিকে অফিসার বানিয়ে প্রেরণ করেছিলাম তারা যেনো শুক্রবার সূর্যাস্তের পর নিজেদের বাহিনী নিয়ে সিদ্ধান্তমূলক হামলা চালায়।

আমীরুল মু'মিনীনের নির্দেশ মুতাবিক হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস সকল সৈন্যকে একত্রিত করে জিহাদের ফযীলাত সম্বলিত আগুন ঝরা বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতা শুনে মুজাহিদরা যুদ্ধের জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত উবাদা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন সামেতকে ডেকে বললেন, আপনার বর্শা আমাকে দিন। অতপর নিজের মাথা থেকে পাগড়ী খুলে বর্শার সাথে বাধলেন এবং তা হযরত উবাদার হাতে সোপর্দ করে বললেন, এটা সেনাপতির ঝাণ্ডা। আজ আপনি সেনাপতি। এর সাথে হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আওয়াম হযরত মিকদাদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত মাসলামা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে স্ব স্ব বাহিনীর অফিসার নিয়োগ করলেন। এরপর মুজাহিদরা হযরত উবাদা রাদিয়াল্লাহ আনহুর নেতৃত্বে এমন প্রচণ্ড হামলা চালালেন যে, প্রথম হামলাতেই রোমকদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেলো এবং জলে ও স্থলে যে পথেই সুযোগ পেলো সে পথেই পলায়ন করলো। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস এক হাজার সৈন্য ইসকান্দারিয়াতে রেখে স্বয়ং মিসরের অভ্যন্তরে পলায়নরত রোমকদের পিছু নিলেন। এদিকে রোমকরা সুযোগ পেয়ে সমুদ্র পথে ইসকান্দারিয়াতে অবস্থানরত মুজাহিদদের ওপর হামলা করে বসলো। এ হামলায় বহু মুসলমান

শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ খবর পেয়ে পলায়ন পর রোমকদের পশ্চাদ্ধাবন পরিত্যাগ করে বিপরীত দিকে ছুটলেন এবং হামলাকারী রোমকদের পরাজিত করে ইসকান্দারিয়ার ওপর কব্জা মযবুত করলেন।

যদিও এ শহর তরবারীর মাধ্যমে বিজিত হয়েছিলো তবুও হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সাধারণ কোনো নাগরিককেই হত্যা অথবা গ্রেফতার করেননি। জিযিয়া এবং খিরাজ ধার্য করার পর তিনি সবাইকে নিরাপত্তা প্রদান করলেন।

অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে যে, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পত্র ইসকান্দারিয়া অবরোধের চার মাস পর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পেয়েছিলেন। পত্র প্রাপ্তির পর তিনি রোমকদের এমন চাপ প্রয়োগ করলেন যে, তারা সন্ধি করতে বাধ্য হলো। তবে সন্ধি পত্রে ১১ মাস পর শহর মুসলমানদের হাতে হস্তান্তরের শর্ত আরোপ করা হয়েছিলো। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রক্তারক্তির হাত থেকে বাঁচার জন্য এ শর্ত মেনে নিয়েছিলেন এবং ১১ মাস অতিবাহিত হওয়ার পর শহর দখল করেন।

পরিস্থিতি যাই হোক ইসকান্দারিয়া পতনের পর মিসরের অন্যান্য শহরে অবস্থানরত রোমকরা হিম্মতহারা হয়ে পড়লো। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস এসব শহর করতলগত করার জন্য হযরত উমায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন ওয়াহাব, হযরত উকবা রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন আমের জাহনী এবং হযরত খারেজা রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন হাজাফার নেতৃত্বে বিভিন্ন দিকে সৈন্য প্রেরণ করলেন। কোনো কোনো স্থানে রোমকরা বাধা দিলো। কিন্তু অবশেষে অস্ত্র সমর্পণ করলো। এভাবে সমগ্র মিসর মুসলমানদের করতলগত হলো। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস মুয়াবিয়া বিন খুদাইজের মাধ্যমে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মিসর বিজয়ের সুসংবাদ প্রেরণ করলেন। এ সুসংবাদ প্রাপ্তির সাথে সাথে তিনি রাব্বুল ইজ্জাতের দরবারে সিজদাবনত হলেন। অতপর সমগ্র মদীনাবাসীকে একত্রিত করে এ সুসংবাদ শুনালেন।

মিসর পদানত করার পর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস বারকার দিকে অগ্রসর হলেন। বারকা ছিলো ইসকান্দারিয়া এবং পশ্চিম ত্রিপোলীর মধ্যে এক শ্যামলিমাময় পূর্ণ আবাসিক এলাকা। স্থানটি মিসরের সীমানার বাইরে ছিলো। কিন্তু এর বাসিন্দারা মিসরকে কর প্রদান করতো। বস্তুত এটাকে মিসরের করদরাজ্য বলা চলে। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস বারকা প্রবেশ করে সেখানকার গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন্দ্রীয় শহর ইস্তাবলিস অবরোধ করলেন। শহরবাসীরা অবিলম্বে আনুগত্য কবুল করে নিলো। এবং বার্ষিক ১৩ হাজার দিনার জিযিয়া প্রদানের প্রতিশ্রুতি পত্র লিখে দিলো।

বারকা বিজয়ের পর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু উকবাহ বিন নাফে রাদিয়াল্লাহ আনহুকে জাবিলা প্রেরণ করলেন। এটি ছিলো সুদানের সীমান্তবর্তী শহর। জাবিলাবাসীরা কোনো বাধা ছাড়াই জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়ে গেলো। এরপর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু পশ্চিম ত্রিপোলীর দিকে অগ্রসর হলেন। রোম সাগরের তীরবর্তী আফ্রিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিলো এটি। মুসলমানদের আগমনের সংবাদ পেয়ে ত্রিপোলীবাসী দুর্গের দরযা বন্ধ করে বসে পড়লো। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু শহরের পূর্ব প্রান্তে তাঁবু ফেললেন এবং অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তা অবরোধ করলেন। দু' মাস পর্যন্ত অবরোধ অব্যাহত থাকলো। কিন্তু শহরে প্রবেশের কোনো পথ পাওয়া গেলো না। একদিন কতিপয় মুসলমান শিকারে গেলেন। ঘটনাক্রমে তারা একটি শুকনো রাস্তা দেখতে পেলেন। সমুদ্রের পানি নেমে যাওয়ার কারণে এ রাস্তা তৈরি ছিলো। তাঁরা এও দেখতে পেলেন যে, শহর এবং সমুদ্রের মধ্যে কোনো প্রাচীর বা অন্য কোনো বাধা নেই। ফিরে এসে তারা যা দেখেছিলেন তা হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে অবহিত করলেন। তাঁরা কালবিলম্ব না করে সে রাস্তা দিয়ে শহরের ওপর হামলা করে বসলেন। এ হঠাৎ আক্রমণে শহরবাসী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো এবং নামমাত্র বাধাদানের পর অস্ত্র সমর্পণ করলো।

ত্রিপোলী করতলগত করার পর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস সেখানেই রইলেন এবং একদল সৈন্য সাবরাহ রওয়ানা করলেন। ত্রিপোলীর অদূরে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিলো। সাবরাবাসী ত্রিপোলীর ঘটনা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত ছিলো না। এজন্যে শহরের ফটক খুলে নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তায় কাজ-কর্মে ব্যস্ত ছিলো। মুসলমানরা হঠাৎ করে আক্রমণ করে শহরে প্রবেশ করলো। সাবরাবাসী আর তাদের মুকাবিলা করার সাহস পেলো না। তারা তৎক্ষণাৎ আনুগত্য স্বীকার করে নিলো।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস লাখ লাখ বর্গমাইলের ওপর ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডীন করেছিলেন। তিনি তখন ইসকান্দারিয়া থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে এমন এক স্থানে অবস্থান করছিলেন যেখানে সফর করা ছিলো খুব কঠিন ব্যাপার। কিন্তু তাঁর আশা ছিলো প্রচুর। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো আফ্রিকার তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া এবং মরক্কোর প্রতি। তিনি হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে পত্র লিখলেন। পত্রে তিনি জানালেন, আমরা ত্রিপোলী পর্যন্ত জয় করে নিয়েছি। এখান থেকে আফ্রিকার সীমান্ত ৯ দিনের পথ। অনুমতি প্রদান করলে আমরা উত্তর আফ্রিকার দিকে অগ্রসর হতে পারি। আমীরুল মু'মিনীন জবাবে লিখলেন ঃ

"আফ্রিকায় পা রেখো না। সে দেশ বিবাদ-বিসম্বাদ এবং অরাজকতার কেন্দ্রবিন্দু। সেখানকার মানুষ কখনো ঐক্যবদ্ধ থাকে না। সেখানকার পানি কঠিন হৃদয় বানিয়ে দেয়। যে তা পান করবে তার অন্তরই কঠিন হয়ে যাবে।"

এ সাথেই হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে মিসরের গভর্নর নিয়োগ করলেন। মুসলমানদের ইসকান্দারিয়া দখলের পর বহুসংখ্যক রোমক নিজেদের ঘর-বাড়ী পরিত্যাগ করে সমুদ্র পথে কাইসারের সাম্রাজ্যে পাড়ি জমায়। মুসলমানরা সেখানে বহু-সংখ্যক বাড়ী, হাবেলী এবং মহল পরিত্যক্ত অবস্থায় পেলো। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ইসকান্দারিয়াকে রাজধানী বানানোর অভিপ্রায় ব্যক্ত করে পত্র লিখলেন। কেননা সেখানে বসবাসের সুন্দর ব্যবস্থা ছিলো। কিন্তু তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন না। তিনি লিখলেন ঃ

"মুসলমান গাজীদেরকে এমন স্থানে বসতিস্থাপন আমি উপযুক্ত মনে করি না যেখানে শীত গ্রীষ্মে কোনো নদী বাধা হয়ে দাঁড়ায়।"

এরপর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস "ফুসতাত" নামক এক নতুন শহরের পত্তন করলেন এবং সেখানেই রাজধানী বানালেন।

এ শহর পত্তনের বিস্তারিত বিবরণ আল্লামা শিবলী নোমানী "আল ফারুক" গ্রন্থে এভাবে দিয়েছেন ঃ

"আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস ইসকান্দারিয়া থেকে রওয়ানা হয়ে কাসরে শামাতে এলেন। এখানে তাঁর সে তাঁবু তেমনিভাবে দণ্ডায়মান ছিলো যা তিনি ইসকান্দারিয়া অভিযানের সময় শূন্য অবস্থায় পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন। বস্তুত তিনি সে তাঁবুতেই অবতরণ করলেন এবং সেখানেই নতুন জনবসতির গোড়াপত্তন করলেন। প্রত্যেক গোত্রের জন্য পৃথক পৃথক সীমানা নির্ধারণ করলেন। মুয়াবিয়া বিন খাদিজ, শুরাইক রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ছামী, আমর বিন মাখজুম এবং ইবনে নাশেরকে যথাযথ স্থানে প্রত্যেক গোত্রকে আবাদ করার দায়িত্ব দিলেন। যত মহল্লা সে সময় ছিলো এবং যেসব গোত্র তাঁতে বসতিস্থাপন করেছিলো তাঁর নাম আল্লামা মাকরিজী বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। বিশেষ ব্যবস্থাপনায় জামে মসজিদ তৈরি করা হয়। সাধারণভাবে বর্ণিত আছে যে, ৮০জন সাহাবী একত্রিত হয়ে মসজিদের কেবলা নির্ধারণ করেন। এসব সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুর মধ্যে যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু, মিকদাদ রাদিয়াল্লাহ আনহু, উবাদা রাদিয়াল্লাহ আনহু, আবু দারদা রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রমুখ প্রখ্যাত ব্যক্তিরা ছিলেন। এ মসজিদ ৫০ গজ লম্বা এবং ৩০ গজ

চওড়া ছিলো। মসজিদটির তিন দিকে দরজা ছিলো। এর একটি ছিলো রাজধানীর দিকে। রাজধানী ও মসজিদের দূরত্ব ছিলো সাত গজ। আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর জন্য একটি বাড়ী বিশেষভাবে তৈরি করেছিলেন। কিন্তু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু লিখে পাঠালেন যে, এ বাড়ী তাঁর জন্য কি প্রয়োজনে আসবে ? ফলে সে বাড়ী বাজারে রূপান্তর করা হলো। যেহেতু শহরটির বসতি তাঁবুর কাছ থেকে শুরু হয়েছিলো। এজন্য নামককরণ করা হয় ফুসতাত। আরবীতে ফুসতাত শব্দের অর্থ হলো তাঁবু। ২১ হিজরীতে শহরটির গোড়া পত্তন হয়। অবিলম্বে ফুসতাতের উন্নয়ন ঘটলো এবং ইসকান্দারিয়ার পরিবর্তে তা মিসরের রাজধানীতে পরিণত হলো।"

ফুসতাতের নির্মাণ কাজ শুরু হলো। এ সময় আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস নীল নদের পশ্চিমে তীর (ফুসতাতের সামনা সামনি) একটি সামরিক ছাউনি তৈরি করলেন। এ ছাউনীতে হামির, হামদান, আলে রাইন, ইযদ বিন হাজার গোত্র এবং হাবশার কতিপয় ব্যক্তিকে রাখা হলো। মুসলমানদেরকে ফুসতাত নগরী নির্মাণের কাজে ব্যাপৃতদের পশ্চিম দিক থেকে কোনো শত্রু নদীর দিক থেকে যাতে হামলা করে বসতে না পারে, সে জন্যই এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিলো। নতুন শহরে বসতিস্থাপনের পর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ঐসব গোত্রকে ফুসতাতে ডেকে আবাদ করতে চাইলেন। কিন্তু নদীর পশ্চিম তীর তাদের এত পসন্দ হয়েছিলো, যে তারা তা পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলো না। এ ছাউনীর নাম দেয়া হয়েছিলো জানিরাহ। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু একথা জানতে পেরে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে এ চিঠি লিখলেন ঃ

"সৈন্য বাহিনী থেকে পৃথক থাকাটা তুমি কিভাবে মেনে নিলে। উপরন্তু তোমার এবং তাদের মধ্যে নদী বিদ্যমান। হঠাৎ করে যদি তাদের ওপর কোনো মুসিবত আপতিত হয়, তাহলে সম্ভবতঃ তুমি কোনো সাহায্য করতে পারবে না। ফলে তাদের ক্ষতি হবে। অতএব, তুমি তাদেরকে ফুসতাত ডেকে নাও। যদি তারা এতে সম্মত না হয়, তাহলে সরকারী অর্থে তাদের বস্তির চারপাশে একটি দুর্গ বানিয়ে দাও।"

সুতরাং হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু সেখানে একটি দুর্গ বানিয়ে দিলেন। কিন্তু হামদান এবং অন্যান্য গোত্রের কিছু লোক বললো যে, তারা কাপুরুষের মত দুর্গে থাকতে চায় না। তাদের দুর্গ হলো তাদের তরবারী। বস্তুত এসব লোক দুর্গের বাইরে খোলা ময়দানে বসতিস্থাপন করলো এবং স্থায়ীভাবে সেখানে রয়ে গেলো। শীঘ্রই সেখানে একটি নয়নাভিরাম শহর হয়ে গেলো। শহরটি বাগানে ঘিরে রেখেছিলো।

ফুসতাতে বসতিস্থাপনের পর মিসরের সাবেক গভর্নর মাকুকাস হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে একটি আবেদন জানালো। আবেদনে মাকতাম পাহাড়ের সন্নিহিত অনাবাদযোগ্য জমি তার কাছে বিক্রি করার প্রস্তাব করা হলো। এজন্যে ৭০ হাজার দিনার দেয়ার প্রস্তুতির কথাও সে অবহিত করলো। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, মিসরের মাটি সকল মুসলমানের মালিকানাধীন। তার কোনো অংশই বিক্রয়যোগ্য নয়। তবুও আমি আমীরুল মু'মিনীনকে লিখছি। তিনি অনুমতি দিলে তোমার কাছে তা বিক্রি করে দেবো।

বিষয়টি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পৌছলে তিনি বললেন ঃ

"মাকুকাসকে জিজ্ঞেস করো যে, সে এ নাকাহরা জমির এতো মূল্য দিতে চায় কেনো। এ জমিতে না আছে পানি, না তা আবাদযোগ্য।"

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস মাকুকাসকে যখন একথা জিজ্ঞেস করলেন, তখন সে বললো, তাদের কিতাবে লেখা আছে যে, এখানে জান্নাতের চারা লাগানো হবে (অর্থাৎ খৃষ্টানদের সমাধিস্থল হবে)। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এ জবাব অবহিত করা হলো। তিনি লিখলেন ঃ

"মুসলমান ছাড়া জান্নাতের চারা আর কে হতে পারে তা আমার বোধগম্য নয়। অতএব যেসব মুসলমান ফুসতাতে মৃত্যুবরণ করবে তাদেরকে মাকতামের সন্নিহিত স্থানে দাফন করবে। কোনো মূল্যেই এ জমি বিক্রি করবে না। (হাসানুল মাহাজিরাহ লিস সুয়ূতী)।

হযরত ওমর ফারুক সকল গভর্নরকে প্রত্যেক বছর হজ্জের সময় হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি সকল গভর্নরের উপস্থিতিতে সাধারণ্যে ঘোষণা করতেন যে, কারোর কোনো গভর্নরের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তা পেশ করো।

এ ধরনের এক সমাবেশে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন ঃ "মানুষেরা ! আমি তোমাদের ওপর যাদেরকে গভর্নর বানিয়ে প্রেরণ করি তাদের এ অধিকার দেইনি যে, তারা তোমাদের থাপ্পর মারবে অথবা তোমাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেবে। বরং তারা তোমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরিকা শিক্ষা দেবে। যদি কোনো গভর্নর অথবা হাকিম এর বিপরীত কিছু করে থাকে তাহলে নির্দ্বিধায় উঠে দাঁড়িয়ে বর্ণনা করো। যাতে আমি তার তদারক করতে পারি।"

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আসও সে সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, আমীরুল মুমিনীন ! কোনো গভর্নর যদি কাউকে আদব

শিক্ষার্থে মারে তাহলেও কি আপনি তার মুহাসিবা করবেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, আল্লাহর কসম ! আমি তাকেও শাস্তিদান করবো। কেননা আমি স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন করতে দেখেছি। সাবধান ! মুসলমানদের মেরো না। তাহলে তারা অপদস্থ হবে। তাদের অধিকার নষ্ট করো না। তাহলে তারা নিয়ামতের অস্বীকৃতি জানাবে।

একবার যথারীতি সকল গভর্নর উপস্থিত ছিলেন। এক মিসরী উঠে অভিযোগ করলো যে, গভর্নর বিনা অপরাধে আমাকে একশ' দোররা মেরেছেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু মিসরীকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমিও কি কিসাস হিসেবে একশ' দোররা মারতে চাও ? সে বললো, অবশ্যই। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, তুমি সাধারণ্যে গভর্নরকে একশ' দোররা মারতে পারো।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস আরজ করলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! এ কাজ গভর্নররা খুব কঠিন বলে বিবেচনা করবে এবং ভবিষ্যতের জন্য এটা একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এভাবে দেশের আইন-শৃংখলা বিধান মুশকিল হয়ে পড়বে।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, "ফরিয়াদকারীর ফরিয়াদের বিহিত করবো না ; এটা হতে পারে না।"

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস ফরিয়াদকারীকে এ শর্তে রাজী করালেন যে, সে প্রতি দোররার পরিবর্তে একটি করে আশরাফী নেবে এবং অভিযোগ প্রত্যাহার করে কিসাসের দাবী ছেড়ে দেবে।

একবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে এ মর্মে অভিযোগ গেলো যে, হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর পুত্র মুহাম্মদ বিন আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ঘোড়া দৌড়ের মাঠে এক মিসরীকে এ বলে প্রহার করেছে যে, সে শরীফদের পুত্রদের মুখে মুখে কথা বলে। অন্য এক রাওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, একজন সম্ভ্রান্ত পিতার পুত্র উপরিউক্ত কথা বলে দোররা মেরেছিলো।

হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু অভিযোগকারীকে নিজের কাছে রাখলেন এবং হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও মুহাম্মদ বিন আমরকে মিসর থেকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা হাজির হলে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু মিসরীকে ডেকে হাতে দোররা দিলেন এবং বললেন, "এ দোররা দিয়ে সম্ভ্রান্ত পিতার পুত্রের খবর নাও।" মিসরী মুহাম্মদ বিন আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওপর দোররা বর্ষণ শুরু করলো। এ সময় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ

আনহু অব্যাহতভাবে বলতে লাগলেন, "হ্যাঁ ! সম্ভ্রান্ত পিতার পুত্রকে বেত্রাঘাত করো।"

মারা শেষ হলে যখন সে দোররা হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ফিরিয়ে দিচ্ছিলো তখন তিনি হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন ঃ "দু' একটি বেত তার ওপরও বর্ষণ করো। কেননা তার ক্ষমতার কারণেই তার পুত্র তোমাকে বেত্রাঘাতের সাহস পেয়েছে।"

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস আরজ করলেন, আমীরুল মু'মিনীন ! ইনসাফের হক আদায় হয়ে গেছে।"

মিসরীও বললো, "আমীরুল মু'মিনীন ! আমার ওপর যে ব্যক্তি যুলুম করেছিলো তার প্রতিশোধ আমি নিয়ে নিয়েছি। এর চেয়ে বেশী আর আমার প্রয়োজন নেই।"

হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন ঃ তোমার ইচ্ছা। নচেৎ তুমি যদি তাকে মারতে চাইতে, তাহলে আমি তোমাকে বাধা দিতাম না।"

এরপর তিনি হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস এবং তাঁর পুত্র উভয়কেই সম্বোধন করে বললেন ঃ

"তোমরা তাদেরকে কবে থেকে গোলাম বানিয়ে নিয়েছো। প্রকৃতপক্ষে তাদের মায়েরা তাদেরকে স্বাধীন হিসেবে জন্ম দিয়েছিলো।"

মিসরে অবস্থানরত হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর পুত্র হযরত আবদুর রহমান একবার মদ পান করার মতো পদস্খলন করে বসলেন। সম্বিত ফিরে পেয়ে খুব লজ্জিত হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর খিদমতে উপস্থিত হয়ে নিজের গোনার কথা স্বীকার করলেন এবং তাঁর ওপর হদ জারীর আবেদন জানালেন। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস তাঁকে খুব করে তিরস্কার করলেন এবং প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু তিনি তাঁর শাস্তি বিধানের জন্য জিদ করতে লাগলেন। এমনকি তিনি এও বললেন যে, শাস্তি দেয়া না হলে তিনি আমীরুল মু'মিনীন রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে (নিজের পিতা) অভিযোগ করবেন। তাঁর কথা শুনে তিনি ভীত হয়ে পড়লেন। সত্যিই যদি তিনি অভিযোগ করেন, তাহলে আমীরুল মু'মিনীনের ক্রোধ তাঁর ওপর আপতিত হবে। সুতরাং তিনি নিজের বাড়ীর আঙ্গিনায় ডেকে নিয়ে তাঁর ওপর হদ জারী করলেন এবং বাড়ীর এক প্রকোষ্ঠে নিয়ে গিয়ে মস্তক মুণ্ডন করালেন। কোনো মাধ্যমে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু এ ঘটনার খবর পেয়ে তাঁকে ক্রোধসম্বলিত এ পত্র প্রেরণ করলেন ঃ

"আমীরুল মু'মিনীন আবদুল্লাহ ওমরের তরফ থেকে আস বিন আসির নামে—হে ইবনে আসেম ! তোমার সাহস এবং প্রতিশ্রুতি পালন না করার ব্যাপারে আমি আশ্চর্য হচ্ছি। আমি মনে করি তুমি বরখাস্ত বা অপাসরণের যোগ্য শাস্তি প্রাপ্তির কাজ করেছো। তুমি আবদুর রহমানের ওপর নিজের বাড়ীর অভ্যন্তরে হত জারী এবং সেখানেই তার মস্তক মুণ্ডন করেছ। অথচ তুমি ভালোভাবেই জানো যে, এ ধরনের সুবিধা প্রদান আমার নীতি বিরোধী। আবদুর রহমান তোমার অধীনস্ত এক ব্যক্তি ছিলো। এজন্য অন্যের সাথে যে ব্যবহার কর সেই ব্যবহারেই তার সাথে করাও তোমার জন্য প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু আমীরুল মু'মিনীনের পুত্র হওয়ার কারণে তাকে তুমি সুবিধা দিয়েছো। তুমি অবহিত আছ যে, হকের প্রশ্নে আমি কাউকে কোনো খাতির করি না। এখন আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি যে, আমার পত্র প্রাপ্তির পরই কষ্টকর ছোট হাওদাজে চড়িয়ে তাকে মদীনা পাঠিয়ে দেবে। যাতে আমি তাকে যথাযথ শাস্তি দিতে পারি।"

আমি এ পত্রের জবাবে একটি পত্র লিখলাম। তাতে আমি আমার ভুল স্বীকার করলাম এবং আমীরুল মু'মিনীনের কাছে ক্ষমা চাইলাম। এ পত্র আমি হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর হাতে প্রেরণ করলাম এবং তার সাথেই আবদুর রহমানকে রাদিয়াল্লাহ আন রওয়ানা করলাম।

বস্তুত আমিরুল মু'মিনীন রাদিয়াল্লাহ আনহুর নির্দেশ মুতাবিক আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ আনহুকে শুধু মাত্র কাঠির ওপর বসিয়ে পাঠানো হয়েছিলো। এজন্যে মদীনা পৌছতে পৌছতে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। হযরত আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ আন বিন আওফ সুপারিশ করে বললেন যে, আমীরুল মু'মিনীন ! তার ওপর হদ জারী হয়ে গেছে। এখন তাকে অতিরিক্ত শাস্তি দিবেন না। কিন্তু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর সুপারিশ মানলেন না এবং আদব শিক্ষার্থে তাকে শাস্তি দিলেন এবং কিছুদিনের জন্য তাকে জেলখানাতেও রাখলেন। মুহাম্মদ হুসাইন হাইকাল "আল ফারুকে ওমর" গ্রন্থে লিখেছেন যে, এ শাস্তির কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ইন্তেকাল করেন। কিন্তু অন্য এক মতে জানা যায় যে, ৩ মাস গ্রেফতার থাকার পর আবদুর হরমান রাদিয়াল্লাহ আনহু সুস্থ হয়ে উঠেন। এরপর পুনরায় অসুস্থ হন এবং মারা যান।

মিসরের গভর্নর থাকাকালে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসের বড় কৃতিত্ব হলো "নহরে আমীরুল মু'মিনীন" নির্মাণ। এ নহরের মাধ্যমে নীল নদকে লোহিত সাগরের সাথে সংযুক্ত করা হয়। এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হলো, ২১ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারা এবং তার উপকণ্ঠে প্রচণ্ড খরায় কিয়ামতের মত অবস্থা সৃষ্টি হয়। যেসব নদী-নালা মদীনার ক্ষেত-খামার শস্য-শ্যামল

মাঠে রূপান্তর করতো তা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। ব্যবসায়ীরা মদীনা আগমন বন্ধ করে দেয়। মানুষ এবং গবাদি পশু শুকিয়ে জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বাজারে খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যেতো না। পাওয়া গেলেও ছিলো অগ্নিমূল্য। ক্ষুধা কাতর ৬০ হাজার বেদুঈন মরুভূমি থেকে বের হয়ে মদীনা ঘেরাও করে। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু এ দুর্ভিক্ষ আয়ত্বে আনার জন্য ইরাক, সিরিয়া এবং মিসরের গভর্নরদের কাছে সাহায্য চাইলেন। সিরিয়ার গভর্নর আমীর মুয়াবিয়া খাদ্য বোঝাই তিন হাজার উট প্রেরণ করলেন। এতে প্রচুর কাপড়ও ছিলো। কুফার গভর্নর দু' হাজার উট পাঠালেন। এমনিভাবে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস উটের এক বিরাট কাফেলা খাদ্য ও কাপড় বোঝাই করে পাঠিয়ে ছিলেন। বস্তুত মিসর থেকে স্থল পথের রাস্তা ছিলো অনেক দূর। এজন্য খাদ্য পৌঁছতে বিলম্ব ঘটলো। ফলে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে এ পত্র লিখলেন ঃ

"আবদুল্লাহ ওমর আমীরুল মু'মিনীনের কাছ থেকে আমর ইবনুল আসের প্রতি সালামুন আলাইকা—আমার জীবনের শপথ আমর। যদি তোমার এবং তোমার সাথীদের উদর পূর্ণ থাকে এবং আমি ও আমার সাথীরা ভূখা থাকি তাহলেও কি পরওয়া করবে না—আল মদদ আল মদদ।"

অন্য এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী এ চিঠির বাক্য এমন ছিলো ঃ "মদদ, মদদ। আরবদের মদদ। উটের কাফেলার অগ্রভাগ থাকবে আমার কাছে। আর পশ্চাদভাগ থাকবে তোমার কাছে। উট বা কাপড়ে আটা ভরে আমার কাছে পাঠাও।"

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস পত্রের জবাব এভাবে দিলেন ঃ

"লাব্বাইকা ইয়া আমীরুল মু'মিনীন। শীঘ্রই আপনার কাছে খাদ্য বোঝাই উটের এতবড় কাফেলা পৌঁছাব যার অগ্রভাগ থাকবে আপনার কাছে এবং পশ্চাৎভাগ আমার কাছে—আমি আশা করি, এমন পথ বেড়িয়ে আসবে, যে আপনার কাছে সমুদ্র পথে খাদ্য প্রেরণ করতে পারবো।"

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর সমুদ্র পথের কথা জানতে পেরে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু খুব খুশী হলেন। কিন্তু কিছুদিন পর তিনি হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসের আরেকটি পত্র পেলেন। এতে তিনি জানালেন যে, সমুদ্র পথ চালু করা একদিকে যেমন কঠিন তেমনি ব্যয়বহুলও। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অসম্ভব। এ পত্র পাঠে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ক্রোধান্বিত হলেন এবং হযরত আমরকে রাদিয়াল্লাহ আনহু লিখলেন ঃ

"নীল নদ থেকে সমুদ্র পর্যন্ত খনন কাজ চালাও। এতে যদি মিসরের সকল রাজত্ব ব্যয় করতে হয় তাহলে তাই করো।"

আল্লামা সুয়ূতী (র) "হাসানুল মাহাজিরাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, এ প্রসঙ্গে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে মদীনায় তলব করলেন। যখন তিনি এলেন তখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, "যদি একটি খাল খনন করে নীল নদকে সমুদ্রের সাথে যুক্ত করে দেয়া যায়, তাহলে মক্কা ও মদীনায় সহজে খাদ্য শস্য আনা সম্ভব হবে এবং আরবে দুর্ভিক্ষ ও দুর্মূল্যের আশংকা থাকবে না। এছাড়া স্থল পথে খাদ্য শস্য প্রেরণ খুব কঠিন ব্যাপার।" হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস মিসর ফিরে গিয়ে অবিলম্বে কাজ শুরু করে দিলেন এবং ফুসতাতের সন্নিকটে নীল নদ থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত প্রায় ৬৯ মাইল লম্বা নদী ৬ মাসের মধ্যে খনন করালেন। জাহাজ এ নহর দিয়ে নীল নদ হয়ে লোহিত সাগরে এসে পৌছতো এবং সেখান থেকে জেদ্দা নোঙ্গর করতো। এ নহর "নহরে আমীরুল মু'মিনীন" নামে খ্যাত হয় এবং বহুদিন তা প্রবাহিত ছিলো। এ নহরের কারণে মিসর এবং মদীনায় খাদ্য শস্যের মূল্য একই ধরনের থাকতো। তাছাড়া বাণিজ্যে মিসরের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। অনেক বছর পর শাসকদের গাফিলতির কারণে এ নহর বন্ধ হয়ে যায়।

আল্লামা শিবলী নোমানী (র) "আল ফারুক" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"এটা এক আশ্চর্য ব্যাপার যে, আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস রোম সাগর এবং লোহিত সাগরের মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। বস্তুত এজন্য তিনি স্থানেরও প্রস্তাব করেছিলেন। ফারমার কাছে রোম সাগর এবং লোহিত সাগরের মধ্যে দূরত্ব ছিলো মাত্র ৭০ মাইল। এ স্থানে তিনি খাল খনন করে দু' সাগরকে সংযুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু একথা জানতে পেরে অনীহা প্রকাশ করেন এবং এ কাজ হলে গ্রীক জাহাজ এসে হাজীদের উঠিয়ে নিয়ে যাবে বলে লিখে পাঠালেন। আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস যদি অনুমতি পেতেন তাহলে সুয়েজ খাল আবিষ্করের গৌরব প্রকৃতপক্ষে আরবদের ভাগ্যেই জুটতো।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস মিসরের গভর্নরীর দায়িত্ব অত্যন্ত সুন্দরভাবে পালন করেন। তখন মিসর ছিলো সচ্ছল এবং সেখানকার জনগণও তাঁর প্রতি খুব খুশী ছিলো। অবশ্যই মিসরের উৎপাদিত ফসল, সম্পদ এবং সচ্ছলতার তুলনায় রাজস্ব কম আদায় হতো বলে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু সন্দেহ পোষণ করতেন। সুতরাং এ প্রসঙ্গে তিনি হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে কয়েকটি কড়া পত্র প্রেরণ করেন। এসব পত্রের ভাষা তাঁর

কাছে অসহ্য বলে মনে হলো এবং তিনিও তার জবাব কঠিন ভাষাতেই দিলেন। জবাবী পত্রে তিনি কম রাজস্ব প্রাপ্তির কারণসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন এবং মিসরের ইমারত থেকে তাঁকে বরখাস্তের জন্য আমীরুল মু'মিনীনের কাছে দরখাস্ত করলেন। কিন্তু আমীরুল মু'মিনীন তার দরখাস্ত মঞ্জুর করেননি। অবশ্য খেলাফতের শেষ পর্যায়ে তিনি মিসরের একটি ক্ষুদ্র অংশ 'সাঈদে মিসরে' আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন সাদ বিন আবি সারাহকে গভর্নর নিয়োগ করেন। এ সত্ত্বেও মিসরের বৃহৎ অংশের ইমারতের দায়িত্ব হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওপরই অর্পিত ছিলো।

একবার হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে এ পত্র লিখলেন ঃ

"আমি জানতে পেরেছি যে, তোমার কাছে উট, বকরী, গরু, ঘোড়া এবং গোলাম রয়েছে। গভর্নরীর আগে এসব তোমার ছিলো না এবং এজন্যে তোমাকে অর্থও দেয়া হয়নি। এরপরও এ সম্পদ তোমার কাছে কোত্থেকে এলো। আমার কাছে তোমার চেয়ে উত্তম মুহাজির ছিলো, যাদেরকে আমি গভর্নর নিয়োগ করতে পারতাম। কিন্তু এ পদ যদি তোমার লাভ এবং আমাদের ক্ষতির জন্য হয়, তাহলে তোমাকে কেন অগ্রাধিকার দেয়া হবে ? এ সম্পদ তোমার কাছে কোত্থেকে এসেছে তা শীঘ্র লিখে জানাও।" হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আন ইবনুল আস সে পত্রের এ জবাব দিলেন ঃ

"আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি আমার সম্পদ সম্পর্কে যা লিখেছেন তা ঠিক। এখানে জিনিসপত্র সস্তা এবং প্রায়ই লড়াই হয়ে থাকে (যা থেকে গনিমাতের মাল অব্যাহতভাবে প্রাপ্তি ঘটে)। বস্তুত অনুমিত অর্থ দিয়ে আমি এ সামান ক্রয় করেছি। যদি আপনার খেয়ানত বৈধও হতো, তাহলেও আমি খেয়ানত করতাম না। কেননা আপনি আমার ওপর আস্থা এনেছেন। রইলো আপনার সেই কথা। আপনি বলেছেন যে, আপনার কাছে আমার চেয়ে উত্তম মুহাজির ছিলো। তাহলে আপনি এ পদ তাদেরকে কেন দেননি। আমিতো এজন্য আপনার দরজা খট খটাইনি বা কখনো ধরণা দেইনি।"

হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু এ জবাবে সন্তুষ্ট হলেন না। হযরত মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মাসলামা আনসারীকে তিনি এক ফরমানসহ হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসের কাছে মিসর প্রেরণ করলেন। ফরমানে নির্দেশ ছিলো যে, তোমার সমগ্র সম্পদ তার সামনে রাখবে। সে তার অর্ধেক (অন্য রাওয়ায়েতে যতটুকু ঠিক মনে করবে) বাইতুল মালের জন্য নিয়ে নেবে।

এ ব্যবস্থায় হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস খুব দুঃখিত হলেন ঠিকই কিন্তু আমীরুল মু'মিনীনের নির্দেশ পালন করলেন এবং সমগ্র সম্পদ হযরত মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মাসলামার সামনে পেশ করে দিলেন। তিনি তা থেকে অর্ধেক নিয়ে নিলেন (অথবা কিছু) এবং বাকী অংশ ফেরত দিলেন।-[ইছাবাহ, কানযুল আ'মাল ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর সরকারী পত্রাবলী।]

অনেক সাহাবা কেরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুম মিসরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস তাদেরকে সীমাহীন সম্মান করতেন এবং তাদের কঠিন কঠিন কথাও অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে বরদাশত করতেন। কোনো সময় যদি কোনো সাহাবী আইন বিরোধী কাজ করে বসতেন তাহলে তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে আমীরুল মু'মিনীনের কাছ থেকে অবশ্যই অনুমতি নিতেন। একবার হযরত শুরাইক বিন ছুমাই রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর কাছে এলেন এবং চাষাবাদ করার অনুমতি চাইলেন। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস বললেন, আপনি সরকারের কাছ থেকে বৃত্তি পেয়ে থাকেন প্রয়োজনের সময় কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাই আপনার কাজ। আপনার চাষাবাদ করার অনুমতি নেই। হযরত শুরাইক রাদিয়াল্লাহ আনহু নিষেধ সত্ত্বেও চাষাবাদ শুরু করলেন। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস অভিযোগ লিখে আমীরুল মু'মিনীনের কাছে প্রেরণ করলেন। তিনি হযরত শুরাইক রাদিয়াল্লাহ আনহুকে মদীনা ডেকে পাঠালেন। তিনি এলে বললেন ঃ "আমি তোমাকে এমন শাস্তি দিবো যে, যাতে মিসরের মানুষ শিক্ষাগ্রহণ করে।"

হযরত শুরাইক রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের কাজের জন্য দুঃখ ও লজ্জা প্রকাশ করলেন এবং ক্ষমা চাইলেন। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে লিখলেন ঃ শুরাইক বিন ছুমাই আমার কাছে এসে কৃত কাজের জন্য লজ্জা প্রকাশ এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

একবার সাহাবী হযরত গারফা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন হারেস মিসরের এক রইস জিম্মীকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সে দাওয়াত কবুল করার পরিবর্তে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে অবমাননাকর কথা বললো। হযরত গারফা রাদিয়াল্লাহ আনহু ক্রোধ সম্বরণ করতে না পেরে তাকে হত্যা করে বসলেন। বিষয়টি হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসের সামনে পেশ করা হলো। তিনি হযরত গারফা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বললেন, আইন আপনার নিজের হাতে নেয়া ঠিক হয়নি। আমরা

জিম্মীদের জান-মালের নিরাপত্তার জামিন রয়েছি। হযরত গারফা রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, এটা ঠিক কিন্তু কোনো জিম্মীর ইসলাম অথবা আমাদের নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অপমান করার অধিকার নেই। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু চুপ হয়ে গেলেন। এরপর হযরত গারফা রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর বিরুদ্ধে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে এক অভিযোগ লিখে পাঠালেন। অভিযোগে তিনি জানালেন, আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস মজলিশে আমাদের সামনে ঠেস দিয়ে বসে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে লিখলেন যে, তুমি নাকি মজলিশে ঠেস দিয়ে বসো। এ অভিযোগ আমার কাছে করা হয়েছে। এটা করো না। অন্যান্য মানুষ যেভাবে বসে সেভাবে তুমিও বসবে।-(ইবনে আসাকির)

প্রখ্যাত চরিতকার ও ঐতিহাসিকরা হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসের মিসরের ইমারতকালের আরো অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এসব ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু সরকারী কর্মকর্তাদের ওপর কেমন তীক্ষ্ণ ও কঠোর দৃষ্টি রাখতেন। এসব ঘটনা থেকে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস সবসময়ই আমীরুল মু'মিনীনের নির্দেশাবলীকে বিনা শব্দে মেনে নিয়েছেন এবং তা অমান্য করার চিন্তা পর্যন্ত করেননি। কোনো ব্যাপারে সন্দেহ হলেই তিনি অবলিম্বে আমীরুল মু'মিনীনকে লিখে পাঠাতেন এবং সেখান থেকে যে নির্দেশ আসতো সে অনুযায়ী কাজ করতেন।

২৪ হিজরীতে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাহাদাতের পর হযরত ওসমান জুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহ আনহু খলিফা নির্বাচিত হলেন। এ সময় তিনি অবস্থা পর্যালোচনা করে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে লিখলেন যে, মিসরে উৎপাদিত ফসল এবং সম্পদের তুলনায় খিরাজ বা রাজস্ব কম আদায় হয়। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস জবাবে লিখলেন ঃ

"গাভী এর চেয়ে বেশী দুধ দিতে পারে না।"

এ জবাব প্রাপ্তির পর হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তার হাত থেকে নিয়ে হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি সারার ওপর ন্যস্ত করলেন এবং কিছুদিন পর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে বরখাস্ত করে আবদুল্লাহ বিন সা'দকে সমগ্র মিসরের স্থায়ী গভর্নর নিয়োগ করলেন। আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন সা'দ রাজস্বের যে পরিমাণ কেন্দ্রে প্রেরণ করলেন, তা হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রেরিত পরিমাণ থেকে কিছু বেশী ছিলো। সুতরাং তিনি যখন মিসর থেকে মদীনা ফিরে এলেন এবং হযরত

ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে সাক্ষাত করলেন, তখন আমীরুল মু'মিনীন বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন। এ সময় উভয় বুযর্গের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিলো তা ঐতিহাসিক ইয়াকুবী বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেনঃ

হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু ঃ আবদুল্লাহ বিন সা'দকে কি অবস্থায় রেখে এসেছ ?

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস ঃ আপনি যেভাবে চেয়েছেন।

হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু ঃ তা কি রকম ?

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ঃ নিজের জন্য শক্তিশালী এবং আল্লাহর জন্য দুর্বল।

হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু ঃ আমিতো তাকে তোমার কর্মপদ্ধতি অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছিলাম।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ঃ আপনি তার ওপর তার শক্তির চেয়ে বেশী বোঝা সমর্পণ করেছেন।

হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু ঃ দেখ, গাভী (অথবা উটনী) বেশী দুধ দিয়েছে (অর্থাৎ আবদুল্লাহ বিন সা'দ বেশী রাজস্ব প্রেরণ করেছে)।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ঃ কিন্তু বাছুরতো অভুক্ত রয়েছে।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস মিসর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ইসকান্দারীয়াবাসী রোমের কাইসারের ইঙ্গিতে বিদ্রোহ করে বসলো। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে এ বিদ্রোহ দমনে নিয়োগ করলেন। কেননা সেখানকার অবস্থা তার চেয়ে বেশী কেউ ওয়াকিবহাল ছিলেন না। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস মিসর পৌছে ইসকান্দারিয়ার সাহায্যে আগত কাইসার বাহিনীকে পরাজিত করলেন। কিন্তু এ বাহিনীর এক অংশ ইসকান্দারিয়া দখল করে নিয়েছিলো। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস ইসকান্দারিয়া প্রবেশ করে তাদেরকে বের করে দিলেন। বস্তুত মাকুকাস এবং তার কওম (কিবতী) রোমকদের সহযোগিতা করেনি। এজন্যে রোমকরা পেছনে হটতে হটতে তাদের বসতি লুট করলো। যখন মিসরী বিদ্রোহী এবং হামলাকারী রোমকরা উৎখাত হলো তখন কিবতীরা বিদ্রোহে শরীক না হওয়ার জন্য রোমক ও তাদের সহযোগীরা ধন-সম্পদ লুট করে নিয়েছে বলে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে ফরিয়াদ এবং তাদের সম্পদ ফিরিয়ে দেয়ার আবেদন জানালো। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস সনাক্ত করিয়ে যাদের সম্পদ ছিলো তাদের ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করলেন।

ইবনে আসির (র) বর্ণনা করেছেন, ভবিষ্যত বিদ্রোহের আশংকামুক্ত থাকার জন্য হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস ইসকান্দারিয়ার প্রাচীর ধ্বংস করে দিলেন। বিদ্রোহ দমনের পর আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে মিসরের সমর নেতা নিয়োগ করতে চাইলেন। কিন্তু তিনি এ পদ কবুল করার ব্যাপারে ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

তাবারী এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন, হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসের বরখাস্তের ঘটনা ইসকান্দারিয়ার বিদ্রোহ দমনের পর ২৬ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিলো। কিন্তু ইমাম সুয়ুতী (র) আল কান্দী লিখেছেন, হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস ইসকান্দারিয়ার বিদ্রোহের আগে ২৫ হিজরীতে বরখাস্ত হয়েছিলেন। হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে বিদ্রোহ দমনের জন্য বিশেষভাবে দ্বিতীয়বার মদীনা থেকে মিসর প্রেরণ করেছিলেন। বিদ্রোহ অবসানের পর যখন তাঁকে সমর নেতার পদ পেশ করা হয়, তখন তিনি এই বলে তা প্রত্যাখ্যান করেন ঃ "আমি এটা পসন্দ করি না যে, আমি গাভীর শিং ধরবো আর দুধ অন্যে দোহন করবে।" অর্থাৎ আবদুল্লাহ বিন সা'দ মিসরের গভর্নর থাকবে আর আমি সেখানে দুশমনের মুকাবিলা করবো।

নিসন্দেহে বরখাস্তের ব্যাপারটি হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসের কাছে খুব কঠিন ব্যাপার ছিলো। এ সত্ত্বেও তিনি একে কোনো সমস্যা করে তোলেননি এবং সবসময়ই হযরত ওসমান জুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুর শুভ কামনা করেছেন। আমীরুল মু'মিনীনের বিরুদ্ধে বিশৃংখলা শুরু হলো এবং মিসর থেকে বিদ্রোহীরা রওয়ানা দিলো। এ সময় হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর ইচ্ছানুযায়ী হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস তাদের কাছে গেলেন এবং বুঝিয়ে শুঝিয়ে ফেরত পাঠালেন। অতপর শহরবাসীদেরকে একত্রিত করে আমীরুল মু'মিনীনের পক্ষ থেকে সাফাই পেশ করলেন।

সাইয়েদেনা হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শক্তিশালী হয়ে উঠলো। তখন তিনি এক পরামর্শ বৈঠক আহ্বান করলেন। এ বৈঠকে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকেও ডাকা হলো। অন্যান্যদের মত প্রদানের পর আমীরুল মু'মিনীন হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বিশেষভাবে তার মত জিজ্ঞেস করলেন। তিনি আরজ করলেন ঃ

"আমীরুল মু'মিনীন ! এসব ষড়যন্ত্র এবং ফেতনা-ফাসাদের মূল কারণ হলো প্রয়োজনের তুলনায় আপনি বেশী কোমলতা দেখিয়ে থাকেন এবং কঠোরতার সময় দৃষ্টি এড়িয়ে যান। আমার পরামর্শ হলো, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর অনুসরণ করুন এবং কঠোরতার সময় কঠোরতা এবং কোমলতার সময় কোমলতার সাথে কাজ করুন।"

বরখাস্তের পর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস সাধারণত ফিলিস্তিনে থাকতেন। মাঝে মধ্যে মদীনা আসতেন। বিদ্রোহীরা যখন খলীফার বাড়ী অবরোধ করলো তখন তিনি মদীনায় ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন নিরুপায় এবং আমীরুল মু'মিনীনকে কার্যকর সাহায্য করতে পারছিলেন না। অক্ষমতার তীব্র অনুভূতিসহ তিনি মদীনা থেকে সিরিয়া চলে গেলেন। যাওয়ার সময় বললেন ঃ "যে ব্যক্তি ওসমানের হত্যায় অংশ নেবে আল্লাহ তাকে অপদস্ত করবেন এবং যে ব্যক্তি তাকে সাহায্য করতে অক্ষম তার মদীনা ত্যাগ করা উচিত।"

সিরিয়া গমনের পরও তিনি হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর নিরাপত্তার ব্যাপারে খুবই উৎকণ্ঠিত ছিলেন। এজন্যে যারাই সেখান থেকে গমনাগমন করতো তাদের কাছে তাঁর অবস্থার খবর নিতেন। তাঁর শাহাদাতের খবরে তিনি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।

হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকালে তিনি যে একাকিত্ব অবলম্বন করেছিলেন। হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পরও কিছুদিন পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখেন এবং উষ্ট্রের যুদ্ধে বলতে গেলে অংশই নেননি।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর মধ্যে বিরোধ তুঙ্গে উঠলো। এ সময় আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর সহযোগিতা প্রার্থনা করলেন। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে দিলেন। এমনিভাবে আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু এক মহান সেনা এবং চিন্তানায়কের সমর্থন পেয়ে গেলেন। তিনি নিজেও একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তবুও হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর পরামর্শ তাঁর সংকট মুকাবিলায় প্রভূত উপকারে এলো। সিফফিনের যুদ্ধ শুরু হলো। আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে সেনাপতি নিয়োগ করলেন। যুদ্ধকালে হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ইয়াসির শাহাদাত বরণ করলেন। তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। তাঁর শাহাদাতের পর দু' ব্যক্তি ঝগড়া করতে করতে আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেদমতে হাজির হলো। উভয়েই হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর শহীদ করার দাবীদার ছিলো এবং দু'জনই পুরস্কার

দাবী করছিলো। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুও এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, তিনি হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাহাদাতের খবর শুনে অত্যন্ত দুঃখীত হলেন এবং বললেন ঃ "আল্লাহর কসম ! এ দু'জন জাহান্নামের জন্য ঝগড়া করছে।"

এ কথায় আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি বললেন ঃ "আমর ! তুমি তাদের ব্যাপারে এমন কথা বলছো ? যারা আমাদের জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করছে।"

এ সময় হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "হায় ! বিশ বছর আগে যদি আমার মৃত্যু হতো।"

আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, "আম্মার হত্যার জন্য আমরা দায়ী নই। বরং তারাই দায়ী যারা তাকে যুদ্ধের ময়দানে টেনে এনেছে।" এভাবেই কথা শেষ হলো।

৩৭ হিজরীর ১০ই সফর উভয় বাহিনীর মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হলো। তাবারী (র), ইবনে সায়াদ (র), ইবনে কাসির (র), ইবনে আসির (র) এবং ইবনে খালদুন (র) বর্ণনা করেছেন, সিরীয় বাহিনীর অবস্থা নাজুক পর্যায়ে পৌছলো। এ সময় হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর পরামর্শ মুতাবিক তারা বর্শাগ্রে কুরআন বেঁধে এ নারা লাগালো ঃ "আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে এ কুরআনই ফায়সালা দেবে।"

এতে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাহিনী অস্ত্র সম্বরণ করে নিলেন এবং উভয় বাহিনীর মধ্যে সালিসীর ব্যাপারে একমত হলেন। আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর পক্ষ থেকে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর পক্ষ থেকে হযরত আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহ আনহু সালিস মনোনীত হলেন।

এ দু' বুযর্গ ব্যক্তি দাওমাতুল জান্দালে পরস্পর মিলিত হলেন এবং একাকীত্বে এ ব্যাপারে দীর্ঘক্ষণ ধরে আলোচনা করতে লাগলেন। আলোচনার বিষয়বস্তু কি ছিলো এবং দু'জন কি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা আলিমুল খাবির আল্লাহ পাকই ভালো জানেন। কিন্তু অনেক নেতৃস্থানীয় চরিতকার এ আলোচনাকে কথোপকথনের আকারে এমনভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, এ কথাবার্তা যেন তাদের সামনেই হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সবাই এ কথাও লিখেছেন যে, এ কথাবার্তা নির্জনে হয়েছিলো। কোনো তৃতীয় ব্যক্তি তাদের কাছে উপস্থিত ছিলেন না।

যা হোক, যখন উভয় বুযর্গ নির্জনত্ব থেকে বাইরে এলেন তখন হযরত আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহ আনহু মানুষের সামনে এ সিদ্ধান্ত শুনালেন ঃ

"আমি এবং আমার বন্ধু [আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস] চিন্তা-ভাবনা করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু ও মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু উভয়ই খেলাফত থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং জনগণ পরামর্শ করে যাকে ইচ্ছা খলীফা নির্বাচন করবেন। এজন্যে আমি আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বরখাস্ত করছি। এখন আপনারা যাঁকে যোগ্য মনে করেন তাঁকে খলিফা নির্বাচিত করুন।"

হযরত আবু মূসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহ আনহুর পর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস উঠে দাঁড়িয়ে এ সিদ্ধান্ত শুনালেন ঃ

"আবু মূসা যা বললো, তা আপনারা শুনেছেন। তিনি নিজের মানুষকে [হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু] বরখাস্ত করেছেন আমিও তাকে বরখাস্ত করছি। কিন্তু আমার মানুষ [হযরত মুয়াবিয়া]-কে বহাল রাখছি। কেননা সে ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আফ্ফানের মনোনীত গভর্নর, তাঁর খুনের দাবীদার এবং তাঁর স্থলাভিসিক্ত হওয়ার সবচেয়ে বেশী যোগ্য।"

যেন দু' সালিসের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ পৃথক ছিলো। এভাবে সালিসে কোনো ফল হলো না। যুদ্ধ মূলতবী হয়ে গেলো।

হাফিজ ইবনে কাসির (র) 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসের সিদ্ধান্তের এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঃ

"হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস সেই সময় জনগণকে ইমাম বিহীন অবস্থায় রাখা ঠিক মনে করেননি। কেননা তখন জনগণের মধ্যে যে বিরোধ চলছিলো তাতে তিনি সংশয়ান্বিত ছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে, উম্মাতকে ইমাম বিহীন অবস্থায় রাখলে উদ্ভূত সংকটের সমাধান হবে না। এজন্যে মুসলিহাতের ভিত্তিতে তিনি আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বহাল রাখলেন এবং ইজতেহাদ সঠিকও হয়ে থাকে এবং ভুলও হয়।"

৩৮ হিজরীতে আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু ৬ হাজার সৈন্যসহ হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে মিসর পদানত করার জন্য প্রেরণ করলেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর পক্ষ থেকে মুহাম্মদ বিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু তখন সেখানকার গভর্নর ছিলেন। মিসর রওয়ানা হওয়ার পূর্বে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস মুহাম্মদ বিন আবি বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে এ চিঠি লিখলেন ঃ "মিসরবাসী তোমার বিরোধী।

এজন্য তুমি আমার মুকাবিলায় সফল হতে পারবে না। আমার বন্ধুত্বপূর্ণ পরামর্শ হলো, তুমি স্বয়ং মিসর ত্যাগ করো। আমি তোমার রক্তে আমার হাত রঞ্জিত করতে চাই না।"

এ চিঠিতে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস যা লিখেছেন তা বাস্তব ভিত্তিক ছিলো। কেননা মুহাম্মদ বিন আবি বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর বিরুদ্ধে মিসরে ব্যাপক গণঅসন্তোষ ছিলো। সরকার বিরোধী একটি শক্তিশালী দলও সেখানে ছিলো। মাসলামা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মুখাল্লাদ এবং মুয়াবিয়া বিন খুদাইজের মত প্রভাবশালী ব্যক্তি এ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু মুহাম্মদ বিন আবি বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওপর এ পত্রের কোনো প্রভাব পড়লো না। তিনি তা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সেখান থেকে মুকাবিলা করার নির্দেশ এলো। বস্তুত হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস যখন মিসর পৌঁছলেন তখন মুহাম্মদ বিন আবি বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত পেলেন। দু' পক্ষের মধ্যে রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হলো। মিসরের খ্যাতনামা বাহাদুর কিনানাহ বিন বাশার হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বাহিনীর বিরুদ্ধে অকল্পনীয় বাহাদুরী প্রদর্শন করলেন। তিনি যেদিকেই অগ্রসর হলেন সেদিকেই ব্যূহ তছনছ হয়ে গেলো। অবশেষে মুয়াবিয়া বিন খুদাইজ তার সামনাসামনি হলো। বহু সিরীয়বাসী তাকে সহযোগিতা করলো এবং কিনানাকে ঘিরে ফেলে হত্যা করলো। এরপরই মুহাম্মদ বিন আবি বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাহিনীর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেলো। মুহাম্মদ উধাও হয়ে গেলেন। কিন্তু সিরীয় এবং তাদের মিসরীয় সমর্থকরা খুঁজে বের করে তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করলো। এভাবে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস মিসর করায়ত্ব করলেন। কয়েকটি শর্তের ভিত্তিতে আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে মিসরের গভর্নর নিযুক্ত করলেন। আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর প্রতি তিনি আজীবন অনুগত থাকবেন, এটি ছিলো অন্যতম শর্ত।

ওদিকে নাহরওয়ানে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু খারেজীদের পরাস্ত করলেন। পরাজিত খারেজীরা সিদ্ধান্ত নিলো যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস তিনজনকেই শহীদ করে ফেলতে হবে। যাতে সকল বিবাদের পরিসমাপ্তি ঘটে। পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইবনে মালজাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওপর হামলা করলো এবং তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। বারক বিন আবদুল্লাহ আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওপর হামলা করলো। কিন্তু তরবারীর কোপ ব্যর্থ হলো এবং তিনি বেঁচে গেলেন। আমর বিন বিকর

তামিমী হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে হত্যা করতে গেলো। কিন্তু ঘটনাক্রমে সেদিন তাঁর শরীর অসুস্থ ছিলো। এজন্যে তিনি নিজের পরিবর্তে খারেজা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন হুজাফাহকে নামায পড়ানোর জন্য প্রেরণ করলেন। আমর বিন বিকর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস মনে করে খারেজাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে হত্যা করে বসলো।

আমীর মুয়াবিয়ার পক্ষ থেকে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস যখন মিসরে গভর্নর নিযুক্ত হন তখন তাঁর বয়স ৮০ বছরের কিছু উর্ধে ছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কয়েক বছর পর্যন্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে আঞ্জাম দেন। ভিন্ন মতে ৪৩ অথবা ৪৭ হিজরীতে তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। এমনকি জীবনের আশা আর ছিলো না। সহীহ আল মুসলিমে আবদুর রহমান বিন সামাছাহ মাহরী থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসের মৃত্যু শয্যায় শুশ্রূষার জন্য গিয়েছিলাম। তিনি প্রাচীরের দিকে মুখ করে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, আব্বাজান ! আপনি কাঁদছেন কেন ? আপনাকে কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অমুক অমুক সুসংবাদ দেননি ? হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস বললেন ঃ

"আমার কাছে সর্বচেয়ে অমূল্য সম্পদ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ—এর শাহাদাত রয়েছে। আমার জীবনের তিনটি অধ্যায় অতিক্রান্ত হয়েছে। এক অধ্যায়ে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মারাত্মক শত্রুতা পোষণ করতাম। আমার আন্তরিক আকাংখা ছিলো যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাতের কাছে এলেই হত্যা করবো। সে অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হতো তাহলে নিসন্দেহে আমি জাহান্নামী হতাম। অতপর আল্লাহ পাক আমার অন্তরকে ইসলামের দিক ফিরিয়ে দিলেন। আমি ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হলাম এবং আরজ করলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! পবিত্র হাত এগিয়ে দিন। আমি বাইয়াত হবো। তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন কিন্তু আমি আমার হাত পিছিয়ে নিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমর ইবনুল আস ! এটা তুমি কি করলে ? আমি আরজ করলাম, এক শর্তে ইসলাম গ্রহণ করতে পারি। তিনি বললেন, শর্তটি কি ? আমি আরজ করলাম, আমার গুনাহ মাফ হয়ে যাক। তিনি বললেন, হে আমর ! তুমি কি জানো না যে, ইসলাম পূর্বেকৃত সকল গুনাহ মিটিয়ে দেয়। হিজরত ও পূর্বেকৃত সকল গুনাহ অস্তিত্বহীন করে। এমনিভাবে হজ্জও পূর্বেকার সকল গোনাহ ধ্বংস করে দেয়। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বলে পরিগণিত হলো এবং আমার দৃষ্টিতে তাঁর চেয়ে বেশী বুযর্গ বলে আর কেউ রইলো না। আজমত এবং হাইবাতের কারণে তাঁর প্রতি আমি দৃষ্টি তুলে দেখতে পারতাম না। যদি কেউ তাঁর অবয়ব সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করে, তাহলে আমি তা বলতে পারবো না। কেননা আমি কখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দৃষ্টি তুলে দেখিনি। যদি এ অবস্থায় মারা যেতাম তাহলে জান্নাতের আশা ছিলো। অতপর জীবনের তৃতীয় অধ্যায় এলো। এ সময় আমি বিভিন্ন ধরনের কাজ করেছি। আমি এখন জানি না যে, আমার কি হাশর হবে। আমার মৃত্যু হলে শোক জ্ঞাপনকারী মহিলারা যেন আমার জানাযার সাথে গমন না করে। জানাযার পেছনে আগুনও যেন না যায়। দাফনের সময় আস্তে আস্তে মাটি নিক্ষেপ করো। দাফনের পর তত সময় কবরের পাশে থাকবে যত সময় পশু যবেহ করে তার গোশত বণ্টন করা হয়। যাতে আমি তোমাদের কারণে সেখানে অন্তরঙ্গ হতে পারি এবং স্রষ্টার দূতদের কি জবাব দিব তা নিরূপণ করে নিতে পারি।"

ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, মৃত্যুর পূর্বে তিনি নিজের গার্ড বাহিনীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি তোমাদের কেমন সাথী ছিলাম ? জবাব এলো আপনি আমাদের প্রতি স্নেহশীল ছিলেন। আমাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন। আমাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করতেন এবং আমাদেরকে অন্তর খুলে পুরস্কার দিতেন।

বললেন, আমি এ ধরনের ব্যবহার এজন্যে করতাম যে, তোমরা আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবে। এখন মৃত্যু আমার সামনে সমুপস্থিত। তাঁকে এখান থেকে দূর করো। তারা ঘাবড়ে গিয়ে বললো, হে আবা আবদুল্লাহ ! আপনি এটা কি বলছেন ? মৃত্যুর ওপরেও কি কারো কোনো শক্তি চলে ? হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস বললেন, আমি জানি যে, মৃত্যুর বিরুদ্ধে তোমরা আমাকে কোনো সাহায্য করতে পারবে না। হায় ! আমার হেফাজতের জন্য যদি তোমাদেরকে না রাখতাম। আফসোস ! আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি তালিব ঠিকই বলতেন। মানুষের মৃত্যু স্বয়ং তার রক্ষক। অতপর বিনয়াবনত হলেন এবং মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো ঃ "হে আল্লাহ ! আমি ক্ষমা চাইবার অধিকারী নই। শক্তিশালীও নই যে, বিজয়ী হবো। তুমি যদি তোমার রহমত বর্ষণ না করো, তাহলে আমার ধ্বংস অনিবার্য।"

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস জীবিতাবস্থায় আশ্চর্য প্রকাশ করে বলতেন যে, মৃত্যুর সময় কিছু লোকের সম্পূর্ণ হুঁশ থাকে। কিন্তু তারা মৃত্যুর তাৎপর্য বা হাকিকত বর্ণনা করতে পারে না। মুমূর্ষ অবস্থায় তাঁর পুত্র বললো, আব্বাজান ! জ্ঞান এবং হুঁশ তো আপনার পুরোপুরিই রয়েছে। মৃত্যুর

অবস্থাটা একটু বর্ণনা করুন না। তিনি বললেন, পুত্র ! সে অবস্থা বর্ণনাতীত ব্যাপার। আমি শুধু এটুকুই অনুভব করছি যে, রিজভী পাহাড় যেন আমার গর্দানের ওপর ভেঙ্গে পড়ছে। আমার অন্ত্রগুলো যেন খেজুর বৃক্ষের কাটার ওপর ঘষা হচ্ছে এবং আমার জীবন সূচের ঘাত দিয়ে বের হচ্ছে।–(তাবকাতে ইবনে সায়াদ)

এরপর পুত্রকে ওসিয়ত করে বললেন, যখন আমার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবে, তখন প্রথম সাধারণ পানি দিয়ে গোসল করাবে এবং কাপড় দিয়ে দেহকে মুছে দেবে। অতপর তাজা এবং পরিষ্কার পানি দিয়ে গোসল করাবে। এরপর তৃতীয়বার কর্পূর মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল দেবে। তারপর কাপড় দিয়ে মুছে দেহ শুকিয়ে নেবে। কাফনের সময় ইজার এঁটে বাঁধবে। জানাযা দ্রুত নেবে না এবং ধীরেও নয়। জানাযার পেছনে পেছনে মানুষ রাখবে। জানাযার সামনে ফেরেশতা গমন করে এবং মানুষ পেছনে যায়। লাশ করবে রাখার পর আস্তে আস্তে মাটি দেবে—অতপর তিনি এ দোয়ায় মশগুল হয়ে গেলেন, হে আল্লাহ ! তুমি হুকুম দিয়েছিলে—আমি তা মানতে পারিনি। তুমি নিষেধ করেছিলে, আমি তার নাফরমানী করেছি। সাহস নেই যে, ক্ষমা চাইবো—শক্তিশালী নই যে, বিজয়ী হয়ে যাবো। হ্যাঁ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ—লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ একথা বলতে বলতে শেষ হিচকী নিলেন এবং চিরকালের জন্য চুপ হয়ে গেলেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

ইবনে আসির (র) বর্ণনা করেছেন যে, ৪৩ হিজরীর প্রথম শাওয়াল ঈদুল ফিতরের নামাযের পর তাঁর পুত্র নামাযে জানাযা পড়ালেন এবং ইসলামের এ মহান ব্যক্তিত্বকে মুকাততাম পাহাড়ের পাশে দাফন করলেন।

মৃত্যুর সময় হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসের বয়স প্রায় ৯০ বছর ছিলো। মৃত্যুকালে তিনি আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং মুহাম্মদ (র) নামক দু' পুত্র রেখে যান। হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু একজন অত্যন্ত উঁচু মর্যাদার সাহাবী হিসেবে পরিগণিত। তিনি নিজের পিতার অনেক আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং একজন বড় আবেদ ও জাহেদ ছিলেন।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসের জীবনের বেশীর ভাগ সময় যুদ্ধের ময়দানে কেটেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। আম্মারের ইমারাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। অতপর ধর্মদ্রোহীদের উৎখাতে পুরোপুরি অংশ নেন। ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার যুদ্ধে জীবন বাজী রেখে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। মিসর এবং ত্রিপোলী জয় করেন। এসব যুদ্ধ শেষে মিসরের গভর্নরের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। এতসব ব্যস্ততা সত্ত্বেও

তিনি দীনি ইলমে পূর্ণ ছিলেন। নবুয়াতের প্রস্রবণ থেকে যতটুকু সম্ভব অবগাহন করেছিলেন। প্রকৃতিগতভাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধীর এবং মেধা সম্পন্ন। এজন্য ইলম ও ফযীলাতের দিক থেকেও তিনি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী ছিলেন।

হাফিজ ইবনে হাজার রাদিয়াল্লাহ আনহু "আল ইসাবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, কুরআন পাঠে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিলো। তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে কুরআন পাঠ করতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদসমূহ অত্যন্ত আগ্রহের সাথে শ্রবণ করতেন। তাঁর থেকে ৩৯টি হাদীস বর্ণিত আছে। এর মধ্যে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম তিনটি হাদীসে ঐকমত্য পোষণ করেন। একটি হাদীস সম্পর্কে ইমাম বুখারী এবং তিনটিতে ইমাম মুসলিম ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর হাদীস বর্ণনাকারী, শিষ্য এবং উপকৃতদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু (পুত্র), আবু কায়েস (গোলাম), উরওয়াহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহ আনহু, আবু ওসমান নাহদী (র), আবদুর রহমান বিন সামাছা মাহরী (র), আম্মারা বিন শামাছা মাহরী (র), আম্মারা বিন খুজাইমা রাদিয়াল্লাহ আনহু, মুহাম্মাদ বিন কায়াব (র), আলী বিন রাবাহ (র) এবং কায়েস বিন আবি হাজেম রাদিয়াল্লাহ আনহুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যাকিছু শুনেছেন এবং যাকিছু করতে দেখেছেন তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি উসওয়ায়ে হাসানা বা উত্তম আদর্শের ওপর চলা এবং বিদআত থেকে দূরে থাকার জন্য জনগণকে উপদেশ দিতেন।

জাতুস সালাসিল বা শিকলের যুদ্ধে বিজয় লাভের পর তিনি সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেন ও মুসলিমদেরকে শিক্ষা দেন। আম্মানেও দু' বছর পর্যন্ত এ কাজ অব্যাহত রাখেন। জনগণের মধ্যে তিনি বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণার আধিক্য দেখে দুঃখিত হতেন। জনগণের মধ্যে তিনি প্রায়ই খুতবাহ দিতেন এবং তাদেরকে সুন্নাত অনুসরণের হেদায়াত করতেন। আলী বিন রাবাহ লাখমী একবার তাঁকে এ খুতবাহ দিতে শুনেছেন ঃ

"হে মানুষেরা ! তোমাদের এ অবস্থা কেন। তোমরা আখিরাত থেকে গাফিল হয়ে দুনিয়া তালাশে ব্যাপৃত হয়ে পড়েছো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব বস্তু পরহেয করতেন তোমরা সেদিকে আকৃষ্ট হচ্ছো। অথচ তোমরা অবগত আছো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া অর্জনে বা বস্তুগত ফায়দা লাভে কিভাবে দূরে থাকতেন।"

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী "তারিখুল খুলাফা" গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাসনকালে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল

আস মিসরের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। এ সময় একদিন বহুসংখ্যক মিসরী তাঁর খিদমতে হাজির হয়ে বললেন, আমাদের চাষাবাদ নীল নদের পানির ওপর নির্ভরশীল। নীল নদ শুকিয়ে গেলে তাতে পানি প্রবাহের জন্য আমরা একটি রসম পালন করে থাকি। আর এ রসম প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস জিজ্ঞেস করলেন, রসমটি কি ? তারা জবাব দিলেন ঃ "আমরা চাঁদের ১১ তারিখে (অন্য রাওয়ায়েত অনুযায়ী প্রতি বছর ১২ই জুন) একটি কুমারী কন্যা ঠিক করি এবং মাতা-পিতার সম্মতিতে তাকে মূল্যবান গহনা ও কাপড় পরিধান করাই। অতপর তাকে নীল নদীতে উৎসর্গ করি। এভাবে নদীতে পানি বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে নদীতে পানি খুব কমে গেছে। এজন্য আপনি আমাদেরকে এ পুরনো রসম পালনের অনুমতি দিন।"

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস বললেন ঃ "তোমরা যাকিছু বললে, তা কল্পনাপ্রসূত ব্যাপার। এসব কল্পনা এবং বাতিল কাজ নির্মূলের জন্যই ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। আমি তোমাদেরকে কোনো নিষ্পাপ বালিকার ওপর এ ধরনের যুলুম অবশ্যই করতে দিবো না।"

মিসরীরা নিরাশ হয়ে চলে গেলো। ঘটনাক্রমে নীল নদে পানি সম্পূর্ণরূপে কমে গেলো এবং অনেক মানুষ দুর্ভিক্ষের আশংকায় দেশ ত্যাগের প্রস্তুতি নিতে লাগলো।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আছ এ অবস্থার কথা আমীরুল মু'মিনিন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুকে জানালে তিনি লিখলেন ঃ

"আলহামদুলিল্লাহ ! তুমি মিসরীদেরকে সঠিক জবাব দিয়েছো। প্রকৃত-পক্ষে এ ধরনের বাতিল রসম রেওয়াজ নির্মূলের জন্যই ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। আমি এ পত্রের সাথে একটি চিরকুট প্রেরণ করছি। তা নীল নদে নিক্ষেপ করবে।"

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস এ পত্র পেলেন। চিরকুট নীল নদীতে নিক্ষেপের পূর্বে তা খুলে তার বিবরণ পাঠ করলেন। তাতে লেখা ছিলোঃ "আল্লাহর বান্দা আমীরুল মু'মিনীনের পক্ষ থেকে—নীল নদের জানা উচিত যে, সে যদি নিজের ইচ্ছায় প্রবাহিত হয়ে থাকে, তাহলে থেমে যাও। আর যদি আল্লাহর নির্দেশে প্রবাহিত হও, তাহলে আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন সে পূর্বের মতো পানিতে পূর্ণ করে দেয়।"

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস এবং তাঁর সাথীরা এ চিরকুট নদীতে নিক্ষেপ করে ফিরে এলেন। পরবর্তী দিন সকালে যখন মিসরবাসী নিদ্রা থেকে জাগলো তখন তারা আল্লাহর কুদরাতের এক অত্যাশ্চর্য নিদর্শন দেখতে পেলো। এ সময় নীল নদীতে ১৬ হাত পানি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জমি পানি সিক্ত হচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে অনেক মিসরী ইসলাম গ্রহণ করলো এবং সে নির্যাতনমূলক রসম চিরতরের জন্য নির্মূল হয়ে গেলো।

আল্লাহ পাক হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে ইজতিহাদ শক্তিও প্রদান করেছিলেন। জাতুস সালাসিল যুদ্ধে এক রাতে গোসল প্রয়োজন হয়ে পড়লো। সে সময় প্রচণ্ড শীত পড়ছিলো। ঠাণ্ডা পানি দিয়ে গোসল করায় অসুস্থ হয়ে পড়ার আশংকা ছিলো এবং গোসল করলে নামায কাজা হয়ে যেতে। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন। অবশেষে জ্ঞান ও ইজতেহাদের মাধ্যমে এ সংকট থেকে মুক্তির পথ বের করলেন। তিনি গোসলের অবস্থাকে অযুর ওপর কিয়াস করলেন। ইজতেহাদের মাধ্যমে তাইয়াম্মুম করলেন এবং নামায পড়লেন। মদীনা ফিরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ঘটনা বললেন। তিনি বললেন, আমর ইবনুল আস ! তুমি জানাবাত বা অপবিত্র অবস্থায় নামায পড়লে ? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! রাতে ভয়ানক ঠাণ্ডা ছিলো। এ অবস্থায় যদি গোসল করি তাহলে শেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিলো। আর যদি গোসল না করি তাহলে নামায যায়। এ দোদুল্যমান অবস্থায় কুরআনের এ আয়াত আমার স্মরণ হলো ঃ লা তাকতুলু আনফুসাকুম ইন্নাল্লাহা কানা বিকুম রাহিমা। বস্তুত তাইয়াম্মুম করে আমি নামায পড়ে নিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হেসে চুপ হয়ে গেলেন।–(মুসনাদে আহমদ)

আমওয়াসের প্লেগ মহামারীকালে বড় বড় জলিলুলকদর সাহাবী যেমন হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল জাররা এবং হযরত মায়াজ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জাবাল অকুস্থল থেকে বাইরে চলে যাওয়াকে তাকদীর বিরোধী মনে করতেন। কিন্তু হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস বলতেন মানুষ ভীতি থেকে বাঁচার জন্য যেভাবে চেষ্টা করে বাঁচে তেমনি এ মুহূর্তে বাঁচার চেষ্টা না করা সঠিক হবে না। সুতরাং হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত মায়াজ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জাবালের ইন্তেকালের পর তিনি ইমারতের দায়িত্ব হাতে নিয়েই সেনাবাহিনীকে মহামারীর স্থান থেকে সরিয়ে পাহাড়ের ওপর নিয়ে গেলেন। এভাবে তারা প্লেগে আক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা পেলো। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুও হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসের এ কাজের প্রশংসা করলেন।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস সাহিত্য সৃষ্টিতে পারদর্শী এবং বাগ্মী ছিলেন। তাঁর রচনায় এবং ভাষণে সব ধরনের সাহিত্য গুণই সুলভ। ইতিহাসে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

একবার হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাকে এ পত্র লিখলেন ঃ

"হে আমর ! তোমার কাছে যা চাই তাহলো, এ পত্র পৌঁছার সাথে সাথেই তুমি মিসরের এমন সঠিক চিত্র তুলে ধরে চিঠি লিখবে যাতে আমি তা পাঠ করে সে দেশের বাস্তব অবস্থা স্বচক্ষে দেখার মতো মনে করতে পারি।"

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস এ চিঠির জবাবে লিখলেন ঃ

"হে আমীরুল মু'মিনীন ! মিসরকে বালুকাময় প্রান্তর ও শ্যামলীময় পূর্ণ দু'টি ভাগে বিভক্ত একটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত বলে মনে করতে পারেন। এক দিকে রয়েছে বালির টিলা আর অন্যদিকে রয়েছে জীর্ণ ঘোড়া অথবা উটের পেটের আকৃতির মত অবস্থা। এটা হলো মিসরের বাহ্যিক দৃশ্য। এ দেশের সামগ্রিক উৎপাদন ও সম্পদ আসওয়ান থেকে নিয়ে গাজা সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। আর এ সম্পদের মূল উৎস হলো একটি প্রবাহিত নদী। এ নদীর জোয়ার-ভাটা চন্দ্র ও সূর্যের উদয় এবং অস্তের সাথে সম্পৃক্ত।

একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিশ্বের সকল প্রস্রবণ যেন একটি নদীকে রাজস্ব স্বরূপ পানি প্রদান করে। সে সময় নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে দু' কূল ছেপে যায় এবং শস্য শ্যামলীমায় পূর্ণকারী পলি রেখে যায়।

এ সময় বিভিন্ন স্থান থেকে অসংখ্য ছোট ছোট নৌকা এখানে আগমন করে। মোটকথা সে সময় যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় নৌকা। খেজুরের পাতার সাথে এসব নৌকার সংখ্যার তুলনা করা যায়।

এরপর ভূমি সিঞ্চনের জন্য যখন আর পানির প্রয়োজন থাকে না, তখন ভাগ্যবান নদীটি নিজের সীমায় প্রত্যাবর্তন করে। এ সময় নদীর মধ্যে লুকায়িত সম্পদ অনায়াসেই আহরণ করা যায়।

খোদার আশির্বাদ পুষ্ট একটি জীব। মৌমাছির মত অন্যের জন্য শ্রম দানকারী এ জীবটি নিজের শ্রম ও গায়ের ঘামের জন্য কোনো লাভের ধার ধারে না। তারা এ মাটিতে সামান্য হাল কর্ষণ করে, বীজ বপন করে এবং সেই স্রষ্টার কাছেই সবুজের-সমারোহ প্রার্থনা করে যে স্রষ্টা শস্যের বৃদ্ধি এবং চরম রূপদানের দায়িত্ব পালন করেন। বীজ বর্ধিত হয়। বৃক্ষ বাড়তে থাকে এবং শিশির বিন্দুর মাধ্যমে মেঘের কাজ হয়ে ফলের খোসা তৈরি হয় এবং তা পোক্ত হয়।

সুন্দর ফসল হওয়ার পরও কোনো কোনো সময় আবার খরার বছর আসে। আমীরুল মু'মিনীন! কোনো কোনো সময় এ শস্য শ্যামল মিসরে খরার কারণে নেমে আসে দুর্ভিক্ষ। মোটকথা বৈপরিত্যে ভরা এ দেশ।

শস্য শ্যামলীমাপূর্ণ মিসর এবং তার বাসিন্দাদের সুপ্রসন্ন ভাগ্য তিনটি জিনিসের ওপর নির্ভরশীল। প্রথমত এমন প্রস্তাব করা প্রয়োজন যাতে রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়ত রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ নদী ও পুলের রক্ষণাবেক্ষণ এবং নতুন নির্মাণে ব্যয় করা উচিত। তৃতীয়তঃ সবসময়ই জমির উৎপাদানের ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারণ করা দরকার।—ওয়াসসালাম

আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে সাইপ্রাসের ওপর হামলার অনুমতি চাইলেন। আমীরুল মু'মিনীন হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে পত্রে সমুদ্রের অবস্থা জানতে চেয়ে পত্র লিখলেন। তিনি জবাবে জানালেন ঃ

"আমি একটি বড় সৃষ্টি দেখেছি। যার ওপর ছোট সৃষ্টি এমনভাবে বসে আছে যেমন কাঠের ওপর পোকা। কাঠ যদি সামান্য এদিক ওদিক হয়, তাহলে পোকা ডুবে যাবে। আর যদি সহীহ সালামতে থাকে তাহলেও ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় থাকে।"

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসের জীবনে রাসূল প্রেম, বাহাদুরী জিহাদের প্রেরণা ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ, শরাফত, নরম মন এবং তাদবির ও রাজনীতি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালোবাসার অবস্থা এমন ছিলো যে, একবার মদীনায় এক গুজবের ফলে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা সৃষ্টি হলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সময় কতিপয় সাহাবী সমভিব্যাহারে মসজিদে নববীতে অবস্থান করছিলেন। বস্তুত প্রকৃত অবস্থা কেউই অবগত ছিলেন না। এজন্য চারিদিকে ভীতি ছড়িয়ে পড়লো। এ নাজুক অবস্থায় শুধুমাত্র হযরত আবু হুজাইফা রাদিয়াল্লাহ আনহু গোলাম সালেম রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর ইবনুল আস তরবারি হাতে মসজিদে দাঁড়িয়ে রইলেন। যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সামান্যতম আঘাতও না আসতে পারে এবং প্রয়োজনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিতেও সামান্যতমও কুণ্ঠাও ছিলো না। পরিস্থিতি একটু শান্ত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের উদ্দেশ্য করে খুতবা দিলেন। খুতবায় তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

আশ্রয়ে কেন আগমন করোনি এবং আমর ইবনুল আস ও সালেমের অনুকরণ কেন করোনি ? কাণাঘুষার মধ্যে আল্লাহর রাসূলের কাছে তোমাদের দৌড়ে আসা উচিত ছিলো এবং ঐকবদ্ধভাবে ভীতির মুকাবিলা করার দরকার ছিলো।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস স্বয়ং বলতেন, ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রিয় বস্তু দুনিয়ায় আমার কাছে আর কিছুই ছিলো না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁকে সম্মান করতেন এবং তাঁর প্রতি ছিলেন স্নেহশীল। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে বর্ণিত আছে যে, একবার এক ব্যক্তি হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললো, সেই ব্যক্তি কি চরিত্রবান নন, যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ভালোবাসতেন ?

তিনি বললেন, এমন এক ব্যক্তির সৌভাগ্যবান হওয়া সম্পর্কে কি কোনো সন্দেহ থাকতে পারে ?

সেই ব্যক্তি বললো, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওফাত পর্যন্ত আপনাকে ভালোবাসতেন।"

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন সময় হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে খোলাখুলিভাবে প্রশংসা করেছেন। একবার তাঁর ঈমানের প্রশংসা করে বললেন, "হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু সাচ্চা মু'মিন।"–(মুসনাদে আহমদ)

একবার এরশাদ করলেন, আমর ইবনুল আস কুরাইশদের মধ্যে অন্যতম সালেহ ব্যক্তি।–(আল ইসাবা)

আরো একবার বলেছিলেন, "আবদুল্লাহ এবং আবু আবদুল্লাহ [আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস] উত্তম পরিবারের মানুষ।–(কানযুল আমাল)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকটি অভিযান তাঁকে জলিলুল কদর সাহাবীদের ওপর অফিসার বানিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী পুরুষ ছিলেন। আমীর হওয়ার কারণে যুদ্ধে পিছনে থাকতেন না। বরং প্রথম কাতারে থেকে বাহাদুরী প্রদর্শন করতেন।

আল্লাহর পথে জিহাদে তিনি অকুতোভয় ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এবং তার পরও ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে অসংখ্য লড়াইয়ে তিনি জান প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করেছেন। সবসময়ই শাহাদাতের তীব্র আকাংখা মনের বীণায় বাজতো। এজন্য প্রত্যেক যুদ্ধেই শত্রু ব্যূহে অবলীলাক্রমে ঢুকে পড়তেন এবং বেপরোয়া হয়ে যুদ্ধ করতেন। আজনাদাইনের

যুদ্ধে তিনি এবং তাঁর ভাই হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহু সারারাত শাহাদাত প্রাপ্তির দোয়া করলেন। পরের দিন হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহু যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেলেন। আর তিনি দোয়া করলেন। পরের দিন হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহু যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেলেন। আর তিনি বেঁচে রইলেন। শাহাদাত থেকে মাহরুম থাকার কারণ আজীবন দুঃখ প্রকাশ করতেন। তিনি বলতেন, হিশাম আমার থেকে আফজাল ছিলেন। এজন্য শাহাদাত প্রশ্নে তার দোয়া কবুল হয়ে গেলো।

বিত্ত বৈভব এবং ধন-সম্পদের দিক থেকে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস আরবের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। তিনি যেমন ধনী ছিলেন তেমনি তাঁর অন্তরও ছিলো প্রশস্ত। আল্লাহর পথে নিজের সম্পদ দরাজ হাতে খরচ করতেন। তিনি বলতেন ঃ "সবচেয়ে বড় দানশীল সেই ব্যক্তি যিনি দুনিয়াকে দীনের উন্নয়নে ব্যয় করেন।"

স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার তাঁর ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহর আবেগের প্রশংসা করে প্রকাশ্যভাবে তিনবার বলেছিলেন ঃ

"হে আল্লাহ ! আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসের মাগফিরাত দান করো। আমি যখনই তাকে দান করার জন্য ডেকেছি তৎক্ষণাৎ সে দান করেছে।"–(কানযুল আমাল)

ইমাম হাকিম (র) নিজের গ্রন্থ "মুসতাদরাকে" হযরত আলকামা বিন রামছার বর্ণনা এভাবে নকল করেছেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে কোনো অভিযানে বাহরাইন প্রেরণ করলেন এবং নিজের অন্য এক অভিযানে তাশরীফ নিলেন। আমরাও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহযাত্রী ছিলাম। পথিমধ্যে তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। জেগে বললেন, "হে আল্লাহ ! আমরের ওপর রহম করো।"

একথা শুনে আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই "আমর" নামক ব্যক্তিটির উল্লেখ করতে লাগলাম। আবার দ্বিতীয়বার চোখ মুদিত করলেন এবং জেগে প্রথম কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। তৃতীয়বারও একই ঘটনা ঘটলো। আমরা নিজেদেরকে স্থির রাখতে না পেরে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আপনি কোন্ আমরের দিকে ইঙ্গিত করছেন। ইরশাদ হলো আমর ইবনুল আস। আমরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমার সেই কথা মনে পড়ছে। যখন আমি লোকদের কাছে সাদকাহ বা দান চাইতাম। তখন সে প্রচুর সাদকা আনতো। আমি জিজ্ঞেস করতাম কোত্থেকে এনেছ। তখন বলতো আল্লাহ দিয়েছেন।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস প্রকৃতিগতভাবেই দাতা ছিলেন। গরীব-দুঃখীদেরকে মুঠো ভরে ভরে দান করতেন। গরীব শরীফদের ওপর তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিলো। না চাইতেই তাদেরকে দিতেন এবং এবং অন্তর খুলে দিতেন।

শরাফত এবং নরম দিলের দিক থেকে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। বিলবিসের যুদ্ধে মাকুকাসের কন্যা গ্রেফতার হয়ে তাঁর সামনে এলো। তিনি তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেন এবং নিরাপত্তাসহ তার পিতার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

ইসকান্দারিয়া বিদ্রোহে এক কিবতি সরদার তালমা গ্রেফতার হলো এবং তাঁর কাছে পেশ করা হলো। তিনি তার সাথে অত্যন্ত সুন্দর ব্যবহার করলেন এবং সাবধান করে মুক্ত করে দিলেন। কেননা সাধারণত কিবতীরা বিদ্রোহে অংশ নেয়নি। দু' একজন যারা অংশ নিয়েছিলো তাদেরকে রোমকরা পথভ্রষ্ট করেছিলো।

আর এক ঘটনাতেও তার নরম মনের পরিচয় পাওয়া যায়। আইনে শামস বা কাছরে শামা বিজয়ের পর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু খেলাফতের দরবারে ইসকান্দারিয়ায় সৈন্য প্রেরণের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। সেখান থেকে অনুমোদন এলে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু যাত্রার নির্দেশ দিলেন। ঘটনাক্রমে একটি কবুতর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর তাঁবুতে বাসা বেধেঁছিলো। তাঁবু ভাঙ্গা হচ্ছিলো। এ সময় তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পড়লো কবুতরের বাসার ওপর। কবুতরকে সেখানেই রাখার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, আমাদের মেহমান যেনো কষ্ট না পায়। বস্তুত আরবীতে তাঁবুকে ফুসতাত বলা হয়। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস ইসকান্দারিয়া থেকে ফিরে এসে সেই তাঁবুর কাছেই শহর পত্তন করেছিলেন। এজন্য ফুসতাত নামেই শহরের নাম বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলো এবং আজ পর্যন্তও সে নামেই খ্যাত আছে।–(আল ফারুক)

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস নিজের ইমারাতকালে মিসরবাসী বিশেষ করে কিবতীদের সাথে অত্যন্ত স্নেহ বৎসল ব্যবহার করতেন। আর এ কারণেই তারা তার সত্যিকার শুভাকাংখী এবং অনুগত ছিলো। এ নরম ব্যবহারের কারণেই রাজস্ব কম আদায় হতো। এ ব্যাপারে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত ওসমান জুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহ আনহু উভয়েই তাঁর কাছে জবাব চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর কর্মকৌশল পরিবর্তন করেননি। বরখাস্তের পর হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে এ ব্যাপারে তাঁর কথোপকথন হয়েছিলো। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে

বলেছিলেন যে, তাঁর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি অধিক রাজস্ব আদায় করে প্রেরণ করেছে (উটনী বেশী দুধ দিয়েছে) তখন তিনি এ অর্থপূর্ণ বাক্য বলেছিলেন—"কিন্তু শাবক বা বাছুর তো অভুক্ত রয়ে গেছে।"

একথার মাধ্যমে তিনি এ বুঝাতে চেয়েছিলে যে, মিসরবাসীর কাছ থেকে রাজস্ব তো বেশী আদায় করা হয়েছে। কিন্তু এটা দেখা হয়নি যে, রাজস্ব আদায়ের পর তারা অভুক্ত রয়েছে কিংবা দারিদ্রে নিমজ্জিত হয়েছে।

রাজনীতি ও কূটনীতি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতার দিক থেকে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস আরবের হাতে গোনা কয়েকজনের অন্যতম ছিলেন। তাঁর চরিত্রের প্রতি তীক্ষ্ণভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, চিক্ষণতার ক্ষেত্রে সমকালীন সময়ে তিনি ছিলেন একক। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সঠিক মতের প্রশংসা করে একবার তাঁকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

"ইসলামে তুমি সঠিক মতের মানুষ।–(কানযুল আমাল) হযরত ওমর ফারুকের রাদিয়াল্লাহ আন মত মানুষ বলতেন ঃ

"আমর ইবনুল আস হুকুমাতের জন্য যোগ্য মানুষ।" তিনি যখন কোনো অপোক্ত এবং দুর্বল মতের মানুষ দেখতেন তখন আশ্চর্য প্রকাশ করে বলতেন —"আল্লাহু আকবার—এ ব্যক্তি এবং আমর ইবনুল আসের সৃষ্টিকর্তাতো একই।"

শাইখাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুর পর হযরত আমর ইবনুল আস যে কর্ম-পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, তা অনেক চরিতকারই সমালোচনা করেছেন। কিন্তু এ ধরনের বাহাছ মুবাহিছা এ পুস্তকের আলোচ্য বিষয় নয়। প্রাচীন আলেমদের কাছে সাহাবাদের ঝগড়া-বিবাদের ব্যাপারে জবান বন্ধ রাখাই শ্রেয়। যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো সাহাবীর পক্ষ থেকে কোনো ত্রুটি হয়েও যায়, তাহলে ব্যাপারটি আল্লাহই দেখবেন। আমাদের এ ব্যাপারে কটু বাক্য করা এবং তাঁর অন্যান্য গুণাবলী উপেক্ষা করা ঠিক নয়।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস অত্যন্ত মর্যাদাবান হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। গর্ব এবং অহংকার তাঁকে কখনও স্পর্শ করেনি। অধীনস্তদের প্রতি পিতার মতো স্নেহশীল ছিলেন। এক যুদ্ধে তাঁর গোলাম এবং সন্তান দু'জনই আহত হয়। প্রথমে তিনি গোলামের কাছে যান। তার জখম দেখেন এবং সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, এখন কিছু দিন আরাম করো। তারপর পুত্রের দিকে অগ্রসর হন এবং তার অবস্থা জিজ্ঞেস করেন।

হযরত কাবিছাছ রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেছেন, "হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস নিজের বান্ধবদের মধ্যে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় এবং প্রিয় ছিলেন। এ ধরনের আমি আর কাউকে দেখিনি।"

তিনি সুন্দর ব্যবহার দিয়ে মিসরীয়দের অন্তর জয় করে দিয়েছিলেন। মিসরীয়রা তাঁকে মুরুব্বী মনে করতো। কখনো কখনো তিনি ক্রোধান্বিত হতেন। কিন্তু সাধারণত তিনি মিষ্ট ভাষী ছিলেন। একবার এক বুড়ো খচ্চরে চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। এক ব্যক্তি দেখে বললো, আপনি মিসরের আমীর হয়ে এ ধরনের পশুর ওপর সওয়ার হয়েছেন। তিনি বললেন, পশু যতক্ষণ বোঝা বহন করতে পারে, স্ত্রী যতক্ষণ অনুগত থাকে এবং বন্ধু যতক্ষণ পর্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে ততক্ষণ আমি অসন্তুষ্ট হই না।

চরিতকাররা হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসের অনেক বাণী উদ্বৃত করেছেন। তাঁর মধ্যে কতিপয় এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

০ সবচেয়ে বড় বাহাদুর সেই ব্যক্তি যার ধৈর্য ক্রোধের ওপর বিজয়ী হয়।

০ সবচেয়ে বড় দাতা সেই ব্যক্তি যে নিজের দুনিয়াকে দীনের উন্নয়নে খরচ করে।

০ এক হাজার উপযুক্ত ব্যক্তির মৃত্যুতে ততখানি ক্ষতি সাধিত হয় না যতখানি ক্ষতি সাধিত হয় একজন অনুপযুক্ত ব্যক্তির ক্ষমতাসীন হওয়ার।

০ শরীফ অভুক্ত হলে মুকাবিলা করে এবং নীচদের উদর পূর্তি হলে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে যাওয়ার হিম্মত দেখায়। সুতরাং অভুক্ত শরীফ এবং ভুখা নীচদেরকে ভয় করো। অভুক্ত শরীফদের খেতে দাও এবং নীচদের তাঁবুতে রাখো।

০ আমি যদি নিজের গোপন তথ্য কোনো বন্ধুকে বলি, আর সে তা প্রচার করে বেড়ায়, তাহলে সে জন্য গাল-মন্দ পাবার হকদার আমি, সে নয়।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস হযরত আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওফাদার বন্ধু ছিলেন। কিন্তু তাঁর সামনে সত্য বা হক কথা বলতে কখনই দ্বিধা করতেন না এবং অন্তরে যা থাকতো স্পষ্টভাবে মুখ দিয়ে তা প্রকাশ করতেন।

চরিতকাররা কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। যেসব ঘটনায় তাঁর হক কথা এবং স্পষ্টবাদিতার স্বাক্ষর মেলে। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস নিসন্দেহে আমাদের ইতিহাসের এক মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব। যাঁকে স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালেহ ব্যক্তির উপাধিতে ভূষিত এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভালোবেসেছেন। তার সৌভাগ্যবান ও মর্যাদাবান হওয়ার প্রশ্নে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।

গ্রন্থপঞ্জী

১. পবিত্র কুরআন শরীফ
২. সহীহ্ আল বুখারী
৩. সহীহ্ আল মুসলিম
৪. মুসনাদে আবু দাউদ
৫. মুসনাদে আহম্মদ বিন হাম্বল
৬. জামে আত তিরমিযি
৭. মুসতাদরাকে হাকেম
৮. মিশকাত শরীফ
৯. তাবকাতে ইবনে সাআদ রাদিয়াল্লাহ্ আনহু
১০. তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক—ইবনে জারীর তাবারী (র)
১১. আল ইসাবাহ ফি তামাইয়িজুস সাহাবাহ—হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র)
১২. তাহযীবুত তাহযীব—হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র)
১৩. আর ইসতিয়াব মারিফাতুল আসহাব—হাফিজ ইবনে আবদুল বার (র) উন্দুলুসী
১৪. আস-সিরাতুন নুববিয়াত—ইবনে হিশাম (র)
১৫. যাদুল মাআদ—হাফিজ ইবনে কাইয়েম (র)
১৬. উসুদুল গাব্বাহ—ইবনে আসীর (র)
১৭. আল কামিল ফিত তারীখ—ইবনে আসীর (র)
১৮. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া—হাফিজ ইবনে কাসীর (র)
১৯. ফতহুল বুলদান—বালাজুরী (র)
২০. আল আনবারুত তাওয়াল—আবু হানিফা দিনাওয়ারী
২১. তরজুমানুল সুন্নাহ—মাওলানা বদরে আলম মিরাঠি (র)
২২. মাআরিফুল হাদীস—মাওলানা মুহাম্মদ মনজুর নুমানী
২৩. খালিদ সাইফুল্লাহ—আবু যায়েদ শালবী
২৪. আল ফারুক—শিবলী নুমানী (র)
২৫. তারীখে ইসলাম—শাহ মুঈনউদ্দীন আহমদ নদবী মরহুম

২৬. তারীখে ইসলাম—আকবর শাহ খান নজিব আবাদী মরহুম
২৭. মিয়ারুস সাহাবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুম—শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নদবী মরহুম
২৮. সিয়ারে আনসার রাদিয়াল্লাহ আনহু—মৌলভী সাঈদ আনসারী মরহুম
২৯. সিয়ারুস সাহাবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুম—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড—মৌলভী সাঈদ আনসারী মরহুম
৩০. আহলি কিতাব সাহাবাহ ওয়া তাবেয়ীন—হাফিজ মুজিবুল্লাহ নদবী
৩১. তারীখে মিল্লাত—কাজী যয়নুল আবেদীন মীরাঠি
৩২. হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর সরকারী পত্রাবলী—খুরশীদ আহমদ ফারুক
৩৩. আল মাশাহেদ—হাকিম রহমান আলী খান মরহুম
৩৪. দায়েরায়ে মাআরেফে ইসলামিয়া (ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম) পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়—বিভিন্ন খণ্ড
৩৫. হায়াতুস সাহাবা রাদিয়াল্লাহ আনহুম—মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ কানধুলুবী (র)

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

* **তাফহীমুল কুরআন (১-১৯ খণ্ড)**
  –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
* **তরজমায়ে কুরআন মজীদ (এক খণ্ডে)**
  –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
* **তাদাব্বুরে কুরআন (১-২ খণ্ড)**
  –মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী
* **শব্দে শব্দে আল কুরআন (১-১ ৪খণ্ড)**
  –মাওলানা মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান
* **সহীহ আল বুখারী (১-৬ খণ্ড)**
  –আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী র.
* **সুনান ইবনে মাজা (১-৪ খণ্ড)**
  –আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা র.
* **শারহু মাআনিল আছার (তাহাবী শরীফ) (১-২ খণ্ড)**
  –ইমাম আবু জাফর আহমাদ আত-তাহাবী র.
* **সীরাতে সরওয়ারে আলম (১-২ খণ্ড)**
  –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
* **মহানবীর সীরাত কোষ**
  –খান মোসলেহ উদ্দীন আহমদ
* **বিশ্বনবীর মোযেজা**
  –ওয়ালিদ আল আযমী
* **হযরত আবু বকর রা.**
  –মুহাম্মদ হুসাইন হাইকল
* **শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দা'য়ী ইলাল্লাহ**
  –মুহাম্মদ নূরুজ্জমান
* **মাওলানা মওদূদীকে যেমন দেখেছি**
  –অধ্যাপক গোলাম আযম
* **মুন্‌সী মেহেরউল্লা ঃ জীবন ও কর্ম**
  –নাসির হেলাল

২

বিশ্ব নবীর সাহাবী

তালিবুল হাশেমী

বিশ্বনবীর সাহাবী

২য় খণ্ড

তালিবুল হাশেমী

অনুবাদ ঃ আবদুল কাদের

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১৩৭

১ম প্রকাশ ঃ এপ্রিল ১৯৮৯

৬ষ্ঠ প্রকাশ
জমাদিউল আউয়াল ১৪৩০
জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬
মে ২০০৯

বিনিময় ঃ ১২০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

سرور کائنات کے پچاسی صحابی -এর বাংলা অনুবাদ

BISHA NABIR SAHABI 2nd Volume by Talibul Hashemy.
Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 120.00 Only

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'পঞ্চাশজন সাহাবী'র দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে গেছে। এ জন্য দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। এ মুহূর্তে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃপক্ষ সাহাবী চরিত গ্রন্থসমূহকে কয়েক খণ্ডে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে 'পঞ্চাশজন সাহাবী'র প্রথম খণ্ড 'বিশ্ব নবীর সাহাবী' প্রথম খণ্ড নামে প্রকাশিত হয়েছে। 'পঞ্চাশজন সাহাবী'র দ্বিতীয় খণ্ডও 'বিশ্ব নবীর সাহাবী' দ্বিতীয় খণ্ড হিসেবে প্রকাশিত হলো। পরবর্তীতে আরো কয়েক খণ্ডে 'বিশ্ব নবীর সাহাবী' প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে। সময়-সুযোগে ইনশাআল্লাহ তা প্রকাশিত হবে।

'বিশ্ব নবীর সাহাবী'র দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে সবিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। গ্রন্থটি বাংলাভাষী পাঠককে আকৃষ্ট করতে পেরেছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যাওয়াই তার প্রমাণ। দ্বিতীয় সংস্করণও পাঠকের কাছে সমাদৃত হবে বলে আমরা আশা করি।

'বিশ্ব নবীর সাহাবী' গ্রন্থের অনুবাদের ভুলত্রুটি আমাকেই কাঁদে নিতে হবে। এ ব্যাপারে কারো কোন বক্তব্য থাকলে তা জানানোর অনুরোধ রইলো। ভুল-ত্রুটি শুধরে নেয়ার আন্তরিক প্রয়াস চালানো হবে। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে যারা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি বিশেষ করে আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। 'বিশ্ব নবীর সাহাবী' গ্রন্থের অনুবাদ কাজের জন্য আল্লাহর নিকট আখিরাতের মুক্তি কামনা করি। যাঁরা এ কাজে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ পাক তাঁদেরকেও আখিরাতে মুক্তি দিন-এ মুনাজাত করি। আমীন।

ঢাকা, ১৭ই ফাল্গুন ১৪০০ সাল
[illegible]ই রমযান, ১৪১৪ হিজরী।
১লা মার্চ, ১৯৯৪ সাল।

বিনয়াবনত
আবদুল কাদের

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
০ কুরআনে হাকিম ও সাহাবীদের মর্যাদা	১
২১. হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)	২৫
২২. হযরত মুগিরাহ (রাঃ) বিন হারিছ হাশেমী	৫৫
২৩. হযরত আবুল আছ (রাঃ) বিন রবি	৬১
২৪. হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ)	৬৯
২৫. হযরত ওবায়দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)	৭৮
২৬. হযরত যবরকান (রাঃ) বিন বদর তামিমী সাদী	৮২
২৭. হযরত জারুদ (রাঃ) বিন আমর আবদী	৮৭
২৮. হযরত মোহাম্মদ (রাঃ) বিন তালহা (রাঃ)	৯৩
২৯. হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন বুদাইল (রাঃ) খুজায়ী	৯৭
৩০. হযরত হুরাইতিব (রাঃ) বিন আবদুল উজ্জা	১০২
৩১. হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন মিরদাস	১০৭
৩২. হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের	১১২
৩৩. হযরত আমর (রাঃ) বিন সাঈদ উমুব্বী	১২৬
৩৪. হযরত সাঈদ (রাঃ) বিন আছ	১২৯
৩৫. হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন উবাদাহ আনসারী	১৩৫
৩৬. হযরত হারাম (রাঃ) বিন মিলহান আনসারী	১৪১
৩৭. হযরত হাসিলুল ইয়ামান (রাঃ)	১৪৫
৩৮. হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন যায়েদ আনসারী	১৪৮
৩৯. হযরত হুরকাহ (রাঃ) বিন আমর আনসারী	১৫৫
৪০. হযরত যিয়াদ (রাঃ) বিন লবিদ আনসারী	১৫৭
৪১. হযরত হাস্সান (রাঃ) বিন সাবিত আনসারী	১৬১
৪২. হযরত আবু মাসউদ বদরী আনসারী (রাঃ)	১৮১
৪৩. হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন উনাইস জুহানি	১৮৬
৪৪. রাফায়াহ (রাঃ) বিন রাফে (রাঃ) আনসারী	১৯২
৪৫. হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বিন জাবার আনসারী	১৯৫
৪৬. হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিত আনসারী	১৯৯
৪৭. হযরত ছারমাহ (রাঃ) বিন আবি আনাছ আনসারী	২১৩
৪৮. হযরত সাহাল (রাঃ) বিন হুনাইফ আনসারী	২১৭
৪৯. হযরত নু'মান (রাঃ) বিন বশির (রাঃ) আনসারী	২২১
৫০. হযরত ইয়ামিন (রাঃ) বিন উমায়ের	২৩১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কুরআনে হাকিমও সাহাবীদের মর্যাদা

সারওয়ারে কায়েনাত, ফখরে মওজুদাত, রহমতে আলম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন মানবকূলের শ্রেষ্ঠতম মানব। তিনি ছিলেন কামিল ইনসান। সার্বিক গুণাবলীর সমাহার ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ'র (সাঃ) সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) মর্যাদা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সমাসীন। নবীদের (আঃ) পর তাঁদের মত উন্নত মানব আজও বিশ্বে আবির্ভূত হয়নি। এ সব মহান মানব যাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ মানব রাসূলে আকরামের (সাঃ) দর্শনে নিজেদের চক্ষুকে আলোকিত করেছিলেন। তাঁরা সর্বোত্তম চরিত্রবানের উপর নিষ্ঠার সাথে ঈমান এনেছিলেন। সরাসরি সুহবতের ফায়েজও তাঁরা হাসিল করেছিলেন এবং তাঁর উত্তম আদর্শকে জীবনের অনির্বাণ শিখা বানিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁরা নভোমন্ডলীয় হেদায়াতের প্রোজ্জ্বল তারকা সদৃশ। তাঁদের সত্যবাদিতা ও ইখলাস, দিয়ানত এবং আমানত, শুভকামনা ও ত্যাগ এবং খোদাভীতি অতুলনীয়। তাঁদের পূত পবিত্র আত্মা থেকে আজ পর্যন্তও সৌভাগ্য এবং সফলতার দীপ্তি বিচ্ছুরিত হয়। তাহজিব তামাদ্দুনের গুচ্ছ তাঁরা সজ্জিত করেছিলেন। তাঁরাই রাজনীতি এবং অর্থনীতির ঔজ্জ্বল্য প্রদান করেছিলেন। জাহেলিয়াতের তমসা এবং কুফর ও শিরকের অন্ধকার গহ্বরে তাঁরাই হেদায়াতের প্রদীপ জ্বেলেছিলেন। আল্লাহর নাম বুলন্দ করার জন্যে তাঁরা জান মাল, সন্তান-সন্ততি তথা প্রয়োজনের মুহূর্তে সব কিছুই হাজির করেছিলেন।

রাসূলে আকরাম (সাঃ) একবার লোকদের সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউই মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি এবং অন্যান্য লোকদের চেয়ে আমার সাথে তাঁর ভালোবাসা বেশী না হয়।

প্রিয় নবীর (সাঃ) এ ইরশাদের সত্যতা সাহাবীরা (রাঃ)নিজেদের আমল দিয়ে এমনভাবে প্রমাণ করেছেন,যা বিশ্বের ইতিহাসে নজিরবিহীন। রিসালাত প্রদীপের এ সব পতঙ্গ ন্যায় বা সত্য পথে যে ধরনের দুঃখ-মুসিবত ও নির্যাতন সহ্য করেছেন তা পাঠ করলে শরীরের প্রতিটি লোমকূপ খাড়া হয়ে যায়। গা শিউরে উঠে। সত্য দ্বীনের প্রসার ও প্রচার এবং হক ঝাণ্ডার শির উন্নত করার লক্ষ্যে তাঁরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে কুরবানী দিয়েছিলেন তা ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে কিয়ামত পর্যন্ত তাওহীদ পন্থীদের জন্যে মশাল স্বরূপ হয়ে থাকবে। এ সব পবিত্র নফসের মানুষ আল্লাহর

সন্তুষ্টির জন্যে মাতা-পিতাকে পরিত্যাগ করেছেন। পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্নতা আবলম্বন করেছেন। স্বদেশ ভূমি ও গোত্রের লোকজনকে বিদায় জানিয়েছেন। ঘর-বাড়ী পরিত্যাগ করেছেন। ক্ষুধা সয়েছেন। সব ধরনের শারীরিক নির্যাতন সহ্য করেছেন। এমনকি প্রয়োজনে হক পথে নিজের জীবনকেও নজরানা হিসেবে পেশ করতেও কুন্ঠিত হননি। শুধুমাত্র প্রিয় নবীর (সাঃ) জীবদ্দশাতেই নয় বরং তাঁর ওফাতের পর সাহাবীরা (রাঃ) আল্লাহর দ্বীনের প্রতি যে ধরনের দরদ দেখিয়েছেন ও নিষ্ঠার সাথে খেদমত, হিফাজত ও প্রসারের কাজ করেছেন তার স্বীকৃতি প্রদান আমাদের ঈমানেরই দাবী। এ সকল পবিত্র আত্মা ইসলামী উম্মাহর কল্যাণকামী। এই উম্মাহ তাঁদের ইহসানের বোঝা থেকে কখনো অব্যাহতি পেতে পারে না। কোন নবী এবং রাসূল শেষ নবীর (সাঃ) সাহাবীর (রাঃ) মত জীবন উৎসর্গকারী সাথী পাননি। বাস্তব কথা হলো, প্রত্যেক সাহাবীই ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর নিদর্শন ছিলেন। আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের (সাঃ) সুন্নাত এ সব মহান ব্যক্তির মাধ্যমেই আমাদের কাছে পৌঁছেছে। তাঁদের চারিত্রিক দৃঢ়তার মাধ্যমে এ উম্মাত সাফল্য এবং কল্যাণের পথে ধাবিত হতে পারে। তাঁরা হলেন সুউচ্চ সত্যবাদিতার আলোকোজ্জ্বল তারকা। তাঁদেরকে প্রত্যক্ষ করে মুসলিম উম্মাহ জীবন তরীর মনযিলে মাকসূদ নির্ধারণ করতে পারে। আল্লাহ পাকের এসব পবিত্র এবং নির্বাচিত ব্যক্তির ত্যাগের আবেগ মহান স্রষ্টার এত পছন্দীয় ছিল যে কুরআনে পাকের স্থানে স্থানে তাঁদের গুণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের প্রশংসা করা হয়েছে এবং সরাসরি তাদেরকে বেহেশতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। যখন আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং রাসূলের (সাঃ) সাহাবীদের শান বর্ণনা করেন তখন সেইসব পবিত্র নফসের মর্যাদা প্রমাণে আর কোন দলিলের প্রয়োজন হয় না। কুরআনে হাকিম সাহাবা কিরামের (রাঃ) গুণাবলী, তাদের স্থান, মান ও মর্যাদা সম্পর্কে কি ধরনের বর্ণনা দিয়েছে তা দেখা যাক। সুরায়ে ফাতাহতে ইরশাদ হচ্ছে ঃ "মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ রাসূল। আর যাঁরা তাঁর সাথে রয়েছেন তাঁরা কাফেরদের উপর কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পর রহমশীল। তোমরা যখনই দেখবে তখনই তাদেরকে রুকু, সিজদা, আল্লাহর ফজিলত এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রচেষ্টায় মশগুল পাবে। সিজদাহর চিহ্ন তাঁদের চেহারায় মওজুদ রয়েছে। যা থেকে তাঁদেরকে পৃথকভাবে চেনা যায়। ইঞ্জিল এবং তাওরাতেও তাঁদের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের উদাহরণ এভাবে দেয়া হয়েছে যে, যেমন একটি ক্ষেত। ক্ষেতে বীজ অংকুরিত হলো। পরবর্তীতে তা শক্তিশালী হলো।এরপর আরো খানিকটা বর্দ্ধিত হলো। অতঃপর নিজের কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে গেল। এ ক্ষেত কৃষককে খুশী করে। অন্যদিকে কাফেররা ফুলে ফলে সুশোভিত ক্ষেত দেখে জ্বলে যায়। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে আল্লাহ তাদের মাগফিরাত এবং বড় ছওয়াবের ওয়াদা করেছেন।" -সূরা ফাতাহ ঃ ২৯

এ আয়াতসমূহে সাহাবায়ে কিরামের তিনটি গুণের কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। গুণ তিনটি হলোঃ কাফেরদের উপর কঠোর, পরস্পর রহমশীল এবং এ ধরনের ইবাদাত গুজার যে তাদের চেহারায় সিজদার নিদর্শন সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠতো। কাফেরদের উপর কঠোর অর্থ এ নয় যে, তাঁরা কাফেরদের সাথে তিক্ত ব্যবহার করতেন। বরং তার অর্থ হলো, কাফেরদের মোকাবিলায় তাঁরা ছিলেন পাথরের মত কঠিন। কোন ধমক, কঠোরতা, চাপ অথবা লোভ-লালসা তাদেরকে হক পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারতো না। তাঁরা ছিলেন প্রিয় নবীর (সাঃ) পক্ষে কাফেরদের বিরুদ্ধে মাথায় কাফন বাঁধা জীবন উৎসর্গকারী মানুষ।

পরস্পর রহমশীলের অর্থ হলো মুমিনরা একে অপরের ভাইয়ের মূর্তিমান প্রতিচ্ছবি। একে অপরের প্রতি দরদ পোষণ এবং দুঃখে দুঃখীত হয়। একজন আরেকজনকে সালাম, সদালাপ এবং হাসি-খুশী ব্যবহার প্রদর্শন করে। একে অন্যের সাথে পরামর্শ করে' পরস্পর সাহায্য করে এবং অপরের ব্যথায় ব্যথিত হয়। একে অন্যের খুন নিজের উপর হারাম মনে করে। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা, জুলুম, প্রতিশোধ গ্রহণ, অন্যায় প্রতিশ্রুতি, খারাপ ধারণা, অপবাদ দেয়া বিদ্রূপ এবং ফিতনা-ফাসাদ থেকে তারা দূরে থাকে। তাদের পরস্পর রহমশীল হওয়া অথবা ভ্রাতৃত্বের জযবার চূড়ান্ত অবস্থা এই ছিল যে, হজরত আবদুর রহমান (রাঃ) বিন আওফ মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা এলেন। মদীনা এসে তিনি হজরত সায়াদ (রাঃ) বিন রবি আনসারীর বাড়ী উঠলেন। হজরত সায়াদের (রাঃ) দু'জন স্ত্রী ছিল। তিনি হজরত আবদুর রহমানকে (রাঃ) বললেন, আমার সকল ধন সম্পদ আপনি অর্ধেক ভাগ করে নিন। এমনকি আমি নিজের স্ত্রীর একজনকে তালাক দিচ্ছি। ইদ্দতের পর আপনি তাকে শাদী করবেন।

হজরত আবদুর রহমানের (রাঃ) অন্তরেও হজরত সায়াদের (রাঃ) মতই ভ্রাতৃত্বের আবেগ ছিল। তিনি নিজের ভাইকে এ ধরনের পরীক্ষায় ফেলা পছন্দ করলেন না। তাঁর ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বললেন, আল্লাহ পাক তোমার সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে বরকত দিন এবং তোমার উপর রহমত নাযিল করুন। আমার আর কিছু প্রয়োজন নেই। বাজারের রাস্তা কোন দিকে শুধু এতটুকু বলে দাও। ব্যবসা করে আমি আমার রুজী কামাই করবো।

সিজদার নিদর্শন অর্থ কপালের সেই দাগ নয় যা সিজদা করার কারণে নামাজীদের কপালে পড়ে থাকে। বরং তার অর্থ খোদাভীতি, বিনয়, সত্যবাদিতা, শারাফত এবং সচ্চরিত্রের সেই সব চিহ্ন যা আল্লাহর সামনে অবনত হওয়ার কারণে মানুষের চেহারায় দীপ্যমান হয়ে উঠে। একজন অহংকারী, দুঃস্বভাব এবং বেশরম মানুষের চেহারা একজন শরীফ পবিত্র এবং বিনয়ী মানুষের চেহারা থেকে অবশ্যই পৃথক ধরনের হয়। কুরআনে কারিমে সাহাবাদের গুণ-বর্ণনায় বলা হয়েছে যে,

তাদের চেহারা আলোয় প্রদীপ্ত থাকে। ইমাম মালেক (রঃ) এই গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, সাহাবায়ে কিরামের বাহিনী সিরিয়া প্রবেশ করলো। এ সময় সেখানকার খৃষ্টানরা বলতে লাগলো, ইসার (আঃ) অনুগামীদের যে গুণ আমরা কিতাবে পড়েছি অথবা নিজেদের আলেমদের কাছে শুনেছি, আরব থেকে আগত লোকদেরও একই গুণে গুণান্বিত মনে হয়।

সূরায়ে আল-আনফালে সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) এ গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছেঃ "ঈমানদার তারাই যাদের অন্তর আল্লাহর নাম নেওয়ার সাথে সাথে কেঁপে ওঠে এবং যখন তাদের সামনে আল্লাহর কালাম পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় ও তারা নিজের রবের উপর ভরসা রাখে। সেই মানুষ যারা নামাজ কায়েম রাখে এবং আমরা তাদেরকে যে রুজী দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। তারাই সত্যিকারের ঈমানদার। তাদের জন্যে নিজের রবের কাছে মর্যাদা রয়েছে। অধিকন্তু মাগফিরাত এবং ইজ্জতের রুজীও রয়েছে।"

সূরায়ে "আত তাওবাহতে" ইরশাদ হয়েছে ঃ এবং ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার মহিলা একে অপরের সাহায্যকারী। নেক কথা শিক্ষা দেয় এবং খারাব কথা থেকে বিরত রাখে। নামাজ কায়েম রাখে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশ মুতাবেক চলে। আল্লাহ এ সব লোকের উপর রহম করবেন। অবশ্যই আল্লাহ সবচেয়ে বড় বিজ্ঞ।

সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) গুণই হলো তাঁদের অন্তর আল্লাহভীতিতে পরিপূর্ণ। তাঁদের সামনে কুরআনে হাকিমের আয়াত পঠিত হলে তাঁদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে কাফেরদের সামনে আল্লাহর কালাম পঠিত হলে তারা তাতে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। তাঁরা নিজের প্রকৃত স্রষ্টার উপর ভরসা রাখে। নামাজের পাবন্দী করে এবং নিজের হালাল আয় থেকে আল্লাহর পথে অকাতরে ব্যয় করে। একে অপরকে সাহায্য করে। ভালো কাজের নির্দেশ দেয় এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামাজ পড়ে, রোযা রাখে, যাকাত প্রদান করে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলের নির্দেশ মুতাবিক চলে।

সূরায়ে "আত-তাওবা" হর' অন্য এক স্থানে আল্লাহ পাক মুহাজির এবং আনসার সাহাবাদের (রা) প্রতি নিজের সন্তুষ্টির সুসংবাদ এই ভাষায় দিয়েছেনঃ

"যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে ও নিজেদের জান এবং মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে, আল্লাহর নিকট তাঁরা সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে সমাসীন এবং তাঁরা সফলতা লাভকারী। তাদের রব তাদেরকে তাঁর রহমত, সন্তুষ্টি এবং এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। যাতে তাঁদের জন্যে স্থায়ী নিয়ামত সমূহ থাকবে।

চিরকালের জন্যে তাঁরা সেখানে অবস্থান করবে। অবশ্যই আল্লাহর নিকট তাদের জন্য বড় প্রতিদান রয়েছে।"

সূরায়ে আল-আনফালেও একই ধরনের কথা বলা হয়েছে ঃ "যারা ঈমান এনেছে ও যারা আল্লাহর রাস্তায় ঘরবাড়ী পরিত্যাগ করেছে এবং জিহাদ করেছে, যারা আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে তারাই সত্যিকারের মুমিন। তাদের জন্যে গুণাহ খাতার ক্ষমা এবং সুন্দর রিযক রয়েছে। এবং যারা পরে ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে ও তোমাদের সাথে একত্রিত হয়ে জিহাদ করেছে তারাও তোমাদেরই অন্তর্ভূক্ত।" — আয়াতঃ৭৪-৭৫

এ পবিত্র আয়াত সমূহে আল্লাহ পাক বিশেষ করে সে সব মুহাজির এবং আনসারের কথা উল্লেখ করেছেন যাঁরা ইসলাম গ্রহণ প্রশ্নে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করেছেন। আর এভাবেই তারা "আস-সাবিকূনাল আওয়ালূন"-এর মহান উপাধির যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছেন। "আস-সাবিকূনাল আওয়ালূন" অর্থাৎ ইসলামের প্রথম যুগের সাহাবীদেরকে এ মর্যাদা ও স্থান দেয়া হয়েছে। এতে তাদের সাথেই শুধু জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়নি, বরং তাদের পদাংক অনুসরণ করে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবাদেরও (রাঃ) বেহেশতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। অগ্রগামীদের দলে সে সব মুহাজির সাহাবী (রাঃ) রয়েছেন, যাঁরা নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম যুগে কঠিন অবস্থায় ঈমান আনার সৌভাগ্য লাভ এবং হক পথে চলার জন্যে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট বরদাশত করেছিলেন। এমনকি তাঁরা নিজের ঘর বাড়ীও পরিত্যাগ করেন। তাদের এই সব কুরবাণী আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হয় এবং তাঁরা তাঁর কাছে সাচ্চা মুমিন এবং জান্নাতী হিসেবে অভিহিত হন। হক পথে তাঁরা যে নজীরবিহীন কুরবাণী স্বীকার করেন তার কতিপয় দৃষ্টান্ত পরখ করুন ঃ

নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম তিন বছরে প্রিয় নবী (সাঃ) অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে তাবলীগের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে থাকেন। নবুয়ত প্রাপ্তির চতুর্থ বছরের শুরুতে "ফাসদা' বিমা তুমারু ওয়া আ'রিজ আনিল মুশরিকিনা" (অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশাবলী প্রকাশ্য শুনান এবং মুশরিকদের কোন পরওয়া করবেন না) এ হুকুম নাযিল হলো। এ নির্দেশানুসারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রকাশ্যে হকের তাবলীগ শুরু করেন। ফলে মক্কার মুশরিকদের ক্রোধ ও গোস্বার আগুন পূর্ণ শক্তির সাথে ফেটে পড়লো। তাওহীদের দাওয়াত গ্রহণকারীদের উপর তারা এমন এমন লোমহর্ষক নির্যাতন চালালো যে তাতে মানবতা মুখ থুবড়ে পড়ে রলো।

হজরত বিলাল হাবশী (রাঃ) মক্কার এক মুশরিক সরদার উমাইয়াহ বিন খালফের গোলাম ছিলেন। ইসলামের আহ্বান শুনতেই তিনি সাচ্চা অন্তরে ঈমান আনেন। তাঁর মুসলমান হওয়ার কথা শুনেই উমাইয়াহ অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো। সত্য গ্রহণের অপরাধে

হজরত বিলালের (রাঃ) জন্যে সে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি আবিষ্কার করলো। তাঁর গলায় রশি বেঁধে মাস্তান যুবকদের হাতে তা দিয়ে দিত। আর তারা সে রশি ধরে তাঁকে মক্কার পাহাড়ী এলাকায় টেনে নিয়ে বেড়াত। অতঃপর উত্তপ্ত বালিতে এনে উপুর করে শুইয়ে দিত এবং পাথর এনে শরীরের ওপর চাপা দিত। রাসূলের (সাঃ) কবি হজরত হাসসান (রাঃ) বিন ছাবিত বলেন, আমি জাহেলী যুগে হজ্ব অথবা উমারাহর জন্য মদীনা থেকে মক্কা গিয়ে ছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম যে, ছেলেরা বিলালকে (রাঃ) রশি দিয়ে বেঁধে এদিক-ওদিক টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এ সত্ত্বেও সে লাত, উজ্জা, হাবল, আসাফ, নায়েলাহ এবং বাওয়ানাহকে (মূর্তি ও দেব-দেবীর নাম) সরাসরি অস্বীকার করছে।

কখনো কখনো উমাইয়াহ স্বয়ং হজরত বিলালকে (রাঃ) ঘর থেকে বের করে নিয়ে যেত এবং হিরার উত্তপ্ত বালুর উপর শুইয়ে দিয়ে ভারী পাথর তার বুকের উপর রেখে দিত। যাতে নড়াচড়া করতে না পারে। অতঃপর বলতো, মুহাম্মাদের (সাঃ) আনুগত্য প্রত্যাহার কর এবং লাত ও উজ্জাই প্রকৃত স্রষ্টা তার প্রতিশ্রুতি দাও। নচেৎ এভাবেই পড়ে থাকবে। এর জবাবে হক পুরস্ত হজরত বিলালের (রাঃ) মুখ দিয়ে আহাদ আহাদ শব্দ বেরুতো। প্রখ্যাত সাহাবী হজরত আমর(রা) বিনুল আস থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি হজরত বিলালকে (রাঃ) এ অবস্থায় দেখলেন যে উমাইয়াহ তাঁকে উত্তপ্ত শক্ত মাটিতে শুইয়ে রেখেছে। মাটিও এমন উত্তপ্ত যে, তার উপর যদি গোশত রাখা হতো তাহলে তা গলে যেত। কিন্তু তিনি সে অবস্থাতেও লাত এবং উজ্জাকে অস্বীকার করে চলেছেন।

কোন কোন দিন বনু জুমাহর ছোকড়ারা হজরত বিলালকে (রাঃ) মারাত্মকভাবে প্রহার করতো। দিনের বেলায় কাপড় খুলে লোহার জিরাহ পরাতো এবং রোদে রেখে দিত। সন্ধ্যায় হাত-পা বেঁধে এক প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ এবং রাতে চাবুক দিয়ে কষাঘাত করতো। এ সত্ত্বেও তাঁর কদম হক পথ থেকে বিচ্যুত হয়নি। মুখ দিয়ে আহাদ আহাদ শব্দ ছাড়া আর কিছুই বের হতো না।

আবু ফাকিহাহ ইয়াসার ইযদী (রাঃ) ও উমাইয়াহ বিন খালফের গোলাম ছিলেন। তিনিও ইসলাম গ্রহণ করলেন। এতে উমাইয়াহ তাঁকেও জুলুম-নির্যাতনের নিশানা বানালো। উত্তপ্ত বালুর উপর মুখ উবু করে তাঁকে শুইয়ে দিত এবং পিঠের উপর রেখে দিত ভারী পাথর। ভয়াবহ গরম ও বোঝার কারণে তিনি বেহুঁশ হয়ে যেতেন। একদিন পাষাণ হৃদয় উমাইয়াহ হজরত আবু ফাকিহার (রাঃ) দু'পায়েই রশি বাঁধলো এবং তাঁকে নির্দয়ভাব টেনে বাইরে নিয়ে গেল। সেখানে উত্তপ্ত বালুর উপর শুইয়ে দিল এবং এত জোরে তার গলার উপর চাপ দিল যে জিহ্বা বেরিয়ে এলো। তিনি নিঃসার হয়ে পড়ে রইলেন। উমাইয়াহ ভাবলো কারবার খতম। কিন্তু তখনো তিনি জীবিত ছিলেন। ঘটনাক্রমে হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) সেই পথ দিয় যাচ্ছিলেন। তিনি হজরত আবু ফাকিহার (রাঃ) ওপর এ নির্যাতনের মর্মন্তুদ চিত্র দেখলেন। তাঁর অন্তর কেঁদে

উঠলো এবং সে সময়ই আবু ফাকিহাকে (রাঃ) উমাইয়াহ'র কাছ থেকে ক্রয় করে আযাদ করে দিলেন। কিন্তু সে যুগে কাফেরদের জুলুম-নির্যাতন থেকে কোন স্বাধীন মুসলমান অথবা গোলাম কেউই মুক্ত ছিল না। হজরত আবু ফাকিহাহ (রাঃ) মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কাফেরদের নির্যাতনের শিকার হয়ে রইলেন। ফলে নবুওতের ৬ষ্ঠ বছরে তিনি হিজরত করে হাবশা চলে গেলেন। হক পথে নির্যাতন সইতে সইতে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল। বদরের যুদ্ধের কিছু দিন পূর্বে তিনি ইনতিকাল করেন।

কোরেশ সরদার সুহাইল বিন আমরের নেক প্রকৃতির সন্তান হজরত আবু জান্দাল (রাঃ) এবং হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) নবুয়তের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাতে পিতা এত ক্রোধান্বিত হলেন যে, দই পুত্রের পায়ে বেড়ি লাগিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করলো। তাঁরা সেখানে বছরের পর বছর ধরে বন্দীত্বের নির্যাতন সইতে থাকেন।

হজরত ইয়াসির (রাঃ) বিন আমের, তাঁর পত্নী হজরত সুমাইয়াহ (রাঃ) বিনতে খাবাত এবং দুই পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) এবং আম্মার (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু জেহেল তাঁদের উপর প্রচণ্ড নির্যাতন চালায়। তাদের অবস্থা পড়ে শরীরের লোমকূপ খাড়া হয়ে যায়। সে তাদেরকে পানিতে ডুবিয়ে রাখতো। উত্তপ্ত বালু এবং প্রজ্বলিত আগুনের উপর শুইয়ে দিত। মক্কার প্রখর রোদে দুপুরে দাঁড় করিয়ে রাখতো। বেত দিয়ে পিটাতো। মোট কথা সে নির্যাতন চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছলো। একদিন প্রিয় নবী (সাঃ) তাঁদেরকে কঠিন নির্যাতন সহ্য এবং মার খেতে দেখলেন। তিনি বললেন, "হে ইয়াসিরের খান্দান! ধৈর্য ধর। নিঃসন্দেহে তোমাদের স্থান জান্নাত।"

জালেম আবু জেহেল একদিন হজরত সুমাইয়াহ'র (রাঃ) গোপন নাজুক স্থানে এত জোরে নিযাহ মারলো যে তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হলেন। অতঃপর আর একদিন সে হতভাগা হজরত আবদুল্লাহকে (রাঃ) তাঁর মেরে শহীদ করে ফেললো। হজরত ইয়াসিরও (রাঃ) বৃদ্ধ অবস্থায় নির্যাতন সইতে সইতে ওফাত পেলেন। হজরত আম্মারের (রাঃ) হায়াত ছিল, এজন্যে তিনি বেঁচে গেলেন। নচেৎ আবু জেহেল তাঁকেও মেরে ফেলতে দ্বিধা করতো না।

হজরত যুবাইর (রাঃ) ইবনুল আওয়াম ঈমান আনলেন। এতে তাঁর অভিভাবক চাচা নওফিল বিন খুয়ায়েলদ ক্রোধে ফেটে পড়লো। হাফিজ ইবনে কাছির (রাঃ) "আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া" গ্রন্থে লিখেছেন, নওফিল হজরত যুবাইরকে (রাঃ) চাটাইতে শুইয়ে দিত। এর পর আগুন জ্বালিয়ে তাতে ধুনি দিত এবং যুবাইরকে (রাঃ) বলতো, নিজের বাপ দাদার ধর্মে ফিরে আয়। কিন্তু যুবাইর (রাঃ) বার বারই বলতেন, "কখনই নয় কখনই নয়। এখন আর আমি কুফুরী গ্রহণ করবো না।"

হজরত মাছয়াব (রাঃ) বিন উমাইর বনু আবদিদ্দার গোত্রের এক সচ্ছল পরিবারের সন্তান ছিলেন। মক্কায় তাঁর মত সুদর্শন যুবক দ্বিতীয় আর কেউ ছিল না। সে সর্বোত্তম মানের পোশাক পরতো এবং উন্নত ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করতো। যে রাস্তা দিয়ে হাঁটতো তা সুবাসিত হয়ে যেত। পায়ে জরিদার হাজরামী জুতা পরিধান করতো। পিতা-মাতার এ আদুরে সন্তান বেশীর ভাগ সময় সাজ-গোজ, আরাম-আয়েশ এবং সুন্দর চুলের যত্ন করেই কাটাতো। এ সত্ত্বেও আল্লাহ পাক তাঁকে সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। রাসূলের (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম যুগে যেই তাওহীদের অমীয় বাণী তাঁর কর্ণ কুহরে প্রবেশ করলো তখনই নির্দ্বিধায় তাকে স্বাগত জানালো। বাড়ীর লোকেরা এ খবর পেয়ে ইসলামগ্রহণের অভিযোগে হাত-পা বেঁধে তাঁকে নির্জন স্থানে আটক করে রাখলো। কিন্তু তিনি কোন অবস্থাতেই হক পথ থেকে বিচ্যুত হলেন না। অবশেষে তাঁকে বাড়ী থেকে বহিষ্কার করা হলো। নবুয়ত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পর তিনি রাসূলের (সাঃ) ইঙ্গিতে হিজরত করে হাবশা চলে গেলেন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর জুলুম নির্যাতন সইতে সইতে তাঁর সুশ্রী নিঃশেষ হয়ে গেল। রেশমের পোশাকের পরিবর্তে একটি কম্বলের অর্ধেক পরিধান করতেন এবং বাকী অংশ গায়ে জড়াতেন। পরিধেয় অংশটুকু বাবলার কাঁটা দিয়ে আটকে রাখতেন। নবুয়ত প্রাপ্তির ১২ বছর পর প্রিয় নবী (সাঃ) তাঁকে ইসলামের প্রথম শিক্ষক বানিয়ে মদীনা প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে ইসলামের তাবলীগ করতে থাকেন। তৃতীয় হিজরীতে ওহোদের যুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে শাহাদাত প্রাপ্ত হন। এতে নবী করিম (সাঃ) খুবই দুঃখিত হলেন। তিনি তাঁর লাশের নিকটে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

"মুমিনদের মধ্যে বহু এমন লোক রয়েছে যে, তারা আল্লাহর সাথে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা সত্যভাবে পালন করে দেখিয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকে নিজের সময় পুরো করেছে এবং অনেকে ইন্তেজার বা অপেক্ষা করছে এবং নিজের ইচ্ছার কোন পরিবর্তন সাধন করেনি।" (সুরায়ে আহযাব ঃ ২৩)

এরপর প্রিয় নবী (সাঃ) বিহ্বল চিত্তে বললেনঃ "মক্কায় আমি তোমার মত সুদর্শন এবং সুন্দর পোশাক পরিধানকারী আর কাউকে দেখিনি। কিন্তু আজ দেখছি যে, তোমার চুল অবিন্যস্ত ও মাটিতে লেপ্টে রয়েছে এবং তোমার শরীরের উপর একটি চাদর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কিয়ামতের দিন তোমরা আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হবে।"

হজরত খাব্বাব (রাঃ) ইবনুল ইরত ইসলাম গ্রহণ করলেন। কাফিররা তাঁর উপর মারাত্মক নির্যাতন শুরু করলো। তাঁরা তাঁর কাপড় খুলে আগুনের উপর শুইয়ে দিত এবং বুকের ওপর রাখতো ভারী পাথর। কখনো দগদগে আগুনের ওপর শুইয়ে ভারী দেহের মানুষ তাঁর বুকের উপর বসতো। যাতে তিনি পাশ ফিরতে না পারেন। খাব্বাব (রাঃ) অটল

ধৈর্যের সাথে সে আগুনে কাবাব হতেন। এমন কি জখমের রক্ত এবং পুঁজ গলে গলে সেই আগুন নিভে যেত। ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, খাব্বাব (রাঃ) পাবণ্ড এক মহিলা উম্মে আনমারের গোলাম ছিলেন। মহিলাটি ইসলাম গ্রহণের অভিযোগে তাঁকে কখনো লোহার যিরাহ পরিয়ে রোদে শুইয়ে দিত এবং কখনো গরম লোহা দিয়ে তাঁর মাথায় দাগ দিত। এ ধরনের ভয়ংকর নির্যাতন সহ্য করতে করতে হজরত খাব্বাব কিছুদিন অতিবাহিত করলেন। এরপর একদিন ফরিয়াদ নিয়ে প্রিয় নবীর (সাঃ) খিদমতে হাজির হলেন।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, সে সময় রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কাবার দেয়ালের ছায়ায় শুয়ে ছিলেন। হজরত খাব্বাব রাসুলুল্লাহ'র (সাঃ) কাছে আরজ করলেনঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি আল্লাহ পাকের কাছে আমাদের জন্য কেন দোয়া করেন না ?" একথা শুনে হুজুর (সাঃ) উঠে বসলেন। তাঁর পবিত্র চেহারা লাল হয়ে গেল এবং বললেনঃ

"তোমাদের আগে অতীতকালে এমন লোকও ছিল, লোহার চিরুণী দিয়ে যাদের গোশত চেঁছে ফেলা হয়েছিল। হাড্ডি ছাড়া তাদের শরীরের আর কিছুই ছিলনা। এ কঠোর অবস্থায়ও তাঁরা নিজের দ্বীনের উপর থেকে আস্থা হারাননি। তাদের মাথার উপর করাত চালান হয়েছে। করাত দিয়ে চিরে তাদেরকে দু'ভাগ করা হয়েছে। এ সত্ত্বেও তাঁরা দ্বীন পরিত্যাগ করেননি। আল্লাহ এ দ্বীনকে অবশ্যই বিজয়ী করবেন এবং তোমরা দেখতে পাবে যে, সওয়ার একাকী ইয়েমেন থেকে হাজারে মাওত পর্যন্ত যাবে ও আল্লাহ ছাড়া কাউকেই ভয় করবে না।"

হুজুরের (সাঃ) ইরশাদ শুনে হজরত খাব্বাব (রাঃ) আল্লাহ'র অভিপ্রায় বুঝে ফেললেন এবং নীরবে ফিরে গেলেন। আল্লামা ইবনে আসির (রঃ) বলেছেন, হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) নিজের খিলাফতকালে একবার হজরত খাব্বাবকে (রাঃ) তাঁর নির্যাতনের কাহিনী শুনানোর নির্দেশ দিলেন। তিনি কাপড় উঠিয়ে আমীরুল মুমিনিনকে নিজের পিঠ দেখালেন। পিঠ দেখে তিনি থ' মেরে গেলেন। কোন শ্বেত রোগীর চামড়া যেমন সাদা হয়ে যায় তেমনি তাঁর সারা পিঠ সাদা হয়ে গেছিল। হজরত খাব্বাব (রাঃ) বললেনঃ

"আমীরুল মুমিনিন, আগুন জ্বালিয়ে তার উপর আমাকে শুইয়ে দেয়া হত। এমনকি আমার পিঠের চর্বি সে আগুন নিভিয়ে দিত।"

হজরত আবু যর গিফারী (রাঃ) নিজের দেশ থেকে মক্কা এসে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন। এ সময় মুশরিকরা চার দিক থেকে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং মার মার ধর ধর করে রক্তাক্ত করে ফেললো। হজরত আব্বাস (রাঃ) এসে যদি তাদের হাত থেকে ছাড়িয়ে না নিতেন তাহলে সেদিনই তাঁর ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যেত।

হজরত ওসমান (রাঃ) বিন মাজউন ইসলাম গ্রহণ করলেন। মুশরিকরা তাঁকে বিভিন্ন ধরনের জুলুম-নির্যাতন, হাসি-ঠাট্টা, বিদ্রূপ এবং অর্থনৈতিক চাপে নিক্ষেপ করলো। অবশেষে বাধ্য হয়ে তিনি ঘর-বাড়ী ত্যাগ করে হাবশায় হিজরত করলেন।

হজরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন মাসউদ ইসলাম গ্রহণের পর মুশরিকদের সামনে কুরআন তিলাওয়াত করলেন। এতে সেই জালেমরা এমন নিষ্ঠুরভাবে মারলো যে, তাঁর চেহারা ফুলে গেল এবং শরীরের কয়েক স্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগলো। কিন্তু তাতে তিনি ভ্রূক্ষেপও করলেন না। একদিকে জালেমরা তাঁকে প্রহার করছিল অন্যদিকে তিনি কুরআন তিলাওয়াত অব্যাহত রেখেছিলেন। যখন তাঁর উপর কাফিরদের জুলুম-নির্যাতন সীমাহীন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছলো তখন প্রিয় নবীর (সাঃ) ইশারায় তিনি হাবশায় হিজরত করলেন।

হজরত ওসমান গনি (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করলেন। এ অপরাধে তাঁর চাচা তাঁকে বেঁধে মারলো। তাঁর ওপর এত নির্যাতন চালানো হলো যে, অবশেষে তিনি স্ত্রী হজরত রোকাইয়া (রাঃ) বিনতে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সহ স্বদেশ ভূমি ত্যাগ করে হাবশা গিয়ে উপস্থিত হলেন।

হজরত তালহা (রাঃ) ঈমান আনলেন। এ কারণে মক্কার কাফিররা তাঁর উপর সীমাহীন অত্যাচার চালালো। সে সময় তাঁর মাতা ইসলাম গ্রহণ করেন নি। তিনিও পুত্রের ইসলাম গ্রহণে অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। ইমাম বুখারী (রঃ) "তারিখুস সগীর" গ্রন্থে মাসউদ বিন খারাশের একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। এ বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তাঁরা সাফা এবং মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে চক্কর মারছিলেন। তাঁরা দেখলেন অনেক মানুষ একজন যুবককে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি ঘটনা? মানুষেরা বললো, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ বেদ্বীন হয়ে গেছে। একজন মহিলা সে যুবকের পেছনে পেছনে গড় গড় করতে করতে এবং গালি দিতে দিতে যাচ্ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মহিলাটি কে ? লোকজন জবাবে বললো সে তার মা সায়বাহ বিনতে হাজরামী। হাফেজ ইবনে কাছির (রঃ) "আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া" গ্রন্থে লিখেছেন, নওফিল বিন খুয়াইলদ আদবিয়া কোরেশের বাঘ খিতাবে মশহুর ছিলো। হজরত তালহার (রাঃ) ইসলাম গ্রহণে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলো। সে হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এবং হজরত তালহাকে (উভয়ই বনু তামিম গোত্রের এবং পরস্পর আত্মীয় ছিলেন) এক রশিতে বাঁধলো এবং নির্যাতন চালালো।

ইবনে আছির (রঃ) এবং ইমাম হাকিম (রঃ) বলেছেন, হজরত তালহার (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের খবর যখন তাঁর চাচা এবং বড় ভাই ওসমান বিন ওবায়দুল্লাহ পেলেন তখন তারা হজরত তালহা (রাঃ) ও হজরত আবু বকর সিদ্দিককে (রাঃ) দড়ি দিয়ে বেঁধে

খুব পিটালো। এর উদ্দেশ্য ছিল যাতে তাঁরা ইসলাম পরিত্যাগ করেন। কিন্তু নির্যাতন যতই করা হোক না কেন ইসলাম থেকে তাঁদের সমান্যতম বিচ্যুতিও ঘটলো না।

হজরত আমের (রাঃ) বিন ফাহিরাহ হজরত আয়েশাহ সিদ্দিকার (রাঃ) এক ধরনের ভাই তোফায়েল বিন আবদুল্লাহর গোলাম ছিলেন। তিনি ঈমান আনলেন। এতে মক্কার মুশরিকদের রাগ ও ক্রোধের তুফান তাঁর উপরে গিয়ে আপতিত হলো। এ হতভাগারা যাবতীয় নির্যাতনই তাঁর উপর চালালো। কখনো তাঁকে নৃশংসভাবে মারা হতো। কখনো উত্তপ্ত বালিতে এবং কাঁটার উপর টেনে হিঁচরে নিয়ে বেড়ানো হতো। একদিন হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) দেখলেন যে, কাফিররা তাঁর শরীরে কাঁটা বিঁধিয়ে দিচ্ছে এবং দাড়ি ধরে থাপ্পর মারছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে ক্রয় করে আযাদ করে দিলেন। এ সত্ত্বেও হুজুরের (সাঃ) সাথে হিজরত করে মদীনা না যাওয়া পর্যন্ত কাফিররা তাঁর উপর নির্যাতন চালাতে কসুর করেনি।

হজরত আয়াশ (রাঃ) বিন আবু রবিয়াহ, হজরত সালমাহ (রাঃ) বিন হিশাম এবং হজরত ওয়ালিদ (রাঃ) বিন ওয়ালিদ ইসলাম গ্রহণ করলেন। কাফিররা তাঁদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করলো। সেখানে তাঁরা বছরের পর বছর ধরে নিঃসঙ্গ জীবন অতিবাহিতকরেন।

হজরত যিন্নিরাহ (রাঃ) কোরেশের মখজুম বংশের দাসী ছিলেন। দাওয়াতে হকের প্রথম যুগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। সত্য গ্রহণের অপরাধে আবু জেহেল তাঁর ওপর নিত্য-নতুন নির্যাতন চালাতো। তিনি জীবন দিতে রাজী ছিলেন, কিন্তু আল্লাহর একত্ববাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে কোন ক্রমেই প্রস্তুত ছিলেন না। আল্লামা বালাজুরী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, হক পথে চরম নির্যাতন সইতে সইতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছিল। এতে আবু জেহেল ভর্ৎসনা করে বললো লাত এবং উজ্জা তোমাকে অন্ধ করে দিয়েছে। তিনি নির্দ্বিধায় জবাব দিলেন, লাত এবং উজ্জা পাথরের মূর্তি। তাদের কে পূজা করছে সেকথা তারা কি করে জানবে। আমার দৃষ্টিশক্তি চলে গিয়ে থাকলে তা আমার আল্লাহর তরফ থেকে মুসিবত হিসেবে এসেছে তিনি চাইলে আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়েও দিতে পারেন। আল্লাহ তাঁর এ দৃঢ়তাকে অত্যন্ত পছন্দ করলেন। পরের দিন তিনি যখন ঘুম থেকে জাগলেন তখন তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন। ইবনে হিশাম লিখেছেন, হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) তাঁকেও ক্রয় করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

হজরত লুবাইনাহ (রাঃ) কোরেশের বনু আদি গোত্রের একটি শাখা বনি মুয়াক্কালের দাসী ছিলেন। নবীর (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম বছরগুলোতেই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন। এতে হজরত ওমর (রাঃ) বিন খাত্তাব (নিজের জাহেলী যুগে) এত উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে, তাঁর উপর প্রতিদিন নির্যাতন চালাতেন। মারতে মারতে যখন ক্লান্ত হয়ে

পড়তেন তখন বলতেন আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এজন্যে তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি। এখনো সময় আছে, নতুন ধর্ম ত্যাগ কর। তিনি জবাবে বলতেন, "অবশ্যই নয়। তুমি যত ইচ্ছা জুলুম করে নাও।" অবশেষে তাঁকেও হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) খরিদ করে স্বাধীন করে দেন।

হজরত নাহদিয়াহ (রাঃ) এবং তার কন্যা বনু আবদিদ দার গোত্রের এক মহিলার ক্রীতদাসী ছিলেন। নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর প্রভু তাঁর ওপর কঠিন নির্যাতন চালান। কিন্তু তিনি এ নির্যাতন উপেক্ষা করে হক পথে অটল ছিলেন।

হজরত উম্মে উবাইস (রাঃ) বনু যোহরাহ গোত্রের বাঁদী ছিলেন। হক দাওয়াতের প্রতি সাড়া দানকারী প্রথম মুসলমানদের অন্যতম ছিলেন। হক পথে চলার অপরাধে মক্কার মশহুর মুশরিক সর্দার আসওয়াদ বিন আবদে ইয়াগুছ তার উপর চরম নির্যাতন চালাতো। কিন্তু তিনি কোন অবস্থাতেই ইসলাম থেকে মুখ ফিরাননি। শেষে হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) তাঁকে এ নির্যাতনের পাঞ্জা থেকে মুক্তি দেন।

হজরত হুমামাহ (রাঃ) হজরত বিলাল হাবশীর (রাঃ) মা ছিলেন। হাফিজ ইবনে আবদুল বার (রঃ) "আল ইসতিয়াব" গ্রন্থে লিখেছেন, তিনিও পুত্রের মত দাওয়াতে হকের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। মুশরিকরা তাঁর পুত্রের উপর যেমন নির্যাতন চালাতো তেমনি তাঁকেও শাস্তি দিত। কিন্তু তিনি ইসলামের ওপর অটল ছিলেন।

এ হ'লো মক্কায় ইসলাম গ্রহণকারী সাবিকুনাল আওয়ালুনদের উপর জুলুম-নির্যাতনের মাত্র কতিপয় উদাহরণ। রাসূলের (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথমযুগে তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহীদের কোন শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণকারীই কাফেরদের জুলুম-নির্যাতন ও অত্যাচারের হাত থেকে নিস্তার পাননি। যখন তাদের নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মজলুম মুসলমানদেরকে হাবশার দিকে হিজরত করার পরামর্শ দিলেন। বস্তুতঃ নবুয়ত প্রাপ্তির ৫ এবং ৬ বছর পর অনেক মুসলমান পুরুষ এবং মহিলা মক্কা থেকে হিজরত করে হাবশা চলে গেলেন। প্রতিটি মানুষ প্রকৃতিগত ভাবেই স্বদেশ এবং নিজের ঘর-বাড়ীকে ভালোবেসে থাকে। এসব পরিত্যাগ করে যাওয়া তাদের জন্যে এক বিরাট পরীক্ষা। কিন্তু আল্লাহর এ পবিত্র বান্দাহরা সে পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হন। তাদের মধ্যে একদল নবীর (সাঃ) হিজরতের পূর্বেই মক্কা ফিরে আসেন এবং অন্য দলটি খায়বারের যুদ্ধ ৭ হিজরী পর্যন্ত হাবশার মুহাজিরের জীবনের মুসিবত সহ্য করতে থাকেন। নবুয়ত প্রাপ্তির ১৩ বছর পর প্রিয় নবী (সাঃ) সাহাবায়ে কিরামকে (রাঃ) মদীনায় হিজরতের নির্দেশ দেন। নির্দেশ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে হক পন্থীরা তাতে সাড়া দিলেন এবং প্রিয়

স্বদেশভূমি, ধন-সম্পদ এবং ঘর-বাড়ীকে বিদায় জানিয়ে মদীনা গিয়ে পৌঁছলেন। আল্লাহ্ পাক তাঁদের এই কুরবাণী অত্যন্ত পছন্দ করলেন। শুধু এ কুরবাণীই নয় বরং পরবর্তীতে তাদের পদাংক অনুসরণ করে যাঁরা এসেছেন তাঁদেরকেও আল্লাহ তা'য়ালা নিজের সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিয়েছেন। যদিও পরবর্তীতে আগমনকারীরা অগ্রগামীদের মত জুলুম-নির্যাতন সহ্য করেননি, তবুও তাঁরাও নিজের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও জীবন হক পথে বিলিয়ে দিয়েছেন এবং হকের ঝাণ্ডা উড্ডীন রাখার জন্যে যে কোন ধরনের কোরবাণী দিতে পিছপা হননি। আল্লাহ পাক নিজের বিশেষ ফজিলতে তাদেরকেও সাবিকুনাল আওয়ালুনের পবিত্র দলের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হ্যাঁ, কিছু পার্থক্যও সূচীত করেছেন। মক্কা বিজয়ের পূর্বে ঈমান আনয়নকারীদেরকে মক্কা বিজয়ের পরে ঈমান গ্রহণকারীদের চেয়ে আফজাল বা উত্তম বলা হয়েছে। যেমন সূরায়ে আল-হাদিদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিজয়ের (মক্কা) পূর্বে ব্যয় করেছে এবং লড়াই করেছে (আর যে এই কাজ পরে করেছে) তা বরাবর হতে পারে না। যারা পরে ব্যয় (ধন-সম্পদ) এবং জিহাদ ও কিতাল (কাফেরদের) করেছে তাদের মর্যাদা পূর্বে ব্যয়কারীদের চেয়ে কম। আল্লাহ পাক সবার সাথেই নেক ওয়াদা করেছেন এবং যে কাজ তোমরা সম্পাদন করো সে সম্পর্কে আল্লাহ ওয়াকিবহাল।" (আয়াত ঃ১০)

কুরআনে করিমে মুহাজিরদের সাথে সাথে আনসারদের উঁচু মর্যাদার কথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরাও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখিরাতে সমান সমান সওয়াবের অংশীদার হবেন। সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) পবিত্র কাতারে আনসারদের এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। এ সকল পবিত্র আত্মার লোক মক্কা থেকে তিনশ' মাইল দূরে এক পুরোনো শহর ইয়াসরাবে বসবাস করতেন। তাঁরা সেখানে অত্যন্ত নির্ঝঞ্ঝাট এবং শান্তিপূর্ণভাবে জীবন অতিবাহিত করছিলেন। এ সব মানুষের ইসলাম গ্রহণেরও প্রয়োজন ছিল না এবং মক্কার হক পন্থীদের আশ্রয় প্রদানেও বাধ্য ছিলেন না। শুধুমাত্র সৎ প্রকৃতির কারণে তাঁরা হক দাওয়াতের প্রতি সাড়া দিয়েছিলেন।

নবীর (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির ১১ বছর পর হজ্জ মওসুমে ৬ জন ভদ্র স্বভাবের খাজরাজী মক্কা এলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁদের সামনে ইসলাম পেশ করলেন। তাঁরা নির্দ্বিধায় তা কবুল করলেন। ইয়াছরাব ফিরে গিয়ে অন্যান্যদের কাছেও তাঁরা তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। নবুয়ত প্রাপ্তির ১২ বছর পর দ্বিতীয়বার তাঁরা মক্কা এলেন। এ সময় তাঁদের সাথে আরো ৬ জন হক পন্থী এসেছিলেন। তাঁরা হুজুরের (সাঃ) হাতে বাইয়াত হলেন। তাঁদের আবেদন অনুযায়ী প্রিয় নবী (সাঃ) হজরত মুসয়াব (রাঃ) বিন উমায়েরকে ইসলামের প্রথম দায়ী বানিয়ে ইয়াছরাব প্রেরণ করলেন। তাঁদের তাবলিগী প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে ইয়াছরাবের ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা হতে লাগলো। নবুয়ত প্রাপ্তির ১৩ বছর পর ইয়াছরাবের ৭৫ জন হকপন্থী (৭৩ জন পুরুষ এবং ২ জন মহিলা)

মক্কা এলেন এবং কাফিরদের অগোচরে রাতের বেলা আকাবার ঘাঁটিতে বিশ্ব নেতার (সাঃ) সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁর হাতে বাইয়াত হলেন। রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) ইয়াছরাব তাশরীফ নেয়ার দাওয়াত দিলেন। এ সময় এ ওয়াদাও করলেন যে, তাঁরা নিজের জীবন, সন্তান এবং সম্পদ দিয়ে তাঁকে (সাঃ) হেফাজত ও সাহায্য করবেন। এই বাইয়াত ইতিহাসে বাইয়াতে উকবায়ে ছানিয়াহ, বাইয়াতে লাইলাতুল উকবাহ অথবা বাইয়াতে উকবায়ে কাবিরাহ নামে স্মরণ করা হয়। এ বাইয়াত ইসলামের ইতিহাসে মাইল ফলকের মর্যাদা রাখে। প্রকৃতপক্ষে এ বাইয়াত আরব ও আজম এবং জিন ও ইনসানের কাছ থেকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করার বাইয়াত ছিল। সে সময় আরবের প্রতিটি অণু পরমাণু হকের নিশানবাহীদের খুন পিপাসু ছিল। ইয়াছরাব ভূখণ্ডের এ সকল পূত পবিত্র মানুষ উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজের জীবন, সম্পদ এবং সন্তানদেরকে মক্কায় নবীর (সাঃ) পদতলে এনে রাখলেন। এ সব পবিত্র ব্যক্তিত্ব নিজেদের সব কিছু হক পথে নিয়োজিত করলেন এবং ভয়-ভীতি ও গালমন্দের পরওয়া করলেন না। এ বাইয়াতের কারণে আনসাররা এমন এক মর্যদায় অধিষ্ঠিত হলেন, যার উপর তাঁরা চিরকাল ফখর করতেন। হুজুর (সাঃ) মক্কায় ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীদেরকে (রাঃ) মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন। অনুমতি পেয়ে প্রায় সকল পুরুষ ও মহিলা সাহাবীই (রাঃ) মক্কাকে বিদায় জানিয়ে মদীনা গিয়ে পৌঁছলেন। আনসাররা তাঁদেরকে আহলান সাহলান ওয়া মারহাবা বলে স্বাগত জানালেন এবং অত্যন্ত হৃষ্ট চিত্তে তাঁদের মেহমানদারী করলেন। কিছু দিন পর স্বয়ং হজরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হজরত আবু বকর (রাঃ) এবং হজরত আমের (রাঃ) বিন ফাহিরাহসহ ইয়াছরাবে তাশরীফ আনলেন। এ সময় আনসাররা রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) এমন উষ্ণ সম্বর্ধনা জানালো যার নজীর বিশ্বের ইতিহাসে পাওয়া ভার। সে দিন "ইয়াছরাব" "মদীনাতুন নবীতে" রূপান্তরিত এবং তার ভূমি নভোমণ্ডলীর ঈর্ষায় পরিণত হলো।

মুহাজিরীনে কিরাম (রাঃ) বছরের পর বছর ধরে বিষবৎ অকথ্য জুলুম-নির্যাতন সহ্যের পর নিজের পরিবার পরিজন, ঘর-বাড়ী এবং ধন-সম্পদ ত্যাগ করে যখন মদীনা পৌঁছলেন তখন তাঁদের কাছে আল্লাহর নাম ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু মদীনার আনসাররা যে ভালোবাসা এবং নিষ্ঠা ও সততার সাথে সে দেশত্যাগীদের মেহমানদারী করলেন তা এক ঈমান প্রজ্জ্বলিত কাহিনী। ইসলামের ইতিহাসে এ কাহিনী চিরকালের জন্যে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটাবে।

প্রকৃতিগত ভাবে আনসাররা ছিলেন অত্যন্ত শরীফ, সাদাসিধে এবং রুচিশীল ও দরাজদিলসম্পন্ন মানুষ। কিন্তু শত-শত বছরের পুরোনো পারস্পরিক মুনাফিকী ও শত্রুতা তাদের শরীফ চরিত্রকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছিল। ইসলাম আনসারদের পারস্পরিক মুনাফিকীকে খতম এবং যারা একে অপরের রক্ত পিপাসু ছিল তাদেরকে দ্বীনের মজবুত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে। আল্লাহ পাক এভাবে আনসারদেরকে ভয়াবহ

ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। সুরায়ে আল-ইমরানে ইরশাদ হয়েছে ঃ "আল্লাহর রজ্জু ঐক্যবদ্ধভাবে দৃঢ়তার সাথে ধারণ কর এবং বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করোনা। আর আল্লাহর সে নিয়ামত স্মরণ করো যখন তোমরা পরস্পর শত্রু রূপে পরিগণিত ছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের অন্তরে (পারস্পরিক) ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিলেন। ফলে পরস্পর তোমরা ভাই হয়ে গেলে। প্রকৃতপক্ষে তোমরা অগ্নি গহ্বরের কিনারায় দণ্ডায়মান ছিলে। আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তা থেকে বাঁচিয়ে নিলেন। এই ভাবেই আল্লাহ তোমাদের নিকট নিজের নিদর্শনাবলী প্রকাশ্যভাবে বর্ণনা করেন। যাতে করে তোমরা পথ পাও।"— আয়াতঃ১০৩

আনসাররা আল্লাহ তা'লার এ মহান ইহসানের পুরোপুরি শুকর আদায় করলেন। তাঁরা নিজের জীবন, সম্পদ এবং সন্তানদেরকে হক পথে ওয়াকফ করে দিলেন এবং নিজেদের ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং নিষ্ঠার এক উজ্জল নিদর্শন ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ করে দিলেন। হিজরতের কয়েকমাস পর প্রিয় নবী (সাঃ) মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন কায়েম করলেন। এ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা শুধুমাত্র এক জরুরী পরিস্থিতির ফলশ্রুতি ছিল না বরং এর মধ্যে বিশেষ হিকমত এবং মুসলিহাত ছিল। এর ফলে একদিকে মুহাজিরদের অন্তর থেকে স্বদেশ ত্যাগের অনুভূতি বিদূরিত হচ্ছিল। দ্বিতীয়তঃ মুহাজিররা পরীক্ষা-নীরিক্ষা এবং জুলুম-নির্যাতনের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়ে খাঁটি সোনায় রূপান্তরিত হয়েছিলেন। তাঁদের প্রশিক্ষণ এবং সংশোধন স্বয়ং বিশ্ব নবী মুস্তাফা (সাঃ) করেছিলেন। এ খাঁটি সোনা সদৃশ মুহাজিররা যাতে নও-মুসলিম আনসার ভাইদের প্রশিক্ষণ দিতে পারেন সে ব্যবস্থাই এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছিল। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টির পূর্বেই আনসাররা মুহাজিরদের প্রতি ছিলেন দয়ার্দ্র বা সেবাগত প্রাণ। কিন্তু এ সম্পর্ক সৃষ্টির পর তাঁরা পাতানো ভাইদের সাথে আপন ভাইয়ের চেয়েও সুন্দর ব্যবহার করলেন। তাঁরা তাঁদেরকে নিজেদের ঘরে নিয়ে গেলেন এবং সকল ধন-সম্পদ ও আসবাব পত্রসহ ঘরের প্রতিটি জিনিস গুণে গুণে তার অর্ধেক দিয়ে দিলেন। আনসারদের মালিকানা দানের আবেগ ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের। হজরত সায়াদ (রাঃ) বিন রাবি' আনসারী নিজের দু' স্ত্রীর একজনকে নিজের মুহাজির ভাইয়ের জন্যে পৃথক করার প্রস্তুতি নিয়েই ফেলেছিলেন। এর বিশদ বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হয়েছে।

আনসাররা নিজের খেজুর বাগান এবং জমি মুহাজির ভাইদেরকে পেশ করলেন। বাগান পরিচর্যা এবং কৃষি বিষয়ে ওয়াকিবহাল না থাকার কারণে তাঁরা তা গ্রহণ করতে আপত্তি জানালেন। তখন আনসারদের ঈমানী জোশ উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। তাঁরা বললেন, এ খেজুরের বাগান ও জমি আমরা অবশ্যই আপনাদেরকে দিব। তাতে কৃষি ও সেচ কাজ আমরাই করবো এবং উৎপাদিত শস্যের অর্ধেক আপনাদেরকে নিতে হবে। মুহাজিররা আন্তরিকতার সাথে নিজের আনসার ভাইদের এ প্রস্তাব কবুল করলেন। খায়বার যুদ্ধ পর্যন্ত মুহাজিররা এ সকল খেজুর বাগান থেকে উপকৃত হতে থাকলেন।

খায়বার যুদ্ধের পর তাঁরা এ সব বাগান কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আনসারদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ভ্রাতৃত্ব সহোদরের মতই আত্মীয় হয়ে গিয়েছিল। এমনকি কোন আনসার ইন্তিকাল করলে মুহাজির ভাই তার সম্পদের উত্তরাধিকার হতেন এবং মরহুমের নিকটাত্মীয় তা থেকে বঞ্চিত হতেন। বদরের যুদ্ধের পর মুহাজিরদের আর্থিক অবস্থা ভালো হয়ে গেলে সূরায়ে আনফালের এই আয়াত নাযিল হলোঃ "নিকটাত্মীয় পরস্পরের বেশী হকদার" (আয়াত ৭৫)

বস্তুতঃ আল্লাহর এ ফরমান বাস্তবায়নে আনসার এবং মুহাজিরদের পারস্পরিক উত্তরাধিকারের বিধান বাতিল করা হয় এবং শুধুমাত্র নিকটাত্মীয়ের মধ্যেই উত্তরাধিকারের নীতি চালু হয়।

আনসারদের ত্যাগ ও সততা নিজেদের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ভাইদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং যখনই প্রয়োজন হয়েছে তখনই তাঁরা হক পথে নিজের সাধ্যের বাইরেও কোরবাণী পেশ করেছেন। হজরত হারিছাহ (রাঃ) বিন নু'মান আনসারী নিজের কয়েকটি বাড়ী প্রিয় নবীর (সাঃ) হাওয়ালা করে দিয়েছিলেন। এমনিভাবে আসহাবে সুফফার ভরণ পোষণের বিষয়টিও নিজেদের দায়িত্বে নিয়েছিলেন। জিহাদের ডাক এলেই তাঁরা নিজেদের জান এবং মাল সমেত ইসলামের জন্যে দণ্ডায়মান হয়ে যেতেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বদরের যুদ্ধের পূর্বে আনসারদের ইচ্ছা বিশেষ করে অবহিত হলেন। কেননা তাঁরা মদীনার বাইরে গিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল না। মুহাজিরদের সাথে পরামর্শের পর যখন হুজুর (সাঃ) বললেন, এখন অন্যরাও পরামর্শ দিন। আওস গোত্রের সরদার হজরত সায়াদ (রাঃ) বিন মায়াজ তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন এবং আবেগময় ভাষায় আরজ করলেনঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি। আপনার রিসালাতের সত্যতা স্বীকার করেছি। আপনার আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। সুতরাং যা মর্জি হয় তাই করুন। সেই মহান আল্লাহর শপথ, যিনি আপনাকে রাসূল (সাঃ) বানিয়ে প্রেরণ করেছেন। আপনি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলে আমরা তাই করবো। আমাদের একজন শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণকারীও পেছনে থাকবে না। ইনশা'ল্লাহ আপনি আমাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে অটল এবং বাহাদুর হিসেবেই পাবেন। আল্লাহ আমাদের তরফ থেকে আপনার চক্ষু শীতল করবেন।"

অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে, সেই সময় খাজরাজ গোত্রের সরদার হজরত সায়াদ (রাঃ) বিন উবাদাহ এই বক্তৃতা করেছিলেনঃ

"হে আল্লাহর রাসূল, সম্ভবতঃ আপনি আনসারদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আপনি যদি সমুদ্রের নির্দেশ দেন তাহলে আমরা তা পদদলিত করবো। আর যদি শুকনো স্থানের নির্দেশ দেন তাহলে বারকে গামমাদ পর্যন্ত (হাবশাহ অথবা ইয়েমেনের একটি স্থানের নাম) উঁটের কলিজা গলিয়ে ফেলবো।"

আনসারদের জিহাদের আবেগ এবং ত্যাগের জযবাহ্ দেখে হুজুরের (সাঃ) চেহারা মুবারক আনন্দে ঝলমল করে উঠলো।

শুধু বদরের যুদ্ধেই নয় বরং আনসাররা প্রত্যেক যুদ্ধেই এবং সব সময়ই মুহাজিরদের পাশে থেকে হক পথে জীবন কুরবানীর চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। সত্য পথে তাদের জীবন দান এবং রাসূল (সাঃ) প্রেমের কতিপয় উদাহরণ এখানে পেশ করা হলোঃ

হজরত হিন্দ (রাঃ) বিনতে আমর বিন হারাম আনসারীয়াহর স্বামী হজরত আমর (রাঃ) বিন জামুহর সন্তান হজরত খাল্লাদ (রাঃ) বিন আমর (রাঃ) এবং ভাই হজরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমর বিন হারাম ওহোদের যুদ্ধে বাহাদুরীর সাথে লড়াই করতে করতে শাহাদাত প্রাপ্ত হন। হজরত হিন্দ (রাঃ) স্বামী, সন্তান এবং ভাইয়ের শাহাদাতের খবর শুনে কোন দুঃখ প্রকাশ না করে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "রাসূলের (সাঃ) কি অবস্থা আমাকে তা বলো। তাঁর তো কোন ক্ষতি হয়নি ?"

লোকরা যখন বললো, খোদার ফজলে হুজুর (সাঃ) ভালো আছেন; তখন তাঁর চেহারা আলোকোজ্জল হয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে তিনি যুদ্ধের ময়দানের দিকে রওয়ানা হলেন। যখন রাসুলুল্লাহকে (সাঃ) দেখলেন তখন অযাচিতভাবে মুখ দিয়ে একথা বেরিয়ে গেলঃ"আপনি ভালো থাকলে সব মুসিবতই তুচ্ছ ব্যাপার।"

হজরত আনাস (রাঃ) বিন নজর আনসারী ওহোদের যুদ্ধে কতিপয় বাহাদুর মুসলমানকে অস্ত্র ফেলে দিয়ে বিষণ্ন অবস্থায় বসে থাকতে দেখলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা যুদ্ধ ছেড়ে এখানে বসে আছ কেন? তাঁরা বললেন, আফসোস ! রাসুলুল্লাহ (সাঃ) শহীদ হয়ে গেছেন। হজরত আনাস বললেন, তাহ'লে তোমরা জীবিত থেকে কি করবে। ওঠো এবং হক বা সত্যের জন্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যেমন জীবন দান করেছেন তেমনি তোমরাও কাফেরদের সাথে লড়াই করে জীবন বিলিয়ে দাও। একথা বলেই অত্যন্ত জোশের সাথে তরবারী চালাতে চালাতে কাফেরদের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং ৭০টি আঘাত খেয়ে শহীদ হয়ে গেলেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হজরত আনাস (রাঃ) বিন মালেক খাদেমে রাসূল (সাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, সূরায়ে আহযাবের এ আয়াত হজরত আনাস (রাঃ) বিন নজরের প্রসঙ্গেই অবতীর্ণ হয় ঃ "ঈমানদারদের মধ্যে এমনও

আছেন যাঁরা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা সত্য করে দেখিয়েছেন। তাদের মধ্যে কেউ নিজের সময় পূর্ণ করেছে এবং কেউ সময় আসার অপেক্ষায় আছেন।"—আয়াতঃ২৩

হজরত খুবাইব (রাঃ) বিন আদি আনসারী এবং হজরত যায়েদ (রাঃ) বিন দাছনা আনসারীকে যাদল ওকারাহর লোকেরা বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজি নামক স্থানে গ্রেফতার করলো। অতঃপর মক্কার কোরেশদের হাওয়ালা করে দিল। এ জালেমরা তাঁদের দু'জনকেই শূলে চড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল। উরওয়াহ (রাঃ) এবং মুসা (রঃ) বিন উকবাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, মুশরিকরা যখন হজরত খুবাইবকে (রাঃ) শূলে চড়াচ্ছিল তখন তাঁকে উচ্চস্বরে ডেকে এবং কসম খেয়ে জিজ্ঞেস করলো, তোমার পরিবর্তে যদি মুহাম্মাদ (সাঃ) শূলে চড়ে এ সময় তুমি নিজের গৃহে আরামে অবস্থান কি পছন্দ করবে? হজরত খুবাইব (রাঃ) বললেনঃ "আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহর (সাঃ) পবিত্র পায়ে যদি কাঁটাও ফোটে। আর আমি নিজের গৃহে আরামে বসে থাকবো—এটা আমার সহ্যের বাইরে।"

এমনিভাবে হজরত যায়েদ (রাঃ) বিন দাছনাকে শুলে চড়ানোর আগে আবু সুফিয়ান (তখনও ঈমান আনেননি) জিজ্ঞেস করলো, "হে যায়েদ! খোদার কসম তুমি সত্যি সত্যি বল, যদি তোমার পরিবর্তে মুহাম্মদের গর্দান উড়িয়ে দেয়া হয় তাহলে কি তুমি নিজের পরিবার-পরিজনসহ খুশীতে থাকবে ?"

এ হক পন্থী বীর পুরুষ আবু সুফিয়ানকে ঠিক একই জবাব দিয়েছিলেন যা খুবাইব রাঃ) মুশরিকদের দিয়েছিলেন। অর্থাৎ আমিতো মুহাম্মাদের (সাঃ) পায়ে কাঁটা ফোটাও সহ্য করতে পারি না। তাঁর জবাব শুনে আবু সুফিয়ানের (রাঃ) মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলঃ "মুহাম্মাদের সাথী তাঁকে যেভাবে ভালোবাসে, দুনিয়ার আর কোন ব্যক্তিরই এমন প্রেমিক নেই।"

ওহোদের যুদ্ধে হজরত সায়াদ (রাঃ) বিন রবি' আনসারী মুশরিকদের বিরুদ্ধে বাহাদুরী প্রদর্শন করে মারাত্মকভাবে আহত হলেন। এক রাওয়ায়েত মতে তিনি ১২টি আঘাত পেয়েছিলেন এবং অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন। তিনি রাসুলুল্লাহকে (সাঃ) গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং রাসূলেরও (সাঃ) তাঁর সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল। যুদ্ধে পর তিনি সায়াদকে (রাঃ) দেখলেন না। সাহাবাদেরকে (রাঃ) সম্বোধন করে বললেন, "এমন কি কেউ আছে যে সায়াদ বিন রবি'র খবর আনবে ?"

হজরত উবাই (রাঃ) বিন কায়াব আনসারী আরজ করলেনঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি যাচ্ছি।" একথা বলে তিনি যুদ্ধের ময়দানে গেলেন এবং লাশের মধ্যে ঘুরে ঘুরে হজরত সায়াদ (রাঃ) বিন রবি'কে খোঁজ করতে লাগলেন। বার বার তাঁর নাম ধরে

ডাকছিলেন, কিন্তু কোন জবাব পাচ্ছিলেন না। অবশেষে তিনি উচ্চস্বরে একথা বললেন, "সায়াদ যদি জীবিত থাকো তাহলে জবাব দাও — রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন।"

সে সময় হজরত সায়াদ (রাঃ) বিন রবি'র মুমূর্ষ অবস্থা। হুজুরের (সাঃ) নাম শুনে শরীর ও রূহের সকল শক্তি একত্র করে তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিলেনঃ

"রাসূলুল্লাহর (সাঃ) পবিত্র খিদমতে আমার সালাম পেশ করবে এবং আমার আনসার ভাইদেরকে বলবে, খোদা নাখাস্তা আজ যদি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শহীদ হয়ে থাকেন, আর তোমাদের মধ্যে যদি কেউ জীবিত থাকে তাহলে আল্লাহর নিকট অবশ্যই মুখ দেখাতে পারবে না এবং তাঁর নিকট তোমাদের কোন ওজরই গ্রহণীয় হবে না। আমরা লাইলাতুল উকবাতে রাসূলুল্লাহ'র (সাঃ) উপর আত্মোৎসর্গের ওয়াদা করেছিলাম।" একথা বলেই আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন।

আনসারদের এ কুরবানীর কারণেই আল্লাহর নিকট মুহাজিরদের মত তারাও মর্যদার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিলেন। তাদেরকে সাচ্চা মুমিন উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন এবং জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

কুরআনে কারিমে সাহবায়ে কিরামের (রাঃ) মর্যাদা বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। কোথাও সকল সাহাবীর (রাঃ) উচ্চ মর্যাদার কথা সামষ্টিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং কাউকে বাদ না দিয়ে সবার জন্যে মাগফিরাত এবং বেহেশতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। কোথায়ও কোন বিশেষ ঘটনা অথবা স্থান ও কাল হিসেবে সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) কোন বিশেষ দলকে আল্লাহর সন্তুষ্টির সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। কোন কোন স্থানে এমন আয়াতও আছে যা কোন বিশেষ সাহাবীর (রাঃ) শানে নাযিল হয়েছে। এমন অনেক আয়াতও আছে যা পূর্বে নাযিল হয়েছিল। এ সত্ত্বেও রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন কোন সাহাবীর (রাঃ) কোন বিশেষ নেক কাজ দেখেছেন তখন এ সব আয়াত তিলাওয়াত করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি এটাই বলতে চেয়েছেন যে, রাসূলের (সাঃ) অমুক সাহাবীর (রাঃ) এ কাজ আল্লাহর নিকট এত পছন্দনীয় যে, তাঁর উপর এ আয়াত প্রযোজ্য।

যে সব আয়াতে সকল সাহাবীকে (রাঃ) জান্নাতী বলা হয়েছে তার মধ্যে কতিপয় উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। এখন অন্য ধরনের কিছু উদাহরণ এখানে পেশ করা হলোঃ

৬ষ্ঠ হিজরীর ১লা জিলকদ সারওয়ারে আলম (সাঃ) ওমরাহ'র ইরাদা করলেন এবং ১৪শ' সাহাবী (রাঃ) সহ মদীনা মুনাওয়ারাহ থেকে মক্কা যাত্রা করলেন। তিনি সাহাবীদেরকে (রাঃ) তরবারী ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র সাথে নিতে নিষেধ করলেন এবং তরবারীও খাপে ভরে নিতে বললেন। জুল হালিফা পৌঁছে হুজুর (সাঃ) এবং সাহাবীরা

(রাঃ) ইহরাম বাঁধলেন। এদিকে মক্কায় কোরেশরা মুসলমানদের আগমনের খবর পেয়ে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন খবর পেলেন যে, কোরেশরা বাধা দিতে প্রস্তুত তখন তিনি হুদাইবিয়া পৌঁছে তাঁবু খাটালেন এবং সেখান থেকে কোরেশদের নিকট এক পয়গাম প্রেরণ করলেন। পয়গামে তিনি জানালেন যে, আমরা শুধু ওমরাহ করতে এসেছি। লড়াই করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কোরেশরা দু'দিন পর উরওয়াহ (রাঃ) বিন মাসউদ ছাকাফীকে (তিনি তখনো ঈমান আনেননি) হুজুরের (সাঃ) সাথে আলোচনার জন্যে পাঠালো। তিনি আলাপ আলোচনার পর ফিরে গিয়ে কোরেশদেরকে আলোচনার বিস্তারিত জানালেন এবং সাথে সাথে আরো বললেনঃ

"হে কোরেশ ভাইয়েরা ! দুনিয়ার বড় বড় রাজা বাদশাহদের দরবারে যাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে। আমি কাইসার ও কিসরা এবং নাজাশীর দরবারের শান শওকত দেখেছি। কিন্তু খোদার কসম, মুহাম্মাদের (সাঃ) সাথীরা তাঁকে যে ইজ্জত এবং সম্মান করে তা কোন ক্রয়কৃত গোলামও সেই সব রাজা বাদশাহদের সাথে করে না। মুহাম্মদ (সাঃ) থুথু ফেললেও এ সব মানুষ অগ্রসর হয়ে সে থুথু নিজের হাতে নেয় এবং উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে তা মুখে এবং হাতে লাগায়। মুহাম্মাদ (সাঃ) ওজু করলে এ সব মানুষ ব্যবহৃত পানির প্রতিটি ফোটার উপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে যেন তাঁরা পরস্পর এজন্যে লড়াই করে জীবন দেবে। মুহাম্মাদ (সাঃ) কোন নির্দেশ দিলে তা পালনের জন্যে সবাই এগিয়ে আসে। মুহাম্মাদ (সাঃ) কোন কথা বললে সকলেই চুপ মেরে যায়। মুহাম্মাদের (সাঃ) এমন মর্যদা যে, কোন সাথী তাঁর প্রতি তাকাতেও সাহস পায় না। আমার কথা যদি তোমরা শোনো, তাহলে তোমরা তাঁর সাথে সন্ধি করে নাও।"

কোরেশরা যদিও উরওয়াহ (রাঃ) বিন মাসউদকে বুজর্গ ব্যক্তি হিসেবে মানতো কিন্তু তাঁর পরামর্শের প্রতি কর্ণপাত করলো না। ওদিকে হুজুর (সাঃ) উরওয়াহর (রাঃ) ফিরে যাওয়ার পর হজরত ওসমান জুন্নুরাইনকে (রাঃ) নিজের দূত হিসেবে কোরেশদের নিকট প্রেরণ করলেন। কোরেশরা হজরত ওসমানকে (রাঃ) মক্কায় আটকে ফেললো। যখন তিনি ফিরে এলেননা তখন মুসলমানদের মধ্যে প্রচারিত হলো যে, হজরত ওসমানকে (রাঃ) মুশরিকরা শহীদ করে ফেলেছে। হুজুর (সাঃ) বললেন, "যদি এ খবর সঠিক হয়, তাহলে আমরা ওসমানের (রাঃ) বদলা নেয়া ছাড়া এখান থেকে ফিরে যাবো না।" সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) যদিও সরঞ্জামহীন ছিলেন তবুও সবাই হুজুরের (সাঃ) কথায় সাড়া দিলেন। প্রিয়নবী (সাঃ) একটি বাবলা বৃক্ষের নীচে বসে পড়লেন এবং মুসলমানদের নিকট থেকে দেহে জীবন থাকা অবস্থায় কাফিরদের সাথে লড়াই করার ও পেছনে না হটার বাইয়াত নিলেন।

সকল সাহাবীই (রাঃ) অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে জীবন কুরবানী করার বাইয়াত করলেন। ইসলামের ইতিহাসে এই বাইয়াত "বাইয়াতে রিদওয়ান" নামে

প্রসিদ্ধ। এই সময় সুরায়ে ফাতাহর এ আয়াত নাযিল হয় ঃ "আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। যখন তারা বৃক্ষের নীচে তোমার নিকট বাইয়াত করছিলেন। তাদের অন্তরের অবস্থা তিনি জানতেন।"—আয়াতঃ১৮

হিজরতের সময় হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) গারে ছুর এবং মদীনা সফরে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে থাকার মহান মর্যাদা লাভ করেছিলেন। এ কাজটি ছিল জীবন বাজী রাখার কাজ। কেননা সে সময় মক্কার কাফিররা রাসূলের (সাঃ) এবং তাঁর সাথীদের জীবন হননের অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। আল্লাহ পাক হজরত আবু বকর সিদ্দিকের (রাঃ) জীবন কুরবানী করার আবেগ এত পছন্দ করলেন যে, এই আয়াতনাযিল করলেন ঃ "তোমরা যদি রাসূলকে সাহায্য না কর তাহলে আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেছে। যে সময় কাফিররা তাঁকে বহিষ্কার করেছিল তখন সে দু'জনের দ্বিতীয় ছিল। যখন তাঁরা গার এ ছিলেন তখন তিনি নিজের সাথীকে বলছিলেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন।"—সুরায়ে তওবাহঃ৪০ আয়াত

যেন স্বয়ং আল্লাহ পাক হজরত আবু বকর সিদ্দিককে (রাঃ) দুইজনের একজনের মর্যাদাপূর্ণ খিতাবে ভূষিত করলেন।

যখন সুরায়ে "আল-হাদিদের" এ আয়াত নাযিল হলো ঃ 'কে আছ যে আল্লাহকে কর্জ দেবে? ভালো কর্জ। যাতে আল্লাহ তাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে ফেরত দেবে এবং তার জন্যে উত্তম বদলা রয়েছে।"—আয়াতরঃ১১

এ আয়াত শুনে হজরত আবুদ্ দাহদাহ আনসারী (রাঃ) হুজুরকে (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন,"হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ কি আমাদের নিকট কর্জ চান?" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "হে আবদ্ দাহদাহ। হ্যাঁ। তিনি আরজ করলেন, "আপনার হাতটা আমাকে একটু দেখান।" হুজুর (সাঃ) নিজের পবিত্র হাত তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। তিনি তা নিজের হাতে নিয়ে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আল্লাহকে আমার বাগান কর্জ দিয়ে দিয়েছি।" হজরত আবু দাহদাহ (রাঃ) যে বাগানটি আল্লার রাহে দিলেন তাতে ৬শ খেজুরের বৃক্ষ ছিল এবং সেখানে তাঁর বাড়ী ছিল। প্রিয় নবীর (সাঃ) সাথে কলা বলে তিনি সোজা বাড়ী গেলেন এব স্ত্রীকে ডেকে বললেন, "দাহদাহ'র মা! বেরিয়ে এসো। আমি এই বাগান আল্লাহকে কর্জ দিয়ে দিয়েছি।"

স্ত্রীও নেকবখত ছিলেন। বললেন, "হে আবুদ্ দাহদাহ, তুমি লাভের বাণিজ্য করেছ।" এবং তৎক্ষণাৎ সামান নিয়ে বাগান থেকে বের হয়ে এলেন।

একদিন সারওয়ারে আলম (সাঃ) সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) এক দলের মধ্যে মধ্যমণি হিসেবে বসেছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তি পেরেশান অবস্থায় তাঁর খিদমতে

হাজির হয়ে আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল। আমি একজন মুসাফির। মদীনায় আমার থাকা ও খাওয়ার কোন বন্দোবস্ত নেই। আপনার সাহায্যের মুখাপেক্ষী।"

প্রিয় নবী (সাঃ) তৎক্ষণ্যৎ আজওয়াজে মুতাহহিরাতের (স্ত্রীদের) নিকট ঘরে কিছু খাবার আছে কিনা তা জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন। সব দিক থেকেই উত্তর এলো যে আজ সবাই ভূখা। তখন তিনি সাহাবাদের (রাঃ) দিকে তাকালেন এবং বললেন ঃ "এমনকি কেউ আছে যে আল্লাহর বান্দাহকে মেহমান বানাবে?"

হুজুরের (সাঃ) ইরশাদ শুনে হজরত আবু তালহা আনসারী (রাঃ) উঠে দাঁড়ালেন এবং আরজ করলেন ঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ। তাকে আমার সাথে নিয়ে যাবো।" একথা বলেই তিনি বাড়ী গেলেন এবং স্ত্রীকে মেহমান আগমনের খবর দিলেন। তিনি জানালেন ঃ "বাচ্চাদের জন্যে কিছু পাকানো হয়েছে। এছাড়া আল্লাহর কসম ঘরে কিছুই নেই।"

হজরত আবু তালহা (রাঃ) বললেন, "এতে ক্ষতির কিছু নেই। বাচ্চাদেরকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে শুইয়ে দাও। যখন তারা শুয়ে পড়বে তখন আমরা তাদের খাবার মেহমানের সামনে দেব। তুমি চেরাগ ঠিক করার বাহানায় উঠে তা নিভিয়ে দেবে। অন্ধকারে মেহমান খাবার খেয়ে নেবে এবং আমরাও এমনি এমনি মুখ চালাতে থাকবো।"

মোট কথা এভাবে মেহমানকে খাবার খাইয়ে স্বামী-স্ত্রী দু'জন এবং বাচ্চারা রাতে অভুক্ত অবস্থায় কাটালেন। সকালে যখন এ অপরিচিত মেহমান হুজরের (সাঃ) খিদমতে উপস্থিত হলেন তখন রাসূলের (সাঃ) মুখে সূরায়ে হাশরের এ আয়াত উচ্চারিত হচ্ছিলঃ"এবং সে ব্যক্তি নিজের উপর অন্যদের অগ্রাধিকার প্রদান করে। যদিও তারা ক্ষুধাতুরথাকে।"—আয়াতঃ৯)

আর হুজুর (সাঃ) বলছিলেন, "রাতে মেহমানের সাথে তোমাদের ব্যবহার আল্লাহ খুব পছন্দ করেছেন।"

এভাবে আরো একদিন এই হজরত তালহাই (রাঃ) রাসূলের নিকট উপস্থিত ছিলেন। ঠিক এমনি সময় সূরায়ে আলে ইমরানের এই আয়াত নাযিল হলোঃ "যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ না করবে ততক্ষণ তোমরা কখনই সওয়াব পাবে না।"—আয়াতঃ৯২)

মসজিদে নববীর সামনে এক প্রশস্ত ও সুন্দর বাগানের মালিক ছিলেন হজরত তালহা (রাঃ)। এ বাগানের কূপ "বিরহার" পানি অত্যন্ত পরিষ্কার, সুমিষ্ট ও খোশবুদার

ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অত্যন্ত উৎসাহের সাথে এ কূপের পানি পান করতেন। মদীনায় এ ধরনের সম্পদ অত্যন্ত মূল্যবান বলে পরিগণিত হতো। কিন্তু হজরত আবু তালহা উঠে দাঁড়ালেন এবং আরজ করলেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লা! আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ হলো 'বিরহা'। আমি তা আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করছি। আল্লার কসম, যদি একথা গোপন রাখা যেত তাহলে তা কখনো প্রকাশ করতামনা।"

আল্লাহর পথে তাঁর খরচের জযবাহ্ দেখে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) চেহারা মুবারাক আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তাঁর জন্যে দোয়া করলেন এবং বললেন, নিজের নিকটাত্মীয়দের মধ্যে এ বাগান বন্টন করে দাও। তিনি তৎক্ষণাৎ রাসূলের (সাঃ) নির্দেশ পালন করলেন এবং সমগ্র বাগান আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

কুরআনে হাকিমে সাহাবা কিরামের (রাঃ) ভালো কাজের আকাংখা, ত্যাগ ও আল্লাহর পথে ব্যয়ের প্রশংসা প্রায়ই করা হয়েছে; আল্লাহর পথে ব্যয়ের একটি চূড়ান্ত নজীর হলো ঃ তাবুকের যুদ্ধের সময় হুজুর (সাঃ) সাহাবায়ে কিরামকে (রাঃ) আল্লাহর পথে ব্যয়ের আহ্বান জানালেন। এ সময় অন্যান্য সাহাবী (রাঃ) নিজেদের সামর্থের চেয়ে বেশী সম্পদের কোরবানী দিলেন। কিন্তু হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এক ইতিহাস সৃষ্টি করলেন।

তিনি ঘরের সেলাইয়ের সুতা পর্যন্ত এনে রাসূলের (সাঃ) সামনে পেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, আবু বকর, ঘরে কিছু রেখে এসেছো তো? জবাবে হজরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) নাম ছাড়া আর কিছুই রেখে আসিনি। আর তাই আমার জন্যে যথেষ্ট।"

সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এমনি ধরনের উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ পাক তাদের পথকে অনুকরণীয় পথ হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁদের বিরোধীতাকে রাসূলের বিরোধীতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সূরায়ে আন নিসাতে ইরশাদ হয়েছেঃ

"তাদের সামনে হিদায়াতের রাস্তা খুলে যাওয়ার পরও যারা রাসূলের (সাঃ) বিরোধিতা করে এবং মুমিনদের রাস্তা পরিত্যাগ করে চলে; আমরা তাদেরকে সে দিকেই ফিরিয়ে দেব যেদিকে তারা ফেরে এবং কিয়ামতের দিন জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। আর জাহান্নাম অত্যন্ত খারাপ স্থান।

মুফাসসিরদের নিকট এখানে 'মুমিনদের রাস্তা'র অর্থ হলো সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) রাস্তা বা পথ, আর সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) সেই পবিত্র নফস সম্পর্কে কুরআনে হাকিমে বারংবার তারিফ এবং প্রশংসা করা হয়েছে। সাহাবাদের উন্নত চরিত্র ও সুন্দর

সুষ্ঠু কাজের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে হলে ভারি ভারি কিতাব রচনা করতে হয়। এখানে তাঁদের কতিপয় গুণাবলীর কথা উল্লেখ করা হলো ঃ

সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) ছিলেন আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের অনুগত, সত্য ঈমানের অধিকারী, নেক নিয়তধারী, নেকীর প্রতি অগ্রগামী, প্রতিটি ভালো কাজে আগুয়ান, হকের জন্যে জীবন বাজী রাখা, হকের জন্যে আত্মীয় স্বজন, স্বদেশ, ঘর বাড়ী, ধন সম্পদ সবকিছুই কোরবাণী করা, হালাল কামাই এবং হালাল খাওয়া, হারাম থেকে বিরত থাকা, ন্যায়-পরায়ণ, আমানতদার, প্রতিশ্রুতি পূরণকারী হক পথে সব ধরনের মুসিবত ধৈর্য এবং স্থৈর্যের সাথে মুকাবিলাকারী, মুখলিস, হক পথে বেশী বেশী সম্পদের কোরবাণী করা, নিজের প্রয়োজনের উপর অন্যের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার প্রদান, নিজের জবানকে আয়ত্বে রাখা, পরস্পর রহমশীল, কাফেরদের উপর কঠিন, কবিরাহ গুণাহ এবং বেশরমী থেকে বেঁচে থাকা, নিজেদের গুপ্তস্থান হেফাজত করা, রাগের সময় ক্ষমা করা, নামাজ কায়েম করা, হজ্ব করা, রোযা রাখা, যাকাত প্রদান করা জ্ঞান আহরণকরা, নেক কাজের নির্দেশ দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা, সত্য সাক্ষ্য প্রদান করা, আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করা, মুসিবতে ধৈর্য ধারণ, ফখর এবং আত্মম্ভরিতা থেকে দূরে থাকা, গরীব, মিসকিন ও সওয়ালকারীকে সাহায্য করা, প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করা, পিতা-মাতার খিদমত করা রাতের নির্জনত্বে বেশী বেশী সিজদা করাসহ এ ধরণের বহু গুণের আধার ছিলেন তারা।

সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এ গুণের বদৌলতেই আল্লাহর প্রিয় ও পছন্দীয় হতে পেরেছিলেন। তাঁদের মর্যাদার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এর থেকে আর কি হতে পারে যে, কুরআনে পাকে তাঁদেরকে ইহ ও পরকালে সফলতায় অভিষিক্ত মানুষ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং প্রকাশ্য ভাষায় বলা হয়েছেঃ "আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে।"

একজন মুসলমানের জীবনের লক্ষ্যই হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং পরকালীন মুক্তি। কিন্তু যেসব মহান নফসকে স্বয়ং আল্লাহ নিজের সন্তুষ্টির সুসংবাদ দেন; তাঁদের মরতবা ও মর্যাদার আন্দাজ কে করতে পারে? নিঃসন্দেহে নবীদের (আঃ) পর তাঁরাই হলেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। আর যে ব্যক্তি তাদের পদাংক অনুসরণ করে চলে তার ভাগ্যবান হওয়া সম্পর্কে কোন কথাই উঠতে পারে না। আল্লাহ্ পাক সকল মুসলমানকে সাহাবাদের (রাঃ) পদাংক অনুসরণ করার তাওফিক দিন আমীন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)

মক্কায় তখন চরম অবস্থা। সাহাবীরা (রাঃ) মুশরিকদের অত্যাচারে জর্জরিত। শুধু অত্যাচারই নয় তাদের জীবন বিপন্ন। এ অবস্থায় রাসূলে করীম (সাঃ) তাদেরকে হিজরতের অনুমতি দিলেন। হিজরতের অনুমতি পেয়ে তাঁরা নিজেদের ঘর বাড়ী এবং প্রিয় স্বদেশ ভূমি ছেড়ে ইয়াসরাব চলে এলেন। এর অব্যবহিত পরই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-ও ইয়াসরাব তাশরীফ আনলেন। হেজায ভূমির এ প্রাচীন শহর "মদীনাতুন নবী" নামে খ্যাত হলো। এ সময় এক ঘটনা ঘটলো ঃ মুজাহিদদের মদীনা আগমনের পর বেশ কিছুদিন যাবত তাদের কোন সন্তান জন্ম গ্রহণ করেনি। মদীনার ইহুদীরা ছিল অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির। তারা এক গুজব রটালো। যাদু করে তারা মুসলমানদের বংশধারা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে—এ ছিল তাদের গুজবের বিষয়বস্তু। ইহুদীদের কথায় মুসলমানদের আস্থাতো ছিল না। কিন্তু তারা মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লেন। ইহুদীদের এ মিথ্যা প্রচারণা যখন তুঙ্গে তখন তাদের মুখে ছাই দিয়ে এক মুহাজির পরিবারে একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হলো। এ খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে মুসলমানদের মধ্যে খুশীর বন্যা বয়ে গেল এবং তাদের না'রা ধ্বনিতে পাহাড় গুঞ্জরিত হয়ে উঠলো। শিশুটির মাতা-পিতা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে হাজির হলেন। তিনি শিশুটিকে কোলে উঠিয়ে নিলেন। অতঃপর একটি খেজুর আনালেন। পবিত্র মুখে তা চিবুলেন এবং মুখের লালা নবজাতকের মুখে দিলেন। শিশুটির জন্য দোয়া করলেন এবং তাকে তার মায়ের কোলে তুলে দিলেন।

নিঃসন্দেহে শিশুটি সৌভাগ্যবান। তার জন্ম গ্রহণে হক পন্থীদের মধ্যে খুশীর জোয়ার বয়ে গিয়েছিল। শিশুটির মুখে এবং পেটে সর্ব প্রথম যে বস্তু গিয়েছিল তাহলো রহমতে দো-আলম ফখরে মওজুদাত (সাঃ)-এর পবিত্র মুখের লালা। এ শিশুটি ছিলেন সাইয়েদেনা হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)।

হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) ইসলামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের সময় যদিও তাঁর বয়স ১০ বছরের বেশী ছিল না তবুও নিজের বংশ, ইলম ও ফজল, জুহদ ও ইবাদাত

বাহাদুরী এবং অন্যান্য গুণাবলীর ভিত্তিতে তিনি উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন অন্যতম সাহাবী ছিলেন। কোরেশের বনু আসাদ গোত্রের সাথে ছিলেন তিনি সম্পৃক্ত। তাঁর বংশনামা নিম্নরূপঃ

আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) ইবনুল আওয়াম বিন খুয়ায়েলেদ বিন আসাদ বিন আবদুল উজ্জা বিন কুসাই।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) –এর পিতা হযরত যোবায়ের (রাঃ) ইবনুল আওয়াম আসহাবে আশারাহ মুবাশশিরা (রাঃ) –এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হাওয়ারীয়ে রাসূল (সাঃ) তাঁর উপাধি ছিল। তিনি উম্মুল মু'মিনিন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ)-এর আপন ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। হুযুর (সাঃ)–এর ফুফু হযরত ছুফিয়া (রাঃ) বিনতে আবদুল মুত্তালিব তাঁর মাতা ছিলেন। এ দিক থেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর মামাতো ভাই ছিলেন। এবং হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) ছিলেন হুযুর (সাঃ)–এর ভ্রাতুষ্পুত্র।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)–এর মাতা হযরত আসমা (রাঃ) সাইয়েদেনা সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) –এর বড় কন্যা ছিলেন। তিনি জলিলুল কদর সাহাবিয়াদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর উপাধি ছিল জাতুন নাতাক অথবা জাতুন নাতাকাতাইন। কেননা নবী (সাঃ)–এর হিজরতের সময় তিনি নিজের কমরবন্দ (নাতাক) ছিঁড়ে খাদ্য ভাণ্ডের মুখ বেঁধেছিলেন। মাতার দিক থেকে মুহসিনায়ে উম্মতে উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)–এর খালা ছিলেন। মোট কথা মাতা ও পিতা উভয় দিক থেকেই তাঁর বংশীয় মর্যাদা সবার নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন যোবায়ের(রাঃ)–এর জন্ম সাল প্রশ্নে দু'ধরনের রাওয়ায়েত আছে। এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি প্রথম হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং অন্য রাওয়ায়েত অনুসারে তাঁর জন্ম হিজরতের ২০ মাস পর দ্বিতীয় হিজরীতে হয়েছিল। যে পরিবেশে তিনি ভূমিষ্ট হয়েছিলেন তা ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে।

কতিপয় রাওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, প্রিয় নবী (সাঃ) তাঁর জলিলুল কদর নানার কুনিয়ত বা পদবী অনুযায়ী তাঁর কুনিয়তও আবু বকরই দিয়েছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় কুনিয়ত ছিল আবু খুবায়েব। এ পদবীতেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

ইমাম হাকিম (রঃ) "মুসতাদরাকে" লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর বয়স সাত-আট বছর হলে একদিন হযরত যোবায়ের (রাঃ) তাকে সাথে নিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর নিকট হাজির হলেন এবং আরজ করলেন ঃ

"ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার এ বাচ্চার বাইয়াত নিন।"

হুযুর (সাঃ) শিশু আবদুল্লাহকে দেখে মুচকি হাসলেন। অতপর অত্যন্ত মুহাব্বাত ও স্নেহের সাথে বাইয়াত নিলেন।

চরিতকাররা বর্ণনা করেছেন বিশ্বনবী (সাঃ)-এর প্রতি হযরত যোবায়ের (রাঃ)-এর ছিল অগাধ ভক্তি শ্রদ্ধা। তিনি প্রায়ই নবী (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত থাকতেন এবং রিসালাতের ফয়েজে নিজেকে অবগাহিত করতেন। উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) ভাগিনাকে খুব ভালবাসতেন। এ জন্য তিনি কখনো মায়ের সাথে আবার কখনো একাকী তার খিদমতে হাজির হতেন। তার মুখস্থ শক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে যা করতে দেখতেন এবং বলতে শুনতেন তা স্মরণ রাখতেন। বস্তুতঃ অনেক হাদীস তিনি সরাসরি রাসূল (সাঃ)-এর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন।

একবার বিশ্বনবী মুস্তফা (সাঃ) উলকী লাগালেন অথবা টিকা নিলেন। এ সময় হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। উলকী লাগানোর ফলে রক্ত বেরুলো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তা হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে দিয়ে বললেন, কোথাও পুতে রেখে এসো। তিনি রাসূল (সাঃ) কে এত শ্রদ্ধা করতেন যে, এ পবিত্র রক্ত কোথাও পুতে রাখাকে পছন্দ করলেন না। হুযুর (সাঃ)-এর দৃষ্টির বাইরে গিয়ে তিনি তা পান করলেন। এরপর ফিরে এলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, রক্ত কোথায় নিক্ষেপ করে এলে? তিনি বললেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তা পান করেছি।" হুযুর (সাঃ) ফরমালেন, "যার শরীরে আমার খুন প্রবেশ করবে, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতে পারবে না। অবশ্য এক সময় তোমাদের হাতে মানুষ মারা যাবে।" (তারিখুল খুলাফা লিসসুয়ুতি)

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) শৈশব কাল থেকেই অত্যন্ত সাহসী এবং ভয়হীন ছিলেন। পরিখা বা খন্দকের যুদ্ধের সময়ে তাঁর বয়স ছিল প্রায় পাঁচ বছর। এত ছোট্ট বয়সেও তিনি এক উঁচু টিলায় চড়ে যুদ্ধের দৃশ্য দেখতেন এবং সামান্যতম ভীতও হতেন না।

একবার তিনি কতিপয় সমবয়স্ক বালকের সাথে খেলা করছিলেন। জনৈক ব্যক্তি তাদেরকে ভয় দেখানোর জন্য বিকট আওয়াজ দিল। অন্যান্য বালকরা এতে

ভীত হয়ে দৌড় দিল। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। অতপর সঙ্গীদেরকে পুনরায় ডেকে আনলেন এবং বললেন, আমি তোমাদের নেতা হচ্ছি,এসো সবাই মিলে সেই ব্যক্তির দুষ্টুমির মজা দেখাই। সুতরাং সবাই তাকে নেতা বানিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। উপায়ান্তর না দেখে অবশেষে তাকে ভেগেইযেতেহলো।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) ছিলেন ভীতিপ্রদ মানুষ। তাঁর দবদবাও ছিল প্রচুর। শিশুরা কোথাও খেলছে। আর সেখান দিয়ে যদি হযরত ওমর (রাঃ)-এর গমন হতো তাহলে আর রক্ষা নেই। সবাই ভোঁ দৌড় দিয়ে পালাতো। একদিন হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) সমবয়সীদের সাথে খেলছিলেন। ঠিক এমন সময় হযরত ওমর (রাঃ) সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। সব বালক খেলা ছেড়ে এদিক ওদিক লুকিয়ে পড়লো। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'বৎস! তুমি পালাওনি কেন?'

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) নির্ভয়ে বললেন, "আমি কেন পালাবো? আমি দুষ্টুমিও করিনি। আর রাস্তাও সংকীর্ণ নয় যে তা আপনার জন্য ছেড়ে দেব।"

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) তার সাহসিকতা এবং নির্ভীকতা দেখে খুব খুশী হলেন এবং মুচকী হেসে সামনের দিকে অগ্রসর হলেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) রাসূল (সাঃ) এবং সিদ্দিকে আকবর (রাঃ)-এর যুগে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন। এজন্য কোন যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর সময়ে তিনি যৌবন প্রাপ্ত হন। ইবনে হাজার (রঃ) "আল ইসাবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, এ সময় তিনি সর্বপ্রথম নিজের পিতার সাথে ইয়ারমুকের যুদ্ধে (১৫ হিজরী) অংশগ্রহণ করেন। তখন তার বয়স ছিল প্রায় ১৫ বছর। বস্তুতঃ তিনি তখনো অনভিজ্ঞ ছিলেন এবং যুদ্ধের হাঙ্গামায় তার ক্ষতি হওয়ার আশংকা ছিল। এ জন্য হযরত যোবায়ের (রাঃ) তাকে ঘোড়ায় চড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং একজন মুজাহিদকে তার হেফাজতের জন্য নিয়োগ করেছিলেন।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) ১৯ হিজরীতে হযরত আমর (রাঃ) ইবনুল আছের সাহায্যার্থে একদল সৈন্য মিশর প্রেরণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর পিতা হযরত যোবায়ের (রাঃ) এ বাহিনীর অন্যতম অফিসার ছিলেন। তিনি মদীনা থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-কেও সাথে নিয়ে চললেন। সুতরাং তিনি মিশরের কয়েকটি অভিযানে পিতার সাথে অংশ নিলেন। মিশর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি জ্ঞানার্জনে ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন। এ অবস্থায় ২৪

হিজরীতে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর হযরত ওসমান গনি (রাঃ)-এর খিলাফতকাল শুরু হলো। আমীরুল মু'মিনিন হযরত ওসমান গনি (রাঃ) ২৬ হিজরীতে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন সায়াদ বিন আবি ছাবাহকে ত্রিপোলী (লিবিয়া) করতলগত করার জন্য আফ্রিকা প্রেরণ করলেন। সে যুগে লিবিয়া, আলজিরিয়া এবং মরক্কো প্রভৃতির সম্মিলিত নাম ছিল আফ্রিকা; আর ত্রিপোলী ছিল এ রাষ্ট্রের কেন্দ্র।

ত্রিপোলীর শাসক ছিল খৃষ্টান। তার নাম ছিল বাতরিক গ্রেগরী। সে একজন অভিজ্ঞ জেনারেলও ছিল। সে এক লাখ ২০ হাজার যুদ্ধবাজ সৈন্য মুসলমানদের মুকাবেলায় এনে দাঁড় করালো। তার একটি কন্যা ছিল। বিভিন্ন রাওয়ায়েতে তার নাম ফিলপানা বলা হয়েছে। রূপে গুণে, মেধা ও বাহাদুরীতে সে ছিল অদ্বিতীয়া। সে-ও পিতার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল এবং নিজের বাহিনীকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অনুপ্রাণিত করেছিল। কয়েকমাস ধরে উভয় বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হলো। কিন্তু জয়-পরাজয় নির্ধারিত হলো না। কতিপয় ঐতিহাসিক গ্রেগরীর একটি ঘোষণার কথা উল্লেখ করেছেন। ঘোষণাটিতে বলা হয়েছিল, যে ব্যক্তি মুসলমানদের সেনাপতির মস্তক কর্তন করে আনতে সক্ষম হবে তাকে একলাখ দিনার নগদ পুরস্কার দেয়া হবে এবং নিজের কন্যাকেও তার সাথে বিয়ে দেবে। এ ঘোষণায় খৃষ্টান বাহিনীর হিম্মত কয়েক গুণ বেড়ে গেল এবং অনেক খৃষ্টান সৈন্য হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন সায়াদের সন্ধানে থাকতো। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন সায়াদ সতর্কতা স্বরূপ যুদ্ধের ময়দানে আগমন ছেড়ে দিয়েছিলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) কয়েকমাস যাবৎ যুদ্ধের ফলাফলের কোন খবর পাচ্ছিলেন না। এ অবস্থায় তিনি হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)-এর নেতৃত্বে একটি সাহায্যকারী দল ত্রিপোলী প্রেরণ করলেন। ইবনে যোবায়ের (রাঃ) জিহাদের ময়দানে আবির্ভূত হলেন। তাঁকে দেখে মুসলমানরা নারায়ে তকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করলেন। গ্রেগরী এর কারণ জিজ্ঞেস করলো। তাকে বলা হলো যে, মুসলমানদের সাহায্যার্থে তাজাদম সৈন্যের আগমন ঘটেছে। এ কথা শুনে সে হতবিহ্বল হয়ে পড়লো। কিন্তু যথারীতি নিজের বাহিনীর সাহস যুগিয়ে যেতে লাগলো। ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর আগমনের পূর্বে যুদ্ধের কোন নির্দিষ্ট সময় ছিলো না। তিনি এসেই সকাল থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত যুদ্ধের সময় নির্ধারণ করেছিলেন। সুতরাং এভাবেই যুদ্ধ চলতে লাগলো। ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর পরামর্শে সেনাপতি আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন সায়াদও ঘোষণা করলেন যে, যে ব্যক্তি গ্রেগরীর মস্তক কেটে আনতে পারবে তাকে এক লাখ দিনার নগদ পুরস্কার এবং গ্রেগরীর কন্যার সাথে তার বিয়ে দেয়া হবে। এ ঘোষণা দানের পর তিনি নিজেও অত্যন্ত

তৎপরতার সাথে যুদ্ধে অংশ নিলেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও যুদ্ধ কোন সিদ্ধান্তমূলক পর্যায়ে উপনীত হলো না। একদিন ইবনে যোবায়ের (রাঃ) নিজের সেনাপতিকে বললেন, এভাবে যুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত হবে না। কেননা আমরা কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে রয়েছি। পক্ষান্তরে গ্রেগরী নিজের দেশের অভ্যন্তরে রয়েছে এবং সবধরনের সাহায্য পাচ্ছে। আমার পরামর্শ হলো, আগামীকাল আমরা নিজেদের বাহিনীর নির্বাচিত বাহাদুরদেরকে তাদের তাবুতে প্রেরণ করবো এবং অবশিষ্ট সৈন্য খৃষ্টানদের সাথে মুকাবেলা করবো। দ্বিপ্রহরের পর খৃষ্টান বাহিনী যখন ক্লান্ত হয়ে ফিরতে থাকবে তখন আমাদের তাজাদম বাহাদুর তাঁবু থেকে বের হয়ে তাদের ওপর হামলা করে বসবে। সেনাপতি এ পরামর্শ খুব পছন্দ করলেন এবং পরবর্তী দিন সে অনুযায়ী কাজ করা হলো। খৃষ্টান সৈন্যরা যখন ক্লান্ত হয়ে পিছে হটছিল তখন ইবনে যোবায়ের (রাঃ) নিজের বাহাদুর সৈন্যসহ তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এ হামলা ছিল আকস্মিক এবং প্রচণ্ড। গ্রেগরী ও তার কন্যার শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও খৃষ্টানরা দৃঢ়ভাবে যুদ্ধ করতে পারেনি। প্রচণ্ড বিশৃংখলার মাঝে তারা পলায়ন করে। হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর হাতে গ্রেগরী নিহত হল এবং তার কন্যাকে মুসলমানরা গ্রেফতার করল। সেনাপতি নিজের ঘোষণা অনুযায়ী তাকে ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-কে দিয়ে দিলেন। তিনি তাকে বিয়ে করেছিলেন না আযাদ করেছিলেন সর্বজন গ্রাহ্য ইতিহাস পুস্তকে এর কোন জবাব পাওয়া যায় না। ত্রিপোলী পদানত করার পর মুসলমানরা আফ্রিকার অন্যান্য সকল শহর ও অঞ্চল একের পর এক জয় করলেন। এ সব অভিযানে ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বাহাদুরীর চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। 'দায়েরা মায়ারেফে ইসলামিয়া' গ্রন্থে আল ইগাফির উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বিজয়ের খবর নিয়ে মদিনা ফিরে এলেন এবং অত্যন্ত সুললিত ও শক্তিশালী ভাষায় অভিযানের বর্ণনা দিলেন। হযরত সাঈদ (রাঃ) ইবনুল আস ২৯-৩০ হিজরীতে তাবারিস্তানে (উত্তর ইরানে) সৈন্য প্রেরণ করলেন। এ সময় হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)-ও এ বাহিনীতে যোগ দেন এবং বিভিন্ন অভিযানে বাহাদুরীর সাথে অংশ নেন। তাবারিস্তান বিজয়ের পর মদীনা ফিরে এলে হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রাঃ) তাঁকে মাসাহিফ লিখন (কুরআনে করীম নকল) মজলিসের সদস্য নিয়োগ করেন। এ মজলিসের অন্যান্য সদস্য ছিলেন। হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন সাবিত আনসারি, হযরত সাঈদ (রাঃ) বিন আস এবং হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বিন হারিস বিন হিশাম। হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর বয়স তখন মাত্র ৩০ বছর ছিল। কিন্তু এ গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র কাজে তার নির্বাচন এ কথারই প্রমাণ দেয় যে, সে সময় তিনি জ্ঞান ও মর্যাদার দিক থেকে অত্যন্ত উঁচু আসনে সমাসীন হয়েছিলেন।

হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে গোলযোগ শক্তিশালী হয়ে উঠলো. এবং ৩৫ হিজরীতে বিশৃংখলাকারীরা খিলাফত ভবন অবরোধ করলো। এ সময় অন্যান্যের মত হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিজের সৈন্যসহ বিদ্রোহীদের মুকাবিলা করার জন্য হযরত ওসমান (রাঃ)-এর অনুমতি চেয়ে আবেদন জানালেন। কিন্তু শরীফ ব্যক্তিত্ব আমীরুল মু'মিনিন (রাঃ) আল্লার দোহাই দিয়ে তাদের কেউই যেন তার খাতিরে রক্ত প্রবাহিত না করে এ অনুরোধ জানালেন। ফলে হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) চুপ মেরে গেলেন। এ সত্ত্বেও তিনি অন্যান্য কুরাইশ যুবকদের সাথে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে থাকলেন। অবরোধের চল্লিশতম দিনে বিদ্রোহীরা সদর দরজা ছেড়ে পিছনের দিক থেকে প্রাচীর টপকে ভিতরে প্রবেশ করলো এবং বয়সের ভারে দুর্বল আমীরুল মু'মিনিনকে কুরআন তিলাওয়াত অবস্থায় নৃশংসভাবে শহীদ করে বসলো। হযরত উসমান (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু খলিফা নির্বাচিত হলেন। এ সময়ে উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) কিসাসে উসমান (রাঃ) অথবা সংশোধনের ঝাণ্ডা তুলে ধরলেন। এ প্রসঙ্গে ৩৬ হিজরীতে দুঃখজনক উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) উম্মুল মু'মিনিন (রাঃ)-এর পদাতিক বাহিনীর অফিসার ছিলেন। তিনি এত নির্ভিক চিত্তে যুদ্ধ করেছিলেন যে, তার সারা শরীর আঘাতে আঘাতে ঝাঝরা হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধ শেষে গণনা করে দেখা গেল যে,তার শরীরে বর্শা এবং তরবারীর চল্লিশেরও বেশী আঘাত রয়েছে। যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) পিতৃস্নেহ থেকেও বঞ্চিত হন। পিতা হযরত যোবায়ের (রাঃ) নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে যাচ্ছিলেন। ঠিক এমনি সময় আমর বিন জারমুজ নামক এক বদ বাতিন ব্যক্তি তাঁকে নামাযে সিজদাহরত অবস্থায় শহীদ করে ফেলে। যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ) জয়ী হলেন। এ সময় হযরত আবদুল্লাহ একাকিত্ব অবলম্বন করলেন এবং সিফফিনের গৃহযুদ্ধে কার্যতঃ অংশই নেননি। এ সত্ত্বেও দাওমাতুল জানদালের সালিশীতে উপস্থিত ছিলেন।

৪০ হিজরীর রামাদান মাসে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু শাহাদাত বরণ করলেন। সাইয়েদেনা হযরত হাসান (রাঃ) খিলাফতের দায়িত্ব পেলেন। কিন্তু উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে কয়েক মাস পর তিনি আমীর মাবীয়ার পক্ষে খিলাফত ছেড়ে দিলেন। এভাবে ৪১ হিজরীতে কারোর অংশগ্রহণ ছাড়াই আমীর মাবিয়া (রাঃ) ইসলামী জাহানের শাসক বনে গেলেন। হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) তাঁর শাসনামলের বেশীরভাগ সময়ই নির্জনত্বে কাটান এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেননি। কোন বিসম্বাদে না জড়িয়ে তিনি আমীর মাবিয়ার (রাঃ) হাতে বাইয়াত করেন। বুজর্গ পিতার রেখে যাওয়া সম্পদের বিরাট অংশ তিনি পেয়েছিলেন। তাছাড়া নিজেও ব্যবসা করতেন। এ জন্য জীবিকার কোন চিন্তা

ছিল না। আমীর মাবিয়া (রাঃ) ৪৯-৫০ হিজরীতে অথবা ৫১-৫২ হিজরীতে কাসতানতুনিয়া জয়ের জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহর খাতিরে তিনি এ বাহিনীতে যোগ দেন। কতিপয় রাওয়ায়েত মুতাবেক এ বাহিনী সম্পর্কেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন যে, "কাইসারের শহরে আমার উম্মাতের প্রথম যে বাহিনী জিহাদ করবে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।"

এ অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি পূর্বেকার মতই নির্জনত্ব গ্রহণ করেন। আর এ একাকীত্বের কাল চলে আমীর মাবিয়া (রাঃ)-এর শাসনকালের শেষ পর্যায়ে ইয়াযিদকে উত্তরাধিকার মনোয়ন পর্যন্ত। আমীর মাবিয়া (রাঃ) জনগণের প্রতি এ মনোনয়ন মেনে নেয়ার আহবান জানান। হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) ইবনে আবিবকর (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত হোসাইন (রাঃ) বিন আলী (রাঃ) ইয়াযিদকে মনোনয়নের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন। আমীর মাবিয়া (রাঃ) তাঁদেরকে এ প্রশ্নে সম্মত করার জন্যে স্বয়ং দামেস্ক থেকে মক্কা মুয়াজ্জামা আগমন করেন। এ সব বুজর্গ ব্যক্তি মদীনা থেকে এসে এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন। অন্য এক রাওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, মদীনাতেই এ সব ব্যক্তির সাথে আমীর মাবিয়া (রাঃ)-এর আলোচনা হয়েছিল। আমীর মাবিয়া (রাঃ) এ চারজনকে ডেকে পাঠালেন। আলোচনার জন্য সবাই হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-কে প্রতিনিধি বানালেন। হযরত মাবিয়া (রাঃ) এবং ইবনে যুবায়ের (রাঃ)-এর মধ্যে এ আলোচনা হলোঃ

আমীর মাবিয়া (রাঃ) ঃ তোমরা সবাই আমার প্রিয়। তোমরা ভালোভাবেই জানো যে, আমি তোমাদের সাথে সব সময় ভালো ব্যবহার করেছি। ইয়াযিদ তোমাদের ভাই এবং চাচার পুত্র। মুসলমানদেরকে বিশৃংখলা ও খুনাখুনির হাত থেকে রক্ষার জন্য আমি চাই যে, তোমরা তাকে খিলাফতের জন্য মনোনয়ন দেবে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখবে। সে তোমাদের সাথে কোন বাদানুবাদ করবে না।

আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)ঃ হে আমীর! আমরা তিনটি বিকল্প আপনার নিকট পেশ করছি। এর মধ্যে যে কোন একটি আপনি গ্রহণ করুন।

প্রথম বিকল্প হলোঃ রাসূল (সাঃ)-এর মত কাউকেই মনোনীত করবেন না। আপনার পর উম্মাত নিজেই খলিফা নির্বাচন করে নেবে। দ্বিতীয় পথ হলোঃ আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর পথ। নিজের উত্তরাধিকার সেই ব্যক্তিকে মনোনয়ন করুন যিনি আপনার আত্মীয় এবং আপনার কবিলাভুক্ত নন। তৃতীয় হলো হযরত ওমর (রাঃ)-এর গৃহীত পথ। কতিপয় ব্যক্তিকে মনোনয়ন দিন। যাঁরা আপনার পরে নিজেদের মধ্য থেকে কাউকে খলিফা নির্বাচন করে নেবেন।

আমীর মাবিয়া (রাঃ)ঃ রাসূল (সাঃ)–এর পর এমন মানুষ ছিলেন যাঁর ওপর উম্মাত ঐকমত্য পোষণ করতে পারতো। এভাবে তারা আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)–এর ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন। কিন্তু এখন সে অবস্থা কোথায়? এখনতো মতভেদ আরো বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা রয়েছে। হযরত আবুবকর (রাঃ)–এর দৃষ্টি হযরত ওমর (রাঃ)–এর ওপর পড়তে পারতো। কিন্তু আমার পর (বনু উমাইয়ার বাইরে) এমন কে আছে যাকে আমি পূর্ণ আস্থার সাথে মনোনয়ন দিতে পারি। বর্তমান অবস্থায় তৃতীয় বিকল্পের ওপর কাজ করা সম্ভব নয়। এছাড়া কি আর কোন পথ নেই?

আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) ঃ না।

আলোচনার পর আমির মাবিয়া (রাঃ) এ সব বুজুর্গকে কি নিজেদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন, না শক্তি প্রয়োগ করে তাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারের বাইয়াত আদায় করেছিলেন? যা হোক, আমীর মাবিয়ার অন্তরে হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) সম্পর্কে খটকা সৃষ্টি হয়েছিল। সুতরাং ৬০ হিজরীর রজব মাসে মৃত্যুর পূর্বে তিনি ইয়াযিদের জন্য যে ওসিয়তনামা রেখে যান তাতে অন্যান্য নসিহতের সাথে একটি নসিহত এও ছিলঃ "খিলাফত প্রশ্নে কুরাইশের তিনজনের ব্যাপারে তোমার বিপদের আশংকা থাকবে। হোসাইন (রাঃ) বিন আলী (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)। ইরাকবাসী একদিন না একদিন হোসাইন (রাঃ)–কে অবশ্যই তোমার বিরুদ্ধে এনে দাঁড় করাবে। তিনি পরাভূত হলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে কাজ করবে। তিনি আমাদের আত্মীয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর নাতি। আমাদের ওপর তাদের হক আছে। আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) খিলাফতের জঞ্জালে পড়া পসন্দ করবেন না এবং ইবাদাতেই মশগুল থাকবেন। অন্যান্যরা যখন তোমার বাইয়াত করবেন তখন তিনিও এ ব্যাপারে তাদের অনুসরণ করবেন। যে ব্যক্তিটির ব্যাপারে তোমার প্রকৃত ভয় আছে সে হলো আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)। এ ব্যক্তি খেঁকশিয়ালের চাল চেলে বাঘের মত তোমার ওপর হামলা করে বসবে। তাকে কাবু করতে পারলে কখনো জীবিত ছেড়ে দেবে না। হাঁ সে যদি সন্ধি করে তাহলে জাতিকে রক্তারক্তির হাত থেকে রক্ষার জন্য তুমিও সন্ধি করা থেকে বিরত থেক না।"

আমীর মাবিয়া (রাঃ)–এর মৃত্যুর পর ইয়াযিদ শাসন পরিচালনার সিংহাসনে আরোহণ করলো। সিরিয়াবাসী তৎক্ষণাৎ তার হাতে বাইয়াত হলো। আমীর মাবিয়া (রাঃ) জীবদ্দশাতেই হেজাজের অধিকাংশ লোকের বাইয়াত নিয়ে রেখেছিলেন। যাঁরা বাইয়াত হননি তাদের মধ্যে সাইয়েদেনা হযরত হোসাইন (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) এমন দু' ব্যক্তিত্ব ছিলেন যাঁদেরকে ইয়াযিদের কোনক্রমেই উপেক্ষা করার ছিল না। সে মদীনার গবর্ণর ওয়ালিদ বিন উতবাহকে উভয় বুজর্গের বাইয়াত

নেয়ার তাকিদ দিয়ে নির্দেশ পাঠালেন। ওয়ালিদ উভয়কেই ডেকে পাঠালেন। হযরত হোসাইন (রাঃ) তার ডাকে এলেন। কিন্তু বাইয়াত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন। ইবনে যোবায়ের (রাঃ) একদিনের সময় চেয়ে নিলেন এবং রাতের মধ্যেই পরিবার পরিজনসহ মদীনা থেকে বের হয়ে মক্কা মুয়াজ্জামা চলে আসেন। মক্কাবাসীরা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলো। কেননা তাঁর আল্লাহ ভীতি ও অন্যান্য গুণাবলীর তারা প্রশংসাকারী ছিল। সে সময়ই হযরত হোসাইন (রাঃ)-ও পরিবার পরিজনসহ কূফার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে মক্কা তাশরীফ রাখলেন। হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) সাইয়েদেনা হোসাইন (রাঃ)-এর কূফাগমনের কথা জানতে পেরে তাঁর নিকট এলেন এবং বললেনঃ "আপনি এখানে হেরেম শরীফে অবস্থান করুন। এটাই উত্তম এখান থেকে আপনি শহরসমূহে দূত প্রেরণ করুন এবং ইরাকী সমর্থকদেরকে এখানেই আপনার নিকট পৌঁছার কথা বলুন। অতঃপর আপনার হাত যখন শক্তিশালী হবে তখন ইয়াযিদের গবর্ণরকে এখান থেকে বের করে দেবেন। আমিও আপনাকে সমর্থন করবো। এ সমর্থন দান আমার জন্য ফরয। আমি আপনাকে এ পরামর্শ দেব যে, খিলাফতের দাবী হেরেম শরীফ থেকেই করুন। কেননা সমগ্র দুনিয়ার মানুষ এখানে সমবেত হয়। আল্লাহ চাইলে আপনি আপনার উদ্দেশ্যে অসফল হবেন না।

হযরত হোসাইন (রাঃ) কূফা গমনে দৃঢ় সংকল্প ছিলেন। এ জন্যে তিনি ইবনে যোবায়ের (রাঃ) -এর পরামর্শ গ্রহণ করলেন না। অন্য এক রাওয়ায়েত মতে তিনি হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-কে এ মর্মে জবাব দিয়েছিলেনঃ "আমি আমার পিতা থেকে এ হাদীস শুনেছি যে, হেরেম শরীফের একটা ভেড়া আছে। যার কারণে তার হুরমত বা মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হবে। আমি এখানে অবস্থান করে সেই ভেড়া হতে চাই না।"

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এবং অন্যান্য শুভাকাংখীরাও সাইয়েদেনা হোসাইন (রাঃ)-কে কূফা গমন না করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তিনি কারোর পরামর্শ মানলেন না এবং পরিবার-পরিজন সমেত কূফা রওয়ানা হয়ে গেলেন। ৬১ হিজরীর ১০ই মুহাররাম কারবালার লোমহর্ষক ঘটনা সংঘটিত হলো। সাইয়েদেনা হোসাইন (রাঃ) নিজের বেশ কিছু প্রিয় সাথীসহ কারবালা ময়দানে ইয়াযিদের সৈন্যের হাতে শহীদ হয়ে গেলেন। এ হৃদয় বিদারক ঘটনার খবর হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) পেলেন এবং অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি সকল মক্কাবাসীকে হেরেম শরীফে ডাকলেন এবং তাদের সামনে এক হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা করলেন। তিনি বললেনঃ "হে মানুষেরা। ইরাকবাসীর চেয়ে জঘন্যতম সৃষ্টি এ বিশ্ব চরাচরে আর নেই। আর ইরাকীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী জঘন্য হলো কূফার মানুষ। হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর হাতে বাইয়াত হওয়ার জন্যে বারংবার তারা তাকে চিঠি দিয়েছিল। কিন্তু হযরত হোসাইন (রাঃ) যখন তাদের সীমান্তে পৌঁছলেন তখন তারা তাঁকে বান্ধবহীন এবং সাহায্যকারীহীন অবস্থায় নিক্ষেপ করলো।

বরং তাদের অধিকাংশই বনু উমাইয়াকে সমর্থন জানালো। ইয়াযিদ বাহিনী মজলুম হোসাইন (রাঃ)-কে ঘিরে নিল এবং ইয়াযিদের বাইয়াত করার জন্যে তাঁর নিকট দাবী জানালোঃ সাথে সাথে তাঁকে ইবনে যিয়াদের নিকট আত্মসমর্পন করতে বললো। অন্যথা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বললো। আল্লার কসম! তিনি সাজ-সরঞ্জামহীন ছিলেন এ কথা হোসাইন (রাঃ) অবহিত ছিলেন। তবে তিনি জিল্লতীর জীবন অপসন্দ করতেন এবং মর্যাদার মৃত্যু গ্রহণ করলেন। আল্লাহ হোসাইন (রাঃ)-এর হত্যাকারীদের অপমানিত করুন। কিন্তু আল্লার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করার নেই। আমি জিজ্ঞেস করি, হোসাইন (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর আমরা কি সেই সব জঘন্য লোকের কথা এবং কাজের ওপর ভরসা করতে পারি? উপস্থিত জনতা একবাক্যে বললো-অবশ্যই নয়।"

হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বক্তৃতা অব্যাহত রেখে বললেনঃ "হে মানুষেরা! আল্লার কসম, সেই যালেমরা উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। তিনি দিনে রোযা রাখতেন এবং রাত জেগে ইবাদাত করতেন। তিনি ছিলেন কুরআনের অনুরাগী এবং পবিত্র। প্রত্যেক দিক থেকেই তিনি তার চেয়ে বেশী খেলাফতের হকদার ছিলেন। আল্লার কসম! হোসাইন (রাঃ) রোযার মুকাবিলায় মদপান, আল্লার ভয়ে ক্রন্দনের পরিবর্তে নৃত্য গীত, কুরআনের হেদায়েতের মুকাবিলায় গুমরাহী এবং হকের জিকরের পরিবর্তে শিকারী কুকুরের উল্লেখ করা অত্যন্ত অপসন্দ করতেন। আল্লাহ এ সব ধোঁকাবাজ হত্যাকারীকে কঠিন শাস্তি দেবেন।"

ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বক্তৃতা শেষ করে কেঁদে ফেললেন এবং উপস্থিত জনতা ডুকরে কেঁদে উঠলো। অতপর সবাই ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর চারপাশে একত্রিত হয়ে বললো, "আল্লার কসম! হোসাইন (রাঃ)-এর পর খিলাফতের হকদার আপনার চেয়ে বেশী আর কেউ নেই। হোসাইন (রাঃ)-এর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে আমরা ঘৃণা প্রকাশ করছি। আপনি হাত বাড়িয়ে দিন। আমরা আপনার হাতে খিলাফতের বাইয়াত করছি।"

মানুষের পীড়াপীড়িতে হযরত ইবনে, যোবায়ের (রাঃ) নিজের হাত অগ্রসর করে দিলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং মুহাম্মদ বিন হানফিয়াহ (রঃ) ছাড়া মক্কাবাসী তাঁর হাতে বাইয়াত করলো।

ইয়াযিদ এ কথা শুনে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো। সে ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-কে গ্রেফতার করে দামেস্ক প্রেরণের জন্য মদীনার গবর্ণরকে নির্দেশ দিল। এ নির্দেশ প্রাপ্তির পর মদীনার গবর্ণর ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-কে গ্রেফতার করার জন্য একটি ছোট বাহিনী প্রেরণ করলো। এ বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর এক ভাই আমর বিন যোবায়ের (রাঃ)। অন্য এক রাওয়ায়েত অনুসারে আমর বিন যোবায়ের (রাঃ) দূত হিসেবে আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)-এর নিকট গেলেন এবং বললেন যে.

আমীরুল মু'মিনিন ইয়াযিদ বিন মাবিয়া (রাঃ) অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে আপনাকে দামেস্ক ডেকে পাঠিয়েছেন। এ দূতগীরির উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। ইবনে যোবায়ের (রাঃ) যদি তার সাথে যেতে সম্মত হয় তাহলে তাঁকে গ্রেফতার করা হবে। যা হোক, হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) ইয়াযিদ বাহিনীকে পরাজিত করলেন অথবা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে আমর বিন যোবায়ের (রাঃ)-কে গ্রেফতার করলেন এবং কিছুদিন পর তাকে হত্যা করালেন। এরপর ইবনে যোবায়ের (রাঃ) প্রকাশ্যভাবে ইয়াযিদকে বরখাস্তের ঘোষণা দিলেন। মদীনাবাসী তাঁর অনুসরণ করলো এবং তারা ইয়াযিদের খিলাফত অস্বীকার করে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন হানজালাহ (রাঃ) গাসিলুল মালায়েকাকে নিজেদের স্থানীয় আমীর নির্বাচন করলো। কথিত আছে যে, বাইয়াত বাতিলের পূর্বে মদীনাবাসীদের একটি প্রতিনিধিদল দামেস্ক গিয়েছিল। সেখানে তাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল। কিন্তু সে প্রতিনিধি দল ফিরে এসে মদীনাবাসীদের সামনে ইয়াযিদের তৎপরতায় এমন এক অপচিত্র পেশ করলো যে, তাতে তারা ইয়াযিদ থেকে দূরে সরে গেল। ইয়াযিদ এ পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার জন্য মুসলিম বিন উকবাহ মাররীর নেতৃত্বে একটি সিরীয় বাহিনী হেজায প্রেরণ করলো। এ বাহিনী মদীনা পৌঁছলে মদীনাবাসী সর্ব শক্তি দিয়ে তার মুকাবিলা করলো। কিন্তু মুসলিম বিন উকবার সামরিক কৌশলের সামনে তারা পরাজিত হলো। হযরত আবদুল্লাহ বিন হানজালাহ (রাঃ) হাজার হাজার মদীনাবাসীসহ সিংহ বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। শহীদদের মধ্যে বিশজন সাহাবী (রাঃ)-ও ছিলেন। সিরীয় বাহিনী তিন দিন ধরে মদীনা মুনাওয়ারাতে হত্যা ও লুণ্ঠনের রাজত্ব চালালো। এরপর তারা হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)-কে অনুগত বানাবোর জন্য মক্কা মুয়াজ্জামার দিকে রওয়ানা হলো। পথিমধ্যে মুসলিম বিন উকবাহ মারা গেল এবং তার স্থানে হাসিন বিন নুমায়ের সিরীয় বাহিনীর সেনাপতি হলো। সে মক্কার নিকটে পৌঁছলে ইবনে যোবায়ের (রাঃ) শহরের বাইরে বেরিয়ে সিরীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করলেন। কিন্তু সিরীয়দের প্রচণ্ড চাপের কারণে অবরুদ্ধ হয়ে বাধা দানের সিদ্ধান্ত নিলেন। হাসিন বিন নুমায়ের বুকাবিস পাহাড়ের ওপর কামান স্থাপন করে কা'বা ঘরের ওপর গোলা নিক্ষেপ শুরু করলো। এতে কা'বা ভবনের প্রচুর ক্ষতি হলো। এ সত্ত্বেও হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) অত্যন্ত বীরত্বের সাথে মুকাবিলা করতে লাগলেন। তিনি মসজিদে হারামে তাবু টাঙিয়ে রেখেছিলেন। গোলাগুলীর কোন পরওয়া ছিল না। তাঁবু থেকে বের হয়ে অত্যন্ত নির্ভাবনায় হেরেম শরীফে নামাযে মশগুল থাকতেন। স্বয়ং হাসিন বিন নুমাইরের বর্ণনা হলোঃ আমার মক্কা অবরোধকালে ইবনে যোবায়ের (রাঃ) নিজের তাঁবু থেকে এমনভাবে বের হতেন যেমন জঙ্গল থেকে বাঘ বের হয়।

অবরোধকালে খারেজীদের একটি দল নাফে বিন আরযাক এবং নাজদাহ বিন আমের (রাঃ)-এর নেতৃত্বে মক্কায় এলো তারা ইয়াজিদ বিরোধী হলেও ইবনে যোবায়ের

(রাঃ)–এর সমর্থক ছিল না। এসত্ত্বেও তারা তাঁকে ইয়াযিদ থেকে উত্তম মনে করতো। তাদের ধারণা ছিল যে, ইবনে যোবায়ের (রাঃ) যদি তাদের সমর্থন করেন তাহলে তারা ইয়াযিদ বাহিনীর বিরুদ্ধে এ নাযুক সময়ে তাঁর সাহায্য করবে।

নাফে এবং নাজদাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ)–এর সাথে সাক্ষাত করে এ প্রস্তাব পেশ করলেন যে, যদি তিনি হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ) এবং নিজের পিতা হযরত যোবায়ের (রাঃ)–এর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ এবং তিরস্কার করেন তাহলে তাদের দল তাঁদের সমর্থনে সিরীয় বাহিনীর সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) এ সব বুজর্গকে তিরস্কার করতে পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করলেন এবং তাদের যুক্তির দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়ে সর্বশেষে বললেনঃ "নিঃসন্দেহে এ সময় তোমাদের সাহায্য আমার জন্য অত্যন্ত কদরের বস্তু ছিল। কিন্তু আমার শাসক হবার ইচ্ছে নেই। জয়–পরাজয়ের চিন্তাও নেই। আমি তো সত্য এবং ন্যায়ের জন্য লড়াই করছি। যদি আমার সাথে এক হয়ে সিরীয়দের মুকাবিলা করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিদান দেবেন। আর তোমরা যদি আমাকে সাহায্য না করো, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তোমরা যদি আমার শত্রুর সাথে গিয়ে মিলিত হও তাহলেও আমি কোন পরওয়া করি না।" তাঁর জবাব শুনে খারেজীরা নিরাশ হয়ে ফিরে গেল।

মক্কার অবরোধ অব্যাহত ছিল, ঠিক এমনি সময় ৬৪ হিজরীর ১৪ রবিউল আউয়াল ইয়াযিদ মারা গেল। তার মৃত্যুর খবর মক্কা পৌঁছলে হাছিন বিন নুমায়ের অবরোধ প্রত্যাহার করে নিল। এক রাওয়ায়েত অনুসারে অবরোধ অবসানের পর হাছিন বিন নুমায়েরের আবেদনে হযরত ইবনে যুবায়ের (রাঃ) হেরেম শরীফের দরজা খুলে দিলেন এবং সিরীয়রা নির্দ্বিধায় তাওয়াফ করতে লাগলো। এ সময় হাছিন ও ইবনে যোবায়ের (রাঃ)–এর সাক্ষাত ঘটলো। অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে যে, রওয়ানা হওয়ার পূর্বে হাছিন ইবনে যোবায়ের (রাঃ)–কে পয়গাম পাঠিয়ে ছিলেন। তাতে সে বাতহা নামক স্থানে রাতে নির্জনে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে চেয়েছিলো এবং উভয় পক্ষ থেকে ১০ জন করে লোক সেখানে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছিল। যা হোক, উভয়ের সাক্ষাত ঘটলো। হাছিন ইবনে যোবায়ের (রাঃ)–কে বললো, ইয়াযিদ মারা গেছে। আমার দৃষ্টিতে বর্তমানে আপনার চেয়ে খিলাফতের হকদার আর কেউ নেই। আমি এবং আমার সঙ্গীরা আপনার হাতে বাইয়াতের জন্য সিরিয়াবাসীদের উদ্বুদ্ধ করবো। হিজাজবাসী প্রথম থেকেই আপনার সাথে রয়েছে। সিরীয়বাসীর বাইয়াতের পর সমগ্র ইসলামী বিশ্ব আপনাকে খলিফা হিসেবে মেনে নেবে। এতদিন আমাদের মধ্যে যে রক্তাক্ত লড়াই হয়েছে তা আপনি ক্ষমা করে দিন।

ইবনে যোবায়ের (রাঃ) হাছিন বিন নুমায়েরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে গুরুগম্ভীর অথচ দরাজ কণ্ঠে বললেন ঃ "মদীনা এবং মক্কাবাসীর রক্তাক্ত ঘটনা ক্ষমা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহর কসম! যতক্ষণ এক এক হিজাজবাসীর কিসাসে বা বদলীর দশ দশ সিরীয় মস্তক উড়িয়ে না দেয়াবো ততক্ষণ তোমার সাথে কোন আলোচনা বা সমঝোতা হতে পারে না।

হাছিন নিরাশ হয়ে বললো যে, "আমার ধারণা ছিল আপনি আরবের অন্যতম চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব এখন বুঝতে পারলাম আমার সে ধারণা ভুল ছিল। আমি আপনাকে খিলাফতের মসনদের দিকে আহবান জানাচ্ছি। আর আপনি আমাকে যুদ্ধের হুমকি দিচ্ছেন। আমি আস্তে আস্তে কথা বলছি। আর আপনি চড়া গলায় কথা বলছেন।"

এ কথা বলে হাছিন নিজের বাহিনীতে ফিরে গেল এবং পরদিন সিরিয়া রওয়ানা হয়ে গেল।

অবরোধকালে কা'বা ভবনের প্রচুর ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। হাছিনের ফিরে যাওয়ার পর হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) কা'বাকে নতুন করে নির্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এ জন্যে প্রথমে পুরাতন ভবন সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে ফেলা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কেউই এ কাজে সাহস পেল না। অবশেষে ইবনে যোবায়ের (রাঃ) স্বয়ং আল্লার নাম নিয়ে প্রাচীরের ওপর চড়ে বসলেন এবং একটি পাথর খসিয়ে তা ভেঙ্গে ফেললেন। তাঁর এ কাজ দেখে অন্যান্যরাও তাতে শরীক হলো। সমগ্র প্রাচীর ভাঙ্গা শেষ হলে ভিত্তি খননের কাজ শুরু হলো। ইবনে যোবায়ের (রাঃ) হাতিমের পরিত্যক্ত অংশও কা'বার সীমানাভুক্ত করলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যেভাবে নতুন ভবন তৈরী করতে চেয়েছিলেন তেমনি তৈরী করলেন। তিনি এ কাজে অন্তর খুলে অর্থ খরচ করলেন এবং অত্যন্ত হিম্মত ও বদান্যতা দেখালেন। যে দিন তিনি এ কাজ সমাপ্ত করলেন সে দিন নতুন ভবনের আভ্যন্তরীণ ও বর্হিভাগের ওপরে এবং নীচে মিশক-আম্বর লাগালেন। তার ওপর রেশমের গিলাফ চড়ালেন। কৃতজ্ঞতায় অনেক গোলাম আযাদ করলেন। অনেক উট এবং বকরী জবেহ করলেন। অতঃপর তিনি কুরাইশের এক বড় দলের সাথে নগ্ন পায়ে ঘর থেকে বের হয়ে তানয়ীম নামক স্থানে পৌঁছে ওমরাহর ইহরাম বাঁধলেন। আল্লাহ পাক তাঁকে রাসূল (সাঃ)-এর ইচ্ছা অনুযায়ী ইবরাহীমি বুনিয়াদের ওপর কা'বা নির্মাণের তাওফিক দিলেন। এক রাওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, তিনি সর্বপ্রথম হাজরে আসওয়াদের ওপর রুপা বিছালেন। গোলাবারুদ বর্ষণের কারণে হাজরে আসওয়াদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এজন্যেই ইবনে যোবায়ের (রাঃ) তা রুপা দিয়ে বাঁধলেন।

ওদিকে সিরিয়ায় ইয়াযিদের মৃত্যুর পর তার পুত্র মাবিয়া ক্ষমতাসীন হলো। সে একজন দ্বীনদার এবং নরম প্রকৃতির লোক ছিল। শাসন কাজের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়া

সে পছন্দ করতো না। এ জন্যে কিছু দিন পরই সে খিলাফতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলো। এখন সমগ্র হিজাজ, ইরাক, মিসর এবং দক্ষিণ আরব ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর খিলাফত মেনে নিল। এমনকি সিরিয়ার বনু উমাইয়ার বিরোধীরাও তাঁকে খলিফা হিসেবে মেনে নিলেন। সে সময় ইবনে যোবায়ের (রাঃ) এক রাজনৈতিক ভুল করে বসলেন। তিনি মদীনা মুনাওয়ারাহ থেকে বনু উমাইয়ার অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরকেও জোরপূর্বক বের করে দিলেন। বহিষ্কৃতদের মধ্যে মারওয়ান ইবিনুল হাকাম এবং তার পুত্র আবদুল মালেকও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা দামেস্ক পৌঁছলো। সে সময় সেখানে বিশৃংখলা বিরাজ করছিলো। অবশেষে বনু উমাইয়ার সকল প্রভাবশালী ব্যক্তিরা জাবিয়াহ নামক স্থানে একত্রিত হয়ে মারওয়ানকে খলিফা নির্বাচিত করলো। মারওয়ান ১৩ হাজার উমাইয়া যোদ্ধাসহ "মরজে রাহেতের" দিকে অগ্রসর হলো। সেখানে জাহাক বিন কায়েস (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর সমর্থক বাহিনী তাবুতে অবস্থান করছিল। উভয় পক্ষের মধ্যে রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এ যুদ্ধে উমাইয়া বাহিনীই অগ্রগামী ছিল। এভাবে সমগ্র সিরিয়ার ওপর বনু উমাইয়ার কর্তৃত্ব বহাল হলো। মারওয়ান সাঈদ বিন আছের নেতৃত্বে একটি বাহিনী মিশর প্রেরণ করলো। ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর নিয়োগকৃত মিশরের গবর্ণর আবদুর রহমান বিন আহমদ আক্রমণে তিষ্ঠাতে না পেরে মিশর আমর বিন সাঈদের হাওয়ালা করে দিলো। এখন অবস্থা এ দাঁড়ালো যে, হিজাজ এবং ইরাক হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)-এর কবজায় রলো। অন্য দিকে সিরিয়া ও মিশরের ওপর মারওয়ানের রাজত্ব। মারওয়ান বেশী দিনের জন্য শাসন কাজ চালাতে পারলো না এবং সে ৬৫ হিজরীর রামাদান মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। তার পর তার পুত্র আবদুল মালিক ক্ষমতার মসনদে বসলো।

সে সময় জাসার অভিযানের (১৩ হিজরী) শহীদ সেনাপতি আবু ওবায়েদ ছাকাফীর (রঃ) পুত্র মুখতার ছাকাফী ইরাক দখলের জন্য তৎপরতা শুরু করে। সে হোসাইনের কিসাস বা বদলা গ্রহণের ঝাণ্ডা উড্ডীন করলো এবং কুফাকে আন্দোলনের কেন্দ্র বানালো। ইরাকে অবস্থানরত বনু উমাইয়া বিরোধীরা তার সাথে একত্রিত হলো। তারা ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে কুফার গবর্ণর আবদুল্লাহ বিন মতিকে জোরপূর্বক বের করে দিল। এভাবে কুফা এবং সে সাথে সমগ্র ইরাকের (বসরা ছাড়া) ওপর মুখতার বিন আবি ছাকাফীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হলো। এক্ষণে সে প্রতিশোধের তরবারী খাপ থেকে বের করলো এবং যারা কারবালার ঘটনায় অংশ নিয়েছিল অথবা বনু উমাইয়াকে সহযোগিতা করেছিল তাদেরকে বেছে বেছে হত্যা করলো। নিহতদের মধ্যে ছিল শামার জিল জওশান, হারমাল বিন কামিল, খাওলী বিন ইয়াযিদ, ওমর বিন সায়াদ, যিয়াদ বিন মালিক, আবদুল্লাহ বিন কায়েস এবং ওসমান বিন খালিদের মত ২০ জন। এরপর সে ইবরাহীম বিন মালিক আশতারের নেতৃত্বে একটি বাহিনী ওবায়েদ উল্লাহ বিন যিয়াদকে

উৎখাতের জন্য মোছাল প্রেরণ করলো। আরব এবং মোছালের মধ্যবর্তী স্থানে খাজির নদীর তীরে তার এবং ইবনে যিয়াদ বাহিনীর সংঘর্ষ হলো। ইবরাহীম বিন মালিক আশতার ইবনে যিয়াদকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত এবং স্বহস্তে হত্যা করলো।

মুখতার যদি আন্দোলনকে শুধুমাত্র হোসাইন (রাঃ)-এর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতো তাহলে ব্যাপারটি এক ধরনের হতো। কিন্তু একই সময় সে ইবনে যোবায়ের (রাঃ) এবং বনু উমাইয়া উভয়ের ক্ষমতার বিরুদ্ধে সশস্ত্র তৎপরতা শুরু করলো। সে নিজের বাজে ধ্যান-ধারণা এবং আকীদা-বিশ্বাসও মানুষের মধ্যে প্রচার করতে লাগলো। ইবনে যিয়াদকে পরাজিত করার পর বনু উমাইয়ার সাথে মুখতারের সরাসরি কোন সংঘর্ষ হয়নি। অবশ্য ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর সাথে তার দ্বন্দ্ব ক্রমেই বেড়ে চললো। ওদিকে ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর মনে সন্দেহ ঘনীভূত হলো। তিনি মনে করলেন যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এবং মুহাম্মাদ বিন হানফিয়াহ হয়তো তাকে সহযোগিতা করছেন। তিনি সতর্কতা হিসেবে উভয় বুজর্গকে নজরবন্দী করলেন। এ খবর পেয়ে মুখতার মক্কায় একটি বাহিনী প্রেরণ করে তাদেরকে নজর বন্দী থেকে মুক্ত করালেন। এরপর উভয় বুজর্গই মক্কা থেকে তায়েফ চলে গেলেন।

আযমীদের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে মুখতার ১৮ মাস যাবত বনু উমাইয়াহ এবং ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে সফল লড়াই চালালো। এ সময় সে কূফার আরবদের ওপর প্রচণ্ড নির্যাতন করলো। ফলে তারা তার বিরুদ্ধে চলে গেল এবং তাদের অনেক শরীফ ব্যক্তি কূফার স্থায়ী আবাস পরিত্যাগ করে বসরাহ চলে গেলেন। তখন হযরত আবদুল্লা বিন যোবায়ের (রাঃ)-এর ছোট ভাই মাসয়াব বিন যোবায়ের (রাঃ) বসরার গবর্নর ছিলেন। তাঁরা মাসয়াবকে কূফার ওপর হামলা চালানোর জন্যে অনুপ্রাণিত করলেন। মাসয়াব সমকালীন প্রখ্যাত জেনারেল মুহাল্লাব বিন আবি আফরাহকে বসরা ডেকে পাঠালেন। সে সময় সে খারেজীদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষরত এবং ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে পারস্যের গবর্নর ছিলেন। তিনি খারেজীদের সাথে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সন্ধি করে নিয়েছিলেন এবং এক শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে বসরাহ পৌঁছলেন।

এক্ষণে মাসয়াব বিন যোবায়ের (রাঃ) সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে কূফার দিকে অগ্রসর হলেন। মুখতারও মুকাবিলার জন্যে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। উভয় পক্ষের মধ্যে দু'তিনটি রক্তাক্ত সংঘর্ষে মুখতার পরাজিত হলো এবং অবশেষে কূফার রাজধানী ভবনে অবরুদ্ধ হয়ে বসে পড়লো। মাসয়াব এত কঠোর অবরোধ আরোপ করলেন যে, ৪০ দিন পর তাকে বাইরে বেরিয়ে আসতে হলো। সে সময় তার সাথে মাত্র ১৯ জন ছিল।

মুখতারসহ তারা সবাই মাসয়াব বাহিনীর সাথে লড়াই করতে করতে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। এমনিভাবে ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর এক বড় শত্রু শেষ হলো এবং ইরাকের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব বহাল হলো। মুখতার ইবনে যোবায়ের (রাঃ) এবং বনু উমাইয়াহ উভয়েরই শত্রু ছিল। তার হত্যার পর আবদুল মালিক এবং ইবনে যোবায়ের (রাঃ) পরস্পর মুখোমুখী হলো এবং উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল। সর্ব প্রথম আবদুল মালিক এক শক্তিশালী বাহিনীসহ কারকেসিয়ার দিকে অগ্রসর হলো। হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে যাফর বিন হারিস এখানকার গবর্ণর ছিলেন। যাফর অত্যন্ত বীরত্বের সাথে আবদুল মালিকের মুকাবিলা করলো। কিন্তু অবশেষে তিনি আবদুল মালিকের সাথে সন্ধি করে নিলেন এবং স্বীয় কন্যাকে তার পুত্র মুসায়লামার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন। এরপর আবদুল মালিক এক বিরাট বাহিনীসহ ইরাকের দিকে রওয়ানা হলো। তার ইরাক পৌঁছার পূর্বেই মাসয়াব বিন যোবায়ের (রাঃ) মুহাল্লাব বিন আবি সাফরাহকে পারস্য এবং আবদুল্লাহ বিন হাযেমকে খোরাসান প্রেরণ করেছিলেন। ফলে আবদুল মালিকের মুকাবিলার জন্য তাঁর নিকট খুব কম সৈন্যই ছিল। এ সত্ত্বেও তিনি হিম্মত হারা হলেন না এবং "দীরে জাসলিক" নামক স্থানে উমাইয়াহ বাহিনীর বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তি দিয়ে মুকাবিলা করলেন। আবদুল মালিক মাসয়াবের জীবনের নিরাপত্তা দানের প্রস্তাব পেশ করলো। কিন্তু তিনি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে নিহত হলেন। মাসয়াব হত্যার পর ইরাক আবদুল মালিকের পদানত হলো। অতপর সে মক্কা মুয়াজ্জামায় সৈন্য প্রেরণের প্রস্তুতি শুরু করলো। মুসতাদরাকে হাকিমে বর্ণিত আছে যে, একদিন সে বনু উমাইয়ার সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব এবং তার শুভাকাংখীদেরকে একত্রিত করলো এবং মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললোঃ "তোমাদের মধ্যে কে ইবনে যোবায়েরকে খতম করার দায়িত্ব নেবে?" আবদুল মালিকের এ প্রশ্নে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছাকাফী দাঁড়িয়ে বললোঃ

"আমীরুল মু'মিনিন! এ কাজের দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত করুন," আবদুল মালিক তিনবার প্রশ্নটি উচ্চারণ করলেন এবং তিনবারই হাজ্জাজ এ কাজের জন্য নিজেকে পেশ করলো। হাজ্জাজ আরো বললো যে, সে একটি ঢাল ছিন্ন করেছে বলে স্বপ্নে দেখেছে।

সর্বশেষে আবদুল মালিক এ অভিযানের দায়িত্ব হাজ্জাজের ওপর ন্যস্ত করলো এবং বর্তমানে মদীনাবাসীদের সাথে কোন বিবাদে জড়িয়ে না পড়ার জন্যে তাকে নির্দেশ দিলো। সেই সঙ্গে তায়েফ পৌঁছে অবস্থান গ্রহণ এবং সেখান থেকে ছোট ছোট বাহিনী মক্কার ওপর হামলার জন্যে প্রেরণের নির্দেশও তাকে দেয়া হলো। ফলে ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর শক্তি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়বে। এর পর যদি আরও সৈন্যের প্রয়োজন হয় তাহলে তাকে জানানোর কথা বলা হলো।

হাজ্জাজ এ সব নির্দেশ পালনের ওয়াদা করলো এবং তিন হাজার সৈন্যসহ তায়েফ পৌঁছে অবস্থান নিলো। ইবনে যোবায়ের (রাঃ) পরিস্থিতি অবগত হলেন এবং মক্কা মুয়াজ্জামা রক্ষার ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করলেন। হাজ্জাজ বাহিনী প্রায়ই মক্কার ওপর হামলার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর সমর্থকরা তাদেরকে ভাগিয়ে দিলো। এভাবে কয়েকমাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর হাজ্জাজ আবদুল মালিকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলো এবং সাথে সাথে মক্কা আবরোধের অনুমতি চাইলো। আবদুল মালিক তৎক্ষণাৎ পাঁচহাজার যোদ্ধার একটি বাহিনী হাজ্জাজের সাহায্যার্থে প্রেরণ করলো এবং তাকে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার অনুমতি দিল। সাহায্য পৌঁছতেই হাজ্জাজ অগ্রসর হয়ে মক্কা অবরোধ করলো এবং বুকাবিস পাহাড়ের ওপর কামান স্থাপন করে শহর ও হেরেম শরীফের ওপর পাথর এবং আগুনের গোলা নিক্ষেপ শুরু করলো। ৭২ হিজরীর (৬৯২ সালের ২৫ মার্চ) পহেলা জিলকদ এ অবরোধ শুরু হয়ে সাত মাসেরও কিছু অধিক সময় তা অব্যাহত থাকলে এ সময় মক্কা শহর এবং বাইতুল্লাহ শরীফ অব্যাহতভাবে পাথর ও আগুনের গোলার শিকার হলো। হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) অত্যন্ত ধৈর্য্য, স্থৈর্য এবং সাহসিকতার সাথে আবরোধের মুকাবিলা করলেন। পাথর এবং আগুনের গোলা বর্ষণের মধ্যেও তিনি অত্যন্ত ইতমিনান ও ধীর স্থিরভাবে কা'বা শরীফে নামাযয পড়তেন। কিন্তু এ সময় দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটলো। শহরে খাদ্যের অভাব দেখা দিল। ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর সঙ্গীরা অবরোধের কাঠোরতা এবং ক্ষুধায় কাতর হয়ে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করতে লাগলো। ইবনে আছির (রঃ) বর্ণনা করেছেন, দশ হাজার মানুষ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)-এর সঙ্গ পরিত্যাগ করে হাজ্জাজের আশ্রয়ে চলে গেল। তাদের মধ্যে ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর দু'পুত্র হামজাহ এবং খুবায়েবও ছিল। শুধু এক পুত্র যোবায়ের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তার সাথে ছিলেন।

এ সময় একদিন হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বৃদ্ধমাতা হযরত আসমার (রাঃ) খিদমতে হাজির হলেন। সে সময় হযরত আসমার বয়স একশ বছরেরও বেশী ছিল এবং তার দৃষ্টি শক্তি রহিত হয়ে গিয়েছিল। হযরত আবদুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেনঃ

"আম্মাজান! আপনি কেমন আছেন।"

হযরত আসমা (রাঃ) ঃ আমার অবস্থা আর কি জিজ্ঞেস করছো। দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে গেছে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) ঃ আম্মাজান! মৃত্যুতে প্রশান্তি আছে।

হযরত আসমা (রাঃ)ঃ পুত্র! আমি তোমার পরিণতি দেখে মরতে চাই। তুমি যদি শাহাদাত বরণ করো তাহলে নিজের হাতে তোমার কাফন দাফন করবো। আর যদি তুমি বিজয়ী হও তাহলে আমার অন্তর ঠাণ্ডা হবে।

এ কথা শুনে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হেসে দিলেন এবং প্রস্থান করলেন। দশ দিন পর তিনি শেষ সালামের জন্য তাঁর খিদমতে পুনরায় হাজির হলেন। সে সময় তিনি মসজিদে হারামে অবস্থান করছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) আরজ করলেনঃ "আম্মাজান! অবরোধের সাত মাস চলে গেল। আমার পুত্র যোবায়ের এবং হাতেগোনা কয়েকজন ছাড়া সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করে হাজ্জাজের নিকট চলে গেছে। সে আমাকেও নিরাপত্তা দিতে প্রস্তুত। আমি যা চাইব তাই দিতে আবদুল মালিকও ওয়াদা করেছে। বলুন! এ অবস্থায় আপনার কি নির্দেশ?

হযরত আসমা (রাঃ)ঃ পুত্র! তুমি নিজের ব্যাপার আমার চেয়ে ভালো বোঝো। যদি তুমি হকের ওপর থেকে থাকো তাহলে যাও। যে পথে তোমার সাথী-সঙ্গীরা জীবন কুরবাণী করেছে সে পথে তুমিও জীবন দান কর। আর যদি তুমি নাহক বা হক পরিপন্থী পথে লড়াই করে থাকো, তাহলে খুব খারাব কাজ করেছ। মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত করেছ। সাথীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছ এবং নিজেও হালাক হয়েছ।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) ঃ আম্মাজান! আমি হক এবং সত্যের জন্যে লড়াই করেছি এবং হক ও সত্যের জন্যে সাথীদের দিয়ে যুদ্ধ করিয়েছি। শুধুমাত্র পরিবর্তিত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে আপনার খিদমতে হাজির হয়েছি।

হযরত আসমা (রাঃ) ঃ যদি তুমি নিজেকে হকপন্থী মনে কর অথচ এখন সমর্থক না থাকার কারণে এবং পরিস্থিতি প্রতিকূল হওয়ার জন্যে দুশমনের সামনে নতি স্বীকার করতে চাও, তা কিন্তু ঠিক নয়। এটা শরীফ এবং দ্বীনদারদের নীতি নয়।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) ঃ আম্মাজান! আমি মৃত্যুকে ভয় করি না। শুধু এ ধারণাই করছি যে, মৃত্যুর পর দুশমন আমার দেহকে টুকরো টুকরো করে শুলে চড়াবে।

হযরত আসমা (রাঃ) ঃ পুত্র! বকরী জবেহ করার পর চামড়া ছাড়ানো হোক অথবা তার দেহ টুকরো টুকরো করা হোক তাতে কি পরওয়া? আল্লার ওপর ভরসা করে তুমি বের হও। মৃত্যুর ভয়ে গোলামীর জিল্লতী বা লাঞ্ছনা কবুল করো না। আল্লার কসম! ইজ্জতের মৃত্যু জিল্লতীর হুকুমাত থেকে উত্তম এবং হক পথে তরবারীর কিমা হওয়া পথভ্রষ্টদের গোলামীর চেয়ে হাজার গুণ শ্রেষ্ঠ।

জলিলুল কদর মাতার এ সাহসিকতাপূর্ণ কথা শুনে হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) ভাবাবেগে নিমজ্জিত হলেন। তিনি অগাধ ভালোবাসায় মায়ের মাথায় চুমু দিলেন এবং বললেনঃ "আম্মাজান! হক পথে বীরত্বপূর্ণ লড়াই করে জীবন দানের ইচ্ছাই আমার ছিল। কিন্তু আপনার মতও আমি নিতে চেয়েছি। যাতে আমার মৃত্যুর পর আপনি দুঃখ প্রকাশ না করেন। আলহামদুলিল্লাহ! আমি আপনাকে দৃঢ়চেতা পেয়েছি। আপনার

কথা আমার ঈমানকে শক্তিশালী এবং আস্থাকে আরো মজবুত করেছে। আমি আজ অবশ্যই কতল হয়ে যাবো। আমার বিশ্বাস, আমার নিহত হওয়ার পরও আপনি এমনি ধৈর্য্য ও শোকরের পথ অবলম্বন করবেন। আল্লাহর কসম! আমি কখনো খারাবকে পছন্দ করিনি। কোন মুসলমানের ওপর যুলুম করিনি। কোন ওয়াদা ভঙ্গ করিনি। আমানতের খেয়ানত করিনি। আমার কোন আমিল অহেতুক যুলুম করলে তা প্রতিরোধ করেছি। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ছাড়া আর আমার কোন উদ্দেশ্য নেই।"

অতপর তিনি আসমানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেনঃ "হে আল্লাহ! আমি এসব কথা ফখর করার উদ্দেশ্যে বলিনি। বরং নিজের মায়ের ইতমিনান এবং প্রশান্তির জন্যে বলেছি।"

হযরত আসমা (রাঃ) বললেন, যাও বেটা, আল্লাহর রাহে জীবন দান কর। ইনশাল্লাহ আমি ছাবির এবং শাকির থাকবো। একটু এগিয়ে এসো। শেষ বারের মত তোমাকে একটু আদর করি।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) সামনে অগ্রসর হলেন এবং হযরত আসমা (রাঃ) তাকে গলায় মিলালেন। তাঁর হাত হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর জিরার ওপর পড়লে জিজ্ঞেস করলেন, বেটা! তোমার শরীরের ওপর এটা কি? ইবনে যোবায়ের (রাঃ) ঃ আম্মাজান! এটা জিরা। দুশমনের তরবারী এবং হামলা থেকে পরিত্রাণের জন্যে এটা ব্যবহার করি।

হযরত আসমা (রাঃ) ঃ বেটা! আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার জন্যে বের হও। আর এসব ভঙ্গুর বস্তুর সাহায্য নাও।

ইবনে যোবায়ের (রাঃ) তৎক্ষাণাৎ জিরা খুলে ফেললেন এবং শিরস্ত্রাণ খুলে নিক্ষেপ করলেন। অতপর সাধারণ পোশাক পরিধান করে মাথায় সাদা রুমাল বেঁধে নিলেন। মাকে ব্যাপারটি জানালে তিনি বললেন, আমি এখন আনন্দিত। যাও, আল্লাহর রাস্তায় লড়াই কর এবং তার নিকট এ পোশাকেই গমন কর।

মা'র নিকট থেকে বিদায় হয়ে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) কামিসের কোণা উঠিয়ে কোমরের সাথে বেঁধে নিলেন। দু' আস্তিন উঠিয়ে দু'হাতে তরবারী ধরে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পৌঁছলেন। এ সময় হাতে গোনা কয়েকজন ফিদাকার তাঁর সাথে ছিলেন। পুত্র যোবায়ের একপাশে এবং ইবনে সাফওয়ান অন্য পাশে তাঁর সহগামী ছিলো। ইবনে যোবায়ের (রাঃ) এবং তাঁর সাথীরা যেদিকে অগ্রসর হতেন সিরীয় সৈন্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত। ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর বয়স সে সময় ৭২ বছর হলেও বীরত্বের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন নজিরবিহীন। দু'হাতে তরবারী চালিয়ে শত্রু ব্যূহের অনেক অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। অতপর ফিরে আবার সাথীদের সাথে এসে মিলিত হলেন। একে একে সাথীরা শহীদ হয়ে

গেলে তাঁকে একজন বললো, আপনি অনুমতি দিলে আমি কা'বার দরজা খুলে দিতে পারি, যাতে আপনি সেখানে প্রবেশ করে দুশমনের হাত থেকে রক্ষা পান। সে সময় ইবনে যোবায়র (রাঃ)-এর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছিলঃ "আমি লাঞ্ছনা বা জিল্লতী স্বীকার করে জীবন বাঁচাতে চাই না এবং মৃত্যুর ভয়ে সিঁড়িতে চড়নেওয়ালা নই। আমি এমন তীর ভালোবাসি যা বিচ্ছিন্ন হয় না এবং মৃত্যুর সাক্ষাৎ প্রার্থী কোন দিকে চাইতে পারে।"

এরপর তিনি বাঘের মত সিরীয়দের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং জোহর নামায পর্যন্ত অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলেন। ইত্যবসরে তিনি কয়েকটি আঘাত পান। কিন্তু সাহসে মোটেই ভাটা পড়েনি। এক সময় জনৈক কৃষ্ণকায় ব্যক্তি গালি দিলে তিনি আগুয়ান হয়ে এমনভাবে তরবারী চালালেন যে, তার দেহ দু'টুকরো হয়ে গেল। অবশেষে জনৈক সিরীয় তাঁর মাথার ওপর পাথর মারলো। ফলে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হলেন। মাথা দিয়ে ফিনকি মেরে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগলো।

প্রচণ্ড রক্তক্ষরণের ফলে তিনি খুব দুর্বল হয়ে পড়লেন। এ অবস্থায় সিরিয়রা হল্লা করে তাঁর ওপর তরবারীর আঘাত বর্ষণ করলো। এভাবে রাসূল (সাঃ)-এর সহচর এবং জাতুন নাতাকাইনের দৃষ্টি রশ্মি এবং সমকালীন শ্রেষ্ঠতম বাহাদুর শহীদ হয়ে মাটিতে ঢলে পড়লেন। সিরীয়রা কালবিলম্ব না করে তার মাথা কেটে নিল।

হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর শাহাদাতের খবর হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে অবহিত করা হলে সে খুব খুশী হলো। সে তার মাথা দামেস্কে আবদুল মালিকের নিকট প্রেরণ করলো এবং লাশ এক উঁচু স্থানে শুলে চড়িয়ে দিলো। হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি খুব দুঃখিত হলেন এবং লাশকে উদ্দেশ করে তিনবার এ বাক্য উচ্চারণ করলেনঃ "আবু খুবায়েব! আসসালামু আলাইকা। আল্লাহর কসম, তুমি বড় নামাযি এবং রোযাদার মানুষ ছিলে। এটা ভিন্ন কথা যে, তুমি দুনিয়াকে তার মর্যাদা থেকে বেশী সম্মান দিয়েছ। প্রকৃতপক্ষে দুনিয়া এত সম্মানের যোগ্য ছিল না। যে জামায়াতের সদস্য তুমি ছিলে সে জামায়াত অত্যন্ত মর্যাদাবান জামায়াত ছিল।"

শাহাদাতের তৃতীয় দিনে হযরত আসমা (রাঃ) হাজুনে তাশরীফ নিলেন। সেখানে ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর লাশ লটকানো ছিল। ঘটনাক্রমে সে সময় হাজ্জাজও সেখানে উপস্থিত ছিলো। হযরত আসমা (রাঃ)-কে বলা হলো যে, হাজ্জাজ তাঁর নিকট দণ্ডায়মান রয়েছে। তিনি তাকে সম্বোধন করে বললেনঃ "এ সওয়ারের অবতরণের সময় কি এখনো আসেনি?"

হাজ্জাজঃ সে বিপথগামী ছিল। প্রাপ্য শাস্তি সে পেয়েছে।

হযরত আসমা (রাঃ) ঃ আল্লাহর কসম! সে বিপথগামী বা অবিশ্বাসী ছিল না। রোযা রাখতো। নামায পড়তো এবং পরহেজগার ছিল।

হাজ্জাজঃ বড় বিবি! এখান থেকে চলে যাও। তোমার জ্ঞান লোপ পেয়েছে।

হযরত আসমা (রাঃ) ঃ আমার জ্ঞান লোপ পায়নি। আল্লার কসম! আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে শুনেছি যে, বনু ছাকিফে এক কাজ্জাব বা মিথ্যুক এবং এক হন্তা জন্ম নেবে। যাই হোক, কাজ্জাবকে (অর্থাৎ মুখতার ছাকাফী) আমরা দেখেছি আর হন্তা হলে তুমি।

অন্য এক রাওয়াতে আছে যে, হাজ্জাজ যখন শুনলো যে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) ইবনে যোবায়েরের (রাঃ) প্রশংসা করেছে তখন সে তার লাশ শুল থেকে নামিয়ে ইহুদীদের কবরস্তানে নিক্ষেপ করেছিল এবং হযরত আসমা (রাঃ)-কে ডেকে পাঠিয়েছিল। তিনি আসতে অস্বীকৃতি জানালেন। এতে হাজ্জাজ অগ্নিশর্মা হয়ে পুনরায় তাঁকে অবিলম্বে চলে আসার কথা বললো। নচেত চুলের ঝুটি ধরে মাটিতে টেনে নেয়ার হুমকি দিল। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে জবাব দিলেন, আল্লাহর কসম! সে সময় পর্যন্ত আমি আসবো না, যতক্ষণ আমার চুলের ঝুটি ধরে মাটিতে টানা না হয়। এ জবাব শুনে হাজ্জাজ স্বয়ং তাঁর নিকট গেলো এবং বললোঃ "সত্যকথা বলতে কি আল্লাহর শত্রুর কি পরিণতি হয়েছে।"

হযরত আসমা (রাঃ) বললেনঃ "হ্যাঁ, তুমি তার দুনিয়া খারাব করেছ। কিন্তু সে তোমার আখিরাত বরবাদ করে দিয়েছে। বিদ্রূপ করে তুমি আমার পুত্রকে ইবনে জাতুন নাতাকাইন বলতে। আল্লাহর কসম! আমিই জাতুন নাতাকাইন। এ সম্মানিত উপাধি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে সে সময় দিয়েছিলেন যখন আমি (হিজরতের সময়) তাঁর খাবার পিঁপড়া থেকে রক্ষার জন্যে নিজের নাতাক দিয়ে ঢেকেছিলাম। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, বনি ছাকিফে একজন কাজ্জাব এবং একজন যালেম হবে। কাজ্জাবকে তো আমরা দেখেছি। আর যালেম হলে তুমি।"

হযরত আসমা (রাঃ)-এর এ স্পষ্টবাদিতায় হাজ্জাজ চুপে চুপে চলে গিয়েছিল।

আর এক রাওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, কোন মাধ্যমে আবদুল মালিক খবর পেলো যে হাজ্জাজ ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর লাশ হযরত আসমা (রাঃ)-এর নিকট হস্তান্তর করেনি। সে তার লাশ হযরত আসমা (রাঃ)-এর নিকট অবিলম্বে হস্তান্তরের নির্দেশ

দিলো। সুতরাং হাজ্জাজ হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর লাশ তাঁর শোকাতুর মায়ের কাছে সোপর্দ করলো। তিনি তাঁকে গোসল দিয়ে হাজুনে দাফন করলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর শাহাদাতের সামান্য কিছু দিন পরই তাঁর জলিলুলকদর মাতা হযরত আসমা (রাঃ) ইন্তেকাল করেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) সে সব সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত যারা জ্ঞান ও ফযিলতের দিক দিয়ে উচ্চতর আসনে সমাসীন। যদিও তিনি রাসূল (সাঃ)-এর ফায়েজে অবগাহিত হওয়ার বেশী সুযোগ পাননি, তবুও হযরত যোবায়ের (রাঃ) ইবনুল আওয়াম (পিতা), হযরত আসমা (রাঃ) বিনতে আবু বকর সিদ্দিক (মাতা), হযরত আবু বকর সিদ্দিক (নানা) এবং উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ-এর (খালা) মত বিরাট মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের ছায়ায় লালিত-পালিত হয়েছিলেন। এ জন্যে তিনি দ্বীনি এলমে সমুদ্রের মত গভীরতা অর্জন করেছিলেন।

ইসলামের সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস হলো কুরআনে হাকিম। হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) কুরআনে হাকিমের বিরাট আলেম এবং ক্বারী ছিলেন। তিনি কখনো কখনো কুরআনে হাকিমের তাফসির করতেন। বস্তুতঃ তার থেকে কতিপয় আয়াতের তাফসির সহিহ বুখারীতে বর্ণিত আছে। কুরআনের কিরআতে তার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) তার কিরআতের অনুরাগী ছিলেন এবং তাকে "ক্বারীউ লিল কুরআন" বলে অভিহিত করতেন। হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রাঃ) ৩০ হিজরীতে কুরআনে হাকিম নকল করার দায়িত্ব যেসব সাহাবীর ওপর ন্যস্ত করেছিলেন তাদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)-ও একজন ছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) থেকে ৩৩টি হাদীস বর্ণিত আছে। তার মধ্যে দুটিতে ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম ঐকমত্য পোষণ করেন। ছয়টি বুখারী এবং দু'টিতে মুসলিম ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন। বর্ণিত হাদীসের বেশীরভাগই স্বয়ং রাসূল (সাঃ)-এর নিকট থেকে গৃহীত। হুজুর (সাঃ) ছাড়াও তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), হযরত ওমর ফারুক (রাঃ), হযরত ওসমান গনি (রাঃ), হযরত আলী কারামাল্লাহু ওয়াজহাহু, উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) এবং হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিত আনসারী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার শাগরিদদের মধ্যে হযরত উরওয়াহ বিন যোবায়ের (রাঃ), তাউস (রঃ), আতা বিন আবি রাবাহ (রঃ), ইবনে আবু মালিকাহ (রঃ), ছাবিত বিন আসলাম বানানি (রঃ), মুহাম্মদ বিন মুনকাদ (রঃ), উবাদ (রঃ), হিশাম (রঃ), আবুসা আছা (রঃ) এবং আবুজ জরিয়ানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাফাককুহ ফিদ্দীনের দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) মদীনার ফকিহ সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। তিনি জনগণকে মাসলা-মাসায়েল বলতেন এবং তাদেরকে সুন্নাতের ওপর চলার পরামর্শ ও নির্দেশ দিতেন। নিজের ফযিলত ও কামালিয়াত সত্ত্বেও তিনি সমকালীন বুজর্গদের নিকট থেকে দ্বীনি এবং ইলমী বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে লজ্জা অনুভব করতেন না। যে বিষয়ে জানতেন না নির্দ্বিধায় তাদের কাছ থেকে তিনি তা জিজ্ঞেস করে নিতেন। তাদের মত সঠিক মনে করলে তার ওপরই আমল করতেন।

মুসতাদরাকে হাকিমে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) আরবী ছাড়া অন্য আরো কয়েকটি ভাষাতেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তার নিকট বিভিন্ন জাতি ও বংশের অনেক গোলাম থাকতো এবং তাদের ভাষাও ছিল বিভিন্ন ধরনের। ইবনে যোবায়ের (রাঃ) সবার সাথে তাদের মাতৃভাষায় কথা বলতেন। কতিপয় ঐতিহাসিক বলেছেন, হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) সাতটি বিদেশী ভাষার ওপর দখল রাখতেন।

হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) একজন বাগ্মী ছিলেন। ফাসাহাত এবং বালাগাতের দিক দিয়ে তাঁর ভাষণ ছিল অত্যন্ত উঁচু স্তরের। কতিপয় রাওয়ায়েতে আছে যে কাব্যেও তার প্রভুত দখল ছিল।

হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)-এর আখলাক বা চরিত্র খনি মনিমুক্তায় পরিপূর্ণ ছিল। ইবাদাত, সাধনা, হক কথন, ধৈর্য ও স্থৈর্য, সুন্নাতের পাবন্দী এবং বাহাদুরীর মত বিশেষ গুণাবলী তাঁকে বিভূষিত করেছিল।

আল্লাহর ইবাদাতে তিনি নিবেদিত চিত্ত ছিলেন। প্রায়ই সারা রাত জেগে নামায পড়তেন এবং দিনে রোযা রাখতেন। ইবাদাতের শওক এবং মসজিদের সাথে গভীর সম্পর্কের কারণে তিনি "হামামাতুল মাসজিদ" উপাধিতে মশহুর হয়েছিলেন। নামাযে এত নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন যে, দাঁড়ানো অবস্থায় তাকে প্রাণহীন খুঁটি বা স্তম্ভের মত মনে হতো। সিজদারত অবস্থায় এমন মনে হতো যে কাপড়ের পুঁটুলী পড়ে রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের পাখী এবং কবুতর মাথা, কাঁধ এবং পিঠের ওপর এসে বসতো। কিন্তু তিনি তার কোন খবরই রাখতেন না। অনেক সময় রুকূ এবং সিজদাতেই সারা রাত কাটিয়ে দিতেন। ইবনে আছির (রঃ) বর্ণনা করেছেন, লোকেরা কয়েকবার পুরো সূরায়ে বাকারাহ শেষ করতো কিন্তু ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর রুকূ'ই শেষ হতো না। একবার ঘরের মধ্যে নামায আদায় করছিলেন। পাশেই তার একটি ছোট শিশু ঘুমুছিলো। বাড়ীর ছাদ থেকে আচমকা একটি সাপ শিশুর ওপর পড়লো। বাড়ীর সবাই শিশুকে বাঁচানোর জন্য দৌড়াদৌড়ি এবং চেঁচামেচি শুরু করলো। কিন্তু ইবনে যোবায়ের (রাঃ) ঘটনাটির খবরই

রাখলেন না। তিনি নিবিষ্টচিত্তে নামাযে মশগুল রলেন। নামায শেষ হলে তিনি ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হলেন।

হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) কঠিন থেকে কঠিনতম সময়েও নামাযে একাগ্রতা কায়েম রাখতেন। মক্কা অবরোধের সময় তার চারপাশে বৃষ্টির মত পাথর বর্ষণ হচ্ছিল। কিন্তু তিনি অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্ততা, একাগ্রতা এবং ইতমিনানের সাথে নামাযে মশগুল রলেন। একবার কামানের এক পাথর মসজিদে হারামের গম্বুজে এসে লাগলো এবং এক কোণা ধসে পড়লো। হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) পাশেই নামায পড়ছিলেন। তিনি সেদিকে ভ্রুক্ষেপই করলেন না এবং তার চেহারায় কোন ধরনের প্রভাবই পরিলক্ষিত হলো না।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলতেন, তোমরা যদি রাসূল (সাঃ)–এর নামায দেখতে চাও তাহলে ইবনে যোবায়ের (রাঃ)–এর নামায দেখো।

হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) জীবনে বহুবার হজ্ব করেছেন। এক রাওয়ায়েতে আছে যে, জ্ঞান হওয়ার পর থেকে তিনি কোন বছর হজ্ব বাদ দেননি। অন্য রাওয়ায়েতসমূহে বলা হয়েছে যে, তিনি মোট আটবার হজ্ব করেছেন। একবার কা'বা শরীফে বন্যার পানি জমা হয়েছিল। হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) কয়েক ফুট পানিতে সাঁতার কেটে তাওয়াফ করেছিলেন।

হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) অত্যন্ত স্পষ্টবাদী ছিলেন। অন্তরে যা থাকতো মুখেও তাই উচ্চারণ করতেন এবং কোন মুলাহাযার কারণে তা বলতেন না। হযরত আমীর মাবিয়া (রাঃ) খুব শক্তিশালী শাসক ছিলেন। কিন্তু হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) তার সামনেই ইয়াযিদকে উত্তরাধিকার নিয়োগের প্রতিবাদ করলেন এবং কোনক্রমেই তাকে মেনে নিতে রাজী হলেন না।

খারেজীদের এক শক্তিশালী দল কতিপয় শর্তে তাকে সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছিল। সময়টি ছিল অত্যন্ত নাজুক এবং তার সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তিনি খারেজীদের শর্ত মানতে পরিষ্কার অস্বীকার করেন এবং আকীদা বিশ্বাস থেকে সরে দাঁড়াতে প্রস্তুত নন বলেও জানিয়ে দেন।

হাছিন বিন নুমায়ের তাকে সিরিয়া গমনের দাওয়াত দেন এবং সাহায্যের ওয়াদা করেন। বিগত কয়েক মাস সিরীয়বাসীরা যে রক্তাক্ত কাণ্ড ঘটিয়েছিল তা ক্ষমা করার শর্তও সে আরোপ করেছিল। কিন্তু তিনি তাদের এ রক্তাক্ত কাণ্ড ক্ষমা করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। হাছিনকে পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে, তিনি প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়বেন।

ইবনে যোবায়ের (রাঃ) প্রায় ১২ বছর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় একদিনের জন্যও শান্তির সাথে তিনি বসতে পারেননি। বনু উমাইয়াহ, মুখতার ছাকাফী, খারেজী এবং অন্যান্য বিরোধীরা তাকে খুব পেরেশান করেছিল। কিন্তু তিনি অত্যন্ত নাজুক অবস্থাতেও হিম্মতহারা হননি এবং অত্যন্ত ধৈর্য ও স্থৈর্যের সাথে প্রতিটি তুফানের মুকাবিলা করেছেন। মক্কা অবরোধের শেষ দিকে যখন সাফল্যের কোন আশা ছিল না তখনও তিনি নিজের ভূমিকায় অটল ছিলেন।

সুন্নাতের অনুসরণকারী হিসেবে তিনি ছিলেন নজীরবিহীন। প্রতিটি কাজে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর আদর্শকে সামনে রাখতেন এবং লোকদেরকেও এমনিভাবে কাজ করার উপদেশ দিতেন। নিজের শাসনকালে শরীয়াতের হুকুম-আহকাম জারীর প্রশ্নে তিনি শক্তি প্রয়োগ করতেও দ্বিধা করেননি। হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর বাহাদুরী বন্ধু ও শত্রু উভয়ের নিকটই ছিল স্বীকৃত। তিনি আরবের অন্যতম বাহাদুর ছিলেন। একবার এক ব্যক্তি মুহাল্লাব বিন আবি ছাফরাহকে জিজ্ঞেস করলো, আজকাল কাদেরকে আরবের বাহাদুর বলা যেতে পারে?

মুহাল্লাব জবাব দিলেনঃ "মুসায়েব বিন যোবায়ের (রাঃ), ওমর বিন ওবায়দুল্লাহ এবং উবাদ বিন হাছিন।"

প্রশ্নকারী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "এবং আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের?" মুহাল্লাব জবাব দিল, "সে তো জ্বীন, আমিতো সাধারণ মানুষের কথা বলছি।"

মুহাল্লাব বিন আবি ছাফরাহ প্রথম যুগের মহান মুসলমান জেনারেলদের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। বাহাদুরীর ব্যাপারে তিনি যতখানি অবহিত ছিলেন অন্য কেউ তা কমই জানতেন। তাঁর নিকট ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর বাহাদুরী ছিল অসাধারণ। তাঁর মত বাহাদুরী কোন জ্বিনের নিকট থেকেই আশা করা যায়।

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রঃ) "তারিখুল খুলাফা" গ্রন্থে লিখেছেন, ইবনে যোবায়ের (রাঃ) কুরাইশদের মধ্যে মশহুর অশ্বারোহী ছিলেন এবং তাঁর বাহাদুরীর কথা সবার মুখে মুখে ফিরতো।

হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) মাতা-পিতার সীমাহীন খিদমত গুজার ছিলেন এবং তাদের আনুগত্য নিজের ঈমানের অংশ মনে করতেন। উহুদের যুদ্ধে হযরত যোবায়ের (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে ওসিয়ত করলেন যে, আমি যদি মারা যাই তাহলে আমার ওপর যে ঋণের বোঝা রয়েছে তা আদায়ের দায়িত্ব হবে তোমার।

হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) সম্মানিত পিতার ওসিয়ত অনুসারে তাঁর ঋণের পাই পাই আদায় করে দিয়েছিলেন এবং সতর্কতা বশতঃ পর পর চার বছর হজ্বের সময় ঘোষণা করতেন যে, কেউ যদি তার মরহুম পিতাকে ঋণ দিয়ে থাকে তাহলে তার নিকট থেকে তা ওসুল করতে পারে। যখন তার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হলো যে, এখন আর কোন ঋণদাতা বাকী নেই তখন পিতার মিরাছ বা সম্পদ সকল ওয়ারেসের মধ্যে শরীয়তের হুকুম অনুসারে বন্টন করে দিলেন। মাতা দীর্ঘজীবি হয়েছিলেন। তাঁকে সবসময় নিজের কাছে রেখেছিলেন এবং জানপ্রাণ দিয়ে খিদমত করতেন। উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) তাঁর খালা ছিলেন। তিনি তাঁকে খুব ভালবাসতেন। তাঁর নামানুসারে তিনি নিজের কুনিয়ত রেখেছিলেন উম্মে আবু আবদুল্লাহ। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) তাঁকে সীমাহীন সম্মান প্রদর্শন এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা করতেন। উম্মুল মু'মিনিন অত্যন্ত দানশীলা এবং প্রশস্ত মনের মানুষ ছিলেন। ইবনে যোবায়ের (রাঃ) তাঁকে যা কিছু দিতেন অবিলম্বে তিনি তা আল্লাহর পথে খরচ করে দিতেন। একবার ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বলে ফেললেন যে, খালাজান যদি হাত না গুটান তাহলে ভবিষ্যতে আর আমি সাহায্য করবো না। উম্মুল মু'মিনিন এ কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং অসন্তুষ্ট হয়ে আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর সাথে আর কথা না বলার কসম খেলেন। দীর্ঘদিন এ অবস্থা চললো। ফলে ইবনে যোবায়ের (রাঃ) ঘাবড়ে গেলেন। হযরত মিসওয়ার বিন মাখরামাহ (রাঃ) এবং আবদুর রহমান বিন আসওয়াদের মাধ্যমে শ্রদ্ধেয় খালার খিদমতে হাজির হয়ে গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। কিন্তু উম্মুল মু'মিনিন চুপ মেরে রলেন। এতে হযরত মিসওয়ার (রাঃ) ও আবদুর রহমান রাসূল (সাঃ)-এর হাদীস বর্ণনা করলেন যে, এক মুসলমান অন্য মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশী কথা না বলা জায়েয নয়। উম্মুল মু'মিনিন রোরুদ্যমান হয়ে বললেন, আমি আবদুল্লাহর সাথে কথা না বলার জন্য কসম খেয়েছি এবং কসম ভাঙ্গাও জায়েয নয়। কিন্তু তারা দু'জন বারবার পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। অবশেষে উম্মুল মু'মিনিন ভাগিনার সাথে কথা বলতে রাজী হলেন এবং কসম ভাঙ্গার কাফফারা স্বরূপ ৪০টি গোলাম আজাদ করে দিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) পিতার অনেক ধন-সম্পদ পেয়েছিলেন। নিজেও বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ নিয়ে প্রচুর গনিমতের মাল হাছিল করেছিলেন। এ জন্যে জীবিকার প্রশ্নে মুখাপেক্ষীহীন ছিলেন। ধনী হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত ব্যয় সংকোচন করেতন। কিন্তু যখন বৈধ প্রয়োজন হতো তখন দরাজ হাতে অর্থ ব্যয় করতেন। উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) তো তাঁর খালা ছিলেন। তিনি অন্যান্য উম্মুল মু'মিনিনকেও আর্থিক সাহায্য দিতে দ্বিধা করতেন না। কা'বার সংস্কার কাজেও তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। বস্তুতঃ মুত্তাকী হওয়ার কারণে দানশীল বলা পছন্দ করতেন না। প্রকৃত

হাজতমন্দ হিসেবে কারোর ওপর আস্থা এলেই তাকে সাহায্য করতেন। অবশ্য মাতা হযরত আসমা (রাঃ) এবং খালা হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)-এর মাধ্যমে প্রচুর অর্থ আল্লাহর রাস্তায় বন্টন করতেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)-এর স্ত্রী ও পুত্রের সঠিক সংখ্যা বর্ণনা করা খুব কঠিন ব্যাপার। কেননা এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ রয়েছে। "খাওলাহ বিনতে মনজুর কাজারিয়াহ" নামক এক স্ত্রীর কথা কতিপয় রাওয়ায়েতে বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায়। এমনিভাবে কতিপয় ঐতিহাসিক খুবায়েব, উবাদ, হামজাহ এবং যোবায়েরের নাম পুত্র হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। আকার আকৃতিতে হযরত আবুদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) জলিলুল কদর নানা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর সাথে অনেকাংশেই সাদৃশ্য রাখতেন। কতিপয় প্রখ্যাত চরিতকার লিখেছেন যে, তাঁর মুখমণ্ডলে কোন চুল ছিল না। অবশ্য তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী গাম্ভীর্য মণ্ডিত ছিলেন। দু'হাতে দু'টি তরবারী ধরে অবলীলাক্রমে চালাতে পারতেন। নামকরা অশ্বারোহী এবং যুদ্ধবিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)-এর খিলাফতকাল অত্যন্ত ঘনঘটাপূর্ণ ছিল। সমস্যা সংকুল হওয়া সত্ত্বেও শাসনাধীন এলাকাসমূহে তিনি কুরআন-সুন্নাহর হুকুম-আহকাম জারীর সম্ভাব্য সবরকম প্রচেষ্টা চালান। তিনি লোকদেরকে খেলতামাশার মশগুল হওয়া থেকে কঠোর ভাবে বিরত রাখতেন এবং রাসূল (সাঃ)-এর এ হাদীসের ওপর আমল করতেনঃ "কোন ব্যক্তি যদি শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ দেখে তাহলে সে যেন তা শক্তি প্রয়োগ করে নির্মূল করে।"

তিনি তাঁর খিলাফতকালে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, কোন ব্যক্তিকে শতরঞ্জ খেলা অবস্থায় পাওয়া গেলে আল্লার কসম আমি তার চুল কেটে দেব এবং দুররাহ মারবো। এ ধরনের অপরাধীকে যে আটক করবে তাকে অপরাধীর শরীরের সকল সরঞ্জাম বাজেয়াফত করে দিয়ে দেয়া হবে।

ইবনে যোবায়ের (রাঃ) শাসন ও বিচার বিভাগকে পৃথক রেখেছিলেন। সব সময় কাজীরা যেন আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাহর ভিত্তিতে ফায়সালা করেন এবং বিচারে যেন পক্ষপাতিত্ব না হয়-এ নির্দেশ তিনি দিয়ে রেখেছিলেন।

ইবনে যুবায়ের (রাঃ) গবর্ণর মনোনয়নে সব সময় তাকওয়া এবং দ্বীনদারীর প্রশ্নটি খেয়াল রাখতেন। তাঁর কতিপয় গবর্ণর হলেনঃ হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন ইয়াযিদ খাতমী (মক্কা মুয়াজ্জামা — সংক্ষিপ্তকালের জন্য), হযরত নুমান (রাঃ) বিন বাশির (রাঃ)

(হেমস), আবদুল্লাহ বিন মতি (কুফা), মুহাল্লাব বিন আবি ছাফারাহ (খোরাসান), আবদুর রহমান বিন হাজদাম (মিশর) এবং মাছরাব বিন যোবায়ের (বসরাহ)।

ইবনে যুবায়ের (রাঃ) গবর্ণরদের প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখতেন। কোন গবর্ণরের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ পাওয়ার সাথে সাথে তিনি তার তাহকিক করতেন। অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে অভিযোগের ধরন হিসেবে বিধান করতেন। একবার তিনি নিজের পুত্র হামজাহকে বসরার গবর্ণর নিয়োগ করে পাঠালেন। সে বসরার শরীফদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করলো। হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) এ খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ হামজাহকে বসরার ইমারতি থেকে বরখাস্ত করলেন। একবার মদীনার গবর্ণর জাবের বিন আসওয়াদ জলিলুল কদর তাবেয়ী হযরত সায়ীদ (রাঃ) বিন মুসাইয়িবকে বেত্রাঘাত করলো। অপরাধ ছিল তিনি ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর বাইয়াত করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। ইবনে যোবায়ের এ ঘটনার খবর পেয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং ক্রোধ মিশ্রত একটি চিঠি জাবেরকে লিখলেন। তিনি চিঠিতে বাড়াবাড়ির জন্যে তাকে গালি দিলেন এবং সায়ীদ (রাঃ)-এর সাথে কোন বাদানুবাদ না করার নির্দেশ দিলেন।

হযরত ইবনে যুবায়ের (রাঃ) ইসলামের ইতিহাসের সর্বপ্রথম গোলাকৃতির মুদ্রা (দিরহাম) তৈরী করেন। মুদ্রার একদিকে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লিপিবদ্ধ ছিল এবং অন্য দিকে ছিল আমারাল্লাহ বিন ওফায়ি ওয়াল আদালি'-এ বাক্য।

হযরত ইবনে যুবায়ের (রাঃ)-এর নিকট পদাতিক বাহিনী ছাড়াও নৌবাহিনীও ছিল। কিন্তু তিনি নৌবাহিনী সুসংগঠিত করার ব্যাপারে নজর দিতে পারেন নি। মাছয়াব বিন যোবায়ের (রাঃ) নিহত হওয়ার পর তাঁর নৌবাহিনীর শক্তিও খুব কম হয়ে যায়।

হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ)-এর চরিত্র এবং কাজের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে জানা যাবে যে, তিনি কখনো কোন জোর তোড় এবং ষড়যন্ত্রে অংশ নেননি। রাষ্ট্রীয় পদসমূহকে তিনি রাজনৈতিক ঘুষ হিসেবেও ব্যবহার করেননি। তাঁর খিলাফতকালে কয়েকবার এমন সুযোগও এসেছিল যে, তিনি চাইলে রাজনৈতিক জোরাতাশির মাধ্যমে শত্রুদেরকে কাবু করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সব সময় জাহের ও বাতেনকে একই ধরনের রেখেছিলেন এবং কখনো চালবাজীর মাধ্যমে কোন কাজ করেননি। হক মনে করে প্রথম দিন যে মনোভাব বা ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন আমৃত্যু সে ভূমিকার প্রতিই অটল ছিলেন। কোন লোভ-লালসা তাকে নিজের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি এবং শত্রুর প্রচণ্ড শক্তিও তাঁকে করতে পারেনি অবদমিত। অত্যন্ত বিপদসংকুল অবস্থাতেও তিনি নিজের সাহস উজ্জীবিত রেখেছিলেন। মাথা কাটিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু শত্রুর সামনে অবনত

হওয়াকে সহ্য করেননি। যদি তিনি রাজনৈতিক ভাগ্যান্বেষীদের মত যোগসাজশ করতেন অথবা মক্কা মুয়াজ্জামা থেকে বের হয়ে যেতেন তাহলে সম্ভবতঃ আজ ইসলামের ইতিহাস ভিন্নভাবে লিখা হতো। কিন্তু তিনি নিজের ব্যক্তিত্বকে ধোঁকাবাজীর আবরণে ঢাকা দেননি এবং হেরেম শরীফ থেকেও বিচ্ছিন্ন হননি। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কতিপয় ব্যাপারে হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর কর্মপদ্ধতির সাথে দ্বিমত পোষণ করা যায়। তবে, এ হাকীকত বা তাৎপর্যও অস্বীকার করা যায় না যে, তিনি প্রথম যুগের এক বিরাট ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

হযরত মুগিরাহ (রাঃ) বিন হারিছ হাশেমী

নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্বে যেসব ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)-এর বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, মুগিরাহ (রাঃ) বিন হারিছ ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। ইতিহাসে তিনি আবু সুফিয়ান পদবীতে মশহুর হয়ে আছেন। তিনি হুযুর (সাঃ)-এর চাচাতো এবং দুধ ভাইও ছিলেন। কেননা উভয়েই হযরত হালিমা সাদিয়া (রাঃ)-এর দুধ পান করেছিলেন। হযরত আবু সুফিয়ান মুগিরাহ (রাঃ)-এর বংশনামা হলোঃ মুগিরাহ বিন হারিছ বিন আবদুল মুত্তালিব বিন হাশিম বিন আবদে মান্নাফ বিন কুসাই।

মাতার নাম ছিল গাযনাহ (অন্য রাওয়ায়েত অনুযায়ী গাযিয়াহ)। তাঁর সম্পর্ক ছিল বনু ফাহর গোত্রের সাথে। তাঁর নসবনামা হলোঃ গাযনাহ (গাযিয়াহ) বিনতে কায়েস বিন তুরায়েফ বিন আবদুল উজ্জা বিন আমিরাহ বিন উমাইরাহ বিন ওয়াদিয়াহ বিন হারিছ বিন ফাহর।

মুগিরাহ (রাঃ) প্রিয় নবী (সাঃ)-এর সম বয়সী এবং অন্তরের দোস্ত ছিলেন। চরিতকারদের বর্ণনা মতে তিনি আকৃতিতে হুযুর (সাঃ)-এর সাদৃশ্য রাখতেন। সুদর্শন, যুদ্ধবিদ্যা এবং কাব্য সাহিত্যের প্রতি তিনি ছিলেন আসক্ত। যৌবন কালেই কুরাইশের অত্যন্ত ভালো অশ্বারোহী এবং কবিদের মধ্যে পরিগণিত হতে থাকেন। নিকটাত্মীয়ের সম্পর্ক এবং এক বয়সী হওয়ার কারণে উভয়ের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। হুযুর (সাঃ)-এর সমবয়সী কুরাইশ যুবকদের মধ্যে তাকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো যে, মানবতার মুক্তির দিশারী প্রিয় নবী (সাঃ) যখন হকের দাওয়াত প্রদান শুরু করলেন মুগিরাহ তখন সে দাওয়াতের প্রতি ইতিবাচক সাড়া প্রদান এবং সাহায্য সহযোগিতার পরিবর্তে উল্টো তাঁর বিরোধীদের কাতারে শামিল হয়ে গেলেন এবং হকের বিরোধিতা করা যেন একমাত্র দায়িত্ব হিসেবে বেছে নিলেন। তার বিরোধিতা রাসূল (সাঃ) -এর সাথে শত্রুতায় পর্যবসিত হয়। এমনকি তিনি হুযুর (সাঃ)-কে গালমন্দ করা এবং হক পন্থীদের যুলুম নির্যাতন প্রশ্নে অন্যান্য নিকৃষ্ট কুরাইশদের থেকে পিছিয়ে রইলেন না। হুযুর (সাঃ) মক্কা থেকে হিজরাত করে মদীনা মুনাওয়ারাহ তাশরীফ

রাখলেন। এ সত্ত্বেও মুগিরাহর ইসলামের দুশমনীতে ভাটা পড়লো না। ইমাম হাকিম (রঃ) "মুসতাদরাকে হাকিমে" লিখেছেন, মক্কা বিজয়ের পূর্বে মুসলমান ও মক্কার মুশরিকদের মধ্যে যত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তাতে আবু সুফিয়ান মুগিরাহ মুশিরিকদের পক্ষে অত্যন্ত সোৎসাহে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এমনিভাবে হকের বিরোধিতা করতে করতে তিনি বিশ বছর কাটিয়ে দেন। আশার বিপরীত তাঁর এ কাজ এবং শত্রুতামূলক আচরণ রাসূল (সাঃ)-এর জন্য অত্যন্ত দুঃখের কারণ হয়েছিল। এ জন্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর ওপর ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

অষ্টম হিজরীতে মুগিরাহ (রাঃ) খবর পেলেন যে, বিশ্ব নবী মুহাম্মাদ মুস্তফা (সাঃ) এক বিরাট বাহিনীসহ মক্কা দখল করতে আসছেন। এ খবর শুনে তিনি অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লেন এবং স্ত্রী ও শিশুদেরকে বললেন, মুহাম্মাদ (সাঃ) বিরাট বাহিনীসহ মক্কা আগমন করছেন। কুরাইশের এমন শক্তি নেই যে, তাঁকে বাধা দেবে। আমি যদি মুসলমানদের হস্তগত হই তাহলে তারা আমাকে জীবিত রাখবে না। এ জন্যে এখান থেকে চলে যাওয়াই আমাদের জন্যে উত্তম।

স্ত্রী অত্যন্ত নেকবখত এবং সমঝদার ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দরদ ভরা কণ্ঠে বললেনঃ "এখনো কি তোমার চোখ খুলেনি। আরব এবং আজমের লোক দলে দলে মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর আনুগত্য কবুল করছে। তোমার জন্যে আফসোস যে, তুমি এখনো শত্রুতামূলক আচরণ করে চলেছ। প্রকৃতপক্ষে অন্যান্যদের চেয়ে বেশী মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে সাহায্য-সহযোগিতা করা তোমার উচিত ছিল।"

স্ত্রীর কথায় হযরত মুগিরাহ (রাঃ) বিশেষভাবে প্রভাবিত হলেন এবং যখন তার সন্তানরাও মায়ের কথার প্রতি সমর্থন জানালো তখন তাঁর অন্তরজগত সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ তিনি গোলাম "মাজকুরকে" একটি উটনী এবং ঘোড়া তৈরীর নির্দেশ দিলেন। অতপর তিনি নবজাত শিশু জাফরকে সাথে নিলেন এবং নবী (সাঃ)-এর খিদমতে হাজির হওয়ার ইচ্ছায় মদীনার দিকে রওয়ানা দিলেন। সে সময় মুসলমানদের অগ্রবর্তী বাহিনী আবওয়া নামক স্থানে পৌঁছে গিয়েছিল। তাঁদের দেখে মুগিরাহ (রাঃ) নিজের বেশ পরিবর্তন করে নিলেন এবং সওয়ারীকে এক স্থানে বেঁধে রেখে চুপিসারে এক মাইল পায়ে হেঁটে বৃহৎ ইসলামী বাহিনীতে গিয়ে পৌঁছলেন। সে সময় তিনি ছিলেন ভীত সন্ত্রস্ত। প্রতি মুহূর্তে ভয়ে পা কাপছিল-এ বুঝি কোন মুসলমানের হাতে পড়ে কতল হয়ে গেলেন। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ একা একা বিশ্ব নবী (সাঃ)-এর সামনে এসে পড়লেন। অগ্রসর হয়ে রাসূল (সাঃ) -এর সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং মুখ থেকে চাদর সরিয়ে নিলেন। তাঁর ধারণা ছিল হুযুর (সাঃ) সামনে পেয়ে খুশী হবেন। কিন্তু স্মরণ ছিল না যে, বিগত ২০ বছরে দীনে হকের বিরোধিতায় তিনি কত

কি করেছেন। তখন তার জন্যে রাসূল (সাঃ) –এর অন্তরে আর কোন স্থান নেই। রাসূল (সাঃ) তার প্রতি ঘৃণা পোষণকারী হয়ে গেছেন। দৃষ্টি যেই মুগিরাহর ওপর পড়লো ওমনি তিনি পবিত্র মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন। মুগিরাহ আবার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পুনরায় মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। মুসলমানরা তাকে হুযুর (সাঃ)–এর সাথে এ অবস্থায় দেখলেন। তারাও তার সাথে একই আচরণ করলো। আনসার সাহাবী হযরত নুয়াইমান (রাঃ) এমন আবেগতাড়িত হয়ে পড়লো যে, কর্কশ কণ্ঠে মুগিরাহকে সম্বোধন করে বললেন, "এই আল্লার দুশমন তুইতো সে ব্যক্তি যে রাসূল (সাঃ)–এর ওপর সর্ব পন্থায় নির্যাতন চালিয়েছিস এবং তাঁর শত্রুতায় আসমান জমিন একাকার করে ফেলেছিস। সময় এসে গেছে এখন তুই সকল অপকর্মের স্বাদ গ্রহণ কর।"

হযরত নুয়াইমান (রাঃ)–এর স্বর ক্রমেই উচ্চ মার্গে চড়তে লাগলো। এদিকে ভয়ে মুগিরার জীবনও যায় যায় অবস্থা। তিনি দৌড়ে নিজের চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)–এর আশ্রয় নিলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) প্রথমে তাঁর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করলেন না কিন্তু যখন তিনি খুব করে অনুনয় বিনয় এবং আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে নুয়াইমান (রাঃ) ও অন্যান্য মুসলমানদের হাত থেকে তাঁর জীবন রক্ষার আবেদন জানালেন তখন হযরত আব্বাস (রাঃ)–এর দয়া হলো এবং তিনি হযরত নুয়াইমান (রাঃ)–কে সম্বোধন করে বললেনঃ "হে নুয়াইমান। আবু সুফিয়ান (মুগিরাহ) রাসূল (সাঃ)–এর চাচাতো ভাই এবং আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। এটা ঠিক যে, বর্তমানে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার প্রতি অসন্তুষ্ট রয়েছেন। কিন্তু তিনি ভবিষ্যতে তাকে ক্ষমাও তো করতে পারেন।"

হযরত আব্বাস (রাঃ)–এর কথা শুনে হযরত নুয়াইমান (রাঃ) চুপ মেরে গেলেন এবং অন্যান্য মুসলমানও তার আস্থার ওপর ছেড়ে দিলেন।

বিশ্বনবী (সাঃ) হুজকাহ আগমন করলেন। এ সময় মুগিরাহ পুত্রসহ রাসূল (সাঃ)–এর আবাসস্থলের বাইরে বসে গেলেন। হুযুর (সাঃ) বাইরে বেরিয়ে তাঁকে দেখে বিরক্তির সাথে মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। হযরত মুগিরাহ (রাঃ) খুব দুঃখিত হলেন ঠিকই কিন্তু নিরাশ হলেন না। যেভাবেই হোক রাসূল (সাঃ)–এর নিকট পৌঁছে নিজের অপরাধ ক্ষমা করিয়ে নেয়ার অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। হুযুর (সাঃ) যেখানেই যেতেন সেখানেই যেতেন। সেখানেই তিনি পৌঁছতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিতেন। সব শেষে হযরত মুগিরাহ (রাঃ) উম্মুল মুমিনিন হযরত উম্মে সালমাহ (রাঃ)–এর বিদমতে উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে রাসূল (সাঃ) –এর নিকট তাঁর প্রশ্নের সুপারিশ পেশ করার নিবেদন জানালেন। তিনি রাজী হলেন এবং

হুযুর (সাঃ)-এর খিদমতে আরজ করে বললেন ঃ "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার চাচার পুত্রকে নিরাশ করবেন না।"

ইরশাদ হলো ঃ "আমার এমন চাচার পুত্রের প্রয়োজন নেই। সে আমার ওপর কম নির্যাতন চালায়নি।"

হযরত মুগিরাহ (রাঃ) হুযুর (সাঃ)-এর জবাব শুনলেন। তাঁর অন্তর ভেঙে খান খান হয়ে গেল। নিরাশ হয়ে তিনি স্ত্রীকে বললেন, "আমার জন্যে ক্ষমার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন জীবিত থেকে কি লাভ? আমি এ অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রকে নিয়ে এখান থেকে চলে যাচ্ছি। আমরা দু'জন উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিক সেদিক চলতে থাকবো এবং একদিন ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হয়ে মৃত্যুবরণ করেবো।"

কোন মাধ্যমে রাসূল (সাঃ)-এর নিকট হযরত মুগিরাহর এ অবস্থার খবর পৌঁছলো। এ সময় দয়ার সাগর রাসূল (সাঃ)-এর অন্তরও আবেগময় হয়ে উঠলো। তিনি হযরত মুগিরাহ (রাঃ)-কে তার সামনে আগমনের অনুমতি মঞ্জুর করলেন। পিতা-পুত্র উভয়েই চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে রাসূল (সাঃ) -এর খিদমতে হাজির হলেন এবং আসসালামু আইলকা ইয়া রাসূলুল্লাহ বলে অগ্রসর হলেন। হুযুর (সাঃ) খাদেমদেরকে তাদের মুখের ওপর থেকে চাদর হটানোর নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, মুখতো দেখা যাক। তারা তৎক্ষণাৎ চাদর সরিয়ে দিলেন। পিতা-পুত্র উভয়েই সে সময় কালেমা শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করলেন। হুযুর (সাঃ) মুগিরাহ (রাঃ)-এর দিকে ইশারাহ করে বললেন ঃ "আবু সুফিয়ান! তুমি আমাকে কবে মক্কা থেকে বের করে দিয়েছিলে?"

তিনি আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল। আমি প্রথমেই খুব লজ্জিত আছি। এরপর আরো গালাগালি করে লজ্জা দেবেন না।"

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ "এখন আর কোন গালাগালি নয়।"

অতপর তিনি হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুকে চাচার পুত্রকে সাথে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে তাকে ওজু এবং সুন্নাতের তালিম প্রদান এবং গোসল দিয়ে পুনরায় তার নিকট নিয়ে আসতে বললেন। হযরত আলী (রাঃ) নবী (সাঃ)-এর নির্দেশ পালনের পর হযরত মুগিরাহ (রাঃ)-কে দ্বিতীয়বার হুযুর (সঃ)-এর খিদমতে পেশ করলেন। তিনি তাকে নামায পড়ালেন এবং ঘোষণা করে দিলেন যে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল আবু সুফিয়ানের প্রতি রাজী হয়ে গেছেন। এ জন্যে সকল মুসলমানও যেন রাজী হয়ে যায়। রাসূল (সাঃ)-এর এ ঘোষণায় হযরত মুগিরাহ (রাঃ) খুশীতে মাটিতে আর পা রাখতে

পারছিলেন না। এখন তার জীবনে বিপ্লব এসে গেল এবং দীনে হকের একজন জানবাজ সৈনিক বনে গেলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আবু সুফিয়ান (মুগিরাহ) (রাঃ) মক্কা বিজয়ে রাসূল (সাঃ)-এর সাথে অংশ গ্রহণকারী ১০ হাজার মুসলমানের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলেন। অষ্টম হিজরীর শওয়াল মাসে হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হলো এ যুদ্ধেও হযরত মুগিরাহ (রাঃ) অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অংশ নিলেন। যুদ্ধের সূচনায় বনু হাওয়াযেনের প্রচণ্ড তীর বর্ষণে মুসলমানদের মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দেয়। এ সময় হযরত মুগিরাহ (রাঃ) কতিপয় সাহাবীসহ রাসূল (সাঃ)-এর সাথে যুদ্ধের ময়দানে অটল পাহাড় হিসেবে দণ্ডায়মান ছিলেন। যখন শত্রুর চাপ বেশী বেড়ে গেল তখন তিনি নাঙ্গা তলোয়ার হাতে নিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়লেন এবং শত্রুর দিকে অগ্রসর হতে চাইলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) এ জীবন বাজী দেখে রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! চাচার পুত্রের প্রতি রাজী হয়ে যান।" হুযুর (সাঃ) বললেন, "আমি রাজী হয়ে গেলাম। সে আমার সাথে যত শত্রুতাই করে থাকুক না কেন আল্লাহ তাকে মাফ করুন।" অতপর তিনি হযরত মুগিরাহ (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বললেন, "আমার বয়সের কসম। তুমি আমার ভাই।" হুযুর (সাঃ)-এর ইরশাদ শুনে তিনি খুশীতে আত্মহারা হয়ে তাঁর কদম মুবারকে চুমু দিলেন। এক রাওয়ায়েতে আছে যে, সে সময় হযরত আব্বাস (রাঃ) হুযুর (সাঃ)-এর সাদা খচ্চরের লাগাম ধরে রেখেছিলেন এবং হযরত মুগিরাহ জিনের পেছনের অংশ ধরা অবস্থায় ছিলেন। রাসূল (সাঃ) -এর ইরশাদ শুনেই তিনি মুশরিকদের ওপর অমিতবিক্রমে হামলা করে বসলেন। অন্যান্য মুসলমানও তাঁর অনুসরণ করলো এবং মুশরিকদের পিছনে হটিয়ে দিল। ইবনে সায়াদ (রঃ) বর্ণনা করছেন যে, হযরত মুগিরাহ (রাঃ)-এর বাহাদুরী এবং জীবন উৎসর্গের এ আবেগ হুযুর (সাঃ)-কে অত্যন্ত খুশী করেছিল এবং তিনি তাঁকে "আসাদুল্লাহ" এবং "আসাদুর রাসূল" উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

হুনাইনের পর রাসূল (সাঃ)-এর যুগে সংঘটিত অন্যান্য যুদ্ধেও হযরত মুগিরাহ (রাঃ) হুযুর (সাঃ)-এর সহগামী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

ইসলাম কবুলের পর হযরত মুগিরাহ (রাঃ) শুধুমাত্র যুদ্ধসমূহে অংশ গ্রহণ করেই অতীত জীবনের কাফফারা আদায় করেননি বরং দিন রাত্রির অধিকাংশ অংশ ইবাদাত এবং আধ্যাত্মিক সাধানায় ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। ইবনে সায়াদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সমস্ত রাত ধরে নামায পড়তেন এবং গরমের দীর্ঘ দিনে সকাল থেকে অর্ধ দিন পর্যন্ত নফল পড়তেন। কিছু বিরতির পর আবার নামায শুরু করতেন এবং আছর পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখতেন। একবার প্রিয় নবী (সাঃ) তাঁকে মসজিদে প্রবেশ

করতে দেখে উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ)-কে বললেন ঃ "আয়েশাহ! জানো একে ?"

তিনি আরজ করলেন ঃ "ইয়া রাসূলুল্লাহ! না।"

ইরশাদ হলোঃ "সে আমার চাচার পুত্র আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিছ। দেখো, সে সবার আগে মসজিদে প্রবেশ করছে এবং সকলের শেষে বের হয়ে আসবে। তার দৃষ্টি জুতোর চামড়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না।"

ইমাম হাকিম (রঃ) "মুসতাদরাকে হাকিমে" এ রাওয়ায়েত উপস্থাপন করেছেন, হযরত মুগিরাহ (রাঃ)-এর ইবাদাত এবং আধ্যাত্মসাধনার একাগ্রতা দেখে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে "জান্নাতের যুবকদের সরদার" উপাধি প্রদান করেন। সে যুগে হযরত মুগিরাহ (রাঃ) সাইয়েদুল আনামের প্রশংসায় অনেক কবিতা রচনা করেন।

হযরত মুগিরাহ (রাঃ) জীবনের নতুন যুগে রাসূল (সাঃ)-এর নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্বের যুগের মত নবিজী (সাঃ)-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে পরিগণিত হন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) খুশীতে তাঁকে "উত্তম পরিজন" বলতেন। হুযুর (সাঃ)-এর প্রতি হযরত মুগিরাহরও সীমাহীন ভালোবাসা ছিল। ১১ হিজরীতে বিশ্বনবী (সাঃ) ওফাত হলে দুনিয়া তার নিকট অন্ধকার হয়ে গেল এবং তিনি এক অন্তরস্পর্শী মারছিয়াহ রচনা করেন। তিন-চার বছর পর তাঁর প্রিয় ভাই নাওফিল (রাঃ) বিন হারিছ মারা গেলে তাঁর অন্তর একদম শীতল হয়ে গেল। সে সময় তিনি আল্লার নিকট দোয়া করে বললেন হে আল্লাহ! রাসূল (সাঃ) এবং ভাইয়ের পর জীবন বিস্বাদ ও দুনিয়া নিরানন্দ হয়ে পড়েছে। এ জন্যে শীঘ্র দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নাও। এ দোয়ার কিছুদিন পরই হজ্জের মওসুম এলো। তিনি হজ্জে শরীক হলেন। মিনায় মাথা মুণ্ডালেন। এ সময় মাথায় ক্ষুর লেগে এমন বেগে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগলো যে, তা আর বন্ধ হয় না। মদীনা মুনাওয়ারাহ ফিরে গিয়ে নিজেই নিজের কবর খুঁড়লেন। অবস্থার অবনতি ঘটলে আত্মীয় স্বজন ক্রন্দন করতে লাগলো। তিনি সবাইকে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আজ পর্যন্ত আল্লাহ পাক প্রতিটি গুনাহ থেকে মাহফুজ রেখেছেন। কবর খোঁড়ার তিন দিন পর আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন। আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) নামাযে জানাযা পড়ালেন এবং জান্নাতুল বাকীতে দাফন করলেন। তিনি অনেক ছেলে-মেয়ে রেখে যান। কিন্তু তাদের দিয়ে বংশ পরম্পরা অব্যাহত থাকেনি।

—০—

হযরত আবুল আছ (রাঃ) বিন রবি

কুরাইশের তিন সন্তান ছিল খুবই ভাগ্যবান। এ তিন ভাগ্যবানের মধ্যে অন্যতম হলেন সাইয়েদেনা হযরত আবুল আছ (রাঃ) বিন রবি'। তিনজনের অপর দু'জন হলেন হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রাঃ) এবং হযরত আলী মুরতাজা (রাঃ)। এ তিনজন ছিলেন কখরে মওজুদাত সারওয়ারে কায়েনাত রহমতে দোআলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামাতা। ভিন্ন রাওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত আবুল আছ (রাঃ)-এর নাম ছিল লাকিত, মুহশিম অথবা হিশম। কিন্তু তিনি আবুল আছ কুনিয়তেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কুরাইশের অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বংশ আবদি শামছের সাথে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। তার নছবনামা হলোঃ আবুল আছ (রাঃ) বিন রবি' বিন আবদুল উজ্জা বিন আবদি শামছ বিন আবদি মান্নাফ বিন কুসাই। আবদি মান্নাফ পর্যন্ত তাঁর নছব প্রিয় নবী (সাঃ) -এর নছবনামার সাথে মিলে যায়।

মাতার নাম ছিল হালাহ (রাঃ) বিনতে খুয়ায়লেদ। তিনি ইসলামের প্রথম মহিলা উম্মুল মুমিনিন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ)-এর আপন বোন। চরিতকারদের সকলেই ঐকমত্য পোষণ করে বলেছেন যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ ও সাহাবিয়াহ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন এবং হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ)-এর ইন্তিকালের পরও জীবিত ছিলেন।

হাফিজ ইবনে আবদুল বার (রঃ) "আল ইসতিয়াব" গ্রন্থে লিখেছেন, একবার তিনি প্রিয় নবী (সাঃ) -এর সাথে সাক্ষাতের জন্য মক্কা মুকাররমা থেকে মদীনা তাইয়িবা গেলেন। রাসূল (সাঃ) -এর আবাসস্থল পৌঁছে ভেতরে গমনের অনুমতি চাইলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ) -এর কণ্ঠস্বরের সাথে মিল ছিল। হুযুর (সাঃ)-এর কানে তাঁর আওয়াজ পৌঁছলো। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে রাসূল (সাঃ)-এর হযরত খাদিজাতুল কুবরাহ (রাঃ)-এর কথা স্মরণ হলো এবং উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রাঃ)-কে বললেন ঃ "খাদিজা (রাঃ)-এর বোন হালাহ হতে পারেন।" ভেতরে এলে তিনি তাঁকে অত্যন্ত তাজিম করলেন। উম্মুল মুমিনিন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ) ভাগিনা আবুল আছ (রাঃ)-কে অত্যন্ত

স্নেহ করতেন এবং নিজের সন্তান বলে মনে করতেন। আবুল আছ (রাঃ) যৌবনকালেই ব্যবসায়ে মশগুল হয়ে গিয়েছিলেন এবং বুদ্ধিমত্তা ও সুন্দর আচরণের জন্যে বিরাট ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এ ভাবে তিনি কুরাইশদের মধ্যে বিত্তবান বলে পরিগণিত হন। তার দিয়ানতদারী, সুন্দর আচার-আচরণ ও লেন-দেনের ওপর মানুষের খুব আস্থা ছিল। ফলে মানুষ তার নিকট আমানত রাখতো। ইবনে আছিরের বক্তব্য অনুসারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মত তিনিও "আমিন" খিতাবে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত আবুল আছ (রাঃ) "আমিন" হওয়া ছাড়াও অত্যন্ত সাহসী এবং বাহাদুর ছিলেন। আরববাসী বাহাদুরীর স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে "হেজাযের বাঘ" লকব দিয়েছিল। নবুয়াত প্রাপ্তির কিছু দিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবুল আছ (রাঃ)-এর সাথে নিজের বড় মেয়ে হযরত যয়নব (রাঃ)-এর বিয়ে দেন। হযরত আবুল আছ (রাঃ) -এর সুন্দর চরিত্রই এ বিয়ের কারণ ছিল। অন্য দিকে হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ)-এর ইচ্ছা এবং পীড়াপীড়িও বিয়েতে কাজ দিয়েছিল। চরিতকাররা ব্যাখ্যা করে বলেননি যে, বিয়ের সময় যয়নব (রাঃ)-এর বয়স কত ছিল। তবে, অপ্রাপ্ত বয়স্কা ছিলেন। এ জন্য কিয়াস করা হয় যে, আবুল আছ (রাঃ)-এর সাথে তার প্রথম বিয়ে হয়।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সাঃ) নবুয়াত প্রাপ্তির পর হকের দাওয়াত প্রদান শুরু করলেন। এ সময় উম্মুল মুমিনিন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ)-এর সাথে হযরত যয়নব (রাঃ)-ও ইসলাম কবুল করেন। কিন্তু হযরত আবুল আছ (রাঃ) বিভিন্ন কারণে পিতৃধর্মের ওপর কায়েম থাকেন। তবে তিনি দ্বীনে হক এবং রাসূল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে কখনো কোন তৎপরতায় অংশ নেননি। ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন যে, একবার কুরাইশের কতিপয় ব্যক্তি হযরত আবুল আছ (রাঃ)-কে হযরত যয়নব (রাঃ)-কে তালাক দেয়ার জন্যে বাধ্য করতে চাইলো এবং কুরাইশের অন্য কোন মেয়ের সাথে বিয়ের প্রস্তাব দিলো। কিন্তু তিনি পরিষ্কারভাবে এ কাজ করতে অস্বীকার করলেন। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই তার কথা সব সময় উল্লেখ করতেন। নবুয়াত প্রাপ্তির ৭ বছর পর কুরাইশের মুশরিকরা প্রিয় নবী (সাঃ) এবং তার সাহায্যকারী ও সমর্থক হাশেমী ও মুত্তালেবীদেরকে শি'বে আবিতালিবে অবরোধ করলো এবং খানা-পিনার কোন বস্তু সেখানে নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ করে দিল। এ ভয়ানক অবরোধ তিন বছর অব্যাহত ছিল। এ ঘোর দুর্দিনে মুশরিকদের বিধি-নিষেধ এবং বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও হযরত আবুল আছ (রাঃ) জীবন বাজী রেখে খানা-পিনার কিছু বস্তু কখনো কখনো শি'ব অভ্যন্তরে পৌঁছে দিতেন। মিরযা মুহাম্মাদ তকীর বক্তব্য অনুসারে হুযুর (সাঃ) তার

এ খিদমতের স্বীকৃতি এ ভাষায় দিয়েছিলেন-"আবুল আছ জামাইয়ের অধিকার আদায় করেছে।"

নবুয়াত প্রাপ্তির ত্রয়োদশ বছরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কা মুয়াজ্জামা থেকে হিযরত করলেন। এ সময় হযরত যয়নব (রাঃ) শ্বশুর বাড়ীতে ছিলেন। হযরত আবুল আছ (রাঃ) নিজের বাপ-দাদার ধর্মের ওপর থাকা সত্ত্বেও তার সাথে ভালো ব্যবহার করতেন। দ্বিতীয় হিজরীতে মক্কার মুশরিকরা বদরের যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত আবুল আছ (রাঃ)-কেও সাথে নিয়ে গেল। অবস্থা এমনই ছিল যে, কোন সুস্থ ব্যক্তি যুদ্ধ অপছন্দ করলেও পিছে থাকতে পারতো না। মুশরিকরা তাকে ভীরু এবং কাপুরুষ বলে তিরস্কার এবং গালি দিত। আর কোন কুরাইশের জন্য এটা ছিল বড় শরমের ও লজ্জার ব্যাপার। বদরের ময়দানে কুরাইশরা পরাজিত হলো। হযরত আবুল আছ (রাঃ) এক আনসারী জানবাজ হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন জাবিরের হাতে বন্দী হলেন। তার সাথে অন্যান্য অনেক মুশরিককেও মুসলমানরা গ্রেফতার করলো।

মক্কাবাসী এ খবর শুনলো। বন্দীদের নিকটাত্মীয়রা রাসূল (সাঃ)-এর নিকট আত্মীয়দের মুক্তির জন্য ফিদিয়া বা অর্থ প্রেরণ করলো। হযরত যয়নবও (রাঃ) দেবর আমর বিন রবির মাধ্যমে ইয়েমেনী আকীক পাথরের একটি হার হযরত আবুল আছ (রাঃ)-এর মুক্তির জন্যে পাঠালেন। হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ) এ হার কন্যা যয়নব (রাঃ)-কে বিয়ের সময় উপহার দিয়েছিলেন। হুযুর (সাঃ)-এর খিদমতে যখন এ হার পেশ করা হলো তখন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ)-এর কথা তার মনে পড়লো এবং অশ্রুতে তার চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। তিনি সাহাবা (রাঃ)-দেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ যদি তোমরা ভালো মনে কর তাহলে যয়নব (রাঃ)-কে এ হার ফেরত পাঠিয়ে দাও। এটা তার মায়ের স্মৃতির নিদর্শন। আবুল আছ (রাঃ) মক্কায় ফিরে গিয়ে যয়নব (রাঃ)-কে মদীনা পাঠিয়ে দেবে। এটাই তার জন্যে ফিদিয়া হিসেবে বিবেচিত হবে।"

সকল সাহাবী (রাঃ) নবী (সাঃ)-এর এ নির্দেশের কাছে মাথানত করলেন। হযরত আবুল আছ (রাঃ) ও এ শর্ত মেনে নিলেন। মুক্ত হয়ে তিনি মক্কা পৌঁছলেন এবং ওয়াদা অনুযায়ী হযরত যয়নব (রাঃ)-কে নিজের ছোট ভাই কিনানাহ বিন রবি'র সাথে মদীনা রওয়ানা করে দিলেন। কুরাইশ মুশরিকরা যখন খবর পেল যে, হযরত যয়নব (রাঃ) মদীনা যাচ্ছেন তখন তারা কিনানাহ বিন রবি' এবং হযরত যয়নব (রাঃ)-এর পিছু নিল এবং "জি তাওয়া" নামক স্থানে তাদেরকে ঘিরে ফেললো। হযরত যয়নব (রাঃ) উটের ওপর সওয়ার ছিলেন। হিবার বিন আসওয়াদ নামক

একজন মুশরিক নিযাহ দিয়ে হযরত যয়নব (রাঃ)-কে মাটিতে ফেলে দিল অথবা উটের মুখ ফিরানোর জন্যে নিজের নিযাহ ঘুরালো। উট খুব দ্রুত পেছনের দিকে মোড় নিল। এতে হযরত যয়নব (রাঃ) মাটিতে পড়ে গেলেন। তিনি গর্ভবতী ছিলেন। প্রচণ্ড আঘাত পেলেন ফলে গর্ভপাত হয়ে গেল। কিনানাহ বিন রবি' অগ্নি শর্মা হয়ে গেলেন। তূনীর থেকে তীর বের করে হুংকার ছেড়ে বললেনঃ "খবরদার! এখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ অগ্রসর হলেই একদম ছাতু ছাতু করে ফেলবো।"

কাফিররা থেমে গেল। আবু সুফিয়ান কিনানাহকে সম্বোধন করে বললোঃ "ভ্রাতুষ্পুত্র তীর সম্বরণ কর আমি তোমার সাথে কিছু কথা বলতে চাই।"

কিনানাহ বললো ঃ "বলো কি বলতে চাও।"

আবু সুফিয়ান তার কানে কানে বললো, "মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর হাতে আমরা যেভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছি তা তুমি জানো। যদি তুমি তার কন্যাকে এভাবে প্রকাশ্যে আমাদের সামনে দিয়ে নিয়ে যাও তাহলে আমরা বড় অপমানিত হবো। তার চেয়ে বরং এটাই উত্তম হবে যে, তুমি এখন যয়নবকে সাথে নিয়ে মক্কা ফিরে এসো এবং অন্য কোন সময়ে গোপনে তাকে নিয়ে যেও।" কিনানাহ এ প্রস্তাব মেনে নিল এবং হযরত যয়নব (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে মক্কা ফিরে এলেন। কিছুদিন পর সে রাতে চুপিসারে হযরত যয়নব (রাঃ)-কে নিজের সাথে নিয়ে মক্কা থেকে বের হয়ে মদীনা পৌঁছে দিল। অন্য আরেক রাওয়ায়েতে আছে যে, হুযুর (সাঃ) হযরত আবুল আছ (রাঃ)-এর সাথে হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন হারিছাকে পাঠিয়ে দিলেন। যাতে তিনি হযরত যয়নব (রাঃ)-কে নিজের সাথে মদীনা নিয়ে আসতে পারেন। হযরত যায়েদ (রাঃ) "বাতনে ইয়াজুজ" নামক স্থানে অবস্থান নেন। কিনানাহ হযরত যয়নব (রাঃ)-কে এ স্থান পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে মক্কা চলে যান এবং সেখান থেকে হযরত যায়েদ (রাঃ) হযরত যয়নব (রাঃ)-কে মদীনা নিয়ে যান।

হযরত যয়নব (রাঃ) -এর মদীনা গমনের পর কুরাইশের একটি দল হযরত আবুল আছ (রাঃ)-এর নিকট এসে তাকে তালাক দেয়ার কথা বললো এবং পরিবর্তে কুরাইশের যে মহিলাকে সে পছন্দ করবে তার সাথেই তার বিয়ে দেবে বলে জানালো। হযরত আবুল আছ (রাঃ) জবাবে বললেন ঃ "আল্লাহর কসম! আমি যয়নবকে কক্ষণই পরিত্যাগ করেত পারবো না। কুরাইশের অন্য কোন মহিলা তার বরাবর হতে পারে না।" এতে কুরাইশরা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেল।

হযরত যয়নব (রাঃ)-এর প্রতি হযরত আবুল আছ (রাঃ)-এর ভালোবাসা ছিল অত্যন্ত গভীর। তিনি মদীনা চলে যাওয়ার পর থেকে হযরত আবুল আছ (রাঃ) নিরানন্দ এবং অশান্তিতে দিন কাটাতে লাগলেন। একবার হযরত আবুল আছ (রাঃ) সিরিয়া সফর করছিলেন। এ সময় খুব ব্যথিত স্বরে তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। কবিতাটির ভাবার্থ হলো ঃ "আমি যখন এরম নামক স্থান অতিক্রম করছিলাম তখন যয়নবের কথা মনে পড়লো। হেরেমে অবস্থানকারী সে ব্যক্তিকে আল্লাহ চিরসবুজ রাখুক। আমিন (সাঃ)-এর কন্যাকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দিক এবং প্রত্যেক স্বামীই সে কথারই প্রশংসা করে যা সে ভালভাবে জানে।"

৬ষ্ঠ হিজরীতে এক বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে হযরত আবুল আছ (রাঃ) সিরিয়া গমন করছিলেন। আইছ নামক স্থানে ইসলামের মুজাহিদদের একটি দল কাফিলার ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে সব ধন-সম্পদ কবজাহ করে নিল।

মুসলমানদের প্রত্যাবর্তনের পর হযরত আবুল আছ (রাঃ)-ও সোজা মদীনা মুনাওয়ারহ পৌঁছলেন এবং হযরত যয়নব (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে আশ্রয় চাইলেন। নিশ্চিন্তে তিনি তাঁকে আশ্রয় দিলেন। ভোরে মুসলমানরা যখন নামায পড়ার জন্যে মসজিদে নববীতে এলো তখন হযরত যয়নব (রাঃ) উচ্চৈস্বরে বললেনঃ " হে মুসলমানরা ! আমি আবুল আছ বিন রবিকে আশ্রয় দিয়েছি।"

হুযুর (সাঃ) নামায থেকে ফারেগ হয়ে বললেন, "তোমরা কি কিছু শুনেছ?"

সবাই আরজ করলেন, "আল্লাহর রাসূল, হ্যাঁ।"

হুযুর (সাঃ) বললেন, "আল্লাহর কসম! এর আগে এ ঘটনা আমি জানতাম না এবং আশ্রয় দানের অধিকারতো প্রতিটি নগণ্য মুসলমানেরই রয়েছে।"

এরপর নবী করীম (সাঃ) ঘরে তাশরীফ নিলেন। এ সময় হযরত যয়নব আবুল আছ (রাঃ) -এর মাল ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে সুপারিশ করলেন। হযরত আবুল আছ (রাঃ) মক্কায় হযরত যয়নব (রাঃ)-এর সাথে ভালো ব্যবহার করেছিলেন। এ জন্যে হুযুর (সাঃ) তাকে সম্মান করতেন। তিনি সাহাবী (রাঃ)-দের বললেন ঃ "তোমরা আমার এবং আবুল আছ (রাঃ)-এর আত্মীয়তার ব্যাপারটি অবগত আছ। যদি তোমরা তার মাল ফিরিয়ে দাও তাহলে এটা তোমাদের ইহসান হবে এবং আমি খুশী হবো। আর যদি না দাও তাহলে এ মাল হবে আল্লাহর উপহার এবং তাতে তোমাদেরই অধিকার রয়েছে। তাতে আমার কোন প্রশ্ন বা পীড়াপীড়ি নেই।

সাহাবায়ে কিরামতো সব সময় রাসূল (সাঃ)-এর সন্তুষ্টিই চাইতেন।

অবিলম্বে তারা সকল মাল ও আসবাব হযরত আবুল আছ (রাঃ)-কে ফিরিয়ে দিলেন। তিনি তা নিয়ে মক্কা পৌঁছলেন এবং সকল লোককে তাঁর নিকট রক্ষিত আমানত ফিরিয়ে দিলেন। অতপর মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "হে কুরাইশরা! এখন আমার জিম্মায় কারো কোন আমানত অথবা মালতো নেই?"

মক্কার সকল লোক একবাক্যে বললো ঃ "অবশ্যই নয়। খোদা তোমাকে ভালো করুন। তুমি একজন নেক্কার এবং বিশ্বাসী মানুষ।"

হযরত আবুল আছ (রাঃ) তাদের জবাব শুনে বললেন, "তাহলে শুনে নাও; আমি মুসলমান হচ্ছি। আল্লাহর কসম। তোমরা আমাকে খিয়ানতকারী মনে না কর এ ভেবেই শুধু আমি মুসলমান হইনি।" একথা বলেই কালেমায়ে শাহাদাত পড়লেন এবং তারপর মক্কা থেকে হিযরত করে মদীনা চলে এলেন। এটা সপ্তম হিজরীর মুহাররাম মাসের ঘটনা।

মদীনা পৌঁছেই হযরত আবুল আছ (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বাকায়দাহ ঈমান আনলেন। হযরত আবুল আছ (রাঃ) -এর ইসলাম গ্রহণের পর হুযুর (সাঃ) হযরত যয়নব (রাঃ)-এর সাথে নতুন করে বিয়ে দিয়েছিলেন কি? এ সম্পর্কে দু'ধরনের রাওয়ায়েত পাওয়া যায়। প্রথম হলো, নতুন করে বিয়ে দেননি। প্রথম আকদ অনুসারেই তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় রাওয়াত হলোঃ হযরত যয়নব (রাঃ) এবং হযরত আবুল আছের মধ্যে শিরকের কারণে বিচ্ছিন্নতা এসেছিল । এ জন্যে নবী করিম (সাঃ) হযরত আবুল আছ (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের পর হযরত যয়নব (রাঃ)-কে প্রথম দফা নির্ধারিত মহরানায় দ্বিতীয় বার বিয়ে দেন এবং হযরত আবুল আছ (রাঃ) -এর বাড়ী পাঠিয়ে দেন।

হযরত আবুল আছ (রাঃ) মক্কায় বিরাট ব্যবসা এবং কারবার ছেড়ে এসেছিলেন এবং তাঁর সুন্দর লেনদেন, আমানত ও দিয়ানতের কারণে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও মুশরিকরা তাঁকে মক্কায় অবস্থানে বাধা দেয়নি। বস্তুতঃ তিনি রাসূল (সাঃ)-এর অনুমতি নিয়ে পুনরায় মক্কা চলে এলেন এবং আগের মত যথারীতি ব্যবসায়ে নিমগ্ন হলেন। মক্কায় অবস্থানের কারণে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সুযোগ তাঁর হয়নি।

হযরত ইবনে হাজর (রঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী তিনি শুধুমাত্র একটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ১০ হিজরীতে প্রিয় নবী (সাঃ) হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর নেতৃত্বে একটি বাহিনী ইয়েমেন প্রেরণ করেন। এক রাওয়ায়েতে আছে

যে, হযরত আলী (রাঃ) ইয়েমেন থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় হযরত আবুল আছ (রাঃ)-কে সেখানকার গবর্ণর বানিয়ে দিয়েছিলেন।

হযরত আবুল আছ (রাঃ)-এর স্ত্রী হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অষ্টম হিজরীতে ওফাত পান। তাঁর ইন্তিকালে হযরত আবুল আছ (রাঃ) শোকে কাতর হয়ে পড়েন। কিন্তু অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দেন এবং সন্তানদের লালন-পালনে মশগুল হয়ে পড়েন। হযরত যয়নব (রাঃ)-এর ইন্তিকালের পর তিনি অন্য কোন মহিলাকে বিয়ে করেননি। এমনিভাবে তিনি তাঁর প্রতি নিবেদিত প্রাণ ছিলেন।

হাফিজ ইবনে আবদুল বার (রঃ) "আল-ইসতিয়াব" গ্রন্থে লিখেছেন, ১৩ হিজরীর যিলহজ্ব মাসে হযরত আবুল আছ (রাঃ) ইন্তিকাল করেন। কিন্তু তারিখে ইবনে মানদাহ ওয়াল আকমাল গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আবুল আছ (রাঃ) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর খিলাফতকালে ধর্মদ্রোহীদের উৎখাতে পুরোপুরি অংশ নিয়েছিলেন এবং মুসায়লামাহ কাজ্জাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামার লড়াইয়ে বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে শাহাদাতের পিয়ালা পান করেন। (এ ব্যাপারে আল্লাহই ভালোজানেন)।

হযরত যয়নব (রাঃ)-এর গর্ভে হযরত আবুল আছ (রাঃ)-এর দু' সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। ছেলেটির নাম ছিল আলী (রাঃ) এবং মেয়ের নাম ছিল উমামাহ (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) বিন আবুল আছ (রাঃ) রাসূলে (সাঃ)-এর সবচেয়ে বড় নাতি ছিলেন এবং তিনি তাকে খুব স্নেহ করতেন। তার ব্যাপারে তিন ধরনের রাওয়ায়েত পাওয়া যায়। প্রথম হলো তিনি শৈশবেই মারা যান। দ্বিতীয় রাওয়ায়েত হলো তিনি মায়ের দুধ পানের দু' বছর বনি গাজিরাহ গোত্রে কাটান। দুধ পানের সময় শেষ হলে রাসূল্লাহ (সাঃ) তাকে মদীনা মুনাওয়ারাহ চেয়ে নেন এবং স্বয়ং তার লালন-পালন করেন। তিনি হযরত যয়নব (রাঃ) এবং হযরত আবুল আছ (রাঃ)-এর নিকট থেকে তাকে চেয়ে নিয়ে ছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় রাসূল (সাঃ)-এর উটের ওপর তাঁর পিছনে এ আলী (রাঃ)-ই বসেছিলো। সে সময় তার বয়স ছিল ১৪-১৫ বছর।

পিতার জীবদ্দসায় যৌবনকালে তিনি মারা যান।

তৃতীয় রাওয়ায়েত হলো, তিনি ইয়ারমুকের যুদ্ধে (১৫ হিজরী) শাহাদাতের পিয়ালা পান করেন।

হযরত উমামাহ (রাঃ) বিনতে আবুল আছ (রাঃ) দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে খুব ভালোবাসতেন। একবার নাজ্জাশী (হাবশার বাদশাহ) একটি

আংটি হুযুর (সাঃ)-কে তোহফা হিসেবে প্রেরণ করেছিল। এ আংটি পেয়ে তিনি বললেন ঃ "যে আমার নিকট সব চেয়ে প্রিয় তাকেই এ আংটি দেব।"

এ কথা যারা শুনেছিল তাদের ধারণা হয়েছিল যে, তিনি আংটিটি হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ)-কে দেবেন। কিন্তু তার লক্ষ্য ছিল ছোটদের প্রতি। সুতরাং তিনি হযরত উমামাহ (রাঃ)-কে ডাকলেন এবং তার আঙ্গুলে পরিয়ে দিলেন। অন্যান্য রাওয়ায়েতে আংটির পরিবর্তে স্বর্ণের হারের কথা উল্লেখ রয়েছে। হারটি কেউ তোহফা হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। হুযুর (সাঃ) হযরত উমামাহ (রাঃ)-কে ডেকে এ হার তার গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন।

সহিহ বুখারী শরীফে আছে যে, হুযুর (সাঃ) হযরত উমামাহ (রাঃ)-কে এত অধিক স্নেহ করতেন যে, তিনি তাকে কোন কোন সময়ে মসজিদে নিয়ে যেতেন। একদিন তিনি তাঁকে কাঁধের ওপর চড়িয়ে মসজিদে উপস্থিত হলেন। তিনি এ অবস্থাতেই নামায পড়া শুরু করলেন। যখন রুকু ও সিজদায় যেতেন তখন শিশু উমামা (রাঃ)-কে আস্তে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিতেন যখন দাঁড়াতেন তখন পুনরায় কাঁধের ওপর বসিয়ে দিতেন। এভাবেই তিনি পুরো নামায আদায় করতেন।

অষ্টম হিজরীতে হযরত যয়নব (রাঃ) ওফাত পেলে হযরত উমামাহ (রাঃ) নানা (সাঃ)-এর অভিভাবকত্বে আসে। হুযুর (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর পিতা হযরত আবুল আছ তাঁর অভিভাবক হন। তিনি মৃত্যুর (শাহাদাত) পূর্বে হযরত উমামাহ (রাঃ)-কে হযরত যোবায়ের (রাঃ)-এর বিন আওয়ামের (মামাতো ভাই) অভিভাবকত্বে প্রদান করেন। হযরত ফাতিমাতুজ জোহরা (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পর তার ওছিয়ত মোতাবেক এবং হযরত যোবায়ের (রাঃ)-এর ইঙ্গিতে হযরত আলী (রাঃ) হযরত উমামাহ (রাঃ)-কে বিয়ে করেন। ৪০ হিজরীতে হযরত আলী (রাঃ) শাহাদাত প্রাপ্ত হলে মুগিরাহ বিন নওফিল (রাঃ) তাকে নিকাহ করেন এবং তাঁর জীবদ্দশাতেই ওফাত পান। কতিপয় রাওয়াত অনুসারে হযরত উমামাহ (রাঃ)-এর কোন সন্তান হয়নি। অনেকে বলেছেন, মুগিরাহর ঔরষে ইয়াহিয়া নামক এক পুত্র জন্ম নিয়েছিল।

হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ)

হযরত আবু খালিদ ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) একজন বাহাদুর মানুষ ছিলেন। বাতিলের মুকাবিলায় তিনি ছিলেন ইস্পাত কঠিন মনের অধিকারী। তরবারীর ঝনঝনানি দিয়ে তিনি রচনা করেছিলেন ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়। কুরাইশের সম্ভ্রান্ত শাখা বনু উমাইয়ার সাথে তিনি ছিলেন সম্পৃক্ত। তিনি কুরাইশের সেনাপতি আবু সুফিয়ান (রাঃ)-এর (বিন হারব বিন উমাইয়াহ বিন আবদি শামস বিন আবদি মান্নাফ বিন কুসাই) প্রিয় পুত্র ছিলেন। চরিতকাররা বলেছেন, আবু সুফিয়ান (রাঃ)-এর সব পুত্রের মধ্যে তিনি ছিলেন যোগ্য বাহাদুর, দরাজ দিল, এবং সুন্দর চরিত্রের অধিকারী। এ জন্যে মক্কাবাসীদের মধ্যে তিনি ইয়াযিদুল খায়ের উপাধিতে মশহুর হয়েছিলেন। উম্মুল মুমিনিনি হযরত 'উম্মে হাবিবাহ (রাঃ) হযরত ইয়াযিদ (রাঃ)-এর বৈমাত্রিয় (মা'র দিক থেকে সতালো) বোন ছিলেন। এভাবে তিনি প্রিয় নবী (সাঃ)-এর শ্যালক ছিলেন। আরবের বিজ্ঞজন আমীর মাবিয়া (রাঃ) তাঁর ছোট বৈমাত্রীয় ভাই ছিলেন। উম্মুল মুমিনিন হযরত উম্মে হাবিবাহ (রাঃ) নবী (সাঃ)-এর নবুয়াত প্রাপ্তির প্রথম যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আর এমনিভাবেই তিনি সাবিকুনাল আওয়ালুন অর্থাৎ প্রথম যুগের পবিত্র অগ্রগামী দলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। অবশ্য হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সাথে মক্কা বিজয়কালে (৮ম হিজরীর রামাদান মাস) ইসলাম গ্রহণ করেন। এ সত্ত্বেও তিনি জাহেলী যুগে মুসলমানদেরকে কখনো দুঃখ কষ্ট দেননি এবং নীচ বা হীন আচরণও করেননি।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) সর্বপ্রথম হুনাইনের যুদ্ধে (৮ম হিজরীর শওয়াল মাসে) অংশগ্রহণ করেন। বিজয়ের পর প্রিয় নবী (সাঃ) গণিমতের মাল বন্টন করলেন। এ সময় তিনি ৪০টি স্বর্ণ অথবা রৌপ্যমুদ্রা এবং একশ উট তাকে দিলেন। হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) "আল-ইসাবাহ"-তে উল্লেখ করেছেন যে, হুনাইনের যুদ্ধের পর হুযুর (সাঃ) হযরত ইয়াযিদ (রাঃ)-কে বনি ফারাসের, আমীর নিয়োগ করেছিলেন।

হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আবু সুফিয়ান বীরত্ব এবং ঔদার্যে নজীরবিহীন ছিলেন। কিন্তু তিনি অনেক বিলম্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ফলে নবী (সাঃ)-এর যুগে তিনি তাঁর তরবারীর শক্তিমত্তা প্রদর্শনের সুযোগ পাননি। বিশ্ব নবী (সাঃ)-এর ইন্তিকালের পর

হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) খলিফা নির্বাচিত হলেন। এ সময় ধর্মদ্রোহিতার ফিতনা সমগ্র আরবকে গ্রাস করে নিয়েছিল। রাসূল (সাঃ)-এর খলিফা (রাঃ) সংকল্পে ছিলেন পাহাড়ের মত অটল। কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি সে ফিতনা উৎখাত করে ছাড়লেন। এরপর তিনি রোম এবং ইরানের দিকে মনোযোগ দিলেন। সর্বপ্রথম তিনি সিরিয়ায় সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নিলেন। সে সময় সিরিয়া শাসন করতো রোমের বাদশাহ হিরাক্লিয়াস। হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) সমগ্র আরবে জিহাদের দুন্দুভি বাজিয়ে দিলেন। এ আহবানে সাড়া দিয়ে প্রত্যেক দিক থেকে মুজাহিদরা উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে মদীনা পৌছতে লাগলেন। যখন বহুসংখ্যক মানুষ একত্রিত হলো তখন হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) হযরত আবু ওবায়েদাহ (রাঃ) ইবনুল জাররাহ, হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ),হযরত শুরাহবিল (রাঃ) বিন হাসানাহ (রাঃ) এবং হযরত মায়াজ (রাঃ) বিন জাবাল আনসারীকে ডেকে পাঠালেন এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ "আমি তোমাদের ওপর সিরিয়ার জিহাদের দায়িত্ব সমর্পণ করতে চাই। যত সৈন্য একত্রিত হবে তা পৃথক পৃথকভাবে তোমাদের নেতৃত্বে রওয়ানা করাবো। জিহাদের ময়দানে একত্রিত হলে তোমাদের প্রধান সেনাপতি হবে আবু ওবায়েদা (রাঃ) ইবনুল জাররাহ । সে যদি না থাকে তাহলে ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) সমগ্র বাহিনীর নেতৃত্ব করবেন। এখন তোমরা যাও এবং সিরিয়া রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ কর।" কয়েকদিন পর যখন আরো মুজাহিদ মদীনা পৌছলেন তখন হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) সেনানিবাসে তাশরীফ নিলেন এবং হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ)-কে ঝাণ্ডা প্রদানপূর্বক রওয়ানার নির্দেশ দিলেন। হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে মদীনা মুনাওয়ারাহ থেকে রওয়ানা হলেন। এ সময় হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) পায়ে হেঁটে তার সাথে কিছু দূর পর্যন্ত গেলেন। হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে আরজ করলেন, "হে রাসূল (সাঃ)-এর খলিফা! হয় আপনিও ঘোড়ায় সওয়ার হোন, অথবা আমাকে সওয়ার থেকে নেমে হেঁটে চলার অনুমতি দিন। আপনি হেঁটে চলবেন আর আমি ঘোড়ায় চড়ে যাবো। এটা হয় না।"

হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) বললেনঃ "আমিও ঘোড়ায় চড়বো না, তোমাকেও ঘোড়া থেকে নামতে দেবো না। আমি যত কদম হাঁটবো তা আল্লার রাস্তায় হাঁটবো এবং আল্লাহ তার প্রতিদান দেবেন বলে আশা করবো।"

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ)-কে বিদায় জানালেন এবং এ ওসিয়ত করলেনঃ "আবু খালেদ! সিরিয়ার অনেক স্থানে তুমি দুনিয়াত্যাগী পাদরীদের সাক্ষাৎ পাবে। তাদেরকে নিজেদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেবে এবং কোন কষ্ট দেবে না। যুদ্ধে তুমি এমন সব লোকের

সামনা সামনি হবে যারা মাথার মধ্যখান থেকে চুল কাটে। তুমি এবং তোমার সাথীরা তাদের মাথার সেই স্থানেই তলোয়ার চালাবে। এছাড়া ১০টি ব্যাপারে বিশেষভাবে খেয়াল রাখবে। তাহলো মহিলা, শিশু এবং বৃদ্ধদের ওপর হাত তুলবে না। সবুজ বৃক্ষ কাটবে না, বস্তি বিরাণ করবে না, বিনা প্রয়োজনে বকরি এবং উট যবেহ করবে না, বৃক্ষে অগ্নি সংযোগ করবে না, কাউকে পানিতে ডুবিয়ে দেবে না, খেয়ানত করবে না এবং কাপুরুষতা প্রদর্শন করবে না।

এরপর তিনি হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ)-এর হাত ধরে মহাবাত্তের আবেগে বললেন, "ইয়াযিদ তোমাকে আল্লাহর হাওয়ালা করছি। তোমার ওপর আল্লাহর রহমত এবং শান্তি বর্ষিত হোক। তুমি আমার প্রথম সেনাপতি। (মদীনা মুনাওয়ারাহ থেকে বিদায় হচ্ছে)।"

মদীনা মুনাওয়ারাহ থেকে বিদায় হয়ে হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হলেন। ইত্যবসরে হযরত খালিদ (রাঃ) বিন ওয়ালিদও ইরাকের অভিযানসমূহ শেষ করে তার নিকট পৌছে গেলেন এবং উভয়ে সম্মিলিতভাবে সীমান্তবর্তী শহর বসরাহর ওপর হামলা করে বসলো। দূরের নাজার নামক রোমক সেনাপতি পাঁচ হাজার সৈন্যসহ মুসলমানের মুকাবিলা করলো। কিন্তু পরাজিত হয়ে পালিয়ে দুর্গে আশ্রয় নিল। অবশেষে জিযিয়া প্রদান এবং তার বিনিময়ে মুসলমানরা রোমকদের জানমালের নিরাপত্তা দানের শর্তে সে সন্ধি করলো।

হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ)-এর সিরিয়া আগমনের পর হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ), হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ), হযরত মায়াজ (রাঃ) বিন জাবাল ও হযরত শুরাহবিল বিন হাসানাহ (রাঃ)-কে সৈন্যসহ সিরিয়া রওয়ানা করে দিলেন। সেই সাথে আম্মানে অবস্থানরত আমর (রাঃ) ইবনুল আছকে সৈন্যসহ সিরিয়া পৌছার নির্দেশ দিলেন। এ সমস্ত বাহিনী সিরিয়ার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়লো। অন্যদিকে রোমের বাদশাহ সিরিয়ায় মুসলমান বাহিনীর অগ্রযাত্রার খবর পেল। খবর পেয়ে সে এক বিরাট বাহিনী মুসলমানদের মুকাবিলার জন্যে প্রেরণ করলো। এ বাহিনী ফিলিস্তিনের আজনাদাইন নামক স্থানে এসে তাঁবু ফেললো (ফিলিস্তিন সে যুগে সিরিয়ারই একটি অংশ ছিল)। রোমক বাহিনীর নেতৃত্ব সরদার তাজারক এবং কাবকালার নামক দু'জন নামকরা জেনারেল দিচ্ছিলো। মুসলমানরাও রোমকদের সৈন্য সমাবেশের কথা অবহিত হয়ে চারদিক থেকে একত্রিত হয়ে আজনাদাইন পৌছে গেল। হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) ইবনুল জাররাহ, হযরত খালিদ (রাঃ) বিন ওয়ালিদ

হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) ইবনুল আবু সুফিয়ান (রাঃ), হযরত শুরাহ বিল (রাঃ) বিন হাসানাহ (রাঃ) এবং হযরত আমর (রাঃ) ইবনুল আছ মুসলমানদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে ১৩ হিজরীর ২৮শে জমাদিউল আউয়াল রোমক এবং মুসলমানদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হলো। রোমকরা জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করলো, কিন্তু আবেগ উদ্দীপ্ত মুসলমানদের দ্রুত ও শাণিত হামলার সামনে তারা তিষ্টাতে পারছিল না এবং অবিলম্বে তাদের ওপর পরাজয়ের আলামত পরিস্ফুট হয়ে উঠলো। তাজারক ও কাবকালার নিজের বাহিনীকে খুব করে উৎসাহ দিলো এবং দীর্ঘক্ষণ হাল ধরে রাখলো। কিন্তু উভয়েই যখন মুসলমান জানবাজদের তরবারীর খোরাক হয়ে গেল তখন রোমকরা হিম্মতহারা হয়ে পড়লো এবং যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে গেল। এ যুদ্ধে তিন হাজার মুসলমান শাহদাতের পিয়ালা পান করলেন। অন্যদিকে রোমকদের নিহতের সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশী ছিল।

ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আজনাদাইনের শহীদদের মধ্যে হযরত আমর (রাঃ) ইবনুল আছের সহোদর হযরত হিশাম (রাঃ) ইবনুল আছও ছিলেন।

আজনাদাইনের যুদ্ধের পর মুসলমানরা সিরিয়ার সদর স্থান দামেস্কের দিকে অগ্রসর হলো এবং চারিদিক থেকে দামেস্ক অবরোধ করলো। শহরটির বড় বড় দরজায় সিরিয়ার বিভিন্ন প্রদেশ করতলগত করার জন্যে আগত অফিসারদের নিয়োজিত করা হলো। বস্তুত হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) ইবনুল জাররাহ বাবুল জাবিয়াহতে, হযরত শুরাহবিল (রাঃ) বিন হাসানাহ (রাঃ) বাবুল ফারাদিসে, হযরত আমর (রাঃ) ইবনুল আছ বাবে তুমায়, হযরত খালিদ (রাঃ) বিন ওয়ালিদ বাবুশ শারকে এবং হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) বাবে কিসানে নিয়োজিত হলেন।

এ অবরোধ দীর্ঘদিন পর্যন্ত (এক বর্ণনা অনুসারে ৬ মাস পর্যন্ত) অব্যাহত থাকলো। এ সময় হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) ওফাত পেলেন এবং হযরত ফারুক (রাঃ) খলিফা নির্বাচিত হলেন। তিনি এক পত্রের মাধ্যমে হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)-কে সিদ্দিকে আকবর (রাঃ)-এর মৃত্যুর খবর দিলেন। যে দূত এ পত্র নিয়ে গিয়েছিলেন তাকে তিনি হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)-এর নিকট থেকে বিশেষভাবে হযরত খালিদ (রাঃ) বিন ওয়ালিদ, হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ), হযরত আমর (রাঃ) ইবনুল আছ, হযরত সাঈদ (রাঃ) বিন যায়েদ এবং হযরত মায়াজ (রাঃ) বিন জাবালের অবস্থা জিজ্ঞেস

করার তাকিদ দিয়েছিলেন। বিশ্লেষণের পর হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) তাকে বললেন, এ সব ব্যক্তিত্ব নিজেদের রীতিনীতি এবং মুসলমানদের শুভ কামনায় তেমনি রয়েছেন যেমন তারা আমার এবং ওমর (রাঃ)-এর নিকট হওয়া উচিত। ছ'মাস অবরুদ্ধ থাকার পর দামেস্কের রোমক বাহিনীকে অস্ত্র সমর্পণে বাধ্য হতে হলো। কেননা, এক রাতে তাদের গাফলতির সুযোগ নিয়ে হযরত খালিদ (রাঃ) বিন ওয়ালিদ কতিপয় জীবন উৎসর্গকারীসহ শহরের প্রাচীরের ওপর চড়ে বসলেন। অভ্যন্তরের দিকে নেমে শহরের দরজা খুলে দিলেন। এদিকে ইসলামী বাহিনী প্রস্তুত ছিল। বানের পানির মত তারা শহরে ঢুকে পড়লো। রোমকরা সাধারণভাবে বাধা দিল। কিন্তু অবশেষে অস্ত্র ফেলে দিয়ে সন্ধির প্রস্তাব করে বসলো। হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) তাদের ওপর জিযিয়া আরোপ করে সন্ধি মঞ্জুর করলেন।

দামেস্কের বিজয়ের কারণে রোমকরা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লো এবং প্রত্যেক দিক থেকে একত্রিত হয়ে পুরো শক্তি সঞ্চয় করে মুসলমানদের মুকাবিলার জন্যে অগ্রসর হলো। আল্লামা তাবারী (রঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী ৪০ হাজার (অন্য বর্ণনায় ৮০ হাজার) রোমক হাইকালার নামক এ প্রখ্যাত জেনারেলের নেতৃত্বে জর্দানের বিসান শহরে তাঁবু ফেললো। হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) পরিস্থিতি অবগত হয়ে নিজেও সৈন্যসহ জর্দানের দিকে অগ্রসর হলেন এবং বিসানের বিপরীত ফাহাল নামক স্থানে তাঁবু ফেললেন। রোমকরা প্রথমে দূত প্রেরণ করে হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)-কে এ মর্মে প্রস্তাব পেশ করলো যে, যদি মুসলমানরা ফিরে যায় তাহলে তাদের প্রত্যেক সৈন্যকে দু' আশরাফী (স্বর্ণ মুদ্রা) করে দেয়া হবে। হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) তাদের এ প্রস্তাব তাচ্ছিল্য সহকারে প্রত্যাখ্যান করলেন এবং যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ালো। দূত ফিরে যাওয়ার পরদিন উভয় বাহিনীর মধ্যে রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হলো। রোমকরা জীবন দিয়ে মুকাবিলা করলো। কিন্তু মুসলমান জীবন উৎসর্গকারীরা অবিলম্বে তাদের ব্যূহ তুলো ধুনা করে ছাড়লো। অবশেষে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পালিয়ে গেল।

এ যুদ্ধের পর জর্দানের অন্যান্য সকল শহর এবং স্থান সহজেই বিজিত হলো। আল্লামা বালাজুরী (রঃ) "ফতুহুল বুলদান" গ্রন্থে লিখেছেন যে, জর্দান বিজয়ের পর হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) ইবনুল জাররাহ হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ)-কে উপকূলবর্তী এলাকায় প্রেরণ করলেন। তিনি হযরত আমর (রাঃ) ইবনুল আছের সাথে মিলিত হয়ে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ে তা করতলগত করলেন।

জর্দান এবং উপকূলীয় এলাকা পদানত করার পর হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) হেমস অভিমুখে রওয়ানা হলেন। এ সময় তিনি হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আবি সুফিয়ান (রাঃ)-কে দামেস্কে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে রেখে গেলেন।

রোমের বাদশাহ হিরাক্লিয়াস এ মর্মে খবর পেল যে, মুসলমানরা হেমসের ওপর হামলা করতে চায়। এ খবর পেয়ে সে জেনারেল তুজারের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী বাহিনী দামেস্কের দিকে রওয়ানা করে দিল। যাতে সে মুসলমানদেরকে হেমসের দিকে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারে। অন্য দিকে সম্ভব হলে দামেস্ক কবজা করে নেবে। তুজার দামেস্কের পশ্চিমে মারজুর রুম নামক স্থানে তাঁবু ফেললো। হিরাক্লিয়াস তার সাহায্যার্থে আরো একটি বাহিনী রওয়ানা করে দিল। এ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল সানাছ নামক এক রোমক জেনারেল। হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) তুজারের মুকাবিলার জন্যে হযরত খালিদ (রাঃ) বিন ওয়ালিদকে নিয়োগ করলেন এবং সানাছের মুকাবিলার জন্যে নিজে অগ্রসর হলেন।

হযরত ইয়াযিদ (রাঃ বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) দামেস্কে চুপচাপ বসে ছিলেন না। বরং পরিস্থিতির ওপর কড়া দৃষ্টি রাখছিলেন। তিনি তুজারের অভিপ্রায়ের কথা জানতে পেরে একদিন নিজের বাহিনীসহ দামেস্ক থেকে বের হলেন এবং তার মাথার ওপর গিয়ে পৌঁছুলেন। সে-ও লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত ছিল। উভয় বাহিনী যুদ্ধ ধ্বনি দিতে দিতে পরস্পরের ওপর হামলা করে বসলো। ঘোরতর লড়াইয়ের সময় হযরত খালিদ (রাঃ) বিন ওয়ালিদও নিজের বাহিনীসহ পৌঁছে গেলেন। তিনি রোমকদের পিছন দিক থেকে হামলা করে বসলেন। এভাবে উভয় দিক থেকে ইসলামী বাহিনী রোমকদের নাস্তানাবুদ করে ফেললো। অন্যদিকে হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) সানাছ বাহিনীকে পরাজিত করলেন এবং সামনে অগ্রসর হয়ে হেমস ঘেরাও করে নিলেন। হেমসবাসীরা অবিলম্বে আনুগত্য স্বীকার করলো। এরপর হুমাত, শিজার, মুয়াররাতুন, নুমান এবং লাজাকিয়াহও একের পর এক পদানত হলো।

একের পর এক পরাজয়ের কারণে রোমক বাদশাহ অত্যন্ত বিচলিত হলো। এ জন্য সিরিয়ার প্রতিটি স্থান থেকে মুসলমানদেরকে বিতাড়িত করার জন্যে সে ইন্তাকিয়ায় বিরাট সৈন্য সমাবেশ ঘটানোর সংকল্প করলো। এ বাহিনীতে বড় বড় অভিজ্ঞ সৈন্য এবং অফিসার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা যখন ইন্তাকিয়া থেকে রওয়ানা হলো তখন চারদিকে সাড়া পড়ে গেল। রোমাকদের এ হামলা প্রস্তুতির কথা হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) জানতে পেরে পরামর্শ পরিষদের বৈঠক আহবান করলেন। বৈঠকে মুসলমান দখলীকৃত শহরসমূহ থেকে সৈন্য অপসারণ

করে এক স্থানে সমবেত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। সিদ্ধান্তটি ছিল অত্যন্ত সুবিবেচনা প্রসূত এবং প্রজ্ঞাসম্পন্ন। কারণ এ পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র এভাবেই ভয়াবহ রোমক শক্তির মুকাবিলা সম্ভব ছিল। অধিকৃত হেমস, দামেস্ক প্রভৃতি শহর পরিত্যাগের সময় মুসলমানরা এত উন্নতমানের চারিত্রিক গুণাবলী প্রদর্শন করেছিল যা বিশ্ব ইতিহাসে এক নজীরবিহীন ঘটনা। আল্লাহর এ সব পবিত্র বান্দারা অধিকৃত শহর পরিত্যাগের সময় সেখানকার বাসীন্দাদেরকে জিযিয়ার অর্থ এ বলে ফেরত দিয়েছিলেন যে, বর্তমান অবস্থায় তারা আর তাদের নিরাপত্তা বিধান করতে পারছেন না। এ জন্যে জিযিয়া গ্রহণ তাদের জন্যে অবৈধ। মুসলমানদের এ কাজে খৃষ্টান এবং ইহুদীরা অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হলো এবং চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে আল্লার নিকট তারা যেন ফিরে আসে এ দোয়া করেছিলো।

মুসলমানরা সিরিয়ার অধিকৃত শহরগুলো পরিত্যাগ করে ইয়ারমুক পৌছলো এবং সেখানে মজবুতভাবে অবস্থান নিল। এখানেই সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ হয়েছিল এবং সিরিয়ার ভাগ্য স্থির হয়ে গিয়েছিল। ইসলামী বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল সর্বমোট ৩০ থেকে ৪০ হাজার। এর মোকাবিলায় রোমক সৈন্য সংখ্যা ছিল ২ থেকে ৩ লাখ। প্রথমে উভয় পক্ষ থেকে দূত বিনিময় শুরু হলো। রোমক সেনাপতি বাহান চাইলো যে মুসলমানরা অর্থ নিয়ে ফিরে যাক। কতিপয় ঐতিহাসিকের বর্ণনা মতে মুসলমান সেনাপতি দশ হাজার, প্রত্যেক অফিসার এক হাজার এবং প্রত্যেক সৈন্যকে সে একশ' দিনার দানের প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু মুসলমানরা এ প্রস্তাব গ্রহণ করলো না এবং যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ইসলামী বাহিনীর সৈন্য ব্যূহের বামদিকের অফিসার ছিলেন হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আবু সুফিয়ান। তিনি চরম বাহাদুরীর সাথে লড়াই করলেন। রোমকরাও প্রাণপণ লড়াই করলো এবং কয়েকবার মুসলমানদের ব্যূহ বিশৃংখল করে ফেললো। একবার তো তারা মুসলমানদেরকে হটাতে হটাতে মহিলাদের তাঁবু পর্যন্ত পৌছে গেল। ইসলামের মর্যাদাবান মহিলারা এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তাঁবুর বাইরে এসে গেলেন এবং তাঁবুর খুটি উচিয়ে রোমকদের ওপর হামলা করে বসলো। সে সময় হযরত আমর (রাঃ) বিন আবু সুফিয়ান, হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ), হযরত আমর (রাঃ) ইবনুল আস, হযরত সাঈদ (রাঃ) বিন যায়েদ, হযরত শুরাহবিল (রাঃ) বিন হাসানাহ (রাঃ) এবং হযরত কুবাছ (রাঃ) বিন আশিম এমন অকুতোভয়ে লড়াই করছিলেন যে, দুনিয়ার কোন কিছু সম্পর্কেই আর হুশ ছিল না। হঠাৎ করে হযরত ইয়াযিদ (রাঃ)-এর পিতা হযরত আবু সুফিয়ান সেদিকে এলেন। তিনি পুত্রকে

ডেকে বললেন প্রাণাধিক পুত্র। এ সময় একজন সিপাহী বাহাদুরীর চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছে। তুমি মুসলমানদের একজন সেনাপতি। সৈন্যদের তুলনায় তোমার ওপর বাহাদুরী প্রদর্শনের দায়িত্ব বেশী। আল্লাহকে বেশী ভয় কর। সব অবস্থাতেই তাঁর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ। তোমার সাথীদের মধ্যে তোমারই বেশী আখিরাতের সাফল্যের প্রচেষ্টা চালানো উচিত। যুদ্ধের মুসিবতসমূহ বরদাশত করছো। আজ যদি তোমার সৈন্যের মধ্য থেকে একজনও তোমার ওপরে বাজী নিয়ে যায় তাহলে তা হবে তোমার জন্যে অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার।"

হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) প্রথম থেকেই বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালাচ্ছিলেন। পিতার হুংকারে তিনি আরো বাহাদুরীর সাথে যুদ্ধ করতে লাগলেন। ইত্যবসরে কায়েস (রাঃ) বিন হাবিরাহ একটি সৈন্যদলসহ বিদ্যুৎবেগে রোমকদের পিছন থেকে হামলা করে বসলো। এ রণকৌশলে শত্রু বাহিনীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি হলো এবং তারা দিগ্বিদিকভাবে পলায়ন করলো। মুসলমানরা অনেক দূর পর্যন্ত রোমকদের ধাওয়া করে স্থানে স্থানে লাশের স্তূপ করেরাখলো।

এ যুদ্ধে মুসলমানদের পূর্ণ সফলতা এলো। আর এ যুদ্ধই সিরিয়ার ভাগ্যের প্রায় ফায়সালা করে দিয়ে দিল। হিরাক্লিয়াস পালিয়ে কাসতানতুনিয়া চলে গিয়েছিল। আর কোন দিন সিরিয়ার মাটিতে তার পা রাখার ভাগ্য হয়নি। এখন শহরের পর শহর দখলে আসতে লাগলো। এবং সিরিয়ার বেশীরভাগ অংশই মুসলামানদের করতলগত হলো। অতঃপর মুসলমানরা বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে অগ্রসর হলেন। এবং তা অবরোধ করা হলো। হযরত ওমর (রাঃ)–এর উপস্থিতিতে লিখিত সন্ধির ভিত্তিতে মুসলমানরা বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করলেন।

বাইতুল মুকাদ্দাস অবস্থানকালে একদিন হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)–কে বললেন, "আমীরুল মু'মিনীন, এখানে আমরা সবকিছুই পাচ্ছি। আল্লাহর রহমতে মুসলমানরা এখন সচ্ছল। আপনি যদি ভালো কাপড় পরিধান করেন, ভালো সওয়ারীতে সওয়ার হন এবং মুসলমানদেরকেও তা ব্যবহারের অনুমতি দেন তাহলে অন্যান্যের দৃষ্টিতে আপনার ও মুসলমানদের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে।"

হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, "না, এযিদ! আমি আমার সাদাসিধে জীবন পরিত্যাগ করবো না। আমি এটা চাই না যে, রোমকদের দৃষ্টিতে আমার ইজ্জত বৃদ্ধি পাক। আর আল্লার দরবারে আমার সম্মান কমে যাক।"

হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) চুপ হয়ে গেলেন এবং আমিরুল মুমিনীন (রাঃ) শেষ পর্যন্ত সাদাসিধে জীবনে অটল ছিলেন। তার এ সরল জীবন যাপন খৃষ্টানদেরকে প্রভূতভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। সন্ধিনামা স্বাক্ষরের কিছুদিন পর হযরত ওমর (রাঃ) মদীনা চলে গেলেন। ১৮ হিজরীতে ইসলামী বাহিনীতে মহামারী আকারে প্লেগ রোগ দেখা দিল। তাতে হাজার হাজার মুসলমান মৃত্যুমুখে পতিত হলো। তাদের মধ্যে সিরীয়ার আমীর হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) ইবনুল জাররাও ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) এ খবর পেয়ে হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)-এর স্থলে হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) বিন অবু সুফিয়ান (রাঃ)-কে সিরিয়ার গবর্ণর নিয়োগ করলেন এবং অবিলম্বে কাইসারিয়ার অভিযানে রওয়ানা হয়ে যাওয়ার জন্যে তাকে নির্দেশ দিলেন। হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) ১৭ হাজার মুজাহিদসহ কাইসারিয়া পৌছে শহর অবরোধ করলেন। অবরোধকালে তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন এবং তাই আমীর মাবিয়া (রাঃ)-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে দামেস্কে ফিরে এলেন। ১৮ অথবা ১৯ হিজরীতে এখানেই তিনি আল্লার ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে চলে যান। এক বর্ণনায় আছে যে, তাঁর জীবদ্দশাতেই আমীর মাবিয়া (রাঃ) কাইসারিয়া দখল করে নেন এবং তাকে খবর দেন। তিনি হযরত ওমর (রাঃ)-কে এ বিজয়ের খবর দিয়েছিলেন। অন্য বর্ণনা অনুসারে আমীর মাবিয়া তার মৃত্যুর পর এ অভিযানে সফল হয়েছিলেন। যা হোক হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) সিরিয়ার বিজয়সমূহের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিশেষ ভূমিকা পালন করেন এবং নিজের বীরত্ব ও স্থৈর্যের আমোছনীয় ছাপ ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

—০—

হযরত ওবায়দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)

হযরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) উম্মার জ্ঞানের সাগর হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)-এর সহোদর ছিলেন। তিনি নবী (সাঃ)-এর হিজরতের একবছর পূর্বে (নবুয়ত প্রাপ্তির ১২ বছরে) জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম হাকিম "মুসতাদরাকে হাকিমে" লিখেছেন হযরত আব্বাস সন্তানদের মধ্যে তাকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতেন। বিশ্বনবী (সাঃ)-এর শ্রদ্ধেয় চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর সন্তানদেরকে খুব ভালেবাসতেন এবং তিনি তাদেরকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

প্রিয় নবী (সাঃ) বহুবার আবদুল্লাহ (রাঃ), ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) এবং কাছির (রাঃ)-কে ডেকে পাঠাতেন এবং তাদেরকে বলতেন, তোমাদের মধ্যে যে দৌড়ে সর্বপ্রথম আমাকে স্পর্শ করতে পারবে তাকে আমি অমুক জিনিস দেবো। তিন ভাই, দৌড়ে তাঁর দিকে যেতো। কেউ তাঁর বুকের ওপর চড়ে বসতো। কেউ পিঠের ওপর উঠে বসতো। তিনি সবাইকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন এবং খুব আদর করতেন।

হযরত আব্বাস (রাঃ) ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পূর্বে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন এবং পরিবার-পরিজনসহ মক্কা থেকে হিযরত করে মদীনা আগমন করেন। সে সময় হযরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)-এর বয়স ৯ বছরের মত ছিল। তিনি নিজের ভাইদের সাথে সময় সময় রাসূল (সাঃ)-এর খেদমতে যেতেন এবং নবী (সাঃ)-এর ফয়েজ লাভ করতেন। রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের পর (১১ হিজরী) হযরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)-এর পিতা হযরত আব্বাস (রাঃ) এবং মাতা হযরত উম্মুল ফজল যবাবাহ (রাঃ)-এর জ্ঞান ও ফজিলত থেকে উপকৃত হতে থাকেন। তিনি বড় ভাই হযরত আবদুল্লাহ বিন-আব্বাস (রাঃ)-এর জ্ঞানের গভীরতার খুব প্রশংসা করতেন। হাফিজ ইবনে আবদুল বার (রঃ) "আল-ইসতিয়াব" গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর প্রসঙ্গে তাঁর এ মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেনঃ

"আমি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে বড় সুন্নাহর আলেম, তাঁর থেকে বেশী সঠিক মতের এবং তাঁর চেয়ে বড় সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন কাউকেই দেখিনি।"

তিনি নিজের এক পুত্র আবদুল্লাহ (রঃ)-কে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)-এর শাগরেদ বানিয়ে দিয়েছিলেন।

হযরত আলী (রাঃ) ৩৫ হিজরীতে খলিফা নির্বাচিত হলেন। এ সময় তিনি হযরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) বিন আব্বাস (রাঃ)-কে ইয়েমেনের গবর্ণর নিযুক্ত করলেন। অতঃপর ৩৬ ও ৩৭ হিজরীতে তাঁকে আমীরে হজ্ব নিয়োগ করেন এবং উভয় বছরেই তাঁর নেতৃত্বে হজ্ব কাজ সমাধা করা হয়।

৪০ হিজরীতে সিরিয়ার গবর্ণর আমীর মাবিয়া (রাঃ) বাছার বিন আবি আরতাতকে হেজাজ এবং ইয়েমেন দখলের জন্যে প্রেরণ করলেন। কোন বাধা ছাড়াই সে মক্কা-মুয়াজ্জমা ও মদীনা-মুনাওয়ারা দখল করে নিলেন এবং ইয়েমেনের দিকে অগ্রসর হলেন। হযরত আলী (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে এখানে হযরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) ইমারাতের দায়িত্ব পালন করছিলেন।

হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ) অত্যন্ত গোপনভাবে হযরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)-কে খবর দিলেন যে, বাছার বিন আরতাত ইয়েমেনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ইয়েমেন দখল করে জনসাধারণের নিকট থেকে সে আমীর মাবিয়া (রাঃ)-এর বাইয়াত নেয়ার ইচ্ছা পোষণ করে। যারা বাইয়াত করার প্রশ্নে ইতস্তত অথবা বাধা দান করে সে তাদেরকে নির্দয়ভাবে হত্যা করে। হযরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)-এর নিকট এত সৈন্যবল ছিল না যে, সে বাছার বিন আরতাতের মুকাবিলা করে। তিনি স্বয়ং খিলাফতের দরবারে গিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করাকেই সঠিক মনে করলেন। বস্তুতঃ তিনি আবদুল্লাহ বিন আবদুল মাদানকে ইয়েমেনে নিজের নায়েব বানিয়ে কূফা রওয়ানা হয়ে গেলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে বাছার ইয়েমেন দখল করে নিলো এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর সমর্থকদের এক বিরাট অংশকে হত্যা করলো। হযরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)-এর পরিবার-পরিজন ইয়েমেনেই ছিলেন। পাষাণ হৃদয় বাছার তাঁর অপ্রাপ্ত বয়স্ক দু'শিশুকে তাদের মায়ের সামনে ধরে হত্যা করলো। হযরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) নিজের নিষ্পাপ শিশুদের শাহাদাতের খবর পেয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। কিন্তু অত্যন্ত ধৈর্য ও সাহসিকতার পরিচয় দিলেন এবং আল্লার সন্তুষ্টির নিমিত্তে মাথা নত করে নিলেন। হযরত আলী (রাঃ) বাছার বিন আরতাতের যুলুম-নির্যাতনের খবর পেলেন। তিনি তাকে উৎখাত করার জন্যে সৈন্য একত্রিত করতে শুরু করলেন। কিন্তু প্রস্তুতি শেষ না হতেই ইবনে মালজামের বিষ মাখা

তীর তাঁকে শহীদ করে ফেললো। আর এ সাথেই শাসন ক্ষমতার বাগডোর উল্টে গেল। এ লোমহর্ষক ঘটনার পর হযরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) একাকীত্ব অবলম্বন করলেন এবং অবশিষ্ট জীবন চুপ চাপ কাটিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর বছর সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। অবশ্য হাফিজ ইবনে আবদুল বার (রঃ) "আল - ইসতিয়ার" গ্রন্থে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, তিনি ৫৮ হিজরীতে পরপারে যাত্রা করেন।

হাদীসের কিতাবে হযরত ওবায়দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত কতিপয় হাদীস মওজুদ রয়েছে। এ সব হাদীস তিনি নিজের পিতা হযরত আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসের সনদে তার সন্তান আবদুল্লাহ (রঃ) এবং মশহুর তাবেয়ী ইবনে সিরীন (রঃ) রয়েছেন।

নেতৃত্বস্থানীয় চরিতকাররা বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) যেমন জ্ঞানের বাদশাহ ছিলেন তেমনি হযরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) বিন আব্বাস নজীরবিহীন দানশীল ছিলেন। তাঁর দস্তরখান অত্যন্ত প্রশস্ত ছিল। এখান থেকে প্রত্যেক গরীব, মিসকিন এবং অভাবী লোকের উপকৃত হওয়ার প্রকাশ্য অনুমতি ছিল। এভাবে অসংখ্য গরীব এবং মিসকিন তাঁর দস্তরখানে লালিত-পালিত হতো। প্রত্যেকদিন একটি করে উট জবেহ করা তাঁর একটি সাধারণ নিয়ম ছিল।

একবার হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) তাঁকে এত দাতাগিরী বন্ধের পরামর্শ দিয়ে বললেন, কতদিন পর্যন্ত আর এ বদান্যতা অব্যাহত রাখতে পারবেন? হযরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) ভাইকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু তাঁর এ পরামর্শ মোটেই পছন্দ হলো না। কেননা বদান্যতা এবং দাতাগিরী তাঁর চরিত্রের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। যেদিন হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁকে সেই পরামর্শ দিয়েছিলেন সেদিন থেকেই তিনি দস্তরখানের জন্যে একটির পরিবর্তে দু'টি করে উট জবেহ করতে লাগলেন।

হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু নিজের খিলাফতকালে দু'ভাইকে ভিন্ন ধরনের দায়িত্ব সমর্পণ করেন। এ সময় তাঁকে মদীনা মুনাওয়ারা অবস্থান ত্যাগ করতে হয়। এ সত্ত্বেও তিনি যখন মদীনায় একত্রিত হতেন তখন আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর নিকট জ্ঞান পিপাসুদের ভীড় জমে যেত। পক্ষান্তরে হযরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)-এর নিকট গরীব ও অভাবগ্রস্তদের লাইন পড়তো ইবনে আছির (রঃ) "উসদুল গাবাহ" গ্রন্থে তাঁর দানশীলতার এক

চমকপ্রদ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। একবার হযরত ওবায়দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) নিজের গোলামসহ কোথায়ও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে গেল। নিকটেই এক বুদ্দুর ঘর দেখা গেল। গোলাম বললো, অন্ধকারে সফর করা ভীতির ব্যাপার। কোথাও আমরা রাস্তা ভুলে যেতে পারি। ঐ বুদ্দুর বাড়ীতে রাতে অবস্থান করাটাই যুক্তিযুক্ত। হযরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ চলো, বাড়ীর মালিকের নিকট থেকে অনুমতি নেয়া যাক। উভয়েই বুদ্দুর নিকট গেলেন এবং বললেন, ভাই আজ রাতে আমরা তোমার মেহমান। হযরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) অত্যন্ত লম্বা দেহী ও সুদর্শন মানুষ ছিলেন। বুদ্দু নিজের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অনুভব করতে পারলেন যে, নিশ্চয়ই সে কোন সম্মানিত ব্যক্তি। সে অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে তাঁকে আহলান, সাহলান ও মারহাবা বা খোশ আমদেদ জানালেন এবং বাড়ীর অভ্যন্তরে গিয়ে নিজের স্ত্রীকে বললেন, আজ এক সম্মানিত ব্যক্তি আমাদের বাড়ীতে অবস্থান করবে। খানা-পিনার জন্যে কি কিছু আছে? জবাবে সে বললো, খানা-পিনার জন্যে অন্য কোন বস্তুতো নেই। অবশ্য এ বকরী রয়েছে। আর বকীরীটির দুধের ওপরই তোমার শিশুর জীবন নির্ভরশীল। বুদ্দু বললো, যাই হোক আমি বকরী জবেহ করে মেহমানকে খাওয়াবো। স্ত্রী বললো, নিষ্পাপ শিশুকে কি মেরে ফেলবে? বুদ্দু বললো, যা হবার তাই হবে। মেহমানকে অভুক্ত রাখা যাবে না। বস্তুতঃ বকরী জবেহ করে হযরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) এবং তাঁর গোলামকে সে খাবার খাওয়ালো। হযরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) স্বামী-স্ত্রীর আলাপ-আলোচনা শুনে ছিলেন। সকালে ঘুম থেকে জেগে গোলামকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার তহবিলে কত আছে? সে বললো, পাঁচশ' দিনার। তিনি পাঁচশ দিনারই বুদ্দুকে দিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। গোলাম বললো, সুবহান আল্লাহ হে আমীর। সেতো আমাদেরকে পাঁচ দিরমহামের বকরী খাইয়েছে। আর আপনি তাকে পাঁচশ' দিনার দিচ্ছেন?

হযরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "আফসোস, তোমার বুদ্ধির! আল্লাহর কসম! এ গরীব মেজবান আমাদের থেকেও অনেকাংশে হৃদয়বান। আমরাতো আমাদের সম্পদ থেকে খুব নগণ্য একটি অংশ তাকে দিচ্ছি। আর সে নিজের কলিজার টুকরো কোরবাণী করে নিজের সমস্ত সম্পদ আমাদের সামনে উপস্থিত করেছে। (অর্থাৎ বকরীটিই তার একমাত্র সম্বল ছিল। তা জবেহ করে আমাদেরকে খাইয়ে দিয়েছে) এবং একমাত্র দুগ্ধপোষ্য শিশুর জীবনেরও পরওয়া করেনি।

একথায় গোলাম চুপ মেরে গেল এবং সে কৃতজ্ঞতার সাথে এ অর্থ বুদ্দুকে দিয়ে দিল।

হযরত যবরকান (রাঃ) বিন বদর তামিমী সা'দী

প্রিয় নবী (সাঃ)-এর প্রত্যেক সাহাবীই এমনিতেই ছিলেন সিরত এবং সুরতে সুন্দর ও সুদর্শন। কিন্তু আল্লাহ পাক কিছু কিছু সাহাবীকে অসাধারণ সুন্দর চেহারা প্রদান করেছিলেন। হযরত যবরকান (রাঃ) ছিলেন এ ধরনের সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি আরবের মশহুর কবিলাহ বনু তামিমের শাখা বনু সায়াদের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পুষ্প নিংড়ানো লাল রং এবং সুন্দর গণ্ডের জন্যে তিনি "মাহে নজদ" উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। নিজের গোত্রের লোকজন তাঁর প্রতি খুবই অনুরক্ত ছিলো। কিন্তু অপরিচিত কোন ব্যক্তি তাঁকে দেখা মাত্র থ' মেরে যেতেন। এ কারণেই তিনি যখন দেশের বাইরে যেতেন তখন চেহারার ওপর কাপড় বেঁধে নিতেন। যাতে তাঁর সুন্দর চেহারা দেখে কেউ ফিতনায় না পড়ে যায়। হযরত যবরকানের (রাঃ)-এর কুনিয়ত বা পারিবারিক পদবী ছিল আবু আয়াশ এবং আসল নাম ছিল হোসাইন। কিন্তু তিনি ইতিহাসে যবরকান উপাধিতে মশহুর হন। তাঁর নসবনামা হলোঃ যবরকান (রাঃ) বিন বদর বিন ইমরুল কায়েস বিন খালফ বিন বাহদিলাহ বিন আওফ বিন কায়াব বিন যায়েদ মানাত বিন তামিম।

হযরত যবরকান (রাঃ)-এর পিতৃপুরুষরা কোন এক সময় বনু তামিমের বাদশাহ ছিলেন। বস্তুতঃ শাহী বংশের সদস্য হওয়ার কারণে স্বগোত্রে তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখা হতো। রাসূল (সাঃ)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির সময় তিনি "বনু সায়াদের" নেতা ছিলেন। এটা সেই গোত্র যার সাথে হুযুর (সাঃ)-এর ধাত্রী মাতা বিবি হালিমার সম্পর্ক ছিল। হযরত যবরকান (রাঃ) শুধুমাত্র একটি গোত্রেরই নেতা ছিলেন না বরং একজন শক্তিশালী কবিও ছিলেন এবং বনি তামিমের কবিদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন। বনু তামিম দীর্ঘকাল যাবত সিংহাসনের অধিকারী ছিল। এজন্য তাদের মস্তিষ্কে বংশীয় গৌরব ও অহমিকা পুরোপুরিই বিদ্যমান ছিল। এ অহমিকাবোধই তাদেরকে পুরো ২১ বছর পর্যন্ত ইসলাম থেকে বিমুখ করে রেখেছিল। কিন্তু অবশেষে সময় এসে গেল। আরবের অন্যান্য গোত্রের মত বনু তামিমও নবী (সাঃ)-এর সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হলো।

মক্কা বিজয় এবং হুনাইনের যুদ্ধের পর (অষ্টম হিজরী) সকল অমুসলিম গোত্রের ওপর হক বা সত্যের ভীতি ছেয়ে গেল এবং আরবের প্রতিটি এলাকা থেকে বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিদল ইসলাম গ্রহণের নিমিত্তে রাসূল (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হতে লাগলো। নবম হিজরীতে এত প্রতিনিধি দল এলো যে, এ বছরকে "প্রতিনিধির বছর" বলা হতো। বনু তামিমও ৭০-৮০ জনের একটি প্রতিনিধি দল সে বছর মদীনা প্রেরণ করে। এ প্রতিনিধিদলে তামিম গোত্রের (বিভিন্ন শাখার) বড় বড় নেতা, অনলববী বক্তা এবং উচুমানের কবি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত যবরকান (রাঃ) বিন বদরও এ দলের একজন সদস্য ছিলেন। বনু তামিমের প্রতিনিধি দলের মদীনা আগমনের ব্যাপারে মশহুর রাওয়ায়েত হলো যে, তারাও অন্যান্য প্রতিনিধি দলের মত আনুগত্য প্রকাশের জন্য রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে হাজির হলো। তবে, এটা পৃথক কথা যে, এ ব্যাপারে প্রতিনিধি দলটি কতিপয় অযৌক্তিক শর্ত আরোপ করেছিলো। কিন্তু অন্য এক বর্ণনায় এও বলা হয়েছে যে, [যা ইমাম বুখারী (রঃ) এবং হাফিজ ইবনে কাইয়েম (রঃ) বর্ণনা করেছেন] নবম হিজরীর মুহাররম মাসে হুযুর (সাঃ) বনু তামিমের শাখা বনু আম্বরকে উৎখাতের জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। কেননা তারা স্বয়ং খিরাজ আদায়ে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল এবং অন্যান্য গোত্রকেও তা আদায় করতে নিষেধ করেছিল। বনু আম্বরের লোকজন ইসলামী বাহিনী দেখে পালিয়ে গেল। মুসলমানরা তাদের ৬২ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে মদীনা নিয়ে এলো। বনু তামিম এসব কয়েদীকে মুক্ত করার জন্যে আকরা বিন হাবিছের নেতৃত্বে বাছাই করা লোকদের একটি দল মদীনা প্রেরণ করলো। ঘটনা যাই হোক, সকল চরিতকারই এ ব্যাপারে একমত যে, এ দল অত্যন্ত ঠাট বাটের সাথে মদীনা এসেছিল। তাফসীরে "মুয়াহিবুর রহমানে" (মৌলবী সাইয়েদ আমীর আলী) প্রতিনিধি দলের নেতা আকরা' বিন হারিছের একটি উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। এ উক্তিতে তিনি বলেছেন, "সে সময় আমার মধ্যে জাহেলিয়াত এবং গ্রাম্যতা দোষ বিদ্যমান ছিল এবং আমি বেআদবীর সাথে রাসূল (সাঃ)-এর সামনে পৌঁছে চেঁচিয়ে বললাম, হে মুহাম্মাদ (সাঃ) বাইরে বেরিয়ে আমাদের কাছে এসো।"

তাদের এ বেয়াদবী রাসূল (সাঃ)-এর নিকট অসহ্য লেগেছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন আপাদমস্তক দয়ার সাগর। বাইরে এসে, তিনি তাদের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করলেন। আকরা (রাঃ) বললেন, "মুহাম্মাদ (সাঃ)! খোদার কসম, আমি সেই ব্যক্তি যার প্রশংসা মানুষের ইজ্জত বৃদ্ধি করে এবং আমার ভৎর্সনা মানুষকে কালিমালিপ্ত করে।" হুযুর (সাঃ) বললেন, "এটাতো আল্লাহর কাজ"। আকরা এতেও চুপ না হয়ে বললেন, "আমরা সবচেয়ে বেশী সম্মানিত।" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, " তোমাদের চেয়ে বেশী

সম্মানিত ছিলেন ইউসুফ (আঃ) বিন ইয়াকুব (আঃ) "। আকরা এবার তার প্রকৃত রূপ প্রকাশ করে বললো,"মুহাম্মাদ (সাঃ) ! আমরা তোমার ওপর ফখর করতে চাই। তোমাদের কবি এবং বাগ্মীদেরকে আমাদের কবি ও বাগ্মীদের বিরুদ্ধে মোকাবিলার অনুমতি দাও।" ইবনে আছিরের (রঃ) বক্তব্য অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন, "আমি অহমিকা প্রকাশ এবং কাব্যগিরির জন্য আগমন করিনি। যদি তোমরা এজন্যেই এসে থাকো তাহলে তোমাদের কাজ করো। আমরা তার জবাব দেবো।"

আকরা নিজের দলের সদস্য আতারদ বিন হাজিবকে ইঙ্গিতে বক্তৃতা করার নির্দেশ দিলেন। আতারদ একজন অনলবর্ষী বক্তা ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে অত্যন্ত সুন্দর ও সুললিত ভাষায় বনু তামিমের মর্যাদা, ধন-সম্পদ, উচ্চ বংশ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, বাহাদুরী, দানশীলতা এবং মেহমানদারীর উল্লেখ করে বক্তৃতা করলেন। তার বক্তৃতা শেষ হলে হুযুর (সাঃ) হযরত ছাবিত (রাঃ) বিন কায়েস আনসারীকে আতারদের বক্তৃতার জবাব দানের নির্দেশ দিলেন। হযরত ছাবিত (রাঃ) দাঁড়িয়ে প্রথমে আল্লাহ তায়ালার হামদ বা প্রশস্তি প্রকাশ করলেন। অতঃপর রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর নবুয়াত প্রাপ্তি, তাঁর দাওয়াত, কুরআন অবতীর্ণ হওয়া এবং মুহাজির ও আনসারদের ফজিলত এমন সুন্দরভাবে এবং প্রভাবশালী ভাষায় বর্ণনা করলেন যে, সমগ্র মজলিশ নীরব হয়ে গেল।

এর পর বনু তামিমের পক্ষ থেকে যবরকান বিন বদর কাব্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলেন এবং নিজের কওমের প্রশংসায়, এক শক্তিশালী কাসিদাহ আবৃত্তি করলেন।

হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) "ইসাবাহ"-তে লিখেছেন যবরকানের কবিতা শুনে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "ইন্না মিনাল বায়ানি লা সিহরা" অর্থাৎ কিছু কিছু বক্তৃতায় যাদু থাকে। কবিতা পাঠ শেষে যবরকান বসে গেলে প্রিয় নবী (সাঃ) হযরত হাসান বিন ছাবিত (রাঃ)-কে জবাব দানের নির্দেশ দিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে শক্তিশালী ও কাব্যরসে সুসমন্বিত এমন কবিতা আবৃত্তি করলেন যে, বনু তামিম গোত্রের প্রতিনিধিরা থ মেরে গেলেন এবং প্রতিনিধি দলের নেতা আকরা' বিন আবিছের মুখ দিয়ে অবলীলাক্রমে বেরিয়ে এলোঃ

"পিতার কসম! মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বক্তা আমাদের বক্তার চেয়ে উত্তম এবং মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর কবি আমাদের কবির চেয়ে ভালো। তাদের কণ্ঠস্বর আমাদের

কণ্ঠস্বর থেকে হৃদয়গ্রাহী এবং মিষ্টি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, শুধুমাত্র এক আল্লাহই ইবাদাতের উপযুক্ত এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল।

প্রতিনিধি দলের সকলেই একবাক্যে তার সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করলেন এবং সবাই কালেমায়ে শাহাদাত পড়ে নিজেদের হাত রহমতে আলম (সাঃ)-এর পবিত্র হাতে রাখলেন। সাথে সাথে হযরত আকরার সুপারিশে হুযুর (সাঃ) বনু আম্বরের সকল কয়েদীকে মুক্ত করে দিলেন।

এ প্রতিনিধি দল মদীনা থেকে প্রত্যাবর্তন করতে লাগলো। এ সময় প্রিয় নবী (সাঃ) যবরকান (রাঃ) বিন বদরকে নিজের পক্ষ থেকে বনু সায়াদের আমীর নিযুক্ত করলেন। সম্ভবতঃ জাহেলী যুগে তার যে সম্মান ছিল ইসলাম গ্রহণের পরও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তা বহাল রাখলেন।

বিশ্ব নবী (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) খিলাফতের আসনে সমাসীন হলেন। এ সময় সমগ্র আরবে ধর্মদ্রোহিতার আগুন প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো। আনসার, কুরাইশ এবং বনু ছাকিফ ছাড়া আরবের এমন কোন গোত্র ছিল না যে, এ ফিতনায় প্রভাবিত হয়নি। বনু তামিমের অনেক শাখাই ধর্মদ্রোহের দাবানলে এলো এবং যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানালো। কিন্তু হযরত যবরকান (রাঃ) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে হকের ওপর দণ্ডায়মান রলেন এবং স্ব-গোত্র বনু সায়াদকেও এ ফিতনা থেকে রক্ষা করলেন। ইবনে আছির (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সে ঘনঘটা পূর্ণ দুর্যোগের সময়ও যথারীতি নিজের কবিলা থেকে যাকাত আদায় করে খিলাফতের দরবারে প্রেরণ করেছিলেন। খলিফাতুর রাসূল হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) তার ইখলাস এবং দৃঢ়তায় খুশী হয়ে তার মান ও মর্যাদা বহাল রেখেছিলেন।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর খিলাফতকালেও হযরত যবরকান (রাঃ) বনু সায়াদের নেতৃত্বে সমাসীন ছিলেন। একবার তিনি যাকাতের অর্থ নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারাহ আসছিলেন পথিমধ্যে প্রখ্যাত কবি হাতিয়ার সাথে সাক্ষাত হলো। আলোচনাকালে হাতিয়া জানালো যে, মরুর জীবনে তার নাভিশ্বাস উঠেছে। এখন সে ইরাক যাচ্ছে। সেখানকার নিয়ামতসমূহ দিয়ে উপকৃত হতে চায়। হযরত যবরকান (রাঃ) আরাম আয়েশের জীবন পছন্দ করতেন না এবং মরুর সাদাসিধে জীবনকে অগ্রাধিকার দিতেন। তিনি হাতিয়াকে ইরাক গমনে বাধা দিলেন এবং প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত তাকে তাঁর বাড়ীতে মেহমান হিসেবে অবস্থানের কথা বললেন। হাতিয়া সে সময় তাঁর কথা মেনে

নিলেন। কিন্তু তার অন্তরে হযরত যবরকান (রাঃ) সম্পর্কে খারাপ ধারণা বদ্ধমূল হলো। সে ভাবলো যে যবরকান (রাঃ) কাব্য সম্পর্কিত তার আশা-আকাংখা ধূলিস্মাৎ করে দিয়েছে। সুতরাং সে তার সম্পর্কে ব্যঙ্গ কবিতা লিখে ফেললো। হযরত যবরকান (রাঃ) চাইলে জবাব দিতে পারতেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তিনি এ ধরনের বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এজন্যে তিনি খিলাফতের দরবারে হাতিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করাটাকেই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। হাতিয়ার কবিতা ছিল রূপক ধরনের। বাহ্যতঃ তা বিদ্রূপাত্মক ছিল না। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) হযরত যবরকান (রাঃ)-এর অভিযোগে দোদুল্যমান অবস্থায় নিপতিত হলেন। এবং তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কবি হযরত হাসসান বিন ছাবিত (রাঃ)-এর মত চাইলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, হাতিয়ার কবিতা ব্যাঙ্গাত্মক কিনা। তিনি সিদ্ধান্ত দিলেন যে, কবিতাটি ব্যাঙ্গাত্মকই। এর পর হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) হাতিয়াকে গ্রেফতার করালেন।

হাফিজ ইবনে আবদুল বার (রঃ) "ইসতিয়াবে" লিখেছেন, কিছুদিন পর হযরত যোবায়ের (রাঃ), ইবনুল আওয়াম এবং হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বিন আওফ হাতিয়ার মুক্তির সুপারিশ করলেন। হযরত ওমর (রাঃ) এ সব মহান সাহাবী (রাঃ)-কে খুব মান্য করতেন। তিনি তাদের সুপারিশ মেনে নিলেন এবং হাতিয়াকে ভবিষ্যতের জন্য তওবাহ করিয়ে মুক্ত করে দিলেন।

হযরত যবরকান (রাঃ) হক কথনে অত্যন্ত পারঙ্গম ছিলেন। হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) বর্ণনা করেছেন, আমীর মাবিয়া (রাঃ)-এর শাসনকালের নামকরা গবর্ণর যিয়াদ বিন আবিহ একবার মানুষের ওপর নির্যাতন চালালো। তিনি তার কাছে গমন করলেন এবং প্রকাশ্যে বললেন যে, তোমার নির্যাতনে জনগণ অতীষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এ কাজ থেকে তুমি বিরত হও।

হযরত যবরকান (রাঃ)-এর মৃত্যু সন সম্পর্কে ইতিহাসবিদরা নীরব। অবশ্য আমীর মাবিয়া (রাঃ)-এর শাসনকাল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। ইবনে আছির (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি যদি কখনো মক্কা মুয়াজ্জামা গমন করতেন তাহলে নিজের চেহারার ওপর কাপড় বেঁধে নিতেন। যাতে তাঁর অনিন্দসুন্দর চেহারার ওপর মানুষের দৃষ্টি না পড়ে।

• • •

হযরত জারুদ (রাঃ) বিন আমর আবদী

ষষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সাঃ) চার পাশের বাদশাহ এবং রইসদের নামে ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্র প্রেরণ করেন। এ ধরনের একটি পত্র বাহরাইনের শাসক মানযার বিন সাওয়ার নামেও প্রেরণ করা হয়। হযরত আলী (রাঃ) বিন আবদুল্লাহ হাজরামী পত্রটি বহন করে নিয়ে যান। পত্রটির কারণে মানযার খুব প্রভাবিত হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। তার হাতেই বিরাট সংখ্যক বাহরাইনবাসী ইসলাম কবুল করেন। আরবের মশহুর কবিলাসহ আবদুল কায়েস বাহরাইনে বসবাস করতো। এ গোত্র ছিল খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী। বাহরাইনে ইসলামের শুভ পদার্পণে গোত্রটির কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করলেও অবশিষ্টরা নিজেদের ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

অষ্টম হিজরীতে মক্কায় ইসলামের পতাকা উড্ডীন হলে ইসলামের শত্রুরা ভীত বিহ্বল হয়ে পড়ে এবং আরবের আনাচে-কানাচে থেকে বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিদল আনুগত্য প্রকাশের জন্য রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে হাজির হতে থাকেন। ন' অথবা দশ হিজরীতে আবদুল কায়েস গোত্রের খৃষ্টানরাও একটি প্রতিনিধিদল মদীনা মুনাওয়ারাহ প্রেরণ করে। ইবনে সায়াদ (রঃ)-এর বক্তব্য অনুসারে এ দলটি ২০ সদস্য এবং হাফিজ ইবনে হাজার আসাকালানী (রঃ)-এর মত অনুযায়ী তা চল্লিশ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত ছিল। প্রতিনিধিদলটি নবী (সাঃ)-এর খিদমতে হাজির হলে দলনেতা সামনে অগ্রসর হয়ে আরজ করলো ঃ "হে মুহাম্মাদ! আমি প্রথম থেকেই ঐশী খৃষ্ট ধর্মের অনুসারী। এখন আপনার দ্বীনের জন্য নিজের দ্বীন ত্যাগ করছি। আপনি কি আমার এ ধর্ম পরিবর্তনের জন্য নাজাতের জামিন হবেন?"

প্রিয় নবী (সাঃ) ফরামালেন ঃ " হাঁ, আমি জামিন হলাম। ইসলাম তোমাদের ধর্ম থেকে উত্তম।" হুযুর (সাঃ)-এর ইরশাদ শুনে দলনেতা তৎক্ষণাৎ কালেমায়ে তাওহীদ পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যরাও ঈমান আনলেন। তাঁদের ইসলাম গ্রহণে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) খুব খুশী

হলেন এবং তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন। আবদুল কায়েস এ প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন হযরত জারুদ (রাঃ) বিন আমর। তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুক্তির জামানত দিয়েছিলেন।

হযরত জারুদ বিন আমর কিতাবপন্থী সাহাবী হিসেবে পরিগণিত ছিলেন। কিতাবপন্থী সাহাবী বলতে তাদেরকেই বুঝায় যারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইহুদী অথবা খৃষ্টান ছিলেন। হযরত জারুদ (রাঃ)-এর প্রকৃত নাম ছিল বাশার। কুনিয়ত ছিল আবু মানযার। লকব ছিল জারুদ। এ লকব এত প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, প্রকৃত নাম মানুষ ভুলেই যায়। চরিত গ্রন্থে তাঁর বংশনামা শুধু এতটুকুই পাওয়া যায়ঃ বাশার (জারুদ) বিন আমর বিন মুয়াল্লা আবদী।

হযরত জারুদ (রাঃ) আবদুল কায়েস গোত্রের অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং অন্যতম প্রখ্যাত নেতা ছিলেন। তিনি খ্যাতিমান বাহাদুরও ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একবার তিনি বকর বিন ওয়ায়েল গোত্রের ওপর অতর্কিতে হামলা চালিয়ে, সকল গবাদিপশু এবং ধন-সম্পদ এমনকি সেলাইয়ের সূতা পর্যন্ত লুট করে নিয়েছিলেন। এ ঘটনা এত প্রসিদ্ধি লাভ করছিলো যে, তিনি বনু আবদুল কায়েস গোত্রের জন্য গৌরবের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কবিরা পর্যন্ত কাব্যে হযরত জারুদ (রাঃ)-এর নাম বীর হিসেবে উল্লেখ করতো।

হযরত জারুদ (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত উপরোল্লিখিত বর্ণনা সীরাতে ইবনে হিশাম থেকে উৎকলিত হয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, তিন রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন, তখন হুযুর (সাঃ) বললেন ঃ 'জারুদ! তুমি এবং তোমার কওম আসতে অনেক বিলম্ব করে ফেলেছ।"

হযরত জারুদ (রাঃ) লজ্জা প্রকাশ করে আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! এখন আমি আপনার খিদমতে হাজির হয়েছি। আমি ইঞ্জিলে আপনার গুণাবলী সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছি। হযরত ঈসা (আঃ) আপনার আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন।" অতপর তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আপনার পবিত্র হাত সম্প্রসারিত করুন। প্রিয় নবী (সাঃ) নিজের হাত এগিয়ে দিলেন। হযরত জারুদ (রাঃ) ত্বরিত গতিতে তা ধরলেন এবং কালেমায়ে তাওহীদ পাঠ করে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন। (তারিখে ইবনে আসাকির)।

এ বর্ণনায় জানা যায় যে, হযরত জারুদ (রাঃ) লেখাপড়া জানতেন এবং ইঞ্জিলের ওপরও তাঁর দখল ছিল। কতিপয় বর্ণনা থেকে প্রকাশ পায় যে, তিনি কবিও ছিলেন। হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) "ইসাবাহ' গ্রন্থে লিখেছেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নবী (সাঃ)-এর দরবারে কবিতার কতিপয় স্তবক শ্রদ্ধার্ঘ হিসেবে পেশ করেছিলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত জারুদ (রাঃ) এবং তার সাথীরা কিছুদিনের জন্য মদীনা মুনাওয়ারাহ অবস্থান করেন। অতপর দেশে ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সফরের প্রস্তুতি নিলেন। হাফেজ ইবনে কাইয়েম (রঃ) "জাদুল মিয়াদ" গ্রন্থে লিখেছেন, যাত্রার প্রাক্কালে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর নিকট আরজ করলেন ঃ " হে আল্লাহর রাসূল! খরচপত্রের জন্য আমাদেরকে কিছু দিন।" হুযুর (সাঃ) বললেনঃ "এখন বাইতুল মাল শূন্য।" তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! "আমাদের এলাকায় লাওয়ারিশ উট যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়। এ সব উট মালিকানায় নেওয়া কি জায়েয? ইরশাদ হলোঃ "লাওয়ারিশ উট মালিকানায় নেয়ার অর্থই হলো দোজখের আগুন অবধারিত করে নেয়া।"

ইবনে হিশাম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, মদীনা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে হযরত জারুদ (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে আরজ করলেন, আমাদের প্রতিনিধি দলের সওয়ারীর ব্যবস্থা করা হোক। তখনকার পরিস্থিতিতে সওয়ারীর ব্যবস্থা করা গেলো না। এতে হযরত জারুদ আরজ করলেনঃ "ইয়া রাসূলুল্লাহ! রাস্তায় আমরা অন্যের অনেক উট পাবো (অর্থাৎ মালিকহীন উট)। তা ধরে সওয়ার হওয়ার অনুমতি আছে কি?" হুযুর (সাঃ) ফরমালেন ঃ "অবশ্যই নয়। তাকে আগুন মনে কর। "মোট কথা, হযরত জারুদ (রাঃ) ইসলাম নামক নেয়ামত লাভ করে দেশে ফিরে গেলেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) খলিফা নির্বাচিত হলেন। তিনি সামগ্রিক পরিস্থিতির সম্যক পর্যালোচনা করতে পারেননি ঠিক এমনি সময়ে আরব জুড়ে ধর্ম ত্যাগীদের লেলিহান শিখা প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো। মক্কার কুরাইশ, মদীনার মুহাজির ও আনসার এবং বনু ছাকিব ব্যতীত কোন গোত্র এমন ছিল না যে তারা এ ফিতনার প্রভাবে কম বেশী প্রভাবিত হয়নি। সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) অত্যন্ত সাহস, দৃঢ়তা এবং ঈমানী শক্তির সাথে সেই ভয়ানক ফিতনার মুকাবিলা করেন এবং কয়েক মাসের মধ্যেই তার মূলোৎপাটন করে ছাড়েন। চরিতকাররা বলেছেন, আবদুল কায়েস গোত্রও ধর্মত্যাগের ফিতনায় জড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু হযরত জারুদ (রাঃ) শুধু সাহস ও অটলতার সাথে ইসলামের ওপর কায়েমই থাকেননি বরং গোত্রের নেতা হওয়ার কারণে তিনি নিজের গোত্রবাসীকেও ধর্মত্যাগী হওয়া থেকে ফিরিয়ে রাখার

প্রচেষ্টা চালান। তিনি বাহরাইনের অন্যান্য লোকদেরকেও ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার নির্দেশ দিলেন। তাঁর এ প্রচেষ্টার ফলে বহু মানুষ পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে বেঁচে গেল। যারা তাঁর কথায় কান দিল না তারা মুরতাদদের সাথে যোগ দিল। পরবর্তীতে তারা শিক্ষণীয় পরিণাম ভোগ করেছিলো। খলিফাতুর রাসূল (সাঃ) হযরত আলা' (রাঃ) বিন আবদুল্লাহ হাজরামীকে এক মজবুত বাহিনী দিয়ে বাহরাইনের অভিযানে প্রেরণ করলেন। হযরত আলা বাহরাইন পৌঁছে মুরতাদদেরকে এমনভাবে উৎখাত করেলন যে, তারা আর ভবিষ্যতে মাথা উচুঁ করে দাঁড়াতে পারেনি।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)–এর খিলাফতকালে হযরত কুদামাহ (রাঃ) বিন মাজউন বাহরাইনের গভর্ণর হয়ে এলেন। একবার কতিপয় রোমক হযরত জারুদ (রাঃ)–কে বললো যে, তারা কুদামাহ (রাঃ)–কে শরাব পান করতে দেখেছেন। হযরত জারুদ (রাঃ) নিজের গভর্ণরের এ পদস্খলন সহ্য করতে পারলেন না এবং সোজা মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছে হযরত ওমর (রাঃ) এর খিদমতে আরয করলেনঃ "আমীরুল মুমিনিন! কুদামাহ শরাব পান করেছে। তার ওপর শরীয়তের হদ বা শাস্তি বিধান করুন।"

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) সাক্ষ্য তলব করলেন। হযরত জারুদ (রাঃ) হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ)–এর নাম বললেন। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)–কে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেনঃ "আমি নিজেতো শরাব পান করা অবস্থায় দেখিনি। তবে নেশার অবস্থায় বমি করতে দেখেছি।"

হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, "শুধু এ সাক্ষ্যে অপরাধ প্রতিষ্ঠিত হয় না।" আরো অনুসন্ধানের জন্য তিনি কুদামাহ (রাঃ)–কে বাহরাইন থেকে ডেকে পাঠালেন। যখন তিনি এলেন তখন হযরত জারুদ (রাঃ) তার ওপর হদ জারীর দাবী জানালেন।

হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, "তুমি তো সাক্ষী। বাদী নও। তোমার কাজ ছিল সাক্ষ্য দান। তা তুমি দিয়েছ। এখন তুমি চুপ থাকো।"

সে সময় জারুদ (রাঃ) চুপ মেরে গেলেন। কিন্তু পরের দিন হযরত কুদামাহ (রাঃ)–এর ওপর হদ জারীর জন্য পীড়াপীড়ি করলেন, সাক্ষ্য যথেষ্ট ছিল না। এজন্য হযরত ওমর (রাঃ)–এর নিকট হযরত জারুদ (রাঃ)-এর পীড়াপীড়ি অসহ্য মনে হলো এবং বললেন ঃ "জারুদ! তুমি বাদী হয়ে যাচ্ছ। প্রকৃত অবস্থা হলো যে, সাক্ষী মাত্র একজন। এতে হযরত জারুদ বললেন,ঃ "আমীরুল মু'মিনিন! আমি আপনাকে আল্লাহর কসম

দিয়ে বলছি যে, হদজারী বা দণ্ড বিধানে বিলম্ব করবেন না।" এ পীড়ারপীড়িতে হযরত ওমর (রাঃ)-এর কিছুটা সন্দেহ হলো এবং বললেনঃ "জারুদ! তুমি নিজের জবাবের ওপর লাগাম টানো। নচেৎ আমি কঠোরতা অবলম্বন করবো।" এ ভীতি প্রদর্শনে হযরত জারুদ (রাঃ) আবেগান্বিত হয়ে বললেন ঃ "আমীরুল মুমিনিন! এটা ঠিক নয় যে, আপনার চাচার পুত্র শরাব পান করবে আর উল্টো আমাকে ধমক দেবেন।"

এ সময় হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-কে পরামর্শ দিলেন যে, আপনার যদি সন্দেহ হয় তাহলে কুদামাহ (রাঃ)-এর স্ত্রীকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত কুদামাহ (রাঃ)-এর স্ত্রী হিন্দাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে তিনি হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ)-এর কথার সত্যতা স্বীকার করলেন। এরপর হযরত ওমর (রাঃ) কুদামাহ (রাঃ)-কে বললেন, "কুদামাহ! দণ্ডের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।"

হযরত কুদামাহ (রাঃ) আরজ করেন ঃ আমীরুল মুমিনিন! ধরে নিলাম তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী আমি শরাব পান করেছি। তবু আমার ওপর দণ্ড বিধান করার অধিকার আপনার নেই। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন -"তা কি করে?" হযরত কুদামাহ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ পাক বলেছেন ঃ

"যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করছে তাদের ওপর সেসব বস্তুর কোন গুনাহ নেই যা তারা খেয়েছে। কেননা, তারা পরহেয করেছে এবং ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে। অতপর পরহেয করেছে এবং ঈমান এনেছে। অতপর পরহেয করেছে এবং নেক কাজ করেছে।" (আল মায়েদা ঃ ৯৩)

হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ "তুমি ব্যাখ্যা ভুল করছো। তোমার সরাসরি হারাম বস্তু থেকে পরহেয করা উচিত ছিল।"

এরপর হযরত ওমর (রাঃ) হযরত কুদাইমা (রাঃ)-এর ওপর শরীয়তের দণ্ড জারী করলেন এবং হযরত জারুদ (রাঃ) মুতমায়েন হয়ে দেশে ফিরে গেলেন।

হাফিজ ইবনে হাজার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, কিছুদিন পর হযরত জারুদ (রাঃ) বসারায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সেখানে থেকেই তিনি ইরানের

জিহাদে অংশ গ্রহণরত মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দেন। ভিন্ন বর্ণনানুযায়ী তিনি পারস্য অথবা নাহাওন্দের যুদ্ধে লড়াইরত অবস্থায় শাহাদাতের পিয়ালা পান করেন। তিনি মানযার নামক এক পুত্র রেখে যান। এ পুত্রের নামানুসারে তাঁর কুনিয়ত ছিল আবু মানযার।

হযরত জারুদ (রাঃ) যদিও রাসূল (সাঃ)-এর যুগের শেষ পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তবুও ফজিলত এবং কামালিয়াতের দিক থেকে শূন্য হাত ছিলেন না। তাঁর থেকে কতিপয় হাদীস হাদীসের কিতাবসমূহে বর্তমান আছে। এসব হাদীস মুহাম্মাদ বিন সিরিন (রঃ), আবুল কামুস (রঃ), আবু মুসলিম আল-জামী (রঃ) এবং যায়েদ বিন আলী (রঃ), বর্ণনা করেছেন। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এর মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমর ইবনুল আস তাঁর থেকে রাওয়ায়েত করেছেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে এ হাদীস হযরত জারুদ (রাঃ) থেকেই বর্ণিত আছে ঃ "মুমিনের হারানো বস্তুতে যে ব্যক্তি মালিকানা স্থাপন করেছে সে নিজেকে আগুনে জালিয়ে দিয়েছে।"

চরিতকাররা হযরত জারুদ (রাঃ)-কে ইখলাস ফি দ্বীন, হক কথন, বাহাদুরী এবং স্পষ্টবাদিতার জন্য খুব প্রশংসা করেছেন।

* * *

হযরত মুহাম্মাদ (রাঃ) বিন তালহা (রাঃ)

চতুর্থ অথবা পঞ্চম হিজরীর কথা। জলিলুল কদর সাহাবী হযরত তালহা (রাঃ) বিন উবাইদুল্লাহ (রাঃ)–এর গৃহে (আশারায়ে মুবাশ্শিরার অন্যতম) একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হলো। তিনি নিজের প্রভূ ও মালিক রাসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর নামে তার নাম রাখলেন এবং বরকত লাভের উদ্দেশ্যে কোলে করে রাসূল (সাঃ)–এর নিকট নিয়ে গেলেন। হুযুর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তার নাম কি রাখা হয়েছে। হযরত তালহা (রাঃ) আরজ করলেন, "মুহাম্মাদ" প্রিয় নবী (সাঃ) বললেন, ঠিক আছে। তাহলে তার কুনিয়ত আমার কুনিয়তের মত আবুল কাসেম থাকলো। অতপর তিনি শিশুর মাথায় স্নেহের হাত বুলালেন এবং তার জন্য মঙ্গল কামনা করে দোয়া করলেন। তাঁর দোয়ার প্রভাবে আবুল কাসেম মুহাম্মাদ (রাঃ) বিন তালহা (রাঃ) বড় হয়ে সৎ চরিত্রের এক নমুনা হলেন। তাকওয়া এবং ইবাদাতের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পরগণিত হতেন।

হযরত আবুল কাসেম মুহাম্মাদ (রাঃ) বিন তালহা (রাঃ)–এর সম্পর্ক কুরাইশের বনু তাইম গোত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং তিনি সাইয়্যেদেনা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)–এর নিকটাত্মীয় ছিলেন তার বংশনামা হলোঃ মুহাম্মাদ (রাঃ) বিন তালহা (রাঃ) বিন উবাইদুল্লাহ বিন উসমান বিন আমর বিন কায়াব বিন সায়াদ বিন তাইম বিন মাররাহ বিন কায়াব।

মাররাহ বিন কায়াবের পর তাঁর নসবনামা প্রিয় নবী (সাঃ)–এর নসবের সাথে মিলে যায়। মাতার নাম ছিল হামনাহ (রাঃ) বিনতে জাহাশ। তিনি প্রখ্যাত সাহাবিয়ার অন্তর্ভুক্ত। তিনি উম্মুল মুমিনিন হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে জাহাশের সহোদরা এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর ফুপাতো বোন ছিলেন। এদিক থেকে হযরত মুহাম্মাদ (রাঃ) বিন তালহা নবীজি (সাঃ)–এর ভাগিনা ছিলেন।

সাহাবী পিতা এবং সাহাবিয়াহ মাতার কোলে লালিত পালিত হয়ে হযরত মুহাম্মাদ (রাঃ) বিন তালহা (রাঃ) উন্নত চরিত্রের এক উদাহরণতুল্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে উঠেছিলেন। তিনি এত বেশী ইবাদাত করতেন যে, মানুষের মধ্যে "সাজ্জাদ" —অতিরিক্ত সিজদাকারীর উপাধিতে মশহুর হয়ে গিয়েছিলেন। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা বলেছেন যে, ইসলামের ইতিহাসে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যাঁকে "সাজ্জাদ" উপাধি দেয়া হয়েছিল।

হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) আল ইসাবাহ গ্রন্থে লিখেছেন যে, হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর ভ্রাতা হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন খাত্তাবের পুত্রের নামও মুহাম্মাদ ছিল। সাইয়েদেনা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর খিলাফতকালে একবার কোন ব্যক্তি যায়েদ (রাঃ)-এর পুত্রকে ডেকে গালমন্দ দিল। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এ কথা জানতে পেরে তাকে ডেকে বললেন, তোমার নামের কারণে "মুহাম্মাদ"নামকে গালমন্দের নিশানা বানানো যায় না। আজ থেকে তোমার নাম মুহাম্মাদের পরিবর্তে আবদুর রহমান রাখা গেল।

অতপর তিনি হযরত তালহা (রাঃ)-এর পুত্রদের নিকট একটি পয়গাম প্রেরণ করলেন। পয়গামে তিনি জানালেন যে, তোমার এবং তোমার সন্তান সন্ততির মধ্যে যার যার নাম মুহাম্মাদ রাখা হয়েছে তা পরিবর্তন করা হোক। হযরত মুহাম্মাদ (রাঃ) বিন তালহা খিলাফতের দরবারে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ " আমিরুল মুমিনিন! রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বয়ং আমার নাম "মুহাম্মাদ" পছন্দ করেছিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, যদি এটা সত্য হয় তবে যাও। কারণ রাসূল (সাঃ)-এর পছন্দকৃত নাম আমি পরিবর্তন করতে পারিনা।

বিশ্বনবী (সাঃ)-এর পরলোক গমনের সময় হযরত মুহাম্মাদ (রাঃ) বিন তালহা (রাঃ) অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর শাসনকালে তাঁর শৈশবকাল ছিল। এ জন্য তিনি এসময় বিশেষ কোন কৃতিত্ব প্রদর্শন করার সুযোগ পাননি। হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রাঃ)-এর খিলাফতকালে পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হন এবং একজন নিশিযাপনকারী আবেদ (সাজ্জাদ) হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। ইমাম হাকিম (রঃ) "মুসতারাকে" লিখেছেন তাকওয়া এবং ইবাদাতের কারণে বড় বড় সাহাবীও তাকে দিয়ে দোয়া করাতেন।

আমীরুল মু'মিনিন হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে বিশৃংখলা দেখা দিলে বিদ্রোহীরা খিলাফত ভবন অবরোধ করলো। এ সময় হযরত মুহাম্মাদ (রাঃ) বিন তালহা (রাঃ) ও অন্যতম কুরাইশ যুবক হিসেবে ভবনের দরজায় দাঁড়িয়ে বিদ্রোহীদের বাধা দান করেন। ধস্তাধস্তিতে হযরত মুহাম্মাদ (রাঃ) বিন তালহা (রঃ), হযরত হাসান (রাঃ) বিন আলী (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর গোলাম কাম্বর আহত হন। কিন্তু তারা বিদ্রোহীদের দরজায় প্রবেশ করতে দেননি। অবশ্য কতিপয় বিশৃংখলাকারী প্রতিবেশীর বাড়ীর প্রাচীর টপকে ভেতরে প্রবেশ করে আমীরুল মুমিনিনকে শহীদ করে ফেলে।

হযরত আলী কারামুল্লাহু ওয়াজহাহু এ হৃদয় বিদারক ঘটনা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং তৎক্ষণাৎ হযরত ওসমান শহীদ (রাঃ)-এর বাড়ী গেলেন। নিজের পুত্র হযরত হাসান ও হোসাইন (রাঃ)-কে মারলেন এবং মুহাম্মাদ (রাঃ) বিন তালহা (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)-কে কঠোর ভাষায় ধমক দিলেন। তিনি বললেন, তোমারা এখানে থাকতে কি করে এ ঘটনা ঘটলো। তারা বললেন, আমরা কি করতে পারতাম। হন্তা বাড়ীর পশ্চাতদিক থেকে প্রাচীর টপকে ভেতরে প্রবেশ করে। দরজা দিয়ে আমরা কাউকেই প্রবেশ করতে দেইনি।

হযরত আলী (রাঃ) খলিফা নির্বাচিত হলে হযরত ওসমান (রাঃ) হত্যার কিসাস বা বদলার দাবী শক্তিশালী হয়ে ওঠলো। এ প্রসঙ্গেই উষ্ট্রের যুদ্ধের মত দুঃখজনক ঘটনা ঘটলো। এক পক্ষের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশাহ সিদ্দিকাহ (রাঃ) এবং অন্যদিকে ছিলেন হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু (রাঃ)। হযরত মুহাম্মদ (রাঃ) বিন তালহা (রাঃ)-এর আন্তরিক টান ছিল হযরত আলী (রাঃ)-এর প্রতি। কিন্তু শ্রদ্ধেয় পিতা তালহা (রাঃ)-এর কারণে উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশার (রাঃ)-এর বাহিনীতে যোগ দেন। যুদ্ধের প্রারম্ভে তিনি উম্মুল মু'মিনিনকে (রাঃ) বললেনঃ 'আম্মাজান। পুত্রের জন্য কি নির্দেশ আছে? উম্মুল মু'মিনিন (রাঃ) বুঝে ফেললেন যে, সে যুদ্ধে অংশ নিতে চায় না। তিনি বললেন, "তোমার অন্তর যদি মুতমায়েন না হয় তাহলে বনি আদমের পন্থা অবলম্বন কর এবং নিজের হাত ফিরিয়ে রাখো।"

উম্মুল মুমিনিন (রাঃ)-এর কথা শুনে হযরত মুহাম্মাদ (রাঃ) তরবারী খাপে ঢোকালেন। যিরাহ খুলে মাটিতে রেখে দিলেন এবং তার ওপর দাঁড়িয়ে গেলেন। সে সময় তিনি মাথায় কালো টুপি পরেছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) তার চিন্তা-ভাবনা এবং অক্ষমতার কথা জানতেন। তিনি নিজের বাহিনীতে ঘোষণা দিলেন যে, কালো টুপি

পরিধানকারীর ওপর (মুহাম্মাদ) যেন কেউ হাত না তোলে কিন্তু যুদ্ধের ডামাডোলে এ পার্থক্য করা সম্ভব হয়নি অথবা অজ্ঞাতসারেই তাকে কেউ শহীদ করে ফেলে।

যুদ্ধ শেষে হযরত আলী কারমাল্লাহু ওয়াজহাহু হযরত হাসান (রাঃ) এবং হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে স্বপক্ষের নিহতদের অনুসন্ধানে যুদ্ধের ময়দানে গেলেন। হঠাৎ করে হযরত হাসান (রাঃ)-এর দৃষ্টি একটি লাশের ওপর পড়লো। লাশটি উবু অবস্থায় মাটির ওপর পড়েছিল। লাশটি সিধা করতেই অযাচিতভাবে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। অতপর বললেন, আল্লাহর কসম! এটি কুরাইশ সন্তান।

হযরত আলী (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, পুত্র কি ব্যাপার? তিনি বললেন, 'এটা মুহাম্মাদ বিন তালহা (রাঃ)-এর লাশ। হযরত আলী (রাঃ) এ কথা শুনে খুব দুঃখিত হলেন এবং লাশের পাশে বসে পড়ে বললেন, "কাবার রবের কসম! এতো সিজদাকারী পিতার আনুগত্য করতে গিয়ে জীবন দান করছে। সে অত্যন্ত উন্নত চরিত্র এবং পবিত্র যুবক ছিল।"

হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত মুহাম্মাদ (রাঃ)-এর শাহাদাতে অত্যন্ত শোকাহত হলেন। ইবনে আছির (রঃ) এবং ইমাম হাকিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন, এ সময় শ্রদ্ধেয় পিতাকে সম্বোধন করে বললেন, "আমি আপনাকে এ যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার কথা বলেছিলাম। কিন্তু অমুক অমুক ব্যক্তির পরামর্শ মেনে নিলেন।"

এর জবাবে হযরত আলী (রাঃ) বললেন, যা হবার তাতো হয়েই গেছে। হায়! আমি যদি ২০ বছর আগেই মরে যেতাম।

এরপর তিনি হযরত মুহাম্মাদ (রাঃ) বিন তালহা (রাঃ)-কেও অন্যান্য লাশের সাথে বসরার সন্নিকটে দাফন করলেন।

* * *

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন বুদাইল (রাঃ) খুজায়ী

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন বুদাইল (রাঃ) একজন বাহাদুর মানুষ ছিলেন। রাসূল (সাঃ) এবং খুলাফায়ে রাশেদাহ (রাঃ)-এর যুগে তিনি নজীরবিহীন বীরত্বের প্রমাণ পেশ করেন। আরবের মশহুর কবিলাহ বনু খুজায়ার সাথে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর বংশনামা নিম্নরূপঃ

আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন বুদাইল (রাঃ) বিন ওয়ারাকা বিন আমর বিন রবিয়াহ বিন আবদুল উজ্জাহ বিন রবিয়াহ বিন জাররী বিন আমের বিন মাযিন বিন খুজায়ী।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর পিতা ওয়ারাকা বনি খাজায়ার অন্যতম নেতা ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও তিনি প্রিয় নবী (সাঃ)-এর সাথে সম্পর্ক রাখতেন এবং মাঝে মধ্যে তার নিকট আসা যাওয়া করতেন। তাঁর গোত্র হুদায়বিয়ার সন্ধি (৬ হিজরীর জিলকদে) কালে মুসলমানদের মিত্র হয়ে যায় এবং সন্ধির এক শর্ত অনুযায়ী মক্কার মুশরিকরা বনু খুজায়াকে কোন রকম উত্যক্ত না করা এবং তাদের বিরুদ্ধে শত্রুকে সাহায্য না করার ব্যাপারে বাধ্য ছিল। কিন্তু কয়েক মাস পরই কুরাইশের মিত্র কবিলাহ বনু বকর বনু খুজায়ায়ার ওপর হামলা করে বসে। এসময় কুরাইশ মুশরিকরা প্রকাশ্যে বনু বকরকে সাহায্য করে। এভাবে তারা কার্যতঃ সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে।

বনু বকর গোত্র কুরাইশদের সাথে মিলিত হয়ে বনু খুজায়ার ওপর চরম নির্যাতন চালালো। বনু খুজায়া গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ)-এর নিকট পৌঁছে এ নির্যাতনের খবর পৌঁছালো। চল্লিশ সদস্য বিশিষ্ট এ প্রতিনিধি দলে বুদাইল (রাঃ) বিন ওয়ারাকা এবং তার পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) ও ছিলেন। চরিতকারগণ উল্লেখ করেছেন, প্রিয় নবী (সঃ) অষ্টম হিজরীতে যেসব কারণে মক্কায় সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম কারণ ছিল বনু খুজায়া গোত্রকে সাহায্য করা। মক্কা বিজয়ের পূর্বে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) এবং তার পিতা শুধুমাত্র

মুসলমানদের মিত্র ছিলেন। মক্কা বিজয়ের অব্যবহিত পরই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) 'ইসাবা'তে লিখেছেন, ইসলাম গ্রহণের সময় হযরত বুদাইলের বয়স ৯৭ বছর ছিল। কিন্তু তিনি এত সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন যে, দাড়ি এবং চুল সম্পূর্ণ কালো ছিল। ইসলামের বাইয়াত গ্রহণের সময় হুযুর (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার বয়স কত?" তিনি আরজ করলেন, "৯৭ বছর" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "আল্লাহ পাক তোমার সুশ্রী এবং কালো চুলে বরকত দিন।"

মক্কা বিজয়ের পর পিতা -পুত্র উভয়েই হুনাইন, তায়েফ এবং তাবুকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। হুনাইনের যুদ্ধের পর গনিমতের মাল ও মুশরিক কয়েদীদের তত্ত্বাবধানের জন্য প্রিয় নবী (সাঃ) হযরত বুদাইল (রাঃ)-কে নিয়োগ করেন।

দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জে হযরত বুদাইল (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিশ্ব নবী (সাঃ)-এর সহযোগী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। পিতা-পুত্র উভয়েই যুদ্ধে অংশগ্রহণ শেষে স্বদেশে ফিরে যেতেন।

ইবনে আছির (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একবার প্রিয় নবী (সাঃ) হযরত বুদাইল (রাঃ)-কে একটি পত্র প্রেরণ করেন। তিনি এ পত্রকে জীবনের এক আরাধ্য বস্তু হিসেবে পরিগণিত করে রেখেছিলেন। নবী (সাঃ)-এর জীবনের শেষ দিকে মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হলে ওফাতের সময় এ পবিত্র পত্র হযরত আবদুল্লাহর নিকট হস্তান্তর করার সময় ওসিয়ত করলেন যে, যতদিন পর্যন্ত এ পত্র তোমাদের নিকট থাকবে ততদিন তোমরা কল্যাণ এবং রবকত পেতে থাকবে।

প্রিয় নবী (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) খলিফা নির্বাচিত হলেন, এ সময় আরবের পরিবেশ গরম হয়ে উঠলো এবং ধর্মত্যাগের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) নজির বিহীন ঈমানী শক্তি ও দৃঢ় এবং অটল হিম্মতের মাধ্যমে কয়েক মাসের মধ্যে এ ফিতনা উৎখাত করে ছাড়লেন। সে ঘনঘোর সময়েও হযরত আবদুল্লাহ বিন বুদাইল (রাঃ) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে হকের ঝাণ্ডা উড্ডীন রাখলেন এবং নিজের গোত্রকেও সে ফিতনার আগুন থেকে বাচানোর পুরোপুরি প্রচেষ্টা চালালেন। তিনি বনু খুজায়ার সর্দার পুত্র সর্দারই ছিলেন না বরং তুলনাহীন বীর ছিলেন।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) নিজের খিলাফতের শেষ দিকে হযরত আবদুল্লাহ বিন বুদাইল (রাঃ)-কে হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ)-এর সাহায্যার্থে ইরান প্রেরণ করলেন এবং তাঁকে ইস্পাহানে অভিযানের নির্দেশ দিলেন। সে সময় হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ) কাম এবং কাশানের অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন এবং ইস্পাহানের দিকে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পাচ্ছিলেন না। হযরত আবদুল্লাহ বিন বুদাইল (রাঃ) পৌঁছার পর তাঁর বোঝা পাতলা হয়ে গেল। ইস্পাহান ইরানের গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ ছিল এবং এর প্রতিরক্ষার্থে এক বিরাট বাহিনী সমাবেশ করে রাখা হয়েছিল। হযরত আবদুল্লাহ বিন বুদাইল (রাঃ) ইস্পাহান প্রদেশে প্রবেশ করলেন। এ সময় সর্ব প্রথম তার মুকাবিলা হয়েছিল শহর বরাজ জাদবিয়ার সাথে। সে ছিল প্রভাবশালী ইস্পাহানী সরদার ইস্তাদ্দারের অভিজ্ঞ সামরিক অফিসার এবং সবাহিনীর অগ্রগামী ভাগের নেতৃত্ব দিচ্ছিল। উভয় বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখী হলো। এ সময় শহর বরাজ জাদবিয়া হুংকার ছেড়ে ময়দানে লাফিয়ে পড়ে বললো যদি কারো হিম্মত থাকে তাহলে আমার মুকাবিলায় এসো। হযরত আবদুল্লাহ বিন বুদাইল (রাঃ) তার হুংকার শুনে সামনে এসে পৌঁছলেন। জাদবিয়া তার ওপর কয়েকবার তরবারী চালালেন। কিন্তু তা নিষ্ফল হলো। অতপর তিনি পুরো শক্তি দিয়ে তরবারী চালিয়ে এক কোপেই তাকে ধরাশায়ী করে ফেললেন।

শহর বরাজ জাদবিয়ার নিহত হওয়ার খবর শুনে ইসতানদার হিম্মত হারা হয়ে পড়লো এবং সাধারণ শর্তেই সন্ধি করে ফেললো। এরপর হযরত আবদুল্লাহ বিন বুদাইল (রাঃ) সামনে অগ্রসর হয়ে ইস্পাহানের উপকণ্ঠ "জি" অবরোধ করলো। জিবাসী সাত তাড়াতাড়ি অস্ত্র ফেলে দিয়ে জিযিয়া প্রদানে রাজী হয়ে আনুগত্য প্রকাশ করলো।

"জী" দখলের পর হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) এবার খোদ ইস্পাহান শহর অবরোধ করলেন। সেখানকার শাসক ফাদওসফান হযরত আবদুল্লাহ বিন বুদাইল (রাঃ)-এর নিকট একটি বাণী প্রেরণ করলেন। বাণীতে বলা হলো যে, অন্য জীবনহানির কি প্রয়োজন। আমরা দু'জনে লড়াই করেই সিদ্ধান্ত নিই। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, ফাদওসফান ৩০ জন নির্বাচিত বাহাদুর সাথে নিয়ে শহর থেকে বের হয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তার রাস্তা বন্ধ করে দেন। এসময় সে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে বলেছিল যে, এসো

আমরা পরস্পরে যুদ্ধ করি। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তার প্রস্তাব নির্বিধায় মেনে নিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তার মুকাবিলায় নিয়ে দণ্ডায়মান হলেন। ফাদওসফান ইরানের নামকরা লড়াকু ছিল। বিশ্বাস ছিল যে, নির্বিঘ্নে সে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে পারবে। কিন্তু যখন মুকাবিলা শুরু হলো তখন হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তরবারীর এমন এক আঘাত হানলেন যে ফাদওসফানের ঘোড়ার জিন কেটে নীচে নেমে গেল এবং সে কোনমতে রেহাই পেল। সে টের পেল যে, আর যদি কিছু সময় লড়াই চলে তাহলে তার জীবনে আর বাঁচার উপায় থাকবে না। অতএব সে বললো, আমি তোমার মত বাহাদুরের রক্তে নিজের হাত রঞ্জিত করতে চাই না। যেসব বাসিন্দা শহর ত্যাগ করে চলে যেতে চায় এবং যারা জিযিয়া দিয়ে থাকতে চায় এ শর্তে তোমার হাতে শহর অর্পণ করতে চাই। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) এ শর্ত মঞ্জুর করলেন এবং ফাদওসফান তাঁর হাতে শহর ন্যস্ত করলেন। ইস্পাহান করতলগত করার পর হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) অন্যান্য এলাকার দিকে অগ্রসর হলেন এবং কিছু দিনের মধ্যে তা জয় করে নিলেন।

হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রাঃ)-এর খিলাফত কালে ২৮ হিজরীতে হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ বিন বুদাইল (রাঃ)-কে কারমানের অভিযানে নিয়োগ করেন। এ সময় হযরত আবু মূসা আশা য়ারি (রাঃ) বসরার গবর্ণর ছিলেন। আল্লামা বালাজুরী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন বুদাইল (রাঃ) তিবস এবং কারিনের দু'টি মজবুত দুর্গ জয় করে নিলেন। এ দুর্গদ্বয় জয়ের ফলে খোরাসানের দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রশ্নে তার কোন প্রতিবন্ধকতা রইলো না। কিছু দিন পর হযরত আবদুল্লাহ বিন আমের (রাঃ) খোরাসান জয় করেছিলেন।

হযরত ওসমান গণি (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু (রাঃ) খলিফার আসনে সমাসীন হন। সিরিয়ার গবর্ণর আমীর মাবিয়া (রাঃ) তাঁর খিলাফত মানলেন না এবং উভয় বুজর্গের মধ্যে ব্যাপক মতানৈক্য শুরু হয়। হাফিজ ইবনে আবদুল বার (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এ বিবাদ হযরত আবদুল্লাহ বিন বুদাইল (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর শক্তিশালী সমর্থক ছিলেন এবং সিফ্ফীন যুদ্ধ শুরুর পূর্বে হযরত আলী (রাঃ)-এর সমর্থকদের সামনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি বললেনঃ "মাবিয়া (রাঃ) যা দাবী করছেন তার তিনি কখনই যোগ্য নন। এ দাবীতে তিনি যাঁর বিরোধিতা করছেন তিনি অবশ্যই তার যোগ্য। আল্লাহর কসম! তোমরা অবশ্যই হকের

ওপর আছ। আল্লাহর নূর তোমাদের সাথে রয়েছে। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত হও। তাদের মুকাবিলায় আল্লাহ তোমাদের ওপর রহমত নাযিল করবেন।"

আপাতঃ মুলতবির পর সিফ্ফীনের যুদ্ধ যখন দ্বিতীয়বার শুরু হলো তখন হযরত আলী (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ বিন বুদাইল (রাঃ)-কে পদাতিক বাহিনীর অফিসার হিসেবে নিয়োগ করলেন। যুদ্ধ বেশ কিছু দিন অব্যাহত রলো। যুদ্ধরত উভয় পক্ষের সৈন্যরা ছোট ছোট দলে একে অপরের মুকাবিলায় আসতো এবং যুদ্ধ করে ফিরে যেতো। একদিন হযরত আবদুল্লাহ বিন বুদাইল (রাঃ) ইরাকী বাহিনীর একটি দল নিয়ে বের হলেন। সিরিয়ার পক্ষ থেকে আবু আওয়ার সুলমী একটি সিরীয় বাহিনী নিয়ে তার মুকাবিলায় এলো। দীর্ঘক্ষণ উভয় পক্ষের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হলো। অতপর আবদুল্লাহ বিন বুদাইল (রাঃ) বীরত্বের আবেগে সিরীয় ব্যূহ ভেদ করে সেই টিলার দিকে অগ্রসর হলেন যেখানে আমীর মাবিয়া (রাঃ) তাবু টাঙিয়ে অবস্থান করছিলেন। তিনি যখন দেখলেন সিরীয় বাহিনীর যে সৈন্যই আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর সামনে পড়ছে তাকেই সে হত্যা করছে। এ সময় তিনি সাথীদেরকে বললেন, লোহাতে যদি কাজ না হয় তাহলে পাথর দিয়ে তা সম্পন্ন কর। এতে সিরীয়রা হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর ওপর পাথর বর্ষণ শুরু করলো এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর জন্য জীবন উৎসর্গকারী শহীদ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। আমীর মাবিয়া (রাঃ) তার লাশের নিকটে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেনঃ "এ ব্যক্তি আমার ভেড়া ছিল।"

* * *

হযরত হুয়াইতিব (রাঃ) বিন আবদুল উজ্জা

৩৫ হিজরীর ১৮ই জিল-হজ্ব তারিখে মদীনা মুনাওয়ারাতে কিয়ামত তুল্য ঘটনা ঘটে গেল। কতিপয় দুরাত্মা বিদ্রোহী রাসূল (সাঃ)-এর হেরেমের পবিত্রতা তছনছ করে সমকালীন সময়ের মহান ও পবিত্র ব্যক্তিত্বকে অত্যন্ত নৃশংসতার সাথে শহীদ করে ফেলে। বিরাট দানশীল, ধৈর্য ও স্থৈর্যের প্রতীক এবং আরব-আজমের খলিফা ও রাসূল (সাঃ)-এর জামাতা সাইয়েদেনা হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের লাশ নিজের ঘরে কাফন বিহীন অবস্থায় পড়ে ছিল। বিদ্রোহীরা চারদিকে ছোট ছোট করে ফিরছিল। এ সব দুর্ভাগ্য বর্বরীয়ান মানুষ কুরআনের ধারী শহীদ খলিফার লাশ দাফনও সহ্য করতে পারছিল না। এ দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় দ্বিতীয় দিনের রাতে কতিপয় (অনেকের মতে সতের জন) সাহসী মুসলমান মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে আমীরুল মু'মিনিনের গৃহে পৌঁছে তাঁর রক্তাক্ত দেহ উঠালেন। তারপর নামাযে জানাযা আদায় করে জীবন বাজী রেখে জান্নাতুল বাকীর পেছনে ছিলে কাওকাবে দাফন করলেন। এ সব বাহাদুর মুসলমানের মধ্যে শত বর্ষের অধিক বয়সের আলোকজ্বল চেহারার এক বুজর্গ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি এ ফরয কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য নিজের জীবনের পরওয়া করেন নি। এমনকি বার্ধক্যের জরাগ্রস্ততাও তাঁকে পিছিয়ে রাখতে পারেনি। এ বুজুর্গ ব্যক্তির নাম হলো আবু মুহাম্মাদ হুয়াইতিব (রাঃ) বিন আবদুল উজ্জা।

হযরত আবু মুহাম্মাদ হুয়াইতিব (রাঃ) বিন আবদুল উজ্জার সম্পর্ক কুরাইশ খান্দান আমের বিন লুববীর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। তাঁর নসবনামা হলো : হুয়াইতিব (রাঃ) বিন আবদুল উজ্জা বিন আবু কায়েস বিন আবদিদ বিন নাসার বিন মালিক বিন হাসাল বিন আমের বিন লুববী।

হযরত হুয়াইতিব (রাঃ) নিজের গোত্রের অন্যতম নেতা ছিলেন এবং কুরাইশের প্রভাবশালী ও বিশ্বস্ত লোকের মধ্যে পরিগণিত হতেন। তিনি জাহেলী যুগে কতিপয় আদুলে গোনা ব্যক্তির অন্যতম ছিলেন যারা লেখা-পড়া জানতেন।

রিসালাত সূর্য ফারান পর্বত চূড়ায় উদিত হওয়ার সময় হযরত হুয়াইতিব (রাঃ)-এর বয়স ৬০ বছর ছিল। তাওহীদের দাওয়াত তাঁর ওপর বিশেষ প্রভাব ফেললো এবং তিনি কয়েকবার ইসলাম গ্রহণের আকাংখা ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু প্রতিবারই বনু উমাইয়ার রইস হাকাম বিন উমাইয়া এ বলে সেই সৌভাগ্য থেকে তাঁকে বঞ্চিত রাখেন যে, এ বয়সে নতুন ধর্ম গ্রহণ তোমার মর্যাদা বিরোধী। পিতৃ পুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে তুমি তোমার বর্তমান মর্যাদা খুইয়ে ফেল না।

নবুয়াত প্রাপ্তি থেকে বিজয় কাল পর্যন্ত হযরত হুয়াইতিব (রাঃ) কেমনভাবে কাটিয়ে ছিলেন তার বর্ণনা ইবনে সায়াদ (রঃ) এবং হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) স্বয়ং তাঁর ভাষ্যে এমনভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"আমি বদরের যুদ্ধেও মুশরিকদের সাথে ছিলাম। আমি স্বচক্ষে দেখলাম যে, ফিরিশতা আসমান থেকে অবতীর্ণ হচ্ছে। আমি সে সময়ই বুঝতে পারলাম যে, সেই ব্যক্তিকে (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হেফাজত করা হয়েছে। এ সত্ত্বেও আমি যা কিছু দেখলাম তা কাউকে বলিনি। বস্তুতঃ আমরা পরাজিত হয়ে মক্কা ফিরে গেলাম। আমি মক্কায় অবস্থান করতে লাগলাম। অন্যদিকে এক দু' করে কুরাইশের লোকরা ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো। হুদাইবিয়ার সন্ধির দিনেও আমি উপস্থিত ছিলাম। সন্ধি প্রশ্নে আমি বেশী তৎপরতা প্রদর্শন করেছিলাম। সন্ধির শেষ সাক্ষী ছিলাম আমি এবং আমি মনে মনে বলেছিলাম, মুহাম্মাদ (সাঃ) তাই করবেন যা কুরাইশরা পছন্দ করে না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন কাজা ওমরাহ পালনের জন্য মক্কায় তাশরীফ আনেন তখন অনেক কুরাইশ বাইরে চলে যায়। কিন্তু আমি ও সোহায়েল বিন আমর মক্কায় এ জন্য অবস্থান করেছিলাম যে, যাতে সময় শেষ হলে মুসলমানদেরকে মক্কা ত্যাগ করার কথা বলতে পারি। সুতরাং তৃতীয় দিনেই আমি এবং সোহায়েল রাসূল (সাঃ)-এর নিকট গিয়ে বললাম যে, আপনার শর্ত পূরণ হয়েছে এখন আপনি এ শহর ত্যাগ করুন। তিনি তৎক্ষণাৎ হযরত বেলাল (রাঃ)-কে সূর্য অস্ত যাবার পূর্বেই তাঁর সাথে আগত সকল মুসলমানকে মক্কা ত্যাগের কথা জানিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।" (তাবকাতে ইবনে সায়াদ, আল-ইসাবাহ্।

অষ্টম হিজরীর রমাজান মাসে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) মক্কা মুয়াজ্জামাতে ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডীন করলেন। এ সময় হযরত হুয়াইতিব (রাঃ)-এর অবস্থা কেমন ছিল তার বর্ণনা তাঁর নিজের ভাষাতেই শুনন ঃ

"মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন শহরে প্রবেশ করলো তখন আমি মারাত্মকভাবে ভীত হয়ে পড়লাম এবং গৃহ থেকে বের হয়ে গেলাম। নিজের পরিবার পরিজনকে বিভিন্ন সুরক্ষিত স্থানে পৌঁছে দিলাম এবং নিজে আওফের বাগানে আশ্রয় নিলাম। হঠাৎ করে দেখলাম যে, আবু যর গিফারী (রাঃ) আমার দিকে আসছেন। তার এবং আমার মধ্যে পুরনো বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু সে সময় তাকে দেখে আমি পলায়নে প্রস্তুত হলাম। তিনি ডেকে বললেন, আবু মুহাম্মাদ! থামো। আমি থেমে গেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, পালাচ্ছো কেন? আমি বললাম, তোমাদের নবী (সাঃ) এসে গেছেন। তাঁর ভয়ে পালাচ্ছি।"

আবু যর (রাঃ) বললেন, তুমি আল্লাহ প্রদত্ত নিরাপত্তায় নিরাপদ। এ কথা শুনে আমি তাঁর নিকট গেলাম এবং সালাম করলাম। তিনি বললেন, তোমার বাড়ী চলো। আমি বললাম, বাড়ী যাওয়ার জন্য কোন রাস্তা কি আছে। খোদার কসম! আমার ধারণা, আমি বাড়ী পর্যন্ত জীবিত পৌঁছতে পারবো না। পথেই কোন মুসলমানের হাতে মারা যাবো। আর বাড়ীতে যদি পৌঁছিও তাহলে কোন মুসলমান ঢুকে মেরে ফেলবে। আমার সন্তান-সন্ততিও বিভিন্ন স্থানে রয়েছে।

আবু যর (রাঃ) বললেন, সন্তান-সন্ততিকে কোন স্থানে একত্রিত কর। তোমাকে আমি স্বয়ং বাড়ী পৌঁছে দেব। বস্তুতঃ তিনি আমাকে সাথে নিয়ে চললেন এবং উচ্চস্বরে এ ঘোষণা দিতে দিতে এগুতে লাগলেন যে, হুয়াইতিব নিরাপত্তা পেয়েছে। তাকে যেন কেউ হেনস্তা না করে।

আবু যর (রাঃ) আমাকে নিরাপদে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে সকল ঘটনা বর্ণনা করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তুমি কি জাননা যে, কতিপয় বিতাড়িত অপরাধী ছাড়া সবাই নিরাপদ? আমি হুযুর (সাঃ)-এর ইরশাদের কথা শুনে সম্পূর্ণ মুতমায়েন হয়ে গেলাম এবং পরিবার-পরিজনকে বাড়ী নিয়ে এলাম। অতপর আবু যর (রাঃ) আমার নিকট এলেন এবং বললেন, কতদিন এবং আর কতদিন? কল্যাণের অনেক সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে গেছে। এখনো সময় আছে। চলো, রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে এসো। তিনি (সাঃ) সকল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী উত্তম, সবচেয়ে বেশী আত্মীয়দের প্রতি রহমকারী এবং সবচেয়ে বেশী ধৈর্যশীল। তাঁর মান-মর্যাদায় তোমার মান-মর্যাদা নিহিত। আমি বললাম, আমি তোমার সাথে যেতে প্রস্তুত আছি।

সুতরাং আমি আবু যর (রাঃ)-এর সাথে বাতহা নামক স্থানে হুযুর (সাঃ)-এর খিদমতে হাজির হলাম। তাঁর (সাঃ) নিকট হযরত আবু বকর এবং হযরত ওমর (রাঃ) ও উপস্থিত ছিলেন। আমি আবু যর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হুযুর (সাঃ)-কে সালাম করার পদ্ধতি কি?

তিনি বললেন, আসসালামু আলাইকা, আইয়ুহান নাবিউ ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু। আমি তাঁকে (সাঃ) সালাম করলাম। তিনি (সাঃ) বললেন, হে হুয়াইতিব। ওয়া আলাইকুমস সালাম। আমি বললাম, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই এবং অবশ্যই আপনিই আল্লাহর রাসূল।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি তোমাকে হেদায়াত দিয়েছেন।

আমার ইসলাম গ্রহণে তিনি (সাঃ) খুব খুশী হলেন। অতপর তিনি (সাঃ) আমার নিকট কিছু অর্থ ঋণ চাইলেন আমি ৪০ হাজার দিরহাম ঋণ হিসেবে দিলাম।

ইসলাম গ্রহণের সময় হযরত হুয়াইতিব (রাঃ)-এর বয়স প্রায় ৮০ বছর ছিল। কিন্তু এ বৃদ্ধ বয়সেও তিনি হুনাইন এবং তায়েফের যুদ্ধে প্রিয় নবী (সাঃ)-এর সহযাত্রী ছিলেন। হুনাইনের গনিমতের মাল থেকে নবী করিম (সাঃ) তাঁকে একশ উট দিয়েছিলেন। তায়েফের যুদ্ধের পর হযরত হুয়াইতিব (রাঃ) মক্কা মুয়াজ্জামা থেকে মদীনা মুনাওয়ারা স্থানান্তর হন।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) হযরত হুয়াইতিব (রাঃ)-কে মান্য করতেন। তিনি নিজের খিলাফতকালে হেরেম শরীফের সীমানা নতুন করে নির্ধারণ করতে চাইলেন এবং এ উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কিরামের একটি দল মনোনীত করলেন। হযরত হুয়াইতিব (রাঃ)-ও এ দলের একজন সদস্য ছিলেন। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিলে হযরত হুয়াইতিব (রাঃ) এবং কতিপয় সাহাবী বিদ্রোহীদেরকে খুব করে বুঝালেন। কিন্তু তারা নিজেদের বিশৃংখলাপূর্ণ আচরণ থেকে বিরত হলো না। এমনকি আমীরুল মু'মিনিনের শাহাদাতের মত হৃদয় বিদারক ঘটনা সংঘটিত হলো। বিদ্রোহীরা এত শক্তিশালী ছিল যে, মযলুম খলিফার লাশ দাফন করার মতো হিম্মতও কারো হয়নি। অবশেষে হযরত হুয়াইতিব (রাঃ) এবং অন্য ১৬জন মুসলমান নিজেদের জীবন বাজী রেখে এ কাজ সম্পাদন করেন।

হযরত হুয়াইতিব হক কথক এবং স্পষ্টবাদী ছিলেন। ইমাম হাকিম (রঃ) "মুসতাদাকে" লিখেছেন যে, আমীর মাবিয়ার (রাঃ) শাসনকালে মারওয়ান বিন হাকাম মদীনার গবর্ণর নিযুক্ত হন। হযরত হুয়াইতিব (রাঃ) একদিন তার কাছে গেলেন। সে ব্যঙ্গ করে বললেন, "বড় মিয়া! আপনি ইসলাম গ্রহণে এত দেরী করেছেন কেন? অনেক যুবক এ সৌভাগ্য অর্জনে আপনার থেকে অগ্রগামী হয়েছে।"

হযরত হুয়াইতিব (রাঃ) জবাব দিলেন যে, ভাই! আমি কয়েকবার ইসলাম গ্রহণের আকাংখা ব্যক্ত করেছিলাম। কিন্তু তোমার পিতা (হাকাম বিন উমাইয়াহ) আমাকে তা থেকে বঞ্চিত করেন।

মারওয়ান এ কথা শুনে চুপ মেরে গেল। কিন্তু হযরত হুয়াইতিব (রাঃ) বললেন, সম্ভবতঃ তুমি জাননা যে, তোমার পিতা ওসমান (রাঃ) বিন আফফানের ওপর ইসলাম গ্রহণের অপরাধে কি ধরনের নির্যাতন চালিয়েছিল। এতে মারওয়ান আরো লজ্জিত হলো এবং সে আর কোনদিন হযরত হুয়াইতিব (রাঃ)-কে ব্যঙ্গাত্মক কোন কথা বলেনি।

হযরত হুয়াইতিব (রাঃ) আমীর মাবিয়া (রাঃ)-এর শাসনকালে মদীনা মুনাওয়ারাতে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় সোয়াশ' বছর। হযরত হুয়াইতিব (রাঃ) থেকে কতিপয় হাদীস বর্ণিত আছে। এ সব হাদীস তিনি কতিপয় বড় বড় সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সনদে পুত্র আবু সুফিয়ান (রঃ) এবং আবদুল্লাহ (রঃ) বিন বুরায়েদাহ (রাঃ) অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

* * *

হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন মিরদাস

হযরত আবুল ফযল আব্বাস (রাঃ) বিন মিরদাস জাহেলী যুগে একজন উচু পর্যায়ের কবি ছিলেন। তিনি নামকরা অশ্বারোহী এবং স্বগোত্রের একজন সরদার ছিলেন। এ সত্ত্বেও তিনি মদ্যপান অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। কাব্যচর্চা, অশ্বারোহণ এবং সরদারীর আবশ্যকীয় বস্তু ছিল মদ বা শরাব। একবার লোকজন জিজ্ঞেস করলো, হে সরদার। আপনি শরাব পান করেন না কেন? অথচ শরাব চিত্তে প্রফুল্লতা আনে এবং শরীরের শক্তি বৃদ্ধি করে।

তিনি জবাবে বলেছিলেন, "আমি কওমের সরদার হয়ে আহম্মক হতে চাই না। আল্লার কসম। আমার পেটে ঐ বস্তু কখনো যেতে পারে না যা জ্ঞান ও হুঁশ থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে।"

হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন মিরদাস নজদের বনু সুলাইম গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। বনু সুলাইম ছিল বনু কায়েস বিন আইলানের একটি শাখা। এ গোত্রে শরাফত, বদান্যতা ও দানশীলতা এবং বীরত্বের কারণে আরবের গোত্রসমূহের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিল। এমনকি একবার স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ কবিলার প্রশংসায় বলেছিলেনঃ "নিঃসন্দেহে প্রত্যেক কওমের জন্য একটি আশ্রয় স্থল থাকে। আরবদের আশ্রয়স্থল হলো কায়েস বিন আইলান।"

হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর নসবনামা হলো ঃ আব্বাস (রাঃ) বিন মিরদাস বিন আবি আমের বিন হারেছাহ বিন আবদি বিন আবাছ বিন মনসুর আস-সুলামী।

হযরত আব্বাস (রাঃ) প্রখ্যাত মারছিয়া বর্ণনাকারী সাহাবিয়াহ আল-খানছা (রাঃ) বিনতে আমরের সতালো পুত্র ছিলেন। তিনি জাহেলী এবং ইসলামের উভয় কালই পেয়েছিলেন।

বিমাতা হযরত খানছা (রাঃ)-এর মত তিনিও কাব্যে সম মর্যাদা পেয়েছিলেন। তবে তিনি সহোদর এবং সহোদরাদের চেয়ে উঁচু মানের কবি ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর এক সহোদর সারাকাহ বিন মিরদাস এবং সহোদরা উমরাত বিনতে মিরদাস জীবিত ছিলেন। তাঁরা হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর ইন্তেকালে শোকগাথা বা মরছিয়া বর্ণনা করেছিলেন।

ইবনে হিশাম (রঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন মিরদাসের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে এক আশ্চর্য ধরনের রাওয়াতে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, হযরত আব্বাস (রাঃ) পিতার নিকট থেকে একটি মূর্তি পেয়েছিলেন। এ মূর্তির নাম ছিল জুমার। পিতার নির্দেশ মুতাবেক হযরত আব্বাস (রাঃ) সে মূর্তির পূজা করতেন। তাঁর গোত্রবাসীও এ রীতিই পালন করতো। একবার আব্বাস (রাঃ) অর্ধ রজনীতে মূর্তিটির অর্চনা করছিলেন। এ সময় তিনি যেন একটি বাণী শুনতে পেলেন। তাতে বলা হয়েছিল যে, "শেষ যুগের পয়গাম্বরের আবির্ভাব ঘটেছে এবং জুমারের ধ্বংসের সময় এসে গেছে।" দ্বিতীয়বার জনৈক ব্যক্তি তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে একই ধরনের কথা বললেন। হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর জন্য এ সতর্কবাণী যথেষ্ট ছিল। তিনি জুমারকে আগুনে নিক্ষেপ করে তৎক্ষণাৎ মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলেন। মদীনা পৌঁছে রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর হাতে মুসলমান হয়ে গেলেন। সে সময় প্রিয় নবী (সাঃ) মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি (সাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ)-৭৮৮কে স্বগোত্রে ফিরে যাওয়ার এবং গোত্রের মুসলমানদেরকে সঙ্গে নিয়ে আল-কুদাইদ নামক স্থানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের নির্দেশ দিলেন।

হযরত আব্বাস (রাঃ) স্বগোত্রে ফিরে গেলেন এবং অত্যন্ত শক্তি ও প্রভাবশালী ভাষায় লোকদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিলেন। বনু সুলাইমের বেশীরভাগ লোক তাঁর আহবানে সাড়া দিলেন এবং নিজের মূর্তিকে আগুনে জ্বালিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। কিন্তু হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর স্ত্রী হযরত হাবিবাহ বিনতে জাহহাকুস সুলামী ব্যতিক্রম ধর্মী আচরণ করলেন। সে তাওহীদের দাওয়াত কবুলের পরিবর্তে হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁকে অনেক তেড়া কথা শুনিয়ে পিতার বাড়ী চলে গেলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর সঙ্গে কৃত ওয়াদাহ পূরণ করলেন এবং মক্কা বিজয়ের সময় (অষ্টম হিজরীর রমাদান মাসে) নিজের গোত্রের ৯ শত সশস্ত্র বাহাদুর সৈন্যসহ আল-কাদিম নামক স্থানে হুজুর (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং মক্কা প্রবেশে তাঁর সহগামী

হলেন। এমনিভাবে তিনি সে ১০ হাজার পবিত্র জনের অন্তর্ভুক্ত হলেন যাদের ব্যাপারে হাজার হাজার বছর পূর্বে ইসতিসনা গ্রন্থে এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল ঃ

"খোদাওন্দ সিনা থেকে এলেন। শায়ির থেকে এসে ফারান পর্বতে আবির্ভূত হলেন। তাঁর দক্ষিণ হস্তে তাদের জন্য আলোকজ্বল শরীয়ত ছিল।"

এ সময় হযরত আবাস (রাঃ) একটি শক্তিশালী কাসিদাহ বললেন। এ কাসিদায় বিজয়ের আনন্দ প্রকাশ ও আল্লাহর শোকর আদায় করা হয়েছিল।

মক্কা বিজয়ের পর হযরত আবাস (রাঃ) বিন মিরদাস হুনাইন এবং তাউসের যুদ্ধে বাহাদুরীর চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। প্রিয় নবী (সাঃ) জিয়য়ানা নামক স্থানে হুনাইনের গনিমতের মাল বন্টন করলেন। এ সময় তিনি হযরত আবাস (রাঃ) কে "মুয়াল্লাফাতুল কুলুব"দের অন্তর্ভুক্ত করলেন। মুয়াল্লাফাতুল কুলুব বলতে সে সব প্রভাবশালী আরব নও-মুসলিম সরদার ছিলেন যাদের মন জয়ের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) খাতির আত্তির করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ খাতির দেখে যাতে অন্যান্য লোকও ইসলামের প্রতি অগ্রসর হয়। হযরত রাফে (রাঃ) বিন খাদিজ থেকে বর্ণিত আছে যে, গনিমতের মাল থেকে প্রতি মুয়াল্লাফাতুল কুলুবকে একশ' করে উট প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু কোন কারণে হযরত আবাস (রাঃ) কম সংখ্যক উট পেয়েছিলেন। তিনি অন্যান্য সরদারের তুলনায় নিজের অংশ কম দেখে এক কাসিদায় অভিযোগ করলেন। হুজুর (সাঃ) এ কাসিদাহ শুনে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওজাহাহুকে বললেন, "তার জবান কেটে দাও।" হযরত আলী (রাঃ) হযরত আবাস (রাঃ)-এর হাত ধরলেন এবং বললেন, আমার সঙ্গে চলো। পথে হযরত আবাস (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে বললেন, হে আলী! আপনি কি আমার জিহ্বা কেটে ফেলবেন? তিনি বললেন, তুমি আমার সাথে এসো। আমি রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশ পালন করবো। মোট কথা তিনি হযরত আবাস (রাঃ)-কে উটের পালে নিয়ে গেলেন এবং তাকে বললেন, এ পাল থেকে নিজের পছন্দ অনুযায়ী একশ' উট বেছে নাও। তিনি একশ' উট বেছে নিলেন এবং খুব খুশী হয়ে গেলেন।

হুনাইন এবং আওতাস যুদ্ধের পর হযরত আবাস (রাঃ) তায়েফের যুদ্ধে প্রিয় নবী (সাঃ)-এর সঙ্গী হিসেবে যোগদান করার সৌভাগ্য লাভ করলেন। ইবনে হিশাম (রঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি প্রত্যেক যুদ্ধ শেষে অত্যন্ত শক্তিশালী কাসিদাহ বলতেন।

ইবনে সায়াদ (রঃ) "তাবকাতে" লিখেছেন, উল্লিখিত যুদ্ধ ছাড়া হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন মিরদাস অন্যান্য যুদ্ধেও শরীক হয়ে ছিলেন। লড়াইয়ের সময় আগমন করতেন এবং যুদ্ধ শেষে স্বদেশে (বনু সুলাইমের এলাকা) ফিরে যেতেন। দশম হিজরীতে বিদায় হজ্বেও তিনি হুযুর (সাঃ)-এর সহযাত্রী ছিলেন। ইবনে মাজাহ (রঃ) এবং বাইহাকী (রঃ) বিদায় হজ্ব প্রসঙ্গে হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন মিরদাসের এ বর্ণনা উল্লেখ করেছেনঃ

"রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সন্ধ্যায় আরাফাতের ময়দানে নিজের উম্মাতের ক্ষমার জন্য দোয়া করলেন। আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সাঃ)-এর দোয়া কবুল করে বললেন, আমি সবাইকেই ক্ষমা করে দিয়েছি। কিন্তু যালেমকে ক্ষমা করবো না এবং মযলুমের হক তার থেকে অবশ্যই আদায় করবো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, হে আল্লাহ তুমি চাইলে মযলুমকে জান্নাত দান কর এবং যালেমকে ক্ষমা করো। কিন্তু এ দোয়া আরাফার সন্ধ্যায় কবুল করা হয়নি। অতপর যখন মুজদালিফায় সকাল হলো তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পুনরায় একই দোয়া করলেন, এবং তাঁর (সাঃ) ইচ্ছা অনুযায়ী এ দোয়া কবুল করে নেয়া হলো। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যালেমকেও ক্ষমা করে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেছেন, দোয়া কবুলের পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হাসলেন অথবা মুচকি হাসি দিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেন, আমাদের মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। এটাতো হাঁসার সময় নয়। আপনাকে কোন্ জিনিস হাঁসিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সব সময় হাসিয়ে আসছেন। তিনি বললেন, আল্লাহর দুষমন ইবলিস যখন জানতে পেল যে, আল্লাহ পাক আমার দোয়া কবুল করেছেন এবং আমার উম্মাতকে ক্ষমা করে দিয়েছেন তখন মাথায় মাটি মেখে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে পালিয়ে গেল। তাকে এ পেরেশানী অবস্থায় দেখে আমার হাঁসি পেল।" (মিশকাত শরীফ)

চরিতকাররা হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন মিরদাসের ওফাতের সাল সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানাননি। তবে এতটুকুন জানা যায় যে, তিনি হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর শাসনামলে জীবিত ছিলেন। ইবনে সায়াদ (রাঃ) বলেছেন, তিনি বসরার নিকট স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি প্রায়ই শহরে আসতেন। বসরাবাসী তাঁর নিকট থেকে হাদীস শুনতেন।

ফজিলত এবং কামালিয়াতের দিক থেকে যদিও হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন মিরদাস কোন বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন না তবুও তাঁর থেকে বর্ণিত কতিপয় হাদীস, হাদীসের কিতাবে পাওয়া যায়।

আল্লামা ইউসুফ বিন যাকিউল মাযি (রঃ) "তাহজিবুল কামাল" গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর সন্তান কিনানাহ (রাঃ) তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর পুত্র জুলহুমাহ (রাঃ)-ও হাদীস বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি রাসূল (সাঃ)-এর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

* * *

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের

চতুর্থ হিজরীর কথা। রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের নিকট একটি নবজাতককে আনা হলো। রাসূল (সাঃ)-এর যুগে মুহাজির ও আনসারদের তৈরী নিয়ম অনুসারে নিজেদের নবজাতককে নবী (সাঃ)-এর নিকট আনতেন এবং তার কল্যাণের জন্যে দোয়া কামনা করতেন। এ শিশুকেও সে নিয়ম অনুযায়ী প্রিয় নবী (সাঃ)-এর খিদমতে আনা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শিশুটির ওপর স্নেহের দৃষ্টি ফেললেন। অতপর তার মুখে নিজের লালা দিয়ে তার জীবন, সুস্বাস্থ্য এবং সৌভাগ্যের দোয়া করলেন। শিশুটি রাসূল (সাঃ)-এর মুখের পবিত্র লালা মজার সাথে গিলে ফেললো। এ সময় রাসূল (সাঃ) বললেন : "এই শিশু বড় হয়ে মুসাক্কী অর্থাৎ পিপাসার্তদের পানি পান করাবে।"

আরবে পিপাসার্তদের পানি পান করানেওয়ালাকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মনে করা হতো। এ ভাগ্যবান শিশু যার মুখে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের মুখ নিঃসৃত লালা রেখেছিলেন এবং যার ব্যাপারে পিপাসার্তদের পানি পান করানেওয়ালা হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছিলেন তিনি হলেন হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের কুরাইশের সম্ভ্রান্ত বংশ বনু আবদি শামসের চোখের মনি ছিলেন। তাঁর পিতা আমের বিন কুরাইজ রাসূল (সাঃ)-এর ফুফু আল- বাইজা বিনতে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র ছিলেন। এ সম্পর্কে আমের বিন কুরাইজ প্রিয় নবী (সাঃ)-এর ফুফাতো ভাই এবং আবদুল্লা (রাঃ) বিন আমের তাঁর ভ্রাতৃপুত্র ছিল। এমনিভাবে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর ফুফু আরওয়া বিনতে কুরাইজ হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রাঃ)-এর মাতা ছিলেন। এ আত্মীয়তার সূত্রে হযরত ওসমান গনি (রাঃ) আবদুল্লাহ বিন আমেরের (রাঃ) ফুফাতো ভাই ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর নসবনামা হলো : আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের বিন কুরাইজ বিন রবিয়াহ বিন হাবিব বিন আবদি শামস বিন আবদি মান্নাফ বিন কুসাই।

আবদি মান্নাফে গিয়ে তাঁর বংশ ধারা রাসূল (সাঃ)-এর নসবনামার সাথে মিলে যায়। হুযুর (সাঃ)-এর পরদাদা হাশিম বিন আবদি মান্নাফ, হযরত আবদুল্লাহ বিন আমের (রাঃ)-এর উর্ধতন দাদা আবদি শামস বিন আবদি মান্নাফের সহোদর ছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের শিশু সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। রাসূল (সাঃ)-এর যুগে ও সিদ্দিকী শাসনামলে তাঁর শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। ওমর ফারুক (রাঃ)-এর শাসনকালে তিনি ছিলেন যুবক। চরিতকাররা রিসালাতকাল এবং শাইখাইনের (আবুবকর ও ওমর) আমলে তাঁর তেমন কোন কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করেননি। অবশ্য প্রমাণাদিতে এটা বুঝা যায় যে, তাঁর শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ অত্যন্ত সুন্দরভাবে হয়েছিল। কেননা, পরবর্তীতে তিনি নিজের সামরিক এবং ব্যবস্থাপনার যোগ্যতানুসারে শুধুমাত্র এক মহান ব্যক্তি হিসেবেই পরিগণিত হননি, বরং নিজের বদান্যতা ও দানশীলতা, ব্যক্তিগত সচ্চরিত্র এবং জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য জনসাধারণের মাঝে এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। সামরিক যোগ্যতা অনুসারে নির্দ্বিধায় তাঁকে প্রথম যুগের একজন মহান মুসলমান জেনারেলের কাতারে স্থান দেয়া যায়।

সাধারণ বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আবদুল্লাহ বিন আমের (রাঃ) ২৯ হিজরীতে প্রথম দৃশ্যে আসেন। এ সময় তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রাঃ) তাঁকে হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ)-এর স্থলে বসরার গবর্ণর নিয়োগ করেন। কিন্তু মাওলানা সাইয়েদ আবু জাফর নদভী "সিন্ধুর ইতিহাস" গ্রন্থে লিখেছেন যে, এর পূর্বে হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁকে সিসতানের অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর শাসনামলেই যদিও সিসতান বিজিত হয়েছিল তবুও সিসতান প্রদেশের অংশ বিশেষ কাবুল তখনও বিজিত হয়নি।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের সিসতান পৌঁছে সেখান থেকে কাবুলের ওপর হামলা এবং শহর অবরোধ করলেন। কাবুলবাসী শহর থেকে বের হয়ে অত্যন্ত বীরত্ব ব্যঞ্জক লড়াই করলো। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের তাদেরকে পরাজিত করলেন এবং কাবুলে ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডীন করলেন। এটি ভারতবর্ষের সেই দরজা যা মুসলমানরা তরবারীর জোরে অর্জন করেছিল। কিন্তু যখন আরব বাহিনী ফিরে গেল তখনই কাবুল আবার স্বাধীন হয়ে গেল।

২৯ হিজরীতে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের বসরার গবর্ণরীর দায়িত্ব নিলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ২৫ বছর। এটা ছিল তাঁর সাহস ও বীরত্বের চরম উৎকর্ষকাল। সে সময় বসরা প্রদেশের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। বসরার গবর্ণরকে

তখন প্রাচ্য দেশসমূহের সবচেয়ে বড় শাসক হিসেবে গণ্য করা হতো। তিনি বসরা এসে নিজের শাসনাধীন এলাকাসমূহের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলেন। কাবুলসহ সমগ্র বিজিত এলাকা তখন বিদ্রোহীদের হাতে ছিল। এতে তিনি পেরেশান হলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি শুধু বিদ্রোহীদেরকেই অনুগত করবেন না বরং দখলকৃত এলাকা ছাড়া অন্যান্য এলাকাও ইসলামের অধীনস্ত করবেন। এ লক্ষ্যে তিনি জিহাদের আবেগে সিক্ত জীবন পণকারী মুজাহিদদের সমন্বয়ে বিভিন্ন বাহিনী গঠন করলেন এবং তাদেরকে অভিজ্ঞ অফিসারদের নেতৃত্বে বিভিন্ন এলাকা দখলের জন্য নিয়োগ করলেন। সর্ব প্রথম তিনি স্বয়ং এক শক্তিশালী বাহিনীসহ পারস্যের ওপর চড়াও হলেন এবং আসতখর, দুরাবে জারদ এবং জুর (ফিরোজাবাদ) দখল করে এ প্রদেশ বিজয়ের পূর্ণতা দান করেন। ইবনে আছির (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যে সময় তিনি জুর দখলে ব্যস্ত ছিলেন সে সময় আসতখরবাসী বিদ্রোহ করে বসলো এবং সেখানকার মুসলমান শাসককে হত্যা করে ফেললো। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) জুর জয়ের পর আসতখরের দিকে দৃষ্টি দিলেন এবং এক ধাওয়াতেই তা দ্বিতীয়বার জয় করে বিদ্রোহীদেরকে সমূচিত শাস্তি দিলেন। এরপর তিনি কারবান এবং কেশজান শহর দখল করলেন এবং অন্য এক বাহিনী প্রেরণ করে কিরমানের বিভিন্ন এলাকা অনুগত করলেন।

সিসতানের কাবুলবাসী মুসলমানদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তাদের দমনের জন্যে আবদুল্লাহ বিন উমায়ের লাইসীকে সিসতানের শাসক নিয়োগ করে পাঠালেন। তিনি সেখানে পৌঁছেই কাবুলের ওপর হামলা করে বসলেন এবং বিদ্রোহীদেরকে পর্যুদস্ত করে কাবুল দখল করে নিলেন। এ সব ঘটনা ২৯ হিজরীতে ঘটেছিল।

৩০ হিজরীতে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে খোরাসানের দিকে অগ্রসর হলেন এবং হিযাতেলাতে (EPHTHALITES) পরাজিত করে দু'তিন বছরের মধ্যে মারদ, বলখ এবং হিরাত পর্যন্ত সমস্ত এলাকা করায়ত্ব করে নিলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) একদিকে নিজে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহতে ব্যস্ত ছিলেন। অন্যদিকে অধীনস্ত অফিসারদেরকে বিজয়ের জন্যে বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করছিলেন। আহনাফ বিন কায়েসকে কোহেস্তান, ইয়াযিদ জারাশীকে রাস্তাকযাম, আসওযাদ বিন কুলসুমকে রাস্তাক বাহাক এবং আবদুল্লাহ বিন মুয়াম্মারকে মাকরান পদানত করার জন্য নিয়োগ করেন।

আল্লামা বালাজুরী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, সে যুগেই হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমেরকে পত্র লিখলেন। তিনি এ পত্রে ভারত বর্ষের অবস্থা জানার জন্য কাউকে প্রেরণের কথা বলেছিলেন। তিনি হাকিম বিন জাবালা আবদীকে প্রেরণ করলেন। সে ফিরে এলে হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁকে সেখানকার অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি আরজ করলেন ঃ "আমীরুল মু'মিনিন! সেখানে পানি খুব কম এবং সেখানকার মানুষ ডাকাত। স্বল্প সংখ্যক সৈন্য সেখানে গেলে তাদেরকে লুটে নেয়া হবে। আর বেশী সংখ্যক গেলে পিপাসায় শেষ হয়ে যাবে।"

এরপর হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমেরকে নির্দেশ দিলেন যাতে তার সৈন্য ভারতবর্ষে প্রবেশ না করে।

এ বর্ণনা সন্দেহ যুক্ত মনে হয়। কেননা হযরত আবদুল্লাহ বিন আমের (রাঃ)-এর একজন জেনারেল আবদুর রহমান (রাঃ) বিন সামুরাহ বর্তমান বেলুচিস্তানে প্রবেশ করে কয়েকটি স্থান জয় করে নিয়েছিলেন। সে সময় হযরত ওসমান গনি (রাঃ)-এরই শাসনকাল ছিল। যদি হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের (রাঃ)-কে কোন নিষেধাজ্ঞামূলক নির্দেশ দিতেন তাহলে তিনি কখনই নিজের কোন সামরিক অফিসারকে ভারতবর্ষের সীমানায় প্রবেশের অনুমতি দিতেন না।

ইবনে আছির (রঃ) সম্পূর্ণ একই ধরনের ঘটনা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর শাসনকালের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। শুধু পার্থক্য এতটুকুন যে, তাতে ভারতবর্ষে গমনকারী ব্যক্তির নাম হাকিম বিন জাবালা আবদীর পরিবর্তে সাহার আবদী বলা হয়েছে। ধারণা করা হয় যে, বিভিন্ন কারণে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) মুসলমানদেরকে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হওয়া থেকে নিষেধ করেছিলেন।

বিভিন্ন অভিযানে নিয়োগকৃত হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমেরের সামরিক অফিসারদের সাফল্য এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সব অফিসার হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর নিকট থেকেই নির্দেশাবলী পেতেন।

হযরত ইবনে আমের (রাঃ) আবদুল্লাহ বিন উমাইর লাইছীকে সিসতান এবং আবদুর রহমান বিন উবাইসকে কারমানের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। তাঁরা উভয়েই সেখানে শান্তি-শৃংখলা বিধানের জন্য অত্যন্ত সুবন্দোবস্ত করেছিলেন। কিন্তু উভয়

প্রদেশের বাসিন্দাই বিশৃংখলা প্রিয় ছিল। কোন না কোন ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করেই রাখতো। ইবনে আমের (রাঃ) এ সব ঘটনার খবর পেয়ে নিজেই খোরাসান গেলেন। ইবনে আছির (রঃ)–এর বর্ণনা অনুযায়ী সিসতানের শাসনভার রবি বিন বিয়াদ হারছিকে অর্পণ এবং মাজাশি বিন মাসউদকে কারমানের গবর্ণর নিয়োগ করলেন।

মাজাশি (রঃ) বিন মাসউদ কারমান পৌছে সেখানকার গুরুত্বপূর্ণ শহর হুমাইদ দখল করলেন। তারপর বিশৃংখলাকারীদেরকে উৎখাত করে সিসতানের রাজধানী "সারেরজানের" ওপর আধিপত্য কায়েম করলেন।সাধারণ নাগরিকদেরকে তিনি ক্ষমা করলেন। কিন্তু বিদ্রোহী ও বিশংখলা সৃষ্টিকারীদের নেতাদেরকে বহিষ্কার করলেন। তারপর তিনি জিরফত দখল করলেন। অতপর কাফাসের পর্বতমালায় এক রক্তাক্ত যুদ্ধে সেখানকার জনগণকে অনুগত বানালেন।

"কাফাস" সম্পর্কে মাওলানা সাইয়েদ আবু জাফর নদভী "তারিখে সিন্ধ"–এ এ ধারণা পোষণ করেছেন যে, কাফাস দৃশ্যত কাবাচের অংশ বিশেষ। এর অর্থ হলো তারা কাবচাকের (তুরকিস্তান) বাসিন্দা ছিল এবং সেখান থেকে হিজরত করে (অথবা বিজয়ীর বেশে) কোন এক সময় ভারতবর্ষের পশ্চিমে পাহাড়ী এলাকায় এসে বসতি স্থাপন করে। সম্ভবতঃ তাদেরকেই বর্তমানে পাঠান ও বালুচ বলা হয়।

আহনাফ বিন কায়েস (রঃ) কাহসিতানের দিকে অগ্রসর হলেন। এ সময় তুর্কীরা ইবনে আমের (রাঃ)–এর খিদমতে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে সন্ধি করলো। এক বর্ণনায় এও বলা হয়েছে যে, আহনাফ (রঃ) তরবারীর জোরে পরাজিত করে কাহসিতান দখল করে নেন।

ইয়াযিদ তারশী (রঃ) রাতাক জামের বিভিন্ন এলাকায় হামলা চালিয়ে বাখরজ, রাতাকে জাম এবং জাভিদ দখল করলেন। আসওয়াদ বিন কুলছুম (রাঃ) রাতাক বাহাকের ওপর হামলা করলেন। কিন্তু তিনি এ যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেলেন। তবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত আওহাম বিন কুলছুম (রঃ) শত্রুদের পরাজিত করে বাহাকের ওপর ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডীন করলেন।

উবাইদুল্লাহ বিন মুয়াম্মার (রঃ) মাকরানে কদম মজবুত করে সকল বিদ্রোহীকে উৎখাত করলেন এবং বিজয়ের পর বিজয় অব্যাহত রেখে ভারতবর্ষের সীমান্তে পৌছে গেলেন।

রবি বিন বিয়াদ (রঃ) সিসতান পৌছে বালিক দুর্গ দখল করলেন। কিন্তু যখন বালিকবাসী আনুগত্যের শপথ করলো তখন দুর্গটি তাদের নিকট প্রত্যর্পণ করা হলো।

এরপর তিনি কয়েকটি রক্তাক্ত সংঘর্ষের পর কারকবিয়া, যাশত, নাশরোয এবং শারওয়ায শহর দখল করে নিলেন। পরে তিনি যারানজ অবরোধ করলেন। যারানজবাসী প্রথমে দুর্গবন্দী হয়ে খুব মুকাবিলা করলো। কিন্তু অবরোধের কঠোরতায় অস্থির হয়ে সন্ধির পয়গাম প্রেরণ করলো। রবি ক্ষমার ওয়াদা করে তাদের শাসককে ডেকে পাঠালেন। এদিকে তিনি নিজের সৈন্যদেরকে এমন পোশাক পরালেন এবং তাদের আকৃতি এমন বানালেন যে, দেখে ভীত হতে হয়। অতপর নিজে একটি লাশের পিঠের ওপর বসে পড়লেন। এবং অপর একটি লাশ বালিশ হিসেবে পেছনে রেখে দিলেন। যারানজের শাসক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এসে এ অবস্থা দেখে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলো এবং কোন বাদানুবাদ বা আলোচনা ছাড়াই মুসলমানদের শর্ত মেনে শহরের দরজা খুলে দিলেন, যারানজ দখলের পর রবি সানারোজ নদী পার হয়ে "আত্তাবল রুস্তম" নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে হামলা করে বসলেন। প্রথমে সেখানকার বাসিন্দারা মুকাবিলা করলো। কিন্তু যখন দেখলো যে, মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করা তাদের শক্তি ও সামর্থের বাইরে তখন অস্ত্র ফেলে দিয়ে আনুগত্য প্রকাশ করলো। মোট কথা, রবি সমগ্র সিসতানে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করে ফিরে এলেন। এক বছর পর তিনি নিজের এক নায়েবকে সিসতানে রেখে আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য খোরাসান এলেন। তিনি সিসতান যেতেই বিদ্রোহীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো এবং নায়েবকে সিসতান ছাড়তে বাধ্য করলো। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের এ খবর পেয়ে এক অভিজ্ঞ জেনারেল হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বিন সামুরাহকে নতুন করে সিসতান দখলের জন্য নিয়োগ করলেন এবং সাথে সাথে তাঁকে ইমামতের দায়িত্বও দিয়ে দিলেন। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) সাহাবী হওয়া ছাড়াও উন্নত ধরনের সামরিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি আট হাজার জীবন উৎসর্গকারী বাহিনীসহ সিসতান প্রবেশ করলেন এবং সকল বাধা পর্যুদস্ত করে যারানজ পৌঁছে গেলেন। যারানজের ইরানী শাসক ইরান বিন রুস্তম শহরের দরজা বন্ধ করে দিল। কিন্তু অবশেষে সেখানে অবস্থানের শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। সে বিশলাখ দিরহাম এবং দু'হাজার গোলাম দিয়ে মুসলমানদের আনুগত্য কবুল করে নিল।

অন্য এক রাওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, যেদিন হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) যারানজের ওপর হামলা করেন, সেদিন যারানজবাসী কোন পর্বের আনন্দে মশগুল ছিল। হঠাৎ করে মুসলমানদেরকে মাথার ওপর দেখে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো এবং কোন বাধা ছাড়াই আনুগত্য কবুল করে নিল।

যারানজ করতলগত করার পর হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) যারানজ এবং কাশের মধ্যবর্তী এলাকাসমূহের ওপর তাওহীদের ঝাণ্ডা বুলন্দ করলেন। এ প্রসঙ্গে মাওলানা সাইয়েদ আবু জাফর নদভী নিজের লিখা পুস্তক "তারিখে সিন্ধ"-এ লিখেছেনঃ

"আবদুর রহমান (রাঃ) বিন সামুরাহ যারানজ এবং কাশের মধ্যবর্তী সকল এলাকা দখল করে নিয়েছিলেন। এ এলাকা যদিও বর্তমানে বেলুচিস্তানের অন্তর্ভূক্ত, কিন্তু সে যুগে তা ভারতবর্ষের অধীন ছিল। কেননা সে সময় বেলুচিস্তান নামে কোন প্রদেশ ছিল না। এমনকি মাকরান এবং সিসতানও সিন্ধুর সাথে যুক্ত ছিল। এ দিক থেকে ভারতবর্ষের মাটিতে এ প্রথম হামলা যা শুষ্ক এলাকা দিয়ে সংঘটিত হয়েছিল এবং এটিই ভারতবর্ষের প্রথম এলাকা যা মুসলমানদের অধীনে এসেছিল। আর স্বয়ং রাসূল (সাঃ)-এর একজন সাহাবী (রাঃ)-এর পবিত্র হাতে তা বিজিত হয়েছিল।

মূর্তি পূজার দেশ ভারতবর্ষে হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বিন সামুরাহই তাওহীদের প্রদীপ প্রজ্বলনকারী মুজাহিদদের নেতা ছিলেন। তিনিই ভারতবর্ষে অন্যান্য মুসলিম বিজেতাদের (মুহাম্মাদ বিন কাসিম, শাহাবুদ্দীন ঘোরী এবং মাহমুদ গজনীর) অগ্রপথিক ছিলেন।

এরপর হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) রাখজের দিকে অগ্রসর হলেন এবং দাদনের (অথবা দাওয়া) গুরুত্বপূর্ণ শহরে পৌছলেন। এ শহরের সন্নিকটে এক পাহাড়ের ওপর এক বিরাট মন্দির ছিল। মন্দিরটি একটি মজবুত দুর্গাকৃতির ছিল। সেখানে যম্বর নামক দেবতার মূর্তি স্থাপিত ছিল। এ দেবতার নামানুসারেই পাহাড়টির নামকরণ করা হয়েছিল" কোহে যম্বর"। এ মন্দির মূর্তি পুজারীদের নিকট অত্যন্ত পবিত্র স্থান ছিল। তারা দূর-দূরান্ত থেকে তা দর্শনে আসতো এবং বহু মূল্যবান উপঢৌকন মূর্তির পায়ের তলায় রাখতো। দাদনবাসী পালিয়ে সে মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করলো এবং শহরের দরজা বন্ধ করে দিলো। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) মন্দির এবং শহর অবরোধ করলেন। তিনি এত কঠোরতা অবলম্বন করলেন যে, মূর্তিপুজারীদেরকে একটি বিরাট অংক দিয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হতে হলো। আল্লামা ইবনে আছির (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) দাদনের মন্দিরে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন বিরাট এক খোদিত মূর্তি। তার চোখে অতন্ত মূল্যবান হীরা বসানো রয়েছে। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) প্রথমে বর্শা দিয়ে মূর্তির চোখ বের করে ফেললেন। অতপর হাত ভেঙ্গে দিলেন। এরপর তিনি সেখানকার শাসক ও অধিবাসীদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ

"হে মানুষেরা! এ হীরা এবং মূর্তির ভগ্ন হাত ওঠিয়ে নাও। তাতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমি এ কাজ শুধু তোমাদেরকে দেখানোর জন্যে করেছি যে, মূর্তি

কখনো উপকার অথবা ক্ষতি সাধন করতে পারে না। এ জন্যে তার ইবাদাত করার অর্থই হলো নিজকে ধ্বংস করা। হে মানুষেরা! আল্লাহই একমাত্র উপাস্য। তিনিই প্রত্যেক বস্তুর মালিক এবং তিনিই উপকার ও ক্ষতি সাধনের ক্ষমতা রাখেন। যদি তোমরা আল্লাহর ওপর ঈমান আনো তা'হলে আশা করা যায় যে, তিনি তোমাদের অন্তর খুলে দেবেন এবং তোমরা দ্বীন ইসলাম ভালোভাবো বুঝতে সক্ষম হবে।"

দাদনের পর হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) যাবল (গজনীহ) এবং বাস্ত জয় করলেন। অতপর যারানজ ফিরে এলেন। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা লিখেছেন, হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)-এর বাহিনীতে গাজা হাসান বসরী (রঃ) এবং অন্যান্য অনেক আলেম এবং ফকিহ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ সব বুজর্গ ব্যক্তি বিজিত এলাকাসমূহে ইসলামের প্রসার ও প্রচারের কাজে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে বহুসংখ্যক মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের একদিকে নিজের জেনারেলদেরকে যুদ্ধে ব্যস্ত রেখেছিলেন। অন্যদিকে স্বয়ং ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ ফি সাবিলিল্লায় মশগুল ছিলেন। বস্তুতঃ তিনি আশবান্দ, যাদাহ, বাশত, আসফারায়েন, গাওয়াফ, রাখ এবং আরইয়ান শহরসমূহ জয় করতে করতে নিশাপুরের রাজধানী আবর শহর পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন এবং তা অবরোধ করলেন। শহরবাসী কয়েকমাস পর্যন্ত মুকাবিলা করলো। কিন্তু এক রাতে মুসলমানদেরকে শহরের ছোট বড় সড়কে ঘুরতে ফিরতে দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল। এর ফলে শহরের কতিপয় রক্ষী অত্যন্ত সংগোপনে ইবনে আমের (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জীবন রক্ষার প্রতিশ্রুতি নিয়ে শহরের একটি দরজা খুলে দিল। মুসলমানরা বাইরে অপেক্ষমান ছিল। তারা তৎক্ষণাৎ শহরে প্রবেশ করলো। শহরের শাসক সেনাবাহিনীর কয়েকটি দলসহ দূর্গে আশ্রয় নিল। কিন্তু সেও বেশীদিন অবরোধের কঠোরতা বরদাশত করতে না পেরে বার্ষিক দশ লাখ দিরহাম খিরাজ দানের প্রতিশ্রুতিতে সন্ধি করলো। এভাবে নিশাপুরের সকল প্রদেশ মুসলমানদের অধীনে এলো।

নিশাপুর দখলের পর হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের আবদুল্লাহ বিন খাযেমকে "নিসা"র দিকে প্রেরণ করলেন। নিসা'র শাসক তিন লাখ দিরহামের প্রতিশ্রুতিতে সন্ধি করলো। তার এ সন্ধি দেখে আবইউরের শাসকও চার লাখ দিরহাম রাজস্ব প্রদান মঞ্জুর করলো। এ থেকে ইবনে আমের (রাঃ) আবদুল্লাহ বিন খাযেমকে সারাখাস দখলের জন্য নিয়োগ করলেন। তিনি সারাখাসের ওপর হামলা চালালে সেখানকার শাসক যাদবিয়াহ মামুলি ধরনের বাঁধা দানের পর আনুগত্য স্বীকার করে নিল। সারাখাস থেকে, ইবনে খাযেম ইয়াযিদ বিন সালেমের নেতৃত্বে কিছু সৈন্য প্রেরণ করে কাইফ এবং নাবিতা শহর জয় করে নিলেন। তওসের শাসক মুসলমানদের বিজয় বন্যা নিজের দিকে ধাবিত হতে

দেখে সশরীরে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বার্ষিক ছ'লাখ দিরহাম রাজস্ব প্রদানের ওয়াদা করলো এবং ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্যের ঘোষণা দিল।

আবদুল্লাহ বিন খাযেমকে সারাখাসের দিকে প্রেরণ করে ইবনে আমের (রাঃ) নিজেও বসে থাকলেন না। তিনি এক শক্তিশালী বাহিনীসহ হিরাতের দিকে অগ্রসর হলেন। হিরাতের শাসক মুসলমানদের অগ্রাভিযানের খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমেরের খিদমতে উপস্থিত হয়ে জিযিয়া প্রদানে রাজী হয়ে আনুগত্য ঘোষণা করলো। তাঁর দেখাদেখি মরদে শাহজাহানের শাসকও জিযিয়া প্রদানে সম্মত হলো এবং বার্ষিক ২২ লাখ দিরহাম প্রদানের আনুগত্যনামা লিখে দিল। এবার ইবনে আমের (রাঃ) আহনাফ বিন কায়েস (রঃ)-কে তাখারিস্তান প্রেরণ করলেন। তিনি কয়েকটি দূর্গ ও শহর অনুগত করার পর তাখারিস্তানের কেন্দ্রীয় শহর মারওয়ারোজ অবরোধ করলেন। শহরবাসী প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করলো। কিন্তু অবশেষে আনুগত্য স্বীকার করলো। ইত্যবসরে হযরত আহনাফ (রঃ) খবর পেলেন যে, বিপুল সংখ্যক শত্রু জুজজানে একত্রিত হয়েছে। তিনি হযরত আকরা (রাঃ) বিন হাবিস তামিমিকে তাদের উৎখাতের জন্য প্রেরণ করলেন। হযরত আকরা (রাঃ) শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করে জুজজান জয় করে নিলেন। এক্ষণে হযরত আহনাফ তালকান ও ফারিয়াবের দিকে অগ্রসর হলেন এবং শহর দু'টি জয় করে বলখ পৌঁছে গেলেন। বলখবাসী মুকাবিলার সাহস না পেয়ে বার্ষিক চার লাখ দিরহাম রাজস্ব প্রদানের ওয়াদা করে সন্ধি করে নিল।

ওদিকে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের জিহুন (OXUS) নদী পার হয়ে মা ওরাউননাহর প্রবেশ করলেন। মা ওরাউন্‌নাহারবাসী মুসলমানদের শক্তি সম্পর্কে পরিজ্ঞাত ছিল। তারা মুকাবিলার পরিবর্তে সন্ধির মধ্যেই কল্যাণ দেখতে পেল। বস্তুতঃ তাদের একটি প্রতিনিধি দল অসংখ্য ঘোড়া। রেশমী কাপড়, দাস-দাসী এবং বিভিন্ন ধরনের উপঢৌকনসহ হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমেরের নিকট উপস্থিত হয়ে সন্ধির দরখাস্ত করলো। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তাদের দরখাস্ত কবুল করলেন এবং কায়েস ইবনুল হাইছামকে মা ওরাউন্‌নাহরে নিজের ভারপ্রাপ্ত নিয়োগ করে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

সকল নেতৃস্থানীয় চরিতকারই হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শাসনকালে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমেরের ব্যাপক বিজয়ের কথা বিস্তৃত আকারেই বর্ণনা করেছেন। মা ওরাউন্‌নাহার, ইস্পাহান, হালওয়ান, কারমান, সারাখাস, গজনী, কাবুল, হিরাত, মারদ, আসতাখার, নিশাপুর প্রভৃতি তাঁর হাতে প্রথম অথবা দ্বিতীয়বার বিজিত হয়। এমনকি মুসলমানরা বেলুচিস্তান পর্যন্ত পৌঁছে যান।

ইবনে আমের (রাঃ)-এর বিজয়াবলীর ঘটনাসমূহ পাঠ করে জানা যায় যে, তিনি একজন সাহসী এবং বীর সেনাপতি ছিলেন এবং সে সময় সামরিক যোগ্যতায় এক নজীরবিহীন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর বিজয়সমূহের এক উল্লেখযোগ্য দিক হলো যে, তিনি যথাসম্ভব রক্তপাত এড়িয়ে গিয়েছিলেন। যেসব শহর ও এলাকার বাসিন্দারা সন্ধির আবেদন করেছিল তিনি তা কবুল করে তাদের নিরাপত্তা প্রদান করেছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের বিজয়সমূহ সম্পন্ন করে হজ্বের মওসুমে বসরা থেকে মক্কা এসে শুকরানা হজ্ব আদায় করলেন। হজ্বের পর তিনি প্রথম মক্কায় এবং পরে মদীনায় গিয়ে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে পুরস্কার ও দানের বৃষ্টিবর্ষণ করলেন। ইবনে আছির (রঃ) বর্ণনা করেছেন, ব্যাপক বিজয়কালে প্রাপ্ত প্রভূত গণিমতের মালের বেশীরভাগই তিনি মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিলেন। মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে এ দানের বিরাট প্রভাব পড়েছিল। তারা ইবনে আমের (রাঃ)-কে প্রভূত দোয়া করেছিলেন। এ কাজ শেষে তিনি নিজের রাজধানী বসরা ফিরে আসেন এবং হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের নির্দয় শাহাদাত পর্যন্ত স্ব-দায়িত্ব পালন করেন।

"দায়েরায়ে মায়ারেফে ইসলামিয়া" গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, বিদ্রোহীরা খিলাফত ভবন অবরোধকালে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের আমীরুল মু'মিনিনকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তা নিষ্ফল হয়। অধিকাংশ বর্ণনায় জানা যায় যে,হযরত উসমান (রাঃ)-এর মনের পবিত্রতা এমন চরম পর্যায়ে পৌছে ছিল যে, তিনি মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ এবং মদীনার হেরেমকে মুসলমানের রক্তে রঞ্জিত হওয়া থেকে রক্ষার জন্য নিজের গভর্ণরদের সাহায্যই তলব করেননি। নচেৎ লাখ লাখ বর্গ মাইল বিজয়কারী ও জীবন উৎসর্গকারী জেনারেলরা যদি নিজেদের বাহিনীসহ আমীরুল মু'মিনিনের সাহায্যে পৌছতেন তাহলে মুষ্টিমেয় বিশৃংখলাকারী তাদের সামনে কোনক্রমেই তিষ্টাতে পারতো না।

হযরত ওসমান গনি (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর হযরত আলী কাররামাল্লাহ ওয়াজহাহু খলিফা নির্বাচিত হলে ওসমান (রাঃ)-এর কিসাসের প্রসঙ্গে দুঃখজনক উটের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)-এর সঙ্গে ছিলেন। আবু হানিফা দিনাওয়ারীর বর্ণনা অনুযায়ী তিনি আনসার বনু কায়েস এবং বনু ছাকিফের নেতৃত্ব প্রদান করেন। (আল-আখবারুত তাওয়াল।)

ইবনে আছির (রঃ) "উসুদুল গাববাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শাহাদাতের খবর শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন।

কেননা হযরত ওসমান (রাঃ) শুধুমাত্র হক খলিফাই ছিলেন না, বরং তাঁর নিকটতম বন্ধু ছিলেন। বস্তুতঃ তাঁর শাহাদাতের পর ব্যাপক বিশৃংখলা দেখা দিয়েছিল। তিনি বাইতুল মালের অর্থসহ বসরা থেকে মক্কা এলেন। সেখানে উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা, হযরত তালহা এবং হযরত যোবায়ের (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত হলো। তিনি জানতে পেলেন যে, তাঁরা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর কিসাসের নিয়তে সিরিয়া গমনের ইচ্ছা পোষণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁদেরকে তার সঙ্গে বসরা গমনের পরামর্শ দিলেন এবং বললেন, সেখানে তাঁরা যথেষ্ট সাহায্যকারী পাবেন। সুতরাং তাঁরা তার সাথে বসরা এলেন এবং সেখানেই দুঃখজনক উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হলো।

হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু এবং হযরত আমীর মাবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যে সিফফিনের যুদ্ধ শুরু হলো। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) আমীর মাবিয়াহ (রাঃ)-এর পক্ষভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধে বিশেষ কোন তৎপরতা দেখাননি। অবশ্য উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ মুলতবির চুক্তিতে অন্যান্যের মত তিনিও সাক্ষী হিসেবে নিজের নাম দস্তখত করেন।

হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর শাহাদাতের পর সাইয়েদেনা হযরত হাসান (রাঃ) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। আমীর মাবিয়া (রাঃ) তাঁর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের সময় হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমেরকে অগ্রবর্তী বাহিনীর অফিসার নিয়োগ করেন। হযরত হাসান (রাঃ) প্রথমে নিজের বাহিনীসহ মাদায়েন তাশরীফ আনেন। সেখান থেকে মুকাবিলার জন্য বের হয়ে সাবাতে তাঁবু ফেললেন। সাবাতে অবস্থানকালে তিনি নিজের সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ প্রশ্নে নিষ্ক্রিয়ভাব লক্ষ্য করেন। কতিপয় খারেজী তাঁকে অপদস্ত করার চেষ্টা চালায়। এমনকি জারাহ বিন কাবিজাহ নামক হতভাগা হামলা করে তাঁর পবিত্র উরু জখম করে দেয়। ফলে সাইয়েদেনা হাসান (রাঃ) মাদায়েন ফিরে আসেন এবং জখম ভালো হওয়া পর্যন্ত কাসরে আবিয়াজে অবস্থান করেন। জখম ভালো হলে পুনরায় মুকাবিলার জন্য বের হন। এ সময় আমীর মাবিয়া (রাঃ)-ও আম্বার পৌছেছিলেন। আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের এবং হযরত হাসান (রাঃ)-এর বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখী হলে হযরত ইবনে আমের (রাঃ) সাইয়েদেনা হাসান (রাঃ)-এর নিকট দূত প্রেরণ করে সালাম এবং একটি বাণী প্রেরণ করলেন। বাণীতে তিনি উল্লেখ করলেন যে, তাঁর মর্যাদা শুধু আমীর মাবিয়া (রাঃ)-র অগ্রবর্তী বাহিনীর। তিনি নিজেও একটি বাহিনীসহ আম্বার পৌছেছেন। আপনার এবং আপনার সহযোগীদের কসম। যুদ্ধ মুলতবী করুন।

সাইয়েদেনা হযরত হাসান (রাঃ)-এর সাথীরা এ বাণী শুনে লড়াই থেকে পিছ পা হতে লাগলো। হযরত হাসান (রাঃ) তাদের দুর্বলতা টের পেলেন। সুতরাং তিনি পুনরায় মাদায়েন ফিরে গেলেন। তাঁর ফিরে যাওয়ার সাথে সাথে ইবনে আমের (রাঃ) অগ্রসর হয়ে মাদায়েন অবরোধ করলো। হযরত হাসান (রাঃ) প্রথম থেকেই পারস্পরিক রক্তারক্তি

অপছন্দ করতেন। নিজের সাথীদের ভূমিকা দেখে কতিপয় শর্তে আমীর মাবিয়া (রাঃ)-এর পক্ষে খেলাফত থেকে সরে দাঁড়ালেন। ইবনে আমের (রাঃ) এ শর্তাবলী আমির মাবিয়া (রাঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। তিনি এ সব শর্ত মেনে নিলেন।

৪১ হিজরীতে আমীর মাবিয়া (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমেরকে দ্বিতীয়বার বসরার গভর্ণর নিয়োগ করেন। ইবনে আছির (রঃ) বর্ণনা করেছেন, আমীর মাবিয়া (রাঃ) বসরার গবর্ণর হিসেবে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইবনে আমের তাঁকে বললেন যে, বসরায় তাঁর অনেক ধন-সম্পদ রয়েছে। যদি অন্য কেউ সেখানকার গবর্ণর হয়, তাহলে সব বরবাদ হয়ে যাবে। এ কথায় আমীর মাবিয়া (রাঃ) তাঁকেই বসরার গবর্ণরীর দায়িত্ব অর্পণ করেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের দ্বিতীয়বার বসরার গবর্ণর হয়ে এসে খবর পেলেন যে, কাবুল, হিরাত, বুশানজ, বলখ, বাজগিস প্রভৃতি শহর এবং এলাকা বিদ্রোহী হয়ে গেছে। তিনি বিদ্রোহীদেরকে উৎখাতের জন্য কায়েস ইবনুল হাইছামকে খোরাসানে, আবদুল্লাহ বিন খাযেমকে হিরাত এবং হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বিন সামুরাহকে সিসতানের দিকে প্রেরণ করলেন। কায়েস ইবনুল হাইছাম বিদ্রোহীদেরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে করতে বলখ পৌঁছলেন এবং শহর দখল করে সেখানকার প্রখ্যাত অগ্নিকুণ্ড নওবাহার মিসমার করে ফেললেন। আবদুল্লাহ বিন খাযেম হিরাত, বুশানজ এবং বাজগিসের বিদ্রোহীদের ওপর যথাযথ আঘাত হেনে অনুগত বানালেন।

আবদুর রহমান (রাঃ) বিন সামরাহ এলাকার পর এলাকা জয় করতে করতে কাবুল পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন এবং শহর অবরোধ করলেন। কাবুলবাসী অত্যন্ত ফাসাদ প্রিয় ছিল। এ জন্য হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) অবরোধের সময় অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করলেন। একরাতে প্রাচীরের ওপর কামান দিয়ে এমন প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করলেন যে, তা ছিদ্র হয়ে গেল। তিনি উবাদ বিন হাছিনকে সৈন্যের একটি দল দিয়ে ছিদ্রটির তত্ত্বাবধানে নিয়োগ করলেন। সকালে শহরবাসীরা বাইরে বেরিয়ে প্রচণ্ড হামলা চালালো, কিন্তু পরাজিত হলো এবং মুসলমানরা শহরে প্রবেশ করলো।

এরপর হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) অগ্রসর হয়ে খাশবসত, রযান এবং খুশক শহর জয় করলেন এবং রাখজ ঘিরে ফেললেন। রাখজবাসী সামান্য মুকাবিলার পর অস্ত্র ফেলে দিলো এবং আনুগত্য কবুল করে নিলো। রাখজ দখলের পর হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) এক রক্তাক্ত যুদ্ধের পর দ্বিতীয়বার গাজনাহ দখল করলেন। অতপর তিনি কান্দাহারের ওপর ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডীন করলেন এবং আরেকবার কাবুলের দিকে অগ্রসর হলেন। সেখানকার বাসিন্দারা তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে নিজেদের অভ্যাস

অনুযায়ী পুনরায় বিদ্রোহ করে বসে। কাবুলবাসী প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে মুকাবিলা করলো। মুসলমানরা তাদেরকে নিদারুনভাবে পরাজিত এবং কাবুলে নিজেদের অবস্থান দৃঢ়ভাবে মজবুত করলো।

৪৩ হিজরীতে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের আবদুল্লাহ বিন সাওয়ার আবদীকে ভারতের উপকূলের বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী লোকদের শাস্তি প্রদানের জন্য ৪ হাজার মুজাহিদসহ প্রেরণ করলেন। তারা মাকরানে কয়েকমাস অবস্থান করলো। ইবনে আছির (রঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি কাইকানবাসীকে চরমভাবে পরাজিত করে গণিমতের মালসহ সোজা দামেস্ক পৌছলেন। তিনি সেখানে আমীর মাবিয়া (রাঃ)-এর খিদমতে কয়েকটি কাইকানী ঘোড়া পেশ করলেন।

৪৪ হিজরীতে ইবনে আমের (রাঃ) মুহাল্লাব বিন আবি সাফরার নেতৃত্বে একটি বাহিনী সিন্ধুর দিকে প্রেরণ করলেন, ইবনে আছির (রঃ)-এর বক্তব্য অনুযায়ী মুহাল্লাব সিন্ধুর সীমান্তে যুদ্ধ করলেন এবং শত্রুর দাঁত ভেঙ্গে দিলেন। অতপর তিনি বিজয় কেতন উড়াতে উড়াতে দেশে ফিরে গেলেন।

কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন, মুহাল্লাব বিন আবি সাফরাহ খাইবার গিরিপথে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। সে যুগে পেশোয়ার থেকে মুলতান পর্যন্ত সমগ্র এলাকা সিন্ধুর অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুহাল্লাবই প্রথম আরব সেনাপতি যিনি খাইবার গিরিপথ দিয়ে ভারত অথবা সিন্ধুতে প্রবেশ করেন।

বসরায় দ্বিতীয়বার গবর্ণরীর তিন বছর অতিক্রান্ত হতেই আমীর মাবিয়া (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমেরকে পদচ্যুত করেন। উপজাতীয়দের সাথে নরম ব্যবহার করার কারণেই এটা করা হয়েছিল। আমীর মাবিয়া (রাঃ)-এ নরম ব্যবহারকে অত্যন্ত বিপদজনক মনে করতেন। সুতরাং আমীর মাবিয়া (রাঃ) ইবনে আমের (রাঃ)-এর স্থলে একজন কঠোর প্রাণ ব্যক্তিকে বসরা প্রেরণ করেছিলেন। বরখাস্তের পর হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের বিভিন্ন মত অনুযায়ী মদীনা মুনাওয়ারাহ অথবা মক্কা মুয়াজ্জমা চলে যান এবং একাকীত্বের জীবন গ্রহণ করেন।

তার ওফাতের সাল নিয়েও মত পার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ ৫৭ হিজরীর কথা লিখেছেন। কেউ ৫৮ হিজরীর কথা বলেছেন। এক বর্ণনায় ৫৯ হিজরীর কথাও পাওয়া যায়।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের সামরিক নিপুণতা দিয়েই শুধুমাত্র নিজেকে সজ্জিত করেননি বরং জনগণের সেবা ও কল্যাণের জন্যও বহু সমাজসেবামূলক কাজ

করে গেছেন। তিনি মাতৃক্রোড়ে মুহসিনে ইনসানিয়াত বা মানবতার কল্যাণকামী রাসূলে করিম (সাঃ)-এর পবিত্র মুখের লালা চেটেছিলেন এবং নবী করিম (সাঃ) তাঁর জন্য এ ভাষায় দোয়া করেছিলেনঃ "এ শিশু (বড় হয়ে) মুসাফী তৃষ্ণার্তদের পানি পানকারী হবে।"

সৃষ্টির সেরা নবী করিম (সাঃ)-এর এ ভবিষ্যদ্বাণী হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমেরের জীবনে পুরোপুরিই প্রতিফলিত হয়েছিল। আল্লাহপাক তাঁর অন্তরে আরবের শুকনো মাটির বাসিন্দাদেরকে বেশী বেশী পানি সরবরাহের সীমাহীন আবেগ সৃষ্টি করেছিলেন। বস্তুতঃ এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তিনি বসরায় দু'টি নহর খোদাই করেছিলেন। এছাড়া উবুল্লাহ নহর সংস্কার করেন। আরাফাতের ময়দানে হাজীদের পানির কষ্ট হতো। তিনি সেখানে বড় বড় পুকুর এবং হাউজ বানিয়ে নহরের পানি সেখানে আনার ব্যবস্থা করেন। এ ছাড়াও তিনি বিভিন্নস্থানে বহুসংখ্যক কূপ খনন করান এবং পানিবিহীন জমিতে বিভিন্ন উপায়ে পানি সেচের ব্যবস্থা করেন। জনসেবা ও শুষ্ক জমিতে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা ছাড়াও তিনি বিভিন্নমুখী জনকল্যাণমূলক কাজ আঞ্জাম দেন। আন-নিহাজ এবং কারইয়াতাইনে বৃক্ষ রোপন করেন এবং বসরায় অনেক বাড়ী ক্রয় করে বাজার তৈরী করেন।

সরকারীভাবে জনকল্যাণমূলক কাজ ছাড়াও হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের ব্যক্তিগতভাবেও আল্লাহর সৃষ্টিজীবকে অনেক উপকার করেছিলেন। প্রকৃতিগতভাবে তিনি ছিলেন দানশীল এবং কল্যাণকামী। আল্লাহ পাক তাঁকে অফুরন্ত ধন-সম্পদ দান করেছিলেন। দু'দুবার বসরার গবর্ণর হয়েছিলেন। এ বড় পদের জন্য উপযুক্ত ভাতা ছিল। নিজের গবর্ণরীর সময় অসংখ্য বিজয়লাভ করেছিলেন। ফলে গণিমতের মালও পেতেন। ইবনে আছির (রঃ) "উসুদুল গাবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, মক্কা মুয়াজ্জামার উপকণ্ঠে প্রচুর বাগান এবং জমি ছিল। এ ছাড়াও তিনি বিরাট অংকের অর্থ বিভিন্ন ব্যবসায়ে লাগিয়েছিলেন। এর মাধ্যমেও অর্থ সমাগম হতো। এমনিভাবে তিনি কুরাইশের নেতৃস্থানীয় সরদার হিসেবে পরিগণিত ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে যে ধরনের ধন-সম্পদ প্রদান করেছিলেন সে ধরনের প্রশস্ত অন্তরও বানিয়েছিলেন। নিজের ধন-সম্পদ নির্দ্বিধায় আল্লাহর পথে খরচ করতেন এবং হাজার হাজার গরীব, ইয়াতিম ও অভাবীকে পালন করতেন। কোন ভিক্ষুক তাঁর দরজা থেকে কখনো শূন্য হাতে ফিরে যেত না। অভাবীদেরকে দু'হাত ভরে দান করতেন।

—০—

হযরত আমর (রাঃ) বিন সাঈদ উমুবী

তাবুকের যুদ্ধের পর প্রিয়নবী (সাঃ)-এর এমন একজন জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তির প্রয়োজন অনুভূত হলো যিনি আস্থাবান ও আমানতদার হওয়ার সাথে সাথে উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনার যোগ্যতাতেও পরিপূর্ণ। এ নির্বাচন প্রশ্নে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো বনু উমাইয়ার আলোক প্রদীপের ওপর। তিনি প্রয়োজনীয় সকল গুণে গুনান্বিত ছিলেন। হুযুর (সাঃ) তাঁকে খায়বার, ফাদাক এবং তাবুকের রাজস্ব আদায়কারী নিয়োগ করলেন এবং দোয়াসহ মদীনা মুনাওয়ারাহ থেকে রওয়ানা করে দিলেন। এ ব্যক্তি নিজের ওপর আরোপিত দায়িত্ব অত্যন্ত সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিতে থাকলেন। এমন কি এ অবস্থাতেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ওফাত পেলেন। তিনি এ হৃদয় বিদারক খবর শুনে বিয়োগ ব্যথায় কাতর হয়ে সব কিছু ছেড়ে মদীনা মুনাওয়ারাহ ফিরে এলেন। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) খলিফার আসনে সমাসীন হয়ে ছিলেন। খলিফাতুর রাসূল (সাঃ) পুনরায় তাঁকে রাসূল (সাঃ)-এর আমলের পদের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করতে চাইলেন এবং তাঁকে বললেন, এ পদের জন্য তোমার চেয়ে যোগ্য আর কে হতে পারেন? কিন্তু তিনি ক্ষমা চাইলেন এবং বললেন, হে খলিফাতুর রাসূল! রাসূল (সাঃ)-এর পর আমি এ দায়িত্ব পালনে সক্ষম নই।

যে ব্যক্তিটির ওপর রাসূল (সাঃ)-এর অগাধ আস্থা ছিল এবং যিনি রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের পর কোন ধরনের পদ গ্রহণে রাজী হননি তিনি ছিলেন হযরত আমর (রাঃ) বিন সাঈদ উমুবী।

সাইয়েদেনা আবু উকবাহ আমর (রাঃ) বিন সাঈদ "আস-সাবিকুনাল আওয়ালুন" অর্থাৎ পবিত্র অগ্রবর্তী দলের একজন সদস্য ছিলেন। দ্বীনের প্রতি নিষ্ঠা এবং অন্যান্য সুন্দর গুণের বদৌলতে তিনি অত্যন্ত উঁচু মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন। তিনি বনু উমাইয়ার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত ছিলেন। তাঁর বংশ নামা হলোঃ আমর (রাঃ) বিন সাঈদ বিন আছ বিন উমাইয়াহ বিন আবদি শামছ বিন আবদি মানাফ বিন কুসাই।

মাতার নাম ছিল সুফিয়া। তিনি বনু মাখজুম গোত্রভুক্ত এবং হযরত খালিদ (রাঃ) বিন ওয়ালিদের ফুফু ছিলেন। হযরত আমর (রাঃ)-এর পিতা এবং দাদা কট্টর মুশরিক ছিল। কিন্তু তাঁর বড় ভাই খালিদ (রাঃ) বিন সাঈদ অত্যন্ত সুন্দর স্বভাবের মানুষ ছিলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) হকের দাওয়াত প্রদান শুরু করলে তিনি নির্ভাবনায় তাতে সাড়া দেন। হযরত আমরও (রাঃ) সৎস্বভাবের ছিলেন। তিনি ভাইয়ের অনুসরণ করেন এবং তাঁর ইসলাম গ্রহণের কিছু দিন পরই তিনিও ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেন। পিতা এবং বংশের অন্যান্যরা ইসলাম গ্রহণের অপরাধে তাঁদের ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালায়। কিন্তু তাওহীদের নেশার নিকট নির্যাতন হার মানলো। সে যুগে তাঁর ভাই আবান বিন সাঈদ (তখনও ঈমান আনেনি) দু'ভাইকে বিদ্রূপ করে কবিতার এক পংক্তি রচনা করে। সেই পংক্তির ভাবার্থ হলোঃ "হায়! জারবিয়ায় মৃত্যুর ঘুমে শায়িত সাঈদ বিন আছ বিল উমাইয়াহ তাকে জারবিয়ায় দাফন করা হয়েছিল। যদি দেখতো যে, আমর (রাঃ) এবং খালিদ দ্বীনকে কিভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।"

হযরত আমর (রাঃ) বিন সাঈদও কবিতা এবং কাব্যে বুৎপত্তি রাখতেন। তিনি যখন এ বিদ্রূপাত্মক কবিতা শুনলেন তখন কবিতা দিয়েই তার জবাব দিয়েছিলেন। তাঁর কবিতার অর্থ হলোঃ "এখন সেই মৃত্যুর ঘুমে শায়িতদের উল্লেখ পরিত্যাগ কর। সে নিজের রাস্তা নিয়েছে এবং সেই হকের দিকে আগুয়ান হও যার সত্য হওয়া প্রশ্নে আর কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বনেই।"

মুশরিকদের যুলুম-নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে গেলে নবুয়াতের ৫ম বছরে হুযুর (সাঃ) মুসলমানদেরকে হাবশার দিকে হিজরাত করার নির্দেশ দিলেন। বস্তুতঃ সে বছর একটি ছোট দল হাবশার দিকে যাত্রা করলো। পরের বছর একশ সদস্যের নারী-পুরুষের একটি বড় কাফেলা হাবশায় হিজরাত করলেন। এ কাফেলায় হযরত আমর (রাঃ) বিন সাঈদ, তাঁর স্ত্রী হযরত ফাতেমা (রাঃ) বিনতে ছাফওয়ান কিনানিয়াহ এবং সহোদর হযরত খালেদ (রাঃ) বিন সাঈদ নিজের স্ত্রীসহ শরীক ছিলেন। হযরত আমর (রাঃ) এবং হযরত খালেদ (রাঃ) পরিবারসহ তের বছর পর্যন্ত হাবশায় দেশত্যাগের মুসিবত বরদাশত করতে থাকেন। খায়বারের যুদ্ধের সময় হাবশা থেকে মদীনা আসেন। যদিও তাঁরা তাতে অংশ নিতে পারেননি, তবুও হুযুর (সাঃ) গনিমাতের মাল থেকে তাঁদেরকে অংশ প্রদান করেন।

মদীনা আগমনের পর হযরত আমর (রাঃ) বিন সাঈদ মক্কা বিজয়ের সময় রাসূল (সাঃ)-এর সহগামী ছিলেন। এরপর তিনি হুনাইন ও তায়েফের যুদ্ধে বাহাদুরী প্রদর্শন করেন। তাবুকের যুদ্ধেও তিনি অংশ গ্রহণ করেন। তাবুকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নবী করিম (সাঃ) তাঁকে মদীনা মুনাওয়ারার পশ্চিম এলাকার খায়বার, ফিদক এবং তাবুক

প্রভৃতি স্থানের রাজস্ব আদায়ারী নিয়োগ করেন। রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর তিনি মদীনা ফিরে যান। মদীনা প্রত্যাবর্তনের মাত্র কিছু দিন পরই রোমক বাদশাহর সাথে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, সে যুগে সিরিয়া রোম সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। খলিফাতুর রাসূল (সাঃ) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) সিরিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করলেন। এ সময় হযরত আমর (রাঃ) বিন সাঈদ সিরিয়া গমনকারী মুজাহিদ বাহিনীতে একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে অংশ গ্রহণ করেন। দু'তিনটি যুদ্ধের পর মুসলমান এবং রোমকদের মধ্যে আজনাদাইনে এক প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘঠিত হলো। হযরত আমর (রাঃ) বিন সাঈদ এ যুদ্ধে চরম বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন এবং কয়েকবার শত্রুব্যূহ তছনছ করে ফেলেন। এক নাজুক অবস্থায় তিনি মুসলমানদেরকে দৃঢ়তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করলেন এবং তাঁর নিকট মুসলমানদের পদস্খলন অসহ্য ব্যাপার এ কথা বলতে বলতে বীরের মত শত্রুব্যূহে ঢুকে পড়লেন। যেই সামনে এলো তাকেই যমালয়ে পাঠালেন এবং রোমক বাহিনীর একদম মধ্যস্থলের দিকে এগিয়ে গেলেন, অবশেষে অসংখ্য রোমক এ মরদে মুজাহিদকে ঘিরে ফেললো এবং তীর, তলোয়ার ও খঞ্জরের বর্ষণ শুরু করলো। তাতে তার সমস্ত শরীর আঘাতে আঘাতে ছিদ্র হয়ে গেল। যখন তরবারী চালানর আর শক্তি রলো না তখন মাটিতে পড়ে গেলেন এবং শাহাদাতের পিয়ালা পান করে জান্নাতে পৌঁছে গেলেন। আল্লামা বালাজুরী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, তাঁর শরীরে ৩০-এরও বেশী আঘাত লেগেছিল। হযরত আমর (রাঃ) বিন সাঈদ এবং তাঁর মত অন্যান্য শহীদের রক্ত বৃথা যায়নি। রোমকদের শিক্ষণীয় পরাজয় হলো এবং তারা নিজেদের হাজার হাজার লাশ ফেলে রেখে পালিয়ে গেল।

হযরত আমর (রাঃ) বিন সাঈদ ঈমানী আবেগের যে চিহ্ন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রেখে গেছেন তা চিরকালের জন্য মুসলমানদের রক্ত উত্তপ্ত করবে।

***

হযরত সাঈদ (রাঃ) বিন আছ

হযরত সাঈদ (রাঃ) বিন আছ ছিলেন সুখ্যাতির নভোমণ্ডলে সূর্য সমতুল্য। বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য, আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতা এবং কৃতিত্ব তাঁকে এ সুখ্যাতির স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করিয়েছিল। বনু উমাইয়ার সঙ্গে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তাঁর পিতা ও দাদা প্রভাবশালী ও মর্যাদাবান নেতা ছিলেন। হযরত সাঈদ (রাঃ)-এর দাদা আবু উহাইহা সাঈদ বিন আছের এমন দবদবা এবং শান শওকত ছিল যে, তিনি যে রঙের পাগড়ী পরিধান করতেন মক্কার কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই রঙের পাগড়ী পরিধান করতে পারতো না। মক্কাবাসী তাকে "জুত্তাজ" (টুপি ওয়ালা) উপাধি দিয়ে রেখেছিল।

আবু উহাইহা সাঈদ বিন আছ জুত্তাজের পুত্রের মধ্যে পাঁচজন খালিদ, আমর, আবান, উবাইদাহ এবং আছ ইতিহাসখ্যাত হয়ে আছে। খালিদ, আমর আবান ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। কিন্তু উবাইদুল্লাহ এবং আছ কুফুরীর ওপরই কায়েম ছিল। এ দুজনই বদরের যুদ্ধে হযরত যোবায়ের (রাঃ) ইবনুল আওয়াম এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর হাতে মারা যায়। হযরত সাঈদ (রাঃ) সেই বদরের যুদ্ধে নিহত আছের পুত্র ছিলেন। তাঁর নসবনামা হলোঃ সাঈদ (রাঃ) বিন আছ বিন আবু উহাইহা সাঈদ জুত্তাজ বিন আছ বিন উমাইয়াহ বিন আবদি শামছ বিন আবদি মানাফ বিন কুসাই।

আবদি মানাফে গিয়ে তাঁর বংশ ধারা রাসূল (সাঃ)-এর বংশের সঙ্গে মিশে যায়। মাতার নাম ছিল উম্মে কুলছুম। তাঁর সম্পর্ক ছিল কুরাইশ বংশের আমের বিন লুববীর সঙ্গে। হযরত সাঈদ (রাঃ) সরাসরি নবী (সাঃ)-এর ফয়েজ পাওয়ার সুযোগ খুব কমই পেয়ে ছিলেন। তা সত্ত্বেও রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তিকালের পর তিনি উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ, হযরত ওমর ফারুক, হযরত ওসমান জুন্নুরাইন এবং অন্যান্য সাহাবী (রাঃ)-এর নিকট থেকে পুরোপুরি ফয়েজ হাসিল করেন এবং মর্যাদাবান সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হতে থাকেন। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা বলেছেন, তিনি অত্যন্ত বাহাদুর, সুন্দর স্বভাব এবং বিজয়ী ব্যক্তি ছিলেন। আরবী ভাষায় ওপর তাঁর অসাধারণ দখল ছিল এবং রাসূল (সাঃ)-এর কণ্ঠ স্বরের সঙ্গে তাঁর কণ্ঠস্বরের মিল ছিল।

ইবনে আসাকির (রঃ) রাসূল (সাঃ)-এর যুগে ঘটিত হযরত সাঈদ (রাঃ) বিন আছের শৈশব কালের একটি ঘটনা হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন ওমর (রাঃ)-এর মুখে এই ভাবে বর্ণনা করেছেনঃ "এক মহিলা রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে একখানা কাপড় পেশ করে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ কাপড় খানি আরবের সবচেয়ে বুজর্গ লোককে দেয়ার নিয়ত করে রেখেছিলাম। এখন তা আপনার নিকট এনেছি। সে সময় হযরত সাঈদ (রাঃ) বিন আছ হুযুর (সাঃ)-এর নিকট দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি মহিলাটির হাদিয়া কবুল করলেন এবং তাকে বললেন, এ কাপড় এ ছেলেটিকে দিয়ে দাও। সে রসূল (সাঃ)-এর নির্দেশ পালন করলো। এ কারণে সেই কাপড়ের নাম সাদিয়া হিসেবে মশহুর হয়ে গিয়েছিল।" এ ঘটনায় হযরত সাঈদ (রাঃ)-এর ওপর হুযুর (সাঃ)-এর অসাধারণ স্নেহের কথা প্রকাশ পায়।

হযরত সাঈদ (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর যুগে এবং হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর শাসনামলে নাবালেগ ছিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর শাসনকালে যৌবনপ্রাপ্ত হন। কিন্তু এ সময় জ্ঞান হাসিল ছাড়াও তাঁর দ্বিতীয় কোন তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়নি। ২৪ হিজরীতে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর হযরত ওসমান জুন্নুরাইন খিলাফতের আসনে সমাসীন হলে কুরআন পাক লিখার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন এবং অসংখ্য নুসখা বা কপি নকল করার সিদ্ধান্ত নেন। এ কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য তিনি যেসব সাহাবী (রাঃ)-কে নিয়োগ করেছিলেন তাদের মধ্যে হযরত সাঈদ (রাঃ) বিন আছও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। ২৯ হিজরীতে হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত সাঈদ (রাঃ)-কে ওলিদ বিন উকবার স্থলে কুফার গবর্ণর নিয়োগ করেন। কুফার গবর্ণরীর সময় হযরত সাঈদ (রাঃ) কয়েকটি শানদার সামরিক সাফল্য প্রদর্শন করেন। কুফায় দায়িত্ব গ্রহণের অব্যবহিত পরই তিনি জারজান এবং তাবারিস্তানের ওপর হামলা করেন। ইবনে আছির (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত সাঈদ (রাঃ)-এর বাহিনীতে হযরত হাসান (রাঃ), হযরত হোসাইন (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এবং কুরাইশের অনেক যুবক অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। বসরার গবর্ণর হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের এ সামরিক অভিযানের খবর পেয়ে তাবারিস্তানের দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু হযরত সাঈদ (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর পৌছার পূর্বেই তাবারিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ স্থান দাবাওন্দ তামিসা, রাদইয়ান, নামন্দ প্রভৃতি স্থান দখল করে নেন। জারজানের শাসক হযরত সাঈদ (রাঃ)-এর বিজয়সূচক হামলা মুকাবিলার সাহস পেল না এবং সে দু' লাখ দিরহাম রাজস্ব প্রদান মঞ্জুর করে আনুগত্য কবুল করে নিল। আল্লামা বালাজুরী (রঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী পার্বত্য এলাকার লোকেরাও সন্ধি করে নিয়েছিল, সে সময়ই আজারবাইজানের লোকেরা বিদ্রোহ করে বসলো এবং চারদিকে বিশৃংখলা সৃষ্টি করলো।

হযরত সাঈদ (রাঃ) এমন সামরিক কৌশল অবলম্বন করলেন যে কিছুদিনের মধ্যেই তাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল এবং ব্যর্থতার গ্লানি স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলো।

হযরত সাঈদ (রাঃ) কূফার গবর্ণরীর দায়িত্ব প্রাপ্তির চার পাঁচ বছরের মধ্যেই কূফাবাসী তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলো। তাদের অসন্তুষ্টির কারণ কি ছিল? ঐতিহাসিকরা তার ব্যাখ্যা দেননি, কূফাবাসীরা তাঁর বিরুদ্ধে আমীরুল মুমিনিন হযরত ওসমান (রাঃ)-এর নিকট অভিযোগ করলো। ফলে, হযরত সাঈদ (রাঃ) ৩৪ হিজরীতে পদ থেকে পদচ্যুত হন। পদচ্যুতির ব্যাপারে দু'ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। এক বর্ণনায় বলা হয় যে, আমীরুল মুমিনিন ওসমান (রাঃ) তাঁকে বরখাস্ত করেন। দ্বিতীয় বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, আমিরুল মুমিনিন কূফাবাসীদের অভিযোগ কোন গুরুত্ব দেননি। এতে মালিকুল আশতারের নেতৃত্বে ১০ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল খলিফার নিকট হাজির হয়ে হযরত সাঈদ (রাঃ)-এর পদত্যাগ দাবী করে। হযরত সাঈদ (রাঃ)-ও সে সময় কূফা থেকে মদীনা এসেছিলেন এবং সে সময় আমিরুল মুমিনিনের নিকট উপস্থিত ছিলেন। আমিরুল মুমিনিন কূফাবাসীর অভিযোগ গুরুত্বহীন বলে আখ্যায়িত করেন এবং হযরত সাঈদ (রাঃ)-কে নিজের পদে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। মালিকুল আশতার সেখানে আর কাল বিলম্ব না করে কূফা ফিরে এলেন এবং কূফাবাসীকে হযরত সাঈদ (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে দারুণভাবে উত্তেজিত করে তুললো। ফল এই হলো যে, হযরত সাঈদ (রাঃ) যখন কূফা ফিরে যাচ্ছিলেন তখন কূফার একটি বড় দল তার পথ অবরোধ করে দাঁড়ায় এবং মদীনা ফিরে যেতে বাধ্য করে। অতপর মালিকুল আশতার কূফার জামে মসজিদে এক বড় সম্মেলন ডেকে নিজের পক্ষ থেকে হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ)-কে কূফার গবর্ণর হিসেবে ঘোষণা করলো। হযরত আবু মূসা (রাঃ) প্রথমে এ দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন। কিন্তু সকলেই যখন আমিরুল মুমিনিন (রাঃ)-এর আনুগত্যের শপথ নিল তখন তিনি গবর্ণর হওয়ার ব্যাপারে সম্মত হলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) এ সব ঘটনার খবর পেয়ে হযরত সাঈদ (রাঃ)-কে কূফা ফেরত পাঠানোকে ঠিক মনে করলেন না এবং হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ)-এর মনোনয়ন অনুমোদন করলেন। তারপর হযরত সাঈদ (রাঃ) মদীনাতেই অবস্থান করেন।

৩৫ হিজরীতে বিদ্রোহীরা আমিরুল মুমিনিন হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রাঃ)-এর বাড়ী অবরোধ করলে হযরত সাঈদ (রাঃ) বিন আছ কতিপয় নওজোয়ান সাহাবীসহ খিলাফত ভবন রক্ষায় কর্তব্য পালন করেন। এ প্রসঙ্গে বিদ্রোহীদের সঙ্গে সংঘর্ষে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর হৃদয়-বিদারক শাহাদাতের ঘটনা সংঘটিত হলে তিনি অত্যন্ত মনোকষ্ট পান এবং ভগ্ন হৃদয়ে মক্কা গিয়ে নির্জনত্ব অবলম্বন করেন। এক বর্ণনায় আছে যে, উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) যখন

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর রক্তের বদলার ঝাণ্ডা উড্ডীন করলেন এবং হযরত যোবায়ের (রাঃ), হযরত তালহা ও অন্যান্য সমর্থকদের সাথে বসরার দিকে রওয়ানা দিলেন তখন হযরত সাঈদ (রাঃ)-ও তাদের সঙ্গে গেলেন। কিন্তু মাররুজ জাহারাইন অথবা জাতে ইরকের সন্নিকটে পৌঁছে তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলেন এবং মক্কা গিয়ে একাকীত্বকে অগ্রাধিকার দিলেন। তিনি উষ্ট্রের যুদ্ধ অথবা সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ কোনটিতেই অংশ নেননি। হযরত আলী (রাঃ)-এর শাহাদাতের কয়েকমাস পর হযরত হাসান (রাঃ) আমীর মাবিয়া (রাঃ)-এর পক্ষে খিলাফত থেকে সরে দাঁড়ালে আমীর মাবিয়া (রাঃ) হযরত সাঈদ (রাঃ)-কে মদীনার গবর্ণর নিয়োগ করলেন। কিন্তু কিছুদিন পর তাঁকে বরখাস্ত করে তাঁর স্থলে মারওয়ান ইবনুল হাকামকে মদীনার গবর্ণর নিয়োগ করেন। (অন্য) এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত সাঈদ (রাঃ) এবং মারওয়ানের পদচ্যুতি ও নিয়োগ বিরতিসহ দু'বার কার্যকর হয়েছিল। হযরত সাঈদ (রাঃ) শেষ বয়সে মদীনা মুনাওয়ারাহ থেকে তিন মাইল দূরে "আল-আকীকে" স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। সেখানে তাঁর মালিকানায় অনেক জমি ছিল। "ইয়াকূত হামুবী" "মুয়াজ্জামুল বুলদান" গ্রন্থে লিখেছেন, "আল-আকীক" অথবা "আরছাতুল আকীক" এক প্রশস্ত ময়দান। সেখানে সাধারণভাবে গৃহাদি নির্মাণের অনুমতি ছিল না। হযরত সাঈদ (রাঃ) সরকার থেকে বিশেষ অনুমোদন নিয়ে থাকার জন্য এক বিরাট বাড়ী তৈরী, কূপ খনন এবং বাগান রচনা করেছিলেন। ভিন্ন মত অনুসারে তিনি ৫৭ অথবা ৫৮ অথবা ৫৯ হিজরীতে সেই বাড়ীতেই ওফাত পান। হাফেজ জাহাবীর (রঃ) বক্তব্য অনুসারে তাঁর লাশ মদীনা আনা হয় এবং জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

হযরত সাঈদ (রাঃ) সাত পুত্র রেখে যান। এ সব পুত্রের নাম হলোঃ ওমর, মুহাম্মাদ, আবদুল্লাহ, ইয়াহিয়া, ওসমান, আম্বাসা এবং আবান। হাফিজ ইবনে আবদুল বার (রঃ) "আল-ইসতিয়াবে" লিখেছেন, হযরত সাঈদ (রাঃ)-এর আরো কয়েকজন ভাই ছিল। কিন্তু আছের বংশধারা সাঈদের পুত্রদের দিয়েই অব্যাহত থাকে।

চরিতকাররা হযরত সাঈদ (রাঃ)-এর শারাফত, বাহাদুরী, জ্ঞান ও ধৈর্য, মর্যাদা, সত্য প্রিয়তা, দানশীলতার অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন। হাফিজ জাহাবী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, আমীর মাবিয়া (রাঃ) বলতেন, সাঈদ (রাঃ) বিন আছ বুদ্ধিমত্তা ও যোগ্যতার দিক থেকে খলিফা হওয়ার যোগ্য ছিলেন।

আল্লামা ইবনে আছির (রঃ) "উসুদুল গাববাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত সাঈদ (রাঃ)-এর পিতা আছ বদরের যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ)-এর হাতে নিহত হয়েছিলেন। এ যুদ্ধে একই নামের আছ (বিন মুগিরাহ) তার ভাগিনা হযরত ওমর (রাঃ)-এর হাতে নিহত হন। একই নাম হওয়ার কারণে ধোঁকা হত যে, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত সাঈদ (রাঃ)-এর পিতা আছকে হত্যা করেছিলেন। বস্তুতঃ বনু উমাইয়ার মধ্যে প্রচণ্ড বংশীয় বিদ্বেষ

ছিল। এ জন্য হযরত ওমর (রাঃ) ধারণা করলেন যে, সম্ভবতঃ সাঈদ (রাঃ) পিতার হত্যাকারী মনে করে মনে মনে তাঁর বিরুদ্ধে খারাপ ধারণা পোষণ করতে পারে। এ ভুল ধারণা দূর করার জন্য একদিন তিনি হযরত সাঈদ (রাঃ)-কে বললেন, "সাঈদ, বদরের যুদ্ধে আমি তোমার পিতাকে নয় বরং আমার আপন মুশরিক মামা আছকে হত্যা করেছিলাম।" হযরত সাঈদ (রাঃ) কাল বিলম্ব না করে জবাব দিয়েছিলেন, আপনি যদি আমার পিতাকেও হত্যা করতেন তাতেই কি আসতো যেতো। আপনি হকের ওপর ছিলেন। আর সে ছিল হকের শত্রু। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর জবাবে আশ্চর্যান্বিত হলেন। হযরত সাঈদ (রাঃ)-এর দানশীলতা এবং অন্তরের প্রশস্ততার কোন সীমা পরিসীমা ছিল না, এটা সম্ভবই ছিল না যে, কোন অভাবগ্রস্ত তাঁর দরজায় এসে শূন্য হাতে ফিরে যাবে। তাঁর দানশীলতা শুধু যারা হাত পাততো তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং যেসব শরীফ অভাবগ্রস্ত মান-ইজ্জতের কারণে কারোর নিকট হাত পাততে পারতো না, তারাও তার দান থেকে উপকৃত হতো। খোঁজ করে করে তিনি এ ধরনের অভাবগ্রস্তদের নিকট পৌঁছতেন এবং তাদের অভাব পূরণ করতেন। যদি কোন অভাবগ্রস্ত এমন সময় তার নিকট আসতো যখন তার কাছে অর্থ থাকতো না, তাহলে তিনি তাকে লিখে দিতেন যে, অর্থ এলে সে যেন নিয়ে নেয়।

ইবনে আছির (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, কূফার গবর্ণরীকালে সাঈদ (রাঃ) প্রত্যেক জুমআর রাতে মসজিদের নামাযীদের মধ্যে দিনার ভর্তি থলী বন্টন করতেন। এ কাজে একজন বিশেষ গোলাম নিয়োগ করা হয়েছিল। বস্তুতঃ জুমার রাতে মসজিদে নামাযীদের অসাধারণ ভীড় হতো। আত্মীয়-স্বজনদের সাথেও তাঁর আচরণ ছিল বদান্যতাপূর্ণ। কাপড়, খাদ্য, নগদ অর্থ এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য দিয়ে তিনি তাদেরেকে সাহায্য করতেন। সপ্তাহে একদিন তিনি নিজের সকল ভাই-ভাতিজাকে এক সাথে নিয়ে খাবার খেতেন।

হাফিজ ইবনে আবদুল বার (রঃ) "আল-ইসতিয়াব" গ্রন্থে লিখেছেন যে, মদীনা থেকে পদচ্যুতির পর একদিন তিনি মসজিদ থেকে বের হলে এক ব্যক্তি তাঁর পিছু নিল। ব্যক্তিটি প্রকাশ্য ভাবে কোন কিছু চাইলো না। কিন্তু হযরত সাঈদ (রাঃ) বুঝতে পেলেন যে, লোকটি অভাবগ্রস্ত। তিনি নিজের গোলামকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে দিয়ে বিশ হাজারের স্লিপ লিখিয়ে সেই ব্যক্তিকে দিয়ে বললেন, আমি যখন ভাতা পাবো তখন এ স্লিপে লিখিত অর্থ তুমি পেয়ে যাবে। কিন্তু সে অর্থ আদায়ের সময় না আসতেই হযরত সাঈদ (রাঃ) ইন্তেকাল করলেন। সেই ব্যক্তি স্লিপটি তার পুত্র আমরকে প্রদান করলেন। তিনি অবিলম্বে স্লিপে লিখিত অর্থ আদায় করলেন।

এধরনের বদান্যতা এবং শান-শওকতের জন্য তার ওপর ৮০ হাজারের ঋণ হয়ে যায়। মৃত্যুর পূর্বে সকল পুত্রকে ডেকে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আমার ওসি হতে চাও। বড় পুত্র নিজেকে পেশ করলে তিনি বললেন, আমার ওসি হতে চাইলে আমার ঋণও অদায় করতে হবে। পুত্র জিজ্ঞেস করলো, "ঋণ কত?" তিনি বললেন, " ৮০ হাজার।" পুত্র বললো, এত ঋণ কেমন করে হলো? তিনি বললেন, পুত্র! পরিষ্কার পোশাক পরিধানকারী শরীফ মানুষের অভাব দূর করার জন্য ঋণ হয়ে গেছে। এ সব লোক বাধ্য হয়ে আমার কাছে আসতো কিন্তু লজ্জায় কিছু চাইতে পারতো না। আমি চেহারা দেখেই বুঝতাম যে, তারা অভাবগ্রস্ত। তাদেরকে চাওয়ার সুযোগ না দিয়েই তাদের অভাব পূরণ করে দিতাম।

হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন উবাদাহ আনসারী

নবুয়াত প্রাপ্তির ১০ বছর পর রাসূলে করিম (সাঃ) হকের তাবলিগের জন্য তায়েফ তাশরীফ নিয়েছিলেন। তায়েফবাসীর দুর্ভাগ্য যে, তারা শুধু তাওহীদের দাওয়াতই প্রত্যাখ্যান করেনি বরং আরবের প্রচলিত মেহমানদারীকেও উপেক্ষা করে রাসূল (সাঃ)-এর সাথে চরম দুর্ব্যবহার করেছিল। কিন্তু প্রিয় নবী (সাঃ) ছিলেন দৃঢ়তা ও অবিচলতার পাহাড়। তিনি তায়েফবাসীর আচরণে মনোকষ্ট না নিয়ে মক্কা ফিরে এসে যথারীতি সত্যের তাবলিগে ব্যস্ত হলেন। হজ্বের সময় হেরেম শরীফ জিয়ারতকারীদের নিকট গিয়ে তাওহীদের দাওয়াত প্রদান তাঁর একটি নিয়ম ছিল এবং সময় সময় বিভিন্ন গোত্রের নিকট গিয়ে তাদের সামনে দ্বীনে হক পেশ করতেন। গোত্রসমূহের নেতারা বড্ড রূঢ় জবাব দিত এবং হেরেম জিয়ারতকারীদের ওপরও তাওহীদের তেমন কোন প্রভাব পড়তো না। কিন্তু নবুয়াত প্রাপ্তির ১১ বছর পর হজ্বের মওসুমে আল্লাহ পাক এক আশ্চর্য ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করলেন। হুযুর (সাঃ) তাবলীগ করতে করতে মিনার এমন কতিপয় তাঁবুর নিকট গিয়ে পৌঁছলেন যেখানে ইয়াছরিব থেকে আগত কতিপয় সুন্দর স্বভাবের লোক অবস্থান করছিলেন। তারা খাযরাজ গোত্রের ৬ ব্যক্তি ছিলেন। প্রিয় নবী (সাঃ) যখন তাদের নিকট গিয়ে আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ এবং শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা শুরু করলে তারা খুব প্রভাবিত হলেন। এরপর হুযুর (সাঃ) কুরআনে হাকিমের কতিপয় আয়াত তিলাওয়াত করলেন। ফলে তাদের অন্তর সম্পূর্ণরূপে বিগলিত হয়ে গেল। তারা পরস্পরের প্রতি চাওয়া চাওয়ি করলো এবং বললো, আল্লাহর কসম! তিনি তো সেই শেষ নবী যাঁর উল্লেখ সব সময় ইয়াছরিবের ইহুদীদের মুখে লেগে থাকে। দেখ, , ইহুদীরা আবার আমাদের চেয়ে হক কবুল প্রশ্নে অগ্রগামী হয়ে না যায়। এ কথা বলে তারা সকলেই ঈমান আনলেন।

খাযরাজ গোত্রের এ ছ'পবিত্র আত্মার ইসলাম গ্রহণ যেন ইয়াছরিবে সৌভাগ্যের সূর্য উদয় ছিল। তাঁরা ইয়াছরিব ফিরে গিয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে দ্বীনে হকের তাবলিগ শুরু করলেন। এমনিভাবে প্রদীপ থেকে প্রদীপ জ্বলতে লাগলো

এবং ইয়াছরিবের সৎ স্বভাবের মানুষ ইসলামের প্রতি ঝুঁকতে লাগলো। সুতরাং পরবর্তী বছর অর্থাৎ নবুয়াত প্রাপ্তির ১২ বছর পর ১২জন মুসলমান রাসূল (সাঃ)-এর দর্শন এবং বাইয়াতের গৌরব লাভের জন্য মক্কা গেলেন। আল্লাহর এ ১২জন পবিত্র বান্দাহর মধ্যে খাযরাজ গোত্রের বনু সালেম শাখার এক সন্তান আব্বাস (রাঃ) বিন উবাদাহ বিন নাজলাহ বিন মালিক বিন আজলান বিন যায়েদ বিন গানাম বিন সালেম বিন আমর বিন আওফ বিন খাযরাজও শামিল ছিলেন। তিনি স্বগোত্রের বাহাদুর যুবক হিসেবে পরিগণিত হতেন। বীরত্ব ও বাহাদুরীর সাথে সাথে আল্লাহ তাঁকে সুন্দর স্বভাবও দান করেছিলেন। তাওহীদের আহবান কানে আসতেই চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তিনি তাতে সাড়া দিলেন এবং পরবর্তী হজ্ব মওসুমে ইয়াছরিবের আরো ১১জন ঈমানদারের সাথে মক্কা গিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে হাজির হলেন এবং নিম্নে বর্ণিত ছ'টি কথার ওপর হুযুর (সাঃ)-এর হাতে বাইয়াত হলেন ঃ

একঃ আমরা শিরক করবো না ; দুই ঃ আমরা চুরি করবো না; তিনঃ আমরা খারাপ কাজ করবো না; চারঃ আমরা চোগলখুরী করবো না এবং কারোর ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবো না; পাঁচ ঃ আমরা নিজেদের কন্যাকে হত্যা করবো না; ছয়ঃ আমরা রাসুলে আকরাম (সাঃ)-এর সকল ভালো কথার আনুগত্য করবো। ইতিহাসে এ বাইয়াত "বাইয়াতে উকবায়ে উলা" নামে খ্যাত হয়ে আছে।

প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁরা হুযুর (সাঃ)-এর নিকট কুরআন পাঠদান এবং দ্বীনের শিক্ষা দানের জন্য তাদেরকে একজন শিক্ষক প্রদানের দরখাস্ত করলেন। প্রিয় নবী (সাঃ) হযরত মুছয়াব (রাঃ) বিন উমায়ের (রাঃ)-কে এ দায়িত্ব অর্পণ করলেন এবং তাঁকে এ পবিত্র কাফেলার সাথে ইয়াছরিব রওয়ানা করালেন।

হযরত মুছয়াব (রাঃ) বিন উমাই (রাঃ)-এর তাবলিগি প্রচেষ্টার কারণে ইয়াছরিবের ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা হতে লাগলো। নবুয়াত প্রাপ্তির ১৫ বছর পর হজ্বের মওসুমে ইয়াছরিব থেকে পাঁচশ' মানুষের একটি কাফেলা হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কা রওয়ানা হলো। এ কাফেলাতে ৭৫ জন ঈমানদার ও (৭৩ জন পুরুষ এবং ২ জন মহিলা) শামিল ছিলেন। তাদের মধ্যে হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন উবাদা (রাঃ)-ও ছিলেন। তাঁরা রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে রাসূলে আকরাম (সাঃ)-কে মদীনা আগমনের দাওয়াত দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। হজ্ব সমাপনের পর বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) একটি রাত ঠিক করলেন। সে রাতে ইয়াছরিবের ঈমানদাররা নিজেদের কাফেলার মুশরিকসহ রাতের অন্ধকারে আকাবার ঘাঁটিতে

একত্রিত হলেন। প্রিয় নবী (সাঃ)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)ও সমভিব্যাহারে সেখানে পৌঁছলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) আনসারদের উদ্দেশ্য জ্ঞাত হয়ে তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"ইয়াছরিবের ভ্রাতৃগণ ! মুহাম্মাদ (সাঃ) নিজের বংশে অত্যন্ত মর্যাদাবান এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর দাওয়াতের প্রতি ভিন্ন মত পোষণকারী বেশীর ভাগ মক্কাবাসীই তাঁর কঠোর শত্রু। এ সত্ত্বেও আমরা তাঁকে শত্রু থেকে মুক্ত করেছি এবং ভবিষ্যতেও পূর্ণ শক্তি দিয়ে তা করবো। তোমরা যদি নিজেদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেত পার তাহলে কথা বলবো। খুব ভালোভাবে বুঝে নিও যে, মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সাথে কোন চুক্তি বা প্রতিশ্রুতির অর্থ হলো ভয়ংকর মুসিবত এবং রক্তাক্ত যুদ্ধের আহবান জানানো। এ জন্য সব কিছু বুঝে শুনে পদক্ষেপ নেবে। নচেৎ তাঁকে নিজের ওপর ছেড়ে দাও।"

হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর বক্তৃতা শুনে হযরত বারা' বিন মা'রুর আবেগ উদ্বেলিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ

"হে আব্বাস। আমরা তোমার কথা শুনেছি। এবার আমাদের কথাও শোন। স্মরণ রেখ যে , আমরা কাপুরুষ নই। আমরা তরবারীর ছায়ায় লালিত পালিত হয়েছি।" অন্যান্য আনসার তার কথায় বাধা দিয়ে বললো, " হে আল্লাহর রাসূল। আপনিও কিছু বলুন ।"

হুযুর (সাঃ) কুরআনে হাকিমের কতিপয় আয়াত তিলাওয়াত করলেন এবং ইয়াছরিববাসীকে ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার নসিহত করলেন। অতঃপর বললেনঃ

"আমি তোমাদের নিকট থেকে এ বাইয়াত নিচ্ছি যে, তোমরা যেভাবে নিজের জীবন ও পরিবার-পরিজনকে হিফাজত করে থাকো তেমনি আমাকেও হিফাজত বা রক্ষা এবং দ্বীনের সম্প্রসারণে সহযোগিতা করবে।"

হযরত রাবা' (রাঃ) বিন মা'রুর তাঁর পবিত্র হাত ধরলেন এবং বললেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম, আমরা আপন জীবন, সম্পদ এবং সন্তানসহ আপনার হিফাজত ও সাহায্য করবো।"

হযরত আবুল হাছিম (রাঃ) বিন তিহান এ সময় তার কথায় বাধা দিয়ে বললেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! বর্তমানে আমরা ইহুদীদের সাথে চুক্তিবদ্ধ আছি। আপনার হাতে বাইয়াতের পর তা বাতিল হয়ে যাবে। ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব পেয়ে আপনি আমাদেরকে যেন পরিত্যাগ না করেন।"

হুযুর (সাঃ) মুচকি হেসে বললেনঃ

"বরং আমার রক্ত তোমাদের রক্ত এবং আমার জিম্মা ও তোমাদের জিম্মা বরাবর। আমি তোমাদের মধ্য থেকে এবং তোমরা আমার থেকে। তোমরা যার সাথে লড়াই করবে আমিও তার সাথে লড়াই করবো এবং যার সাথে তোমরা সন্ধি করবে আমিও তার সাথে সন্ধি করবো।"

হুযুর (সাঃ)-এর ইরশাদ শুনে ইয়াছরাবের সকল ঈমানদার ব্যক্তি বাইয়াতের জন্য অগ্রসর হলেন। এ সময় হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন উবাদাহ সাহাবীদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ

"বন্ধুগণ ! ভালোভাবে বুঝে নাও যে, তোমরা কোন্ বস্তুর বাইয়াত নিচ্ছ। এ বাইয়াত আরব এবং আজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর। খুব ভালোভাবে জেনে নাও যে, তোমাদের ওপর এমন সময়ও আসতে পারে যে, আমাদের শরীকরা কতল হয়ে যেতে পারে। আমাদের সম্পদ বরবাদ হয়ে যেতে পারে। আমাদের মান-সম্ভ্রম নষ্ট হতে পারে। সে সময় আপদ-বিপদে ঘাবড়ে গিয়ে তোমরা রাসূল (সাঃ)-কে যেন পরিত্যাগ করে না বস।"

সকল আনসার এক বাক্যে বললো ঃ "হাঁ হাঁ, আমরা সকল বিপদ দেখেও বাইয়াত করছি।"

তারপর প্রিয়নবী (সাঃ) আনসারদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"আল্লাহর প্রসঙ্গে আমি বলছি যে, তোমরা তার ইবাদাত কর এবং কাউকেই তার সাথে শরীক করো না। নিজের ও সাথীদের জন্য এটা চাই যে, আমাদেরকে আশ্রয় দাও এবং যেভাবে নিজের জীবনকে রক্ষা করো সেভাবে আমাদেরকেও রক্ষা করবে।"

প্রশ্ন হলো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যদি এ সকল কাজ করি তাহলে প্রতিদানে আমরা কি পাবো।" হুযুর (সাঃ) বললেন ঃ "জান্নাত।"

এ কথা শুনে আনসারদের অন্তর ঈমান ও ইয়াকিনের আলোয় প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো এবং তারা বললো ঃ " তাহলে আপনি যা কিছু চান, তার জন্যই আমরা প্রস্তুত রয়েছি।"

এরপর একের পর এক তারা হুযুর (সাঃ)-এর হাতে বাইয়াত হলেন। ইতিহাসে এ বাইয়াতকে বাইয়াতে উকাবায়ে ছানিয়া, বাইয়াতে উকাবায়ে কবিরাহ এবং বাইয়াতে লাইলাতুল উকাবা নামে খ্যাত হয়ে আছে। আর ইসলামের ইতিহাসে এটা মাইল স্টোনের মর্যাদা রাখে। বস্তুতঃ এটা আরব এবং আজম, জ্বীন ও ইনসানের সাথে লড়াইয়ের বাইয়াত ছিল। এ সময় আরবের মাটির প্রতিটি কণা হকের ঝাণ্ডাবাহীদের রক্ত পিপাসু ছিল এবং আরবের কোন কাবিলাই হক পন্থীদের সাহায্যের ঘোষণা দানের সাহস রাখতো না। সেই ঘন ঘোর দুর্দিনে ইয়াছরিবের এ সব পবিত্র মানুষ উঠে দাঁড়ালেন এবং কালেমায়ে হক বুলন্দ করার জন্য জীবন, সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে মক্কার রাসূল (সাঃ)-এর পবিত্র পদধূলী প্রদানেরও আকাংখা ব্যক্ত করলেন। সে পবিত্র রাতে প্রিয় নবী (সাঃ)-এর সাথে তাঁরা যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলেন তা বাস্তবেও কার্যকর করে দেখিয়েছিলেন। কত শুভ ও সুন্দর ছিলেন সে সকল ব্যক্তিত্ব যাঁরা জীবনবাজী রেখে এ বাইয়াত করেছিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিষ্ঠা এবং সততার সে বাইয়াত বা ওয়াদা পূরণ করেছিলেন।

চরিতকাররা বলেছেন, যখন এ বাইয়াত সম্পন্ন হলো তখন হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন উবাদাহ দাঁড়িয়ে অত্যন্ত আবেগের সাথে বললেন, " হে আল্লাহর রাসূল! আপনি চাইলে আগামী সকালেই আমি হকের শত্রুদেরকে তরবারীর স্বাদ গ্রহণ করাতে পারি।" হুযুর (সাঃ) বললেন, "না, এখনো সে নির্দেশ আসেনি।"

বাইয়াত উকাবায়ে কবিরার পর হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন উবাদাহ এবং তার দু'তিন জন সাথী মক্কাতেই স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। (অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ইয়াছরিব ফিরে যান এবং সেখান থেকে মক্কা আগমন করেন। তারপর মক্কার হক পন্থীদের সাথেই অবস্থান করেন) হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) মুসলামানদেরকে মদীনায় হিজরাতের অনুমতি প্রদান করলে তিনিও তাদের সাথে হিজরাত করে মদীনা গমন করেন। এ জন্য তাঁকে মুহাজিরী আনসার বলা হয়।

হযরত রাসূলে করিম (সাঃ) মক্কা থেকে হিজরতের পর কিছুদিন কুবাতে অবস্থান করেছিলেন। তারপর তিনি যথার্থ ইয়াছরিবে (মদীনা) শুভ পদার্পণ করেন। মদীনার আনসাররা তাঁকে এক ঐতিহাসিক সমর্ধনা প্রদান করেন। এ সমর্ধনার উদাহরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। প্রিয় নবী (সাঃ) বনু সালেমের মহল্লা অতিক্রম করছিলেন। এ সময় বনু সালেমের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন উবাদাহ এবং হযরত উতবান (রাঃ) বিন মালিক অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। তারা তাঁকে গরীব খানায় অবস্থানের জন্যও মিনতি জানান। কিন্তু এ সৌভাগ্য আল্লাহ পাক হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ)-এর তকদীরে লিখে রেখেছিলেন। এ জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের আবেগের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক এবং দোয়া করতে করতে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

কয়েক মাস পর প্রিয় নবী (সাঃ) মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেন। তখন হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন উবাদাহকে জলিলুর কদর মুহাজির সাহাবী হযরত ওসমান (রাঃ) বিন মাজউনের দ্বীনিভাই বানিয়ে দিলেন।

দ্বিতীয় হিজরীর রামাদান মাসে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন উবাদাহ কোন বিশেষ কারণ বশতঃ তাতে অংশ নিতে পারেনি। এর ক্ষতিপূরণ হিসেবে তিনি পরবর্তী বছর ওহুদের যুদ্ধে অংশ নিয়ে মাথায় কাফন বেঁধে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। এক বর্ণনা অনুযায়ী মক্কার মুশরিক সুফিয়ান বিন আবদি শামস তাকে শহীদ করে।

হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) "আল-ইসাবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন উবাদাহ শাহাদাতের পূর্বে কিছু দিন আসহাবে সুফ্ফার দলেও ছিলেন।

হযরত হারাম (রাঃ) বিন মিলহান আনসারী

বিশ্ব নেতা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) মক্কার মাটিকে বিদায় জানিয়ে মদীনা মুনাওয়ারা হতে শুভ পদার্পণ করলেন। এ সময় কতিপয় আনসারী সাহাবী (রাঃ) অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে রাসূল (সাঃ)-এর নিকট থেকে কুরআন করিমের তালিম হাসিল করেন এবং একইভাবে তা অন্যদেরকেও তালিম দেন। কুরআন হাকিমের প্রতি অসাধারণ ভালোবাসা পোষণকারী এ সব সাহাবীর মধ্যে মদীনা মুনাওয়ারাহ'র হারাম (রাঃ) বিন মিলহান নামক একজন যুবকও ছিলেন। আনসারের সম্ভ্রান্ততম বংশ বনু নাজ্জারের সাথে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তাঁর নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

হারাম (রাঃ) বিন মিনহান বিন খালিদ বিন যায়েদ বিন হারাম বিন জুনদুব বিন আমের বিন গানাম বিন আদি বিন নাজ্জার বিন ছালাবা বিন আমর বিন খাযরাজ।

হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) এবং হযরত উম্মে হারাম (রাঃ) অত্যন্ত জলিলুল কদর সাহাবিয়াহ ছিলেন। তাঁরা উভয়েই হারাম (রাঃ) বিন মিলহানের সহোদরা ছিলেন। অনেক দূরের আত্মীয়তার সূত্রে তাঁরা রাসূল (সাঃ)-এর খালা হতেন। এ সম্পর্কে হযরত হারাম (রাঃ)-ও রাসূল (সাঃ)-এর মামু হতেন।

হযরত হারাম (রাঃ) বিন মিলহান অগ্রবর্তী আনসার সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত। তিনি নবী (সাঃ)-এর হিজরাতের পূর্বেই সহোদরাদের সাথে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। রহমতে আলম (সাঃ) মদনীতে তাশরীফ আনার পর অন্যান্য আনসার ভাইদের সাথে তিনিও তাঁকে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে স্বাগতঃ জানিয়েছিলেন এবং দিবা-নিশি নবুয়াতের প্রস্রবণ থেকে ফয়েজপ্রাপ্ত হতে থাকেন। এমনকি অল্প সময়ের মধ্যেই কুরআন-সুন্নাহর আলেম হয়ে গেলেন। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, তিনি বেশীর ভাগ সময়

কুরআন পড়তেন এবং রাতে কুরআনের দরস পেশ করতেন। এভাবে তিনি "ক্বারী" উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।

হযরত হারাম (রাঃ) অত্যন্ত একনিষ্ঠ মুসলমান ছিলেন এবং তাঁর ঈমানী আবেগের কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না। রাতে দরসে কুরআন শেষে আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল হয়ে যেতেন এবং সকাল পর্যন্ত নামায পড়তেন। দিনে মাসজিদে নববী এবং আসহাবে সুফফার খিদমত আবশ্যক করে নিয়েছিলেন। সহিহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, তিনি মসজিদে নববীতে পানি ভরে রাখতেন। অতঃপর জঙ্গলে গিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে আনতেন এবং তা বিক্রি করে আসহাবে সুফ্ফা ও অন্যান্য অভাবগ্রস্ত মুসলামানদের খানা-পিনার ব্যবস্থা করতেন। উন্নত চরিত্র এবং নিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর নৈকট্য লাভ করেছিলেন।

দ্বিতীয় হিজরীর রমাদান মাসে হক এবং বাতিলের প্রথম সংঘর্ষ ঘটে বদরের প্রান্তরে। হযরত হারাম (রাঃ) বদরী সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি জীবন বাজী রেখে লড়াই করেন। কতিপয় বর্ণনায় বর্ণিত আছে যে, পরবর্তী বছর ওহোদের যুদ্ধেও তিনি অংশ নিয়েছিলেন এবং বাহাদুরীর চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন।

চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে বনু কালাবের সরদার আবু বারা' আমের বিন মালিক নজদ থেকে মদীনা মুনাওয়ারা এসে রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে কতিপয় ব্যক্তিকে তার সাথে তার কওমের নিকট ইসলামের দাওয়াত দানের জন্য প্রেরণের আবেদন জানালো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার আবেদন কবুল প্রশ্নে দ্বিধা প্রকাশ করলেন। কেননা কিছু দিন পূর্বে বনু আমেরের সরদার আমের বিন তোফায়েল এক চিঠিতে হুমকি প্রদান করে যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) যেন তাকে স্থলাভিষিক্ত বানায় অথবা নরম জমিনে সে শাসন করুক এবং কঠিন জমিনে আমের শাসন করবে। নচেৎ সে হাজার হাজার যোদ্ধাসহ মদীনার ওপর হামলা করবে। এ আমের আবু বারার ভ্রাতৃষ্পুত্র ছিল। আবু বারা' বারবার নিশ্চয়তা প্রদান করে বললো যে, যেসব মুসলমান তার সাথে যাবে সে তাদের নিরাপত্তার জামিন হবে।

সহিহ বুখারীতে হযরত আনাস (রাঃ) বিন মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রিয় নবী (সাঃ) (আবু বারা'র নিশ্চয়তার ভিত্তিতে) ৭০ জন সাহাবীকে হযরত হারাম (রাঃ) বিন মিলহানের নেতৃত্বে নজদ প্রেরণ করেছিলেন। তাদের বেশী সংখ্যকই

ছিলেন আনসার এবং আসহাবে সুফ্ফার সদস্য। তাঁরা কুরআনে করিমের হাফেজ এবং কারী উপাধিতে মশহুর ছিলেন। হুযুর (সাঃ) আমের বিন তোফায়েলের নামে একটি পত্রও সেই দলের হাতে প্রদান করলেন। এ সব সাহাবী মদীনা থেকে বিদায় গ্রহণ করে বি'রে মাউনা নামক স্থানে এসে থেমে গেলেন। স্থানটি ছিল মক্কা মুয়াজ্জমা এবং আসফানের মধ্যে। ওয়াকেদী বর্ণনা করেছেন যে, এটা বনি সুলাইমের একটি পুকুর ছিল। আর তা ছিল বনি আমের ও বনু সুলাইমের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।

হযরত হারাম (রাঃ) বিন মিলহান বিশ্বনবী (সাঃ)-এর পত্র নিয়ে আমের বিন তোফায়েলের নিকট গেলেন। সেই হতভাগা রাসূল (সাঃ)-এর পত্র পর্যন্ত না পড়ে এবং আরবদের প্রচলিত মেহমানদারীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এক ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করলো। সে ব্যক্তি পিছন দিক থেকে এসে হযরত হারাম (রাঃ)-কে বর্শা মারলো। এ বর্শা তাঁর শরীরের এপার ওপার হয়ে বেরিয়ে গেল। হযরত হারাম (রাঃ) আঁজলা ভরে রক্ত উঠিয়ে নিজের চেহারা এবং মাথায় ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, "কাবার রবের কসম! আমি সফল হয়েছি।" এ কথা বলেই তিনি মাটিতে ঢলে পড়লেন এবং মাথায় শাহাদাতের মুকুট পরিধান করে জান্নাতবাসী হয়ে গেলেন।

ওয়াকেদী বর্ণনা করেছেন যে, হযরত হারাম (রাঃ) বিন মিলহানের ওপর বর্শা নিক্ষেপকারীর নাম ছিল জাব্বার বিন সালমা কিলাসবী। পরে জাব্বার লোকদের নিকট হযরত হারামের "আমি সফল হয়েছি" এ কথার অর্থ জিজ্ঞেস করেছিল। তারা বলেছিল যে, এর অর্থ হলো "আমি বেহেশত লাভে সক্ষম হয়েছি।" জব্বার এ কথা শুনে বললো, "খোদার কসম! সে সত্য কথা বলেছে। " এরপর সে ইসলাম গ্রহণ করে।

হযরত হারাম (রাঃ) -এর শাহাদাতের পর আমের বিন তোফায়েল বনু আমের গোত্রকে বললো, অন্যান্য মুসলমানের সাথেও এ ধরনের ব্যবহারই কর। কিন্তু তারা আবু বারা'র আশ্রয়ের কারণে তাতে আপত্তি করলো। ফলে আমের চারপাশের কতিপয় গোত্র যেমন বনু সুলাইম, রায়াল এবং জাকওয়ান প্রভৃতিকে একত্রিত করে মুসলমানদের ওপর হামলা করে বসলো।

অন্য এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী মুসলমানরা হযরত হারাম (রাঃ)-এর শাহাদাতের খবর শুনে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেলেন। আমের বিন তোফায়েল এবং তার

অসংখ্য সাথী মুষ্টিমেয় মুসলমানদের ঘিরে ফেললো এবং দু'জন ছাড়া অবশিষ্ট সকলকে এক এক করে শহীদ করে ফেললো। এ দু'জনের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত কা'ব (রাঃ) বিন যায়েদ আনসারী। তিনি গুরুতররূপে আহত হয়েছিলেন। মৃত মনে করে কাফেররা তাকে ফেলে গিয়েছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন হযরত আমর (রাঃ) বিন উমাইয়া জুমরী। নজদীরা তাঁকে গ্রেফতার করেছিল। পরে সুযোগ পেয়ে তিনি পালিয়ে এসেছিলেন। অবশ্য অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, আমের বিন তোফায়েলের মাতা মানত পুরা করার জন্য তাকে মুক্ত করে দিয়েছিল।

হযরত আমর (রাঃ) বিন উমাইয়া মদীনা পৌঁছে এ লোমহর্ষক ঘটনার কথা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অবহিত করলেন। এ খবর পেয়ে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। সাধারণত তিনি কারোর জন্য বদ দোয়া করতেন না। কিন্তু বিরে মাউনার দুঃখজনক শাহাদতের ঘটনায় তিনি খুব শোকাভীভূত হয়েছিলেন। সহীহ বুখারীর বর্ণনা মুতাবেক রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একমাস পর্যন্ত হতভাগা হন্তাদের জন্য বদ দোয়া করেছিলেন। প্রিয় নবী (সাঃ) হযরত হারাম (রাঃ) বিন মিলহানকে চিরকাল স্মরণ রেখেছিলেন। তিনি কখনো কখনো বলতেন, উম্মে হারাম (রাঃ) এবং উম্মে সুলাইম (রাঃ)-এর জন্য আমার খুব দুঃখ হয়। তাদের ভাই জমলুম হয়ে শাহাদাত বরণ করেছিলো।

- X -

হযরত হাসিলুল ইয়ামান (রাঃ)

চরিতকারগণ হযরত হাসিলুল ইয়ামান (রাঃ)-এর নাম তিন ভাবে লিখেছেন। তা হলো ঃ হুসাইল, হাসিল এবং হাসল। তাঁর কুনিয়াত ছিল আবু হুজাইফা। সকল চরিতকারই তাঁর কুনিয়াত প্রশ্নে ঐকমত্য পোষণ করেন। হযরত আবু হুজাইফা হাসিল (রাঃ)-এর সম্পর্ক ছিল গাতফানের আবাস বংশের সাথে। নসবনামা হলো ঃ হাসিল (রাঃ) বিন জাবের বিন আমর বিন রবিয়াহ বিন ফারুদাহ বিন হারিছ বিন মাযিন বিন কাতিয়াহ বিন আবাস।

হাফিজ ইবনে আবদুল বার (রঃ) আল-ইসতিয়াব গ্রন্থে লিখেছেন যে, হাসিল (রাঃ)-এর দাদার নাম ছিল ইয়ামান। এ জন্য তিনিও ইয়ামান উপাধিতে মশহুর হন। তাঁর সুখ্যাতিরও কারণ আছে। তিনি স্বগোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে পালিয়ে মদীনা চলে এসেছিলেন। এখানে তিনি বনি আবদিল আশহালের সাথে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং সেই বংশের এক মহিলা রুবাব (রাঃ) বিনতে কাবের বিন আদি বিন আবদিল আশহাল-এর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। বস্তুতঃ তিনি ইয়েমেনী ছিলেন। এ জন্য তাঁর মিত্র তাঁকে আল-ইয়ামান বলা শুরু করে।

হযরত হাসিল (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত দু'ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে যে, তিনি পুত্র হযরত হুজাইফার সাথে নবী (সাঃ)-এর হিজরাতের পূর্বে ঈমান এনেছিলেন। ইবনে আছির (রাঃ)-এর মত অনুযায়ী হযরত হুজাইয়া (রাঃ) হিজরাতের পূর্বে মক্কা পৌঁছেন এবং প্রিয় নবী (সাঃ)-এর সাথে হিজরাতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত হাসিল (রাঃ), স্ত্রী রুবাব (রাঃ) বিনতে কা'ব এবং দু'পুত্র হুজাইফা (রাঃ) ও সাফওয়ান (রাঃ) হিজরাতের [অর্থাৎ হুযুর (সাঃ)-এর মদীনায় শুভ পদার্পণের সাথে সাথে] পর ইসলাম গ্রহণ করেন।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, বদরের যুদ্ধের সময় হযরত হাসিল (রাঃ) পুত্র হুজাইফা (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য বের হলেন। দুর্ঘটনাবশতঃ রাস্তায় কুরাইশ মুশরিকদের হাতে পড়ে গেলেন। তারা বললো, তোমরা সম্ভবতঃ মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিকট গমন করছো। আমরা তোমাদেরকে কোন মতেই যেতে দেব না। হযরত হাসিল (রাঃ) বললেনঃ আমরা মদীনা যাচ্ছি। তাতে তোমাদের আপত্তির কি থাকতে পারে? মুশরিকরা বললো, ঠিক আছে। তাহলে যুদ্ধে অংশ নেবে না এ ব্যাপারে কসম খাও। উভয়েই অনিচ্ছাকৃতভাবেই যুদ্ধে অংশ না নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ফলে কাফিররা তাদেরকে মুক্ত করে দিল। মুক্তির পর নবীজী (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হয়ে সকল ঘটনা খুলে বললেন। হুযুর (সাঃ) বললেন, নিজের প্রতিশ্রুতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকো এবং বাড়ী ফিরে যাও। রইলো বিজয় ও সাহায্যের ব্যাপার। তা আল্লাহর হাতে রয়েছে। আমরা আল্লাহর নিকটই তা কামনা করবো।

ওহোদের যুদ্ধের সময় হযরত হাসিল (রাঃ) পুত্র হুজাইফা (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য বের হলেন। হুযুর (সাঃ) হযরত হাসিল (রাঃ)-কে দুর্বল দেখে অন্য আরেকজন বয়স্ক বুজর্গ হযরত ছাবিত (রাঃ) বিন ওয়াকশের সাথে মহিলা ও শিশুদের নিকট এক উঁচু টিলার ওপর অথবা দুর্গে বসিয়ে দিলেন। হাফিজ ইবনে আবদুল বার (রাঃ) "ইসাবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, হুযুর (সাঃ) উভয়কেই মহিলা এবং শিশুদের হিফাজতের জন্য নিয়োগ করেছিলেন। যুদ্ধ শুরু হলে জিহাদী আবেগ উভয় বুজর্গকে অস্থির করে ফেললো। একে অপরকে বললো। "তোমার পিতার মৃত্যু হোক।" আমরা এখানে কেন হাতের ওপর হাত রেখে বসে থাকবো। আজ না মরি, কাল তো মরতেই হবে। চলো, আল্লাহর পথে লড়াই করি। আল্লাহ পাক শাহাদাতের নিয়ামত নসিব করতে পারেন। সুতরাং উভয় বুজর্গ তরবারী হাতে নিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে এসে দাঁড়লেন। মুশরিকরা হযরত ছাবিত (রাঃ) বিন ওয়াকশকে শহীদ করে ফেললো। মুসলমানরা হযরত হাসিল (রাঃ)-কে চিনতে না পেরে তার ওপর তরবারী চালিয়ে দিল। হযরত হুজাইফা (রাঃ) চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, "ইনি আমার পিতা, ইনি আমার পিতা।" কিন্তু যুদ্ধের ডামাডোলে কেউ তার কথা শুনতে পেল না এবং হযরত হাসিল (রাঃ) মুসলমানদের হাতে শাহাদাতের পিয়ালা পান করে জান্নাতুল ফিরদাউসে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

হযরত হুজাইফা (রাঃ) পিতার শাহাদাতে খুব মনোকষ্ট পেলেন। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করলেন এবং ইয়াগফিরুল্লাহু লাকুম বলে চুপ মেরে গেলেন। প্রিয় নবী

(সাঃ) এ ঘটনার কথা জানতে পেরে হযরত হুজাইফা (রাঃ)-কে ডেকে অত্যন্ত দুঃখ করলেন এবং হাসিল (রাঃ) শহীদের দিয়ত আদায় করলেন। কিন্তু হযরত আবু হুজাইফা (রাঃ) এ দিয়তের অর্থ গ্রহণ সহ্য করতে পারলেন না এবং তিনি তা মিসকিনদের মধ্যে সাদকাহ করে দিলেন। নবী করিম (সাঃ) তাঁর এ আবেগের প্রশংসাকরলেন।

এক বর্ণনায় আছে যে,হুযুর (সাঃ) এ ঘটনা শুনে বললেন, হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়েই জিহাদের ছওয়াব পাবেন।

হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত রুবাব (রাঃ) বিনতে কা'বের ঔরষে হযরত হাসিল (রাঃ)-এর পাঁচ সন্তান জন্ম নিয়েছিল। হুজাইফা (রাঃ), সা'দ, সাফওয়ান (রাঃ), মাদলাজ এবং লাইলা তাদের মধ্যে শুধু হযরত হুজাইফা এবং হযরত সাফওয়ান (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছিল। হযরত হুজাইফা (রাঃ) নবী (সাঃ)-এর নৈকট্য লাভ করতে পেরেছিলেন এবং তিনি সাহিবিস সির অর্থাৎ রাসূল (সাঃ)-এর গোপনীয়তা রক্ষাকারী হিসেবে খ্যাত হয়েছিলেন। তিনি বড় বড় সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হতেন।

০ ০ ০

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন যায়েদ আনসারী

হযরত আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন যায়েদ বিন আছেম এমন জলিলুলকদর মাতার কোলে লালিত-পালিত হয়েছিলেন যিনি রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি ছিলেন নিবেদিতা চিত্ত। তিনি হকের জন্য জীবন, সন্তান, এবং সম্পদ কুরাবানীর আবেগের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এ মহিলার নাম ছিল নসিবাহ (রাঃ) বিনতে কা'ব। ইতিহাসে তিনি উম্মে আম্মারাহ কুনিয়াতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর ভাইয়ের নাম ছিল হাবিব (রাঃ) বিন যায়েদ বিন আছেম।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন যায়েদ খাযরাজের সম্ভ্রান্ত শাখা বনু নাজ্জারের পাদ প্রদীপ ছিলেন। তাঁর নসবনামা হলো ঃ আবদুল্লাহ (রাঃ) যায়েদ বিন আছেম বিন কাব বিন আমর বিন আওফ মাবজুল বিন আমর গানাম বিন আযুন বিন নাজ্জার বিন ছালাবাহ বিন আমর বিন খাযরাজ।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর পিতা যায়েদ বিন কাব আছেম ইসলামের যুগ পাননি। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর শৈশব অবস্থাতেই মারা যান। তাঁর মাতা হযরত উম্মে আম্মারাহ অত্যন্ত সৎ স্বভাবসম্পন্ন মহিলা ছিলেন। তিনি আনসারদের অগ্রবর্তী দলের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। বাইয়াতে উকাবায়ে উলা অর্থাৎ প্রথম বাইয়াতে উকাবার পর হযরত মাছয়াব (রাঃ) বিন উমাইর ইয়াছরাবে ইসলামের তাবলিগ শুরু করলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। নবুয়াত প্রাপ্তির ১৩ বছরে মদীনা থেকে ৭৫ ব্যক্তির একটি দল মক্কা গিয়ে লাইলাতুল উকাবাতে রাসূল (সাঃ)-এর হাতে বাইয়াত করলেন এবং প্রিয় নবী (সাঃ)-কে ইয়াছরিব গমনের দাওয়াত প্রদান করেন। তিনি এ দলের অন্যতম সদস্যা ছিলেন।

কতিপয় রাওয়ায়েতে আছে যে, হযরত উম্মে আম্মারাহ পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) এবং হযরত হাবিব (রাঃ) তাঁর সাথেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অন্য রাওয়াতে আছে, হুযুর (সাঃ) যখন মক্কা থেকে হিজরাত করে মদীনা তাশরীফ আনেন তখন তারা ইসলাম

গ্রহণ করেন। এ সব বর্ণনার সামঞ্জস্য বিধান এভাবে করা যায় যে, নবী (সাঃ)-এর হিজরাতের পূর্বেই তিনি মাতার সাথে মুসলমান হন। কিন্তু হিজরাতের পর রাসূল (সাঃ)-এর হাতে বাইয়াত করেন।

বদরের যুদ্ধে (দ্বিতীয় হিজরীর রামাদান মাস) হযরত আবদুল্লাহর অংশগ্রহণ প্রশ্নে মতভেদ রয়েছে। কতিপয় চরিতকার বলেছেন যে, তিনি বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। আবার অনেকে বলেছেন যে, সে সময় তার বয়স ১৫ বছরের কম ছিল। এ জন্য তাতে অংশ নিতে পারেননি। অবশ্য বদরের যুদ্ধের পর রাসূল (সাঃ)-এর যুগে সংঘটিত অন্যান্য সকল যুদ্ধেই তাঁর অংশ গ্রহণ প্রশ্নে চরিতকাররা একমত পোষণ করেন।

আল্লামা ইবনে সায়াদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, ওহোদের যুদ্ধে (তৃতীয় হিজরী) হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন যায়েদ-এর মাতা হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) এবং ভ্রাতা হাবিব (রাঃ) সহ অংশ নিয়েছিলেন এবং অত্যন্ত বাহাদুরীর সাথে লড়াই করেন। তাঁর মাতা এ যুদ্ধে এমন নজিরবিহীন বাহাদুরী এবং দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছিলেন যে, ওহোদের মহিলা লকবে খ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ করে তখন হুযুর (সাঃ)-এর নিকট হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন জীবন উৎসর্গকারী ছিলেন। এর পূর্বে হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) অন্যান্য মহিলার সাথে মশকে পানি ভরে মুজাহিদদেরকে পান করাচ্ছিলেন এবং আহতদের শুশ্রূষা করছিলেন। যখন তাঁরা রাসূল (সাঃ)-কে বিপদাপন্ন দেখলেন তখন মশক ফেলে দিয়ে তরবারী এবং ঢাল হাতে তুলে নিলেন এবং প্রিয় নবী (সাঃ)-এর নিকট পৌঁছে কাফেরদের সামনে বুক পেতে দিলেন। কাফেররা বারবার হুযুর (সাঃ)-এর দিকে এগিয়ে আসছিল। এ সময় হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) অন্যান্য সাহাবীদের সাথে মিলে তীর ও তরবারী দিয়ে বাধা দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে এক মুশরিক তাকে লক্ষ্য করে তার মাথার ওপর তরবারীর আঘাত হানলো। তিনি ঢাল দিয়ে আঘাত ফিরিয়ে দিলেন এবং তার ঘোড়ার পায়ের ওপর এমন আঘাত হানলেন যে, ঘোড়া ও তার আরোহী মাটির ওপর পতিত হচ্ছিল।

প্রিয় নবী (সাঃ) এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিলেন। তিনি হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে ডেকে বললেন ঃ

"আবদুল্লাহ! তোমার মাতাকে সাহায্য কর।" রাসূল (সাঃ)-এর ডাক শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এলেন এবং তরবারীর এক আঘাতে হামলাকারী মুশরিককে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন। ঠিক সে সময় অপর আরেক জন মুশরিক

দ্রুত এসে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর বাম বাহু জখম করে চলে গেল, হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) নিজের হাতে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর জখম বাঁধলেন এবং বললেনঃ "পুত্র যাও! যতক্ষণ দম আছে অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পার ততক্ষণ লড়াই কর।"

হুযুর (সাঃ) তাঁর জীবন উৎসর্গের আবেগ দেখে বললেনঃ "হে উম্মে আম্মারাহ! তুমি যে সাহসের পরিচয় দিয়েছ তা আর কার মধ্যে হবে।"

ইত্যবসরে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে আহতকারী মুশরিক ফিরে পুনরায় হামলা করে বসলো। হুযুর (সাঃ) উম্মে আম্মারাহ (রাঃ)-কে বললেন ঃ "উম্মে আম্মারাহ! ঠেকাও! ঠেকাও! এটি সেই দুর্ভাগা যে আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে আহত করছিল।" হযরত উম্মে আম্মারাহ ফিরে তরবারীর এমন আঘাত হানলেন যে, সে দু'টুকরো হয়ে পড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ দৃশ্য দেখে মুচকি হাসলেন এবং বললেনঃ উম্মে আম্মারাহ ! তুমি নিজের পুত্রের খুব প্রতিশোধ নিয়েছ।"

মোট কথা, উম্মে আম্মারাহ শেষ পর্যন্ত লড়াই অব্যাহত রেখেছিলেন এবং আহত হয়েছিলেন। এক বর্ণনায় আছে যে, তাঁর শরীরের ১২টি স্থানে ক্ষত হয়েছিল। যুদ্ধের পর হুযুর (সাঃ) স্বয়ং তাঁর ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছিলেন এবং কয়েকজন বাহাদুর সাহাবীদের নাম নিয়ে বলেছিলেন ঃ "আল্লাহর কসম! আজ উম্মে আম্মারাহ তাদের সবার চেয়ে বেশী বাহাদুরী দেখিয়েছে।"

অন্য আরো বর্ণনায় আছে যে, হুযুর (সাঃ) বলতেন, ওহোদের দিন ডাইনে বামে যেদিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করতাম শুধু উম্মে আম্মারাই পরিদৃষ্ট হতো।

ওহোদের যুদ্ধের পর হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন যায়েদ খন্দকের যুদ্ধেও বাহাদুরী প্রদর্শন করেন। ৬ষ্ঠ হিজরীতে তিনি হুদাইবিয়াতে বাইয়াতে রেদওয়ানে অংশগ্রহণের মহান মর্যাদা হাসিল করেছিলেন। এমনিভাবে তিনি "আসহাবুশ শাজারাহ"র সেই পবিত্র দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন যাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক প্রকাশ্য ভাষায় নিজের সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিয়েছিলেন। এরপর তিনি মাক্কাসহ খায়বারের যুদ্ধে অংশ নেন। অতপর সপ্তম হিজরীতে মা-সহ উমরাতুল

কাজাতে হুযুর (সাঃ)-এর সাথী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। ৮ম হিজরীতে তিনি সেই দশ হাজার পবিত্র দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ পান যারা মক্কা বিজয়ের সময় রাসূল (সাঃ)-এর সহযোগী ছিলেন।

সেই বছরই তিনি হুনাইনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। এ যুদ্ধেও তাঁর মাতা সাথে ছিলেন। বিশ্বনবী মুহাম্মাদ মুস্তফা (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) খেলাফতের আসনে সমাসীন হন। এ সময় হঠাৎ করে সমগ্র আরবে ধর্মত্যাগের আগুন প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। ধর্মত্যাগীদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল নজদ কবিলার বনু হানিফার সরদার মুসাইলামাহ কাজ্জাব। সে নবুয়াতের দাবী করে ৪০ হাজার লোককে নিজের ঝাণ্ডা তলে একত্রিত করে ফেললো। সে সময় হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর ভ্রাতা হযরত হাবিব (রাঃ) বিন যায়েদ আম্মান থেকে মদীনা আসছিলেন। তিনি যালেম মুসাইলামার হাতে ধৃত হলেন। সে তাকে ধর্মত্যাগে বাধ্য করলো। কিন্তু তিনি পরিষ্কার অস্বীকৃতি জানালেন। মুসাইলামা তার শরীরে এক এক অঙ্গ কর্তন করে ফেললো। তবু তিনি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত বলতে থাকলেনঃ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল।"

তাঁর এ নির্যাতনমূলক শাহাদাতের খবর শুনে হযরত উম্মে আম্মারাহ এবং হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) খুবই মনোকষ্ট পেলেন। কিন্তু হাবিব (রাঃ)-এর অটলতায় আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করেলন। তাঁরা মুসাইলামার নিকট থেকে এ যুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণের ওয়াদাও করলেন।

এ ঘটনার কিছু দিন পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) হযরত খালিদ (রাঃ) বিন ওয়ালিদকে মুসাইলামাকে উৎখাতের জন্যে নিয়োগ করলেন। এ সময় হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) উভয়েই হযরত খালিদ (রাঃ)-এর বাহিনীতে সামিল হয়ে গেলেন। মুসাইলামা যুদ্ধের ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। সে ৪০ হাজার যোদ্ধাকে মুসলমানদের মুকাবিলায় এনে দাঁড় করিয়ে দিল। আকরাবা (ইয়ামামা) নামক স্থানে মুরতাদ এবং হক পন্থীদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হলো। কখনো মুসলমানরা পেছনে হটে যেতে লাগলো। আবার কখনো তারা মুরতাদদেরকে পেছনে হটিয়ে দিলো। হযরত খালিদ (রাঃ) বিন ওয়ালিদ যুদ্ধের এরূপ দেখলেন। তিনি মুসলমানদের সকল গোত্রকে পৃথক করে প্রত্যেক গোত্রকে স্ব স্ব ঝাণ্ডার তলে কাজ করার নির্দেশ দিলেন। এ কৌশলের যথেষ্ট ফল দিলো। প্রত্যেক গোত্র বাহাদুরী এবং দৃঢ়তার ক্ষেত্রে একে

অপরকে ডিঙিয়ে যেতে চাইলো। ফলে মুরতাদরা অস্থির হয়ে পড়লো। মুসাইলামা নিজের বাহিনীর মধ্যে পরাজয়ের লক্ষণ দেখতে পেয়ে শিষ্যদেরকে ডেকে বললো জীবন বাঁচাতে চাইলে পালাও। হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) প্রথম থেকেই মুসাইলামার নিকট পৌঁছার চেষ্টা করছিলেন। এক্ষণে তাঁরা সে সুযোগ পেলেন। উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) আঘাতের পর আঘাত খেতে খেতে নিজের বর্শা দিয়ে রাস্তা তৈরী করতে করতে তার দিকে অগ্রসর হলেন। এতে তিনি শরীরে ১১টি আঘাত পেয়েছিলেন। মুসাইলামার নিকট পৌঁছে তিনি বর্শা দিয়ে তার ওপর হামলা করতে চাইছিলেন। দু'টি অস্ত্র এক সাথে তার ওপর নিপতিত হলে দ্বিখণ্ডিত হয়ে সে ঘোড়ার নীচে পড়ে গেল। উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) দৃষ্টি উঠিয়ে দেখলেন যে, তাঁর পাশে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) দাঁড়িয়ে আছেন এবং নিকটেই হযরত ওয়াহশী (রাঃ) দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওয়াহশী (রাঃ) নিজের অস্ত্র মুসাইলামার ওপর নিক্ষেপ করেছিলেন এবং সে সময় হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তার ওপর তরবারী চালিয়েছিলেন। হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) উভয়েই হযরত হাবিব (রাঃ)-এর হত্যাকারী ও মুসলমানদের ঘোরতর শত্রুর মৃত্যুতে কৃতজ্ঞতার সিজদা আদায় করলেন। হযরত খালিদ (রাঃ) অত্যন্ত দ্রুত হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ)-এর চিকিৎসা করালেন এবং তার এ সকল ক্ষতস্থান ভালো হয়ে গেলো।

এ ঘটনার পর হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন যায়েদ দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন। কিন্তু খুলাফায়ে রাশেদীন (রাঃ) আমীরে মাবিয়ার (রাঃ) খিলাফতকালে তাঁর তৎপরতা সম্পর্কে চরিতগ্রন্থগুলো নীরব। ৬৩ হিজরীতে মদীনাবাসীরা ইয়াযিদের বাইয়াত ছিন্ন করে হযরত আবদুল্লাহ বিন হানজালাকে আমীর বানিয়ে নেয়ার পর তিনি জনসমক্ষে আবির্ভূত হলেন। ইয়াযিদ মদীনাবাসীর কর্মপন্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাদেরকে অনুগত বানানোর জন্য একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলো। হযরত আবদুল্লাহ বিন হানজালাহ (রাঃ) সে বাহিনীর সাথে মোকাবিলা করার জন্য শহরবাসীর নিকট থেকে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত যুদ্ধের বাইয়াত গ্রহণ শুরু করলেন। আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন যায়েদকে বাইয়াত গ্রহণের কথা বলা হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বাইয়াতের শর্ত কি? জবাব দেয়া হলো যে,'মৃত্যু'। তিনি বললেন, রাসূল (সাঃ)-এর পর এ শর্তে আমি কারো হাতে বাইয়াত করতে পারি না।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন হানজালাহ (রাঃ)-এর হাতে মৃত্যুর বাইয়াত না করা সত্ত্বেও ইয়াযিদের শাসনে খুব অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং তার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করা জিহাদের মর্যাদার সমতুল্য মনে করতেন। সুতরাং নিজের দু'পুত্র খাল্লাদ এবং আলীকে সাথে নিয়ে অন্যান্য মদীনাবাসীর মত ইয়াযিদী বাহিনীকে রুখে দাঁড়ালেন এবং অত্যন্ত বাহাদুরীর সাথে লড়াই করতে করতে দু'পুত্রসহ শহীদ হয়ে গেলেন। সে সময় তাঁর বয়স প্রায় ৭৫ বছর।

জ্ঞান ও ফজিলতের দিক থেকে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন যায়েদ এক বিশেষ মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন। হাদীসের কিতাবসমূহে তাঁর থেকে বর্ণিত বেশ কিছু হাদীস রয়েছে। তাঁর হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে রয়েছেন উবাদ বিন তামিম (রাঃ), সাঈদ (রঃ) বিন মুসাইয়িব (রাঃ), ইয়াহিয়া বিন আম্মারাহ (রাঃ), উবাদাহ বিন হাবিব (রাঃ) এবং ওয়াসে বিন হাইয়ান (রাঃ)।

মুসনাদের আহমদ বিন হাম্বলের এক বর্ণনায় জানা যায় যে, বিশ্বনবী (সাঃ) হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন যায়েদকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং তার বাড়ী যেতেন। একবার প্রিয়নবী (সাঃ) তার বাড়ী গেলেন তিনি পানি আনলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ওযু করলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর ওযু করার পদ্ধতি স্মরণ করে নিলেন। বস্তুতঃ এক যামানা পর লোকেরা হুযুর (সাঃ)-এর ওযু করার পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করলে তিনি স্বয়ং তাদের সামনে ওযু করে বলে দিলেন যে, হুযুর (সাঃ) এ পদ্ধতিতে ওযু করতেন।

###

হযরত ছুরাকাহ (রাঃ) বিন আমর আনসারী

সাইয়েদেনা হযরত ছুরাকাহ (রাঃ) বিন আমর আনসারী অত্যন্ত মর্যদাবান সাহাবী ছিলেন। তিনি একদিকে রাসূল (সাঃ)-এর যুগে সকল ধরনের মর্যাদা পেয়েছিলেন। অন্যদিকে শাহাদাতের সৌভাগ্যও লাভ করেছিলেন। আনসারের সম্ভ্রান্ত বংশ বনু নাজ্জারের সাথে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তাঁর নসবনামা হলোঃ ছুরাকাহ বিন আমর বিন আতিতাহ বিন খানছা বিন মাবজুল বিন আমর বিন গানাম বিন মালিক বিন নাজ্জার।

ছুরাকাহ (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণকাল সম্পর্কে চরিতকাররা নির্দিষ্ট করে কিছু বলেননি। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, নবী (সাঃ)-এর হিজরতের কিছু পূর্বে অথবা তাৎক্ষণিক পরেই ঈমান আনার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। যুদ্ধসমূহ শুরু হলে হযরত ছুরাকাহ (রাঃ) সর্বপ্রথম বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তারপর তিনি ওহোদ এবং পরিখার যুদ্ধে বাহাদুরী প্রদর্শন করেন।

ষষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ওমরাহ আদায়ের জন্য মদীনা মুনাওয়ারাহ থেকে মক্কা মুয়াজ্জামার দিকে রওয়ানা হলেন। এ সময় মুহাজির ও আনসারদের ১৪'শ সাহাবী তাঁর সহযাত্রী ছিলেন। হযরত ছুরাকাহ (রাঃ)-ও এ ১৪শ'র একজন ছিলেন। কুরাইশরা মুসলমানদের রওয়ানার কথা জানতে পেরে একদম তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো। মুসলমানরা যাতে মক্কায় প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য মাথায় কাফন বেধেঁ প্রস্তুত হলো। প্রিয় নবী (সাঃ) মক্কার কাফেরদের ইচ্ছার কথা জানতে পেরে রাস্তা পরিবর্তন করে হুদাইবিয়া নামক স্থানে তাঁবু টাঙ্গালেন। সেখান থেকে তিনি একজন দূতকে কুরাইশদের নিকট এ বাণীসহ প্রেরণ করলেন যে, আমরা শুধু ওমরাহ পালনের জন্য এসেছি। যুদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়। এটাই ঠিক হবে যে, কুরাইশরা আমাদের সাথে কিছুদিনের জন্য সন্ধি করে নিক। কুরাইশরা উরওয়া (রাঃ) বিন মাসউদ ছাকাফীকে (সে সময় পর্যন্ত ঈমান আনেন নি) দূত হিসেবে মুসলমানদের নিকট প্রেরণ করলো। রাসূল (সাঃ)-এর সাথে আলাপ-আলোচনা শেষে সে মক্কা ফিরে গিয়ে কুরাইশদের সাথে মুসলমানদের সন্ধি করে দেয়ার প্রস্তাব দিল। কিন্তু কুরাইশরা তার

কথা শুনলো না। নবী করিম (সাঃ) পুনরায় আরেকজন দূতকে কুরাইশদের কাছে প্রেরণ করলেন। কুরাইশরা তার সাথে দুর্ব্যবহার করলো। এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী তার ওপর হামলা করে বসলো। কিন্তু তিনি বেঁচে গেলেন। এক্ষণে হুযুর (সাঃ) হযরত ওসমান গনি (রাঃ)-কে দূত বানিয়ে প্রেরণ করলেন। তিনি একজন বন্ধুর সহযোগিতায় মক্কায় গেলেন। কিন্তু কুরাইশরা তাকে মক্কায় আটকে ফেললো। ওদিকে মুসলমানদের মধ্যে আবেগের তুফান সৃষ্টি হলো। প্রিয় নবী (সাঃ) বললেন, যদি এ খবর সঠিক হয় তাহলে আমরা ওসমান (রাঃ)-এর রক্তের বদলা না নেয়া পর্যন্ত এ স্থান ত্যাগ করবো না। এ কথা বলে তিনি (সাঃ) একটি বাবলা বৃক্ষের নীচে বসে পড়লেন এবং সেখানে উপস্থিত সাহাবীদের জীবন কুরবানীর বাইয়াত গ্রহণ করেন। এর নাম বাইয়াতে রেদওয়ান। অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির বাইয়াত। কেননা এ বাইয়াতকারীদের ব্যাপারে আল্লাহ পাক এ ভাষায় নিজের সন্তুষ্টির কথা প্রকাশ করেছেনঃ "অবশ্যই আল্লাহ খুশী হয়েছিলেন ঈমান আনয়নকারীদের ওপর। যখন তারা তোমার হাতে এ বৃক্ষের নীচে বাইয়াত করছিল।"

হযরত ছুরাকাহ (রাঃ) বিন আমরও সেই সৌভাগ্যবান সাহাবীর অন্যতম ছিলেন যারা বাইয়াতে রেদওয়ানে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেছিলেন।

পরে জানা গেল যে, হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শাহাদাতের খবর সঠিক ছিল না। কিন্তু মুসলমানদের উৎসাহ উদ্দীপনা এবং হকের প্রতি আবেগের প্রভাবে কুরাইশরা হিম্মত হারা হয়ে পড়লো। ফলে তারা কতিপয় শর্তে মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে নিল। এ শর্তাবলীর মধ্যে একটি শর্ত এ ছিল যে, মুসলমানরা এ বছর ফিরে যাবে এবং আগামী বছর এসে ওমরাহ করবে (কিন্তু এতে মক্কায় শুধুমাত্র তিনদিন অবস্থান করতে পারবে।)

সপ্তম হিজরীতে প্রিয় নবী (সাঃ) সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-এর এক বিরাট দলসহ মক্কা তাশরীফ আনলেন এবং অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে কাজা ওমরাহ আদায় করলেন। এ সময়ও হযরত ছুরাকাহ (রাঃ) বিন আমর হুযুরের (সাঃ)-এর সাথী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর বিশ্বনবী (সাঃ) আশে-পাশের রঈস এবং বাদশাদের নিকট ইসলামের দাওয়াতনামা সম্বলিত পত্র প্রেরণ করলেন। একটি পত্র তিনি বসরার শাসক শুরাহবিল বিন আমরের নামেও লিখলেন এবং হারেছ (রাঃ) বিন উমাইর ইজদীকে এ পত্রসহ শুরাহবিলের নিকট পাঠালেন। এ যালেম হযরত হারিছ (রাঃ)-কে শহীদ করে

ফেললো। হুযুর (সাঃ) হযরত হারেছ (রাঃ)–এর বদলা নেয়ার জন্য তিন হাজার মুজাহিদ সমন্বয়ে গঠিত এক বাহিনী হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন হারেছার নেতৃত্বে প্রেরণ করেলেন। এ বাহিনীতে হযরত ছুরাকাহ বিন আমরও যোগ দিয়েছিলেন। ওদিকে শুরাহবিলের সাহায্যার্থে রোমের কাইসার এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করলো। মুসলমান এবং খৃষ্টানরা মুতা নামক স্থানে পরস্পর মুখোমুখি হলো। উভয় বাহিনীর অনুপাত ছিল ১ঃ ৪০। কিন্তু মুসলমানেরা আল্লাহর ওপর ভরসা করে শত্রুর ভীতিপ্রদ শক্তিকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেললো। সেনাপতি হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন হারেছা অত্যন্ত বাহাদুরীর সাথে লড়াই করে শহীদ হয়ে গেলেন। তারপর হযরত জাফর (রাঃ) বিন আবি তালিব ঝাণ্ডা ধরলেন। তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন। অতপর হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন রাওয়াহা আনসারী নেতৃত্ব হাতে নিলেন। তিনিও শাহাদাতের পিয়ালা পান করলেন। এ সময় হযরত খালিদ (রাঃ) বিন ওয়ালিদ মুসলমানদের কমাণ্ড হাতে নিলেন এবং চরম বীরত্বের সাথে লড়াই করে মুসলমানদেরকে শত্রুর পঙ্গপালের কবল থেকে মুক্ত করে আনলেন। হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন হারেছা হযরত জাফর (রাঃ) বিন আবি তালিব এবং হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন রাওয়াহা ব্যতীত অন্য আর যেসব বীর এ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন হযরত ছুরাকাহ (রাঃ)–ও তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

###

হযরত যিয়াদ (রাঃ) বিন লবিদ আনসারী

প্রিয় নবী (সাঃ) -এর নবুয়াত প্রাপ্তির ১৩ বছর পর মদীনা মুনাওয়ারাহ থেকে ৭৫ জন পবিত্র ব্যক্তিত্ব মক্কা গমন করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মদীনা আগমনের দাওয়াত দেন। এ সব ব্যক্তিত্ব রাসূল (সাঃ)-কে শুধু দাওয়াতই দেননি এবং নিজের জীবন, সম্পদ এবং সন্তান রক্ষার মত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এ পবিত্র আত্মার ব্যক্তিবর্গের মধ্যে হযরত যিয়াদ (রাঃ) বিন লবিদ আনসারী অন্যতম ছিলেন। সময়টি ছিল ঘনঘোর দুর্যোগপূর্ণ সময়। আরবের প্রতিটি অণু-পরমাণু মানবতার শুভাকাংখী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাঁর অনুসারীদের খুন পিপাসু ছিল। তাঁকে মদীনায় আহবান শুধু মক্কাবাসীদেরই নয় সমগ্র আরবই যুদ্ধের ময়দানে ডাকার শামিল ছিল। কিন্তু আল্লাহকেই এ সকল পবিত্র বান্দাহ সব কিছু হক পথে নিয়োজিত করলো। তাঁরা কোন ভয়েও ভীত হলো না এবং কোন মুসিবতকেও পরওয়া করলেন না। লাইলাতুল উকাবার বাইয়াত তাদেরকে এমন মহান মর্যদায় অভিষিক্ত করছিল যে কিয়ামত পর্যন্ত তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। হযরত যিয়াদ (রাঃ)-এর সম্পর্ক ছিল খাযরাজ গোত্রের শাখা "বনু রিয়াজার" সাথে। তাঁর বংশনামা হলো, যিয়াদ (রাঃ) বিন লবিদ ছায়ালাবা বিন সিনান বিন আমের বিন উমাইয়াহ বিন রিয়াজাহ বিন আমের বিন যারিক বিন আবদি হারিছা বিন মালিক বিন গাজাব বিন জাশাম বিন খাযরাজ।

হযরত যিয়াদ (রাঃ) বিন লবিদ বংশের অন্যতম অফুরন্ত প্রাণ সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। আল্লাহ তায়ালাহ তাঁকে সুন্দর স্বভাব দান করছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টাতেই আওস এবং খাযরাজ গোত্রের অনেক পবিত্র আত্মার মানুষ দাওয়াতে হকের প্রতি সাড়া দিয়েছিলেন। হযরত যিয়াদ (রাঃ) বিন লবিদও এ দলের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। এভাবে তিনি আনসাদের অগ্রবর্তী দলের সদস্য হন। নবুয়াত প্রাপ্তির ১৩ বছর পর তিনি বাইয়াতে উকাবায়ে কবিরায় অংশ গ্রহণের মহান সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এ বাইয়াতের পর যখন মদীনায় মুহাজিরদের আগমন শুরু হলো তখন হযরত যিয়াদ (রাঃ) মদীনার অন্য তিন সম্মানিত ব্যক্তি হযরত জাকওয়ান (রাঃ) বিন আবদি কায়েস, হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন উবাদাহ নাজলাহ ও হযরত উকবাহ (রাঃ) বিন ওয়াহাবের সাথে মক্কা পৌছেন এবং

কিছুদিন পর অনেক মক্কী সাহাবী (রাঃ)-এর সাথে ফিরে আসেন। এ ভিত্তিতে সকল সাহাবী মুহাজিরী আনসারী উপাধিতে খ্যাত হয়েছিলেন।

মক্কা থেকে হিজরাতের পর বিশ্ব নবী (সাঃ) কিছু দিন কুবায় অবস্থান করেন। অতপর বিশ্বনবী (সাঃ) একটি নির্দিষ্ট দিনে মদীনায় প্রবেশ করেন। অতপর তিনি (সাঃ) একটি নির্দিষ্ট দিনে মদীনায় প্রবেশ করেন। মদীনার ইতিহাসে দিনটি সবচেয়ে স্মরণীয় দিন ছিল। মদীনার আনসাররা প্রাণভরা উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে রাসূল (সাঃ)-কে স্বাগত জানালে- এবং প্রকৃত অর্থে নিজেদের মন-প্রাণকে রাসূল (সাঃ)-এর নিকট সঁপে দিলেন। হুযুর (সাঃ) বনু বিয়াজার মহল্লা অতিক্রম করছিলেন। এ সময় হযরত যিয়াদ (রাঃ) বিন ফরদ মুবারকবাদ জ্ঞাপন এবং অবস্থানের জন্য নিজের বাড়ী পেশ করলেন। কিন্তু ভাগ্য নিয়ন্তা এ সম্মানের জন্য হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ)-এর গৃহ নির্বাচিত করে রেখেছিলেন। এ জন্য হুযুর (সাঃ) তাঁকে বললেন, "আমার উটনীকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দাও। সে হুকুমের দাস। আল্লাহর তরফ থেকে নিজেই মনযিল তালাশ করে নেবে।"

রাসূলে করিম (সাঃ) মদীনায় স্থায়ীভাবে অবস্থানের পর হযরত যিয়াদ (রাঃ) বিন লবিদ প্রায় সময়ই নবীজি (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত থাকতেন এবং খুব করে ফয়েজ লাভ করতেন। এভাবে তিনি সম্মানিত সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হতে থাকলেন। তিরমিজী শরীফে বর্ণিত আছে যে, একবার প্রিয় নবী (সাঃ) তাকে বললেন, এখন ইলম উঠে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। হযরত যিয়াদ (রাঃ) নবী (সাঃ)-এর এত সান্নিধ্য অর্জন করছিলেন যে, তিনি নির্দ্বিধায় কথাবার্তা বলতেন। তিনি আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! এখনতো ইলম মানুষের শিরা-উপশিরায় পৌঁছে গেছে। তা উঠে যাওয়ার সময় আবার কি করে এলো? হুযুর (সাঃ) তাঁর এ বক্তব্যকে কম বুদ্ধির কথা বলে মনে করলেন এবং কিছুটা কঠিন ভাষায় বললেনঃ

"হে যিয়াদ! তোমার মাতা তোমার ওপর ক্রন্দন করুক। আমি তোমাকে খুব বিজ্ঞ মানুষ মনে করতাম। তোমার কি দৃষ্টিগোচর হয় না যে, ইহুদী এবং খৃষ্টানরা তাওরাত এবং ইঞ্জিল অধ্যয়ন করে থাকে। কিন্তু তা থেকে কোন ফায়দা গ্রহণ করে না।

হযরত যিয়াদ (রাঃ) এ কথায় কেঁপে উঠলেন এবং আরজ করলেন, ঃ হে আল্লাহ রাসূল ! অবশ্যই আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আপনি সঠিক কথা বলেছেন।

আল্লাহর পথে জিহাদে যিয়াদ (রাঃ)-এর খুব আগ্রহ ছিল। তিনি বদর ওহুদ, খন্দক এবং রাসূল (সাঃ)-এর যুগে সংঘটিত অন্যান্য যুদ্ধেও হুযুর (সাঃ)-এর সাথী হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

নবম হিজরীর মুহাররাম মাসে রাসূলে করিম (সাঃ) ছাদকা এবং যাকাত আদায়ের জন্য পৃথক পৃথক আদায়কারী নিয়োগ করলেন। এ সময় হযরত যিয়াদ (রাঃ) বিন যবিদকে হাজরা মাওতের আদায়কারী হিসেবে নিয়োগ করলেন এবং সে সাথে সেখানকার রাজস্ব আদায়কারী হিসেবে নিয়োগ পেলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শুধু সে ব্যক্তিকেই কোন পদ দিতেন যে সে পদের আকাংখা করতো না এবং সে দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালনের যোগ্য হতেন। হুযুর (সাঃ)-এর নির্ধারিত এ মাপকাঠির আলোকে হযরত যিয়াদ (রাঃ)-এর ব্যক্তিত্ব এবং যোগ্যতা সহজেই অনুমান করা যায়।

রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর ধর্মত্যাগের এক হিড়িক পড়ে গেল। এ সময় ইয়েমেনের এক বিরাট সংখ্যক মানুষ ফিতনার শিকার হলো। এবং যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানালো। খলিফাতুর রাসূল (সাঃ) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) হযরত মুহাজির (রাঃ) বিন উমাইয়াকে নাজরান, কুন্দাহ এবং হাজরে মাওতের মুরতাদদের উৎখাতের কাজে নিয়োজিত করলেন। হযরত যিয়াদ (রাঃ)-কেও সহযোগিতা করার জন্য পত্র লিখলেন। হযরত মুহাজির (রাঃ) বিন উমাইয়া নাজরান এবং ছালায়র মুরতাদদের উৎখাত করে কুন্দাইর দিকে অগ্রসর হলেন। মারবি ও হাজরা মাওতের মধ্যবর্তী স্থানে পৌছার পর হযরত যিয়াদ (রাঃ) পত্র পেলেন। পত্র খুব তাড়াতাড়ি কুন্দাহার ওপর হামলার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এ পত্র পেয়েই হযরত মুহাজির (রাঃ) দ্রুত অগ্রসর হয়ে হযরত যিয়াদ (রাঃ)-এর নিকট পৌছলেন। কুন্দাহতে চারটি দুর্গ ছিল। এ সকল দুর্গকে মাহজার বলা হতো। কুন্দাহবাসীর সরদার অথবা বাদশা আশয়াছ বিন কায়েস যবরকান দুর্গে থাকতো। হযরত মুহাজির (রাঃ) ও হযরত যিয়াদ (রাঃ) যবরকানের ওপর হামলা করলেন। মুরতাদরা হামলা বরদাশত করতে না পেরে পালিয়ে নাজির নামক দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিল। হযরত মুহাজির (রাঃ) এবং হযরত যিয়াদ অত্যন্ত কঠোরভাবে দুর্গটি অবরোধ করলেন। এ অবরোধে আশয়াছের নাভিশ্বাস উঠলো। উপায়ান্তর না দেখে সে হযরত যিয়াদ (রাঃ)-কে পয়গাম পাঠিয়ে বললো যে, এত লোককে নিরাপত্তা দিলে সে দুর্গ তার হাতে ন্যস্ত করবে। হযরত যিয়াদ (রাঃ) এ প্রস্তাব মেনে নিলেন এবং চুক্তি লিখিতভাবে আনার জন্য আশয়াছকে বলে পাঠালেন। সে চুক্তি লিপিবদ্ধ করে আনলো। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত যিয়াদ (রাঃ) তাতে সিল মোহর লাগিয়ে দিলেন। এরপর আশয়াছ দুর্গের দরজা খুলে দিল। মুরতাদদের একটি দল

মুসলমানদের মুকাবিলা করলো। কিন্তু তাদের বেশীর ভাগই মারা গেল। এবং অবশিষ্টদের মুসলমানরা গ্রেফতার করলো। চুক্তিনামা দেখা হলো। কিন্তু তাতে আশয়াছ বিন কায়েছের নাম ছিল না। ঘাবড়ে গিয়ে নিজের নাম লিখতে ভুলে গিয়েছিল। এ জন্য তাকেও অন্যান্য কয়েদীর সাথে মদীনা পাঠিয়ে দেয়া হলো। সেখানে সে তওবাহ করে। দ্বিতীয়বার ইসলাম গ্রহণ করে। অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত যিয়াদ (রাঃ) রক্তাক্ত যুদ্ধের মাধ্যমে মুরতাদদের ওপর বিজয় লাভ করেছিলেন এবং আশয়াছ বিন কায়েসকে গ্রেফতার করে আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যা হোক, হযরত যিয়াদ (রাঃ) মুরতাদের উৎখাতের ব্যাপারে কোন শৈথিল্য প্রদর্শন করেননি। সিদ্দিকে আকবর (রাঃ)-এর পর হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-ও নিজের শাসনকালে হযরত যিয়াদ (রাঃ)-কে হাজরে মাওতের ইমারাতের দায়িত্বে নিয়োজিত রাখেন। এ পদ থেকে পদচ্যুতির পর তিনি কূফা অথবা সিরিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং সেখানেই ৪১ হিজরীতে ওফাত পান।

হযরত যিয়াদ (রাঃ) বিন লবিদ থেকে কতিপয় হাদীস বর্ণিত আছে। এ সকল হাদীস আওফ বিন মালিক, সামিল বিন আবিল জায়াদান (রঃ) এবং জোবায়ের বিন নুফায়ের (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

* * *

হযরত হাস্‌সান (রাঃ) বিন সাবিত আনসারী

জাহেলী যুগে আরবরা ছিল উম্মি। উম্মি হওয়া সত্ত্বেও তাদের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। এ সব বৈশিষ্ট্যের কারণে অনেক জাতির ওপর তাদের প্রাধান্য ছিল। আরব জাতি ছিল মূর্খ, অভদ্র এবং অশিষ্ট। কিন্তু ভাষার অলংকরণ এবং বাকপটুতার দিক দিয়ে এ জাতি ছিল অদ্বিতীয়। সম্ভাষণ ও কাব্যের ক্ষেত্রে তাদের গৌরব ছিল শীর্ষে। এ কারণেই তারা অন্য জাতিকে আজাম বা বোবা হিসেবে আখ্যায়িত করতো। প্রত্যেক গোত্রের কবি স্বগোত্রের মর্যাদা ও প্রশংসার নিশান বরদার- ঝাণ্ডাবাহী ছিলেন। তারা শক্তিশালী বর্ণনার মধ্য দিয়ে যাকে চেতো মর্যাদার তুঙ্গে তুলতো এবং যাকে চেতো দুর্নামের ভাগাড়ে নিপতিত করতো। পসন্দ-অপসন্দ ছাড়াও কবিকুল নিজেদের কাব্যকে জাতীয় ও রাজনৈতিক প্রয়োজনেও ব্যবহার করতেন। গোত্রসমূহের মান-সম্মান ও সম্ভ্রম এবং শাসকদের ইজ্জত তাদের হাতেই ছিল। এ জন্যেই বড় বড় সরদার তাদের সামনে নিশ্চুপ এবং শাসকরাও তাদের ভয়ে ভীত থাকতেন। যখন তারা কারোর প্রশংসা অথবা বিদ্রূপে কবিতা রচনা করতো তখন তা বিদ্যুৎ বেগে সারা আরবে ছড়িয়ে পড়তো এবং তা নির্বিশেষে সকলের মুখে মুখে ফিরতো। আরবদের এ চরিত্র এবং বিরান ভূমির মধ্যে মুহাম্মাদে আরাবী (সাঃ) আবির্ভূত হলেন। তাঁর তাওহীদের দাওয়াতের জবাব মক্কার মুশরিকরা যেভাবে দিয়েছিল তারই ফলশ্রুতিতে তিনি নিজের ঘর-বাড়ী এবং প্রিয় স্বদেশ ভূমিকে পরিত্যাগ করে মদীনা মুনাওয়ারাহ গমন করেন। তাতেও মুশরিকদের অন্তর ঠাণ্ডা হলো না। তাদের কবিরা বিশ্বনবী (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের বিদ্রূপে কবিতা রচনা করে সমগ্র আরবে ছড়াতে শুরু করলো। এ কবিতাবলী কয়েকদিনের মধ্যেই হাজার হাজার মাইল দূর পর্যন্ত পৌঁছে যেত। মক্কা থেকে মদীনার দূরত্ব ছিলতো মাত্র তিনশ' মাইল। মুসলমানদের নিকট যখন এ সব কবিতা পৌঁছতে লাগলো তখন তাঁরা অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তাঁরা হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুকে মক্কার কবিদের বিদ্রূপের জবাব দানের জন্যে অনুরোধ জানালেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যদি অনুমতি দেন

তাহলে তিনি তা করতে পারেন। তাঁর জবাব শুনে সাহাবারা (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর নিকট আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। মুশরিক কবিরা আপনার এবং আপনার জন্য জীবন উৎসর্গকারীদের বিদ্রূপ করে কবিতা রচনা করছে এবং তা সমগ্র আরবে প্রচার করছে। আপনি নির্দেশ দিলে হযরত আলী (রাঃ) এ অশ্লীল কথনের জবাব দিতে পারে।"

নবী করিম (সাঃ) বললেন ঃ "আলী এ কাজের উপযুক্ত নয়।"

অতপর তিনি আনসারদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেনঃ "যাঁরা তলোয়ার দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন, তাঁরা কি ভাষা দিয়ে এ বিদ্রূপের বাধা দিতে পারেন না?"

হুযুর (সাঃ)-এর এ ইরশাদ শুনে বয়স্ক একজন আনসার সাহাবী উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজের জিহবা বের করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দেখালেন। অতপর অত্যন্ত উৎসাহের সাথে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! এ কাজের জন্যে আমি হাজির! আল্লাহর কসম! রিসালাতের শত্রুদের কথার জবাবে বসরা, সিরিয়া এবং ইয়েমেনে আমার নিকট অন্য কোন কথাই প্রিয় নয়।"

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ "আমি যে বংশ থেকে স্বয়ং উদ্ভূত সে বংশের লোকদের বিদ্রূপ তুমি কিভাবে করবে।"

তিনি আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর সত্য রাসূল ! তাদের মধ্য থেকে আপনাকে এ ভাবে পৃথক করবো যেভাবে আটার স্তূপ থেকে চুল বের করা হয়।"

নবী করিম (সাঃ) ঐ ব্যক্তির দিকে সুদৃষ্টিতে চাইলেন এবং তাঁর ওপর মুশরিকদের বিদ্রূপের জবাব দানের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। অতপর দেখা গেল যে, সে ব্যক্তি নিজের শক্তিশালী কথা দিয়ে একদিকে মুশরিক কবিদের জবান বন্ধ করে দিয়েছেন, অন্যদিকে প্রিয় নবী (সাঃ)-এর প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করে নিজের সকল শক্তি নিঃশেষ করে দিয়েছেন। এ সাহাবী যিনি নবী (সাঃ)-এর দরবারে সবচেয়ে বড় কবি হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত হাসসান (রাঃ) বিন সাবিত আনসারী।

খাযরাজ গোত্রের প্রসিদ্ধ শাখা বনু নাজ্জারের সাথে সাইয়েদেনা হযরত হাস্সান (রাঃ) বিন সাবিতের সম্পর্ক ছিল। তাঁর বংশ তালিকা নিম্নরূপ ঃ

হাসসান (রাঃ) বিন সাবিত বিন মানযার বিন হারাম বিন আমর বিন যায়েদ মানাত বিন আদি বিন আমর বিন মালিক বিন নাজ্জার বিন সায়ালাবা বিন আমর বিন খাযরাজ।

তাঁর মশহুর উপাধি ছিল আবুল ওয়ালি। আসমাউর রিজাল গ্রন্থসমূহে তাঁর উপাধি হিসেবে আবুল হিছাম এবং আবু আবদুর রহমানও পাওয়া যায়। 'রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কবি' ছিল তাঁর পদবী। মায়ের নাম ছিল ফারিয়াহ বিনতে খালেদ। তিনি খাযরাজ বংশের বনু সায়েদাহর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং খাযরাজ নেতা হযরত সায়াদ (রাঃ) বিন উবাদাহ'র ফুফার কন্যা ছিলেন। বংশ তালিকা হলো ঃ ফারিয়াহ (রাঃ) বিনতে খালেদ বিন খানিস বিন লাওজান বিন আবদুদ বিন যায়েদ বিন ছায়ালাবা বিন খাযরাজ বিন কায়াব বিন সায়েদাহ। তাঁরও ইসলাম গ্রহণ এবং সাহাবীয়াহ হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল।

কাব্য এবং কবির সাথে সম্পর্কযুক্ত বংশে হযরত হাস্সান (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দীর্ঘায়ু লাভ প্রশ্নেও বংশটির খ্যাতি ছিল। হযরত হাস্সান (রাঃ)-এর পরদাদা হারাম বিন আমরের ১২০ বছর বয়স হয়েছিল। তাঁর দাদা মানযারের বয়সও ১২০ বছর ছিল। পিতা সাবিতও ১২০ বছর জীবিত ছিলেন। স্বয়ং হযরত হাস্সান (রাঃ)-ও এ আয়ুই পেয়েছিলেন। মাবরাদ নাহুবী বর্ণনা করেছেন, হযরত হাসসান (রাঃ)-এর বংশের কয়েক পুরুষই কবি ছিল। তাঁর পরদাদা, দাদা, পিতা, পুত্র এবং নাতিও কবি ছিলেন। তাঁর কবিত্বের কথা বলতে গেলে-তিনি ছিলেন সমকালীন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। কাব্যের প্রখ্যাত সমালোচক আবু ওবায়দাহ (রাঃ) বলেছেন, তিনটি বৈশিষ্ট্য হযরত হাসসান (রাঃ)কেঅন্যান্য কবি থেকে পৃথক করেছে ঃ

১. জাহেলী যুগে তিনি খাযরাজের [মদীনাবাসী] কবি ছিলেন।
২. রাসূলের যুগে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কবি ছিলেন।
৩. ইসলাম প্রচারের যুগে তিনি সমগ্র ইয়েমেনের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন।

আবু ওবায়দাহ (রাঃ) বলেছেন, সর্বসম্মত মত হলো মরু প্রান্তরের বাসিন্দার মধ্যে মদীনাবাসী, অতপর আবদুল কায়েস এবং তারপর বনু ছাকিফের কাব্য উত্তম। আর মদীনাবাসীর সবচেয়ে বড় কবি হলেন হাস্সান (রাঃ)।

হযরত হাসসান (রাঃ)-এর পিতা ও পিতামহ স্বগোত্রের সরদার ছিলেন। মসজিদে নববীর পশ্চিম দিকে বাবুর রাহমাতের সামনে অবস্থিত ফারে দুর্গে তাঁদের বাসস্থান ছিল।

হযরত হাসসান (রাঃ) হিজরাতে নববী (সাঃ)-এর ৬০/৬৫ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং নবী (সাঃ)-এর হিজরাতের সময় ৬০/৬৫ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি জীবনের যতটুকু অংশ জাহেলী যুগে কাটিয়েছিলেন প্রায় ততটুকুই ইসলাম গ্রহণের পর জীবিত ছিলেন। ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণের পূর্বে তিনি সমগ্র আরবে নিজের কবিত্বের ভিত্তি মজবুত করেছিলেন এবং আরবের প্রতিটি শিশুও তাঁকে শক্তিশালী কবি হিসেবে জানতো।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত হাসসান (রাঃ)-এর দিন-রাত কেমন ভাবে কাটতো? বিভিন্ন ঐতিহাসিকের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, আপাদমস্তক তিনি কাব্যে বিভোর থাকতেন, আওস এবং খাযরাজের পারস্পরিক যুদ্ধে তিনি নিজের গোত্রের প্রশংসায় শক্তিশালী কবিতা রচনা করতেন এবং তাদেরকে প্রতিশোধমূলক তৎপরতায় উদ্বুদ্ধ করতেন। লড়াই থেকে ফুসরত পেলে হায়রাহ ও গাসসানের বাদশাহর দরবারে চলে যেতেন এবং তাদের প্রশংসায় শক্তিশালী কাসিদাহ রচনা করে পুরস্কার লাভ করতেন। গাসসানের বাদশাহর প্রশংসায় রচিত তাঁর কবিতাঃ

> তিনি এমন দানশীল যে, তাঁর কাছে সব সময় মেহমানের আগমন ঘটে। তাঁর কুকুর অচেনা লোকের আগমনে ঘেউ ঘেউ করে না। [অর্থ হলো, তাঁর কাছে এত অধিক সংখ্যক মেহমানের আগমন ঘটে যে, তাঁর কুকুর তা মেনে নিয়েছে এবং অতে ঘেউ ঘেউ করে না] এবং স্বয়ং তিনি কাউকে জিজ্ঞেসও করেন না যে, সে কে, কোথা থেকে এসেছে এবং কেনই বা এসেছে। এ গৌরাঙ্গ চেহারার অভিজাত ব্যক্তিটি পেছনের লোকদের মধ্যে লম্বা নাক বিশিষ্ট।

আরববাসী রাজা-বাদশাহদের প্রশংসাকে অত্যন্ত নীচুমানের কাজ মনে করতো। শুধুমাত্র বড় বড় পুরস্কারের আশায়ই হযরত হাসসান (রাঃ) গাসসানের বাদশাহ অথবা জাফনার বংশধরদের প্রশংসা করতেন না বরং তাঁরা তাঁর পিতামহের কুলের ছিলেন বলেই তাঁদের প্রশস্তি গাইতেন। তাঁদের প্রশস্তিকে তিনি নিজের গোত্রের প্রশস্তি মনে করতেন। নিজের গোত্রের প্রশস্তি এবং পিতা ও পিতামহের ব্যাপারে গৌরব করা প্রত্যেক আরব কবিই নিজের হক বলে ধারণা করতেন। হযরত হাসসান (রাঃ)-এর গোত্র খাযরাজ 'ইজদের' একটি শাখা ছিল। বংশনামার বিশেষজ্ঞদের নিকট 'ইজদ' বনু কাহতানভুক্ত। তাদের প্রকৃত দেশ ছিল ইয়েমেন। হযরত হাসসান (রাঃ)-এর বংশনামা

একদিকে গাসাসিনাহ অথবা আলে জাফনা পর্যন্ত পৌঁছে থাকে। তাঁরা সিরিয়ার গাস্সানী শাসক ছিলেন। অন্যদিকে লাখমিইয়ীন বংশের সাথে তাঁর বংশের সম্পর্ক ছিল। তাঁরা আরবের ইরাকের হিরার বাদশাহ ছিলেন। কেননা তাঁদের সবার পূর্বপুরুষ ছিলেন আমার মজিকিয়া বিন আমের বিন মাযুনসামা। আমর মজিকিয়ার এক পুত্র জাফনা সিরিয়ার প্রথম বাদশা ছিলেন। তাঁর বংশের কম-বেশী ১৯ জন বাদশাহ হয়েছিলেন। তাঁর নামের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণেই গাসাসিনাহকে জাফনার বংশধরও বলা হয়। হযরত হাস্সান (রাঃ) আলে জাফনার প্রশস্তি অত্যন্ত জোরালো ভাষায় বর্ণনা করতেনঃ

> "জাফনার সন্তান-সন্ততি নিজের পিতা ইবনে মাবিয়ার কবরের চারপাশে থাকে। যিনি অত্যন্ত দানশীল ও উদার ছিলেন।
> এর অর্থ হলো জাফনার বংশধারা আরবের অন্যান্য গোত্রের মত যাযাবর নয়। বরং তারা বাদশাহর গোত্র এবং নিবিড়ভাবে নিজের পিতার কবরের চার পাশে অবস্থান করে। তাদের আবাসস্থল সবুজের সমারোহে ভরপুর। মরুভূমির মাটি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।"

নিজের বংশের শরাফতের ওপর হযরত হাস্সান (রাঃ)-এর বড় গৌরব ছিল। একবার জনৈক কবি তাঁর সামনে নিজের বাপ-দাদার প্রশংসায় কবিতার কতিপয় চরণ পড়লেন। এ কবিতায় অন্যের বংশের প্রাধান্য দেয়া হয়েছিল। হযরত হাস্সান (রাঃ) তার জবাবে বললেনঃ

> "তুমি কি জান না যে, আমরা আমর বিন আমরের বংশধর। আমাদের এমন এক বংশীয় গৌরব রয়েছে যা প্রত্যেক মর্যাদাবান লোকের চেয়েও বেশী মর্যাদাশালী। আমাদের বংশের শিকড় জমিনের একদম তলদেশে প্রোথিত। অতপর তা থেকে এমন শাখাসমূহ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে যা প্রত্যেক সিতারার মুকাবিলা করে থাকে। আমাদের মধ্যে অব্যাহতভাবে বাদশাহ এবং যুবরাজ জন্মগ্রহণ করে থাকে। আমরা যেন পূর্বদিকে উদিত প্রজ্বলিত তারকা। এ তারকামণ্ডলীর কোন একটি যখন অদৃশ্য হয় তখন অন্য একটি দৃশ্যমান হয় এবং তা বিশ্বে অব্যাহতভাবে আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরণ করতে থাকে।

বর্তমান যুগের কিছু বিশেষজ্ঞ খাযরাজ এবং আওসকে [আনসারী] নাবত বিন ইসমাইলের বংশধর হিসেবে প্রমাণিত করেছেন। [অর্থাৎ কাহতানী নয় বরং আদনানী]। কিন্তু হযরত হাস্সান (রাঃ)-এর যুগে তাঁদেরকে কাহতানীই মনে করা হতো।

জাহেলী যুগে হযরত হাস্সান (রাঃ) ও অন্যান্য কবির মত মদাসক্ত ছিলেন। একবার তিনি সিরিয়া গেলেন। সেখানে বনি বকর বিন ওয়ালের প্রখ্যাত কবি আ'শার সাথে সাক্ষাৎ হলো। দু'জনে মিলে এক মদের দোকানে গেলেন ঘুমিয়ে পড়লেন এবং খুব গিললেন। এরপর হাস্সান (রাঃ) সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লেন। চোখ খুলে আশা'কে মদের দোকানদারকে বলতে শুনলেন, 'তার ঋণ করার প্রয়োজন হতো না, কিন্তু তার কাছে অর্থ নেই।' এ কথা শুনেই তিনি চক্ষু বন্ধ করলেন এবং দৃশ্যতঃ শুয়ে রইলেন। ইত্যবসরে আ'শার চোখ বুঁজে এলো। যখন দেখলেন যে, সে ঘুমিয়ে গেছে তখন তিনি চুপি চুপি উঠলেন এবং দোকানে যত মদ ছিল সব কিনে নিলেন ও তা মাটিতে ঢালতে লাগলেন। এ মদ গড়িয়ে গড়িয়ে আ'শার গায়ের নীচে পৌছলো। তার কাপড় ভিজে গেল। আ'শা চমকে ঘুম থেকে জাগলো। হাস্সান (রাঃ)-কে সরাবের নহর বহানো দেখে বুঝে ফেললেন যে, তিনি তার কথা শুনে ফেলেছেন। অনেক তোষামোদ ও ওজর আপত্তি পেশ করলো। হযরত হাস্সান (রাঃ) আকো উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন এবং নিজের দৃঢ়চিত্ততা ও উঁচু মর্যাদা সম্পর্কে অত্যন্ত শক্তিশালী কবিতা প্রকাশ্যতঃ আশা'কে শুনিয়ে দিলেন। সে একদম নিশ্চুপ হয়ে গেল। [ইসলাম গ্রহণের পর হযরত হাস্সান কখনো মদ স্পর্শ পর্যন্ত করেননি]।

একবার উকাজের বাজারে নাবিগাহ জবিয়ানির সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তৎকালীন যুগে তিনি প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। সে সময় তিনি হযরত খানসা (রাঃ)-এর কবিতা শুনছিলেন। খানসা (রাঃ) সে যুগে নজীর বিহীন মহিলা কবি ছিলেন এবং মর্সিয়া রচনায় বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিনি চলে গেলে হযরত হাস্সান (রাঃ) নাবিগাহকে নিজের কবিতা শুনাতে শুরু করলেন। তাঁর কবিতা শুনে নাবিগার মুখ দিয়ে অযাচিতভাবে বেরিয়ে এলঃ ইন্নাকা লা শায়েরুন (নিঃসন্দেহে তুমি কবি)।

অন্য এক বর্ণনা মতে তিনি এ বাক্য ব্যবহার করেছিলেন, 'তুমি কবি এবং আগে আগত বনি সুলাইমের বোন গোনসা (রাঃ) মর্সিয়া রচনাকারী।'

একদিন রাস্তার মাথায় বসে কয়েকজন বন্ধুকে নিজের কবিতা শুনাচ্ছিলেন। এ সময় জাহেলী যুগের নামকরা কবি হাতিয়াহ সেখান দিয়ে গমন করছিলেন। তিনিও দাঁড়িয়ে তাঁর কবিতা শুনতে লাগলেন। হাস্সান (রাঃ) তাঁকে চিনতেন না। ভাবলেন কোন গ্রাম্য গোঁয়ার। বললেন, এ বন্ধু কি শুনছিস? তিনি বলেন, 'এতে কোন অসুবিধেতো দেখছিনে।'

এ জবাব তিনি এত কেপরোয়াভাবে দিয়েছিলেন যে, হযরত হাস্সান (রাঃ) আরো অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন এবং বললেন, 'তোর পদবী কি?'

তিনি বললেন, 'আবু লামিকাহ'।

হাস্সান বললেন, 'মহিলার নামে নিজের কুনিয়ত রেখেছিস। এর চেয়ে জিল্লতীর বিষয় আর কি হতে পারে।'

এরপর জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর নাম কি?'

তিনি বললেন, 'হাতিয়াহ।'

নাম শুনে চিনতে পারলেন এবং চমকে উঠলেন, কিন্তু জাহেলী যুগের ঢংয়ে বললেন, 'তাহলে আপনি যেতে পারেন। খোদা হাফেজ।
তিনি চুপচাপ চলে গেলেন।

এ হাতিয়াহ হযরত হাস্সান (রাঃ)-এর পূর্ণ কবিত্বের স্বীকৃতি প্রদানকারী ছিলেন। তিনি তাঁকে 'আশ্আরুল আরব' [আরবের সবচেয়ে বড় কবি] বলতেন।

সংক্ষিপ্ত কথা হলো জাহেলী যুগেই হযরত হাস্সান [রাঃ] বিন সাবিত আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে পরিগণিত হন। কিন্তু জাহেলী যুগের কবিত্ব তাঁর গৌরবের বিষয় নয়। স্বয়ং ইসলাম গ্রহণের পর তিনি যে কাব্য রচনা করেন তা-ই হকপন্থীদের অন্তরের আওয়াজ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

হযরত হাস্সান (রাঃ) বিন সাবিত কবিতা ও সাহিত্যের পরিভাষায় উভয় যুগের কবি। অর্থাৎ তিনি এমন কবি যিনি জাহেলী যুগও পেয়েছেন আবার ইসলামের যুগও। ইসলাম গ্রহণের সময় বার্ধক্য এসে পড়েছিল। কিন্তু অন্যভাবে তাঁর কবিত্ব যৌবনপ্রাপ্ত হয়। এখন তিনি জাহেলী যুগের মৌলিকতা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে ওঠেন। রাসূল (সাঃ)-এর যুগে মুখ দিয়ে জিহাদই হলো হযরত হাস্সান (রাঃ)-এর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। একদিকে তিনি হকের শত্রু মুশরিক কবিদের অশ্লীল কথনের এমন দাঁত ভাঙা জবাব দিয়েছিলেন যে, তারা নীরব হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে বিশ্বনেতা হযরত রাসূলুল্লা (সাঃ)-এর প্রশংসায় এমন উদ্দীপনা ও নিষ্ঠাপূর্ণ বাক্য রচনা করেন যে, সৃষ্টির প্রতিটি অণু পরমাণু উদ্বেলিত হয়ে ওঠে এবং সকল পূত-পবিত্র আত্মা তার ওপর সুখ্যাতির পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করেন।

হাফেয ইবনে হাজর আসকালানী (রাঃ) 'তাহজীবুত তাহজীব' গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)-এর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। এ বর্ণনায় বলা হয়েছে

যে, 'হযরত হাসসান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে থেকে নিজের নফস এবং জবান দিয়ে জিহাদ করেছেন।'

এ বর্ণনায় স্পষ্ট হয় যে, হযরত হাস্সান (রাঃ) রাসূল (সাঃ) কৃত যুদ্ধসমূহে শরীক হয়ে তরবারী দিয়ে জিহাদও করেছেন। কিন্তু নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা এ মতের বিরুদ্ধাচারণ করেছেন। তাঁরা বলেন, হযরত হাস্সান (রাঃ) প্রকৃতিগতভাবে (অন্তরের দিক দিয়ে) দুর্বল ছিলেন। এ জন্যে কোন যুদ্ধে শরীক হয়ে তরবারী দিয়ে যুদ্ধ করতে পারেননি। বাস্তবিকই তিনি যদি যুদ্ধ মসূহে নিজের তরবারীর নিপুণতা না দেখিয়ে থাকেন তাহলে সেটা ছিল তার অক্ষমতা। এটা তাঁর বুজদিলী নয়। এটাই আমাদের মত। ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স ৬০ বছরের বেশী ছিল। দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। অবশেষে অন্ধই হয়ে গিয়েছিলেন। এ জন্যে আমাদেরকে সুধারণা পোষণ করতে হবে। আমাদেরকে মনে করতে হবে যে, তিনি বার্ধক্য এবং ক্ষীণ দৃষ্টির কারণে যুদ্ধে বাস্তবত অংশ গ্রহণে অক্ষম ছিলেন। এর ক্ষতিপূরণ তিনি ন্যায়ের প্রতি সমর্থন, হক পন্থীদের সুরক্ষা এবং রাসূল (সাঃ) প্রশস্তির মাধ্যমে করেছিলেন। অন্য কথায় হযরত হাস্সান (রাঃ) নবী (সাঃ)-এর যুগের যুদ্ধ সমূহে অবশ্যই শরীক হয়েছিলেন। কিন্তু তাতে তরবারী ধারণের পরিবর্তে ভাষায় তরবারী দিয়ে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

ইবনে আসির (রঃ) আহযাব যুদ্ধ প্রসঙ্গে (৫ হিজরী) হযরত হাস্সান (রাঃ)-এর ব্যাপারে এক হৃদয়গ্রাহী ঘটনার অবতারণা করেছেন। এ যুদ্ধে সমগ্র আরবের মুশরিক ও ইহুদী ঐক্যবদ্ধ হয়ে মদীনা মুনাওয়ারার ওপর হামলা করে বসে এবং বিশেষ করে মদীনার অভ্যন্তরস্থ ইহুদী বনি কোরায়জাহ গোত্র বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্যে এক পায়ে দাঁড়িয়েছিল। মুসলমানদের জন্যে এটা ছিল এক অগ্নি পরীক্ষা। কিন্তু আল্লাহর এ পবিত্র বান্দাদের দৃঢ়তা ও স্থিরতা এক মুহূর্তের জন্যেও এদিক ওদিক হয়নি-টলেনি। তারা কুফর ও শিরকের এ ভয়াবহ সংঘর্ষে আপাদমস্তক কাঁপিয়ে পড়লেন। এ সময় হুযুর (সাঃ) মুসলমান মহিলা এবং শিশুদেরকে বনি কোরায়জাহর কপট ইহুদীদের হাত থেকে রক্ষার জন্যে 'ফারে' দুর্গে স্থানান্তর করলেন। এ দুর্গ ছিল হযরত হাস্সান (রাঃ)-এর খানদানের আবাসগৃহ। তিনি সতর্কতা হিসেবে মহিলা ও শিশুদের দেখাশুনার জন্যে হযরত হাস্সান (রাঃ)-কে দুর্গে রেখেছিলেন। কেননা ইহুদী বনি কোরায়জাহ এবং 'ফারে' দুর্গের মধ্যবর্তী স্থানে মুসলমানদের কোন বাহিনী ছিল না। সে ভয়াবহ সময়ে একদিন এক ইহুদী দুর্গের দিকে এলো এবং দুর্গে অবস্থানরত মানুষের খোঁজ খবর নিতে লাগলো। হুযুর (সাঃ)-এর ফুফু হযরত সুফিয়াহ (রাঃ) বিনতে আবদুল মুত্তালিবও এ যুদ্ধে ছিলেন। তিনি ইহুদীটিকে গোয়েন্দা তৎপরতায় লিপ্ত দেখলেন এবং হযরত হাস্সান (রাঃ)-কে বাইরে গিয়ে তাকে হত্যা করার কথা বললেন। হযরত হাস্সান (রাঃ) বললেন, আবদুল মুত্তালিবের কন্যা!

আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনি অবগত আছেন যে, আমি এ ইহুদীর সাথে লড়াইয়ের যোগ্য নই।

হযরত সুফিয়াহ (রাঃ অত্যন্ত বাহাদুর মহিলা ছিলেন। তিনি হযরত হাস্সান (রাঃ)-এর জবাব শুনে নিজেই উঠে দাঁড়ালেন। তাঁবুর একটি খুঁটি উঠিয়ে নিলেন এবং বাইরে বেরিয়ে সে ইহুদীর মাথায় এমন জোরে আঘাত হানলেন যে, সে সেখানেই অক্কা পেলো। ফিরে এসে হযরত হাস্সান (রাঃ)-কে বললেন, এখন গিয়ে ইহুদীর মাথা কেটে ফেলুন এবং তার সরঞ্জাম নিয়ে আসুন।

হযরত হাস্সান (রাঃ) বললেন, 'হে আবদুল মুত্তালিবের কন্যা! তার সরঞ্জামের আমার কি প্রয়োজন? (অথবা আমার তা লাভের খাহেস নেই)।

বনু মুসতালিকের যুদ্ধ (৫ম হিজরী) থেকে ফেরার পথে ইফকের দুঃখজনক ঘটনা ঘটলো। মুনাফিকরা উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে তোহমত বা মিথ্যা অপবাদ দিল।

মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল এ ঘটনায় সবার অগ্রগামী ছিল। এ সময় হযরত হাস্সান (রাঃ)-এর কিছুটা পদস্খলন হয়। তিনি দু'একজন মুসলমানের সাথে মুনাফিকদের প্রতারণার জালে আবদ্ধ হন এবং তাদের কথার সাথে সুর মেলান। আল্লাহ তায়ালা উম্মুল মুমিনীন (রাঃ)-এর পবিত্রতা সম্পর্কিত ঘোষণা দানের পর নবী করীম (সাঃ) প্রতারিত মুসলমানদের ওপর কুরআন নির্দেশিত শাস্তির বিধান কার্যকর করেন। দণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে হযরত হাস্সান (রাঃ)-ও ছিলেন। মুনাফিকরা উম্মুল মুমিনীনের সাথে একজন অত্যন্ত মুখলিস ও পবিত্র সাহাবী হযরত সাফওয়ান (রাঃ) বিন মুয়াত্তালকেও জড়িত করে। তিনি এ অপবাদের জন্যে আবেগের বশবর্তী হয়ে হযরত হাস্সান (রাঃ)-এর ওপর তরবারী চালিয়ে দিয়েছিলেন।

ইবনে আসীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন, এ ঘটনার পর হযরত হাসসান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারে হযরত সাফওয়ান (রাঃ) বিন মুয়াত্তালের বিরুদ্ধে শিকায়েত করলেন। প্রিয়নবী (সাঃ) তার কিসাসে হযরত হাস্সান (রাঃ)-কে খেজুরের একটি বাগান প্রদান করালেন এবং তিনি সেখানে আবাসস্থান তৈরী করেছিলেন। কিন্তু সহীহ বুখারীর এক রাওয়ায়েতে দেখা যায় যে, যখন হযরত হাস্সান (রাঃ)-এর এক নিকটাত্মীয় হযরত আবু তালহা আনসারী (রাঃ) (বনু নাজ্জারের একজন নেতা) নিজের মূল্যবান সম্পত্তি

বিরহা সাদকাহ করে। রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশ মতে। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করেন তখন এ বাগান তাঁর অংশে পড়ে।

যদিও ইফকের ঘটনায় হযরত হাস্সান (রাঃ)-এর পদস্খলন হয়েছিল এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) তাতে প্রকৃতিগতভাবে দুঃখ পেয়েছিলেন। তবুও তিনি হযরত হাস্সান (রাঃ)-কে দণ্ড কার্যকর হওয়ার পর ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। যদি কেউ তাঁর সামনে হযরত হাস্সান (রাঃ)-কে খারাপ বলতো তাহলে তিনি তাকে নিষেধ করতেন এবং বলতেন, সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তরফ থেকে মুশরিকদের জবাব দিত।

প্রিয় নবী (সাঃ) হযরত হাস্সান (রাঃ) বিন সাবিতকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পন করেন। তিনি এ দায়িত্ব অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দর এবং আবেগ-উদ্দীপনার সাথে পালন করতেন। এ কারণে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর প্রশংসার পাত্র হন। তিনি রাসূল (সাঃ)-এর নিকট অত্যন্ত মর্যাদাবানও ছিলেন। হুযুর (সাঃ)-এর নির্দেশে মসজিদে নববীতে তাঁর জন্য মিম্বার দাঁড় করানো হতো। এ মিম্বারে দাঁড়িয়ে অথবা বসে তিনি কাফিরদের অপবাদের জবাব দিতেন। আবার অনেক সময় প্রিয় নবী (সাঃ)-এর প্রশংসায় কবিতা পড়ে শুনাতেন। বিশ্বনবী (সাঃ) বলতেন, হাস্সান (রাঃ)-এর ব্যঙ্গ কবিতা অন্ধকারে তীরের মত কাফেরদের ওপর কার্যকর হতো। একবার হুযুর (সাঃ) হযরত হাস্সান (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ 'হে হাস্সান! আমার তরফ থেকে জবাব দাও।' সে সাথে দোয়া করলেন-'হে আল্লাহ! পবিত্র আত্মার তরফ থেকে তাকে সাহায্য কর।'

আরেকবার ইরশাদ হলোঃ 'হে হাস্সান! মুশরিকদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা পড়। জিবরাঈল (আঃ) তোমার সাথে রয়েছেন।'

বস্তুত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বহুবার হযরত হাস্সান (রাঃ)-এর কাব্যের প্রশংসা, দোয়া করেছেন এবং মুশরিক কবিদের অশ্লীল কথনের জবাব দানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রায় সকল যুদ্ধেই এবং গুরুত্বপূর্ণ সময়ে হযরত হাস্সান (রাঃ) হকপন্থীদের পক্ষে এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত উদ্দীপনাময় কবিতা রচনা করেন। এ সকল কবিতা রাসূলুল্লা (সাঃ)-কে খুশী করতো এবং হকের শত্রুদের কলিজা ছিন্ন করে ছাড়তো। তিনি ফখর করে বলেছেনঃ

> "আমার জবান কর্তনকারী তরবারীর মত শক্তিশালী এবং এতে আয়েব বা দোষণীয় কিছু নেই। আমার কাব্য সমুদ্র এত স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার যে, তাতে কোন কিছু নিক্ষেপ করলে ময়লাযুক্ত হয় না। [অর্থাৎ কোন সমালোচকের সমালোচনা তাতে কোন ত্রুটি খুঁজে পায় না।]"

এক রাওয়ায়েতে আছে, একবার কোন মুশরিকের ব্যঙ্গের জবাবে তিনি এ কবিতা বলেনঃ

"তুমি মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে গালাগাল করেছ। আমি তাঁর তরফ থেকে এর জবাব দিয়েছি এবং এর পুরস্কার আল্লাহর নিকট রয়েছে। এবং আমাদের মধ্যে আল্লাহর আমীন জিবরাইল আছেন। তাঁর আত্মা পবিত্র এবং তাঁর কোন সমকক্ষ নেই।"

প্রিয়নবী (সাঃ) এ কথা শুনে বললেনঃ 'জাযাকাল্লাহু আলাল্লাহিল জান্নাতা' । হাঁ আল্লাহর নিকট তোমার পুরস্কার বেহেশ্‌ত ।।

প্রকৃতপক্ষে এ কবিতা সে কাসিদার অন্তর্ভুক্ত যা হযরত হাস্‌সান (রাঃ) মক্কা বিজয়ের মুহূর্তে বলেছিলেন। অন্য কোন সময়েও সম্ভবতঃ তিনি এ কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। বদর, ওহোদ এবং পরিখার যুদ্ধে তিনি অত্যন্ত তেজস্বী ভাষায় কবিতা রচনা করেন। এমনিভাবে ইসলামের মশহুর দুশমন ইহুদী কবি কা'ব বিন আশরাফ নিহত হলে তিনি অত্যন্ত আবেগময় ভষায় খুশী প্রকাশ করেছিলেন।

নবম হিজরীতে বনু তামিমের প্রতিনিধিদল মদীনা মুনাওয়ারা আগমন করে এবং মুসলমানদের সামনে নিজেদের অহমিকা প্রকাশ করে। তাদের কবি যবরকান (রাঃ) বিন বদর (সে সময় পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি) নিজের কওমের প্রশংসায় স্বরচিত অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের কবিতা আবৃত্তি করেন।

প্রিয়নবী (সাঃ) হযরত হাস্‌সান (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলেন যে, ওঠো এবং যবরকানের জবাব দাও। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে উপস্থিতভাবে এত উচ্চাঙ্গের কবিতা বললেন যে, বনু তামিম সর্দার আকরা (রাঃ) বিন হাবেস বলে উঠলেনঃ "মুহাম্মাদ-পিতার কসম! তোমাদের কবিআমাদের কবির চেয়ে ভালো।"

প্রিয় নবী (সাঃ) হযরত হাস্‌সান (রাঃ)-এর প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির (৬ হিজরীর জেলকদ) পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত হাতিব (রাঃ) বিন আবি বালতা'কে মিসরের গবর্ণর মাকুকাসের নিকট ইসলামের মুবাল্লিগ হিসেবে প্রেরণ করলেন। মাকুকাস ইসলাম গ্রহণ করেননি তবে হযরত হাতিব (রাঃ)-এর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। মিসর ত্যাগ করার প্রাক্কালে মাকুকাস প্রিয় নবী (সাঃ)-এর জন্য অনেক তোহফা এবং হাদিয়া তাঁর নিকট প্রদান করেন। এ তোহফার মধ্যে মারিয়া (রাঃ) এবং শিরিন (রাঃ) নাম্নী দু'জন কিবতী সহোদরা ছিলেন। দু'সহোদরা হযরত হাতিবের তাবলীগের ফলে ইসলাম গ্রহণ করেন। মদীনা প্রত্যাবর্তন করে হযরত হাতিব (রাঃ) তাদেরকে রাসূল (রাঃ)-এর খিদমতে পেশ করলেন। এ সময় হুযুর (সাঃ) হযরত

মারিয়া (রাঃ)-কে নিজের গৃহে জায়গা দিলেন এবং হযরত শিরীন (রাঃ)-কে হযরত হাস্সান (রাঃ)-এর মালিকানায় অর্পণ করলেন। এভাবে হযরত হাস্সান (রাঃ) প্রিয় নবী (সাঃ)-এর শ্যালিকার স্বামী হয়ে গেলেন। হযরত শিরীন (রাঃ)-এর পেটে হযরত হাস্সান (রাঃ)-এর পুত্র আবদুর রহমান (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও একজন কবি হিসেবে স্বীকৃতি পান। আবদুর রহমান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পুত্র হযরত ইবরাহিম (রাঃ)-এর আপন খালাত ভাই ছিলেন।

হযরত হাস্সান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পরও দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন। এ সময়ে তিনি কখনো কখনো মসজিদে নববীতে বসে মানুষকে নিজের কবিতা শুনাতেন। একবার হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর শাসনামলে এমনিভাবে কবিতা পড়ছিলেন। আমিরুল মুমিনীন (রাঃ) তা দেখলেন, মসজিদে কবিতা পড়তে নিষেধ করলেন। হযরত হাস্সান (রাঃ) ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, আপনার চেয়েও উত্তম ব্যক্তিত্বের সামনে মসজিদে নববীতে বসে কবিতা পাঠ করেছি। এ জন্যে আমাকে কেউ এ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারবে না। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) তাঁর এ জবাব শুনে চুপ হয়ে গেলেন।

জাহেলী যুগের শেষ গাস্সানী শাসক জাবালা বিন আইহাম হযরত হাস্সান (রাঃ)-এর প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত ছিলেন। হযরত হাস্সান (রাঃ) তাঁর প্রশংসায় অত্যন্ত শক্তিশালী কাসিদাহ রচনা করতেন এবং তিনিও তাঁকে প্রচুর দক্ষিণা দিতেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর শাসনামলে জাবালা অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে মদীনা আগমন করেন এবং আমিরুল মুমিনীনের হাতে ইসলামগ্রহণ করেন। কিন্তু বাদশাহীর ঠাট ও অহংকার তাঁর মগজ থেকে তখনও দূর হয়নি। কা'বা শরীফ তাওয়াফের সময় তাঁর জুব্বার ওপর এক বদ্দুর পা পড়ে। জাবালা অগ্নিশর্মা হয়ে তার মুখের ওপর এমন জোরে এক থাপ্পড় মারেন যে তাতে তার নাক জখম হয়ে যায়। বদ্দুটি এ ব্যাপারে খলিফার দরবারে অভিযোগ দায়ের করলো। আমিরুল মুমিনীন জাবালাকে নির্দেশ দিলেন, হয় বদ্দুকে সন্তুষ্ট করাও, না হয় শরীয়ত মুতাবিক সে তোমার মুখের ওপর থাপ্পড় মেরে নিজের বদলা নেবে।

জাবালা এক রাতের সময় চাইলেন। আমিরুল মুমিনীন সময় মঞ্জুর করলেন। জাবালা সে রাতেই মদীনা মুনাওয়ারা থেকে পালিয়ে গেলেন এবং মুরতাদ হয়ে রোমের বাদশাহ হারকেলের নিকট কাসতানতুনিয়া চলে গেলেন। কিছু দিন পর হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) জালামা বিন মাসাহিক কিনানীকে ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্রসহ হারকেলের নিকট কাসতানতুনিয়া প্রেরণ করলেন। হারকেল ইসলামের দাওয়াত কবুল না করলেও কাসিদকে অত্যন্ত খাতির যত্ন করলো। জালামা ফিরে আসছিলেন। এ সময় হারকেল

তাঁকে বললো তোমার একজন আরব ভাই এখানে আছে। তার নাম জাবালা বিন আইহাম। তার সাথে দেখা করে যাও। জাসামা তার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। একজন বাদশাহর যে ঠাট-বাট তাই তিনি অবলোকন করলেন। জাবালা জাসামাকে খুব সম্মান ও তাজিম করলেন। তাঁর সামনে খাবার পেশ করলেন এবং কতিপয় অপ্সরা সদৃশ বাঁদীকে গান গেয়ে তাঁকে খুশী করার নির্দেশ দিলেন। তারা অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে বনু গাস্সানের প্রশস্তিমূলক একটি কাসিদাহ গাইলো। এ কাসিদাহর প্রথম চরণের অর্থ নিম্নরূপঃ

> "কতই না ভালো ছিল সে সব লোক যাদের সাথে আমি বালাখানায় একত্রিত হয়েছিলাম।"

এ কবিতায় জাবালা এবং তার বংশের ইজ্জত ও উদার অন্তরের প্রশংসা করা হয়েছিল। কবিতা শুনে জাবালা অযাচিত ভাবে হাসতে শুরু করলেন এবং জাসামাকে জিজ্ঞেস করলেন 'এ কবিতা কার তা কি তুমি জানো?' তিনি বললেন 'না'। জাবালা বললেন, এটা হাস্সান বিন সাবিতের কবিতা। এরপর তাকে কাঁদিয়ে দেয়ার মত গান গাওয়ার জন্যে নির্দেশ দিলেন। তারা গাইলোঃ

> "মায়ান নামক স্থানে তাবুকের সেদিকে এবং জামান উপত্যকায় এ গৃহ কার? যা বিরান হয়ে পড়ে রয়েছে।"

এটা কোন কবিতা ছিল না। বরং বনি গাস্সানের বাদশাহের বিরাট বালাখানার মর্সিয়া ছিল। এ মর্সিয়া শুনে জাবালার চক্ষু দিয়ে সমুদ্রের জলধারা নেমে এলো এবং জাসামাকে জিজ্ঞেস করলেন, জানো এ কবিতা কার? তিনি বললেন, না। জাবালা বললো, এটাও হাস্সান বিন সাবিতেরই কবিতা। অতপর তিনি হযরত হাস্সান (রাঃ) বিরচিত কতিপয় কবিতা নিজেই আবৃত্তি করলেন। এর মধ্যে একটি কবিতা নিম্নরূপঃ

> "হায়! আমার মা যদি আমার জন্ম না দিত এবং হায়! ওমর (রাঃ) আমাকে যা বলেছিল তা যদি মেনে নিতাম।"

এ কবিতা থেকে অনুভব করা যায় যে, জাবালা মুরতাদ হওয়ার কারণে অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিলেন। আলাপ-আলোচনার সময় তিনি অত্যন্ত আদব এবং তাজিমের সাথে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নাম উচ্চারণ করছিলেন। কিন্তু কাসতান্তুনিয়ায় প্রাপ্ত আরাম-আয়েশ পরিত্যাগ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এ জন্যে দ্বিতীয়বার তিনি আর ইসলাম গ্রহণ করতে পারেননি। কবিতা পাঠ করে তিনি কিছুক্ষণ বিমূঢ় রইলেন এবং জাসামাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হাস্সান (রাঃ) বিন সাবিত কি জীবিত আছেন?'

জাসামা বললেন, 'হ্যাঁ', তিনি জীবিত আছেন। কিন্তু বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে গেছেন।'

জাবালা তৎক্ষণাৎ পাঁচশ' দিনার এবং পাঁচ সেট রাজ পোশাক আনিয়ে তার হাওয়ালা করলেন এবং বললেন, হাসসানকে আমার সালাম বলবেন। আর এ দিনার ও পোশাক আমার তরফ থেকে তাকে দেবেন।

জাসামা মদিনা প্রত্যাবর্তন করে আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর নিকট এ ঘটনা বিবৃত করলেন। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত হাস্সান (রাঃ)-কে ডেকে পাঠালেন। তিনি এসে সালাম দিয়েই বললেন, 'আমিরুল মু'মিনীন! আমি এখানে আলে জাফনার রুহ সমূহের খোশবু উপলব্ধি করছি।'

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বললেন, 'আল্লাহ সেই মাধ্যমে আপনাকে সাহায্য করেছেন।' অতপর তাঁকে জাবালা প্রেরিত দিনার ও পোশাক প্রত্যর্পন করলেন।

অপর এক রাওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, জাবালা হযরত হাস্সান (রাঃ)-এর জন্যে মূল্যবান একটি পোশাক এবং কয়েকটি উন্নত জাতের উট প্রেরণ করেছিলেন। তিনি জাসামাকে বলেছিলেন, মদীনায় পৌঁছেই হাস্সান (রাঃ)-কে জীবিত পেলে তাকে এ পোশাক এবং উট আমার তরফ থেকে উপঢৌকন হিসেবে দেবেন। আর যদি তিনি ওফাত পান তাহলে পোশাকটি তাঁর বাড়ী পৌঁছে দেবেন এবং উটগুলো তাঁর কবরে নিয়ে জবেহ করবেন (আল্লাহই এ ব্যাপারে ভালো জানেন)।

হযরত হাস্সান (রাঃ) বিন সাবিত হযরত আমির মাবিয়ার খিলাফত কালে ৫৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় ১২০বছর। মৃত্যুকালে একমাত্র সন্তান পুত্র আবদুর রহমানকে রেখে যান। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে হযরত বারা বিন আযিব, হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়িব (রাঃ), হযরত উরওয়াহ বিন যোবায়ের (রাঃ), হযরত আবু সালমাহ বিন আবদুর রহমান (রাঃ) এবং হযরত খারেজাহ বিন যায়েদ বিন সাবিত এর নামবিশেষভাবেউল্লেখযোগ্য।

হযরত হাস্সান বিন সাবিত (রাঃ) আরবের সমকালীন প্রখ্যাত কবিদের অন্যতম ছিলেন। কেউ কেউ তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তবে এ পরিচিতি ছাড়াও তাঁর আর একটি পরিচয় ছিল। আর এ পরিচিতিই তাঁকে চিরকালের জন্যে সমুজ্জ্বল করে রেখেছে। তাঁর সবচেয়ে বড় গৌরবের ব্যাপারটি হল যে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর কবি (শায়েরুন্নবী) ছিলেন।

শৈশবকাল থেকেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মর্যাদার চিত্র হযরত হাস্সান (রাঃ)-এর অন্তরে অংকিত হয়েছিল। তিনি নিজেই বলেছেনঃ

"আমার বয়স তখন সাত-আট বছর হবে। একদিন খুব প্রত্যুষে এক ইহুদী মদীনার সব ইহুদীকে ডেকে একত্রিত করলো। সবাই যখন এসে উপস্থিত হলো তখন সে বললোঃ সেই সিতারাহ উদিত হয়েছে। সেই তারার উদয় স্থানে আজ রাতেই মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর জন্ম হবে। [এরপর যখন তিনি রাসূল হিসেবে প্রেরিত হলেন এবং মদীনা তাশরীফ আনলেন তখন সেই ইহুদী জীবিত ও উপস্থিত ছিল। কিন্তু সেই হতভাগা ঈমান আনেনি।]

সে দিন থেকেই হযরত হাস্সান (রাঃ) সর্বশেষ নবী (সাঃ)-এর দিদারের আকাংখা পোষণ করতে থাকেন। প্রিয় নবী (সাঃ)-এর মদীনা শুভাগমন ঘটলেই তিনি অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনাসহ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ এবং বাইয়াতের সৌভাগ্য অর্জন করেন। এরপর তিনি নিজে সমগ্র কাব্যিক যোগ্যতা রাসূল (সাঃ)-এর প্রশস্তি এবং তাঁর সুরক্ষার লক্ষ্যে ওয়াকফ করে দেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাপূর্ণ আবেগ দিয়ে হুযুর (সাঃ)-এর প্রশংসার হক আদায় করেন। তাঁর মত অন্য কোন কবির পক্ষেই এত সুউচ্চ কল্পনা রাজ্যে বিচরণ করা সম্ভব হয়নি। এ প্রসঙ্গে তাঁর দু'টি কবিতাঃ

"[ইয়া রাসূলুল্লাহ] আপনার চেয়ে সুন্দর আমার চক্ষু অবশ্যই দেখেনি এবং কোন নারীই আপনার চেয়ে সুন্দর শিশু জন্ম দেয়নি।

আপনাকে ত্রুটিমুক্তভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। [অর্থাৎ মনে হয় স্রষ্টা আপনাকে আপনার ইচ্ছা ও মর্জি হিসেবেই সৃষ্টি করেছেন।]"

হযরত হাস্সান (রাঃ)-এর রাসূল (সাঃ) প্রশস্তিমূলক কাসিদাহ এবং না'তের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, তা শুধু কল্পনামূলকই ছিল না। বরং তাঁর প্রতিটি কবিতাই অন্তর রসে জারি ছিল।

প্রিয় নবী (সাঃ)-এর শানে তিনি হাজার কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু কোন কবিতাতেই অবাস্তব কিছু বলেননি। কতিপয় পংক্তি এখানে উল্লেখ করা গেলঃ

"তিনি আল্লাহর নবী। নিরাশা ও নবী সমূহের অতীত হওয়ার পর যখন বিশ্বে মূর্তির পূজা চলছিল তখন আমাদের নিকট তাঁর শুভাগমন ঘটেছে।

তিনি আমাদের জন্য প্রোজ্জ্বল প্রদীপ এবং পথ প্রদর্শক হয়ে গেলেন। তিনি এমন দীপ্তিমান ও প্রজ্জ্বলভাবে আবির্ভূত হলেন যেমন শান দেয়া হিন্দী তরবারী চমক মারে।

তিনি আমাদেরকে জাহান্নামের আগুনের ভয় দেখিয়েছেন এবং বেহেশ্তের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে ইসলামের শিক্ষা দিয়েছেন। যে জন্য আমরা আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করি।"

নবী (সাঃ)-এর হিজরত প্রসঙ্গে তিনি মক্কাবাসীদের দুর্ভাগ্য এবং মদীনাবাসীর সৌভাগ্য সম্পর্কে মনোভাব ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেনঃ

"নিঃসন্দেহে সে জাতি হতাশ হয়েছে যাদের কাছ থেকে তাদের নবী চলে গেছেন এবং তারা মর্যাদা লাভ করেছেন যাদের কাছে গিয়ে তিনি উপস্থিত হয়েছেন ও তারা শুভ সকাল লাভ করেছে।

যে জাতির কাছ থেকে তার পয়গাম্বর চলে গেছেন সে জাতির জ্ঞানও লুপ্ত হচ্ছে এবং যাদের কাছে উপস্থিত হয়ে অবস্থান নিয়েছেন তাদেরকে তিনি নিজের আলোয় আলোকিত করেছেন।

মদীনাবাসীর রব গুমরাহীর পর তাদেরকে হেদায়াতের সৌভাগ্য দান করেছেন এবং সরল পথ দেখিয়েছেন। যে হকের অনুসরণ করে সে হেদায়াত পায়।"

আলোচিত কয়েকটি কবিতার পংক্তির মাধ্যমেই হযরত হাস্সান (রাঃ)-এর রাসূল (সাঃ) প্রেমের গভীরতা সম্পর্কে অনুমান করা যায়। এ ধরনের হাজার হাজার পংক্তিমালা তাঁর দিওয়ানের স্থানে স্থানে হীরা-মানিক্যের মত জ্বলজ্বল করছে।

হযরত হাস্সান (রাঃ) বিন সাবিত রাসূল (সাঃ)-এর প্রশস্তিমূলক কবিতার সাথে সাথে কাফেরদের বিরুদ্ধে অসংখ্য ব্যঙ্গাত্মক কবিতাও রচনা করেছেন। তিনি অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে প্রিয় নবী (সাঃ) এবং তাঁর অনুসরণকারীদের বিরোধিতাকারীদেরকে একদিকে কবিতার মাধ্যমে বাধা দিয়েছেন। অন্যদিকে মুশরিকদের জবাব এমন শক্তিশালী ব্যঙ্গাত্মক কবিতার মাধ্যমে প্রদান করেছেন যাতে তারা নীরব হয়ে যেতে বাধ্য হয়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দু'জন জীবন উৎসর্গকারী সাহাবী হযরত আবদুল্লা (রাঃ) বিন রাওয়াহা এবং হযরত কা'ব (রাঃ) বিন মালিক আনসারীও মুশরিক কবিদের বিদ্রূপের জবাব অত্যন্ত জোরালো ভাষাতেই প্রদান করেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে হযরত হাস্সান (রাঃ)-এর ভূমিকা ছিল সবার উর্ধে। এক

রাওয়ায়েতে আছে, কুরাইশ কবিদের বিদ্রূপের জবাব দানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে নবী করিম (সাঃ) হযরত কা'ব (রাঃ) বিন মালিককে এ কাজের জন্যে বলে পাঠালেন। তিনি নির্দেশ পালন করলেন। কিন্তু নবী করিম (সাঃ) তাঁর জবাবী বিদ্রূপ পসন্দ করলেন না। অতপর তিনি হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন রাওয়াহাকে এ কাজের নির্দেশ দিলেন। তিনিও তা করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তাও পছন্দ হলো না। এরপর তিনি হযরত হাস্সান (রাঃ)-কে কুরাইশদের বিদ্রূপের জবাব দিতে বললেন। রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশ শুনে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেনঃ

"সময় এসেছে সেই বাঘকে আহবান জানানোর যে লেজ নাড়ছে।"

অতপর তিনি দৃঢ় আস্থার সাথে বললেনঃ আমার ভাষা দিয়ে তাদেরকে ঠিক করে দেব (অথবা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ফেলবো)। প্রকৃতপক্ষে যা তিনি বলেছিলেন, তা তিনি দেখিয়েছেন। [মুসনাদে আহমদ]

হুযুর (সাঃ) মুশরিক কবি গোষ্ঠীর মোকাবিলা এবং সাহাবী (রাঃ)-দের সুরক্ষার কাজে হযরত হাস্সান (রাঃ)-কে নিয়োজিত করেছিলেন। এ প্রশ্নে তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সাথে তাঁকে পরামর্শ করে নেয়ারও হেদায়াত দিয়েছিলেন। কেননা হযরত আবু বকর (রাঃ) আরব জনগণ সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল ছিলেন। বস্তুত হযরত হাস্সান (রাঃ) প্রায়ই হযরত আবু বকর (রাঃ-এর খিদমতে উপস্থিত হতেন এবং নসবনামা সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে তথ্য লাভ করতেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁকে বলতেন, ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপের সময় অমুক অমুক মহিলাকে ছেড়ে কথা বলবে। কেননা তারা রাসূল (সাঃ)-এর দাদী। হযরত হাস্সান (রাঃ) তাঁর নির্দেশ অনুযায়ীই কাজ করতেন। তিনি নিজের কবিতায় কুরাইশ মুশরিকদের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানতেন। কিন্তু তাতে হুযুর (সাঃ) এবং কুরাইশ বংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত সাহাবী (রাঃ)-দের গায়ে কোন আঁচড় লাগতোনা।

আবু লাহাব প্রিয় নবী (সাঃ)-এর চাচা। কিন্তু ইসলামের ঘোরতর শত্রু ছিল। হযরত হাস্সান (রাঃ) তার প্রতি এ ভাষায় ব্যঙ্গ করেছেনঃ

"আবু লাহাবকে জানিয়ে দাও, মুহাম্মাদ (সাঃ) নবুয়াতের দায়িত্ব আঞ্জাম দানের জন্যে অবশ্যই উঁচু মর্যাদায় আসীন হবেন। এ কথা তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলেও কিছু আসে যায় না।

বনি হাসিম সম্মান ও উঁচু মর্যাদায় আসীন হয়েছে। কিন্তু তোমাকে তিরস্কারের দুঃখ বেদনায় জর্জরিত করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।"

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চাচাত ভাই আবু সুফিয়ান বিন হারিছ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইসলামের একজন কট্টর দুশমন ছিলেন। তিনি হুযুর (সাঃ)-কে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেও কসুর করেননি। হযরত হাস্সান (রাঃ) তাঁর শোধ এভাবে নিয়েছেনঃ

"তোমার জীবনের কসম। কুরাইশের সাথে তোমার আত্মীয়তা এমন যেমন উট শাবকের সম্পর্ক উটপাখীর বাচ্চার সাথে হয়ে থাকে।

যে কওমের তুমি নও তাদের নিয়ে গর্ব করো না। তুমিতো খবিস বনি হিসামের মতও নও।"

কুরাইশ সরদারদের মধ্যে ইসলাম বিরোধিতায় আবু জেহেল সকলের অগ্রগামী ছিল। বদরের যুদ্ধে মক্কার কাফেরদেরকে সেই টেনে এনেছিল। হযরত হাস্সান (রাঃ) তাকে এ ভাবে তিরস্কৃত করেনঃ

"অবশ্যই আল্লাহপাক সে দলের ওপর অভিসম্পাত বর্ষণ করেছেন যারা বাহাদুরীর মিথ্যা দাবীদার ছিল এবং মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে ডেকে এনেছিল।

সে খবিস এবং অভিশপ্ত। যে ব্যক্তি সত্যপথের হেদায়াত প্রাপ্ত হয় তাকে সব সময়ই বড় মনে করা হয়। অথচ সে তাকে ভর্ৎসনা করে।

সে লোকদেরকে গুমরাহির দিকে উদ্বুদ্ধ করে। এমনকি তার চারপাশে মানুষ একত্রিত হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে তার নির্দেশ হেদায়াত না করে পথভ্রষ্ট করে।

আল্লাহপাক নবী করিম (সাঃ)-এর সাহায্যের জন্যে নিজের বাহিনী প্রেরণ করেছেন এবং সব যুদ্ধেই তিনি তাঁকে সাহায্য ও বিজয় দান করেছেন।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আবদুল্লাহ বিন যিবা'রা কুরাইশের নেতৃস্থানীয় কবি ছিল। ঘটনাক্রমে মুসলমানদেরকে ওহোদের যুদ্ধে প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। ইবনে যিবা'রা একে মুশরিকদের বিজয় বলে অভিহিত করলো এবং কতিপয় অহমিকাপূর্ণ কবিতা বলে ফেললো। হযরত হাস্সান (রাঃ)-কে সম্বোধন করে হক পন্থীদেরকে তিরস্কার ও গালাগালি দিল তাতে। হযরত হাস্সান (রাঃ) এর দাঁত ভাঙা জবাব দিলেন। ওহোদ যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা বিশ্লেষণ করলেন এবং সাথে সাথে বদরের যুদ্ধে কাফেরদের লজ্জাজনক পরাজয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইবনে যিবা'রাকে তিরস্কার করলেনঃ

"ইবনি যিবা'রা এ লড়াইয়ের [ওহোদ] অবস্থা খুব ভালভাবেই জানে। যদি সে ইনসাফ করে তাহলে ফযিলত আমাদের জন্যেই।

অবশ্যই তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে এবং আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে খুব প্রতিশোধ নিয়েছি। কখনো কখনো যুদ্ধে এ ধরনের ওলট পালট হয়েই থাকে। যখন আমরা (বদরের যুদ্ধে) কঠিনভাবে হামলা করলাম, তখন আমরা তোমাদের পাহাড়ের নিম্নভূমিতে ঠেলে দিলাম।

একই স্থানে আমরা তোমাদের ৭০ জনকে লুটিয়ে ফেললাম। এ কথা বিন্দুমাত্রও মিথ্যা নয়।

তোমাদের অনেক লোককে আমরা কয়েদ করলাম এবং পরাজিত হয়ে জল কুককুটের মত পালিয়ে গেলে। আমরা তোমাদের প্রত্যেক সরদারকে কতল করলাম এবং প্রতিটি মর্যাদাবান বাহাদুরকে মেরে ফেললাম।

আমরা নই, তোমরাই লেজ গুটিয়ে পালিয়েছ। যুদ্ধ যখন তুঙ্গে আমরা তখন ময়দানে থাকি।"

উবাই বিন খালফ একজন কুচক্রী মুশরিক ছিল। একবার (হিজরতের পূর্বে) একটি পচা হাড়সহ রাসূল (সাঃ)-এর নিকট এলো এবং বলতে লাগলো, তুমি বল, আল্লাহ মৃতকে জীবিত করবে? বল, এ হাড় কে জীবিত করতে পারে? হযরত হাস্সান (রাঃ) এ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে উবাই বিন খালফ, উতবাই বিন রবিয়াহ, শাইবা বিন রবিয়াহ এবং আবু জেহেলের তিরস্কার এভাবে করেছেনঃ

"অবশ্যই উবাই নিজের পিতার গুমরাহীর উয়ারিশ হয়েছে। যখন সে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করে। মুহাম্মাদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্যে তুমি তার নিকট পচা হাড় সহ এসেছো? প্রকৃতপক্ষে তুমি নিজেই এর তাৎপর্য বুঝতেঅক্ষম।

আবু জেহেলের আনুগত্য করে রবিয়ার পুত্রদ্বয় ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের মা তাদের জন্যে ক্রন্দন করে।"

একবার আরবের এক গোত্রের সরদার হারিছ বিন আওফ রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে এসে হাজির হলো এবং নিবেদন করে বললো, কাউকে আমার সাথে দিন, যে আমার গোত্রকে দ্বীনের তা'লিম দেবে। আমি তার রক্ষার দায়িত্ব নিলাম। হুযুর (সাঃ)

একজন আনসার সাহাবীকে তার সাথে দিলেন। তাকে সাথে নিয়ে হারিছ নিজের কওমের কাছে গেল। কিন্তু তার কওম বিশ্বাসঘাতকতা করলো এবং আনসার সাহাবী (রাঃ)–কে শহীদ করে ফেললো। কিছুদিন পর হারিছ বিন আওফ নিজের গোত্রের বিশ্বাসঘাতকতায় দুঃখ প্রকাশের জন্যে হুযুর (সাঃ)–এর খিদমতে হাজির হলো। এ হৃদয় বিদারক কাহিনী শুনে রাসূল (সাঃ) খুব ব্যথিত হলেন। তবে হারিছের সুমিষ্ট ক্ষমা প্রার্থনা দেখে ভদ্রতার খাতিরে চুপ করে থাকলেন। এ সময় হযরত হাস্সান (রাঃ) হারিছ ও তার গোত্রের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কিত দু'টি কবিতা বলেন। কবিতা দু'টি শুনে হারিছ খুব পেরেশান এবং ভীত হয়ে রাসূল (সাঃ) নিকট আরজ করলেনঃ "হে মুহাম্মাদ (সাঃ)! আমি এ ব্যক্তির [হাস্সান] বিদ্রূপ থেকে বাঁচার জন্যে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। তিনি সে ব্যক্তি, নিজের তিক্ত ভাষা যদি সমুদ্রে মিশিয়ে দেন তাহলে আল্লাহর কসম সমুদ্রের সমুদয় পানি তেতো হয়ে যাবে।"

সংক্ষেপে কথা হলো, হযরত হাস্সান (রাঃ) বিন সাবিত শক্তিশালী কবিতার মাধ্যমে হকের শত্রুদের মুখ বন্ধ করেছিলেন এবং হক পন্থীদেরকে করেছিলেন আনন্দিত। ফলে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেলেন।

-০-

হযরত আবু মাসউদ বদরী আনসারী (রাঃ)

রাসূল (সাঃ)-এর মাদানী যুগের একটি ঘটনা। একদিন এক সাহাবী (রাঃ) নিজের গোলামের আচরণে ক্রোধান্বিত হলেন এবং বেত দিয়ে পিটানো শুরু করলেন। ইত্যবসরে পিছনে অনেক দূর থেকে এক আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি সে কণ্ঠস্বর চিনতে পারলেন না। যখন সে আওয়াজ নিকটবর্তী হলো তখন দেখলেন যে, স্বয়ং রাসূলে করিম (সাঃ) আওয়াজ দিচ্ছেন। তিনি (সাঃ) তাঁকে সম্বোধন করে বললেনঃ "তুমি যেভাবে আল্লাহর অধীনস্ত তেমন এ গোলাম তোমার অধীনস্ত নয়। অথবা তিনি বলেছিলেন যে, যে আল্লাহ তোমাকে এ গোলামের ওপর শক্তিশালী করেছেন সেই আল্লাহ তাকেও তোমার ওপর শক্তিশালী করতে পারেন।"

রহমতে আলম (সাঃ)-এর ইরশাদ শ্রবণ করে সে সাহাবীর হাত থেকে বেত পড়ে গেল এবং তিনি লজ্জিত কণ্ঠে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)। আমি ভবিষ্যতে কখনো কোন গোলামকে আর মারবো না। এবং এ গোলামকে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আজাদ করে দিচ্ছি।"

সৃষ্টির সেরা প্রিয় নবী (সাঃ)-এর প্রতি এ সাহাবীর কি ধরনের অগাধ ভক্তি ছিল তা এ ঘটনা থেকেই আন্দাজ করা যায়। কারণ রাসূল (সাঃ)-এর ভক্তি ইঙ্গিত পেতেই তিনি সারা জীবনের জন্য কোন গোলামের ওপর হাত ওঠানো থেকে তওবাহ করেছিলেন এবং যে গোলামের ওপর হাত তুলেছিলেন, তাকে তৎক্ষণাৎ আজাদ করে দিয়েছিলেন। আলোচ্য এ সাহাবীর নাম ছিল হযরত আবু মাসউদ বদরী আনসারী (রাঃ)।

হযরত আবু মাসউদ বদরী আনসারী (রাঃ) আসহাবুল বদর সাহাবী (রাঃ)-এর মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। তার নাম ছিল উকবাহ। কিন্তু তিনি আবু মাসউদ কুনিয়তেই বেশী প্রসিদ্ধ ছিলেন। খাযরাজ গোত্রের বনু হারেছ বংশের সাথে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। বংশধারা নিম্নরূপ ঃ

উকবাহ বিন আমর ছা'লাবাহ বিন আছির বিন আছিরাহ বিন আতিয়াহ বিন খাদারাহ বিন আওফ বিন হারেছ বিন খাযরাজ।

কোন কোন মতে বদরী উপাধির কারণ হলো, তিনি বদরে অবস্থান করতেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, তিনি বদরী সাহাবী ছিলেন। আল্লাহ পাক হযরত আবু মাসউদ (রাঃ)-কে সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। নবী (সাঃ)-এর হিজরতের দু'এক বছর পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আবার নবুয়াত প্রাপ্তির ১৩ বছর পর তিনি মক্কা গিয়ে বাইয়াতে উকবায়ে কবিরাতে অংশ গ্রহণের মহান সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এ সময় রাসূল (সাঃ)-এর হাতে বাইয়াতকারী সাহাবী (রাঃ)-দের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্ব কনিষ্ঠ।

হিজরতের পর যুদ্ধ সমূহ শুরু হলো। হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) সর্ব প্রথম বদরের যুদ্ধে অংশ নেন। ইমাম ইবনে ইসহাক (রঃ), হাফিজ ইবনে আবদুল বার (রঃ) এবং অন্য কতিপয় চরিতকার ও যুদ্ধ ইতিহাস লিখকের মতে তিনি বদরের যুদ্ধে অংশ নেননি। কিন্তু ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) দৃঢ়মত প্রকাশ করে বলেছেন যে, তিনি বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। সহিহ বুখারীতে বর্ণিত অসংখ্য হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম বুখারী প্রমাণ করেছেন যে, তিনি বদরের যুদ্ধে অংশ নেন। তিনি যদি বদরের যুদ্ধে অংশ না নিয়ে থাকেন তাহলেও তাঁর মর্যাদা খাটো হওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা আকাবাহতে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের মর্যাদা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সেসব সাহাবীর চেয়ে বেশী যারা বাইয়াতে আকাবাহতে শরীক হননি।

ওহোদ এবং পরবর্তী সকল যুদ্ধে হযরত আবু মাসউদ (রাঃ)-এর অংশ গ্রহণ সম্পর্কে সকল চরিতকার এবং ঐতিহাসিক ঐকমত্য পোষণ করেন। সম্ভবতঃ তিনি সেসব সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত যাঁরা রাসূল (সাঃ)-এর যুগে সকল যুদ্ধে প্রিয় নবী (সাঃ)-এর সহগামী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রাঃ)-এর খিলাফতের শেষ অবধি মদীনা মুনাওয়ারাতে অবস্থান করেছিলেন। অবশ্য এ সময় তিনি কিছুদিন বদরে কাটান। তৃতীয় খলিফা (রাঃ)-এর খিলাফতের শেষ দিকে তিনি কুফা চলে যান। এক বর্ণনা অনুযায়ী তিনি সেখানে বাড়ী তৈরী করেছিলেন।

সহিহ বুখারীর এক বর্ণনায় জানা যায় যে, হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু খলিফার আসনে সমাসীন হলে উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) ওসমান (রাঃ)-এর খুনের বদলা নেয়ার জন্য সংশোধনের ঝাণ্ডা তুলে ধরার সময় হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) কূফায় ছিলেন। উটের যুদ্ধের পূর্বে হযরত হাসান (রাঃ) এবং হযরত আম্মার বিন ইয়াছির (রাঃ) কূফা গমন করেন। সেখানকার লোকজন যাতে হযরত আলী (রাঃ)-কে সাহায্য করে এ জন্যেই তাঁরা গিয়েছিলেন। সেসময় হযরত আবু মূসা আশয়ারী কূফার গবর্ণর ছিলেন। হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) তাঁকে সাথে নিয়ে হযরত আম্মার বিন ইয়াছিয়া (রাঃ)-এর নিকট গেলেন এবং বললেনঃ "হে আবুল ইয়াকজান! আপনার সঙ্গীদের এমন কেউ নেই, যাকে আমি ভালো মন্দ বলতে না পারি। কিন্তু আপনি তার ব্যতিক্রম। যখন থেকে আপনি রাসূল (সাঃ)-এর সাহচর্য গ্রহণ করেছেন তখন থেকে আমি আপনার মধ্যে দোষের কিছু দেখিনি। অবশ্য এ ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করা অর্থাৎ হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণ দোষণীয়।"

হযরত আম্মার (রাঃ) বিন ইয়াছির (রাঃ) জবাবে বললেনঃ "হে আবু মাসউদ! আমি ও আপনি এবং আপনার এ সাথীর (হযরত আবু মূসা আশয়ারী) মধ্যে রাসূল (সাঃ)-এর সাথীত্ব গ্রহণের পর দোষণীয় কিছু দেখিনি। অবশ্য এ ব্যাপারে দেরী করা অর্থাৎ হযরত আলী (রাঃ)-এর সাহায্যে দেরী করা দোষণীয় ব্যাপার।"

আলোচনা এখানেই শেষ করে হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) হযরত আম্মার বিন ইয়াছির ও হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ)-কে জুময়ার নামায আদায়ের কথা বলে বিদায় করে দিলেন।

এ ঘটনার কিছু দিন পর দুঃখজনক উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) কি এ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন? ইতিহাস এবং চরিতগ্রন্থগুলো এ ব্যাপারে নীরব। কিয়াস হলো যে, তিনি এ যুদ্ধে অংশ নেননি। অবশ্য যখন হযরত আলী (রাঃ) এবং আমীর মাবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যে বিরোধ তুঙ্গে উঠলো তখন আবু মাসউদ (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে জোরেশোরে সমর্থন দিলেন। হযরত আলী (রাঃ) তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন এবং বিশ্বস্ত মনে করতেন। সিফ্ফিনের যুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য কূফা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে তিনি হযরত আবু মাসউদ (রাঃ)-কে স্থলাভিষিক্ত করে যান। হযরত আলী (রাঃ)-এর অনুপস্থিতিতে তিনি কূফার ইমামতের দায়িত্ব সুন্দরভাবে আঞ্জাম দেন। হযরত আলী (রাঃ)-এর প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অত্যন্ত গভীর। এ কারণেই তিনি নিজের কন্যাকে সাইয়েদেনা হযরত হোসাইন (রাঃ) বিন আলী (রাঃ)-এর সাথে

বিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর এক পুত্র যায়েদ তাঁরই কন্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন।

সিফ্ফিনের যুদ্ধের পর হযরত আবু মাসউদ (রাঃ)-এর অন্তরে মদীনার প্রতি আকর্ষণ এবং টান এত বৃদ্ধি পায় যে, তিনি কূফা ত্যাগ করে পুনরায় মদীনা মুনাওয়ারাহ গমন করেন এবং সেখানেই জীবনের বেশীর ভাগ সময় কাটান। অবশ্য মাঝে মধ্যে কূফা আসতেন।

হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) আমীর মাবিয়াহ (রাঃ)-এর শাসনকালে ৪১ থেকে ৫০ হিজরীর মধ্যে কোন এক সময় ইন্তেকাল করেন। কতিপয় বর্ণনায় আছে যে, তিনি আমীর মাবিয়া (রাঃ)-এর শাসনকালের শেষ পর্যন্ত (৬০ হিজরী) জীবিত ছিলেন। তবে হযরত মুগিরাহ (রাঃ) বিন শু'বার কূফায় ইমামতকালে তিনি ওফাত পান। এ মতই শক্তিশালী মত বলে ধারণা করা হয়। কালটি ছিল ৪১ থেকে ৫০ হিজরীর মধ্যে।

হযরত আবু মাসউদ (রাঃ)-এর এক পুত্র এবং কন্যা ছিল বলে জানা যায়। কন্যা হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন। এ সম্পর্কের ভিত্তিতে হযরত হোসাইন (রাঃ) হযরত আবু মাসউদ (রাঃ)-এর জামাতা হন এবং হযরত আলী (রাঃ) হন বেয়াই। পুত্রের নাম ছিল বশির। তিনি রাসূল (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় অথবা তাঁর ওফাতের কিছু দিন পর জন্মগ্রহণ করেন।

জ্ঞান ও ফজিলতের দিক দিয়ে হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) উঁচু মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন। তিনি হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী (রাঃ)-দের তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত হিসেবে পরিগণিত। তিনি ১০২টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তিনি অত্যন্ত হক কথা বলতেন। একবার কূফার গবর্ণর হযরত মুগিরাহ (রাঃ) বিন শু'বা আছরের নামায দেরী করে ফেললেন। হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) সে সময় কূফায় ছিলেন। তিনি তাঁকে প্রকাশ্যে সমালোচনা করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যেভাবে পড়তেন তেমনি সঠিক সময়ে নামায পড়া উচিত। জিব্রাইল (আঃ) রাসূল (সাঃ)-কে যে সময়ে নামায পড়তে বলতেন সে সময়েই তিনি নামাযের সময় নির্ধারণ করেছিলেন।

হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) অত্যন্ত আন্তরিকতা এবং আগ্রহের সাথে রাসূল (সাঃ)-এর হাদীসসমূহ শোনাতেন এবং লোকদেরকে নবী (সাঃ)-এর সুন্নাতের ওপর আমল করার নির্দেশ দিতেন। একবার তিনি দেখলেন যে, লোকজন জামায়াতের সময় মিলেমিশে দাঁড়ানোর তেমন আর খেয়াল করছে না। এতে তিনি বললেন, যতদিন তোমরা হুযুর (সাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী মিলেমিশে দাঁড়াতে ততদিন তোমাদের মধ্যে ঐক্য ছিল। এখন সে সুন্নাত পালন ছেড়ে দিয়েছ বলে তোমাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি হয়েছে।

একদিন লোকদেরকে বললেন, তোমরা কি জান রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কিভাবে নামায আদায় করতেন? অতপর নিজে নামাজ পড়িয়ে বলে দিলেন যে, এটি ছিল রাসূল (সাঃ)-এর নামায পড়ানোর পদ্ধতি।

কোন কাজে তড়িঘড়ি করা তিনি পছন্দ করতেন না এবং লোকদেরকেও এটা করা থেকে বিরত থাকতে বলতেন। মুসনাদে আবু দাউদে উল্লেখ আছে যে, একবার তিনি কিছু লোকজনসহ বসেছিলেন। এমন সময় দু'ব্যক্তি এসে বললো, এখানকার কোন ব্যক্তি কি আমাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিতে পারে? সেখানে বসা জনৈক ব্যক্তি বললো, "আমি সিদ্ধান্ত দিতে পারি।" এতে হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) মুঠিভরে পাথর উঠিয়ে তার প্রতি নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, "চুপ, তাড়াতাড়ি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মাকরূহ।"

* * *

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন উনাইস জুহানি

হিজরাতের পর বিশ্বনেতা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) মদীনায় শুভ পদার্পণ করলেন। এতে শুধু মদীনাতেই নয়, বরং মদীনার উপকণ্ঠের এলাকাসমূহেও অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটতে লাগলো। ইসলামের এ প্রসারে ইহুদী এবং মুশরিকদের বুকের ওপরে যেন সাপ দৌড়াতে লাগলো। তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে নিত্যনতুন পরিকল্পনা তৈরী করলো। তারা শুধু লোকদেরকে হক দ্বীন কবুল থেকেই বিরত রাখতো না বরং হুযুর (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে নানা ধরনের কুৎসা রটনা করে বেড়াত। বনু হাযিলের খালিদ বিন নবিহ নামক এক ব্যক্তি এ ধরনের হকের দুশমন ছিল। সে ছিল বিশাল বপুর এক ভয়ংকর আকৃতির মানুষ। আর হকের বিরোধিতা করাই ছিল তার একমাত্র কাজ। প্রিয় নবী (সাঃ)-এর নিকট অব্যাহতভাবে তার অপকর্মের কথা পৌঁছতে লাগলো। একদিন তিনি সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ)-এর একটি দলের সামনে বললেন ঃ "খালিদ বিন নবিহকে খতম করবে?"

সাথে সাথে একজন সাহাবী উঠে দাঁড়ালেন। আবিদ হওয়ার কারণে তাঁর চেহারায় আলোর বিচ্ছুরণ ঘটছিলো। তিনি দাঁড়িয়ে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। এ কাজ আমার ওপর সোপর্দ করুন এবং সে ব্যক্তির কিছু চিহ্ন বলে দিন।"

প্রিয় নবী (সাঃ) বললেন ঃ "তার চিহ্ন হলো, তাকে যে দেখে সেই ভয় পায়।"

তিনি আরজ করলেন ঃ "হে আল্লার রাসূল ! আমি তো কখনো কাউকে ভয় করিনি।"

অতপর তিনি খালিদ বিন নবিহ'র বাসস্থানের দিকে রওয়ানা হলেন। তার বাসস্থান ছিল আরফাতে। সেখানে পৌঁছে খালিদকে তেমনি পেলেন যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন সাহসী মানুষ। তার

সাথে দু'চারটি কথা বলে তরবারী বের করে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং মুহূর্তের মধ্যে ধর থেকে মাথা খণ্ডিত করে ফেললেন। ফিরে এসে রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে আরজ করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহর সেই দুশমনকে যমালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

এ খবর শুনে রাসূল (সাঃ) খুব খুশী হলেন এবং তিনি তাঁকে নিজের লাঠি দান করে বললেনঃ "এ লাঠিতে হেলান দিও। যাতে তুমি কিয়ামতের দিন এ লাঠিসহ আমার সাথে সাক্ষাত করতে পার।"

রাসূল (সাঃ)-এর এ সাহবী যিনি নিজের জীবন বাজী রেখে হকের এক ভয়ংকর শত্রুকে জাহান্নামে পাঠিয়েছিলেন এবং এ সাহসিকতাপূর্ণ কাজের জন্য প্রিয় নবী (সাঃ) যাঁকে নিজের পবিত্র লাঠি প্রদান করেছিলন তিনি ছিলেন, হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন উনাইস জুহান্নি।

সাইয়েদেনা হযরত আবু ইয়াহিয়া আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন উনাইস মর্যাদাপূর্ণ সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি কাজায়া কবিলার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। বংশনামা হলোঃ আবদুল্লাহ বিন উনাইস বিন আসয়াদ বিন হারাম বিন হাবিব বিন মালিক বিন গানাম বিন কা'ব বিন তাইম বিন নাফাছাহ বিন ইয়াস বিন ইয়ারবু বিন বারক বিন দুবরাহ।

বারক বিন দুবরাহ'র সন্তান-সন্ততি জাহিনাহ কবিলার সাথে সংযুক্ত হয়ে গিয়েছিল। লোকজন তাকে জুহান্নাম বলে অভিহিত করতো। হযরত আবদুল্লাহ বিন উনাইস (রাঃ)-এর বংশ খাযরাজের বনু সালমাইর মিত্র। এজন্য তাদেরকে আনসারীও বলা হয়।

বাইয়াতে আকাবায়ে কবিরার পূর্বেই হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন উনাইস ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অতপর তিনি মদীনার ৭৪ জন, হকপন্থীর সাথে মক্কা গমন করেন এবং প্রিয় নবী (সাঃ)-এর হাতে বাইয়াত করেন ও তাঁকে মদীনা গমনের দাওয়াত দেন। এভাবে তিনি আকাবার সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত হন। তাদের মর্যাদা আনসারী বদরী সাহাবীদের থেকেও বেশী।

দ্বিতীয় আকাবার বাইয়াতের পর হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন উনাইস মক্কাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং পুনরায় মক্কী সাহাবীদের সাথে মদীনা হিযরত করেন। এ জন্য তাঁকে মুহাজিরী আনসারী বলা হয়। মদীনা পৌঁছে তাঁর ঈমানী আবেগ এ পর্যায়ে পৌঁছে যে, হযরত মায়াজ বিন জাবাল (রাঃ) এবং অন্যান্য যুবকের সাথে মিলে বনু সালমার প্রতিটি ঘরে যেতেন ও সেখানে অবস্থিত মূর্তি ভেঙ্গে বাইরে নিক্ষেপ করতেন। বনু সালমার এক নেতা আমর বিন জমুহ নিজের ঘরে রক্ষিত মূর্তিকে অত্যন্ত ভালবাসতো, আবেগে উদ্বেলিত এ সব যুবক রাতে তার অগোচরে মূর্তিটি নিয়ে আসে এবং আবর্জনার এক গর্তে নিক্ষেপ করে। সকালে নিদ্রা থেকে উঠে আমর মূর্তির অনুসন্ধানে বের হলো এবং তা আবর্জনার গর্তে উবু হয়ে পড়া অবস্থায় পেল। এতে খুব রাগান্বিত হলো এবং বলতে লাগলো, যে এ কাজ করছে তার খোঁজ পেলে একদম গিলে ফেলবো। যাহোক, মূর্তিটি উঠিয়ে সে ঘরে নিয়ে এলো এবং গোসল করিয়ে খুশবু লাগিয়ে যথাস্থানে রেখে দিল। কিন্তু এ মূর্তি ভাঙ্গা যুবকরা প্রত্যেকদিন মূর্তিটি নিয়ে আবর্জনার গর্তে নিক্ষেপ করতো। যখন কয়েকবার এ ঘটনা ঘটলো তখন আমর (রাঃ) বিন জমুহ মূর্তিটির ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে ঈমান গ্রহণ করলেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন উনাইস মদীনার বাইরে নিজের কবিলার সাথে এক নির্জন মরু বস্তিতে বাস করতেন। বিশ্ব নবী (সাঃ) হিজরতের পর মদীনা মুনাওয়ারাহ তাশরীফ আনলেন। তখন তিনি প্রায়ই রাসূল (সাঃ)-এর কয়েজ লাভ করতেন। কতিপয় নেতৃস্থানীয় চরিতকার লিখেছেন যে, তিনি আসহাবে সুফফার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সময় সময় নিজের গ্রামে চলে যেতেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন উনাইস বিরাট কলিজাওয়ালা এবং নির্ভীক মানুষ ছিলেন। রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তি ও ভালবাসা ছিল। হুযুর (সাঃ)-এর প্রতিটি নির্দেশ পালনের জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং মদীনা এসে বেশীর ভাগ সময় নবী (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত থাকার চেষ্টা করতেন। হুযুর (সাঃ) প্রথমে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়তেন। দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাসে যখন এ আয়াত নাযিল হলোঃ

"(হে নবী) আপনি আপনার মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফিরিয়ে নিন এবং হে মুসলমানরা! তোমরা যেখানেই থাকোনা কেন সে দিকেই মুখ ফিরিয়ে নেবে। এ নির্দেশের সাথে হুযুর (সাঃ) নিজের মুখ তৎক্ষণাৎ কাবার দিকে ফিরিয়ে নিলেন। সাহাবারা

কিরামও তাঁর অনুসরণ করলেন। এ সময় হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন উনাইসও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

যুদ্ধসমূহ শুরু হলে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন উনাইস সর্বপ্রথম ওহোদের যুদ্ধে শরীক হন এবং তারপর অন্যান্য সকল যুদ্ধেই রাসূল (সাঃ)-এর সহযাত্রী ছিলেন। মওলানা সাঈদ আনসারী মরহুম "সিয়রে আনসার" গ্রন্থে লিখেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন উনাইস বদরের যুদ্ধেও অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিকরা বদরী সাহাবীর যে তালিকা প্রদান করয়েছন তাতে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন উনাইসের নাম নেই।

বড় বড় যুদ্ধে অংশগ্রহণ ছাড়াও হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন উনাইস কয়েকটি বিশেষ অভিযানেও অংশ নিয়েছিলেন।

বনু হাযিলের ইসলামের শত্রু খালিদ বিন নবিহর হত্যার ঘটনা ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ হিজরীতে প্রিয় নবী (সাঃ) খবর পেলেন যে, খায়বারের এক ইহুদী নেতা আবু রাফে সালাম বিন আবিল হুকাইক গাতাফান প্রভৃতি গোত্রকে তার বিরুদ্ধে উস্কানী দিয়ে একটি বড় বাহিনী একত্রিত করছে এবং তারা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রিয় নবী (সাঃ) আবু রাফেকে উৎখাতের জন্য হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আতিকের নেতৃত্বে পাঁচজনের একটি দল খায়বার রওয়ানা করালেন। এ অভিযানে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন উনাইসও অংশ নিয়েছিলেন। এ পাঁচ মুজাহিদ মাথায় কাফন বেঁধে খায়বার গেলেন এবং আবু রাফেকে হত্যা করে মিশন সফল করে বিজয়ী বেশে ফিরে এলেন। এ অভিযানে অংশগ্রহণকারী অবশিষ্ট তিন সাহাবীর নাম হলোঃ হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ), হযরত মাসউদ (রাঃ) বিন সানান এবং হযরত খাযারী (রাঃ) ইবনুল আসওয়াদ।

একবার এক ইহুদী হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন উনাইসের মাথায় ওপর বাঁকা কাঠ দিয়ে এমন জোরে আঘাত করলেন যে, তার মাথা ফেটে গেল। তিনি স্বয়ং বর্ণনা করেছেন যে, আমি সেই অবস্থায় রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে হাজির হলাম। তিনি ক্ষতের ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে ফুঁ দিলেন। আমার ক্ষত সেরে গেল এবং আমার মাথায় আর কোনদিন কোন কষ্ট হয়নি। (তিবরানী)

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন উনাইস একজন বড় আবেদ ছিলেন। একবার পবিত্র রামাদান মাসে তিনি নির্জন মরুর বস্তিতে অবস্থান করছিলেন। সেখান থেকে প্রতিদিন

মসজিদে নববীতে আসা সম্ভব ছিল না এবং তিনি লাইলাতুল কদরে জেগে থাকতে চাহিলেন। অথচ তার কোন তারিখ নির্দিষ্ট ছিল না। তিনি নবী (সাঃ)-এর দরবারে দরখাস্ত করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আমার জন্য একটি তারিখ নির্দিষ্ট করে দিন। যাতে আমি সেদিন মসজিদে নববীতে উপস্থিত হয়ে শববিদারী বা রাত্রি জাগরণ করতে পারি।"

হুযুর (সাঃ) তাকে রামাদানের ২৩তম রাতে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। বস্তুতঃ হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সে রাত নির্দিষ্ট হয়েছিল। এজন্য লোকজন সে রাতের নাম দিয়েছিল "লাইলাতুল জুহনী"। এরপর প্রতিবছর এ রাতে মদীনাবাসী মসজিদে নববীতে একত্রিত হতেন এবং সকাল পর্যন্ত ইবাদাতে মশগুল থাকতেন।

বিশ্ব নবী (সাঃ)-এর ওফাতের কয়েক বছর পর হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন উনাইস মিসর সীমান্তের নিকট গাজার উপকন্ঠীয় শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। কতিপয় বর্ণনায় আছে যে, তিনি মিসর ও আফ্রিকাতেও গিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁর এ সফর জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য ছিল।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন উনাইস ৫৪ হিজরীতে ওফাত পান। হাফিজ আবু নয়িম ইসবাহানী (রঃ) মুহাম্মাদ বিন কা'ব (রঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মৃত্যুর পূর্বে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর কাছ থেকে প্রাপ্ত লাঠিসহ দাফন করার জন্য ওসিয়ত করেছিলেন। বস্তুতঃ ইন্তিকালের পর সেই পবিত্র লাঠি কাফনের মধ্যে তার পেটের ওপর রেখে দেয়া হয়েছিল এবং লাঠিসহই তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন উনাইস থেকে ১২৪ টি হাদীস বর্ণিত আছে। এ সকল হাদীস তিনি সরাসরি রাসূলে আকরাম (সাঃ) এবং হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে হযরত জাবের (রাঃ) বিন আবদুল্লাহ, হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রাঃ), আবদুল্লাহ বিন আবি উমাইয়াহ, আবদুর রহমান (রাঃ) ও হযরত কা'ব বিন মালিক (রাঃ)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হাদীস বর্ণনায় তাঁর মর্যাদা এ ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় যে, একবার জালিলুল কদর সাহাবী হযরত জাবের (রাঃ) বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) আনসারী এক মাসের দূরত্ব অতিক্রম করে শুধুমাত্র একটি হাদীস শ্রবণের জন্য তাঁর নিকট খাজা হতে এসেছিলেন।

আকিদাহ এবং নৈতিকতার দিক দিয়ে তাঁর একটি হাদীস অত্যন্ত মশহুর হয়ে আছে। এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলছেন, কবিরাহ গুনাহর মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ হলোঃ

০ আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা।

০ মাতা-পিতার নাফরমানী করা।

০ জেনে-শুনে মিথ্যা কসম খাওয়া এবং আদালতে কসমকারী যদি মাছির পাখনা সমান গরবড় করে তাহলে আল্লাহর তরফ থেকে তার অন্তরে কিয়ামত পর্যন্ত একটি চিহ্ন লাগিয়ে দেয়া হয়।

* * *

রাফায়াহ (রাঃ) বিন রাফে' (রাঃ) আনসারী

সাইয়েদেনা হযরত আবু মায়াজ রাফায়াহ (রাঃ) ছিলেন এক মহান মর্যাদা সম্পন পিতার সন্তান। তিনি শুধু অগ্রবর্তী পবিত্র আনসার দলের একজন খ্যাতনামা সদস্যই ছিলেন না বরং হকের পথে নিজের জীবন কুরবানী করার সুযোগও পেয়েছিলেন। অর্থাৎ হযরত রাফে (রাঃ) বিন মালিক যারকী রাসূল (সাঃ)-এর নবুয়াত প্রাপ্তির ১১ বছরে সর্বপ্রথম মক্কা গিয়ে রাসূলে (সাঃ)-এর দর্শন এবং বাইয়াতের সৌভাগ্য অর্জন করেন। অতপর নবুয়াতের ১২ বছরে ১১ জন সাথীসহ দ্বিতীয়বার মক্কা গমন করেন এবং হুযুর (সাঃ)-এর হাতে বাইয়াত হন। সে সময়ই তাঁর স্ত্রী উম্মে মালিক (রাঃ) এবং ভাগ্যবান পুত্র হযরত রাফায়াহ (রাঃ) ঈমান আনয়ন করেন। নবুয়াতের ১৩ বছরে হজ্বের মওসুমে হযরত রাফে' (রাঃ) মদীনার ৭৪ জন ঈমানদারের সাথে তৃতীয়বার মক্কা যান এবং "লাইলাতুল আকাবাহ'তে হুযুর (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ ও বাইয়াত গ্রহণ করেন। এ বাইয়াত ইতিহাসে মাইল ষ্টোন হিসেবে খ্যাত।

কতিপয় নেতৃস্থানীয় ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, হযরত রাফে' (রাঃ) নবুয়াতের ১৩ বছরে নিজের ভাগ্যবান পুত্র হযরত রাফায়াহ (রাঃ)-কেও সাথে এনেছিলেন। এভাবে যুবক রাফায়াহ (রাঃ)-ও বাইয়াতে আকাবাহ কাবিরাতে শরীক হওয়ার মহান সুযোগ লাভ করেছিলেন। খাযরাজ গোত্রের বনু যারিক শাখার সাথে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তাঁর বংশনামা হলোঃ রাফায়াহ (রাঃ) বিন রাফে' (রাঃ) বিন মালিক বিন আজলান বিন আমর বিন আমের বিন যারিক বিন আবদি হারেছাহ বিন গাজাব বিন জাশম বিন খাযরাজ।

হযরত রাফায়াহ (রাঃ)-এর মাতা হযরত উম্মে মালিক (রাঃ) বিনতে উবাই বনু হুবলা (খাযরাজ)-এর সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাইর বোন ছিলেন। আল্লাহর কি কুদরাত যে, ইবনে উবাই ছিল মুনাফিকদের সরদার। আর তার বোন, ভগ্নিপতি এবং ভাগিনেয় রাসূল (সাঃ)-এর জান নিছার সাহাবীদের দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।

প্রিয় নবী (সাঃ)–এর হিজরতের পর যুদ্ধ সমূহ শুরু হলো। এ সময় হযরত রাফায়াহ (রাঃ) হক ও বাতিলের মধ্যেকার সর্বপ্রথম সংঘর্ষ বদরের যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং বদরী সাহাবী হওয়ার স্থায়ী মর্যাদার সুযোগ লাভ করেন। এ যুদ্ধে তিনি ওয়াহাব বিন উমাইর আমরী নামক মুশরিককে গ্রেফতার করেন।

বদরের পর রাফায়াহ (রাঃ) সম্মানিত পিতা হযরত রাফে' (রাঃ) বিন মালিকের সাথে ওহোদের যুদ্ধে শরীক হন। পিতা–পুত্র উভয়েই অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। যুদ্ধে হযরত রাফে' (রাঃ) শাহাদাত প্রাপ্ত হন। আর এমনিভাবে হযরত রাফায়াহ (রাঃ) অপিলুর কারণ পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হন।

ওহোদের যুদ্ধের পর হযরত রাফায়াহ (রাঃ) পরিখার যুদ্ধে অংশ নেন। ৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে হযরত রাফায়াহ (রাঃ) বাইয়াতে রিদওয়ানের মহান সৌভাগ্য লাভ করেন। এমনিভাবে তিনি "আসহাবিশ্ শাজারাহ"তে শামিল হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সার্টিফিকেটে ভূষিত হন। এরপর তিনি খায়বার, মক্কা বিজয় এবং অন্যান্য যুদ্ধে রাসূল (সাঃ)–এর সহগামী হন।

রহমতে আলম (সাঃ) –এর ওফাতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এবং হযরত ওসমান জন্নুরাইন (রাঃ)–এর খিলাফতকালে হযরত রাফায়াহ (রাঃ)–এর তৎপরতার বিবরণ কোন কিছু ইতিহাসে পাওয়া যায় না। অবশ্য হযরত আলী (রাঃ)–এর খিলাফতকালে তিনি হযরত আলী (রাঃ)–এর একজন শক্তিশালী সমর্থক ছিলেন। উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) হযরত উসমান (রাঃ) হত্যার বিচারের দাবী নিয়ে দাঁড়ালেন এবং হযরত তালহা (রাঃ) ও হযরত যোবায়ের (রাঃ)–কে সাথে নিয়ে বসরা গেলেন। এতে হযরত আলী (রাঃ) খুবই দুঃখিত হলেন। তিনি নিজের সমর্থক এক দলের সামনে বললেনঃ

"রাসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর ইন্তিকালের পর আহলে বাইত হওয়ার ভিত্তিতে আমরা রাসূল (সাঃ)–এর খিলাফতের সবচেয়ে বেশী হকদার হওয়ার কথা মনে করতাম। কিন্তু লোকেরা যখন অন্যদেরকে খলিফা বানালো তখন আমরা ধৈর্য ধারণ করলাম এবং ফিতনা ফাসাদ থেকে বিরত থাকলাম। এর ফল খুবই ভালো হলো। এরপর লোকেরা বিদ্রোহ করে ওসমান (রাঃ)–কে হত্যা করলো। তাঁর শাহাদাতের পর সাধারণ মানুষ স্বেচ্ছায় উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে আমার হাতে বাইয়াত করলো। আমি কারো ওপর শক্তি

প্রয়োগ করিনি। বাইয়াতকারীদের মধ্যে তালহা (রাঃ) এবং যোবায়ের (রাঃ)-ও ছিলেন। কিন্তু একমাস অতিক্রান্ত না হতেই তারা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছেন এবং সৈন্যসহ বসরা পৌঁছেন। আল্লাহ পাক এ ফিতনা-ফাসাদ দেখছেন।"

এখানে হযরত রাফায়াহ (রাঃ)-ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমিরুল মুমিনিন (রাঃ)-এর বক্তৃতা শুনে আরজ করলেনঃ

"আমিরুল মুমিনিন। নবী করিম (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর হক পথে কুরবানীর ভিত্তিতে আমরা আনসাররাই খিলাফতের সবচেয়ে বেশী যোগ্য বলে মনে করতাম। কিন্তু কুরাইশের মুহাজিররা রাসূল (সাঃ)-এর সাথে নিজেদের নিকটতম সম্পর্ক, ইসলাম গ্রহণে অগ্রবর্তী ভূমিকা এবং হিজরতের মত ফজিলত বর্ণনা করে নিজেরেদেরকে খিলাফতের যোগ্য বলে প্রমাণিত করলেন। আমরা মনে করলাম যে, কিতাব ও সুন্নাত কায়েম আছে এবং হকের ভিত্তিতেই কাজ হচ্ছে। অতএব, আমরা কুরাইশের খিলাফতের দাবী মেনে নিলাম এবং আমাদেরকে এটাই করা উচিত ছিল। এখন আপনার হাতে বাইয়াত গ্রহণের পর কতিপয় ব্যক্তি আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহর কসম! আমরা আপনাকেই তাদের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি। আপনি যে নির্দেশই দিন না কেন, আমরা তা পালন করবো।"

হযরত রাফায়াহ (রাঃ)-এর বক্তৃতার পর আরও কতিপয় বুজর্গ একই ধরনের আবেগময় ভাষণ দিলেন এবং হযরত আলী (রাঃ) নিজের সমর্থকদের নিয়ে বসরা রওয়ানা হয়ে গেলেন। সেখানে উষ্ট্রের যুদ্ধের দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হলো। এ যুদ্ধে হযরত রাফায়াহ (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে ছিলেন। এরপর তিনি সিফ্‌ফিনের যুদ্ধেও হযরত আলী (রাঃ)-এর প্রতি পূর্ণ সমর্থন দান করেন।

৪০ হিজরীতে হযরত আলী (রাঃ) শহীদ হলেন। হযরত রাফায়াহ (রাঃ)-ও তারপর বেশীদিন জীবিত ছিলেন না। ভিন্ন মত অনুযায়ী তিনি ৪১ অথবা ৪২ হিজরীতে ওফাত পান। সন্তানদের মধ্যে মায়াজ (রাঃ) এবং ওবায়েদ (রঃ) নামক দু'পুত্রের নাম জানা যায়। হযরত রাফায়াহ (রাঃ) থেকে বেশ কিছু হাদীস বর্ণিত আছে।

* * *

হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বিন জাবার আনসারী

নবুয়াতের ১২ বছর পর হযরত মাছয়াব (রাঃ) বিন উমায়ের ইসলামের প্রথম মুবাল্লিগ হিসেবে মদীনা মুনাওয়ারাহ গমন করেন। সেখানে তাবলিগের কাজ শুরু করার পর আওস গোত্র সরদার হযরত সায়াদ (রাঃ) বিন মায়াজ তাদের মহল্লায় গমনে তাঁকে বাধা দান করেন। কিন্তু হযরত মাছয়াব (রাঃ) যখন তাঁকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেলন তখন তাঁর সুন্দর কথা এবং ধৈর্যে খুব প্রভাবিত হয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তিতে তার নিজের গোত্র বনু আবদুল আশহাল সেই দিনই মুসলমান হয়ে গেল। আওসের অন্যান্য পরিবারেও ইসলাম দ্রুততার সাথে বিস্তার লাভ করলো। সে যুগেই আওস গোত্রের শাখা বনু হারেছার এক সুন্দর স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তি আবদুল উজ্জাহ ইসলাম গ্রহণ করেন। বিশ্বনেতা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সাঃ) হিজরাতের পর মদীনায় শুভ পদার্পন করলেন। এ সময় একদিন আবদুল উজ্জাহ রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ! এখানে আপনার আগমনের পূর্বেই আল্লাহ পাক আমাকে ইসলামের নিয়ামতে সমৃদ্ধ করেছেন।"

হুযুর (সাঃ) একথা শুনে খুশী প্রকাশ করলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কি? " তিনি বললেন, "আবদুল উজ্জাহ।" প্রিয় নবী (সাঃ) বললেন, "না, আজ থেকে তোমার নাম হবে আবদুর রহমান।"

বনু হারেছার এ ব্যক্তি যাকে প্রিয় নবী (সাঃ) 'আবদুর রহমান ' নাম দিয়েছিলেন ইতিহাসে তিনি আবু আবাস কুনিয়াতে মশহুর হয়ে আছেন। তাঁর নসবনামা হলোঃ আবু আবাস আবদুর রহমান বিন জাবার বিন আমর বিন যায়েদ বিন হাশাম বিন মাজদায়াহ বিন হারেছাহ বিন হারেছ বিন খাযরাজ বিন আমর বিন মালিক বিন আওস।

হযরত আবু আবাছ (রাঃ) নবুয়াতের ১৩ পর হজের মওসুমে মক্কা গিয়ে লাইলাতুল আকাবার অংশ নিতে পারেননি। তবে তাঁর একজন বন্ধু হযরত আবু বুরদাহ (রাঃ) বিন নিয়ার আসহাবে উকবার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। হযরত আবু বুরদাহ

(রাঃ) মক্কা থেকে ফিরে এলেন এবং হযরত আবাছ (রাঃ)-কে মক্কায় সংঘটিত ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত করলেন। খবরাদি শুনে তাঁর ঈমানী আবেগ উদ্বেলিত হয়ে ওঠলো। হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) "ইসাবাহ" তে লিখেছেন যে, হযরত আবু আবাছ (রাঃ) হযরত আবু বুরদাহ (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে নিজের গোত্রের মূর্তি ভেঙ্গে ফেললেন। এ ঘটনার কিছুদিন পর প্রিয় নবী (সাঃ) মদীনা তাশরীফ আনলেন। এ সময় অন্য আনসার ভাইদের সাথে হযরত আবু আবাছ (রাঃ)-ও রাসূলুল্লাহ(সাঃ)-কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলেন এবং মুহাজির সাহাবীদেরকে অত্যন্ত সুপ্রসন্ন চিত্তে মেহমানদারী করলেন। হিজরতের পাঁচ মাস পর প্রিয় নবী (সাঃ) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে দ্বিনী ভ্রাতৃত্ব কায়েম করেন। হযরত আবু আবাছ (রাঃ)-এর ভ্রাতৃত্বে আসেন জলিলুল কদর মুহাজির সাহাবী হযরত খুনাইস (রাঃ) বিন হাজাফাহ।

হযরত আবু আবাছ (রাঃ) আনসারে আঙ্গুলে গোণা কয়েক ব্যক্তির অন্যতম ছিলেন যাঁরা জাহেলী যুগেও আরবী লিখা-পড়া জানতেন। আল্লামা ইবনে আছির (রাঃ) "উসুদুল গাব্বাহ" গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে লিখেছেনঃ "তিনি ইসলামগ্রহণের পূর্বে আরবী লিখতেন।"

নবী (সাঃ)-এর হিজরতের পর হযরত আবু আবাছ (রাঃ) প্রায়ই তাঁর নিকট যেতেন এবং সামর্থ অনুযায়ী ফয়েজ লাভ করতেন। এভাবে তিনি কুরআন ও হাদীস শাস্ত্রে প্রভূত ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন।

যুদ্ধসমূহের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং বদরী সাহাবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৪৮ বছর।

প্রিয়নবী (সাঃ) মদীনা মুনাওয়ারাহ তাশরীফ আনার পর মদীনার ইহুদীদের সাথে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য চুক্তি ও সন্ধি করেছিলেন। ইহুদীরা মদীনা চুক্তি নামে খ্যাত এ চুক্তিতে দস্তখত করেছিলেন ঠিকই কিন্তু তারা গোপনে গোপনে হকপন্থীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলো। কা'ব বিন আশরাফ নামক তাদের এক সরদার এ ব্যাপারে বেশী অগ্রগামী ছিল। সে একজন অনলবর্ষী বক্তা এবং শক্তিশালী কবি ছিল এবং মুসলমানদের কোনরকম তোয়াক্কাই করতো না। সে কবিতার মাধ্যমে রাসূল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে বিষ প্রকাশ করতো।

হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) বর্ণনা করেছেন, সে হতভাগা একবার প্রিয় নবী (সাঃ)-কে শহীদ করার পরিকল্পনা এঁটেছিল। কিন্তু ব্যর্থ হয়। বদরের যুদ্ধে কুরাইশ মুশরিকদের পরাজয় হলো। কা'ব এ সময় নিহত কুরাইশদের স্মরণে মরসিয়া রচনা করলো এবং

তাদের নিকট শোক প্রকাশের জন্য মক্কা গেল। সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করে তাদের নিহতদের বদলা নেয়ার জন্য উত্তেজিত করলো। মদীনা ফিরে এসে নিজের কওমের মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগের চেয়ে বেশী উত্তেজনা ছড়াতে লাগলো এবং প্রিয়নবী (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে নিত্য-নতুন কবিতা বাঁধতে লাগলো। তার এ তৎপরতা শুধুমাত্র মদীনা চুক্তির খেলাপই ছিল না বরং তা গাদ্দারীর সংজ্ঞায় পড়তো। হুযুর (সাঃ) বেশ কিছু দিন যাবৎ তার এ তৎপরতা উপেক্ষা করে আসছিলেন। কিন্তু যখন সে মদীনা মুনাওয়ারায় নতুন নগর রাষ্ট্রের জন্য বিপদজনক হয়ে উঠলো তখন একদিন তিনি সাহাবীদের সামনে কা'ব বিন আশরাফের অপতৎপরতায় অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং সাহাবীদেরকে এ ব্যাপারে তদারক করার উৎসাহ দিলেন। হুযুর (সাঃ)-এর ইরশাদ শুনে আনসারের পাঁচ ব্যক্তি ফিতনা উৎখাতের সংকল্প করলো। কিন্তু কা'ব বিন আশরাফের মূলোৎপাটন সহজ কাজ ছিল না। তার বাসস্থান অথবা মহল এক মজবুত দুর্গ সদৃশ ছিল এবং নিজের রক্ষার জন্য সে অনেক সশস্ত্র যুবক নিয়োগ করেছিল। এ সত্ত্বেও আনসারী জানবাজরা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর খাতিরে নিজেদের জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে একরাতে কা'বের দুর্গে প্রবেশ করে তার ভবলীলা সাঙ্গ করে ফেললো। ইসলামের এ সর্বনিকৃষ্ট দুশমন হত্যাকারী জানবাজ লোকদের অন্যতম ছিলেন হযরত আবু আবাছ আবদুর রহমান (রাঃ)।

এ ঘটনার পর হযরত আবু আবাছ (রাঃ) ওহোদের যুদ্ধ, পরিখার যুদ্ধ এবং রাসূল (সাঃ)-এর যুগে সংঘটিত বেশীর ভাগ অন্য যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। কতিপয় বর্ণনায় আছে যে, রিসালাত যুগের শেষ দিকে হযরত আবু আবাছ (রাঃ) অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এ অবস্থায় তিনি একদিন হুযুর (সাঃ)-এর খিদমতে হাজির হলেন। তিনি রাস্তা চলার জন্য তাঁকে একটি লাঠি প্রদান করেছিলেন।

হযরত আবু আবাস আবদুর রহমান ৩৪ হিজরীতে কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। আমিরুল মু'মিনিন হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁর পীড়ার খবর পেয়ে দেখতে এলেন। এ অসুখই তাঁর শেষ অসুখ ছিল এবং ইসলামের এ মহান সন্তান প্রায় ৮০ বছর বয়সে আল্লাহর সান্নিধ্যে পাড়ি জমালেন। আমিরুল মুমিনিন হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রাঃ) জানাজার নামায পড়ালেন বাকি গোরস্তানে দাফন করলেন। হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বিন নুমান হযরত আবু বুরদাহ (রাঃ) বিন নিয়ার এবং হযরত মুহাম্মাদ (রাঃ) বিন মাসলামাহর মত মহান সাহাবী তাঁর লাশ কবরে নামিয়েছিলেন।

হযরত আবু আবাছ (রাঃ) মুহাম্মাদ (রাঃ) এবং যায়েদ (রঃ) নামক দু'পুত্র রেখে যান। তিনি হাদীস বর্ণনায় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। হাদীসের কিতাবসমূহে তাঁর থেকে বর্ণিত মাত্র পাঁচটি হাদীস পাওয়া যায়।

এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত আবু আবাস (রাঃ) বৃদ্ধকালে চুলে মেহেদি লাগাতেন।

* *

*

হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিত আনসারী

বিশ্ব নেতা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারাহ আগমন করলেন। তাঁর শুভাগমনে এ প্রাচীন শহর নব বসন্তে সজ্জিত হলো। মদীনার অলি-গলি রিসালাতের সুগন্ধিতে ভরপুর হয়ে গেল। একদিন কতিপয় আনসারী সাহাবী ১২ বছর বয়স্ক এক তরুণকে হুযুর (সাঃ)-এর পবিত্র খিদমতে সমপস্থিত করে আরজ করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ তরুণ বনু নাজ্জারের আশার প্রদীপ। পবিত্র কুরআনের প্রতি তার আকর্ষণ এত বেশী যে, ইতিমধ্যেই ১৭টি সূরা মুখস্ত করে ফেলেছে।"

রহমতে আলম (সাঃ) একথা শুনে খুব খুশী হলেন এবং বনু নাজ্জারের সেই সৌভাগ্যবান সন্তানকে পবিত্র কুরআন পাঠের নির্দেশ দিলেন। তিনি নির্দেশ পালনার্থে তৎক্ষণাৎ ১৭টি সূরা পাঠ করলেন। প্রিয় নবী (সাঃ)-এর বিস্মিত চেহারায় আলোকচ্ছটা ঝলমলিয়ে উঠলো। তিনি ভাগ্যবান পুত্রের মাথায় স্নেহের হাত বুলালেন এবং তার কল্যাণের জন্য দোয়া করলেন। পবিত্র কুরআনের প্রতি এত অধিক আকর্ষণ পোষণকারী এ মাদানী তরুণের নাম ছিল হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিত আনসারী।

সাইয়েদেনা হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিত আনসারী ছিলেন মর্যাদাবান সাহাবীদের অন্যতম, দ্বিনী এবং ইলমী খিদমতের কারণে কতিপয় সাহাবীর মত তিনিও উম্মাহর স্তম্ভ হিসেবে পরিগণিত। তাঁর কুনিয়ত ছিল আবু সাঈদ এবং আবু খারেজাহ। কেউ কেউ আবার আবু আবদুর রহমান নামের তৃতীয় কুনিয়তের কথাও উল্লেখ করেছেন। উম্মাহর জ্ঞানের সাগর, ওহির কাতিব, ক্বারী এবং ফরয সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞ এ সকল উপাধি ছিল তাঁর। খাযরাজের সম্ভ্রান্ততম শাখা বনু নাজ্জারের সাথে ছিল তাঁর সম্পর্ক। তার নসবনামা হলোঃ যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিত বিন জাহহাক বিন যায়েদ বিন লওজান বিন আমর বিন আবদি বিন আওফ বিন গানাম বিন মালিক বিন নাজ্জার।

হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর পিতা ছাবিত বিন জাহহাক নবী (সাঃ)-এর হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে বুয়াছের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। সে সময় হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর বয়স মাত্র ৬ বছর ছিল। তিনি মাতা নাওয়ার বিনতে মালিকের স্নেহে লালিত পালিত হন।

হিজরতের একবছর পূর্বে ইসলামের প্রথম মুবাল্লিগ হযরত মুস্আব (রাঃ) বিন উমাইর মদীনা আগমন করেন। তাঁর তাবলিগী প্রচেষ্টায় আওস এবং খাযরাজ গোত্রের সকল পরিবারে ইসলামের চর্চার বিস্তার লাভ ঘটে। সে যুগে মদীনার যে সকল পুন্যাত্মা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিতও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সে সময় তার বয়স ছিল ১১ বছর। আল্লাহ পাক তাঁকে অত্যন্ত পবিত্র স্বভাব দান করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করেই অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা লাভ শুরু করেন। এমনকি প্রিয় নবী (সাঃ)-এর মদীনা শুভাগমনের পূর্বেই ১৭টি সূরা হেফজ করে ফেলেছিলেন। কুরআনের প্রতি এ আকর্ষণের কারণে আনসারদের মধ্যে তাঁকে বিশেষ নজরে দেখা হতো। হিজরতের পর হযরত যায়েদ (রাঃ) বেশীর ভাগ সময় নবী (সাঃ)-এর ফয়েজ লাভের জন্যই কাটাতেন। অত্যন্ত মেধাসম্পন্ন হওয়ার কারণে খুব শীঘ্র জ্ঞানের মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর বিশেষ সান্নিধ্য লাভ করেন। চরিতকাররা বলেছেন, হযরত যায়েদ (রাঃ) শুধু আরবী ভাষাই লিখতে পড়তে জানতেন না বরং হুযুর (সাঃ)-এর ইঙ্গিতে ইবরানী এবং সুরইয়ানী ভাষাও শিখেন এবং খুব কম সময়ে এ ভাষাদ্বয়ে লিখা-পড়ার অনুশীলনীও চালান। পরবর্তী পর্যায়ে আরো অগ্রসর হয়ে তিনি তাওরাত এবং ইঞ্জিলেরও আলেম হয়ে যান। আল্লামা মাসউদী (রঃ) "কিতাবুত তানবিহ ওয়াল আশরাফ" গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত যায়েদ (রাঃ) হাবশী, কিবতী, রোমক এবং ফারসী ভাষাও জানতেন। মদীনায় যারা এ সকল ভাষা জানতেন তাদের নিকট থেকে তিনি তা শিখেছিলেন।

হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর হস্তলিপি ছিল অত্যন্ত সুন্দর। তিনি একজন ভালো কারুশিল্পী ছিলেন। ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একজন অংকে বিশারদ ছিলেন এবং অংকের জটিলতম সমস্যাদি মুহূর্তের মধ্যে সমাধান করে দিতেন।

প্রিয় নবী (সাঃ) হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিতের যোগ্যতার খুব কদর করতেন। তিনি তাঁকে কাতিবে ওহির পদে নিয়োগ করেছিলেন। রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি শুধু ওহিই লিখতেন না, বরং অন্যান্য দেশের রাজা-বাদশাহর যে সকল পত্রাবলী আসতো, রাসূল (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে তার জবাবও লিখতেন।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে বর্ণিত আছে যে, হযরত যায়েদ (রাঃ) প্রিয় নবী (সাঃ)-এর অত্যন্ত সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। কোন কোন সময় তিনি হুযুর (সাঃ)-এর পাশে বসে যেতেন। প্রিয় নবী (সাঃ) স্নেহবশতঃ তাঁর রানের ওপর নিজের পবিত্র উরু রাখতেন। একদিন সেই অবস্থায়ই রাসূল (সাঃ)-এর ওপর ওহী নাযিল হলো। হযরত যায়েদ (রাঃ) বলেনঃ "সে সময় হুযুর (সাঃ)-এর পবিত্র উরু আমার নিকট এত ভারী

মনে হল যে, আমার রান বুঝি ভেঙে চুরে যাবে।" কিন্তু নবী (সাঃ)-এর প্রতি এত আদব ছিল যে, তিনি মুখ দিয়ে উহ শব্দও উচ্চারণ করেন নি এবং অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে বসেছিলেন।

রাসূলে আকরাম (সাঃ) ওহী লিখার কাজ অন্যান্য সাহাবী (রাঃ) দিয়েও করিয়েছিলেন। এভাবে পত্র লিখনের কাজও অন্য সাহাবীরা করেছিলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর নাম এ জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে আছে যে, তিনি নবী (সাঃ)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছিলেন।

মুসনাদে আহমাদ (রঃ)-এ বর্ণিত আছে যে, যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিত দোয়াত-কলম হাড়ের টুকরো অথবা হাল্কা পাথর প্রভৃতিসহ রাসূল (সাঃ)-এর নিকট বসে যেতেন। যখন ওহী নাযিল হতো তখন হুযুর (সাঃ)-এর পবিত্র মুখে যা শুনতেন তা লিখে নিতেন। কোন কোন সময় প্রিয় নবী (সাঃ) ওহী লিখনের ব্যাপারে তাঁকে বিশেষ হেদায়েত দিলে তা তিনি অবিলম্বে পালন করতেন।

নবী (সাঃ)-এর হিজরতের পর তিনি বেশীরভাগ সময় ওহী লিখার কাজে ব্যয় করেছেন। যা কিছু লিখতেন তাই অন্তরে গেঁথে নিতেন। অন্যান্য সাহাবী ওহীর যে অংশ লিখতেন তাঁদের নিকট থেকেও তিনি তা শুনে মুখস্ত করে নিতেন। এ ভাবে রাসূল (সাঃ)-এর যুগেই তিনি সমগ্র কুরআন শরীফ মুখস্ত করে নিয়েছিলেন।

সহীহ বুখারীতে আছে যে, যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিত শুধুমাত্র পুরো কুরআনেরই হাফেজ ছিলেন না বরং তিনি হুযুর (সাঃ)-এর সম্মুখেই বিভিন্ন বস্তুর ওপর লিখিত কুরআনের সকল অংশ একত্রিতও করেছিলেন।

হক ও বাতিলের প্রথম সংঘর্ষ দ্বিতীয় হিজরীর রামাদান মাসে বদরের ময়দানে সংঘটিত হয়েছিল। সে সময় হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিতের বয়স ছিল ১৩ বছর। যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য হুযুর (সাঃ) বয়স নির্ধারণ করেছিলেন কমপক্ষে ১৫ বছর। কিন্তু হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর ঈমানী উদ্দীপনা এত ছিল যে, কতিপয় যুবকের সাথে রাসূল (সাঃ)-এর নিকট হাজির হলেন এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। হুযুর (সাঃ) তাদের ঈমানী আবেগের প্রশংসা করলেন। কিন্তু যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দিলেন না। এতে তিনি নিরুপায় হয়ে মদীনা ফিরে এলেন।

ওহোদের যুদ্ধেও (তৃতীয় হিজরী) হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর অংশগ্রহণ সম্পর্কে মতভেদ আছে। অবশ্য পরিখার যুদ্ধে (পঞ্চম হিজরী) তাঁর অংশগ্রহণ সম্পর্কে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন। এ সময় তাঁর বয়স প্রায় ১৬ বছর ছিল। ইবনে সায়াদ (রাঃ)

বলেছেন, পরিখা খননে তিনি অত্যন্ত তৎপরতার সাথে অংশ নিয়েছিলেন। হুযুর (সাঃ) তাঁকে পরিখা থেকে মাটি বের করতে দেখে খুব খুশী হয়েছিলেন এবং বলেছিলেনঃ "কি ভালো ছেলে।" ঘটনাক্রমে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। হযরত আম্মারাহ (রাঃ) বিন হাযম আনসারীর দৃষ্টি তাঁর ওপর পড়লে মজাক করে তিনি তার অস্ত্র খুলে নিলেন। আত্মীয়তার দিক থেকে হযরত আম্মারাহ (রাঃ) হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর চাচা হতেন এবং বয়সে তার চেয়ে বেশ বড় ছিলেন। সম্ভবতঃ অস্ত্র খুলে নিয়ে তিনি তাঁকে সতর্ক করতে চেয়েছিলেন যে, এ অবস্থায় ঘুমানো ঠিক নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও হযরত যায়েদ (রাঃ) ক্লান্তির কারণে এত গভীর নিদ্রামগ্ন ছিলেন যে, অস্ত্র খুলে নেয়া টেরই পেলেন না। প্রিয় নবী (সাঃ) সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি কৌতুক করে বললেন, "হে ঘুমের পিতা ওঠো।" তিনি নিদ্রা থেকে জাগলে হুযুর (সাঃ) সাহাবীদেরকে সম্বোধন করে বললেন, "কারো সাথে এ ধরনের মজাক বা ঠাট্টা করো না।"

পরিখার যুদ্ধের পর হযরত যায়েদ (রাঃ) অন্যান্য যুদ্ধেও রাসূল (সাঃ)-এর সাথে অংশ নিয়েছিলেন। তাবুকের যুদ্ধেও তিনি অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে যোগদান করেন। এ যুদ্ধে তার গোত্র মালিক বিন নাজ্জারের ঝাণ্ডা হযরত আম্মারাহ (রাঃ) বিন হাজামের নিকট ছিল, হুযুর (সাঃ) এ ঝাণ্ডা তাঁর নিকট থেকে নিয়ে হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিতের কাছে সমর্পন করলেন। হযরত আম্মারাহ (রাঃ) আরজ করলেনঃ "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমার কি অপরাধ হয়েছে।"

প্রিয় নবী (সাঃ) বললেনঃ "তেমন কিছু ঘটেনি। আমি যায়েদকে ঝাণ্ডা শুধু এ জন্য দিয়েছি যে, সে তোমার থেকে কুরআন বেশী পড়েছে।"

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর ছকিফায়ে বনু সায়েদাতে আনসারদের এক সমাবেশ হলো। হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিতও তাতে যোগদান করেন। এ সমাবেশে কতিপয় বুজর্গ আনসার খাযরাজ গোত্রের নেতা হযরত সায়াদ (রাঃ) বিন উবাদাহকে খলিফা বানানোর প্রস্তাব পেশ করলো এবং আনসারদের খিলাফতের হকদার প্রমাণের জন্য জোরে শোরে বক্তৃতা করলেন। হযরত যায়েদ (রাঃ) এ সময় চুপ রলেন। ইত্যবসরে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এবং হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) ইবনুল জাররাহও এ সমাবেশে উপস্থিত হলেন। তাঁরা কুরাইশ মুহাজিরদের খিলাফতের হকদার হওয়া সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলেন এবং এ কথাও তারা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন যে, আরববাসী কুরাইশের নেতৃত্ব ব্যতীত অন্যের নেতৃত্ব মেনে নেবে না। এ সময় আনসারদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত যায়েদ (সাঃ) বিন ছাবিতই তাদের সমর্থনে কথা বলেন। তিনি জানান, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুহাজিরদের

মধ্যে ছিলেন। এ জন্য ইমামও মুহাজিরদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করা উচিত। আমরা যেভাবে রাসূল (সাঃ)-এর আনসার বা সাহায্যকারী ছিলাম তেমনি ইমামেরও সাহায্যকারী থাকবো।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) সাহসিকতাপূর্ণ বক্তৃতা দানের জন্য হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিতকে মুবারকবাদ দিলেন এবং তার মঙ্গলের জন্য দোয়া করলেন। এরপর হযরত যায়েদ (রাঃ) অন্য কতিপয় আনসারসহ সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর হাতে বাইয়াত হন।

হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) নিজের খিলাফত কালে হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে খিলাফতের পদে বহাল রাখেন এবং মজলিশে শূরার সদস্য নিয়োগ করেন। ধর্মত্যাগের ফিতনার শুরুতে হযরত যায়েদ (রাঃ) মদীনা মুনাওয়ারার প্রতিরক্ষায় রাসূল (সাঃ)-এর খলিফার সাহায্য করেন। অতপর তিনি মুসায়লামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামার রক্তাক্ত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। যুদ্ধ কালে তাঁর শরীরে একটি তীর বিদ্ধ হয়। কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁকে রক্ষা করেন। এ যুদ্ধে অসংখ্য কুরআনের হাফিজ শহীদ হন। এতে পবিত্র কুরআনের কোন অংশ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়। সুতরাং হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর দৃষ্টি আকর্ষণের ফলে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) কুরআনে হাকিমের সকল লিখিত অংশ একত্রিত করে এক মুসহাফের আকৃতিতে সংকলন করার দায়িত্ব হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিতের ওপর অর্পন করেন। প্রথমতঃ এ দায়িত্ব পালনে হযরত যায়েদ (রাঃ) খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি সিদ্দিকে আকবর (রাঃ)-এর অনুপ্রেরণায় এ কাজে অগ্রসর হলেন। রাসূল (সাঃ)-এর খলিফা এ মহান কাজে তাঁকে সাহায্য করার জন্য ৭৫ জন সাহাবী (রাঃ)-এর একটি দল নিয়োগ করলেন।

যদিও রাসূল (সাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই হযরত যায়েদ (রাঃ) কুরআনে হাকিমের সকল অংশ একত্রিত করেছিলেন তবুও যে সকল অংশ তখনো মানুষের নিকট ছিল তাও তিনি নিয়ে একত্রিত করলেন এবং সমগ্র কুরআন পাক এক সাথে এক জিলদে লিখে নিলেন। কোন আয়াত সম্পর্কে মত বিরোধ দেখা দিলে দু'সাহাবীর সাক্ষ্য অনুযায়ী তা লিপিবদ্ধ করেন। সহীহ বুখারীতে আছে যে, কুরআনে হাকিমের এ নুসখা প্রথম হযরত আবু বকর সিদ্দিক এবং পরে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর নিকট ছিল। তাদের পরে উম্মুল মু'মিনিন হযরত হাফসা (রাঃ)-এর নিকট রাখা হয়।

হযরত ওসমান গণি (রাঃ)-এর খিলাফতকালে বিভিন্ন এলাকার লোকদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কিরাত পাঠ শুরু হয়। এ সময় হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত হাফসা (রাঃ)-এর নিকট থেকে এ মুসহাফ চেয়ে পাঠালেন এবং চার সাহাবী দিয়ে তাঁর পাঁচটি অনুলিপি করালেন। অতপর তা বিভিন্ন ইসলামী প্রদেশে প্রেরণ করলেন। সহীহ বুখারী অনুযায়ী

যেসব বুজর্গ ব্যক্তি অনুলিপির কাজ করেছিলেন তাদের মধ্যে হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিতও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর শাসনকাল এলো। এ সময় তিনি যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিতকে শুধুমাত্র লিখক এবং মজলিশে শূরার সদস্য পদেই বহাল রাখলেন না বরং কাজীর পদ সৃষ্টি করে তাকে মদীনা মুনাওয়ারার কাজী নিয়োগ করলেন এবং বেতনও ঠিক করে দিলেন, বস্তুতঃ সেসময় লিখনীর কাজ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। এ জন্য হযরত মুয়াইকিব দাওসী (রাঃ)-কে তাঁর সহকারী নিয়োগ করেন। প্রথম প্রথম কাজীর জন্য কোন পৃথক ভবন নির্মাণ করা হয়নি। এ জন্য হযরত যায়েদ (রাঃ) কাজীর দায়িত্ব নিজের ঘরেই আঞ্জাম দেন। বিশেষ করে মদীনা শহর এর উপকণ্ঠ সমূহের মামলা তাঁর নিকট আসতো। একবার হযরত উবাই (রাঃ) বিন কায়াব এবং আমিরুল মু'মিনিন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর মধ্যে কোন ব্যাপারে ঝগড়া হয়ে গেল। হযরত উবাই (রাঃ) বিন কায়াব আমিরুল মু'মিনিনের বিরুদ্ধে হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর আদালতে মামলা দায়ের করে দিলেন। উভয় পক্ষই হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর আদালতে হাজির হলেন। হযরত যায়েদ (রাঃ) শ্রদ্ধা বশতঃ আমিরুল মু'মিনিনের জন্য নিজের আসন খালি করে দিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) সরকারী কর্মকর্তাদের ওপর কড়া দৃষ্টি রাখতেন। তিনি হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর এ কাজ অপসন্দ করলেন এবং তাঁকে সম্বোধন করে বললেনঃ "এটা ইনসাফ থেকে অনেক দূরে। আমাকে আমার প্রতিপক্ষের সাথে বসা উচিত।" বস্তুতঃ তিনি হযরত উবাই (রাঃ)-এর সাথে বসে গেলেন। হযরত ওমর বিবাদী ছিলেন এবং তিনি বাদীর দাবী অস্বীকার করেছিলেন। এ জন্য শরীয়ত অনুযায়ী শপথ বা কসম করা তাঁর ওপর ওয়াজিব ছিল। হযরত যায়েদ (রাঃ) খিলাফতের সম্মানার্থে হযরত উবাই (রাঃ)-কে আমীরুল মু'মিনিন (রাঃ)-এর কসম মাফ করে দেয়ার কথা বললেন। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) এ অনুগ্রহ গ্রহণ করলেন না এবং হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে আদালতে খলিফা এবং একজন সাধারণ মুসলমানকে একই পর্যায়ে রাখার নির্দেশ দিলেন। এ ঘটনার পর হযরত যায়েদ (রাঃ) সবসময় হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতেন।

হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর ওপর হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর সীমাহীন আস্থা ছিল। তিনি ১৬ এবং ১৭ হিজরীতে হজ্বের জন্য মক্কা মুয়াজ্জমা গমন করেন। এ সময় হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে তিনি নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যান। সিরিয়া গমনের সময়ও তিনি তাকে দায়িত্ব দিয়ে মদীনা রেখে যান। সিরিয়া থেকে তাঁকে পত্র লিখলেন। এ সময় তিনি নিজের নামের পূর্বে তাঁর নাম লিখলেন (অর্থাৎ যায়েদ বিন ছাবিতের প্রতি ওমর বিন খাত্তাব থেকে) আমীরুল মু'মিনিনের অনুপস্থিতিতে হযরত যায়েদ (রাঃ) খিলাফতের দায়িত্ব অত্যন্ত সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিতেন। আমিরুল মু'মিনিন ফিরে

এসে তার কুশলতার প্রশংসা করতেন এবং সুন্দরভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য কিছু জায়গীর প্রদান করতেন।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বাইতুল মাকদাস গমনের সময় কতিপয় মুহাজির এবং আনসারকেও সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন। এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিতও এ সফরে আমীরুল মু'মিনিনের সাথে ছিলেন।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) রাষ্ট্রীয় বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করলেন এবং চাকুরীজীবীদের মর্যাদা অনুযায়ী বৃত্তি নির্ধারণ করলেন। এ বৃত্তির পরিমাণ নির্বাচন এবং তার হকদার সকল মানুষের তালিকা হযরত যায়েদ (রাঃ)-ই প্রস্তুত করেছিলেন। ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) "কিতাবুল খিরাজে" লিখেছেন, হযরত ওমর (রাঃ) আনসারদের বৃত্তি বন্টনের দায়িত্ব বিশেষ করে হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর ওপর অর্পণ করেছিলেন। তিনি এ কাজ কুবা থেকে শুরু করেছিলেন। তার পর বনু আবদিল আশহালকে বৃত্তি দেন। অতপর আওসের অন্যান্য শাখা, তারপর খাযরাজ গোত্র এবং সর্বশেষে নিজের বৃত্তি নির্ধারণ করেন।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর ২৪ হিজরতে হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রাঃ) খলিফার আসনে সমাসীন হলেন। এ সময় তিনিও হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর মর্যাদা ও পদ বহাল রাখলেন। ৩১ হিজরীতে তিনি হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে মদীনা মুনাওয়ারার কেন্দ্রীয় বাইতুল মালের অফিসার নিয়োগ করলেন। তিনি এ পদে কয়েক বছর অধিষ্ঠিত ছিলেন। হজ্ব উপলক্ষে আমীরুল মু'মিনিন মক্কা গমনের সময় খিলাফতের কাজ-কারবার হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর হাতে ন্যস্ত করে যেতেন। হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে ফিতনা-ফাসাদের আগুন প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো। হযরত যায়েদ (রাঃ) এ সময় সামর্থ অনুযায়ী আমীরুল মু'মিনিনকে সমর্থন দিলেন এবং আনসারদেরকে তার সাহায্যের উদ্দেশ্যে অগ্রসর করার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু পরিস্থিতি এমন রূপ পরিগ্রহ করেছিল যে, তার কোন প্রচেষ্টা সফল হয়নি এবং আমিরুল মু'মিনিনকে বিদ্রোহীরা শহীদ করে ফেললো। কতিপয় বর্ণনায় আছে যে, হযরত যায়েদ (রাঃ) এবং শহীদ খলিফার মধ্যে এত গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল যে মানুষ তাকে ওসমানী বলতো।

হযরত ওসমান গনি (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ হলেন। তাঁর শাসনামলেই উষ্ট্র এবং সিফ্ফীনের দুঃখজনক যুদ্ধ সংঘটিত হলো। হযরত যায়েদ (রাঃ) এ সকল যুদ্ধে যদিও হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে ছিলেন না তবুও তিনি তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁর খলিফত ও কামালিয়তের প্রকাশ্য স্বীকৃতি দিতেন।

হযরত যায়েদ (রাঃ)–এর বয়স ৫৬ বছর হয়েছিল। ঠিক এমনি সময় প্রকৃত স্রষ্টার নিকট থেকে ডাক এলো এবং ৪৫ অথবা ৪৬ হিজরীতে তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। তাঁর ওফাতের খবর প্রচারিত হলে লোকজন শোকে শোকাভিভূত হয়ে পড়লো। সে সময় আমীর মাবিয়ার পক্ষ থেকে মারওয়ান ইবিনুল হাকাম মদীনার গবর্নর ছিল। সেই নামাযে জানাযা পড়ালো। রাসূল (সাঃ)–এর কবি হযরত হাস্সান বিন ছাবিত সে সময় জীবিত ছিলেন। তিনি হযরত যায়েদ (রাঃ)–এর ইন্তেকালে একটি মরছিয়া লিখে ফেললেন।

হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) তাঁর ওফাতের খবর শুনলেন এবং তাঁর মুখ দিয়ে নির্দ্বিধায় বেরিয়ে এলো "আজ জ্ঞানের সমুদ্র ওঠে গেল।"

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) জানাযা এবং দাফন কাজে শরীক ছিলেন। যখন হযরত যায়েদ (রাঃ)–কে দাফন করা হলো তখন তিনি শোকাভিভূত হয়ে বললেন, "দেখ, ইলম এ ভাবেই চলে যায়। আজ ইলমের একটি অংশ দাফন হয়ে গেল।"

হযরত যায়েদ (রাঃ) মৃত্যুকালে ১১টি পুত্র রেখে যান। ইলম ও ফজিলতের দিক দিয়ে তারা অত্যন্ত উঁচু মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন। এক পুত্র খারেজা (রাঃ) "সাত ফকিহর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকেন। পৌত্ররাও জ্ঞানের জগতে অত্যন্ত নামকরা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। হযরত যায়েদ (রাঃ)–এর স্ত্রীর নাম ছিল জামিলা (রাঃ)। তাঁর কুনিয়ত ছিল উম্মুল অলা এবং উম্মে সায়াদ এবং তিনি ছিলেন মশহুর সাহাবী হযরত সায়াদ (রাঃ) বিন রবি আনসারীর (ওহোদের শহীদ) কন্যা।

হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিত ছিলেন মহৎ জ্ঞানের অধিকারী। রাসূল (সাঃ)–এর একটি ইরশাদ থেকেই তাঁর মহৎ জ্ঞানের অনুমান করা যায়। প্রিয় নবী (সাঃ) বলেছিলেন, "আমার উম্মাতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ফারায়েজ সম্পর্কিত জ্ঞানের অধিকারী হলো যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ)।"

ফারায়েযের ইলমে সবচেয়ে জটিল বিষয় হলো উত্তরাধিকার আইন। কুরআনে করিমে মিরাছ এবং ওদিয়তের বড় বড় মাসয়ালা সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মানবীয় সমাজে এ ক্ষেত্রে আশ্চর্য এবং অভাবিতপূর্ব পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এ সকল সমস্যা সমাধানের প্রশ্নে যেখানে কুরআনে হাকিমের নির্দেশাবলী মৌলিক মর্যাদা সম্পন্ন সেখানে রাসূলে আকরাম (সাঃ)–এর নির্দেশাবলী এবং বড় বড় সাহাবার সিদ্ধান্ত সমূহ ও ফতওয়াবলীও সামনে রাখা অত্যাবশ্যক। ইলমে ফারায়েয প্রকৃতপক্ষে ফিকাহরই একটি শাখা। হযরত যায়েদ (রাঃ)–এর কুরআন, হাদীস এবং ফিকাহতে এত গভীরতা

ছিল যে, ইলমে ফারায়েযে তিনি বিশেষজ্ঞ বলে খ্যাত ছিলেন। এ ফজিলত বা মর্যাদার কারণেই তিনি রাসূল (সাঃ)-এর যুগেই মুফতির পদে আসীন হন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ও হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর শাসনামলেও তিনি মদীনা মুনাওয়ারার মুফতী ছিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর নিকট তাঁর মর্যাদা এমন ছিল যে, তিনি হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর মদীনায় অবস্থানকে মদীনাবাসীদের জন্য আবশ্যিক মনে করতেন। তিনি বলতেন, "মদীনাবাসী যায়েদ (রাঃ)-এর জ্ঞানের মুখাপেক্ষী। কেননা তাঁর নিকট যে বস্তু রয়েছে তা অন্য কারো কাছে নেই।" এ কারণেই তিনি হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে মদীনার বাইরে কখনো কোন পদে নিয়োগ করেননি। হযরত ওমর (রাঃ) সিরিয়া তাশরিফ নেয়ার পর জাবিয়া নামক স্থানে হাজার হাজার মানুষের সম্মুখে ভাষণ দেয়ার সময় বলেছিলেনঃ কারো যদি ফারায়েয সম্পর্কে কোন কিছু জানতে হয় অথবা প্রশ্ন করতে হয় তাহলে সে যেন যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিতের নিকট যায়।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) স্বয়ং ইলম ও ফজিলতের দু'সমুদ্রের সম্মিলন স্থল ছিলেন। তিনিও হযরত যায়েদ (রাঃ) থেকে অনেক মাসায়ালার ফতওয়া জেনে নিতেন। তাবকাতে ইবনে সায়াদে তার এ বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে যে, যায়েদ ফারুকী খিলাফতের সমুদ্র ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) সমগ্র মানুষকে বিভিন্ন ছোট ও বড় শহরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং ফতওয়া প্রদান থেকে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু যায়েদ (রাঃ) মদীনাতুন নবী (সাঃ)-তে বসে মদীনাবাসী এবং অন্যান্য লোকদেরকে ফতওয়া দিতেন।

তাবেয়ীন সরদার হযরত সাঈদ (রাঃ) বিন মুছাইয়িব যখনই কোন কঠিন মাসয়ালার সম্মুখীন হতেন তখনই তিনি তা হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর ইজতিহাদ এবং ফায়সালার আলোকে সমাধান করতেন। তিনি বলতেন, যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিত সিদ্ধান্তাবলী সম্পর্কে বেশী অবহিত ছিলেন এবং যেসকল মাসয়ালার ব্যাপারে রাসূল (সাঃ)-এর কোন ইরশাদ অথবা সিদ্ধান্ত নেই তা বর্ণনার সময় তিনি সবচেয়ে বেশী অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিতেন।

দারুল হিজরার ইমাম হযরত মালিক (রাঃ) বিন আনাছ বলতেন, হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর পর যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিত মদীনা মুনাওয়ারার ইমাম ছিলেন।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) ফারায়েজের সকল মাসয়ালায় হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর অনুসরণ করতেন। কুরআনী বিদ্যায় হযরত যায়েদ (রাঃ) ফারায়েয ছাড়া কিরাতেও গভীরতা রাখতেন। ইমাম শা'বী (রঃ) বলেছেন, "যায়েদ (রাঃ) ফারায়েয ছাড়া কিরাতেও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন" সাইয়েদুল কুররা হযরত উবাই (রাঃ) বিন কা'ব আনসারীর জীবদ্দশায় তাঁর পূর্ণ খ্যাতি লাভ হয়নি। কিন্তু তাঁর ইন্তিকালের পর যায়েদ (রাঃ)-এর কিরাত সর্বজনগ্রাহ্য হয়। বস্তুতঃ তাঁর কিরাত কুরাইশের কিরাতের অনুরূপ

ছিল। এ জন্য তিনি সমগ্র ইসলামী জাহানে সুপ্রসিদ্ধি লাভ করেন। বর্তমানে ইসলামী দুনিয়াতে যে কিরাত প্রচলিত আছে তা হযরত যায়েদ (রাঃ)-এরই কিরাত। প্রিয় নবী (সাঃ)-এর যুগে হযরত যায়েদ (রাঃ) বেশীর ভাগ সময় নবী (সাঃ)-এর নিকটে কাটিয়েছেন। কিন্তু তিনি হাদীস বর্ণনায় অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। এ জন্য তাঁর নিকট থেকে শুধু ৯২ টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে ৫টি হাদীস ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) ঐকমত্য পোষণ করেন। তাঁর হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে হযরত উম্মে সা'দ (স্ত্রী) ব্যতীত হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ), হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ), হযরত আনাস (রাঃ) বিন মালিক, হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) এবং হযরত সাহাল (রাঃ) বিন সাদের মত মহান সাহাবী অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। তাবেয়ীদের মধ্যে হযরত সাঈদ (রাঃ) বিন মুসাইয়্যিব (রঃ), আবান বিন ওসমান (রাঃ), কাসেম (রঃ) বিন মুহাম্মাদ বিন আবুবকর (রাঃ), খারেজা (রঃ) বিন যায়েদ, আতা' (রঃ) বিন ইয়াসার, তাউস (রঃ), সাহাল (রঃ) বিন আবি হাছমা, বছর (রঃ) বিন সাঈদ এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তাফাক্কুহ ফিদ দীন অর্থাৎ দীনের সমঝের ব্যাপারেও হযরত যায়েদ (রাঃ) অত্যন্ত উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন এবং সাহাবাদের মধ্যকার মুজতাহিদ হিসেবে পরিগণিত হতেন। তিনি শুধুমাত্র রাসূল (সাঃ)-এর যুগেই ফতওয়া দানের সুযোগ লাভ করেননি, বরং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), হযরত ওমর ফারুক (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত আমীর মাবিয়া (রাঃ)-এর খিলাফত কালেও মদীনার মুফতী ছিলেন। চরিতকাররা বর্ণনা করেছেন যে, হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর ফতওয়ার সংখ্যা এত বেশী যে, তা একত্রিত করলে বড় বড় কয়েক ভলিউম হতে পারে। হযরত সাঈদ (রাঃ) বিন মুসাইয়্যিব (রাঃ) বলতেন, হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর প্রতিটি বক্তব্যের ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করতেন। হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিত সেই চার সাহাবীর একজন যাঁদের বিদ্যা সর্বজন গ্রাহ্য ছিল। এ ক্ষেত্রে অপর তিনজন সাহাবী হলেন হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন মাসউদ, হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)। কুরআন, হাদীস এবং ফিকাহ ছাড়াও হযরত যায়েদ (রাঃ) অংকে বিদ্যাতেও পারদর্শী। প্রথম প্রথম আরবদের অংকে শাস্ত্রে কোন দখল ছিল না। এমনকি তারা এক হাজারের ওপর গণনাও জানতো না। কিন্তু হযরত যায়েদ (রাঃ) নিজের ধীশক্তি এবং মেধার মাধ্যমে এ শাস্ত্রে আশ্চর্যজনক পারদর্শীতা লাভ করেন। ইবনে মাকাদ (রাঃ) বলেছেন, প্রিয় নবী (সাঃ) হুনাইনের যুদ্ধে গনিমাতের মাল হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর পরামর্শ অনুযায়ী বন্টন করেছিলেন। সে সময় তার বয়স ছিল মাত্র ১৯ বছর। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর খিলাফতকালে ইয়ামামার যুদ্ধের গনিমাতের মাল মদীনা পৌঁছলে তিনি তা বন্টনের দায়িত্ব হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর ওপরই ন্যস্ত

করেন। এ কাজ তিনি অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পাদন করেন। রমাদান দুর্ভিক্ষকালে হযরত আমর (রাঃ) ইবনুল আছ খাদ্য ভর্তি ২০টি জাহাজ মিশর থেকে প্রেরণ করেন। এ সময় হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) হযরত যায়েদ (রাঃ) এবং আরো কতিপয় সাহাবীকে সাথে নিয়ে তৎকালীন নিকটবর্তী জার নামক এক বন্দরে গমন করেন এবং খাদ্য গ্রহণ করে দু'টি গুদাম ভর্তি করান। অতপর দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকদের একটি তালিকা তৈরীর জন্য তিনি হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলেন, এ তালিকায় প্রত্যেক ব্যক্তির নাম এবং প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণের কথাও উল্লেখ করতে বলা হয়। হযরত যায়েদ (রাঃ) এক রেজিষ্টার তৈরী করেন। এ রেজিষ্টারে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকদের অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয় এবং প্রত্যেকের মধ্যে কাগজের চেক বন্টন করেন। এ চেকের নীচে আমীরুল মুমিনিনের সীলমোহর অঙ্কিত ছিল। চেক দেখিয়ে তারা খাদ্য নিতে পারতো। ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর এ প্রথম কাগজের চেক জারী করা হয়। আর এটা হতে পেরেছিল হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর মেধার কারণেই।

ফজিলত এবং মর্যাদার কারণেই সকল সাহাবী (রাঃ) হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। জ্ঞান সমুদ্র হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) তাঁকে এক মহান আলেম হিসেবে মনে করতেন। একবার যায়েদ (রাঃ) ঘোড়ায় সওয়ার হলেন। এ সময় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ঘোড়ার লাগাম ধরলেন। হযরত যায়েদ (রাঃ) বললেন, এ্যাঁ, এ্যাঁ, আপনি এটা কি করছেন। আপনি হলেন রাসূল (সাঃ)-এর চাচার পুত্র এবং আমার শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি বললেন, ওলামা এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের শান হলো তাদের লাগাম ধরা।

আমীর মাবিয়া (রাঃ)-তাঁর নিকট থেকে যা কিছু শুনতেন তারই বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। এভাবে অন্য সাহাবীও তাঁর জ্ঞানের পূর্ণতার স্বীকৃতি দিতেন এবং প্রশংসা করতেন।

হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিত অত্যন্ত পবিত্র এবং পসন্দনীয় চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর চরিত্রে ইসলামে অগ্রবর্তী হওয়া, জ্ঞান পিপাসা, রাসূল প্রেম, সুন্নাতের পায়রবী, হক কথন এবং বিনয় প্রভৃতি গুণাবলী স্থান পেয়েছিল ১১ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সাথে সাথে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে জ্ঞান অর্জনে ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। এমনকি জ্ঞানের মর্যাদার দিক থেকে বড় বড় সাহাবীর কাতারে শামিল হন এবং রাসূল (সাঃ)-এর সামনে ফতওয়া দানের যোগ্য বলে বিবেচিত হন। প্রিয় নবী (সাঃ)-এর প্রতি তাঁর ছিল অগাধ শ্রদ্ধা এবং গভীর ভালোবাসা। এ জন্য তিনি বেশীর ভাগ সময় নবী (সাঃ)-এর দরবারে কাটাতেন। অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে জেগে নোজা হুজুর (সাঃ)-এর পবিত্র খিদমতে পৌঁছে যেতেন। প্রত্যুষের এ কাজের জন্য তিনি বহুবার নবীজি (সাঃ)-

এর সাথে সেহরী খাওয়া এবং রোযা রাখার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। বিশ্বনবী (সাঃ)-ও তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। তাকে নিজের হুজরা মোবারকে ডেকে নিতেন এবং নামাযের জন্য নিজের সাথে মসজিদে নিয়ে যেতেন। কোন কোন সময় হুযুর (সাঃ) তাকে নিজের পাশে বসাতেন। ওহী নাযিল হওয়ার সাথে সাথে তাকে দিয়ে লিখাতেন। কখনো কখনো হুযুর (সাঃ) ইবরানী ভাষায় পত্র পেতেন। এ পত্র তিনি ইহুদীদের দিয়ে পড়িয়ে নিতেন। এ অবস্থা তাঁর নিকট খুব সন্তোষজনক ছিল না। কেননা ইহুদীরা পত্রের বিবরাবলী জেনে মুসলমানদের জন্য ভয়ের কারণ হতে পারতো। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে বললেন, তুমি ইবরানী ভাষা শিখে নাও। তিনি রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশ পালনার্থে রাত দিন একাকার করে ফেললেন এবং ১৫ দিনের মধ্যে ইবরানী ও সুরিয়ানী ভাষায় এত দক্ষতা অর্জন করলেন যে, সে সব ভাষায় লিখিত পত্রাবলী খুব সহজে পড়ে নিতেন এবং তার জবাবও লিখে দিতেন।

হযরত যায়েদ (রাঃ) সুন্নাতের খুব অনুগত ছিলেন। নিজেও হুযুর (সাঃ)-এর নির্দেশাবলীর ওপর আমল করতেন এবং অন্যদেরকেও সেভাবে আমল করার নির্দেশ দিতেন। কাউকে সুন্নাত পরিপন্থী কোন কাজ করতে দেখলে চুপ থাকতে পারতেন না এবং তা নিষেধ করতেন। মুসনাদে আহমদ (রঃ)-এ আছে যে, একবার হযরত শুরাহবিল বিন সায়াদ (রাঃ)-কে মদীনা মুনাওয়ারার এক বাগানে জাল পাততে দেখে উচ্চৈস্বরে ডেকে বললেন, শুরাহবিল! এটা হারাম জমিন। এখানে শিকার করা নিষিদ্ধ। আরেকবার শুরাহ বিল (রাঃ)-কে বাজারে একটি পাখী ধরতে দেখলেন। এতে তিনি খুব ক্রোধান্বিত হলেন। শুরাহ বিল (রাঃ)-এর নিকট থেকে পাখী ছিনিয়ে নিয়ে উড়িয়ে দিলেন এবং তাঁকে থাপ্পড় মেরে বললেন, হে নিজের নফসের দুশমন। তোমার কি জানা নেই যে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) মদীনা মুনাওয়ারাহকে হারাম ঘোষণা করেছেন।

মদীনার গবর্নর মারওয়ান ইবনুল হাকামের সাথে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এ সম্পর্ক তাঁর স্পষ্টবাদিতায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। একবার জালিলুল কদর সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) সাহাবীদের মর্যাদার ব্যাপারে মারওয়ানের সামনে একটি হাদীস বর্ণনা করলেন। মারওয়ান তা মানলো না এবং হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা বর্ণনার অভিযোগ আনলো। সে সময় হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিত এবং হযরত রাফে বিন খুদাইজও মারওয়ানের পাশে বসে ছিলেন। তাঁরা উভয়ই তৎক্ষণাৎ হযরত আবু সাঈদ (রাঃ)-এর বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার করলেন এবং মারওয়ানের মতকে ভুল বলে আখ্যায়িত করলেন।

সহীহ বুখারীতে আছে যে, মাগরিবের নামায পড়ানোর সময় ছোট ছোট সূরা পড়া মারওয়ান একটি নিয়ম বানিয়ে নিয়েছিল। হযরত যায়েদ (রাঃ) বাধা দিলেন এবং

বললেন, তুমি কি নিয়ম বানিয়ে রেখেছ। রাসূলে করিম (সাঃ) মাগরিবের নামাযে লম্বা সূরা পাঠ করতেন।

একবার হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) এক সিরীয় ব্যবসায়ীর নিকট থেকে যাইতুনের তেল কিনলেন মাল সেখানে রাখা অবস্থাতেই অন্য একজন ক্রেতা সৃষ্টি হলো। সে ইবনে ওমর (রাঃ)-কে বললো, এত লাভ দেব, আমার নিকট বিক্রি করে দিন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) তাতে রাজী হয়ে গেলেন। কে যেন পিছন দিক থেকে তাঁর হাত ধরে বললেন, আবু আবদুর রহমান! প্রিয় নবী (সাঃ) এ ধরনের করা থেকে নিষেধ করেছেন। প্রথমে মাল এখান থেকে সরাও। তারপর বিক্রি কর।

একবার উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) যোবায়ের (রাঃ)-এর পরিবারের নিকট জানান যে, একদিন হুযুর (সাঃ) তাঁর নিকট আছরের পর দু'রাকায়াত নামায পড়ে ছিলেন। তাঁরা এটাকে সুন্নাত মনে করে পড়া শুরু করলেন। হযরত যায়েদ (রাঃ) এ কথা জানতে পেরে বললেন, আল্লাহ পাক আয়েশা (রাঃ)-কে মাফ করুন। প্রকৃত ঘটনা এ ছিল যে, দ্বিপ্রহরের সময় কতিপয় গ্রামবাসী হুযুর (সাঃ)-এর নিকট এলেন তাঁরা তাঁর নিকট মাসয়ালা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে জোহরের সময় হয়ে পড়লো। তিনি শুধুমাত্র জোহরের ফরয পড়ে গৃহে চলে গেলেন। সেখানে জোহরের পরিত্যক্ত দুই রাকায়াত সুন্নাতের কথা স্মরণ হলে তিনি তা আছরের পর পড়ে নিলেন। নচেৎ হুযুর (সাঃ) আছরের পর নামায পড়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন।

মহান মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী হযরত রাফে (রাঃ) বিন খুদাইজ একবার লোকদের নিকট বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ক্ষেত ভাড়া প্রদান নিষেধ করেছেন। ফলে লোকদের মধ্যে ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে লাগলো। হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিত শুনে বললেন, আল্লাহ পাক রাফে'কে ক্ষমা করুন। আমি সে হাদীসটির তাৎপর্য তার চেয়ে বেশী জানি, ঘটনা এ ছিল যে, ক্ষেতের ভাড়া সম্পর্কিত ব্যাপার নিয়ে দু' ব্যক্তি বিবাদ করছিল। হুযুর (সাঃ) তাদেরকে ঝগড়া করতে দেখে বললেন, যদি অবস্থা এ হয় (অর্থাৎ ক্ষেত ভাড়া দান ঝগড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়) তাহলে ক্ষেত ভাড়া দান ঠিক নয়। রাফে' (রাঃ) হুযুর (সাঃ)-এর ইরশাদের শুধুমাত্র শেষ অংশ শুনে ছিলেন এবং তাই লোকদেরকে বলা শুরু করে দিয়েছিলেন।

প্রকৃতিগত ভাবে হযরত যায়েদ (রাঃ) নীরবতা পছন্দ করতেন এবং মজলিশে অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সাথে বসতেন। তাবলীগের জন্য সমসাময়িক শাসকদের নিকটও গমন করতেন। একবার মারওয়ানের মহল থেকে বের হয়ে শিষ্যরা জিজ্ঞেস করলো হযরত মারওয়ানের নিকট কিভাবে গিয়েছিলেন? তিনি বললেন, সে কতিপয় হাদীস জিজ্ঞেস করেছিল। আমি তাকে বললাম, এমন তিনটি জিনিস রয়েছে যা মুসলমানের অন্তরকে

জীবিত রাখে। প্রথম, প্রতিটি কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি দৃষ্টি রাখা। দ্বিতীয়, শাসক এবং আমীরদেরকে নসিহত করা এবং তৃতীয় হলো জামায়াতবদ্ধ হয়ে থাকা।

হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর চরিত্রে বিনয় পুরোপুরিই বিদ্যমান ছিল। প্রত্যেকের সাথেই হাসি মুখে মিলিত হতেন এবং বিনয় ও বুদ্ধিমত্তার সাথে প্রশ্নের জবাব দিতেন। অবশ্য জ্ঞানের গভীরতার কারণে কোন কোন সময় নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করে ফেলতেন। তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী বুজুর্গ মানুষ ছিলেন। কিন্তু মুসলমানদের পারস্পারিক বিবাদে পক্ষাবলম্বন করা পসন্দ করতেন না। ফিতনা থেকে তিনি নিজেকে সব সময়ই বাচিয়ে রেখেছিলেন এবং মুসলমানদের পারস্পরিক বিবাদ ও বিরোধে কোন সম্পর্ক রাখতেন না।

—0—

হযরত ছারমাহ (রাঃ) বিন আবি আনাছ আনসারী

বিশ্ব নবী (সাঃ)-এর নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্বে যদিও সকল আরববাসী সামগ্রিকভাবে কুফর, শিরক এবং নাফরমানীর অক্টোপাশে আবদ্ধ ছিল। তবুও তাদের মধ্যে কিছু এমন লোকও ছিল যারা তাওহীদপন্থী এবং ইবরাহীমের পথ অনুসরণকারী ছিলেন। আবার কতিপয় এমন লোকও ছিলেন যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত করতেন না। কিন্তু তারা আবার কোন শরীয়াতের অন্তর্ভুক্তও ছিলেন না। তারা তাওহীদ ও ইবাদাতে ইলাহীর আকাংখায় শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের অপেক্ষায় ছিলেন। ইতিহাসে এ ধরনের সাহাবীকে হুনাফা উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। এ ধরনের সৌভাগ্যবান সাহাবীর সংখ্যা আঙ্গুলে গোনা যায়। তবে তারা মক্কা ও আরবের অন্যান্য এলাকায় ছিলেন। এমনকি ইয়াছরাবেও তাদের অস্তিত্ব ছিল। ইয়াছরাবের হুনাফার মধ্যে আবু কায়েস ছারমাহ (রাঃ) বিন আবি আনাস অধিক বয়স ও পবিত্রতার জন্য বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। খাযরাজ গোত্রের সম্মানিত শাখা বনু নাজ্জারের সাথে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তাঁর বংশনামা হলোঃ ছারমাহ (রাঃ) বিন আনাস আবার কায়েস বিন মালিক বিন আদী বিন আমের বিন গানাম বিন আদী বিন নাজ্জার।

আল্লাহতায়ালা হযরত ছারমাহ (রাঃ)-কে সৎ স্বভাব দান করেছিলেন। যৌবনকালেই তিনি মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করেছিলেন এবং দুনিয়াদারী ত্যাগ করে সন্ন্যাসীত্ব গ্রহণ করেন। সেই সময় তিনি ক্যামভাস বা চটের পোশাক পরিধান করতেন এবং নির্জনে বসে বসে ধ্যানে তন্ময় থাকতেন। কিছুদিন এ একাকীত্ব ও নির্জনে কাটানোর পর দুনিয়ার ধান্ধায় অংশগ্রহণ শুরু করেন। কিন্তু মূর্তিপূজা এবং অধর্ম থেকে সবসময়ই বিরত থাকতেন। হকপন্থীদের মত গোসলের পর দেহ শুদ্ধির জন্য গোসল করতেন এবং এমন ঘরে প্রবেশ করতেন না যে ঘরে হায়েজা মহিলা অথবা কোন অপবিত্র মানুষ উপস্থিত থাকতেন। একবার তিনি তৎকালীন সময়ে প্রচলিত ধর্মের মধ্য থেকে যে ধর্ম সঠিক অর্থে কল্যাণের দিকে পথ প্রদর্শন করে তা গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। বস্তুতঃ তিনি এ আকাংখায় খৃষ্টান ধর্মের প্রতি আকর্ষিত হয়েছিলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে, তৎকালীন খৃষ্টানরা নিজের ধর্মকে পরিবর্তন করে তাতে মূর্তিপূজা অনুপ্রবেশ করিয়েছে তখন তিনি খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ থেকে বিরত রইলেন এবং দ্বীনে ইবরাহীম গ্রহণ করলেন।

যদিও পথ প্রদর্শক কেউ ছিল না কিন্তু তিনি নিজের প্রজ্ঞা দূরদর্শীতার ভিত্তিতে এক খোদার ইবাদাতে মশগুল হয়ে যান। এ উদ্দেশ্যে তিনি একটি ইবাদাতখানাও তৈরী করলেন। ইবাদাতখানাটিকে খুব পাক পবিত্র রাখতেন এবং গোসল ওয়াজিব হওয়া ব্যক্তিকে তাতে প্রবেশ করতে দিতেন না। হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) বলেছেন, তিনি নিজের ইবাদাতের ব্যাপারে বলেছেনঃ "আমি ইবরাহীম (আঃ)-এর রবের ইবাদাত করি।"

এভাবে জীবন কাটাতে কাটাতে হযরত হারমাহ (রাঃ)-এর বয়স একশ বছরের বেশী হয়ে গিয়েছিল। পবিত্র চরিত্র এবং বার্ধক্যের কারণে তিনি মদীনাবাসীর অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র ছিলেন।

নবী (সাঃ)-এর হিজরাতের কিছুকাল পূর্বেই ইয়াছরাবে ইসলাম চর্চার বিস্তার লাভ ঘটে এবং লোকজন শেষ নবী (সাঃ)-এর কথা উল্লেখ করতে থাকে। ফলে হযরত হারমাহ (রাঃ)-এর অন্তর সাক্ষ্য দিয়ে ফেলল যে, মক্কায় যে পবিত্র ব্যক্তিত্ব নবুয়াতের দাবী করেছেন তিনি আল্লার সত্য রাসূল এবং সত্য দ্বীনের তাবলীগ ও প্রসারের জন্যই প্রেরিত হয়েছেন। তিনি রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঈমান আনয়নের জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন। কিন্তু বার্ধক্য ও ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে মক্কা মুয়াজ্জমায় সফর করে যাওয়া তার পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব ছিল না। তিনি হুযুর (সাঃ) কখে মদীনা আসবেন সে জন্য অস্থির চিত্তে পথপানে চেয়ে থাকতেন। তখন তাঁর জীবনের একমাত্র কামনা, বাসনা এবং আরাধ্য বস্তুই ছিল পয়গাম্বরে আখিরুজ্জামান (সাঃ)-কে নয়নভরে দেখে চোখ এবং অন্তরকে সুশীতল করা।

অবশেষে সেই শুভক্ষণ এলো। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ইয়াছরিবের মাটিতে শুভ পদার্পণ করলেন। সে সময় ইয়াছরাব "মদীনাতুন নবী" রূপে আত্মপ্রকাশ করলো। প্রিয় নবী (সাঃ)-এর মদীনা শুভাগমনে হযরত হারমাহ (রাঃ) যিন আবি আনাছ আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। অত্যন্ত আবেগ ভরা অন্তরে নবী করিম (সাঃ)-কে মোবারকবাদ জানালেন। ঈমান আনয়ন এবং বাইয়াত গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য করলেন এবং এ স্থায়ী সম্পদ লাভে আল্লাহর দরবারে সিজদাহ জ্ঞাপন করলেন।

ইন্তেকাল: [illegible] হযরত হারমাহ (রাঃ)-এর বয়স প্রায় ১০৮ বছর ছিল। [illegible] অবস্থায় [illegible] রেখে এবং [illegible] তিনি [illegible] পবিত্র নিকটে।

আল্লাহপাক হযরত ছারমাহ (রাঃ)-কে কাব্য রচনার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তিনি মুগোত্রের একজন নামকরা কবি ছিলেন। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা তাঁর অনেক কবিতা নিজেদের গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। এ সকল কবিতা পড়ে মনে হয় যে, তিনি তৎকালীন যুগের শেখ সাদী ছিলেন। কেননা তাঁর অধিকাংশ কবিতাতেই খারপ কাজ থেকে পরিত্রাণ এবং ভাল কাজের প্রতি অগ্রবর্তী ভূমিকা পালনের নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহর আজমত বা মহানত্ব বর্ণনার সাথে সাথে তিনি মূর্তিপূজা, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা, হারাম খাওয়া এবং ধোঁকাবাজী প্রভৃতি থেকে বেঁচে থাকা ও আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার করা, ইয়াতিম-গরীবদের সাহায্যের ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন।

আল্লামা ইবনে আছির (রঃ) "উসুদুল গাব্বাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, "ছারমাহ (রাঃ) বিন আবি আনাছের অধিকাংশ কবিতা হিকমত ও নসীহতে পূর্ণ।"

ঈমানের প্রস্রবণে অবগাহনের পর তিনি এক শক্তিশালী কাসিদাহ বলেন। তাতে তিনি মক্কার কুরাইশদের বঞ্চনাপূর্ণ ভাগ্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ এবং মদীনাবাসীদের সৌভাগ্যের গর্ব করলেন।

ইমাম হাকিম (রঃ) এবং ইবনে আসির (রঃ) বর্ণনা করেছেন, উম্মাহর জ্ঞানের সমুদ্র হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হযরত ছারমাহ (রাঃ) বিন আবি আনাছের নিকট যেতেন এবং তাঁর কবিতা শ্রবণ করতেন।

হযরত ছারমাহ (রাঃ) বিন আবি আনাছ শতায়ু হওয়া সত্ত্বেও পবিত্র রামাদানের রোযা ছাড়তেন না। বরং রোযা অবস্থায় মাঠে নিজের ক্ষেতে কাজ করতে চলে যেতেন। একদিন রোযা অবস্থায় সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে এলেন এবং ইফতারের জন্য খাবার চাইলেন। খাবার আসতে দেরী হওয়ায় তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। কেননা রোযা এবং সারা দিনের পরিশ্রমে তিনি অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সে সময় নিয়ম ছিল যে, ইফতারের সময় যদি কেউ ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে তাকে সেই রাত এবং পরের দিনও রোযা রাখতে হত। তাঁর স্ত্রী খাবার নিয়ে এসে তাঁকে নিদ্রামগ্ন দেখে বললেন, "তোমার ওপর আফসোস।" খুব ভোরে ঘুম থেকে জাগরিত হয়ে খুব দুর্বলতা অনুভব করতে লাগলেন। এমন কি বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। প্রিয় নবী (সাঃ) এ ঘটনার কথা শুনে এ আয়াত (অন্য মতে এ আয়াত নাযিল হয়) পাঠ করলেনঃ "এবং খাও ও পান কর এমনকি যতক্ষণ না রাতের কালো রেখা থেকে সুবহে সাদেকের সাদা রেখা পরিষ্কার রূপে দেখা দেয়।"

প্রিয় নবী (সাঃ)-এর পবিত্র মুখ থেকে এ আয়াত শুনে মানুষের মধ্যে খুশীর বন্যা বয়ে গেল। হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) বলেন, এ আয়াতের শানে নুযুলের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। বিশেষ করে এ আয়াত কোন সাহাবীকে উপলক্ষ করে নাযিল হয়েছে

সে ব্যাপারে এ আয়াতের শাব্দিক অর্থ হলোঃ তোমরা সে সময় পর্যন্ত খানা পিনা কর যতক্ষণ পর্যন্ত সাদা সূতা এবং কালো সূতার মধ্যে পার্থক্য না করা যায়। এ আয়াত শুনে একজন সাহাবী নিজের পায়ের আঙুলে একটি কালো ও অপর আঙুলে একটি সাদা সূতা বেঁধে নিয়েছিলেন। অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে যে, সাহাবীটি বিছানার মাথার দিকে একটি কালো ও একটি সাদা সূতা রেখে দিল এবং যতক্ষণ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ঠিকভাবে হত না ততক্ষণ খানা-পিনা করতেন। এ সময় মিনাল ফাজরি শব্দ নাযিল হয়। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সাদা এবং কালো সূতার অর্থ আলো ও অন্ধকারের দু'টি রেখা।

হযরত ছায়মাহ (রাঃ) একশ বিশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

০.০.০

হযরত সাহাল (রাঃ) বিন হুনাইফ আনসারী

ওহুদের যুদ্ধে এক আকস্মিক দুঃখপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেল। এ আকস্মিকতায় মুসলমানদের মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দিল এবং হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শুধুমাত্র কয়েকজন আনসার সাহাবীসহ ময়দানে রয়ে গেলেন। এ সকল সাহাবীর মধ্যে একজন সুদর্শন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কোন ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেনঃ "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আপনি আমার আড়ালে দাঁড়ান। আল্লার কসম, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার জীবন আছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাকে রক্ষা করবো এবং এখান থেকে আমার পা পিছু হটাবোনা।"

মুশরিকদের তরফ থেকে হুজুর (সাঃ)-এর দিকে যে তীর আসতে থাকলো তাতে তিনি বাধা দিতে থাকলেন এবং জবাবে নিজেও মুশরিকদের ওপর তীর নিক্ষেপ করতে থাকলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর এ আত্মোৎসর্গের জযবা খুব পছন্দ করলেন। তিনি বার বার অন্যান্য সাহাবীকে বললেন, "তাকে তীর দাও। সে সাহাল।"

এ সাহাবী—যিনি ওহোদের যুদ্ধে নিজের জীবন হাতে রেখে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রাসূল (সাঃ) কে রক্ষা করেছিলেন এবং তাঁর সুনজর কেড়েছিলেন—তিনি ছিলেন হযরত সাহাল (রাঃ) বিন হুনাইফ আনসারী।

হযরত আবু সায়াদ সাহাল (রাঃ) বিন হুনাইফ আনসারীর সম্পর্ক ছিল আওস গোত্রের সাথে। তাঁর নসবনামা হলোঃ সাহাল (রাঃ) বিন হুনাইফ বিন ওয়াহিব বিন আকিম বিন ছায়লাবা বিন হারিছ বিন মাজদায়াহ বিন আমর বিন আশম বিন আওক বিন আমর বিন আওক বিন মালিক বিন আওস।

হযরত সাহাল (রাঃ) ছোট সহোদর হযরত ওসমান (রাঃ) বিন হুনাইফের সাথে হিজরাতে নববীর আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এভাবে তিনি আনসারের অগ্রবর্তী দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হিজরাতের কয়েক মাস পর তিনি

নবী (সাঃ) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন কায়েম করেন। ইবনে সায়্যাদ (রাঃ)-এর বর্ণনা অনুসারে এ সময়ে হযরত সাহাল (রাঃ)-কে হযরত আলী কারামাল্লাহু ওয়াজহাহুর ভাই বানিয়েছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ চরিতকারের মত হলো, হুযুর (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে নিজের ভাই বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

হক ও বাতিলের প্রথম যুদ্ধ বদরে হযরত সাহাল (রাঃ) বিন হুনাইফ অংশ গ্রহণ করে বদরী সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

ওহোদের যুদ্ধে তিনি প্রচণ্ড বাহাদুরী প্রদর্শন করেন। চরম বিশৃংখলার মধ্যেও তিনি অটল ছিলেন। হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) বর্ণনা করেছেন, যেদিন তিনি মৃত্যুর হাতে বাইয়াত হয়েছিলেন। যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত তিনি শত্রুর ওপর অব্যাহতভাবে তীর নিক্ষেপ করতে থাকেন এবং হুযুর (সাঃ) অন্যান্য সাহাবীকে বলতে থাকেন যে, তাঁকে তীর দিতে থাকো। সে সাহাল।

ওহোদের যুদ্ধের পর তিনি পরিখার যুদ্ধেও বাহাদুরী প্রদর্শন করেন। ৬ষ্ঠ হিজরীতে বাইয়াতে রেদওয়ানে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। এরপর খায়বর, মক্কা বিজয়, হুনাইন, তায়েফ এবং তাবুকের যুদ্ধসমূহে রাসূল (সাঃ)-এর সহচর ছিলেন। হযরত সাহাল (রাঃ) যুদ্ধ সমূহে অংশগ্রহণের সাথে সাথে নবী (সাঃ) এর ফয়েজও লাভ করতেন। হুযুর (সাঃ)-ও তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আল্লাহ তায়ালা সুন্দর স্বভাবের সাথে সাথে রূপও দান করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত সুদর্শন ছিলেন। কোন এক যুদ্ধে হুযুর (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন। নিকটেই একটি নালা ছিল। তাতে গোসল করতে লাগলেন। একজন আনসারী সাহাবী তাঁর সুন্দর শরীর দেখে বলে ওঠলেন, "বাঃ বাঃ কি সুন্দর দেহ! আমি এত সুন্দর দেহ আর কখনো দেখিনি।" তিনি এ কথা বলতেই হযরত সাহাল (রাঃ) বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। তাঁর সাথী দৌড়ে গিয়ে প্রচণ্ড জ্বরে শরীর উত্তপ্ত দেখতে পেলেন। উঠিয়ে তিনি তাকে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে নিয়ে এলেন। প্রিয় নবী (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, "কি ব্যাপার?" সাহাবাটি ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, "আশ্চর্য মানুষ নিজের ভাইয়ের শরীর অথবা মাল দেখে বরকতের দোয়া করে না। এ জন্যই বলা লাগে।" আল্লাহর রহমতে হযরত সাহল (রাঃ) তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠলেন।

রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের পর খলিফা ওসমান জুন্নুরাইনের শাসনকাল পর্যন্ত সাহাল (রাঃ)-এর জীবনের ব্যাপারে চরিতকারেরা কিছুই বলেননি। হযরত আলী (রাঃ)-এর শাসনকালে তাঁর নাম জনসমক্ষে আবার প্রকাশ পায়। হযরত

সাহাল (রাঃ)-কে তিনি মদীনার আমীর নিয়োগ করেছিলেন। তাও স্বল্পকালীন সময়ের জন্য। কিছুদিন পর তিনি তাঁকে কূফা ডেকে পাঠান এবং তিনি মদীনা থেকে কূফা চলে যান।

উষ্ট্রের যুদ্ধের পর হযরত আলী (রাঃ) বিভিন্ন প্রদেশে গবর্ণর নিয়োগ করেন। তখন হযরত সাহাল (রাঃ)-কে হযরত আমীর মাবিয়া (রাঃ)-এর স্থানে সিরিয়ার গবর্ণর নিয়োগ করা হয়। কিন্তু সিরিয়ার ওপর আমীর মাবিয়া (রাঃ)-এর ধাবা মজবুত ছিল। হযরত সাহাল (রাঃ) সিরীয় সীমান্তে অবস্থিত তাবুক নামক স্থানে পৌঁছে আমীর মাবিয়া (রাঃ)-এর সওয়ার পেলেন এবং তাঁকে ফিরে যেতে বাধ্য করা হলো। তিনি ফিরে এসে হযরত আলী (রাঃ)-কে বললেন, আমীর মাবিয়া (রাঃ) আপনার বিরোধিতার পথ বেছে নিয়েছেন এবং সিরিয়াবাসী তাঁর বাইয়াত করে নিয়েছে। ঘটনার পর আলী (রাঃ) এবং হযরত মাবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যে সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ শুরু হয়। এসময় হযরত সাহাল হযরত আলী (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে যুদ্ধে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করেন।

আবু হানিফাহ দিনাওয়ারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যুদ্ধে একবার তিনি হেজাজবাসীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সে সময় হযরত আলী (রাঃ) তাঁকে পারস্যের আমীর নিয়োগ করেন। কিন্তু ইমামতের দায়িত্ব গ্রহণ করতেই তিনি কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হন এবং শক্তি প্রয়োগ করে তাঁকে পারস্য থেকে বের করে দেয়া হয়।

হযরত সাহাল (রাঃ) যদিও একজন বড় বাহাদুর ছিলেন। তবুও সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে তিনি এক দলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সন্ধি আলোচনার পক্ষে মত প্রদান করেন। ফলে তারা তাঁকে বুজদিল হিসেবে আখ্যায়িত করে। তিনি এ কথা শুনে বলেছিলেনঃ

"তাদের মত ঠিক নয়। আমি বুজদিল বা কাপুরুষ নই। আমি যে কাজের জন্য তরবারী উঠিয়েছি তা আসান বা সহজ করে নিয়েছি। হুদাইবিয়ার দিন যদি তরবারী দিয়ে কাজ করা রাসূল (সাঃ)-এর মরজী বিরোধী না হতো তাহলে সেদিন আমি মুশরিকদের সাথে লড়াই করতে প্রস্তুত ছিলাম।"

হযরত সাহাল (রাঃ) বিন হুনাইফ ৩৮ হিজরীতে কূফায় ইন্তেকাল করেন। আমীরুল মু'মিনিন হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু ৬ তাকবীরের সঙ্গে তার নামাযে জানাযা পড়ান এবং বলেন, "তিনি বদরী সাহাবী ছিলেন।" বদরী সাহাবীদের নামাযে জানাযায় এ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা হতো।

মৃত্যুর সময় হযরত সাহাল (রাঃ) দু' পুত্র রেখে যান। তারা হলেন আবু উমামাহ আসয়াদ (রাঃ) ও আবদুল্লাহ (রঃ)। আবু উমামাহ আসয়াদ (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর যুগে জন্মগ্রহণ করেন।

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে হযরত সাহাল (রাঃ)-এর নাম চতুর্থ পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। তাঁর থেকে ৪০টি হাদীস বর্ণিত আছে।

তিনি হুযুর (সাঃ) এবং হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিত থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেসব তাবেয়ী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন আবু আওয়ায়েল (রঃ), উবাইদুল্লাহ (রঃ) বিন আবদুল্লাহ (রঃ) ও আবদুর রহমান বিন আবি লায়লা (রঃ)।

হযরত নু'মান (রাঃ) বিন বশির (রাঃ) আনসারী

দ্বীনের প্রতি ভালোবাসাই আল্লাহর দ্বীন। মহিলা হোক অথবা পুরুষ, শিশু হোক অথবা বৃদ্ধ। স্রষ্টা যাকে ইচ্ছা তাকেই তা দান করেন। রাসূল (সাঃ)-এর জীবনের শেষ দিকে মদীনাবাসী এক অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুর দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা এবং রাসূল প্রেমের এক আশ্চর্য ধরনের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। এ শিশু প্রায়ই নবী (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত থাকতো এবং অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে তাঁর কাছ থেকে দ্বীনের কথা শিখতো। হুযুর (সাঃ) ওয়াজের জন্য মিম্বরের ওপর দাঁড়াতেন, তখন এ শিশু মিম্বরের নিকট বসে যেত। তন্ময় হয়ে সে রাসূল (সাঃ)-এর কথা শুনতো এবং তা স্মরণ রাখার চেষ্টা করতো। সে হুযুর (সাঃ)-এর পিছনে নামায পড়তো এবং পবিত্র রামাদান মাসের রাতে জেগে ইবাদাত করতো। প্রিয় নবী (সাঃ)-ও সে শিশুকে খুব ভালবাসতেন এবং স্নেহ করতেন। একবার হুযুর (সাঃ)-এর নিকট তায়েফ থেকে আঙ্গুর এলো। শিশুটিও তখন রাসূল (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিল। তিনি তাকে দু'ছড়া আঙ্গুর দিয়ে বললেন, "পুত্র, একছড়া তোমার এবং আরেক ছড়া তোমার মাতার। বাড়ী গিয়ে তাঁকে দিয়ে দিও।" সেতো শিশু ছিল। পথে নিজের ছড়া খেয়ে খুব মজা পেল। দ্বিতীয় ছড়াও খেয়ে ফেললো এবং মাকে এ কথা কখনো বললোও না। কিছুদিন পর হুযুর (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "পুত্র, মাকে কি আঙ্গুরের ছড়া দিয়েছিলে?" রাসূল (সাঃ)-এর সাহচর্যের গুণে সে-ও সত্যবাদী হয়েছিল। আরজ করলো, "হে আল্লাহর রাসূল—না। দু'ছড়াই আমি খেয়ে ফেলেছিলাম।" তার জবাব শুনে হুযুর (সাঃ) মুচকি হাসলেন এবং তার কান ধরে বললেন, "খুব ধূর্ত হয়ে গেছ দেখি।"

শিশুটি নবী শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মাদ(সাঃ)-এর প্রচুর স্নেহ ও ভালোবাসা পেয়েছিল এবং আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি তারও ছিল অগাধ ভক্তি শ্রদ্ধা। আর সেই শিশু ছিলো হযরত নু'মান (রাঃ) বিন বশির আনসারী।

হযরত আবু আবদুল্লাহ নু'মান বিন বশির (রাঃ)-এর সম্পর্ক ছিল খাযরাজ বংশের বনু হারেছের সঙ্গে। নসবনামা হলোঃ নু'মান (রাঃ) বিন বশির (রাঃ) বিন সায়াদ বিন

ছায়ালাবা বিন খালাছ বিন যায়েদ বিন মালিক আগার বিন ছায়ালাবা বিন কায়াব বিন খাযরাজ বিন হারিছ বিন খাযরাজুল আকবার।

হযরত নু'মান (রাঃ) দ্বিতীয় হিজরীতে বদরের যুদ্ধের তিন চার মাস পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন। জ্ঞান হলে নিজের বাড়ীতে ইসলামের সুগন্ধি মোহিত হতে দেখেছিলেন। তাঁর পিতা হযরত বশির (রাঃ) বিন সায়াদ আনসারের অগ্রাবর্তী দলভূক্ত ছিলেন এবং প্রিয় নবী (সাঃ)-এর প্রতি ছিলো অগাধ শ্রদ্ধা। তিনি বাইয়াতে উকাবায়ে কবিরাতে অংশ নিয়েছিলেন এবং বদর, ওহোদ, খন্দক ও অন্যান্য সকল যুদ্ধে রাসূল (সাঃ)-এর সহগামী ছিলেন। হুযুর(সাঃ)-এর ওফাতের পর আনসারের এক বড় শ্রেণীর ধারণা ছিলো যে, খাযরাজের সরদার হযরত সায়াদ (রাঃ) বিন উবাদাহ সায়েদী আনসারীকে খিলাফতের আসনে আরোহণ করা উচিত। কিন্তু হযরত বশির (রাঃ) বিন সায়াদ মুহাজিরদের খিলাফতের পক্ষে জোরেশোরে সমর্থন জ্ঞাপন করলেন এবং আনসারদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর বাইয়াত করলেন। হযরত নু'মানের মাতা হযরত উমরাহ (রাঃ) বিনতে রাওয়াহা জালিলুল কদর সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন রাওয়াহার সহোদরা এবং অত্যন্ত মুখলিস সাহাবিয়াহ ছিলেন। পুত্র নু'মান (রাঃ)-এর প্রতি ছিল অসাধারণ ভালেবাসা। একবার তিনি একটি বিশেষ সম্পদ হযরত নুমান (রাঃ)-এর নামে হেবাহ করতে চাইলেন এবং স্বামী হযরত বশীর (রাঃ) বিন সাদেককেও রাজী করিয়ে নিলেন। অতপর তিনি হযরত বশীর (রাঃ)-কে বললেন, এ কাজে রাসূল (সাঃ)-কে সাক্ষী বানিয়ে নিন। হযরত বশীর শিশু নুমান (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে রাসূলে (সাঃ)-এর নিকট হাজির হলেন এবং আরজ করলেন ঃ " হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমি আমার অমুক সম্পদ এ পুত্রকে প্রদান করছি।"

হুযুর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, " এ সম্পদ থেকে তুমি কি তার অন্যান্য ভাইদেরকেও অংশ দিয়েছ?"

হযরত বশির (রাঃ) আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, না।"

হুযুর (সাঃ) বললেন, "তাহলে আমি জুলুমের সাক্ষী হতে পারি না।" অন্য অপর এক রাওয়াতে তাঁর সঙ্গে এ শব্দাবলী সংশ্লিষ্ট আছে,ঃ "আল্লাহকে ভয় কর এবং সন্তানদের মধ্যে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা কর।"

এরপর হযরত বশির (রাঃ) চুপ-চাপ ঘরে ফিরে গেলেন এবং হযরত উমরাহ (রাঃ)-ও প্রিয় নবী (সাঃ)-এর নির্দেশের সামনে মাথা নত করে দিলেন।

যে সম্পদ মাতা-পিতা হযরত নু'মান (রাঃ)-কে বিশেষভাবে দিতে চেয়েছিলেন তা কি ছিল? এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কতিপয় রাওয়াতে আছে এটা জমি ছিল। আবার কতিপয় রাওয়াতে আছে যে তা একটি গোলাম ছিল।

বলা হয়ে থাকে যে, নবী (সাঃ)-এর হিজরতের পর কোন আনসারীর গৃহে হযরত নু'মানই প্রথম জন্ম গ্রহণ করেন। মাতা-পিতা তাঁকে অসাধারণভাবে ভালবাসতেন এবং প্রায় সময়ই হুযুর(সাঃ)-এর পবিত্র খিদমতে নিয়ে যেতেন। তার জন্য দোয়া করতেন। এ কারণেই শিশু নু'মানের অন্তরে রহমতে আলম (সাঃ)-এর প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা জন্মেছিল। ১১ হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসে প্রিয় নবী (সাঃ)-এর ইন্তেকালের সময় হযরত নুমান (রাঃ)-এর বয়স আট বছর ৭ মাস ছিল। বয়স এত কম হওয়া সত্ত্বেও তিনি হুযুর (সাঃ)-এর এক বিরাট সংখ্যক ইরশাদ মুখস্ত করে নিয়েছিলেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এবং হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রাঃ)-এর খিলাফতকালে হযরত নুমান (রাঃ) বিন বশির (রাঃ)-এর তৎপরতার কোন হদিস পাওয়া যায় না। অবশ্য কতিপয় রাওয়েত থেকে জানা যায় যে, তিনি হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শাহাদাতে খুব ব্যাথিত হয়েছিলেন এবং তার রক্তাক্ত কুরতাহ ও স্ত্রী নায়েলা (রাঃ)-এর কর্তিত আঙ্গুল হযরত মাবিয়া (রাঃ)-এর নিকট দামেস্ক নিয়ে গিয়েছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) খিলাফতের শুরুতেই যখন আমীর মাবিয়া (রাঃ)-এর সাথে তাঁর মত বিরোধ শুরু হলো তখন হযরত নু'মান (রাঃ) আমীর মাবিয়া (রাঃ)-কে সমর্থন দান করেন। আমীর মাবিয়া (রাঃ) হযরত নু'মানকে খুব শ্রদ্ধা করতেন এবং নিজের শাসনকালে তাঁকে কয়েকটি উচ্চপদে সমাসীন করেন। ঐতিহাসিক ইয়াকুবী বর্ণনা করেছেন, আমীর মাবিয়ার নির্দেশে হযরত নু'মান (রাঃ) দু'হাজার সৈন্যের বাহিনীসহ আইনুত তামারের ওপর হামলা করেন। সে সময় সেখানে হযরত আলী (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে মালিক বিন কাব গবর্নর ছিলেন। তিনি হামলাকারী বাহিনীকে হটিয়ে দিয়েছিলেন। স্বয়ং হযরত নু'মান এ বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন না তিনি কোন দ্বিতীয় ব্যক্তিকেই এ অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

দামেস্কের কাজী হযরত ফুজালাহ (রাঃ) বিন উবায়েদ আনসারী ৫৩ হিজরীতে ওফাত পেলেন। এ সময় হযরত আমীর মাবিয়া (রাঃ) হযরত নু'মান (রাঃ)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। তার কিছুদিন পর তিনি হযরত নু'মান (রাঃ)-কে ইয়েমেনের আমীর নিয়োগ করেন। নিজের মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে ৫৯

হিজরীতে আমীর মাবিয়া (রাঃ) হযরত নুমান (রাঃ)-কে কূফার মত গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশের গবর্নর বানান। তিনি এ পদে বহাল থাকা অবস্থায় ৬০ হিজরীতে আমীর মাবিয়া (রাঃ) ওফাত পান এবং প্রথম ইয়াযিদ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। কূফাবাসী এ ঘটনার খবর পেল। তারা বনু উমাইয়ার বিরোধী হযরত সুলায়মান (রাঃ) বিন ছুরাদুল খাজায়ীর গৃহে একত্রিত হয়ে হযরত হুসাইন (রাঃ) বিন আলী (রাঃ)-এর খিদমতে পত্র প্রেরণ করে তাঁকে কূফা তাশরীফ আনার অনুরোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পত্রে তারা তাঁর বাইয়াত করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়। এ পত্র প্রেরণের পর কূফাবাসী একের পর এক এ বিষয়বস্তুর পত্র প্রেরণ অব্যাহত রাখলো। হযরত হোসাইন (রাঃ) পর পর তাদের পত্র পেলেন। তিনি আপন চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আকিল (রাঃ) কে পরিস্থিতি অবগত হওয়ার জন্য কূফা প্রেরণ করলেন। মুসলিম বিন আকিল (রাঃ) কূফা পৌঁছলে ১২ অথবা ১৮ হাজার মানুষ তাঁর হাতে বাইয়াত নিলেন। হযরত নু'মান বিন বশির (রাঃ) এ পরিস্থিতির খবর পেয়ে দেখেও না দেখার ভূমিকা নিলেন। কিন্তু যখন শাসক বিরোধী তৎপরতা বৃদ্ধি পেতে লাগলো তখন হযরত নু'মান (রাঃ) মিম্বরে চড়ে লোকদের সামনে এক শক্তিশালী ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি বললেন, "হে মানুষেরা! আল্লাহকে ভয় কর এবং ফিতনা সৃষ্টি করো না। কেননা তাতে জীবন হানি হয়। রক্ত প্রবাহিত ও সম্পদ লুটপাট হয়। যে আমার সাথে লড়াই করবে না আমি তার সাথে লড়াই করবো না। যে আমার ওপর হামলা করবে না আমি তার ওপর হামলা করবো না। ধারণার বশবর্তী হয়ে কাউকে আটক করবো না। যার অপরাধ প্রকাশ হয়ে গেছে এবং জানা গেছে যে বাইয়াত ছিন্ন করেছে তাহলে আমার হাতে যতদিন তরবারী থাকবে ততদিন তার ওপর আঘাত হানতে থাকবো। আমি যদি একাও হই তাহলেও আমি এ কাজ চালিয়ে যাব।"

এ সমাবেশে বনু উমাইয়ার এক শক্তিশালী সমর্থক আব্দুল্লাহ বিন মুসলিমও উপস্থিত ছিল। হযরত নু'মান (রাঃ)-এর নরমপন্থা তার পছন্দ হলো না। সে উঠে বললো, "হে আমীর! আপনার গৃহীত কর্মপদ্ধতি দুর্বল। এখন নরম নয় কঠোর হওয়ার সময়।"

হযরত নু'মান (রাঃ) বললেন, "আমি আল্লার নাফরমানীতে শক্তিশালী হওয়া এবং আনুগত্যের প্রতি দুর্বল হওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি এবং আল্লাহ যদি কারোর ওপর আবরণ দিয়ে থাকেন, আমি তা ছিন্ন করতে চাই না।"

আবদুল্লাহ বিন মুসলিম সেখান থেকে উঠে গৃহে এলো এবং ইয়াযিদকে কূফায় কোন শক্তিশালী ব্যক্তি প্রেরণের কথা লিখে একটি পত্র দিল। সে পত্রে উল্লেখ করলো যে, "নু'মান (রাঃ) অত্যন্ত দূর্বলতা প্রদর্শন করছে।"

ইয়াযিদ এ পত্র পেয়ে উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদকে কূফার গবর্নর নিয়োগ করলো। হযরত নু'মান (রাঃ) শাসন ক্ষমতা তার হাতে সোপর্দ করে সিরিয়া চলে গেলেন। এটা ৬০ হিজরীর ঘটনা। কিছুদিন পর ইয়াযিদ তাকে হেমসের গবর্নর নিয়োগ করলেন এবং তাঁর ওফাত পর্যন্ত এ পদেই বহাল ছিলেন।

হযরত নু'মান (রাঃ) কূফা থেকে প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পর কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনা সংঘটিত হলো। এ ঘটনায় সাইয়েদেনা হযরত হোসাইন (রাঃ) তার বেশ কিছু সংখ্যক আত্মীয় স্বজন এবং সাথী শাহাদত বরণ করলেন। হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর উত্তরাধিকারদেরকে দামেস্ক নিয়ে যাওয়া হলো, তারা যখন দামেস্কে কিছুদিন অবস্থান করলেন, তখন ইয়াযিদ তাদেরকে হযরত নু'মান বিন বশির(রাঃ)-এর তত্ত্বাবধানে মদীনা মুনাওয়ারাহ প্রেরণ করলো।

হযরত নু'মান (রাঃ) যথাসাধ্য মুসিবাত যাদাহ মুসাফিরদেরকে সাহায্য করলেন এবং রাস্তায় তাঁদের কোন কষ্ট হতে দিলেন না। কোন মনযিলে এ কাফেলা যাত্রা বিরতি করলে হযরত নুমান (রাঃ) এবং তাঁর সাথীরা পর্দার খেয়ালে পৃথক হয়ে যেতেন। কাফেলাটি মদীনা মুনাওয়ারাহ পৌঁছলে হযরত যয়নব (রাঃ) হযরত ফাতিমা (রাঃ) সুন্দর ব্যবহারের জন্য হযরত নুমান (রাঃ)-কে চুরি ও বাজু বন্ধ খুলে প্রদান করলেন। সাথে সাথে তাদের নিকট অন্য কোন জিনিস না থাকার কারণে দিতে পারলেন না বলে ক্ষমা চাইলেন।

হযরত নু'মান অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বললেন, "হে রাসূল (সাঃ)-এর বেটিরা! আল্লাহর কসম আমি যা কিছু করেছি তা আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং রাসূল (সাঃ)-এর আপনাদের আত্মীয়তার থাকার কারণে করেছি। দুনিয়ার কোন স্বার্থের জন্য করিনি। এ অলংকার নিয়ে আমি আমার ছওয়াব নষ্ট করবো না। আল্লার কসম! এ সব আপনাদের নিকটেই রাখুন।"

হযরত হোসাইন (রাঃ) ছাড়া ইয়াযিদ হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)-কেও ভয় করতেন। তিনি মক্কায় অবস্থান করছিলেন এবং ইয়াযিদের বাইয়াতের আগ্রহী ছিলেন

না। কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনার পর সে কতিপয় লোককে ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর বাইয়াত নেয়ার জন্য মক্কা প্রেরণ করেছিল। ইবনে যোবায়ের (রাঃ) তাদেরকে এ জবাব দিয়েছিলেন যে, "আমি ইয়াযিদের কোন কথার জবাব দেব না। আমি বিদ্রোহী নই। তবে, নিজেকে অন্য কারোর কবজায় কখনো ন্যস্ত করবো না।"

তারা ফিরে গিয়ে ইয়াযিদকে হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)-এর জবাব সম্পর্কে অবহিত করলো। তাতে সে আরো বেশী ক্রোধান্বিত হলো এবং সিরিয়ার সম্ভ্রান্ত লোকদের একটি প্রতিনিধি দল ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর নিকট প্রেরণ করলো। এ দলে হযরত নু'মান বিন বশীর (রাঃ)-ও ছিলেন। তারা মসজিদে হারামে গিয়ে হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করলেন এবং তাঁকে ইয়াযিদের বাইয়াত গ্রহণে সম্মত করাতে চাইলেন। এতে ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর প্রতিনিধি দলের এক সদস্য আবদুল্লাহ বিন উজাত আশয়ারীকে সম্বোধন করে বললেনঃ

"এ হেরেমে আমার সাথে লড়াই করা কি হালাল হবে?" ইবনে উজাত জবাবে বললেন, "হাঁ, আপনি আমীরুল মুমিনিনের আনুগত্য না করলে তা হালাল হবে।"

ইবনে যোবায়ের (রাঃ) হেরেমের একটি কবুতরের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "এ কবুতর মারা কি হালাল?" ইবনে উজাত বললেন, "হাঁ, যদি জানা যায় যে, সে আমীরুল মুমিনের অবাধ্য।" ইবনে উজাতের সাথে আলোচনার পর হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) হযরত নু'মান বিন বশির(রাঃ)-কে নির্জনে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, "আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি যে, তোমার নিকট আমিই আফজাল না ইয়াযিদ?"

হযরত নুমান (রাঃ)ঃ "আপনি"

হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) "আমার পিতা আফজাল না ইয়াযিদের পিতা?" হযরত নু'মান (রাঃ) "আপনার পিতা" হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ), "আমার মাতা আফজাল না ইয়াযিদের মাতা।" হযরত নু'মান (রাঃ), "আপনার মাতা।" হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ), "আমার খালা আফজাল, না ইয়াযিদের খালা আফজাল?" হযরত নুমান (রাঃ), "আপনার খালা।" হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ), "আমার ফুফু আফজাল না ইয়াযিদের ফুফু?" হযরত নুমান (রাঃ) আপনার—আপনার পিতা যোবায়ের (রাঃ),

মাতা আসমা (রাঃ) বিনতে আবি বকর (রাঃ) —খালা উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) এবং ফুফু উম্মুল মুমিনিন হযরত খোদায়জাহ (রাঃ) বিনতে খুয়ায়লেদ।"

হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বললেন, "এরপরও তুমি কি পরামর্শ দাও যে, আমি ইয়াযিদের বাইয়াত করি।"

হযরত নু'মান (রাঃ) বিন বশির (রাঃ) বললেন, "আপনি যদি আমার পরামর্শ চান তাহলে আমি আপনাকে এ মত দেব না এবং ভবিষ্যতে আপনার নিকট আসবোও না।" এরপর প্রতিনিধি দলটি ইয়াযিদের নিকট ফিরে গেল।

ইয়াযিদের মৃত্যু এবং মাবিয়া (রাঃ) বিন ইয়াযিদের ক্ষমতা থেকে পদত্যাগের পর ৬৪ হিজরীতে হযরত নু'মান (রাঃ) বিন বশির হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)-এর বাইয়াত করেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) তাঁকে হেমসের শাসনকর্তা এবং সিরিয়ার কতিপয় জেলার শাসক হিসেবে জাহহাক বিন কায়েসকে নিয়োগ করেন। নতুন উমাইয়া খলিফা মারওয়ান ইবনুল হাকাম জাহহাক বিন কায়েসকে অনুগত করার জন্য একটি শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করলেন। হযরত নু'মান (রাঃ) এ খবর পেয়ে শুরাহ বিল বিন জুল কালার নেতৃত্বে কিছু সৈন্য জাহহাক বিন কায়েসের সহায্যার্থে প্রেরণ করলেন। মারজে রাহাত নামক স্থানে উভয় বাহিনীর মধ্যে রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হলো। যুদ্ধে জাহহাক বিন কায়েস পরাজিত হলেন। হযরত নু'মান (রাঃ) পরাজয়ের খবর পেয়ে রাতে হেমস থেকে বেরিয়ে গেলেন। মারওয়ান খালিদ বিন আদিল কিলায়ীর নেতৃত্বে একটি বাহিনী দিয়ে তার পিছু ধাওয়া করালেন। খালিদ বিন আদি তাঁকে হেমসের উপকণ্ঠে বিরান নামক একটি গ্রামে গিয়ে ঘিরে নিল এবং শহীদ করে মাথা কেটে নিল। অতপর সে হযরত নুমানের পরিবার-পরিজনকে গ্রেফতার করলো এবং তাদেরকে হযরত নু'মান (রাঃ)-এর মাথাসহ মারওয়ানের নিকট পেশ করলো। মারওয়ান হযরত নুমান (রাঃ)-এর মাথা তাঁর স্ত্রীর কোলের ওপর নিক্ষেপ করলো। এক বর্ণনায় আছে, তার স্ত্রী মাথাটি তাকে প্রদানের জন্য স্বয়ং দরখাস্ত করেছিলেন। যাহোক এটা ছিল এক শিক্ষণীয় ঘটনা। ইসলামের উন্নত নৈতিক মানদণ্ডের সঙ্গে এর কোন সামঞ্জস্য ছিল না। কারণ, ইসলাম লাশ অবমাননা করার অনুমতি দেয় না। অন্যদিকে হযরত নু'মান বিন বশির (রাঃ) বিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বনু উমাইয়ার খিদমত করেন। কিন্তু অবশেষে একজন উমাইয়া শাসকের হাতেই তাঁকে শাহাদাত প্রাপ্ত হতে হয়।

হযরত নু'মান (রাঃ)-এর শাহাদতের ঘটনা ৬৫ হিজরীতে ঘটে। সে সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৬৪ বছর। তাঁর তিনটি ছেলের নাম জানা যায়। তাঁরা হলেন ঃ মুহাম্মাদ, বশির এবং ইয়াযিদ।

হযরত নু'মান (রাঃ) বিন বশির (রাঃ) অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। চরিতকাররা তাঁর ধৈর্য, রহমদিল হওয়া, নরম মেজাজ এবং বদান্যতার খুব প্রশংসা করেছেন। তাঁর জীবনের একটি বিরাট অংশ ঘনঘোর দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় কেটেছিল। তবুও রক্তারক্তি থেকে বিরত থাকার জন্য তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন এবং নাজুক থেকে নাজুকতম পরিস্থিতিতে নিজেকে আয়ত্বে রেখেছিলেন। ইবনে জরির, তাবারি (রঃ) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "তিনি ধৈর্যশীল, ইবাদাতগুজার এবং ক্ষমাশীল ছিলেন।"

হাফিজ ইবনে আবদুল বার (রঃ) "আল ইসতিয়াবে" তাঁর দানশীলতার এক হৃদয়গ্রাহী ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত নুমান (রাঃ) যখন হেমসের গভর্ণর ছিলেন (ইয়াযিদের শাসনকালে) তখন প্রখ্যাত কবি আ'শা হামদানি তাঁর নিকট এসে আরজ করলো, আমি ইয়াযিদের কাছে গিয়ে সাহায্যের আবেদন করেছিলাম। কিন্তু সে আমার আবেদনের প্রতি ভ্রুক্ষেপই করেনি। এখন আপনার নিকট এসেছি। আত্মীয়তার হক আদায় করুন এবং আমার ঋণ পরিশোধ করে দিন। হযরত নু'মান সে সময় শূন্য হস্ত ছিলেন এবং কসম খেয়ে বললেন তার কাছে কিছুই নেই। আশা হামদানী তাঁর জবাব শুনে অত্যন্ত নিরাশ হলো। নু'মান (রাঃ) তাঁর ওপর খুব রহম হলো। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, ঠিক আছে। অতপর মানুষজন একত্রিত করে ২০ হাজার লোকের সামনে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ "হে মানুষেরা। আশা হামদানি তোমাদের নিকট এসেছেন। সে তোমাদের চাচার পুত্র। একজন মুসলমান এবং সম্ভ্রান্ত বংশীয়। কালের বিড়ম্বনায় সে আজ অর্থের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে। এখন তোমার মত কি।"

উপস্থিত সকলেই এক বাক্যে বললো, "আপনি যে নির্দেশ দেবেন তাই পালন করবো।"

হযরত নু'মান (রাঃ) বললেন, " না, আমি এ ব্যাপারে তোমাদের কোন নির্দেশ দেব না। তোমরা নিজেরাই তার সাহায্যের একটি পথ বের কর।"

জনতা বললো, " আপনি মাথা পিছু এক দিনার ঠিক করে দিন" তিনি বললেন, "না, দু'জন মিলে এক দিনার দাও।" সকলেই তাতে রাজী হয়ে গেল।

এরপর তিনি বললেন, আমি এখন আশা'কে সরকারী তহবিল থেকে অর্থ দিচ্ছি। যখন তোমাদের প্রদত্ত অর্থ জমা হবে তখন হিসেব করে তা সরকারী তহবিলে জমা দেয়া হবে। বস্তুত তিনি আশাকে ১০ হাজার দিনার দিলেন। তিনি তাতে আপাদমস্তক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এবং এ প্রসঙ্গে একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন।

জ্ঞান ও ফজিলতের দিক থেকে হযরত নু'মান বিন বশির (রাঃ) অত্যন্ত উচুঁ মর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন। যদিও তিনি রাসূল (সাঃ)-এর যুগে কম বয়স্ক ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর তকদিরে জ্ঞান অন্বেষণের স্পৃহা আমানত রেখেছিলেন এবং সাথে সাথে প্রবল মুখস্ত শক্তির নেয়ামত দান করেছিলেন। তিনি রাসূল (সাঃ)-এর জবানীতে যা কিছু শুনতেন তাই মুখস্ত করে নিতেন। রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের পর তিনি উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এরনিকট থেকে ফয়েজ হাসিল করেন। এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি নিজের মামা হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (মুতা যুদ্ধের শহীদ) থেকেও হাদীস শুনেছেন।

হাদীস বর্ণনায় হযরত নু'মান (রাঃ) অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। এরপরও তিনি ১২৪টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর হাদিস বর্ণনাকারী এবং শিষ্যদের মধ্যে ইমাম শাবী (রঃ), সামমাক বিন হারব (রঃ) আবু ইসহাক সাবিয়ী, সালিম বিন আবিল জায়াদ (রঃ), উরওয়াহ (রঃ) বিন যোবায়ের (রঃ), আবু কালাবাল জারামী (রঃ), উবাইদুল্লাহ (রঃ) বিন আবদুল্লাহ বিন উতবাহ হাবিব বিন সালেম (রঃ) এবং আবদুল মূলক বিন উমায়ের(রঃ)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হযরত নু'মান (রাঃ) বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণর ছিলেন। এ কারণে তাকে হাজার হাজার মামলার ফায়সালা করতে হয়। চরিতকাররা বলেছেন, ফায়সালা করার সময় তিনি প্রিয় নবী (সাঃ)-এর নির্দেশাবলী এবং আদর্শকে সামনে রাখতেন ও হাদীসের হাওয়ালাহও দিতেন। বক্তৃতাতেও তিনি খুব পারদর্শী ছিলেন। অত্যন্ত সুন্দর ও সুললিত বক্তৃতা দিতেন। বক্তৃতায় রাজনৈতিক বিষয়াবলীর ইঙ্গিত দিতেন, হাদীস বর্ণনা করতেন এবং মাসয়ালাও বলতেন। তাঁর এক শিষ্য আমমাক বিন হারব তাবেয়ী (রঃ) বলেছেন, তিনি যত লোকের

বক্তৃতা শুনেছেন তাদের মধ্যে হযরত নু'মান (রাঃ)-ই ছিলেন সবচেয়ে বড় বক্তা।

কখনো কখনো হাদীস বর্ণনার সময় আঙ্গুল দিয়ে কানের দিকে ইশারাহ করে বুঝাতে চাইতেন যে, তিনি স্বয়ং এ কান দিয়ে রাসূল (সাঃ) এভাবে বলতে শুনেছেন। তাঁর লেখনী বুদ্ধিমত্তায় পূর্ণ থাকতো। কবিতাতেও তাঁর আকর্ষণ ছিল। কতিপয় চরিতকার তার কিছু কবিতা উপস্থাপন করেছেন।

হযরত ইয়ামিন (রাঃ) বিন উমায়ের

মদীনার ইহুদীরা আওস এবং খাজরাজ গোত্রের লোকদেরকে প্রায়ই শেষ নবী (সাঃ)-এর আত্ম প্রকাশের খবর দিতো। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো যে, যখন শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) মদীনায় শুভ পদার্পন করলেন তখন তারা তাঁর ওপর ইমান আনতে স্পষ্টভাবে শুধু অস্বীকারই করলোনা বরং তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্র আঁটলো। কিন্তু এ সকল বাঁকা স্বভাবের লোকদের মধ্যেও কিছু সৎস্বভাবের লোক ছিলেন। নিজের কওমের এ ভূমিকা তাদের পছন্দ হলোনা। তাঁরা জান-প্রান দিয়ে নিজেদের ভাগ্য ইসলামের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নিল। এ ধরনের সৎস্বভাবের লোকদের মধ্যে ইয়ামিন (রাঃ) বিন উমায়েরও ছিলেন। ইহুদী গোত্র বনি নজিরের সাথে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। বংশ নামা হলোঃ ইয়ামিন (রাঃ) বিন উমায়ের বিন কা'ব বিন আমর বিন হাজ্জাশ। কতিপয় বর্ণনায় তাঁর পিতার নামও ইয়ামিন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁর নাম ইবনে ইয়ামিন বলা হয়েছে।

বনু নজির গোত্রের লোকেরা হযরত ইয়ামিন (রাঃ)-কে সঠিক পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য লোভ-লালসা এবং ভয়-ভীতির সকল অস্ত্রই প্রয়োগ করেছিল। কিন্তু তাঁর অটলতা এবং স্থির চিত্তে কোন পরিবর্তন আসেনি। দিন দিন রাসূল (সাঃ)-এর সাথে তাঁর ভালোবাসা বৃদ্ধিই পেয়েছিল।

একবার বনু নজিরের এক অসৎ লোক আমর বিন হাজ্জাশ প্রিয় নবী (সাঃ)-কে এক ঘরে ডেকে নিয়ে ওপর থেকে ভারী বস্তু ফেলে দিয়ে শহীদ করার পরিকল্পনা করেছিল। হুযুর (সাঃ) এ পরিকল্পনার কথা জানতে পেলেন। আর এ ভাবেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেল। এসত্ত্বেও তাঁর মনে আমর বিন হাজ্জাশের সেই অপবিত্র তৎপরতার কথা দাগ কেটে রাখলো। এ ব্যক্তি হযরত ইয়ামিন (রাঃ) বিন উমায়েরের চাচাতো ভাই ছিল। হযরত ইয়ামিন (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর একদিন হুযুর (সাঃ) তাঁকে বললেনঃ "ইয়ামিন, তুমি কি তোমার ভাইয়ের তৎপরতা দেখেছঃ সে আমাকে ধোকা দিয়ে ডেকে হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা হযরত জিবরাইল আমীনের মাধ্যমে আমাকে তার অসৎ উদ্দেশ্যের কথা জানিয়ে দেন।"

হযরত ইয়মিন (রাঃ) হুযুর (সাঃ)-এর এরশাদ শুনে ক্রোধে অস্থির হয়ে পড়লেন সেই সময়ই তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং আমর বিন হাজ্জাশের তাকে রইলেন। একদিন সুযোগ পেয়ে তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলেন এবং শান্তির নিশ্বাস ফেললেন।

নবম হিজরীতে তাবুকের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। বছরটি ছিল প্রচণ্ড খরার। এজন্য অনেক মুসলমানকে যুদ্ধ সরঞ্জাম ও সফরের সুযোগ-সুবিধা প্রদানে খুব বেগ পেতে হচ্ছিল। কতিপয় সাহাবী (রাঃ) রাসুল (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হয়ে সরকারের সামান প্রদানের দরখাস্ত করলেন। সে সময় দেওয়ার মত কোন বস্তুই ছিলনা। এজন্য প্রিয় নবী (সাঃ) অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। তারা অত্যন্ত পাক্কা এবং মুখলিস মুসলমান এবং যেকোন মূল্যে রাসুল (সাঃ)-এর সহগামী হয়ে জিহাদে শরীক হতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু সফর ছিল সুদীর্ঘ এবং কষ্টকর। তাছাড়া সওয়ারী এবং সামান ছাড়া তা অতিক্রম করাও সম্ভব ছিলনা। যখন এ সকল বস্তু প্রাপ্তির কোন পথ বেরুলোনা তখন নিরাশ হয়ে তারা রোদন করতে লাগলেন। কুরআনে হাকিমে তাদের নৈরাশ্য এবং দুশ্চিন্তার চিত্র এ ভাবে অংকিত করা হয়েছেঃ

"এবং না আছে কোন অভিযোগ সেই সকল লোকের ওপর যারা তোমার নিকট সওয়ারী চাইতে এসেছিল। এবং তুমি বললে, আমার নিকট এমন কোন জিনিস নেই যার ওপর তোমাদের সওয়ার করাবো। ফলে তারা ঐ দুশ্চিন্তায় ফিরে গেল যে তাদের নিকট রাহা খরচ ছিলনা। তাদের চক্ষু দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল।"

এ সকল অক্ষম সাহাবীর মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন মুখাফফাল মুযনি এবং হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) বিন রগবও ছিলেন। ঘটনাক্রমে হযরত ইয়ামিন (রাঃ) বিন উমাইর তাঁদেরকে ক্রন্দন অবস্থায় দেখে ফেললেন। ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বললেন, রাসূলের নিকট সফরের সামান চেয়েছিলাম কিন্তু পাওয়া যায়নি এবং আমাদের এমন সামর্থও নেই যে সামান সরবরাহ করতে পারি। হযরত ইয়ামিন (রাঃ) তাদেরকে সান্ত্বনা দিলেন এবং দুই সওয়ারী ও কিছু রাস্তার খরচ পেশ করলেন। এ কথা হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইবনে হিশামের রাওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত ইয়ামিন (রাঃ) তাদেরকে একটি উট এবং কিছু খেজুর দিয়েছিলেন। এ সামান্য সামানসহ সেই দুজন তাবুকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

হযরত ইয়ামিন (রাঃ) বিন উমাইয়ের বিস্তারিত তথ্য চরিত গ্রন্থে পাওয়া যায়না। এমনকি তাঁর মৃত্যুর সাল পর্যন্তও পাওয়া যায়নি।

হাফিজ ইবনে আব্দুল বার (রঃ) "আল-ইসতিয়াব" গ্রন্থে হযরত ইয়ামিন (রাঃ) বিন উমায়ের সম্পর্কে লিখেছেনঃ "তিনি মহান সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত।"

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

গ্রন্থপঞ্জী

১। পবিত্র কুরআন শরীফ
২। সহিহ বুখারী
৩। সহিহ মুসলিম
৪। মুসনাদে আবু দাউদ
৫। মুসনাদে আহম্মদ বিন হাম্বল
৬। জামে' তিরমিজী
৭। মুসতাদরাকে হাকিম
৮। মিশকাত শরীফ
৯। তাবকাতে ইবনে সায়াদ (রঃ)
১০। তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক—ইবনে জারীর তাবারী (রঃ)
১১। আল-ইসাবাহ ফি তামাইয়িজুস সাহাবাহ—হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ)
১২। তাহজিবুত তাহজিব—হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ)
১৩। আল-ইসতিয়াব মারিফাতুল আসহাব—হাফিজ ইবনে আব্দুল বার (রঃ) উন্দুলুসী
১৪। আস-সিরাতুন নবুবিয়াত—ইবনে হিশাম (রঃ)
১৫। যাদুল মিয়াদ—হাফিজ ইবনে কাইয়েম (রঃ)
১৬। উসুদুল গাবাহ—ইবনে আছির (রঃ)
১৭। আল-কামিল ফিত তারিখ—ইবনে আছির (রঃ)
১৮। আল-বিদায়া ওয়াল নিহায়া—হাফিজ ইবনে কাছির (রঃ)
১৯। ফতুলুল বুলদান—বালাজুরী (রঃ)
২০। আল-আনবারুত তাওয়াল—আবু হানিফাহ দিনাওয়ারী
২১। তরজুমানুস সুন্নাহ—মওলানা বদরে আলম মিরাটি (রঃ)
২২। মায়ারিফুল হাদীস—মওলানা মুহাম্মদ মনজুর নুমানী
২৩। খালিদ সাইফুল্লাহ—আবু যায়েদ শালবী
২৪। আল-ফারুক—শিবলী নুমানী (রঃ)
২৫। তারিখে ইসলাম—শাহ মুয়ীন উদ্দীন আহমদ নদবী মরহুম
২৬। তারিখে ইসলাম—আকবর শাহ খান নজিব আবাদী মরহুম
২৭। মিয়ারুস সাহাবাহ (রাঃ)—শাহ মুয়ীনুদ্দীন আহমদ নদবী মরহুম
২৮। সিয়ারে আনসার (রাঃ)—মওলভী সাঈদ আনসারী মরহুম
২৯। সিয়ারুস সাহাবাহ (রাঃ)—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড—মওলভী সাঈদ আনসারী মরহুম

৩০। আহলি কিতাবে সাহাবাহ ওয়া তাবেয়ীন—হাফিজ মুজিবুল্লাহ নদবী
৩১। তারিখে মিল্লাত—কাজী যয়নুল আবেদীন মীরাঠি
৩২। হজরত ওমরের (রাঃ) সরকারী পত্রাবলী—খুরশীদ আহমদ ফারুক
৩৩। আল-মাশাহেদ—হাকিম রহমান আলী খান মরহুম
৩৪। দায়েরায়ে মায়ারেফে ইসলামিয়া (ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম) পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়-বিভিন্ন খণ্ড
৩৫। হায়াতুস সাহাবাহ (রাঃ)—মওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ কানধুলুবী (রঃ)

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- **তাফহীমুল কুরআন (১-১৯ খণ্ড)**
  –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- **তরজমায়ে কুরআন মজীদ (এক খণ্ডে)**
  –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- **তাদাব্বুরে কুরআন (১-২ খণ্ড)**
  –মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী
- **শব্দে শব্দে আল কুরআন (১-১ ৪খণ্ড)**
  –মাওলানা মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান
- **সহীহ আল বুখারী (১-৬ খণ্ড)**
  –আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী র.
- **সুনান ইবনে মাজা (১-৪ খণ্ড)**
  –আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা র.
- **শারহু মাআনিল আছার (তাহাবী শরীফ) (১-২ খণ্ড)**
  –ইমাম আবু জাফর আহমাদ আত-তাহাবী র.
- **সীরাতে সরওয়ারে আলম (১-২ খণ্ড)**
  –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- **মহানবীর সীরাত কোষ**
  –খান মোসলেহ উদ্দীন আহমদ
- **বিশ্বনবীর মোযেজা**
  –ওয়ালিদ আল আযমী
- **হযরত আবু বকর রা.**
  –মুহাম্মদ হুসাইন হাইকল
- **শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দা'য়ী ইলাল্লাহ**
  –মুহাম্মদ নূরুজ্জমান
- **মাওলানা মওদূদীকে যেমন দেখেছি**
  –অধ্যাপক গোলাম আযম
- **মুন্সী মেহেরউল্লা ঃ জীবন ও কর্ম**
  –নাসির হেলাল

৩

বিশ্ব নবীর সাহাবী

তালিবুল হাশেমী

বিশ্বনবীর সাহাবী

তৃতীয় খণ্ড

তালিবুল হাশেমী

অনুবাদ ঃ আবদুল কাদের

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ২০০

১ম প্রকাশ ঃ এপ্রিল ১৯৯৪

২য় প্রকাশ

রজব	১৪৩০
আষাঢ়	১৪১৬
জুলাই	২০০৯

বিনিময় ঃ ১৭৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

خیر البشرکے جالیس جان نثار -এর বাংলা অনুবাদ
BISHA NABIR SAHABI-3rd Volume by Talibul Hashemy.
Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane,
Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 175.00 Only.

তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকা

উর্দু সাহিত্যের প্রোথিত যশা জীবনীকার শ্রদ্ধেয় জনাব তালিবুল হাশেমীর সাহাবীদের জীবনী গ্রন্থসমূহ বর্তমানে বাঙালী পাঠক সমাজের জ্ঞান পিপাসা কিছুটা হলেও নিবৃত্ত করতে পেরেছে। আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃপক্ষ প্রথমতঃ তাঁর লিখা 'পঞ্চাশজন সাহাবী'র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই বইয়ের প্রথম খণ্ড ইতিমধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃপক্ষ বের করেছেন। তবে, তা অন্য নামে। এবার নাম দেয়া হয়েছে "বিশ্ব নবীর সাহাবী"। আধুনিক প্রকাশনীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "বিশ্ব নবীর সাহাবী" কয়েক খণ্ডে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

এ সিদ্ধান্ত মুতাবেক বর্তমান খণ্ডটি 'বিশ্ব নবীর সাহাবী' তৃতীয় খণ্ড হিসেবে বের হলো। পঞ্চাশ জন সাহাবী'র দ্বিতীয় খণ্ড শেষ হলে তা 'বিশ্ব নবীর সাহাবী' দ্বিতীয় খণ্ড হিসেবে ইনশাল্লাহ বের হবে। বর্তমান খণ্ডে ৪০ জন সাহাবীর জীবনী আলোচিত হয়েছে। বিদগ্ধ পাঠক সমাজ এ জীবনী পাঠে অবশ্যই উপকৃত হবেন।

'বিশ্ব নবীর সাহাবী'র তৃতীয় খণ্ড প্রকাশনায় ভুল-ত্রুটি থাকাটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। পাঠকবর্গ তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দিয়ে দেখবেন বলে আশা করি। অনুবাদ সহ অন্যান্য কাজে অনেকেই সহযোগিতা করেছেন। তাদের প্রতি আমি চির কৃতজ্ঞ। আল্লাহ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস কবুল করুন। আমীন।

ঢাকা, ৩০ শে অগ্রহায়ণ, ১৪০০ সাল।
২৯ শে জমাদিউস সানি, ১৪১৪ হিজরী।
১৪ই ডিসেম্বর

বিনয়াবনত
আবদুল কাদের

সূচী পত্র

১। সাইয়েদুশ্ শুহাদা হযরত হামযাহ (রা) বিন আবদুল মুত্তালিব ১১
২। সাইয়েদুনা বিলাল (রা) বিন রাবাহ হাবশী ৩০
৩। হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা) ৪৩
৪। হযরত শুরাহবীল (রা) বিন হাসানাহ (রা) ৫৮
৫। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশ ৭৭
৬। সাইয়েদুনা আবু সালমাহ আবদুল্লাহ মাখযুমী ৮৫
৭। হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) ৯৩
৮। সাইয়েদুনা হযরত আরকাম (রা) বিন আবিল আরকাম মাখযূমী ৯৯
৯। হযরত উবাইদাহ (রা) বিন হারিছ মুত্তালিবী ১০৬
১০। হযরত হাতিব (রা) বিন আবি বালতাআহ ১১৩
১১। হযরত উককাশাহ (রা) বিন মিহসান আসাদী ১২৫
১২। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাখরামা আমেরী ১৩১
১৩। হযরত ছামামা (রা) বিন আছাল হানাফী ১৩৫
১৪। হযরত সালামা (রা) বিন আকওয়া আসলামী ১৪১
১৫। হযরত আমর (রা) বিন আবাসা ১৫৭
১৬। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আবু বকর সিদ্দীক (রা) ১৬৬
১৭। হযরত আবু রুহম মানহুর গিফারী (রা) ১৭০
১৮। হযরত জামাম (রা) বিন ছা'লাবা ১৭৪
১৯। হযরত কা'ব (রা) বিন মালিক আনসারী ১৮০
২০। হযরত উবাই (রা) বিন কা'ব আনসারী ১৯২
২১। হযরত যায়েদ (রা) বিন আরকাম আনসারী ২০৬
২২। হযরত বারা' (রা) বিন মালিক ২১৪
২৩। সাইয়েদুনা আবু জাবের আবদুল্লাহ সালামা (রা) ২২৪
২৪। হযরত সামমাক (রা) বিন খারশাহ সায়েদী ২৩৪
২৫। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা আনসারী ২৪০
২৬। হযরত আমর (রা) বিন জামূহ সালামা ২৫৭
২৭। হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল আনসারী ২৬৫

২৮। হযরত কাতাদাহ (রা) বিন নু'মান আনসারী ২৯৬
২৯। হযরত আবু লুবাবাহ রিফায়াহ (রা) বিন আবদুল মানযার আনসারী ৩০৩
৩০। হযরত আবদুল্লা (রা) বিন সালাম ৩১০
৩১। হযরত সা'দ (রা) বিন রবী' আনসারী ৩২১
৩২। হযরত হাবীব (রা) বিন যায়েদ আনসারী ৩২৭
৩৩। হযরত বশীর (রা) বিন সা'দ আনসারী ৩৩০
৩৪। হযরত খুযাইমা (রা) বিন সাবিত খুতমী ৩৩৭
৩৫। হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আবু বকর সিদ্দীক (রা) ৩৪২
৩৬। হযরত দ্বাহহাক (রা) বিন সুফিয়ান ৩৫২
৩৭। হযরত আত্তাব (রা) বিন আসীদ উমুবী ৩৫৮
৩৮। হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন সামুরাহ ৩৬৪
৩৯। হযরত কায়েস (রা) বিন আছেম মুনকারি ৩৭৪
৪০। হযরত তামীম (রা) বিন আওস দারী ৩৮০
৪১। গ্রন্থপঞ্জী ৩৮৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সাইয়েদুশ্ শুহাদা হযরত হামযাহ (রা) বিন আবদুল মুত্তালিব

তৃতীয় হিজরীর ৭ই শওয়াল। ওহোদের যুদ্ধ শেষ হয়েছে, যুদ্ধের ময়দানে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য। রহমতে আলম (সা)–এর ৭০ জন জীবন উৎসর্গকারীর রক্তাক্ত লাশ এদিক ওদিক পড়েছিল। মুশরিকরা মনের কোণে লুক্কায়িত জিঘাংসা এবং প্রতিশোধের এমন পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিল যে, প্রায় সকল শহীদের লাশই বিকৃত করে ফেলেছিল। তাঁদের কান, নাক এবং ঠোঁট কেটে নিক্ষেপ করেছিল অথবা হার বানিয়ে গলায় ঝুলিয়েছিল। সারওয়ারে আলম (সা) স্বয়ং এই যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর নিজের আহত হওয়ার কথা খেয়ালই ছিল না। অবশ্য নিজের এত সংখ্যক জীবন উৎসর্গকারীর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ায় তিনি খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন। যুদ্ধের পর হুযূর (সা) ময়দানের পর্যালোচনার জন্য বের হলেন। এ সময় তাঁর পবিত্র চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছিল এবং চেহারায় দুঃখ ও বেদনার ছাপ পরিলক্ষিত হচ্ছিল। হাঁটতে হাঁটতে তিনি একটি লাশের নিকট এসে থেমে গেলেন। মুশরিকরা আল্লাহ্‌র পথের এই শহীদের সাথে যে আচরণ করেছিল তা চরম পর্যায়ের পৈশাচিকতা ও কঠিন হৃদয়েরই প্রতিচ্ছবি ছিল। হতভাগারা এই পবিত্র লাশের ঠোঁট, নাক ও কানই কর্তন করেনি বরং পেটেরও স্থানে স্থানে ফেড়ে ফেলেছিল। সাইয়েদুল মুরসালীন (সা) এই লাশ দেখলেন। তাঁর অন্তর কেঁদে উঠলো। মুখ দিয়ে বের হলো "তোমার উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক। কেননা, আমি যতটুকুন জানি, তুমি আত্মীয়দেরকে বেশী খেয়াল রাখতে এবং নেক কাজে অগ্রগামী ছিলে।"

এই হক পথের শহীদ, যাঁর জন্য সৃষ্টির সেরা ফখরে মওজুদাত সাইয়েদুল আনাম রহমতে দো আলম (সা) রহমতের দোয়া করেছিলেন এবং যাঁর নেক আখলাকের প্রকাশ্য প্রশংসা করেছিলেন তিনি হলেন, রাসূলের (সা) চাচা হযরত হামযাহ (রা) বিন আবদুল মুত্তালিবুল হাশেমী।

সাইয়েদুনা হযরত হামযাহ (রা) হক পথে নিজের জীবন বিক্রি করে দিয়েছিলেন। তাঁর মহানত্ব সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। তাঁর হসব–নসব প্রসঙ্গে এতটুকুন লিখাই যথেষ্ট যে, তিনি প্রিয় নবীর (সা) চাচা হুযূরের (সা) পিতা হযরত আবদুল্লাহ হযরত হামযাহর (রা) বৈমাত্রেয়

ভাই]। এছাড়া হুযূরের (সা) সঙ্গে তাঁর আরো দু' ধরনের সম্পর্ক ছিল। প্রথমত, হুযূরের (সা) মাতা হযরত আমেনাহ বিনতে ওয়াহাব যাহরী হযরত হামযাহর (রা) মাতা হালাহ বিনতে আহিব (অথবা ওয়াহিব) যাহরীর চাচাতো বোন ছিলেন। এই দিক থেকে হযরত হামযাহ (রা) হুযূরের (সা) খালাতো ভাই হতেন। দ্বিতীয়ত আবু লাহাবের বাঁদী ছাওবিয়াহ (রা) হযরত হামযাহ (রা) এবং বিশ্ব নবী (সা) উভয়কেই দুধ পান করিয়েছিলেন। এই দিক থেকে হযরত হামযাহ (রা) হুযূরের (সা) দুধ ভাই ছিলেন। হযরত হামযাহর (রা) জন্ম সাল সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের রেওয়ায়াত রয়েছে। কতিপয় নেতৃস্থানীয় চরিতকার লিখেছেন, তিনি হুযূরের (সা) দু'বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং কতিপয় চরিতকার চার বছরের পার্থক্যের কথা বর্ণনা করেছেন। দু'ধরনের বর্ণনাই সমান মর্যাদার অধিকারী। পার্থক্য দু'বছরের হোক অথবা চার বছরের হোক এ থেকে এটা অবশ্যই প্রমাণিত হয় যে, ছাওবিয়াহ (রা) হযরত হামযাহ (রা) ও হুযূরকে (সা) পৃথক পৃথক সময়ে দুধ পান করিয়েছিলেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) আল ইসতিআবে এই মতই প্রকাশ করেছেন।

হযরত হামযাহর (রা) কুনিয়ত আবু আম্মারাহ এবং আবু ইয়ালা উভয়ই ছিল। সাইয়েদুশ শুহাদা, আসাদুল্লাহ এবং আসাদুর রাসূল এই তিনটি হলো তাঁর মশহুর লকব।

হযরত হামযাহর (রা) শৈশবকালের অবস্থা পর্দায় ঢাকা রয়েছে। বেশীর পক্ষে এতটুকুন জানা যায় যে, শৈশবকাল থেকেই তরবারী চালনা, তীরন্দাজী এবং কুস্তিগীরির সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল এবং আমোদ ভ্রমণ ও শিকারে খুব উৎসাহ ছিল। জওয়ান হওয়ার পর তিনি কুরাইশের নামকরা বাহাদুরদের মধ্যে স্থান লাভ করেন। কিন্তু তিনি গোত্রসমূহের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদে খুব কমই অংশ নিতেন এবং বেশীরভাগ সময়ই আমোদ ভ্রমণ ও শিকারে কাটাতেন।

নবুওয়াত প্রাপ্তির পর রহমতে আলম (সা) তাওহীদের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। এভাবে ছ'বছর কেটে গেল। কিন্তু হুযূরের (সা) প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও হযরত হামযাহ (রা) ইসলামী দাওয়াতের ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখালেন না। সম্ভবত সে যুগে তাঁর জীবনের লক্ষ্যই ছিল শিকার কর এবং খাও। এই স্বভাবের কারণেই দাওয়াতে হক নিয়ে চিন্তা-ভাবনার ফুরসত হয়নি। এমনিভাবে তাঁর দিন-রাত কাটছিল। হঠাৎ করে একদিন এক ঘটনা ঘটে গেল। সেই ঘটনাই তাঁর অন্তর ও দৃষ্টিভঙ্গীকে পরিবর্তন করে দিল এবং

তিনি দীনে হকের একজন জানবাজ সিপাহী হয়ে গেলেন। ঘটনাটি হলো ঃ (নবুওয়াত প্রাপ্তির ৬ষ্ঠ সালে) একদিন রহমতে আলম (সা) দারে আরকাম থেকে বের হয়ে ছাফা (অথবা অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী জাহুন) এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। (অথবা কতিপয় রেওয়ায়াত মত সেই স্থানের নিকট লোকদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিচ্ছিলেন।) এমন সময় সেখান দিয়ে আবু জেহেল যাচ্ছিল। তার সঙ্গে ছিল আদী বিন হামরা এবং ইবনুল আসদা। হুযূরকে (সা) দেখে আবু জেহেলের শরীরে যেন আগুন লেগে গেল এবং তাঁকে অবলীলাক্রমে গালি দিতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে দীনে হকের ব্যাপারে অত্যন্ত খারাপ শব্দ ব্যবহার করলো। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, সে হুযূরের (সা) উপর মাটি এবং গোবর নিক্ষেপ করলো এবং তাঁর গায়ে হাতও দিল। রহমতে আলম (সা) নিজের মহান চরিত্রের দাবী অনুযায়ী অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দিলেন এবং আবু জেহেলের কোন কথার কোন জবাব দিলেন না। অবশেষে সে ক্লান্ত হয়ে বকা-ঝকা করতে করতে চলে গেল এবং হুযূরও (সা) সেখান থেকে চলে গেলেন। ঘটনাক্রমে বনু তাইমের সরদার আবদুল্লাহ বিন জুদইয়ানের (স্বাধীন করা) বাঁদী ছাফা পর্বতে নিজের গৃহে বসে সমগ্র ঘটনা অবলোকন করছিলেন। হযরত হামযাহ (রা) শিকার থেকে ফেরার পথে তার ঘরের সামনে দিয়ে আসছিলেন। সে সময় সে তাঁকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"আবু আম্মারাহ! হায়, তুমি যদি কিছুক্ষণ আগে এখানে উপস্থিত থাকতে, তাহলে দেখতে পেতে যে, আমর বিন হিশাম (আবু জেহেল) তোমার ভাতিজার সঙ্গে কি ধরনের অনাকাংখিত আচরণ করেছে। অত্যন্ত কঠোর গালিও দিয়েছে এবং গায়েও হাত দিয়েছে। কিন্তু ইবনে আবদুল্লাহ এর কোন জবাব দেননি এবং অসহায়ভাবে ফিরে গেছেন।" [কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে, এই ঘটনার খবর হুযূরের (সা) ফুফু হযরত ছুফিয়াহ (রা) বিনতে আবদুল মুত্তালিব সহোদর হযরত হামাযাহকে (রা) দিয়েছিলেন। এ কথাও প্রচলিত আছে যে, দু'জন মহিলা হযরত হামযাহকে (রা) এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। যা হোক, হযরত হামযাহ (রা) যে-ই শিকার থেকে ফিরেছিলেন, অমনি কোন না কোন মাধ্যমে তিনি এই খবর পেয়েছিলেন]।

ঘটনার খবর শুনেই হযরত হামযাহর (রা) মনে ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধ জেগে উঠলো। ক্রোধে অস্থির হয়ে সোজা কাবা গৃহের দিকে হাঁটা দিলেন। আবু জেহেল সেখানে মজলিস জাঁকিয়ে বসে আত্মগর্ব প্রকাশ করছিলো। হযরত হামযাহ (রা) সেখানে পৌছে আবু জেহেলের মাথায় প্রচন্ডভাবে ধনু দিয়ে আঘাত হানলেন। ফলে মাথা ফেটে দরদর করে রক্ত পড়তে লাগলো। অতপর তিক্ত কণ্ঠে বললেন, "তুই মুহাম্মাদকে (সা) গালি দিয়েছিস। আমিও

তাঁর দীনের উপর ঈমান এনেছি সে যা বলে আমিও তাই বলি। যদি তোর সাহস থাকে তাহলে আমাকে একটু গালি দিয়ে দেখ।"

আবু জেহেলকে রক্তাক্ত দেখে বনু মাখযূমের কিছু মানুষ তার সমর্থনে দাঁড়িয়ে গেল এবং হযরত হামযাহর (রা) উপর হামলার জন্য উদ্যত হলো। কিন্তু আবু জেহেল তাদেরকে এই বলে বাধা দিলো যে, আবু আম্মারাহকে ছেড়ে দাও। আমি তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে গালি দিয়েছিলাম। এ জন্য সে ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েছে।

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে, আবু জেহেলের সমর্থক মাখযূমীরা হযরত হামযাহকে (রা) বললোঃ "হামযাহ! সম্ভবত তুমিও বেদীন হয়ে গেছ।"

হযরত হামযাহ (রা) নিশঙ্কচিত্তে জবাব দিলেনঃ "আমার দীনও তাই যা মুহাম্মাদের (সা)। আমার নিকট যখন হক প্রতিভাত হয়েছে তখন আমাকে ইসলাম গ্রহণে কে বাধা দিতে পারে? আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল এবং যা কিছু বলেন, তা সম্পূর্ণ সত্য। আল্লাহর কসম! আমি এখন এই কথা থেকে কোনক্রমেই ফিরে যেতে পারি না। তোমরা সত্য হলে আমাকে বাধা দিয়ে দেখ।"

হযরত হামযাহর (রা) জবাব শুনে মাখযূমীরা তাঁর উপর হামলা করতে চাইলো। আবু জেহেল প্রমাদ গুণলো। সে মনে করলো এইভাবে বনু মাখযূম ও বনু হাশিমের মধ্যে এমন যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে যা কেউ-ই নিভাতে পারবে না। সুতরাং সে মাখযূমীদেরকে হযরত হামযাহর (রা) সঙ্গে বাদানুবাদ না করার কথা বললো।

হযরত হামযাহ (রা) জিদের বশবর্তী হয়ে ইসলাম গ্রহণের কথা তো ঘোষণা করে দিলেন। কিন্তু যখন গৃহে ফিরলেন তখন মনে সংশয় সৃষ্টি হলোঃ "আমি কুরাইশের সরদার হয়ে মুহাম্মাদের (সা) নতুন দীন গ্রহণ করে নিজের বাপ-দাদার দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা। তার চেয়ে মরে যাওয়াই শ্রেয়।" এই সংশয় ও সন্দেহের মধ্যে তিনি আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন। ঃ "হে আল্লাহ! আমি যে রাস্তা অবলম্বন করছি তাতে যদি কোন কল্যাণ থাকে তাহলে তার সত্যতার স্বীকৃতির কারণে আমার অন্তরে শান্তি দিন। নচেৎ যে বস্তুর মধ্যে আমি আটকা পড়েছি তা থেকে বের হওয়ার কোন পথ তৈরী করে দাও।"

এক রেওয়ায়াতে আছে, আবু জেহেলকে আহত করার পর হযরত হামযা (রা) বিশ্ব নবীর (সা) নিকট গিয়ে বললেন ঃ "ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমার তো খুশী হওয়া উচিত যে, আমি আবু জেহেলের নিকট থেকে তোমার প্রতিশোধ নিয়েছি।"

হুযূর (সা) বললেন, "চাচাজান! আমি এই ধরনের কথায় খুশী হই না। আপনি গাইরুল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দীনে হকের আনুগত্য করলেই আমি খুশী হবো।"

হুযূরের (সা) এই হকের দাওয়াতের পর তিনি ভয়ানক দ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন এবং তখনই তিনি এই জটিলতা ও মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে নিষ্কৃতির জন্য দোয়া করলেন। সারা রাত এই চিন্তাতেই কেটে গেল। সকালে রহমতে আলমের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে নিজের মানসিক দ্বন্দ্বের কথা অবহিত করলেন। হুযূর (সা) তাঁকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ইসলাম সঠিক হওয়ার ব্যাপারে বুঝালেন, আল্লাহর ভয় প্রদর্শন করলেন এবং হক গ্রহণের বিনিময়ে জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন। হুযূরের (সা) ইরশাদ শুনে হযরত হামযাহর (রা) অন্তর ইয়াকীন এবং নূরে ভরে গেল এবং তিনি বলে উঠলেন ঃ "আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, আপনি সত্যবাদী আপনি আপনার দীনের ব্যাপক প্রচার করুন। আল্লাহর কসম। আমি এটা কোনক্রমেই পসন্দ করি না যে, আমার উপর আসমান ছায়া দেবে আর আমি আমার প্রথম দীনের উপর কায়েম থাকবো।"

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত হামযাহর (রা) বেশীর ভাগ সময় আরকাম গৃহে রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে কাটতে লাগলো। একদিন অন্য কতিপয় সাহাবীর (রা) সঙ্গে সেখানেই নবীর (সা) খিদমতে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় কুরাইশের লৌহমানব হযরত ওমর (রা) বিন খাত্তাব দারে আরকামের দরজা খট খটালেন। এক ব্যক্তি দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন যে, হযরত ওমর (রা) নাঙ্গা তরবারী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। (অন্য রেওয়ায়াতে তিনি তরবারী কোমরে বাঁধা অবস্থায় ছিলেন) তিনিও হুযূরকে (সা) এ কথা বললেন। সাহাবীরা (রা) সংশয়ে পড়ে গেলেন যে, রক্তারক্তি না ঘটে যায়! এ সময় হযরত হামযাহ (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং অত্যন্ত জোশের সঙ্গে বললেন, তাকে আসতে দাও। যদি নেক ইচ্ছা নিয়ে এসে থাকে তাহলে ভালো। নচেত তার তরবারী দিয়েই তার মাথা কাটা হবে।

হযরত ওমর (রা) ভেতরে এলে হুযূর (সা) তাঁর চাদর মাটির দিকে টেনে জোরে টান মারলেন এবং বললেন, "ওমর! বলো, কোন্ অভিপ্রায় নিয়ে এসেছ?" নবুওয়াতের জালালী কণ্ঠস্বরে হযরত ওমরের (রা) শরীর কাঁপতে লাগলো এবং তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের উপর ঈমান আনার উদ্দেশ্যে হাযির হয়েছি।"

এতে হুযূরে আকরাম (সা) জোরে আল্লাহু আকবার বলে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাহাবায়ে কিরাম (রা) এত জোরে নারায়ে তাকবীর উচ্চারণ করলেন

যে, মাটি এবং পাহাড় গুঞ্জরিত হয়ে উঠলো। এখন হযরত হামযাহ (রা) এবং হযরত ওমর ফারুকের (রা) মত দু'টি শক্তিশালী বাহু পাওয়া গেল। নবুওয়াতের সপ্তম বছরে মক্কার মুশরিকরা বনূ হাশিম ও বনূল মুত্তালিবকে শি'বে আবী তালিবে অবরোধ করলো। এ সময় হযরত হামযাহও (রা) তিন বছর পর্যন্ত অবরোধ জীবনের বিষ পান করার মত কষ্ট সহ্য করেন। আল্লামা ইবনে সা'দ (র) বর্ণনা করেছেন, রহমতে আলম (সা) মক্কায় নিজের প্রিয় জান-নিসার (আযাদকৃত গোলাম) হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছাহকে হযরত হামযাহর ইসলামী ভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন। নবুওয়াতের ১৩ বছরের পর হুযূর (সা) সাহাবায়ে কিরামকে (রা) মদীনায় হিজরতের অনুমতি দান করলে হযরত হামযাহও (রা) অধিকাংশ সাহাবীর (রা) সঙ্গে [হুযূরের (সা) হিজরতের কিছু দিন পূর্বে] হিজরত করে মদীনায় তাশরীফ নেন।

আছেম বিন ওমর বিন কাতাদাহ (র) বর্ণনা করেছেন, মদীনা পৌঁছে হযরত হামযাহ (রা) হযরত সাআদ (রা) বিন খাছিমাহর বাড়ীতে অবস্থান করেন। কিন্তু ওয়াকেদী (র) লিখেছেন, তিনি হযরত কুলছুম (রা) ইবনূল-হাদাম এর মেহমান হয়েছিলেন। কিছুদিন পর প্রিয় নবীও (সা) মদীনা মুনাওয়ারাহ তাশরীফ আনেন এবং ইসলামের মাদানী অধ্যায় শুরু হয়।

আল্লামা ইবনে সাআদ ওয়াকেদীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, ইসলামের সর্বপ্রথম ঝান্ডা হযরত হামযাহকে (রা) প্রদান করা হয়। প্রথম হিজরীর রমযান মাসে বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) হযরত হামযাহর (রা) নেতৃত্বে ৩০ জন অশ্বারোহীকে উপকূলীয় এলাকার দিকে প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল তারা সিরিয়া থেকে মক্কা আগত কুরাইশের কাফেলাকে বাধা দেবেন। সেই কাফেলায় আবু জেহেলসহ তিনশ' ব্যক্তি ছিল। উভয়পক্ষ সামনা-সামনি হলে মাজদি বিন আমরুল মাজহানি কোনমতে বাঁচিয়ে যুদ্ধ পর্যন্ত গড়াতে দেয়নি এবং হযরত হামযাহ (রা) রক্তারক্তি ছাড়াই মদীনা ফিরে আসেন।

ইবনে সা'দ (র) এই অভিযানের নাম দিয়েছেন, "সারইয়াতু সাইফুল বাহার।" কিন্তু বাস্তবে সহীহ বুখারীর মতে "সারইয়াতু সাইফুল বাহার" ৮ম হিজরীতে সংঘটিত হয়। সে সময় ইসলামী বাহিনীর আমীর ছিলেন, হযরত আবু উবায়দাহ (রা) ইবনুল জাররাহ। কতিপয় রেওয়ায়াতে এই অভিযানকে 'সারইয়াতু হামযাহ' বলা হয়েছে। আর এটাই ঠিক।

এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী এই অভিযান কোন বিশেষ কাফেলাকে বাধা দানের জন্য প্রেরণ করা হয়নি, বরং সাধারণভাবে কুরাইশের কাফেলাসমূহের

গুপ্তচর বৃত্তির জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল এবং শুধুমাত্র ঘটনাক্রমে আবু জেহেলের কাফেলার সঙ্গে সামনাসামনি হয়েছিল।

দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাসে প্রিয় নবী (সা) ৬০ অথবা ৭০ জন সাহাবায়ে কিরামকে (রা) সঙ্গে নিয়ে ওয়াদ্দান অথবা আবওয়া নামক যুদ্ধস্থলে গিয়ে পৌছেন। এই যুদ্ধেও হুযূর (সা) হযরত হামযাহকে (রা) বাহিনীর নেতা ও ঝান্ডাবাহী বানিয়েছিলেন। ইসলামী বাহিনীর আবওয়া পৌছার পূর্বেই কুরাইশের কাফেলা সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল। এ জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটার সুযোগ হয়নি। এ সত্ত্বেও বনু জুমরাহর সঙ্গে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী তারা কুরাইশ অথবা মুসলমান কাউকেই সাহায্য না করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। সর্বাবস্থায় তারা নিরপেক্ষ থাকবে বলে চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়।

একই সালের জমাদিউল আখিরে যূল আশিরাহ'র যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে রহমতে আলম (সা) একশ ৫০ জন সাহাবী সমেত মক্কার কুরাইশদের শাস্তি প্রদানের জন্য যুল আশিরাহ তাশরীফ নেন। এই যুদ্ধেও হুযূর (সা) মুজাহিদদের ঝান্ডা বহনের সম্মান হযরত হামযাহকেই (রা) দিয়েছিলেন। কিন্তু এবারও কোন রক্তারক্তি ঘটেনি। কেননা কুরাইশের কাফেলা কিছুদিন পূর্বেই যুল আশিরাহ অতিক্রম করে গিয়েছিল। অবশ্য বনু মাদলাজের সঙ্গে পারস্পরিক সাহায্যের এক চুক্তি সাধিত হয়।

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে হক ও বাতিলের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধের নাম 'বদরের যুদ্ধ" বলে পরিচিত। হযরত হামযাহ (রা) এই যুদ্ধে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নেন। সাধারণ যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে মুশরিকদের ব্যূহ থেকে উতবাহ বিন রবিয়াহ, শাইবাহ বিন রবিয়াহ এবং ওয়ালিদ বিন উতবাহ তরবারী দোলাতে দোলাতে বের হলো। মুসলমানদেরকে যুদ্ধের আহবান জানালো। ইসলামী বাহিনী থেকে তিনজন বীর আনসার [আফরা-পুত্র আওফ (রা), মাআয (রা) এবং মুয়াববায (রা) অথবা অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী আওফ (রা), মাআয (রা) এবং আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা] তাদের মুকাবিলায় দাঁড়ালেন। কুরাইশী যোদ্ধারা যখন অবগত হলো যে, তাদের মুকাবিলায় দন্ডায়মান তিনজন বীর মদীনার বাসিন্দা তখন তারা তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানালো এবং উতবাহ ডেকে বললো, "মুহাম্মাদ! এই সব মানুষ আমাদের সমকক্ষ নয়। আমাদের কওম ও সমকক্ষ লোকদেরকে মুকাবিলার জন্য প্রেরণ করো।"

এতে হুযূরে আকরাম (সা) হযরত হামযাহ (রা), হযরত আলী (রা) এবং হযরত উবাইদাহ (রা) বিন হারিছুল মাতলাবীকে তাদের সঙ্গে মুকাবিলার

নির্দেশ দিলেন। এই তিন বাহাদুর হুযূরের (সা) নির্দেশ শোনা মাত্র বর্শা হেলাতে হেলাতে দুশমনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। হযরত হামযাহর (রা) মুকাবিলা শাইবার সঙ্গে, হযরত আলী (রা) ওয়ালিদের সঙ্গে এবং হযরত উবাইদাহ'র (রা) মুকাবিলাহ উতবাহ'র সঙ্গে হলো। হযরত হামযাহ (রা) এবং হযরত আলী (রা) প্রথম আঘাতেই স্ব স্ব শত্রুকে জাহান্নামে প্রেরণ করলেন। কিন্তু উতবাহ ও উবাইদাহ (রা) উভয়েই দীর্ঘক্ষণ লড়াই করতে থাকলেন। এমনকি দু'জনই আহত হলেন। হযরত উবাইদাহ'র (রা) ক্ষত অত্যন্ত গুরুতর ছিল। হযরত হামযাহ (রা) এবং হযরত আলী (রা) এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে উভয়েই এক সঙ্গে আঘাত হেনে উতবাহকেও লাশ বানিয়ে ফেললো।

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে, হযরত হামযাহর (রা) মুকাবিলা হয়েছিল উতবাহর সঙ্গে। হযরত আলীর (রা) শাইবাহর সঙ্গে এবং হযরত উবাইদাহর (রা) ওয়ালিদের সঙ্গে। হযরত হামযাহ (রা) এবং হযরত আলী (রা) খুব তাড়াতাড়ি উতবাহ ও শাইবাহর উপর বিজয়ী হলেন। কিন্তু নওজোয়ান ওয়ালিদ বৃদ্ধ উবাইদাহকে (রা) গুরুতরভাবে আহত করলো। এতে হযরত হামযাহ (রা) এবং হযরত আলী (রা) সামনে অগ্রসর হলেন এবং মুহূর্তের মধ্যে ওয়ালিদকে মাটি ও রক্তে মিশিয়ে দিলেন।

উতবাহ, শাইবাহ এবং ওয়ালিদকে নিহত হতে দেখে কুরাইশের একজন নামকরা যোদ্ধা তায়িমাহ বিন আদী প্রচন্ড আবেগে গর্জন করতে করতে যুদ্ধের ময়দানে পৌছলো। হযরত হামযাহ (রা) তৎক্ষণাৎ তার দিকে অগ্রসর হলেন এবং এক আঘাতেই তাকে নরকে পাঠিয়ে দিলেন। এক্ষণে মুশরিকরা উত্তেজিত হয়ে সাধারণভাবে হামলা করে বসলো। মুসলমানদের সংখ্যা কাফেরদের তুলনায় তিন ভাগের এক ভাগেরও কম ছিল। কিন্তু তাঁরা এমন সাহসিকতা ও বীরত্বের সঙ্গে মুকাবিলা করলো যে, কাফেররা পরাজিত হতে বাধ্য হলো। হযরত হামযাহ (রা) এমনভাবে লড়াই করছিলেন যে, তাঁর পাগড়ীর উপর উট পাখীর পালক খচিত ছিল এবং দু'হাতে তরবারী চালনা করছিলেন। যেদিকে ঝুঁকছিলেন কাফেরদের ব্যূহ ওলট পালট হয়ে যাচ্ছিল। সেদিন তাঁর হাতে অনেক মুশরিক নিহত অথবা আহত হয়েছিল। তাদের মধ্যে বনু মাখযূমের একজন যোদ্ধা আসওয়াদ বিন আবদুল আসাদ বিন হিলালও ছিল। দেখতে ব্যক্তিটি অত্যন্ত কুৎসিত ছিল। সে যুদ্ধের ময়দানে এসে উচ্চস্বরে কসম খেয়ে বললো, আজ আমি মুসলমানদের হাওজের পানি অবশ্যই পান করবো এবং তা খারাব করে ছাড়বো। হযরত হামযাহ (রা) তার এই অহংকারপূর্ণ কথা শুনে অস্থির হয়ে পড়লেন এবং বাঘের মত তার উপর

ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর প্রথম আঘাতেই আসওয়াদের এক ঠ্যাং কেটে পড়ে গেল এবং সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। কিন্তু হিম্মত করে পুনরায় উঠলো এবং হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে মুসলমানদের হাওজ পর্যন্ত গিয়ে পৌছলো। হযরত হামযাহও (রা) তার পিছু পিছু ছিলেন। আসওয়াদ হাওজে ঝাঁপ দিলো। হযরত হামযাহ (রা) তাকে হাওজের মধ্যেই হত্যা করলেন।

কয়েক ঘন্টার যুদ্ধেই মুসলমানরা কাফেরদের পরাজিত করলেন। যুদ্ধে ৭০ জন মুশরিক নিহত হলো। তাদের মধ্যে উতবাহ, শাইবাহ, ওয়ালিদ, আবু জেহেল, নাজার ইবনুল হারিছ এবং আরো কতিপয় কুরাইশ সরদার অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রায় সমসংখ্যক মুশরিককে মুসলমানরা গ্রেফতার করলো। এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত হামযাহ (রা) আসওয়াদ বিন আমেরকে গ্রেফতার করেন। পরে আলহা বিন আবি তালহা ফিদইয়া হিসেবে দু'হাজার দীনার দিয়ে তাকে মুক্ত করে।

তিবরানী হযরত হারিস তাইমী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত হামযাহ (রা) বদরের যুদ্ধের দিন উট পাখীর পালক লাগিয়ে রেখেছিলেন। যুদ্ধের পর জনৈক মুশরিক জিজ্ঞেস করলো, উট পাখীর পালক কে লাগিয়েছিল? তাকে বলা হয়েছিল যে, তিনি ছিলেন হামযাহ (রা) বিন আবদুল মুত্তালিব। সে বললো, সে আজ আমাদের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করেছে। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে বদরের কতিপয় কয়েদী এই ব্যাখ্যা করেছে। যখন তারা জানতে পেলো যে, তিনি হামযাহ (রা) ছিলেন। তখন তারা বললো, আজকের যুদ্ধে হামযাহ (রা) আমাদের উপর সবচেয়ে বেশী আঘাত হেনেছেন।

দ্বিতীয় হিজরীর শওয়াল মাসে 'বনু কাইনুকা' যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বনু কাইনুকা'র ইহুদীরা অত্যন্ত বিত্তবান, শক্তিশালী ও যোদ্ধা ছিল। তারা লৌহজাত দ্রব্য ও মুদ্রার ব্যবসা করতো এবং নিজেদের হেফাজতের জন্য কয়েকটি দূর্গ বানিয়েছিল। হিজরতের পর হুযূরে আকরাম (সা) মদীনায় তাশরীফ আনার পর হকপন্থী ও বনু কাইনুকার মধ্যে একটি বন্ধুত্বমূলক চুক্তি সম্পাদিত হয়। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুকে সাহায্য করবে না এবং বাইরে থেকে যদি কেউ মুসলমানদের উপর হামলা করে তাহলে তারা মুসলমানদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে দুশমনের মুকাবেলা করবে বলে চুক্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু তারা খুব শীঘ্রই এই চুক্তি ভঙ্গ করলো। বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় তাদের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়ালো। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের কানাঘুষা করতে লাগলো। মুসলমানদের বিজয়ের গুরুত্বকে তারা এই বলে খাটো করতে থাকে যে, মক্কার কুরাইশরা যুদ্ধ বিদ্যায়

পারদর্শী নয়। মুসলমানদের মুকাবিলা যদি আমাদের সঙ্গে হতো তাহলে তারা বুঝতে পারতো যে, বীরেরা কিভাবে লড়ে।

দ্বিতীয় হিজরীর শওয়াল মাসে এক আকস্মিক ঘটনায় ঘৃতাহুতির কাজ হলো। একজন মুসলমান মহিলা কোন কাজে বনু কাইনুকার মহল্লায় গেলেন। এক ইহুদী তাঁর গায়ে হাত দিয়ে অপমানিত করলো। তা দেখে একজন মুসলমান ক্রোধে অস্থির হয়ে সেই ইহুদীকে হত্যা করে বসলো। ইহুদীরা সেই মর্যাদাবান মুসলমানকে শহীদ করে ফেললো এবং প্রকাশ্যে বিদ্রোহ এবং চুক্তি ভঙ্গের দিকে অগ্রসর হলো। মুসলমানরা তাদেরকে খুব করে বুঝালো কিন্তু অস্ত্র এবং দূর্গের ব্যাপারে তাদের এত অহংকার ছিল যে, কোনভাবেই তারা তাদের দুষ্ট চিন্তা থেকে ফিরলো না। অবশেষে নবীয়ে আকরাম (সা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং তাদের মহল্লা অবরোধ করলেন। 'বনু কাইনুকা' পনেরো দিন পর্যন্ত দূর্গে বন্দী অবস্থায় মুকাবিলা করলো। তারপর তাদের হিম্মত জবাব দিয়ে দিলো। রাসূলে করীম (সা) যে সিদ্ধান্ত দেবেন তাতেই তারা সম্মত হবে বলে জানালো। হুযূর (সা) খাযরাজের কতিপয় নেতার সঙ্গে পরামর্শ করে বনু কাইনুকাকে মদীনার আবাসস্থল পরিত্যাগপূর্বক বাইরে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। বস্তুত তারা মদীনা থেকে বের হয়ে সিরিয়ার এক জেলা আযরুয়াতে চলে গেল। ইবনে সা'দ (র) এবং ইবনে হিশাম (র) বর্ণনা করেছেন, বনু কাইনুকা'র যুদ্ধেও বিশ্ব নবী (সা) হযরত হামযাহকে (রা) ইসলামী বাহিনীর ঝান্ডা অর্পণ করেছিলেন। সুতরাং তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত বীরত্ব ও ধৈর্যের সঙ্গে ঝান্ডা বহনের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন।

তৃতীয় হিজরীতে মক্কায় মুশরিকরা বদরের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে মদীনা মুনাওয়ারার উপর চড়াও হলো। ৭ই শওয়াল হকের ঝান্ডাবাহী এবং কাফেররা ওহোদ পাহাড়ের পাদদেশে পরস্পরকে হামলা করে বসলো। সে সময় রহমতে আলমের (সা) সঙ্গে সাতশ' জানবাজ সাহাবী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একশ' যিরাহ পরিধানকারী এবং কতিপয় ঘোড়ায় সওয়ার ছিলেন। পক্ষান্তরে মুশরিকদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার। তাদের মধ্যে দু'শ ছিল ঘোড় সওয়ার এবং সাতশ' যিরাহ পরিধানকারী। মুসলমানরা ওহোদের পাহাড় পেছনের দিক রেখে নিজেদের ব্যূহ রচনা করলেন। হুযূর (সা) ৫০ জন তীরন্দাজের একটি দলকে সেই গিরিপথে মোতায়েন করলেন যেখান দিয়ে শত্রুর হামলা করার আশংকা বিদ্যমান ছিল। এই যুদ্ধে হযরত হামযাহ (রা) একটি দলের অফিসার নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই দলের কোন মুজাহিদই যিরাহ পরিধানকারী ছিলেন না। যুদ্ধের দামামা বেজে

উঠলো। কুরাইশের মহিলারা দফ বাজিয়ে বীরত্ব গাঁথা শুনিয়ে নিজেদের পুরুষদেরকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলো।

সর্বপ্রথম কুরাইশের ঝান্ডাবাহী তালহা বিন আবি তালহা ব্যূহ থেকে বেরিয়ে এলো এবং মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে হাঁক দিলো ঃ "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে আমার সামনে আসবে?" হযরত আলী মুরতাজা (রা) তাকে মুকাবিলা করার জন্য অগ্রসর হলেন এবং এক আঘাতেই তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর ওসমান বিন আবি তালহা কবিতা পাঠ করতে করতে অগ্রসর হলো। হযরত হামযাহ (রা) তার উপর হামলা করলেন এবং কাঁধের উপর এত জোরে তরবারী চালালেন যে, কোমর পর্যন্ত চলে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি না'রা উচ্চারণ করলেন, "আমি হলাম হিজাজের সাকির (আবদুল মুত্তালিব) পুত্র।"

আল্লামা শিবলী নোমানী (র) "সিরাতুন্নবী" গ্রন্থে ওসমানকে তালহার পুত্র হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অন্যান্য চরিতকাররা (ইবনে আছির, হাকিম এবং হাফিজ ইবনে আবদুল বার প্রভৃতি) ওসমান বিন তালহাকে সাহাবায়ে কিরামের (রা) অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি মক্কা বিজয়ের কিছু দিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হুযূর (সা) তাঁকে কা'বার চাবি রক্ষকের বংশীয় পদে বহাল রাখলেন। ধারণা করা হয় যে, ওহোদের যুদ্ধে হযরত হামযাহর (রা) হাতে যে ওসমান নিহত হয়েছিল সে ছিল আবি তালহার পুত্র এবং তালহার ভাই।

কুরাইশের ঝান্ডা উঠিয়ে অন্যরাও যখন মুসলমানের হাতে একের পর এক নিহত হলো তখন মুসলমানরা সাধারণভাবে হামলা করে বসলো। হযরত হামযাহ (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবু দুজানাহ (রা), হযরত সা'দ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস, হযরত তালহা (রা), হযরত সা'দ (রা) বিন মাআজ, হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজাইর ও অন্যান্য জীবন উৎসর্গকারী বৃহৎ সৈন্যদলে ঢুকে পড়লেন এবং শত্রু সৈন্যের কাতারের পর কাতার লাশ করে ফেললেন। হযরত হামযাহ (রা) দু'হাতে তরবারী চালাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন যে, আমি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের বাঘ। এই সময় মক্কার এক নেতৃস্থানীয় মুশরিক সাবা' বিন আবদুল উজ্জা তাঁর সামনে এসে পড়লো। হযরত হামযাহ (রা) তাকে সম্বোধন করে ক্রোধান্বিত কণ্ঠে বললেন, "মহিলাদের খাতনা করনেওয়ালী উম্মে আনমারের পুত্র তুই খোদা ও খোদার রাসূলের (সা) বিরুদ্ধে লড়তে এসেছিস?" এ কথা বলে তিনি এমনভাবে তরবারী চালালেন যে, সে খন্ডিত হয়ে সেখানেই পড়ে গেল। এদিকে হযরত হামযাহ (রা) এমনিভাবে লাশের উপর লাশ ফেলে যাচ্ছিলেন। ওদিকে জুবাইর বিন মাতআমের হাবশী গোলাম ওয়াহশী একটি পাথরের পেছনে চুপটি মেরে

হযরত হামযাহকে (রা) বাগে পাওয়ার জন্য অস্ত্রসহ অপেক্ষা করছিল। জুবাইর বিন মাতআমের চাচা তায়িমা বিন আদীর (বদরে নিহত) প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে ওয়াহশীকে হযরত হামযাহর (রা) হত্যার জন্য নিয়োগ করেছিল। আর এই কাজের বিনিময়ে তাকে স্বাধীন করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ঘটনাক্রমে খুব শীঘ্রই ওয়াহশী হামলা করার সুযোগ পেয়ে গেল। হযরত হামযাহ (রা) সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন। সে সময় হঠাৎ করে পা ফসকে তিনি চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। সুযোগ পেয়ে ওয়াহশী তৎক্ষণাৎ তাক করে নিজের ছোট বর্শাটি তাঁর উপর নিক্ষেপ করলো। এই বর্শা গিয়ে লাগলো তাঁর নাভিতে এবং তা পার হয়ে গেল। হযরত হামযাহ (রা) মারাত্মকভাবে আহত হওয়া সত্ত্বেও উঠে তার উপর হামলা করতে চাইলেন কিন্তু পারলেন না। তিনি পড়ে গেলেন এবং তাঁর পবিত্র রুহ আল্লাহর নিকট পৌছে গেল। হযরত হামযাহর (রা) শাহাদাতে মুশরিকরা খুব খুশী হলো এবং তাদের মহিলারা আনন্দের গান গাইতে লাগলো। হিন্দা বিনতে উতবাহ (আবু সুফিয়ানের স্ত্রী) মনের আনন্দ প্রকাশের জন্য হযরত হামযাহর (রা) পবিত্র লাশের, কান, নাক, ঠোঁট (এবং অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী গুপ্ত অঙ্গও) কেটে ফেলে। এরপর পেট কেটে কলিজা বের করে চিবিয়ে গিলে ফেলার চেষ্টা করলো। কিন্তু তা পারলো না। এবং উগড়ে ফেলে দিলো। অতপর একটি উঁচু স্থানে চড়ে উচ্চৈস্বরে কতিপয় গৌরব গাঁথা পাঠ করলো। এই গৌরব গাঁথার মর্মার্থ হলো, আজ আমরা বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ নিয়েছি এবং ওয়াহশী আমার অন্তর ঠান্ডা করে দিয়েছে। আমি যতদিন জীবিত থাকবো ততদিন তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো।

আল্লামা ইবনে সা'দ (রা) বর্ণনা করেছেন, হুযূর (সা) হিন্দাহর এই অপকর্মের খবর পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সেকি হামযাহর (রা) কলিজার কোন অংশ খেয়েছে? লোকজন আরয করলো, না। তিনি বললেন ঃ "হে আল্লাহ! হামযাহ'র (রা) শরীরের কোন অংশকে জাহান্নামে দাখিল হতে দিও না।"

যুদ্ধ শেষে প্রিয় নবী (সা) প্রিয় চাচার বিকৃত লাশের নিকট গেলেন। সে সময় তিনি খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। লাশের অবস্থা দেখে তিনি দুঃখে অস্থির হয়ে পড়লেন এবং সম্বোধন করে বললেন–"তোমার উপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক। কেননা তুমি আত্মীয় স্বজনের সবচেয়ে বেশী খেয়াল রাখতে এবং নেক কাজে অগ্রগামী ছিলে। আমার যদি ছুফিয়াহ'র (হুযূরের ফুফু এবং হামযাহ'র বোন) দুঃখ ও কষ্টের কথা খেয়াল না হতো তাহলে তোমার লাশ এমনিভাবে রেখে দিতাম। যাতে পশু পাখী তা খেয়ে ফেলে এবং কিয়ামতের দিন তাদের পেট থেকেই তোমাকে উঠানো হতো।"

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে, সে সময় হুযূর (সা) বলেছিলেন, আমাকে জিবরিল আমীন সুসংবাদ দিয়েছেন যে, হামযাহ (রা) বিন আবদুল মুত্তালিবকে সপ্তম আকাশের উপর আসাদুল্লাহ ও আসাদুর রাসূল লিখা হয়েছে।

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে, হুযূর (সা) হযরত হামযাহকে (রা) আসাদুল্লাহ ও সাইয়েদুশ শুহাদা উপাধি প্রদান করেছিলেন।

ইবনে সা'দ "তাবকাতুল কাবির"-এ লিখেছেন, হুযূর (সা) হযরত হামযাহর (রা) লাশ করুণ অবস্থায় দেখে বলেছিলেন, "আল্লাহ্র কসম! আমি তোমার বদলায় কাফেরদের ৭০ ব্যক্তির লাশ বিকৃত করবো।" কিন্তু তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্র তরফ থেকে হুকুম নাযিল হলো ঃ

> "যদি তোমরা শাস্তি দাও তাহলে সেই ধরনের শাস্তি দাও যেমন তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং যদি সবর করো তাহলে অবশ্যই সবরকারীদের জন্য সবর সবচেয়ে উত্তম এবং তোমরা সবর করো এবং তোমাদের সবর করা আল্লাহর তাওফিকেই হয়।" (সূরায়ে নাহল)

এই হুকুম নাযিলের পর হুযূর (সা) বললেন, আমি সবর করছি এবং প্রতিশোধ নিব না। সুতরাং তিনি সবর ইখতিয়ার করলেন এবং কসমের কাফ্ফারা আদায় করে দিলেন।

ইত্যবসরে হযরত হামযাহর (রা) সহোদরা হযরত ছুফিয়াহ (রা) বিনতে আবদুল মুত্তালিব যুদ্ধ পরিস্থিতি অবগত হওয়ার জন্য মদীনা থেকে বের হলেন। হুযূর (সা) তাঁর পুত্র হযরত যোবায়েরকে (রা) ডেকে ছুফিয়াহকে (রা) হামযাহর (রা) লাশ না দেখার কথা বললেন। হযরত যোবায়ের (রা) তাঁকে লাশের নিকট আসতে নিষেধ করলে তিনি বললেন, " আমি আমার ভাইয়ের ঘটনা শুনে ফেলেছি। কিন্তু আল্লাহর পথে এটা কোন বড় কুরবানী নয়। প্রিয় ভাইকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখে চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। তবে, "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" ছাড়া মুখ দিয়ে আর কিছুই বের হলো না। প্রত্যাবর্তন করার সময় হযরত যোবায়েরকে (রা) দু'টি চাদর প্রদান করলেন এবং তা দিয়ে মামার কাফন দাফন করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু নিকটেই একজন আনসারীর লাশ পড়েছিল। হযরত যোবায়ের (রা) দুই চাদর দুই শহীদের মধ্যে একটি করে ভাগ করে দিলেন। সেই একটি চাদর দিয়ে হযরত হামযাহর (রা) মাথা ঢাকলে পা বেরিয়ে পড়তো। আর পা ঢাকলে মাথা বেরিয়ে পড়তো। অবশেষে হুযূর (সা) বললেন, মুখমন্ডল এবং মাথা চাদর দিয়ে ঢেকে দাও এবং পায়ের উপর ঘাস দাও। এমনিভাবে রাসূলের (সা) চাচার জানাযা তৈরী হলো। এ সময় সাহাবায়ে কিরাম (রা) কাঁদতে

লাগলেন। হুযূর (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কাঁদছো কেন? তাঁরা আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। আজ আমাদের এই সামর্থ নেই যে, আপনার চাচার সমগ্র শরীর কাপড় দিয়ে ঢাকতে পারি।" হুযূর (সা) বললেন, "সেই যুগ আসছে যখন মুসলমানরা এমন স্থানে কর্মব্যস্ত থাকবে যেখানে খানা-পিনা, পরিধেয় বস্ত্র এবং সওয়ারীর প্রাচুর্য হবে। সেখান থেকে তারা পরিবার পরিজনকে মদীনা হতে নিজের নিকট আসার কথা লিখবেন।"

তারপর রহমতে আলম (সা) সর্বপ্রথম হযরত হামাযাহর (রা) জানাযার নামায পড়লেন। অতপর এক এক করে ওহোদের শহীদদের জানাযা হযরত হামযাহর (রা) পাশে এনে রাখা হলো এবং হুযূর (সা) প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক নামায পড়ালেন। এমনিভাবে সেদিন হযরত হামযাহর (রা) উপর ৭০ বার জানাযার নামায পড়ানো হলো। এই মর্যাদায় হযরত হামযাহর (রা) সমকক্ষ আর কেউ নেই। নামাযে জানাযার পর হযরত হামযাহকে (রা) তাঁর ভাগিনেয় হযরত আবদুল্লাহ বিন জাহাশের সঙ্গে একই কবরে ওহোদের শহীদদের স্তূপে দাফন করা হলো।

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) ইসাবাহতে লিখেছেন, ৩৭ বছর পর ৪০ হিজরীতে হযরত আমীরে মাবিয়ার (রা) নির্দেশে ওহোদের দিক থেকে খাল খনন করা হলো। খাল কাটার সময় কয়েকজন শহীদের লাশ একদম তরতাজা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। ঘটনাক্রমে হযরত হামযাহর (রা) পায়ে বেলচা লেগে গিয়েছিল। সে সময় তাঁর পা দিয়ে রক্তের ফিনকি এমনভাবে বের হয়েছিল যেমন জীবিত মানুষের ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত বের হয়।

ইবনে সা'দ (র) এবং ইবনে হিশাম (র) লিখেছেন, নিজের প্রিয় চাচার বিচ্ছিন্নতার কারণে বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন। তিনি যখন ওহোদের ময়দান থেকে প্রত্যাবর্তন করে মদীনা মুনাওয়ারাহ পৌছলেন তখন বনু আবদুল আশহাল এবং বনু জাফরের ঘর থেকে মহিলাদের কাঁদার শব্দ এলো। তাঁরা নিজেদের শহীদদের জন্য কাঁদছিলেন। হুযূরের (সা) চোখ অশ্রু পূর্ণ হয়ে উঠলো এবং তা পবিত্র মুখমন্ডলের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়লো। তিনি বললেন, "আফসোস! হামযাহর (রা) জন্য কাঁদার কেউ নেই।" হযরত সা'দ (রা) বিন মাআয (রা) এবং উসায়েদ (রা) বিন হুজায়ের যখন এই কথা শুনলেন, তখন তাঁরা নিজেদের মহিলাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, প্রত্যেক মহিলা আনসারী নিজেদের শহীদদের জন্য কাঁদার আগে, যেন রাসূলের (সা) নিকট গিয়ে হযরত হামযাহর (রা) জন্য কাঁদেন। বস্তুত সকল আনসারী

মহিলা রাসূলের (সা) নিকট পৌঁছে অত্যন্ত দরদ দিয়ে হযরত হামযাহর (রা) জন্য কাঁদতে লাগলেন। এই অবস্থায় হুযূর (সা) ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর জেগে দেখলেন যে, আনসার মহিলারা তখনো কাঁদছেন। তিনি তাদেরকে তখন ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং সেদিনের পর কোন মৃত ব্যক্তির জন্য না কেঁদে ধৈর্য ধারণের নসীহত করলেন।

আল্লামা শিবলী নোমানী লিখেছেন, নবী করীম (সা) যখন যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে এলেন তখন ঘরের দরজায় পর্দানশীন আনসার মহিলাদের ভিড় জমেছিল এবং তারা হযরত হামযাহর (রা) মাতম করছিলেন। তিনি তাঁদের জন্য দোয়া করলেন এবং বললেন, তোমাদের হামদরদীর শুকর আদায় করছি। কিন্তু মৃত ব্যক্তিদের জন্য বিলাপ করা জায়েয নয়। হযরত হামযাহর (রা) প্রতি রহমতে আলমের (সা) সীমাহীন ভালোবাসার পরিমাপ একটি ঘটনা দিয়ে করা যায়। কয়েক বছর পর হযরত হামযাহর (রা) হত্যাকারী ওয়াহশী বিন হারব ইসলাম গ্রহণ করে হুযূরের (সা) খিদমতে হাযির হলে তিনি বললেন, "তুমি যদি তোমার চেহারা আমার নিকট থেকে লুকাতে পার তাহলে লুকিয়ে ফেল। কেননা, তোমাকে দেখে হামযাহর (রা) দুঃখ তাজা হয়।" বস্তুত সে সমগ্র জীবন হুযূরের (সা) খিদমতে যেতে পারেনি।

সহীহ বুখারীতে স্বয়ং হযরত ওয়াহশী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, "যখন ওহোদ থেকে লোকজন ফিরে এলো তখন আমি চলে এলাম এবং মক্কায় ইসলামের চর্চা হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করলাম। অতপর সেখান থেকে তায়েফ চলে গেলাম। তায়েফবাসী হুযূরের (সা) নিকট কিছু কাসেদ প্রেরণ করলো এবং আমাকে বললো যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কাসেদকে কিছু বলেন না। সুতরাং আমিও তাদের সঙ্গী হলাম। যখন রাসূলের (সা) সামনে পৌঁছলাম এবং তাঁর (সা) দৃষ্টি যখন আমার ওপর পড়লো তখন বললেন, হামযাহকে (রা) কি তুই শহীদ করেছিলি এবং তোর নামই কি ওয়াহশী। আমি (লজ্জিত হয়ে) আরয করলাম, জী হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যা কিছু অবগত আছেন তা সত্য ও সঠিক। হুযূর (সা) বললেন, যদি তুই আমার সামনে থেকে হটে যেতে পারিস তাহলে হটে যা। আমি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে বের হয়ে পড়লাম। রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর মুসায়লামাহ কায্যাব বিদ্রোহ করে বসলো। আমি তখন মনে মনে বললাম মুসায়লামাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিত এবং তাকে হত্যা করা দরকার। এতে সম্ভবত হযরত হামযাহর (রা) বদলাহ পূরণ হতে পারে। অতএব, আমি লোকদের সঙ্গে রওয়ানা হলাম। তারপর যা হবার তাই হলো। আমি যখন ইয়ামামাহ পৌঁছলাম, সেখানে আমি গমের রঙ সদৃশ এক ব্যক্তিকে দেখলাম। সে ভাঙ্গা প্রাচীরের পাশে দাঁড়িয়েছিল। (সে-ই

ছিল মুসায়লামাহ কায্যাব)। আমি তার বুকে বর্শা মারলাম এবং দু' হাত দিয়ে তার দু' কাঁধের মধ্য দিয়ে তা পার করিয়ে দিলাম। এতক্ষণে একজন আনসারী এগিয়ে এলো এবং তরবারী দিয়ে তার মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেললো।"

এমনিভাবে হযরত ওয়াহশী (রা) বিন হারবের মাধ্যমে ইসলামের যতটুকুন ক্ষতি হয়েছিল, ততটুকুন উপকারও হয়ে গেল।

হযরত হামযাহ (রা) কয়েকটি বিয়ে করেছিলেন। স্ত্রীদের নাম হলো ঃ বিনতে লামতাহ বিন মালিক। তার পেটে ইয়ালা এবং আমের দু' পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল। খাওলাহ বিনতে কায়েস। তার পেটে জন্ম নিয়েছিল আম্মারাহ। সালমা বিনতে আমিস। তার পেটে উমামাহ (রা) নাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। আম্মারাহ এবং আমের উভয়েই নিসন্তান মারা যায়। ইয়ালার কয়েকটি সন্তান জন্ম নিয়েছিল। কিন্তু তারা শৈশবেই মৃত্যুবরণ করে। উমামাহকে (রা) হুযূরের (সা) সৎপুত্র হযরত আমর (রা) বিন আবি সালমাহ মাখযূমীর (রা) সঙ্গে বিয়ে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁর কোন সন্তান হয়নি। এমনিভাবে হযরত হামযাহর (রা) বংশধারা পুত্র ও কন্যা কারোর মাধ্যমেই অব্যাহত থাকেনি। কতিপয় বালুচ গোত্র নিজেদেরকে হযরত হামযাহর (রা) সন্তান বলে থাকে। কিন্তু তাদের দাবী প্রমাণের জন্য মজবুত দলীল প্রয়োজন।

আল্লামা ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু হুযূরকে (সা) হযরত উমামাহ (রা) বিনতে হামযাহর (রা) সঙ্গে বিয়ে করার উৎসাহ দিলে তিনি বলেন, "সে আমার দুধশরীক ভাইয়ের কন্যা। আমার বিয়ে তার সঙ্গে কি করে হতে পারে?"

সপ্তম হিজরীর যিলকদ মাসে হুযূরে আকরাম (সা) ওমরাহ পালনের জন্য মক্কা মুয়াজ্জামা তাশরীফ নেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্ত অনুযায়ী তিন দিন অবস্থানের পর তিনি মক্কা ত্যাগ করতে লাগলেন। এ সময় হযরত হামযাহর (রা) এতীম শিশু কন্যা চাচা চাচা করতে করতে হুযূরের (সা) দিকে দৌড় দিলো। হযরত আলী (রা) তাকে কোলে তুলে নিয়ে গিয়ে হযরত ফাতিমাতুজ জোহরার নিকট সোপর্দ করে বললেন, এ তোমার চাচার মেয়ে। আমি তাকে উঠিয়ে এনেছি। হযরত আলীর (রা) ভাই হযরত জাফর (রা) বিন আবি তালিব এবং হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছাহও হযরত উমামাহকে (রা) নিজের লালন পালনে নেয়ার জন্য হুযূরের (সা) খিদমতে পৃথক পৃথক দাবী পেশ করলেন। হযরত আলীর (রা) বক্তব্য ছিল যে, উমামাহ আমার চাচার কন্যা। এ জন্য আমিই তার হকদার। হযরত জাফর (রা) এই বলে নিজের দাবী প্রতিপন্ন করলেন যে, সে আমার চাচার কন্যা এবং আমার স্ত্রীর [আসমা (রা) বিনতে

আমিস] ভাগিনেয়া। হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছাহ (রা) বললেন, সে আমার (দীনী) ভাইয়ের কন্যা। আল্লাহ! আল্লাহ! এই গৌরব ও ভালোবাসার প্রতিযোগিতা একটি শিশু কন্যা প্রতিপালনের জন্য হচ্ছিল। অথচ ইসলামের পূর্বে এই নিষ্পাপ শিশু কন্যাকে মাটিতে জীবিত পুতে ফেলা হতো।

প্রিয় নবী (সা) এই বিবাদে হযরত জাফরের (রা) পক্ষে সিদ্ধান্ত দিলেন। কেননা তাঁর স্ত্রী আসমা (রা) বিনতে আমিস হযরত উমামাহর (রা) আপন খালা ছিলেন এবং খালা মা'র সমান হয়ে থাকেন।

সাইয়েদুনা হযরত হামযাহর (রা) চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ, বীরত্ব, জানবাজী, নির্ভীকতা, আত্মীয়তা, রাসূল প্রেম এবং জিহাদে উৎসাহ সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য ছিল। স্বয়ং নবীর (সা) যবানেই তাঁর উত্তম চরিত্রের বর্ণনা এভাবে দেয়া হয়েছে ঃ "তিনি আত্মীয়দেরকে সবচেয়ে বেশী খেয়াল রাখতেন এবং নেক কাজে সবসময় অগ্রগামী থাকতেন।"

আল্লাহপাক তাঁকে সিপাহীসুলভ গুণাবলী প্রদান করেছিলেন। আমোদ ভ্রমণ এবং শিকারের এত আকর্ষণ ছিল যে, নবীর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পর্যন্ত তিনি দাওয়াতে হকের প্রতি খেয়ালই করেননি। কিন্তু যখন আবু জেহেলের অপতৎপরতার কারণে তাঁর মর্যাদাবোধ জেগে উঠলো তখন ইসলামের শক্তিশালী বাহুতে পরিণত হয়ে গেলেন। কুরাইশের নাম করা পাহলোয়ান হযরত ওমর (রা) যখন দারে আরকামের দরজায় খটখটালো তখন স্বাভাবিকভাবেই সাহাবাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হলো। কিন্তু তখন হযরত হামযা-ই (রা) বজ্র কণ্ঠে বলেছিলেন, ওমরকে (রা) আসতে দাও। তার নিয়ত যদি খারাব হয় তাহলে তার তরবারী দিয়েই তার মাথা কাটা হবে। হিজরতের পর শাহাদাত পর্যন্ত তিনি অধিকাংশ যুদ্ধে যে বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন তা তাঁরই প্রাপ্য।

মাওলানা রুমী (র) মসনবীতে লিখেছেন, হযরত হামাযাহ (রা) যৌবনকালে সবসময় যিরাহ পরিধান করে লড়াই করতেন। কিন্তু যৌবনের পর ইসলাম গ্রহণ করে যিরাহ পরিধান সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করেছিলেন এবং এমনভাবে যুদ্ধে শরীক হতেন যে, সামনের দিক থেকে বুকখোলা থাকতো এবং দু'হাতেই তরবারী চালাতেন। লোকজন জিজ্ঞেস করতো, হে রাসূলের চাচা! হে ব্যূহ ভঙ্গকারী মুজাহিদ! হে যুবকদের সরদার! আপনি কি আল্লাহর হুকুম শুনেননি যে, জেনে-বুঝে ধ্বংসের মধ্যে পড়ো না। অতপর আপনি সতর্কতার সঙ্গে কেন কাজ করেন না। আপনি যখন যুবক ও সুঠামদেহী ছিলেন, তখন আপনি কখনো যিরাহ ছাড়া যুদ্ধে অংশ নিতেন না।

এখন আপনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। এ সময় আপনি নিজের জীবন রক্ষা এবং সতর্কতার দাবীর ব্যাপারে কেন বেপরওয়া হয়ে গেছেন। ভালো, তরবারী কাকে খাতির করে এবং তীর কাকে প্রশ্রয় দেয়। আমরা এটা চাই না যে, আপনার মত বাঘের বীরত্ব নিজের অসতর্কতার কারণে দুশমনের হাতে শেষ হয়েযায়।

তাঁদের কথা শুনে হযরত হামযাহ (রা) বলেছিলেন, আমি যখন যুবক ছিলাম তখন মনে করতাম মৃত্যু মানুষকে এই দুনিয়ার আরাম-আয়েশ থেকে মাহরুম করে। এ জন্য কেন অহেতুক মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবো এবং অজগরের মুখে নিক্ষিপ্ত হবো। এই কারণেই আমি জীবন রক্ষার্থে যিরাহ পরিধান করতাম। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলে আকরামের (সা) ফয়েযে আমার ধারণা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এখন এই নশ্বর দুনিয়ার ব্যাপারে আমার কোন আকর্ষণ নেই এবং মৃত্যু আমার নিকট জান্নাতের চাবি বলে মনে হয়। যিরাহ তো সেই ব্যক্তিই পরিধান করে যার জন্য মৃত্যু ভীতিপ্রদ বস্তু। যাকে তোমরা মৃত্যু বলে থাকো তা আমার নিকট অনন্ত জীবন।

হযরত হামযাহ (রা) একজন সিপাহী পুরুষ ছিলেন। এ জন্য মেজায স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা রুক্ষ ছিল। বুখারী ও মুসলিমের এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী জানা যায় যে, শরাব হারামের নির্দেশ নাযিলের পূর্বে তিনি তাতে অভ্যস্ত ছিলেন। একবার আনসারদের মদের মাহফিলে শরীক ছিলেন। এই মাহফিলে সুকণ্ঠি গায়িকা গান গাচ্ছিলেন। নিকটেই এক ব্যক্তির হুজরার আঙ্গিনায় দু'টি মোটা তাজা উটনী বাঁধা ছিল। সেই গায়িকা উটনীদ্বয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে একটি কবিতা পাঠ করলো।

কবিতা শুনে হযরত হামযাহ (রা) নেশাগ্রস্ত অবস্থায় অযাচিতভাবে লাফিয়ে পড়লেন এবং উটনীদ্বয়ের চুট কেটে ফেললেন এবং পিঠ চিরে কলিজা বের করে আনলেন। এই উটনী দু'টো ছিল হযরত আলীর (রা)। নিজের উটনীদ্বয়ের এই ধরনের মৃত্যুতে তিনি খুব কষ্ট পেলেন। অশ্রু ভারাক্রান্ত অবস্থায় রাসূলের (সা) নিকট অভিযোগ করলেন। হুযূর (সা) হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছাহকে সঙ্গে নিয়ে তক্ষুণি আনন্দ মাহফিলে তাশরীফ নিলেন এবং হযরত হামযাহকে (রা) এই অন্যায় কাজের জন্য তিরস্কার করলেন। সেই সময় তাঁর জ্ঞান ছিল না। ঘুরে হুযূরকে (সা) দেখলেন এবং বললেন, "তোমরা সবাই আমার পিতার গোলাম।"

হুযূর (সা) জানতে পেলেন যে, এখন আর তার হুঁশ নেই। সুতরাং তিনি ফিরে গেলেন। এটা একটা দুঃখজনক ঘটনা ছিল। এতে হযরত হামযাহর (রা)

নিশ্চয়ই আফসোস হয়েছিল এবং তিনি তার ক্ষতিপূরণও করেছিলেন। কেননা, তিনি আত্মীয়দের প্রতি খুব খেয়াল রাখতেন। তাবাকাতে ইবনে সা'দে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত হামযাহ (রা) হুযূরের নিকট (সা) নিবেদন করে বললেন যে, তিনি যেন তাকে জিবরাইল আমীনকে (আ) আসল সুরতে দেখিয়ে দেন। হুযূর (সা) বললেন, "চাচা! জিবরাইলকে (আ) আসল সুরতে দেখার মত শক্তিতো আপনার নেই।" কিন্তু হযরত হামযাহ (রা) তাঁকে দেখার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন। একদিন জিবরাইল (আ) নাযিল হলেন। এ সময় হুযূর (সা) হযরত হামযাহকে (রা) বললেন, আপনি উপরের দিকে তাকান এবং দেখুন যে, হযরত জিবরাইল (আ) আসল সুরতে নাযিল হয়েছেন। হযরত হামযাহ (রা) উপরে তাকালেন এবং হযরত জিবরাইলের (আ) পা দেখেই মূর্ছা গেলেন।

ইমাম হাকেম (র) মুসতাদরাকে হযরত আবদুল্লাহ বিন আববাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমায়েছেন যে, গত রাতে আমি বেহেশতে প্রবেশ করে দেখলাম, জাফর (রা) ফিরিশতাদের সঙ্গে উড়ছেন এবং হামযাহ (রা) একটি আসনের উপরে ঠেস দিয়ে বসে আছেন।

ইবনে আসির (র) "উসুদুল গাবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত হামযাহ (রা) একটি হাদীসও বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমায়েছেন, প্রত্যেক দোয়ায় এই বাক্য অবশ্যই পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِاِسْمِكَ الْاَعْظَمِ وَرِضْوَانِكَ الْاَكْبَرِ-

সাইয়েদুনা হযরত হামযাহর (রা) নজীরবিহীন বীরত্ব ও সাহসিকতাকে সামনে রেখে কতিপয় ব্যক্তি আশ্চর্য ধরনের বানোয়াট কাহিনী তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং তাকে আমীর হামযাহর (রা) কাহিনী নাম দিয়ে মজার সঙ্গে বর্ণনা করছে। বাস্তবত এসব কাহিনী বানোয়াট ছাড়া আর কিছু নয়। একজন জালীলুল কদর সাহাবীর সাথে ভুল কথা সংশ্লিষ্ট করা অথবা তা পড়া ও শোনা শুধু সময়ের অপচয়ই নয় বরং খামাখাই গুনাহ কামাই ছাড়া আর কিছু নয়। হযরত হামযাহর (রা) মহানত্ব ও মর্যাদা এ ধরনের বানোয়াট কাহিনীর মুখাপেক্ষী নয়।

সত্য কথা হলো, সাইয়েদুনা হামযাহর (রা) জীবনের বাস্তব ঘটনাবলীই এত উদ্দীপনাপূর্ণ যে, তাতে মুসলমানদের রক্ত চিরকালই উত্তপ্ত হতে থাকবে।

সাইয়েদুনা বিলাল (রা) বিন রাবাহ হাবশী

হিজরতে নবুয়ীর কিছু দিন পরের ঘটনা। রহমতে আলমের (সা) একজন জীবন উৎসর্গকারী সাহাবী ঘর বাঁধতে চাইলেন। কিন্তু বিয়ে করার মত সামর্থ তাঁর ছিল না। তাঁর জমি, ঘর, সম্পদ কিছুই ছিল না। উপরন্তু তিনি সুদর্শনও ছিলেন না। কালো রং, মোটা ঠোঁট এবং পাতলা শরীর— সর্বোপরি তিনি ছিলেন একজন বিদেশী। তাঁর হাবশী বংশোদ্ভূত পিতা মক্কার বনু জুমাহ বংশের গোলাম ছিল এবং গোলাম পিতার মত পুত্রও হিজরতের পূর্বে বছরের পর বছর কুরাইশ মুশরিকদের গোলামী করে কাটিয়েছিলেন। মুহাজির ও আনসার কারোর সঙ্গেই তাঁর দূরতম সম্পর্কও ছিল না। গুণ বলে যদি তার মধ্যে কিছু থেকে থাকতো তা হলো তিনি ছিলেন রিসালাত প্রদীপের অন্যতম পতঙ্গ। সফর অথবা মুকীম যে অবস্থায়ই হোক না কেন, তিনি সবসময় হুযূরের (সা) খিদমতে থাকতেন। তিনি কখনো আশা করতেন না যে, তাঁর মতো একজন দরিদ্র বিদেশী হাবশী পুত্রকে আরবের কোন শরীফ নিজের কন্যা বিয়ে দিতে সম্মত হবেন। কিন্তু তাঁর আশ্চর্যের সীমা-পরিসীমা রইলো না। যখনই তিনি বিয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তখনই মুহাজির ও আনসার শরীফদের যাঁরা মূল ছিলেন তাঁরা তাঁর সামনে মন-প্রাণ খুলে দিলেন। প্রত্যেকেই অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে অগ্রসর হয়ে বললেন, আপনাকে আত্মীয় বানানোর চেয়ে বড় ইযযত আর কি হতে পারে। এখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়ালো যে, রাসূলের (সা) সেই সাহাবীর (রা) আত্মীয় নির্বাচনই কঠিন হয়ে দাঁড়ালো।

রাসূলের (সা) এই হাবশী বংশোদ্ভূত সাহাবী (রা) যাঁর সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে মুহাজির ও আনসারদের (রা) নেতৃস্থানীয়রাও আনন্দ এবং গৌরব মনে করতেন, তিনি ছিলেন সাইয়েদুনা বিলাল (রা) বিন রাবাহ হাবশী।

হযরত আবু আবদুল্লাহ বিলাল (রা) বিন রাবাহ রাসূলের দরবারের অন্যতম মহান মর্যাদাবান সদস্য ছিলেন। তাঁর নাম শুনলে প্রতিটি মুসলমানের মাথা ভক্তি-শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়ে। তিবরানী (র) এবং অন্য কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন, রাবাহ প্রকৃতপক্ষে হাবশী ছিলেন। তিনি স্ত্রী হুমামাহ সমভিব্যাহারে এসে মক্কার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলেন এবং কুরাইশের

বনু জুমাহ বংশের গোলামী গ্রহণ করেছিলেন। (অথবা তাঁকে গোলাম বানানো হয়েছিল)। এই গোলামী অবস্থাতে নবীর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির প্রায় ২৮ বছর পূর্বে রাবাহ ও হুমামাহর পুত্র বিলাল (রা) জন্মগ্রহণ করেন। বিলালের (রা) যখন জ্ঞান হলো তখন চারদিকে কুফর ও শিরকের ঘনঘটা দেখতে পেলেন। তাঁর প্রভু বা মালিক উমাইয়াহ বিন খালফ জুমহিও কট্টর মুশরিক ছিল। তার গোলামীতেই তিনি জীবনের ২৮টি বছর অতিবাহিত করেছিলেন। ইত্যবসরে তাঁর কানে হকের দাওয়াতের আওয়াজ পৌছলো। এটা ছিল নবুওয়াত প্রাপ্তির সম্পূর্ণ প্রথম যুগ যখন সারওয়ারে আলম (সা) অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে হকের তাবলীগ শুরু করেছিলেন। হযরত বিলাল (রা) প্রকৃতিগতভাবে অত্যন্ত শরীফ এবং পবিত্র আত্মার মানুষ ছিলেন। সম্ভবত নবুওয়াতের পূর্বেই তিনি হুযূরের (সা) উন্নত চরিত্রে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বস্তুত তাওহীদের আওয়াজ শুনা মাত্র তিনি নির্ভাবনায় তাতে সাড়া দিলেন এবং নিজের মন ও প্রাণ রাসূলে আরাবীর (সা) জন্য উৎসর্গ করে দিলেন। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা বলেছেন, তিনি সেই সাত নেক ভাগ্যবান ব্যক্তিত্বের অন্যতম ছিলেন যাঁরা তাওহীদের ঝাণ্ডাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। এভাবে তিনি 'আস্‌সাবিকুনাল আউয়ালুনের' দলেও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হন।

উমাইয়াহ বিন খালফ–এর কানে হযরত বিলালের (রা) ইসলাম গ্রহণের কথা পৌছতেই একদম অগ্নিশর্মা হয়ে পড়লো। সে হযরত বিলালকে (রা) ডেকে জিজ্ঞেস করলো ঃ

"আমি শুনতে পেয়েছি যে, তুমি অন্য কোন মা'বুদ তালাশ করে নিয়েছ। সত্য করে বল, তুমি কোন্ মা'বুদের পূজা করে থাকো?"

হযরত বিলাল (রা) দ্বিধাহীন চিত্তে জবাব দিলেন ঃ

"মুহাম্মাদের (সা) আল্লাহর।"

উমাইয়াহ চোখ লাল করে বললো ঃ

"মুহাম্মাদের (সা) আল্লাহর পূজা করার অর্থ হলো তুমি পবিত্র লাত ও উজ্জার দুশমন হয়ে গেছো। সোজাভাবে সঠিক পথে এসে যাও, নচেৎ যিল্লতির সঙ্গে মারা যাবে। আমি এটা কখনো বরদাশত করতে পারি না যে, তুমি লাত ও হোবল পূজারীদের গোলাম হয়ে মুহাম্মাদের (সা) আল্লাহর পূজা করবে।"

হযরত বিলাল তাওহীদের নেশায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিলেন। পরিণাম সম্পর্কে বেপরওয়া হয়ে জবাব দিলেন ঃ

"আমার দেহের উপর তুমি শক্তি প্রয়োগ করতে পারো। কিন্তু আমার অন্তর ও জীবন মুহাম্মাদ (সা) ও মুহাম্মাদের (সা) আল্লাহর নিকট বন্ধক রেখেছি। এখন এক আল্লাহর ইবাদাতই আমার জীবনের চরম লক্ষ্য। তোমাদের স্বহস্তে তৈরি মা'বুদকে পূজা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

উমাইয়াহ বিন খালফ রাগে ও ক্ষোভে দিওয়ানাহ হয়ে গেল। একজন অসহায় গোলামের মুখ দিয়ে এতবড় কথা? বজনিনাদে সে বললো ঃ "ঠিক আছে, তাহলে তুই তোর বেদীনীর স্বাদ ভোগ কর। মুহাম্মাদ (সা) এবং তার আল্লাহ কিভাবে তোকে রক্ষা করে তা দেখবো।"

একথা বলেই সেই যালেম হযরত বিলালের (রা) উপর যুলুম-নির্যাতনের এক সীমাহীন অধ্যায় শুরু করলো। মক্কায় হেরার মাটি গরমের জন্য বিখ্যাত। এই মাটি রৌদ্রে তামার মত গরম হয়ে যায়। দুপুরের সময় উমাইয়াহ হযরত বিলালকে (রা) ঘর থেকে বের করে নিয়ে যেত এবং হেরার উত্তপ্ত বালুর উপর শুইয়ে দিয়ে একটি ভারি পাথর তাঁর বুকে চাপা দিতো। যাতে নড়াচড়া করতে না পারেন। অতপর মুহাম্মাদের (সা) আনুগত্য থেকে প্রত্যাবর্তন এবং লাত ও উজ্জা সত্য মা'বুদ হওয়ার কথা স্বীকার করে নেয়ার কথা বলতো। নচেৎ তাঁকে এভাবেই পড়ে থাকতে হবে বলে শাসাতেন। এর জবাবে হক বা সত্যের প্রেমিক হযরত বিলালের (রা) মুখ দিয়ে আহাদুন আহাদুন শব্দ বের হতো। উমাইয়াহ অগ্নিশর্মা হয়ে তাঁর উপর নির্যাতন শুরু করতো। আর তিনি আহাদুন আহাদুনই বলে যেতেন। একদিনতো সেই যালেম নির্যাতনের চরম সীমায় গিয়ে পৌছলো। পুরা একদিন এবং এক রাত হযরত বিলালকে (রা) ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর করে রেখে উত্তপ্ত বালিতে তাঁর ছটফট করার তামাশা দেখতে লাগলো।

মশহুর সাহাবী হযরত আমর (রা) ইবনুল আছ থেকে বর্ণিত আছে যে, উমাইয়া বিলালকে (রা) প্রচণ্ড উত্তপ্ত মাটির উপর শুইয়ে রাখা অবস্থায় দেখেছি। উত্তপ্ত মাটিও এমন মাটি যে, তার উপর গোশত রাখলে তা গলে যেত। কিন্তু তিনি সেই অবস্থাতেও লাত এবং উজ্জাকে অস্বীকার করে চলেছিলেন। উমাইয়া দেখলো যে, এত নির্যাতন চালানো সত্ত্বেও এই আল্লাহ প্রেমিকের হিম্মতের ললাটে কোন ভাঁজই পড়ে না। ফলে সে আরো অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো এবং নিজের ও বনু জুমাহর অন্যান্য গোলামকে লাত ও হোবলের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণাকারীর উপর এমন নির্যাতনের উস্কানী দিল, যাতে তিনি মুহাম্মাদ (সা) ও মুহাম্মাদের (সা) আল্লাহর নাম উচ্চারণ পরিত্যাগ করে। এই সব হতভাগা উমাইয়ার সন্তুষ্টি লাভের জন্য হযরত বিলালকে (রা) মারাত্মকভাবে মারতো। দিনের বেলায় তাঁর কাপড় খুলে

লোহার যিরাহ পরাতো এবং রোদে ফেলে রাখতো। সন্ধ্যার সময় হাত-পা বেঁধে এক কুঠরীতে বন্ধ করে রাখতো এবং রাতে তাঁকে চাবুক মারা হতো। কিন্তু হযরত বিলালের (রা) মুখ দিয়ে আহাদুন আহাদুন ছাড়া আর কিছুই বের হতো না।

আল্লামা ইবনে সা'দ (র) বর্ণনা করেছেন, উমাইয়া হযরত বিলালের (রা) গলায় রশি বেঁধে গোলামদের হাতে দিত। তারা তাঁকে মক্কার পাহাড়ী পথে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে বেড়াতো। অতপর উত্তপ্ত বালুতে এনে উপুড় করে শুইয়ে দিত এবং তাঁর উপর পাথর এনে স্তুপ করতো। কিন্তু হযরত বিলাল (রা) শুধু আহাদুন আহাদুনই বলতেন। রাসূলের (সা) কবি হযরত হাসসান বিন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি জাহেলী যুগে হজ্ব (অথবা ওমরা)-এর জন্য মক্কা গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন যে, ছেলেরা বিলালকে (রা) একটি রশি দিয়ে বেঁধে এদিক ওদিক টেনে হেঁচড়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। অথচ সে লাত, উজ্জা, হোবল, ইসাফ, নায়েলা এবং বাওয়ানা সকলকেই অস্বীকার করে চলেছে।

মোটকথা, হযরত বিলালের (রা) উপর দীর্ঘদিন যাবৎ এমন এমন অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়েছিল যে, তা শুনে শরীরের লোমকূপ খাড়া হয়ে যায়। তাঁর শরীরের প্রতিটি অংশে গুরুতর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু কোন মুসিবত, কঠোরতা এবং কষ্ট তার ঈমানকে সামান্যতম দুর্বলও করতে পারেনি।

ঘটনাক্রমে সাইয়েদুনা আবু বকর সিদ্দীকের (রা) বাড়ী বনু জুমাহ'র মহল্লাতেই ছিল। তিনি আসা যাওয়ার পথে হযরত বিলালের (রা) উপর নিত্য-নতুন নির্যাতন দেখে অস্থির হয়ে যেতেন এবং চিন্তা করতেন যে, এই মযলুমকে মুশরিকদের যুলুমের পাঁজা থেকে কিভাবে মুক্ত করা যাবে। একদিন তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তিনি উমাইয়ার বাড়ী গিয়ে তাকে বললেনঃ

"হে উমাইয়া! এই নিরপরাধ ও অসহায় গোলামের উপর এত নির্যাতন চালিও না। সে যদি একক আল্লাহর ইবাদাত করে তাতে তোমার কি ক্ষতি। তুমি যদি তার উপর ইহসান কর তাহলে এই ইহসান আখিরাতের দিন তোমার কাজে আসবে।"

"আমি তোমার কাল্পনিক আখিরাতের দিনে বিশ্বাসী নই। যা ইচ্ছা আমি তাই করবো।"

তার জবাবে সিদ্দীকে আকবার (রা) বিচলিত না হয়ে অত্যন্ত নরমভাবে বুঝালেন যে, তুমি শক্তিশালী। এই অসহায় গোলামের উপর যুলুম-নির্যাতনের পাহাড় তোমার জন্য শোভা পায় না। এভাবে আরবদের জাতীয় ঐতিহ্য বরবাদ করো না।

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) কথায় রেগে গিয়ে উমাইয়া বললো ঃ "ইবনে আবী কুহাফাহ তুমি যদি এই গোলামের প্রতি এতই সহানুভূতিশীল হয়ে থাকো তাহলে তাকে কিনে নেও না কেন?"

সিদ্দীকে আকবার (রা) ত্বরিত বললেন, "বলো, কি নেবে।"

উমাইয়া বললো, "তুমি তোমার গোলাম ফুসতাস রুমীকে আমাকে দাও এবং একে নিয়ে যাও।"

ফুসতাস অত্যন্ত ভালো গোলাম ছিল এবং মক্কাবাসীর নিকট তার অনেক সুনাম ছিল। উমাইয়া ধারণা করেছিল যে, আবু বকর (রা) তাকে দিতে কখনো রাজী হবেন না। কিন্তু হযরত আবু বকর তৎক্ষণাৎ বললেন, "আমি রাজী।"

উমাইয়া আশ্চর্য হয়ে গেল। সে নির্লজ্জভাবে বললো, "ফুসতাসের সঙ্গে ৪০ আওকিয়া রৌপ্যও নেবো।"

উমাইয়া নিজের ধারণায় খুব লাভজনক ব্যবসা করলো। সিদ্দীকে আকবার (রা) বিলালকে (রা) সঙ্গে নিয়ে যখন যেতে লাগলেন তখন হেসে বললোঃ

"ইবনে আবী কুহাফাহ, তোমার স্থানে যদি আমি হতাম তাহলে এই গোলামকে এক পয়সার ৬ ভাগের একভাগের বিনিময়েও কিনতাম না।"

হযরত সিদ্দীকে আকবার (রা) বললেনঃ

"উমাইয়া, তুমি এই গোলামের মর্যাদা ও মূল্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নও। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো তাহলে ইয়েমেনের বাদশাহীও তার মূল্যের চেয়ে নগণ্য বলে বলবো।"

একথা বলেই হযরত বিলালকে (রা) আযাদ করে দিলেন এবং সঙ্গে করে নিয়ে রাসূলের (সা) নিকট পৌছলেন। সেখানে গিয়ে সকল ঘটনা হুযূরকে (সা) শুনালেন। তিনি খুব খুশী হলেন এবং বললেনঃ "আবু বকর! এই ভালোকাজে আমাকেও শরীক করে নাও।"

সিদ্দীকে আকবার (রা) আরয করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে আযাদ করে দিয়েছি।"

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) অনেক মূল্য দিয়ে হযরত বিলালকে (রা) ক্রয় করেন। অতপর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আযাদ করে দেন। রহমতে আলম (সা) খুশী হয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) জন্য দোয়া করলেন।

মুশরিকদের নির্যাতনের পীড়া থেকে মুক্ত হওয়ার পর হযরত বিলাল (রা) নিজেকে সম্পূর্ণরূপে রহমতে আলমের (সা) খিদমতের জন্য ওয়াকফ করে দিলেন। সুখ-দুঃখ, সফর-মুকীম, ওয়ায-তাবলীগের মজলিসে অথবা যুদ্ধের ময়দানে তিনি সবসময় হুযূরের (সা) খিদমতে হাযির থাকতেন।

নবুওয়াতের ১৩ বছরে রহমতে আলম (সা) সাহাবায়ে কিরামকে (রা) মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরতের নির্দেশ দিলে হযরত বিলালও (রা) হুযূরের (সা) নির্দেশ পালন করে মদীনা গমন করেন এবং হযরত সা'দ (রা) বিন গাইসুমা আনসারীর মেহমান হন। প্রিয় নবী (সা) মদীনায় শুভাগমনের কয়েক মাস পর যখন মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেন তখন হযরত বিলালকে (রা) হযরত আবু রবিহা (রা) আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান গাছয়ামী আনসারীর ইসলামী ভাই বানিয়ে দিলেন। এই দুই ভাইয়ের মধ্যে এত সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়েছিল যে, বাইরে কোথাও গেলে হযরত বিলাল (রা) নিজের সকল কাজের দায়িত্ব হযরত আবু রবিহার (রা) উপর সঁপে যেতেন।

আল্লামা ইবনে সা'দ (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত বিলাল (রা) সিরিয়ায় যুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য মদীনা ত্যাগের প্রস্তুতি নিলেন। এ সময় আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, বিলাল (রা) তোমার ওজিফা কে নেবে? তিনি জবাব দিলেন ঃ

"আবু রবিহা! কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার সঙ্গে তাঁর যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেছেন তা কখনো ছিন্ন হবার নয়।"

যুদ্ধ পরম্পরা শুরু হলে হযরত বিলাল (রা) বদর থেকে তাবুক পর্যন্ত সকল যুদ্ধে প্রিয় নবীর (সা) সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। বদরের যুদ্ধে তিনি আটা পিষছিলেন। এমন সময় তাঁর নজর গিয়ে পড়লো উমাইয়া বিন খালফের উপর। হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। হযরত বিলালের (রা) উমাইয়ার ইসলাম দুশমনীর কথা স্মরণ হয়ে গেল এবং তিনি ডেকে ডেকে বলতে লাগলেন -"হে আল্লাহর এবং রাসূলের আনসার! এ হলো মুশরিকদের নেতা উমাইয়া বিন খালফ। দেখ, সে যেন নিস্তার না পায়।" তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতেই কতিপয় সাহাবা (রা) সেদিকে দৌড় দিলেন এবং মুহূর্তের মধ্যে উমাইয়াকে নরকে পাঠিয়ে দিলেন।

এক রেওয়ায়াতে আছে, উমাইয়ার সঙ্গে তার পুত্র আলী বিন উমাইয়াকেও হত্যা করা হয়েছিল। তারা উভয়েই ইসলামের জঘন্যতম শত্রু ছিল। কতিপয় চরিতকার লিখেছেন, বদরের যুদ্ধে হযরত বিলাল (রা) অন্য আরেক মুশরিক উমাইয়া বিন আবি হুজাইফাকে গ্রেফতার করেন। পরে

আবদুল্লাহ্ বিন রবিয়া মাখযূমী চার হাজার দিনার ফিদিয়া দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে নেয়।

হিজরতের পর মসজিদে নববী নির্মিত হলো এবং আযান প্রবর্তন করা হলো। এ সময় হুযূরে আকরাম (সা) আযান দানের দায়িত্ব হযরত বিলালের (রা) উপর অর্পণ করলেন। ইবনে সা'দ (র) কাসিম বিন আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, "বিলাল (রা) ইসলামের সর্বপ্রথম মুয়াযযিন।

হযরত বিলালের (রা) কণ্ঠস্বর ছিল খুব উঁচু বা শক্তিশালী এবং হৃদয়গ্রাহী। সুমিষ্ট স্বরের সঙ্গে তাতে এত প্রভাব ছিল যে, যে-ই শুনতো সে-ই কাজ কাম পরিত্যাগ করে নামাযের জন্য মসজিদের দিকে দৌড় দিতেন।

অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয় হলে হযরত বিলাল (রা) নিয়ম মাফিক রাসূলে করীমের (সা) সঙ্গী ছিলেন। কা'বা শরীফ পবিত্র করার পর তিনি হযরত বিলালকে (রা) বললেন ঃ

"হে বিলাল! কা'বার ছাদে দাঁড়িয়ে তাওহীদের তাকবীর বুলন্দ কর।"

হযরত বিলাল (রা) নির্দেশ পালন করলেন। যখন তিনি হৃদয়গ্রাহী কণ্ঠে আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু এবং আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ উচ্চারণ করছিলেন তখন আসমান ও যমীনের উপর নিস্তব্ধতা ছেয়ে গিয়েছিল।

১১ হিজরীতে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) আখিরাতের সফরে যাত্রা করলেন। এ সময় হযরত বিলালের (রা) উপর দুঃখ ও বেদনার পাহাড় ভেঙ্গে পড়লো। প্রিয় প্রভুর (সা) বিচ্ছিন্নতায় তাঁর অন্তরের জগত উজাড় হয়ে গেল। তিবরানী আবদুল্লাহ (রা) বিন মুহাম্মাদ, ওমর (রা) এবং আম্মার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলের (সা) ওফাতের পর হযরত বিলাল (রা) খলীফাতুব রাসূল (সা) হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন ঃ

"হে খলীফাতুর রাসূল! আমি প্রভুকে (সা) একথা বলতে শুনেছি যে, মু'মিনদের জন্য সবচেয়ে উত্তম কাজ হলো জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। মৃত্যু পর্যন্ত আমি জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ-তে মাশগুল থাকতে চাই।"

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) বললেন ঃ

"হে বিলাল! তোমাকে আল্লাহর ও নিজের মর্যাদা ও অধিকারের কসম করে বলছি, আমার বয়স বেশী হয়ে গেছে। আমার শক্তি কমে গেছে এবং আমার মৃত্যু নিকটে। এ সময় তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না।"

হযরত বিলাল (রা) সিদ্দীকে আকবারের (রা) কথা মেনে নিলেন এবং মদীনাতেই রয়ে গেলেন।

সহীহ বুখারী এবং তাবকাতে ইবনে সা'দের রেওয়ায়াত অনুযায়ী হুযূরের (সা) ওফাতের পর হযরত বিলাল (রা) সিদ্দীকে আকবারের (রা) নিকট গেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"হে খলীফাতুর রাসূল! আপনি কি আমাকে আল্লাহর জন্য স্বাধীন করেছিলেন? না, আপনার সঙ্গে থাকার জন্য?

হযরত আবু বকর (রা) বললেন ঃ

"আমি তোমাকে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য স্বাধীন করেছিলাম।" একথার পর হযরত বিলাল (রা) নিবেদন করলেন ঃ "আমাকে জিহাদে যেতে দিন। কেননা অবশিষ্ট জীবন আমি এই কাজেই ব্যয় করতে চাই। এই কাজকে আমার প্রভু (সা) সর্বোত্তম কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন।" কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) আল্লাহর কসম খেয়ে তাঁকে বললেন, "এই বার্ধক্যে আমাকে তোমার নৈকট্য থেকে মাহরুম করো না।" হযরত বিলাল (রা) তাঁর কথা মেনেতো নিলেন। কিন্তু শর্ত আরোপ করলেন যে, আমি রাসূলের (সা) পর কারোর জন্য আযান দিব না।

সিদ্দীকে আকবার (রা) বললেনঃ "এ ব্যাপারে তোমার স্বাধীনতা রয়েছে।"

এই সব রেওয়ায়াতের বিপরীত আবু নুআইম (র) হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়েব থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন হযরত আবু বকর (রা) বলেন যে, আমি তোমাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য স্বাধীন করেছিলাম তখন তিনি বলেন, তাহলে আমাকে আল্লাহর পথে জিহাদের অনুমতি দিন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁকে অনুমতি দিলেন এবং তিনি সিরিয়া গমনকারী সৈন্যবাহিনীতে শামিল হয়ে গেলেন। কিন্তু বুখারী ও ইবনে সা'দের রেওয়ায়াতের মুকাবিলায় এই রেওয়ায়াতের সনদ দুর্বল। এ জন্য নেতৃস্থানীয় চরিতকারদের মধ্যে অধিকাংশের মত হলো যে, হযরত বিলাল (রা) হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালের প্রথম দিকে জিহাদের জন্য সিরিয়া যান এবং রোমকদের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় প্রসঙ্গে হযরত ওমর ফারুককে (রা) স্বয়ং সিরিয়া যেতে হয়। তাঁর বাইতুল মুকাদ্দাস পৌছার পর খৃষ্টানরা শহরের দরজা খুলে দেন এবং খলীফাতুল মুসলিমীন খৃষ্টানদের সঙ্গে সন্ধি চুক্তি করেন। এই কাজ শেষে তিনি মুসলমানদের সামনে এক ওজস্বী বক্তৃতা দেন। শ্রোতাদের মধ্যে হযরত বিলালও উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে সম্বোধন করে বলেনঃ

"হে আমাদের সরদার বিলাল! আজ আপনি ইসলামের প্রথম কিবলার তাওহীদের ঝাণ্ডা উড্ডীন করেছেন। এই মহান গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আপনি আযান দিলে আমরা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো।"

হযরত বিলাল (রা) আরয করলেনঃ

"আমীরুল মু'মিনীন! আমি ওয়াদা করেছিলাম যে, রাসূলের (সা) পরে কারোর জন্য আযান দিব না। কিন্তু আজ আপনার নির্দেশ পালনে আযান দিচ্ছি।"

একথা বলেই আযানের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। যখন তাঁর মুখ দিয়ে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার শব্দ উচ্চারিত হলো তখন সাহাবায়ে কিরামের (রা) দিল ও মন ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল। রহমতে আলমের (সা) পবিত্র যুগের কথা তাদের স্মরণ হলো। যখন তিনি আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছলেন তখন সাহাবায়ে কিরাম (রা) কাঁদতে কাঁদতে দুর্বল হয়ে পড়লেন। রাসূলের (সা) বিচ্ছিন্নতায় ফারুকে আজম (রা) তড়পাতে লাগলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো, হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) এবং হযরত মাআয (রা) বিন জাবালেরও একই অবস্থা ছিল। হযরত বিলাল (রা) আযান থেকে ফারিগ হলে এসব রাসূল (সা) প্রেমিক খুব কষ্টে নিজেদেরকে সামলে নিলেন।

ঐতিহাসিক ইয়াকুবী বর্ণনা করেছেন, সিরিয়া অবস্থানকালে একবার হযরত বিলাল (রা) হযরত ওমরের (রা) নিকট একটি অভিযোগ পেশ করলেন। অভিযোগে তিনি জানালেন যে, সিরিয়ার আমীররা পাখীর গোশত এবং ময়দার রুটি ছাড়া কিছু খেতেই জানেন না। হযরত ওমর (রা) ব্যাপারটি তদন্ত করলেন। তদন্তে জানতে পেলেন যে, এসব বস্তু সেখানে খুব সস্তা। এ সত্ত্বেও তিনি সকল আমীরের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিলেন। তাঁরা সাধারণ লোকদের মধ্যে প্রতিদিন দু'টি রুটি, যায়তুনের তেল এবং সিরকা বন্টনের প্রতিশ্রুতি দিলেন। তাছাড়া গনীমতের মাল সমানভাবে বন্টন করবেন বলেও প্রতিশ্রুতিতে উল্লেখ করলেন।

সিরিয়ার যুদ্ধ শেষে হযরত বিলাল (রা) সেখানকার "গাওলান" নামক একটি গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন। একরাতে স্বপ্নে দেখলেন যে, হুযূর (সা) তাশরীফ এনেছেন এবং বলছেন, "হে বিলাল! এখনো কি আমার যিয়ারতে আসার সময় তোমার হয়নি?" এই স্বপ্ন তাঁর মন ও মস্তিষ্ক বিকল করে ফেললো। বিচ্ছিন্নতার আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠলো এবং অস্থির চিত্তে মদীনা মুনাওয়ারা রওয়ানা হলেন। রওজা মুবারকে পৌঁছলে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল এবং রাসূলের (সা) বিচ্ছিন্নতায় এমন দরদের সঙ্গে কাঁদলেন যে, যারাই

তা দেখলো তাদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। সে সময় হযরত হাসান (রা) এবং হযরত হোসাইনও (রা) উপস্থিত ছিলেন। প্রেমিকের (সা) কলিজার টুকরাদেরকে বুকের সঙ্গে লাগিয়ে বার বার মুখ ও মাথায় চুমু দিচ্ছিলেন। তাঁরা ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে, "হে বিলাল "রাসূলের (সা) রওজায় আগামীকাল ফজরের নামাযের আযান আপনিই দিবেন।" বিলাল (রা) রাসূলের (সা) কলিজার টুকরাদের ইচ্ছা কি করে ফিরিয়ে দিতে পারেন। ফজরের সময় হলে রাসূলের (সা) রওজার নিকট (অথবা অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী মসজিদে নবুবীর ছাদে) আযানের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। সমগ্র মদীনা তাঁর আযান শোনার জন্য ভেঙ্গে পড়লো। যেই তিনি আযান দেয়া শুরু করলেন সেই মদীনার সমগ্র পরিবেশ যেন হাশরের মাঠের মত হয়ে গেল। রাসূলে আকরামের (সা) পবিত্র যুগের চিত্র সকলের সামনে ভেসে এলো। হযরত বিলাল (রা) পবিত্র রওজার দিকে অংগুলি সংকেত করে যখন আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বললেন তখন পর্দানশীন মহিলারাও অস্থির চিত্তে বাইরে বেরিয়ে এলেন। লোকজন কেঁদে জারজার হতে লাগলো। মনে হচ্ছিল যে, হাদিয়ে বরহক (সা) আজই ইন্তেকাল করেছেন। কথিত আছে যে, রাসূলে আকরামের (সা) ওফাতের পর মদীনা মুনাওয়ারাতে এ ধরনের হৃদয় স্পর্শী দৃশ্য আজ পর্যন্ত কখনো পরিদৃশ্যমান হয়নি।

আল্লামা ইবনে আসীর (র) উসুদুল গাবায় লিখেছেন, হযরত বিলাল (রা) ২০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। সে সময় তাঁর বয়স প্রায় ৬০ বছর ছিল। দামেস্কের বাবুস সাগিরের নিকট তাঁকে দাফন করা হয়। চরিতকাররা লিখেছেন, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর নিকট হযরত বিলালের (রা) ওফাতের খবর পৌঁছলে তিনি কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তিনি বার বার বলতে লাগলেন ঃ

"আহ! আমাদের সরদার বিলালও (রা) আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।"

আল্লামা ইবনে সা'দ (র) এবং ইবনে আসাকীর (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত বিলাল (রা) জীবনে কয়েকটি বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু কোন স্ত্রীরই কোন সন্তান হয়নি। তাঁর স্ত্রীগণ আরবের অত্যন্ত শরীফ ও সম্ভ্রান্ত বংশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্তা ছিলেন। এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত আবু বকরের (রা) এক কন্যা তাঁর এক স্ত্রী ছিলেন। এক স্ত্রীর নাম ছিল হিন্দ আল খাওলানিয়া। তিনি বনু যাহরা বংশোদ্ভূত ছিলেন। এক স্ত্রীর সম্পর্ক ছিল আনসারের খাযরাজ গোত্রের আদি বিন কা'ব বংশের সঙ্গে।

হযরত বিলালের (রা) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ইসলামের প্রতি অগ্রগামিতা, মুসিবত বরদাশতকরণ, রাসূল (সা) প্রেম, জিহাদের শওক,

ইবাদাতের প্রতি আকর্ষণ এবং ঈমানের আবেগ সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য। সর্বাবস্থায় তিনি রহমতে আলমের (সা) খিদমতে হাজির থাকতেন। দুই ঈদ এবং ইসতিসকার নামাযের সময় বর্শা নিয়ে তিনি হুযূরের (সা) আগে আগে যেতেন। হুযূর (সা) কোন কাজের নির্দেশ দিলে তা পালনের জন্য নিজের জীবনের পরওয়া করতেন না। তাঁর এই দায়িত্ববোধ ও আন্তরিকতা হুযূরের (সা) অত্যন্ত বিশ্বস্ত বানিয়ে দিয়েছিল এবং তিনি (সা) নিজের অধিকাংশ পারিবারিক বিষয়ও তাঁর উপরই ন্যস্ত করেছিলেন। তিনি শুধু হুযূরের (সা) মুয়াযযিনই ছিলেন না, বরং একজন রাত্রি জাগরণকারী আবেদও ছিলেন এবং আখেরাতের চিন্তায় সবসময় বিচলিত থাকতেন। তাঁর স্ত্রী হিন্দ বর্ণনা করেছেন, হযরত বিলাল (রা) বিছানায় শোয়ার সময় বলতেন, "হে আল্লাহ! আমার গুনাহ ক্ষমা কর এবং আমার অসুস্থতার সময় আমাকে মা'যুর মনে কর।"

সহীহ বুখারীতে হযরত আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন ফজরের নামাযের সময় হুযূর (সা) হযরত বিলালকে (রা) ডেকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে বিলাল! আমাকে তুমি তোমার এমন কোন আমলের কথা বর্ণনা কর যাতে সবচেয়ে বেশী সওয়াবের আশা করা যায়। কেননা আমি জান্নাতে নিজের আগে তোমার জুতার শব্দ শুনেছি।"

আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো এমন কোন আমল করিনি। অবশ্য রাত-দিনে আমার এমন কোন ওযু নেই যা করার পর আমি নামায পড়িনি।"

হযরত বিলাল (রা) রাসূলের (সা) যে নৈকট্য লাভ করেছিলেন তার ভিত্তিতে সকল সাহাবী (রা) তাঁকে অত্যন্ত প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্র মনে করতেন। সহীহ বুখারীতে হযরত জাবির (রা) বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রা) বলতেন, "আবু বকর আমাদের সরদার এবং তিনি আমাদের সরদার বিলালকে স্বাধীন করেছিলেন।"

একবার হযরত বিলালের (রা) এক ভাই কোন আরব বংশে বিয়ের পয়গাম পাঠালেন। লোকটি নিজেকে আরব বংশোদ্ভূত বলে জাহির করতো। তাঁরা জবাবে বলে পাঠালেন যে, আমরা আপনাকে চিনি না। হাঁ, বিলাল (রা) যদি এসে সত্য প্রমাণ করেন যে, আপনি বাস্তবিকই তাঁর ভাই। তাহলে আপনার সঙ্গে সম্পর্ক করতে আমাদের কোন আপত্তি নেই।

হযরত বিলাল (রা) তাশরীফ নিয়ে বললেন, "ভদ্র মহোদয়গণ! আমি বিলাল রাবাহ। আর এই ব্যক্তি আমার ভাই। তার ধর্মীয় ও নৈতিক অবস্থা

তেমন সুবিধাজনক নয়। তোমরা চাইলে তার সঙ্গে তোমাদের মেয়ের বিয়ে দিতে পারো। নচেৎ অস্বীকৃতি জানিয়ে দাও।"

তাঁরা বললেন, "বিলাল! আপনি যার ভাই, তার সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক স্থাপনতো আমাদের জন্য গৌরবের ব্যাপার।"

হযরত ওমর ফারুকের (রা) শাসনামলে একবার কতিপয় কুরাইশ সরদার হযরত ওমর ফারুকের (রা) সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গেলেন। ইত্যবসরে হযরত বিলালও (রা) সেখানে পৌছলেন। হযরত ওমর (রা) সর্বপ্রথম হযরত বিলালকে (রা) ভেতরে ডাকলেন। কুরাইশ সরদারদের কেউ কেউ ব্যাপারটিকে কঠের ভাবে গ্রহণ করলেন। তাদের কেউ কেউ বলেই ফেললেন, কুরাইশ নেতারা অপেক্ষা করছেন। আর বিলাল হাবশীকে তাদের চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। এসময় হযরত ইকরামাহ (রা) বিন আবি জেহেল [অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত সোহায়েল (রা) বিন আমর] বললেন, "হকের প্রতি আহবানকারী (সা) আমাদের সবাইকে একই সময় হকের দিকে আহবান করেছিলেন। কিন্তু আমরা তা কবুল করায় বিলম্ব করছি এবং বিলালের (রা) মত মানুষ আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়েছে। এ জন্য তিনি এখনও সেই অগ্রগণ্যের মর্যাদা পাবেন এবং আমাদের অভিযোগের কোন অধিকার নেই।"

হযরত বিলাল (রা)-এর ঈমানী আবেগ ছিল অত্যন্ত প্রচণ্ড। তিনি ঈমানকেই সকল নেক কাজের ভিত্তিভূমি বলে মনে করতেন। একবার জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, সর্বোত্তম কাজ কোন্‌টি? তিনি বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সা) উপর সত্য অন্তরে ঈমান আনো। অতপর জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহর ফরয আদায় কর। তারপর বাইতুল্লাহর হজ্জের ফরয আদায় কর।"

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত বিলাল (রা) সর্বাবস্থায় সবসময় নিজের প্রভু ও মাওলার (সা) সঙ্গে থাকতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যদি অভুক্ত থাকতেন তাহলে তিনিও অভুক্ত থাকতেন। রাসূলের (সা) যদি কোন দুঃখ লাগতো তাহলে তিনিও খুব দুঃখ পেতেন। তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "আল্লাহর রাস্তায় আমাকে এত ভীতি প্রদর্শন ও ধমক দেয়া হয়েছে যে, অন্য কাউকে এত ভয় দেখানো হয়নি এবং আল্লাহর রাস্তায় আমাকে এত নির্যাতন চালানো হয়েছে যে, অন্য কাউকে সে ধরনের নির্যাতন চালানো হয়নি এবং একবার ৩০ রাত আমাকে এমনভাবে কাটাতে হয়েছিল যে, আমার ও বিলালের জন্য খাওয়ার এমন কিছুই ছিল না যা কোন প্রাণী খেতে পারে। তবে, বিলাল নিজের বগলের তলায় যা লুকিয়ে রেখেছিল তাই ছিল।"

কতিপয়, রেওয়ায়াত আছে, যেহেতু হযরত বিলাল (রা) আরবী বংশোদ্ভূত ছিলেন না, সেজন্য আযানে হায়ে হুত্তির স্থানে হায়ে হাওয়াজ উচ্চারণ করতেন। মক্কার কিছু নওমুসলিম এদিকে হুযূরের (সা) দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তাতে তিনি হযরত বিলালের সত্যতা ও আন্তরিকতার প্রশংসা করলেন এবং তাদের অভিযোগ এই বলে খণ্ডন করলেন, "আল্লাহর নিকট বিলালের (রা) হায়ে হাওয়াজ তোমাদের হায়ে হুত্তির চেয়ে উত্তম।" কিন্তু অনেক নেতৃস্থানীয় বিদ্বজনেরা এই রেওয়ায়াতের সমালোচনা করেছেন এবং লিখেছেন যে, হযরত বিলাল (রা) সকল অক্ষরের মাখরাজ সম্পূর্ণ সঠিকভাবে উচ্চারণ করতেন।

. সাইয়েদুনা হযরত বিলাল (রা) ধৈর্য ও স্থৈর্য এবং সত্যতা ও আন্তরিকতার যে চিত্র ইতিহাসের পাতায় অঙ্কিত করে গেছেন তা প্রতিটি মুসলমানের জন্য চিরকালের মত মশাল হিসেবে গণ্য হবে। তাঁর নাম শুনে প্রত্যেক মুসলমানের নাড়ির গতিবেগ বেড়ে যায়। হায়! সে যদি হযরত বিলালের (রা) রাসূল (সা) প্রেমের হাজার-লাখ ভাগের এক ভাগও পেত। তাহলে তার আখেরাত সুন্দর হতো।

হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা)

সে এক অন্ধকার যুগ। তখনো রাসূলের (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তি ঘটেনি। সমগ্র আরব উপত্যকা জুড়ে কুফর ও শির্কের ঘনঘটা। তবে কিছু কিছু ব্যতিক্রমও ছিল। কিছু কিছু গোত্রে দু'চারজন এমন লোকও ছিল যাঁরা শিরক ও জাহেলী প্রথাকে চরমভাবে ঘৃণা করতেন। তাঁরা সত্য অন্তরেই তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং দীনে ইবরাহিমী অনুসরণ করতে চাইতেন। যায়েদ এ ধরনের নেক স্বভাবের মানুষই ছিলেন। কুরাইশের প্রখ্যাত কবিলা বনু আদির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। তিনি আমর বিন নুফায়েলের (বিন আবদুল উজ্জা বিন রাবাহ বিন আবদুল্লাহ বিন কুরয বিন যারাহ বিন আদি বিন কা'ব বিন লুয়ী কারাশী) পুত্র এবং হযরত ওমর ফারুকের (রা) চাচাতো ভাই ছিলেন। তাওহীদের আকীদায় যায়েদ অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। তিনি শুধু মূর্তি পূজা এবং শির্ককেই ঘৃণা করতেন না বরং মূর্তিদের উপর কৃত কুরবানী ও খুনকেও হারাম মনে করতেন। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা লিখেছেন, যায়েদ কাব্যেও ব্যুৎপত্তি রাখতেন এবং নিজের কবিতায় প্রকাশ্যভাবেই কুফর ও শির্কের নিন্দা করতেন। তেমনি তিনি আল্লাহর ওয়াহদানিয়াত এবং মহানত্বের ব্যাপারেও কবিতা লিখেছেন।

মূর্তি পূজা এবং জাহেলী প্রথাকে প্রকাশ্য নিন্দা করা এবং লোকদেরকে দীনে ইবরাহিমীর দিকে আহবান জানানোকে কুরাইশরা ঠাণ্ডা মাথায় বরদাশত করার মত ছিল না। তারা যায়েদের কট্টর দুশমন হয়ে গেল এবং তাঁর উপর যুলুম করার জন্য কোমর বাঁধলো। এ ব্যাপারে তাঁর চাচা খাত্তাব (হযরত ওমরের পিতা) সবচেয়ে বেশী তৎপর ছিল। সে এমনভাবে নির্যাতন করেছিল যে, যায়েদ টিকতে না পেরে মক্কা থেকেই বের হয়ে গিয়েছিলেন এবং হারারে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। এ সত্ত্বেও কখনো কখনো লুকিয়ে চুপিয়ে কা'বা যিয়ারতের জন্য মক্কা আসতেন। ওহী অবতীর্ণ হওয়ার কয়েক বছর পূর্বে একবার রহমতে আলম (সা) এবং যায়েদের মধ্যে বালদাহ উপত্যকায় সাক্ষাত হয়েছিল। এ সময় হুযূরের (সা) মত যায়েদও মূর্তিদের নামে যবেহকৃত পশুর গোশত খেতে অস্বীকৃতি জানান। সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, "রাসূলুল্লাহ (সা) বালদার নিম্নাঞ্চলে যায়েদ বিন আমর বিন নুফায়েলের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তখনো তাঁর উপর ওহী নাযিল হয়নি। তাঁর সামনে দস্তরখান বিছানো হলো।

তিনি খেতে অস্বীকৃতি জানালেন। অতপর যায়েদ বললেন, তোমাদের মূর্তিদের নামে যে পশু যবেহ হয় তা আমি খাই না। আমি সেই পশু খাই যা আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করা হয়। যায়েদ বিন আমর কুরাইশের যবেহকৃত পশুকে খারাপ জানতো এবং বলতো, আল্লাহ বকরী সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তার জন্য আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন এবং যমীন থেকে ঘাস উঠিয়েছেন। অতপর তোমরা তা অস্বীকার করে তাকে গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করো এবং তাকে (গায়রুল্লাহ) সম্মান কর।"

জাহেলী যুগে আরবে কন্যা হত্যা একটি সাধারণ রেওয়াজ ছিল। যালেম পিতা নিজের শিশু কন্যাকে জীবিত দাফন করে দিত। যায়েদ এই লোমহর্ষক যুলুমকে প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করতেন। তিনি যখনই কোন কঠোর অন্তর পিতার এই ইচ্ছার কথা অবগত হতেন তখনই তার নিকট যেতেন এবং কন্যাকে নিজের অভিভাবকত্বে নিয়ে নিতেন। এমনিভাবে তিনি ২০টি নিষ্পাপ শিশু-কন্যার জীবন বাঁচিয়েছিলেন।

হযরত আসমা (রা) বিনতে আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, "আমি যায়েদ বিন আমরকে বৃদ্ধাবস্থায় দেখেছিলাম। তিনি কা'বার দেওয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এবং বলছিলেন, হে কুরাইশরা! আল্লাহর কসম, আমি ছাড়া তোমাদের মধ্যে কেউই দীনে ইবরাহীমের উপর নেই। যখন কোন ব্যক্তি নিজের কন্যাকে হত্যা করতে চাইতো তখন তিনি বলতেন, হত্যা করো না। আমি তার ভার বহন করবো। একথা বলে তাকে নিয়ে যেতো। যখন যুবতী হয়ে যেত তখন তার পিতাকে বলতেন তুমি চাইলে তাকে নিয়ে যেতে পারো। নচেৎ আমার নিকটই থাকতে দাও। আমি তার খরচ বহন করবো।"

যায়েদ দীনে ইবরাহীমের অনুসন্ধানে সিরিয়া, মুসেল ও জাযিরাহ পর্যন্ত সফর করেন এবং সেখানকার ইহুদী এবং খৃষ্টান আলেমদের সঙ্গে সাক্ষাতও করেন। কিন্তু কাঙ্খিত বস্তুর সন্ধান মেলেনি। কেননা, তাদের ধ্যান-ধারণাও মক্কার মুশরিকদের আকীদা-বিশ্বাসের সঙ্গে সাদৃশ্য ছিল। এতে তিনি হাত উঠিয়ে বলেন, "হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো যে, আমি দীনে ইবরাহীমের উপর রয়েছি।"

তিনি একথাও বলতেন, "হে আল্লাহ! তোমার ইবাদাতের কোন্ পদ্ধতি তোমার নিকট পসন্দনীয় তা যদি আমি জানতাম তাহলে আমি সেই পদ্ধতিতেই ইবাদাত করতাম।" অতপর তিনি নিজের হাতের উপর মাথা রেখে সিজদা করতেন।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফার (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে জনৈক ব্যক্তি 'বিলাদে লাখাম' নামক স্থানে যায়েদকে হত্যা করে। ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন, ওয়ারাকাহ বিন নাওফিল তাঁর হত্যার ঘটনায় একটি বেদনাদায়ক মরসিয়া রচনা করেন।

মশহুর তাবেয়ী হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত ওমর (রা) যায়েদের পুত্রের সঙ্গে নবীর (সা) দরবারে হাযির হলেন এবং আরয করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! যায়েদের ধ্যান-ধারণার কথা আপনি জানতেন। আমরা কি তাঁর জন্য মাগফিরাত কামনা করবো।"

তিনি বললেন, "আল্লাহ তা'আলা যায়েদ বিন আমরকে ক্ষমা করুন এবং তাঁর উপর রহমত করুন। তিনি দীনে ইবরাহীমের উপর ইন্তিকাল করেছিলেন।"

অন্য আরেক রেওয়ায়াতে যায়েদের ব্যাপারে হুযূরের (সা) এই ইরশাদ নকল করা হয়েছে, তিনি কিয়ামতের দিন পৃথক একজন উম্মাত হিসাবে উঠবেন।

যায়েদ বিন আমর বনু খোযায়ার জনৈকা মহিলা ফাতিমা বিনতে বা'জাকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁরই গর্ভে সেই মর্দে হকের জন্ম হয়েছিল যিনি পরবর্তীতে ইসলামের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে স্থান পেয়েছিলেন। পবিত্র নফস পিতা সেই পুত্রের নাম রেখেছিলেন সাঈদ। বাস্তবিকই যথার্থ নামই তিনি রেখেছিলেন। আবুল আওয়ার সাঈদ (রা) বিন যায়েদের যখন জ্ঞান হলো তখন স্বগৃহে সবসময় একক আল্লাহর এবং দীনে ইবরাহীমের আলোচনাই শুনতে পেয়েছিলেন। কিয়ামতের দিন পৃথক এক উম্মাত হিসেবে উত্থিতকারী একত্ববাদে বিশ্বাসী পিতার প্রশিক্ষণে তাঁর অন্তরে তাওহীদের প্রতি গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেয়। বস্তুত প্রিয় নবী (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির পর যেই দাওয়াতে হক প্রদান শুরু করেন তৎক্ষণাৎ আগুয়ান হয়ে হযরত সাঈদ (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর আগে মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন নেক স্বভাবের মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ফাতিমা (রা) বিনতে খাত্তাব হযরত সাঈদের (রা) স্ত্রী ছিলেন। এই ফাতিমা (রা) ছিলেন হযরত ওমরের (রা) সহোদরা। আল্লাহ তা'আলা তাঁকেও নেক স্বভাব দান করেছিলেন। স্বামীর সঙ্গে তিনি নিজেও মুসলমান হয়েছিলেন। আর এমনিভাবে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই আল্লাহর সেই পবিত্র বান্দাহদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন যাঁদেরকে আল্লাহ পাক সাবিকুনাল আউয়ালুনের খিতাব প্রদান করে স্পষ্ট ভাষায় বেহেশতের সুসংবাদ

দিয়েছেন। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত সাঈদ (রা) এবং হযরত ফাতিমা (রা) বিনতে খাত্তাবের পূর্বে শুধুমাত্র ২৬ ব্যক্তি ঈমান এনেছিলেন। হযরত ফাতিমা (রা) ২৭তম এবং হযরত সাঈদ (রা) ছিলেন ২৮তম মুসলমান।

হযরত সাঈদ (রা) এবং ফাতিমা (রা) স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই পবিত্র কুরআন শরীফের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক ছিল। তাঁরা আল্লাহর কালামের তা'লীম লাভের জন্য হযরত খাব্বাব (রা) ইবনুল ইরতকে প্রায়ই স্বগৃহে ডেকে আনতেন। হক পন্থীদের জন্য যুগটি ছিল কঠিন পরীক্ষার যুগ। কুরাইশ মুশরিকরা হক পন্থীদের উপর যুলুম-নির্যাতনের পাহাড় আপতিত করার প্রশ্নে শরাফত ও মানবতার সীমাকে লংঘন করেছিল। এমনকি রহমতে আলম (সা) পর্যন্ত তাদের অনিষ্ট ও নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য কতিপয় জীবন উৎসর্গকারীর সাথে হযরত আরকাম (রা) বিন আবিল আরকামের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আরকামের গৃহের অবস্থান ছাফা পাহাড়ের পাশে। সেই যুগে হযরত ফাতিমার (রা) বাহাদুর ভাই হযরত ওমর (রা) বিন খাত্তাবও কুফর ও শিরকের অন্ধকারে পথভ্রষ্ঠ অবস্থায় ঘুরছিলেন এবং প্রিয় নবীর (সা) প্রিয় চাচা হযরত হামযাহ (রা) বিন আবদুল মুত্তালিবের অবস্থাও একই ছিল। তিনি দাওয়াতে হকের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা না করে আমোদ-প্রমোদ ও শিকারের প্রতিই বেশী আকৃষ্ট ছিলেন। একদিন যথারীতি শিকার থেকে ফিরে আসছিলেন। এমন সময়, আবদুল্লাহ বিন জুদআনের এক দাসী তাঁর রাস্তা অবরোধ করে দাঁড়ালো এবং বিদ্রূপ করে বললো ঃ

"আবু আম্মারাহ! হায় তুমি যদি কিছুক্ষণ আগে আসতে। তাহলে দেখতে পেতে আবু জেহেল তোমার ভাতিজা মুহাম্মাদের (সা) সঙ্গে কি ধরনের আচরণ করেছে। সে কা'বা ঘরে নিজের ধর্মের ওয়ায করছিলেন। এ সময় আবু জেহেল তাঁকে চরমভাবে গালাগালি করলো। তাঁর উপর মাটি ও গোবর নিক্ষেপ করলো এবং শারীরিক নির্যাতনও করলো। আফসোস! বনু হাশিমের ইয়াতীমের সাহায্যে কোন হাতই অগ্রসর হলো না।"

হযরত হামযাহ (রা) প্রিয় নবীর (সা) যেমন চাচা ছিলেন, তেমনি ছিলেন দুধ ভাই। রক্ত ও দুধের আবেগ তাঁকে অস্থির করে তুললো। ভয়ানক ক্রোধান্বিত অবস্থায় তিনি ধনুক হাতে নিয়ে কা'বার দিকে দৌড় দিলেন। আবু জেহেল তখনো সেখানেই ছিল এবং কুরাইশের এক বৈঠকে বসে খোশগল্প করছিলো। হযরত হামযাহ (রা) ক্রোধান্বিত অবস্থায় তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তার মাথার উপর এমন জোরে ধনু দিয়ে আঘাত হানলেন যে, সে রক্তাক্ত হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে আহবান জানিয়ে বললেন, "তুই

মুহাম্মাদকে (সা) গালি দিয়েছিস। প্রকৃতপক্ষে আমার দীনও মুহাম্মাদেরই (সা) দীন এবং সে যা কিছু বলে আমিও তাই বলি। তোর যদি সাহস থাকে তাহলে আমাকে তাতে বাধা দিয়ে দেখ।"

এতে বনু মাখযূমের কিছু মানুষ আবু জেহেলের সমর্থনে দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু সে বললোঃ "আবু আম্মারাহকে ছেড়ে দাও। আমি সত্যি আজ তার ভাতিজাকে অনেক গালি দিয়েছি। এজন্য সে রাগান্বিত হয়েছে।"

এরপর হযরত হামযাহ (রা) প্রিয় নবীর (সা) খিদমতে পৌছলেন এবং বললেন, "ভ্রাতুষ্পুত্র! খুশী হয়ে যাও। আমি আমর বিন হিশামের (আবু জেহেল) নিকট থেকে তোমার প্রতিশোধ নিয়ে নিয়েছি।" হুযূর (সা) বললেন, "চাচাজান! আমারতো আকাঙ্খা হলো যে, আপনি মূর্তি পূজা পরিত্যাগ করে হক দীনের আনুগত্য করবেন।"

হযরত হামযাহ (রা) এই কথা শুনে চুপ মেরে গেলেন এবং দ্যোদুল্যমান অবস্থায় গৃহে ফিরে এলেন। সারা রাত গভীর চিন্তা-ভাবনায় কাটলো। সকাল পর্যন্ত তাঁর দ্বিধা-সংশয় কেটে গেল এবং রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে পৌছে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

হযরত হামযাহর (রা) ইসলাম গ্রহণ মক্কার মুশরিকদের মধ্যে বিদ্যুতের মত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো। পক্ষান্তরে হকপন্থীরা সীমাহীন খুশী হলেন। চরিতকাররা জানিয়েছেন, সেই যুগেই হুযূর (সা) একদিন দোয়া করেছিলেন, "হে আল্লাহ! কুরাইশের দু' স্তম্ভ ওমর বিন খাত্তাব এবং ওমর বিন হিশাম (আবু জেহেল)-এর মধ্য থেকে তুমি যাকে ইচ্ছা কর তাঁকে হেদায়াতের পথ দেখাও। যাতে তোমার দীন শক্তিশালী হয়।"

আল্লাহ পাক এই দোয়া আশ্চর্যজনকভাবে কবুল করলেন। হযরত হামযাহর (রা) ইসলাম গ্রহণের পর আবু জেহেলের অবস্থা কোমর ভাঙ্গা সাপের মত হয়ে গেল। রাগে কাঁপতে কাঁপতে সে ঘোষণা করলো, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদকে (সা) হত্যা করে তার মাথা আমার কাছে নিয়ে আসবে তাকে একশটি লাল উট অথবা এক হাজার আওকিয়া রৌপ্য পুরস্কার দেব। আত্মীয়তাসূত্রে হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা) আবু জেহেলের ভাগিনেয় (তাঁর মা আবু জেহেলের চাচাতো বোন ছিলেন) এবং কুরাইশদের অন্যতম বীর হিসেবে পরিগণিত হতেন। আবু জেহেল তাকে খুব ভীষণভাবে উত্তেজিত করলেন। এমনকি তিনি তরবারী হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, আমিই এই কাজ সমাধা করবো।

একথা বলেই তিনি তরবারী হাতে হযরত আরকামের (রা) বাড়ীর দিকে রওয়ানা দিলেন। ঘটনাক্রমে রাস্তায় তাঁর গোত্রের জনৈক নুয়াইম (রা) বিন আবদুল্লাহ আল-খাস-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তিনি পূর্বেই ঈমান এনেছিলেন। হযরত ওমরের (রা) অবস্থা দেখে তিনি ঘাবড়ে গেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "ওমর কোথায় যাচ্ছ?"

হযরত ওমর (রা) ঃ ব্যস, আজ সেই ব্যক্তিকে শেষ করে ছাড়বো। সে কুরাইশদের মধ্যে মতানৈক্য ও তেদাভেদ সৃষ্টি করে রেখেছে। সে আমাদের মা'বুদদেরকে খারাপ বলে এবং আমাদের দীনকে সমালোচনা করে।

হযরত নুয়াইম (রা) ঃ ওমর! আল্লাহর কসম, তোমার নফস তোমাকে প্রতারণায় নিক্ষেপ করে রেখেছে। তুমি যদি মুহাম্মাদের (সা) হত্যায় সফল হও তাহলে বনু আবদি মান্নাফ তোমাকে জীবিত ছাড়বে না।

হযরত ওমর (রা) ঃ আমি কাউকে পরোয়া করি না। মনে হয় তুমিও যেন বিধর্মী হয়ে গেছ। তোমার ধড়টাই না হয় আগে নামিয়ে নি?

হযরত নুয়াইম (রা) ঃ আমাকে তুমি পরে হত্যা করো। আগে নিজের বাড়ীর খবর নাও।

হযরত ওমর (রা) ঃ আমার বাড়ীর কে?

হযরত নুয়াইম (রা) ঃ তোমার বোন ফাতিমা (রা) এবং ভগ্নিপতি সাঈদ (রা) বিন যায়েদ উভয়েই মুসলমান হয়ে গেছে।

হযরত নুয়াইমের (রা) কথা শুনে হযরত ওমর (রা) রাগে গড় গড় করতে লাগলেন। সোজা সাঈদ (রা) বিন যায়েদের বাড়ী গিয়ে পৌছলেন। সে সময় হযরত খাব্বাব (রা) ইবনুল ইরতও হযরত সাঈদের (রা) গৃহে ছিলেন এবং ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে হযরত সাঈদ (রা) ও ফাতিমাকে (রা) কুরআন তা'লীম দিচ্ছিলেন। হযরত ওমর (রা) তিলাওয়াতে কুরআনের আওয়াজ শুনে আরো তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। দরজায় সজোরে খটখট করতে লাগলেন। তিন হকপন্থীই বুঝে ফেললেন যে, ওমর এসেছেন। হযরত খাব্বাবতো (রা) ঘরের পেছনের অংশে পালালেন এবং হযরত ফাতিমা (রা) কালামে পাকের অংশ বিশেষ তাড়াতাড়ি কোথায়ও লুকিয়ে দরজা খুলে দিলেন।

হযরত ওমর (রা) ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কিসের গুনগুন শব্দ ছিল? আমি যা এখনই শুনলাম।"

হযরত সাঈদ (রা) ও ফাতিমা (রা) বললেন, "তুমি কিছুই শোননি।"

হযরত ওমর (রা) অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, "না, আমি শুনেছি। আল্লাহর কসম! তোমরা বেদীন হয়ে গিয়েছ বলে জানতে পেরেছি। এই কাজের কি স্বাদ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।"

একথা বলেই তিনি হযরত সাঈদকে (রা) ঝাপটে ধরলেন। তাঁর মাথার চুল ধরে মাটিতে ফেলে দিলেন এবং অবলীলাক্রমে মারা শুরু করলেন। হযরত ফাতিমা (রা) স্বামীকে মারতে দেখে অস্থির হয়ে পড়লেন এবং ভাইয়ের কবল থেকে তাঁকে বাঁচানোর জন্য সামনে অগ্রসর হলেন। হযরত ওমর (রা) রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে একটি কাঠ দিয়ে হযরত ফাতিমার (রা) মুখের উপর আঘাত করলেন। ফলে তিনি রক্তাক্ত হয়ে গেলেন। কিন্তু ধৈর্যের এমন চরম পরাকাষ্ঠা দেখালেন যে, এই অবস্থাতেও তিনি বললেন, "হাঁ, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং মুহাম্মাদের (সা) আনুগত্য কবুল করেছি। তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। ইসলামের হেদায়াতের নকশা আমাদের অন্তর থেকে কখনই মিটবে না।"

রক্তে রঞ্জিত সহোদরার মুখ দিয়ে এই কথা শুনে হযরত ওমর (রা) হতভম্ব হয়ে পড়লেন। তাঁর ক্রোধ লজ্জায় পরিণত হলো এবং বললেন, "ঠিক আছে, তোমরা যা পড়ছিলে তা আমাকেও দেখাও।"

হযরত ফাতিমা (রা) বললেন, "আমাদের ভয় হচ্ছে যে, তুমি তা নষ্ট করে ফেলবে।"

হযরত ওমর (রা) নিজের মা'বুদদের কসম খেয়ে বললেন, "আমি তা পড়ে ফিরিয়ে দেব।"

এতক্ষণে হযরত ফাতিমার (রা) কিছুটা সাহস হলো। তিনি আশা করতে লাগলেন যে, তাঁর উপর আল্লাহর কালামের সম্ভবত প্রভাব পড়বে। তিনি বললেন ঃ "আমরা আল্লাহর কালাম পড়ছিলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি গোসল না করে শরীর পবিত্র না করবে ততক্ষণ তুমি এই কালামে পাককে স্পর্শ করতে পারবে না।"

হযরত ওমর (রা) উঠে গোসল করলেন এবং হযরত ফাতিমা (রা) কুরআনের অংশসমূহ এনে তাঁর সামনে রাখলেন। সে সময় সূরায়ে ত্বাহা তাঁর সামনে এলো। তিনি তা পড়া শুরু করলেন। কেবলমাত্র বিসমিল্লাহির

রাহমানির রাহিমই পড়া শেষ করেছিলেন, এমন সময় তাঁর শরীর কেঁপে উঠলো। অন্তর থেকে কুফর ও শির্কের অন্ধকার দূর হতে লাগলো। তিলাওয়াত করে তিনি যতই এগিয়ে যেতে লাগলেন কুরআনে করীমের বাণীর মহত্ব, বর্ণনা ভঙ্গী এবং সুন্দর ভাষা তাঁকে ততই যাদু করে ফেলতে লাগলো। যখন তিনি এই আয়াতে পৌছলেন ঃ

اِنَّنِى اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِى.

"আমিই আল্লাহ। আমি ব্যতীত কেউই ইবাদাতের যোগ্য নয়। অতএব, আমারই ইবাদাত করো এবং আমার স্মরণের জন্য নামায পড়ো।"

এ আয়াত পড়তেই তাঁর মধ্যে ভাবাবেগের সৃষ্টি হলো এবং তিনি অযাচিতভাবে বলে উঠলেন, "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।"

হযরত খাব্বাব (রা) ইবনুল ইরত এতক্ষণ ঘরের ভেতরে লুকিয়ে ছিলেন। এখন বেরিয়ে এলেন এবং আনন্দপূর্ণ স্বরে বললেন, "হে ওমর! মুবারকবাদ। রাসূলের (সা) দোয়া তোমার পক্ষে কবুল হয়েছে। হুযূর (সা) গতকালই দোয়া করেছিলেন যে, "হে আল্লাহ! আমর বিন হিশাম (আবু জেহেল) অথবা ওমর (রা) বিন খাত্তাব-এই দু'জনের মধ্যে যাকে তুমি চাও ইসলামে প্রবেশ করিয়ে দাও।"

হযরত ওমর (রা) অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে হযরত খাব্বাবের (রা) নিকট খুব তাড়াতাড়ি রাসূলের (সা) খিদমতে নিয়ে যাওয়ার আবেদন জানালেন।

হযরত খাব্বাব (রা) হযরত ওমরকে (রা) সঙ্গে নিয়ে হযরত আরকামের (রা) গৃহের দিকে রওয়ানা দিলেন। সেখানে পৌছে দরজা খটখটালেন। কিন্তু সাহাবীগণ (রা) দরজা খোলার ব্যাপারে চিন্তায় পড়ে গেলেন। আল্লাহর সিংহ হযরত হামযাহর (রা) জোশ এসে গেল। তিনি তরবারী হাতে নিয়ে বললেন, "ওমর এসে থাকলে আসুক। তার নিয়ত যদি নেক না হয় তাহলে আল্লাহর কসম এই তরবারী দিয়েই তার গর্দান উড়িয়ে দেব।" এ সময় রহমতে আলম (সা) বললেন, "দরজা খুলে দাও!" দরজা খুলতেই হযরত ওমর (রা) অস্থির হয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন। হযরত খাব্বাব (রা) তাঁর পেছনে পড়ে গিয়েছিলেন। হুযূর (সা) জিজ্ঞেস করলেন, ওমর কি নিয়তে এসেছ?

হযরত ওমর (রা) নবুওয়াতের জালালিয়তে কেঁপে উঠলেন। মাথা নত করে অত্যন্ত নীচু স্বরে বললেন, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনার জন্য।"

এই কথা শুনে সাহাবায়ে কিরাম (রা) আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। তাঁরা এতো জোরে নারায়ে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করলেন যে, মক্কার পাহাড় মুখরিত হয়ে উঠলো।

হযরত ওমরের (রা) ইসলাম গ্রহণ ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তিনি সাহসিকতা, বাহাদুরী, নির্ভীকতা, বিচক্ষণতা ও অন্তর্দৃষ্টির বদৌলতে ইসলামের এক মহান স্তম্ভ হিসেবে পরিগণিত হন। এবং এই বিশ্বে এমন এক নকশা এঁকে দেন যা চিরকালের জন্য ইসলামী মিল্লাতের জন্য গৌরবের বস্তু হয়ে থাকবে। ফারুকে আজমকে (রা) হক পথে আনার ব্যাপারে হযরত সাঈদ (রা) বিন যায়েদ ও ফাতিমা (রা) বিনতে খাত্তাবের বিরাট ভূমিকা ছিল। তাঁদের ধৈর্য ও ইখলাসের ফলশ্রুতিতেই বনু আদির লৌহ মানবের মনও বিগলিত হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি তৎক্ষণাৎ হকের দুশমনদের কাতার থেকে বের হয়ে ইসলামের প্রতি জীবন উৎসর্গকারীদের দলে এসে যোগ দেন।

রহমতে আলম (সা) সাহাবায়ে কিরামকে (রা) মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলে হযরত সাঈদ (রা) প্রথম মুহাজিরদের সঙ্গে মদীনা পৌছেন এবং হযরত আবু লুবাবা আনসারীর (রা) গৃহে অবস্থান করেন। হাফিজ ইবনে হাজার (র) "তাহযীবে" লিখেছেন, হিজরতের সময় তাঁর স্ত্রীও সঙ্গে ছিলেন। কিছু দিন পর হুযূর (সা) যখন মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব কায়েম করেন তখন হযরত সাঈদকে (রা) হযরত রাফে' (রা) বিন মালেক, যারকী আনসারীর ইসলামী ভাই বানিয়েছিলেন [ইবনে সা'দ (র) একথা বলেছেন। ইবনে হিশাম (র) এবং ইবনে আসীর (র) লিখেছেন যে, হুযূর (সা) তাঁকে হযরত উবাই (রা) বিন কা'বের ইসলামী ভাই বানিয়েছিলেন।]

দ্বিতীয় হিজরীতে বদরের ময়দানে হক ও বাতিলের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত সাঈদ (রা) বিন যায়েদ এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তিনশ' তের পবিত্র নফসের অন্যতম ছিলেন। ওয়াকেদী, ইবনে সা'দ এবং অন্য কতিপয় চরিতকার লিখেছেন, বদরের যুদ্ধের সময় প্রিয় নবী (সা) হযরত সাঈদকে (রা) এক বিশেষ কাজের জন্য হযরত তালহার (রা) সঙ্গে সিরিয়ার দিকে প্রেরণ করেছিলেন। যুদ্ধশেষ হয়ে যাওয়ার পর তাঁরা মদীনা ফিরে আসেন। তা সত্ত্বেও হুযূর (সা) বদরের গনীমাতের মালে তাঁদের অংশ দেন এবং তাঁদেরকে জিহাদের সওয়াবে অভিষিক্ত হওয়ার সুসংবাদও দেন। কিন্তু সহীহ বুখারীতে স্পষ্টভাবে তাঁদের নাম বদরী সাহাবীদের তালিকায় উল্লেখ রয়েছে। অন্য এক রেওয়ায়াতেও তাঁদের নামের সঙ্গে বদরী লকব উল্লেখ আছে। এথেকে জানা যায় যে, হযরত সাঈদ (রা) বাস্তবতই বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। বদরের পর অন্যান্য যুদ্ধেও রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গী ছিলেন। ওহোদ, খন্দক, খাইবার,

হুনাইন এবং তায়েফ সহ সকল যুদ্ধেই পূর্ণ সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। ৬ষ্ঠ হিজরীতে বাইয়াতে রিদ্বওয়ানে শরীক থাকার সৌভাগ্যও লাভ করেছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় সেনাবাহিনীর একটি দলের অফিসার ছিলেন। তাবুকের যুদ্ধে কঠিন দীর্ঘ সফরের কষ্ট হাসি-খুশীভাবে বরণ করেছিলেন। মোট কথা, ইসলাম গ্রহণের পর এমন কোন মর্যাদা ছিল না যা তিনি হাসিল করেননি।

রাসূলে আকরামের (সা) ওফাতের কিছুদিন পর ইরান ও রোম থেকে যখন সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে তখন হযরত সাঈদ (রা) সিরিয়া গমনকারী সৈন্যদলে একজন জীবন উৎসর্গকারী মুজাহিদ হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ১৩ হিজরীতে হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) শাসনামলে আজনাদাইনে এক ভয়ংকর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে ৯০ হাজার রোমক যোদ্ধা প্রখ্যাত সেনাপতি দারদানের নেতৃত্বে মুসলমানদের মুখোমুখী হয়। আর এই যুদ্ধে মুসলমানের সংখ্যা ছিল মাত্র ২০ হাজারের মত। হযরত সাঈদসহ (রা) জীবনপণকারী মুসলমানরা মাথায় কাফন বেঁধে লড়াই করেন এবং নিজেদের ঈমানী শক্তির উপর নির্ভর করে বিরাট সংখ্যক রোমক সৈন্যদের শিক্ষামূলকভাবে পরাজিত করেন। তারপর মুসলমানরা দামেস্ক অভিমুখে রওয়ানা হন। সেই সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ওফাত পান এবং ফারুকী খিলাফতের সূচনা ঘটে। তখন দামেস্ক অবরোধ অব্যাহত ছিল। অবরোধকালে হিরাক্লিয়াস দামেস্কবাসীর সাহায্যের জন্য এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করে। ইসলামের সেনাপতি হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ এই বাহিনীর আগমনের খবর পেলেন। এ সময় তিনি নিজের বাহিনীর এক অংশকে অবরোধের কাজে লাগিয়ে অবশিষ্ট সৈন্যসহ দামেস্ক থেকে এক মনযিল দূরে রোমকদের সাহায্যকারী সৈন্যদের মুকাবিলায় দাঁড়ালেন। ইসলামী বাহিনীর ব্যূহ রচনার সময় তিনি হযরত সাঈদ (রা) বিন যায়েদকে প্রথম কাতারের অফিসার নিয়োগ করলেন। রোমক বাহিনী হামলা চালালে সর্বপ্রথম এই কাতার হামলার শিকার হন। হযরত সাঈদ (রা) অত্যন্ত বাহাদুরী ও অটলতার সঙ্গে রোমক হামলার মুকাবিলা করেন। ইত্যবসরে হযরত খালেদ (রা) রোমকদের বামে এবং হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল ডানে এমন প্রচণ্ডভাবে হামলা চালালেন যে, শত্রুদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল এবং ইসলামী বাহিনীর প্রথম কাতার তাদের চাপ থেকে মুক্ত হয়ে গেল। এই সময় হযরত সাঈদ (রা) রোমকদের উপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন যে, তাদের সকল ব্যূহই ছত্রভঙ্গ ও বিশৃংখল হয়ে পড়লো এবং তাদের হাজার হাজার লোক নিহত ও পালিয়ে যেতে বাধ্য হলো। এই যুদ্ধ "ইয়াওমি মারজুস

সফর"– নামে বিখ্যাত। ইসলামী বাহিনী বিজয়ীর বেশে দামেস্ক ফিরে এলো এবং কিছুদিনের মধ্যেই তরবারীর সাহায্যে তা কবজা করে নিলো। দামেস্ক বিজয়ের পর মুসলমানরা কিনসিরিন এবং বা'লাবাক্ক জয় করে হেমসের দিকে অগ্রসর হলেন, হেমস ছিল সিরিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। রোমকরা সেখানে এক বিরাট বাহিনী একত্রিত করে রেখেছিল। সেসময় মারিস নামক সিরিয়ার এক নাম করা যোদ্ধা হেমসের শাসক ছিল। প্রথমে সে শহর থেকে বের হয়ে মুসলমানদের মুকাবিলা করলো। কিন্তু যখন এক রক্তাক্ত লড়াইয়ের পর মুসলমানরা তাদেরকে হারিয়ে দিল তখন তারা দূর্গে বন্দী হয়ে পড়তে বাধ্য হলো। মুসলমানরা দূর্গ অবরোধ করলো এবং তা জয় করার জন্য বার বার হামলা চালালো। কিন্তু হেমসবাসীরা প্রচণ্ড বাধা দিল এবং মুসলমানদেরকে পিছু হটিয়ে দিল। অবশেষে মুসলমানরা যুদ্ধের একটি পরিকল্পনা তৈরি করলেন এবং সেই অনুযায়ী কতিপয় সওয়ার এবং অতিসাধারণ সামান রেখে সমগ্র বাহিনীর হেমস অবরোধ প্রত্যাহার করিয়ে এক মনযিল দূরে চলে গেলেন। হেমসের শাসক মারিস মনে করলো যে, মুসলমানরা নিরাশ হয়ে পিছিয়ে গেছে। সুতরাং সে নিজের বাহিনীসহ দূর্গের বাইরে এলো এবং মুসলমানদের সেনা ছাউনীর উপর হামলা করে বসলো। মুসলমান সওয়াররা সাধারণভাবে মুকাবিলা করে পিছে হটা শুরু করলো। রোমকদের সাহস বেড়ে গেল এবং তারা দ্রুত গতিতে মুসলমানদের পিছু নিলো। এমনিভাবে মুসলমানদের চাল সফল হলো। ইসলামের বড় বাহিনী দামেস্ক থেকে বেশ দূরে গোপন ছাউনী প্রতিষ্ঠা করেছিল। যখনই রোমক বাহিনী তার আওতায় এলো তখনই ইসলামের মুজাহিদরা বিদ্যুৎ বেগে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। রোমকরা জীবন বাজি রেখে লড়াই করলো। কিন্তু হযরত সাঈদ (রা) যখন তাদের নেতা মারিসের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিল তখন তারা দিশেহারা হয়ে পালিয়ে গেল। মুসলমানরা তখন ঝড়ের বেগে হেমসের দিকে অগ্রসর হলো।

হেমসবাসীরা নিজেদের পরিণাম স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছিল। কালবিলম্ব না করে তারা মুসলমানদের আনুগত্যের কথা ঘোষণা করে শহরের দরজা খুলে দিল।

হেমস বিজয়ের পর ১৫ হিজরী (৬৩৬ খৃঃ)–তে ইয়ারমুকের রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ সিরিয়ার ভাগ্যের ফায়সালা করে দিয়েছিল। এই যুদ্ধে হযরত সাঈদ (রা) পদাতিক বাহিনীর প্রধান ছিলেন। তিনি অত্যন্ত নির্ভীকতা ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে জিহাদের হক আদায় করেছিলেন।

আল্লামা শিবলী নু'মানী (র) 'আল–ফারুক' গ্রন্থে লিখেছেন, যুদ্ধকালে রোমকরা মুসলমানদের বাম দিকে হামলা করলো। বস্তুত এই অংশে লাখাম

ও গাসসান গোত্রের অধিকাংশ লোকজন ছিল। তাদের অন্তরে রোমকভীতি স্থান করেছিল। এ জন্য প্রথম হামলাতেই মুসলমানদের পা আলগা হয়ে গেল। কিন্তু অফিসাররা পা মজবুত করে রইলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত সাঈদ (রা) ক্রোধে হাঁটু ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। রোমকরা তাঁর দিকে অগ্রসর হলে তিনি বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং অগ্রবর্তী অফিসারকে হত্যা করে ভূতলে ফেলে দিলেন। হযরত সাঈদ (রা) এবং তাঁর মত অন্যান্য মুজাহিদদের জীবন পণের ফলশ্রুতিতে রোমকদের শিক্ষণীয় পরাজয় ঘটলো। সেই যুগেই ইসলামের সেনাপতি হযরত আবু উবাইদাহ (রা) ইবনুল জাররাহ হযরত সাঈদকে (রা) দামেশকের শাসক নিয়োগ করলেন। অথচ তাঁর অন্তরে জিহাদের উদ্দীপনার আগুন জ্বলছিল। তিনি হযরত আবু উবাইদাকে (রা) লিখলেন যে, "আমি এমন কুরবানী করতে পারবো না যে, আপনারা জিহাদ করবেন, আর আমি তা থেকে বঞ্চিত থাকবো। সুতরাং এইপত্র পৌঁছতেই আমার স্থানে অন্য কাউকে পাঠিয়ে দিন।" অতপর দামেস্কের শাসকের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে জিহাদের ময়দানে পৌঁছে গেলেন। যতক্ষণ সিরিয়া সম্পূর্ণরূপে বিজয় না হলো, তিনি অব্যাহতভাবে জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহতে ব্যাপৃত রইলেন। সিরিয়া বিজয়ের পর হযরত সাঈদ (রা) মদীনা এসে নির্জনত্ব অবলম্বন করলেন।

২৩ হিজরীতে আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক (রা) আহত হলে সে সময় হযরত সাঈদ (রা) তাঁর গৃহে ছিলেন এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) সেখানেই বসে ছিলেন। হযরত ওমর (রা) তখন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আব্বাসের (রা) গায়ে ঠেস দিয়ে বসে বললেন, "দেখো, আমি কালালা সম্পর্কে কিছু বলিনি এবং কাউকে নিজের উত্তরাধিকারী বানাইনি। যেসব আরব এখন আটক আছে তারা সকলেই মুক্ত।"

হযরত সাঈদ (রা) বললেন, "আপনি যদি কোন মুসলমানকে খলীফা মনোনয়ন দেন তাহলে মুসলমানরা আপনার মনোনয়নে আস্থা স্থাপন করবেন।"

হযরত ওমর (রা) বললেন, "আমিতো শুধুমাত্র সেই ৬ ব্যক্তির মধ্যে খিলাফত রাখবো যাঁদের প্রতি হুযূর (সা) ওফাত পর্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন এবং যাঁরা খিলাফতের বোঝা বইবার যোগ্য ছিলেন।" অতপর বললেন ঃ

"যদি সালেম (রা) মাওলা আবি হুযাইফাহ (রা) অথবা আবু উবাইদাহ (রা) ইবনুল জাররাহ'র মধ্য থেকে কেউ এ সময় উপস্থিত থাকতেন তাহলে তাকে আমি খলিফা বানিয়ে মুতমায়িন বা নিশ্চিন্ত হতাম।"

যে ৬ ব্যক্তিকে হযরত ওমর (রা) খিলাফতের যোগ্য মনে করেছিলেন তাঁরা হলেন, হযরত ওসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত যোবায়ের (রা), হযরত তালহা (রা), হযরত সা'দ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস এবং হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ।

তাঁরা সবাই আশারায়ে মুবাশশিরা ছিলেন। এই দিক থেকে হযরত সাঈদ (রা) বিন যায়েদই তাঁদের সমমর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু হযরত ওমর (রা) তাঁকে শুধুমাত্র এ জন্য খিলাফতের জন্য মনোনীত করলেন না যেহেতু তিনি তাঁর নিজ বংশ বনু আদির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। আর অন্যদের সম্পর্ক বনি আদির সঙ্গে ছিল না।

এই ঘটনার পর অবশিষ্ট জীবন তিনি অত্যন্ত নীরবে কাটিয়ে দেন। সে যুগে দেশীয় রাজনীতিতে কয়েকটি উত্থান-পতন ঘটে। কিন্তু তিনি সব ধরনের হাঙ্গামা থেকে অনেক দূরে থাকেন। ৩৫ হিজরীতে আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান (রা) নৃশংসভাবে শহীদ হলে অবশ্য তিনি নিশ্চুপ থাকতে পারেননি। তিনি যালেমদেরকে প্রকাশ্যভাবে নিন্দা করেন। সে সময় তিনি কুফা অবস্থান করছিলেন। এই ঘটনার খবর পেয়ে তিনি কুফার মসজিদে লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে মানুষরা! আল্লাহর কসম, ইসলাম গ্রহণের অপরাধে ওমর (রা) আমাকে এবং তার বোনকে বেঁধে রাখতেন। এটা সেই সময়কার ঘটনা যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি এবং তোমরা ওসমানের (রা) সঙ্গে যে অন্যায় আচরণ ও বাড়াবাড়ি করেছ তার জন্য যদি ওহোদ পাহাড় ফেটে যায় তাহলে তা ঠিকই হবে।" (সহীহ বুখারী কিতাবুল মানাকিব)।

হযরত সাঈদ (রা) মদীনার উপকণ্ঠে আকীক নামক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। এই স্থানেই তিনি বিভিন্ন মত অনুযায়ী ৫০, ৫১ অথবা ৫২ হিজরীতে জুময়ার দিনে ওফাত পান। আকীক থেকে মদীনায় জানাযা আনা হয়। হযরত সা'দ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস মাইয়্যেতকে গোসল দিলেন এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) কাফন ও নামাযে জানাযা পড়ালেন। অতপর হযরত সা'দ (রা) এবং ইবনে ওমর (রা) কবরে নামলেন এবং ইসলামের এই দীপ্তিমান নক্ষত্রকে মাটি চাপা দিলেন।

অন্য এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত সাঈদ (রা) কুফায় [হযরত আমীর মাবিয়ার (রা) শাসনকালে] ওফাত পান এবং কুফার শাসক হযরত মুগিরাহ (রা) বিন শু'বা জানাযার নামায পড়ান। কিন্তু ইবনে সা'দ (র) এবং অন্য কয়েকজন চরিতকার প্রথম রেওয়ায়াতকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

সাধারণভাবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, ওফাতের সময় হযরত সাঈদের (রা) বয়স ৭০ অথবা ৭৩ বছর ছিল। কিন্তু জ্ঞান অনুযায়ী তাঁর বয়স ৮০ বছরের কাছাকাছি বলে মনে হয়। কেননা, নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছরে হযরত ওমর ফারুক (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। সেসময় হযরত সাঈদ (রা) পূর্ণ যুবক ছিলেন এবং তাঁর বিয়েও হয়েছিল। তিনি তাঁর পিতা যায়েদকেও (রা) ভালোভাবে দেখেছিলেন। তিনি নবুওয়াত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে নিহত হয়েছিলেন। ধারণা করা হয় যে, সেসময় তাঁর বয়স ১১ বছরের কম ছিল না এবং নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছরে তিনি ২০–২২ বছর বয়সের হয়ে গিয়েছিলেন। এই হিসেবে ওফাতের সময় তাঁর বয়স ৮০ বছর থেকে কিছু কম অথবা বেশীও হতে পারে। তবে ৭০ বছর কোন অবস্থাতেই হতে পারে না। হযরত সাঈদ (রা) বিন যায়েদ সেই মহান ১০ সাহাবীর অন্যতম হিসেবে পরিগণিত যাঁদেরকে রহমতে আলম (সা) বিশেষ করে নাম ধরে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তাঁরা আসহাবে "আশারায়ে মুবাশশিরাহ'র" আজিমুশশান লকবে মশহুর হয়ে আছেন। প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত সাঈদ (রা) বিন যায়েদ সেই সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যিনি লড়াইয়ে নবীর (সা) আগে এবং নামাযের কাতারে হযূরের (সা) পিছনে (অর্থাৎ নিকটে) থাকতেন।

আল্লাহ প্রেম এবং আল্লাহভীতি এবং ইবাদাতের আধিক্যের কারণে হযরত সাঈদকে (রা) "মুসতাজাবুদ দাওয়াত"–এর মর্যাদা লাভ ঘটেছিল। ইমাম মুসলিম, হাফিজ ইবনে হাজার এবং হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) লিখেছেন, একবার আরওয়া বিনতে আবীস নাম্নী এক মহিলা মদীনার গভর্ণর মারওয়ান ইবনুল হাকামের নিকট অভিযোগ করে বললো যে, সাঈদ (রা) বিন যায়েদ তার জমির কিছু অংশ বাড়িয়ে নিয়েছে। মারওয়ান তাঁকে ডেকে প্রকৃত অবস্থা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ

"তুমি আমার সম্পর্কে ধারণা করে থাক যে, আমি তার জমির কিছু অংশ জোরপূর্বক দখল করেছি। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি যুলুম করে কব্জা করবে, কিয়ামতের দিন তাকে তেমনি সাতগুণ জমির জিঞ্জির গলায় পরানো হবে।"

মারওয়ান তাঁকে এ ব্যাপারে কসম খেতে বললে তিনি সেই জমি ছেড়ে দিলেন। কিন্তু অন্তরের দুঃখপূর্ণ অবস্থায় মুখ দিয়ে এই বাক্য বেরিয়ে গেল, " হে আল্লাহ! এই মহিলা যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তাকে অন্ধ করে দিন এবং তাকে এই জমিতেই মৃত্যু দিন (অথবা তাকে তার বাড়ীর কূপে নিক্ষেপ

করো) এবং মুসলমানদের নিকট আমার অধিকারকে সুন্দরভাবে স্পষ্ট করে দিও।"

খোদার কুদরত যে, কিছুদিন পর আরওয়ার দৃষ্টিশক্তি শেষ হয়ে গেল, অতপর একদিন সে, ঐ অবস্থায় নিজের বাড়ীর কূপে পড়ে মারা গেল। তারপর এই ঘটনা মদীনাবাসীদের মধ্যে একটি উদাহরণ হয়ে গেল। তাঁরা উদাহরণ দিয়ে বলতো ঃ "আল্লাহ তোমাকে অন্ধ করুক, যেমন আরওয়াকে অন্ধ করেছিল।"

হযরত সাঈদ (রা) হক কথনের বিশেষ গুণে গুণান্বিত ছিলেন। একদিন তিনি কুফার মসজিদে কুফার গভর্ণর হযরত মুগীরাহ (রা) বিন শু'বার নিকট বসেছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে হযরত আলী কাররামাল্লাহ ওয়াজহাহুর শানে কিছু অনুচিত কথা বললেন। হযরত সাঈদ (রা) গর্জে উঠে বললেনঃ

"মুগীরাহ, মুগীরাহ, তোমার সামনে লোকেরা রাসূলের (সা) সাহাবী সম্পর্কে ভালো-মন্দ বলছে এবং তুমি তাদেরকে বাধা দিচ্ছ না। আলী (রা) সেই সব লোকের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) বেহেশতের সুসংবাদ দিয়েছেন।"

রাসূল প্রেম, জিহাদের উৎসাহ, আল্লাহ প্রেম ও আল্লাহভীতি, ত্যাগ ও আন্তরিকতা হযরত সাঈদ (রা) বিন যায়েদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল। হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেছেন, সাঈদ (রা) বিন যায়েদের আমল কখনো গুনাহর কলংকে কলংকিত হয়নি এবং তিনি সবসময় রাসূলের (সা) আনুগত্যে উদ্যমী ছিলেন।

হযরত সাঈদ (রা) বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি বিয়ে করেছিলেন। তাদের গর্ভে অনেক সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। চরিতকাররা তাঁর ১৪ পুত্র এবং ২০ কন্যার নাম বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। ওয়াকেদী লিখেছেন, সাঈদ (রা) বিন যায়েদ লম্বাদেহী ও গমের রংয়ের মানুষ ছিলেন এবং তাঁর মাথা লম্বা ও ঘন চুল ছিল।

হযরত শুরাহবীল (রা) বিন হাসানাহ (রা)

সপ্তম হিজরীর খায়বারের যুদ্ধের কিছু পরের ঘটনা। একদিন মশহুর মহিলা সাহাবী হযরত শিফা' (রা) বিনতে আবদুল্লাহ রহমতে আলমের (সা) পবিত্র খিদমতে হাযির হলেন এবং নিজের প্রয়োজন বর্ণনা করে কিছু চাইলেন। হুযূরের (সা) দানশীলতার মেঘ প্রত্যেক অভাবীর উপর ঝম ঝম করে বর্ষিত হতো। কিন্তু ঘটনাক্রমে সে সময় তাঁর (সা) নিকট হযরত শিফা'কে (রা) দেয়ার মত কিছুই ছিল না। তিনি সময় চাইলেন, কিন্তু হযরত শিফা' পীড়াপীড়ি করতেই থাকলেন। ইত্যবসরে নামাযের সময় হয়ে গেল এবং হুযূর (সা) মসজিদের দিকে রওয়ানা হলেন। হযরত শিফা' (রা) নবীর (সা) দরবার থেকে উঠে নিজের কন্যার বাড়ী চলে গেলেন। বাড়ীটি কাছেই ছিল। বাড়ী গিয়ে জামাইকে নামাযের জন্য মসজিদে না যেয়ে ঘরে বসা দেখলেন। রাসূলের (সা) কোন সাহাবীর আযানের আওয়াজ শুনে নামাযের জন্য মসজিদে না যাওয়াটা অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল। হযরত শিফা' (রা) জামাইকে গালাগালি করলেন। তিনি বললেন, নামাযের সময় হয়েছে, অথচ তুমি ঘরে বসে আছ। তিনি আরয করলেন ঃ

"খালাজান, আমাকে গালি দিবেন না। আমার নিকট একটিই মাত্র পুরাতন কামীস ছিল। তাতে আমি তালি লাগিয়ে রেখেছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) আমার নিকট থেকে তা ধার করে নিয়ে গেছেন। কেননা, তাঁর নিকট পরিধান করার মত কাপড় ছিল না। এখন শুধু লুঙ্গি পরে খালিগায়ে মসজিদে যেতে আমার লজ্জা লাগছে। অন্যদিকে আমি কি লোকদেরকে বলে বেড়াবো যে, হুযূর (সা) আমার কামীস ধার করে নিয়ে গেছেন।"

জামাইয়ের জবাব শুনে, হযরত শিফা' (রা) খুব লজ্জিত হলেন এবং বললেন ঃ

"আমার মাতা-পিতা রাসূলের (সা) উপর কুরবান হোক। আমি কি জানতাম যে, রাসূলের (সা) এই অবস্থা। আমিতো সকাল থেকে তাঁর নিকট কিছুর জন্য পীড়াপীড়ি করছিলাম এবং তিনি ওযর করছিলেন।"

হযরত শিফা' (রা) বিনতে আবদুল্লাহর এই ভাগ্যবান জামাই, যিনি রহমতে আলমের (সা) জন্য মন-প্রাণসহ ফিদা ছিলেন। তিনি হলেন হযরত শুরাহবীল বিন হাসানাহ (রা)।

হযরত আবু আবদুল্লাহ শুরাহবীল বিন হাসানাহ (রা) প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফার (সা) সেসব জীবন উৎসর্গকারী সাহাবীর অন্যতম হিসেবে পরিগণিত হতেন যারা সত্য দীনের মর্যাদা বুলন্দ করার অব্যাহত প্রচেষ্টায় নিজের জীবন অতিবাহিত করেছিলেন এবং এই পথে বড় কোন মুসিবতকেও পরওয়া করেননি। আল্লামা ইবনে আসীর (র) 'উসূদুল গাবাহ' গ্রন্থে হযরত শুরাহবিলের পিতার নাম আবদুল্লাহ বিন মাতা' বিন আবদুল্লাহ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইবনে হাযমের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর নাম আবদুল্লাহ বিন আমর বিন মাতা' ছিল। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত শুরাহবীল বনি তামীম বংশোদ্ভূত ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ চরিতকার তাঁকে কিন্দী বংশোদ্ভূত বলে অভিহিত করেছেন। অল্প বয়সেই শুরাহবীল (রা) পিতৃছায়া থেকে মাহরুম হন। তাঁর মাতা হাসানাহ (রা) মক্কার সুফিয়ান (রা) বিন মা'মারের সঙ্গে আবার বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। ধারণা করা হয়ে থাকে যে, সেই যুগে হাসানাহ নিজের অল্প বয়স্ক পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে স্বদেশ থেকে মক্কা আসেন এবং সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান [এটা নবীর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির ২৫–৩০ বছর পূর্বেকার ঘটনা] বস্তুত মক্কাবাসীরা হযরত শুরাহবীলের বাপ–দাদা সম্পর্কে বেশী ওয়াকিফহাল ছিলেন না, এ জন্য তাঁকে মায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে শুরাহবীল (রা) বিন হাসানাহ বলে ডাকতে লাগলো এবং এ নামেই তিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

অধিকাংশ চরিতকার লিখেছেন, হযরত শুরাহবীল (রা) কুরাইশের বনু যাহরাহ বংশের মিত্র ছিলেন। কিন্তু তাঁরা একথা বিশ্লেষণ করেননি যে, বনু যাহরাহর সঙ্গে তিনি কোন্ প্রয়োজনে মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। অথচ তাঁর সতালো পিতা সুফিয়ান (রা) বিন মা'মারের সম্পর্ক কুরাইশের বনু জামাহর সঙ্গে ছিল। যাহোক, এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, হযরত শুরাহবীল (রা) তার মা হাসানাহ (রা), তাঁর সতালো পিতা সুফিয়ান (রা) বিন মা'মার, বৈপিত্রেয় ভাই জাবের (রা) বিন সুফিয়ান এবং জুনাদাহ (রা) বিন সুফিয়ান সকলেই উত্তম স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তাঁরা সকলেই নবুওয়াত প্রাপ্তির একদম প্রারম্ভিক যুগে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এমনিভাবে পরিবারটি আস সাবিকুনাল আউয়ালুনের পবিত্র দলের বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিলেন। অন্য কোন পরিবার এ ধরনের সৌভাগ্য খুব কমই পেয়েছিল। বিভিন্ন রেওয়ায়াতে জানা যায় যে, হযরত শুরাহবীল (রা) এবং তাঁর খান্দানওয়ালারা নবুওয়াত প্রাপ্তির প্রথম বছরের কোন এক সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এটা ছিল সেই যুগ যখন প্রিয় নবী (সা) প্রকাশ্য হকের তাবলীগ শুরু করেননি এবং অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে তাবলীগের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতেন।

নামাযের সময় হলে মুসলমানরা নিজের কওম ও গোত্র থেকে লুকিয়ে মক্কার সুনসান উপত্যকায় গিয়ে নামায পড়তেন। যাতে মুশরিকরা তাদের দীন পরিবর্তনের কথা জানতে না পারে। চুপিসারে ইবাদাতকারী সেই প্রথম যুগের মুসলমানদের মধ্যে হযরত শুরাহবীল বিন হাসানাহও শামিল ছিলেন। নবুওয়াতের তৃতীয় বছরের পরে একবার মুসলমানরা মক্কার এক ঘাটিতে নামায আদায়রত ছিলেন। এমন সময় মুশরিকদের একটি ছোট দল সেখানে গিয়ে হাযির। তারা মুসলমানদেরকে এক নতুন পদ্ধতিতে ইবাদত করতে দেখে জ্বলে উঠলো এবং নামাযীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। হযরত সা'দ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসও নামায পড়ছিলেন। তিনি জোশে এসে গেলেন এবং পাশেই পড়ে থাকা উটের একটি হাড় উঠিয়ে এক মুশরিকের মাথায় মারলেন এতে তার মাথা ফেটে গেল। অন্য মুসলমানও মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। মুশরিকরা তাদের হাবভাব দেখে নরম হলো এবং আহত সঙ্গীকে নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। হুযূর (সা) এই ঘটনা জানতে পেরে হযরত আরকাম (রা) বিন আবিল আরকাম মাখজুমীর বাড়ী মুসলমানদের ইজতিমা' এবং দাওয়াত ও তাবলীগের কেন্দ্র বানিয়ে দিলেন। হযরত আরকামের (রা) বাড়ী সাফা পাহাড়ের নিকট অবস্থিত ছিল। হুযূর (সা) নিজেই সেখানে উপস্থিত থাকতেন এবং হক পন্থীরাও (হযরত শুরাহবীল বিন হাসানাহসহ) তাঁর খিদমতে হাযির হয়ে আরকাম গৃহেই নামায আদায় করতেন। নবুওয়াতের চার বছর পর প্রথম দিকে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) প্রকাশ্যে হকের দাওয়াত প্রদানের কাজ শুরু করেছিলেন। এ সময় মুশরিকদের ক্রোধের পাহাড় পূর্ণ শক্তিতে ফেটে পড়লো এবং মুসলমানদের উপর যুলুম-নির্যাতনের এক সীমাহীন অধ্যায় শুরু হলো। হযরত শুরাহবীল বিন হাসানাহ (রা) এবং তাঁর পরিবারবর্গও কুরাইশ মুশরিকদের যুলুম-নির্যাতনের নিশানা হয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত সবর ও দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যেক ধরনের মুসিবত সহ্য করতে লাগলেন। কাফিরদের নির্যাতনের মাত্রা যখন ক্রমেই কঠিনতম হয়ে উঠতে লাগলো তখন নবুওয়াতের পঞ্চম বছরের শেষার্ধে প্রিয় নবী (সা) মুসলমানদেরকে হাবশা গমনের নির্দেশ দিলেন। হাবশার বাদশাহ একজন নেকদিল মানুষ ছিলেন। তিনি কারোর উপর যুলুম হতে দিতেন না। সুতরাং ১১জন পুরুষ এবং চারজন মহিলা সমন্বয়ে গঠিত একটি কাফেলা হাবশা হিজরত করলেন। এটাই প্রথম হাবশা হিজরত ছিল। পরবর্তী বছর নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছরের শুরুতে ৮০ জনের বেশী পুরুষ এবং ১৮ অথবা ১৯ জন মহিলা হাবশা রওয়ানা হলেন। তাদের মধ্যে শুরাহবীল বিন হাসানাহ এবং তাঁর আহলে খান্দানও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সকল চরিতকার হাবশা দ্বিতীয়

হিজরতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে হযরত শুরাহবীল (রা), তাঁর মাতা হযরত হাসানাহ (রা), সতালো পিতা সুফিয়ান (রা) বিন মা'মার, বৈপিত্রেয় ভাই হযরত যায়েদ (রা) ও হযরত জুনাদাহর (রা) নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তাঁর গোটা পরিবারটাই আল্লাহর রাস্তায় নিজের ঘর-বাড়ী ছেড়ে দিয়ে হাবশার উদ্বাস্তু জীবন গ্রহণ করেছিলেন।

আল্লামা বালাযুরী (র) এবং অন্য কতিপয় চরিতকার লিখেছেন যে, যেসকল সাহাবী ওহী লিখার মর্যাদা পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত শুরাহবীল বিন হাসানাহও (রা) শামিল ছিলেন। বলাবাহুল্য অনেক রেওয়ায়াতেই তাঁর নামের সঙ্গে "রাসূলের কাতিব" কথাটি পাওয়া যায়। এই সব রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত শুরাহবীল বিন হাসানাহ (রা) শিক্ষিত বা লেখা-পড়া জানা মানুষ ছিলেন এবং শৈশবকালে তাঁর লিখা-পড়া ও প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। এসব রেওয়ায়াত থেকে আরো জানা যায় যে, তিনি সেই বিশেষ সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের প্রতি প্রিয় নবীর (সা) সম্পূর্ণ আস্থা ছিল। এমনকি তিনি (সা) ওহী লিখারমত মহান জিম্মাদারী তাঁকে সোপর্দ করেছিলেন। চরিতকাররা যদিও একথা স্পষ্ট করে বলেননি যে, হযরত শুরাহবীল (রা) কখন এবং কতবার ওহী লিখার খিদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন। তবে, ধরন-ধারণ দেখে জানা যায় যে, হাবশা হিজরতের পূর্বেই তিনি মাঝে মধ্যে এই মর্যাদাপূর্ণ কাজ করেন এবং হাবশা থেকে ফিরে এসেও তিনি এই দায়িত্ব আঞ্জাম দেন।

হযরত শুরাহবীল বিন হাসানাহ (রা) নিজের আহল ও খান্দানের সঙ্গে হাবশায় অব্যাহতভাবে ১৩ বছর পর্যন্ত উদ্বাস্তুর জীবন কাটাতে থাকেন। হাবশার মুহাজিরদের মধ্যে হযরত উম্মে হাবীবাহ (রা) বিনতে আবু সুফিয়ানও ছিলেন। তিনি হাবশার দ্বিতীয় হিজরতে স্বামী ওবায়দুল্লাহ বিন জাহাশের সঙ্গে সেই কাফেলায় হাবশা পৌছেছিলেন যাতে হযরত শুরাহবীল বিন হাসানাহ (রা) এবং তার আহল ও খান্দান শামিল ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত ওবায়দুল্লাহ বিন জাহাশ হাবশা পৌছে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে এবং আবলীলাক্রমে মদ পান শুরু করেন। হযরত উম্মে হাবীবাহ (রা) স্বামীকে অনেক বুঝালেন। তিনি বললেন, কেন পরকাল বরবাদ করছো। কিন্তু আল্লাহ ওবায়দুল্লাহর অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তার উপর কোন প্রভাব পড়লো না এবং খৃষ্টান অবস্থাতেই মারা গেল। প্রিয় নবী (সা) বিদেশ বিভুঁয়ে উদ্বাস্তু জীবনে হযরত উম্মে হাবীবার (রা) বিধবা হওয়ার খবর পেয়ে তাঁকে নিজের রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দেয়ার ইচ্ছা করলেন। বস্তুত যখন তাঁর ইদ্দত পূর্ণ হলো তখন হুযূর (সা) হযরত আমর বিন উমাইয়াতুয যুমরীর হাতে

নাজ্জাশীর (হাবশার বাদশাহ) নামে একটি দাওয়াত পত্র পাঠালেন । তার মধ্যে হযরত উম্মে হাবীবার (রা) নিকাহর পয়গামও দেয়া হয়েছিল। নাজ্জাশী হুযূরের (সা) পয়গাম হযরত উম্মে হাবিবাহকে (রা) দিলেন। এই পয়গাম পেয়ে তিনি নিশ্চিন্তায় তা কবুল করলেন। সুতরাং এক মজলিশে নাজ্জাশী হযরত উম্মে হাবীবার (রা) বিয়ে (গায়েবানা) হুযূরের (সা) সঙ্গে দিয়ে দিলেন এবং হুযূরের (সা) পক্ষ থেকে মোহরানাও আদায় করলেন। এটা ৬ হিজরীর ঘটনা।এই মুবারক নিকাহর কিছু দিন পর নাজ্জাশী হাবশার সকল মুহাজিরকে দু'টি নৌকায় চড়িয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় রওয়ানা করে দিলেন। ইবনে সা'দ (র) বর্ণনা করেছেন যে, দু' নৌকায় ৬০ জন পুরুষ ও মহিলা ছিলেন। তাদের মধ্যে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবাহ (রা) ছাড়া হযরত শুরাহবীল এবং তার পরিবার এবং খান্দানও শামিল ছিলেন।

আবু দাউদ এবং নাসায়ী রেওয়ায়াত করেছেন যে, নাজ্জাশী হযরত উম্মে হাবীবাহকে (রা) হযরত শুরাহবীল বিন হাসানাহর (রা) সঙ্গে ও তত্ত্বাবধানে মদীনা রওয়ানা করেছিলেন। এই পবিত্র কাফেলা যেদিন মদীনা পৌছলো সেদিন হুযুরে আকরাম (সা) খায়বারে উপস্থিত ছিলেন এবং সেই দিনই খায়বার বিজয় থেকে ফারেগ হয়েছিলেন। হুযূরের (সা) তখনো মদীনা আগমনে কিছুটা বিলম্ব ছিল, কিন্তু হাবশা থেকে আগত সাহাবীগণ (রা) রাসূলের (সা) সঙ্গে সাক্ষাত না করে শান্তি পাচ্ছিলেন না। সকল পুরুষ সাক্ষাতের উৎসাহে খায়বার পৌছলেন এবং সাঈয়েদুল মুরসালীনের অবয়ব দর্শনে নিজেদের চোখ আলোকিত করলেন।

রহমতে আলম (সা) ১৩ বছর আগেকার সেইসব জীবন উৎসর্গ কারীকে দেখে খুব খুশী হলেন। তিনি সকলের সঙ্গে মুয়ানাকা করলেন এবং কপালে চুমু দিলেন। অতপর তিনি তাদেরকেও খায়বারের গনীমাতের মালের অংশ দান করলেন। হাবশা থেকে প্রত্যাগমনকারী সকল সাহাবী এবং সাহাবিয়াকে (রা) "যুল হিজরাতাইন" অর্থাৎ দু' হিজরতের লকব প্রাপ্তি ঘটেছিল। কেননা তাঁরা দু'টি হিজরত করেছিলেন। প্রথম মক্কা থেকে হাবশা এবং দ্বিতীয়ত হাবশা থেকে মদীনা। হযরত শুরাহবীল বিন হাসানাহও (রা) এ পবিত্র দলের একজন সদস্য হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। আল্লামা ইবনে সা'দ (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত শুরাহবীল মদীনায় বনু যারিকের মহল্লায় অবস্থান করেন। এখানেই তাঁর বিয়ে হয়েছিল মশহুর সাহাবীয়াহ হযরত শিফা (রা) বিনতে আবদুল্লাহর (আদুবিয়া) কন্যার সঙ্গে। আল্লামা বালাযুরী (র) "আনসাবুল আশরাফে" লিখেছেন, হযরত শুরাহবীল বিন হাসানাহ (রা) নবী করীমের (সা) সঙ্গে যুদ্ধসমূহে অংশ নিতে লাগলেন। অবশ্য আল্লামা বালাযুরী (র) হযরত

শুরাহবীল (রা) কোন্ কোন্ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তা বিশ্লেষণ করেননি। তবে, খায়বারের পরের যুদ্ধসমূহেই তিনি অংশ নিয়েছিলেন। কেননা, এর পূর্বেকার সময়েতো তিনি হাবশাতেই কাটিয়েছিলেন। অন্যান্য চরিতকারদের অধিকাংশই হযরত শুরাহবীলের (রা) রাসূলের (সা) সঙ্গের যুদ্ধে অংশগ্রহণের কথা লিখেননি। কিন্তু হযরত শুরাহবীলের (রা) জীবনের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে জানা যায় যে, তিনি একজন সৈনিক মানুষ ছিলেন। এ জন্য এটা ধারণা করা যায় না যে, হাবশা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি ঘরে বসে থাকবেন। এও রেওয়ায়াত আছে যে, শেষ যুগে নবী করীম (সা) তাঁকে দূত বানিয়ে মিসর প্রেরণ করেছিলেন। তিনি মিসরেই ছিলেন এমন সময় রাসূলের (সা) ওফাত হয়। এই দুঃখজনক খবর শুনতেই তিনি মদীনা ফিরে আসেন। সে সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খিলাফতের আসনে সমাসীন হয়েছিলেন। হযরত শুরাহবীল (রা) মদীনা পৌঁছেই তাঁর হাতে বাইয়াত হন।

১১ হিজরীতে খিলাফতে সিদ্দীকী শুরু হতেই সমগ্র আরবে ধর্মদ্রোহীতার ফিতনার আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠলো। মুরতাদদের মধ্যে তিন ধরনের মানুষ অন্তর্ভূক্ত ছিল। এক দল সরাসরি ইসলামই ত্যাগ করে বসেছিল। দ্বিতীয় দলে মুসায়লামা কায্যাব, তোলাইহা বিন খুয়াইলাদ এবং আসওয়াদ আনাসীর মত মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদারদের ফাঁদে আটকা পড়েছিল। তৃতীয় দল যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল তারা এত শক্তিশালী হয়ে উঠলো যে, ইসলামী খিলাফত হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়লো। কিন্তু এই নাযুক মুহূর্তে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ঈমানের এমন জোশ, বীরত্ব ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করলেন যে, ইতিহাসে তার নজীর পাওয়া যাবে না। তিনি এ সকল ফিতনার মূলোৎপাটনের জন্য দৃঢ় ইচ্ছা ঘোষণা করলেন এবং মুরতাদদের কোন দাবীর সামনেই মাথা নত করলেন না। সুতরাং তিনি ইসলামী মুজাহিদদেরকে ১১টি বাহিনীতে বিভক্ত করলেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন দিকে মুরতাদ ও মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদারদের নির্মূল করার জন্য রওয়ানা করলেন। তাদের মধ্যে একটি বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন হযরত শুরাহবীল বিন হাসানাহ (রা)। মুসায়লামা কায্যাবের নির্মূলের জন্য হযরত ইকরামা (রা) বিন আবি জাহালকে সাহায্য করার দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করা হয়। অতপর কিন্দাহ ও হাজরেমাওত প্রভৃতির মুরতাদদের বিশৃংখলা দমনের দায়িত্বও দেয়া হয়। দুর্ভাগ্যবশত হযরত ইকরামা (রা) শক্তিশালী দুশমন মুসায়লামা কায্যাবের শক্তির সঠিক অবস্থা নিরুপণ করতে ব্যর্থ হন এবং হযরত শুরাহবীল (রা)-এর পৌঁছার পূর্বেই মুসায়লামার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে বসেন। এর ফলে তাঁকে পিছু হটতে হয়। হযরত শুরাহবীল (রা) সেখানে পৌঁছলে তিনিও একই অবস্থার সম্মুখীন হন।

কিন্তু তিনি পিছু হটেও মুসায়লামার সঙ্গে সংঘর্ষ অব্যাহত রাখেন। [কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে, যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই হযরত শুরাহবীল (রা) হযরত আবু বকর সিদ্দীককে (রা) মুসায়লামার সামরিক শক্তি এবং প্রস্তুতি সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন] ইত্যবসরে হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ তোলাইহা বিন খুয়াইলাদ এবং আইনিয়া বিন হাসিনের উৎখাত কর্ম শেষ করেছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁকে হযরত শুরাহবীলকে (রা) সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেন। ইয়ামামার ময়দানে হকপন্থী ও মুসায়লামা কায্যাবের বিরাট বাহিনীর মধ্যে তৎকালীন যুগের ঘোরতর রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে হযরত শুরাহবীল (রা) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাথায় কাফন বেঁধে যুদ্ধ করতে থাকেন। অবশেষে মুরতাদরা পরাজিত হয় এবং তাদের বাহিনী রণেভঙ্গ দেয়। যুদ্ধে স্বয়ং মুসায়লামাও নিহত হয়। ইয়ামামার যুদ্ধের পর হযরত শুরাহবীল (রা) ধর্মদ্রোহীতার ফিতনার কয়েকটি ফ্রন্টেও বীরত্ব প্রদর্শন করেন। হকপন্থীদের একাগ্রতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শনের ফলশ্রুতিতে কয়েক মাসের মধ্যেই মুরতাদ ও মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদাররা সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয় এবং সমগ্র আরব খিলাফতে সিদ্দীকীর সামনে আনুগত্যের মাথা নত করে।

১৩ হিজরীতে সিরিয়ার রোমক শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হলে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এই অভিযানে চারজন সেনাপতি নিয়োগ করেন। বিভিন্ন রাওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, রাসূলের (সা) খলীফা হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) ইবনুল জাররাহকে হেমসের, ইয়াযীদ (রা) বিন আবু সুফিয়ানকে বালকা ও দামেস্কের, হযরত আমর (রা) ইবনুল আসকে ফিলিস্তিনের এবং হযরত শুরাহবীল বিন হাসানাহকে (রা) জর্দানে নিয়োজিত করেছিলেন। (সে যুগে এসব এলাকা সিরিয়ারই অন্তর্ভুক্ত ছিল) এবং কার্যকর নেতৃত্ব প্রসঙ্গে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যে আমীরের নেতৃত্বাধীন অঞ্চলে যুদ্ধ সংঘটিত হবে তিনিই সৈন্য বাহিনীর নেতৃত্ব দিবেন। যুদ্ধের ময়দানে যদি সবাই একত্রিত হয়ে যান তাহলে সকল সৈন্যের সিপাহসালার হবেন হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) ইবনুল জাররাহ।

আরব সীমান্ত থেকে বের হতেই ইসলামের মুজাহিদরা স্থানে স্থানে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত রোমকদের বড় বড় দলের দেখা পেলেন। তারা মুসলমানদেরকে প্রচন্ডভাবে বাধা দিল। কিন্তু হকপন্থীদের সামনে তারা কোনক্রমেই দাঁড়াতে পারলো না। হযরত ইয়াযীদ (রা) বিন আবি সুফিয়ান (রা) সর্বপ্রথম মদীনা থেকে বের হয়েছিলেন। তাবুকে তার বাহিনীর সঙ্গে রোমকদের এক বিরাট বাহিনীর সংঘর্ষ ঘটলো। রোমক বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল হিরাক্লিয়াসের চার অভিজ্ঞ অফিসার বাতলিক, জর্জিস, লুকা এবং

সলিয়া। এই বাহিনীর তুলনায় হযরত ইয়াযীদ (রা) বিন আবি সুফিয়ানের (রা) সৈন্য সংখ্যা ছিল খুব অল্প। কিন্তু তিনি আল্লাহর ভরসায় তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। প্রথম দিনের যুদ্ধে হার-জিতের কোন সিদ্ধান্ত হলো না। দ্বিতীয় দিনে প্রচন্ড যুদ্ধ শুরু হলে উভয় পক্ষই প্রাণপণ লড়াই করলো। যুদ্ধের চরম অবস্থায় হযরত শুরাহবীল বিন হাসানাহ (রা) নিজের বাহিনীসহ সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি হযরত ইয়াযীদ (রা) বিন আবি সুফিয়ানের (রা) রওয়ানার পর মদীনা থেকে বসরা অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। তিনি যখন রোমকদেরকে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখতে পেলেন তখন বিনা বিশ্রামে নারায়ে তাকবীর দিতে দিতে নিজের ভাইদের সাহায্যার্থে ময়দানে নেমে এলেন। ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ানের (রা) বাহিনীর জন্য হযরত শুরাহবীলের (রা) আগমন গায়েবী সাহায্যই বলতে হবে। তারা সম্মিলিতভাবে নতুন উদ্যমে রোমকদের উপর এমন প্রচন্ডভাবে হামলা করলো যে, তাদের ব্যূহ তছনছ হয়ে গেল। রোমকদের বড় বড় অফিসার যুদ্ধে নিহত হলো। হাজার হাজার সৈন্য নিহত হওয়ার ফলে তারা পালিয়ে গেল।

যুদ্ধের পর হযরত ইয়াযীদ (রা) বিন আবু সুফিয়ান (রা) হযরত শুরাহবিলের (রা) সঙ্গে কোলাকুলি করলেন এবং পরস্পর মুবারকবাদ দিলেন। অতপর উভয় সিপাহসালার স্ব স্ব গন্তব্যের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। হযরত ইয়াযীদ (রা) বিন আবি সুফিয়ান (রা) গেলেন বালকার দিকে। আর হযরত শুরাহবীলের (রা) দৃষ্টি তখন বসরার দিকে।

সিরিয়ার হুরান প্রদেশের সদর ছিল বসরা। সামরিক দিক থেকে স্থানটির গুরুত্ব ছিল অত্যধিক। রোমক জেনারেল রুহাস অথবা রুমানুস সেখানকার শাসক ছিল। হযরত শুরাহবীল (রা) চার হাজার যোদ্ধা সমেত আক্রমণ করতে করতে বসরার নিকট পৌছলেন। এ সময় রুহাস মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধের পরিবর্তে সন্ধি করে নেয়াই উপযুক্ত মনে করল। সুতরাং সে হযরত শুরাহবীলের (রা) সঙ্গে সন্ধির আলোচনা শুরু করে দিল। বসরাবাসী নিজেদের শাসকের এই সন্ধিমূলক আরচণ পসন্দ করলো না। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তিতে মুকাবিলা করার জন্য তাকে বাধ্য করলো। রুহাস অনিচ্ছাকৃতভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করলো এবং মুসলমানরাও যুদ্ধের জন্য কোমর বেঁধে দাঁড়ালেন। ইতিমধ্যে হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদও নিজের বাহিনীসহ ইরাক থেকে বসরা এসে পৌছলেন। তিনি হযরত শুরাহাবীলের (রা) সঙ্গে একযোগে বসরার যুদ্ধবাজ রোমকদের উপর এমন আঘাত হানলেন যে, তারা শান্তি শান্তি ও রক্ষা কর রক্ষা কর বলে চেঁচিয়ে উঠলো এবং দুর্গের

দরজা খুলে দিয়ে শান্তি ও নিরাপত্তা চাইলো। জিযিয়া প্রদানের শর্তে হযরত খালিদ (রা) তাদের নিরাপত্তা দিয়ে দিলেন। অতপর তিনি হযরত শুরাহবীলকে বসরায় রেখে দামেস্কের দিকে অগ্রসর হলেন এবং হযরত আবু ওবায়দার (রা) সঙ্গে মিলিত হয়ে শহর অবরোধ করলেন। পক্ষান্তরে হিরাক্লিয়াস বসরায় মুসলমানদের দখলদারিত্বের খবর পেয়ে এক বিরাট বাহিনী (কতিপয় রেওয়ায়াত অনুযায়ী তা ৯০ হাজার জোয়ান সমন্বয়ে গঠিত ছিল) মুসলমানদের মুকাবিলার জন্য প্রেরণ করলো। এই বাহিনী আজনাদাইন পৌছে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিল। হেমসে রোমক শাসক দারদানও এক বিরাট বাহিনী নিয়ে এ উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো যে, যাতে দামেস্ক, বালকা এবং ফিলিস্তীনে অবস্থানরত ইসলামী বাহিনীর সঙ্গে হযরত শুরাহবীলের (রা) সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন থাকে। হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) এবং খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ রোমকদের সমাবেশ ও তৎপরতা সম্পর্কে অবহিত হলেন। সকল ইসলামী বাহিনী একত্রিত হয়ে এ তুফানের মুকাবিলা করাকেই তারা সঠিক মনে করলেন। সুতরাং তাঁরা দামেস্ক থেকে অবরোধ প্রত্যাহার করে আজনাদাইনের দিকে অগ্রসর হলেন এবং অন্যান্য অফিসারকে সেখানে এসে একত্রিত হওয়ার জন্য লিখে পাঠালেন।

হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) এবং খালিদের (রা) পত্র পেয়েই হযরত শুরাহবীল (রা) বসরা থেকে আজনাদাইন রওয়ানা হলেন। তার রাস্তা বিচ্ছিন্ন করার জন্য দারদান খুব চেষ্টা করলো। কিন্তু তিনি সহীহ সালামতে আজনাদাইন পৌছে গেলেন। তারপর হযরত ইয়াযীদ (রা) বিন আবু সুফিয়ান (রা) এবং হযরত আমর (রা) ইবনুল আছও স্ব স্ব বাহিনী সমেত আজনাদাইন এসে বড় ইসলামী বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হলেন। অন্যদিকে দারদানও আজনাদাইনের তাঁবুতে অবস্থানরত সেই বড় রোমক বাহিনীতে গিয়ে মিলিত হলো। ১৩ হিজরীর ২৮শে জমাদিউল আউয়াল শনিবার আজনাদাইনের ময়দানে মুসলমান ও রোমকদের মধ্যে প্রচন্ড রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হলো। রোমকরা বীরত্ব প্রদর্শনে কোন কুণ্ঠা প্রদর্শন করলো না। কিন্তু মুসলমানদের জোশ ও উদ্দীপনার সামনে তাদের কোন কিছুই কার্যকর হলো না। যখন তাযারক, কাবকালার, দারদান এবং অন্য কতিপয় বড় বড় রোমক অফিসার এক এক করে নিহত হলো তখন রোমকদের জবাবদানের শক্তি রহিত হয়ে গেল এবং তারা চরম বিশৃংখল অবস্থায় ইলিয়া, কাইসারিয়া ও হেমস প্রভৃতির দিকে পালিয়ে গেল। এই যুদ্ধে প্রায় তিন হাজার মুসলমান শহীদ হন এবং তা থেকে কয়েক গুণ বেশী রোমক মারা যায়। ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন যে, আজনাদাইনের শহীদদের মধ্যে হযরত আমর (রা)

ইবনুল আছের ছোট ভাই হযরত হিশাম (রা) ইবনুল আছও ছিলেন। তিনি সাবিকুনাল আউয়ালুন এবং দু' হিজরতকারীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মুসলমানরা রোমকদের পিছু ধাওয়া করলেন। এ সময় পথে তারা একটি অপ্রশস্ত গিরিপথ পেলেন। এ পথ দিয়ে একবার শুধু এক জনই অতিক্রম করতে পারে। যেসব মুসলমান সেই স্থান অতিক্রম করে গেলেন তাদের সঙ্গে রোমকরা যুদ্ধ করতে লাগলো। হযরত হিশাম (রা) শহীদ হয়ে সেই অপ্রশস্ত পথের উপর পড়ে গেলেন। এখন যে মুসলমানই সেখানে পৌছলেন সে-ই সেখানে থেমে যেতে লাগলেন। কেননা, সামনে অগ্রসর হলে হযরত হিশামের (রা) লাশ ঘোড়ার খুরের নীচে পিষ্ট হতো। হযরত আমর (রা) ইবনুল আছ এই অবস্থা দেখে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে মুসলমানরা! আল্লাহ তায়ালা আমার ভাইকে শাহাদাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন এবং তাঁর রুহ উঠিয়ে নিয়েছেন। এখানেতো শুধু তার দেহ পড়ে রয়েছে। এ জন্য তোমরা তার লাশের উপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে দাও এবং আল্লাহর দুশমনদের মুকাবিলা করো।"

একথা বলে তিনি ঘোড়া ছুটালেন। অন্যান্যরা তাঁর অনুসরণ করলেন। এমনিভাবে হক পথের শহীদের লাশ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। যুদ্ধ শেষ হলে হযরত আমর (রা) ইবনুল আছ ভাইয়ের ছিন্নবিচ্ছিন্ন লাশের অংশকে বস্তায় ভরে দাফন করলেন।

আজনাদাইন বিজয়ের পর সম্মিলিত ইসলামী বাহিনী দামেস্কের দিকে অগ্রসর হলেন এবং আরেকবার খুব কঠোরভাবে শহরটি অবরোধ করলেন। এ অবরোধে হযরত শুরাহবীল (রা) বাবুল ফারাদিসে মোতায়েন এবং দামেস্কের পদাতিক বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। এ অবরোধ কয়েক মাস যাবত অব্যাহত রইলো। এ সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ওফাত পেলেন এবং হযরত ওমর ফারুক (রা) খিলাফতের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন। ময়দানে এসে মুকাবিলা করার মত সাহস দামেস্কবাসীর ছিল না। এ জন্য তারা শহরের প্রাচীরের উপর থেকেই মুসলমানদের উপর তীর এবং পাথর বর্ষণ করতে লাগলো। অবশ্য কতিপয় সৈন্য দল শহর থেকে বের হয়ে মুসলমানদের উপর হামলা করার মত দু'চারটি ঘটনাও সংঘটিত হলো। কিন্তু তারা পরাজিত হয়ে পিছু হটে গেল। একদিন হযরত শুরাহবীল বিন হাসানাহ (রা) অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে দুর্গের উপর হামলা করলেন। দামেস্কবাসীরা তার উপর তীর ও পাথরের মেঘ বর্ষণ করলো। হযরত শুরাহবীলের (রা) কয়েকজন সঙ্গী শহীদ ও আহত হলেন। এক রেওয়ায়াতে আছে যে, শহীদদের মধ্যে মশহুর সাহাবী হযরত আবান (রা) বিন সাঈদও ছিলেন। অন্য কতিপয় রেওয়ায়াত

মুতাবিক হযরত আবান (রা) আজনাদাইনের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী উম্মে আবান (রা) হযরত শুরাহবীলের বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত নিপুণ তীরান্দাজ ছিলেন। দামেস্কবাসীরা মুসলমানদের উপর মারাত্মকভাবে তীর ও পাথর নিক্ষেপ শুরু করলে তিনি তাক করে করে রোমকদের উপর তীর নিক্ষেপ করতে লাগলেন। নিক্ষেপিত একটি তীর ক্রুশ হাতে নিয়ে রোমকদের উদ্দীপনাদানকারী পাদরীর গায়ে লাগলো। তার হাত থেকে ক্রুশ নীচে পড়ে গেল। তাতে রোমকদের মধ্যে প্রচন্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হলো এবং নিজেদের সরদার তুমার নেতৃত্বে দরজা খুলে হযরত শুরাহবীলের (রা) বাহিনীর উপর হামলা করলো। হযরত শুরাহবীল (রা) এই ঝড়ো হামলায় ঘাবড়ে না গিয়ে রোমকদেরকে দাঁতভাঙ্গা জবাব দিলেন। এ সময় উম্মে আবান (রা) যুদ্ধ গাঁথা পড়তে পড়তে রোমকদের উপর তীর বর্ষণ করছিলেন।

হযরত উম্মে আবানের (রা) ধনু থেকে নিক্ষিপ্ত একটি তীর তুমার চোখে গিয়ে লাগলো। এতে সে চীৎকার দিয়ে পেছনে ভেগে গেল। তার বাহিনীও তাকে অনুসরণ করলো এবং সকলেই দূর্গে গিয়ে ঢুকলো। দামেস্ক অবরোধকালে আরো কয়েকবার হযরত শুরাহবীল (রা) পূর্ণমাত্রায় বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। এমনকি স্বয়ং হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ তাঁর চরম নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার স্বীকৃতি দিয়েছেন। দীর্ঘ কয়েক মাস অবরোধের পর অবশেষে মুসলমানরা দামেস্কের উপর ইসলামের পতাকা উড্ডীন করলেন। হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) সকল শহরবাসীকে নিরাপত্তা দান করলেন। তিনি মুসলমানদেরকে গনীমাতের মাল গ্রহণ ও কাউকে গ্রেফতার করতে নিষেধ করে দিলেন। এ ঘটনা ঘটেছিল ১৪ হিজরীর রজব মাসে। ১৪ হিজরীর যিলকদ মাসে মুসলমানরা জর্দান অভিমুখে রওয়ানা হলেন। এখানে রোমকরা খুব জোরে শোরে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যস্ত ছিলো।

দামেস্কের পতন রোমকদেরকে প্রচন্ডভাবে উত্তেজিত করেছিল। তারা জর্দানের বিসান শহরে সৈন্য সমাবেশ শুরু করলো। কিছু দিনের মধ্যেই সেখানে ৪০ থেকে ৮০ হাজারের মত যুদ্ধবাজ রোমক একত্রিত হলো। মুসলমানগণ বিসানের সামনে কয়েক মাইল দূরে ফাহাল নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন করলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) জর্দান পদানত ও ইমারতের জন্য হযরত শুরাহবীলকে (রা) নিয়োগ করেছিলেন। হযরত ওমরও (রা) এ সিদ্ধান্ত বহাল রাখলেন। এ জন্য ফাহালের ইসলামী বাহিনীর কমাণ্ড হযরত শুরাহবীলের (রা) উপর ন্যস্ত হলো। তিনি আবুল আওয়ার সালমীকে (রা) কিছু সৈন্য দিয়ে তাবরিয়ার দিকে প্রেরণ করলেন এবং স্বয়ং রোমকদের উপর

হামলার জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় রইলেন। কেননা বিসানে অবস্থানরত রোমকরা নদীর বাঁধ কেটে দিয়েছিল এবং ফাহালের চার পাশ পানিতে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল। ফাহালে মুসলমানদের অবস্থান দীর্ঘতর হলো। ফলে রোমক জেনারেল সাকলা বিন মিহযাক সৈন্যের সংখ্যাধিক্যের ধারণায় স্বয়ং মুসলমানদের উপর হামলা করার পরিকল্পনা প্রস্তুত করলো এবং একটি নির্দিষ্ট রাতে একটি বিশেষ স্থান থেকে কাদা ও পানি পার হয়ে মুসলমানদের উপর এসে পড়লো। অন্যদিকে হযরত শুরাহবীল (রা) নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন। রাতের অন্ধকারে রোমকরা ফাহাল পৌছে মুসলমানদেরকে মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত পেলো। এটা অবশ্য তারা চিন্তাও করেনি। উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচন্ড যুদ্ধ হলো এবং তা রাত শেষ হয়ে পরের দিনও অব্যাহত রইল। হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ, জিরার (রা) বিন আযুর এবং শুরাহবীল (রা) বিন হাসানাহ (রা) মরণপণ লড়াই করে দুশমনের কোমর ভেঙ্গে দিল। সাকলা এবং তার সঙ্গী কয়েকজন জেনারেল নিহত হলো এবং রোমক বাহিনী পালিয়ে গেল।

কতিপয় ঐতিহাসিক এ ঘটনাকে অন্যভাবে লিখেছেন। তাঁরা বলেছেন, মুসলমানরা স্বয়ং ফাহাল থেকে অগ্রসর হয়ে রোমকদের উপর হামলা করে বসে এবং পরাজিত করে। যা হোক, হযরত শুরাহবীল (রা) ফাহালের যুদ্ধে ব্যাপক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন।

ফাহালের যুদ্ধ শেষে হযরত শুরাহবীল (রা) হযরত আমর (রা) ইবনুল আছকে সঙ্গে নিয়ে বিসান পৌছে তা অবরোধ করলেন। অবরুদ্ধরা বেশী দিন মুসলমানদের মুকাবিলায় টিকতে পারলো না এবং দামেস্কের আরোপিত শর্তে মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করে নিলো। তাবরিয়াবাসীরা যখন বিসানবাসীর অবস্থা জানতে পারলো তখন তারাও হযরত আবুল আওয়ারের (রা) মাধ্যমে হযরত শুরাহবীলকে (রা) সন্ধির পয়গাম প্রেরণ করলো। তিনি এ দরখাস্ত অনুমোদন করলেন এবং তাবরিয়াবাসীদের থেকেও দামেস্কের শর্তের মত শর্তে সন্ধি করলেন। তারপর হযরত শুরাহবীল (রা) জর্দানের অন্যান্য সকল শহর ও স্থান যেমন আযরুয়াত, আম্মান, জারাশ, মাআব প্রভৃতি স্থান অত্যন্ত সহজভাবে জয় করে নিলেন। আসল কথা হলো, সেখানকার বাসিন্দারা মুকাবিলার সাহসই রাখতো না। এ জন্য সকলেই দামেস্কের সন্ধিপত্রের শর্ত অনুযায়ী মুসলমানদের আনুগত্য কবুল করে নিল। এমনিভাবে সমগ্র জর্দান মুসলমানদের অনুগত হয়ে গেল এবং হযরত শুরাহবীল (রা) সেখানকার আমীরের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে লাগলেন। অন্য দিকে আবু ওবায়দাহ (রা) হেমসের উপর হামলা করে তা জয় করে নেন এবং সেখানেই মুকিম হয়ে যান।

রোমের বাদশাহ হিরাক্লিয়াস ইনতাকিয়া অবস্থান করছিল। সে যখন জর্দান ও হেমসের উপর মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার খবর পেল তখন ক্ষোভে এবং ক্রোধে পাগল প্রায় হয়ে গেল। সে মুসলমানদের সঙ্গে একটি সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধের জন্য নিজের অধিকৃত এলাকাসমূহে জবরদস্তিমূলক সৈন্য ভর্তি শুরুর নির্দেশ প্রেরণ করলো। সাথে সাথে রোমকদেরকেও উদ্বুদ্ধ করে বললো যে, তারা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে আরবদেরকে সিরিয়া থেকে বের না করে তাহলে তাদের মান-মর্যাদা হুমকির সম্মুখীন হবে। যেখানে যেখানে হিরাক্লিয়াসের ফরমান পৌছলো সেখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাড়া পড়ে গেল এবং চারদিক থেকে যুদ্ধবাজ রোমকদের দল ইনতাকিয়ায় পৌছতে লাগলো। এমনিভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই কয়েক লাখ রোমক হিরাক্লিয়াসের পতাকা তলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে মরার জন্য একত্রিত হলো। হিরাক্লিয়াস নিজের একজন প্রখ্যাত জেনারেল বাহানকে একটি বিরাট বাহিনী দিয়ে মুসলমানদেরকে নাস্তানাবুদ করার নির্দেশ দিলেন। ওদিকে হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) রোমকদের বিরাট যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর পেয়ে নিকটবর্তী এলাকাসমূহের আমীর ও সামরিক বাহিনীর অফিসারদেরকে পরামর্শের জন্য নিজের নিকট (হেমসে) ডেকে পাঠালেন। সকলে একত্রিত হলে হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) সামগ্রিক অবস্থা বর্ণনা এবং করণীয় সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। হযরত ইয়াযীদ (রা) বিন আবু সুফিয়ান (রা) মত প্রকাশ করে বললেন, মহিলা ও শিশুদেরকে শহরে রেখে আমরা সকলেই বাইরে গিয়ে রোমকদের মুকাবিলা করা উচিত। সাথে সাথে খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ এবং আমর (রা) ইবনুল আছকে দামেস্ক ও ফিলিস্তিন থেকে ডেকে আনা হোক।

হযরত শুরাহবীল (রা) বিন হাসানাহও (রা) সে সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, ইয়াযীদ (রা) বিন আবু সুফিয়ানের (রা) বক্তব্যের সঙ্গে তিনি একমত নন। কেননা, শহরবাসী হলো খৃষ্টান। তারা ধর্মীয় উন্মাদনায় উন্মত্ত হয়ে আমাদের অনুপস্থিতিতে আমাদের পরিবার পরিজনকে হিরাক্লিয়াসের হাওয়ালা করে দিতে পারে অথবা মেরে ফেলতে পারে।

হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) বললেন, "তাহলে খৃষ্টানদেরকেই শহর থেকে বের করে দিলে কি হয়?"

হযরত শুরাহবীল (রা) তৎক্ষণাৎ বললেন, "হে আমীর! অধিবাসীদেরকে শহর থেকে বের করে দেয়ার অধিকার আমাদের নেই। কেননা, ঘর ও জান-মালের হেফাজতের শর্তে তাদেরকে আমরা নিরাপত্তা দিয়েছি। তাছাড়া

তাদেরকে শহর থেকে বের করা হবে না বলেও আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। এখন আমরা সেই প্রতিশ্রুতি কি করে লংঘন করতে পারি?"

হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) তাঁর এই বক্তব্য মেনে নিলেন এবং অন্যদের মত জানতে চাইলেন। কতিপয় সাহাবী রায় দিলেন যে, হেমসে থেকেই দরবারে খিলাফত থেকে সাহায্য চাওয়া হোক এবং দামেস্ক ও ফিলিস্তিনের সাহায্যকারী সৈন্যের জন্য অপেক্ষা করা হোক।

হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) বললেন যে, এখন অতো সময় নেই। কেননা খৃষ্টানদের বিরাট বাহিনী যে কোন সময় আমাদের উপর হামলা করে বসতে পারে।

সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হলো যে, হেমস ত্যাগ করে দামেস্ক রওয়ানা এবং সেখানে খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে ভবিষ্যত কর্মসূচী নিরূপণ করতে হবে। হেমস থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) কয়েক লাখ পরিমাণ অর্থ হেমসবাসীকে ফেরত দিলেন। এই অর্থ তাদের নিকট থেকে জিযিয়া হিসেবে নেয়া হয়েছিল। অর্থ ফেরত দানের সময় তিনি বললেন, এখন আমরা তোমাদের রক্ষার দায়িত্ব বহন করতে সক্ষম নই। শহরবাসীর উপর এর এমন প্রভাব পড়লো যে, তারা কেঁদে কেঁদে দোয়া করতে লাগলো। তারা মুসলমানদেরকে অতিশীঘ্র ফিরিয়ে আনার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানালো। সঙ্গে সঙ্গে এ কসমও খেলো যে, যতক্ষণ তারা জীবিত থাকবে ততক্ষণ কাইসার এ শহর দখল করতে পারবে না।

হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) হেমস ত্যাগ করে দামেস্ক পৌছলেন এবং হযরত খালিদ (রা) সমেত সামরিক বাহিনীর সকল অফিসারকে একত্রিত করে পরামর্শ করলেন। একেকজন এক এক ধরনের মত দিলেন। ইত্যবসরে ফিলিস্তিন থেকে হযরত আমর (রা) ইবনুল আছের পত্র এসে পৌছলো। তিনি লিখে পাঠালেন "রোমক বাহিনী জর্দান প্রবেশ করেছে এবং চারদিকে ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে। এ সময় জর্দান পৌছে সকল ইসলামী বাহিনী ঐক্যবদ্ধ হয়ে রোমকদের মুকাবিলার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো এবং সাথে সাথে খিলাফতের দরবার থেকে সাহায্য চাওয়ার কথাও স্থির হলো। সুতরাং হযরত আবু ওবায়দাহ (রা), খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ, শুরাহবীল (রা) বিন হাসানাহ (রা) এবং ইয়াযীদ (রা) বিন আবু সুফিয়ান (রা) তৎক্ষণাৎ দামেস্ক থেকে রওয়ানা হলেন এবং অত্যন্ত দ্রুতগতিতে জর্দানের সীমানায় ইয়ারমুকের ময়দানে পৌছে তাবু ফেললেন। হযরত আমর (রা) ইবনুল আছও এখানে এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হলেন।

এদিকে রোমক বাহিনীও তুফানের গতিতে এসে পৌছলো এবং ইয়ারমুকের উল্টো দিক বিরুল জাবালে তাঁবু ফেললো। বিভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী রোমক সৈন্যের সংখ্যা দুই থেকে পাঁচ লাখের মধ্যে ছিল। তাদের তুলনায় ইসলামী সৈন্য সংখ্যা ছিল শুধুমাত্র ৩৫ হাজারের মত। তবুও তাদের প্রচন্ড উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল। ইয়ারমুকের ময়দানে কয়েক দিন ধরে রোমক ও মুসলমানদের মধ্যে প্রচন্ড যুদ্ধ হলো। উভয়পক্ষই বীরত্ব প্রদর্শনে কোন কুণ্ঠা করলো না। ইবনে জারির তাবারী (র) বর্ণনা করেছেন এ যুদ্ধে হযরত শুরাহবীল (রা) বিন হাসানাহ (রা) বাম দিকের সিপাহসালার ছিলেন। অন্য কতিপয় ঐতিহাসিক তাঁকে কোন বিশেষত্ব ছাড়াই সৈন্যদের এক অংশের সেনাপতি বলে লিখেছেন। যা হোক, তিনি ইয়ারমুক যুদ্ধে এক স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত। তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এমন বীরত্ব ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন যে, সবাই তার ঈমানের জোশ ও জিহাদের আবেগের কথা খোলা মনে স্বীকার করেছেন। ঐতিহাসিকরা ইয়ারমুকের যুদ্ধে তাঁর বীরত্বের কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তার মধ্য থেকে দু' তিনটির বর্ণনা এখানে দেয়া হলো।

একদিন ৩০ হাজারের একটি রোমক বাহিনী হযরত শুরাহবীলের (রা) বাহিনীর ওপর এমন প্রচন্ডভাবে হামলা করলো যে, অধিকাংশ মুসলমানদের পা কাঁপতে লাগলো। কিন্তু হযরত শুরাহবীল (রা) শুধুমাত্র পাঁচশ লোকের একটি দল নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে পাহাড়ের মত অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং রোমকদেরকে অগ্রসর হতে দিলেন না। নিজের সরদারকে অব্যাহতভাবে লড়াই করতে দেখে হটে যাওয়া মুসলমানরা লজ্জিত হয়ে ফিরে এলেন। হযরত শুরাহবীল (রা) তাঁদের প্রতি উষ্মা প্রকাশ করে বললেন, এটা তোমরা কি করেছ। এটাতো বেহেশত ত্যাগ করে দোযখে নিপতিত হওয়ার ব্যাপার। এতে তাঁরা খুব লজ্জিত হল এবং রোমকদের উপর এমন প্রচন্ড শক্তিতে হামলা করল যে, তাদের ব্যূহ তছনছ হয়ে গেল। অবশেষে তারা পিছু হটতে বাধ্য হলো।

আরেকবার শত্রু পক্ষের এক লাখ তীরান্দাজ ঐক্যবদ্ধভাবে মুসলমানদের উপর মারাত্মকভাবে তীর বর্ষণ করলো। তাতে হাজার হাজার মুসলমান শহীদ অথবা আহত হলেন। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে, মুসলমানদের জন্য দিনটি ছিল কঠিন মুসিবতের। শহীদ এবং অন্যান্য আহতরা ছাড়া চোখে তীর লাগার কারণে ৭শ' মুসলমান এক চোখ বিশিষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন। বস্তুত মুসলমানদের মধ্যে দিনটি ইয়াওমুত তা'বির অর্থাৎ এক চোখ হওয়ার দিন হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ নাযুক সময়ে হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ বাছাই করা

কতিপয় জানবাজকে সঙ্গে নিয়ে তীর বর্ষণকে উপেক্ষা করে ঘোড়া চালিয়ে তীর বর্ষণকারীদের উপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং প্রচন্ড বেগে হামলা চালিয়ে তাদেরকে নাস্তানাবুদ করে ফেললেন। হযরত খালিদের (রা) এই জানবাজ সাথীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, হযরত শুরাহবীল (রা)।

আল্লামা শিবলী (র) 'আল-ফারুক' গ্রন্থে ইয়ারমুক যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, একদিন রোমক জেনারেল ইবনে কানাতির বাম দিকে প্রচন্ড হামলা চালালো। দুর্ভাগ্যবশত এ অংশে বেশীর ভাগ লাখাম ও গাসসান গোত্রের মানুষ ছিলেন। তারা সিরিয়ার দিকে বসবাস করতো এবং বেশ কিছুদিন ধরে রোমকদেরকে কর দিয়ে আসছিলো। তাদের মনে রোমক ভীতি ছিল। এর ফলশ্রুতিতে প্রথম হামলাতেই তাদের পা ফসকে গেল। অফিসাররা যদি হিম্মতহারা হতেন তাহলে লড়াই শেষ হয়ে গিয়েছিল। রোমকরা পলায়নকারীদের ধাওয়া করতে করতে তাঁবু পর্যন্ত পৌছে গেল। এই অবস্থা দেখে মহিলারা বের হয়ে পড়লেন এবং তাদের বীরত্বের কারণে খৃষ্টানরা সামনে অগ্রসর হতে পারলো না। সৈন্যরা যদিও বিশৃংখল হয়ে পড়েছিল, তবুও অফিসারদের মধ্যে কুবাছ (রা) বিন আশিম, সাঈদ (রা) বিন যায়েদ (রা) ইয়াযীদ বিন আবি সুফিয়ান (রা), আমর (রা) ইবনুল আছ এবং শুরাহবীল (রা) বিন হাসানাহ (রা) বাহাদুরী প্রদর্শন অব্যাহত রেখেছিলেন। হযরত শুরাহবীলের (রা) চারপাশে রোমকরা ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল। আর তিনি মাঝখানে পাহাড়ের মত অটল অবস্থায় দাঁড়িয়ে কুরআনের এই আয়াত–

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ–

(التوبة: ١١١)

"আল্লাহ জন্নাতের বিনিময়ে মুসলমানদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে মেরে থাকে এবং মারা যায়।"

পড়ছিলেন এবং এই বলে না'রা দিচ্ছিলেন যে, আল্লাহর নিকট বিক্রিত ও আল্লাহর প্রতিবেশীরা কোথায়? যার কানেই এই আওয়াজ পৌছলো সে-ই নির্দ্বিধায় ফিরে এলো। এমনকি বিশৃংখল বাহিনী সুশৃংখল হয়ে উঠলো এবং শুরাহবীল (রা) তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে এমন বাহাদুরীর সঙ্গে যুদ্ধ করলেন যে, রোমকরা আর অগ্রসর হতে পারলো না।

হযরত শুরাহবীল (রা) এবং ইসলামের অন্যান্য জীবন উৎসর্গকারীদের অটলতা ও বীরত্বের কারণে রোমকদের শিক্ষণীয় পরাজয় ঘটলো। তাদের ৭০ হাজার থেকে এক লাখের মত সৈন্যের লাশ যুদ্ধের ময়দানে পড়ে রইলো এবং হিরাক্লিয়াস ইনতাকিয়া থেকে কুসতুনতুনিয়া চলে যেতে বাধ্য হলো। ইনতাকিয়া ত্যাগের সময় তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছিল। "বিদায়! হে সিরিয়া।"

ইয়ারমুক বিজয়ের পর মুসলমানরা কানসারিন, হালব, ইনতাকিয়া, বানজ, মারয়াশ, হাসনি হিরছ, বুকা, জারমা ও অন্য আরো কয়েকটি স্থান অল্প সময়ের মধ্যেই জয় করলেন। অতপর ফিলিস্তীনের কেন্দ্রীয় শহর বাইতুল মুকাদ্দাস অবরোধ করলেন। অবরোধকারী সৈন্যদের মধ্যে হযরত শুরাহবীলও (রা) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। খৃষ্টানরা কয়েক মাস পর্যন্ত দুর্গ বন্ধ করে লড়তে লাগলো। কিন্তু অবশেষে হিম্মত হারিয়ে ফেললো এবং শর্ত সাপেক্ষে সন্ধির দরখাস্ত করলো। তাদের শর্ত ছিল, খলিফাতুল মুসলিমুন হযরত ওমর ফারুক (রা) স্বয়ং বাইতুল মুকাদ্দাস তাশরীফ আনবেন এবং স্বহস্তে চুক্তিনামা লিখবেন। হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) হযরত ওমরকে (রা) পত্র লিখে জানালেন যে, বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় আপনার আগমনের উপর নির্ভরশীল। হযরত ওমর (রা) এ পত্র পেয়ে নেতৃস্থানীয় সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে হযরত আলীকে (রা) নায়েব নিয়োগ করলেন এবং খিলাফতের দায়িত্ব তাঁর হাতে তুলে দিলেন। তারপর ১৩ হিজরীর রজব মাসে স্বয়ং মদীনা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস রওয়ানা হলেন। ফারুকে আযমের (রা) বাইতুল মুকাদ্দাস সফরের চিত্র কি ছিল? আল্লামা শিবলীর (র) ভাষায় কোন নাকারা-নহবত বাজেনি। কোন শান-শওকত প্রদর্শিত হয়নি। লয়-লশকরের ছড়াছড়ি ছিল না। এমনকি সামান্য তাঁবুও ছিল না। সওয়ারীর মধ্যে ছিল ঘোড়া এবং কতিপয় মুহাজির ও আনসার সঙ্গে ছিলেন। এ সত্ত্বেও যেখানেই ফারুকে আযমের (রা) মদীনা থেকে সিরিয়া রওয়ানা হওয়ার খবর পৌঁছেছিল সেখানকার মাটিই দেবে গিয়েছিল। মোট কথা, আমীরুল মু'মিনীন ঐ অবস্থায়ই জাবিয়া পৌঁছলেন। বায়তুল মুকাদ্দাসের খৃষ্টান নেতারা সেখানেই তার খিদমতে হাযির হলেন এবং সন্ধির চুক্তি সাক্ষর করলেন। অতপর হযরত ওমর (রা) বাইতুল মুকাদ্দাস তাশরীফ নিলেন। শহরে প্রবেশের সময় অন্যান্য সাহাবীর সঙ্গে হযরত শুরাহবীলও ছিলেন।

আল্লামা যাহাবী (র) ও অধিকাংশ ঐতিহাসিক লিখেছেন, হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত শুরাহবীল (রা) বিন হাসানাহকে (রা) জর্দানের গভর্ণর নিয়োগ করেছিলেন। এ নিয়োগ কবে এবং কখন হয়েছিল সেই প্রসঙ্গে বিভিন্ন

বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু আমরা যখন হযরত শুরাহবীলকে (রা) সিরিয়ার অধিকাংশ যুদ্ধে একজন জানবাজ মুজাহিদ হিসেবে অংশগ্রহণ করতে দেখি তখন নিসন্দেহে এটাই সিদ্ধান্ত নিই যে, আমীরের দায়িত্ব পালনের সুযোগ তাঁর খুব কমই হয়েছিল। আল্লামা ইবনে আবদুল বার (র) "ইসতিয়াবে" লিখেছেন, ১৮ হিজরীতে যখন সিরিয়ায় ভয়াবহ আকারে আমওয়াসের প্লেগ ছড়িয়ে পড়লো তখন হযরত আমর (রা) ইবনুল আছ প্লেগ উপদ্রুত এলাকা থেকে ইসলামী বাহিনীকে হটিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু হযরত শুরাহবীল (রা) এই পরামর্শ মানলেন না এবং বললেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেছেন, প্লেগ আল্লাহর রহমত এবং নবীদের দোয়া। আগেও অনেক নেক ও সালেহ ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। এ জন্য বর্তমান অবস্থান থেকে অবশ্যই সরা উচিত নয়। বস্তুত তিনি সেখানেই অবস্থান করলেন এবং সেই অনাকাঙ্খিত রোগেই ওফাত পেলেন।

মুহাম্মাদ হোসাইন হাইকাল "ওমর ফারুকে আজম" গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত ওমর ফারুক (রা) যখন আমওয়াসের প্লেগে হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) ইবনুল জাররাহ ও ইয়াযীদ (রা) বিন আবি সুফিয়ানের ইন্তিকালের খবর পেলেন তখন তিনি তাদের স্থলে যথাক্রমে হযরত শুরাহবীল (রা) বিন হাসানাহ (রা) এবং মাবিয়া (রা) বিন আবু সুফিয়ানকে (রা) নিয়োগ করলেন। তারপর আমীরুল মু'মিনীন মহামারীর প্রভাবের পর্যালোচনা এবং আইন-শৃঙ্খলা বহাল করার জন্য দ্বিতীয়বার সিরিয়া গমন এবং ইলা হয়ে জাবিয়া পৌছে সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করলেন। জাবিয়া অবস্থানকালে তিনি হযরত শুরাহবীলকে (রা) তাঁর দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেন। হযরত শুরাহবীল (রা) জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি আমাকে কোন অসন্তুষ্টির কারণে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন?"

হযরত ওমর (রা) জবাব দিলেন, "না। তুমি আমার খুব প্রিয়। কিন্তু আমি এমন এক ব্যক্তিকে সমগ্র সিরিয়ার আমীর বানাতে চাই যে তোমার চেয়ে শক্তিশালী।"

হযরত শুরাহবীল (রা) আরয করলেন, "তাহলে আপনি সর্বসাধারণ্যে এই ঘোষণা দিন। যাতে মানুষের সামনে আমাকে লজ্জা পেতে না হয়।"

হযরত ওমর (রা) লোকদেরকে একত্রিত করে ঘোষণা দিলেন, "হে মানুষেরা! আল্লাহর কসম, আমি শুরাহবীলকে কোন অসন্তুষ্টি অথবা সংকীর্ণতার কারণে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিইনি। বরং তাঁর স্থলে এমন এক ব্যক্তিকে আমীর বানাতে চাই, যে তাঁর থেকেও শক্তির সঙ্গে শাসন করতে

পারেন। আমার নিকট এই কাজের জন্য মাবিয়া (রা) বিন আবি সুফিয়ান যোগ্যতম ব্যক্তি।"

মহামারী তখনো সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়নি। এ ঘটনার কিছুদিন পর হযরত শুরাহবীল (রা) সেই রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রকৃত স্রষ্টার সমীপে গিয়ে হাযির হলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৬৭ অথবা ৬৯ বছর। যদিও হযরত শুরাহবীলের (রা) সমগ্র জীবন জিহাদের ময়দানে অতিবাহিত হয়েছিল এবং হাদীস বর্ণনা করার সুযোগ পাননি। তবুও তাঁর থেকে দু'টি হাদীস বর্ণিত আছে। হাদীসদ্বয় ইবনে মাজায় সন্নিবেশিত হয়েছে। হযরত শুরাহবীল (রা) বিন হাসানাহর (রা) জীবনে ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামীতা, হক পথে জীবন উৎ-সর্গীকরণ, জিহাদের শওক এবং ইবাদাতের প্রতি গভীর আকর্ষণ সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য দিক। তিনি সেই সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন যখন এক আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা মুশরিকদের নিকট এক ক্ষমাহীন অপরাধ ছিল। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ১৩ বছর পর্যন্ত বিদেশে উদ্বাস্তুর জীবন কাটিয়েছিলেন। তিনি দুই হিজরতের সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং সমগ্র জীবন আল্লাহর পথে জিহাদে অতিবাহিত করেন। আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি এত গভীর আকর্ষণ ছিল যে, বেশী বেশী রোযা রাখতেন এবং সারা রাত আল্লাহর যিকরে কাটিয়ে দিতেন। বেশী ইবাদাত করায় তিনি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু যখন জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হতেন তখন দুশমনের উপর বাঘের মত হামলা করতেন। সকল ঐতিহাসিকই এ ব্যাপারে একমত যে, তিনি একজন বিরাট বাহাদুর সিপাহী এবং নামকরা সিপাহসালার ছিলেন। মিল্লাতে ইসলামিয়া নিসন্দেহে তাঁকে নিয়ে গৌরব করতে পারে।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশ

ওহোদের যুদ্ধের (তৃতীয় হিজরীর ৭ই শওয়াল) একদিন পূর্বে প্রিয় নবীর (সা) দু' জীবন উৎসর্গকারী মদীনার কোন এক স্থানে বসে পরের দিনের যুদ্ধের ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন। তাদের মধ্যে একজন হঠাৎ করে দোয়ার জন্য হাত উঠালেন এবং আল্লাহর দরবারে এ আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহ! আগামীকাল আমি যখন দুশমনের সামনা সামনি হবো, তখন এমন মানুষকে তুমি আমার সামনে এনো, যে বিরাট যোদ্ধা ও ক্রোধান্বিত। সে আমার সঙ্গে লড়াই করবে এবং আমি তার সঙ্গে বুঝবো। অতপর আমাকে তার উপর বিজয়ী করো। যাতে আমি তাকে তোমার রাস্তায় হত্যা করতে পারি।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁর দোয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমীন বললেন এবং স্বয়ং হাত উঠিয়ে এ দোয়া করলেন ঃ "হে আমার আল্লাহ! আমার মুকাবিলায় এমন ব্যক্তিকে আনবে, যে হবে বিরাট বাহাদুর এবং চটপটে। আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ করবো এবং সে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে। এমনকি লড়াই করতে করতে আমি তোমার রাস্তায় তার হাতে নিহত হবো। অতপর সে আমার নাক ও কান কেটে নেবে। যখন আমি তোমার সঙ্গে মিলিত হবো এবং তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবে যে, তোমার কান কেন কাটা হয়েছে। তখন আমি আরয করবো যে, হে আল্লাহ! তোমার এবং তোমার রাসূলের (সা) জন্য। আমার জবাবে তুমি বলবে যে, হাঁ তুমি সত্য বলেছ।"

আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের (সা) এ প্রেমিক, হক পথে শহীদ হওয়ার জন্য যাঁর এত আকাঙ্খা, তিনি ছিলেন সাইয়েদুনা হযরত আবদুল্লাহ বিন জাহাশ আসদী। ইতিহাসে তিনি 'আল-মাজদা ফিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর পথে কানকাটা উপাধিতে মশহুর ছিলেন। ওহোদের যুদ্ধের আগের দিন তাঁর সঙ্গে অপর দোয়া প্রার্থনাকারী ছিলেন হযরত সা'দ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস।

সাইয়েদুনা আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশ (বিন রিয়াব বিন ইয়া'মার বিন সাবরাহ বিন মুররাহ বিন কাছির বিন গানাম বিন দাওদান বিন আসাদ খুযাইমাহ) সর্বোত্তম সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি ছিলেন বনু আসাদ বিন খুযাইমাহ কবিলাভুক্ত। এ কবিলা ছিল মশহুর আদনানী কবিলা, বনু মুদিরের একটি শাখা এবং জাহেলী যুগে বনু আবদি শামসের (কুরাইশ)

মিত্র ছিল। ইবনে কাছীর (র) আরো ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, আবদুল্লাহর (রা) পিতা জাহাশ বিন রিয়াবের মৈত্রী সম্পর্ক ছিল হারব বিন উমাইয়ার (আবু সুফিয়ানের পিতা) সঙ্গে। অর্থাৎ সে বনু উমাইয়ার মিত্র ছিল। কিন্তু বনু উমাইয়াও বনু আবদি শামসেরই শাখা ছিল। এ জন্য উভয় রেওয়ায়াতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। হযরত আবদুল্লাহর (রা) বংশকে বনী গানাম বিন দাওদানও বলা হতো।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশের সঙ্গে রাসূলে করীমের (সা) দু' ধরনের বিশেষ সম্পর্ক ছিল ঃ

প্রথমত ঃ তিনি হুযূরের (সা) ফুফাতো ভাই ছিলেন। তাঁর মাতা উমাইয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব ছিলেন হুযূরের (সা) পিতা আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিবের আপন বোন।

দ্বিতীয়তঃ তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব (রা) বিনতে জাহাশের আপন ভাই ছিলেন। এদিক থেকে তিনি ছিলেন হুযূরের সম্বন্ধী বা শ্যালক।

আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশের বয়স তখন ২৪ কিংবা ২৫ বছর হবে। এমন সময় হাদীয়ে আকরাম (সা) হকের দাওয়াত প্রদান শুরু করলেন। আল্লাহ পাক আবদুল্লাহকে নেক স্বভাব দান করেছিলেন। হকের আহবান কর্ণকুহরে প্রবেশ করতেই তিনি তা মন ও অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেন এবং রহমতে আলমের (সা) হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে সাবিকুনাল আউয়ালুনের অর্থাৎ প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে পরিগণিত হন। এটা নবুওয়াতের সম্পূর্ণ প্রথম যুগ ছিল এবং হুযূর (সা) এখনো আরকাম (রা) বিন আবিল আরকামের বাড়ীতে স্থানান্তর হননি।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) শুধু একাই আগে ইসলাম গ্রহণ করেননি। বরং একই সঙ্গে তাঁর সাথে তাঁর তিন বোন হযরত যয়নব (রা), উম্মে হাবীবা (রা) ও হামনা (রা) এবং দুই ভাই আবু আহমদ আবদ (রা) এবং উবায়েদুল্লাহও ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর অন্যান্য মুসলমানের মত এই বংশও মক্কার কুরাইশদের যুলুম নির্যাতনের শিকার হন। কুরাইশদের নির্যাতন যখন চরমে পৌছলো তখন হুযূরের (সা) ইঙ্গিতে হযরত আবদুল্লাহ (রা) নিজের আহল ও খান্দানের সঙ্গে হাবশা হিজরত করেন। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি হাবশায় দু'বার হিজরত করেন। অন্য কতিপয় রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে যে, হাবশার দ্বিতীয় হিজরতে তিনি হিজরত করেন। দুর্ভাগ্যবশত সেখানে তাঁর ভাই ওবায়দুল্লাহ খারাপ সাহচর্যে ইসলাম ত্যাগ ও খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে মদাসক্ত হয়ে পড়ে এবং এ অবস্থাতেই মারা যায়। রাসূলুল্লাহ (সা)

এ খবর পেয়ে ওবায়দুল্লাহর বিধবা স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রা) বিনতে আবু সুফিয়ানকে নিকাহর পয়গাম প্রেরণ করেন। এ পয়গাম তিনি কবুল করেন। হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী শরীয়ত মুতাবেক গায়েবানাভাবে রাসূলের (সা) সঙ্গে তাঁর নিকাহ পড়িয়ে দেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) এবং তাঁর অন্যান্য পরিবার পরিজন অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সঙ্গে ইসলামের সঙ্গে সম্পৃক্ত রইলেন এবং হুযূরের (সা) মদীনা হিজরতের কিছুদিন আগে হাবশা থেকে মক্কা ফিরে আসেন। তিবরানী হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে আকরাম (সা) এবং অন্যান্য সাহাবীর (রা) মদীনা হিজরতের পর হাতে গোনা যে কয়জন মুসলমান মক্কায় ছিলেন তাদের মধ্যে সর্বশেষে হযরত আবদুল্লাহ (রা) এবং তাঁর ভাই আবু আহমদ আবদ (রা) বিন জাহাশ হিজরতের প্রস্তুতি নেন এবং একদিন নিজের কবিলা বনী গানাম বিন দাওদানের সকল সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা থেকে মদীনা রওয়ানা হন। এমনিভাবে মক্কায় বনী গানাম বিন দাওদানের মহল্লা সম্পূর্ণরূপে বিরাণ হয়ে গেল এবং বেশীর ভাগ বাড়ীতে তালা ঝুলতে লাগলো। মদীনায় হযরত আবদুল্লাহ (রা) এবং তাঁর খান্দানকে আনসারের মশহুর বাহাদুর হযরত আছেম (রা) বিন ছাবিত বিন আবি আফলাহ নিজের মেহমান বানিয়ে নিলেন। আল্লামা ইবনে সা'দ তাবাকাতে লিখেছেন, হুযূর (সা) হযরত আছেম (রা) বিন ছাবিতকে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশের দীনী ভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন। দু' হিজরত করার কারণে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশ দু' হিজরতকারী সাহাবীদের (রা) মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন।

দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাসে প্রিয় নবী (সা) হযরত আবদুল্লাহর (রা) বিন জাহাশকে ১০-১২ জন সাহাবীর একটি দলের আমীর নিয়োগ করলেন এবং একটি সিলমোহরযুক্ত পত্র দিলেন। তাঁকে দু'দিন সফরের পর সেই পত্র খুলে পড়ার এবং তাতে লিপিবদ্ধ নির্দেশ মুতাবিক কাজের নির্দেশ দিলেন। সে দলে হযরত সা'দ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস, উতবা (রা) বিন গাযওয়ান, উক্কাশাহ (রা) বিন মিহসান এবং ওয়াকিদ (রা) বিন আবদুল্লাহ তামীমী প্রমুখের মত জালীলুল কদর সাহাবী শামিল ছিলেন। বস্তুত হুযূর (সা) সে দলের রওয়ানা হওয়ার পূর্বে সে সকল সাহাবীকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "যদিও আবদুল্লাহ বিন জাহাশ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নন, তবুও সে ক্ষুধা ও পিপাসার কাঠিন্য সবচেয়ে বেশী বরদাশত করতে পারে। এ কারণেই আমি তাকে তোমাদের উপর আমীর নিযুক্ত করেছি।"

কতিপয় চরিতকার লিখেছেন, এ যুদ্ধে [যে যুদ্ধ আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশ নামে প্রখ্যাত] হযরত আবদুল্লাহকে (রা) "আমীরুল মু'মিনীন" বলে

ডাকা হয়েছিল। যদিও সাধারণ রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত ওমর ফারুক (রা) মুসলমানদের সর্বপ্রথম সরদার। তিনি আমীরুল মু'মিনীন উপাধিতে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কিন্তু সেটা এই অর্থে যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে সর্ব প্রথম হযরত ওমর ফারুককে (রা) আমীরুল মু'মিনীন উপাধিতে সম্বোধন করা হয়েছিল।

দু'দিন সফরের পর হযরত আবদুল্লাহ (রা) হুযূরের পবিত্র চিঠি খুলে পড়লেন। চিঠিতে তিনি সোজা মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থান নাখলায় গিয়ে অবস্থানের নির্দেশ পেলেন এবং সেখান থেকে কুরাইশের তৎপরতা সম্পর্কে অবহিত হতে বললেন। সে চিঠিতে তিনি কাউকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর সাথে যাওয়ার ব্যাপারে বাধ্য করতে নিষেধ করেছিলেন।

চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত হয়ে হযরত আবদুল্লাহ (রা) সঙ্গীদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

"ভাইয়েরা আমার! রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে কুরাইশের গমনাগমন এবং তৎপরতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এ কাজে সাহায্য নেয়ার জন্য কারোর উপর জবরদস্তি করতে নিষেধ করেছেন। নিসন্দেহে এটা জীবন সঙ্গীন অবস্থায় ফেলে দেয়ার কাজ। তোমাদের মধ্যে যার আল্লাহর পথে শাহাদাতের আকাঙ্খা রয়েছে সে আমার সঙ্গে যেতে পারে এবং যে ফিরে যেতে চায় তার ফিরে যাওয়ার স্বাধীনতা রয়েছে। আমার দিক থেকে কারোর উপর কোন বাধ্য-বাধকতা নেই।"

দলের সকলেই এক বাক্যে বললেন, "আমরা আপনার সঙ্গে থাকবো এবং রাসূলের (সা) ফরমান অবশ্যই পালন করবো। তাতে আমাদের জীবন গেলেও যাবে।"

সুতরাং হযরত আবদুল্লাহ (রা) পুরো দলসহ নাখলার দিকে রওয়ানা দিলেন এবং বাতনে নাখলা পৌছে কুরাইশদের অবস্থা জানতে তৎপর হলেন। ঘটনাক্রমে কুরাইশের একটি কাফেলা সে সময় তায়েফ (অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী সিরিয়া) থেকে কাঁচা চামড়া, মুনাক্কা ও অন্যান্য বাণিজ্যিক পণ্য নিয়ে সেই পথ অতিক্রম করছিলো। এ কাফেলায় আমর বিন হাজরামী, হাকাম বিন কাইসান, ওসমান বিন আবদুল্লাহ, তার ভাই নওফিল বিন আবদুল্লাহ মাখযূমী এবং কুরাইশের অন্য কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুসলমানরা সেই কাফেলার ব্যাপারে পরস্পর পরামর্শ করলেন। সেই দিনটি ছিল রজবের প্রথম তারিখ। কিন্তু মুসলমানদের ধারণা ছিল দিনটি জমাদিউল আখিরের শেষ দিন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিল যে, আজই কাফেলার বিরুদ্ধে এক হাত নেয়া হবে।

সে সময় যদি তাদের ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে আগামীকাল থেকে রজব মাস শুরু হবে। আর রজব মাস তো যুদ্ধ-বিগ্রহ হারামের মাস। অতএব, আমরা তাদের কিছুই করতে পারবো না। বস্তুত মুসলমানরা কাফেলার দিকে অগ্রসর হলেন। হযরত ওয়াকিদ (রা) বিন আবদুল্লাহ তামীমী কাফেলার নেতা আমর বিন হাজরামীকে তীর মেরে খতম করে ফেললেন এবং হাকাম বিন কাইসান ও ওসমান বিন আবদুল্লাহ মুসলমানদের হাতে গ্রেফতার হলো। নাওফিল বিন আবদুল্লাহ এবং কাফেলার অন্যান্য ব্যক্তিরা পালিয়ে গেল এবং কাফেলার সঙ্গে আনা বাণিজ্যিক পণ্যাদি মুসলমানরা দখল করে নিলেন। ঐতিহাসিকরা বলেছেন, এ দিন ইসলামের সর্বপ্রথম গনীমাতের মাল এবং ওসমান বিন আবদুল্লাহ এবং হাকাম বিন কাইসান ছিল মুসলমানদের সর্বপ্রথম কয়েদী। গনীমাতের মাল বন্টনের ব্যাপারে তখন পর্যন্ত কোন হুকুম নাযিল হয়নি। এ জন্য হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশ ইজতিহাদ করলেন এবং গনীমাতের মালের এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করে অবশিষ্ট চার ভাগ নিজের সঙ্গীদের মধ্যে সমান সমান ভাগ করে দিলেন। হযরত আবদুল্লাহর (রা) ইজতিহাদ আল্লাহর দরবারে গৃহীত হলো এবং পরে সে মুতাবিক খুমুস অর্থাৎ এক-পঞ্চমাংশের নির্দেশ অবতীর্ণ হলো।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশ গনীমাতের মাল সমেত রাসূলের (সা) দরবারে উপস্থিত হলে তিনি তা গ্রহণে দ্বিধান্বিত হলেন এবং বললেন, আমি তোমাকে হারাম মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করার নির্দেশ দিইনি। অন্যান্য সাহাবীও (রা) লড়াইকারীদের এ কাজ পসন্দ করলেন না। কুরাইশ মুশরিকরা এবং মদীনার ইহুদীরাও এ ঘটনাকে ফলাও করে প্রচার করলো এবং মুসলমানদেরকে তিরস্কার করে বলতে শুরু করলো যে, মুহাম্মাদ (সা) এবং তাঁর সঙ্গীরা হারাম মাসকে হালাল করে নিয়েছে। তাঁরা রজবে (হারাম মাসে) রক্তারক্তি করেছে, সম্পদ লুট করেছে এবং মানুষ গ্রেফতার করেছে। এমনিভাবে তারা হারাম মাসের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছে।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) এবং তাঁর সঙ্গীরা কসম খেয়ে সারওয়ারে আলম (সা) ও অন্যান্য মুসলমানদেরকে নিশ্চয়তা দিলেন যে, যা কিছু ঘটেছে তা ভুল ধারণার কারণে হয়েছে। আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে হারাম মাসে রক্তকান্ড ঘটাইনি। বাস্তবতও এ ঘটনা সন্দেহ বশত ঘটেছিল। এ সত্ত্বেও তারা সাংঘাতিক ধরনের দুঃখিত ও লজ্জিত হয়েছিলেন। তাতে আল্লাহর রহমত জোশে এসে গেল এবং এ আয়াত নাযিল হলো ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ؕ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ؕ

وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ -

(البقرة : ٢١٧)

"হে নবী (সা) লোকজন আপনাকে হারাম মাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে থাকে যে, তাতে কি লড়াই করা জায়েয? আপনি বলে দিন, তাতে লড়াই করা খুব গুনাহর কাজ এবং আল্লাহর পথে বাধা দেয়া, তাকে না মানা, মসজিদে হারামে যেতে না দেয়া এবং তার আহলকে (মুসলমানদের) তা থেকে বের করে দেয়া আল্লাহর নিকট তার থেকেও বড় গুনাহ এবং ফাসাদ সৃষ্টি ও খুন-খারাবি থেকেও বড় গুনাহ।" (আল-বাকারা ঃ ২১৭)

এভাবে আল্লাহ পাক স্বয়ং হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশ এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে মুক্ত করে দিলেন। আল্লাহ পাকের এ ইরশাদে মুসলমানদের পক্ষ থেকে এক ধরনের ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়া হয়েছে। (অর্থাৎ লড়াইকারীরা হারাম মাসে যুদ্ধ করে যে ভুল করেছে তা শুধুমাত্র ধারণার ভুলের জন্য হয়েছিল। নচেৎ নীতিগতভাবে হারাম মাসে লড়াই করা বাস্তবিকই বড় গুনাহর কাজ) কিন্তু শিরক ও কুফুরী করা, মুসলমানদেরকে মসজিদে হারামে গমনে বাধা দেয়া, বরং তা থেকে বের করে দেয়া ইবনে হাজরামীকে হত্যা ও দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতারের চেয়েও বড় অপরাধ। এ জন্য হে কাফেরেরা! তোমরা তাদের বিরুদ্ধে কোন্ লম্বা মুখে তিরস্কার কর?

এ আয়াত নাযিল হওয়াতে মুসলমানরা খুব খুশী হলো এবং নবী করীমও (সা) গনীমাতের মালের এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণ করলেন।

হক ও বাতিলের প্রথম যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশ ৩১৩ জন জীবন উৎসর্গকারীদের অন্যতম ছিলেন। বদরের যুদ্ধে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তারা সাজ-সরঞ্জামহীন অবস্থায় কাফেরদের ভয়ংকর আল্লাহদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এ যুদ্ধে তাঁরা বাহাদুরী ও জানবাজীর হক আদায় করেছিলেন এবং কুরাইশের নাম করা বাহাদুর ওয়ালিদ বিন ওয়ালিদ বিন মুগিরাহ মাখযূমীকে [খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের আপন ভাই] গ্রেফতার করা হয়েছিল। যুদ্ধের পর তাঁর দু' ভাই খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং হিশাম বিন ওয়ালিদ তাকে মুক্ত করতে এসেছিলেন। এ সময় হযরত আবদুল্লাহ (রা) চার হাজার মুদ্রা ফিদিয়া দাবী করলেন। এত পরিমাণ

অর্থ দানে তারা চিন্তায় পড়ে গেল। কিন্তু পরে খালিদ হিশামকে (অথবা অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী হিশাম খালিদকে লজ্জা দিয়ে বললো যে, ওয়ালিদ কি আমাদের ভাই নয়। আবদুল্লাহ যদি চার হাজারেরও বেশী দাবী করে তাহলেও সে পরিমাণ অর্থ আদায় করে ওয়ালিদকে ছাড়িয়ে নেয়া উচিত। সুতরাং তারা চার হাজার আদায় করে ওয়ালিদকে ছাড়িয়ে নিল এবং সঙ্গে করে মক্কা রওয়ানা হয়ে গেল। যুলহুলাইফা নামক স্থানে পৌছে ওয়ালিদ পালিয়ে পুনরায় মদীনা এলেন এবং রাসূলের (সা) দরবারে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি বন্দী অবস্থায় আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশের সুন্দর আচরণ এবং মুসলমানদের উন্নত চরিত্রে প্রভাবান্বিত হয়ে ইসলামকে সত্য হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, ফিদিয়া আদায়ের পূর্বে তুমি কেন মুসলমান হওনি? জবাবে তিনি বলেছিলেন, ফিদিয়ার ভয়ে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি একথা মানুষ বলুক তা আমি চাইনি। আমার আকাঙ্খা ছিল, প্রথমে আমার কওমের লোকজন ফিদিয়া দিয়ে আমাকে ছাড়িয়ে নিক। তারপর আনন্দচিত্তে কোন ভীতি অথবা লোভের বশবর্তী না হয়ে ইসলাম গ্রহণ করবো। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশের হক পথে শহীদ হওয়ার বিরাট আকাঙ্খা ছিল। সুতরাং ওহোদের যুদ্ধের একদিন পূর্বে তিনি তাঁর সঙ্গীসহ যে দোয়া করেছিলেন তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে।

মুসতাদরাকে হাকিমে হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, যুদ্ধের একদিন পূর্বে হযরত আবদুল্লাহ (রা) এ দোয়া করেছিলেন ঃ "ইলাহী! আমি তোমাকে কসম করে বলছি যে, আগামীকাল সকালে দুশমনের সঙ্গে যেন আমার মুকাবিলা হয়। সে আমার পেট ফাড়বে এবং আমার নাক ও কান কেটে নেবে। অতপর তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে যে, তুমি কেন শহীদ হয়েছ। তখন আমি বলবো তোমার জন্য।"

সাঈদ (রা) বলেন, "আমি আশা করি যে, আল্লাহ পাক যেভাবে তাঁর কসমের প্রথমভাগ পুরো করেছেন তেমনিভাবে তার শেষ অংশও পূরণ করবেন।"

পরের দিন যুদ্ধ শুরু হলো। হযরত আবদুল্লাহ (রা) এমন বীরত্বের সঙ্গে লড়লেন যে, তার আর কোন দিক খেয়াল ছিল না। লড়াই করতে করতে তাঁর তরবারী ভেঙ্গে গেল। এ সময় রাসূলে করীম (সা) তাঁকে খেজুরের এক মজবুত লাঠি দিলেন। তা দিয়ে তিনি তরবারীর কাজ নিলেন এবং দীর্ঘক্ষণ যাবত বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। এ অবস্থায় আবুল হাকাম বিন আখনাস ছাকাফী তাঁর উপর তরবারীর এক কোপ মারলো। তাতেই তিনি শহীদ হয়ে মাটিতে

লুটিয়ে পড়লেন। মুশরিকরা তাঁর লাশ বিকৃত করলো এবং নাক ও কান কেটে নিল। এমনিভাবে আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করলেন।

আল্লামা ইবনে আসীর (র) লিখেছেন, হযরত সা'দ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস তাঁর লাশের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অযাচিতভাবে তাঁর জবান দিয়ে বের হয়ে গেল, "আল্লাহর কসম! আবদুল্লাহর দোয়া আমার দোয়া থেকে উত্তম ছিল।" যুদ্ধের পূর্বে হক পথের এ শহীদ এবং নিজের শাহাদাতের এবং লাশ বিকৃত করার ব্যাপারে এমন আস্থা এনেছিলেন যে, লোকদের নিকট কসম খেয়ে খেয়ে বলতেন, "হে আল্লাহ আমার! আমি তোমার কসম খেয়ে বলছি যে, আমি তোমার রাস্তায় শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করবো। এমনকি কতল হয়ে যাবো এবং দুশমন আমার লাশ বিকৃত করবে।" আল্লাহ পাক তাঁর কসম তাঁর আকাঙ্খা অনুযায়ী হুবহু পূরণ করেছেন।

শাহাদাতের সময় তাঁর বয়স ৪০ বছরের কিছু বেশী ছিল। মধ্যমধর্মী অবয়বের সুদর্শন মানুষ ছিলেন। মাথায় ঘন চুল ছিল। রহমতে আলম (সা) তাঁকে এত ভালোবাসতেন যে, তাঁকে নিজের প্রিয় চাচা সাইয়েদুশ শুহাদা হযরত হামযার (রা) সঙ্গে একই কবরে ওহোদের শহীদদের কবরস্থানে দাফন করেন। সন্তানের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশের মাত্র একটি পুত্র ছিল। শাহাদাতের পর রাসূলে আকরাম (সা) স্বয়ং তাঁকে নিজের অভিভাবকত্বে নেন এবং খায়বারে তাঁর জন্য সম্পত্তিও খরিদ করেন।

সাইয়েদুনা হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশের চরিত্রের উল্লেখযোগ্য দিক হলো যে, তিনি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের মুহাব্বতে দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে মুখাপেক্ষীহীন হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর অন্তরে সব সময়ে শাহাদাতের আকাঙ্খা অনুরণিত হতো। শুধু শাহাদাতই নয় বরং এরও তিনি আকাঙ্খা করেছিলেন যে, দুশমনরা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের (সা) মুহাব্বতের অপরাধে তাঁর লাশ বিকৃত করবে এবং তিনি সে অবস্থায় আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবেন। ওহোদের যুদ্ধে আল্লাহ তাঁর এ আকাঙ্খা পূরণ করেন এবং তিনি নিজের আমলের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর জন্য এক শিক্ষা রেখে যান।

সাইয়েদুনা আবু সালমাহ আবদুল্লাহ মাখযুমী

চতুর্থ হিজরীর জমাদিউস সানীর প্রথম দিককার ঘটনা। এক দিন রহমতে আলম (সা) একজন সাহাবীর কঠিন অসুস্থতার খবর পেলেন। তিনি মদীনার সন্নিকটে আলিয়া নামক স্থানে মুমূর্ষু অবস্থায় কাটাচ্ছিলেন। হুযূর (সা) এ খবর শুনে অস্থির হয়ে তৎক্ষণাৎ রুগী দর্শনের জন্য তাঁর বাড়ী গেলেন। এ সময় তাঁর প্রাণ বায়ু বের হওয়ার মত অবস্থা। যে-ই রাসূলে করীম (সা) তাঁর গৃহে পা রাখলেন, অমনি তিনি হুযূরের (সা) প্রতি বিষণ্ন নয়নে তাকালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রূহ পরপারের দিকে যাত্রা করলো। এতেই মনে হচ্ছিল যে, তাঁর চোখ শুধুমাত্র রাসূলে করীমের (সা) দীদারের অপেক্ষায় ছিল। হুযূর (সা) পবিত্র হাত দিয়ে তাঁর চোখ বন্ধ করলেন। বাড়ীর লোকজনদেরকে হা-হুতাশ করতে নিষেধ করলেন এবং মাইয়েতের নিকট দাঁড়িয়ে এ দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ! তার কবরকে প্রশস্ত ও আলোকিত কর। কবরকে নূর দিয়ে পূর্ণ কর। নিজের এ বান্দাহকে ক্ষমা কর এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে তার মর্যাদা বুলন্দ কর।"

যখন সে সাহাবীর জানাযার নামায পড়া হলো তখন রহমতে আলম (সা) অস্বাভাবিকভাবে ৯টি তাকবীর বললেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ন'তাকবীর কিভাবে বললেন? ভুল হয়নি তো? তিনি বললেন, না। বরং সেতো হাজার তাকবীরের মুসতাহিক ছিলো।

এ সাহাবী যাঁর জন্য সাইয়েদুল মুরসালীন, ফখরে মওজুদাত ও হাশরের দিনের সুপারিশকারী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) এত অন্তর নিংড়ানো দোয়া করলেন এবং যার নামাযে জানাযা অস্বাভাবিকভাবে পড়লেন, তিনি ছিলেন সাইয়েদুনা আবু সালমাহ আবদুল্লাহ (রা) বিন আবদুল আসাদ মাখযুমী।

হযরত আবু সালমাহ আবদুল্লাহ (রা) সে মহান সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন, যারা রাসূলের (সা) দরবারের বিশেষ সদস্য হিসেবে পরিগণিত হতেন। তাঁর খান্দান জাহেলী যুগে বিশেষ সম্মান ও ক্ষমতার মালিক ছিলেন। নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

আবু সালমাহ আবদুল্লাহ (রা) বিন আবদুল আসাদ বিন হিলাল বিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন মাখযুম।

হযরত আবু সালমাহ (রা) প্রিয় নবীর (সা) নিকটাত্মীয় ছিলেন। তাঁর আম্মা বাররাহ বিনতে আবদুল মুত্তালিব ছিলেন হুযূরের (সা) ফুফু। এ হিসেবে তিনি হুযূরের (সা) ফুফাতো ভাই। ইমাম বুখারী (র) এবং ইমাম মুসলিম (র) লিখেছেন যে, হযরত আবু সালমাহ (রা) হুযূরের (সা) দুধভাই ছিলেন। রাসূলের (সা) আপন চাচা হযরত হামযাহ (রা) এবং ফুফাতো ভাই হযরত আবু সালমাহ (রা) উভয়ের সাথেই দুধভাইয়ের সম্পর্ক ছিল।

হযরত আবু সালমাহ (রা) প্রকৃতিগতভাবে অত্যন্ত নেক নফস এবং পবিত্র মানুষ ছিলেন। তাঁর স্ত্রী উম্মে সালমাহ হিন্দ (রা) বিনতে আবি উমাইয়াহ সোহায়েলও একই ধরনের মানুষ ছিলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়ই সাধারণের যুলুম-নির্যাতনের মুখে দাওয়াতের প্রথম যুগেই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। রাসূলে করীম (সা) তখন পর্যন্ত হযরত আরকাম (রা) বিন আবিল আরকামের (রা) গৃহে আশ্রয় নেননি। কতিপয় চরিতকার এ ধারণা প্রকাশ করেছেন যে, হযরত আবু সালমাহর (রা) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে শুধুমাত্র ১০ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সাবিকুনাল আউয়ালুনের মধ্যেও বিশেষ মর্যাদাবান ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আবু সালমাহও (রা) অন্য মুসলমানদের মত কুরাইশ মুশরিকদের যুলুম-নির্যাতনের শিকার হন। কাফেরদের নির্যাতন চরমে পৌছলে নবুওয়াতের পাঁচ বছর পর প্রিয় নবী (সা) মুসলমানদেরকে হাবশা হিজরতের অনুমতি দিলেন। সুতরাং সর্বপ্রথম ১১ জন পুরুষ এবং চার জন মহিলা সমন্বয়ে একটি কাফেলা রওয়ানা হলো। হক পথের এ মুসাফিরদের মধ্যে হযরত আবু সালমাহ (রা) এবং তাঁর স্ত্রী উম্মে সালমাহও (রা) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কুরাইশ কাফেররা এই মযলুমদের ইচ্ছা জানতে পেরে তাদের পেছনে পেছনে সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত ধাওয়া করলো। কিন্তু তারা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এলো। কেননা, শুয়াইবাহ বন্দরে তারা পৌছার পূর্বেই মুসলমানদের জাহাজ সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল। হকপন্থীরা হাবশায় কেবলমাত্র তিন মাস অতিবাহিত করেছিলেন। এমন সময় মক্কাবাসীরা মুসলমান হয়ে গেছেন বলে তারা খবর পেলেন [অথবা রাসূলে আকরাম (সা) এবং কাফেরদের মধ্যে সন্ধি হয়ে গেছে] এ খবর শুনে মুহাজিররা হাবশা থেকে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, সকল মুহাজির মক্কা ফিরে আসেন এবং তাঁদের মধ্য থেকে একটি দল সেখানে রয়ে যান। হযরত আবু সালমাহ (রা) এবং উম্মে সালমাহ

(রা) মক্কায় প্রত্যাবর্তনকারীদের অন্যতম ছিলেন। মক্কার নিকট পৌছে তাঁরা জনতে পারলেন যে, যে খবর তাঁরা পেয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ ভুল ছিল। এ সত্ত্বেও তাঁরা সে সময় হাবশা ফিরে যাওয়া সঠিক মনে করলেন না এবং কারোর না কারোর আশ্রয় নিয়ে শহরে প্রবেশ করলেন।

ইবনে হিশাম (র) ইবনে ইসহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, হযরত আবু সালমাহ (রা) হযরত আবু তালিবের আশ্রয় নেন। হযরত আবু তালিব তাঁর মামা ছিলেন। বনু মাখযুম তাতে বিগড়ে গেল। তারা আবু তালিবের নিকট প্রতিবাদ জানিয়ে বললো যে, আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে [মুহাম্মাদ (সা)] পূর্বেই নিজের আশ্রয়ে রেখেছেন। এখন আপনি আমাদের মানুষকেও আপনার আশ্রয়ে নিচ্ছেন। এটা কেন?

আবু তালিব জবাব দিলেন ঃ "মুহাম্মাদ (সা) আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আর আবু সালমাহ আমার ভাগিনেয়। আমি যদি নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রকে আমার আশ্রয়ে নিতে পারি তাহলে ভাগিনেয়কেও নিতে পারি।" বনু মাখযুম আবু তালিবের কথা মানলো না এবং তারা আবু সালমাহকে (রা) তাদের নিকট প্রত্যার্পণের দাবীতে অটল রইলো।

এ সময় আবু লাহাব নিজের ভাইয়ের সমর্থনে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লো। সে উঠে দাঁড়ালো এবং বনু মাখযুমকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "মাখযুমী ভাইয়েরা! তোমরা এতক্ষণ আবু তালিবকে অনেক কিছু শুনিয়েছ। এখন আমার কথা কিছু শোন। আবু তালিব তোমাদের আজ্ঞাবাহী নন। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে আশ্রয় দিতে পারেন। চুক্তিভঙ্গের জন্য তোমরা তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারো না। তোমরা যদি তাঁকে উত্যক্ত করা বন্ধ না কর, তাহলে আমি তাঁর সঙ্গে মিলে তোমাদের মুকাবিলা করবো।"

আবু লাহাব ছিল মুশরিকদের অন্যতম অবলম্বন। তার ভ্রূ কুঞ্চন ও দৃষ্টিভঙ্গী দেখে বনু মাখযুম তৎক্ষণাৎ নিজেদের দাবী পরিত্যাগ করে বললো ঃ "হে আবু উতবাহ! আমরা কখনো আপনাকে অসন্তুষ্ট করবো না।"

এ ঘটনার পর মুসলমানদের উপর কুরাইশদের নির্যাতন আরো বেড়ে গেল। সুতরাং হুযূর (সা) মুসলমানদেরকে হাবশার দারুল আমানে পুনরায় চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। বস্তুত নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছর হাবশায় দ্বিতীয় হিজরত সংঘটিত হলো। তাতে ৮৩ জন পুরুষ এবং ২০ জন মহিলার একটি কাফেলা কাফেরদের প্রচন্ড বাধা সত্ত্বেও কোন না কোনভাবে হাবশা পৌছতে সফল হলেন। এ কাফেলায় হযরত আবু সালমাহ (রা) এবং উম্মে সালমাহ (রা) উভয়েই শামিল ছিলেন। এটা যেন তাঁদের দ্বিতীয় হিজরত ছিল।

হাবশায় কয়েক বছর উদ্বাস্তুর জীবন অতিবাহিত করার পর হযরত আবু সালমাহ (রা) এবং উম্মে সালমাহ (রা) অন্যান্য মুহাজিরদের সঙ্গে মক্কা মুয়াজ্জামা ফিরে আসেন। এটা হলো হুযূরের (সা) মদীনা হিজরতের কিছু দিন পূর্বেকার ঘটনা। এখানে পৌছে তিনি পুনরায় নিজের গোত্রের ও অন্যান্য কাফেরের নির্যাতনের শিকার হন।

নবীর (সা) হিজরতের এক বছর বা সোয়া বছর পূর্বে (নবুওয়াতের ১২ তম বছরে) কাফেরদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়ে হযরত আবু সালমাহ (রা) মদীনায় হিজরত করতে ইচ্ছা করলেন। এ সময় তাঁর নিকট শুধু একটি উটই ছিল। তাঁর উপর তিনি হযরত উম্মে সালমাহ (রা) এবং নিজের শিশু সন্তান সালমাহকে উঠালেন। এ সময় উম্মে সালমাহর (রা) খান্দানের লোকজন উট থামিয়ে দিয়ে বললো, তুমি যেতে পারো কিন্তু আমাদের মেয়ে তোমার সঙ্গে যেতে পারে না। একথা বলে তারা আবু সালমাহর (রা) হাত থেকে উটের রশি ছিনিয়ে নিল এবং উম্মে সালমাহকে (রা) জোরপূর্বক নিজেদের সঙ্গে নিয়ে গেল। ইত্যবসরে আবু সালমাহর (রা) খান্দানের লোকজন (বনু আবদুল আসাদ) এসে পৌছলো। তারা উম্মে সালমাহর (রা) নিকট থেকে শিশু সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে বনু মুগীরাকে বললো, তোমরা নিজেদের মেয়েকে আমাদের লোকের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়েছ। অতএব, আমরা আমাদের পুত্র সালমাহকে তোমাদের নিকট কেন রাখবো। এই কাড়াকাড়িতে শিশু সালমাহর হাত ভেঙ্গে গিয়েছিল। (আল্লামা বালাযুরী (র) বর্ণনা করেছেন যে, সালমাহর (রা) এই হাত মৃত্যু পর্যন্ত ঠিক হয়নি)।

এটা একটা হৃদয়বিদারক দৃশ্য ছিল। কিন্তু আবু সালমাহ (রা) অন্তরের উপর পাথর বেঁধে বিবি–বাচ্চা ছাড়াই একাকী মদীনা রওয়ানা হলেন। তার স্ত্রী উম্মে সালমাহ (রা) বনু মুগীরাহর নিকট এবং শিশুপুত্র বনু আবদুল আসাদের নিকট রয়ে গেল। সত্য দীনের খাতিরে পিতা, পুত্র ও স্ত্রী তিনজন বিচ্ছিন্নতার মুসিবত বরদাশত করছিলেন। হযরত উম্মে সালমাহ (রা) স্বাভাবিকভাবেই স্বামী ও পুত্রের বিচ্ছিন্নতায় খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। তিনি প্রতিদিন সকালে বাড়ী থেকে বের হতেন এবং সারাদিন এক টিলার ওপর (আবতাহ) বসে বসে কাঁদতেন। পুরো একটি বছর এভাবে কেটে গেল। একদিন বনু মুগীরার এক রহমদিল ও প্রভাবশালী ব্যক্তি তাঁকে এ অবস্থায় দেখলেন। তাতে তার অন্তর বিগলিত হয়ে গেল। সে নিজের গোত্রের লোকজনকে একত্রিত করে বললো ঃ "এ কন্যাতো আমাদেরই রক্তের। আমরা কতদিন এ মিসকীনকে তার স্বামী ও পুত্র থেকে বিচ্ছিন্ন রাখবো। হে বনী মুগীরাহ! আমাদের কবিলাতো অত্যন্ত শরীফ এবং বাহাদুর। তারাতো যুলুমকে ভালো জানে না।"

এ নেকদিল লোকের বক্তৃতা শুনে অন্যান্যদের অন্তরেও দয়ার উদ্রেক হলো এবং তারা উম্মে সালমাহকে (রা) মদীনায় তার স্বামীর নিকট গমনের অনুমতি দিয়ে দিল। বনু আবদুল আসাদ যখন এ ঘটনা শুনলো তখন তাদের মনও বিগলিত হয়ে গেল। তারা সালমাহকে (রা) তার মায়ের নিকট পাঠিয়ে দিল। হযরত উম্মে সালমাহ (রা) শিশু পুত্রকে কোলে নিলেন এবং উটে চড়ে মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে তানঈম নামক স্থানে ওসমান বিন তালহা নামক এক শরীফ ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। তিনি উম্মে সালমাহকে (রা) শিশু পুত্রসহ একাকিনী সফর করতে দেখে স্বগতোক্তি করে বললেন ঃ "হে ওসমান! মক্কার এক কন্যা এভাবে একাকিনী সফর করবে, আর তুমি তাকে সাহায্য করবে না। তা হতে পারে না।" তিনি উম্মে সালমার (রা) উটের রশি ধরলেন এবং আস্তে আস্তে মদীনার দিকে এগিয়ে চললেন। যখন কোথায়ও তাঁবু ফেলতেন তখন তিনি কোন বৃক্ষের আড়ালে চলে যেতেন এবং রওয়ানার সময় উট তৈরী করে নিয়ে আসতেন। মোট কথা এমনিভাবে তারা পৌছলেন। আবু সালমাহ (রা) সেখানেই অবস্থান করছিলেন। তিনি নিজের নেক চরিত্রা স্ত্রী এবং শিশু পুত্রকে পেয়ে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। ওসমান বিন তালহা এখান থেকে মক্কা ফিরে গেলেন। (তিনি মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন) হযরত উম্মে সালমাহ (রা) তাঁর এ নেক কাজকে চিরকালের জন্য স্মরণে রেখেছিলেন। তিনি বলতেন "আমি ওসমান বিন তালহা থেকে বেশী শরীফ মানুষ দেখিনি।"

আল্লামা ইবনে আসীর (র) হযরত উম্মে সালমাহর (রা) একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, আবু সালমাহর (রা) খান্দান থেকে বেশী কোন পরিবারকেই ইসলামের খাতিরে মুসিবত সহ্য করতে তিনি দেখেননি।

এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা আগমনকারী প্রথম মুসলমান ছিলেন হযরত আবু সালমাহ (রা)। এমনিভাবে তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মে সালমাহ(রা) প্রথম মহিলা মুসলমান ছিলেন যিনি হিজরত করে মদীনা আগমন করেন। এটা ছিল তাঁদের তৃতীয় হিজরত। শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এসব ভাগ্যবান অন্তরের লোক তা করেছিলেন। আল্লামা ইবনে সা'দ (র) বর্ণনা করেছেন, রহমতে আলমের (সা) মদীনা তাশরীফ আনা পর্যন্ত হযরত আবু সালমাহ (রা) কুবাতে আমর বিন আওয়ার কবীলায় অবস্থান করেন। হুযূর (সা) মদীনায় হিজরতের পর মশহুর সাহাবী হযরত আবু খাইছামা আনসারীর (রা) সঙ্গে হযরত আবু সালমাহর (রা) ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠা করিয়ে দেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য একটুকরো জমি দান করেন।

দ্বিতীয় হিজরীতে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটা ছিল হক ও বাতিলের মধ্যকার প্রথম যুদ্ধ। এযুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন। হযরত আবু সালমাহ (রা) এ ৩১৩ পবিত্র নফসের অন্যতম ছিলেন। তৃতীয় হিজরীতে তিনি ওহোদের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধকালে আবু উসামা জাছামী নামক এক মুশরিক বিষ মাখানো তীর তার বাহুতে নিক্ষেপ করে। তাতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। এক মাস চিকিৎসার পর বাহ্যিকভাবে তিনি সুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তীরের বিষ ভেতরে ভেতরে ক্রিয়াশীল ছিল। তৃতীয় হিজরীর শেষের দিকে রাসূলে আকরাম (সা) খবর পেলেন যে, কাতান পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসকারী বনু আসাদ বিন খুযাইমার সরদার তোলায়হা ও সালমাহ (অথবা অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী আসাদ বিন খুয়াইলাদ) নিজের কবীলাকে মদীনার ওপর হামলার জন্য উস্কানি দিচ্ছে। হুযূর (সা) হযরত আবু সালমাহকে (রা) দেড়শ' সওয়ার দিয়ে বনু আসাদ বিন খুযায়মার এলাকায় গিয়ে সংগঠিত হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে বিশৃংখল করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। হযরত আবু সালমাহ (রা) অত্যন্ত গোপনভাবে চতুর্থ হিজরীর ১লা মুহাররাম তাদের সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন এবং তরবারী দিয়ে হামলা করে বসেন। তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় এদিক-ওদিক পালিয়ে গেল। এ সময় হযরত আবু সালমাহ (রা) মুজাহিদদেরকে তিন দলে বিভক্ত করে বিভিন্ন দিকে তাদের পেছনে প্রেরণ করলেন। মুজাহিদরা বনু আসাদের সবাইকে উপযুক্ত শিক্ষা দিলেন এবং বিরাট সংখ্যক উট, ভেড়া ও বকরী তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিলেন। হযরত আবু সালমা (রা) ২৯ দিন পর বিজয়ী বেশে মদীনা ফিরে এলেন এবং এ বিপুল গনীমাতের মাল রাসূলের (সা) দরবারে পেশ করলেন। তাতে হুযূর (সা) খুব খুশী হলেন এবং হযরত আবু সালমাহ (রা) এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে দোয়া করলেন। ইতিহাসে এ যুদ্ধ "আবু সালমাহর (রা) যুদ্ধ অথবা কাতানের যুদ্ধ" নামে খ্যাত। এ অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পর আবু সালমাহর (রা) ওহোদের যুদ্ধে প্রাপ্ত আঘাতের ব্যথা পুনরায় বৃদ্ধি পেল। অনেক চিকিৎসা করা হলো কিন্তু ক্ষত বেড়েই চললো। এমনকি আবু সালমাহ (রা) বেঁচে থাকার প্রশ্নে নিরাশ হয়ে পড়লেন। সে সময় রাসূলে করীম (সা) দেখার জন্য কয়েকবার তার নিকট গমন করলেন। চতুর্থ হিজরীর জমাদিউস সানীর প্রথম দিকে তিনি শেষ অবস্থায় এসে উপনীত হলেন। এ অবস্থায় হুযূরকে (সা) খবর দেয়া হলো। তিনি তৎক্ষণাৎ এসে উপস্থিত হলেন। তিনি রাসূলকে (সা) দেখতে দেখতে পরপারের দিকে যাত্রা করলেন হুযূর (সা) পবিত্র হাত দিয়ে তাঁর চোখ বন্ধ করতে করতে বললেন ঃ "মানুষের রূহ যখন শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় তখন তা দেখার জন্য চোখ খোলা থাকে।"

এ সময় হযরত উম্মে সালমাহ (রা) শোকাতুর ছিলেন এবং বারবার বলছিলেন ঃ "হায়, হায় বিদেশ-বিভূঁয়ে কেমন মৃত্যু হলো।"

হুযূর (সা) তাঁকে সবরের তালকীন দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাগফিরাতের জন্য দোয়া করার নির্দেশ দিলেন আর আল্লাহর নিকট তাঁর থেকে উত্তম স্থলাভিষিক্ত পাওয়ার জন্য দোয়া করতে বললেন। তারপর হুযূর (সা) স্বয়ং আবু সালমাহর (রা) জন্য মাগফিরাত কামনা করলেন এবং বিশেষ ব্যবস্থার সাথে তাঁর জানাযার নামায পড়ালেন।

হযরত আবু সালমাহ (রা) মৃত্যুর সময় স্ত্রী ছাড়া চার সন্তান (দুই পুত্র দুই কন্যা) রেখে যান। ছেলে দু'টির নাম হলো সালমাহ (রা), ওমর (রা) এবং মেয়ে দু'টির নাম হলো দুররাহ (রা) ও যয়নব (রা)। এসব সন্তান হুযূরের (সা) স্নেহ ছায়ায় লালিত পালিত হয়। এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবু সালমাহ (রা) নিজের পরিবার-পরিজনের প্রতি সীমাহীন স্নেহপরায়ণ ছিলেন। বস্তুত মৃত্যুর সময় তাঁর মুখ দিয়ে এ বাক্যই বেরিয়েছিল ঃ "হে আল্লাহ! আমার পরিবার-পরিজনকে ভালোভাবে দেখো।" আল্লাহ পাক তাঁর দোয়া কবুল করেছিলেন। কয়েক মাস পর হযরত উম্মে সালমাহ (রা) উম্মুল মু'মিনীন হয়ে যান এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সন্তানদের অভিভাবক হন।

এ প্রসঙ্গে ইবনে সা'দ তাবকাতে এ রেওয়ায়াতও বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু সালমাহর (রা) জীবদ্দশায় একবার হযরত উম্মে সালমাহ (রা) বলেছিলেন ঃ

"আমি শুনেছি যদি কোন মহিলার স্বামী তার জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করে এবং সে মহিলা তারপর দ্বিতীয়বার বিয়ে না করে তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করান। এমনিভাবে কোন পুরুষের জীবদ্দশায় তার স্ত্রী মারা গেলে এবং সে পুরুষ তারপর দ্বিতীয় বিয়ে না করলে আল্লাহ তায়ালা সে পুরুষকেও জান্নাত দান করে থাকেন। এসো আমরা দু'জন ওয়াদাবদ্ধ হই যে, আমাদের মধ্যে প্রথমে যে-ই মৃত্যুবরণ করুক অন্যজন তারপর একাকীত্বের জীবন কাটাবে।

আবু সালমাহ (রা) বললেন, "তুমি কি আমার কথা মানবে?"

উম্মে সালমা (রা) জবাব দিলেন, "কেন মানবো না।?"

আবু সালমাহ (রা) বললেন, "তাহলে শোনো! যদি আমি প্রথমে মারা যাই তাহলে আমার পর তুমি অবশ্যই বিয়ে করবে।" এরপর তিনি দোয়ার জন্য হাত উঠালেন এবং আল্লাহর নিকট এ আরয করলেন ঃ "হে মাওলায়ে করীম!

আমি যদি উম্মে সালমাহর (রা) জীবদ্দশায় মারা যাই তাহলে তুমি তাকে আমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি স্থলাভিষিক্ত করো।"

তাঁর এ দোয়া আল্লাহ পাক কবুল করেছিলেন এবং তাঁর পর হযরত আবু সালমাহর (রা) স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন সাইয়েদুল মুরসালীন (সা)।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে স্বয়ং উম্মে সালমাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

"একদিন আবু সালমাহ (রা) রাসূলের (সা) দরবার থেকে বাড়ী ফিরে এলেন। সে সময় তিনি খুব খুশী ছিলেন। আমাকে বলতে লাগলেন যে, আজ রাসূলের (সা) মুবারক ইরশাদ আমাকে খুব আনন্দ দিয়েছে। তিনি বলেছেন, যে মুসলমান মুসীবতের সময় (সত্য অন্তরে) আল্লাহর প্রতি ঝুঁকেন এবং এ দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ এ মুসীবতে আমাকে সাহায্য এবং উত্তম নিয়ামত দান করুন। তাহলে আল্লাহ তার দোয়া কবুল করে থাকেন।"

আবু সালমাহর (রা) একথা আমার অন্তরে সেঁটে গেল। যখন তিনি ওফাত পেলেন তখন আমি খুব দুঃখ পেলাম এবং আমি এ দোয়া করলাম। কিন্তু আমার অন্তরে এ ধারণা সৃষ্টি হলো যে, আবু সালমাহর (রা) চেয়ে উত্তম পরিবর্তিত নিয়ামত কে হতে পারেন? ইদ্দত শেষ হওয়ার পর যখন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে নিকাহ করার পয়গাম প্রেরণ করলেন তখন আমার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে আবু সালমাহর (রা) চেয়ে উত্তম পরিবর্তিত নিয়ামত প্রদান করেছেন।"

সাইয়েদুনা হযরত আবু সালমাহ (রা) যদিও দীর্ঘ জীবন পাননি, তবুও আন্তরিকতাপূর্ণ আমল, হক পথে মুসীবত বরদাশতকরণ, রাসূল (সা) প্রেম এবং ত্যাগ ও বীরত্বের যে চিত্র ইতিহাসের পাতায় রেখে গেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর নাম জীবিত ও স্থায়ী রাখবে।

হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা)

রহমতে আলম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফার (সা) প্রেরণ হক ও বাতিলের মধ্যে এক দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্ব সংঘাতের সূচনা মাত্র ছিল। তা সত্ত্বেও নবুওয়াতের চতুর্থ বছর পর্যন্ত যখন "ফাসদা' বিমা তু'মারা ওয়া আ'রিয আনিল মুশরিকীন" (অর্থাৎ আল্লাহর আহকাম প্রকাশ্যে বর্ণনা করুন এবং মুশরিকদের তরফ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন)–এই আয়াত নাযিল হয়নি তখনো সেই দ্বন্দ্ব–সংঘাত প্রচন্ড আকার ধারণ করেনি। বস্তুত নবুওয়াতের প্রথম তিন বছরে সারওয়ারে আলম (সা) এবং মক্কার কাফেরদের পারস্পরিক সম্পর্ক এমন ছিল যে, তিনিও (সা) তাদের নিকট নির্দ্বিধায় গমন করতেন এবং তারাও তাঁর মজলিসে উপস্থিত হয়ে ইরশাদসমূহ শুনতো।

সে যুগেরই ঘটনা। একদিন প্রিয় নবীর (সা) মজলিসে আবু জেহেল, উতবা, শাইবা, উমাইয়া বিন খালফ, ওয়ালিদ বিন মুগীরা প্রমুখ অনেক কুরাইশ সরদার বসেছিল এবং তিনি তাদের নিকট অত্যন্ত গুরুত্ব ও মনোযোগের সঙ্গে হকের তাবলীগ করছিলেন। ইত্যবসরে একজন অন্ধ মানুষ লাঠি ভর দিয়ে নবীর মজলিসে হাজির হয়ে আরয করলেন ঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ আরশিদনী"

(হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে হেদায়াতের পথ বলে দিন)। [তিরমিযী শরীফে এ শব্দাবলী হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। ইবনে জারীর এবং ইবনে আবি হাতেম (রা) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের (রা) বক্তব্য অনুযায়ী ঐ ব্যক্তি এ সময় হুযূরের (সা) নিকট কুরআনে হাকিমের এক আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমাকে সেই ইলম শিখিয়ে দিন যা আল্লাহ আপনাকে শিখিয়েছেন।"]

কুরাইশ নেতারা ইসলাম গ্রহণ করুক এ আকাঙ্খা হুযূর (সা) পোষণ করতেন। এ জন্য তিনি অত্যন্ত মনোযোগ ও একাগ্রতার সাথে ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করছিলেন। আর আশা করছিলেন যে, তাদের মধ্যে কেউবা হক গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করবে এবং সে ইসলামকে শক্তিশালী করার মাধ্যম হবে। এমন সময় একজন অন্ধ সেখানে উপস্থিত হয়ে আলোচনায় বাধা দানকে তিনি (সা) পসন্দ করলেন না এবং তিনি তার প্রতি

তেমন কোন গুরুত্ব না দিয়ে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রাখলেন। রাব্বুল আলামীনের হাবীবের (সা) নিকট থেকে অন্ধের প্রতি এই আচরণে আল্লাহর নিকট থেকে সুরায়ে আবাসা নাযিল হলো। ইরশাদ হলো,

عَبَسَ وَتَوَلّٰى اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى ۝ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى ۝
اَوْيَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ۝ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ۝ فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ۝
وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ۝ وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعٰى ۝ وَهُوَ يَخْشٰى ۝
فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ۝ كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهٗ ۝

(سورة العبس : ١-١٢)

"বেজার মুখ হলো ও অনাগ্রহ দেখালো, এ জন্য যে, সেই অন্ধ ব্যক্তি তাঁর নিকট এসেছে। তুমি কি জানো, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো। কিংবা উপদেশ গ্রহণ করতো এবং উপদেশ দান তার জন্য কল্যাণকর হতো? যে লোক উন্নাসিকতা দেখায় তার প্রতি তো তুমি লক্ষ্য দিতেছ, অথচ সে যদি পরিশুদ্ধ না হয়, তাহলে তোমার উপর এর দায়িত্ব কি? আর যে লোক তোমার নিকট দৌড়ে আসে এবং সে ভয় করে, তার প্রতি অনীহা প্রদর্শন করছো। কক্ষণো নয়, এ তো এক উপদেশ। যার ইচ্ছা তা গ্রহণ করবে।" (আবাসা ঃ ১-১২)

জিবরাইল আমীন (আ) এ আয়াতসমূহ পড়ে যাচ্ছিলেন এবং বিশ্বনবীর (সা) চেহারায় চাঞ্চল্যের চিহ্ন ফুটে উঠছিলো। কিন্তু যখন জিবরাইল (আ) "কাল্লা ইন্নাহা তাজকিরাতুন" পর্যন্ত পৌছলেন তখন হুযূরের (সা) ইতমিনান হলো যে এটা বাস্তবত উপদেশ মাত্র। তারপর তিনি তৎক্ষণাৎ সেই অন্ধ ব্যক্তির বাড়ী গেলেন। সে ব্যক্তি ইতিমধ্যে রাসূলের (সা) অমনোযোগিতার কারণে ফিরে গিয়েছিলেন। হুযূর (সা) তাঁকে নিজের পবিত্র মজলিসে ফিরিয়ে আনলেন। নিজের পবিত্র চাদর মাটিতে বিছিয়ে দিলেন এবং অত্যন্ত সম্মান ও ভালোবাসার সঙ্গে তাঁকে তার ওপর বসালেন। অতপর নবীর (সা) দরবারে তাঁর স্থায়ী আসন হয়ে গেল। এ সৌভাগ্যবান অন্ধ যাঁর খাতিরে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত নিজের হাবীবকে উপদেশ দিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন ইবনে উম্মে মাকতূম।

হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) অন্যতম জালীলুল কদর সাহাবী ছিলেন। তিনি সাবিকুনাল আউয়ালুনের সেই পবিত্র শ্রেণীভুক্ত ছিলেন যাঁরা নবুওয়াতের সম্পূর্ণ প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

বিভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত ইবনে উম্মে মাকতূমের আসল নাম ছিল আমর অথবা আবদুল্লাহ অথবা হাছিন। কিন্তু তিনি মার কুনিয়ত সংযোগে ইবনে উম্মে মাকতূম নামে মশহুর হন। পিতার নাম ছিল কায়েস বিন যায়েদাহ (বিন আছাম বিন হরম বিন রাওয়াহা বিন হিজর বিন আদি মায়িদ বিন আমের লাব্বিল কারাশি)। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরার আপন মামা ছিলেন। এমনিভাবে হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) হযরত খাদিজাতুল কুবরার (রা) মামাতো ভাই ছিলেন। মায়ের নাম ছিল আতিকা (উম্মে মাকতূম) বিনতে আবদুল্লাহ বিন গাফছা বিন আমের বিন মাখযুম।

হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) যদিও দৃষ্টি শক্তি থেকে বঞ্চিত ছিলেন, তবুও আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অত্যন্ত নেক স্বভাব দান করেছিলেন। এ জন্য রাসূলের (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির পর যখনই তাঁর কানে হকের দাওয়াত পৌছলো তখনই তিনি চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তা গ্রহণ করলেন।

তিনি সূরায়ে আবাসা নাযিল হওয়ার পূর্বে অথবা পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, সে ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। তবে তিনি যে প্রাচীন মুসলমান ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। হাফেজ ইবনে হাজার (র) এবং হাফেজ ইবনে কাছীর (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) সেসব মুসলমানের অন্যতম ছিলেন যাঁরা মক্কায় নবুওয়াতের সূচনা লগ্নে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সূরায়ে আবাসা নাযিল হওয়ার পর রহমতে আলম (সা), উম্মুহাতুল মু'মিনীন (রা) এবং সাহাবা কিরাম (রা) হযরত ইবনে উম্মে মাকতূমকে (রা) সীমাহীন মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করতেন। তিনি যখনই নবী (সা) গৃহে গমন করতেন তখনই উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) মধু ও লেবু দিয়ে তাকে মেহমানদারী করতেন। মুসতাদরাকে হাকিমে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, সূরায়ে আবাসা নাযিল হওয়ার পর মধু ও লেবু ইবনে উম্মে মাকতূমের দৈনন্দিন খাদ্যবস্তু ছিল। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) লিখেছেন, এ ঘটনার পর হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) রাসূলের (সা) দরবারে উপস্থিত হলে রহমতে আলম (সা) তাঁকে দেখে বলতেন, এ ব্যক্তিকে মারহাবা বলো। তার কারণেই আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন। অতপর হুযূর (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন, তোমার কি কোন কিছুর প্রয়োজন আছে? তিনি যদি নিজের কোন প্রয়োজনের কথা বলতেন তাহলে হুযূর (সা) তাৎক্ষণিকভাবে তা পূরণ করে দিতেন।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) যখন সাহাবায়ে কিরামকে (রা) মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন তখন হযরত ইবনে উম্মে মাকতূমও (রা) হিজরত করে মদীনা গমন করলেন। হুযূর (সা) যখন স্বয়ং হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারা তাশরীফ নিলেন তখন হযরত ইবনে উম্মে মাকতূমকে (রা) আযান দেয়ার দায়িত্ব দিলেন। সহীহ বুখারীতে আছে, রমযানুল মুবারকে তাঁর আযান শুনে লোকজন খানাপিনা বন্ধ করে দিতেন। তাঁর আযানকে যেন সাহরীর শেষ সময় হিসেবে মনে করা হতো।

হিজরতের পর যুদ্ধের সিলসিলা শুরু হলো। এ সময় হযরত ইবনে উম্মে মাকতূমের (রা) অন্তরেও জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহতে অংশ গ্রহণের সীমাহীন আবেগ সৃষ্টি হলো। কিন্তু নিজের অক্ষমতার কারণে বাস্তবত যুদ্ধে অংশ নিতে পারতেন না। যখন এ আয়াত নাযিল হলো ঃ

"যে মুসলমান ঘরে বসে থাকে সে মর্যাদায় মুজাহিদ ফি সাবীলিল্লাহর সমান হয় না।"

ঘটনাক্রমে সে সময় হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) রাসূলের (সা) দরবারে উপস্থিত ছিলেন। এ আয়াত শুনে তিনি অত্যন্ত আফসোসের সঙ্গে রাসূলের (সা) খিদমতে আরয করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। আমি যদি মা'যুর বা অক্ষম না হতাম তাহলে কখনোই বাড়ী বসে থাকতাম না। বরং জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহতে ব্যাপৃত থাকতাম।

তাঁর দুঃখ ভারাক্রান্ত আকাঙ্খা আল্লাহর দরবারে এমনভাবে গৃহীত হলো যে, সে সময়ই এ আয়াত নাযিল হলো ঃ

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ - (النساء : ٩٥)

"মুসলমানদের মধ্যে যারা কোন অক্ষমতা ছাড়া বাড়ী বসে থাকে তারা মর্যাদায় সেই মুজাহিদ ফি সাবীলিল্লাহর সমান নয়, যারা নিজেদের জান-মাল দিয়ে জিহাদ করে থাকেন।" (আন-নিসা ঃ ৯৫)

এমনিভাবে যেন আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা)-এর মত মা'যুর মুসলমানদেরকে জিহাদের নির্দেশ থেকে বাদ দিয়ে দিলেন।

হাফিজ ইবনে হাজার (র) এবং আল্লামা ইবনে আবদুল বার্ (র) লিখেছেন, এ আয়াত নাযিলের পর হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) অন্ধ

(মা'যূর) হওয়ার কারণে জিহাদে শরীক হওয়ার যোগ্য ছিলেন না। কিন্তু জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহতে অংশগ্রহণে তাঁর এত উৎসাহ ছিল যে, কতিপয় যুদ্ধে লোকদের নিকট থেকে ঝান্ডা নিয়ে দু' কাতারের মধ্যে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত অটল পাহাড়ের মত নিজের স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতেন। জীবন দানের এ আবেগ রাসূলের (সা) দরবারে তাঁকে অত্যন্ত সম্মানিত বানিয়ে দিয়েছিল। সুতরাং অনেক সময় যখন হুযূর (সা) মদীনার বাইরে তাশরীফ নিতেন তখন তিনি মদীনাতে হযরত ইবনে উম্মে মাকতূমকে (রা) নিজের স্থলাভিষিক্ত ও নামাযের ইমাম নিয়োগ করতেন। হাফিজ ইবনে আবদুল বার (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) তেরবার রহমতে আলমের (সা) প্রতিনিধিত্ব করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

আল্লামা ইবনে সা'দ (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) কুরআনে করীমের হাফেজ ছিলেন এবং হিজরতের পর মদীনা মুনাওয়ারাতে লোকজনকে কিরআত শিক্ষা দিতেন। মসজিদে নববীতে জামায়াতের সঙ্গে নামায আদায়েও তাঁর সীমাহীন উৎসাহ ছিল। মসজিদে নববী থেকে তাঁর বাড়ী দূরে ছিল। কিন্তু তিনি অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই মসজিদে নববীতে এসে জামায়াতের সঙ্গে আদায় করতেন। রাস্তায় কয়েক স্থানে জঙ্গল ছিল। তিনি যেহেতু কোন পথপ্রদর্শক ছাড়াই আসতেন সে জন্য কয়েকবার তাঁর কাপড় জঙ্গলে আটকে গিয়েছিল এবং তা ছাড়ানোর জন্য তাঁকে খুব কষ্ট করতে হয়েছিল। বস্তুত একবার রাসূলে আকরামের (সা) নিকট আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! কোন কোন সময় বাড়ী থেকে মসজিদে আসতে আমার খুব কষ্ট হয়। এ জন্য ঘরেই নামায পড়ে নিব কি?"

হুযূর (সা) জিজ্ঞেস করলেন "তুমি কি তোমার বাড়ীতে আযান ও ইকামতের আওয়াজ শুনতে পাও?তিনি আরজ করলেনঃ "হাঁ, আল্লাহর রাসূল (সা)।"

হুযূর (সা) বললেন ঃ "তাহলে তুমি অবশ্যই মসজিদে এসেই নামায আদায় করো।"

সুতরাং তিনি এরপর স্থায়ীভাবে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই নিয়মমত মসজিদে নববীতে এসে আদায় করতেন।

প্রিয় নবী (সা) ইন্তেকাল করলে হযরত ইবনে উম্মে মাকতূমের (রা) ওপর শোকের পাহাড় ভেঙ্গে পড়লো। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং

হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁকে সাহস দিলেন। তিনি চুপচাপ মদীনায় নিজের সময় কাটাতে লাগলেন। এ সত্ত্বেও তাঁর অন্তরে জিহাদের উৎসাহ উঁকি মারতো। হযরত ওমর ফারুক (রা) নিজের খিলাফতকালে তাঁর জন্য যুক্তিযুক্ত বৃত্তি নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন এবং বাড়ী থেকে মসজিদ পর্যন্ত পথ প্রদর্শনের জন্য এক জন খাদেমও দিয়েছিলেন। কিন্তু জিহাদের উৎসাহ তাঁকে বাড়ীতে আরামের সঙ্গে বসতে দিল না। হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত সা'দ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসকে ইরাক পদানত করার জন্য প্রেরণ করলেন। এ সময় হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) নিজের অক্ষমতা সত্ত্বেও ইসলামী বাহিনীতে শামিল হয়ে যান।

আল্লামা ইবনে সা'দ (র) এবং হাফিজ ইবনে হাজার (র) লিখেছেন, কাদেসিয়ার রক্তাক্ত যুদ্ধে হযরত ইবনে উম্মে মাকতূমও (রা) অংশ নিয়েছিলেন। এই যুদ্ধ ইরাকের ভাগ্যের সিদ্ধান্ত করে দিয়েছিল। তিনি যিরাহ পরিধান করে ঝান্ডা তুলে ধরে ইসলামের মুজাহিদদের ব্যূহের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। যুদ্ধ যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছলো তখন মুসলমান ও ইরানীরা পরস্পরের বিরুদ্ধে এমনভাবে হামলা চালালো যে, সুশৃংখল ব্যূহ আর রইলো না। এই বিশৃংখলার মধ্যে হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) শাহাদাতের পিয়ালা পান করে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন।

আল্লামা ওয়াকেদী বর্ণনা করেছেন, হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) মদীনায় ইন্তেকাল করেন। কিন্তু অন্যান্য নেতৃস্থানীয় চরিতকার পূর্বেকার রেওয়ায়াতকেই সঠিক বলে আখ্যায়িত করেছেন। হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) থেকে কতিপয় হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। তাঁর থেকে এসব হাদীসের বর্ণনাকারী হলেন, হযরত আনাস (রা) এবং যার বিন জায়েশ (র)।

সাইয়েদুনা হযরত আরকাম (রা) বিন আবিল আরকাম মাখযূমী

নবুওয়াত প্রাপ্তির পর তিন বছর পর্যন্ত রহমতে আলম (সা) অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে তাবলীগের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে থাকেন। এ সময়ে অনেক নেক স্বভাবের ব্যক্তিত্ব হক দাওয়াত কবুল করলেন এবং তা নিজের প্রভাবিতদের মধ্যে প্রসারের জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালালেন। এমনিভাবে ইসলামের হেদায়াতের নূর ভেতরে ভেতরে গোমরাহীর অন্ধকার দূর করতে লাগলো। সেই যুগে হকপন্থীরা চুপে চুপে মক্কার সুনসান উপত্যকায় নামায পড়তেন। যাতে কুরাইশ মুশরিকরা তাদের হক কবুলের কথা জানতে না পারে। কিন্তু মক্কার কাফেরদের কানে কোন না কোনভাবে এ কথা পৌঁছে গেল। তারা জানতে পারল যে, তাদের ভাই-বন্ধুদের মধ্য থেকে কিছু মানুষ নতুন দীন গ্রহণ এবং ইবাদাতের এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। সুতরাং তারা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলো। কোন মুসলমানকে ইবাদাতরত অবস্থায় ধরতে পারলে তাকে শাস্তি দেবে এমন চিন্তাও তারা করলো।

সেই যুগে দু'তিনটি এমন ধরনের ঘটনা ঘটলো যে, নামায আদায়কারী হকপন্থীদের ওপর মুশরিকরা হামলা করে বসলো। যদিও হকপন্থীরা তাদের জবাব দিল। কিন্তু তাতে মক্কার মুশরিকদের সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘাতের আশংকা দেখা দিল। প্রিয় নবী (সা) সে সময় পরিস্থিতি এমন রূপ নিক তা চাইতেন না। তাঁর ধারণা ছিল মুসলমানরা মক্কায় এমন একটি সুরক্ষিত স্থান পাক যেখানে কাফেরদের হামলার ভয় থাকবে না এবং সেখানেই তারা একত্রিত হয়ে নামায পড়বে। তখনো সেই ধরনের একটি স্থানের অনুসন্ধান চলছিল। এমন সময় একদিন ১৯-২০ বছরের একজন যুবক হুযূরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমার প্রশস্ত বাড়ী সাফা পাহাড়ের পাদদেশে এবং বাইতুল্লাহর নিকটে অবস্থিত। আমি তা আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি। মুসলমানরা তাতে একত্রিত হয়ে যা ইচ্ছা তাই করবে। সে বাড়ীতে কাফেররা ঢুকবে এমন সাহস নেই।

রহমতে আলম (সা) হক পূজারী নওজোয়ানের ত্যাগের আবেগে খুব খুশী হলেন। তাঁর জন্য দোয়া করলেন এবং তাঁর উদারতাপূর্ণ প্রস্তাব কবুল করে সে

বাড়ী মুসলমানদের ইজতিমা ও দাওয়াত এবং তাবলীগের কেন্দ্র বানিয়ে দিলেন। এই যুবক যার গৃহ ইসলামের প্রথম কেন্দ্র এবং ইসলাম অনুসারীদের আশ্রয়স্থল হয়েছিল এবং যাঁর ত্যাগের আবেগ সাইয়েদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফাকে (সা) খুশী করেছিল। তিনি ছিলেন বনূ মাখযূমের নয়নমণি আবু আবদুল্লাহ আরকাম (রা) বিন আবিল আরকাম।

হযরত আরকাম (রা) বিন আবিল আরকাম আবদি মান্নাফ আল্লাহর সেই অন্যতম পবিত্র মানুষ ছিলেন যিনি দাওয়াতে হকের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজের অটলতা, ত্যাগ এবং আন্তরিকতাপূর্ণ কাজের স্থায়ী চিত্র ইতিহাসের পাতায় অংকিত করেছেন। ইতিহাসবিদদের মধ্যে কেউ হযরত আরকামকে (রা) সপ্তম, কেউ একাদশতম এবং কেউ দ্বাদশতম মুসলমান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সব মতের কোনটিকেই চূড়ান্ত বলা যাবে না। অবশ্য এ কথা পূর্ণ আস্থার সঙ্গেই বলা যায় যে, তিনি অত্যন্ত প্রাচীন মুসলমান ছিলেন এবং নবুওয়াত প্রাপ্তির প্রথম তিন বছরের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। আল্লামা ইবনে আসীর (র) 'উসুদুল গাবাহ' গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত আরকাম (রা), হযরত আবু সালমা (রা) বিন আবদুল আসাদ, হযরত ওবায়দা (রা) বিন হারিছ মাত্তালিবি এবং হযরত ওসমান (রা) বিন মাযউন এক সঙ্গে ঈমান এনেছিলেন।

হযরত আরকাম (রা) বনূ মাখযূম বংশোদ্ভূত ছিলেন। এই বংশ কোরেশের অত্যন্ত সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয় বংশ ছিল। জাহেলী যুগে সেনাবাহিনীর সেনাপতি এবং সামরিক ক্যাম্পের বন্দোবস্ত করার দায়িত্ব এই বংশের হাতেই ন্যস্ত ছিল। তাঁর দাদা আবু জুনদুব আসাদ বিন আবদুল্লাহ সমকালীন যুগে মক্কার অন্যতম প্রসিদ্ধ সরদার হিসেবে পরিগণিত হতেন। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা) এবং হযরত খালিদ (রা) সাইফুল্লাহর দাদা মুগীরা এবং হযরত আবু সালমা (রা) ইবনুল আসাদের দাদা হেলালের ভাই ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ

আরকাম (রা) বিন আবিল আরকাম আবদি মান্নাফ বিন আবু জুনদুব আসাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন মাখযূম বিন ইয়াকজা বিন মুররাহ বিন কা'ব বিন লুয়ী।

মুররাহ বিন কা'ব পর্যন্ত গিয়ে হযরত আরকামের (রা) নসবনামা প্রিয় নবীর (সা) নসবের সাথে মিলে যায়। মুররাহ হুযূরের (সা) প্রপিতামহ কুসাই বিন কিলাবের দাদা ছিলেন। ইসলামের মশহুর দুশমন আবু জেহেলের দুই ভাই সালমা (রা) বিন হিশাম এবং আয়াশ (রা) বিন আবু রাবিয়া ইসলাম গ্রহণে হযরত আরকামের (রা) সঙ্গী ছিলেন।

হযরত আরকামের (রা) মায়ের নাম এবং খান্দানের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কতিপয় রেওয়ায়াত অনুযায়ী তাঁর নাম ছিল উমাইমা এবং তিনি বনূ খোযাআ গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। অন্য কতিপয় রেওয়ায়াত আছে যে, বনূ সাহামের সঙ্গে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন।

চরিতকাররা হযরত আরকামের (রা) জন্ম সাল সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেননি। কিন্তু কার্যকারণে মনে হয় যে, তিনি হিজরতে নববীর ত্রিশ বছর পূর্বে ৫৯৪ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। এ হিসাব অনুযায়ী নবীর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির (৬১১ খৃঃ) সময় তাঁর বয়স প্রায় ১৭ বছর ছিল। সুতরাং এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, হযরত আরকাম (রা) রাসূলের (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির সম্পূর্ণ প্রথম যুগে ঈমানের নিয়ামতে পূর্ণ হয়েছিলেন। এ জন্য ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স ১৭ অথবা ১৮ বছর নির্ধারণ করা যায়। যৌবনকালে তাওহীদকে মজবুতভাবে আকড়ে ধরে প্রত্যেক ধরনের মুসীবতের আহবান জানানো কোন নেক আত্মারই কাজ হতে পারে। বনূ মাখযূমের এই ভাগ্যবান যুবক একাজ করে দেখিয়েছেন এবং প্রত্যেক রকমের ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করে রাসূলের (সা) সঙ্গেই নিজের ভবিষ্যত সংযুক্ত করে নিয়েছিলেন। তিনি নিজের বাড়ী 'দারে আরকামকে' চরম দুঃসময়ে 'দারুল ইসলাম' হওয়ার সুযোগ দিয়ে ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন।

শিআ'বে আবি তালিবে অবরোধ থাকাকালীন (নবুওয়াতের ৭ম সাল) সেই পবিত্র বাড়ীই ইসলামী দাওয়াতের কেন্দ্রীয় মর্যাদা প্রাপ্ত হয়। রহমতে আলম (সা) সেই যুগে দারে আরকামেই অবস্থান করছিলেন। এখানে এসেই হকপন্থীরা তাঁর নিকট একত্রিত হতো এবং ঘরের দরজা বন্ধ করে নামায পড়তেন। নতুন মানুষও সেই স্থানে এসে ইসলাম কবুল এবং নবীর (সা) ফয়েয লাভ করতেন। নিসন্দেহে দারে আরকাম মুসলমানদের আশ্রয়স্থল ছিল। কিন্তু তার অর্থ এটা নয় যে, মুসলমানরা সেখানে নিজেদেরকে কয়েদ করে রেখেছিল। নবুওয়াতের চতুর্থ বছরের শুরুতে যখন আল্লাহর তরফ থেকে এ নির্দেশ নাযিল হলো ঃ

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ - (الحجر : ٩٤)

"আল্লাহর নির্দেশাবলী প্রকাশ্যে শুনান এবং মুশরিকদের পরওয়া করবেন না।"

তখন রহমতে আলম (সা) প্রকাশ্যে হকের দাওয়াতের কাজ শুরু করে দিলেন। তিনি কখনো একাকী এবং কখনো কতিপয় জীবন উৎসর্গকারী সঙ্গী নিয়ে দারে আরকাম থেকে বের হয়ে লোকদেরকে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতেন এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকার পরামর্শ করতেন। তার

ফলশ্রুতিতে চারদিক থেকে বিরোধীতার তুফান শুরু হলো এবং সেই সকল মানুষই যারা তাঁকে আমানতদার, দিয়ানতদার, সত্যবাদী ও মহান চরিত্রের অধিকারী হিসেবে প্রশংসা করতো, তারাই তাঁর জীবনের দুশমন হয়ে গেল। তা সত্ত্বেও নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছরের পর কুরাইশের বাঘ ও রাসূলের চাচা হযরত হামযাকেও (রা) আল্লাহ তায়ালা ইসলাম কবুলের তাওফীক দিলেন এবং তিনি দারে আরকামেই হুযূরের (সা) নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের তিন দিন পর (অন্য এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী তিন মাস পর) হযরত ওমর ফারুকও (রা) সেখানে এসে নিজের হাত রহমতে আলমের (সা) পবিত্র হাতে দিয়েছিলেন।

হযরত হামযা (রা) এবং হযরত ওমরের (রা) মত বাহাদুর ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের ইসলাম গ্রহণ হকপন্থীদের জন্য অত্যন্ত শক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ালো। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত ওমর (রা) ইসলাম গ্রহণের পর সকল মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে দারে আরকাম থেকে বের হলেন এবং প্রকাশ্যে মসজিদে হারামে গিয়ে নামায পড়লেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহর কসম! ওমর (রা), ইসলাম গ্রহণ না করলে আমরা কাবায় নামায পড়তে পারতাম না। মুসলমানদের সংখ্যা এবং শক্তির এই বৃদ্ধি কাফেরদের চক্ষুশূল হয়ে গেল এবং তারা উত্তেজিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিল যে, বনূ হাশেম ও বনূ মুত্তালিব মুহাম্মাদকে (সা) তাদের নিকট হস্তান্তর না করা পর্যন্ত তাদের সঙ্গে সাধারণের সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে। এদিকে বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিব মরতে রাযী ছিল কিন্তু হুযূরের (সা) সামান্যতম অসুবিধা সহ্য করতেও প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং তারা তিন বছর পর্যন্ত শিআ'বে আবু তালিবে অবরুদ্ধ থেকে বিষবত দুঃখ-মুসীবত সইতে লাগলেন। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও কাফেরদের দাবী মঞ্জুর করার ধারণাও অন্তরে স্থান দেননি।

দারে আরকাম হযরত ওমর ফারুকের (রা) ইসলাম গ্রহণ পর্যন্ত অথবা শিআ'বে আবু তালিবে অবরুদ্ধ হওয়ার আগে পর্যন্ত ইসলামের কেন্দ্রের মর্যাদায় অভিষিক্ত ছিল। এ ব্যাপারে অবশ্য মত বিরোধ রয়েছে। তবে যা হোক, ইসলামের ইতিহাসে দারে আরকামের স্থায়ী খ্যাতি লাভ ঘটে।

বাইয়াতে আকাবায়ে কবীরার (নবুওয়াতের ১৩ বছর পর জিলহাজ্বে) পর সারওয়ারে আলম (সা) মক্কার মুসলমানদেরকে মদীনায় হিজরত করার সাধারণ অনুমতি দেন। বস্তুত মক্কার বেশীর ভাগ মুসলমান কয়েক মাসের মধ্যে হিজরত করে মদীনা চলে গেলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আরকাম (রা) বিন আবিল আরকামও ছিলেন। প্রিয় নবী (সা) হিজরত করে মদীনা তাশরীফ

নিলেন এবং কয়েক মাস পর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করলেন। এ সময় হযরত আরকামকে (রা) হযরত আবু তালহা যায়েদ (রা) বিন সাহাল আনসারীর ইসলামী ভাই বানিয়ে দিলেন। আল্লামা ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, হুযূর (সা) হযরত আরকামকে (রা) স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য মদীনার বনী যারিক মহল্লায় এক টুকরো জমি দান করেছিলেন।

দ্বিতীয় হিজরীতে যুদ্ধের সিলসিলা শুরু হলে বদরুল কুবরা, ওহোদ, আহযাব, খায়বার, হুনাইন মোট কথা এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি যাতে হযরত আরকাম (রা) বীরত্ব প্রদর্শন করেননি। আল্লামা ইবনে আসীর (র) উসুদুল গাবাতে লিখেছেন, হক ও বাতিলের প্রথম সংঘর্ষে রহমতে আলম (সা) হযরত আরকামকে (রা) একটি তরবারী দান করেছিলেন। এ তরবারীর মাধ্যমে তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দানে বীরত্ব দেখান।

হুযূরে আকরামের (সা) হযরত আরকামের (রা) দিয়ানত ও আমানতদারীর ওপর সীমাহীন আস্থা ছিল। সুতরাং তিনি তাঁকে যাকাত আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করলেন এবং তিনি রাসূলের যুগে এই দায়িত্ব অত্যন্ত সুন্দরভাবে আঞ্জাম দেন।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, হযরত আরকাম (রা) অত্যন্ত পরেহযগার, সত্যবাদী এবং বাহাদুর মানুষ ছিলেন। আল্লাহর ইবাদাতের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল। একবার ছওয়াব হাছিলের লক্ষ্যে বাইতুল মুকাদ্দাসে নামায পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং সফরের প্রস্তুতি নিয়ে হুযূরের (সা) অনুমতি নিতে এলেন। হুযূর (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "বাইতুল মুকাদ্দাস গমনের ইচ্ছা কেন করেছ। বাণিজ্যের জন্য অথবা অন্য কোন কারণে?"

তিনি আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসুল (সা)! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। শুধুমাত্র ছওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে বাইতুল মুকাদ্দাসে নামায পড়তে চাই।"

হুযূর (সা) বললেন ঃ "মসজিদে হারাম (বাইতুল্লাহ) ছাড়া মসজিদে নববীর এক নামায দুনিয়ার সকল মসজিদের হাজার নামায থেকে উত্তম।"

হযরত আরকাম (রা) হুযূরের (সা) ইরশাদ শুনে সফরের ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন।

হযরত আরকাম (রা) রহমতে আলমের (সা) ইন্তেকালের পর ৪২ অথবা ৪৩ বছর জীবিত ছিলেন। এ সময় খিলাফতে রাশেদার সমগ্রকাল অতিবাহিত

হয়। এমনকি সমগ্র ইসলামী বিশ্বে আমীরে মাবিয়ার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এ সুদীর্ঘ সময়ে হযরত আরকামের (রা) জীবন সম্পর্কিত কোন ঘটনা চরিত ও ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন মত অনুযায়ী তিনি ৫৩ অথবা ৫৫ হিজরীতে ৮৩ অথবা ৮৫ বছর বয়সে ওফাত পান। আল্লামা ইবনে সা'দ (র) তাবকাতে লিখেছেন, ওফাতের পূর্বে হযরত আরকাম (রা) তাঁর নামাযে জানাযা হযরত সা'দ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসকে (রা) পড়ানোর ওসিয়ত করেছিলেন। মদীনার কিছু দূরে আকীকে তিনি বসবাস করতেন। এ জন্য মদীনা পৌছতে দেরী হয়ে গেল। মদীনার গভর্ণর মারওয়ান ইবনুল হাকাম অপেক্ষা করতে রাযী ছিলেন না। সে বললো, সা'দ আসা পর্যন্ত জানাযাহ কতক্ষণ পড়ে থাকবে। আমি নামায পড়িয়ে দিচ্ছি।

হযরত আরকামের (রা) পুত্র ওবায়দুল্লাহ (রা) এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি বললেন, "সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা) না আসা পর্যন্ত জানাযার নামায পড়া হবে না।"

মারওয়ান পীড়াপীড়ি করলে বনু মাখযূম কবিলা হযরত ওবায়দুল্লাহ বিন আরকামের (রা) সমর্থনে দাঁড়িয়ে গেল। ইত্যবসরে হযরত সা'দ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস তাশরীফ আনলেন এবং জানাযার নামায পড়িয়ে ইসলামী বিশ্বের এই সূর্যকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করলেন।

হযরত আরকাম (রা) ইন্তেকালের সময় দুই পুত্র ওবায়দুল্লাহ এবং ওসমান ও তিন কন্যা ছুফিয়া, মরীয়ম ও উমাইয়া রেখে যান।

হযরত আরকাম (রা) ইবনু অবিল আরকাম ইসলামের অন্যতম মহান সন্তান ছিলেন। তিনি শুধুমাত্র আস-সাবিকুনাল আউয়ালুনই ছিলেন না বরং বদরী সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্যও অর্জন করেছিলেন। বদর ছাড়াও তিনি অন্য সব গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধেও প্রিয় নবীর (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। যে কারণে তিনি স্থায়ী খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন, তাহলো তাঁর উদারতা ও ত্যাগ। অত্যন্ত ভীতিপূর্ণ যুগে তিনি রাসূল (সা) এবং অন্যান্য হকপন্থীদের মেযবান হন এবং নিজের বাড়ী শুধু মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাসূলকে (সা) দান করে দেন।

হযরত আরকাম (রা) এ বাড়ীর গুরুত্ব সম্পর্কে খুবই জ্ঞাত ছিলেন। এ জন্য তিনি তা ওয়াক্ফ করে দেন। যাতে বিক্রয় ও উত্তরাধিকারের বিবাদ থেকে মুক্ত থাকে। এ সত্ত্বেও মৃত্যুর পর বাড়িটি তাঁর খান্দানের অধীন ছিল। তাতে একটি ইবাদাতগাহ। (কুব্বা অথবা মসজিদ) ছিল। এই বাড়ী কা'বার নিকটে এমন স্থানে অবস্থিত ছিল যেখানে হজ্বের সময়ে লোকেরা সাফা ও

মারওয়ার মাঝে সায়ীর সময় তার দরজার সামনে দিয়ে যেত। ১৪০ হিজরীতে দ্বিতীয় আব্বাসী খলীফা আবু জাফর মনসুর তা হযরত আরকামের (রা) পৌত্র আবদুল্লাহ বিন ওসমান এবং অন্যান্য উত্তরাধিকারের নিকট থেকে কিনে নেন। পরে তা খলীফা মাহদীর বাঁদীর অধীনস্ত হয়। সে তার নিজের ইচ্ছানুযায়ী তা সম্পূর্ণ নতুন করে পুনর্নির্মাণ করায়। তারপর কালের পরিবর্তনে তাতেও কয়েকটি পরিবর্তন সাধিত হয়। তবে তা সব সময়ই দারে আরকামের পবিত্র নামেই মশহুর ছিল।

ইসলামের এই প্রথম কেন্দ্র যেখান থেকে দীনের কিরণসমূহ বিচ্ছুরিত হয়েছিল। বর্তমানে যদিও তা পবিত্র হরমের অংশ হয়ে গেছে। কিন্তু 'দারে আরকাম' এবং হযরত আরকামের (রা) ত্যাগের কথা চিরকালের জন্য বাকী থাকবে।

হযরত উবাইদাহ (রা) বিন হারিছ মুত্তালিবী

বদরের যুদ্ধের কিছু দিন পর রহমতে আলম (সা) একবার সাহাবীদের সঙ্গে সাফরা উপত্যকা অতিক্রম করছিলেন। রাত কাটানোর জন্য তিনি সেখানেই তাঁবু ফেললেন। বাতাস বইতে শুরু করলো। বাতাসের সঙ্গে মিশকের সুগন্ধি বয়ে আসতে লাগলো। সাহাবায়ে কিরাম (রা) হুযূরের খিদমতে আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সা)! কোথাও থেকে যেন মিশকের সুগন্ধি বয়ে আসছে। তাতে আমাদের দেহ-মন প্রফুল্লময় হয়ে গেছে।"

প্রিয় নবী (সাঃ) বললেন ঃ "আবু মাবিয়ার কবর এখানে থাকতে তোমরা আশ্চর্যান্বিত হচ্ছ কেন?"

আবু মাবিয়ার কুনিয়তের এই আশিকে রাসূল (সা)-এর কবরের বদৌলতে সমগ্র সাফরা উপত্যকা সুগন্ধি হয়ে গেছে। সাইয়েদুনা হযরত উবাইদাহ (রাঃ) বিন হারিছ মুত্তালিবী বদরের শহীদ ছিলেন।

হযরত উবাইদাহ (রাঃ) বিন হারিছ বিন মুত্তালিব বিন আবদি মান্নাফ বিন কুসাই,আল-কারাশী অন্যতম জালীলুল কদর সাহাবী ছিলেন। তাঁর কুনিয়ত আবু মাবিয়াও ছিল। আবুল হারিছও। উপাধি ছিল শাইখুল মুহাজিরীন। তিনি বনূ আবদি মান্নাফ-এর শাখা বনু মুত্তালিবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তিনি প্রিয় নবীর (সাঃ) প্রপিতামহ হাশিম বিন আবদি মান্নাফের ভাই মুত্তালিবের পৌত্র ছিলেন। এই দিক থেকে আত্মীয় সম্পর্কে হুযূরে আনওয়ারের (সা) চাচা ছিলেন। মাতার নাম ছিল সাখিলা এবং প্রিয় নবীর (সা) ১০ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। (কতিপয় হাদীস ব্যাখ্যাতা এবং চরিতকার হযরত উবাইদাহ (রা) বিন হারিছকে হযরত আব্দুল মুত্তালিবের পৌত্র এবং হাশেমী বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু এটা ভুল ধারণা। নিসন্দেহে হযরত আবদুল মুত্তালিবের এক পুত্রের নামও হারিছ ছিল। তবে, হারিছ (নবীর (সা) চাচা) বিন আবদুল মুত্তালিবের পুত্রদের নাম ছিল নাওফিল, আবদুল্লাহ, রবিয়া এবং মুগীরা। হযরত উবাইদা (রাঃ) হারিছ বিন মুত্তালিবের পুত্র ছিলেন। তিনি হাশেমী ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন মুত্তালিবী।

নবুওয়াতের প্রথম দিকে হযরত উবাইদা (রা), হযরত ওসমান (রা) বিন মাযউন, হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ, হযরত আবু ওবায়দা (রা)

ইবনুল জাররাহ, হযরত আবু সালমা (রা) ইবনুল আসাদ এবং আরকাম (রা) ইবনুল আবিল আরকামের সঙ্গে সেই সময় দাওয়াতে হক কবুল করেছিলেন, যে সময় এই কাজ ভয়ংকর বলে বিবেচিত হত। হযরত উবাইদাহ (রা) তখন যৌবনকাল অতিক্রম করে বার্ধক্যের সীমানায় পৌছে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যুবকদের মত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে ইসলামকে জীবনের মূল মন্ত্র বানিয়ে নিয়েছিলেন এবং কুরাইশ মুশরিকদের বিরোধিতা ও নির্যাতন সত্ত্বেও ভীত সন্ত্রস্ত হননি। তাঁর ইসলাম গ্রহণের কিছু দিন পর যখন মুশরিকরা হকপন্থীদের জীবন সংকটপূর্ণ করে তুললো তখন প্রিয় নবী (সা) নিজের কতিপয় জীবন উৎসর্গকারীকে সঙ্গে নিয়ে হযরত আরকাম (রা) বিন আবিল আরকাম মাখযূমীর গৃহে আশ্রয় নেন। আশ্রয়গ্রহণকারীদের মধ্যে হযরত উবাইদাহও (রা) ছিলেন। হযরত আরকামের (রা) গৃহ সাফা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ছিল এবং সেখানে অবস্থান করে দুশমনের হামলা খুব ভালোভাবে প্রতিরোধ করা যেত। নির্যাতীত মুসলমানরা সে পবিত্র স্থান তখন পরিত্যাগ করেছিলেন যখন হযরত ওমর (রা) বিন খাত্তাব সেখানে এসে রহমতে আলমের (সা) পায়ের ওপর পড়লেন এবং সাকিয়ে কাওছারের (সা) পবিত্র হাতে তাওহীদের সুমিষ্ট পানীয় পান করে জীবন ধন্য করলেন।

প্রিয় নবীর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির পর ৭ বছর কেটে গেল। মক্কায় কুরাইশরা তখনো দেখলো যে, তাদের সীমাহীন যুলুম-নির্যাতন সত্ত্বেও মুসলমানদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে এবং তাঁদের মধ্যকার একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নির্যাতনমুক্ত হয়ে হাবশার নিরাপদ স্থানেও পৌছে গেছেন তখন তারা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলো এবং তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তারা এক বৈঠকে সর্বসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্ত নিল যে, যতক্ষণ বনূ হাশেম মুহাম্মাদকে (সা) হস্তান্তর না করবে, কোন ব্যক্তি তাঁদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না। তাঁদের নিকট কোন বস্তু বিক্রয় করা হবে না। তাঁদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক স্থাপন করা হবে না এবং তাদেরকে প্রকাশ্যে চলাফেরাও করতে দেয়া হবে না। এ চুক্তি লিখে কা'বার দরজায় ঝুলিয়ে দেয়া হলো।

বনূ হাশিম যখন এই চুক্তির কথা জানতে পেল তখন তারা প্রিয় নবীকে (সা) মুশরিকদের নিকট হস্তান্তর করতে স্পষ্ট অস্বীকার করলো এবং হযরত আবু তালিব হাশেমী খান্দানের সকলকে নিয়ে (আবু লাহাব এবং তার প্রভাবাধীন কতিপয় হাশেমী ব্যতীত) পাহাড়ের একটি উপত্যকায় চলে গেলেন। এই উপত্যকা বনূ হাশেম উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল এবং তাকে শিয়া'বে আবি তালিব বলা হতো। সেই কঠিন সময়ে বনূ মুত্তালিব বনূ হাশিমকে সম্পূর্ণরূপে সহযোগিতা করেছিল। প্রকৃতপক্ষে মুত্তালিব বিন আবদি

মান্নাফের সন্তানরা প্রথম থেকেই হাশেমীদের সুখ-দুঃখে অংশ নিতেন। বনূ হাশেম যেমনি হুযূরে আনওয়ারের (সা) হিফাজত ও যত্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তেমনি বনূ মুত্তালিবও তাঁর নিরাপত্তা ও হিফাজতের জন্য কসম খেয়েছিলেন। বস্তুত শিআ'বে আবি তালিবে অবরুদ্ধ থেকে যেমন বনূ হাশিম যুলুম নির্যাতনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছিল তেমনি মুত্তালিবীরাও উপত্যকায় অবস্থান করে সব ধরনের কষ্ট সইতে লাগলো। সেই ওয়াদা রক্ষাকারীদের মধ্যে হযরত উবাইদাহ (রা) ইবনুল হারিছও শামিল ছিলেন। এই বিষবৎ অবরোধ পূর্ণ তিন বছর অব্যাহত ছিল। এই সময় সে জালেম অবরোধকারীরা যথাসম্ভব খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য মুসলমানদের নিকট পৌছতে দিত না। অবরুদ্ধদের শিশুরা ক্ষুধায় কাতরাতো। মুশরিকরা তাদের কান্না শুনে খুব পুলক অনুভব করতো। মহিলাদের বুকের দুধ শুকিয়ে গিয়েছিল এবং অবরুদ্ধদের মুখে কয়েকদিন পর্যন্ত কিছু যেতো না। কোন কোন সময় অসহায় অবরুদ্ধরা গাছের পাতা খেয়ে পেট পুরতেন। কোথাও থেকে যদি শুকনো চামড়া পেতেন তাহলে তা ভুনে ছাতুর মত করে তা উদরস্থ করতেন। এত দুঃখ-কষ্ট ও মুসীবত সত্ত্বেও তিন বছরের এই দীর্ঘ সময়ে এক মুহূর্তের জন্যও অবরুদ্ধরা মক্কার ইয়াতীম নবীর (সা) সান্নিধ্য পরিত্যাগ করার কল্পনাও করেননি। অবশেষে তিন বছর পর মুশারিকদের মধ্যকার কতিপয় ব্যক্তির কিছু রহম হলো এবং তারা সে নির্যাতনমূলক চুক্তি ভঙ্গ করে বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবকে শিআ'বে আবি তালিব থেকে বের করে নিয়ে এলো। সে অবরোধকালে হযরত উবাইদাহ (রা) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত ধৈর্য ও সহ্যের সঙ্গে প্রিয় নবীকে (সা) সহযোগিতা করেন।

সারওয়ারে কায়েনাত (সা) যখন সাহাবায়ে কিরামকে (রা) মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন তখন হযরত উবাইদাহ (রা) ইবনুল হারিছও সহোদর তোফায়েল (রা), হাছিন (রা) ও ভ্রাতুষ্পুত্র মিসতাহ (রা) বিন আছাছাসহ (বিন উবাদ বিন মুত্তালিব) হিজরত করে মদীনা পৌছলেন এবং হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আজলানীর গৃহে অবস্থান করলেন। হিজরতের সময় তাঁর বয়স ৬০ বছরের মত ছিল এবং তিনি রহমতে আলমের (সা) নিকট অত্যন্ত মর্যাদাবান ছিলেন। এ জন্যই লোকদের মধ্যে তিনি "শাইখুল মুহাজিরীন" লকবে মশহুর হয়ে গিয়েছিলেন। প্রিয় নবী (সা) হযরত উবাইদাহকে (রা) স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য মদীনায় এক টুকরো জমি দান করেছিলেন। সেখানেই তিনি নিজের পুরো খান্দানসহ বসবাস করেন। মুহাজিরদের মধ্যে হযরত উবাইদাহ'র (রা) ভ্রাতৃত্ব হযরত বিলাল (রা) বিন রাবাহ হাবশীর সঙ্গে কায়েম ছিল। হুযূর (সা) যখন মুহাজির ও আনসারদের

মধ্যে ভ্রাতৃত্ব কায়েম করেন তখন হযরত উবাইদাহকে (রা) হযরত উমায়ের (রা) বিন হুমাম আনসারীর দীনী ভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন।

হিজরতের পর মুসলমানদের কিছুটা শান্তি জুটেছিল এবং কাফেরদের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। এ সত্ত্বেও মক্কার মুশরিকদের হামলার ভীতি সব সময়ই ছিল। এই ভীতি তদারকির জন্য বিশ্বনবী (সা) সাহাবীদের (রা) ছোট ছোট দল প্রায়ই মক্কার দিকে অথবা মদীনার উপকণ্ঠে প্রেরণ করতেন। এ ধরনের অভিযান 'সারইয়া' নামে পরিচিত। শত্রুদের তৎপরতার ওপর দৃষ্টি রাখাই ছিল এ সব অভিযানের লক্ষ্য। যাতে তারা অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে হামলা করে না বসে। বদরের যুদ্ধের পূর্বে যেসব সারইয়া বা লড়াই সংঘটিত হয়েছিল তার মধ্যে একটির নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন হযরত উবাইদাহ (রা)। এ অভিযান প্রথম হিজরীর শওয়াল মাসে সংঘটিত হয় এবং তা "সারইয়া উবাইদাহ (রা) বিন হারিছ" অথবা "সারইয়া রাবেগ" নামে মশহুর। হুযূরে আকরাম (সা) এ অভিযানে ৬০ অথবা ৮০ জন মানুষ দিয়ে হযরত উবাইদাহ (রা) বিন হারিছকে কুরাইশদের তৎপরতা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানোর জন্য রাবেগ উপত্যকার দিকে প্রেরণ করেন। হেজাযের উপকূলবর্তী এলাকায় ছানিয়াতুল মাররাহ নামক স্থানে মুসলমানরা কুরাইশদের একটি কাফেলার মুখোমুখী হয়। এই কাফেলার নেতৃত্বে ছিল আবু সুফিয়ান (অথবা অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী ইকরামা বিন আবি জাহল)। তার অধীন ছিল দু'শ মানুষ। কুরাইশদের সংখ্যা যদিও বেশী ছিল; কিন্তু তারা যুদ্ধ করতে চায়নি। পিঠ বাঁচিয়ে চলে যায়। হযরত উবাইদাহর (রা) অধীন হযরত সা'দ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসের মত উৎসাহী মুজাহিদও ছিলেন। তিনি এ সময় হক পথে একটি তীরও নিক্ষেপ করেছিলেন। সহীহ বুখারীতে হযরত সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি প্রথম আরব যে আল্লাহ্র পথে প্রথম তীর চালিয়েছিলো। সারইয়া উবাইদাহ (রা) বিন হারিছ থেকেই সর্বপ্রথম আল্লাহর পথে তীর চালানো হয়।

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে, হযরত উবাইদাহ (রা) ইবনুল হারিছ সর্বপ্রথম সাহাবী যাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা) কোন সারইয়ার নেতৃত্বের জন্য নিশান অথবা ঝান্ডা প্রদান করেছিলেন। কিন্তু অন্য কতিপয় রেওয়ায়াত অনুযায়ী রাসূলের (সা) চাচা হযরত হামযাহ (রা) বিন আবদুল মুত্তালিব সর্বপ্রথম এই সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

দ্বিতীয় হিজরীর ১৭ই রমযানুল মুবারকে বদরের ময়দানে হকের ঝান্ডাবাহী এবং বাতিল পূজারীরা পরস্পর মুখোমুখী হয়। এ সময় হযরত

উবাইদাহ (রা) বিন হারিছও রহমতে আলমের (সা) সঙ্গে ছিলেন। কুরাইশ বাহিনী থেকে সর্বপ্রথম (আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশের সারইয়াতে (মৃত্যুবরণকারী) আমর ইবনুল হাজরামীর ভাই আমের হাজরামী অগ্রসর হয়ে যুদ্ধের আহবান জানালো। হযরত ওমর ফারুকের (রা) গোলাম হযরত মাহজা' তার মুকাবিলার জন্য বের হলেন এবং বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে শাহাদাতবরণ করেন। (তাবারী এবং অন্য আরো কতিপয় ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন যে, আমেরের সঙ্গে মুকাবিলার সময় কোন বদ মুশরিক তাঁর ওপর তীর নিক্ষেপ করে এবং তিনি সে তীরের আঘাতে মৃত্যুবরণ করেন) তারপর উতবাহ ও শাইবাহ (রবিয়াহ বিন আবদি শামস বিন আবদি মান্নাফের পুত্র) ও ওয়ালিদ বিন উতবাহ সামনে অগ্রসর হলো এবং মুকাবিলার জন্য মুসলমানদের প্রতি আহবান জানালো। মুসলমানদের পক্ষ থেকে হারিছের পুত্র হযরত আওফ (রা), হযরত মাআ'য (রা) এবং মুআব্বিয (রা) মুকাবিলার জন্য বের হলেন। (কতিপয় রেওয়ায়াতে হযরত আওফ (রা) এবং কতিপয় রেওয়ায়াতে হযরত মুয়াব্বিযের (রা) স্থানে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা আনসারীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে) এ তিন জনই আনসারী ছিলেন। উতবাহ তাঁদের নাম ও নসব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। যখন জানতে পেলো যে, তারা মদীনাবাসী তখন ডেকে বললো ঃ "মুহাম্মাদ! এরাতো আমাদের বরাবর নয়।"

এ কথায় হুযূর (সা) তিন আনসারী মুজাহিদকে পিছু হটে আসার নির্দেশ দিলেন এবং হযরত হামযাহ (রা), আলী (রা) এবং উবাইদাহকে (রা) সম্বোধন করে বললেন ঃ "হামযাহ, আলী, উবাইদাহ যাও এবং দীনে হকের জন্য তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর।"

তিন যুবক বর্শা দুলিয়ে দুলিয়ে শত্রুদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে, প্রিয় নবী (সা) বনূ আবদি শামসের তিন যোদ্ধার মুকাবিলায় তিন জন হাশেমীকে প্রেরণের ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। কিন্তু তাতে সমস্যা ছিল যে, যেখানে কুরাইশ বাহিনীতে আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব, নওফিল বিন হারিছ বিন আবদুল মুত্তালিব, মুগীরাহ বিন আবদুল মুত্তালিব এবং আকিল বিন আবি তালিব এই চারজন হাশেমী ছিলেন সেখানে ইসলামী বাহিনীতে হুযূর (সা) ছাড়া হযরত হামযাহ (রা) এবং হযরত আলী (রা) মাত্র দু' জন হাশেমী ছিলেন। এ জন্য তিনি (সা) হযরত উবাইদাহকে (রা) শামিল করে সেই কমতি পূরণ করেছিলেন। হযরত উবাইদাহ ছিলেন মুত্তালিবী এবং বনূ হাশেমের মিত্র।

আল্লামা ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, হযরত হামযাহ (রা) উতবাহর সামনে দাঁড়িয়ে হুংকার দিয়ে বললেন, "আমি হলাম হামযাহ বিন আবদুল মুত্তালিব। আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাঘ।"

উতবাহ তার জবাবে বললেন, "আমি আমার খলীফাদের বাঘ। তোমার সঙ্গে এরা কারা?"

হযরত হামযাহ (রা) বললেন, "এরা হলো আলী (রা) বিন আবি তালিব এবং উবাইদাহ (রা) বিন হারিছ"।

উতবাহ বললো, "হাঁ, তারা আমাদের বরাবর এবং জোড়ার মানুষ।"

যুদ্ধ শুরু হলে উতবাহ হযরত হামযার (রা) হাতে এবং ওয়ালিদ হযরত আলীর (রা) হাতে মারা যায়। এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তায়িমা বিন আদি বিন নওফিলের আবেগ উতলে উঠলো এবং হুংকার দিয়ে অগ্রসর হলো। কিন্তু শেরে খোদা হযরত হামযাহ (রা) এক আঘাতেই তাকে লাশ করে ফেললেন। অবশ্য হযরত উবাইদাহ (রা) এবং শাইবার মধ্যে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত সংঘর্ষ অব্যাহত রইলো। এমনকি তারা উভয়েই ক্লান্ত হয়ে পড়লো। কিন্তু শেষ বার শাইবাহ নিজের তরবারী দিয়ে হযরত উবাইদাহর (রা) ওপর প্রচন্ড আঘাত হানলো। এ আঘাতে তিনি মারাত্মক আহত হলেন। তার একটি পা শহীদ হয়ে গেল এবং পায়ের গোছার হাড় থেকে মজ্জা বের হতে লাগলো, তা দেখে হযরত আলী (রা) (অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত হামযাও) সেদিকে অগ্রসর হলেন এবং শাইবাকে জাহান্নামে পৌছে দিয়ে হযরত উবাইদাহকে (রা) যুদ্ধের ময়দান থেকে উঠিয়ে আনলেন)।

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে, হযরত উবাইদাহর (রা) মুকাবিলা হয়েছিল উতবাহর সঙ্গে। সে ছিল তাঁর সমবয়সী এবং তিনি উতবাহর আঘাতে আহত হয়েছিলেন। হযরত হামযাহ (রা) শাইবাকে হত্যা করেছিলেন এবং হযরত আলী (রা) ওয়ালিদকে। এক রেওয়ায়াতে এও আছে যে, উবাইদাহ (রা) ওয়ালিদের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন এবং তার হাতেই আহত হয়েছিলেন। অন্যদিকে হযরত আলী (রা) শাইবাকে এবং হযরত হামযা (রা) উতবাহকে খতম করেছিলেন। যা হোক, কুরাইশের তিন যুদ্ধবাজ আল্লাহর বাঘদের হাতে নিজেদের পরিণাম ভোগ করেছিল। তাদের মধ্যে উতবাহ'র মর্যাদা সবচেয়ে বেশী ছিল। তিনি বনূ আবদি শামছের সরদার এবং কুরাইশ বাহিনীর সেনাপতি ছিল।

হযরত উবাইদাহকে (রা) যখন রহমতে আলমের (সা) খিদমতে উঠিয়ে আনা হলো তখন তাঁর শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর অবস্থা দেখে

হুযূর (সা) মনে মনে খুব কষ্ট পেলেন। তিনি তাঁদেরকে শান্ত্বনা দিলেন এবং নিজের পবিত্র মাথা স্নেহস্বরূপ তাঁর উরুর ওপর রেখে দিলেন। হযরত উবাইদাহ (রা) প্রিয় নবীর (সা) খিদমতে আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমার কি শাহাদাতের মৃত্যু নসীব হবে না?"

হুযূর (সা) বললেনঃ "নিসন্দেহে তুমি শহীদ এবং নেককারদের নেতা।"

ওহীর ধারক ও রাসূলুল্লাহর (সা) ইরশাদ শুনে হযরত উবাইদাহ'র (রা) চেহারা খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং তিনি আরয করলেন ঃ

"আবু তালিব যদি আজ জীবিত থাকতেন এবং আমাকে এই অবস্থায় দেখতেন তাহলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হতো যে, আমি তাঁর সেই কথার কতখানি যোগ্য।" তাঁর কথা ছিল "আমরা রাসূলকে হেফাজত করবো। এমনকি তাঁর চার পাশে জীবন দিয়ে দিব এবং নিজের সন্তান-সন্ততি থেকে বেপরওয়া হয়ে যাবো।"

বদরের যুদ্ধের পর ইসলামী বাহিনী মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলো। পথিমধ্যেই হযরত উবাইদাহর (রা) শেষ সময় এসে উপস্থিত হলো। তাঁর পবিত্র রূহ সাফরা উপত্যকায় পরপারের দিকে যাত্রা করলো এবং সেই উপত্যকাতেই তাঁর লাশ স্থায়ী শয়ানে শায়িত হলো। তাঁর লাশ দাফনের পর বেশ কিছু দিন যাবত চারদিকে মিশকের খোশবু বইতো। কেউ সে পথ দিয়ে গমন করলে সেই সুগন্ধীতে সে মাতোয়ারা হয়ে যেত।

শাহাদাতের সময় হযরত উবাইদাহ'র (রা) বয়স ৬৩ বছর হয়েছিল। তিনি চার কন্যা খাদিজা, সুফিয়া, সানজালা ও রাইতা এবং ছ' পুত্র মাবিয়া, হারিছ, মুহাম্মাদ, মানকাজ, আওন ও ইবরাহীমকে রেখে যান।

হযরত হাতিব (রা) বিন আবি বালতাআহ্

ষষ্ঠ হিজরী। হুদায়বিয়ার সন্ধির পরের ঘটনা। একদিন রহমতে আলম (সা) মুসলমানদেরকে মসজিদে নববীতে একত্রিত করলেন এবং তাঁদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "হে মানুষেরা! আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন। এখন সেই রহমত বন্টন করার সময় এসেছে। উঠে দাঁড়াও এবং সমগ্র দুনিয়াকে হকের দাওয়াত দাও"।

তারপর হুযূরে আকরাম (সা) প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্রপ্রধান ও নেতাদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্রাবলী লিখলেন এবং তাদেরকে তা পৌছানোর জন্য কতিপয় হুশিয়ার ও বুদ্ধিমান সাহাবী (রা) নির্বাচিত করলেন। মিসরের শাসক মুকাওকিসকে নবীর (সা) পত্র পৌছানোর দায়িত্ব যাঁর ওপর অর্পিত হলো তিনি হলেন ৪০ বছর বয়সের একজন পুরাতন মুসলমান এবং রাসূলের (সা) প্রতি জীবন উৎসর্গকারী। তিনি কিছুটা খর্বাকৃতির ছিলেন। কিন্তু তাঁর দেহের গঠন প্রকৃতি ছিল ভারসাম্যপূর্ণ। তিনি সুদর্শন ছিলেন। চেহারায় ছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার ছাপ। তিনি রাসূলের (সা) পবিত্র পত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং তা নিয়ে মিসর রওয়ানা হলেন। রাজধানী ইস্কান্দারিয়াতে পৌছে মিসরের শাসক মুকাওকিসকে নিজের আগমনের খবর দিলেন। এ খবর পেয়ে মিসরের শাসক নিজের কর্মকর্তাদেরকে আরবের দূতের সঙ্গে সুন্দর ও মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার এবং তাঁর অবস্থান ও উত্তম খাবারের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিলেন। দু'-তিন দিন পর সে আরব দূতের সঙ্গে আলোচনার জন্য নিজের দরবারে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ধর্মীয় নেতাদেরকে তলব করলেন এবং আরব দূতকেও ডেকে পাঠালেন।

আরব দূত দরবারে তাশরীফ আনলেন মুকাওকিস তাঁকে সহাস্য বদনে স্বাগত জানালেন এবং তাঁকে সেই স্থানে বসালেন যেখানে বাদশাহদের দূতকে বসানো হতো। আলাপ-আলোচনাকালে মুকাওকিস জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "মুহাম্মাদ (সা) কি প্রকৃতই আল্লাহর প্রেরিত নবী?"

আরব দূত ঃ "নিশ্চয়ই"।

মুকাওকিস ঃ যদি তাই হয়, তাহলে যখন তাঁর কওম তাঁকে নিজের

পিতৃভূমি থেকে বহিষ্কার করেছিল তখন তিনি বদদোয়া কেন করেননি?"

আরব দূত : "আপনি কি হযরত ইসা (আঃ) বিন মারয়ামকে আল্লাহর সত্যিকার পয়গম্বর হিসেবে মানেন?"

মুকাওকিস : "অবশ্যই"

আরব দূত : "যদি তাই হয়, তাহলে যখন তাঁকে শূলে চড়ানো হয়, তখন তিনি নিজের কওমের জন্য বদদোয়া কেন করেননি?"

মুকাওকিস এ জবাব শুনে হতভম্ব হয়ে পড়লেন এবং বলে উঠলেন, "অবশ্যই তুমি নিজেও বিজ্ঞ এবং যে ব্যক্তিত্বের পক্ষ থেকে এসেছো তিনিও বড় হিকমতওয়ালা মানুষ।"

রাসূলের (সা) এই সাহাবী (রা) যাঁর বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা ক্ষমতায় মদমত্ত এক খৃষ্টান শাসককে শুধু নিজের বিজ্ঞতাই নয়, বরং রাসূলের বিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা ও হিকমতের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করেছিলেন তিনি ছিলেন হযরত হাতিব (রা) বিন আবী বালতাআহ।

সাইয়েদুনা হযরত আবু আবদুল্লাহ (অথবা আবু মুহাম্মদ) হাতিব (রা) বিন আবি বালতাআহ ইয়েমেনের বাসিন্দা এবং বনূ লাগাম বিন আদির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলো : হাতিব বিন আবি বালতাআহ বিন উমায়ের বিন সালমাহ বিন সায়াব বিন সাহাল বিন আনআতিক বিন সায়াদ বিন রাশিদাহ (খালিফাহ) বিন ইজব বিন জাযিলাহ বিন লাখাম বিন আদি।

কতিপয় চরিতকার তাঁকে কাহতানি বংশোদ্ভূত বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং অনেকে আবার তাঁকে বনূ মাযহাজ বংশের একজন সদস্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ চরিতকারের মত হলো তিনি ইয়েমেনী লাখামী ছিলেন। জাহেলী যুগে কালের বিপাকে তিনি মক্কা এসে পড়েন। সেখানে তিনি বনূ আসাদ বিন আবদুল উজ্জার সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন করে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান।

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে, হযরত হাতিব (রা) বনূ আসাদের এক ব্যক্তি উবায়দুল্লাহ বিন হামিদের গোলাম ছিলেন। কিন্তু অন্যরা লিখেছেন যে, তিনি হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়ামের মিত্র ছিলেন।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) " ইসাবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, জাহেলী যুগে হাতিব (রা) অন্যতম প্রখ্যাত অশ্বারোহী ছিলেন এবং কবিতা ও কাব্যে প্রভূত জ্ঞান রাখতেন।

হযরত হাতিবের (রা) বয়স তখন ২১-২২ বছর হবে। সে সময় রাসূলে আকরাম (সা) নবুওয়াত প্রাপ্ত হন এবং লোকদেরকে হকের দিকে আহবান করতে শুরু করলেন। আল্লাহ পাক তাঁকে সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। দাওয়াতের শুরুতেই তিনি তাওহীদকে আঁকড়ে ধরেছিলেন এবং সাইয়েদুল আনামের (সা) সাহাবীদের (রা) অন্তর্ভূক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। কতিপয় ঐতিহাসিক তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে শুধু এতটুকুন লিখাই যথেষ্ট মনে করেছেন যে, তিনি হিজরতের পূর্বে ঈমান আনেন। কিন্তু কেউ কেউ বিশেষভাবে লিখেছেন যে, তিনি হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়ামের সঙ্গে নবুওয়াতের প্রাথমিক বছরগুলোতে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। যাহোক, সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, তিনি "আসসাবিকুনাল আউয়ালুন"-এর পবিত্র দলের একজন সম্মানিত সদস্য ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর মক্কায় হযরত হাতিবের (রা) ওপর কি ঘটেছিল? এ ব্যাপারে চরিত গ্রন্থে বিস্তারিত কিছু পাওয়া যায়নি। অনুমান করা হয় যে, অন্য হক পন্থীদের সঙ্গে তিনিও কাফেরদের নির্যাতন সইতে থাকেন। নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরের পর হুযূর (সা) সাহাবায়ে কিরামকে (রা) মদীনায় হিজরতের সাধারণ অনুমতি প্রদান করেন। নবীর (সা) হিজরতের কিছুদিন আগে হযরত হাতিবও (রা) অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের (রা) মত মক্কার মাটিকে বিদায় জানিয়ে মদীনায় তাশরীফ নেন এবং উসবাহর মহল্লায় হযরত মানযার (রা) বিন মুহাম্মাদ আনসারীর বাড়ীতে অবস্থান করেন। সারওয়ারে আলম (সা) মদীনায় আগমনের পর মুহাজির এবং আনসারের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় হযরত হাতিব (রা) বিন আবি বালতাআহকে হযরত উয়ায়েম (রা) বিন সায়েদাহ আনসারীর ভাই বানিয়ে দেন।

যুদ্ধের সিলসিলা শুরু হলে সর্ব প্রথম হযরত হাতিবের (রা) তরবারী বদরের যুদ্ধে চকমক করে উঠলো এবং হকের দুশমনদের মাথার ওপর বিদ্যুৎ বেগে গিয়ে আপতিত হলো এই যুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি বীরত্ব প্রদর্শন করেন। মুশরিকরা পরাজিত হলে তাদের অনেক সঙ্গীকে মুসলমানরা গ্রেফতার করলো। বনূ আসাদের এক যুদ্ধবাজ হারিছ বিন আয়েজ হযরত হাতিবের হাতে গ্রেফতার হলো। হারিছের সঙ্গী বনী আসাদের দু'জন অন্য ব্যক্তি সায়েব বিন আবি জাবিশ এবং সালেম বিন শামমাখকে হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ এবং হযরত সা'দ (রা) বিন আবী ওয়াক্কাস গ্রেফতার

করেছিলেন। এ তিন জনকেই ওসমান বিন আবি জায়েশ চার হাজার দীনার ফিদিয়া দিয়ে মুক্ত করিয়েছিল।

বদরের পর হযরত হাতিব (রা) ওহোদ, খন্দক, খায়বার, মক্কা বিজয়, হুনায়েন, তায়েফ এবং তাবুক যুদ্ধে প্রিয় নবীর (সা) সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। এই মর্যাদার সঙ্গে ৬ষ্ঠ হিজরীতে তিনি বাইয়াতে রিদওয়ানে শরীক হওয়ার মহান সৌভাগ্যও লাভ করেন।

৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত হাতিবকে (রা) মিসরের শাসকের নিকট ইসলামের মুবাল্লিগ (দূত) বানিয়ে প্রেরণ করেন। হযরত হাতিব (রা) মুকাওকিসের নামে হুযূরের (সা) যে পবিত্র পত্র নিয়ে যান তার বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ ঃ

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহর বান্দাহ এবং তার রাসূল মুহাম্মাদের (সা) এই পত্র কিবতের মহান নেতা মুকাওকিসের নামে। সেই ব্যক্তির ওপর সালাম যে হেদায়াত অনুসরণ করে থাকেন। আমি তোমাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি এবং ইসলামের দিকে আহবান জানাচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করলে নিরাপদ থাকবে এবং আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দ্বিগুণ ছওয়াব দেবেন। আর যদি অস্বীকৃতি জানাও তাহলে কিবতীদের গুনাহ তোমার ওপর বর্তাবে। হে আহলি কিতাব! এমন এক কথার দিকে এসো যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বরাবর। তাহলো আমরা আল্লাহ ছাড়া কাউকেই ইবাদাত করবো না এবং তার সঙ্গে কাউকে শরীক করবো না এবং আমাদের মধ্যে কেউ অন্য কাউকে আল্লাহর সামনে পরওয়ারদিগার বানোবো না এবং তোমরা যদি এসব না মানো তাহলে সাক্ষী থেকো যে, আমরা (আল্লাহকে একক ও লাশরীক) মানি।"

হযরত হাতিব (রা) ইস্কান্দারিয়া পৌঁছে মুকাওকিসের দরবারে গেলেন। সে তাঁকে খুব সম্মান করলো। হুযূরের (সা) পবিত্র পত্র অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে চোখে লাগালো এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়লো। সে সময় হযরত হাতিব (রা) ও মুকাওকিসের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল তার সারমর্ম নিম্নরূপ ঃ

হযরত হাতিব ঃ "তোমার পূর্বে এখানে এক বাদশাহ ছিল। সে নিজেকে আল্লাহ মনে করতো। বস্তুতঃ আল্লাহতায়ালা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের আযাবে নিক্ষেপ করলেন এবং তার থেকে প্রতিশোধ নিলেন। অতএব, তুমি অন্যের

পরিণাম দেখে শিক্ষা গ্রহণ কর। এমন যেন না হয় যে, তোমাকে দেখে অন্যরা শিক্ষা গ্রহণ করে।"

মুকাওকিস ঃ আমরা পূর্ব থেকেই এক ধর্মের অনুসারী। আমরা সেই ধর্মকে ততক্ষণ পরিত্যাগ করতে পারি না যতক্ষণ অন্য কোন ভালো ধর্ম দেখতে না পাই।

হযরত হাতিব ঃ "আমরা তোমাকে ইসলামের দিকে আহবান জানাই। ইসলাম সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ দীন। আমাদের নবী (সা) যখন লোকদেরকে তার দাওয়াত দিলেন তখন তাঁর কওম কুরাইশরা কঠোর বিরোধিতা করলো। তেমনিভাবে ইহুদীরাও এ দীনের কঠোর দুশমন হিসেবে বিবেচিত হলো। কিন্তু নাসারা বা খৃষ্টানরা তাদের তুলনায় এ দীনের নিকটবর্তী ছিল। আল্লাহ্‌র কসম! মুসা (আ) যেমন মসিহ ইবনে মারয়ামের (আ) সুসংবাদ দিয়েছিলেন তেমনি মসিহ ইবনে মারয়াম (আ) মুহাম্মাদের (সা) সুসংবাদ দিয়েছিলেন। খৃষ্টানরা যেমন ইহুদীদেরকে ইঞ্জিলের দাওয়াত দেয় তেমনি আমরা তোমাদেরকে কুরআনের দিকে আহবান জানাই।

নবীদের (আ) সমসাময়িক জাতি তাঁর উম্মত হয়ে থাকে এবং তাদের ওপর তার আনুগত্য অত্যাবশ্যক। যেহেতু তোমরা এক নবীর যুগ পেয়েছ এ জন্য তাঁর ওপর ঈমান আনা তোমাদের অত্যাবশ্যক কাজ। আমরা তোমাদেরকে ঈসার (আ) দীন পরিত্যাগ করতে বলছি না। বরং বাস্তবত সেই পথেই যেতে চাই।"

মুকাওকিস হযরত হাতিবের (রা) বক্তৃতায় খুব প্রভাবিত হলো। কিন্তু রাষ্ট্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বিদ্রোহের ভয়ে সে দাওয়াতে হক কবুল করার সাহস পেলো না। এ সত্ত্বেও সে হুযূরের (সা) পবিত্র পত্র অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে হাতির দাঁতে নির্মিত এক পাত্রে বন্ধ করে তাতে মোহর লাগিয়ে নিজের বিশেষ দাসীর হেফাজতে রেখে দিলেন। দরবার শেষ হলে হযরত হাতিব (রা) নিজের অবস্থান স্থলে চলে গেলেন। দু'তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর মুকাওকিস পুনরায় হযরত হাতিবকে (রা) দরবারে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলো যে, তোমাদের পয়গাম্বর যদি সঠিকই হন তাহলে স্বদেশ ত্যাগের সময় নিজের কওমের জন্য তিনি বদদোয়া কেন করেননি। হযরত হাতিব (রা) তখন তার জবাবে তার নিকট প্রশ্ন করেন যে, হযরত ঈসা

(আ) শূলে চড়ার সময় নিজের কওমের জন্য বদ দোয়া কেন করেননি। তখন মুকাওকিস লা জবাব হয়ে হযরত হাতিব (রা) এবং রাসূলে আকরামের (সা) হিকমতের স্বীকৃতি দিল।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত হাতিব (রা) পাঁচ দিন পর্যন্ত ইস্কান্দারিয়াতে অবস্থান করেন। সেখান থেকে তিনি যখন রওয়ানা হলেন তখন মুকাওকিস তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে বিদায় জানান এবং হযূরের (সা) নামে একটি পত্র ছাড়া কিছু উপঢৌকনও হযরত হাতিবের (রা) সঙ্গে দিয়ে দিলেন। কতিপয় চরিতকার সেই উপঢৌকনসমূহের বিস্তারিত বিবরণ এভাবে দিয়েছেন ঃ

১। দুই দাসী। মারিয়াহ ও সিরীন,

২। এক দাসী। নাম অজ্ঞাত,

৩। "ইয়াফুব" নামের একটি গাধা,

৪। "দুলদুল" নামের একটি খচ্চর,

৫। একটি বর্শা, ৬। রেশমের একটি পোশাক,

৭। এক হাজার মিছকাল স্বর্ণ।

এছাড়া একশ মিছকাল স্বর্ণ হযরত হাতিবকে (রা) পুরস্কার স্বরূপ অথবা বিদায় সম্বর্ধনা হিসেবে প্রদান করলেন। হযরত হাতিব (রা) মদীনা মুনাওয়ারা ফিরে এইসব উপঢৌকন হযূরের (সা) খিদমতে পেশ করলেন এবং তিনি (সা) তা কবুল করলেন। মারিয়া কিবতিয়াকে (রা) নিজের খিদমতে রাখলেন। তাঁর গর্ভে হযূরের (সা) পুত্র ইবরাহীম (রা) জন্মগ্রহণ করেন। সিরীনকে হযরত হাসসান (রা) বিন সাবিতকে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর গর্ভে আবদুর রহমান বিন হাসসান (রা) জন্ম নেন। নাম না জানা দাসীকে হযরত জাহাম (রা) হুযায়ফাকে দেয়া হয়। "ইয়াফুব" বিশেষ সওয়ারী হিসেবে বিবেচিত হতো। হযূর (সা) বিদায় হজ্জের জন্য রওয়ানা হলে পথিমধ্যে তা মারা যায়। দুলদুলও বেশ কিছু দিন যাবত বিশেষ সওয়ারী ছিল। অতপর হযূরে আকরাম (সা) তা হযরত আলীকে (রা) দিয়ে দেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্র (৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকদ) অনুযায়ী মুসলমানরা মক্কায় সৈন্য পরিচালনা করতে পারতেন না। কিন্তু আল্লাহর কুদরত উপলব্ধি করার মত। ৮ম হিজরীতে স্বয়ং মক্কাবাসীই এই সুযোগ করে দেয়। উক্ত সন্ধিপত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিল যে, কোন কবিলা যদি উভয় পক্ষের কাউকে সমর্থন করে তাহলে তাকে কেউ ক্ষতি করবে না এবং তার মুকাবিলায় তার

শত্রুকেও সাহায্য করবে না। এই শর্ত অনুযায়ী বনূ খোযায়াহ কবিলা মুসলমানদের সমর্থন গ্রহণ করলো এবং বনূ বকর নিল কুরাইশের সমর্থন। চুক্তির দেড় বছর পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই চলতে লাগলো। কিন্তু বনূ বকর একদিন বনূ খোযায়ার ওপর হামলা করে বসলো। অত্যন্ত নৃশংসতার সাথে তাদের পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের হত্যা করলো। এমনকি হরমে আশ্রয় গ্রহণকারীদেরকেও তারা পরিত্রাণ দিল না। কুরাইশরা সে সময় প্রকাশ্যে বনূ বকরকে সাহায্য করলো এবং এভাবে হুদায়বিয়ার চুক্তি ভেঙ্গে ফেললো। বনূ খোযায়াহ ৪০ ব্যক্তির একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় প্রেরণ করলো। এই দলের নেতা ছিলেন আমর বিন সালেম খোযায়ী। তিনি হুযূরের (সা) খিদমতে উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত দরদপূর্ণ ভাষায় বনূ বকর ও কুরাইশের লোমহর্ষক নির্যাতনের কাহিনী শুনালেন। এ কাহিনী শুনে হুযূর (সা) খুব দুঃখিত হলেন। তিনি কুরাইশের নিকট দূত প্রেরণ করলেন। এই দূত তাঁর পক্ষ থেকে তাদের সামনে এ তিন শর্ত পেশ করলেন ঃ

১। বনূ খোযায়ার নিহতদের দিয়্যাত আদায় করতে হবে।

২। কুরাইশ বনূ বকরের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবে। এ দু' শর্ত না মানলে তাহলে ঃ

৩। প্রকাশ্য ঘোষণা করতে হবে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধি ভেঙ্গে গেছে।

প্রিয় নবীর (সা) দূত যখন কুরাইশের নিকট পৌঁছলেন তখন তাদের কতিপয় আবেগতাড়িত ব্যক্তি অহংকারের সঙ্গে বললো যে, আমরা মুহাম্মাদের (সা) অধীনস্ত বা গোলাম নই। আমরা যা ইচ্ছা তাই করেছি। যাও, আমরা সন্ধি বা চুক্তির পরওয়া করি না। অথবা আমরা তৃতীয় শর্তই (চুক্তি ভেঙ্গে ফেলার) মেনে নিলাম।

দূত ফিরে গেলে কুরাইশদের সম্বিৎ ফিরে এলো। তারা যে অযৌক্তিক কথাবার্তা ও তৎপরতা দেখিয়েছে তা বুঝতে পারলো। এখন তারা আবু সুফিয়ানকে দূত বানিয়ে হুযূরের (সা) খিদমতে প্রেরণ করলো। উদ্দেশ্য, সে হুদায়বিয়ার সন্ধি নবায়ন করে আনবে। আবু সুফিয়ান মদীনায় পৌঁছে চুক্তি নবায়নের খুব চেষ্টা চালালো। কিন্তু তেমন কোন উপযুক্ত জবাব পেল না। উপায়ান্তর না দেখে মসজিদে গিয়ে নিজেই ১০ বছরের নতুন চুক্তির এক তরফা ঘোষণা দিয়ে মক্কা ফিরে এলো। এদিকে বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) অত্যন্ত চুপ-চাপ মক্কায় সৈন্য পরিচলনার প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। তিনি চাইতেন যে, মক্কাবাসীরা যেন মুসলমানদের প্রস্তুতি ও ইচ্ছার কথা কোনক্রমেই জানতে না পারে। এ জন্য প্রস্তুতিকালে তিনি সাহাবায়ে

কিরাম (রা) কেও নিজের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেননি। হযরত হাতিব (রা) বিন আবী বালতাআহ অত্যন্ত মেধা ও প্রজ্ঞা সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তিনি নিজের দূরদর্শিতার মাধ্যমে বুঝে নিলেন যে, রাসূলে আকরাম (সা) মক্কার ওপর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজন মক্কায় ছিল। ধারণা করলেন যে, প্রায় সকল মুহাজিরের আত্মীয়স্বজন মক্কায় রয়েছে। তারা তাদের সম্পদ ও সন্তান সন্ততিকে যেভাবেই হোক রক্ষা করবেন। কিন্তু আমি তো কুফু বা বরাবর নই এবং আমার আত্মীয়-স্বজনের সমর্থক ও হিফাজতকারী সেখানে কেউ নেই। আমি যদি কুরাইশদেরকে মুসলমানদের সৈন্য পরিচালনার কথা সময়মত জানিয়ে দিই তাহলে তারা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হবে এবং আমার পরিবার-পরিজনকে হেফাজত করবে। বস্তুত তিনি একখানা চিঠি লিখে মক্কা গমনকারী এক মহিলার নিকট তা সপর্দ করলেন ও যে কোন অবস্থায় তা গোপন রাখার তাকিদ দিলেন এবং মক্কায় পৌছে চিঠিটি ইকরামা বিন আবু জাহলের হাতে দেয়ার কথা বললেন। এই কাজের বিনিময় স্বরূপ হযরত হাতিব (রা) সে মহিলাকে ১০ দীনার দিলেন। মহিলাটি চিঠি নিয়ে রওয়ানা হলো। এ সময় ওহীর মাধ্যমে প্রিয় নবী (সা) ঘটনা সম্পর্কে জানতে পেলেন। তিনি হযরত আলী (রা), হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়াম এবং হযরত মিকদাদ (রা) বিন আসওয়াদকে মহিলাটির পিছু ধাওয়া এবং তার নিকট থেকে চিঠিটি ছিনিয়ে আনার নির্দেশ দিলেন। এ তিন অশ্বারোহী সে মহিলাকে রাওদ্বায়ে খাক নামক স্থানে গিয়ে ধরলেন এবং চিঠি ছিনিয়ে নিয়ে ফিরে এলেন। এই চিঠি হুযূরের (সা) সামনে পড়া হলো। তিনি হাতিবকে (রা) সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হাতিব! কি ব্যাপার?"

তিনি আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমার ব্যাপারে ত্বরিত সিদ্ধান্ত নেবেন না। আল্লাহ্র কসম, আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সা) ওপর ঈমান রাখি। আমি আমার দীন পরিবর্তন করিনি এবং মুনাফেকী ও ধর্মদ্রোহীতা নিজের অন্তরে স্থান দেইনি। আমি একজন উদ্বাস্তু ও ইয়েমেনের বাসিন্দা। কুরাইশের মিত্র কিন্তু কুরাইশী নই। মক্কায় আমার কোন সমর্থক ও সাহায্যকারী ছিল না। এ জন্য আমি মনে করেছিলাম যে, নিজের কোন হক কুরাইশদের উপর স্থাপন করবো। যাতে তারা আমার পরিবার-পরিজনের সমর্থন ও হেফাজত করে। এ উদ্দেশ্যই আমাকে চিঠি লিখতে উদ্বুদ্ধ করে। এতে অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।"

এ কথা শুনে হুযূরে আকরাম (সা) সাহাবীদেরকে (রা) বললেন যে, হাতিব (রা) সত্য কথা বলে দিয়েছে। হযরত ওমর ফারুক (রা)ও সেই

মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আবেগময় হয়ে উঠলেন এবং বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! অনুমতি হলে এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই।"

হুযূর (সা) বললেন, "না, না, হে ওমর! হাতিব (রা) বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অন্তর আল্লাহ তায়ালা দেখছেন। তিনি তাদের অন্তরকে সমগ্র বিশ্ব থেকে উত্তম পেয়েছেন। এখন সে মুনাফিক হতে পারে না।"

রহমতে আলমের (সা) মুবারক ইরশাদ শুনে হযরত ওমরের (রা) চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। সহীহ বুখারীতে (কিতাবুল জিহাদ, বাবুল জাসূস) এ ঘটনা হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর জবানীতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে, যোবায়েরকে (রা) এবং মিকদাদ বিন আসওয়াদকে প্রেরণ করলেন এবং বললেন যে, তোমরা খাক নামক বাগানে যাও। ওখানে এক নিকাবধারী মহিলা পাবে। তার কাছে একটি চিঠি রয়েছে। তা ছিনিয়ে আনবে। আমরা ঘোড়া দৌড়িয়ে সেখানে গেলাম। রাওদ্বায়ে খাকে সেই নিকাবধারী মহিলাকে পেলাম। আমরা বললাম, চিঠি বের কর। মহিলাটি বললো, আমার কাছে কোন চিঠি নেই। আমরা বললাম, নিজেই বের করে দাও। নচেৎ তোমার দেহ তল্লাশী করা হবে। (অর্থাৎ তোমাকে ল্যাংটা করা হবে)। এ কথার পর সে (মাথার) খোঁপার (অথবা কোমর) থেকে চিঠি খানা বের করলো। আমরা তা নিয়ে রাসূলের (সা) নিকট এলাম। চিঠিটি ছিল হাতিব (রা) বিন আবী বালতাআর পক্ষ থেকে মক্কার কতিপয় মুশরিকের নামে। তাতে রাসূলের (সা) কতিপয় ব্যাপার উল্লেখ ছিল। তিনি (সা) হাতিবকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে হাতিব! ব্যাপার কি? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াতাড়ি করবেন না। আমি কুরাইশের মিত্র ছিলাম। কুরাইশী ছিলাম না। আপনার সঙ্গে যে সব মুহাজির রয়েছেন, মক্কায় তাঁদের আত্মীয়-স্বজন আছেন। তারা তাঁদের পরিবার-পরিজন ও সম্পদ হেফাজত করবে। তাদের সঙ্গে আমার যেহেতু কোন সম্পর্ক নেই তাই তাদের সঙ্গে এমন কোন ইহসান করতে চেয়েছিলাম যাতে তারা আমার আত্মীয়-স্বজনকে সমর্থন করে। আল্লাহর কসম! একাজ আমি কুফুরীর ভিত্তিতে করিনি। ধর্মদ্রোহীতার কারণেও করিনি। অথবা কুফুরীর ওপর সম্মতির ভিত্তিতেও তা করিনি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যা সত্য তাই সে বলে দিয়েছে। ওমর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অনুমতি পেলে এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই। তিনি বললেন, সে বদরে অংশ নিয়েছে এবং তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ তাআলা

আহলে বদর সম্পর্কে জেনেই বলে দিয়েছেন, তোমরা যা ইচ্ছা তাই কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।"

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হুযূর (সা) চিঠির বিষয়বস্তু শোনার পর হযরত হাতিবকে (রা) মসজিদ থেকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। কতিপয় সাহাবী (রা) হযরত হাতিবকে (রা) ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে চললেন। এ পরিস্থিতিতে হযরত হাতিব (রা) অসহায় হয়ে পেছনে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলেন, যাতে হুযূর (সা) তাঁর প্রতি দয়ার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং বাস্তবিকই রাসূলের (সা) রহমের দরিয়া উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, হাতিবকে (রা) আমার নিকট নিয়ে এসো। তিনি যখন লজ্জায় আনত হয়ে হুযূরের (সা) সামনে দাঁড়িয়েছিলেন তখন তিনি বললেন, আমি তোমার অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছি। এখন আল্লাহ তায়ালার নিকট নিজের মাগফিরাতের জন্য দোয়া কর। ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ কখনো করবে না।

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত হাতিব (রা) যে মহিলাটির নিকট চিঠি দিয়েছিলেন তার নাম ছিল সারাহ। সে ছিল আবু ওমর বিন ছাইফী বিন হাশিমের বাঁদী। গান-গাওয়া এবং শোক-গাঁথা গেয়ে বেড়ানো ছিল তার পেশা। মক্কা বিজয়ের কিছু দিন পূর্বে হুযূরের (সা) নিকট থেকে আর্থিক সাহায্য লাভের জন্য মদীনা আসে। প্রিয় নবী (সা) ও মুহাজির সাহাবীরা (রা) সামর্থ্য অনুযায়ী নগদ অর্থ এবং কাপড় তাকে দান করেন এবং পাথেয় ও সওয়ারীও যোগাড় করে দেন। সে যখন রওয়ানা দেয় তখন হযরত হাতিব (রা) পৃথকভাবে এই চিঠি তাকে প্রদান করেন।

ইবনে আসীর বর্ণনা করেছেন, একজন মুশরিক কবি ইবনে খাতাল বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা) ও সাহাবীদের (রা) প্রসঙ্গে ব্যঙ্গ কবিতা সারাহকে স্মরণ করিয়ে দিত। সে কবিতা সে সূর দিয়ে গাইত। এ জন্য হুযূর (সা) তাকে ওয়াজিবুল কতল (তার রক্ত বৈধ) ঘোষণা করেছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন হযরত আলী (রা) তাকে হত্যা করেন। কিন্তু ইবনে হিশাম এবং আল্লামা আবুল ফাতাহ ফতহুদ্দিন মুহাম্মাদ লিখেছেন, হুযূর (সা) সারাহকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কয়েক বছর পর হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে তিনি ওফাত পান। কথিত আছে যে, সওয়ারির ঘোড়ার ধাক্কা লেগে তিনি মারা যান।

সহীহ বুখারীতে (কিতাবুত তাফসীরে) আছে যে, হযরত হাতিবের ঘটনার পর কুরআন পাকে এই আয়াত নাযিল হলো ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ۚ

"হে মুমিনগণ! আমার এবং তোমাদের দুশমনকে দোস্ত বানিও না। তোমরা তাদেরকে বন্ধুত্বপূর্ণ চিঠি প্রেরণ কর। অথচ তোমাদের নিকট যে দীনে হক এসেছে তা তারা অস্বীকার করেছে।" আল মুমতাহিনাহ–১

হাফেজ ইবনে আবদুল বার বর্ণনা করেছেন, রহমতে আলমের (সা) ওফাতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খিলাফতের দায়িত্বে সমাসীন হওয়ার পর তিনিও হযরত হাতিবকে (রা) মিসরের বাদশাহ মুকাওকিসের নিকট দূত হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি এমন সুন্দরভাবে দূতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন যে, ইসলামী রাষ্ট্র ও মিসর সরকারের মধ্যে এক বন্ধুত্বমূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দুই সরকার কয়েক বছর পর্যন্ত সেই চুক্তির উপর বহাল ছিলেন। পরে এমন কতকগুলো কারণের উদ্ভব হলো যে, মুসলমানরা (হযরত ওমর ফারুকের খিলাফতকালেই) মিসরের ওপর হামলা করতে বাধ্য হলো।

মিসরের দূতগিরি থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হযরত হাতিব (রা) বিন আবী বালতাআহ অবশিষ্ট জীবন মদীনায় অত্যন্ত চুপচাপ কাটিয়ে দেন। তাবকাতে ইবনে সাআদ ও মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলের (র) কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, তিনি জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্যবসা করতেন এবং প্রচুর লাভ করেছিলেন। হযরত ওমর ফারুকের (রা) শাসনামলে একবার বাজারে তিনি এত সস্তা মুনাক্কা বিক্রী করা শুরু করলেন যে, অন্যান্য দোকানদারের লোকসানের আশংকা দেখা দিল। তাতে আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁকে মূল্য বৃদ্ধির নির্দেশ দিলেন অথবা তা বাজারের বাইরে নিয়ে যেতে বললেন।

এক রেওয়ায়াতে আছে, তিনি একটি হোটেল খুলেছিলেন। তাতে এতো লাভ করেছিলেন যে, তা দিয়ে কয়েকটি বাড়ী বানিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও ওফাতের সময় চার হাজার দীনার নগদ ছিল।

হযরত হাতিব (রা) হযরত ওসমান যুন্নূরাইনের (রা) খিলাফতকালে ৩০ হিজরীতে ওফাত পান। সে সময় তাঁর বয়স ৬৫ বছর অতিক্রম করেছিল। স্বয়ং আমীরুল মুমিনীন জানাযার নামায পড়ান। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) লিখেছেন যে, তাঁর জানাযা ও দাফনে বিরাট সংখ্যক মুসলমান অংশ নিয়েছিলেন। স্ত্রী ও সন্তান সম্পর্কে চরিত গ্রন্থে কিছু পাওয়া যায়নি।

প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণ, হিজরত, বদর, বাইয়াতে রিদওয়ান এবং অন্য সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ হযরত হাতিব (রা) বিন আবি বালতাআর বিশেষ বৈশিষ্ট।

স্বয়ং নবী করীম (সা) তাঁর গুণের প্রশংসাকারী ছিলেন। এক রেওয়ায়াতে আছে যে, প্রকৃতিগতভাবে তিনি একটু কঠোর ছিলেন। একবার তাঁর এক গোলাম রাসূলের (সা) দরবারে তাঁর কঠোর স্বভাবের অভিযোগ করলো এবং সঙ্গে সঙ্গে (ক্রোধান্বিত অবস্থায়) বললো, "হে আল্লাহর রাসূল। হাতিব অবশ্যই জাহান্নামে যাবে।" হুযূর (সা) বললেন, "না সে বদর ও হুনাইনে উপস্থিত ছিল।" অন্য এক হাদীসে এসেছে যে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ "যে মুসলমান বদর ও ওহোদে হাযির ছিল অবশ্যই সে দোযখে দাখিল হবে না।"

মক্কা বিজয়ের পূর্বে যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মুশরিকদের নিকট চিঠি লিখেছিলেন, সে ব্যাপারে রাসূলের (সা) নিকট আরয করেছিলেন। সুতরাং হুযূর (সা) তাঁর স্পষ্টবাদীতা এবং নেক নিয়তকে সামনে রেখে শুধু ক্ষমাই করেননি বরং তাঁর "বদরী" হওয়ার মর্যাদার জন্য প্রকাশ্যে প্রশংসাও করেছিলেন।

হযরত উককাশাহ (রা) বিন মিহসান আসাদী

একদিন রহমতে আলম (সা) মদীনার কবরস্থান "জান্নাতুল বাকী"তে তাওহীদ প্রদীপের কতিপয় পতঙ্গের মাঝে বসেছিলেন এবং সেখানে হাশরের দিনের কথা হচ্ছিল। আলোচনার মাঝে রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ "কিয়ামতের দিন এ কবরস্থানের ৭০ হাজার মানুষকে হিসাব-কিতাব ছাড়াই ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

হুযূরের (সা) ইরশাদ শুনে উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে একজন অত্যন্ত উৎসাহ ও নিষ্পাপ ভঙ্গিতে আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ যেন আমাকে তাঁদের একজন করে দেন।"

হুযূর (সা) বললেন, "তুমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।" একথা শুনে সে ব্যক্তি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন এবং তার মুখ দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা বাক্য বেরিয়ে এলো।

অন্য এক সাহাবী আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্যও দোয়া করুন।" হুযূর (সা) বললেন, "সাবাকাকা বিহা উককাশাতু অর্থাৎ উককাশাহ তোমার চেয়ে অগ্রগমন করে ফেলেছে। অতপর হুযূরের (সা) এই পবিত্র বাক্য উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। কোন ব্যক্তি যদি কোন কাজ আগে করতো তখন লোকজন বলতো "অমুক উককাশাহর মতো অগ্রগমন করেছে।"

হিসাব কিতাব ছাড়া জান্নাতে দাখিল হওয়ার সুসংবাদ পাওয়ার ব্যাপারে অন্যদের ওপর প্রাধান্য প্রাপ্ত এই উককাশাহ (রা) বিন মিহসান বিন হারদানের কলিজার টুকরো এবং বনূ আসাদ বিন খুযাইমার শাখা বনী গানাম বিন দাওদানের নয়নমণি ছিলেন। তাঁর পূর্ণ নসবনামা হলো ঃ উককাশাহ বিন মিহসান বিন হারদান বিন মাররাহ বিন কবীর বিন গানাম বিন দাওদান বিন আসাদ বিন খুযাইমা।

এ গোত্র জাহেলী যুগে বনূ আবদি শামসের (কুরাইশ) মিত্র ছিল। হযরত উককাশাহর (রা) কুনিয়ত ছিল আবু মিহসান এবং তিনি সেই সময় হক দাওয়াত কবুল করেছিলেন যখন এ কাজ শানিত তরবারীর ওপর চলার নামান্তর ছিল। এভাবে তিনি সাবিকুনাল আউয়ালুনের পবিত্র দলে অন্তর্ভুক্ত

হওয়ার মহান সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। কুরাইশ মুশরিকদের যুলুম-নির্যাতন যখন চরমে পৌছলো তখন হযরত উককাশাহর গোত্রের অনেক মানুষ (যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন) হযুরের (সা) ইঙ্গিতে হাবশা হিজরত করেন এবং সেখানে শান্তি ও নিরাপদ জীবনযাপন করতে লাগলেন। কিন্তু হযরত উককাশাহ (রা) মদীনা হিজরত পর্যন্ত মক্কাতেই অবস্থান করেছিলেন এবং হক পথে কাফেরদের যুলুম-নির্যাতন বীরত্বের সঙ্গে সইতে থাকেন। প্রিয় নবী (সা) যখন মদীনায় হিজরত করেন তখন উককাশাও (রা) অন্যান্যের সঙ্গে মক্কা ভূমিকে বিদায় জানিয়ে মদীনা পৌছে গেলেন।

মদীনায় সর্বপ্রথম "সারইয়ায়ে আবদুল্লাহ বিন জাহাশ"-এ তিনি অংশ নেন। এই সারইয়া বা যুদ্ধে বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা) হযরত আবদুল্লাহ বিন জাহাশকে ১০ অথবা ১২ জন সাহাবীর আমীর নিয়োগ করেন এবং একটি সীলমোহরযুক্ত চিঠি দিয়ে তাঁকে তা দু'দিন পথ চলার পর খোলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। দু'দিন পর হযরত আবদুল্লাহ (রা) চিঠিটি খুললেন। তাতে লেখা ছিল যে, "নাখলায় (মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থান) অবস্থান করে কুরাইশদের মতলব সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাও এবং আমাকে তা জানাও" হযরত আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমি রাসুলের (সা) নির্দেশ অবশ্যই পালন করবো। যিনি হক পথে জীবন কুরবানী করতে দ্বিধা করবেন না। তিনি আমার সঙ্গে যেতে পারেন এবং যিনি এ ব্যাপারে সম্মত হবেন না তিনি স্বেচ্ছায় ফিরে যেতে পারেন।

তাঁর সকল সঙ্গী (যাদের মধ্যে উককাশাহ (রা) বিন মিহসানও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন) এক বাক্যে বললেন যে, তাঁরা তাঁর সঙ্গে থাকবেন। বস্তুত এই দল সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে নাখলায় গিয়ে অবস্থান নিলেন। ঘটনাক্রমে কুরাইশের একটি বাণিজ্য দল মুসলমানদের তাঁবুর নিকটেই এসে থামলো। তারা মুসলমানদেরকে ভয় পেল। কিন্তু উককাশাহ বিন মিহসান পাহাড় থেকে এসে তাদের সামনে উপস্থিত হলেন। তিনি মাথা কামিয়ে রেখেছিলেন। এতে তারা নিশ্চিন্ত হলো, তারা মনে করলো এরা ওমরাহকারী। এদের নিয়ে ভয়ের কিছু নেই।

ওদিকে মুসলমানরা পারস্পরিক পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এ কাফেলাকে বেঁচে যেতে দেয়া উচিত হবে না। মুসলমানদের ধারণা ছিল যে, সেই দিনটি ছিল জমাদিউস সানীর শেষ দিন। কিন্তু বাস্তবে রজব মাস শুরু হয়ে গিয়েছিল। এ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। মুসলমানরা সন্দেহ ও সংশয়ের মধ্যে কুরাইশের মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে দিল। একজন মুজাহিদ কাফেলার নেতা আমর বিন হাজরামীকে তীর মেরে শেষ করে দিল

এবং হাকাম বিন কাইসান ও ওসমান বিন আবদুল্লাহ মাখযুমীকে গ্রেফতার করলো। কাফেলার অবশিষ্টরা পালিয়ে গেল। মুসলমানরা প্রভূত গনীমাতের মাল লাভ করলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) তার পঞ্চমাংশ পৃথক করে রেখে অবশিষ্টাংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সমান সমান ভাবে বন্টন করে দিলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) গনীমাতের মাল ও কয়েদীসহ নবীর (সা) খিদমতে এলেন। এ সময় হুযূর (সা) বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে হারাম মাসে যুদ্ধ করতে নিষেধ করিনি?"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) এবং তাঁর সঙ্গীরা ওযর পেশ করে বললেন যে, মাসের হিসাবে আমাদের ভুল হয়ে গেছে। আমাদের ধারণা ছিল যে, লড়াইয়ের দিন ছিল জমাদিউস সানীর শেষ তারিখ।

এদিকে মক্কার মুশরিকবৃন্দ ও ইহুদীরাও মুসলমানদেরকে এই বলে ভর্ৎসনা শুরু করলো যে, মুহাম্মাদ (সা) এবং তাঁর সঙ্গীরা হারাম মাসকে হালাল করে নিয়েছে।

সুতরাং হুযূর (সা) গনীমাতের মাল গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকলেই নিজেদের কাজের ওপর ভয়ানকভাবে লজ্জিত হলেন এবং আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে লাগলেন। সে সময় আল্লাহর রহমত জোশ মেরে উঠলো এবং এ আয়াত নাযিল হলো :

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ؕ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ؕ
وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ
مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ – (البقرة : ٢١٧)

"লোকজন আপনাকে হারাম মাসে যুদ্ধ করা জায়েয কিনা সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে থাকে। আপনি বলে দিন যে, হারাম মাসে যুদ্ধ করা বড় গুনাহর কাজ এবং আল্লাহর রাস্তা থেকে বিরত রাখা ও আল্লাহর সঙ্গে কুফুরী করা এবং মসজিদে হারাম থেকে মুসলমানদেরকে বের করে দেয়া আল্লাহর নিকট তা থেকেও বড় গুনাহর কাজ।"

এ আয়াত নাযিল হলে মুসলমানরা সান্ত্বনা পেলেন এবং হুযূরও (সা) গনীমাতের মাল গ্রহণ করলেন। নবীর (সা) যুদ্ধের সিলসিলা শুরু হলো। হযরত উককাশাহ (রা) বিন মিহসান বদর, ওহোদ, খন্দক, খাইবার, মক্কা বিজয়, হুনাইন, তাবুক সকল যুদ্ধেই বীরত্বের সঙ্গে অংশ নেন এবং সকল যুদ্ধেই অসাধারণ আন্তরিকতা সহকারে ত্যাগ ও বাহাদুরী প্রদর্শন করেন।

বদরের যুদ্ধে সহোদর আবু সিনান বিন মিহসান এবং ভ্রাতুষ্পুত্র সিনান বিন আবু সিনান বিন মিহসানকে সঙ্গে নিয়ে অংশগ্রহণ করেন এবং আশ্চর্য ধরনের বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) আল-ইসতিয়াবে লিখেছেন যে, যুদ্ধ করতে করতে তাঁর তরবারী খন্ড-বিখন্ড হয়ে গেল। তা দেখে হুযূর (সা) তাঁকে খেজুরের একটি ছড়ি প্রদান করলেন। তিনি এই ছড়ি নিয়েই শত্রু ব্যূহে ঢুকে পড়লেন এবং শেষ হওয়া পর্যন্ত বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। এই যুদ্ধে কুরাইশের একজন নাম করা যোদ্ধা মাবিয়া বিন কায়েস তাঁর হাতে নরকবাসী হয়েছিল।

৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউল আউয়ালে (অথবা অন্য রেওয়ায়াতে রবিউস সানীতে) রাসূলে আকরাম (সা) খবর পেলেন যে, বনু আসাদ বিন খুযাইমার একটি দল গামার মারযুক প্রস্রবণের নিকটে তাঁবু ফেলেছে এবং তারা মদীনার ওপর হামলা করতে চায়। প্রিয় নবী (সা) হযরত উককাশাহ (রা) বিন মিহসানকে ৪০ জন সওয়ার দিয়ে সেই সব দুষ্ট প্রকৃতির লোকদেরকে উৎখাতের নির্দেশ দিলেন। হযরত উককাশাহ (রা) তড়িৎ বেগে তাদের নিকট গিয়ে পৌছলেন। বনূ আসাদের লোকজন মুকাবিলা করার সাহস পেল না এবং তারা চরম বিশৃংখলার মধ্যে পলায়ন করল। হযরত উককাশাহ (রা) তাদের দুশ' উট সহ সাফল্যের সাথে মদীনায় ফিরে এলেন। এই অভিযান সারইয়াহ উককাশাহ (রা) বিন মিহসান অথবা সারইয়াহ গামার মারযুক নামে খ্যাত।

একই বছর হযরত উককাশাহ (রা) সেই চৌদ্দশ পবিত্র নফসের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন যাঁরা হুদাইবিয়া নামক স্থানে প্রিয় নবীর (সা) হাতে লড়াই করা ও মরার বাইয়াত করেন এবং "আসহাবুস শাজারাহ"র উপাধি লাভ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত হন।

১১ হিজরীতে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) ওফাত পান এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খিলাফতের দায়িত্বে সমাসীন হন। এ সময় সমগ্র আরবে কয়েকবার ধর্মদ্রোহীতার আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে। তখন খলিফাতুর রাসুল (সা) সাইয়েদুনা সিদ্দীকে আকবার (রা) অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতি সত্ত্বেও নজিরবিহীন অটলতা, বীরত্ব এবং ঈমানী আবেগ প্রদর্শন করেন। তিনি মুরতাদদের সকল দাবী কঠোরতার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন।

মুরতাদদের একটি শক্তিশালী দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিল তুলাইহা বিন খুয়াইলাদ। এ ব্যক্তি ছিল যোদ্ধা। আরবের অন্যতম বাহাদুর হিসেবে পরিগণিত হতো। প্রকৃতপক্ষে সে রাসূলের (সা) যুগের শেষ দিকে ধর্মদ্রোহীতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং নবুওয়াতের দাবীদার বনে যায়। হুযূর (সা) তার ধর্মদ্রোহীতা

এবং মিথ্যা দাবীর খবর শুনে হযরত জিরার (রা) বিন আযুরকে তাকে উৎখাতের জন্য নিয়োগ করেছিলেন। তুলাইহা হযরত উককাশাহ'র (রা) কবিলা বনূ আসাদ বিন খুযাইমার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল এবং হযরত জিরার (রা) বিন আযুরও সেই গোত্রের সদস্য ছিলেন। হযরত জিরার (রা) ওযারদাত নামক স্থানে তুলাইহা এবং তার সমর্থকদেরকে চরমভাবে পরাজিত করে। এই যুদ্ধে হযরত উককাশাহর (রা) ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত সিনান (রা) বিন আবি সিনান বিন মিহসান হযরত জিরারের (রা) সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশ নেন। প্রিয় নবী (সা) তাঁকে বিশেষভাবে খবর পাঠিয়ে বলেছিলেন যে, সে যেন জিরারের (রা) সঙ্গে মিলে তুলাইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। হযরত জিরার (রা) তুলাইহাকে পরাজিত করে মদীনা রওয়ানা হন। তিনি রাস্তাতেই ছিলেন এমন সময় প্রিয় নবীর (সা) ইন্তেকাল হয়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য বিভিন্ন দিকে সৈন্য প্রেরণ করেন। এ সময় হযরত উককাশাহ (রা) এবং হযরত জিরার (রা) খালিদ (রা) বিন ওয়ালীদের বাহিনীতে শামিল হয়ে যান। হযরত খালিদ (রা) সর্ব প্রথম তুলাইহার দিকে নজর দেন। হযরত জিরারের (রা) নিকট পরাজিত হয়ে সে বাযাখাতে অবস্থান করছিল এবং তাই, ফাযারাহ এবং আসাদ গোত্রকে নিজের ঝান্ডাতলে একত্রিত করেছিল। হযরত খালিদ (রা) হযরত উককাশাহ (রা) এবং হযরত সাবিত (রা) বিন আকরামকে তুলাইহাকে উচিৎ শিক্ষা দানের ব্যাপারে নিয়োগ করলেন। তাঁরা দেখা-শুনার জন্য স্ববাহিনীর আগে ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে যাচ্ছিলেন। ঘটনাক্রমে শত্রু সওয়ারের সঙ্গে সংঘর্ষ বেঁধে গেল। তাতে তুলাইহা এবং তার ভাই সালমাহ বিন খুয়াইলাদও শামিল ছিল। তুলাইহা হযরত উককাশার (রা) ওপর এবং সালমাহ হযরত সাবিতের (রা) ওপর হামলা করলো। হযরত সাবিত (রা) শীঘ্রই সালমাহ'র হাতে শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করলেন। কিন্তু হযরত উককাশাহ (রা) তুলাইহার ওপর এমনভাবে হামলা চালালেন যে, সে সালমাহকে নিজের সাহায্যের জন্য ডাকতে লাগলো। সালমাহ তৎক্ষণাৎ এদিকে অগ্রসর হলো এবং দু' সহোদর একত্রে হযরত উককাশাহকে (রা) নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে এনে ফেললো। উভয়েই আরবের নাম করা যোদ্ধা ছিল। কিন্তু হযরত উককাশাহ (রা) পূর্ণ অটলতার সঙ্গে উভয়ের মুকাবিলা করলেন। সমগ্র শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুকাবিলা অব্যাহত রাখলেন। এমনকি তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়ে গেলেন এবং মহাপ্রভুর দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

ইসলামী বাহিনী যখন সেখানে পৌছলো তখন সেখানে উভয় জানবাজকে (হযরত উককাশাহ (রা) ও হযরত সাবিত (রা)) মাটিতে রক্তাক্ত অবস্থায়

পড়ে থাকতে দেখে হতভম্ব হয়ে পড়লো। প্রিয় নবীর (সা) এই জীবন উৎসর্গকারীদের শাহাদাত কোন সাধারণ ঘটনা ছিল না। প্রত্যেকের চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো। হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন এবং সমগ্র বাহিনীকে থামিয়ে রাহে হকের দু' শহীদকে তাঁদের রক্তাক্ত কাপড়েই দাফন করলেন। তারপর তাঁরা সামনে অগ্রসর হয়ে তুলাইহাকে পরাজিত করলেন এবং সে সিরিয়ার দিকে পালিয়ে গেল। আল্লাহ্‌র কি শান! পরে সেই তুলাইহাকেই আল্লাহ তায়ালা তাওবার তাওফীক দিয়ে দিলেন এবং সিরিয়া অবস্থানকালেই সে সত্য অন্তরে দ্বিতীয়বার ইসলাম গ্রহণ করেন। একবার তিনি সিদ্দীকী খিলাফতকালে ওমরাহ পালনের জন্য মদীনার পাশ দিয়ে মক্কা যাচ্ছিলেন। এমন সময় একজন হযরত আবু বকর সিদ্দীককে (রা) খবর দিলেন যে, তুলাইহা যাচ্ছে। তা শুনে তিনি বললেন, "এখন সে ইসলামে দাখিল হয়েছে। যেতে দাও।"

হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে সে মদীনা এসে হযরত ওমরের (রা) খিদমতে হাযির হলো এবং বাইয়াতের ইচ্ছা প্রকাশ করলো। হযরত ওমর (রা) বললেন ঃ

"তুলাইহা, তুমি নিজের মনগড়া কথাকে আল্লাহ্‌র ওহী হিসেবে আখ্যায়িত করে আল্লাহ্‌র ওপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছ।"

তুলাইহা বললো, "আমিরুল মুমিনীন! এও কুফুরী ফিতনার অন্যতম ফিতনা ছিল। ইসলাম তা চিরকালের জন্য খতম করে দিয়েছে। এখন আমি আল্লাহ্‌র ক্ষমা প্রত্যাশী।"

হযরত ওমর (রা) এ কথা শুনে চুপ হয়ে গেলেন এবং তার বাইয়াত কবুল করে নিলেন। তুলাইহা নিজের অতীত জীবনের তৎপরতার ক্ষতিপূরণ এমনভাবে করেছিলেন যে, সে যুগের বিভিন্ন যুদ্ধে ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে জীবন বাজী রেখে অংশ নেন এবং অভাবনীয় সাফল্য প্রদর্শন করেছিলেন।

হযরত উককাশাহ'র (রা) সীরাতের মধ্যে ইসলাম গ্রহণে অগ্রগমন, হক পথে জীবন দান, জিহাদের উৎসাহ এবং আখিরাতের চিন্তা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক। আল্লামা ইবনে আসীর উসুদুল গাবাহ গ্রন্থে লিখেছেন যে, হযরত উককাশাহ (রা) অত্যন্ত জালীলুল কদর সাহাবী ছিলেন এবং শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হতেন।

বাস্তবত এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য ও মর্যাদার ব্যাপার আর কি হতে পারে যে, স্বয়ং নবী করীম (সা) তাঁকে হিসাব-কিতাব ছাড়াই জান্নাতে দাখিল হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাখরামা আমেরী

সবেমাত্র আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন মাখরামার গৌফ গজাতে শুরু করেছে। এমন সময় তিনি মক্কার লোকদের মধ্যে এক আশ্চর্য ধরনের আলোচনা শুনলেন। তারা বলছে, "আবদুল মুত্তালিবের এতিম পৌত্র বলছে, সে নাকি আল্লাহ্‌র রাসূল। মূর্তি পূজার যোগ্য নয়। সে কাউকে উপকারও করতে পারে না। আবার ক্ষতিও করতে পারে না। ইবাদাতের যোগ্য শুধু আল্লাহ তায়ালা। সে-ই প্রত্যেককে রিযিক দিয়ে থাকে এবং সে-ই সকল লাভ-লোকসানের মালিক।"

যুবক আবদুল্লাহ যদিও কুফর ও শিরকের পরিবেশে লালিত পালিত হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ পাক তাকে অত্যন্ত পবিত্র ও নেক স্বভাব দান করেছিলেন। কুরাইশের অন্য যুবকদের মত খেলা-ধূলার প্রতি তার কোন আকর্ষণই ছিল না। সে যখন লোকদেরকে এই কথা বলতে শুনলো তখন মনে মনে চিন্তা করলো, "ইবনে আবদুল মুত্তালিব যদি এই কথা বলেই থাকেন তাহলে লোকজন তা বিশ্বাস করছে না কেন। কিছু দিন আগেও তো এই মক্কাবাসীরাই তাঁর পবিত্রতা, আমানত, দিয়ানত এবং সত্যবাদীতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে পড়তো। আর এখন এ সামান্য কথাতেই তারা অগ্নিশর্মা হয়ে পড়েছে। মুহাম্মাদ (সা) তো কোন ভুখা নাঙ্গা খান্দানে জন্মগ্রহণ করেননি যে তাকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে। আল্লাহ্‌র কসম। মুহাম্মাদও (সা) সত্য এবং মুহাম্মাদের (সা) আল্লাহ্‌ও সত্য। আমি অবশ্যই তার ওপর ঈমান আনবো।

ইবনে মাখরামা এ আকাংখার কথা ঘোষণা তো করলেন কিন্তু যখন চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন তখন মক্কার এতীমকে মান্যকারীদেরকে বিভিন্ন ধরনের দুঃখ মুসীবতে পতিত দেখতে পেলেন। এটা ছিল দাওয়াতে হকের প্রথম যুগ। যে ব্যক্তি তাওহীদের ঝান্ডা উত্তোলনের সাহস দেখাতো কুরাইশ মুশরিকরা তার ওপর জভুক্ত নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়তো এবং যুলুম-নির্যাতনে জর্জরিত করে তাকে জীবিত থাকাই কঠিন করে তুলতো। কিন্তু বনূ আমের বিন লুবীর এ যুবকের ধমনীতে নীরেট শরাফত ও বীরত্বের খুন প্রবাহিত হচ্ছিল। তার মন ও অন্তর বলে উঠলো, "আবদুল্লাহ। যুলুম-নির্যাতন এবং মুসীবতের প্লাবনে ঘাবড়ে গিয়ে দাওয়াতে হক থেকে

চক্ষু মুদে থাকা নীচ ধরনের বুযদিলী। সামনে অগ্রসর হও এবং হাদিয়ে বরহককে (সা) মজবুতভাবে আঁকড়ে ধর।" বস্তুত তিনি বীরের মত অগ্রসর হলেন। একদিন রহমতে দো আলমের (সা) পবিত্র খিদমতে উপস্থিত হলেন এবং ঈমানের অবিনশ্বর সম্পদে পূর্ণ হলেন। তখন তিনি সেই পবিত্র দলের একজন সদস্য ছিলেন যাকে আল্লাহ তায়ালা সাবিকুনাল আউয়ালুনের মহান উপাধিতে অভিষিক্ত করেছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাখরামা বনূ আমের বিন লুবী গোত্রের যুবকদের ইযযতস্বরূপ ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বাহাদুর ও শরিফুন নাফস ব্যক্তিত্ব। তাঁর হক দাওয়াত কবুলের খবর মক্কার মুশরিকদের মধ্যে বিদ্যুতের মত ছড়িয়ে পড়লো। তারা নওজোয়ান আবদুল্লাহকে (রা) তার পিতৃধর্মের ওপর ফিরিয়ে নেয়ার জন্য সব ধরনের অস্ত্রই ব্যবহার করলো। কিন্তু হকের নেশা এমন ছিল না যে, যুলুম-নির্যাতনের ভীতি তা ছাড়িয়ে দিতে পারে। আবদুল্লাহ (রা) কোন শয়তানী চালকে কোন গুরুত্বই দিলেন না। অন্যান্য ইসলামী অনুসারীর মতই তিনিও মুশরিকদের যুলুম-নির্যাতনের শিকার হলেন। তারা মার পিট, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, মিথ্যা অপবাদ মোট কথা হেনস্তা করার যত ধরনের অস্ত্র ছিল সবই তারা প্রয়োগ করলো। কিন্তু তাঁর ঈমানের ওপর অটলতার সামান্যতম স্খলনও ঘটাতে পারলো না। মুশরিকদের যুলুম-নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে গেলে প্রিয় নবী (সা) হযরত আবদুল্লাহকে (রা) ডেকে হেদায়াত দিলেন যে, যখনই সুযোগ পাবে তুমিও অন্য মুসলমানদের সঙ্গে হাবশা চলে যাবে। সেখানকার বাদশাহ রহমদিল ও ইনসাফ প্রিয়। আশা করি, তোমরা সে দেশে শান্তিতে থাকবে।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) হুযূরের (সা) নির্দেশ পালন করলেন। হাবশায় দ্বিতীয় হিজরতের সময় ৮৩ জন পুরুষ এবং ২০ জন মহিলা সমন্বয়ে গঠিত একটি কাফেলা মক্কা থেকে রওয়ানা হলো। তিনিও তাতে শামিল হলেন। কাফেররা এ কাফেলাকে বাধা দানের জন্য খুব চেষ্টা করলো। কিন্তু আল্লাহ পাক হেফাজতের সাথে তাদেরকে হাবশায় পৌছে দিলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাখরামা অন্য মুসলমানের সঙ্গে কয়েক বছর হাবশায় উদ্বাস্তুর জীবন কাটাতে লাগলেন। প্রিয় নবী (সা) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা তাশরীফ নিলেন। হাবশায় মুহাজিররা নবীর (সা) হিজরতের খবর পেলেন। এ সময় তাদের অন্তরেও রাসূলের (সা) সান্নিধ্যে পৌছার উন্মাদনা সৃষ্টি হলো। কিন্তু দীর্ঘ সামুদ্রিক সফর এ পথে ছিল প্রধান অন্তরায়। তারপরও ৩৩ জন পুরুষ ও ৮ জন মহিলা হিম্মত বাঁধলেন এবং মক্কা হয়ে মদীনা যাওয়ার জন্য হাবশা ত্যাগ করলেন। এ দলে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাখরামাও ছিলেন। তারা

সহীহ সালামতে মক্কা পৌছলেন। কিন্তু সেখান থেকে যখন মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে লাগলেন তখন মক্কার মুশরিকরা বাধা দিল। জোরপূর্বক তারা ৭ জনকে ঠেকিয়ে রাখলো। অবশ্য অন্যান্যরা কোন না কোন উপায়ে মদীনা পৌছতে সফল হলেন। এই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাখরামাও শামিল ছিলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৯ বছর।

মদীনা প্রবেশের পূর্বে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাখরামা কুবাতে অবস্থান করেন। তাঁর মেযবান ছিলেন হযরত কুলছুম (রা) ইবনুল হাদাম আনসারী। তিনি ছিলেন আমর বিন আওফ গোত্রের সরদার। এর পূর্বে তিনি প্রিয় নবীর (সা) মেযবানীর সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। চরিতকাররা কুবায় হযরত আবদুল্লাহর অবস্থানকাল সম্পর্কে তেমন কিছু বলেননি। কিন্তু ধারণা করা হয় যে, সেখানে তিনি খুব কম সময়ই ছিলেন। তিনি যখন অন্য সাথীদের সঙ্গে মদীনায় রাসূলের (সা) খিদমতে উপস্থিত হন তখন হুযূর (সা) তাকে দেখে খুব আনন্দিত হন এবং হযরত ফারদা (রা) বিন আমর বায়াজীকে তাঁর দীনী ভাই বানিয়ে দেন। দ্বিতীয় হিজরীতে হক ও বাতিলের প্রথম যুদ্ধ বদরের ময়দানে সংঘটিত হয়। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাখরামা সেই তিনশ তের পবিত্র নফসের অন্যতম ছিলেন যারা বদরের ময়দানে রাসূলে আকরামের (সা) সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। বদরের পর তিনি ওহোদ, খন্দক এবং খায়বারের যুদ্ধেও তরবারীর চমক দেখিয়েছিলেন। বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী চৌদ্দশ' সাহাবীর তিনিও একজন ছিলেন। এসব সাহাবীকে আল্লাহ তায়ালা আসহাবুশ শাজারাহ উপাধিতে ভূষিত করেন এবং স্পষ্ট ভাষায় তাঁর সন্তুষ্টির সুসংবাদ দেন। তারপর মক্কা বিজয়, হুনায়েন, তায়েফ এবং তাবুকেও রহমতে আলমের (সা) সঙ্গীত্বের হক আদায় করেন। মোট কথা, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি জীবন উৎসর্গের পূর্ণ আবেগ প্রদর্শন করেন। আর এমনিভাবে তিনি ইসলামের পথে জীবন দানকারীদের কাতারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেন।

হযরত আবদুল্লাহর (রাঃ) অন্তর সব সময় শাহাদাতের আকাংখায় অস্থির থাকতো এবং তিনি এই দোয়া করতেনঃ "হে আল্লাহ! আমাকে সে সময় পর্যন্ত মৃত্যু দিও না যতক্ষণ আমার দেহের প্রতিটি অংশ তোমার রাস্তায় ক্ষতবিক্ষত না হয়।"

১১ হিজরীতে প্রিয় নবী (সা) ওফাত পান। এ সময় হযরত আবদুল্লাহর (রা) অন্তরে হক পথে জীবন উৎসর্গ করার আকাংখা আরো বেশী তীব্র আকার ধারণ করে। তখন ধর্মদ্রোহীতার আগুনের লেলিহান শিখা সমগ্র আরবকে গ্রাস

করে নেয়। খলীফাতুর রাসূল (সা) সাইয়েদুনা সিদ্দীকে আকবার (রা) ইসলামের মুজাহিদদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে মুরতাদদের উৎখাতের জন্য প্রেরণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) এই ধরনের একটি দলে শামিল হন। এক স্থানে সেই দলের সঙ্গে মুরতাদদের প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। কতিপয় রেওয়ায়াতে তাকে ইয়ামামার যুদ্ধ বলে বলা হয়েছে। কিন্তু বেশীর ভাগ রেওয়ায়াতে সেই যুদ্ধের নাম বলা হয়নি। যা হোক, এটা ঠিক যে, ধর্মদ্রোহীতার প্রসঙ্গেই যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাখরামা এ যুদ্ধে এত উদ্দীপনা ও অটলতার সঙ্গে অংশ নিয়েছিলেন যে, জান-প্রাণের কোন খেয়াল ছিল না। আঘাতে আঘাতে শরীর জর্জরিত হচ্ছিল। কিন্তু তিনি তরবারী চালিয়েই যাচ্ছিলেন। তাঁর শরীরের এমন কোন স্থান ছিল না যেখানে শত্রুর অস্ত্রের আঘাত লাগেনি। তাঁর দোয়া কবুলের সময় এলো। আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে তিনি মাটিতে ঢলে পড়লেন। লোকজন ময়দান থেকে উঠিয়ে তাঁকে তাঁবুতে নিয়ে গেল। পবিত্র রমযানের মাস ছিল। হযরত আবদুল্লাহও (রা) রোযা ছিলেন। আঘাতে আঘাতে তিনি কাহিল হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু রোযা ভাঙ্গা সহ্য করতে পারলেন না। সন্ধ্যায় হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) তাঁর অবস্থা জানতে এলে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "ইফতার করেছেন কি?" তিনি ইতিবাচক জবাব দিলেন। তাতে তিনি বললেন ঃ "আমার জন্যও পানি আনুন।" তিনি আশ্চর্যান্বিত হলেন যে, এই মরদে মুজাহিদ এ অবস্থাতেও রোযা রয়েছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ পানি আনার জন্য দৌড় দিলেন। কিন্তু ফিরে না আসতেই আবদুল্লাহ (রা) বিন মাখরামা হাওজে কাওছারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সে সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৪১ বছর। আল্লামা ইবনে সা'দ (র) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মাসাহিক নামক এক পুত্র রেখে গিয়েছিলেন। সে তাঁর স্ত্রী যয়নব (রা) বিনতে সুরাকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আল্লামা ইবনে আসীর (র) উসুদুল গাবাতে লিখেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) আবেদ, জাহেদ ও জ্ঞানী ছিলেন।

হযরত ছামামা (রা) বিন আছাল হানাফী

রহমতে আলম (সা) মক্কা মুয়ায্যামা থেকে হিজরত করলেন। তাতে ইয়াছরাব নবজীবন লাভ করলো। হুযূরে আকরামের (সা) আগমনে খেজুর বাগানে ঘেরা এ পুরাতন শহরের ভাগ্য খুললো। এ শহরের দরজায় যে-ই তাঁর পদধূলি পড়লো তখনই ইয়াছরাব থেকে তা 'মদীনাতুন নবী' হয়ে গেল। তখন এ শহর ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে হকের ঝান্ডাবাহীদের তৎপরতার প্রধান কেন্দ্রে রূপ নিল। প্রিয় নবী (সা) প্রায়ই বিভিন্ন গোত্র ও এলাকার ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে এখান থেকে অভিযান পরিচালনা করতেন। মক্কা বিজয়ের কিছুদিন আগে তিনি কতিপয় সওয়ার সমন্বয়ে গঠিত একটি সামরিক বাহিনীকে নজদের দিকে প্রেরণ করলেন এবং এ অভিযানের ফলের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। সে যুগেই একদিন রাসুলের (সা) প্রদীপের কিছু পতঙ্গ মসজিদে নববীতে বসা অবস্থায় ছিলেন। এমন সময় নজদ থেকে মুজাহিদরা সফল হয়ে ফিরে এলেন। তাঁরা নিজেদের সওয়ার বাইরে বেঁধে অস্থির চিত্তে মসজিদের দিকে আসতে লাগলেন। তাদের পোশাক ছিল মলিন। কিন্তু চেহারা ছিল ঈমানের নূরে প্রদীপ্ত। তাঁদের সঙ্গে একজন কয়েদীও ছিল। রশি দিয়ে তার হাত বাঁধা ছিল। এ কয়েদী খুব ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ এবং সুন্দর পোশাক পরিহিত ছিল। মুজাহিদরা মসজিদে নববীতে (সা) পৌঁছে উপস্থিত সাহাবীদেরকে (রা) সালাম করলেন এবং কয়েদীকে মসজিদের একটি খুঁটীর সঙ্গে বেঁধে বিশ্বনবীর (সা) অপেক্ষায় বসে রইলেন।

কিছুক্ষণ পর প্রিয় নবীজী (সা) মসজিদে তাশরীফ আনলেন। মুজাহিদদের কর্মতৎপরতায় সন্তোষ প্রকাশ এবং তাদের জন্য দোয়া করলেন। অতপর তিনি কয়েদীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং সাহাবীদেরকে (রা) সম্বোধন করে বললেন : "এ ব্যক্তিকে কি তোমরা চিন?"

সাহাবীগণ (রা) আরয করলেন, "আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলই (সা) ভালো জানেন।" তিনি বললেন, "সে হলো ইয়ামামার সরদার ছামামা বিন আছাল। ইসলামের জঘন্যতম শত্রু (অথবা অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী একজন মুসলমানের হত্যাকারী)। তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া যেতে পারে। ঠিক আছে, এখনকার জন্য তাকে বেঁধে রাখো। কিন্তু তার খানা-পিনার দিকে ভালোভাবে দৃষ্টি রাখবে।"

অতপর হুযূর (সা) (সেই সময় অথবা অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী এশার নামাযের পর তাশরীফ এনে) ছামামাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "বল, ছামামা কি বলতে চাও।"

জবাব দিল, "হে মুহাম্মাদ! আমাকে যদি হত্যা কর তাহলে আমি তার যোগ্য (অথবা অন্য এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী একটি পশু অথবা একজন খুনীকে হত্যা করবে)। আর যদি মুক্তি দাও তাহলে আমাকে কৃতজ্ঞ হিসেবে পাবে। যদি ফিদিয়া চাও তাহলে মন খুলে চাও। আমি তা দেব।"

এ জবাব শুনে তিনি (সা) ছামামাকে সেভাবেই রেখে চলে গেলেন। দ্বিতীয় দিনও রহমতে আলম (সা) এবং ছামামার মধ্যে এ ধরনের আলোচনাই হলো এবং হুযূর (সা) কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই চলে গেলেন। তৃতীয় দিনও একই ধরনের সওয়াল-জওয়াব হলো। হুযূর (সা) তৎক্ষণাৎ বললেন ঃ "ছামামাকে মুক্ত করে দাও।"

সাহাবায়ে কিরাম (রা) কালবিলম্ব না করে তার বন্ধন খুলে দিলেন এবং হুযূর (সা) তাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "ছামামা, এখন তুমি স্বাধীন। তুমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পার"।

রহমতে আলমের (সা) সুন্দর আচরণে ছামামা এত প্রভাবান্বিত হলো যে, তার অন্তর থেকে শিরক ও কুফুরীর অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে গেল। মসজিদ থেকে বের হয়ে দৌড়ে নিকটের একটি খেজুর বাগানে গেলেন এবং গোসল করে মসজিদে নববীতে (সা) ফিরে এলেন। রসূলে করীম (সা) তখনো সেখানে বসা অবস্থায় ছিলেন। ছামামা হুযূরের (সা) সামনে কালেমায়ে শাহাদাত পড়লেন এবং এ আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র কসম, কিছুক্ষণ পূর্ব পর্যন্ত আমার দৃষ্টিতে আপনার চেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি কেউ ছিল না এবং আমার নিকট আপনার চেহারার চেয়ে অপসন্দনীয় কোন চেহারা ছিল না। কিন্তু এখন দুনিয়ায় আমার নিকট আপনার চেয়ে কোন প্রিয় ব্যক্তি নেই এবং আপনার চেয়ে সুন্দর চেহারা আর কারো আছে বলে আমি মনে করি না। আল্লাহ্‌র কসম! আজকের পূর্বে আপনার দীন থেকে খারাব দীন আর কিছুই ছিল না। কিন্তু এখন এ দীন থেকে ভালো ও সর্বোত্তম দীন আমি আর দেখি না। আল্লাহ্‌র কসম। এর পূর্বে এ বস্তি থেকে (মদীনা মুনাওয়ারা) বেশী খারাব বস্তি আমার নিকট আর ছিল না। কিন্তু আজ এ শহর বিশ্বের সকল শহর থেকে উত্তম বলে মনে হয়। হে আল্লাহ্‌র সত্য রাসুল! আমি আমার স্বদেশ থেকে ওমরার নিয়তে চলেছিলাম। পথিমধ্যে এ ঘটনা ঘটে গেল। আল্লাহ তায়ালা এখন আমাকে ইসলামের নিয়ামত দিয়ে পূর্ণ করে দিয়েছেন। তাহলে আমি কি এখনো ওমরাহ করতে পারি?"

সারওয়ারে আলম (সা) বললেন ঃ "হাঁ, হাঁ তুমি ওমরাহ করতে পার। শর্ত হলো যে, মক্কায় তোমার জীবন যেন বিপন্ন না হয়।"

ছামামা হুযূরকে (সা) সালাম করলেন এবং মক্কার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

হযরত আবু উমামা ছামামা (রা) বিন আছালের ইসলাম গ্রহণের কাহিনী ওপরে বর্ণিত হয়েছে। তিনি ছিলেন নাজদের একজন প্রভাবশালী সর্দার। আরবের সেই কবীলার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল যে কবীলা রাসূলের (সা) শেষ যুগ বরং হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতকালে ইয়ামামার যুদ্ধ পর্যন্ত অব্যাহতভাবে ইসলাম বিরোধীতায় লিপ্ত ছিল। এ ছিল সেই কবীলা যে মুসায়লামা কায্যাবের মত শয়তান জন্ম দিয়েছিল। হযরত ছামামার (রা) নসবনামা হলো ঃ ছামামা বিন আছাল বিন নু'মান বিন সালমা বিন উতবা বিন ছালাবা বিন ইয়ারবু বিন ছালাবা বিন দাওল বিন হানফিয়াহ হানাফী ইয়ামামী।

ইয়ামামা ছিল খাদ্যে উদ্বৃত্ত এলাকা। নিজের এলাকার প্রয়োজন পূরণ করার পর বাইরেও প্রেরণ করা হতো। যেসব এলাকায় কৃষি পণ্য উৎপন্ন হতো না তারা খাদ্যের প্রশ্নে ইয়ামামারই মুখাপেক্ষী থাকতো এবং তারা এখান থেকেই খাদ্য আমদানী করতো। ছামামা (রা) ছিলেন নিজের এলাকায় সবচেয়ে বড় খাদ্য ব্যবসায়ী এবং মক্কার মুশরিকদের সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ট সম্পর্ক। এ সম্পর্কের কারণেই তিনিও ইসলামের এবং হাদিয়ে আকরামের (সা) কঠোর শত্রু হয়ে যান। (তিনি কেমন ধরনের ইসলামের শত্রু ছিলেন তা ইসলাম গ্রহণের সময় স্বয়ং হুযূরের (সা) সামনে বর্ণনা করেছেন) এক রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি জাহেলী যুগে একজন মুসলমানকে শহীদ করে ফেলেন এবং হুযূর (সা) এ কথা শুনে খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার (র) ইসাবাহ গ্রন্থে লিখেছেন, একবার মশহুর সাহাবী হযরত আলা (রা) বিন আবদুল্লাহ হাজরামীকে ছামামা তার এলাকার ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় আটক করেন। তিনি তাঁকে কতল করতে চাইছিলেন কিন্তু তাঁর নেক স্বভাবের চাচা আমের বিন সালমা তাঁকে এ যুলুম থেকে বিরত রাখেন এবং ছামামার (রা) হাত থেকে তাঁকে মুক্তি দেওয়ান। আলা (রা) প্রিয় নবীর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি আমেরের জন্য দোয়া করলেন এবং ছামামার জন্য এ দোয়া করলেন যে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে আমার অধীন করে দাও। সুতরাং হুযূর (সা) মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইয়ামামাতে অভিযান চালালেন। সে সময় তিনি মুসলমানদের হাতে গ্রেফতার হলেন। আল্লাহ

তায়ালার কি কুদরত যে, এই গ্রেফতারী তার জন্য রহমত হিসেবে পরিগণিত হলো এবং তিনি দীনে হক গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করে রিসালাতের (সা) প্রদীপের পতঙ্গদের দলে শামিল হয়ে গেলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর ছামামা (রা) সোজা মক্কা মুয়ায্যামা পৌছলেন। লোকটি ছিলেন বড় বাহাদুর ও নির্ভীক। নিশ্চিন্তে ওমরাহ আদায় করলেন এবং নিজের ইসলাম গ্রহণের কথাও প্রকাশ করে দিলেন। অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে, কুরাইশ নিজের গোয়েন্দা মারফত তাঁর ইসলাম গ্রহণের খবর আগেই পেয়েছিলো। সুতরাং মক্কা পৌছলে মুশরিকরা তাঁকে ওমরা আদায়ে বাধা দান করে এবং তাঁকে বেদীন ও ধর্মদ্রোহী হিসেবে আখ্যায়িত করে। ছামামা (রা) তাদেরকে দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিলেন এবং বললেন ঃ "বেদীনতো হইনি বরং মুহাম্মাদের (সা) ওপর ঈমান এনেছি। আল্লাহ্‌র কসম। এখন আমার অনুমতি ছাড়া গমের একটি দানাও ইয়ামামা থেকে মক্কা আসবে না।"

তিনি যা বলেছিলেন বাস্তবত তা করে দেখিয়েছিলেন। দেশে ফিরে গিয়ে মক্কায় খাদ্য প্রেরণ বন্ধ করে দেন। তাঁর এ পদক্ষেপে মক্কায় কিয়ামত হয়ে যায় এবং সেখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কুরাইশরা ঘাবড়ে গিয়ে প্রিয় নবীর (সা) খিদমতে একটি পত্র মদীনায় প্রেরণ করলো। সে পত্রে লিখা ছিল ঃ "মুহাম্মাদ! যুদ্ধেতো তুমি পিতাদেরকে হত্যা করেছো। এখন তাদের শিশুদেরকে অভুক্ত রেখে মারছো। অথচ তুমি লোকদেরকে আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় করার নির্দেশ দিয়ে থাকো, তুমি কি এটা পসন্দ করো যে, তোমার কওম ক্ষুধায় তড়পাতে থাক এবং তুমি আরামে মদীনায় বসে থাকবে। এখন কি ইয়ামামা থেকে কোন খাদ্য দ্রব্য আসবে না?"

এই চিঠির ভাষা ছিল অত্যন্ত বেয়াদবি পূর্ণ। এটা ছিল কুরাইশ মুশরিকদের অহংকারের অকাট্য ছবি। এরা সেই মানুষ যারা কয়েক বছর পূর্বে বনী হাশেমকে শিয়াবে আবিতালিবে অব্যাহতভাবে তিন বছর অবরুদ্ধ রেখে তাদের জীবিত থাকাকে খুব কষ্টকর করে তুলেছিল। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) চাইলে এ সময় তিনি কুরাইশদের বিরুদ্ধে ভয়ানক প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারতেন। তাছাড়া এ চিঠির বক্তব্যও বাস্তবসম্মত ছিল না। কেননা ছামামা (রা) হুযূরের (সা) ইঙ্গিতেতো খাদ্য প্রেরণ বন্ধ করেননি এবং হুযূর (সা) কখনো যুদ্ধে কুরাইশের বিরুদ্ধে আগ্রাসন করেননি। বরং তারা নিজেরাই বার বার মদীনার ওপর চড়াও হয়েছিল। হুযূর (সা) এ চিঠিতে লিখিত বাজে কথার জন্য কুরাইশের মুশরিকদেরকে শাস্তিও দিতে পারতেন।

কিন্তু তিনি ছিলেন দয়ার সাগর। রাহমাতুললিল আলামীন হিসেবে তিনি লোকজন অভুক্ত থেকে ধুকে ধুকে মারা যাক তা কখনো সহ্য করতে পারেননি। তৎক্ষণাৎ ছামামাকে (রা) বলে পাঠালেন যে, "খাদ্য প্রেরণ বন্ধ করো না।" ছামামা (রা) বিনা শব্দে হযুরের (সা) ইরশাদ তামিল করলেন এবং যথারীতি মক্কায় খাদ্য পাঠাতে লাগলেন।

বিশ্বনবীর (সা) ইন্তেকালের পর সমগ্র আরবে কয়েকবার ধর্মদ্রোহীতার ফিতনার আগুনের লেলিহান শিখা জ্বলে উঠলো বনূ হানীফা মুসায়লামা কায্যাবের ষড়যন্ত্রের ফাঁদে আটকা পড়ে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসলো এবং সিদ্দীকী খিলাফতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল। সে সময় ছামামা (রা) ইয়ামামাতেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে ইসলামের ওপর কায়েম ছিলেন এবং নিজের আহলে কবীলাকেও ধর্মদ্রোহীতা থেকে রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা মুসায়লামার ষড়যন্ত্রে এমনভাবে আটকে গিয়েছিল যে, কেউই তাঁর কথায় কর্ণপাত করেনি। নিরুপায় হয়ে তিনি স্বদেশ থেকে হিজরতের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন। সে যুগে আলা (রা) বিন আবদুল্লাহ হাজরামীকে বাহরাইনের মুরতাদদেরকে উৎখাতের জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। তিনি ইয়ামামার পাশ দিয়ে বাহরাইন যাচ্ছিলেন। ছামামা (রা) এ খবর পেয়ে হাম খেয়াল মুসলমানদেরকে একত্রিত করলেন এবং বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, বনূ হানীফার গোমরাহ হয়ে যাওয়ার পর আমি এখানে থাকতে পারি না। অদূর ভবিষ্যতে তারা এমন মুসীবতে ফেঁসে যাবে যে, তা থেকে মুক্তিলাভ তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়বে। হকপন্থীরা এ ফিতনার মূলোৎপাটনের জন্য এসে পড়েছেন। এ কাজে তাঁদেরকে সাহায্য করা প্রত্যেক সাচ্চা মুসলমানের জন্য ফরয। আমি তাদেরকে সাহায্য করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। যে ব্যক্তি আমার সঙ্গে যেতে চায় অবিলম্বে সে যেন তৈরী হয়ে যায়।

বনূ হানীফার সকল অটল মুসলমান তাঁর সঙ্গে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। সুতরাং তিনি হকের ঝান্ডাবাহীদের এ ছোট দলের সঙ্গে হযরত আলার (রা) বাহিনীতে গিয়ে শামিল হলেন। বাহরাইনের রবিয়ার পুরো গোত্র এবং বাশার বিন আমর আবদি নিজের অধীনস্তদের সঙ্গে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে বনূ কায়েস বিন ছালাবা বিন হাতিম (অথবা হাতম) ইবনে দবিয়ার নেতৃত্বে ইসলাম বিরোধী হয়ে গিয়েছিল। এ সব দুষ্কৃতিকারী জাওয়াছ দুর্গে অবস্থান গ্রহণ করে। হযরত আলা (রা) জাওয়াছ অবরোধ করলেন। অবরোধকালে এক রাতে দুর্গের ওপর অতর্কিতে হামলা চালানো হয়। তাতে বনূ কায়েসের সরদার হাতিম মারা যায় এবং মুরতাদরা অস্ত্র সমর্পণ করে।

হযরত ছামামা (রা) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাহু হিসেবে হযরত আলার (রা) সঙ্গে ছিলেন এবং মুরতাদদেরকে উৎখাতের কাজে সব সময় তাঁকে সহযোগিতা করেন। এ অভিযান শেষ হলে তিনি একজন মুসলমান সিপাহীর নিকটে একটি সুন্দর পোষাক দেখতে পান। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, এ পোষাক কোথায় পেয়েছ। সে জবাব দিল, "দুর্গে হামলা পরিচালনার সময় আমিই হাতিমকে হত্যা করেছিলাম এবং এ পোষাক আমি তার দেহ থেকে নামিয়ে নিয়েছিলাম।"

হযরত ছামামার (রা) এ পোষাক খুব পসন্দ হলো এবং তিনি তা খরিদ করে নিলেন। তা পরিধান করে তিনি বাইরে বেরুলেন। এ সময় তিনি বনূ কায়েসের কিছু দুরভিসন্ধি সম্পন্ন মানুষের সামনে পড়ে গেলেন। তারা নিজেদের নিহত সরদারের পোষাক তাঁর গায়ে দেখে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো এবং তারা মনে করলো যে, ছামামা (রা) হাতিমের হত্যাকারী। তারা তরবারী নিয়ে সমবেতভাবে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং সেই সত্যবাদী পুরুষকে মুহূর্তের মধ্যে শহীদ করে ফেললো।

হযরত ছামামার (রা) স্ত্রী ও সন্তান এবং ফযীলত ও কামালিয়ত সম্পর্কে চরিত গ্রন্থগুলো নীরব। অবশ্য কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, তিনি একজন ভালো বক্তা ছিলেন এবং কাব্যেও ব্যুৎপত্তি রাখতেন। ধর্মদ্রোহীতার ফিতনার যুগে মুসায়লামা কায্যাবের বিরুদ্ধে তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী কবিতা রচনা করেছিলেন।

হযরত সালামা (রা) বিন আকওয়া আসলামী

ষষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাস। হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রিয় নবী (সা) হুদাইবিয়া থেকে মদীনা ফিরে আসার জন্য রওয়ানা হলেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন চৌদ্দশ জীবন উৎসর্গকারী সাহাবী। তাঁরা সকলেই হুদাইবিয়াতে একটি বৃক্ষের নীচে হুযূরের (সা) পবিত্র হাতে হক পথে জীবন বিলিয়ে দেয়ার বাইয়াত (বাইয়াতে রিদ্বওয়ান) করেছিলেন।

সফরকালের প্রথম রাত। এ পবিত্র কাফেলা একটি পাহাড়ের পাদদেশে তাঁবু ফেললো। সন্ধিপত্রে উভয় পক্ষের দস্তখত হয়ে যাওয়ার পর দুটি ঘটনা সংঘটিত হয়। এ ঘটনায় উপলব্ধি করা যায় যে, মুশরিকদের নিয়ত পরিষ্কার ছিল না। সন্দেহ ছিল যে, মুসলমানদের অজ্ঞাতে তারা হামলা করে না বসে। এ ভয়ের তদারকীর জন্য হুযূর (সা) রাতের বেলা কাফেলার তত্ত্বাবধানের সুবন্দোবস্ত করতে চাইলেন। সুতরাং তিনি বললেন, "আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির ওপর নিজের রহমত নাযিল ও মাগফিরাত দেবেন যে আজ রাতে এ পাহাড়ের চূড়ায় চড়ে পাহারা দেবে এবং মুশরিকদের তৎপরতা বা চলাচল সম্পর্কে সময়মত আমাদেরকে খবর দেবে।"

হুযূরের (সা) এ ইরশাদ শুনে এক সুঠামদেহী ও সম্মানিত ব্যক্তি সামনে অগ্রসর হলেন এবং অত্যন্ত আস্থার সঙ্গে আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এ খিদমত আমি আঞ্জাম দিব"।

হুযূর (সা) তাঁর এ উৎসর্গীকৃত মনোভাব দেখে খুব খুশী হলেন এবং বললেন, "হাঁ, তুমিই এ কাজ করবে।" সেব্যক্তি তৎক্ষণাৎ নিজের অস্ত্র হাতে নিলেন এবং দৌড়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেলেন। সারা রাত তিনি সৈন্যদের চারপাশে ঘুরে ঘুরে এবং পর্বতের চূড়ায় গিয়ে দুশমনের তৎপরতা সম্পর্কে খোঁজ নিলেন। তাঁর বিশেষ তৎপরতা ও আল্লাহর রহমতে দুশমনরা কোন অপকর্ম করার সাহস পেল না এবং মুসলমানরা ভালোভাবেই রাত কাটালো। এ ব্যক্তি ছিলেন রাসূলের (সা) সেই সাহাবী (রা) যিনি নাযুক মুহূর্তে একাকী হকপন্থীদের পবিত্র কাফেলার তত্ত্বাবধান করেছিলেন এবং এমনিভাবে রহমতে দো আলমের (সা) দোয়ায়ে মাগফিরাতের হকদার হন। তাঁর নাম হলো, সাইয়েদুনা হযরত সালামা (রা) ইবনুল আকওয়া আসলামী।

হযরত সালামা (রা) বিন আকওয়া অন্যতম মহান মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন। তাঁর বীরত্ব ও কুরবানীর আবেগে অন্য মুসলমানরা ঈর্ষা করতেন। বনূ কাময়াহ'র একটি শাখা বনূ আসলামের সঙ্গে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। মারযে জাহরান এবং তার আশে-পাশে এ কবীলা বসবাস করতো। হযরত সালামার (রা) কুনিয়ত ছিল আবূ আয়াছ। এ কুনিয়ত সম্পর্কে সকল চরিতকারই ঐকমত্য পোষণ করেন। তবে তাঁর আসল নাম এবং নসবের ব্যাপারে মত-বিরোধ রয়েছে। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, তাঁর আসল নাম ছিল "সিনান" এবং পিতার নাম আবদুল্লাহ। বস্তুত মুসতাদরাকে হাকিমে তাঁর নসবনামা নিম্নরূপ উল্লেখ আছে ঃ

সিনান বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন কুশায়ের বিন খুযায়মা বিন মালিক বিন সালামান বিন আসলাম।

কিন্তু সহীহ মুসলিমে হযরত সালামার (রা) প্রকৃত নাম সালামাহ (রা) বলা হয়েছে এবং তাঁর পিতার নাম আমর ইবনুল আকওয়া বর্ণনা করা হয়েছে। তার অর্থ হলো হযরত সালামার (রা) দাদার নাম আবদুল্লাহ নয় বরং আকওয়া ছিল। এমনিভাবে তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহর পরিবর্তে আমর ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি দাদার নামের নিসবতে ইবনুল আকওয়া নামেই মশহুর হন।

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, আকওয়া'র আসল নাম ছিল সিনান। অন্য কয়েকটি রেওয়ায়াতে সিনানকে আকওয়া'র পুত্র বলা হয়েছে। যেন হযরত সালামার (রা) পিতা আমর সিনান বিন আকওয়ার ভাই ছিলেন। যা হোক, সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়াতের অন্য সব রেওয়ায়াতের ওপর অগ্রাধিকার রয়েছে। এ জন্য আমরা হযরত সালামার (রা) পিতার নাম আমর ইবনুল আকওয়াকেই স্বীকার করবো এবং সঙ্গে সঙ্গে হযরত সালামার (রা) আসল নাম সালামাহই (রা) ছিল বলে মানবো।

হযরত সালামাহ (রা) কখন ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন? ঐতিহাসিকবৃন্দ তা বিশ্লেষণ করেননি। কিন্তু কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে পরিষ্কার হয় যে, তিনি ৬ষ্ঠ হিজরীর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং হক পথে স্বদেশ ভূমি, কবীলা ও পরিবার পরিজন থেকে মুখ ফিরিয়ে হাবীবের (সা) শহর "মদীনা মুনাওয়ারাতে" এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। এভাবে তিনি হিজরতের মর্যাদাও পেয়েছিলেন। মদীনা পৌছে তিনি সামর্থ অনুযায়ী নবীর (সা) ফয়েযে অবগাহিত হয়েছিলেন।

৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে হুযূর (সা) ১৪শ সাহাবী সমভিব্যাহারে ওমরার জন্য মদীনা থেকে মক্কা মুয়াযযামা রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তিনি

জানতে পারলেন যে, কুরাইশরা মুসলমানদেরকে বাধা দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করে। বস্তুত এটা ছিল হারাম মাস। এ জন্য মুসলমানরা লড়াই করতে চাননি। হুযূর (সা) কুরাইশদেরকে পয়গাম প্রেরণ করে জানান যে, আমরা শুধু ওমরা আদায়ের জন্য এসেছি। লড়াই করতে চাই না। এটাই উত্তম যে, কুরাইশরা আমাদের সঙ্গে স্বল্পকালের জন্য সন্ধির চুক্তি করে নিতে পারে। কুরাইশরা নিজেদের পক্ষ থেকে উরওয়া (রা) বিন মাসউদ ছাকাফীকে (যিনি সে সময় পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি) দূত বানিয়ে হুযূরের (সা) সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রেরণ করলো। তিনি দৌত্যগিরী শেষে ফিরে গিয়ে কুরাইশদেরকে হুযূরের (সা) সঙ্গে নিজের আলাপ-আলোচনার কথা বিস্তারিত জানালেন এবং সাথে সাথে তাদেরকে মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করে নেয়াই উত্তম বলে পরামর্শ দিলেন। তিনি আরো বললেন, আমি মুসলমানদেরকে মুহাম্মাদের (সা) প্রতি যে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পোষণ করতে দেখেছি তা পূর্বে কোথাও দেখিনি। অথচ আমি দুনিয়ার বড় বড় বাদশাহর দরবার দেখেছি। কুরাইশরা উরওয়ার (রা) পরামর্শ মানেনি। হুযূর (সা) পুনরায় একজন দূত প্রেরণ করলেন। কুরাইশরা তাঁর ওপর হামলা করে বসলো। কিন্তু তিনি কোন মতে বেঁচে গেলেন। তারপর কুরাইশরা কিছু যুদ্ধবাজ ব্যক্তিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রেরণ করলো। মুসলমানরা তাদেরকে ধরে ফেললেন। কিন্তু হুযূর (সা) তাঁদেরকে ছেড়ে দিলেন এবং ক্ষমা করলেন। অতপর তিনি হযরত ওসমানকে (রা) দূত বানিয়ে মক্কা প্রেরণ করেন। কুরাইশরা তাঁকে কয়েদ করে। ওদিকে মুসলমানদের মধ্যে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, হযরত ওসমানকে (রা) শহীদ করা হয়েছে। হুযূর (সা) খুব দুঃখিত হলেন এবং মুসলমানদেরও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। প্রিয় নবী (সা) বললেন, ওসমানের (রা) খুনের প্রতিশোধ নেওয়া ফরয। এ কথা বলে তিনি একটি বাবলা বৃক্ষের নীচে বসে গেলেন এবং সকল সাহাবীর (রা) নিকট থেকে জীবন উৎসর্গের বাইয়াত নিলেন। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের এ জীবন উৎসর্গের আবেগকে খুব পসন্দ করলেন এবং বাইয়াতকারী সকলকেই নিজের সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিলেন। এ জন্য ইতিহাসে এ বাইয়াত "বাইয়াতে রিদ্বওয়ান" নামে স্থায়ী প্রসিদ্ধি লাভ করে। হযরত সালামাও (রা) এ চৌদ্দশ জালীলুল কদর সাহাবীর (রা) মধ্যে শামিল ছিলেন। কিন্তু এ সময় তিনি এমন এক সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন যা অন্য কোন মুসলমানের ভাগ্যে জোটেনি। সহীহ মুসলিমে আছে যে, হযরত সালামা (রা) হুদায়বিয়াতে প্রথমবার নিজের আহলে কবীলার সঙ্গে হুযূরের (সা) পবিত্র হাতে মৃত্যুর বাইয়াত করেন। কিছুক্ষণ পর হুযূরের (সা) দৃষ্টি তাঁর ওপর পড়লে তিনি বললেন, "হে ইবনে আকওয়া! তুমি কি বাইয়াত

করবে না।" তিনি আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমিতো বাইয়াত করেছি।" তিনি বললেন, "পুনরায় বাইয়াত কর।" তিনি তৎক্ষণাৎ নির্দেশ পালন করলেন। হুযূর (সা) উদারতাবশত তাঁকে একটি ঢাল প্রদান করলেন। তৃতীয়বার পুনরায় হুযূর (সা) তাঁর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, "সালামা বাইয়াত করবে না?" আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমি তো দু'বার বাইয়াত হয়েছি।" হুযূর (সা) ফরমালেন, "তৃতীয়বার করতে অসুবিধা কি?" হযরত সালামা (রা) কালবিলম্ব না করে তৃতীয়বার বাইয়াতের সৌভাগ্য লাভ করলেন। সে সময় হুযূর (সা) দেখলেন যে, তিনি যে ঢাল হযরত সালামাকে (রা) দিয়েছিলেন তা তাঁর নিকট নেই। জিজ্ঞাসা করলেন, সালামা! সেই ঢাল কোথায়? আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার চাচার নিকট কোন অস্ত্র ছিল না। আমি তা তাঁকে দিয়েছি।" হুযূর (সা) হেঁসে ফেললেন এবং বললেন, "সালামা তোমার উদাহরণ তো সেই মানুষের মত যে দোয়া করেছিল যে, হে আল্লাহ আমাকে এমন বন্ধু দাও যে আমার জীবনের চেয়েও প্রিয়।"

বাইয়াতে রিদ্বওয়ানের কথা জানতে পেরে কুরাইশরা ভীত হয়ে পড়লো এবং সন্ধিতে রাজী হয়ে গেল। সন্ধি চুক্তির পর হুযূর (সা) হুদাইবিয়াতে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় সেই মুশরিকরা মুকিম পাহাড় থেকে ভোরের বেলা নেমে এলো। তাদের লক্ষ্য ছিল নামাযে মশগুল অবস্থায় মুসলমানদের ওপর হামলা করা। হযরত সালামার (রা) চাচা (অথবা অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী ভাই) হযরত আমের (রা) ইবনুল আকওয়া এমন পন্থা অবলম্বন করলেন যে, তারা সকলেই তাঁর হাতে গ্রেফতার হয়ে গেল। হযরত আমের (রা) তাদেরকে নিয়ে হুযূরের খিদমতে পৌছালেন। ঠিক তখনি হযরত সালামাও চার জন মুশরিককে গ্রেফতার করে ধীরে ধীরে হুযূরের (সা) খিদমতে এসে হাযির। তারা একটি বৃক্ষের নীচে শুয়ে হুযূর (সা) সম্পর্কে খারাপ কথা বলছিলো। হযরত সালামা (রা) তাদের কথা শুনেছিল। যখন তারা শুয়ে পড়েছিল তখন হযরত সালামা (রা) তাদের অস্ত্র কবজা করে নিয়েছিল। অতপর তাদেরকে গ্রেফতার করে নেয়। রহমতে আলম (সা) দয়া পরবশ হয়ে তাদের সকলকে ক্ষমা এবং যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যেতে অনুমতি দিলেন।

সে বছরই যীকারদ অথবা গাব্বাহর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে হযরত সালামা এমন নজিরবিহীন বীরত্ব ও ভীতিহীনতা প্রদর্শন করেছিলেন যে, হুযূরও (সা) তাঁকে খুব প্রশংসা করেছিলেন এবং অন্যান্য সাহাবীর (রা)

নিকটও তিনি এ যুদ্ধের বিশেষ বীর হিসেবে চিহ্নিত হলেন। মদীনা মুনাওয়ারা থেকে প্রায় ১২ মাইল দূরত্বে বনী গাতফান এলাকার নিকটে যীকারদ অথবা যীকারদাহ নামক একটি পুকুর ছিল। তারই সন্নিকটে (মদীনার দিকে) একটি বিরাট জঙ্গল অথবা গাবাহ ছিল। তাতে রাসূলে আকরামের (সা) উট চরতো। ৬ষ্ঠ হিজরীতে (এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী বছরের শেষের দিকে) ইসলামের একজন দুশমন লুটেরা উয়াইনা বিন হাসান ফুযারী ৪০ জন সওয়ারী সমেত গাবাহর চারণ ভূমিতে অতর্কিতে হামলা চালালো এবং রাখাল হযরত যার (রা) বিন আবু জার গিফারীকে (রা) শহীদ করে ২০টি দুধালো উটনী নিয়ে গেল। ঘটনাক্রমে হযরত সালামা (রা) বিন আকওয়া এবং হযরত রাবাহ (রা) (রাসুলের গোলাম) ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। হযরত সালামা (রা) এ ঘটনার কথা জানতে পেরে হুযূরের (সা) মুহাব্বতে আগুনের শিখার মত জ্বলে উঠলেন। তিনি হযরত রাবাহকে (রা) ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে হুযূরকে (সা) খবর দেয়ার জন্য মদীনার দিকে রওয়ানা করালেন এবং নিজে একাকী মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন। (এ রেওয়ায়াত মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলের। সহীহ বুখারীতে হযরত সালামা (রা) বিন আকওয়া থেকে রেওয়ায়াত আছে যে, একদিন আমি ফজরের আযানের আগেই রওয়ানা দিলাম। পথিমধ্যে আমি আবদুর রহমান বিন আওফের গোলামের সাক্ষাৎ পেলাম এবং সে আমাকে বললো যে, রাসূলুল্লাহর (সা) উটনীগুলোকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কে ধরে নিয়ে গেছে। সে বললো, বনূ গাতফানের লোকেরা। তারপর হযরত সালামা (রা) যে ঘটনা পেশ করলেন তা প্রায় একই। যা মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বলে উল্লেখ রয়েছে।) হযরত সালামা (রা) প্রথমে নিকটবর্তী এক টিলায় চড়ে মদীনার দিকে মুখ করে তিনবার "ইয়া সাবাহাহ" বলে না'রাহ দিলেন। (সাহায্য প্রর্থনার সময় এ শ্লোগান দেওয়া হয়। তার অর্থ হলো "হে সকালের মুসীবত।") এবং একাকীই বৃক্ষকে আড়াল করে হামলাকারীদের ওপর তীর ও পাথর বর্ষণ শুরু করলেন। তিনি বিরাট বাহাদুর এবং মারাত্মক তীরন্দাজ ছিলেন। তিনি তীর চালাচ্ছিলেন এবং হুংকার দিয়ে বীরত্ব গাথা উচ্চারণ করছিলেন।

এ একাকী মরদে মুজাহিদ লুটেরাদেরকে এমন শিক্ষা দিল যে, তারা সব কিছু ভুলে গেল এবং সকল উট রেখে পালিয়ে গেল। হযরত সালামা (রা) উটনীগুলোকে মদীনার দিকে হাঁকিয়ে দিলেন এবং স্বয়ং ডাকাতদের পিছু নিলেন। ডাকাতরা চাদর ও বর্শা ফেলে রেখে সেই এক মুজাহিদের সামনে দিয়ে ভেগে যাচ্ছিল। এমনকি তারা ৩০টি চাদর এবং ৩০টি বর্শা ফেলে রেখে

গেল। হযরত সালামা (রা) প্রত্যেক চাদর ও বর্শার ওপর চিহ্নস্বরূপ একটি করে পাথর রেখে দিচ্ছিলেন। অতপর তাদের পিছু ধাওয়া করলেন। যখন চাশতেরও কিছু বেশী সময় হলো তখন উয়াইনিয়া বিন বদর ফুযারী কিছু সশস্ত্র সওয়ার সমেত লুটেরাদের সাহায্যের জন্য এসে পৌছলো। হযরত সালামা (রা) নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের চূড়ায় চড়লেন। উয়াইনিয়া গাতফানী ডাকাতদেরকে জিজ্ঞেস করলো, "এ ব্যক্তি কে?" তারা বললো, এ ব্যক্তি আমাদেরকে খুব উত্যক্ত করেছে। সে সকাল থেকে এ সময় পর্যন্ত আমাদের পিছু ত্যাগ করেনি এবং আমাদের সব কিছু ছিনিয়ে নিয়েছে।

উয়াইনিয়া বললোঃ "তার পশ্চাতে নিশ্চয়ই কোন দল আছে। নচেৎ একাকী সে তোমাদের পিছু নেওয়ার সাহস পেতো না। এখন তোমরা তাকে গ্রেফতার করার চেষ্টা কর।" সুতরাং তাদের মধ্যেকার চারজন হযরত সালামার দিকে চললো। যখন তারা চূড়ার ওপর হযরত সালামার (রা) নিকটে গেল তখন তিনি তাদেরকে ডেকে বললেন, "তোমরা কি জানো আমি কে?" গাতফানীরা বললো, "তুমি কে?"

হযরত সালামা (রা) বললেন, "আমি হলাম আকওয়ার পুত্র। সেই পবিত্র সত্তার কসম যিনি মুহাম্মাদকে (সা) আলোকময় দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ বানিয়েছেন তোমাদের মধ্যে কারোর এমন শক্তি নেই যে, আমাকে ধরবে এবং তোমাদের মধ্যে একজনও এমন নেই যে, আমি যদি তাকে খতম করতে চাই তাহলে সে বেঁচে যাবে।"

হযরত সালামা (রা) এবং ডাকাতদের মধ্যে এ ধরনের সওয়াল-জওয়াব চলছিল। ঠিক এমন সময় দূরে ধুলো উড়তে দেখা গেল। অতপর বৃক্ষ শাখার ঝাণ্ডাসহ তিনজন অশ্বারোহী আবির্ভূত হলেন। তাঁরা হযরত সালামার (রা) সাহায্যার্থে নিজেদের ঘোড়া বিদ্যুৎ বেগে চালিয়ে আসছিলেন। এ সব অশ্বারোহী সাহায্যকারী দলের অগ্রবর্তী সদস্য ছিল। ডাকাতদের খবর পেয়েই রাসূলুল্লাহ (সা) পিছু ধাওয়ার জন্য তাদেরকে পাঠিয়েছিলেন। সর্বাগ্রে ছিলেন হযরত মিহরায বিন ফাদলাহুল মুকাল্লাব বিহি আখরাম আসদী (রা)। তাঁর পেছনে ছিলেন হযরত আবু কাতাদাহ (রা) আনসারী এবং তাঁর পেছনে কিছু দূরে হযরত মিকদাদ (রা) বিন আমর আল-আসওয়াদ কিন্দী (রা) ছিলেন। তৎক্ষণাৎ হযরত সালামা (রা) পাহাড়ের চূড়া থেকে নীচে নামলেন এবং হযরত আখরামের (রা) ঘোড়ার লাগাম ধরে বললেন, "আখরাম! সামনে অগ্রসর হয়ো না। আমি ভয় করছি যে, লুটেরারা তোমাকে ঘিরে না নেয়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। হুযূর (সা) এবং সাহাবীগণ (রা) এসে পড়বেন।"

হযরত আখরাম (রা) বললেন, "হে সালামা! তুমি যদি আল্লাহ ও আখিরাতের দিনের ওপর ঈমান এনে থাকো এবং তুমি মনে করো যে, জান্নাত ও দোযখ হক তাহলে তুমি আমার শাহাদাতের পথে বাধা দিও না।"

এ বাক্য তিনি এত উৎসাহ এবং আবেগের সঙ্গে বললেন যে, হযরত সালামা (রা) তাঁর ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিলেন এবং তিনি ঘোড়া দৌড়িয়ে আবদুর রহমান ফাযারীর দিকে অগ্রসর হলেন এবং প্রথম আঘাতে তার ঘোড়ার পা কেটে ফেললেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবদুর রহমান ফাযারীর বর্শাও তার অন্তর পার হয়ে গেল এবং তিনি শাহাদাতের পেয়ালা পান করে প্রকৃত মাওলার সঙ্গে গিয়ে মিললেন। তখন আবদুর রহমান নিজের ঘোড়া থেকে নেমে হযরত আখরামের (রা) ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে গেলেন। ইত্যবসরে হযরত আবু কাতাদাহ (রা) ঘোড়া দৌড়িয়ে এসে পৌছলেন এবং নিজের বর্শা দিয়ে আবদুর রহমানকে জাহান্নামে প্রেরণ করে সেই সময়ই হযরত আখরামের (রা) প্রতিশোধ নিয়ে নিলেন। ঠিক সেই সময়ই হযরত মিকদাদ (রা) ও আবু কাতাদাহ (রা)ও সালামার (রা) সঙ্গে এসে মিললেন এবং সেই তিনজন জানবাজ ডাকাতদেরকে বর্শার খোরাক বানালেন। কিছুক্ষণের মধ্যে হযূরের (সা) প্রেরিত কিছু আরো সওয়ারও পৌছে গেলেন। তখন লুটেরারা পালিয়ে যাওয়াই কল্যাণ মনে করলো। কিন্তু মুজাহিদরা তাদের পিছু ধাওয়া করেই চললেন। সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে ফাযারী লুটেরারা একটি পুকুরে একত্রিত হয়ে পানি পানের চিন্তা করছিল। এমন সময় হযরত সালামা (রা) হুংকার দিয়ে তাদের নিকট গিয়ে পৌছলেন। এ সময় হযরত সালামার (রা) সঙ্গীরা অনেক দূরে পড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহর সেই বাঘের সামনে ২০ জন সশস্ত্র যুদ্ধবাজ পানি পান না করেই পালিয়ে গেল এবং অনেক দূরে ছানিয়া জেবোর গিয়ে আশ্রয় নিল। ততক্ষণে সূর্যাস্ত গিয়েছিল কিন্তু হযরত সালামা (রা) সামনের দিকেই অগ্রসর হয়ে চলেছিলেন। এ সময় একজন ফাযারী লুটেরার ওপর তার দৃষ্টি পড়লো। তিনি তাকে তীর মারলেন এবং বীরত্ব গাঁথা পড়লেন।

জবাবে সে বললো, "ইবনে আকওয়ার সকাল হবেনা।" "হাঁ, হে নিজের নফসের দুশমন" এ কথা বলে হযরত সালামা (রা) অপর একটি তীর তার প্রতি নিক্ষেপ করলেন। সে ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়ে সেখান থেকে পলায়ন করল। দুটি ঘোড়া ফেলে গেল। হযরত সালামা (রা) ঘোড়া দু'টি হাঁকিয়ে যু কারদ পুকুরে এসে পৌছলেন। সেখানে রাসুলে আকরাম (সা) পাঁচশ' সশস্ত্র জীবন উৎসর্গকারীসহ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় হযরত বিলাল (রা) বিন রাবাহ একটি উট জবেহ করে তার কলিজা হযূরের (সা) জন্য

আগুনে ভুনা করছিলেন। হযরত সালামা (রা) হুযূরের (সা) খিদমতে ঘোড়া দু'টি পেশ করতে করতে আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি আমাকে একশ' মানুষ দেন তাহলে আমি ফাযারী লুটেরাদের নাম-নিশানা মিটিয়ে ফেলবো। এমনকি তাদের মধ্যে কোন খবর দেনেওয়ালাও বাঁচবে না।"

হুযূর (সা) মুচকী হেসে বললেন, "হে সালামা! তুমি কি সত্যিই তাই করবে?" হযরত সালামা (রা) অত্যন্ত জোশের সঙ্গে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! সেই আল্লাহর কসম যিনি আপনাকে মুয়াযযাজ ও মুকাররাম বানিয়েছেন। আমি ঠিক তাই করবো।" তাঁর জোশ ও আবেগ দেখে রহমতে আলম (সা) খুশী হয়ে গেলেন এবং এত হাসলেন যে, তাঁর পেছনের পবিত্র দাঁত থেকে কিরণমালা বিচ্ছুরিত হতে লাগলো। অতপর তিনি বললেন, "হে ইবনে আকওয়া! যেতে দাও এবং কাবু করার পর ক্ষমা করে দাও।"

ইত্যবসরে একজন গাতফানী (ধারণা করা হয় যে, সে মুসলমান হবে) এসে খবর দিল যে, ফাযারী লুটেরারা অমুক গাতফানীর নিকট পৌছলে সে তাদের মেহমানদারীর জন্য একটি উট জবেহ করে তার চামড়া খসাচ্ছিল। ঠিক এমন সময় ধূলো উড়তে দেখে সে মনে করলো যে, রাসূলের (সা) সৈন্য বুঝি আসছে। সুতরাং তারা সেই জবেহ করা উট ফেলে রেখে সেখান থেকে পলায়ন করল। হুযূর (সা) এ খবর শুনে মুচকি হাসলেন। সকাল হলে হুযূর (সা) বললেন, "আমাদের সওয়ারের মধ্যে সর্বোত্তম হলো আবু কাতাদাহ (রা) এবং পদদলে যাত্রাকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সালামা (রা)।"

তারপর হুযূর (সা) গনীমাতের মাল থেকে সওয়ার ও পদদলে যাত্রার উভয় ধরনের অংশই প্রদান করলেন। নবী করীম (সা) যী কারদ থেকে মদীনা রওয়ানা হলেন। তখন বিশ্ব হযরত সালামার (রা) মান-মর্যাদার এক আশ্চর্য ধরনের দৃশ্য দেখলেন। রহমতে আলম (সা) অত্যন্ত স্নেহভরে হযরত সালামাকে (রা) নিজের সওয়ারীর উপর (এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী আযবা নামক উটনী) নিজের পেছনে বসিয়ে রেখেছিলেন এবং অন্যান্য সব সাহাবায়ে কিরাম (রা) স্ব স্ব সওয়ারীতে তাঁর (সা) পেছনে পেছনে চললেন। এ পবিত্র কাফেলা তখন মদীনা থেকে কয়েক মাইল দূরে ছিলেন। এমন সময় একজন আনসারী সাহাবী বার বার চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, কেউ কি মদীনা পর্যন্ত দৌড়ে আমার ওপর বাজী নিতে পারে? হযরত সালামা (রা) বিন আকওয়ার কানে এ কথা গেল। তিনি ডেকে সেই সাহাবীকে (রা) বললেন ঃ "তুমি কি কোন সম্মানিত ব্যক্তিকে ইযযত করো না।?" তুমি কি কোন শরীফ ব্যক্তিকে সম্মান করো না।?" তিনি বললেন, "রাসুল (সা) ছাড়া অন্য কাউকে নয়।"

হযরত সালামা (রা) হুযূরের (সা) খিদমতে আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। তাঁর সঙ্গে দৌড়ে প্রতিযোগিতা করি এ অনুমতি আপনি আমাকে দিন"

হুযূর (সা) বললেন, "যা তোমার মরযী।"

এরপর তিনি আনসারী সাহাবীকে (রা) সম্বোধন করে বললেন, "তৈরী হয়ে যাও। আমি তোমার সঙ্গে দৌড়ে প্রতিযোগিতা করবো।" সুতরাং উভয়েই স্ব স্ব সওয়ারী থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন এবং মদীনার দিকে দৌড়াতে লাগলেন। হযরত সালামা (রা) বলেন, "আমি তাকে কিছু দূর পর্যন্ত সুযোগ দিলাম এবং নিজেকে পিছু রাখলাম। অতপর আমি দৌড়ে তার সমান সমান হয়ে গেলাম এবং তার বাহুর ওপর নিজের হাত রেখে বললাম, আল্লাহ্র কসম! এখন আমি তোমার থেকে এগিয়ে গেলাম। সে হেসে বললো, আমারও সেই ধারণা। অতপর আমি তার আগে মদীনায় পৌছে গেলাম।"

এ ঘটনা থেকে জানা যায় যে, হযরত সালামা (রা) অত্যন্ত দ্রুত গতি সম্পন্ন মানুষ ছিলেন এবং বাস্তবিকই হুযূরের (সা) ইরশাদ অনুযায়ী সর্বোত্তম পদাতিক ছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) ইসাবাহতে লিখেছেন যে, তিনি ঘোড়া থেকে দ্রুত দৌড়াতেন এবং যদি কোন অশ্বারোহীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা হতো তাহলে তিনি তার থেকে আগে চলে যেতেন।

যী কারদের যুদ্ধের তিন দিন পর রহমতে আলম (সা) খায়বারের ইহুদীদের উৎখাতের জন্য মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন। এ অভিযানে ১৬ জন মুজাহিদ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সালামা (রা) বিন আকওয়াও শামিল ছিলেন। খায়বারের যুদ্ধ রাসূলের (সা) সময়ের প্রসিদ্ধ যুদ্ধ ছিল। এ যুদ্ধ অনেক দিন চলেছিল এবং সে সময় ইহুদীদের সঙ্গে কয়েকটি সংঘর্ষ সংঘটিত হয়েছিল। এসব সংঘর্ষে হযরত সালামা (রা) জীবনবাজী রেখে বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। প্রিয় নবী (সা) হযরত সালামার (রা) তৎপরতায় এত খুশী হয়েছিলেন যে, যখন খায়বার বিজয়ের পর ইসলামী বাহিনী মদীনা প্রত্যাবর্তন শুরু করলেন তখন তিনি (সা) হযরত সালামার (রা) হাত ধরে ছিলেন। সহীহ বুখারীতে খায়বার যুদ্ধ সম্পর্কে হযরত সালামা (রা) বিন আকওয়া থেকে দু'টি হাদীস বর্ণিত আছে। এক হাদীসে তিনি বলেন, খায়বারের যুদ্ধের দিন আমার পায়ের গোছায় তরবারী লেগেছিল। আমি রাসূলের (সা) খিদমতে হাজির হলাম। তিনি তার ওপর তিনবার ফুঁ দিলেন। আমার ক্ষত সেরে গেল। এবং সে সময় থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত আর কোন ব্যথা পাইনি। দ্বিতীয় হাদীসে

তিনি বলেন, আমরা রাসূলের (সা) সাথে খায়বার রওয়ানা হয়ে গেলাম। সারা রাত সফর করলাম। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি আমের (রা) (বিন আকওয়া) কে বললো যে, আমাদেরকে কিছু শুনাওনা। বস্তুত আমের (রা) ছিলেন কবি। তিনি সওয়ারী থেকে নেমে এ হুদী বা উট চলার গান শোনাতে লাগলেন ঃ

"হে আল্লাহ! তোমার সাহায্য না হলে আমরা হেদায়াত পেতাম না। সাদকা করতাম না, নামায পড়তাম না। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর। যতদিন আমরা জীবিত থাকবো ততদিন তোমার ওপর ফিদা। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ইতমিনান ও মর্যাদা দান কর। এবং যখন আমরা দুশমনের মুখোমুখি হই তখন আমাদেরকে অটল রেখো। এরা আমাদেরকে নাহক কথার দিকে আহবান করে থাকে। কিন্তু আমরা তা অস্বীকার করি। তারা আমাদের ওপর শক্তি প্রয়োগ করেছে।"

হুযূরের (সা) পবিত্র কানে এর আওয়াজ পৌঁছলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এ হাঁকনেওয়ালা (উট চলার গানের গায়ক) কে? লোকজন আরয করলো, "আমের বিন আকওয়া।" তিনি বললেন, "আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন" আমাদের মধ্য থেকে একজন বললো, "হে আল্লাহর নবী! তার শাহাদাত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। আপনি আমাদেরকে তার থেকে কোন ফায়দা উঠাতে দেননি।" অতপর আমরা রওয়ানা হয়ে খায়বর পৌঁছলাম এবং তা অবরোধ করলাম। এমনকি সাহাবীদের বিজয় লাভ ঘটলো। সে সময় আমাদের খুব ক্ষুধা অনুভূত হলো এবং বিজয়ের দিন সন্ধ্যায় আমাদের তাঁবুতে স্থানে স্থানে আগুন জ্বলতে লাগলো। হুযূর (সা) জিজ্ঞেস করলেন, এটা কিসের আগুন এবং তোমরা কিসের নীচে আগুন জ্বালাচ্ছো। আমরা আরয করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা গোশত পাকাচ্ছি।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কিসের গোশত?" আমরা বললাম "গাধার" তিনি বললেন, এ গোশত ফেলে দাও এবং পাতিল ভেঙ্গে ফেলো। একজন বললো, আমরা তা ফেলে দিয়ে পাতিল ধুয়ে নি। হুযূর (সা) বললেন, ঠিক আছে তাই কর। এ যুদ্ধে দুশমন যখন আমাদের সামনে এলো এবং কাতারবন্দী হলো তখন আমের জনৈক ইহুদীর ওপর তরবারী দিয়ে কোপ মারলো। তাঁর তরবারী ছিল ছোট। এ জন্য তরবারী ফিরে তার উরুর ওপর লাগলো। আর এ ক্ষতের ব্যাথায় তিনি ইন্তেকাল করলেন। সৈন্যরা যখন ফিরে এলো তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আমার হাত ধরে ছিলেন সে সময় তিনি আমার দিকে দেখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, সালামা তুমি চিন্তাযুক্ত কেন? আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। লোকদের ধারণা আমেরের সকল কাজ বেকার গেছে (তাদের ধারণায় আমের (রা) আত্মহত্যা করেছিল।)। হুযূর (সা) বললেন, "যারা এ কথা

বলে, তারা ভুল বলে, আমের দ্বিগুণ সওয়াব পাবে এবং তিনি নিজের দু' আঙ্গুল মিলালেন এবং বললেন, অবশ্যই আমের জাহিদ এবং মুজাহিদ ছিলেন।"

সহীহ মুসলিম এবং হাদীসের অন্য কতিপয় কিতাবেও খায়বারের যুদ্ধ প্রসঙ্গে হযরত সালামা (রা) বিন আকওয়ার এক সুদীর্ঘ রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। তার কিছু অংশ সহীহ বুখারীর রেওয়ায়াত থেকে কিছু ভিন্নতর। তাতে হযরত সালামা (রা) পরিষ্কারভাবে বলেছেন, খায়বারের যুদ্ধে যখন মারহাব মুকাবিলার জন্য মুসলমানদেরকে আহবান জানালো তখন আমের (রা) বিন আকওয়া বীরত্ব গাথা পড়তে পড়তে তার সামনা সামনি হলেন। উভয়ের মধ্যে তরবারী চললো। মারহাবের তরবারী আমেরের (রা) ঢালে ঢুকে গেল। সে তা ঝটকা দিয়ে ছাড়াতে চাইলে তার অথবা আমেরের নিজের তরবারী নিজের গায়ে লেগে গেল। তাতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ শিরা কেটে গেল এবং তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। আমি কতিপয় সাহাবীকে বলতে শুনলাম যে, তার সব আমল বেকার হয়ে গেছে (অর্থাৎ তিনি আত্মহত্যা করেছেন) এ কথা শুনে আমি কাঁদতে কাঁদতে হুযূরের খিদমতে হাযির হলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েছে? আমি আরয করলাম যে, লোকজন বলে যে, আমেরের (রা) আমল বাতিল হয়ে গেছে। তিনি বললেন, এ কথা কে বলেছে? আমি আরয করলাম যে, কয়েকজন সাহাবী এ কথা বলেছেন। তিনি বললেন, তাঁরা ভুল বলেছে। বরং আমের দু'ধরনের সওয়াব পাবেন।

এ ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলীকে (রা) ডেকে পাঠালেন এবং বললেন যে, আজ আমি এমন মানুষকে ঝান্ডা অর্পন করবো যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে (সা) ভালবাসে। হযরত আলী (রা) সে সময় চোখের ব্যাথায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে ধরে হুযূরের (সা) খিদমতে এনে হাযির করলাম। তিনি (সা) নিজের পবিত্র মুখের লালা তাঁর চোখে লাগালেন এবং তৎক্ষণাৎ তিনি আরোগ্য লাভ করলেন। অতপর হুযূর (সা) তাঁর হাতে ঝান্ডা তুলে দিলেন। তিনি মারহাবের মুকাবিলার জন্য বের হলেন এবং তাকে হত্যা করলেন। এমনিভাবে খায়বার বিজিত হলো।

সপ্তম হিজরীতে রাসূলে আকরাম (সা) খবর পেলেন যে, বনূ কিলাবের লোকজন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। হুযূর (সা) হযরত আবু বকর সিদ্দীককে (রা) এক দল সৈন্য দিয়ে তাদেরকে উৎখাতের জন্য প্রেরণ করলেন। এ দলে সালামা (রা) বিন আকওয়াও শামিল ছিলেন। আল্লামা ইবনে সা'দ (র) ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত সালামা (রা) এ

যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন, একাকীই সাতজনকে হত্যা করেছিলেন এবং যারা পলায়ন করেছিল তাদের মহিলাদেরকে আটক করেন। তাদের মধ্যে একজন অনিন্দ্য সুন্দর মহিলা ছিল। হযরত আবু বকর (রা) তাকে হযরত সালামাকে (রা) দিয়ে দিয়েছিলেন। (সহীহ মুসলিম ও আবু দাউদে আছে যে, এ মহিলা হযরত সালামার (রা) অংশে পড়েছিল) বনু কিলাবের উৎখাত কাজ শেষ হওয়ার পর মুজাহিদগণ যখন মদীনা ফিরে এলেন তখন হুযূর (সা) পরে সেই মহিলাকে চেয়ে নিলেন এবং পুনরায় তাকে মক্কা প্রেরণ করে তার পরিবর্তে কয়েকজন মুসলমান কয়েদীকে মুক্ত করালেন।

আল্লামা ইবনে সা'দ (র) বলেন যে, সেই মহিলা নিজের কব্জায় থাকা সত্ত্বেও হযরত আবু সালামা (রা) তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করেননি এবং যখন হুযূর (সা) একটি দীনী উদ্দেশ্যে তাকে ফেরৎ চাইলেন তখন তিনি তাকে আযাদ করে দিলেন। এ ঘটনা হযরত সালামার (রা) ধার্মিকতা ও রাসূলের (সা) প্রতি আনুগত্যের অকাট্য প্রমাণ বহন করে।

অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর হুনাইন ও তায়েফের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এসব যুদ্ধেও হযরত সালামা (রা) তরবারীর পারদর্শীতা প্রদর্শন করেন। সহীহ মুসলিমে হযরত সালামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলের (সা) নিকট মুশরিকদের একজন গোয়েন্দা এলো। তিনি সে সময় স্বগৃহে ছিলেন না। সে সাহাবীদের সাথে কথা বললো এবং চলে গেল। যখন তিনি (সা) তাশরীফ আনলেন তখন সে ব্যক্তিকে খুঁজে বের করে হত্যার নির্দেশ দিলেন। আমি তাকে খুঁজে বের করলাম এবং হত্যা করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাকে কে হত্যা করেছে? লোকজন বললো, সালামা (রা) বিন আকওয়া, তিনি (সা) বললেন, সেই লোকটির সকল মাল ও আসবাব সালামার (রা)।

এ রেওয়ায়াতে এটা বর্ণনা করা হয়নি যে, এ ঘটনা কখন সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। তাতে বলা হয়েছে যে, এ ঘটনা ছাকিফ ও হাওয়াযিন (হুনাইন) যুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়। উটের পিঠে এক সওয়ার মুসলমান বাহিনীতে এসে পৌছলো এবং খানায় শরীক হলো। এ সময় সে গোয়েন্দার দৃষ্টিতে মুসলমান সৈন্যদেরকে দেখতে লাগলো। সে যখন চলে গেল তখন মুসলমানদের সন্দেহ হলো। তাঁরা বললো যে, সে গোয়েন্দা বা চর ছিল। হযরত সালামা (রা) বিদ্যুৎ বেগে তার পিছু নিল এবং পথেই তাকে ধরে ফেললো। অতপর তার উটের রশি ধরে বসলো এবং তরবারীর এক কোপে তার মস্তক উড়িয়ে দিল। এরপর তিনি তার সওয়ারী ও অন্য সামান দখল করলেন। হুযূর (সা) দেখে জিজ্ঞেস

করলেন তাকে কে মেরেছে? লোকজন বললো সালামা (রা)। তিনি বললেন, তাহলে তার সকল সামান সালামার (রা)।

হযরত সালামার (রা) জিহাদে খুব উৎসাহ ছিল। মদীনা আসার পর খুব কম যুদ্ধই এমন হবে যাতে তিনি অংশগ্রহণ করেননি। সহীহ বুখারীতে স্বয়ং হযরত সালামা (রা) বিন আকওয়া থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূলের (সা) সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি এবং যে বাহিনী রাসূল (সা) প্রেরণ করতেন আমি তার ৯টিতে শরীক হয়েছি।

এমনিভাবে রাসূলের (সা) যুগে যেসব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তার সব ক'টিতেই হযরত সালামা (রা) অংশ নিয়েছিলেন। এসব যুদ্ধের সর্বমোট সংখ্যা হলো ১৬। যে সব যুদ্ধে তিনি রহমতে আলমের (সা) সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন তার মধ্যে 'যী কারদ' অথবা 'গাবাহ', খায়বার এবং হুনাইনের নাম চরিতকাররা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন দলীল থেকে জানা যায় যে, এসব ছাড়াও তিনি আরো যেসব যুদ্ধে রাসূলের (সা) সাথী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন তাহলো ঃ

১। ওয়াদিউল কুরার যুদ্ধ অথবা যাতুর রিকার যুদ্ধ (সপ্তম হিজরীর মুহররম মাসে)। ২। মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ (অষ্টম হিজরী)। ৩। তায়েফের যুদ্ধ (অষ্টম হিজরী)। ৪। তাবুকের যুদ্ধ (নবম হিজরী)।

প্রিয় নবীর (সা) ইন্তেকালের পর হযরত সালামা (রা) অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে মদীনা অবস্থান করতে লাগলেন। কিন্তু আমীরুল মু'মিনীন হরযত ওসমান (রা) যখন শহীদ হলেন, তখন তিনি এত কষ্ট পেলেন যে, মদীনা অবস্থান ত্যাগ করে রাবজাহ চলে গেলেন। সেখানে একজন মহিলাকে বিয়ে করেন। এ মহিলার গর্ভে কয়েকটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ৭৪ হিজরীতে তিনি মদীনা ফিরে যান এবং কিছু দিন পর ওফাত পান।

সহীহ বুখারীতে ইয়াযীদ বিন আবি ওবায়দাহ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওসমান (রা) বিন আফফান যখন শহীদ হলেন তখন সালামা (রা) বিন আকওয়া রাবজাহ চলে গেলেন। সেখানে একজন মহিলাকে বিয়ে করলেন এবং কতিপয় সন্তান হলো। তিনি সেখানেই অবস্থান করছিলেন। কিন্তু ওফাতের কিছু দিন পূর্বে মদীনা এলেন এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেন। (বুখারী কিতাবুল ফিতান)

হযরত সালামা (রা) অন্যতম মহান সাহাবী ছিলেন। তাঁর থেকে ৭৭টি হাদিস বর্ণিত আছে।

হযরত সালামা (রা) রাসূলের (সা) যুগের কতিপয় চোখে দেখা ঘটনা অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করতেন। সহীহ বুখারীতে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা রাসূলের (সা) পাশে বসা অবস্থায় ছিলাম। এমন সময় একটি জানাযা আনা হলো এবং নামায পড়ার জন্য তাঁর নিকট অনুরোধ জানানো হলো। তিনি বললেন, "তার ওপর কোন ঋণতো নেই?" লোকজন আরয করলো, 'না' তিনি পুনরায় বললেন, "কোন কিছু রেখে মারা গেছে কি?" আরয করা হলো, 'না।' তিনি তার নামাযে জানাযা পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আরো একটি জানাযা আনা হলো এবং লোকজন হুযূরের (সাঃ) নিকট নামায পড়ার জন্য অনুরোধ জানালেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তার ওপর কোন ঋণ নেইতো?" বলা হলো, 'হাঁ। ঋণ আছে' তিনি বললেন, "কিছু রেখে মারা গেছে কি"? বলা হলো, "তিন দীনার রেখে গেছে।" তিনি তারও নামাযে জানাযা পড়ালেন। অতপর তৃতীয় জানাযা আনা হলো এবং হুযূরের (সা) নিকট নামায পড়ার অনুরোধ করা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন সেকি কিছু রেখে মারা গেছে? আরয করা হলো, না। বললেন, তার কি ঋণ আছে? আরয করা হলো, "তিন দীনার" তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের মানুষের নামায পড়ো (আমি পড়বো না)। আবু কাতাদাহ (রাঃ) আরয করলেন। " হে আল্লাহর রাসূল! তার ওপর যে ঋণ রয়েছে তা আমার দায়িত্বে নিচ্ছি। আপনি নামায পড়ুন। তার পর তিনি তার নামায পড়লেন।

সহীহ মুসলিমে হযরত সালামা (রা) বিন আকওয়া থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলের (সা) সামনে বাম হাতে খাবার খাচ্ছিল। তিনি তাকে বললেন, ডান হাত দিয়ে খাও সে বললো, ডান হাত দিয়ে খাওয়ার শক্তি নেই। তিনি বললেন, "আল্লাহ যেন তোকে শক্তি না দেন।" আমি (সালামা) দেখলাম যে, সেই ব্যক্তি ডান হাত নিজের মুখ পর্যন্ত উঠাতে পারলো না। (অর্থাৎ তার ডান হাত অবশ হয়ে গেল)।

হযরত সালামা (রা) থেকে বর্ণিত কয়েকটি হাদীস গুরুত্বপূর্ণ দীনী মাসয়ালার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। যেমন সহীহাইনের (বুখারী ও মুসলিম শরীফ) এক রেওয়ায়াতে হযরত সালামা (রা) বিন আকওয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন যে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরবানী করবে সে তার গোশত তিন দিনের বেশী রাখবে না। অতপর দ্বিতীয় বছর এলো। আমরা আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি এ বছরও গত বছরের মত আমল করবো? তিনি বললেন, না। নিজে খাও এবং অপরকে খাওয়াও। গত বছরতো মেহনত-মুশাককাত ও অভাবের বছর ছিল। এ জন্য আমি নিষেধ করেছিলাম।

সহীহ মুসলিমে হযরত সালামা (রা) ইবনুল আকওয়া থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা নবী করীমের (সা) সঙ্গে সূর্য ঢলতে জুমআর নামায আদায় করতাম। অতপর ফিরে সূর্যের ছায়া তালাশ করতাম। আবু দাউদ ও নাসায়ী হযরত সালামা (রা) বিন আকওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি নবীর (সা) নিকট আরয করলাম, আমি একজন শিকারী। আমি কি এক জামাতেই নামায পড়বো। তিনি বললেন, "হাঁ। কিন্তু তাতে বোতাম অথবা সেলাই দিয়ে নিও। সেলাই কাঁটা দিয়ে হলেও তা দিও। সহীহ মুসলিমের এক রেওয়ায়াতে হযরত সালামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানের ওপর তরবারী ওঠাবে সে আমাদের কেউ নয়। তিরমিযীতে হযরত সালামা (রা) বিন আকওয়া থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমায়েছেন, মানুষ নিজের অহংকারের ওপর অগ্রসর হতে থাকে এবং শেষে সে সেই শাস্তিই পায় যা অন্য অহংকারীরা পেয়ে থাকে।

কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত সালামা (রা) বিন আকওয়া নিজের ইলম ও ফযীলতের ভিত্তিতে লোকদের নিকট অত্যন্ত সম্মানিত ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন এবং তিনি অন্যতম ফতওয়াদানকারী সাহাবী হিসেবে পরিগণিত হতেন। আল্লামা ইবনে সা'দ (রা) যিয়াদ বিন মিনা (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন যে, হযরত সালামা বিন আকওয়া (রা), ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে ওমর (রা), আবু সাঈদ খুদরী (রা), আবু হুরাইরা (রা), আবদুল্লাহ বিন আমর (রা) বিন আছ, জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা), রাফে' (রা) বিন খাদীজ, আবু ওয়াকেদ লাইছী (রা) এবং তাঁদের মত অন্যান্য সাহাবী (রা) মদীনায় ফতওয়া দিতেন ও হুযূরের (সা) হাদীস বর্ণনা করতেন।

হযরত সালামা (রা) বিন আকওয়ার চারিত্রিক গুণাবলীর পাতায় রাসূলের প্রতি আনুগত্য, ধার্মিকতা, আল্লাহ্‌ভীতি, জিহাদের প্রতি উৎসাহ, উদারতা ও দানশীলতা এবং ত্যাগ সবচেয়ে প্রোজ্জ্বল দিক। নবীর (সা) সুন্নাতের অনুসরণের উৎসাহ তাঁর জীবনাচরণে রাসূলের (সা) উত্তম গুণের ঝলক সৃষ্টি করেছিলেন। রাসূলের (সা) বংশের জন্য যেমন সাদকা গ্রহণ জায়েয ছিল না। তেমনি তিনিও নিজের জন্য সাদকার মাল হারাম মনে করতেন। কোন বস্তুতে সরিষা বরাবর সাদকার সন্দেহ হলে তিনি তা অবশ্যই ব্যবহার করতেন না। এমনকি নিজের সাদকাকৃত বস্তু দ্বিতীয়বার ক্রয় করাও জায়েয মনে করতেন না। আল্লাহ ও তার রাসূল (সা) যেসব কাজ নিষিদ্ধ করেছেন তা থেকে তিনি যে কোন মূল্যে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতেন।

আল্লামা ইবনে সা'দ (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত সালামা (রা) অত্যন্ত উদার ও দানশীল ছিলেন। কোন ব্যক্তি তাঁর নিকট আল্লাহ্‌র মাধ্যম দিয়ে

সওয়াল করলে কখনো খালী হাতে ফেরত দিতেন না। তিনি বলতেন আল্লাহ্‌র পথে যদি মানুষকে না দেওয়া হয় তাহলে কোন্ পথে দেবে। এ সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র মাধ্যম দিয়ে সওয়াল করাকে তিনি দোষের মনে করতেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, মানুষ সাদাসিধেভাবে নিজের প্রয়োজনের কথা বর্ণনা করবে। সামর্থ্যবান ব্যক্তি যদি তার প্রয়োজন পূরণ করে, তাহলে সে তা আল্লাহ্‌র নির্দেশ মোতাবেকই করবে। আল্লাহ্‌র মাধ্যম দানের প্রয়োজন কি?

দীনের প্রতি মর্যাদাবোধ এবং হযূরের (সা) প্রতি মুহাব্বতের অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁর (সা) সম্পর্কে কোন কটু কথা শুনলে কেঁপে উঠতেন। ফুযারী লুটেরারা তাঁর (সা) উটনী ডাকাতি করেছিল। সে সময় তিনি (হযরত সালামা (রা)) একাকী সশস্ত্র ডাকাতদের এক বড় দলের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন এবং নিজের ঈমানী শক্তি বলে তাদের সবাইকে এক হাত নিয়েছিলেন।

বাস্তবত হযরত সালামা (রা) বিন আকওয়া ইসলামী মিল্লাতের সেই হান সন্তান যাদের কৃতিত্ব ইসলামের ইতিহাসের পাতায় ঝলমল করছে।

হযরত আমর (রা) বিন আবাসা

নবুওয়াত প্রাপ্তির চতুর্থ বছর। রহমতে আলম (সা) প্রকাশ্যে হকের তাবলীগ শুরু করলেন। কুরাইশ মুশরিকদের ক্রোধ ও উষ্মা সর্বশক্তিসহ ফেটে পড়লো। অথচ তারাই হকের বার্তা শোনার পূর্বে হুযূরকে (সা) সত্যবাদী, আমানতদার এবং অত্যন্ত উঁচু চরিত্রের অধিকারী বলে আন্তরিকভাবে স্বীকার করতো। তারা তাঁকে অকপট চিত্তে প্রশংসাও করতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, যখনই তাদেরকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করা হলো তখনই তারা সর্বোত্তম সৃষ্টির (সা) খুন পিপাসু হয়ে গেলো। তারা তাঁকে (সা) নির্যাতন করতে কসুর করলো না। আবার তাঁর অনুসারীরাও তাদের যুলুম-নির্যাতন থেকে রেহাই পেলো না। আল্লাহর পবিত্র বান্দাহদের ওপর সকল ধরনের নির্যাতনই চালানো হলো। তবে, তাঁরা নজিরবিহীন ধৈর্য, স্থৈর্য এবং অটলতা প্রদর্শন করলেন। সেই ঘনঘোর দুর্যোগপূর্ণ সময়ে রহমতে আলম (সা) একবার হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত বিলাল (রা) বিন রাবাহর সঙ্গে হকের তাবলীগের উদ্দেশ্যে উকাজের বাজারে তাশরীফ নিলেন। এখানে প্রত্যেক বছর আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে লোকজন আসতেন এবং এ বাজার এক বিরাট জাতীয় মেলার রূপ নিত। হাদীয়ে বরহক হুযূরে আকরাম (সা) মেলায় আগত লোকদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন। এ সময় বহুসংখ্যক মুশরিক তাঁর চারপাশে একত্রিত হয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুরু করলো। মেলাতে বনূ সুলাইম গোত্রের এক সুন্দর প্রকৃতির বেদুইন উপস্থিত ছিলেন। তিনি কাফেরদের বে-আদবীর পরিবর্তে হুযূরের (সা) তাবলীগের আন্দাজ এবং তাঁর ধৈর্য ও স্থৈর্য দেখে খুব প্রভাবিত হলেন। যখন একটু নির্জন হলো এবং কাফেররা চলে গেল তখন তিনি রাসূলের (সা) নিকট পৌছলেন এবং তাঁর (সা) দাওয়াতের বিস্তারিত জানার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। সে সময় প্রিয় নবী (সা) এবং সেই বেদুইনের মধ্যে এ কথোপকথন হয়েছিল ঃ

বেদুইন ঃ আপনি কে?

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ আমি আল্লাহর নবী।

বেদুইন ঃ নবী কাকে বলে?

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে বাণী বাহককে।

বেদুইন ঃ সত্যি কি আল্লাহ আপনাকে প্রেরণ করেছেন?

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ হাঁ, আল্লাহ তাআলা আমাকে নবুওয়াত প্রদান করেছেন।

বেদুইন ঃ আপনার দাওয়াত কি?

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ আল্লাহকে এক মানতে হবে। কাউকে তাঁর সঙ্গে শরীক করা যাবে না। মূর্তিদেরকে পূজা করা যাবে না আত্মীয়দেরকে ভালোবাসতে হবে এবং তাদের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করতে হবে।

বেদুইন ঃ কোন ব্যক্তি কি আপনার ওপর ঈমান এনেছে?

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ (হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত বিলালের (রা) প্রতি ইঙ্গিত করে) এ দু'জনের একজন আযাদ এবং একজন গোলাম আমার ওপর ঈমান এনেছেন।

বেদুইন ঃ ইসলাম কি?

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ প্রত্যেকের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করা এবং মিসকীনদেরকে খাবার খাওয়ানো হলো ইসলাম।

বেদুইন ঃ আর ঈমান?

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ আল্লাহ্র পথে সবর ও সন্তুষ্টির নাম হলো ঈমান।

বেদুইন ঃ ইসলামের সর্বোন্নত সোপান কি?

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ কাউকে মুখ দিয়ে মন্দ না বলা এবং কাউকে শারীরিক কষ্ট না দেয়া।

বেদুইন ঃ ঈমানের সর্বোন্নত সোপান কি?

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ সুন্দর কর্মে ঈমান উন্নত হয়।

বেদুইন ঃ হে আল্লাহর নবী। আমিও আপনার ওপর ঈমান আনয়ন করছি। আল্লাহ্র একত্ববাদের স্বীকৃতি দিচ্ছি। মূর্তি পূজায় অস্বীকৃতি জানাচ্ছি এবং আত্মীয়দের সঙ্গে সুন্দর আচরণ আমার জীবনের কর্মসূচী হবে।

রাসূলে আকরাম (সা) : "আরে ভাই আজকাল আমরা যে যুলুমের শিকার হচ্ছি তা বরদাশত করা তোমার সাধ্যের বাইরে। এখন তুমি স্বদেশে চলে যাও। যখন শুনবে যে, আমি বিজয়ী হয়েছি তখন আমি যেখানে অবস্থান করি সেখানে চলে আসবে।

বেদুইন হুযূরের (সা) নির্দেশ পালনার্থে স্বদেশে ফিরে গেলেন, কিন্তু শূন্য হাতে গেলেন না। তিনি দীন ও দুনিয়ার নিয়ামতে নিজের ঝুলি ভরে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি শুধু ইসলামের মহান নিয়ামতে পূর্ণ হননি বরং সাইয়েদুল মুরসালীনের মহান নির্দেশাবলীও মন-মগজে মাহফুজ করে নিয়েছিলেন এবং আজীবন তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বনূ সুলাইমের এ ভাগ্যবান বেদুইন ছিলেন হযরত আমর বিন আবাসা। তিনি যখন বাড়ী থেকে বের হয়েছিলেন তখন শূন্য হাতে ছিলেন। কিন্তু যখন ফিরে যান তখন তকদীর পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল এবং ঈমানের সম্পদে পরিপূর্ণ ছিলেন।

হযরত আবু নাজিহ আমর (রা) বিন আবাসা (বিন আমের বিন খালেদ বিন গাদিরাহ বিন ইতাব বিন ইমরাউল কায়েস) সেই কতিপয় সাহাবায়ে কিরামের (রা) অন্যতম ছিলেন যাঁরা জাহেলী যুগেও আল্লাহ তাআলাকে একক এবং লাশরীক জানতেন। মূর্তি পূজা অস্বীকার করতেন এবং দীনে ইবরাহীমীকে অনুসরণ করতে চাইতেন। এ ধরনের সাহাবীদেরকে ইতিহাসে হুনাফা নামে স্মরণ করা হয়। হযরত আমরের (রা) মাতার নাম ছিল রামলা বিনতে ওয়াকিয়া। মুসতাদরাকে হাকিমের এক রেওয়ায়াতে স্পষ্ট আছে যে, জালীলুল কদর সাহাবী হযরত আবু যার গিফারীও (রা) তাঁরই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে হযরত আমর (রা) বিন আবাসা হযরত আবু যার গিফারীর বৈপিত্রীয় ভাই।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) ইসাবাহতে স্বয়ং হযরত আমর (রা) বিন আবাসা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বুদ্ধি হতেই আমি মূর্তি পূজার জোয়াল ঘাড় থেকে নিক্ষেপ করেছিলাম। কেননা, আমার অন্তরে এ কথা স্পষ্ট ছিল যে, এসব মূর্তি কাউকে কোন লাভ অথবা ক্ষতি করতে পারে না। আমি সে যুগে মূর্তি পূজারীদেরকে সরাসরি গোমরাহীতে লিপ্ত বলে মনে করতাম। সে যুগেই এক আহলে কিতাবের সঙ্গে আমার মুলাকাত হয়েছিল। সে আমাকে বলেছিল যে, আমাদের কিতাব অনুযায়ী পবিত্র মক্কা থেকে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে, যিনি লোকদেরকে মূর্তি পূজা থেকে নিষেধ করবেন এবং এক অদেখা মাবুদের ইবাদাতের দাওয়াত দিবেন। তাঁর শরীআত হবে সকল

শরীআত থেকে উত্তম। এ কথা শুনে আমি সব সময় সেই অপেক্ষায় থাকতে লাগলাম যে, কবে আমি এ ব্যক্তির আবির্ভাবের খবর পাবো। সুতরাং যে ব্যক্তিই মক্কা থেকে আসতো তাকেই আমি সেখানকার বর্তমান অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করতাম। একদিন মক্কা থেকে আগত এক ব্যক্তি আমাকে বললো যে, মক্কায় এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে, যিনি লোকদেরকে মূর্তিপূজা করতে নিষেধ করে থাকেন এবং একক আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনয়নের দাওয়াত দেন। তাঁর সুন্দর কাজ-কাম থেকে মনে হয় যেন তিনি এক ভালো দীনের আহবায়ক।

এ খবর পেতেই আমি নিজের উটনীর ওপর সওয়ার হয়ে মক্কা পৌছলাম এবং উকাজ বাজারে গিয়ে রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে পৌছে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলাম। যখন আমি যথাযথ জবাব পেলাম তখন আমি ইসলাম কবুল করে নিলাম। অতপর প্রিয় নবী (সা) আমাকে স্বদেশ ভূমিতে ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন। (এ ঘটনা ওপরে বর্ণিত হয়েছে)।

এক রেওয়ায়াতে হযরত আমর (রা) বিন আবাসা নিজেকে চতুর্থ মুসলমান হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তার কারণ হলো, যে সময় তিনি মুসলমান হন তখন রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে শুধুমাত্র দু'জন মুসলমান হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত বিলাল হাবশী (রা) উপস্থিত ছিলেন। হযরত আমরের (রা) অন্যান্য মুসলমানের কথা জানা ছিল না। এ জন্য তিনি নিজেকে চতুর্থ মুসলমান হিসেবে মনে করেছিলেন। নচেত সে সময় পর্যন্ত আরো অনেক নেক ফিতরতের সাহাবী ইসলামের সীমায় প্রবেশ করেছিলেন।

আল্লামা ইবনে সাআদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, এ সময় রাসূলে আকরাম (সা) অন্যান্য কথা ছাড়া হযরত আমর (রা) বিন আবাসাকে এ কথাও বলেছিলেন যে, অন্যায় হত্যা থেকে বেঁচে থাকতে হবে এবং রাস্তা নিরূপদ্রব (অর্থাৎ লুটতরাজহীন) রাখতে হবে।

সিয়ারুস সাহাবা তৃতীয় খন্ডে মওলানা শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নদবী মরহুম লিখেছেন যে, হযরত আমর (রা) বিন আবাসা প্রথম প্রথম রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে সেই সময় (গোপনভাবে) উপস্থিত হয়েছিলেন যখন তিনি মুশরিকদের শত্রুতামূলক আচরণের কারণে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতেন না। কিন্তু জ্ঞানের আলোকে এ রেওয়ায়াত সঠিক বলে মনে হয় না। কেননা, কুরাইশের মুশরিকরা বিরোধীতার তুফান সেই সময় বইয়েছিল যখন তিনি (সা) প্রকাশ্যে হকের দাওয়াত দিতে শুরু করেন। সকল চরিতকারই এ ব্যাপারে একমত যে, রহমতে আলম (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির

চতুর্থ বছরের শুরুতে হকের দাওয়াত সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করেন। এর পূর্বে তিন বছর পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে তাবলীগের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতেন। প্রকাশ্যে তাবলীগে হকের পরই কাফিররা তাঁর বিরুদ্ধে লেগে গেলেন। আস্তে আস্তে মক্কার পার্শ্ববর্তী এবং আরবের অন্যান্য এলাকার লোকেরাও তাঁর দাওয়াত সম্পর্কে অবহিত হলেন এবং তিনি সমগ্র আরবে "সাহিবে কুরাইশ" উপাধিতে মশহুর হয়ে পড়লেন। হাফিজ ইবনে হাজার (র) ইসাবাতে আমর (রা) বিন আবাসার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে যে রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন তাতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি সেই সময়ে হুযূরের (সা) খিদমতে হাযির হয়েছিলেন যখন তিনি প্রকাশ্যে দাওয়াতে হক প্রদান শুরু করেছিলেন এবং হক পন্থীরা মুশরিকদের যুলুম-নির্যাতনের নিশানা হয়েছিলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আমর (রা) বিন আবাসা বছরের পর বছর পর্যন্ত স্বদেশেই অবস্থান করতে থাকেন। ইত্যবসরে রহমতে আলম (সা) হিজরত করে মদীনা তাশরীফ নেন। বদর, ওহোদ, খন্দক এবং খায়বারের যুদ্ধও সংঘটিত হয়। মক্কা বিজয়ের কিছু দিন পূর্বে মদীনার কতিপয় মানুষ মরুভূমির বস্তি এলাকা দিয়ে অতিক্রম করছিল। এ সময় হযরত আমর (রা) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "মক্কা থেকে যে সাহেব তোমাদের ওখানে গিয়েছিলেন তাঁর অবস্থা কি?"

তাঁরা বললেন, তাঁর কওমতো তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা এঁটেছিল। কিন্তু তারা তাতে সফল হতে পারেনি। আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেন এবং তিনি সহীহ সালামতেই মদীনা আগমন করেন। বর্তমানে তাঁকে আমরা এমন অবস্থায় রেখে এসেছি যে, মানুষ তাঁর দিকে দলে দলে আসছে।

হযরত আমর (রা) এ খবর শুনতেই অস্থির হয়ে পড়লেন এবং তৎক্ষণাৎ উটনীর ওপর সওয়ার হয়ে মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলেন। মদীনা পৌঁছে উটনী কোথায়ও বেঁধে সোজা রহমতে আলমের (সা) খিদমতে হাযির হলেন। অত্যন্ত আদবের সঙ্গে সালাম করলেন এবং বললেন : "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন?" হুযূর (সা) বললেন, "হাঁ, তুমি সেই না, যে কয়েক বছর আগে আমার সঙ্গে মক্কায় সাক্ষাৎ করেছিলে এবং আমার রিসালাতের সত্যতা মেনে নিয়েছিলে।"

হযরত আমর (রা) আরয করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই আমি সেই ব্যক্তি।"

হাফিজ ইবনে হাজার (র) ইসাবাহতে লিখেছেন, নিজের পরিচয় দেওয়ার পর হযরত আমর (রা) বিন আবাসা রাসূলে আকরামের (সা) নিকট দরখাস্ত করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! সেই কুরআন আমাকেও পড়ান যা আপনার উপর নাযিল হয়েছে।"

আল্লামা ইবনে সাআদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, সে সময় হযরত আমর হুযূরের (সা) খিদমতে আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! "আল্লিমনী মা আল্লামাকাল্লাহ" (হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে যে ইলম দিয়েছেন তা আমাকেও কিছু শিক্ষা দিন)।

সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত আমর (রা) বিন আবাসা মদীনা আগমনের পর রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে নামায, রোযা ও অন্যান্য দীনী বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতপর স্থায়ীভাবে মদীনাতেই বসতি স্থাপন করেন।

হযরত আমর (রা) বিন আবাসার মদীনা আগমনের কিছু দিন পরই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) মক্কা বিজয়ের সংকল্প করেন। এ সময় হযরত আমর (রা) সেই দশ হাজার হকের বীরের মধ্যে শামিল হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং তিনি রাসূলের (সা) সঙ্গী হয়েছিলেন।

মক্কা বিজয়ের পর যে যুদ্ধে হযরত আমর (রা) বিন আবাসা অংশগ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়, তা হলো তায়েফের যুদ্ধ। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে স্বয়ং হযরত আমর (রা) বিন আবাসা থেকে বর্ণিত আছে যে, অবরোধকালে রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একটি তীর চালাবে তার জন্য জান্নাতে একটি দরজা খুলে যাবে।" হুযূরের (সা) ইরশাদ শুনে আমি একেরপর এক ১৬টি তীর চালাই।

সিয়ারুস সাহাবাতে শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নদবী (র) লিখেছেন যে, তায়েফ ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধে হযরত আমর (রা) বিন আবাসার অংশগ্রহণ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা যায় না। কিন্তু এতটুকুন জানা যায় যে, তার পরও তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

হযরত আমর (রা) বিন আবাসা মক্কা বিজয়ের (অষ্টম হিজরীর রমযানে) কিছুদিন পূর্বেই মদীনা এসেছিলেন। ১১ হিজরীতে রাসূলে আকরামের (সা) ওফাত হয়। এ জন্য হযরত আমর (রা) নবীর (সা) ফয়েয লাভের বেশী সুযোগ পাননি। তা সত্ত্বেও নিজের সুন্দর স্বভাব এবং ইলমে দীন হাসিলের উৎসাহের কারণে তিনি অনেক কিছু অর্জন করেন। সুতরাং তাঁর থেকে ৪৮টি হাদীস বর্ণিত আছে।

হাফেজ ইবনে হাজার (র) এবং আবু নঈম (র) উভয়েই একটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ভক্তি, আল্লাহ্ভীতি ও রাসূলের (সা) আনুগত্যের বরকতে হযরত আমর (রা) বিন আবাসা আল্লাহর দরবারে গৃহীতদের মধ্যে শামিল হন। এ রেওয়ায়াত হযরত কা'বের গোলামের মুখে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ

"আমরা হযরত মিকদাদ (রা) বিন আসওয়াদ, শাফে (রা) বিন হাবীব হাযলী এবং আমর (রা) বিন আবাসার সঙ্গে কোথায়ও যাচ্ছিলাম। সফরকালে একদিন হযরত আমর বিন আবাসা পশু চারণের জন্য জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন। দ্বিপ্রহরের দিকে তাঁকে তালাশের জন্য গিয়ে দেখি তিনি (একটি খোলা স্থানে) শুয়ে রয়েছেন এবং একটি মেঘ তাঁকে ছায়া দিয়ে রেখেছে। আমি তাঁকে ঘুম থেকে জাগালাম। এ সময় তিনি বললেন, ভাই, তুমি যা দেখেছ তোমার কসম তা তুমি কাউকে বলবে না। আল্লাহ্র কসম! তার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত এ কথা আমি কাউকে বলিনি।"

হযরত আমর (রা) বিন আবাসা নবীর (সা)দরবারে নিজের পর্যবেক্ষণ এবং হুযূরের (সা) ইরশাদসমূহ অত্যন্ত বিনয় ও আনন্দের সঙ্গে লোকদেরকে বলতেন। আমরা এখানে তাঁর থেকে বর্ণিত শুধুমাত্র দুটি হাদীস বরকত হিসেবে বর্ণণা করবো।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে হযরত আমর (রা) বিন আবাসা থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে হাজির হলো এবং জিজ্ঞেস করলো ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! ইসলাম কি বস্তু?" তিনি বললেন, "ইসলাম হলো এই যে, তোমার অন্তর আল্লাহর সামনে ঝুঁকে যাবে এবং তোমার যবান ও হাত কোন মুসলমানকে কষ্ট দেবে না।"

অতপর সে জিজ্ঞেস করলো ঃ "ইসলামের সর্বোত্তম অংশ কি?" তিনি বললেন, "ঈমান।" সে জিজ্ঞেস করলো ঃ "ঈমান কি বস্তু।" তিনি বললেন, "ঈমান হলো এ যে, আল্লাহ তায়ালা, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর নীতিসমূহ অন্তর দিয়ে মানা এবং মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার জীবিত হওয়ার ওপর বিশ্বাস ও আস্থা রাখা।"

সে জিজ্ঞেস করলো ঃ "আচ্ছা ঈমানে সর্বোত্তম কি?" তিনি বললেন, ঃ "হিজরত"।

সে আরয করলো ঃ "হিজরতের অর্থ কি?"

তিনি বললেন ঃ "তার অর্থ হলো যে, তুমি খারাবকে পরিত্যাগ করবে।"

সে জিজ্ঞেস করলো ঃ "আচ্ছা, তাহলে সর্বোত্তম হিজরত কি?"

তিনি বললেন ঃ "জিহাদ করা এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে জীবন দিয়ে লড়াই করা।"

সে জিজ্ঞেস করলো ঃ "আচ্ছা, তাহলে সর্বোত্তম জিহাদ কোন্‌টি?"

তিনি বললেন ঃ "সেই ব্যক্তির জিহাদ যার ঘোড়া আহত হয় এবং নিজের রক্তও প্রবাহিত হয়।"

এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী এ ইরশাদে তিনি এ অতিরিক্ত কথাও বলেছিলেন, "তারপর আরো দু'টি কাজ রয়েছে যা সর্বোত্তম। কিন্তু হাঁ, যে ব্যক্তি এ কাজই করে। প্রথম, হজ্ব। এমন হজ্ব যাতে খিয়ানত নেই (অর্থাৎ যাতে কোন গুনাহ সংঘটিত না হয়) দ্বিতীয় ওমরাহ করা।"

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলের অন্য এক রেওয়ায়াতে হযরত আমর (রা) বিন আবাসা থেকে বর্ণিত আছে যে, বার্ধক্য পীড়িত এক ব্যক্তি নিজের লাঠির সহায়তায় রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! ইসলাম গ্রহণের পূর্বে অনেক খিয়ানত ও গুনাহ করেছি। ইসলাম গ্রহণের পর আমার এ সব গুনাহ কি মাফ করে দেয়া হবে?"

তিনি বললেন ঃ "তুমি কি এ সাক্ষ্য দাও না যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই।?"

তিনি বললেন ঃ "অবশ্যই আমি সাক্ষ্য দিই এবং এও যে, আপনি আল্লাহর রাসূল।"

তিনি বললেন ঃ "তুমি যাও। আল্লাহ তায়ালা তোমার কুফুরির যামানার সকল খিয়ানত এবং গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন।"

রাসূলের (সা) আনুগত্য, আল্লাহ্ ভীতি এবং হক কথন তাঁর চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সা) নির্দেশের সামান্যতম এদিক-ওদিকও তিনি পসন্দ করতেন না। অবস্থা যতই কঠিন হোক না কেন তিনি লোকদেরকে সবসময়ই সঠিক পথে চলার পরামর্শ দিতেন।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে, একবার আমীর মাবিয়া (রা) এবং রোমকদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। এ চুক্তি অনুযায়ী কোন পক্ষ একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অন্য পক্ষকে হামলা করতে পারতো না। কিন্তু

পরিস্থিতি এমন হলো যে, আমীর মাবিয়া (রা) যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন এবং নিজের বাহিনীকে রোমকদের সীমান্তে মোতায়েন করে ইচ্ছা করলেন যে, চুক্তির মেয়াদ শেষ হতেই রোমকদের ওপর হামলা করে বসবেন। হযরত আমর (রা) বিন আবাসাও আমীরে মাবিয়ার (রা) বাহিনীতে ছিলেন। আমীরে মাবিয়ার (রা) ইচ্ছার কথা জানতে পেরে তিনি উচ্চৈস্বরে লোকদেরকে নির্দেশ দিতে লাগলেন যে, হে মুসলমানরা। কাউকে ধোকা দিও না এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর। তার নির্দেশের ফল হলো যে, আমীর মাবিয়া (রা) নিজের ইচ্ছা বাতিল করতে বাধ্য হলেন।

হাফেজ ইবনে হাজার (র) ইসাবাহতে লিখেছেন, হযরত আমর (রা) বিন আবাসা হযরত ওসমান যুন্নুরাইনের (রা) খিলাফতকালের শেষ দিকে ওফাত পান। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলের রেওয়ায়াত থেকে সন্দেহ হয় যে, তিনি আমীরে মাবিয়ার (রা) শাসনকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কিন্তু ইসাবাহ ও মুসনাদের রেওয়ায়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য হতে পারে। সামঞ্জস্যটা হলো হযরত আমর (রা) বিন আবাসা আমীর মাবিয়ার (রা) বাহিনীতে সেই সময় শামিল ছিলেন যখন তিনি হযরত ওসমানের (রা) পক্ষ থেকে সিরিয়ার গভর্ণর ছিলেন এবং প্রায়ই রোমকদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতেন।

চরিতকাররা হযরত আমর (রা) বিন আবাসাকে অন্যতম মহান সাহাবী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বিন আবু বকর সিদ্দীক (রা)

রহমতে আলম (সা) সিদ্দীকে আকবার (রা) সমভিব্যাহারে হিজরতের মুবারক সফর শুরু করলেন। তখন তিন দিন ও রাত তাঁরা ছওর পাহাড়ে অবস্থান করেন। সেখানে অবস্থানকালে যখন রাতের অন্ধকার গভীর হতো তখন সুঠামদেহী একজন সুদর্শন যুবক হুযূরের (সা) খিদমতে হাযির হতেন এবং মক্কার কুরাইশদের দিনের সকল ধরনের তৎপরতা সম্পর্কে অবহিত করতেন। তারপর সেই পাহাড়েই পড়ে থাকতেন। শেষ রাতে চুপিসারে উঠতেন এবং মক্কা গিয়ে কুরাইশদের সঙ্গে মিশে যেতেন। সময়টি এমন নাযুক ছিল যে, মক্কার মুশরিকরা যদি সেই যুবকের প্রতি গোয়েন্দাগিরীর সামান্যতম সন্দেহও করতো তাহলে তারা তাঁকে জীবিত রাখতো না। এ ভাগ্যবান যুবক যিনি হিজরতের সময় নিজের জীবন বিপন্ন করে প্রিয় নবীর (সা) সাহায্য ও খিদমত করেছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) লখতে যিগর বা কলিজার টুকরা হযরত আবদুল্লাহ।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আবু বকর সিদ্দীক (রা) (বিন আবি কোহাফাহ ওসমান বিন আমের বিন আমর বিন কা'ব বিন সা'দ বিন তাইম বিন কা'ব বিন লুবী বিন গালিব) যাতুন নাতাকাইন হযরত আসমা (রা) বিনতে আবু বকর সিদ্দীকের (রা) সহোদর। মাতার নাম ছিল কাতিলা (মাসগার) বিনতে আবদুল উজ্জা। বনী আমের বিন লুবী কবীলার সঙ্গে সে সম্পর্ক যুক্ত ছিলো। সে ইসলাম গ্রহণ করেনি। এ জন্য হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাকে তালাক দিয়ে দেন। ঐতিহাসিকরা হযরত আবদুল্লাহর (রা) জন্ম সাল সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু লিখেননি। তবে, এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, নবীর (সা) হিজরতের সময় তিনি যুবক ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) বড় পুত্র হযরত আবদুর রহমান (রা) হুদাইবিয়ার সন্ধি পর্যন্ত কুফর ও শিরকের ভ্রান্ত পথে চলছিলেন কিন্তু ছোট পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রা) নবুওয়াতের প্রথমদিকেই তাওহীদের পথে আগমন করেছিলেন এবং এমনিভাবে সাবিকুনাল আউয়ালুনের পবিত্র দলে শামিল হয়ে যান। তিনি অত্যন্ত সতর্ক ও তীক্ষ্ণ ধী সম্পন্ন যুবক ছিলেন। হিজরতের সফরে রওয়ানা হওয়ার আগে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁকে কুরাইশদের ইচ্ছা ও পরামর্শ সম্পর্কে তাদেরকে

সব সময় অবহিত রাখার তাকিদ দিয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) আনন্দ চিত্তে এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তা সুচারুরূপে ও গোপনীয়ভাবে আঞ্জাম দেন। তিনি সারাদিনব্যাপী কুরাইশ মুশারিকদের পরিকল্পনা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতেন এবং রাতে ছওর পাহাড়ে পৌছে সকল খবর প্রিয় নবী (সা) ও আবু বকর সিদ্দীককে (রা) অবহিত করতেন এবং সেখানেই শুয়ে পড়তেন। সূর্যোদয়ের পূর্বেই ঘুম থেকে উঠে চুপিসারে মক্কা ফিরে যেতেন।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি প্রতিদিন প্রিয় নবী (সা) ও শ্রদ্ধেয় পিতার জন্য খাবারও সঙ্গে নিয়ে যেতেন। আল্লামা ইবনে ইসহাক (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আসমা (রা) প্রত্যেক রাতে হুযূর (সা) এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীককে (রা) টাটকা খাবারও পৌছাতেন। এ রেওয়ায়াত থেকে কতিপয় আলেম মত প্রকাশ করে বলেছেন হযরত আসমা (রা) স্বয়ং খাবার নিয়ে যেতেন। আবার অন্যরা মত প্রকাশ করে বলেছেন যে, তিনি নিজের ভাই আবদুল্লাহর (রা) হাতে খাবার প্রেরণ করতেন। মদীনা পৌছার কিছুদিন পর রহমতে আলম (সা) হযরত যায়েদ (রা) বিন হারেছা এবং হযরত আবু রাফে'কে (রা) মক্কা প্রেরণ করেন। যাতে তাঁরা তাঁর পরিবার-পরিজন ও সম্পর্কযুক্তদেরকে সেখান থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় নিয়ে আসেন। এ দু'জনের সঙ্গে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) আবদুল্লাহ বিন উরাইকিত মারফত নিজের পুত্র আবদুল্লাহর (রা) নামে পত্র প্রেরণ করলেন। পত্রে লিখলেন, সেও যেন নিজের সৎ মা উম্মে রুমান (রা) এবং বোন হযরত আসমা (রা) এবং হযরত আয়েশা সিদ্দীকাকে (রা) মদীনা নিয়ে আসেন। সুতরাং হযরত যায়েদ (রা) বিন হারেছা উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রা), হুযূরের (সা) দু' কন্যা হযরত ফাতিমাতুজ জোহরা এবং হযরত উম্মে কুলছুমকে (রা) এবং নিজের স্ত্রী হযরত উম্মে আইমান (রা) ও পুত্র উসামাকে নিয়ে এলেন। এদিকে হযরত আবদুল্লাহ (রা) হযরত উম্মে রুমান (রা), হযরত আসমা (রা) এবং হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ (রা) কে সঙ্গে নিয়ে মদীনা পৌছেন। সহীহ বুখারী এবং মুসনাদে আবু দাউদে আছে যে, হুযূরের (সা) পরিবার-পরিজন মসজিদে নববীর সন্নিহিত নবনির্মিত হুজরাসমূহে অবস্থান করেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) পরিবার-পরিজন বনূ হারিছ বিন খাযরাজের মহল্লায় হযরত হারিছ (রা) বিন নু'মান আনসারীর বাড়িতে অবস্থান করেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আবুবকর (রা)-এর বিয়ে হয়েছিল জালীলুল কদর সাহাবী হযরত সাঈদ বিন যায়েদের সহোদরা আতিকা (রা) বিনতে যায়েদ বিন আমর বিন নুফায়েলের সঙ্গে। তিনি সাহাবীয়াহ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন অনিন্দ্য সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী। ইবনে আছীর

জাওজী উসুদুল গাবাহ গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ (রা) তাঁকে এত ভালবাসতেন যে, তাঁর ভালবাসায় জিহাদ পর্যন্ত ত্যাগ করেছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর জিহাদ ত্যাগ করায় খুব মনোকষ্ট পেয়েছিলেন। হযরত আতিকা (রা) হযরত আবদুল্লাহকে (রা) যেহেতু জিহাদে যেতে বাধ্য করেনি এ জন্য হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) হযরত আবদুল্লাহকে (রা) আতিকাকে (রা) তালাক দানের নির্দেশ দেন। প্রথমে তিনি কিছুদিন যাবত টালবাহানা করেন। কিন্তু যখন শ্রদ্ধেয় পিতার তরফ থেকে পীড়াপীড়ি করা হলো তখন তিনি মাতা-পিতার আনুগত্যে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তালাক দিয়ে দেন এবং একটি কবিতা লিখেন ঃ

"হে আতিকা। সূর্য যতক্ষণ আলো দেবে, চাঁদ কথা বলবে, ততক্ষণ আমি তোমাকে ভুলবো না।

হে আতিকা। আমার অন্তর রাত দিন তোমার প্রতি তাকিয়ে আছে এবং হাজার হাজার আশা-আকাঙ্খা তোমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে।

আমার মত মানুষ তার মত মহিলাকে তালাক দেয়নি এবং তার মত মহিলাকে অপরাধ ছাড়া তালাক দেয়া যায় না।"

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) অত্যন্ত কোমল প্রাণ লোক ছিলেন। তিনি এ কবিতাতে খুব প্রভাবিত হলেন এবং হযরত আবদুল্লাহকে (রা) আতিকাকে (রা) ফিরিয়ে নেওয়ার অনুমতি দিলেন। এ ঘটনা মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পূর্বের বলে মনে হয়। কেননা, কয়েকজন চরিতকার লিখেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) মক্কা বিজয় এবং হুনায়েন ও তায়েফের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তায়েফ অবরোধকালে একদিন তিনি শত্রুর পক্ষ থেকে নিক্ষিপ্ত এক তীরে গুরুতর আহত হন। (বলা হয়ে থাকে যে, বনূ সাকীফের জনৈক ব্যক্তি এ তীর নিক্ষেপ করেছিল।) বাহ্যত এ ক্ষত সেরে গেলেও তীরের বিষক্রিয়া অভ্যন্তরে অব্যাহত ছিল। সুতরাং প্রিয়নবীর (সা) ওফাতের কিছুদিন পর ১১ হিজরীর শওয়াল মাসে ক্ষতটির পুনরাবির্ভাব ঘটলো এবং সেই ব্যাথাতেই হযরত আবদুল্লাহ (রা) ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি কোন সন্তান রেখে যাননি।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হুযূরের (সা) কাফন মুবারক থেকে একটি চাদর বেঁচে গিয়েছিল। হযরত আবদুল্লাহ (রা) তা সাত দিনার দিয়ে তাবাররুক হিসেবে নিজের কাফনের জন্য কিনে নিয়েছিলেন। কিন্তু যখন তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো তখন তিনি সেই চাদর দিয়ে তাকে কাফন না করার ওসিয়ত করলেন। কেননা, সেই চাদরে যদি কোন কল্যাণ থাকতো তাহলে সাইয়েদুল মুরসালীন (সা) অবশ্যই তাতে কাফন হতেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)

হযরত আবদুল্লাহর (রা) নামাযে জানাযা পড়ান। হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আবি বকর (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা) এবং তালহা (রা) বিন ওবায়দুল্লাহ কবরে নামলেন এবং জোহরের নামাযের পর খলিফাতুর রাসূলের (সা) কলিজার টুকরাকে দাফন করে দেয়া হলো। হযরত আবদুল্লাহ (রা) যেহেতু তায়েফের যুদ্ধে নিক্ষিপ্ত তীরের ক্ষতে ওফাত পেয়েছিলেন সে জন্য কতিপয় ঐতিহাসিক তাঁকে তায়েফের শহীদদের মধ্যে পরিগণিত করে থাকেন। হযরত আতিকা (রা) প্রিয় স্বামীর ওফাতে অত্যন্ত মনোকষ্ট পেয়েছিলেন। তিনি এ সময় একটি দরদভরা মরছিয়া রচনা করেন।

চরিত ও ইতিহাস গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আবী বকরের (রা) জীবনী খুব কমই পাওয়া যায়। সম্ভবত এর কারণ হলো যে, তিনি রাসূলের (সা) যুগে অধিকাংশ যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি। তা সত্ত্বেও তাঁর জীবনের কিছু দিক অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ। তিনি শুধুমাত্র ইসলামে অগ্রগমন এবং হিজরতের সৌভাগ্যই লাভ করেননি বরং হিজরতের সময় তিনি নবীর (সা) খাতিরে যেমনভাবে নিজের জীবনকে বিপন্ন করেছিলেন সে ধরনের খুব কম সাহাবীই করতে পেরেছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি সেই দশ হাজার মুজাহিদের অন্যতম ছিলেন যাঁরা রাসূলের (সা) সঙ্গী হয়েছিলেন। অতপর তিনি হুনাইন ও তায়েফের যুদ্ধে জীবনবাজী রেখে অংশ নিয়ে মুজাহিদ ফি সাবীলিল্লাহ হওয়ারও সৌভাগ্য অর্জন করেন। কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) লেখাপড়া জানতেন এবং সাহিত্যেও জ্ঞান রাখতেন। মহান মর্যাদা সম্পন্ন পিতার তিনি সীমাহীন অনুগত ছিলেন। এমনকি তাঁর নির্দেশে নিজের জীবনের চেয়েও প্রিয় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিয়েছিলেন। যে হকপন্থী মানুষের নামাযে জানাযা আম্বিয়ার (আ) পর দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ পড়িয়েছিলেন এবং যাঁকে ফারুকে আজম (রা) ও তালহাতুল খায়ের (রা)-এর মত ব্যক্তিত্ব স্থায়ী আবাসস্থলে রেখেছিলেন তাঁর মর্যাদার ব্যাপারে আর কি কথা হতে পারে।

হযরত আবু রুহম
মানহুর গিফারী (রা)

অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের অব্যবহিত পরই হুনায়েন ও তায়েফের রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হুনাইনে বনূ হাওয়াযেন গোত্রের শিক্ষণীয় পরাজয় ঘটলো। কিন্তু তায়েফের যুদ্ধ চূড়ান্ত পর্যায়ে না পৌছেই শেষ হয়ে গেল। বাস্তবে এটা প্রকাশ্য ময়দানের যুদ্ধ ছিল না। কেননা, তায়েফবাসী দুর্গ বন্ধ করে বসে গিয়েছিল এবং সারওয়ারে আলম (সা) তা অবরোধ করে রেখেছিলেন। এ অবরোধ কম-বেশী তিন সপ্তাহ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এরপর যখন হুযূর (সা) তায়েফবাসীকে শিক্ষা দানের জন্য শহরের বাইরে তাদের আঙ্গুর বাগান ধ্বংস করার নির্দেশ দিলেন তখন তারা দূত প্রেরণ করে অত্যন্ত মিষ্টি স্বরে আবেদন জানালো যে, তিনি যেন এ কাজ না করেন। সেই আঙ্গুরের ওপরই তাদের জীবিকা নির্ভরশীল। যদি তা ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে তারা ক্ষুধায় মারা যাবে।

এ কথা শুনে বিশ্বনবীর (সা) রহমতের অন্তর উথলে উঠলো। তিনি এ জঘন্যতম শত্রুকেও অভুক্ত রেখে মারা সহ্য করতে পারলেন না এবং তিনি তায়েফের অবরোধ উঠিয়ে নিলেন। তায়েফ থেকে তিনি সঙ্গীদেরসহ জি'রানা রওয়ানা হলেন। সেখানে হুনাইনের যুদ্ধের অঢেল গনীমাতের মাল তাঁর বন্টন করার ছিল। পথিমধ্যে তাঁর একজন সাহাবীর উটনী ঘটনাক্রমে হুযূরের (সা) উটনীর সঙ্গে ধাক্কা খেলো এবং তাঁর জুতার কিনারা হুযূরের (সা) পবিত্র রানের ওপর দিয়ে ঘষে গেল। তাতে প্রিয়নবীর (সা) খুব কষ্ট হলো। তিনি সেই সাহাবীর পায়ের ওপর বেত মেরে বললেন ঃ "তোমার পা পিছনে সরাও, আমার রান জখম হয়ে গেছে।"

হুযূরের (সা) ক্রোধে তাঁর কম্পন শুরু হয়ে গেল। বেত মারার আর কি কষ্ট হতে পারে। নিজের আখিরাত বরবাদ হওয়ারও ভয় ছিল। সকালে যখন সৈন্য বাহিনী জি'রানা পৌছে তাঁবু ফেললো তখন সেই সাহাবী নিয়ম মত উট চরানোর জন্য বের হয়ে গেলেন। কিন্তু সব সময় মনের মধ্যে ধুক ধুক করতে লাগলো যে, তার তৎপরতার নিন্দা করে আল্লাহর তরফ থেকে কোন নির্দেশ না জারি হয়ে যায়। ফিরে এসে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, হুযূর (সা) তাঁকে তলব তো করেননি? লোকজন বললো, হুযূর (সা) তাঁকে স্মরণ করেছিলেন। এ কথা শুনে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় তিনি

রহমতে আলমের (সা) খিদমতে হাযির হলেন এবং হুযূরের (সা) ইরশাদ শোনার জন্য একাগ্রচিত্তে কান খাড়া করে রইলেন। তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন, যখন প্রিয়নবী (সা) তাঁর প্রতি স্নেহ ও ভালবাসার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন ঃ "তোমার জুতাতে আমার রানে আঁচড় পড়ে গিয়েছিল। এ জন্য আমি তোমার পা বেত মেরে সরিয়ে দিয়েছিলাম। আমার বেতে নিশ্চয়ই তোমার কষ্ট হয়েছে। তার বিনিময়ে এ বকরীর পাল পুরস্কারস্বরূপ নিয়ে নাও।"

হুযূরের (সা) রহমতের শান দেখে সেই ব্যক্তির শরীরের প্রতিটি লোমকূপ "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি দিয়ে উঠলো। আনন্দে তাঁর পা আর মাটিতে পড়ছিলো না এবং তিনি বার বার বলছিলেন যে, আজ আমার থেকে সৌভাগ্যবান আর কে হতে পারে? আমার প্রভূ আমাকে শুধু ক্ষমাই করেননি বরং বিশেষ রহমতে আমাকে ভূষিত করেছেন।

প্রিয় নবীর (সা) এ যথার্থ প্রেমিকের নাম ছিল হযরত আবু রুহম মানহুর গিফারী (রা)।

হযরত আবু রুহমের নাম হলো কুলছুম এবং লকব ছিল মানহুর। নসবনামা হলো ঃ কুলছুম বিন হাছিন বিন খালেদ বিন আসআস বিন যায়েদ বিন আমিস বিন আহমাস বিন গিফার।

চরিতকাররা তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাল সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেননি। কিন্তু এটা ধারণা করা হয় যে, নবীর (সা) হিজরতের পর তিনি মদীনা আগমন করেন এবং রহমতে আলমের (সা) খিদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এটা বদরের যুদ্ধের পরের ঘটনা হতে পারে। কেননা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের তালিকায় তাঁর নাম দেখা যায় না। যদি তিনি বদরের যুদ্ধের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে থাকেন তাহলে সে সময় স্বদেশে চলে গিয়েছিলেন এবং বদরের যুদ্ধের পর মদীনায় এসে থাকবেন।

তৃতীয় হিজরীতে সংঘটিত ওহোদের যুদ্ধে তিনি অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নেন এবং অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন। যুদ্ধের সময় একটি তীর এসে বুকে বিদ্ধ হয়। তাতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। আল্লামা ইবনে সা'দ কাতিবুল ওয়াকেদী বর্ণনা করেছেন যে, যুদ্ধের পর তাঁকে রাসূলের (সা) খিদমতে আনা হলে তিনি (সা) মুখের পবিত্র লালা তাঁর ক্ষতের ওপর লাগিয়ে দেন। তার বরকতে খুব তাড়াতাড়ি ক্ষত সেরে যায়।

যেহেতু সিনাকে 'নহর' বলা হয় এবং হুযূর (সা) তাঁর 'নহরের' ওপর মুখের লালা লাগিয়েছিলেন এ জন্যে তিনি মানুষের মধ্যে 'মানহুর' উপাধিতে মশহুর হন।

৬ষ্ঠ হিজরীতে হযরত আবু রুহম (রা) সেই চৌদ্দশ' সাহাবীর দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন যাঁরা হুদাইবিয়া নামক স্থানে হুযূরের (সা) হাতে মৃত্যুর বাইয়াত করেন এবং আল্লাহর দরবার থেকে আসহাবুশ শাজারার উপাধি এবং জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন।

বাইয়াতে রিদওয়ানের পর হযরত আবু রুহম খায়বারের যুদ্ধে অমিতবিক্রমে অংশ নিয়েছিলেন। আল্লামা ইবনে আছীর উসুদুল গাবাহ গ্রন্থে লিখেছেন যে, হুযূর (সা) খায়বারের যুদ্ধের গনীমাতের মাল থেকে তাঁর অংশের দ্বিগুণ প্রদান করেছিলেন।

ইবনে আছীর তার কারণ বর্ণনা করেননি। কিন্তু ধারণা হলো যে, তিনি কোন বিশেষ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছিলেন।

প্রিয় নবীর (সা) নিকট হযরত আবু রুহমের (রা) খুব কদর ও মর্যাদা ছিল। অষ্টম হিজরীতে তিনি (সা) মক্কা বিজয়ের লক্ষ্যে মদীনা থেকে বের হলেন। এ সময় তিনি হযরত আবু রুহমকে (রা) মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত বানালেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) আল-ইসতিয়াবে লিখেছেন যে, এ ছাড়াও হযরত আবু রুহম (রা) ওমরাতুল কাযার সময়ও এ মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

তাবকাতে ইবনে সা'দ থেকে জানা যায় যে, মক্কা বিজয় ও হুনাইনের যুদ্ধের পর তায়েফ অবরোধ শুরু হলে হযরত আবু রুহম (রা) হুযূরের অনুমতি নিয়ে তায়েফে পৌছে অবরোধকারী মুজাহিদদের সঙ্গে শামিল হন।

তাবুকের যুদ্ধের (নবম হিজরী) সময় হুযূর (সা) আবু রুহমকে (রা) গিফার গোত্রে পাঠালেন। যাতে তিনি বেশী বেশী মানুষকে জিহাদে শামিল হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। সে বছর ছিল প্রচন্ড খরার বছর। এ জন্য লোকজন এত লম্বা সফরে ভয় পেত। তা সত্ত্বেও হযরত আবু রুহম (রা) বনূ গিফারকে এমন আন্তরিকতার সঙ্গে জিহাদের উৎসাহ দিলেন যে, তাদের একটি বিরাট দল স্বদেশ থেকে এসে মুজাহিদদের দলে শামিল হয়ে গেলেন।

ইমাম হাকেম (র) মুসতাদরাকে লিখেছেন যে, তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের সময়ও হযরত আবু রুহমের (রা) উটনী হুযূরের (সা) সওয়ারীর নিকটে ছিলেন। হযরত আবু রুহমের (রা) জি'রানা সফরের ঘটনার কথা স্মরণ ছিল। এ জন্য যখনই তাঁর উটনী হুযূরের (সা) উটনীর একদম নিকটবর্তী হয়ে পড়তো তখনই তিনি নিজের উটনীকে দূরে সরিয়ে নিতেন।

হযরত আবু রুহম (রা) প্রসঙ্গে এর চেয়ে বেশী চরিত গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না। এমনকি তাঁর মৃত্যু সাল সম্পর্কেও কোন তথ্য নেই। অবশ্য হাদীসের কিতাবসমূহে তাঁর থেকে বর্ণিত দু'টি হাদীস পাওয়া যায়। হযরত আবু রুহম (রা) সম্পর্কে চরিত গ্রন্থসমূহে যতটুকুন বিবরণই পাওয়া যায় তা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে উন্নত চরিত্র দিয়ে বিভূষিত করেছিলেন এবং সেই বদৌলতেই তিনি রহমতে আলমের (সা) রহম-করমের পাত্র হয়েছিলেন।

হযরত জামাম (রা)
বিন ছা'লাবা

সে এলো–কিন্তু তার অন্তরে ছিল প্রচন্ড দ্বন্দ্ব। সে রাসূলের (সা) খিদমতে হাযির হলো। সে প্রশ্ন করলো। রাসূল (সা) শুনলেন। যখন সে ফিরে গেল তখন তার মন, মগজ ও অন্তর ইয়াকীন ও ঈমানের নূরে পূর্ণ ছিল। তিনি স্বজাতির মধ্যে ফিরে গেলেন। সেই নূর তিনি স্বজাতির অন্তরেও প্রজ্জ্বলিত করলেন। অতপর ইতিহাসের পাতা থেকে চিরকালের জন্য লুকিয়ে গেলেন।

মহাজ্ঞানী আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউই তাঁর শৈশব ও বৃদ্ধকাল কেমন ছিল তা জানেন না। কিন্তু তার আগমন–জিজ্ঞেস করা–শোনা এবং ফিরে যাওয়া ইসলামের ইতিহাসে এক আলোকময় অধ্যায় হিসেবে পরিগণিত।

তাঁর সংক্ষিপ্ত কর্ম ইতিহাসের পাতায় যে চিত্র এঁকে দিয়েছে তা আজও প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে এবং তার আলো অসংখ্য অন্তরকে আলোকময় করছে।

নবম হিজরীর কথা। একদিন রহমতে আলম (সা) মসজিদে নবুবীতে (সা) বসেছিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা), হযরত তালহা (রা) বিন উবাইদুল্লাহ, হযরত আনাস (রা) বিন মালিক এবং আরো কতিপয় জালীলুল কদর সাহাবীও (রা) নবীর (সা) পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। ইত্যবসরে সামনের দিক থেকে এক বেদুইনের আবির্ভাব ঘটলো। তার অবয়ব ছিল মাঝারি ধরনের। সুদর্শন যুবক ছিল। সে নিজের উটনীর রশি ধরে গ্রামের মানুষের মত মসজিদের ভেতর ঢুকে পড়লো। উটনী এক কোণায় বসালো এবং হুযূরের (সা) মজলিসের নিকটে পৌছে উচ্চৈস্বরে জিজ্ঞেস করলো ঃ "আপনাদের মধ্যে ইবনে আবদুল মুত্তালিব কে?"

হুযূর (সা) ঃ আমি ইবনে আবদুল মুত্তালিব। বলুন?

বেদুইন ঃ মুহাম্মাদ (সা) আপনার নাম?

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ হাঁ।

বেদুইন ঃ হে ছাহেব! আমি একজন গ্রামের মানুষ। আপনার নিকট কিছু কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। আমার কর্কশ ভাষায় আপনি অসন্তুষ্ট হবেন না তো?

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ না, না। তুমি নির্দ্বিধায় যা জানতে চাও, তা জিজ্ঞেস করো। আমি অবশ্যই অসন্তুষ্ট হবো না।

বেদুইন ঃ হে মুহাম্মাদ (সা)! আপনার দূত আমাদের কবিলায় গিয়েছিল। সে আমাদেরকে জানিয়েছে, আপনি এ কথা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে তাঁর রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন?

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ হাঁ, তিনি সত্য বলেছেন।

বেদুইন ঃ আকাশ কে বানিয়েছে?

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ আল্লাহ।

বেদুইন ঃ যমীন কে বানিয়েছে?

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ আল্লাহ।

বেদুইন ঃ ঐ সব পাহাড় কে কায়েম করেছে এবং তার মধ্যস্থ বিভিন্ন বস্তু কে তৈরী করেছে?

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ আল্লাহ।

বেদুইন ঃ সেই আল্লাহর কসম! যিনি আসমান ও যমীন বানিয়েছেন এবং ঐ সব পাহাড় প্রতিষ্ঠা করেছেন। বাস্তবিকই কি আল্লাহ আপনাকে তাঁর পয়গম্বর হিসেবে প্রেরণ করেছেন?

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ (নাআম) হাঁ।

বেদুইন ঃ আপনার দূত আমাদেরকে এও বলেছে যে, দিন ও রাতে আমাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া ফরয।

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ সে সত্য বলেছে।

বেদুইন ঃ সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে রিসালাতের মার্যাদায় সমাসীন করেছেন। বাস্তবিকই কি আল্লাহ আপনাকে সেই সব নামাযের নির্দেশ দিয়েছেন?

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ হাঁ।

বেদুইন ঃ আপনার দূত আমাদেরকে এ কথাও বলেছিল যে, বছরে একবার আমাদেরকে নিজেদের সম্পদের ওপর যাকাত দিতে হবে।

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ সে ঠিকই বলেছে।

বেদুইন ঃ সেই সত্তার কসম। যিনি আপনাকে নবুওয়াত প্রদান করেছেন। বাস্তবিকই কি আল্লাহ পাক আপনাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন?

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ হাঁ।

বেদুইন ঃ আপনার দূত আমাদেরকে রমযানের পুরো মাস রোযা রাখার কথাও বলেছে।

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ হাঁ সে ঠিকই বলেছে।

বেদুইন ঃ সেই আল্লাহর কসম। যিনি আপনাকে তাঁর রাসূল বানিয়ে প্রেরণ করেছেন। তিনিই কি আপনাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন?

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ হাঁ।

বেদুইন ঃ আপনার দূত আমাদেরকে এও বলেছে যে, সামর্থবানের ওপর বাইতুল্লাহর হজ্ব করা ফরয।

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ সে ঠিকই বলেছে।

এই সওয়াল-জওয়াব শেষ হলে বেদুইন কালেমায়ে শাহাদাত পড়লেন এবং আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল। আমার কওম আমাকে নিজেদের দূত বানিয়ে আপনার খিদমতে প্রেরণ করেছে। আমার নাম হলো জামাম বিন ছা'লাবা এবং আমি বনূ সা'দ বিন বকরের ভাই। সেই হক সত্তার কসম। যিনি আপনাকে সত্য নবী বানিয়েছেন। যে সব কথা আপনি ইরশাদ করেছেন তার আমি কমও করবো না এবং বেশিও করবো না।"

এ কথা বলে তিনি অত্যন্ত আদবের সঙ্গে সালাম করলেন এবং স্বদেশের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। এ সময় রহমতে আলম (সা) সাহাবাদেরকে (রা) সম্বোধন করে বললেন ঃ "যদি এই এলো-মেলো চুল বিশিষ্ট লোকটি সত্য বলে থাকে তাহলে অবশ্যই সে জান্নাতে যাবে।"

হযরত জামাম (রা) বিন ছা'লাবা ইসলামের নির্দেশাবলী পালনের অঙ্গীকার করায় রহমতে আলম (সা) তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। সা'দ বিন বকর গোত্রের সঙ্গে তাঁর বংশীয় সম্পর্ক ছিল। জামাম (রা) অত্যন্ত মর্যাদাবান এবং সুদর্শন যুবক ছিলেন। তিনি স্বগোত্রে বিজ্ঞ ও চিন্তাশীল ব্যক্তি হিসেবে পরগণিত হতেন। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি বনূ সা'দের অন্যতম নেতৃস্থানীয় মানুষ ছিলেন। তাঁর শৈশবকালের কোন হদিস পাওয়া যায়

না। অবশ্য হাফেজ ইবনে হাজার (র) ইসাবাহতে লিখেছেন যে, জামাম (রা) একজন নেক স্বভাবের মানুষ ছিলেন এবং যে যুগে সমগ্র আরব বিভিন্ন ধরনের অনৈতিকতায় ডুবে ছিল সে যুগেও তিনি সেসব খারাব কাজ থেকে সব সময় দূরে থাকতেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর বিশ্বনবী (সা) হকের সম্প্রসারণ ও দীনের তাবলীগের জন্য আরবের সকল গোত্রের মধ্যে মুবাল্লিগ প্রেরণ করেন। হুযূরের (সা) দায়ী বা আহবানকারী বনূ সাআদেও পৌছেন এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। কবীলাবাসীরা এই প্রসঙ্গে রাসূলে আকরামের (সা) সঙ্গে সরাসরি আলোচনাই উপযুক্ত মনে করলেন। আর এই উদ্দেশ্যেই জামাম (রা) বিন ছা'লাবাকে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে মদীনা প্রেরণ করেন।

ইমাম বুখারীর কিয়াস হলো যে, জামাম (রা) হুযূরের (সা) খিদমতে হাযির হওয়ার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। কিন্তু আল্লামা কুরতুবী (র) এবং অন্য কতিপয় আলেম বলেছেন যে, তিনি হুযূরের (সা) সঙ্গে সামনা সামনি কথোপকথনের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। দু'ধরনের বর্ণনার মধ্যে এ ধরনের সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, তিনি আগেই ইসলামের ব্যাপারে প্রভাবিত হয়েছিলেন। অবশ্য কার্যত তিনি হুযূরের (সা) খিদমতে হাযির হয়েই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। জামাম (রা) যেভাবে রাসূলের (সা) নিকট হাযির হয়েছিলেন। তিনি যেভাবে নির্ভীকভাবে কথা বলেছিলেন তাও তার গ্রাম্য জীবনেরই বহিপ্রকাশ ছিল। হুযূর (সা) এবং তাঁর মধ্যে যে কথোপকথন হয় নেতৃত্বস্থানীয় চরিতকাররা তাকে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য কতিপয় রাওয়ায়েতে শব্দের হের ফের রয়েছে। কিন্তু অর্থ একই। তবে, কতিপয় রাওয়ায়েতে অতিরিক্ত কিছু শব্দ রয়েছে। তাতে হুযূর (সা) জামামকে (রা) শরীআতের আহকাম ছাড়া পালনীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহও শিক্ষা দিয়ে দিলেন।

নাজদের গোত্রসমূহ সুন্দর ও বিশুদ্ধ আরবী ভাষা বলতো। জামাম (রা) নাজদেরই এক গোত্রের সন্তান ছিলেন। এ জন্য তাঁর গ্রাম্য ভঙ্গী আলাপ-আলোচনাতেও এক বিশেষ ধরনের শান ছিল। হযরত ওমর ফারুকের (রা) মত লোককেও এত প্রভাবিত করেছিলেন যে, তিনি বলে উঠেছিলেন : "আমি জামাম (রা) থেকে উত্তম এবং প্রভাব সৃষ্টিকারী কথোপকথনকারী আর কাউকে দেখিনি।"

হাফেজ ইবনে হাজার (র) বর্ণনা করেছেন যে, স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা) একবার (সেই সময় অথবা অন্য সময়) হযরত জামামের (রা) প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছিলেন : "জামাম (রা) জ্ঞানী মানুষ।"

যে ব্যক্তি স্বয়ং রাসূল (সা) থেকে আকলমন্দ হওয়ার সনদপ্রাপ্ত হন তার সৌভাগ্যবান ও জ্ঞানী হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারে?

হযরত জামাম (রা) নবীর (সা) নিকট থেকে বিদায় নিয়ে স্বগোত্রে পৌছলেন। এ সময় গোত্রের লোকজন অত্যন্ত আগ্রহভরে জামামের (রা) প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা তাঁর চারপাশে জড়ো হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "বলুন, মদীনায় কি দেখলেন এবং মুহাম্মাদের (সা) সঙ্গে কি আলোচনা হলো?"

সে সময় হযরত জামামের (রা) মুখ দিয়ে অযাচিতভাবে বের হয়ে পড়লো ঃ "লাত ও উজ্জা অপমানিত হোক অথবা লাত ও উজ্জার মন্দ হোক।"

প্রতিমাদের শানে এ বাক্য শুনে বনূ সা'দ গোত্র কেঁপে উঠলো। এ ধরনের কথা মুখ দিয়ে বের করার অর্থ তাদের নিকট ধ্বংস ডেকে আনার নামান্তর ছিল। সবাই এক বাক্যে বলে উঠলো ঃ "জামাম তোমার মুখ বন্ধ কর। সম্মানিত লাত ও উজ্জার অবমাননার কারণে বিভিন্ন ধরনের রোগ অথবা তোমার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটতে পারে। কালবিলম্ব না করে তাওবা করো। নচেৎ তোমার সঙ্গে আমাদেরকেও নিয়ে ডুববে।"

জামাম (রা) তাওহীদের নেশায় বিভোর ছিলেন। অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দরদভরা মনে তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "হে আমার কওম! কান খুলে শোনো। লাত ও উজ্জা শুধুমাত্র পাথর। কাউকে উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। তোমাদের জন্য আফসোস যে, তোমরা এই সব পাথরকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছ। ইবাদাতের যোগ্য শুধু মাত্র আল্লাহ তাআলার একক সত্তা। তিনিই মুহাম্মাদকে (সা) নিজের সত্যিকার রাসূল বানিয়ে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর ওপর নিজের কিতাব নাযিল করেছেন। এই কিতাব হেদায়াত ও কল্যাণের প্রস্রবণস্বরূপ। সেই কিতাবের ওপর আমল করে তোমরা অন্ধকার ও গোমরাহীর পাঁক থেকে বেড়িয়ে আসবে। এই গোমরাহীর পাঁকে তোমাদের গলা পর্যন্ত ডুবে আছে। আমি সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছি এবং স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) তাঁর বান্দাহ ও রাসূল। আমার কথা মানো এবং কালবিলম্ব না করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের(সা) ওপর ঈমান আনো। তাতেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। নচেত তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে সেই সব কথা জেনে নিয়েছি যার ওপর তোমাদের আমল করা এবং যা থেকে দূরে থাকা উচিত।"

হযরত জামামের (রা) বক্তৃতা এত প্রভাবপূর্ণ ও অন্তর জয়কারী ছিল যে, গোত্রের সকলেই শিরকের প্রতি ঘৃণা পোষণকারী হয়ে গেলেন এবং সন্ধ্যা আসতে আসতে তাদের মধ্যে এমন কেউ অবশিষ্ট রইলো না, যে ইসলাম গ্রহণ করেননি।

হযরত জামামের (রা) জীবনের ঘটনাবলী এর চেয়ে বেশী আর চরিত গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়নি। এ সত্ত্বেও সম্পূর্ণ একটি গোত্রকে কুফর ও শিরকের ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত করে হক পথে পরিচালনা করা এমন একটি মর্যাদার ব্যাপার ছিলো যাতে কেউই তার সমকক্ষ হতে পারেননি। তরজুমানুল কুরআন বা কুরআনের ভাষ্যকার এবং উম্মাতের জ্ঞান সমুদ্র হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) বলতেন ঃ "আমি কোন জাতির মধ্যে জামামের (রা) থেকে উত্তম কোন ব্যক্তি দেখিনি।"

হযরত কা'ব (রা) বিন মালিক আনসারী

রাসূলের (সা) যুগের এক মুবারাক দিনের ঘটনা। রহমতে আলম (সা) এক আনসারী সাহাবীর (রা) বাড়ী তাশরীফ নিলেন। এই সাহাবী ছিলেন একজন শক্তিশালী কবি। তাঁর কাব্যে এমন প্রভাব ও আতংক থাকতো যে, কাফেররা তা শুনে থরথর কম্পিত হতো। তিনি সাইয়েদুল মুরসালীনের (সা) আগমনের খবর শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন এবং অস্থির চিত্তে বাড়ীর বাইরে বের হয়ে হুযূরকে (সা) ইসতিকবাল করলেন। প্রিয় নবী (সা) তাঁকে দেখে মুচকি হাসলেন এবং বললেন ঃ "আবু আবদুল্লাহ! কিছু কবিতা শুনাও।" রাসূলের (সা) ইরশাদ তামিলে তাঁর তো কোন ওযর ছিল না। তৎক্ষণাৎ নিজের কয়েকটি কবিতা অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে পাঠ করলেন। হুযূর (সা) তা শুনে খুব খুশী হয়ে বললেন, "আরো" তিনি পুনরায় কয়েকটি কবিতা পড়লেন। বিশ্ব নবী (সা) বললেন, "আরো।" এমনিভাবে তিনি তাঁর থেকে তিন বার ফরমায়েশ দিয়ে কবিতা শুনলেন এবং তাঁর প্রশংসা করে বললেন ঃ "কাফেরদের ওপর এই কবিতার আঘাত তীরের আঘাত থেকেও কঠিন"।

এই সাহাবী যাঁর কবিতা শোনার জন্য দোজাহানের সর্দার (সা) স্বয়ং তাঁর নিকট গিয়েছিলেন এবং যাঁর কবিতার হুযূর (সা) প্রশংসা করেছিলেন তিনি হলেন সাইয়েদুনা আবু আবদুল্লাহ কা'ব (রা) বিন মালিক আনসারী।

হযরত কা'ব (রা) বিন মালিক আনসারী অন্যতম জালীলুল কদর সাহাবী হিসেবে পরিগণিত হতেন। তিনি খাযরাজ গোত্রের বনূ সালামা বংশোদ্ভূত ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ কা'ব (রা) বিন মালিক বিন আবী কা'ব আমর বিন কাইন বিন সাওয়াদ বিন গানাম বিন কা'ব বিন সালমা বিন আলী বিন আসাদ বিন সারদা বিন ইয়াযীদ বিন জাশাম বিন খাযরাজ। মাতার নাম ছিল লাইলা বিনতে যায়েদ বিন ছা'লাবা এবং তিনিও বনূ সালামা বংশের ছিলেন। হযরত কা'ব (রা) মাতা-পিতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। এ জন্য অত্যন্ত আরাম-আয়েশে লালিত পালিত হন। এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী তিনি নবীর (সা) হিজরতের প্রায় ২৭ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শৈশবকালেই তিনি অত্যন্ত সুন্দর স্বভাব এবং পবিত্র প্রকৃতির ছিলেন। আল্লাহ তাআলা কাব্য সৃষ্টির আবেগ ও উৎসাহও তাঁকে দান করেছিলেন। সুতরাং যৌবনকাল পর্যন্ত পৌঁছতে

পৌঁছতে তাঁর কাব্যের খ্যাতি দূর দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃতি ঘটে। এমনকি তিনশ' মাইল দূরের মক্কার মানুষ পর্যন্ত তাঁকে একজন কবি হিসেবে জানতো। দ্বিতীয় আকাবার বাইআতের পর হযরত মাসয়াব (রা) বিন উমায়ের ইসলামের প্রথম মুবাল্লিগ হিসেবে মদীনা মুনাওয়ারা তাশরীফ আনেন এবং তাঁর তাবলীগী প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা শুরু হয়। হযরত কা'ব (রা) বিন মালিকও সেই যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি মদীনা মুনাওয়ারার সেই প্রথম ৪০ জন মুসলমানের একজন ছিলেন যাঁরা হিজরতে নবুবীর (সা) পূর্বেই হযরত আসআদ (রা) বিন যুরারাহ আনসারীর ইমামতে জুমআর নামায পড়েছিলেন। স্বয়ং হযরত কা'ব (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, জুমআর নামাযের নির্দেশ আসার পূর্বেই আমরা (মদীনার আনসাররা) সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, সপ্তায় একদিন সকলেই একত্রিত হয়ে নামায পড়বো। এই উদ্দেশ্যে আমরা আরোবার দিন (জুমআ) গ্রহণ করেছিলাম। সর্বপ্রথম জুময়া হযরত আসআ'দ (রা) বিন যুরারাহ বনী বিয়াজার এলাকায় পড়িয়েছিলেন। এই নামাযে ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

নবুওয়াত প্রাপ্তির ত্রয়োদশ বছরে পাঁচশ' মদীনাবাসীর একটি কাফেলা হজ্বের জন্য মক্কা রওয়ানা হলো। এই কাফেলার মধ্যে ৭৫ জন এমন মানুষও (দুইজন মহিলা ও ৭৩ জন পুরুষ) শামিল ছিলেন যাঁরা ঈমান এনেছিলেন কিন্তু তাঁদের ইসলাম অন্য (অমুসলিম) মদীনাবাসীর নিকট গোপন ছিল। সেই ঈমানদারদের মধ্যে হযরত কা'ব (রা) বিন মালিকও ছিলেন। হজ্ব ছাড়াও রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে হাযির হয়ে তাঁরা বাইআতের মর্যাদা লাভও তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মদীনা আগমনের দাওয়াত দানেরও লক্ষ্য ছিল। তাঁরা যে কাজের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন তা সাধারণ বা সহজ কাজ ছিল না। সে সময় আরবের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শক্তিও রহমতে আলম (সা) এবং তাঁর অনুসারীদের শত্রু ছিল। তাঁর হাতে বাইআত হওয়া এবং পুনরায় তাঁকে নিজেদের দেশে আগমনের দাওয়াত দেওয়া যেন সমগ্র আরবকে যুদ্ধের জন্য আহবান জানানোরই নামান্তর ছিল। কিন্তু মদীনার এই হক পুজারী দৃঢ় সংকল্প জামায়াত নিজেদের আকাঙ্খা পূরণ করেই ছাড়লেন। ইসলামের ইতিহাসে এই বিরাট মর্যাদাপূর্ণ ঘটনা বাইআতে আকাবায়ে কাবীরা অথবা বাইআতে লাইলাতুল আকাবা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। হযরত কা'ব বিন মালিক এই ঈমান আলোকিত ঘটনাকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"আমরা নিজেদের কওমের মুশরিকদের সঙ্গে হজ্বের জন্য মক্কা রওয়ানা হলাম। পথিমধ্যে আমাদের কবীলার সরদার বারা' (রা) বিন মারুর বললেন

যে, কা'বার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসার পরিবর্তে সেদিকে মুখ করে নামায পড়ো। আমরা বললাম, আমাদের জানা মতে নবী করীম (সা) সিরিয়ার (বাইতুল মাকদাস) দিকে মুখ করে নামায পড়ে থাকেন আমরা তো তাঁর তরীকার ওপরই আমল করবো। কিন্তু বারা' (রা) কা'বার দিকে মুখ করেই নামায পড়তে লাগলেন এবং আমরা তাঁকে বাধা দিতে লাগলাম। মক্কা পৌছে বারা' (রা) আমাকে বললো, ভাতিজা, এসো রাসূলের (সা) খিদমতে যাই এবং তাঁর নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করি। আমি হুযূরকে (সা) আগে কখনো দেখিনি এবং তাঁকে চিনিও না। অবশ্য তাঁর চাচা আব্বাসকে (রা) জানতাম। কেননা, তিনি বাণিজ্য ব্যাপদেশে মদীনা যাতায়াত করতেন। এক ব্যক্তি বললেন, তোমরা হরমে যাও। তাহলে তোমরা সেখানে রাসূলুল্লাহকে (সা) আব্বাসের (রা) সঙ্গে বসা দেখতে পাবে। আমরা সেখানে পৌছে হুযূরকে (সা) সালাম করলাম। তিনি আব্বাসকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, এ কে? তিনি বললেন, এ হলো বারা' বিন মারুর আর এ হলো কা'ব বিন মালিক। আমি কখনো হুযূরের (সা) এই ইরশাদ বিস্মৃত হইনি। তিনি আমার নাম শুনেই বললেন, 'কবি?' আব্বাস (রা) বললেন, 'হাঁ' অতপর বারা' (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা নামাযে আমাদের মুখ কোন দিক করবো? হুযূর (সা) বললেন, বাইতুল মাকদাসের দিকে। (সুতরাং তিনি পরে সেই অনুযায়ী আমল শুরু করেন।) তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আপনারা আইয়ামে তাশরীকের মধ্যবর্তী দিনে আকাবাতে আমার সঙ্গে রাতে সাক্ষাৎ করবেন। যখন সেই রাত এলো তখন আমরা নিজের কওমের সঙ্গে নিজেদের অবস্থান স্থলে শুয়ে পড়লাম। এক তৃতীয়াংশ রাত অতিবাহিত হলে আমরা অত্যন্ত সংগোপনে তাঁর (সা) সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আকাবার দিকে চললাম। শুধুমাত্র একজন অমুসলিমকে আমরা আমাদের ইচ্ছার ব্যাপারে অবহিত করলাম। তিনি ছিলেন আবু জাবের আবদুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম। তিনি অত্যন্ত শরীফ এবং আমাদের অন্যতম নেতা ছিলেন এবং তখনো বাপ-দাদার দীনের ওপর কায়েম ছিলেন। আমরা বললাম যে, আপনি জাহান্নামের ইন্ধন হোন এটা আমরা চাই না। আমরা তাঁর নিকট ইসলাম পেশ করলাম। তিনি নির্দ্বিধায় ঈমান আনলেন এবং আমাদের সঙ্গে বাইআতে আকাবায় শরীক হলেন। সে সময় আমরা ৭৩ জন পুরুষ ছিলাম এবং আমাদের সঙ্গে ২ জন মহিলা ছিলেন। আমরা সকলেই যখন আকাবাতে একত্রিত হলাম তখন প্রিয় নবী (সা) হযরত আব্বাসকে (রা) সঙ্গে নিয়ে তাশরীফ রাখলেন। আব্বাস (রা) আমাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, হে খাজরাজের দল! মুহাম্মাদ (সা) নিজের খান্দানে যে মর্যাদা রাখেন তা তোমরা অবহিত আছ। আমরা (অর্থাৎ

বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিব) সব সময় দুশমনদের থেকে তাঁকে হিফাজত করেছি এবং ভবিষ্যতেও আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তা করবো। তোমরা যদি তোমাদের ওয়াদা পূরণ করতে পারো এবং মৃত্যু পর্যন্ত মুহাম্মাদের (সা) হিফাজত করতে পারো তাহলে কথা বলবে। খুব বুঝে শুঝে ও চিন্তা-ভাবনা করে নাও যে, মুহাম্মাদের (সা) হিফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ যেন ভয়ংকর মুসিবত ও রক্তাক্ত যুদ্ধের আহবান জানানো। এ সবকিছু মস্তিষ্কে রেখে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তোমরা যদি সন্দেহ কর যে, পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে তাঁকে তোমাদেরকে পরিত্যাগ এবং দুশমনের হাওয়ালা করতে হবে তাহলে এইটাই উত্তম যে, তাঁকে নিজের অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও।

আমরা বললাম, আব্বাসের (রা) কথা আমরা শুনেছি। হে আল্লাহর রাসূল! এখন আপনি বলুন যে, আপনি আমাদের নিকট থেকে কি প্রতিশ্রুতি নিতে চান।

এ কথার পর রাসূলুল্লাহ (সা) পবিত্র কুরআনের কতিপয় আয়াত পড়লেন। আমাদেরকে ইসলামের ওপর কায়েম থাকার পরামর্শ দিলেন এবং বললেন, আমি তোমাদের নিকট থেকে এই কথার বাইআত নিচ্ছি যে, তোমরা নিজের জীবন এবং নিজের পরিবার-পরিজনের মত আমাকে সমর্থন ও হেফাজত করবে।

বারা' (রা) বিন মারুর তাঁর (সা) পবিত্র হাতকে নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলেন এবং বললেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! মহান আল্লাহ্র কসম! আমরা আমাদের জান ও মাল দিয়ে আপনাকে হেফাজত করবো। আমরা তরবারীর কোলে-লালিত পালিত হয়েছি এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ আমরা নিজেদের বাপ-দাদার উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। তাঁর কথায় বাধা দিয়ে আবুল হাছিম বিন আততাইহান বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! বর্তমানে আমাদের ও ইহুদীদের মধ্যে অনেকগুলো চুক্তি রয়েছে। বাইআতের পর এই সব চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে এমন তো হবে না যে, আপনি শক্তি ও ক্ষমতা পেয়ে আমাদেরকে পরিত্যাগ করবেন এবং স্বগোত্রে ফিরে যাবেন।"

হুযূর (সা) মুচকি হেসে জবাব দিলেন, "না। আমার রক্ত তোমাদের রক্ত সমান এবং আমার দায়িত্ব তোমাদের দায়িত্ব বরাবর। আমি তোমাদের এবং তোমরা আমার। তোমরা যার সঙ্গে লড়াই করবে আমিও তার সঙ্গে লড়াই করবো এবং তোমরা যার সঙ্গে সন্ধি করবে আমিও তার সঙ্গে সন্ধি করবো।"

হুযূরের (সা) ইরশাদ শুনে হযরত কা'ব (রা)সহ মদীনার সকল মুসলমানই তাঁর হাতে বাইআত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। মদীনাবাসীরা

এই বাইআতের সব সময়ই গৌরব প্রকাশ করতেন। কোন কোন সময়তো তর্কই হয়ে যেতো যে, লাইলাতুল আকাবাতে কে সর্বপ্রথম হুযূরের (সা) বাইআত হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। বনূ নাজ্জার বলতেন, প্রথম বাইআতকারী ছিলেন আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ নাজ্জারী। বনূ আবদুল আশহাল হযরত আবুল হাছিম (রা) ইবনুত তাইহানের নাম বলতো এবং বনূ সালামা দাবী করতো যে, সর্বপ্রথম এই সৌভাগ্য হয়েছিল কা'ব (রা) বিন মালিকের।

যা হোক, বাইআতের পর হুযূর (সা) আনসারদেরকে তাদের মধ্য থেকে ১২ জন নকীব নির্বাচনের হেদায়াত দিলেন। তাঁরা হুযূরের (সা) ইরশাদ তামীলের জন্য খাযরাজ গোত্র থেকে ৯ জন এবং আওস গোত্র থেকে ৩ জন নকীব নির্বাচিত করলেন। ইবনে হিশাম (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত কা'ব (রা) বিন মালিক এ ঘটনা প্রসঙ্গে একটি কবিতা লিখেন। এ কবিতায় ১২ জন নকীবের নাম বর্ণিত আছে। সহীহ বুখারীর এক রেওয়ায়াতে স্পষ্ট হয় যে, হযরত কা'ব (রা) বিন মালিক বাইআতে আকাবায়ে কাবীরাতে অংশগ্রহণের জন্য সব সময় গৌরব প্রকাশ করতেন (এই গৌরব ছিল কৃতজ্ঞতা স্বরূপ। কেননা, আল্লাহ তাঁকে এই মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছিলেন।)

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত কা'ব (রা) বিন মালিকের কুনিয়ত ছিল আবু বশীর। যখন তিনি ঈমান আনলেন তখন রহমতে আলম (সা) নির্দেশ দিলেন যে, এখন তোমার কুনিয়ত হবে আবু বশীরের পরিবর্তে আবু আবদুল্লাহ। সুতরাং তাঁর এই কুনিয়তই প্রসিদ্ধি লাভ করে। হিজরতের কয়েক মাস পর নবীয়ে আকরাম (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় হযরত কা'ব (রা) বিন মালিককে হযরত তালহা (রা) বিন ওবাইদুল্লাহর ইসলামী ভাই বানান। হযরত তালহা (রা) আসহাবে আশারায়ে মুবাশশিরার একজন ছিলেন।

হযরত কা'ব (রা) শুধুমাত্র তরবারীর মালিকই ছিলেন না বরং আল্লাহ তাআলা তাঁকে শিরক কর্তনকারী ভাষাও দিয়েছিলেন। তিনি দু'যুগ সন্ধিক্ষণের অন্যতম মশহুর কবি ছিলেন। অর্থাৎ জাহেলী ও ইসলামী উভয় যুগেরই প্রখ্যাত কবি ছিলেন। হাফেজ আবদুল বার (র) বর্ণনা করেছেন যে, মুশরিকদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা রচনার দায়িত্ব আনসারদের মধ্য থেকে তিন ব্যক্তি গ্রহণ করেন। এই তিন ব্যক্তি হলেন ঃ হাসসান (রা) বিন সাবিত, কা'ব (রা) বিন মালিক এবং আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা।

হযরত হাসসান (রা) তাঁর কাব্যে মুশরিকদের নসবের ওপর এমন বিদ্রূপবান নিক্ষেপ করতেন যে, তারা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়তো। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা কাফেরদের গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট হওয়ার জন্য গালি দিতেন। হযরত কা'ব (রা) নিজের কবিতায় কাফেরদেরকে যুদ্ধের হুমকি এমনভাবে দিতেন যে, তারা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তো। এক রেওয়ায়াতে আছে যে, খায়বারের যুদ্ধের পর দাওস গোত্র হযরত কা'বের কবিতা শুনেই মুসলমান হয়ে যায়।

রহমতে আলম (সা) হযরত কা'বের (রা) কবিতা এতো পছন্দ করতেন যে, একবার তিনি (সা) স্বয়ং তাঁর বাড়ী তাশরীফ নেন এবং তিনবার ফরমায়েশ দিয়ে তাঁর কবিতা শুনেন।

হযরত কা'ব (রা) বদর এবং তাবুক ছাড়া সকল যুদ্ধেই রহমতে আলমের (সা) সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন এবং সকল যুদ্ধেই বীরত্ব প্রদর্শন করেন। বদরের যুদ্ধের সময় তাঁর প্রস্তুত হওয়ার আগেই রাসূলে আকরাম (সা) মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে যান। এ জন্য তিনি তাতে অংশগ্রহণ থেকে অকৃতকার্য হন। সহীহ বুখারীতে আছে যে, এই অকৃতকার্যতা তিনি লাইলাতুল আকাবাতে শরীক হওয়ার কথা বলে পূরণ করতেন এবং বলতেন যে, বদরের চেয়েও লাইলাতুল আকাবা বেশী মর্যাদাবান।

ওহোদের যুদ্ধে তিনি দীনী ভাই হযরত তালহার (রা) মত নজীরবিহীন বীরত্ব ও অটলতা প্রদর্শন করেছিলেন এবং যুদ্ধে ১১টি আঘাত পান। যুদ্ধের সময় যখন প্রিয় নবীর (সা) শাহাদাতের গুজব রটে গেল তখন সাহাবায়ে কিরামের (রা) ওপর শোক ও দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়লো। ঘটনাক্রমে হযরত কা'বের (রা) দৃষ্টি পড়লো হুযূরের (সা) ওপর তিনি তাঁকে সহীহ সলামতে দেখে আনন্দের আবেগে বলে উঠলেন ঃ "এই তো আল্লাহর রাসূল।"

হুযূর (সা) ইশারা করে বললেন, "চুপ করো।"

তাবুকের যুদ্ধ প্রসঙ্গে হযরত কা'ব (রা) বিন মালিক এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এক সুদীর্ঘ রেওয়ায়াতে তিনি নিজেই তা বর্ণনা করেছেন। সেই রেওয়ায়াতের সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

নবম হিজরীতে রাসূলে আকরাম (সা) খবর পেলেন যে, রোমের বাদশাহ মদীনা মুনাওয়ারার ওপর হামলা করতে চাইছে এবং বিরাট বাহিনী নিয়ে সিরিয়ার রাস্তা দিয়ে আরবের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। হুযূর (সা) ঘোষণা করে দিলেন যে, আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে সীমান্তে রোমকদের মুকাবিলা করবো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহাবায়ে কিরামকে (রা) তাবুকের যুদ্ধের প্রস্তুতির নির্দেশ

দিলেন। সে বছর বৃষ্টি না হওয়ার কারণে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল এবং গরম ছিল প্রচন্ড। মদীনাবাসীর খেজুরের ফসলই ছিল খাদ্যের প্রধান বস্তু। এই খেজুর তখন প্রায় পাকে পাকে অবস্থা। এই মওসুমে তারা কখনো বাইরে যেতো না। কিন্তু হুযূরের (সা) নির্দেশ শুনতেই কতিপয় মুনাফিক এবং মা'যূর, বা অক্ষম মুসলমান ছাড়া সকল মুসলমানই মনে-প্রাণে জিহাদের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। অবশ্য মুনাফিক ও মা'যূর ছাড়া তিন জন সাচ্চা মুসলমানও এমন ছিলেন যাঁরা কোন মজবুত ওযর ছাড়া এই লড়াইয়ে শরীক হতে পারেননি। এই তিন জন হলেন ঃ কা'ব (রা) বিন মালিক, হিলাল (রা) বিন উমাইয়া এবং মারারাহ (রা) বিন রাবী'। অন্তরে নিফাকের কারণে তাঁরা যুদ্ধে যাননি তা নয় বরং শুধুমাত্র অলসতা ও ক্লান্তি তাদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করে।

হযরত কা'ব (রা) সে যুগে খুব স্বচ্ছল মানুষ ছিলেন। সফরের জন্য তিনি দু'টো উটও কিনেছিলেন এবং অন্যান্য সামানও সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু ইসলামী বাহিনীর রওয়ানার সময় অলসতায় পড়ে গেলেন। মনে মনে ভাবলেন এত তাড়াতাড়ির কি আছে। আগামী কাল গিয়ে একত্রিত হবো। দ্বিতীয় দিনেও আলসেমী ঘিরে ধরলো এবং যেতে পারলেন না। মোট কথা এধার-ওধার করতে করতেই কয়েকদিন কেটে গেল। এমনকি তিনি হুযূরের (সা) তাবুক পৌছার খবর পেলেন। সে সময় ৩০ হাজার জীবন উৎসর্গকারী তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। কিন্তু হযরত কা'ব (রা) সেই দলে ছিলেন না। হযরত কা'বের (রা) সঙ্গে হুযূরের (সা) গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি তাবুক পৌছে বিশেষভাবে জিজ্ঞেস করলেন যে, কা'বকে (রা)-তো দেখছি না। কোন কিছু হয়েছে কি? একজন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ধনসম্পদ তাকে আসতে দেয়নি। হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল তাঁর কথার প্রতিবাদ করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যতটুকু জানি কা'ব একজন ভালো মানুষ। এ কথার পর হুযূর (সা) চুপ হয়ে গেলেন এবং কিছু বললেন না।

হুযূর (সা) তাবুকের যুদ্ধ থেকে ফিরে এলেন। এসময় কিছু মানুষ বিভিন্ন ধরনের হিলা-বাহানা তৈরী করে হযরত কা'বকে (রা) বললো যে, তুমি এসব বলো। তাহলে হুযূর (সা) ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু কা'ব (রা) সংকল্প করে ফেলেছিলেন যে, তিনি হুযূরের (সা) সামনে নিজের ভুলের কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করবেন এবং কোন বাহানা তালাশ করবেন না।

আরো প্রায় ৮০ জনের মত মানুষ তাবুক যাননি। তারা সবাই হুযূরের (সা) খিদমতে হাযির হলেন এবং স্ব স্ব ওযর পেশ করলেন। হুযূর (সা) সবাইকেই

ক্ষমা করে দিলেন। হযরত কা'ব (রা) রাসূলের (সা) নিকট উপস্থিত হলেন। হুযূর (সা) মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "কা'ব, তুমি যুদ্ধে কেন শরীক হওনি? অসুস্থ ছিলে অথবা সরঞ্জাম ছিল না?"

তিনি আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার কোন ওযর ছিল না। সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলাম এবং সরঞ্জামও ছিল। শুধুমাত্র আলসেমী এবং দোদুল্যমানতা আমাকে জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে মাহরূম রেখেছে।"

হুযূর (সা) বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ। এখন বাড়ী যাও এবং আল্লাহ্র নির্দেশের অপেক্ষা কর।"

একই অবস্থা হযরত মারারাহ (রা) বিন রবী' এবং হিলাল (রা) বিন উমাইয়ারও হলো। হুযূর (সা) সকল মুসলমানকে এই তিন জনের সঙ্গে কথা বার্তা বলতে নিষেধ করে দিলেন।

হযরত কা'ব (রা) বলেন, রাসূলের (সা) দরবার থেকে ফিরে আসার পর আমার কওমের কতিপয় মানুষ আমাকে ভর্ৎসনা করে বললো যে, তুমি এর পূর্বে কোন গুনাহ করোনি। যদি তুমি কোন ওযর পেশ করতে তাহলে হুযূর (সা) তা কবুল করতেন। আমি তাদের কথা প্রত্যাখ্যান করলাম। কিন্তু সেদিন থেকে যমীন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার নিকট সংকীর্ণ মনে হতে লাগলো। সকলেই আমাকে এড়িয়ে চলতো। আমি দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম যে, এই অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হয় তাহলে হুযূর (সা) জানাযার নামাযও পড়াবেন না এবং আল্লাহ না করুন রাসূলের (সা) যদি ওফাত হয় তাহলে চিরকালের জন্য আমি মুসলমানদের নিকট মারদূদ হিসেবে চিহ্নিত হবো। মোট কথা আমি ৫০ দিন খুব কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে কাটালাম। আমার অপর দু'জন সঙ্গীতো প্রথম থেকেই নিজেদের গৃহে চুপচাপ বসেছিলেন। আমি বাড়ী থেকে বের হয়ে মসজিদে যেতাম। নামাযে অংশ নিতাম এবং হুযূরের (সা) মজলিসেও উপস্থিত হতাম। কিন্তু না হুযূর (সা) এবং না কোন মুসলমান আমার সঙ্গে কোন কথা বলতেন। আমি হুযূরের (সা) দিকে তাকাতাম। তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন এবং আমাকে এড়িয়ে যেতেন। একদিন আমি প্রতিবেশী আবু কাতাদার (রা) প্রাচীরের ওপর আরোহণ করে তাকে সালাম দিলাম। তিনি সালামের জবাব দিলেন না। আমি কসম দিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "আবু কাতাদা! তুমি খুব ভালভাবেই জানো যে, আমি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে (সা) ভালবাসি।" আবু কাতাদা (রা) এই প্রশ্নের জবাবেও চুপ করে রইলেন। আমি তিনবার আমার কথার পুনরুল্লেখ করলাম। এতে তিনি শুধু এতটুকুন বললেন, "আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলই ভাল জানেন।" এ

কথা শুনে আমার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। সকালেই আমি একদিন মদীনার বাজারে যাচ্ছিলাম। এমন সময় একজন কিবতী খৃষ্টান আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো। সে গাস্সানের বাদশাহর নিকট থেকে আমার নামে একটি চিঠি নিয়ে এসেছিল, এই চিঠিতে গাসসানের বাদশাহ লিখেছিল ঃ

"আমি জানতে পেরেছি যে, তোমার প্রভু তোমার সঙ্গে খারাব আচরণ করেছে। এখন আমার নিকট চলে এসো এবং দেখো যে, এখানে তোমার কেমন সম্মান দেয়া হয়।"

আমি চিঠি পড়ে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পাঠ করলাম। আমার এই দুর্ভাগ্যপূর্ণ দিনও দেখার ছিল যে, একজন কাফের আমাকে সত্য পথ থেকে হটাতে এবং আমার মুনীব (সা) থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। বাড়ী পৌছে আমি এই চিঠি পুড়িয়ে ফেললাম। বিচ্ছিন্নতার চল্লিশতম দিনে হযূর (সা) আমাকে পয়গাম পাঠিয়ে নিজের স্ত্রী থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। আমি দূতকে বললাম, তালাক দিয়ে দিব কি? সে বললো, "না, বরং তার থেকে পৃথক থাকো।" তৎক্ষণাৎ আমি স্ত্রীকে নাইওর পাঠিয়ে দিলাম। পঞ্চাশতম দিনের সকালে নামায পড়ে নিজের গৃহের ছাদে শুয়েছিলাম। আমার জন্য জীবন খুব কঠিন হয়ে উঠছিলো এবং চরম অশান্তিতে কাটাচ্ছিলাম। এ সময় হঠাৎ করে 'সুলা' পাহাড়ের চূড়া থেকে একজন চেঁচিয়ে বললো, "কা'ব সুসংবাদ গ্রহণ কর।" আমি এ কথা শুনতেই সিজদায় গেলাম এবং আনন্দের আতিশয্যে কাঁদতে লাগলাম। পরে জানতে পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের নামাযের শেষে আমার এবং আমার অন্য দু'সঙ্গীর ক্ষমা ঘোষণা করেন এবং পাহাড়ের চূড়া থেকে আহবানকারী আমাকে সে খবর দিয়েছিলেন। তার পর এক ব্যক্তি ঘোড়া দৌড়ে আমার নিকট এলো এবং আমাকে সুসংবাদ দিল। আমি নিজের দু'টি কাপড়ই তাঁকে দান করে দিলাম। নিজে অন্যের নিকট থেকে চেয়ে কাপড় পরিধান করলাম এবং সোজা হযূরের (সা) খিদমতে হাযির হলাম। সে সময় যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন সকলেই আমাকে মুবারকবাদ দেয়ার জন্য দৌড়ে এলেন। সর্বপ্রথম তালহা (রা) অগ্রসর হয়ে মুবারকবাদ দিলেন এবং মুসাফাহা করলেন। আমি তাঁর সেই সুন্দর আচরণ ও উষ্ণ আলিঙ্গনের কথা কখনো ভুলবো না। আমি হযূরকে (সা) সালাম দিলাম। এ সময় হযূরে আকরামের (সা) চেহারা হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং তিনি চাঁদের মত ঝল মল করতে লাগলেন। তিনি বললেন ঃ

"কা'ব তোমার জীবনে এমন মুবারক দিন কখনো আসেনি। তোমাকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ তোমার তাওবা কবুল করেছেন।"

আমি আরয করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার তাওবার পূর্ণতার জন্য আমি আমার সকল ধন-সম্পদ সাদকা করছি।" হুযূর (সা) বললেন ঃ "না। তাতে দারিদ্রতা আসবে। নিজের সম্পদের একাংশ সাদকা করো।"

আমি খায়বারের অংশ আল্লাহর পথে দিয়ে দিলাম এবং বললাম "আল্লাহ পাক সত্য কথনের জন্য আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। ইনশাআল্লাহ আমৃত্যু সত্য কথা বলা পরিত্যাগ করবো না।"

হযরত মারারাহ (রা) এবং হযরত হেলালের (রা) তাওবাও এভাবে কবুল হয়ে গেল।

পবিত্র কুরআনে এ ঘটনার প্রতি এসব আয়াতে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। ঃ

وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ۚ حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ ۚ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

(التوبه : ١١٨)

"সেই তিনজনকেও তিনি ক্ষমা করে দিলেন, যাদের ব্যাপারটি মুলতবী করে রাখা হয়েছিল। যমীন যখন তার বিস্তৃতি ও বিশালতা সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল এবং তাদের জানপ্রাণও তাদের ওপর বোঝা হয়ে পড়লো, তারা জেনে নিল যে, আল্লাহর (আযাব) থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য স্বয়ং আল্লাহ্র রহমতের আশ্রয় ছাড়া পানাহ নেওয়ার আর কোন স্থান নেই, তখন আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদের দিকে ফিরলেন, যেন তারা তাঁর দিকে ফিরে আসে। নিসন্দেহে তিনি বড় ক্ষমাকারী ও দয়াবান।"

সহীহ বুখারীতে আছে যে, হযরত কা'ব (রা) এই ঘটনার ব্যাপারে বলতেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর আল্লাহ আমার ওপর এমন ইহসান করেননি যার গুরুত্ব আমার অন্তরে সেই সত্যের থেকে বেশী যে সত্যের প্রকাশ আমি রাসূলের (সা) সামনে করেছিলাম। আমি যদি মিথ্যা বলতাম তাহলে সেইভাবেই ধ্বংস হয়ে যেতাম যেমন মিথ্যাবাদীরা অর্থাৎ মুনাফিকরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

হযরত কা'ব (রা) বিন মালিকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছিল ইসলামে অগ্রগমন, রাসূল প্রেম, দীনের প্রতি ভালবাসা, আল্লাহ্ভীতি, সত্য জ্ঞানী ও সত্যবাদীতা।

আল্লামা ইবনে ইসহাক হযরত তামীম দারীর (রা) গোলাম আবুল হাসান (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন এই আয়াত নাযিল হলোঃ

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنَ (الشعراء : ٢٢٤)

"এবং কবিদের অনুসরণকারীরাতো গোমরাহ হয়ে থাকে।" তখন হযরত কা'ব (রা) বিন মালিক, হযরত হাসসান (রা) বিন সাবিত এবং হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা কাঁদতে কাঁদতে হুযূরের (সা) খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! যে সময় আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করলেন তখন তিনি জানতেন যে, আমরা সবাই কবি।"

হুযূর (সা) তাঁদেরকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন যে, তোমরা সেই সব কবির অন্তর্ভুক্ত নও যাদের ব্যাপারে এই আয়াত নাযিল হয়েছে। বরং তোমরা সেই সব লোকের অন্তর্ভুক্ত যাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে ঃ

اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا –

(الشعراء : ٢٢٧)

"হাঁ, কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে এবং বেশী বেশী আল্লাহকে স্মরণ করেছে।"

অন্য আরো এক সময় হযরত কা'ব (রা) রহমতে আলমকে (সা) জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! কবিতা সম্পর্কে আপনি কি বলেন?"

হুযূর (সা) বললেন ঃ "কোন ক্ষতি নেই। মুসলমান তার তরবারী ও ভাষা উভয় দিয়েই জিহাদ করে।"

শেষ বয়সে হযরত কা'বের (রা) দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছিল। তাঁর পুত্র আবদুর রহমান (রা) বলেন, আমি সে যুগে আমার পিতাকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে যেতাম। আমি যখন তাঁকে সঙ্গে নিয়ে জুমআর নামাযের জন্য বের হতাম এবং তিনি জুমআর নামাযের আযান শুনলে আবশ্যিকভাবে হযরত আবু উসামা আসআদ (রা) বিন যারারাহ'র মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনি সব সময় এ ধরনের কেন করেন। তিনি বললেন, হে আমার পুত্র! আসআদ (রা) সেই প্রথম ব্যক্তি যিনি নবী করীম (সা)–এর আগমনের পূর্বে 'বাকী'তে' বনী বিয়াজার কবরের নিকট আমাদেরকে জুমআর নামায পড়াতেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে সময় আপনারা কতজন ছিলেন। তিনি বললেন, "৪০ জন।"

হযরত আসআদ (রা) বিন যারারার জুমআ পড়ানো যেনো হযরত কা'ব (রা) নিজের ওপর ইহসান মনে করতেন এবং তার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করে সেই ইহসানের হক আদায় করতেন।

মুসনাদে আবু দাউদে আছে যে, একবার হযরত কা'ব (রা) বিন মালিক মসজিদে নববীতে এক সাহাবীর নিকট ঋণের অর্থ দাবী করে বসলেন। তাতে চেঁচামেচি হলো। এই শোরগোলের আওয়াজ নবীর (সা) হুজরাতেও গিয়ে পৌছলো। হুযূর (সা) সেখান থেকে কাপড়ের পর্দা উঠিয়ে বললেন ঃ "কা'ব অর্ধেক ঋণ ক্ষমা করে দাও।" হযরত কা'ব (রা) তৎক্ষণাৎ বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! ক্ষমা করলাম।"

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফার (সা) ওফাতের পর হযরত কা'ব (রা) বিন মালিক প্রায় ৩৯ বছর জীবিত ছিলেন। সে সময় কয়েকটি বিপ্লব হয়। কিন্তু তিনি মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধে অংশ নেননি। অবশ্য হযরত ওসমান যুন্নুরাইনের (রা) শাহাদাতে তিনি চুপ থাকতে পারলেন না এবং সেই লোমহর্ষক ঘটনায় একটি মরছিয়া রচনা করেন।

হযরত কা'ব (রা) আমীরে মুআবিয়ার (রা) শাসনকালের কোন এক সময় ওফাত পান। কতিপয় চরিতকার তাঁর মৃত্যুর সাল ৫০ হিজরী বলে উল্লেখ করেছেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৭৭ বছর। মৃত্যুকালে তিনি পাঁচ পুত্র রেখে গিয়েছিলেন। তাঁরা হলেন ঃ আবদুর রহমান, আবদুল্লাহ, ওবায়দুল্লাহ, মুয়ীদ এবং মুহাম্মাদ। হযরত কা'ব (রা) থেকে ৮০টি হাদীস বর্ণিত আছে।

হযরত উবাই (রা) বিন কা'ব আনসারী

প্রিয় নবীর (সা) হিজরতের কয়েক বছর পরের ঘটনা। একদিন মধ্যম আকৃতি এবং একহারা গড়নের ফর্সা একজন পবিত্র সূরতের মানুষ রাসূলের (সা) নিকট হাযির হলেন। তিনি অত্যন্ত আদবের সঙ্গে হুযূরকে (সা) সালাম করলেন এবং তাঁর নিকট বসে ইরশাদসমূহ শুনতে লাগলেন। এমন সময় রাসূলের (সা) ওপর ওহী নাযিলের পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো এবং তাঁর পবিত্র মুখ দিয়ে কুরআনে হাকীমের একটি সূরা উচ্চারিত হলো (কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, এই সূরাটি ছিল সূরায়ে বাইয়্যেনাহ), সেই ব্যক্তি আল্লাহর ওহীর প্রতিটি শব্দ মনোনিবেশ সহকারে শুনছিলেন এবং লিখে নিচ্ছিলেন। জিবরাইল আমীন (আ) যখন আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দিয়ে ফিরে চলে গেলেন, তখন রহমতে আলম (সা) সেই ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বললেনঃ "তোমাকে কুরআন শুনানোর জন্য আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।" সেই ব্যক্তি আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ কি আমার নাম উল্লেখ করেছেন?" হুযূর (সা) বললেন, 'হাঁ' এ কথা শুনে সেই ব্যক্তি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন এবং কাঁদতে লাগলেন।

রাসূলের (সা) এই সাহাবী (রা) স্বয়ং আল্লাহ যাঁর নাম উল্লেখ করে হাবীবে পাককে (সা) কুরআন শুনানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি হলেন, সাইয়েদুল মুসলিমীন হযরত উবাই (রা) বিন কা'ব আনসারী।

সাইয়েদুনা হযরত উবাই (রা) বিন কা'ব আনসারী ইসলামের ইতিহাসের এক মহান ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিগণিত। রাসূলের (সা) দরবারে তাঁর বিশেষ মর্যাদা ছিল। তিনি ছিলেন জ্ঞানের সমুদ্র। হযরত উবাইয়ের (রা) সম্পর্ক ছিল আনসারের অত্যন্ত সম্মানিত শাখা নাজ্জারের (খাজরায) বনী জাদিলা বংশের সঙ্গে। তাঁর নসবনামা হলো ঃ

উবাই (রা) বিন কা'ব বিন কায়েস বিন উবায়েদ বিন যিয়াদ বিন মুআবিয়া বিন আমর বিন মালিক বিন নাজ্জার বিন ছা'লাবা বিন আমর বিন খাযরাজুল আকবার। তাঁর মাতার নাম ছিল সুহাইলা। তিনি ছিলেন আদী বিন নাজ্জার বংশীয়া।

হযরত উবাই (রা)-এর দু'টি কুনিয়ত ছিল একটি হলো আবুল মানযার। এই কুনিয়ত ছিল রাসূল (সা) প্রদত্ত। দ্বিতীয় কুনিয়ত ছিল আবুত তোফায়েল। তাঁর পুত্রের নামানুসারে হযরত ওমর ফারুক (রা) এই কুনিয়ত রেখেছিলেন। সাইয়েদুল আনসার, সাইয়েদুল মুসলিমীন এবং সাইয়েদুল কুবরা হযরত উবাইয়ের (রা) লকব ছিল।

হযরত উবাইয়ের (রা) শৈশব ও যৌবনকাল সম্পর্কে চরিত গ্রন্থসমূহে কিছুই পাওয়া যায় না। অবশ্য কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, তিনি জীবনের প্রথম অংশেই লেখা-পড়া শিখেছিলেন এবং আনসারের শিক্ষিত লোক হিসেবে পরিগণিত হতেন। মরহুম মাওলানা সাইদ আনসারী সিয়ারে আনসারে এইমত প্রকাশ করেছেন যে, সম্ভবত হযরত উবাই (রা) ইসলামের পূর্বে তাওরাত পড়েছিলেন এবং এই প্রভাবেই ইসলামের আওয়াজ তাঁকে খুব তাড়াতাড়ি আকৃষ্ট করে।

হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত উবাই (রা) যৌবনকালে মদের প্রতি আসক্ত ছিলেন এবং তাঁর (হযরত আনাস) সতালো পিতা আবু তালহার (রা) শারাবের মাহফিলের বিশেষ সদস্য ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর উভয়েই জালীলুল কদর সাহাবী হিসেবে পরিগণিত হন। হযরত আবু তালহা (রা) যায়েদ বিন সাহাল আনসারী হযরত উবাইয়ের (রা) মামাতো ভাই ও নিত্য সহচর ছিলেন।

হযরত উবাইয়ের (রা) ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে মশহুর রেওয়ায়াতটি হলো, তিনি দ্বিতীয় আকাবাতে মক্কা গিয়ে প্রিয় নবীর (সা) পবিত্র হাতে বাইআত করেন। কিন্তু ইতিহাস ও চরিত গ্রন্থসমূহে দ্বিতীয় আকাবায় অংশগ্রহণকারীদের যে তালিকা প্রদান করা হয়েছে তাতে হযরত উবাই (রা) বিন কা'বের নাম নেই। তা থেকে এই সিদ্ধান্তেই পৌছা যায় যে, তিনি আকাবার বাইয়াতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আকাবার বাইয়াতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন কি-না সে ব্যাপারে মত বিরোধ রয়েছে। যা হোক, নবীর (সা) হিজরতের পূর্বেই তিনি ঈমান এনেছিলেন। আর এ ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন।

হিজরতের পর সাইয়েদুল আনামের (সা) মদীনা মুনাওয়ারাতে শুভ পদার্পণ ঘটলে আনসারদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম হযরত উবাই (রা) বিন কা'ব ওহী লিখার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এই দিক থেকে আনসারদের মধ্যে ওহী লিখক হিসেবে তাঁর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।

হিজরতের কয়েক মাস পর হুযূর (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় হযরত উবাইকে (রা) জালীলুলকদর সাহাবী (আশ্‌রায়ে মুবাশশারার একজন) হযরত সাঈদ (রা) বিন যায়েদের ইসলামী ভাই বানিয়ে দেওয়া হয়।

যুদ্ধ শুরু হলে হযরত উবাই (রা) বদর থেকে নিয়ে তায়েফ পর্যন্ত সকল যুদ্ধেই রহমতে আলমের (সা) সঙ্গী ছিলেন।

হযরত জাবের (রা) বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, ওহোদের যুদ্ধে হযরত উবাইয়ের (রা) দেহে একটি তীর বিদ্ধ হয়। ফলে তিনি গুরুতররূপে আহত হন। প্রিয় নবী (সা) এই খবর পেয়ে চিকিৎসার জন্য একজন ডাক্তার প্রেরণ করেন। এই চিকিৎসক তাঁর শিরা কেটে দিয়েছিলেন। হুযূর (সা) স্বহস্তে সেই শিরায় দাগ দেন তাতে হযরত উবাইয়ের (রা) ক্ষত খুব শীঘ্র শুকিয়ে যায়।

নবী করীমের (সা) প্রতি হযরত উবাইয়ের (রা) সীমাহীন ভালবাসা ছিল এবং আল্লাহর কালামের সঙ্গে ছিল গভীর সম্পর্ক। বস্তুত তিনি সময়ের বেশীরভাগই নবীর (সা) দরবারে কাটাতেন। হুযূর (সা) তাঁকে কুরআন শুনিয়ে হিফজ বা মুখস্ত করাতেন এবং ওহী লিখার খিদমতও নিতেন। এভাবে রাসূলের (সা) সঙ্গে তাঁর বিশেষ নৈকট্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কুরআনে হাকীমের প্রতি হযরত উবাইয়ের (রা) অসাধারণ উৎসাহ এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা হযরত উবাইয়ের (রা) নাম উল্লেখ করে রাসূলকে (সা) তাঁকে কুরআন শুনাতে বলেছিলেন। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী হুযূরে আকরাম (সা) হযরত উবাইয়ের (রা) শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। এর ফলশ্রুতিতে তিনি কুরআনে হাকীমের হাফেজ এবং কুরআনী জ্ঞানের একজন বড় আলেম হন। রাসূলে আকরাম (সা) তাঁর কিরআত এত পসন্দ করতেন যে, একবার তিনি বলেছিলেন যে, "লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কারী হলেন উবাই (রা) বিন কা'ব।"

একবার হুযূর (সা) হযরত উবাই (রা) কে প্রশ্ন করলেন যে, "কুরআনের কোন্ আয়াত সীমাহীন আজমতপূর্ণ?"

হযরত উবাই আরয করলেন, "আয়াতুল কুরসী"।

তাঁর জবাব শুনে হুযূর (সা) খুব খুশী হলেন এবং বললেন, "উবাই। এই ইলম তোমাকে খুশী করুক।"

হযরত উবাই (রা) যা এবং যখন ইচ্ছা তখনই হুযূরকে (সা) জিজ্ঞেস করতে পারতেন। রহমতে আলম (সা) হযরত উবাইকে (রা) এই অনুমতি

দিয়ে রেখেছিলেন। সুতরাং তিনি অত্যন্ত স্বাধীনভাবে নবীর (সা) ফয়েযে অবগাহিত হতেন। অনেক সময় সারওয়ারে আলম (সা) কোন কিছু জিজ্ঞাসা না করতেই তাঁকে কুরআনে করীমের গুঢ় রহস্য সম্পর্কে অবহিত করতেন।

স্বয়ং হযরত উবাই (রা) বিন কা'ব থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "আমি তোমাকে এমন একটি সূরা বলবো যা না তাওরাতে আছে, না যবূরে আছে আর না আছে ইঞ্জিলে। এমনকি কুরআনেও এ ধরনের ২য় সূরা অবতীর্ণ হয়নি।"

আমি আরয করলাম, "অবশ্যই বলুন।"

তিনি বললেন, "অবশ্যই আমি আশা করি যে, তুমি এই দরজা দিয়ে বের না হতেই তা জেনে যাবে।" অতপর তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে খাড়া হলাম। তিনি আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন এবং আমার হাত তাঁর হাতে ছিল। আমি এ সময় এই ভয়ে পিছু হটতে শুরু করলাম যে, তিনি সেই সূরার খবর দেওয়ার পূর্বেই যেন দরজার বাইরে চলে না যান। আমি যখন দরজার নিকটবর্তী হলাম তখন আরয করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! সেই সূরা? যার ওয়াদা আপনি আমার সঙ্গে করেছেন।

তিনি বললেন, "তুমি যখন নামাযের জন্য দাঁড়াও তখন কিভাবে পড়ো?"

"আমি সূরায়ে ফাতেহা পড়লাম। তিনি বললেন, "এই সেই সূরা। এবং এই সূরা হলো সাবয়া মাছানী। এই সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন",

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ (الحجر ٨٧)

"এবং আমরা আপনাকে সাত আয়াত দিয়েছি। যা বারবার পড়া হয়ে থাকে এবং কুরআনে আজীম দিয়েছি।"

হযরত উবাই'র (রা) কুরআন হিফজ এবং হাফেজা শক্তির ওপর প্রিয় নবীর (সা) পূর্ণ আস্থা ছিল। তার প্রমাণ এই ঘটনা থেকে পাওয়া যায় যে, একবার হুযূর (সা) ফজরের নামায পড়াতে গিয়ে একটি আয়াত পড়তে ভুলে গিয়েছিলেন। নামায থেকে ফারিগ হয়ে হুযূরের (সা) স্বয়ং এই আয়াতের কথা খেয়াল হলো। তিনি সাহাবীদেরকে (রা) তাঁর কিরআত খেয়াল করেছিলো কিনা তা জিজ্ঞেস করলেন। সকল সাহাবী চুপ রইলেন। কিন্তু হযরত উবাই (রা) বিন কা'ব সঙ্গে সঙ্গে আরয করলেন : "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অমুক আয়াত পড়েননি। তাকি মানসূখ হয়ে গেছে অথবা ভুলবশত ছেড়ে দিয়েছেন?"

হুযূর (সা) বললেন ঃ "না। আমি পড়তে ভুলে গিয়েছিলাম। আমি জানতাম যে, তুমি ছাড়া আর কারোর খেয়াল সেদিকে হবে না।"

একবার হযরত উবাই (রা)-এর একটি আয়াতের কিরাতের ব্যাপারে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদের সঙ্গে মতবিরোধ হলো। উভয়েই রাসূলের (সা) খিদমতে হাযির হলেন এবং স্ব স্ব কিরাত সম্পর্কে এই আয়াত পড়ে তাঁকে শুনালেন। হুযূর (সা) বললেন, "তোমরা দু'জনেই ঠিক পড়েছ।" হযরত উবাই (রা)-এর অন্তরে সন্দেহের সৃষ্টি হলো এবং তিনি হয়রান হয়ে আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমিও ঠিক পড়ি এবং আবদুল্লাহও তা কেমন করে হয়?"

এ কথা বলার ছিল তাই বলেছিলেন। কিন্তু নবীর (সা) ভয়ে শরীর কেঁপে উঠলো এবং ঘাম বেরিয়ে পড়ল। হুযূর (সা) তাঁর অবস্থা দেখে তাঁর বুকের ওপর তাঁর পবিত্র হাত রেখে বললেন ঃ "ইলাহী! উবাই (রা)-এর সন্দেহ দূর কর।" মুহূর্তের মধ্যে তাঁর অন্তর সন্দেহ থেকে পবিত্র হয়ে গেল।

রহমতে আলমের (সা) করুণা ও দয়ার মেঘ হযরত উবাই'র (রা) ওপর এমনভাবে ঝুম ঝুম করে বর্ষিত হয়েছিল যে, রাসূলের (সা) যুগেই তিনি দারস ও ফতওয়া দানের আসন অলংকৃত করেছিলেন। লোকজন তাঁর নিকট কুরআন পড়তেন এবং বিভিন্ন মাসয়ালার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেন। একবার এক ইরানী সাহাবী (রা) তাঁর নিকট কুরআন পড়া শুরু করলেন। যখন এই আয়াতে পৌঁছলেন,

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ۝ طَعَامُ الْأَثِيْمِ ۝ (الدخان : ٤٣-٤٤)

তখন ইরানী সাহাবীর (রা) মুখ দিয়ে আসীমের পরিবর্তে ইয়াতিম বের হতো। অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার মুখ থেকে সঠিক উচ্চারণ বের হলো না। অবশেষে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে হুযূরের (সা) খিদমতে হাযির হলেন এবং নিজের অসুবিধার কথা বললেন। হুযূর (সা) ইরানীকে বললেন, "বলো, তায়ামুজ জালিমি" তিনি এই শব্দ সম্পূর্ণ শুদ্ধভাবেই উচ্চারণ করলেন। প্রিয়নবী (সা) হযরত উবাইকে (রা) বললেন, "তার জবান ঠিক করার জন্য চেষ্টা করতে থাকো। আল্লাহ তোমাকে তার সওয়াব দিবেন।"

মশহুর সাহাবী হযরত তোফায়েল (রা) বিন আমর দাওসী হযরত উবাই (রা) বিন কা'বের নিকট কুরআন পড়লেন। এ সময় তিনি একটি ধনু তাঁকে হাদিয়া হিসেবে পেশ করলেন। হযরত উবাই (রা) তা লাগিয়ে নবীর (সা) নিকট উপস্থিত হলেন। হুযূর (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "উবাই! এই ধনু

কে দিয়েছে?" আরয করলেন "তোফায়েল বিন আমর দাওসী। আমি তাকে কুরআন পড়িয়েছি। হুযূর (সা) ফরমালেন ঃ "তা ফিরিয়ে দাও। নচেৎ এটা জাহান্নামের একটি টুকরার হার হয়ে যাবে।" তিনি আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল। আমরা ছাত্রদের বাড়িতে খাবারও খাই।" তিনি বললেন, "সেই খাবার বিশেষভাবে তোমাদের জন্য তৈরী করা হয় না। তোমরা যদি খাওয়ার সময় পৌঁছে গিয়ে থাক এবং তাতে শরীক হয়ে থাকো তাহলে তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু যে জিনিস বিশেষ করে তোমাদের জন্য তৈরী করা হয় তোমরা যদি তা ব্যবহার কর তাহলে নিজেদের পরকাল বরবাদ করবে।"

অন্য এক রাওয়ায়েতে স্বয়ং হযরত উবাই (রা) বিন কা'ব বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে কুরআনের একটি সূরা শিখিয়েছিলাম। সে একটি কাপড় আমাকে হাদিয়া হিসেবে দিয়েছিল। আমি রাসূলকে (সা) সে কথা উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, "যদি তুমি তা নাও তাহলে তোমাকে আগুনের কাপড় পরিধান করতে হবে।"

হযরত উবাই (রা) রহমতে আলমের (সা) ইরশাদসমূহের প্রতিটি শব্দ অভিনিবেশ সহকারে শুনতেন এবং তা জীবনের জপমালা বানিয়ে নিতেন। একবার তিনি রাসূলের (সা) দরবারে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি হুযূরকে (সা) প্রশ্ন করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল। আমরা যে অসুস্থ হই, অথবা অন্য যে কষ্ট পাই তাতেও কি কোন সওয়াব আছে?"

হুযূর (সা) বললেন ঃ "হাঁ, এই সব রোগ এবং কষ্ট মুসলমানদের গুনাহর কাফফারা হয়ে যায়।"

হযরত উবাই (রা) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল, সাধারণ কষ্টও কি গুনাহর কাফফারা হয়?"

তিনি বললেন, "ছোট ছোট কষ্টও কি, মুসলমানের শরীরে যদি একটি কাঁটাও বিঁধে তাহলে তাও তার গুনাহর কাফফারা হয়ে থাকে।"

এ কথা শুনতেই তাঁর মুখ দিয়ে এই দোয়া উচ্চারিত হলো ঃ "হে আল্লাহ! আমি সব সময় জ্বরে আক্রান্ত থাকবো। তবে, জামায়াতের সঙ্গে নামায, ওমরাহ ও জিহাদের যোগ্য থাকবো।"

এই দোয়া তৎক্ষনাৎ কবুল হয়ে গেল। চরিতকাররা বর্ণনা করেছেন যে, তার পর হযরত উবাইয়ের (রা) শরীরে সব সময় সামান্য তাপ বা জ্বর অনুভূত হতো। সম্ভবত এ জন্যই তাঁর মেজায একটু রুক্ষ থাকতো।

নবম হিজরীতে রহমতে আলম (সা) হযরত উবাইকে (রা) বাল্লি, আজরা এবং বনু সাআদ গোত্রের সাদকা আদায়কারী নিয়োগ করে সেখানে প্রেরণ করেন। তিনি এই দায়িত্ব অত্যন্ত সততা ও উদ্যমশীলতার সঙ্গে আঞ্জাম দেন। একবার তিনি কোন এক গ্রামে গেলেন। এ সময় এক ব্যক্তি তার সকল পশু এনে তার সামনে উপস্থিত করলো এবং বললো তিনি যা ইচ্ছে তাই বেছে নিতে পারেন। তিনি উটের দু'বছরের একটি শাবক নিলেন। পশুর মালিক বললেন, "এই শাবক আপনার কোন্ কাজে আসবে? এই জওয়ান ও মোটা উটনী নিন।

হযরত উবাই (রা) বললেন ঃ "না, না। এটা রাসূলের (সা) হুকুমের খিলাফ। উত্তম হলো যে, তুমি আমার সঙ্গে মদীনায় হুযূরের (সা) খিদমতে চলো। তিনি যে নির্দেশ দেবেন সেই নির্দেশ পালন করো।"

পশুর মালিক খুব মুখলিস মুসলমান ছিলেন। তিনি হযরত উবাইয়ের (রা) সঙ্গে রাসূলের (সা) খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং সেই উটনী হুযূরের (সা) খিদমতে পেশ করলেন।

তিনি বললেন ঃ "তুমি যদি এই উটনী খুশীর সঙ্গে দিতে চাও তাহলে তা দিয়ে দাও। আল্লাহ তাআলা তোমাকে এর প্রতিদান দেবেন। তিনি সন্তুষ্টি ও আনন্দের সঙ্গে এই উটনী সাদকা হিসেবে দিয়ে দিলেন এবং আনন্দ চিত্তে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করলেন।

একবার হযরত উবাই (রা) কোথায়ও একটি থলে পেলেন। খুলে দেখলেন তাতে একশ দীনার রয়েছে। দৌড়ে দৌড়ে হুযূরের (সা) খিদমতে হাযির হলেন এবং ঘটনার কথা বললেন–তিনি ফরমালেন ঃ এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা দিতে থাকো। তিনি এক বছর ধরে সেই দীনারের কথা ঘোষণা দিতে লাগলেন। কিন্তু কেউ তার মালিকানা দাবী করলো না। হযরত উবাই (রা) পুনরায় হুযূরের (সা) নিকট হাযির হয়ে আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি এক বছর পর্যন্ত লোকদেরকে খবর দিচ্ছি। কিন্তু কেউ এ অর্থ নিতে এলো না।"

হুযূর (সা) বললেন ঃ "আরো এক বছর অপেক্ষা করো। যদি কোন ব্যক্তি অর্থের পরিমাণ এবং থলের চিহ্ন বলে সেই দীনার দাবী করে তাহলে তা তাকে দিয়ে দেবে। তা না হলে এই মাল তোমার হয়ে গেছে।"

কুরআনের কিরআতের ব্যাপারে হযরত উবাইর (রা) এমন কামালিয়াত হয়ে গিয়েছিল যে, স্বয়ং ওহী ও নবুওয়াতের (সা) বাহক তাঁর নিকট কুরআনের দাওরা করতেন। নিজের ওফাতের (১১ হিজরী) বছরেও হযরত

উবাইকে (রা) শেষবার কুরআন শুনান এবং সঙ্গে সঙ্গে ইরশাদ করেন, "জিবরাইল আমীন (আ) এসে আমাকে বলেছেন যে, উবাইকে (রা) কুরআন শুনিয়ে দিন।"

প্রিয় নবীর (সা) ওফাতের পর খিলাফতের প্রশ্ন সৃষ্টি হলো। এ সময় হযরত উবাই (রা) সেই কতিপয় সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা হযরত আলীকে (রা) খিলাফতের যোগ্য মনে করতেন। তবুও যখন অধিকাংশ মুসলমানের রায় অনুযায়ী হযরত আবু বকর (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তখন হযরত উবাই (রা) আনন্দ চিত্তে তাঁর হাতে বাইআত করলেন। সিদ্দীকে আকবার (রা) হযরত উবাইকে (রা) অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তিনি যখন কুরআনে হাকীম বিন্যস্ত ও সম্পাদনার কাজ সাহাবায়ে কিরামের (রা) মধ্যেকার একটি জ্ঞানী দলের দায়িত্বে ন্যস্ত করেন তখন হযরত উবাইকে (রা) সেই দলের আমীর নিয়োগ করেন। তিনি কুরআনের শব্দাবলী বলে যেতেন এবং লোকজন তাখন লিখে নিতেন। যদি কোন আয়াতের আগে পরের ব্যাপারে মতবিরোধ হয়ে যেতো তখন সকলে মিলে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতেন। সিদ্দীকে আকবারের (রা) পর হযরত ওমর ফারুক (রা) খিলাফতের দায়িত্বে সমাসীন হলে তিনি হযরত উবাইকে (রা) মজলিসে শূরার সদস্য মনোনীত করেন। তিনি হযরত উবাই-এর (রা) ইলমের মহত্ব এবং সঠিক রায়ের সীমাহীন ভক্ত ছিলেন এবং তাঁকে অসাধারণ সম্মান করতেন। তিনি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ও দীনী ব্যাপারে তাঁর রায়কে খুবই গুরুত্ব দিতেন।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) ইসাবাহতে লিখেছেন যে, হযরত ওমর (রা) তাঁকে সাইয়েদুল মুসলিমূন হিসেবে আখ্যায়িত করতেন এবং বলতেন, "আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ক্বারী হলেন উবাই।" এমনিভাবে হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) "আল ইসতিয়াবে" লিখেছেন যে, হযরত ওমর (রা) থেকে বিভিন্নভাবে এই রেওয়ায়াত আমাদের নিকট পৌঁছেছে। তিনি (হযরত ওমর) বলেছেন, বিচার সম্বন্ধীয় ইলমে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে কৌশলী বা নিপুণ হলেন আলী (রা) বিন আবী তালিব এবং হিফজে কুরআনে সবচেয়ে বড় হলেন উবাই (রা)।

সাইয়েদ মুহাম্মাদ আলী বাবলাভী নিজের গ্রন্থে ("আততারুফু বিননাবিয়্যি ওয়াল কুরআনিশ শরীফ") খুব মজবুত হাওয়ালা দিয়ে লিখেছেন , "হযরত ওমর (রা) কঠিন সমস্যার ব্যাপারে হযরত উবাইয়ের (রা) দিকে প্রত্যাবর্তন করতেন এবং জটিল ব্যাপারে তাঁকে দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়াতেন এবং তিনি তাঁকে সাইয়েদুল মুসলিমীন এবং সাইয়েদুল কুররার উপাধিতে ডাকতেন।"

হযরত ওমর ফারুক (রা) নিজের শাসনামলে তারাবীহর নামাযকে জামায়াতের সঙ্গে আদায়ের ব্যবস্থা করেন। এ সময় তিনি হযরত উবাই (রা) বিন কা'বকে পুরুষদের এবং হযরত সোলায়মান (রা) বিন আবী হাদমাকে মহিলাদের ইমাম নিয়োগ করেন। আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা) যদিও হযরত উবাইয়ের (রা) ওপর অত্যন্ত দয়াদ্র ছিলেন এবং তাঁর মান-ইজ্জত প্রদর্শনে কোন ত্রুটি করতেন না। তবুও, হযরত উবাই (রা) দীনী ব্যাপারে সামান্যতম খাতিরও করতেন না এবং যে কথা হক মনে করতেন তা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করতেন। কানযুল উম্মালে আছে ঃ

হযরত ওমর (রা) এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন ঃ সে সময় সেই ব্যক্তি এই আয়াত পাঠ করছিলেনঃ

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

(التوبه : ١٠٠)

তিনি এই আয়াত শুনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, একটু এদিকে এসো তো। সে তাঁর নিকট এলে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এই আয়াত কার কাছ থেকে মুখস্ত করেছ। সে বললো, এই আয়াত আমাকে উবাই (রা) বিন কা'ব মুখস্ত করিয়েছেন। তিনি বললেন, চলো, উবাই (রা) বিন কা'বের নিকট যাই। তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে উবাইয়ের (রা) নিকট এলেন। তিনি বললেন, "হে আবুল মানযার! এই ব্যক্তি বলছে যে, তুমি তাকে এই আয়াত শিক্ষা দিয়েছ।" উবাই (রা) বললেন, সে ঠিকই বলেছে। আমি এই আয়াত রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র মুখ থেকে শুনেছি। হযরত ওমর (রা) (আশ্চর্য) হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি তা মুহাম্মাদের (সা) মুখ থেকে শুনেছ?" উবাই (রা) বললেন, "হাঁ"। তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করার পর তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, "হাঁ, আল্লাহর কসম! তা আল্লাহ জিবরাইলের (আ) ওপর এবং জিবরাইল (আ) মুহাম্মাদের (সা) অন্তরের ওপর নাযিল করেন। অবশ্যই খাত্তাব এবং তার পুত্রের পরামর্শ নেয়নি।" এ কথা শুনে হযরত ওমর (রা) সেখান থেকে বের হয়ে এলেন। এমনভাবে বের হয়ে এলেন যে, তাঁর দু'টি হাত আসমানের দিকে উঠছিল এবং আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবর উচ্চারণ করছিলেন।"

এই প্রসঙ্গে কানযুল উম্মালে আরো অনেক রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য দু'একটি হলো ঃ একবার হযরত আবু দারদা (রা) সিরিয়াবাসীর একটি বিরাট দলকে নিজের সঙ্গে মদীনা নিয়ে এলেন। তাঁরা হযরত উবাইয়ের (রা) নিকট কুরআন শিক্ষা লাভ করেন। একদিন তাদের মধ্য থেকে একজন হযরত ওমরের (রা) সামনে কোন আয়াত পড়লেন। হযরত ওমর (রা) তার কিরআত সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করলেন। সে বললো, আমি উবাই (রা) বিন কা'ব থেকে এ আয়াত এভাবে শুনেছি। হযরত ওমর (রা) এক ব্যক্তিকে উবাইকে (রা) ডেকে আনার জন্য প্রেরণ করলেন। সে সময় উবাই (রা) উটের খাবার দিচ্ছিলেন। আমীরুল মুমিনীনের পয়গাম পেয়ে দূতকে জিজ্ঞেস করলেন, কি প্রয়োজন? তিনি ঘটনা বর্ণনা করলেন। তাতে হযরত উবাই (রা) ক্রোধান্বিত হলেন এবং হাতে উটের খাবার নিয়েই খিলাফতের দরবারে উপস্থিত হলেন। হযরত ওমর (রা) সেই আয়াত তাঁকে দিয়ে পড়ালেন। তারপর হযরত যায়েদ (রা) বিন সাবিতকে সেই আয়াত পড়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি নির্দেশ পালন করলেন। কিন্তু তাঁর কিরআত হযরত উবাইর (রা) কিরআত থেকে সামান্য ভিন্ন ধরনের ছিল। হযরত ওমর (রা) হযরত যায়েদকে (রা) সমর্থন করলেন। এতে হযরত উবাই (রা) উত্তেজিত হয়ে বললেন, "ওমর, আল্লাহর কসম! আপনি জানেন যে, আমি রাসূলের (সা) নিকট ভেতরে থাকতাম এবং আপনারা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতেন। আজ আমাকে অপমানিত করা হচ্ছে। আল্লাহর কসম! আপনি যদি বলেন, তাহলে আমি ঘরে বসে যাবো। কারোর সঙ্গে কথা বলবো না এবং লোকজনকে কুরআনও পড়াবো না। এই অবস্থাতেই আমার মৃত্যু হবে।

হযরত ওমর (রা) বললেন, "অবশ্যই না। আল্লাহ আপনাকে ইলম দিয়েছেন। উৎসাহের সঙ্গে আপনি লোকদেরকে কুরআন তালীম দেবেন।"

অন্য আরো একবার হযরত ওমর (রা) হযরত উবাই (রা) বিন কা'বের কোন আয়াতের কিরআতে আপত্তি করলে তিনি রেগে গিয়ে বললেন, "আমি রাসূলের (সা) কাছ থেকে স্বয়ং শুনেছি আর বাকী'র বাজারে আপনি কেনা-বেচায় ভয়ানক ব্যস্ত ছিলেন।" হযরত ওমর (রা) হযরত উবাইর (রা) প্রতি খুবই শ্রদ্ধাবান ছিলেন এবং তাঁকে মুশকিলে ফেলতে চাইতেন না। বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ।"

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি মদীনার এক গলিতে কুরআন মজীদের একটি আয়াত পড়তে পড়তে যাচ্ছিলাম। ইতিমধ্যে পেছন থেকে আওয়াজ এলো, "সনদ বলো। হে ইবনে আব্বাস (রা)

সনদ বলো।" আমি ফিরে তাকিয়ে দেখি হযরত ওমর (রা)। আমি বললাম, আমি আপনাকে (রা) উবাই (রা) বিন কা'বের হাওয়ালা দিচ্ছি। এ কথা শুনে তিনি নিজের এক গোলামকে বললেন, উবাইয়ের (রা) নিকট যাও এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করো যে, তুমি তাকে এই আয়াত মুখস্ত করিয়েছ কিনা। আমরা উবাইয়ের নিকট গেলাম। আমরা সবেমাত্র তাঁর দরজাতে পৌছেছি ঠিক এমন সময় হযরত ওমর (রা) এসে উপস্থিত এবং ভেতরে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। উবাই (রা) অনুমতি দিয়ে দিলেন। আমরা উবাইর (রা) নিকট এমন অবস্থায় পৌছেছিলাম যে, তাঁর বাঁদী তার মাথায় চিরুনী করছিলো। হযরত ওমরের (রা) জন্য এক টুকরো চামড়া ফেলে দেয়া হলো। তিনি তার ওপর বসে পড়লেন। উবাই (রা) বিন কা'ব প্রাচীরের দিকে মুখ করে বসেছিলেন। সেই ভাবেই বসে রইলেন এবং তাঁর পিঠ ছিল হযরত ওমরের (রা) দিকে। তা দেখে হযরত ওমর (রা) আমাদের দিকে মুখ করে বললেন, "দেখোতো, উবাই (রা) আমাদের কোন পরওয়াই করছে না।" কিছুক্ষণ পর উবাই (রা) বিন কা'ব হযরত ওমরের (রা) দিকে মুখ ফিরালেন এবং বললেন, "খোশ আমদেদ, আমীরুল মুমিনীন। এখন কি জন্য তাশরীফ এনেছেন? শুধু মুলাকাতের জন্য অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে? হযরত ওমর (রা) বললেন, "আমি যে উদ্দেশ্যেই এসে থাকি না কেন। তুমি লোকদেরকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করছো কেন?"

উবাই (রা) বললেন, "সম্ভবত আপনি এমন কোন আয়াত শুনেছেন যা আপনার নিকট কঠিন মনে হয়েছে। আপনার জানা উচিত যে, আমি কুরআন সেই ব্যক্তিত্বের নিকট থেকে শিখেছি যিনি তা তাজা তাজা জিবরাইল আমীন (আ) থেকে হাসিল করেছিলেন।" এ কথা শুনে হযরত ওমর (রা) হাতের ওপর হাত মারলেন। "আল্লাহর কসম, তুমি ইহসান জিতাতে চাও, আমি তোমার কথায় সন্তুষ্ট হলাম না–তুমি কোনভাবেই (নিজের কথা বলা থেকে) বিরত হবে না এবং আমারও সহনশীলতা আসবে না।" এ কথা বলে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন।

কোন কোন সময় মতবিরোধ হওয়া সত্ত্বেও হযরত ওমর (রা) হযরত উবাইকে (রা) আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করতেন। সিরিয়ার মশহুর সফরে তিনি জাবিয়া নামক স্থানে যে খুতবা দিয়েছিলেন তাতে বলেছিলেন ঃ "কুরআনের প্রতি যার উৎসাহ আছে সে যেন উবাই'র (রা) নিকট যায়।"

হযরত ওসমান যুন্নুরাইনও (রা) হযরত উবাইর (রা) জ্ঞান সমুদ্রের প্রশংসাকারী ছিলেন। তিনি নিজের শাসনামলে অনুভব করলেন যে, কতিপয়

সাহাবীর কিরআতে মতবিরোধ রয়েছে। সুতরাং তিনি সকল মুসলমানকে এক কিরআতের ওপর ঐক্যবদ্ধ করার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করলেন। এ লক্ষ্যে তিনি আনসার ও মুহাজিরদের মধ্য থেকে ১২ জন সাহাবী নির্বাচিত করলেন। এসব সাহাবীর পুরো কুরআনের ওপর পূর্ণ দখল ছিল। অতপর তিনি তাঁদের ওপর পরামর্শের ভিত্তিতে এই মতবিরোধ দূর করার দায়িত্ব সমর্পণ করলেন। এই মজলিসের আমীর নিয়োজিত হলেন হযরত উবাই (রা)। তিনি বলে যেতেন এবং হযরত যায়েদ (রা) বিন ছাবিত তা লিখে নিতেন। যেখানে মতবিরোধ দেখা দিত সেখানে সকলে পরস্পর পরামর্শ করে তা দূর করে নিতেন। কানযুল উম্মালে আছে যে, এরপর কুরআনে করীমের সকল নুসখা হযরত উবাই (রা)-এর কিরআতের অনুরূপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত উবাই (রা), হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে (১৯ অথবা ২০ অথবা ২২ হিজরীতে) ওফাত পেয়েছিলেন। সবচেয়ে মশহুর রেওয়ায়াত হলো যে, তিনি হযরত ওসমানের (রা) শাসনামলে ৩২ হিজরীতে ওফাত পেয়েছিলেন। কিরআতের মতবিরোধ দূরকারী রেওয়ায়াত এই অবস্থায় সহীহ হতে পারে যদি হযরত উবাইর (রা) ওফাতকাল ৩২ হিজরী হিসেবে মেনে নেওয়া হয়।

হযরত উবাই (রা) মৃত্যুকালে যে ক'জন সন্তান রেখে যান তাদের মধ্যে তোফায়েল, মুহাম্মদ, রবী', আবদুল্লাহ এবং উম্মে ওমরের নাম জানা যায়। তাঁর স্ত্রী উম্মে তোফায়েলও (রা) সাহাবিয়াহ ছিলেন।

হযরত উবাই (রা) ইলম ও ফযীলতের সম্মিলিত সমুদ্র ছিলেন। তিনি শুধু কুরআনী ইলমেরই সামুদ্রিক গভীরতা রাখতেন না, বরং হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রেরও একজন বিরাট আলেম ছিলেন। ইমাম যাহাবী (র) বর্ণনা করেছেন যে, "হযরত উবাই (রা) রাসূলের (সা) হাদীসসমূহের বিরাট একটা অংশ শুনাতেন।" তবে, হযরত উবাই (রা) হাদিস বর্ণনায় খুব সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তাঁর থেকে ৬৪টি হাদীস বর্ণিত আছে।

হযরত উবাইয়ের (রা) ইলমের মহত্ব এমন ছিল যে, বড় বড় জালীলুল কদর সাহাবী তাঁর হালকায়ে দারসে শামিল হতেন। এসব সাহাবীর (রা) মধ্যে ছিলেন হযরত ওমর ফারুক (রা), হযরত আবু হুরায়রা (রা), হযরত উবাদা (রা) বিন সামেত, হযরত আবু মুসা আশআরী (রা), হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা), হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) এবং হযরত আনাস (রা) বিন মালিক। এই সব বুযুর্গ হযরত উবাইয়ের (রা) বাড়ী গিয়ে মাসয়ালা জিজ্ঞেস করতে দ্বিধা করতেন না।

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, আনসারদের মধ্যে তাঁকে সবচেয়ে বড় আলেম হিসেবে মানা হতো। ইসলামী ইলম ছাড়াও তাওরাত এবং ইঞ্জীলের ওপরও তাঁর দখল ছিল। এসব কিতাবে প্রিয় নবী (সা) সম্পর্কে যে সুসংবাদসমূহ রয়েছে তা তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে লোকদেরকে শুনাতেন।

রহমতে আলমের (সা) ইন্তেকালের পর হযরত উবাই (রা) বিন কা'ব ফয়েযের এমন এক প্রস্রবণ তুল্য ছিলেন যে, তা থেকে প্রত্যেক মুসলমান প্রয়োজনমত ফয়েয লাভ করতেন। তিনি লোকদেরকে শরীয়াতের মাসয়ালাও বলতেন। আবার কুরআনে হাকীমের তাৎপর্য এবং মারিফাত সম্পর্কেও শিক্ষা দিতেন। কুরআনে করীমের ওপর আমল করেই মুসলমান নিজের দুনিয়া ও আখিরাতকে সুন্দর করতে পারেন বলে তিনি মনে করতেন। একবার কোন এক ব্যক্তি তাকে ওসিয়ত করার জন্য আরয করলেন। তিনি বললেন ঃ "কুরআনে করীমকে নিজের ইমাম বানিয়ে নাও। তার সিদ্ধান্ত ও আহকামের ওপর রাজী হয়ে যাও। নিসন্দেহে এই কুরআন সেই বস্তু যা তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) রেখে গেছেন। আর এটা এমন সাথী যার ওপর কেউ কোন কথা বলতে পারে না। তাতে তোমাদের কথা যেমন উল্লেখ রয়েছে তেমনি তোমাদের পূর্বেকার উম্মাতের কথাও আছে। এই কুরআনই তোমাদের পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদ মিটিয়ে থাকে। তাতে তোমাদের যেমন তেমনি পরবর্তীকালে আগমনকারীদের অবস্থাও বর্ণিত আছে।"

আবু নুআঈম (র) "হুলিয়া" তে লিখেছেন যে, হযরত উবাই (রা) বিন কা'ব বলতেন, মুমিনদের মধ্যে চারটি গুণ অবশ্যই থাকে।

প্রথম, মুসিবতে পড়লে সবর করে থাকে। দ্বিতীয়, যদি সে কোন নিয়ামত প্রাপ্ত হয় তাহলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে থাকে। তৃতীয় সে যদি কোন সিদ্ধান্ত দেয় তাহলে সম্পূর্ণ ইনসাফ করে। চতুর্থ, সে যদি কোন কথা বলে তাহলে সত্য বলে এবং যখন কোন বান্দাহ আল্লাহ তাআলার ভয়ে কোন কিছু ত্যাগ করে তখন আল্লাহ তার বিনিময়ে তা থেকেও উত্তম বস্তু এমন স্থান থেকে দেন যেখান থেকে তা প্রাপ্তির চিন্তাও করা যায় না। যখন কোন বান্দাহ আল্লাহ প্রদত্ত কোন নিয়ামতের কদর করে না এবং তা এমনভাবে ব্যবহার করে যা শরীয়াতের দিক থেকে তার জন্য জায়েয নয়। তাহলে আল্লাহ অবশ্যই তার বদলায় এমন পদ্ধতিতে শাস্তি প্রদান করেন যা তার ধারণাতীত।

কতিপয় শরয়ী মাসয়ালাতে হযরত উবাই (রা) নিজের বিশেষ মত পোষণ করতেন। যেমন তিনি জোহর ও আসরের নামাযে ইমামের পেছনে কিরআত পড়তেন এবং অন্যান্য নামাযে চুপ থাকতেন। যিনার শাস্তি তিন ধরনের বলে

বলতেন। বিবাহিত বৃদ্ধের জন্য বেত্রাঘাত ও রজম উভয়ই, বিবাহিত যুবকদের জন্য শুধুমাত্র রজম মারা এবং অবিবাহিত যুবকদের জন্য শুধু মাত্র বেত্রদন্ড।

তিনি কিছুটা লৌকিকতাপূর্ণ মানুষ ছিলেন। হালকায়ে দারসে গদীর ওপর বসে তালীম দিতেন এবং শিষ্যদেরকে তাঁর তা'জীমের জন্য আপাদমস্তক দাঁড়িয়ে যাওয়াতে নিষেধ করতেন না। বৃদ্ধকালেও যখন মাথা ও দাড়ির চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল তখনও বিশৃংখল ও উস্কো খুস্কো চুল পসন্দ করতেন না। একজন বাঁদী তার চুল সুন্দর করে দেয়ার দায়িত্ব পালন করতো। ঘরের দেওয়ালে একটি আয়না লাগানো ছিল। যখন চিরুনী করতেন তখন সে দিকে মুখ করতেন।

ইলম এবং আমল উভয় দিক থেকেই হযরত উবাই'র (রা) ব্যক্তিত্ব সুশোভিত ছিল। বিদয়াত থেকে দূরে থাকতেন এবং প্রতিটি কাজে সুন্নাতে নবুবীর (সা) প্রতি গুরুত্ব দিতেন। তাঁর ইবাদাতে এক বিশেষ সৌন্দর্য প্রকাশিত হতো। অত্যন্ত খুশু ও খুযূ'র সঙ্গে নামায পড়তেন। অধিকাংশ রাতই জেগে কাটাতেন। তিলাওয়াত এবং নামাযে চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তো। সাধারণত তৃতীয় রাতে কুরআন মজীদ খতম করতেন। রাতের এক অংশে দরুদ ও সালামে মশগুল থাকতেন।

ইসলামে অগ্রগমন, রাসূল (সা) প্রেম, জিহাদের শওক, কুরআন ও হাদীসের প্রতি আকর্ষণ এবং ইসলাহও তাবলীগের আবেগ হযরত উবাই (রা) বিন কা'বের বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। এসব বৈশিষ্ট্যের কোন একটির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তাঁর আলোকিত ব্যক্তিত্ব দৃষ্টি গোচর হয়।

হযরত যায়েদ (রা) বিন আরকাম আনসারী

খন্দকের যুদ্ধের কিছু দিন পরের ঘটনা। রহমতে আলম (সা) খবর পেলেন যে, মুসতালিক গোত্রের সরদার হারিছ বিন আবি জিরার মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বিরাট বাহিনী একত্রিত করেছে এবং মদীনার ওপর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। হুযুর (সা) সাহাবায়ে কিরামকে (রা) এই ফিতনা উৎখাতের জন্য প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন এবং ৬ষ্ঠ হিজরীর শাবানের শুরুতে জীবন উৎসর্গকারীদের একটি দলসহ মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে মুররে ইয়াসী' নামক কূপের (অথবা ঝর্ণার) নিকট তাঁবু ফেললেন। তারই পাশে ছিল বনূ মুসতালিকের বসবাস। প্রিয় নবী (সা) হযরত ওমর ফারুকের (রা) মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং অপকর্ম থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু সেই হতভাগারা হুযুরের (সা) আহবান কবুল না করে বরং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে বসলো। মুসলমানরা হুযুরের (সা) ইরশাদ মুতাবিক তাদের ওপর কয়েকবার এক সঙ্গে এমন প্রচন্ডভাবে হামলা করলো যে, তারা বোধশূন্য বা অচেতন হয়ে পড়লো এবং নিজেদের ১০ জনকে যমের হাতে তুলে দিয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে গেল। বনূ মুসতালিকের পরাজয়ের পর ইসলামী বাহিনী মুররে ইয়াসী' সংলগ্ন বস্তিতে কয়েকদিন অবস্থান করলো। এখানে অবস্থানকালে একদিন দুর্ভাগ্যবশত এক মুহাজির হযরত জাহজাহ (রা) বিন মাসউদ গিফারী এবং এক আনসারী হযরত সিনান (রা) বিন ওয়াবরাবিল জুহনী পানির প্রশ্নে পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হলো। এমনকি তাঁরা মল্ল যুদ্ধে লেগে গেলো। যুদ্ধে জাহজাহ (রা) সিনানকে লাথি মারলো। আনসারদের নিকট কারোর লাথির আঘাত খুবই লজ্জাকর বলে বিবেচিত হতো। সুতরাং সিনান (রা) সাহায্যের জন্য আনসারদের ডাকা শুরু করে দিলেন। জাহজাহও (রা) নিজেকে বিপদাপন্ন মনে করে তাঁকে সাহায্যের জন্য মুহাজিরদেরকে ডাকতে লাগলেন। তিনি চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন যে, আনসাররা তাঁকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়েছে। মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাইও সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলো। মুসলমানদের মধ্যে বিবাদ ঘটানোর এক সুবর্ণ সুযোগ সে পেলো। সে আনসারদেরকে কঠোরভাবে উত্তেজিত করলো এবং সিনানের সাহায্যের জন্য উদ্বুদ্ধ করলো। অন্য দিক থেকে কতিপয় মুহাজিরও তরবারী উঁচু করে ধরে বের হয়ে এলেন।

এমনিভাবে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে খুনাখুনী হওয়ার আর বাকী রইলো না। ঠিক এমন সময় রহমতে আলমের (সা) পবিত্র কানে এই গন্ডগোলের আওয়াজ পৌঁছলো। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁবুর বাইরে তাশরীফ নিলেন এবং বললেন ঃ "এই জাহেলিয়াতের দোহাই কেন? তোমরা কারা আর জাহেলিয়াতের দোহাই কি বস্তু? তোমরা তা পরিত্যাগ করো। কেননা, তা খুব খারাব বস্তু।"

হুযূরের (সা) ইরশাদ শুনে উভয়পক্ষের কিছু সাহাবী সামনে অগ্রসর হলেন এবং সিনান (রা) ও জাহাজাহ (রা)-কে গলায় গলায় মিলিয়ে দিলেন। এভাবেই গন্ডগোল মিটে গেল। কিন্তু আবদুল্লাহ বিন উবাই এবং তার মুনাফিক সঙ্গীদের ওপর ব্যাপারটি খুব কঠিন মনে হলো। তারা পরস্পর সম্মিলিত হয়ে এক জায়গায় বসলো। এ সময় আবদুল্লাহ তার মনের ঝাল মিটিয়ে বললো ঃ

"এসব তোমাদেরই কাজের ফল। তোমরা যদি মুহাজিরদেরকে সাহায্য দান বন্ধ করে দাও তাহলে তারা নিরুপায় হয়ে নিজেরাই মদীনা ছেড়ে চলে যাবে। আল্লাহর কসম! মদীনা ফিরে গিয়ে আমাদের মধ্যকার মান-ইযযতওয়ালারা হীন ও নীচুদেরকে শহর থেকে বের করে দেবে।"

ঘটনাক্রমে এই মাজমা'তে মদীনার এক যুবকও উপস্থিত ছিলেন। এই যুবক দীনে হক এবং দায়ীয়ে হককে (সা) গভীরভাবে ভালো বাসতেন। আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের কথা শুনে তার রক্ত টগবগ করে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের চাচা হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার নিকট দৌড়ে গেলেন এবং সকল ঘটনা তাঁর নিকট বর্ণনা করলেন। তিনি খুব লজ্জিত হলেন এবং রাসূলের (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে ইবনে উবাইয়ের বাজে কথার উল্লেখ করলেন। হুযূর (সা) যুবককে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি চাচার কাছে যে কথা বলেছিলেন সেই কথা রাসূলের (সা) নিকটও পুনরুক্তি করলেন। হুযূর (সা) বললেন, "সম্ভবত তুমি আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট। হতে পারে যে, তুমি ভুল শুনেছ"। যুবকটি কসম খেয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি বাস্তবিকই আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের মুখ থেকে এ কথা শুনেছি।" ফলে সারওয়ারে আলম (সা) ইবনে উবাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এ কথা বলেছ? সে স্পষ্ট অস্বীকার করে বসলো এবং কসম খেতে লাগলো যে, আমি অবশ্যই এ কথা বলিনি। এই ছেলে মিথ্যা বলছে।

আনসারদের মধ্যে এই যুবকের চাচাও ইবনে উবাই'র কসমের ওপর আস্থা আনলেন এবং ছেলেকে এই বলে গালি দিলেন যে, সে খামাখাই এই

অভিযোগ করে রাসূলকে (সা) নারাজ করে ফেলেছে। যুবকটি খুবই দুঃখিত হলেন এবং নিজের বাড়ী গিয়ে বসে রইলেন। তার মনটা খুবই ভারাক্রান্ত ছিলো। এই অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়লেন। তখনো জাগেননি। ঠিক এই অবস্থায় আল্লাহর রহমত উথলে উঠলো এবং বিশ্ব নবীর (সা) ওপর সূরায়ে মুনাফিকুন নাযিল হলো। এই সূরাতে সেই নেককার যুবকের কথার সত্যতার স্বীকৃতি দেওয়া হলো এবং মুনাফিকদের যথার্থ স্বরূপ উদঘাটন করা হলো। (সূরায়ে মুনাফিকুনের নাযিলের স্থান সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়াত রয়েছে। একটি রেওয়ায়াত হলো যে, এই সূরা মুররে ইয়াসী'র তাঁবুতে অবতীর্ণ হয়েছিল। দ্বিতীয় রেওয়ায়াতে আছে যে, ফিরতি সফরকালে নাযিল হয়েছিল। তৃতীয় রেওয়ায়াত অনুযায়ী হুযূরের (সা) মদীনা পৌছার সঙ্গে সঙ্গে এই আয়াত নাযিল হয়। যা হোক, সকল চরিতকারই এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) ইবনে উবাইয়ের তৎপরতায় এত ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন যে, তিনি হুযূরের খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অনুমতি দিলে আমি সেই মুনাফিকের গরদান উড়িয়ে দিই। আর আপনি যদি এটা ঠিক মনে না করেন তাহলে আনসারদের মধ্য থেকে সা'দ (রা), মাআয (রা) বিন জাবাল, উব্বাদ (রা) বিন বাশার অথবা মুহাম্মাদ (রা) বিন মাসলামাকে সেই কিসসা খতম করে ফেলার নির্দেশ দিন।" রহমতে আলম (সা) বললেন, "না, এমন করো না। লোকজন বলবে যে, মুহাম্মাদ (সা) সঙ্গীদেরকে হত্যা করায়।"

আবদুল্লাহ বিন উবাইর পুত্রের নামও ছিল আবদুল্লাহ। তিনি একজন সাচ্চা মুসলমান এবং একনিষ্ঠ সাহাবী ছিলেন। আল্লামা ইবনে আসীর বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমরের (রা) পর তিনি হুযূরের খিদমতে হাযির হলেন এবং আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা আপনাকে নীচ বলেছে। আল্লাহর কসম! সে নিজেই নীচ। যদিও আমি আমার পিতার অনুগত, কিন্তু আপনি নির্দেশ দিলে এখনই আমি তার মাথা উড়িয়ে দিতে পারি। অন্য কেউ হত্যা করলে সম্ভবত আমার অন্তরে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠতে পারে এবং আমার আখিরাত বরবাদ হয়ে যাবে।"

হুযূর (সা) তাঁকেও সেই জবাব দিলেন, যে জবাব হযরত ওমরকে (রা) দিয়েছিলেন। তার পর যখন ইসলামী বাহিনী মদীনা ফিরে এলো তখন আবদুল্লাহ (রা) তরবারী উঁচু করে পিতার সামনে দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেনঃ "তুমি স্বীকার কর যে, আমিই নীচ এবং মুহাম্মাদ (সা) মর্যাদাবান। নচেৎ আল্লাহর কসম রাসূলের (সা) অনুমতি ছাড়াই আমি তোমাকে মদীনায়

অবশ্যই ঢুকতে দিব না।" তাতে ইবনে উবাই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলো যে, "দেখো, আমার পুত্রই আমাকে মদীনা প্রবেশে বাধা দিচ্ছে।"

হুযূর (সা) এই খবর পেয়ে আবদুল্লাহকে (রা) বলে পাঠালেন যে, "নিজের পিতাকে ঘরে যেতে দাও। যতক্ষণ সে আমাদের মধ্যে থাকবে ততক্ষণ–আমরা তাঁর সঙ্গে ভালো আচরণই করবো।" আবদুল্লাহ (রা) নবীর (সা) ইরশাদের সামনে মাথা নীচু করে দিলেন। আর এমনিভাবে ইবনে উবাই মদীনায় প্রবেশ করতে পারলো।

হুযূর (সা) সে সময়ই সেই যুবককে ডেকে পাঠালেন। তিনি যখন হাযির হলেন তখন হুযূর (সা) তাঁর সামনে সূরায়ে মুনাফিকুন–এর আয়াত পড়লেন। অতপর হাসতে হাসতে তাঁর কান ধরে বললেন, "ছেলেটির কান সত্য ছিল, আল্লাহ স্বয়ং তার সত্যতা স্বীকার করেছেন।"

এই ভাগ্যবান যুবক যাঁর সত্যতা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি ছিলেন হারিছ বিন খাযরাজ গোত্রের আশা–আকাংখার ভরসাস্থল হযরত যায়েদ (রা) বিন আরকাম।

সাইয়েদুনা হযরত আবু ওমর যায়েদ (রা) বিন আরকাম আনসারী অন্যতম মহান মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী ছিলেন। খাযরাজ গোত্রের শাখা হারিছ বিন খাযরাজের সঙ্গে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তাঁর নসবনামা হলো ঃ

যায়েদ (রা) বিন আরকাম বিন যায়েদ বিন কায়েস বিন নুমান বিন মালিকুল আয়াজ্জ বিন ছালাবা বিন কা'ব বিন খাযরাজ বিন হারিছ বিন খাযরাজ আকবার।

শৈশবকালেই যায়েদ (রা) বিন আরকামের পিতা আরকাম বিন যায়েদ ইন্তেকাল করেন। জালীলুল কদর সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা আনসারীর সম্পর্কও এই বংশের (হারিছ বিন খাযরাজ) সঙ্গে ছিল। তিনি খুব নেক নফস এবং বুযূর্গ ব্যক্তি ছিলেন এবং দূরতম সম্পর্কের ভিত্তিতে যায়েদ (রা) বিন আরকামের চাচা হতেন। তিনি ইয়াতীম অসহায় যায়েদকে (রা) নিজের অভিভাবকত্বে নেন এবং অত্যন্ত স্নেহ ও আন্তরিকতার সঙ্গে লালন পালন করেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা আনসারের সাবিকুনাল আউয়ালুনের মধ্যে পরিগণিত হন। তিনি বাইআতে আকাবায়ে কাবীরাতে ইসলাম গ্রহণ করে মদীনা ফিরে এসে কিশোর যায়েদকেও ইসলামের কথা বললেন। তিনি চাচার অনুসরণ করলেন এবং নবীর (সা) হিজরতের পূর্বেই ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেন। রহমতে আলম (সা) মক্কা থেকে

হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারা তাশরীফ নিলেন, তখন আনসারের অন্যান্য শিশুর মত যায়েদেরও (রা) ঈদ হয়ে গেল। সে দিন আনসার শিশুদের আনন্দের সীমা-পরিসীমা ছিল না। তারা খুশীর আবেগে "জায়া রাসূলুল্লাহ জায়া নাবিয়ুল্লাহ" বলে বলে শহরের গলিসমূহে এবং সড়কে আনন্দে আত্মহারা হয়ে নেচে নেচে বেড়াচ্ছিল।

দ্বিতীয় হিজরীতে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। সে সময় হযরত যায়েদ (রা) ১০-১১ বছর বয়সের বালক ছিলেন। এ জন্য যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। ওহোদের যুদ্ধের সময়ও তাঁর বয়স যুদ্ধের যোগ্য ছিল না। কিন্তু হক পথে জীবন কুরবান করার জন্য তিনি অস্থির ছিলেন। তবুও রাসূলে আকরাম (সা) যখন তাকে যুদ্ধে অংশ গ্রহনের অনুমতি দিলেন না তখন ভগ্ন হৃদয়ে বাড়ী চলে গেলেন। তারপর তিনি সর্ব প্রথম খন্দকের যুদ্ধে অংশ নেয়ার সুযোগ পান। যৌবনের প্রারম্ভকাল, টগবগে রক্ত, খন্দক খনন এবং অন্যান্য কাজে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নেন। খন্দকের পর বনূ মুসতালিকের যুদ্ধে শরীক হন। কতিপয় রেওয়ায়াত অনুযায়ী এই যুদ্ধ খন্দকের যুদ্ধের পূর্বে সংঘটিত হয়। কিন্তু সঠিক হলো যে, এই যুদ্ধ খন্দকের যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয়।

এ সময় হযরত যায়েদ (রা) বিন আরকাম রাসূল (সা) প্রেম এবং ঈমানের মর্যাদাবোধ যেভাবে প্রকাশ করেন তার উল্লেখ ওপরেই করা হয়েছে। স্বয়ং হযরত যায়েদ (রা) বিন আরকাম থেকে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ বিন উবাই যখন রাসূলের (সা) সামনে নিজের কথা স্পষ্ট অস্বীকার করলো এবং কসম খেয়ে নিজের পবিত্রতার নিশ্চয়তা দিল তখন আনসারের বুযূর্গ ব্যক্তিবর্গ এবং স্বয়ং আমার চাচা আমাকে ভালো-মন্দ বললেন। এমনকি আমার অনুভূতি হলো যে, রাসূলও (সা) বুঝি আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করেছেন। এতে আমার এতো দুখ লাগলো যে, জীবনে কখনো তা লাগেনি। আমি অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত মনে বাড়ী গিয়ে বসে রইলাম। যখন সূরায়ে মুনাফিকূন-এর দ্বিতীয় আয়াতের সঙ্গে এই আয়াত নাযিল হলো ঃ

يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَآ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ؕ
وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ -

(المنٰفقون : ٨)

"তারা বলে যে, আমরা মদীনা প্রত্যাবর্তন করলে যে সম্মানিত সে হীনকে সেখান থেকে বহিষ্কৃত করবে। অথচ মান মর্যাদাতো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের জন্য। কিন্তু এই মুনাফিকরা তা জানে না।"

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা যেন আমার কথার প্রতিটি শব্দের সত্যতা স্বীকার করেছেন। তাতে রাসূলের (সা) চেহারায় খুশী উপচে পড়লো এবং তিনি হাসতে হাসতে আমাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "হে যায়েদ। আল্লাহ তোমার কথার সত্যতার স্বীকৃতি দিয়েছেন।"

অন্য এক রেওয়ায়াতে হযরত যায়েদের (রা) সঙ্গে এই শব্দ সংশ্লিষ্ট আছে যে, হুযূর (সা) হেসে আমার কান ধরলেন এবং বললেন, " ছেলেটির কান সত্য ছিল। আল্লাহ স্বয়ং সেই সত্যতার স্বীকৃতি দিয়েছেন।"

খন্দক এবং বনূ মুসতালিক ছাড়া হযরত যায়েদ (রা) আরো ১৫টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সহীহ বুখারীর একটি রেওয়ায়াতে তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ১৯টি যুদ্ধে অংশ নেন। তার মধ্য থেকে ১৭টিতে আমি তাঁর সফরসঙ্গী ছিলাম।

৬ষ্ঠ হিজরীর যিলকদ মাসে অনুষ্ঠিত বাইয়াতে রিদওয়ানেও হযরত যায়েদের (রা) অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ ঘটেছিল। এমনিভাবে তিনি সেই সব ভাগ্যবান সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত হন যাঁদেরকে আল্লাহ তাআলা আসহাবুশ শাজারাহ'র উপাধি এবং স্পষ্ট ভাষায় নিজের সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

অষ্টম হিজরীর জুমাদিউল আউয়াল মাসে হযরত যায়েদ (রা) বিন আরকাম জালীলুল কদর চাচা হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহার সঙ্গে মাওতার যুদ্ধে রওয়ানা হলেন। চাচা-ভাতিজা দু'জনই একই উটে সওয়ার ছিলেন। পথিমধ্যে হযরত আবদুল্লাহ (রা) অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন।

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ এই কবিতা শাহাদাতের এক রাত আগে মাওতার ময়দানে পাঠ করেন। বস্তুত তাতে শাহাদাতের সীমাহীন আকাঙ্খা ব্যক্ত করা হয়েছিল। এ জন্য হযরত যায়েদ (রা) এই কবিতা শুনে ক্রন্দন শুরু করে দিয়েছিলেন। তাতে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলেন। তিনি চাবুক উঠিয়ে ধমক দিয়ে হযরত যায়েদকে (রা) বললেনঃ আল্লাহ আমাকে শাহাদাতের তাওফীক দিলে তোমার কি অসুবিধা। তুমি আমার উটের হাওদা আমার খান্দানে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।"

রহমতে আলমের (সা) ওফাতের পর হযরত যায়েদ (রা) জীবনের বেশী অংশ দারস ও ইরশাদ এবং শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা দানে কাটিয়েছিলেন। হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর সঙ্গে একনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সুতরাং সিফফীনের যুদ্ধে তাঁর বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেন। আল্লামা ইবনে সা'দ (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত যায়েদ (রা) বিন আরকাম কুফার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলেন।

হযরত যায়েদের (রা) কুফা অবস্থানকালেই কারবালার লোমহর্ষক ঘটনা সংঘটিত হয়। হযরত যায়েদ (রা) তাতে খুবই দুঃখিত হন। আবু হানীফা দিনাওয়ারী "আখবারুত তাওয়াল" গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত হোসাইনের (রা) পবিত্র মাথা উবায়েদুল্লাহ বিন যিয়াদের সামনে পেশ করা হলে সে নিজের ছড়ি তাঁর ঠোঁটে লাগালো। ঘটনাক্রমে হযরত যায়েদ (রা) বিন আরকামও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি অস্থির হয়ে বললেন ঃ "না, না। ঐ পবিত্র ঠোঁট থেকে তোমার ছড়ি সরিয়ে নাও। আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর রাসূলকে (সা) ঐ ঠোঁটের ওপর চুমু দিতে দেখেছি।"

অতপর তাঁর গলা ধরে এলো এবং কেঁদে জারজার হয়ে গেলেন। যে ইবনে যিয়াদ রাসূলের (সা) খান্দানকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলেছিল সে কি করে তার সম্মান দেবে। সে চেঁচিয়ে বললো ঃ "কেন কাঁদছো? আল্লাহ তোমার চোখকে যেন কাঁদাতে থাকেন। আল্লাহর কসম! বার্ধক্যের জন্য তোমার জ্ঞান ঠিক নেই এই ধারণা যদি আমার না হতো তাহলে আমি তোমার মাথা উড়িয়ে দিতাম।"

এ ধরনের কথা সত্ত্বেও তিনি নবীর (সা) খান্দানের সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক প্রদর্শন থেকে বিরত থাকেননি। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে যে, একবার হযরত মুগীরাহ (রা) বিন শু'বা তাঁর সামনে হযরত আলী কাররামাল্লাহ ওয়াজহাহুর শানে কিছু কঠিন কথা বললেন।

তিনি বললেন ঃ "মুগীরাহ! আমি নিজের কানে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মৃত ব্যক্তিকে খারাব বলতে নিষেধ করেছেন। আলী (রা) নিজের রবের খিদমতে পৌঁছে গেছেন। এখন তাঁর সম্পর্কে এ ধরনের বাক্য কেন ব্যবহার কর।"

নবীর বংশের মুসীবতে তাঁর অন্তর খান খান হয়ে যেত। অন্যান্য মুসলমানের মুসীবতেও অস্থির হয়ে যেতেন। হিররার ঘটনায় ইয়াযীদী বাহিনীর হাতে হযরত আনাস (রা) বিন মালিকের এক পুত্র এবং অন্য কতিপয় আত্মীয় শহীদ হয়ে গেলেন। হযরত যায়েদ (রা) তাঁদেরকে শোক জ্ঞাপনমূলক চিঠি লিখলেন। এই চিঠিতে তিনি তাঁদের শোক হালকা করার

চেষ্টা করেন ঃ "আমি আল্লাহর রাসূলকে (সা) এই দোয়া করতে শুনেছি যে, হে আল্লাহ! আনসার, তাদের সন্তান, তাদের সন্তান-সন্তুতি, তাদের মহিলা এবং তাদের সকল সন্তানের মাগফিরাত দিন।"

৬৮ হিজরীতে হযরত যায়েদ (রা) বিন আরকামের শেষ সময় এসে উপস্থিত হলো এবং তিনি প্রায় ৮০ বছর বয়সে কুফায় ওফাত পান।

হযরত যায়েদ (রা) বিন আরকাম ইলম ও ফযলের মাজমাউল বাহরাইন ছিলেন। এ সত্ত্বেও তিনি খুব সতর্কতার সঙ্গে হাদীস রেওয়ায়াত করতেন। এ জন্য তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা হলো ৯০টি। এই সব হাদীসের রাবীদের মধ্যে কয়েকজন জালীলুল কদর সাহাবী এবং প্রখ্যাত তাবেয়ীগণ রয়েছেন। নিজের জ্ঞানের গভীরতা ও মানমর্যাদা সত্ত্বেও তিনি সমকালীন লোকদের ইলম ও ফযলের স্বীকৃতি দানে কুণ্ঠাবোধ করতেন না।

রাসূল প্রেম, জিহাদের প্রতি শওক, হক কথন, বিনয়, সুন্নাতের অনুকরণ এবং আল্লাহর সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া তাঁর অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি নিজের সুন্দর চরিত্রের জন্য রাসূলের (সা) নিকট বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। এমনকি তিনি যদি কখনো অসুস্থ হয়ে পড়তেন তখন স্বয়ং রাসূলে করীম (সা) তাঁকে দেখার জন্য তাশরীফ আনতেন।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে, একবার তাঁর চোখে অসুখ করলো। হুযূর (সা) দেখার জন্য তাশরীফ আনলেন। যখন সুস্থ হলেন তখন তিনি যায়েদকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "ইবনে আরকাম! এই রোগ না সারলে কি করতে?"

তিনি আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! সবর করতাম এবং আখিরাতে সওয়াবের আশা করতাম।"

হুযূর (সা) বললেন, "তুমি এরকম করতে তা হলে আখিরাতে এই এক কাজই তোমার সকল গুনাহর ক্ষতিপূরণ করে দিত।"

হযরত যায়েদের (রা) স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতির বিস্তারিত বিবরণ কোন গ্রন্থে পাওয়া যায়নি।

হযরত বারা' (রা)
বিন মালিক

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফার (সা) হিজরতের কয়েক বছর পরের কথা। মদীনার কোন এক স্থানে রাসূল (সা) প্রদীপের কয়েকটি পতঙ্গ সাইয়েদুল আনাম রহমতে আলমের (সা) চারপাশ ঘিরে বসে নবীর ফয়েযে অবগাহিত হচ্ছিলেন। এমন সময় দূর এক গলিতে এক ব্যক্তিকে দেখা গেল। তিনি দ্রুত গতিতে রাসূলের (সা) দিকে আসছিলেন। তিনি একজন মোটা ও লম্বা আকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁর দেহে ছিল তালি লাগানো দু'টি পুরাতন চাদর। মাথার চুল ও দাড়ি ছিল অবিন্যস্ত। তিনি নিকটে এসে অত্যন্ত আদবের সঙ্গে সালাম করলেন। অতপর নবীর মজলিসে বসে খুব উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে রাসূলে মাকবুলের (সা) ইরশাদ শুনতে লাগলেন। আলাপ-আলোচনার মধ্যে রহমতে আলম (সা) বললেন : "অনেক ধূলা-বালি মিশ্রিত এবং অবিন্যস্ত চুলের মানুষ। দুই পুরাতন চাদরওয়ালা। যিনি লোকদের মধ্যে সম্পূর্ণ নীচ। যখন কসম খেয়ে বসেন তখন আল্লাহ তাঁর কসম পূরণ করেন বারা'ও (রা) এইসব মানুষেরই একজন।"

নবাগত এই ব্যক্তিতো "বারা"ই ছিলেন। সেরা সৃষ্টির (সা) ইরশাদ শুনে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন এবং অযাচিতভাবে তাঁর মুখ দিয়ে আল্লাহর প্রশংসাসূচক কথা বের হয়ে গেল।

বারা'র (রা) কসমের মর্যাদা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা প্রদান করেছেন। তিনি ছিলেন খাযরাজের নাজ্জার বংশের সদস্য। তিনি মালিক বিন নজরের কলিজার টুকরো, ওহোদের শহীদ হযরত আনাস বিন নজরের ভাতিজা এবং খাদেমে রাসূল (সা) হযরত আনাস (রা) বিন মালিকের বৈমাত্রেয় ভাই। তাঁর নসবনামা নিম্নরূপ :

বারা' (রা) বিন মালিক বিন নজর বিন জমজম বিন যায়েদ বিন হারাম বিন জুনদুব বিন আমের বিন গানাম বিন আদী বিন নাজ্জার।

মাতার নাম ছিল সামহা। মালিক বিন নজরের দ্বিতীয়া স্ত্রী ছিলেন উম্মে সুলাইম সাহলা (রা) বিনতে মিলহান। তিনি অন্যতম জালীলুল কদর মহিলা সাহাবী ছিলেন। রাসূলের (সা) খাদেম হযরত আনাস (রা) তাঁরই গর্ভে জন্ম

গ্রহণ করেন। হযরত উম্মে সুলাইমকে (রা) আল্লাহ পাক সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। তিনি প্রথমদিকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজের নাবালক পুত্রকেও কালেমা পড়াতে থাকেন। মালিক বিন নজর কট্টর মুশরিক ছিল। সে উম্মে সুলাইমের (রা) ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে বলতে লাগলো যে, তুমি আমার বাচ্চাকেও বেদীন করে ফেলছো। উম্মে সুলাইম (রা) তাকে অনেক বুঝালেন। কিন্তু সে ইসলাম গ্রহণ করলো না। বরং অসন্তুষ্ট হয়ে সিরিয়া চলে গেল। সেখানে কোন শত্রু তাকে হত্যা করে ফেললো। এমনিভাবে হযরত বারা' (রা) এবং হযরত আনাস (রা) উভয়েই এতিম হয়ে গেলেন।

হযরত আনাসকে (রা) তো তাঁর মা বিশ্ব নবীর (সা) খাদেম বানিয়ে দিলেন। কিন্তু হযরত বারা' (রা) বন্ধুহীন ও অসহায় হয়ে পড়লেন। চরিতকাররা তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাল নির্দিষ্ট করে বলেননি। কিন্তু কার্যকারণে জানা যায় যে, তিনি নবীর (সা) হিজরতের কিছু দিন পূর্বে অথবা কিছু দিন পর ইসলাম গ্রহণ করেন। বস্তুত মাথার ওপর পিতার ছায়া ছিল না। আর সে কোন সম্পদও রেখে যায়নি, সে জন্য হযরত বারা' (রা) আল্লাহর মেহমান অর্থাৎ আসহাবে সুফফাতে শামিল হয়ে গেলেন।

আল্লাহর এই সব পবিত্র বান্দাহ ইসলামের খিদমতের জন্য নিজেদের জীবন ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। রাসূলে আকরাম (সা) তাঁদের অবস্থানের জন্য একটি সমতল ছাদ বানিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা সেখানেই ইলম হাসিল এবং আল্লাহর স্মরণে মশগুল থেকে অভুক্ত ও দরিদ্রের জীবন কাটাতেন। রহমতে আলম (সা) আসহাবে সুফফার (রা) ওপর সীমাহীন স্নেহ প্রদর্শন করতেন এবং তাঁদের আহার ও পোশাকের জামিন ছিলেন। এসব হকপন্থী পুরুষ এই জীবন শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই অবলম্বন করেছিলেন এবং সন্যাসিত্বের সঙ্গে তাদের দূরতম সম্পর্কও ছিল না। শান্তির সময় তাঁরা ছিলেন আল্লাহর মিসকীনতুল্য মানুষ। আর জিহাদের ময়দানে ছিলেন বাঘের চেয়েও ভয়ংকর। রাসূলের ফয়েয ও সুহবত তাঁদেরকে এমন ধরনের বানিয়েছিলেন। এটা ছিল সেই পাঠাগার যেখানে ফয়েয প্রাপ্তরা দুনিয়ার সর্বোত্তম শাসক, সর্বোত্তম গবেষক, সর্বোত্তম শিক্ষক এবং সর্বোত্তম মুজাহিদ হয়েছিলেন।

হযরত বারা' (রা) আসহাবে সুফফাতে কখন শামিল হয়েছিলেন? চরিতকাররা তারও ব্যাখ্যা দেননি। তা সত্ত্বেও ধারণা করা হয় যে, প্রথমেই তিনি এই পবিত্র দলে শামিল হন এবং সম্পূর্ণ নিজের সাথীদের রংয়ে রঞ্জিত হন। মোটা সোটা পোশাক তাঁর দেহের ওপর থাকতো এবং রুক্ষ ও শুকনো খাদ্যে শরীর ও আত্মার সম্পর্ক বজায় রাখতেন।

রাসূলের (সা) প্রতি তাঁর চূড়ান্ত পর্যায়ের ভালবাসা ছিল এবং হুযূরের (সা) খিদমত ও আনুগত্য তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বস্তু ছিল। আর এ কারণেই হুযূরও (সা) তাঁর ওপর সীমাহীন স্নেহপরায়ণ ছিলেন এবং তাঁকে আল্লাহর অন্যতম প্রিয় বান্দাহ হিসেবে আখ্যায়িত করতেন।

হক–বাতিলের সর্বপ্রথম যুদ্ধ 'বদরের যুদ্ধে' হযরত বারা' (রা) বিন মালিক এবং তাঁর চাচা হযরত আনাস (রা) বিন নজর কোন কারণে অংশ নিতে পারেননি। উভয়েই অত্যন্ত মুখলিস মুসলমান এবং প্রিয় নবীর (সা) জান নিছার ছিলেন। এ জন্য বদরের যুদ্ধে তাঁদের অংশগ্রহণ না করার বিশেষ কোন কারণ থাকতে পারে। হতে পারে অসুস্থ ছিলেন অথবা মদীনার বাইরে গিয়েছিলেন। হযরত আনাস (রা) বিন নজর এই সৌভাগ্য থেকে মাহরূম থাকার ক্ষতিপূরণ হিসেবে ওহোদের যুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে শাহাদাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হন। হযরত বারা' (রা) ওহোদ থেকে নিয়ে তাবুকের যুদ্ধ পর্যন্ত প্রত্যেক যুদ্ধে রাসূলের (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন। এমনকি রাসূলের (সা) ইন্তেকালের পরও জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আল্লাহর পথে জিহাদে মশগুল ছিলেন।

একাদশ হিজরীতে রাসুলে আকরামের (সা) ওফাতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) খলীফা নির্বাচিত হলেন। ঠিক এই সময় ধর্মদ্রোহীতার ফিতনার আগুন জ্বলে উঠলো। মুরতাদদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল ইয়ামামার বনু হানীফা কবিলার এক ব্যক্তি মুসায়লামা বিন হাবিব। ইতিহাসে সে "মুসায়ালামা কায্যাব" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। রাসূলের (সা) জীবনের শেষ দিকেই মুসায়লামা ইসলাম থেকে ফিরে গিয়েছিল এবং মদীনা এসে প্রিয় নবীর (সা) নিকট তাঁর পর তাকে খলীফা বানানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়ার দাবী জানিয়েছিল। হুযূর (সা) তার দাবী প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন ঃ

"খিলাফত তো অনেক বিরাট ব্যাপার, আমি তোকে নিজের হাতের ছড়ি পর্যন্ত দেয়া পসন্দ করি না।"

ইয়ামামা ফিরে গিয়ে সে হুযূরকে (সা) চিঠি লিখলো ঃ "আমি আপনার কাজে লেগে গেছি। অর্ধেক মুলুক আমার এবং অর্ধেক কুরাইশের।"

বিশ্বনবী (সা) তার জবাবে বললেন ঃ "মুলুক আল্লাহ তাআলার। তিনি নিজের বান্দাহদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার ওয়ারিছ বানান এবং আখিরাতের কল্যাণ পরহেজগারদের জন্য।"

হুযূরের (সা) ওফাতের পর মুসায়লামা কায্যাব প্রকাশ্যভাবে এবং প্রায় এক লাখ মানুষকে নিজের অনুসারী বানিয়ে ইসলামী হুকুমাতের বিরুদ্ধে

বিদ্রোহের ঝান্ডা তুলে ধরলো। সে ক্ষমতার দাপটে এত মত্ত হয়ে পড়েছিল যে, কোন মুসলমান পেলেই জবরদস্তিমূলক তাকে নিজের নবুওয়াত স্বীকার করানোর চেষ্টা করতো। যদি তা অস্বীকার করতো তাহলে বিভিন্ন ধরনের কষ্ট দিয়ে তাকে শহীদ করিয়ে দিত। হযরত আবু বকর সিদ্দীকে আকবার (রা) তাকে উৎখাতের জন্য হযরত ইকরামা (রা) বিন আবি জেহেলকে নিয়োগ করলেন। তিনি রওয়ানা হয়ে গেলে মুসায়লামার বিরাট সংখ্যক বাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে হযরত শুরাহবিল (রা) হাসানাকে আরো সৈন্যসহ তাঁর সাহায্যার্থে প্রেরণ করলেন। হযরত ইকরামা (রা) বীরত্বের আবেগে উদ্বেলিত হয়ে সাহায্য পৌছার পূর্বেই মুসায়লামার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসলেন। কিন্তু তাঁর সামান্য সংখ্যক সৈন্য মুসায়লামার বিরাট বাহিনীর সামনে টিকতে পারলেন না। এ জন্য হযরত ইকরামাকে (রা) পিছিয়ে আসতে হলো। হযরত আবু বকর (রা) এই পরাজয়ের খবর পেয়ে হযরত ইকরামার (রা) তাড়াতাড়ির জন্য খুব নাখোশ হলেন এবং তাঁকে মদীনা প্রত্যাবর্তনের পরিবর্তে মাহরাহ ও আম্মান গিয়ে সেখানকার মুরতাদদের সঙ্গে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন। অন্যদিকে হযরত শুরাহবীল (রা) বিন হাসানাকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি ইয়ামামা গিয়ে খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের সঙ্গে মুসায়লামার বিরুদ্ধে লড়াই কর। হযরত খালিদ (রা) সে সময় মদীনায় অবস্থান করছিলেন। শুরাহবীলও সেই একই ভুল করলেন যে ভুল ইকরামা (রা) করেছিলেন। হযরত খালেদের (রা) পৌছার পূর্বেই মুসায়লামার সাথে লড়াই শুরু করে দিল। মুসলমানদের স্বল্পসংখ্যক দলকে পরাজিত হয়ে পিছু হটতে হলো। ইত্যবসরে হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ মুহাজির ও আনসারদের এক সৈন্য বাহিনীসহ বাততাহ এসে পৌছলো। সেই বাহিনীতে হযরত বারা' (রা) বিন মালিকও ছিলেন। চারদিক থেকে মুসলমানরা যখন বাততাহ এসে পৌছলো তখন হযরত খালিদ (রা) মুসায়লামার দিকে অগ্রসর হলেন। সে সময় মুসায়লামার নিকট ৪০ হাজারের বেশী যুদ্ধবাজ সৈন্য ছিল। তাদের মুকাবিলায় মুসলমান জানবাজদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৩ হাজার।

আকরাবা নামক ময়দানে হকপন্থী ও মুরতাদদের মধ্যে রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হলো। ঐতিহাসিক ইবনে জারীর তাবারি বর্ণনা করেছেন "মুসলমানরা এত কঠিন যুদ্ধের মুখোমুখি আর কখনো হয়নি।"

যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই মুসায়লামার পুত্র শুরাহবীল যুদ্ধ গাথা গেয়ে গেয়ে নিজের কবীলাকে প্রচন্ডভাবে উত্তেজিত করেছিল এবং তাদের জাতীয় গৌড়ামিকে এই বলে উদ্বেলিত করেছিল যে, হে বনূ হানীফা! আজ তোমাদের

মান-মর্যাদার জন্য যুদ্ধ করে মর। নচেত মুসলমানরা তোমাদের স্ত্রী ও মেয়েদেরকে বাঁদি বানিয়ে রাখবে।

শুরাহবীলের ডাক শুনে মুরতাদরা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে মুসলমানদের ওপর হামলা করে বসলো। মুসলমানরাও জীবন বাজি রেখে অত্যন্ত বাহাদুরীর সঙ্গে সেই প্রচন্ড হামলা থামিয়ে দিলেন। কিন্তু মুরতাদদের চাপ এতো বেশী ছিল যে, মুসলমানদের ব্যূহ ভেঙ্গে যাচ্ছিল। মুসায়লামা বাহিনীর জওয়ানরা কাটা পড়ে মরছিল। তা সত্ত্বেও পিছু হটার নামও নিচ্ছিল না। হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ এবং ইসলামী বাহিনীর অন্যান্য বীর মুজাহিদগণ মুসলমানদেরকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষার জন্য প্রচন্ড বেগে যুদ্ধ করছিলেন। এই প্রচেষ্টায় হযরত কায়েস (রা) বিন সাবিত, হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাব, হযরত আবু হোযায়ফা (রা), আবু হোযায়ফার (রা) গোলাম হযরত সালেম (রা) এবং আরো কতিপয় জালীলুল কদর সাহাবী বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ইসলামের জন্য নিজেদের জীবনকে কুরবান করে দিয়েছিলেন। এই নাযুক অবস্থায় হযরত বারা' (রা) বিন মালিক সামনে অগ্রসর হলেন। চরিতাকাররা বর্ণনা করেছেন যে, যখন তিনি যুদ্ধের ময়দানে রওয়ানা হতেন তখন তাঁর দেহ প্রচন্ডভাবে কেঁপে উঠতো। এই কম্পন বন্ধ করার জন্য কয়েকজন তাকে ঠেসে ধরতো। যখন এই কম্পন বন্ধ হতো তখন তাঁর মধ্যে অসীম সাহস সৃষ্টি হতো এবং যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়তেন। সেইদিনও একই ঘটনা ঘটলো। মুসলমানদেরকে ভীতির মধ্যে দেখে তিনি খুব আবেগমন্ডিত হলেন এবং কম্পন শেষ হলে যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছে হুংকার দিয়ে বললেনঃ "হে মুসলমানের দল, কোনদিকে যাও। আমি বারা' বিন মালিক। আমার দিকে এসো।"

তাঁর হুংকারে মুসলমানদের অসংলগ্ন পা পুনরায় মজবুত হয়ে গেলো এবং তাঁরা নতুন উৎসাহে শত্রুর ওপর প্রচন্ড হামলা করলো। সে সময় শত্রু পক্ষের একজন নাম করা যুদ্ধবাজ হযরত বারা'র (রা) সামনে এসে পড়লো। সে ছিল খুব মোটা সোটা ও লম্বাদেহী মানুষ। লোকজন তাকে "ইয়ামামার গাধা" উপাধিতে ডাকতো। বারা' (রা) তার পায়ের ওপর তরবারী দিয়ে হামলা চালালো। সে স্তম্ভিত হয়ে নিজের পা বাঁচাতে চাইলো এবং ধড়াস করে পড়ে গেল। হযরত বারা' নিজের তরবারীখাপে ভরে তার তরবারী ছিনিয়ে নিয়ে এমন প্রচন্ড আঘাত হানলেন যে, সে দ্বিখন্ডিত হয়ে গেল।

যেভাবে যুদ্ধ চলছিলো তা প্রত্যক্ষ করে হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ আন্দাজ করলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসায়লামাকে খতম না করা হবে ততক্ষণ যুদ্ধে কোন ফায়সালা হবে না। সুতরাং তিনি জানবাজদের একটি দল নিয়ে

দুশমনের ওপর তুফানের মত হামলা চালিয়ে বসলেন এবং মুরতাদদের ব্যূহসমূহ ছিন্ন ভিন্ন করে মুসায়লামার দিকে অগ্রসর হলেন। হযরত বারা' (রা) বিন মালিক সেই দলেই বাহাদুরী দেখিয়ে চলেছিলেন। মুসায়লামা যখন দেখলো যে, মুসলমানরা তার মাথার ওপর পৌছতে চায় তখন সে ঘাবড়ে গিয়ে স্বগোত্র বনূ হানীফা সমেত পিছু হটলো এবং নিজের দুর্গসম বাগান "হাদিকাতুর রাহমানে" গিয়ে ঢুকলো। তার দরজা ছিল অত্যন্ত মজবুত এবং তা ভাঙ্গা সম্ভব ছিল না। হযরত বারা' (রা) বিন মালিক এবং আবু দুজানা(রা) মুসলমানদেরকে বললেন ঃ "হে মুসলমানরা! বাগানের মধ্যে আমাদেরকে নামিয়ে দাও। আমরা বাগানে গিয়ে আল্লাহর দুশমনের সঙ্গে লড়াই করবো।" মুসলমানরা নিজেদের এই জানবাজদ্বয়কে বিপদে ফেলার ব্যাপারে ইতস্ততঃ করছিলো। হযরত আবু দুজানা (রা) তো নিজেই প্রাচীর টপকে বাগানের মধ্যে লাফিয়ে পড়লেন। বারাও (রা) মুসলমানদেরকে কসম দিয়ে বললেন যে, আমাকেও বাগানে নামিয়ে দাও। তাহলে আমি কি করি তা দেখতে পাবে।

মুসলমানরা বাধ্য হয়ে তাঁকে প্রাচীরের ওপর চড়িয়ে দিলেন এবং তিনিও বীরত্বের সঙ্গে বাগানের মধ্যে লাফিয়ে পড়লেন। বায়হাকী (র) মুহাম্মাদ বিন সিরীন (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত বারা' (রা) একটি ঢালের ওপর বসে গিয়েছিলেন এবং মুসলমানদেরকে বলেছিলেন যে, সে ঢালকে বর্শার ওপর উঠিয়ে তাঁকে প্রাচীরের ওপর চড়িয়ে দেওয়া হোক। সুতরাং তারা তাই করেছিলেন।

লাফ দেওয়ার জন্য হযরত আবু দু'জানার (রা) একটি পা ভেঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু বারা (রা) সহীহ সালামতে বাগানে নেমে গেলেন এবং ক্ষুধার্ত বাঘের মত মুরতাদদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তরবারী চালাতে চালাতে বাগানের ফটকে পৌছে তা খুলে দিলেন। সে সময় পর্যন্ত তিনি ১০ জন মুশরিককে হত্যা করেছিলেন। মুসলমান সৈন্যরা প্রচন্ডবেগে ভেতরে ঢুকলেন এবং মুরতাদদেরকে তরবারীর খোরাক বানাতে লাগলেন। মুসায়লামা পলায়নের চিন্তায় ছিল। ঠিক এমন সময় হযরত ওয়াহশী (রা) তাকে দেখে ফেললেন। তিনি তাক করে নিজের বল্লম তার ওপর নিক্ষেপ করলো এবং সে দ্বিখন্ডিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তাকে নিহত হতে দেখে মুরতাদদের মধ্যে চরম বিশৃংখলা দেখা দিল এবং তারা নিজেদের হাজার হাজার মানুষকে তরবারীর নীচে রেখে পালিয়ে গেল। মুসলমানদের ক্ষতিও কম ছিল না। তাঁদের এক হাজার মানুষ শাহাদাতের পিয়ালা পান করেছিলেন। এইসব মানুষের মধ্যে অনেক জালীলুল কদর সাহাবী (রা) এবং হাফেজে কুরআনও ছিলেন।

হযরত বারা' (রা) বিন মালিক আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর শরীরে তীর ও তরবারীর ৮০টিরও বেশী আঘাত লেগেছিল। হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ তাঁকে উঠিয়ে নিজের আবাস স্থলে নিয়ে এলেন এবং নিজে তাঁর সেবা শুশ্রুসা করেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত বারা'র (রা) চিকিৎসার জন্য হযরত খালিদ (রা) এক মাস পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করলেন। বারা'র (রা) ক্ষত যখন শুকিয়ে গেল তখন তিনি পূর্বের মতই উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে পুনরায় জিহাদের জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

ধর্মদ্রোহীতার ফিতনা সমাপ্তির পর ইরান ও সিরিয়ার যুদ্ধবাজদের সঙ্গে সুদীর্ঘ লড়াইয়ের ধারা শুরু হলো এবং আরবের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে তাওহীদের ঝান্ডাবাহীরা কায়সার ও কিসরার বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্য ইরান ও সিরিয়ার ময়দানসমূহের দিকে রওয়ানা হলেন। হযরত বারা' (রা) বিন মালিকও ইসলামের মুজাহিদ দলে শামিল হয়ে গেলেন এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আল্লাহর পথে জিহাদে মশগুল ছিলেন। তিনি যেসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন ঐতিহাসিকগণ তার দু' তিনটির বেশী বিস্তারিত বিবরণ দেননি। সম্ভবত তার কারণ এই যে, তিনি সাধারণত একজন সিপাহী হিসেবে জিহাদে অংশ নেন। হযরত ওমর ফারুকের (রা) ইরশাদ ছিল যে, বারা'কে (রা) সেনা বাহিনীর অফিসার বানানো খুব ভয়ংকর ব্যাপার। কেননা তিনি পরিণাম বিবেচনা না করেই সোজা যেতেন। এ কথা সঠিকই ছিল। আল্লাহ তাআলা হযরত বারা'কে বাঘের দিল প্রদান করেছিলেন। তিনি ছিলেন বাহাদুর মানুষ। প্রকৃত অর্থে তিনি ছিলেন আল্লাহর শের। হকপথে এমন নির্ভীকভাবে যুদ্ধ করতেন যে, বীরত্ব ও অটলতাও পেছনে পড়ে থাকতো। হযরত ওমর (রা) তাঁকে 'বালা' বলে ডাকতেন। বাস্তবিকই তিনি দুশমনের জন্য বালা হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। মুহাম্মাদ হোসাইন হাইকাল নিজের কিতাব "ওমর ফারুকে আজম" এ হযরত বারা' (রা)'র সম্পর্কে লিখেছেন : "তিনি একজন অভিজ্ঞ ও নাম করা অশ্বারোহী ছিলেন। মুসলমানরা ধর্মদ্রোহীতার যুদ্ধসমূহ ও ইরাক এবং সিরিয়ার লড়াইয়ে তাঁর বীরত্বপূর্ণ কৃতিত্ব প্রত্যক্ষ করেছেন এবং সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি কোথায়ও পরাজিত হননি।"

আরবের ইরাক এবং ইরানের কয়েকটি যুদ্ধে হযরত বারা' (রা) এবং হযরত আনাস (রা) উভয় ভাই-ই একত্রে শরীক হয়েছিলেন। ইরাকের এক যুদ্ধে হযরত আনাস (রা) বিন মালিক কঠিন মুসীবতে আটকে পড়েছিলেন। সেই সময় হযরত বারা' যদি তাঁর সাহায্যের জন্য না পৌছতেন তাহলে

ইসলামের এই মহামূল্যবান মানুষের জীবন শেষ হওয়ার আর কিছুই বাকী ছিল না। কতিপয় ঐতিহাসিক সেই যুদ্ধের নাম দিয়েছেন হারিকের যুদ্ধ। হারিকের (ইরাক) দুর্গ অত্যন্ত মজবুত দুর্গ ছিল। মুসলমানরা তার ওপর হামলা করলে হারিকবাসীরা দুর্গ বন্ধ করে দেয়। তারা দুর্গের প্রাচীরের ওপর কাঁটাদার জিঞ্জির লটকিয়ে দেয়। কোন মুসলমান প্রাচীরের ওপর চড়তে চাইলে তাকে জিঞ্জির দিয়ে ওপর দিকে টেনে নিত। একদিন হযরত আনাস (রা) বিন মালিক বীরত্বের উৎসাহে প্রাচীরের ওপর আরোহণের চেষ্টা করলেন। দুর্গবাসীরা তাঁকে জিঞ্জিরে জড়িয়ে ফেললো। ওপরের দিকে টেনে নিচ্ছিলই এমন সময় হযরত বারা'র (রা) নজর পড়লো। ভাইকে বাঁচানোর জন্য তিনি পাগলের মত অগ্রসর হলেন এবং জিঞ্জির ধরে এমন জোরে ঝটকা মারলেন যে, তা দুর্গবাসীদের হাত থেকে ছুটে গেল এবং হযরত আনাস (রা) মাটিতে পড়ে গেলেন। বস্তুত তিনি তখনো বেশী উঁচুতে উঠেছিলেন না বলে বেঁচে গেলেন। কিন্তু জিঞ্জিরের কাঁটায় হযরত বারা'র (রা) হাতের গোশত ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল এবং হাড্ডি বের হয়ে পড়লো। তবুও তাঁর আহত হওয়ার কোন দুঃখ ছিল না। বরং নিজের ভাইকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচানোর জন্য খুব খুশী হলেন এবং বার বার আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। এ ঘটনার পর মুসলমানরা খুব সজাগ হয়ে গেল এবং খুব সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে লাগলেন। অবশেষে তাঁরা একদিন দুর্গের ওপর এমন প্রচন্ডভাবে হামলা করে বসলেন যে, অবরুদ্ধরা হিম্মতহারা হয়ে পড়লো এবং তারা অস্ত্র সমপর্ণ করলো। মুসলমানরা বিজয়ীর বেশে দুর্গে প্রবেশ করলেন। এবং তার সর্বোচ্চ চূড়ায় ইসলামের ঝান্ডা উড়িয়ে দিলেন।

সপ্তদশ হিজরীতে হযরত আবু মুসা আশআ'রী (রা) বসরার গবর্ণর হলেন। এ সময় সন্নিকটবর্তী ইরানী এলাকা খুজিস্তানের সরদাররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আঁটলো এবং প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসলো। হযরত আবু মুসা (রা) ইসলামের জীবন উৎসর্গকারীদের একটি শক্তিশালী দলসহ খুজিস্তানের ওপর হামলা করে বসলেন এবং সেখানকার গুরত্বপূর্ণ শহর আহওয়াজ, মানাযির, সাওম এবং আমহারযকে একের পর এক জয় করে নিলেন। ইরানের বাদশাহ ইয়াযদগিরদ সে সময় কুমে অবস্থান করছিল। আবু মুসার (রা) বিজয়ের খবর পৌঁছলে সে হারমুযান নামক একজন সরদারকে অবিলম্বে সেখানে গিয়ে আহওয়াজ এবং পারস্য দেশের শাসন ক্ষমতা হাতে নেয়ার ও মুসলমানদেরকে সেই এলাকা থেকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। হারমুযান ছিল ইরানের শাহী বংশোদ্ভূত। সে খুব বিজ্ঞ ও প্রভাবশালী মানুষ ছিল। সে এক বিরাট বাহিনী নিয়ে খুজিস্তানের সদর তাসতারে

(শাবিস্তার) নিজের অবস্থানস্থল বানালো এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য জোর প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। সে ইরানীদের জাত্যাভিমানকে উস্কে দিল এবং ইরানী যুদ্ধবাজদের এক বিরাট সংখ্যক সেনা বাহিনী শাবিস্তার এসে তার ঝান্ডাতলে সমবেত হয়ে লড়াই করে মরার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। হারমুযান শাবিস্তার দুর্গের প্রাচীর, চূড়া ও খন্দক মেরামত করালো এবং তা অপরাজেয়, বানানোর কোন প্রচেষ্টাই বাকী রাখলো না। হযরত আবু মুসা (রা) তাসতার রওয়ানা হলেন এবং শহরের নিকট পৌছে তাঁবু ফেললেন। ইসলামের মুজাহিদদের মধ্যে হযরত বারা' (রা) বিন মালিক এবং আনাস (রা) বিন মালিকও শামিল ছিলেন। দুই ভাইই জালীলুল কদর সাহাবী ছিলেন এবং জিহাদের ময়দানে বহুবার অসীম সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। হযরত ওমর (রা) যদিও সতর্কতা স্বরূপ হযরত বারাকে (রা) সৈন্য বাহিনীর প্রধান বানাতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু হযরত আবু মুসা (রা) নিজের সঠিক রায়ের ভিত্তিতে তাঁকে ডান দিকের প্রধান নিয়োগ করেছিলেন। হযরত আনাসকে (রা) অশ্বারোহীদের নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন। হারমুযান নিজের বাহিনীর সংখ্যাধিক্যের জোরে শহরের বাইরে বের হয়ে মুসলমানদের ওপর হামলা করে বসলো। কিন্তু ইসলামের মুজাহিদরা বীর বিক্রমে লড়াই করে হারমুযানকে পিছু হটিয়ে দুর্গ বন্ধ করতে বাধ্য করলেন। এই যুদ্ধে হযরত বারা' (রা) পূর্ণ বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন এবং একাই দুশমনের একশ' মানুষকে হত্যা করেছিলেন। তাছাড়া সঙ্গীদের সঙ্গে মিলে তিনি এত সংখ্যক ইরানী হত্যা করেন যে, তার সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন। অবরোধকালে একদিন হযরত বারা' (রা) সুললিত কণ্ঠে কবিতা পাঠ করছিলেন। এমন সময় হযরত আনাস (রা) তাঁর তাঁবুতে পৌছলেন এবং বললেন ঃ "ভাইজান! আল্লাহ আপনাকে এর চেয়েও সুন্দর বস্তু (অর্থাৎ কুরআনে হাকীম) প্রদান করেছেন। আপনি তা খোশ ইলহানে কেন পাঠ করেন না?" হযরত বারা' (রা) জবাব দিলেন, "আনাস, সম্ভবত তুমি মনে কর যে, আমি বিছানার ওপরই মরে থাকবো। আল্লাহর কসম! এমনটা হবে না। আমার মৃত্যু যুদ্ধের ময়দানেই আসবে।"

একদিন শত্রু বাহিনী বাইরে বের হয়ে মুসলমানদের ওপর এমন ভীতিকর হামলা করে বসলো যে, তাতে তাঁদের পা কেঁপে উঠলো। মুসলমানদের হযরত বারা' (রা) সম্পর্কিত প্রিয় নবীর (সা) হাদীস স্মরণ ছিল। তাঁরা তাঁর নিকট এলেন এবং বললেন, "আজ কসম খান যে, আল্লাহ আমাদেরকে বিজয় দেবেন।" বারা' (রা) তৎক্ষণাৎ দোয়ার জন্য হাত উঠিয়ে বললেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি যে, মুসলমানদেরকে

সফল ও বিজয়ী করুন। কাফেরদের হাত তাঁদের হাতে তুলে দিন এবং আমাকে আমার প্রভুর (সা) যিয়ারত নসীব করুন।"

তারপর সৈন্য বাহিনী নিয়ে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যে-ই সামনে এলো তাকেই যমালয়ে পাঠালেন। এভাবে বীরত্ব প্রদর্শন করতে করতে দুর্গের ফটক পর্যন্ত গিয়ে পৌছলেন। এখানে স্বয়ং হারমুযান তাঁর মুখোমুখি হলো। তার আপাদমস্তক ছিল লোহায় ঢাকা। উভয়ের মধ্যে প্রচন্ড যুদ্ধ হলো। বারা' (রা) এক প্রচন্ড আঘাত পেলেন এবং হকের এই জানবাজ সিপাহী শাহাদাতের পেয়ালা পান করে জান্নাতবাসী হলেন। কিন্তু আল্লাহর শেরের রক্ত বেকার গেল না। তাঁর শাহাদাতের পর মুসলমানরা মহান বিজয় লাভ করলেন এবং ইরানীরা পিছু হটে দুর্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা নিজের প্রিয় বান্দাহ বারা'র (রা) কসম পূর্ণ করলেন। কিছু দিন পর মুসলমানরা শুধুমাত্র তাসতারই জয় করেননি বরং হারমুযানকে গ্রেফতার করে হযরত আনাসের (রা) হেফাজতে খলীফার দরবারে প্রেরণ করা হলো। সেখানে সে এক বাহানা করে নিজের জীবন বাঁচায়। অতপর ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেন।

হযরত বারা (রা) বিন মালিক অন্যতম জালীলুল কদর সাহাবী ছিলেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) তাঁকে ফযীলত প্রাপ্ত সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত করেছেন। কেননা, তিনি বছরের পর বছর ধরে নবীর (সা) ফয়েযে অবগাহিত হয়েছেন। তা সত্ত্বেও তিনি কোন হাদীস বর্ণনা করেননি। তার স্পষ্ট কারণ হলো যে, মৌলিকভাবে তিনি ছিলেন একজন সিপাহী মানুষ। সারাজীবন যুদ্ধের ময়দানেই কাটিয়ে দিয়েছেন এবং হাদীস বর্ণনা করার প্রতি খেয়ালই দেননি। সকল চারিতকারই তাঁর নজিরবিহীন বীরত্ব ও ভীতিহীনতার স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারটিতে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন।

সাইয়েদুনা আবু জাবের আবদুল্লাহ সালামা (রা)

তৃতীয় হিজরীর ৭ই শাওয়াল ছিল হকপন্থীদের জন্য কঠিন পরীক্ষা ও দুঃখের দিন। সেদিন ওহোদের ময়দানে রহমতে দো আলম (সা) আহত হন এবং ৭০ জন মুসলমান হক পথে নিজের জীবনকে নযরানা হিসেবে পেশ করেন। মক্কার মুশরিকরা সে সময় এমন পাষন্ডতার পরিচয় দেয় যে, মানবতা মুখ থুবড়ে পড়ে। তারা প্রতিশোধের আবেগে নিহত মুসলমানদের অধিকাংশের লাশ বিকৃত করে ফেলে (তাঁদের কান, নাক ও ঠোঁট কেটে ফেলে)। যুদ্ধের পর মুজাহিদদের আত্মীয়-স্বজনরা অবস্থা জানার জন্য উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে মদীনা থেকে ওহোদের ময়দানে পৌছেন। প্রিয়নবী (সা) তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে ময়দানে চক্কর লাগালেন এবং শহীদদের রক্তাক্ত লাশ দেখে তাঁর চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে গেল। সত্য পথের এক শহীদের বোন নিজের প্রিয় ভাইয়ের বিকৃত লাশ দেখে শোকে-দুঃখে অস্থির হয়ে চীৎকার করে কেঁদে কেঁদে জারজার হয়ে গেলেন। রহমতে আলম (সা) তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন ঃ "তুমি কাঁদো অথবা নাই কাঁদো। (আল্লাহ তোমার ভাইকে এই মর্যাদা প্রদান করেছেন) ফেরেশতা তার ওপর নিজের পাখার ছায়া বিস্তার করে আছে।"

ওহোদের এই মহান মর্যাদাবান শহীদ যাঁর জানাযাতে আসমানী ফেরেশতারা ডানার ছায়া দিয়েছিলেন তিনি হলেন সাইয়েদুনা আবু জাবের আবদুল্লাহ (রা) বিন আমর বিন হারামুস সালমান আল আনসারী।

সাইয়েদুনা আবু জাবের আবদুল্লাহ (রা) বিন আমর জালীলুল কদর সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। তিনি খাযরাজের শাখা বনূ সালমার অন্যতম সরদার ছিলেন। তাঁর নসবনামা হলো ঃ আবদুল্লাহ (রা) বিন আমর বিন হারাম বিন কা'ব বিন গানাম বিন সালমা বিন সায়াদ বিন আলী বিন আসাদ বিন সারদাহ বিন ইয়াযীদ বিন জাশাম বিন খাযরাজ।

বনূ সালমার বসতি ছিল হাররা এবং মাসজিদে কিবলাতাইন পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু বিশেষ করে আবদুল্লাহ (রা) বিন আমরের বংশ কবরস্থান ও ছোট একটি মসজিদের মধ্যবর্তী স্থানে বসতি স্থাপন করেছিলেন। আবদুল্লাহর (রা) পিতা আমর বিন হারাম বিত্তবান মানুষ ও নিজের খান্দানের সরদার ছিলেন। একটি পুকুর আইনুল আরযাক এবং কয়েকটি দুর্গ তাঁর ব্যবহারে ছিল।

তার ওফাতের পর সমগ্র সম্পত্তি হযরত আবদুল্লাহ (রা) পান। তিনি অধিক সন্তান ও দরাজ হাতের মানুষ ছিলেন। এ জন্য বিত্ত বৈভব থাকা সত্ত্বেও ঋণগ্রস্ত থাকতেন। চরিতকাররা তাঁর জন্ম সাল সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু লিখেননি। তবে জানা যায় যে, ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। (হিজরতের প্রায় ৪০ বছর পূর্বে)।

আনসারদের মধ্যে ইসলামের শুরু হয় আকাবার বাইআত থেকে। নবুওয়াত প্রাপ্তির একাদশ বছরে ৬ জন আনসারী মক্কা গিয়ে ইসলাম গ্রহণ ও হুযূরের (সা) হাতে বাইয়াত হন। পরের বছর মদীনার ১২ জন সৌভাগ্যবান এই সুযোগ লাভ করেন এবং সেই বছরই তাঁদের দরখাস্ত অনুসারে হুযূর (সা) হযরত মুসআব (রা) বিন ওমায়েরকে ইসলামের প্রথম মুবাল্লিগ বানিয়ে মদীনা প্রেরণ করেন। তাঁরই তাবলীগী প্রচেষ্টার ফল হিসেবে আনসারদের বাড়ী বাড়ী ইসলামের চর্চা সম্প্রসারিত হলো। এটা জানা যায় নি যে, সেই যুগে কেন হযরত আবদুল্লাহ (রা) ইসলাম গ্রহণ করতে পারেননি। অবশ্য নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে হজ্বের মওসুমে যখন মদীনাবাসীর একটি কাফেলা হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কা গমনের জন্য প্রস্তুত হলো তখন তিনিও তাতে শামিল হলেন। (সে যুগে আরবের মুসলিম ও কাফির সকলেই হজ্বকে নিজেদের ধর্মীয় ফরয বলে মনে করতো)। এই কাফেলায় ৭৪ জন মুসলমান এবং অবশিষ্টরা কাফের ছিল। ইবনে জারির তাবারী হযরত কা'ব (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সফরকালে আমরা আবদুল্লাহ (রা) বিন আমর বিন হারামকে বললাম ঃ "হে আবু জাবের। আপনিও আমাদের কওমের একজন সরদার। আপনার মান-মর্যাদা রয়েছে কিন্তু আমাদের দুঃখ যে, আপনি এখনো কুফর ও শিরকের ভুল পথে চলছেন। আপনি যদি এ অবস্থার ওপর কায়েম থাকেন তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা আপনাকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন। আমরা চাই না যে, আপনার মত একজন বুদ্ধিমান মানুষের এই পরিণাম হোক। আপনি আমাদের সহযোগিতা করলে কতই না ভাল হতো। আপনি দীনে হক কবুলে বিলম্ব করবেন না। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সঙ্গে মুলাকাতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন। আমরা হুযূরের (সা) খিদমতে হাযির হয়ে বাইআত করবো।"

মোট কথা, আমরা এত আন্তরিকতার সঙ্গে আবদুল্লাহকে (রা) ইসলামের দা'ওয়াত দিয়েছিলাম যে, তিনি তৎক্ষণাৎ আমাদের হাতে মুসলমান হয়ে গেলেন। তাঁর যুবক ছেলে জাবেরও (রা) সেই কাফেলায় শামিল ছিলেন। তিনিও তাঁর সঙ্গেই ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্যলাভ করেন। (অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত জাবের (রা) নিজের পিতার পূর্বেই মুসলমান

হয়েছিলেন। ইমাম আহমদ (র) এবং তিবরানী (র) স্বয়ং হযরত জাবের থেকে বর্ণনা করেন যে, আকাবায়ে কবীরার বাইআতের পূর্বে আনসার মহল্লাসমূহে এমন কোন মহল্লা ছিল না যাতে মুসলমানদের একটি জামাআত পাওয়া না যেতো। একদিন আমরা একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমরা রাসূলুল্লাহকে (সা) আর কতদিন মক্কায় বন্ধু-বান্ধব ও সাহায্যকারী ছাড়া রেখে দেবো-তারপর আমরা হজ্বের মওসুমে মক্কা গেলাম এবং আকাবায় হুযূরের (সা) সঙ্গে মিলিত হলাম)।

এমনিভাবে কাফেলায় মুসলিম অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ৭৫ জন (৭৩ জন পুরুষ এবং দু'জন মহিলা) হয়ে গেল।

তারপর কাফেলার লোকদের মধ্য থেকে হযরত উয়ায়েম (রা) বিন সায়িদাহ ও অন্য কতিপয় ব্যক্তি (যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল) হুযূরের (সা) খিদমতে হাযির হলেন এবং মদীনার হকপন্থীদের সঙ্গে মুলাকাতের জন্য কোন সময় নির্ধারণের অনুরোধ জানালেন। হুযূর (সা) বললেন, তারা আমার সঙ্গে শেষ দিনের (অথাৎ সেই শেষ দিন যেদিন হাজীগণ মিনা থেকে রওয়ানা হয়ে যান) আগের রাতে আকাবার নিম্নভূমিতে যেন সাক্ষাত করে। সুতরাং নির্ধারিত রাতে কাফেলার সকল মুসলমান অত্যন্ত সংগোপনে দু' দু' চার চার করে নির্ধারিত স্থানে পৌছে গেলেন। সেখানে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) নিজের চাচা আব্বাস (রা) বিন আবদুল মুত্তালিবের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। (হযরত আব্বাস (রা) সেই সময় পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি। কিন্তু তিনি প্রথম থেকেই হুযূরের (সা) কল্যাণকামী ও সাহায্যকারী ছিলেন। এ জন্য হুযূর (সা) তাঁর ওপর আস্থা রাখতেন। এক রেওয়ায়াতে এও আছে যে, হযরত আব্বাস (রা) অন্তরে অন্তরে মুসলমান হয়েছিলেন। কিন্তু সে ইসলাম গোপন রেখেছিলেন)।

হযরত মাআয (রা) বিন রিফাআ বিন রাফে' থেকে বর্ণিত আছে যে, (এ ধরনের রেওয়ায়াতে কিছুটা মতবিরোধ রয়েছে, আমরা ইবনে সা'দ ওয়াকেদীর উদ্ধৃতিসহ এ রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছি) যখন সকলেই আকাবাতে একত্রিত হলেন তখন হযরত আব্বাস (রা) বিন আবদুল মুত্তালিব এভাবে আলোচনা শুরু করলেন ঃ "হে খাযরাজের লোকেরা! (সে যুগে আওস এবং খাযরাজের সমষ্টিকে খাযরাজ বলা হতো) তোমরা মুহাম্মাদকে (সা) তোমাদের ওখানে যাওয়ার দাওয়াত দিয়েছ। তাহলে শুনে রেখো যে, মুহাম্মাদ (সা) নিজের কবীলা এবং আত্মীয়দের মধ্যে অত্যন্ত মজবুত অবস্থানের মালিক। আমাদের মধ্যে যাঁরা তাঁর দীন কবুল করেছেন এবং যাঁরা

তাঁর দীন কবুল করেননি সকলেই তাঁর হেফাজত ও সাহায্য করছেন। কিন্তু মুহাম্মাদ (সা) সকলকে ছেড়ে তোমাদের নিকটই যেতে চান। এখন তোমরা চিন্তা করে দেখ যে ,তোমাদের মধ্যে সমগ্র আরবের বিরোধিতা সহ্য করার শক্তি ও সাহস আছে কি না। কেননা, সমগ্র আরব ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমাদের ওপর হামলা করে বসবে। অতএব, পরস্পর ভালভাবে পরামর্শ করে কোন ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। কেননা, সবচেয়ে ভালো হলো সত্য কথা।"

তারপর হযরত আব্বাস (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, "আমাকে একটু বলতো, তোমরা তোমাদের দুশমনের কেমন করে মুকাবিলা করে থাকো?"

এই প্রশ্নের পর হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আমর বিন হারাম বললেন ঃ "আল্লাহর কসম, হে আব্বাস! আমরা লড়াই করে মরার মানুষ। যুদ্ধ আমাদের বিধিলিপি। আমরা তার বিশেষজ্ঞ হয়ে গেছি। কেননা, বাপ-দাদার ওয়ারিস সূত্রে আমরা তা পেয়েছি। প্রথমে আমরা তীর শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা চালিয়ে থাকি। অতপর বর্শা ভেঙ্গে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা তা দিয়ে দুশমনের ওপর হামলা করে থাকি। তারপর আমরা তরবারী টেনে নিই এবং দুশমনের মুখোমুখী মুকাবিলা করি। এই অবস্থায় কোন না কোন দল শেষ হয়ে যায়।"

আবদুল্লাহর (রা) কথা শুনে হযরত আব্বাস (রা) বললেন ঃ "বাস্তবিকই তোমরা যুদ্ধ পরীক্ষিত মানুষ।" অতপর বারা' (রা) বিন মারুর জোশে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ

"হে আব্বাস (রা)! আমরা আপনার কথা শুনেছি। আপনিও আমাদের এ কথা শুনে নিন যে, আমরা কাপুরুষ নই। তরবারীর কোলে আমরা লালিত পালিত হয়েছি। আল্লাহর কসম! আমাদের অন্তরে রাসূলের (সা) আনুগত্য এবং জান ও মাল দিয়ে তাঁর হেফাজত ছাড়া আর কিছু নেই।" অন্যান্য আনসাররা তাঁর কথায় বাধা দিয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও কিছু বলুন।"

হুযূর (সা) কুরআনে করীমের কতিপয় আয়াত পড়লেন এবং ইয়াছরাব বাসীদেরকে ইসলামের ওপর দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকার হেদায়াত দিলেন এবং বললেন ঃ "আমি তোমাদের নিকট থেকে এই কথার বাইআত নিচ্ছি যে, তোমরা নিজেদের জীবন ও পরিবার-পরিজনের মত আমাকে হেফাজত করবে এবং দীনের প্রসারে আমাকে পুরোপুরি সাহায্য করবে।"

হযরত বারা' (রা) বিন মারুর পুনরায় বললেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম, আমরা আপনাকে সার্বিকভাবে হেফাজত এবং সাহায্য করবো।"

হযরত আবুল হাইছম বিন আত-তাইহান কথার মাঝে বাধা দিয়ে বললেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল। আমাদের ও ইহুদীদের মধ্যে অনেকগুলো চুক্তি রয়েছে। এই বাইআতের পর তা বাতিল হয়ে যাবে। এমন যেন না হয় যে, আল্লাহ তাআলা যখন আপনাকে বিজয় দিবেন তখন আপনি আমাদেরকে পরিত্যাগ করে নিজের কওমের মধ্যে ফিরে যাবেন।"

বিশ্ব নবী (সা) মুচকি হেসে বললেন ঃ "না। বরং আমার রক্ত তোমাদেরই রক্ত এবং আমার দায়িত্ব তোমাদেরই দায়িত্ব। আমি তোমাদের এবং তোমরাও আমার। তোমরা যার সাথে লড়াই করবে আমিও তার সাথে লড়াই করবো এবং যার সঙ্গে তোমাদের সন্ধি হবে আমার সঙ্গেও তাদের সন্ধি হবে।"

রাসূলের (সা) ইরশাদসমূহ শুনে এইসব পবিত্র আত্মার মানুষ বাইআতের জন্য অগ্রসর হলেন। সর্বপ্রথম হযরত বারা' (রা) বিন মারুর (অন্য এক রেওয়ায়াত অনুসারে হযরত আসয়াদ (রা) বিন যারারাহ) হুযুরের (সা) হাতে বাইআত করলেন। এ সময় হযরত আসআদ (রা) বিন যারারাহ (আর এক রেওয়ায়াত মত হযরত আব্বাস (রা) বিন উবাদাহ বিন নজলাহ আনসারী) উচ্চ স্বরে বললেন ঃ "হে ইয়াছরাব বাসী। সাবধান থেকো যে, তোমরা কোন্ বস্তুর বাইআত করছো। এই বাইআত সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর। (সাদা এবং কালা সবার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতে হবে)। খুব ভালভাবে জেনে রেখো, এর ফলশ্রুতিতে এমন সময় আসতে পারে যে, আমাদের শরীফরা কতল হবেন, আমাদের সম্পদ বরবাদ হবে, আমাদের ইযযত ও সম্মান নষ্ট হবে। সে সময় সংকট ও মুসীবতের চাপে ঘাবড়ে গিয়ে তোমরা যেন মুহাম্মাদকে (সা) দুশমনের হাতে সোপর্দ করে না বসো। তোমাদের যদি নিজেদের জীবনের ভয় হয় তাহলে এখনই তাঁকে ছেড়ে দাও এবং সাফ সাফ ওযর পেশ করো। আর যদি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁকে সাহায্য করার হিম্মত রাখো তাহলে তাঁর হাত মজবুত করে আকড়ে ধর।"

সকল আনসার সমস্বরে বললেন, "হাঁ, হাঁ, আমরা সকল ভয় দেখেই বাইআত করছি।" অতপর তাঁরা আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল। আমরা যদি আমাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করি তাহলে আমরা কি পাবো?"

হুযুর (সা) বললেন, "জান্নাত"

হুযুরের (সা) জবাব শুনে সকলেই উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে একের পর এক রাসূলের (সা) হাতে বাইআত হলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আমর বিন হারামও সর্বসম্মতভাবে সেই পবিত্র আত্মাসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইতিহাসে এ বাইআতকে বাইআতে লাইলাতুল আকাবা, বাইআতে আকাবায়ে

ছানিয়া, বাইআতে আকাবায়ে কাবীরাহ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই বাইআত ইসলামের ইতিহাসে মাইলস্টোনের মর্যাদা রাখে এবং তাতে অংশগ্রহণকারী হকপন্থীদের মর্যাদা বদরের সাহাবীদের চেয়েও বেশী এবং তাঁদের মধ্য থেকে যিনি বদরের যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন তাঁর সম্মান ও মর্যাদার আন্দাজ কে করতে পারে?

বাইআতের পর প্রিয় নবী (সা) মদীনাবাসীদেরকে বললেন ঃ "মূসা (আ) বনী ইসরাইলের ১২ জন নকীব নির্বাচন করেছিলেন। তোমরাও দীনী বিষয়াদি সংরক্ষণের জন্য নিজেদের ১২ জন নকীব নির্বাচিত কর।"

সুতরাং মদীনার মুমিনরা সর্বসম্মতভাবে ১২ জন নকীব নির্বাচিত করলেন। তাঁদের মধ্যে ৯ জন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের এবং তিনজন আওস গোত্রের।

খাযরাজের ৯ জন নকীবের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আমর বিন হারাম। খাযরাজের শাখা বনু সালামা খান্দানের নকীব হিসেবে তাঁকে নিয়োগ করা হয়। তিনি এই খান্দানেরই লোক ছিলেন। মদীনা ফিরে তিনি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটান। খাযরাজের সরদার সা'দ (রা) বিন উবাদাও তাঁর মত তাবলীগের কাজে খুব তৎপর ছিলেন। প্রিয় নবী (সা) একবার তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন ঃ "হে আল্লাহ! আমাদের পক্ষ থেকে সকল আনসারকে উত্তম প্রতিদান দিন। বিশেষ করে আবদুল্লাহ (রা) বিন আমর বিন হারাম এবং সা'দ (রা) বিন উবাদাহকে।"

নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে অনুষ্ঠিত বাইআতে আকাবায়ে কবীরার পর সারওয়ারে আলম (সা) মক্কায় মুসলমানদেরকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি দেন। কিন্তু তিনি নিজে আড়াই মাস মক্কাতেই অবস্থান করেন। এই সময় মক্কা থেকে বেশীরভাগ মুসলমান হিজরত করে মদীনার দারুল আমানে পৌঁছে যান। এরপর হুযূর (সা) স্বয়ং হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারা তাশরীফ নেন। এ সময় মদীনাবাসী অন্তর খুলে তাঁকে ইসতিকবাল করেন এবং বাইআতে আকাবার চুক্তি অনুযায়ী রাসূলের (সা) খিদমত ও সাহায্যের জন্য নিজেদের জান-মাল ওয়াকফ করেন।

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে বদরের ময়দানে হক ও বাতিলের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আমর সেই তিনশ' ১৩ পবিত্র আত্মার অন্যতম ছিলেন যাঁরা রহমতে আলমের (সা) সঙ্গী ছিলেন। তাঁরা সাজ-সরঞ্জামহীন হওয়া সত্ত্বেও ভয়ংকর কুফুরী শক্তির বিরুদ্ধে মুখামুখী হলেন। তাঁরা শুধুমাত্র নিজেদের ঈমানী শক্তির বলেই

মুশরিকদেরকে শিক্ষনীয় পরাজয় এবং ব্যাপক আকারে জীবনহানি ঘটাতে পেরেছিলেন। মুসলমানদের নিকট এই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের লক্ষ্যে মক্কায় কুরাইশরা আগুনের মত জ্বলে উঠলো। তারা পরবর্তী বছর তিনগুণ প্রস্তুতিসহ মদীনার ওপর হামলা করে বসলো। সারওয়ারে আলম (সা) মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বের হয়ে ওহোদ পাহাড়ের পাশে সেই শয়তানী বাহিনীর মুখোমুখি হলেন। সে সময় শুধুমাত্র ৭শ' মুসলমান তাঁর সঙ্গে ছিলেন। পক্ষান্তরে পূর্ণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হামলাকারীদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার। ইসলামের গাজীদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আমরও শামিল ছিলেন। সহীহ বুখারীতে আছে যে, যুদ্ধের পূর্বে এক রাতে তিনি যুবক পুত্র হযরত জাবেরকে (রা) ডাকলেন এবং বললেন ঃ

"পুত্র, আমার অন্তর বলছে যে, এই যুদ্ধে সর্বপ্রথম আমার শাহাদাত নসীব হবে। আমার নিকট জান, মাল ও সন্তানের চেয়ে রাসূল (সা) বেশী প্রিয়। রাসূলের (সা) পর সবচেয়ে প্রিয় হলে তুমি। তোমাকে ওসিয়ত করছি যে, তুমি বাড়ী থেকে তোমার বোনদেরকে ভালভাবে দেখা শুনা করবে এবং আমার যে ঋণ রয়েছে তা পরিশোধ করে দেবে।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) এ ওসিয়ত এ জন্য করেছিলেন যে, তাঁর ৯টি কন্যা সন্তান ছিল। তাদের মধ্যে ৬টি ছিল খুবই ছোট। ৯ বোনের শুধু এক ভাই ছিলেন হযরত জাবের (রা)। তিনিও যদি লড়াইতে শামিল হতেন তাহলে বাড়ী একদম খালি হয়ে যেত।

যুদ্ধের ময়দানে তৎপরতা শুরু হলে হযরত আবদুল্লাহ (রা) দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যকার সবকিছু সম্পর্কে বে খবর হয়ে বাঘের মত মুশরিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং দূর পর্যন্ত তাদের ব্যূহের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। উসামাতুল আওয়ার বিন উবায়েদ নামক একজন মুশরিক (অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী) সুফিয়ান বিন আবদি শামস তাঁকে তাক করে হামলা করলো, আবদুল্লাহ (রা) শহীদ হয়ে মাটিতে ঢলে পড়লেন। এমনিভাবে তাঁর মনের আকাঙ্খা পূরণ হলো। কঠোর অন্তরের মুশরিকরা তাঁর লাশ বিকৃত করে ফেললো। যুদ্ধ শেষ হলে মুসলমানরা লাশের ওপর কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন। হযরত জাবের (রা) এসে লাশের মুখ থেকে কাপড় হটিয়ে তাঁর অবস্থা দেখে কাঁদতে লাগলেন। বনূ সালমা তাঁকে কাঁদতে বারণ করছিলেন। কিন্তু তাঁর ক্রন্দন আর থামছিলো না। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আমরের ভগ্নিপতি হযরত আমর (রা) ইবনুল জামূহ এবং ভাগিনেয় খাল্লাদ (রা) বিন আমর (রা) ইবনুল জামূহও এই যুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন।

তাঁর বোন হিন্দ (রা) বিনতে আমর বিন হারাম ওহোদের ময়দানে পৌঁছে স্বামী, পুত্র এবং ভাইকে মাটি ও রক্তে একাকার দেখলেন। এটা ছিল তাঁর জন্য চরম দুঃখজনক ব্যাপার। কিন্তু যখন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফাকে (সা) কাছে পেলেন তখন মনে সান্ত্বনা এলো। এ সত্ত্বেও যখন হযরত আবদুল্লাহর (রা) মুখ থেকে কাপড় সরানো হলো তখন ভাইকে সেই অবস্থা দেখে অযাচিতভাবে মুখ দিয়ে চীৎকার বেরিয়ে গেল এবং হযরত জাবেরের (রা) সঙ্গে (ভাতিজা) মিলে কাঁদতে লাগলেন। এ সময় রহমতে আলম (সা) বললেন, "তোমরা কাঁদো আর নাই কাঁদো, ফেরেশতারা নিজেদের পাখা দিয়ে আবদুল্লাহর (রা) ওপর ছায়া বিস্তার করে রেখেছে।"

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত হিন্দ (রা) বিনতে আমর স্বামী আমর (রা) ইবনুল জামুহ কলিজার টুকরা খাল্লাদ এবং ভাই আবদুল্লাহ (রা) তিন জনের লাশ উটের ওপর করে কাফন দাফনের উদ্দেশ্যে মদীনা নিয়ে চলেছিলেন। পথিমধ্যে হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ (রা) কে যুদ্ধের ময়দানের দিকে আসা অবস্থায় দেখতে পেলেন (সে সময় পর্যন্ত পরদার আয়াত নাযিল হয়নি) তিনি হিন্দের (রা) নিকট রাসূলের (সা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। হিন্দ (রা) বললেন, "আলহামদুলিল্লাহ হুযূর (সা) ভাল আছেন এবং এইসব লাশ হলো আমার স্বামীর, পুত্রের এবং ভাইয়ের।" ইত্যবসরে সেই উট নিজেই বসে পড়লো। তাকে অনেক হাঁকানো হলো। কিন্তু সে এক কদমও মদীনার দিকে অগ্রসর হলো না। উম্মুল মুমিনীন (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, "সম্ভবত বোঝা বেশী হয়েছে।" হিন্দ (রা) আরয করলেন, "না, আমরা তার ওপর এর চেয়ে বেশী বোঝা নিয়ে থাকি।"

উম্মুল মুমিনীন বললেন, "তাঁদের মধ্যে কি কেউ মদীনা থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় কিছু বলেছিল?"

হিন্দ (রা) বললেন, "আমার স্বামী আমর (রা) ইবনুল জামুহ রওয়ানার সময় তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে ফেরত না আনার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করেছিলেন।

উম্মুল মুমিনীন (রা) বললেন, "আনসারদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছেন তাঁরা যখন কোন বিষয়ে কসম খান তখন আল্লাহ তাঁর কসম পূর্ণ করে দেন। আমর (রা) ইবনুল জামুহও এই ধরনেরই মানুষ ছিলেন। তুমি এখন তাঁদের লাশ ওহোদের ময়দানে ফিরিয়ে নিয়ে যাও এবং অন্য শহীদদের সঙ্গে দাফন কর।"

হিন্দ (রা) এরপর উটের মুখ ওহোদের দিকে ফিরালেন। তখন সে দ্রুত গতিতে চলতে লাগলো এবং তিন শহীদকেই পুনরায় ওহোদের ময়দানে পৌছে দিল। এখানে স্বয়ং বিশ্ব নবী (সা) তাঁদেরকে নিজের সামনে দাফন করালেন।

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত জাবের (রা) পিতা আবদুল্লাহর (রা) লাশ উটে করে মদীনা নিয়ে গিয়েছিলেন। হুযূর (সা) এ কথা জানতে পেরে আবদুল্লাহর (রা) লাশ ওহোদের ময়দানে ফিরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিলেন। অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি ছোট বোনদের ইচ্ছা অনুসারে লাশ মদীনা নিয়ে গিয়ে বনূ সালামার বংশীয় কবরস্থানে দাফন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হুযূর (সা) ইজাযত দেননি। রহমতে আলমের (সা) নির্দেশ অনুযায়ী এক এক কবরে দুই দুই শহীদ দাফন করা হয়।

আল্লামা ইবনে আসীর (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) ভগ্নিপতি আমর (রা) ইবনুল জামুহকে খুব ভালবাসতেন। সুতরাং আবদুল্লাহ (রা) এবং আমরকে (রা) একই কবরে দাফন করা হয়।

সহীহ বুখারীতে হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, "ওহোদের যুদ্ধে আমার পিতা ও চাচাকে একই চাদরে কাফন করা হয়েছিল।"

এই রেওয়ায়াতে চাচার নামের ব্যাখ্যা করা হয়নি।

অনুমান করা হয় যে, তিনি হযরত আমর (রা) ইবনুল জামুহকেই চাচা বলে থাকবেন। আত্মীয়তার দিক থেকে তিনি হযরত জাবেরের (রা) ফুফা ছিলেন।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আমরের চেহারায় একটি আঘাতের দাগ পড়ে গিয়েছিল। সেখানে তিনি হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন। কেউ তাঁর হাত চেহারার ওপর থেকে সরিয়ে দিলে সেই ক্ষত থেকে দর দর করে রক্ত পড়তে লাগলো। অতপর তাঁর হাত নিজে নিজেই সেখানে চলে গেল এবং রক্ত বন্ধ হলো।

সহীহ বুখারীতে আছে যে, ওহোদের যুদ্ধের ৬ মাস পর হযরত জাবের (রা) পিতার লাশ অন্য এক কবরে স্থানান্তর করেন। সে সময় তাঁর শরীর ঠিক তেমনি ছিল যেমন ওহোদের দিন দাফন করা হয়েছিল।

মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিকে (র) রয়েছে যে, এই ঘটনার ৪৬ বছর পর হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আমরের কবর সয়লাবের কারণে খুলে গিয়েছিল। সে সময় লোকজন দেখলো যে, লাশ সহীহ সালামতেই রয়েছে।

মওলানা হাকিম রহমান আলী খান নিজের কিতাব "আল-মাশাহিদে" হযরত জাবের (রা) বিন আবদুল্লাহর (রা) রেওয়ায়াতে নকল করেছেন যে, আমীর মাবিয়া (রা) নিজের শাসনামলে যখন একটি খাল খননের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তখন সেই খালের স্থানে কয়েকজন শহীদের কবর পড়েছিল। তিনি শহীদদের উত্তরাধিকারদেরকে খবর দিলেন যে, তারা যেন বিকল্প কবরের ব্যবস্থা করেন। উত্তরাধিকাররা স্ব স্ব ব্যক্তিদের কবর খুঁড়ে তাঁদের লাশ একদম তাজা লাশ হিসেবে পেলেন। আমিও নিজের পিতার (আবদুল্লাহ (রা) বিন আমর) শরীরকে সম্পূর্ণ নরম পেলাম। জামে' তিরমিযীতে আছে যে, ওহোদের যুদ্ধের পর হযরত জাবের (রা) খুব শোকাভিভূত ছিলেন। প্রিয় নবী (সা) তাকে এই অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তুমি এত দুশ্চিন্তা গ্রস্ত কেন? তিনি আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! বাপ শহীদ হয়ে গেছে এবং অনেক ঋণ ও সন্তান রেখে গেছে। সেই চিন্তাই করছি।"

হুযূর (সা) বললেন, "আল্লাহ তাআলা তোমার পিতার সাথে প্রত্যক্ষভাবে এবং পরদা ছাড়া কথা-বার্তা বলেছেন। অথচ আল্লাহ তাআলা কারোর সঙ্গে পর্দা ছাড়া কথা বলেন না। তিনি তোমার পিতাকে সামনে ডেকে বললেন, হে আমার বান্দাহ! তোমার যা ইচ্ছা তাই চাও। তিনি আরয করলেন, হে পরওয়ারদিগার! আমাকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠিয়ে দাও। যাতে দ্বিতীয়বার তোমার দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করে আবার শাহাদাত লাভ করতে পারি। আল্লাহ তাআলা বললেন, এটা আমার স্থির সিদ্ধান্ত যে, যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে আসবে সে পুনরায় ফিরে যেতে পারবে না। আবদুল্লাহ আরয করলেন, হে আল্লাহ! আমার অবস্থা আমার সন্তানদেরকে জানিয়ে দিন। তাতে এই আয়াত নাযিল হলো ঃ "যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদেরকে মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত।"

রহমতে আলমের (সা) ইরশাদ শুনে হযরত জাবের (রা) সান্ত্বনা পেলেন। অতপর তাঁর বাগানের খেজুরে আল্লাহ পাক এত বরকত দিলেন যে, সমস্ত ঋণ আদায় হওয়ার পরও কিছু খেজুর বেঁচে গেল। সহীহ বুখারী এবং মুসনাদে আহ্‌মদ বিন হাম্বলে (র) এ ঘটনাকে হুযূরের (সা) মুজিযার মধ্যে শামিল করা হয়েছে। কেননা, হুযূর (সা) এই খেজুরে বরকতের জন্য দোয়া করেছিলেন এবং নিজের পবিত্র হাত দিয়ে তা বন্টন করেছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ'র (রা) পুত্র হযরত জাবের (রা) একজন অন্যতম অধিকসংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী এবং জালীলুল কদর সাহাবী ছিলেন।

হযরত সামমাক (রা)
বিন খারশাহ সায়েদী

দ্বিতীয় হিজরীর ১৭ই রমযান শুক্রবার বদরের ময়দানে হক ও বাতিলের মধ্যকার সংঘর্ষ সংঘটিত হয় এবং যুদ্ধের আগুন প্রচন্ড শক্তিতে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় মুশরিকদের ব্যূহ থেকে বনূ সাহামের নাম করা যোদ্ধা আছিম বিন আবি আওফ বিন জাবিরা গর্জন করতে করতে বের হলো এই ব্যক্তি ছিল খুব শক্তিশালী ও পশু চরিত্রের। সে সময় ক্রোধে সে গড় গড় করছিল এবং অত্যন্ত অহমিকাপূর্ণভাবে নিজের তরবারী ঘুরিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিল ঃ

"হে কুরাইশের দল! সেই ব্যক্তির ব্যাপারে অবশ্যই হাত ফিরিয়ে রেখো না যে আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী এবং গোত্রসমূহের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টিকারী। আজ আমি তাকে মেরে ফেলবো অথবা নিজে জীবন দেব।"

এই হতভাগা প্রকাশ্যভাবেই প্রিয় নবীর (সা) প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তার হম্বিতম্বি শুনে হকপন্থীরা অস্থির হয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তাদের ব্যূহ থেকে মাথায় লাল কাপড় বাঁধা এক ব্যক্তি বেরিয়ে এলো এবং অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে আছিম বিন আওফের দিকে অগ্রসর হলো। যদিও দেহ এবং অবয়বের দিক থেকে আছিমের সঙ্গে তাঁর কোন তুলনাই ছিল না। কিন্তু ঈমানী আবেগ তাঁর বাহুতে প্রচন্ড শক্তি সৃষ্টি করেছিল। আছিমের নিকটে পৌঁছে তিনি তরবারী দিয়ে এমন এক কোপ মারলেন যে, সেই এক কোপেই তার প্রাণবায়ু সাঙ্গ হয়ে গেল। তখন তিনি তার সরঞ্জাম নেয়ার জন্য অগ্রসর হচ্ছিলেন। ঠিক এমন সময় দ্বিতীয় মুশরিক মা'বাদ বিন ওয়াহাব কালবী তরবারী দোলাতে দোলাতে তাঁর ওপর হামলা করে বসলো। তৎক্ষণাৎ তিনি হাটু গেড়ে বসে গেলেন এবং মা'বাদের হামলা ব্যর্থ হলো। অতপর তিনি তার ওপর তরবারী দিয়ে কয়েকটি আঘাত হানলেন। কিন্তু এই আঘাত কার্যকর হলো না। তবুও মা'বাদ বোধশূন্য অবস্থায় পলায়ন করল এবং একটি গর্তে লাফ দিল। সেই ব্যক্তি তার পিছু ধাওয়া করলো এবং বীরত্বের সঙ্গে সেই গর্তে তার ওপর লাফিয়ে পড়লো। সে নিজেকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করলো কিন্তু তিনি তাকে বকরীর মত জবেহ করে ফেললো। বদরের যুদ্ধের এই বীর ছিলেন হযরত সামমাক (রা) বিন খারশাহ আনসারী। ইতিহাসে তিনি "আবু দুজানাহ" কুনিয়তে মশহুর হন।

সাইয়েদুনা হযরত আবু দুজানাহ সামমাক (রা) বিন খারশাহ (বিন লাওজান বিন আবদুদ বিন যায়েদ বিন তুরাইফ বিন খাযরাজ বিন সায়িদাহ

বিন কা'ব বিন খাযরাজুল আকবার)। খাযরাজের সায়িদাহ খান্দানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। এই খান্দান মদীনার প্রসিদ্ধ খান্দান ছিল। খাযরাজ সরদার হযরত সা'দ (রা) বিন উবাদাহও এই খান্দানের সন্তান ছিলেন এবং হযরত আবু দুজানার (রা) চাচাতো ভাই ছিলেন। হযরত আবু দুজানা সামমাক (রা) মদীনার নাম করা বাহাদুরদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। সারওয়ারে কায়েনাত (সা) তখনো হিজরত করে মদীনা তাশরীফ আনেননি। এ সময়ই আবু দুজানা (রা) কতিপয় ইয়াছরাবীর নিকট হাদিয়ে আকরাম (সা) এবং তাঁর দাওয়াতের অবস্থা শুনলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে নরম অন্তর দিয়েছিলেন। সেই সময়ই তিনি একক আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সা) ওপর গায়েবীভাবে ঈমান আনয়ন করেন। নবী করীম (সা) যখন হিজরত করে মদীনায় শুভ পদার্পণ করেন। তখন আবু দুজানার (রা) খুশীর কোন সীমা পরিসীমা ছিল না। তিনি হাশেমী রাসূলের (সা) প্রতি মন ও অন্তরের সঙ্গে অনুরক্ত হয়ে পড়লেন। রাবেগ যুদ্ধের সময় (প্রথম হিজরী) প্রখ্যাত সাহাবী হযরত উতবাহ (রা) বিন গাযওয়ান কুরাইশ মুশরিকদের হাত থেকে জীবন বাঁচিয়ে মদীনা এলে প্রিয় নবী (সা) হযরত আবু দুজানাহ (রা) এবং তাঁর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এই দুই দীনী ভাইয়ের বৈশিষ্ট্য ছিল নজীরবিহীন ঈমানী শক্তি এবং জীবন উৎসর্গ করার আবেগ।

হযরত আবু দুজানাহ (রা) ছিলেন যুদ্ধের ময়দানের অশ্বারোহী এবং তীর চালনায় নজীরবিহীন। নবীর (সা) যুদ্ধসমূহ শুরু হলে তিনি প্রতিটি রণক্ষেত্রেই বীরত্বের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। যুদ্ধের জন্য বের হওয়ার সময় মাথার একদিকে লাল কাপড়ের পট্টি জড়িয়ে নিতেন এবং এমনভাবে চলাফেরা করতেন যেন শত্রুকে পিষে মারবেন। বদরের যুদ্ধে তিনি যে বাহাদুরী প্রদর্শন করেন তার এক ঝলক ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে। সেদিন তিনি কুরাইশের চারজন নাম করা বাহাদুর রবিয়া বিন আসাদ, আবু মাসাফি আশআ'রী, আছিম বিন আবি আওফ জাবিরাহ সাহামী এবং মা'বাদ বিন ওয়াহাব কালবীকে জাহান্নামে প্রেরণ ও অনেক মুশরিককে আহত করেন। এমনিভাবে বদরের সাহাবীদের মধ্যে তাঁর বিশিষ্ট স্থান রয়েছে।

তৃতীয় হিজরীতে ওহোদের যুদ্ধ শুরু হলে হযরত আবু দুজানা (রা) সেই যুদ্ধে এমন বীরত্ব দেখান যে, ওহোদের যুদ্ধে তিনি বিশেষ বাহাদুর হিসেবে পরিগণিত হন। সহীহ মুসলিম এবং মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, ওহোদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) পবিত্র হাতে একটি তরবারী নিয়ে ইরশাদ করলেন যে, এই তরবারী কে নেবে? সকলেই অত্যন্ত আগ্রহ ভরে হুযূরের (সা) দিকে তাকাতে লাগলেন।

এমন মনে হচ্ছিল যে, তাদের প্রত্যেকেই এই তরবারীর প্রত্যাশী ছিলেন। কিন্তু যখন হুযূর (সা) বললেন যে, এর হক কে আদায় করবে তখন সকলেই হতচকিত হয়ে গেল। অবশ্য হযরত আবু দুজানাহ সামমাক (রা) দাঁড়িয়ে আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি এই তরবারীর হক আদায় করবো।" রাসূলে আকরাম (সা) সেই তরবারী তাঁকেই দিলেন এবং তিনি তা দিয়েই লড়াই করলেন।

এই রেওয়ায়াতে তরবারীর হক সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি। অবশ্য মুসতাদরাকে হাকিমে হযরত যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনিও এই তরবারী নেওয়ার খাহেশ করেছিলেন। কিন্তু হুযূর (সা) তাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। আবু দুজানাহ (রা) যখন তার হকের সঙ্গে গ্রহণের আরয করলেন তখন হযরত যোবায়ের (রা) বললেন, তাঁর আবার হক কি? এ সময় প্রিয় নবী (সা) বললেন ঃ "সেই তরবারী দিয়ে কোন মুসলমানকে মারা যাবে না এবং তা নিয়ে কাফেরদের নিকট থেকে পালানো যাবে না।" অতপর তিনি সেই তরবারী আবু দুজানাকে (রা) প্রদান করেন।

আল্লামা ইবনে আসীর (র) উসুদুল গাবাহতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু দুজানাহ (রা) (প্রিয় নবীর (সা) নিকট থেকে তরবারী প্রাপ্তির পর) নিজের নিয়ম অনুসারে মাথায় লাল রুমাল বেঁধে যুদ্ধের ময়দানের দিকে চললেন। সে সময় রহমতে আলম (সা) ইরশাদ করলেন ঃ "যদিও অহমিকাপূর্ণ চাল-চলন আল্লাহর নিকট অপসন্দনীয়। কিন্তু এখন তাতে দোষের কিছু নেই।"

হাফেজ ইবনে কাসীর (র) আল-বিদায়া ওয়াননিহায়াতে ইবনে হিশামের উদ্ধৃতি দিয়ে এই রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত এটুকুন বর্ণনা করেছেন যে, যখন আবু দুজানাহ (রা) নিজের মাথায় লাল রুমাল বাঁধলেন তখন আনসাররা বললেন, "আবু দুজানাহ (রা) মৃত্যুর পট্টি বেঁধেছে।" এর পূর্বেও যখন তিনি মাথায় লাল পট্টি বাঁধতেন তখনো আনসাররা এ ধরনেরই বলতো। তার পর আবু দুজানাহ (রা) গাথা পড়তে পড়তে যুদ্ধের ময়দানের দিকে অগ্রসর হলেন।

হযরত আবু দুজানাহ (রা) এমনভাবে যুদ্ধের ময়দানে দাখিল হলেন যেমন বাঘ শিকারের ওপর থাবা মারে। যে মুশরিকই তার সামনে এলো তরবারী দিয়ে তাকে টুকরো টুকরো করে ফেললেন অথবা আহত করলেন। হযরত কা'ব (রা) বিন মালেক আনসারী থেকে বর্ণিত আছে যে, ওহোদের যুদ্ধে মুশরিকদের এক যুদ্ধবাজ আপাদমস্তক যিরাহ পরিধান এবং সবধরনের অস্ত্রে সজ্জিত ছিলো। সে মুসলমানদের ওপর হামলা করছিলো এবং নিজের লোকদেরকে মুসলমানদেরকে ঘিরে বকরীর পালের মত এক স্থানে একত্রিত

করতে বলছিলো। সে সময় মুসলমানদের ব্যূহসমূহ থেকে একাকি এক যিরাহ পরিধানকারী তীরের মত গিয়ে তার ওপর হামলা করে বসলেন। মুশরিক যুদ্ধবাজটি যদিও মুসলমান যিরাহ পরিধানকারীর চেয়ে উন্নত অস্ত্রে সজ্জিত ছিল। কিন্তু মুসলমান মুজাহিদটি মুশরিকের নিকটে পৌছে তার কাঁধের ওপর তরবারীর এমন আঘাত হানলেন যে, সে দুই টুকরো হয়ে মাটিতে লুটে পড়ল। সে সময় আমি (হযরত কা'ব) সেই মুসলমানের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। মুশরিককে জাহান্নামে প্রেরণের পর সে নিজের চেহারার ওপর থেকে স্বয়ং পর্দা ওঠালেন এবং আমাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"কা'ব তুমি দেখছো যে, আমি হলাম আবু দুজানাহ।"

হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়াম থেকেও এরকম বর্ণনাই পাওয়া যায়। তবে তাতে কিছুটা বেশী বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, হযরত আবু দুজানাহ (রা) লড়াই ও হত্যা করতে করতে কুরাইশ মুশরিকদের সেই মহিলাদের নিকট পৌছে যান যারা একটি পাথরের ওপর বসেছিল এবং হিন্দ বিনতে উতবার নেতৃত্বে কবিতা পড়ে পড়ে নিজেদের পুরুষদেরকে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করছিলো।

হযরত আবু দুজানাহ (রা) অগ্রসর হয়ে হিন্দের গর্দানের ওপর তরবারী রাখলেন। তাতে সে চেঁচিয়ে উঠলো এবং সাহায্যকারীদেরকে ডাকতে লাগলো। কিন্তু যুদ্ধের হাঙ্গামায় কেউই তার ডাকে সাড়া দিল না। এ অবস্থা দেখে হযরত আবু দুজানাহ (রা) তার গর্দান থেকে তরবারী সরিয়ে নিলেন এবং ফিরে গেলেন। হযরত যোবায়ের (রা) বলেন, পরে আবু দুজানার (রা) সঙ্গে আমার সাক্ষাত হলে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, তুমি সেই মহিলাকে হত্যা করনি কেন?

তিনি জবাব দিলেন যে, "রাসুল (সা) প্রদত্ত তরবারী দিয়ে একজন মহিলাকে হত্যা করাকে আমি লজ্জার ও খারাব বলে মনে করলাম। আবার মহিলাও এমন মহিলা যে, যার ডাকে কেউ সাড়া দিল না।"

কতিপয় রেওয়ায়াতে হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়াম থেকে এই বর্ণনাও সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে যে, প্রিয় নবী (সা) আমার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে নিজের তরবারী আবু দুজানা কে (রা) দিলেন। তাতে আমার মনে কিছুটা কষ্ট লাগলো। কারণ আমি ছিলাম কুরাইশী। রাসূলের (সা) ফুফুর পুত্র এবং তরবারী নেওয়ার জন্য সর্বপ্রথম আমিই দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে উপেক্ষা করলেন। আল্লাহর কসম! আমি দেখে নেবো যে, আবু দুজানাহ (রা) এই তরবারী দিয়ে কি করে। অতপর যখন আমি যুদ্ধে আবু দুজানাহর কৃতিত্ব

দেখলাম তখন আমার মন স্থির হলো এবং আমার মুখ দিয়ে অবলীলাক্রমে বেরিয়ে এলো যে, অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) প্রত্যেক জিনিষ সম্পর্কেই উত্তম জানেন।

ওহোদের যুদ্ধে যেসব মুশরিক হযরত আবু দুজানাহর হাতে জাহান্নাম প্রাপ্ত হয়। চরিতকাররা তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন হামিদ বিন যোহায়ের উসদী এবং উবায়েদ বিন আজেয আমেরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

একটি ভুলের জন্য ঘটনাক্রমে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হয়ে গেলে হযরত আবু দুজানাহ (রা) অন্য কতিপয় অটল মুহাজির ও আনসারদের সঙ্গে পাথরের মত রাসূল (সা) ও দুশমনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রহমতে আলমের (সা) ঢাল হিসেবে কাজ করেন। শত্রুপক্ষের যেসব মানুষ হুযূরের (সা) দিকে অগ্রসর হচ্ছিল আবু দুজানাহর (রা) তরবারী বিদ্যুতবেগে তাদের ওপর আপতিত হচ্ছিল এবং ময়দান পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল। তিনি আঘাতের পর আঘাত পাচ্ছিলেন কিন্তু কোন মুশরিককে হুযূরের (সা) নিকট পৌছতে দেননি। মুশরিকরা যখন হটে গেল তখন হযরত আবু দুজানাহর (রা) সর্বাঙ্গ আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে গিয়েছিল। প্রিয় নবী (সা) তাঁর বীরত্ব ও অটলতায় খুব খুশী হলেন এবং বললেন ঃ

"আবু দুজানাহ খুব লড়াই করেছে।"

বদর ও ওহোদের পর অন্যান্য যুদ্ধেও হযরত আবু দুজানাহ (রা) নজিরবিহীন বীরত্ব প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রিয় নবীর (সা) প্রতি জীবন উৎসর্গের হক আদায় করেন। আল্লামা ইবনে সা'দ (র) বর্ণনা করেছেন যে, বনূ নজীরের যুদ্ধে হুযূর (সা) স্বয়ং নিজের মাল থেকে হযরত আবু দুজানাহকে (রা) অংশ দেন এবং তাঁর এই সম্পদ "ইবনে খারাশাহ'র সম্পদ"–নামে মশহুর হয়।

একাদশ হিজরীতে প্রিয় নবীর (সা) ওফাত হলে হযরত আবু দুজানাহ (রা) শোকে দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। কিন্তু জিহাদের উৎসাহে ভাটা পড়েনি। হযরত সিদ্দীকে আকবারের (রা) খিলাফতকালে মুসায়লামা কায্যাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামাতে প্রসিদ্ধ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে তিনি অত্যন্ত উৎসাহ–উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নেন। যুদ্ধে এমন এক সময় আসলো যে, মুসলমানদের চাপে বাধ্য হয়ে মুসায়লামা নিজের বাগানে চলে গেল এবং বাগানের চার দেয়ালের সুযোগ নিয়ে মুসলমানদের ওপর তীর বর্ষণ শুরু করলো। মুসলমানরা বাগানের অভ্যন্তরে প্রবেশের খুব চেষ্টা করলো। কিন্তু বৃষ্টির মত নিক্ষিপ্ত তীরে তাঁরা পিছু হটে আসতে বাধ্য হচ্ছিলেন। অবশেষে

হযরত আবু দুজানাহ (রা) বীরের মত সামনে অগ্রসর হলেন এবং প্রাচীর টপকে বাগানের মধ্যে লাফিয়ে পড়লেন। তাতে তাঁর পায়ের হাড় ভেঙ্গে গেল। কিন্তু তাঁর হিম্মতে কোন ভাটা পড়লো না। পা টানতে টানতে এবং দুশমনকে মেরে কেটে বাগানের ফটক পর্যন্ত পৌছে গেলেন। ইত্যবসরে হযরত বারা' (রা) বিন মালিকও প্রাচীর টপকে ফটক পর্যন্ত পৌছে তা খুলে দিলেন। ইসলামের মুজাহিদরা বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। তৎক্ষণাৎ ভেতরে প্রবেশ করে মুরতাদদেরকে তরবারীর খোরাক বানানো শুরু করলেন। হযরত আবু দুজানাহ (রা) ইসলামের দুশমন মুসায়লামাকে হত্যার তাকে ছিলেন। এমন সময় মুরতাদদের বর্শা ও তরবারীর আঘাত তাঁকে এদিক-ওদিক করে দিলো। আর এমনিভাবে ইসলামের এই বীর পুরুষ শাহাদাতের পেয়ালা পান করে প্রকৃত মওলার সঙ্গে মিলিত হলেন। তিনি সমগ্র জীবন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য অতিবাহিত করেছিলেন। ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি নিজের লক্ষ্যে সফল হন।

সাইয়েদুনা হযরত আবু দুজানাহর (রা) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছিল দীনের প্রতি মর্যাদাবোধ, নির্ভীকতা এবং নজীরবিহীন বাহাদুরী। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) ইসতিয়াব গ্রন্থে লিখেছেন, তিনি সমকালীন যুগের অন্যতম বাহাদুর হিসেবে পরিগণিত হতেন এবং নবীর (সা) সময়কার যুদ্ধসমূহে তাঁর বিশেষ মর্যাদা ছিল।

প্রিয় নবীর (সা) হিজরতের পূর্বেই হযরত আবু দুজানাহ (রা) ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। এ জন্য তিনি আনসারদের সাবিকুনাল আউয়ালুনের অন্তর্ভুক্ত। তিনি স্বভাবগত দিক দিয়ে একজন জীবন উৎসর্গকারী সিপাহী এবং মুজাহিদ ছিলেন। এ জন্য তিনি হাদিস বর্ণনার সুযোগ পাননি। এ সত্ত্বেও মুসনাদে আবু দাউদে তাঁর থেকে একটি মশহুর হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসে তিনি বলেন ঃ "রাসূলের (সা) মজলিসে সাহাবীরা (রা) পার্থিব জগতের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি (সা) বললেন ঃ শুনে রেখো, অতপর শুনে রেখো যে, সাদাসিধেভাবে জীবন অতিবাহিত করাও ঈমানদারীর মধ্যে পরিগণিত।

আল্লামা ইবনে আসীর (র) লিখেছেন যে, হযরত আবু দুজানাহ (রা) অন্যতম মার্যাদাবান সাহাবী ছিলেন এবং হকপন্থীদের নিকট তিনি মহান মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা আনসারী

হিজরতে নবুবীর কয়েক বছর পরের ঘটনা। একদিন ঈমানের নূরে আলোকিত চেহারাসম্পন্ন একজন আনসারী সাহাবী সারওয়ারে আলমের (সা) খিদমতে হাযির হওয়ার নিয়তে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে মসজিদে নবুবীর দিকে রওয়ানা হলেন। সে সময় হুযূর (সা) মসজিদে খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি তখনো মসজিদের বাইরেই ছিলেন এমন সময় হুযূর (সা) খুতবার মধ্যেই কতিপয় লোককে সম্বোধন করে বসে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। হুযূরের (সা) নির্দেশ শোনা মাত্র সেই ব্যক্তির পা মাটিতে পড়ে গেল এবং সেখানেই বসে পড়লেন। হুযূর (সা) খুতবা থেকে ফারেগ হলে জনৈক ব্যক্তি তাঁর খিদমতে এই ঘটনা পেশ করলেন। তিনি সেই ব্যক্তির রাসূলের (সা) প্রতি আনুগত্যের এই আবেগে খুব খুশী হলেন এবং তাঁকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "আল্লাহ তায়ালা তোমার অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) আনুগত্যের আবেগ আরো বেশী করে দিন।"

রাসূলের (সা) এই সাহাবী যাঁর আনুগত্যের আবেগ রহমতে আলমকে (সা) এত আনন্দিত করেছিল যে, তিনি (সা) তাঁর বরকতের জন্য দোয়া করেছিলেন। এই সাহাবী ছিলেন সাইয়েদুনা হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা আনসারী।

যেসব ব্যক্তি নিয়ে ইসলামী মিল্লাত গৌরব করতে পারে সাইয়েদুনা হযরত আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা আনসারী তাঁদের অন্যতম। খাযরাজ গোত্রের হারিছ বিন খাযরাজ বংশের সঙ্গে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তাঁর নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা বিন ছা'লাবা বিন ইমরাউল কায়েস বিন আমর বিন ইমরাউল কায়েসুল আকবার বিন মালিকুল আগার বিন ছা'লাবা বিন কা'ব বিন খাযরাজ বিন হারিছ বিন খাযরাজুল আকবার।

মাতা কাবশা বিনতে ওয়াকিদও একই গোত্রভুক্ত ছিলেন। কতিপয় রেওয়ায়াত অনুযায়ী তিনিও সাহাবিয়া হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার মশহুর কুনিয়ত ছিল আবু মুহাম্মাদ। যদিও কতিপয় রেওয়ায়াতে আবু রাওয়াহা এবং আবু ওমরও তাঁর কুনিয়ত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা গোত্রের অন্যতম নাম করা ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শুধু শিক্ষিত মানুষই ছিলেন না বরং একজন শক্তিশালী কবিও ছিলেন। চরিতকাররা লিখেছেন যে, তিনি জাহেলী এবং ইসলামী উভয় যুগেই খুব সম্মানী মানুষ ছিলেন। পার্থিব মান-ইযযতের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সুন্দর স্বভাবও দান করেছিলেন। বস্তুত প্রথম বাইআতে আকাবার পর মদীনার ঘরে ঘরে যখন ইসলামের চর্চা চলছিল তখন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহাও চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই হকের দাওয়াত কবুল করে নেন। নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে তাঁর বাইআতে আকাবায়ে কাবীরাতে অংশগ্রহণের মহান সৌভাগ্য লাভ ঘটেছিল। এই সময় বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফার (সা) ইঙ্গিতে ইয়াছরাবী মুমিনরা যে ১২ জন নকীব নির্বাচন করেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা। হযরত সা'দ (রা) বিন রবী' আনসারী এবং তাঁকে বনূ হারিছার নকীব বানোনো হয়। হিজরতের পর রহমতে আলম (সা) মদীনায় শুভ পদার্পণ করলেন। এ সময় হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা মদীনার সেই সব সরদারের অন্যতম ছিলেন যাঁরা হুযূরকে (সা) উষ্ণ সম্বর্ধনা প্রদান করেছিলেন। তিনি রাসূলের (সা) মেযবান হওয়ার আবেদনও জানিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এই সৌভাগ্য দিয়েছিলেন হযরত আবু আইয়ুব আনসারীকে (রা)।

কয়েক মাস পর প্রিয় নবী (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহাকে জালীলুল কদর মুহাজির সাহাবী হযরত মিকদাদ (রা) বিন আমরুল আসওয়াদ কিন্দীর দীনী ভাই বানিয়ে দেয়া হয়।

সহীহ বুখারীতে আছে যে, মসজিদে নবুবীর নির্মাণ কাজ শুরু হলে বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) সাহাবীদের (রা) সঙ্গে নিজেও ইট বহনের কাজ করেছিলেন। সে সময় তাঁর পবিত্র মুখে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা বিরচিত কবিতা উচ্চারিত হয়েছিল।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা ইসলাম গ্রহণ করেই মন ও অন্তর দিয়ে রাসূলে আরাবীর (সা) আন্তরিক প্রেমিক হয়ে যান। সহীহ বুখারীতে আছে যে, বদরের যুদ্ধের পূর্বে একবার খাযরাজ সরদার হযরত সা'দ (রা) বিন উবাদাহ অসুস্থ হয়ে পড়েন। হুযূর (সা) এ খবর পেয়ে দেখার মানসে সওয়ারীর

ওপর সওয়ার হয়ে তাঁর নিকট গমন করলেন। রাস্তায় এক মজলিসে কিছু মুসলমান ও মুনাফিক একত্রিত বসেছিল। তাঁদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা এবং মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সুলুলও উপস্থিত ছিল। আবদুল্লাহ বিন উবাই ছিল সেই ব্যক্তি যাকে নবীর (সা) হিজরতের পূর্বে মদীনার সকলেই (আওস ও খাযরাজ) নিজেদের বাদশাহ বানানোর ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন এবং তার জন্য মুকুটও বানানো হয়েছিল। কিন্তু রহমতে আলমের (সা) মদীনা মুনাওয়ারা আগমনের পর এ সকল তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় এবং সকল আনসার হুযূরের (সা) পবিত্র হাতে নিজেদের হাত দিয়ে দেন। ব্যাপারটি আবদুল্লাহর জন্য ছিল খুবই কঠিন এবং সে রাসূলের (সা) প্রতি খুবই বিদ্বেষ পোষণ করতো। হুযূরের (সা) সওয়ারীর ধূলা উড়লে সে অন্তরের ঝাল এভাবে ঝাড়লো যে, নিজের চাদর নাকের ওপর দিল এবং অত্যন্ত বেতমীযভাবে বললো, "ধুলি উড়িয়ে এসো না।"

এর জবাবে হুযূর (সা) মজলিসে উপস্থিত সকলকে সালাম করলেন। অতপর সওয়ারী থেকে অবতরণ করে আল্লাহর একত্ববাদের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিলেন। আবদুল্লাহ বিন উবাই অত্যন্ত রুক্ষ মেজাযে বললো ঃ

"তোমার কথা যদি সত্য হয়, তাহলে যারা নিজেরা তোমার নিকট গমন করে তাদেরকে বলো। এখানে এসে আমাদেরকে বিরক্ত করো না।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা ইবনে উবাইয়ের অবমাননাকর কথা শুনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বললেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসুল! আপনি অবশ্যই তাশরীফ আনবেন। আমরা আপনার কথা মন-প্রাণ দিয়ে পসন্দ করি।" এ সময় কথা এতদূর গড়িয়েছিল যে, মুসলমান ও মুনাফিকদের মধ্যে তরবারী ব্যবহারের পর্যায় প্রায় এসে গিয়েছিল। রহমতে আলম (সা) উভয়পক্ষকে এমন হিকমতের সঙ্গে বুঝালেন যে, তারা ঠান্ডা হলো। অতপর হুযূর (সা) হযরত সা'দ (রা) বিন উবাদাহর বাড়ী তাশরীফ নিলেন এবং কথা বলার ফাঁকে বললেন, "সা'দ শুনেছ! আজ আবু হাবাব (আবদুল্লাহ বিন উবাই) আমাকে এ কথা বলেছে।" তিনি আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসুল! আপনি তার কথা শুনবেন না। এ সেই ব্যক্তি যাকে মদীনাবাসী আপনার আগমনের পূর্বে বাদশাহ বানাতে চেয়েছিল। আল্লাহ আপনাকে হক ও সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন। এরপর আমরা আমাদের ইচ্ছা পরিত্যাগ করি। ইবনে উবাইয়ের কথা বাদশাহী থেকে বঞ্চিত হওয়ারই ফলশ্রুতি।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার এই ঈমানী আবেগ ও রাসূল প্রেম তাঁকে নবীর (সা) নিকটবর্তী করেছিল। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর কবিতা একমাত্র হকের তাবলীগ এবং কাফেরদের সমালোচনার জন্য ওয়াকফ করা হয়েছিল। আবদুল্লাহ (রা) নিজের কবিতাতে কাফেরদের গোমরাহী সম্পর্কে এমনভাবে বর্ণনা করতেন যে, তারা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠতো। তাঁর অন্তরে হক পথে শহীদ হওয়ার বাসনা সব সময়ই জাগ্রত ছিল। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) "আল ইসাবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, "হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা প্রত্যেক যুদ্ধে অগ্রগামী এবং ফেরার সময় সবার পেছনে থাকতেন।"

জিহাদের প্রতি তাঁর উৎসাহের আন্দাজ এ থেকে করা যায় যে, বদর থেকে মওতা পর্যন্ত (যে যুদ্ধে তিনি শাহাদাতবরণ করছিলেন) এমন কোন যুদ্ধ ছিল না যাতে তিনি হুযূরের (সা) সঙ্গী ছিলেন না।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা সেই তিন জানবাজের অন্যতম ছিলেন যাঁরা বদরের যুদ্ধে উতবাহ, শাইবাহ এবং ওলীদ–এর বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্য বের হয়েছিলেন। অন্য রেওয়ায়াতে তাঁর পরিবর্তে হযরত মুয়াব্বিজ (রা) বিন আফরা'র নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য দুজন আনসার জানবাজ সর্বসম্মত মতে ছিলেন হযরত মায়ায (রা) বিন আফরা' এবং আওফ বিন আফরা'। এটা ভিন্ন কথা যে, কুরাইশের যুদ্ধবাজরা তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করা পসন্দ করেনি। ফলে হযরত হামযা (রা), হযরত আলী (রা) এবং হযরত উবাইদাহ (রা) ইবনুল হারিছ তাদের মুকাবিলা করেন। বদরের যুদ্ধের পর প্রিয় নবী (সা) হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা এবং হযরত যায়েদ বিন হারিছাকে বিজয়ের সুসংবাদ দানের জন্য মদীনা মুনাওয়ারা প্রেরণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা মদীনার উত্তরে এবং হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছা শহরের দক্ষিণাংশে বিজয় সংবাদ শুনান।

চতুর্থ হিজরীর জিলকদ মাসে হুযূরে আকরাম (সা) দ্বিতীয় বদরের যুদ্ধ অথবা শেষ বদরের জন্য রওয়ানা হন। এ সময় তিনি হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহাকে মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যান।

পঞ্চম হিজরীতে খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে আরবের সকল মুশরিক ঐক্যবদ্ধভাবে মদীনায় হামলা চালায়। পরিখা খনন করে মুসলমানরা নিজেদের প্রতিরক্ষা করেন। অবরোধকালে মদীনার বনূ কুরায়জার ইহুদীরা বিশ্বাসঘাতকতার জন্য কোমর বেঁধে দাঁড়ায়। কিন্তু হুযূরের (সা) সময়মত পদক্ষেপের কারণে তারা এই অপকর্মের সুযোগ পায়নি। সেই নাজুক সময়ে

হুযূর (সা) হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহাকে অন্যান্য প্রভাবশালী মুসলমানদের সঙ্গে বনু কুরায়জার সাথে আলোচনার জন্য প্রেরণ করেন। তাঁরা ফিরে এসে হুযূরকে (সা) তাদের খারাব ধারণা সম্পর্কে অবহিত করেন।

৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়া নামক স্থানে বাইআতে রিদওয়ানের আজিমুশশান ঘটনা সংঘটিত হয়। সে সময় হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার চৌদ্দশ জীবন উৎসর্গকারীর একজন হওয়ার সৌভাগ্য লাভ ঘটে। এসব সাহাবী (রা) হুযূরের (সা) পবিত্র হাতে মৃত্যুর বাইআত করেন এবং আল্লাহর তরফ থেকে তাঁরা "আসহাবুশ শাজারাহ" লকব ও আল্লাহর সন্তুষ্টির সনদ প্রাপ্ত হন।

সপ্তম হিজরীতে খায়বার বিজয় হয়। এ সময় সেখানকার উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নিরূপণের জন্য হুযূর (সা) হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহাকে নিয়োগ করেন। তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই দায়িত্ব পালন করেন।

৬ষ্ঠ হিজরী শওয়াল মাসে রাসূলে আকরাম (সা) হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহাকে এক বিশেষ অভিযানে নিয়োগ করেন। এই অভিযান "সারিয়্যাহ আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার" নামে মশহুর। (এটা বাইআতে রিদওয়ানের পূর্বেকার ঘটনা) এই ঘটনার পটভূমি হলো ঃ খায়বারের পার্শ্ববর্তী এক ইহুদী সরদার আবু রাফে' সাল্লাম বিন আবিল হুকাইক ইসলাম বিরোধিতায় এতদূর অগ্রসর হয়েছিল যে, সে বনু গাতফান কবীলাকে মদীনার ওপর হামলার জন্য উস্কানি দিচ্ছিল। হুযূর (সা) তার এই অপতৎপরতার কথা জানতে পেলেন। ৬ষ্ঠ হিজরীর রমযান মাসে তিনি হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আতীক সালামার নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি দল খায়বার প্রেরণ করলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আতীক আবু রাফে'কে নরকে প্রেরণ করে সহীহ সালামতে মদীনা ফিরে এলেন। কিন্তু আবু রাফে'কে হত্যা করেও পরিস্থিতি ঠিক হলো না। কেননা, তার স্থলাভিষিক্ত উসায়ের বিন রাযামও ইসলাম বিরোধিতায় আবু রাফে'র পদাঙ্ক অনুসরণ করে চললো। হুযূর (সা) এই শত্রুতামূলক তৎপরতার খবর পেয়ে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহাকে ঘটনা যাচাইয়ের জন্য প্রেরণ করলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) খুব গোপনভাবে তা যাচাই করে জানতে পেলেন যে, হুযূর (সা) যে খবর পেয়েছেন তা সঠিক। সুতরাং তিনি ফিরে এসে পূর্ণ পরিস্থিতি হুযূরের (সা) সামনে তুলে ধরলেন। তিনি তাঁকে ত্রিশ জন সওয়ারী দিয়ে খায়বার গিয়ে উসায়েরকে নিজের সঙ্গে করে মদীনা নিয়ে আসার হেদায়াত দিলেন। যাতে তার সাথে সামনাসামনি আলোচনা করা যায়। হযরত আবদুল্লাহ (রা) খায়বার গিয়ে উসায়েরের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং তার সঙ্গে এমন কৌশলে আলোচনা করলেন যে, সে ৩০

জন ইহুদীসহ তাঁর সঙ্গে রওয়ানা দিলে পথিমধ্যে এমন কোন বাক্যালাপ হয়েছিল যে, মুসলমান ও ইহুদীদের মধ্যে তরবারী শানিত হয়ে উঠলো এবং উসায়ের সমেত সকল ইহুদী মুসলমানদের হাতে নিহত হলো।

কাজী মুহাম্মাদ সুলায়মান সালমান মানসুরপুরী (র) "রহমাতুললিল আলামীন" গ্রন্থে লিখেছেন যে, এই রক্তারক্তি ভুল বোঝাবুঝির জন্য ঘটেছিল। ইহুদীরা মনে করেছিল যে, মুসলমানরা তাদেরকে হত্যা করতে চায়। অন্য দিকে মুসলমানরা ধারণা করেছিল যে, ইহুদীদের নিয়ত ভালো না। এই খারাব ধারণার ভিত্তিতে উভয় পক্ষ একে অপরের ওপর হামলা করে বসে। মৌলবী সাঈদ আনসারী মরহুম সিয়ারে আনসারে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা ফিরতি সফরে প্রত্যেক ইহুদীর জন্য একজন করে মুসলমান মোতায়েন করেন। উসায়েরের কিছুটা সন্দেহ হলো এবং সে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল মুসলমানরা ধোকাবাজীর অপরাধে সকলের গর্দান উড়িয়ে দিল।

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, বাস্তবিকই উসায়েরের নিয়ত খারাপ ছিল। সে এবং হযরত আবদুল্লাহ (রা) এক উটে সওয়ার ছিলেন। উসায়ের হযরত আবদুল্লাহকে (রা) কতলের ইচ্ছায় তাঁর ওপর দুবার তরবারী চালায়। কিন্তু তিনি বেঁচে যান। যখন সে তাঁর ওপর তৃতীয় দফা তরবারী চালালো তখন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা অথবা তাঁর একজন সঙ্গী হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আনিস জবাবী তরবারী চালিয়ে তার মাথা উড়িয়ে দিল। তাতে তার সঙ্গীরা মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিন্তু সকলেই মারা পড়লো।

হুদায়বিয়ার সন্ধিতে (৬ষ্ঠ হিজরী) কুরাইশদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল যে, পরবর্তী বছর মুসলমানরা মক্কা এসে ওমরাহ আদায় করতে পারবেন এবং তিনদিন অবস্থানের পর ফিরে যাবেন। সুতরাং সপ্তম হিজরীতে প্রিয় নবী (সা) ঘোষণা করে দিলেন যে, মুসলমানরা যেন ওমরাহ পালনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এই নির্দেশ জারি হওয়ার পর সাহাবায়ে কিরাম (রা) সফরের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সপ্তম হিজরী ২রা জিলকদ হুযূর (সা) কাযা ওমরা পালনের জন্য মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন। বস্তুত সন্ধি চুক্তিতে এই শর্ত আরোপিত ছিল যে, মুসলমানরা অস্ত্র ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করবে। এ জন্য সকল অস্ত্র বাতনে বাহন নামক স্থানে রেখে দেয়া হলো। প্রিয় নবীর (সা) দল যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন তখন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা রাসূলের (সা) উটের রশি ধরেছিলেন এবং অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে কবিতা পাঠ করছিলেন।

হযরত ওমর ফারুক (রা) সেই কবিতাকে কিছু কঠিন মনে করলেন এবং তিনি হযরত আবদুল্লাহকে (রা) সম্বোধন করে বললেন, "হ্যাঁ, এমন কবিতা আল্লাহর হারাম শরীফে এবং রাসূলের (সা) সামনে পড়ছো?"

হুযূর (সা) বললেন, "ওমর! আমি আবদুল্লাহর কবিতা শুনছি। আল্লাহর কসম! তাঁর কবিতা মুশরিকদের ওপর তীর এবং খঞ্জরের কাজ করে।"

অতপর তিনি হযরত আবদুল্লাহকে (রা) বললেন, তুমি বলো, "আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি একক। তিনি নিজের বান্দাহকে মদদ করেন এবং তাঁর বাহিনীকে শক্তিশালী করে দিয়েছেন এবং শত্রু সৈন্যকে একাই পরাজিত করেছেন।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) হুযূরের (সা) নির্দেশ মোতাবেক আমল করলেন। এ সময় সকল সাহাবী (রা) আওয়াজ মিলিয়ে এ কথাগুলোর পুনরুল্লেখ করলেন। তাতে এমন গুঞ্জরণ সৃষ্টি হলো যে, পরিবেশ ভীতিপ্রদ হয়ে উঠলো এবং কাফেরদের অন্তর ভয়ে কেঁপে উঠলো।

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর হুযূরে আকরাম (সা) বিভিন্ন বাদশাহ এবং শাসকদের নিকট তাবলীগী দাওয়াতনামা প্রেরণ করেছিলেন। এই সকল চিঠির একটি হযরত হারিছ (রা) বিন উমায়ের ইয়াজদীর হাতে বসরার শাসক হারিছ বিন শামর গাসসানীর নামেও প্রেরণ করেছিলেন। হারিছ (রা) বিন উমায়ের যখন মাওতা নামক স্থানে পৌছলেন তখন সেখানকার রোমক শাসক শুরাহবীল বিন আমর গাসসানী তাঁকে গ্রেফতার করে শহীদ করে ফেলে। কাসিদ অথবা দূতকে হত্যা করা কোন ধর্ম অথবা আইনে বৈধ নয়। হুযূর (সা) নিজের দূতকে মযলুমভাবে শহীদ করার খবর পেয়ে খুব দুঃখ পেলেন। তিনি অষ্টম হিজরীর জমাদিউল উলাতে হারিছ (রা) বিন উমায়েরের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছার নেতৃত্বে তিন হাজার মুজাহিদকে মদীনা থেকে রওয়ানা করে দিলেন এবং ইরশাদ করলেন যে, যুদ্ধে যদি যায়েদ (রা) বিন হারিছা শহীদ হয়ে যান তাহলে জা'ফর (রা) বিন আবী তালিব সেনা বাহিনীর আমীর হবেন। তিনি যদি শহীদ হয়ে যান তাহলে আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা সৈন্যদের নেতৃত্ব দেবেন এবং সেও যদি শহীদ হয়ে যায় মুসলমানরা যাকে যোগ্য মনে করবে তাকে আমীর বানিয়ে নেবে।

সে সময় এক ইহুদীও সেখানে উপস্থিত ছিল। রাসূলের (সা) ইরশাদ শুনে সে বললো যে, অবশ্যই এ তিন জন মারা যাবে। কেননা পূর্বেকার নবীদের কথার এ পরিণামই হতো। তিন বুযুর্গই বললেন, "হুযূর (সা) সত্য নবী। যদি আমাদের ভাগ্যে শাহাদাত লেখা থাকে তাহলে সুন্দর ভাগ্যই বলতে হবে।"

হুযূর (সা) একটি সাদা পতাকা বানিয়ে হযরত যায়েদের (রা) নিকট হস্তান্তর করলেন এবং সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে মদীনা মুনাওয়ারার বাইরে তাশরীফ নিলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা মদীনাবাসীদের নিকট থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন। এ সময় তাঁর পূর্ণ আস্থা ছিলো যে, পুনরায় এই দুনিয়ায় আর এই সব লোকের সঙ্গে সাক্ষাত হবে না। যখন সকলে বিদায় সালাম জানালেন এবং দোয়া করলেন যে, আল্লাহ তোমাকে সহীহ সালামতে ফিরিয়ে আনুন। তখন আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা একবিতা আবৃত্তি করলেন ঃ (অর্থাৎ আমি আল্লাহর নিকট নিজের গুনাহর জন্য ক্ষমা চাই এবং তরবারীর এমন এক মোক্ষম আঘাত কামনা করি যা আবেগকে ঠান্ডা করে দেয়। যাতে ফেনামিশ্রিত রক্ত পানির মত প্রবাহিত হয়। অথবা বর্শার এমন এক আঘাত যা অন্ত্র ও কলিজা ছিঁড়ে-ফুঁড়ে বের হয়ে যায়। এমনকি মানুষ আমার কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে তখন বলে উঠবে যে, আল্লাহ এই গাজীকে হেদায়াত দিয়েছেন এবং সফল করেছেন এবং অবশ্যই সে হেদায়াতের ওপর ছিল।)

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) সাহাবীদের একটি দলের সঙ্গে সেই পবিত্র বাহিনীকে বিদায় দেওয়ার জন্য কিছু দূর গেলেন। মদীনা ত্যাগের পূর্বে তিনি সেই বাহিনীকে শিশু, বৃদ্ধ এবং মহিলাদেরকে হত্যা না করা, তাদের বৃক্ষ না কাটা, তাদের ঘর-বাড়ী ধ্বংস না করা এবং যারা নিজেদের ইবাদাতখানাতে সন্যাসব্রত গ্রহণ করে আছে তাদের সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ না করার তাকিদ দিলেন।

হুযূর (সা) ফিরে গেলেন। এ সময় হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার খুশীতে মন ভরে গেল এবং তার মুখ দিয়ে এই কবিতা বের হয়ে পড়লঃ "সেই সত্ত্বার ওপর শেষ সালাম যাঁকে আমি খেজুর বাগানে বিদায় জানিয়েছি। যিনি সর্বোত্তম বিদায় দানকারী এবং সর্বোত্তম বন্ধু।"

শুরাহবীল বিন আমর গাসসানী মুসলমানদের সৈন্য প্রেরণের খবর পেয়ে মুকাবিলার জন্য খুব জোরে শোরে প্রস্তুতি শুরু করলো এবং সঙ্গে সঙ্গে হিরাক্লিয়াসের নিকট সাহায্য চেয়ে পাঠালো। হিরাক্লিয়াস সে সময় সেই এলাকাতেই বালকা নামক স্থানে একটি বিরাট বাহিনীসহ উপস্থিত ছিল। সে প্রায় এক লাখ রোমক যোদ্ধাকে শুরাহবীলের সাহায্যে প্রেরণ করলো। ইসলামী বাহিনী সিরিয়া সীমান্তে প্রবেশ করে মায়ান নামক স্থানে তাঁবু ফেললো। এ সময় তাঁরা প্রতিপক্ষের ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতির কথা জানতে পেলো। কতিপয় সাহাবী মত প্রকাশ করে বললেন যে, রাসূলকে (সা) পরিস্থিতি

সম্পর্কে অবগত করা দরকার। এ সময় হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা উচ্চস্বরে বলে উঠলেন ঃ "হে লোকেরা! তোমরা কি জন্য ঘাবড়াচ্ছ? তোমাদের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হলো হক পথে নিজেদের জীবনকে কুরবানী করা। মুসলমান কখনো বস্তুগত শক্তি ও জনশক্তির সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে লড়াই করে না। তারা শুধুমাত্র দীনে হকের খাতিরে যুদ্ধ করে। আর তাতেই তাদের সম্মান বৃদ্ধি পায়। সামনে অগ্রসর হও এবং শাহাদাত এবং বিজয় এই দুই সাফল্যের মধ্যে যে কোন একটি অর্জন কর।"

হযরত আবদুল্লাহর (রা) বক্তৃতা সকল মুজাহিদের অন্তরে শাহাদাতের আকাঙ্খার আগুন জ্বালিয়ে দিল। তারা মওতাহ পৌঁছে রোমকদের ভয়াবহ খোদাদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হলো। হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছা বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে শহীদ হয়ে গেলেন। এ সময় হযরত জা'ফর (রা) বিন আবি তালিব ঝান্ডা তুলে নিলেন। তিনিও ৯০টি যখম খেয়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। হুযূরের (সা) ইরশাদ অনুযায়ী তখন আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা সেনাবাহিনীর নেতা হলেন। কথিত আছে যে, তিন দিন পর্যন্ত তিনি কোন খাদ্য গ্রহণ করেছিলেন না। শাহাদাতের কিছুক্ষণ পূর্বে তাঁর সামনে গোশত রাখা হয়েছিল। তা খেয়ে পূর্ণ শক্তিতে লড়াই করার জন্যই এটা করা হয়েছিল। সবেমাত্র প্রথম লোকমা মুখে দিয়েছেন। এমন সময় হযরত জা'ফরের শাহাদাতের খবর শুনলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই লোকমা উগড়ে দিলেন এবং নিজের নফসকে সম্বোধন করে বললেন, জা'ফর (রা) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। আর তুই এখনো দুনিয়া পূজা করছিস। অতপর তরবারী হাতে ঝান্ডা ধরে গাথা পড়তে পড়তে যুদ্ধের ব্যূহে ঢুকে পড়লেন।

লড়াই করতে করতে আঙ্গুলে প্রচন্ড আঘাত লাগলো এবং তা কেটে ঝুলে পড়লো। হযরত আবদুল্লাহ (রা) ঘোড়া থেকে নেমে পা দিয়ে আঙ্গুল দাবিয়ে ধরে হাত হেঁচকা টান দিলেন। এভাবে তা শরীর থেকে পৃথক হয়ে গেল। বেশী রক্ত পড়ায় খুব দুর্বলতা অনুভব করলেন এবং মনে কিছু সংশয় সৃষ্টি হলো যে, কিভাবে লড়াই করবেন। কিন্তু এই সংশয় তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে গেল এবং তিনি নিজের নফসকে সম্বোধন করে বললেন, হে নফস! এই দ্বিধা বা সংশয় যদি স্ত্রীর জন্য হয়ে থাকে তাহলে তাকে তালাক। যদি গোলামদের জন্য হয় তাহলে তারা স্বাধীন। আর যদি বাগান ও কৃষির জন্য হয়ে থাকে তাহলে তা আল্লাহর রাস্তায় সাদকা করছি। অতপর বীরত্বের সঙ্গে গাথা পড়তে পড়তে শত্রু ব্যূহে ঢুকে গেলেন।

দীর্ঘক্ষণ ধরে তিনি তরবারী ও বর্শা দিয়ে লড়াই চালালেন। এমনি সময় শত্রু পক্ষের কোন সিপাহী বর্শা দিয়ে এমন প্রচন্ড আঘাত হানলো যে, উভয়

পক্ষে লড়াইরতদের ব্যূহের মাঝখানে তিনি ঢলে পড়লেন। বুক দিয়ে রক্তের ফোয়ারা ছুটলো। এই রক্ত তিনি মুখে ডললেন এবং মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললেন, "হে মুসলমানরা! নিজের ভাইয়ের গোশত বাঁচাও।" (অর্থাৎ দুশমনরা যেন আমার লাশ বিকৃত না করে) সুতরাং মুসলমানরা তাঁর চার পাশে ঘিরে ধরলো এবং কাফেরদেরকে পিছু হটিয়ে দিল। ইত্যাবসরে তাঁর রূহ আল্লাহর সান্নিধ্যে গিয়ে উপস্থিত হলো।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার শাহাদাতের পর হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ সেনাবাহিনীর আমীর হলেন। তিনি দীনের গাজীদেরকে একত্রিত করে পূর্ণাঙ্গ হামলা চালালেন। তাতে তারা পরাজিত হলো।

সহীহ বুখারীতে হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, যে সময় মওতার ময়দানে মুসলমানরা জীবন-মরণ যুদ্ধে লিপ্ত। সে সময় হাজার হাজার মাইল দূরে মদীনায় প্রিয় নবী (সা) মসজিদে নবুবীর মিম্বারে বসেছিলেন। তাঁর পবিত্র চক্ষু দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল এবং মুখ দিয়ে উচ্চারিত হচ্ছিল এই বাক্য ঃ

"ঝান্ডা নিল যায়েদ (রা) এবং সে শহীদ হয়ে গেল। অতপর জাফর (রা) ঝান্ডা নিল এবং সে শহীদ হয়ে গেল। তারপর আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা ঝান্ডা হাতে নিল এবং সেও শহীদ হলো এরপর আল্লাহর এক অন্যতম তরবারী তা হাতে নিল এবং তাকে বিজয় দান করা হলো।"

তাবকাতে ইবনে সা'দে হযরত আবু মাইসারাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত যায়েদ (রা), জা'ফর (রা) এবং আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা শহীদ হলেন হুযূর (সা) (দাঁড়িয়ে) এই তিনজনের জন্য পৃথক পৃথকভাবে মাগফিরাতের জন্য দোয়া করলেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা রাসূলের (সা) দরবারের অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি হুযূরের (সা) উদ্দেশ্যে ফিদা হওয়ার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকতেন। এ জন্য বিশ্বনবীও (সা) তাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন এবং তাঁর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখতেন। বস্তুত হুযূর (সা) হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহাকে ওহী লিখার দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। এই দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিতেন। তাছাড়াও রাসূলের (সা) দরবারের তিন মশহুর কবির মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। অন্য দু'জন কবি ছিলেন হযরত হাসসান (রা) বিন সাবিত এবং হযরত কা'ব (রা) বিন মালিক। হাফিজ ইবনে আবদুল বার (র) "ইসতিয়াব" গ্রন্থে লিখেছেন, "মুশরিকদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপের খিদমত

আঞ্জাম দেয়ার জন্য আনসারের তিন ব্যক্তি দায়িত্ব নিয়েছিলেন। অর্থাৎ হাসসান (রা) বিন সাবিত, কা'ব (রা) বিন মালিক এবং আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা।" কিন্তু এই তিন বুজর্গ ব্যক্তির ব্যঙ্গ বিদ্রূপের বিষয় ছিল পৃথক পৃথক। আল্লামা ইবনে আসীর "উসুদুল গাবাহ"তে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত হাসসান (রা) বিন সাবিত নিজের কবিতাতে মুশরিকদের হসব-নসবের ওপর এক হাত নিতেন। হযরত কা'ব (রা) বিন মালিক তাদেরকে যুদ্ধের হুমকি দিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখতেন এবং হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা তাদের ওপর কুফুরীর ইলযাম লাগাতেন অর্থাৎ তারা যে গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছে সে জন্য তাদেরকে ভর্ৎসনা করতেন।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, প্রিয় নবী (সা) খন্দকের যুদ্ধ শেষে সাহাবায়ে কিরামকে (রা) সম্বোধন করে বললেন ঃ

"আজকের পর কাফেরদের আর তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সাহস হবে না। কিন্তু তারা তোমাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করবে। এই অবস্থায় তোমাদের মধ্যে কে মুসলমানদের সম্মান রক্ষা করবে।"

হযরত আবদুলাহ (রা) বিন রাওয়াহা তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমি।" সুতরাং তারপর ব্যঙ্গ কবিতা রচনা তাঁর নেশায় পরিণত হলো। তাঁর ব্যঙ্গ বিদ্রূপে কাফিররা খুব অস্থির থাকতো। প্রিয় নবী (সা) বলতেন যে, আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার কবিতা কাফেরদের ওপর তীরের মতো কাজ করে।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা কাফেরদের ব্যঙ্গ ছাড়াও অন্যান্য কবিতা রচনাতেও পারদর্শিতা রাখতেন এবং তিনি উপস্থিত কবিতা রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সহীহ বুখারী এবং অন্যান্য কিতাবে তাঁর অসংখ্য না'ত এবং গাথামূলক কবিতা পাওয়া যায়। রহমতে আলম (সা) হযরত আবদুল্লাহর (রা) কবিতাসমূহ এত পসন্দ করতেন যে, তিনি কয়েকবার নিজের পবিত্র মুখ দিয়ে তাঁর কতিপয় কবিতার পুনরাবৃত্তি করেছেন। আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মসজিদে নবুবী নির্মাণের সময় প্রিয় নবী (সা) তাঁর কবিতা পড়তেন এবং মাটি উঠাতেন। সহীহ বুখারীতে হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, খন্দকের যুদ্ধেও হুযূর (সা) খন্দক খোঁড়া, পাথর ভাঙ্গা এবং মাটি সরানোর কাজে নিজেই অংশ নিয়েছেন। সে সময় তিনি ইবনে রাওয়াহার (রা) কবিতা উচু গলায় পড়তেন। কবিতাটির ভাবার্থ নিম্নরূপ ঃ "ইলাহী! তোমার সাহায্য না হলে আমরা হেদায়াত কোথেকে পেতাম। আমরা না যাকাত দিতাম, না নামায পড়তাম।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ওপর শান্তি নাযিল কর এবং যুদ্ধে আমাদেরকে অটল রাখো। এই শত্রু বিনা কারণে আমাদের ওপর যুলুমের সাথে আপতিত হয়েছে। যখন তারা ফিতনা সৃষ্টি করতে চাইবে তখন আমরা তা অস্বীকৃতি জানাবো।"

হযরত উরওয়াহ (রা) বিন যোবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, মাওতার যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা রাসূলে আকরাম (সা)-এর খিদমতে হাযির হলেন এবং তাঁর নিকট থেকে বিদায় হতে গিয়ে এই কবিতা আবৃত্তি করলেন ঃ (ভাবার্থ)

"আল্লাহ তায়ালা যে সৌন্দর্য ও সৌকর্য আপনাকে প্রদান করেছেন তা কায়েম ও দায়েম থাকুক। যেমন মুসার (আ) সৌন্দর্যকে চিরকালীন রূপ দেয়া হয়েছিল এবং আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সাহায্য করুন যেমন অন্যান্য রাসূলকে করেছিলেন।।

হে মনোনীত রাসূল। আমি আপনার মধ্যে পূর্ণ কল্যাণ প্রত্যক্ষ করেছি। আল্লাহ জানেন যে, আমার অন্তর্দৃষ্টি আমাকে খিয়ানত করেনি। আপনি আল্লাহর নবী। কিয়ামতের দিন যে আপনার সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে তার ভাগ্য বিদীর্ণ হয়ে গেছে।"

কয়েকটি রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, অনেক সময় প্রিয় নবী (সা) আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার নিকট ফরমায়েশ করে কবিতা শুনতেন এবং তার প্রশংসা করতেন। একবার তিনি হুযূরের (সা) নির্দেশে মুশারিকদের বিদ্রূপে কিছু উপস্থিত কবিতা আবৃত্তি করলেন তাতে হুযূর (সা) মুচকি হাসলেন এবং হযরত আবদুল্লাহকে (রা) দোয়া করলেন যে, আল্লাহ যেন তোমাকে অটল রাখেন।

নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা বলেছেন যে, নিজের কবিসুলভ যোগ্যতা এবং আত্মোৎসর্গের আবেগের কারণে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা রাসূলের (সা) কবির লকবে মশহুর হয়েছিলেন।

ইতিহাসে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার শুধুমাত্র ৫০টি কবিতা মাহফুজ রয়েছে। এসব কবিতার অধিকাংশই সীরাতে ইবনে হিশামে পাওয়া যায়।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে ইসলাম গ্রহণে অগ্রগমন, রাসূলের (সা) প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্য, দীনের প্রতি সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ, ইবাদাত ও আল্লাহর যিকরের প্রতি আকর্ষণ,

আল্লাহভীতি, জিহাদ ও শাহাদাতের প্রতি উৎসাহ ইত্যাদি। তিনি নবীর (সা) হিজরতের পূর্বে সেই সময় ইসলাম গ্রহণ করেন যখন ইসলামের নাম নেওয়াও সমগ্র আরবে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর ছিল। প্রিয় নবীর (সা) প্রতি ভালবাসার অবস্থাটা এমন ছিল যে, তাঁর সুশ্রী অবয়ব দর্শনে কোন সময়ই মনের পিপাসা মিটতো না। একবার এক কবিতায় তিনি তাঁকে (সা) সম্বোধন করে অন্তরের আবেগ এভাবে প্রকাশ করেছিলেনঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আপনার মধ্যে যদি প্রকাশ্য নিদর্শন নাও থাকতো তবুও আপনার আলোকোজ্জ্বল চেহারা ও রিসালাতের খবর প্রদান নিজেকে হক রাসুল প্রমাণের জন্য যথেষ্ট ছিল।"

হিজরতের কিছুদিন পর একবার আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সুলূল হুযূর (সা) সম্পর্কে বেতমীযী কথা এবং হুযূরের (সা) হক দাওয়াতের ব্যাপারে কটু-বাক্য করলো। এ সময় হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা লাফিয়ে উঠলেন এবং হুযূরের (সা) পক্ষে লড়াই করে মরার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

রাসূলের আনুগত্য প্রশ্নে এত অধ্যবসায়ী ছিলেন যে, রাসূলের মুখে যা কিছু শুনতেন তা জীবনের তপস্যা বানিয়ে নিতেন এবং সেই কথাকে নিজের ঈমানের অংশ মনে করতেন। কোন চিন্তা-ভাবনা এবং টু শব্দ ছাড়াই রাসূলের (সা) হুকুম তামিল করতেন। স্বয়ং প্রিয় নবী (সা) একবার তাঁর রাসূলের প্রতি আনুগত্যের প্রশংসা করেছিলেন এবং তা বৃদ্ধির জন্য দোয়া করেছিলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার কবিত্ব যে রং ধারণ করে তা দীনের প্রতি তার মর্যাদাবোধেরই পরিচায়ক। নিজের কবিতাতে কাফেরদেরকে ইসলামের নূরে হেদায়াত থেকে চোখ বন্ধ করা এবং কুফর ও শিরকের নাজাসাতে ডুবে থাকায় এমন লজ্জা দিতেন যে, তারা মুখ লুকিয়ে চলা ফেরা করতো। আল্লাহর ইবাদাতে এমন ব্যস্ত থাকতেন যে, পাঞ্জেগানা নামায ছাড়াও নফল নামাযও বেশী বেশী পড়তেন। হাফেজ ইবনে হাজার (র) লিখেছেন, "তিনি একজন বিরাট আবেদ ও যাহেদ ছিলেন। "ঘর থেকে বের হওয়া এবং ঘরে ফেরার সময় দুই রাকায়াত নামায পড়া তাঁর নিয়ম ছিল। সহীহ বুখারীতে আছে যে, আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা প্রচন্ড গরমেও রোযা ভাংতেন না। এমনকি সফরেও রোযা রাখতেন। একবার সফরে রাসূলের (সা) সঙ্গী ছিলেন। সফরে এমনিতেই রোযা না রাখারও অনুমতি থাকে। কিন্তু এই সফরে এত প্রচন্ড গরম ছিল যে, রোযা রাখার ধারণা করাও কষ্টকর ছিল। তা সত্ত্বেও রাসুলে করীম (সা) এবং হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা রোযা ছিলেন।

আল্লাহর যিকরের প্রতিও হযরত আবদুল্লাহর (রা) গভীর আকর্ষণ ছিল। যিকর ও ওয়াযের মজলিসে তিনি আত্মিক আনন্দ পেতেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে,হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা রাসূলের (সা) কোন সাহাবীর সঙ্গে মিলিত হলে তাঁকে বলতেন যে, এসো কিছুক্ষণের জন্য রবের ওপর ঈমান আনি। একদিন এ কথা তিনি একজন সাহাবীকে বললেন। তাতে তিনি খুব রুষ্ট হলেন এবং তিনি হুযূরের (সা) খিদমতে হাযির হয়ে অভিযোগ করে বললেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! ইবনে রাওয়াহাকে দেখুন। তিনি আমাদেরকে সামান্য সময়ের জন্য আল্লাহর ওপর ঈমান আনার দাওয়াত দিয়ে থাকেন। হুযূর (সা) বললেন ঃ "আল্লাহ ইবনে রাওয়াহার ওপর রহম করুন। অবশ্যই সে এমন মজলিস পসন্দ করে যাতে ফেরেশতাও গৌরব করে থাকে।"

মুসনাদে বাইহাকীতে এই রেওয়ায়াত এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা অন্য এক সাহাবীকে (রা) বলেছিলেন যে, এসো সামান্য সময়ের জন্য ঈমান আনয়ন করি। এ কথা শুনে তিনি বললেন, "আমরা কি মুমিন নই?"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বললেন, "নিসন্দেহে আমরা মুমিন। কিন্তু আমরা আল্লাহর যিকর করতে চাই। যা আমাদের ঈমানে অতিরিক্ত বলে বিবেচিত হবে।"

অন্য এক রেওয়ায়াতে হযরত শুরাইহ বিন উবায়েদ (রা) বলেন যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা নিজের সঙ্গীদের মধ্য থেকে কারোর হাত ধরতেন এবং তাঁকে বলতেন যে, এসো কিছুক্ষণের জন্য ঈমান আনি অর্থাৎ ঈমান তাজা করি। অতপর তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যিকরের মজলিসে বসে যেতেন। হযরত আবুদদারদা (রা) আনসারী থেকেও এ ধরনের রেওয়ায়াতই বর্ণিত আছে।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা সব সময় আল্লাহর ভয়ে ভীত এবং তিনি আখিরাতের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতেন। হাফিজ ইবনে কাসীর (র) লিখেছেন, একবার হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা অসুস্থ ছিলেন এবং স্ত্রীর কোলে মাথা রেখেছিলেন। হঠাৎ করে তিনি কাঁদতে লাগলেন। তাঁর স্ত্রীও কাঁদা শুরু করলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি কেন কাঁদছো? তিনি বললেন, আপনাকে কাঁদতে দেখে আমারও ক্রন্দন এসে গেলো। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমারতো আল্লাহর একথা স্মরণ হয়ে গিয়েছিল,

وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا (مريم :٧١)

"তোমাদের মধ্যে কেউই জাহান্নামের ওপর দিয়ে অতিক্রম করা ছাড়া অবশ্যই রেহাই পাবে না। এটা তোমার রবের নিকট জরুরী ও সিদ্ধান্তমূলক।" আমি জানি না যে, সেই জাহান্নাম থেকে আমি রেহাই পাবো কিনা।

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, এই ঘটনা সেই সময় সংঘটিত হয়েছিল যখন তিনি মওতার যুদ্ধে রওয়ানার পূর্বে লোকদের নিকট থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন। তাঁকে ক্রন্দন করতে দেখে লোকেরা জিজ্ঞেস করলো যে, কোন্ কথায় আপনি কাঁদছেন। তিনি জবাব দিলেন যে, দুনিয়ার মুহাব্বত আমার কান্নার কারণ নয়। তোমাদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্নতার দুঃখেও আমি কাঁদিনি। বরং আখিরাতের ভয় আমাকে কাঁদিয়েছে। অতপর তিনি উল্লেখিত আয়াত পাঠ করলেন।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, যখন সুরায়ে আশ-শুয়ারার এই আয়াত নাযিল হলো,

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ - (الشعراء : ٢٢٤)

"আর কবিদের কথা! তাদের পেছনে চলে বিভ্রান্ত লোকেরা"

তখন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা, হাসসান (রা) বিন সাবিত এবং কা'ব (রা) বিন মালিক (এই তিনজনই রাসূলের দরবারের কবি ছিলেন) আল্লাহর ভয়ে কেঁপে উঠলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে হুযূরের (সা) খিদমতে হাযির হয়ে সকলেই আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসুল! যে সময় আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন, তখনতো তিনি জানতেন যে, আমরা সকলেই কবি।" হুযূর (সা) তাঁদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে, তোমরা সেই মানুষ যাদের ব্যাপারে সেই সুরাতেই বলা হয়েছে ঃ

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ۗ - (الشعراء : ٢٢٧)

"যাঁরা ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে এবং বেশী বেশী আল্লাহর যিকর করেছে এবং মযলুম হওয়ার পর তারা তার বদলা নিয়ে নিয়েছে।"

এমনিভাবে সাইয়েদুল মুরসালীন (সা) তাঁদের নিকট পরিষ্কার করে দেন যে, তোমরা সেই কবিদের অন্তর্ভুক্ত নও যাদেরকে গুমরাহ মানুষেরা অনুসরণ করে।

হুযূরের (সা) ইরশাদ শুনে তাঁদের মধ্যে শান্তি ফিরে এলো এবং আনন্দ চিত্তে ঘরে ফিরে গেলেন।

জিহাদের প্রতি হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার এত উৎসাহ ছিল যে, বদর থেকে মওতা পর্যন্ত প্রত্যেক যুদ্ধেই তিনি উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নেন। তিনি প্রত্যেক যুদ্ধে সকল মুজাহিদদের আগে আগে থাকতেন এবং যুদ্ধ শেষ হলে সকলের পর যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসতেন। আল্লাহ পাক তাঁকে শাহাদাত নসীব করান এটা ছিল তাঁর আন্তরিক আকাঙ্খা।

মশহুর সাহাবী হযরত যায়েদ (রা) বিন আরকাম দূর সম্পর্কের ভ্রাতুষ্পুত্র হতেন। শৈশবকালে ইয়াতীম হয়ে গিয়েছিলেন এবং হযরত আবদুল্লাহ তাঁকে লালন-পালন করেছিলেন। মওতার যুদ্ধে ইবনে রাওয়াহার (রা) সঙ্গী ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা মওতার যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হলেন। এ সময় তিনি আমাকে তাঁর পেছনে বসিয়ে নিয়েছিলেন। আমরা সারা রাত সফর করেছিলাম। এ সময় তিনি অত্যন্ত দরদভরা কণ্ঠে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। কবিতাটির ভাবার্থ হলো ঃ

"হে আমার উটনী! তুমি যখন আমাকে ময়দানী এলাকায় চারদিনের দূরত্বে পৌঁছে দিলে তখন নিজের কর্তব্য পালন করলে।

হে আল্লাহ! তোমার শান হলো পুরস্কার প্রদান এবং তুমি সকল আয়েব থেকে পবিত্র। আমাকে আমার পরিবার-পরিজনের মধ্যে ফিরিয়ে এনো না।

এবং মুসলমান এসে গেছেন এবং আমাকে সিরিয়ার মাটিতে ছেড়ে দিয়েছে। এখানেই আমি অবস্থান করতে চেয়েছিলাম। তোমাকে প্রত্যেক নিকটাত্মীয়রা আল্লাহর দিকে যেতে যেতে পরিত্যাগ করে গেছে এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধন শেষ করে ফেলেছে।

এখন আমি ভেজা ও শুকনো খেজুরের খোশা থেকে মুখাপেক্ষীহীন।

আমি এই কবিতা শুনে ক্রন্দন করতে লাগলাম। তাতে হযরত আবদুল্লাহ (রা) দোররাহ উঠিয়ে বললেন, "হে বেওকুফ, তোমার কি অসুবিধা। আল্লাহ যদি আমাকে শাহাদাত নসীব করেন এবং তুমি আমার খান্দানের নিকট আমার উটনীর হাওদা ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।"

আল্লাহ তায়ালা হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার মনের আকাঙ্খা পূরণ এবং মওতার যুদ্ধে তাঁকে শাহাদাতের সৌভাগ্য দান করলেন।

আল্লামা ইবনে আসীর (র) "উসুদুল গাবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, হুযূর (সা) মওতার যুদ্ধে হযরত যায়েদ (রা), জা'ফর (রা) এবং আবদুল্লাহ (রা) বিন

রাওয়াহার শাহাদাতের খবর পেয়ে অশ্রুসজল নেত্রে বললেন ঃ "এরা ছিল আমার ভাই, আমার প্রতি সহানুভূতিশীল এবং আমার সঙ্গে আলোচনাকারী।"

সকল চরিতকারই ধারাবাহিকতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, মানবকূল শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহাকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি তাঁকে সীমাহীন স্নেহ করতেন। হাফেজ ইবনে হাজার (র) "ইসাবাহতে" লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ (রা) একবার কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। এমনকি তিনি অচেতন হয়ে পড়লেন। হুযূর (সা) এ খবর পেয়ে দেখার জন্য গেলেন এবং তাঁর নিকট দাঁড়িয়ে দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ! তার মৃত্যু এসে থাকলে তা আসান কর। নচেত সুস্থ করে দাও।"

বস্তুত তাঁর ভাগ্যে শাহাদাত লিখা ছিল। এ জন্য তিনি সেই কঠিন রোগ থেকে সুস্থ হয়ে উঠলেন।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, প্রিয় নবী (সা) একবার তাঁর প্রশংসা করে বলেছিলেন ঃ "আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা খুব ভাল মানুষ।"

চরিতকাররা হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার পরিবার-পরিজন সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু লিখেননি। অবশ্য ইবনে আসীর (র) লিখেছেন যে, শাহাদাতের সময় তাঁর স্ত্রী ও সন্তান জীবিত ছিলেন। কিন্তু তাঁদের দিয়ে বংশধারা অগ্রসর হয়নি। হযরত আবদুল্লাহ (রা) থেকে কতিপয় হাদীসও বর্ণিত আছে।

হযরত আমর (রা) বিন জামূহ সালামা

তৃতীয় হিজরীর ৬ই শওয়াল সারওয়ারে আলম (সা) ওহোদের যুদ্ধে গমনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এমন সময় বনূ সালমার চার জন যুবক তাঁর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা চার ভাই যুদ্ধে শরীক হচ্ছি। আমাদের পিতা দুর্বল এবং খুব বয়স্ক মানুষ। তাঁর একটি পাও খোঁড়া। কিন্তু তিনিও আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জিদ ধরেছেন। তাঁর ব্যাপারে আপনার কি অভিমত।"

হুযূর (সা) বললেন ঃ তোমাদের পিতা নিজের মা'যূরীর কারণে জিহাদের ফরয আদায়ে বাধ্য নন। তোমরা তাঁকে ব্যাপারটি বুঝাও।

যুবকরা আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তাঁকে অনেক বুঝিয়েছি। কিন্তু তিনি কোন কথাই মানেন না।

প্রিয় নবী (সা) বললেনঃ ঠিক আছে, তোমরা তাঁকে আমার নিকট ডেকে নিয়ে এসোতো।

যুবকরা বাড়ী গেলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন। সে সময় তাঁদের সঙ্গে ছিলেন সাদা রংয়ের ঝাঁকড়া চুল ও সাদা দাড়ি বিশিষ্ট এক বুযুর্গ ব্যক্তি। খোঁড়াতে খোঁড়াতে তিনি এলেন। তিনি ছিলেন তাঁদের পিতা। তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে সারওয়ারে আলম (সা) কে সালাম দিয়ে আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। এই দুর্বলের জন্য কি নির্দেশ?"

হুযূর (সা) মুচকি হেসে অত্যন্ত মিষ্ট স্বরে বললেনঃ "ভাই! আমি শুনেছি যে, আপনিও আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে চান। আপনার নিষ্ঠা এবং ত্যাগের আবেগ আল্লাহর নিকট খুবই পসন্দনীয়। কিন্তু আপনার বয়স এখন যুদ্ধে অংশ নেয়ার মত নয়। তাছাড়া আপনি এক পা'র ব্যাপারে মা'যূরও। এজন্য আপনার ওপর জিহাদে গমনে বাধ্য বাধকতা নেই। আশা করা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে আপনার নিয়তের বিনিময়ে জিহাদের সওয়াব দান করবেন।"

সেই বুযুর্গ অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! এই ছেলেরাও আমাকে জিহাদের ময়দানে গমনে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু আল্লাহর

কসম। আমি আশা করি যে, আমি যদি হক পথে লড়াই করে মারা যাই তাহলে এই পা খসতে খসতে জান্নাতে পৌছে যাবো। আল্লাহর কসম! আমাকে আপনার সঙ্গী হওয়ার অনুমতি দিন।"

হুযূর (সা) তাঁর নিষ্ঠাপূর্ণ আবেগে খুব প্রভাবিত হলেন এবং তাঁর ছেলেদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "পুত্ররা! এখন আর তাঁকে বাধা দিও না। সম্ভবত তাঁর ভাগ্যে শাহাদাতের মর্যাদা প্রাপ্তিই লিখা রয়েছে।"

হুযূরের (সা) ইরশাদ শুনে এই বুযুর্গ ব্যক্তি পুত্রদের সঙ্গে আনন্দের সাথে বাড়ী ফিরে গেলেন। তারপর অস্ত্র হাতে তুলে নিলেন এবং অত্যন্ত নম্র ও বিনয়ের সঙ্গে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দোয়া করলেনঃ "হে আল্লাহ! আমাকে শাহাদাতের নসীব দিও এবং আমাকে নিরাশ করে বাড়ী ফিরিয়ে এনো না।"

তারপর তিনি সোজা প্রিয় নবীর (সা) খিদমতে পৌছলেন এবং অন্য মুসলমানদের সাথে তিনি (সা) সহ যুদ্ধের ময়দানে রওয়ানা দিলেন।

এই বুযুর্গ ব্যক্তি যাঁর ঈমানী আবেগ এবং শাহাদাতের আকাঙ্খা রহমতে আলমকে (সা) এত প্রভাবিত করেছিল যে, তিনি তাঁর বার্ধক্য ও মা'যুরী সত্ত্বেও লড়াইতে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করেছিলেন। তিনি ছিলেন সাইয়েদুল আনসার হযরত আমর বিন জামূহ সালামা (রা)।

সাইয়েদুনা হযরত আমর (রা) বিন জামূহ (বিন যায়েদ বিন হারাম বিন কা'ব বিন গানাম বিন কা'ব বিন সালামা) খাযরাজ গোত্রের শাখা বনূ সালামার সরদার ছিলেন। এক রেওয়ায়াতে আছে যে, জাহেলী যুগে তিনি বংশীয় মূর্তি-খানার মুতাওয়াল্লী ছিলেন। মূর্তিপূজার প্রতি তাঁর এত আকর্ষণ ছিল যে, তাতে তিনি প্রায় পাগল ছিলেন। কাঠের একটি মূর্তি বানিয়ে ঘরে রেখে দিয়েছিলো। সকাল ও সন্ধ্যা তা পূজা করতো এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে তা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতো। তাঁর জীবনের অসংখ্য দিন ও রাত এ অবস্থাতেই অতিবাহিত হয়। এমনকি বার্ধক্যও এসে পড়ে। সেই যুগেই ফারান পর্বতের চূড়ায় রাসূল সূর্য উদিত হয়। তার আলোকচ্ছটায় ইয়াসরাবের অনেক গৃহকেও আলোকিত করে। নবুওয়াতের একাদশ বছরে ৬ জন, দ্বাদশ বছরে ১২ জন এবং ত্রয়োদশ বছরে ৭৫ জন ইয়াসরাবী মক্কা গমন করেন। তারা রহমতে আলমের (সা) খিদমতে হাযির হয়ে ঈমানের নিয়ামত এবং হুযূরের (সা) বাইআত গ্রহণ করে সৌভাগ্যমন্ডিত হন। নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে বাইআতে আকাবায়ে কবীরাতে অংশগ্রহণকারী ৭৫ জন পবিত্র নফসের মধ্যে হযরত আমর (রা) বিন জামূহর যুবক পুত্র মাআযও (রা) ছিলেন। এ সব মানুষ ইসলাম গ্রহণ

করে ইয়াসরাব ফিরে এলে ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা হতে লাগলো। কিন্তু বৃদ্ধ আমর নিজের মূর্তি (মানাত) নিয়ে একদম পাগল প্রায় ছিলেন। তা পরিত্যাগ করা কোন অবস্থাতেই তার সহনীয় ছিল না।

মাআয (রা) বিন আমর এবং বনু সালামার অন্য কতিপয় নওমুসলিম যুবক আমরকে মূর্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য এক মজার ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। তারা রাতে আমরের মূর্তি বাইরে নিয়ে যেত এবং তা অপবিত্র বস্তু দিয়ে লেপ্টে কোন গর্তে উপুড় করে রেখে দিত। সাত-সকালে ঘুম থেকে জেগে আমর মূর্তিকে নিজের স্থানে না পেয়ে খুব গালাগালি এবং চেঁচামেচি করতো। তিনি বলতেন, "তোমাদের সর্বনাশ হোক। জানি না, আমাদের মাবুদকে কে নিয়ে গিয়েছে"। তরপর তার খোঁজে বের হতো। যখন পেতেন তখন তা পরিষ্কার করতেন গোসল দিতেন এবং খোশবু লাগিয়ে যথাস্থানে রেখে দেয়ার সময় বলতেন, "আল্লাহর কসম! তোমার সঙ্গে এই দুর্ব্যবহার কে করেছে তা যদি আমি জানতে পারি তাহলে তার যে কি শাস্তি দিব তা দুনিয়া দেখবে।"

এঘটনা যখন প্রত্যেক দিনই ঘটতে লাগলো তখন একদিন রেগে মূর্তির গলায় তরবারী রেখে বললেন ঃ "আল্লাহর কসম! আমি জানি না যে, তোমার সঙ্গে কে এই বেতমীযী আচরণ করছে। এখন এই তরবারী তোমার নিকট রইলো। তুমি স্বয়ং তা দিয়ে নিজেকে হেফাজত করবে।"

ছেলেরা মূর্তির গর্দানে তরবারী লটকানো দেখে খুব হাসাহাসি করলো। তারা তরবারী নামিয়ে নিজেদের নিকট রেখে দিল এবং মুর্তিকে একটি মৃত কুকুরের সঙ্গে রশিতে বেঁধে বনু সালমার এমন এক কূপের ওপর লটকিয়ে দিল যাতে লোকজন ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ করতো। সকালে আমর তরবারী ও মূর্তি উভয়কেই গায়েব দেখতে পেয়ে খোঁজে বের হলেন। মূর্তিকে যখন কুকুরের সঙ্গে আবর্জনার কূপের ওপর লটকানো দেখলো তখন তার চোখ বিস্ফোরিত হয়ে গেল এবং মূর্তি পূজার ওপর ঘৃণা ধরে গেল। আল্লামা সামহুদী (র) "ওফায়ুল ওফা" গ্রন্থে লিখেছেন যে, এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই রাস্তার মাথায় একজন মুসলমানের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। তাঁর সামনে তিনি কাঁদতে লাগলেন। মুসলমান লোকটি গালাগালি দিল যে, তুমি নিজেকে হাস্যাস্পদ করে রেখেছ। এই মূর্তি কি কাউকে কোন ক্ষতি বা উপকার করতে পারে? আমার কথা যদি শোন তাহলে মূর্তিদেরকে তিন তালাক দিয়ে দাও এবং এক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনো। আমরের (রা) অন্তরে তাঁর কথা প্রভাব বিস্তার করলো এবং তিনি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলেন।

আল্লামা ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আমর (রা) বিন জামূহ একজন ভালো কবি ছিলেন। তিনি নিজের মূর্তির প্রতি বিদ্রূপ করে এই কবিতা লিখেছিলেন ঃ

"আল্লাহর কসম। তুই যদি ইলাহ হতিস তাহলে তুই এবং মৃত কুকুর কূপের মধ্যে এক রশিতে বাঁধা অবস্থা থাকতিসনে।

তোর ওপর অভিসম্পাত ঐ স্থানে পড়ে থাকার জন্য। সেই স্থান কত খারাব স্থান ছিল আমি যদি তোকে সেই খারাব স্থান থেকে খোঁজ করে না আনতাম তাহলে সেখানেই উপুড় হয়ে পড়ে থাকতিস।

আল্লাহ পাক তার পূর্বেই আমাকে রক্ষা করেছেন। নচেৎ কবরের অন্ধকারে আমাকে রেহেন রাখা হতো।

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর যিনি ইহসানকারী, রিযিকদাতা এবং বদলার দিনের মালিক।"

অন্য এক রেওয়ায়াতে হযরত আমর (রা) বিন জামূহর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত মাআয (রা) বিন আমর (রা) যখন আকাবায়ে কবীরার বাইআতের পর ইয়াসরাব ফিরে এলেন তখন তাঁর মাতা হিন্দ (রা) বিনতে আমর বিন হারামও ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত আমর (রা) বিন জামূহ'র কানে পুত্রের ইসলাম গ্রহণের কথা গেল। তিনি তখন স্ত্রীকে বললেন, মাআয সম্ভবত বেদীন হয়ে গেছে। স্ত্রী বললেন, "এমনতো নয়। তবে এটা ঠিক যে, সে নিজের কওমের লোকদের সঙ্গে মক্কা গিয়েছিলো।" আমর পুত্রকে ডেকে পাঠালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন যে, "আমি শুনেছি তুমি মক্কা গিয়ে সেই ব্যক্তির সঙ্গে মুলাকাত করেছ, যে নবী হওয়ার দাবী করে। সেই ব্যক্তি কি দাওয়াত দেয় তা আমাকে বলো।" মাআয (রা) তাঁর জবাবে সুরায়ে ফাতেহার "আস সিরাতুল মুসতাকীম" পর্যন্ত পড়ে শুনালেন। আমর (রা) খুব প্রভাবিত হলেন। বলতে লাগলেন ঃ "এতো খুব উচ্চাঙ্গের বাণী। তাঁর অন্যান্য বাণীও কি এ ধরনের?"

মাআয (রা) বললেন ঃ "অবশ্যই আব্বাজান। কতই না ভাল হতো আপনি যদি তাঁর বাইআত নিতেন। আপনার কওমের বেশীর ভাগ মানুষই তাঁর বাইআত হয়েছেন।"

জবাবে আমর (রা) বললেন, "প্রথমে আমি মানাতের সঙ্গে পরামর্শ করবো এবং সে যে নির্দেশ দেবে সেই হিসেবে আমল করবো।"

বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন যে, মানাতের সঙ্গে তাঁর সওয়াল জওয়াবের অবস্থাটা এমন হতো যে, পরদার আড়ালে একজন ধোকাবাজ মহিলা দাঁড়িয়ে যেতো এবং সে মানাতের পক্ষ থেকে জবাব দিত। হযরত আমরের (রা) স্ত্রী হিন্দ (রা) সেই মহিলাকে সেখান থেকে ভাগিয়ে দিলেন। হযরত আমর (রা) মূর্তির সামনে পৌছলেন। তার প্রতি সম্মান দেখালেন এবং জিজ্ঞেস করতে লাগলেন ঃ "হে আমার মাবুদ! তুমি কি জান না যে, তোমার একজন দুশমন পয়দা হয়ে গেছে। সে আমাদেরকে তোমার ইবাদাতে বাধা দান করে এবং তোমাকে ধ্বংস করার নির্দেশ দেয়। এখন তুমিই বলো আমি কি করবো।"

মোট কথা, এমনিভাবে দীর্ঘক্ষণ কথা বলতে লাগলেন। কিন্তু কোন জবাব পেলেন না। ফলে, তিনি তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন এবং সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা ভেঙ্গে ফেললেন। অতপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন।

আল্লামা ইবনে ইসহাক (র) লিখেছেন যে, হযরত আমর (রা) বিন জামূহ নিজের হেদায়াত প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে একটি কবিতার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। সেই কবিতার ভাবার্থ নিম্নরূপ ঃ

"আমি আমার অতীত জীবনের জন্য আল্লাহর সামনে তওবা করছি এবং আল্লাহর আগুন (দোযখ) থেকে নাজাত চাচ্ছি। আল্লাহর পুরস্কারে আমি তার হামদ ও ছানা করছি। তিনিই বাইতুল হারাম এবং তার পরদার মাবুদ।

আমি আল্লাহরই তাসবীহ ও পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আসমান থেকে নিপতিত কাতরা ও অব্যাহতভাবে বর্ষিত বৃষ্টির পরিমাণের মত সেই পবিত্রতা।

আমি গোমরাহী পঙ্কে নিমজ্জিত ছিলাম। মানাত এবং অন্যান্য পাথরের ইবাদাত করতাম। সেই আল্লাহ পাক আমাকে হেদায়াত দিয়েছেন।

বৃদ্ধকালে যখন আমার মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে, তখন আল্লাহ আমাকে মূর্তি পূজার লজ্জাকর আয়েব থেকে মুক্তি দিয়েছেন। গোমরাহীর অন্ধকার আমাকে ধ্বংস করে ফেলতো, আল্লাহ পাক নিজের হাতে আমাকে বাঁচিয়েছেন।

যতক্ষণ আমার নিশ্বাস আছে ততক্ষণ আমি সেই আল্লাহর হামদ ও শুকরিয়া আদায় করতে থাকবো। যিনি সকল সৃষ্টি এবং জালেমদের মালিক।

এই কবিতা আমি এ জন্য রচনা করেছি যে, আমি আল্লাহর গৃহে তাঁরই প্রতিবেশী হয়ে যাবো।"

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হলো হযরত আমর (রা) নিজের পুত্রদের সঙ্গে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে তাতে শরীক হলেন এবং খুব বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। সহীহ মুসলিমে আছে যে, এই যুদ্ধে যে দুই যুবক আবু জেহেলকে হত্যা করেন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত মাআয (রা) বিন আমর জামূহ। (অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় চরিতকার এই রেওয়ায়াত সম্পর্কে ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন এবং লিখেছেন যে, আবু জেহেলকে হত্যাকারী যুবক ছিলেন মাআয (রা) বিন আফরা) কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আমর (রা) বিন জামূহ বদরের যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। কেননা পা খোঁড়া এবং বার্ধক্যের কারণে পুত্ররা তাঁকে যুদ্ধের ময়দানে গমনে বাধা দিয়েছিলেন। ওহোদের যুদ্ধের সময়ও একই অবস্থা হয়েছিল। কিন্তু এবার হযরত আমর (রা) যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য এত পীড়াপীড়ি করলেন যে, প্রিয় নবী (সা) তাঁকে যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়ে দিলেন।

হযরত আমর (রা) পুত্রদের সঙ্গে উৎফুল্ল চিত্তে যুদ্ধের ময়দানে পৌছলেন। ঘটনাক্রমে একটি ভুলের জন্য যুদ্ধের চিত্র পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং মুসলমানদের মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দিল। তখন হযরত আমর (রা) স্বীয় পুত্র খাল্লাদকে সঙ্গে নিয়ে হাতের তরবারী ধরে মুশরিকদের ব্যূহে ঢুকে পড়লেন। পিতা-পুত্র উভয়েই খুব বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করলেন। কিন্তু অবশেষে মুশরিকরা তাঁদেরকে ঘিরে ফেলে শহীদ করে ফেললো।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আমর (রা) বিন জামূহ'র সঙ্গে তাঁদের এক ওফাদার গোলাম সলিমও (রা) ছিলেন। সে নিজের প্রভুর সঙ্গে অত্যন্ত বাহাদূরীর সঙ্গে যুদ্ধ করে অবশেষে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করলেন। মুশরিকদের পিছু হটার পর বিশ্ব নবী (সা) সেদিক দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন আমর (রা) বিন জামূহকে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে বললেন : "আল্লাহর কিছু বান্দাহ এমন আছে তারা কোন কসম খেলে আল্লাহ তা পূরণ করে দেন। আমরও (রা) সেই সব বান্দাহদের একজন। আমি দেখছি যে, সে জান্নাতে চলা ফেরা করছে এবং তার খোঁড়া পা ঠিক হয়ে গেছে।"

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হুযূর (সা) ফরমায়েছেন : "আমি আমরকে (রা) জান্নাতে খোঁড়া পা সমেত চলা-ফেরা করতে দেখেছি।"

এই যুদ্ধে হযরত আমরের (রা) নিসবতি ভাই (তাঁর স্ত্রী হিন্দের (রা) ভাই) হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আমর বিন হারামও শাহাদাত প্রাপ্ত হন। হযরত হিন্দ (রা) স্বামী, পুত্র ও ভাইয়ের শাহাদাতের খবর শুনে জিজ্ঞেস করলেন :

"রাসূলুল্লাহ (সা) ঠিক-ঠাক আছেন তো?" লোকজন যখন ইতিবাচক জবাব দিলেন তখন ধীরে ধীরে তার খিদমতে পৌঁছে আরয করলেন ঃ "আপনি ঠিক থাকলে সব মুসিবতই তুচ্ছ ব্যাপার।"

হযরত হিন্দ (রা) একটি উট সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাতে স্বামী, পুত্র এবং ভায়ের লাশ বোঝাই করে মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রা) সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তিনি অন্য কতিপয় মহিলার সঙ্গে রাসূলের (সা) খবর নেয়ার জন্য ওহোদের ময়দানের দিকে আসছিলেন। (সে সময় পরদার আয়াত নাযিল হয়নি) উম্মুল মুমিনীন (রা) হিন্দের (রা) নিকট হুযূরের (সা) খাইরিয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, "আলহামদু লিল্লাহ হুযূর (সা) ভাল আছেন। এবং এসব লাশ হলো আমার স্বামী, ভাই এবং পুত্রের। তাঁরা যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করেছেন। ইত্যবসরে উট মাটির ওপর বসে পড়লো। সে আর কোনক্রমেই মদীনার দিকে পা বাড়ালো না। উম্মুল মুমিনীন (রা) বললেন, "সম্ভবত বোঝা বেশী হয়েছে।"

হিন্দ (রা) আরয করলেন, "না, উম্মুল মুমিনীন (রা)! এর ওপরতো এর চেয়েও বেশী বোঝা উঠানো হয়।" অবশেষে তিনি উট উঠিয়ে মুখ ওহোদের দিকে করলেন। তৎক্ষণাৎ সে সেদিকে রওয়ানা দিল।

হিন্দ (রা) তিন শহীদের লাশই প্রিয় নবীর (সা) খিদমতে নিয়ে গেলেন। সে সময় তিনি অন্য শহীদদের লাশ দাফন করাচ্ছিলেন। তিনি হিন্দকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় তাঁদের মধ্য থেকে কেউ কি কিছু বলেছিলেন?"

হিন্দ (রা) আরয করলেন, "হাঁ, আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় দোয়া করেছিলেন যে, হে আল্লাহ, আমাকে শাহাদাত নসীব করো এবং আমাকে নিরাশ অবস্থায় পরিবার-পরিজনের মধ্যে ফিরিয়ে এনো না।"

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, সে সময় হুযূর (সা) ইরশাদ করেছিলেন যে, আনসারদের মধ্যে এমন মানুষও আছে যে, সে কসম খেলে আল্লাহ তাঁর কসম পূর্ণ করে দেন। আমর বিন জামূহ এমন লোকই ছিলেন।

তারপর হুযূর (সা) তিন শহীদকে ওহোদের গাঞ্জে শহীদানে নিজের সামনে দাফন করালেন এবং তাঁদের জন্য মাগফিরাত কামনা করলেন। আল্লামা ইবনে আসীর (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আমর (রা) বিন জামূহ এবং হযরত

আবদুল্লাহ (রা) বিন আমর বিন হারামকে একই কবরে দাফন করা হয়েছিল। এক রেওয়ায়াতে আছে যে, ৬ মাস পর হযরত আবদুল্লাহর (রা) পুত্র হযরত জাবের (রা) পিতার লাশকে অন্য স্থানে সরানোর জন্য কবর খুঁড়লে হযরত আমর (রা) বিন জামূহ এবং হযরত আবদুল্লাহর (রা) লাশ সম্পূর্ণ তরতাজা ও তাঁদের ওপর একটি করে খেজুরও পেলেন। সেই ঘটনার ৪৬ বছর পর একবার পুনরায় ওহোদের কবর খোঁড়ার প্রয়োজন হলে সকল শহীদদের লাশই তরতাজা পাওয়া গিয়েছিল।

হযরত আমর (রা) বিন জামূহ যদিও শেষ বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং মাত্র তিন বছরের মত ইসলামের যুগ পেয়েছিলেন। কিন্তু একনিষ্ঠার কারণে তিনি মহান সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। অধিকাংশ চরিতকার জানিয়েছেন যে, তিনি অত্যন্ত সাদা-সিধে প্রকৃতির এবং উদার বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর দান ও উদারতা সম্পর্কে হুযূরেরও (সা) স্বীকৃতি রয়েছে। বস্তুত অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, একবার বনূ সালামার কিছু মানুষ প্রিয় নবীর (সা) খিদমতে হাযির হলেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তোমাদের সরদার কে?" তাঁরা আরয করলো ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের নেতা হলো জাদ বিন কায়েস। সে একজন বখীল মানুষ।"

হুযূর (সা) বললেন ঃ "বখীলীর চেয়ে খারাব বস্তু আর নেই। আজ থেকে তোমাদের সরদার সাদা বাবরী চুলওয়ালা আমর (রা) বিন জামূহ।"

সেই দিন থেকেই তিনি বনূ সালামার সরদার হয়ে গেলেন এবং লোকজন তাঁকে সাইয়েদুল আনসার বলতে লাগলেন। তিনি সরদার হওয়ায় বনূ সালামা এত খুশী হয়েছিলো যে, তাঁরা সেই ঘটনায় গৌরবমূলক কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন।

হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল আনসারী

রাসূলের (সা) দরবারে একদিন লম্বাদেহী, আলোকোজ্জ্বল চেহারা, বড় বড় চোখ ও ফর্শা রং বিশিষ্ট এক নওজোয়ান উপস্থিত ছিলেন। তিনি খুব মনোযোগ ও আন্তরিকতার সঙ্গে রহমতে আলমের (সা) ইরশাদসমূহ শুনছিলেন। তিনি যখন হুযূরের (সা) ইরশাদের জবাবে কিছু আরয করছিলেন তখন মনে হচ্ছিল যে, তাঁর দাঁত থেকে যেনো আলোর রশ্মি বের হচ্ছে। হুযূর (সা) তাঁর হাত নিজের পবিত্র হাত দিয়ে ধরে বললেন ঃ "আমি তোমাকে খুব ভালবাসি।"

যুবকটি খুশীতে আত্মহারা হয়ে আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমিও আপনাকে অত্যন্ত ভালবাসি এবং আপনি আমার নিকট দুনিয়ার সকল বস্তু থেকেও প্রিয়।"

সাইয়েদুল মুরসালীন (সা) মুচকি হেসে বললেন ঃ "ঠিক আছে। তুমি সকল নামাযের পর এই দোয়া পড়তে কখনো ভুল করবে না ঃ

ربى اعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

"হে আল্লাহ! তোমার যিকর, শুকর ও ইবাদাত ভালভাবে করার জন্য আমাকে সাহায্য করো।"

তিনি আরয করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার ইরশাদের ওপর সব সময় আমল করবো এবং অন্যদেরকেও তার ওপর আমলের জন্য ওসিয়ত করবো।"

এই ভাগ্যবান যুবক ছিলেন সাইয়েদুনা হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল আনসারী।

সাইয়েদুনা আবু আবদুর রহমান মাআয (রা) বিন জাবাল মানব শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফার (স) মহান মর্যাদাসম্পন্ন অন্যতম সাহাবী ছিলেন। একদিকে তিনি যেমন ছিলেন হক পথের এক অত্যুৎসাহী মুজাহিদ ও উন্নত চরিত্র বিশিষ্ট মানুষ। অন্যদিকে ছিলেন ইলম ও ফযীলতের গভীর সমুদ্র। ইলম ও ফযীলতের দিক দিয়ে তাঁকে মাজমাউ'ল বাহ্‌রাইন বলা হতো। তিনি আলেমে রাব্বানী, কানযুল উলামা এবং ইমামুল ফোকাহা লকবে ভূষিত ছিলেন।

হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল আনসারের খাযরাজ গোত্রভুক্ত ছিলেন এবং তিনি তার শাখা উয়াই বিন সাআদের ছিলেন চোখের মনি। তাঁর নসবনামা হলো ঃ

মাআয বিন জাবাল বিন আমর বিন আওস বিন আয়েয বিন আদি বিন কা'ব বিন আমর উয়াই বিন সাআদ বিন আলী বিন আসাদ বিন সারদাতা বিন ইয়াযীদ বিন জাশম বিন খাযরাজ আকবার।

হযরত মাআযের (রা) তখন যৌবনকাল। কতিপয় ইয়াসরাবীর নিকট কিছু আশ্চর্য ধরনের কথা শুনলেন। তাঁরা মাআযকে (রা) বললেন যে, মক্কায় এক নবী প্রেরিত হয়েছেন। তিনি শিরক ও মূর্তি পূজার নিন্দা করেন এবং লোকদেরকে এক আল্লাহর পূজা করার শিক্ষা দিয়ে থাকেন। যুবক মাআযকে (রা) আল্লাহ তায়ালা সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। তিনি এসব কথায় খুব প্রভাবিত হলেন। নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরে হযরত মাসআব (রা) বিন উমায়ের ইসলামের প্রথম দায়ী হিসেবে যখন ইয়াসরাব তাশরীফ নিলেন এবং লোকদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন, হযরত মাআয (রা) তৎক্ষণাৎ তাঁর খিদমতে হাযির হলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর।

পরবর্তী বছর (নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে) পাঁচশ' ইয়াসরাবীর একটি কাফেলা হজ্বের জন্য মক্কা রওয়ানা হলেন। এই কাফেলায় ৭৫ জন এমন ব্যক্তিও ছিলেন (৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা) যাঁরা ইতিমধ্যেই মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কাফেলার অন্য সদস্যরা তা জানতো না। সেই হক পথের যাত্রীদের মধ্যে হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল অন্যতম ছিলেন। মক্কা পৌঁছে এই ৭৫ জন এক রাতে অতি সংগোপনে আকাবা উপত্যকায় একত্রিত হলেন। রহমতে আলম (সা) হযরত আব্বাস (রা)-এর সমভিব্যাহারে তাঁদের নিকট তাশরীফ নিলেন। কিছুক্ষণ সওয়াল-জওয়াব হতে থাকলো। তাঁর পর তাঁরা সবাই হুযূরের (সা) নিকট বাইআত করলেন এবং সেই ওয়াদার সঙ্গে সঙ্গে হুযূরকে (সা) ইয়াসরাব তাশরীফ নেওয়ার দাওয়াত দেন। তাঁরা নিজেদের জান, মাল এবং সন্তান দিয়ে তাঁর হেফাজত ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এটা এমন একটি প্রতিশ্রুতি ছিল যা বাস্তবায়নের অর্থই ছিল সমগ্র আরবের প্রতি শত্রুতার আহবান জানানো।

হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল অন্যান্য ইয়াসরাবী হকপন্থীদের সঙ্গে প্রিয় নবীর (স) নিকট বাইআত গ্রহণ করে ইয়াসরাব ফিরে এলেন। তখন তাঁর ঈমানী উৎসাহ-উদ্দীপনার সীমা পরিসীমা ছিল না। এটা ছিল তাঁর পূর্ণ

যৌবনকাল। স্বপ্ন আর আশা-আকাঙ্খার সময়। কিন্তু তাঁর একটিই মাত্র আকাঙ্খা ছিল। তিনি চাইতেন যে, ইয়াসরাবের মুশরিকরা মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে খান খান করে ফেলুক এবং প্রতিটি শিশু ইসলামের আস্তানায় মাথা ঝুঁকিয়ে দিক। সুতরাং যখন তাঁর প্রতিবেশী বনূ সালামা খান্দানের যুবক মুসলমানরা নিজের গোত্রের মূর্তিদেরকে ভাঙ্গার জন্য বের হলেন তখন হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল তাঁদের মধ্যে অগ্রগামী ছিলেন। বনূ সালামা খান্দানের সরদার আমর বিন জামূহর ছিল মূর্তি পূজার প্রতি প্রচন্ড আকর্ষণ। তিনি কাঠের একটি মূর্তি বানিয়ে স্বগৃহে রেখেছিলেন এবং সকাল-সন্ধ্যা তার পূজা করতেন। হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল এবং বনূ সালমা খান্দানের নওমুসলিম যুবকরা আমর বিন জামূহর মধ্যে মূর্তির ব্যাপারে ঘৃণা সৃষ্টির জন্য এক মজার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। তারা রাতে আমরের মূর্তি বাইরে নিয়ে যেত এবং ময়লা আবর্জনা মাখিয়ে কোন গর্তে নিক্ষেপ করতো। আমর সকালে ঘুম থেকে জেগে যথাস্থানে মূর্তি না পেয়ে খুব পেরেশান হয়ে তার সন্ধানে বাড়ী থেকে বের হতো। যখন পেতেন তখন তার থেকে নাজাসত বা ময়লা আবর্জনা দূর করতেন, গোসল করাতেন এবং খোশবু লাগিয়ে পুনরায় তা নিজের স্থানে এনে রেখে দিতেন। প্রায়ই যখন এ ধরনের ঘটনা ঘটতে লাগলো তখন তিনি খুব বিরক্ত হলেন। এক রাতে ঘুমানোর পূর্বে মূর্তির গর্দানে তরবারী লটকিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ "আল্লাহর কসম! আমি জানি না কে তোমার সঙ্গে এই বেআদবী করে। এখন তোমার নিকট তরবারী রইলো। নিজের হেফাজত নিজে করবে।"

যুবকরা মূর্তির ঘাড়ে তরবারী দেখে খুব মজা পেল। তারা তরবারী নামিয়ে নিজেদের দখলে নিল এবং মূর্তিকে একটি মৃত কুকুরের সাথে বেঁধে ময়লায় ডুবিয়ে একটি কূপের ওপর লটকিয়ে দিল। সকালে আমর মূর্তিকে তরবারী সমেতই গায়েব দেখলো। তিনি খুব তাড়াতাড়ি তার সন্ধানে বের হলেন। যখন মূর্তিকে মৃত কুকুরের সঙ্গে ময়লা-আবর্জনার কূপের ওপর লটকানো দেখলেন তখনই তাঁর চোখ বিস্ফোরিত হয়ে গেল এবং মূর্তি পূজার ব্যাপারে প্রচন্ড ঘৃণা সৃষ্টি হলো। বাড়ী ফিরছিলেন ঠিক এমনি সময়ে একজন মুসলমানের সঙ্গে সাক্ষাত হলো। তিনি তাঁকে ভর্ৎসনা করলেন। তিনি বললেন, আপনি শুধুমাত্র নিজেকে বিদ্রূপের পাত্র বানিয়ে রেখেছেন। যে মূর্তি নিজের হেফাজত করতে পারে না সে কি করে অন্যের লাভ এবং ক্ষতি করতে পারে। আমর বিন জামূহর কোন জবাব ছিল না। সে সময়ই তিনি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়ে দিলেন।

হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল এবং তাঁর ভাগ্যবান সঙ্গীরা দিন-রাত একাজ করেই কাটাচ্ছিলেন। এমন সময় কয়েক মাস পর রহমতে আলম (সা) মক্কার মাটিকে বিদায় জানিয়ে ইয়াসরাবে তাশরীফ রাখলেন। হুযূরের (সা) পবিত্র পদস্পর্শে সেই দু' হাজার বছরের প্রাচীন শহরের ভাগ্য খুলে গেল। তার গলি কুচায় রিসালাতের সুরভিত বায়ু প্রবাহিত হতে লাগলো এবং এই ইয়াসরাব নবীর শহর বা মদীনাতুননবীতে পরিণত হলো। আনন্দে হযরত মাআয (রা) বিন জাবালের পা মাটিতে আর পড়ে না। লাইলাতুল আকাবাতেই হাশেমী রাসূলের (সা) জন্য মন-প্রাণ উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। এখন তিনি হুযূরে আকরামের (সা) আস্তানাতেই পড়ে থাকতে লাগলেন। সামান্য সময়ের জন্য বিচ্ছিন্ন হওয়াও তাঁর জন্য খুবই কষ্টকর ছিল। তাঁর (সা) দয়া ও স্নেহের বৃষ্টি তার ওপর ঝমাঝম বর্ষিত হতে লাগলো। তিনি দিন রাত নবীর (সা) ফয়েয লাভ করতে লাগলেন। এমনকি তাঁর সিনা আল্লাহর কালাম (কুরআনে হাকীম) এবং নবীর (সা) ইরশাদের খনি এবং এক জগত তাঁর জ্ঞানের গভীরতার প্রশংসাকারী হয়ে গেল।

হিজরতের কয়েক মাস পর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন কায়েম করা হলো। হুযূর (সা) এ সময় হযরত মাআয (রা) বিন জাবালকে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদের দীনী ভাই বানালেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা আগমন করেন তখন তাঁকে হযরত মাআযই (রা) নিজের কাছে রাখেন। আল্লাহর কুদরত এ দু' ভাইয়ের দীন সম্পর্কে এত জ্ঞান হয়েছিল যে, একজন ইমামুল ফুকাহা এবং অন্যজন ফকিহুল উম্মাত লকবে মশহুর হন।

সহীহ বুখারীতে আছে যে, হুযূর (সা) যুবক মাআয (রা) বিন জাবালকে বনূ সালামার মসজিদের ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন। আল্লামা শিবলী নুমানী (র) সীরাতুন্নবী (সা) গ্রন্থে সহীহ মুসলিমের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, রাসূলে আকরাম (সা) (হযরত আবু মাসউদ আনসারীর (রা) রেওয়ায়াত অনুযায়ী) ইমাম নির্বাচনের জন্য এই নীতি নির্ধারণ করেছিলেন : "যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহর কিতাব পড়েছে সে-ই জামায়াতে ইমামতি করবেন। তাতে যদি সকলেই সমান সমান হন তাহলে যে সুন্নাত সম্পর্কে বেশী ওয়াকিফহাল হবেন তিনিই ইমামতি করবেন। এতেও যদি সকলে সমান হন তাহলে যিনি প্রথম হিজরত করেছিলেন। আর তাতেও যদি সকলে সমান হন তাহলে যাঁর বয়স বেশী হবে।"

বনূ সালামার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সাহাবীদের তালিকার ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ

করলে দেখা যাবে যে, তাদের মধ্যে অনেক বয়স্ক সাহাবীও রয়েছেন। তার বিপরীত হযরত মাআয (রা) সম্পূর্ণরূপে যুবক ছিলেন এবং তিনি মুহাজিরও ছিলেন না। এ কারণে তিনি নিশ্চয়ই সকলের চেয়ে কুরআন শরীফ বেশী পড়েছিলেন। ফলে তাঁকে ইমামতের পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। অথবা তিনি সুন্নাত সম্পর্কে বেশী ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাঁর চরিত পাঠ করলে জানা যায় যে তিনি কুরআন ও সুন্নাতের মহাসমূদ্রসম আলেম ছিলেন। অব্যাহতভাবে নবীর (সা) ফয়েয লাভের কারণেই এটা সম্ভব হয়েছিল। বাস্তবত হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল অন্যতম সেই মহান সাহাবী ছিলেন যাঁরা নবীর (সা) দরবার থেকে ইলম অর্জনে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। সফর হোক অথবা মুকীম সকল অবস্থাতেই নবীর (সা) ফয়েয থেকে উপকৃত হওয়ার কোন সুযোগই তিনি হাত ছাড়া হতে দেননি।

যুদ্ধের সিলসিলা শুরু হলে বদর থেকে নিয়ে তাবুক পর্যন্ত এমন কোন যুদ্ধ ছিল না যাতে হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল রাসূলের (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেননি। তিনি শুধু একজন উত্তম আলেমই ছিলেন না বরং হক পথে জীবন উৎসর্গকারী একজন মুজাহিদও ছিলেন। প্রতিটি যুদ্ধেই পূর্ণাঙ্গের বাহাদুরী ও অটলতা প্রদর্শন করেছিলেন এবং এটা প্রমাণ করেছিলেন যে, ইলম ও ফযলের সঙ্গে সঙ্গে তিনি যুদ্ধের ময়দানেরও অশ্বারোহী। তাঁর ফযীলত বা মর্যাদার জন্য বাইআতে আকাবায়ে কবীরাহতে অংশ গ্রহণই কম ছিল না। বদর, বাইআতে রিদওয়ান, তাবুক এবং অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ তাঁর মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করেছিল। আল্লামা ইবনে সা'দ (র) বর্ণনা করেছেন যে, মক্কা বিজয়ের পর হুযূর (সা) হুনাইনের জন্য রওয়ানার প্রাক্কালে হযরত মাআয (রা) বিন জাবালকে মক্কার আমীর বানিয়েছিলেন। তিনি মক্কাবাসীদেরকে দীনী মাসয়ালা এবং কুরআন তালীম দিতেন। হুনাইন এবং তায়েফ থেকে ফারেগ হয়ে হুযূর (সা) মদীনা মুনাওয়ারা তাশরীফ নিলেন। এ সময় হযরত মাআযকে (রা) নিজের কাছে ডেকে নিলেন এবং তাঁর স্থলে হযরত আত্তাব (রা) বিন আসীদকে মক্কার ইমারতে নিয়োগ করলেন।

হযরত মাআয (রা) বিন জাবালের কিছু দিন যাবত মক্কার আমীরের পদে বহাল থাকার সত্যতা মুসতাদরাকে হাকিমের এক রেওয়ায়াতেও পাওয়া যায়। বস্তুত তিনি হুযূরের (সা) নির্দেশ মুতাবেক মক্কাতে অবস্থান করেছিলেন। এ জন্য এটা ধারণা করা ভুল হবে না যে, তিনি হুনাইন ও তায়েফের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সওয়াব এবং মালে গনীমতের অংশও অবশ্যই পেয়েছিলেন।

তাবুকের যুদ্ধ রাসূলের (সা) যুগের সর্বশেষ যুদ্ধ ছিল। এই যুদ্ধে রাসূলে

আকরাম (সা) ত্রিশ হাজার জীবন উৎসর্গকারীকে সঙ্গে নিয়ে তিনশ মাইলের কঠিন সফর শেষে তাবুক তাশরীফ নিয়েছিলেন। বনূ সালামার একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য কা'ব (রা) বিন মালিক আনসারী শুধুমাত্র অলসতার কারণে হযূরের (সা) সঙ্গী হওয়ার মর্যাদা লাভ থেকে অকৃতকার্য হন। তাবুক পৌঁছে হযূর (সা) তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। বনূ সালমার এক ব্যক্তি আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল। সম্পদ এবং সূরত তাকে যুদ্ধে আগমনে বাধা দিয়েছে।"

হযরত মাআয (রা) বিন জাবালও নিকটেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি এ কথা শুনে সামনে অগ্রসর হয়ে আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল। আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমি যতটুকু জানি তাতে বলতে পারি যে, কা'ব একজন ভাল মানুষ। আমরা কখনো তার মধ্যে কোন খারাব জিনিস দেখিনি।"

হযরত মাআযের (রা) কথা শুনে হযূর (সা) চুপ হয়ে গেলেন এবং কা'বের (রা) ব্যাপারে আর কিছু বললেন না।

এ ঘটনা মাআযের (রা) নেক নফস ও হক কথনের প্রমাণ দেয়। হযরত কা'ব (রা) প্রকৃতই ভাল মানুষ ছিলেন এবং হযূরের (সা) প্রতি তাঁর কম ভালবাসা ছিল না। শুধু মাত্র আলসেমী তাঁকে তাবুকে গমনে বাধা দিয়েছিল। তারই পরিণামে তাঁকে ৫০ দিনের বিচ্ছিন্নতার শাস্তি ভোগ করতে হয়। সে সময় তিনি যে ধৈর্যের পরিচয় দেন তা একজন ভাল মানুষের নিকট থেকেই আশা করা যেতে পারে।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) লোকদেরকে সঙ্গে নিয়ে তাবুকের যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হলেন। ভোর হলে তিনি তাঁদের ফজরের নামায পড়ালেন। লোকজন নামায পড়ে সওয়ার হয়ে গেলেন। যখন সূর্য উঠলো তখন লোকজন রাত্রি জাগরণের কারণে ঝিমুচ্ছিলেন। অবশ্য আমি আমার সওয়ার রাসূলের (সা) সওয়ারীর পিছনে লাগিয়ে রেখেছিলাম। অন্যান্যদের সওয়ার চলছিল এবং তাদেরকে এদিক-ওদিকের রাস্তায় নিয়ে গেল। সেই সময় হযূরের (সা) পেছনে চলমান আমার উটনী ঠোকর খেল। আমি তাঁর লাগাম টেনে ধরতে চাইলাম। তাতে তার গতি আরো বেড়ে গেল। এমনকি তার কারণে রাসূলের (সা) উটনীও জোরে চলতে লাগলো। তিনি (সা) চেহারার ওপর থেকে কাপড় ওঠালেন। এ সময় তিনি দেখলেন যে, সকল সৈন্যের মধ্যে সবচেয়ে নিকটবর্তী হলাম আমি। তিনি আওয়াজ দিলেন ঃ "হে মাআয!" আমি আরয করলামঃ

"হে আল্লাহর নবী! আমি হাযির রয়েছি।" তিনি বললেন, "আরো নিকটে এসো।"

আমি তাঁর আরো নিকটে গেলাম। এমনকি আমার সওয়ারী তাঁর সওয়ারীর সঙ্গে সম্পূর্ণ এক হয়ে গেল। তিনি বললেন, তাঁর ধারণা ছিল না যে, লোকজন তাঁর থেকে এত দূরে রয়েছে। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কিছু মানুষ তো ঝিমুচ্ছিল। এ জন্য তাদের সওয়ারী চলছিল এবং চলছিল এবং তাদেরকে নিয়ে এদিক-ওদিক চলে গেল। তিনি (সা) বললেন, তিনিও ঝিমুচ্ছিলেন। আমি যখন দেখলাম যে, তিনি আমার প্রতি খুশী রয়েছেন এবং মওকাটাও নির্জনত্বের। এ সময় আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! অনুমতি হলে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। এই ব্যাপারটি আমাকে অসুস্থ এবং দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।

তিনি বললেন, "ঠিক আছে, তোমার যা ইচ্ছা তাই জিজ্ঞেস করতে পার।" আমি আরয করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! এমন কোন কাজের কথা বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। এছাড়া আর আমি আপনার নিকট কিছু জিজেস করবো না।"

তিনি বললেন, "বাহ, বাহ, তুমি বিরাট কথা জিজ্ঞেস করেছ।" এ কথাটি তিনি তিনবার পুনরুক্তি করলেন এবং বললেন, হাঁ, যার জন্য আল্লাহ ভাল চান তার জন্য কোন কিছু কঠিন নয়। তিনি প্রতিটি কথাই আমার নিকট তিনবার পুনরুল্লেখ করলেন। এটা তিনি এ জন্য করেছিলেন যে, যাতে আমি তাঁর ইরশাদসমূহ ভালভাবে মুখস্ত করে নিই। তিনি বললেন, আল্লাহ এবং আখিরাতের ওপর ইয়াকীন রেখো, নামায পড়ো, আল্লাহর ইবাদাত করো এবং কাউকে তাঁর সঙ্গে শরীক করো না। এমনকি এই অবস্থাতেই তোমার মৃত্যু এসে পড়বে।

আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আরো বলুন। তিনি আমার জন্য তিনবার বললেন। অতপর তিনি ফরমাইলেন, তুমি চাইলে দীনের সবচেয়ে বড় আমলের কথা বলতে পারি। আর সেই আমল দীনের মূল। আমি আরয করলাম, আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। আপনি বলুন। তিনি বললেন, দীনের ভিত্তি বা মূল হলো, তুমি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং সে একক এবং লাশরীক এবং মুহাম্মাদ (সা) তাঁর বান্দাহ ও রাসূল। আর যে আমলে দীনের বাঁধন মজবুত থাকে তাহলো নামায পড়া ও যাকাত প্রদান করা। এবং দীনের আমলের মধ্যে সর্বোত্তম আমল হলো জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ। আমাকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমি সেই

সময় পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকবো যতক্ষণ পর্যন্ত লোকজন নামায না পড়বে, যাকাত না দেবে এবং এই কথার সাক্ষ্য না দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি একক এবং তার কোন শরীক নেই যখন তারা এই সব কথার ওপর আমল করলো তখন তারা নিজেও বাঁচলো এবং নিজেদের জান-মালও বাঁচিয়ে নিল।

রহমতে আলম (সা) তাবুকের যুদ্ধ থেকে মদীনা ফিরে এলেন। এ সময় ইয়েমেনের কতিপয় নওমুসলিম নেতা (তারা হিমইয়ারের শাহী খান্দানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল।) একটি প্রতিনিধি দল হিসেবে হুযূরের (সা) খিদমতে হাযির হলো। তারা রাসূলের (সা) কোন প্রতিনিধিকে ইয়েমেনের শাসক হিসেবে নিয়োগের জন্য অনুরোধ জানালো। এই শাসক এদিকে যেমন তাবলীগ ও দীনী মাসয়ালা শিক্ষা দেবেন তেমনি অন্যদিকে শাসন কাজও চালাবেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য হুযূরের (সা) দৃষ্টি পড়লো হযরত মাআয (রা) বিন জাবালের ওপর। তিনি তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন যে, আমি তোমাকে ইয়েমেনবাসীর শাসক বানিয়ে প্রেরণ করতে চাই। সেখানে তুমি অনেক সময় জটিল সমস্যার সম্মুখীন হবে। যখন তোমার নিকট কোন বিবাদ মীমাংসার জন্য আসবে তখন তুমি কিভাবে ফায়সালা করবে তা আমাকে বলো।

হযরত মাআয (রা) আরয করলেন, আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করবো।

হুযূর (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি যদি আল্লাহর কিতাবে সেই বিষয় ফায়সালার জন্য কোন অকাট্য প্রমাণ বা দলিল না পাও তাহলে কি করবে?

আরয করলেন, রাসূলের সুন্নাত মুতাবিক ফায়সালা করবো।

হুযূর (সা) বললেন, রাসূলের সুন্নাতেও যদি তুমি কোন জিনিস না পাও?

আরয করলেন, "অতপর আমি নিজের মত অনুসারে ইজতিহাদ করবো এবং এ ব্যাপারে সামান্যতম ত্রুটিও করবো না।"

হযরত মাআযের (রা) জবাবসমূহ শুনে হুযূর (সা) খুব খুশী হলেন এবং তাঁর বুকের ওপর নিজের পবিত্র হাত রেখে বললেন, "আল্লাহর শোকর। তিনি আল্লাহর রাসূলের দূতকে সেই বিষয়ের তাওফীক দিয়েছেন যাতে আল্লাহর রাসূল সন্তুষ্ট।"

তারপর হুযূরে আকরাম (সা) ইয়েমেনবাসীর নামে এক ফরমান লিখালেন।

ফরমানে তিনি জানালেন যে, আমি আমার লোকদের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ ব্যক্তিকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করছি। মাআয (রা) বিন জাবাল এবং তাঁর সাথীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে। সাদকা এবং জিযিয়ার অর্থ তাঁর নিকট একত্রিত করবে ও তাঁকে সন্তুষ্ট রাখবে। দেখো সে যেন তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে না যায়।

অতপর তিনি (সা) হযরত মাআয (রা) বিন জাবালকে এই নসীহত করলেন ঃ

"ইয়েমেনবাসীর সঙ্গে নরম ব্যবহার করো। কঠোর হয়ো না। জনগণকে খুশী রাখবে। তাদের মধ্যে ঘৃণার উদ্রেক করো না। পরস্পর মিলে-মিশে কাজ করবে। তুমি সেখানে এমন মানুষও পাবে যারা পূর্ব থেকেই কোন ধর্মের অনুসারী। যখন তাদের নিকট পৌছবে তখন প্রথমে তাদেরকে তাওহীদ ও রিসালতের দাওয়াত দেবে। যখন তারা তা কবুল করবে তখন তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ তোমাদের ওপর দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও ফরয করেছেন। যখন তারা তা মেনে নেবে তখন তাদেরকে বলতে হবে যে, তোমাদের ওপর যাকাতও ফরয। এটা তোমাদের ধনীদের থেকে নিয়ে গরীবদেরকে দেওয়া হবে। যখন তারা যাকাতও মেনে নেবে তখন বেছে বেছে ভাল জিনিসই নেবে না। মযলুমদের বদ দোয়ার ভয় করো। তাদের এবং আল্লাহর মধ্যে কোন পরদার অন্তরাল নেই।

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, হুযূর (সা) হযরত মাআয (রা) বিন জাবালকে ইয়েমেনের প্রান্ত সীমার আমীর বানিয়েছিলেন। তার সদর দফতরে ছিল জুনদ। আর ইয়েমেনের নিম্ন ভূমির ইমারাত অর্পন করা হয়েছিল হযরত আবু মুসা (রা) আশয়ারীর ওপর। অন্য এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী হুযূর (সা) ইয়েমেনকে পাঁচ অংশে বিভক্ত করেছিলেন এবং তাতে পাঁচজন আমীর নিয়োগ করেছিলেন।

এ সব ব্যক্তি স্ব স্ব এলাকায় স্বাধীন ছিলেন অথবা হযরত মাআয (রা) বিন জাবালের অধীন ছিলেন? এ ব্যাপারে মত বিরোধ রয়েছে। মওলানা সাঈদ আনসারী মরহুম সিয়ারে আনসারে লিখেছেন যে, হযরত মাআযের (রা) আবাসস্থল ও দফতর ছিল ইয়েমেনের সদর দফতর জুনদে এবং অন্যান্য এলাকার রাজস্ব আদায়কারীরা হযরত মাআযের (রা) অধীন ছিলেন। তাঁরা স্ব স্ব এলাকার সাদকা ও জিযিয়ার অর্থ আদায় করে হযরত মাআযের (রা) নিকট প্রেরণ করতেন। তিনি কোষাগার অথবা বাইতুল মালের রক্ষক ছিলেন এবং অন্য এলাকার রাজস্ব আদায়কারীদের ফায়সালা বিচার বিবেচনা

করতেন। কাজী মুহাম্মাদ সোলায়মান সালমান মানসুরপুরী (র) বাদরুল বাদূরে লিখেছেন যে, ইসলামী শরীয়াতের শিক্ষা প্রদান এবং কুরআন মজীদের সাধারণ শিক্ষা, সাধারণ মোকদ্দমার তত্ত্বাবধান এবং ইয়েমেনের সকল কর্মচারীর সম্পদ সরবরাহও মাআয (রা) বিন জাবালের দায়িত্বে ছিল।

বিভিন্ন রেওয়ায়াত পর্যালোচনা পূর্বক এই উপসংহারই টানা যায় যে, সাদকা আদায়, কোষাগার (বাইতুলমাল) ও মোকদ্দমা সম্পর্কিত সকল বিষয়ে হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল সমগ্র ইয়েমেনের সর্বোচ্চ শাসক বা হাকিমে আ'লা ছিলেন। এসব বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে অন্যরা স্বাধীন ছিলেন। হুযূর (সা) তাঁদেরকেও সেই নসীহতই করেছিলেন যা হযরত মাআযকে (রা) করেছিলেন।

বহু নেতৃস্থানীয় চরিতকার লিখেছেন যে, হযরত মাআয (রা) ইয়েমেনের জন্য তৈরী হয়ে হুযূরের (সা) খিদমতে হাযির হলে তিনি কিছু দূর পর্যন্ত তাঁর সাথে সাথে গেলেন। এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত মাআয (রা) উটের ওপর সওয়ার ছিলেন এবং হুযূর (স) পায়ে হেঁটে সাথে সাথে চলছিলেন ও হযরত মাআযের (রা) সঙ্গে কথা বলছিলেন। এর দ্বারাই বুঝা যায় যে, হযরত মাআয (রা) হুযূরের (সা) ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুযায়ী সওয়ারী থেকে নামেননি। কথা-বার্তা বলার সময় তিনি বললেন ঃ "মাআয (রা) তোমার ওপর অনেক ঋণ রয়েছে। কেউ যদি হাদিয়া দেয় তাহলে তা গ্রহণ করবে। আমার পক্ষ থেকে অনুমতি রইলো।"

হযরত মাআয (রা) হুযূর (সা) থেকে রুখসত হতে লাগালেন। এ সময় তিনি বললেন ঃ "সম্ভবত এরপর তুমি আমার সঙ্গে আর মিলিত হতে পারছো না এবং যখন মদীনা ফিরে আসবে তখন আমার কবর দেখো।"

হযরত মাআয (রা) সত্যিকার রাসূল (সা) প্রেমিক ছিলেন। হুযূরের (সা) ইরশাদ শুনে অস্থির হয়ে পড়লেন এবং কাঁদা শুরু করে দিলেন। হুযূর (সা) বললেন, " কেঁদো না। এ ধরনের কাঁদা ভাল নয়।"

সাইয়েদুল আনামের (সা) ইরশাদ শুনে হযরত মাআয (রা) চুপ হয়ে গেলেন এবং অত্যন্ত আদবের সঙ্গে হুযূরকে (সা) বিদায়ী সালাম জানালেন। তিনি বললেনঃ "যাও, আল্লাহ তোমাকে হিফাজত করুন। সব ধরনের মুসীবত থেকে বাঁচান এবং জিন ও ইনসানের দুষ্টামী থেকে মাহফুজ রাখুন।"

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে যে, এ সময় হযরত মাআয (রা) অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে মদীনার ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তাকওয়া অবলম্বনকারীদেরকে ভালবাসি।"

মোট কথা, হুযূর (সা) থেকে বিদায় হয়ে হযরত মাআয (রা) অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে ইয়েমেন পৌছলেন এবং পুরো দু'বছর সেখানে উপস্থিত থেকে নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব খুব ভালভাবে আঞ্জাম দিতে লাগলেন। অন্যান্য রাজস্ব আদায়কারীগণও তাঁর সাথে আন্তরিকতার সঙ্গে সাহায্য করতে লাগলেন এবং স্ব স্ব এলাকা থেকে সাদকা ও জিযিয়া আদায় করে যথাযথভাবে প্রেরণ করতে লাগলেন। ঐতিহাসিক তাবারী (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলে আকরাম (সা) সাদকা, জিযিয়া, গনীমত, খুমুস প্রভৃতির ব্যাপারে বিস্তারিত নির্দেশ লিখে হযরত মাআযের (রা) নিকট সোপর্দ করেছিলেন এবং তিনি সেই মুতাবিকই আমল করতেন।

হযরত মাআয (রা) ইয়েমেনেই ছিলেন। একাদশ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) ইন্তেকাল করেন। হযরত মাআয (রা) হুযূরে আকরামের (সা) স্থায়ী বিচ্ছেদের খবর পেলেন। তাঁর ওপর দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়লো। ইয়েমেনের প্রতি মন বিরক্ত হয়ে উঠলো এবং কিছুদিন পর ইমারতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে মদীনা ফিরে এলেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে কিছু সম্পদ ও পশু ছিল। ইয়েমেনবাসীরা তা তাঁকে হাদিয়া হিসেবে দিয়েছিল। হযরত মাআয (রা) সকল কিছু খলিফাতুর রাসুল (সা) হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিদমতে পেশ করলেন। স্বয়ং রাসূলে করীম (সা) যেহেতু তাঁকে হাদিয়া গ্রহণের অনুমতি দিয়েছিলেন, সেহেতু হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এসব বস্তু গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন এবং বললেন, আমি তোমাকে এসব জিনিষ দান করে দিলাম।

হযরত মাআয (রা) মদীনাতেও বেশী দিন অবস্থান করলেন না। তিনি রহমতে আলমের (সা) সেই ইরশাদ "আল্লাহর পথে জিহাদ সর্বোত্তম আমল"–কে জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে রেখেছিলেন। হুযূরের (সা) সফরসঙ্গী হিসেবে প্রায় সকল যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলেন। এখন তিনি চিন্তা করলেন যে, রাসূলের (সা) ওফাতের পর ঘরে বসে থাকাতে কোন বীরত্ব নেই। অবশিষ্ট জীবন জিহাদের ময়দানেই কাটানো উচিত। সে সময় সিরিয়া থেকে যুদ্ধের সিলসিলা শুরু হয়েছিল। সুতরাং তিনিও সিরিয়া গমনকারী মুজাহিদদের দলে শামিল হয়ে গেলেন। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, পরিবার–পরিজনসহ তিনি জর্দানে (ফিলিস্তীন) বসবাস শুরু করেন এবং সেখান থেকেই সিরিয়া প্রবেশকারী ইসলামী বাহিনীতে শামিল হন। ঐতিহাসিক ওয়াকেদী বর্ণনা করেছেন যে, সর্ব প্রথম হযরত মাআয (রা) হযরত আমর (রা) ইবনুল আছের নেতৃত্বে ফিলিস্তীনের কতিপয় যুদ্ধে বীরত্ব

প্রদর্শন করেন। (সে যুগে ফিলিস্তীন সিরিয়ারই একটি অংশ ছিল এবং তা ছিল হিরাক্লিয়াসের দখলে)। রোমক বাহিনী যখন পর পর কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হলো তখন হিরাক্লিয়াস স্বয়ং এক বিরাট বাহিনী মুসলমানদেরকে উৎখাত করার জন্য প্রেরণ করলো। সেই বাহিনী আজনাদাইন নামক স্থানে তাঁবু ফেললো। মুসলমান বাহিনী সে সময় বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) এবং খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ দামেস্কে, হযরত আমর (রা) ইবনুল আস ফিলিস্তীনে, হযরত ইয়াযীদ (রা) বিন আবু সুফিয়ান (রা) বালকাতে এবং হযরত শুরাহবীল (রা) বিন হাসানাহ বসরাতে ছিলেন। তাঁরা স্ব স্ব বাহিনীসহ আজনাদাইন পৌঁছে গেলেন এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে খৃষ্টানদের সামনে দাঁড়ালেন। এই যুদ্ধে হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল ডান দিকের প্রধান ছিলেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে তিনি মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে মুসলমানরা! আজ জীবনকে আল্লাহর নিকট বেচে দাও। তোমরা যদি রোমকদেরকে পরাজিত করতে পারো তাহলে এই দেশে ইসলামের ঘর বানানোর গোড়াপত্তন করা সম্ভব। তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও বিরাট সওয়াবের হকদার হবে।"

যুদ্ধের ময়দান গরম হয়ে উঠলো। হযরত মাআয (রা) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চরম বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। অবশেষে শত্রুর শিক্ষণীয় পরাজয় ঘটলো এবং প্রভূত গনীমতের মাল মুসলমানদের হাতে আসলো।

আজনাদাইনের যুদ্ধের পর মুসলমানরা দামেস্ক অবরোধ করলো। অবরোধকালে একদিন মুসলমানরা খবর পেল যে, রোমের বাদশাহ হিরাক্লিয়াস একজন সামরিক অফিসার দরজারকে একটি বিরাট বাহিনী দিয়ে দামেস্কবাসীকে সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেছে। হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ কিছু সৈন্য দামেস্কের বাইরে রেখে অবশিষ্টদেরকে সঙ্গে নিয়ে দরজারের মুকাবিলার জন্য অগ্রসর হলেন। হযরত মাআয (রা) বিন জাবালও সেই বাহিনীতে ছিলেন। হযরত খালিদ (রা) এবারও তাঁকে ডান দিকের প্রধান বানালেন। যুদ্ধ শুরু হলো। হযরত মাআয (রা) রোমকদের ডানদিকে এত প্রচন্ডভাবে হামলা চালালেন যে, তারা পরাজিত হলো। অন্য দিকে হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ, হাশিম (রা) বিন উতবা, সাঈদ (রা) বিন যায়েদ এবং হযরত আবু ওবায়দা (রা) রোমক বাহিনীর মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে দিলেন ও খুব তাড়াতাড়ি শত্রু বাহিনী হেরে গেলো। এ যুদ্ধ "ইয়াওমে মারজুস সফর" নামে মশহুর। তা থেকে ফারেগ হয়ে মুসলমানরা পুনরায় দামেস্ক ফিরে এলেন এবং আরো কঠোরতর অবরোধ আরোপ করলেন।

এই অবরোধ অব্যাহত থাকা অবস্থাতেই ত্রয়োদশ হিজরীর ২২শে জমাদিউস সানি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ইন্তেকাল করেন এবং হযরত ওমর ফারুক (রা) খলীফা নির্বাচিত হন। তিনি একটি পত্রের মাধ্যমে হযরত আবু ওবায়দাকে (রা) সিদ্দীক আকবারের (রা) ওফাতের খবর দিলেন। হযরত আবু ওবায়দা (রা) পত্রবাহক কাসেদের সামনেই হযরত মাআযকে (রা) ডেকে পাঠালেন। তিনি সিদ্দীকে আকবরের (রা) ওফাতের খবর শুনে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়লেন। অতপর কাসেদকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "আবু বকরের (রা) ওপর আল্লাহর রহমত হোক। তাঁর পর মুসলমানরা কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে?"

কাসেদ বললো ঃ "আবু বকর (রা) ওমরকে (রা) নিজের স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেন এবং সকল মুসলমান তাঁর বাইআত করে নিয়েছে।"

হযরত মাআযের (রা) চেহারা হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং তিনি বললেন ঃ "আলহামদু লিল্লাহ। মুসলমানরা খুব ভাল করেছে যে, ওমর ফারুকের (রা) হাতে বাইআত করে নিয়েছে।"

অতপর কাসেদ হযরত ওমর ফারুকের (রা) পক্ষ থেকে কতিপয় নেতৃস্থানীয় সাহাবীর (রা) অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ, ইয়াযীদ (রা) বিন আবু সুফিয়ান (রা) ও সাঈদ (রা) বিন যায়েদ ছাড়া হযরত মাআয (রা) বিন জাবালও ছিলেন। হযরত আবু ওবায়দা (রা) মাআযের (রা) ব্যাপারে বললেন, তিনি তেমনই আছেন যেমন তাঁকে দেখছো। বরং বয়স যত বেশী হচ্ছে দুনিয়া সম্পর্কে তাঁর অনীহা তত বাড়ছে এবং আখিরাতের আকাঙ্খা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই কথোপকথনের পর হযরত আবু ওবায়দা (রা) নিজের এবং হযরত মাআয (রা) বিন জাবালের পক্ষ থেকে হযরত ওমরকে (রা) একটি পত্র লিখলেন। তাতে আশা প্রকাশ করা হলো যে, তিনি (ওমর) যেন বন্ধু, শত্রু, উচু-নীচু, দুর্বল ও শক্তিশালী সকলের সঙ্গেই একই ধরনের আচরণ ও ইনসাফ করেন এবং সবসময় আল্লাহভীতির সঙ্গে কাজ করেন। কাসেদের গমনের পর মুসলমানরা দামেস্কের অবরোধ আরো কঠোর করলেন এবং অবশেষে এক রক্তাক্ত যুদ্ধের পর তার ওপর ইসলামের ঝান্ডা উড়িয়ে দিলেন।

দামেস্কের পরাজয়ে রোমকরা ভয়ানক বিচলিত হয়ে পড়লো। তারা জর্দানের বিসান শহরে একত্রিত হয়ে মুকাবিলার জন্য খুব জোরে শোরে প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করলো। আরব ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে রোমক বাহিনীর সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার এবং তারা সম্পূর্ণভাবে অস্ত্রসজ্জিত ছিল। মুসলমানরা

দামেস্কের ওপর নিজেদের কবজা মজবুত করে বিসান অভিমুখে যাত্রা করলো এবং ফাহাল নামক স্থানে তাঁবু ফেললেন। ইত্যবসরে রোমকরা সেই এলাকার সকল নদী-নালা ও নহরের বাঁধ ভেঙ্গে দিল এবং ফাহাল ও বিসানের মধ্যবর্তী এলাকাতে শুধু পানি আর পানিতে একাকার হয়ে গেল। এমনিভাবে বিসানে একত্রিত রোমক সৈন্যরা নিজেদেরকে মাহফুজ মনে করতে লাগলো। একদিন রোমকরা হযরত আবু ওবায়দার (রা) নিকট এক পয়গামে তাদের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা বললো। নচেৎ তারা এত বড় বাহিনী নিয়ে হামলা করবে যে, মুসলমানদের কেউই বাঁচতে পারবে না বলে হুমকি দিল।

তার প্রত্যুত্তরে হযরত আবু ওবায়দা (রা) বলে পাঠালেন যে, দেশ আল্লাহর এবং সম্মান ও অপমান তার হাতেই নিবদ্ধ। তোমরা যদি আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর তাহলে আমরাও শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত যুদ্ধ চালাবো।

মুসলমানদের ধৈর্য দেখে রোমকরা সন্ধি করতে এগিয়ে এলো এবং কোন দূত প্রেরণের জন্য হযরত আবু ওবায়দাকে (রা) বলে পাঠালো। হযরত আবু ওবায়দা (রা) হযরত মাআয (রা) বিন জাবালকে এই কাজের জন্য নির্বাচিত করলেন। এদিকে রোমকরা ইসলামী দূতকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য এক সোনালী কারুকার্য খচিত তাঁবুতে অত্যন্ত শান-শওকতের দরবার সাজালো। এমন সব নামি দামী কার্পেট বিছানো হলো যে, তা দেখে চোখ ছানা-বড়া হয়ে যায়। হযরত মাআয (রা) সিপাহী সুলভ আচরণের মাধ্যমে ঘোড়ায় চড়ে সেখানে পৌছলেন। দরবারের নিকট পৌছে ঘোড়া থেকে অবতরণ করলেন এবং কার্পেটের কাছাকাছি পৌছে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলেন। একজন রোমক অগ্রসর হয়ে বললেন, আমি ঘোড়া ধরছি। আপনি আমাদের সরদারদের নিকট দরবারের ভেতরে চলুন। হযরত মাআয (রা) বললেন ঃ "আমি এই সব মূল্যবান কার্পেট ও লৌকিকতাপূর্ণ বিছানায় বসা গুনাহ বলে মনে করি। গরীবদের ওপর যুলুম করে এসব অর্জন করা হয়েছে। এসব হলো দুনিয়ার সৌন্দর্য। আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়া থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং অপচয় ও অহংকার থেকে নিষেধ করেছেন। এ জন্য আমি মাটির ওপরই বসবো।" এ কথা বলে ঘোড়ার বাগ ধরে মাটিতেই বসে পড়লেন। রোমকরা বললো ঃ "আপনি যদি দরবারে বসতেন তাহলে তা আপনার জন্য মর্যাদার ব্যাপার হতো। কিন্তু আফসোস যে, নিজের মর্যাদার প্রতিও আপনার খেয়াল নেই এবং আপনি গোলামদের মত মাটিতে বসে গেছেন।"

এ কথা শুনে হযরত মাআয (রা) আত্মদৃপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন এবং অত্যন্ত আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বললেন ঃ "তোমরা যে মান ইয্যতের

দিকে আমাকে ডাকছো তা তোমরা নিজের কওমের ওপর যুলুম করে হাসিল করেছ। এই ইযযত ও মর্যাদা তোমাদের জন্যই শোভা পায়। আমি তার বিন্দুমাত্রও পরওয়া করি না। তোমরা বলছো যে, আমি গোলামের মত মাটিতে বসে পড়েছি। বাস্তবত আমি আল্লাহর এক নাচিজ বান্দাহ এবং গোলাম। আমার রব সেসব মানুষকে পসন্দ করেন যারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য নম্রতা ও বিনয় প্রদর্শন করে।"

তাঁর কথা শুনে রোমকরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়লো এবং জিজ্ঞেস করলো ঃ "মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কি আপনি? হযরত মাআয (রা) জবাব দিলেন ঃ "আল্লাহ মাফ করুন। আমি সর্বোত্তম এটা ধারণা না করাই আমার জন্য যথেষ্ট।" অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে তিনি বললেন ঃ "এটাই যথেষ্ট যে, আমি সবচেয়ে খারাব।" তারপর রোমকরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো ঃ "তোমরা আমাদের দেশে কেন এসেছ এবং আমাদের নিকট কি চাও। হাবশা তোমাদের নিকটবর্তী দেশ। তার ওপর তোমরা হামলা করোনি। একজন মহিলা ইরান শাসন করছে। তোমরা সেদিকেও যাওনি। কিন্তু আমাদের দেশের ওপর এসে চড়ে বসেছ। তোমরা জানো না যে, আমাদের বাদশাহর অসংখ্য সৈন্য ও উপায়-উপাদান রয়েছে এবং সে তোমাদেরকে পিষে ফেলতে পারে। আমাদের কোন শহর অথবা দুর্গ দখল করে তোমরা মনে করছো যে, শাহানশাহকে পরাজিত করবে। তাহলে এটা তোমাদের খামখেয়ালী ছাড়া আর কিছু নয়। অতপর যখন তোমরা আমাদের নবী ও কিতাবের ওপর ঈমান রাখো তখন আমাদের সঙ্গে লড়াই কিভাবে ঠিক হতে পারে?"

হযরত মাআয (রা) তাদের জবাবে বললেন ঃ "সর্ব প্রথম আমি তোমাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান জানাচ্ছি। তোমরা তা গ্রহণ কর। আমাদের কিবলা অভিমুখী হয়ে নামায পড়ো। মদ পান ছেড়ে দাও। শূকরের গোশত খেয়ো না এবং আমাদের রাসূলের (সা) তরীকার ওপর চলো। তাতে আমরা ও তোমরা দীনী ভাই হয়ে যাব। তোমরা যদি এই দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকৃতি জানাও তাহলে জিযিয়া দাও। তাও যদি তোমরা না মানো তাহলে আমাদের ও তোমাদের মধ্যে তরবারীই ফায়সালা করবে। তোমরা বলেছ যে, তোমাদের শাহানশাহর সৈন্যের সংখ্যা অসংখ্য বা বেশুমার। কিন্তু সৈন্যের কম বা বেশীতে আমাদের কোন পরওয়া নেই। আমরা সংখ্যা বা শক্তির ওপর ভরসা করি না। বরং আমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করি। তার নির্দেশে কত ছোট দল কয়েকগুণ বড় বাহিনীর ওপর জয়লাভ করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ "বারবার অনেক ছোট দলসমূহ বড় বড় দলের ওপর আল্লাহর নির্দেশে বিজয় লাভ করেছে।"

তোমরা বলে থাকো যে, তোমাদের শাহানশাহ তোমাদের জান ও মালের মালিক। কিন্তু আমরা যাকে আমীর বানিয়েছি সে আমাদের মতই একজন মানুষ। সে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দীনী কিতাবের ওপর আমল করে এবং আমাদের নবীর (সা) তরীকার ওপর চলে ততক্ষণ আমরা তাকে শাসক হিসেবে মানি। কিন্তু সে যদি রাস্তা পরিবর্তন করে তাহলে আমরা তাকে পদচ্যুত করি। যদি চুরি করে তাহলে তার হাত কেটে দি। যিনা করলে দুররা মারি। যদি সে অন্যায়ভাবে কাউকে আঘাত দেয় তাহলে তাকেও ঐভাবে আঘাত দেয়া হয়। সে আমাদের থেকে লুকিয়ে থাকে না। নিজেকে সে আমাদের চেয়ে বড়ও মনে করে না এবং গনীমতের মাল থেকে সে আমাদের চেয়ে বেশী অংশ পায় না। অবশ্যই আমরা তোমাদের নবীকে সত্য বলে মানি। কিন্তু তোমাদের মত তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলি না। তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে যা বলো তা থেকে তিনি পবিত্র। তাঁকে কেউ জন্ম দেয়নি এবং তিনি কাউকে জন্মও দেননি।"

রোমকরা হযরত মাআযের (রা) কথা শুনে বললো ঃ "বালকার এলাকা এবং জর্দানের সে অংশ যা তোমাদের দেশের সঙ্গে মিলিত তা নিয়ে নাও এবং আমাদের দেশ থেকে বের হয়ে ইরানের দিকে চলে যাও।"

হযরত মাআয (রা) তাদের প্রস্তাব বাতিল করে দিলেন এবং উঠে চলে এলেন। অতপর রোমকরা হযরত আবু ওবায়দার (রা) সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করলো এবং প্রথমেই ইসলামী বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যকে দুই দুই আশরাফী দেওয়ার প্রস্তাব করলো। হযরত আবু ওবায়দা (রা) এই প্রস্তাবও বাতিল করে দিলেন। অতপর উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। ১৪ হিজরীর জিলকদ মাসে উভয় বাহিনীর মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধ সংঘটিত হলো। যুদ্ধে খৃষ্টানরা মারাত্মকভাবে পরাজিত হলো এযুদ্ধ "ফাহালের" যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল এ যুদ্ধেও ডানদিকের প্রধান ছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী তিনি নিজেও বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন এবং অধীনস্থ সৈন্যদেরকেও সক্রিয়তার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়েছিলেন। এই যুদ্ধের পর জর্দানের সকল গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং স্থান সহজেই জয় হয়ে গেল।

জর্দান বিজয়ের পর মুসলমানরা হেমস, হমাত, শিযার, মুয়াররাতুন নু'মান, লা যাকিয়া এবং অন্য কয়েকটি শহর একের পর এক জয় করে নিল। তাঁদের অব্যাহত অগ্রযাত্রা হিরাক্লিয়াসকে ক্রোধান্বিত করে তুললো। সে এবার সকল উপায়-উপকরণ একত্রিত করে মুসলমানদেরকে সিরিয়া থেকে বের করে দেয়ার মজবুত সিদ্ধান্ত নিলো। সুতরাং সে বিরাট সংখ্যক সৈন্য একত্রিত

করলো এবং তাদেরকে সকল ধরনের যুদ্ধ সরঞ্জাম দিয়ে মুসলমানদের ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য প্রেরণ করলো। রোমক বাহিনী ইয়ারমুকের নিকটে ওকুসার ময়দানে তাঁবু ফেললো এবং মুসলমানদের ওপর হামলার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলো। ভিন্ন মত অনুসারে রোমক সৈন্য সংখ্যা দুই লাখ থেকে ১০ লাখের মধ্যে ছিল। হযরত আবু ওবায়দাও (রা) যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন এবং সিরিয়ার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকা সকল সৈন্যকে একত্রিত করে ইয়ারমুক উপত্যকায় পৌছে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে হযরত ওমরকে (রা) চিঠি লিখে রাজধানী থেকে সাহায্য চাইলেন। রেওয়ায়াতে আছে যে, রোমক সৈন্যদের সমাবেশের খবর শুনে হযরত আবু ওবায়দা (রা) সিদ্ধান্ত প্রদানকারী সাহাবীদের (রা) সঙ্গে পরামর্শ করলেন। কেউ কেউ মত প্রকাশ করে বললেন যে, সকল ইসলামী সৈন্য সিরিয়া ছেড়ে আরবের সীমান্তে চলে যাবে এবং রাজধানী থেকে সৈন্য পৌছার পর দুশমনের মোকাবিলা করবে। হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল এ মতের তীব্র বিরোধিতা করলেন এবং বললেন যে, যে সকল এলাকায় আল্লাহ পাক আমাদেরকে বিজয় দিয়েছেন তা পরিত্যাগ করা ধ্বংসের নামান্তর হবে এবং তা দ্বিতীয়বার জয় করা কঠিন ব্যাপার হবে। হযরত আবু ওবায়দা (রা) তাঁর মতের সঙ্গে একমত হলেন এবং শুধুমাত্র ৩০-৪০ হাজার মুজাহিদ নিয়ে দুশমনের বিরাট বাহিনীর বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। ১৫ হিজরীর রজব মাসে ইয়ারমুক (অথবা ওকুসা) ময়দানে রোমক এবং মুসলমানদের মধ্যে এমন রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হলো যে, এর পূর্বে আর এমন যুদ্ধ হয়নি। এযুদ্ধ সিরিয়ার ভাগ্য প্রায়ই নির্ধারিত করে দিয়েছিল। হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল (সমগ্র ডান অথবা তার এক অংশের সেনাপতি ছিলেন) এই যুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত ধৈর্য ও হিম্মতের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর যুবক পুত্র আবদুর রহমান (রা) পিতার পাশা-পাশি বীরের হক আদায় করেছিলেন।

আল্লামা শিবলী নু'মানী (র) "আলফারুক" গ্রন্থে লিখেছেন যে, একবার খৃষ্টানরা এমন জোরে হামলা করলো যে, মুসলমানদের ডান দিকটা ভেঙ্গে মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং অত্যন্ত বিশৃংখলভাবে পিছু হটতে শুরু করলো। পরাজিতরা হটতে হটতে মহিলাদের তাঁবু পর্যন্ত এসে পড়লো। এ অবস্থা দেখে মহিলারা ক্রোধান্বিত হয়ে পড়লো। তারা তাঁবুর খুঁটি উঠিয়ে চীৎকার করে বললো যে, হে পুরুষেরা! এদিকে এলে খুঁটি দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেবো।

হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল এ অবস্থা দেখে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়লেন এবং বললেন, আমি পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করছি। কিন্তু কোন বাহাদুর এ ঘোড়ার হক আদায় করতে পারলে তার জন্য ঘোড়া প্রস্তুত। তাঁর পুত্র বললো, এ হক আমি আদায় করবো। কেননা, আমি সওয়ার হয়ে ভাল যুদ্ধ করতে পারি। মোট কথা, পিতা–পুত্র উভয়েই শত্রুর মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং এমন বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন যে, মুসলমানদের বিচলিত পা পুনরায় মজবুত হয়ে গেল।

হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল এবং অন্যান্য মুজাহিদের জীবন বাজি রাখার কারণে ফল এ হলো যে, খৃস্টানদের কোমর ভাঙ্গা পরাজয় ঘটলো এবং তারা প্রায় এক লাখ মানুষের লাশ যুদ্ধের ময়দানে রেখে পালিয়ে গেল।

ইয়ারমুকের যুদ্ধের পর মুসলমানদের বিজয়ের ধারা কানসারিন, হালব, ইন্তাকিয়া প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করে বাইতুল মাকদাসের (জেরুসালেম) সামনে গিয়ে স্থির হলো। শহরবাসী অবরুদ্ধ হয়ে পড়লো। কিছু দিন পর তারা হযরত আবু ওবায়দাকে (রা) সন্ধির পয়গাম পাঠালো। কিন্তু শর্ত আরোপ করে তারা বললো যে, মুসলমানদের খলীফা স্বয়ং এখানে এসে সন্ধির শর্ত স্থির করবেন। পরামর্শের জন্য হযরত আবু ওবায়দা (রা) হযরত মাআযকে (রা) জর্দান থেকে ডেকে পাঠালেন। তিনি মত দিলেন যে, প্রথমে শহরবাসীর নিকট থেকে সন্ধির মজবুত প্রতিশ্রুতি নিতে হবে। নচেৎ আমীরুল মুমিনীন এখানে তাশরীফ আনার পর যদি তারা ফিরে যায় তাহলে তা খুব খারাব হবে। এ পরামর্শ অনুযায়ী হযরত আবু ওবায়দা (রা) শহরবাসীর নিকট থেকে সন্ধির পাকা–পোক্ত প্রতিশ্রুতি নিলেন। অতপর হযরত ওমর ফারুককে (রা) চিঠির মাধ্যমে বাইতুল মাকদাস তাশরীফ আনার আবেদন জানালেন। আমীরুল মুমিনূন এ আবেদন কবুল করলেন এবং কতিপয় মুহাজির ও আনসারসহ অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে বাইতুল মাকদাসে তাশরীফ আনলেন। শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ নির্দ্বিধায় তাঁর খিদমতে হাযির হলো এবং উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো।

বাইতুল মাকদাসে অবস্থানকালে একদিন নামাযের সময় হযরত ওমর ফারুক (রা) সাইয়েদুনা বিলালকে (রা) আযান দেয়ার অনুরোধ জানালেন। তিনি বললেন ঃ "আমি ওয়াদা করেছিলাম যে, রাসূলের (সা) পর আর আযান দিব না। কিন্তু আজ শুধুমাত্র এ ওয়াক্তের নামাযের জন্য আপনার হুকুম পালন করছি।"

হযরত বিলাল (রা) আযান দেয়া শুরু করলেন। এ সময় সাহাবীদের (রা) মনে হুযূরের (সা) পবিত্র যুগের কথা স্মরণ হয়ে গেল এবং তাঁরা কেঁদে জারজার হতে লাগলেন। হযরত মাআযও (রা) রাসূলের (সা) কথা স্মরণ হওয়ায় অস্থির হয়ে পড়লেন এবং কাঁদতে কাঁদতে হেঁচকি ধরে গেল।

১৮ হিজরীতে মিসর, ইরাক ও সিরিয়ায় মহামারী আকারে প্লেগ দেখা দিল। এ প্লেগ "তাউ'নে আমওয়াস" নামে খ্যাত। হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল সেই সময় সিরিয়ার সেনাপতি হযরত আবু ওবায়দা (রা) ইবনুল জাররাহ'র সঙ্গে সিরিয়াতে উপস্থিত ছিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত আবু ওবায়দাকে (রা) মহামারী কবলিত এলাকা থেকে সরে আসার জন্য উৎসাহ দিলেন। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে ক্ষমা চাইলেন এবং বললেন যে, এটা আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর থেকে পলায়নের নামান্তর হবে। হাজার হাজার মুজাহিদ এ মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছিলেন। এমনকি স্বয়ং হযরত আবু ওবায়দাও (রা) তাতে আক্রান্ত হলেন। অসুখ কঠিন রূপ নিলে তিনি হযরত মাআয (রা) বিন জাবালকে ডেকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করলেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে যে, এ সময় হযরত আবু ওবায়দা (রা) মুসলমানদের ডেকে বললেন, "হে মানুষেরা! এ মহামারী তোমাদের ওপর আল্লাহর রহমত, তোমাদের নবীর (সা) দাওয়াত এবং তোমাদের পূর্বেকার নেকীর মৃত্যু। এখন আবু ওবায়দাও (রা) নিজের রবের নিকট সেই সৌভাগ্যের অংশ পাওয়ার আকাঙ্খী।"

তাঁর ভাষণ অব্যাহত ছিল। এমন সময় নামাযের সময় এসে পড়লো। হযরত আবু ওবায়দা (রা) হযরত মাআযকে (রা) নির্দেশ দিলেন যে, সে-ই নামায পড়াবে। এদিকে নামায শেষ হলো। ওদিকে হযরত আবু ওবায়দার রূহ ঊর্ধ্বে জগতে রওয়ানা দিল। হযরত মাআয (রা) এবং হযরত আবু ওবায়দার (রা) মধ্যে গভীর ভালবাসা ছিল। এ জন্য হযরত মাআয (রা) নিজের প্রিয় দোস্তের ওফাতে দুঃখে কাতর হয়ে পড়লেন। তিনি মুসলমানদেরকে একত্রিত করে এ খুতবা দিলেন ঃ "হে মানুষেরা! গুনাহ থেকে তাওবা করো। যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে তাওবা করে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত সে ঋণের বোঝা নিজের মাথা থেকে নামিয়ে দিক। কেননা, ঋণ আখিরাতে মুসীবতের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যদি কোন মুসলমান কোন ভাইয়ের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট থাকে তাহলে সে তার সঙ্গে তা মিটিয়ে ফেলবে। কেননা, কোন মুসলমানের জন্যে জায়েয নয় যে, সে তার ভাইয়ের সঙ্গে তিন দিনের বেশী সালাম কালাম বন্ধ রাখবে। আল্লাহর নিকট তা বড় গুনাহর কাজ। হে মুসলমানেরা! এমন এক ব্যক্তি তোমাদের নিকট থেকে চির বিদায় নিয়েছেন

যিনি আখলাকের দিক থেকে নজীরবিহীন ছিলেন। তিনি সবচেয়ে বেশী ক্ষমাশীল ছিলেন। মুসলমানদের সবচেয়ে বেশী কল্যাণকামী ছিলেন। ঘৃণা-বিদ্বেষ থেকে সকলের চেয়ে বেশী পবিত্র ছিলেন। তাঁর জন্য রহমতের দোয়া করো। এখন আর তাঁর মত সরদার তোমরা পাবে না।"

এরপর হযরত মাআয (রা) জানাযার নামায পড়ালেন এবং হযরত আমর (রা) ইবনুল আছ ও দ্বাহহাক (রা) বিন কায়েসের সঙ্গে মিলে আমীনুল উম্মাতকে দাফন করলেন। অতপর তিনি সেনাপতি হলেন। হযরত আমর (রা) ইবনুল আছ তাঁকে সেখান থেকে সরে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। তাতে তিনি খুব ক্ষুব্ধ হলেন এবং মিম্বরে চড়ে বক্তৃতা করলেন। হযরত আবু ওবায়দা (রা) নিজের প্রসঙ্গে এর পূর্বে যে কথা বলেছিলেন তিনিও তার পুনরুল্লেখ করলেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল অনুসারে তিনি অতিরিক্ত আরো বলেছিলেন যে, হে মানুষেরা! আমি রাসুল (সা) থেকে শুনেছি যে, মুসলমানরা সিরিয়া জয় করে নেবে। অতপর এক ধরনের রোগ সৃষ্টি হবে। যা ফোঁড়ার মত শরীরে ক্ষতের সৃষ্টি করবে। তাতে আক্রান্ত হয়ে যে মারা যাবে সে শহীদ হবে এবং তার আমলনামা পবিত্র হবে। হে আল্লাহ! আমি যদি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ হাদীস শুনে থাকি তাহলে এ রহমত আমার গৃহে প্রেরণ কর এবং আমাকে তাতে যথেষ্ট অংশ দাও।

খুতবা বা ভাষণের পর তাঁবুতে এলেন। এসেই একমাত্র পুত্র আবদুর রহমানকে (রা) অসুস্থ পেলেন। অত্যন্ত ধৈর্য ও উৎসাহের সঙ্গে তাঁকে নসীহত করলেন ঃ "হে পুত্র! এটা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে। দেখ, এ ব্যাপারে তোমার অন্তরে যেন কোন সন্দেহের সৃষ্টি না হয়।"

পুত্র জবাব দিলেন ঃ "আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন।" এ কথা বলেই তিনি পরপারের দিকে যাত্রা করলেন। এর পূর্বে হযরত মাআযের (রা) দুই স্ত্রীও এ রোগেই মারা গিয়েছিলেন। এখন একমাত্র পুত্রের ওফাতের পর সম্পূর্ণ একাকী রয়ে গেলেন। কিন্তু তিনিও স্রষ্টার নিকট থেকে ডাক পেলেন। ডান হাতের শাহাদাত আংগুলীতে ফোঁড়া বের হলো। প্রচন্ড কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু তিনি খুশী ছিলেন এবং বলছিলেন যে, সকল দুনিয়ার সম্পদ এ কষ্টের সামনে কিছুই নয়। যখন প্রচন্ড ব্যাথা হতো তখন বেহুশ হয়ে যেতেন। হুশ ফিরলেই বলতেন হে আল্লাহ! তুমি জানো যে, আমি তোমাকে খুব ভালবাসি। এ জন্য আমাকে নিজের চিন্তায় চিন্তিত কর। তারপর অচেতন হয়ে পড়তেন। যখন রোগ কিছুটা নিরাময় হতো তখন এ বাক্যই মুখ দিয়ে বের হতো। ওফাতের রাত খুব অশান্তিতে কাটলো। তিনি বার বার জিজ্ঞেস

করলেন, সকাল হয়েছে কিনা? লোকজন বললো, না, সকাল হয়নি। রাত অতিক্রান্ত হলে তাঁকে বলা হলো যে, এখন সকাল হয়েছে। তিনি বললেন, আমি সেই রাত থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই যে রাতের সকাল জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। শুভ হোক মৃত্যু। শুভ হোক সেই যিয়ারতকারীর যে কিছু দিনের জন্য নিজের হাবীব থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল এবং এখন অভুক্ত অবস্থায় তার নিকট গমন করছে। ইলাহী আমার! অবশ্যই আমি তোমাকে ভয় করতাম। আজ আমি তোমার নিকট মাগফিরাত ও রহমতের আশা করি।

হযরত মাআযের (রা) দুই শিষ্য আমর বিন মাইমূন (রা) এবং ইয়াযীদ বিন উমায়ের (রা) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মাআযের (রা) ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলে আমরা কাঁদতে লাগলাম। হযরত মাআয (রা) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কাঁদছো কেন? আমরা আরয করলাম সেই ইলমের জন্য কাঁদছি যা আপনার সঙ্গে চলে যাবে। হযরত মাআয (রা) বললেন, কেঁদো না। ইলম ও ঈমান কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। যারা তা অনুসন্ধান করবে তারা তা পাবে। আমার পর আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ, আবুদ দারদা (রা), সালমান ফারসী (রা) এবং আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম এ চার ব্যক্তির নিকট ইলম তালাশ করবে।

ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলে হযরত মাআয (রা) খুব কাঁদতে লাগলেন। লোকেরা আরয করলেন যে, আপনি রাসূলের (সা) মাহবুব সাহাবী। আপনি আল্লাহর পথের মুজাহিদ। আপনার সিনা কুরআনের খনি। আপনি কেন কাঁদছেন? তিনি বললেন, আমি মৃত্যুকে ভয় করি না, দুনিয়া ত্যাগ করতেও আমার দুশ্চিন্তা নেই। পরকালে আমার অবস্থা কি হবে সেই কথা চিন্তা করে আমি কাঁদছি। এ অবস্থাতেই পবিত্র রূহ উর্ধ্ব জগতে যাত্রা করলো। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৬ বছর। তাঁর একটিই মাত্র পুত্র ছিলেন। তাঁর সামনেই তিনি ওফাত পান। তাঁর ওফাতের পর উয়ায়্বী বংশের পরিসমাপ্তি ঘটে। জর্দান নদীর তীরে মশহুর শহর বিসানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়। বর্ণনা করা হয় যে, সেই শহরের নিকটে সেই স্থান অবস্থিত যেখান থেকে হযরত ইসা (আ)কে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। হযরত মাআয (রা) ছাড়াও এ শহরে আরো অনেক জালীলুল কদর সাহাবীর দাফন হওয়ার সৌভাগ্য-লাভ ঘটেছিল।

চরিতকাররা হযরত মাআযের (রা) সুন্দর অবয়বের প্রশংসা করেছেন। মিহি আটার ন্যায় উজ্জ্বল রং, দীর্ঘ অবয়ব, উজ্জ্বল কালো চোখ, সংযুক্ত ভ্রূ, বাবরী চুল ও এত পরিষ্কার দাঁত ছিল যে, কথা বলার সময় মুখ দিয়ে আলো

বিচ্ছুরিত হতো বলে মনে হতো। কণ্ঠস্বর মধুর চেয়েও মিষ্টি ছিল। যিনিই তাঁর মজলিসে বসতেন তিনিই তাঁর হয়ে যেতেন।

সাইয়েদুনা হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল ছিলেন অন্যতম মহান সাহাবী। ইলম ও ফজীলতের দিক দিয়ে তিনি ইসলামী উম্মাহর অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে পরিগণিত। তিনি বছরের পর বছর ধরে নবুওয়াতের ফয়েযের প্রস্রবণ থেকে সর্বাবস্থায় সরাসরি অবগাহিত হয়েছেন। স্বয়ং নবী করীম (সা) তাঁর ব্যাপারে বলতেন যে, আমার সাহাবীদের মধ্যে হালাল ও হারামের সবচেয়ে বড় আলেম হলো মাআয (রা) বিন জাবাল। তিনি হুযূরের (সা) সামনেই ফতওয়া দানের আসনে সমাসীন হয়েছিলেন। রাসূলে করীম (সা) স্বয়ং তাঁর তাফাককুহ ফিদ দীন বা দীনের সমঝ এবং আল্লাহর মারেফাত প্রশ্নে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন। হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল রাসূলে আকরামের খিদমতে হাযির হলেন। তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে মাআয! সকাল কেমনভাবে কেটেছে? আরয করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঈমানের সঙ্গে আমার সকাল হয়েছে। তিনি বললেন, প্রত্যেক কথারই একটা পটভূমি থাকে। তোমার এই কথার কি পটভূমি রয়েছে? হযরত মাআয (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! কোন সকাল আমার এমন অতিবাহিত হয়নি, যাতে আমি ধারণা করিনি যে, আমি সন্ধ্যা অতিক্রম করতে পারবো না এবং কোন সন্ধ্যা এমন অতিবাহিত হয়নি যাতে আমি ধারণা করিনি যে, আমি সকাল করতে পারবো না। আমি এমন কোন কদম রাখিনি যাতে দ্বিতীয় কদম না রাখার খেয়াল হয়নি এবং আমি যেন সকল উম্মতের দিকে দেখছি। তারা হাঁটু গেড়ে বসে আছে। তাদেরকে আমলনামার দিকে ডাকা হচ্ছে এবং তাদের সঙ্গে তাঁদের নবী রয়েছেন এবং সেই উম্মতদের সঙ্গে তাদের সেই মূর্তিসমূহও রয়েছে যাদেরকে তারা আল্লাহ ছাড়া ইবাদাত করতো। আমি যেন জান্নাতবাসীর সওয়াবের দিকে দেখছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "তুমি মারিফাতে পৌঁছে গেছ। তার ওপর অটল থাকো।"

রাসূলের (সা) যুগেই হযরত মাআয (রা) কুরআন হিফজ করেছিলেন এবং ইলমে কুরআনে তাঁর চূড়ান্ত পর্যায়ের দক্ষতা লাভ ঘটেছিল। সহীহ বুখারীতে আছে হুযূর (সা) বলতেন, চার ব্যক্তির নিকট থেকে কুরআন হাসিল করো। তাঁরা হলেন আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ, সালিম (রা), মাওলায়ে আবি হুজায়ফা (রা), উবাই (রা) বিন কা'ব এবং মাআয (রা) বিন জাবাল। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন মাআয (রা) বিন জাবাল আলেমদের ইমাম হবেন। বস্তুত এ ভিত্তিতেই তাঁকে আলেমদের ইমাম বলা হয়ে থাকে।

হযরত ওমর ফারুক (রা) বলতেন, মাআযের (রা) মত মানুষ জন্ম দিতে মহিলারা অক্ষম। সিরিয়া সফরে জাবিয়াতে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেনঃ "কেউ ফিকাহ শিখতে চাইলে সে যেন মাআযের (রা) নিকট যায়।" অন্য এক স্থানে তিনি বলেছিলেন ঃ "মাআয (রা) না হলে ওমর ধ্বংস হয়ে যাবে।" এক রাওয়ায়েতে আছে যে, মৃত্যুর পূর্বে হযরত ওমর ফারুক (রা) বলেছিলেন, মাআয (রা) যদি এখন জীবিত থাকতো তাহলে আমি তাকে খলীফা বানাতাম। উম্মাহর ফকীহ হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ বলতেন, সেই অর্থে মাআয (রা) বিন জাবাল এক উম্মাত ছিলেন যে, তিনি লোকদেরকে কল্যাণমূলক কাজ শিক্ষা দিতেন এবং সেই অর্থে অনুগত ও আত্মোৎসর্গ ছিলেন, যে সব সময় আল্লাহ এবং তার রাসূলের আনুগত্য করতেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন ওমরের নিকট হযরত মাআয (রা) উম্মাহর একজন জ্ঞানী ছিলেন।

এ ইলম ও ফযল সত্ত্বেও হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল থেকে শুধু মাত্র ১৫৭টি হাদীস বর্ণিত আছে। তার কারণ হলো যে, তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে হাদীস বর্ণনা করতেন। তাঁর হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে হযরত ওমর ফারুক (রা), হযরত আনাস (রা) বিন মালিক, হযরত জাবির (রা) বিন আবদুল্লাহ, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা), হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা), হযরত আবু মুসা আশআরী (রা), হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) এবং হযরত আবু কাতাদার (রা) মত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। প্রখ্যাত শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজন হলেন ঃ আবু ছালাবা খাশনী (র), আবু মুসলিম খাওলানী (র), আসওয়াদ বিন হিলাল (র), ইবনে আবি আওফা (র), আবু আবদুল্লাহ ছানালজি (র), মাসরুক (রা), আবু ইদরীস খাওলানী (র), খুবাদা বিন আবি উমাইয়া ও আসলাম মাওলায়ে হযরত ওমর (রা)।

অনেক রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, রহমতে আলম (সা) হযরত মাআযকে (রা) বিশেষ রহমতের যোগ্য মনে করতেন। হুযূর (সা) স্বয়ং তাকে তালীম দিতেন এবং তিনিও হুযূরের (সা) ফয়েয লাভের কোন সুযোগ হাত ছাড়া হতে দিতেন না।

সহীহাইন অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত মাআয (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি একদিন গাধার ওপর রাসূলের (সা) সঙ্গে সওয়ার এবং তাঁর পিছনে বসেছিলাম। আমার এবং তাঁর মধ্যে শুধু ছিল জিনের কাঠ। তিনি বললেনঃ "মাআয! তুমি কি জানো যে, বান্দাহর ওপর আল্লাহর এবং আল্লাহর ওপর বান্দাহর হক কি?" আমি আরয করলামঃ "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই

(সা) সে সম্পর্কে ভাল জানেন।" তিনি বললেন ঃ "আল্লাহর ওপর বান্দাহর হক হলো যে, সে শুধুমাত্র তারই ইবাদাত করবে এবং কাউকে তার অংশীদার স্বীকার করবে না এবং বান্দাহর ওপর আল্লাহ্‌র হক হলো যে, যে ব্যক্তি তার সঙ্গে কাউকে শরীক করলো না তাকে যেন সে শাস্তি না দেন।" আমি আরয করলাম ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি লোকদেরকে এ সুসংবাদ শুনিয়ে দিব যে, তা শুনে তারা খুশী হয়ে যাবে?" তিনি বললেন ঃ "না, এ সুসংবাদ দিলে তারা অলস হয়ে যাবে এবং আমল করা ছেড়ে দেবে।" ইমাম বুখারী (র) এবং ইমাম মুসলিম (র) বলেন যে, হযরত মাআয (রা) ওফাতের কিছু সময় পূর্বে এ হাদীস বর্ননা করেন।

হযরত মাআয (রা) রাসূলের (সা) যুগে একবার (ভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী) কিছু দিনের জন্য সিরিয়া অথবা ইয়েমেনে তাশরীফ নিলেন। সেখানে দেখলেন যে, খৃষ্টানরা নিজেদের বুযূর্গদের সিজদা করে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তারা এ ধরনের কেন করে? তারা বললো, "আমাদের পূর্বে নবীদের সালাম করার পদ্ধতি এটাই ছিল।" ফিরে এসে হুযূরের (সা) খিদমতে হাযির হলেন এবং এ ঘটনা বর্ণনা করে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমরাও কি আপনাকে সিজদা করবো?"

হুযূর (সা) বললেন ঃ "না। তারা যেভাবে নিজেদের কিতাবের বিকৃতি সাধন করেছে, তেমনি নিজেদের নবীদের ওপর মিথ্যা আরোপ বা তোহমত দিয়েছে। কোন মানুষকে যদি সিজদা করা বৈধ হতো তাহলে আমি মহিলাকে বলতাম যে, সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তার চেয়ে উত্তম সালামের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। একে অপরকে আসসালামু আলাইকুম বলা জান্নাতবাসীদের তরীকা।"

সহীহ বুখারীতে হযরত জাবের (রা) বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত মাআয (রা) নিজের মহল্লাহর মসজিদে বনূ সালামার লোকদেরকে নামায পড়াতেন। একবার তিনি ইশার নামাযে সুরায়ে বাকারা পাঠ করলেন। এক ব্যক্তি (যিনি সারা দিন কাজের জন্য খুব পরিশ্রান্ত ছিলেন। তাঁর লম্বা কিরাতের জন্য) পৃথকভাবে সংক্ষিপ্ত নামায পড়ে নিলেন। হযরত মাআয (রা) এ খবর পেয়ে বললেন, এ ব্যক্তি মুনাফিক। সেই ব্যক্তির হযরত মায়াজের (রা) কথা খুব কঠিন মনে হলো। সে ব্যক্তি হুযূরের (সা) খিদমতে পৌঁছে আরয করলো ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা শ্রমজীবী মানুষ। স্বহস্তে মজদুরী করে থাকি এবং উটের মাধ্যমে পানি তরে থাকি। আজ মাআয (রা) আমাদের নামায পড়িয়েছে এবং তাতে সুরায়ে বাকারা শুরু করে দেয়। এ জন্য আমি

পৃথকভাবে নামায পড়ে নিই। তাতে মাআযের (রা) ধারণা যে, আমি মুনাফিক হয়ে গিয়েছি।"

হযরত মাআয (রা) নবীর (সা) দরবারে হাযির ছিলেন। হুযূর (সা) তাঁকে সম্বোধন করে তিনবার বললেন ঃ "হে মাআয! তুমি কি ফিতনা সৃষ্টি করবে?" অতপর বললেন শুধুমাত্র ওয়াশশামসু ওয়া দুহাহা এবং সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লার মত ছোট সুরা পড়বে। (কেননা মুকতাদীদের মধ্যে বৃদ্ধ, দুর্বল এবং সকল ধরনের মানুষই হয়ে থাকে)।

একবার হুযূর (সা) লোকদেরকে নামায পড়াচ্ছিলেন। হযরত মাআয (রা) সেই সময় পৌছলেন যখন মুসল্লীরা শেষ বসায় ছিলেন। হযরত মাআয (রা) সেই বৈঠকেই জামায়াতে শরীক হয়ে গেলেন। হুযূর (সা) সালাম ফিরালেন। তখন মাআয (রা) উঠে একাকী ছুটে যাওয়া রাকায়াত সমূহ শেষ করলেন। এর পূর্বে নিয়ম ছিল যে, লোকজন ইশারাতে নামাযীদের নিকট জিজ্ঞেস করতো যে, কত রাকায়াত হয়েছে এবং সে তা পুরো করে জামায়াতে শরীক হতো। সেদিন হুযূরের (সা) হযরত মাআযের (রা) তরীকা খুব পসন্দ হলো এবং তিনি লোকদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, ভবিষ্যতে তোমরাও এমনিই করো। সুতরাং এ পদ্ধতি হুযূরের (সা) সুন্নাত হিসেবে নির্ধারিত হয়।

একদিন হযরত মাআয (রা) রাসূলে আকরামকে (সা) জিজ্ঞেস করলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! সর্বোত্তম ঈমান কি? তিনি বললেন ঃ "আল্লাহর জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহর জন্যই শত্রুতা করা এবং নিজের জবানকে সব সময় আল্লাহর স্মরণে মশগুল রাখা।" তিনি আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সা)! সর্বোত্তম আমল কি?" তিনি বললেন ঃ "যা নিজের জন্য পসন্দ করবে, তা সকলের জন্য পসন্দ করবে এবং যা নিজের জন্য খারাব মনে করবে তা সবার জন্যই খারাব মনে করবে।"

একবার হযরত মাআয (রা) সফরে হুযূরের (সা) সঙ্গে ছিলেন পথিমধ্যে হুযূর (সা) হযরত মাআযকে (রা) অনেক নসীহত করলেন। তিনি এও বললেন যে, হে মাআয! সাদকা গুনাহর আগুনের ওপর পানির ছিটার কাজ দেয়। এমনিভাবে গত রাতের নামায (তাহাজ্জুদ) গুনাহকে দূর করে। অতপর হুযূর (সা) নিজের পবিত্র জবান ধরে বললেন ঃ একে বাধা দাও। হযরত মাআয (রা) আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মুখ দিয়ে যা বের হয় তারও কি হিসাব হবে? " হুযূর (সা) বললেন ঃ "হে মাআয! নিজের জবানের জন্য অনেক মানুষ দোযখে যাবে। একবার হুযূর (সা) হযরত মাআযকে (রা) ইসলামে তাবলীগের গুরুত্ব বুঝালেন। তিনি বললেন ঃ হে

মাআয! তুমি যদি একজন মুশরিককেও মুসলমান বানাও, তাহলে যেন দুনিয়ার সবচেয়ে বড় নিয়ামত হাসিল করলে।

হযরত মাআযকে (রা) ইয়েমেন প্রেরণ করার সময় হুযূর (সা) তাঁকে বিশেষভাবে নসীহত করলেন যে, হে মাআয! আরাম-আয়েশ থেকে দূরে থাকবে। কেননা, আল্লাহর বান্দাহ আরাম-আয়েশ প্রিয় হয় না।

হযরত মাআয (রা) বলেন, একদিন হুযূর (সা) বললেন ঃ " হে মাআয! শয়তান মানুষের নেকড়ে বাঘ। নেকড়ে যেমন সেই বকরীকে ধরে নিয়ে যায় যে পাল থেকে পালিয়ে যায় অথবা পাল থেকে দূরে চলে যায় অথবা পালের একদম কিনারে থাকে। তেমনিভাবে শয়তান সেই মানুষকে কাবু করে ফেলে যে জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ জন্য তোমরা পাহাড়ের উপত্যকা (অর্থাৎ গোমরাহ বা পথভ্রষ্টতা) থেকে বাঁচো এবং সব সময় জামায়াতের সঙ্গে থাকো।"

মুসনাদে আহমদে আছে, হুযূর (সা) হযরত মাআযকে (রা) এ ৮ বিষয়ের তাকিদ এবং ওসীয়ত করেছিলেন ঃ

১-শিরকের সঙ্গে কখনো নিজেকে সম্পৃক্ত করো না। এ জন্য যদি তোমাকে কেউ হত্যাও করে ফেলে অথবা আগুনেও নিক্ষেপ করে।

২-মাতা-পিতাকে কখনো ক্ষতি অথবা আঘাত দিওনা। যদি তারা তোমাকে তোমাদের পরিবার-পরিজন এবং ধন সম্পদ থেকে পৃথক ও মাহরূমও করে।

৩-জেনে-বুঝে কখনো ফরয নামায তরক করবে না। কেননা, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায তরক করে, আল্লাহ তায়ালা তার দায়িত্ব ও জামানত থেকে মুক্ত হয়ে যান।

৪-শরাব পান করবে না। কেননা, তা সকল খারাব কাজের মূল।

৫-গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা গুনাহতে লিপ্ত মানুষ আল্লাহর গযবের শিকার হয়।

৬-যুদ্ধের ময়দান থেকে কখনো পলায়ন করবে না। যদি সকল সৈন্য রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকে এবং মৃত্যুর সামনে দন্ডায়মান থাকে তবুও।

৭-অসুস্থতা ও রোগাক্রান্ত অবস্থায় ধৈর্য ও স্থৈর্যের সাথে কাজ করতে হবে।

৮–নিজের সন্তানদের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করতে হবে। তাদেরকে আদব শিক্ষা দিতে হবে এবং তাদের মধ্যে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করতে হবে।

একবার রহমতে আলম (সা) বললেন ঃ "হে মাআয! আমি কি তোমাকে জান্নাতের একটি মর্যাদার কথা বলবো?" তিনি খুব উৎসাহের সঙ্গে আরয করলেন ঃ "অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল (সা)!" তিনি বললেন ঃ "লা হাওলা ওয়া লা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ (সত্য অন্তরে) বেশী বেশী পড়ো।"

হযরত মাআযের (রা) একটি অভ্যেস ছিল। তিনি হুযূরকে (সা) একাকী পেলেই কিছু না কিছু প্রশ্ন অবশ্যই করতেন। যদি কখনো তিনি কিছু জিজ্ঞেস না করতেন তখন হুযূর (সা) বলতেনঃ মাআয! আমাকে একাকী পেয়েও তুমি কিছু জিজ্ঞেস করোনি কেন?

ইসলামে অগ্রগমন, রাসূল প্রেম, ঈমানের প্রতি জোশ, কুরআন ও হাদীসের প্রতি আকর্ষণ, ইলমের প্রতি উৎসাহ, আল্লাহর পথে জিহাদ, যুহদ ও তাকওয়া, সুন্নাত অনুসরণ, সত্যবাদীতা, সঠিক মত, দান ও বদান্যতা, শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদান, তাফাক্কুহ ফিদ দীন এবং তাবলীগ ও নসীহতের প্রতি উৎসাহ হযরত মাআযের (রা) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি সেই যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন যখন এ ধরনের কাজের অর্থই ছিল সমগ্র আরবের শত্রুতা খরিদ করা। হুযূরের (সা) মদীনায় শুভ পদার্পণের পর বেশীরভাগ সময় তিনি তাঁর নিকটই কাটাতেন। এমন কোন দিন আসেনি যে, তিনি রাসূলের (সা) উজ্জ্বল কান্তি দর্শন করেননি।

ঈমানের প্রতি জোশ এমন ছিল যে, বাইআতে আকাবায়ে কবীরা থেকে ফিরে এসে প্রত্যেক ঘরের মূর্তি সাফ করার কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। কুরআন–হাদীসের প্রতি সীমাহীন আকর্ষণ ও ভালবাসা ছিল। প্রিয়নবীর (সা) সামনেই কুরআন হিফজ করে ফেলেন এবং হুযূরের (সা) পবিত্র মুখ নিঃসৃত যে কথাই শুনতেন তা জীবনের জপমালা বানিয়ে নিতেন। জ্ঞান হাসিলের অবস্থাটা এমন ছিল যে, সফর ও মুকীম, একাকী ও সামষ্টিক সকল অবস্থাতেই নবীর (সা) ফয়েযে অবগাহিত হওয়ার জন্য চেষ্টা করতেন। আল্লাহর পথে জিহাদের অস্থিরতা এমন ছিল যে, শুধুমাত্র রাসূলের যুগের যুদ্ধেই আত্মোৎসর্গীকৃতভাবে শরীক হন নাই, বরং হুযূরের (সা) ইন্তেকালের পরও প্রায় অবশিষ্ট জীবনই জিহাদের ময়দানে কাটিয়ে দেন। যুহদ ও তাকওয়ার অবস্থা এমন ছিল যে, রাতের বেশীরভাগই বিশেষ করে শেষাংশে ইবাদাত এবং আল্লাহর যিকরে অতিবাহিত করতেন। ইয়েমেনের এমারত ছেড়ে ফিরে এসে সকল সম্পদ ও সরঞ্জাম এমনকি নিজের কোড়া পর্যন্ত

রাসূলের (সা) খলীফার নিকট পেশ করলেন। অথচ হুযূর (সা) তাঁকে হাদিয়া (উপঢৌকন) কবুল করার (তিনি ঋণগ্রস্ত হওয়ার কারণে বিশেষভাবে) অনুমতি প্রদান করেছিলেন।

হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর ফারুক (রা) নিজের শাসনামলে একবার হযরত মাআযকে (রা) বনী কিলাবে সাদকা আদায়ের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। বস্তুত তিনি সাদকা ওসুল করে শরীআত অনুযায়ী তা বন্টন করে দিয়েছিলেন এবং কিছুই অবশিষ্ট রাখেননি। যখন ফিরে এলেন তখন শূন্য হাত। যে চট বসার জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন তা-ই গলায় জড়িয়ে এসেছিলেন। তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন ঃ "সেই মাল কোথায় যা তুমি সেখানে পেয়েছ? অন্য রাজস্ব আদায়কারীওতো বাড়ীর জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আসে।"

হযরত মাআয (রা) বললেন ঃ "আমার ওপর একজন তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।" স্ত্রী বললেন ঃ "রাসূলুল্লাহ (সা) এবং হযরত আবু বকরতো (রা) তোমাকে আমানতদার হিসেবেই জানতেন। এখন আবার কি হয়েছে যে, হযরত ওমর (রা) তোমার ওপর একজন তত্ত্বাবধায়ককে চাপ প্রয়োগের জন্য পাঠিয়েছেন।

তাঁর স্ত্রী (সরাসরি অথবা) নিজের আত্মীয় মহিলাদের মাধ্যমে হযরত ওমরের (রা) নিকট অভিযোগ করলেন। হযরত ওমর (রা) হযরত মাআযকে (রা) ডেকে বললেন ঃ হে মাআয! তোমার স্ত্রী এটা কি বলে? আমি তো তোমার ওপর কোন তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করিনি।"

হযরত মাআয (রা) আরয করলেন ঃ "হে আমীরুল মুমিনীন! বাস্তবত আল্লাহ তায়ালা আমার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। আমি আমার স্ত্রীর নিকট আর কি ওযর পেশ করবো।" হযরত ওমর (রা) তাঁর জবাব শুনে খুব হাসলেন এবং তাঁকে কিছু দিয়ে বললেন এ দিয়ে স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করো।

এত কঠোরভাবে সুন্নাত অনুসরণ করতেন যে, নিজের প্রতিটি কথা ও কাজে হুযূরের (সা) আদর্শকে সামনে রাখতেন এবং এ ব্যাপারে ইতমিনান হয়ে নিতেন যে, তাঁর কোন আমল হুযূরের (সা) ইরশাদ বা মরযীর খেলাফতো হচ্ছে না। ইয়েমেনের আমীর হিসেবে প্রেরণের সময় হুযূর (সা) তাঁকে ৩০টি পশুর ওপর একটি বাছুর নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। একদিন এক ব্যক্তি গরুর একটি পাল নিয়ে এলো। তাতে ৩০টির কম গাভী ছিল। হযরত মাআয (রা) বললেন ঃ "রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত এই পালের ওপর থেকে আমি কিছু নিতে পারি না।

তাঁর সত্যবাদীতার সবচেয়ে বড় দলীল হলো যে, তিনি সেই সময় হুযূরের (সা) সত্য নবী হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যখন যৌবনের নেশা মানুষকে মাতাল করে রাখে। ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর। নবীর (সা) ফয়েযে তাঁর সত্যবাদীতা আরো সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং স্বয়ং নবী করীম (সা) তাঁর সত্যবাদীতার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। একবার হযরত আনাস (রা) বিন মালিকের সামনে একটি হাদীস বর্ণনা করলেন। হাদীসটির ব্যাপারে হযরত আনাসের (রা) কিছুটা সন্দেহ হলো। তিনি হুযূরের (সা) নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সা)। আপনি কি মাআয (রা) বিন জাবালের নিকট এ কথা বলেছিলেন?" হুযূর (সা) ফরমাইলেন ঃ "মাআয সত্য বলেছে। মাআয সত্য বলেছে। মাআয সত্য বলেছে।"

হযরত মাআযের (রা) মেধা ও সঠিক মতের ব্যাপারটি স্বীকৃত। স্বয়ং হুযূরে আকরাম (সা) অনেক সময় তাঁর রায় বা মতকে পসন্দ করতেন। আল্লামা ইবনে সা'দ (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খিলাফত পরিচালনা প্রশ্নে যেসব সাহাবীর (রা) সঙ্গে পরামর্শ করতেন তাঁদের মধ্যে হযরত মাআয (রা) বিন জাবালও শামিল ছিলেন। অথচ সে সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৩০ বছর।

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) ওফাতের পর হযরত ওমর ফারুক (রা) নিজের খিলাফতকালে যথারীতি মজলিসে শূরা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এ শূরার একজন সদস্য হিসেবে হযরত মাআয (রা) বিন জাবালকে মনোনীত করেন। সিরীয় সেনাপতি হযরত আবু ওবায়দা (রা) ইবনুল জাররাহ হযরত মাআয (রা) নি জাবালকে নিজের বিশেষ উপদেষ্টা নিযুক্ত করেছিলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁর নিকট থেকে অবশ্যই পরামর্শ নিতেন। হযরত মাআযের (রা) পরামর্শের ধরন পড়ে জানা যায় যে, তিনি একজন অত্যন্ত সঠিক মত ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ ছিলেন।

নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মাআয (রা) অত্যন্ত প্রশস্ত হাত ও দানশীল ছিলেন। কোন সওয়ালকারীকে তিনি শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিতেন না। এ দানশীলতার কারণেই অনেক সহায় সম্পদ বিক্রী হয়ে গিয়েছিল এবং ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। যখন ঋণদাতারা উত্যক্ত করা শুরু করলো তখন বাড়ী থেকে বের হওয়াই ছেড়ে দিলেন। তারা হুযূরের (সা) নিকট অভিযোগ করলো। হুযূর (সা) হযরত মাআযকে (রা) ডেকে পাঠালেন। তিনি নিজের পূরো অবস্থা হুযূরের (সা) খিদমতে পেশ করলেন। রহমতে আলম (সা) বললেনঃ যে ব্যক্তি ঋণ মাফ করে দেবে আল্লাহ তায়ালা তার ওপর রহম করবেন। কিছু মানুষ নিজেদের দাবী ছেড়ে দিলেন। আবার কিছু

লোক ব্যক্তিগত কারণে দাবী ছাড়লেন না। হুযূর (সা) হযরত মাআযের (রা) অবশিষ্ট সম্পদ তাদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু ঋণ রয়ে গেল। হুযূর (সা) তাদেরকে বললেন যে, তোমরা যা পেয়েছ তার ওপরই সন্তুষ্ট থাকো। হযরত মাআযকে (রা) শান্ত্বনা দিলেন যে, ঘাবড়ে যেও না। আল্লাহ তায়ালা খুব শীঘ্র তোমার জন্য কোন উত্তম ব্যবস্থা করে দেবেন। কিছু দিন পর হুযূর (সা) হযরত মাআযকে (রা) ইয়েমেনের আমীর বানিয়ে প্রেরণ করলেন। এ সময় তিনি তাকে বিশেষভাবে অনুমতি দিয়ে বলেছিলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি সন্তুষ্ট চিত্তে ও উৎসাহের সঙ্গে হাদিয়া দেয় তাহলে তা গ্রহণ করো। ধারণা করা হয় যে, হুযূর (সা) হযরত মাআযের (রা) ঋণগ্রস্ত হওয়ার কারণে এ অনুমতি দিয়েছিলেন। কেননা, তিনি আল্লাহর পথে নিজের সম্পদ বিলিয়ে দেয়ার কারণে ঋণ গ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

হযরত মাআয (রা) প্রিয় নবীর (সা) নিকট থেকে সরাসরি কুরআন, হাদীস এবং ফিকাহর শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং রাসূলের (সা) সামনেই শিক্ষা দান ও ফতওয়া দানের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর হুযূর আকরাম (স) তাঁকে শুধু এ ধারণায় মক্কার রাজস্ব আদায়কারী বানিয়েছিলেন যে, তিনি লোকদেরকে কুরআন ও সুন্নাতের শিক্ষা দেবেন। হুযূর (সা) যখন তাঁকে ইয়েমেন প্রেরণ করেছিলেন। তখন ইয়েমেনবাসীকে শিক্ষার দায়িত্বও তাঁর ওপর অর্পণ করেছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীকও (রা) তাঁকে ফতওয়া দানের পদে অধিষ্ঠিত রাখেন। হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে যদিও তাঁর বেশীর ভাগ সময় জিহাদের ময়দানে কেটেছিল তবুও তিনি শিক্ষা গ্রহণ এবং শিক্ষাদান থেকে গাফিল ছিলেন না এবং দামেস্ক, হেমস ও ফিলিস্তিনের কয়েকটি শহরে শিক্ষাদানের কেন্দ্র কায়েম করেন। তিনি প্রায়ই সেখানে গিয়ে শিক্ষা দিতেন এবং নিজের ইলমের ফয়েয থেকে জনগণকে অবগাহিত করতেন। এ সব শহর ছাড়াও তিনি অন্য অনেক শহরে সফর করে সেখানকার জ্ঞান পিপাসুদের পিপাসা মেটাতেন।

মশহুর তাবেয়ী আবু মুসলিম খাওলানী (র) বর্ণনা করেছেন যে, আমি একবার হেমসের জামে মসজিদে গেলাম। সেখানে দেখলাম ৩২ জন সাহাবী এক হালকায় বসে রয়েছেন এবং দীনী মাসয়ালা নিয়ে আলোচনা করছেন। একজন নওজোয়ান ছাড়া অবশিষ্ট সাহাবী ছিলেন বয়স্ক। যখন কোন বিষয়ে তারা একমত হচ্ছিলেন না তখন সেই যুবকের নিকট তা পেশ করছিলেন। তিনি মুহূর্তের মধ্যে তা নিষ্পত্তি করে দিচ্ছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ যুবকটি কে? তারা বললো, তিনি হলেন মাআয (রা) বিন জাবাল (রা)।

তাঁর শিক্ষা দান সংক্রান্ত এ ধরনের আরো রেওয়ায়াত কিতাবসমূহে পাওয়া যায়। ফিকাহতে হযরত মাআযের (রা) অসামান্য প্রতিভার স্বীকৃতি স্বয়ং রাসূলে করীমই (সা) দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, আমার সাহাবীদের (রা) মধ্যে মাআয (রা) বিন জাবাল হালাল ও হারামের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় আলেম।

হাদীস ও চরিতগ্রন্থসমূহে হযরত মাআযের (রা) অসংখ্য ফিকহী সিদ্ধান্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ সব সিদ্ধান্ত পড়ে জানা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা দীনী মাসয়ালাতে তাঁকে পূর্ণ মেধা দান করেছিলেন এবং তাঁর গভীর দৃষ্টি জটিল জটিল মাসয়ালার গ্রন্থিও মুহূর্তের মধ্যে মোচন করে দিত। রাসূলের (সা) ফয়েয হযরত মাআযকে (রা) তাবলীগ ও নসীহতের ব্যাপারেও প্রচন্ডভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর প্রভাবপূর্ণ বক্তব্য শ্রবণকারীর পক্ষে নিজেকে সংশোধন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। একবার নিজের পুত্রকে বললেন, পুত্র, যখন তুমি কোন নামায পড়বে তখন এমনভাবে পড়বে যেন তুমি চিরতরে বিদায় হয়ে যাচ্ছ এবং তারপর আর এখানে আসবে না। পুত্র, ভালভাবে জেনে নাও যে, মুমিন দুই নেকীর মধ্যে মৃত্যুবরণ করে। এক যা সে মৃত্যুর পূর্বে করে এবং দ্বিতীয় সাদকায়ে জারিয়া।

একবার জনৈক ব্যক্তি বললো যে, আমাকে নসীহত করুন। তিনি বললেন, আমার কথা যদি মানো তাহলে রোযাও রাখো ইফতারও করো। নামাযও পড় এবং শয়নও করো। রিযিকও কামাই কর এবং গুনাহ থেকেও বেঁচে থাকো। তোমার শেষ যাতে ইসলামের ওপর হয় সে চেষ্টা কর এবং নিজেকে মযলুমের বদদোয়া থেকে রক্ষা কর।

হযরত কাতাদাহ (রা)
বিন নু'মান আনসারী

রাসূলের (সা) যুগের এক রাতের ঘটনা। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। মদীনা মুনাওয়ারা ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত। প্রিয় নবী (সা) ইশার নামাযের জন্য মসজিদে পৌছলেন। চারদিকে একদম জনমানব শূন্য। সেই দুর্যোগপূর্ণ রাতে লোকজন গৃহেই নামায পড়ে নিয়েছিল। অবশ্য এক ব্যক্তি মসজিদের এক কোনায় বসেছিল। বিদ্যুৎ চমকালো। হুযূর (সা) বললেন ঃ "কাতাদাহ! তুমি?"

আরয করলেন ঃ "হাঁ, আল্লাহর রাসূল! আমার ধারণা ছিল যে, এই ঘুট ঘুটে অন্ধকারে খুব কম মানুষই মসজিদে আসতে পারবে। এ জন্য সাহস করে ইচ্ছাকৃতভাবে মসজিদে এসেছি।"

প্রিয় নবী (সা) তাঁর নিষ্ঠাপূর্ণ আবেগে খুব খুশী হলেন এবং বললেন ঃ "নামায শেষ হলে আমার সঙ্গে বাড়ী ফিরবে।"

তিনি যখন বাড়ী ফিরতে লাগলেন তখন রহমতে আলম (সা) তাঁকে খেজুরের একটি বাঁকা ডাল দিয়ে বললেনঃ "এটা নাও। এই ডাল তোমার আগে এবং পিছনে দশ দশ হাত পর্যন্ত আলোকিত করবে।"

তিনি বাড়ীর দিকে চললেন। এ সময় রাসূল (সা) প্রদত্ত খেজুরের ডাল এক প্রোজ্জ্বল বাতির রূপ নিল এবং তিনি তার আলোয় অত্যন্ত ইতমিনান ও সহজে বাড়ী পৌছলেন।

এই সেই কাতাদাহ, যাঁর একনিষ্ঠ আবেগে সাইয়েদুল আনাম এবং খাইরুল খালায়েক হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সা) খুশী হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আওস গোত্রের বনু জাফর শাখার চোখের মণি এবং নু'মান বিন যায়েদ (বিন আমের বিন সাওয়াদ বিন জাফর বিন খাযরাজ বিন আমর বিন মালিক বিন আওস)-এর ভাগ্যবান পুত্র। হযরত কাতাদাহ (রা) বয়প্রাপ্ত না হওয়া অবস্থাতেই পিতৃস্নেহ থেকে মাহরূম হন। তাঁর মাতা আনীসা (রা) বিনতে কায়েস (আদি বিন নাজ্জার গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন।) খাযরাজ গোত্রের খাদরাহ বংশের শরীফ ব্যক্তি মালিক বিন সিনানের সঙ্গে নিকাহ বসেন। তাঁর ঔরষে মশহুর সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) জন্মগ্রহণ করেন। এই দিক থেকে হযরত কাতাদাহ (রা) বিন নু'মান এবং হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বৈপিত্রীয় ভাই ছিলেন। হযরত কাতাদাহর (রা) কুনিয়ত

আবু ওমর এবং আবু আবদুল্লাহ দু'টিই ছিল। তিনি আনসারদের সাবিকুনাল আউয়ালুনের মধ্যে ছিলেন। আল্লামা ইবনে আসীর (র) "উসুদুল গাবাহতে" লিখেছেন যে, হযরত কাতাদাহ (রা) দ্বিতীয় বাইআতে আকাবাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু অন্যান্য সীরাত গ্রন্থে দ্বিতীয় বাইআতে আকাবায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কাতাদাহর (রা) নাম অন্তর্ভুক্ত নেই। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে, তিনি দ্বিতীয় বাইআতে আকাবার কিছু পূর্বে অথবা পরে মুসলমান হয়েছিলেন। যা হোক, তিনি আনসারদের মধ্যে ইসলামে অন্যতম অগ্রগমনকারী ছিলেন।

দ্বিতীয় হিজরীর রমযানুল মুবারকে বদরের যুদ্ধে হক ও বাতিলের মধ্যে প্রথম সংঘর্ষ ঘটে। হযরত কাতাদাহ (রা) এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ৩১৩ জন পবিত্র নফসের অন্যতম ছিলেন। এইসব লোককে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) স্পষ্ট ভাষায় জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দানে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেন। পরবর্তী বছর তৃতীয় হিজরী শওয়াল মাসে হযরত কাতাদাহ ওহোদের যুদ্ধেও অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের ময়দানে জনৈক মুশরিক তাঁর চোখের ওপর এমন এক প্রচন্ড আঘাত হানলো যে, তাঁর চোখের মণি-বাইরে ঝুলতে লাগলো। লোকজন তা কেটে দিতে চাইলো। এ সময় তিনি বললেন ঃ "রাসূলের (সা) সঙ্গে পরামর্শ করে নাও।"

হযূরের (সা) সামনে ব্যাপারটি পেশ করা হলো। তিনি বললেনঃ "না।" অতপর তিনি নিজের পবিত্র হাত দিয়ে কাতাদার (রা) চোখের মনি যথাস্থানে বসিয়ে দিয়ে দোয়া করলেন ঃ "আল্লাহুম্মা আকসিহা জামালান অর্থাৎ হে আল্লাহ! তার চোখকে সুদর্শন করে দাও।"

আল্লাহর কুদরাত! তাঁর এই চোখ আগের থেকেও বেশী সুদর্শন এবং আলোকময় হয়ে গেল এবং সারা জীবন কোন ব্যাথা অনুভব করেননি।

কতিপয় রেওয়ায়াতে একে বদরের যুদ্ধের ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ইমাম মালিক (র), দারেকুতনী (র), ইবনে আবদুল বার (র) এবং কতিপয় নেতৃস্থানীয় চরিতকার তাকে ওহোদের যুদ্ধের ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং এইটাই সঠিক। তিবরানীর রাওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত কাতাদাহ (রা) স্বয়ং এই ঘটনাকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে জনৈক ব্যক্তি আমাকে একটি ধনু প্রদান করলেন। আমি তাঁর (সা) সামনে দাঁড়িয়ে এত তীর নিক্ষেপ করলাম যে, তার এক অংশ ভেঙ্গে গেল (তা আর তীর চালানোর যোগ্য রইলো না।) এ সত্ত্বেও

আমি অব্যাহতভাবে (হুযূরের প্রাণ রক্ষার্থে) তাঁর সামনে সেই স্থানে দাঁড়িয়ে রইলাম। মুশরিকদের কোন তীর যখন তাঁর মুবারক চেহারার দিকে আসতো আমি তখন আমার মাথা সামনে এগিয়ে দিতাম। একটি তীর এসে আমার চোখে লাগলো এবং মনি চোখ থেকে বের হয়ে আমার হাতের ওপর এসে পড়লো। আমি তা হাতের তালুতে নিয়ে হুযূরের খিদমতে হাযির হলাম। তিনি আমার অবস্থা দেখে অশ্রু স্বজল হয়ে উঠলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ, কাতাদাহ (রা) তোমার নবীর সম্মান নিজের চেহারা দিয়ে করেছে। তুমি তার চোখ ভাল এবং দৃষ্টি শক্তি তীক্ষ্ণ করে দাও। সুতরাং এই চোখ অত্যন্ত সুন্দর ও তীক্ষ্ণ শক্তি সম্পন্ন হয়ে গেল।"

ইমাম হাছিমি (র) হযরত কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি ওহোদের যুদ্ধে রাসূলের (সা) একদম সামনে দাঁড়িয়েছিলাম এবং তাঁর পবিত্র মুখকে আমার মুখ দিয়ে রক্ষা করেছিলাম। আর আবু দুজানা (রা) হুযূরের (সা) পিঠের দিকে নিজের পিঠ দিয়ে রক্ষা করছিলেন। এমনকি তাঁর সমগ্র পিঠ তীরের আঘাতে ছিদ্র হয়ে গিয়েছিল।

আল্লামা ইবনে সা'দ (র) এই ঘটনাকে অন্যভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ওহোদের যুদ্ধে হযরত কাতাদাহর (রা) চোখ তাঁর গন্ডদেশের ওপর ঝুলছিল। এ সময় তিনি রাসূলের খিদমতে হাযির হলেন এবং আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল। আমার একটি স্ত্রী আছে। আমি তাকে খুব ভালবাসি। সে যদি আমার চোখের এই অবস্থা দেখে তাহলে বিরক্তি বা ঘৃণা প্রকাশ করতে পারে বলে আমার ভয় হচ্ছে।"

প্রিয় নবী (সা) তাঁর কথা শুনে নিজের পবিত্র হাত দিয়ে ঠিকরে পড়া চোখের মণি তাঁর চোখের অভ্যন্তরে যথাস্থানে রেখে দিলেন। চোখ আসল অবস্থায় ফিরে এলো এবং অন্য চোখ থেকেও সুদর্শন হয়ে গেল। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা বর্ণনা করেছেন যে, এই ঘটনা হযরত কাতাদাহ (রা) বিন নুমানের বংশ ও সন্তান সন্তুতির জন্য মান-সম্মান ও গৌরবের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আল্লামা আসীর (র) লিখেছেন যে, হযরত কাতাদাহর (রা) সন্তানদের মধ্য থেকে জনৈক ব্যক্তি কবিতার এ দুই ছত্রে সে ঘটনার ওপর গৌরব প্রকাশ করেছেন ঃ

"আমি সে ব্যক্তির পুত্র যার চোখ গন্ডদেশের ওপর ঝুলছিল।

অত্যন্ত সুন্দরভাবে মুহাম্মাদ মুস্তফার পবিত্র হাত দিয়ে তা যথা স্থানে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

অতপর এচোখ প্রথম যেমন ছিল তেমনি হয়ে গেল। কি সুন্দর ছিল সে চোখ এবং কি সন্দুর ছিল তার দ্বিতীয় বার আলোকিত হওয়া।

এক রাওয়ায়েতে আছে যে, এই কবিতা কাতাদাহর (রা) পৌত্র আছেম (র) বিন ওমর সেই সময় আবৃত্তি করেছিলেন যখন তিনি ওমর (র) বিন আবদুল আযীযের খিদমতে হাযির হয়েছিলেন এবং তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ "আপনি কে?" আছেম এই কবিতা পড়ে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন। হযরত ওমর (র) বিন আবদুল আযীয এতে তাঁকে খুব সম্মান করেছিলেন।

ওহোদের যুদ্ধের পর হযরত কাতাদাহ (রা) খন্দকের যুদ্ধ এবং নবীর (সা) অন্যান্য যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। অষ্টম হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে মক্কা বিজয়ের সময় তিনি রাসূলের (সা) সফর সঙ্গী ছিলেন। আল্লামা ইবনে আসীর (র) বর্ণনা করেছেন যে, ইসলামী বাহিনী যখন মক্কায় প্রবেশ করলো তখন বনু জাফরের ঝান্ডা হযরত কাতাদার নিকট ছিল।

মক্কা বিজয়ের পর অষ্টম হিজরীর শওয়াল মাসে হুনাইনের রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর কারণ ছিল বড় আশ্চর্য ধরনের। মক্কার ওপর ইসলামের ঝান্ডা পতপত করে ওড়ার ফলে আরবের বাতিলপন্থীদের মধ্যে যখন ভীতি সঞ্চারিত হলো তখন বনূ সাকীফ ও বনূ হাওয়াযেনের যুদ্ধবাজ গোত্রগুলোর ওপর তার উল্টো প্রভাব লক্ষ্য করা গেল। তারা হকের সামনে মাথা অবনত করার পরিবর্তে বিদ্রোহ করার জন্য উঠে পড়ে লাগলো এবং মুসলমানদেরকে খতম করে তায়েফে অবস্থিত মক্কাবাসীদের জাগীর এবং বাগানসমূহ দখল করে নেয়ার পরিকল্পনা করলো। এই হতভাগারা বনূ নজর, বনূ হিলাল এবং অন্য আরো কতিপয় গোত্রকে নিজেদের দলে টেনে নিল ও একটি বিরাট বাহিনীর আকারে মক্কার দিকে অগ্রসর হলো। এরই মধ্যে তারা আওতাস নামক স্থানে পৌছলো। বিশ্বনবী (সা) তাদের দুরভিসন্ধির কথা জানতে পেলেন। হুযূর (সা) তাদের মুকাবিলার জন্য ১২ হাজার জানবাজ সঙ্গে নিয়ে আওতাস রওয়ানা হলেন। নিজেদের সৈন্য সংখ্যা বেশী দেখে কতিপয় মুসলমানের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলঃ "এখন আমাদের ওপর আর কে বিজয়ী হতে পারে।"

এ অহংকার আল্লাহর পসন্দ হলো না এবং তিনি মুসলমানদেরকে এক কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দিলেন। ইসলামী বাহিনী যেই হুনাইন উপত্যকায় প্রবেশ করলো ঠিক তখনই উপত্যকার দু'দিকে লুকায়িতভাবে অবস্থানরত শত্রু তাদের ওপর তীরের বৃষ্টি বর্ষণ করলো। বনূ হাওয়াযেন গোত্র ছিল খুব ভয়াবহ। তাদের তীর কিয়ামতের মত অবস্থা সৃষ্টি করল। তারপর তারা

গুপ্তকেন্দ্র থেকে বের হয়ে বর্শা এবং তরবারী দিয়ে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ইসলামী বাহিনীর প্রথম দিককার দলসমূহে বেশীর ভাগ ছিল মক্কার নওমুসলিম। তারা হতবুদ্ধি হয়ে পিছু হটে গেল এবং অন্য মুসলমানদের মধ্যেও বিশৃংখলা সৃষ্টি হলো। এ নাযুক সময়ে রহমতে আলম (সা) দৃঢ়তা ও ধৈর্যের পাহাড় হিসেবে যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়েছিলেন এবং সাহাবায়ে কিরামের (রা) একটি ছোট্ট দল তাঁর চারপাশে জীবন বাজী রাখার হক আদায় করছিলেন। চরিতকাররা বিস্তারিতভাবে লিখেছেন যে, এ অটল দলে হযরত কাতাদাহ (রা) বিন নু'মানও শামিল ছিলেন। এই বিশৃংখল অবস্থায় প্রিয় নবী (সা) অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে এই গাথা উচ্চারণ করছিলেন "আনান্নাবিয়্যু লা কাযিব-আনাবনু আবদুল মুত্তালিব" (আমি নবী। তাতে প্রকৃতপক্ষে মিথ্যার কিছু নেই। আমি আবদুল মুত্তালিবের পুত্র)।

হযরত আব্বাস (রা) (রাসূলের চাচা) হুযূরের নিকটেই ছিলেন। তিনি তাঁকে মুহাজির ও আনসারদেরকে ডাকার নির্দেশ দিলেন। তিনি নারা লাগালেন "হে আনসারের দল, হে আসহাবে শাজারাহ" (অর্থাৎ বৃক্ষের নীচে বাইআতে রিদওয়ানকারীরা)

এই ভীতিপূর্ণ আওয়াজ কর্ণকুহরে প্রবেশ করতেই সমগ্র ইসলামী বাহিনী মুহূর্তের মধ্যে ঘুরে দাঁড়ালো এবং দেখতে দেখতে মুশরিকদের ব্যূহ এলোমেলো করে ফেললো। মুশরিকদের অসংখ্য মানুষ নিহত ও আহত এবং গ্রেফতার হলো এবং অঢেল গনীমতের মাল মুসলমানদের হাতে এলো। ওহোদের যুদ্ধের মত যে সব মুসলমান হুনাইনের যুদ্ধে অটল ছিলেন তাঁদের কথা নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এবং তাদের বীরত্ব ও ধৈর্যের খুব প্রশংসা করেছেন। হযরত কাতাদাহ'র (রা) এই জীবন উৎসর্গকারীদের মধ্যে থাকাটা রাসূল (সা) প্রেম এবং ব্যগ্র অন্তরের প্রমাণ বহন করে।

রাসূলের (সা) যুগের শেষ দিকে হুযূরে আকরাম (সা) মাওতার যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অভিজ্ঞ মুজাহিদদের একটি বাহিনী প্রস্তুত করলেন। এই বাহিনীতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা), হযরত সাঈদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস, হযরত আবু ওবায়দা (রা) ইবনুল জাররাহ এবং হযরত সাঈদ (রা) বিন যায়েদের সঙ্গে হযরত কাতাদাহও (রা) শামিল ছিলেন। এই সকল সাহাবী (রা) অত্যন্ত মর্যাদাবান ছিলেন। হুযূর (সা) এই বাহিনীর আমীর বানিয়েছিলেন মাহবুব সাহাবী "মাওতার শহীদ" হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিসার পুত্র হযরত উসামাকে (রা)। এ সময় হুযূরের (সা)

অসুস্থতা শুরু হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তিনি এই বাহিনীকে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারা মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে জারফ নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন করলো। এখানেই হযরত উসামা (রা) হুযূরের (সা) কঠিন পীড়ার খবর পেলেন এবং তিনি কতিপয় সাহাবীকে (রা) সঙ্গে নিয়ে তৎক্ষণাৎ জারফ থেকে মদীনা ফিরে এলেন। তাঁর মদীনা পৌছার অব্যবহিত পরই হুযূর (সা) ইন্তেকাল করেন এবং তিনি তাঁর দাফন–কাফনে অংশগ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সকল সৈন্যও জারফ থেকে মদীনা ফিরে এলো। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর হযরত উসামাকে (রা) দ্বিতীয়বার তাঁর অভিযানে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং হযরত বুরাইদা (রা) বিন হাছিব ঝান্ডা নিয়ে জারফ পৌছে গেলেন। ইত্যবসরে সমগ্র আরবে ধর্মদ্রোহীতার ফিতনার আগুন জ্বলে উঠলো। কতিপয় সাহাবী হযরত আবু বকরকে (রা) দেশের নাযুক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই অভিযান মূলতবী করার পরামশ দিলেন। অটল ও দৃঢ়চেতা এই মহান ব্যক্তিত্ব বললেন ঃ "অবশ্যই নয়। আমাকে যদি পাখী ছিঁড়েও (অথবা হিংস্র প্রাণী ফেঁড়েও) খায় তবুও আমি এই অভিযান বন্ধ করবো না। এই বাহিনী স্বয়ং রাসূলে করীম (সা) রওয়ানা করিয়েছিলেন।"

সুতরাং হযরত উসামা (রা) বিন যায়েদ (রা) সাতশ' সাহাবী (রা) সমভিব্যাহারে মনযিলে মকসূদে পৌছলেন এবং শত্রুকে শিক্ষণীয়ভাবে পরাজিত করে মাওতার যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন। এই অভিযানে হযরত কাতাদাহও (রা) হযরত উসামার (রা) সঙ্গে ছিলেন। উসামা (রা) বাহিনী সফল হয়ে বিজয়ীর বেশে মদীনা মুনাওয়ারা ফিরে এলেন। এ সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খুব খুশী হলেন এবং মুহাজির ও আনসারদের সঙ্গে নিয়ে মদীনার বাইরে গিয়ে তাঁকে ইসতিকবাল করলেন।

বিশ্ব নবীর (সা) ইন্তেকালের পর হযরত কাতাদাহ (রা) ১১–১২ বছর জীবিত ছিলেন। কিন্তু চরিত গ্রন্থসমূহে তাঁর জীবনের এই অধ্যায় সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু পাওয়া যায় না। কাতিবুল ওয়াকেদী আল্লামা ইবনে সা'দের (র) বর্ণনা অনুযায়ী হযরত কাতাদাহ (রা) ফারুকী খিলাফতের শেষ বছর ২৩ হিজরীতে ওফাত পান। আমীরুল মুমিনূন হযরত ওমর ফারুক (রা) জানাযার নামায পড়ান। এ দিয়েই তাঁর মর্যাদার আন্দাজ করা যায় যে, স্বয়ং খলীফায়ে আরব ও আজম হযরত ওমর ফারুক (রা), হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) এবং হযরত মুহাম্মাদ (রা) বিন মুসলিমা আনসারীর মত ব্যক্তিবর্গ তাঁকে কবরে নামিয়েছিলেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৬৫ বছর।

হযরত কাতাদাহ (রা) মৃত্যুর সময় দু'টি পুত্র রেখে যান। তাঁদের নাম হলো ওমর এবং আবদুল্লাহ। ওমর বিন কাতাদাহর (রা) সন্তানদের মধ্যে কয়েকজন ইলম ও ফযীলতের দিক দিয়ে মশহুর হয়েছিলেন।

হযরত কাতাদাহ (রা) জ্ঞানের ও ফযীলতের দিক থেকে অত্যন্ত উঁচুস্থানে সমাসীন ছিলেন। কিন্তু তিনি হাদীস বর্ণনাতে খুব সতর্ক ছিলেন। এ জন্য তাঁর থেকে শুধুমাত্র ৭টি হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, অধিকাংশ সাহাবী তাঁর থেকে ফতওয়া চাইতেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আবু কাতাদাহ (রা) এবং আবু সাঈদ খুদরীর (রা) মত মহান মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীও ছিলেন।

ইবনে শাহীন (র) ইবনে আবী দাউদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত কাতাদাহ (রা) সর্বপ্রথম মদীনায় সুরায়ে মারয়াম নাযিল হওয়া সম্পর্কে লোকদেরকে অভিহিত করেন।

হযরত আবু লুবাবাহ রিফায়াহ (রা) বিন আবদুল মানযার আনসারী

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে হক ও বাতিলের মধ্যের প্রথম যুদ্ধ বদরের জন্য রহমতে আলম (সা) মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন। এ সময় শুধুমাত্র ৩১৩ জন জীবন উৎসর্গকারী তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। যুদ্ধে তো তাঁরা গেলেন। সাজ-সরঞ্জামের অবস্থা ছিল খুবই কম। সকলের জন্য সওয়ারী ছিলনা। ৬০টি উট এবং দু'টি ঘোড়া ছিল তাদের সওয়ারী। কিন্তু এই সাজ-সরঞ্জামহীন অবস্থা ও সংখ্যাল্পতা সত্ত্বেও তাঁদের ঈমানের জোশ এবং জীবন কুরবানীর আকাঙ্খা এমন ছিল যে, ফেরেশতারাও তাতে ঈর্ষা করতো। ৮০ মাইলের দীর্ঘ সফরের জন্য উটের ওপর সওয়ারের এমন ব্যবস্থা করা হয়েছিলো যে, একেক উটের ওপর পালা করে তিন জন বসতেন এবং নামতেন। এই সফরে বিশ্ব স্রষ্টা এক আশ্চার্য ধরনের ছবি প্রত্যক্ষ করলেন। গৌর বর্ণের আলোকোজ্জ্বল চেহারার এক ব্যক্তি উটের ওপর সওয়ার ছিলেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সাইয়েদুল মুরসালীন ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) এবং খায়বার বিজেতা ও হযরত ফাতিমার (রা) স্বামী সাইয়েদুনা আলী মুরতাজা পদব্রজে চলছেন। সেই ব্যক্তি বার বার আরয করছিলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আপনি উটে চড়ুন। আমি পদব্রজে যাবো।"

হুযূর (সা) বললেন ঃ "না ভাই। এখন উটে চড়ার পালা তোমার, তুমি আমার থেকে বেশী পদব্রজে চলতে পারো না এবং আমিও তো হক পথে পদব্রজে চলার সওয়াব থেকে মুখাপেক্ষীহীন থাকতে পারি না।"

এই ব্যক্তি যাঁকে দোজাহানের শাহানশাহ, জিন ও ইনসানের গৌরব এবং রহমতে দো আলম (সা) পীড়াপীড়ি করে নিজের পবিত্র সওয়ারীর ওপর বসিয়েছিলেন এবং স্বয়ং তার সঙ্গে পদব্রজে গেলেন, তিনি ছিলেন সাইয়েদুনা হযরত রিফায়াহ (রা) বিন আবদুল মানযার আনসারী। ইতিহাসে তিনি আবু লুবাবাহ (রা) কুনিয়তে মশহুর হয়েছিলেন। ইবনে শিহাব এবং ইবনে হিশাম তাঁর নাম লিখেছেন বশীর। কিন্তু ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র), ইবনে ইসহাক এবং অন্য কতিপয় নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা বলেছেন যে, তাঁর নাম ছিল রিফায়াহ।

সাইয়েদুনা আবু লুবাবা রিফায়াহ (রা) বিন আবদুল মানযার আওস গোত্রের আমর বিন আওফ বংশোদ্ভূত ছিলেন। তারা কুবাতে বসবাস করতেন। সাহাবায়ে কিরামের (রা) সেই দলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল যার মর্যাদা (জমহুর আলেমদের নিকট) বদরের সাহাবীদের থেকেও উঁচু ছিল। এই পবিত্র দল ইতিহাসে "আহলে আকাবা" নামে পরিচিত। অর্থাৎ তাঁরা কুবা ও মদীনা মুনাওয়ারার সেই মানুষ যারা হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মক্কা গিয়ে আকাবার গিরিপথে প্রিয় নবীর (সা) হাতে বাইআত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তাঁরা সেই পবিত্র নফস ছিলেন যাঁরা ভীতিময় যুগে নিজের জান ও মালকে মক্কার এতীম নবীর (সা) পায়ের নীচে নিয়ে রেখেছিলেন। তখন সমগ্র আরব মুসলমানদের রক্ত পিপাসু ছিল। হযরত আবু লুবাবাহ রিফায়াহ (রা) সেই পবিত্র দলের এক উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন।

অধিকাংশ রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি আকাবায়ে কবীরার বাইআতে (অথবা বাইআতে লাইলাতুল আকাবা) প্রিয় নবীর (সা) হাতে বাইআত হয়েছিলেন। অবশ্য কতিপয় রেওয়ায়াতে এও আছে যে, তিনি প্রথম বাইআতে আকাবাতেও শরীক ছিলেন এবং তাঁকে নিজের কবীলার নকীব বানানো হয়েছিল। যা হোক, তিনি যে আহলে আকাবা ছিলেন তা প্রমাণিত। হিজরতের পর হুযূরে আকরাম (সা) কুবাতে তাশরীফ নিলে তিনি অন্যান্যদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহকে (সা) উষ্ণ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। অতপর হুযূরের (সা) কুবা ও মদীনাতে অবস্থানকালে এমন একনিষ্ঠ ও ত্যাগ প্রদর্শন করেছিলেন যে, খুব শীঘ্রই তিনি হুযূরের (সা) স্নেহ ও আস্থাভাজন হন। ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন যে, নবীর (সা) হিজরতের পূর্বে যখন হুযূরের (সা) ইঙ্গিতে বেশীর ভাগ সাহাবী (রা) মদীনায় হিজরত করেন তখন সেই প্রথম মুহাজিরদের মধ্যেকার বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি কুবা পৌঁছে হযরত আবু লুবাবা রিফায়াহ (রা) বিন আবদুল মানযারের বাড়ীতে অবস্থান করেন। তিনি অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে এবং উৎসাহের সঙ্গে মুহাজির ভাইদের মেযবানী করেন।

বদরের যুদ্ধের সময় হযরত আবু লুবাবা (রা) শুধুমাত্র রহমতে আলমের (সা) উটের ওপর বসার সৌভাগ্যই লাভ করেননি বরং তিনি মদীনা মুনাওয়ারাতে হুযূরের (সা) প্রতিনিধিত্ব করার মর্যাদাও লাভ করেন। চরিতকাররা বর্ণনা করেছেন যে, ইসলামী বাহিনী যখন মদীনা থেকে দুই দিনের দূরত্বে রুমা নামক স্থানে পৌঁছলো তখন প্রিয় নবী (সা) হযরত আবু লুবাবাকে (রা) বললেন যে, তুমি মদীনা ফিরে গিয়ে আমার প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব আঞ্জাম দাও। হযরত আবু লুবাবাহ (রা) ইরশাদ তা'মীল করলেন। তা

সত্ত্বেও রাসূল করীম (সা) তাঁকে বদরের মুজাহিদদের মধ্যে গণ্য করলেন এবং গনীমতের মালে অন্য সাহাবীদের মত তাঁকেও অংশ দিলেন। সুতরাং সকল চরিতকারই ঐকমত্যের ভিত্তিতে তাঁকে বদরের সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত করে থাকেন। আল্লামা ইবনে সা'দ লিখেছেন, বনী কাইনুকার সাবিকের যুদ্ধেও হযরত আবু লুবাবাহ (রা) মদীনা মুনাওয়ারাতে রাসূলের (সা) প্রতিনিধিত্ব করার মর্যাদা লাভ করেন।

বদরের যুদ্ধের পর হযরত আবু লুবাবাহ (রা) ওহোদ, খন্দক, খায়বার ও অন্যান্য যুদ্ধেও রহমতে আলমের (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার সুযোগ লাভ করেছিলেন এবং প্রত্যেক যুদ্ধেই অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে তরবারীর নিপুণতা প্রদর্শন করেন। বনূ কোরায়জার যুদ্ধে (পঞ্চম হিজরীতে খন্দকের যুদ্ধের অব্যবহিত পরই) এক আশ্চর্য ধরনের ঘটনা ঘটলো। ইতিহাসে তা হযরত আবু লুবাবাহর (রা) অসাধারণ প্রসিদ্ধির কারণ হয়ে গেল। চরিত গ্রন্থসমূহে এই ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। তার সার বস্তু হলো ঃ মদীনার ইহুদীদের শক্তিশালী গোত্র বনূ কোরাইজা বাহ্যত মুসলমানদের সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক রেখেছিল। কিন্তু পর্দার অন্তরালে ইসলামের জঘন্য শত্রু ছিল। পঞ্চম হিজরীতে খন্দকের যুদ্ধে কুফর পূর্ণ শক্তিতে ইসলামের ওপর হামলা করে বসলো এবং আরবের সকল হক দুশমনরা ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামের কেন্দ্র মদীনা মুনাওয়ারাকে অবরোধ করলো। মুসলমানদের জন্য এটা ছিল নাযুক সময়। মিত্রতার সম্পর্কের দিক থেকে বনূ কুরাইজার জন্য মুসলমানদেরকে সাহায্য করা আবশ্যক ছিল। অথবা কমপক্ষে নিরপেক্ষ থাকতে পারতো। কিন্তু সেই নাযুক সময়ে সেই হতভাগারা বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য কোমর বেঁধে লাগলো এবং হামলাকারীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে শহরের শান্তি ও নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটাতে শুরু করলো। তাদের এই পদক্ষেপ মুসলমানদের পিঠে ছুরিকাঘাতের নামান্তর ছিল। বিশ্বনবী (সা) আভ্যন্তরীণ ও বাইরের বিপদের আশংকায় মহিলা, শিশু ও অক্ষমদেরকে একটি রক্ষিত এলাকায় স্থানান্তর করলেন। আর আওস সরদার হযরত সা'দ (রা) বিন মাআয ও খাযরাজ সরদার হযরত সা'দ (রা) বিন উবাদাকে বনূ কুরাইজার নিকট এই পয়গাম দিয়ে প্রেরণ করলেন যে, এই মুহূর্তে তারা যেন কোন অনিষ্ট না করে। কিন্তু সেই বিশ্বাসঘাতকরা হুযূরের (সা) পয়গামের এই জবাব দিল ঃ "মুহাম্মাদ (সা) কে? তা আমরা জানি না এবং তার সঙ্গে আমাদের কোন কথা বা চুক্তি আছে বলে মনে করি না।" হুযূর (সা) সে সময়ের জন্য চুপ করে গেলেন। কিন্তু যখন হামলাকারীদেরকে আল্লাহ পাক পরাজিত করলো এবং তারা ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় মদীনার অবরোধ

উঠিয়ে পালিয়ে গেল, তখন তিনি বনূ কোরাইজার বিশ্বাসঘাতকদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং তাদের দুর্গ অবরোধ করে নিলেন।

ইহুদীদের নিজেদের শক্তিমত্তা ও মজবুতি সম্পর্কে খুব অহংকার ছিল। কিন্তু ২৫ দিন অবরোধের পর তাদের হিম্মতে ভাটা পড়লো এবং তারা প্রিয় নবীর (সা) নিকট আবু লুবাবাহ রিফায়াহ (রা) ইবনুল মানযারকে তাদের নিকট প্রেরণের অনুরোধ জানালো। তারা আবু লুবাবাহর সঙ্গে পরামর্শ করতে চেয়েছিল। বিশেষ করে তাঁকে ডাকার কারণ ছিল। তিনি আওস গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। বনূ কুরাইজা এবং আওস গোত্রের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে খুব গভীর ও মিত্রতাপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজিত ছিল। প্রিয় নবী (সা) বনূ কুরাইজার দরখাস্ত কবুল করলেন এবং হযরত আবু লুবাবাহকে (রা) তাদের নিকট গমনের অনুমতি দিলেন।

হযরত আবু লুবাবাহ (রা) দুর্গের অভ্যন্তরে গেলেন। এ সময় ইহুদীরা তাঁকে খুব সম্মান দেখালো। পরামর্শকালে অস্ত্র সমর্পণ করে তারা দুর্গের বাইরে যেতে পারবে কিনা সে ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো। হযরত আবু লুবাবাহ (রা) ইহুদীদেরকে অস্ত্র সমর্পণের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের কণ্ঠ নালির দিকে ইশারা করলেন। যার মর্মার্থ ছিল যে, বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে তাদেরকে হত্যা করা হবে। এই ইঙ্গিততো দিয়ে দিলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতি জাগলো যে, তিনি মুসলমানদের এক সামরিক গোপনীয়তা ফাঁস করে দিয়েছেন। এখন ইহুদীরা নিরাশার ঘোরে দৃঢ় সংকল্প হয়ে কোন অঘটন না ঘটিয়ে বসে এবং তাতে মুসলমানদের ক্ষতি না হয়ে যায়। তাহলে তার দায়িত্ব তার ওপর বর্তাবে। তিনি এ কথা মনে করে কেঁপে উঠলেন। নিজেকে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের (সা) খিয়ানতকারী ঠাওরালেন। নির্দ্বিধায় ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়তে লাগলেন। চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তাতে দাড়ি ভিজে গেল। দুর্গ থেকে বাইরে বেরুলেন। কিন্তু রাসূলের (সা) সামনে মুখ দেখানোর সাহস হলো না। সোজা মসজিদে নবুবীতে পৌছলেন এবং একটি মোটা শিকল দিয়ে নিজেকে একটি স্তম্ভের সঙ্গে বেঁধে দিলেন। দিন-রাত আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি এবং নিজের গুনাহ মাফের জন্য দোয়া করতে লাগলেন। পানাহার সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিয়েছিলেন। শুধুমাত্র নামায ও জরুরী প্রয়োজন মেটানোর জন্য শিকল খুলে নিতেন এবং তা শেষে কন্যাকে দিয়ে নিজেকে আবার বাঁধিয়ে নিতেন। তাঁর এহেন অবস্থার কথা শুনে সারওয়ারে আলম (সা) বললেন ঃ "যা হবার তা হয়ে গেছে। আবু লুবাবাহ যদি প্রথমেই আমার নিকট আসতো তাহলে আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট তাঁর মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতাম।"

ওদিকে আল্লাহ পাক ইহুদীদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুললেন। কোন ক্ষতি করার আর সাহস হলো না তাদের। তাদেরকে বিজিত পেয়ে হুযূর (সা) পুরুষদেরকে হত্যা করালেন এবং মহিলাদের সঙ্গে যুদ্ধ বন্দীর ন্যায় আচরণ করলেন। হযরত আবু লুবাবাহ'র (রা) নিজের ওপর আরোপিত শাস্তি ভুগতে ভুগতে কয়েকদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। এ সময় কাঁদতে কাঁদতে তাঁর চোখ ফুলে গেল। দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ এবং কান বধির হয়ে গেল। কখনো কখনো তাঁর কন্যা তাঁর মুখে সামান্য খাদ্য দিয়ে দিতেন এবং পানির দুই ঢোক পান করিয়ে দিতেন। এছাড়া আর তিনি কিছুই খেতেন না। একদিন দুর্বলতার কারণে বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। সে সময় আল্লাহর রহমত জোশ মেরে উঠলো এবং ফজরের নামাযের পূর্বে রাসূলের (সা) ওপর সূরা তওবার অধিকাংশ আয়াত নাযিল হলো ঃ

"হে মুসলমান! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের মুয়ামালায় এবং নিজেদের আমানতে খিয়ানত করো না। প্রকৃত ব্যাপার হলো তোমাদের এ ব্যাপারে জানা আছে এবং ভালভাবে জেনে নাও যে, অবশ্যই তোমাদের সম্পদ ও সন্তান ফিতনা স্বরূপ এবং আল্লাহর নিকট বড় সওয়াব রয়েছে। হে ঈমানদাররা! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করো তাহলে সে তোমাদেরকে বিশিষ্ট বা বিখ্যাত করবেন এবং তোমাদের খারাবীসমূহ দূর করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ বড় মেহেরবান।"

হুযূর (সা) সে সময় হযরত উম্মে সালামার (রা) হুজরাতে অবস্থান করছিলেন। ওহী নাযিলের পর তিনি মুচকি হাসলেন এবং পবিত্র চেহারা হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠলো। হযরত উম্মে সালামা (রা) আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ যেন সব সময় আপনাকে হাসান। ব্যাপার কি?"

হুযূর (সা) বললেন "আবু লুবাবাহর তওবা কবুল হয়ে গেছে।"

হযরত উম্মে সালামা (রা) আরয করলেন ঃ "আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। যদি অনুমতি হয় তাহলে আবু লুবাবাহকে (রা) এই সুসংবাদ শুনিয়ে দিই।"

হুযূর (সা) বললেন ঃ "হাঁ, তুমি চাইলে শুনিয়ে দিতে পারো।"

হযরত উম্মে সালামা'র (রা) হুজরা মসজিদে নবুবীর একদম কাছেই ছিল। তিনি সেখান থেকেই ডেকে বললেন ঃ "আবু লুবাবাহ! তোমার জন্য শুভ সংবাদ। তোমার তওবাহ কবুল হয়েছে।" আরও কিছু মানুষ উম্মুল মুমিনীনের কথা শুনলো এবং তাদের মাধ্যমে এ খবর মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র শহর ছড়িয়ে পড়লো। লোকজন উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে হযরত আবু লুবাবাহকে (রা)

মুবারকবাদ দেয়ার জন্য মসজিদে নবুবীর দিকে আসতে লাগলো। এদিকে হযরত আবু লুবাবাহ'রও(রা) হুশ ফিরে এলো। লোকজন তাঁর শিকল খুলতে লাগলো। তিনি খুব কঠোরতার সঙ্গে তা নিষেধ করে বললেন ঃ

"যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) আমার মত গুনাহগারের শিকল না খুলবেন, ততক্ষণ আমি এই স্তম্ভের সঙ্গেই বাঁধা থাকবো।"

রহমতে আলম (সা) ফজরের নামাযের জন্য তাশরীফ আনলেন এবং স্বহস্তে হযরত আবু লুবাবাহর (রা) শিকল খুললেন। তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন এবং হুযূরকে (সা) ঝাপটে ধরে আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর পথে আমি আমার সকল কিছু সাদকা করছি। আপনি আমাকে সব সময়ের জন্য আপনার কদমে ঠাঁই দিন।"

হুযূর (সা) বললেন ঃ "শুধুমাত্র এক তৃতীয়াংশ সম্পদ ছদকা কর।"

হযরত আবু লুবাবাহ (রা) হুকুম তামীল করলেন। অতপর সারা জীবন নিজের প্রতিটি কথা ও কাজে চরম সতর্কতা অবলম্বন করতেন। এমনকি হাদীস বর্ণনা থেকেও যথাসম্ভব দূরে থাকতেন। ভয় ছিল যে, রাসূলে আকরাম (সা) যা বলেননি তা তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে না যায়। এ জন্য তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা খুবই কম।

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, স্তম্ভ বা খুঁটির সঙ্গে বাঁধার ঘটনা তাবুকের যুদ্ধের সময় ঘটেছিল। কেননা, শুধুমাত্র অলসতার কারণে হযরত লুবাবাহ (রা) এই যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি। মুফাসসিরগণ ঐকমত্য হয়ে তাঁদের নাম হযরত কা'ব (রা) বিন মালিক, হিলাল (রা) বিন উমাইয়া এবং মারারাহ (রা) বিন রবী বলে উল্লেখ করেছেন। এ জন্য এটাই সঠিক যে, হযরত আবু লুবাবাহ (রা) তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন এবং এই ঘটনা বনূ কুরাইজার যুদ্ধের সময়ই ঘটেছিল।

৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে হযরত আবু লুবাবাহ (রা) বাইআতে রিদওয়ানে (অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির বাইআত) শরীক হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এমনিভাবে তিনি সেই চৌদ্দশ "আসহাবিশ শাজারাহ'র" পবিত্র দলে শামিল হয়েছিলেন যাঁদেরকে আল্লাহ পাক প্রকাশ্য ভাষায় নিজের সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

অষ্টম হিজরীতে দশ হাজার পবিত্র আত্মার মানুষ মক্কা বিজয়ে গমন করেন। এ সময় তিনিও রাসূলের (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন। মক্কা বিজয়ের যুদ্ধে তিনি বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিলেন। প্রিয় নবী (সা) আনসার আমর (রা)

বিন আওফের ঝান্ডা তাঁকে প্রদান করেছিলেন। তাঁর পর তিনি হুনাইন, তায়েফ এবং তাবুকের যুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। রাসূলে আকরামের (সা) ইন্তেকালের পর হযরত আবু লুবাবাহ (রা) দীর্ঘদিন বেঁচেছিলেন এবং হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর খিলাফতকালের কোন এক সময় ইন্তিকাল করেন। (ওফাতকাল সম্পর্কে মতভেদ আছে) এই সময় তাঁর কোন তৎপরতার সন্ধান পাওয়া যায় না। বিভিন্ন কার্যকারণে জানা যায় যে, তিনি হুযূরের (সা) পর বেশীর ভাগ সময় চুপচাপ আল্লাহর স্মরণে কাটিয়ে দেন। কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে প্রকাশ পায় যে, রহমতে দো আলমের (সা) আদর্শ অনুসরণে তাঁর বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। এমনকি তিনি সাধারণ সাধারণ ব্যাপারেও হুযূরের অনুসরণ করতেন। এমনিভাবে তিনি একজন সুন্দর চরিত্রের বাস্তব ছবি হয়ে গিয়েছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম

রহমতে আলম (সা) এর মদীনা মুনাওয়ারাতে হিজরতের কিছু দিন পরের ঘটনা। একদিন আধা বয়সের একজন সুদর্শন পুরুষ নবীর (সা) খিদমতে হাযির হলেন এবং এইভাবে আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল। আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। গত রাতে আমি এক আশ্চর্য ধরনের স্বপ্ন দেখেছি। আমি দেখলাম যে, আমি এক বাগানে আছি। সেই বাগানের প্রশস্ততা এবং শ্যামলিমা বর্ণনাতীত ব্যাপার। এই বাগানের মাঝখানে এক লোহার স্তম্ভ রয়েছে। এই স্তম্ভের নীচের অংশ মাটিতে এবং ওপরের অংশ একদম আসমান পর্যন্ত পৌছে গেছে। ওপরের দিকে একটি আংটা ছিল। একজন আমাকে সেই খুঁটি বা স্তম্ভে উঠতে বললো। আমি বললাম যে, আমি উঠতে পারি না। ইত্যবসরে একজন খাদিম এলো। সে আমার পেছনের দিকের কাপড় উঠালো এবং আমি তাতে উঠা শুরু করলাম এমনকি আমি খুঁটির মাথায় উঠে গেলাম এবং তার আংটা ধরলাম। একজন খুব মজবুত করে তা ধরতে বললো। তারপর আমি ঘুম থেকে জেগে গেলাম।"

হুযূরে আকরাম (সা) বললেন, "স্বপ্নে যে বাগান তুমি দেখেছ তা হলো ইসলামের বাগান এবং স্তম্ভ হলো ইসলামের আহকাম ও আরকান। আর যে আংটা বা বৃত্ত দেখেছ তাহলো উরওয়াতুল উছকা। এই আয়াতে সেদিকে ইশারাহ করা হয়েছেঃ "আমৃত্যু পর্যন্ত তুমি ইসলামের ওপর কায়েম থাকবে।"

রাসূলের (সা) জবানীতে নিজের স্বপ্নের এই তাবীর বা ব্যাখ্যা শুনে সেই ব্যক্তি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন এবং তার মুখে তাকবীর উচ্চারিত হলো। এই সেই ব্যক্তি যাঁকে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ইসলামের ওপর কায়েম থাকার সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত আবু ইউসুফ আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম।

সাইয়্যেদুনা আবু ইউসুফ আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম বিন হারিছ অত্যন্ত জালীলুল কদর ও "আহলি কিতাব" সাহাবীদের (রা) মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। মদীনার ইহুদী বংশ কাইনুকার সঙ্গে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। চরিতকাররা লিখেছেন যে, তিনি হযরত ইউসুফের (আ) বংশধর ছিলেন। তাঁর বংশ বনূ কাইনুকার লোকজন সাধারণতঃ শিল্পী ও কৃষিজীবী ছিলেন। লোহা

ও স্বর্ণের কারুকার্যে তারা বিশেষ পারদর্শীতা রাখতো। আরবী "কাইন" শব্দকে কামার এবং "কা"কে উর্বর ও কৃষি উপযোগী জমি বলা হয়। বস্তুত বনূ কাইনুকা পেশাগত দিক থেকে এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। মদীনার অন্যান্য ইহুদী গোত্রের তুলনায় তারা খুব মজবুত ও শক্তিশালী ছিল। তারা খাযরাজের বনূ আওফের শাখা তাওয়াকুলের মিত্র ছিল।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালামের আসল নাম ছিল হিছিন। তিনি ছিলেন বনূ কাইনুকার সরদার এবং মদীনায় তাওরীতের সবচেয়ে বড় আলেম। তাছাড়া ইঞ্জীলের ওপরও তাঁর দখল ছিল। তিনি তাওরাতে শেষ নবীর (সা) নিশানাসমূহ সম্পর্কে পড়েছিলেন এবং তাঁর আকাঙ্খা ছিল যে, হায়! তিনি যদি সেই শেষ নবীর যুগ পেতেন ও তাঁর সুদর্শন নধর কান্তি দেখে নিজের চোখকে জুড়াতে পারতেন!

নবুওয়াতের একাদশ বছরের হজ্ব মওসুমে বনূ খাযরাজের ৬ জন সজ্জন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর মক্কা থেকে মদীনা ফিরে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালামকে বললেন যে, আপনি যে আখেরী বা শেষ নবীর (সা) আগমনের উল্লেখ করে থাকেন, তিনি মক্কায় আবির্ভূত হয়েছেন এবং আমরা সানন্দ চিত্তে তাঁর আনুগত্য কবুল করে নিয়েছি। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম তাঁদের নিকট রাসূলের (সা) দাবীদারের আলামতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা যে বর্ণনা দিলেন তা তাওরাতে প্রাপ্ত আলামতসমূহের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিলে গেল। সুতরাং তাঁর অন্তরে সেই সময়ই ইসলামের বীজ অংকুরিত হলো এবং তিনি সাইয়েদুল আনাম ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের (সা) দর্শন লাভের জন্য দিন রাত অস্থির থাকতে লাগলেন। দ্বিতীয় বাইআতে আকাবার পর যখন ইসলামের চর্চা আওস ও খাযরাজের ঘরে ঘরে ছেয়ে গেল তখন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালামের অন্তরে রাসূল দর্শনের আকাঙ্খা আরো তীব্র আকার ধারণ করলো। নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে প্রিয় নবী (সা) যখন মদীনা মুনাওয়ারায় শুভ পদার্পণ করলেন তখন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম নিজের বাগানে ছিলেন এবং শিশুদের জন্য ফল পাড়াচ্ছিলেন। তাঁর ফুফু খালিদাহ বিনতে হারিছও তাঁর পাশে বাগানে বসেছিলেন। ইত্যবসরে কেউ এসে হুযূরে আকরামের (সা) শুভাগমনের খবর দিল। হযরত আবদুল্লাহ (রা) এর জন্য খবরটি ছিল এক অভাবিতপূর্ণ ব্যাপার। তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে নারায়ে তাকবীর উচ্চারণ করে বসলেন। তাঁর ফুফু বলতে লাগলেন ঃ

"হিছিন! এই ব্যক্তির আগমনে তুমি এতে খুশী হয়েছ যে, সম্ভবত মুসা (আ) বিন ইমরানের শুভাগমনেও তুমি এতো খুশী হতে না।"

তিনি বললেন ঃ "ফুফুজান! আল্লাহর কসম সেও মুসার (আ) ভাই। যে উদ্দেশ্যে মুসা (আ) দুনিয়ায় তাশরীফ এনেছিলেন সেই একই উদ্দেশ্যে তিনিও এসেছেন।"

ফুফু বললেন ঃ "ভ্রাতৃষ্পুত্র! সত্যি কি তিনি নবী। যাঁর ব্যাপারে তাওরাত ও অন্যান্য আসমানী কিতাবসমূহে খবর দেয়া হয়েছে?"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বললেন ঃ "অবশ্যই তিনি সেই নবী"।

ফুফু বললেন ঃ "তাহলে তো আমাদের সৌভাগ্য যে, শেষ নবী (সা) স্বয়ং আমাদের শহরে শুভ পদার্পণ করেছেন।"

আল্লামা ইবনে হিশাম (র) বর্ণনা করেছেন যে, এই আলোচনার পর হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম নবীর (সা) খিদমতে হাযির হলেন। খালিদাহ বিনতে হারিছও তাঁর পেছনে পেছনে গমন করলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে বাড়ী ফিরে এলেন। এখন তাঁর আকাঙ্খা হয়ে দাঁড়ালো যে, বাড়ীর অন্যান্য সদস্য যেন ইসলামের মহান নিয়ামত থেকে মাহরুম না থাকে। সুতরাং তিনি বাড়ীর সকলকে ইসলামের শিক্ষা দিলেন এবং তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করলেন।

স্বয়ং হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম বর্ণনা করেছেন, যখন থেকে আমি রাসূলের (সা) আবির্ভাবের চর্চা শুনেছিলাম তখন থেকেই আমি তাঁর ওপর গায়েবানাভাবে ঈমান এনেছিলাম। কিন্তু আমি আমার ঈমান ইহুদীদের নিকট গোপন রেখেছিলাম। হুযূর (সা) যখন মদীনা তাশরীফ আনলেন, তখন আমি তাঁর খিদমতে হাযির হলাম। তাঁর দর্শন লাভ এবং তাঁর কথাবার্তা শুনে আমার পোক্ত ঈমান হলো যে, তিনিই শেষ নবী। তা সত্ত্বেও আরো ইতমীনানের জন্য আমি হুযূরের (সা) নিকট কতিপয় প্রশ্ন করতে চাইলাম। বস্তুত রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বনূ নাজ্জারের মহল্লায় (হযরত আবু আইউব আনসারীর (রা) গৃহে) মুকীম হয়ে গেলেন তখন আমি পুনরায় তাঁর খিদমতে হাযির হলাম এবং কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে ইসলাম গ্রহণ করে ফেললাম।

সহীহ বুখারীতে আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম হুযূরের (সা) খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন যে, আমি আপনার নিকট তিনটি বিষয় জিজ্ঞেস করছি। প্রেরিত নবী ছাড়া আর কেউই এ বিষয়ে জানে না।

১–কিয়ামতের প্রথম আলামত কি?

২–জান্নাতবাসী খাদ্য হিসেবে প্রথমে কি পাবে?

৩–কোন্ কারণে শিশু কখনো মায়ের আকৃতির হয় এবং কখনো পিতার আকৃতির হয়?

হুযূর (সা) এই তিন প্রশ্নেরই জবাব দিলেন। অতপর হযরত আবদুল্লাহ (রা) অযাচিতভাবে বলে উঠলেন ঃ আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া ইন্নাকা রাসূলুল্লাহ অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আবদুল্লাহ (রা) আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইহুদী জাতির সরদার এবং তাদের সরদারের পুত্র। আমার কওম আমাকে আলেমের পুত্র আলেম হিসেবেও মানে এবং আমাকে খুব সম্মান করে। কিন্তু আমি জানি যে, আমার কওমের মানুষেরা ভয়ংকর মিথ্যাবাদী। আপনি নেতৃস্থানীয় ইহুদীদেরকে ডাকুন। আমি লুকিয়ে থাকবো। আপনি তাদেরকে আমার ইসলাম গ্রহণের কথা উল্লেখ না করে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করুন।" হুযূর (সা) তৎক্ষণাৎ নেতৃস্থানীয় ইহুদীদেরকে ডেকে পাঠালেন এবং তাদেরকে বললেন ঃ

"হে মানুষেরা! আমি তোমাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। তোমরা স্থির জেনো যে, ইসলাম হলো সত্য দ্বীন। আমি আল্লাহর বান্দাহ এবং তাঁর রাসূল। অতএব, তোমরা আমার দাওয়াত কবুল কর।"

ইহুদী নেতারা বললো ঃ "আমরা ইসলাম কবুল করতে চাই না। আমরা যে দীনের ওপর আছি তাই আমাদের জন্য উত্তম।"

হুযূর (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "হে ব্যক্তিবর্গ! হিছিন বিন সালাম তোমাদের মধ্যে কেমন মর্যাদার মানুষ?"

তারা বললো ঃ সে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো মানুষ এবং সকলের চেয়ে ভালো মানুষের ছেলে। সে আমাদের নেতা। তাঁর মত কোন আলেম নেই এবং তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয়।"

হুযূর (সা) বললেন ঃ "আচ্ছা, সে যদি মুসলমান হয়ে যায় তাহলে তোমরা কি তার অনুসরণ করবে?" তারা বললো ঃ "সে মুসলমান হোক, এ ধরনের যেন আল্লাহ না করেন। এটা কখনো হতে পারে না।"

তারপর হুযূর (সা) হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালামকে ডাক দিলেন। তিনি ঘরের একটি কামরায় লুকিয়ে ছিলেন। তিনি উচ্চস্বরে কালেমায়ে শাহাদাত পড়তে পড়তে বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং ইহুদীদেরকে বললেন ঃ

"হে লোকেরা! আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা খুব ভালোভাবে জানো যে, তিনি আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর দীন সম্পূর্ণ সত্য দীন। তারপরও তোমরা ঈমান আনয়নে ইতস্তত করছো?"

এ কথা শুনে ইহুদীরা উত্তেজিত হয়ে পড়লেন এবং চীৎকার করে করে বলতে লাগলেন ঃ "তুমি মিথ্যাবাদী এবং আমাদের দলের সর্ব নিকৃষ্টতম মানুষ এবং সর্বনিকৃষ্টতমের পুত্র।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম হুযূরের (সা) খিদমতে আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আপনিতো দেখলেন। তাদের এই মিথ্যাচারীতার খটকাই আমার ছিল।"

হুযূর (সা) বললেন ঃ "এখন থেকে তুমি হিছিনের পরিবর্তে আবদুল্লাহ বলে অভিহিত হবে।" সুতরাং তিনি সেই নামেই খ্যাতি লাভ করেন।

ইবনে আইনিয়াহ (র) "লুবাবুন নকুলে" বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম ইসলাম গ্রহণের পর নিজের দুই ভ্রাতুষ্পুত্র সালামাহ এবং মুহাজিরকে অত্যন্ত দরদ ও নিষ্ঠার সঙ্গে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং তাদেরকে বললেন, তোমরা জানো যে, আল্লাহ তাআলা তাওরাতে বলেছেন, আমি ইসমাইলের (আ) বংশে একজন নবী প্রেরণ করবো। যার নাম হবে আহমদ (সা)। যে-ই তাকে গ্রহণ করবে সে-ই নাজাত পাবে এবং যে তাকে অস্বীকার করবে সে অভিসম্পাতের যোগ্য হবে।"

এ কথা শুনেই সালামাহ ইসলাম গ্রহণ করলো। কিন্তু মুহাজির দাওয়াতে হক কবুল করতে অস্বীকৃতি জানালো।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম আল্লাহর আনুগত্য এবং রাসূলের (সা) অনুসরণকে জীবনের ধর্ম বানিয়ে নিলেন। তিনি খুব মনোযোগের সঙ্গে হুযূরের (সা) ইরশাদসমূহ শুনতেন এবং তা জীবনের জপমালা করে নিতেন। এভাবে তিনি সর্বাবস্থায় রাসূলের (সা) অনুসরণ করতেন। আল্লাহভীতি ও ইবাদাতের প্রতি এত আকর্ষণ ছিল যে, চেহারায় সব সময় বিনয় ও নম্রতার ছাপ পরিলক্ষিত হতো। ইলম ও ফযল, আল্লাহভীতি, বেশী বেশী ইবাদাত এবং সুন্নাত অনুসরণের ভিত্তিতে তিনি রাসূলের (সা) খুব প্রিয় পাত্র হয়ে গিয়েছিলেন। এ জন্য হুযুর (সা) বলতেন, "আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।" তা সত্ত্বেও তাঁর মিযাজে চরম পর্যায়ের বিনয় ছিল।

হযরত কায়েস বিন উবাদ তাবেয়ী (র) বলেন যে, "আমি একদিন মসজিদে

নবুবীতে বসেছিলাম। ইতিমধ্যে সেখানে একজন বুজর্গ ব্যক্তি এলেন। তাঁর চেহারার বিনয় ও আনুগত্যের ছাপ স্পষ্টই পরিলক্ষিত হচ্ছিল। তিনি দু' রাকায়াত নামায আদায় করলেন। ইত্যবসরে লোকজন বলা শুরু করেছিল যে, এই ব্যক্তি জান্নাতী। তিনি নামায শেষে মসজিদ থেকে চলে যেতে লাগলেন। এ সময় আমি তাঁর পিছু পিছু চললাম। বাড়ী পৌছে আমি তাঁর খিদমতে আরয করলাম যে, মসজিদে লোকজন আপনার সম্পর্কে বলাবলি করছিলো যে, আপনি জান্নাতী। তিনি বললেন, যে ব্যক্তির এ ব্যাপারে অকাট্য জ্ঞান নেই তার এমন কথা বলা উচিত নয়। তা সত্ত্বেও আমি তোমাকে লোকদের এ ধরনের ধারণার ভিত্তি সম্পর্কে বলছি। আমি রাসূলের (সা) যুগে একবার স্বপ্ন দেখেছিলাম। সেই স্বপ্নের তাবীর হিসেবে রাসূলে করীম (সা) বলেছিলেন যে, আমৃত্যু তুমি ইসলামের ওপর কায়েম থাকবে।" এই বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম এবং তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে কথাগুলো বলেছিলেন।

একবার লোকজন দেখলো যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম নিজের কোমরের ওপর করে কাঠের বোঝা বাজার থেকে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি ছিলেন কবীলার সরদার। আল্লাহ পাক দুনিয়ার সম্পদও তাঁকে দিয়েছিলেন। তাঁকে এই অবস্থায় দেখে লোকজন খুব আশ্চর্য হলো। তারা বললো ঃ "আবু ইউসুফ! আল্লাহ তো আপনাকে সব কিছু দিয়েছে। আপনি এই কাঠ কোন মজদুর দিয়েও তো নেওয়াতে পারতেন।"

তিনি বললেন, "আমি এইভাবে নফসের অহমিকাবোধকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করছি। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি যে, যার অন্তরে সরিষা বরাবর অহংকারও থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"

অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা বদর ও ওহোদের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালামের নাম তালিকাভুক্ত করেননি। কিন্তু খন্দকের যুদ্ধের মুজাহিদদের মধ্যে তাঁর নাম ব্যাপক আকারেই উল্লেখ করেছেন এবং এ কথাও লিখেছেন যে, তিনি তার পরবর্তী সকল যুদ্ধেই অংশ নিয়েছিলেন। শামসুল আয়েম্মা সারাখসী (র) বনূ নযীরের অবরোধের উল্লেখ করে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এই ইহুদী বংশ মদীনার বাতহা উপত্যকার সন্নিকটে বসবাস করতো। তারা হযূরের (সা) সঙ্গে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরে মক্কার কোরেশদের উস্কানিতে সেই চুক্তি ভেঙ্গে ফেলে। চতুর্থ হিজরীতে হযূর (সা) এক প্রয়োজনে তাদের মহল্লায় গমন করেছিলেন। এ

সময় তারা হুযূরকে (সা) শহীদ করে ফেলার ষড়যন্ত্র আঁটে এবং ইবনে জাহাশ নামক এক ইহুদীকে সেই প্রাচীরের ওপর চড়িয়ে দেয়, যে প্রাচীরের নীচে তিনি বসেছিলেন। ইবনে জাহাশ একটি ভারি পাথর রাসূলের (সা) ওপর গড়িয়ে ফেলছিল ঠিক এমন সময় আল্লাহ তাআলা সেই ব্যাপারে তাঁকে অবহিত করেন এবং তিনি সেখান থেকে উঠে সহীহ সালামতে ফিরে গেলেন। তারপর তিনি মুসলমানদেরকে বনূ নযীরকে অবরোধ এবং তাদের খেজুরের বাগান ধ্বংস করার নির্দেশ দেন। এই কাজে যাদেরকে নিয়োগ করা হয়েছিল তাদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালামও ছিলেন। বনূ নযীর খুব শীঘ্র অস্ত্র সমর্পণ করলো। কিন্তু হুযূর (সা) তাদেরকে মদীনায় অবস্থানের অনুমতি দিলেন না এবং খায়বারে বহিষ্কার করলেন। এই সব মানুষ ৬শ উটের ওপর নিজেদের সকল সম্পদ ও সামান বোঝাই করে বাজনা বাজাতে বাজাতে মদীনা থেকে বিদায় হলো।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম রাসূলের (সা) সান্নিধ্যলাভের কারণে সকল সাহাবী (রা) তাঁকে খুব সম্মান করতেন। হুযূরের (সা) ওফাতের পর তিনি বেশীর ভাগ সময় মদীনায় ইবাদাত, দারস ও ফতওয়া দানে কাটাতেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) বাইতুল মাকদাসের সন্ধির ব্যাপারে মদীনা থেকে সিরিয়া রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে কতিপয় মুহাজির ও আনসারকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন।

সাইয়্যেদুনা হযরত ওসমানের (রা) খিলাফতকালে ফিতনার যুগ শুরু হলে এবং বিদ্রোহীরা আমীরুল মুমিনীনের (রা) বাড়ী অবরোধ করলে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম আমীরুল মুমিনীনের (রা) গৃহে তাশরীফ নিয়ে বললেন ঃ "এই সব মানুষ আপনাকে হত্যার জন্য দৃঢ় সংকল্প, আপনি বলুন, এমতাবস্থায় আমি আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি।" হযরত ওসমান (রা) বললেন, বাইরে গিয়ে জনতার সমাবেশকে ভেঙ্গে দেয়ার চেষ্টা করুন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম বাইরে তাশরীফ নিলেন এবং সমাবেশকে সম্বোধন করে এই ভাষণ দিলেন ঃ

"একমাত্র আল্লাহ তাআলা সকল প্রশংসার যোগ্য। সেই একক সত্তাই প্রকৃত মাবুদ। তাঁকে কেউ জন্ম দেয়নি এবং তিনিও কাউকে জন্ম দেননি। অতপর তিনি মুহাম্মাদকে (সা) সুসংবাদদাতা এবং ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। যে ব্যক্তি তাঁর আনুগত্য করবে তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং যে তাঁর নাফরমানী করবে তাকে জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করেছেন এবং আল্লাহ সেই সকল লোককে বিজয়ী করেছেন যাঁরা পূর্ণ দীন

অনুসরণ করেছেন। যদিও তা মুশরিকদের ভালো লাগেনি। অতপর হুযূর (সা) মদীনা মুনাওয়ারাকে নিজের আবাস স্থল বানিয়েছেন। তাকে হিজরতের ও ঈমানের ঘর বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহর কসম! যখন তিনি মদীনায় তাশরীফ আনেন তখন থেকে ফেরেশতা এই শহরকে ঘিরে রেখেছেন এবং সেই সময় হতে আল্লাহ তাআলার তরবারী আজ পর্যন্ত খাপে রাখা হয়েছে। অবশ্যই আল্লাহ পাক হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফাকে (সা) সত্য দীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন। অতপর যে ব্যক্তি হেদায়াতের পথ অনুসরণ করেছে সে আল্লাহর হেদায়াতের সঙ্গে হেদায়াতের পথ গ্রহণ করেছে এবং যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়েছে সে বিবৃতি আর দলীল উপস্থাপন করেই পথভ্রষ্ট হয়েছে। শুনে নাও, অতীতকালে কোন নবীকে হত্যা করা হলে তার পরিবর্তে ৭০ হাজার যুদ্ধবাজকে হত্যা করা হয়েছে এবং কোন খলীফাকে হত্যা করা হলে তার পরিবর্তে ৩৫ হাজার লড়াইকারীকে হত্যা করা হয়েছে। তোমরা এই শায়খে কবীরকে (আমিরুল মুমিনীন হযরত ওসমান (রা) কে) হত্যার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না। আল্লাহর কসম! যে ব্যক্তি তাঁর হত্যায় অংশ নেবে সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে হাত কাটা ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায় উপস্থিত হবে। তোমাদের জানা উচিত যে, পুত্রের ওপর পিতার যে অধিকার থাকে সেই অধিকার তোমাদের ওপর আমিরুল মুমিনীনের রয়েছে।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালামের বক্তৃতা এই পর্যন্ত পৌছামাত্র বিদ্রোহীরা উত্তেজিত হয়ে চীৎকার দিয়ে বলতে লাগলো "এই ইহুদী (নাউযুবিল্লাহ) মিথ্যা বলছে। তাকে এবং ওসমান উভয়কে হত্যা করো"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম তাদের ওপর ক্রোধের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন : "তোমরা মিথ্যা বলছো। আল্লাহর কসম! তোমরা গুনাহগার। আমি ইহুদী নই। আমিতো অন্যতম একজন মুসলমান। জাহেলী যুগে আমার নাম ছিল হিছিন। রাসূলুল্লাহ (সা) তা পরিবর্তন করে রাখেন আবদুল্লাহ। আমার ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহ, রাসূল ও মুমিনরা জানেন। কুরআনে করীমের এইসব আয়াত আমার সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتٰبِ -

(الرعد : ٤٣)

"বলে দিন, আল্লাহ আমার এবং তোমাদের মধ্যে সাক্ষ্যের জন্য যথেষ্ট এবং তারা যথেষ্ট যাঁদের নিকট কিতাবের ইলম আছে।"

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ - (الاحقاف : ١٠)

"হে নবী! তাদেরকে বলুন, তোমরা কখনও চিন্তা করে দেখেছ কি যে, এই কালাম যদি আল্লাহর নিকট থেকেই এসে থাকে, আর তোমরা তাকে অমান্য-অগ্রাহ্য কর তাহলে তোমাদের পরিণতি কি হবে? এই ধরনেরই এক কালামের সত্যতা সম্পর্কে বনী ইসরাইলের একজন সাক্ষী সাক্ষ্যও দিয়েছে। সে ঈমান আনলো, আর তোমরা তোমাদের অহংকারে ডুবে থাকলে! এই ধরনের যালিম লোকদেরকে আল্লাহ কখনো হেদায়াত করেন না।"

অতএব, স্মরণ রেখো। যদি তোমরা আমীরুল মুমিনীনকে (রা) হত্যা করো তাহলে আল্লাহর কসম ফেরেশতা মদীনা থেকে বের হয়ে যাবে এবং আল্লাহর সেই তরবারী খাপ থেকে বের হয়ে আসবে যা এখন পর্যন্ত বন্ধ রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত খাপে ফিরে যাবে না।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালামের বক্তৃতা বিদ্রোহীদের ওপর কোন প্রভাব ফেললো না। অবশেষে তারা হযরত ওসমান যুন্নুরাইনকে (রা) হত্যা করেই ছাড়লো। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম আমীরুল মুমিনীনের শাহাদাতে ভয়ানকভাবে দুঃখিত হলেন এবং তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো ঃ "হায়! আজ আরবের শক্তির পরিসমাপ্তি হলো।" তারপর তিনি নির্জনবাসী হয়ে গেলেন।

হাফেজ ইবনে হাজার (র) ইসাবাহতে লিখেছেন যে, মুরতাজার যুগে হযরত আলী কাররামাল্লাহ ওয়াজহাহু রাজধানী যখন মদীনা থেকে কুফায় স্থানান্তর করতে লাগলেন। তখন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম তাঁর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন ঃ "আমীরুল মুমিনীন! চিন্তা করে দেখুন, আপনি যদি এই সময় রাসূলের (সা) মিম্বর ছেড়ে দেন তাহলে জীবনে আর কোন সময় তা যিয়ারতের সৌভাগ্য হয় কি না!"

হযরত আলী (রা) লোকদেরকে বললেন ঃ "আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম খুবই ভালো মানুষ। এ জন্য সে এ ধরনের বলছে।" কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালামের সন্দেহই সঠিক বলে প্রমাণিত হলো এবং কয়েক বছর পর হযরত আলী কাররামাল্লাহ ওয়াজহাহু কুফায় শাহাদাত বরণ করলেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম ৪৩ হিজরীতে আমীরে মাবিয়ার (রা) শাসনকালে মদীনাতে ওফাত পান। তিনি মৃত্যুকালে দুই পুত্র রেখে যান। পুত্র দু'জন হলেন ঃ ইউসুফ (রা) ও মুহাম্মাদ (রা) উভয়েই সাহাবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। হযরত ইউসুফের (রা) ব্যাপারে রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি জন্মগ্রহণ করলে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম তাঁকে কোলে করে দোয়া ও বরকতের জন্য হুযূরের (সা) খিদমতে নিয়ে গেলেন। হুযূর (সা) তাঁকে নিজের কোলে বসালেন। মাথায় স্নেহের হাত বুলালেন এবং ইউসুফ নাম প্রস্তাব করলেন।

সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম যদিও দীর্ঘদিন যাবত নবীর (সা) ফয়েযে অবগাহিত হয়েছিলেন তা সত্ত্বেও তিনি হাদীস বর্ণনায় খুব সতর্কতা অবলম্বন করতেন। বস্তুত তাঁর থেকে শুধুমাত্র ২৫টি হাদীস বর্ণিত আছে। তাঁর হাদীসের রাবীদের মধ্যে হযরত আনাস (রা) বিন মালিক, হযরত আবু হুরায়রাহ (রা), আবদুল্লাহ (রা) বিন মাগফাল, যারারাহ (রা) বিন আওফার মত জালীলুল কদর সাহাবী, তাঁর পুত্র, পৌত্র এবং কয়েকজন তাবেয়ী রয়েছেন। জ্ঞান ও ফযীলতের দিক থেকে তিনি সৃষ্টির আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছিলেন এবং বড় বড় মর্যাদাবান সাহাবী (রা) তাঁর নিকট মাসয়ালা ও হাদীস জিজ্ঞাসা করতেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে যে, হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) একবার হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালামের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমি রাসূলের (সা) থেকে শুনেছি জুময়ার দিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে বান্দাহ যদি সেই মুহূর্তে আল্লাহর কাছে কিছু চায় তাহলে তিনি তা অবশ্যই দান করেন। আমাকে বলুন সেই মুহূর্ত কোন্‌টি। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বললেন ঃ "আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়।" হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) বললেন, এটা কেমন করে হয়। এই বিশেষ মর্যাদাতো কোন নামাযের অবস্থায়ই হয়ে থাকে। আর আসর ও মাগরিবের মধ্যে তো কোন নামাযই নেই। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম বললেন ঃ আপনার কি হুযূরের (সা) সেই হাদীসের কথা মনে নেই, যে হাদীসে তিনি বলেছিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি নামাযের অপেক্ষায় থাকে সে যেন নামাযেই থাকে। হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন।

জালীলুল কদর সাহাবী হযরত সালমান ফারসীর (রা) সঙ্গে হযরত আবদুল্লাহর (রা) গভীর ভালোবাসা ছিল। তাবকাতে ইবনে সায়াদে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত সালমান (রা) আমাকে বললেন, হে আমার ভাই! আমাদের মধ্যে যে নিজের সাথীর আগে মারা যাবে সে বেঁচে থাকা সাথীকে অবশ্যই দেখতে আসবে। আমি বললাম

"আবু আবদুল্লাহ! এমন কি হতে পারে?" তিনি বললেন, "হাঁ, মুমিনের রূহ স্বাধীন করে দেওয়া হয়। সে যমীনের যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারে এবং কাফেরের রূহ কয়েদ করে রাখা হয়।" তারপর হযরত সালমান (রা) ইন্তেকাল করলেন। আমি তাঁর ওফাতের পর একদিন দ্বিপ্রহরে শুয়েছিলাম এবং তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। আমি দেখলাম যে, সালমান (রা) এলেন এবং আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বললেন, আমি তাঁর সালামের জবাব দিয়ে বললাম, "হে আবদুল্লাহ! কেমন আছেন?" তিনি বললেন, "খুব ভালো।" অতপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কোন্ আমলকে আপনি সবচেয়ে বেশী আফযাল পেয়েছেন?" তিনি বললেন, "তাওয়াককুলকে আমি আশ্চর্য ধরনের পেয়েছি এবং তুমি তাওয়াক্কুলের ওপর অটল থাকবে। তাওয়াক্কুল সর্বোত্তম বস্তু।"

হাফেজ যাহাবী (র) তাযকিরাতুল হুফ্ফাযে লিখেছেন যে, আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম মদীনায় আহলে কিতাবের সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন।

অন্যান্য মুহাদ্দিস ও চরিতকারের নিকট হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম ইসলাম গ্রহণের পর কুরআনেরও বড় আলেম হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ইলমের মরতবার আন্দাজ তিরমিযীর এই রেওয়ায়াত থেকে করা যায় যে, ইমামুল ফুকাহা হযরত মাআয (রা) বিন জাবালের মৃত্যুর সময় লোকজন তাঁর নিকট ওসীয়তের দরখাস্ত করলেন। তখন তিনি বললেন, "আমি বিদায় হয়ে যাবো। কিন্তু ইলম তার নিজস্ব স্থানে অবশিষ্ট থাকবে এবং যে তা তালাশ করবে বিশেষ করে চার ব্যক্তির নিকট তা পাবে। সেই চার ব্যক্তি হলেন ঃ আবু দারদা (রা), সালমান ফারসী (রা), আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ এবং আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম। এই আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম প্রথমে ইহুদী ছিলেন। তারপর মুসলমান হন। আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) তাঁর ব্যাপারে এ কথা বলতে শুনেছি ঃ ইন্নাহু আশিরুন আশরাতুল জান্নাত।

রাসূলের (সা) যে সাহাবীর শান আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং কুরআন মজীদে বর্ণনা করেছেন এবং যাঁকে ফখরে মওজুদাত সাইয়েদুল মুরসালীন (সা) জান্নাতী বলে আখ্যায়িত করেছেন। এমন কোন মুসলমান আছে কি যে তাঁর মহানত্বের স্বীকৃতি দেবে না এবং তাঁর পদাংক অনুসরণ করে চলার আকাঙ্খা পোষণ করবে না।

হযরত সা'দ (রা) বিন রবী' আনসারী

ওহোদের যুদ্ধের পর একদিন এক সাহাবী হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) সঙ্গে সাক্ষাত করতে গেলেন। গিয়ে তিনি দেখলেন যে, সিদ্দীকে আকবার (রা) শুয়ে রয়েছেন এবং একটি ছোট্ট শিশুকে নিজের বুকের ওপর বসিয়ে রেখেছেন। অত্যন্ত আদরের সঙ্গে তাকে বারবার চুমু খাচ্ছেন এবং স্নেহ করছেন। তিনি হয়রান হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু বকর! শিশুটি কে?

তিনি বললেন, এ সেই ব্যক্তির কন্যা যাকে আল্লাহ তায়ালা বিরাট মর্যাদা দান করেছেন। সে রাসূলের (সা) জন্য নিজের জীবন কুরবান করে দিয়েছে এবং কিয়ামতের দিন সে হুযূরের অন্যতম নকীব হিসেবে পরিগণিত হবে।"

সিদ্দীকে আকবার (রা) যে মহান মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি ছিলেন হযরত সা'দ (রা) বিন রবী' আনসারী।

হযরত সা'দ (রা) বিন রবী' মদীনা মুনাওয়ারার খাযরাজ গোত্রের বনূ হারিছ বিন খাযরাজ (বনূ হারিছাহ) বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাবকাতে ইবনে সা'দে তাঁর নসবনামা এভাবে লিপিবদ্ধ আছে ঃ

সা'দ বিন রবী' বিন আমর বিন আবি যুবায়ের বিন মালিক বিন ইমরাউল কায়েস বিন মালিক আয়ায বিন ছায়ালাবাহ বিন কায়াব বিন খাযরাজ বিন হারিছ বিন খাযরাজ আকবার। মাতার নাম ছিল হাযিলাহ। হযরত সা'দ স্বগোত্রে অত্যন্ত বিত্তশালী ও স্বচ্ছল বলে পরিগণিত ছিলেন।

আল্লামা ইবনে সা'দ লিখেছেন যে, তিনি আনসারদের কতিপয় শিক্ষিত লোকের অন্যতম ছিলেন। জাহেলী যুগে তিনি খুব মর্যাদাবান ছিলেন।

বিত্তবৈভবের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা হযরত সা'দকে (রা) সৎ স্বভাব দান করেছিলেন। নবুওয়াতের দশম বছরে ৬ জন নেক স্বভাবের খাযরাজীর মাধ্যমে হাদিয়ে আকরামের (সা) হকের দাওয়াত যখন ইয়াসরাববাসীর নিকট পৌছলো তখন সা'দ নির্ভাবনায় সেই দা'ওয়াত কবুল করে নিলেন এবং এমনিভাবে তিনি আনসারদের সাবিকুনাল আউয়ালুনের মধ্যে পরিগণিত হওয়ার মহান সৌভাগ্য অর্জন করলেন। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি প্রথম আকাবাতে মুসলমান হন। তারপর তিনি সেই ৭৫ জন পবিত্র নফসের

দলে শামিল হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন যাঁরা বাইআতে আকাবায়ে কবীরাতে রহমতে আলমের (সা) সঙ্গে এক পবিত্র প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হন। প্রতিশ্রুতিতে তাঁরা বলেছিলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ যুলজালালের কসম, আমরা সর্বাবস্থায় জান ও মাল দিয়ে আপনার সাহায্য এবং হেফাজত করবো।"

এই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে হুযূর (সা) তাঁদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ "আমার রক্ত ও তোমাদের রক্ত এবং আমার দায়িত্ব তোমাদের দায়িত্বে থাকবে। আমি তোমাদের এবং তোমরা আমার। তোমরা যার সঙ্গে লড়াই করবে আমিও তাদের সাথে লড়াই করবো এবং তোমরা যার সঙ্গে সন্ধি করবে আমিও তাদের সাথে সন্ধি করবো।"

হযরত সা'দ (রা) সেই সৌভাগ্যবানদের মধ্যে ছিলেন যাঁদের সঙ্গে হুযূর (সা) প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন যে, আমার জীবন-মৃত্যু তোমাদের সাথেই হবে।

আকাবায়ে কবীরার বাইআতের পর প্রিয় নবী (সা) ইয়াসরাববাসীকে বললেন, তোমরা দীনী বিষয়াদির হেফাজতের জন্য নিজেদের মধ্য থেকে ১২ জন নকীব নির্বাচিত কর। সুতরাং বাইআতে অংশগ্রহণকারীরা সর্বসম্মতভাবে ১২ জন নকীব নির্বাচিত করলেন। তাদের মধ্যে ৯ জন খাযরাজ গোত্র এবং তিনজন আওস গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। খাযরাজী নকীবদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত সা'দ (রা) বিন রবী'। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, তিনি নিজের কবীলায় অত্যন্ত প্রভাবশালী ও মান মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তাঁকে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার সঙ্গে বনূ হারিছার নকীব বানানো হয়েছিল।

হিজরতে নববীর পাঁচ মাস পর সারওয়ারে আলম (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় হযরত সা'দ (রা) বিন রবী'কে হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফের ইসলামী ভাই বানিয়েছিলেন।

(সহীহ বুখারীতে হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুর রহমান (রা) হিজরতের পর হযরত সা'দ (রা) বিন রবী'র বাড়ীতে অবস্থান করেন।)

ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পর হযরত সা'দ (রা) নিষ্ঠা ও ত্যাগের এমন এক মহান উদাহরণ পেশ করেছিলেন যে, যা বিশ্বের ইতিহাস পেশ করতে

অক্ষম রয়েছে। তাঁর দু'জন স্ত্রী ছিলেন। তিনি নিজের অর্ধেক মাল ও সাজসরঞ্জাম প্রদান ছাড়া হযরত আবদুর রহমানের নিকট এক প্রস্তাব পেশ করলেন। প্রস্তাবে তিনি বললেন যে, তিনি চাইলে তাঁর এক স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ে করতে পারেন। সেই স্ত্রীকে তিনি তালাক দিয়ে দেবেন। হযরত আবদুর রহমান (রা) তাঁর প্রস্তাব কবুল করলেন না। উপরন্তু তিনি তাঁকে অনেক দোয়া করলেন। হযরত আনাস (রা) এই ঘটনার বর্ণনা এই ভাষায় পেশ করেছেন ঃ

"আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ আমাদের নিকট এলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে সা'দ (রা) বিন রবী'র ভাই বানিয়ে দিলেন। সা'দ (রা) বিত্তবান মানুষ ছিলেন। তিনি আবদুর রহমানকে (রা) বললেন, সকল আনসার অবগত আছে যে, আমি অত্যন্ত বিত্তবান মানুষ। আমি আমার অর্ধেক মাল ও উট ভাগ করে দেব এবং আমার দু'জন স্ত্রী রয়েছে। আপনি তাদেরকে দেখুন। যাকে পসন্দ করেন তাকে তালাক দিয়ে দিব এবং যখন সে হালাল হবে তখন তাকে নিকাহ করে নিবেন।

আবদুর রহমান বললেন, আল্লাহ আপনার মাল মাত্তা এবং পরিবার ও পরিজনে বরকত দিন।

অতপর তিনি হযরত সা'দ (রা) বিন রবী'কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "এখানে কোন বাজার আছে কি? যে বাজারে বাণিজ্য চলে"।

তিনি বললেন ঃ "হাঁ। কাইনুকাতে বাজার আছে।"

হযরত আবদুর রহমান (রা) তাঁর নিকটে বাজারের রাস্তা বলে দেওয়ার অনুরোধ জানালেন।

হযরত সা'দ (রা) বাজার পর্যন্ত তাঁকে পথ দেখিয়ে দিলেন। হযরত আবদুর রহমান (রা) সেখানে ব্যবসা শুরু করলেন এবং এমন একদিন এসেছিল যে, মদীনায় তাঁর মত বড় ব্যবসায়ী আর কেউ ছিল না।

দ্বিতীয় হিজরীতে হযরত সা'দ (রা) বিন রবী' বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের (রা) অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মহান সৌভাগ্য অর্জন করেন। মাওলানা সাঈদ আনসারী মরহুম নিজের কিতাব সিয়ারে আনসারের দ্বিতীয় খন্ডে লিখেছেন ঃ "হযরত সা'দের (রা) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ সম্পর্কে ইতিহাস গ্রন্থসমূহ নিশ্চুপ রয়েছে।"

কিন্তু তাবকাতে ইবনে সা'দে (তৃতীয় খন্ড) হযরত সা'দ (রা) বিন রবী'কে স্পষ্টভাবে বদরের সাহাবীদের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

মরহুম মওলানা আবুল কাসেম রফিক দিলাওয়ারী স্বলিখিত মশহুর কিতাব সীরাতে কুবরাতে (দ্বিতীয় খন্ড) আল্লামা ইবনে সা'দের (র) রেওয়ায়াতকে সঠিক আখ্যায়িত করে হযরত সা'দ (রা) বিন রবী'কে বদরী সাহাবী বলেছেন। কাজী মুহাম্মাদ সোলায়মান মানসুর পুরীও (র) "রাহমাতুললিল আলামীন" গ্রন্থে তাঁকে বদরী সাহাবী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

বদরের পর হযরত সা'দ (রা) ওহোদের যুদ্ধে শরীক হন এবং অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন। এমনকি আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে পড়ে যান। এক রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি ১২টি গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন। রাসূলে আকরাম (সা) হযরত সা'দকে (রা) খুব ভালবাসতেন। হযরত সা'দও (রা) রাসূলকে (সা) সীমাহীন ভালবাসতেন। যুদ্ধের পর সা'দকে (রা) দেখতে না পেয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "সা'দ (রা) বিন রবী'র খবর আনার মত কেউ আছে কি?"

হযরত উবাই (রা) বিন কাআব আরয করলেন ঃ "হে রাসূল! (সা) আমি যাচ্ছি।" এ কথা বলেই তিনি যুদ্ধের ময়দানে গেলেন এবং লাশের মধ্যে ঘুরে ফিরে সা'দ (রা) বিন রবী'কে তালাশ করতে লাগলেন। বার বার তাঁর নাম ধরে ডাক দিলেন। কিন্তু কোন জবাব পেলেন না। শেষে তিনি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললেন ঃ "সা'দ যদি জীবিত থাকো তাহলে জবাব দাও। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে তোমার নিকট পাঠিয়েছেন।"

এ সময় হযরত সা'দের (রা) অবস্থা খুবই খারাব। রাসূলের (সা) নাম শুনে নিজের মধ্যে কিছুটা শক্তি অনুভব করলেন। মন ও শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিলেন ঃ

"রাসূলে আকরামের (সা) পবিত্র খিদমতে আমার সালাম আরয করো এবং আমার আনসার ভাইদেরকে বলো যে, আল্লাহ না করুন আজ যদি রাসূলুল্লাহ (সা) শহীদ হয়ে যান ও তোমাদের মধ্যে কেউ যদি জীবিত থাকেন তাহলে আল্লাহকে কখনই মুখ দেখাতে পারবে না এবং তার সামনে তোমাদের কোন ওযর গ্রহণীয় হবে না। আমরা লাইলাতুল আকাবাতে রাসূলের (সা) ওপর ফিদা হওয়ার জন্য ওয়াদা করেছিলাম।"

এ কথা বলেই তিনি হেঁচকি তুললেন এবং চিরদিনের জন্য চুপ হয়ে গেলেন।

হযরত উবাই (রা) বিন কাআব হযরত সা'দের (রা) শেষ কথাগুলো হুযূরের (সা) খিদমতে আরয করলে তিনি বললেন ঃ "আল্লাহ সা'দকে (রা)

নিজের রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দিন। জীবন ও মৃত্যু উভয় অবস্থাতেই তিনি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের কল্যাণকামী ছিলেন।"

এই যুদ্ধে হযরত খারেজা (রা) বিন যায়েদ বিন আবী যোবায়েরও অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে শহীদ হয়েছিলেন। তিনি হযরত সা'দ (রা) বিন রবী'র দাদা আমর বিন আবী যোবায়েরের ভাই ছিলেন। এই আত্মীয়তার সূত্রে হযরত সা'দ (রা) তাঁর পৌত্র হতেন। হুযূর (সা) দাদা ও পৌত্রকে (হযরত খারেজা ও সা'দ) উভয়কে একই কবরে দাফন করার নির্দেশ দিলেন। এমনিভাবে রহমতে আলমের (সা) এই দুই জান নিছার জীবনেও একে অপরের সহযোগিতা করেছেন এবং আখিরাতেও এক স্থানেই রইলেন।

হযরত সা'দ (রা) মৃত্যুকালে দুটি শিশু কন্যা রেখে যান। তাঁর কোন পুত্র ছিল না। এ জন্য সা'দের (রা) ভাই তাঁর সকল সম্পত্তি দখল করে নিল। সেই শিশু কন্যা দু'টির মা উমারাহ (রা) বিনতে হারাম তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! (সা) এরা হলো শহীদে ওহোদ সা'দ (রা) বিন রবী'র কন্যা। তাদের চাচা সা'দের (রা) সকল জায়েদাদ দখল করে নিয়েছে। সে তাদেরকে পিতার রেখে যাওয়া সম্পত্তির হকদার মনে করে না। আল্লাহর কসম! তারা যদি কিছু না পায় তাহলে তাদের বিয়ে হবে না।"

রাসূলে করীম (সা) বললেন ঃ "আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং এ ব্যাপারে ফায়সালা করবেন।"

আল্লামা ইবনে সা'দ (র) এবং ইবনে আসীর (র) বর্ণনা করেছেন যে, এই সময় মিরাসের আয়াত নাযিল হয় ঃ

فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ـ (النساء : ١٧٦)

"মৃতের উত্তরাধিকারী যদি দুই বোন হয় তবে, তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ পাওয়ার অধিকারিনী হবে।"

সুতরাং হুযূর (সা) কন্যাদ্বয়ের চাচাকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে আল্লাহর ফরমান অনুযায়ী সা'দের (রা) রেখে যাওয়া সম্পত্তি বন্টনের নির্দেশ দিলেন। বন্টনের পর যা বাঁচবে তাই তার কাছে রাখার কথা বললেন। তিনি নির্দেশ পালন করলেন। হযরত সা'দের (রা) অন্য স্ত্রীর নাম জানা যায়নি এবং তার গর্ভজাত কোন সন্তানেরও উল্লেখ পাওয়া যায়নি।

ঈমানের উদ্দীপনা, রাসূল প্রেম এবং ত্যাগ ও নিষ্ঠার কারণে হযরত সা'দ (রা) বিন রবী' সকল সাহাবীর মধ্যে অত্যন্ত ইযযত ও মর্যাদার অধিকারী

ছিলেন। রহমতে আলমও (সা) তাঁকে ভালবাসতেন এবং বিশেষ বিশেষ সময় তাঁর নিকট থেকে পরামর্শ নিতেন। ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, ওহোদের যুদ্ধের পূর্বে হুযূর (সা) মক্কার মুশরিকদের যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর পেয়ে হযরত সা'দের (রা) সঙ্গে বিশেষভাবে আলোচনা করেছিলেন।

আত্মীয়তার দিক থেকে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) হযরত সা'দ (রা) বিন রবী'র ফুফা ছিলেন। কেননা রবী'র চাচাতো বোন হাবীবা (রা) বিনতে খারেজা (রা) বিন যায়েদকে হযরত আবু বকরের (রা) সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি হযরত সা'দ (রা) এবং তাঁর সন্তানদেরকে খুব মান্য করতেন। একবার তাঁর খিলাফতকালে হযরত সা'দ (রা) বিন রবী'র কন্যা উম্মে সা'দ (অথবা উম্মে সাঈদ) জামিলা (রা) তাঁর খিদমতে হাযির হলেন। সিদ্দীকে আকবার (রা) সম্মানসূচক নিজের চাদর তাঁর জন্য বিছিয়ে দিলেন। সে সময় হযরত ওমর ফারুকও (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে খলীফাতুল মুসলিমীন! মহিলাটি কে? তিনি বললেন, "তিনি সে ব্যক্তির কন্যা যিনি আমাদের দু'জন থেকে উত্তম ছিলেন।" হযরত ওমর ফারুক (রা) আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তা কেমন করে?" সিদ্দীকে আকবার (রা) বললেন : "এ জন্য যে, তার পিতা সা'দ (রা) বিন রবী' রাসূলের (সা) সামনে জান্নাতুল ফিরদাউসের পথ ধরেন এবং আমি আর তুমি এখনো এই দুনিয়ায় বসে আছি।

হযরত হাবীব (রা) বিন যায়েদ আনসারী

হযরত হাবীব (রা) বিন যায়েদ আনসারী এক জালীলুল কদর মায়ের পুত্র ছিলেন। এই মা সম্পর্কে সাইয়েদুল মুরসালীন (সা) বলেছিলেন ঃ "ওহোদের যুদ্ধে আমি উম্মে আম্মারাকে (রা) আমার ডাইনে ও বাঁয়ে সমানে যুদ্ধ করতে দেখেছিলাম।" তাঁর ব্যাপারে তিনি দোয়া করেছিলেন ঃ "হে আল্লাহ্ ! উম্মে আম্মারাকে (রা) জান্নাতে আমার সঙ্গে রেখো।" হযরত হাবীব (রা) সেই বাহাদুর মায়ের দুধ পান করেছিলেন। তিনি খাযরাজ গোত্রের বনূ নাজ্জার বংশোদ্ভূত ছিলেন। পিতার নাম ছিল যায়েদ বিন আছেম। তাঁর শৈশবকালেই পিতা মারা যান। আল্লামা ইবনে সা'দ (র) বর্ণনা করেছেন যে, তৃতীয় হিজরীতে হাবীব (রা) বাহাদুর মা হযরত উম্মে আম্মারা (রা) ও ভাই আবদুল্লাহর (রা) সঙ্গে ওহোদের যুদ্ধে শরীক হন এবং শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত অটলতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকেন। ধারণা করা হয় যে, তিনি পরের যুদ্ধসমূহেও রাসূলের (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

হুযূরে আকরামের (সা) জীবনের শেষ দিকে ইয়ামামার সরদার মুসায়লামা কায্যাব মুরতাদ হয়ে নবুওয়াত দাবী করে বসলো। সে প্রিয় নবীকে (সা) এই চিঠি লিখলো ঃ

"মুসায়লামা রাসূলে খোদার পক্ষ থেকে মুহাম্মাদ রাসূলে খোদার নামে।

আসসালামু আলাইকা। আমি আপনার রিসালাতের অংশীদার। অর্ধেক দেশ আমার, অর্ধেক কুরাইশের। কিন্তু কুরাইশ এক চরমপন্থী জাতি।"

হুযূর (সা) তার এই জবাব লিখলেন ঃ

"মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহর চিঠি মুসায়লামা কায্যাবের নামে–

যে ব্যক্তি হেদায়াতের আনুগত্য করে তার ওপর সালাম। অতপর তুমি জানো যে, দেশ আল্লাহর এবং তিনি বান্দাহদের মধ্যে যাকে চান তার উত্তরাধিকার বানান এবং আখিরাতের কল্যাণ পরহেজগারদের জন্য রয়েছে।"

এই পবিত্র চিঠি প্রেরণের কিছু দিন পর রাসূলে করীম (সা) ওফাত পান। তারপর মুসায়লামা কাযযাব স্বরূপে প্রকাশিত হলো। সে ধোকাবাজী ও নির্যাতনের মাধ্যমে লোকদেরকে জবরদস্তিমূলকভাবে নিজের অনুগত বানানো

শুরু করলো। প্রায় ৪০ হাজার যুদ্ধবাজ আরব মুরতাদ হয়ে তার পতাকাতলে সমবেত হলো। যে ব্যক্তি তার নবুওয়াত অস্বীকার করতো তার ওপর সে কঠোর নির্যাতন চালাতো।

সেই যুগে একদিন হযরত হাবীব (রা) বিন যায়েদ আম্মান থেকে মদীনা আসছিলেন। এমন সময় সেই জালেমের হাতে পড়লেন। সে জিজ্ঞেস করলো ঃ "মুহাম্মাদের (সা) ব্যাপারে তোমার ধারণা কি?"

হযরত হাবীব (রা) জবাব দিলেন ঃ "তিনি আল্লাহর সত্য রাসূল"

মুসায়লামা বললোঃ "না বরং বলো যে, মুসায়লামা আল্লাহর সত্য রাসূল।"

হযরত হাবীব (রা) অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তার কথা প্রত্যাখ্যান করলেন। জালেম মুসায়লামা তরবারীর এক আঘাতে তাঁর হাত শহীদ করে ফেললো এবং তাঁকে বললো ঃ "এখন আমার কথা মানবে কি না?" হযরত হাবীব (রা) জবাব দিলেন ঃ "অবশ্যই নয়।" মুসায়লামা তারপর তার দ্বিতীয় হাতও শহীদ করে ফেললো এবং বললো এখনো সময় আছে আমার রিসালাত মেনে নেওয়ার।

এই রাসূল প্রেমিক উম্মে আম্মারার (রা) মত মায়ের দুধ পান করেছিলেন। বললেন, অবশ্যই নয়, অবশ্যই নয়। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।

তারপর মুসায়লামা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গেল এবং সে হযরত হাবীবের (রা) দেহের প্রতিটি জোড়া কাটা শুরু করলো। হযরত হাবীব (রা) টুকরা টুকরা হয়ে গেলেন কিন্তু ইসলামের পথ থেকে তাঁর পা এক মুহূর্তের জন্যও টলটলায়মান হলো না।

হযরত উম্মে আম্মারাহ (রা) তাঁর মুজাহিদ পুত্রের নির্যাতন মূলক শাহাদাতের খবর শুনলেন এসময় তার অটল মনোভাবের জন্য আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। কিন্তু মনে মনে ওয়াদা করলেন যে, আল্লাহ তাওফীক দিলে মুসায়লামার এই যুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করেই ছাড়বেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পর হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা) খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদকে মুসায়লামা কায্যাবকে উৎখাতের কাজে নিয়োগ করলেন। এ সময় হযরত উম্মে আম্মারাও (রা) নিজের অন্য পুত্র হযরত আবদুল্লাহর সঙ্গে হযরত খালিদের (রা) বাহিনীতে যোগ দিলেন। মুসায়লামা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রস্তুতি নিলো এবং ৪০ হাজার যুদ্ধবাজকে যুদ্ধের ময়দানে এনে দাঁড় করালো। আকরাবা (ইয়ামামা) নামক স্থানে মুরতাদ ও হকপন্থীদের মধ্যে সে যুগের সবচেয়ে ভয়ংকর রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হলো।

(ঐতিহাসিক তাবারী বর্ণনা করেছেন যে, এতবড় কঠিন যুদ্ধ মুসলমানদের সামনে আর কোন দিন আসেনি।) কখনো মুসলমানরা পিছু হটে যেতো। আবার কখনো তারা মুরতাদদেরকে পেছনে হটিয়ে দিত।

হযরত খালিদ (রা) যুদ্ধের এই অবস্থা দেখে মুসলমানদের সকল গোত্রকে পৃথক করে দিলেন এবং ঘোষণা করে দিলেন যে, প্রত্যেক গোত্র স্ব স্ব ঝান্ডার নীচে লড়াই করবে। যাতে অনুধাবন করা যায় যে, আজ কে হক পথে অটলতা দেখাতে পারে। এই পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হলো। প্রত্যেক গোত্র বাহাদুরী ও অটলতার প্রশ্নে একে অপরের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করলো এবং মুসায়লামা বাহিনীর মুখ ফিরিয়ে দিল। হযরত উম্মে আম্মারাও (রা) শুরু থেকে এ পর্যন্ত অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে লড়াই করছিলেন। কয়েকবার মুসায়লামা পর্যন্ত পৌছার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বার বারই বনূ হানীফার মুরতাদরা পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ালো। ইত্যবসরে মুরতাদদের মধ্যে পরাজয়ের আলামত প্রকাশ পেলো। তখন মুসায়লামা তাদেরকে ডেকে বললো যে, নিজেদের মান-ইয্যত বাঁচাতে হলে বাঁচাও। সে সময় উম্মে আম্মারাহ (রা) তাকে তাক করলেন এবং আঘাতের পর আঘাত খেয়েও নিজের বর্শা দিয়ে রাস্তা তৈরী করে তার দিকে অগ্রসর হলেন। এই প্রচেষ্টায় তিনি ১১টি আঘাত পেয়েছিলেন এবং একটি হাতের কব্জিও কেটে গিয়েছিল। মুসায়লামার নিকট পৌছে তিনি নিজের বর্শা দিয়ে হামলা করতে উদ্যত হলেন এমন সময় মুসায়লামার ওপর দুটো অস্ত্র এক সঙ্গে পড়লো এবং সে কেটে ঘোড়ার নীচে গিয়ে পড়লো। উম্মে আম্মারা (রা) নজর উঠিয়ে দেখলেন। তিনি পাশে পুত্র আবদুল্লাহকে (রা) দন্ডায়মান পেলেন এবং নিকটেই ওয়াহশী (রা) বিন হারব দাঁড়িয়েছিলেন। ওয়াহশী (রা) নিজের অস্ত্র মুসায়লামার ওপর নিক্ষেপ করেছিলেন এবং আবদুল্লাহ (রা) তৎক্ষণাৎ তার ওপর নিজের তরবারী দিয়ে আঘাত হেনেছিলেন। হযরত উম্মে আম্মারাহ (রা) নিজের পুত্র হাবীবের (রা) হত্যাকারী এবং মুসলমানদের জঘন্যতম শত্রুর মৃত্যুতে শুকরিয়ার সিজদা আদায় করলেন। হযরত খালিদ (রা) খুব তাড়াতাড়ি তাঁকে চিকিৎসা করালেন ফলে শীঘ্রই তাঁর সকল ক্ষত সেরে গেল।

লাখ লাখ সালাম সেই মুবারক মা ও পুত্রের ওপর যাঁদের পদাঙ্ক চিরকালের জন্য মুসলমানদেরকে হকপথ প্রদর্শন করবে।

হযরত বশীর (রা) বিন সা'দ আনসারী

হিজরতে নবুবীর কয়েক বছর পরের ঘটনা। মদীনার এক সাহাবী (রা) পাঁচ-ছ বছরের এক শিশু পুত্রের আঙ্গুল ধরে রাসূলের (সা) নিকট হাযির হলেন এবং আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সা) আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। এ আমার অত্যন্ত প্রিয় পুত্র এবং তার মাও তাকে খুব ভালোবাসে। আমাদের উভয়েরই আন্তরিক ইচ্ছা হলো যে, সে-ই আমাদের সম্পত্তির ওয়ারিস হোক। আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমি অমুক জমি নিজের এই পুত্রকে হিবা করছি। আজকের পর পুত্রই তার মালিক হবে।"

রহমতে আলম (সা) জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি তোমার অন্য পুত্রদেরকেও অংশ দিয়েছ? " তিনি আরয করলেন, "না"। হুযূর (সা) বললেন ঃ "তাহলে আমি যুলুমের সাক্ষী হবো না! (কেননা এক পুত্রের কারণে অন্যদেরকে সম্পত্তি থেকে মাহরুম করা স্পষ্ট না ইনসাফী)।

রহমতে আলমের (সা) ইরশাদ শুনে সেই ব্যক্তি বললেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সা)! যা আপনি পসন্দ করেন না আমিও তা পসন্দ করি না। আমি এখন এই শিশুর সঙ্গে অবশ্যই বিশেষ আচরণ করবো না।" এ কথা বলেই তিনি শিশুকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে গেলেন।

রাসূলের (সা) এই সাহাবী যিনি সাইয়েদুল আনামের (সা) ইরশাদের সামনে বিনা বাক্যব্যয়ে মাথা নত করে দিয়েছিলেন এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য নিজের আবেগকে দলিত মথিত করে দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন সাইয়েদুনা হযরত বশীর (রা) বিন সা'দ আনসারী।

হযরত আবু নু'মান বশীর (রা) বিন সা'দ আনসারী মহান মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর সম্পর্ক ছিল "হারিছ বিন খাযরাজ" শাখার সঙ্গে। নসবনামা হলো ঃ বশীর (রা) বিন সা'দ বিন সাআলাবা বিন খালাস বিন যায়েদ বিন মালিক আয়াজ বিন সাআলাবা বিন কায়াব বিন খাযরাজ বিন হারিছ বিন খাযরাজুল আকবার।

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা, হযরত সা'দ (রা) বিন রবী', হযরত আবু মাসউদ বদরী (রা) এবং আরো কতিপয় জালীলুল কদর সাহাবীও এই বংশোদ্ভূত ছিলেন। হযরত বশীর (রা) বিন সা'দ ইয়াসরাবের সেই হাতে গোনা কতিপয় মানুষের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা জাহেলী যুগেও লিখা পড়া জানতেন। নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরে বাইআতে আকাবায়ে উলার পর হযরত মুসআব (রা) বিন উমায়ের ইসলামের প্রথম দায়ী হিসেবে ইয়াসরাব তাশরীফ নেন। তাঁর প্রচেষ্টার বদৌলতেই কয়েক মাসের মধ্যে আওস ও খাযরাজের অনেক পরিবারে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটে। হযরত বশীর (রা) বিন সা'দেরও সেই যুগে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ হয়। নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে বাইআতে লাইলাতুল আকাবাতে (দ্বিতীয় আকাবা অথবা আকাবায়ে কবীরা) তিনি ইয়াসরাবের সেই ৭৫ জন পবিত্র নফসের দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁরা এই প্রতিশ্রুতিসহ রহমতে আলমের (সা) পবিত্র হাতে বাইআত করেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! (সা) আপনি ইয়াসরাবে আসুন। আমরা আপনাকে নিজের জীবন, মাল এবং সন্তানসহ সাহায্য ও হেফাজত করবো।"

এমনিভাবে তাঁর সেই পবিত্র দলের সদস্য হওয়ার সৌভাগ্য লাভ ঘটে যে দল ইতিহাসে "আহলে আকাবা" অথবা "আকাবা" নামে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। প্রথম মুহাজিরবৃন্দ (খুলাফায়ে রাশেদীনসহ) ও নবী (সা) স্ত্রীগণের পর আহলে আকাবার মর্যাদা সকল সাহাবী থেকে আফজাল। এমনকি বদরের সাহাবীদের চেয়েও তাঁরা মর্যাদাবান। তা থেকেই হযরত বশীর (রা) বিন সা'দের মর্যাদা আন্দাজ করা যায়। কিন্তু তিনি শুধু আকাবাই নন "বদরী" হওয়ার সৌভাগ্যও লাভ করেছিলেন। তিনি সেই চৌদ্দশ' জান নিছার সাহাবীর দলেও শরীক ছিলেন যাঁদেরকে আল্লাহ তায়ালা "আসহাবিশ শাজারার" মহান উপাধি এবং জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

চরিতকাররা লিখেছেন যে, প্রিয় নবীর (সা) মদীনায় শুভাগমনের পর যুদ্ধের সিলসিলা শুরু হলে বদর থেকে নিয়ে তাবুক পর্যন্ত এমন কোন যুদ্ধ ছিল না যাতে হযরত বশীর (রা) বিন সা'দ হুযূরের (সা) সঙ্গে অংশ নেননি। সপ্তম হিজরীর জিলকদ মাসে প্রিয় নবী (সা) ওমরার জন্য মক্কা মুয়াযযামা তাশরীফ নেন। এ সময় হযরত বশীর (রা) বিন সা'দ সশস্ত্র গ্রুপের সালার ছিলেন। এই গ্রুপটি হুযূরের (সা) হেফাজতের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। এক বছর পূর্বে হুদায়বিয়ার সন্ধিনামায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, পরবর্তী বছর মুসলমানরা মক্কা এসে ওমরা আদায় করতে পারবে। তবে, তাদেরকে অস্ত্র রেখে মক্কায় প্রবেশ করতে হবে। এই শর্ত ভীতিপ্রদই ছিল। কিন্তু মুসলমানরা আল্লাহর ওপর

ভরসা করে চুক্তির প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং মক্কার আট মাইল আগেই সকল অস্ত্র খুলে রেখে দেন। এই সকল অস্ত্র হেফাজতের জন্য একশ' সশস্ত্র সওয়ারের একটি বাহিনী মোতায়েন করা হয়। এই বাহিনীর নেতা ছিলেন হযরত বশীর (রা) বিন সা'দ। এই সকল জানবাজ বিরাট ত্যাগের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। তারা স্বয়ং সশস্ত্র হওয়ার কারণে মক্কা মুয়াযযামাতে প্রবেশ করেননি। অন্যদিকে প্রিয় নবী (সা) অন্যান্য মুসলমানসহ মক্কায় প্রবেশ করে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে ওমরা আদায় করেন।

হযরত বশীর (রা) বিন সা'দ নবীর (সা) সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ ছাড়াও দু'টি অভিযানেও নেতৃত্ব দেন। এই অভিযান দু'টি রাসূলে করীম (সা) সপ্তম হিজরীর শা'বান মাসে (অন্য এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী শওয়াল মাসে) প্রেরণ করেন। প্রথম অভিযানটি "বনী' মুররার সারিয়্যাহ" নামে খ্যাতি লাভ করে। এটা বনী মুররাহ'র বিরুদ্ধে ফিদকের দিকে প্রেরণ করা হয়েছিল। ৩০ জন জানবাজের সমন্বয়ে গঠিত ছিল অভিযানটি এবং হযরত বশীর (রা) বিন সা'দ তাঁর আমীর ছিলেন। হযরত বশীর (রা) এবং তাঁর সঙ্গীরা খুব বাহাদুরীর সঙ্গে যুদ্ধ করেন। কিন্তু তাতে তেমন সাফল্য লাভ সম্ভব হয়নি। কেননা, সকল মুজাহিদই শত্রুর তীরের আঘাতে আহত হয়েছিলেন। হযরত বশীরও (রা) গুরুতর আহত হলেন। এক বর্ণনা অনুযায়ী দুশমনরা তাঁকে মৃত মনে করে ফেলে যায়। রাতে সম্বিত ফিরে এলে তিনি কোন প্রকারে ফিদকের গ্রামে পৌঁছেন। সেখানে এক নেক দিল ইহুদী তাকে আশ্রয় দেন এবং তাঁর চিকিৎসা ও শুশ্রুষা করেন। কিছুদিন পর সেখান থেকে তিনি মদীনায় ফিরে আসেন। তারপর হুযূর (সা) তাঁকে তিনশ' যোদ্ধা দিয়ে বনূ গাতফানের দিকে প্রেরণ করলেন। এই গোত্র উয়াইনাহ বিন হাসান ফাযারীর নেতৃত্বে কুরা উপত্যকা ও ফিদকের মধ্যবর্তীস্থানে একত্রিত হয়ে মদীনার ওপর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এই অভিযান "সারিয়্যাহ বশীর বিন সা'দ" নামে প্রসিদ্ধ। হযরত বশীর (রা) বনূ গাতফানের ওপর এমন প্রচন্ড বেগে হামলা করলেন যে, তারা পালিয়ে বাঁচলো এবং মুসলমানরা প্রচুর গনীমতের মালসহ সফলকাম হয়ে ফিরে এলেন।

কতিপয় চরিতকার "সারিয়্যাহ বশীর বিন সা'দের" অবস্থা অন্যভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা লিখেছেন যে, এই অভিযান বনূ ফাযারাহ এবং বনূ আযরায় প্রেরণ করা হয়েছিল। এটা শুধুমাত্র ৩৩ জন পদাতিক মুজাহিদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল এবং হযরত বশীর (রা) তাঁদের নেতা ছিলেন। যুদ্ধে যদিও সকল মুসলমান আহত হয়েছিলেন। কিন্তু শত্রুরাও বিশৃংখল হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের দু'জনকে মুসলমানরা গ্রেফতার করেছিল।

আমাদের ধারণা যে, এই দুই অভিযানের অবস্থা মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। সঠিক এইটাই যে, প্রথম অভিযান শুধুমাত্র ৩০ জন মুজাহিদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল এবং দ্বিতীয় অভিযানে তিনশ' জানবাজ শামিল ছিলেন। কেননা বনূ গাতফানের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল এবং তাদের উৎখাতের জন্য একটি মজবুত বাহিনীর প্রয়োজন ছিল।

একাদশ হিজরীতে প্রিয় নবীর (সা) ওফাতের পর সকীফায়ে বনী সায়েদাতে আনসারদের এক বিরাট সমাবেশ হলো। বস্তুত এইসব ব্যক্তি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রিয় নবী (সা) এবং মুহাজিরদেরকে মন ও অন্তর দিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন এবং নিজেদের অসংখ্য মানুষ কুরবান করেছিলেন। এ জন্য (সেই কুরবানীর ভিত্তিতে) কুরআন মজীদ ও হাদীসসমূহে তাদেরকে খুব মর্যাদা ও ফযীলতের মুসতাহিক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সব কথার পরিপ্রেক্ষিতে আনসারদের অন্তরে খিলাফতের ধারণা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং তারা সাইয়েদুল খাযরাজ হযরত সা'দ (রা) বিন উবাদাকে খলিফাতুর রাসূল (সা) নির্বাচন করার চেষ্টা করলেন। অতপর ধারণা হলো যে, কুরাইশের মুহাজিররা যদি খিলাফতের দাবী করে তাহলে তাদেরকে কি জবাব দেওয়া হবে। জনৈক ব্যক্তি প্রস্তাব পেশ করলো যে, একজন আমীর হবে তাদের এবং আরেকজন হবে আমাদের। হযরত সা'দ (রা) বিন উবাদাহ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। ইত্যবসরে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত ওমর ফারুক (রা) অন্য কতিপয় মুহাজিরকে সঙ্গে নিয়ে সমাবেশে উপস্থিত হলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা ও কথা কাটা-কাটি হলো। দু'পক্ষই নিজেদের দাবীর স্বপক্ষে দলীল পেশ করলেন। কিন্তু সমস্যার সমাধান হলো না। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, এ সময় হযরত বশীর (রা) বিন সা'দ আনসারী হওয়া সত্ত্বেও কুরাইশের দাবীর প্রতি সমর্থন জানালেন। অবশেষে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এক প্রভাবপূর্ণ ভাষণ দিলেন। এই ভাষণে তিনি কুরাইশ মুহাজিরদের ফযীলতের কথা খুব ওজস্বী ভাষায় বর্ণনা করলেন। তাঁর পর হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) ফযীলত বর্ণনা করলেন। এ সময় উপস্থিত সকলেই চেঁচিয়ে উঠলেন, "আমরা আবু বকরের (রা) আগে অগ্রসর হওয়া থেকে পানাহ চাই।" সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) হাতে বাইআত হওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লো। হযরত বশীর (রা) বিন সা'দ আনসারদের প্রথম ব্যক্তি ছিলেন অথবা প্রথম ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন যাঁরা হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) হাতে বাইআত করেন। সহীহ বুখারীতে আছে যে, এই সাধারণ বাইআতের পর হযরত সা'দ (রা) বিন উবাদাহ ভগ্ন হৃদয় হয়ে স্বগৃহে চলে গিয়েছিলেন।

কিছু দিন পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর নিকট এসে বাইআত করার জন্য হযরত সা'দকে (রা) পয়গাম প্রেরণ করলেন। তিনি বাইআত করা থেকে অস্বীকৃতি জানালেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত আবু বকর সিদ্দীককে (রা) অবশ্যই তাঁর বাইআত গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। এ সময় হযরত বশীর (রা) বিন সা'দও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি খলীফাতুর রাসূলের (সা) খিদমতে আরয করলেন, সা'দ (রা) বিন উবাদাহ নিজের কথায় বড় মানুষ। তিনি একবার যখন অস্বীকার করে বসেছেন তখন আর তাঁকে বাইআতে রাযী করানো যাবে না। তাঁকে যদি বাধ্য করানো হয় তাহলে পরিস্থিতি অস্বস্তিকর হয়ে উঠতে পারে এবং বংশ সমেত সকল খাযরাজই তাঁর সমর্থনে দাঁড়িয়ে যেতে পারে। বরং ঘুমন্ত ফিতনাকে না জাগানোই উত্তম এবং সা'দ (রা) বিন উবাদাকে এমনিই ছেড়ে দেওয়া হোক। একা সে কি করতে পারবে? সিদ্দীকে আকবার (রা) এবং অন্যান্য সাহাবী (রা) হযরত বশীর (রা) বিন সা'দের মত পসন্দ করেন এবং কেউই হযরত সা'দ (রা) বিন উবাদার সঙ্গে বাদানুবাদ করেননি।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, কিছু দিন পর হযরত সা'দ (রা) বিন উবাদাহ (রা) সন্তুষ্ট চিত্তে হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) হাতে বাইআত করেন। কিন্তু অধিকাংশ চরিতকারই প্রথম (বাইআত না করার) রেওয়ায়াতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

সিদ্দীকে আকবার (রা) খলীফার আসনে সমাসীন হওয়ার পর সমগ্র আরবে ধর্মদ্রোহীতার আগুন জ্বলে উঠলো। এই নাযুক সময়ে খলীফাতুর রাসূল (সা) অভূতপূর্ব ধৈর্য, স্থৈর্য ও সাহসিকতা প্রদর্শন করলেন এবং উপায়-উপকরণ কম হওয়া সত্ত্বেও মুরতাদদের সামনে মাথা নত করতে অস্বীকার করলেন। এটা হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) দুরদর্শিতা এবং ঈমানী শক্তির ফলশ্রুতি ছিল। হকপন্থীরা স্বল্প সংখ্যক হলেও কয়েক মাসের মধ্যে মুরতাদদের যুদ্ধবাজ বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে ফেললো এবং অবশেষে তারা ইসলামের দিকেই ফিরে এলো। ধর্মদ্রোহীতার ফিতনা উৎখাতে হযরত বশীর (রা) বিন সা'দও জীবন উৎসর্গকারীর ভূমিকা পালন করলেন। তিনি হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের বাহিনীতে শামিল হয়ে মুসায়লামা কায্যাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামার যুদ্ধে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করেন। এমনিভাবে ধর্মদ্রোহীতার ফিতনার অন্য কয়েকটি যুদ্ধেও নিজের তরবারীর ঝলক দেখালেন। মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার এবং ধর্মদ্রোহীদের সমূলে উৎপাটিত হওয়ার পর হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) নির্দেশ মুতাবিক হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ ইরাকের দিকে অগ্রসর হলেন এবং ইরানের

শক্তিশালী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংঘর্ষের সূত্রপাত হলো। হযরত বশীর (রা) বিন সা'দও একজন মুজাহিদ হিসেবে হযরত খালিদের (রা) বাহিনীতে শরীক ছিলেন। ইরাকে প্রবেশ করে হযরত খালিদ (রা) উবুল্লাহ, মাযার, দালজাহ, আলইয়াস, আমগেশিয়া, হিরাত, আমবার, আইনুত তামার এবং আরো কয়েকটি স্থানে ইরানীদেরকে একের পর এক পরাজিত করে প্রমাণ করলেন যে, আরব জাতির নীচু ও হীন অবস্থা থেকে উত্থান ঘটেছে। এমনকি রাজকীয় সিংহাসনের শান-শকওত এবং শক্তিও তার সামনে নস্যি সমতুল্য। এই সকল যুদ্ধে হযরত বশীর (রা) বিন সা'দ বীরত্ব ও জানবাজীর হক আদায় করেছিলেন। ইরাকের সর্বশেষ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল আইনুত তামারে। তাতে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই যুদ্ধ ১২ হিজরীর কোন এক সময় সংঘটিত হয়। কতিপয় রেওয়ায়াত অনুযায়ী তিনি আইনুত তামারের যুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে শাহাদাতের মর্যাদায় সমাসীন হন। এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী তিনি সেই যুদ্ধে আহত হন এবং পরে ইন্তিকাল করেন। যা হোক, এ ব্যাপারে সকলেই এক মত যে, তিনি ১২ হিজরীতে ওফাত পান।

নেতৃস্থানীয় চরিতাকাররা হযরত বশীর (রা) বিন সা'দের পারিবারিক জীবন এবং সন্তানের ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেননি। শুধুমাত্র তাঁর একজন স্ত্রী উমরাতা (রা) বিনতে রাওয়াহা এবং এক পুত্র নু'মানের (রা) নাম সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করেছেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলের এক রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, নু'মান (রা) ছাড়া তাঁর আরো সন্তানও ছিল।

রাসূলের (সা) কবি হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার বোন ছিলেন উমারাহ (রা) এবং তিনি সাহাবিয়াহ হওয়ার গৌরব লাভ করেন। তাঁর পুত্র নু'মান (রা) বিন বশীর অন্যতম মশহুর সাহাবী ছিলেন। নবীর হিজরতের পর তিনিই প্রথম শিশু ছিলেন যিনি এক আনসার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত বশীর (রা) বিন সা'দ শিশু নুমানকে (রা) বিশ্ব নবী (সা) এর খিদমতে প্রেরণ করতেন। তিনিই ছিলেন সেই নু'মান (রা) যাঁর মাতা-পিতা ভালবাসার আতিশয্যে নিজের সকল সম্পত্তি তাঁকে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হুযূর (সা) তা নিষেধ করেন।

প্রিয় নবী (সা) শিশু নু'মান (রা) এবং তাঁর মাতা উমারাহকে (রা) খুব স্নেহ করতেন। হাফেজ আদুল বার (র) ইসতিয়াবে লিখেছেন যে, একবার তায়েফ থেকে হুযূরের (সা) নিকট আঙ্গুর এলো। সে সময় শিশু নু'মান (রা) নবীর (সা) নিকট উপস্থিত ছিল। হুযূর (সা) তাঁকে আঙ্গুরের দু'টি ছড়া দিলেন এবং বললেন যে, একটি তোমার এবং অপরটি তোমার মায়ের। নু'মান (রা)

রাস্তায় দু' ছড়াই খেয়ে ফেললো এবং মাকে একথা বললোও না। কিছু দিন পর হুযূরের (সা) খিদমতে হাযির হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ "নু'মান (রা)! আঙ্গুরের সেই ছড়া তোমার মাকে দিয়েছিলে কি?" তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সা)! না।" হুযূর (সা) স্নেহের সঙ্গে তার কান ধরে বললেন, ধূর্ত কোথাকার?"

ইসলামে অগ্রগমন, জিহাদের শওক, রাসূলের (সা) আনুগত্য এবং নেক স্বভাব হযরত বশীর (রা) বিন সা'দের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার যে, চরিতকাররা এতবড় জালীলুল কদর সাহাবী সম্পর্কে খুব কম লিখেছেন। এ সত্ত্বেও কম বেশী যে কয়টি রেওয়ায়াত তাঁর সম্পর্কে পাওয়া যায় তা তাঁর মর্যাদাই বহন করে।

হযরত খুযাইমা (রা) বিন সাবিত খুতমী

রাসূলের (সা) যুগের ঘটনা। একদিন সৌভাগ্যের দীপ্ত আভায় প্রোজ্জ্বল এক ব্যক্তি রহমতে আলমের (সা) পবিত্র খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। গত রাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি হুযূরের (সা) ললাট মুবারকে চুমু দিচ্ছি।" তিনি তাঁর কথা শুনে মুচকি হাসলেন এবং বললেনঃ "তুমি তোমার স্বপ্নের সত্যতা প্রমাণ করতে পার।"

সেই ব্যক্তি হুযূরের (সা) ইরশাদ শুনে ভালোবাসার আতিশয্যে আত্মহারা হয়ে পড়লেন এবং প্রচন্ড আবেগে সামনে অগ্রসর হয়ে ফখরে মওজুদাতের (সা) পবিত্র ললাটে চুমু দিলেন। দর্শকদের জন্য এটা ছিল এক আশ্চর্য ধরনের দৃশ্য। তাদের ঈর্ষা হচ্ছিল যে, এই সুমহান সৌভাগ্য যদি তাদের হতো। কিন্তু আল্লাহর নিয়ম ভিন্ন ধরনের। যাকে ইচ্ছা তাকেই তিনি ফযীলত দান করে থাকেন।

আসমান ও যমীনের পবিত্রতম ব্যক্তিত্ব, জ্বিন ও ইনসানের গৌরব, রাসূলদের নেতা, নবীদের ইমাম রহমতে দো আলমের (সা) ললাট মুবারকে চুম্বনদানকারী মহান ভাগ্যবান এই সাহাবীর নাম ছিল হযরত খুযাইমা (রা) বিন সাবিত খুতমী আনসারী।

সাইয়েদুনা হযরত খুযাইমা (রা) হেদায়াতের আকাশে দেদীপ্যমান সেই সকল তারকার মধ্যে পরিগণিত যাঁদের প্রখর আলোকে ইসলামের ইতিহাসের পাতা উজ্জ্বলময়। তিনি আওস কবীলার শাখা বনূ খুতমার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

খুযাইমা (রা) বিন সাবিত বিন ফাকা বিন সা'লাবা বিন সায়িদাহ বিন আমের বিন আয়ান বিন আমের বিন খুতমাহ (আবদুল্লাহ) বিন জাশম বিন মালিক বিন আওস।

মায়ের নাম ছিল কাবশা বিনতে আওস। তিনি খাযরাজের শাখা বনূ সায়িদার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। হযরত খুযাইমার (রা) কুনিয়ত ছিল আবু আম্মারা। লকব ছিল যুশ শাহাদাতাইন। নবী করীম (সা) তাঁকে এই লকব দান করেছিলেন।

আল্লাহ তাআলা হযরত খুযাইমাকে (রা) অত্যন্ত নেক স্বভাব দান করেছিলেন। প্রিয় নবীর (সা) মদীনা হিজরতের পূর্বে হযরত মুসআব (রা) বিন উমায়ের ইসলামের প্রথম দায়ী হিসেবে মদীনা আগমন করেন। তাঁর তাবলীগী প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসেবে আওস ও খাযরাজের বেশীর ভাগ পরিবারই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত খুযাইমাও (রা) সেই যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। হক কবুলের পর প্রতিমাগুলোর প্রতি তাঁর এত ঘৃণা জন্মেছিল যে, নিজের একজন উৎসাহী সাথী উমায়ের বিন আদীকে সঙ্গে নিয়ে বনূ খুতমার সকল মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেছিলেন।

প্রিয় নবী (সা) মদীনা তাশরীফ আনলেন এবং যুদ্ধের ধারা শুরু হলো। হযরত খুযাইমা প্রায় সকল যুদ্ধেই রাসূলের (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন। মরহুম মওলবী সাঈদ আনসারী সিয়ারে আনসার গ্রন্থে হযরত খুযাইমাকে (রা) বদরী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু চরিত ও জিহাদের গ্রন্থসমূহের বদরী সাহাবীদের তালিকায় তাঁর নাম নেই। বাস্তবিকই যদি তিনি বদরের যুদ্ধে অংশ না নিয়ে থাকেন তাহলে তার বিশেষ কারণ থাকতে পারে। হতে পারে তিনি সে সময় মদীনার বাইরে ছিলেন। অথবা অসুস্থ ছিলেন। নচেৎ তাঁর মত লোকের কোন ওযর ছাড়া বদরের যুদ্ধে অংশ না নেওয়ার কথা চিন্তাই করা যায় না।

মক্কা বিজয়ের সময় তিনি রাসূলের (সা) সাথে ছিলেন। সে সময় তাঁর বিশেষ মর্যাদা লাভ ঘটেছিল। প্রিয় নবী (সা) তাঁকে বনূ খুতমার ঝান্ডা অর্পণ করেছিলেন এবং এই ঝান্ডা উড়াতে উড়াতে মক্কা প্রবেশ করেন।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফার (সা) ওফাতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা) এবং হযরত ওসমান যুন্নুরাইনের (রা) খিলাফতকালে হযরত খুযাইমা (রা) বিন সাবিতের জীবন কেমন কেটেছিল? চরিত গ্রন্থগুলো এ ব্যাপারে নীরব রয়েছে। হযরত আলীর (রা) খিলাফতকালে তাঁর নাম দ্বিতীয়বার জনসমক্ষে আসে। হযরত আলী (রা) রাজধানী মদীনা থেকে কুফায় স্থানান্তর করলে তিনিও কুফায় গিয়ে মুকীম হন।

৩৬ হিজরীতে উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সময় হযরত খুযাইমা (রা) হযরত আলীর (রা) সঙ্গে ছিলেন। এ সত্ত্বেও তিনি এই যুদ্ধে বাস্তবভাবে অংশ নেননি। তারপর তিনি ৩৭ হিজরীতে সংঘটিত সিফফীনের যুদ্ধে হযরত আলীর (রা) সমর্থক ছিলেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে যে, হযরত আম্মার (রা) বিন ইয়াসির যখন সিরীয় সৈন্যের হাতে শাহাদাত প্রাপ্ত হন তখন হযরত খুযাইমা (রা) আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন এবং তরবারী

হাতে নিয়ে বীরত্ব গাঁথা পড়তে পড়তে দুশমনের ব্যূহে ঢুকে পড়লেন। তিনি দীর্ঘক্ষণ অত্যন্ত বাহাদুরীর সঙ্গে লড়াই করতে লাগলেন। অবশেষে সিরীয়দের তীর ও তরবারীর আঘাতে শাহাদাতের পেয়ালা পান করে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন।

হযরত খুযাইমা (রা) মৃত্যুকালে দুই পুত্র আম্মারাহ, ওমর এবং এক কন্যা উমরাহকে রেখে যান।

হযরত খুযাইমার (রা) জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনার কথা এখানে স্মরণযোগ্য। প্রিয় নবী (সা) সেই ঘটনায় তাঁর সাক্ষ্যকে দুই ব্যক্তির সাক্ষ্যের সমান বলে আখ্যায়িত করেছিলেন এবং তিনি "যুশ শাহাদাতাইন" লকবে বিভূষিত হয়েছিলেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদে আবু দাউদ, নাসায়ী এবং তাবকাতে ইবনে সা'দ প্রভৃতিতে বর্ণিত আছে যে, একবার রাসুলুল্লাহ (সা) একজন বেদুইনের (তিবরানী ও ইবনে শাহীন যার নাম সওয়ার ইবনুল হারছ লিখেছেন) নিকট থেকে একটি ঘোড়া কিনলেন। তারপর সেই বেদুইন হুযূরের (সা) পিছনে পিছনে চললো। রাস্তার এমন এক স্থানে এই কেনা-বেচা হয়েছিল, যে স্থানটি ছিল হুযূরের বাসস্থান থেকে কিছু দূরে এবং মূল্যের অর্থ তাঁর নিকট ছিল না। সুতরাং তিনি সেই বেদুইনকে মূল্য দেওয়ার জন্য নিজের সঙ্গে নিয়ে চললেন। হুযূর (সা) দ্রুত গতিতে গেলেন। যাতে তাড়াতাড়ি বাড়ী পৌঁছে মূল্য আদায় করতে পারেন। কিন্তু বেদুইন খুব আস্তে আস্তে চলতে লাগলেন। (এমনকি অনেক পেছনে পড়ে গেল)। ইত্যবসরে কিছু লোক তার সঙ্গে মিলিত হলো এবং ঘোড়ার দরদাম করতে লাগলো। তারা জানতো না যে, হুযূর (সা) ঘোড়াটি ক্রয় করেছেন। এমনকি কতিপয় লোক বেদুইনকে রাসূলের (সা) সঙ্গে ধার্যকৃত মূল্যের চেয়ে বেশী মূল্য প্রদানের প্রস্তাব পেশ করলো। তাতে বেদুইন হুযূরকে (সা) উচ্চস্বরে ডেকে বললো (কেননা তিনি আগে এগিয়ে গিয়েছিলেন) "আপনি এই ঘোড়া কিনলে কিনুন নচেৎ আমি তা অন্যের নিকট বেচে দেবো।" তিনি বেদুইনের চেঁছানো শুনে দাঁড়িয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে বেদুইন তাঁর নিকট এলো।

হুযূর (সা) বললেন ঃ "তুমি তো আমার নিকট ঘোড়া বেচে দিয়েছ।" বেদুঈন উল্টে বললো, "আল্লাহর কসম। আমি তা আপনার নিকট বেচিনি।"

তিনি বললেন ঃ "হাঁ, তুমি তা আমার নিকট বেচেছ এবং আমি তা তোমার নিকট থেকে কিনেছি।"

হুযূর (সা) বার বার এ কথা বললেন এবং বেদুইন প্রত্যেকবারই তা অস্বীকার করলো এবং বললো যে, যদি বেচে থাকি তাহলে তার কোন সাক্ষী

উপস্থিত করুন। ইতিমধ্যে অনেক মানুষ জমা হয়ে গেল। তাঁরা বেদুইনকে বললো যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। মিথ্যা বলতে পারেন না। তিনি যা বলছেন তা নিশ্চয়ই সত্য। তুমি অনর্থক কেন পীড়াপীড়ি করছো। কিন্তু সে বারবার সাক্ষী তলব করেই চলেছিল।

ইত্যবসরে হযরত খুযাইমা (রা) বিন সাবিত সেখানে পৌছলেন। তিনি বেদুইনকে সম্বোধন করে বললেন, আমি এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি এই ঘোড়া তাঁর নিকট বিক্রয় করেছ। তাতে রাসূলে আকরাম (সা) হযরত খুযাইমাকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমিতো সে সময় উপস্থিত ছিলে না। তুমি কিভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছ। তিনি আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সা)। আমি আপনার কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি। (যেহেতু আপনি যা কিছু বলেন তা সত্যই বলেন। এ জন্য আমি এই সাক্ষ্য দিয়েছি।) তাঁর নিষ্ঠা দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, খুযাইমা (রা) যার পক্ষে অথবা বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে তাঁর একার সাক্ষ্যই যথেষ্ট হবে অর্থাৎ তাঁর সাক্ষ্য দুই ব্যক্তির সাক্ষ্যের সমান। সুতরাং হযরত খুযাইমা (রা) সেই দিন থেকেই যুশ শাহাদাতাইন উপাধিতে মশহুর হন।

কতিপয় ব্যক্তি এই বর্ণনা এই ভিত্তিতে অস্বীকার করেছেন যে, তা সহীহাইনে নেই। কিন্তু সহীহ বুখারীর হাদীসে এই ঘটনার প্রাসঙ্গিক উল্লেখ রয়েছে। তা থেকে জানা যায় যে, ইমাম বুখারী এই ঘটনার সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন। এই হাদীস কাতিবে ওহী হযরত যায়েদ (রা) বিন সাবিত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, যখন আমরা মাসাহিফ নকল করি তখন সূরায়ে আহযাবের এই আয়াত যা রাসূল (সা) এর নিকট থেকে শুনেছিলাম তা পেলাম না ঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً –

(الاحزاب : ٢٣)

"ঈমানদারদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা আল্লাহর নিকট কৃত ওয়াদাকে সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ স্বীয় মানত পূর্ণ করেছে আর কেউ সময় আসার অপেক্ষায় রয়েছে, তারা নিজেদের আচরণে কোন পরিবর্তন সূচিত করেনি।"

এই আয়াত হযরত খুযাইমা (রা) বিন সাবিত আনসারী থেকে পাওয়া যায়। তাঁর সাক্ষ্যকে রাসূলুল্লাহ (সা) দুই ব্যক্তির সাক্ষ্যের সমান বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

হযরত খুযাইমার (রা) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জোশে ঈমান এবং রাসুল প্রেম সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য ছিল। তার প্রমাণ ওপরে বর্ণিত ঘটনা থেকেই পাওয়া যায়।

আওস গোত্রের লোক হযরত খুযাইমার (রা) শরাফত ও মর্যাদার ব্যাপারে গৌরব করতেন। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) "আল ইসাবাহ ফি তামীযিস সাহাবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন যে, একবার আওস এবং খাযরাজের মধ্যে পারস্পরিক গৌরব প্রকাশ করা হলো। এ সময় আওস গোত্রের লোকজন যেসব জালীলুল কদর ব্যক্তিত্বের কথা খাযরাজী ব্যক্তিত্বের তুলনায় পেশ করেছিলেন তাদের মধ্যে এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন হযরত খুযাইমা (রা) বিন সাবিত।

হযরত খুযাইমা (রা) থেকে ৩৮টি হাদীস বর্ণিত আছে। তাঁর রাবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন হযরত জাবের (রা) বিন আবদুল্লাহ (রা), ইবরাহীম বিন সা'দ (রা) বিন আবী ওয়াক্কাস, আবু আবদুল্লাহ জাদলী (র) এবং আতা বিন ইয়াসার।

হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আবু বকর সিদ্দীক (রা)

হিজরী প্রথম শতাব্দীর ৬ষ্ঠ দশকে এক হজ্ব মওসুমের ঘটনা। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ (রা) বাইতুল্লাহর হজ্বের জন্য মদীনা মুনাওয়ারা থেকে মক্কা মুয়াযযামা আগমন করলেন। মক্কায় অবস্থানকালে তিনি একদিন কবরস্থানে তাশরীফ নিলেন। এক কবরের পাশে তিনি যে-ই গমন করলেন অমনি বিলাপের আবেগে অস্থির হয়ে পড়লেন এবং কেঁদে জার জার হয়ে গেলেন। সে সময় হঠাৎ করে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো এই কবিতা ঃ

"আমরা দু'জন বাদশাহর মুসাহিবদের মত দীর্ঘদিন এক সঙ্গে ছিলাম। এমনকি লোকজন বলতো যে, এরা আর কখনো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।

অতপর আমরা যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম তখন আমি এবং মালিক যেন দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব সত্ত্বেও এক রাতও এক সঙ্গে অতিবাহিত করিনি।"

তারপর তিনি কোমল স্বরে বলতে লাগলেন ঃ

"হে কবরের বাসিন্দা! যখন তুমি নিজের জীবন আল্লাহর নিকট সোপর্দ করছিলে সে সময় যদি আমি তোমার নিকট উপস্থিত থাকতাম তাহলে আল্লাহর কসম, আমি এত কাঁদতাম না এবং তোমাকে সেখানেই দাফন করতাম যেখানে তুমি ওফাত পেয়েছিলে।"

এই কবরের অধিবাসী যাঁর স্মরণে উম্মাতের জালীলুল কদর মা আয়েশা সিদ্দীকা (রা) কে অস্থির করে ফেলেছিল তিনি ছিলেন হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আবু বকর সিদ্দীক (রা)। তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রা) সহোদর ছিলেন।

সাইয়েদুনা আবু আবদুল্লাহ আবদুর রহমানের (রা) হসব-নসব বর্ণনা প্রসঙ্গে এতটুকুই যথেষ্ট যে, তিনি নবীদের পর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দাহ সাইয়েদুনা হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) প্রিয় পুত্র ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ আবদুর রহমান (রা) বিন আবু বকর সিদ্দীক (রা) বিন আবু কাহাফাহ ওসমান (রা) বিন আমের বিন আমর বিন কাআব বিন সাঈদ বিন তাইম বিন মুররাহ বিন কাআব বিন লুব্বিল কারাশী।

মাতার নাম ছিল উম্মে রুমান (রা)। তিনিও জালীলুল কদর সাহাবিয়াহ ছিলেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকাও (রা) তাঁরই গর্ভজাত ছিলেন। এই দিক থেকে হযরত আবদুর রহমান (রা) এবং উম্মুল মুমিনীন (রা) আপন ভাই-বোন ছিলেন। কথিত আছে যে, হযরত আবদুর রহমানের (রা) আসল নাম ছিল আবদুল কা'বা। ইসলাম গ্রহণের পর হুযূরে আকরাম (সা) সেই নাম পরিবর্তন করে আবদুর রহমান রেখে দেন।

সিদ্দীকে আকবারের (রা) আবাসস্থল সৌভাগ্যের সেই চূড়া ছিল যা ইসলাম সূর্যের কিরণমালায় সর্বপ্রথম উদ্ভাসিত হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর কি কুদরত যে, হযরত আবদুর রহমান ইসলামে অগ্রগমন করতে পারেননি এবং হুদায়বিয়ার সন্ধি পর্যন্ত কুফর ও শিরকের ভ্রান্তপথে এদিক-ওদিক বিচরণ করেছেন। জানা যায়নি যে, কি কারণে তাঁর অন্তরে কুরাইশের পিতৃধর্ম প্রীতি এত মজবুতভাবে শিকড় গেড়ে বসেছিল যে, তাঁর জালীলুল কদর মাতা-পিতার প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ ও নিষ্ঠাপূর্ণ কাজও তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেনি। এমনকি তিনি বদরের যুদ্ধে বাতিল বাহিনীতে শামিল হয়ে লড়াই করতে গিয়েছিলেন। সিদ্দীকে আকবার (রা) তাঁকে কুরাইশ বাহিনীর পক্ষ থেকে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের আহবান জানাতে দেখে ক্রোধে অস্থির হয়ে ডেকে বললেন ঃ "এই নচ্ছার, আমার অধিকারের কি হলো"

এর জবাব আর তিনি কি দেবেন। মুসতাদরাকে হাকিমে বর্ণিত আছে যে, সিদ্দীকে আকবার (রা) স্বয়ং তাঁর মুকাবিলায় যেতে চাইলেন। কিন্তু রহমতে আলম (সা) পিতাকে পুত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দিলেন না। কথিত আছে যে, ইসলাম গ্রহণের পর একবার হযরত আবদুর রহমান (রা) পিতাকে বললেন, বদরের যুদ্ধে এক সময় আপনি আমার তরবারীর নীচে এসে গিয়েছিলেন কিন্তু আমি পিতৃত্বের অধিকারের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে আপনাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম। সিদ্দীকে আকবার বললেন, "পুত্র, যদি সেদিন তুমি আমার তরবারীর আওতায় আসতে তাহলে আল্লাহর কসম আমি তোমাকে কখনো ছেড়ে দিতাম না।"

বদরের যুদ্ধের পর হযরত আবদুর রহমান (রা) ওহোদের যুদ্ধেও মক্কার মুশরিকদের সঙ্গে ছিলেন। মোট কথা বছরের পর বছর তাঁর জীবনের এই অবস্থা ছিল। অবশেষে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় তাঁর অন্তর থেকে কুফর ও শিরকের রং সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করে এক জানবাজ সিপাহী হয়ে যান।

জ্যেষ্ঠ পুত্রের ইসলাম গ্রহণে সিদ্দীকে আকবার (রা) খুব খুশী হলেন। তিনি হযরত আবদুর রহমানকে (রা) মদীনায় ডেকে পাঠালেন এবং নিজের

ব্যক্তিগত ব্যবসা ও বাড়ীর সকল কাজ তাঁর হাতে ছেড়ে দিলেন। তিনি এই সকল দায়িত্ব খুব সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিতেন এবং প্রতিটি ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় পিতার ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করতেন। কখনো কখনো সিদ্দীকে আকবার (রা) ক্রোধান্বিত হতেন। সে সময় হযরত আবদুর রহমান (রা) অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে শ্রদ্ধেয় পিতার হুমকি ধমকি সহ্য করতেন। সহীহ বুখারীতে আছে যে, একবার রাতে কতিপয় সাহাবী (রা) সিদ্দীকে আকবারের (রা) বাড়ীতে মেহমান ছিলেন। খাওয়ার কিছু আগে রাসূলের (সা) দরবারে হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) কোন জরুরী কাজ পড়লো। বাড়ী থেকে রওয়ানার সময় হযরত আবদুর রহমানকে (রা) হেদায়াত করলেন যে, আমি রাসূলের (সা) পবিত্র খিদমতে যাচ্ছি। তুমি আমার প্রত্যাবর্তনের পূর্বে সম্মানিত মেহমানদেরকে খাবার খাইয়ে দেবে। আমার আসতে দেরী হতে পারে। এ জন্য তাদের যেন কষ্ট না হয়।

হযরত আবদুর রহমান (রা) শ্রদ্ধেয় পিতার নির্দেশ অনুযায়ী মেহমানদের সামনে খাবার পেশ করলেন। কিন্তু তাঁরা খাবার খেলেন না। তাঁরা ওযর পেশ করে বললেন যে, বাড়ীর মালিক উপস্থিত নেই তাঁরা কি করে খায়। সিদ্দীকে আকবার (রা) অনেক দেরী করে ফিরে এসে জানতে পেলেন যে, মেহমানরা এখনো অভুক্ত রয়েছেন। তিনি ধারণা করলেন যে, আবদুর রহমান মেহমানদের খানা খাওয়ানোর ব্যাপারে গাফলতি প্রদর্শন করেছে। তিনি রেগে তাঁকে ভালো-মন্দ বলতে লাগলেন। হযরত আবদুর রহমান (রা) পিতার ক্রোধকে খুব ভয় করতেন। এ জন্য তিনি তাঁর সামনে থেকে সরে গেলেন। তিনি যখন জানতে পেলেন যে, তাঁকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হচ্ছে তখন তিনি সামনে এসে অত্যন্ত আদবের সঙ্গে আরয করলেন "আব্বাজান! আমি আপনার নির্দেশ পালনার্থে মেহমানদের সামনে খাবার পেশ করেছিলাম। আমার অনেক পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তাঁরা আপনার অনুপস্থিতিতে খাবার খেতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।"

মেহমানরা হযরত আবদুর রহমানের (রা) কথার সত্যতা স্বীকার করলেন এবং বললেন, "আল্লাহর কসম! তাঁর কোন কসুরই নেই। এ জন্য যতক্ষণ তিনি খাবার না খাবেন আমরাও খাবো না।" এই কথায় হযরত সিদ্দীকে আকবারের (রা) ক্রোধ দূর হলো এবং সকলে এক সঙ্গে খাবার খেলেন।

হযরত আবদুর রহমান (রা) স্বয়ং বর্ণনা করেছেন যে, সেদিন খাবারে এত বরকত হয়েছিল যে, আমরা সবাই পেটপুরে খেলাম। তা সত্ত্বেও অনেক বেঁচে গেল। সুতরাং আমি কিছু খাবার নিয়ে রাসূলের (সা) খিদমতেও হাযির হলাম। এই খাবার তিনি এবং সেখানে উপস্থিত অনেক সাহাবীই খেলেন।

রহমতে আলম (সা) এবং মহান মর্যাদাবান পিতার (রা) অভিভাকত্ব এবং সান্নিধ্যের ফয়েয হযরত আবদুর রহমানকে (রা) একজন মিছালী মুসলমান বানিয়ে দিয়েছিল। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বয়সে যদিও তাঁর ছোট ছিলেন, কিন্তু দীনী দিক থেকে তাঁর মর্যাদা কিছুটা বেশী ছিল। সুতরাং দীনী ব্যাপারে তিনি সবসময় হযরত আবদুর রহমানকে (রা) পথ প্রদর্শন করতেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে যে, একবার হযরত আবদুর রহমান (রা) উম্মুল মুমিনীনের (রা) সামনে তাড়াতাড়ি ওযূ করলেন। উম্মুল মুমিনীনের সন্দেহ হলো যে, তাঁর সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভেজেনি। তৎক্ষণাৎ বললেন, "আবদুর রহমান ভালোভাবে ওযূ কর। আমি রাসূল (সা) থেকে শুনেছি যে, ওযূতে যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভিজবে না তাতে জাহান্নামের অভিশাপ পড়বে।" সুতরাং এরপর তিনি ওযূ করার সময় হুযূরের (সা) এই ইরশাদ সামনে রাখতেন।

জালীলুল কদর পিতা সিদ্দীকে আকবারের (রা) নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি বীরত্ব ও বাহাদুরী লাভ করেছিলেন। আসাদুল্লাহিল গালিব হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু (রা) সিদ্দীকে আকবারকে (রা) "আশজায়ু'ন্নাস" মানব শ্রেষ্ঠ বাহাদুর লকবে ভূষিত করেছিলেন। হযরত আবদুর রহমান (রা) তীর ও তরবারী পরিচালনায় অসাধারণ নৈপুণ্য রাখতেন এবং যুদ্ধের ময়দানে বাঘের মত লড়াই করতেন। হুদায়বিয়ার পর তিনি সকল যুদ্ধে (মক্কা বিজয়, হুনাইন, তায়েফ এবং তাবুক) শরীক হয়েছিলেন এবং প্রত্যেক যুদ্ধেই বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। একাদশ হিজরীতে রহমতে আলম (সা) ইন্তেকাল করলেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খলীফা নির্বাচিত হলেন। এ সময় সমগ্র আরবে ধর্মদ্রোহীতার আগুন জ্বলে উঠলো। এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ইয়ামামায় মুসায়লামা কাযযাবের বিরুদ্ধে। হযরত আবদুর রহমান (রা) এই যুদ্ধে আশ্চর্য ধরনের বাহাদুরী দেখিয়েছিলেন। তাঁর তীরের আঘাতে শত্রুর ৭ জন বিরাট যোদ্ধা একের পর এক ধরাশায়ী হয়। যুদ্ধের সময় ইয়ামামার দুর্গের প্রাচীরের এক স্থান ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাতে মুসলমানদের জন্য দুর্গে ঢোকার রাস্তা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দুশমনের একজন জানবাজ (মাহকাম বিন তোফায়েল) নিজের পা দৃঢ় করে সেই ফাটল স্থানে দাঁড়িয়ে গেল এবং কাউকে সামনে অগ্রসর হতে দিল না। হযরত আবদুর রহমান (রা) তাক করে তার বুকে এমন তীর মারলেন যে, তৎক্ষণাৎ সে খতম হয়ে গেল এবং মুসলমানরা একযোগে দুর্গের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লো। অবশেষে হযরত আবদুর রহমান (রা)-এর মত জানবাজদের বদৌলতেই মুসলমানদের মহান বিজয় সম্ভব হয়েছিল।

সিরিয়ায় রোমক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ধারা শুরু হলে হযরত আবদুর রহমান (রা) সিরিয়া গমনকারী মুজাহিদ বাহিনীতে শামিল হয়ে গেলেন এবং কয়েক বছর পর্যন্ত সিরিয়ার যুদ্ধে খুব উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করলেন। প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি এমন বীরত্ব প্রদর্শন করলেন যে, আরবের অন্যতম বাহাদুর হিসেবে পরিগণিত হলেন। কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, তিনি আরবের সেই সব বাছাই করা বাহাদুরের অন্যতম ছিলেন যাদেরকে এক হাজার বাহাদুরের সমান মনে করা হতো।

হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে কানসারীনের রক্তাক্ত যুদ্ধে হযরত আবদুর রহমানও শামিল ছিলেন। এই যুদ্ধে এক সময় এক ভয়াবহ অভিযানের জন্য হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ দশজন অভিজ্ঞ অশ্বারোহী নির্বাচিত করলেন। তাঁদের একজন ছিলেন হযরত আবদুর রহমান (রা)। এই অভিযানকালে সেই সব অশ্বারোহীকে বিরাট সংখ্যক দুশমনের মুকাবিলা করতে হয়। হযরত আবদুর রহমান (রা) এই যুদ্ধে শত্রু পক্ষের পাঁচজনকে হত্যা করেন। এমনকি গাসসানীদের বাদশাহ জাবালা বিন আইহাম স্বয়ং তাদের মুকাবিলার জন্য বের হলো। জাবালা একজন নাম করা বীর এবং সম্পূর্ণ সতেজ ছিল। এদিকে হযরত আবদুর রহমান (রা) পাঁচ ব্যক্তির সঙ্গে লড়াই করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাবালার সঙ্গে মুকাবিলার জন্য ঘুরে দাঁড়ালেন। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে বর্শা ও তরবারীর ঘোরতর যুদ্ধ হলো। এমনকি দু'জনই গুরুতরভাবে আহত হয়ে স্ব স্ব সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হলেন।

ইয়ারমুকের ভয়াবহ যুদ্ধ সিরিয়ার সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকে। এই যুদ্ধে হযরত আবদুর রহমান (রা) এক আশ্চর্য ধরনের কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। এক সময় ৬০ হাজার গাসসানী আরবদের মুকাবিলার জন্য বের হলো। হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ শুধুমাত্র ৬০ জন অশ্বারোহী বাছাই করলেন। হযরত আবদুর রহমানও (রা) সেই ৬০ অশ্বারোহী দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই ষাট জন মুজাহিদ দল বেঁধে যৌথভাবে লড়াই শুরু করলেন এবং ৬০ হাজারের বিরাট বাহিনীকে এমনভাবে বিপন্ন করে তুললেন যে, সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই ৬০ জন জীবন উৎসর্গকারীর সামনে তারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। হযরত আবদুর রহমান (রা), যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়াম এবং ফযল (রা) বিন আব্বাস শত্রুর একটি দলকে পদদলিত করতে করতে বহু দূর চলে গেলেন। মুসলমানরা আশংকা প্রকাশ করছিলেন যে, তারা হয়তো শহীদ হয়ে গেছেন। তবে, রাত শেষে তাঁরা সহীহ সালামতে স্ববাহিনীতে ফিরে এলেন।

এই যুদ্ধে অন্য এক সময়ে মুজাহিদ কায়েস (রা) বিন হাবিরা'র সঙ্গে রোমক শাহজুরের মুকাবিলা হলো। উভয়েই দীর্ঘক্ষণ যাবত পরস্পরের বিরুদ্ধে আক্রমণ অব্যাহত রাখলো। একবার কায়েস (রা) শত্রুর ওপর তরবারী দিয়ে প্রচন্ডভাবে আঘাত হানলেন। কিন্তু এই আঘাতে তাঁর তরবারী ভেঙ্গে দুখন্ড হয়ে গেল। তখন তাঁর নিকট ছোট্ট একটি খঞ্জর ছাড়া আর কিছুই ছিল না এবং তাঁর জীবন ভয়ানক হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এই নাযুক মুহূর্তে হযরত আবদুর রহমান (রা) বিদ্যুত বেগে নিজের ব্যূহ থেকে বের হয়ে কায়েসের (রা) নিকট পৌছলেন এবং তাঁর হাতে একটি নতুন তরবারী তুলে দিলেন। রোমকের মদদের জন্যও তার একজন সঙ্গী পৌছে গেল। আবদুর রহমান (রা) এবং কায়েস মুহূর্তের মধ্যে শত্রুদ্বয়কে জাহান্নামে প্রেরণ করলেন। অতপর আবদুর রহমান (রা) যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে রোমকদেরকে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধের জন্য আহবান জানাতে লাগলেন। তাদের কেউই যখন তাঁর সামনে এলো না তখন তিনি বাঘের মত গর্জন করতে করতে রোমকদের ডান বাহুর ওপর গিয়ে পড়লেন এবং কয়েকজন রোমককে হত্যা করে নিজের বাহিনীতে ফিরে এলেন। এমনিভাবে আরো কয়েকটি সংঘর্ষে তিনি নজিরবিহীন বীরত্ব প্রদর্শন করে ইয়ারমুকের যুদ্ধে বিশেষ বীরদের তালিকাভুক্তির যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। এরপর বাইতুল মুকাদ্দাস অবরোধকারী বাহিনীতে শামিল হন এবং হযরত ওমর ফারুকের (রা) আগমনের পর বাইতুল মুকাদ্দাসের পবিত্র মাটি ইসলামের মুজাহিদদেরকে স্বাগত জানালো। তখন তিনি হালব বিজয়ের জন্য প্রেরিত অভিযানে শরীক হন। হালব বিজয়ের জন্য মুসলমানদের খুব চেষ্টা করতে হয়েছিল। কেননা, হালববাসী দুর্গের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে দীর্ঘদিন যাবত মুসলমানদেরকে বাধা দিয়েছিল। এই সময় হযরত আবদুর রহমান (রা) কয়েকবার নিজের বাহিনীর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করেন। হালব বিজয়ের পর তিনি সিরিয়ার আরো কয়েকটি সংঘর্ষে মহা বিক্রমে যুদ্ধ করেছিলেন। এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী তিনি মিসরের যুদ্ধসমূহেও অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাসে তাঁর মিসর যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর খিলাফতের প্রারম্ভে দুঃখজনক উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তখন তিনি সহোদরা হযরত আয়েশার (রা) সঙ্গে ছিলেন।

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, আমীর মাবিয়া (রা) যখন ইয়াযীদকে উত্তরাধিকার মনোনীত করলেন তখন তিনি মদীনার গভর্ণর মারওয়ান ইবনুল হাকামকে চিঠি লিখলেন। চিঠিতে তিনি লিখলেন যে, কুফা ও সিরিয়াবাসী ইয়াযীদকে যুবরাজ হিসেবে মেনে নিয়েছে। মদীনাবাসীকেও তুমি এই কাজে

বাধ্য করো। এই চিঠি পেয়েই মারওয়ান মদীনাবাসীর এক সাধারণ সমাবেশে ইয়াযীদকে যুবরাজ হিসেবে মেনে নেওয়ার আহবান জানালেন। মদীনাবাসী মারওয়ানের কথা পসন্দ করলো না। সর্বপ্রথম হযরত আবদুর রহমান (রা) দাঁড়িয়ে বজ্র নির্ঘোষে বললেন ঃ

"তোমার এবং মাবিয়ার (রা) ইচ্ছা হলো উম্মাতে মুহাম্মাদীয়াতে কায়সারের রেওয়াজ চালু করা। কায়সারের রেওয়াজ হলো এক কায়সার মারা গেলে তার পুত্র কায়সার হবে। আল্লাহর কসম! এভাবে তোমরা সাধারণ মুসলমানকে খলীফা নির্বাচন থেকে বঞ্চিত করছো"।

এই ঘটনার পূর্বে আমীর মাবিয়া (রা) এবং হযরত আবদুর রহমানের (রা) পারস্পরিক সম্পর্ক খুব ভালো ছিল। এ জন্য মারওয়ান তাঁর কথা শুনে চটে গেলো এবং তাঁকে গ্রেফতার করতে চাইলো। তিনি সহোদরা হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রা) ঘরে ঢুকে গেলেন। মারওয়ানের ভেতরে ঢোকার সাহস হলো না। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে বললো ঃ "এই সেই ব্যক্তি যার ব্যাপারে কুরআনের এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

وَالَّذِىْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَآ اَتَعِدٰنِنِىْٓ اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِىْ وَهُمَا يَسْتَغِيْثٰنِ اللّٰهَ وَيْلَكَ اٰمِنْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَيَقُوْلُ مَا هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ - (الاحقاف : ١٧)

অর্থাৎ মাতা-পিতার আনুগত্য না করাতে আল্লাহ তাদেরকে নিন্দা করেছেন।

উম্মুল মুমিনীন (রা) মারওয়ানের কথা শুনে ক্রোধান্বিত হলেন এবং পরদার পেছন থেকে বললেন ঃ "আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ পাক কোন আয়াত নাযিল করেননি। বরং শুধুমাত্র সেই আয়াত যে আয়াতে আমার পবিত্রতার কথা বলা হয়েছে।" (সহীহ বুখারী, সূরা আহকাফের তাফসীর)

আল্লামা ইবনে আসীর (র) "উসুদুল গাবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, এ সময় উম্মুল মুমিনীন এই কথা বলেছিলেন ঃ "আল্লাহর কসম- না-এই আয়াত আবদুর রহমানের (রা) ব্যাপারে নাযিল হয়নি- যদি চাও তাহলে আমি সেই ব্যক্তির নাম বলতে পারি- যার দিকে এই আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে।" মারওয়ানের পক্ষ থেকে কোন জবাব দেওয়া সম্ভব হয়নি এবং চুপচাপ চলে গিয়েছিল।

হযরত হোসাইন (রা) বিন আলী (রা), আবদুল্লাহ (র) বিন আব্বাস (রা), আবদুল্লাহ (রা) বিন যোবায়ের (রা) এবং আরো কয়েকজন বুযুর্গ ব্যক্তি হযরত আবদুর রহমানকে (রা) সমর্থন করেছিলেন। অতপর আমীর মাবিয়া (রা) স্বয়ং মদীনা এলেন এবং সাধারণ সমাবেশ ও ব্যক্তিগত পর্যায়েও তাদেরকে ইয়াযীদের বাইআত কবুল করার দাওয়াত দিলেন। কিন্তু কোনভাবেই তাঁরা তাতে রাজী হলেন না।

হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) "আল ইসতিয়াব ফি মা'রিফাতিল আসহাব" গ্রন্থে লিখেছেন যে, হযরত আবদুর রহমানের (রা) সমর্থনলাভের জন্য আমীর মাবিয়া (রা) এক লাখ দিরহাম প্রেরণ করলেন। কিন্তু হযরত আবদুর রহমান (রা) তা স্পর্শ করাও সহ্য করেননি। তিনি বললেন ঃ "আমি দীনকে দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রয় করতে পারি না।"

এই ঘটনার পর হযরত আবদুর রহমান (রা) মদীনায় অবস্থান পরিত্যাগ করে মক্কা মুয়াযযামা থেকে ১০ মাইল দূরে "হাবশী অথবা হোবায়শী" নামক এক পাহাড়ী স্থানে বসবাস শুরু করেন। সেখানেই তিনি একদিন সুস্থ অবস্থায় নিদ্রা গেলেন। কিন্তু ঘুমের মধ্যেই তাঁর শেষ ডাক এসে উপস্থিত হলো। মক্কায় নিয়ে লোকজন তাঁর লাশ দাফন করলেন। সহীহ বুখারীর মত অনুযায়ী ৫৮ হিজরীতে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। কতিপয় রাওয়ায়েতে ৫৩ হিজরীর কথাও বলা হয়েছে। মারওয়ান সম্পর্কিত ঘটনা যদি সঠিক মেনে নেয়া হয় তাহলে হযরত আবদুর রহমানের (রা) মৃত্যু ৫৬ হিজরীর পরই হয়েছিল বলে মানতে হয়। কেননা, আমীর মাবিয়া (রা) ইয়াযীদকে ৫৬ হিজরীতেই মনোনীত করেছিলেন। এখানে এ কথার দিকেও খেয়াল রাখতে হবে যে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ (রা) ৫৮ হিজরীর রমযান মাসে ইন্তেকাল করেছিলেন। তিনি যদি হজ্বের মওসুমে মক্কা মুয়াযযামা গিয়ে ভাইয়ের কবর যিয়ারত করে থাকেন তাহলে এটা নিশ্চিত যে, এই হজ্ব রমযানের ৫৮ হিজরীর পূর্বেকার। এ জন্য এইটাই ধারণা করা হয় যে, হযরত আবদুর রহমান (রা) ৫৬ ও ৫৮ হিজরী মধ্যবর্তী সময়ে ওফাত পান।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ (রা) ভাইয়ের হঠাৎ করে মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে শোকাভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি হযরত আবদুর রহমানকে (রা) খুব ভালোবাসতেন। কেউ বিষ দিয়ে মেরে ফেলেছিল বলে সন্দেহ করেছিলেন। মুসতাদরাকে হাকিমে আছে যে, এই ঘটনার পর একদিন এক মহিলা হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রা) সামনে নামায পড়ছিলেন। সিজদারত অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। এই অবস্থা দেখে তিনি নিশ্চিত হলেন যে, হযরত আবদুর

রহমানের (রা) মৃত্যুও স্বাভাবিক ছিল। তাতে বিষ মিশানোর কোন ব্যাপার ছিল না। তা সত্ত্বেও তাঁর অন্তরের ভার সেই সময় হাল্কা হলো যখন হজ্বের সময় ভাইয়ের কবরের পাশে গিয়ে খুব করে কাঁদলেন।

হযরত আবদুর রহমানের (রা) দু'জন পুত্র এবং দু'জন কন্যার নাম পাওয়া যায়। পুত্রদ্বয়ের নাম ছিল যথাক্রমে আবু আতিক মুহাম্মাদ (রা) এবং আবদুল্লাহ (র)। কন্যাদ্বয়ের নাম হলো হাফসা (র) এবং আসমা (র)। তাঁরা সকলেই উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রা) প্রশিক্ষণে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। উম্মুল মুমিনীন তাদেরকে খুব ভালোবাসতেন এবং দীনী ব্যাপারে পদে পদে পথ প্রদর্শন করতেন। মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিকে (র) আছে, একবার হাফসা (র) বিনতে আবদুর রহমান (রা) অত্যন্ত পাতলা ওড়না পরে ফুফুর খিদমতে হাযির হলেন। উম্মুল মুমিনীন (রা) তাঁর ওড়না দেখে খুব নারায হলেন এবং বললেন ঃ "হাফসা তুমি জানো না, সুরায়ে নূরে আল্লাহ কি আহকাম নাযিল করেছেন।" অতপর তিনি সেই ওড়না ছিঁড়ে ফেললেন এবং এক জনের ওড়না চেয়ে এনে তাঁকে পরালেন।

হযরত আবদুর রহমানের (রা) পুত্র আবু আতিক মুহাম্মাদও (রা) সাহাবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। হযরত আবদুর রহমানের পরিবারের যেন চার বংশ সাহাবী ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর দাদা আবু কাহাফাহ (রা), পিতা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), নিজে স্বয়ং এবং পুত্র আবু আতিক মুহাম্মাদ (রা)।

আবু আতিক মুহাম্মাদের (রা) পুত্র আতিক (র) এবং পৌত্র আবদুল্লাহ (র) বিন আতিক (র) ও-উম্মুল মুমিনীনের কোলে লালিত পালিত হয়েছেন। উম্মুল মুমিনীনের (রা) ওফাতের পর তাঁর যেসব আত্মীয় স্বজন তাঁকে কবরে নামিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত আবদুর রহমানের (রা) পুত্র আবদুল্লাহ এবং প্রপৌত্র আবদুল্লাহ (র) বিন আতিক (র) বিন মুহাম্মাদও (রা) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আবু বকরের (রা) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল বীরত্ব, জিহাদের প্রতি উৎসাহ, হক কথন এবং নির্ভীকতা। হযরত সাঈদ (র) বিন মুসাইয়্যিব থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুর রহমান (রা) কখনো মিথ্যা বলেননি।

সিহাহ সিত্তাতে হযরত আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত কয়েকটি হাদীস উল্লেখ রয়েছে। আমরা সহীহ বুখারীতে বর্ণিত দু'টি হাদীস বরকত হিসেবে এখানে উল্লেখ করছি। এক রেওয়ায়াতে তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, (হযরত) আয়েশা (রা) সিদ্দীকার

পেছনে সওয়ার হয়ে মাকামে তানয়ীমে তাঁকে ওমরা করিয়ে দাও। এই রেওয়ায়াত থেকে প্রকাশ পায় যে, হযরত আবদুর রহমান (রা) রাসূলের (সা) সফর সঙ্গী এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)সহ ওমরাহ করার সৌভাগ্যও লাভ করেছিলেন।

দ্বিতীয় রেওয়ায়াতে হযরত আবদুর রহমান (রা) হুযূরের (সা) এক মুজিযার কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি স্বয়ং তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি বলেন, একদিন আমরা সর্বমোট ১৩০ জন হুযূরের (সা) সাথে সফর করছিলাম। তিনি (সা) বললেন, তোমাদের মধ্যে কারোর কাছে কি কিছু খাবার আছে। ঘটনাক্রমে সে সময় শুধুমাত্র এক ব্যক্তির নিকট প্রায় তিন সের গমের আটা ছিল। হুযূর (সা) তা গুলাতে বললেন। আটা যখন গুলানো হলো তখন বিরাট বপুধারী একজন মুশরিক নিজের বকরী হাঁকিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বেচার না হাদিয়া দেওয়ার ইচ্ছা? সে বললো বিক্রী করতে চাই। তিনি একটি বকরী কিনে (যবেহ করালেন) ও রান্না করালেন এবং কলিজা ভুনার নির্দেশ দিলেন। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি যে, ১৩০ জনের এমন কেউই ছিলেন না যে, তাকে রাসূলুল্লাহ (সা) কলিজার কোন টুকরা দেননি। সেখানে যারাই উপস্থিত ছিল তাদের প্রত্যেককেই (সে সময়ই) দিয়ে দিলেন। আর যারা উপস্থিত ছিলেন না তাদের অংশ রেখে দিলেন। অতপর তিনি বকরীর গোশত বড় দু'টি পাত্রে রাখলেন। সকলেই তা পেট পুরে খেলেন। তারপরও দু' পেয়ালা বেঁচে গেল। আমরা তা উটের ওপর নিয়ে রাখলাম।

সাইয়েদুনা হযরত আবদুর রহমান (রা) নিসন্দেহে দেরী করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নিষ্ঠাপূর্ণ কাজের মাধ্যমে অতীত জীবনের ক্ষতিপূরণ করেন। এমনকি রাসূলের (সা) সান্নিধ্যও হাসিল করেন। এ কারণেই উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ (রা) তাঁকে সীমাহীন ভালবাসতেন এবং তাঁকে শুধুমাত্র শ্রদ্ধেয় ভাইয়ের মর্যাদাই দিতেন না বরং হুযূরের (সা) একজন মুখলিস জান-নিছার এবং ইসলামের একজন জীবন উৎসর্গকারী মুজাহিদ মনে করে তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন।

হযরত দ্বাহহাক (রা) বিন সুফিয়ান

মক্কা বিজয়ের (অষ্টম হিজরীর রমযান মাস) কয়েকদিন পর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) মক্কা থেকে হুনাইন রওয়ানা হলেন। এ সময় অন্যান্য গোত্র ছাড়া বনূ কিলাবের হক পন্থীদের একটি দলও রাসূলের (সা) খিদমতে হাযির হলেন। উদ্দেশ্য ছিল যে, বনূ হাওয়াযেনের বিদ্রোহের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাঁরা রাসূলের (সা) সফরসঙ্গী হবেন। বীরত্বের আবেগে পূর্ণ বেদুইনদেরকে দেখে রহমতে আলম (সা)–এর পবিত্র চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি তাঁদেরকে বললেন ঃ "তোমাদের দলে কতজন আছে?"

তাঁরা আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল। আমরা ৯০০ জন (ন' শ' জন) আছি।"

হুযূর (সা) বললেন, "তোমরা যদি চাও, তাহলে আমি তোমাদেরকে এমন একজন অশ্বারোহী দেব যিনি তোমাদের সংখ্যাকে এক হাযারের সমান করে দেবেন এবং তোমাদের নেতৃত্বও দেবেন।

তাঁরা সমস্বরে আরয করলেন ঃ "অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল।"

হুযূর (সা) তরবারী হাতে শক্তিশালী বপু ও অবয়ব সম্পন্ন এক ব্যক্তিকে সামনে আসার জন্য ইঙ্গিত করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই নির্দেশ পালন করলেন।

প্রিয় নবী (সা) এমারতের ঝান্ডা তাঁকে প্রদান করলেন এবং বনূ কিলাবকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"এখন তোমরা পুরো এক হাযার। যাও, নিজের আমীরের আনুগত্য কর।"

এই ব্যক্তি যাঁকে রাসূল শ্রেষ্ঠ ফখরে মওজুদাত (সা) পুরো একশ' অশ্বারোহীর সমান বলে আখ্যায়িত করেছিলেন তিনি হলেন, হযরত দ্বাহহাক (রা) বিন সুফিয়ান। ইতিহাসে তিনি "সাইয়াফে রাসূলুল্লাহ" (রাসূলের (সা) তরবারীবাহী রক্ষীর) উপাধিতে মশহুর হয়ে আছেন।

সাইয়েদুনা হযরত দ্বাহহাক (রা) বিন সুফিয়ান সমকালীন অন্যতম বাহাদুর এবং প্রিয় নবী (সা) –এর অত্যন্ত একনিষ্ঠ জীবন উৎসর্গকারীদের

মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। ভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী তাঁর কুনিয়ত ছিল আবু সা'দ অথবা আবু সাঈদ এবং তিনি বনূ কিলাবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। এই কবীলা মশহুর নজদী কবীলা "বনূ আমেরের" একটি শাখা ছিল। তাঁর নসবনামা নিম্নরূপ ঃ দ্বাহহাক (রা) বিন সুফিয়ান বিন আওফ বিন কা'ব বিন আবি বকর বিন কিলাব বিন রবিয়াহ বিন আমের বিন ছা'ছা আমেরী কিলাবী।

সকল চরিতগ্রন্থেই এই নসবনামা উল্লেখ রয়েছে। অবশ্য হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) "আল ইসতিয়াব" গ্রন্থে হযরত দ্বাহহাকের (রা) নামের সঙ্গে "আল কালবী" লিখেছেন। অধিকাংশ চরিতকার এটিই সঠিক বলেছেন যে, তিনি বনূ কিলাবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। এ জন্য কিলাবী ছিলেন।

অধিকাংশ চরিতকাররা বিশ্বস্ততার সঙ্গে লিখেছেন যে, তিনি বেশীর ভাগ সময় তরবারী উঁচিয়ে রাসূলের (সা) হিফাজতের লক্ষ্যে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এ জন্য "সাইয়াফে রাসূল" অর্থাৎ রাসূলের (সা) তরবারীবাহী রক্ষীর উপাধিতে মশহুর হন।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) এবং হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) বর্ণনা করেছেন যে, দ্বাহহাক (র) বিন সুফিয়ানের আবাসস্থল মদীনার উপকণ্ঠের গ্রামে ছিল। এ জন্য তিনি মদীনাবাসী হিসেবে পরিচিত। কিন্তু জমহুর চরিতকার তাঁকে মুহাজিরদের মধ্যে শামিল করেছেন এবং কিয়াসও এইটাই করা হয়। কেননা নজদী কবীলাসমূহকে মদীনাবাসী হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না।

হযরত দ্বাহহাক (রা) জাহেলী যুগে স্বগোত্রের নেতৃস্থানীয় এবং বাহাদুর ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হতেন এবং কবিতা ও কাব্যে দখল রাখতেন। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন প্রিয় নবী (সা) তাঁকে নিজের গোত্রের আমীর এবং অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী সাদাকা ওসুলকারী হিসেবে নিয়োগ করেন।

এ ব্যাপারে সকল চরিতকারই এক মত যে, হযরত দ্বাহহাক (রা) মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু কেউই তাঁর ইসলাম গ্রহণের সঠিক কাল সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেননি। অবশ্য ওয়াকেদীর এক রেওয়ায়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, তিনি বীরে মাউনার ঘটনার (চতুর্থ হিজরী সফর মাসে) পূর্বে মুসলমান হয়েছিলেন এবং হুযূর (সা) তাঁকে বনূ কিলাবের সাদাকা আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন অথবা তাঁকে বনূ কিলাবের রাজস্ব আদায়কারী নিয়োগ করেছিলেন।

ভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী বীরে মাউনাতে বনূ আমেরের সরদার আমের বিন তোফায়েলের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে ৩৯ অথবা ৬৯ জন সাহাবী (রা) নজদের মুশরিকদের হাতে শাহাদাতের পেয়ালা পান করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই সব সাহাবীকে (কারী) হযূর (সা) আবু বারা' আমের বিন মালিক বিন জাফর কিলাবীর আবেদনে বনূ আমরে গোত্রে ইসলামের তাবলীগের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। আমের বিন তোফায়েল রা'ল ও জাকওয়ান প্রভৃতি গোত্রের সাহায্যে একজন ব্যতীত (হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়া) বাকী সকলকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে শহীদ করে ফেলে। শহীদদের মধ্যে হযরত আমের (রা) বিন ফুহাইরাও শামিল ছিলেন। হত্যাকারী জাব্বার বিন সালামা কিলাবী যখন তাঁর ওপর বর্শা নিক্ষেপ করলো তখন তাঁর মুখ দিয়ে অযাচিতভাবে বেরিয়ে এলো : "ফূযতু ওয়াল্লাহি" অর্থাৎ আল্লাহর কসম আমি সফল হয়ে গেছি।

হযরত দ্বাহহাক (রা) বিন সুফিয়ান সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। জাব্বার স্বগোত্রে (বনূ কিলাব) ফিরে এলো এবং হযরত দ্বাহহাককে (রা) এই ঘটনা শুনালো। তাতে তিনি খুব দুঃখিত হলেন। জাব্বার তাঁকে জিজ্ঞেস করলো : "ফূযতু ওয়াল্লাহি" বলে নিহত ব্যক্তি কি বুঝাতে চেয়েছিল? হযরত দ্বাহহাক (রা) তাঁকে বললেন, প্রত্যেক মুসলমান বিশ্বাস করে যে, সে যদি আল্লাহর রাস্তায় মারা যায় তাহলে সে বেহেশতে যায়। আমের (রা) বিন ফুহাইরাহ শাহাদাতের পূর্বে এ কথা বলে নিজের সেই আস্থা ও ঈমান প্রকাশ করেছিলেন যে, আল্লাহ তাঁকে জান্নাত দান করেছেন এবং সে এভাবে জীবনের লক্ষ্যে সফল হয়ে গেছেন। জাব্বার হযরত দ্বাহহাকের (রা) কথায় এতো প্রভাবিত হলেন যে, তৎক্ষণাৎ তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন।

হযরত দ্বাহহাক (রা) বীরে মাউনা, হযরত আমের (রা) বিন ফুহাইরার শাহাদাত এবং জাব্বার বিন সালামার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাবলী বিশদভাবে রাসূলের (সা) খিদমতে লিখে পাঠালেন। আল্লামা ইবনে আসীর বলেছেন, হুযূর (সা) এই ঘটনায় মনে এত কষ্ট পেয়েছিলেন যে, তিনি ৪০ দিন পর্যন্ত সকালের নামাযের পর গাদদার হত্যাকারীদের জন্য বদ দোয়া করেছিলেন।

হযরত দ্বাহহাক (রা) বিন সুফিয়ান কোন্ কোন্ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন? চরিতকাররা তা বিস্তারিত বলেননি। শুধুমাত্র তিন-চারটি যুদ্ধের প্রসঙ্গে তাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত হযরত দ্বাহহাকের (রা) বীরত্ব সকলের নিকটই স্বীকৃত। এ প্রেক্ষিতে ধারণা করা হয় যে, ইসলাম গ্রহণের পর তিনি কোন যুদ্ধে পিছিয়ে ছিলেন না। ঐতিহাসিক ওয়াকেদী বলেছেন,

একবার প্রিয় নবী (সা) বনূল কারতার বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। এই অভিযানের নেতা হিসেবে তিনি হযরত দ্বাহহাক (রা) বিন সুফিয়ানকে নিয়োগ করলেন। কবীলাটি বনূ বকরের একটি শাখা ছিল এবং তারা বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। হযরত দ্বাহহাক (রা) তাদেরকে যথাযথ শাস্তি দিলেন এবং অভিযানে সফল হয়ে মদীনা ফিরে এলেন।

হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) এবং আরো কতিপয় চরিতকার লিখেছেন যে, হুনাইনের যুদ্ধে বনূ সুলাইমের মুজাহিদদের কমান্ড হযরত দ্বাহহাকের (রা) দায়িত্বে ছিল। আর এই সেই বনূ সুলাইম যার ঝান্ডা হযরত দ্বাহহাককে (রা) প্রদানের সময় হুযূর (সা) বলেছিলেন যে, সে তোমাদের নয় শ' সংখ্যাকে এক হাজারের সমান করে দেবে। অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, এই ঘটনা মক্কা বিজয়ের পূর্বে সেই সময় সংঘটিত হয়েছিল যখন বনূ সুলাইম কাদিদ নামক স্থানে রাসূলের (সা) নিকট হাযির হয়ে ইসলামী বাহিনীতে শামিল হয়েছিল।

হাফেজ ইবনে হাজার (র) এবং আল্লামা বালাযুরী (র) বর্ণনা করেছেন যে, জি'রানা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলে আকরাম (সা) দ্বাহহাক (রা) বিন সুফিয়ানকে বনূ কিলাবের নিকট থেকে যাকাত আদায়ের দায়িত্ব অর্পন করেন। ওয়াকেদীর রেওয়ায়াতকে যদি সঠিক বলে মেনে নেওয়া হয় যে, হুযূরের (সা) পক্ষ থেকে হযরত দ্বাহহাককে (রা) চতুর্থ হিজরীতে বনূ কিলাবের রাজস্ব আদায়কারী নিয়োগ করা হয়েছিল তাহলে তার অর্থ এই হবে যে, কিছু দিন পর হযরত দ্বাহহাক (রা) সেই পদ থেকে অব্যাহতি পেয়ে হুযূরের (সা) নিকট মদীনা চলে এসেছিলেন এবং অষ্টম হিজরীতে হুনাইনের যুদ্ধের পর তিনি সেই পদে দ্বিতীয়বার নিয়োগ লাভ করেছিলেন।

নবম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে প্রিয় নবী (সা) স্বয়ং হযরত দ্বাহহাকের (রা) গোত্র বনূ কিলাবে একটি অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল বনূ কিলাবের মুশরিকদের শিক্ষা দেওয়া। হুযূর (সা) এই অভিযানেও হযরত দ্বাহহাককেই (রা) নেতা বানিয়েছিলেন এবং এই অভিযান তাঁর নামেই "সারিয়্যাহ দ্বাহহাক বিন সুফিয়ান কিলাবী" খ্যাতি লাভ করে। (কেউ কেউ তাকে সারিয়্যাহ বনূ কিলাবও লিখেছেন।) বনূ কিলাবের মুশরিকরা মুসলমানদেরকে বাধা দিলো। কিন্তু খুব শীঘ্রই পরাজিত হলো।

একাদশ হিজরীতে রাসূলে আকরামের (সা) ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খিলাফতের আসনে সমাসীন হলে সমগ্র আরবে ধর্মদ্রোহীতার আগুন জ্বলে উঠলো। বনূ সুলাইম গোত্রও ধর্মদ্রোহীতার আওতায় এসে গেলো। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাদের উৎখাতের জন্য হযরত

দ্বাহহাক (রা) বিন সুফিয়ানকে প্রেরণ করলেন। আল্লামা খায়রুদ্দীন আয-যাবেকলী "আল আলাম" গ্রন্থে লিখেছেন যে, হযরত দ্বাহহাক (রা) বিন সুফিয়ান বনূ সুলাইমের অসংখ্য মুরতাদের বিরুদ্ধে অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হন। কিন্তু হযরত দ্বাহহাকের (রা) রক্ত বিফলে যায়নি। তোলায়হা বিন খুয়াইলদ আসদীর পরাজয়ের পর বনূ সুলাইম এবং তার সমর্থকদের সাহসে ভাটা পড়লো এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশই হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের হাতে দ্বিতীয়বার ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন। অবশ্য ধর্মদ্রোহী অবস্থায় যাদের হাত মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল তাদেরকে গ্রেফতার করে হত্যা করা হয়। হযরত দ্বাহহাকের (রা) স্ত্রী ও সন্তানদের ব্যাপারে চরিত গ্রন্থগুলো নীরব রয়েছে।

হযরত দ্বাহহাক (রা) বিন সুফিয়ান মৌলিকভাবে একজন সৈনিক মানুষ ছিলেন। এ জন্য হাদীস বর্ণনা করার সুযোগ তাঁর কমই হয়েছিল। তিনি শুধুমাত্র চারটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হাফিজ ইবনে আবদুল বার (র) আল ইসতিয়াবে লিখেছেন যে, হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত দ্বাহহাকের (রা) মতকে খুব গুরুত্ব দিতেন। এই কথার পক্ষে তিনি এই ঘটনা পেশ করেন ঃ হযরত ওমর ফারুক (রা) নিহত ব্যক্তির রক্তপণে স্ত্রীকে অংশ দেওয়ার পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু হযরত দ্বাহহাক (রা) তাঁকে বললেন, আমি যে কবীলার রাজস্ব আদায়কারী ছিলাম আশিমুজ জুবানী নামক তার এক ব্যক্তি ভুলবশত নিহত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) এই খবর পেয়ে আমাকে লিখিত নির্দেশ প্রেরণ করলেন যে, নিহত আশিমের রক্তপণে তার স্ত্রীকেও অংশ দিতে হবে। সুতরাং আমি সেই নির্দেশ অনুযায়ী আমল করেছিলাম। হযরত দ্বাহহাকের (রা) এই সাক্ষ্যের কারণে হযরত ওমর ফারুক (রা) নিজের মত পরিবর্তন করে নেন। এই ঘটনা যদি হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে সংঘটিত হয়ে থাকে তাহলে ওপরে বর্ণিত আয-যারেকলীর রেওয়ায়াত সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি করে। তিনি বলেছিলেন যে, হযরত দ্বাহহাক (রা) ধর্মদ্রোহীতার ফিতনার সময় শাহাদাত পান। এই অবস্থায় প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, হযরত দ্বাহহাক (রা) কখন ওফাত পেয়েছিলেন? তার জবাব চরিত ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না।

হযরত দ্বাহহাক (রা) নবী করীমকে (সা) খুব ভালবাসতেন। আল্লামা বালাযুরী (র) বর্ণনা করেছেন যে, একবার তিনি হুযূরের (সা) খিদমতে একটি দুগ্ধবতী উটনী হাদিয়া হিসেবে পেশ করলেন। উটনীটির বেশী দুধ দানের ব্যাপারে খ্যাতি ছিল। হযরত দ্বাহহাক (রা) রাসূলের (সা) হিফাজত করাকে নিজের জন্য গৌরবের বস্তু মনে করতেন। সুতরাং তিনি কয়েকবার হুযূরের

(সা) পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁর হিফাজতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। সে সময় নাঙ্গা তরবারী তাঁর হাতে থাকতো। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) বলেন যে, এই খিদমতের বিনিময়ে রাসূলের (সা) দরবার থেকে তিনি "সাইয়াফে রাসূল" খিতাবে বিভূষিত হন। এই খিতাবে আর কেউ তাঁর সমকক্ষ নেই। তাঁর বীরত্বের এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে যে, স্বয়ং রাসূলে করীম (সা) তাঁকে একশ অশ্বারোহীর সমান মনে করতেন এবং তা প্রকাশ্যে বলতেনও।

হযরত আত্তাব (রা) বিন আসীদ উমুবী

অষ্টম হিজরী রমযানে মক্কা বিজয়ের কিছু দিন পর রহমতে আলম (সা) খবর পেলেন যে, বনূ হাওয়াযিন আরো কতিপয় কবীলার সঙ্গে মিলিত হয়ে মক্কা মুয়াযযামার ওপর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। হুযূর (সা) সাহাবায়ে কিরামকে (রা) বললেন, সামনে অগ্রসর হয়ে তাদের মুকাবিলা করাই উত্তম হবে এবং তাদেরকে মক্কার কাছে আসতে দেওয়া উচিত হবে না। সুতরাং এই উদ্দেশ্যে তিনি ১২ হাজার জীবন উৎসর্গকারীকে সঙ্গে নিয়ে হুনাইন রওয়ানা হলেন। ইসলামী বাহিনী রওয়ানার পূর্বে মক্কা মুয়াযযামার এমারাত কোন আস্থাবান ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত করার প্রয়োজন অনুভূত হলো। যদিও মক্কা মুয়াজ্জামায় অনেক বয়স্ক সাহাবী ছিলেন। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য সাইয়েদুল মুরসালীনের (সা) দৃষ্টি পড়লো মক্কার এমন একজন যুবকের প্রতি যাঁর বয়স ২০–২১ বছর ছিল এবং তিনি মাত্র কিছু দিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। এই ভাগ্যবান যুবকের নাম ছিল আবু আবদুর রহমান আত্তাব (রা) বিন আসীদ। হুযূর (সা) তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি দৌড়াতে দৌড়াতে রাসূলের (সা) দরবারে হাযির হলেন এবং অত্যন্ত আদবের সঙ্গে সালাম করে নবীর (সা) ইরশাদ শুনার জন্য একাগ্রচিত্তে দাঁড়িয়ে গেলেন। প্রিয় নবী (সা) তাঁকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"আত্তাব, আমি এখান থেকে যাচ্ছি। আমার পর তুমি মক্কার শাসক হবে। স্মরণ রেখো, আল্লাহর বান্দাহদের ওপর আমি তোমাকে শাসক বানাচ্ছি। এটা এ কারণে যে, আমার নিকট তুমি এই কাজের সবচেয়ে বেশী যোগ্য। যদি তোমার চেয়ে অন্য কেউ এই পদের যোগ্য হতো তাহলে তাকে এই দায়িত্ব অর্পন করতাম।"

হযরত আত্তাব (রা) নবীর (সা) নির্দেশের সামনে মাথা নত করে দিলেন। অতপর নিজের শাসন সময়টুকুতে সু ব্যবস্থাপনা, দারিদ্র দূরীকরণ, ভালো কাজের আদেশ এবং খারাব কাজ থেকে বিরত রাখার কাজ এতো ভালভাবে আঞ্জাম দিলেন যে, রাসূলের (সা) উত্তরাধিকারের যথাযথ হক আদায় করলেন।

সাইয়েদুনা হযরত আবু আবদুর রহমান আত্তাব (রা) বিন আসীদ অন্যতম মহান সাহাবী হিসেবে পরগণিত ছিলেন। কুরাইশের প্রখ্যাত শাখা বনূ উমাইয়ার সঙ্গে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তাঁর নসবনামা হলো ঃ

আত্তাব (রা) বিন আসীদ বিন আবিল আয়েছ বিন উমাইয়া বিন আবদি শামস বিন আবদি মান্নাফ বিন কুসাই বিন কিলাব বিন মোররাহ।

এমনিভাবে হযরত আত্তাবের (রা) নসবের ধারা পঞ্চম তবকায় আবদি মান্নাফের সঙ্গে রাসূলের (সা) পিতৃ ধারার সাথে মিলে যায়। হযরত ওসমান যূন্নূরাইন (রা), আবু সুফিয়ান (রা) এবং আমীর মাবিয়াও (রা) একই বংশের (বনূ উমাইয়া অথবা বনূ আবদি শামস) সদস্য ছিলেন।

চরিতকাররা হযরত আত্তাবের (রা) জন্ম সাল সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলেননি। কিন্তু এ ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, মক্কা বিজয়ের সময় তাঁর বয়স ২০–২১ বছরের বেশী ছিল না। এই হিসাব অনুযায়ী তাঁর জন্ম সাল নবুওয়াত প্রাপ্তির প্রথম বছর। হুযূরের (সা) হিজরতের (নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছর) সময় তিনি ১২ বছরের নাবালেগ ছিলেন। যদিও তিনি নবীর (সা) হিজরতের পর বয়োপ্রাপ্ত হন। এ সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তাঁকে সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি প্রথম থেকেই মূর্তি পূজাকে ঘৃণা করতেন এবং মুশরিকানা কাজ থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকতেন। হুযূরে আকরামও (সা) তাঁর সুন্দর স্বভাব সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। বস্তুত মুসতাদরাকে হাকিমের এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী মক্কা বিজয়ের দু'এক দিন পূর্বে হুযূর (সা) আলোচনা প্রসঙ্গে সাহাবীদের (রা) সামনে বলেছিলেন যে, কুরাইশের চার ব্যক্তি শিরক থেকে দূরে এবং ইসলামের প্রতি অনুরক্ত রয়েছেন।

সাহাবীগণ (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল। তারা কারা? হুযূর (সা) বললেন, তারা হলেন "আত্তাব (রা) বিন আসীদ, সোহায়েল (রা) বিন আমর, হাকিম (রা) বিন হাযাম এবং জুবায়ের (রা) বিন মুতইম।" আল্লাহর কি শান যে, এই চার ব্যক্তিই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন এবং জালীলুল কদর সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হয়েছিলেন। হযরত আত্তাব (রা) যদিও মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু হুযূর (সা) তাঁর বীরত্ব, জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তায় এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, হুনাইনের যুদ্ধে রওয়ানার পূর্বে তিনি তাঁকে (অথবা হুনাইনের যুদ্ধের মাঝে) মক্কার শাসক নিয়োগ করেছিলেন। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, হুযূর (সা) প্রথমে হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল আনসারীকে মক্কার আমীর নিযুক্ত করেছিলেন এবং কিছুদিন

পর তাঁর স্থলে হযরত আত্তাবকে (রা) নিয়োগ করেছিলেন। আরো কতিপয় রেওয়ায়াত অনুযায়ী হুযূর (সা) হযরত আত্তাবকে (রা) মক্কার আমীর নিযুক্ত করেছিলেন এবং হযরত মাআয (রা) বিন জাবালকে তাঁর সাহায্য ও লোকদেরকে কুরআন এবং সুন্নার তালীম দেওয়ার জন্য মক্কায় রেখে গিয়েছিলেন। হযরত মাআযের (রা) মক্কায় এমারাত প্রশ্নে মতবিরোধ থাকতে পারে কিন্তু এ ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন যে, হযরত আত্তাব (রা) বিন আসীদ চার-পাঁচ বছর পর্যন্ত মক্কার আমীর ছিলেন। আল্লামা ইবনে আসীর (র) উসুদুল গাবাহতে এবং ইবনে হাযাম "জাওয়ামেয়ুস সীরাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, অষ্টম হিজরীর হজ্ব হযরত আত্তাব (রা) বিন আসীদ-এর এমারতে সম্পন্ন হয়। এই দিক থেকে তিনি ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে প্রথম আমীরে হজ্ব। হাফেজ ইবনে হাজার (র) "ইসাবাহ"তে লিখেছেন, রাসূলে আকরাম (সা) হযরত আত্তাবের (রা) জন্য প্রতিদিন শুধুমাত্র দুই দিরহাম নির্ধারণ করেছিলেন এবং তিনি তাঁর সমগ্র এমারতকালে সেই দুই দিরহামেই সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি কখনো তা বৃদ্ধিরও দাবী করেননি। এবং আয়ের দ্বিতীয় কোন মাধ্যমও তালাশ করেননি। এমনকি যদি কেউ হাদিয়া হিসেবে কিছু দিতেন তাও ব্যবহার করতেন না। ইমাম হাকিম মুসতাদরাকে লিখেছেন যে, একবার কোন ব্যক্তি তাঁকে হাদিয়া হিসেবে দু'টি চাদর দান করেছিলেন। তিনি এই চাদর গ্রহণ তো করলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তা নিজের গোলাম কাইসানকে দিয়ে দিলেন। তিনি বলতেন, যে পেট দুই দিরহামে ভরে না, আল্লাহ তা কখনো তৃপ্ত করবেন না।

হযরত আত্তাব (রা) আল্লাহর আহকাম জারীর ব্যাপারে খুব কঠোরতা অবলম্বন করতেন এবং গ্রহণীয় ওজর ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে জামায়াতের সঙ্গে নামায আদায় না করার অনুমতি দিতেন না। হাফেজ ইবনে হাজার (র) বর্ণনা করেছেন, তিনি মক্কাবাসীদের সামনে বলতেন যে, আল্লাহর কসম! জামায়াত তরক করা নীরেট মুনাফেকী এবং যে ব্যক্তি জামায়াতের সঙ্গে নামায আদায় করবে না আমি তাকে হত্যা করবো। এই ব্যাপারে তাঁর কঠোরতায় মক্কাবাসী একদম অসহায় হয়ে পড়লো। এমনকি তাঁরা মদীনায় একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে প্রিয় নবীর (সা) নিকট অভিযোগ করলেন যে, আত্তাব (রা) শরীয়তের হুকুম-আহকাম জারী প্রশ্নে সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। তাতে হুযূর (সা) হযরত আত্তাবকে (রা) সকল কাজে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিলেন। তারপর তিনি কঠোরতা কমিয়ে আনলেন।

সহীহ বুখারীতে হযরত মিসওয়ার (রা) বিন মাখরামা থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত আলী কাররামাল্লাহ ওয়াজহাহ আবু জেহেলের কন্যাকে

বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আবু জেহেলের পরিবার পরিজন হুযূরের (সা) নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে ইরশাদ করলেন ঃ "হিশামের বংশধর আলী (রা) বিন আবি তালিবের সঙ্গে নিজের কন্যাকে বিয়ে দিতে চায় এবং আমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে কিন্তু আমি অনুমতি দেব না। কখনো দেব না–আমি হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করার জন্য আসিনি। আল্লাহর কসম! আল্লাহর রাসূলের (সা) কন্যা এবং আল্লাহর এক দুশমনের কন্যার একই ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে হতে পারে না।"

সুতরাং হযরত আলী (রা) নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন। মুসয়াবুয যুবায়রী থেকে বর্ণিত আছে যে, এ সময় হযরত আত্তাব (রা) বিন আসীদ আবু জেহেল কন্যা জুয়াইরিয়ার সঙ্গে বিয়েতে তৈরী হয়ে গিয়েছিলেন। তার একমাত্র কারণ এই ছিল যাতে হযরত ফাতিমাতুয যোহরার আর সতীনের ঘর করার কোন সম্ভাবনাই না থাকে। ব্যাপারটি তাঁর রাসূল প্রেমের কথা প্রমাণ করে। কেননা, তিনি জানতেন যে, প্রিয় নবী (সা) নিজের কলিজার টুকরার সঙ্গে সতীন আনাকে কখনই পসন্দ করবেন না।

ইবনে হাযাম লিখেছেন, হযরত আত্তাব (রা) আবু জেহেল কন্যা আল–হানাফাকে নিকাহ করেছিলেন। প্রথমে সে হযরত সোহায়েল (রা) বিন আমরের স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু কোন কারণে তিনি তাকে তালাক দিয়েছিলেন।

একাদশ হিজরীতে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) এর ইন্তেকাল হলে হযরত আত্তাব (রা) এ খবর শুনে শোকাভিভূত হয়ে পড়লেন এবং ভগ্ন হৃদয়ে মক্কার উপকণ্ঠে কোন এক উপত্যকায় চলে গেলেন। আল্লামা ইবনে আসাকির (র) হযরত উবায়েদুল্লাহ বিন উমায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন, মক্কা মুয়াযযামার বুযূর্গ ব্যক্তি হযরত সুহায়েল (রা) বিন আমর হযরত আত্তাবের (রা) মক্কা ত্যাগের খবর পেয়ে খোঁজ করতে করতে তাঁর নিকট পৌছে গেলেন। তিনি তাঁকে শহরে ফিরে যেতে এবং জনগণের সঙ্গে কথা বলার আবেদন জানালেন।

হযরত আত্তাব (রা) জবাব দিলেন যে, রাসূলের (সা) ইন্তেকালের পর তিনি কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। হযরত সোহায়েল (রা) বললেন, আপনি আমার সঙ্গে চলুন। আমি আপনার পক্ষ থেকে লোকদের সঙ্গে কথা বলবো।

সুতরাং দু'জনই মসজিদুল হারামে আসলেন। সেখানে বহু সংখ্যক মক্কাবাসী একত্রিত ছিলেন। হযরত সোহায়েল (রা) বিন আমর তাঁদের সামনে ঠিক তেমনি খুতবা দিলেন যেমন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) মদীনাবাসীর সামনে দিয়েছিলেন। তাতে লোকজনের মধ্যে সাহস ফিরে এলো এবং তারা

কাজকাম শুরু করলো। ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেছেন, এ সময় হযরত সোহায়েল (রা) সেই সব দায়িত্ব পালন করেন যা মক্কার আমীর হিসেবে হযরত আত্তাবের (রা) দায়িত্ব ছিল। স্পষ্টত, তার কারণ এই ছিল যে, হুযূরের (সা) ইন্তেকালে হযরত আত্তাব (রা) এত দুঃখ পেয়েছিলেন যে, তিনি আর মক্কার এমারতের বোঝা বহন করার মত ছিলেন না। কথিত আছে যে, কয়েকদিন পর তিনি নিজের দায়িত্ব পালনের যোগ্য হন। খলিফাতুর রাসূল (সা) হযরত আবু বকর সিদ্দীকও (রা) তাঁকে সেই পদে বহাল রেখেছিলেন এবং তিনি খিলাফতে সিদ্দিকীর সম্পূর্ণ সময়ই মক্কায় এমারতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। ইবনে হাযাম বর্ণনা করেছেন যে, ত্রয়োদশ হিজরীতে যেদিন হযরত আবু বকর সিদ্দীকের ওফাতের খবর মক্কা পৌছলো সেইদিন হযরত আত্তাব (রা) ওফাত পান।

আল্লামা ইবনে আসীরও (র) তাঁর ওফাতের সাল ১৩ হিজরী বলে লিখেছেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৫–২৬ বছর। কতিপয় রেওয়ায়াত অনুযায়ী ১৩ হিজরী থেকে ২২ হিজরীর মধ্যে কোন এক বছর তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল। তার অর্থ হলো যে, তিনি হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালেও মক্কায় শাসক ছিলেন। আল্লামা শিবলী নু'মানী (র) "আল ফারুক" গ্রন্থে হযরত ওমরের (রা) প্রশাসকদের তালিকায় হযরত আত্তাব (রা) বিন আসীদের নাম পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) ইসাবাতে এই রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন যে, একবার হযরত ওমর (রা) একটি মূল্যবান চাদর হযরত আত্তাব (রা) বিন আসীদকে পেশ করেছিলেন। কেননা, মক্কা বিজয়ের পর তাঁকে যখন রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা মুয়াযযামার প্রশাসক বানিয়ে দিলেন তখন তাঁকে দু'টি চাদর ছাড়া আর কিছু বিনিময় দেওয়া যায়নি।

এই রেওয়ায়াত থেকেও স্পষ্ট হয় যে, হযরত আত্তাব (রা) ফারুকী শাসনামলেও জীবিত ছিলেন। যা হোক, এ ব্যাপারে সকল চরিতকারই ঐকমত্য পোষণ করেন যে, হযরত আত্তাব (রা) দীর্ঘজীবী ছিলেন না এবং যৌবনকালেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

হযরত আত্তাব (রা) মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ জন্য নবীর (সা) ফয়েয লাভের সুযোগ তাঁর খুব কমই হয়েছিল। তা সত্ত্বেও সকল চরিতকার তাঁকে মহান সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত করেছেন এবং তাঁর ইলম ও ফজল এবং যুহদ ও তাকওয়ার প্রশংসা করেছেন। আল্লামা ইবনে আসীর (র)

"উসুদুল গাবাহ" গ্রন্থে তাঁর ব্যাপারে এই মত প্রকাশ করেছেন যে, আত্তাব (রা) একজন সালেহ, সচেতন ও সম্মানিত ছিলেন।

বিভিন্ন সূত্র মতে জানা যায় যে, হযরত আত্তাব (রা) ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই একজন সুন্দর স্বভাব, জ্ঞানী ও বাহাদুর যুবক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন এবং বিশ্ব নবীও (সা) তাঁর সৎ গুণাবলী সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। এই কারণেই তিনি তাঁকে মক্কার এমারতের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে হযরত আত্তাবের (রা) একক মর্যাদা এ জন্য প্রতিষ্ঠিত যে, অনেক বয়স্ক সাহাবী থাকতেও রাসূল (সা) তাঁকে মক্কার আমীর নিযুক্ত করেছিলেন।

হযরত আত্তাব (রা) থেকে কতিপয় হাদীসও বর্ণিত আছে। যা থেকে জানা যায় যে, তিনি তাফাককুহ ফিদ্দীনে বিশেষ মর্যাদা রাখতেন। উদাহরণস্বরূপ তিরমিযী ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন যে, একবার কোন এক ব্যক্তি হযরত আত্তাব (রা)-এর নিকট আঙ্গুরের যাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। জবাবে তিনি বলেছিলেন যে, নবী (সা) আঙ্গুরের যাকাত সম্পর্কে এই বলেছেন যে, আঙ্গুরের আন্দাজ করতে হবে। (অর্থাৎ শুকানোর পর তার ওজন কি হবে) এবং শুকনো আঙ্গুরের মত যাকাত দিতে হবে।

এই রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত আত্তাব (রা) রাসূলের (সা) মুখে যা কিছু শুনেছিলেন তা খুব ভালোভাবেই স্মরণ রেখেছিলেন এবং নিজের এমারতকালে সেই অনুযায়ীই সিদ্ধান্ত করেছিলেন। তিনি কয়েক বছর যাবত মক্কা মুয়ায্যামার আমেল বা গবর্ণর ছিলেন। কিন্তু যখন প্রকৃত স্রষ্টার তরফ থেকে ডাক এলো তখন এই নশ্বর জগৎ থেকে এমনভাবে বিদায় হলেন যে, বস্তু জগৎ তাঁকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেনি।

হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন সামুরাহ

অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে রহমতে আলম (সা) দশ হাজার জীবন উৎসর্গকারী সমভিব্যাহারে বিজয়ীর বেশে মক্কা মুয়াজ্জামায় প্রবেশ করলেন। সেটি এক আশ্চর্য ধরনের দৃশ্য! আট বছর পূর্বে যারা হকপন্থীদের ওপর মক্কার মাটি অপ্রশস্ত করে দিয়েছিল এবং তাদেরকে মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য করেছিল তারাই আজ এক চরম অসহায় অবস্থায় কা'বার হরমে হুযূরে আকরামের (সা) সামনে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে আছে। হুযূর (সা) তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ! আমি আজ তোমাদের সঙ্গে কেমন ধরনের ব্যবহার করবো বলে মনে করছো।"

সকলেই নীচু স্বরে আরয করলো ঃ "আপনি যুবকদের শরীফ ভাই এবং বৃদ্ধদের শরীফ ভ্রাতুষ্পুত্র।"

ইরশাদ হলো ঃ "হে কুরাইশ ভ্রাতৃবৃন্দ! আমি আজ আপনাদেরকে তাই বলবো যা ইউসুফ (আ) তাঁর ভাইদেরকে বলেছিলেন ঃ "লা তাছরীবা আলাইকুমুল ইয়াওমা" অর্থাৎ তোমাদেরকে আজ কোন জবাবদিহী করতে হবে না। তোমরা আজ সকলেই মুক্ত।

অযাচিত এই সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা শুনে কুরাইশদের মধ্যে বিয়ের উৎসবের মত অবস্থার সৃষ্টি হলো। নিজেদের কৃতকর্মের প্রেক্ষাপটে তাদের এটা ধারণাও ছিল না যে, কোন জবাবদিহী ছাড়াই তারা পরিষ্কার ক্ষমা পেয়ে যাবে। কিন্তু যখন মানব শ্রেষ্ঠের (সা) ক্ষমার মেঘমালা থেকে তাদের ওপর টপ টপ করে বৃষ্টি বর্ষণ হতে লাগলো, তখন তাদের প্রতিটি লোমকূপ বলে উঠলো যে, তারা বনূ হাশিমের ইয়াতীমকে মক্কা থেকে বের করে দিয়ে বিরাট অপরাধ করেছিল। আজ তাদের ওপর ইসলামের সত্যতা প্রোজ্জ্বল দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে উঠল। সুতরাং তাঁরা কালবিলম্ব না করে খাইরুল বাশারের (সা) রহমতের আঁচলকে মজবুতভাবে ধরলেন এবং সত্য অন্তরে একক আল্লাহর ওপর ঈমান আনলেন। সেই সময় বেঁটে অবয়বের একজন যুবক দয়ার সাগর নবী করীমের (সা) খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমি আপনার চাচার পুত্র আবদুল কা'বা।"

হুযূর (সা) অত্যন্ত স্নেহ ও মুহাব্বাতের সঙ্গে বললেন ঃ "না, বরং আজ থেকে তুমি আবদুর রহমান।" আল্লাহর রাসূলের (সা) নিকট থেকে আবদুর রহমান নাম প্রাপ্ত এই যুবক সামুরাহ (রা) বিন হাবীবের (বিন আবদি শামস বিন আবদি মান্নাফ বিন কুসাই) পুত্র ছিলেন। তাঁর পর দাদা আবদি শামস এবং হুযূরের (সা) পরদাদা হাশিম সহোদর ছিলেন। এ জন্য তিনি নিজেকে হুযূরের (সা) চাচার পুত্র বলেছিলেন। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা হযরত আবদুর রহমানের (রা) জন্ম সাল সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলেননি। কিন্তু ধারণা করা হয় যে, নবীর (সা) হিজরতের পূর্বে তাঁর বয়স খুব কম ছিল এবং হকপন্থীদের ওপর তিনি নির্যাতন চালাননি। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি পূর্ণ যৌবনকাল কাটাচ্ছিলেন। সেই সময়ই তিনি ইসলামের মহান নিয়ামত লাভ করেন এবং আবদুল কা'বা থেকে আবদুর রহমান হয়ে রাসূল (সা) প্রদীপের পতঙ্গদের অন্তর্ভুক্ত হন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) বর্ণনা করেছেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আবদুর রহমান তাবুকের যুদ্ধের কঠিন সফরে রহমতে আলমের (সা) সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা ছাড়াও হযরত আবদুর রহমান (রা) অন্য কতিপয় সময় নবীর (সা) ফয়েয লাভ করেন। সুতরাং হাদীসের কিতাবসমূহে তাঁর থেকে বর্ণিত ১৪টি হাদীস পাওয়া যায়।

আল্লামা ইবনে সা'দ (র) লিখেছেন, একবার হযরত আবদুর রহমান (রা) রাসূলের (সা) নিকট উপস্থিত হলেন। এ সময় সারওয়ারে আলম (সা) তাঁকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "আবদুর রহমান! নিজে কখনো এমারত এবং নেতৃত্বের প্রার্থী হয়ো না। তুমি যদি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কোন দায়িত্ব কবুল কর তাহলে তার ভালো মন্দের বোঝা এককভাবে তোমার ঘাড়ে পড়বে। হাঁ, যদি বিনা ইচ্ছায় যদি তুমি এমারত প্রাপ্ত হও তাহলে সেই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা কর। আল্লাহ তাআলা তোমাকে সাহায্য করবেন।"

হযরত আবদুর রহমান (রা) বিশ্বনবীর (সা) এই পবিত্র ইরশাদকে জীবনের জপমালা বানিয়ে নেন এবং আজীবন কখনো এমারতের খাহেশ করেননি। অবশ্য কোন দায়িত্ব অথবা এমারত বিনা খাহেশে প্রাপ্ত হলে তা গ্রহণ করতেন। অতপর তা সুন্দরভাবে পালনের জন্য নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করতেন।

রাসূলের (সা) যুগের পর এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আবদুর রহমান (রা) বিন সামুরাহ'র নাম কোন ঘটনায় দৃষ্টিতে পড়ে না। কিন্তু তৃতীয় খলীফা হযরত

ওসমানের (রা) খিলাফতকালে তিনি হঠাৎ একজন মহান জেনারেল হিসেবে আবির্ভূত হন। তাঁর প্রভূত সামরিক যোগ্যতা ছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত ওমরের (রা) খিলাফতকালে তিনি কোথায় ছিলেন ও কি করতেন? চরিতগ্রন্থসমূহে তাঁর কোন জবাব পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁর সামরিক কৃতিত্বের হাল পড়ে এটা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যায় যে, তিনি একজন অভিজ্ঞ সামরিক অফিসার ছিলেন এবং তিনি হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত ওমরের (রা) সময়কার যুদ্ধসমূহেও কোন না কোনভাবে অবশ্যই অংশ নিয়েছিলেন। এটা অবশ্য ভিন্ন কথা যে, সে যুগে তাঁর নাম কি কারণে জনসমক্ষে প্রকাশ পায়নি।

হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে মুসলমানরা ইরানে অগ্রগামী হয়ে মাকরান এবং সিস্তান (অথবা সিজিস্তান) পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। তাঁর সীমান্ত পাকিস্তানের বর্তমান বেলুচিস্তানের সঙ্গে মিশেছে। (সে যুগে বেলুচিস্তান নামে কোন প্রদেশ ছিল না।) সিস্তান ইরানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ ছিল এবং সেখানকার অধিবাসীরা ছিল খুব যোদ্ধা। কিছুদিন পর তারা বিশৃংখলা সৃষ্টি করে মুসলমানদের আনুগত্য থেকে বের হয়ে যায়। হযরত ওসমান (রা) খিলাফতের মসনদে বসলেন। এ সময় তিনি পুনরায় সিস্তানের প্রতি মনোযোগ দিলেন এবং বসরার শাসক হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আমেরকে সিস্তান, কাবুল, মাকরান, কারমান প্রভৃতি এলাকা বিদ্রোহীদের খপ্পড় থেকে উদ্ধার করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। ইবনে আমের (রা) সিস্তানের অভিযানে রবী' বিন যিয়াদকে নিয়োগ করলেন। তিনি ৩০ হিজরীতে (৬৫০ খৃঃ) বিরাট এক হামলা চালিয়ে সিস্তানের ওপর পুনরায় ইসলামের পতাকা উড্ডীন করলেন। রবী' দু'বছর পর্যন্ত সিস্তানে অবস্থান করেছিলেন। তারপর তিনি সিস্তানের রাজধানী যারাঞ্জে নিজের নায়েব নিয়োগ করে ইবনে আমেরের (রা) সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য খোরাসান (অথবা বসরা) চলে গেলেন। তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর সিস্তানীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল এবং রবী' বিন যিয়াদের নায়েবকে যারাঞ্জ থেকে বের করে দিল এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসলো।

আবদুল্লাহ (রা) বিন আমের এই খবর পেয়ে হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন সামুরাহকে সিস্তান অবনত করার জন্য নিয়োগ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সিস্তানের এমারতের পরওয়ানা লিখে দিলেন। অন্য এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী আমিরুল মুমিনীন হযরত ওসমান (রা) হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন সামুরাকে সিস্তান অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন। যা হোক, ৩৩ হিজরীতে

হযরত আবদুর রহমান (রা) প্রায় আট হাজার সৈন্য সমন্বয়ে গঠিত একটি মজবুত বাহিনীসহ সিস্তানের সদর যারাঞ্জের দিকে অগ্রসর হলেন। এই যুদ্ধে খাজা হাসান বসরী (র) এবং বেশ কিছু সংখ্যক ফকীহও ছিলেন। এইসব নেককার ব্যক্তির উপস্থিতিতে মুজাহিদদের সাহস বেড়ে গেল। হযরত আবদুর রহমান (রা) কঠিন রাস্তা অতিক্রম করে বিদ্যুৎ বেগে যারাঞ্জ এসে উপস্থিত হলেন। সিস্তানের শাসক আপারভেজ (অথবা আবরান বিন রোস্তম) শহরের দরজা বন্ধ করে দিল এবং মুসলমানদের মুকাবিলা করলো। কিন্তু খুব শীঘ্রই হৃদয়ঙ্গম করতে পারলো যে, এই কাফন বাঁধা মুজাহিদদের মুকাবিলা করা তার সাধ্যাতীত ব্যাপার। সুতরাং সে বিশ লাখ দিরহাম এবং দুই হাজার গোলাম দিয়ে মুসলমানদের আনুগত্য কবুল করে নিল।

হযরত আবদুর রহমানের (রা) সঙ্গে যেসব ফকীহ এসেছিলেন তাঁরা এলাকায় ইসলামের সম্প্রসারণের জন্য খুব প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাঁদের তাবলীগী প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে যদিও সিস্তানীদের এক বিরাট সংখ্যক মানুষ মুসলমান হয়েছিলেন তবুও তারা যখনই সুযোগ পেত তখনই ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসতো। যারাঞ্জ পদানত করার পর হযরত আবদুর রহমান (রা) যারাঞ্জ ও কাশ–এর মধ্যবর্তী সকল এলাকা জয় করে নিলেন। আরব ঐতিহাসিকরা বর্ণনা করেছেন যে, এই সকল এলাকা পাকিস্তানী বেলুচিস্তানে শামিল রয়েছে।

মাওলানা সাইয়েদ আবু জাফর সাহেব নদভী এই প্রসঙ্গে স্বলিখিত পুস্তক "সিন্ধুর ইতিহাস" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "আবদুর রহমান (রা) বিন সামুরাহ সেই সব এলাকা দখল করেছিলেন যা যারাঞ্জ ও কাশের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল। এই এলাকা যদিও বর্তমানে বেলুচিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সে যুগে হিন্দুস্তানের অধীন ছিল। কেননা, সে সময় পর্যন্ত বেলুচিস্তান নামের কোন প্রদেশ ছিল না। বরং মাকরান ও সিস্তানই সিন্ধুর সঙ্গে সন্নিহিত ছিল। এইদিক থেকে হিন্দুস্তানের ওপর এই প্রথম হামলা স্থলভাগের ওপর দিয়ে সংঘটিত হয়েছিল। আর হিন্দুস্তানের এই প্রথম এলাকা যা মুসলমানদের দখলে এসেছিল এবং স্বয়ং রাসূলের (সা) সাহাবীর (রা) পবিত্র হাতে বিজয় লাভ করেছিল।"

হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন সামুরাহ যেন ভারতের মাটিতে সর্ব প্রথম আযান দানকারী মুজাহিদদের নেতা ছিলেন এবং হিন্দুস্তানের অন্যান্য সকল মুসলিম বিজেতার (মুহাম্মাদ বিন কাসেমসহ) অগ্র পথিক ছিলেন।

যারাজ্ঞ ও কাশের মধ্যবর্তী এলাকাসমূহ পদানত করার পর হযরত আবদুর রহমান (রা) রাখজের দিকে অগ্রসর হলেন এবং শক্তিশালী হামলার মাধ্যমে দাদনের (অথবা দাওয়া) গুরুত্বপূর্ণ শহর পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিলেন। এই শহরের লোকজন পালিয়ে নিজেদের মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিল। মন্দিরটি একটি মজবুত দুর্গের আকারে একটি পাহাড়ের ওপর তৈরী করা হয়েছিল। তাতে "যুর" নামক একটি মূর্তি স্থাপিত ছিল। এই হিসেবে সেই পাহাড়কে "জাবালে যুর" অথবা কোহে যুর বলা হতো। বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, এই মন্দির মূর্তি পূজারীদের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র ছিল। দূর দূরান্ত থেকে তারা দর্শনের জন্য আসতো এবং "মূর্তিকে" মূল্যবান উপঢৌকন প্রদান করতো। এই সব উপঢৌকনের বদৌলতে মন্দিরের সেবায়েত ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বিত্তবান হয়ে গিয়েছিল। হযরত আবদুর রহমান (রা) মন্দির অবরোধ করলেন। সামান্য কিছু দিনের মধ্যেই তারা হিম্মত হারিয়ে ফেলল এবং প্রচুর অর্থ দিয়ে সন্ধি করে নিলো। এই অর্থের পরিমাণ সম্পর্কে একটি রেওয়ায়াত আছে। রেওয়ায়াতটিতে বলা হয়েছে যে, পাঁচ ভাগের এক ভাগ বের করে আট হাজার মুজাহিদের মধ্যে বন্টন করা হলো। প্রত্যেক মুজাহিদ চার হাজার দিরহাম করে পেলো।

আল্লামা ইবনে আসীর (র) বর্ণনা করেছেন যে, শহর বিজয়ের পর হযরত আবদুর রহমান (রা) সোজা মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। গিয়ে দেখলেন যে, সেখানে নীরেট স্বর্ণের এক বিরাট মূর্তি স্থাপিত রয়েছে। তার চোখে মূল্যবান পদ্মরাগ মণি বসানো রয়েছে। হযরত আবদুর রহমান (রা) প্রথমে নিজের বর্শার মাথা দিয়ে সেই মূর্তির চোখ বের করে ফেললেন। অতপর তার হাত ভেঙ্গে ফেললেন। তারপর সেখানকার শাসক ও অন্য মানুষ যারা এই তামাশা দেখছিল তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে মানুষেরা! এই পদ্মরাগ মণি এবং মূর্তির ভগ্ন হাত তুলে নাও। ধন-সম্পদ আমার প্রয়োজন নেই। আমি এই কাজ শুধু এটাই দেখানোর জন্য করেছি যে, মূর্তি কারোর কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। এ জন্য তার ইবাদাত করা যেন নিজের জীবন বরবাদ করা। হে মানুষেরা! ইবাদাতের যোগ্য শুধু একমাত্র আল্লাহ। তিনিই প্রত্যেক বস্তুর মালিক এবং তিনিই প্রত্যেককে উপকার ও ক্ষতি করার শক্তি রাখেন। তোমরা যদি মহান আল্লাহর ওপর ঈমান আনো তাহলে আশা করা যায় যে, আল্লাহ তোমাদের সিনা পরিষ্কার করে দেবেন এবং তোমরা দীন ইসলামকে ভালোভাবে বুঝতে পারবে।"

এই মূর্তি ভাঙ্গার পর হযরত আবদুর রহমান (রা) বাসত ও যাবিলের (গাযনাহ) দিকে অগ্রসর হলেন এবং নিজের বীরত্ব ও চেষ্টার বদৌলতে অত্যন্ত কম সময়ে তা জয় করে নিলেন। এই বিজয় পূর্ণ করার পর তিনি যারাঞ্জ ফিরে এলেন এবং সেখানকার আইন-শৃঙ্খলার প্রতি দৃষ্টি দিলেন। সামান্য কিছু দিনই অতিবাহিত হয়েছিল এমন সময় হযরত ওসমানের (রা) শাহাদাতের ঘটনা সংঘটিত হলো। হযরত আবদুর রহমান (রা) এই খবর পেয়ে আমের বিন আহমারকে যারাঞ্জে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে স্বয়ং বসরা রওয়ানা হলেন।

হযরত ওসমানের (রা) শাহাদাতের পর হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু খলীফার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তাঁর আমলে জামাল ও সিফফীনের রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এই দুই যুদ্ধে হাজার হাজার মুসলমান মারা যায়। সেই ভয়ংকর যুগে হযরত আবদুর রহমান (রা) সম্পূর্ণ নির্জনত্ব গ্রহণ করেন এবং অন্যান্য কতিপয় সাহাবায়ে কিরামের (রা) মত কোন পক্ষের সমর্থনও করেননি। আবার কোন পক্ষের বিরোধিতাও করেননি। হযরত সাইয়েদুনা হাসানের (রা) খিলাফতকালেও হযরত আবদুর রহমানের (রা) কোন তৎপরতার সন্ধান পাওয়া যায় না।

৪১ হিজরীতে (৬৬১ খৃষ্টাব্দ) সমগ্র ইসলামী দুনিয়ার ওপর আমীর মাবিয়ার (রা) কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। এ সময় তিনি সর্ব প্রথম সেই সকল এলাকার দিকে দৃষ্টি দিলেন যে সকল এলাকা মুসলমানদের গৃহযুদ্ধের সুযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসেছিল। সুতরাং আমীর মাবিয়া (রা) দ্বিতীয়বার আবদুল্লাহ (রা) বিন আমেরকে বসরার গভর্ণর নিয়োগ করলেন এবং সিস্তান প্রভৃতি এলাকা অনুগত করার দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত করলেন। ইবনে আমের (রা) সিস্তানে হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন সামুরাহর মুজাহিদসুলভ তৎপরতার পর্যালোচনা করে তাঁকে নির্জনত্ব থেকে ডেকে পাঠালেন এবং দ্বিতীয়বার তাঁকে সিস্তানের শাসক নিয়োগ করলেন। তিনি তাঁকে বিদ্রোহীদেরকে উৎখাতের নির্দেশ দিলেন।

হযরত আবদুর রহমান (রা) নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে সিস্তানের দিকে অগ্রসর হলেন এবং এলাকার পর এলাকা জয় করতে করতে কাবুল পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। কাবুলের লোকজন বড় বিশৃংখল ছিল। তারা অস্ত্র সমর্পণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো এবং দুর্গ বন্ধ করে দিল। হযরত আবদুর রহমান (রা) অবরোধে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করলেন এবং এক রাতে শহরের ওপর কামান দিয়ে এমন পাথর বর্ষণ করলেন যে, দুর্গের এক প্রাচীরে ফাটল

ধরলো। হযরত আবদুর রহমান (রা) রাতের অন্ধকারে শহরে প্রবেশ করাকে সঠিক মনে করলেন না এবং ইবাদ বিন হিছিনকে একটি সৈন্য দল দিয়ে ফাটল তত্বাবধান করার জন্য নিয়োগ করলেন। যাতে শত্রুরা তা মেরামত করতে না পারে। সকাল হলো। কাবুলীরা অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে না'রা দিয়ে শহরের বাইরে বেরিয়ে এলো। হযরত আবদুর রহমান (রা) কাবুলীদের ধারণা বিরোধী পদক্ষেপে আশ্চর্যান্বিত হলেন। কিন্তু তিনি স্ব বাহিনীর বাছাই করা দলসমূহ নিয়ে কাবুলের ওপর এমন প্রচন্ডভাবে জবাবী হামলা চালালেন যে, মুহূর্তের মধ্যে তাদের পরাজয় ঘটলো এবং মুসলমানরা ধাওয়া করে শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। কাবুলীরা তখন অত্যন্ত মিষ্টিস্বরে নিরাপত্তা চাইলো এবং নিজেদের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিল। হযরত আবদুর রহামন (রা) তাদেরকে নিরাপত্তা এবং নিজের সৈন্যদেরকে রক্ত বহানো থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিলেন। ইবনে আসীর (র) এ কথা বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে ঐতিহাসিক ইয়াকুবী লিখেছেন যে, কাবুল শহরের মুহাফিজ বা রক্ষক মুসলমানদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিল এবং সে স্বয়ং শহরের দরজা খুলে দিয়েছিল। যা হোক, মুসলমানরা কাবুল দখল করলো। তারপর হযরত আবদুর রহমান (রা) খাওয়াশ এবং বাসতের ওপর ইসলামের পতাকা উড্ডীন করলেন। অতপর রাযানের দিকে অগ্রসর হলেন। রাযানবাসী মুসলমানদের আগমনের খবর পেয়ে প্রথমেই শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সুতরাং মুসলমানরা কোন বাধা ছাড়াই তা দখল করে নিলো। হযরত আবদুর রহমান (রা) শহরটি পরিচালনার ব্যবস্থা করে সামনে অগ্রসর হলেন এবং তাখারিস্তানের এলাকায় প্রবেশ করলেন। সর্ব প্রথম "খাশাক" নামক গুরুত্বপূর্ণ শহর রাস্তায় পড়লো। এই শহরের বাসিন্দাদের লড়াইয়ের হিম্মত হলো না এবং তারা মুসলমানদের শর্ত কবুল করে আনুগত্য স্বীকার করে নিল।

খাশাক থেকে হযরত আবদুর রহমান (রা) রাখজ পৌছলেন। মুকাবিলার জন্য রাখজবাসীরা ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলো। তারা মুসলমানদের সামনে দাঁড়িয়ে গেল এবং দীর্ঘক্ষণ খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বাধা দিল। কিন্তু মুসলমান জানবাজদের সামনে কিছুতেই কুলোতে পারলো না এবং কয়েক ঘন্টা পর তাদের বাধা দানের শক্তি রহিত হয়ে গেল। তাদের অস্ত্র সমর্পণ করিয়ে হযরত আবদুর রহমান (রা) শহরে প্রবেশ করলেন এবং তার ওপর পুনরায় ইসলামের ঝান্ডা উড়িয়ে দিলেন। রাখজের পর হযরত আবদুর রহমানের (রা) সামনের মনযিল ছিল গাযনাহ (বা বিলিস্তান)। গাযনার বাসিন্দারা ছিল যোদ্ধা এবং তাঁদের নিকট প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র ছিল। তারা অত্যন্ত সুশৃংখলভাবে মুসলমানদেরকে বাধা দিল। গাযনার নিকটে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচন্ড লড়াই হলো। মুসলমানরা

কতিপয় দলকে রক্ষিত সৈন্য হিসেবে রেখে দিয়েছিল এবং শুরুতে যুদ্ধের ময়দান থেকে তাদেরকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছিল। যুদ্ধ যখন চরম পর্যায়ে দাঁড়ালো তখন এক এক দল নারায়ে তাকীবর দিয়ে শত্রুর ওপর ঝাপিয়ে পড়লো। এই কৌশল এত কার্যকর প্রমাণিত হলো যে, গাযনাবাসীর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়লো এং তারা নিরাপত্তা প্রার্থনা করতে বাধ্য হলো।

হযরত আবদুর রহমান (রা) যে সময় গাযনাবাসীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত সে সময় কাবুলবাসীর মরা গাংগে বান ডাকলো। তারা ময়দান খালি পেয়ে বিদ্রোহের ঝান্ডা উঁচু করে ধরলো। বাস্তবত তারা ছিল প্রচন্ড বিশৃংখলা প্রিয় এবং চুক্তি যুক্তি তাদের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বা প্রয়োজনীয় বস্তু ছিল না। হযরত আবদুর রহমান (রা) এই খবর পেয়েই তাদেরকে শাস্তি দানের দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করলেন। তবুও কাবুল রওয়ানা হওয়ার পূর্বে তিনি কান্দাহার জয় করলেন এবং গাযনা ও কান্দাহার পরিচালনার সন্তোষজনক ব্যবস্থা করে কাবুলের দিকে ফিরে এলেন। কাবুলীরা প্রচন্ডভাবে মুকাবিলা করলো। কিন্তু ইসলামের মুজাহিদরা প্রচন্ড ক্রোধের সঙ্গে তাদেরকে উৎখাত করে ছাড়লো এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে কাবুলে নিজেদের অবস্থান ঠিক করলো। এই বিজয়ের ফলে সিস্তান থেকে গাযনা এবং কান্দাহার পর্যন্ত সকল এলাকা মুসলমানদের অধীনস্ত হয়ে গেল। এই সকল ঘটনা ৪৩-৪৪ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল এবং সকল অভিযান সম্পন্ন হতে শুধুমাত্র সর্বমোট এক বছর লেগেছিল। সিস্তান ছিল ইরানী বীরদের চারণভূমি। শাহনামা ফেরদৌসীর জীবিত চিরঞ্জীব চরিত্র ছাম, যাল, রোস্তম প্রভৃতির সম্পর্ক এই মাটির সঙ্গেই ছিল। তেমনিভাবে খোরাসান এবং যাবিলিস্তানের (বর্তমানর আফগানিস্তান) বাসিন্দারাও অত্যন্ত কঠোর হৃদয় ও যোদ্ধা ছিল। এক বছরের স্বল্প সময়ে এবং কঠিন পাহাড়ী রাস্তা অতিক্রম করে এ ধরনের যোদ্ধা জাতিসমূহকে অনুগত বানানো হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন সামুরাহ'র এমন এক কৃতিত্ব যা তাঁকে দুনিয়ার অন্যতম মহান জেনারেলের কাতারভুক্ত করার মুস্তাহিক বা যোগ্য বানিয়ে দেয়।

কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন, বনূ উমাইয়ার প্রখ্যাত সেনাপতি মুহাল্লাব বিন আবী সাফরাহ খারেজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধসমূহে স্থায়ী খ্যাতিলাভ করেন। অথচ তিনিও প্রথমে হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন সামুরাহর বাহিনীর একজন অফিসার ছিলেন। যে যুগে হযরত আবদুর রহমান (রা) সিস্তান এবং খোরাসানের অভিযানে ব্যাপৃত ছিলেন তখন তিনি সিন্ধু ও হিন্দ সীমান্তে জিহাদ করছিলেন। ইবনে আসীর (র) ৪৪ হিজরীর ঘটনাবলীতে লিখেছেন ঃ

"মুহাল্লাব সিন্ধুর সীমান্তে যুদ্ধ করেন। দুশমনের দাঁত ভেঙ্গে দেন এবং সফল হয়ে ফিরে আসেন।"

সাইয়েদ আবু জাফর নদবী "তারীখে সিন্ধ"-এ লিখেছেন , "মুহাল্লাব আরবদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যিনি হিন্দের সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করেন। যে দরজা দিয়ে আজ পর্যন্ত পুরাতন জাতিসমূহ আসছে।"

এটা ছিল দুররায়ে খায়বার। এই অভিযানে মুহাল্লাব মুলতান এবং পেশোয়ারের মধ্যবর্তী এলাকাসমূহ জয় করতে করতে কাইকান (কালাত) পর্যন্ত পৌছেন এবং সেখান থেকে প্রভূত গনীমতের মাল হাসিল করে ফিরে যান। ঐতিহাসিকরা এটা স্পষ্ট করে বলেননি যে, মুহাল্লাব এই অভিযানে হযরত আবদুর রহমানের (রা) নির্দেশে রওয়ানা হয়েছিলেন অথবা তিনি কেন্দ্রীয় খিলাফত থেকে সরাসরি নির্দেশ পেয়েছিলেন। হাকিকত যাই হোক এটা খুব দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যায় যে, মুহাল্লাব তাঁর সাহায্য ও সমর্থন অবশ্যই পেয়েছিলেন।

সিস্তান ও খোরাসান পদানত করার পূর্বে হযরত আবদুর রহমানকে (রা) বসরার গভর্ণর হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আমের নিজের পক্ষ থেকে সিস্তানের ওয়ালী নিযুক্ত করেছিলেন। অভিযান সম্পন্ন হওয়ার পর স্বয়ং আমীর মাবিয়া (রা) তাঁকে যথারীতি রাষ্ট্রের সনদ দান করেন। তিনি সিস্তানে আশ্চর্যজনক পদ্ধতিতে শাসন কাজ চালিয়ে ছিলেন। তাঁর দরজা আমীর ও গরীব প্রত্যেকের জন্য সব সময় খোলা থাকতো এবং তিনি প্রত্যেকের সঙ্গে কোন পক্ষপাতিত্ব ছাড়া ইনসাফ করতেন। তিনি ছিলেন একজন দরবেশ প্রকৃতির মানুষ। তিনি অতি সাধারণ কাজ করতেও লজ্জাবোধ করতেন না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রকৃতিতে ছিল নমনীয়তা ও পরিচ্ছন্নতা। আল্লামা ইবনে আসীর (র) "উসুদুল গাবাহতে লিখেছেন, বর্ষাকালে সিস্তানের রাজধানীর (যারাজ) অলি-গলি যখন কাদায় পরিপূর্ণ হয়ে যেতো তখন হযরত আবদুর রহমান (রা) অন্যান্য লোকদের সঙ্গে নিজেও গলি পরিষ্কার করতেন।

হযরত আবদুর রহমান (রা) অত্যন্ত সুন্দরভাবে সিস্তানের শাসন কাজ চালাচ্ছিলেন। কিন্তু কেন যে, ৪৬ হিজরীতে খোরাসানের ওয়ালী যিয়াদ তাঁকে পদচ্যুত করেন তা জানা যায়নি। তার অন্তর সিস্তানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভের পর তিনি স্বদেশ ভূমি মক্কায় ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে সিস্তানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। হাফেজ ইবনে হাজর (র) লিখেছেন যে, হযরত আবদুর রহমান (রা) সেখানেই ৫০ হিজরীতে পরপারে যাত্রা করেন। কিন্তু এক রেওয়ায়াতে এও

আছে যে, তিনি বসরা চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানেই তিনি ওফাত পান। তাঁর সন্তানদের মধ্যে শুধু এক পুত্র ওবায়দুল্লাহর নাম পাওয়া যায়।

হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন সামুরাহর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে নিষ্ঠাপূর্ণ কাজ, কৌশল, বাহাদুরী, হিম্মত, সাহস ও নির্ভীকতা এবং বিনয়। তিনি নিসন্দেহে ইসলামের সেই মহান জেনারেলদের অন্তর্ভূক্ত যাঁরা কঠোর অবস্থাতেও দীনে হকের পয়গাম দুনিয়ার দূর দূরান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

হযরত কায়েস (রা) বিন আছেম মুনকারি

সাইয়েদুনা হযরত ওমর ফারুকের খিলাফতকালের ঘটনা। বসরায় নতুন স্থাপিত শহরের এক গৃহে রাসূলের (সা) একজন সাহাবী মৃত্যু শয্যায় শায়িত ছিলেন। তাঁর চওড়া হাড় ও মুখাকৃতি থেকে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, কখনও তিনি অত্যন্ত সম্মানিত এবং বিরাট দেহের মানুষ ছিলেন। কিন্তু অসুখ তাঁকে খুব দুর্বল ও দুঃখ কষ্টে নিপতিত করেছে। তবুও এই অবস্থাতেও তাঁর চেহারাতে আশ্চর্য ধরনের মহিমা ফুটে উঠেছিল। এবং তা থেকে আলোর রশ্মি বিকিরণ হচ্ছিল। রাসূলের (সা) এই সাহাবীকে আল্লাহ পাক অনেক সন্তান দান করেছিলেন। সে সময় তাঁর মৃত্যু শয্যার পাশে ৩২ জন পুত্র বসেছিলো। তিনি অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে তাদেরকে সম্বোধন করে বলছিলেন ঃ

"প্রিয় পুত্রগণ! আমি এখন তোমাদের নিকট থেকে চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করছি। আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন। যখন আমি মারা যাবো তখন নিজেদের সবচেয়ে বড় ভাইকে সরদার বানাবে। যদি ছোটকে সরদার বানাও তাহলে যারা তোমাদের সমকক্ষতার দাবী করে তারা তোমাদের ওপর অঙ্গুলি নির্দেশ করবে। সব সময় নিজেদের পূর্ব পুরুষদের পদাংক অনুসরণ করে চলার চেষ্টা করবে। আমার মৃত্যুতে কান্নাকাটি ও চেঁচামেচি করবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা) এই কাজ করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। নিজের সম্পদের সংশোধন এবং হেফাজতের ব্যাপারে গাফিল হয়ো না। তাতে শরীফদের সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং নিম্ন পর্যায়ের লোকদের ইহসানের বোঝা উঠাতে হয় না। নিজেদের উটের নাম বৃদ্ধির জন্য অপ্রয়োজনীয় স্থানে ব্যয় করো না। কিন্তু প্রয়োজনীয় স্থানে ব্যয় করতে আবার দ্বিধা করো না। নিম্ন শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠা করো না। তাতে তোমরা সাময়িক খুশী বা আনন্দিত হতে পারো। কিন্তু তাতে যে ক্ষতিসমূহ রয়েছে তা সাময়িক খুশীর সামনে কিছুই নয়। নিজের শত্রুর সন্তানদের সম্পর্কে হুশিয়ার থাকবে। এটা কোন আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে, সে তার পূর্বপুরুষদের মত তোমাদের সঙ্গে অন্তরে শত্রুতা পোষণ করে। জাহেলী যুগে আমার সাথে কবীলা বকর বিন ওয়ায়েলের সাথে শত্রুতা ছিল। এ জন্য আমার কবর এমন স্থানে বানাবে যেখানে তারা হস্তক্ষেপ করতে না পারে। নচেত তারা প্রতিশোধের আবেগে

আমার কবর খুঁড়ে ফেলতে পারে এবং তোমরা তার বদলা নেওয়ার জন্য এমন কিছু করে ফেলতে পারো যা তোমাদের পরকাল বরবাদ করে ফেলবে।"

এতটুকুন বলে রাসূলের (সা) সেই সাহাবী ক্লান্ত হয়ে পড়লেন এবং নিঃশ্বাস ঠিক করার জন্য কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। অতপর তিনি কম্পিত হাতে একটি তীর বের করলেন এবং তা জ্যেষ্ঠ পুত্রের হাতে দিয়ে বললেন ঃ "তীরটি ভেঙ্গে ফেলো।"

সে তৎক্ষণাৎ ভেঙ্গে ফেললো। অতপর দুই তীর এক সঙ্গে দিলেন এবং বললেন ঃ "এ দু'টিও ভাঙ্গো।" সে খুব চেষ্টা করলো। কিন্তু ভাংতে পারলেন না। অভিজ্ঞ পিতা তারপর সকল পুত্রকে পুনরায় সম্বোধন করে বললেন, "তোমরা দেখলে যে, একটি তীর কিভাবে সহজে ভেঙ্গে গেল। কিন্তু যখন দু'টি তীর একত্রিত করা হলো তখন সমগ্র শক্তি ব্যয় করা সত্ত্বেও ভাঙ্গা গেল না। তোমরা যদি পরস্পর প্রেম-ভালোবাসা এবং ঐক্যবদ্ধ না থাকো এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও তাহলে তোমাদের প্রত্যেকের উদাহরণ হবে "এক তীরের" মত। এক তীরকে তো যে কেউ ভাঙ্গতে পারে। আর তোমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকো তাহলে কেউ তোমাদের ভাঙ্গতে বা ক্ষতি করতে সাহস পাবে না। স্মরণ রেখো, একতাতেই শক্তি ও বরকত নিহিত রয়েছে।"

এতটুকুন বলে স্নেহশীল নসীহতকারী পিতা একটি হেঁচকী দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উড়ন্ত রূহ দেহের খাঁচা থেকে বের হয়ে স্থায়ী জগতের দিকে যাত্রা করলো। মৃত্যুকালে নিজের পুত্রদেরকে এই সুন্দর শিক্ষনীয় ওসিয়তকারী সাহাবী ছিলেন হযরত কায়েস (রা) বিন আছেম মুনকারী তামীমী।

সাইয়েদুনা হযরত আবু আলী কায়েস (রা) বিন আছেম মুনকারী বিশ্বনবীর (সা) ইরশাদে বর্ণিত সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম সাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন ঃ খিয়ারুকুম ফিল জাহিলিয়াতি খিয়ারুকুম ফিল ইসলাম" অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে জাহেলী যুগে উচ্চ মর্যাদায় ছিল সে ইসলামেও বুলন্দ মরতবার হয়েছে।

হযরত কায়েস (রা) আরবের প্রখ্যাত কবীলা বনূ তামীমের শাখা বনূ মুনকারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ কায়েস (রা) বিন আছেম বিন খালিদ বিন মুনকার বিন উবায়েদ বিন মাকায়েস বিন আমর বিন কা'ব বিন সা'দ বিন যায়েদ বিন মানাত বিন তামীম।

কায়েস (রা) নিজের গোত্র বনূ মুনকারের সরদার ছিলেন এবং খুব বিত্ত বৈভব ও শান-শওকতের মানুষ ছিলেন। তাঁর অশ্বারোহণ, উদারতা ও

দানশীলতা এবং সঠিক মতের কথা সকলের মুখে মুখে ফিরতো। মানুষের পরস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ মেটানোর ক্ষেত্রে তাঁর বিরাট ভূমিকা ছিল। তাঁর গোত্রের সাথে বকর বিন ওয়ায়েলের পুরনো শত্রুতা ছিল এবং প্রায়ই তাদের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহ পর্যন্ত হতো। এই সব যুদ্ধে কায়েস (রা) সব সময় সামনে থাকতেন এবং নিজের যুদ্ধ কৌশল দিয়ে শত্রুকে পরাজিত করতেন।

কাব্য ও কবিত্বেও জ্ঞান রাখতেন এবং মনে যখন আবেগ সৃষ্টি হতো তখন অত্যন্ত সুন্দর কবিতা রচনা করে ফেলতেন। স্বভাবগত দিক থেকে যদিও তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ছিলেন তবুও একবার জাহেলিয়াতের জিদে নিজের এক নিষ্পাপ কন্যাকে জীবিত মাটিতে পুঁতে ফেলেছিলেন। এই কাজের জন্য সারা জীবন তিনি আফসোস করেছেন।

জাহেলী যুগে মদ্যপান সম্মানিতদের জন্য আবশ্যিক ব্যাপার ছিল। এ জন্য তিনিও এ কাজে লিপ্ত ছিলেন। মদ্য পানের সময় পিপার পর পিপা শেষ করে দিতেন। একবার মদ পান করে জ্ঞান পর্যন্ত হারিয়ে ফেললেন। এই অবস্থায় এমন এক কদর্য কাজ করলেন যা তাঁর মত একজন সম্মানিত কবীলা সরদারের পক্ষে মর্যাদাহীন ব্যাপার ছিল। জ্ঞান ফিরে এলে লোকজন তাঁর সেই কদর্য কাজের কথা জানালে তিনি লজ্জায় মুখ লুকিয়ে চলা ফেরা করতেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) লিখেছেন তিনি সেই দিন মদ্যপান থেকে চিরদিনের জন্য তাওবা করেন এবং এই কবিতা বলেন ঃ

"আমার নিকট মদ ভালো বস্তু ছিল। কিন্তু তাতো ধৈর্যশীল মানুষের চরিত্র ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহর কসম। আমি এখন তা সুস্থ অবস্থাতেও পান করবো না এবং অসুস্থ অবস্থায় ওষুধ হিসেবেও ব্যবহার করবো না।"

অতপর তিনি বাস্তবিকই জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজর (র) ইছাবাহতে হযরত কায়েসের এই বর্ণনা নকল করেছেন ঃ "আমি জাহেলী যুগে জ্ঞাতসারে কখনো কোন খারাব কাজ করিনি এবং কখনো কেউ আমার ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপের সুযোগ পায়নি। সে যুগে আমার বেশীর ভাগ সময় কেটেছে সামরিক অভিযানে অথবা মানুষের ঝগড়া-বিবাদ মেটাতে।"

পঞ্চম হিজরী থেকে এমনিতেই নবীর (সা) দরবারে আরবের প্রতিনিধি দল আগমন শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর এই প্রতিনিধি দলের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়। নবম হিজরীতেতো এত প্রতিনিধি দল এসেছিলেন যে, সেই বছরের নামই হয় "আমুল ওফুদ" বা প্রতিনিধি দলের বছর। সেই বছরই বনূ তামীমের প্রতিনিধি দলও খুব জাহেলী ঠাট বাটের সঙ্গে মদীনা

মুনাওয়ারা আসলো। এই প্রতিনিধি দল ৭০ অথবা ৮০ ব্যক্তি সমন্বয়ে গঠিত ছিল। তাদের মধ্যে হযরত কায়েস (রা) বিন আছেমও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বনূ তামীমের ধ্যান-ধারণা, বংশীয় অহমিকা ও তাকাববরী এবং জাহেলী ঔদ্ধত্যে পূর্ণ ছিল। তারা নিজেদের সঙ্গে নিজেদের গোত্রের শীর্ষস্থানীয় বক্তা ও কবি এনেছিলেন। যাতে মুসলমানদের ওপর নিজেদের ভাষণ ও কবিত্ব প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তারা জাহেলিয়াতের কারণে রাসূল (সা) এর শ্রেষ্ঠত্বের মান-মর্যাদার পরিমাপ করতে পারেনি। রাসূল (সা) এর পবিত্র বাসস্থানের বাইরে দাঁড়িয়ে তারা বেদুইনদের মত ডাকাডাকি শুরু করলো। "মুহাম্মাদ বাইরে এসো এবং আমাদের কথা শোনো" হুযূর (সা) তাদের সম্বোধন পসন্দ করেলন না। কিন্তু তাঁর দয়ার প্রকৃতি জবাবদিহি অথবা খারাব ব্যবহারে অগ্রসর হলো না। তিনি বাইরে এলেন এবং তাদের সঙ্গে হাসিমুখে সাক্ষাত করলেন। প্রতিনিধি দলের একজন নেতা আকরা' বিন হাবিস বললো, "মুহাম্মাদ! আমরা বনূ তামীমের মানুষ। আমাদের দাবী হলো যে, কোন কওম হসব-নসব, মান-মর্যাদা, ইলম ও হিকমত, দানশীলতা এবং অন্যান্য গুণে আমাদের বরাবর নয়। আমরা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আপনার ওপর গৌরব প্রকাশ করতে চাই।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এই শর্ত বড় অযৌক্তিক ছিল। কিন্তু হুযূর (সা) চাচ্ছিলেন যে, এই সব মানুষ কোন না কোনভাবে দাওয়াতে হক বুঝুক। সুতরাং তিনি বললেন, "আমি আত্ম গরিমা প্রকাশ এবং কবিত্ব ছড়ানোর জন্য প্রেরিত হইনি। কিন্তু তোমরা যদি সে জন্যই এসে থাকো তাহলে আমি তাও অবজ্ঞা করবো ন। তোমরা তোমাদের কামালিয়াত দেখাও। আমরা তার জবাব দিব।"

রাসূলের (সা) এই কথার পর তাদের অনলবর্ষী বক্তা আতারদ বিন হাজিব দাঁড়িয়ে একটি সুন্দর বক্তৃতা দিলেন এই বক্তৃতায় সে নিজের কবীলার গুণ গরিমা বর্ণনা করে দাবী করলো যে, কোন কওম বনূ তামীমের সমান নয়।

তার বক্তব্যের জবাব দানের জন্য হুযূরের (সা) নির্দেশে হযরত ছাবিত (রা) বিন কায়স দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর হামদের পর রাসূলে পাকের (সা) রহমতের শান ও মুহাজির এবং আনসারের ফযীলতের পক্ষে এমন সুন্দরভাবে বক্তৃতা করলেন যে, মজলিসে নীরবতা ছেয়ে গেল। বক্তৃতামালা শেষ হলো। তারপর এলো কবিতার পালা। বনূ তামীমের জাদু বর্ণনার কবি যবরকান বিন বদর নিজের কওমের শানে খুব শক্তিশালী একটি কাসীদাহ পাঠ করলো। এই কাসীদাহ উৎকর্ষের দিক দিয়ে চূড়ান্ত মানের ছিল। সে

বসলে হুযূর (সা) হযরত হাসসান বিন ছাবিতকে তার জবাব দানের নির্দেশ দিলেন। হযরত হাসসান (রা) ছিলেন দেশের ভাষার রাজা। তিনি রাসূলের (সা) ইঙ্গিত পেতেই যবরকানের আঙ্গিকেই এমন ফসীহ ও বালিগ কাব্য শুনালেন যে, তারা বলে উঠলো, "মুহাম্মাদ! আপনার বক্তা আমাদের বক্তার চেয়ে উত্তম এবং আপনার কবি আমাদের কবির থেকে আফযাল।" এই স্বীকৃতির পর সকলেই ইসলাম গ্রহণ করলেন। এ সময় হুযূর (সা) হযরত কায়েস (রা) বিন আছেমের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, "সেতো মরুচারীদের নেতা।"

আল্লামা ইবনে সা'দ (র) তাবকাতে লিখেছেন, কিছুদিন পর হুযূর (সা) হযরত কায়েসকে (রা) সাদাকা ওসূলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পন করেছিলেন।

আল্লামা ইবনে হিশাম (র) বর্ণনা করেছেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর হযরত কায়েস (রা) বিন আছেম হুনাইনের যুদ্ধে শরীক হন। কিন্তু এই মত সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। কারণ হুনাইনের যুদ্ধ মক্কা বিজয়ের অব্যাবহিত পর অষ্টম হিজরীর শওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। অথচ হযরত কাযেস (রা) নবম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। হতে পারে যে, তিনি তাবুকের যুদ্ধে (নবম হিজরী) অংশ নিয়েছিলেন। যা হোক, কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত কায়েস (রা) ইসলামের নিয়ামত লাভের পর প্রায়ই রহমতে আলমের (সা) খিদমতে হাযির হতেন এবং নবীর ফয়েয লাভ করতেন। মুসতাদরাকে হাকিমে আছে যে, আল্লাহ তাআলা হযরত কায়েসকে (রা) প্রচুর বিত্ত বৈভব দান করেছিলেন। শুধুমাত্র উট ও অন্যান্য পশুই ছিল হাজার হাজার। একবার তিনি নিজের ধন-সম্পদের ব্যাপারে হুযূরের (সা) নিকট কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি তোমার নিজের সম্পদ পসন্দ কর না প্রভুর? তিনি আরয করলেন, "নিজের সম্পদ হে আল্লাহর রাসূল (সা)।"

হুযূর (সা) বললেন, "তোমার মাল তো তাই যা খানা-পিনা ও পরিধান করে শেষ করে দাও অথবা হক পথে ব্যয় করে সমান করে ফেলো। নচেত ঐ সম্পদ তোমার প্রভুর।"

সুতরাং তিনি সেই সম্পদের বেশীরভাগই নিজের মৃত্যুর পূর্বেই শেষ করে দিয়েছিলেন এবং জাহেলী যুগে যে কন্যা হত্যা করেছিলেন তার কাফফারাও আদায় করেছিলেন। আগে থেকেই নম্র স্বভাবের মানুষ ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর এই গুণ আরো বেড়ে গিয়েছিল। আল্লামা ইবনে আসীর (র) লিখেছেন যে, একবার তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁর এক পুত্রকে হত্যা করে। লোকজন হত্যাকারীকে ধরে ফেলে এবং তাকে মশকে বেঁধে নিহতের লাশের সঙ্গে

হযরত কায়েসের (রা) নিকট নিয়ে এলো। তিনি অত্যন্ত ছবরের পরিচয় দিলেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্রকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "প্রাণাধিক চাচা! তুমি কতবড় খারাব কাজ করেছ। নিজের মুসলমান ভাইকে হত্যা করে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সা) নাফরমানী করেছ। সে তোমার চাচাতো ভাইও হতো। এ জন্য তুমি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর গুণাহও করেছ।"

এভাবে দীর্ঘক্ষণ যাবত তিনি তাকে নছীহত করলেন। অতপর অন্য পুত্রকে বললেন, "তার মশক খুলে দাও এবং নিজের ভাইয়ের কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করো।" নিহত পুত্রের মাতা শোকাভিভূত ছিল। তিনি তাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং নিজে খুনের রক্তপণ পরিশোধ করলেন।

হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে বসরা আবাদ হলো। এ সময় হযরত কায়েস (রা) মরুভূমির বাড়ী ত্যাগ করে বসরা চলে যান এবং সেখানেই স্থায়ী আবাস গড়ে তোলেন। সেখানেই তিনি ১৪ হিজরীর পর কোন এক সময় পরপারের ডাকে সাড়া দেন। সে সময় তাঁর ৩২ জন পুত্র জীবিত ছিল। তাহযীবুল কামালে উল্লেখ আছে যে, তাঁর দুই পুত্র হাকিম এবং আহনাফ তাঁর নিকট থেকে কতিপয় হাদীসও বর্ণনা করেছেন।

হযরত তামীম (রা) বিন আওস দারী

রহমতে আলম সারওয়ারে কাওনাইন (সা) মক্কা ভূমিকে বিদায় জানিয়ে ইয়াসরাবে শুভ পদার্পণ করলেন। এ সময় তিন হাজার বছরের প্রাচীন কিন্তু অবলুপ্ত শহরের ভাগ্য খুলে গেল। তার দরজা এবং প্রাচীর রিসালাতের নূরে ঝলমল করে উঠলো এবং সেই শহর ইয়াসরাব থেকে "মদীনাতুন নবী" হয়ে গেল।

মদীনা মুনাওয়ারায় শুভাগমনের কিছু দিন পর প্রিয় নবী (সা) সেই পবিত্র শহরে আল্লাহর ঘর তৈরীর ইচ্ছা করলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি নিজের মেযবান সাইয়েদুনা আবু আইউব আনসারীর (রা) বাড়ীর সামনের পতিত জমির একটি অংশ ঠিক করলেন। এই জমির মালিক ছিল বনূ নাজ্জারের দুই এতীম শিশু। তাদের নাম হলো হযরত সাহাল (রা) এবং সোহায়েল (রা) এই ভাগ্যবান শিশুদ্বয় এবং তাদের মা হুযূরের (সা) খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সা)। আমরা এই জমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আপনাকে দান করছি।" বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) তাঁদের কল্যাণময় আবেগে খুব খুশী হলেন। কিন্তু তিনি বললেন ঃ "আল্লাহতাআলা তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমি এই জমি বিনামূল্যে নিব না।" সুতরাং তাদের জমির মূল্য পৌনে চার তোলা স্বর্ণ আদায় করে দিলেন এবং জমি ঠিক করে মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করে দেওয়া হলো। মসজিদ নির্মাণকালে বিশ্ববাসী এক আশ্চর্য দৃশ্য অবলোকন করলো। তারা দেখলো রাজমিস্ত্রী ও মজুর হিসেবে সাহাবায়ে কিরাম (আনসার ও মুহাজির)-এর সঙ্গে স্বয়ং রাসূলে আকরামও (সা) শামিল ছিলেন। মজদুরের পোশাকে তিনি পাথর বহন করছিলেন এবং পবিত্র মুখ দিয়ে উচ্চারিত হচ্ছিল এই কবিতা ঃ

"হে আল্লাহ! পরকালের প্রতিদানই বড় প্রতিদান। বস্তুত তুমি আনসার ও মুহাজিরদের ওপর রহম কর।"

রিসালাত প্রদীপের পতঙ্গরা অত্যন্ত অনুনয়ের সঙ্গে হুযূরের (সা) নিকট অনুরোধ করে বলেছিলেন যে, তারা থাকতে তিনি যেন কষ্ট না করেন। কিন্তু হুযূর (সা) মুচকি হেসে কাজ অব্যাহত রাখেন। প্রিয় নবীকে (সা) ঘর্মাক্ত ও কাদা মাটিতে একাকার দেখে সাহাবায়ে কিরামের (রা) অন্তর বিদীর্ণ হয়ে

যেতো। কিন্তু তাঁরা মজবুর ছিলেন। হুযূরকে (সা) এই অবস্থায় দেখে তাঁরা অত্যন্ত উৎসাহভরে কবিতা আবৃত্তি করতে করতে মসজিদ নির্মাণের কাজে মশগুল হয়ে যেতেন। কবিতাটির সারমর্ম হলো ঃ

"আমরা যদি বসে থাকি এবং রাসূলে আকরাম (সা) কাজ করেন তাহলে তা হবে কঠিন গোমরাহীমূলক কাজ।"

মোট কথা এইভাবে কয়েক মাসের মধ্যে বিশ্বের এই পবিত্রতম মসজিদ নির্মাণের কাজ শেষ হলো। এই মসজিদ সব ধরনের লৌকিকতামুক্ত ও খুব সাদামাঠা করে বানানো হয়েছিল। কাঁচা ইট এবং অভাঙ্গা পাথরের প্রাচীর, খোরমা বৃক্ষের স্তম্ভ, খেজুর পাতার ছাপ্পর এবং মাটিতে পাথরকুচির বিছানা দিয়ে এ মসজিদ বানানো হয়। কিন্তু যেসব পবিত্র হাত এই মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন এবং যাঁদের সিজদায় তা পূণ্য হয়েছিল তাঁদের মর্যাদার সামনে আসমানের নীচের সকলের মর্যাদা খুব তুচ্ছ ছিল। বছরের পর বছর পর্যন্ত মসজিদে নববী প্রথম দিনের মত সাদা-সিধেভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এমনকি রাতে আলোরও কোন ব্যবস্থা ছিল না এবং লোকজন চাঁদ অথবা তারার আলোয় নামায পড়তেন। অবশ্য কখনো কখনো সাহাবায়ে কিরাম খেজুরের ডালের মশাল জ্বালিয়ে আসতেন।

নবম হিজরীর ঘটনা। রহমতে আলম (সা) এক রাতে নামাযের জন্য মসজিদে তাশরীফ রাখলেন। তিনি দেখলেন যে, মসজিদের স্থানে স্থানে লণ্ঠন বাতি লটকানো এবং তার আলোয় মসজিদ আলোকিত হয়ে আছে। হুযূরের (সা) পবিত্র চেহারায় হাসি ফুটে উঠলো এবং তিনি সাহাবায়ে কিরামকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "আজ মসজিদে আলো কে জ্বালিয়েছে?" তাঁরা একজন অত্যন্ত পবিত্র আকৃতির এবং হাসিখুশী মুখ এক ব্যক্তির দিকে ইশারা করলেন। প্রিয় নবী (সা) তাঁর কাজে খুব খুশী প্রকাশ করলেন। অনেক দোয়া করলেন এবং বললেন, আমার যদি কোন (অবিবাহিত) মেয়ে থাকতো তাহলে আমি তাঁর বিয়ে এই ব্যক্তির (আলোদানকারী) সঙ্গে দিতাম। সে সময় মসজিদে হুযূরের (সা) চাচাতো ভাই নওফিল (রা) বিন হারিছ বিন আবদুল মুত্তালিবও উপস্থিত ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সা)। আমার বিধবা মেয়ে উম্মুল মুগীরা আছে। আপনি চাইলে তার বিয়ে এই ব্যক্তির সঙ্গে দিতে পারেন।" হুযূর (সা) তাঁর প্রস্তাব মেনে নিলেন এবং সেই মজলিসেই সেই ব্যক্তির সঙ্গে উম্মুল মুগীরার বিয়ে দিয়ে দিলেন।

এই ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম মসজিদে নববীতে আলোর ব্যবস্থা এবং রহমতে আলমকে (সা) এত খুশী করেছিলেন যে, তিনি শুধুমাত্র তাঁকে নিজের দোয়াই

দেননি বরং নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিয়েও তাঁর সঙ্গে দিয়েছিলেন। তাঁর নাম ছিল সাইয়েদুনা হযরত তামীম (রা) বিন আওস দারী)।

হযরত তামীম (রা) বিন আওস (বিন খারেজাহ বিন সুদ বিন খুযাইমা বিন জিরা' বিন আদী বিন আদ-দার) সিরিয়ার বাসিন্দা এবং খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বংশীয় সম্পর্ক ছিল মশহুর কবীলা লাখামের সঙ্গে। তাঁর পিতামহের মধ্যে একজন ক্ষমতাবান ব্যক্তির নাম ছিল দার। তাঁর নিসবতেই তিনি দারী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে অত্যন্ত নেক ও সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। মক্কা ও মদীনার মানুষ বাণিজ্য ব্যাপদেশে প্রায়ই তাঁর দেশে গমন করতেন। তাদের নিকট থেকে হাদিয়ে আকরাম (সা) এবং তাঁর দাওয়াতের অবস্থা শুনে তাঁর অন্তর দাম্রিয়ে হক (সা) এবং তাঁর দাওয়াতের সত্যতার সাক্ষ্য দিল এবং তিনি হকের প্রতি ঝুঁকে পড়লেন। এ সত্ত্বেও তিনি একটি সময় পর্যন্ত পিতৃভূমি থেকে বাইরে বেরুনোর সুযোগ পেলেন না। নবম হিজরীতে নিজের ভাই নঈমের সঙ্গে মদীনা এলেন এবং রহমতে আলমের (সা) খিদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করলেন। বিলম্বে ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও তিনি মহান মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। আল্লামা ইবনে সা'দ (র) বর্ণনা করেছেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর হযরত তামীম (রা) মদীনা মুনাওয়ারাতেই স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান।

ঐতিহাসিক ইবনে কাসীর (র) লিখেছেন, সিরিয়া থেকে মদীনা আগমনের সময় হযরত তামীম (রা) কিছু লণ্ঠন এবং তা জ্বালানোর তেল সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি লণ্ঠনগুলোতে তেল ভরে মসজিদে লটকে দেন এবং সন্ধ্যায় তা জ্বালান। তাঁর এই কাজ প্রিয় নবীর (সা) খুশীর কারণ হলো এবং তিনি হুযূরের সীমাহীন স্নেহের পাত্র হয়ে গেলেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তামীম (রা) দারীই প্রথম ব্যক্তি যিনি মসজিদ আলোকিত করার কাজ শুরু করেন। (ইবনে মাজাহ)।

আল্লামা ইবনে সা'দ (র) এবং ইবনে কাসীর (র) বর্ণনা করেছেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর হযরত তামীম (রা) সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু তারা সেই সকল যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলেননি। বস্তুত হযরত তামীম (রা) যে সময় ঈমান আনেন তখন তাবুকের যুদ্ধ ছাড়া রাসূলের (সা) সকল যুদ্ধই অতীত হয়ে গেছে। এই জন্য এটা বলাই সঠিক হবে যে, তিনি তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলেন। নবম হিজরীতে কতিপয় সারইয়াও (যে সব যুদ্ধে রাসূল (সা) স্বশরীরে উপস্থিত হননি) সংঘটিত হয়েছিল। হতে

পারে, হযরত তামীম (রা) সেই সকল যুদ্ধের একটি অথবা কতিপয় যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

নবম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ থেকে শুরু করে প্রিয় নবীর (সা) ইন্তেকাল (১১ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাস) পর্যন্ত হযরত তামীম (রা) নবীর (সা) সুহবতে থেকে খুব ফয়েয হাসিল করেন এবং কুরআনে হাকীমের আলেম হিসেবে পরিগণিত হতে থাকেন। আল্লামা ইবনে সা'দ (র) বলেছেন, রাসূলের (সা) যুগে যে সকল সাহাবী কুরআন একত্রিত করেছিলেন হযরত তামীমও (রা) তাঁদের মধ্যে শামিল ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যেহেতু তিনি খৃষ্টান ছিলেন সেহেতু ইঞ্জীল সম্পর্কেও তিনি পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) তাঁর জীবন নির্বাহের জন্য সিরিয়ার একটি গ্রাম আইনুনকে জায়গীর হিসেবে দান করেছিলেন এবং তার ফরমানও লিখিত আকারে দিয়েছিলেন। সিরিয়া বিজয়ের অনেক পূর্বে তার জমি থেকে জায়গীর হিসেবে দান করা নবীর (সা) অন্যতম বিশেষত্ব ছিল। কতিপয় মুহাদ্দিস তাকে নবীর (সা) মু'জিযার মধ্যে পরিগণিত করেছেন। হযরত তামীম (রা) শুধুমাত্র রাসূলের (সা) যুগেই নয় বরং হযরত সিদ্দীকে আকবার (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা) এবং হযরত ওসমান গণীর (রা) পূর্ণ খিলাফতকালেও মদীনাতেই মুকীম ছিলেন। সাইয়েদুনা হযরত ওসমানের (রা) শাহাদাতের উপর মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তা থেকে বাঁচার জন্য অন্তরের ওপর পাথর চাপা দিয়ে প্রিয়নবীর প্রিয় ভূমিকে বিদায় জানিয়ে স্বদেশ ভূমি সিরিয়া চলে গেলেন। সিরিয়ায় তিনি জীবনের শেষ পর্যন্ত নির্জনত্বে কাটালেন। তাঁর দিন-রাত আল্লাহর বন্দেগীতে কাটতো এবং জীবন ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে। হাফেজ ইবনে হাজর (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত তামীম (রা) ৪০ হিজরীতে আখিরাতের সফরে যাত্রা করেন এবং হিবরুন নামক এক গ্রামে তাঁর লাশ দাফন করা হয়। তাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। রোকেয়া নাম্নী শুধুমাত্র একটি কন্যা ছিল। তার নিসবতেই তাঁর কুনিয়ত ছিল আবু রোকেয়া।

সাইয়েদুনা হযরত তামীমদারী (রা) অন্যতম জ্ঞানী ও মর্যাদাপূর্ণ সাহাবী ছিলেন। সংসার বিরাগ, রাসূল প্রেম, আল্লাহভীতি, ইবাদাত ও আধ্যাত্মিক সাধনা এবং কুরআনের প্রতি গভীর আকর্ষণ তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। যেহেতু তিনি রাসূলের যুগের শেষে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ জন্য তাঁর থেকে হাদীস খুব কমই বর্ণিত হয়েছে। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা নিয়ে মত বিরোধ আছে। তবুও এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, হাদীস বর্ণনার দিক থেকে তিনি সাহাবীদের পঞ্চম তবকাভুক্ত। অর্থাৎ যে সকল সাহাবীর বর্ণিত

হাদীসের সংখ্যা ৪০ অথবা ৪০–এর কম তিনি সেই পর্যায়ভুক্ত। তাঁর মহিমা ও মর্যাদার ব্যাপারটি এই কথা থেকেই পরিমাপ করা যায় যে, হযরত আনাস (রা) বিন মালিক, আবদুল্লাহ (রা) বিন ওমর, আবদুল্লাহ (রা) বিন আব্বাস (রা) এবং আবু হোরায়রার (রা) মত উম্মতের স্তম্ভগণ তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাছাড়াও অনেক মহান তাবেয়ীগণও তাঁর নিকট থেকে ফয়েয লাভ করেছেন এবং হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন। সহীহ মুসলিমের মশহুর হাদীস আদদীনু নসীহাতু (দ্বীন নসিহত) হযরত তামীম (রা) দারী থেকেই বর্ণিত।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত তামীম (রা) ইহুদী ও নাসারার আলেম হিসেবে পরিগণিত ছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার (র) তাহযীবুত তাহযীবে লিখেছেন, তিনি দুই কিতাব (আধুনিক ও প্রাচীন যুগের) মান্যকারী ছিলেন। এ জন্য ইহুদী ও নাসারা উভয়েই তাঁকে নিজেদের আলেমের মধ্যে পরিগণিত করতেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি সকল শক্তি কুরআন অধ্যয়ন ও তা হৃদয়ঙ্গম করার কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। এমনকি কুরআনী জ্ঞানের সমুদ্র হয়ে গিয়েছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজর (র) বলেন, হযরত তামীম (রা) দারী ইঞ্জিল ও কুরআন উভয়েরই আলেম ছিলেন। কুরআনের প্রতি তাঁর সীমাহীন আকর্ষণ ছিল। নিজের নামাযে এত বেশী কুরআন তিলাওয়াত করতেন যে, লোকজনের তাতে ঈর্ষা হতো। হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁর ইলম ও ফযীলতের খুব সম্মান করতেন। তিনি যখন তারাবীর নামায জামায়াতের সঙ্গে পড়ার বন্দোবস্ত করেন তখন মহিলাদের ইমামতের জন্য হযরত তামীমকে (রা) মনোনীত করেছিলেন।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র), হাফেজ ইবনে হাজর (র), আল্লামা ইবনে আসীর (র) এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় চরিতকারগণ হযরত তামীমের (রা) ইবাদাত ও আধ্যাত্মিক সাধনার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি সময়ের বেশীর ভাগই আল্লাহর ইবাদাতে কাটাতেন এবং অধিকাংশ পুরো রাতই নামায পড়তেন। তাহাজ্জুদের নামায খুব কঠোরতার সঙ্গে পড়তেন এবং আল্লাহর ভয়ে সকল সময় ভীত সন্ত্রস্ত থাকতেন। কোন কোন সময় নামায পড়তে পড়তে তিনি কাঁদতেন। হাফেজ ইবনে হাজর (র) ইসাবাতে লিখেছেন; হযরত তামীম (রা) এক রাতে নামায পড়ছিলেন। নামাযের মধ্যে যখন এই আয়াত পড়লেন ঃ

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۔

(الجاثيه : ٢١)

"যে সব লোক অন্যায় পাপ কাজ করেছে তারা কি এ কথা মনে করে নিয়েছে যে, আমরা তাদেরকে এবং ঈমান গ্রহণকারী ও নেক-আমলকারীদেরকে একই রকম করে দেব, তাদের জীবন ও মৃত্যু একই রকম হয়ে যাবে? তারা এই যে ফায়সালা করছে তা অত্যন্ত খারাব।" তখন কেঁদে যার যার হয়ে যেতে লাগলেন এবং সকাল পর্যন্ত এই আয়াত দোহরাতে থাকলেন।

আল্লাহ তাআলা হযরত তামীমকে (রা) শান্ত স্বভাব দান করেছিলেন। যদিও প্রিয় নবীর (সা) নিকট থেকে ফায়েয লাভের বেশী সুযোগ তাঁর হয়নি তবুও আড়াই বছর সময়েই তিনি এমন এক উদাহরণ যোগ্য মরদে মুমিন হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজে নবীর (সা) আদর্শের ঝলক পরিস্ফুট হয়ে উঠতো। একবার রহমতে আলম (সা) থেকে বাহ্যাড়ম্বরের নিন্দা শুনলেন। তারপর হতে আজীবন যথাসম্ভব তাঁর ইবাদাতের কথা যাতে লোকজনের নিকট প্রকাশ না পায় সেই চেষ্টা করতেন। হাফেজ ইবনে হাজার (র) বর্ণনা করেছেন যে, একবার জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আপনি রাতে কত রাকাআত নামায পড়ে থাকেন? হযরত তামীম (রা) তার এই গোয়েন্দাগিরীতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, আমি রাতে একাকী (মানুষের দৃষ্টির অগোচরে) এক রাকাআত নামায পড়াকে সেই নামায থেকে উত্তম মনে করি যে নামায সারারাত ধরে পড়া হয় এবং সকালে সে ব্যাপারে মানুষের মধ্যে বলে বেড়ানো হয়।

একবার তাঁর শাগরেদ বা শিষ্য (মশহুর তাবেয়ী) হযরত রূহ বিন যামবা' (রা) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে গেলেন। তিনি দেখলেন যে, হযরত তামীম (রা) ঘোড়ার জন্য যব পরিষ্কার করছেন এবং বাড়ীর অন্যান্যরা তাঁর পাশে বসে রয়েছেন। হযরত রূহ (র) আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আবু রোকেয়া! বাড়ীর আর কেউ কি এ কাজ করতে পারে না?" হযরত তামীম বললেন, "ভাই, করতে তো পারে। কিন্তু তাতে আমি কোন সওয়াব পাবো না। কেননা, আমি রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছি যে, যখন কোন মুসলমান নিজের ঘোড়ার জন্য খাবার পরিষ্কার করে এবং তা তাকে খাওয়ায় তাহলে সে প্রত্যেক দানার বিনিময়ে সওয়াব পায়।"

হযরত তামীম (রা) আল্লাহর হকের সঙ্গে সঙ্গে বান্দাহর হকেরও পুরোপুরি খেয়াল রাখতেন এবং সব সময় সাইয়েদুল মুরসালীনের সেই পবিত্র

ইরশাদ সামনে রাখতেন যাতে তিনি বলেছিলেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ তিনি যিনি আল্লাহর সৃষ্টির উপকার করেন। হাফেজ ইবনে হাজর (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে একবার হাররাহ নামক স্থানের এক জায়গায় আগুন জ্বলে উঠলো। সেই আগুনের বিস্তৃতি ঘটলে খেজুরের বাগানের ক্ষতি হওয়ার আশংকা ছিল। হযরত ওমর (রা) হযরত তামীমের (রা) নিকট তাশরীফ নিলেন এবং তাঁকে সেই ঘটনার খবর দিলেন। হযরত তামীম (রা) তৎক্ষণাৎ হাররাহ গিয়ে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে আগুন নিভিয়ে দিলেন।

মানুষের কল্যাণ করার আবেগ তাঁর মধ্যে এ ধরনের ছিল। এই ভিত্তিতে হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁকে "খাইরু আহলিল মদীনাহ" এই খিতাব দিয়ে রেখেছিলেন এবং তাঁকে খুব সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো। তিনি মসজিদে আলো দেওয়ার যে সুন্দর কাজের সূচনা করেছিলেন তা চিরকাল তাঁর কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। সহীহ বুখারী
২। সহীহ মুসলিম
৩। মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক
৪। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল
৫। মুসনাদে আবু দাউদ
৬। জামে' তিরমিযী
৭। আল-মাগাযী-ওয়াকেদী (র)
৮। ফুতুহুশ শাম-ওয়াকেদী (র)
৯। আত-তাবাকাতুল কুবরা-ইবনে সা'দ (র)
১০। তারীখুল উমামুল মুলূক-তাবারী (র)
১১। আল-কামিল -ইবনে আসীর (র)
১২। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া -হাফেজ ইবনে কাসীর (র)
১৩। আস-সিয়ারুন নবুবিয়াহ - ইবনে হিশাম (র)
১৪। উসুদুল গাবাহ - ইবনে আসীর (র)
১৫। ফতুহুল বুলদান - বালাযুরী (র)
১৬। আনসাবুল আশরাফ - বালাযুরী (র)
১৭। আল ইসতিয়াব ফী মা'রিফাতিল আসহাব
-হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র)
১৮। আল-ইসাবাহ ফী তামীযিস সাহাবাহ
-হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র)
১৯। তাহযীবুত তাহযীব - হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র)
২০। আখবারুত তাওয়াল - আবু হানীফা দিনূরী
২১। দায়েরায়ে মাআরিফে ইসলামীয়া -পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়
২২। তরজুমানুস সুন্নাহ-মওলানা বদরে আলম মিরাঠি (র)
২৩। হায়াতুস সাহাবাহ -মওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ কান্ধালুভী (র)
২৪। মিশকাতুল মাসাবীহ
- শেখ ওয়ালিউদ্দিন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ খতীব উমরী

২৫। সীরাতে কুবরা – মওলানা আবুল কাসেম রফীক দিলাওয়ারী (র)

২৬। আল–মাশাহিদ – হাকিম রহমান আলী খান

২৭। মুহাজিরীন (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড)
– শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নদবী (র)

২৮। সিয়ারে আনসার (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড)
– মাওলানা সাঈদ আনসারী মরহুম

২৯। আল ফারুক– শিবলী নু'মানী

৩০। আহলি কিতাব সাহাবা ওয়া তাবেয়ীন
– হাফেজ মুজিবুল্লাহ নদবী (র)

৩১। সিয়ারুস সাহাবা (সপ্তম খন্ড) – শাহ মুইনুদ্দীন আহমদ নদবী (র)

৩২। উসওয়ায়ে সাহাবা (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড)
– মওলানা আবদুস সালাম নদবী (র)

৩৩। তারীখে ইসলাম – মুনশী গোলাম কাদের ফসীহ মরহুম

৩৪। তারীখে ইসলাম – শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নদবী (র)

৩৫। রাহ্‌মাতুললিল আলামীন
– কাজী মুহাম্মদ সোলায়মান মানসুরপুরী (র)

–০–

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- **তাফহীমুল কুরআন (১-১৯ খণ্ড)**
  –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- **তরজমায়ে কুরআন মজীদ (এক খণ্ডে)**
  –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- **তাদাব্বুরে কুরআন (১-২ খণ্ড)**
  –মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী
- **শব্দে শব্দে আল কুরআন (১-১ ৪খণ্ড)**
  –মাওলানা মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান
- **সহীহ আল বুখারী (১-৬ খণ্ড)**
  –আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী র.
- **সুনান ইবনে মাজা (১-৪ খণ্ড)**
  –আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা র.
- **শারহু মাআনিল আছার (তাহাবী শরীফ) (১-২ খণ্ড)**
  –ইমাম আবু জাফর আহমাদ আত-তাহাবী র.
- **সীরাতে সরওয়ারে আলম (১-২ খণ্ড)**
  –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- **মহানবীর সীরাত কোষ**
  –খান মোসলেহ উদ্দীন আহমদ
- **বিশ্বনবীর মোযেজা**
  –ওয়ালিদ আল আযমী
- **হযরত আবু বকর রা.**
  –মুহাম্মদ হুসাইন হাইকল
- **শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দা'য়ী ইলাল্লাহ**
  –মুহাম্মদ নূরুজ্জমান
- **মাওলানা মওদূদীকে যেমন দেখেছি**
  –অধ্যাপক গোলাম আযম
- **মুন্সী মেহেরউল্লা ঃ জীবন ও কর্ম**
  –নাসির হেলাল

বিশ্ব নবীর সাহাবী

৪

তালিবুল হাশেমী

বিশ্ব নবীর সাহাবী

৪র্থ খণ্ড

তালিবুল হাশেমী

অনুবাদ ঃ আবদুল কাদের

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা-চট্টগ্রাম-খুলনা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১৫১৯১, ৯৩৫৯৫৫২
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ২০৭

২য় প্রকাশ

রজব	১৪৩০
আষাঢ়	১৪১৬
জুলাই	২০০৯

বিনিময় : ১৮৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

خير البشرك تيس جان نثار -এর বাংলা অনুবাদ
BISHA NABIR SAHABI-4th Volume by Talibul Hashemy.
Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane,
Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 185.00 Only.

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। 'বিশ্বনবীর সাহাবী'র চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হলো। এক বছর আগেই খণ্ডটি প্রকাশিত হওয়ার নির্ধারিত কর্মসূচী ছিল। কাগজ সংকটের কারণে প্রকাশে এই বিলম্ব ঘটলো। এ ব্যাপারে আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃপক্ষ অসহায় ছিলেন। আশা করি, পাঠকবর্গ বিষয়টি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

'বিশ্বনবীর সাহবী'র চতুর্থ খণ্ডে ৩০জন সাহাবীর জীবনী স্থান পেয়েছে। এই সাহাবীদের জীবনীও আমাদের জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অনুকরণীয় আদর্শ। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাদের জীবনী থেকে যথার্থ শিক্ষা গ্রহণের তাওফিক প্রদান করুন, এই মুনাজাতই আমরা করি।

অনুবাদকের ক্ষেত্রে এবং মুদ্রণজনিত কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সহৃদয় পাঠকবর্গ অবশ্যই আমাদের গোচরীভূত করবেন। আমরা পরবর্তীতে তা শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করবো। আল্লাহ পাক আমাদের এই প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

ঢাকা, ৩রা মাঘ, ১৪০১ সাল।
১৪ই শাবান, ১৪১৫ হিজরী।
১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯৫ সন।

বিনয়াবনত
আবদুল কাদের

সূচীপত্র

১। হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছা ৯
২। হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়াম ২৮
৩। হযরত মিকদাদ (রা) বিন আমর (আল আসওয়াদ) ৪৮
৪। হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়ের ৬২
৫। হযরত আবু যার গিফারী (রা) ৭৪
৬। হযরত সালমান ফারসী (রা) ৯২
৭। হযরত ইবনে উম্মে আবদ (রা) ফকিহুল উম্মাত ১০৭
৮। হযরত হুজায়ফা (রা) ইবনুল ইয়ামান—"সাহিবুস সির" ১২৫
৯। হযরত খাব্বাব (রা) বিন আরাত ১৩৯
১০। হযরত উতবা (রা) বিন গাযওয়ান ১৪৯
১১। হযরত উসমান (রা) বিন মাজউন ১৬২
১২। হযরত সোহায়েব রুমী (রা) ১৭৪
১৩। হযরত আবু আবদুল্লাহ সালেম (রা) ১৮২
১৪। হযরত তোফায়েল জুন্নুর (রা) ১৮৯
১৫। হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজ ১৯৮
১৬। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) ২১৪
১৭। হযরত খোবায়েব আনসারী (রা) ২৩৬
১৮। হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়ের আশহালী ২৫১
১৯। হযরত মুছান্না (রা) বিন হারিছা শাইবানী ২৬৭
২০। হযরত জিরার (রা) বিন আযওয়ার আসাদী ২৯৩
২১। হযরত আদি (রা) বিন হাতেম তাই ৩১০
২২। হযরত জারির (রা) বিন আবদুল্লাহ আল বাজলী ৩২০
২৩। হযরত সাখার (রা) বিন হারব—কুরাইশ সেনাপতি ৩৩৫
২৪। হযরত সাঈদ (রা) বিন আমের ৩৬৪
২৫। হযরত সোহায়েল (রা) বিন আমর ৩৭১
২৬। হযরত ছাবিত (রা) বিন কায়েস আনসারী ৩৮৮
২৭। হযরত উমায়ের (রা) বিন সায়াদ ৩৯৭
২৮। হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়া জুমরী ৪০৬
২৯। হযরত আবু তালহা যায়েদ (রা) বিন সাহাল আনসারী ৪১৯
৩০। হযরত হারিছ (রা) বিন রবয়ী ৪৩১
৩১। গ্রন্থপঞ্জী ৪৪১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছা

রাসূলের (সা) ইন্তেকালের বেশ কিছু বছর পরের ঘটনা। একদিন ফারুকে আ'জমের জালিলুল কদর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রা) মসজিদে নববীর এক কোণে একজন যুবককে দেখলেন। তার কপাল সৌভাগ্যের আলোয় এমনভাবে ঝলমল করছিল যে, বার্ধক্যপীড়িত আবদুল্লাহ'রও তার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হলো। পাশেই বসা ছিলেন আবদুল্লাহ বিন দিনার। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "এই যুবকটি কে? হায় সে যদি আমার নিকট আসতো।"

এক ব্যক্তি বললেন, "আবু আবদুর রহমান! আপনি কি তাকে চিনেন না। সে হলো যায়েদের (রা) পুত্র মুহাম্মাদ (র) বিন উসামা (রা)। "হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন ওমর এই কথা শুনে শ্রদ্ধায় মাথা নত করলেন এবং হাত দিয়ে মাটি তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগলেন। অতপর বললেন, "রাসূলুল্লাহ (সা) যদি তাঁকে দেখতেন তাহলে (তার পিতা ও দাদার মত) তাকেও ভাল বাসতেন।"

একথাগুলো বলতে বলতে তাঁর গলার স্বর ধরে এলো এবং চোখ দিয়ে অবলীলাক্রমে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো, সে সময় মুহাম্মাদের (র) দাদা যায়েদ (রা) বিন হারিছার সঙ্গে সাইয়েদেনা মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ'র (সা) ভালবাসা এবং যায়েদ (রা) বিন হারিছার নিজের প্রভুর প্রতি গভীর সম্পর্কের কথা তাঁর স্মরণ হলো। তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনিই ছিলেন যায়েদ (রা) বিন হারিছা। যিনি প্রিয় নবীকে (সা) ভাল বাসতেন এবং প্রিয় নবীর (সা) নিকট তিনিও ছিলেন অত্যন্ত প্রিয়। তাঁর জীবনের অসংখ্য দিন-রাত রহমতে আলমের (সা) খিদমতে অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁর প্রসঙ্গে হুজুর (সা) বলেছিলেন ঃ "আমি যায়েদের উত্তরাধিকারী এবং যায়েদ আমার উত্তরাধিকারী।"

তিনি এক সময় রাসূলের (সা) পুত্র [ইবনে মুহাম্মাদ (সা)] নামে মশহুর ছিলেন। এ জন্যই তাঁর সন্তান-সন্ততি দেখে বড় বড় মর্যাদাবান সাহাবী (রা) পর্যন্ত অস্থির হয়ে পড়তেন এবং রাসূলের পবিত্র যুগের কথা তাঁদের স্মরণ হতো। হযরত যায়েদ (রা) নিজের সকল কিছু প্রিয় নবীর (সা) ভালবাসায় উৎসর্গ করেছিলেন।

ইয়েমেনের একটি সম্ভ্রান্ত কবিলা বনু কাজায়া'র (বনু কালাব) সরদার হারিছা বিন শারাহিলকে আল্লাহ তায়ালা প্রভূত নিয়ামত দিয়ে অভিষিক্ত

করেছিলেন। তার গোত্রের বনু মায়ানের এক নেক স্বভাব মহিলা সা'দা বিনতে ছালাবা তার সহধর্মীনি ছিলেন। কয়েকটি সন্তানও তাকে দেয়া হয়েছিল এবং ধনসম্পদেরও কোন কমতি ছিল না। স্বামী-স্ত্রী এবং তিন সন্তান আসমা, জাবালা এবং যায়েদ সমন্বয়ে গঠিত এই ছোট পরিবার হাসি-খুশীতে দিন অতিবাহিত করছিল। হঠাৎ করে বাতাসের গতি পরিবর্তিত হয়ে গেল। সা'দা একবার নিজের ৮ বছরের পুত্র যায়েদকে সঙ্গে নিয়ে এ কাফেলার সহযাত্রী হয়ে নিজের মাতা-পিতার বাড়ী যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে বনি কাইন বিন জাসারের লোকজন কাফেলার ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। মাল ও সামান ছাড়া তারা সা'দার কলিজার টুকরাকে ছিনিয়ে নিয়ে গায়েব হয়ে যায়। নিজের নয়নমণিকে এভাবে ছিনিয়ে নেয়ায় হতভাগী মায়ের দুনিয়া অন্ধকার হয়ে আসে। তিনি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর কান্না ও ফরিয়াদে আসমান এবং যমীনের কলিজা ফেটে যাচ্ছিল। (অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী) হযরত যায়েদকে (রা) অপহরণের সময় তাঁর মাতা সা'দা ওফাত পেয়েছিলেন। তিনি দুই পুত্র জাবালা এবং যায়েদ ও কন্যা আসমাকে সাথে নিয়ে নাইওর গিয়েছিলেন। সা'দার মৃত্যু ঘটলে হারিছা আসমা এবং জাবালাকে নিজের নিকট নিয়ে যান। কিন্তু যায়েদ নানার কাছেই রয়ে যান। কিছুদিন পর বনু ফাযারাহর লোকজন তায় গোত্রের ওপর অতর্কিতে হামলা চালায় এবং মাল আসবাব এবং যায়েদ (রা) সহ লোকজনকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। হারিছা যখন প্রাণাধিক পুত্রের অপহরণের খবর পেলেন তখন শোকে দুঃখে পাগল হয়ে গেলেন। গ্রামে গ্রামে এবং অলিতে গলিতে যায়েদ যায়েদ বলে ডেকে ফিরলেন। মরুভূমি, জঙ্গল ও পাহাড় সকল স্থানেই তন্নতন্ন করে খুঁজলেন। কিন্তু যায়েদের কোন সন্ধান পেলেন না। পুত্র থেকে বিচ্ছিন্ন পাগল পিতা জীব জন্তু, বৃক্ষ ও পাথর সবার নিকটই পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করতেন। উত্তপ্ত লু হাওয়া এবং ভোরের সমীরণের নিকটও তার এই আশা ছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ওয়াস্তে তার নয়নমণির খবর এনে দেয়। পুত্রের বিচ্ছিন্নতার কথা তার জপমালা হয়ে গিয়েছিল। তিনি যখন অপহৃত পুত্রের জন্য ক্রন্দন করতেন তখন শুধু বন্ধুরাই নয় শত্রুও কেঁদে দিতো।

"আমি যায়েদের জন্য কেঁদে কেটে সারা হলাম। কিন্তু জানি না সে কোথায় গেছে। জানি না, সে জীবিত আছে কিনা। জীবিত থাকার আশার আলো জ্বালিয়ে রাখবো কিনা। না সে মৃত্যুর পেয়ালা পান করেছে। খোদার কসম! আমি বার বার জিজ্ঞেস করেছি। তা সত্ত্বেও আমি জানি না যে তুমি নরম যমীনের আস্তরণে ডুবে গেছ কিনা অথবা পাহাড় তোমাকে গিলে ফেলেছে। হায়! আমি যদি জানতে পেতাম যে তোমার প্রত্যাবর্তন কখনো সম্ভব। (তুমি

কি জানো যে) তোমার প্রত্যাবর্তনে আমার দুনিয়া আবাদ হবে। সূর্যোদয় আমাকে তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সূর্যাস্ত পুনরায় তার কথা জীবন্ত করে তোলে। বসন্তের সমীরণ তার বিচ্ছিন্নতার আগুন ভড়কে দেয়। আহ! আমি কত দুঃখে নিমজ্জিত হয়েছি। হে আমার পুত্র! আমি তোমার সন্ধানে দুনিয়ার কোণে কোণে ফিরবো। তোমার সন্ধানে উট ক্লান্ত হয়ে পড়লেও আমি ক্লান্ত হবো না। অথবা আমি যদি মারাও যাই। প্রত্যেক মানুষই মরণশীল। যদিও আশার মরীচিকা তাকে ধোঁকা দিয়ে চলেছে। আমি কায়েস এবং ওমরকে ওসিয়ত করছি। অতপর ইয়াযিদকে [ইয়াযিদ ও জাবালা যায়েদের(রা) সতালো ভাই ছিলেন] এবং তারপর জাবালাকে। ওসিয়তটি হলো তারা যেন যায়েদের সন্ধান অব্যাহত রাখে।" অসংখ্য রাত ও দিন এভাবেই কেটে গেল।

অন্যদিকে হারিছা বিন শারাহিলের অপহৃত পুত্রের জন্য আল্লাহর কুদরত বিরাট মর্যাদা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। এই মর্যাদাও এমন যে তাতে ফেরেশতারাও ঈর্ষা করতো।

অপহরণকারীরা যায়েদকে (রা) স্নেহময়ী মাতার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ওকাযের বাজারে নিয়ে যায়। সেখানে উম্মুল মু'মিনীন খাদিজাতুল কুবরার (রা) ভ্রাতুষ্পুত্র হাকিম বিন জাযাম তাঁকে চারশ দিরহামের বিনিময়ে কিনে নেয় এবং মক্কা ফিরে এসে ফুফুর নিকট হস্তান্তর করে। হযরত খাদিজার (রা) সঙ্গে যখন সারওয়ারে আলমের (সা) বিয়ে হয় তখন তিনি (সা) সেখানে যায়েদকে (রা) দেখতে পান। সেই নওজোয়ান ছেলের সুন্দর চরিত্র তাঁর খুব পসন্দ হলো। তিনি তাঁকে হযরত খাদিজার (রা) নিকট থেকে চেয়ে নেন। এমনিভাবে এই বুলন্দ সৌভাগ্যের যুবক ১৫ বছর বয়সে এমন এক পবিত্র ব্যক্তিত্বের গোলামীর ভাগ্য লাভ করেন যিনি ছিলেন দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। এ ধরনের গোলামের সৌভাগ্যের আন্দাজ কে করতে পারে? যায়েদের (রা) সুন্দর চরিত্র এবং সীমাহীন নিষ্ঠা হুজুরের (সা) স্নেহধন্য করেছিল। যায়েদের প্রতি হুজুরেরও (সা) এমন ভালবাসা সৃষ্টি হয়েছিল যে, তার দর্শন ছাড়া তিনি মুহূর্তকালও শান্তিতে থাকতে পারতেন না।

সেই যুগে এক বছর বনু কালাবের কতিপয় ব্যক্তি হজ্জের জন্য মক্কা এলো। বনু কাজায়া এবং তাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। একদিন বনু কালাব হারিছা বিন শারাহিলের সেই ক্রন্দন গাথা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে উচ্চারণ করছিলো। সে সময় যায়েদ (রা) সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি হতবুদ্ধি

হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। বনু কালাবের লোকদের দৃষ্টিও তার ওপর পড়লো। তারা তৎক্ষণাৎ চিনে ফেললো যে এই হলো সেই হারিছার অপহৃত পুত্র। তারা যায়েদকে (রা) নিকটে ডেকে নাম ও অন্যান্য বিষয় জিজ্ঞেস করলো। তাতে তাদের ধারণা সঠিক বলে প্রমাণিত হলো। তখন তারা যায়েদকে (রা) তাঁর পিতার দুঃখের কাহিনী জানালেন এবং তাঁকে তাদের সঙ্গে যেতে বললেন। কিন্তু যায়েদের (রা) রাসূল (সা) প্রেম এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, মাতা, পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের ভালোবাসা তার সামনে কিছুই ছিল না। তিনি বনু কালাবের হাজীদেরকে বললেন ঃ

"বুজর্গ ও ভাইয়েরা আমার। অনুগ্রহপূর্বক আমার শোকার্ত খান্দানকে আমার এই পয়গাম পৌঁছে দিবেন যে, যদিও আমি তাদের থেকে দূরে রয়েছি কিন্তু নিজের কওমের প্রতি ভালবাসা পোষণ করি। আমি খানায়ে কাবার মাশয়ারে হারামের নিকট থাকি। সেই দুঃখ ও শোক ভুলে যাও যা তোমাদেরকে রুগ্ন করে রেখেছে এবং উটের মত চলে দুনিয়ার মাটি তন্নতন্ন করে বেড়িও না। খোদার শোকর যে আমি বনী মায়াদের এক সম্ভ্রান্ত খান্দানভুক্ত। যারা বংশ পরিক্রমায় মর্যাদাশালী।"

এ সকল হাজী ফিরে গিয়ে যখন হারিছা বিন শারাহিলকে তার অপহৃত পুত্রের খবর এবং তার পয়গাম পৌঁছে দিলেন তখন নিরাশ ও শোকার্ত পিতা আনন্দের আতিশয্যে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লো। জ্ঞান ফিরতেই নিজের ভাই কাব এবং অন্য পুত্র জাবালাকে সঙ্গে নিয়ে তৎক্ষণাৎ মক্কা রওয়ানা হলো। কয়েক দিনের দূরত্ব কয়েক ঘন্টায় অতিক্রম করে প্রিয় নবীর (সা) খিদমতে পৌঁছে অবলীলাক্রমে কান্না শুরু করে দিল। বছরের পর বছর ধরে নিজের নয়নমণিকে দেখতে না পাওয়া পিতা আবেগাপ্লুত হয়ে হিচকী টেনে টেনে কান্নারত অবস্থায় রহমতে আলমের (সা) খিদমতে এই আরজ করলো ঃ

"হে সাহেবে কোরাইশ! হে ইবনে আবদুল মুত্তালিব! হে হেরেমের মুতাওয়াল্লি। হে গরীবদের অভিভাবক। হে মুসিবতজাদাদের বন্ধু। আমি একজন মুসিবতজাদা মানুষ। আল্লাহর ওয়াস্তে আমার কলিজার টুকরোকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দিন এবং তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিন। তার আযাদীর জন্য আমি আমার সকল সম্পদ দিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি।"

হুজুর (সা) দুঃখ প্রপীড়িত ও শোকার্ত পিতাকে সাহস দিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তোমার কলিজার টুকরো কে?" সে বললো, "যায়েদ"।

হুজুর (সা) বললেন : "যায়েদ যা পসন্দ করবে তাই আমি মেনে নেব। যদি সে তোমাদের সঙ্গে যেতে চায় তাহলে তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। আমি কোন ফিদিয়া গ্রহণ ছাড়াই তাকে তোমাদের হাওয়ালা করে দিব। আর যদি সে আমার সঙ্গে থাকতে চায় তাহলে আমি এমন নই যে, তাকে জোরপূর্বক পাঠিয়ে দিব।"

বস্তুত ফায়সালার জন্য যায়েদকে (রা) ডাকা হলো। তিনি এক নজরেই নিজের পিতা, চাচা এবং ভাইকে চিনে ফেললেন। কিন্তু হুজুরের (সা) মর্যাদা ও আদবের কথা খেয়াল রেখে তাদের দিকে মনোযোগী হলেন না। হুজুর (সা) জিজ্ঞাসা করলেন :

"যায়েদ, এরা কারা তা জানো?"

তিনি আরজ করলেন : "জ্বী হ্যাঁ। ইনি আমার পিতা। ইনি আমার চাচা এবং ইনি আমার ভাই।"

হুজুর (সা) বললেন : "ওঠো এবং তাঁদেরকে সালাম করো।"

যায়েদ (রা) নির্দেশ পেতেই উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলেন। এ সময় বিচ্ছিন্ন পিতা নিজের হারিয়ে যাওয়া "কলিজার টুকরাকে" বুকে চেপে ধরে এত কাঁদলেন যে, দাড়ি ও কাপড় ভিজে গেল। এটা এমন এক ভাবাবেগের দৃশ্য ছিল যে, যেই তা দেখেছিল সেই না কেঁদে পারেননি। আবেগ যখন কিছুটা ঠাণ্ডা হলো তখন হুজুর (সা) বললেন : "যায়েদ, তোমার পিতা এবং চাচা তোমাকে নিতে এসেছেন। আমি তোমাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিলাম। তুমি যদি তাঁদের সঙ্গে যেতে চাও তাহলে উৎসাহের সঙ্গে যেতে পার।"

হযরত যায়েদ কাল বিলম্ব না করে জবাব দিলেন :

"হে আমার প্রভু! আপনার চেয়ে আমি কাউকে অগ্রাধিকার দিতে পারি না। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে আপনার কদম থেকে বিচ্ছিন্ন করবেন না।"

এ কথা শুনে হারিছা বিন শারাহিল হতভম্ব হয়ে পড়লেন। তিনি যায়েদকে (রা) বললেন :

"যায়েদ, আফসোস! তুমি আযাদী, পিতা, চাচা, ভাই, খান্দান এবং স্বদেশভূমির চেয়ে গোলামীকে অগ্রাধিকার দিচ্ছ।"

যায়েদ বললেন : "আমার প্রভু আমার উপর এত মেহেরবান এবং দয়ালু যে আপন মাতা-পিতাও নিজের সন্তানের উপর এত দয়ালু ও স্নেহপরায়ণ হয় না।

এ জন্য আমি তার গোলামীকে হাজার আযাদীর উপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি।"

হযরত যায়েদের (রা) জবাব শুনে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) এত খুশী হলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে স্বাধীন করে দিলেন। অতঃপর তাঁর হাত ধরে কা'বা শরীফে তাশরীফ নিলেন এবং কুরাইশের সাধারণ সমাবেশে ঘোষণা করলেন ঃ

"হে মানুষেরা! সাক্ষী থেকো যে, আজ থেকে যায়েদ আমার পুত্র। আমি তার উত্তরাধিকারী এবং সে আমার উত্তরাধিকারী হবে।"

হারিছা, কাব এবং জাবালা হুজুরের (সা) এই স্নেহময়তা দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। তাঁরা তাঁর (সা) উদার হৃদয় ও শরাফতীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন এবং হৃষ্টচিত্তে স্বদেশ ফিরে গেলেন।

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হুজুর (সা) অনেক পূর্বেই হযরত যায়েদকে (রা) নিজের পুত্র বানিয়ে নিয়েছিলেন। যায়েদের (রা) পিতা ও চাচা যখন মক্কা এলেন তখন হুজুর (সা) যায়েদকে (রা) পুত্র বানানোর ঘোষণা পুনরুল্লেখ করেছিলেন মাত্র। এই ঘটনার পর লোকজন হযরত যায়েদকে (রা) "যায়েদ বিন মুহাম্মাদ" বলতে লাগলো।

এসব ঘটনা নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেকার। রহমতে আলম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) যখন নবুওয়াতের আসনে সমাসীন হলেন তখন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা), হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) এবং হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর সঙ্গে হযরত যায়েদও কোন সংশয় ও সন্দেহ ছাড়াই অবিলম্বে হুজুরের (সা) উপর ঈমান আনয়ন করেন। সাধারণভাবে মশহুর আছে যে, গোলামদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত যায়েদ (রা) ঈমান এনেছিলেন। কিন্তু তিনি গোলাম ছিলেন না। বরং হুজুর (সা) বেশ কিছুদিন পূর্বেই তাঁকে আজাদ করে দিয়েছিলেন। এ জন্য ইসলাম গ্রহণে অগ্রগণ্যতার মর্যাদায় তিনি উল্লিখিত তিন বুজর্গের সমান সমান। [এই প্রসঙ্গে ইমাম জুহুরী লিখেছেন যে, যায়েদ (রা) বিন হারিছার পূর্বে অন্য কেউ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। তিনি সম্ভবত একথাই বলতে চান যে, হযরত যায়েদই (রা) সর্বপ্রথম ঈমান এনেছিলেন। কিন্তু জমহুর ওলামার মত হলো ঃ হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা), হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা), হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু এবং হযরত যায়েদ (রা) এই চার ব্যক্তিরই ইসলামে অগ্রগণ্যতার মর্যাদা রয়েছে।]

হুজুরে আকরাম (সা) প্রিয় চাচা শেরে খোদা হযরত হামযার (রা) সংগে তাঁর ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই দুই ভাই পরস্পরকে খুব ভাল বাসতেন। হযরত হামযা (রা) যখন কোন যুদ্ধে যেতেন তখন হযরত যায়েদকে (রা) নিজের ওসি নিযুক্ত করে যেতেন। উভয়ের গভীর সম্পর্কের পরিমাণ সহীহ বুখারীর এই হাদীস থেকে অনুমান করা যায়। হাদীসটিতে বলা হয়েছে ঃ হুদায়বিয়া সন্ধির পর হুজুর (সা) মক্কা থেকে রওয়ানা হলেন। এ সময় হযরত হামযার (রা) কন্যা উমামাহ (রা) "হে চাচা, হে চাচা" বলতে বলতে দৌড়াতে লাগলো। হযরত আলী (রা) তাঁকে কোলে তুলে নিলেন এবং পরে তার হাত ধরে হযরত ফাতিমাতুজ জোহরার (রা) নিকট দিলেন এবং বললেন যে, এ হলো তোমার চাচার কন্যা। এই কথায় হযরত জাফর (রা) বিন আবি তালিব এবং হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছা নবীর (সা) দরবারে দাবী করে বসলেন যে, উমামাহর (রা) তাঁদের নিকট থাকা উচিত। হযরত জাফর (রা) বলতেন যে, সেতো আমার চাচার কন্যা এবং তার আপন খালা(আসমা বিনতে আমিস) আমার স্ত্রী। এমনিভাবে হযরত আলীও (রা) উমামার (রা) চাচার পুত্র হওয়ার ভিত্তিতে নিজের অধিকার দাবী করতেন। কিন্তু হযরত যায়েদ (রা) বলতেন যে, "সে আমার ভাইয়ের মেয়ে।" প্রিয়নবী (সা) হযরত জাফরের (রা) পক্ষে ফায়সালা দিয়েছিলেন। কেননা তাঁর স্ত্রী ছিলেন উমামার (রা) আপন খালা।

রহমতে আলম (সা) হযরত যায়েদকে (রা) আপন পুত্রের মত ভালবাসতেন। এ জন্য তিনি মানুষের মধ্যে "হিব্বু রাসূলিল্লাহ" উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। হযরত যায়েদের (রা) ওপর প্রিয় নবীর (সা) সীমাহীন স্নেহ অকারণে ছিল না। বাস্তবতঃ এই জালিলুল কদর ব্যক্তিত্ব অসংখ্য গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। অসাধারণ নিষ্ঠা, রাসূলের (সা) প্রতি গভীর ভালবাসা এবং আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসূলের (সা) পথে জীবন কুরবান করার সীমাহীন আবেগ নবীর (সা) নিকট তাঁকে অত্যন্ত প্রিয় করে তুলেছিল। মক্কী এবং মাদানী জীবনে এমন কোন মুসিবত ও কঠোরতা ছিল না যা তিনি নিজের প্রভুর সঙ্গে সহ্য করেননি। নবুওয়াতের চতুর্থ বছরে আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক রাসূলে করিম (সা) যখন হকের দাওয়াত প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন এবং আরবের বিভিন্ন গোত্রকে প্রকাশ্যে হকের দিকে আহবান জানালেন তখন লাত ও উজ্জার পূজারীদের ক্রোধাগ্নি জ্বলে উঠলো এবং তারা হক পন্থীদের ওপর চরম নির্যাতন শুরু করলো। সেই ভয়াবহ যুগে বিশ্ব কয়েকবারই অবলোকন করেছে যে, বিশ্ব নবী (সা) কোন কবিলাতে হকের তাবলীগের জন্য যাচ্ছেন আর তিনি উটের ওপর নিজের পিছনে হযরত যায়েদকে (রা) বসিয়ে

রেখেছেন। হুজুর (সা) যদি পদব্রজে গমন করতেন তাহলে যায়েদও(রা) তাঁর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার আবেগ নিয়ে সাথে সাথে গমন করতেন।

নবুওয়াতের দশম বছরের শওয়াল মাসে প্রিয়নবী (সা) হযরত যায়েদকে(রা) সঙ্গে নিয়ে বনু বকর গোত্রে তাশরীফ নিলেন। কিন্তু তারা তাঁকে গ্রহণ করলো না। অতপর তিনি কাহতান গোত্রে গেলেন। তারাও তাঁর সঙ্গে শত্রুতামূলক আচরণ করলো। সেখান থেকে তিনি তায়েফে তাশরীফ নিলেন এবং সেখানকার তিন সরদার আবদি ইয়ালিল বিন আমর, মাসউদ বিন আমর এবং হাবিব বিন আমরকে হকের দাওয়াত দিলেন। এই তিন ভাই খুব খারাপ ব্যবহার করলো। আল্লামা ইবনে সায়াদ এবং ইবনে জারির তাবারী বর্ণনা করেছেন যে, এই তিন ব্যক্তি হুজুরকে (সা) অত্যন্ত অভদ্র ও অসৌজন্যমূলক জবাব দিল। আবদি ইয়ালিল বললো, "খোদা তোমাকে নবী বানিয়ে নিজের হাতে কাবার গিলাফ ছিন্নভিন্ন করেছে।" মাসউদ বললো, "নবী বানানোর জন্য তোমাকে ছাড়া খোদা কি আর মানুষ পেলো না।" হাবিব বললো, "যদি তুমি ঠিকই নবী হও, তাহলে তোমার বিরুদ্ধে কথা বলা অসৌজন্যমূলক কাজ। আর যদি তুমি খোদাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে থাকো তাহলে আমাকে সম্বোধন করে কথা বলার যোগ্যই নও তুমি। বরং তুমি এখান থেকে চলে যাও।" তারা শুধু একথা বলেই ক্ষান্ত হল না বরং তায়েফের কিছু ছোকরা ও আদিবাসীদেরকে রাসূলকে (সা) উত্যক্ত করার জন্য উস্কে দিল। শয়তানের এসব চ্যালা চামুণ্ডা হুজুরের (সা) দশদিন তায়েফ অবস্থানকালে প্রচণ্ড হৈ হুল্লোড় করলো। হুজুর (সা) যেদিকেই যেতেন তারা পিছু পিছু তালি বাজাতো, চীৎকার করতো, গালি দিত এবং পাথর ছুঁড়ে মারতো। হযরত যায়েদ (রা) নিজেকে হুজুরের (সা) ঢাল বানিয়ে নিতেন। তিনি এই চেষ্টাই করতেন যে নিক্ষিপ্ত পাথর বা ইট যেন রাসূলের (সা) পবিত্র দেহে না লেগে তাঁর শরীরে লাগে। কিন্তু চারদিক থেকে যখন পাথর নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো তখন যায়েদ(রা) কতক্ষণ আর হুজুরকে (সা) রক্ষা করতে পারতেন। হুজুরও (সা) আহত হতেন এবং যায়েদও (রা)। দশম দিনে সেই হতভাগারা নির্যাতনের চরম পর্যায়ে এসে পৌছলো। রহমতে আলম (সা) মারাত্মকভাবে আহত হলেন এবং তাঁর পবিত্র দেহ রক্তাক্ত হয়ে পড়লো। হযরত যায়েদও (রা) জখমে জখমে অস্থির হয়ে পড়লেন। বাধ্য হয়ে হুজুরে আকরাম (সা) শহরের বাইরে আঙ্গুরের এক বাগানে আশ্রয় নিলেন। বাগানটির মালিক ছিল মক্কার অন্যতম সরদার উতবা বিন রবিয়া এবং শাইবা বিন রবিয়া। বাগানে আশ্রয় নেয়ার পর হযরত যায়েদ (রা) নিজের চাদর দিয়ে হুজুরের (সা) পবিত্র দেহের রক্ত পরিষ্কার করলেন। তারপর নিজের ক্ষত পরিষ্কার করলেন। বাগানে কিছুক্ষণ

অবস্থানের পর হুজুর (সা) হযরত যায়েদের (রা) সঙ্গে মক্কা ফিরে এলেন। হযরত যায়েদ(রা) হুজুরের (সা) সন্তুষ্টির কোন সুযোগই হাতছাড়া হতে দিতেন না। হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে একবার রাসূলে আকরাম (সা) বলেন, "যে ব্যক্তি কোন জান্নাতী মহিলাকে বিয়ে করতে চায় সে যেন উম্মে আইমানকে(রা) বিয়ে করে।" উম্মে আইমান (রা) হুজুরের (সা) আয়া ছিলেন। তিনি তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন এবং এতো ভাল বাসতেন যে তাকে "আমার মা" বলে ডাকতেন। হযরত যায়েদ (রা) হুজুরের (সা) সন্তুষ্টির জন্য অবিলম্বে হযরত উম্মে আইমানকে (রা) বিয়ে করেন। বাস্তবত তিনি হযরত যায়েদের (রা) চেয়ে বয়সে কিছুটা বড় ছিলেন।

হযরত উম্মে আইমানের (রা) গর্ভে হযরত উসামা (রা) বিন যায়েদ জন্মগ্রহণ করেন। হযরত যায়েদ (রা) এবং উম্মে আইমানের (রা) সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে হুজুর (সা) হযরত উসামাকে (রা) এতো ভালবাসতেন যে, তিনিও "হিব্বু রাসূলিল্লাহর" উপাধিতে প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা) সাহাবায়ে কিরামকে (রা) মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলে হযরত যায়েদও (রা) হিজরত করে মদীনা চলে গেলেন এবং ভিন্ন ভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত কুলছুম (রা) বিন হাদাম আনসারী অথবা হযরত সায়াদ (রা) কিন খাইছামা আনসারীর মেহমান হলেন। প্রিয়নবী (সা) যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা তাশরীফ আনলেন তখন তিনি এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) হযরত যায়েদকে(রা) হযরত আবু রাফে' (রা) এবং আবদুল্লাহ বিন আরিকতের সঙ্গে নিজেদের পরিবার পরিজনকে নিয়ে আসার জন্য মক্কা প্রেরণ করলেন। বস্তুত হযরত ফাতিমাতুজ জোহরা (রা), হযরত উম্মে কুলছুম (রা) উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রা) বিনতে যাময়া, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আবু বকর (রা), হযরত উম্মে রুমান (রা), উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) এবং হযরত আসমা (রা) বিনতে আবু বকর (রা) এসব সাহাবীর সঙ্গে মক্কা থেকে মদীনা হিজরত করেন। বদরের যুদ্ধের পর হুজুরের (সা) নির্দেশ অনুযায়ী হযরত যায়েদ (রা) পুনরায় মক্কা গমন করেন এবং তাঁর বড় কন্যা হযরত যয়নবকে (রা) সঙ্গে নিয়ে মদীনা ফিরে আসেন।

হিজরতের পাঁচ মাস পর রাসূলে আকরাম (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছাকে আবদুল আশহাল গোত্রের নেতা হযরত উসাইদ (রা) বিন হুজাইর আনসারীর

ইসলামী ভাই বানান। তিনিও অত্যন্ত মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন এবং আনসারদের সাবিকুনাল আউয়ালুনের মধ্যে গণ্য হতেন।

চতুর্থ হিজরীতে প্রিয়নবী (সা) নিজের ফুফাতো বোন হযরত যয়নব (রা) বিনতে জাহাশের বিয়ে দিয়েছিলেন হযরত যায়েদের (রা) সঙ্গে। হযরত যয়নবের (রা) মোহর হুজুর (সা) হযরত যায়েদের (রা) পক্ষ থেকে স্বয়ং আদায় করেছিলেন। এ বিয়ের পূর্বে হযরত যায়েদ (রা) নবী (সা) পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে রাসূলের (সা) সঙ্গে থাকতেন। এরপর হুজুর (সা) তাকে পৃথক বাড়ীতে স্থানান্তর করেন এবং সংসার করার জন্য অত্যাবশ্যকীয় আসবাবপত্র দান করেন। হযরত যয়নব (রা) প্রায় এক বছর পর্যন্ত হযরত যায়েদের (রা) স্ত্রী ছিলেন। খান্দান ও নসবের ভারসাম্যহীনতা এবং প্রকৃতিগত অসাদৃশ্যের কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা হতে পারেনি। হযরত যায়েদ (রা) বার বার নবীর (সা) নিকট হযরত যয়নবের (রা) কঠোর মেযাজের অভিযোগ আনলেন। এমনকি তাঁকে তালাক দেয়ার অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করলেন। হুজুর (সা) তাঁকে এই কাজ করতে নিষেধ করলেন। এরশাদ হলো,

اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ

"তুমি নিজের স্ত্রীকে নিজের নিকট রাখো (ছেড়ে দিও না) এবং আল্লাহকে ভয় কর।" (সূরায়ে আহ্যাব-৩৭)

হযরত যায়েদ (রা) সে সময় চুপ মেরে গেলেন। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তিক্ততা বেড়েই চললো। সম্পর্ক যখন চরম পর্যায়ে পৌছলো তখন হযরত যায়েদ (রা) হযরত যয়নবকে (রা) তালাক দিয়ে দিলেন। তাঁর ইদ্দত পুরো হলে হুজুর (সা) আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী হযরত যায়েদের (রা) মাধ্যমেই হযরত যয়নবের (রা) নিকট নিজের বিয়ের পয়গাম প্রেরণ করলেন। তিনি হযরত যয়নবকে (রা) এই পয়গাম পৌছালেন। এ সময় তিনি বললেন, "আল্লাহর পক্ষ থেকে যতক্ষণ কোন নির্দেশ না আসবে ততক্ষণ আমি কিছুই বলতে পারবো না।" একথা বলার অব্যবহিত পরই এই আয়াত নাযিল হলো ঃ

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا (الا حراب - ٣٧)

"পরে যায়েদ যখন তার নিকট থেকে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করে নিলেন তখন আমরা তাকে (তালাক প্রাপ্তা মহিলাকে) তোমার সঙ্গে বিয়ে দিলাম।"

এমনিভাবে হযরত যয়নব (রা) বিনতে জাহাশ উম্মুল মু'মিনীনভুক্ত হলেন। এই বিয়ের ফলে মুনাফিক, ইহুদী ও মুশরিকরা হুজুরকে (সা) বদনাম করার

জন্য সমালোচনার তুফান বইয়ে দিল। অপবাদের ভিত্তি তারা এই বানিয়ে নিয়েছিল যে, মুহাম্মাদ (সা) তো পুত্রবধুকে বিয়ে করা হারাম বলে অভিহিত করে থাকেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং নিজের পুত্র যায়েদের (রা) স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ে করেছেন। তাদের এই ফিতনামূলক কথার জবাব আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এভাবে দেয়া হয়েছে ঃ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ط

"(হে জনগণ!) মুহাম্মাদ, তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নয়, বরং আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী।" (আল আহযাব- ৪০)

একথার সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَاۤئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ

মুখ-ডাকা পুত্রদেরকে তাদের পিতার সাথে সম্পর্ক-সূত্রে ডাকো, এটাই আল্লাহর নিকট অধিক ইনসাফের কথা।" (আল আহযাব-৫)

এ নির্দেশের পর লোকজন হযরত যায়েদকে (রা) "যায়েদ (রা) বিন মুহাম্মাদ"-এর পরিবর্তে যায়েদ (রা) বিন হারিছা বলতে লাগলেন এবং মুখ-ডাকা পুত্রও আপন পুত্রের মত হয়ে থাকে এ জাহেলী ধারণা চিরকালের জন্য বাতিল হয়ে গেল।

হযরত যায়েদ (রা)–এর চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো জিহাদের প্রতি উৎসাহ। শৌর্যবীর্য ও বীরত্ব তাঁর শিরা উপশিরায় পূর্ণ ছিল এবং হক পথে জীবন বিলিয়ে দেয়ার আবেক সবসময়ই তার মধ্যে টগবগ করতো। তিনি একজন বিশেষজ্ঞ তীরন্দাজ ছিলেন। তীর নিক্ষেপই তাঁর শখের বস্তু ছিল। হিজরাতের পর যুদ্ধের সিলসিলা শুরু হলে বদর থেকে মাওতা পর্যন্ত সকল যুদ্ধেই হযরত যায়েদ (রা) বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেন। মাররে ইয়াসি' যুদ্ধে যেহেতু হুজুর (সা) তাঁকে মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেছিলেন সেহেতু তিনি তাতে অংশ নিতে পারেননি। নামকরা যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ ছাড়া হযরত যায়েদের (রা) সাত অথবা ৯টি সামরিক অভিযানে (সারিয়্যা) নেতৃত্ব দানের সৌভাগ্য হয়েছিল। এসব অভিযানের মধ্যে কতিপয়ের বিশ্লেষণ নিম্নরূপঃ

১. সারিয়্যায়ে কারদা ঃ এই সারিয়্যাহ বা যুদ্ধ নজদের একটি ঝর্ণা 'কারদা'র নিকট বিভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় হিজরীর

জমাদিউস সানিতে সংঘটিত হয়। হযরত যায়েদের (রা) নেতৃত্বে মুসলমানরা শত্রুকে শিক্ষণীয়ভাবে পরাজিত এবং অনেক উট, মাল ও আসবাব সহ দুশমনের একজন সরদার ফুরাত বিন হাইয়ান আজলীকে গ্রেফতার করেন।

২. সারিয়্যায়ে জামুম : এই যুদ্ধকে সারিয়্যায়ে জামুহও বলা হয়ে থাকে। ৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউস সানিতে রাসূলে আকরাম (সা) হযরত যায়েদকে (রা) বনু সুলাইমের মুকাবিলার জন্য প্রেরণ করেন। এই কবিলা মদীনা মুনাওয়ারার চার মনযিল দূরত্বে জামুম নামক খেজুর বাগানে বাস করতো। হযরত যায়েদ (রা) বনু সুলাইমকে সমূলে উৎখাত করলেন। অনেক উট এবং বকরী গনিমতের মাল হিসেবে লাভ করলেন। তাছাড়া দুশমনের অনেক লোককে গ্রেফতার করে মদীনা নিয়ে এলেন।

৩. সারিয়্যায়ে আইস : ৬ষ্ঠ হিজরীর জমাদিউল আউয়ালে হুজুর (সা) খবর পেলেন যে, কুরাইশের সামান ভর্তি একটি কাফেলা সিরিয়া থেকে ফিরে আসছে। তিনি হযরত যায়েদকে (রা) ১৭০ সওয়ারসহ সেই কাফেলার পথরোধ করার নির্দেশ দিলেন। হযরত যায়েদ (রা) সেই কাফেলাকে আইস নামক স্থানে ঘিরে ফেললেন এবং কাফেলার সকলকে গ্রেফতার করে মদীনা নিয়ে এলেন। গনিমতের মাল হিসেবে রূপার অনেক সামান পাওয়া গেল। কয়েদীদের মধ্যে হুজুরের (সা) বড় কন্যা হযরত যয়নবের (রা) স্বামী আবুল আসও ছিলেন। তিনি হযরত যয়নবের (রা) আশ্রয় নিয়ে মুক্তি পেলেন। হুজুর(সা) তার সকল মালও ফিরিয়ে দিলেন।

৪. সারিয়্যায়ে তারাফ : মদীনা মুনাওয়ারা থেকে ৩৬ মাইল দূরত্বে ইরাকের দিকে তারাফে একটি ঝরণা ছিল। ৬ষ্ঠ হিজরীর জমাদিউস সানিতে হুজুর (সা) এক দুশমন গোত্রের উৎখাতের জন্য হযরত যায়েদকে (রা) সেখানে প্রেরণ করলেন। দুশমনরা মুকাবিলার হিম্মত পেলো না। এবং তারা হযরত যায়েদের (রা) পৌছার পূর্বেই পালিয়ে গেল।

৫. সারিয়্যায়ে হিসমা : সারিয়্যায়ে তারাফের অব্যবহিত পরই হুজুর (সা) হযরত যায়েদকে (রা) পাঁচ শ' সওয়ার দিয়ে বনি জাযামকে উৎখাতের জন্য হিসমা প্রেরণ করলেন। তারা কাসতানতুনিয়ায় দৌতগিরী শেষে ফেরার পথে হযরত দাহিয়া কালবীকে (রা) লুটে নিয়েছিল এবং তারা যথার্থ শাস্তির যোগ্য ছিল। হযরত যায়েদ (রা) এই অভিযানে অত্যন্ত সতর্কতা এবং দূরদর্শিতার সঙ্গে কাজ করছিলেন। তিনি দিনের বেলা সঙ্গীদেরসহ পাহাড়ে লুকিয়ে থাকতেন। এবং রাতে সফর করতেন। এমনকি হিসমা পৌছা পর্যন্ত দুশমনের কানে পর্যন্ত এই খবর পৌছেনি। হযরত যায়েদ (রা) হঠাৎ করে হামলা

চালিয়ে তাদেরকে কঠিন শিক্ষা দিলেন। বনু জাযামের সরদার হুনাইদ বিন এওয়াজ পুত্রসহ নিহত হলো। গনিমতের মাল হিসেবে এক হাজার উট, পাঁচ হাজার বকরী এবং অনেক কয়েদী পাওয়া গেল। হযরত যায়েদ (রা) এসব বস্তু হযরত যায়েদ (রা) বিন রিফায়ার মাধ্যমে প্রিয় নবীর (সা) খিদমতে পাঠিয়ে দিলেন। গনিমতের মাল যখন মদীনা পৌঁছলো তখন ঘটনাক্রমে বনু জাযামের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আবু ইয়াযিদ (রা) বিন আমর নবীর (সা) দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তিনি যেহেতু পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ জন্য হুজুর (সা) তাঁকে খুব সম্মান করতেন। তিনি যখন নিজের কবিলাবাসীদের জন্য সুপারিশ করলেন তখন রহমতে আলম (সা) সকল কয়েদীকে মুক্ত করে দিলেন এবং সব গনিমতের মালও তাদেরকে ফেরত দিলেন।

৬. সারিয়্যায়ে উম্মে কারফা ফাযারিয়া (অথবা সারিয়্যায়ে ওয়াদিউল কুরা) : ৬ষ্ঠ হিজরীর রমযান মাসে হযরত যায়েদ (রা) একটি বাণিজ্যিক কাফেলার সঙ্গে সিরিয়ার দিকে গমন করছিলেন। কুরা উপত্যকায় বনু ফাযারার একদল মানুষ কাফেলার উপর অতর্কিতে হামলা চালালো এবং বাণিজ্যিক পণ্য লুটে নিল।

হযরত যায়েদের (রা) সঙ্গে মুসলমানদের একটি ছোট দল ছিল। ফাযারী ডাকাতদের হাতে তারা খুব নির্যাতিত হলো। হযরত যায়েদ (রা) অত্যন্ত কষ্টে জীবন বাঁচিয়ে মদীনা পৌঁছে সকল ঘটনা রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে পেশ করলেন। বনু ফাযারার লোকজন এর আগেও কয়েকবার ডাকাতি ও রাহাজানি করেছিল। এক্ষণে হুজুর (সা) তাদেরকে শাস্তি দানের জন্য একটি শক্তিশালী সৈন্যদল দিয়ে হযরত যায়েদকে (রা) প্রেরণ করলেন। তিনি সতর্কতার সঙ্গে দিনে লুকিয়ে থেকে এবং রাতে সফর করে বনু ফাযারার ওপর গিয়ে চড়াও হলেন। ফাযারীরা মুকাবিলার সাহস করলো না এবং তারা সবাই পালিয়ে গেল। অবশ্য তাদের শাসক উম্মে কারফা বিনতে রবিয়া বিন বদর এবং তার কন্যাকে মুসলমানরা গ্রেফতার করলো। হযরত যায়েদ (রা) মদীনা ফিরে এলেন। এ সময় বিশ্ব নবী (সা) হযরত আয়েশা সিদ্দিকার (রা) হুজরাতে উপস্থিত ছিলেন। উম্মুল মুমিনীন (রা) বর্ণনা করেছেন যে, যায়েদ(রা) আমার ঘরের দরজা খটখটালেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) যে অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থাতেই বাইরে তাশরীফ নিলেন এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত যায়েদের (রা) সঙ্গে সেই অভিযানের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন।

৭. মাওতার যুদ্ধ : অষ্টম হিজরীর জমাদিউল আউয়ালে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হুজুরে আকরাম (সা) হারিছ (রা) বিন উমায়ের ইযদীকে ইসলামের

দাওয়াতের পত্র দিয়ে বসরার শাসকের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। তিনি দামেস্কের নিকট মাওতা নামক স্থানে পৌছলেন। এই সময় বালকার সরদার শুরাহবিল বিন আমর গাসসানী তাঁকে শহীদ করে ফেললো। (অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত হারিছ (রা) বসরার শাসকের নিকট পত্র পৌছিয়ে ফিরে আসছিলেন।)

দূত হত্যা একটি সঙ্গীন অপরাধ। হুজুর (সা) তার প্রতিশোধ গ্রহণার্থে তিন হাজার মুজাহিদের একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। এই বাহিনীর আমীর নিয়োগ করেছিলেন হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছাকে। হুজুর (সা) কিছুদূর পর্যন্ত মুজাহিদদের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন এবং তাঁদেরকে বিদায় করার সময় বললেন, যায়েদ (রা) যদি শহীদ হয়ে যান তাহলে জাফর (রা) বিন আবি তালিব সেনাবাহিনীর আমীর হবেন। তিনিও যদি শহীদ হয়ে যান তাহলে আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন। আল্লামা ইবনে সায়াদ বর্ণনা করেছেন যে, এ সময় হযরত জাফর (রা) হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর আপন ভাই এবং [হুজুরের (সা) চাচার পুত্র ছিলেন] আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যায়েদকে (রা) আমার ওপর আমীর নিয়োগ করবেন এটা আশা করিনি। সারওয়ারে আলম (সা) ফরমালেন ঃ

"একথা রাখো। তুমি জানোনা যে, আল্লাহর নিকট উত্তম কি।"

এই সৈন্য বাহিনী মাওতা পৌছলে খৃস্টানদের বিরাট বাহিনী নিজেদের মিত্র গোত্রদেরসহ মুকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়লো। তাদের সর্বোমোট সংখ্যা প্রায় এক লাখ ছিল। এ সত্ত্বেও মুসলমানরা আল্লাহর ওপর ভরসা করে সেই ভয়াবহ খোদাদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলেন। অত্যন্ত রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এই যুদ্ধে হযরত যায়েদ (রা) পূর্ণাঙ্গ অটলতা এবং বাহাদুরী প্রদর্শন করলেন। সঙ্গীদেরকে উৎসাহ দানের জন্য তিনি শত্রু ব্যূহের গভীরে পৌছে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করলেন। যুদ্ধ যখন প্রচণ্ডরূপ ধারণ করলো তখন হযরত যায়েদের (রা) বুকে একটি বর্শা বিদ্ধ হলো এবং তিনি শহীদ হয়ে নীচে পড়ে গেলেন। হযরত জাফর (রা) সামনে অগ্রসর হয়ে ইসলামের ঝাণ্ডা তুলে ধরলেন। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধের পর তিনিও যখন শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করলেন তখন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। যখন তিনিও শহীদ হলেন তখন হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ পতাকা হাতে তুলে নিলেন এবং মুজাহিদদেরকে একত্রিত করে দুশমনের ওপর এমন

প্রচণ্ড বেগে হামলা চালালেন যে, তারা পরাজিত হলো এবং মুসলমানরা সফল ও বিজয়ীর বেশে মদীনা ফিরে এলেন।

অনেক মুহাদ্দিস এবং নেতৃস্থানীয় চরিতকার এ প্রসঙ্গে একটি রেওয়ায়াত ধারাবাহিকতার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, মাওতায় যখন প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছিল তখন রাসূলে আকরাম (সা) সাহাবায়ে কিরামের (রা) মধ্যে মসজিদে নববীতে বসেছিলেন। হঠাৎ করে তিনি বললেন ঃ

"যায়েদ (রা) শহীদ হয়ে গেছেন এবং এখন জাফর ঝাণ্ডা তুলে ধরেছেন। জাফরও শহীদ হয়ে গেছেন এবং এখন পতাকা আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার হাতে। তিনিও জান্নাতের পথ নিলেন। এখন সেই ব্যক্তি ঝাণ্ডা হাতে তুলে নিলেন যিনি আল্লাহর অন্যতম তরবারী হিসেবে বিবেচিত"। [অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, এ সময় হুজুর (সা) দাঁড়িয়ে প্রথমে এই তিন বুজর্গের গুণাবলী বর্ণনা করলেন। অতপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! যায়েদকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! যায়েদকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! যায়েদকে ক্ষমা কর! হে আল্লাহ! জাফর এবং আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহাকে ক্ষমা কর।—তাবকাতে ইবনে সায়াদ]

সে সময় আল্লাহ পাক যুদ্ধের নকশা হুজুরের (সা) সামনে এনে দিয়েছিলেন অথবা জিবরিল আমীন (আ) তাঁকে প্রতি মুহূর্তের খবর পৌঁছে দিচ্ছিলেন। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন এ ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন যে, মুজাহিদদের ফিরে আসার পূর্বেই হুজুর (সা) হযরত যায়েদ (রা), জাফর (রা) এবং আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার শাহাদাতের খবর মুসলমানদেরকে দিয়েছিলেন। সহীহ বুখারীতে আছে যে, হুজুর (সা) যে সময় মুসলমানদেরকে এই খবর প্রদান করেন তখন তার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। আল্লামা ইবনে আছির উসুদুল গাব্বাহতে লিখেছেন যে, এই সময় হুজুর (সা) একথাও ইরশাদ করেছিলেন ঃ "এরা ছিল আমার ভাই, আমার প্রিয় এবং আমার সঙ্গে আলোচনাকারী।"

হযরত খালিদ (রা) বিন সুমরাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত যায়েদের (রা) অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যা পিতার শাহাদাতের খবর শুনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তা দেখে হুজুরও (সা) কাঁদতে লাগলেন এবং তিনি এত কেঁদেছিলেন যে তাঁর বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদা হয়রান হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! একি।" তিনি বললেনঃ "এটা ভালবাসা, আবেগ যা প্রতিটি ভালবাসাকারীর অন্তরে নিজের প্রিয় ব্যক্তির জন্য হয়ে থাকে।"

হাফেজ ইবনে হাজার (র) লিখেছেন, শাহাদাতের সময় হযরত যায়েদ(রা) বিন হারিছার বয়স ছিল ৫৫ বছর। অন্যদিকে তাবকাতে ইবনে সায়াদে হযরত উসামা বিন যায়েদের (রা) একটি রেওয়ায়াতে উল্লেখ আছে। তাতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার পিতা থেকে বয়সে ১০ বছরের বড় ছিলেন। তাবকাতের রাওয়ায়াত যদি সঠিক বলে মনে করা হয় তাহলে শাহাদাতের সময় হযরত যায়েদের (রা) বয়স ৫১-৫২ বছরের বেশী হতে পারে না।

হাফেজ ইবনে হাজার (র) হযরত যায়েদের (রা) হুলিয়া মোবারক বর্ণনায় বলেছেন, আকৃতি ছিল বেঁটে। নাক ছিল চ্যাপ্টা এবং রং ছিল গভীর গমের রং। (ইসাবাহ)

আল্লামা ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত যায়েদের রং ছিল খোলা গমের মতো। (উসুদুল গাব্বাহ)

হযরত যায়েদ (রা) জীবনে পাঁচটি বিয়ে করেছিলেন। স্ত্রীরা হলেন, হযরত উম্মে আইমান (রা), হযরত যয়নব (রা) বিনতে জাহাশ (যিনি পরে উম্মুল মুমিনীন হন) উম্মে কুলসুম (রা) বিনতে উকবা বিন আবি মুয়িত [তিনি হুজুরের (সা) ফুফাতো বোন আরওয়া বিনতে কুরাইযের কন্যা এবং হযরত উসমান (রা) বিন আফফান তাঁর সতালো ভাই ছিলেন], দুররাহ (রা) বিনতে আবি লাহাব [তিনি হুজুরের (সা) চাচার কন্যা ছিলেন] এবং হিন্দ (রা) বিনতে আওয়াম [তিনি হুজুরের (সা) ফুফাতো বোন ছিলেন]। হযরত যোবায়ের (রা) বিন আওয়াম তাঁর সহোদর ছিলেন এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা) তাঁর আপন ফুফু ছিলেন।

হযরত যায়েদের (রা) মোট তিনজন সন্তান ছিলেন। হযরত উম্মে আইমানের (রা) গর্ভে হযরত উসামা (রা) বিন যায়েদ এবং উম্মে কুলছুমের(রা) গর্ভে যায়েদ বিন যায়েদ ও রোকেয়া বিনতে যায়েদ (রা)।

হযরত উসামা (রা) মহানবীর (সা) প্রিয়তম সাহাবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। যায়েদ এবং রোকেয়া শৈশবকালেই মারা যান।

হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছা আসমানী ফজিলতের অধিকারী ছিলেন। তিনিই একমাত্র সাহাবী যাঁর নাম কুরআনে পাকে উল্লেখ আছে। এই মর্যাদা আর কোন সাহাবী লাভ করেননি। তাঁর চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে রাসূল প্রেম, প্রতিশ্রুতিপূরণ, জিহাদে উৎসাহ, ইবাদাতে গভীর আগ্রহ, দারিদ্র এবং সচ্ছলতা এবং বিনয় প্রদর্শন। সৎচরিত্র এবং জীবন উৎসর্গের আবেগের

কারণে তিনি রাসূলের (সা) সান্নিধ্য লাভে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তিনি হিব্বুন্নাবি (সা) উপাধিতে মশহুর হয়েছিলেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) বলতেন, "কোন সময় এমন হয়নি যে রাসূলুল্লাহ (সা) কোন যুদ্ধে হযরত যায়েদকে (রা) প্রেরণ করেননি এবং তাঁকে সেই বাহিনীর নেতা বানাননি। তিনি যদি হুজুরের (সা) ওফাতের সময় জীবিত থাকতেন তাহলে হুজুর (সা) তাঁকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করতেন।

এমনিভাবে হযরত সালমা (রা) বিন আকওয়া থেকে বর্ণিত আছে যে, "আমি সাতটি যুদ্ধে হযরত যায়েদের (রা) সঙ্গে অংশ নিয়েছি। আমি দেখেছি যে, প্রত্যেক যুদ্ধেই হুজুর (সা) হযরত যায়েদকে (রা) সেনাবাহিনীর সেনাপতি বানিয়েছেন।"

মহানবী (সা) হযরত যায়েদকে (রা) নিজের পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে মনে করতেন। কোন ব্যক্তি যদি তাঁর ব্যাপারে কোন খারাব কথা বলতো তাহলে হুজুর (সা) খুব দুঃখ পেতেন। একবার কতিপয় ব্যক্তি হযরত উসামা (রা) বিন যায়েদের বংশ সম্পর্কে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা শুরু করলো [শুধু এই ভিত্তিতে যে, হযরত যায়েদের (রা) রং ছিল গমের রংয়ের আর হযরত উসামার (রা) রং ছিল কালো]। হুজুর (সা) পর্যন্ত এই কথা পৌছল তাতে তিনি খুব মনোকষ্ট পেলেন। সহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা সিদ্দিকার (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, "সেই যুগে একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যন্ত উৎফুল্লচিত্তে বাড়ী তাশরীফ আনলেন। সে সময় তাঁর চেহারা মুবারক খুশীতে ডগমগ করছিল। এসেই বললেন, আয়েশা জানো, কেবলই মুজাযযার মুদালজী (মুখের ভাব দেখে যিনি স্বভাব বলতে পারে) এসেছিল। সে সময় যায়েদ (রা) ও উসামা (রা) দু'জনে একই চাদরের নীচে ছিল। দু'জনের পা শুধু চাদরের বাইরে ছিল। মুজাযযার উভয়ের পা দেখেই বললেন, এই পা একে অপর থেকে সৃষ্টি।"

এ সময় হুজুরের খুশী হওয়ার কারণ এই ছিল যে, সেই ব্যক্তি সত্যের স্বীকৃতি দিয়েছিল। এর ফলে বিদ্বেষ পোষণকারীদের মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নচেৎ সাধারণ অবস্থায় এসব লোকের কথা দলিল হয় না। তাছাড়া হুজুর (সা) জোতির্বিদ ও গণকদের কথায় আস্থা স্থাপন পসন্দ করতেন না।

হযরত ওমর ফারুক (রা) নিজের খিলাফতকালে সাহাবীদের (রা) বৃত্তি নির্ধারণ করলেন। এ সময় তিনি স্বীয় পুত্রের বৃত্তি আড়াই হাজার এবং উসামা (রা) বিন যায়েদের (রা) তিন হাজার ঠিক করলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) আরজ করলেন ঃ

"আমি সকল যুদ্ধে উসামার পাশাপাশি থেকেছি এবং আপনিও কোন যুদ্ধে যায়েদের পিছনে থাকেননি। তারপরও আপনি আমার বৃত্তি উসামার থেকে কম কেন নির্ধারণ করেছেন?"

হযরত ওমর বললেন ঃ

"জানে ফিদার বা কলিজার টুকরা আমার। তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) উসামাকে তোমার চেয়ে এবং উসামার পিতাকে তোমার পিতার চেয়ে বেশী ভাল বাসতেন।"

হযরত যায়েদ (রা) এবং তাঁর পুত্র উসামাকে (রা) কত গভীরভাবে ভাল বাসতেন তা এই ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়। মাওতার যুদ্ধের পর হুজুর(সা) শহীদদের প্রতিশোধ গ্রহণার্থে একটি বাহিনী তৈরী করলেন। যদিও এই বাহিনীতে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা), হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস, হযরত সাঈদ (রা) বিন যায়েদ, হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) ইবনুল জাররাহ এবং হযরত কাতাদাহ (রা) বিন নুমানের মত জালিলুল কদর সাহাবা শামিল ছিলেন। কিন্তু হুজুর (সা) ১৮ বছর বয়স্ক উসামাকে (রা) সেই বাহিনীর আমীর নিয়োগ করলেন। কতিপয় ব্যক্তি তাতে বিস্ময় প্রকাশ করলেন। এ সময় তিনি গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। তা সত্ত্বেও পবিত্র মাথায় পট্টি বেঁধে হুযরার বাইরে তাশরীফ নিলেন এবং মিম্বরের ওপর বসে খুতবা দিলেন। তাতে তিনি ইরশাদ করলেন ঃ

"আমি, খবর পেয়েছি যে, তোমাদের মধ্য থেকে কতিপয় ব্যক্তি উসামার নেতৃত্ব সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করেছ। হে মানুষেরা! এটা আমার জন্য কোন নতুন কথা নয়। এর পূর্বে তোমরা উসামার পিতা যায়েদকে সেনাবাহিনীর নেতা বানানোর প্রশ্নে অভিযোগ করেছিলে। আল্লাহর কসম! যায়েদ সব ধরনের নেতৃত্বের যোগ্য ছিল এবং সে আমার সীমাহীন প্রিয় ছিল এবং তারপর উসামা আমার নিকট তোমাদের চেয়ে বেশী প্রিয়।"

হযরত যায়েদের (রা) বছরের পর বছর ধরে রহমতে আলমের (সা) পবিত্র খিদমতে কাটানোর সৌভাগ্য হয়েছিল এবং রাসূলে করিম (সা) স্বয়ং তাঁকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। এ জন্য তিনি দ্বীন ও দুনিয়া প্রত্যেক ব্যাপারেই হুজুরের (সা) অনুসরণ করতেন। সবসময় তালি লাগানো ও মোটা কাপড় পরিধান করতেন। নিজের জুতা নিজে মেরামত করতেন। সাধারণত যবের রুটি খেতেন। যবের রুটি পানি অথবা দুধ দিয়ে ভিজিয়ে আনন্দের সঙ্গে খেয়ে নিতেন। জনৈক ব্যক্তি বলেন, "আবু উসামা! আপনি এত ঘাটিয়া বা নিম্নমানের পোশাক পরেন?" হযরত যায়েদ (রা) তার জবাবে বললেন ঃ

"আমাদের মান-ইজ্জত তো শুধুমাত্র ইসলামের কারণে। মূল্যবান পোশাক দিয়ে কি হয়।"

হযরত যায়েদ (রা) যদিও একজন সফল সামরিক অফিসার এবং দূরদর্শী সেনাপতি ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে একজন সাধারণ সিপাহী এবং তাঁর মধ্যে কোন পার্থক্য পরিদৃষ্ট হতো না। তাঁর মধ্যে এমন আবেগ পরিলক্ষিত হয়নি যে, তিনি বাহিনীর সরদার এবং অন্যরা তাঁর অধীনস্থ সিপাহী। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আমের বলেন, হযরত যায়েদ (রা) কোন সফর বা অভিযানে গেলে নিজের জন্য তাঁবু খাটাতেন না বরং রৌদ্রের সময় একটি চাদর কোন বৃক্ষ বা ঝোপের ওপর দিয়ে তার ছায়ায় আরাম করে নিতেন। নিজের সংগীদেরকেও সাদাসিধে জীবন যাপনের হেদায়াত দিতেন। সঙ্গীদের যদি পানির প্রয়োজন হতো তাহলে স্বয়ং পানি ভরে আনতেন। একদিন এক তাঁবুতে নিজের কাঁধের ওপর মশক ভর্তি পানি বহন করে আনছিলেন। জনৈক ব্যক্তি বললেন, "হে আমীর! এটা আমাকে দিন।" তিনি বললেন, "আল্লাহ তায়ালা তোমাকে প্রতিদান দিন। এ কাজ আমি নিজেই করবো। যাতে আমার দিল ও দিমাগে ইমারতের গন্ধ সৃষ্টি না হয়।"

আর্থিক অবস্থার কথা আর বলতে কি! বাড়ীতে শুধুমাত্র খেজুর পাতার পুরাতন মাদুর এবং সাধারণ কয়েকটি বরতন ছাড়া অন্য কোন সামান ছিল না। একবার এক ব্যক্তি তাঁর সীমাহীন সাদাসিধে জীবনের জন্য বিস্ময় প্রকাশ করলে তিনি বললেন, "এই গৃহের আরাম-আয়েশে কি ফায়দা। এ থেকে তো বিদায় নিতেই হবে।"

হযরত যায়েদের (রা) আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি গভীর আকর্ষণ ছিল। রাতে খুব কম শুতেন এবং বেশীরভাগ সময় নামাযে অতিবাহিত করতেন। সারা জীবনই তাহাজ্জুদের নামায পড়েছেন। শেষ রাতে সঙ্গীদেরকেও নামাযের জন্য জাগিয়ে দিতেন। আল্লাহভীতিতে অধিকাংশ সময় অশ্রুসজল থাকতেন। মেহমানদের সঙ্গে অত্যন্ত বিনয় প্রকাশ করতেন। মিসকিন, গরীব, ইয়াতিম, বিধবা এবং অভাবগ্রস্তদের খিদমত ফরজ মনে করে করতেন। সমগ্র জীবন আল্লাহভীতি, রাসূল প্রেম ও আনুগত্য, ইবাদাত ও তাকওয়া এবং খিদমতে খালকের প্রতিচ্ছবি ছিলেন। এসব গুণের কারণেই যায়েদ (রা) রহমতে আলমের (সা) মাহবুব হতে পেরেছিলেন।

হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়াম

নবুওয়াতের প্রথম যুগের ঘটনা। একদিন মক্কায় এক ভীতিপ্রদ খবর রটে গেল। এই অপরা খবর হকপন্থীদেরকে চরম দুশ্চিন্তায় নিক্ষিপ্ত করলো। প্রত্যেকের মুখে একথাই উচ্চারিত হচ্ছিল যে, এটা কি করে সম্ভব? এখনো আবু তালিব জীবিত রয়েছেন এবং বনু হাশিমের তরবারী ভোঁতা হয়ে যায়নি।এই খবর সঠিক ছিল অথবা শুধুমাত্র গুজব তা কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারছিল না। কিছু লোক বলছিল যে, মুহাম্মাদকে (সা) মুশরিকরা গ্রেফতার করেছে। আবার অন্যরা বলছিল যে, হুজুরকে (সা) শহীদ করে ফেলা হয়েছে। বনু হাশিম অত্যন্ত ক্রোধান্বিত অবস্থায় ছিল। এ ব্যাপারে তারা কোন পদক্ষেপ গ্রহণ প্রশ্নে চিন্তা করছিলেন এমন সময় বনু আসাদের একজন যুবকের কানেও এই খবর পৌছলো। ১৬ বছর বয়স্ক বিরাট আকৃতির স্থূলকায় যুবক রহমতে আলমকে (সা) গভীরভাবে ভালবাসতেন। কিছুক্ষণ পূর্বেই সে দুপুরের বিশ্রামের জন্য স্বগৃহে এসেছিলো। এ খবর শুনতেই সে তড়পে উঠলো। খুঁটি থেকে ঝুলন্ত তরবারী নামিয়ে তার খাপ মাটিতে ফেলে দিল এবং তরবারী হাতে মক্কার গলিতে লাফিয়ে পড়লো। তার গতি ছিল রাসূলের (সা) পবিত্র বাসগৃহের দিকে। সে সময় ক্রোধে তার চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল এবং অত্যন্ত দ্রুতগতিতে রাস্তা অতিক্রম করছিল। খুব শীঘ্র সে হুজুরের (সা) গৃহে পৌছে গেল। সেখানে পৌছে সে খুব আনন্দিত হলো। সে দেখলো যে মহানবী (সা) সুস্থ অবস্থায়ই রয়েছেন। হুজুর (সা) হাতে তরবারীসহ যুবককে দেখে মুচকি হাসলেন এবং বললেন, "কি ভাই, ভালোতো। এ সময় তুমি নাঙ্গা তরবারি হাতে কিভাবে এলে?"

যুবকটি আরজ করলো, "হে আল্লাহর রাসূল আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমি শুনেছিলাম যে দুশমনরা আপনাকে গ্রেফতার করেছে অথবা সম্ভবত আপনাকে শহীদ করে ফেলা হয়েছে।"

ইরশাদ হলো : "আচ্ছা, এই কথা! যদি বাস্তবিকই এমন হতো তাহলে তুমি কি করতে?"

যুবকটি নির্দ্বিধায় আরজ করলো : "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম, আমি মক্কাবাসীদের সঙ্গে লড়াই করে মরতাম।" তার জবাব শুনে রহমতে আলমের (সা) চেহারা মুবারকে খুশীর হিল্লোল বয়ে গেল। তিনি

যুবকটির জীবন উৎসর্গের আবেগের প্রশংসা করলেন এবং তার কল্যাণ কামনা করে দোয়া করলেন। এমনকি তার তরবারীর জন্যও দোয়া করলেন। এটিই প্রথম তরবারী ছিল যা হক পথে রাসূলে বরহকের সমর্থনে বুলন্দ হয়েছিল। সত্যিকার রাসূল প্রেমিক এই যুবক ছিল বনু আসাদ গোত্রের প্রস্ফুটিত ফুল সাইয়েদেনা হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়াম।

সাইয়েদেনা হযরত আবু আবদুল্লাহ যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়াম (বিন খুয়ায়েলদ বিন আসাদ বিন আবদুল উজ্জা বিন কুসাই) ইসলামের ইতিহাসে এক মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। নবীর (সা) দরবার থেকে তিনি "হাওয়ারীয়ে রাসূল" উপাধি পেয়েছিলেন। মহানবী (সা) নিজের পবিত্র মুখ দিয়ে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। এভাবে তিনি আসহাবে আশারায়ে মুবাশশিরার মধ্যে পরিগণিত হন। সাইয়েদেনা হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁকে দ্বীনের আরকানের মধ্যে একটি রুকন হিসেবে আখ্যায়িত করতেন। হযরত যোবায়েরের (রা) সঙ্গে রাসূলের (সা) কয়েক ধরনের সম্পর্ক ছিল।

১. তিনি হুজুরের (সা) ফুফু হযরত সুফিয়া (রা) বিনতে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র ছিলেন। এমনিভাবে হুজুর (সা) তার মামাতো ভাই ছিলেন।

২. উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা) হযরত যোবায়েরের(রা) ফুফু ছিলেন। এদিক থেকে প্রিয় নবী (সা) হযরত যোবায়েরের (রা) ফুফা ছিলেন।

৩. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রা) বড় বোন হযরত আসমা (রা) বিনতে আবু বকর সিদ্দীককে (রা) হযরত যোবায়েরের (রা) সঙ্গে বিয়ে দেয়া হয়েছিল। এদিক থেকে হুজুর (সা) তার ভাবরা হন।

৪. হযরত যোবায়েরের (রা) নসবের ধারা কুসাই বিন কিলাবে পৌছে রাসূলের (সা) নসব ধারার সঙ্গে মিলে যায়। এমনিভাবে তারা উভয়েই একই প্রপিতামহের বংশোদ্ভূত ছিলেন।

হযরত যোবায়ের (রা) নবীর (সা) হিজরতের প্রায় ২৮ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শৈশবকালেই পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হন। চাচা নওফিল বিন খুয়ায়েলদ নিজের অভিভাবকত্বে তাকে লালন-পালন করেন। হযরত যোবায়েরের (রা) মাতা হযরত সুফিয়া (রা) অত্যন্ত বাহাদুর এবং শেরদিল মহিলা ছিলেন। সুতরাং তিনি হযরত যোবায়ের (রা) থেকে কঠিন মেহনত ও পরিশ্রমের কাজ নিতেন এবং অনেক সময় তাকে শাসন করতেও দ্বিধা করতেন না। নওফিল বিন খুয়ায়েলদ একদিন ভ্রাতুষ্পুত্রকে মায়ের হাতে মার খেতে

দেখে অস্থির হয়ে পড়লেন এবং হযরত সুফিয়াকে (রা) কঠোরভাবে বাধা দিলেন এবং বললেন যে, এভাবে তুমি ছেলেকে মেরে ফেলবে। তিনি বনু হাশিমের নিকটও সুফিয়া যাতে ছেলের ওপর কঠোরতা অবলম্বন না করে তা বলতে বলেন। যখন একথা সাধারণ্যে প্রচার হয়ে গেল তখন হযরত সুফিয়া(রা) লোকদের সামনে এই গাথা পড়লেন ঃ "যে একথা বলেছে যে, আমি তার (যোবায়ের) সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করি সে ভুল বলেছে। আমি তাকে এ জন্য মেরে থাকি যাতে সে আকলমন্দ হয় এবং শত্রুকে পরাজিত করে ও গনিমতের মাল লাভ করে।

হাফেজ ইবনে হাজার (র) ইসাবাতে লিখেছেন যে, শৈশবকালে হযরত যোবায়েরের (রা) সঙ্গে এক যুবকের মুকাবিলা হয়ে গেল। তিনি এমন মার দিলেন যে, সেই ব্যক্তির হাত ভেঙে গেল। লোকজন হযরত সুফিয়ার (রা) নিকট অভিযোগ করলো। এ সময় তিনি সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তোমরা যোবায়েরকে কেমন পেয়েছো। বাহাদুর অথবা বুয দিল?

মোটকথা মায়ের প্রশিক্ষণের প্রভাবে পরবর্তীতে হযরত যোবায়ের (রা) বিরাট বাহাদুর হতে পেরেছিলেন।

হযরত যোবায়ের (রা) এমন এক বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যে বংশের ওপর ইসলাম সূর্যের কিরণমালা দাওয়াতে হকের প্রথম যুগেই পড়েছিল। তার ফুফু হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা) ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম মহিলা ছিলেন। মাতা হযরত সুফিয়াও (রা) নবুওয়াতের প্রথম যুগে ঈমান এনেছিলেন। ইসলামের আলো তাদের অন্তরকে আলোকিত না করাটা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। বস্তুত তিনি ভিন্ন ভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী আট, বারো অথবা ১৬ বছর বয়সেই দাওয়াতে হককে লাব্বাইক বলেছিলেন। কতিপয় ঐতিহাসিক ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তার ক্রমিক নম্বর চতুর্থ অথবা পঞ্চম বলে লিখেছেন। কিন্তু এটা সঠিক নয়। অবশ্য সাবিকুনাল আউয়ালুনের মধ্যে তিনি বিশেষ স্থান রাখতেন। ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত চাচার স্নেহের আধার ছিলেন। কিন্তু যেই তিনি দাওয়াতে হক কবুল করলেন সেই চাচার আচরণ পরিবর্তন হয়ে গেল এবং সে তার ওপর কঠিন নির্যাতন শুরু করলো। হাফেজ ইবনে কাছির (র) আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে আবুল আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত যোবায়েরের (রা) চাচা চাটাই দিয়ে তাকে পেচিয়ে আগুন উসকে দিয়ে তাতে ধুনি দিত এবং নিজের বাপ-দাদার ধর্মের ওপর ফিরে আসার কথা বলতো। কিন্তু যোবায়ের (রা) প্রতিবারই বলতেন, অবশ্যই নয়, অবশ্যই নয়, "এখন আর আমি কাফের হবো না।"

চাচার নির্যাতন যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন হযরত যোবায়ের (রা) মহানবীর (সা) ইঙ্গিতে হাবশা হিজরাত করলেন। কিছুদিন সেখানে কাটানোর পর মক্কা ফিরে এলেন এবং বাণিজ্যিক পেশা গ্রহণ করলেন। কিছু দিন পর স্বয়ং রহমতে আলম (সা) মদীনা হিজরাত করেন। সে সময় হযরত যোবায়ের (রা) একটি বাণিজ্যিক কাফেলার সঙ্গে সিরিয়া গিয়েছিলেন। যখন তিনি সিরিয়া থেকে মক্কার দিকে ফিরে আসছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) সমভিব্যহারে মদীনা তাশরীফ নিচ্ছিলেন। ঘটনাক্রমে পথিমধ্যে হযরত যোবায়েরের (রা) সঙ্গে তাদের সাক্ষাত ঘটে। এ সময় তিনি হুজুর (সা) ও সিদ্দীকে আকবারের (রা) খিদমতে কিছু সাদা কাপড় হাদিয়া হিসেবে পেশ করেন। অতপর মক্কা তাশরীফ নেন।

কিছুদিন পরই তিনি নিজের মা হযরত সুফিয়া (রা) এবং স্ত্রী আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দীককে (রা) সঙ্গে নিয়ে মদীনা হিজরত করেন এবং কিছুদিন কুবায় অবস্থান করেন। সেখানেই প্রথম হিজরীতে (অন্য এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী দ্বিতীয় হিজরীতে) হযরত আসমার (রা) গর্ভে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন যোবায়ের জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মের পূর্বে কয়েকমাস পর্যন্ত কোন মুহাজির গৃহে সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। এজন্য মদীনার ইহুদীরা গুজব রটিয়ে দিয়েছিল যে, তারা মুসলমানদের ওপর জাদু করে রেখেছে এবং তাদের বংশধারা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ (রা) জন্মগ্রহণ করলে মুসলমানরা সীমাহীন খুশী হলেন। তারা আনন্দের আতিশয্যে এতো জোরে নারায়ে তাকবীর ধ্বনি দিয়েছিল যে, পাহাড় গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল। মুসলমানদের এত খুশীর কারণ ছিল এই শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার কারণে ইহুদীদের জাদুর তেলেসমাতি প্রকাশ হয়ে পড়েছিল।

মহানবী (সা) মদীনায় মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। তখন হযরত যোবায়েরের (রা) ইসলামী ভাই হন হযরত সালমাহ (রা) বিন সালামাহ বিন ওয়াকাশ। তিনি ছিলেন আওস বংশের বনু আবদুল আশহালের একজন সম্মানিত সদস্য এবং বাইয়াতে উকবায়ে কবিরায় অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম। মদীনায় অবস্থানের প্রাথমিক কয়েক বছর হযরত যোবায়েরের (রা) জীবিকা ছিল কৃষি নির্ভর। রাসূলে আকরাম (সা) তাকে বনু নজিরে একটি খেজুরের বাগান এবং অন্যস্থানে কিছু জমি দান করেছিলেন। তা থেকে খুব কম আয় হতো। এ জন্য অত্যন্ত টানাটানিতে দিন কাটতো। পরে তিনি কৃষির সঙ্গে ব্যবসাও শুরু করেন। আল্লাহ তায়ালা তাতে খুব বরকত দিলেন এবং তিনি খুব সচ্ছল হয়ে গেলেন।

হিজরতের পর যুদ্ধের সিলসিলা শুরু হলে হযরত যোবায়ের (রা) প্রতিটি যুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ অটলতা এবং অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। কয়েকবার স্বয়ং হুজুরে আকরাম (সা) তার বীরত্ব ও জীবন উৎসর্গের আবেগের প্রকাশ্যে প্রশংসা করেন। শেরে খোদা হযরত আলী মুরতাজা (রা) তাঁকে আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহাদুর হিসেবে আখ্যায়িত করতেন। হক ও বাতিলের প্রথম যুদ্ধ বদরের ময়দানে সংঘটিত হয়। এ সময় হযরত যোবায়ের (রা) তরবারী দুশমনের ব্যূহের ওপর বিদ্যুৎ বেগে আপতিত হলো এবং তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে ফেললো। তিনি যেদিকে অগ্রসর হতেন সেদিকেই দুশমন বাহিনী কচু কাটা হতো। সেদিন তাঁর মাথায় হলুদ রংয়ের পাগড়ী ছিল। হুজুরের (সা) দৃষ্টি তার ওপর পড়লে বললেন ঃ

"আজ মুসলমানদের সাহায্যার্থে ফেরেশতাও হলুদ পাগড়ী বেঁধে আসমান থেকে নেমে এসেছেন।"

হযরত আসমা (রা) বিনতে আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রচণ্ড যুদ্ধের সময় একজন যুদ্ধবাজ মুশরিক একটি উঁচু টিলার ওপর চড়ে হুংকার ছাড়লো ঃ

"কেউ কি আছে যে আমার মোকাবিলা করবে।"

হুজুর (সা) একজন সাহাবীকে (রা) সম্বোধন করে বললেন, "তুমি কি তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে যাবে? তিনি আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি চাইলে আমি প্রস্তুত আছি।"

ইত্যবসরে মহানবীর (সা) দৃষ্টি পড়লো হযরত যোবায়েরের (রা) ওপর। তিনি নিকটেই বসে ছিলেন এবং ক্রোধে দাঁত কটমট করছিলেন। হুজুর (সা) বললেন, "হে সুফিয়ার (রা) পুত্র দাঁড়াও এবং এই মুশরিকের মোকাবিলা কর।" হযরত যোবায়ের (রা) তীরের মত তার ওপর গিয়ে পতিত হলেন এবং তার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন। উভয়েই খুব শক্তিশালী ছিলেন এবং একে অপরকে টিলা থেকে নীচে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করতে লাগলো। হুজুর (সা) বলেন, "তাদের মধ্য থেকে যে আগে নীচে পড়বে সেই মারা যাবে। তারপর তিনি হযরত যোবায়েরের (রা) জন্য দোয়া করলেন। কয়েক মুহূর্ত পরই উভয়েই নীচে এমনভাবে পড়লো যে মুশরিক নীচে ছিল এবং হযরত যোবায়ের (রা) তার ওপর। চোখের পলকে হযরত যোবায়ের (রা) নিজের তরবারী দিয়ে মুশরিকটির গর্দান উড়িয়ে দিলেন। তারপর হযরত যোবায়ের (রা) কুরাইশের নামকরা বাহাদুর ওবায়দা বিন সাঈদ বিন আছের সঙ্গে মোকাবিলা করলেন।

সহীহ বুখারীর রেওয়ায়াত অনুযায়ী স্বয়ং হযরত যোবায়ের (রা) এই মোকাবিলার অবস্থা এই ভাষায় বর্ণনা করেছেন ঃ

"বদরের দিন আমার মুকাবিলা হয় ওবায়দা বিন সাঈদ বিন আছের সঙ্গে তার আপাদমস্তক লোহায় ঢাকা ছিল। শুধু তার চোখ দেখা যাচ্ছিল। তার কুনিয়ত ছিল আবু জাতুল কারাশ। সে হুংকার দিয়ে বললো, আমি হলাম আবু জাতুল কারাশ। আমি আমার বর্শা দিয়ে তার ওপর হামলা করলাম এবং তাক করে তার চোখে বর্শা মারলাম। সে মারা গেল।"

হযরত যোবায়ের (রা) আবু জাতুল কারাশকে শেষ করে ফেলেছিলেন। এ সময় তিনি তার বর্শা লাশের ওপর পা রেখে খুব মুশকিলের সংগে এমনভাবে বের করলেন যে, বর্শার ফালা বাকা হয়ে গেল। মহানবী (সা) হযরত যোবায়েরের (রা) সেই বর্শা ফেরত নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর নিকট থেকে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) চেয়ে নিলেন। অতপর এই বর্শা ফারুকে আজমের (রা) কব্জায় আসে। ফারুকে আজমের পর হযরত যোবায়ের (রা) এই বর্শা পুনরায় ফেরত নেন। কিন্তু আমিরুল মুমিনীন উসমান (রা) জুন্নুরাইন তাঁর থেকে তা চেয়ে নেন। হযরত উসমানের (রা) শাহাদাতের পর এই বর্শা আলী (রা) পরিবারের নিকট পৌঁছে। অতপর হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রা) তাঁর নিকট থেকে নিয়ে নেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজের কাছে রাখেন।

হযরত যোবায়েরের (রা) যে তরবারী বদরের ময়দানে চমকিত হয়েছিল তাও এই বর্শার মত স্মরণীয় বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। বদরের দিন হযরত যোবায়ের (রা) স্বয়ং তাড়াহুড়োর সময় এই তরবারী এমনভাবে চালান যে তাতে করাতের মত দাঁত পড়ে গিয়েছিল। এই তরবারীতে রূপার কাজ করা ছিল। হযরত যোবায়েরের (রা) শাহাদাতের পর এই তরবারী তাঁর জালিলুল কদর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন যোবায়েরের (রা) কব্জায় আসে। সহীহ বুখারীতে হযরত উরওয়াহ (রা) বিন যোবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ (রা) বিন যোবায়েরের শাহাদাতের পর খলীফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ান উমুব্বী আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"হে উরওয়াহ! তুমি কি যোবায়েরের (রা) তরবারী চিন?

আমি বললাম ঃ "হ্যাঁ।"

আবদুল মালিক জিজ্ঞেস করলো, "তার চিহ্ন কি?"

আমি বললাম, "বদরের দিন তাতে দাঁত পড়ে গিয়েছিল?"

আবদুল মালিক বললেন, "হাঁ ঠিকই বলেছ। দুই বাহিনীর মুখোমুখি সংঘর্ষে তাতে দাঁত পড়ে গিয়েছিল।" তারপর সে আমাকে এই তরবারী দিয়ে দেয়।

উরওয়াহর (রা) পুত্র হিশাম বর্ণনা করেছেন যে, উরওয়াহর (রা) পর সেই পবিত্র তরবারী নিয়ে যোবায়ের (রা) পরিবারে ঝগড়া হয়। আমরা পরস্পর তার মূল্য নির্ধারণ করলাম তিন হাজার দিরহাম এবং আমাদের মধ্যে একজন তা নিয়ে নিল। হায়! আমি যদি তরবারীটা নিয়ে নিতাম।

বদরের যুদ্ধে হযরত যোবায়েরের (রা) কাঁধে এক অথবা দু'টি তরবারীর আঘাত লেগেছিল। দু'টি আঘাতের মধ্যে একটি ছিল গুরুতর। সেই আঘাতের দাগ মিশে গেলেও সেখানে গর্তের মত হয়ে গিয়েছিল। হযরত উরওয়াহ বিন যোবায়ের (রা) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি শৈশবকালে সেই গর্তে আঙ্গুল ঢুকিয়ে খেলা করতেন।

ওহোদের যুদ্ধে হযরত যোবায়ের (রা) সেই চৌদ্দজন স্থাবিত কদম বা অটল সাহাবীর (রা) অন্যতম ছিলেন যারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ্ব নবীর(সা) ঢাল হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও তাদের ধৈর্যের বিচ্যুতি ঘটেনি। হাফেজ ইবনে কাছির (র) ইউনুস বিন ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ওহোদের দিন তালহা বিন আবি তালহা মুশরিকদের ঝাণ্ডাবাহী ছিলো। যুদ্ধের ময়দানে এসে সে মুসলমানদেরকে লড়াইয়ের আহবান জানালো। হযরত যোবায়ের (রা) দৌড়ে তার কাছে গেলেন এবং লাফ দিয়ে তার উটে চড়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে উট থেকে মাটিতে ফেলে দিলেন এবং নিজের তরবারী দিয়ে তাকে জবেহ করে ফেললেন। মহানবী (সা) হযরত যোবায়েরের (রা) প্রশংসা করলেন এবং বললেন ঃ

"প্রত্যেক নবীর একজন করে হাওয়ারী বা সাহায্যকারী থাকতো এবং আমার সাহায্যকারী হলো যোবায়ের (রা)। যোবায়ের (রা) যদি তাকে মুকাবিলার জন্য বের না হতো তাহলে আমি স্বয়ং তার মুকাবিলার জন্য যেতাম।" (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া)

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত যোবায়ের (রা) তালহাকে নয় বরং তার পুত্র কিলাব বিন তালহাকে হত্যা করেছিলেন এবং তালহা বিন আবি তালহার হত্যাকারী ছিলেন হযরত আলী মুরতাজা (রা)। যাহোক, ওহোদের ময়দানে হযরত যোবায়েরের (রা) হাতে মুশরিকদের একজন নামকরা যোদ্ধা অবশ্যই নিহত হয়েছিল।

যুদ্ধকালে এক সময় বিশ্ব নবী (সা) নিজের পবিত্র তরবারী খাপ থেকে বের করলেন এবং বললেন ঃ

"কে আছে যে আজ এর হক আদায় করবে?"

হযরত যোবায়ের (রা) এবং হযরত আবু দুজানা আনসারী (রা) তিনবার এই খিদমতের জন্য নিজেদেরকে পেশ করলেন। অবশেষে হুজুর (সা) এই তরবারী হযরত আবু দুজানাকে (রা) প্রদান করলেন। এ সত্ত্বেও হযরত যোবায়েরের (রা) জীবন উৎসর্গের আবেগ ইতিহাসের পাতায় চিরস্থায়ী হয়ে রইলো।

সহীহ বুখারীতে হযরত উরওয়াহ বিন যোবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, ওহোদের যুদ্ধে রাসূলে আকরাম (সা) যখন আহত হলেন এবং মুশরিকরা চলে গেল, তখন তিনি তাদের পুনরায় ফিরে আসার ধারণায় বললেন, "কে তাদের পিছু নেবে? সাহাবীদের মধ্য থেকে ৭০ জন এ কাজের জন্য এগিয়ে এলেন। এই সত্তর জনের মধ্যে হযরত যোবায়েরও (রা) ছিলেন।

সহীহ বুখারীতে হযরত উরওয়াহর (রা) মুখে হযরত আয়েশা সিদ্দীকার(রা) এই কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে,

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ

(ال عمران : ١٧٢)

সেই সকল সাহাবীর ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল যারা হুজুরের (সা) এরশাদ তামিলে ওহোদের যুদ্ধের পর মুশরিকদের পিছু ধাওয়া করেছিলেন। তাদের মধ্যে হযরত যোবায়ের (রা) এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীকও (রা) ছিলেন।

পঞ্চম হিজরীতে তাওহীদ অনুসারীরা খন্দকের মত কঠিন যুদ্ধের সম্মুখীন হন। এ সময় মুশরিকরা বিরাট এক ঢলের মত এসে মদীনার ওপর হামলা করে বসে। বিশ্ব নবী (সা) মদীনার চারপাশে খন্দক বা পরিখা খনন করে সেই বাহিনীর মুকাবিলা করেন। মুশরিকদের অবরোধ প্রায় তিন সপ্তাহ অব্যাহত ছিল। তখন যদিও কোন বড় যুদ্ধ হয়নি তবুও উভয় পক্ষের মধ্যে মাঝে মধ্যে সংঘর্ষ ঘটেছিল। হাফেজ ইবনে কাছির (র) "আল বিদায়া" গ্রন্থে ইবনে ইসহাকের উদ্ধৃতি সহ বর্ণনা করেছেন যে, পরিখার যুদ্ধের সময় একদিন নওফিল বিন আবদুল্লাহ বিন মুগিরাহ মাখজুমী নিজেদের সেনা ছাউনী থেকে বাইরে বেরিয়ে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য আহবান জানালো। হযরত যোবায়ের (রা) বিদ্যুতবেগে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তরবারী দিয়ে

তাকে দু' টুকরো করে ফেললেন। এ সময় তার তরবারীতে করাতের মত দাঁত পড়ে গেল। নওফিলকে নরকে প্রেরণের পর হযরত যোবায়ের (রা) একটি বীরত্ব গাঁথা পড়তে পড়তে ফিরে এলেন। গাঁথাটির ভাবার্থ হলো ঃ "আমি হলাম সেই ব্যক্তি যে নিজেকেও রক্ষা করে এবং নবী মুস্তাফা উম্মিকেও রক্ষা করে।।"

ইহুদী বনু কুরাইজা এবং মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্বের চুক্তি ছিল। কিন্তু পরিখার যুদ্ধের সময় ইহুদীদের নিয়ত বদলে গেল এবং তারা মুসলমানদের পেছনে খঞ্জর ঢুকিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করতে লাগলো। হক পন্থীদের জন্য এটা ছিল নাজুক সময়। হুজুর (সা) এসব গাদ্দারের অশুভ পরিকল্পনা সম্পর্কে জ্ঞাত হলেন। তিনি মুসলমানদেরকে একত্রিত করে বললেন, "বনি কুরাইজার খবর কে আনবে?" হযরত যোবায়ের (রা) অগ্রসর হয়ে আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি যাবো"।

বিশ্ব নবী (সা) তিনবার নিজের কথার পুনরুক্তি করলেন এবং তিনবারই হযরত যোবায়ের (রা) নিজেকে সেই ভয়ংকর কাজের জন্য পেশ করলেন। হুজুর (সা) তার এই আবেগে খুব খুশী হলেন। সহীহ বুখারীতে হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর (সা) সে সময় একথা ইরশাদ করেছিলেন।

"প্রত্যেক নবীর একজন করে হাওয়ারী হয় এবং আমার হাওয়ারী হলো যোবায়ের (রা)।"

সহীহ বুখারীতেই হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রা) থেকে এই রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে যে, খন্দকের বা পরিখার যুদ্ধে ওমর বিন আবি সালমা এবং আমাকে মহিলাদের সঙ্গে রাখা হয়েছিল। আমি দেখলাম যে, ঘোড়ায় চড়ে যোবায়ের দুই অথবা তিনবার বনি কুরাইজার দিকে গেলেন এবং ফিরে এলেন। সন্ধ্যায় যখন আমার সংগে তাঁর মুলাকাত হলো তখন আমি বললাম আব্বাজান! আমি আপনাকে বনি কুরাইজার দিকে যেতে দেখেছিলাম। হযরত যোবায়ের (রা) বললেন ঃ

"পুত্র! তুমি আমাকে দেখেছিলো?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ"। হযরত যোবায়ের (রা) বললেন ঃ "রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন যে, বনু কুরাইজার খবর কে আনবে। আমি খবর আনার জন্য গিয়েছিলাম। যখন ফিরে এলাম তখন হুজুর (সা) আমার জন্য নিজের মাতা-পিতাকে একত্রিত করলেন এবং বললেন, ফিদাকা আবি ওয়া উম্মি অর্থাৎ আমার মাতা-পিতা তোমার জন্য কুরবান হোক।"

অধিকাংশ চরিতকারই বর্ণনা করেছেন যে, "ফিদাকা আবি ওয়া উম্মি" বাক্যটি রাসূলের (সা) মুখ দিয়ে হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আউওয়াম এবং হযরত সাআদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস ছাড়া আর কারোর জন্যই বের হয়নি। খন্দকের যুদ্ধের পরিণতি হয়েছিল যে, ২২ দিনের অবরোধের পর কাফিররা আসমানী মুসিবত এবং মুসলমানদের অসাধারণ ধৈর্য ও অবিচলতার সামনে টিকতে না পেরে ভেগে গিয়েছিল।

খন্দকের যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই হযরত যোবায়ের (রা) বনি কুরাইজার যুদ্ধে অংশ নেন। তারপর ৬ষ্ঠ হিজরীতে বাইয়াতে রিদওয়ানের দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হন। ৬ষ্ঠ হিজরীতে অথবা সপ্তম হিজরীর শুরুতে খায়বারের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এই যুদ্ধেও হযরত যোবায়ের (রা) জীবন বাজী রেখে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন যে, খায়বারের রঈস মারহাব যখন হযরত আলী মুরতাজার (রা) হাতে নিহত হলো তখন তার বিশাল বপুধারী যুদ্ধবাজ ভাই ইয়াসির ক্রোধান্বিত হয়ে ময়দানে এলো। হযরত যোবায়ের (রা) তার মুকাবিলার জন্য অগ্রসর হলেন। তাঁর আকার-আকৃতি ইয়াসিরের তুলনায় কিছুই ছিল না এবং ধারণা করা হচ্ছিল যে, সে আজ ইয়াসিরের হাত থেকে রেহাই পাবে না। তাঁর মাতা হযরত সুফিয়াও (রা) হুজুরের (সা) সঙ্গে মদীনা থেকে এসেছিলেন। তিনি অস্থির হয়ে হুজুরের (সা) নিকট আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আজ আমার কলিজার টুকরা শহীদ হয়ে যাবে।"

মহানবী (সা) বললেন, "না। ইনশাল্লাহ সে দুশমনের ওপর বিজয়ী হবে।" বস্তুত কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর হযরত যোবায়ের (রা) ইয়াসিরকে হত্যা করলেন।

অষ্টম হিজরীতে যখন দশ হাজার পবিত্র নফসের সৈন্য বাহিনী মক্কায় বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করলেন তখন হযরত যোবায়ের (রা) এক বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তিনি মুহাজিরদের ঝাণ্ডাবাহী হিসেবে নিয়োজিত হন এবং নবীর (সা) বিশেষ ঝাণ্ডা তাকেই প্রদান করা হয়। সহীহ বুখারীতে হযরত উরওয়াহ বিন যোবায়ের (রা) থেকে মক্কা বিজয়ের ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, "একটি বাহিনী এলো যার সংখ্যা অন্যান্য সকল দলের চেয়ে কম ছিল। তাতে রাসূলুল্লাহ (সা) এবং কতিপয় সাহাবী ছিলেন এবং নবীর ঝাণ্ডা যোবায়ের(রা) ইবনুল আউওয়ামের নিকট ছিল।" সহীহ মুসলিমে আছে যে, মক্কা বিজয়ের দিন হযরত যোবায়ের (রা) ইসলামী বাহিনীর বাম বাহুর সরদার ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ চরিতকারই বুখারীর রেওয়ায়াতকে

অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং লিখেছেন, হযরত যোবায়ের (রা) সর্বশেষে ও সবচেয়ে ছোট দলে ছিলেন। রহমতে আলমও (সা) সেই দলে ছিলেন। ঐতিহাসিক ইবনে সায়াদ বর্ণনা করেছেন যে, মক্কা বিজয়ের পর যখন চারদিকে শান্তি নেমে এলো তখন হযরত যোবায়ের (রা) এবং হযরত মিকদাদ (রা) ইবনুল আসওয়াদ কিন্দি নিজের ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে রাসূলের (সা) নিকট উপস্থিত হলেন। এ সময় তাঁরা এক মহান সৌভাগ্যের অধিকারী হন। বিশ্ব নবী (সা) দাঁড়িয়ে তাঁদের চেহারা থেকে ধুলো পরিষ্কার করে দেন।

মক্কা বিজয়ের পর হুনাইনের রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত যোবায়ের(রা) এই যুদ্ধেও বীরত্বের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। এক সময় অনেক মুশরিক নিজেদের ঘাঁটি থেকে বের হয়ে একযোগে হযরত যোবায়েরের (রা) ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হযরত যোবায়ের (রা) একাকী এমন সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সাথে লড়াই করেছিলেন যে, কাফিররা পালিয়ে বেঁচেছিল। হুনাইনের পর হযরত যোবায়ের (রা) তায়েফ ও তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তারপর বিদায় হজ্জে তিনি রহমানবীর (সা) সহযাত্রী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

একাদশ হিজরীতে বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা) ইন্তেকাল করলে হযরত যোবায়েরের (রা) ওপর দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়লো এবং তিনি ভগ্ন হৃদয়ে নির্জনত্ব গ্রহণ করেন। প্রথমে খিলাফত প্রশ্নে তিনি হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুকে (রা) সমর্থন করেন। [হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর শ্বশুর ছিলেন।] কিন্তু তারপর তাঁর ধারণা বদলে যায় এবং কিছুদিন পর তিনি সকল মুসলমানের মত হযরত সিদ্দীকে আকবারের (রা) বায়াত করেন। দুই তিন বছর তিনি অত্যন্ত নীরবভাবে কাটান। তবে, ফারুকে আজমের (রা) খিলাফতকালে তাঁর রক্ত টগবগিয়ে উঠলো এবং নিজের ছোট বয়স্ক পুত্র আবদুল্লাহকে সঙ্গে নিয়ে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর জন্য সিরিয়া পৌঁছলেন। সে সময় সিরিয়ার সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ ইয়ারমুকের ময়দানে সংঘটিত হচ্ছিল। হযরত যোবায়ের (রা) সেই যুদ্ধে বিস্ময়কর বাহাদুরী প্রদর্শন করলেন। সহীহ বুখারীতে তাঁর পুত্র উরওয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলের (সা) সাহাবীরা ইয়ারমুকের যুদ্ধে যোবায়েরকে (রা) বললেন, আপনি প্রচণ্ডভাবে হামলা করেন না কেন যাতে আমরাও প্রচণ্ডভাবে হামলা করতে পারি। তিনি বললেন, আমি যদি প্রচণ্ডভাবে হামলা চালাই তাহলে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে। (অর্থাৎ আমাকে অনুসরণ করতে পারবে না)। লোকেরা

বললো, এমনটি হবে না। হযরত যোবায়ের (রা) কাফেরদের ওপর (এক প্রচণ্ড) হামলা করলেন, এবং তাদের ব্যূহ তছনছ করে সামনে অগ্রসর হয়ে গেলেন। কিন্তু কোন মুসলমান তাকে অনুসরণ করতে পারলো না। তিনি যখন ফিরে আসতে লাগলেন তখন কাফেররা ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেললো এবং তাঁর কাঁধের ওপর দু'টি আঘাত হানলো। বদরের যুদ্ধেও তাঁর কাঁধে একটি আঘাত লেগেছিল। আমি শৈশবকালে সেই আঘাতের ফলে সৃষ্ট গর্তে আমার আঙ্গুল ঢুকিয়ে খেলা করতাম।" এতো শুধু একটি ঘটনা। ওয়াকেদী, তাবারী এবং আরো কতিপয় ঐতিহাসিক ইয়ারমুকের যুদ্ধে হযরত যুবায়েরের (রা) জানবাজী ও সাহসিকতার আরো কয়েকটি ঘটনাও বর্ণনা করেছেন। এসব ঘটনা থেকে জানা যায় যে, তিনি এই রক্তাক্ত যুদ্ধে অন্যতম বিশিষ্ট বাহাদুর ছিলেন।

সিরিয়া বিজয়ের পর ইসলামী মুজাহিদরা হযরত আমর (রা) ইবনুল আছের নেতৃত্বে মিসরের ওপর চড়াও হলেন এবং সেখানকার মশহুর শহর ফুসতাত অবরোধ করলেন। ফুসতাতের দুর্গ খুব মজবুত ছিল এবং মুজাহিদদের সংখ্যা খুব স্বল্প থাকার কারণে হযরত আমর (রা) ইবনুল আছ আমিরুল মুমিনীনের নিকট সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। ফারুকে আজম (রা) চার হাজার সৈন্য হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়াম, হযরত উবাদাহ (রা) বিন ছামেত, হযরত মিকদাদ (রা) বিন আসওয়াদ কিন্দী এবং হযরত মাসলামা (রা) বিন মুখাল্লাদের নেতৃত্বে প্রেরণ করলেন এবং হযরত আমরকে(রা) লিখলেন যে, "তাদের মধ্যেকার প্রত্যেক অফিসার এক হাজার সওয়ারের সমান। এ জন্য এই সৈন্য সংখ্যাকে ৮ হাজার মনে করবেন"। মিসরীয়দের প্রতিরক্ষা এত মজবুত ছিল যে, এই সৈন্য পৌঁছার পরও সাত মাস পর্যন্ত দুর্গ জয় করা যায়নি। একদিন হযরত যোবায়ের (রা) প্রচণ্ডভাবে উত্তেজিত ও আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন এবং সিঁড়ি লাগিয়ে তরবারী হাতে দুর্গের প্রাচীরের ওপর চড়ে বসলেন। আরো কতিপয় মুজাহিদও তাঁকে অনুসরণ করলেন এবং প্রাচীরের ওপর চড়ে তারা নারায়ে তাকবীর ধ্বনি বুলন্দ করলেন। নীচের সৈন্যরাও না'রা দেয়া শুরু করলো। খৃষ্টানরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো। ইতাবসরে হযরত যোবায়ের (রা) প্রাচীর থেকে নেমে দুর্গের দরজা খুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকল ইসলামী সৈন্য ভেতরে ঢুকে পড়লেন। খৃষ্টানরা অস্ত্র সমর্পণ করলো এবং নিরাপত্তা চাইলো। হযরত আমর (রা) তাদের দরখাস্ত কবুল করলেন এবং ফুসতাতের ওপর ইসলামী পতাকা উড়িয়ে দিলেন।

ফুসতাত বিজয়ের পর হযরত যোবায়ের (রা) সিকান্দারিয়া পদানত করার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। সিকান্দারিয়া দুর্গ ছিল খুবই মজবুত।

আর এ কারণেই তা জয় বা পদানত করা অকল্পনীয় ব্যাপার ছিল বলে ধারণা করা হতো। ইসলামী সৈন্যরা দীর্ঘদিন যাবত তা অবরোধ করেছিলেন। অবশেষে একদিন হযরত যোবায়ের (রা) এবং মাসলামা (রা) বিন মুখাল্লাদ সৈন্য বাহিনীর কতিপয় মজবুত দল নিজেদের সঙ্গে নিলেন এবং এমন প্রচণ্ডভাবে হামলা করলেন যে, দুশমনের তাদের আনুগত্য করা ছাড়া আর কোন পথ রইলো না।

তেইশ হিজরীতে সাইয়েদেনা ফারুকে আজম (রা) শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন। তিনি শাহাদাতের পূর্বে হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত তালহা (রা), হযরত যোবায়ের (রা), হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ এবং হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসের নাম মুসলমানদের সামনে পেশ করে ওসিয়ত করলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এই ছ'জন বুজর্গের প্রতি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। এ জন্য আমার পর এই ছ'জনের মধ্য থেকে একজনকে খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে। তারা সকলেই হযরত আবদুর রহমান বিন আওফকে সালিশ মানলেন। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট থেকে ব্যক্তিগতভাবে মত নেয়ার পর হযরত উসমানের (রা) পক্ষে রায় দিলেন। হযরত যোবায়ের (রা) এই নির্বাচনকে কালবিলম্ব না করে মেনে নিলেন এবং হযরত উসমানের (রা) হাতে বাইয়াত করেন। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, এ সময় হযরত যোবায়ের (রা) উদারতা প্রদর্শন করে হযরত আলীর (রা) পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। কিন্তু বেশীরভাগ মত হযরত উসমানের (রা) পক্ষে ছিল। সুতরাং তিনি মজলিসে শূরার সিদ্ধান্তের সামনে মাথা নত করে দিলেন।

আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমানের (রা) খিলাফতকালে হযরত যোবায়ের (রা) পুনরায় নির্জনত্ব গ্রহণ করেন এবং সব ধরনের বিশৃংখলা থেকে দূরে সরে থাকেন। কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে তাঁর প্রচণ্ড প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। একবার নাক দিয়ে রক্ত পড়ার কারণে হযরত উসমান (রা) হজ্জ করতে অক্ষম হয়ে পড়লেন। বরং জীবন সম্পর্কেই নিরাশ হয়ে পড়লেন। এ সময় জনগণের দাবীর পরিপেক্ষিতে তিনি হযরত যোবায়েরকে (রা) আমীরে হজ্জ এবং নিজের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করলেন। তিনি কসম খেয়ে একথাও বললেন যে, অবশ্যই যোবায়ের (রা) তোমাদের মধ্যে উত্তম এবং রাসূলুল্লাহ(সা) তোমাদের চেয়ে তাঁকে বেশী ভলবাসতেন। (সহীহ বুখারী—কিতাবুল মানাকিব)

৩৫ হিজরীতে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীরা মদীনা মুনাওয়ারাতে নিজেদের রাজত্ব কায়েম এবং খলিফার রাসস্থান অবরোধ করে নিলো। এই নাযুক মুহূর্তে

হযরত যোবায়ের (রা) নিজের বড় পুত্র আবদুল্লাহকে (রা) খলিফার বাড়ীতে হেফাজতের জন্য নিয়োগ করলেন। কিন্তু একদিন বিদ্রোহীরা অন্যদিক থেকে প্রাচীর টপকে খলীফার ঘরে ঢুকে পড়লো এবং আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান (রা) জুন্নুরাইনকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে শহীদ করে ফেললো। আমীরুল মু'মিনীনের এই নৃশংসভাবে শাহাদাতে হযরত যোবায়ের (রা) খুব দুঃখ পেলেন। এদিকে বিদ্রোহীরা এত নির্মম ছিল যে তারা আমীরুল মু'মিনীনের(রা) কাফন দাফনেও সম্মত ছিল না। শেষে হযরত যোবায়ের (রা) এবং কতিপয় মুসলমান জীবন বাজী রেখে হযরত উসমানকে (রা) শহীদের কাফন পরান এবং রাতের সময় গোপনে হযরত যোবায়ের (রা) তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং মদীনা থেকে কিছু দূরে হাশ কাওকাব নামক স্থানে তাকে দাফন করেন।

হযরত উসমান গনির (রা) শাহাতাদের পর সাইয়েদেনা আলী মুরতাজা (রা) খলীফার পদে সমাসীন হন। তাঁর খিলাফতকালের প্রথমেই পরিস্থিতি ও ঘটনাবলী ভিন্নদিকে মোড় নেয়। হযরত উসমানের (রা) কিসাসের প্রসঙ্গে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর মুকাবিলায় সংশোধনের ঝাণ্ডা তুলে ধরলেন। হযরত যোবায়ের (রা), হযরত তালহা (রা) এবং অন্য কতিপয় সাহাবী উম্মুল মু'মিনীনের (রা) উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। অন্যদিকে আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী মুরতাজার (রা) সঙ্গেও জালিলুল কদর সাহাবীর একটি বিরাট দল ছিলেন। ৩৬ হিজরীর ১০ই জমাদিউস সানিতে সমকালীন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষদের মধ্যে চরম দুঃখজনক উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসতাদরাকে হাকিমের রেওয়ায়াত অনুযায়ী যুদ্ধ শুরুর পূর্বে সাইয়েদেনা আলী মুরতাজা (রা) একাকী ঘোড়ায় চড়ে ময়দানে তাশরীফ নিলেন এবং হযরত যোবায়েরকে (রা) ডেকে বললেন ঃ

"আবু আবদুল্লাহ! তোমার কি সেদিনের কথা স্মরণ আছে যেদিন আমরা উভয়ে পরস্পর হাত ধরাধরি করে রাসূলের (সা) সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। হুজুর (সা) তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আলীর সঙ্গে কি তোমার বন্ধুত্ব আছে? তুমি ইতিবাচক জবাব দিয়েছিলে। এ সময় হুজুর (সা) বলেছিলেন, একদিন তুমি আলীর সঙ্গে অন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত হবে।"

হযরত যোবায়ের (রা) জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, আমার স্মরণ হয়েছে।"

হযরত আলী (রা) একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে স্বাহিনীতে ফিরে গেলেন। কিন্তু হযরত যোবায়েরের (রা) অন্তরের জগতে পরিবর্তন এলো। তিনি সেই

সময়ই যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে বসরা রওয়ানা হয়ে গেলেন। আমর বিন জারমুজ নামক এক ব্যক্তি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তাঁর পিছু ধাওয়া করলো। হযরত যোবায়ের (রা) বসরা পৌঁছে নিজের গোলামকে সামান ও আসবাবসহ রওয়ানা হওয়ার হেদায়াত দিলেন এবং স্বয়ং বসরার জনবসতি থেকে দূরে চলে গেলেন। এ সময় ইবনে জারমুজ ঘোড়া দৌড়ে তার নিকট পৌঁছলো এবং জিজ্ঞাসা করলো, "আবু আবদুল্লাহ! আপনি কওমকে কেমন রেখে এসেছেন?"

হযরত যোবায়ের (রা) ঃ "লোকজন পরস্পরের রক্ত বহানোর জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে।"

ইবনে জারমুজ ঃ "আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

হযরত যোবায়ের (রা) ঃ "আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি এবং এখন আমি সেই হাঙ্গামা থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে কোন দিকে চলে যেতে চাই।"

ইবনে জারমুজ বললো, তাহলে আমিও আপনার সঙ্গে যাবো। কিছুদূর যাওয়ার পর যোহরের নামাযের সময় হয়ে গেল। হযরত যোবায়ের (রা) নামায পড়ার জন্য নামলেন। ইবনে জারমুজ বললো, আমিও আপনার সঙ্গে নামায পড়বো।

হযরত যোবায়ের (রা) বললেন, "আমি তোমাকে নিরাপত্তা দিচ্ছি। তুমিও কি আমার ব্যাপারে এটা করবে?"

ইবনে জারমুজ বললো, "অবশ্যই।"

এই ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির পর উভয়েই ঘোড়া থেকে নেমে নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। হযরত যোবায়ের (রা) যেই সিজদায় গেলেন সেই আমর বিন জারমুজ গাদ্দারী করে তার গর্দানের ওপর তরবারীর আঘাত হানলো এবং হাওয়ারীয়ে রাসূলের (সা) পবিত্র মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললো। তারপর সে হযরত যোবায়েরের (রা) যিরাহ, তরবারী এবং মাথা নিয়ে আমীরুল মু'মিনীন আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর খিদমতে উপস্থিত হলো। আশা ছিল আমীরুল মু'মিনীন তার কাজের প্রশংসা করবেন। কিন্তু শেরে খোদা হযরত যোবায়েরের (রা) তরবারীর দিকে বেদনার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন ঃ

"এই তরবারী রাসূলের (সা) সামনে থেকে দুশমনের মেঘমালা সরিয়ে দিয়েছে। হে ইবনে সুফিয়ার (রা) হন্তা। তোমার জন্য জাহান্নামের সুসংবাদ।"

বর্ণিত আছে যে, এ সময় ইবনে জারমুজ নিরাশ অবস্থায় এই কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন ঃ

"আমি আমীর (রা) নিকট যোবায়েরের (রা) মাথা নিয়ে হাজির হলাম। এ কাজের বিনিময়ে আমি তার সান্নিধ্য আশা করেছিলাম। আমি যখন তাঁর নিকট গেলাম তখন সে আমাকে জাহান্নামের সুসংবাদ দিলো। এই সুসংবাদ ছিল কত খারাপ আর তোহফাও দিল কত মন্দ।"

শাহাদাতের সময় হযরত যোবায়েরের (রা) বয়স ৬৪ বছর ছিল। শাহাদাতস্থল আসসিবা উপত্যকাতেই তাকে দাফন করা হয়। এই দুঃখজনক ঘটনার কয়েক বছর পূর্বে হযরত যোবায়ের (রা) এবং হযরত আসমার (রা) মধ্যে কতিপয় কারণে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু হযরত আসমা (রা) যেই তাঁর শাহাদাতের খবর পেলেন সেই শোকে ও দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন এবং অবলীলাক্রমে তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হলো এই মরসিয়া ঃ

"ইবনে জারমুজ যুদ্ধের দিন এক বুলন্দ হিম্মত অশ্বারোহীর সঙ্গে গাদ্দারী করলো এবং গাদ্দারীও এমন অবস্থায় করলো যে, সে একাকী ও সামানহীন অবস্থায় ছিল।

হে আমর! তুই যদি পূর্বেই তাকে সতর্ক করে দিতি তাহলে তুই তাকে এমন ব্যক্তি হিসেবে পেতি যে, না তার অন্তরে ভীতি সৃষ্টি হতো এবং না হাত কাঁপতো।

তোর মা তোর জন্য ক্রন্দন করুক। তুই একজন মুসলমানকে (অন্যায়ভাবে) হত্যা করেছিস। তোর ওপর অবশ্যই আল্লাহর আজাব নাযিল হবে।" ইবনে আছিরের বক্তব্য অনুযায়ী হযরত আতিকা (রা) বিনতে যায়েদ এই কবিতা বলেছিল]

হযরত যোবায়ের (রা) জীবনে বিভিন্ন সময়ে সাতটি বিয়ে করেছিলেন। স্ত্রীদের নাম হলো ঃ হযরত আসমা (রা) বিনতে আবুবকর সিদ্দীক (রা), হযরত উম্মে খালিদ (রা) বিনতে খালিদ (রা) বিন সাঈদ বিন আছ, রাবাব(রা) বিনতে আনিফ, যয়নব (রা) বিনতে মুরছাদ, হযরত উম্মে কুলছুম (রা) বিনতে উকবা, হালাল (রা) বিনতে কায়েস এবং আতিকা (রা) বিনতে যায়েদ বিন আমার বিন নোফায়েল।

সহীহ বুখারী থেকে জানা যায় যে, হযরত যোবায়ের (রা) শাহাদাতকালে চার স্ত্রী, ৯ পুত্র এবং ৯ কন্যা রেখে যান। পুত্রদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ(রা), উরওয়াহ (রা), মানযার (রা) [তাঁরা হযরত আসমার (রা)

গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন] এবং মাসরাব (রা) খাবাব (রা) বিনতে আনিফের গর্ভে] ইসলামী ও ইলমী খিদমতের জন্য খ্যাতি লাভ করেন।

হযরত যোবায়ের (রা) খুব দীর্ঘাকৃতির ছিলেন। তিনি যখন ঘোড়ায় সওয়ার হতেন তখন পা মাটিতে ঠেকে যেত। গোধুম বর্ণ এবং মাথায় ছিল ঘন চুল। দাড়ি ছিল হালকা।

বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) হযরত যোবায়েরকে (রা) মদীনার উপকূলে কিছু জমি দান করেছিলেন। এ জমি তিনি স্বহস্তে আবাদ করতেন। খায়বর জয়ের পর হুজুর (সা) তাঁকে বনু নাজিরের একটি খেজুরের বাগান দিয়েছিলেন। হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর হযরত যোবায়েরকে (রা) জরিফ নামক স্থানে একটি জায়গীর দান করেছিলেন। তাঁর পর হযরত ওমর ফারুক (রা) আকিক নামক স্থানে একখণ্ড সবুজ শ্যামল জমি দিয়েছিলেন। বদরী সাহাবী হওয়ার কারণে সরকারের পক্ষ থেকে তিনি যুক্তিযুক্ত বৃত্তি পেতেন। সময় সময় গনিমতের মাল থেকেও প্রচুর পরিমাণ পেতেন। সর্বোপরি আল্লাহপাক তাঁর ব্যবসায়ে প্রচুর বরকত দিয়েছিলেন। এভাবে তিনি ধনীদের কাতারভুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। জমি ছাড়াও বিভিন্নস্থানে তাঁর ১৫টি বাড়ীও ছিল (১১টি মদীনায়, দু'টি বসরায়, একটি কুফাতে এবং একটি মিসরে)। শাহাদাতের সময় তাঁর অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য ছিল আনুমানিক পাঁচ কোটি ২ লাখ দিরহাম কিন্তু নজিরবিহীন উদারতা এবং দানশীলতার জন্য তিনি ২২ লাখ দিরহাম ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। শাহাদাতের পর এই ঋণ তাঁর সম্পত্তি থেকে আদায় করা হয়।

সাইয়েদেনা হযরত যোবায়ের (রা) ফজিলত ও প্রশংসার আসমানে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। রাসূলের (সা) যুগে তিনি সব ধরনের মর্যাদা এবং সম্মান লাভ করেছিলেন। তিনি দ্বীন গ্রহণের প্রশ্নেও এমন অগ্রগামী ছিলেন যে, ১২ অথবা ১৬ বছর বয়সে হক মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরেন। সে সময় এ ধরনের কাজ তরবারীর তীক্ষ্ণ ধারের ওপর জীবন সঁপে দেয়ার নামান্তর ছিল। সেই ভয়ংকর যুগে সর্বপ্রথম মহানবীর (সা) সমর্থনে তরবারী ধরেন, হক পথে সব ধরনের মুসিবত সহ্য করেন এবং দুই হিজরতের সৌভাগ্য লাভ করেন। বদর থেকে শুরু করে তাবুক পর্যন্ত প্রতিটি যুদ্ধেই আশ্চর্য ধরনের বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রমাণ দেন। হক পথে এত আঘাত পেয়েছিলেন যে শরীরের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এমন কোন অংশ ছিল না যা ক্ষতের নিশানা শূন্য ছিল। হাওয়ারীয়ে রাসূলের (সা) সুমহান লকব হাসিল করেছিলেন। বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছিল। রাসূলের (সা) পবিত্র মুখে

জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন। সিরিয়া ও মিসরের জিহাদে নজীরবিহীন বাহাদুরী প্রদর্শন করেন। শাহাদাতের পেয়ালাও পান করেছিলেন এমন অবস্থায় যে, মাথা সিজদাবনত এবং মুখে তাকবীর উচ্চারিত হচ্ছিল।

হযরত যোবায়েরের (রা) চরিত্রও বিভিন্ন ধরনের ফুলে সুশোভিত ছিল। ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে ব্যয়, যুহদ ও তাকওয়া, আল্লাহভীতি, নিজের চেয়ে অন্যকে প্রধান্য দান এবং আমানতদারী ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সহীহ বুখারীতে আছে যে, হযরত যোবায়ের (রা) নিজের সকল বাড়ী (১৫টির মধ্যে ১৫টিই) হক পথে দান (ওয়াকফ) করেছিলেন। এমনিভাবে বাইহাকী মুগিছ বিন সামনী (রা) থেকে এবং আবু নঈম (রা) সাঈদ বিন আজীজ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত যোবায়েরের (রা) এক হাজার গোলাম ছিল। এসব গোলাম প্রতিদিন তাঁকে খিরাজ আদায় করতো (অর্থাৎ তারা যে কাজ করতো তার মজুরির নির্দিষ্ট অংশ হযরত যোবায়েরকে (রা) আদায় করত)। হযরত যোবায়েরের (রা) সকল অর্থ তৎক্ষণাৎ দান করতেন এবং নিজের গৃহে এমনভাবে প্রবেশ করতেন যে, তার নিকট এক দিরহামও অবশিষ্ট থাকতো না।

হযরত যোবায়েরের (রা) দিয়ানত এবং আমানতের খুবই সুখ্যাতি ছিল। লোকেরা শুধু নিজেদের মালমাত্তাই তাঁর নিকট আমানত রাখতেন না বরং মৃত্যুর সময় তাদের সন্তান ও মালের রক্ষক বানানোর আকাংখা প্রকাশ করতো। বস্তুত হযরত উসমান জুন্নুরাইন (রা), হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ এবং হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফের মত জালিলুল কদর সাহাবীবৃন্দ তাঁকে নিজেদের ওসি বানিয়েছিলেন। সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত যোবায়ের (রা) এ জন্য ঋণগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে, লোকজন তার নিকট মাল নিয়ে আসতো এবং আমানত হিসেবে তা রেখে দিত। যোবায়ের (রা) বলতেন যে এতো আমানত নয় বরং অতীত বস্তু। কেননা আমি তা খরচ হয়ে যাওয়ার ভয় করি।

যুহদ ও তাকওয়া এবং আল্লাহভীতির ব্যাপারটা এমন ছিল যে, প্রতিটি ব্যাপারেই নবীর সুন্নাত অনুসরণের চেষ্টা করতেন এবং খুব সাধারণ ব্যাপারেও আল্লাহর ভয়ে কেঁপে উঠতেন। কুরআনে হাকিমে বর্ণিত কিয়ামতের বর্ণনা সম্বলিত কোন আয়াত শুনলেই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়তেন। হযরত যোবায়ের (রা) যদিও হাওয়ারীয়ে রাসূল ছিলেন এবং বছরের পর বছর ধরে রাসূলের ফয়েজ লাভ করেছিলেন তবুও পূর্ণ আল্লাহভীতির কারণে হাদিস কমই বর্ণনা

করতেন। সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রা) তাঁর হাদিস কম বর্ণনার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন ঃ

"আমি যোবায়েরকে (রা) বললাম, আমি আপনাকে রাসূলের (সা) নিকট থেকে হাদিস বর্ণনা করতে শুনি না। যেমন অমুক অমুক হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি বললেন, আমি হুজুরের (সা) সঙ্গ কখনো ত্যাগ করিনি। কিন্তু তাঁকে বলতে শুনেছি যে, যে আমার ব্যাপারে মিথ্যা বলে (অর্থাৎ আমার সঙ্গে মিথ্যা সংশ্লিষ্ট করে) তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।"

হযরত যোবায়ের (রা) থেকে মোট ৩৮টি হাদিস বর্ণিত আছে। এসব হাদিসের অধিকাংশই আখলাক সম্পর্কিত।

ফারুকে আজম (রা) নিজের শাহাদাতের পূর্বে যে ছ'জন বুজর্গকে খিলাফতের জন্য মনোনীত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত যোবায়েরও (রা) ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজের চেয়ে অন্যকে প্রাধান্য দেয়ার স্বভাবের পরিচয় এমনভাবে দিয়েছিলেন যে, হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর সমর্থনে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন এবং মজলিসে শূরা যখন হযরত উসমান জুন্নুরাইনের (রা) সমর্থনে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন তখন তিনি টুশব্দ না করে হযরত উসমানের (রা) বাইয়াত করেন।

হযরত যোবায়ের (রা) সঠিক অর্থে মর্দে মুমিন ছিলেন এবং কোন ব্যক্তিকে হঠাৎ করে অথবা ধোঁকা দিয়ে হত্যা করা কোন অবস্থাতেই বৈধ বা জায়েয মনে করতেন না। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে যে, তিনি যখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রা) সঙ্গে দাওয়াতে ইসলাহ'র বা সংশোধনের দাওয়াতের ঝাণ্ডা উড্ডীন করলেন তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন যে, আপনি ইঙ্গিত দিলে আলীকে (রা) হত্যা করে ফেলবো। তিনি বললেন, তুমি এ কাজ কিভাবে করবে। আলীর (রা) নিকট তো বিরাট বাহিনী রয়েছে। সে বললো, আমি আলীর (রা) বাহিনীতে একজন সিপাহী হিসেবে ঢুকে পড়বো এবং কোন সময় সুযোগ বুঝে তাঁর গর্দান উড়িয়ে দিব। তিনি বললেন, অবশ্যই নয়। আমি রাসূল (সা) থেকে শুনেছি, "হঠাৎ করে হত্যার জিঞ্জির হলো ঈমান। এ জন্য কোন মুমিন কাউকে হঠাৎ করে যেন হত্যা না করে।"

হযরত যোবায়ের (রা) খুব মর্যাদাবান ছিলেন। রাসূলের (সা) কবি হযরত হাসসান বিন ছাবিত তাঁর শানে কাসিদাহ রচনা করেছেন এবং তাতে হযরত যোবায়েরের (রা) মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের ভাষায় বর্ণনা করেছেন। সেই কাসিদার কতিপয় পংক্তি এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

"তিনি নবীর (সা) প্রতিশ্রুতি ও সুন্নাতের ওপর কায়েম ছিলেন। তিনি হলেন হুজুরের (সা) হাওয়ারী এবং কাজেই তার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

তিনি এমন মশহুর অশ্বারোহী এবং বাহাদুর, যিনি সেই দিন হামলা করতেন যখন মানুষ (যুদ্ধের) ভয়ে লুকিয়ে ফিরতো।

রাসূলের (সা) সঙ্গে তাঁর নিকটাত্মীয়ের সম্পর্ক ছিল এবং তিনি সেই ব্যক্তি যাঁর দ্বারা ইসলামের সাহায্য হয়েছে।"

হযরত মিকদাদ (রা) বিন আমর (আল আসওয়াদ)

"হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সে রকম নই যে মূসার (আ) কওমের মত বলে দেব যে,

فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ (المائده - ٢٤)

অর্থাৎ, তুমি এবং তোমার রব গিয়ে লড়াই কর এবং আমরা তো এখানে বসে থাকবো। আমরা তো বরং বলি যে চলুন, যেদিকে আপনার রব আপনাকে হুকুম দিচ্ছেন, সেদিকে চলুন। সেই আল্লাহর কসম যার কুদরতের কব্জায় আমাদের জীবন রয়েছে এবং যিনি আপনাকে হকের সঙ্গে প্রেরণ করেছেন। আমরা আপনার ডাইনে লড়াই করবো এবং বামে লড়াই করবো, সামনে লড়াই করবো এবং পিছনে লড়াই করবো এবং আল্লাহর কসম যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মধ্য থেকে একটি চোখও পলক ফেলবে ততক্ষণ আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করবো না।"

হক এবং বাতিলের প্রথম যুদ্ধ বদরে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে দীর্ঘ দেহী, বলিষ্ঠ, মাথায় ঘন চুল এবং মুখমণ্ডলে সুন্দর দাঁড়ি বিশিষ্ট এক ব্যক্তি অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে উপরিউক্ত বাক্যাবলী মহানবীর (সা) খিদমতে পেশ করছিলেন এবং আনন্দের আতিশয্যে হুজুরের (সা) পবিত্র চেহারা প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। এই বাক্যাবলী শুধু রহমতে আলমকেই খুশী করেনি বরং সে সময় উপস্থিত রাসূলের (সা) সকল পতঙ্গেরই রক্ত উত্তপ্ত করে তুলেছিল। বীরত্বের আবেগে তাদের চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল এবং বাহুর মাশল ফুলে ফুলে উঠছিল। অতপর যখন বিশ্ব নবী (সা) এই সাহাবীর জন্য দোয়া করলেন তখন প্রত্যেকেই ঈর্ষান্বিত হলো যে, হায়! এই বাক্যাবলী যদি তার মুখ দিয়ে বের হতো! ইতিহাসের পাতায় স্থায়ীভাবে অংকিত হয়ে যাওয়া বাণী বলার সৌভাগ্য দ্বীনে হকের যে জীবন উৎসর্গকারীর লাভ হয়েছিল তিনি ছিলেন আবুল আসওয়াদ মিকদাদ (রা) বিন আমর। আত্মোৎসর্গের আবেগের নজিরবিহীন ঘটনা তাঁকে সাহাবায়ে কিরামের (রা) দৃষ্টিতে অত্যন্ত প্রিয় সম্মানের পাত্র বানিয়ে দিয়েছিল। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসুদ বলতেন ঃ

"বদরের যুদ্ধে মিকদাদের সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ আমার নিকট এত প্রিয় যে দুনিয়াপূর্ণ নেয়ামতসমূহও তার সামনে খুবই নগণ্য ব্যাপার।"

বয়স কম হওয়ার কারণে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) বদরের যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। তিনি বলতেন ঃ

"হায়! আমি যদি বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের যোগ্য হতাম এবং এই বাক্যাবলী আমার মুখ দিয়ে বের হতো!"

চরিত গ্রন্থসমূহে হযরত মিকদাদের (রা) পুরো নাম চারভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাহলো ঃ মিকদাদ বিন আমর বাহরাবী, মিকদাদ বিন আমর কিন্দী, মিকদাদ বিন আসওয়াদ আল কিন্দী আল হাজরামী এবং মিকদাদ বিন আল আসওয়াদ কারশী আযযাহরী।

তাঁকে বাহরাবী এ জন্য বলা হয়েছে যে, তাঁর পিতা ও পিতামহের জন্মভূমি ছিল বাহরা। অথবা অন্যসব রেওয়ায়াত অনুযায়ী তাঁর সম্পর্ক ছিল বাহরা বিন আমরের কবিলার সঙ্গে। এই গোত্র হলো কাজায়ার একটি শাখা। বর্ণিত আছে যে, হযরত মিকদাদের (রা) জন্মের পূর্বে তার গোত্রের জনৈক ব্যক্তি প্রতিবেশী কোন ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। সুতরাং মিকদাদের (রা) পিতা আমর বিন সা'লাবা কিসাসের ভয়ে পালিয়ে কিন্দাহ চলে গিয়েছিলেন। এই কিন্দাহ ছিল হাজরা মাওতের (ইয়েমেন) জিলাসমূহের একটি শহর। সেখানে কিন্দী বংশের শাসন ছিল। আমর বিন সা'লাবা বনু কিন্দার সঙ্গে মিত্রতা বা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং একজন কিন্দী মহিলাকে বিয়ে করেন। হযরত মিকদাদ (রা) সেই মহিলার গর্ভে কিন্দাহতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং সেখানেই যৌবনপ্রাপ্ত হন। এই সম্বন্ধের দিক থেকে তাঁকে কিন্দী এবং হাজরামী বলা হয়ে থাকে। হযরত মিকদাদের (রা) তখন যৌবনকাল। বনু কিন্দার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি আবি শামার বিন হাজার আল কিন্দীর সঙ্গে তার ঝগড়া হলো। মিকদাদ (রা) খুব তাগড়া যুবক ছিলেন। তিনি তরবারী দিয়ে আবি শামারকে ঘায়েল করে ফেললেন এবং স্বয়ং নিজের খান্দানসহ পালিয়ে মক্কা গিয়ে উপস্থিত হলেন। এখানে তিনি আসওয়াদ বিন আবিদ ইয়াযুদ কারাশী আযযাহারীর সঙ্গে মিত্রতা পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে তার আশ্রয় গ্রহণ করলেন। শীঘ্রই তিনি নিজের শক্তিমত্তা, বীরত্ব এবং সুন্দর আচরণের মাধ্যমে আসওয়াদ বিন আবদি ইয়াগুছের সুদৃষ্টি ভাজন হলেন এবং সে তাঁকে পোষ্যপুত্র বানিয়ে নিল। এই পোষ্যপুত্রের ভিত্তিতে তিনি মিকদাদ বিন আল আসওয়াদ কারাশীর আযযাহারী নামে খ্যাত হয়ে গেলেন। এটাই কিয়াস করা হয় যে, উদযুহুম লি আবায়িহিম (লোকদেরকে তাদের পিতার সম্বন্ধে ডেকো) এই নির্দেশ নাযিলের পর তাঁকে মিকদাদ বিন আমরই বলা হয়ে থাকতো। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো যে, বিভিন্ন রেওয়ায়াতে তাঁর নাম "মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ"ই বর্নিত হয়েছে।

ঐকমত্য অনুসারে তাঁর কুনিয়াত ছিল আবুল আসওয়াদ। কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে প্রকাশ পায় যে কখনো কখনো হুজুর (সা) স্বয়ং তাঁকে "আবুল আসওয়াদ" বলে ডাকতেন।

মক্কায় হযরত মিকদাদের (রা) অবস্থানের পর কেবলমাত্র কিছুদিন কেটেছিল। এ সময়ের মধ্যেই ইসলামের ধুমধাম পড়ে গেল। যুবক মিকদাদকে আল্লাহ তায়ালা সুশ্রীর সঙ্গে সুন্দর প্রকৃতিও দান করেছিলেন। যেইমাত্র তৌহিদের দাওয়াত তাঁর কানে পৌঁছলো তৎক্ষণাৎ তিনি ইতস্তত না করেই তাতে সাড়া দিলেন এবং নবীর (সা) আস্তানাতে উপস্থিত হয়ে নিজের হাত সারওয়ারে আলমের (সা) পবিত্র হাতে রাখলেন। এটা সেই যুগ ছিল যখন বাহ্যিকভাবে তাওহীদের দাওয়াতের সফলতা অসম্ভব বলে পরিদৃষ্ট হতো এবং তাওহীদের সন্তানদের একটি ছোট্ট দল মুশরিকদের ভয়ানক নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। মিকদাদ (রা) বিদেশী ছিলেন। কিন্তু বুকে ছিল ইস্পাতের অন্তর। পরীক্ষার সময় তিনি বীরত্বের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং অটলতা ও ত্যাগের এমন প্রদীপ জ্বাললেন যা অনন্তকাল পর্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। এক রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি সাত মুসলমানের অন্যতম ছিলেন যাঁরা সর্বপ্রথম সাকিয়ে কাওসারের (সা) পবিত্র হাতে তাওহীদের পাত্র পান করেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য অনেক রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, সে সময় হক পন্থীদের সংখ্যা তার থেকেও বেশী হয়েছিল। যাহোক, তিনি যে অগ্রগামী মুসলমান ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইসলাম গ্রহণের পর অন্যান্য মুসলমানের মত তিনিও মুশরিকদের নির্যাতনের নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। কাফেরদের নির্যাতনের মাত্রা যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন হুজুরের (সা) ইংগিতে হাবশা বা আবিসিনিয়া হিজরত করলেন। সকল চরিতকারই হাবশার দ্বিতীয় হিজরতের ৮৩ জন মুহাজিরের উল্লেখের সময় তাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। হাবশায় একটি সময় পর্যন্ত উদ্বাস্তুর জীবন অতিবাহিত করার পর মক্কা ফিরে এলেন। সে সময় মুসলমানরা মদীনা হিজরতের অনুমতি পেয়েছিলেন এবং তারা অব্যাহতভাবে স্বদেশভূমি ত্যাগ করে মদীনা গমন করছিলেন। হযরত মিকদাদ (রা) এবং তাঁর একজন সঙ্গী হযরত উতবাহ (রা) বিন গাযওয়ানের পথে এমন কিছু বাধা এসে দাঁড়ায় যে, তাঁরা বেশ কিছু দিন যাবত মদীনা রওয়ানা হতে পারেননি। এমনকি বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফাও (সা) হিযরত করে মদীনা তাশরীফ রাখেন। এই রেওয়ায়াত আল্লামা ইবনে আছিরের (রা) তাবকাতে ইবনে সায়াদের এক রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত মিকদাদ (রা) হুজুরের (সা) পূর্বে মদীনা গিয়েছিলেন এবং হযরত কুলসুম (রা) বিন হাদমের বাড়ীতে অবস্থান করেছিলেন। ইবনে আছির

বর্ণনা করেছেন, প্রথম হিজরীর শওয়াল মাসে দুশ' মানুষের সমন্বয়ে গঠিত মক্কার মুশরিকদের একটি সৈন্যবাহিনী আকরামা বিন আবি জেহেলের নেতৃত্বে (অথবা অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী আবু সুফিয়ান) মদীনার দিকে রওয়ানা দেয়। হযরত মিকদাদ (রা) এবং হযরত উতবাহ (রা) বিন গাযওয়ানও কোন বাহানায় সেই বাহিনীতে শামিল হন। রাসূলে আকরাম (সা) মুশরিকদের এই তৎপরতা সম্পর্কে খবর পেয়ে হযরত উবায়দাহ ইবনুল হারিছের (রা) নেতৃত্বে ৬০ জন মুজাহিদের একটি দলকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্য প্রেরণ করলেন। ইতিহাসে এই ঘটনা সারিয়ায়ে নাবেগা নামে প্রসিদ্ধ। মুশরিকরা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে টহল দিয়ে ফিরে গেল। অবশ্য হযরত মিকদাদ (রা) এবং উতবাহ (রা) সুযোগ পেয়ে মুসলমানদের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং তাঁদের সঙ্গে মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছে হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হলেন।

হিজরতের প্রথম যুগে হযরত মিকদাদ (রা) অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে জীবন কাটান। রহমতে আলম (সা) তা জানতে পেয়ে হযরত মিকদাদ (রা) এবং তাঁর মত দু'জন আরো গরীব মুহাজিরের খরচ-খরচা নিজের কাঁধে নিলেন। সহীহ মুসলিমে হযরত মিকদাদের (রা) যবানে বর্ণিত আছে ঃ

একবার আমার ও আমার দুই সঙ্গীর ওপর কঠিন সময় এলো। আমরা সকলেই দারিদ্র্যে পতিত হলাম। এমনকি একবেলার রুটির জন্যও অস্থির থাকতাম। যখন অব্যাহতভাবে অভুক্ত থাকার মত পরিস্থিতির উদ্ভব হলো তখন আমরা সাহাবীদের (রা) নিকট আমাদের খাওয়ানোর আবেদন জানালাম। কিন্তু কেউই আমাদের আবেদনে সাড়া দিলেন না (সে সময় সকলের অবস্থাই করুণ ছিল)। অবশেষে আমরা রাসূলের (সা) খিদমতে হাজির হলাম এবং আমাদের অবস্থা বর্ণনা করলাম। হুজুর (সা) আমাদের তিনজনকেই বাড়ী নিয়ে গেলেন। [মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলের রেওয়ায়াত অনুযায়ী হুজুর (সা) তাদের মেযবান হযরত কুলসুম (রা) বিন হাদামের বাড়ীতে স্থান দিলেন] সে সময় হুজুরের (সা) নিকট শুধু তিনটি (অথবা অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী চার) বকরী ছিল। হুজুর (সা) বকরীগুলোর দুধ পান করতে বললেন। বস্তুত আমরা সে বকরীগুলোর দুধ দোহন করে পান করতাম এবং রাসূলের (সা) অংশ রেখে দিতাম। হুজুর (সা) রাতের বেলা তাশরীফ আনতেন। এসেই তিনি প্রথমে আমাদেরকে আস্তে আস্তে সালাম করতেন। এটা এ জন্য করতেন যে যাতে নিদ্রিত ব্যক্তিরা জেগে না ওঠেন এবং জাগরিতরা শুনে না ফেলেন। অতপর তিনি মসজিদে গিয়ে নামায পড়তেন।

নামায থেকে ফারেগ হয়ে আবার আসতেন এবং নিজের অংশের দুধ পান করতেন। একদিন আমি নিজের অংশের দুধ পান শেষ করেছি। এমন সময় শয়তান আমার অন্তরে ওয়াসওয়াসা বা সন্দেহ সৃষ্টি করলো। শয়তান বললো হুজুর (সা) বেশীরভাগ সময় আনসারদের নিকট কাটান। তাঁরা হুজুরকে (সা) হাদিয়া স্বরূপ খানা-পিনার অনেক জিনিস পেশ করে থাকে এবং তিনি তা খেয়ে থাকেন। তাঁর এই দুধের প্রয়োজন নেই। বস্তুত আমি ধারণা করে সব দুধ পান করলাম এবং হুজুরের (সা) জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখলাম না। কিন্তু দুধ পান করার পর খেয়াল হলো যে, হুজুর (সা) অভুক্ত থাকতে পারেন এবং তিনি যখন নিজের অংশের দুধ পাবেন না তখন আমাকে বদদোয়া দিতে পারেন এবং আমার দ্বীন ও দুনিয়া বরবাদ হয়ে যাবে। এই খেয়াল হতেই আমার শরীরের লোমগুলো খাড়া হয়ে গেল এবং আমি খুব বেচাইন হয়ে পড়লাম। কোনভাবেই আমি শান্তি পাচ্ছিলাম না। ইতিমধ্যে হুজুর (সা) এসে হাজির হলেন। নিয়ম অনুযায়ী খুব নরম স্বরে সালাম করলেন। অতপর নামায পড়লেন তারপর দুধের পাত্র দেখলেন। পাত্রটি শূন্য ছিল। হুজুর (সা) আকাশের দিকে তাকালেন। আমি ধারণা করলাম যে, ব্যস, তিনি এখন আমার জন্য বদদোয়া করবেন এবং আমি বরবাদ হয়ে যাবো।

কিন্তু আমি এ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে বদদোয়ার পরিবর্তে রহমতে আলম (সা) এই দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ! যে আমাকে খাইয়েছে তাকে তুমি খাওয়াও এবং যে আমাকে পান করিয়েছে তাকে তুমি পান করাও।" তারপর আমি চাদর গায়ে জড়িয়ে এই ইচ্ছায় উঠলাম যে, বকরীগুলোর মধ্যে যে বকরীটি সবচেয়ে বেশী মোটা তাজা সেটি জবাই করে তার গোশত ভুনে হুজুরের (সা) খিদমতে পেশ করবো। কিন্তু তিনটি বকরিই যাচাই করে দেখলাম যে, তাদের স্তন দুধে পূর্ণ রয়েছে। আমি একটি পাত্র হাতে নিলাম এবং আল্লাহর নাম নিয়ে তাতে দুধ দোহানো শুরু করলাম। পাত্রটি যখন ভরে গেল এবং তার ওপর ফেনা দেখা যেতে লাগলো তখন আমি সেই দুধ রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে পেশ করলাম। তিনি বললেন, "তুমি কি তোমার অংশ পান করেছো?" আমি আরজ করলাম, "আপনি পান করুন।"

হুজুর (সা) কিছু দুধ পান করে বাকীটুকু আমাকে দিলেন। আমি আরয করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি পান করুন। হুজুর (সা) দ্বিতীয়বার দুধ পান করলেন। কিন্তু পাত্রে কিছু দুধ তবুও রয়ে গেল। তিনি তা আমাকে দিলেন। আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি খুব আসুদাহ হয়ে গেছেন এবং তাঁর দোয়ার বরকতে দুধ শেষ হলো না। তাছাড়া তিনি নিজের দোয়ার বরকতের

মধ্যে আমাকেও অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম এবং এতো হাসলাম যে, মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। হুজুর (সা) জিজ্ঞেস করলেন, "আবুল আসওয়াদ এটা কি?" আমি ঘটনা বিবৃত করলাম। হুজুর(সা) বললেন, "এটা ছিল আল্লাহর রহমত। তুমি তোমার দুই সঙ্গীকে কেন জাগাওনি। তারাও এই দুধ পান করতে পারতো।"

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে সারওয়ারে আলম (সা) মদীনাতে সাহাবায়ে কিরামের (রা) সঙ্গে পরামর্শ করলেন। সে সময় সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং ওমর ফারুক (রা) উদ্দীপনাময় বক্তৃতা পেশ করলেন। তাদের পর হযরত মিকদাদ (রা) সেই মুখলিস কথা বললেন, যা উপরে উল্লিখিত হয়েছে। সে সময় মুসলমানদের সাজ-সরঞ্জামহীনতার অবস্থা এমন ছিল যে, তাদের নিকট সর্বমোট ৭০টি উট এবং দু'টি ঘোড়া ছিল। একটি ঘোড়ার ওপর সওয়ার ছিলেন হযরত হারিছা (রা) বিন সুরাকা আনসারী খাজরাজী। অন্যটির ওপর ছিলেন হযরত মিকদাদ (রা)। বদর পৌঁছে হযরত হারিছা (রা) হাওজ থেকে পানি পান করছিলেন। এমন সময় একজন মুশরিক (অনেকের বক্তব্য অনুযায়ী হাব্বান ইবনুল আরকা) তাকে তাক করে তীর নিক্ষেপ করলো। এই তীর তাঁর গলায় বিদ্ধ হলো এবং লড়াই শুরু হওয়ার পূর্বেই তিনি জান্নাতের পথে যাত্রা করলেন। তাঁর বিধবা মা হযরত রুবাইয়ি (রা) বিনতে নাজার [যিনি হযরত আনাস (রা) বিন মালিকের ফুফু ছিলেন] নিজের ভাগ্যবান পুত্রকে সীমাহীন ভালবাসতেন। যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার অনুগত এতিম পুত্রের ওপর পাগলের মত ফিদা ছিলাম। সে যদি বেহেশতে গিয়ে থাকে তাহলে ভাল। তা না হলে আপনি দেখবেন যে, আমি আমার অবস্থা কি করি।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ

"বেহেশত কি। হারিছাকে তো আল্লাহ তায়ালা জান্নাতুল ফিরদাউস প্রদান করেছেন।"

হযরত রুবাইয়ির (রা) ঠোঁটের ওপর অপ্রত্যাশিত মুচকি হাসি দেখা দিল এবং বলতে লাগলেন, "কি মজা! কি মজা! হে হারিছা।"

হযরত হারিছার (রা) শাহাদাতের পর কাফেরদের একশ' যিরাহ পরিধানকারী সওয়ারের মোকাবিলায় হযরত মিকদাদ (রা) বদরের ময়দানে মুসলমানদের একমাত্র ঘোড় সওয়ার ছিলেন। তিনি ঘোড় সওয়ারী, নিযাহবাজী

এবং তীর নিক্ষেপে পূর্ণ ধরনের নিপুণতা রাখতেন। পরবর্তী পর্যায়ে এমনকি তাঁকে আরবের এক হাজার বাহাদুরের সমান মনে করা হতো। যুদ্ধের ময়দান যখন গরম হয়ে উঠলো তখন তিনি নিজের ঘোড় দৌড় এবং নিযাহবাজীর এমন কৃতিত্ব দেখালেন যে, শত্রুপক্ষ ভীত সন্ত্রস্ত এবং বিমূঢ় হয়ে গেল। তিনি যেদিকে অগ্রসর হতেন মুশরিকদের ব্যূহে আতংক ছড়িয়ে পড়তো। মোট কথা, যুদ্ধের পূর্বে তিনি সারওয়ারে কায়েনাতের (সা) সঙ্গে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা জীবনবাজী রেখে পূরণ করে দেখিয়েছিলেন।

বদরের যুদ্ধের পর হযরত মিকদাদ (রা) ওহোদ, খন্দক এবং সকল মশহুর গাযওয়া বা যুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্ব ও অটলতার সঙ্গে বাহাদুরীর হক আদায় করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে জিকারদ অথবা গাব্বাহর যুদ্ধে তাঁর বিশেষ কৃতিত্বের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে আইনিয়া বিন হাছান ফাযারী মদীনা থেকে কয়েক মাইল দূরে জিকারদের নিকট গাব্বাহর চারণভূমিতে অতর্কিত হামলা চালায় এবং রাখাল হযরত যার (রা) বিন আবু যার গিফারীকে (রা) শহীদ করে হুজুরের (সা) ২০টি দুধালো বকরী হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। ঘটনাক্রমে সে সময় মশহুর সাহাবী হযরত সালমা (রা) ইবনুল আকওয়া এবং রাসুলের (সা) আযাদকৃত গোলাম হযরত রাবাহ (রা) ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সেখানে এসে উপস্থিত। হযরত সালমা (রা) ছিলেন একজন নিপুণ তীরন্দাজ ও দ্রুতগতিসম্পন্ন ঘোড় সওয়ার। তিনি এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখলেন। ফলে হুজুরের (সা) প্রতি ভালবাসা ও দ্বীনের মর্যাদাবোধ তাঁকে অস্থির করে তুললো। প্রথমে তিনি নিকটবর্তী একটি টিলার ওপর চড়ে মদীনার দিকে মুখ করে তিনবার "ইয়া সাবাহাহ'র নারা লাগালেন। অতপর হযরত রাবাহকে (রা) ঘোড়ার ওপর সওয়ার করিয়ে হুজুরকে (সা) খবর দেয়ার জন্য মদীনা রওয়ানা করলেন এবং স্বয়ং একাকী গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে লুণ্ঠনকারীদের ওপর সমানে তীর ও পাথর নিক্ষেপ করলেন। এমনকি তারা উটনীগুলো ফেলে পালিয়ে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই অন্যদের সাহায্য নিয়ে আবার ফিরে এলো এবং হযরত সালমার (রা) জীবন বিপন্ন হয়ে পড়লো। ওদিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে হুজুর (সা) মুসলমানদেরকে লুটেরাদের পিছু ধাওয়া করার নির্দেশ দিলেন। সে সময় সর্বপ্রথম যে তিনজন জানবাজ ঘোড়া দৌড়িয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিলেন তাঁরা ছিলেন হযরত মুহরিয বিন নাজলা আল মুকাল্লাব বিহি আখরাম উসদী (রা), হযরত আবু কাতাদাহ আনসারী (রা) এবং হযরত মিকদাদ (রা) বিন আমর। আখরাম (রা) ঘোড়া দৌড়ে আগে চলে গেলেন এবং আবদুর রহমান ফাযারীর হাতে শাহাদাতপ্রাপ্ত হলেন। তাঁর পিছনে ছিলেন হযরত আবু কাতাদাহ (রা)। তিনি নিজের নিযাহর

সাহায্যে আবদুর রহমানকে জাহান্নামে প্রেরণ করে তৎক্ষণাৎ হযরত আখরামের (রা) প্রতিশোধ নিয়ে নিলেন। ঠিক সেই সময় হযরত মিকদাদ (রা) আবু কাতাদাহ (রা) এবং সালমার (রা) সঙ্গে মিলিত হলেন। এক্ষণে এই তিন জানবাজ লুটেরাদেরকে বর্শার নিশানা বানিয়ে ছাড়লো। ইত্যবসরে হুজুর (সা) প্রেরিত আরও কতিপয় সওয়ার এসে উপস্থিত হলেন। হতভাগা লুটেরারা এবার পালানোর মধ্যেই তাদের কল্যাণ নিহিত বলে মনে করলো। কিন্তু মুজাহিদরা সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাদের পিছু ধাওয়া অব্যাহত রাখলো। রাতে জিকারদ ফিরে এলে সেখানে রাসূলে আকরামকে(সা) পাঁচশ' শসস্ত্র মুজাহিদ দলের সঙ্গে উপস্থিত পেলেন। হুজুর (সা) হযরত সালমা (রা), আবু কাতাদাহ (রা), মিকদাদ (রা) এবং অন্যান্য মুজাহিদের জানবাজীতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। সেই বছরই হযরত মিকদাদ (রা) বাইয়াতে রিদওয়ানে শরীক হওয়ার সম্মান লাভ করেন।

প্রতিনিধি দলের বছর অর্থাৎ নবম হিজরীতে আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহ থেকে নবীর (সা) দরবারে প্রতিনিধিদল আগমন শুরু হলো। এসব প্রতিনিধি দলের অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণের জন্য হাজির হলেন। অবশ্য কতিপয় দল শরীয়তের হুকুম আহকাম শেখার জন্য এবং কতিপয় দল দেশী অথবা পার্থিব লক্ষ্যেও এসেছিলেন। সেই সময় বাহরা থেকেও একটি প্রতিনিধিদল মদীনা পৌঁছে। তারা হযরত মিকদাদের (রা) সগোত্রীয় এবং স্বদেশী ছিলেন। এ জন্য তারা সোজা তাঁর নিকট গমন করেন। হযরত মিকদাদ (রা) তাঁদেরকে স্বাগত জানালেন — আরামের সঙ্গে বসালেন এবং তারপর তাঁদের জন্য হায়েশ তৈরী করালেন। হায়েশ এক ধরনের আরবী সুস্বাদু খাবার। এই খাবার খেজুর, ছাতু এবং ঘি মিলিয়ে তৈরী করা হয়। প্রতিনিধিদল এই খাবার অত্যন্ত উৎসাহের সাথে খেলেন। হযরত মিকদাদ (রা) খাবারের এক পেয়ালা রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে প্রেরণ করলেন। হুজুর (সা) তা থেকে প্রয়োজন মত গ্রহণ করে পেয়ালাটি ফেরত পাঠালেন। এক্ষণে মিকদাদ দু'বেলা সে পেয়ালা মেহমানদের সামনে রাখতেন আর তারা খুব আসুদাহ হয়ে খেতেন। কিন্তু তারপরও কিছু না কিছু হায়েশ বেঁচে থাকতো। একদিন তাঁরা আশ্চর্য হয়ে হযরত মিকদাদকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"আমরা শুনেছি যে, তোমাদের খাদ্য হলো যব এবং খেজুর। কিন্তু যে খাবার তুমি অব্যাহতভাবে কয়েকদিন আমাদেরকে পরিবেশন করছো তা এত সুস্বাদু এবং উত্তম যে, বাড়ীতেও আমাদের তা খুব কম জোটে। তুমি এই খাদ্য কোথা থেকে সরবরাহ করছো।"

হযরত মিকদাদ বললেন, "বন্ধুগণ! আমি অধম কিসের যোগ্য। এতো আমার আকা মুহাম্মাদ (সা)-এর বরকত। হুজুরের (সা) আঙ্গুলি মোবারক এই খানাকে স্পর্শ করেছে।" একথা শুনতেই প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ সমস্বরে বলে উঠলেন ঃ "অবশ্যই মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল।"

এরপর তাঁরা আরো কয়েকদিন মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করেন। তাঁরা কুরআন ও শরীয়তের হুকুম আহকাম শিখেন এবং তারপর স্বদেশ ফিরে যান। দশম হিজরীতে হযরত মিকদাদ (রা) বিদায় হজ্জে প্রিয় নবীর (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।

রাসূলে আকরামের (সা) ওফাতের পর আনসার (রা) ও মুহাজিররা (রা) খিলাফতের সমস্যা সমাধানের জন্য সাকিফায়ে বনু সায়েদা হতে একত্রিত হলেন। এ সময় হযরত মিকদাদ (রা) সেসব সাহাবীর অন্যতম ছিলেন যাঁরা খিলাফতের জন্য হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও যখন বেশীর ভাগ মুসলমান হযরত আবু বকর সিদ্দীককে (রা) খলীফা নির্বাচন করলো তখন তিনিও কিছুদিন পর অন্যান্য অধিকাংশ বিরোধিতাকারী বুজুর্গের মত সিদ্দিকে আকবরের (রা) বাইয়াত করে নিলেন।

হযরত ওমর ফারুকের (রা) শাসনামলে হযরত আমর (রা) ইবনুল আছ মিসরে সামরিক অভিযান চালান। এ সময় মিসরীয়রা বিরাট লোক-লশকর এবং সাজ-সরঞ্জামসহ মুসলমানদেরকে প্রতি পদে পদে বাধা দেয়। হযরত আমরের (রা) নিকট খুব কম সৈন্য ছিল। তিনি খিলাফতের দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁর বার্তা পেতেই চার হাজার সিপাহী এবং চারজন অফিসার তাঁকে সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি এ সময় লিখে পাঠান যে, এসব অফিসারের প্রত্যেকেই এক হাজার মানুষের সমান। এই অফিসাররা ছিলেন হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়াম, হযরত মিকদাদ (রা) বিন আমর, হযরত উবাদাহ (রা) বিন ছামেত এবং হযরত মাসলামা (রা) বিন মুখাল্লাদ। এই সাহায্য পৌঁছার কারণে হযরত আমর (রা) ইবনুল আছের হাত খুব শক্তিশালী হলো এবং মুসলমানরা কিছুদিনের মধ্যেই মিসরের মাটিতে ইসলামের ঝাণ্ডা পতপত করে উড়িয়ে দিলেন। এ অভিযানের সময় হযরত মিকদাদ (রা) এবং অন্যান্য অফিসারবৃন্দ যে অসাধারণ সাহসিকতা, হিম্মত ও বাহাদুরী প্রদর্শন করেছিলেন, ঐতিহাসিকরা তা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, মিসর গমনের পূর্বে হযরত মিকদাদ (রা) সিরিয়ার জিহাদেও অংশগ্রহণ

করেছিলেন। আল্লামা ইবনে কাছির (রা) ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিখ্যাত সাহাবীবৃন্দের মধ্যে হযরত মিকদাদের (রা) নাম বিশেষভাবে নিয়েছেন এবং "আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া" গ্রন্থে লিখেছেন, যুদ্ধ শুরুর পূর্বে তিনি সূরায়ে আনফাল এবং সুরায়ে তওবা তিলাওয়াতকারী অন্যতম ক্বারী ছিলেন।

রাসূলের (সা) দরবার থেকে হযরত মিকদাদ (রা) মদীনার বনি আদিলা মহল্লায় জমি লাভ করেছিলেন। তারপরও তিনি জরফে জায়গীর পেয়েছিলেন। জরফ ছিল মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। শেষে হযরত মিকদাদ (রা) সেখানে গিয়েই স্থায়ী বাসিন্দা হন। হাফেজ ইবনে হাজার (র) লিখেছেন, মিকদাদ (রা) এমনিতেই মোটাসোটা মানুষ ছিলেন। কিন্তু শেষ বয়সে তাঁর পেট অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়েছিল (সম্ভবত তিনি ইসতিসকা নামক ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন)। তার একজন রোমক গোলাম তাকে অস্ত্রপচার করেন। কিন্তু ব্যাধি সারার পরিবর্তে কষ্ট আরো মারাত্মক আকারে বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় তিনি ৩৩ হিজরীতে পরপারের ডাকে সাড়া দেন। সে সময় তাঁর বয়স ৭০ বছর অতিক্রম করেছিল। লাশ জরফ থেকে মদীনা আনা হলো। আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান (রা) বিন আফফান স্বয়ং নামাযে জানাযা পড়ান। তারপর হাজার হাজার মুসলমান অশ্রু ভারাক্রান্ত নেত্রে রাসূলের (সা) সেই জানবাজ সাহাবীর লাশ কারী' গোরস্তানে দাফন করেন।

হযরত মিকদাদ (রা) বিন আমরের স্থান সেসব সাহাবীর মধ্যে পরিগণিত যাঁদের মর্যাদা ও ফজিলতের ব্যাপারে মুসলমানদের সকল থট্‌স অব স্কুলের চিন্তা নায়কগণ ঐকমত্য পোষণ করেন। ঈমানী আবেগ ও জীবন উৎসর্গের জযবার বদৌলতে তিনি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের (সা) প্রিয়পাত্র হতে পেরেছিলেন। একবার রাসূলে আকরাম (সা) বলেছিলেন, আল্লাহ পাক আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, চার ব্যক্তির সঙ্গে মুহাব্বত রাখো এবং আল্লাহ আমাকে খবর দিয়েছেন যে, তিনিও সেই চার ব্যক্তিকে ভালবেসে থাকেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, তারা কারা? তিনি বললেন, আলী (রা), মিকদাদ (রা), সালমান (রা) এবং আবু যর (রা)।

আল্লামা ইবনে আবদুল বার (র) ইসতিয়াবে সঠিক সনদসহ এই রেওয়ায়াত উল্লেখ করছেন যে, রাসূলে করিম (সা) এক ব্যক্তিকে কুরআন শরীফ পড়তে শুনলেন। সে নিজের কণ্ঠস্বরকে কুরআনের সঙ্গে উঁচু করছিল। হুজুর (সা) বললেন, এই ব্যক্তি ইবাদাতগুজার মানুষ। অন্য একজনও নিজের কণ্ঠস্বর উঁচু করছিলো হুজুর (সা) বললেন, এই ব্যক্তি নিজেকে প্রদর্শন করছে। লোকজন গিয়ে দেখলো যে প্রথম ব্যক্তি ছিলেন মিকদাদ (রা)। ইমাম মুহাম্মাদ

বাকের (র) বলেছেন, মিকদাদ (রা) এমন ব্যক্তি যাঁর কখনো সন্দেহ হয়নি এবং হক পথ থেকে সরে যাওয়ার কোন চিন্তাও হয়নি।

কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে প্রকাশ পায় যে, হযরত মিকদাদ (রা) কুরআনের হাফেজ ছিলেন এবং লোকদেরকে কুরআন তালিম দিতেন।

আল্লামা শেখ মুস্তাফা সাদেক রাফেয়ী নিজের কিতাব "ইজাযুল কুরআনে" লিখেছেন যে, "মুসলমানরা বিভিন্ন দিকে চলে গেলেন এবং প্রত্যেক শহরের লোকজন অবশিষ্ট হাফেজদের মধ্য থেকে কোন একজনের নিকট থেকে কুরআন শিক্ষা শুরু করলেন। বস্তুত দামেস্ক ও হেমসবাসী হযরত মিকদাদ(রা) বিন আসওয়াদের নিকট থেকে কুরআন শিখেছিলেন।"

সহীহ বুখারীতে আছে যে, রাসূলের যুগে অপরাধীদের হত্যা করার কাজে নিয়োজিত সাহাবীদের মধ্যে হযরত মিকদাদ (রা) অন্যতম। হযরত মিকদাদ (রা) ছিলেন একজন মরদে সিপাহী। তিনি সাদাসিধে ও স্পষ্টবাদী ছিলেন। কতিপয় কারণে তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত শাদী করতে পারেননি। একদিন হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ জিজ্ঞাসা করে বসলেন, মিকদাদ (রা) তুমি বিয়ে কেন করছো না? স্বতস্ফূর্তভাবে জবাব দিলেন, "তোমার কন্যাকে আমার সঙ্গে বিয়ে দাও।" হযরত আবদুর রহমান (রা) তাঁর এই জবাবে খুব ক্ষুব্ধ হন এবং তাঁকে কঠোর কথা শুনান। হযরত মিকদাদ (রা) নবীর (সা) দরবারে এ ব্যাপারে অভিযোগ করলে তিনি বললেন ঃ

"কেউ যদি তোমার সংগে মেয়ে বিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে আমি তোমার সঙ্গে আমার চাচার মেয়েকে বিয়ে দেব।"

সুতরাং এরপর হুজুর (সা) হযরত দাবায়াহ (রা) বিনতে যোবায়ের বিন আবদুল মুত্তালিবের সঙ্গে হযরত মিকদাদের বিয়ে দেন। এভাবে প্রিয় নবীর (সা) সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনেরও সৌভাগ্য লাভ ঘটে।

হযরত মিকদাদ (রা) প্রিয় নবীর খুব প্রিয় ছিলেন। তিনি রাসূলের (সা) প্রতি পতঙ্গের মত ফিদা ছিলেন এবং তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান অর্জনে টু শব্দটি করতেন না। অনেক সময় এমনও হতো যে, যদি কোন সাহাবী হুজুরের (সা) নিকট সরাসরি কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে না পারতেন তাহলে হযরত মিকদাদকে (রা) মাধ্যম বানাতেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, একবার হযরত আলী (রা) রাসূলের (সা) নিকট হযরত মিকদাদের (রা) মাধ্যমে একটি বিশেষ মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

হযরত মিকদাদ (রা) লৌকিকতা ছাড়াই রাসূলের (সা) নিকট মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করতেন। তার প্রমাণ সহীহ মুসলিমের এই হাদিসেই পাওয়া যায়।

"মিকদাদ (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কাফেরদের মধ্যে কারো সঙ্গে যদি আমার সংঘর্ষ বেধে যায় এবং সে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকে। তারপর তরবারী দিয়ে আমার একটি হাত কেটে দেয়। অতপর আমার থেকে বাঁচার জন্য কোন বৃক্ষের আশ্রয় নেয় এবং বলে যে আমি একমাত্র আল্লাহর জন্য ইসলাম কবুল করছি, তাহলে হে আল্লাহর রাসূল! এই কালেমা উচ্চারণের পর আমি কি তাকে হত্যা করতে পারি? তিনি বললেন, অবশ্যই নয়। আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! সে তো এই কালেমা তখন উচ্চারণ করেছে যখন প্রথম আমার হাত কেটে নেয়। অতপর আমি তাকে কেন হত্যা করবো না। তিনি বললেন, কখনই হত্যা করবে না। কেননা যদি তাকে হত্যা করো তাহলে সে এখন এমন মর্যাদা সম্পন্ন মুসলমান হয়ে যাবে যেমন তুমি তার হত্যার পূর্বে ছিলে। আর এখন তোমার রক্ত তেমনি হালাল হবে যেমন কালেমা পাঠের পূর্বে তার ছিল।"

একবার জনৈক ব্যক্তি তাঁর স্থূল দেহ নিয়ে উপহাস করে বললো "আবুল আসওয়াদ আল্লাহ তায়ালা জিহাদে শরীক হওয়া থেকে তোমাকে মাফ করে দিয়েছেন।" তিনি তৎক্ষণিক জবাব দিলেন, "না ভাই না।" আল্লাহর নির্দেশ হলো ঃ

انْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط

"পাতলা হও, অথবা ভারী হও বের হয়ে পড়ো এবং নিজের ধন সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পাথে জিহাদ কর।" (আত তাওবাহ ৪১)

তিনি তোষামোদী ও চাটুকারিতাকে ঘৃণা করতেন। সহীহ মুসলিমে আছে, একবার হযরত উসমানের (রা) খিলাফত কালে এক ব্যক্তি আমিরুল মুমিনীনের সামনে তার প্রশংসা করতে লাগলো। হযরত মিকদাদ (রা) তা শুনছিলেন। তিনি উঠে হয়ে পাথরের টুকরো উঠালেন এবং সেই ব্যক্তির মুখের ওপর নিক্ষেপ করতে লাগলেন। হযরত উসমান (রা) বললেন, হা, হা কি করছো। মিকদাদ (রা) জবাব দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "যখন তোষামোদকারীকে দেখবে তখন তার মুখের ওপর মাটি নিক্ষেপ করবে।"

হযরত মিকদাদের (রা) জীবনে যদিও রাসূলের (সা) জন্য জীবন উৎসর্গকরণ ও জিহাদের প্রেরণা সবচেয়ে বেশী প্রোজ্জ্বল দিক তবুও রাসূলের (সা) সঙ্গে সুদীর্ঘ সুহবতের ফলে তিনি মর্যাদাবান সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কতিপয় মাসয়ালায় তিনি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন এবং লোকদেরকে তা শিক্ষাও

দিতেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আবদুর রহমান বিন জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, একদিন আমরা মিকদাদ (রা) ইবনুল আসওয়াদের নিকট বসেছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তাঁকে বললো মুবারক এই দুই চক্ষু। যে চক্ষু রাসূলের (সা) দর্শন লাভ করেছে। খোদার কসম। আমাদের আকাংখা হয় যে আপনি যা কিছু দেখেছেন আমরাও তা দেখি এবং যেসব স্থানে আপনি গেছেন আমরাও সেসব স্থানে যাই। একথা শুনে মিকদাদ (রা) অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। আমি খুব আশ্চর্যান্বিত হলাম এই ভেবে যে সেই বেচারাতো কোন খারাপ কথা বলেনি। বরং ভাল কথাই বলেছিল। অতপর মিকদাদ (রা) তার দিকে মনোযোগী হয়ে বললেন, যে যুগে আল্লাহ তায়ালা তাকে পয়দাই করেননি সে যুগে থাকার আকাংখা তার কি করে হলো। সে যদি সেই যুগে জন্ম নিত তাহলে তার ধৈর্য ও অটলতার কি অবস্থা হতো কে জানে। খোদার কসম। রাসূলের (সা) যুগে এমন লোকও ছিল যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা উপুড় করে দোযখে নিক্ষেপ করেছেন। কারণ, তারা রাসূলের (সা) দাওয়াত কবুল ও তাঁকে সত্য নবী হিসেবে মেনে নেয়নি। তুমি সেই যামানার হওয়ার আকাংখা তো করো কিন্তু আল্লাহর শোকর আদায় করো না। আল্লাহই তোমাকে এমন যুগে সৃষ্টি করেছেন যে, জ্ঞান হতেই তুমি নিজের সৃষ্টিকর্তাকে চিনে নিয়েছ এবং দ্বীনে হকের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছ। এই পথের মুসিবতসমূহ অন্যরা উঠিয়েছে এবং তুমি তা থেকে মাহফুজ থেকেছ। আল্লাহর কসম! আল্লাহ তায়ালা রাসূলকে (সা) খুব কঠিন সময়ে প্রেরণ করেছিলেন। যুগটি এমন ছিল যখন জনগণের নিকট মূর্তিপূজা ছাড়া উত্তম কোন দ্বীন ছিল না। সে সময় তিনি এমন এক কিতাব নিয়ে আসেন যা হক ও বাতিলকে পৃথক করে দিয়েছে। তারই ফলশ্রুতিতে পুত্রকে পিতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। এমনিভাবে এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তায়ালা ঈমান আনয়নের সৌভাগ্য দিয়েছিলেন সে নিজেকে মুসলমান হিসেবে দেখতে পেত। আর তার পিতা, পুত্র ও ভাইকে দেখতো কাফের রূপে। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তারা যদি ঐ অবস্থায় মারা যায় তাহলে দোযখে যাবে। এই বিশ্বাস ও আস্থার পরও তার চোখ কি করে শীতল থাকতে পারে। এই কথা আল্লাহ পাক এই আয়াতে ইরশাদ করেছেন,

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ

"যারা এই দোয়া করে হে আমাদের পরওয়ারদিগার আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের তরফ থেকে আমাদের চক্ষুকে শীতল করে দাও।"

(আল ফুরকান ৭৪)

হিজরতের পর কিছুদিন হযরত মিকদাদ (রা) অত্যন্ত দারিদ্রে কাটিয়ে ছিলেন। তারপর ব্যবসা শুরু করেন এবং বেশ সচ্ছল হন। হযরত মিকদাদের (রা) স্ত্রী হযরত দাবায়াহ (রা) বিনতে যোবায়ের থেকে বর্ণিত আছে যে একদিন হযরত মিকদাদ (রা) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দানের জন্য ঘর থেকে বাইরে গেলেন এবং বাকী' গারকাদের নিকট এক বিরাণ স্থানে বসলেন। হঠাৎ করে তার নিকটের এক গর্ত থেকে একটি বড় ইঁদুর একটি দিনার এনে তার সামনে রাখলো এবং সে বারবার একইভাবে একেকটি দিনার এনে রাখতে লাগলো। এমনিভাবে হযরত মিকদাদের (রা) সামনে ১৭টি দিনার জমা হলো। তিনি দিনারগুলো নিয়ে সরওয়ারে আলমের (সা) খিদমতে হাজির হলেন এবং সকল ঘটনা বর্ণনা করলেন, হুজুর (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ইঁদুরের গর্তে হাত ঢুকিয়েছিলে? তিনি আরজ করলেন, খোদার কসম, না। হুজুর (সা) বললেন, "তাহলে এই মালে কোন সাদকা দিতে হবে না। আল্লাহ তাতে বরকত দিন।"

দাবায়াহ (রা) বলেন, "দিনারগুলোর শেষটি তখনও শেষ হয়নি। এই অবস্থায় আমি রৌপ্যের স্তূপ মিকদাদের (রা) ঘরে দেখে নিয়েছিলাম" অর্থাৎ তিনি সচ্ছল হয়ে গিয়েছিলেন। বদরী সাহাবী হওয়ার কারণে হযরত মিকদাদ (রা) প্রচুর ভাতাও পেতেন এবং জরফ ও খায়বারে জায়গীরও পেয়েছিলেন। ওফাতের পর খায়বারের জায়গীর আমীর মাবিয়া (রা) তাঁর উত্তরাধিকারদের নিকট থেকে একলাখ দিরহাম দিয়ে খরিদ করেছিলেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে দাবায়াহ (রা) বিনতে যোবায়ের থেকে শুধুমাত্র একটি মেয়ের কথা জানা যায়। মেয়েটির নাম ছিল কারিমাহ।

হযরত মুসয়াব (রা)
বিন উমায়ের

উমায়ের বিন হাশিমের পুত্র মুসয়াব (রা) শুধু বনু আবদিদ দারের যুবকদের ইজ্জত-আবরুই ছিলেন না বরং সমগ্র মক্কায় তাঁর মত সুর্দশন, ছিমছাম এবং প্রফুল্ল চিত্তের যুবক কেউই ছিলো না। আল্লাহ তায়ালা তাঁর পিতা-মাতাকে অগাধ ধন-সম্পদ এবং সচ্ছলতার নিয়ামত দান করেছিলেন। তাঁরা স্বীয় পুত্রকে অত্যন্ত প্রাচুর্যের মধ্য দিয়ে লালন পালন করেন। মুসয়াবের (রা) যৌবনকাল সৌন্দর্য এবং পরিচ্ছন্ন প্রিয়তার অত্যন্ত সুন্দর মিশ্রণ ছিল। তিনি সর্বোত্তম রেশমী কাপড় পরিধান এবং ভাল সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। যে গলি দিয়ে যেতেন সেই গলি সুগন্ধিতে সুবাসিত হয়ে যেত। যে কাপড় তিনি পরতেন তার এক জোড়ার মূল্য ছিল দু'শ দিরহাম। সে যুগে অর্থের এই পরিমাণ নিঃসন্দেহে বিরাটই ছিল। পায় থাকতো হাজারামী পাদুকা মধ্যম দেহী এই যুবক বেশীরভাগ সময় সাজ-গোজ এবং মাথার চুল সুন্দর বানানোর কাজেই ব্যয় করতেন। কিন্তু সুদর্শন ও প্রফুল্লচিত্ত হওয়ার পরও তিনি অত্যন্ত পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। প্রিয় নবী (সা) যখন দাওয়াতে হকের কাজ শুরু করেন তখন মুসয়াবের (রা) পবিত্র ও পরিষ্কার দিমাগ তা সঙ্গে সঙ্গে কবুল করে। হকপন্থীরা সে সময় অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে কাল কাটাচ্ছিলেন। মুশরিকরা জুলুম-নির্যাতনের মাধ্যমে তাওহীদপন্থীদের জীবন সম্পূর্ণরূপে দুর্বিসহ করে রেখেছিল এবং রহমতে আলম (সা) কতিপয় জীবন উৎসর্গকারীসহ হযরত আরকাম (রা) বিন আবিল আরকামের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

সেই ভয়াবহ সময়ে যুবক মুসয়াব (রা) একদিন রহমতে আলমের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে ঈমানের পেয়ালা পান করে হুজুরের (সা) হাতে বাইয়াত করলেন। তারপর তিনি প্রায়ই রাসূলের (সা) দরবারে হাজির হতেন এবং তাঁর ফয়েজে যতদূর সম্ভব অভিষিক্ত হতেন।

প্রথমদিকে হযরত মুসয়াব (রা) ইসলাম গ্রহণের কথা স্বগৃহে গোপন রেখেছিলেন। তাতে দু'ধরনের উপযোগিতা ছিল। প্রথমত তিনি তার স্নেহশীল আম্মাকে দুঃখ দিতে চাইতেন না। কারণ তিনি তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভাল

বাসতেন। দ্বিতীয়ত তিনি আম্মার নিকট থেকে এত পরিমাণ আর্থিক সাহায্য নিতেন যে সেই অর্থ মজলুম দ্বীনি ভাইদেরকে দান করতেন। কিন্তু এই লুকোচুরিতো বেশী দিন চলতে পারে না। একদিন কা'বা শরীফের চাবি বাহক উসমান বিন তালহা (যিনি তখনও মুসলমান হননি) তাকে কোথাও একক আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ইবাদাত করতে দেখলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর মা ও পরিবারের অন্যান্যদের নিকট গিয়ে বললেন ঃ

"তোমরা তো মুসয়াবের জন্য জীবন দিয়ে ফেলো। আর সেতো মুহাম্মাদকে (সা) কানের দুল বানিয়ে ফিরছে।"

হযরত মুসয়াবের (রা) মা খানাস বিনতে মালিক এবং বংশের অন্যান্যদের ওপর এ খবর বিদ্যুতের মত আপতিত হলো। মুসয়াবের (রা) প্রতি তার গভীর ভালবাসা সীমাহীন ঘৃণায় পরিবর্তিত হলো। প্রথমতো তিনি তাঁকে খুব কিল থাপ্পড় মারলেন। তারপর রশি দিয়ে বেঁধে একাকী কয়েদ করে রাখলেন। মুসয়াব (রা) দ্বীনে হক থেকে মুখ ফিরিয়ে পুনরায় আম্মা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ ভালবাসার মুখাপেক্ষী হতে পারতেন। কিন্তু তাওহীদের পেয়ালা বা আকর্ষণ তাকে এমন নেশাগ্রস্ত করে ফেলেছিল যে, আরাম-আয়েশের বঞ্চনা এবং কয়েদ ও বন্দীত্বের মুসিবতকে তিনি হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছিলেন। এত নির্যাতনের পরও তিনি দ্বীনে হক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া বরদাশত করেননি। কিছুদিন এভাবেই অতিবাহিত হলো। এদিকে মুসলমানদের সঙ্গে কাফেরদের আচরণ ক্রমেই কঠিনতর হতে লাগলো। এমনকি রাসূলে করিম (সা) নির্যাতিত মুসলমানদেরকে আবিসিনিয়া বা হাবশা হিজরতের অনুমতি দিলেন। সুতরাং ১২ জন পুরুষ ও চারজন মহিলার একটি ছোট কাফেলা তৎক্ষণাৎ হিজরতের জন্য এগিয়ে এলেন। হক পথে সর্বপ্রথম স্বদেশ ভূমি ছেড়ে বিদেশ বিভুঁইয়ে গমনকারীদের মধ্যে হযরত মুসয়াবও (রা) শামিল ছিলেন। সুযোগ পেয়ে তিনি নির্যাতনের জিন্দানখানা থেকে পালিয়ে সেই কাফেলার সঙ্গে আবিসিনিয়া গিয়ে উপস্থিত হলেন। আল্লাহর পথে মুহাজিরদের আবিসিনিয়ায় কেবলমাত্র তিন মাসই অতিবাহিত হয়েছিল। এমন সময় তারা খবর পেলেন যে, মক্কার কুরাইশরা মুসলমান হয়ে গেছেন [অথবা রাসূলে আকরামের (সা) বিরোধিতা ত্যাগ করেছেন]। আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) এবং বালাজুরির (র) বর্ণনামতে, এ খবর শুনে মুহাজিররা(রা) মক্কা ফিরে এলেন। অবশ্য ইবনে ইসহাক (র) লিখেছেন যে, কতিপয় মুহাজির সেখানেই রয়ে যান। যা হোক, হযরত মুসয়াব (রা) মক্কা প্রত্যাবর্তনকারী সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন। শহরের নিকটে পৌছে তাঁরা অবহিত হলেন যে, প্রাপ্ত খবর ছিল ভিত্তিহীন। তা সত্ত্বেও তারা পুনরায়

আবিসিনিয়া ফিরে যাওয়াটা সঠিক মনে করলেন না এবং তাঁদের প্রত্যেকেই কোন না কোন কুরাইশ নেতার নিরাপত্তা নিয়ে শহরে প্রবেশ করলেন। ভিন্ন ভিন্ন মত অনুযায়ী হযরত মুসয়াব (রা) নাজর ইবনুল হারিছ বিন কালদাহ অথবা আবু আজিজ বিন উমায়েরের আশ্রয় লাভ করেছিলেন। আবিসিনিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর এসব সাহাবীর (রা) ওপর কুরাইশদের জুলুম নির্যাতনের মাত্রা আরো বেড়ে গেল। সুতরাং হুজুর (সা) মজলুম মুসলমানদেরকে পুনরায় আবিসিনিয়া হিজরতের নির্দেশ দিলেন। এবার ৮০ জনের বেশী পুরুষ এবং ১৯ অথবা ২০ জন মহিলা আবিসিনিয়া রওয়ানা হলেন। হযরত মুসয়াব (রা) এই হকপন্থী কাফেলাতেও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ কাফেলায় তাঁর ভাই আবুর রুম (রা) বিন উমায়েরও শামিল ছিলেন। কুরাইশ মুশরিকরা তাঁদের পথে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলো। কিন্তু তারা কোন না কোনভাবে আবিসিনিয়া পৌছতে সফল হলেন। হযরত মুসয়াব (রা) কিছুদিন পর্যন্ত আবিসিনিয়াতে উদ্বাস্তুর জীবন কাটিয়ে পুনরায় মক্কা ফিরে আসেন। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা তাঁর প্রত্যাবর্তনের সাল সম্পর্কে কিছু বলেননি। তবে, বিভিন্নভাবে জানা যায় যে, মদীনায় হিজরতের তিন চার বছর পূর্বে তিনি আবিসিনিয়া থেকে মক্কা প্রত্যাবর্তন করেন এবং বেশীরভাগ সময় প্রিয় নবীর (সা) পবিত্র খিদমতে কাটাতেন [কতিপয় চরিতকার হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়েরের আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরতের কথা উল্লেখ করেননি। কিন্তু ইবনে হিশাম (র) ইবনে ইসহাকের (র) উদ্ধৃতি দিয়ে আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরতকারী মুহাজিরদের তালিকায় হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়েরের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।]

হযরত মুসয়াব (রা) হাবশা থেকে ফিরে এলেন। কিন্তু তার অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। মুখের কমনীয়তা এবং সুশ্রী বলতে আর কিছুই ছিল না। পরিধানে ছিল মোটা সোটা কাপড়। তাও আবার কয়েকটি তালি লাগানো। শরীরের নরম চামড়া হয়ে গিয়েছিল পুরু। মলিন হয়ে গিয়েছিল চেহারা। গায়ের রং হেমন্ত কালের পীতবর্ণ ধারণ করেছিল। কিন্তু এ মরদে হকের অটলতা এবং দৃঢ় সংকল্পে সামান্যতম পার্থক্যও সূচীত হয়নি। তিনি মহানবীর (সা) খিদমত এবং দারিদ্রতাকে আরাম আয়েশের জীবন থেকে অগ্রাধিকার দিতেন। হযরত মুসয়াব (রা) একদিন নবীর (সা) দরবারে এমন অবস্থায় উপস্থিত হলেন যে তাঁর পরিধেয় কাপড়ে শুধু তালি আর তালিই পরিলক্ষিত হচ্ছিল। উপরন্তু কাপড়টি ছিল মোটা ও খসখসে। সারওয়ারে আলম (সা) তাঁকে এ অবস্থায় দেখে অশ্রু সিক্ত হয়ে পড়লেন। অন্য আরেক সময় তিনি নবীর (সা) মজলিসে এমনভাবে উপস্থিত হলেন যে, সতর ঢাকার জন্য

সাধারণ কাপড়ও ছিল না। একটি খালের অংশ দিয়ে শরীর ঢেকে রেখেছিলেন এবং সেই খালেরও বহুস্থানে তালি লাগানো ছিল। এটা শরীর কাঁপিয়ে দেয়ার মত একটা দৃশ্য ছিল। অথচ যে শরীর কখনো রেশম ছাড়া কোন পোশাকের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। আজ সেই শরীর আবৃত ছিল পচনশীল খাল দিয়ে। বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা) হক পথের এ মুসাফিরকে এ আশ্চর্য "পোশাকে" দেখে চমকে উঠলেন। হুজুর (সা) বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন ঃ

"কয়েক বছর পূর্বে আমি এ যুবককে সমগ্র মক্কায় সবচেয়ে বিলাসী, সুদর্শন, সুন্দর পোশাক ও সচ্ছল অবস্থায় দেখেছি। কিন্তু আজ আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের (সা) প্রতি ভালবাসার জন্যে সে সকল আরাম আয়েশ কুরবান করে দিয়েছে এবং ভাল কাজের আকর্ষণ তাকে পার্থিব আনন্দ ও আরাম আয়েশ থেকে মুখাপেক্ষীহীন করে ফেলেছে।

দ্বীনের প্রতি হযরত মুসয়াবের (রা) ত্যাগের আবেগ এবং খুলুসিয়াত তাঁকে রহমতে আলমের (সা) স্নেহের পাত্র বানিয়ে দিয়েছিল এবং রাসূলের (সা) দরবারে তিনি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি হুজুরের (সা) পবিত্র সুহবতে খুব ফয়েজ লাভ করেছিলেন। অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে তিনি দ্বীনের শিক্ষা হাসিল করতেন এবং কুরআনের যে সূরা অবতীর্ণ হতো তা তৎক্ষণাৎ হিফজ করে ফেলতেন। এমনকি কিছুদিন পর তিনি একজন আলেমে দ্বীন ও ফকিহ হিসেবে পরিচিত হন। হুজুর (সা) তাবলীগ ও দাওয়াতের জন্য যেসব সাহাবীকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন হযরত মুসয়াব (রা) তাঁদের অন্যতম ছিলেন।

বছরের পর বছর ধরে রাসূলে আকরাম (সা) একটি নিয়ম পালন করে আসছিলেন। হজ্জের দিনগুলোতে হেরেম শরীফ যিয়ারতকারী বিভিন্ন গোত্রের নিকট গিয়ে তিনি তাওহীদের দাওয়াত দিতেন। কিন্তু কুরাইশ মুশরিকরা বৈরীতামূলক আচরণ দিয়ে তাদেরকে হকের দিকে অগ্রসর হতে দিত না। নবুওয়তের ১০ম বছরের হজ্জ মওসুমে আল্লাহ তায়ালা এক আশ্চর্য ধরনের অবস্থা সৃষ্টি করলেন। হুজুর (সা) তাবলীগ করতে করতে কতিপয় এমন তাঁবুর নিকট পৌঁছলেন যাতে ইয়াসরাব থেকে আগত কিছু নেক চরিত্রের মানুষ অবস্থান করছিলেন। তাঁরা ছিলেন খাজরাজ গোত্রের মানুষ। সংখ্যায় ছিলেন ৬ জন। এসব ব্যক্তি ইহুদীদের নৈকট্য এবং অন্য কতিপয় কারণে "নবীয়ে আখিরুজ্জামান" বা শেষ নবী ও "দ্বীনে ইবরাহীমের" নাম সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিলেন না। হুজুর (সা) যখন তাঁদের সামনে আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ ও

মহানত্ব সম্পর্কে বর্ণনা দিলেন তখন তারা প্রভাবিত হলো। তারপর তিনি যখন কুরআনে করিমের কতিপয় আয়াত তিলাওয়াত করলেন তখন তাঁদের অন্তর সম্পূর্ণরূপে বিগলিত হয়ে গেল। তাঁরা পরস্পরের প্রতি চাওয়া চাওয়ি করলেন এবং বললেন, "আল্লাহর কসম! এতো সেই নবী যাঁর উল্লেখ সবসময় ইহুদীদের মুখে উচ্চারিত হয়ে থাকে। দেখো আবার ইহুদীরা আমাদের আগেই ইসলাম গ্রহণ করে না ফেলে।" একথা বলেই তারা সকলেই সে সময় কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলেন। খাজরাজ গোত্রের এসব সৌভাগ্যবান ব্যক্তিত্বের ইসলাম গ্রহণ যেন আনসারদের মধ্যে সৌভাগ্য সূর্যের উদয় ছিল। আল্লাহর এসব পবিত্র বান্দাহ ঈমানের সম্পদে পূর্ণ হয়ে যখন ইয়াসরাব ফিরে গেলেন তখন তারা সেখানে দ্রুতগতিতে দ্বীনে হকের তাবলীগের কাজ শুরু করলেন এবং প্রদীপ থেকে প্রদীপ জ্বলতে লাগলো। বস্তুত পরবর্তী সালে অর্থাৎ নবুওয়াতের একাদশ বছরে ১২ জন মুসলমান (১০ জন খাজরাজী এবং দু'জন আওস) প্রিয় নবীর (সা) যিয়ারতের জন্য মক্কা পৌঁছলেন। হুজুর (সা) আগমনের খবর পেয়ে এক রাতে তাদের নিকট গেলেন। তাঁরা অগ্রসর হয়ে হুজুরকে স্বাগত জানালেন এবং তাঁর হাতে বাইয়াত করলেন। প্রত্যাবর্তনের সময় এসব সাহাবী কুরআন পড়ানো এবং দ্বীনের কথা শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে একজন শিক্ষক প্রদানের জন্য রাসূলের (সা) নিকট আবেদন জানালেন। হুজুর (সা) এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য হযরত মুসয়াব(রা) বিন উমায়েরকে নির্বাচন করলেন এবং তাবলীগে হক ও মুসলমানদেরকে সংগঠিত এবং শিক্ষাদানের জন্য তাঁকে মদীনা যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। ত্যাগ ও নিষ্ঠার এ মূর্ত প্রতীক হুজুরের (সা) নির্দেশ পেতেই বিনা ওযর ও চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই ইসলামের প্রথম দায়ী হয়ে তৎক্ষণাৎ ইয়াসরাব রওয়ানা হয়ে গেলেন।

হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়ের ইয়াসরাবে নিজের দায়িত্ব অত্যন্ত সুন্দরভাবে পালন করলেন। তাঁর সরলতা, পবিত্রতা, বিনয়, মধুর ভাষা এবং উন্নত চরিত্র চুপিসারে লোকদের মনে স্থান করে নিতে লাগলো। তিনি নিজের অবস্থান স্থলে [হযরত আসয়াদ (রা) যারারার বাড়ী] লোকদেরকে ডাকতেন এবং তাদেরকে দ্বীনের কথা শিক্ষা দিতেন। এছাড়া তিনি প্রায়ই আওস ও খাজরাজের বিভিন্ন মহল্লা এবং বাড়ী চক্কর দিতেন। তিনি লোকদেরকে এমন বাগ্মীতাপূর্ণ ও সুন্দরভাবে ইসলামের দাওয়াত দিতেন যে নিঃসন্দেহে তারা প্রভাবিত হয়ে যেতেন। তাঁর সরলতা ও অনাড়ম্বরতার অবস্থা এমন ছিল যে এদিক-ওদিক যাওয়ার সময় কাধের ওপর কম্বলের একটি ছোট টুকরো লটকে নিতেন। সামনের দিক থেকে তা বাবলা গাছের কাটা দিয়ে লটকানো

থাকতো। খুব কম সময়ের মধ্যেই তিনি লোকদের মনোযোগ আকর্ষণের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়েছিলেন এবং তাঁর তাবলিগী প্রচেষ্টায় ইয়াসরাববাসী উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে ইসলামের সীমানায় প্রবেশ করতে লাগলেন। তাদের মধ্যে আওস ও খাজরাজের বড় বড় সরদারও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আওসের মধ্যে হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজ ও উসায়েদ (রা) বিন হাজিরুল কিতায়ের এবং খাজরাজের মধ্যে থেকে হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ, আবু আইয়ুব (রা) আনসারী এবং সায়াদ (রা) বিন রবির মত প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের ইসলাম গ্রহণে ইয়াসরাবে ইসলাম ব্যাপক আকারে বিস্তার লাভ করলো। দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের সঙ্গে সঙ্গে হযরত মুসয়াব (রা) ইয়াসরাবের মুসলমানদের তানজিম ও তালিমের ব্যাপারেও গাফিল রলেন না। একদিকে তিনি রাসূলে করিমের (সা) অনুমতি নিয়ে [হযরত সায়াদ (রা) বিন খাছিমা গৃহে] জামায়াতের সঙ্গে জুময়ার নামায পড়ার ভিত্তি রাখলেন। অন্যদিকে নওমুসলিম আনসারদেরকে অত্যন্ত পরিশ্রম করে দ্বীনি শিক্ষা দিলেন। এমনিভাবে কিছু দিনের মধ্যেই ইয়াসরাবের অলিগলিতে একক আল্লাহর ও রাসূলুল্লাহর (সা) চর্চা হতে লাগলো।

পরবর্তী বছর নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে দ্বীনে হকের এই সকল দায়ী ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে হজ্জের জন্য মক্কা পৌছেন। এ সময় হযরত মুসয়াবের (রা) না নিজের ঘরের কথা স্মরণে এলো, না পিতামাতার কথা। তিনি সোজা নবী করিমের (সা) পবিত্র খিদমতে হাজির হলেন এবং নিজের মদীনা অবস্থানকালের সকল অবস্থা ও ঘটনার বিস্তারিত শুনালেন। হুজুর (সা) শুনে খুব খুশী হলেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করলেন। হযরত মুসয়াবের (রা) সঙ্গীরা তার তাবলীগে এত প্রভাবিত হয়েছিলেন যে তারা খুব তাড়াতাড়ি হুজুরের (সা) দর্শন লাভ করে নিজের পিপাসা মেটানোর জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সমগ্র মক্কা হকের ঝাণ্ডাবাহীদের জীবনের শত্রু হয়ে গিয়েছিল। এ জন্য সতর্কতা প্রয়োজন ছিল। সুতরাং রাতের অন্ধকারে হুজুর (সা) তাদের নিকট তাশরীফ নিলেন এবং সকলকে নিজের বাইয়াতের সম্মানে অভিষিক্ত করলেন।

হযরত মুসয়াবের (রা) মা যখন পুত্রের আগমনের খবর পেলেন তখন ডেকে পাঠালেন। তিনি যখন তার নিকট পৌছলেন তখন সে তাকে প্রচুর গালাগালি করলো এবং কেঁদে কেঁদে তাঁকে বললো, পুত্র! এ নতুন ধর্মকে পরিত্যাগ করো যাতে তোমার জন্য ভালবাসায় আমার বুক আবার ভরে যায়।

হযরত মুসয়াব (রা) জবাব দিলেন "মা! আমি আল্লাহর মনোনীত ধর্মকে সন্তুষ্ট চিত্তে ও উৎসাহের সঙ্গে কবুল করেছি। কখনোই তা পরিত্যাগ করতে পারি না।" তার পর মা ধমক দিয়ে বললেন, আবিসিনিয়া যাওয়ার পূর্বে তোমাকে যে চিকিৎসা করা হয়েছিল এখনো সে চিকিৎসাই করতে হবে।

হযরত মুসয়াবও (রা) খুব সাহসের সঙ্গে জবাব দিলেন ঃ

"মা! তুমি কি জবরদস্তি করে আমাকে আমার দ্বীন পরিত্যাগ করাতে পারো। স্মরণ রেখো, এখন যদি কেউ আমাকে কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করে তাহলে আমি তাকে হত্যা করবো।"

তারপর তাঁর মা অসহায় হয়ে কাঁদতে লাগলেন। হযরত মুসয়াব (রা) অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বুঝালেন, "মা! কল্যাণ কামনা করে তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি যে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের ওপর ঈমান আনয়ন কর। তাতেই তোমার কল্যাণ নিহিত রয়েছে।"

কিন্তু কুফর ও শিরক তাঁর মাকে একদম গিলে রেখেছিল।

সে বললো ঃ "প্রোজ্জ্বল তারকাসমূহের কসম! আমি কখনই তোমার দ্বীন কবুল করবো না। আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও।"

হযরত মুসয়াব (রা) রহমতে আলমের (সা) পবিত্র খিদমতে ফিরে এলেন এবং তাঁর ৭৫ জন সঙ্গীর সঙ্গে ইয়াসরাব চলে গেলেন। এসব পবিত্র আত্মার মানুষ বাইয়াতের সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, রহমতে আলম (সা) যদি তাঁদের শহরে শুভ পদার্পণ করেন তাহলে তারা হুজুর (সা) এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে সাহায্য ও হিফাজত করবেন। সুতরাং তাদের প্রত্যাবর্তনের পর হুজুর (সা) সাহাবীদেরকে (রা) মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন। প্রিয় নবীর (সা) ইঙ্গিত পেয়ে নির্যাতিত মুসলমানরা সেই নতুন দারুল আমানের দিকে হিজরত শুরু করলেন এবং দুই তিন মাসের মধ্যে তাঁদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মদীনা পৌঁছে গেলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়েরও শামিল ছিলেন। সারওয়ারে আলমের (সা) হিজরতের শুধুমাত্র ১২ দিন পূর্বে তাঁরা মক্কাকে বিদায় জানান এবং মদীনা পৌঁছে আওস সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজের বাড়ী অবস্থান শুরু করেন। কয়েকদিন পর মহানবীও (সা) হিজরত করে মদীনা তাশরীফ আনলেন এবং মুসলমানদের মাদানী জীবন শুরু হয়ে গেল।

হিজরতের পর প্রথম পাঁচ মাস আনসারদের গৃহসমূহ মুহাজিরদের জন্য আম বা সাধারণ মেহমানখানা ছিল। কিন্তু এ জীবন এবং পরিস্থিতি খুব

সুশৃংখল ছিল না। এ জন্য রাসূলে আকরাম (সা) প্রতিপালন ও জামানতের জন্য একটি সহজ অথচ স্থায়ী এবং সুশৃংখল কর্মপদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। বস্তুত হিজরতের পাঁচ মাস পর তিনি হযরত আনাস (রা) বিন মালিকের প্রশস্ত বাড়ীতে আনসার ও মুহাজিরদেরকে একত্রিত করলেন এবং তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি এক একজন মুহাজির ও আনসারকে ডাকতেন এবং তাঁদেরকে সম্বোধন করে বলতেন, "আজ থেকে তোমরা দু'জন ভাই ভাই।" এই পবিত্র মজলিসে হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়ের ভ্রাতৃত্বের আত্মীয়তা রাসূলের (সা) মেযবান বনু নাজ্জারের রঈস হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর (রা) সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করা হলো।

হিজরতের পরও হযরত মুসয়াব (রা) অব্যাহতভাবে দাওয়াত ও তাবলীগ এবং ওয়াজ নসিহতের কাজে ব্যাপৃত রইলেন। দ্বিতীয় হিজরীতে সংঘটিত বদরের যুদ্ধের সময় তিনি সেই ৩১৩ জন পবিত্র আত্মার অন্যতম ছিলেন। যাঁরা অটলতা ও সংকল্প এবং ঈমান ও ত্যাগের অতুলনীয় বা অক্ষয় ছবি ইতিহাসের পাতায় সেঁটে দেন। তাঁরা 'আসহাবে বদর'-এর মহান উপাধিতে বিভূষিত হন। হক ও বাতিলের প্রথম এই সংঘর্ষে রাসূলে করিম (সা) মুহাজিরদের সবচেয়ে বড় ঝাণ্ডা তাঁকে প্রদান করেছিলেন। এটাও তাঁর জন্য ছিল বিশেষ মর্যাদা।

তৃতীয় হিজরীতে সংঘটিত ওহোদের যুদ্ধেও হুজুর (সা) ঝাণ্ডা বহনের মর্যাদা হযরত মুসয়াবকে (রা) দিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে একটি ভুলের জন্য যুদ্ধের মোড় পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং রাসূলের (সা) শাহাদাতের খবর ছড়িয়ে পড়লো। সে সময় মুসলমানরা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লো।

এক দল বললো, "রাসূলের (সা) পর লড়াই করে আর কি লাভ? আর একথা বলেই তারা মদীনা রওয়ানা হলেন।"

দ্বিতীয় দল বললো, "হুজুরের (সা) পর জীবিত থেকে কি লাভ? একথা বলেই তারা শাহাদাতের জন্য বীরের মত কাফের বাহিনীর মধ্যে ঢুকে পড়লো।"

তৃতীয় দলে ছিল তারা, যারা হুজুরের (সা) চারপাশে বেষ্টনী দিয়ে তাঁকে হেফাজত করে চলেছিলেন। এই দলে ছিলেন মাত্র ১৪ জন জানবাজ।

হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়ের শাহাদাত অন্বেষণকারী অটল মুজাহিদদের দ্বিতীয় দলে শামিল ছিলেন। তাঁর সিনা ছিল দ্বীনী জ্ঞানের খনি। তিনি যখন রাসূলের (সা) শাহাদাতের খবর শুনলেন তখন তাঁর মুখ দিয়ে এই আয়াত উচ্চারিত হলো ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

"এবং মুহাম্মাদ (সা) তো একজন রাসূল। তাঁর পূর্বেও রাসূল অতিবাহিত হয়েছে।"

এই আয়াত পড়েই তিনি উচ্চস্বরে নারা লাগালেন ঃ "আমি রাসূলের মাথা নত হতে দেব না।"

একথা বলেই তিনি এক হাতে নাঙ্গা তরবারী এবং অন্যহাতে ঝাণ্ডা নিয়ে কাফেরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মুশরিকদের মশহুর অশ্বারোহী ইবনে কামইয়া অগ্রসর হয়ে তরবারী দিয়ে আঘাত হানলো। এই আঘাতে তাঁর ডান হাত শহীদ হয়ে গেল। হযরত মুসয়াব (রা) তৎক্ষণাৎ বাঁ হাত দিয়ে ঝাণ্ডা ধরলেন। ইবনে কামইয়া অপর হাতও শহীদ করে ফেললো। তিনি কর্তিত বাহুর সাহায্যে ঝাণ্ডা বুক দিয়ে ধরলেন। সম্ভবতঃ তিনি দৃঢ় সংকল্প করেছিলেন। যে, যতক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাস চলবে তক্ষণ ইসলামী ঝাণ্ডা অবনত হতে দিবেন না। হতভাগা ইবনে কামইয়া তারপর ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁর ওপর বর্শা দিয়ে এমন এক আঘাত হানলো যে, ইলম ও ইশকে পূর্ণ হযরত মুসয়াবের (রা) পবিত্র বুকে তা বিধে গেল এবং তিনি তার প্রকৃত স্রষ্টার সঙ্গে মিলিত হলেন। তিনি যেই মাটিতে পতিত হলেন সেই তাঁর ভাই আবুর রুম (রা) বিন উমায়ের অগ্রসর হয়ে ঝাণ্ডা হাতে তুলে নিলেন এবং যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা উঁচুতে তুলে ধরে বীরের হক আদায় করতে লাগলেন। যুদ্ধের পর সেই ঝাণ্ডা অবনত না করে মদীনা নিয়ে এলেন।

কুরাইশরা যখন যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে গেল এবং মুসলমানরা নিজেদের শহীদদের কাফন দাফনের দিকে দৃষ্টি দিলেন তখন তাঁরা দেখলেন যে মক্কার সেই সুদর্শন কমনীয় চেহারার যুবক মুসয়াব (রা) রক্তাক্ত অবস্থায় মাটির ওপর উপুর হয়ে পড়ে আছে। বিশ্ব নবী (সা) তার শাহাদাতের খবরে খুব দুঃখ পেলেন। তিনি সেই ইলম ও আমলে পূর্ণ ব্যক্তিত্বের লাশের নিকট দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً –

"মু'মিনদের মধ্যে কিছু এমনও আছেন যে তাঁরা আল্লাহর নিকট যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা সত্য করে দেখিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কতিপয় নিজেদের মুদ্দাত পূর্ণ করেছেন এবং কতপিয় এখনো ইন্তিজার করছেন এবং নিজেদের ইচ্ছায় কোন পরিবর্তন করেননি। (আল আহযাব-২৩)

[সহীহ বুখারীতে হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁর চাচা হযরত আনাস (রা) বিন নজর সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হয়েছিল। হযরত আনাস (রা) বিন নজর অন্যতম জালিলুল কদর সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। তিনি বনু নাজ্জার খান্দানের একজন সরদার ছিলেন এবং আত্মীয়তার দিক থেকে রাসূলে আকরামের (সা) পরদাদী সালমার ভ্রাতুষ্পুত্র হতেন। দ্বিতীয় বাইয়াতে উকবাতে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। কোন কারণে বদরের যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। এ জন্য তাঁর অন্তরে খুব দুঃখ ছিল। হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আফসোস যে আমি বদরের যুদ্ধে শরীক হতে পারিনি। আল্লাহ যদি আমাকে সুযোগ দেন তাহলে বিশ্ব দেখবে যে আমি ভবিষ্যতে কি করি।"

ওহোদের যুদ্ধে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নেন। হুজুরের (সা) শাহাদাতের খবর শুনে মুসলমানরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো। এ সময় হযরত আনাস (রা) অগ্রসর হলেন। রাস্তায় হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজের সঙ্গে মুলাকাত হলে তিনি বললেন "সায়াদ কোথায় যাচ্ছো। আল্লাহর কসম আমি ওহোদের দিকে জান্নাতের খোশবু পাচ্ছি।" একথা বলেই তিনি হাতে তরবারী নিয়ে কাফেরদের মাজমাতে ঢুকে পড়লেন এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আঘাতের পর আঘাত খেতে খেতে লড়াই চালাতে লাগলেন। আঘাতে আঘাতে সারা শরীর জর্জরিত হয়ে গিয়েছিল এবং লাশ চেনা যাচ্ছিল না। তাঁর বোন রবি (রা) বিনতে নজর হাতের আঙুল দেখে চিনতে পারলেন। শরীরে তীর, বর্শা এবং তরবারীর ৮০টি আঘাত ছিল।

হযরত আনাস (রা) বিন মালিক বলেন যে, একবার আমার ফুফু রবি বিনতে নজরের হাতে এক আনসারী মেয়ের দাত ভেঙ্গে গেল। তাঁর অভিভাবকরা কিসাস দাবী করে বসলেন এবং হুজুর (সা) কিসাসের নির্দেশ জারি করে দিলেন। আনাস (রা) বিন নজর এই খবর পেয়ে কেঁপে উঠলেন এবং হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম! রবির দাঁত ভাঙ্গা যাবে না।" হুজুর (সা) বললেন "এটাই আল্লাহর নির্দেশ।" আল্লাহর কি ইচ্ছা! মেয়েটির উত্তরাধিকাররা দিয়্যত নিতে রাজী হয়ে গেল এবং রবি'র দাঁত রক্ষা পেল। এই সময় হুজুর (সা) বলেছিলেন যে, আল্লাহর কিছু বান্দাহ এমন আছে সে যখন কসম খায় তখন আল্লাহ তাদের কসম পূর্ণ করে দেন।]

অতপর হুজুর (সা) বিহ্বল হয়ে বললেন : "আমি মক্কায় তোমার মত সুদর্শন ও সুন্দর পোশাক পরিহিত আর কাউকে দেখিনি। কিন্তু আজ তোমার

চুল ধুলি মলিন ও অবিন্যস্ত এবং তোমার শরীরের ওপর শুধুমাত্র একটি চাদর রয়েছে। আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমরা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার নিকট হাজির হবে।"

তারপর তিনি হযরত মুসয়াবের (রা) কাফনের নির্দেশ দিলেন। হক পথের এই শহীদের চাদর এত ছোট ছিল যে তা দিয়ে মাথা ঢাকা হলে পা বেরিয়ে যেত এবং পা ঢাকা হলে মাথা বেরিয়ে পড়তো, অবশেষে হুজুর (সা) বললেন যে, মাথা চাদর দিয়ে ঢেকে দাও এবং পা "আজখার" ঘাস দিয়ে ঢেকে এই শহীদকে মাটি দিয়ে দাও। সাহাবীরা (রা) নির্দেশ পালন করলেন। আর এভাবেই সেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিত্ব বাহ্যিক দুনিয়া থেকে চিরকালের জন্য বিদায় নিলেন।

হযরত মুসয়াবের (রা) বিয়ে হয়েছিল মশহুর মহিলা সাহাবী হযরত হামনা (রা) বিনতে জাহাশের [রাসূলের (সা) ফুফাতো বোন] সঙ্গে। তিনি যয়নব নামী একটি মেয়ে রেখে যান।

হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়ের অন্যতম মশহুর সাহাবী ছিলেন। তিনি ঠিক ভরা যৌবনে একাকী আরাম আয়েশের জীবন শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরিত্যাগ করেছিলেন এবং হক পথে এমন এমন নির্যাতন সহ্য করেছিলেন যে, তার অবস্থা পাঠ করে চোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। হযরত মুসয়াবের (রা) দারিদ্র ও মুসিবত দেখে শুধুমাত্র সাহাবায়ে কিরামই (রা) নন বরং কখনো মওজুদাত হুজুরও (সা) দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়তেন। কিন্তু স্বয়ং হযরত মুসয়াবের (রা) সবর ও শোকর এবং মুখাপেক্ষীহীনতার অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি সবসময় হাসি খুশী থাকতেন এবং পার্থিব আনন্দ সম্পূর্ণরূপে ভুলেই গিয়েছিলেন।

হযরত মুসয়াব (রা) সাবিকুনাল আউয়ালুনের সেই পবিত্র দলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন যারা হক পথে তিন হিজরত করার সম্মান লাভ করেছিলেন। মদীনায় তাঁর তাবলীগী প্রচেষ্টায় যে ফল পাওয়া গিয়েছিল তা ইসলামের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। ইলম ও ফজলের দিক থেকে তাঁর মর্যাদা এত উঁচুতে ছিল যে অনেক সাহাবী তাঁকে ঈর্ষা করতেন। ওহোদের ময়দানে তাঁর কাফন যে পদ্ধতিতে হয়েছিল তা বড় বড় জালিলুল কদর সাহাবীর জন্য জীবৎকালে শিক্ষণীয় ঘটনা ছিল। সহীহ বুখারীতে আছে যে, একবার হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফের সামনে (লৌকিকতাপূর্ণ) খাবার এলো। এ সময় তাঁর ইসলামের প্রথম যুগের কথা স্মরণ হলো। তিনি বললেন, "মুসয়াব (রা) বিন উমায়ের আমার থেকে উত্তম ছিলেন। তিনি শহীদ হয়ে গেলেন এবং

এক চাদর ছাড়া তাঁর কাফন জুটলো না..... সম্ভবত আমাদেরকে দুনিয়াতেই সকল নিয়ামত দিয়ে দেয়া হয়েছে।" একথা বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং খাওয়া ছেড়ে দিলেন। অন্য আরো কয়েকটি রেওয়ায়াত থেকেও জানা যায় যে, সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যখন হযরত মুসয়াবের (রা) কথা আলোচনা হতো তখন তাঁরা অশ্রু সজল হয়ে উঠতেন এবং তাঁদের মুখ দিয়ে এই মরদে হকের জন্য সালাম ও মাগফিরাতের দোয়া বের হতো।

হযরত আবু জার গিফারী (রা)

সর্বোত্তম মানব রহমতে আলম (সা) একদিন কতিপয় সাহাবীর (রা) মধ্যে বসেছিলেন। এমন সময় শ্যামবর্ণের এক আকর্ষণীয় দেহের এক ব্যক্তি হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হলেন। ব্যক্তিটির মাথা ও দাড়ির কেশ ছিল পক্ক। তিনি প্রিয় নবীর (সা) খিদমতে উপস্থিত হয়ে এমনভাবে সালাম করলেন যে, তাতে সীমাহীন শ্রদ্ধা ও ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটছিল। তাঁকে দেখে সারওয়ারে আলমের (সা) প্রোজ্জ্বল চেহারা হাসিখুশীতে পূর্ণ হয়ে গেল এবং রাসূলের (সা) মুখ দিয়ে একথাগুলো উচ্চারিত হলো ঃ

"আবু জার থেকে বেশী কোন সত্যবাদীর ওপর আসমান ছায়া দান করেনি এবং যমীন এমন কোন ব্যক্তিকে কাঁধের ওপর তোলেনি।"

এবং সৃষ্টির প্রতিটি অণু পরমাণু স্বাক্ষ্য দিয়েছিল যে, অবশ্যই সাইয়েদুল মুরসালিন সত্য কথা বলেছিলেন।

আবু জার (রা) সেই সময় ইসলামের সত্যতার স্বাক্ষ্য দিয়েছিলেন যখন খাদিজাতুল কুবরা (রা), আবু বকর সিদ্দীক (রা), আলী মুরতাজা (রা) এবং যায়েদ বিন হারিছা (রা) ছাড়া কেউই "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" বলেননি এবং কেউই সারা জীবন আবু জারের (রা) মুখে হক ছাড়া অন্য কথা শোনেননি। এমনকি তাঁর সত্যবাদিতা ও স্পষ্টবাদিতা আসমান ও দুনিয়ায় উর্মি সংঘাত তুলেছিলো।

ভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত আবু জারের (রা) প্রকৃত নাম ছিল বারির অথবা জুনদুব। বনু গিফার গোত্রের সঙ্গে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। এই গোত্র ছিল কিনানা বিন খাযিমা বংশোদ্ভূত। বংশটির উর্ধতন ১৫তম পুরুষে রাসূলে আকরামের (সা) প্রপিতামহ ছিলেন। গিফার বিন মিবাল হযরত আবু জারের(রা) উর্ধতন সপ্তম পুরুষের এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তারই নামানুসারে কিনানী বংশোদ্ভূত আরবদের এই গোত্রকে গিফারী বলা হতো। গিফার পর্যন্ত হযরত আবু জারের (রা) নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

আবু জার (জুনদুব অথবা বারির) বিন জানাদাহ বিন কায়েস বিন আমর বিন মালিল বিন সায়ির বিন হাযাম বিন গিফার। মায়ের নাম ছিল রানলাহ বিনতে রবিয়াহ। তিনিও গিফার গোত্রভুক্ত ছিলেন। বনু গিফারের ঠিকানা ও

আবাসস্থল ছিল মদীনা মুনাওয়ারা থেকে ৮০ মাইল দূরে বদরের পাশে। তার নিকটেই ছিল সেই সড়ক যা মক্কা মুকাররামাকে সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের সাথে সংযুক্ত করেছিল। বনু গিফারের লোকজন খুব দরিদ্র ছিল এবং অত্যন্ত কষ্টে জীবন কাটাতো। তা সত্ত্বেও তাঁরা দীর্ঘদিন যাবত ধৈর্য ও অল্পে তুষ্টি নিজেদের অভ্যাসে পরিণত করে রেখেছিলেন। কিন্তু এমন এক সময় এলো যে, দারিদ্র্য ও দুঃসহ অবস্থা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে ফেললো এবং তারা ডাকাতি ও লুণ্ঠনকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করলো। তারা শুধুমাত্র মক্কা ও সিরিয়ার মধ্যে যাতায়াতকারী বাণিজ্যিক কাফেলাই লুট করতো না বরং আশেপাশের গোত্রসমূহকেও মাঝে মধ্যে লুটের নিশানা বানাতো। হযরত আবু জার (রা) এই পরিবেশে জ্ঞানের চোখ খুললেন। যখন তিনি দেখলেন যে কবিলার যুবকরা নিত্যনতুন অভিযানে গমন করে এবং বিভিন্ন ধরনের মাল ও আসবাবে পূর্ণ হয়ে ফিরে আসে তখন তিনিও তাদের সঙ্গে শরীক হয়ে গেলেন। কিন্তু সর্বশক্তিমানের তাঁর মাধ্যমে অন্য কাজ নেয়ার ইচ্ছা ছিল। কি জানি কি এক অজ্ঞাত কারণে একাকী তাঁর জীবনে বিপ্লব হয়ে গেল এবং তাঁর স্বভাব লুটতরাজ, হত্যা, গারতগিরী ও রাহাজানী থেকে বিরূপ হয়ে গেল। সেই সঙ্গে তিনি কবিলার দেব-দেবী এবং মূর্তিদের ওপরও বিতৃষ্ণ হয়ে পড়লেন। মহান রব তাঁকে তাওহীদের রাস্তা দেখিয়ে দিলেন এবং তিনি রাত-দিন একক আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল থাকতে লাগলেন। নিজেই নামাযের কোন পদ্ধতি ঠিক করে নিলেন এবং যেদিকেই আল্লাহ তায়ালা ঝুঁকিয়ে দিতেন সেদিকেই মুখ করে নামায পড়ে নিতেন। সহীহ মুসলিমে আছে যে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই আবু জারের (রা) ওপর আল্লাহভীতি বিজয়ী হয়ে গিয়েছিল। স্বয়ং তিনি বর্ণনা করেছেন ঃ

"আমি রাতে নামাযের জন্য দাঁড়াতাম এবং দাঁড়িয়েই থাকতাম। এমনকি সুবহে কাজিব হয়ে যেতো। সে সময় আমি নিজেকে মাটিতে নিক্ষেপ করতাম এবং এমনভাবে পড়ে থাকতাম যেন কোন কাপড় পড়ে রয়েছে। আমার ওপর যখন রোদ পড়তো তখন আমি উঠতাম।"

গিফারের লোকজন তাঁর মুখ দিয়ে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র কথা শুনতেন এবং আশ্চর্য হয়ে যেতেন যে তাকে কোন ধরনের পাগলামীতে পেয়ে বসেছে। সে সময় মক্কা থেকে ইসলামের সূর্য উদিত হয়েছে এবং হাদিয়ে বরহক (সা) তাওহীদের দাওয়াতের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। একদিন গিফার গোত্রের এক ব্যক্তি মক্কা গেল। সেখানে তার কানে হকের দাওয়াত পৌঁছলো। ফিরে এসে হযরত আবু জারের (রা) সঙ্গে দেখা করলো এবং বললো, 'আবু জার' তোমার মত মক্কাতেও এক ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে থাকেন এবং

লোকদেরকে মূর্তিপূজা থেকে নিষেধ করেন।" আবু জার (রা) তো প্রথম থেকেই কোন হাদি বা পথপ্রদর্শকের সন্ধানে ছিলেন। এ খবর পেয়ে ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সহোদর উনাইসকে একথা বলে মক্কা প্রেরণ করলেন যে, সে মক্কা গিয়ে সেই ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত করবে যে মানুষদেরকে একক আল্লাহর দিকে আহবান জানিয়ে থাকে। তারপর ফিরে এসে তার অবস্থা বর্ণনা করবে। উনাইস (রা) একজন উঁচুদরের কবি এবং অত্যন্ত জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। মক্কা পৌছে তিনি বিশ্ব নবীর (সা) ইরশাদসমূহ শুনে খুব প্রভাবিত হন। ফিরে এলে আবু জার (রা) জিজ্ঞেস করলেন, "মক্কার তাওহীদের দায়ীকে তুমি কেমন দেখেছ?"

উনাইস জবাব দিলেন, "লোকজন তাকে কবি, জাদুকর ও গণক বলে থাকে। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি তাকে তেমন দেখিনি। তিনি কবিও নন গণকও নন এবং জাদুকরও নন। তিনি তো শুধু জনগণকে কল্যাণের দিকে আহবান জানান। এবং অকল্যাণ থেকে বিরত রাখেন।"

এই সংক্ষিপ্ত জবাবে হযরত আবু জার (রা) খুশী হতে পারলেন না এবং স্বয়ং পরিস্থিতি যাচাইয়ের জন্য মক্কা রওয়ানা হয়ে গেলেন।

মক্কা পৌছে হযরত আবু জার (রা) কা'বাতে অবস্থান করলেন। বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফাকে (সা) চিনতেন না। কারোর নিকট জিজ্ঞাসা করাকেও তিনি যুক্তিসিদ্ধ মনে করলেন না। আল্লাহর প্রতি দৃঢ় আস্থা ছিল যে, তিনিই দায়ীরে হকের সঙ্গে সাক্ষাত ঘটিয়ে দেবেন। এভাবেই কয়েকদিন চলে গেল। একদিন হযরত আলী (রা) তাঁকে একদিকে ডেকে নিয়ে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "ভাই, তোমাকে এখানে কয়েকদিন ধরে দেখছি। তুমি কোন্ বস্তুর সন্ধান করছো?" হযরত আবু জার (রা) জবাব দিলেন, "তুমি যদি আমাকে মনিবলে মকসুদে পৌছে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দাও এবং মুখ না খোল তাহলে বলে দিচ্ছি।"

হযরত আলী (রা) বললেন, "তুমি মুতমাইন বা নিশ্চিত থাকো। তোমার গোপন ফাঁস হবে না।"

তারপর হযরত আবু জার (রা) নিজের মকসুদ বা লক্ষ্যের কথা বললেন। হযরত আলী (রা) তাঁর কথা শুনে বললেন, "তুমি হেদায়াতের পথ পেয়ে গেছ। যার সন্ধানে তুমি এসেছ নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহর সাচ্চা রাসূল।" "হযরত আবু জারের (রা) ওপর ভাবাবেশ দেখা দিল। তিনি হযরত আলীর (রা) নিকট দরখাস্ত করলেন, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে সেই পবিত্র সত্তার

নিকট পৌঁছে দিন।" [অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আলী (রা) প্রথম দিন কিছু জিজ্ঞাসা না করে হযরত আবু জারকে (রা) স্বগৃহে নিয়ে গেলেন। রাত কাটিয়ে আবু জার (রা) পুনরায় কা'বা শরীফে গিয়ে পৌঁছলেন। দ্বিতীয় দিন হযরত আলী (রা) পুনরায় তাঁকে নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন এবং কা'বায় অবস্থানের মাকসাদ জিজ্ঞেস করলেন—হযরত আবু জার (রা) তাঁর নিকট থেকে গোপনীয়তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি নিলেন। অতপর নিজের অবস্থা কমবেশী বর্ণনা করলেন এবং বললেন যে, আমি এখানে শুধুমাত্র মক্কার দায়ীয়ে হকের সন্ধানে অবস্থান করছি।]

হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু তাঁকে সঙ্গে নিয়ে নবীর (সা) খিদমতে উপস্থিত হলেন। হুজুরের (সা) নবুওয়াতের মহত্বপূর্ণ প্রোজ্জ্বল মুবারক চেহারা দর্শনে আবু জারের (রা) অন্তর সাক্ষ্য দিল যে, বাস্তবিকই তিনি আল্লাহর সাচ্চা রাসূল। অস্থির চিত্তে আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আপনার দাওয়াতের বিস্তারিত জানান।"

হুজুর (সা) এমন সুন্দরভাবে আবু জারের (রা) সামনে ইসলাম পেশ করলেন যে, তাঁর অন্তর ঈমানের আবেগে পূর্ণ হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ তিনি কালেমায়ে শাহাদাত পড়ে ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হয়ে গেলেন। তার পূর্বে শুধুমাত্র চার পবিত্র ব্যক্তিত্ব ঈমানের নেয়ামতে ভাগ্যবান হওয়ার সুযোগ লাভ করেছিলেন। তাঁরা হলেন, উম্মুল মু'মিনীন খাদিজা (রা), সিদ্দীকে আকবার(রা), আলী মুরতাজা (রা) এবং যায়েদ বিন হারিছা (রা)। এরপর হুজুর (সা) আবু জারকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন :

"গিফারী ভাই তোমার পানাহারের কি ব্যবস্থা ছিল?"

তিনি আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! খাবার তো কিছুই পাইনি। যমযমের পানি পান করে পেটপূর্ণ করেছি।"

সে সময় হযরত সিদ্দীকে আকবার (রা) পাশেই ছিলেন। তিনি আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! যদি অনুমতি হয় তাহলে আমি কি কিছু খাওয়াতে পারি?" হুজুর (সা) বললেন, "হাঁ, হাঁ, অবশ্যই।"

সিদ্দীকে আকবার (রা) হযরত আবু জারকে (রা) সঙ্গে নিয়ে বাড়ী গেলেন। রাসূলে আকরামও (সা) সঙ্গে গেলেন। সেখানে সিদ্দীকে আকবার (রা) তায়েফের শুকনো আঙ্গুর প্রিয় নবী (সা) এবং আবু জারের (রা) খিদমতে পেশ করলেন। মক্কা পৌঁছার পর হযরত আবু জারের (রা) এটাই ছিল প্রথম খাবার। অতপর রাসূলে করিম (সা) আবু জারকে (রা) বললেন :

"আবু জার (রা) এখন তুমি নিজের কবিলায় ফিরে যাও এবং তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দাও। যখন দাওয়াতে হকের ব্যাপকতার খবর পাবে তখন এখানে পুনরায় চলে এসো। বর্তমানে তুমিও মক্কাতে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রেখো।"

আবু জারের (রা) অন্তর তাওহীদের আবেগে পূর্ণ ছিল। আরজ করলেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম, আপনি অনুমতি দিন। আমি মক্কায় আমার ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করে যাবো।" হুজুর (সা) তার আবেগ ও উদ্যম দেখে চুপ মেরে গেলেন।

তারপর আবু জার (রা) সোজা কা'বার হেরেমে তাশরীফ নিলেন। সেখানে মুশরিকদের 'মাজমা' ছিল। আবু জার (রা) মুশরিকদেরকে সম্বোধন করে উচ্চস্বরে বললেন ঃ

"হে মানুষেরা, একক আল্লাহ ব্যতীত কেউই পূজার যোগ্য নয় এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর সত্য রাসূল।"

আবু জারের (রা) মুখ দিয়ে এই কথা বের হতে না হতেই মুশরিকরা চারদিক থেকে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং মেরে মেরে রক্তাক্ত করে দিল। ইত্যবসরে আব্বাস (রা) বিন আবদুল মুত্তালিব এসে পড়লেন। একজন বিদেশীকে এই অবস্থায় দেখে তার অন্তর বিগলিত হয়ে গেল। তিনি আবু জারের (রা) ওপর উপুর হয়ে পড়ে মুশরিকদেরকে বললেন, "তোমরা থামো, কেন অন্যায়ভাবে এই গরীবের জীবন নিচ্ছ।" আব্বাস (রা) তখনো ঈমান আনয়ন করেননি। এ জন্য মুশরিকরা তাঁর কথা খুব মানতো। তাঁর কথায় তারা আবু জারকে (রা) ছেড়ে দিলেন। কিন্তু তাওহীদে মাতোয়ারা আবু জার (রা) পরের দিন পুনরায় কা'বা পৌছলেন এবং মুশরিকদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিতে লাগলেন। মুশরিকরা তাঁকে পুনরায় ধরলো এবং নির্যাতন শুরু করলো। এবারও আব্বাস (রা) তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং মুশরিকদের বুঝালেন যে, "এই ব্যক্তি গিফারের যুদ্ধবাজ ও রক্তপিপাসু গোত্রের সদস্য। তোমরা যদি তাকে মেরে ফেলো তাহলে তোমাদের কোন বাণিজ্যিক কাফেলা মনযিলে মাকসুদ পর্যন্ত পৌছতে পারবে না। গিফারীদের সঙ্গে খামাখাহ শত্রুতা কেন কিনে নিচ্ছ।"

মুশরিকদের বোধোদয় হলো এবং তারা আবু জারকে (রা) ছেড়ে দিল। আবু জার বুঝতে সক্ষম হলো যে, তাদের অন্তরে মোহর লেগে গেছে। তাদের ওপর তার কথার কোন আছর হবে না। তাদেরকে আল্লাহর সত্য রাসূলই (সা) হেদায়াতের পথে আনতে পারেন। এ জন্য নিজস্ব বলয়ে গিয়ে তাবলীগ

করাটাই উত্তম হবে। একথা চিন্তা করে তিনি স্বদেশের পথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি সর্বপ্রথম দুই সহোদর এবং মাকে তাওহীদের দাওয়াত প্রদান করলেন। এ তিনজনই কালবিলম্ব না করে দাওয়াতে সাড়া দিলেন। অতপর তিনি নিজের কবিলাকে ইসলামের দিকে আহবান জানালেন। অর্ধেক গোত্র তখনই মুসলমান হয়ে গেল এবং বাকী অর্ধেক মহানবীর (সা) হিজরতের পর ঈমান এনেছিলেন।

হযরত আবু জার (রা) দীর্ঘদিন পর্যন্ত স্বগোত্রের লোকজনদেরকে ইসলামের শিক্ষা দিতে থাকেন। যখন বদর, ওহোদ, খন্দক প্রভৃতি যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল তখন তিনি স্বদেশভূমি থেকে হিজরত করেন। মদীনাতুর রাসূলে (সা) পৌঁছে নবীর (সা) দরবারে হাজির হলেন এবং নিজেকে সারওয়ারে দো আলমের (সা) খিদমতের জন্য ওয়াকফ করে দিলেন। [এক রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলে আকরাম (সা) ৩২টি দুধালো উটনী হযরত আবু জারকে (রা) দিয়েছিলেন। তিনি উটনীগুলো নিয়ে মদীনা থেকে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত জিকারদের নিকট এক জঙ্গলে মুকিম হয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রী লায়লা এবং পুত্র জারও (রা) সঙ্গে ছিলেন। ৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউল আউয়ালে বনু গাতফানের লুটেরারা আইনিয়া বিন হিসান ফাযারীর নেতৃত্বে হঠাৎ করে হামলা চালালো। এই হামলায় জার (রা) শহীদ হয়ে গেলেন। লুটেরারা সকল উটনী ও আবু জারের (রা) স্ত্রীকে হাঁকিয়ে নিয়ে চললো। সময় মতই সাহাবীরা এই খবর পেলেন এবং পিছু ধাওয়া করলেন ও সকলকে মুক্ত করে আনলেন। এই ঘটনা গাযওয়ায়ে জি কারদ নামে মশহুর হয়ে আছে।] তাবুকের যুদ্ধের প্রাক্কালে আবু জার গিফারীও (রা) নিজের প্রভু (সা) সহ তাবুক রওয়ানা হয়ে গেলেন। পথে তাঁর উট দুর্বল হয়ে পড়লো এবং তিনি ইসলামী বাহিনীর পেছনে পড়ে গেলেন। অন্তরে জিহাদের অনুপ্রেরণা ছিল। সেখানেই উট ছেড়ে দিলেন এবং সব সামান পিঠে নিয়ে পদব্রজে মনযিলে মাকসুদের দিকে রওয়ানা দিলেন। সামনে অগ্রসর হয়ে ইসলামী বাহিনী একস্থানে অবস্থান করলো। এক ব্যক্তি হুজুরের (সা) নিকট আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ দূরে একজন মানুষ আসছে। কে যে হবেন তা জানা নেই?" হুজুর (সা) বললেন, "আবু জার হবে।"

লোকজন দেখলো যে, সত্যি তিনি আবু জার (রা) ছিলেন। রাসূলে করিমের (সা) নিকট আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল আল্লাহর কসম তিনি আবু জারই।"

হুজুর (সা) বললেন, "আবু জার (রা) একাকীই চলে থাকে। একাকীই মারা যাবেন এবং কিয়ামতের দিন একাকী উঠবেন।"

হযরত আবু জার (রা) গিফারীর যুহ্দ, তাকওয়া এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ভালবাসার অবস্থাটা এমন ছিল যে প্রিয় নবী (সা) তাঁকে "মসিহুল ইসলাম লকবে বিভূষিত করেছিলেন।"

একদিন হযরত আবু জার (রা) রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এক ব্যক্তি কতিপয় ব্যক্তিকে ভালবাসে। কিন্তু তাঁদের আমল বাস্তবায়নের শক্তি রাখে না। তার ব্যাপারে আপনার কি ইরশাদ।"

হুজুর (সা) বললেন, "সেই ব্যক্তি যাঁদেরকে ভালবাসেন তাঁদের সঙ্গেই থাকবেন।"

আবু জার (রা) গিফারী আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি শুধু আপনাকে এবং আল্লাহ তায়ালাকে ভালবাসি।" হুজুর (সা) বললেন, "তুমি অবশ্যই আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের (সা) সঙ্গে রয়েছো।"

মহানবী (সা) আবু জার গিফারীকে (রা) এত স্নেহ করতেন যে, মৃত্যুশয্যাতেও তিনি তাকে ডেকে পাঠান। আবু জার (রা) নবীর (সা) নিকট পৌঁছে গভীর ভালবাসার সঙ্গে তাঁর ওপর ঝুঁকে পড়েন। হুজুর (সা) তার মুবারক হাত নিজের পবিত্র শরীরের সঙ্গে লাগালেন। আবু জার (রা) প্রায় আত্মহারা হয়ে পড়লেন। হুজুরের (সা) ওফাতের পর আবু জারের (রা) অন্তরের দুনিয়া উজার হয়ে গেল।

তিনি মদীনা ত্যাগ করে সিরিয়া গিয়ে বসবাস শুরু করেন। তাঁর জীবন ছিল যুহ্দ ও আল্লাহভীতি এবং দারিদ্র ও অল্পে তুষ্টির এক আশ্চর্য নমুনা। যা কিছু হাতে আসতো তা আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিতেন। শুধু একটি চাদর শরীরে শোভা পেত। শায়খাইনের (রা) পর তিনি অনুভব করলেন যে, ধন-সম্পদের প্রতি লোকদের মোহ সৃষ্টি হয়েছে। সাদাসিধে পোশাকের স্থলে আড়ম্বরপূর্ণ পোশাকের ব্যবহার শুরু হয়ে গেছে। বিজয় এবং গনিমতের মালের আধিক্যে কোষাগার স্ফীত হয়ে উঠেছে। সাধারণ ঘরের পরিবর্তে প্রাসাদ নির্মাণ শুরু হয়ে গেছে। আবু জার (রা) এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে বেচাইন হয়ে গেলেন। তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করে মুসলমানদেরকে ডেকে বললেন, "ভাইয়েরা আমার! ধন-সম্পদ জমা করা এবং আরাম-আয়েশের জীবন পরিচালনা করার মধ্যে সরাসরি ধ্বংস রয়েছে। আল্লাহর নির্দেশ হলো ঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ -

"যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে না তাদেরকে বেদনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।" (আত তাওবা ঃ ৩৪)

তোমরা যদি আল্লাহর নির্দেশ থেকে বিদ্রোহ ঘোষণা কর তাহলে তার প্রতিশ্রুতি কখনো টলতে পারে না।

হযরত আবু জার গিফারী (রা) যেভাবে এই আয়াতের তাফসির করতেন সে ব্যাপারে সিরিয়ার গভর্ণর আমীর মুয়াবিয়া (রা) এবং অধিকাংশ সাহাবী ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তাঁরা বলতেন যে, আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টানদের সঙ্গে এই আয়াত সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু আবু জার (রা) বলতেন যে, অবশ্যই নয়। এই আয়াত ইহুদী, খৃষ্টান এবং মুসলমান সকলের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। তিনি কঠোরভাবে এই মতই পোষণ করতেন এবং ভয়-ভীতি ও লোভ-লালসার কোন অস্ত্রই তাঁকে এই মত প্রকাশ থেকে বিরত রাখতে পারতো না। তাঁর কথার মর্মার্থ ছিল এই ঃ

"হে বিত্তবান মুসলমানরা! তোমরা যদি নিজের সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় না করো, তাহলে কিয়ামতের দিন তোমাদের জমাকৃত সম্পদ তোমাদের মুখমণ্ডলে, পাশে এবং পিঠে দাগ দেবে। মনে রেখো, সম্পদে তিন বস্তু শরীক থাকে। (১) উত্তরাধিকার। তুমি কখন এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে সে ব্যাপারে তারা অপেক্ষমান থাকে এবং তারা তোমার সঞ্চিত সম্পদ কবজা করতে চায় (২) তকদির। যা তোমাকে জিজ্ঞাসা ব্যতিরেকে সিদ্ধান্ত জারী করে দেয়। (৩) স্বয়ং তুমি। তুমি যদি এই উভয়ের ওপর বাজি নিতে পারো তাহলে অবশ্যই তুমি তা কর। আল্লাহ বলেন, "তুমি নেকী ও কল্যাণকে কখনই পেতে পারো না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি নিজের প্রিয় বস্তু সবার জন্য আম করে না দাও।"

"ভুলে যেও না যে, মানুষ মরার পর শুধু তিনটি বস্তুই তার কাজ দেবে(১) নেক আওলাদ। তারা তার জন্য মাগফিরাত কামনা করে। (২) সাদকায়ে জারিয়াহ (৩) ইলম যা থেকে মানুষ ফয়েজ লাভ করে থাকে।

গরীব লোকেরা আবু জারের (রা) বাণী শুনে, তাঁর ওপর পতঙ্গের মত আপতিত হতে লাগলো। অন্যদিকে ধনীরা তাঁর কথায় অমঙ্গলের পদধ্বনি শুনতে পেলো।

আমীরে মুয়াবিয়া (রা) নিজের প্রাসাদ আল খাজরা নির্মাণ করছিলেন। হঠাৎ করে একদিন হযরত আবু জার (রা) সেই স্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রাসাদের ঠাটবাট দেখে আমীর মুয়াবিয়াকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"এই প্রাসাদ নির্মাণ যদি আল্লাহর সম্পদ দিয়ে হয়ে থাকে তাহলে তা হবে খিয়ানত। আর তা নির্মাণে যদি নিজের সম্পদ ব্যয় করে থাকো তাহলে তা হবে অপচয়।"

আমীরে মুয়াবিয়া (রা) একথার কোন জবাব দিলেন না। কিন্তু তাঁর অন্তরে হযরত আবু জারের (রা) ব্যাপারে খটকা সৃষ্টি হয়ে গেল। কিছুদিন পর আমীর মুয়াবিয়া (রা) সাইপ্রাস অভিযানের ইচ্ছা করলেন। সেনাবাহিনী রওয়ানা হতে লাগলো। এমন সময় তিনি হযরত আবু জার গিফারীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি জিহাদে যেতে চান?" আবু জার (রা) তো আল্লাহর রাস্তায় নিজের জীবন ওয়াকফ করে রেখেছিলেন। তিনি জবাব দিলেন ঃ

"গৃহে এক হাজার দিন অতিবাহিত করার চেয়ে আল্লাহর পথে একদিন জিহাদ করা উত্তম। আমি জিহাদের আহবানে সাড়া দিচ্ছি।"

একথা বলেই তিনি ইসলামী বাহিনীতে গিয়ে শামিল হলেন। ইসলামের মুজাহিদরা যখন সাইপ্রাস জয় করে নিল তখন হযরত আবু জার গিফারী (রা) সিরিয়ায় ফিরে এসে লোকদের মধ্যে পুনরায় নিজের মত প্রচার করতে লাগলেন। সরকারের বিরুদ্ধে তিনি এত কঠোরভাবে সমালোচনা করতেন যে, আমীর মুয়াবিয়ার (রা) সঙ্গে বিবাদ বেধে যাওয়ার উপক্রম হলো। একদিন আমীর মুয়াবিয়া (রা) উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ আবু জারের (রা) খিদমতে প্রেরণ করলেন। তিনি সেই অর্থ কয়েক ঘন্টার মধ্যে অভাবীদের ভেতর বিতরণ করে দিলেন। পরের দিন আমীর মুয়াবিয়া (রা) পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে একজন দূতকে তাঁর নিকট এই বলে প্রেরণ করলেন যে, গতকাল ভুলবসত সেই অর্থ আপনাকে দেয়া হয়েছিল। তা ফিরিয়ে দিন। উদ্দেশ্য ছিল যে, যদি এই অর্থ আবু জারের (রা) নিকট বর্তমান থাকে তাহলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা যাবে যে, আপনিতো এক রাতের জন্যও সম্পদ জমা রাখা হারাম মনে করেন। অথচ এই অর্থ আপনি কেমন করে নিজের নিকট রেখেছিলেন। দূত যখন আবু জারের নিকট পৌঁছলো এবং তার নিকট অর্থ ফিরিয়ে দেয়ার দাবী জানালো তখন তিনি বললেন, "সেই অর্থতো আমি সূর্য ওঠার পূর্বেই অভাবীদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছি।" দূত আমীরে মুয়াবিয়ার (রা) নিকট ফিরে গেলো এবং তাঁকে হযরত আবু জারের (রা) জবাব শুনালো। জবাব শুনে তাঁর মুখ দিয়ে অযাচিতভাবে বেরিয়ে এলো, "আবু জার (রা) বাস্তবিকই সত্যবাদী। যা বলে তার ওপর আমলও করে।"

আমীর মুয়াবিয়া একদিন হযরত আবু জারকে (রা) ডেকে পাঠালেন। তিনি যখন তাশরীফ রাখলেন তখন তাঁকে খাবার দাওয়াত দিলেন। দস্তরখানের

ওপর বিভিন্ন ধরনের খাবার সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। আবু জারের (রা) মত দরবেশ মানুষ কি করে এই খাবারে হাত লাগাতে পারে। তৎক্ষণাৎ তিনি দাওয়াত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন এবং বললেন ঃ

"রাসূলের (সা) যুগ থেকে সপ্তাহে আমার খাবারের পরিমাণ হলো এক ছা' যব। আল্লাহর কসম! আমি তা থেকে বেশী খাবো না। এভাবেই আমি আমার দোস্ত রাসূলে আকরামের (সা) নিকট গিয়ে উপস্থিত হবো।"

আমীর মুয়াবিয়া (রা) এবং হযরত আবু জারের (রা) মধ্যে অসন্তোষ যখন বৃদ্ধি পেল তখন আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান (রা) হযরত আবু জারকে (রা) মদীনা ডেকে পাঠালেন। সেখানেও তিনি নিজের বিশেষ মত জনগণের মধ্যে প্রচার শুরু করলেন। হযরত উসমান (রা) চরমপন্থী ধ্যান-ধারণা দেখে তাঁকে ফতওয়া দান থেকে বিরত থাকতে বললেন। কিন্তু হযরত আবু জার(রা) এই নিষেধাজ্ঞা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম! আমার গর্দানের ওপর যদি তরবারীও রাখা হয় এবং আমার ইয়াকিন হয় যে, গর্দান কাটার পূর্বে যা কিছু প্রিয় নবীর (সা) নিকট থেকে শুনেছি তা শোনাতে পারবো তাহলে তা অবশ্যই শুনিয়ে দেবো।" "হযরত উসমান (রা) আবু জারকে (রা) "রাবযাহ" চলে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। মরু আরবের একটি ছোট গ্রাম হলো রাবযাহ। আবু জার গিফারী (রা) নিজেও নির্জনত্ব পসন্দ করতেন। নিজের পরিবার-পরিজনকে সঙ্গে নিলেন এবং আনন্দের সঙ্গে রাবযাহ গিয়ে বসবাস শুরু করলেন।

ইরাকের লোকজন হযরত আবু জারের (রা) রাবযাহ অবস্থানের কথা জানতে পেলো। তারা তাঁর নিকট একটি বার্তা প্রেরণ করলেন। এই বার্তায় তারা জানালো যে উসমান (রা) আপনার সঙ্গে অন্যায় আচরণ করেছেন। আপনি যদি আমাদের নেতৃত্ব দান করেন তাহলে আমরা উসমানের (রা) বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা তুলে ধরবো।

হযরত আবু জার (রা) গিফারী জবাবে বলে পাঠালেন ঃ "উসমান (রা) যা কিছু করেছেন তাতেই আমার কল্যাণ রয়েছে বলে আমি মনে করি। তোমরা তাতে নাক গলিও না এবং আমীরুল মু'মিনীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো না। কেননা যারা নিজের আমীরকে হেয় করে আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করেন না।"

ইরাকীরা চুপ মেরে গেল এবং হযরত আবু জার গিফারী (রা) দুনিয়ার হৈ-হাঙ্গামা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধৈর্য এবং অল্পে তুষ্ট থেকে জীবন কাটাতে লাগলেন। ৩১ অথবা ৩২ হিজরীতে হজ্জের মওসুমে হযরত আবু জার গিফারী

(রা) কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। রাবযাহর সকল মানুষ হজ্জের জন্য রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল। সে সময় তাঁর নিকট শুধুমাত্র জীবন সঙ্গিনী এবং এক কন্যা উপস্থিত ছিলেন। আবু জার গিফারীর (রা) মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হলে তাঁর স্ত্রী কাঁদতে লাগলেন। আবু জার (রা) খুব ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কাঁদছো কেন?"

স্ত্রী জবাব দিলেন, "আপনি এক বিরাণ স্থানে মৃত্যুবরণ করছেন। আমার নিকট আপনাকে কাফন দেয়ার মত কাপড় নেই। তাছাড়া আমার বাহুতে এমন শক্তিও নেই যে, আপনার স্থায়ী আবাস তৈরী করতে পারি।"

হযরত আবু জার গিফারী (রা) বললেন, "শোনো, একদিন আমরা কতিপয় ব্যক্তি রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। হুজুর (সা) বললেন, তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি মরুভূমিতে মারা যাবে এবং তার জানাযায় মুসলমানদের একটি দল বাইরে থেকে এসে অংশ নেবে। সে সময় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা শহরে ওফাত পেয়েছেন। এখন আমিই শুধু বাকী রয়েছি। রাসূলে আকরাম (সা) যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা অবশ্যই আমার জীবনে ঘটবে বলে আমি বিশ্বাস করি। তুমি বাইরে গিয়ে দেখো হুজুরের (সা) ইরশাদ অনুযায়ী মুসলমানদের কোন দল অবশ্যই আসছেন।" পাশেই একটি টিলা ছিল। হযরত আবু জারের (রা) স্ত্রী তাতে আরোহণ করে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর দূরে বালি উড়তে দেখা গেল। অতপর তার মধ্যে কতিপয় সওয়ার দেখা গেল। নিকটে এলে আবু জারের (রা) স্ত্রী তাঁদেরকে ডেকে বললেন, "ভাইসব! নিকটেই একজন মুসলমান আখিরাতের সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাঁর কাফন ও দাফনে আমাকে সাহায্য কর।" কাফেলার লোকেরা জিজ্ঞাসা করলেন, "লোকটি কে?" তিনি জবাব দিলেন, "আবু জার গিফারী (রা)।" আবু জারের (রা) নাম শুনেই কাফেলা ওয়ালারা অস্থির হয়ে পড়লেন এবং "আমাদের মাতা-পিতা তাঁর ওপর কোরবান হোক" একথা বলেই তাঁর দিকে অগ্রসর হলেন।

এদিকে আবু জার (রা) মেয়েকে বললেন, "কলিজার টুকরো আমার! একটি বকরী জবেহ করো এবং গোশতের হাড্ডি চুলায় চড়িয়ে দাও। কিছু মেহমান আসছেন। তাঁরা আমার কাফন-দাফন করবেন। তাঁরা যখন আমার দাফনের কাজ শেষ করবেন তখন তাদেরকে বলবে যে, আবু জার (রা) আপনাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলেছেন, যতক্ষণ আপনারা এই গোশত না খাবেন ততক্ষণ এখান থেকে বিদায় হবেন না।"

কাফেলার লোকজন যখন হযরত আবু জারের (রা) তাঁবুতে প্রবেশ করলেন তখন তাঁর শেষ অবস্থা। খুব দুর্বল কণ্ঠে বললেন, "তোমাদের শুভ হোক। বহু বছর পূর্বে হাদিয়ে বরহক (সা) তোমাদের এখানে আগমনের খবর দিয়েছিলেন। আমি তোমাদেরকে ওসিয়ত করছি যে, "আমাকে এমন কোন ব্যক্তি কাফন পরাবে না যিনি বর্তমানে সরকারী কর্মচারী আছে অথবা অতীতে ছিলে।" ঘটনাক্রমে সেই কাফেলায় একজন আনসার যুবক ছাড়া সকলেই কোন না কোনভাবে সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সে অগ্রসর হয়ে বললো, "হে রাসূলে করিমের (সা) প্রিয় বন্ধু! আমি আজ পর্যন্ত সরকারী চাকরি থেকে সম্পর্কহীন রয়েছি। আমার নিকট দু'টি কাপড় রয়েছে। কাপড় দু'টি আমার আম্মা নিজ হাতে বুনেছেন। অনুমতি দিলে এই কাপড় দিয়ে আপনার কাফন দিতে পারি।"

হযরত আবু জার (রা) হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লেন এবং অতপর "বিসমিল্লাহি ওয়া বিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতিহী রাসূলিল্লাহি" বলে মহান আল্লার নিকট জীবন সোপর্দ করে দিলেন।

এই কাফেলার অধিকাংশ মানুষ ছিলেন ইয়েমেনের অধিবাসী। ঘটনাক্রমে তাঁদের সঙ্গে ছিলেন ফাকিহুল উম্মাহ বা উম্মাহর ফকিহ হযরত আবদুল্লাহ(রা) বিন মাসউদ। তিনি জানাযার নামায পড়ালেন এবং সকলে মিলে ন্যায় ও হেদায়াতের সূর্যকে দাফন করলেন। তাঁরা যখন রওয়ানা হতে চাইলেন তখন আবু জার গিফারীর (রা) কন্যা কসম দিয়ে খাবার খাওয়ালেন।

আল্লামা তাবারী (র) বর্ণনা করেছেন যে, যাওয়ার সময় হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ হযরত আবু জারের (রা) পরিবার পরিজনকে সঙ্গে নিলেন এবং মক্কা মুয়াজ্জামা পৌছে তাঁদেরকে হযরত উসমানের (রা) হাওয়ালা করে দিলেন। অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হজ্জ থেকে ফিরে হযরত উসমান(রা) স্বয়ং তাঁদেরকে রাবযাহ থেকে মদীনা নিয়ে গেলেন এবং স্থায়ীভাবে তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিলেন। সাইয়েদেনা আবু জার গিফারী (রা) অন্যতম মহান সাহাবী ছিলেন। তাঁর মর্যাদার ব্যাপারে মিল্লাতে ইসলামিয়া ঐকমত্য ঘোষণা করে থাকেন।

ইসলাম গ্রহণে অন্যতম অগ্রগামী, রাসূল প্রেম, কুরআন ও হাদিসে উৎসাহী, দারিদ্র ও আল্লাহভীতি, ত্যাগ ও অল্পে তুষ্টি, তাকওয়া ও তাওয়াক্কুল, তাবলীগ ও ইরশাদ এবং সত্যবাদিতা ও স্পষ্টবাদিতা ছিল হযরত আবু জারের (রা) চরিত্রের উল্লেখযোগ্য দিক। সাইয়েদেনা হযরত উমর ফারুক (রা) জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁকে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদের সমান মনে করতেন।

শেরে খোদা আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু বলতেন, আবু জার (রা) এত জ্ঞান অর্জন করেছেন যে, মানুষ তা লাভে অক্ষম এবং সেই থলেকে এমনভাবে বন্ধ করে দিয়েছেন যে, তা থেকে সামান্যও কমেনি।

রহমতে আলম (সা) হযরত আবু জারকে (রা) সীমাহীন স্নেহ করতেন। তিনি যখন নবীর (সা) মজলিশে উপস্থিত হতেন তখন হুজুর (সা) সর্বপ্রথম তাঁকেই সম্বোধন করতেন। তিনি যদি মজলিশে উপস্থিত না থাকতেন তাহলে তাঁকে তালাশ করে আনা হতো এবং হুজুর (সা) তাঁর সঙ্গে মুসাফিহা করতেন।

নবীর (সা) দরবারে খুব কম সাহাবীই (রা) এমন ছিলেন যাঁরা লৌকিকতা ছাড়া হুজুরের (সা) নিকট প্রশ্ন করতে পারতেন। কিন্তু রহমতে আলম (সা) হযরত আবু জারকে (রা) এতো অধিক ভালবাসতেন যে, তিনি স্বাধীনভাবে সাধারণ সাধারণ ব্যাপারেও প্রশ্ন করতেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে, হযরত আবু জারের (রা) প্রতি রাসূলে করিমের (সা) শ্রদ্ধা ও ভালবাসা চরম পর্যায়ের ছিল। মদীনা আগমনের পর অধিকাংশ সময় তিনি রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে অতিবাহিত করতেন এবং মন-প্রাণ ঢেলে দিয়ে হুজুরের (সা) খিদমত করাই ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কাজ। এই খিদমতের বদৌলতে তিনি রাসূলের (সা) দরবারে এত নৈকট্য এবং আস্থা লাভ করেছিলেন যে, হুজুর (সা) তাঁকে গোপান কথাও বলতেন এবং তিনিও গোপনীয়তা রক্ষার দায়িত্ব পুরোপুরি আদায় করতেন।

একবার হযরত আবু জার (রা) মদীনার একটি মসজিদে শুয়ে ছিলেন। এমন সময় সারওয়ারে আলম (সা) তাশরীফ আনলেন এবং বললেন ঃ

"আবু জার! এমন সময় যদি আসে যে তোমাকে এই মসজিদ থেকে বের করে দেয়া হবে তাহলে তুমি কি করবে?"

আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! মসজিদে নববীতে (সা) চলে যাবো অথবা নিজের ঘরে বসে থাকবো।"

তিনি বললেন ঃ "সেখান থেকেও যদি বের করে দেয়া হয় তাহলে কি করবে?

আরজ করলেন ঃ "তরবারী বের করবো।" হুজুর (সা) তাঁর কাঁধের ওপর হাত রেখে তিনবার বললেন ঃ

"আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। তরবারী বের করবে না। বরং ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করবে এবং যেখানে তোমাকে চলে যেতে বলা হবে সেখানে চলে যাবে।"

হযরত আবু জার (রা) হুজুরের (সা) সেই ইরশাদের ওপর শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত আমল করেছিলেন। সকল অবস্থাতেই নিজের মত নির্ভয়ে প্রকাশ করতেন। কিন্তু সমকালীন শাসকের বিরুদ্ধে কখনো তরবারী ধরেননি। প্রকৃতপক্ষে শুধু এই ইরশাদই নয় বরং হুজুরের (সা) নিকট থেকে তিনি যা কিছু শুনতেন তা জীবনের জপমালা বানিয়ে নিতেন এবং শুধুমাত্র স্বয়ং নিজেই তার ওপর আমল করতেন না বরং লোকদেরকেও তার ওপর আমল করার নসিহত করতেন। কোন হাদিস বর্ণনা করার সময় তিনি এই বলে শুরু করতেন ঃ "আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ (সা) আমার নিকট থেকে এই প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন অথবা আমি আমার খলিল বা দোস্ত রাসূলুল্লাহকে (সা) একথা বলতে শুনেছি।" হুজুরের (সা) ওফাতের পর কখনো তাঁর কথা উল্লেখ করা হলে হযরত আবু জারের (রা) চক্ষু দিয়ে দরদর করে অশ্রু ঝরে পড়তো এবং প্রচণ্ড আবেগে কণ্ঠ দিয়ে কোন স্বর বের হতো না।

হযরত আবু জার (রা) বছরের পর বছর ধরে যদিও নবীর (সা) ফয়েজে অভিষিক্ত হয়েছিলেন তবুও তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা শুধুমাত্র ২৮১টি। নির্জনতাই তার প্রধান কারণ। তিনি হুজুরের (সা) যেসব ইরশাদ মুসলমানদের নিকট পৌঁছিয়েছিলেন তার বেশীর ভাগই ছিল তাওহীদ ও আখলাকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

তাঁর থেকে বর্ণিত কতিপয় হাদীস সংক্ষিপ্তাকারে এখানে বরকত হিসেবে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "হে আবু জার! কোন নেক কাজকেই উপহাসাস্পদ এবং সাধারণ মনে করে ছেড়ে দিও না। উদাহরণ স্বরূপ নিজের ভাইয়ের সাথে উদারতার সঙ্গে মিলিত হওয়াটাও নেক কাজ।" (মুসলিম)

২. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ হে আবু জার! যখন তুমি তরকারি রান্না করবে তখন শুরবা বেশী রাখবে এবং যে প্রতিবেশী সাহায্য পাওয়ার যোগ্য তার বাড়ি উপযুক্ত অংশ পাঠাবে। (মুসলিম)

৩. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের খাদেম তোমাদের ভাই। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত সে নিজে যা খাবে তা নিজের খাদেমকেও খাওয়াবে। যা নিজে পরবে তাকেও তা পরাবে এবং এমন কাজ দিয়ে তাকে কষ্ট দেবে না যা তার সাধ্যের বাইরে। যদি এমন কাজ তাকে করতে বলা হয়, তাহলে স্বয়ং তাকে সাহায্য করতে হবে। (বুখারী)

৪. নবী (সা) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি কাউকে ফাসেক অথবা ফাজের বলে এবং সে তা না হয় তাহলে তা সেই গালি দানকারীর ওপর আপতিত হবে। (বুখারী)

৫. আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, কোন্ আমল সবচেয়ে উত্তম। তিনি বলেছিলেন, আল্লাহর ওপর ঈমান আনা এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা। আমি আরজ করলাম। তারপর কোন্ আমল সবচেয়ে উত্তম। তিনি বললেন, গোলাম আযাদ করা। আমি আরজ করলাম। কোন্ গোলাম আযাদ করা সর্বোত্তম। তিনি বললেন, যে গোলাম সবচেয়ে বেশী মূল্যবান এবং মালিকের বেশী পসন্দনীয় তাকে আযাদ করাই সর্বোত্তম। আমি আরজ করলাম, যদি আমি তা না করতে পারি। বললেন, তুমি সেই অভাবীকে সাহায্য করো যে কোন মজদুরী অথবা পেশায় নিয়োজিত রয়েছে অথবা কোন অদক্ষ লোককে কাজ বাতিয়ে দাও। আমি আরজ করলাম, আমি যদি তাও না করতে পারি। বললেন, তুমি এমনভাবে জীবন কাটাও যাতে তোমার থেকে মানুষ কোন কষ্ট না পায়। কেননা তোমার জন্য এসব কথা সাদকা। (বুখারী)

৬. রাসূলুল্লাহ (সা) একবার ইরশাদ করলেন, একজন আগমনকারী পরওয়ারদিগারের নিকট থেকে এসে আমাকে খবর দিলেন যে, আমার উম্মত থেকে কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো এবং আল্লাহর সঙ্গে কোন বস্তুকে শরীক করলো না তাহলে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। আমি আরজ করলাম যদি সে যিনা এবং চুরিও করে। বললেন, হাঁ যদি সে যিনা এবং চুরিও করে (সে অবশ্যই জান্নাতে দাখিল হবে)। (বুখারী)

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবু জার (রা) হুজুরের (সা) নিকট চারবার এই সওয়াল করেছিলেন এবং তিনি প্রত্যেকবার একই জবাব দিয়েছিলেন। অবশ্য চতুর্থবার তিনি "যদিও আবু জারের (রা) নিকট তা যত অপসন্দনীয়ই হোক না কেন"—একথাটি অতিরিক্ত বলেছিলেন। হযরত আবু জারের (রা) অভ্যাস ছিল যে, তিনি যখন এই হাদিস বর্ণনা করতেন তখন হুজুরের (সা) একথাও অবশ্যই উল্লেখ করতেন।

৭. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে একটি নেকী করবে সে দশগুণ বদলা পাবে এবং আমি তার ওপরও বেশী করবো এবং যে খারাপ কাজ করবে সে শুধু একটি খারাপ কাজের বদলা পাবে। এবং এরও সম্ভাবনা রয়েছে যে আমি তাকে ক্ষমা করে দিতে পারি। যে আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হবে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাবো এবং যে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হবে আমি তার দিকে দুই হাত অগ্রসর হবো

এবং যে আমার দিকে আস্তে আস্তে মনোহর ভঙ্গীতে অগ্রসর হবে আমি তার দিকে ত্বরিত গতিতে অগ্রসর হবো। যে আমার সঙ্গে দুনিয়ার সমান গুনাহ করে মিলিত হবে আমি তার সঙ্গে ততবড় মাগফিরাত নিয়ে মিলিত হবো। শর্ত হলো সে আমার সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। -(মুসলিম)

৮. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, হে আবু জার! সর্বপ্রথম নবী ছিলেন আদম এবং সর্বশেষ হলাম আমি মুহাম্মাদ (সা)।

-(তিরমিজি, ইবনে হাব্বান, আবু নঈম ও ইবনে আসাকির)

হযরত আবু জার (রা) গিফারীর চরিত্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো যুহদ ও তাকওয়া এবং সবর ও অল্পে তুষ্টি। তিনি খুব সাদাসিধে প্রকৃতির এবং দরবেশ মানসিকতার মানুষ ছিলেন। তাঁর সাধনা ও আল্লাহর প্রতি ভরসার জীবন দেখে স্বয়ং নবী করিম (সা) বলতেন, আবু জারের (রা) মধ্যে ঈসা (আ) বিন মরিয়মের মত সাধনা রয়েছে।

হাফিজ ইবনে হাজার (র) ইসাবাতে লিখেছেন যে, হযরত আবু জারের(রা) জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত এই সাধনার জীবনই বিজয়ী ছিল। বিজয়ের আধিক্যে মুসলমানদের সমাজে যে পরিবর্তন এসেছিল হযরত আবু জার (রা) তার সামান্য পরিমাণ প্রভাবই কবুল করেছিলেন। নবীর (সা) যুগে যেমন জীবন কাটাতেন পরেও সবসময় সেই একইভাবে কাটাতেন।

একবার তিনি রাসূলে আকরামের (সা) নিকট নেতৃত্বের খাহেশ করেছিলেন। তাতে হুজুর (সা) বলেছিলেন, "আবু জার তুমি নেতৃত্বের বোঝা বইতে পারবে না। তোমার জন্য আমি সেই বস্তু পসন্দ করি যা নিজের জন্য পসন্দ করে থাকি।"

তারপর তিনি সারা জীবনে কোন পদের খাহেশ করেননি। চার হাজার দিরহাম ভাতা পেতেন। এই অর্থ থেকে বছরের সব প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে যা অবশিষ্ট থাকতো তা অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। ঘরে নগদ অর্থ রাখার তিনি কঠোর বিরোধী ছিলেন এবং লোকদেরকেও তা নিষেধ করতেন। "কানযুল উম্মালে" আছে, তিনি লোকদেরকে বলতেন যে, দুনিয়ায় শুধু দু'টি কাজ করবে। এক পরকালের আকাংখা এবং দ্বিতীয় হালাল রুজি। এছাড়া আর তৃতীয় কোন কাজের চেষ্টা করো না। যদি তোমাদের নিকট হালাল মাধ্যমে দুই দিরহাম এসে যায় তাহলে এক দিরহাম নিজের পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় করো এবং অপর দিরহামটি আল্লাহর পথে দান কর। তৃতীয় দিরহামের জন্য কখনো ইরাদা করো না। কারণ তা তোমাদেরকে ক্ষতিসাধন করবে।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে হযরত আবু আসমা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি রাবযাহতে হযরত আবু জারের (রা) নিকট গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি তাঁর স্ত্রীকে অত্যন্ত ক্লান্ত অবস্থায় দেখতে পেলেন এবং হযরত আবু জার (রা) বলছিলেন যে, দেখো, এই আল্লাহর বাঁদী আমাকে ইরাক যেতে বাধ্য করছে এবং আমি যখন ইরাকে গমন করবো তখন লোকজন নিজেদের দুনিয়া নিয়ে আমার দিকে অগ্রসর হবে। তারা জানে না যে, আমার খলিল রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলেছেন যে, পুলসিরাতে খুব সরু একটি পিছল রাস্তা রয়েছে। যার ওপর থেকে পা সরে সরে যেতে চাইবে। তোমাদের সকলকে সেই রাস্তা অতিক্রম করতে হবে। তোমাদের বোঝা যদি তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী হয় এবং তোমরা হালকা থাকো তাহলে তোমরা খুব সহজেই এই রাস্তা অতিক্রম করতে পারবে। কিন্তু তোমাদের ওপর যদি উটের মত বোঝা বোঝাই থাকে তাহলে রাস্তা অতিক্রম করা খুব কঠিন হবে।

তাবকাতে ইবনে সায়াদে আছে একবার ইরাকের গভর্ণর হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) হযরত আবু জারের (রা) সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তিনি তাঁকে হে আমার ভাই, হে আমার ভাই বলে সম্বোধন করছিলেন আর হযরত আবু জার (রা) বলছিলেন যে, গভর্ণর হওয়ার পর তুমি আর আমার ভাই নেই। হযরত আবু মূসা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, তা কেন? হযরত আবু জার (রা) বললেন, গভর্ণর হওয়ার পর তুমি কি কি করেছ তা আমি জানি না। প্রথমে বলো, কোন বড় প্রাসাদ তো বানাওনি। পশুর পালতো একত্রিত করোনি। কৃষিকাজ করে খাদ্য তো মজুদ করোনি। হযরত আবু মূসা (রা) যখন প্রত্যেক প্রশ্নের জবাব নেতিবাচক দিলেন তখন বললেন, "হাঁ এখন তুমি আমার ভাই।"

একবার জনৈক ব্যক্তি হযরত আবু জারকে (রা) এক চাদরে নামায পড়তে দেখলেন। নামায থেকে ফারেগ হওয়ার পর তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নিকট কি একটি চাদরই রয়েছে। বললেন, "হ্যাঁ" তিনি বললেন, কিছু দিন হলো আমি আপনার নিকট দু'টি কাপড় দেখেছিলাম। বললেন, "হ্যাঁ" তার মধ্যে থেকে একটিকে আমার চেয়েও অভাবগ্রস্তকে দিয়ে দিয়েছি। "তিনি বললেন ঃ "আপনার নিজেরই তো তা প্রয়োজন ছিল।" বললেন, "আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। তুমি আমাকে দুনিয়ার জঞ্জালে ফাঁসাতে চাচ্ছো। আমার নিকট একটি চাদর আছে। কিছু বকরী আছে। যার দুধ আমি পান করে থাকি। কয়েকটি খচ্চর আছে যা সওয়ারীর কাজে আসে। একজন খাদেম

আছে। যে খাবার রান্না করে দেয়। এসবের চেয়ে আর বেশী কি কি নেয়ামত আমার চাই? চরিত গ্রন্থসমূহে হযরত আবু জারের (রা) প্রসঙ্গে এ ধরনের কুড়িটি ঘটনা পাওয়া যায়। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, হযরত আবু জারের (রা) মধ্যে আল্লাহভীতি ও অল্পে তুষ্টি ছাড়া ত্যাগ, বদান্যতা, মেহমানদারী এবং বিনম্রতার মত সুন্দর গুণাবলীও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। প্রকৃতপক্ষে হযরত আবু জার (রা) একজন সর্বগুণে গুণান্বিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং তাঁর চরিত্রের প্রতিটি দিক ইসলামী মিল্লাতের জন্য মশাল হিসেবে বিবেচ্য।

হযরত সালমান ফারসী (রা)

সাইয়েদুল আবরার রহমতে আলম (সা)-এর শুভাগমনের অনেক বছর পূর্বে ইস্পাহানের (পারস্য) উপকণ্ঠে "জি" নামক এক গ্রামে "আবুল মুলক" নামের একটি ধনী খান্দান বাস করতো। এই গ্রামের সরদার "বুজাখশান বিন মুরসালান আবুল মুলকি" ইরানের দরবারে খুব প্রতিপত্তি রাখতো। সে শুধু একজন বড় জমিদারই ছিল না বরং একটি উপাসনাগারের পরিচালকও ছিল। বুজাখশানের একটি ছোট পুত্র ছিল। তার নাম ছিল মাবাহ। এই পুত্রের জন্য সে জীবনও দিতে প্রস্তুত ছিল। সে তাকে অত্যন্ত আদর যত্নে লালন-পালন করে। মাতা-পিতার আদর যত্নে লালিত পালিত হওয়া সত্ত্বেও সে খুব সৌভাগ্যবান ছিল। তাঁর স্বভাবে ঔদ্ধত্য ও যথেচ্ছাচার নাম মাত্রও ছিল না। সে একজন সাদাসিধে এবং নীরব প্রকৃতির ছেলে ছিল। সমবয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে খেলার পরিবর্তে যে সবসময় উপাসনালয়ে আগুন জ্বালানোতে ব্যস্ত থাকতো। উপাসনালয় যাতে সবসময় আলোকোজ্জ্বল থাকে এবং তার আগুন যাতে না নেভে এটাই ছিল তার প্রচেষ্টা।

একদিন বুজাখশান মাবাহকে বললো, পুত্র! আমি আজ প্রয়োজনীয় কাজের কারণে ক্ষেতে যেতে পারবো না, এ জন্য ক্ষেতের দেখাশুনার দায়িত্ব তোমার ওপর রইলো। মাবাহ পিতার নির্দেশ পালনার্থে তৎক্ষণাৎ ক্ষেতের দিকে রওয়ানা দিল। পথিমধ্যে ছিল খৃস্টানদের গীর্জা। সে সময় তারা ইবাদাতে মশগুল ছিল এবং উচ্চৈস্বরে মুনাজাত করছিলো। মাবাহ তাদের আওয়াজ শুনে গীর্জায় চলে গেল। খৃস্টানদের ইবাদাতের পদ্ধতি দেখে সে খুব প্রভাবিত হলো এবং স্বধর্ম অগ্নিপূজার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়ে পড়লো। খৃস্টানরা যখন ইবাদাত শেষ করলো তখন মাবাহ তাদের সরদারকে বললো যে, তাদের ধর্ম তার খুব পসন্দ হয়েছে। সেদিন থেকেই সে অগ্নিপূজা ছেড়ে দিল এবং তাদের ধর্ম গ্রহণ করলো। খৃস্টানরা খুব খুশী হলো এবং তারা সে সময়ই সে যুবককে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করে নিল।

মাবাহর অন্তরে হক অনুসন্ধানের ব্যস্ততা ছিল। খৃস্টানদের নিকট জিজ্ঞাসা করলো খৃস্ট ধর্মের কেন্দ্র কোথায়। তাঁরা বললো, সিরিয়ায়। মাবাহ কথাটি মনে রাখলো এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত গীর্জায় রইলো। যখন সূর্য ডুবে যাওয়ার সময় হলো তখন বাড়ী ফিরে এলো। পিতা জিজ্ঞাসা করলো ক্ষেত দেখে

এসেছোতো। মাবাহ জবাব দিল, "না, রাস্তায় একটি গীর্জা ছিল। কিছু মানুষ সেখানে ইবাদাতে মশগুল ছিল। তাদের ইবাদাত পদ্ধতি আমার খুব পছন্দ হলো এবং আমি সারাদিন তাদের নিকটেই কাটিয়েছি। "বুজাখশান পুত্রের "পথভ্রষ্টতায়" খুব ক্রোধান্বিত হলো। সে বললো, "তাদের ধর্ম সম্পূর্ণরূপে অদ্ভুত এবং আমাদের পবিত্র ধর্মের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। আজ থেকে ঘর থেকে বের হওয়া তোমার জন্য নিষিদ্ধ করা হলো।" একথা বলে সে তার কলিজার টুকরার পায়ে বেড়ি দিয়ে বন্দী করে রাখলো। মাবাহ অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে নির্জনত্বের জিন্দানখানায় কাটাতে লাগলো। একদিন সুযোগ পেয়ে সে খৃষ্টানদের নিকট একটি বাণী প্রেরণ করলো। বাণীতে সে বললো, সিরিয়া গমনকারী কোন কাফেলা পাওয়া গেলে তাকে যেন খবর দেয়া হয়। ঘটনাক্রমে কিছুদিন পরই সিরিয়া থেকে কিছু মানুষ বাণিজ্য ব্যাপদেশে সেখানে এলো। তারা যখন সিরিয়া প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হলো তখন খৃষ্টানরা মাবাহকে খবর দিল। মাবাহ কোন উপায়ে বেড়ি থেকে নাজাত লাভ করলো এবং সিরিয়া গমনকারী কাফেলায় শামিল হয়ে গেল।

সিরিয়া পৌঁছে মাবাহ লোকদের নিকট সেখানকার সবচেয়ে বড় ধর্মীয় নেতার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলো এবং পুনরায় তার খিদমতে পৌঁছে তাকে খৃষ্ট ধর্ম শিক্ষাদানের জন্য অনুরোধ জানালো। আরো বললো যে, খৃষ্ট ধর্ম হাসিলের জন্য সে সুদূর পারস্য থেকে এখানে এসেছে। উসকুফ মাবাহর দরখাস্ত কবুল করলো এবং সে তার নিকট থাকতে লাগলো। এই উসকুফ একজন কপট মানুষ ছিল। প্রকাশ্যতঃ সে সঠিক মানুষের মত কাটাতো। কিন্তু অভ্যন্তরীণ দিক থেকে সে ছিল আরাম-আয়েশের পূজারী এবং ধন-সম্পদ জমা করাই ছিল তার একমাত্র কাজ। সে সাত মটকী সোনা চাঁদী জমা করে রেখেছিল। মাবাহ তার লোভ-লালসা এবং বদকাজ দেখে মনে মনে খুব ফুঁসতো। কিন্তু কিছুই করতে পারতো না। কেননা মানুষ উসকুফকে অত্যন্ত ইজ্জত ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতো। কিছুদিন পর উসকুফের পরপারের ডাক এলো। তার কাফন দাফনের জন্য লোকজন একত্রিত হলো। এ সময় মাবাহ তার অভ্যন্তরীণ সব কথা লোকদের নিকট খুলে বললো এবং তাদেরকে তার জমাকৃত সম্পদের কাছে এনে হাজির করলো। লোকজন খুব উত্তেজিত হলো এবং উসকুফের লাশ শুলে চড়িয়ে খুব করে পাথর মারলো। তারপর তারা একজন আবেদ ও যাহেদ পাদরীকে তার স্থলাভিষিক্ত করলো। এই ব্যক্তি বাস্তবিকই নেক স্বভাব এবং পার্থিব আরাম আয়েশকে ঘৃণা করতো। তার প্রতি মাবাহর খুব ভক্তি শ্রদ্ধা জন্মালো এবং সে মন ও অন্তর দিয়ে তার খিদমতে লেগে থাকতো। পাদরীও যথাসাধ্য মাবাহকে ফয়েজ দেয়ার চেষ্টা করতো। শেষে তারও জীবন সন্ধ্যা

ঘনিয়ে এলো। মৃত্যু যন্ত্রণা উপস্থিত হলে সে মাবাহকে বললো, আমার মৃত্যুর পর তুমি মোসালের অমুক ব্যক্তির নিকট চলে যাবে। সে খৃষ্ট ধর্মের একজন সাচ্চা প্রেমিক। সে ছাড়া কোন হক পূজারীকে পাওয়া তোমার জন্য মুশকিলই হবে।

মাবাহ মরহুম পাদরীর ওসিয়ত অনুযায়ী মোসাল পৌছলো এবং যে ব্যক্তির ঠিকানা দেয়া হয়েছিল তার খিদমতে পৌছে জ্ঞান অর্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আল্লাহর কি কুদরত! কিছুদিন পরই সেও শেষ সফরের প্রস্তুতি নিলো। মৃত্যুর সময় সে মাবাহকে ওসিয়ত করলো ঃ

"হে আমার পুত্র! আমাকে দাফন করে তুমি নাসিবাইনে অমুক ব্যক্তির নিকট চলে যাবে। আমার জানা মতে সে ব্যক্তিই তোমাকে দ্বীনে হকের ওপর চালাবে। অন্যান্য মানুষ দ্বীনে পরিবর্তন এনেছে এবং পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।"

মাবাহ হকের অনুসন্ধানে নাসিবাইন পৌছলো। সেখানকার পাদরী তাকে নিজের অভিভাবকত্বে নিলেন। মাবাহ কেবলমাত্র কিছুদিন হলো সেই পবিত্র ব্যক্তির সুহবতে ফয়েজ পেয়েছিলো। এমন সময় মৃত্যুদূত তার দরজাতে এসেও উপস্থিত হলো। যখন সে মৃত্যুদূতের হাতে নিজের জীবন তুলে দিচ্ছিল তখন মাবাহ জিজ্ঞাসা করলো, "আমার পবিত্র অভিভাবক। আমার জন্য আপনার ইরশাদ কি।" পাদরী বললো, "পুত্র! যে নূরে হকের অনুসন্ধানে তুমি ব্যাপৃত রয়েছো। তা উমুরিয়ার অমুক ব্যক্তির নিকট পাবে। আমার মৃত্যুর পর সোজা তার নিকট চলে যাবে।"

মাবাহ নাসিবাইনের মরহুম পাদরীর কাফন-দাফনের পর সরাসরি উমুরিয়া পৌছলো এবং সেখানকার উসকুফের খিদমতে নিজেকে ওয়াকফ করে দিলো। সে একজন অত্যন্ত পবিত্র এবং পরহেজগার মানুষ ছিল। আল্লাহ তায়ালা তাকে ইলমের সাথে আমলও দান করেছিলেন। মাবাহ তার সুহবত বা সান্নিধ্যে খুব করে ফয়েজ লাভ করলো এবং খৃষ্ট ধর্মের সত্যিকার অনুগামী হয়ে গেল। নিজের উস্তাদের মত সে নিজেও দিন রাত ইবাদাতে মশগুল থাকতো। কয়েকটি বকরী কিনে নিয়েছিল তার দুধ থেকে শারীরিক শক্তি লাভ করতো। কিছুদিন পর উমুরিয়ার পবিত্রদেহী উসকুফেরও শেষ সময় এসে হাজির হলো। যখন সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছিলো তখন মাবাহ আরজ করলো ঃ

"আমি হাজার হাজার মাইলের অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের সফর অতিক্রম করে এবং কয়েকটি দরজার মাটি শোধন করে আপনার খিদমতে উপস্থিত

হয়েছিলাম। কিন্তু আপনিও আমার সঙ্গ ত্যাগ করে চলেছেন। আপনার পর আমি কোথায় যাবো।"

উমুরিয়ার দরবেশ ব্যক্তিটি ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিলো ঃ

"হে হক সন্ধানকারী পুত্র! আমি তোমাকে কি পরামর্শ দেবো? এ সময় সারা দুনিয়া নাফরমানীতে ডুবে আছে। কুফর ও শিরকের বিদ্যুত চারদিকে চমকাচ্ছে। এ দুনিয়ায় এমন কোন ব্যক্তি আমার নজরে আসছে না যার নিকট তোমাকে প্রেরণ করবো। অবশ্য এখন সেই শেষ নবীর (সা) আগমন সময় প্রায় সমুপস্থিত। তিনি আরবের মরুভূমি থেকে উঠে দ্বীনে হানিফকে জীবিত করবেন। এবং সেই যমীনে হিজরাত করবেন যাতে প্রচুর খেজুর বৃক্ষ থাকবে। তার দুই কাঁধের মধ্যে নবুওয়াতের মোহর থাকবে। তিনি হাদিয়া কবুল করবেন। কিন্তু নিজের জন্য সাদকাহ হারাম মনে করবেন। তুমি যদি সেই পবিত্র নবীর (সা) যামানা পাও তাহলে তাঁর খিদমতে অবশ্যই উপস্থিত হবে।"

একথা বলেই পবিত্র গুণের অধিকারী উসকুফ শেষ নিশ্বাস নিলো এবং স্রষ্টার সাথে গিয়ে মিলিত হলো।

তারপর মাবাহ শুরু করলো শেষ নবীর (সা) সন্ধান। সবসময় সে এক ধ্যানেই থাকতো। কোন কাফেলা পেলেই তার সঙ্গে সেই পবিত্র ভূমিতে গিয়ে পৌছবে যেখানে নবীয়ে (সা) আখিরুজ্জামান আবির্ভূত হবেন। শেষে একদিন তার অন্তরের ইচ্ছা পূরণ হলো। বনু কালাব গোত্রের একটি কাফেলা উমুরিয়া অতিক্রম করলো। মাবাহ জানতে পেল যে, এই কাফেলা আরব যাবে। তিনি তৎক্ষণাৎ কাফেলা সরদারের নিকট পৌছলো এবং তার গবাদি পশু নিয়ে তাকে সঙ্গে করে আরব নিয়ে যাওয়ার আবেদন জানালো। কাফেলার সরদার তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেল এবং মাবাহর গরু ও বকরী নিজের দখলে নিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে চললো।

কাফেলা যখন আলকুরা উপত্যকায় পৌছলো তখন কাফেলার লোকজনের নিয়ত সেই সাদা-সিধে অন্তরের যুবকের ব্যাপারে পরিবর্তন হয়ে গেল এবং তাকে গোলাম বানিয়ে এক ইহুদীর নিকট বিক্রয় করে দিল। মাবাহ কিছুদিন সেই ইহুদীর নিকট রইলো। ইয়াসরাবে বসবাসকারী সেই ইহুদীর এক আত্মীয় একদিন তার সঙ্গে দেখা করতে এলো। তার একটি গোলামের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। নিজের মেজবানের নিকট এ প্রসঙ্গে সে উল্লেখ করলো। তারপর সে মাবাহকে তার মেহমানের নিকট বিক্রয় করে দিল। এ ব্যক্তি

মাবাহকে নিজের সঙ্গে ইয়াসরাব নিয়ে এলো। ইয়াসরাব পৌঁছে মাবাহ চারিদিকে খেজুর বৃক্ষের ঝাড় দেখলো। তাতে তার আস্থা হলো যে, যে শেষ নবীর (সা) উল্লেখ উমুরিয়ার পাদরী করেছিল, তিনি একদিন এই খেজুর বৃক্ষের মাটিতে অবশ্যই শুভাগমন করবেন। এক্ষণে মাবাহ দিন-রাত সেই একই চিন্তায় বিভোর রইল।

শেষে একদিন সেই শুভ সময় সমুপস্থিত হলো। মাবাহ সেই অপেক্ষাতেই এতোদিন ছিল। সে নিজের ইহুদী মালিকের বাগানে এক খেজুর বৃক্ষে আরোহণ করে খেজুর পাড়ছিল। মালিক নীচে বসেছিল। ইত্যবসরে শহর থেকে হন্তদন্ত হয়ে একজন ইহুদী এলো এবং বললো, "খোদা বনু কিলাবকে ধ্বংস করুক। সকলেই কুবাতে এক ব্যক্তির নিকট দৌড়ে যাচ্ছে। এই ব্যক্তি মক্কা থেকে এসেছে। এবং নিজেকে নবী বলে দাবী করছে। তারা তার দাবীর প্রতি আস্থা স্থাপন করে ফেলেছে এবং তাদের শিশু ও মহিলাদের মধ্যেও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে।"

মাবাহর কানে একথা পৌঁছতেই তার শরীরেও শিহরণ জাগলো। তার অন্তর সাক্ষ্য দিল যে, তার ইপ্সিত বস্তু এসে পৌঁছেছে। ব্যাকুল চিত্তে সে বৃক্ষ থেকে নামলো এবং আগত ইহুদীর নিকট বেপরোয়াভাবে জিজ্ঞাসা করলো ঃ

"তুমি কি বলছিলে? আবার একটু বলো না!"

তার মালিক গোলামের অনুসন্ধানী মন ও ব্যাকুলতার জন্য খুব ক্রোধান্বিত হলো। খুব জোরের সাথে তার মুখের ওপর একটি চড় কষলো এবং বললো, "হতভাগা! তোর কাজ তুই কর। এসব কথায় তোর কি।" মাবাহ অন্তরের ওপর পাথর চাপা দিয়ে চুপ মেরে গেল। কিন্তু তার ধৈর্য ও স্থিতি শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন পর সুযোগ পেয়ে কিছু খাদ্যদ্রব্য কিনে রাসূলের (সা) দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলো এবং এভাবে আরজ করলো ঃ

"হে আল্লাহর মনোনীত বান্দাহ! আপনি এবং আপনার সাথীরা বিদেশী। এই কতিপয় জিনিস আমি সাদকার জন্য রেখেছিলাম। আপনার চেয়ে বেশী হকদার এ বস্তুর জন্য আর কাউকে পাইনি। এসব গ্রহণ করুন।"

হুজুর (সা) মাবাহর নিকট থেকে তা নিয়ে সঙ্গীদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন এবং নিজে কিছুই খেলেন না। মাবাহ মনে মনে বললো, "শেষ নবীর একটি আলামত বা নির্দশন তো দেখতে পেলাম যে, তিনি সাদকা খান না।" দ্বিতীয় দিন পুনরায় কোন খাদ্য বস্তু কিনলো এবং রাসূলের (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করলো, "এটা হলো হাদিয়া। কবুল করুন।" হুজুর (সা)

হাদিয়া কবুল করলেন। তার কিছু অংশ নিজে খেলেন এবং অবশিষ্টাংশ সাহাবীদের (রা) মধ্যে বন্টন করে দিলেন। মাবাহর পূর্ণ আস্থা হলো যে, সাদকা গ্রহণ থেকে বিরত থাকা এবং হাদীয়া গ্রহণকারী এ ব্যক্তিই শেষ নবী। কিন্তু তখনো নবুওয়াতের মোহর অবলোকন করা বাকী ছিল। কিছু দিনপর মাবাহ শুনতে পেলো যে রাসূলে আকরাম (সা) এক জানাযার সঙ্গে গারকাদ বাকীতে তাশরীফ এনেছেন। ধীরে ধীরে সে সেখানে পৌছলো। হুজুরকে (সা) আদবের সঙ্গে সালাম করলো এবং পবিত্র পিঠের দিকে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। উদ্দেশ্য যে কোন সময় কাপড় সরলে নবুওয়াতের মোহর দেখে নেবে। হুজুর (সা) মাবাহর অন্তরের অবস্থা অনুভব করতে পারলেন। পবিত্র পিঠ থেকে কাপড় সরিয়ে দিলেন। মাবাহর সামনে তখন মুহরে নবুওয়াত স্বীয় বৈশিষ্ট্যে দেদীপ্যমান ছিল। সে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে ঝুঁকে নিজের কম্পিত ঠোঁট মুহরে নবুওয়াতের ওপর রাখলেন। অতপর অবলীলাক্রমে কাঁদতে লাগলো। হুজুর (সা) বললেন, "সামনে এসো। মাবাহ সামনে এলো এবং হকের অনুসন্ধানে যেসব পর্যায় তাকে অতিক্রম করতে হয়েছিল তার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করলো। হুজুর (সা) মাবার সুদীর্ঘ কাহিনী সকল সাহাবীকেও (রা) শুনালেন। অতপর মাবাহকে মুসলমান করে তাঁর নাম রাখলেন সালমান। সেই দিন থেকেই মাবাহ বিন বুজাখশান সালমান ফারসী (রা) মহান নামে খ্যাত হয়ে গেলেন।

সালমান (রা) এক্ষণে নিজের মনজিলে মাকসুদে পৌছে গিয়েছিলেন। তার জীবনে বিপ্লব সাধিত হয়ে গিয়েছিল। দিনরাত তিনি আকায়ে দোজাহানের খিদমতে হাজির থাকতে চাইতেন। কিন্তু ইহুদীর গোলামীর জিঞ্জির ঘাড়ে এমনভাবে লেগে গিয়েছিল যে কোন মতেই তা থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব ছিল না। বদর এবং ওহোদের যুদ্ধ এমনিভাবেই কেটে গেল। এই গোলামী তাঁকে এ যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত রাখলো। হুজুর (সা) সালমানের মজবুরী বা অক্ষমতার কথা জানতেন। একদিন তাকে বললেন, "সালমান! তোমার প্রভু বা মালিককে বিনিময় দিয়ে দাসত্বের জিঞ্জির থেকে তোমার গলা মুক্ত করিয়ে নাও।" সালমানতো (রা) অন্তরে অন্তরে তাই চাইতেন। ইহুদী মালিকের সঙ্গে নিজের মূল্য ঠিক করলেন। সে চল্লিশ আওকিয়া সোনা এবং তিনশ' চারা লাগানোর দাবী জানালো। হুজুর (সা) এ চুক্তির কথা শুনে সাহাবা কিরামকে (রা) বললেন ঃ

"তোমরা সালমানকে (রা) একজন ইসলামের দুশমনের গোলামী থেকে স্বাধীন হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য কর।"

সাহাবীরা (রা) আনন্দ চিত্তে সালমানের (রা) সাহায্য করার দায়িত্ব নিলেন। প্রত্যেকেই সামর্থ অনুযায়ী বেশী বেশী চারা একত্রিত করলেন। এমনিভাবে পুরো তিনশ' চারা হয়ে গেল। অতপর সকলে মিলে গর্ত খুড়লেন। হুজুর (সা) স্বয়ং তাশরীফ আনলেন এবং সাহাবীদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে সকল চারা ইহুদীর জমিতে লাগিয়ে দিলেন। এখন আর একটি শর্ত বাকী রইলো। আল্লাহ তা পূরণের ব্যবস্থা করলেন।

কিছুদিন পর এক যুদ্ধে হুজুর (সা) চল্লিশ আওকিয়া সোনা পেলেন। হুজুর (সা) এই সোনা সালমানকে (রা) দিয়ে দিলেন এবং বললেন, যাও, তোমার মালিককে দিয়ে মুক্ত হয়ে এসো। সালমান (রা) দৌড়াতে দৌড়াতে গেলেন। এই সোনা ইহুদীকে দিলেন এবং তার গলা থেকে গোলামীর জিঞ্জির ছাড়িয়ে নিজের প্রকৃত মালিকের পায়ের ওপর এসে পড়লেন। সেই দিন থেকে সালমান (রা) ফারসী সর্বাবস্থায় রাসূলে করিমের (সা) খিদমতে উপস্থিত থাকতেন।

পঞ্চম হিজরীর জিলকদ মাসে খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মুশরিকদের একটি বিরাট বাহিনী মদীনার ওপর চড়াও হলো। হুজুর (সা) যুদ্ধের ব্যাপারে সাহাবীদের (রা) সঙ্গে পরামর্শ করলেন। হযরত সালমান ফারসী (রা) ইরানের যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কে খুব ভালভাবে ওয়াকিফহাল ছিলেন। তিনি আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! দুশমনের বিরাট বাহিনীর মুকাবিলায় আমাদের সংখ্যা অনেক কম। এ জন্য খোলা ময়দানে যুদ্ধ করা ঠিক হবে না। মদীনার চারদিকে খন্দক বা পরিখা খনন করে শহরকে হেফাজত করাটাই উত্তম হবে।"

হুজুর (সা) তাঁর প্রস্তাব খুব পছন্দ করলেন এবং পরিখা খননের কাজ শুরু করে দিলেন। রাসূলে করিমের (সা) সঙ্গে তিন হাজার সাহাবী (রা) এ কাজে শরীক হলেন এবং প্রায় ১৫ দিন কঠিন পরিশ্রমের পর পাঁচ গজ প্রশস্ত ও পাঁচ গজ গভীর পরিখা তৈরী হয়ে গেল। কাজ বন্টনের সময় আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে হযরত সালমানের (রা) সম্পর্কে এক চিত্তাকর্ষক বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। আনসাররা বলতেন, "সালমান আমাদের সাথে থাকবে।" আর মুহাজিররা বলতেন, "আমাদের সাথে থাকবে।" হুজুর (সা) একথা কাটাকাটি শুনে বললেন ঃ

"সালমান আমার আহলে বাইতের সদস্য।" আল্লাহর কি কুদরত! পারস্যের উদ্বাস্তু এবং মিসকিন সালমানের (রা) সৌভাগ্য। প্রিয় নবী (সা)

নিজের পবিত্র জবান দিয়ে তাকে নিজের আহলে বাইতে শামিল করছেন। মুশরিকরা রাসূলের শহরকে ধরাধাম থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এসেছিল। কিন্তু সেই খন্দক তাদেরকে শহর পর্যন্ত পৌঁছতেই দেয়নি।

অধিকন্তু আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে অদৃশ্যভাবে সাহায্য করলেন এবং এমন সব কারণ সৃষ্টি করে দিলেন যে, মুশরিকরা ২৭ দিন পর অবরোধ তুলে নিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেল।

খন্দকের যুদ্ধের পর হযরত সালমান (রা) প্রত্যেক যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তাঁর রাসূল প্রেম এবং জিহাদের উৎসাহ দেখে একবার হুজুর (সা) বললেন ঃ

"জান্নাত তিন ব্যক্তির কামনা করে থাকে। তারা হলেন, আলী (রা), আম্মার (রা) এবং সালমান (রা)।" আরো একবার হুজুর (রা) তাঁকে "সালমানুল খায়ের" নামে ভূষিত করেছিলেন।

সারওয়ারে কায়েনাতের (সা) ওফাতের পর সালমান ফারসী (রা) বেশ কিছুদিন মদীনায় রইলেন। ফারুকে আজমের (রা) খিলাফতকালে তিনি ইরাকে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন। ইরানের ওপর সামরিক অভিযানকালে তিনিও ইসলামী মুজাহিদ বাহিনীতে শরীক হলেন এবং কয়েকটি যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। ফারুকে আজম (রা) তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি সালমানকে (রা) মাদায়েনের গভর্ণর নিয়োগ করলেন এবং প্রায় চার অথবা পাঁচ হাজার দিরহাম বেতন নির্ধারণ করে নিলেন। কিন্তু সেই মরদে দরবেশের গভর্ণরী অবস্থা ছিল আশ্চর্য ধরনের। যে বেতন পেতেন তা মিসকিনদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন এবং স্বয়ং চাটাই বয়ন করে রুটির খরচ মেটাতেন। চাটাই বুনার আয়ের এক-তৃতীয়াংশ দান করতেন। খুতবা দানের সময় একটি সাধারণ ধরনের উবা পরিধান করতেন। কোথাও যাওয়ার সময় যীন ছাড়া একটি অতি সাধারণ গাধায় সওয়ার হয়ে এবং একটি ছোট খাটো কামিস পরে যেতেন। লোকজন তাঁকে দেখে হাসতো এবং ঠাট্টা করতো। কিন্তু তিনি সাফ সাফ বলতেন, "ভাল ও মন্দের আন্দাজ তো এই জীবনের পরে হবে। আজ যত ইচ্ছা তত হেসে নাও।"

তার নিকট উটের পশমের একটি পুরাতন কম্বল ছিল। দিনের বেলা তা শরীরের ওপর দিতেন এবং রাতে শোয়ার সময় তা মুড়ি দিতেন। তিনি যখন নিজের দরবেশী পোশাক পরিধান করে বাইরে বেরুতেন তখন লোকজন বলতো, "নেকড়ে বাঘ এসেছে, নেকড়ে বাঘ এসেছে।" একদিন মাদায়েনের বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় একজন অপরিচিত মানুষ তাকে মজদুর

মনে করে নিজের সামান উঠাতে বললো। হযরত সালমান (রা) সামান মাথায় নিয়ে তার পেছনে পেছনে চললেন। রাস্তায় লোকজন তা দেখে বললো, "হে রাসূলের সাহাবী, হে আমীর, আপনি এই বোঝা কেন মাথায় তুলেছেন! আনুন আমরা তা পৌঁছে দিই।" সামানের মালিক হতভম্ব হয়ে গেল। অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে হযরত সালমানের (রা) নিকট ক্ষমা চাইল এবং তার মাথা থেকে সামান নামাতে চাইলো। হযরত সালমান (রা) বললেন ঃ

"ভাই, তুমি এই সামান উঠিয়ে নিজের বাড়ী পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করেছিলে। এখন আমি তা মনযিলে মকসুদে পৌঁছে দিয়ে ক্ষান্ত হবো।"

একবার এক ব্যক্তি হযরত সালমান ফারসীর (রা) গৃহে গেল। গিয়ে দেখলো যে, তিনি নিজের হাতে আটা ঠাসছেন। সে জিজ্ঞেস করলো, খাদেম কোথায়? হযরত সালমান (রা) জবাব দিলেন, কোন কাজে পাঠিয়েছি। আমি তার কাঁধে দুই দুইটা কাজের বোঝা চাপানো সমীচীন মনে করি না।"

একদিন কোন এক ব্যক্তি হযরত সালমান ফারসীকে (রা) গালি দিল। তিনি বললেন, "ভাই, কিয়ামতের দিন যদি আমার গুনাহর পাল্লা ভারী হয় তাহলে তুমি যা কিছু বলেছ আমি তার থেকেও খারাপ। আর যদি আমার গুনাহর পাল্লা হাল্কা হয় তাহলে তোমার কথায় আমার ভয় কিসের।"

একবার এক ব্যক্তি হযরত সালমানকে (রা) বললো, আপনারতো ঘর-বাড়ী নেই। আমি আপনার জন্য একটি ঘর বানাতে চাই। হযরত সালমান (রা) তাতে অস্বীকৃতি জানালেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি অব্যাহতভাবে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। শেষে হযরত সালমান (রা) বললেন, "ভাই! যদি আমার জন্য ঘর বানাতেই চাও তাহলে এমনভাবে বানাবে যে যদি শুই তাহলে পা যেন দেয়ালে ঠেকে যায়, যদি দাঁড়াই তাহলে মাথা যেন ছাদে ঠেকে যায়।" সে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী ছোট করে একটি ঝুপড়ি বানিয়ে দিল।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের (রা) খিলাফতকালে ৩৫ হিজরীতে হযরত সালমান ফারসী ইন্তেকাল করেন। চরিত গ্রন্থসমূহে তাঁর বয়স সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের রেওয়ায়াত আছে। যেমন ৮০ বছর, ১৫০ বছর এবং ২৫০ বছর। হাফেজ ইবনে হাজার (র) ইসাবাতে ২৫০ বছর সম্পর্কিত রেওয়ায়াতকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি যখন মৃত্যু শয্যায় তখন হযরত সাদ বিন আবি ওয়াকাস (রা) তাঁর শুশ্রূষার জন্য গিয়েছিলেন। হযরত সালমান (রা) জার জার হয়ে কাঁদতে লাগলেন। হযরত সাদ (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"আবু আবদুল্লাহ! [সালমান ফারসীর (রা) কুনিয়ত] কাঁদার কি কারণ থাকতে পারে। রাসূলে করিম (সা) তোমার ওপর সন্তুষ্ট চিত্তে বিদায় নিয়েছেন। এখনতো স্থায়ী জগতে তোমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত ঘটবে।"

হযরত সালমান (রা) জবাব দিলেন, "আল্লাহর কসম আমি মৃত্যুকে ভয় করি না। পার্থিব স্বার্থেরও আমার খাহেশ নেই। বরং এ জন্য কাঁদি যে, প্রিয় নবী (সা) আমার নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, আমি যেন দুনিয়া জমা না করি এবং দুনিয়া থেকে সেইভাবে যাই যেভাবে তিনি গিয়েছিলেন। এখন আমার নিকট আসবাবপত্র জমা হয়ে গেছে এবং আমি প্রিয় নবীর (সা) দর্শন লাভ থেকে বঞ্চিত হতে পারি বলে ভীত।" যে আসবাবপত্রের জন্য হযরত সালমান (রা) কাঁদছিলেন। তা ছিল শুধুমাত্র একটি বড় পাত্র, একটি লোটা, একটি পুরানো কম্বল এবং একটি লোহার পাত্র। বালিশের পরিবর্তে মাথার নীচে দু'টি ইট ছিল। তিনি হযরত সা'দ (রা) এবং অন্য লোকদেরকে নসিহত করলেন যে, "সকল অবস্থাতেই আল্লাহকে স্মরণে রেখো এবং হজ্জ অথবা জিহাদ করতে করতে অথবা কুরআন পড়তে পড়তে আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করো। তাছাড়া খিয়ানতের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না।"

হযরত আবু আবদুল্লাহ সালমান ফারসী (রা) অন্যতম জালিলুল কদর সাহাবী ছিলেন। তিনি রাসূলের (সা) বিশেষ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। এছাড়াও তিনি ইলম ও ফজল রাসূল প্রেম, ফাহাম ও তাদাববুর আল্লাহভীতি এবং তাফাককুহ ফিদ্বীনের বদৌলতে সাহাবায়ে কিরামের (রা) পবিত্র জামায়াতে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। হযরত সালমানের (রা) মর্যাদা সম্পর্কে মুসলমানদের সকল থটস অব স্কুলের গবেষকদের পূর্ণ ঐকমত্য রয়েছে। তাঁর ইলম ও ফজিলতের ওপর সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য স্বয়ং নবী করিমের (সা) এই বক্তব্য, "সালমান (রা) ইলমে পূর্ণ।" শেরে খোদা হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর নিকট একবার হযরত সালমানের (রা) ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, "সালমান (রা) ইলম ও হিকমতে লোকমান হাকিমের সমান ছিলেন।" অন্য আরেকবার তিনি বলেছিলেন "সালমানকে (রা) প্রথম (অর্থাৎ পূর্বেকার কিতাব ইঞ্জিল ও তাওরাত) এবং শেষ (অর্থাৎ কুরআনে হাকিম)-এর ইলম দেয়া হয়েছে। তিনি এমন এক নদী যা কখনো শুকায় না।" আল্লামা ইবনে সায়াদ বর্ণনা করেছেন যে, ইমামুল ফুকাহা আলেমে রাব্বানী হযরত মায়াজ (রা) বিন জাবাল আনসারী একবার নিজের একজন শাগরেদকে ওসিয়ত করছিলেন যে, চার ব্যক্তির নিকট থেকে

ইলম হাসিল করবে। এই চার ব্যক্তির মধ্যে হযরত সালমান (রা) একজন ছিলেন।

প্রিয় নবীর (স্বা) প্রতি হযরত সালমানের (রা) গভীর ভালবাসা ছিল। তিনি বেশীর ভাগ সময়ই হুজুরের (সা) খিদমতে অতিবাহিত করতেন এবং সামর্থ অনুযায়ী নবীর (সা) ফয়েজে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। রাসূলে করিমের (সা) সঙ্গে তার বিশেষ নৈকট্যে কোন কোন সময় উম্মুহাতুল মু'মিনীনেরও (রা) ঈর্ষা জাগতো।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) সিদ্দীকা বলেন, সালমান (রা) রাতে রাসূলের (সা) খিদমতে এত দেরী করতেন যে, আমাদের (পবিত্র স্ত্রীগণ) আশংকা হতো যে, আমাদের অংশের সময়ও বুঝি হুজুর (সা) সালমানের সঙ্গে কাটিয়ে দেন।

হযরত সালমানের (রা) প্রতি হুজুরের (সা) ভালবাসা এত গভীর ছিলো যে, তিনি তাঁকে অগ্নি উপাসকের বংশোদ্ভূত এবং বিদেশী হওয়া সত্ত্বেও নিজের আহলে বাইতের মধ্যে শামিল করে নিয়েছিলেন। সহীহ মুসলিমে আছে, একবার হযরত সালমান (রা), হযরত বিলাল (রা) এবং হযরত সুহায়েব (রা) একস্থানে একত্রে বসেছিলেন। ঘটনাক্রমে আবু সুফিয়ান (রা) তাঁদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিন বুজর্গই বললেন, "আল্লাহর কোন তরবারী এই আল্লাহর দুশনের গর্দানের ওপর পড়েনি।" হযরত আবু বকর সিদ্দীকও (রা) তাদের নিকটেই ছিলেন। তিনি বললেন, "এই ব্যক্তি কুরাইশের সরদার। তার ব্যাপারে তোমাদের এমন কঠোর কথা বলা উচিত ছিল না। তিন বুজর্গই সিদ্দীকে আকবারের (স্বা) ইরশাদ পছন্দ করলেন না। হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রা) এই ঘটনা হুজুরের (সা) খিদমতে আরজ করলেন। তিনি বললেন, "সম্ভবত তুমি তাঁদেরকে নারাজ বা অসন্তুষ্ট করে ফেলেছ। তাঁদের নারাজ করার অর্থই হলো আল্লাহকে নারাজ করা।"

হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে সিদ্দীকে আকবার (রা) খুব লজ্জিত হলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই বুজর্গদের নিকট গিয়ে ক্ষমা চাইলেন।

হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) "ইসতিয়াব" গ্রন্থে এই রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ তায়ালা আমাকে চার ব্যক্তির সঙ্গে মুহাব্বাত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এবং আমাকে খবর দিয়েছেন যে, তিনিও (আল্লাহ) তাঁদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করেন।" জিজ্ঞেস করা হলো, এই চার ব্যক্তি কে কে। বললেন, "আলী (রা), মিকদাদ (রা), সালমান (রা) ও আবু জার (রা)।"

মুসতাদরাকে হাকিমে স্বয়ং হযরত সালমান (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি একবার রাসূলের (সা) খিদমতে হাজির হলাম। সে সময় তিনি একটি বালিশে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন। তিনি তা আমার সামনে ফেলে দিলেন এবং বললেন, "হে সালমান! যদি কোন মুসলমান নিজের মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাত করতে যায় এবং সে সম্মান প্রদর্শনার্থে তার জন্য নিজের বালিশ পেশ করে তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন।"

হযরত সালমান (রা) একবার হযরত ওমর ফারুকের (রা) নিকট গেলেন। তিনিও সম্মান প্রদর্শনার্থে নিজের পিঠের বালিশ সালমানকে (রা) পেশ করলেন। হযরত সালমান (রা) হযরত ওমরকে (রা) দোয়া দিলেন এবং সেই ঘটনা বর্ণনা করলেন যাতে হুজুর (সা) তাঁকে নিজের বালিশ প্রদান করেছিলেন। হযরত সালমানের (রা) সংসারের প্রতি উদাসীনতা ও তাকওয়ার অবস্থা এমন ছিল যে, সারা জীবন ফকিরের অবস্থায় কাটিয়ে দিয়েছিলেন। এমনকি গভর্ণর হওয়ার পরও ফকিরী অবস্থা বিরাজিত ছিল। তিনি একদম সাদা সিধে স্বভাবের ছিলেন। তাঁর বাসস্থান ছিল একটি ঝুপড়ি। দাঁড়ালে তার ছাদ মাথায় ঠেকতো। আর শুলে তাঁর দেয়াল দুই পায়ে ঠেকে যেতো। আর এই ঝুপড়িও লোকেরা তাঁকে অনেক পীড়াপীড়ি করে বানিয়ে দিয়েছিল। মৃত্যুর সময় ঘরের সকল সামানের মূল্য ২০-২২ দিরহামের বেশী ছিল না।

কুন্দাহ গোত্রে হযরত সালমানের (রা) বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর স্ত্রীর নিকট গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন যে, দেয়ালের স্থানে স্থানে পরদা লটকানো রয়েছে। তিনি বললেন, এই ঘরের কি জ্বর হয়েছে যে, তাকে বাতাস থেকে রক্ষার জন্য কাপড় লটকিয়ে দেয়া হয়েছে অথবা মক্কা মুয়াজ্জমা থেকে কাবা কুন্দাহ গোত্রে এসে পৌছেছে ফলে তার ওপর গিলাফ চড়ানো হয়েছে। তারপর তিনি দরজার পর্দা ছাড়া সকল পর্দা দেয়াল থেকে সরিয়ে দিলেন। তাতে দেয়াল পরিষ্কার দেখা যেতে লাগলো। তিনি ঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সেখানে অনেক মূল্যবান সামান পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন। এই সামান কার। বলা হলো আপনার এবং আপনার স্ত্রীর।

তিনি বললেন, আমার আকা মুহাম্মাদ (সা) আমাকে বলেছিলেন, দুনিয়ায় তোমার নিকট শুধু এতটুকুন সামান থাকতে হবে যতটুকু কোন মুসাফিরের নিকট পথের প্রয়োজনের জন্য থাকে। আমার এই সামানের প্রয়োজন নেই।

একবার কোন শহর জয়ের পর সঙ্গীদের সাথে সেখানে প্রবেশ করলেন। এ সময় স্থানে স্থানে খানাপিনার বস্তুর স্তুপ দেখতে পেলেন। একজন সঙ্গী আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললেন, দেখুন আল্লাহ তায়ালা কত কি প্রদান করেছেন।

হযরত সালমান (রা) তাকে বাধা দিয়ে বললেন, ভাই কিসে এতো খুশী হচ্ছো। এটাও খেয়াল রেখো যে, প্রতিটি দানার হিসাব-কিতাবের দায়িত্ব আমাদের ওপর এসে পৌঁছেছে।

হযরত সালমান (রা) মাদায়েনের গভর্ণর ছিলেন এবং ৩০ হাজার মানুষের ওপর শাসন কাজ চালাতেন। একবার মাদায়েন থেকে সিরিয়া গমন করলেন। জ্বীন ছাড়া একটি গাধার ওপর সওয়ার হয়ে সেখানে গেলেন। গায়ে ছিল শতর্ধো তালি লাগানো লিবাস। লোকজন বললো, হে আমীর! আপনার একি অবস্থা। তিনি বললেন, ভাই! আরাম-আয়েশ তো শুধু মাত্র আখিরাতের জন্য।

হযরত সালমানের (রা) আল্লাহ্ ভক্তি ও আল্লাহভীতি নিসন্দেহে অসাধারণ ছিলো কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, তিনি সন্ন্যাসত্ব গ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা) সন্ন্যাসত্ব গ্রহণ নিষেধ করেছিলেন, সেহেতু হযরত সালমান (রা) সন্ন্যাসত্ব নিজেই শুধু অপছন্দ করতেন না, বরং অন্যদেরকে তা গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বলতেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) ইসতিয়াব গ্রন্থে লিখেছেন যে, হযরত সালমানের (রা) পাতানো ভাই হযরত আবু দারদা (রা) আনসারী সীমাহীন আবেদ ও যাহেদ ছিলেন। দিনে রোযা রাখতেন এবং রাত ভর ইবাদাতে মশগুল থাকতেন। একবার হযরত সালমান (রা) তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তিনি সে সময় বাড়ী ছিলেন না। তাঁর স্ত্রীকে আলুথালু অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, তোমার এ অবস্থা কেন! তিনি জবাব দিলেন, কার জন্য সেজেগুজে থাকবো। তোমাদের ভাইতো দুনিয়া ছেড়ে দিয়েছে। হযরত আবু দারদা (রা) বাড়ী এসে হযরত সালমানকে (রা) দেখে খুব খুশী হলেন। তাঁর সামনে খাবার দিলেন এবং নিজে রোযা রাখার কারণে ক্ষমা চাইলেন।

হযরত সালমান (রা) বললেন, "যদি তুমি না খাও তাহলে আমিও খাবো না।" অতপর হযরত আবু দারদার (রা) নিকটই শুয়ে পড়লেন। কিছু রাত অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত আবু দারদা (রা) ইবাদাতের জন্য উঠলেন। এ সময় তিনি তার হাত চেপে ধরলেন এবং বলেন, "আবু দারদা! তোমার ওপর তোমার রব, তোমার চোখ এবং তোমার স্ত্রী সকলেরই অধিকার রয়েছে। রোযার সঙ্গে ইফতার এবং শববিদারীর সঙ্গে শয়নও আবশ্যক। ভোর হলে উভয়েই বিষয়টি রাসূলের (সা) খিদমতে পেশ করলেন। হুজুর (সা) হযরত আবু দারদাকে (রা) সম্বোধন করে বললেন, "সালমান (রা) দ্বীন সম্পর্কে তোমার চেয়ে বেশী জ্ঞান রাখে।"

আল্লামা ইবনে আছির (র) "উসুদুল গাব্বাতে" লিখেছেন যে, প্রিয় নবীর (সা) ইন্তেকালের পর হযরত আবু দারদা (রা) সিরিয়া চলে গেলেন। সেখানে তিনি অবস্থা সম্পন্ন হয়ে উঠলেন। একবার তিনি হযরত সালমানকে (রা) [তিনি এ সময় ইরাকে ছিলেন।] চিঠি লিখলেন ঃ

"এখানে আমি খুব সচ্ছল অবস্থায় আছি। আল্লাহ তায়ালা সম্পদ ও সন্তান উভয় বস্তুই দান করেছেন এবং আমি পবিত্র স্থানে অবস্থান করছি।"

হযরত সালমান (রা) তার জবাবে লিখলেন ঃ

"ভাই। সম্পদ ও সন্তানের আধিক্য অথবা পবিত্র স্থানে থাকাই ভাল নয় বরং উত্তম হলো যে, তুমি এমন কোন আমল কর যা পরকালে তোমার কাজে আসবে।"

হযরত সালমান (রা) থেকে ৬০টি হাদিস বর্ণিত আছে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) এবং আওস বিন মালিক (রা) তাঁর অন্যতম ছাত্র ছিলেন। হাদিস বর্ণনায় তিনি অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন এবং অন্যদের নিকট থেকেও একই ধরনের আশা করতেন। একবার তিনি সাহিবুসসির (গোপন কথা জাননেওয়ালা) হযরত হুজায়ফা (রা) ইবনুল ইয়ামানের মত জালিলুল কদর সাহাবীকেও একটি ব্যাপারে বাধা দিয়ে ছিলেন। ব্যাপারটি হলো তিনি মাদায়েনের লোকদেরকে এমন কিছুকথা শুনাতেন যা হুজুর (সা) ক্রোধান্বিত অবস্থায় কারোর সম্পর্কে বলেছিলেন। তিনি হযরত হুজায়ফাকে (রা) বললেন, "তুমি কি জানো না যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলতেন যে, হে আল্লাহ! ক্রোধান্বিত অবস্থায় কারোর সম্পর্কে আমার মুখ দিয়ে কঠোর বাক্য বের হয়ে পড়ে তাহলে সেই বাক্যও তার জন্য কল্যাণকর করে দিও। এখন তুমি লোকদের নিকট এসব কথা বলছো। পরিণামে মুসলমানদের মধ্যে বিশৃংখলা বাড়বে। কেননা যাদের ওপর হুজুর (সা) কখনো সাময়িকভাবে ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন তাদেরকে অন্য মুসলমানরা ভয়ের মনে করবে। তুমি যদি তোমার ভূমিকা পরিত্যাগ না কর তাহলে আমি আমিরুল মু'মিনীন ওমরকে (রা) বলে দেব।" রহমতে আলমের (সা) সীমাহীন স্নেহ পাবার কারণে আহলে বাইতের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। এ জন্য তিনি সাদকার ব্যাপারে খুবই কঠোরতা অবলম্বন করতেন। কোন বস্তুতে যদি সাদকার সামান্যতম সন্দেহও হতো তাহলে তা তিনি পরহেজ করতেন।

পরকাল ভীতির অবস্থা এমন ছিল যে, নিজেও সবসময় এ ব্যাপারে ভীত সন্ত্রস্ত থাকতেন এবং লোকদেরকেও তা স্মরণ করাতেন। বলতেন, তিন ব্যক্তির

ব্যাপারে আমার খুব বিস্ময় লাগে। প্রথম সেই ব্যক্তি যে সবসময় দুনিয়া তলবে থাকে। অথচ, মৃত্যু তার তলবে রয়েছে।

দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি যে মৃত্যুকে ভুলে বসে আছে। কিন্তু মৃত্যু তার থেকে মোটেই গাফিল নয়। তৃতীয় সেই ব্যক্তি, যে হোহো করে হাসে। অথচ সে জানে না যে, আল্লাহ তার ওপর সন্তুষ্ট অথবা অসন্তুষ্ট।

একবার নেতৃস্থানীয় কুরাইশবৃন্দ এক স্থানে একত্রিত হয়েছিলেন এবং নিজেদের ফজিলত ও প্রশংসা বর্ণনা করছিলেন। হযরত সালমানও (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকেও নিজের সম্পর্কে কিছু বলতে বলা হলো। তিনি বললেন ঃ

"ভাইসব। আমি কিসের ওপর গর্ব করবো। আমার শুরু হয়েছে অপবিত্র পানি দিয়ে এবং পরিণামে একদিন এই দেহ দুর্গন্ধ লাশের রূপ পরিগ্রহ করবে। অতপর পরকালে জীবনের সকল আমল তো নিয়ে যাবো। যদি নেকীর পাল্লা ভারী হয় তাহলে আল্লাহ প্রতিদান দেবেন। আর যদি খারাপের পল্লা ভারী হয় তাহলে স্থায়ী অপমান ও শাস্তি রয়েছে।"

তিনি প্রায়ই বলতেন, তিনটি বিষয় তাঁকে মারাত্মক দুশ্চিন্তায় ডুবিয়ে রাখে এবং তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে, এক, রাসূলের (সা) এবং তাঁর সঙ্গীদের বিচ্ছিন্নতা। দ্বিতীয় কবরের আযাব এবং তৃতীয় কিয়ামত ভীতি।

তিনি লোকদেরকে প্রায়ই বিনয়ী হওয়ার উপদেশ দিতেন এবং বলতেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয় আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার মাথা বুলন্দ করবেন।

কাজ অথবা কথা যে দিকেই নজর দেয়া যাবে সেদিকেই হযরত সালমানের (রা) চরিত্র আলোকজ্জ্বল বলে পরিদৃষ্ট হবে।

হযরত ইবনে উম্মে আবদ (রা)

ফকিহুল উম্মাত

দাওয়াতে হকের প্রথম যুগে একদিন রহমতে আলম (সা) হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) সঙ্গে মক্কা মুয়াজ্জামার বাইরে জঙ্গলে তাশরীফ নিলেন। হাটাহাটি করতে গিয়ে রাসূলে করিম (সা) পিপাসা অনুভব করলেন। কিন্তু কোথাও পানির সন্ধান পাওয়া গেল না। অবশ্য নিকটেই এক যুবক রাখাল বকরী চরাচ্ছিলো। হযরত আবু বকর (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"মিয়া সাহেব, তুমি কি কোন বকরী দোহন করে আমাদের পিপাসা নিবারণ করতে পারো?"

ছোট দেহ এবং গমের রং-এর সেই হালকা-পাতলা রাখাল অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বললো ঃ

"ভদ্র জনেরা। এই বকরী তো আমার নয়। তার মালিক হলো উকবা বিন আবি মুয়াইত (মক্কার মশহুর মুশরিক)। তার অনুমতি ছাড়া কোন বকরীর দুধ আপনাদেরকে দেয়া আমানতের খিয়ানত হবে।"

বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) বললেন ঃ "ঠিক আছে, তুমি এমন বকরী আনো যা দুধ দেয় না। (অথবা যে বকরী বাচ্চা প্রসব করেনি।)

রাখালটি বললো ঃ "এ ধরনের বকরী তো আছে। কিন্তু তা দিয়ে আপনার কি কাজ হবে।"

হুজুর (সা) বললেন, "তুমি আনো তো", রাখাল একটি বকরী পেশ করলো। প্রিয় নবী (সা) তার স্তনের ওপর হাত রেখে দোয়া করলেন। আল্লাহ তায়ালা তৎক্ষণাৎ তা দুধে পূর্ণ করে দিলেন। অতপর সিদ্দীকে আকবার (রা) দুধ দোহনের জন্য বসলেন এবং এত দুধ পেলেন যে, তিনজন পূর্ণ আসুদাহ হয়ে পান করলেন। তারপর হুজুরের (সা) দোয়ায় বকরীর স্তন শুকিয়ে আসল অবস্থায় ফিরে এলো। যুবক রাখাল এই দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। মক্কায় হক দাওয়াতের আওয়াজ তার কানেও এসেছিল। কিন্তু হক দাওয়াতের আহবায়কের সঙ্গে আজই ঘটনাক্রমে মিলিত হওয়ার সুযোগ হলো। এই মু'জিযা দেখে তার অন্তর হাদিয়ে আকরামের (সা) প্রতি ভালবাসা এবং শ্রদ্ধায়

আপ্লুত হয়ে গেল। সে সময় তো চুপ মেরে রইলেন। তবে, শহরে ফিরে গিয়ে নিজের আবেগ আর বেশীক্ষণ ধরে রাখতে পারলেন না এবং একদিন হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে নিবেদন জানালেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাকেও আপনার দলে দাখিল করে নিন।" রহমতে আলম (সা) যুবক রাখালের বিশ্বস্ততা ও ঈমানদারী প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তার দরখাস্ত কবুল করলেন এবং অত্যন্ত মুহাব্বাত ও স্নেহের সাথে তার মাথায় নিজের পবিত্র হাত রাখলেন এবং বললেন, "তুমি শিক্ষিত ছেলে।"

এই ভাগ্যবান যুবক, যাকে সাইয়েদুল আনাম রহমতে আলম (সা) 'শিক্ষিত ছেলে'র উপাধি দান করেছিলেন তার নাম ছিল আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ। প্রিয় নবী (সা) প্রায়ই তাঁকে তাঁর মা উম্মে আবদের (রা) সম্বন্ধে "ইবনে উম্মে আবদ" বলে ডাকতেন। [প্রকাশ্যত তার কারণ ছিল যে, হযরত আবদুল্লাহর (রা) পিতা মাসউদ ইসলামের যুগ পায়নি। অবশ্য তাঁর মা উম্মে আবদ (রা) জালিলুল কদর সাহাবিয়াহ ছিলেন। এ জন্যই হুজুর (সা) তাঁকে উম্মে আবদ বলে ডাকতে পসন্দ করতেন।] তিনি বনু খান্দাফের একটি শাখা মাদরাকা খান্দানের বনু হাবিলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। আল্লামা ইবনে আছির বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পিতা মাসউদ বিন গাফিল বিন হাবিব বিন শামমাখ বিন ফার বিন মাখযুম আইয়ামে জাহেলিয়াতে আবদ বিন হারেছের মিত্র ছিলেন।

ঈমানের নিয়ামতে পূর্ণ হয়ে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ নিজেকে প্রিয় নবীর (সা) খিদমতের জন্য ওয়াকফ করে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে কুরআনে হাকিমের শিক্ষা লাভ করতে লাগলেন। সে সময় পর্যন্ত শুধুমাত্র কয়েকজন নেকবখত ব্যক্তিত্বই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁরা সকলেই কুরাইশের ক্রোধ ও রোষানলের শিকার হয়েছিলেন। একদিন নবুওয়াত প্রদীপের পতঙ্গরা পারস্পরিক পরামর্শ করলো যে, কুরাইশরা আজ পর্যন্ত উচ্চৈস্বরে কুরআন পাঠ শুনেনি। এমন কোন পথ বের করতে হবে যাতে তাদের সামনে উচ্চৈস্বরে আল্লাহর কালাম পাঠ করা যায়।

যুবক আবদুল্লাহ (রা) তৎক্ষাৎ বললেন, "আমি এই দায়িত্ব পালন করবো।"

সাহাবীরা (রা) বললেন, "এটা খুব ভীতিপ্রদ কাজ। একাজ করতে গিয়ে তুমি আবার মুসিবতে নিপতিত হয়ে না যাও। তোমার কবিলা এত শক্তিশালী নয় যে, তোমাকে মুশরিকদের পাঞ্জা থেকে মুক্তি দিতে পারবে।"

আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ ঈমানী আবেগে অস্থির হয়ে বললেন, "আমাকে এই কাজ করতে দাও। আল্লাহর ওপর আমার আস্থা আছে এবং তিনিই আমাকে হেফাজত করবেন।" সাহাবীরা (রা) তাঁর ঈমানী জোশ দেখে চুপ মেরে গেলেন।

পরবর্তী দিন সূর্য উঠলো। এ সময় কুরাইশের সকল মুশরিক একস্থানে একত্রিত ছিল। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ খুব উচ্চৈস্বরে তাদের সামনে কুরআনে করিম তিলাওয়াত শুরু করে দিলেন।

মুশরিকরা এই অপরিচিত কালাম শুনে যারপরনাই বিস্মিত হলো এবং পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। একজন বললো, "সেতো সেই কিতাব পড়ছে যা মুহাম্মাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে" একথা শুনে সকল মুশরিক উত্তেজিত হয়ে উঠলো এবং আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। নওজোয়ান আশেকে কুরআনকে এমনভাবে প্রহার করলো যে, তাঁর চেহারা ফুলে গেলো। এবং শরীরের কয়েক অংশ থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে গেলো। কিন্তু ঈমানের আবেগ এমন ছিল যে, একদিকে তাঁকে প্রহার করা হচ্ছিল। অন্যদিকে তাঁর কুরআন তিলাওয়াত অব্যাহত ছিল। এমনকি মুশরিকরা মারতে মারতে হাঁপিয়ে গেল। আবদুল্লাহ (রা) সেই সময় চুপ হলেন যখন শুরুকৃত কুরআনের সূরাই শেষ হলো।

তিনি যখন পেরেশান অবস্থায় সাহাবায়ে কিরামের (রা) নিকট গেলেন তখন তারা বললেন, "আমাদের এই আশংকাই ছিল এবং এ জন্যই আমরা তোমাকে সেখানে গমনে বাধা দান করেছিলাম।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ বললেন ঃ

"আল্লাহর কসম। আমার দৃষ্টিতে মুশরিকরা আজ থেকে বেশী কখনো অপমানিত হয়নি। আমিতো ইচ্ছা করেছি যে, আগামীকাল পুনরায় তাদেরকে আল্লাহর কালাম শুনাবো।"

সাহাবায়ে কিরাম (রা) বললেন ঃ

"তুমি যা কিছু করেছ তাই যথেষ্ট। এখন আর তোমার যাওয়ার প্রয়োজন নেই। যে কালাম শোনা মুশরিকরা খুব অপছন্দ করতো তা তুমি তাদের কানে পৌঁছানোর কর্তব্য পালন করেছ।"

আবদুল্লাহ (রা) নিজের বন্ধুদের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে চুপ মেরে গেলেন। কিন্তু কাফেররা তো তাঁকে আরামের সাথে থাকতে দিলো না। তারা আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদের ওপর সীমাহীন নির্যাতন শুরু করলো। যখন মুশরিকদের

নির্যাতন সহ্যের বাইরে চলে গেল তখন সারওয়ারে কায়েনাত (সা) তাঁদেরকে হাবশা বা আবিসিনিয়া হিজরতের নির্দেশ দিলেন। নবীর (সা) নির্দেশ পালনার্থে হযরত আবদুল্লাহ (রা) দুইবার হাবশায় হিজরত করেন এবং তৃতীয়বার হিজরত করে মদীনা তাশরীফ নিয়েছিলেন। সারওয়ারে আলম (সা) মায়াজ (রা) বিন জাবালের সঙ্গে তাঁর ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করান এবং তাঁর থাকার জন্য মসজিদে নববীর নিকট এক টুকরো জমি দান করলেন।

দ্বিতীয় হিজরীতে যুদ্ধের সিলসিলা শুরু হলো। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি যুদ্ধেই অংশ নিয়েছিলেন। বদরের যুদ্ধে যখন দু'জন আনসার যুবক আবু জেহেলকে মারাত্মকভাবে আহত করলো তখন ঘটনাক্রমে আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদও প্রিয় নবীর (সা) নির্দেশ পালনার্থে আবু জেহেলকে তালাশ করতে করতে সেখানে পৌঁছে গেলেন। আবু জেহেল সে সময় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছিল। আবদুল্লাহ (রা) তার বুকের ওপর চড়ে বসলো এবং তার দাড়ি ধরে বলতে লাগলো "হে আল্লাহর দুশমন, তুইই আবু জেহেল। আল্লাহ তোকে খুব অপমানিত করেছে।"

আবু জেহেল বললো, "হায়! কোন কিষাণ যদি আমাকে হত্যা না করতো।" (এখানে কিষাণের অর্থ হলো আনসার, আনসাররা কৃষিজীবী হওয়ার কারণে কুরাইশরা তাদেরকে নিকৃষ্ট মনে করতো।)

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ আবু জেহেলের কথা শুনে তার ঘাড়ের ওপর পা রাখলেন। আবু জেহেল বললো, "এই মেষ পালক তুই অনেক উঁচু স্থানে চড়েছিস। এতটুকু অন্ততঃ বল যে বিজয় কাদের হয়েছে।"

আবদুল্লাহ (রা) জবাব দিলেন, "এই আল্লাহর দুশমন! আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সা) বিজয় লাভ ঘটেছে।" এত টুকুন শুনেই আবু জেহেল হিমশীতল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ তার মস্তক কেটে নিলেন এবং তা প্রিয় নবীর পায়ের কাছে এনে রাখলেন। হুজুর (সা) আবু জেহেলের অপবিত্র মাথার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ

"আলহামদু লিল্লাহিল্লাজি আখযাকা ইয়া আদুব্বাল্লাহা" (হামদ ও ছানার যোগ্য সেই আল্লাহ যিনি হে আল্লাহর দুশমন তোকে অপমানিত করেছে।)

অতপর বললেন, "মাতা ফিরআউনা হাজিহিল উম্মাতি" (এই উম্মাতের ফিরাউনের মৃত্যু ঘটেছে।)

বদরের যুদ্ধের পর হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ অত্যন্ত উৎসাহ এবং বীরত্বের সঙ্গে ওহোদ, খন্দক এবং খায়বারের যুদ্ধে অংশ নেন। হুদায়বিয়া এবং মক্কা বিজয়ের সময়ও তিনি বিশ্ব নবীর (সা) সফর সঙ্গী ছিলেন।

মক্কা বিজয়ের পর অষ্টম হিজরীর শওয়াল মাসে হুনাইনের রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধের কারণসমূহের মধ্যে ছিল ঃ হাওয়াযিন এবং ছাকিফের যোদ্ধা গোত্রসমূহকে শয়তান এই বলে উস্কানী দিল যে, তোমরা যদি মুসলমানদেরকে পরাজিত করতে পারো, তাহলে মক্কাবাসীর যত জায়গীর এবং বাগান রয়েছে তা তোমাদের দখলে আসবে ও একক আল্লাহর পূজারীরাও শেষ হয়ে যাবে।

বস্তুত তারা বনি হিলাল, নাসর, জাশম এবং বনি মুদিরের কবিলাসমূহকে নিজেদের সঙ্গে একত্রিত করলো ও হাজার হাজার যুদ্ধবাজ সৈন্য নিয়ে মক্কার দিকে অগ্রসর হলো। তারা আওতাস নামক স্থানে পৌঁছেছিল। এমন সময় হুজুর (সা) তাদের গমনাগমন ও তৎপরতার সংবাদ পেলেন। তিনি কালবিলম্ব না করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন এবং ১২ হাজার তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহীসহ মক্কা থেকে রওয়ানা হলেন। ইসলামী বাহিনীতে মক্কার দুই হাজার নওমুসলিমও শামিল ছিলেন। এত বেশী সংখ্যক সৈন্য দেখে মুসলমানদের যবান দিয়ে বের হয়ে গেল, "এখন আমাদের ওপর আর কে বিজয়ী হতে পারে।" এই অহংকার আল্লাহর পসন্দ হলো না এবং তিনি হকপন্থীদেরকে এক কঠিন পরীক্ষায় নিক্ষেপ করলেন।

ইসলামী বাহিনী হুনাইন উপত্যকায় পৌঁছে দেখতে পেল যে, উপত্যকার উভয় দিকে শত্রু সৈন্যরা তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। যেই মুসলমানদের অগ্রবর্তী দল তাদের পাল্লায় এলো তৎক্ষণাৎ তারা প্রচণ্ডভাবে তীর নিক্ষেপ শুরু করলো। অতপর ঘাত বা গুপ্তস্থান থেকে বের হয়ে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। অগ্রবর্তী বাহিনীর বেশীর ভাগ সদস্যই ছিল নওমুসলিম। তারা হতবুদ্ধি হয়ে পেছনের দিকে ভেগে গেল। অন্যান্য মুসলমানও হতবিহ্বল হয়ে পড়লো। এই নাযুক মুহূর্তে প্রিয় নবী (সা) অটল পাহাড়ের মত যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং সাহাবায়ে কিরামের (রা) ছোট একটি জামায়াত তাঁর চার পাশে জীবন উৎসর্গের নিপুণতা প্রদর্শন করছিলেন। এই ছোট দলের মধ্যে ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা), হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু, হযরত আব্বাস (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ। এই ভীত সন্ত্রস্ত পরিস্থিতিতে প্রিয় নবী (সা) উচ্চৈস্বরে এই যুদ্ধ গাঁথা পাঠ করছিলেন ঃ

انا النبى لا كاذب

انا ابن عبد المطلب

"আমি নবী, এতে সামান্য মিথ্যাও নেই

আমি আবদুল মুত্তালিবের পুত্র।"

হুজুর (সা) সে সময় নিজের সাদা খচ্চর দুলদুলের ওপর সওয়ার ছিলেন। তার বাগডোর ছিল হযরত আবু সুফিয়ান (রা) বিন হারিছের হাতে। তিনি এ জন্য রশি ধরে রেখেছিলেন যাতে হঠাৎ করে খচ্চরটি সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে না যায়। কিন্তু দুলদুল সামনে অগ্রসর না হয়ে পেছনের দিকে হটে যাচ্ছিল। এ অবস্থায় হুজুর একবার যিন থেকে নীচে নেমে পড়ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বিন মাসউদ অস্থির হয়ে পড়লেন এবং ডেকে বললেন ঃ

"আপনার মাথা উঁচু আল্লাহ আপনাকে উঁচু মর্যাদা দিয়েছেন।"

হুজুর (সা) বললেন, "আবদুল্লাহ! আমাকে এক মুঠো মাটি দাও।" হযরত আবদুল্লাহ (রা) তৎক্ষণাৎ নির্দেশ পালন করলেন। হুজুর (সা) এই মাটি মুশরিকদের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। আল্লাহর কুদরতে তা তাদের চোখে গিয়ে ঢুকলো।

তারপর হুজুর (সা) হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদকে [অথবা অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত আব্বাস (রা)] মুহাজির ও আনসারকে ডাকার নির্দেশ দিলেন। তিনি উচ্চৈস্বরে ডাকা শুরু করলেন, "হে আনসারের দল, হে বাইয়াতে রেদওয়ান করনেওয়ালারা।" পুনরায় প্রত্যেক কবিলার নাম নিয়ে নিয়ে ডাকতে শুরু করলেন। এই ডাক কানে যেতেই সকল মুসলমান এক সঙ্গে উল্টে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তরবারী দিয়ে কাফেরদের কাজ সাঙ্গ করে দিল। মুশরিকরা চরমভাবে পরাজিত হলো এবং নিজেদের অসংখ্য নিহত ব্যক্তির লাশ যুদ্ধের ময়দানে রেখে পালিয়ে গেল। বেশুমার গনিমতের মাল মুসলমানদের হস্তগত হলো।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কালামে এই ঘটনার উল্লেখ এই ভাষায় করেছেন ঃ

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِىْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ
كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ
بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ - ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ

عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط وَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِيْنَ –

"এই সেদিন হুনাইন যুদ্ধের দিন (আল্লাহর প্রত্যক্ষ সাহায্য ও হাত ধরার ব্যাপারটি তোমরা দেখেছো)। সে দিন তোমাদের সংখ্যা বিপুলতার অহংকার বা অহমিকা ছিল; কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজেই আসেনি। যমীন তার অসীম বিশালতা সত্ত্বেও তোমাদের পক্ষে সংকীর্ণই হয়ে গিয়েছিল, আর তোমরা পশ্চাদপসরণ করে পালিয়ে গেলে। অতপর আল্লাহ তাঁর শান্তির অমিয়ধারা তাঁর রাসূল ও ঈমানদার লোকদের ওপর বর্ষণ করলেন, আর সেই বাহিনীও পাঠালেন —যা তোমরা দেখতে পেতে না। আর সত্যের অস্বীকারকারীদের তিনি শাস্তি দান করলেন, কেননা সত্যের বিরোধীদের এই হচ্ছে প্রতিফল।"

১১ হিজরীতে বিশ্ব নবীর (সা) ওফাত হলে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদের ওপর দুঃখের পাহাড় ভেংগে পড়লো এবং অন্তর বিদীর্ণ অবস্থায় নির্জনত্ব গ্রহণ করলেন। কিন্তু কয়েক বছর পর ইয়ারমুকের যুদ্ধের সময় যখন ফারুকে আজম (রা) প্রতিটি সুস্থ মুসলমানকে জিহাদে অংশগ্রহণের উৎসাহ দিলেন, তখন হযরত আবদুল্লাহ শামিল হয়ে গেলেন এবং সিরিয়া পৌঁছে ইয়ারমুকের যুদ্ধে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা ও অটলতার সাথে বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। জিহাদের ময়দান থেকে ফিরে এলে ফারুকে আজম (রা) ২০ হিজরীতে তাঁকে কুফার কাজী নিয়োগ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার বাইতুল মাল বা কোষাগার এবং দ্বীনি শিক্ষা বিভাগও তার হাতে ন্যস্ত করলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি কুফাবাসীর নামে যে ফরমান লিখেন তাতে বিশেষভাবে লিখেছিলেন "আমি আবদুল্লাহ বিন মাসউদকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করে অত্যন্ত ত্যাগ স্বীকার করেছি।" হযরত ইবনে মাসউদ (রা) পুরো ১০ বছর কুফায় নিজের দায়িত্ব অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পালন করেন। তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান জুন্নুরাইন (রা) কোন কথায় অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে পদচ্যুত করেন। তাঁর পদচ্যুতির খবর কুফাবাসীরা খুব কঠিনভাবে গ্রহণ করলো। তারা একত্রিত হয়ে হযরত আবদুল্লাহর (রা) নিকট গমন করলেন এবং বললেন ঃ

"আবু আবদুর রহমান, আপনি কুফা ত্যাগ করবেন না। প্রয়োজন হলে আমরা সকলে আপনার জন্য নিজের জীবন কুরবান করে দেব।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) তাদের কথা মানলেন না এবং বললেন ঃ "আমি আমিরুল মু'মিনীনের নির্দেশ অমান্য করে ফিতনার দরজা খুলবো না।"

সুতরাং নিজের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে তিনি একটি কাফেলার সঙ্গে হজ্জের জন্য মক্কা রওয়ানা হয়ে গেলেন। রাবযাহ নামক স্থানে পৌঁছলে তিনি একজন বেদুঈন মহিলাকে রাস্তার মাথায় দাঁড়ানো অবস্থায় পেলেন। সে হযরত আবদুল্লাহ (রা) এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে ডেকে বললো, "ভাইসব! নিকটেই একজন মুসলমান শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছে। তার কাফন দাফনে আমাকে সাহায্য কর।"

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "সেই ব্যক্তি কে?"

মহিলাটি জবাব দিলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবী আবু জার গিফারী।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) এবং তাঁর সঙ্গীরা হযরত আবু জারের (রা) নাম শুনে "আমাদের মাতা-পিতা তাঁর ওপর কুরবান হোক" একথা বলে তাঁর কুটিরের দিকে দৌড় দিলেন। সেখানে হযরত আবু জার (রা) শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছিলেন। তিনি নবাগতদেরকে 'আহলান ওয়া সাহলান' বললেন এবং নিজের কাফন দাফন সম্পর্কে হেদায়াত দিয়ে পরপারের ডাকে সাড়া দিলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ তাঁর নামাযে জানাযা পড়ালেন। অতপর সবাই মিলে তাঁর লাশ দাফন করলেন। তারপর নিজেদের সফরে রওয়ানা হয়ে গেলেন। মক্কা পৌঁছে হযরত ইবনে মাসউদ হজ্জ করলেন এবং মদীনা গিয়ে পুনরায় নির্জনত্ব গ্রহণ করলেন। দিন-রাত শুধু আল্লাহর স্মরণ ছাড়া কোন কাজ ছিল না। সেই যুগেই একদিন এক ব্যক্তি তাঁর খিদমতে হাজির হয়ে বললেন, "আবু আবদুর রহমান, আমি আজ রাতে স্বপ্নে দেখেছি যে, আপনি সারওয়ারে কাওনাইনের (সা) খিদমতে হাজির রয়েছেন এবং হুজুর (সা) বলছেন, ইবনে মাসউদ আমার পর তোমার কষ্ট হয়েছে। এসো, আমার নিকট চলে এসো।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বললেন, "আল্লাহর কসম! তুমি এই স্বপ্ন দেখেছো?" সে ইতিবাচক জবাব দিলো। তারপর তিনি বললেন, "ব্যাস, তাহলে আমার শেষ সময় এসে গেছে। সম্ভবত তুমি আমার জানাযায় শরীক হয়েই মদীনার বাইরে যাবে।"

এ ঘটনার কিছুদিন পরই তিনি শয্যাশায়ী হয়ে গেলেন। যখন অসুস্থতা কঠিন দিকে মোড় নিলো তখন হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রা) তাঁর শুশ্রূষার জন্য তাশরীফ আনলেন। সেই সময় উভয় বুজুর্গের মধ্যকার সম্পর্ক খুব ভাল

ছিল না এবং হযরত উসমান (রা) দু'বছর ধরে তাঁর ভাতাও বন্ধ করে রেখেছিলেন। শুশ্রূষার সময় উভয় বুজুর্গের মধ্যে এই কথোপকথন হয় ঃ

হযরত উসমান (রা) ঃ "আপনার কি অসুখ হয়েছে?"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) ঃ "নিজের গুনাহর।"

হযরত উসমান (রা) ঃ "আপনার কি কোন জিনিসের প্রয়োজন আছে?"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) ঃ "হ্যাঁ, আল্লাহর রহমতের।"

হযরত উসমান (রা) ঃ "আপনার জন্য কি চিকিৎসক পাঠাবো?"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) ঃ "চিকিৎসকই তো আমাকে শয্যাশায়ী করেছে।"

হযরত উসমান (রা) ঃ "আপনার ভাতা জারি করে দেবো?"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) ঃ "আমার তা প্রয়োজন নেই।"

হযরত উসমান (রা) ঃ "আপনার সন্তানদের কাজে আসবে।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) ঃ "আপনি আমার সন্তানদের দারিদ্রতা ও অভাবের কথা চিন্তা করবেন না। আমি তারদেকে প্রতি রাতে শয়নের আগে সূরায়ে ওয়াকেয়াহ তিলাওয়াতের পরামর্শ দিয়েছি। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি প্রতি রাতে শয়নের আগে সূরায়ে ওয়াকেয়াহ পাঠ করবে সে কখনো দারিদ্রতা ও অভুক্ত অবস্থায় নিপতিত হবে না।"

আল্লামা ইবনে সাঈদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, সেই আলোচনার পর উভয় বুজুর্গের অন্তর পরস্পরের পক্ষ থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল।

হযরত আবদুল্লাহর (রা) যখন ইয়াকিন হয়ে গেলো যে, এই রোগ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না, তখন তিনি হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়াম এবং তাঁর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়েরকে (রা) ডেকে পাঠালেন এবং তাদেরকে নিজের ধন-সম্পদ, সন্তান ও কাফন-দাফনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ওসিয়ত করার পর পরপারের ডাকে সাড়া দিলেন। এই ঘটনা ৩২ হিজরীর। সে সময় হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদের বয়স ৬০ বছরের কিছু বেশী ছিল। আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান গনি (রা) নামাযে জানাযা পড়ালেন এবং বাকী' গোরস্তানে হযরত উসমান (রা) বিন মাজউনের পাশে তাঁর লাশ দাফন করা হলো। তাবকাতে ইবনে সায়াদের রাওয়ায়াত অনুযায়ী ইবনে মাসউদের (রা) ওফাতের পর হযরত উসমান (রা) বন্ধকৃত সকল ভাতা চালু করে দিলেন। এই ভাতার পরিমাণ ছিল বার্ষিক পাঁচ হাজার দিরহাম। এমনিভাবে তাঁর সন্তানরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ একবারে পেয়ে গেলেন।

সাইয়েদেনা হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ প্রোজ্জ্বল ও মহান চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামিতা, কঠিন মুসিবত বরদাশতকরণ, রাসূল প্রেম, জিহাদের প্রতি উৎসাহ, কুরআনের প্রতি ভালবাসা, জ্ঞানের গভীরতা, যুহদ ও তাকওয়া, সবর ও বিনয়, অল্পে তুষ্টি এবং তাফাক্কুহ ফিদ্বীন বা দ্বীনের জ্ঞান তাঁর অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি সেই সময় তাওহীদের ঝাণ্ডা সমুন্নত করেছিলেন যখন কুরাইশ মুশরিকরা হকপন্থীদের খুন পিপাসু ছিল। দীর্ঘদিন যাবত হক পথে বিভিন্ন ধরনের অন্তর বিদীর্ণকারী নির্যাতন সহ্য করেন। এমনকি প্রিয় স্বদেশভূমিকে বিদায় জানিয়ে হাবশায় হিজরত করতে বাধ্য হন। হাবশা থেকে মদীনা এসে বদর থেকে তাবুক পর্যন্ত প্রত্যেক যুদ্ধেই নিজের নিষ্ঠা ও জানবাজি প্রদর্শন করেন। বিশ্ব নবীর (সা) প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধার অবস্থাটা এমন ছিল যে, শান্তি হোক অথবা যুদ্ধ, সফর হোক অথবা মুকিম, একাকী হোক বা লোকের সামনে, তিনি বেশীরভাগ সময়ই নবীর (সা) দরবারে উপস্থিত থাকতেন। এভাবে তিনি একদিকে নবীর ফয়েজে অবগাহিত হতেন। অন্যদিকে হুজুরের (সা) খিদমতের সৌভাগ্য লাভ করতেন। হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা ইয়েমেন থেকে মদীনা এলাম। এ সময় আমরা আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদকে রাসূলের (সা) নিকট এত যাতায়াত করতে দেখতাম যে, আমরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত ধারণা করেছিলাম যে, তিনি(আবদুল্লাহ) হুজুরের (সা) বাড়ীর একজন সদস্য।

প্রকৃতপক্ষে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) মহানবীর (সা) বিশেষ খাদেমদের মধ্যে শামিল হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি হুজুরের (সা) বিছানা বিছাতেন, তা গুছিয়ে রাখতেন ও মিসওয়াক এনে পেশ করতেন। হুজুরকে(সা) ওজু করাতেন। তার সওয়ারীর বাগ ধরতেন। মোটকথা রাসূলের (সা) দরবারে তিনি বিশেষ স্থান দখল এবং নৈকট্যের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তিনি রাসূলের (সা) জুতাওয়ালা, বালিশওয়ালা এবং ওজু ওয়ালা এসব উপাধিতে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। রহমতে আলমের (সা) নিকট তাঁর কি মর্যাদা ও মূল্য ছিল তার আন্দাজ তাবকাতে ইবনে সায়াদের একটি রেওয়ায়াত থেকে করা যায়। এই রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদের পায়ের গোড়া থেকে হাঁটু পর্যন্ত খুব পাতলা ছিল এবং তিনি তা ঢেকে রাখতেন। একদিন রাসূলে আকরাম (সা) ইবনে মাসউদ (রা) এবং আরো কতিপয় সাহাবী সমভিব্যহারে জঙ্গলে তাশরীফ নিলেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হুজুরের (সা) জন্য মিসওয়াক ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে পিলু গাছের ওপর

চড়লেন। তাঁর পাতলা পাতলা পা দেখে সাহাবায়ে কিরাম (রা) হাসতে লাগলেন। হুজুরের (সা) নিকট তাদের হাসি পসন্দ হলো না। তিনি বললেন ঃ

"তোমরা ইবনে উম্মে আবদের পাতলা পা দেখে হাসছো। অথচ এই পা-ই হাসরের দিন ইনসাফের দাঁড়িপাল্লায় ওহোদ পাহাড় থেকেও বেশী ভারী হবে।"

ইলম ও ফজিলতের ক্ষেত্রে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ উম্মাহর স্তম্ভ হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকেন। তিনি সেই ধরনের একজন ফজিলত ওয়ালা সাহাবী। যাদেরকে রাসূলে আকরামের (সা) পর কুরআনের সবচেয়ে বড় আলেম হিসেবে মান্য কর হয়। স্বয়ং হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলতেন যে, তিনি কুরআনে হাকিমের ৭০টি সূরা বিশেষ করে রাসূলের (সা) মুবারক জবান থেকে শুনে ইয়াদ করেছিলেন এবং কুরআনের প্রতিটি আয়াতের ব্যাপারে তার এই জ্ঞান রয়েছে যে, তা কোথায় নাযিল হয়েছে এবং তার শানে নুযুল কি ছিল।

সহীহ বুখারীতে আছে যে, একবার স্বয়ং রাসূলে করিম (সা) লোকদেরকে বললেন যে, কুরআন চার ব্যক্তির নিকট থেকে শিখবে। এই চার ব্যক্তি হলেনঃ আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ, সালেম (রা), আবু হোযায়ফার আযাদকৃত গোলাম মায়াজ (রা) বিন জাবাল এবং উবাই (রা) বিন কায়াব। হযরত ওমর ফারুক (রা) ইবনে মাসউদের (রা) জ্ঞানের গভীরতার খুব কদর করতেন। তিনি তার ব্যাপারে বলতেন যে, "তিনি একটি পাত্র, যা জ্ঞানে পরিপূর্ণ।" হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু একবার বলেছিলেন, আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ কুরআনের ক্বারী, দ্বীনের ফকিহ ও সুন্নাহর আলেম ছিলেন।

হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) বলতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে ইবনে মাসউদের (রা) মত সমুদ্র মওজুদ রয়েছে ততক্ষণ আমার নিকট কোন মাসয়ালা জিজ্ঞেস করো না। হযরত আবু মাসউদ বদরী (রা) বলতেন, রাসূলের (সা) পর আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদের চেয়ে বড় কেউ কুরআনের আলেম আছেন বলে আমি জানি না।

আল্লাহ তায়ালা হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদকে কুরআনের ইলমের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর কিরআতের যোগ্যতাও দিয়েছিলেন। সুললিত কণ্ঠ ও হৃদয়ের উত্তাপ দিয়ে তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেন। একদিন তিনি নামাযে সূরায়ে নিসা পাঠ করছিলেন। এমন সময় মহানবী (সা) হযরত সিদ্দীকে আকবার(রা) এবং ফারুকে আজমকে (রা) সঙ্গে নিয়ে মসজিদে তাশরীফ আনলেন এবং তাঁর তিলাওয়াতে এত খুশী হলেন যে, তিনি যখন নামায থেকে

ফারেগ হলেন তখন বললেন, "যা চাও তাই দেয়া হবে, যা চাও তাই দেয়া হবে।"

অতপর ইরশাদ করলেন ঃ "কুরআন যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে, সেইভাবে যদি কোন ব্যক্তি তরতাজা পড়তে শিখতে চায় তাহলে সে যেন কিরআতে ইবনে উম্মে আবদের অনুসরণ করে।"

অন্য আরো একবার রহমতে আলম (সা) হযরত আব্দুল্লাহ (রা) বিন মাসউদের নিকট থেকে সূরায়ে নিসা শুনলেন। সে সময় গভীর প্রভাবে রাসূলের (সা) পবিত্র চোখ মুদে এলো।

পবিত্র কুরআনের তাফসীরেও তাঁর পূর্ণ কামালিয়াত ছিল। কারোর নিকট থেকে কোন সহীহ হাদিস শুনলে প্রায় সময়ই তার সমর্থনে কুরআনে করিমের আয়াত পড়ে দিতেন। তাফসীর ও হাদিসের কিতাবসমূহে এমন অসংখ্য রেওয়ায়াত পাওয়া যায়, যা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদকে কুরআনের জ্ঞানের সাথে সাথে অসাধারণ মুখস্ত শক্তি এবং মেধা দান করেছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ হাদিস বর্ণনায় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তিনি প্রতি মুহূর্তে এই ভয়ে ভীত থাকতেন যে, হাদীস বর্ণনার সময় এমন কোন শব্দ যেন মুখ দিয়ে বের হয়ে না যায় যা হুজুর (সা) বলেননি। হাদিস বর্ণনার সময় অত্যন্ত আদবের সঙ্গে বসতেন এবং প্রতিটি শব্দ এমন সতর্কতার সঙ্গে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতেন যেন দায়িত্বের বোঝায় দেবে যাচ্ছেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে, একবার এক হাদিস বর্ণনার পর মুচকি হাসি দিলেন। তারপর লোকদেরকে বললেন, "আমি কেন হাসলাম তাতো তোমরা জিজ্ঞেস করলে না।" লোকেরা বললো, "আপনিই বলুন"। ইরশাদ হলো, "এজন্য যে, এই সময় স্বয়ং রাসূলে করিম (সা) এমনিভাবে মুচকি হেসেছিলেন।" তাঁর সতর্কতার অবস্থাটা এমন ছিল যে হাদিস বর্ণনার সময় "কালা" রাসূলুল্লাহ (সা) এই বাক্য মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে সবসময় সামর্থ অনুযায়ী বেঁচে থাকার চেষ্টা করতেন। যদি কখনো এই বাক্য মুখ দিয়ে বের হয়ে যেতো তাহলে শরীর কেঁপে উঠতো এবং বলতেন হুজুর (সা) এমনিভাবে বলেছিলেন অথবা তার থেকে কিছু কম অথবা তার থেকে কিছু বেশী অথবা তার সমার্থক শব্দ ইরশাদ করেছিলেন। তাবকাতে ইবনে সায়াদে মশহুর তাবেয়ী হযরত আমর বিন মাইমুন থেকে বর্ণিত আছে, "একবার পুরো একবছর আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে, প্রতি বৃহস্পতিবার হযরত ইবনে মাসউদের (রা) খিদমতে হাজির হয়ে ফয়েজ হাসিল করতাম। এই সময়ে

একবার ছাড়া আমি কখনো তাঁকে হুজুরের (সা) প্রতি সম্বন্ধ করে কথা বলতে শুনিনি। সে সময় হঠাৎ করে তার মুখ দিয়ে 'কালা' রাসূলুল্লাহি (সা) অংশটি বের হয়ে যায়। তখন তার শরীরে কম্পন দেখা দিল। মাথা ঘর্মাক্ত হয়ে উঠলো। শিরা ফুলে গেল এবং চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়লো।"

এ সত্ত্বেও ইবনে মাসউদ (রা) হুজুরের (সা) ইরশাদসমূহকে সতর্কতা ও ভীতিসহ উম্মাহর নিকট পৌছানোকে নিজের দায়িত্ব এবং কর্তব্য বলে মনে করতেন। বস্তুত তাঁর থেকে ৮৪৮টি হাদিস বর্ণিত আছে। তার মধ্যে ৬৪টিতে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম ঐকমত্য পোষণ করেন। ৪১টিতে ইমাম বুখারী ও ৩৫টিতে ইমাম মুসলিম মতদ্বৈততা প্রকাশ করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ বছরের পর বছর ধরে অব্যাহতভাবে নবুওয়াতের দরবার থেকে সরাসরি ফয়েজ লাভ করেছিলেন। সুতরাং তিনি শরীয়তের আহকামের তথ্যের এক মহাসমুদ্রে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি অন্যতম ফকিহ সাহাবী ছিলেন। জমহুর ওলামার নিকট এই পর্যায়ে শুধুমাত্র ৭জন সাহাবী ছিলেন। অর্থাৎ হযরত ওমর ফারুক (রা), হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা), হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আব্বাস, হযরত যায়েদ (রা) বিন ছাবিত এবং হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন ওমর (রা)।

আল্লামা ইবনে হাযম বর্ণনা করেছেন যে, যদি এসব বুজুর্গের ফতওয়া এক স্থানে একত্রিত করা হয় তাহলে প্রত্যেকের ফতওয়া দিয়ে কয়েক ভলিউম করে কিতাব সংকলন করা যায়। এই সাত বুজুর্গের মধ্যেও শুধুমাত্র চারজন অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ, হযরত যায়েদ (রা) বিন ছাবিত, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আব্বাস এবং হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন ওমরের (রা) এমন বৈশিষ্ট্য ছিল যে, বর্তমান ইসলামী ফিকাহর বেশীরভাগ অংশের ভিত্তি তাঁদের ফতওয়ার ওপর স্থাপিত এবং তারা সকলেই ফকিহুল-উম্মাহ এই লকবে মশহুর হয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদের ফতওয়া ও মতামতসমূহের সবই যদিও ফিকহী মাসলাকের নিকট অত্যন্ত ওজনদার ও গুরুত্বপূর্ণ তবুও হানাফী ফিকাহর সবকিছুই নির্ভর করে তার ওপর। তার কারণ হলো, হযরত ইবনে মাসউদ (রা) কুফায় ফিকাহর বাকায়দা তালিম দিতেন এবং তাঁর শিষ্যরা তাঁর ফতওয়াসমূহকে লিখিত আকারে পেশ করতেন। আল্লামা ইবনে কাইয়েম (র) বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ ছাড়া কোন সাহাবীর শিষ্যরা তাঁর ফতওয়া ও ফিকহী মতকে লিখে রাখেননি।

হযরত ইবনে মাসউদের (রা) পর তাঁর নামকরা তিনজন ছাত্র আলকামাহ (র) বিন কায়েম নাখয়ী, আসওয়াদ (র) বিন ইয়াযিদ নাখয়ী এবং মাসরুক(র) বিন আবদুর রহমান (আজদা) হামদানী ফিকাহ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ব্যাপক খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে আলকামাহ (র) হযরত ইবনে মাসউদের (রা) হাদিসের সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন। তাঁর ওফাতের পর ইবরাহিম (র) বিন ইয়াযিদ নাখয়ী (তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং বিশেষ শাগরিদ ছিলেন) তাঁর ফজিলতের আসনে সমাসীন হন। আল্লামা ইবনে সায়াদ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ফিকাহর ইমাম ছিলেন এবং তাঁর ফিকহী কামালিয়াত সম্পর্কে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করতেন। ইবরাহিমের (র) ফতওয়াবলীর সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন হাম্মাদ (র)। এই হাম্মাদ (র) থেকেই ইমাম আবু হানিফা (র) শিক্ষা লাভ করেন। বস্তুত হানাফী ফিকাহর প্রাসাদ বা ইমারত পরোক্ষভাবে হযরত ইবনে মাসউদের (রা) ফতওয়াসমূহের ভিত্তির ওপর স্থাপিত হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (র) নিজের জ্ঞান ও ইজতিহাদের মাধ্যমে হানাফী ফিকাহর এত উন্নয়ন ঘটিয়েছিলেন যে, ইসলামী দুনিয়ার একটি বিরাট অংশ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হানাফী মাসলাকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে আসছে।

শিক্ষা ও ফতওয়া প্রদান ছাড়া হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ তাবলীগ এবং ইরশাদের দায়িত্বও পালন করতেন। তিনি একজন উচ্চ শ্রেণীর বক্তা বা খতিব ছিলেন এবং তাঁর খুতবা ও ওয়াজে নজিরবিহীন প্রভাব পড়তো। হাদিস ও চরিতগ্রন্থসমূহে এমন কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, কোন কোন সময় তিনি স্বয়ং রাসূলের (সা) উপস্থিতিতে খুতবা দিতেন। হুজুর (সা) তাঁর খুতবার প্রশংসা করেছিলেন। আল্লামা ইবনে আসাকির (র) এবং হাইছামী (র) হযরত আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। তারপর তিনি হযরত আবু বকরকে (রা) বললেন, হে আবু বকর দাঁড়াও এবং খুতবা দাও।

তিনি হুজুর (সা) প্রদত্ত খুতবা থেকেও সংক্ষিপ্ত খুতবা দিলেন। অতপর তিনি হযরত ওমর ফারুককে খুতবা দানের নির্দেশ দিলেন। তিনি নির্দেশ পালন করলেন। কিন্তু তাঁর খুতবা হযরত আবু বকরের (রা) খুতবা থেকেও সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর তিনি অন্য কোন এক ব্যক্তিকে খুতবা দানের নির্দেশ দিলেন। তিনি নিজের খুতবায় ভিন্ন ধরনের কথা বলতে শুরু করলেন। প্রিয়নবী (সা) তাঁর খুতবা পসন্দ করলেন না এবং তাঁকে বসে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। অতপর তিনি হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন এবং

বললেন, "হে ইবনে উম্মে আবদ, দাঁড়াও এবং খুতবা দাও।" হযরত আবদুল্লাহ (রা) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং হামদ ও ছানার পর বললেন ঃ

"হে লোকেরা! নিসন্দেহে আল্লাহ পাক আমাদের মালিক এবং নিসন্দেহে ইসলাম আমাদের দ্বীন এবং নিসন্দেহে কুরআন আমাদের ইমাম এবং নিসন্দেহে কা'বা আমাদের কিবলা এবং [হুজুরের (সা) দিকে ইঙ্গিত করে] ইনি আমাদের রাসূল ও নবী (সা)। আল্লাহ এবং তার রাসূল (সা) যেসব বস্তু আমাদের জন্য পসন্দ করেছেন আমরাও তা পসন্দ করেছি এবং আল্লাহ ও তার রাসূল (সা) যেসব বস্তু আমাদের জন্য অপসন্দ করেছেন আমরাও তা অপসন্দ করেছি।"

সারওয়ারে আলম (সা) তাঁর খুতবা শুনে খুব খুশী হলেন এবং বললেন ঃ

"ইবনে উম্মে আবদ ঠিক বলেছে, ইবনে উম্মে আবদ ঠিক বলেছে এবং সত্য বলেছে। আমি তার ব্যাপারে রাজী হয়ে গেছি যার ব্যাপারে আল্লাহ আমার জন্য, আমার উম্মতের জন্য এবং ইবনে উম্মে আবদের জন্য রাজী হয়েছেন।"

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) নিজের খুতবা ও ওয়াজে সাধারণত তাওহীদ, জামায়াতে নামায এবং পরকালের ভয়ের কথা বলতেন। তাঁর ইরশাদসমূহের কতিপয় অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

"হে মানুষেরা! যে দুনিয়া লাভের চেষ্টা করেছে সে আখিরাতের ক্ষতি করেছে এবং যে আখিরাতের চেষ্টা করেছে সে দুনিয়ার ক্ষতি করেছে। অনিত্যের ক্ষতি বাকীর জন্য তোমাদের বরদাশত করা উচিত।"

"হে লোকেরা! দুনিয়ায় যে কপটতা করবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে কপটতার শাস্তি দেবেন। দুনিয়ায় যে খ্যাতির জন্য কাজ করে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার কাজের শুহরত করাবেন (তার জন্য কোন প্রতিদান থাকবে না) এবং যে মর্যাদা ও বড়াইয়ের খাতিরে শীর্ষে ওঠে আল্লাহ তাকে নীচে নিক্ষেপ করবেন এবং যে বিনয় অবলম্বন করে আল্লাহ তার মাথা উঁচু করবেন।"

"ভাইসব! আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। কুরআনের সঙ্গে চলো সে যেখানে তোমাদেরকে নিয়ে যায় এবং তোমাদের নিকট যে হক আনবে তা কবুল কর যদিও হক আনয়নকারী অনেক দূরের এবং তোমাদের সঙ্গে তার শত্রুতাও থাকে। তোমাদের নিকট কেউ বাতিল আনলে তা প্রত্যাখ্যান কর যদি সে তোমাদের বন্ধু ও আত্মীয়ও হয়।"

মোট কথা হযরত ইবনে মাসউদের (রা) ওয়াজ ও নসিহত এ ধরনের সুন্দর ভাষণ সম্বলিত হতো।

সাইয়েদেনা ইবনে মাসউদ (রা) যদিও রাসূলের (সা) নৈকট্য লাভকারী অন্যতম সাহাবী হিসেবে পরিগণিত ছিলেন এবং তিনি স্বয়ং প্রিয় নবীর (সা) মুখ দিয়ে কয়েকবার তাঁর মাগফিরাতের সুসংবাদ শুনেছিলেন, তবুও তিনি আল্লাহর ভয়ে সদা কম্পমান থাকতেন। ইবনে সায়াদ (র) তার এই বক্তব্যও নকল করেছেন যে, "হায়! মৃত্যুর পর যদি আমাকে উঠানো না হতো।" আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সবসময় প্রচেষ্টা চালাতেন। খুব বেশী নামায পড়তেন এবং রমযান ছাড়া প্রতি সোমবার, বৃহস্পতিবার এবং আশুরার দিন অবশ্যই রোযা রাখতেন। কোন কোন সময় এমনও হতো যে, কুরআন তিলাওয়াত অবস্থাতেই রাত অতিবাহিত হতো। সুবহিসাদিক থেকে সূর্য ওঠা পর্যন্ত তাসবিহ-তাহলিলে মশগুল থাকাটা তাঁর অভ্যাস ছিল। তিনি নিজেই শুধু নন বরং নিজের পরিবার পরিজনকেও খুব ভোরে জাগিয়ে দিতেন এবং সকল ঘর ইবাদাতে মশগুল হয়ে যেত। জামায়াতের সঙ্গে ও সময়মত নামায আদায়ে পাবন্দ ছিলেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে যে, একবার কুফার গভর্ণর ওয়ালিদ বিন উকবার মসজিদে পৌঁছতে দেরী হয়ে গিয়েছিল। হযরত আবদুল্লাহ (রা) তাঁর জন্য অপেক্ষা না করেই সময়মত নামায পড়িয়েছিলেন। তাতে ওয়ালিদ খুব গোস্বা হয়ে তাঁর নিকট জবাব চাইলেন। তিনি বললেন ঃ

"আল্লাহ এটা পসন্দ করেন না যে, তুমি নিজের কাজে ব্যস্ত থাকবে আর লোকজন নামাযে তোমার জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদের চারিত্রিক খনি মূল্যবান মনিমুক্তায় পূর্ণ ছিল। তিনি নিজের প্রতিটি কথা ও কাজে রাসূলে আকরামের (সা) অনুসরণের প্রচেষ্টা চালাতেন। এভাবে তিনি সুন্দর চরিত্রের এক নমুনা হয়ে গিয়েছিলেন। জামে' তিরমিযীতে আবদুর রহমান বিন ইয়াযিদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, "একবার আমরা সাহিবুস সির হযরত হোযায়ফা (রা) ইবনুল ইয়ামানের খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলাম যে, আমাদেরকে এমন কোন মানুষের সন্ধান দিন যিনি চরিত্র ও হেদায়াতে রাসূলের (সা) সাদৃশ্য রাখেন। যাতে আমরা তাঁর নিকট থেকে ফয়েজ হাসিল করতে পারি। হযরত হোযায়ফা (রা) বললেন ঃ

"আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাসূলের (সা) আদর্শের সবচেয়ে বেশী পাবন্দ।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ছিলেন জ্ঞানের এক মহাসমুদ্র। তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন মহান বিনয়ী। কোন মাসয়ালার ব্যাপারে যদি তাঁর জানা না থাকতো তাহলে নির্দ্বিধায় বলে দিতেন যে, তিনি তা জানেন না। কোন সময় যদি কোন ফতওয়া দিয়ে দিতেন এবং পরে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়া যেত তাহলে অবিলম্বে সেই ফতওয়া বাতিল করে দিতেন। তিনি তাঁর সমকালীন জ্ঞানী-গুণীদের সীমাহীন সম্মান করতেন। তিনি তাঁদের ইলম ও ফজিলতেরই শুধু প্রকাশ্য স্বীকৃতি দিতেন না বরং যে মাসয়ালা সম্পর্কে জানতেন না তা নির্দ্বিধায় তাঁদের নিকট থেকে জেনে নিতেন। তাতে নিজের মর্যাদাহানি মনে করতেন না। এমনকি তিনি নিজের শিষ্যদের জ্ঞানের গভীরতার স্বীকৃতি দিতেও লজ্জা করতেন না। নিজের মশহুর শাগরিদ আলকামা (র) বিন কায়েস নাখয়ীর সম্পর্কে বলতেন, "আলকামার জ্ঞান থেকে আমার জ্ঞান বেশী নয়।" তাবকাতে ইবনে সায়াদে আছে যে, হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু নিজের খিলাফতকালে কুফা পৌঁছে হযরত ইবনে মাসউদের (রা) কয়েকজন একান্ত বন্ধুর নিকট তাঁর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা সর্বসম্মতভাবে আরজ করলেন ঃ

"আমিরুল মু'মিনীন, আমরা আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ থেকে বড় কোন পরহেজগার মেহমান নাওয়াজ, সুন্দর প্রকৃতি ও চরিত্র এবং সর্বোত্তম দোস্ত বা বন্ধু দেখিনি।"

হযরত আলী (রা) জিজ্ঞেস করলেন, "একথা কি তোমরা সত্য অন্তরে বলছো।" তারা বললো, "হ্যা, আমিরুল মু'মিনীন, এসব কিছুই সম্পূর্ণ ঠিক।" বললেন, "তোমরা আবদুল্লাহ বিন মাসউদের ব্যাপারে যা কিছু বলেছো আমি তাঁকে তা থেকেও ভাল মনে করে থাকি।"

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) মেহমানদেরকে খুব তাজিম ও সম্মান করতেন। তিনি কুফার আর-রুমাদার বাড়ী খালি করিয়ে দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল সেখানে মেহমান রেখে তাদের বেশী বেশী খিদমত করা। তিনি চরম ধৈর্যশীল ও মুখাপেক্ষীহীন ছিলেন। হযরত উসমান (রা) দুই বছর পর্যন্ত তাঁর ভাতা (বার্ষিক পাঁচ হাজার দিরহাম) বন্ধ রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত তা পুনরায় চালুর আবেদন করেননি। এবং অত্যন্ত ধৈর্য ও শুকুরের সঙ্গে নিজের সময় কাটাতে থাকেন। ওফাতের কাছাকাছি সময়ে হযরত উসমান(রা) তাঁর শুশ্রূষার জন্য তাশরীফ আনলেন এবং তার ভাতা পুনর্বহাল করবেন কিনা সে ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে তা না করে দিলেন।

তার পারিবারিক জীবন ছিল অত্যন্ত সুন্দর। স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে অত্যন্ত স্নেহের আচরণ করতেন। ঘরে প্রবেশের পূর্বে সবসময় গলায় খাঁখারী দিতেন অথবা উচৈস্বরে কিছু বলতেন। যাতে ঘরের মানুষেরা সতর্ক হয়ে যায়। পরিবারের লোকজনের কুরআন ও দ্বীনি মাসয়ালা তালিম দেয়ার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। সেই সঙ্গে তিনি তাদের দিয়ে দ্বীনের হুকুম আহকামের পাবন্দীও করাতেন। বলতেন যে, "ইনশাআল্লাহ লোকেরা ইবনে উম্মে আবদের সন্তানদেরকে দ্বীন থেকে গাফেল পাবে না।"

সুন্দর চরিত্র ও জ্ঞানের গভীরতার বদৌলতে তিনি হযরত ওমরের (রা) মত মানুষের নিকট এমন মর্যাদার অধিকারী ছিলেন যে, তিনি তার সামান্যতম অপমানও বরদাশত করতে পারতেন না। হাফেজ ইবনে হাজার (র) বর্ণনা করেছেন যে, ফারুকী শাসনামলে একবার হযরত ইবনে মাসউদ (রা) জনৈক ব্যক্তিকে তার তহবন্দ টাখনুর নীচে চলে যাওয়ায় তিরস্কার করলেন। সেই ব্যক্তি জবাবে বললো, "ইবনে মাসউদ (রা) তুমিও তহবন্দ ঠিক করে পর।" তিনি বললেন, "ভাই, আমি মাযুর। কেননা আমার পা খুব পাতলা।" হযরত ওমর (রা) এই ঘটনা শুনে সেই ব্যক্তিকে ডেকে বেত মারলেন। কেননা সে আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদের মত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তর্ক করেছিল।

হযরত হুজায়ফা (রা) ইবনুল ইয়ামান—"সাহিবুস সির"

সাইয়েদেনা হযরত ওমর ফারুকের (রা) শাসনামল। একদিন তিনি মদীনা মুনাওয়ারা থেকে কিছু দূরে খেজুর গাছের এক ঝোপের মধ্যে বসেছিলেন। এই ঝোপ ছিল সেই রাজপথের নিকটে যে রাজপথ মদীনাকে ইরাক ও ইরানের সঙ্গে মিলিত করতো। খেজুর গাছগুলো এমনভাবে লাগানো হয়েছিল যে ঝোপের মধ্যে বসে কোন ব্যক্তি রাজপথের ওপর দিয়ে যাতায়াতকারীকে দেখতে পেতো। কিন্তু বাইরে থেকে কেউ তাকে দেখতে পেতো না। এটা ছিল সেই যুগ, যখন আরব মুজাহিদদের সামনে ইরানের কিসসার শানশওকত ও মান-মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল এবং ইরানের বিভিন্ন প্রদেশের আইন-শৃংখলা ও শাসনকাজ মুসলমান গভর্ণরদের হাতে ছিল। হযরত ওমর ফারুক (রা) ঝোপের মধ্যে বসে বারবার রাজপথের দিকে তাকাচ্ছিলেন মনে হচ্ছিল, তিনি যেন কারোর জন্য অপেক্ষা করছেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর তিনি দূরে ধূলো উড়তে দেখলেন। একটি সওয়ার মদীনার দিকে আসছিলো। তিনি ছিলেন ইয়েমেনী চেহারার এবং মধ্য আকৃতির একজন হালকা পাতলা মানুষ। তিনি যিন ছাড়া খচ্চরের ওপর সওয়ার ছিলেন। তাঁর দেহে ছিল মোটাসোটা পোশাক। তারও কয়েক স্থানে ছিল তালি। তিনি ঝোপের নিকট পৌছলে হযরত ওমরের (রা) চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এই ব্যক্তির জন্যই তিনি এত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করছিলেন। অস্থির চিত্তে তিনি ঝোপ থেকে বাইরে বেরিয়ে তাঁর সামনে এলেন এবং খচ্চর থেকে নামিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, "আল্লাহর কসম! তুমি ইসলামের মর্যাদা রেখেছ। তুমি আমার ভাই এবং আমি তোমার ভাই।" আরব ও আজমের খলীফা হযরত ওমর ফারুক যাকে এমন করে সম্মান করছিলেন তিনি ছিলেন ইরানের সাবেক রাজধানী মাদায়েনের গভর্ণর আবু আবদুল্লাহ হুজায়ফা (রা) ইবনুল ইয়ামান।

হযরত হুজায়ফা (রা) ইবনুল ইয়ামান সেসব বুলন্দ মরতবা সম্পন্ন সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত যাদেরকে স্বয়ং সালারে আম্বিয়া এবং ফখরে রাসূল (সা) কিয়ামতের দিন নিজের সঙ্গী হবেন বলে সুসংবাদ দিয়েছেন। তাঁর কুনিয়াত ছিল আবু আবদুল্লাহ এবং লকব ছিল "সাহিবুসসিররি রাসূলিল্লাহ।" হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) "ইসতিয়াবে" লিখেছেন, এই লকব দানের

কুনিয়াত ছিল আবু আবদুল্লাহ এবং লকব ছিল "সাহিবুসসিররি রাসূলিল্লাহ।" হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) "ইসতিয়াবে" লিখেছেন, এই লকব দানের কারণ হলো যে, রাসূলে আকরাম (সা) তাঁকে মুনাফিকদের নাম বলে দিয়েছিলেন। তিনি সেসব নাম বিশ্বস্ততার সঙ্গে হিফাজত করতেন।

হযরত হুজায়ফা (রা) বনু গাতফানের আবাস বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁর পিতা সাধারণভাবে আল ইয়ামান (ইয়ামান) নামে মশহুর। কিন্তু তাঁর আসল নাম ভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী হুসাল অথবা হুসাইল ছিল। তিনি জাহেলী যুগে নিজের গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে বসেন এবং কিসাসের ভয়ে দেশ ত্যাগ করে মদীনা (ইয়াসরাব) এসে বসবাস শুরু করেন। এখানে তিনি আওসের বনু আবদিল আসহালের সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং একজন আসহালি মহিলা রুবাব বিনতে কা'বকে বিয়ে করেন। তারই গর্ভে হযরত হুজায়ফা (রা) জন্মগ্রহণ করেন। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী(র) বর্ণনা করেছেন যে, আওস ও খাজরাজ মূলত ইয়েমেনী ছিল।

এ জন্য হুসায়েলের নাম তাঁর কওমের লোকেরা ইয়ামান রেখে দেয়। এই নাম তাঁর এত মশহুর হয় যে, লোকজন আসল নাম ভুলেই যায়।

সারওয়ারে আলম (সা) তখনো মদীনা মুনাওয়ারাতে শুভ পদার্পণ করেননি। সেই সময়ই হুসায়েল (রা) এবং হুজায়ফা (রা) হুজুরের (সা) দাওয়াত ও তার ওপর নির্যাতনের কথা শুনেছিলেন। পিতা-পুত্র উভয়েই নেক স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তাঁদের অন্তর সাক্ষ্য দিল যে, ইসলামের দায়ী (সা) আল্লাহর সত্য রাসূল এবং তাঁর দাওয়াত কবুলে বিলম্ব করা ক্ষতির অবশ্যই কারণ হবে। সুতরাং সব ধরনের বিপদ ও ভীতি মাথায় নিয়ে তারা সোজা মক্কা গিয়ে পৌঁছলেন এবং হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে ঈমান আনলেন। পরে হযরত হুজায়ফার (রা) মা রুবাব (রা) এবং এক ভাই সাফওয়ানও (রা) ইসলামের নিয়ামতে পূর্ণ হয়ে গেলেন।

সহীহ মুসলিমের এক রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, বদরের যুদ্ধের সময় হযরত হুসায়েল (রা) এবং হুজায়ফা (রা) মক্কায় ছিলেন। যুদ্ধের অবস্থা শুনে তাতে অংশগ্রহণের জন্য মক্কা থেকে রওয়ানা হলেন। রাস্তায় মুশরিকরা বাধা দিয়ে বললো যে, মুহাম্মাদের (সা) নিকট যেতে চাও? তাঁরা বললেন, "আমরা তো নিজের বাড়ী (মদীনা) যাচ্ছি।" মুশরিকরা বললো, "তোমাদের মদীনা গমনে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু শর্ত হলো যে, তোমরা মুহাম্মাদের (সা) সাহায্যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে পারবে না।" উভয়ে ইচ্ছায় হোক

অথবা অনিচ্ছায় হোক মুশরিকদের শর্ত মেনে নিলেন এবং তাদের পাঞ্জা থেকে ছুটে মদীনা পৌঁছলেন। হুজুর (সা) তখনো যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হননি। দু'জনে রাসূলের (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলেন। যদিও সে সময় একজন মানুষেরও বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তবুও সারওয়ারে আলম (সা) বললেন, "তোমরা নিজেদের প্রতিশ্রুতি পূরণ কর এবং ফিরে যাও। আমাদের প্রয়োজন আল্লাহর সাহায্য।" তাঁরা হুজুরের (সা) নির্দেশ পালন করলেন এবং অন্তরের ওপর পাথর রেখে ফিরে গেলেন।

ওহোদের যুদ্ধে পিতা-পুত্র উভয়েই অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নিলেন। হুসায়েল (রা) বার্ধক্যের কারণে খুব দুর্বল ছিলেন। এ জন্য হুজুর (সা) যুদ্ধ শুরুর পূর্বে তাঁকে এবং অন্য একজন বয়স্ক বুজুর্গ হযরত রিফায়াহ (রা) বিন ওয়াকাশ আনসারীকে মহিলা ও শিশুদের নিকট এক উঁচু টিলার ওপর(অথবা দুর্গ) পাঠিয়ে দিলেন। যুদ্ধের ময়দান গরম হয়ে উঠলো। এ সময় উভয় বুজুর্গের জোশ এসে গেল। একে অপরকে বললেন, "লা উবালিকা" (তোমার পিতার মৃত্যু হোক) "আমরা এখানে কেন বসে আছি। অথচ আমাদের ভাই ও পুত্ররা হক পথে জীবন কুরবান করছে। আমরা তো শেষ রাতের প্রদীপ। আজ মরি কি কাল মরি। চলো, আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে শাহাদাতের সৌভাগ্য হাসিল করি।" অন্যজন বললেন, "আল্লাহর কসম! তুমি সত্য কথা বলেছ।" সুতরাং দু'জনেই তরবারী হাতে যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সে সময় ঘটনাক্রমে এক পদস্খলনের কারণে মুসলমানদের মধ্যে চরম বিশৃংখলা দেখা দিয়েছিল। রিফায়াহ (রা) জনৈক মুশরিকের হাতে শহীদ হয়ে গেলেন। কিন্তু হুসায়েলুল ইয়ামানকে (রা) কিছু মুসলমান ভুলবশত মুশরিক মনে করে শহীদ করে ফেললো। হুজায়ফা (রা) চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিলেন যে, হে আল্লাহর বান্দারা, উনি আমার পিতা। কিন্তু বিশৃংখলার কারণে কেউ তার কথা শুনতে পেলো না। পিতার শাহাদাতে হুজায়ফা (রা) খুব দুঃখিত হলেন ঠিকই কিন্তু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখলেন। কেননা ভুলবশত মুসলমানরা এ ধরনের কাজ করে ফেলেছিলেন। 'আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন' একথা বলেই তিনি চুপ মেরে গেলেন। রাসূলে আকরাম (সা) এ ঘটনা শুনে হযরত হুজায়ফার (রা) প্রতি হামদরদি বা সহানুভূতি প্রকাশ করলেন এবং তাঁর ক্ষমার আবেগের প্রশংসা করলেন। উপরন্তু ইরশাদ করলেন, হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই ক্ষমাপ্রাপ্ত। একটি রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত হুজায়ফা (রা) দিয়াতের অর্থ মুসলমানদের জন্য সাদকা করে দিয়েছিলেন এবং এক দিরহামও নিজের জন্য খরচ করেননি। কতিপয় চরিতকার ওহোদের যুদ্ধে হযরত হুসায়েলুল ইয়ামানের (রা) বার্ধক্য ও প্রপীড়িত সঙ্গীর নাম রিফায়াহ'র

(রা) পরিবর্তে ছাবিত বিন ওয়াক্কাশের নাম লিখেছেন। কিন্তু অনেক সনদসম্পন্ন রেওয়ায়াত থেকে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ছাবিত বিন ওয়াক্কাশ হযরত হুসায়েনের (রা) জামাই ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে লায়লা বিনতে হুসায়েনুল ইয়ামানের বিয়ে হয়েছিল। এ জন্য তার সম্পর্কে বার্ধক্যের কথা খাটে না। হাঁ, ছাবিত বিন ওয়াক্কাশ এবং লায়লার যুবক পুত্র (অর্থাৎ হুসায়েনুল ইয়ামানের নাতি) সায়রাম আবদুল আশহাল (রা) ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি যুদ্ধের ময়দানে অথবা লড়াই শুরু হওয়ার পূর্বে হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে ইসলাম কবুল করেন। অতপর বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। হুজুর (সা) তাঁর শাহাদাতের খবর শুনে বললেন, সে আমলতো করেছে কম, কিন্তু বদলা পেয়েছে অনেক বেশী।"

খন্দকের যুদ্ধে হযরত হুজায়ফার (রা) এক মহান সৌভাগ্য নসিব হয়েছিল। কাফেরদের বিরাট বাহিনী প্রায় একমাস মদীনা মুনাওয়ারা অবরোধ করে রেখেছিল। এমনি সময় এক রাতে ঘূর্ণিবায়ু শুরু হলো। সাথে আকাশে কালো মেঘ ছেয়ে গেল। বিদ্যুতের চমক এবং মেঘের গর্জনে অন্তর কাঁপছিল। এমন ঘুটঘুটে অন্ধকার পড়েছিল যে, নিজের হাত পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না। এই ভয়াবহ ঝড়-বৃষ্টির তুফানে মুশরিকদের মারাত্মক ক্ষতিসাধিত হয়েছিল। তাঁদের তাঁবু উপড়ে পড়েছিল এবং হাড়ি-পাতিল চুলা থেকে উল্টে গিয়েছিল। এই আকস্মিক মুসিবতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মুশরিকরা মদীনা ত্যাগের ইরাদা করলো। ওদিকে মদীনা মুনাওয়ারাতে বিশ্ব নবী (সা) মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"কে আছে এমন যে মুশরিক বাহিনীতে যাবে এবং তাদের গতিবিধি ও ইচ্ছার কথা জেনে এসে আমাকে অবহিত করবে। যে ব্যক্তি এই কাজ করবে আমি তাকে বেহেশতে আমার সঙ্গী হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করছি।"

সে সময় অত্যন্ত ঠাণ্ডা ও তীব্র বাতাস বইছিল। হুজুর (সা) তিনবার এই বাক্য দোহরালেন। কিন্তু সকলেই পরস্পরের প্রতি চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলো এবং কেউই সামনে এগিয়ে এলো না। চতুর্থবার হুজুর (সা) হযরত হুজায়ফার (রা) নাম নিয়ে বললেন, "হুজায়ফা (রা) যাও, এ কাজ তুমি কর। কিন্তু খবরদার কোন মুশরিকের ওপর হামলা করে বসবে না।"

আকায়ে নামদারের (সা) নির্দেশ পালনে হযরত হুজায়ফা (রা) অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মুশরিক বাহিনীর দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। সেখানে পৌঁছে এক আশ্চর্য ধরনের বিশৃংখল অবস্থা দেখতে পেলেন। প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল। সেই বাহিনীর নেতা আবু সুফিয়ান পিঠে খুব আঘাত পেয়েছিল এবং

তাতে সে সেঁক দিচ্ছিল। ঘটনাক্রমে হযরত হুজায়ফা (রা) তাকে তাক করলেন। মন চাইলো তাকে নিজের তীরের নিশানা বানাবেন। কিন্তু হুজুরের(সা) হেদায়াতের কথা স্মরণে এসে গেলো এবং নিজের হাত গুটিয়ে নিলেন। মুশরিকদের দুরবস্থার খোঁজ-খবর নিয়ে তিনি হুজুরের (সা) খিদমতে ফিরে এলেন এবং সকল ঘটনা তনুমন দিয়ে আরজ করলেন। হুজুর (সা) তার কাজে খুব খুশী হলেন এবং তাঁর শরীরের ওপর নিজের কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলেন। সফরের ক্লান্তি এবং ঠাণ্ডায় একদম অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। কম্বল জড়িয়ে সেখানেই বেখবর হয়ে শুয়ে পড়লেন। সকাল হলে সারওয়ারে কায়েনাত (সা) অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে বললেন, "হে নিদ্রাগমনকারী এখন ওঠো।"

খন্দকের যুদ্ধের পর হযরত হুজায়ফা (রা) খায়বার, বাইয়াতে রেদওয়ান, মক্কা বিজয় এবং অন্যান্য যুদ্ধেও বীরত্বের সঙ্গে অংশ নেন। তিনি চলন, বলন এবং আদাত সকল বিষয়েই প্রিয় নবীর (সা) অনুকরণ করার প্রচেষ্টা চালাতেন। হুজুর (সা) পবিত্রতা অর্জন করতেন। এ সময় তিনি তাঁকে পানি দিতেন। হুজুরের (সা) সঙ্গে খাওয়ার সুযোগ হলে যতক্ষণ হুজুর (সা) শুরু না করতেন ততক্ষণ তিনি খাবারে হাত পর্যন্ত দিতেন না। হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হলে জোহর থেকে এশা পর্যন্ত তাঁর সুহবতে কাটাতেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে যে, একবার নবীয়ে আকরাম (সা) তাঁকে এশার পর নিজের হুজরা মুবারকে থামিয়ে নিজের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে নফলের নিয়ত বাঁধলেন। সারারাত দুই রাকায়াতেই কেটে গেল। এমনকি হযরত বিলাল (রা) ফজরের আযান দিলেন এবং হুজুর তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ফজরের নামাযের জন্য তাশরীফ নিলেন। সারওয়ারে আলম (সা) হযরত হুজায়ফাকে (রা) খুব ভাল বাসতেন। কোন কোন সময় তিনি তাঁর সঙ্গে একাকীত্বে আলোচনা করতেন। একবার হুজুর (সা) তাঁকে ইযারের সীমা বর্ণনা করলেন। এ সময় তিনি নিজের পবিত্র হাত দিয়ে তাঁর পায়ের গোছা স্পর্শ করেন। অন্য আরো একবার হুজুর (সা) লোকদের সামনে এমনভাবে তাশরীফ রাখলেন যে, হযরত হুজায়ফার (রা) বুকের সঙ্গে তিনি ঠেস দিয়েছিলেন। উম্মে হুজায়ফা (রা) হযরত রুবাবও (রা) অত্যন্ত নেকবখত স্ত্রী ছিলেন। তিনি প্রিয় নবীকে (সা) খুব গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন এবং চাইতেন যে, হুজায়ফা (রা) যেন বাকায়দা রাসূলের (সা) দরবারে হাজির হন। একবার ঘটনাক্রমে হযরত হুজায়ফা (রা) কিছু দিন হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হতে পারেননি। হযরত রুবাব (রা) একথা জানতে পেরে খুব অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁকে তৎক্ষণাৎ হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলেন। সে সময় সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিলো।

তিনি দৌড়াতে দৌড়াতে গেলেন এবং মাগরিবের নামায হুজুরের (সা) পিছনে পড়লেন। নামায পড়ার পর হুজুর (সা) মসজিদ থেকে বের হলে হুজায়ফাও(রা) মাথা নীচু করে হুজুরের (সা) পিছনে পিছনে চললেন। কয়েক পা গিয়ে হুজুর (সা) পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন কে? আরজ করলেন, "আপনার গোলাম হুজায়ফা।" তিনি বললেন, "আল্লাহ তোমাকে এবং তোমার মাকে মাগফিরাত দিন।" তারপর তিনি নবীর দরবারে অব্যাহতভাবে হাজেরী দেয়াটাকে অভ্যাস বানিয়ে নিয়েছিলেন। হুজুর (সা) তাঁকে এত স্নেহ করতেন এবং তাঁর ওপর এত আস্থা রাখতেন যে, অন্যরা তাতে ঈর্ষা করতো এবং তাঁরা তাঁকে "সাহিবুসসির রাসূলুল্লাহ" বলতেন।

মহানবীর (সা) ওফাতের পর হযরত হুজায়ফা (রা) বিদীর্ণ অন্তরে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে ইরাক চলে গেলেন এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন। আল্লামা ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সেই যুগেই আলজাযিরার নাসিবাইন শহরের জনৈকা মহিলাকে শাদী করেন এবং পুনরায় মাদায়েন চলে যান।

হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁকে খুব মানতেন। সিদ্দীকে আকবারের (রা) ইন্তেকালের পর তিনি যখন খলীফা নির্বাচিত হলেন এবং বিজিত এলাকাসমূহে গভর্ণর নিয়োগ করেন তখন হযরত হুজায়ফাকে (রা) দাজলার আশপাশের ব্যবস্থাপক নিয়োগ করেন। হুজায়ফা (রা) ফকির মানসিকতার মানুষ ছিলেন এবং ইমারতের সৌন্দর্য তাঁকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। মোটাসোটা কাপড় পরতেন এবং খুব সাদাসিধেভাবে জীবন কাটাতেন। দাজলার আশেপাশের লোকেরা খুব খারাপ প্রকৃতির ও বিশ্বাসঘাতক ছিল। তারা হুজায়ফার (রা) ফকিরী ও মুখাপেক্ষীহীনতার ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলো এবং সাহায্য করার পরিবর্তে তাঁর কাজে বিভিন্ন ধরনের বাধা আরোপ করলো। তাদের এই শত্রুতামূলক আচরণ ও নীচতা সত্ত্বেও হযরত হুজায়ফা (রা) তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে লাগলেন। আল্লাহ পাক তাঁকে ব্যবস্থাপনার সার্বিক গুণাবলীই প্রদান করেছিলেন। তিনি ভূমি এবং উৎপাদন এত সুন্দরভাবে নির্ধারণ করলেন যে, সরকারের রাজস্ব আয় অনেক বেড়ে গেল। হযরত ওমর (রা) তাঁর এই কাজের কথা জানতে পেরে খুব খুশী হলেন এবং হযরত হুজায়ফার (রা) মর্যাদা তাঁর দৃষ্টিতে আরো কয়েকগুণ বেড়ে গেল।

১৮ হিজরীতে মুসলমানরা নাহাওয়ান্দের ওপর সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সে সময় হযরত হুজায়ফা (রা) কুফা অবস্থান করছিলেন। হযরত ওমর (রা) তাঁকে কুফা থেকে মুজাহিদ বাহিনীসহ বের হয়ে নু'মান(রা) বিন

মুকরানের সাহায্যের জন্য পৌঁছতে চিঠি লিখলেন। কুজিস্তান বিজয়ী হযরত নু'মান (রা) অত্যন্ত কৌশলী ও জানবাজ সাহাবী ছিলেন এবং হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ ও সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসের পাশাপাশি ইরাকের কয়েকটি যুদ্ধে নিজের বাহাদুরী এবং জীবন উৎসর্গের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) খুব চিন্তা-ভাবনা করে তাঁকে নাহাওয়ান্দ অভিযানের সিপাহসালার নিয়োগ করেছিলেন এবং সাহাবীদের (রা) সাধারণ সমাবেশে তাঁর ব্যাপারে এই ধারণা প্রকাশ করেছিলেন, "আল্লাহর কসম! সেই ব্যক্তির বুক সর্বাগ্রে বর্শার জন্য এগিয়ে দেয়া হবে।" কাদেসিয়ার পর নাহাওয়ান্দের যুদ্ধ ইরানের সকল যুদ্ধের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধ ছিল। এ যুদ্ধে ইরান নিজের দেড় লাখ (অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী দু'লাখ) যোদ্ধাকে আরবদের মুকাবিলায় এনে দাঁড় করিয়েছিল এবং এত জোরেশোরে যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়েছিল যে, চারদিকে তুফান সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। আল্লামা তাবারী (র) বর্ণনা করেছেন যে, ইরানীদের জবরদস্ত সমাবেশ এবং যুদ্ধ প্রস্তুতির প্রেক্ষাপটে হযরত ওমর (রা) স্বয়ং তাঁদের মুকাবিলায় গমন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু তাঁকে বাঁধা দিয়েছিলেন।

হযরত ওমরের (রা) হেদায়াত অনুযায়ী হুজায়ফা (রা) কুফা থেকে একটি নির্বাচিত বাহিনী নিয়ে বের হলেন এবং নু'মান (রা) বিন মুকরানের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলেন। অন্য কতিপয় স্থান থেকেও সাহায্যকারী বাহিনী এসে উপস্থিত হলো। এমনিভাবে সকল সৈন্য মিলিয়ে ইসলামী বাহিনীর সংখ্যা দেড় লাখ ইরানীর মুকাবিলায় বেশী হলেও ত্রিশ হাজারে পৌঁছলো।

হযরত ওমর (রা) নু'মানকে (রা) এও লিখে পাঠিয়েছিলেন যে, এই যুদ্ধে খোদানাখাস্তা তুমি যদি কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার শিকার হও তাহলে হুজায়ফা (রা) বিন ইয়ামান ইসলামী বাহিনীর সিপাহসালার হবেন। এদিকে ইরানীরা নাহাওয়ান্দে নিজেদের দুর্গ বন্ধ করে রেখেছিল। মুসলমানরা নাহাওয়ান্দের দিকে অগ্রসর হলে রাস্তায় কেউ তাদেরকে বাধা দিল না এবং তারা শহর থেকে দুই তিন মাইল দূরে তাঁবু স্থাপন করলো। এখন তারা অপেক্ষা করছিল যে, ইরানীরা কখন বাইরে বেরিয়ে তাঁদের মুকাবিলা করবে। কিন্তু কাদেসিয়া এবং অন্যান্য যুদ্ধে ইরানীদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাতে তারা প্রকাশ্যে মুসলমানদের মুকাবিলায় সাহস পাচ্ছিল না। অবশ্য কখনো-সখনো তাঁদের কোন দল চুরিচামারি ও গোপনে বাইরে বের হতো এবং মুসলমানদের কোন টহল দলের সাথে সামান্য কিছু সংঘর্ষের পর ফিরে যেতো। এমনিভাবে দুই মাস চলে গেল। এদিকে মুসলমানরা ইরানীদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। অবশেষে তাঁরা ইরানীদেরকে দুর্গের বাইরে আনার এক ফন্দি

আঁটলেন। এই ফন্দি অনুযায়ী একটি দল ছাড়া সকল সৈন্য একদিন তাঁবু উঠিয়ে পিছু হটে গেল। সেই দলটির নেতৃত্ব করছিলেন হযরত কা'কা' (রা) বিন আমর তামিমী। তিনি দলটিসহ শহরের দিকে অগ্রসর হলেন এবং নিকটে পৌঁছে দুর্গের চূড়া ও প্রাচীরের ওপর তীর বর্ষণ শুরু করে দিলেন। ইরানীরা নিজেদের গোয়েন্দা মারফত সব খবর পাচ্ছিল। তারা মনে করলো যে, মুসলমানরা পিছু হটে গেছে এবং শুধুমাত্র কয়েকজন পিছনে পড়ে রয়েছে। সুতরাং তারা শহরের দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে এলো এবং কা'কা'র (রা) দলের ওপর হামলা করে বসলো। কা'কা' (রা) পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী কিছুক্ষণ অটলভাবে লড়াই করতে লাগলেন। অতপর আস্তে আস্তে পিছু হটতে শুরু করলেন। ইরানীরা তাঁর পিছু পিছু রওয়ানা হলো। যখন তারা শহর থেকে কিছু দূরে চলে এলো তখন হঠাৎ করে বড় ইসলামী বাহিনী তাদের সামনে আবির্ভূত হলো। বিরাট সংখ্যক ইরানী বাহিনীর জন্য তখন ফিরে যাওয়াও সম্ভব ছিল না। কেননা সারা রাস্তায় তারা নিজেরাই কাঁটা বিছিয়ে এসেছিল। বস্তুত সেই স্থানেই ইতিহাসের সেই রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হলো, যে যুদ্ধ অগ্নি উপাসক ইরানীদের ভাগ্যের ওপর চিরকালের জন্য মোহর অংকিত করে দিল। ঘোরতর যুদ্ধ চলছিলো। ঠিক এমন সময় যুদ্ধের ময়দানে হযরত নু'মান (রা) বিন মুকরানের ঘোড়া পা ফসকে পড়ে গেল এবং সেই সঙ্গে বৃষ্টির মত তীর এসে তাঁকে আঘাত করলো। এই তীরের আঘাতে তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। হযরত ওমরের(রা) হেদায়াত অনুযায়ী তারপর হযরত হুজায়ফা (রা) আমীরে লশকর হলেন। হযরত নাঈম (রা) বিন মুকরান, সুয়াইদ (রা) বিন মুকরান, কা'কা' (রা) বিন আমর তামিমী, জারির (রা) বিন আবদুল্লাহ আল বাজালী, তোলায়হা (রা) বিন খুয়ায়েলদ, আমর (রা) বিন মাদি করব এবং আরো কয়েকজন আরব বাহাদুর স্ব স্ব দলের সঙ্গে তাঁর ডাইনে বাঁয়ে এবং সামনে ও পিছনে ছিলেন। তাঁরা সকলে মিলে ইরানীদের ওপর এত প্রচণ্ড বেগে হামলা চালালেন যে, সূর্য অস্ত যেতে যেতেই তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। ত্রিশ হাজার ইরানী যুদ্ধের ময়দানে লাশ হয়ে পড়ে রইলো এবং প্রায় ৮০ হাজার রাতের অন্ধকারে পালাতে গিয়ে পরিখায় পড়ে ধ্বংস হয়ে গেল। এই "ফাতহুল ফাতুহ" অর্থাৎ বিজয়সমূহের বিজয়ের পর হযরত হুজায়ফা (রা) স্ব বাহিনীর সঙ্গে শহরের দিকে অগ্রসর হলেন এবং কোন বাধা ছাড়াই তাতে প্রবেশ করলেন। শহরবাসী ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় শান্তি শান্তি বলে চেঁচাচ্ছিল। হযরত হুজায়ফা (রা) তাদেরকে বললেন, ভয় পেয়ো না। আমরা মুসলমানরা কোন নিরস্ত্র মানুষের ওপর হাত তুলি না। অতপর তিনি বালেগ ব্যক্তিদের ওপর সাধারণ ধরনের জিযিয়া নির্ধারণ করে সকলকে নিরাপত্তা দিয়ে দিলেন এবং

এই প্রতিশ্রুতিও দিলেন যে, তাদের ধন-সম্পদ ও ধর্মের ব্যাপারে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করা হবে না। শহরবাসী এই উদার আচরণে এত খুশী হলো যে, শ্রদ্ধায় তাদের মাথা নত হয়ে গেল। হযরত হুজায়ফার (রা) নাহাওয়ান্দ অবস্থানকালে একদিন অগ্নি-পূজারীদের উপাসনাগারের জনৈক ধর্মবেত্তা তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলো এবং অত্যন্ত মূল্যবান মণিমুক্তায় ভর্তি দু'টি সিন্দুক তাঁকে দিলেন। হযরত হুজায়ফা (রা) এসব মণিমুক্তা স্পর্শ পর্যন্ত করলেন না এবং তা সব গনিমতের মালের পঞ্চমাংশসহ হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিদমতে মদীনা মুনাওয়ারাতে পাঠিয়ে দিলেন। ফারুকে আজম (রা) এসব মণিমুক্তা বাইতুলমালে দাখিল করানো পসন্দ করলেন না এবং তা একটি হেদায়াতসহ হযরত হুজায়ফার(রা) নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। হেদায়াতে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, এসব মণিমুক্তা বিক্রয় করে যে অর্থ পাওয়া যাবে তা মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে। হুজায়ফা (রা) মণিমুক্তাসমূহ চার কোটি দিরহামে বিক্রয় করেন এবং সকল অর্থ মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

নাহাওয়ান্দ বিজয়ের পর হযরত হুজায়ফা (রা) আজারবাইজানে সেনা অভিযান চালালেন এবং এক কঠিন যুদ্ধের পর তাকে ইসলামী শাসনাধীনে আনলেন। অতপর তিনি সওকান এবং জিলান পদানত করলেন ও আরো সামনে অগ্রসর হওয়ার চিন্তা করছিলেন ঠিক এই সময় হযরত ওমর (রা) তাঁকে সামরিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে মাদায়েনের গভর্ণর নিয়োগ করলেন।

হযরত হুজায়ফা (রা) প্রকৃত অর্থে "আল ফাকরু ফাখরী" অর্থাৎ দারিদ্র্যতা আমার গৌরব-এর নমুনা ছিলেন। অবশ্য 'আল ফাকরু ফাখরী" উক্তিটি কোন হাদিস নয়। এটা কোন ব্যক্তির মশহুর উক্তি।

তিনি একটি টাট্টু ঘোড়ার খালি পিঠে সওয়ার হয়ে সাধারণ পোশাক পরে মাদায়েনে প্রবেশ করলেন। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ নিজেদের নতুন গভর্ণরকে ইসতিকবালের জন্য শহরের বাইরে একত্রিত হয়েছিলেন। কিন্তু হযরত হুজায়ফা (রা) তাদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে গেলো। অথচ তারা তা টেরও পেলো না যে, মাদায়েনের গভর্ণর শহরের মধ্যে পৌঁছে গেছেন। অপেক্ষা করতে করতে যখন অনেক সময় কেটে গেল তখন তারা মুসলমানদেরকে জিজ্ঞেস করলো যে, শহরের নতুন গভর্ণরের আসার কথা ছিল। এখনো তিনি এলেন না কেন? মুসলমানরা বললো, তিনি তো সবেমাত্র তোমাদের সামনে দিয়ে শহরের মধ্যে পৌঁছে গেলেন। একথা শুনে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বিস্মিত হলেন।

কিছুক্ষণ পর হযরত হুজায়ফা (রা) সকল মুসলমান ও মাদায়েনবাসীকে একত্রিত করলেন এবং তাদের সামনে আমীরুল মু'মিনীনের ফরমান পাঠ করে শুনালেন। তাতে লিখা ছিল ঃ

"হুজায়ফা (রা) বিন ইয়ামানকে তোমাদের আমীর নিয়োগ করা হলো। তাঁর নির্দেশ শোনো এবং তাঁর আনুগত্য কর এবং তিনি যা কিছু তোমাদের নিকট চান তা তাঁকে দেবে।"

তিনি যখন ফরমান পাঠ শেষ করলেন তখন চার দিক থেকে আওয়াজ উঠলো, "আপনি আপনার প্রয়োজনের কথা বর্ণনা করুন আমরা তা পূরণ করবো।"

হযরত হুজায়ফা (রা) দারিদ্রের শীর্ষদেশে ছিলেন। তিনি বললেন ঃ

"শুধু আমার পেটের জন্য খাদ্য এবং গাধার জন্য খাবার চাই। আমি যতক্ষণ এখানে থাকবো এর অতিরিক্ত তোমাদের নিকট কিছু চাইবো না।" এবং বাস্তবিকই হযরত হুজায়ফা (রা) নিজের কথা পূর্ণ করে দেখিয়ে ছিলেন। যতদিন মাদায়েনে ছিলেন ততদিন তিনি ফকিরী অবস্থাতেই ইমারাত চালিয়েছেন। একটি সাধারণ ছাপ্পরে থাকতেন এবং সওয়ারীর জন্য সবসময় গাধা ব্যবহার করতেন। লোকদেরকে সবসময় ফিতনার স্থান থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিতেন। একবার লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, "হযরত! ফিতনার স্থান কোনটি?" তিনি বললেন, "আমীর এবং শাসকদের দরজা। লোকেরা আমীরদের নিকট গমন করে। তাদের ভুল কথা সমর্থন করে এবং তাদের অযাচিত প্রশংসা করে। এটাইতো ফিতনা।"

একবার হযরত ওমর (রা) কিছু অর্থ প্রেরণ করলেন। এই অর্থের সবটুকুনই অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বন্টন করে দেন। এমনিভাবে যখনই তিনি বেতন পেতেন তখনই পানাহারের বস্তু খরিদ করার জন্য কিছু দিরহাম নিজের কাছে রেখে দিতেন এবং অবশিষ্ট সব আল্লাহর পথে ব্যয় করতেন। সাদাসিধে জীবন ও শরীয়তের আহকাম পালনে তিনি কতখানি একনিষ্ঠ ছিলেন তা এই ঘটনা থেকেই অনুমান করা যায়।

একবার পানের জন্য পানি চাইলেন। একজন সরদার রূপার পাত্রে পানি এনে দিলেন। তিনি বিরক্তি সহকারে তা নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন ঃ

"আমি কি তোমাদেরকে বার বার সতর্ক করিনি যে রাসূলুল্লাহ (সা) সোনা ও রূপার পাত্রে পানাহার নিষেধ করেছেন।"

কিছুদিন পর খিলাফতের দরবার থেকে ডেকে পাঠানো হলে নিজের ফকিরী অবস্থাতেই তিনি মদীনা পৌঁছেন। হযরত ওমর (রা) রাস্তায় চুপিসারে বসেছিলেন। তিনি যখন দেখলেন যে তিনি যে অবস্থায় মদীনা থেকে গিয়েছিলেন সেই অবস্থাতেই ফিরে এসেছেন।

তখন তিনি ভালবাসার আতিশয্যে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন ঃ

"হুজায়ফা (রা) তুমি আমার ভাই এবং আমি তোমার ভাই।" তারপর তিনি তাকে সেই পদে বহাল রাখলেন। ইমারাত পরিচালনকালীন অবস্থায় হযরত হুজায়ফার (রা) গরীবী অবস্থা হযরত ওমর ফারুকের (রা) খুব পসন্দনীয় ছিল। আল্লামা ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত ওমরের(রা) নিকট কয়েকজন সাহাবী একত্রিত ছিলেন তিনি তাদেরকে স্ব স্ব ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করতে বললেন। সবাই বললেন, কোন অমূল্য ধনাগার যদি পেতাম তাহলে তা আল্লাহর পথে লুটিয়ে দিতাম। হযরত ওমর (রা) বললেনঃ

"আমিতো আবু ওবায়দাহ (রা), মায়াজ (রা) বিন জাবাল ও হুজায়ফা (রা) বিন ইয়ামানের মত মানুষ পেতে চাই এবং তাদেরকে দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করাতে চাই।

ফারুকে আজমের (রা) পর হযরত উসমান গনিও (রা) হযরত হুজায়ফাকে (রা) মাদায়েনের গভর্ণর পদে বহাল রাখলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবত তার অন্তর জিহাদে গমনের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল। বস্তুত তিনি ৩০ হিজরীতে ইমারাতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে খোরাসান পদানত করার জন্য গমনকারী সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। খোরাসান বিজয়ের পর তিনি রে এবং আরমেনিয়ার যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করেন। অতপর ৩১ হিজরীতে খাকানে খিজরের বিরুদ্ধে যে অভিযান প্রেরণ করা হয় তাতে অংশ নেন। এমনিভাবে সেই যুদ্ধে সংঘটিত অন্যান্য যুদ্ধেও একাত্ম হয়ে অংশ নেন। আল্লামা তাবারী বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উসমান (রা) বাব পদানত করার জন্য তিনবার সৈন্য প্রেরণ করেন। প্রতিবারই তার নেতৃত্ব দেন হযরত হুজায়ফা (রা)। হযরত উসমানের (রা) খিলাফতের শেষদিকে তিনি পুনরায় মাদায়েনের গভর্ণরী পদে ফিরে আসেন এবং এখানেই ৩৫ হিজরীতে হযরত উসমানের (রা) শাহাদাতের ৪০ দিন পর পরপারে যাত্রা করেন। জীবনের শেষ দিনগুলোতে প্রায়ই ইস্তিগফার ও আল্লাহর নিকট কান্নাকাটিতে মশগুল থাকতেন। লোকজন কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ

'দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য আমার দুশ্চিন্তা নেই। আমিতো মৃত্যুকে স্বাগত জানাই। আখিরাতের কারণে আমি কেঁদে থাকি। জানি না, সেখানে

আমার সঙ্গে কেমন ধরনের ব্যবহার করা হবে। মৃত্যুকালীন সময়ে তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হচ্ছিল। "হে আল্লাহ। তোমার সঙ্গে আমার মুলাকাত যেন মুবারাক হয়। আমি দুনিয়া ও তার মধ্যকার সব বস্তু থেকে তোমাকে ভালবাসি।"

ওফাতের পূর্বে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর বাইয়াত এবং নিজের পুত্রদেরকেও তার আনুগত্য করার ওসিয়ত করেছিলেন। সুতরাং তাঁর দুই পুত্র সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলীর (রা) পক্ষে থেকে লড়াই করে শহীদ হন।

আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, মৃত্যুকালে হযরত হুজায়ফা (রা) চার পুত্র রেখে যান। তাঁরা হলেন, আবু ওবায়দা, বিলাল, সাফওয়ান এবং সাঈদ।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র) বলেছেন, হযরত হুজায়ফা (রা) মধ্যাকৃতির মানুষ ছিলেন। সামনের সারির দাঁত ছিল খুব চমকদার ও সুন্দর। তা থেকে যেন আলোর বিচ্ছুরণ ঘটতো। দৃষ্টিশক্তি এতো তীব্র ছিল যে অন্ধকার রাতেও তীরের নিশানা দেখে নিতে পারতেন।

হযরত হুজায়ফা (রা) মর্যাদাবান সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন এবং মুসলমানদের সকল থটস অব স্কুলই তাঁর মর্যাদা, ইলম, ফজিলত ও যুহদ এবং তাকওয়ার কথা বলে থাকেন। কুরআন, হাদিস এবং ফিকাহ হতে সমুদ্রের গভীরতা রাখতেন। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র) "ইতকানে" ওবায়েদের (রা) কিতাব আল কিরাআতের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, "হুজায়ফা (রা) নবী যুগের অন্যতম হাফেজে কুরআন ছিলেন। রাসূলে আকরাম (সা) তাঁকে মুনাফিকদের নাম বিশেষভাবে বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কখনো কোন মুনাফিকের নাম লোকদেরকে বলেননি। এ জন্য লোকেরা তাঁকে সাহিবে সিররে রসূলুল্লাহ (সা) বলতো।" শারহে ইহইয়াউল উলুমে আছে যে, হুজায়ফা (রা) কোন মুনাফিকের নামতো বলতেন না। অবশ্য এটা বলে দিতেন যে, বর্তমানে এতজন মুনাফিক জীবিত আছে। ইসতিয়াবের লিখক হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর ফারুক (রা) একটি মাপকাঠি ঠিক করেছিলেন। তাহলো যে ব্যক্তির জানাযায় হুজায়ফা (রা) শরীক হতেন তাতে তিনিও শরীক হতেন এবং তিনি যদি কোন ওজর ছাড়া শরীক না হতেন তাহলে হযরত ওমরও (রা) জানাযায় যেতেন না এবং মনে করতেন যে, মৃত ব্যক্তি মুনাফিকদের দলভুক্ত ছিলো।

হযরত হুজায়ফা (রা) থেকে একশ'র কিছু বেশী হাদিস বর্ণিত আছে। শাসনকাজের জন্য তিনি খুব কমই ফুরসত পেতেন। কিন্তু যখনই সুযোগ পেতেন তখনই লোকদেরকে হাদিস শিক্ষা দিতেন। লোকেরা তাঁকে খুবই সম্মান করতো। শিক্ষার মজলিসে উঁচু কণ্ঠে অথবা কানাঘুষা করার মত সাহস কারোরই হতো না। তার হাদিস বর্ণনাকারীদের মধ্যে হযরত জাবের(রা) বিন আবদুল্লাহ আনসারী, আবুত তোফায়েল (রা), আবদুল্লাহ (রা) বিন ইয়াযিদ খাতমী, রাবয়ী (রা) বিন খারাশ, আবু ইদরিস গাওলানী (র), যার বিন হুবায়েশ (র), আবু ওযায়েল (র), আবদুর রহমান বিন আবি লায়লা এবং হুমাম (র) ইবনুল হারিছের মত জালিলুল কদর সাহাবী এবং তাবেয়ী অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

একবার রাসূলে আকরাম (সা) সাহাবায়ে কিরামের (রা) এক মাজমাতে কিয়ামত পর্যন্তকার সকল ফিতনার কথা বর্ণনা করলেন। হযরত হুজায়ফাও(রা) সেই মাজমাতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হুজুরের (সা) এই খুতবা সবসময় স্মরণ রেখেছিলেন এবং এমন এক সময় এলো যে, লোকজন এই বিষয়ে হুজুরের (সা) ইরশাদসমূহের জ্ঞান শুধুমাত্র হযরত হুজায়ফার (রা) মাধ্যমেই পেতো। কেননা সেই মজলিসে উপস্থিত অন্যান্য সাহাবী এক এক করে ওফাত পেয়েছিলেন। সহীহ বুখারীতে আছে যে, অন্যান্য সাহাবীর (রা) উল্টো হযরত হুজায়ফা (রা) রাসূলে আকরামের (সা) নিকট খারাপ বস্তুসমূহের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেন। এর কারণ হিসেবে তিনি বলতেন যে, হুজুর (সা) যে বস্তুকে খারাপ বলবে আমি তা থেকে চিরকালের জন্য বেঁচে থাকবো।

হযরত হুজায়ফা (রা) সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার বিশেষ ব্যবস্থা করতেন। একবার এক ব্যক্তিকে খুব তাড়াতাড়ি নামায পড়তে দেখলেন। সে সালাম ফেরালে বললেন, এটা নামায পড়ার পদ্ধতি নয়। যদি এভাবে মারা যাও তাহলে ইসলামের ওপর থেকে মৃত্যুবরণ করবে না। অতপর তাকে নামায পড়ার পদ্ধতি বর্ণনা করলেন এবং রুকূ ও সিজদাতে ভারসাম্য রক্ষা ও ছোট কেরায়াত পড়ার কথা বললেন।

একবার কিছু মানুষকে ফজুল কথা বলতে দেখলেন। বললেন, "এমন কথা থেকে পরহেজ করো। কেননা হুজুরের (সা) যমানায় এ ধরনের আলোচনা নিফাকের মধ্যে পরিগণিত হতো।"

মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলে (র) আছে, একবার হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বনের জন্য শিশিতে পেশাব করা শুরু

করলেন। তাঁর ভয় ছিলো যে, ফোঁটা বাইরে পড়ে না যায়। হযরত হুজায়ফা(রা) একথা জানতে পেরে তাঁকে নিষেধ করলেন এবং বললেন, "এত কঠোরতা ইসলামী চেতনার পরিপন্থী।"

হযরত হুজায়ফার (রা) নামায ও রোযার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। দারিদ্র ও অভুক্ত থাকাকে খুব পসন্দ করতেন এবং লোকদেরকে আমীরদের নিকট যেতে নিষেধ করতেন। দুনিয়ার ব্যবস্থা খুব অপসন্দ করতেন এবং অনেক সময় বলতেন, মন চায় দরজা বন্ধ করে বসে থাকি ও কারোর সঙ্গে দেখা না করি। আর এই অবস্থাতেই স্রষ্টার নিকট গিয়ে উপস্থিত হই।

হযরত খাব্বাব (রা)
বিন আরাত

সাইয়েদেনা হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু সিফ্‌ফিনের যুদ্ধের পর (৩৭ হিজরীতে) রাজধানী কুফায় ফিরে এলেন। এ সময় শহরের বাইরে সাতটি কবরের ওপর তাঁর দৃষ্টি পড়লো। লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "এসব কাদের কবর। আমরা যখন কুফা থেকে গিয়েছিলাম তখন তো এখানে কোন কবর ছিল না।"

জওয়াব এলো, "আমীরুল মু'মিনীন এই প্রথম কবর হলো খাব্বাব (রা) বিন আরাতের। তাঁর ওসিয়ত অনুসারেই সর্বপ্রথম এখানে দাফন করা হয়। অবশিষ্ট কবরগুলো অন্যদের। তাঁদের আত্মীয়রা তাঁদেরকে খাব্বাবের (রা) পরে এখানে দাফন করেছেন।"

এই জবাব শুনে শেরে খোদার (রা) চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো এবং সমকালীন সময়ের শ্রেষ্ঠ মানুষের মুখ দিয়ে অবলীলাক্রমে বের হয়ে এলো ঃ

"খাব্বাবের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। তিনি স্বেচ্ছায় ও আনন্দ চিত্তে ইসলাম গ্রহণ করেন। নিজের খুশীতে হিজরত করেন। সারা জীবন জিহাদে কাটান এবং হক পথে প্রচণ্ড মুসিবত সহ্য করেন। আল্লাহ তায়ালা নেক্‌কারদের আমল নষ্ট করেন না।"

একথা বলে তিনি কবরগুলোর খুব নিকটে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত হযরত খাব্বাব (রা) ও অন্যান্য কবরবাসীর জন্য মাগফিরাত কামনা করলেন। এই খাব্বাব (রা) বিন আরাত যার কবর দেখে "আসাদুল্লাহ আল গালিব" অশ্রুসিক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তো সেই ব্যক্তি ছিলেন যিনি ইতিহাসের পাতায় নিজের দৃঢ় সংকল্প ও অটলতার এমন চিহ্ন এঁকে দিয়েছিলেন যা ঈমানদারদের জন্য পথের মশাল হয়ে রয়েছে। অর্ধশতাব্দী পূর্বে এক গরীবুল ওয়াতান বা উদ্বাস্তু এবং অসহায় গোলাম হওয়া সত্ত্বেও তিনি এমন এক পথ অবলম্বন করেছিলেন যাতে শুধু কাঁটা আর কাঁটাই বিছানো ছিল এবং পদে পদে মানবরূপী নেকড়েরা সেই পথের মুসাফিরদেরকে ছিন্ন- ভিন্ন করে ভক্ষণের জন্য ওঁৎ পেতে বসেছিল। এই পথ ছিল "হক পথ" এবং খাব্বাব (রা) সেই পথে এমন এমন লোমহর্ষক মুসিবত সহ্য করেছিলেন যে, তাঁর

অবস্থা শ্রবণ করে বড় বড় জালিলুল কদর সাহাবীও (রা) অস্থির হয়ে পড়তেন এবং হযরত খাব্বাবের (রা) ঈমানী জোশ ও সবর এবং অটলতার প্রশ্নে ঈর্ষা করতেন। এই খাব্বাবতো (রা) তিনিই ছিলেন যিনি ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে একদিন আমীরুল মু'মিনীনের সঙ্গে সাক্ষাত করতে গেলে ফারুকে আজম (রা) সম্মানার্থে তাঁকে নিজের আসনে বসালেন এবং লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"খাব্বাব ছাড়া আর শুধু এক ব্যক্তিই আছেন যিনি এই আসনে বসার যোগ্য।"

হযরত খাব্বাব (রা) জিজ্ঞেস করলেন, "আমীরুল মু'মিনীন, সেই ব্যক্তি কে?"

বললেন "বিলাল (রা) বিন রাবাহ।"

তিনি আরজ করলেন, "আমীরুল মু'মিনীন, বিলালের (রা) মর্যাদা আমার সমান কি করে হতে পারে। মুশরিকদের মধ্যে কয়েকজন তাঁর সাহায্যকারীও ছিলো। যাদের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁকে বাঁচিয়ে নিতেন। কিন্তু আমার তো কোন জিজ্ঞেসকারীও ছিল না। অতপর তিনি নিজের হৃদয়বিদারক মুসিবতের কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন। তাতে ফারুকে আজম (রা) এবং মজলিসে উপস্থিত অন্যান্যদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। সেই খাব্বাব (রা) আজ মণকে মণ মাটির নীচে স্বপ্নে বিভোর ছিলেন এবং হায়দারে কাররার (রা) তাঁর কবরের পাশে দুঃখ ভারাক্রান্ত চিত্তে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর চোখে ছিল অশ্রু এবং মুখে ছিল হযরত খাব্বাবের (রা) ফজিলত ও প্রশংসা এবং মাগফিরাতের দোয়া। আল্লাহ, ওমর ফারুক (রা) এবং আলী হায়দারের (রা) মত মহান মানুষ যে মরদে মুমিনের ফজিলতের স্বীকৃতিদানকারী ও প্রশংসাকারী হন তাঁর উচ্চ মর্যাদার আন্দাজ কে করতে পারে?

সাইয়দেনা আবু আবদুল্লাহ খাব্বাব (রা) বিন আরাত বনু তামিম গোত্রভুক্ত ছিলেন। তাঁর নসবনামা হলো ঃ খাব্বাব (রা) বিন আরাত বিন জুনদলা বিন সায়াদ বিন খাযিমা বিন কায়াব বিন সায়াদ বিন যায়েদ মানাত বিন তামিম। যদিও কতিপয় রেওয়ায়াতে তাঁকে খাযায়ী বলা হয়েছে কিন্তু তিনি তামিমী গোত্রভুক্ত ছিলেন। এই বক্তব্যই সঠিক। জাহেলী যুগে তাঁর খান্দানের ওপর কি আপদ আপতিত হয়েছিল তা জানা যায়নি। সে সময় তাঁকে গোলাম বানিয়ে মক্কায় বিক্রয় করা হয়। তাঁর মালিকের ব্যাপারে দুই ধরনের রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী উতবা (রা) বিন গাযওয়ান তাঁকে ক্রয় করেছিলেন এবং দ্বিতীয় রেওয়ায়াত মতে তিনি উম্মে আনমার বিনতে সাবায়ুল

খাযায়ীয়ার গোলাম ছিলেন। আমাদের অনুসন্ধান অনুযায়ী দ্বিতীয় রেওয়ায়াতই সঠিক। উতবাহ (রা) বিন গাযওয়ানের এক গোলামের নাম নিসন্দেহে খাব্বাব (রা) ছিল। কিন্তু তিনি দ্বিতীয় আরেক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর কুনিয়াত ছিল আবু ইয়াহিয়া এবং তিনি ১৭ হিজরীতে ওফাত পান। পক্ষান্তরে হযরত খাব্বাব (রা) বিন আরাতের কুনিয়াত ছিল আবু আবদুলাহ এবং তিনি ৩৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। উভয়েই জালিলু কদর সাহাবী ছিলেন এবং মহানবীর (সা) সঙ্গে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ জন্য কতিপয় নেতৃস্থানীয় চরিতকার হযরত খাব্বাব (রা) বিন আরাত এবং উতবা (রা) বিন গাযওয়ানের মুক্তিদানকৃত গোলাম হযরত খাব্বাবের (রা) মধ্যে পার্থক্য সাধন করতে পারেননি। এ জন্য উভয়কেই একই ব্যক্তিত্ব মনে করেছেন।

মক্কা পৌঁছে হযরত খাব্বাব (রা) বিন আরাত কর্মকারের পেশা গ্রহণ করেন এবং তরবারী বানিয়ে বিক্রয় করতে লাগলেন। এমনিভাবে তিনি বেশ আয় করছিলেন এবং খুব মজার সাথেই জীবন অতিবাহিত করছিলেন। সেই যুগেই কোন মাধ্যমে তাঁর কানে তাওহীদের দাওয়াতের আওয়াজ এসে পৌঁছে। সে সময় পর্যন্ত শুধু মাত্র পাঁচজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তিত্ব ইসলাম কবুল করেছিলেন। হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা), হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু (রা), হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছা এবং হযরত আবু জার গিফারী (রা)। মক্কার পরিস্থিতি তখন খুব ভীতিজনক ছিল এবং মুশরিকরা ইসলামের নামও শুনতে পারতো না। বাস্তবত সে সময় ইসলাম গ্রহণ করাটা ভয়াবহ মুসিবত ডেকে আনার নামান্তর ছিল এবং নামকরা মানুষও তাওহীদের ঝাণ্ডা উড্ডয়নে মুশরিকদের ক্রোধ থেকে বাঁচতে পারতো না। খাব্বাব (রা) ছিলেন একজন উদ্বাস্তু ও বন্ধু-বান্ধবহীন গোলাম। কিন্তু আল্লাহপাক তাঁকে অত্যন্ত পবিত্র স্বভাব ও বাঘের অন্তর দান করেছিলেন। হকের আওয়াজ কানে পৌঁছতেই তিনি পরিণামের কথা চিন্তা না করেই বেপরওয়া হয়ে সেই দাওয়াতে সাড়া দানে কুণ্ঠাবোধ করলেন না। আর এমনিভাবে তিনি সাবিকুনাল আউয়ালুনের পবিত্র দলের "৬ষ্ঠ মুসলমান" হওয়ার মহান মর্যাদা ও লকবের গৌরবে গৌরবান্বিত হন। হযরত খাব্বাবের (রা) নিকট পরিস্থিতির ভয়াবহতা অস্পষ্ট ছিল না। কিন্তু তিনি নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা একদিনের জন্যও গোপন করে রাখেননি। যেই তিনি নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন, তেমনি কাফেরদের ক্রোধাগ্নি তাঁর ওপর আপতিত হলো। তারা অসহায় খাব্বাবের (রা) ওপর এমন পাশবিক নির্যাতন চালালো যে মানবতা ও শরাফত মুখ থুবড়ে পড়লো। তারা তাঁর কাপড় খুলে তপ্ত আগুনের ওপর শুইয়ে দিত এবং বুকের ওপর রাখতো ভারী

পাথর। কখনো আগুনের ওপর শুইয়ে বিরাট বপুর কোন ব্যক্তি তাঁর বুকের ওপর বসে যেতো। যাতে তিনি পাশ ফিরতে না পারেন। খাব্বাব (রা) ধৈর্য ইসতাকামাত বা অটলতার সাথে সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ওপর কাবাব হতেন। এমনকি ক্ষতস্থানসমূহ থেকে রক্ত পুঁজ গলে গলে সেই আগুনকে ঠাণ্ডা করে দিত। এমন ভয়াবহ নির্যাতন সত্ত্বেও তাঁর সামান্যতম পদস্খলন ঘটেনি। এমনিভাবে নির্যাতন সইতে সইতে কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন ফরিয়াদ নিয়ে প্রিয় নবীর (সা) খিদমতে উপস্থিত হলেন। সহীহ বুখারীতে আছে যে, হুজুর (সা) সে সময় কাবার প্রাচীরের ছায়ায় শুয়ে ছিলেন। খাব্বাব(রা) হুজুরের (সা) নিকট আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল। আপনি আল্লাহ পাকের নিকট আমাদের জন্য দোয়া করেন না কেন?" একথা শুনে হুজুর (সা) উঠে বসলেন। তাঁর পবিত্র চেহারা লাল হয়ে গেল এবং বললেন ঃ

"তোমাদের পূর্বে অতীতকালে এমন লোকও ছিলেন যাঁদের গোশত লোহার চিরনী দিয়ে আঁচড়িয়ে নেয়া হয়েছে। হাড় ব্যতীত তাদের আর কিছুই রাখা হয়নি। এত কঠোরতা সত্ত্বেও তাদের দীনী ইতিকাদ বা বিশ্বাস সামান্যতম এদিক ওদিক হয়নি। তাঁদের মাথার ওপর করাত চালানো হয়েছে। করাত দিয়ে মাঝখান দিয়ে চিরে দুইভাগ করে দেয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও তাঁরা দীন পরিত্যাগ করেননি। আল্লাহ এই দীনকে অবশ্যই সফল করবেন এবং তোমরা দেখবে যে সওয়ার একাকী সানায়া (ইয়েমেন) থেকে হাজরা মাওত পর্যন্ত গমন করবে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না।"

হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে হযরত খাব্বাবের (রা) সাহস কয়েকগুণ বেড়ে গেল এবং চুপচাপ নিজের বাড়ী চলে গেলেন।

হযরত খাব্বাবের (রা) মালিক উম্মে আনমারও খুব কঠোর অন্তরের মহিলা ছিল। আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, সে হযরত খাব্বাবের (রা) ইসলাম গ্রহণের শাস্তি স্বরূপ কখনো লোহার যিরাহ পরিধান করিয়ে রোদে শুইয়ে রাখতো এবং কখনো উত্তপ্ত লোহা দিয়ে তাঁর মাথায় দাগ দিতো। রহমতে আলম (সা) উম্মে আনমারের নির্যাতনের অবস্থা শুনে খুব বিষণ্ন বোধ করতেন। তিনি খাব্বাবকে (রা) খুশী করার চেষ্টা করতেন। সেই হতভাগিনী যখন হুজুরের (সা) এই চেষ্টার কথা জানতে পেতো তখন সে খাব্বাবের (রা) ওপর আরো কঠোরভাবে জুলুম-নির্যাতন শুরু করতো। যখন তার জুলুমের আর সীমা পরিসীমা রইলো না, তখন হযরত খাব্বাব (রা) সারওয়ারে আলমের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আবেদন জানালেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! দোয়া করুন, যাতে আল্লাহ তায়ালা আমাকে এ আজাব থেকে মুক্তি দেন।"

হুজুর (সা) দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ! খাব্বাবকে (রা) সাহায্য কর।"

আল্লামা ইবনে আছির লিখেছেন, হুজুরের (সা) দোয়ার পর উম্মে আনমারের মাথায় এমন কঠিন ব্যথা হওয়া শুরু হলো যে, কোনভাবেই তা কমতো না এবং সে কুকুরের মত ডাকতো। লোকজন বললো, যতক্ষণ পর্যন্ত লোহা দিয়ে তোমার মাথায় দাগ দেয়া না হবে ততক্ষণ ব্যথা কমবে না। উম্মে আনমার কঠিন ব্যাথায় ছটফট করছিলো। সে হযরত খাব্বাবকেই (রা) এ দায়িত্ব অর্পণ করলো যে সে যেন গরম লোহা দিয়ে তার মাথায় দাগ দেয়। বস্তুত যে গরম লোহা হযরত খাব্বাবের (রা) ওপর ব্যবহৃত হতো তা তার ওপর ব্যবহৃত হলো। কিন্তু এই চিকিৎসা সত্ত্বেও তার কোন উপকার হলো না এবং কিছু দিন পর সে তড়পাতে তড়পাতে মারা গেল।

মুশরিকরা হযরত খাব্বাবকে (রা) দৈহিক শাস্তি দিয়েই ক্ষান্ত হলো না বরং তার আর্থিক ক্ষতি করার জন্য প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতেও কুণ্ঠিত হলো না। মশহুর মুশরিক আছ বিন ওয়ায়েল হযরত খাব্বাবের (রা) নিকট কিছু অর্থ ধারতো। তিনি যখন সেই ঋণের অর্থ চাইতেন তখন আছ বলতো, "যতক্ষণ তুমি মুহাম্মাদের (সা) দীন ত্যাগ না করবে ততক্ষণ এক কড়িও দেবো না।" খাব্বাব (রা) বলতেন, "যতক্ষণ তুমি দ্বিতীয়বার জীবিত হয়ে এই দুনিয়ায় না আসবে ততক্ষণ আমি মুহাম্মাদের (সা) আঁচল ছাড়তে পারবো না।"

আছ বলতো, "তাহলে অপেক্ষা করতে থাকো। আমি যখন মরে দ্বিতীয়বার জীবিত হবো এবং নিজের সম্পদ সন্তানদের জন্য খরচের পর তোমার ঋণ পরিশোধ করবো।"

আছের এই বক্তব্য মুসলমানদের হাশর, নাশর এবং পরকালের প্রতি, ঈমানের প্রতি এক ধরনের ব্যঙ্গ ছিল। সহীহ বুখারীতে এই ঘটনা সম্পর্কে কুরআনে হাকিমের এই আয়াত নাযিল হয়,

اَفَرَءَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالاً وَّوَلَدًا - اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا - كَلاَّ سَنَكْتُبُ مَا يَقُوْلُ وَنَمُدُّ لَهٗ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا - وَّنَرِثُهٗ مَا يَقُوْلُوَيَاتِيْنَا فَرْدًا -

"অতপর তুমি কি দেখেছ সেই ব্যক্তিকে যে আমাদের আয়াতসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং এই বলে যে, আমাকে তো মাল-সম্পদ ও সন্তান জনবলে ধন্য করা হতে থাকবেই? সে কি গায়েব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে? কিংবা সে রহমানের নিকট থেকে কোন প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে? কখনও নয়, সে যা বলে তা আমরা লিখে নিব এবং তার জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির মাত্রা আমরা আরো বৃদ্ধি করে দিব। যে সাজ-সরঞ্জাম ও জনবলের কথা এই লোক বলে তা সবই শেষ পর্যন্ত আমার নিকটই থেকে যাবে এবং সে একাকীই আমার নিকট হাজির হবে।"

মজলুম খাব্বাব (রা) বছরের পর বছর ধরে দুঃখ-মুসিবতের চাকায় নিষ্পেষিত হতে লাগলেন। ইত্যবসরে হিজরতের হুকুম অবতীর্ণ হলো এবং তিনি হিজরত করেন। বরং তাঁর সামনে ছিল শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে স্বয়ং হযরত খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত আছে, "আমি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করেছিলাম।" আল্লামা ইবনে আছির (উসুদুল গাব্বাহ গ্রন্থের প্রণেতা) বলেছেন যে, হুজুর (সা) মদীনায় খাব্বাব (রা) এবং খারাশ (রা) বিন ছাম্মার গোলাম তামিমের (রা) মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু মুসতাদরাকে হাকিমের রেওয়ায়াত অনুযায়ী তাঁর ভ্রাতৃত্ব জোবায়ের (রা) বিন আতিকের সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যুদ্ধের ধারা শুরু হলে হযরত খাব্বাব (রা) সারওয়ারে কায়েনাতের (সা) নৈকট্যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল যুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের (রা) যুগে যখন বিজয়ের দরজা খুললো তখন হযরত খাব্বাব (রা) কিছু কিছু সময় খুব কাঁদতেন এবং বলতেন ঃ

"আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাসূলের (সা) সঙ্গে হিজরত করি এবং আমাদের প্রতিদান আল্লাহর জিম্মায় থাকে। অতপর আমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউতো এমন ছিলেন যে, তারা মারা গেছেন এবং দুনিয়ায় নিজের প্রতিদানের কোন ফলই খাননি। কিন্তু কারোর কারোর ফল পেকে গেছে এবং সে তা ছিঁড়ে খাচ্ছে। মাসয়াব (রা) ওহোদে শাহাদাত পেলে তাকে কাফনের জন্য একটি ছোট চাদর ছাড়া আমাদের নিকট কিছুই ছিল না। সেই চাদর দিয়ে তার মাথা ঢাকা হলে পা অনাবৃত হয়ে যেতো এবং পা ঢাকলে মাথা আলগা হয়ে যেতো। শেষে হুজুরের (সা) নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর মাথা চাদর দিয়ে ঢাকা হলো এবং পায়ের ওপর আজখার (এক ধরনের ঘাস) রাখা হলো। আর আজকের অবস্থা হলো, আল্লাহর ফজিলত আমাদের ওপর বৃষ্টির মত বর্ষিত হচ্ছে। আমি ভয় পাই যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের মুসিবতের বদলা আমাদেরকে দুনিয়াতেই না দিয়ে দেন।"

অনেক রেওয়ায়াত থেকে এটা জানা যায় যে, হযরত খাব্বাব (রা) শেষ বয়সে কুফায় স্থায়ীভাবে বাস করতেন। সেখানে ৩৭ হিজরীতে কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। পেটের কোন তাকলীফ ছিল। তার চিকিৎসার জন্য পেটের সাত স্থানে দাগ দেয়া হয়েছিল। তাতে তিনি খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ

"হুজুর (সা) যদি মৃত্যুর আকাংখা করতে নিষেধ না করতেন তাহলে আমি আমার মৃত্যুর দোয়া করতাম।"

সেই নাজুক পরিস্থিতিতে কিছু মানুষ শুশ্রূষার জন্য এলেন এবং আলোচনার সময় বললেন ঃ

"আবু আবদুল্লাহ! খুশী হোন যে, দুনিয়া ত্যাগের পর হাওজে কাওসারের ওপর নিজের পরিত্যক্ত সাথীদের সঙ্গে সাক্ষাত করবেন।"

একথা শুনে তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন ঃ

"আল্লাহর কসম! আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না। তোমরা সেসব সাথীর কথা উল্লেখ করেছ যারা দুনিয়ায় কোন প্রতিদান পায়নি।আখিরাতে তাঁরা অবশ্যই নিজেদের প্রতিদান পাবে। কিন্তু আমরা তাদের পর রয়েছি এবং দুনিয়ার নিয়ামতের এত অংশ পেয়েছি যে, ভয় হয় তা আমাদের আমলের সওয়াব হিসেবেই হিসেব না হয়ে যায়।"

ওফাতের কিছুক্ষণ পূর্বে তাঁর সামনে কাফন আনা হলো। তাতে অশ্রুসিক্ত অবস্থায় তিনি বললেন ঃ

"এতো সম্পূর্ণ কাফন। আফসোস! হামযাকে (রা) একটি ছোট ধরনের চাদর দিয়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। যা তাঁর সম্পূর্ণ শরীর আবৃত করার মতো ছিল না। পা ঢাকলে মাথা আলগা হয়ে যেতো এবং মাথা ঢাকলে পা খুলে যেতো। শেষে আমরা তাঁর পা আজখার দিয়ে ঢেকে কাফনের কাজ সম্পন্ন করি।"

তিনি পুনরায় ওসিয়ত করলেন যে, কুফাবাসীদের নিয়ম অনুযায়ী তাঁকে যেন শহরের মধ্যে দাফন না করা হয় বরং তাঁর কবর শহরের বাইরে খোলা ময়দানে তৈরীর নির্দেশ দিলেন। এই ওসিয়তের পর তিনি পরপারে যাত্রা করলেন। ওসিয়ত অনুযায়ী শহরের বাইরে তাঁকে দাফন করা হলো। তারপর কুফাবাসীও নিজেদের মৃতদেরকে তাঁর কবরের পাশে দাফন করা শুরু করলো। মুসতাদরাকে হাকিমের রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু তাঁর দাফনের পূর্বে সিফ্‌ফিন থেকে কুফা পৌঁছেছিলেন এবং তিনিই

জানাযার নামায পড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু ইবনে আছির বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী (রা) হযরত খাব্বাবের (রা) ওফাতের কয়েক দিন পর কুফা পৌঁছেন এবং তাঁর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মাগফিরাত কামনা করেন। ওফাতের সময় হযরত খাব্বাবের (রা) বয়স ৭২ বছরের মত ছিল।

সাইয়েদেনা হযরত খাব্বাব (রা) বিন আরাত অন্যতম জালিলুল কদর সাহাবী হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকেন। তিনি চরম অগ্নিপরীক্ষার যুগে ইসলামের স্থায়ী নিয়ামতে ভূষিত হন এবং দুনিয়ার কোন কঠোরতা ও মুসিবত তাঁকে হকপথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, তিনি একদম প্রথম যুগেই কুরআন পড়ে নিয়েছিলেন। কিছু রাবী হযরত ওমরের (রা) ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় তাঁর নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের বর্ণনা হলো যে, যে যুগে সরওয়ারে আলম (সা) ৩৯ জন জান নিছারসহ হযরত আরকামের (রা) গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই যুগে হযরত খাব্বাব (রা), হযরত সাঈদ (রা) বিন যায়েদ এবং তাঁর স্ত্রী ফাতিমা (রা) বিনতে খাত্তাবের [হযরত ওমরের (রা) সহোদরা] বাড়ী তাঁদেরকে কুরআন শরীফ পড়াতে যেতেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত ওমর (রা) বোন ও ভগ্নিপতিকে সতর্ক করার জন্য তাদের বাড়ী গমন করেন। এ সময় খাব্বাবও (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি একটি কুঠরীতে লুকিয়ে ছিলেন এবং হযরত ওমর (রা) বোন ও ভগ্নিপতির সাথে কথা কাটাকাটিতে লেগে গেলেন। এক পর্যায়ে হযরত ওমর (রা) মেরে বসলেন এবং তিনি আহত হলেন। তাতে হযরত ওমর (রা) নরম হয়ে গেলেন এবং তাঁকে কুরআন শুনাতে বললেন। তিনি কেবলমাত্র সূরায়ে ত্বা-হার কতিপয় আয়াত তিলাওয়াত করেছিলেন। এমন সময় হযরত ওমরের (রা) অন্তরের জগৎ পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং তিনি তাঁকে মুহাম্মাদের (সা) খিদমতে নিয়ে যাওয়ার কথা বললেন। ঠিক এই সময় হযরত খাব্বাব (রা) কুঠরী থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে আনন্দের আতিশয্যে বলে ফেললো ঃ "হে ওমর! আমি তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি যে, গতকাল রাতে হুজুর (সা) ওমর অথবা আবু জেহেলের মধ্য থেকে যাকে আল্লাহর পসন্দ হয় তাকে ইসলাম গ্রহণের শক্তি প্রদানের জন্য দোয়া করেছিলেন। মনে হয় হুজুরের (সা) দোয়া তোমার স্বপক্ষে কবুল হয়েছে।"

তারপর হযরত ওমর (রা) আরকামের (রা) গৃহে হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত ওমর ফারুক (রা) এবং অন্য সকল সাহাবায়ে কেরাম হযরত খাব্বাবকে (রা) অত্যন্ত সম্মান করতেন। হযরত ওমরের (রা) খিলাফতকালে খাব্বাব (রা) তাঁর নিকট তাশরীফ রাখতেন। তিনি তাঁকে নিজের আসনে নিজের সাথে বসাতেন। আল্লামা ইবনে আছির বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত ওমর (রা) হযরত খাব্বাবের (রা) নিকট নিজের মুসিবতের কাহিনী বর্ণনার অনুরোধ জানালেন। হযরত খাব্বাব (রা) হযরত ওমরকে (রা) কাপড় উঠিয়ে নিজের পিঠ দেখালেন। তাতে তিনি বিস্মিত হয়ে গেলেন। সারা পিঠ এমন সাদা ছিল যেমন কুষ্ঠ রোগীর চামড়া হয়ে থাকে। খাব্বাব (রা) বললেনঃ

"আমীরুল মু'মিনীন, আগুন জ্বালিয়ে তার ওপর আমাকে শুইয়ে দেয়া হতো। এমনকি আমার পিঠের চর্বি সেই আগুন নিভিয়ে দিত।" হযরত খাব্বাব (রা) প্রায়ই রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে হাজির হতেন এবং তাঁর নিকট থেকে দ্বীনের শিক্ষালাভ করতেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে, একরাতে হযরত খাব্বাব (রা) হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে দেখলেন যে, তিনি সারা রাত নামায পড়ে কাটিয়ে দিয়েছেন। সকাল হলে খাব্বাব (রা) আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আজ রাতে আপনি যেভাবে নামায পড়লেন এর পূর্বে কখনো সেভাবে পড়েননি।"

হুজুর (সা) বললেন, "আজ রাতের নামাযে আমি আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে নিজের উম্মতের জন্য তিনটি প্রার্থনা জানিয়েছি। যার মধ্য থেকে দু'টি মঞ্জুর করা হয়েছে এবং তৃতীয়টি কবুল করা হয়নি। যে দু'টি দোয়া কবুল করা হয়েছে তা হলো, আল্লাহ দুশমনকে আমার ওপর বিজয় দেবেন না এবং আল্লাহ আমার উম্মতকে এমন আজাব দিয়ে ধ্বংস করবেন না। যা দিয়ে পূর্বেকার উম্মতদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল।"

আল্লামা ইবনে কাছির বলেন যে, হযরত খাব্বাব (রা) অত্যন্ত মর্যাদাবান হওয়া সত্ত্বেও খুব বিনয়ী স্বভাবের ছিলেন। একবার তিনি অনেক সাহাবীর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। এসব সাহাবী হযরত খাব্বাবের (রা) নিকট এমন বিষয়ে নির্দেশ দানের আবেদন জানালেন যা তাঁরা আমল করতে পারেন।

তিনি বলেন, "আমি কে, যে কোন ব্যাপারে নির্দেশ দেবো। এমনও হতে পারে যে, আমি লোকদেরকে কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলাম। আর আমি স্বয়ং তার ওপর আমল করি না।

হযরত খাব্বাব (রা) থেকে ৩৩টি হাদিস বর্ণিত আছে। তাঁর থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্যে তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ ছাড়া হযরত আবু উমামা বাহেলী(রা), কায়েস (র) বিন আবি হাযেম, মাসরুক (র) বিন আজদা, আলকামা (র) বিন কায়েস এবং ইমাম শা'বীর (র) মত মহান ব্যক্তিত্ব শামিল ছিলেন।

হযরত উতবা (রা) বিন গাযওয়ান

চৌদ্দ হিজরীর শেষের দিকের কথা। আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুকের (রা) নির্দেশে বসরায় নতুন শহর আবাদ হলো। এই শহরের নবনির্মিত জামে মসজিদে প্রথম জুমার নামায পড়ার জন্য সমগ্র শহর ভেঙ্গে পড়লো। সেই দিন মানুষ খুশী ও শুকুরের মিশ্র আবেগে উদ্বেলিত ছিল এবং তাদের তাসবিহ ও তাহলিলে মসজিদের প্রাচীর গুঞ্জরিত হয়ে উঠছিল। খুতবা শুরু হলো। লোকজন নীরব হয়ে কান খাড়া করে তা শুনতে লাগলেন। খতিব ছিলেন মনোমুগ্ধকর হেজাজী অবয়ব এবং নূরানী সুরতের এক সুন্দর আকৃতির বুজুর্গ। তাঁর শরীরে সুন্দর সাধারণ পোশাক শোভা পাচ্ছিল। তাঁর মুখমণ্ডল ও চোখ দেখে মনে হচ্ছিল যে, তিনি একজন পবিত্র মানুষ এবং নিশি জাগরণকারী আবেদ। তিনি প্রথমে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও ছানা বর্ণনা করলেন। মক্কার ইয়াতিম নবীর (সা) অনুসারী হওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা এবং গৌরব প্রকাশ করলেন। তারপর বললেন ঃ

"হে মানুষেরা! এই দুনিয়া কয়েকদিনের। খুব শীঘ্রই এই দুনিয়াটা আমাদের থেকে পিঠ ফিরিয়ে নেবে। তার বড় অংশ অতীত হয়েছে এবং ছোট অংশ অবশিষ্ট রয়েছে। যেমন কোন পাত্রের পানি ফেলে দেয়ার পর শেষে কিছুক্ষণ পর্যন্ত তা থেকে ফোটা ফোটা পানি পড়ে। অবশ্যই তোমরা এই নশ্বর বিশ্ব থেকে শীঘ্র এমন একস্থানে গমনকারী যা চিরস্থায়ী। অতএব, সেই স্থায়ী ঠিকানার জন্য তোমরা সামান কেন তৈরী করছো না? আর এই সামান হলো নেকী এবং খায়ের। হে মানুষেরা, আমার আকা মুহাম্মাদ (সা) আমাকে বলেছেন যে, জাহান্নাম এত প্রশস্ত ও গভীর যে, তার কিনার থেকে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হলে তা ৭০ বছরেও তার তলায় পৌঁছে না এবং আল্লাহর কসম! একদিন এই জাহান্নাম অবশ্যই পূর্ণ হয়ে যাবে। তোমরা কি এতে বিস্মিত হচ্ছো? আল্লাহর কসম! আমাকে হুজুর (সা) এও বলেছেন যে, জান্নাত এত প্রশস্ত হবে যে তার এক দরজা দ্বিতীয় দরজা থেকে ৪০ বছরের দূরত্বে হবে। কিন্তু একদিন এমনও হবে যে, জান্নাতের হকদারদের তাতে প্রচণ্ড ভিড় হবে। হে মানুষেরা একদিন এমন ছিল যে, আমি ছাড়া শুধুমাত্র ৬ ব্যক্তি রাসূলের (সা) সঙ্গে ছিলেন এবং আমাদের দারিদ্র ও অসহায়ত্বের অবস্থা এমন

ছিল যে, বৃক্ষের পাতা ছাড়া খাদ্যদ্রব্য হিসেবে আমরা আর কিছুই পেতাম না। এই খাবার খেতে খেতে এমনকি আমাদের চোয়াল ছিঁড়ে গিয়েছিল এবং আমাদের পোশাক? তার অবস্থা এমন ছিল যে, একদিন আমি একটি চাদর পেলাম। তা ছিঁড়ে দুই ভাগ করলাম। এক ভাগ দিয়ে আমি তহবন্দ বানালাম এবং অপর ভাগ দিয়ে সায়াদ (রা) বিন মালিক (আবিওয়াক্কাস) তহবন্দ বানালেন। আজ আল্লাহ আমাদের ওপর এই রহম করেছেন যে, আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই কোন না কোন শহরের আমীর। আমি আল্লাহর নিকট এই বিষয়ে পানাহ চাই যে, নিজেকে বড় মনে করবো? অথচ তার নিকট আমি এক উপহাসস্পদ সৃষ্টি। হে মানুষেরা! ভালভাবে শুনে নাও যে, নবুওয়াত শেষ হয়ে গেছে এবং আমার তো মনে হয় পরিণামে বাদশাহী কায়েম হবে—তোমরা আমাদের পরে আগমনকারী আমীরদেরকে পরীক্ষা করে নিও।"

এই খুতবা কি ছিল। শিক্ষার জন্য একটি কষাঘাত বা চাবুক। তা শুনে শ্রোতারা রোদন শুরু করে দিল এবং প্রচণ্ড আবেগে অধিকাংশই চিৎকার দিয়ে উঠলো। এই খতিব যিনি বসরাবাসীর সামনে রাসূলের (সা) যুগের প্রথমের হকপন্থীদের হলাহল পূর্ণ মুসিবতের নকশা পেশ করলেন এবং নিজের ঈমানী বিচক্ষণতা দিয়ে ভবিষ্যত ঝলক দেখিয়ে সাচ্চা মুসলমান হওয়ার উপদেশ দিলেন। তিনি কোন সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন বসরার আমীর(গভর্ণর) হযরত উতবাহ (রা) বিন গাযওয়ান মাযনী। ত্রিশ হাজার মানুষের শাসক। সৈন্য ও ধনাগারের মালিক। কিন্তু দুনিয়ার প্রতি অনীহা এবং আল্লাহভীতির অবস্থাটা এমন ছিল যে, মোটা কাপড় পরে থাকতেন ও বাইতুলমালের এক পয়সাও ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করাকে হারাম মনে করতেন। তিনি আল ফাকরী ফখরীর সঠিক প্রতিনিধি ছিলেন এবং হাদিয়ে আকরামের (সা) সুহবতের ফয়েজ তাকে একজন উপমামূলক মুসলমান ও শাসক বানিয়ে দিয়েছিল।

আবু আবদুল্লাহ উতবাহ (রা) বিন গাযওয়ানের সম্পর্ক কায়েস আয়লানের শাখা বনু মাযিনের সঙ্গে ছিল। নসবনামা হলো ঃ উতবাহ (রা) বিন গাযওয়ান বিন জাবের বিন ওয়াহাব বিন নাসিব বিন যায়েদ বিন মালিক বিন হারিছ বিন মাযিন বিন মানসুর বিন ইকরামা বিন খাসফা বিন কায়েস বিন আয়লান।

আল্লামা ইবনে আছির বর্ণনা করেছেন যে, জাহেলী যুগে তাঁর খান্দান বনি নওফিল বিন আবদি মানাফের মিত্র ছিল।

হযরত উতবার (রা) বয়স তখন প্রায় ত্রিশ বছর। সে সময় ফারান পর্বতের চূড়া দিয়ে ইসলামের সূর্য উদিত হলো এবং রহমতে আলম (সা) লোকদেরকে

হকের দিকে ডাকতে শুরু করলেন। মক্কার কুরাইশদের ওপর হকের আহবান বিদ্যুতের মত উপস্থিত হলো। কেননা তারা শত শত বছর ধরে যেসব কল্পনা, গোঁড়ামী এবং ভুল কাজে ব্যাপৃত ছিল ইসলাম তার মূল কেটে দিয়েছিল। সুতরাং কুরাইশরা দ্বীনে হকের বিরোধিতা করাকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে বানিয়ে নিয়েছিল। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে বাধা দানের জন্য এমন সব তৎপরতা তারা শুরু করলো যে, মানবতা মুখ থুবরে পড়ে রইলো। যারই ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য হতো সেই তাদের নির্যাতনের শিকার হতো এবং তার জীবন হয়ে উঠতো দুর্বিসহ। আল্লাহ তায়ালা হযরত উতবাকে (রা) নেক স্বভাব দান করেছিলেন। যেই দাওয়াতে হকের আওয়াজ তাঁর কানে পৌছলো তখনই তাঁর মন ও অন্তর সাক্ষ্য দিল যে, এ দাওয়াত সম্পূর্ণরূপে কল্যাণকর এবং তাতেই মানবতার কল্যাণ রয়েছে। পক্ষান্তরে তিনি এটাও দেখলেন যে, এই দাওয়াত কবুল করার অর্থ হলো অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ার নামান্তর। যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করে সে মক্কার কাফেরদের ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁর হিম্মত কাফেরদের জুলুম ও নির্যাতনের ভয়ে ভীত হয়ে হক গ্রহণের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকার ব্যাপারটি কোনক্রমেই বরদাশত করলো না। সুতরাং তিনি কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই অগ্রসর হয়ে তাওহীদের ঝাণ্ডা আঁকড়ে ধরলেন এবং কুরআনে করিমের ভাষায় যাদেরকে 'আসসাবিকুনাল আউয়ালুনে'র মহান উপাধিতে ভূষিত করে স্পষ্ট ভাষায় জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে সেই দলে শামিল হয়ে গেলেন। সেই সময় পর্যন্ত একটি স্বল্পসংখ্যক মানুষই ঈমান আনার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত উতবাহ (রা) শুধুমাত্র ৬ জন মুসলমানের নামই জানতেন এবং তাঁর ধারণা ছিল যে, তিনি সপ্তম মুসলমান। এ সত্ত্বেও চরিতকারদের অনুমান হলো যে, সে সময় মুসলমানদের সংখ্যা ৬ থেকে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কুরাইশরা যখন জানতে পেল যে, উতবা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছে তখন তারা তাঁর খুন পিপাসু হয়ে গেল। তাঁর জীবিকার দরজাই তারা বন্ধ করে দিল না বরং দৈহিক শাস্তি প্রদানেও কুণ্ঠাবোধ করলো না। কিন্তু তাওহীদের নেশা তো এমন বস্তু ছিল না যে, জুলুম নির্যাতন চালিয়ে তা দূর করা যাবে। তিনি বীরত্বের সঙ্গে সব ধরনের দুঃখ মুসিবতের মুকাবিলা করলেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও নিজের কদমকে হক পথ থেকে এদিক-ওদিক সরাননি। সেই সময় অন্য সাহাবীর মত তিনিও এমন দরিদ্র ছিলেন যে, কয়েকদিন পর্যন্ত না খেয়ে অতিবাহিত করতেন এবং জঙ্গল ও বৃক্ষের পাতা খেয়ে খেয়ে সময়

কাটাতেন। ফলে তাঁর চোয়াল ফেটে যেতো। এমনিভাবে কাপড় ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত এবং অত্যন্ত কষ্টে সতর ঢাকার জন্য কোথাও থেকে কাপড় যোগাড় করতেন। হক পন্থীদের ওপর কুরাইশদের নির্যাতন যখন চরমে উঠলো তখন বিশ্বনবী (সা) মুসলমানদেরকে হাবশা বা আবিসিনিয়া হিজরতের অনুমতি দিলেন। সুতরাং হযরত উতবাহ (রা) বিন গাযওয়ান হাবশায় দ্বিতীয় হিজরতে ৮২ জন পুরুষ এবং ২০ জন মহিলার নির্যাতীত কাফেলায় শামিল হয়ে গেলেন। কাফেররা হিজরতের পথে তাদেরকে প্রচণ্ডভাবে বাধা আরোপ করলো। কিন্তু তবুও তারা হাবশায় পৌছতে সফল হলেন। হাবশায় বাদশাহ নাজ্জাসীর নেক দিল ও সুন্দর আচরণের বদৌলতে হযরত ওতবাহ (রা) এবং অন্যান্য মুহাজির কয়েক বছর পর্যন্ত শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করতে লাগলেন। মক্কার কুরাইশদের বাড়াবাড়ির হাত তখন তাদের থেকে অনেক দূরে ছিল। কিন্তু বিদেশ বিদেশই হয়ে থাকে। মক্কা এবং মক্কায় ইয়াতিম নবীর (সা) স্মরণে তারা সবসময় তড়পাতে থাকতেন। হযরত উতবার (রা) অস্থিরতা এতো বেড়ে গিয়েছিল যে, কয়েক বছর পর তিনি হাবশার দারুল আমান থেকে মক্কা ফিরে আসেন। আল্লামা ইবনে আছির (র) "উসুদুল গাব্বাহ" গ্রন্থে লিখেছেন যে, তখনো মুসলমানরা মদিনায় হিজরত করেননি এবং যথারীতি তারা কাফেরদের নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। কিন্তু এবার কুরাইশরা হযরত উতবার (রা) ওপর কোন নির্যাতন করলো না। তিনি চুপচাপ মক্কায় দিন কাটাতে লাগলেন। তবে, কিছুদিন পর যখন রহমতে আলম (সা) মদীনা হিজরত করলেন তখন উতবার (রা) নিকট মক্কার একেক দিন শতাব্দীর মত ভারী হয়ে গেল। দিনরাত শুধু একই চিন্তায় মশগুল থাকতেন যে, কি করে মক্কা থেকে বের হয়ে নিজের আকার কদমে পৌঁছে যাবেন। প্রথম হিজরীর শাওয়াল মাসে আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইচ্ছে পূর্ণ করে দিলেন। ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, কুরাইশের একটি সৈন্য দল ইকরামা বিন আবি জেহেল অথবা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মুসলমানদের তৎপরতার খোঁজ নেয়ার উদ্দেশ্যে মদীনার দিকে রওয়ানা হলো। হযরত উতবা (রা) বিন গাযওয়ান এবং হযরত মিকদাদ (রা) বিন আসওয়াদও সেই দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। কুরাইশরা ধারণা করেছিল যে, সম্ভবত তারা জাতীয় জিদের ভিত্তিতে মদীনাবাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায়। এ জন্য তারা তাদেরকে এই সৈন্য দলে শামিল হওয়ার অনুমতি দিয়েছিল। রাবিগ নামক স্থানে দলটির সঙ্গে ৬০ অথবা ৮০ জনের সেই মুসলমানদের দলের সঙ্গে

সংঘর্ষ বেধে গেল যে দলটিকে রাসূলে আকরাম (সা) হযরত উবায়দা (রা) বিন হারিছের নেতৃত্বে টহল দানের জন্য প্রেরণরকরেছিলেন। উভয় দিক থেকে কিছুক্ষণ পর্যন্ত একে অপরের ওপর তীর বর্ষণ করলো। অতপর মক্কার কুরাইশরা পিছপা হয়ে মক্কার দিকে রওয়ানা হয়ে গেল। ইত্যবসরে হযরত উতবা (রা) বিন গাযওয়ানরএবং মিকদাদ (রা) বিন আসওয়াদ সুযোগ পেয়ে ইসলামী বাহিনীতে গিয়ে মিলিত হলেন এবং সেই বাহিনীর সাথে মদীনা পৌঁছে মুহাজির ভাইদের সঙ্গে শামিল হলেন। এমনিভাবে তিনি "দুই হিজরতকারী"র মর্যাদা লাভ করলেন। অর্থাৎ এক হিজরত তিনি মক্কা থেকে হাবশায় করেছিলেন এবং দ্বিতীয়টি করেন মক্কা থেকে মদীনায়। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালমা আজলানী মদীনায় তাঁকে নিজের মেহমান বানান।

পরে যখন প্রিয়নবী (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব কায়েম করেন, কখন হযরত উতবাকে (রা) আনসারের মশহুর বাহাদুর আবু দুজানা সামমাক (রা) বিন খারশার ইসলামী ভাই বানান।

দ্বিতীয় হিজরীতে যুদ্ধের সিলসিলা শুরু হলে হযরত উতবাহ (রা) বিন গাযওয়ান সেই সব যুদ্ধ ও অভিযানে অংশ নেন যেসব যুদ্ধে স্বয়ং রাসূলে করিম (সা) সশরীরে অংশ নিয়েছিলেন। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর প্রসঙ্গে এমন কোন মর্যাদা ছিল না যা তিনি লাভ করেননি। সর্বপ্রথম তিনি দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাসে সংঘটিত সারিয়াতে আবদুল্লাহ বিন জাহাশে বীরত্বের সঙ্গে অংশ নেন। অতপর তাঁর তরবারী বদরের যুদ্ধে চমকে ওঠে। এই যুদ্ধে হকপন্থীদের তিনশ' তেরজন সাজসরঞ্জামহীন হওয়া সত্ত্বেও কাফেরদের ভয়াবহ তাগুতি শক্তির বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এমনিভাবে তাঁর বদরী সাহাবী হওয়ার মহান সৌভাগ্য লাভ ঘটে। তিনি একজন উঁচু শ্রেণীর তীরন্দাজ এবং তীর বিশেষজ্ঞ ছিলেন। বদরের পর ওহোদ, খন্দক, জিকারদ, খায়বার, হুনাইন এবং তায়েফের যুদ্ধে তাঁর নির্ভুল নিশানার তীর দুশমনের বুক ছিদ্র করেছিলো। হুদায়বিয়াতেও তিনি সেই চৌদ্দশ' জীবন উৎসর্গকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা রহমতে আলমের (সা) পবিত্র হাতে মৃত্যুর বাইয়াত করেছিলেন এবং আল্লাহর নিকট থেকে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন। অষ্টম হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে তিনি সেই দশ হাজার পবিত্র আত্মার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা রহমতে আলমের (সা) সঙ্গী হয়ে মক্কা মুয়াজ্জমায় বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেন।

নবম হিজরীতে তাবুকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হুজুর (সা) খবর পেলেন যে, রোমের কায়সার এক বিরাট বাহিনীসহ আরবের ওপর হামলার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। তিনি সাহাবীদেরকে রোমকদের মুকাবিলার নির্দেশ দিলেন। "শত্রুকে কোনক্রমেই আরব সীমান্তে ঢুকতে দেয়া যাবে না। এ জন্য তোমাদেরকে আমার সঙ্গে সিরিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত আরবের সীমান্তে পৌঁছে শত্রুকে রুখতে হবে।" সে বছর অনাবৃষ্টির কারণে দেশে দুর্ভিক্ষ লেগেছিল এবং কঠিন গরমও পড়েছিল। খেজুর ফসলের ওপরই মুসলমানদের আশা ভরসা ছিল। খেজুর তখন প্রায় পাকে পাকে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও হুজুরের (সা) হুকুম শুনতেই কতিপয় মুনাফিক এবং তিনজন কাহিল মুসলমান ছাড়া সকল মুসলমান মন ও অন্তর দিয়ে জিহাদের প্রস্তুতিতে ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন। এই সময় তাঁরা কুরবানীর ইখলাস এবং ফিদাকারীর এমন উদাহরণ পেশ করলেন যে, দুনিয়ার ইতিহাসে তার নজির পাওয়া যায় না। প্রত্যেকেই নিজের সামর্থের চেয়ে বেশী মাল ও সামান পেশ করলেন। মহিলারা নিজেদের গহনা খুলে দিয়ে দিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) সে সময় নিজের ঘর ঝেড়ে মুছে সকল মাল ও আসবাব এমনকি সুই সুতাও হুজুরের (সা) পায়ের নিকট এনে রেখে দিলেন। মোটকথা সারওয়ারে আলম (সা) ত্রিশ হাজার মুজাহিদসহ মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বের হলেন। এই জীবন উৎসর্গকারীদের মধ্যে হযরত উতবা (রা) বিন গাযওয়ানও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। চৌদ্দ মনজিলের কঠোর কষ্টের পথ সফর করে তাবুক পৌঁছে জানা গেল যে, শত্রুরা নিজেদের স্থান থেকে নড়েনি। হুজুর (সা) তাবুকে কয়েকদিন অবস্থান করলেন এবং ইত্যবসরে চারপাশে সৈন্য দল প্রেরণ করে অমুসলিম রইসদেরকে অনুগত করলেন। তারপর জীবন উৎসর্গকারীদেরকে সঙ্গে নিয়ে ভালভাবে মদীনা প্রত্যাবর্তন করলেন। যেহেতু এই যুদ্ধে সৈন্যদের প্রস্তুতি এবং সফরকালে মুসলমানদেরকে সীমাহীন মুসিবত সহ্য করতে হয়েছিল, এ জন্য তাকে "জাইশুল উসরা"ও বলা হয়ে থাকে।

দশম হিজরীতে বিশ্ব নবী (সা) পবিত্র জীবনের শেষ হজ্জ পালন করেন। তাতে কম-বেশী এক লাখ মুসলমানের হুজুরের (সা) সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য ঘটে। তাদের মধ্যে হযরত উতবা (রা) বিন গাযওয়ানও শামিল ছিলেন। রাসূলে আকরামের (সা) ওফাতের (১১ হিজরী) পর হযরত উতবা (রা) বিন গাযওয়ান ১৪ হিজরীতে (ফারুকী খিলাফতকালে) পুনরায় জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করেন। ১১ হিজরী থেকে ১৪ হিজরীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তিনি কোথায় ছিলেন, ঐতিহাসিকরা তার বিশ্লেষণ করেননি। ইবনে আছির(র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত উতবাকে (রা) উবুল্লা, দাসতে মাইসান এবং তার সন্নিহিত এলাকাসমূহ পদানত করার

জন্য মনোনীত করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি দু'টি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত ওমর (রা) যখন হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসকে কাদেসিয়ার অভিযানে রওয়ানা করেন, তখন হযরত উতবাকে(রা) ইরাকের দক্ষিণ অংশ পুনরায় জয় করার জন্য প্রেরণ করেন। সিদ্দীকে আকবারের (রা) শেষ যুগে এই অংশ বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিলো। উবুল্লাহ, দাসতে মাইসান প্রভৃতি এই অংশেই অবস্থিত ছিল। এই অভিযানে প্রেরণের সময় হযরত ওমর (রা) হযরত উতবাকে (রা) এই হেদায়াত দিয়েছিলেন।

"আল্লাহর ফজিলত ও রহমতের ওপর ভরসা করে তুমি আরবের চূড়ান্ত শেষ সীমার দিকে সঙ্গীদেরকে সাথে নিয়ে রওয়ানা হয়ে যাও। সেই সীমান্ত এমন সীমান্ত যেখান থেকে আজমী দেশসমূহ শুরু হয়েছে। সকল অবস্থাতেই আল্লাহভীতি ও পরহেজগারীর সঙ্গে কাজ করবে এবং মস্তিষ্কে একথা রাখবে যে, তোমরা এক প্রতারক দুশমনের মাটিতে গমন করছো। আমি আশা করি, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।

আমি আ'লা বিন আবদুল্লাহ হাজরামীকে লিখে পাঠিয়েছি। তিনি যেন আরফূজা (রা) বিন হারছুমার নেতৃত্বে তোমাকে সামরিক সাহায্য প্রেরণ করেন। তিনি একজন কৌশলী এবং জানবাজ মানুষ। তুমি তাঁর সঙ্গে সব ব্যাপারে পরামর্শ করবে। তোমার রাস্তায় যেসব আরব গোত্র আবাদ রয়েছে তাদেরকেও জিহাদে যোগদানের জন্য উদ্বুদ্ধ কর এবং সঙ্গে নিয়ে নাও। আজমবাসীদেরকে প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দাও। তারা যদি গ্রহণ করে, তাহলে তাদেরকে নিজের ভাই মনে করবে। যদি ইসলাম কবুল না করে তাহলে তাদেরকে জিযিয়া প্রদানে বাধ্য করো। তাতেও যদি প্রস্তুত না হয় তাহলে তরবারী দিয়ে কাজ নেবে। আল্লাহ তোমাদের সাহায্যকারী।"

সুতরাং হযরত উতবা (রা) সেখান থেকে সরাসরি উবুল্লাহ পৌঁছলেন। দ্বিতীয় রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত উতবা (রা) প্রথমে হযরত আ'লা (রা) বিন আবদুল্লাহ হাজরামীর সাহায্যের জন্য গেলেন। তিনি আসতাখার নামক স্থানে শত্রুর ঘেরের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। হযরত আ'লা (রা) হাজরামী অত্যন্ত আবেগপ্রবণ মুজাহিদ ছিলেন এবং আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতকালে ধর্মদ্রোহিতার ফিতনা নির্মূলের ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। খিলাফতে ফারুকীর প্রথম দিকে তিনি "দালতান নাহারাইন" পদানত করার ইচ্ছা করলেন এবং একটি বাহিনীর সঙ্গে সামুদ্রিক নৌকায় সওয়ার হয়ে সেদিকে রওয়ানা হলেন। কোন কারণে তিনি পারস্য উপসাগরের উপকূলে

অবতীর্ণ হতে পারেননি তা জানা যায়নি। বরং বাহরাইন থেকে উপসাগর পার হয়ে আসতাখার গিয়ে পৌঁছেন। পারস্য উপসাগরে ইরানীদের এক মজবুত যুদ্ধ বহর ছিল। তারা আসতাখার অবরোধ করলো এবং মুসলমানদেরকে অতুক্ত মারার সংকল্প করলো। এদিকে হযরত আ'লা (রা) এবং তাঁর সঙ্গীরা মাথায় কাফন বেঁধে ঘোষণা করলো যে, যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকবে ততক্ষণ ইরানীদের নিকট অস্ত্র সমর্পণ করবেন না। কোন উপায়ে হযরত ওমর (রা) হযরত আ'লার (রা) অবরুদ্ধ হওয়ার খবর পেলেন। তিনি আ'লাকে (রা) এই অভিযানে যাওয়ার অনুমতি দেননি। কেননা তিনি নৌযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চাননি। কিন্তু এখন হাজার হাজার মুসলমানের জীবন বাঁচানোর প্রশ্ন এসে দাঁড়ালো। সুতরাং আ'লার (রা) এই কাজ অপসন্দ করা সত্ত্বেও তিনি হযরত উতবা (রা) বিন গাযওয়ানকে একটি শক্তিশালী বাহিনীসহ আ'লার (রা) সাহায্যের জন্য পৌঁছার নির্দেশ দিলেন। হযরত উতবা (রা) ১২ হাজার জানবাজসহ আসতাখারের দিকে রওয়ানা হলেন এবং অবরোধকারী ইরানীদের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলেন। এমনিভাবে হযরত আ'লা (রা) এবং তাঁর সঙ্গীরা এক বিরাট মুসিবত থেকে মুক্তি লাভ করলেন। তারপর তাঁরা সকলে মিলে উবুল্লাহ এবং আহওয়াজের ওপর চড়াও হলো। আমাদের অনুসন্ধান অনুযায়ী হযরত উতবা (রা) আ'লা (রা) হাজরামীকে সাহায্যের জন্য বসরা থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন। সে সময় বসরা ও কুফা উভয় শহরই আবাদ এবং সেখানে সামরিক ছাউনিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হযরত উতবা (রা) বসরার গভর্ণর ছিলেন। তিনি বসরা এবং কুফা থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে হযরত আ'লার (রা) সাহায্যের জন্য পৌঁছেছিলেন।

আবু হানিফা দিনাওয়ারী (র) "আল আখবারুত তাওয়াল" গ্রন্থে এই উভয় রেওয়ায়াত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, ফারুকী খিলাফতের শুরুতে সুয়াইদ বিন কুতবাতাল আজলী ইরাকের দক্ষিণ এলাকায় ইরানীদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলেন। তিনি সামরিক দৃষ্টিভঙ্গীতে নিজের পক্ষকে দুর্বল মনে করে হযরত ওমরকে (রা) তাঁকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে সৈন্য প্রেরণের জন্য লিখলেন। হযরত ওমর (রা) সুয়াইদের পত্র পেয়েই হযরত উতবা (রা) বিন গাযওয়ানকে ডাকলেন এবং দুই হাজারের মুজাহিদ বাহিনী দিয়ে তাঁকে সুয়াইদের সাহায্যের জন্য প্রেরণ করলেন। তিনি যখন রওয়ানা হলেন তখন হযরত ওমর (রা) তাঁর পিছু পিছু কিছুদূর গেলেন এবং বললেন, "হে উতবা! তোমার মুসলমান ভাইয়েরা হিরা এবং তৎসংলগ্ন এলাকাসমূহ পদানত করেছে। আর সেইটাই হলো বাবল যা হারুত-মারুতের শহর নামে পরিচিত। আজকাল তাদের ঘোড়া আক্রমণ

করতে করতে মাদায়েনের উপকণ্ঠে পৌঁছে যাবে। আমি তোমাকে এই সৈন্য দিয়ে এ জন্য প্রেরণ করছি যে, তুমি সোজা আহওয়াজ যাবে এবং সেখানকার বাসিন্দাদের ওপর এমন চাপ প্রয়োগ করবে যাতে তারা তোমাদের ভাইদের বিরুদ্ধে কোন সাহায্য করতে না পারে। তাদের সঙ্গে উবুল্লাহর উপকণ্ঠে যুদ্ধ অব্যাহত রাখো।"

হযরত উতবা (রা) মদীনা থেকে রওয়ানা হলে মনযিলের পর মনযিল অতিক্রম করে সেই স্থানে পৌঁছলেন যেখানে আজ বসরা শহর অবস্থিত। সুয়াইদ বিন কুতবাও নিজের লোকজনসহ সেই স্থানে তাঁর বাহিনীতে শামিল হয়ে গেলেন এবং সকলে মিলে উবুল্লাহর ওপর হামলা করলেন।

ঘটনা যাই ঘটুক, এ ব্যাপারে সকল ঐতিহাসিক একমত যে, হযরত উতবার (রা) মনযিলে মকসুদ অথবা তাঁর অভিযানের লক্ষ্য ছিল উবুল্লাহ এবং তার উপকণ্ঠের এলাকাসমূহ পদানত করা। মুহাম্মাদ হোসাইন হাইকাল "আল ফারুকে আজম" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"সে যুগে উবুল্লাহ একটি বড় বন্দর ছিল। সেখানে ভারতবর্ষ ও চীন থেকে গমনাগমনকারী জাহাজ নোঙ্গর করতো। তাছাড়া সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে সে সময় বন্দরটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এখানে ভারতের ব্যবসায়ীদের বিরাট একটা সংখ্যা অবস্থান করতেন। উতবার (রা) সঙ্গে নামকরা যোদ্ধা হযরত আরাফজাহ (রা) বিন হারছুমা বারকীও এসে মিলিত হলেন এবং ইসলামের মুজাহিদরা উবুল্লাহ ঘিরে ফেললেন। এই শহর তার পূর্বে হযরত আবু বকরের (রা) শাসনামলেও হযরত খালেদ (রা) বিন ওয়ালিদ জয় করেছিলেন। কিন্তু খালেদের (রা) ইরাক থেকে গমনের পর ইরানীরা পুনরায় তা কবজা করে নিয়েছিল। শহর রক্ষার জন্য ইরানীরা একটি অভিজ্ঞ বাহিনী মোতায়েন করেছিল। তারা অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে মুসলমানদের মুকাবিলা করলো এবং কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত মুসলমানদেরকে শহর কবজা করতে দিল না। অবশেষে এক রক্তাক্ত যুদ্ধে মুসলমানরা ইরানীদের নাস্তানাবুদ করে ফেললো এবং তারা নিজেদের হাজার হাজার মানুষ কাটিয়ে পালিয়ে গেল। শহরের অনেক মানুষও হাল্কা-পাতলা সামান নিয়ে তাদের সঙ্গেই বেরিয়ে গেল। তা সত্ত্বেও সেই ঐশ্বর্যমণ্ডিত এবং জনসংখ্যাধিক্য শহরে অনেক কিছুই অবশিষ্ট ছিল। হযরত উতবা (রা) বিজয়ীর বেশে শহরে প্রবেশ করলেন। প্রচুর ধন-সম্পদ তাঁর হাতে এলো। কোন বিলম্ব ছাড়াই তিনি তৎক্ষণাৎ হযরত ওমরকে (রা) বিজয়ের খবর এই ভাষায় দিলেন ঃ

"অতপর আল্লাহ তায়ালার হাজারো শুকুর যে, তিনি উবুল্লাহ পদানত করেছেন। স্থানটি হলো আম্মান, বাহরাইন, পারস্য, ভারত এবং চীন থেকে

আগত জাহাজসমূহের নোঙ্গরস্থল। আমরা প্রচুর গনিমতের মাল লাভ করেছি। আমি ইনশাআল্লাহ তার বিস্তারিত খুব শীঘ্র লিখবো।"

উতবা (রা) এই চিঠি নাফে বিন হারিছ বিন কালদাহ ছাকাফির হাতে দিয়ে রওয়ানা করলেন। যখন তিনি মদীনা পৌঁছলেন তখন হযরত ওমর (রা) এবং অন্য মুসলমানরা বিজয়ের খবর শুনে খুব আনন্দিত হলেন। এদিকে হযরত উতবা (রা) উবুল্লাহর ওপর কবজা মজবুত করে মাযারের ওপর হামলা করলেন। এখানকার বাসিন্দারাও আবু বকর সিদ্দীকের (রা) শাসনামলে মুসলমানদের আনুগত্য কবুল করে পুনরায় বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। তারা জীবন দিয়ে মুসলমানদের মুকাবিলা করলো। কিন্তু উবুল্লাহ বিজয়ের নেশায় মত্ত মুজাহিদরা কয়েক ঘন্টার মধ্যে তাদেরকে শিক্ষণীয়ভাবে পরাজিত করলো এবং শহরের শাসককে গ্রেফতার করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিল। তার কোমরবন্দে মূল্যবান ইয়াকুত যুমুররাদ জড়ানো ছিল। হযরত উতবাহ (রা) এই কোমরবন্দ বিজয়নামার সঙ্গে হযরত ওমরের (রা) খিদমতে প্রেরণ করলেন। মাযার বিজয়ের পর হযরত উতবা (রা) উপকণ্ঠের এলাকাসমূহ অনুগত বানালেন এবং ফোরাত নদী পার হয়ে দাস্তে মাইসানের দিকে অগ্রসর হলেন। এটা ইরানীদের একটি মজবুত ঘাঁটি ছিল এবং উবুল্লাহ থেকে পালিয়ে আসা ইরানীরাও এখানে একত্রিত হয়েছিল। দাস্তে মাইসানের বাইরে ইরানী ও মুসলমানদের মধ্যে ঘোরতর এবং তীর ও বর্শার পরিবর্তে হাতাহাতি যুদ্ধ সংঘটিত হলো। কঠিন প্রকৃতির আরবরা শীঘ্রই ইরানীদেরকে পরাজিত করলো। দাস্তে মাইসানের ইরানী শাসক জনৈক মুসলমানের হাতে মারা গেল এবং অন্যরা চরম বিশৃংখলার মধ্য দিয়ে শহর খালি করে চলে গেল। হযরত উতবা (রা) নিজের বাহিনীসহ শহরে প্রবেশ করলেন। এ সময় তিনি শহরের বাড়ীঘর ও দোকানপাটসমূহ মূল্যবান সম্পদ ও আসবাবে ঠাসাঠাসি পেলেন। এমনিভাবে প্রত্যেক মুসলমানের অংশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গনিমতের মাল এলো। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে; সেই শহরের শাসকের মূল্যবান কোমরবন্দ হযরত ওমরের (রা) খিদমতে পাঠালেন। এরপর তিনি "আবরকাবাদ"-এর গুরুত্বপূর্ণ শহরের ওপর হামলা চালান এবং এক ব্যাপক সংঘর্ষের পর তার ওপরও ইসলামের পতাকা উত্তোলন করেন। এমনিভাবে হযরত ওমর (রা) হযরত উতবাকে (রা) যে অভিযানে নিয়োগ করেছিলেন তা পূর্ণ হয়।

মিসরের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ হোসাইন হাইকাল বর্ণনা করেছেন যে, যখন হযরত উতবা (রা) বিন গাযওয়ান উবুল্লাহ ও দাজলার সকল উপকূলীয় এলাকা ইসলামের অধীন আনেন তখন তিনি হযরত ওমরকে (রা)

লিখলেন, "মুসলমানদের এমন একটি আবাস প্রয়োজন যেখানে তারা ঠাণ্ডার হাত থেকে হেফাজত থাকতে পারবে এবং যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে অবস্থান করবে।" হযরত ওমর (রা) তাঁকে জবাব দিলেন ঃ "তোমার সঙ্গীদেরকে একস্থানে একত্রিত কর। এই স্থান পানি ও তৃণ শস্যশ্যামল প্রান্তরের নিকটে হওয়া চাই। অতপর আমাকে তার বিস্তারিত অবস্থা লিখো।"

উতবা (রা) যখন সম্পূর্ণ বিস্তারিত লিখে পাঠালেন তখন হযরত ওমর (রা) বসরার অবতরণ স্থলকে পসন্দ করলেন এবং লোকজন সেখানে পৌঁছে বাঁশ দিয়ে ঘর বানালো। এমনিভাবে হযরত উতবা (রা) বাঁশের মসজিদ নির্মাণ করালেন। মুসলমানরা যখন কোথায়ও চড়াও হতেন তখন এসব ঘর ফেলে দিতেন এবং যখন যুদ্ধ থেকে ফিরে আসতেন তখন তা আবার বানিয়ে নিতেন। একবার এসব ঘরে আগুন লেগে গেল। এ সময় হযরত ওমরের (রা) অনুমতিতে লোকজন মজবুত গৃহ বানালো। পরে যখন পারস্য উপসাগরের কূলে ইরাকের সীমান্ত ছাউনি তৈরী হলো তখন পাথরের গৃহ বানানো হলো এবং এক অত্যন্ত শানদার মসজিদ নির্মাণ করানো হলো।

আল্লামা শিবলী নুমানী (র) "আল ফারুক" গ্রন্থে বসরার আবাদী সম্পর্কিত বিভিন্ন রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন এবং সম্ভবত তিনি তা "ফতুহুল বুলদান বালাজুরী" থেকে গ্রহণ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"পারস্য ও ভারতের নৌ হামলা থেকে নিশ্চিন্ত থাকার জন্য হযরত ওমর (রা) উতবা (রা) বিন গাযওয়ানকে উবুল্লাহ বন্দরের নিকট মোতায়েন করেছিলেন। কেননা এখানে পারস্য সাগরের উপসাগর দিয়ে ভারতবর্ষ এবং পারস্যের জাহাজসমূহ নোঙ্গর করতো। এখানেই একটি শহর আবাদ করা হয়েছিল। জমি সম্পর্কিত সকল বিষয় স্বয়ং হযরত ওমর (রা) বলে দিয়েছিলেন। উতবা (রা) ৮শ' মানুষের সঙ্গে রওয়ানা হয়েছিলেন এবং খারিছবা এসেছিলেন। সেখানেই বর্তমানে বসরা আবাদ হয়েছে। প্রথমে এখানে শুধু নীরেট মাটি পড়ে ছিল। আর ভূমিও ছিল প্রস্তরময় এবং আশে পাশে পানি ও চারার সামান ছিল। এই ভূমি ছিল আরব প্রকৃতির সমতুল্য। এ জন্য উতবা(রা) ভিত্তি প্রস্তরের কাজ করে ফেললেন এবং বিভিন্ন গোত্রের জন্য পৃথক পৃথক সীমানা টেনে দিয়ে খুব ছোট ছোট ঘর তৈরী করালেন। যেখানে যে কবিলা আবাদ করা ঠিক হবে তা নির্ণয়ের জন্য আছেম বিন দালফকে নিয়োগ করলেন। বিশেষ করে নির্মিত সরকারী ভবনসমূহ ও জামে মসজিদ খুব প্রসিদ্ধ ছিল।"

আরব ঐতিহাসিকরা লিখেছেন যে, আরবী ভাষায় বসরাকে নরম প্রস্তরময় ভূমি বলা হয়ে থাকে। বস্তুত যেখানে এই শহর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে সেই

ধরনের ভূমি ছিল। এ জন্য তার নাম বসরা নামে খ্যাত হয়ে গেল। আল্লামা বালাজুরী (র) একজন অগ্নি উপাসক আলেমের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, যেখানে এই শহর নির্মিত হয়, আজমীরা তাকে বাসরাহ বলতো। কেননা সেখানে অনেক রাস্তা এসে মিলিত হতো। আরবরা তাকে মুয়াররাব করে বসরা বানিয়ে নেয়। তিনি একথাও লিখেছেন, যে, বসরার জামে মসজিদ নির্মাণের জন্য হযরত উতবা (রা) হযরত মিহজান (রা) ইবনুল আওরাকে নিয়োগ করেছিলেন।

আবু হানিফা দিনাওয়ারী বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উতবা (রা) হযরত ওমরের (রা) ইঙ্গিতে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তিকে হাভেলী নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিলেন এবং ক্ষেত-খামার করার জন্য জমি দিয়েছিলেন তিনি হলেন নাফে বিন হারিছ বিন কালদাহ ছাকাফী।

বসরা নির্মাণের পর হযরত ওমর (রা) হযরত উতবাকে (রা) এই শহরের আমীর (গভর্ণর) নিয়োগ করেন। ৬ মাস পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে কাজ করতে থাকেন। তারপর তিনি এই পদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন। তার কারণ কি ছিল। এ ব্যাপারে দু'টি রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। এক রেওয়ায়াত হলো যে, তিনি অত্যন্ত যাহিদ ও মুখাপেক্ষীহীন স্বভাবের মানুষ ছিলেন। এ জন্য ইমারতের দায়িত্ব পালন করা তাঁর স্বভাব বিরোধী ছিল। দ্বিতীয় রেওয়ায়াত হলো, হযরত ওমর (রা) খবর পেলেন যে, হযরত উতবা (রা) এবং তাঁর সঙ্গীরা দাজলা ও ফোরাতের উপকূলীয় এলাকায় বেহিসাব গনিমতের মাল লাভ করেছেন এবং তারা সোনা ও রূপার মধ্যে গড়াগড়ি যাচ্ছেন। হযরত ওমর (রা) সঠিক অবস্থা জানার জন্য হযরত উতবাকে (রা) ডেকে পাঠালেন। যা হোক, ৬ মাস পর হযরত উতবা (রা) হযরত মাজাশি বিন মাসউদকে (রা) নিজের স্থলাভিষিক্ত বানালেন এবং হযরত মুগিরাহ (রা) বিন শু'বাকে নামাযের ইমাম নিয়োগ করে মক্কা রওয়ানা হয়ে গেলেন। রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে তিনি বসরাবাসীর সামনে এক লম্বা ভাষণ বা খুতবা দিলেন। এই ভাষণের শেষের দিকে তিনি বললেন ঃ

"হে বসরাবাসী! গুনাহর প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা এবং নেক কাজের হিম্মত আল্লাহই প্রদান করেন। আমি এখন চলে যাচ্ছি। আমার পর তোমরা যখন পরবর্তী শাসকদের অধীন আসবে তখন জানতে পারবে।"

খাজা হাসান বসরীর (র) উক্তি হলো, "উতবার (রা) পরবর্তী শাসকদের পালায় আমরা পড়েছি। আমরা দেখেছি যে, উতবা (রা) তাঁদের সকলের চেয়ে আফজাল ছিলেন।"

হযরত উতবা (রা) মক্কা পৌঁছলেন এ সময় হযরত ওমরও (রা) হজ্জের জন্য সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি বসরার বিস্তারিত অবস্থা আমীরুল মু'মিনীনের কর্ণগোচর করালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বসরার ইমারাত থেকে নিজের ইস্তাফা পেশ করলেন। হযরত ওমর (রা) তাঁর ইস্তাফা নামঞ্জুর করলেন এবং তাকে নিজের পদে ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন। হযরত উতবা(রা) বাধ্য হয়ে বসরা রওয়ানা হলেন। কিন্তু তাঁর আন্তরিক কামনা ছিল যে, আল্লাহ যেন তাঁকে ইমারাতের দায়িত্ব থেকে বাঁচিয়ে নেন। আল্লাহর কি কুদরত। পথিমধ্যে তিনি উট থেকে পড়ে গেলেন। মারাত্মক আঘাত পেলেন। তার ব্যথায় বসরা পৌঁছার পূর্বেই ওফাত পেলেন এবং ইসলামের এই রত্ন ৫৭ বছর বয়সে চিরদিনের জন্য দুনিয়ার নজর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

হযরত উসমান (রা)

বিন মাজউন

দ্বিতীয় হিজরীর শেষের দিকের ঘটনা। একদিন জনৈক আহ্বানকারী ডেকে ডেকে বললেন, হে লোকেরা! আজ আবুস সায়েব দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। একথা শুনে মদীনা মুনাওয়ারার মুমিনরা শোকাভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁদের চোখ অশ্রুশিক্ত হয়ে উঠলো। রহমতে আলমও (সা) এই দুঃখপূর্ণ খবরে খুব বিষন্বিত হলেন। জানাযা প্রস্তুত হলে হুজুর (সা) হযরত উম্মুল আলা আনসারিয়ার (রা) গৃহে তাশরীফ নিলেন। সেখানেই আবুস সায়েব ইন্তেকাল করেছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা সেখানে এক আশ্চর্য দৃশ্য অবলোকন করলেন। জ্বিন ও ইনসানের গৌরব হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) মাথা ঝুঁকিয়ে মাইয়্যেতের কপালের ওপর তিনবার চুম্বন করলেন। সে সময় তাঁর চক্ষু দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। এই অশ্রু আবুস সায়েবের গণ্ডদেশ ভিজিয়ে দিল। অতপর তিনি বললেন ঃ

"আবুস সায়েব, আমি তোমার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছি। তুমি দুনিয়া থেকে এমনভাবে বিদায় নিয়েছ যে, তোমার জামার প্রান্ত তাতে সামান্যও মলিন হয়নি।"

একথা বলতে বলতে হুজুরের (সা) কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। এ সময় উপস্থিত অন্যান্যরাও ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদছিলেন এবং নিজের বিচ্ছিন্ন সঙ্গীর জন্য অন্তরের অন্তস্থল থেকে মাগফিরাত কামনা করছিলেন। এক ব্যক্তি হুজুরের(সা) নিকট আরজ করলেন ঃ

"ইয়া রাসূলুল্লাহ, আবুস সায়েবকে আমরা কোথায় দাফন করবো।"

তখন পর্যন্ত মদীনায় মুসলমানদের কোন বিশেষ কবরিস্তান ছিল না। বিশ্ব নবী (সা) কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন এবং বললেন ঃ

"মাকামে বাকী'তে তাঁর কবর খোঁড়ো।"

সাহাবীরা (রা) নির্দেশ পালন করলেন। এ সময় হুজুর (সা) জানাযার সঙ্গে বাকীতে তাশরীফ নিলেন এবং জানাযার নামায পড়িয়ে দাফন তত্ত্বাবধান করার জন্য কবরের ওপর দাঁড়িয়ে গেলেন। দাফন সম্পন্ন হলে তিনি কবরের মাথায় একটি পাথর রেখে বললেন ঃ

"আজ থেকে আমি বাকী'কে মুসলমানদের কবরস্তানে পরিণত করলাম। ভবিষ্যতে যে মুসলমান মদীনায় শেষ সফরে যাত্রা করবেন তাকে এখানেই দাফন করা হবে।"

এই "আবুস সায়েব" যাঁর মৃত্যু সাইয়েদুল মুরসালিন খাইরুল বাশার (সা) সমেত সকল মুমিনকে কাঁদিয়েছিল এবং জান্নাতুল বাকী'র মাটি যাঁকে সর্বপ্রথম নিজের কোলে স্থান দিয়েছিল, তিনি ছিলেন হযরত উসমান (রা) বিন মাজউন।

আবুস সায়েব হযরত উসমান (রা) বিন মাজউন বিন হাবিব কুরাইশ খান্দানের বনু জামুহ'র সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে নেক ও সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। জাহেলী যুগেও তিনি খেল-তামাশা থেকে বিরত থাকতেন। উপরন্তু আরবরা সাধারণত যেসব নীতিহীন কাজে ব্যাপৃত থাকতো তা থেকেও তিনি পবিত্র ছিলেন। আল্লামা ইবনে সায়াদ বর্ণনা করেছেন যে, জাহেলী যুগে আরবে শিশুরা পর্যন্ত শরাব বা মদে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু উসমান (রা) বিন মাজউন সেই যুগেও শরাবকে ঘৃণা করতেন এবং বলতেন ঃ

"মদ পানে মানুষের জ্ঞান ও বিবেক লোপ পায়। তাতে মা-বোনের পার্থক্য থাকে না এবং উঁচু-নীচু সকলের বিদ্রূপের পাত্র হতে হয়। অতএব, কোন শরীফ ব্যক্তি এ ধরনের অপবিত্র বস্তু কেন ব্যবহার করবে।"

রহমতে আলম (সা) দাওয়াতে হক প্রদানের কাজ শুরু করলেন। এ সময় উসমানের (রা) মত নেক স্বভাবের মানুষ তাতে প্রভাবিত না হয়ে কি করে থাকতে পারতেন। তখন কেবলমাত্র ১৩ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। একদিন হযরত উসমান (রা) বিন মাজউন ও হযরত আবু উবায়দা (রা) ইবনুল জারাহ, হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ, হযরত উবায়দা (রা) ইবনুল হারিছ এবং হযরত আবু সালমা (রা) ইবনুল আসাদের সঙ্গে সাকিয়ে কাউসারের (সা) খিদমতে হাজির হলেন এবং তাঁর পবিত্র হাত থেকে তাওহীদের পেয়ালা পান করে মুসলমানদের কাতারে শামিল হয়ে গেলেন। তারপর তিনিও অন্যান্য হকপন্থীর মত মুশরিকদের জুলুম-নির্যাতন, ঠাট্টা, বিদ্রূপ ও অর্থনৈতিক চাপের শিকার হলেন। পরিস্থিতি যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন নবুওয়াতের পঞ্চম বছরে প্রিয় নবী (সা) মুসলমানদেরকে পরামর্শ দিয়ে বললেন, "বর্তমানে তোমরা এখান থেকে বের হয়ে হাবশা চলে যাও। সেখানে একজন নেকদিল এবং ন্যায় স্বভাবের বাদশাহর রাজত্ব রয়েছে। সে তোমাদেরকে আশ্রয় দেবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা এই পরিস্থিতি

পরিবর্তনের কোন ব্যবস্থা করে না দেন ততক্ষণ তোমরা সেখানেই অবস্থান করবে।"

হুজুরের (সা) ইঙ্গিত পেয়ে মুসলমানদের এক বিরাট সংখ্যা হিজরতের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। কিন্তু একই সময়ে বেশী সংখ্যায় হিজরত করা সম্ভব ছিল না। কেননা মুসলমানরা এভাবে জীবন নিয়ে বাইরে চলে যাবে, তা কুরাইশদের সহ্যের বাইরের ব্যাপার ছিল। সুতরাং সর্বপ্রথম ১২ জন পুরুষ এবং চার জন মহিলা সমন্বয়ে গঠিত একটি ছোট দলের কাফেলা হাবশা বা আবিসিনিয়া রওয়ানা হলো। এই কাফেলায় হযরত উসমান (রা) বিন মাজউন ছাড়া হযরত উসমান জুন্নুরাইন (রা), হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়াম, হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ এবং হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়েরের মত জালিলুল কদর সাহাবীও শামিল ছিলেন। ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর পথে হিজরতকারী এই প্রথম কাফেলার আমীর নিয়োজিত হয়েছিলেন হযরত উসমান (রা) বিন মাজউন। এই ব্যক্তিবর্গ লুকিয়ে ছাপিয়ে শুয়াইবিয়া বন্দর পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন এবং হাবশা গমনকারী দুই বাণিজ্যিক জাহাজে চেপে বসলেন। ইত্যবসরে কুরাইশদের কানে তাঁদের চলে যাওয়ার খবর পৌঁছলো। খবর শুনে তারা বিদ্যুদ্বেগে তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করে উপকূল পর্যন্ত পৌঁছে গেল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কুরাইশদের পৌঁছার পূর্বেই উভয় জাহাজই বন্দর থেকে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল। হক পথের এই মুসাফিররা হাবশা পৌঁছে অত্যন্ত শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে দিন অতিবাহিত করতে লাগলেন। এই অবস্থায় সেখানে তিন মাসই কেবল কেটেছিল। এমন সময় তাঁরা এক উদ্ভট খবর পেলেন যে, মক্কার সকল মুশরিক ইসলাম গ্রহণ করেছেন [অথবা রাসূলে আকরাম (সা) এবং কুরাইশদের মধ্যে আপোস হয়ে গেছে এবং কুরাইশরা হুজুরের (সা) বিরোধিতা পরিত্যাগ করেছে।] এ খবর শুনে তাঁরা খুব খুশী হলেন এবং সকলেই মক্কা মুয়াজ্জামার দিকে যাত্রা করলেন। মক্কার নিকট পৌঁছে তাঁরা জানতে পেলেন যে, খবরটি ছিল ভিত্তিহীন। এখন এই ছিন্নমূল দল একদম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। ভাবতে লাগলেন যে, হাবশা ফিরে যাবেন, না মক্কায় প্রবেশ করে পুনরায় কাফেরদের নির্যাতনের শিকার হবেন। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর শেষে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, নিজেদের অমুসলিম আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব অথবা কুরাইশের কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাহায্য (আশ্রয়) নিয়ে শহরে প্রবেশ করবেন। সুতরাং সকলেই কারো না কারোর আশ্রয় নিয়ে শহরে প্রবেশ করলেন। হযরত উসমান (রা) বিন মাজউনকে বনু মাখযুমের সরদার ওয়ালিদ বিন মুগিরা[হযরত খালিদ সাইফুল্লাহর (রা) পিতা] আশ্রয় দিল এবং তিনি মক্কায়

শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে থাকতে লাগলেন। কিন্তু বেশী দিন না যেতেই তিনি মানসিক দিক দিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে গেলেন। তিনি যখন দেখতেন যে, মক্কার মুশরিকরা বিশ্ব নবী (সা) ও অন্যান্য হকপন্থীর ওপর চরম নির্যাতন চালাচ্ছে এবং তিনি ওয়ালিদের আশ্রয়ে আরামের সঙ্গে দিন অতিবাহিত করছেন তখন চরম লজ্জাবোধ করতেন। তিনি মনে মনে ভাবতেন যে, আফসোস! আমার আকা ও মাওলা এবং আমার দীনি ভাইয়েরা বিভিন্ন ধরনের মুসিবতে লিপ্ত রয়েছেন। আর আমি এক মুশরিকের সহযোগিতায় সুখ ও আরামের জীবন অতিবাহিত করছি। আল্লাহর কসম! এটা তো শুধুমাত্র নফস পূজা। অতএব, একদিন তিনি অত্যন্ত বেচাইন হয়ে ওয়ালিদের নিকট পৌঁছলেন এবং তাঁকে বললেন ঃ

"হে আবা আবদি শামস, তুমি তোমার সহযোগিতার হক আদায় করেছ। এখন আর আমি তোমার আশ্রয়ে থাকতে চাই না। আমার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর সাহাবীদের নমুনাই যথেষ্ট।"

ওয়ালিদ বললো, "পুত্র, বলোতো কি হয়েছে! তোমাকে কি কেউ কোন কষ্ট দিয়েছে?"

হযরত উসমান (রা) বললেন ঃ

"না এমন কিছু হয়নি। ব্যাস, আমি এখন শুধু আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় চাই। অন্য কারো সহযোগিতা আমার প্রয়োজন নেই।"

ওয়ালিদ বললো, "তুমি যদি তাই চাও, তাহলে হেরেম শরীফে গিয়ে সবার সামনে আমার আশ্রয় থেকে বের হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দাও। কেননা আমিও এমনিভাবে তোমাকে আমার আশ্রয়ে নিয়েছিলাম।"

হযরত উসমান (রা) সেজন্য তৎক্ষণাৎ তৈরী হয়ে গেলেন। ওয়ালিদ তাঁকে সঙ্গে নিয়ে হেরেমে গেলেন এবং সাধারণ মানুষের সামনে তাঁর ইচ্ছার কথা প্রকাশ করলেন। হযরত উসমান (রা) দাঁড়িয়ে তার সত্যতা স্বীকার করলেন এবং বললেন ঃ

"হে মক্কাবাসী! আমি ওয়ালিদকে একজন প্রতিশ্রুতি পূরণকারী এবং শরীফ মানুষ হিসেবে পেয়েছি। সে আমার সহযোগিতার সম্পূর্ণ হক আদায় করেছে। কিন্তু আল্লাহর আশ্রয় ছাড়া অন্য কারোর আশ্রয়ে থাকা আমার পসন্দ নয়। এ জন্য ওয়ালিদের আশ্রয় আমি ফিরিয়ে দিয়েছি।"

ওয়ালিদ বিন মুগিরার আশ্রয় পরিত্যাগ করা জুলুম-নির্যাতনের অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ারই নামান্তর ছিল। মুশরিকরা হকপন্থীদের জন্য এই অগ্নিকুণ্ড

প্রজ্বলিত করে রেখেছিল। কিন্তু হযরত উসমান (রা) বিন মাজউন নিজের আকা ও মাওলা (সা) এবং অন্যান্য হকপন্থীদের অনুসরণে প্রত্যেক ধরনের আরাম-আয়েশ থেকে মুখাপেক্ষীহীন হয়ে বীরত্বের সঙ্গে সেই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

সেই যামানায় জাহেল আরবের মশহুর কবি লবিদ বিন রবিয়ার মক্কায় আগমন ঘটে। আবু আকিল লবিদ (রা) বিন রবিয়া আমেরী আরবের জাহেলী যুগে অন্যতম মহান কবি ছিলেন। তিনি ইমরুল কায়েস, নাবেগা জুবিয়ানী, যোহায়ের বিন আবি সালমা, আমর বিন কুলছুম, আ'শা বিন কায়েস এবং তারাফা ইবনুল আবদের সমকক্ষ কবি ছিলেন। তিনি আস-সাবউল মুয়াল্লাকাতের অন্যতম ছিলেন। একবার নিজের চাচাদের সঙ্গে নু'মান আবু কাবুসের দরবারে গেলেন। সেখানে মহান জাহেলী কবি নাবেগা জুবিয়ানীর সঙ্গে সাক্ষাত হলো। তিনি তাঁর কবিতা শুনে খুব প্রশংসা করলেন এবং বললেন যে, তুমি বনি আমের ও বনু কায়েসের সকল কবি থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে গেছ। অতপর সে ধীরে ধীরে আরবের জাহেলী যুগের কবিদের প্রথম কাতারে এসে গেলেন। নবম হিজরীতে বনি জাফর বিন কিলাব গোত্রের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে নবীর (সা) দরবারে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স ছিল ৯০ বছর। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধি অনুযায়ী এই রেওয়ায়াতের বক্তব্য অসম্ভব বলে মনে হয়। কেননা, ইবনে আছিরের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ১ হিজরীতে ওফাত পেয়েছিলেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল ১৪৫ বছর। এই হিসেব অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স প্রায় ১১৩ বছর ছিল।

সুতরাং ইসাবা ও আগানির এই রেওয়ায়াতও সঠিক নয় যে, লবিদ (রা) ইসলামী অবস্থায় ৫৫ বছর জীবিত ছিলেন। ঈমান আনার পর লবিদ (রা) কবিতা রচনা ত্যাগ করেন এবং আমৃত্যু একটি অথবা দু'টি ছাড়া কোন কবিতা বলেননি। তিনি বলতেন যে, আল্লাহ কবিতার বিনিময়ে আমাকে সূরায়ে বাকারা এবং আলে ইমরান প্রদান করেছেন।

চরিতকাররা লিখেছেন যে, লবিদ (রা) জাহেলিয়াত এবং ইসলাম উভয় যুগেই অত্যন্ত উদার, বাহাদুর, সত্যবাদী, ঘোড়সওয়ার এবং শরীফ মানুষ ছিলেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) লিখেছেন যে, স্বয়ং বিশ্বনবী (সা) লবিদের (রা) কতিপয় কবিতা পসন্দ করতেন।

তিনি তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। মক্কার মুশরিকরা তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে গেল এবং তিনি নিজের কাব্যের মাহফিল গরম করতে লাগলেন।

একবার তিনি কুরাইশের এক মজলিসে নিজের কাসিদা শুনাচ্ছিলেন। তিনি যখন এই পংক্তি শুনালেন ঃ

আলা কুল্লু শাইয়িন মা খালাল্লাহ বাতিলুন—

(সতর্ক থেকো, আল্লাহ ছাড়া প্রত্যেক বস্তুই বাতিল) এ সময় সেই মজলিসে উপস্থিত হযরত উসমান (রা) বিন মাজউন নির্দ্বিধায় বলে উঠলেন ঃ "সম্পূর্ণ ঠিক কথা, তুমি সত্যি কথা বলেছ।"

কিন্তু যখন তিনি দ্বিতীয় পংক্তি আবৃত্তি করলেন ঃ

ওয়া কুল্লু নায়িমুন লা মাহালাহু যায়েলু-

(এবং প্রত্যেক নিয়ামত নিসন্দেহে ধ্বংস হয়ে যাবে) এই পংক্তি শুনে উসমান (রা) বলে উঠলেন ঃ "এটা ভুল কথা। জান্নাতের নিয়ামতসমূহ চিরস্থায়ী এবং কখনো ধ্বংস হবে না।" এই কথায় সারা মাজমায় হৈচৈ শুরু হলো। লোকজন হযরত উসমানকে (রা) গালমন্দ দিতে লাগলো এবং লবিদের নিকট এই কবিতা দ্বিতীয়বার পড়ার ফরমায়েশ করলো। তিনি তাঁর কবিতার পুনরুক্তি করলেন। হযরত উসমানও (রা) নিজের কথা পুনর্ব্যক্ত করলেন। তাতে লবিদ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন এবং কুরাইশদের সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে কুরাইশ ভইয়েরা! খোদার কসম, পূর্বে তোমাদের মজলিসসমূহের এই অবস্থা ছিল না। কারোর জন্য তা লজ্জারও ছিল না এবং কেউ তাতে বদতমিজীও করতে পারতো না। এই ব্যক্তি যদি আমাকে এভাবে বাধা দান করে তাহলে আমার কবিতা শুনানো হয়ে গেছে।"

লবিদের কথা শুনে মুশরিকরা জ্বলে উঠলো এবং বনু মুগিরার এক ব্যক্তি উঠে হযরত উসমানের (রা) মুখের ওপর এমন জোরে থাপ্পড় মারলো যে, তাঁর চোখ নীল হয়ে গেল। ওয়ালিদ বিন মুগিরা পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। বলতে লাগলেন, "বেটা, তুমি যদি আমার আশ্রয়ে থাকতে, তাহলে কার সাহস ছিল যে, তোমার গায়ে হাত দেয়। হযরত উসমান তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, 'হে আবা শামস, আমার দ্বিতীয় চোখও হক পথে এই ধরনের আঘাত খাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে আছে।"

ওয়ালিদ বললো, 'উসমান, তুমি পুনরায় আমার আশ্রয়ে এসে যাও। এটাই ভাল।' তিনি কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই জবাব দিলেন, "আমার জন্য শুধু আল্লাহর আশ্রয়ই যথেষ্ট।"

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, আল্লাহ তায়ালা সেই মজলিসেই ওয়ালিদের এক ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল্লাহ বিন আবি উমাইয়াকে হযরত উসমানের (রা) পক্ষে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং সে ঘুষি মেরে গালাত্ত গালকারীর নাক ভেঙ্গে দিলেন। এই ঘটনার পর মক্কার মুশরিকরা পূর্বের থেকে আরো কয়েকগুণ শক্তিতে মুসলমানদের ওপর জুলুম-নির্যাতন শুরু করে দিল। এই নির্যাতন যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন বিশ্ব নবী (সা) হকপন্থীদেরকে পুনরায় হাবশা গমনের অনুমতি দিলেন। কিন্তু এবার মক্কা থেকে বের হওয়া খুব কঠিন ব্যাপার ছিল। তা সত্ত্বেও ৮৩ জন পুরুষ ও ২০ জন মহিলা হাবশা গমনে সফল হন। এই দলে হযরত উসমান (রা) বিন মাজউন, তাঁর অল্পবয়স্ক পুত্র সায়েব (রা) এবং দুই ভাই কুদামা (রা) বিন মাজউন এবং আবদুল্লাহ (রা) বিন মাজউনও শামিল ছিলেন।

মক্কার মুশরিকরা যখন জানতে পেলো যে, এত বেশী সংখ্যক মুসলমান হাবশা গমন করে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে দিন কাটাচ্ছে, তখন তারা ছটফট করে উঠলো এবং আবদুল্লাহ বিন রবিয়া (আবু জেহেলের বৈমাত্রেয় ভাই) ও আমর ইবনুল আছকে অনেক মূল্যবান উপঢৌকনসহ হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর (যার নাম আসমাহা বলে বলা হয়ে থাকে) নিকট প্রেরণ করে। প্রতিনিধি দল প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল যাতে তারা কোন না কোন উপায়ে মুহাজিরদেরকে হাবশা থেকে বের করে দেয়ার জন্য নাজ্জাশীকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। কিন্তু দুই সদস্যের এই প্রতিনিধি দলের মিশন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।(পক্ষান্তরে এই মিশনের উল্টো ফল ফলে। স্বয়ং নাজ্জাশী ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন।)

হাবশায় এসব মুহাজিরের চার-পাঁচ বছর কেটে গেল। একদিন তাঁরা খবর পেলেন যে, রহমতে আলম (সা) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা তাশরীফ নিয়ে গেছেন। এ খবর পেয়ে তারাও হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হওয়ার জন্য অস্থির হয়ে গেলেন। কিন্তু অসহায়ত্ব এবং মদীনা মুনাওয়ারার দীর্ঘ জল ও স্থলের সফর তাদের পথের প্রধান অন্তরায় ছিল। তা সত্ত্বেও ৩৩ জন পুরুষ এবং ৮ জন মহিলা মক্কা মুয়াজ্জামার পথে মদীনা মুনাওয়ারা গমনের জন্য যাত্রা করলেন। কিছুদিন পর তারা ভালভাবে মক্কা মুয়াজ্জামা পৌঁছলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হযরত উসমান (রা) বিন মাজউন, তাঁর পুত্র সায়েব (রা) এবং দুই সহোদর। মক্কা মুয়াজ্জমায় কিছু দিন অতিবাহিত করার পর হযরত উসমান (রা) নিজের পরিবার-পরিজন ও খান্দান সমেত মদীনা হিজরত করেন। আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, "হযরত উসমান (রা)

বিন মাজউন মক্কা থেকে এমনভাবে বিদায় হন যে, তার খান্দানের কেউই আর সেখানে রইলেন না এবং তার গৃহসমূহে তালা পড়ে গেল।"

মদীনা পৌঁছে এসব সাহাবী (রা) হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালমা আজলানীর গৃহে অবস্থান করলেন। হুজুর (সা) তাঁদের আগমনের খবর পেয়ে খুব খুশী হলেন এবং হযরত উসমান (রা) ও তাঁর ভাইদের গৃহ নির্মাণের জন্য কয়েক খণ্ড প্রশস্ত জমি দান করলেন। কয়েক মাস পর রাসূলে আকরাম (সা) মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় হযরত উসমান (রা) বিন মাজউনকে জালিলুল কদর সাহাবী হযরত আবুল হাছিম (রা) বিন তিহান আনসারীর দ্বীনি ভাই বানালেন। দ্বিতীয় হিজরীর মুবারক রমযান মাসে হযরত উসমান (রা) বিন মাজউন হক ও বাতিলের প্রথম যুদ্ধ বদরের যুদ্ধে অংশ নেয়ার মহান মর্যাদা লাভ করেন। এই যুদ্ধে তিনি খুব বীরত্ব প্রদর্শন করেন। কুরাইশের এক যুদ্ধবাজ আউসুল মা'বার বিন সুরান মুসলমানদের ওপর খুব বেশী বেশী হামলা করছিলো। হযরত উসমান (রা) তরবারী হাতে তার দিকে অগ্রসর হলেন। ইত্যবসরে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুও সেখানে পৌঁছে গেলেন এবং উভয় জানবাজ মুহূর্তের মধ্যে তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিলেন।

অন্য আরেকজন মুশরিক হানজালা বিন কাবিসাকে হযরত উসমান (রা) পরাজিত করে জীবিত গ্রেফতার করে নিলেন। যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসার পর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আনসারী ভাই এবং তাঁর পরিবার পরিজনেরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সেবা শুশ্রূষা করলেন। কিন্তু তার অসুস্থতার মেয়াদ বৃদ্ধিই পেতে থাকলো। এমনকি দ্বিতীয় হিজরীর শেষের দিকে স্রষ্টার তরফ থেকে ডাক এলো। তাঁর ওফাতে মদীনা মুনাওয়ারাতে কান্নার রোল পড়ে গেল। যিনিই তাঁর মৃত্যুর খবর শুনলেন তিনিই মাথা ধরে বসে পড়লেন। হযরত উসমান (রা) অসুস্থতার পূর্ণ সময়টাই হযরত উম্মুল আ'লা আনসারীয়ার (রা) গৃহে কাটিয়েছিলেন এবং সেখাইে ইন্তেকাল করেন। রহমতে আলম (সা) স্বয়ং দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে উম্মুল আ'লার গৃহে তাশরীফ নিলেন এবং মাইয়্যেতের কপালে তিনবার চুমু দিলেন। উম্মুল আ'লা হুজুরের (সা) সামনে মাইয়্যেতকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"আবুস সায়েব তোমার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তোমাকে সম্মানিত করেছেন।"

হুজুর (সা) যদিও স্বয়ং হযরত উসমানকে (রা) খুব ভালবাসতেন তবুও তিনি বললেন, "উম্মুল আ'লা তুমি তা কি করে জানলে?" তিনি আরজ

করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আল্লাহ তায়ালা আবুস সায়েবের মত মানুষকে ইজ্জত না দিলে আর কাকে দেবেন।"

হুজুর (সা) ফরমালেন ঃ

"নিসন্দেহে উসমান ইসলামের চরম পর্যায়ে আসীন ছিলেন এবং আমি তার জন্য আল্লাহর নিকট কল্যাণের আশা করি। কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর রাসূল হয়েও (স্বয়ং) জানি না যে, আমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা হবে।" (সহীহ বুখারী)

(হাদিস ব্যাখ্যাকারীরা লিখেছেন যে, হুজুরের (সা) এই ইরশাদ লোকদেরকে একথা বোঝানোর জন্য ছিল যে, মুসলমানের মৃত্যুতে তার আখিরাত সম্পর্কে ইয়াকিনীভাবে বা স্থির চিত্তে কিছু বলো না। হতে পারে যে, একব্যক্তি বাহ্যিকভাবে খুব নেক ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তার কোন কাজে পাকড়াও করে নেবেন যা আমাদের দৃষ্টির আড়ালে ছিল। এমনিভাবে এও হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে খুব বদকার ছিল। আল্লাহ তায়ালা তার কোন বিশেষ নেকীকে কবুল করে ক্ষমা করে দিতে পারেন। এ জন্য আমাদেরকে স্বয়ং কোন ব্যক্তির বেহেশতী ও দোযখী হওয়ার "স্বাক্ষ্য" দেয়া উচিত নয়।)

হযরত উসমান (রা) বিন মাজউন মৃত্যুকালে দু'পুত্র রেখে যান। তাঁরা হলেন, আবদুর রহমান এবং সায়েব (রা)। আবদুর রহমানের জীবনী চরিত গ্রন্থে পাওয়া যায় না। অবশ্য হযরত সায়েব ইতিহাসে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং জালিলুল কদর সাহাবী হিসেবে পরিগণিত হন। তিনি পিতার সঙ্গে দুই হিজরতের মর্যাদা লাভ করেন এবং রাসূলের (সা) যুগের সকল যুদ্ধে অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নেন। তিনি অত্যন্ত সম্মানিত মানুষ ছিলেন এবং রাসূলে আকরামও (সা) তাঁকে খুব সম্মান করতেন। তিনি বুয়াতের যুদ্ধে তাশরীফ নেয়ার সময় হযরত সায়েবকে (রা) মদীনা মুনাওয়ারাতে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যান। হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) শাসনামলে হযরত সায়েব (রা) ইয়ামামার যুদ্ধে অংশ নেন এবং পূর্ণ জানবাজীর সঙ্গে লড়াই করেন। সেই যুদ্ধে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন এবং কিছুদিন পর সেই ব্যথাতেই ওফাত পান। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৩০ বছরের কিছু বেশী।

হযরত উসমান (রা) বিন মাজউনের স্ত্রীর নাম ছিল খাওলা বিনতে হাকিম। তিনি সুলাইম গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন এবং মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলের রেওয়ায়াত অনুযায়ী আত্মীয়তার দিক থেকে রাসূলে আকরামের

(সা) খালা হতেন। তিনি জালিলুল কদর মহিলা সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। অত্যন্ত ইবাদাত গুজার ও নেক সিরতের মহিলা ছিলেন। তাঁর থেকে ১৫টি হাদিস বর্ণিত আছে। হযরত উসমান (রা) বিন মাজউনের ওফাতের পর তিনি জীবনে আর দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। হযরত সায়েব (রা) এবং আবদুর রহমান তাঁরই গর্ভজাত ছিলেন।)

হযরত উসমান (রা) বিন মাজউনের চারিত্রিক বৈশিষ্টের মধ্যে ছিল নেক স্বভাব, দ্বীনে অটলতা, রাসূল প্রেম, বীরত্ব ও বাহাদুরী, শরম ও হায়া এবং প্রচণ্ড খোদাভীতি। এমনিতে জাহেলী যুগেই তাঁর পবিত্রতার খ্যাতি ছিল। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর এই রং আরও উজ্জ্বল হয়। আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি সীমাহীন আকর্ষণ ছিল। প্রায় দিনই অব্যাহতভাবে রোযা রাখতেন এবং রাতের পর রাত জেগে ইবাদাত করতেন। মুসনাদে আবু দাউদে আছে যে, রাসূলে আকরাম (সা) অব্যাহত রাত্রি জাগরণ এবং ইবাদাতের অবস্থা জানতে পেয়ে তাঁকে ডেকে পাঠান। তিনি যখন হাজির হলেন তখন হুজুর (সা) বললেন ঃ

"উসমান! তুমি কি আমার সুন্নাতের প্রতি বিরক্ত?"

তিনি আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল। আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। খোদার কসম, এমন কথা নয়। আপনার সুন্নাত তো আমার জন্য পথের মশাল স্বরূপ।"

হুজুর (সা) বললেন, "তাহলে শোনো, আমি ঘুমাই এবং নামাযও পড়ি। রোযাও রাখি এবং ইফতারও করি এবং মহিলাদের বিয়েও করি। উসমান, আল্লাহকে ভয় কর। তোমার ওপর তোমার স্ত্রীরও হক রয়েছে। তোমার মেহমানেরও তোমার ওপর হক আছে এবং তোমার নফসেরও তোমার ওপর হক আছে। এজন্য তুমি রোযাও রাখো এবং ইফতারও কর। নামাযও পড় এবং শয়নও করো।"

আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) এই ঘটনা অন্যভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, ইবাদাতে হযরত উসমান (রা) বিন মাজউনের ব্যস্ততা এতো বৃদ্ধি পেয়েছিল যে তিনি বিবি বাচ্চাদের থেকেও মুখাপেক্ষীহীন হয়ে পড়েছিলেন। ফলে তাঁর স্ত্রী সাজ-সজ্জা ও প্রসাধন করাও পরিত্যাগ করেছিলেন এবং খুব সাদাসিধে ও খারাপ অবস্থায় থাকতে লাগলেন। একদিন তিনি ঘটনাক্রমে নবীর (সা) হেরেমে এলেন। এ সময় উম্মুহাতুল মু'মিনীন তাঁকে এই অবস্থায় দেখে খুব বিস্মিত হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "খাওলা, তোমার অবস্থা কেন এমন করে রেখেছ। তোমার স্বামী তো কুরাইশের সুখী মানুষদের

মধ্যে পরিগণিত।" তিনি বললেন, "তাঁর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক। সে তো সারা দিন রোযা রাখে আর সারারাত নামায পড়ে।"

উম্মুহাতুল মু'মিনীন কথার গভীরে পৌঁছে গেলেন এবং সরাসরি আল্লাহর (সা) নিকট হযরত উসমানের (রা) ব্যবহারের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ হযরত উসমানের (রা) গৃহে তাশরীফ নিলেন এবং তাঁকে বললেন, "উসমান, আমি কি তোমার জন্য নমুনা বা আদর্শ নই?"

তিনি আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। কি ব্যাপার ঘটেছে।"

ফরমালেন : "তুমি কি অব্যাহতভাবে রোযা রাখো এবং সারারাত ইবাদাতে মশগুল থাকো?" আরজ করলেন, "হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল।" বললেন, "এমন করো না। তোমার ওপর তোমার চোখের, তোমার শরীরের এবং তোমার বিবি-বাচ্চারও হক আছে। নামাযও পড় এবং আরামও কর। রোযাও রাখো এবং ইফতারও করো।" হযরত উসমান (রা) আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! ভবিষ্যতে এমনি করব।"

এই ঘটনার কিছুদিন পর হযরত উসমানের (রা) স্ত্রীর পুনরায় নবীর হেরেমে যাওয়ার সুযোগ ঘটলো। সে সময় তিনি সেজেগুজে অত্যন্ত আনন্দচিত্তে ছিলেন।

সহীহ বুখারীতে আছে যে, একবার হযরত উসমান (রা) দুনিয়া থেকে খুব বেজার হয়ে গিয়েছিলেন এবং কামশক্তিকে ধ্বংস করে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করতে এবং দুনিয়ার নেয়ামত পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। হুজুর (সা) তাঁর ইচ্ছার কথা জানতে পেরে তাঁকে ডেকে বুঝিয়ে বললেন যে, "যে ব্যক্তি জেনে বুঝে নিজের কামশক্তিকে ধ্বংস করবে (খাসি হবে অথবা খাসি করাবে) সে আমার উম্মত বলে পরিগণিত হবে না। তোমাদের উচিত আমাকে আদর্শের নমুনা বানানো। আমি গোশতও খাই এবং নিজের স্ত্রীর নিকটও গমন করি, রোযাও রাখি এবং ইফতারও করি।"

হুজুরের (সা) উপদেশে হযরত উসমান (রা) নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন।

হযরত উসমানের (রা) স্বভাবে লজ্জা-শরমের উপাদানও প্রচুর পরিমাণে ছিল। এমনকি তিনি একাকীও উলঙ্গ হওয়াটা পসন্দ করতেন না। একদিন প্রিয় নবীর (সা) সামনে নিজের স্বভাবের এই দিকটির কথা উল্লেখ করলে তিনি ফরমালেন : "উসমান, আল্লাহ তায়ালা তোমার স্ত্রীকে তোমার জন্য এবং তোমাকে তার জন্য পর্দাহীন বানিয়েছেন"।

তিনি যখন নবীর (সা) মজলিস থেকে বিদায় নিলেন তখন হুজুর (সা) প্রশংসার সুরে বললেন ঃ "উসমান বিন মাজউনের লজ্জা ও পর্দাপুশীদা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে।"

হযরত উসমান (রা) শুধু আহিদই ছিলেন না, বরং জিহাদের ময়দানের বাঘও ছিলেন। বস্তুত বদরের যুদ্ধে তিনি খুব বীরত্ব প্রদর্শন করেন। এই যুদ্ধের বিজুলিন পরই তিনি ওফাত পান। এসত্ত্বেও তাঁর জানবাজ পুত্র সায়েব (রা) পিতার প্রশিক্ষণের হক আদায় করেন এবং নবীযুগের সকল যুদ্ধে জীবনবাজি রেখে অংশগ্রহণ করেন।

হযরত সোহায়েব রুমী (রা)

রহমতে আলম (সা) হিজরতের পর কিছুদিন কুবাতে অবস্থান করলেন। কুবায় অবস্থানকালে হুজুর (সা) একদিন কতিপয় সাহাবীর সাথে বসে খেজুর খাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে মধ্য আকৃতি, ঘন দাড়ি এবং খুব লাল চেহারার মুশকিলে পড়া এক ব্যক্তি নবীর (সা) মজলিসে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর পোশাক ছিল ধূলায় ধূসরিত। চেহারায় ছিল ক্লান্তির ছাপ এবং একচোখে পট্টি বাঁধা ছিল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে, তিনি এক লম্বা সফর থেকে আসছেন এবং তার চোখে ছিল ব্যথা। সেই ব্যক্তি মহানবী (সা) ও উপস্থিত অন্যদেরকে সালাম করলেন এবং কোন কিছু না বলেই খেজুর খেতে শুরু করলেন। খাওয়ার ধরন থেকে মনে হচ্ছিল যে, তিনি ক্ষুধার্ত ছিলেন। হযরত ওমর ফারুকও (রা) সে সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি হয়রান হয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! দেখুন, তাঁর চোখ ব্যথা করছে। অথচ কি গোগ্রাসে খেজুর সাবাড় করছে।"

বস্তুত চোখের অসুখের সময় খেজুর খাওয়াটা ক্ষতিকর হয়। এ জন্য হুজুরও (সা) সেই ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "সুবহানাল্লাহ! তোমার চোখে অসুখ হয়েছে। আর তুমি খেজুর খাচ্ছ!"

সেই ব্যক্তি আরজ করলেন ঃ "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ভাল চোখটির পক্ষ থেকে খাচ্ছি।"

তাঁর জবাব শুনে সারওয়ারে আলম (সা) এভাবে হাসলেন যে, পবিত্র দাঁত থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতে লাগলো। খেজুর খাওয়া শেষ করে সেই ব্যক্তি হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) প্রতি ফিরে বললেন ঃ "জনাব, আপনিতো স্বয়ং রাসূলের (সা) সঙ্গে এসে গেলেন। অথচ আমাকে সঙ্গে আনলেন না।"

অতপর হুজুরের (সা) খিদমতে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আপনিও এই অক্ষমের কথা খেয়াল করেননি। আমি মক্কায় একাকী রয়ে গেলাম। আর কুরাইশরা আমার ওপর চড়ে বসলো। নিজের ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্র সবকিছু তাদেরকে দিয়ে অতি কষ্টে জীবন বাঁচিয়ে আপনার নিকট পৌঁছেছি।"

হুজুর (সা) মুচকি হেসে বললেন ঃ "আবু ইয়াহইয়া, তুমি বড় লাভজনক ব্যবসা করেছ।" আবু ইয়াহইয়া, তুমি বড় লাভজনক ব্যবসা করেছ।"

সেই সঙ্গেই আল্লাহর ওহির এই বাক্যাবলী নবীর (সা) যবানে জারি হয়ে গেল ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ –

"অপরদিকে মানুষের মধ্যেই এমন লোক রয়েছে যে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যেই নিজের জীবন প্রাণ উৎসর্গ করে, বস্তুত আল্লাহ এসব বান্দাহর প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল।" (আল বাকারাহ, ২০৭)

এই ব্যক্তি যাঁর অটলতা এবং কুরবানী আল্লাহর দরবারে স্পষ্ট ভাষায় গৃহীত হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিল এবং যাঁর ত্যাগের আবেগকে সৃষ্টির সেরা ও গৌরব মাহবুবে খোদা (সা) প্রশংসা করেছিলেন তিনি ছিলেন হযরত সোহায়েব (রা) বিন সিনান রুমী।

সাইয়েদেনা হযরত সোহায়েব (রা) বিন সিনান, হযরত বলাল হাবশী (রা), আম্মার (রা) বিন ইয়াসির (রা), আমের (রা) বিন ফাহিরাহ, খাব্বাব (রা) বিন আরাত এবং আবু ফাকিহার (রা) মত মহান মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী হিসেবে পরিগণিত হতেন। আল্লাহর এই পবিত্র বান্দা মক্কায় উদ্বাস্তু ছিলেন এবং ইসলামের শত্রুদের গৃহে গোলামীর যিন্দেগী যাপন করতেন। কিন্তু যেই তাঁর কানে হকের পয়গাম পৌঁছলো তক্ষণি তিনি তা কবুল করতে এক মুহূর্তও চিন্তা করলেন না। এমনিভাবে তিনি সাবিকুনাল আউওয়ালুনের পবিত্র দলের শামিল হয়ে গেলেন। এটা ছিল দাওয়াতে হকের প্রারম্ভিক কাল। যে ব্যক্তিই ইসলামের নিয়ামত গ্রহণ করে নিজেকে সৌভাগ্যমন্ডিত করতেন সে-ই কাফেরদের চরম জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়ে যেতেন। তিনি বিদেশী হওয়ার কারণে বন্ধু-বান্ধবহীন ছিলেন। এ জন্য পাষাণ হৃদয় কাফেররা তাঁর ওপর নির্মমভাবে নির্যাতন চালাতো। হযরত সোহায়েব রুমী (রা) বেশ কিছুদিন যাবত তাদের নির্যাতনের শিকার হয়ে রইলেন। তিনি ইরাকের কোন এক গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। পিতার নাম ছিল সিনান বিন মালিক এবং মাতার নাম সালমা বিনতে কায়িদ। স্ব এলাকায় খান্দানটি খুব সম্ভ্রান্ত ছিল। সিনান অথবা তাঁর ভাই লবিদ ইরানের পক্ষ থেকে উবুল্লাহর শাসক ছিলেন। সোহায়েব তখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন। রোমকবাসীরা উবুল্লাহর ওপর হামলা

করে বসলো এবং অন্য মাল আসবাবের মত সোহায়েবকেও ধরে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে গেল। সুতরাং তিনি শৈশবকাল থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত রোমকদের গোলামীতে অতিবাহিত করেন। এ জন্য তিনি রুমী হিসেবে প্রসিদ্ধ হন। একবার বনু কালাবের কিছু ব্যবসায়ী সোহায়েব (রা) যে এলাকাতে গোলামীর জীবন কাটাচ্ছিলেন সেই এলাকায় গেলেন। কালাবী ব্যবসায়ীরা সোহায়েবকে (রা) রোমকদের নিকট থেকে কিনে নিলো এবং নিজেদের সঙ্গে মক্কা নিয়ে এলো। মক্কায় আবদুল্লাহ বিন জাদয়ান তাঁকে কালাবীদের নিকট থেকে কিনে নিলো।

মুসতাদরাকে হাকিমে আছে যে, ইবনে জাদয়ান তাঁকে কিনে আযাদ করে দিলেন। কিন্তু ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, সোহায়েব (রা) পালিয়ে মক্কা পৌঁছলেন এবং আবদুল্লাহ বিন জাদয়ানের সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন করলেন। বিভিন্ন কার্যকারণে মনে হয় যে, সোহায়েব (রা) একজন কৌশলী ও পরিশ্রমী মানুষ ছিলেন। তিনি যখন মক্কা আসেন তখন সম্পূর্ণরূপে কপর্দকশূন্য ছিলেন। কিন্তু এত অর্থ উপার্জন করেন যে, কয়েক বছরের মধ্যে তিনি মক্কার অন্যতম বিত্তবান হিসেবে পরিগণিত হতে লাগলেন। সেই যুগেই বিশ্বনবী (সা) দাওয়াতে হকের কাজ শুরু করলেন। আল্লাহ তায়ালা সোহায়েবকে (রা) সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। তিনি দাওয়াতে হকের কথা শুনে একদিন হযরত আরকাম (রা) বিন আবিল আরকামের বাড়ী গেলেন। রাসূলে আকরাম (সা) সেখানে কতিপয় জান-নিছারের সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন। হযরত সোহায়েব (রা) রাসূলের (সা) নিকট পৌঁছে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন। তাতে তিনি খুব খুশী হলেন।

নবী করিম (সা) বলতেন, সোহায়েব রোমের প্রথম ফল। আল্লামা ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত সোহায়েব (রা) এবং হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা) উভয়েই একই দিনে এক সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন। সে সময় পর্যন্ত শুধুমাত্র ৩০ ব্যক্তি ইসলামের সীমানায় প্রবেশ করেছিলেন।

হযরত সোহায়েব (রা) একজন বন্ধু-বান্ধবহীন বিদেশী ছিলেন। মুশরিকদের অনিষ্ট থেকে হেফাজত থাকার জন্য নিজের ইসলামকে অন্যান্যদের মত লুকিয়ে রাখতে পারতেন। কিন্তু তাঁর ঈমানী আবেগ একদিনের জন্যও ইসলামকে লুকিয়ে রাখার ব্যাপারটি সহ্য করতে পারলো না। মুশরিকদের সামনে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করে যেন ভিমরুলের চাকে হাত দিয়ে ফেললেন। এই হতভাগারা তাঁর ওপর সকল শয়তানী অস্ত্রসহ ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তাঁকে নিত্য নতুন নির্যাতন চালালো ও

নিজেদের আমোদ প্রমোদের বিষয় বানিয়ে নিল। কখনো গরম বালির ওপর শুইয়ে দিত। কখনো পানির মধ্যে চুবিয়ে ধরে রাখতো। কখনো মেরে মেরে রক্তাক্ত করে দিত। কিন্তু তিনি এক মুহূর্তের জন্যও হক থেকে বিচ্যুত হননি। মোটকথা এই ধরনের নির্যাতন সইতে সইতে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হলো। ইত্যবসরে বিশ্ব নবী (সা) সাহাবায়ে কিরামকে (রা) মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন। সুতরাং অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম (রা) নবীর (সা) হিজরতের কিছুদিন পূর্বেই মদীনা চলে গেলেন। কিন্তু সোহায়েব (রা) মক্কাতেই রয়ে গেলেন।

বায়হাকীর রেওয়ায়াত অনুযায়ী প্রিয় নবী (সা) একবার হযরত সোহায়েবের (রা) সামনে বলেছিলেন যে, তোমরা একদিন হিজর অথবা মদীনায় হিজরত করবে। সেইদিন থেকে হযরত সোহায়েব (রা) ইচ্ছা করে রেখেছিলেন যে, তিনি হিজরতের সময় বিশ্ব নবীর (সা) সঙ্গে থাকার মর্যাদা লাভ করবেন। কিন্তু পরবর্তীকালে পরিস্থিতি এমন রূপ ধারণ করলো যে, হুজুর (সা) হযরত আবু বকরের (রা) সঙ্গে গোপনভাবে হিজরত করলেন এবং হযরত সোহায়েব (রা) তাঁর সফর সঙ্গী হওয়া থেকে মাহরুম হয়ে গেলেন। তিনি যখন বিশ্ব নবীর (সা) হিজরতের কথা জানতে পেলেন তখন মক্কায় একদিন অতিবাহিত করাও তার জন্য কঠিন হয়ে পড়লো এবং মদীনা গমনের জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন। সুতরাং কিছুদিন পর তিনি সফরে রওয়ানা হলেন। কুরাইশ মুশরিকরা তাঁর ইচ্ছা সম্পর্কে জানতে পেরে (ইবনে সায়াদের রেওয়ায়াত অনুযায়ী) চারদিক থেকে হযরত সোহায়েবকে (রা) ঘিরে ধরলো এবং তাঁকে সেখান থেকে যেতে দেবে না বলে জানিয়ে দিল। হযরত সোহায়েব (রা) ধনুকের ওপর তীর রেখে হুংকার দিয়ে বললেন ঃ

"হে মক্কাবাসী তোমরা খুব ভালভাবেই অবগত আছো যে, আমার তীরের নিশানা কখনো ভুল হয় না। আল্লাহর কসম, আমার তুনিরের সকল তীর শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা আমার নিকট পৌঁছতে পারবে না। তারপরও যদি তোমাদের মধ্যে কেউ বেঁচে যায়, তাহলেও আমি তরবারী বের করবো এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমার জীবন থাকবে ততক্ষণ তোমাদের সঙ্গে লড়াই করবো। যদি নিস্তার পেতে চাও, তাহলে আমার পিছু নেয়া ছেড়ে দাও এবং নিজেদের বাড়ী ফিরে যাও।"

মুশরিকরা বললো, "তুমি যখন মক্কা এসেছিলে তখন খুব দরিদ্র ও কপদর্কশূন্য ছিলে। কিন্তু এখন তুমি এখান থেকে এত পরিমাণ ধন-সম্পদ নিয়ে যাচ্ছো, এই সম্পদ আমাদের। আমাদেরকে তা দিয়ে দাও এবং যেখানে

ইচ্ছা সেখানে চলে যাও।" হযরত সোহায়েব (রা) সকল ধন-সম্পদ তাদের সামনে ফেলে দিলেন এবং খালি হাতে মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলেন।

অন্য কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত সোহায়েব (রা) নিজের সকল ধন-সম্পদ গৃহের কোন এক স্থানে লুকিয়ে রেখেছিলেন। মুশরিকরা তাঁর পিছনে ধাওয়া করলে তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরা যদি আমার পথে বাধা না দাও, তাহলে আমি তোমাদেরকে আমার সকল সম্পদের সন্ধান দেব। মুশরিকরা তাঁর একথা মঞ্জুর করলো এবং হযরত সোহায়েব (রা) নিজের সকল পুঁজি তাদের হাওয়ালা করে দিলেন। এমনকি বাদী দু'টিও মুশরিকদেরকে দিয়ে দিলেন।

মক্কাকে এমনিভাবে বিদায় জানিয়ে হযরত সোহায়েব (রা) সোজা রহমতে আলমের (সা) খিদমতে কুবা পৌঁছলেন। সেখানেই খেজুরের মজার ঘটনা সংঘটিত হলো এবং অন্যান্য কথা হলো।

হাফেজ ইবনে কাছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলে আকরাম (সা) হযরত সোহায়েবকে (রা) দেখেই বললেন ঃ "ব্যবসায়ে সোহায়েব অনেক লাভ করেছে, ব্যবসায়ে সোহায়েব অনেক লাভ করেছে।" বস্তুত হযরত সোহায়েব (রা) কুবা পৌঁছার পূর্বেই বিশ্ব নবী (সা) ওহীর মাধ্যমে তাঁর কুরবানী ও অটলতার খবর পেয়েছিলেন "আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া" গ্রন্থে স্বয়ং হযরত সোহায়েব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, "আমি কুবায় রাসূলের(সা) খিদমতে পৌঁছলে তিনি আমাকে দেখেই বললেন, হে আবু ইয়াহইয়া তোমার এই বাণিজ্য খুব লাভজনক হয়েছে।"

আমি আরজ করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল, এখন আমার পূর্বে আপনার নিকট আর কেউ আসেনি। এই ঘটনার খবর আপনাকে নিশ্চয়ই হযরত জিবরাইল (আ) দিয়েছেন।"

হযরত সোহায়েব (রা) কুবাতে হযরত সায়াদ (রা) বিন খাইছুমা আউসীর বাড়ীতে অবস্থান করলেন। রাসূলে করিম (সা) হযরত সোহায়েবকে (রা) জালিলুল কদর সাহাবী হযরত আবু সাঈদ হারিছ (রা) বিন ছুম্মা নাজারী খাজরাজীর ইসলামী ভাই বানিয়ে দেন। যুদ্ধের সিলসিলা শুরু হলে হযরত সোহায়েব (রা) বদর থেকে তাবুক পর্যন্ত সকল যুদ্ধেই রহমতে আলমের (সা) সঙ্গী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। তীর ও তরবারী পরিচালনায় তিনি খুব নিপুণ ছিলেন। প্রতিটি যুদ্ধে নিজের বীরত্বের যথার্থতা প্রদর্শন করেছেন। আপাদমস্তক যিরাহ পরিধানকারী এমন কোন দুশমন যদি তাঁর সামনে আসতো তাহলে

তাক করে তার চোখে এমনভাবে তীর মারতেন যে, সে পিছনে উল্টে গিয়ে পড়তো। হক পথে তাঁর যুদ্ধের বড় গৌরব ছিল। বার্ধক্যকালে লোকদেরকে চারপাশে একত্রিত করে খুব মজা করে নিজের যুদ্ধের কৃতিত্বের ঘটনাবলী শোনাতেন। রহমতে আলমও (সা) হযরত সোহায়েবের (রা) ইসতিকামাত,. ইখলাস এবং জানবাজির অত্যন্ত কদর করতেন। একবার তিনি বলেছিলেন ঃ

"সোহায়েব ভাল মানুষ। সে যদি আল্লাহকে ভয় নাও করতো তাহলেও তার নাফরমানী করতো না।"

রহমতে আলম (সা) হযরত সোহায়েব (রা) এবং তাঁর মত অন্য বুজর্গদেরকে মন যোগানোর খুব খেয়াল রাখতেন। সহীহ মুসলিমের এক রেওয়ায়াতে আছে যে, একবার হযরত সোহায়েব (রা) হযরত সালমান ফারসী (রা) এবং হযরত বিলাল (রা) বিন রাবাহ কোথায়ও একত্রিত হয়ে বসেছিলেন। এমন সময় আবু সুফিয়ান (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনজন তাঁকে দেখে বললেন ঃ

"আল্লাহর তরবারী এখন পর্যন্ত আল্লাহর এই দুশমনের মাথা উড়িয়ে দেয়নি।"

হযরত আবু বকর সিদ্দীকও (রা) পাশেই কোথাও ছিলেন। তিনি বললেন ঃ

"এই ব্যক্তি কুরাইশের সরদার। তার ব্যাপারে এমন কঠিন কথা মুখ দিয়ে বের করো না।" তারপর তিনি হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে এই ঘটনা বর্ণনা করলেন। হুজুর (সা) বললেন ঃ

"তোমার বাধাদানের জন্য সম্ভবত তারা খারাপ মনে করেছেন। তাদেরকে অসন্তুষ্ট করা যেন আল্লাহকেই অসন্তুষ্ট করা।" হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) প্রিয় নবীর (সা) ইরশাদ শুনে কেঁপে উঠলেন। সেই সময়ই তিনি তিন বান্দার নিকট ফিরে এসে বললেন ঃ "প্রিয় ভাইয়েরা ! আমার কথায় তোমরা অসন্তুষ্ট তো হওনি।"

তাঁরা বললেন, "না, হে আবু বকর ! আমাদের অন্তরে তোমার বিরুদ্ধে কোন অসন্তোষ নেই। আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে ক্ষমা করুন।"

রহমতে আলম (সা) হযরত সোহায়েব (রা) ওপর এত মেহেরবান ছিলেন যে, তিনি স্বয়ং তাঁর কুনিয়াত আবু ইয়াহিয়া প্রস্তাব করেন। অথচ হযরত সোহায়েবের (রা) "ইয়াহিয়া" নামক কোন পুত্র ছিল না।

হযরত সোহায়েব (রা) যদিও বছরের পর বছর পর্যন্ত রাসূলের (সা) সুহবতের ফয়েজ হাসিল করেছিলেন, কিন্তু হাদিস বর্ণনায় তিনি সীমাহীন

সতর্ক ছিলেন। এ জন্য তাঁর থেকে বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা খুব কম। তা সত্ত্বেও মর্যাদার দিক দিয়ে তিনি অন্যতম মহান সাহাবী ছিলেন। ন্যায়ের প্রতি ভালবাসা, কঠিন অবস্থায় ধৈর্যধারণ, অটলতা, বীরত্ব, জিহাদের প্রতি উৎসাহ, সুন্দর মেজায, মেহমানদারী এবং দরিদ্র প্রতিপালন ছিল তাঁর গুণাবলী। হযরত ওমর ফারুককে (রা) তিনি সীমাহীন ভালবাসতেন এবং তিনি তাঁকে খুব সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর খিলাফতকালে হযরত সোহায়েব (রা) বিন আমর এবং কুরাইশের কতিপয় নেতা হযরত ওমর ফারুকের (রা) সঙ্গে মুলাকাতের জন্য গেলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময় হযরত সোহায়েব (রা) হযরত বিলাল (রা) এবং হযরত আম্মার (রা) বিন ইয়াসিরও সেই উদ্দেশ্যে সেখানে পৌঁছলেন। হযরত ওমর (রা) বাড়ীর ভেতর ছিলেন তাঁকে মুলাকাতের জন্য আগমনকারীদের নাম বলা হলো। তিনি সর্বপ্রথম হযরত সোহায়েব (রা), বিলাল (রা) এবং আম্মারকে (রা) ডেকে পাঠালেন। হযরত আবু সুফিয়ানের(রা) আর সহ্য হলো না। বলতে লাগলেন ঃ

"বিস্ময়ের ব্যাপার হলো যে, এসব গোলাম কালবিলম্ব না করে, সাক্ষাতের অনুমতি লাভ করে। আর আমরা অপেক্ষা করতে থাকি।"

হযরত সোহায়েল (রা) তাঁর কথায় বাধা দিয়ে বললেন ঃ

"ভাই এ জন্য তো আমরা নিজেরাই দায়ী। তাওহীদের দাওয়াত তো আমরা সকলে একই সঙ্গে পেয়েছিলাম। কিন্তু তারা তা কবুলে আগে এগিয়ে এসেছিলেন।"

এজন্য আমীরুল মু'মিনীন যদি তাদেরকে আমাদের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন, তাতে দোষের কি রয়েছে?"

হযরত ওমর ফারুক (রা) একবার হযরত সোহায়েবকে (রা) বললেন ঃ "সোহায়েব (রা) তুমি আমার প্রিয়। কিন্তু তোমার তিনটি জিনিস আমার পসন্দনীয় নয়। প্রথমত, তোমার ভাষায় আজমী ছাপ বেশী। অথচ তুমি আরবী হওয়ার দাবী করে থাকো। দ্বিতীয়ত, তুমি দয়া মায়াহীনভাবে তোমার ধন-সম্পদ ব্যয় করো। তৃতীয়ত, তুমি নিজের কুনিয়ত এক পয়গম্বরের নামে রেখেছ। প্রকৃতপক্ষে ইয়াহইয়া নামের কোন পুত্র তোমার নেই।"

তিনি বললেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন, বাস্তবিকই আমি আরব। শৈশবকালে রোমকরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মধ্যেই লালিতপালিত হয়েছি। এ জন্য আমার ভাষায় আজমী ছাপ বেশী। তাতে আমার কোন কসুর নেই। রইলো অপব্যয়ের কথা। আসল ব্যাপার হলো, আমি অপব্যয় করি না। বরং

আমার আমলের বুনিয়াদ নবী করিমের (সা) একটি ফরমান। এই ফরমানে তিনি বলেছিলেন, তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম ব্যক্তি, যে লোকদেরকে খাবার খাওয়ায় এবং সালামের জবাব দান করে। সর্বশেষ রইলো কুনিয়তের ব্যাপার। তা আমি নিজে গ্রহণ করিনি, বরং রাসূলে করিম (সা) প্রস্তাব করেছিলেন।"

তাঁর জবাব শুনে হযরত ওমর ফারুক (রা) চুপ মেরে গেলেন এবং আর কখনো এ প্রসঙ্গে কোন কথা বলেননি। হযরত সোহায়েবের (রা) যুক্তিযুক্ত জবাব হযরত ওমর ফারুককে (রা) মুতমায়েন করে দিলো।

হযরত ওমরের (রা) দৃষ্টিতে হযরত সোহায়েব (রা) অত্যন্ত মর্যাদাবান ও সম্মানিত মানুষ ছিলেন। নিজের ওফাতের পূর্বে তিনি ওসিয়ত করে ছিলেন যে, যতক্ষণ নতুন খলিফা নির্বাচিত না হবে ততক্ষণ সোহায়েব (রা) মুসলমানদের ইমামতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেবেন এবং তিনিই তাঁর জানাযার নামায পড়াবেন। সুতরাং হযরত সোহায়েব (রা) তাঁর নামাযে জানাযা পড়ালেন এবং তিনদিন পর্যন্ত মুসলমানদের ইমামত করেন।

৩৮ হিজরীর শাওয়াল মাসে হযরত সোহায়েব (রা) মদীনা মুনাওয়ারাতে ওফাত পান এবং বাকী' গোরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয়। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৭০ অথবা ৭২ বছর।

হযরত আবু আবদুল্লাহ সালেম (রা)

রহমতে আলম (সা) মদীনায় শুভ পদার্পণ করলেন। তারপর মদীনা মুনাওয়ারা হয়ে গেল ঈর্ষার শহর। মদীনাতুন নবী (সা) নবুওয়াতের নূরে জ্বল জ্বল করছিলো এবং তার গলি উপগলি রিসালাতের সুঘ্রাণে সুবাসিত হয়ে উঠেছিল। সেই যুগে একদিন প্রিয় নবী (সা) পবিত্র বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) কোন কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ফিরতে অস্বাভাবিক দেরী হচ্ছিল। ফলে প্রিয় নবী (সা) খুব বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি এ ব্যাপারে কিছু চিন্তা করছিলেন ঠিক এমন সময় উম্মুল মু'মিনীন (রা) ফিরে এলেন। হুজুর (সা) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

"আয়েশা, কোথায় এত দেরী করলে?"

উম্মুল মু'মিনীন (রা) আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমি ফিরে আসছিলাম। এমন সময় রাস্তায় একজন কারীর তিলাওয়াতে কুরআনের আওয়াজ আমার কানে এলো। সেই আওয়াজে এমন হৃদয়োত্তাপ ও প্রভাব ছিল যে, আমি তাতে মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলাম এবং মাটি আমার পা সেঁটে ধরেছিল। এ কারণেই আমার ফিরতে দেরী হয়ে গেল।"

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ "তুমি সেই কারীকে কি অবস্থায় রেখে এসেছো?"

উম্মুল মু'মিনীন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আসা পর্যন্ত সে তিলাওয়াতে মশগুল ছিল।"

হুজুর (সা) একথা শুনেই সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন এবং বাইরে চলে গেলেন। গিয়ে দেখলেন যে, সত্যি সত্যি সেই কারীর সুন্দর কিরাআত শুনে লোকজন ঠায় দাঁড়িয়ে আছে এবং গভীরভাবে মোহাবিষ্ট হয়ে তা শুনছে। এমন মনে হচ্ছিল যে, সকল সৃষ্টি যেন নিশ্চুপ হয়ে গেছে। এই অবস্থা দেখে হুজুরের (সা) পবিত্র চেহারা খুশীতে ঝলমল করতে লাগলো এবং তাঁর যবান দিয়ে বের হলে গেল ঃ "সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমার উম্মতের মধ্যে তোমার মত লোক সৃষ্টি করেছেন।"

এই ভাগ্যবান এবং মহান মার্যাদা সম্পন্ন কুরআনের কারী, যাঁর জন্য জ্বিন ও ইনসানের গৌরব (সা) গর্ব প্রকাশ করেছিলেন, তিনি ছিলেন হযরত আবু আবদুল্লাহ সালেম (রা)।

হযরত আবু আবদুল্লাহ সালেম (রা) সেই অন্যতম মহান সাহাবী ছিলেন, যাঁরা ছিলেন কুরআনে হাকিমের হাফেজ, গভীর জ্ঞান সম্পন্ন আলেম এবং কিরাআতের ইমাম। রাসূলে আকরাম (সা) বলতেন ঃ

"কুরআন শিখতে চাইলে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) আবু হোযায়ফার (রা) আযাদকৃত গোলাম সালেম (রা), উবাই (রা) বিন কা'ব এবং মায়াজ (রা) বিন জাবালের নিকট থেকে শিখো।"

চারজনের মধ্যেও হযরত সালেমের (রা) এই বিশেষ মর্যাদা ছিল। অথচ তিনি আরবী বংশোদ্ভূত ছিলেন না। বরং তিনি ইরানী ছিলেন। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা তাকে কুরআন অনুধাবনে এমন যোগ্যতা দান করেছিলেন যে, স্বয়ং রাসূলে আকরাম (সা) লোকদেরকে তাঁর নিকট থেকে কুরআন শিক্ষার উপদেশ দিয়েছিলেন।

হযরত সালেমের (রা) পিতা ও পিতামহ তথা পূর্ব পুরুষরা ইরানের আসতাখার শহরের বাসিন্দা ছিলেন। ভিন্ন মত অনুযায়ী পিতার নাম ছিল মা'কাল অথবা ওবায়েদ। সালেম (রা) মক্কা মুয়াজ্জামায় কখন এবং কিভাবে পৌঁছেছিলেন, এ ব্যাপারেও বিভিন্ন রেওয়ায়াত রয়েছে। এসব রেওয়ায়াতের সামঞ্জস্য বিধান খুব কঠিন ব্যাপার।

আল্লামা ইবনে আছির (র) "উসুদুল গাব্বাহ"তে বর্ণনা করেছেন যে, সালেম (রা) ইয়াছরাবের এক মহিলা ছবিতা (রা) বিনতে ইয়া'র আনসারীয়ার (রা) গোলামীতে মদীনা পৌঁছেন। তিনি স্বাধীন করে দিলে হযরত আবু হোযায়ফা(রা) বিন উতবা তাঁকে নিজের পুত্র বানিয়ে নেন। এমনিভাবে তার মধ্যে আনসারী ও মুহাজির দুই মর্যাদাই স্থান পায়। কিন্তু ইবনে আছির (র) এটা পরিষ্কার করেননি যে, ছবিতার গোলামী থেকে আযাদী লাভের পর হযরত সালেমের (রা) সম্পর্ক হযরত আবু হোযায়ফার (রা) সঙ্গে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি তো মক্কার সরদার উতবা বিন রবিয়ার পুত্র ছিলেন এবং সেখানেই তাঁর স্থায়ী আবাস ছিল। হিজরতের পূর্বে তাঁর মদীনা আগমনের কোন প্রমাণ নেই।

অন্যদিকে ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, ছবিতা বিনতে ইয়ার আনসারীয়া (রা) হযরত আবু হোযায়ফার (রা) স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু তিনিও এটা

বিশ্লেষণ করেননি যে, ছবিতার (রা) সঙ্গে হযরত আবু হোযায়ফার (রা) বিয়ে কবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সঙ্গেই ইবনে সায়াদ (র), ইমাম বুখারী (র), আবু দাউদ (র), হাফেজ ইবনে হাজার (র) এবং আরো কয়েকজন মুহাদ্দিসের রেওয়ায়াত থেকে একথা নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, হযরত সালেম (রা) শৈশবকালেই হযরত আবু হোযায়ফার (রা) ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং তাঁর নিকটই তিনি মক্কায় বয়োপ্রাপ্ত হন। এই প্রসঙ্গে সহীহ বুখারী এবং সুনানে আবু দাউদে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এই বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, "হযরত সালেম (রা) নিজের মুখে ডাকা পিতা হযরত আবু হোযায়ফার (রা) গৃহে স্বাধীনভাবে গমনাগমন করতেন। কিন্তু তিনি যখন জওয়ান হন এবং 'উদ'য়ুহুম লী আবায়িহিম' অর্থাৎ তাঁদেরকে তাদের পিতাদের নিসবতে ডাকো—এই নির্দেশ নাযিল হয় তখন হযরত আবু হোযায়ফার (রা) সন্দেহ জাগলো যে সালেমের (রা) স্বাধীনভাবে গমনাগমন আল্লাহর নির্দেশ বিরোধী নয়তো। সুতরাং তিনি স্ত্রী সাহলা (রা) বিনতে সোহায়েলের সামনে এই সন্দেহের কথা প্রকাশ করলেন। তিনি রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে হাজির হলেন এবং আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! সালেমকে আমরা নিজেদের পুত্র মনে করতাম এবং শৈশবকাল থেকেই সে আমাদের গৃহে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতো। কিন্তু এখন আবু হোযায়ফার (রা) নিকট তার গমনাগমন খুব কঠিন ব্যাপার বলে মনে হয়।"

হুজুর (সা) বললেন, তাঁকে নিজের দুধ খাইয়ে দাও, তাহলে সে তোমাদের জন্য মুহরিম হয়ে যাবে।" এমনিভাবে সে হযরত আবু হোযায়ফা (রা) ও সাহলার (রা) দুধ পুত্র হয়ে গেল। কিন্তু উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এই অনুমতি শুধুমাত্র সালেমের (রা) জন্য মাখসুস ছিল। নচেৎ বয়োপ্রাপ্ত অবস্থায় রিদায়াত বা দুধ খাওয়ানোর হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয় না।

ইবনে আছিরের সেই রেওয়ায়াত যদি সঠিক বলে মেনে নেয়া হয়, যে রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সালেম (রা) ছবিতা (রা) আনসারিয়ার গোলাম হয়ে মদীনা এসেছিলেন এবং আযাদ হওয়ার পর হযরত আবু হোযায়ফার (রা) অভিভাবকত্বে আসেন তাহলে এটা মানতে হয় যে, জাহেলী যুগেই ছবিতার (রা) বিয়ে হযরত হোযায়ফার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক গোলাম সালেমকে (রা) সঙ্গে নিয়ে নবীর (সা) হিজরতের কয়েক বছর পূর্বেই ইয়াসরাব থেকে মক্কা এসেছিলেন অথবা ছবিতা (রা)

তাকে আযাদ করে দিয়েছিলেন। তিনি স্বয়ং কোনভাবে মক্কা পৌঁছেন এবং সেখানে হযরত আবু হোযায়ফার (রা) অভিভাবকত্বে আসেন। আর যদি মনে করা হয় যে, হযরত আবু হোযায়ফা (রা) মদীনায় হিজরতের পর হযরত ছবিতাকে (রা) বিয়ে করেন এবং সেখানেই হযরত সালেমকে (রা) নিজের অভিভাবকত্বে নেন তাহলে অন্যান্য নেতৃস্থানীয় চরিতকারের বর্ণনা সন্দেহে পর্যবসিত হয়। [মুসতাদরাকে হাকেমের এক বর্ণনা থেকে একটি ভিন্নধর্মী অবস্থা সামনে আসে। সে অনুযায়ী হযরত সালেমের (রা) শাহাদাতের পর তাঁর সম্পত্তি ছবিতা (রা) বিনতে ইয়ারের নিকট প্রেরণ করা হয়। এ সময় তিনি তা এই বলে ফেরত পাঠান যে, সালেমকে সায়েবা আযাদ করেছিল। সায়েবার নিকট সম্পত্তি প্রেরণ করা হলে তা তিনি এই বলে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান যে, আমি সালেমকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আযাদ করেছিলাম।]

হযরত সালেম (রা) কিভাবে মক্কা পৌঁছেছিলেন সে দিকে দৃষ্টি না দিয়ে আমরা বলতে চাই যে, তিনি শৈশবকাল থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত এবং যৌবনকাল থেকে হিজরত পর্যন্ত সম্পূর্ণ সময় মক্কায় হযরত আবু হোযায়ফার (রা) নিকটই অতিবাহিত করেন। হযরত আবু হোযায়ফা (রা) তাঁকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। এমনকি তাঁকে নিজের পোষ্যপুত্র আখ্যায়িত করেছিলেন। এ জন্য তিনি জনসাধারণ্যে সালেম বিন আবু হোযায়ফা (রা) নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। সালেমও (রা) আবু হোযায়ফার (রা) জন্য জীবন বাজী রাখতেন। উভয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্কের কারণেই হযরত আবু হোযায়ফা (রা) নিজের আপন ভ্রাতুষ্পুত্রী ফাতিমা বিনতে ওয়ালিদের সঙ্গে হযরত সালেমের (রা) বিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে যখন হুকুম নাযিল হলো যে, মুখে ডাকা পুত্র আপন পুত্র হয় না এবং তাদেরকে আসল পিতার সঙ্গেই সম্বন্ধযুক্ত করো তখন লোকজন তাঁকে সালেম বিন আবু হোযায়ফার (রা) পরিবর্তে মাওলায়ে (আযাদকৃত গোলাম) আবু হোযায়ফা (রা) বলতে লাগলো।

কেবলমাত্র হযরত সালেমের (রা) গোঁফ গজাচ্ছিল ঠিক এমনি সময় ফারান গিরিপথ দিয়ে রিসালাত সূর্য উদয় হলো। যেসব হতভাগার চোখের ওপর পরদা পড়ে গিয়েছিল এবং অন্তরের ওপর কুফর এবং শিরকের তালা লেগে গিয়েছিল তারাই সেই নূরে মুবিন বা স্পষ্ট আলো থেকে চোখ বন্ধ রেখেছিল। কিন্তু ভাগ্যবান স্বভাবের ব্যক্তিত্ববর্গ আস্তে আস্তে হক দাওয়াত কবুল করতে লাগলেন।

হযরত সালেম (রা) এবং তাঁর মুরুব্বী বা অভিভাবক হযরত আবু হোযায়ফাও (রা) এসব ভাগ্যবানের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁরা নির্ভাবনায় হকের ঝাণ্ডা মজবুতভাবে আকড়ে ধরলেন। আর এমনিভাবে তাঁরা সাবিকুনাল আউওয়ালুনের পবিত্র জামায়াতের সদস্য হয়ে গেলেন। বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা) মক্কা মুয়াজ্জামায় হযরত সালেমের (রা) ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করলেন আমিনুল উম্মাহ হযরত আবু উবায়দা (রা) ইবনুল জারাহর সঙ্গে। মদীনায় হিজরতের নির্দেশ হলে তিনি হযরত আবু হোযায়ফা(রা) এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের সঙ্গে নবীর (সা) হিজরতের পূর্বেই মদীনা পৌঁছে গেলেন। মক্কায় অবস্থানকালে তিনি সকল ধরনের বাধা-বিপত্তি এবং দুঃখ মুসিবত ও নির্যাতন সত্ত্বেও নবীর (সা) ফয়েজ লাভের কোন সুযোগই হাতছাড়া হতে দেননি। সুতরাং দ্বীনী ইলমে তিনি সমুদ্রের গভীরতা লাভ করেছিলেন। ফজিলত ও কামালিয়াত, হিফজে কুরআন এবং সুন্দর কিরআতের বদৌলতে সকল সাহাবায়ে কিরামের (রা) মধ্যে তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো। বিশ্ব নবীর (সা) কুবাতে শুভাগমনের পূর্বে হযরত সালেম (রা) প্রথম মুহাজিরদের ইমামতের মার্যাদা লাভ করেছিলেন। হুজুর (সা) কুবা থেকে মদীনা তাশরীফ রাখলেন। এসময় হযরত সালেম (রা) মসজিদে কুবাতে স্থায়ীভাবে ইমামতের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে লাগলেন। সহীহ বুখারীতে আছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), হযরত ওমর ফারুক(রা), হযরত উসমান জুন্নুরাইন (রা), হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ, হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস এবং অসংখ্য অন্যান্য জালিলুল কদর সাহাবী (রা) বহুবার হযরত সালেমের (রা) ইকতিদাতে নামায পড়েছেন। আল্লাহ তায়ালা হযরত সালেমকে (রা) দাউদী কণ্ঠস্বর দান করেছিলেন। তিনি যখন খোশ লাহানে কুরআনে করিম তিলাওয়াত করতেন তখন শ্রবণকারীরা মোহাবিষ্ট হয়ে পড়তেন। স্বয়ং রাসূলে আকরাম (সা) তাঁর সুন্দর কিরআতে গৌরব প্রকাশ করতেন এবং তিনি লোকদেরকে তাঁর নিকট থেকে কুরআন শিখার উপদেশ দিতেন।

মদীনায় রাসূলে আকরাম (সা) হযরত মায়াজ (রা) বিন মায়িজ আনসারীকে হযরত সালেমের দ্বীনী ভাই বানিয়েছিলেন। তিনি হযরত সালেমের (রা) উদ্দেশ্যে সব রকমের ত্যাগের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে যুহুদ, তাকওয়া এবং মুখাপেক্ষীহীনতার অবস্থাটা এমন ছিলো যে, কখনো কোন ব্যাপারে হযরত মায়াজকে (রা) কষ্ট দেননি। বরং যা কিছু কামাই করতেন তা হক পথে খরচ করে দিতেন এবং নিজে অত্যন্ত আনন্দচিত্তে দারিদ্র ও বুভুক্ষার জীবন কাটাতেন।

হযরত সালেম (রা) ইলম ও ফজিলতের ময়দানেই শুধু নেতা ছিলেন না বরং জিহাদের ময়দানেরও বাঘ ছিলেন। বদর, ওহোদ, খন্দক এবং অন্যান্য সকল গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধেও নবী করিমের (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন এবং পূর্ণ বীরত্ব প্রদর্শন করে হুজুরের (সা) বন্ধুত্বের হক আদায় করেন। সিদ্দীকে আকবরের (রা) খিলাফতকালে তিনি মুখে ডাকা পিতা হযরত হোযায়ফার (রা) সঙ্গে ইয়ামামার ভয়াবহ যুদ্ধে শরীক হন। কতিপয় ঐতিহাসিকের মতে মুসলমানরা যত লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলেন তার মধ্যে এটা ছিল কঠিনতম যুদ্ধ। তাতে লোহায় লোহায় টক্কর ছিল। এক পক্ষে ছিলেন সেই আরব মুজাহিদবৃন্দ যারা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের জন্য লড়াই করছিলেন। বিপক্ষে ছিল সেই বিরাট সংখ্যক আরব মুরতাদ যারা গোত্রগত গোড়ামী এবং মুসায়লামা কাজ্জাবের নেতৃত্বে লড়াই করছিলো। (এরাই যখন দ্বিতীয়বার ইসলামের সীমায় এলো তখন প্রথমে উল্লেখিত মুজাহিদদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে কায়সার ও কিসরার সিংহাসন উল্টে দিয়েছিল।) এই রক্তাক্ত যুদ্ধে মুহাজিরদের ঝাণ্ডা হযরত সালেমের (রা) নিকট ছিল। একবার যখন মুরতাদদের সীমাহীন চাপে বাধ্য হয়ে মুসলমানদের পা টলটলায়মান হয়ে উঠলো তখন সালেম (রা) একটি গর্ত খুঁড়ে তাতে পা মজবুত করে দাঁড়িয়ে গলেন রবং হুংকার ছেঁড়ে বললেন ঃ

"হে মুসলমানরা! আফসোস যে, রাসূলের (সা) সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে আমরা এভাবে ময়দান ছেঁড়ে দিতাম না।" তাঁর হুংকারে মুসলমানদের টলটলায়মান পা পুনরায় মজবুত হলো। জনৈক মুজাহিদ ভুল বশত বলে ফেলেছিলেন যে, "আমরা তোমার ব্যাপারে সন্দেহ করি। তুমি এই ঝাণ্ডা অন্য কাউকে দিয়ে দাও।" একথা শুনে তাঁর আবেগ উথলে উঠলো এবং বললেন, "আমি যদি নিজেকে মুসলমানদের ঝাণ্ডা বহনকারীর যোগ্য প্রমাণিত করতে না পারি তাহলে আমার থেকে বড় বদবখত কুরআন বহনকারী আর কেউ নেই।" একথা তাঁর মুখেই ছিল ঠিক তক্ষুণি মুরতাদরা বিরাট এক হামলা করে বসলো। হযরত সালেম (রা) এত উৎসাহের সঙ্গে লড়াই করছিলেন যে, তাদের হামলার যথার্থ জবাব দিলেন। কিন্তু মুরতাদদের হামলা কোন ক্রমেই কম ছিল না। এক হতভাগা ডান হাতের ওপর পূর্ণ শক্তিতে তরবারীর আঘাত হানলো। ফলে তা কেটে দূরে গিয়ে পড়লো। তিনি ইসলামের ঝাণ্ডা বাম হাতে ধারণ করলেন। তাও কেটে গেলো। এ সময় তিনি কর্তিত হাতের দুইবাহু এক যায়গায় করে ইসলামের ঝাণ্ডা বুক দিয়ে উঁচু করে ধরলেন এবং অবলীলাক্রমে কুরআনের এই আয়াত মুখ দিয়ে বের হয়ে পড়লো ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ ۚ وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ -

"এবং মুহাম্মাদ শুধুমাত্র একজন রাসূল এবং অনেক নবী এমন ছিলেন যে, যাঁদের পক্ষে অনেক আল্লাহওয়ালা জিহাদ করেছেন।" (আলে ইমরান-১৪৪, ১৪৬)

অবশেষে তিনি মুরতাদদের তীর, তরবারী এবং বর্শার আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। অন্তিম মুহূর্তে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "আবু হোযায়ফার (রা) অবস্থা কি?" জবাব পেলেন ঃ "তিনি শাহাদাতের পেয়লা পান করেছেন।" পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ "আমার সেই মুসলমান ভাই কোথায়, যে আমার ব্যাপারে অভিযোগ করেছিল।" লোকেরা বললো, "সে ও শাহাদাতের মর্যাদায় আসীন হয়েছে।" হযরত সালেম বললেন ঃ "আমাকে তাদের দু'জনের মধ্যে দাফন করবে।"

একথা বলার পর তার প্রাণ পাখী দেহের খাঁচা থেকে উড়ে গেল। আল্লামা ইবনে আছির (র) এই রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, যখন তিনি শহীদ হন তখন তাঁর মাথা মুখে ডাকা পিতা হযরত আবু হোযায়ফার (রা) পায়ের ওপর ছিল।

হযরত সালেম (রা) শাহাদাতের সময় পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্যে একটি ঘোড়া, অস্ত্র এবং সাধারণ ধরনের মাল ও আসবাব ছাড়া কিছুই রেখে যাননি। কেননা সারা জীবন একটি নিয়মই পালন করতেন তাহলো, যা কামাই করতেন তা আল্লাহর পথে খরচ করে দিতেন। কোন সন্তান ছিল না এবং কেউই তাঁর সম্পদের দাবী করেনি। এ জন্য হযরত ওমর (রা) তা পরে বাইতুল মালে জমা করান।

হযরত সালেমের (রা) ফজিলত ও কামালিয়াত এবং সুন্দর চরিত্র হযরত ওমরের (রা) ওপর খুব প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন তখন বলেছিলেন ঃ

"আজ যদি সালেম (রা) জীবিত থাকতো তাহলে খিলাফতের জন্য আমি তাকে মনোনীত করতাম। মজলিসে শুরার প্রয়োজন হতো না।"

ফারুকে আজমের (রা) ইরশাদ থেকে হযরত সালেমের (রা) মর্যাদা ও যোগ্যতা সম্পর্কে ভালভাবেই আন্দাজ করা যায়।

হযরত তোফায়েল জুনুর (রা)

নবুওয়াত প্রাপ্তির প্রথম তিন বছর রহমতে আলম (সা) অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে তাবলীগের দায়িত্ব আঞ্জাম দিচ্ছিলেন। কিন্তু চতুর্থ বছরের শুরুতে যখন (فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ - حجر ٩٤) অর্থাৎ "তোমাকে যে নির্দেশ দেয়া হয় তা প্রকাশ্যে বর্ণনা করো এবং মুশরিকদের তরফ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও"—আল্লাহর এই ফরমান নাযিল হলো তখন তিনি প্রকাশ্যে হকের দাওয়াত প্রদান এবং শির্ক ও জাহেলিয়াতের নিন্দা করা শুরু করলেন। ফলে কুরাইশ মুশরিকদের ক্ষোভ ও ক্রোধ পূর্ণ শক্তিতে ফেটে পড়লো। সেসব মানুষ যারা বছরের পর বছর ধরে হুজুরের (সা) মহান সৃষ্টি হওয়াতে দিয়ানত, আমানত, সত্যবাদিতা ও পবিত্র নফসের প্রশংসাকারী ছিল, তারাই এখন তাঁর খুন পিপাসু হয়ে গেল। এমন কোন দুঃখ ও কষ্ট ছিল না যে তারা মানবতার কল্যাণকামী প্রিয় নবী (সা) ও তাঁর দাওয়াত গ্রহণকারীদেরকে দেয়নি। কিন্তু সকল জুলুম-নির্যাতন সত্ত্বেও যখন তারা দেখলো যে হকপন্থীদের সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধিই পেয়ে চলেছে তখন সেই হতভাগারা নবী করিমকে (সা) জাদুকর বলা শুরু করলো। অন্তরে অন্তরে অবশ্য তারা জানতো যে এটা মিথ্যা কথা। কিন্তু অজ্ঞ ও অপরিচিত মানুষ তদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতো। আর এমনিভাবে হক কবুলের সৌভাগ্য থেকে মাহরুম থাকতো। সেই যুগে মক্কার মুশরিকরা শুনতে পেলো যে, দাওসের নেতা তোফায়েল বিন আমর (বিন তোরায়েফ বিন আদ বিন ছালাবা বিন সুলায়েম বিন ফাহম বিন গানাম বিন দাওস) মক্কা আসছেন। তোফায়েল তার পূর্বেও মক্কা গমনাগমন করতেন। কিন্তু এবার তার আগমনের খবরে মুশরিকদেরকে এক আশ্চর্য ধরনের পরেশানীতে নিক্ষেপ করলো।

দাউস ছিল আরবের একটি শক্তিশালী গোত্র। ইয়েমেনের এক কোণায় একটি পাহাড়ের পাশে গোত্রটি বসবাস করতো। গোত্রবাসীরা ছিলেন সাহসী ও সচ্ছল। তারা নিজেদের বসতির পাশে একটি মজবুত দুর্গও নির্মাণ করেছিল। এ জন্য পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে তাদের খ্যাতি ছড়িয়েছিল। তোফায়েল বিন আমর দাউসী একজন সুন্দর কবি এবং মর্যাদাবান মানুষ ছিলেন। এই সঙ্গে তিনি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ও সঠিক মত প্রকাশের যোগ্যতাও রাখতেন। এই সব গুণের কারণে দাউস গোত্রে তার খুব মান-মর্যাদা ছিল। কুরাইশের মুশরিকরা যখন তার মক্কা রওয়ানার খবর শুনলেন তখন তাদের সন্দেহ হলো যে, দাউস গোত্রের এই প্রভাবশালী ও মর্যাদাবান ব্যক্তি দায়িয়ে হকের (সা) দাওয়াতে

যখন তার মক্কা রওয়ানার খবর শুনলেন তখন তাদের সন্দেহ হলো যে, দাউস গোত্রের এই প্রভাবশালী ও মর্যাদাবান ব্যক্তি দায়িয়ে হকের (সা) দাওয়াতে প্রভাবান্বিত না হয়ে যান। ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য তারা সকলেই একস্থানে বৈঠক করলো। বৈঠকে তোফায়েলকে উষ্ণ সম্বর্ধনা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হলো এবং তাঁর খাতির-যত্নের ব্যাপারে কোন ত্রুটি তাতে না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখার কথা বলা হলো। সেই সঙ্গে তাঁকে সারওয়ারে আলমের (সা) বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হলো। তারা চাইছিলো যে, তোফায়েলের নিকট রাসূলের (সা) বিরুদ্ধে এমন সব কথা বলা হবে যাতে তিনি তাঁর প্রতি ঘৃণা পোষণকারী ও তাঁর কথা শুনতে নারাজ হয়ে যান।

তোফায়েল যেই মক্কায় আবির্ভূত হলেন, তেমনি মুশরিকরা নিজেদের পরিকল্পনা মুতাবিক বুকে জড়িয়ে ধরলো। অতপর তারা বিশ্ব নবীর (সা) বিরুদ্ধে তার কান ভারী করা শুরু করলো। স্বয়ং তোফায়েল (রা) বর্ণনা করেছেন, কুরাইশের যে ব্যক্তিই আমার সঙ্গে মিলিত হতো সেই আমাকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করতো যে, "তুমি আমাদের সম্মানিত মেহমান এবং এখানকার স্থানীয় অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নও। আমরা কল্যাণ কামনার্থে তোমাকে বলে দিচ্ছি যে, আমাদের কবিলার এক ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সা) বিন আবদুল্লাহ কিছুদিন থেকে আমাদেরকে বেকায়দায় ফেলে রেখেছে। সে আমাদেরকে ব্যাকুল করে রেখেছে এবং আমাদের সকল কাজ বিশৃংখল করে দিয়েছে। তার কথা জাদুর মত প্রভাব বিস্তার করে। সে তার বক্তব্যের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী ও ভাই ভাইয়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছে। আমাদের ভয় হলো যে, তুমি আবার সেই জালে ফেঁসে না যাও। বস্তুত আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ পরামর্শ হলো, তুমি তার কোন কথা শুনো না এবং তার সঙ্গে কথাও বলো না।" কুরাইশদের কথাবার্তা আমাকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুললো। আমি আমার কানে তুলো দিয়ে রাখলাম। যাতে, হঠাৎ করে কোথায়ও যদি তাঁর (সা) সঙ্গে সাক্ষাত হয়ে যায় তাহলে তাঁর মুখ নিসৃত কোন বাণী যেন আমার কানে প্রবেশ না করে বসে।

তোফায়েল একদিন খুব ভোরে কা'বার হেরেম শরীফে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন যে, রহমতে আলম (সা) কা'বার পাশে নামায পড়ছেন। এটা জানা যায়নি যে, সেদিন তিনি কানে তুলো দিতে ভুলে গিয়েছিলেন কি না অথবা কান থেকে তুলো পড়ে গিয়েছিল কি না। নামাযে যে আয়াত হুজুর (সা) তিলাওয়াত করছিলেন তিনি তা শুনে ফেললেন। কালাম ছিল আসমান ও যমীনের স্রষ্টার। আর তা উচ্চারিত হচ্ছিল রাসূলের (সা) যবানে।

তোফায়েলের মত ভদ্র প্রকৃতির মানুষ তাতে প্রভাবিত না হয়ে কি করে থাকতে পারেন। তিনি দিল ও আত্মায় প্রশান্তি অনুভব করলেন। তিনি মনকে জিজ্ঞেস করলেন যে, "হে তোফায়েল, তুমি কেমন আহমক যে, কুরাইশের প্রতারণায় পড়ে গেছ। তোমার নিজের কি কোন জ্ঞান ও বিবেক নেই। আল্লাহ তোমাকে কবিত্বের যোগ্যতা দিয়েছেন এবং তুমি নিজে কারোর কাজের ভুল-ত্রুটি ধরতে পারো। তা হলে এমন কি জটিলতা আছে যার ফায়সালা তুমি নিজে করতে পারোনি। সেই ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত করে জেনেতো নিতে পারো যে, সে কি বলে। যদি তাঁর কথা গ্রহণযাগ্য হয় তাহলে তোমাকে তা মেনে নেয়া উচিত। তা যদি না হয়, তাহলে যবরদস্তি তো নেই।"

প্রিয় নবী (সা) যখন নামায থেকে ফারেগ হয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন তখন তোফায়েলও পিছু পিছু চললেন। যখন তাঁর (সা) আবাসস্থলে পৌঁছলেন তখন তোফায়েল তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আরজ করলেন ঃ

"জনাব! আপনার কওম বা জাতি আমার নিকট আপনার ও আপনার দাওয়াত সম্পর্কে এই এই কথা বলেছে। তাদের কথায় প্রভাবিত হয়ে নিজের কানে তুলো দিয়ে রাখি। যাতে আপনার আওয়াজ শুনতে না পাই। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে হারাম শরীফে আল্লাহ আমাকে আপনার আওয়াজ শুনিয়ে দিয়েছেন। আপনি যা কিছু পড়ছিলেন তা আমার নিকট খুব ভাল মনে হয়েছে। এখন আপনি কি চান তা যদি আমাকে একটু ব্যাখ্যা করে বলতেন।"

বিশ্ব নবী (সা) তাঁর সামনে ইসলামের সৌন্দর্যাবলী বর্ণনা করলেন এবং পুনরায় কুরআনে হাকিমের কিছু অংশ শুনালেন। আবুল ফারাজ ইস্পাহানী ইবনে কালবীর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, "এ সময় হুজুর (সা) সুরায়ে ইখলাস এবং মুয়াব্বি জাতাইন (সুরা ফালাক ও সুরা নাস) তিলাওয়াত করেছিলেন।"

প্রিয় নবীর (সা) পবিত্র মুখে এই মিষ্টি কালাম শুনে তোফায়েল মোহাবিষ্ট হয়ে পড়লেন এবং তাঁর অন্তর স্বাক্ষ্য দিল যে, এটা মানব রচিত কালাম নয়। অযাচিতভাবে তিনি বলে উঠলেন ঃ

"খোদার কসম, আজ পর্যন্ত আমি এ থেকে বেহতর কালাম শুনিনি। এবং তাঁর (সা) কথা থেকে ভাল হিকমত সম্বলিত ইনসাফের কথাও শুনিনি। আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর সত্য রাসূল এবং তাঁর দাওয়াত আমি মন ও অন্তর দিয়ে গ্রহণ করছি।"

এমনিভাবে হযরত তোফায়েল (রা) মুহূর্তের মধ্যে ইসলামের নিয়ামতে পূর্ণ হয়ে গেলেন এবং কুরাইশ মুশরিকরা তাঁকে ঈমানের সৌভাগ্য থেকে

বঞ্চিত রাখার জন্য যেসব মন্ত্রণা দিয়েছিলো তা সম্পূর্ণরূপেই অকেজো হয়ে গেল।

তোফায়েল (রা) মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় প্রিয় নবীর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার কওমের সরদার। তারা আমাকে খুব মান্য করে। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে দেশে ফিরে গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিব।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "হাঁ, তুমি নিজের কবিলাকে হকের দিকে আহবান জানাতে পার।"

তিনি পুনরায় আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! দোয়া করুন, আল্লাহ পাক আমাকে এমন কোন চিহ্ন দান করেন যাতে দাওয়াতের কাজ আমার জন্য সহজ হয়ে যায়।

মাহবুবে কিবরিয়ার (সা) দোয়া নিয়ে তোফায়েল (রা) স্বদেশ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। দীর্ঘ সফরের পর যেদিন তিনি নিজের বস্তির নিকট পৌঁছলেন তখন সূর্য ডুবে গিয়েছিল এবং সকল উপত্যকা অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। রাস্তার দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে উঁচু থেকে ঢালুর দিকে গিয়ে দাউস বসতির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। গাঢ় অন্ধকারে অনুপযোগী পাহাড়ী রাস্তায় নীচের দিকে উট নিয়ে যাওয়া খুব কঠিন কাজ ছিল। সে সময় এক আশ্চর্য ধরনের ঘটনা সংঘটিত হলো। তোফায়েল (রা) যেই নীচের দিকে রুখ করলেন তাঁর মুখমণ্ডল জ্যোতিস্মানের মত আলোকিত হয়ে উঠলো এবং তা থেকে বিচ্ছুরিত আলোকমালা চারপাশের ময়দান আলোকিত করে ফেললো। "ইসতিয়াব" গ্রন্থের প্রণেতা হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) লিখেছেন যে, তোফায়েল (রা) সে সময় স্বপ্নোত্রের প্রত্যেক বাড়ী দেখছিলেন। এ ছিল রহমতে আলমের (সা) দোয়ার প্রভাব। জানা যায়নি যে, সে সময় তোফায়েলের (রা) অন্তরে কি খেয়াল এসেছিল। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে দোয়ার হাত উঠালেন এবং আকাশের দিকে মুখ করে বললেন ঃ

"হে আল্লাহ! মুখমণ্ডলে নয়, অন্য কোন স্থানে এই চিহ্নকে স্থানান্তর করে দিন।"

একথা তাঁর মুখেই উচ্চারিত হচ্ছিল ঠিক এমন সময় আলো সেই লাঠিতে স্থানান্তরিত হয়ে গেল যা তাঁর হাতে ছিল। তারপর যখন তিনি রাস্তা অতিক্রম করছিলেন তখন সেই লাঠি মশালের কাজ দিচ্ছিল। এটা ছিল সেই চিহ্ন যার কারণে তিনি ইতিহাসে "জুন্নুর" উপাধিতে মশহুর হয়েছিলেন।

শ্রান্ত ও ক্লান্ত অবস্থায় বাড়ী পৌঁছে কারোর সঙ্গে কথাবার্তা না বলে তৎক্ষণাৎ শুয়ে পড়লেন। সকাল হলে তাঁর বৃদ্ধ পিতা সাক্ষাতের জন্য এলেন। তোফায়েল (রা) তাঁকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"পিতা আমার! আমার থেকে দূরে থাকুন। আপনার সাথে এখন আমার কোন সম্পর্ক নেই।

পিতা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "কেন পুত্র, কি হয়েছে?" তিনি জবাব দিলেন "আমি ইসলাম কবুল করেছি। এবং মুহাম্মাদের (সা) দ্বীনের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছি।"

পিতাও খুব নেক স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তিনি কোন কঠিন জবাব না দিয়ে কাল বিলম্ব না করে বললেন ঃ "যে দ্বীন তোমার, আমারও সেই একই দ্বীন।"

আনন্দে তোফায়েলের (রা) চেহারা আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন ঃ "ঠিক আছে, আপনি তাহলে গোসল করে পবিত্র কাপড় পরিধান করুন এবং আমার নিকট আসুন।"

তিনি যখন গোসল করে এবং কাপড় পরিবর্তন করে দ্বিতীয়বার পুত্রের নিকট এলেন তখন তোফায়েল (রা) তাঁকে ইসলামের তালকিন দিলেন এবং মক্কায় তার অবস্থান ও হুজুরের (সা) সঙ্গে তার মুলাকাতের বিবরণ দিলেন। তিনি প্রথমেই পুত্রের সমর্থনের ইকরার করেছিলেন। এখন তিনি নির্ভাবনায় কালেমায়ে শাহাদাত পড়ে নিলেন এবং দ্বীনে হকের ঝাণ্ডাবাহীদের মধ্যে শামিল হয়ে গেলেন। তারপর স্ত্রীর পালা এলো। তোফায়েল (রা) তাঁকেও সেই একই কথা বললেন যা পিতাকে বলেছিলেন। তিনি বললেন ঃ "প্রাণাধিকে, আমি কি অপরাধ করেছি যে, তুমি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ।"

তিনি বললেন, "ইসলাম আমার এবং তোমার মধ্যে বিচ্ছিন্নতার যোজন সৃষ্টি করে দিয়েছে। আমি হলাম মুসলমান আর তুমি মুশরিক। আমার ও তোমার সম্পর্ক কি করে থাকতে পারে।"

স্ত্রীও ভাগ্যবতী ছিলেন। তৎক্ষণাৎ বললেন ঃ "আমিও তোমার দ্বীন গ্রহণ করছি। কিন্তু আমাকে একটু বলো যে, তা কি।"

তোফায়েল (রা) বললেন ঃ "প্রথমে মা'বাদে জুশ শারাতে (দাউস গোত্রের মূর্তির নাম) গমন কর। তার পুকুরে গোসল কর এবং পবিত্র কাপড় পড়ে আমার নিকট এসো।" গোত্রের প্রথা অনুযায়ী সেই ইবাদাতখানায় ঢোকার অর্থই হলো নিজের ধ্বংস ডেকে আনার নামান্তর। স্বামীর আজগুবী কথা শুনে স্ত্রী ভয় পেয়ে গেলেন এবং বলতে লাগলেন ঃ "আমি তোমার কথা অনুযায়ী

কাজ করলে যদি জুশ শারা আমাকে এবং আমাদের সন্তানদেরকে ক্রোধ ও ক্ষোভের নিশানা বানিয়ে নেয়।"

তোফায়েল (রা) উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন ঃ "ভাল, মূর্তি কি আবার কোনদিন কাউকে লাভ-লোকসান বা ক্ষতি করতে পারে। সে তো নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কেই কিছু জানে না। তুমি যাও। কোন খটকা ছাড়াই গোসল কর। পরিণামের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি।"

তিনি গেলেন এবং গোসল করে এলেন। তখন তোফায়েল (রা) তাঁকে বিস্তারিতভাবে ইসলামের তালকিন দিলেন এবং তিনিও ইসলাম গ্রহণ করলেন। এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী তোফায়েলের (রা) মাতাও একইভাবে ইসলামের সীমানায় প্রবেশ করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

অতপর হযরত তোফায়েল (রা) নিজের কবিলাকে দ্বীনে হকের দিকে আহবান জানানো শুরু করলেন। কিন্তু তার অব্যাহত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দাউসবাসী তাঁর দাওয়াত গ্রহণের জন্য এগিয়ে এলো না। ইবনে কালবী বর্ণনা করেছেন, তাঁর রাত-দিন প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে দাউসের শুধুমাত্র এক ব্যক্তি মুসলমান হলো। তিনি তার নামের কথা উল্লেখ করেননি। কিন্তু কতিপয় আলেম মত প্রকাশ করেছেন যে, ইসলাম গ্রহণকারী এই ব্যক্তি ছিলেন হযরত আবু হুরায়রা (রা)।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, দাউস গোত্রে যিনা বা অবৈধ যৌন সঙ্গমের বহুল প্রচলন ছিল। পক্ষান্তরে ইসলাম যিনাকে খুব কঠোরভাবে হারাম করেছে। এ জন্য তারা ইসলামের প্রতি আগ্রহী হতো না। কয়েক মাসের জীবনপাত চেষ্টা সত্ত্বেও যখন কোন ফল হলো না তখন হযরত তোফায়েল (রা) খুব মনঃকষ্ট পেলেন এবং মক্কা গিয়ে রহমতে আলমের (সা) খিদমতে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার কওম খুব নীচ এবং লম্পট। আমি সব ধরনের চেষ্টা করেছি। কিন্তু তারা হক গ্রহণে এগিয়ে আসেনি। আপনি তাদের হেদায়াতের জন্য দোয়া করুন।" অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, তোফায়েল (রা) হুজুরের (সা) নিকট দাউস গোত্রের জন্য বদ দোয়ার আবেদন জানালেন।

প্রিয় নবী (সা) ছিলেন সৃষ্টির সেরা। তোফায়েলের (রা) কথা শুনে তিনি হাত উঠালেন এবং দোয়া করলেন ঃ আল্লাহুম্মা ইহদি দাউসান "হে আল্লাহ, দাউসকে হেদায়াত দাও।" অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি এ সময় "এবং তাদের ওপর রহমত বর্ষণ কর" একথাও বলেছিলেন।

তারপর তিনি তোফায়েলকে (রা) বললেন ঃ "যাও এবার গিয়ে নিজের কবিলাকে খুব নরম ও মুহাব্বাতের সঙ্গে পুনরায় হকের দাওয়াত দাও।"

একথার পর তোফায়েল (রা) স্বগোত্রে ফিরে গেলেন এবং তাবলিগ শুরু করলেন। লোকজন তাঁর কথা অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে শুনলো। ধীরে ধীরে তারা খারাপ ও ফাহেশা কাজের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে ইসলামের প্রতি আগ্রহী হতে লাগলেন। অতপর হাদিয়ে আকরামের (সা) দোয়ার প্রভাব এই হলো যে, কিছু দিনের মধ্যেই দাউসের বেশ কিছু পরিবার ইসলাম গ্রহণের মর্যাদায় অভিষিক্ত হলেন।

সহীহ মুসলিমে আছে যে, যে সময় দাউস গোত্র ইসলামের মহান নিয়ামতে অভিষিক্ত হচ্ছিলেন সে সময় মক্কায় হকপন্থীদের ওপর কাফেরদের নির্যাতন চরম আকার ধারণ করেছিল। জুলুম-নির্যাতন ও পরীক্ষা-নীরিক্ষার এই যুগে হযরত তোফায়েল (রা) মক্কা এলেন এবং সারওয়ারে আকরামের(সা) খিদমতে হাজির হয়ে তাঁকে তাদের দুর্গে তাশরীফ নেয়ার জন্য দরখাস্ত করলেন। দাউসের প্রতিটি শিশু জীবন দেবে তবুও আপনার ওপর কোন আঁচর লাগতে দেবে না। হুজুর (সা) হযরত তোফায়েলের (রা) নিষ্ঠাপূর্ণ আবেগের প্রশংসা করলেন। কিন্তু কিছু বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সে সময় মক্কা ত্যাগ করা পসন্দ করলেন না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ইচ্ছাই তাই ছিল। কেননা রাসূলের (সা) মেযবানীর মর্যাদা আল্লাহ পাক আনসারদের তকদিরে লিখে রেখেছিলেন। হুজুরের (সা) জবাব শুনে তোফায়েল (রা) স্ব গোত্রে ফিরে গেলেন এবং আগের মতই সার্বিকভাবে তাবলিগ ও ইসলাহ'র কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এমনিভাবে কয়েক বছর অতিবাহিত হলো।

ইত্যবসরে হুজুর (সা) হিজরত করে মদীনা তাশরীফ নিলেন এবং বদর, ওহোদ ও খন্দকের যুদ্ধও অতীত হলো।

সম্ভবত মাতা-পিতার খিদমতের কারণে অথবা অন্য কোন কারণে তোফায়েল (রা) সপ্তম হিজরীর পূর্বে মদীনা যেতে পারেননি। সেবছর প্রিয় নবী (সা) খায়বার যুদ্ধে তাশরীফ নিলেন। এ সময় তোফায়েল (রা) দাউসের ৭০-৮০টি পরিবারসহ তাঁর খিদমতে হাজির হলেন এবং নিজের সঙ্গীদেরসহ অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে যুদ্ধে অংশ নিলেন। আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত তোফায়েলের (রা) ইচ্ছানুযায়ী হুজুর (সা) দাউসী মুজাহিদদেরকে খায়বারের ওপর হামলাকারী সৈন্যের দক্ষিণ দিকে মোতায়েন করলেন। তোফায়েল (রা) এবং তাঁর সঙ্গীরা মক্কা বিজয় পর্যন্ত হুজুরের (সা)

সঙ্গে ছিলেন। হযরত তোফায়েল (রা) বর্ণনা করেছেন যে, "এই সময় হুজুর (সা) আমাদের ওপর খুব দয়া প্রদর্শন করেছিলেন।"

মক্কা বিজয়ের পর তিনি মহানবীর (সা) নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে স্বগোত্রে ফিরে গেলেন এবং পুনরায় তাবলীগে মশগুল হয়ে পড়লেন। মক্কা বিজয় সকল আরববাসীকে ইসলামের প্রতি আসক্ত করে তুললো। এবার কয়েক দিনের মধ্যেই চারশ' ব্যক্তি হযরত তোফায়েলের (রা) হাতে ইসলাম কবুল করলেন। তোফায়েল (রা) তাদের সবাইকে নিয়ে তায়েফের যুদ্ধে রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে হাজির হলেন এবং খুব তৎপরতার সঙ্গে যুদ্ধে অংশ নিলেন। তারপর তিনি হুজুরের (সা) ওফাত পর্যন্ত মদীনায় অবস্থান করলেন এবং রাসূলের (সা) নিকট থেকে সামর্থ অনুযায়ী ফরেজ লাভ করলেন।

আল্লামা ইবনে সায়্যাদ (র) তাবকাতে লিখেছেন যে, মক্কা বিজয়ের পর হযরত তোফায়েল (রা) রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে আরজ করলেন যে, "তাঁর গোত্রে তখন পর্যন্ত একটি মূর্তিখানা রয়েছে। তাতে জুল কাফফাইন নামক একটি মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। দাউসের যারা ঈমানের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত রয়েছে তারা খুব উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে মূর্তিটির পূজা করে থাকে। হুজুর (সা) যদি অনুমতি দেন তাহলে সেই ভূতখানা মিসমার করে দিতে পারি।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "হ্যাঁ, ভূতখানাটি ধ্বংস করে দাও।"

সুতরাং হযরত তোফায়েল (রা) নিজের গোত্রের কতিপয় মুসলমানের সঙ্গে গেলেন এবং ভূতখানা বা মন্দিরটি ধ্বংস করে মূর্তিটিতে আগুন লাগিয়ে দিলেন। সে সময় তিনি একটি কবিতা পাঠ করছিলেন। তার ভাবার্থ হলো ঃ

"হে জুলকাফফাইন! আমি তোমার পূজারী নই। তোমার জন্মের পূর্বে আমার জন্ম। আমি তোমার অন্তরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছি।"

তায়েফের যুদ্ধের সময় তিনি হুজুরের (সা) খিদমতে উপস্থিত হয়ে জুলকাফফাইন ধ্বংসের কাহিনী বর্ণনা করলেন। তা শুনে তিনি খুব খুশী হলেন।

মহানবীর (সা) ওফাতের পর আরবে ধর্মদ্রোহিতার ফিতনার আগুন জ্বলে উঠলো। এ সময় হযরত তোফায়েল (রা) পূর্ণ অটলতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করলেন এবং এই ফিতনা নির্মূলে খুব তৎপরতা প্রদর্শন করলেন। মুসায়লামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে যখন অভিযান প্রেরণ করা হলো তখন তিনি তাতে খুব উৎসাহের সঙ্গে

অংশ নিলেন এবং ইয়ামামার যুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে হক পথে নিজের জীবন কুরবান করে দিলেন।

চরিত গ্রন্থসমূহে হযরত তোফায়েলের (রা) জীবনী সম্পর্কে আর কিছু পাওয়া যায় না। সন্তানদের মধ্যে শুধুমাত্র একপুত্র আমরের (রা) নাম জানা যায়। তিনিও মুরতাদদের উৎখাতের জন্য অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। ধর্মদ্রোহিতার ফিতনা যখন শেষ হলো তখন সিরিয়া গমনকারী মুজাহিদদের দলে শামিল হয়ে গেলেন এবং ইয়ার মুকের যুদ্ধে যথার্থ বীরত্ব প্রদর্শন পূর্বক শাহাদাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হন।

হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজ

খন্দকের যুদ্ধে (পঞ্চম হিজরী) সমগ্র আরবের ইসলামের শত্রুরা ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামের কেন্দ্রের ওপর চড়াও হয়েছিল। বিশেষ করে মদীনা মুনাওয়ারার অভ্যন্তরে বনু কোরায়জার ইহুদীরা আস্তিনের সাপ বা কপটবন্ধুর ভূমিকা পালনের জন্য কোমর বেঁধে ছিল। হকপন্থীদের জন্য এটা ছিল বিরাট এক পরীক্ষার ব্যাপার। কিন্তু তাদের অন্তরে হক পথে জীবন বিলিয়ে দেয়ার আকাংখা উদ্বেলিত হচ্ছিল। অবস্থাটা এমন ছিল যে, কারোর ধৈর্যে বা স্থৈর্যে সামান্যতম পদস্খলনও ঘটেনি এবং আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতায় তারা এই পরীক্ষায় সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হন ঃ

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ط

"আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের মুখ ফিরিয়ে দিলেন, তারা কোন স্বার্থ লাভ না করেই মনে জ্বালা-যন্ত্রণা নিয়ে ফিরে গেল।" (আল আহযাব- ২৫)

হকের শত্রুদের ভীত সন্ত্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তাওহীদ পন্থীরা ন্যায়-সঙ্গতভাবেই খুব খুশী হলেন। কিন্তু কার জানা ছিল যে, এক মাস পরই তাদের ওপর দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে। আর এই দুঃখও এমন যে, "ইয়াওমে ওহুদের" ক্ষতও হেরে যাবে। কিন্তু যা ঘটার তা ঘটেই থাকে। সেটা ছিল পঞ্চম হিজরীর জিলকদ মাসের এক শোকার্ত দিন। শোক বিহবল চোখগুলো দেখতে পেল যে, মসজিদে নববীতে সারওয়ারে আলম (সা) বসে রয়েছেন এবং নুরানী চেহারা, দোহারা ও লম্বাদেহী এক ব্যক্তি তাঁর পবিত্র উরুর ওপর মাথা রেখে স্থায়ী নিদ্রায় শায়িত রয়েছেন। হুজুরের (সা) চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে সিদ্দীকে আকবার (রা) এলেন এবং এ হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখে চীৎকার দিয়ে ওঠেন। সঙ্গে সঙ্গে অবলীলাক্রমে তাঁর মুখ দিয়ে বের হয়ে যায় "হায়, আমার কোমর ভেঙ্গে গেছে।" হুজুর (সা) বলেন, "আবু বকর, এ ধরনের বলো না।" ওদিকে হযরত ওমর ফারুকও উপস্থিত ছিলেন। প্রচুর কান্নাকাটির কারণে তাঁর গলাও ধরে এসেছিল এবং তিনি বার বার "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পাঠ করছিলেন। অন্য সাহাবীরাও (রা) কঠিন দুঃখে অস্থির ছিলেন। সেই স্থায়ী নিদ্রায় শায়িত ব্যক্তির জানাযায় এমন মর্যাদার সাথে রওয়ানা হয় যে, তাতে স্বয়ং রহমতে আলম(সা)

সহ আল্লাহর হাজার হাজার পবিত্র বান্দাহ শামিল ছিলেন। তারা পালাক্রমে জানাযা কাঁধে নিচ্ছিলেন। একদিক থেকে আওয়াজ আসছিল যে, লাশ তো একদম হাল্কা। হুজুর (সা) বলছিলেন, "হ্যাঁ, জানাযা ফেরেশতারা বহন করছে।" ওদিকে বাকী' গোরস্তানে আবু সাঈদ খুদরী (রা) কবর খুড়ছিলেন এবং বলছিলেন ঃ

"আল্লাহর কসম, আমি কবর থেকে মিশকের সুঘ্রাণ পাচ্ছি।"

লাশ দাফন শেষে হুজুর (সা) ফিরে এলে প্রত্যক্ষদর্শীরা হতভম্ব হয়ে দেখলো যে মুহসিনে ইনসানিয়াত হাদিয়ে বরহক (সা) যেন দুঃখ ও শোকের এক প্রতিচ্ছবি হয়ে গেছেন। দাড়ি মুবারক হাতে ধরা অবস্থায় রয়েছেন এবং চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে গড়িয়ে তা ভিজিয়ে দিচ্ছে।

অতপর প্রিয় নবীর (সা) মুখ দিয়ে উচ্চারিত হলো ঃ "মৃত ব্যক্তির মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠলো। আকাশের দরজা তার রূহের জন্য প্রশস্ত করে দেয়া হলো এবং সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জানাযায় শরীক হলেন।" এ সময় আখিরাতের পথে রওয়ানাকারী রাসূলের সেই সাহাবীর আত্মীয়-স্বজনও গোত্রবাসীরা অনুভব করলেন যে, তাদের ক্ষতের ওপর আরামদায়ক পট্টি বেঁধে দেয়া হয়েছে—নিসন্দেহে মৃত ব্যক্তির ওপর ছোট্ট কেয়ামত নেমে এসেছে। কিন্তু এ সময় তিনি যে অক্ষয় মর্যাদায় বিভূষিত হলেন তা তুলনাহীন।

সেই মহান মর্যাদার রাসূলের সাহাবী, যাঁর মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল, তিনি কে ছিলেন? তিনি ছিলেন আউস সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজ আনসারী। তাঁর সৌভাগ্য ও মহান মর্যাদার জন্য তার গোত্রের লোকজন এই ভাষায় গর্ব প্রকাশ করতেন ঃ "কোন মৃত ব্যক্তির মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেনি। কিন্তু সায়াদ আবি আমরের মৃত্যুতে তা হয়েছিল।"

মদীনার আউস গোত্রের শাখা বনু আবদুল আশহালের সরদার—এই আবি আমর সায়াদ (রা) বিন মুয়াজ (বিন নু'মান বিন ইমরাউল কায়েস বিন যায়েদ বিন আবদুল আশহাল) তিনিই তো ছিলেন যিনি এই কয়েক বছর আগেও নিজের গোত্র সমেত কুফর ও শিরকের অন্ধকারে পথভ্রষ্ট ছিলেন। ফারান পর্বত শীর্ষে রিসালাত সূর্য উদিত হয়েছিল এবং তার আলোকচ্ছটা মদীনার কতিপয় স্থানেও আলোকোজ্জ্বল করেছিল। কিন্তু সায়াদের (রা) অন্তরপ্রদেশ তখনো গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। প্রিয় নবীর (সা) মদীনায় শুভাগমনের দেড় বছর পূর্বে একদিন তিনি শুনলেন যে, মক্কার এক কুরাইশ (রাসূলে আকরাম(সা))

নিজের এক ব্যক্তিকে মদীনা প্রেরণ করেছে। আর সেই ব্যক্তি তার খালাতো ভাই আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ খাজরাজীর বাড়ীতে অবস্থান করছে এবং মদীনার গোত্রসমূহকে নিজের পৈত্রিক ধর্ম থেকে বিচ্যুত করে কুরাইশ ব্যক্তিটির দ্বীন গ্রহণের দাওয়াত প্রদানে ব্যস্ত রয়েছেন। একথা শুনে সায়াদের(রা) রক্ত টগবগিয়ে উঠলো। কিন্তু আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক চুপ মেরে রইলেন।

রাসূলে করিমের (সা) এই দায়ী ছিলেন হযরত মুসায়াব (রা) বিন উমায়ের। হুজুর (সা) তাঁকে ইসলামের শিক্ষা প্রদান ও প্রচারের জন্য সেসব নেকবখত ইয়াছরাবীর আবেদনে মদীনা প্রেরণ করেছিলেন যাঁরা বাইয়াতে উকবায়ে উলায় ইসলামের মহান নিয়ামতে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। পুনরায় যখন একদিন এক ব্যক্তি এসে সায়াদ (রা) বিন মুয়াজকে খবর দিল যে, মুসয়াব (রা) এবং আসয়াদ (রা) স্বয়ং তাঁর কবিলা বনু আশহালের একটি বাগানে বসে লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করছে তখন তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। নিজের চাচার পুত্র উসায়েদ (রা) বিন হুজায়েরকে ডেকে বললেন ঃ

"উসায়েদ, তুমি কেমন অলসতায় ভুগছো। দেখ, এই দুই ব্যক্তি আমাদের ঘরে ঢুকে লোকদেরকে বিপথগামী করছে। তুমি যাও এবং তাদেরকে খুব কঠোরভাবে নিষেধ করো যে, তারা যেন ভবিষ্যতে আর আওসের মহল্লায় না আসেন।"

উসায়েদ (রা) খুব বড় একজন বাহাদুর ছিলেন। তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে বর্শা উঠালেন এবং একাকী মারক কূপের দিকে অগ্রসর হলেন। সেখানেই মুসয়াব (রা) এবং আসয়াদ (রা) বসেছিলেন। আসয়াদ (রা) উসায়েদকে সে দিকে আসতে দেখে মুসয়াবের (রা) কানে বললো, "ইনি হলেন আবদুল আশহালের দুই বড় সরদারের একজন। তিনি যদি দ্বীনে হক কবুল করে নেন তাহলে আমরা খুব শক্তিশালী হবো। খুব ভালভাবে চেষ্টা করে দেখ, তিনি কুফুরীর পাঁক থেকে বের হয়ে আসেন কিনা।"

উসায়েদ (রা) নিকটে এসেই হকের প্রতি আহবানকারীদের ওপর গর্জে উঠলো। তাঁর কণ্ঠস্বরে ছিল কর্কশতা। হযরত মুসয়াবকে (রা) সম্বোধন করে বললেন ঃ

"তোমরা আমাদের লোকদেরকে বেওকুফ বানাচ্ছো। যদি নিজেদের ভাল চাও, তাহলে কাল বিলম্ব না করে এখান থেকে ফিরে যাও এবং আর কখনো আমাদের মহল্লার দিকে আসবে না।"

হযরত মুসয়াব (রা) তাঁর ক্রোধোন্মত্ত কথাবার্তা খুব ধৈর্যের সঙ্গে শুনলেন এবং অত্যন্ত নরম স্বরে বললেন ঃ

"প্রিয় ভাই! আপনি কিছুক্ষণ বসে আরামের সাথে আমার কথা শুনুন। যদি পসন্দ হয় তাহলে কবুল করে নিন। নচেত প্রত্যাখ্যান করুন।"

হযরত মুসয়াবের (রা) ধৈর্যপূর্ণ কথাবার্তা উসায়েদের (রা) ক্রোধের ওপর পানির ছিটার কাজে এলো এবং তিনি বর্শা মাটিতে গেড়ে একথা বলতে বলতে বসে পড়লেন ঃ "ঠিক আছে, কি বলার আছে তা বলো।" হযরত মুসয়াব (রা) খুব হৃদয়গ্রাহীভাবে ইসলামের নীতিমালা বর্ণনা করলেন এবং পুনরায় কুরআনে করিমের কতিপয় আয়াত পাঠ করলেন। উসায়েদ (রা) এই আয়াত শুনে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন ঃ

"এই দ্বীন কত সুন্দর এবং এই কালাম কত উঁচু ধরনের। ভাই, আমাকেও তোমাদের দ্বীনে ঢুকিয়ে নাও।"

হযরত মুসয়াব (রা) তাঁকে গোসল করা এবং পবিত্র কাপড় পরিধানের নসিহত করলেন এবং অতপর তাঁকে কালেমায়ে শাহাদাত পড়ালেন। যা তাঁর ইসলাম গ্রহণের প্রকাশ্য ঘোষণা ছিল। মুসলমান হওয়ার পর উসায়েদ (রা) বললেন ঃ

"আরো এক ব্যক্তি রয়েছেন। তিনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তাহলে সমগ্র কবিলা তার অনুসরণ করবে। আমি তাকে তোমার নিকট প্রেরণ করছি।"

উসায়েদ (রা) সোজা সায়াদ (রা) বিন মুয়াজের নিকট পৌঁছলেন এবং সায়াদকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "সেখানে তো আরো কথা হয়ে থাকে। আপনার স্বয়ং সেখানে যাওয়া প্রয়োজন।"

সায়াদ (রা) উসায়েদের (রা) চেহারা দেখে এবং তাঁর কথা শুনে বলে উঠলো ঃ "আল্লাহর কসম, এতো সেই চেহারা নয়। যা এখান থেকে যাওয়ার সময় ছিল।"

তিনি খুব ক্রোধান্বিত হলেন এবং নিযাহ উঠিয়ে খুব দ্রুততার সঙ্গে রওয়ানা হলেন। বাগানে পৌঁছে মুসয়াব (রা) এবং আসয়াদকে (রা) খুব ইতমিনানের সঙ্গে বসা অবস্থায় পেলেন। তিনি একদম হঠাৎ করে তাঁকে গালি দিয়ে বলতে লাগলেন ঃ "উসায়েদের দিয়েতো কিছু হলো না। কিন্তু তোমরা প্রকাশ্যে আমাদের মহল্লাতে এ ধরনের আকীদা-বিশ্বাসের কথা প্রচার করবে তা আমি কোন ক্রমেই সহ্য করতে পারি না। আবু উমামা [হযরত আসয়াদের (রা)

কুনিয়ত) আত্মীয় না হলে আমি তোমার সঙ্গে খুব কঠোর ব্যবহার করতাম। তুমি এই সাহস পেলে কোথায়?"

আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ সায়াদের খালাতো ভাই এবং খাজরাজ গোত্রের নাজ্জার খান্দানের সরদার ছিলেন এবং সায়াদের (রা) কথায় দমে যাওয়ার পাত্র ছিলেন না। কিন্তু তিনি এ সময় অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে এবং খুব শান্ত ও নরম স্বরে বললেন, "ভাই, একটু বসে শোনোতো এই ব্যক্তি কি বলেন। তাঁর কথা যদি তোমার পসন্দ হয় তা হলে ভাল কথা । নচেত তোমার স্বাধীনতা রয়েছে।"

তাঁর কথায় সায়াদ (রা) বসে পড়লেন। হযরত মুসয়াব (রা) তাঁর নিকটও ইসলামের সৌন্দর্যাবলী বর্ণনা করলেন এবং পুনরায় কুরআনে করিম শুনালেন। আল্লাহ তায়ালা উসায়েদের মত তাঁকেও নেক স্বভাব দান করেছিলেন। তাঁর পরিষ্কার অন্তর কুরআনে করিম শুনতেই ঈমানের নূরে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে গেলেন। নিজের কবিলাতে ফিরে সমগ্র বনু আবদুল আশহালকে একত্রিত করে বলতে লাগলেন ঃ

"তোমাদের নিকট আমি কেমন মানুষ?"

জবাব এলো, "আপনি আমাদের সরদার এবং আমাদের সকলের চেয়ে বুদ্ধিমান ও বেশী সমঝদার।" সায়াদ (রা) বললেন ঃ "তাহলে তোমরা পুনরায় শুনে নাও যে, আমি দ্বীনে হক কবুল করেছি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরাও একক আল্লাহ এবং তার বাছাইকৃত রাসূলের (সা) ওপর ঈমান না আনবে ততক্ষণ তোমাদের সঙ্গে আমার কথা বলা হারাম।"

নিজের খান্দানে হযরত সায়াদের (রা) সীমাহীন প্রভাব এবং প্রতিপত্তি ছিল। তাঁর ঘোষণা শুনেই বনু আবদুল আশহালের বেশীর ভাগ সদস্যই তক্ষুণি ইসলামের নিয়ামত গ্রহণ করলেন এবং যারা অবশিষ্ট রইল তারা সন্ধ্যা হতে হতেই মুসলমান হয়ে গেলেন এবং দীনার গলিকুচা তাকবির ধ্বনিতে গুঞ্জরিত হয়ে উঠলো। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজ হযরত মুসয়াবকে (রা) নিজের মেহমান বানিয়ে নিলেন। নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে কাজে লাগিয়ে সমগ্র কবিলাকে একই দিনে ইসলামের সীমানাভুক্ত করে নেয়া হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজের এক অনন্য কৃতিত্ব ও মর্যাদা। এই কৃতিত্ব ও মর্যাদার সমকক্ষ আর কেউ নেই। এমনিভাবে হযরত সায়াদের (রা) ইসলাম গ্রহণ ইসলামের ইতিহাসে এক অসাধারণ ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। হযরত সায়াদের (রা) এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে রাসূলে আকরাম (সা) তাঁর খান্দান বনু আবদুল আশহালকে আনসারের দু'টি সর্বোত্তম পরিবারের

মধ্যে একটি পরিবার হিসেবে আখ্যায়িত করতেন। অন্য পরিবার ছিল বনু নাজ্জারের। তার মর্যাদা ছিল প্রথম।

নবীর (সা) হিজরতের পর হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজ রাসূলে করিম(সা) এবং মুহাজির সাহাবীদের (রা) খিদমত ও সহযোগিতা প্রশ্নে কোন ত্রুটি করেননি। তিনি প্রায়ই রহমতে আলমের (সা) খিদমতে হাজির হতেন এবং সামর্থ অনুযায়ী নবীর (সা) ফয়েজ লাভ করতেন। ইবনে ইসহাক (র) বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর (সা) আমিনুল উম্মাত হযরত আবু উবায়দা (রা) ইবনুল জারাহ'র সঙ্গে তাঁর ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু ওবায়দার(রা) ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক হযরত আবু তালহা আনসারীর (রা) সঙ্গে স্থাপিত হয়েছিল। অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এই রেওয়ায়াতও খুব শক্তিশালী নয়। প্রকৃতপক্ষে হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের ব্যাপারে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যায় না। অবশ্য এটা প্রমাণিত যে, তিনি নিজের কবিলা সমেত মুহাজিরদের খিদমতে সবসময় অগ্রগামী ছিলেন। একদিন রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে হাজির ছিলেন। এমন সময় ইসলামের মশহুর দুশমন মক্কার সরদার উমাইয়া বিন খালফের আলোচনা শুরু হলো। হুজুর (সা) বললেন যে, এই ব্যক্তি একদিন সেসব মজলুম মুসলমানের হাতে মারা যাবে যাদেরকে সে রাতদিন নির্যাতন চালাতো। উমাইয়ার সঙ্গে হযরত সায়াদের (রা) খুব দূরের সম্পর্ক ছিল। সে যদি কখনো মদীনা আসতো তাহলে তাঁর নিকটই অবস্থান করতো। সুতরাং তিনি তার সম্পর্কে হুজুরের (সা) ইরশাদকে নিজের মস্তিষ্কে হেফাজত করে রাখলেন। কিছুদিন পর তিনি ওমরার জন্য মক্কা গেলেন। এসময় জানা-শোনা থাকার কারণে তিনি উমাইয়ার বাড়ীতেই অবস্থান নিলেন। তিনি উমাইয়াকে বললেন যে, তাওয়াফকারীদের ভিড় থেকে হেরেম যখন খালি হবে তখন যেন তাঁকে খবর দেয়া হয়। সুতরাং একদিন দুপুরের সময় খানায়ে কা'বা যখন মূর্তিপূজারীশূন্য দৃষ্টিগোচর হলো তখন উমাইয়া তাঁকে খবর দিল এবং সে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তাওয়াফের জন্য চললো। পথিমধ্যে আবু জেহেলের সামনাসামনি হয়ে গেলো। নতুন চেহারা দেখে উমাইয়াকে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার সাথে লোকটি কে?" সে জবাব দিল, সায়াদ (রা) বিন মায়াজ। আওসের সরদার।"

আবু জেহেলের জাহেলী ধমনি নেচে উঠলো এবং সে হযরত সায়াদকে(রা) সম্বোধন করে বললো, "আশ্চর্য যে, তোমরা নিজেদের নিকট

বিধর্মীদের (মুসলমান) আশ্রয় দিয়ে রেখেছ। অথচ তুমি এখানে মক্কায় নির্ভয়ে চলা ফেরা করছো। তোমার সঙ্গে যদি উমাইয়া না থাকতো তাহলে আমি দেখে নিতাম যে তুমি কি করে এখান থেকে বেঁচে ফিরে যাও।"

হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজের দ্বীনী সম্ভ্রমবোধ উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। গর্জন করে বললেন ঃ "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাকে একটু বাধা দিয়েই দেখো। আমি যদি তোমার মদীনার রাস্তা বন্ধ না করে দিই তাহলে আমার নাম সায়াদ নয়।" কথা বেড়ে যাচ্ছিল দেখে উমাইয়া মাঝখানে বলে উঠলেন, "এই সায়াদ! কি বলছো। এতো আবুল হাকাম। মক্কার সরদার। তার সঙ্গে নরম স্বরে কথা বলো।"

হযরত সায়াদ (রা) কখন চুপ মেরে থাকার লোক ছিলেন। তিনি বললেন, "যাও, বসো। আমি রাসূলে সাদেক ও আমিনের (সা) নিকট থেকে শুনেছি যে, একদিন মুসলমানরা তোমাকে হত্যা করবে।" উমাইয়া একথা শুনে কেঁপে উঠলো এবং বললো, "মক্কা এসে মারবে কি?" তিনি বললেন, "আমি তা জানি না।"

এই কথোপকথনের পর কেউই আর তাঁর সঙ্গে বাদানুবাদ করেনি এবং তিনি ওমরা করে ভালভাবেই মদীনা ফিরে এলেন।

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে পরামর্শের জন্য হুজুর (সা) সকল মুহাজির (রা) ও আনসারকে(রা) একত্রিত করলেন এবং সকল অবস্থা তাদের সামনে রাখলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা) এবং হযরত মিকদাদ(রা) বিন আমর (রা) এ সময় অত্যন্ত উদ্দীপনাময় বক্তৃতা দিলেন এবং তাঁরা হক পথে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দেবেন বলে রাসূলকে (সা) আশ্বাস দিলেন। এই তিনজনই ছিলেন জানবাজ মুহাজির। রাসূলে করিম (সা) আনসারদের ইচ্ছাও জানতে চাইছিলেন। কেননা বাইয়াতের সময় তাঁরা মদীনার বাইরে গিয়েও দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন এমন প্রতিশ্রুতি দেননি। মুহাজিরদের বক্তৃতার পর (অন্য এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী বললেন, এখন অন্যরাও পরামর্শ দিন) আওসের সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজ হুজুরের ইঙ্গিত বুঝে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন এবং অত্যন্ত উদ্দীপনাময় কণ্ঠে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল—আমরা আপনার ওপর ঈমান এনেছি এবং আপনার রিসালাতের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছি। আপনার আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছ। অতএব, আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন। সর্বশ্রেষ্ঠ রবের কসম, যিনি আপনাকে রাসূল বানিয়ে প্রেরণ করেছেন। আপনি যদি আমাদেরকে সমুদ্রে

লাফিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন তাহলে আমরা লাফিয়ে পড়বো। এ ব্যাপারে আমাদের একজনও পিছিয়ে থাকবে না। ইনশাল্লাহ আপনি আমাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে অটল পাবেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের পক্ষ থেকে আপনার চোখকে ঠাণ্ডা করুন।"

হযরত সায়াদের (রা) জিহাদের উৎসাহ এবং আত্মোৎসর্গের আবেগ দেখে হুজুরের (সা) পবিত্র চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। যখন সৈন্য সাজানো হলো তখন হুজুর (সা) আউসের ঝাণ্ডা হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজকে নিজের পবিত্র হাত দিয়ে প্রদান করলেন।

বদরের যুদ্ধে হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজ উমাইয়া বিন খালফের ব্যাপারে রাসূলে আকরামের (সা) ভবিষ্যদ্বাণীকে নিজের চোখ দিয়ে পূর্ণ হতে দেখেছিলেন। পরাজয়ের পর মুশরিকদের মধ্যে চরম বিশৃংখলা দেখা দিল। এ সময় উমাইয়া এবং তার পুত্র আলী হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফের হাতে গ্রেফতার হয়ে গেল। তিনি তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। হযরত বিলাল(রা) বিন রাবাহ তা দেখে ফেললেন। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "হে মুসলমানরা! এ হলো মুশরিকদের দলপতি উমাইয়া বিন খালফ। দেখো, বেঁচে যেন না যায়।" তাঁর আওয়াজ শুনে মুসলমানরা উমাইয়া এবং আলী বিন উমাইয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং মুহূর্তের মধ্যে উভয়কেই জাহান্নামে প্রেরণ করলো।

ওহোদের যুদ্ধের পরামর্শ বৈঠকে হুজুর (সা) নিজের মত প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, মদীনার সীমায় থেকেই শত্রুকে প্রতিহত করা হোক। কিন্তু ইসলামের যুবকদের অন্তরে শাহাদাতের আকাংখা ধিকি ধিকি জ্বলছিল। তাদের অধিকাংশই মদীনা থেকে বাইরে বেরিয়ে মুকাবিলা করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। হুজুর (সা) তাদের কথা মেনে নিলেন এবং অস্ত্র পরিধানের জন্য পবিত্র ঘরের মধ্যে তাশরীফ নিলেন। হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজ এবং উসায়েদ (রা) হুজায়ের লোকদেরকে লজ্জা দিলেন। তাঁরা বললেন, তোমরা অন্যায়ভাবে হুজুরের (সা) মতের বিরোধিতা এবং তাঁকে বাইরে যাওয়ার জন্য বাধ্যকরেছ। হতে পারে হুজুরের (সা) রায় ছিল ওহির ভিত্তিতে। উচিত হবে হুজুর (সা) বাইরে বেরিয়ে এলে তোমাদের কথা ফিরিয়ে নেয়া।

হুজুর (সা) যখন যিরাহ পরিধান করে তরবারী এবং ঢাল লাগিয়ে পবিত্র ঘর থেকে বাইরে তাশরীফ আনলেন, তখন সকলেই লজ্জা প্রকাশ করে আরজ করলেন ঃ

"কোন অবস্থাতেই আমরা হুজুরের (সা) বিরোধিতা করাকে অনুমোদন করবো না। আপনি মদীনার বাইরে যাবেন না। আমরা এখানেই আপনার বন্ধুত্বের হক আদায় করবো।"

হুজুর (সা) বললেন, "নবী যখন কোন কাজের ইরাদা করে ফেলেন তখন তা পূরণ করে ছাড়েন। এখন অস্ত্র খুলতে পারেন না।"

এই যুদ্ধে হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজ নবীর (সা) বাসস্থান রক্ষার দায়িত্ব পেলেন। তার চেয়েও বড় সৌভাগ্য তিনি লাভ করেছিলেন। পরাজয় ও বিশৃংখলার সময় তিনি সেই কতিপয় সাহাবীর (রা) একজন ছিলেন যারা যুদ্ধের ময়দানে শেষ পর্যন্ত অটল থেকে বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। এই যুদ্ধে তাঁর সহোদর আমর (রা) বিন মুয়াজ শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন।

ওহোদের যুদ্ধের সময় এক আশ্চর্য ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়। এই ঘটনা সায়াদ (রা) বিন মুয়াজের জন্য সুন্দর বিস্ময় এবং আবদুল আশহাল খান্দানের মান-মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হয়। এই ঘটনা প্রায় সকল মুহাদ্দিসই বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত সায়াদ(রা) বিন মুয়াজের অনুসরণে তাঁর গোত্র একই দিনে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাঁর খান্দানের এক ব্যক্তি আমর বিন ছাবিত আশহালী হযরত সায়াদের (রা) কথা অস্বীকার করলো এবং নিজের পিতৃ পুরুষের ধর্মের ওপর কঠোরভাবে অটল থাকে। হযরত সায়াদ (রা), হযরত উসাইদ (রা) এবং খান্দানের অন্যান্য সদস্য তাঁকে ইসলাম গ্রহণের জন্য খুব উৎসাহ দেন। কিন্তু তিনি তা মানেননি। ওহোদের যুদ্ধে রাসূলে আকরাম (সা) সাহাবীদের সঙ্গে মদীনা থেকে বাইরে তাশরীফ নিলেন। সে সময় আমর বিন ছাবিত বাইরে কোথায়ও ছিলেন। বাড়ী ফিরে দেখতে পেলেন যে, মহল্লা সুনসান পড়ে রয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, লোকজন কোথায় গেছে? জবাব এলো, "রাসূলের (সা) সঙ্গে ওহোদ গেছে।" একথা শুনে মনে খুব উৎসাহ সৃষ্টি হলো। যিরাহ পরলেন। শিরস্ত্রান মাথার ওপর রাখলেন। অস্ত্র দিয়ে দেহ সুসজ্জিত করলেন এবং ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ওহোদের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। নবীর (সা) নিকট হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "যুদ্ধ মনে হয় লেগে গেছে। বলুন, প্রথমে ইসলাম কবুল করবো না আপনার সমর্থনে লড়াই করবো?"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "উভয় কাজই করো। প্রথমে ইসলাম গ্রহণ কর, এবং অতপর আল্লাহর পথে লড়াই কর।"

আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি এক রাকায়াত নামাযও পড়িনি। যুদ্ধে যদি শেষ হয়ে যাই তাহলে কি আমার মাগফিরাত হবে?"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "হ্যাঁ, ইসলাম গ্রহণের পূর্বেকার সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা বড়ই গাফুরুর রাহীম।" একথা শুনে সে সময়ই তিনি কালেমায়ে শাহাদাত পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। এদিকে যুদ্ধের ময়দান

গরম হয়ে উঠলে তিনি তরবারী হাতে যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছলেন। বনু আবদুল আশহাল তাঁর কঠোর অন্তর সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। তাঁকে নিজেদের ব্যূহে দেখে তারা উত্তেজিত হয়ে উঠলো এবং তাঁকে সেখান থেকে চলে যেতে বললো। তারা বললো যে, তাদের কাফেরের সাহায্যের প্রয়োজন নেই। আমর (রা) কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন যে, "আমি মুসলমান হয়ে গেছি। অতপর তিনি কাফেরদের ব্যূহে ঢুকে পড়লেন এবং এমন বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করলেন যে, কাফেরদের মুখ ভোঁতা হয়ে গেল। শেষে বহু সংখ্যক মুশরিক তীড় করে ধরে তাঁকে গুরুতর ভাবে আহত করলো। এবং তিনি অস্থির হয়ে মাটির ওপর পড়ে গেলেন। লড়াইয়ের পর বনু আবদুল আশহালের লোকজন নিজেদের শহীদ ও আহতদের উঠাতে লাগলেন। এ সময় তাঁর ওপরও নজর পড়লো। তখনো কোন রকম শ্বাস প্রশ্বাস চলছিলো। তারা জিজ্ঞাসা করলো, "জাতীয় মর্যাদা কি তোমাকে এখানে টেনে এনেছে? তিনি বললেন, "না, আমি মুসলমান হয়ে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের জন্য লড়াই করেছি।" এই অবস্থাতেই তাকে উঠিয়ে ঘরে আনা হলো। সমগ্র বনু আবদুল আশহালেই এই খবর ছড়িয়ে পড়লো। এ সময় আমরের (রা) (আসিরমের) ঈমান গ্রহণের সৌভাগ্য লাভের খবরে হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজের বিস্ময় মিশ্রিত আনন্দ অনুভব হতে লাগলো। তৎক্ষণাৎ তাঁর বাড়ী তাশরীফ নিলেন এবং আসিরমের (রা) সহোদরার নিকট থেকে সকল ঘটনা শুনলেন। ইত্যবসরে আসিরম (রা) আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারের দিকে যাত্রা করেছেন। হুজুর (সা) যখন এই খবর শুনলেন তখন বললেন ঃ "সে আমল খুব কমই করেছে। কিন্তু ছওয়াব বা প্রতিদান বেশী পেয়েছে।"

এই ঘটনা হযরত সায়াদের (রা) খান্দান আবদুল আশহালের মান-মর্যাদা আরও তুঙ্গে তুলে দিল। সাহাবায়ে কিরামের (রা) যখনই এই ঘটনা স্মরণ হতো তখন পরস্পরকে জিজ্ঞেস করতেন, সেই ব্যক্তি কে ছিলেন যিনি এক ওয়াক্ত নামাযও পড়েননি অথচ সোজা জান্নাতে গিয়েছেন? এই প্রশ্নের জবাব মিলতো, "তিনি হলেন, আসিরাম (রা) আবদুল আশহাল।"

খন্দকের যুদ্ধও এমন এক পরীক্ষামূলক যুদ্ধ ছিল যে, তাতে মু'মিন ও মুনাফিক, দোস্ত এবং দুশমনের মধ্যে স্পষ্ট ভেদ রেখা টেনে দিয়েছিল। মুনাফিকরা মুসলমানদেরকে হিম্মতহারা করে দেয়ার জন্য কোমর বেঁধে লেগেছিল। অন্যদিকে মু'মিনরা কবিতা পাঠ করতে করতে খন্দক বা পরিখা খননের কাজে মশগুল হয়ে গিয়েছিল।

হুজুর (সা) এই নাযুক সময়ে বনু গাতফানের লুটেরাদেরকে অন্য মুশরিকদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করার মানসে তাদের সরদারদেরকে ডেকে সন্ধির আলোচনা শুরু করে দিল। তারা ফিরে যাওয়ার জন্য শর্ত আরোপ করে বললো যে, মদীনাবাসী যদি তাদের উৎপাদিত ফলের এক-তৃতীয়াংশ দিয়ে দেয় তাহলে তারা ফিরে যেতে পারে। হুজুরের (সা) ধারণা ছিল যে, যদি এই শর্তে সিদ্ধান্ত হয়ে যায় তাহলে মদীনাবাসী নিজেদের গাতফানী প্রতিবেশীর লুট তরাজ থেকে মাহফুজ হয়ে যাবে। তা সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত মূলক কথা বলার পূর্বে তিনি এই শর্ত সম্পর্কে আনসারদের সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন বলে মনে করলেন। আউস সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজ এবং খাজরাজ সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদা উভয়েই আরজ করলেন। "হে আল্লাহর রাসূল আপনি যা বলছেন তা আল্লাহর নির্দেশ। এই নির্দেশ পালনে আমরা বাধ্য, না হুজুর (সা) আমাদেরকে বাঁচানোর জন্য এই প্রস্তাব দিচ্ছেন।"

হুজুর (সা) বললেন, "এটা আল্লাহর নির্দেশ নয়, বরং তোমাদের ওপর মুশরিকদের চাপ কমানোর জন্য এ ধরনের করছি। কেননা সমগ্র আরব ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমাদের ওপর হামলা করে বসেছে।"

একথার পর উভয় সরদারই এক বাক্যে আরজ করলেন "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি শুধু আমাদেরকে বাঁচানোর জন্য এই চুক্তি করতে চান তাহলে আমাদের নিবেদন হলো যে, এই শর্ত আপনি কোনক্রমেই মেনে নিবেন না। বনু গাতফান আমাদের নিকট থেকে সেই সময়ও খেজুরের একটি আঁটি পর্যন্ত খিরাজ হিসেবে নিতে পারেনি । তখন তো আমরা মুশরিক ছিলাম। এখন আমরা যখন আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের ওপর ঈমান আনার মর্যাদা লাভ করেছি তখন তারা আমাদের নিকট থেকে কি খিরাজ নেবে! আমাদের ও তাদের মধ্যে এখন শুধু তরবারীই সিদ্ধান্ত নেবে।

হুজুর (সা) তাঁদের ঈমানী জযবায় এত প্রভাবিত হলেন যে, বনু গাতফানের সরদারদেরকে পরিষ্কার জবাব দিয়ে দিলেন। যুদ্ধের সময় একদিন হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজ যিরাহ পরিধান করে হাতে বর্শা নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে রওয়ানা হলেন। রাস্তায় বনু হারিছার গর্তের মধ্যে তাঁর মাতা কাবশা (রা) বিনতে রাফে' এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) পাশা পাশি বসে ছিলেন। সে সময় তিনি যুদ্ধ গাথা পড়তে পড়তে তাঁদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলেন যুদ্ধ গাথাটির মর্মার্থ হলো : "সামান্য সময়ের জন্য দাঁড়াও, যুদ্ধের ময়দানে আমার সওয়ারীকে পৌঁছতে দাও। যখন মৃত্যুর সময় এসে যাবে তখন মৃত্যু যে কত ভাল তা জানা যায়।" এই গাথা শুনে তাঁর মা

উচ্চৈস্বরে বললেন "পুত্র, দৌড়ে যাও, তুমি অনেক দেরী করে ফেলেছ।" ঘটনাক্রমে যে হাতে বর্শা ছিল তা যিরাহর বাইরে বেরিয়ে ছিল। উম্মুল মু'মিনীন (রা) বললেন, "সায়াদের মা, হায়! সায়াদের যিরাহ যদি একটু লম্বা হতো। তাঁর হাত বাইরে বের হয়ে আছে।" উম্মুল মু'মিনীনের (রা) আশংকা সঠিক বলে প্রমাণিত হলো। হযরত সায়াদ (রা) যখন যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছলেন তখন হাব্বান বিন আবদি মান্নাফ নামক একজন মুশরিক যে ইবনুল আরকা নামে মশহুর ছিলো তাক করে তাঁর খোলা হাতের ওপর তীর নিক্ষেপ করলো। এই তীর হযরত সায়াদের (রা) একটি শিরা কেটে গেল। ফলে প্রচণ্ডভাবে রক্তপাত হতে লাগলো।

হুজুরের (সা) পবিত্র কানে ইবনে আরকার কথা পৌঁছলো এবং তিনি হযরত সায়াদের আহত হওয়ার কথা শুনে বললেন, "আল্লাহ তোর অর্থাৎ ইবনে আরকার চেহারা আগুনে ঝলসে দেবেন।" যুদ্ধের পর হুজুরে আকরাম(সা) হযরত সায়াদের (রা) জন্য মসজিদে নববীর চত্বরে একদিকে তাঁবু স্থাপন করালেন এবং চিকিৎসক হযরত রাফিদা আসলামিয়াকে তাঁর সেবা ও চিকিৎসার জন্য নিয়োগ করলেন। হুজুর (সা) স্বয়ং প্রতিদিন তার শুশ্রূষার জন্য তাশরীফ আনতেন। রহমতে আলম (সা) নিজের পবিত্র হাত দিয়ে তাঁর ক্ষতস্থানে দাগ দিলেন। ফলে রক্ত বেরোনো বন্ধ হয়ে গেল। তা সত্ত্বেও তিনি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হলেন না। অসুস্থ থাকা অবস্থাতেই তিনি একদিন আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ! কুরাইশদের সঙ্গে যুদ্ধের সিলসিলা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে আমাকে আরো সময় দিন। আমি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার আকাংখা পোষণ করি। এসব কুরাইশই তো তোমার রাসূল বরহকের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে, মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেছে। আর যদি যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে থাকে তাহলে এই ক্ষত থেকেই আমাকে শাহাদাত নসিব করুন। অবশ্য আমাকে সে সময় পর্যন্ত জীবিত রাখুন, যে সময় পর্যন্ত বনু কোরাজার ব্যাপারে আমার মন মুতমায়িন না হয়ে যায়।" আল্লাহ তায়ালা তাঁর দোয়ার শেষ অংশ কবুল করলেন। বনু কোরায়জার ইহুদীরা যুদ্ধকালে চরম গাদ্দারী করেছিল। তারা মুসলমানদের সঙ্গে কৃত মিত্রতার চুক্তি "আমাদের ও মুহাম্মাদের (সা) মধ্যে কোন চুক্তি নেই" এই বলে ভেঙ্গে ফেলেছিল। তারা মুসলমানদের পিঠে খঞ্জর ঢুকিয়ে দেয়ার জন্য দুই হাজার নিযাহ, দেড় হাজার তরবারী, দেড় হাজার ঢাল এবং তিনশ' যিরাহ জমা করে রেখেছিল। আল্লাহ তায়ালা যদি তাদের এই অপকর্ম সময়মত বন্ধ করে না দিতেন তাহলে তারা মুসলমানদের অপূরণীয় ক্ষতি করতে পারতো। খন্দকের যুদ্ধের পর হুজুরে আকরাম (সা) আল্লাহর নির্দে

অনুযায়ী বনি কোরায়জার মহল্লা অবরোধ করে নিলেন এবং তাতে এত কঠোরতা অবলম্বন করলেন যে, কিছুদিন পরই তারা একটি শর্তে অস্ত্র সমর্পণ করলো। শর্তটি ছিল যে, তাদের ব্যাপারে আউস সরদার সায়াদ (রা) বিন মুয়াজ যে সিদ্ধান্ত দেবে তা উভয় পক্ষই মেনে নেবে। এই গাদ্দাররা হযরত সায়াদকে (রা) এই আশায় সালিশ মেনে ছিল যে, তিনি তাদেরকে সম্মান করবেন। কেননা আউস ও বনু কোরায়জা গোত্র দীর্ঘ দিন যাবত পারস্পরিক মিত্রতার সম্পর্ক বজায় রেখেছিল। হুজুর (সা) হযরত সায়াদকে(রা) ডেকে পাঠালেন। তিনি অসুস্থ অবস্থাতেই গাধা অথবা খচ্চরের ওপর সওয়ার হয়ে ঘটনাস্থলে পৌছলেন। হুজুর (সা) তাঁকে দেখে আনসারদেরকে সম্বোধন করে বললেন, "নিজেদের সরদারের সম্মানের জন্য উঠে দাঁড়াও।" অতপর হুজুর (সা) ইহুদীদের প্রতি ইঙ্গিত করে হযরত সায়াদকে (রা) বললেন, এরা তোমার সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করছে। তিনি আরজ করলেন" তাহলে আমি এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, তাদের লড়াইকারী সকল পুরুষকে হত্যা করতে হবে। মহিলা এবং শিশুদেরকে গোলাম বানিয়ে নিতে হবে এবং তাদের সহায় সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে।"

হুজুর (সা) বললেন, "সায়াদ তুমি আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক ফায়সালা করেছ।"

সুতরাং এই ফায়সালার ওপর আমল করা হলো বনু কোরায়জার এক একজন যুদ্ধবাজ গাদ্দারকে তাঁর সামনে হত্যার পর তিনি সেখান থেকে ফিরে এলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কিছুদিন পর হযরত সায়াদের (রা) অসুস্থতা গুরুতর রূপ নিলো। দাগ দেয়ার পর তাঁর হাতের ক্ষত থেকে রক্ত প্রবাহিত হওয়াতো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু হাত ফুলে গিয়েছিল। একদিন তার সে ক্ষত (নিজে নিজেই অথবা একটি ছাগলের খুর লাগার ফলে) এমনভাবে ফেটে গেল যে তা দিয়ে অঝোর ধারায় রক্ত প্রবাহিত হতে লাগলো। এ কারণে তাঁর মৃত্যু কষ্ট শুরু হয়ে গেল। হুজুর (সা) এই খবর পেয়ে অস্থির হয়ে মসজিদে পৌঁছলেন। সে সময় হযরত সায়াদের (রা) পবিত্র রূহ এই নশ্বর জগৎ ছেড়ে চলে গিয়েছিল। হুজুর (সা) হযরত সায়াদের (রা) মৃত্যুতে খুব দুঃখ পেলেন এবং নিজের জান নিছার ও মাহবুব সাহাবীর লাশ পবিত্র কোলে নিয়ে বসে গেলেন। অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, রহমতে আলম (সা) যখন হযরত সায়াদের (রা) তাঁবুতে পৌঁছলেন তখনো তার শ্বাস-প্রশ্বাস চলছিল। হুজুর (সা) তাঁর মাথা নিজের পবিত্র উরুর ওপর রেখে বললেন। "হে আল্লাহ! সায়াদ (রা) তোমার রাস্তায় অনেক কষ্ট স্বীকার করেছে। সে তোমার রাসূলকে

(সা) সত্য রাসূল হিসেবে মেনে নিয়েছিল এবং ইসলামের হকসমূহ আদায় করে নিয়েছে। হে আল্লাহ! তার রূহের সঙ্গে সেই ধরনের ব্যবহার করো যেমন ব্যবহার নিজের বন্ধুদের রূহের সঙ্গে করে থাকো।"

হযরত সায়াদ (রা) হুজুরের (সা) আওয়াজ শুনে চোখ খুললেন এবং আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ বলে নিজের মাথা রাসূলের (সা) উরু থেকে সরিয়ে নিলেন [সে সময়ও হুজুরের (সা) আদব খেয়াল ছিল।] এরপর হুজুর (সা) তাঁকে মসজিদ থেকে তাঁর বাড়ীতে স্থানান্তর করিয়ে দিলেন। কয়েক মুহূর্ত পর সেখানেই তিনি ওফাত পেলেন। হযরত সায়াদের (রা) মৃত্যুতে মদীনা মুনাওয়ারাতে শোকের ছায়া নেমে এলো। যেই শুনলো সেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। এমনকি বড় বড় জালিলুল কদর সাহাবীও নিজেদেরকে আয়ত্তে রাখতে পারলেন না এবং অসহায়ভাবে কাঁদতে লাগলেন। হযরত সায়াদের (রা) মা হযরত কাবশা (রা) সে সময় কেঁদে কেঁদে বিলাপমূলক কবিতা পড়ছিলেন। এই কবিতা নিজের পুত্রের সীমাহীন প্রশংসা বাক্য ছিল। হুজুর (সা) বললেন! "ক্রন্দনকারী (বিলাপকারী) যত মহিলা আছে তারা মিথ্যা বলে থাকে, কিন্তু উম্মে সায়াদ (রা) সত্য বলে থাকেন।" জানাযা এবং দাফনের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত সায়াদের (রা) প্রতি বনু আবদুল আশহালের কেমন গভীর ভালবাসা ছিল তার আন্দাজ একটি ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়। হযরত সায়াদের (রা) ওফাতের বেশ কিছু দিন পর একবার রাসূলে আকরাম (সা) সাহাবায়ে কিরামের (রা) সঙ্গে সফর করছিলেন। হযরত উসায়েদ (রা) বিন আশহালীও তার সফর সঙ্গী ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি খবর পেলেন যে, তাঁর স্ত্রী ওফাত পেয়েছেন। এই খবরে এত কষ্ট পেলেন যে, মুখের ওপর কাপড় দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বললেন, "আপনি একজন জালিলুল কদর সাহাবী হয়ে একজন মহিলার জন্য এভাবে কাঁদছেন।" একথা শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ চুপ মেরে গেলেন এবং মুখের ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে বললেন, "উম্মুল মু'মিনীন, আপনি সত্যি বলেছেন। আমাদের শুধু সায়াদ (রা) বিন মুয়াজের জন্য কাঁদা উচিত।" প্রিয় নবী (সা) এই সকল কথা শুনছিলেন।

হযরত সায়াদ (রা) মৃত্যুকালে দুই পুত্র রেখে যান। আমর (রা) এবং আবদুল্লাহ (রা) উভয়েই সাহাবী ছিলেন এবং দু'জনেরই বাইয়াতে রিদওয়ানে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য লাভ ঘটেছিল।

হযরত সায়াদের (রা) পিতা মুয়াজ আইয়ামে জাহেলিয়াতে মারা গিয়েছিলেন। মা কাবশা বিনতে রাফে নবীর (সা) হিজরতের কিছুদিন পূর্বে

ইসলাম গ্রহণপূর্বক সাহাবিয়া হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তিনি আনসারদের ফকিহ হযরত আবু সাঈদ খুদরীর (রা) চাচাতো বোন ছিলেন । হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজের ওফাতের পর তিনি অনেকদিন জীবিত ছিলেন।

হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজ শুধুমাত্র পাঁচ বছর রাসূলে আকরামের (সা) বরকতপূর্ণ সাহচর্যে থাকার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি নিজের দ্বীনী খিদমত, কুরবানী এবং রাসূল প্রেমের বদৌলতে এত উঁচু মর্যাদা লাভ করেছিলেন যে, বড় বড় জালিলুল কদর সাহাবী তাঁর প্রতি ঈর্ষা করতেন । সকল নেতৃস্থানীয় চরিতকার এ ব্যাপারে একমত যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) মত বিশ্ব নবীর (সা) প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ইশকের দরজা পর্যন্ত পৌছেছিল। তিনি হুজুরের (সা) নিকট থেকে যে হাদিস শুনতেন তা আল্লাহর তরফ থেকে আসার ব্যাপারে স্থির বিশ্বাস রাখতেন। এ জন্য তাঁকে আনসারের সিদ্দীকে আকবার মনে করা হতো। হুজুরও (সা) হযরত সায়াদকে (রা) সীমাহীন ভালবাসতেন এবং তাঁকে সম্মানও করতেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলে আকরামের (সা) পর বনু আবদুল আশহালে সায়াদ (রা) বিন মুয়াজ, উসায়েদ (রা) বিন হুজায়ের এবং উবাদ (রা) বিন বাশারের যে মর্যাদা লাভ ঘটেছিল অন্য কেউই তার সমকক্ষ হতে পারেননি।

হযরত সায়াদের (রা) ওফাতের পর একবার হুজুরের (সা) নিকট কোথাও থেকে রেশমের একটি জুববা এলো। লোকজন এত নরম রেশম দেখে বিস্মিত হচ্ছিলেন। হুজুর (সা) বললেন, "তোমরা এই নরম দেখেই বিস্মিত হচ্ছো। অথচ জান্নাতে সায়াদ (রা) বিন মুয়াজের রুমাল তার থেকেও বেশী নরম এবং মোলায়েম।"

আরো একবার হুজুর (সা) বলেছিলেন, "কবরের অপ্রশস্ততা থেকে যদি কেউ নাজাত বা পরিত্রাণ পেতো তাহলে সে সায়াদ (রা) বিন মায়াজ হতো।" স্বয়ং হযরত সায়াদ (রা) একবার নিয়ামত বর্ণনা হিসেবে বলেছিলেন যে, "এমনিতে আমি একজন সাধারণ মানুষ। কিন্তু তিনটি ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা আমাকে নিজের বিশেষ ফজিলতে ভূষিত করেছেন। প্রথম কথা হলো, হুজুরের (সা) প্রতিটি হাদিসকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে বলে মনে করি। দ্বিতীয় ঃ নামাযে কোন ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হয় না। তৃতীয় ঃ জানাযার সঙ্গে যখন গমন করি তখন মুনকার নাকিরের সওয়ালের প্রতি খেয়াল থাকে।"

পাঁচ বছরের কম সময়ে সত্যবাদিতা ও ইয়াকিনের এই দরজায় পৌঁছানো এবং পয়গাম্বরীর আখলাকে উত্তরণ নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার বিশেষ ফজিলতের কারণেই সম্ভব হয়েছিল। সত্য কথা হলো, হযরত সায়াদের (রা) পবিত্র জীবনের যে কোন দিকেই যদি দৃষ্টি দেয়া যায় তাহলে তা আলোকোজ্জ্বল বলেই দৃষ্টিগোচর হবে।

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা)

নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরের রবিউল আউয়াল মাসে ফখরে মওজুদাত খাইরুল আনাম রহমতে আলম (সা) মক্কা থেকে হিজরত করে কুবাতে শুভ পদার্পণ করলেন। এ সময় কুবাবাসী চোখ ও অন্তর রাস্তার বিছানা বানিয়ে ছাঁড়লো। আমর বিন আওফ কবিলা এমন নিষ্ঠা ও উষ্ণতার সঙ্গে মক্কার দূররে ইয়াতিমকে (সা) মেযবানী করেছিল যে, তার কাহিনী শুনলে মৃত অন্তরেও জীবনের স্পন্দন অনুভূত হয়। সারওয়ারে আলম প্রিয় নবী (সা) কুবাতে ১৪ দিন অবস্থান করেন। তারপর পুনরায় জুময়ার দিন তিনি ইয়াসরাবের অভ্যন্তরে তাশরীফ নেয়ার জন্য নিজের উটনী কাসওয়াকে তলব করলেন। মদীনার আনসাররা হুজুরের (সা) বিচ্ছিন্নতার ধারণায় মনমরা হয়ে গেলেন এবং বনি আমর বিন আওফের নেতৃবৃন্দ হুজুরের (সা) উটনীর সামনে দাঁড়িয়ে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কোন কাজ আপনার মেজাজ বিরোধী হয়ে যায়নিতো। অথবা হুজুর (সা) আমাদের গরীবখানা থেকে উত্তম অবস্থানস্থলে তাশরীফ নিতে চাইছেন।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানেই আমার যাওয়ার নির্দেশ রয়েছে।" তার পূর্বে রহমতে আলম (সা) বনু নাজ্জারকে নিজের ইচ্ছা সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং তারা অত্যন্ত খুশী ও আনন্দে অস্ত্র সাজিয়ে হুজুরকে (সা) নিয়ে যাওয়ার জন্য ইয়াসরাব থেকে কুবা এসে পৌঁছলো। নবী করিম (সা) কুবা থেকে রওয়ানা হলেন। এ সময় সামনে ও পেছনে, ডাইনে ও বাঁয়ে আনসার এবং মুহাজিরদের সশস্ত্র দল চলছিলো এবং আনসারের সকল গোত্র রাহমাতুল্লিল আলামীনের অপেক্ষায় কুবা থেকে ইয়াসরাব পর্যন্ত অস্ত্র সজ্জিত হয়ে দুই কাতারে দাঁড়িয়েছিলেন। রোদে তাদের অস্ত্রের চমক দৃষ্টি শক্তিকে ক্ষীয়মাণ করে দিচ্ছিল এবং পরিবেশ তাকবির ও আহলান সাহলান ওয়া মারহাবার ধ্বনিতে গুঞ্জরিত হচ্ছিল।

প্রিয় নবী (সা) বনু সালেমের মহল্লায় পৌঁছলে নামাযের সময় হয়ে গেল। হুজুর (সা) উটনীর ওপর থেকে নেমে পড়লেন এবং লোকদেরকে জুময়ার নামাযের প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। অতপর তিনি খুতবা দিলেন। খুতবায় রাব্বুল ইজ্জাতের হামদ ও প্রশংসা বর্ণনা করলেন এবং মুসলমানদেরকে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের (সা) আনুগত্যের হেদায়াত দিলেন এবং তাদেরকে বললেন যে, একদিন আমাদের সবাইকে আহকামুল হাকেমীনের সামনে উপস্থিত হয়ে নিজের আমলের হিসেব দিতে হবে। এ জন্য প্রত্যেক

মুসলমানের আখিরাতের জন্য নেক আমল করা ফরজ এবং তাকওয়া ও তাহারাতকে জীবনের অভ্যাসে পরিণত করতে হবে।

খুতবার পর সকল সাহাবীর সঙ্গে তিনি জুময়ার নামায পড়লেন। এটা ছিল তাঁর সর্বপ্রথম জুময়ার নামায এবং এই খুতবা তাঁর সর্বপ্রথম নামাযের খুতবা ছিল।

জুময়ার নামায থেকে ফারেগ হওয়ার পর হাদিয়ে আকরাম (সা) ইয়াসরাবের দক্ষিণ দিক দিয়ে শহরে প্রবেশ করলেন। হুজুরের (সা) ইয়াসরাব প্রবেশ উৎসাহের দুনিয়া এবং ইশকের ইতিহাসে অতুলনীয় ঘটনা। যে শ্রদ্ধাপূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ইয়াসরাববাসী রহমতে আলমকে (সা) স্বাগত জানিয়েছিল পৃথিবীর ইতিহাস তার উদাহরণ পেশ করতে পারেনি। সেদিন ইয়াসরাব "মদীনাতুন নবী" হয়ে গেল এবং তার ভূমি আকাশের ঈর্ষার বস্তুতে পরিণত হলো। আনসাররা এতো খুশী হয়েছিল যে, কুবা থেকে নিয়ে মদীনা পর্যন্ত তিন মাইল রাস্তা রাসূল দর্শকদের দ্বারা পূর্ণ ছিল। মদীনার ইতিহাসে এটা ছিল সবচেয়ে বড় খুশীর দিন। ইয়াছরাবের মাটির প্রতিটি ধূলিকণা খুশীতে বাগবাগ হয়ে গিয়েছিল যে, আজ তাদের সেই রহমতে আলমের (সা) পবিত্র পদ চুম্বনের সৌভাগ্য লাভ ঘটবে, যিনি আসমান ও যমীনের সকল সৃষ্টির গৌরবের বস্তু ছিল। সমগ্র শহর খুশীর আবেগ এবং শ্রদ্ধার আধিক্যে বসন্তের দোলনা হিসেবে মনে হচ্ছিলো এবং সমগ্র পরিবেশ আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনায় মুখরিত ছিল। মদীনার হাবশী গোলাম আনন্দের আতিশয্যে নিজের সামরিক নৈপুণ্য দেখাচ্ছিল এবং শিশুরা "রাসূল এসেছেন, রাসূল এসেছেন" এই না'রা দিতে দিতে খুশীতে লাফালাফি করছিল। আনন্দের উচ্ছ্বাসে পর্দানশীন মহিলারাও ঘরের ছাদের ওপর এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কুমারী মেয়েরা কামরার মধ্য থেকে উঁকি মারছিলো। রাস্তায় আনসারের প্রতিটি গোত্র আবেদনের স্বরে রাসূলে আকরামের (সা) সামনে আসছিলেন এবং আরজ করছিলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের বাড়ী হাজির, জীবন হাজির, মাল হাজির।"

হুজুর (সা) প্রত্যেক কবিলার ইহসানের স্বীকৃতি দিচ্ছিলেন এবং তার জন্য কল্যাণ কামনা করছিলেন।

যে সময় প্রিয় নবী (সা) কোন গলিতে প্রবেশ করছিলেন তখনই তার উভয় দিকের বাড়ীর ছাদ থেকে আনসারের পর্দানশীন মহিলাদের মুখ দিয়ে আনন্দ ও উৎসাহে এই সঙ্গীত উচ্চারিত হচ্ছিল ঃ

طلع البدر علينا - من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا - مادعى لله داع

ايها المبعوث فينا - جئت بالامر المطاع

"ওদা' পর্বতের গিরিপথ দিয়ে আমাদের ওপর পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হয়েছে। যতক্ষণ দোয়া প্রার্থনাকারী দোয়া করবে ততক্ষণ আমাদের ওপর আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন ওয়াজিব। আমাদের মধ্যে প্রেরিত হে মহাপুরুষ! আপনি এমন নির্দেশ নিয়ে এসেছেন যার আনুগত্য আমাদের ওপর ফরজ।"

বনু নাজ্জারের আনন্দ উচ্ছ্বাসের সীমা পরিসীমা ছিল না। কেননা হুজুরের(সা) মাতামহির আত্মীয়তা সূত্রে তাদের বিশ্বাস ছিল যে, বিশ্ব নবী (সা) তাদেরকেই মেযবানীর মর্যাদা দান করবেন। আর এমনিভাবে তারা মাহবুবে কিবরিয়ার (সা) প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবেন। বনু নাজ্জারের মাছুম শিশুরা দফ বাজিয়ে বাজিয়ে এই গীত গাইছিল ঃ

نحن جوار من بنى نجار

ياحبزا محمد من جار

"আমরা হলাম বনু নাজ্জারের মেয়ে
মুহাম্মাদ (সা) কতইনা ভাল প্রতিবেশী"

সারওয়ারে কায়েনাত (সা) এসব শিশু মেয়েদের পাশ দিয়ে অতিক্রমের সময় মুচকি হেসে বললেন ঃ

"শিশুরা! তোমরা কি আমাকে ভালবাসো?"

তারা একবাক্যে বললো, "হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "তোমরাও আমার নিকট খুব প্রিয়।"

প্রিয় নবীর (সা) খাস খাদেম হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি সেদিন থেকে বেশী মুবারক এবং আনন্দপূর্ণ দিন আর দেখিনি। যেদিন রাসূলে আকরাম (সা) মদীনায় শুভ পদার্পণ করেছিলেন। সেদিন মদীনার দরজা ও প্রাচীর মহানবীর শুভাগমনে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

বিশ্ব নবী (সা) যতই সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন আনসারদের আশা আকাংখার অস্থিরতা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আনসারের প্রত্যেকটি গোত্র এবং

ব্যক্তি আপাদমস্তক আকাংখায় ডুবে ছিল। প্রত্যেকেই রহমতে আলমের (সা) মেযবানীর মর্যাদা প্রাপ্তির আশা করছিলেন। সকলেই জানতেন যে, রহমতের এই বাদশাহ, শান্তির শাহজাদা এবং লুতফ ও করমের এই সুদর্শন মুখমণ্ডল যার গৃহে নিজের পবিত্র পা রাখবেন রহমতের ফেরেশতা তার দহলিজ পাহারা দেবে। আল্লাহর নেয়ামতসমূহ তার গৃহে অবতীর্ণ হবে এবং দ্বীন ও দুনিয়ার সকল বরকত তার নিকট আসবে। এ জন্য হুজুরের (সা) মেযবান হওয়ার জন্য আনসারদের মধ্যে প্রচণ্ড টানাটানি ছিল। গোত্রসমূহের নেতৃবৃন্দ যেমন হযরত উতবান (রা) বিন মালিক, সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ, আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা, আব্বাস (রা) বিন উবাদাহ, খারেজাহ (রা) বিন যায়েদ, যিয়াদ (রা) বিন লবিদ, ফারদাহ (রা) বিন আমর, সায়াদ (রা) বিন রবি, সলিত (রা) বিন কায়েস, মানযার (রা) বিন আমর এবং আবু সালিত আসিরাহ (রা) বিন আবি খারেজা ব্যক্তিগতভাবে হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের গরীবখানা হাজির। তাতে শুভ পদার্পণ করুন।"

মহানবীর (সা) ওপর তখন ওহি নাযিলের অবস্থা বর্তমান ছিল। তিনি তাঁর আশা পোষণকারীর পক্ষে দোয়া করছিলেন এবং বলছিলেন ঃ "এই উটের রাস্তা ছেড়ে দাও তার রাস্তা বন্ধ করো না। সে আল্লাহর তরফ থেকে নিয়োজিত রয়েছে।"

হুজুর (সা) সে সময় উটনীর রশি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলেন। হাদিয়ে আকরামের (সা) ইরশাদ শুনে সব মানুষ চুপ মেরে গেলেন এবং কম্পিত হৃদয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো যে, দেখা যাক, সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে যিনি রাহমাতুল লিল আলামীনের (সা) মেযবানীর মহান সৌভাগ্য লাভ করেন।

কাসওয়া [বিশ্ব নবীর (সা) উটনী] যেতে যেতে বনু নাজ্জারের মহল্লায় পৌঁছলো এবং সেখানে গিয়ে বসে পড়লো যেখানে আজকাল মসজিদে নববীর (সা) বড় দরজা রয়েছে। হুজুর (সা) তার ওপর থেকে নামলেন না। কাসওয়া পুনরায় উঠে দাঁড়ালো ও কিছুদূর গিয়ে ফিরে এলো এবং প্রথম যেস্থানে বসেছিল সেই স্থানেই এসে দু'পা একত্রিত করে বসে পড়লো। সেই স্থানের সম্পূর্ণ নিকটে একটি দ্বিতল বাড়ী ছিল। বাড়ীটির মালিক হুজুরকে ইসতিকবাল করার জন্য দহলিজে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি কাসওয়াকে নিজের বাড়ীর নিকটে এভাবে বসতে দেখে আনন্দের আতিশয্যে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। দৌঁড়ে গিয়ে রহমতে আলমকে (সা) উষ্ণ সম্বর্ধনা জানালেন। ইত্যবসরে বনু

নাজ্জারের অন্যান্যরাও সেখানে পৌঁছে গেলেন এবং প্রত্যেকেই পীড়াপীড়ি করে বলতে লাগলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমার গরীব খানায় শুভ পদার্পণ করুন। এদিকে সেই ব্যক্তি আরজ করলেন ঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা এই মিসকিনের বাড়ী। অনুমতি দিলে হুজুরের (সা) সামান নামিয়ে দি।"

রহমতে আলম (সা) কারোরই মনে আঘাত দিতে চাইছিলেন না। বললেন, "লটারী করে নাও।" আল্লাহর কি শান! লটারী করা হলো। কিন্তু লটারীতেও তার নামই উঠলো। রাব্বুল ইজ্জত যেন তাঁর তকদিরেই ফখরে দোজাহানের (সা) মেযবানীর মর্যাদা লিখে দিয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বিশ্ব নবীর (সা) সামান উটনীর ওপর থেকে নামালেন এবং তাঁর গৃহ রিসালাত (সা) সূর্যের আলোকচ্ছটায় ঝলমল করে উঠলো।

এই ব্যক্তি যিনি মদীনা মুনাওয়ারাতে বিশ্ব নবীর (সা) মেযবানীর মহান সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন এবং যার সৌভাগ্যে জ্বীন ও ইনসান ঈর্ষা করেছিল তিনি ছিলেন বনু নাজ্জারের সরদার হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা)।

হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর (রা) প্রকৃত নাম ছিল খালেদ বিন যায়েদ। কিন্তু তাঁর কুনিয়ত "আবু আইয়ুব" এত মশহুর হয়ে গিয়েছিল যে, খুব কম মানুষই তাঁর আসল নাম জানতো। আল্লামা ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, যে ভয়াবহ যুগে বিদ্রোহীরা হযরত উসমানের (রা) গৃহ অবরোধ করে রেখেছিল এবং তিনি নামাযের জন্য ঘর থেকেও বের হতে পারতেন না। এ সময় কতিপয় সাহাবী (রা) হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর নিকট মসজিদে নববীতে এসে নামায পড়ানোর আবেদন জানান। হযরত আলী (রা) স্বয়ং নামায পড়ানোর ব্যাপারে ক্ষমা চাইলেন। অবশ্য বললেন যে, খালিদ (রা) বিন যায়েদকে নামায পড়াতে বলো।

লোকেরা জিজ্ঞেস করলো ঃ "কোন খালিদ বিন যায়েদ?"

তিনি বললেন ঃ "আবু আইয়ুব" সেদিন সাধারণ মানুষ হযরত আবু আইয়ুবের (রা) আসল নাম জানতে পেলো।

হযরত আবু আইয়ুব (রা) খাজরাজের বনু নাজ্জারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। রাসূলে করিমের (সা) মাতামহীর সাথে আত্মীয়তা ছিল বনু নাজ্জারের। মালিক বিন নাজ্জারের সন্তানদের মধ্য থেকে হওয়ার ভিত্তিতে আল মালেকী এবং আনসারের ইযদী হওয়ার কারণে আল ইযদীও লিখা হয়। নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

খালেদ (আবু আইয়ুব) বিন যায়েদ বিন কুলায়েব বিন ছালাবা বিন আবদি আওফ খাযরাজী।

হযরত আবু আইয়ুবের মাতার নাম ছিল হিন্দ (অন্য এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী যাহরা) বিনতে সায়াদ খাযরাজী। তিনি হযরত আবু আইয়ুবের পিতা যায়েদ বিন কুলাইবের মামাতো বোন ছিলেন।

হযরত আবু আইয়ুব (রা) নবীর হিজরতের ৩১ বছর পূর্বে ইয়াসরাবে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আনসারের সাবিকুনাল আউয়ালুনের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। তিনি হুজুরের (সা) মদীনা মুওনাওয়ারাতে শুভাগমনের পূর্বেই হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়েরের তাবলিগী প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তারপর তার বাইয়াতে উকবায়ে কবিরাতে শামিল হওয়ার মহান সৌভাগ্য লাভ করেন। সে সময় তিনি ৭৪ জন সাথীর সঙ্গে হাদিয়ে আকরামের (সা) নিকট এই পবিত্র প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ইয়াসরাবে শুভ পদার্পণ করলে আল্লাহর কসম, আমরা সবসময় নিজের জীবন এবং মাল দিয়ে আপনার হেফাজত ও সাহায্য করবো।"

রহমতে আলম (সা) মদীনা মুনাওয়ারাতে তাশরীফ নিলেন। এ সময় হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) রাসূলের (সা) মেযবানীর সেই মহান মর্যাদা লাভ করলেন যাতে অন্যান্য সাহাবী সবসময় ঈর্ষা করতেন। সারওয়ারে আলম (সা) হযরত আবু আইয়ুবের (রা) বাড়ীতে অবস্থানের লক্ষ্যে কিভাবে নির্বাচিত হলেছিলেন? ঘটনার একটি দিক ওপরে বর্ণিত হয়েছে। অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে, কাসওয়াকে নিজের বাড়ীর পাশে বসতে দেখে হযরত আবু আইয়ুব (রা) দৌঁড়ে এগিয়ে এলেন এবং হুজুরকে (সা) আহলান সাহলান বলে স্বাগতঃ জানালেন। হুজুর (সা) নীচে নামলেন। এ সময় হযরত আবু আইয়ুব(রা) উটনীর ওপর থেকে হাওদা নামিয়ে তৎক্ষণাৎ নিজের বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গেলেন। অন্যান্যরা রাসূলকে (সা) নিজেদের বাড়ী নিয়ে যেতে চাইলেন। তাতে রাসূল (সা) বললেন, "মানুষ সেখানেই অবস্থান করে যেখানে তাঁর হাওদা থাকে।"

অন্য আরেক রেওয়ায়াতে আছে যে, বিশ্ব নবী (সা) ইচ্ছাকৃতভাবে হযরত আইয়ুবের (রা) নিকট অবস্থান করেন। কেননা তিনি বনু নাজ্জারের সরদার ছিলেন এবং বনু নাজ্জারের সঙ্গে হুজুরের (সা) আত্মীয়তা ছিল। কিন্তু এই রেওয়ায়াতে একথার ব্যাখ্যা করা হয়নি যে, বনু নাজ্জারের অন্য কোন নেতার বাড়ীতে রাসূলে আকরাম (সা) কেন অবস্থান করেননি এবং এই সৌভাগ্য

হযরত আবু আইয়ুব আনসারীরই (রা) কেন হয়েছিল। প্রকৃত কথা হলো এসব কিছু আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ীই হয়েছিল। হযরত আবু আইয়ুবকে (রা) রাব্বুল ইজ্জতের পক্ষ থেকেই হুজুরের (সা) মেযবানীর জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল।

হযরত আবু আইয়ুবের (রা) বাড়ী ছিল দোতলা বিশিষ্ট। এক কামরা ছিল নীচে এবং অপরটি ছিল ওপরে। তিনি রাসূলের (সা) নিকট আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি গরীবখানার ওপর তলায় অবস্থান করুন।" হুজুর (সা) বললেন, "না, লোকজন আমার নিকট যাতায়াত করবে। এ জন্য নীচের তলাই আমার অবস্থানের জন্য উপযোগী হবে। সুতরাং হুজুরের (সা) ইচ্ছানুযায়ী হযরত আবু আইয়ুব (রা) ঘরের নীচের তলা খালি করে দিলেন এবং নিজে ওপর তলায় চলে গেলেন। কিন্তু তিনি ও তার স্ত্রী সবসময় এই ভেবে অস্থির থাকতেন যে, তিনি ওপর তলায় রয়েছেন এবং আল্লাহর নবী (সা) নীচের তলায় অবস্থান করছেন।

আল্লামা ইবনে হিসাম বর্ণনা করেছেন, একদিন ওপর তলায় পানি ভর্তি পাত্র ফেটে গেল। হযরত আবু আইয়ুব (রা) এই ভেবে অস্থির হয়ে পড়লেন যে, পানি বয়ে নীচে যাবে এবং বিশ্ব নবীর (সা) তাকলিফ হবে। ঘরে গায়ে দেয়ার মত একটি লেপই ছিল। হযরত আবু আইয়ুব (রা) তৎক্ষণাৎ লেপটি টেনে পানির ওপর নিক্ষেপ করলো। যাতে প্রবাহিত পানি তুলা শোষণ করে নেয়। পানি যখন নীচে প্রবাহিত হওয়ার আশংকা তিরোহিত হলো তখন স্বামী-স্ত্রী শান্তির নিঃশ্বাস নিলেন।

মহানবী (সা) যদিও নিজের ইচ্ছানুযায়ী নীচের তলায় অবস্থান করছিলেন। কিন্তু হযরত আবু আইয়ুব (রা) এবং তাঁর স্ত্রীর ওপর তলায় থাকাটা খুবই অপসন্দনীয় ব্যাপার ছিল। ফখরে মওজুদাত, খাইরুল বাশার, সাইয়েদুর রাসূল এবং সারওয়ারে কায়েনাত (সা) নীচের তলায় অবস্থান করবেন, আর নগণ্যতম খাদেম থাকবে ওপর তলায় এটা ছিল তাঁর হৃদয়বিদারক ব্যাপার। এই মানসিক কষ্ট এক রাতে এমন প্রচণ্ড আকার ধারণ করলো যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ছাদের এক কোণে গুটিশুটি মেরে বসে রইলেন এবং সমগ্র রাত এই অবস্থায় জেগে কাটিয়ে দিলেন। ভোর হলে হযরত আবু আইয়ুব (রা) প্রিয় নবীর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সারা রাত ছাদের এক কোণায় বসে জেগে ছিলাম। হুজুর (সা) কারণ জিজ্ঞেস করলেন। এ সময় তিনি বললেন ঃ "আমাদের মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। আমরা সবসময়ই আপনার সঙ্গে বেআদবীর ভয়ে অস্থির থাকি। রাতে এই ভীতি এত বৃদ্ধি পেল যে, হে আল্লাহর রাসূল আমাদের ওপর রহম

করুন এবং ওপর তলায় তাশরীফ রাখুন। হুজুরের (সা) গোলামদের জন্য পদতলে থাকাটাই গৌরবের বিষয় হবে।"

বিশ্ব নবী (সা) হযরত আবু আইয়ুবের (রা) আবেদন কবুল করলেন এবং তিনি ওপরের তলায় স্থানান্তর হয়ে গেলেন। হযরত আবু আইয়ুব (রা) এবং তাঁর স্ত্রী পূর্ণ খুশীতে নীচের তলায় থাকা শুরু করলেন।

মহানবী (সা) ছ' অথবা সাত মাস হযরত আবু আইয়ুবের (রা) বাড়ী অবস্থান করেন। এই সময় হযরত আবু আইয়ুব (রা) গভীর শ্রদ্ধার সাথে রহমতে দো আলমের (সা) খিদমত করেছিলেন। হযরত আবু আইয়ুব (রা) দু'বেলাই হাদিয়ে আকরামের (সা) খিদমতে খাবার পেশ করতেন। কোন কোন সময় অন্য আনসারের নিকট থেকেও খাবার এসে যেতো। খাওয়ার পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকতো হুজুর (সা) তা হযরত আবু আইয়ুবের (রা) নিকট প্রেরণ করতেন। তার শ্রদ্ধাবোধ এবং রাসূল প্রেম এত গভীর ছিল যে, খাবারের মধ্যে যেখানে যেখানে রাসূলে করিমের (সা) আঙ্গুলের ছাপ দেখতে পেতেন বরকত ও রাসূলের (সা) আনুগত্য হিসেবে সেখানে নিজের আঙ্গুল রেখে খাবার খেতেন। একবার খাবার যেমন পাঠানো হয়েছিল তেমনি ফিরে এলো। হযরত আবু আইয়ুব (রা) ব্যাকুল হয়ে হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান। আপনি আজ খাবার গ্রহণ করেননি।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "হ্যাঁ, আজকের খাবারে রসুন ছিল। রসুন আমার পসন্দনীয় নয়।"

হযরত আবু আইয়ুব (রা) আরজ করলেন ঃ "হুজুর (সা) যা পসন্দ করেন না, আমিও তা পসন্দ করি না।" [রসুন ইসলামী শরীয়তে হারাম নয়। যেহেতু তা খাওয়ায় মুখে এক ধরনের গন্ধ হয় সে জন্য রাসূলে আকরাম (সা) তা অপসন্দ করতেন]।

আবু আইয়ুবের (রা) বাড়ীতে অবস্থানের পর প্রিয় নবী (সা) মদীনা মুনাওয়ারাতে আল্লাহর ঘর বানানোর ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এই উদ্দেশ্যে হুজুর (সা) হযরত আবু আইয়ুবের (রা) বাড়ীর সামনের সেই জমি নির্বাচিত করলেন যেখানে তাঁর উটনী এসে বসেছিল। এই জমির মালিক ছিলেন বনু নাজ্জারের দুই ইয়াতিম শিশু, সোহায়েল (রা) এবং সাহাল (রা)। প্রিয় নবী (সা) আনসারদেরকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, "আমি মূল্য দিয়ে এই জমি নিতে চাই। যাতে সেখানেই আল্লাহর ঘর নির্মাণ করতে পারি।"

আনসাররা আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এই জমির মালিকদেরকে আমরা মূল্য দিয়ে দিব এবং তা নিজেদের পক্ষ থেকে আপনাকে দান করছি। তার প্রতিদান আমরা আল্লাহর থেকে গ্রহণ করবো।" হুজুর (সা) আনসারদের(রা) কুরবানীর আবেগের প্রশংসা করলেন কিন্তু জমির মূল্য দানে পীড়াপীড়ি করলেন এবং জমির মালিক সাহাল (রা) ও সোহায়েলকে (রা) ডেকে পাঠালেন। উভয় ভাগ্যবান শিশুই আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এই জমি আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আপনাকে দান করছি।" শিশু দু'টির মা-ও তাদেরকে সমর্থন জানালো। হুজুর (সা) বললেন, "আল্লাহ তোমাদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমি এই জমি মূল্য ছাড়া নিব না।"

অতপর তিনি অভিজ্ঞ লোকদের পরামর্শ অনুযায়ী জমির মূল্য দশ মিছকাল (পৌণে চার তোলা) স্বর্ণ নির্ধারণ করলেন। এই মূল্য হুজুরের (সা) পক্ষ থেকে কেউ আদায় করলেন। এ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের রেওয়ায়াত আছে, "ফাতহুল বারির" রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) এই জমির মূল্য দিয়ে দিয়েছিলেন।

হিজরতের ৬ষ্ঠ মাসে হুজুর (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় মদীনায় ইসলামের প্রথম শিক্ষক হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়েরকে হযরত আবু আইয়ুবের (রা) ভাই বানালেন। ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কিছু দিন পর মসজিদ এবং তৎসংলগ্ন দু'টি হুজরা বা কামরার নির্মাণ কাজ শেষ হলো। তখন বিশ্ব নবী (সা) হযরত আবু আইয়ুবের (রা) বাড়ী থেকে সেই হুজরায় স্থানান্তর হয়ে গেলেন।

হিজরতের অব্যবহিত পরেই মদীনার মুনাফিক এবং ইহুদীরা তাওহীদবাদীদের বিরুদ্ধে শত্রুতা শুরু করে দিল। হুজুর (সা) তাদের ষড়যন্ত্রের কথা অবহিত হয়ে সাহাবায়ে কিরামকে (রা) হিদায়াত দিলেন। হিদায়াতে তিনি রাতে অস্ত্র বেঁধে শোয়ার এবং কিছু লোককে জেগে পাহারা দানের নির্দেশ দিলেন। যাতে মক্কার কুরাইশ এবং অন্য শত্রুর আকস্মিক হামলার তদারক করা যায়। এক সময় হযরত আবু আইয়ুব (রা) সারা রাত জেগে নবীর (সা) বাড়ী পাহারা দিলেন। সকাল হলে বিশ্ব নবী (সা) তাঁর জন্য দোয়া করলেন ঃ

"হে আবু আইয়ুব, আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করুন ও নিরাপত্তা দিন। তুমি তার নবীর (সা) রক্ষকের কাজ করেছ।"

হুজুরের (সা) এই দোয়ার প্রভাবেই হযরত আবু আইয়ুব (রা) আজীবন দুঃখ-মুসিবত থেকে মাহফুজ ছিলেন এবং ওফাতের পরও শতাব্দীর পর

শতাব্দী কাল পর্যন্ত নাসারারা তাঁর কবরের হিফাজত ও তত্ত্বাবধান করতে থাকে। এমনকি তাঁর দাফনের স্থানই অর্থাৎ কাসতানতুনিয়াও মুসলমানদের অধীনে চলে আসে। আজও তুর্কী সরকার তাঁর কবরের তত্ত্বাবধান করে চলেছেন এবং সেখানে আশেকানের ভিড় লেগেই থাকে।

দ্বিতীয় হিজরীতে যুদ্ধের সিলসিলা শুরু হলে বদর থেকে বাইয়াতে বিদওয়ান পর্যন্ত এবং বাইয়াতে রিদওয়ান থেকে হুনাইন পর্যন্ত এমন কোন যুদ্ধ বা সমর ছিল না যাতে হযরত আবু আইয়ুব (রা) রহমতে আলমের (সা) সঙ্গে ছিলেন না। একদিকে তিনি তিন শ' তেরজন বদরী সাহাবীর দলে শামিল ছিলেন। তেমনি তাঁকে সেই চৌদ্দশ' জীবন উৎসর্গকারীর দলে দেখা যায় যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা আসহাবুশ শাজারাহ বলে অভিহিত করেছিলেন এবং স্পষ্ট ভাষায় জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি সেই ১০ হাজার পবিত্র আত্মার একজন ছিলেন যাঁদের সম্পর্কে হাজার হাজার বছর পূর্বে কিতাবে ইসতিসনাতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল।

একাদশ হিজরীতে মহানবীর (সা) ইন্তেকালের পর খিলাফতের সমস্যা দেখা দিলে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) সেই কতিপয় সাহাবীর অন্যতম ছিলেন যাঁরা হযরত আলীকে (রা) খিলাফতের মুসতাহিক বলে মনে করতেন। সুতরাং তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) বাইয়াত প্রশ্নে কিছু দিন অপেক্ষা করলেন। হযরত আলী (রা) যখন সিদ্দীকে আকবারের (রা) বাইয়াত করলেন তখন তাঁরাও নিজের হাম খেয়াল সাথীদেরসহ তাঁর অনুসরণ করলেন এবং অতপর কারোর মনে তাঁর বিরুদ্ধে মলিনতার লেশমাত্রও রইলো না।

সিদ্দীকে আকবারের (রা) সংক্ষিপ্ত খিলাফতকালে মুসলমানরা আরবের সীমানার বাইরে বেরিয়ে জিহাদ শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই যুগের যুদ্ধসমূহে হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর (রা) নাম পাওয়া যায় না। হযরত ওমর ফারুক (রা) খিলাফতের মসনদে সমাসীন হলেন। তাঁর শাসনামলে ইসলামের মুজাহিদদের ঘোড়ার খুর এশিয়া ও আফ্রিকার লাখ লাখ বর্গ মাইল এলাকা চষে ফেললো এবং তার ওপর ইসলামের পতাকা উড্ডীন করে দিল। আল্লামা ওয়াকেদী ও অন্য কতিপয় ঐতিহাসিক ফারুকী শাসনামলের কোন কোন যুদ্ধে হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর (রা) নাম স্পষ্ট করেই উল্লেখ করেছেন এবং লিখেছেন যে, ভানসার যুদ্ধে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। মিসর বিজয়ের পর হযরত আমর (রা) ইবনুল আছ একটি বাহিনী পশ্চিমকে (উত্তর আফ্রিকা) পদানত করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। এই বাহিনী অগ্রসর হয়ে

বারকাহ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলো এবং সেখানে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করে ফিরে এলো। এই বাহিনীতে আবু আইয়ুব আনসারীও (রা) শামিল ছিলেন। সাধারণভাবে ঐতিহাসিকরা সেই যুগে হযরত আবু আইয়ুবের (রা) কর্মতৎপরতার বিস্তারিত বিবরণ দেননি। তবে, এতটুকুন অবশ্যই জানা যায় যে, তিনি ফারুকী শাসনামলের কয়েকটি যুদ্ধে এক উদ্দীপ্ত মুজাহিদ হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এবং জিহাদের জন্য লম্বা সফর করেন।

হযরত উসমান জুন্নুরাইনের (রা) খিলাফতকালে হযরত আবু আইয়ুব (রা) অধিকাংশ সময় মদীনাতেই অবস্থান করেছিলেন। কতিপয় ব্যাপারে আমীরুল মু'মিনীনের (রা) সঙ্গে তাঁর চরম মতবিরোধ ছিল। কিন্তু তিনি কোন গোলমালে অংশ নেননি। যে দিনগুলোতে বিদ্রোহীরা আমীরুল মু'মিনীনের (রা) বাড়ী অবরোধ করে রেখেছিল হযরত আবু আইয়ুব (রা) মসজিদে নববীতে সেই দিনগুলোতে মুসলমানদের ইমামতি করেছিলেন। হযরত উসমান জুন্নারাইনের (রা) শাহাদাতের পর হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু খলিফা নির্বাচিত হলেন। তিনি হযরত আবু আইয়ুবকে (রা) অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। তিনি হযরত আবু আইয়ুবের (রা) বার্ষিক বৃত্তি পাঁচ হাজার দিরহাম থেকে বৃদ্ধি করে বিশ হাজার করে দেন এবং খিলাফতের নিকট হতে প্রাপ্ত গোলামের সংখ্যা ৮ থেকে বাড়িয়ে ৪০ করা হয়।

হযরত আলী মুরতাজার (রা) খিলাফতের শুরুতে হযরত সাহাল (রা) বিন হানিফ আনসারী মদীনার আমীর ছিলেন। ৩৬ হিজরীতে হযরত আলী মুরতাজা তাঁকে কুফা ডেকে নেন এবং মদীনার আমীর হিসেবে হযরত আবু আইয়ুবকে (রা) নিয়োগ করেন। বেশীর ভাগ রেওয়ায়াতে আছে যে, উষ্ট্রের ও সিফ্‌ফিনের যুদ্ধের সময় তিনি মদীনার আমীর ছিলেন। কিন্তু আল্লামা ইবনে আবদুল বার(র) ইসতিয়াব গ্রন্থে লিখেছেন যে, হযরত আবু আইয়ুব (রা) উষ্ট্র ও সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে হযরত আলীর (রা) পক্ষে অংশগ্রহণ করেন।

৩৭ হিজরীতে সংঘটিত খারেজীদের বিরুদ্ধে নাহরওয়ানের প্রসিদ্ধ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে হযরত আবু আইয়ুব (রা) হযরত আলীর বাহিনীর মুকাদ্দামাতুল জায়েশ বা অগ্রবর্তী দলের সেনাপতি ছিলেন। এই যুদ্ধে তিনি অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, নাহরওয়ানের যুদ্ধে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু নিজের মশহুর ঝাণ্ডা "রাইয়াতুল ঈমান" হযরত আবু আইয়ুবের (রা) হাতে সোপর্দ করেন। এটা একটা বিরাট সম্মানের ব্যাপার ছিল। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) জানবাজী এবং ত্যাগের মাধ্যমে নিজেকে সেই

সম্মান বা মর্যাদার যোগ্য করেছিলেন এবং শেরে খোদা (রা) তাঁর বীরত্বের প্রশংসা করেছিলেন।

হযরত আলী মুরতাজার (রা) শাহাদাতের পর হযরত আবু আইয়ুব (রা) রাজনৈতিক বিশৃংখলা থেকে দূরে থেকে নির্জনত্ব অবলম্বন করেন। কিন্তু জিহাদের উৎসাহ তাঁর অন্তরে সবসময়েই তুড়ি দিয়ে উঠতো।

৪৮-৪৯ অথবা ৫০-৫১ অথবা ৫২ হিজরীতে আমীরে মুয়াবিয়া (রা) একটি ইসলামী বাহিনী কাসতানতুনিয়া পদানত করার জন্যে প্রেরণ করলেন। এ সময় হযরত আবু আইয়ুব (রা) নিজের বার্দ্ধক্য সত্ত্বেও সেই বাহিনীতে একজন সাধারণ মুজাহিদ (সিপাহী) হিসেবে অংশ নেন। কতিপয় ঐতিহাসিকের বর্ণনা অনুযায়ী সেই বাহিনীর নেতৃত্বের দায়িত্ব ছিল সুফিয়ান বিন আওফের ওপর। কিন্তু অধিকাংশ মজবুত রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, সেই বাহিনীর আমীর ছিলেন ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়া (রা)। ইয়াযিদ ইসলামের ইতিহাসে একজন কুখ্যাত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। এ জন্য তার নেতৃত্বে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) এবং অন্য কতিপয় জালিলুল কদর সাহাবীর (রা) কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাটা কতিপয় মানুষের জন্য বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল। কিন্তু সেই জটিলতার গ্রন্থি মোচন বা সমস্যার সমাধান মশহুর শিয়া আলেম সাইয়েদ আলী নকী সাহেব বর্তমান যুগের মুজতাহিদ স্বরচিত কিতাব "তাজকিরায়ে হুফ্ফাজে শিয়া"-তে এভাবে পেশ করেছেন ঃ

"কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ব্যাপারটা তাঁর অর্থাৎ হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর নিকট বিশেষ উৎসাহের বিষয় ছিল। এমনকি এই প্রসঙ্গে ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়ার সেনাপতিত্বে যুদ্ধ করা পর্যন্ত তিনি খারাপ মনে করেননি। তাঁর ইজতিহাদী ধারণা ছিল যে, কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ যদি ফাসিক ও ফাজিরের অধীন হলেও তাতে সঠিক নিয়তে অংশগ্রহণে ধর্মের সাহায্য হয়। এ জন্য মুয়াবিয়ার নির্দেশে ইয়াযিদের অধীনে রোমের যুদ্ধে আবু আইয়ুব আনসারী (রা) উপস্থিত ছিলেন।" (তাজকিরায়ে হুফ্ফাজে শিয়া-১৩৫৩ হিঃ প্রকাশকাল)

কাসতানতুনিয়া অভিযানের সময় হযরত আবু আইয়ুবের (রা) বয়স ৮০ বছরের বেশী ছিল। কিন্তু তিনি জিহাদে এত উৎসাহী ছিলেন যে, এই বৃদ্ধ বয়সেও মদীনা মুনাওয়ারা থেকে সিরিয়া পর্যন্ত শুধুমাত্র জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য সফর করেন। অতপর একজন সাধারণ মুজাহিদ হিসেবে ইসলামী বাহিনীতে শামিল হন। অথচ সেই বাহিনীর নেতৃবৃন্দ এবং অফিসারবৃন্দের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তিই কোন দিক থেকেই তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল না। বাস্তবে তিনি

"সাহিবে বদর" এবং "সাহিবে শাজারাহ" হওয়ার কারণে ইসলামী বাহিনীতে বিশেষ মর্যাদা রাখতেন। তাঁর উপস্থিতি ইসলামী বাহিনীর জন্য বরকতের কারণ ছিল এবং তাতে তাদের সাহস কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছিল। আমীর মুয়াবিয়া (রা) ইসলামী নৌবাহিনীকে সব ধরনের সাজ সরঞ্জাম দিয়ে সুসজ্জিত করেছিলেন। অতপর একদিন এই বাহিনী শাহাদাতের উৎসাহে উদ্দীপিত হাজার হাজার মুজাহিদকে নিয়ে সিরিয়ার উপকূল থেকে কাসতানতুনিয়া রওয়ানা হয়ে গেল। কিছুদিন পর ইসলামী নৌবাহিনী রোম সাগর অতিক্রম করে বসফরাস প্রণালীতে প্রবেশ করলো এবং কাসতানতুনিয়ার সামনে একটি উপযুক্ত স্থানে নোঙ্গর করে মুজাহিদদেরকে শুকনো স্থানে নামিয়ে দিল। রোমক বাদশাহ চতুর্থ কাসতানতিন প্রচুর সাজ-সরঞ্জামসহ মুসলমানদের সামনা-সামনি হলো। মুসলমানরা ভালভাবে বিশ্রামও নিতে পারেনি এমন সময় রোমকরা তাদের ওপর হামলা করে বসলো। মুসলমানরা অত্যন্ত ধৈর্য ও সাহসের সঙ্গে রোমকদের হামলায় বাধা দিল এবং রক্তাক্ত যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। মুসলমানদের এত প্রচণ্ড উৎসাহ ছিল যে, তারা দুশমনের ব্যূহে ঢুকে পড়তো। আবদুল আজীজ (রা) বিন যারারাহ নামক এক মুজাহিদ একবার একাকী রোমকদের ব্যূহ মাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গেলেন। মুসলমানরা তাকে এভাবে নিজের জীবনকে বিপদের সম্মুখীন করে তুলতে দেখে চেঁচিয়ে উঠলো যে, এ ধরনের করা আল্লাহর সেই ফরমান বিরোধী।

وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ

"তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করে না।"

(আল বাকারাহ-১৯৫)

এ সময় হযরত আবু আইয়ুব (রা) এগিয়ে গিয়ে ইসলামী বাহিনীকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে মুসলমানরা! তোমরা এই আয়াতের অর্থ এই বুঝেছ? অথচ তার প্রকৃত অর্থ এর উল্টো। আনসাররা যুদ্ধের সময় ব্যস্ত থাকার কারণে তাদের কারবার ও বাণিজ্যে যে ক্ষতি হয়েছিলো শান্তির সময় তা পুষিয়ে নেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। সে সময় এই আয়াত নাযিল হয় যে, জিহাদে কোন লোকসান বা ধ্বংস নেই বরং জিহাদ থেকে দূরে থাকাটাই নিজেকে ধ্বংসের নামান্তর হয়ে থাকে।"

হযরত আবু আইয়ুবের (রা) ইরশাদ শুনে মুসলমানরা রোমকদের ওপর মরণপণ ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং খুব শীঘ্র তাদেরকে হটে যেতে বাধ্য করলো।

রোমকরা শহরের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিলো এবং প্রাচীরের দরজা বন্ধ করে দিল। মুসলমানরা শহর অবরোধ করে নিল এবং তা পদানত করার জন্য উপযুক্ত সুযোগ তালাশ করতে লাগলো।

ইসলামী বাহিনী যে সময় কাসতানতুনিয়া অবরোধ করে রেখেছিল সে সময় ইউরোপের আবহাওয়া মুসলমানদের স্বাস্থ্যের ওপর খুব খারাপ প্রভাব ফেলছিল। এমনকি এক বিরাট সংখ্যক মুসলমান অসুস্থ হয়ে পড়লো। ঐতিহাসিকরা এই রোগকে প্লেগ বা মহামারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এটা অন্ত্রের কোন অসুখ ছিল। অনেক মুজাহিদ এই রোগ থেকে বাঁচতে পরেননি। হযরত আবু আইয়ুবও (রা) সে সময় কঠিনভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। যখন তাঁর আর বাঁচার কোন আশা রইলো না তখন সেনাবাহিনীর আমীর ইয়াযিদ তাঁর খিদমতে হাজির হলো এবং বললো ঃ "আপনার কোন ওসিয়ত থাকলে তা বলুন।"

হযরত আবু আইয়ুব (রা) বললেন ঃ "আমি যখন মারা যাবো তখন মুসলমানদেরকে আমার সালাম পৌঁছে দেবে এবং তাদেরকে বলতে হবে যে, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) এই বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি একক আল্লাহর সাথে কাউকেই অংশীদার না জানা অবস্থায় ইন্তেকাল করবে—আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাত নসিব করবেন। এবং আমার জানাযাহ দুশমনের ভূমি থেকে যতদূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারো, নিয়ে গিয়ে দাফন করবে।"

ইয়াযিদ তাঁর ওসিয়ত পূরণ করার প্রতিশ্রুতি দিল এবং হযরত আবু আইয়ুব (রা) আল্লাহর নিকট নিজের জীবন সোপর্দ করে দিলেন। তাঁর ওফাতে মুসলমানদের ওপর শোক ও দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়লো। সেনাবাহিনীর আমীর স্বয়ং নামাযে জানাযাহ পড়ালেন। অতপর সকল সৈন্য অস্ত্র সাজিয়ে তাঁর লাশ কাসতানতুনিয়ার প্রাচীরের নীচে নিয়ে গেলেন এবং ইসলামের এই জালিলুল কদর বীরের দাফন কাজ সমাপ্ত করলেন। আকদুল ফরিদের লিখক বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু আইয়ুবের (রা) দাফন কাজ রাতে সম্পন্ন করা হয়। কাসতানতিনের কায়সার রাতের বেলায় মুসলমানদের তৎপরতার খবর পেলো। ফলে সে দূত প্রেরণ করে তার কারণ জিজ্ঞেস করলো। মুসলমানরা তাকে বললো যে, রাতে আমাদের পেশওয়ায়ে আজম মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহর (সা) একজন সাহাবীর ইন্তেকাল হয়। আমরা তাঁর দাফন কাজে ব্যস্ত ছিলাম। কায়সার বলে পাঠালো যে, তোমরা এখান থেকে চলে যাওয়ার পর আমরা কবর খুঁড়ে তাঁর হাড় বাইরে নিক্ষেপ করবো।

কায়সারের এই অভদ্রোচিত কথায় মুসলমানদের রক্ত গরম হয়ে উঠলো। ইয়াযিদ কায়সারকে বলে পাঠালো যে, "তোমরা যদি এ ধরনের তৎপরতা দেখাও তাহলে আল্লাহর কসম স্মরণ রেখো যে, মুসলমানদের বিশাল সাম্রাজ্যে যত গীর্জা আছে তা সব ধ্বংস করা হবে এবং খৃষ্টানদের কবর উঠিয়ে ফেলা হবে।"

ইয়াযিদের এই সতর্কবাণীর যথেষ্ট প্রভাব হলো। কায়সার জবাবে বলে পাঠালো যে, "আমি তোমাদের দ্বীনী মর্যাদার পরীক্ষা নিচ্ছিলাম। কুমারী মরিয়মের কসম, আমরা তোমাদের নবীর (সা) সাহাবীর কবরের সম্মান ও তার রক্ষণাবেক্ষণ করবো।"

ঐতিহাসিকরা বর্ণনা করেছেন যে, রোমকরা বাস্তবিকই নিজেদের প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রেখেছিল। একটি রেওয়ায়াতে তো এতটুকুনও বর্ণনা করা হয়েছে যে, রোমের কায়সার স্বয়ং হযরত আবু আইয়ুবের কবরের ওপর কুব্বা নির্মাণ করিয়েছিল।

তাবকাতে ইবনে সায়াদে আছে যে, দুর্ভিক্ষের সময় রোমক খৃষ্টানরা হযরত আবু আইয়ুবের (রা) মাজারে উপস্থিত হতো এবং তাঁর ওসিলা দিয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া করতো। আল্লাহ তায়ালা রাসূলের (সা) মেযবানের সম্মান রাখতেন এবং তাদের আশা পূরণ করতেন।

হযরত আবু আইয়ুবের (রা) ওফাতের পর মুসলমানরা কাসতানতুনিয়ার অবরোধ তুলে নিয়ে ফিরে এলো। কাসতানতুনিয়া বিজয়ের সৌভাগ্য হয়েছিল তার প্রায় ৮শ' বছর পর। সুলতান মুহাম্মাদের নেতৃত্বে এই বিজয় ঘটেছিল। কালের ব্যবধানে হযরত আবু আইয়ুবের (রা) মাযার মাটিতে ঢেকে গিয়েছিল এবং দীর্ঘ দিন যাবত কেউই জানতো না যে, রাসূলের (সা) মেযবানের পবিত্র দেহ কোথায় দাফন করা হয় ৫৭ হিজরীতে যখন বিজয়ী বীর সুলতান মুহাম্মাদ (র) কাসতানতুনিয়ার ওপর ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডীন করেন তখন অত্যন্ত চেষ্টা চরিত্র ও অনুসন্ধানের পর মাটি খুঁড়ে মাযার উদ্ধার করা হয়। সুলতান (র) সেই স্থানে এক বিরাট গম্বুজ নির্মাণ করান এবং তার নিকট একটি শান শওকতপূর্ণ জামে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিলেন। যখন এই মসজিদ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হলো সুলতান তখন সেখানে গেলেন এবং নামায আদায় করলেন। নামাযের পর শেখুল আছর আকা শামসুদ্দীন (র) সুলতানের হাতে তরবারী দিলেন এবং তার জন্য দোয়া খায়ের করলেন। তারপর শত শত বছর যাবত এই প্রথা ছিল যে, তুরস্কের যে সুলতানই ক্ষমতাসীন হতেন তিনি প্রথমে জামে আবু আইয়ুবে হাজির হতেন এবং শেখুল আছর শামসুদ্দীন (র) প্রদত্ত

তরবারী নিজের কোমরে বাঁধতেন। তারপর নিয়ম অনুযায়ী তার ক্ষমতাসীন হওয়ার কথা ঘোষণা করা হতো। এটা যেন তুর্কী বাদশাহদের করোনেশন (Coronation) অর্থাৎ রাজমুকুট পরিধানের নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুস্তফা কামাল পাশার তুরস্কে খিলাফতের সমাপ্তি ঘটিয়ে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ভিত্তি রাখার ফলে সেই প্রথারও পরিসমাপ্তি ঘটে।

বিভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত আবু আইয়ুব (রা) দু'টি বিয়ে করেছিলেন। এক স্ত্রীর নাম ছিল উম্মে হাসান বিনতে যায়েদ (রা) বিন ছাবিত। তার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন আবদুর রহমান। যৌবনকালেই তিনি ইন্তেকাল করেন। দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন মুহতারামা উম্মে আইয়ুব। এই মহিলা মশহুর সাহাবিয়া ছিলেন এবং তার থেকে কয়েকটি হাদিসও বর্ণিত আছে। নিজের শ্রদ্ধেয় স্বামীর সঙ্গে সারওয়ারে আলমের (সা) মেযবানীর মর্যাদা তিনিও লাভ করেছিলেন। তিনিই হুজুরের (সা) জন্য খাবার তৈরী করতেন। তার গর্ভে জন্মগ্রহণকারী সন্তানদের মধ্যে আইয়ুব, খালেদ এবং মুহাম্মাদ তিনপুত্র এবং এক কন্যা উমরার নাম জানা যায়। হযরত আবু আইয়ুবের (রা) সন্তানদেরকে আল্লাহ তায়ালা খুব আধিক্য এবং উন্নতি প্রদান করেছিলেন। তাসাউফের দুনিয়ার নামকরা বুজুর্গ শেখুল ইসলাম হিরাতের পীর খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র) (৪৮১ হিজরীতে মৃত্যু) হযরত আবু আইয়ুবেরই (রা) বংশধর ছিলেন। তার সন্তান-সন্ততি হিরাতের চার পাশে এবং আফগানিস্তানের এলাকাসমূহে আজও রয়েছেন। হযরত আবু আইয়ুব (রা) আনসারীর বংশধরদের মধ্য থেকে দুই বুজর্গ হযরত ইউসুফ আনসারী (র) এবং হযরত আলাউদ্দিন আনসারী (র) ভারতে তাশরীফ এনেছিলেন। এই উপমহাদেশের আনসারীদের ঊর্ধ্বতন পুরুষ এই দুই বুজর্গ।

হযরত আবু আইয়ুব (রা) বনু নাজ্জারের সচ্ছল ব্যক্তিদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। তিনি একটি দ্বিতল বাড়ী এবং তার সন্নিহিত খেজুরের একটি বাগানের মালিক ছিলেন। তার আসল পেশা ছিল কৃষি কাজ। কিন্তু কতিপয় রেওয়ায়াত অনুযায়ী তিনি অর্থনৈতিক সচ্ছলতার জন্য টুকরো কাপড়ের ব্যবসাও করতেন। নবীর (সা) হিজরতের পর ইসলামের বিজয় যতই বাড়তে লাগলো মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থাও ততই উন্নত হতে লাগলো। হযরত আবু আইয়ুবও (রা) পূর্ব থেকে সচ্ছল হয়ে গেলেন এবং ধারণা করা হয়ে থাকে যে, নবীর (সা) হিজরতের কিছুদিন পর তিনি টুকরো কাপড়ের ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছিলেন। বদরী সাহাবী হওয়ার কারণে হযরত ওমর ফারুক (রা) তার বার্ষিক বৃত্তি পাঁচ হাজার দিরহাম নির্ধারণ করেছিলেন। হযরত আলী (রা)

নিজের খিলাফতকালে তার বৃত্তির পরিমাণ বিশ হাজার দিরহাম করে দেন। এমনিভাবে তিনি ধনীদের কাতারে শামিল হয়ে গেলেন।

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) বিভিন্ন ধরনের গুণাবলী ও সুন্দর চরিত্রের এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি ছিলেন। মুসলমানদের সকল মাযহাবই তার মহান মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইসলাম গ্রহণের অগ্রগামিতা, রাসূল (সা) প্রেম, জিহাদের উৎসাহ, তাফাককুহ ফিদ দ্বীন, হক কথন ও নির্ভীকতা, সংশোধনের আবেগ এবং কুরআন শরীফ ও হাদিসের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক হযরত আবু আইয়ুবের (রা) চরিত্রের উল্লেখযোগ্য দিক। এসব গুণের কারণে তিনি রাসূলের (সা) নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হিজরতের পর তিনি যে উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সঙ্গে প্রিয় নবীর (সা) মেযবানী করেছিলেন তা তার রাসূল (সা) প্রেমেরই প্রমাণ। মসজিদে নববীর (সা) নির্মাণের পর হুজুর (সা) তৎসংলগ্ন হুজরাতে স্থানান্তর হয়ে গেলেন। কিন্তু তারপরও হুজুর(সা) কখনো কখনো হযরত আবু আইয়ুবের গৃহে তাশরীফ নিতেন। একদিন বিশ্ব নবী (সা) অভুক্ত অবস্থায় পবিত্র হুজরা থেকে বাইরে বেরুলেন। রাস্তায় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত ওমর ফারুকের (রা) সঙ্গে সাক্ষাত হলো। ঘটনাক্রমে তারাও সেদিন অভুক্ত ছিলেন। হুজুর (সা) উভয়কে সঙ্গে নিয়ে হযরত আবু আইয়ুবের (রা) বাড়ী তশরীফ নিলেন। সে সময় হযরত আবু আইয়ুব (রা) নিজের খেজুর বাগানে ছিলেন এবং বাড়ীতে খাবার কোন বস্তু ছিল না। হযরত আবু আইয়ুবের (রা) স্ত্রী হুজুরকে (সা) স্বাগত জানালেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আবু আইয়ুব কোথায়?"

হযরত আবু আইয়ুবের (রা) বাগান বাড়ীর একদম নিকটেই ছিল। তিনি হুজুরের (সা) কণ্ঠস্বর শুনে খেজুরের একটা কাঁধি ছিঁড়ে নিয়ে দৌড়ে বাড়ী এলেন এবং কাঁধিটি প্রিয় মেহমানের খিদমতে পেশ করলেন। সেই সাথে একটি বকরীও জবেহ করলেন। অর্ধেক গোশতের সালন পাকালেন এবং অবশিষ্ট অংশ দিয়ে কাবাব বানালেন এবং হুজুরের (সা) খিদমতে খাবার পেশ করলেন। হুজুর (সা) একটি রুটির ওপর কিছু গোশত রেখে বললেন ঃ

"এটা ফাতিমার (রা) নিকট পাঠিয়ে দাও। সেও কয়েকদিন অভুক্ত রয়েছে।"

হযরত আবু আইয়ুব (রা) হুকুম তামিল করলেন এবং হুজুর (সা) নিজের সঙ্গীদের সাথে মিলে খাবার খেলেন। এই লৌকিক খাবার খেতে গিয়ে তিনি ভাবাবেশে পড়ে গেলেন এবং বললেন ঃ

"আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, কিয়ামতের দিন বান্দাদেরকে পার্থিব নিয়ামতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।" (অর্থাৎ এসব নেয়ামতের হক তোমরা কিভাবে আদায় করেছ)

হযরত আবু আইয়ুব (রা) শুধু রাসূলে করিমের (সা) সত্য আশেকই ছিলেন না বরং তিনি নবীর (সা) খান্দানের সকল সদস্যকেই সীমাহীন ভালোবাসতেন। এই ভিত্তিতেই হযরত আলী মুরতাজা (রা) ও হুজুরের (সা) অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের দৃষ্টিতে হযরত আবু আইয়ুবের (রা) সীমাহীন মর্যাদা ছিল। যে যুগে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) (হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর তরফ থেকে) বসরার গভর্ণর ছিলেন। হযরত আবু আইয়ুব (রা) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বসরা তাশরীফ নিলেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) পূর্ণ আনন্দের সাথে তাঁকে ইসতিকবাল করলেন এবং বসরার নিজের বাড়ী ও সাজসরঞ্জামসহ তাঁকে দিয়ে দিলেন। দেয়ার সময় তিনি বললেন, যেভাবে আপনি রাসূলে করিমের (সা) মেযবানী করার জন্য নিজের ঘর খালি করে দিয়েছিলেন তেমনি আমিও আপনার মেযবানীর জন্য নিজের ঘর, মাল, আসবাবসহ আপনাকে দিয়ে দিলাম।

ইফকের ঘটনায় যখন মুনাফিকরা হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রা) ওপর তোহমত বা মিথ্যা অপবাদ আরোপ করলো তখন আবু আইয়ুবের (রা) স্ত্রী উম্মে আইয়ুব (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "লোকজন যা কিছু বলছে আপনি তা শুনেছেন।" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, কিন্তু তা সবই মিথ্যা।" আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি লোকজন যে কথায় উম্মুল মু'মিনীনকে দোষারোপ করছে, তুমি কি তা করতে পরো।"

উম্মে আইয়ুব (রা) বললেন ঃ "আল্লাহর কসম, অবশ্যই নয়।"

তিনি বললেন ঃ "তুমি যদি এ রকম করতে না পারো তাহলে আয়েশা সিদ্দীকার (রা) মর্যাদা ও কৃতিত্ব তো তোমার চেয়ে অনেক বেশী।"

হযরত আবু আইয়ুব (রা) হক কথক ছিলেন। একবার মিসরের গভর্ণর হযরত উকবা (রা) বিন আমের জাহনী মাগরিবের নামাযে কোন কারণে দেরী করলেন। ঘটনাক্রমে হযরত আবু আইয়ুবও (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে বললেন, "উকবা এটা কেমন নামায?" হযরত উকবা (রা) জবাব দিলেন যে, এক কাজের জন্য ঘটনাক্রমে দেরী হয়ে গেছে। হযরত আবু আইয়ুব (রা) বললেন ঃ

"তাতো ঠিক। কিন্তু এটা ভুলে যেও না যে, তুমি রাসূলের (সা) সাহাবী। তোমার কথা এবং কাজ মানুষের জন্য দলিল হয়ে যেতে পারে। হুজুর (সা)

মাগরিবের নামায তাড়াতাড়ি পড়তে বলেছেন। তুমি যদি এই নামাযে বিলম্ব কর তাহলে জনগণ মনে করবে যে, হুজুরও (সা) এই সময়ে নামায আদায় করে থাকবেন। স্মরণ রেখো যে, কোন সাহাবীর কোন কাজ নবীয়ে আকরামের (সা) সুন্নাতের খিলাফ যেন না হয়।"

হযরত উকবা (রা) ভবিষ্যতে সতর্ক থাকার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

একবার মদীনার শাসক মারওয়ান ইবনুল হাকাম শুধুমাত্র নিজের দুর্বলতার কারণে মসজিদের ইমামদেরকে ডেকে নামায একটু বিলম্বে পড়ার তাকিদ দিলেন। যাতে তিনি জামায়াতে শামিল হতে পারেন। হযরত আবু আইয়ুব (রা) এই ঘটনা জানতে পেরে অবিলম্বে মারওয়ানের নিকট গেলেন এবং বললেন, "নামায বিলম্ব করানোর কোন অধিকার তোমার নেই। তুমি যদি এ ব্যাপারে রাসূলের (সা) অনুসরণ না কর তাহলে আমরা তোমার বিরোধিতা করবো। আর যদি হুজুরের (সা) আমলকে পথ চলার মশাল বানাও তাহলে আমরা তোমার সঙ্গে থাকবো।"

এক যুদ্ধে সেনাপতি আবদুর রহমান বিন খালিদ (রা) (বিন ওয়ালিদ) চারজন বন্দীকে হাত-পা বেঁধে হত্যা করালেন। হযরত আবু আইয়ুব (রা) এই ঘটনার খবর পেয়ে খুব অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন ঃ

"এ তো শোনিতপাত এবং বর্বরতামূলক কাজ। রাসূলুল্লাহ (সা) বন্দীদের সঙ্গে এ ধরনের বর্বরতামূলক আচরণ নিষেধ করে দিয়েছেন। আমিতো এভাবে একটি মুরগীও জবেহ করা পসন্দ করি না।"

হযরত আবু আইয়ুব (রা) হক কথনের সঙ্গে সঙ্গে সীমাহীন শরীফ এবং নরম অন্তরের মানুষ ছিলেন। রোমের যুদ্ধে অনেক রোমক মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। তাদেরকে জাহাজে চড়ানো হলো। ঘটনাক্রমে হযরত আবু আইয়ুব(রা) সেই কয়েদীদের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন যে একজন মহিলা কয়েদী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তাকে এভাবে কাঁদতে দেখে তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। তার এই অসহায়ভাবে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করে জানতে পেলেন যে, তার শিশু সন্তানকে কেড়ে নিয়ে জাহাজের অন্য কোথায়ও রাখা হয়েছে। হযরত আবু আইয়ুব (রা) তক্ষুণি সেই শিশুকে তালাশ করে নিয়ে এলেন এবং তার মা'র হাওয়ালা করে দিলেন। কয়েদীদের তত্ত্বাবধায়ক অফিসারের নিকট হযরত আবু আইয়ুবের (রা) এই কাজ খুবই অসহনীয় মনে হলো। সে সেনাপতির নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগ করলো। সেনাপতি যখন তাঁর নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সা) এই ধরনের জুলুম বা নির্যাতনমূলক আচরণ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। এখন তুমি বুঝে নাও যে, আমি এ ধরনের জুলুম নির্যাতন নিজের চোখের সামনে কিভাবে দেখতে পারি।"

হযরত আবু আইয়ুব (রা) সুন্নাতের খিলাফ কোন কিছু দেখলেই অস্থির হয়ে পড়তেন এবং হকের আওয়াজ বুলন্দ করতে কখনো দ্বিধা করতেন না। একবার সিরিয়া এবং মিসর তাশরীফ নিলেন। সেখানে গিয়ে মুসলমানদের বাড়ীতে পায়খানা কিবলামুখী দেখতে পেলেন। এটা দেখে তাঁর খুব খারাপ লাগলো। বারবার বলতেন, "হে মুসলমানরা! কিবলামুখী করে পায়খানা বানানো খুবই খারাপ কাজ। আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে শুনেছি যে, তোমরা যখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যাও তখন কিবলার দিকে মুখ করো না এবং সেদিকে পিছনও দিও না।"

হযরত আবু আইয়ুব (রা) থেকে বর্ণিত এই হাদিসের এত ব্যাপক প্রচার হয় যে, বর্তমানে মুসলমানদের প্রতিটি শিশু সন্তানও কিবলামুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করাকে গুনাহ হিসেবে মনে করে থাকে।

একবার হযরত সালেম (রা) বিন আবদুল্লাহ আনসারী হযরত আবু আইয়ুবকে (রা) ওয়ালিমার দাওয়াতে ডাকলেন। তিনি তাঁর বাড়ী গেলেন। সেখানে গিয়ে দরজাতে চিত্র সম্বলিত ঝুলন্ত পর্দা দেখতে পেলেন। হযরত আবু আইয়ুব (রা) তা দেখে মনে খুব ব্যথা পেলেন। তিনি হযরত সালেমকে (রা) খুব তামবিহ করলেন এবং যতক্ষণ এই পর্দা সরিয়ে না নেয়া হলো ততক্ষণ তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন না। হযরত আবু আইয়ুবের (রা) খুবই লজ্জা শরম ছিল। তিনি যখন ঘরের বাইরে কূপের ওপর ঘটনাক্রমে গোসল করতে যেতেন তখন চারদিকে কাপড় টাঙ্গিয়ে নিতেন।

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) সেসব জালিলুল কদর সাহাবীর মধ্যে পরিগণিত হতেন যাঁরা রাসূলে আকরামের (সা) আমলেই সম্পূর্ণ কুরআন হেফজ করে নিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি ইলম ও ফজিলতের দিক থেকে জ্ঞানের সমুদ্র ছিলেন এবং এক বিশ্ব তাঁর ইলমের কামালিয়াতের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। যেসব জালিলুল কদর সাহাবী এবং তাবেয়ী তার ইলমের কামালিয়াত থেকে ফয়েজ প্রাপ্ত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা), হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা), হযরত আনাস (রা) বিন মালিক, হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রা), হযরত বারা' (রা) বিন আযিব, হযরত উরওয়া বিন যোবায়ের (রা), হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব (র),

হযরত আতা' বিন ইয়াসার (র) এবং হযরত আবদুর রহমান বিন আবি লায়লার (র) মত উম্মাহর ফকিহদের নাম দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে।

হযরত আবু আইয়ুব (রা) "তাফাক্কুহ ফিদ্দীনে" এমন কামালিয়াত রাখতেন যে, খুব জটিল জটিল বিষয় এক মুহূর্তের মধ্যে সমাধান করে দিতেন। একবার হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) এবং হযরত মিসওয়ার(রা) বিন মাখরামার মধ্যে একটি মাসয়ালাতে মতবিরোধ হলো। মাসয়ালাটি ছিল যে, এক ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় জানাবতের গোসলের সময় নিজের হাত দিয়ে মাথা ডলতে পারে কি না। হযরত মিসওয়ারের (রা) নিকট মাথা ধোয়া জায়েজ ছিল না। কিন্তু ইবনে আব্বাস (রা) তা জায়েজের পক্ষে ছিলেন। উভয় বুজুর্গই হযরত আবদুল্লাহ বিন হোসাইনকে (রা) হযরত আবু আইয়ুবের (রা) নিকট এই মাসয়ালায় তাঁর মত কি তা জানার জন্য প্রেরণ করলেন। আবদুল্লাহ হযরত আবু আইয়ুবের বাড়ী পৌঁছলেন। সে সময় তিনি ঘটনাক্রমে গোসল করছিলেন। আবদুল্লাহ (রা) উচ্চৈস্বরে এই মাসায়ালা জিজ্ঞেস করলেন। হযরত আবু আইয়ুব (রা) কাপড়ের অন্তরাল থেকে নিজের মাথা বাইরে বের করলেন এবং হাত দিয়ে মাথা ডলতে শুরু করলেন। অতপর বললেন ঃ "রাসূলুল্লাহ(সা) এভাবে গোসল করতেন।"

আসেম বিন সুফিয়ান ছাকাফী সালাসিলের যুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য রওয়ানা হলেন। তিনি রাস্তাতেই ছিলেন। এমন সময় যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার খবর পেলেন। জিহাদ থেকে মাহরুম হওয়ার জন্য তিনি খুব দুঃখীত হলেন। দুঃখ ও হতাশ অবস্থায় তিনি আমীরে মুয়াবিয়ার (রা) নিকট গেলেন। সে সময় তাঁর নিকট হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) এবং হযরত উকবা (রা) বিন আমের জুহানীও উপস্থিত ছিলেন। তিনজনই সাহাবী এবং জ্ঞানের পূর্ণতায় সুশোভিত ছিলেন। আসেম সরাসরি হযরত আবু আইয়ুবের (রা) নিকট মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলেন এবং আমীরে মুয়াবিয়া (রা) ও হযরত উকবার (রা) প্রতি দৃষ্টি দিলেন না। হযরত আবু আইয়ুব (রা) তাঁর মাসয়ালার জবাব দিলেন। কিন্তু অন্য বুজুর্গদের প্রতি তাঁর অনীহাকে পসন্দ করলেন না। আসেমের কথার জবাব দিয়ে তিনি স্বয়ং হযরত উকবার (রা) প্রতি মনোযোগী হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ "উকবা! আমি কি সঠিক জবাব দিয়েছি।" হযরত উকবা (রা) তাঁর জবাবের সত্যতা স্বীকার করলেন। এই ঘটনা থেকে হযরত আবু আইয়ুবের (রা) জ্ঞানের ব্যাপকতার সন্ধান মেলে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে বিনয়ী ছিলেন তারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

হযরত আবু আইয়ুব (রা) থেকে ১৫০টি হাদিস বর্ণিত আছে। হাদিস শ্রবণেও তাঁর খুব উৎসাহ ছিলো। আমীরে মুয়াবিয়ার (রা) শাসনামলে মশহুর

সাহাবী হযরত উকবা (রা) বিন আমের জুহনী মিসরে অবস্থানরত ছিলেন। হযরত আবু আইয়ুব (রা) জানতে পেলেন যে, তিনি একটি বিশেষ হাদিসের বর্ণনাকারী। সেই হাদিস শোনার সুযোগ তাঁর হয়নি। তিনি তা শোনার জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন এবং বার্দ্ধক্য অবস্থায় শুধুমাত্র একটি হাদিস শোনার জন্য তিনি মদীনা মুনাওয়ারা থেকে মিসরের কষ্টকর ও দীর্ঘ সফরে যান। মিসর পৌঁছে হযরত মুসলিমা (রা) বিন মুখাল্লাদের বাড়ী তাশরীফ নিলেন। তিনি রাসূলের (সা) মেযবানের সাথে স্বাক্ষাত করে খুব খুশী হলেন এবং মিসর সফরের কষ্ট কেন সহ্য করেছেন তা জিজ্ঞেস করলেন। হযরত আবু আইয়ুব (রা) বললেন, তিনি উকবার নিকট থেকে একটি হাদিস শুনতে এসেছেন। কেননা ইসলামী জাহানে এ সময় সেই হাদিস জাননে ওয়ালা আর কেউ নেই। তিনি বললেন, আমাকে উকবার বাড়ীর ঠিকানা বলে দিন। মোটকথা, তিনি মুসলিমা (রা) থেকে বিদায় নিয়ে হযরত উকবার (রা) বাড়ী পৌঁছলেন এবং তাঁর নিকট সেই বিশেষ হাদিস জিজ্ঞেস করলেন। হাদিসটি শুনালে তিনি তাঁকে শুকরিয়া জানিয়ে নিজের উটে সওয়ার হয়ে মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলেন। হযরত আবু আইয়ুবের (রা) হাদিস প্রেমের আন্দাজ এই ঘটনা থেকেই করা যায়। মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থাতেও হাদিস প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন।

হযরত খুবায়েব আনসারী (রা)

ওহোদের যুদ্ধের কয়েক মাস পরের ঘটনা। একদিন রহমতে আলম (সা) মদীনা মুনাওয়ারার কোন এক স্থানে সাহাবায়ে কিরামের (রা) একটি দলের মধ্যে বসেছিলেন। দ্বীন ও দুনিয়ার কথাবার্তা হচ্ছিল এবং রাসূল প্রদীপের পতঙ্গরা হুজুরের (সা) ইরশাদসমূহ থেকে ফায়দা উঠানোর জন্য একাগ্রচিত্তে বসেছিলেন। হঠাৎ করে মহানবীর (সা) ওপর ওহী নাযিলের অবস্থা সৃষ্টি হলো এবং রাসূলের (সা) যবান দিয়ে এই বাক্য উচ্চারিত হলো ঃ

আলাইকাস সালাম ইয়া খুবাইবা—আলাইকাস সালাম ইয়া খুবাইবা অর্থাৎ "হে খুবায়েব! তোমার ওপর সালাম—হে খুবায়েব! তোমার ওপর সালাম।"

সাহাবায়ে কিরাম (রা) বিস্ময়ের সঙ্গে হুজুরের (সা) দিকে তাকালেন এবং তিনি কি বলছেন তা শুনলেন। সারওয়ারে আলম (সা) তাঁদের বিস্ময়ের ব্যাপারটি বুঝে নিলেন এবং তাঁদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"খুবায়েবকে আল্লাহর দুশমনরা হত্যা করে ফেলেছে। ইনি জিবরাইল (আ) আমাকে তার সালাম পৌঁছাচ্ছেন।"

হক পথের এই শহীদ যাঁর সালাম—তিনশ' মাইল দূরের তাঁর হত্যার স্থান থেকে—রুহুল আমীন (আ) প্রিয় নবীকে (সা) পৌঁছালেন এবং যাঁর ওপর স্বয়ং সাইয়েদুল আনাম খায়রুল খালায়েক ইমামুল মুরসালীন (সা) সালাম প্রেরণ করলেন। তিনি ছিলেন আওস গোত্রের আশা-আকাংখার কেন্দ্রবিন্দু হযরত খুবায়েব (রা) বিন আদি আনসারী। তিনি মদীনা মুনাওয়ারার সেসব সৌভাগ্যবানদের অন্যতম ছিলেন যারা নবীর (সা) হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ লাভ করেছিলেন। রহমতে আলমের (সা) মদীনা মুনাওয়ারাতে শুভ পদার্পণের পর তিনি নবীর (সা) অনেক অনেক ফয়েজ হাসিল করেছিলেন। এমনকি খুব শীঘ্র তিনি মর্যাদাবান সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হতে লাগলেন। বদরের যুদ্ধে তিনি তিনশ' তেরজন পবিত্র আত্মার সেই দলে শামিল হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন, যাঁদের ত্যাগ ও কুরবানী এবং নিষ্ঠা ও বাহাদুরীর কাহিনী ইসলামের ইতিহাসের পাতায় স্থায়ীভাবে প্রোজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। এই যুদ্ধে হুজুর (সা) হযরত খুবায়েবকে (রা) মুজাহিদদের আসবাব-পত্রের তত্ত্বাবধান কাজে নিয়োগ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি যুদ্ধের ময়দানে তরবারীর চমক দেখানোর সুযোগও পেয়েছিলেন। তিনি কুরাইশ মুশরিকের

এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হারেছ বিন আমের বিন নওফিলকে জাহান্নামে প্রেরণ করেছিলেন। বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত খুবায়েবকে (রা) রাসূলে আকরাম (সা) গভীরভাবে ভালবাসতেন এবং তাঁর অন্তরে দ্বীনে হকের জন্য জীবন কুরবানী করার আবেগ সবসময় বিরাজিত ছিল। হুজুরও (সা) তাঁকে খুব স্নেহ করতেন এবং নবীর সেই সীমাহীন ভালবাসা ও স্নেহ তাঁকে এক অনুকরণীয় মরদে মু'মিন বানিয়ে দিয়েছিল।

ওহোদের যুদ্ধে মুসলমান তীরন্দাজদের বিচ্যুতির কারণে হকপন্থীদের প্রচণ্ড ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল। কাফেরদের সাহস গিয়েছিল বেড়ে। তারপর থেকে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিত্যনতুন ষড়যন্ত্র আঁটতো। মক্কা এবং আসফানের মধ্যে বনু লাহইয়ান নামক এক মুশরিক কবিলার আবাদ ছিল। তারা ছিল কুরাইশের মিত্র গোত্র বনু হাযিলের শাখা। চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে বনু লাহইয়ানের সরদার সুফিয়ান বিন খালিদ মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক হীন ষড়যন্ত্র আঁটলো। (কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, সুফিয়ান বিন খালিদ লাহইয়ানি হাযলী এক যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছিল। এ জন্য বনু লাহইয়ান তার হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই পরিকল্পনা তৈরী করে)।

ঘটনা হলো এই যে, ওহোদের যুদ্ধের পর মক্কার এক বনী কারাশিয়া সালাফা বিনতে সায়াদ ঘোষণা করলো যে, যে ব্যক্তি ইয়াসরাবের আছেম (রা) বিন ছাবিতকে জীবিত ধরে আনবে অথবা তার মাথা কেটে আমার নিকট পৌঁছাবে আমি তাকে উন্নত জাতের একশ উট পুরস্কার দেব। এই ঘোষণার পটভূমি এই ছিল যে, সালাফার দুই পুত্র মাসাফি বিন তালহা এবং হারিছ বিন তালহা (অথবা অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী কালাব বিন তালহা) ওহোদের যুদ্ধে হযরত আছেম (রা) বিন ছাবিত আনসারীর হাতে নিহত হয়েছিল। সুতরাং সে ওয়াদা করেছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের স্বামী এবং পুত্রদের হত্যার প্রতিশোধে আছেমের (রা) মাথা কেটে আনা না হবে ততক্ষণ শান্তির সঙ্গে বসবে না। সুফিয়ান বিন খালেদ লাহইয়ানি কিছুটা এই পুরস্কারের লোভে এবং কিছুটা মুসলমানদেরকে কষ্ট দানের ধারণায় আদাল ও কারাহ গোত্রের কতিপয় মানুষ হাত করলো। সে তাদেরকে মুসলমানের বেশে মদীনা গমনের পরামর্শ দিলো। সেখানে গিয়ে তারা বলবে যে, তাদের কবিলার সকলেই ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী। কিন্তু শর্ত হলো, কিছু মুসলমান তাদের নিকট গিয়ে তাদেরকে ভালভাবে ইসলামের শিক্ষা দেবে। এই শর্ত যদি মুহাম্মাদ (সা) মেনে নেন তাহলে মুয়াল্লিম বা শিক্ষকদের মধ্যে আছেম (রা) বিন ছাবিতকেও অন্তর্ভুক্ত

করার চেষ্টা করতে হবে। আদল ও কারাহ'র সাতজন হতভাগা সুফিয়ান বিন খালিদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করলো এবং মদীনা পৌঁছে নবীয়ে আকরামের (সা) নিকট কতিপয় শিক্ষক তাদের সঙ্গে দেয়ার আবেদন জানালো। যাতে তারা তাদের গোত্রসমূহে তাবলীগ করতে পারে এবং ইসলামের আহকাম শিখাতে পারে। ধোঁকা হিসেবে তারা হযরত আছেম (রা) বিন ছাবিতের নিকট নিজেদের গোত্রসমূহের বেশীর ভাগ মানুষের তার প্রতি ভালবাসার অনেক কথাই বললো। [ইবনে আছিরের বর্ণনানুযায়ী এসব মানুষ মদীনায় হযরত আছেমের (রা) পিতা ছাবিতের গৃহে বাস করেছিল] রহমতে আলম (সা) তাদের দরখাস্ত কবুল করলেন এবং ৬ জন (অন্য রেওয়ায়াত মতে ১০ জন) সাহাবীকে হযরত আছেম (রা) বিন ছাবিতের নেতৃত্বে তাদের সঙ্গে প্রেরণ করলেন। দায়ীয়ে হকের এই পবিত্র দলে হযরত খুবায়েব (রা) বিন আদিও শামিল ছিলেন।

[হযরত আছেম (রা) এবং খুবায়েব (রা) ছাড়া যেসব সাহাবী এই দলে শামিল ছিলেন তাদের চার জনের নাম চরিতকাররা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। সেই চারজন সাহাবী হলেন ঃ মারছাদ (রা) বিন আবি মারছাদ, খালিদ (রা) বিন আল বাকির, আবদুল্লাহ (রা) বিন তারেক এবং যায়েদ (রা) বিন আদ দাছনা। এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হুজুর (সা) সেই জামায়াতের আমীর হিসেবে হযরত মুরছাদকে (রা) নিয়োগ করেন। বস্তুত আল্লামা ইবনে সায়াদ এই ঘটনাকে "সারিয়ায়ে মারছাদ" নাম দিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ চরিতকারই হযরত আছেমই (রা) এই দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বলে মত প্রকাশ করেছেন এবং তাঁরা এই ঘটনাকে "গাযওয়াতুর রাজি" নাম দিয়েছেন। রাজি'র যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। বুখারীতে হযরত আবু হুরায়রার (রা) এক রেওয়ায়াত থেকে এটাও প্রকাশ পায় যে, হুজুর (সা) এই দলকে স্বয়ং গোয়েন্দাগিরির জন্য প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য সব রেওয়ায়াতে ষড়যন্ত্রের কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।]

এই পবিত্র দল যখন রাজি'তে পৌঁছলেন তখন আদল এবং কারাহ'র প্রতিনিধিদল পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র অনুযায়ী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং গাদ্দারী করলো এবং বনু লাহইয়ানকে খবর দিল যে, তোমাদের শিকার এসে গেছে। সুতরাং দুইশ' লাহইয়ানি যোদ্ধা হকপন্থীদের এই ছোট্ট দলের ওপর হামলা করে বসলো। তাদের মধ্যের একশ' খুবই শক্তিশালী ছিল। মুসলমানরা তাদের ভাবভঙ্গী দেখে দৌঁড়ে নিকটের একটি টিলার ওপর উঠে গেলেন এবং বনু লাহইয়ানকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীরা! আরবের চিরাচরিত প্রথা পদদলিত করছো কেন? মেহমানদেরকে এভাবে ধোঁকা দিয়ে ঘরে ডেকে এনে হত্যা করা কি বৈধ? তোমরা যদি তাই চাও তাহলে শুনে নাও যে, আমরা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তোমাদের মোকাবিলা করবো। যেই আমাদের নিকট আসবে সে জীবন নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না।"

লাহইয়ানীরা বললো ঃ

"আমরা তোমাদেরকে ধ্বংস করতে চাই না। আমরা তো শুধুমাত্র মক্কার কুরাইশদের নিকট থেকে তোমাদের মাধ্যমে কিছু সম্পদ হাসিল করতে চাই। আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, তোমরা যদি নীচে নেমে আসো তাহলে আমাদের আশ্রয়ে থাকবে।"

হযরত আছেম (রা) বললেন ঃ

"আল্লাহর কসম! আমরা মুশরিকদের কোন প্রতিশ্রুতিকে বিশ্বাস করি না। আমরা কোনক্রমেই তোমাদের আশ্রয় নিতে চাই না।"

অতপর কাফেররা চারদিক থেকে এসব অসহায় মুসলমানদের ওপর তীর এবং বর্শা দিয়ে হামলা করে বসলো। মুসলমানরা অত্যন্ত দৃঢ় এবং অটলতার সঙ্গে মুকাবিলা করলেন। হযরত আছেম (রা) সঙ্গীদেরকে বললেন ঃ

"ভাইয়েরা! আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। তবে, তাতে কিছু আসে যায় না। শাহাদাতের মনযিল তোমাদের সামনে এবং বেহেশতের হুররা তোমাদেরকে কোলে নেয়ার জন্য অস্থির হয়ে আছে।"

মুসলমানরা নিজেদের তীর বের করলেন এবং কাফেরদের তীরের জবাব তীর দিয়েই দিলেন। তীর যখন শেষ হয়ে গেল তখন নিযা দিয়ে মুকাবিলা করলেন। হযরত আছেম (রা) দোয়া করলেন ঃ

"হে আল্লাহ! তোমার পথে আমরা নির্যাতিত অবস্থায় মারা যাচ্ছি। আমরা প্রথম দিন থেকে তোমার দ্বীনের সমর্থন করেছি। এখন তোমার সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমি তোমার সঙ্গে ওয়াদা করেছিলাম যে, আমি নিজে কখনো কোন মুশরিককে স্পর্শ করবো না এবং কোন মুশরিককে আমার দেহ স্পর্শ করতে দেব না। মৃত্যুর পর আমার লাশ হেফাজতের দায়িত্ব তোমার ওপর থাকবে।"

এই দোয়ার পর তিনি যুদ্ধ গাথা পড়তে পড়তে শত্রুদের মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং দু'জন (৬ জন) সাথীকে সঙ্গে নিয়ে শাহাদাতের মর্যাদায় সমাসীন হলেন। (তাবকাতে ইবনে সায়াদে আছে যে, হযরত আছেম (রা) সে

সময় এই গাথা পড়েছিলেন ঃ "আমি দুর্বল নই। শক্তিশালী এবং সামর্থবান এবং আমার ধনুর ছিলা খুবই মজবুত। প্রশস্ত তীর ধনুর ওপর দিয়ে উড়ে যায়। মৃত্যু অবধারিত এবং জীবন বাতিল বস্তু এবং মানুষের তকদিরে যা আছে তা ঘটবেই এবং মানুষ নিজের রবের দিকে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করবে। আমি যদি তোমাদের সাথে লড়াই না করি তাহলে আমার মা আমাকে নিখোঁজ করে ফেলবেন।"

আল্লামা ইবনে দুরাইদ "জামহারাতে" হযরত আছেমের (রা) সঙ্গে এই গাথা সংশ্লিষ্ট করেছেন ঃ "আমি হলাম আবু সোলায়মান এবং আমার নিকট মুকয়াদের মত নামকরা তীর প্রস্তুতকারীর তীর রয়েছে এবং এই তীর অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত। এবং যখন লড়াইয়ের ময়দান গরম হয় তখন আমি কেঁপে উঠি না। এবং আমার নিকট গরুর চামড়ার উত্তম ঢাল রয়েছে। আমি হলাম আবু সোলায়মান এবং আমার মত বাহাদুর এখন যুদ্ধে। আমার কওমও সম্মানিত এবং আমার খান্দানও। এবং আমি সেসব বস্তুর ওপর ঈমান এনেছি যার ওপর (আমার আকা) মুহাম্মাদ (সা) ঈমান এনেছেন।" তিন সাহাবী হযরত খুবায়েব (রা) বিন আদী, হযরত যায়েদ (রা) ইবনুদ দাছনা এবং হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন তারেককে মুশরিকরা জীবিত গ্রেফতার করে নিয়ে গেল। হযরত আছেমের (রা) দোয়া যা একজন বেদনাভারাক্রান্তের অন্তর থেকে বের হয়েছিল তা সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর নিকট কবুল হয়ে গেল। মুশরিকরা যখন তাঁর মাথা কাটতে চাইলো তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর পবিত্র দেহের চারপাশে মৌমাছির (এবং কতিপয় রেওয়ায়াত অনুযায়ী নেকড়ে) ঝাঁক প্রেরণ করলেন। কোন মুশরিক সেদিকে অগ্রসর হলে তাকে মারাত্মকভাবে হুল ফুটিয়ে দেয়। শেষে তারা লাশ সেখানেই রেখে গেল। তাদের ধারণা ছিল যে, মৌমাছির এই ঝাঁক কিছুক্ষণ পরই উড়ে যাবে, সে সময় তার মাথা কেটে নেবে। আল্লাহর অপার কুদরত যে, রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত ঘটলো। ফলে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো। হযরত আছেমের (রা) পবিত্র দেহ সেই বৃষ্টির পানিতে ভেসে গেল এবং হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর লাশ কাফেরদের হস্তগত হলো না। এমনিভাবে আল্লাহ পাক তার দেহকে অমর্যাদা করার হাত থেকে রক্ষা করলেন। জীবদ্দশাতেও কোন কাফের তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি এবং শাহাদাতের পরও কেউ তা করতে সক্ষম হয়নি। [হযরত আছেম (রা) বিন ছাবিত আনসারী অন্যতম জালিলুল কদর সাহাবী ছিলেন। তিনি আউস গোত্রভুক্ত ছিলেন। হিজরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। বড় বাহাদুর মানুষ ছিলেন এবং তীর, তরবারী ও বর্শার যুদ্ধে পূর্ণ পারদর্শী ছিলেন। বদরের যুদ্ধে তিনি ইসলামের মশহুর দুশমন উকবা বিন আবি মুঈতকে হত্যা করেন এবং

ওহোদের যুদ্ধে বনু আবদিদ দারের দুই অশ্বারোহী মাসাকে ও হারিছ অথবা তালহা বিন আবি তালহার পুত্র কিলাব ও সালাফা বিনতে সায়াদকে নিজের তীরের নিশানা বানিয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর ওয়াদা করেছিলেন যে, তিনি কখনো কোন মুশরিককে স্পর্শ করবেন না এবং নিজের দেহকেও কোন মুশরিককে স্পর্শ করতে দেবেন না। আল্লাহ তায়ালা শাহাদাতের পরও তাঁর দেহকে মুশরিকদের অপবিত্র হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) এই ঘটনা শুনে বললেন, "এটা আল্লাহর মেহেরবানী। তিনি নিজের মু'মিন বান্দাকে এমনিভাবে হেফাজত করেছিলেন।" হযরত আছেমের (রা) কন্যা জামিলা (রা) হযরত ওমর ফারুকের (রা) বাগদত্তা ছিলেন। আছেম বিন ওমর (রা) তাঁর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন।]

হযরত খুবায়েব (রা) যায়েদ (রা) এবং আবদুল্লাহ (রা) বিন তারেককে কাফিররা ধনুকের ছিলা দিয়ে বাঁধতে লাগলো। এ সময় হযরত আবদুল্লাহ (রা) প্রচণ্ডভাবে বাধা দিলেন। তা সত্ত্বেও মুশরিকরা তাঁকে কোন না কোনভাবে বেঁধে মক্কা রওয়ানা হয়ে গেল। তারা মাররে জাহরান পৌঁছলে আবদুল্লাহ (রা) নিজের হাতকে কয়েদের রশি থেকে বের করে নিলেন এবং একজন মুশরিকের তরবারী ছিনিয়ে নিতে চাইলেন। তা দেখে মুশরিকরা ক্রোধান্বিত হলো এবং পিছু হটে তাঁর ওপর পাথর নিক্ষেপ শুরু করলো। এই অবস্থাতেই তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। মুশরিকরা সেখানেই তাঁকে দাফন করে সামনে অগ্রসর হলো। [কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, মুশরিকরা আবদুল্লাহকে (রা) রাজী' নামক স্থানেই শহীদ করে ফেলেছিল।] এতক্ষণে তাদের কব্জায় মাত্র দুই আশেকানে হক অবশিষ্ট ছিল। হযরত খুবায়ের (রা) বিন আদী এবং হযরত যায়েদ (রা) বিন আদ দাছনাকে মক্কার বাজারে নিয়ে আসা হলো। সে যুগে সেখানে পশুর মত মানুষ কেনা-বেচা হতো। কুরাইশরা যখন জানতে পেলো যে, বনু লাহইয়ান মুহাম্মাদের (সা) দুই সঙ্গীকে গ্রেফতার করে মক্কা নিয়ে এসেছে তখন তারা খুব খুশী হলো এবং দেখার জন্য বাজারের দিকে ছুটলো। তারা দেখতে চাইছিলো যে, কয়েদীদ্বয়ের কেউ তাদের কোন প্রিয় ব্যক্তির হত্যাকারী কিনা। হযরত খুবায়েব (রা) বদরের যুদ্ধে হারিছ বিন আমের বিন নওফিলকে হত্যা করেছিলেন। হারিছের আত্মীয়রা যখন খুবায়েবকে (রা) দেখলো তখন তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লো। কারণ, তারা হারিছের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য খুব সহজ সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল। সুতরাং হারিছের পুত্র (অথবা অন্য এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী যয়নব বিনতে হারিছ) হযরত খুবায়েবকে (রা) একশ' উটের বিনিময়ে কিনে নিল।

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, নিহত হারিছ বিন আমেরের মিত্র হাজার বিন আবি আহাব তামিমী খুবায়েবকে (রা) ৮০ দিনার অথবা ৫০টি উটের বিনিময়ে কিনে নেয়। যাতে তার ভ্রাতুষ্পুত্র উকবা বিন হারিছ তাঁকে হত্যা করে নিজের পিতার রক্তের প্রতিশোধ নিতে পারে। [হাফিজ ইবনে হাজার (র) "ইসাবাতে" লিখেছেন, ৬-৭ জন মিলে হযরত খুবায়েবকে (রা) কিনেছিল। তারা সকলেই ছিল বদরের যুদ্ধে নিহতদের আত্মীয়-স্বজন।]

এমনিভাবে হযরত যায়েদ (রা) বিন আদ দাছনাকে সাফওয়ান বিন উমাইয়া ৫০টি উটের বিনিময়ে কিনে নেয়। যাতে তাঁকে বদরের যুদ্ধে নিহত নিজের পিতা উমাইয়া বিন খালফের বদলায় হত্যা করতে পারে। আল্লাহর দুই পবিত্র বান্দা লাহইয়ানি বিশ্বাসঘাতকদের নির্যাতনের পাঞ্জা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে কাঠোর প্রাণ মুশরিকদের হাতে এসে পড়ে।

মক্কার কুরাইশরা কুফুরী অবস্থাতেও নিষিদ্ধ মাসগুলোতে (অর্থাৎ চার নিষিদ্ধ মাসে রজব, জিলকদ, জিলহজ্জ এবং মহররম) যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে দূরে সরে থাকতো। হযরত খুবায়েবকে (রা) যে সময় কেনা হয়েছিল সে সময়টা ছিল জিলকদ মাস। এ জন্য বনু হারিছ নিষিদ্ধ মাসে তাঁকে হত্যার কাজ মূলতবী রাখলো এবং জিঞ্জিরাবদ্ধ করে একটি কুঠরীতে বন্দী করে রাখলো। তাবকাতে ইবনে সায়াদে বর্ণিত আছে যে, বনু হারিছ খুবায়েবের (রা) তত্ত্বাবধানের জন্য তাদের প্রিয় একজন ভয়ংকর মানুষকে নিয়োগ করে। ইবনে ইসহাক (র) বলেছেন, বনু হারিছরা খুবায়েবকে (রা) খরিদ করে হুজায়ের বিন আবি আহাবের দাসী মাদদীয়ার (অথবা মারিয়া) গৃহে বন্দী করে রাখা হয় এবং তাঁর তত্ত্বাবধানের জন্য যয়নব বিনতে হারিছকে নিয়োগ করা হয়। পরবর্তী কালে এই মাদদীয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বলেন ঃ

"আল্লাহর কসম! আমি খুবায়েব (রা) বিন আদী থেকে উত্তম কোন কয়েদী দেখিনি। সে রাতের শেষাংশে এমন হৃদয়গ্রাহী কণ্ঠস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করতেন যে, কুরাইশের মহিলারা তা শুনে অবলীলাক্রমে ক্রন্দন করতো। একদিন আমি তাঁর কুঠরীর প্রবেশ পথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। আমি দেখে হয়রান হয়ে গেলাম যে, জিঞ্জিরাবদ্ধ খুবায়েব (রা) বিরাট ছড়া (মানুষের মাথার সমান) থেকে আঙ্গুর খাচ্ছেন। অথচ সেটা আঙ্গুরের মওসুম ছিল না। এটা ছিল আল্লাহ প্রদত্ত রিযক। তিনি তাঁকে তা প্রদান করেছিলেন।"

"আমি একদিন খুবায়েবকে (রা) বললাম, তোমার কোন জিনিসের প্রয়োজন থাকলে আমাকে বলো। খুবায়েব (রা) বললো, আমার কোন জিনিসের প্রয়োজন নেই। অবশ্য আমি তোমাকে তিনটি ব্যাপারে অনুরোধ

করবো ঃ (১) আমাকে মিষ্টি পানি পান করাবে (২) মূর্তির আস্তানায় যেসব পশু জবেহ হয় তার গোশত আমাকে খাওয়াবে না (৩) কুরাইশরা যখন আমাকে হত্যা করতে চাইবে আগেই আমাকে তা অবহিত করবে।"

"আমি এই তিনটি বিষয় পূরণের জন্য কৃত সংকল্প হলাম। যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিক্রান্ত হলো তখন কুরাইশরা খুবায়েবকে (রা) হত্যার জন্য একত্রিত হলো। আমি খুবায়েবকে (রা) কুরাইশ অভিসন্দি সম্পর্কে অবহিত করলাম। আল্লাহর কসম! এ সময় আমি তাঁকে মোটেই ভীত হতে দেখিনি। তবে, তিনি পবিত্রতার জন্য আমার নিকট ক্ষুর চাইলেন। আমি আমার অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রের মাধ্যমে তাঁর নিকট ক্ষুর পাঠালাম। পরে আমার খেয়াল হলো যে, আমি তো নির্বোধের মত কাজ করেছি। এই কয়েদী তো নিজের জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েছে। সে তার পুত্রকে মেরে না ফেলে। আমি দৌড়াতে দৌড়াতে কয়েদখানায় গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম যে, খুবায়েব(রা) ক্ষুর হাতে নিয়ে আমার পুত্রকে বলছে, "পুত্র! তোমার মা কি আমাকে ভয় পায়নি। সে তোমার হাতে ক্ষুর কি করে পাঠালো!" আমি দরজার আড়াল থেকে বললাম, "হে খুবায়েব! আমি এই শিশুকে তোমার নিকট আল্লাহর নিরাপত্তায় প্রেরণ করেছি।" খুবায়েব (রা) আমার ভীতি আঁচ করতে পারলেন এবং বললেন ঃ

"আমি সেই ব্যক্তি নই যে, এই নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করবো। আমাদের দ্বীনে এই ধরনের জুলুম ও বিশ্বাসঘাতকতার স্থান নেই।"

হযরত খুবায়েবের (রা) এই উন্নত চরিত্র প্রত্যক্ষ করার পরও কালিমা লিপ্ত অন্তরের কুরাইশদের দয়ার উদ্রেক হলো না। তারা সেই পবিত্র চরিত্রের মানুষটিকে হত্যার জন্য উঠে পড়ে লাগলো।

নিসন্দেহে হযরত খুবায়েব (রা) কুরাইশের একজন বড় সরদারের হত্যাকারী ছিলেন। কিন্তু তিনি ধোঁকা দিয়ে এই হত্যাকাণ্ড ঘটাননি। বরং যুদ্ধের ময়দানে বীর পুরুষের মত লড়াই করে হত্যা করেছিলেন। এখন হাতে পেয়ে কুরাইশরা তার ওপর যে নির্যাতন চালাচ্ছিল তা দুনিয়ার কোন আইনেই সিদ্ধ নয়। তা ছিল স্পষ্ট শয়তানী এবং কাপুরুষতা। রশিতে বাঁধা একজন অসহায় কয়েদীকে কুড়িজন সশস্ত্র ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে প্রহার করছিল। এই কাজতো আরবদের জাতীয় রীতিনীতিরও সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল। কিন্তু কুরাইশ মুশরিকরা প্রতিশোধের আবেগে একদম অন্ধ হয়ে পড়েছিল। তারা সেই মজলুম বিদেশীকে হত্যা করার বিশেষ ব্যবস্থা করে এবং তাঁকে শুলে চড়িয়ে

বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারার সিদ্ধান্ত নেয়। সুতরাং তারা নিষিদ্ধ মাসসমূহ অতিক্রান্ত হওয়ার পর হেরেমের বাইরে তানয়িম নামক স্থানে শূল স্থাপন করলো এবং সেখানে সকল মক্কাবাসীকে উপস্থিত হওয়ার জন্য কাড়া নাকাড়া বাজিয়ে দিল। মক্কাবাসী এই তামাশা দেখার জন্য সেখানে ভেঙ্গে পড়লো। তারা ঢোল ও দাফ বাজাচ্ছিল। পতাকা ওড়াচ্ছিল এবং তুরি বাজাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল সেখানে যেন কোন মেলা বা উৎসব হচ্ছিল। হযরত খুবায়েবকে (রা) সেখানে আনা হলো। উপস্থিত জনতা আনন্দের আতিশয্যে শ্লোগানে শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুললো। হত্যার পূর্বে জালেমরা হযরত খুবায়েবকে (রা) জিজ্ঞেস করলো ঃ "কোন ইচ্ছা থাকলে তা বলতে পারো।"

হযরত খুবায়েব (রা) বললেন ঃ "আমার আর কোন ইচ্ছা নেই। অবশ্য দু'রাকায়াত নামায পড়ার সময় দাও।"

মুশরিকরা বললো ঃ "পড়ে নাও।"

হযরত খুবায়েব (রা) তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত বিনয় ও একাগ্রচিত্তে নামায আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। দু'রাকায়াত পড়া হলে বললেন ঃ

"আমি নামায আদায়ে বেশী সময় ব্যয় করতাম। কিন্তু চিন্তা করলাম যে, তোমরা ভেবে বসবে যে, খুবায়েব (রা) মৃত্যুকে ভয় পেয়ে গেছে এবং হত্যার সময় ফাঁকি দিচ্ছে।"

তারপর বাহাদুর মরদে মু'মিনটি শূলের নীচে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং এই কবিতা আবৃত্তি করলেন ঃ

"লোকজন উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে আমার চারপাশে একত্রিত হচ্ছে। বড় বড় গোষ্ঠী আমার হত্যার তামাশা দেখার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এসব মানুষ আমার প্রতি শত্রুতা প্রকাশ করছে এবং আবেগে উদ্বেলিত হয়ে আছে।

আমি এই বধ্যভূমিতে আপাদমস্তক দাঁড়িয়ে আছি। কবিলাগুলোর লোকজন আমার হত্যার তামাশা দেখানোর জন্য শিশু ও মহিলাদেরকে নিয়ে এসেছে।

লোকজন আমাকে একটি উঁচু লাকড়ীর নিকট নিয়ে এসেছে এবং বলছে ইসলাম পরিত্যাগ করলে তোমার জীবন বাঁচতে পারে। কিন্তু দ্বীনে হক পরিত্যাগ করার চেয়ে মরে যাওয়াই উত্তম।

আমার চোখ আদ্র। কিন্তু আমি ধৈর্য ধারণ করবো এবং শত্রুর সামনে অবনত হবো না। কেননা আমি আল্লাহর নিকট সাফল্য লাভকারী হবো।

মৃত্যুকে আমি ভয় করিনা। ভয় করি শুধু জাহান্নামের রক্ত শোষণকারী লেলিহান অগ্নিশিখাকে। উত্তম আরশের মালিক আমার বিদমত গ্রহণ এবং আমাকে ধৈর্য ও স্থৈর্যের হেদায়াত করেছেন।

দ্বীনে হকের দুশমনরা মেরে মেরে আমার গোশতকে একদম ভরতা বানিয়ে দিল। আমি আমার বিদেশী ও অসহায় হওয়ার ফরিয়াদ আমার স্রষ্টার নিকটই করছি। আল্লাহর কসম! আমি যখন আল্লাহর পথে জীবন দিচ্ছি তখন কোন দিকে পতিত হচ্ছি বা কিভাবে জীবন দিচ্ছি তার পরোয়া নেই। আল্লাহর নিকট আশা, তিনি চাইলে আমার দেহের প্রতিটি অংশে বরকত দেবেন।"

এই কবিতা পাঠের পর তিনি এই বলে দোয়া করলেন ঃ

"হে আল্লাহ! আমি তোমার রাসূলের (সা) পয়গাম তাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি। এখন তুমি তোমার রাসূলে বরহকের নিকট আমার অবস্থার খবর পৌঁছে দাও।"

এই দোয়া করার পর তিনি আসমানের পানে তাকালেন। সে সময় তার মুখ দিয়ে নিজের হত্যাকারীদের জন্য এই বদ দোয়া জারী হয়ে গেল ঃ

"তাদের প্রত্যেকের ওপর তোমার শাস্তি নাযিল করো এবং তাদেরকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ধ্বংস করো। তাদের কেউ যেন রক্ষা না পায়।"

হযরত খুবায়েবের (রা) বদদোয়ায় মুশরিকরা এতো ভীত এবং সন্ত্রস্তিত হয়ে উঠলো যে, তাদের অধিকাংশই একপাশ হয়ে মাটির ওপর শুয়ে পড়লো। অনেকে একে অপরের পিছনে লুকালো। কিছু মানুষ কানে আঙ্গুল দিয়ে পালাতে লাগলো এবং কেউ বা গাছের আড়ালে গিয়ে পালালো। কেননা বদদোয়া থেকে বাঁচার জন্য এসব পদ্ধতিই তাদের জানা ছিল। এই দৃশ্য এত শিক্ষণীয় এবং হৃদয়বিদারক ছিল যে, সে সময় উপস্থিত লোকদের আজীবন তা স্মরণ ছিল।

[এ সময় হযরত মুয়াবিয়া (রা) বিন আবু সুফিয়ান (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, যে সময় খুবায়েব (রা) বদদোয়া করলেন তখন আমার পিতা আবু সুফিয়ান আমাকে এত জোরে ধাক্কা দিলেন যে, আমি উবু হয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। তারপর আমাকে এমনভাবে টানতে লাগলেন যে, আমার শরীরের অনেক স্থানে নুনছা ঘা হয়ে গেল এবং তার ব্যথায় আমি কয়েকদিন বিছানায় শুয়ে ছিলাম।

হাকিম (রা) বিন হাযাম বলেন যে, আমি খুবায়েবের (রা) বদদোয়ার ভয়ে বৃক্ষের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে ছিলাম। জোবায়ের (রা) বিন মাতয়াম অন্য

মানুষের আড়ালে আড়ালে চলছিল। হুয়াইতিব (রা) বিন আবদুল উজ্জা নিজের কানে আঙ্গুল দিয়ে দ্রুত প্রস্থান করলেন যাতে খুবায়েবের (রা) বদদোয়া না শুনতে হয়। এসব ব্যক্তি সে সময় কাফের ছিল এমনিভাবে সেখানে উপস্থিত অন্যান্য সকল মানুষের মধ্যে বিশৃংখলা ও ভীতি সৃষ্টি হয়। মশহুর সাহাবী হযরত সাঈদ (রা) বিন আমের কখনো কখনো অচেতন হয়ে পড়তেন। একবার হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁর নিকট এই অচেতন হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, আমি খুবায়েবের (রা) হত্যার সময় তামাশা প্রত্যক্ষকারীদের মধ্যে একজন ছিলাম। যখনই খুবায়েবের (রা) বদদোয়ার কথা আমার স্মরণ হয় তখনই আমি কাঁপতে থাকি এবং অচেতন হয়ে পড়ি। এটা প্রতিরোধ করা আমার সাধ্যের বাইরে।]

এই বদদোয়ার পর হযরত খুবায়েব (রা) ফাঁসির রজ্জু নিজের গলায় লটকে নিলেন। উরওয়া (রা) এবং মূসা (রা) বিন উকবা থেকে বর্ণিত আছে যে, মুশরিকরা যখন হযরত খুবায়েবকে (রা) শূলিতে চড়ালো তখন তাঁকে ডেকে এবং কসম দিয়ে বললো যে, মুহাম্মাদকে (সা) তোমার স্থানে শূলিতে চড়ালে এবং নিজের গৃহে আরামের সঙ্গে বসে থাকাকে কি তুমি পসন্দ করতে?

হযরত খুবায়েব (রা) বললেন ঃ "আল্লাহর কসম! আমিতো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র পায়ে কাঁটা ফোটাও সহ্য করতে পারবো না। আর তোমরা বলছো আমি ঘরে আরামে বসে থাকবো।"

অতপর কাফেররা হযরত খুবায়েবকে (রা) ইসলাম থেকে পশ্চাৎগমনের সর্বশেষ চেষ্টা চালালো। কিন্তু তিনি মুশরিকদের লোভ-লালসা অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন। জালেমরা এবার শূলির রশিতে টান দিল এবং তাঁর মুখ কিবলামুখী করে দিল। সে সময় হযরত খুবায়েবের (রা) মুখ দিয়ে এই আয়াত বেরিয়ে এলো ঃ

فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ

"তোমরা যেদিকেই রুখ করো না কেন সেদিকেই আল্লাহ রয়েছেন।"

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত খুবায়েব (রা) সে সময় রাসূলে আকরামের (সা) ওপর সালাম প্রেরণ করলেন এবং রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে দোয়া করলেন যে, তিনি যেন তাঁর অবস্থার খবর হুজুরকে (সা) পৌঁছে দেন।

তারপর পাষাণ হৃদয় মুশরিকরা সেই মরদে মু'মিনের দেহের ওপর বল্লমের আঘাত শুরু করলো। কয়েকবার খুবায়েবের (রা) মুখ কিবলামুখী হয়ে গেল। তখনো জীবনের স্পন্দন কোনমতে অবশিষ্ট ছিল। তিনি বললেন ঃ

"আলহামদুলিল্লাহ! তিনি আমার মুখ তাঁর ঘরমুখী করে দিয়েছেন।"

কাফেররা তাঁর ঘায়েলকৃত দেহের ছটফটানি দেখে আনন্দে মা'রা লাগাচ্ছিল। তারা খুবায়েবের (রা) চেহারা কিবলার দিক থেকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেয়ার খুব চেষ্টা করলো। কিন্তু তাতে ব্যর্থ হলো। অবশেষে একজন মুশরিক তাঁর বুকের ওপর এত প্রচণ্ড জোরে নিযাহ মারলো যে, তা এপার ওপার হয়ে গেল। সে সময় তাঁর মুখ দিয়ে কালেমায়ে তাওহীদ উচ্চারিত হচ্ছিল। আর এই অবস্থাতেই তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হলেন।(অধিকাংশ সিরাত বা চরিত গ্রন্থে এই মুশরিকের নাম আবু সারুয়া বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই আবু সারুয়া মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হয়েছিলেন।)

তারপর মুশরিকরা হক পথের এই শহীদের লাশকে শূলে লটকিয়েই রেখে দিল।

হযরত খুবায়েবের (রা) সঙ্গী হযরত যায়েদ (রা) বিন আদ দাছনাকে সাফওয়ান বিন উমাইয়া কিনেছিল। কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, সাফওয়ান তাঁকে নিজের গোলাম ফুসতাসের নিকট সমর্পণ করেছিল। সে তাঁকে হেরেমের বাইরে তানয়িম নামক স্থানে নিয়ে গিয়েছিল এবং অনেক তামাশা প্রত্যক্ষকারীদের সামনে শহীদ করে ফেলেছিল। কিন্তু মূসা (রা) বিন উকবা এবং আরো কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, হযরত খুবায়েব (রা) ও হযরত যায়েদ (রা) বিন দাছনাকে একই দিনে এবং একইস্থানে শহীদ করা হয়। এই কথাই সঠিক বলে মনে হয়। কেননা যে বস্তু হযরত খুবায়েবকে (রা) তাৎক্ষণিকভাবে হত্যার ব্যাপারে বাধা দিল সেই একই বস্তু যায়েদকে (রা) হত্যার ব্যাপারেও বাধা দিল। আর তাহলো নিষিদ্ধ মাস।

এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা বর্ণনা করেছেন, মুশরিকরা যখন হযরত খুবায়েব (রা) ও হযরত যায়েদকে (রা) তানয়িমে আনলো তখন তাঁরা উভয়েই খুব আনন্দের সঙ্গে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন। তাতে কাফেররা আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়লো। অতপর উভয়ে পরস্পরকে ধৈর্য ও স্থৈর্যের পরামর্শ দিলেন। কাফেররা তৎক্ষণাৎ তাঁদেরকে পরস্পর থেকে পৃথক করে ফেললো। হযরত খুবায়েব (রা) যখন শাহাদাত বরণ করলেন তখন যায়েদকে (রা) বধ্যভূমিতে আনা হলো। আবু সুফিয়ান তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"হে যায়েদ! খোদার কসম, সত্যি সত্যি বলোতো তোমার পরিবর্তে যদি মুহাম্মাদের (সা) গর্দান উড়িয়ে দেয়া হয় এবং তুমি নিজের পরিবার পরিজনসহ আনন্দ ও খুশীতে থাকো তা কি তুমি পসন্দ করবে?"

ইবনে ইসহাক এবং ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন যে, এই মরদে মু'মিনও সেই একই জবাব দিয়েছিলেন যা হযরত খুবায়েব (রা) দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ

"আল্লাহ ক্ষমা করুন, মুহাম্মাদের (সা) পবিত্র পায়ে সামান্য কাঁটা ফুটে যাওয়াও আমি সহ্য করতে পারবো না।"

আবু সুফিয়ান (রা) সঙ্গীদেরকে সম্বোধন করে বললো, "তোমরা দেখলে মুহাম্মাদের (সা) সঙ্গীরা তাকে যেভাবে ভালবাসে তার কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না।"

তারপর জনৈক জালেম হযরত যায়েদের (রা) বুকের ওপর নিষাহ মারলো। এই নিষাহ তার অন্তরকে ছিদ্র করে এপার ওপার হয়ে গেল এবং তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চৈস্বরে বেরিয়ে এলো আল্লাহু আকবার ধ্বনি। তখন সাফওয়ানের গোলাম ফুসতাস এগিয়ে এলো এবং সে তাঁর মাথা কেটে নিল। এমনিভাবে সেই মরদে মু'মিনও নিজের প্রকৃত মালিকের সান্নিধ্যে চলে গেলেন।

হযরত খুবায়েব (রা) শাহাদাতের পূর্বে আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করেছিলেন যে, তিনি যেন তাঁর অবস্থার খবর হযরত মুহাম্মাদের (সা) নিকট পৌঁছে দেন। মহান আল্লাহ তাঁর এই দোয়া কবুল করেন এবং হুজুরকে (সা) তৎক্ষণাৎ এই হৃদয়বিদারক ঘটনার খবর ওহীর মাধ্যমে পৌঁছে দিলেন। হিব্বুন্নবী (সা) হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছা বলেন, তিনিও সে সময় নবীর মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। নবীর (সা) ওপর হঠাৎ করে ওহী অবতীর্ণ হওয়ার আলামত পরিস্ফুট হয়ে উঠলো এবং তিনি বললেন ঃ

"মুশরিকরা খুবায়েবকে (রা) শহীদ করে ফেলেছে এবং জিবরাইল (আ) তাঁর সালাম নিয়ে এসেছেন।"

ইবনে জারির (র) ও হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) বর্ণনা করেছেন যে, এই ঘটনার পর একদিন হযরত মুহাম্মাদ (সা) হযরত আমর(রা) বিন উমাইয়া জামরীকে মক্কা গিয়ে খুবায়েবের (রা) লাশের খবর নিতে এবং তা শূল থেকে নামাতে বললেন। হযরত আমর (রা) খুব দ্রুত গতি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি রাত-দিন একাধারে চলে মক্কা পৌঁছলেন এবং রাতের অন্ধকারে যেখানে খুবায়েবের (রা) লাশ শূলে লটকানো ছিল সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি বৃক্ষে চড়ে শূলের রশি কাটলেন। ফলে লাশ মাটিতে পড়ে গেল। হযরত আমর (রা) হযরত খুবায়েবের (রা) পবিত্র দেহ মদীনা নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি গাছ থেকে নীচে নেমে একদম থ' মেরে গেলেন। তিনি লাশ পেলেন না। বললেন, "তাহলে কি মাটি গিলে ফেলেছে।"

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, খুবায়েবের (রা) শাহাদাতের কয়েকদিন পর রহমতে আলম (সা) সাহাবায়ে কিরামকে (রা) বললেন, "কে আছে যে, খুবায়েবের (রা) লাশ শূল থেকে নামিয়ে আনবে এবং জান্নাতের হকদার হবে।"

হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়াম এবং হযরত মিকদাদ (রা) ইবনুল আসওয়াদ একই সাথে উঠে দাঁড়ালেন এবং আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এ কাজ করবো।"

সুতরাং উভয়ে লুকিয়ে ছাপিয়ে মক্কা পৌছলেন। রাতের বেলায় যখন খুবায়েবের (রা) বধ্যভূমিতে গেলেন তখন তাঁর লাশ শূলের ওপর সম্পূর্ণ তরতাজা দেখে বিস্মিত হলেন। মনে হচ্ছিল সেদিনই তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে গিয়ে পৌঁছেছেন। তাঁর এক হাত ছিল নিজের ক্ষতের ওপর। সেই ক্ষত দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। অথচ ৪০ দিন পূর্বে শাহাদাত বরণ করেছিলেন।

হযরত যোবায়ের (রা) লাশ শূল থেকে নামালেন এবং তা নিজের ঘোড়ার ওপর রেখে হযরত মিকদাদ সমভিব্যহারে মদীনা রওয়ানা হলেন। সকাল হলে কোন মাধ্যমে কুরাইশরা এই ঘটনা জানতে পেল। তারপর অনেক সশস্ত্র মুশরিক উটের ওপর সওয়ার হয়ে হযরত যোবায়ের (রা) ও মিকদাদের (রা) পিছনে ধাওয়া করলো। হযরত যোবায়ের (রা) কুরাইশ সরদারদেরকে নিজের মাথার ওপর দেখে হযরত খুবায়েবের (রা) লাশ ঘোড়া থেকে নামিয়ে মাটির ওপর রেখে দিলেন। মাটি তৎক্ষণাৎ তার লাশ গিলে ফেললো।

এই কারণে হযরত খুবায়েবকে (রা) "বালিগুল আরদ" লকবে ডাকা হয়ে থাকে।

এরপর হযরত যোবায়ের (রা) কুরাইশের প্রতি তাকিয়ে হুংকার দিয়ে বললেন ঃ

"হে কুরাইশ মুশরিকরা! আমাদের পেছনে ধাওয়া করার সাহস তোমাদের কি করে হলো। তোমরা কি জানোনা যে, আমি আওয়ামের পুত্র এবং আবদুল মুত্তালিবের দৌহিত্র। আমার এই সঙ্গী হলো বাহাদুর মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ কিন্দী। আমরা নিজেদের বাড়ী ফিরছি এবং তোমাদের কোন ক্ষতি করিনি। তোমরা যদি তীর দিয়ে লড়াই করতে চাও তাহলে আমরা তীর দিয়েই লড়বো। তরবারী দিয়ে লড়তে চাইলে আমরাও তরবারী দিয়ে লড়াই করবো। আল্লাহর কসম! যতক্ষণ আমাদের দেহে জীবন রয়েছে ততক্ষণ আমরা তোমাদেরকে আমাদের নিকট ঘেষতে দেব না।"

কুরাইশ মুশরিকরা যখন দেখলো যে, এই মরদে মু'মিনরা মরতে ও মারতে কৃত সংকল্প তখন তারা আর তাদের সঙ্গে বাদানুবাদ না করে ফিরে চলে গেল। হযরত যোবায়ের (রা) ও মিকদাদ (রা) যখন রাসূলের (সা) দরবারে হাজির হয়ে সমগ্র ঘটনা বর্ণনা করলেন। শুনে হুজুর (সা) খুব খুশী হলেন এবং বললেন, জিবরাইল আমীন (আ) আমাকে বলেছেন যে, আল্লাহ তায়ালার ফেরেশতারা তোমাদের উভয়ের জন্য গর্ব প্রকাশ করেছেন।

হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়ের আশহালী

সাইয়েদুল আনাম রহমতে আলমের (সা) মজলিসসমূহ ছিল খুবই পবিত্র মজলিস। গাম্ভীর্য ও মর্যাদায় পূর্ণ থাকতো এই মজলিস। তাতে সবসময় হেদায়াত ও ইরশাদ, আখলাক, আমল, নফস ও কলবের পরিশুদ্ধির ব্যাপারে আলোচনা হতো। মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ মাথা নত করে আদবের সাথে এমনভাবে বসতেন যেন তাঁদের মাথায় পাখী বসে আছে। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত উরওয়াহ (রা) বিন মাসউদ ছাকাফী হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় মক্কার কুরাইশদের পক্ষ থেকে দূত হয়ে নবীর (সা) দরবারে উপস্থিত হলেন। সে সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি নবীর মজলিসে রিসালাত প্রদীপের পতঙ্গদের কর্মপদ্ধতি দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন। কুরাইশদের নিকট ফিরে গিয়ে তিনি বললেন :

"কুরাইশ ভাইসব! আমি দুনিয়ার বড় বড় রাজা-বাদশাহদের (রোমের কাইসার, ইরানের কিসরা ও হাবশার নাজ্জাশী) দরবারে গিয়েছি। কিন্তু মুহাম্মাদের (সা) সঙ্গীরা যেভাবে মুহাম্মাদকে (সা) ভালবাসে এবং ভক্তিশ্রদ্ধা করে তা আমি কোন বাদশাহর দরবারে দেখিনি। মুহাম্মাদ (সা) থুথু নিক্ষেপ করলেও তারা তা হাতে নেয় এবং নিজের দেহ ও চেহারায় মেখে নেয়। মুহাম্মাদ (সা) ওজু করার সময় তারা ব্যবহৃত পানির এক এক ফোটার জন্য এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে যেন পরস্পর লড়াই করে মরবে। মুহাম্মাদ (সা) কোন নির্দেশ দিলে প্রত্যেকেই তা পালনের জন্য পরস্পর প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়। তাঁর সামনে কেউ উচ্চৈস্বরে কথা বলে না এবং কেউ তাঁর দিকে মুখ উঁচু করে তাকায়ও না।"

নবীর মজলিসের এটা একটা আংশিক দিক ছিলো। মজলিসের সবগুণই ছিল। তাই বলে তা একদম কাটখোট্টা বা নির্জীব ছিল না। রহমতে আলম (সা) লোকদের সাথে খুব হাসি-খুশীভাবে আলাপ-আলোচনা করতেন। অনেক সময় রাসূলের (সা) রসিকতায় সমগ্র মজলিস আনন্দিত হয়ে উঠতো। এসব সময় অনেক সাহাবীও (রা) পবিত্র ব্যঙ্গ ও কৌতুকপ্রদ কথা বলতেন। এসব ব্যঙ্গ বা কৌতুক অন্য সাহাবী (রা) মানসিকভাবে আহত হতেন না এবং হুজুরও (সা) মুচকী হাসতেন। এ ধরনেরই এক মজলিসের ঘটনা। একজন হাসিমুখ সাহাবী (রা) কৌতুকপূর্ণ কথা বলে সঙ্গীদেরকে হাসাচ্ছিলেন।

কৌতুকের কারণে মজলিস যখন একটু উত্তপ্ত হয়ে উঠলো তখন প্রিয় নবী (সা) তাঁর পাঁজরে লাঠি দিয়ে খোঁচা দিলেন। তিনি আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আপনার লাঠি আমাকে কষ্ট দিয়েছে।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "তাহলে ভাই, আমার কাছ থেকে বদলা নাও।"

তিনি বললেন ঃ "হুজুর (সা)! আপনার লাঠিতো আমার খালি শরীরে লেগেছিল। কিন্তু আপনার দেহে কামিস রয়েছে। বদলা কি করে পূর্ণ হতে পারে।"

প্রিয় নবী (সা) তৎক্ষণাৎ নিজের জামা খুলে বললেন ঃ "এসো ভাই, এখন বদলা নাও।"

সেই সাহাবীর চোখ আবেগের আধিক্যে বুঁজে গেলো। হুজুরকে (সা) গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে জাপটে ধরলেন এবং তাঁর পবিত্র পাঁজরে একের পর এক চুমু দিতে লাগলেন। তারপর রুদ্ধকণ্ঠে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমি আপনার কাছ থেকে বদলা নেবো? আল্লাহর কসম! হুজুরের (সা) পবিত্র পাঁজরে চুমু দেয়ার সৌভাগ্য লাভই আমার লক্ষ্য ছিল।"

সর্বোত্তম মানুষ হযরত মুহাম্মাদের (সা) এই সত্যিকার প্রেমিকের নাম ছিল হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়েরুল কিতায়েব আশহালী আনসারী।

সাইয়েদেনা আবু ইয়াহইয়া উসায়েদ (রা) বিন হুজায়ের অন্যতম মহান মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী ছিলেন। স্বয়ং নবী করিম (সা) একবার তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন। "উসায়েদ বিন হুজায়ের খুব ভাল মানুষ।"

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) সিদ্দীকা বলতেন, উসায়েদ (রা) আনসারের তিনজন সর্বোত্তম মানুষের একজন [অন্য দুই ব্যক্তি হলেন আওস সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজ এবং উবাদ বিন বাশার (রা)]। হযরত উসায়েদ (রা) আওস কবিলার আবদুল আশহাল বংশের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর বংশ আওসের তরবারীধারী যোদ্ধা ছিলেন এবং মহানবীর (সা) ইরশাদ অনুযায়ী বনু নাজ্জারের (খাজরাজ) পর আনসারের সর্বোত্তম খান্দান ছিলো।

হযরত উসায়েদের (রা) পিতা হুজায়েরুল কিতায়েব (বিন সামমাক বিন আতিক বিন রাফে' বিন ইমরাউল কায়েস বিন যায়েদ বিন আবদুল আশহাল) আওস কবিলার সিপাহসালার ছিলেন এবং জাহেলী যুগে একজন নেতৃস্থানীয়

ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হতেন। তিনি শুধু লিখাপড়াই জানতেন না বরং অত্যন্ত উঁচু শ্রেণীর তীরন্দাজ, তরবারী যোদ্ধা এবং সাঁতারুও ছিলেন। এ জন্য তিনি কিতায়েব কামেল এবং কামিল উপাধিতে ভূষিত হতেন। হুজায়েরের পিতা সামমাকও নিজের গোত্রের সরদার ছিলেন। "আইয়ামে আনসারের" সময়ে একবার বনু হারিছা ও বনু আবদুল আশহালের মধ্যে এক রক্তাক্ত লড়াই সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে সামমাক মারা যায় এবং আবদুল আশহাল নিজের বাড়ী-ঘর পরিত্যাগ করে বনি সুলাইমের এলাকায় আশ্রয় নেয়। হুজায়ের কসম খেয়ে শপথ গ্রহণ করে যে, সে বনু হারিছার বিরুদ্ধে অবশ্যই প্রতিশোধ নেবে। সুতরাং সে কিছুদিনের মধ্যেই এক বিরাট বাহিনী তৈরী করে এবং তাদেরকে সাথে নিয়ে বনু হারিছার ওপর হামলা চালায়। বনু হারিছা এই হামলা মুকাবিলা করতে না পেরে খাইবারের দিকে পালিয়ে যায় (অথবা হুজায়ের তাদেরকে বহিষ্কার করে)। কয়েক মাস পর হুজায়ের দয়ার্দ্র হয়ে ওঠেন এবং তিনি তাদেরকে ইয়াসরাবে ডেকে আনেন। তারপর হুজায়ের খাযরাজের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে আওসের নেতৃত্ব দেন। নবীর (সা) হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে প্রখ্যাত বুয়াছের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধেও যথারীতি আওসের সিপাহসালার ছিলেন হুজায়েরুল কিতায়েবই। উভয় পক্ষই অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে লড়াই করে। কিন্তু অবশেষে আওসের ওপর পরাজয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় হুজায়ের যুদ্ধের ময়দানে শিরদাঁড়া উঁচু করে দাঁড়িয়ে গেল। বর্শার তীক্ষ্ণ অংশ পায়ের নীচে গেড়ে নিলেন এবং নতুন করে নিজের কবিলার মধ্যে যুদ্ধের এমন প্রাণ ফুঁকে দিলেন যে, পলায়নরত আওসীরা উল্টো প্রচণ্ড বেগে হামলা করে বসলো। ফলে খাজরাজীদের পলায়ন ছাড়া গত্যন্তর রইলো না। খাজরাজের সিপাহসালার আমর বিন নু'মান বায়াজী যুদ্ধের ময়দানেই নিহত হলো। হুজায়েরও মারাত্মকভাবে আহত হলো এবং এ কারণেই পরে মারা গেল। উসায়েদ (রা) এই প্রখ্যাত জেনারেলের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন এবং নিজের পিতার মত তিনিও যুদ্ধবিদ্যা, সাঁতার এবং লিখাপাড়ায় পূর্ণ পারদর্শীতা অর্জন করেছিলেন। বস্তুত লোকজন তাঁকেও কিতায়েব ও কামেল বলে ডাকতেন। ইবনে হিসাম (র) বর্ণনা করেছেন যে, হুজায়েরের মৃত্যুর পর আওস গোত্রের সাধারণ নেতৃত্বের মুকুট হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজের মাথায় রাখা হয় এবং সামরিক নেতৃত্ব অর্পিত হয় উসায়েদ (রা) বিন হুজায়েরের ওপর। কিন্তু সে সময় কে জানতো যে, তাকদীরের লিখন সায়াদ (রা) এবং উসায়েদের (রা) ভাগ্যে যে মর্যাদা লিখছেন তা এত মর্যাদাকর যে, মুসলিম উম্মাহ এই উভয় যুবকের জন্য চিরকাল গৌরব করবে।

মহানবীর (সা) হিজরতের কিছুদিন পূর্বে আওস ও খাজরাজ বছরের পর বছর ধরে পরস্পরের গলা কেটে ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়েছিল। অতপর পারস্পরিক যুদ্ধ করার মত শক্তি আর তাদের ছিল না। এ জন্য তারা সকলে মিলে খাজরাজের এক সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুলকে (মুনাফিক সরদার) নিজেদের বাদশাহ বানানোর প্রশ্নে ঐকমত্য ঘোষণা করলো। সে সময় ইসলাম সূর্য ফারান পর্বত শীর্ষে উদিত হয়েছিল এবং তার কিরণচ্ছটা ইয়াসরাবের মাটিতেও নিপতিত হচ্ছিল। নবুওয়াতের দশম বছরে খাজরাজের ছ'ব্যক্তি হজ্জের জন্য মক্কা গিয়েছিলেন। তাঁরা ইসলামের নিয়ামতে অভিষিক্ত হয়ে ইয়াসরাব প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। পরবর্তী বছরে ১২ জন সৌভাগ্যবান ইয়াসরাবী রহমতে আলমের (সা) হাতে বাইয়াত করেন। এসব ব্যক্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব নবী (সা) হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়েরকে দ্বীনের তাবলীগ ও তালিমের জন্য ইয়াসরাব প্রেরণ করেন। তিনি ইয়াসরাব পৌঁছেই খুব দ্রুত হকের তাবলীগে মশগুল হয়ে পড়লেন।

তিনি একদিন বনু আবদুল আশহাল সংলগ্ন এক বাগানে বসে বসে তাবলীগ করছিলেন। এমন সময় দেখতে পেলেন যে, একজন ক্রোধান্বিত মানুষ তাঁর দিকে আসছেন। হযরত মুসয়াবের (রা) মেযবান হযরত আসয়াদ(রা) বিন যারারাহও সেখানে ছিলেন। তিনি বললেন, "ইনি হলেন, উসায়েদ বিন হুজায়ের। দুই আওস সরদারের অন্যতম। হক কবুলের ভাগ্য যদি তার হয় তাহলে আমাদের কাজ সহজ হয়ে যাবে।"

সে সময় উসায়েদ (রা) আওস সরদার সায়াদ (রা) বিন মায়াজের ইঙ্গিতে হযরত মুসয়াব (রা) এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে নিজের মহল্লা থেকে বহিষ্কারের জন্য এসেছিলেন। কেননা তাঁরা ইয়াসরাববাসীকে তাদের পূর্ব-পুরুষদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করছিলেন। সেখানে এসেই উসায়েদ (রা) বর্শা আন্দোলিত করলেন এবং অত্যন্ত কর্কশ স্বরে মুসয়াবকে (রা) বললেন ঃ

"এই মহল্লায় এসে আমাদের লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করার সাহস তোমার কোথেকে হলো? ভাল চাইলে এক্ষুণি এখান থেকে চলে যাও এবং ভবিষ্যতে আর কখনো এদিকে আসার নাম নেবে না।"

হযরত মুসয়াব (রা) একজন মুবাল্লিগের মত ধৈর্যশীল হয়ে জবাব দিলেন ঃ

"সম্মানিত ভাই আমার! আগে বসুন এবং আমার কথা শুনুন। যদি পসন্দ হয় তাহলে ভাল। তা নাহলে প্রত্যাখ্যানের অধিকার আপনার রয়েছে।"

উসায়েদ (রা) হযরত মুসয়াবের (রা) মিষ্ট ও বিনীত কণ্ঠের কথা শুনে খুব প্রভাবিত হলেন। ক্রোধ উবে গেল এবং বর্শা গেড়ে বসে পড়লেন। হযরত

মুসয়াব (রা) খুব সুন্দরভাবে তাঁর সামনে হকের দাওয়াত পেশ করলেন এবং কুরআনে কারীমের কতিপয় আয়াত পড়লেন। উসায়েদ (রা) ছিলেন শিক্ষিত এবং বিচক্ষণ মানুষ। আল্লাহর কালাম শুনে তাঁর অন্তরজগত মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল। তৎক্ষণাৎ কালেমা পড়ে তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ

"আরো এক ব্যক্তি রয়েছেন। তিনি যদি দ্বীনে হক কবুল করেন তাহলে সমগ্র কওম মুসলমান হয়ে যাবে।"

একথা বলেই তিনি সোজা সায়াদ (রা) বিন মায়াজের নিকট পৌঁছলেন। তিনি তাঁকে দেখেই বললেন, "আল্লাহর কসম! এখনতো তোমার সেই চেহারা নেই।" উসায়েদ (রা) এমন কিছুকথা বললেন যে, সায়াদও (রা) নিজের বর্শা উঠিয়ে বাগানের দিকে গেলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে একই ঘটনা ঘটলো যা হযরত উসায়েদের (রা) সঙ্গে ঘটেছিল। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে পবিত্র স্বভাব দান করেছিলেন। তিনিও মুসলমান হয়ে গেলেন এবং নিজের প্রভাব খাটিয়ে সিরিয়া পর্যন্ত সমগ্র কবিলাকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে এলেন। আল্লামা ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়ের এবং সায়াদ (রা) বিন মায়াজের ইসলাম গ্রহণের প্রভাবে আনসারের সকল খান্দানে তীব্র গতিতে ইসলাম সম্প্রসারিত হতে লাগলো এবং কিছুদিনের মধ্যেই ইয়াসরাবের অলি গলি তাকবির ধ্বনিতে গুঞ্জরিত হতে লাগলো।

নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে হজ্জের মওসুমে ইয়াসরাব থেকে ৭৫ জন হকপন্থী (৭৩ জন পুরুষ এবং দু'জন মহিলা) মক্কা মুয়াজ্জামা আগমন করলেন এবং একটি নির্ধারিত রাতে উকবার গিরিপথে একত্রিত হলেন। প্রিয় নবীও(সা) সেখানে তাশরীফ আনলেন। তাঁরা সকলেই হুজুরের (সা) হাতে বাইয়াত করলেন। অতপর তাঁরা হুজুরকে (সা) ইয়াসরাব তাশরীফ নেয়ার দাওয়াত দিলেন। এ সময় তাঁরা এই প্রতিশ্রুতিও দিলেন যে, রাসূলের (সা) জীবন রক্ষার্থে তাঁদের প্রতিটি সন্তান জীবন দানে কসুর করবে না।

ইতিহাসে এই বাইয়াতকে বাইয়াতে লাইলাতুল উকবা, বাইয়াতে উকবায়ে ছানিয়া, বাইয়াতে উকবায়ে কবিরাহ এই বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। ইসলামের ইতিহাসে এই বাইয়াত একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাতে আনসাররা এমন নিষ্ঠাপূর্ণ আবেগের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন যে, ইতিহাসে তার কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না। আরবভূমির প্রতিটি অনু-পরমাণু হকপন্থীদের খুন পিপাসু ছিল এবং আরবের কোন কবিলার ইসলাম অনুসারীদের প্রতি সমর্থনের কথা ঘোষণা করার সাহস ছিল না। এমন এক ঘনঘোর দুর্যোগপূর্ণ

সময়ে ইয়াসরাবের ভূমি থেকে এসব মানুষ মাথা তুলে দাঁড়ান এবং শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের জীবন, মাল ও সন্তান মক্কার ইয়াতিম নবীর (সা) পায়ের নিকট সমর্পণ করেন। সেসব হক- পন্থীর মধ্যে উসায়েদ (রা) বিন হুজায়েরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বাইয়াতের পর মহানবী (সা) ইয়াসরাববাসীকে বললেন, দ্বীনি ব্যাপার সংরক্ষণের জন্য তোমরা নিজেদের ১২ জন নকীব নির্বাচন কর। সুতরাং তাঁরা ঐকমত্যের ভিত্তিতে বারোজন নকীব নির্বাচিত করলেন। তাদের মধ্যে ৯ জন ছিলেন খাজরাজের এবং তিনজন ছিলেন আওসের আশা-আকাংখার ভরসাস্থল। আওসের তিন নকীবের অন্যতম ছিলেন হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়ের। তিনি নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি ও আল্লাহ এবং রাসূলের (সা) প্রতি গভীর ভালবাসার কারণে ইসলামের অত্যন্ত শক্তিশালী বাহু হিসেবে বিবেচিত হয়েছিলেন।

হিজরতের কয়েক মাস পর রাসূলে আকরাম (সা) মুহাজির ও আনসারের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় তিনি হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়েরকে নিজের প্রিয় সাহাবী এবং মুখে ডাকা পুত্র হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছার ইসলামী ভাই বানিয়েছিলেন। দ্বিতীয় হিজরীতে কুফর ও ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মাওলানা সাঈদ আনসারী মরহুম "সিয়ারে আনসার" গ্রন্থে লিখেছেন যে, "হযরত উসায়েদের (রা) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে।" কিন্তু বাস্তবত ইতিহাস ও চরিতগ্রন্থের কোন একটি গ্রহণযোগ্য পুস্তকে হযরত উসায়েদের (রা) নাম "আসহাবে বদরের" তালিকায় পরিদৃষ্ট হয় না। এ ধরনের অভিজ্ঞ সিপাহী এবং ইসলাম প্রেমিকের বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকাটা অবশ্যই আশ্চর্যের ব্যাপার বটে। নিশ্চয়ই তার যুক্তিযুক্ত কোন কারণ থাকবে। এমনও হতে পারে যে, তিনি অসুস্থ ছিলেন অথবা মদীনাতে উপস্থিত ছিলেন না। তা সত্ত্বেও তাতে তাঁর মর্যাদা কমেনি। কেননা তিনি উকবার বাইয়াতে অংশ নিয়েছিলেন এবং জমহুর উলামার নিকট আসহাবে উকবার মর্যাদা আসহাবে বদর থেকে আফজাল। বদরের পর যত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তার সকলটিতেই হযরত উসায়েদ (রা) জীবন বাজী রেখে অংশগ্রহণ করেন। ওহোদের যুদ্ধে তিনি সেই বিশেষ প্রসিদ্ধ বীরদের অন্যতম ছিলেন যাঁরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দানে ছাবিত কদম বা অটল ছিলেন এবং নিজেদের মাথা ও বুককে রাসূলের (সা) ঢাল বানিয়ে রেখেছিলেন। এক রেওয়ায়াতে আছে যে, ওহোদের যুদ্ধে আওসের ঝাণ্ডা হযরত উসায়েদের (রা) নিকট ছিল। এই যুদ্ধে তিনি সাতটি আঘাত পান। খন্দকের যুদ্ধে হযরত উসায়েদ (রা) অত্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি দুইশ' মুজাহিদকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকদিন পর্যন্ত অধ্যাহতভাবে

খন্দক হিফাজত করেন। এই যুদ্ধকালে একবার মহানবী (সা) বনু গাতফানের লুটেরাদেরকে কাফেরদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য তাদের একজন প্রভাবশালী সরদার আমের বিন তোফায়েলকে ডেকে পাঠালেন। সে একজন সঙ্গীসহ হুজুরের (সা) নিকট এলো। এসময় তিনি তাকে বুঝালেন যে, তোমরা আমাদের প্রতিবেশী এবং তোমরা সবসময়ই আমাদের সঙ্গে রয়েছ। এ জন্য তোমাদেরকে কাফেরদের প্রতি সমর্থন ও মদীনার ওপর চুপিসারে হামলা থেকে বিরত থাকা উচিত।

সে জবাব দিল যে, মদীনার উৎপাদিত পণ্যের এক তৃতীয়াংশ তাদেরকে দেয়া হলে তারা ফিরে যাবে। পরামর্শের জন্য হুজুর (সা) আনসার সরদারদেরকে ডাকলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত উসায়েদও ছিলেন। তাঁরা সকলেই আমেরের দাবী প্রত্যাখ্যান করলেন। হযরত উসায়েদ (রা) এত আবেগ প্রবণ হয়ে পড়লেন যে, তিনি নিজের বর্শার তীক্ষ্ণ প্রান্ত দিয়ে আমেরের মাথায় খোঁচা দিয়ে বললেন, "খেঁকশিয়াল! এখান থেকে পালা" "আমের ক্রোধান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কে?" বললেন, "আমি উসায়েদ বিন হুজায়ের।" সে জিজ্ঞাসা করলো, হুজায়েরুল কিতায়েবের পুত্র? বললেন, "হ্যাঁ।" আমের বললো, "তোমার পিতা তোমার থেকে ভাল ছিল।" উসায়েদ (রা) কর্কশ কণ্ঠে জবাব দিলেন, "অবশ্যই নয়। আমার পিতাও কাফের ছিল এবং তুমিও কাফের। এ জন্য আমি তোমাদের দু'জনের চেয়ে ভাল।"

হযরত উসায়েদ (রা) অধিকাংশ সময় রাসূলের (সা) দরবারে হাজির থাকতেন এবং প্রিয় নবীর (সা) হেফাজতের বিশেষ খেয়াল রাখতেন। আল্লামা মুহাম্মাদ বিন সায়াদ (কাতিবুল ওয়াকেদী) তাবকাতে কাবিরে লিখেছেন যে, নবীর (সা) হিজরতের পর (সম্ভবত পঞ্চম হিজরীতে) একবার আবু সুফিয়ান রাসূলে আকরামকে (সা) মদীনা মুনাওয়ারাতে শহীদ করে ফেলার পরিকল্পনা করলো এবং এ কাজের জন্য আমর বিন উমাইয়াতাজ জুমরীকে নির্বাচিত করলো। (সে সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি)। কাপড়ের নীচে খঞ্জর লুকিয়ে একটি দ্রুত গতিসম্পন্ন উটে চড়ে আমর মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলো। ৬ষ্ঠ দিনে মদীনার নিকট জোহরুল হিরাহ নামক স্থানে পৌঁছলেন। সেখানেই উট ছেড়ে দিলেন এবং স্বয়ং রাসূলের (সা) ঠিকানা জিজ্ঞাসা করতে করতে বনু আবদুল আশহালের মসজিদে এলো। হুজুর (সা) তখন সেই মসজিদে সাহাবীদের একটি দলের মধ্যে আরাম করছিলেন। আমরের ওপর তাঁর দৃষ্টি পড়লো। এ সময় তিনি বললেন, এই ব্যক্তির নিয়তটো ভাল মনে হচ্ছে না। সাহাবীদের মধ্যে হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়েরও সেখানে উপস্থিত

ছিলেন। তিনি হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে চিতার মত লাফ দিলেন এবং আমরকে নিজের থাবার মধ্যে নিলেন। তাঁর দেহ তালাশ করা হলো। তখন কাপড়ের নীচে থেকে খঞ্জর বের হয়ে পড়লো। আমর খুব শক্তিশালী এবং দ্রুতগতিসম্পন্ন মানুষ ছিল। সে পলায়নের চেষ্টা করলো। কিন্তু উসায়েদের (রা) বজ্রমুষ্ঠি থেকে বের হওয়া তার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব হলো না। অসহায় অবস্থায় নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করলো এবং সকল ঘটনার আদ্যোপান্ত বর্ণনা দিল।

রহমতে আলম (সা) মুচকি হেসে হযরত উসায়েদকে (রা) বললেন, "ঠিক আছে, তাকে ছেড়ে দাও। আমি তাকে ক্ষমা করছি।"

আমর (রা) হুজুরের (সা) দয়ার শান দেখে তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে গেলেন। কিন্তু হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) এবং ইবনে আছির (র) লিখেছেন, এ ধরনের সকল রেওয়ায়াত যাতে বলা হয়েছে যে, হযরত আবু সুফিয়ান (রা) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে অমুক সময় হুজুরকে (সা) হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলেন তা জয়িফ বা দুর্বল বর্ণনা। হতে পারে অন্য কোন মক্কাবাসী এই ধরনের ষড়যন্ত্র করেছিল।

৬ষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে মুররে ইয়াসির (অথবা বনি মুসতালিক) যুদ্ধের সময় ইফকের আফসোসনাক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। [এই যুদ্ধের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, তা খন্দকের যুদ্ধের পর সংঘটিত হয়েছিল। আবার কেউ বলেছেন তা পরে হয়েছিল। সম্ভবত এই অনুমানই ঠিক যে, তা খন্দকের যুদ্ধের পর হয়েছিল। মুররে ইয়াসির যুদ্ধের সফরে হযরত আয়েশা সিদ্দীকাও (রা) হুজুরের (সা) সঙ্গে ছিলেন। যুদ্ধের পর ফিরতি সফরকালে সৈন্যবাহিনী একস্থানে রাত কাটালো। হযরত আয়েশা (রা) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দানের জন্য তাঁবু থেকে দূরে চলে গেলেন। অসাবধানতাবশত সেখানে তাঁর গলার হার খুলে পড়ে গেল। সেখান থেকে ফিরে আসার পর ব্যাপারটি বুঝতে পেলেন এবং উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। অতপর তিনি সেখানে আবার গেলেন। ধারণা করেছিলেন যে, সেনাবাহিনী রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই হার তালাশ করে ফিরে আসতে পারবেন। কিন্তু হার তালাশ করে যখন ফিরলেন তখন সেনাবাহিনী ইতিমধ্যে রওয়ানা হয়ে গেছে। তাতে তিনি খুব ঘাবড়ে গেলেন। বয়সটা ছিল অনভিজ্ঞের বয়স। চাদর গায়ে দিয়ে সেখানেই শুয়ে পড়লেন। হযরত সাফওয়ান (রা) বিন মুয়াত্তাল সালমী নামক এক সাহাবী কোন ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনে অথবা দেরীতে ঘুম থেকে জাগার অভ্যাসের কারণে সেনাবাহিনী থেকে পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন। তিনি উম্মুল

মু'মিনীনকে (রা) চিনে ফেললেন। কেননা শৈশবকালে (অথবা পর্দার নির্দেশের পূর্বে) তিনি তাঁকে দেখেছিলেন। তাঁকে পিছনে পড়ে থাকার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। যখন ঘটনা জানতে পেলেন তখন খুব হামদরদী প্রকাশ করলেন। সেই সময়ই উম্মুল মু'মিনীনকে (রা) উটের ওপর বসিয়ে দ্রুতগতিতে সেনাবাহিনীর পেছনে রওয়ানা হলেন এবং দ্বিপ্রহরের মধ্যে সেনাবাহিনীর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলেন। মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাই যখন এই ঘটনা জানতে পেলো তখন সে বলে বেড়াতে লাগলো যে, আয়েশা (রা) আর পবিত্র নেই (নাউজুবিল্লাহ)। এটা সরাসরি অপবাদ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আবদুল্লাহ'র মিথ্যা প্রচার ও অপবাদে কিছু সরল অন্তরের মুসলমানও ভুল ধারণার শিকার হলো। প্রিয় নবী (সা) যখন একথা শুনলেন তখন খুব দুঃখিত হলেন এবং একদিন সাহাবায়ে কিরামের (রা) সামনে নিজের ক্রোধ এই ভাষায় প্রকাশ করলেন ঃ

"এক ব্যক্তি আমার পরিবার সম্পর্কে আমাকে খুব কষ্ট দিয়েছে। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার তদারক করতে পারো না।"

হযরত উসায়েদ (রা) আবেগ উদ্বেলিত হয়ে দাঁড়িয়ে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! সে যদি আওস গোত্রের মানুষ হয় তাহলে আপনি তার নাম বলুন। আল্লাহর কসম! আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব এবং তার সম্পর্ক যদি খাজরাজের সঙ্গে থাকে তাহলেও আপনি যে নির্দেশ দিবেন আমি তা পালন করবো।"

খাজরাজ সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদার নিকট কথাটি অসহনীয় ছিল, কেননা তাঁর ধারণায় এভাবে খাজরাজের ওপর আওসের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তিনি হযরত উসায়েদকে (রা) সম্বোধন করে বললেন ঃ "তুমি ভুল বলছো। তুমি কোন খাজরাজীকে হত্যা করতে পারো না।"

হযরত উসায়েদ (রা) দ্বিধাহীন চিত্তে জবাব দিলেন ঃ

"তুমি একথা বলছো অথচ আল্লাহর রাসূল (সা) যদি নির্দেশ দেন তাহলে সে যেই হোক না কেন আমরা তাকে অবশ্যই হত্যা করবো।"

এভাবে কথা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। রাসূলে আকরাম (সা) হস্তক্ষেপ করলেন এবং উভয় গোত্রের প্রজ্জলিত আবেগকে ঠাণ্ডা করলেন। কিছুদিন পর বারায়াতের আয়াত নাযিল হলো। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রা) পবিত্রতার সত্যতা স্বীকার করলেন। সেই মুররে ইয়াসির (বনি মুসতালিক) যুদ্ধের সময় আরো একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছিল। সূরায়ে

আল মুনাফিকুনে তার বর্ণনা সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। যুদ্ধের পর মুসলমানরা তখনো বনি মুসতালিকের এলাকায় অবস্থান করছিলেন। এমন সময় এক মুহাজির ও এক আনসারের মধ্যে পানি নিয়ে ঝগড়া হয়ে গেল এবং ঘটনা হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ালো। উভয়েই মুহাজির ও আনসারকে সাহায্যের জন্য ডাকলো। মুনাফিক সরদার আবুল্লাহ বিন উবাইও সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিল। সে এই ঝগড়ায় খুব করে বাতাস দিল। এমনকি একথাও বললো যে, মদীনা পৌঁছে আমাদের মধ্যে যারা মর্যাদাবান তারা নীচদেরকে বহিষ্কার করবে।

রহমতে আলম (সা) এই ঘটনার কথা শুনলেন। তিনি উভয় পক্ষকে সাবধান করলেন এবং তাদের মধ্যে সন্ধি বা মীমাংসা করিয়ে দিলেন। অতপর তিনি নিয়ম বহির্ভূতভাবে ইসলামী বাহিনীকে অসময়ে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন। সফরকালে হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়ের প্রিয় নবীর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আজ আপনি এমন সময় রওয়ানার নির্দেশ দিয়েছেন যা আপনার নিয়ম বিরোধী ছিল।"

হুজুর (সা) বললেন, "তুমি কি শোননি যে, তোমাদের সেই সাহেব কি বলেছেন?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! কোন সাহেব?"

বললেন ঃ "আবদুল্লাহ বিন উবাই।"

হযরত উসায়েদ (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "সে কি বলেছে?"

হুজুর বললেন ঃ "সে বলেছে যে, মদীনা পৌঁছে ইজ্জতওয়ালারা নীচদেরকে মদীনা থেকে বের করে দেবে।"

হযরত উসায়েদের (রা) দ্বীনী মর্যাদাবোধ জাগ্রত হলো। অস্থির চিত্তে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম, ইজ্জতওয়ালাতো আপনি। আর নীচ হলো সে। আপনি যখন চাইবেন তাকে বের করে দিতে পারবেন।"

আবদুল্লাহ বিন উবাইর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রা) যখন পিতার কথা জানতে পেলেন তখন তিনিও ক্রোধের আবেগে অস্থির হয়ে পড়লেন। ইসলামের কাফেলা যখন মদীনা তাইয়েবায় প্রবেশ করছিল তখন তরবারী ধরে পিতার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ

"আপনি বলেছিলেন যে, মদীনা পৌঁছে ইজ্জতওয়ালা নীচকে বের করে দেবে। এখন আপনি জানতে পাবেন যে ইজ্জতওয়ালা কে। আল্লাহর কসম, যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) অনুমতি না দেবেন, আপনি মদীনায় পা রাখতে পারবেন না।"

লোকজন হুজুরের (সা) নিকট একথা পৌঁছালো। তিনি হযরত আব্দুল্লাহকে (রা) বলে পাঠালেন যে, সে যেন তার পিতাকে বাড়ী যেতে দেয়।

৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়ের বাইয়াতে রিদওয়ানের সৌভাগ্য লাভ করেন এবং এমনিভাবে সেই চৌদ্দশ' আসহাবে শাজারাহ'র শামিল হয়ে গেলেন যাঁদেরকে স্বয়ং আল্লাহ পাক নিজের সন্তুষ্টির কথা এই ভাষায় বর্ণনা করেছেন ঃ

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

"আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন, যখন তারা গাছের তলায় তোমার বাইয়াত করছিল।"

হুদায়বিয়ার সন্ধির সপ্তম হিজরীতে হযরত উসায়েদ (রা) খায়বারের যুদ্ধে নিজের তরবারীর পারদর্শীতা প্রদর্শন করলেন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি সেই দশ হাজার সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা রহমতে আলমের (সা) সহযাত্রী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। অধিকন্তু তিনি এই দিক দিয়েও সৌভাগ্যবান যে, তিনি বিশেষ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সেই বিশেষ দলে ছিলেন স্বয়ং প্রিয় নবী (সা), হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং অন্যান্য বুজর্গ সাহাবীবৃন্দ। বিশ্ব নবী (সা) মক্কায় প্রবেশ করলেন। এ সময় হযরত উসায়েদ (রা) তাঁর পাশে পাশে চলছিলেন। একটি রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত উসায়েদের (রা) এক পাশে ছিলেন মহানবী (সা) এবং অপর পাশে হযরত সিদ্দীকে আকবার (রা)।

মক্কা বিজয়ের পর হযরত উসায়েদ (রা) হুনাইনের যুদ্ধ এবং তারপর তায়েফের যুদ্ধে বীরবিক্রমে অংশ নেন। হুনাইনের যুদ্ধের প্রথম দিকে যখন বনু হাওয়াযেনের প্রচণ্ড তীর নিক্ষেপে মুসলমানদের ব্যূহে বিশৃংখলা সৃষ্টি হলো তখন হযরত উসায়েদ (রা) নিজের স্থানে অটল থাকলেন। সে সময় আওসের ঝাণ্ডা তাঁর হাতে ছিল। তাবুকের যুদ্ধের সময় অন্য সাহাবীদের মত হযরত উসায়েদও (রা) জিহাদের সামান সরবরাহে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অংশ নিয়েছিলেন এবং তাবুকের কঠোরতম সফরে বিশ্ব নবীর (সা) সহযাত্রী হওয়ার

সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। বিদায় হজ্জের সময়ও তিনি রহমতে আলমের (সা) সঙ্গে ছিলেন।

প্রিয় নবীর (সা) ইন্তেকালের অব্যবহিত পরেই খিলাফতের সমস্যা দেখা দিল। আনসারের প্রায় সকল পরিবারের বেশীরভাগ সদস্যই খাজরাজ সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাকে খলিফা বানাতে আগ্রহী ছিলেন। এ জন্য তারা সাকিফায়ে বনু সায়েদাতে একত্রিত হলেন। এ সময় হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়ের পূর্ণাঙ্গ দূরদর্শীতা এবং ঈমানী বিচক্ষণতা প্রদর্শন করেছিলেন। আল্লামা ইবনে জারির তারারী বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উসায়েদ (রা) আওস গোত্রকে হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) বাইয়াতের জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। বস্তুত আওস সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজের ওফাতের পর সবচেয়ে বেশী প্রভাব প্রতিপত্তি হযরত উসায়েদেরই (রা) ছিল। এ জন্য সকলেই নিশ্চিন্তে ও নির্দ্বিধায় তাঁর কথা মেনে নিলেন এবং হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদার পরিবর্তে হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) হাতে বাইয়াত করলেন। তা দেখে হযরত সায়াদের (রা) নিজের গোত্র খাজরাজও হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) বাইয়াতে বিলম্ব করলো না। এমনিভাবে প্রায় সকল মুসলমান ঐক্যের দৃষ্টিকোণ থেকে একত্রিত হয়ে গেলেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) শাসনকালে হযরত উসায়েদ (রা) অত্যন্ত কঠিন অবস্থাতে মুহাজির ও আনসারের একটি ক্ষুদ্র দলের সাথে মিলে মদীনা মুনাওয়ারা হিফাজত করতে লাগলেন। মুরতাদ ও বেদুঈন লুটেরারা দু'একবার মদীনার ওপর হামলার অপচেষ্টা চালালো। কিন্তু সিদ্দীকে আকবার (রা) মদীনায় অবস্থানরত অল্প সংখ্যক সাহাবীকে (রা) সঙ্গে নিয়ে তাদের দাঁত- ভাঙ্গা জবাব দিলেন। এ সময় যাঁরা জীবন বাজী রেখে কাজ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত উসায়েদও (রা) ছিলেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) হযরত উসায়েদের (রা) বীরত্ব ও স্পষ্টবাদিতাকে আন্তরিকভাবে স্বীকার করতেন এবং তাঁকে অপরিসীম ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, সিদ্দীকে আকবারের (রা) নিকট হযরত উসায়েদ (রা) আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে আফজাল ছিলেন।

হযরত ওমর ফারুকও (রা) হযরত উসায়েদকে (রা) খুব তাজিম করতেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে তাঁর পরামর্শ নিতেন। নিজের শাসনামলে তিনি যখন বাইতুল মুকাদ্দাস তাশরীফ নিলেন (১৬ হিজরী) তখন নিজের সাথে কতিপয় মুহাজির ও আনসারকেও নিয়ে যান। তাঁদের মধ্যে একজন হযরত

উসায়েদ (রা) বিন হুজায়ের ছিলেন। তিনি সিরিয়ার সকল সফরে হযরত ওমর ফারুকের (রা) সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গেই মদীনা ফিরে আসেন।

হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়ের বিশ হিজরীতে ওফাত পান। যেদিন তাঁর ওফাত হয় সেদিন মদীনা মুনাওয়ারাতে বিলাপ ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। মুহাজির এবং আনসার সকলের চোখই অশ্রুসজল ছিল। আরব ও আজমের খলিফা আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক (রা) স্বয়ং তাঁর বাড়ীতে গিয়েছিলেন এবং অসংখ্য সাহাবীর সাথে জানাযা নিয়ে বাকী'তে এসে উপস্থিত হয়ে ছিলেন। তিনি নিজেই জানাযার নামায পড়িয়েছিলেন। অতপর শোক বিহ্বলচিত্তে ইসলামের এই মহান ব্যক্তিত্বকে জান্নাতুল বাকী'র মাটির হাওয়ালা করে দিলেন। মৃত্যুকালে হযরত উসায়েদ (রা) চার হাজার দিরহাম ঋণী ছিলেন। হযরত ওমর ফারুককে (রা) তাঁর সম্পত্তি থেকে এই ঋণ পরিশোধের ওসিয়ত করলেন। হযরত ওমর (রা) সম্পত্তি না বেচে ঋণদাতাদেরকে চারটি বার্ষিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধে সম্মত করালেন। সুতরাং হযরত উসায়েদের (রা) বাগানের ফল বিক্রয় করে চার বছরের মধ্যে সকল ঋণ আদায় করা হয়। এমনিভাবে সম্পূর্ণ সম্পত্তিই রক্ষা পায়। হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত উসায়েদের (রা) সন্তানদের জন্য এই কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেন। তিনি বলতেন যে, তিনি নিজের ভাইয়ের সন্তানদেরকে অভাবগ্রস্ত দেখতে চাননি। হযরত উসায়েদের (রা) সন্তানদের মধ্যে শুধুমাত্র এক পুত্র ইয়াহইয়ার নাম বুখারীর একটি রেওয়ায়াতে পাওয়া যায়। সম্ভবত আতিক নামের কোন পুত্রও ছিলেন। কেননা আবু ইয়াহইয়া ছাড়া তার কুনিয়ত আবু আতিকও ছিল। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে যে, হযরত উসায়েদের (রা) স্ত্রী রাসূলের (সা) যুগেই ইন্তেকাল করেন। তিনি বিদায় হজ্জ থেকে ফারেগ হয়ে রাসূলে আকরামের (সা) সঙ্গে ফিরে আসছিলেন। এমন সময় জুলহুলাইফা নামক স্থানে কতিপয় যুবক আনসার তাঁকে স্ত্রীর ওফাতের খবর দেন। উসায়েদ (রা) মুখের ওপর কাপড় দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনি একজন উঁচু মর্যাদার সাহাবী হয়ে একজন মহিলার জন্য কাঁদছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ অশ্রু মুছলেন এবং বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমাকে যদি কাঁদতেই হয় তাহলে সায়াদ (রা) বিন মুয়াজের জন্য কাঁদা উচিত। রাসূলে আকরাম (সা) এসব কথা শুনতে লাগলেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হযরত উসায়েদের (রা) প্রভূত প্রশংসা করতেন। তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়ের অন্যতম জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন।

সাইয়েদেনা উসায়েদ (রা) বিন হুজায়ের সেইসব মহান সাহাবীর মধ্যে পরিগণিত ছিলেন যাঁরা চরম প্রতিকূল অবস্থায় ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডীন এবং আজীবন ইসলামের শক্তিশালী বাহুর ভূমিকা পালন করেন। হযরত উসায়েদের (রা) চারিত্রিক বৈশিষ্টের মধ্যে রাসূল প্রেম, দ্বীনের প্রতি সম্ভ্রমবোধ, শাওকে জিহাদ, বীরত্ব ও চেষ্টা, নাফসের পবিত্রতা, ইখলাস এবং ইবাদাত ও কুরআন-হাদিসের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল। এত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে কুরআনে হাকিম তিলাওয়াত করতেন যে, লোকজন ঈর্ষা করতো। সহীহ্ বুখারীতে স্বয়ং তাঁর থেকেই বর্ণিত আছে যে, এক রাতে তিনি সূরায়ে বাকারাহ্ তিলাওয়াত করছিলেন। তাঁর ঘোড়া পাশেই বাঁধা ছিল। ঘোড়াটি হ্রেষা রব করতে লাগলো। তিনি চুপ করলে ঘোড়াও চুপ করে গেল। তিনি পুনরায় পড়া শুরু করলে ঘোড়া আবার ডাকতে লাগলো। তিনি আবার চুপ করলে ঘোড়াও থেমে গেল। বস্তুত তাঁর পুত্র ইয়াহইয়া ঘোড়ার নিকট ছিল। তার কোন ক্ষতি হয় কিনা এ জন্য তিনি ভীত ছিলেন। তিনি নামাযে সালাম ফিরিয়ে ইয়াহইয়াকে নিজের নিকট টেনে নিলেন। এ সময় ঘটনাক্রমে তাঁর দৃষ্টি আসমানের দিকে নিবদ্ধ হলো। তখন একটি মেঘ (ছায়াবান) নিজের মাথার ওপর পেলেন। এই মেঘ থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। সকালে একথা নবী করিমের (সা) খিদমতে পেশ করলেন। হুজুর (সা) বললেন, "হে ইবনে হুজায়ের! এমনিভাবে পড়বে এবং অবশ্যই পড়বে।" তিনি আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ভয় পেয়েছিলাম যে, ইয়াহইয়া আবার কষ্ট না পায়। কেননা সে ঘোড়ার নিকট ছিল। এ জন্য আমি সালাম ফিরিয়ে ইয়াহইয়াকে নিজের নিকট টেনে নিয়েছিলাম। আসমানের দিকে যখন তাকালাম তখন একটি মেঘ দেখলাম। এই মেঘে প্রদীপের মত আলো জ্বলছিল অতপর যখন দিন হলো তখন সেই মেঘ অদৃশ্য হয়ে গেল এবং আসমানের দিকে চলে গেল। হুজুর (সা) বললেন, "তুমি কি বুঝতে পারো যে তা কি ছিল?" আমি আরজ করলাম "না।" বললেন, "তা ছিল ফেরেশতা।" তোমার কুরআন তিলাওয়াত শোনার জন্য এসেছিলেন। তুমি যদি সকাল পর্যন্ত তিলাওয়াত অব্যাহত রাখতে তাহলে সে-ও সকাল পর্যন্ত শুনতো। এমনকি মানুষ তাকে দেখে ফেলতো এবং সে কারো থেকে লুকোতো না।

সহীহ বুখারীতে অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, এক রাতে ছিল প্রচণ্ড অন্ধকার। হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়ের নবীর (সা) দরবার থেকে উঠে বাড়ী রওয়ানা হলেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে আরও একজন সাহাবীও চললেন। হযরত উসায়েদের (রা) হাতে একটি লাঠি ছিল। লাঠির সাহায্যে তিনি চলতে লাগলেন। এ সময় তিনি দেখতে পেলেন যে, আগে আগে একটি আলো

চলছে। যার কারণে সমগ্র রাস্তা আলোকিত হয়ে গেছে। উভয়ে যখন একস্থানে পৌঁছে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন তখন আলোও উভয়ের সঙ্গে পৃথক হয়ে গেল।

মুসনাদে আবু দাউদের এক রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলে আকরাম (সা) হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়েরকে বনু আবদুল আশহালের মসজিদের ইমাম নিয়োগ করেছিলেন। এ থেকে জানা যায় যে, হযরত উসায়েদ (রা) বনু আবদুল আশহালের মধ্যে সবচেয়ে বেশী কালামুল্লাহ পড়েছিলেন অথবা সবচেয়ে বেশী সুন্নাহ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। কেননা সহীহ মুসলিমে হযরত আবু মাসউদ (রা) বদরী থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে জামায়াতের ইমামত সেই করবে যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহর কিতাব পড়েছে। যদি এ ব্যাপারে সকলেই বরাবর হয় তাহলে সুন্নাহ সম্পর্কে যে বেশী ওয়াকিফ হবে সেই ইমামতি করবে। যদি তাতেও সকলে বরাবর বা সমান হয় তাহলে যে আগে হিজরত করেছিল সে ইমামতি করবে। যদি তাতেও সকলে সমান সমান হয় তাহলে যার বয়স বেশী সেই ইমামতি করবে।

হযরত উসায়েদ (রা) মুহাজিরও ছিলেন না। আবার বয়সেও সকল আশহালীর চেয়ে বড় ছিলেন না। এ জন্য এটা স্পষ্ট যে, হয় তিনি বনু আবদুল আশহালের মধ্যে সবচেয়ে বড় কুরআনের আলেম ছিলেন অথবা সুন্নাহ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী ওয়াকিফ ছিলেন এবং এটা কোন অসম্ভব ব্যপার ছিল না যে, তিনি উভয় ফজিলতেই ভূষিত ছিলেন। হযরত উসায়েদ (রা) কোন নতুন শরয়ী মাসয়ালা অথবা হুকুমের জ্ঞান লাভ করলে খুব খুশী হতেন এবং আনন্দের কথা নির্দ্বিধায় প্রকাশ করতেন। সহীহ বুখারীতে আছে যে, হযরত আয়েশা (রা) এক সফরে সহোদরা হযরত আসমার (রা) হার চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। রাস্তায় তা কোথাও পড়ে গেল। রাসূলে করিম (সা) কতিপয় সাহাবীকে তা অনুসন্ধানের জন্য পাঠালেন। রাস্তায় তাদের নামাযের সময় হলো। কিন্তু দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ওজুর পানির কোন খোঁজ ছিল না। সকলেই ওজু ছাড়া নামায আদায় করে নিলেন। তাঁরা যখন হুজুরের (সা) নিকট ফিরে এলেন তখন খুব দুঃখের সঙ্গে ওজু ছাড়া নামায পড়ার কথা উল্লেখ করলেন। সে সময় তাইয়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়। হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়ের (আনন্দের আতিশয্যে) হযরত আয়েশাকে (রা) সম্বোধন করে বললেন, "উম্মুল মু'মিনীন! আল্লাহ তাআলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। যখনই কোন কাজে আপনি আটকে গেছেন আল্লাহ স্বয়ং তা থেকে বের হওয়ার পথ বাতলে দিয়েছেন এবং মুসলমানদের জন্যও তাতে বরকত হয়েছে।"

হযরত উসায়েদ (রা) নবীর (সা) এত সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন যে, কোন কোন সময় তিনি হুজুরের (সা) নিকট অপর লোকদের জন্য সুপারিশ করতেন। বাইহাকী এবং ইবনে আসাকির হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে রেওয়ায়াত করেছেন যে, একদিন নবী (সা) লোকদের মধ্যে খাদ্য বন্টন করলেন। সে সময় হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়ের হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! বনি জাফরের অমুক আনসারী খুবই অভাবগ্রস্ত এবং সেই গৃহে মহিলা ছাড়া কোন পুরুষ নেই। হুজুর (সা) বললেন, "হে উসায়েদ! হায়, তুমি যদি আগে আসতে! এখন তো আমি সব বন্টন করে ফেলেছি। তুমি যদি শোনো যে কোথাও থেকে কোন মাল অথবা সামান আমার কাছে এসেছে তাহলে আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে।" তারপর তাঁর নিকট খায়বার থেকে যব ও খেজুর এলো। হুজুর (সা) লোকদের মধ্যে এই সামান বন্টন করলেন। এ সময় তিনি বনি জাফরের সেই সব মহিলাকে সবচেয়ে বেশী দিলেন। হযরত উসায়েদ (রা) আরজ করলেন, "হে আল্লাহর নবী! আল্লাহ তায়ালা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।" হুজুর (সা) বললেন, "হে আনসারের দল! আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকেও ভাল প্রতিদান দিন। তোমরা অত্যন্ত পবিত্র ও ধৈর্যশীল।"

হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়ের থেকে ১৮টি হাদিস বর্ণিত আছে। তাঁর হাদিস বর্ণনাকারীদের মধ্যে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা), হযরত আনাস (রা) বিন মালিক, হযরত কা'ব (রা) বিন মালিক এবং হযরত আবু সাঈদ খুদরীর (রা) মত মহান মর্যাদা সম্পন্ন বুজুর্গ মানুষও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হযরত মুছান্না (রা) বিন হারিছা শাইবানী

নবুওয়াতের দশম বছর। হজ্জের মওসুম। রহমতে আলম (সা) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) সমভিব্যহারে দীর্ঘদিনের প্রথা অনুযায়ী হকের তাবলীগের জন্য মিনা তাশরীফ নিলেন। আরবের দূর-দূরান্ত থেকে হজ্জের জন্য আগত যিয়ারতকারীদের তাবুতে শহরটি ছিল আবাদ। বিভিন্ন গোত্রকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে তিনি এক মজলিসে উপস্থিত হলেন। এই মজলিস ছিল মহান ও মর্যাদাবান। তাতে কতিপয় সম্মানিত ও মার্যাদাশালী ব্যক্তি আলোচনারত ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা) সামনে অগ্রসর হয়ে তাদেরকে সালাম করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"হে বাইতুল্লাহ'র মেহমানরা! তোমরা কোন্ কবিলার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত?"

উত্তর এলো ঃ "আমরা শাইবান ছা'লাবার সন্তান এবং পারস্যবাসীর প্রতিবেশী।"

উত্তরদানকারী ছিলেন একহারা গড়নের এক প্রভাবশালী মানুষ। তার মাথায় ছিল কালো চুলের গুচ্ছ। তা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে বুকের ওপর এসে পড়েছিল। হযরত আবু বকরের (রা) তৎক্ষণাৎ কিছুকথা স্মরণ হলো। তিনি সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে তুমি মাফরুক বিন আমর।"

সে বললো, "তুমি ঠিকই চিনেছ ভাই। আমি মাফরুকই। আর আমার সঙ্গে রয়েছেন হানি বিন কাবিসা, মুছান্না বিন হারিছা এবং নুমান বিন শরীক।"

হযরত আবু বকর (রা) আরবের সকল গোত্র এবং তাদের নসব সম্পর্কে খুব ভালভাবে পরিজ্ঞাত ছিলেন। তিনি তাদেরকে চিনে ফেললেন এবং হুজুরের (সা) খিদমতে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। এরা স্বগোত্রের সার বস্তু। তাদের কবিলাতে তাদের চেয়ে বেশী মর্যাদাবান ও সম্মানিত মানুষ আর কেউ নেই। আপনি অনুমতি দিলে আমি তাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারি।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "অবশ্যই।"

অতপর হযরত আবু বকর (রা) পুনরায় মাফরুকের প্রতি মনোযোগী হলেন। সে ছিল তার কবিলার প্রধান বাগ্মী পুরুষ। জবাব দানের জন্য গুছিয়ে গাছিয়ে বসলেন।

হযরত আবু বকর (রা) ঃ "তোমাদের কবিলায় লোক সংখ্যা কত হবে?"

মাফরুক ঃ "আমাদের সংখ্যা হাজারের অধিক। আর এটা ঠিক যে, এটা সংখ্যার দিক দিয়ে কম নয়।"

হযরত আবু বকর (রা) ঃ "তাদের হিফাজতের কি ব্যবস্থা আছে?"

মাফরুক ঃ "আমরা নিজেদের হিফাজতের বা প্রতিরক্ষার জন্য অব্যাহতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকি। কিন্তু সকল জাতির ভাগ্যই তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে।"

হযরত আবু বকর (রা) ঃ "তোমাদের এবং তোমাদের শত্রুদের মধ্যকার যুদ্ধের অবস্থা কি ধরনের হয়?"

মাফরুক ঃ "আমরা যখন যুদ্ধে লিপ্ত হই। তখন আমাদের ক্রোধের কথা না হয় নাই জিজ্ঞেস করলে। ক্রোধান্বিত অবস্থায় আমরা কিভাবে দুশমনের মুকাবিলা করি, তাও আমরাই জানি। আমরা ঘোড়াকে সন্তানের চেয়ে বেশী মূল্যবান মনে করি। অস্ত্রকে দুধদানকারী উটের চেয়ে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি এবং জয়-পরাজয় তো আল্লাহর হাতে। কখনো আমরা বিজয়ী হই। আবার কখনো পরাজিতও হয়ে থাকি।"

তারপর মাফরুক হযরত আবু বকরকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তোমাকে কুরাইশের লোক বলে মনে হয়। আমার অনুমান কি ঠিক?

হযরত আবু বকর (রা) বললেন ঃ "হ্যাঁ, ভাই তোমার অনুমান ঠিক। তুমি রাসূলুল্লাহ'র (সা) ব্যাপারে শুনে থাকবে। [হুজুরের (সা) দিকে ইঙ্গিত করে] ইনিই তিনি।"

মাফরুক বললেন ঃ "হ্যাঁ, আমরা তাঁর ব্যাপারে শুনেছি।" অতপর তিনি হুজুরকে (সা) সম্বোধন করে বললেন ঃ "হে কুরাইশী ভাই, তুমি কোন্ বস্তুর দাওয়াত দাও?"

হুজুর (সা) অগ্রসর হয়ে বসে গেলেন এবং হযরত আবু বকর (রা) তাঁর ওপর নিজের কাপড়ের ছায়া দিয়ে নিকটে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি বললেন ঃ "আমি তোমাদেরকে একথার দিকে আহবান জানাই যে, তোমরা সাক্ষ্য দেবে,

আল্লাহ ছাড়া আর কেউই ইবাদাতের যোগ্য নয় এবং আমি আল্লাহর রাসূল। আমি চাই যে, তোমরা আমার সাহায্যকারী হবে এবং আমাকে হিফাজত করবে। যাতে আমি বিনা বাধায় আল্লাহর হুকুম-আহকাম লোকদের নিকট পৌঁছাতে পারি।

কুরাইশরা আল্লাহর হুকুম-আহকামের প্রকাশ্য বিরোধিতা করেছে। তার রাসূলকে (সা) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। বাতিলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে হককে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আল্লাহ অবশ্যই সকল বস্তু থেকে মুখাপেক্ষীহীন ও প্রশংসার যোগ্য।"

মাফরুক জিজ্ঞেস করলেন ঃ "আর কোন্ কোন্ বস্তুর দিকে দাওয়াত দিয়ে থাকো?"

জবাবে হুজুর (সা) কুরআনে হাকিমের কতিপয় আয়াত তিলাওয়াত করলেন। এসব আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার বানিও না। মাতা-পিতার সঙ্গে ইহসান কর। দারিদ্রতার ভয়ে নিজের সন্তান-সন্ততিকে হত্যা করো না। বেহায়াপনা বা নির্লজ্জতার কাছেও ঘেঁষো না। তা প্রকাশ্যই হোক বা অপ্রকাশ্যই হোক। যাদের রক্ত আল্লাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন তাদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করো না। ইয়াতিমের সম্পদে হাত লাগিও না। মাপ-জোপের কাজ ইনসাফের সাথে করবে এবং যখন তোমরা কথা বলবে তখন ইনসাফ করবে। যদি তা কোন আত্মীয়ের ব্যাপারও হয় এবং আল্লাহর সঙ্গে যে প্রতিশ্রুতিই দাও না কেন তা পূর্ণ কর।

মাফরুক এসব আয়াত শুনেই বলে উঠলেন ঃ "হে কুরাইশী ভাই! তুমি যা কিছু শুনিয়েছ তা কখনই এই যমীনের কথা হতে পারে না। যদি এই কালাম যমীনের কোন বাসিন্দার হতো তাহলে আমরা নিশ্চিতভাবে চিনতে পারতাম। আল্লাহর কসম! তোমার দাওয়াত সম্পূর্ণভাবে কল্যাণে ভরপুর। সেই জাতি মিথ্যা বলেছে এবং বাড়াবাড়ি করেছে যারা তোমাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছে। আমি কি ঠিক বলিনি?"

হানি বিন কাবিসাও কুরআনে হাকিমের বর্ণনা ভঙ্গীতে বিমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে মাফরুকের কথার সত্যতা স্বীকার করলো এবং হুজুরকে (সা) সম্বোধন করে বললেন ঃ "হে কুরাইশী ভাই! তুমি যে কালাম বা বাণী শুনিয়েছ তা নিসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু তোমার সাথে এটা আমাদের প্রথম সাক্ষাত। আমাদের কবিলা এখানে উপস্থিত নেই। এ জন্য তাদের পরামর্শ ব্যতীত আমরা কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। যা হোক, আমরা তোমাদের

দাওয়াতের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করবো। ইনি হলেন আমাদের সরদার ও সিপাহসালার মুছান্না বিন হারিছা। তাঁর সঙ্গেও আলোচনা করুন। তাহলে ভাল হবে।"

মুছান্না ছিলেন এক কমনীয় যুবক। তাঁর সুন্দর চেহারা সুরত দেখে একবাক্যে বলা যায় যে, বাস্তবিকই তিনি কোন সরদার পুত্র সরদার। তাঁর চোখে ছিল ঈগলের চমক এবং চেহারায় চিন্তা-ভাবনার ছাপ পরিলক্ষিত হতো। কুরআনে হাকিমের যাদুময় ভাষার অলংকারে তিনি হতভম্ব হয়ে পড়লেন। হানি যখন তাঁর নাম নিলো তখন চমকে উঠলো এবং হুজুরকে (সা) সম্বোধন করে বললো ঃ

"হে কুরাইশী ভাই! আমি যে বিস্ময়পূর্ণ বাণী আপনার মুখ থেকে শুনেছি, আল্লাহর কসম! এমন পসন্দনীয় বাণী এর পূর্বে কখনো আমার কানে আসেনি। হানি যা কিছু বলেছে তাও ঠিক। কিন্তু বড় কথা হলো যে, আমরা পারস্যের প্রতিবেশী এবং সেখানে আমাদের অবস্থান কিসরার সন্তুষ্টির ওপর নির্ভরশীল। আমরা তার নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, আমরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবো না এবং তার কোন বিরোধীকেও আমাদের মধ্যে আশ্রয় দিব না। হতে পারে যে, যে কথার দিকে আপনি দাওয়াত দিচ্ছেন তা কিসরার পসন্দনীয় নয় এবং সে আমাদেরকে পিষে মারবে। পারস্যের শাসক খুবই নিষ্ঠুর মানুষ। ক্ষমা ও নরমী বলতে কোন কিছুই সে জানে না। আমরা আরবের নিকট ও পাশের শাসকদের মুকাবিলায় আপনাকে সাহায্য করতে পারি। কিন্তু কিসরার মুকাবিলা করা আমাদের সাধ্যাতীত ব্যাপার। এ জন্য আমরা আপনার দাওয়াত সম্পূর্ণরূপে কবুল করতে অক্ষম।

হুজুর (সা) মুছান্নার জবাব শুনে বললেন ঃ "শাইবানী ভাই! তোমাদের জবাবে খারাপ কিছু নেই। তোমরা যা বলেছ তা ঠিকই বলেছ। তবে, আংশিক সহযোগিতা ইসলামী চেতনা বিরোধী। তোমরা যদি হককে স্বীকার করো তাহলে সম্পূর্ণ দ্বীনকে কবুল করতে হবে। কিসরা ও ইসলামের আনুগত্য এক সঙ্গে সম্ভব নয়। আল্লাহর দ্বীনকে নিয়ে সে-ই দাঁড়াতে পারে যে তার চারদিক থেকে হিফাজতের জন্য কোমর বেঁধে দাঁড়ায়।" একথা বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং হযরত আবু বকরের (রা) হাত ধরে সামনে এগিয়ে গেলেন।

এ হলো সেই ঘটনা যাতে বনু শাইবানের শাহ্সওয়ার মুছান্না বিন হারিছার নাম প্রথমবার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পেল এবং রাত-দিনের বিবর্তনে এই ঘটনা দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। আর এমনিভাবে কেটে গেল ১১টি বছর।

নবুওয়াত প্রাপ্তির দশম বছর থেকে নবম হিজরী পর্যন্ত কিয়ামতের মত অবস্থা বিদ্যমান ছিল। এযুগে বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) মক্কার ভূমিকে বিদায় জানিয়ে মদীনা তাশরীফ নেন। বদর, ওহোদ, খন্দক এবং খায়বারের যুদ্ধ অতীত হয়েছে। হুদায়বিয়ার সন্ধিনামা থেকে স্পষ্ট বিজয়ের পথ সূচীত হয়েছিল। অনেক দেশের রাজা-বাদশাহদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রেরণ করা হয়েছিল। অবশেষে মক্কার ভূমি, যা এক সময় তাওহীদের মহান দায়ীর (সা) প্রতি সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তাই আবার অষ্টম হিজরীতে তার মান, মর্যাদা, বিজয় ও সৌভাগ্যের দৃশ্য অবলোকন করেছিল। আরবের কেন্দ্র মক্কা মুয়াজ্জামার ওপর ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডয়নে সমগ্র আরব অবনত হয়ে পড়েছিল। ইসলামের দুশমনদের ওপর হকের আতংক ছেয়ে গেল। তাদের উঁচু মাথা অবনত হয়ে গেল এবং তারা হকের সত্যতা ও মহানত্বের সাক্ষ্য দানের জন্য আরবের প্রতিটি কোণ থেকে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে রহমতে আলমের (সা) খিদমতে হাজির হতে লাগলো। নবম হিজরীতে এত বেশী প্রতিনিধিদল এসেছিল যে, সে বছরের নামই হয়ে গিয়েছিল "আমুল ওফুদ" বা প্রতিনিধিদলের বছর। কাইসার ও কিসরার ভীতির যাদুও ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আরবের উত্তর সীমান্তে আবাদ আরব গোত্রসমূহও তখন সেই যাদুর বন্দীত্ব থেকে স্বাধীন হয়। সেই বনু শাইবান, যারা এক সময় রহমতে আলমের (সা) দাওয়াতকে হক মনে করেও কিসরার ভয়ে তা কবুল করেনি, তাদের অন্তর এখন ইসলামের সত্যতা ও মহানত্বে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। যখন তারা দেখলো যে, অন্যান্য গোত্রের যুবক ও বৃদ্ধ, নারী ও পুরুষ দলে দলে রাসূলে আরাবীর (সা) দরবারে উপস্থিত হচ্ছে তখন তারাও সামনে অগ্রসর হলো এবং নিজেদের একটি প্রতিনিধিদলকে আনুগত্য প্রকাশের জন্য মদীনা মুনাওয়ারা রওয়ানা করলেন। এই দলের নেতৃত্ব করছিলেন মুছান্না বিন হারিছা। সেই মুছান্না; ১১ বছর পূর্বে যাঁর নিকট একদিন বিশ্ব নবী (সা) স্বয়ং গিয়েছিলেন। কিন্তু তাকদিরের কি ফের, তখন তিনি ইসলাম গ্রহণে সাবিকুনাল আউয়ালুন হওয়ার সৌভাগ্য থেকে মাহরুম হন। আজ তিনি সেই রহমতে আলমের (সা) বন্দীত্বের জিঞ্জির পরিধানে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছেন এবং রাসূলের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। এটা ছিল তাঁর জীবনের এক স্মরণীয় দিন। সেদিন তিনি ইসলামের নাঙ্গা তরবারী হয়ে গেলেন। এই তরবারী জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হকের সহযোগিতায় আর খাপে ঢোকেনি।

হযরত মুছান্না (রা) বিন হারিছা বনু শাইবান গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। এই গোত্র আদনানী বংশের মশহুর কবিলা বনু বকর বিন ওয়ায়েলের একটি শাখা ছিল। তাঁর নসবনামা হলো ঃ

মুছান্না (রা) বিন হারিছা বিন সালমা বিন সায়াদ বিন মুররাহ বিন জাহল বিন শাইবান বিন ছা'লাবা বিন উকাবাহ বিন ছায়াব বিন আলী বিন বকর বিন ওয়ায়েল। বনু বকর বিন ওয়ায়েল যেহেতু রবিয়াহ বিন নাযারের (বিন মায়াদ বিন আদনান) বংশোদ্ভূত ছিলেন এ জন্য তাঁর এবং তাঁর সকল শাখাকে আলে রবিয়াহ অথবা রাবয়ীও বলা হতো।

ইসলামের আবির্ভাবের সময় আরবের উত্তর সীমান্ত সে যুগের দুই আজিমুশশান সাম্রাজ্যের সীমান্তের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। ইরাক থেকে পশ্চিম দিকের এলাকা রোমের বাযনাতনী শাসনের অধীন ছিল এবং তার পূর্ব দিকের এলাকা ইরানের সাসানী শাসনাধীন ছিল। ইরাকের সংযুক্ত এলাকায় বসবাসরত আরব গোত্রসমূহ ইরানী শাসকদের ট্যাক্স দিত অথবা তাদের প্রভাবাধীন ছিল এবং সিরিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত এলাকায় বসবাসরত গোত্রসমূহ রোমক শাসকদের আনুগত্য ও সমর্থন জানাতো। বনু শাইবান প্রথমে উল্লেখিত গোত্রসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সুদীর্ঘদিন যাবত ইরানী শাসনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়েছিল। তারা খুব বাহাদুর ও যোদ্ধা ছিল। আরবী মান-মর্যাদার অহমিকাবোধও তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আরবে এমন কোন শক্তিশালী ও সুসংগঠিত সরকার ছিল না যে, ইরানের শাহের ভীতিপ্রদ শক্তির মুকাবিলা করতে পারে। এ জন্য তারা ইরানী শাসনের আনুগত্য করতে বাধ্য ছিল। ইরানের এই শান-শওকত নবুওয়াতের দশম বছরে বনু শাইবানের সরদারদেরকে রাসূলে আরাবীর (সা) হক দাওয়াত কবুলে বাধা দিয়েছিল। ইরানের অনুগত হওয়া সত্ত্বেও বনু শাইবান আরবের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেনি। আরব বংশোদ্ভূত হওয়ার ব্যাপারে তাদের গভীর অনুভূতি ছিল। এ জন্য তারা অন্য আরব গোত্রের মত প্রত্যেক বছর মক্কা পৌঁছতেন।

মুছান্না নিজের গোত্রের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। তিনি ছিলেন বীর এবং নির্ভিক মানুষ। তিনি সমর বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি নিজের বিচক্ষণতা, সঠিক মত, দূরদর্শিতা এবং হিকমতের বদৌলতে শুধুমাত্র বনু শাইবানের চোখের মণিই ছিলেন না বরং প্রতিবেশী গোত্রসমূহও তার মজবুত নিপুণতা ও ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি প্রদান এবং প্রশংসা করতেন। অষ্টম হিজরীতে মক্কায় ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডীন হলো। এ সময় হুনাইনে বনু হাওয়াযিনের যোদ্ধাদের শক্তি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলে মুছান্নার (রা) দূরবীণ দৃষ্টি অনুভব করতে

পারলো যে, আরবে এক নতুন শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। এই শক্তির পক্ষে হকও রয়েছে এবং তার সঙ্গে আল্লাহর সাহায্যও আছে। কিসরাভীতি তাদের অন্তর থেকে সম্পূর্ণরূপে কর্পূরের মত উবে গিয়েছিল এবং তারা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে নিজেদেরকে রাসূলে আরাবীর (সা) পায়ের তলায় সমর্পণ করলো। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা এটা পরিষ্কার করেননি যে, ইসলাম গ্রহণের পর মুহাম্মদ (রা) কতদিন মদীনা মুনাওয়ারাতে অবস্থান করেছিলেন। তবুও বিভিন্নভাবে জানা যায় যে, তিনি কিছুদিন মদীনা মুনাওয়ারাতে অবস্থান করে অবশ্যই নবীর (সা) ফয়েজে অবগাহিত হয়েছিলেন। কেননা পরবর্তী জীবনে তাঁর কাজকর্ম মজবুত আকিদা সম্বলিত উদাহরণযোগ্য মুসলমান এবং আপাদমস্তক মুজাহিদের কর্মতৎপরতাই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এই চরিত্রের মানুষের মধ্যে নবীর (সা) প্রভাব অবশ্যই ছিল বলে মনে করার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

একাদশ হিজরীতে রাসূলে আকরাম (সা) ইন্তেকাল করেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খিলাফতের দায়িত্বে সমাসীন হন। এ সময় সমগ্র আরবে ধর্মদ্রোহিতার আগুন জ্বলে উঠে। কিছুসংখ্যক মুরতাদ মুসায়লামা কাজ্জাব এবং তোলায়হা আসদীর মত মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদারের অনুগত হয়ে ইসলাম ত্যাগ করলো। অন্য একটি দল নামায ও যাকাতে কম দাবী করতে লাগলো এবং তৃতীয় আরেক গ্রুপ যাকাত আদায়ে সরাসরি অস্বীকৃতিই জানিয়ে বসলো। মদীনার আনসার, মক্কার কুরাইশ এবং বনু ছাকিফ ছাড়া খুব কম গোত্রই এমন ছিল যে, যাদের সকলে অথবা কতিপয় মানুষ মুরতাদ হয়নি। নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী খিলাফতের জন্য এটা ছিল এক কঠিন ও নাযুক সময়। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তুলনাহীন অটলতা, দৃঢ়সংকল্প ও হিম্মতের সঙ্গে কাজ করলেন এবং মুরতাদদের সামনে অবনত হওয়া অথবা তাদের কোন ধরনের সুবিধা দানে শুধু অস্বীকারই করলেন না বরং নিজের উপায়-উপকরণের চরম সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাদের উৎখাতের জন্য সংকল্পবদ্ধ হলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ১১টি বাহিনী প্রস্তুত করলেন এবং বিভিন্ন এলাকায় মুরতাদদের উৎখাতের জন্য তাদেরকে প্রেরণ করলেন।

তাদের মধ্যে একটি বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন হযরত আ'লা (রা) বিন আবদুল্লাহ হাজরামী। তাঁকে বাহরাইনের মুরতাদদেরকে উৎখাতের জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। বাহরাইন ছিল বনু শাইবানের আবাসস্থলের নিকটবর্তী স্থানে। বাহরাইনবাসী শাইবানী যোদ্ধাদেরকে নিজেদের পক্ষে আনার জন্য খুব চেষ্টা চালালো। কিন্তু মুহাম্মদ (রা) বিন হারিছা অটল পাহাড়ের মত তাদের

পথের বাধা হয়ে দাঁড়ালেন। তিনি ইসলামের সমর্থনে জীবনের বাজী লাগিয়ে দিলেন এবং নিজের গোত্রের কোন সদস্যকে মুরতাদদের সাহায্যের জন্য যেতে দিলেন না। আ'লা (রা) যখন বাহরাইনে মুরতাদদেরকে পরাজিত করলেন তখন মুছান্নাও (রা) বনু শাইবানকে সঙ্গে নিয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং পরাজিত মুরতাদদের সকল রাস্তা বন্ধ করে দিলেন। এটা মুছান্নারই (রা) প্রচেষ্টার ফল ছিল যে, সেই এলাকায় বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীরা দ্বিতীয় বার আর মাথা উঁচু করতে সাহস পায়নি। ধর্মদ্রোহী বা মুরতাদরা সম্পূর্ণরূপে উৎখাত এবং ইসলামী হুকুমাতের একচ্ছত্র শাসন সমগ্র আরবে বহাল হয়ে গেল তখন মুছান্না (রা) ইরানের অগ্নি উপাসকদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে এমন জিহাদ শুরু করলেন যে, কয়েক বছরের মধ্যে কিসরা শাসনকে ভূলুণ্ঠিত করে রেখেছিলেন। দ্বাদশ হিজরীতে মুছান্না (রা) ইরানীদের বিরুদ্ধে যে জিহাদ শুরু করেছিলেন তার কয়েকটি কারণ ছিল। সবচেয়ে বড় কারণ এই ছিল যে, ইরানী শাসকবৃন্দ নিজেদের অধিকৃত অথবা প্রভাবিত আরব এলাকাসমূহের বাসিন্দাদের সঙ্গে খুবই খারাপ ব্যবহার করতো এবং তাদেরকে অপমানিত করা ও শোষণের কোন পথই বাকী রাখতো না। এসব আরবের জীবিকা বেশীর ভাগই নির্ভরশীল ছিল কৃষিকাজের ওপর। যখন তারা নিজেদের গায়ের ঘাম ও রক্ত একাকার করে ফসল উৎপন্ন করতো তখন ইরানী শাসকরা আসতো এবং সম্পূর্ণ ফসলই একত্র করে নিয়ে যেতো এবং বখশিশ হিসেবে আরবদেরকে কয়েকটি মুদ্রা দিয়ে যেতো। এই অপমানমূলক আচরণ এবং জঘন্য ধরনের শোষণের কারণে আরবরা ইরানীদেরকে প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করতো।

দ্বিতীয় কারণ হলো, সে যুগে ইরানী সাম্রাজ্য রাজনৈতিক বিশৃংখলায় নিপতিত ছিল। ইরানী শাসকরা পরস্পরের বিরুদ্ধে এমন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল যে, চার বছরের মধ্যে ইরানের সিংহাসনে নতুন নতুন বাদশাহ একের পর এক আরোহণ করেছিল। আর প্রত্যেক নতুন বাদশাহ নিজের বিরোধীদেরকে নির্দয়ভাবে হত্যা করেছিল।

মুছান্না খুব গভীরভাবে ইরানের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন এবং সঙ্গত কারণেই এই নির্যাতনমূলক শাসনের জোয়াল কাঁধ থেকে দূরে নিক্ষেপ করার সময় এসেছে বলে অনুভব করতেন। ইসলাম তাঁর স্বাধীনতার আবেগকে আরো উদ্বেলিত করে তুললো এবং একটি শক্তিশালী আরব রাষ্ট্র পৃষ্ঠপোষক হওয়ার কারণে তিনি আরো সাহস পেলেন। তিনি যখন দেখলেন যে, অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলার কারণে ইরানীদের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ার আলামত প্রকট হয়ে পড়ছে তখন তরবারী খাপ থেকে বের করলেন এবং নিজের

গোত্রকে সংগঠিত করে আরব ইরাকের ইরান অধিকৃত এলাকাসমূহের ওপর ঝড়ের বেগে আক্রমণের এক অব্যাহত সিলসিলা শুরু করলেন। কতিপয় অন্য আরব গোত্রের যুবকরাও তাঁকে সহযোগিতা করলো এবং ইরানী জমিদার ও জায়গীরদারদের ওপর অনবরত হামলা করে কাহিল করে ফেললো। মুছান্নার(রা) সঙ্গীদের মধ্যে সুয়ায়েদ বিন কুতবাহ আজলীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুছান্না (রা) হিরার দিক থেকে ইরানীদের ওপর হামলা করতেন। অন্যদিকে সুয়ায়েদ করতেন আবাল্লুর দিক থেকে। এমনিভাবে যা কিছু তিনি হাতের কাছে পেতেন তাই উঠিয়ে নিতেন। ইরানীরা যদি মরিয়া হয়ে তাদেরকে ধাওয়া করতো তাহলে তারা দূর মরুভূমিতে চলে যেতেন। ফলে ইরানীদেরকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হতো।

ইরানের বিরুদ্ধে আরবদের এই যুদ্ধ এক ধরনের গেরিলা যুদ্ধ ছিল। এই গেরিলা যুদ্ধের সময় মুছান্না সেই ইরানী শাসকদেরও খুব খবর নিয়েছিলেন যারা বাহরাইনে ইসলামী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জলনে মুরতাদদের সাহায্য করেছিলো। মুছান্না (রা) আস্তে আস্তে নিজের তৎপরতার ধারা পারস্য উপসাগরসহ উত্তর দিকে ফোরাত নদীর তীর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন এবং ইরানী বাহিনী ও তার সহযোগী গোত্রসমূহের গর্বকে খর্ব করেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) মুরতাদদের উৎখাতের পর কেবলমাত্র নিজের ভবিষ্যত কর্মসূচী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন, ঠিক এই সময় তিনি মুছান্নার (রা) এক দীর্ঘ পত্র পেলেন। এই পত্রে তিনি তাঁর অভিযানসমূহের অবস্থা লিখে পাঠিয়েছিলেন এবং রাসূলের খলিফার নিকট তাঁর সাহায্যের জন্য অবিলম্বে সৈন্য প্রেরণের প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। ইরানী সরকার তখন অস্থির চিত্তে কাল কাটাচ্ছিল এবং সেই সময়ই ছিল তাদের ওপর হামলার প্রকৃষ্ট সময়। তাঁর অব্যাহত হামলার কারণে ইরানীরা খুব সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। এ জন্যই তিনি হযরত আবু বকরের (রা) নিকট পত্র লিখেছিলেন। রাজনৈতিক বিশৃংখলার কারণে নিসন্দেহে তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তাহলে কি হবে। তারাতো কয়েক শতাব্দীর পুরাতন এক মহান সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার ছিল। এ জন্য এমনো ছিলো না যে, কয়েক হাজার আরব গেরিলার নিকট তারা আত্মসমর্পণ করে বসবে। সুতরাং তারা আরবদেরকে বাধা দানের জন্য নিজেদেরকে সংগঠিত করতে লাগলো। মুছান্না (রা) যখন এই অবস্থা জানতে পেলেন তখন ইসলামী খিলাফতের খলিফার নিকট সাহায্য প্রার্থনাকে যথোপযুক্ত মনে করলেন। কেননা অসীম উপায়-উপকরণের মালিক একটি সাম্রাজ্যের সঙ্গে অন্য একটি সাম্রাজ্যই যথার্থভাবে মুকাবিলা করতে সক্ষম। গেরিলা বাহিনী কোন এলাকার ওপর

স্থায়ী দখল কায়েম রাখতে পারে না। আবার তারা দূর এলাকা পর্যন্ত রসদ ও যুদ্ধের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু আনা-নেয়ার ব্যবস্থাও করতে পারে না।

মুছান্না (রা) কিসরার ক্ষমতা ও শান-শওকতের কোমর ভেঙ্গে দেয়ার জন্য এত অস্থির ছিলেন যে, পত্র প্রেরণের পর স্বয়ং বিদ্যুৎ বেগে মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছলেন এবং খিলাফতের দরবারে হাজির হয়ে ইরানের রাজনৈতিক বিপ্লব ও নিজের অভিযানের ঘটনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর কথা খুব চিন্তা ও সহমর্মিতার সঙ্গে শ্রবণ করলেন এবং আহলুর রায় সাহাবীদের (রা) সঙ্গে পরামর্শের পর তাঁকে পূর্ণ সহযোগিতার নিশ্চয়তা দিলেন। এ সময় মুছান্না (রা) হযরত আবু বকরের (রা) নিকট তাঁকে ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিয়ম মত নিজের কওমের সরদার নিয়োগ করার আবেদন জানান। হযরত আবু বকর (রা) তাঁর দরখাস্ত মঞ্জুর করলেন এবং তাঁকে বনু শাইবানের ইমারাতের ফরমান প্রদান করলেন। সেই সঙ্গে তাঁকে এই নির্দেশও দিলেন যে, ফিরে গিয়ে বনু শাইবান এবং তার মিত্র গোত্রদেরকে ব্যাপকভাবে সংগঠিত করবে এবং মদীনা থেকে সাহায্য পৌঁছার অপেক্ষা করবে। আল্লামা বালাজুরী (র) বর্ণনা করেছেন, মুছান্না (রা) স্বদেশে ফিরে গিয়ে সর্বপ্রথম নিজের গোত্রের সেসব লোককে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করলেন যারা তখন পর্যন্ত খৃষ্টান অথবা মূর্তিপূজারী ছিলো। তাঁর তাবলীগের ফলে তারা সকলেই মুসলমান হয়ে গেলেন। তারপর তাঁরা বনু শাইবান ও অন্যান্য সহযোগী গোত্রদেরকে সঙ্গে নিয়ে এক নতুন সংকল্পসহ ইরাক রওয়ানা হলো এবং দাজলা ও ফোরাত নদীর ডেল্টা এলাকায় ইরানীদের ওপর চাপ প্রয়োগ শুরু করলো। তা সত্ত্বেও সাহায্য পৌঁছার পূর্বে তাঁরা নিজেদের লোকদেরকে কোন বড় ধরনের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া থেকে নিষেধ করে দিলেন। কেননা এটাই ছিল খলিফাতুর রাসূলের নির্দেশ।

মুছান্নার (রা) চলে যাওয়ার পর হযরত আবু বকর (রা) হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদকে মুখলিস মুসলমানদের সমন্বয়ে গঠিত একটি মজবুত বাহিনীসহ অবিলম্বে মুছান্নার (রা) সাহায্যে পৌঁছার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আরব ইরাকে সুসংগঠিতভাবে অগ্রাভিযান চালানোর নির্দেশ দিলেন। হযরত খালিদ (রা) সবেমাত্র ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ করেছিলেন এবং তাঁর অধীন সৈন্যসংখ্যা ছিল খুব কম। কেননা তার অধিকাংশই ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল। তদুপরি হযরত আবু বকরের(রা) নির্দেশ ছিল যে, তিনি যেন নিজের বাহিনীতে এমন কোন লোককে অন্তর্ভুক্ত না করেন যে একবার মুরতাদ হয়ে দ্বিতীয়বার মুসলমান হয়েছিল। তা সত্ত্বেও হযরত খালিদ (রা) এমন একজন অভিজ্ঞ জেনারেল

ছিলেন যিনি কোন বিরাট সমস্যাকেও থোড়াই তোয়াক্কা করতেন। তিনি শুধু দুই হাজার মুজাহিদ সঙ্গে নিয়ে ইরাকের আজিমুশ্বান অভিযানে রওয়ানা হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে রবিয়া গোত্রের আরো আট হাজার মানুষ তাতে যোগ দিল। আর এমনিভাবে দশ হাজারের দল নিয়ে ইরাকের সীমান্তে পৌঁছে গেল। মুছান্না (রা) সেখানে আট হাজার মুজাহিদসহ তাঁর অপেক্ষা করছিলেন। এসব সৈন্যের নেতৃত্ব হযরত খালিদ (রা) গ্রহণ করলেন এবং মুছান্না (রা) হলেন তাঁর দক্ষিণ হস্ত। তিনি ইরানীদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য এবং ইরাকের অলি গলি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। এ জন্য হযরত খালিদ (রা) কোন পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে তাঁর নিকট অবশ্যই পরামর্শ গ্রহণ করতেন। ইরাকের ওপর হামলার পূর্বে হযরত খালিদ (রা) সেখানকার ইরানী গভর্ণর হুরমুজকে একটি পত্র দিলেন। পত্রে তিনি তাঁকে হয় ইসলাম গ্রহণ অথবা জিযিয়া প্রদান করে মুসলমানদের আশ্রয়ে আসার আহবান জানালেন। এই দুইটির কোনটিই যদি গ্রহণীয় না হয় তাহলে সে-ই অপরাধী হবে বলে জানিয়ে দিলেন। তাছাড়া তিনি পত্রে আরও লিখলেন যে, তিনি এমন এক যোদ্ধা জাতি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন, যারা মৃত্যুকে এমন ভালবাসে যেমন তারা জীবিত থাকাকে ভালবেসে থাকে। হুরমুজ এই পত্র পেয়ে সকল অবস্থা কিসরাকে লিখে পাঠালেন এবং নিজে সৈন্য প্রেরণে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিছুদিনের মধ্যেই সে এক বিরাট বাহিনী তৈরী করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্য রওয়ানা হয়ে গেল।

এদিকে ইরানী দরবার থেকেও সে নির্দেশ প্রাপ্ত হলো। নির্দেশে বলা হলো যে, হামলাকারীরা যেন কোন অবস্থাতেই অগ্রসর হতে না পারে। ইরানীদের উৎসাহ উদ্দীপনার অবস্থাটা এমন ছিল যে, তাদের অনেক দল পরস্পর লোহার শিকলে আবদ্ধ করে রেখেছিল। যাতে কোন ব্যক্তি যুদ্ধের ময়দান থেকে পালাতে না পারে। কাজেমা শহরের নিকটে হাফির নামক স্থানে উভয় বাহিনী পরস্পরের সামনাসামনি হলো। ইরানীরা মুসলমানদের ওপর এমন প্রচণ্ড গতিতে হামলা করে বসলো যে, যদি খালিদ (রা), মুছান্না (রা) এবং কা'কা (রা) বিন আমরুত তামিমী নিজেদের বাহিনীকে শামলে না নিতেন তাহলে সম্ভবত তাদের ব্যূহসমূহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত। মুসলমানরা শামলে নিয়ে এমন প্রচণ্ড জবাবী হামলা চালালো যে, শত্রুর অগ্রসরমান কদম থেমে গেল। অতপর সামনা সামনি ও দলে দলে যুদ্ধ শুরু হলো। যুদ্ধের সময় ময়দানে হযরত খালিদের (রা) হাতে হুরমুজ মারা গেল। তার হত্যার খবরে ইরানীরা হতোদ্যম হওয়ার পরিবর্তে আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলো এবং তারা পাগলের মত মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। দীর্ঘক্ষণ যাবত ঘোরতর যুদ্ধ হতে লাগলো। কিন্তু সেনাপতির অনুপস্থিতির কারণে অবশেষে ইরানীদের

মধ্যে পরাজয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগলো। এমনকি তাদের ডান ও বাম বাহু বা দিক সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল। অবশিষ্ট সৈন্য ব্যাকুল হয়ে ভেগে গেল।

এই যুদ্ধে মুসলমানরা প্রচুর গনিমতের মাল লাভ করলো। ইরানীরা যেসব শিকল দিয়ে নিজেদেরকে শৃংখলিত করে রেখেছিল তা যুদ্ধের ময়দান থেকে একত্রিত করা হলো। এই শিকলের ওজন হয়েছিল প্রায় সাড়ে সাত মণ। এই কারণে এই যুদ্ধকে "জাতুস সালাসিল"ও বলা হয়ে থাকে।

গনিমতের মালের যে অংশ মদীনা মুনাওয়ারা প্রেরণ করা হয়েছিল তার মধ্যে একটি হাতিও ছিল। হযরত আবু বকরের (রা) নির্দেশে তা শহরে ঘোরানো হলো। মহিলারা তা দেখে বিস্ময়ের সঙ্গে বলতে লাগলো, "আমাদের সামনে যা রয়েছে তাকি আল্লাহর সৃষ্টি?" ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখানোর পর হাতিটিকে ইরাকে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, সালাসিল যুদ্ধের পর হযরত খালিদ(রা) মুছান্নাকে (রা) পলায়নরত ইরানীদের পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দিলেন। সুতরাং তিনি এক মজবুত সেনাদলসহ পলায়নপর ইরানীদের পিছু নিলেন। পথিমধ্যে তিনি দু'টি দুর্গ অতিক্রম করছিলেন। এই দুর্গের একটির মালিকানা ছিল জনৈকা ইরানী শাহজাদী এবং তার স্বামীর। মুছান্না (রা) দুর্গ দু'টি জয় করে নিলেন এবং পুনরায় পরাজিত সৈন্যদের ধাওয়া করা শুরু করলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, মাদায়েন পৌঁছার পূর্বেই পলায়নপর সৈন্যদেরকে শেষ করে ফেলা যাবে। তিনি রাস্তাতেই ছিলেন এমন সময় মাদায়েন থেকে ইরানীদের এক বিরাট সেনাবাহিনী আগমনের খবর পেলেন। শাহানশাহ ইরদে শির এই সৈন্য হুরমুজের পরাজয়ের খবর শুনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্য প্রেরণ করেছিল। তার নেতৃত্ব দিচ্ছিল প্রখ্যাত ইরানী আমীর কারিন বিন কারইয়ানিস। রাস্তায় সালাসিল যুদ্ধের পলায়নরত ইরানীরাও তাদের সঙ্গে শামিল হয়ে গেল। কিছু দূর অগ্রসর হয়ে সেই বাহিনী মাযার নামক স্থানে তাঁবু ফেললো। হযরত মুছান্নার (রা) সৈন্যদলের এই নতুন সৈন্যের সংখ্যা সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। কিন্তু তাঁরা ছিলেন বিরাট বীর মানুষ। সেখান থেকে পিছপা হওয়াটাকে তারা কোনক্রমেই সহ্য করতে পারলো না এবং ইরানী বাহিনীর নিকটেই একটি উপযুক্ত স্থানে তাঁবু ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে এক দ্রুতগতিসম্পন্ন দূত প্রেরণ করে হযরত খালিদকে (রা) ইরানীদের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করালেন।

হযরত খালিদ (রা) মুছান্নার (রা) পয়গাম বা পত্র পেলেন। পত্র পেয়ে তিনি মুহূর্তকালও বিলম্ব করলেন না এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর সাহায্যের জন্য রওয়ানা দিলেন। ঠিক সেই সময়ই কারিন মুছান্নার (রা) স্বল্প সংখ্যক সৈন্যের ওপর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। খালিদ (রা) মাযারে পৌঁছে তার পরিকল্পনা বানচাল করে দিলেন। যুদ্ধ শুরু হলে ইরানীরা এমনভাবে গর্জন করতে করতে অগ্রসর হলো যে, মাটি কেঁপে উঠলো। তাদের অন্তর ছিল প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহায় ভরপুর এবং মুসলমানদেরকে নিজেদের ভূখণ্ড থেকে বহিষ্কারের প্রশ্নে ছিল কৃতসংকল্প। মুছান্না (রা) স্ব সৈন্যের সম্মুখ সারির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তিনি মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললেন, হে আরব ভাইয়েরা! এসব বুযদিলের তর্জন গর্জনের পরোয়া করো না। আমি বহুবার তাদেরকে পরীক্ষা করেছি। নিজেদের বর্শা সোজা কর এবং তাদের কলিজা ছিদ্র করে ফেল। একথা বলেই তারা ইরানীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তাদের কয়েকটি ব্যূহ তছনছ করে ফেললো। ইরানীরা যথাসাধ্য বীরত্ব প্রদর্শন করলো এবং সালাসিল যুদ্ধের চেয়েও বেশী অটলতা দেখালো। কিন্তু খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের তরবারী তাদেরকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়লো। ত্রিশ হাজার ইরানী মারা গেল। নিহতদের মধ্যে কারেন এবং আরো অনেক ইরানী সরদারও শামিল ছিলো।

মাযারের লড়াইয়ের পর দুলজা, উলাইয়্যিস, ইয়াওমুল মাকার, হিরাহ, আইনুত তামার, দাওমা, আম্বার, হাছিদ, মাদিহ, ছানা এবং ফারাজ-এর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

ইরাক যেহেতু ইরানী শাসকদের নির্ধারিত আবাসস্থল বা বিশ্রামাগার ছিল এবং কিসরার রাজধানী মাদায়েন সেই প্রদেশেই (বাগদাদের নিকট) অবস্থিত ছিল। সে জন্য ইরানীরা প্রতিটি যুদ্ধেই জীবন বাজী রেখে মুসলমানদের মুকাবিলা করেছিল। কিন্তু খালিদ সাইফুল্লাহ (রা), মুছান্না (রা) বিন হারিছা, জারার (রা) বিন আযদার, কা'কা (রা) বিন আমর অন্যান্য বীরদের সহযোগিতায় প্রতিটি যুদ্ধেই শত্রুকে শিক্ষণীয় পরাজয় স্বীকারে বাধ্য করেছিলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই মাদায়েন পর্যন্ত ময়দান সাফ করে দেন। মুছান্নার (রা) নির্ভীকতা এবং বীরত্বের অবস্থাটা এমন ছিল যে, তিনি ইরানীদের পিছু ধাওয়া করে মাদায়েনের ইরানী পরিখা পর্যন্ত গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু হযরত খালিদ (রা) তাঁকে আরো অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত করেন। কেননা যুদ্ধের ময়দান বিস্তৃতরূপ ধারণ করেছিল। সে সময় মুসলমানরা সিরিয়ার ওপরও হামলা করেছিলেন এবং কয়েকটি যুদ্ধে সিরীয়দেরকে ভয়ানকভাবে পরাজিত করে রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে

হতবাক করে দিয়েছিলেন। হিরাক্লিয়াস প্রথমত মনে করেছিল যে, তার অভিজ্ঞ সৈন্যবাহিনী সংখ্যাধিক্য ও উচ্চমানের যুদ্ধ সরঞ্জামের শক্তির বলে বলীয়ান হয়ে কিছুদিনের মধ্যেই মুসলমানদেরকে পরাজিত হতে বাধ্য করবে। কিন্তু পরিস্থিতি যখন তার বিপরীত হলো তখন সে কয়েক লাখ যোদ্ধা রোমকদেরকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে সিরিয়ায় মুসলমানদের মুকাবিলায় এনে দাঁড় করালো। পরিস্থিতিটা ছিল খুবই ভয়াবহ। কেননা মুসলমান সংখ্যা এবং সরঞ্জামের দিক থেকে রোমকদের দশ ভাগের এক ভাগও ছিল না। রোমকদের এই যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর মদীনা পৌঁছলো। এ সময় হযরত আবু বকর (রা) হযরত খালিদকে (রা) ইরাকের ব্যাপারটি মুছান্নার (রা) ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজের বাহিনীসহ সিরিয়া পৌঁছার নির্দেশ দিলেন। এই নির্দেশ পৌঁছতেই হযরত খালিদ ইরাকের ইমারাত হযরত মুছান্নার (রা) ওপর ন্যস্ত করলেন এবং দ্রুত সিরিয়া রওয়ানা হয়ে গেলেন।

হযরত খালিদ (রা) সিরিয়া গমনের পর হযরত মুছান্নার (রা) নিকট খুব কম সংখ্যক সৈন্যই অবশিষ্ট ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি হিরাতে অবস্থানস্থল বানিয়ে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিজিত এলাকাসমূহের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করলেন। সেই যুগেই ইরানে হঠাৎ করে আরো একটি রাজনৈতিক বিপ্লব সমুপস্থিত হলো। ইরানী আমিররা মুসলমানদের বর্ধিত শক্তিতে ভীত হয়ে সাময়িকভাবে নিজেদের মধ্যেকার পারস্পরিক বিবাদ মিটিয়ে ফেললো এবং ঐকমত্যের ভিত্তিতে শাহরিরান (অথবা শাহরি বারাজ) বিন ইরদে শিরকে নিজেদের বাদশাহ হিসেবে মেনে নিল। নির্বিশেষে ইরানের সকল ধরনের জনগণ তার আনুগত্যের প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হলো। শাহরিরান কিছুদিনের জন্য দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়নে কাজ করলো। অতপর মুসলমানদের প্রতি মনোনিবেশ করলো। সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে সে খবর পেল যে, আরবদের সেনাপতি অর্ধেক সৈন্য নিয়ে সিরিয়া চলে গেছে এবং বর্তমানে ইরাকে অবস্থানরত অবশিষ্ট সৈন্যের নেতৃত্ব দিচ্ছে একজন বেদুঈন সরদার। শাহরিরানের নিকট মুসলমানদেরকে ইরাক থেকে বহিষ্কারের এইটাই ছিল সর্বোত্তম সুযোগ। এ জন্য সে দশ হাজার যোদ্ধা সমন্বয়ে গঠিত একটি বাহিনীকে প্রত্যেক ধরনের যুদ্ধ সরঞ্জামে সজ্জিত হয়ে মুসলমানদের ওপর হামলার নির্দেশ দিল। সঙ্গে সঙ্গে মুছান্নাকে (রা) বিদ্রুপ ও অবজ্ঞামূলক একটি পত্র প্রেরণ করলো। তাতে লিখা ছিল ঃ

"আমি তোমাদের মুকাবিলার জন্য একটি বাহিনী পাঠিয়েছি। তাদের অধিকাংশই মুরগী ও শুয়োর চরিয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও এই বাহিনী তোমাদের আচার কিভাবে বের করে তা দেখতে পাবে।"

মুছান্না (রা) এই পত্র পেতেই হিরা থেকে রওয়ানা হয়ে বাবেলের পরিত্যক্ত স্থানে গিয়ে তাঁবু ফেললেন এবং শাহরিরানকে জবাবে জানালেন ঃ

"তুমি বিদ্রোহী হও অথবা মিথ্যাবাদী। উভয় অবস্থাই তোমার জন্য অমঙ্গলের। আল্লাহর নিকট বিদ্রোহ ও মিথ্যাচার উভয় বস্তুই শাস্তিযোগ্য। জানা যায় যে, মুরগী ও শুয়োরের রাখাল ছাড়া অন্যান্য মানুষও আমাদের মুকাবিলায় জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করে থাকে এবং তুমি এ ধরনের মানুষেরই সাহায্য গ্রহণে বাধ্য। আল্লাহর শোকর যে, তিনি তোমার ধোঁকাবাজীর কৌশল তোমার ওপরই ফিরিয়ে দিয়েছেন।"

ইরানী বাহিনী মাদায়েন থেকে পঞ্চাশ মাইলের দূরত্ব অতিক্রম করে বাবেলের নির্জনভূমিতে উপস্থিত হলো। এ সময় মুছান্না (রা) অগ্রসর হয়ে তাদের রাস্তা বন্ধ করে দিল। তাঁর দুই জানবাজ ভাই মাসউদ (রা) এবং মা'নাও (রা) সঙ্গে ছিলেন। একজন বাঁদিক আগলে রেখেছিলেন। অন্যজন ছিলেন ডানদিকে। ইরানী বাহিনীতে একটি ভীতিজনক যোদ্ধা হাতিও ছিল। হাতিটি চিৎকার করতে করতে এবং শুঁড় উচিয়ে ইসলামী বাহিনীর দিকে অগ্রসর হলো। তখন মুছান্না (রা) নিজের ঘোড়ার উপর থেকে লাফিয়ে পড়লেন। আরো কতিপয় জানবাজ তাকে অনুসরণ করলেন এবং তাঁরা তরবারী দিয়ে হাতির ওপর একযোগে হামলা করে বসলো। হাতির শুঁড় কেটে গেল এবং খুব তাড়াতাড়ি ধরাশায়ী হয়ে পড়লো। তারপর মুসলমানরা ইরানীদের ওপর নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনাসহ এমন প্রচণ্ড হামলা চালালো যে, তাদের আর প্রতিরোধ ক্ষমতা রইলো না এবং নিজেদের হাজার হাজার মানুষ নিহত অবস্থায় ফেলে রেখে হতবুদ্ধি অবস্থায় পালিয়ে গেল। এই পরাজয়ের খবর শাহরিরানের ওপর বিদ্যুতের মত আপতিত হলো এবং সে প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল।

শাহরিরানের মৃত্যুর পর ইরান পুনরায় বিপ্লবের আবর্তে নিক্ষিপ্ত হলো। প্রথমে দুখতে যিনান সিংহাসনে আরোহণ করলো। কিন্তু খুব শীঘ্র তাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেয়া হলো। তারপর একের পর এক শাপুর ও আযর মিদাখত ইরানের রাজমুকুট নিজের মাথায় রাখলো। কিন্তু তাদের ভাগ্যও প্রসন্ন ছিল না। অবশেষে পুরান দখত ইরানের সিংহাসনের মালিক হলো। সে ছিল একজন বুদ্ধিমতী মহিলা। সে ইরানের নামকরা বাহাদুর রোস্তম বিন ফারখ যাদকে নিজের উজির এবং সেনাপতি নিয়োগ এবং সকল রাষ্ট্রীয় ব্যাপার তার হাতে ন্যস্ত করলো। রোস্তম ক্ষমতায় এসেই মুসলমানদেরকে বাধা দানের জন্য একটি বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করলো। মুছান্না (রা) সে সময় হিরাতে

অবস্থান করছিলেন। তিনি ইরানীদের যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর পেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ হযরত আবু বকরকে (রা) চিঠি লিখলেন যে, তাঁর নিকট সামান্য সৈন্য রয়েছে এবং বিরাট ইরানী বাহিনীর মুকাবিলা করতে হলে আরো বেশী সৈন্যের প্রয়োজন। এ জন্য আপনি অবিলম্বে সাহায্য প্রেরণ করুন এবং আমাকে আমার বাহিনীতে সেসব কবিলাকেও অন্তর্ভুক্তির অনমুতি দিন যারা ধর্মদ্রোহিতা থেকে তওবা করে পুনরায় ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে। কয়েক সপ্তাহ যাবত যখন এই পত্রের জবাব এলো না তখন মুছান্না (রা) বাশির (রা) বিন খাসাসিয়াকে নিজের স্থালাভিষিক্ত করে স্বয়ং মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলেন।

হযরত মুছান্না (রা) যখন মদীনা পৌঁছলেন তখন খলিফাতুর রাসূল হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খুবই অসুস্থ ছিলেন এবং জীবনের শেষ মনযিল অতিক্রম করছিলেন। এই অবস্থায় তিনি মুছান্নার (রা) নিকট থেকে ইরাকের অবস্থা শুনলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হযরত ওমরকে (রা) ডেকে পাঠালেন। ইতিমধ্যেই তিনি তাঁকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেছিলেন। তিনি হাজির হলে ওসিয়ত করলেন ঃ

"হে ওমর! আমি জীবন সায়াহ্নে উপনীত হয়েছি। আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাকবো এমন আশাও নেই। আমি যা বলি তা মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং তার ওপর আমল করো। দিনে যদি আমার জীবন বায়ু নির্বাপিত হয় তাহলে সন্ধ্যার পূর্বে আর যদি রাতে হয় তাহলে সকালের আগেই মুসলমানদেরকে উৎসাহ দিয়ে মুছান্নাকে (রা) সাহায্যের জন্য উদ্বুদ্ধ করবে। কোন মুসিবত তোমাকে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ ও দ্বীনের কাজ থেকে যেন গাফিল করে না দেয়। তুমি জানো যে, রাসূলের (সা) ওফাতের পর আমি কোন কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে সেটা ছিল একটা বিরাট পরীক্ষা। আমি যদি সে সময় দুর্বলতা প্রদর্শন করতাম তাহলে দ্বীনে হানিফীর সমাপ্তি ঘটতো। আল্লাহ যদি মুসলমানদেরকে সিরিয়ায় বিজয় দান করেন তাহলে খালিদের (রা) সেনাবাহিনীকে পুনরায় ইরাক পাঠিয়ে দেবে। কেননা অত্র এলাকার অভিযানসমূহে সে-ই অন্যদের চেয়ে বেশী যোগ্য।"

এই ওসিয়তের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) পরপারের ডাকে সাড়া দিলেন এবং হযরত ওমর ফারুক (রা) খিলাফতের আসেন সমাসীন হলেন। সিদ্দীকে আকবরের (রা) ওসিয়ত অনুযায়ী তিনি সর্বপ্রথম মুসলমানদেরকে একত্রিত করলেন এবং জিহাদের জন্য তাদেরকে ইরাক গমনে উদ্বুদ্ধ করলেন। এটা ছিল অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ। এ জন্য তারা পরস্পরের প্রতি চাওয়া চাওয়ি করে চুপ

মেরে যেতেন। তিনদিন পর্যন্ত একই অবস্থা চললো। চতুর্থ দিন মুছান্না (রা) সর্বসাধারণ্যে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বললেন ঃ

"হে মুসলমানেরা! জানি না তোমরা চুপ মেরে আছো কেন? সম্ভবত তোমরা ইরানকে ভীতিপ্রদ মনে করে থাকবে। আল্লাহর কসম! আমরা অগ্নি উপাসকদেরকে পরীক্ষা করে দেখেছি। তারা যুদ্ধের ময়দানের মানুষ নয়। আমরা তাদের একটি বিরাট এলাকা কবজা করে নিয়েছি এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদের বীরত্বের প্রমাণ রেখেছি। ইনশাআল্লাহ তারা আমাদের মুকাবিলায় টিকতে পারবে না।"

মুছান্নার (রা) বক্তৃতা শেষ হলে বনু ছাকিফ কবিলার এক মুজাহিদ আবু ওবায়েদ (র) বিন মাসউদ উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "আমীরুল মু'মিনীন! এ কাজের জন্য আমি উপস্থিত।" হযরত আবু ওবায়েদের (র) বাহাদুরী সকল মুসলমানকে উত্তেজিত করে তুললো। হযরত সালিত (রা) বিন কায়েস এবং হযরত সায়াদ (রা) বিন ওবায়েদ আনসারীও "আমরাও এ কাজের জন্য হাজির" বলে উঠে দাঁড়ালেন এবং চারদিক থেকে ইরাকের জিহাদে গমনে আকাংখীদের ভীড় সৃষ্টি হয়ে গেল।

হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত মুছান্নাকে (রা) সাহায্য দানের জন্য এক হাজার যুবক নির্বাচন করলেন এবং হযরত আবু ওবায়েদকে (র) তাদের নেতা নিয়োগ করলেন। সাহাবী না হওয়া সত্ত্বেও তিনি জিহাদের দাওয়াত কবুলে অগ্রগামী হয়েছিলেন। এভাবে তিনি নিজেকে নেতৃত্বের যোগ্য করে তুলেছিলেন। তারপর হযরত ওমর (রা) মুছান্নাকে (রা) এই বলে হেদায়াত করলেন ঃ

"কাল বিলম্ব না করে তুমি ইরাক রওয়ানা হয়ে যাও। সাহায্যকারী বাহিনী প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের পর খুব শীঘ্র তোমাদের নিকট পৌঁছে যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই বাহিনী না পৌছবে ততক্ষণ যুদ্ধ শুরু করবে না।"

হযরত মুছান্না (রা) আমীরুল মু'মিনীনের নির্দেশ অনুযায়ী তৎক্ষণাৎ ইরাক রওয়ানা হয়ে গেলেন।

মুছান্না (রা) হিরাহ পৌছলেন। এ সময় সমগ্র ইরান মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল। রোস্তম ইরানের সামরিক শক্তিকে নতুনভাবে সুসংগঠিত করেছিল এবং সে আরব ইরাকের সকল সীমান্ত জেলায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। মুছান্না (রা) ছিলেন একজন দূরদর্শী ও তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন জেনারেল। তিনি আঁচ করতে পারলেন যে,

এই অবস্থায় তাঁর হিরাহ অবস্থানের ফলে মুসলমানদের সমূহ বিপদ হতে পারে। বস্তুত তিনি নিজের বাহিনীকে হিরাহ থেকে সরিয়ে খাফ্ফান নিয়ে এলেন। স্থানটি ছিল এমন যে, ইরানীরা সেখানে হামলা করতে সক্ষম ছিল না। এক মাস পর আবু ওবায়েদ ছাকাফীও (র) খাফ্ফানে এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। এ সময় আবু ওবায়েদের (র) বাহিনীতে ছিল কয়েক হাজার যুবক। কেননা রাস্তায় বহু আরব গোত্র জিহাদে অংশ গ্রহণের মর্যাদা লাভের জন্য তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেক এমন যোদ্ধাও ছিলেন যাঁরা ধর্মদ্রোহিতার ফিতনায় জড়িয়ে পড়ার পর তওবা করেছিলেন। হযরত ওমর(রা) তাদেরকে মুছান্নার (রা) পরামর্শের ভিত্তিতে ইসলামী বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে সংঘটিত ঘটনাবলী প্রমাণ করেছিল যে, হযরত মুছান্নার (রা) পরামর্শ সম্পূর্ণ ঠিক ছিল। কেননা ইরান ও সিরিয়ার যুদ্ধসমূহে তারা নজিরবিহীন বীরত্ব প্রদর্শন করেছিল।

রোস্তম ইতিমধ্যে দু'টি বিরাট বাহিনী জাবান ও রাজপুত নারসীর নেতৃত্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিল। জাবান হিরাহ ও কাদেসিয়ার মধ্যবর্তী নিমারক নামক স্থানে তাঁবু ফেললো। আবু ওবায়েদ (র) খাফ্ফান থেকে বের হয়ে ইরানী বাহিনীর ওপর হামলা করে বসলেন এবং এক রক্তাক্ত যুদ্ধের পর তাদেরকে পরাজিত করলেন। মাতার (রা) বিন ফাজ্জা নামক একজন মুসলমান সৈন্য জাবানকে গ্রেফতার করলো। তিনি জাবানকে চিনতেন না। অনুনয় বিনয়ের কারণে জাবানকে তিনি নিরাপত্তা দিয়ে দিলেন। পরে মুসলমানরা জাবানকে চিনে ফেললো এবং তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করতে চাইলো। আবু ওবায়েদ (র) ঘটনা জানতে পেরে জাবানকে মুক্তি দানের নির্দেশ দিলেন। কেননা একজন মুসলমান তাকে নিরাপত্তা দিয়েছে। অন্য দিকে নারসী ৩০ হাজার সৈন্যসহ কাসকারে তাঁবু ফেলে রেখেছিল। জাবানের বাঁচা খোঁচা অবশিষ্ট সৈন্যও তার বাহিনীতে গিয়ে শামিল হয়েছিল। এদিকে রোস্তম যখন জাবানের পরাজয়ের খবর পেল তখন নারসীর সাহায্যের জন্য একটি সহযোগী বাহিনী জালিইয়ানুস নামের এক ইরানী নেতার নেতৃত্বে কাসকার প্রেরণ করলো। নারসী এই সাহায্যকারী বাহিনীর আগমনের অপেক্ষায় ছিল। ঠিক এমন সময় আবু ওবায়েদ (র) ফোরাত নদী পার হয়ে তার মাথার ওপর গিয়ে উপস্থিত হলেন। কাসকারের নিকট সাকাতিয়া নামক স্থানে উভয় বাহিনীর মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধ সংঘটিত হলো। ইরানীরা খুব উল্লম্ফন দেখালো। কিন্তু মুসলমানদের দ্রুতগতিসম্পন্ন হামলার সামনে কোনমতেই তারা তিষ্ঠাতে পারলো না এবং খুব শীঘ্র যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে গেল। অতপর মুসলমানরা জালিইয়ানুসের দিকে অগ্রসর হলো। তখন সে বারে সামা (অথবা

বাকেশিয়া) নামক স্থানে অবস্থান করছিল। এক হামলাতেই তারা তাকেও পালিয়ে যেতে বাধ্য করলো এবং সে মাদায়েন পৌঁছে কোনমতো নিজেকে বাঁচালো। তারপর আবু ওবায়েদ (র) মুছান্না (রা) ও অন্যান্য সামরিক অফিসারকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে আরব ইরাকের সর্বত্র ছড়িয়ে দিলেন। তাঁরা কিছুদিনের মধ্যেই অবশিষ্ট সকল বিদ্রোহী গোত্রকে পদানত করে ফেললেন এবং ইরাকীদের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব মজবুত করলেন।

নারসী ও জালিইয়ানুসের পরাজয়ের খবর শুনে রোস্তম খুবই অসন্তুষ্ট হলো। সে নিজের এক বিশ্বস্ত্র এবং প্রখ্যাত সেনা অফিসার জুলহাজিব বাহমন জাদেবিয়াকে বিরাট সেনা বাহিনী সমেত এমন শান শওকতের সঙ্গে রওয়ানা করালো যে, ইরানের জাতীয় পতাকা "দারফাশে কাবিয়ানী" তাদের মাথার ওপর পত পত করে উড়ছিল এবং পাহাড় সদৃশ্য অনেক যুদ্ধের হাতি সেই বাহিনীর আগে আগে চলছিল। এসব হাতির পদধ্বনিতে মাটি কেঁপে কেঁপে উঠছিল। সৈন্য বাহিনীটি ফোরাত নদীর তীরবর্তী কাসসুন নাতিফ নামক স্থানে তাবু ফেললো। এদিকে আবু ওবায়েদ (র) কাসকার থেকে রওয়ানা হয়ে ফোরাতের অপর তীরে অবস্থিত মারোহা নামক স্থানে অবস্থান নিয়েছিলেন। বাহমন জাদেবিয়া তাঁকে এক পয়গাম প্রেরণ করলো। পয়গামে তিনিই নদী পার হয়ে আসবেন, না সে পার হয়ে যাবে তা জানতে চাইলো। মুছান্না (রা), সালিত (রা) এবং অন্যান্য অভিজ্ঞ মুসলমান আবু ওবায়েদকে (র) ইরানী বাহিনীকে এ পারে আসার আহবান জানানোর পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তার ধারণায় অপর তীরে গিয়ে যুদ্ধ করাটাই সমীচিন ছিল। সুতরাং তিনি বীরত্বের আবেগে নিজের বাহিনী নিয়ে নদীর অপর তীরে চলে গেলেন। আবু ওবায়েদের (র) এই কর্মপদ্ধতির সঙ্গে মুছান্নার (রা) প্রচণ্ড মতবিরোধ ছিল। কিন্তু আমীরের আনুগত্যের বিরোধিতা করা তার রীতি ছিল না। নদীর অপর তীরে গিয়ে যুদ্ধ করলে মুসলমানদের মারাত্মক ক্ষতির আশংকা রয়েছে শুধু এ কথাটুকুন বলেই তিনি চুপ মেরে গেলেন। তবে, তিনি বললেন যে, তাঁরা আমীরের অনুগামী হবেন।

দুর্ভাগ্যবশত ফোরাত নদীর অপর তীর ও ইরানী বাহিনীর মধ্যেকার ময়দান খুবই অপ্রশস্ত ছিল। এ জন্য মুসলমানরা নিজেদের ব্যূহ সঠিকভাবে সাজাতে পারলেন না। যুদ্ধ শুরু হলে ইরানীরা প্রথমে নিজেদের হাতিকে আগে প্রেরণ করলো। মুসলমানদের ঘোড়া তাদের ভয়াবহ আকৃতি দেখে পেছনে হটতে শুরু করলো। আবু ওবায়েদ (র) এবং আরো কয়েকজন জানবাজ যোদ্ধা নিজেদের

ঘোড়ার ওপর থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়লো এবং তরবারী উঁচিয়ে হাতিদের ওপর হামলা করে বসলেন। বন্য হাতিরা বহু মুসলমানকে নিজের পায়ের তলায় পিষে ফেললো। আবু ওবায়েদ (র) অগ্রসর হয়ে তাদের শূঁড়ের ওপর তরবারী চালাতে এবং সঙ্গীদেরকে সাহস যোগাতে লাগলেন। তাঁর সীমাহীন বাহাদুরী দেখে অন্য মুসলমানরাও পাগলপ্রায় হাতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ঠিক এমনি সময় এক ভয়ংকর সাদা হাতি আবু ওবায়েদের (র) ওপর হামলা করে বসলো। তিনি নিজের তরবারী দিয়ে এক কোপে তার শূড় মাথা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। কিন্তু হাতিটিও অগ্রসর হয়ে তাকে পায়ের তলায় পিষে ফেললো। আবু ওবায়েদের (র) শাহাদাতের পর তাঁর ভাই হাকাম (র) বিন মাসউদ ছাকাফী নিজের হাতে ঝাণ্ডা তুলে ধরলেন। অন্য একটি হাতি তাকেও শহীদ করে ফেললো। মোটকথা, ছাকিফ গোত্রের ছ'জন বাহাদুর এমনিভাবে ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন।

সবশেষে মুছান্না (রা) বিন হারিছা ঝাণ্ডা হাতে তুলে নিলেন এবং লোকদের ভগ্ন সাহস পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু হাতিদের ভয়াবহ হামলায় মুসলমানদের ব্যূহ তছনছ হয়ে গিয়েছিল এবং তারা হতদন্ত হয়ে পিছু হটছিল। আবদুল্লাহ বিন মুরছাদ ছাকাফী নামক একজন মুজাহিদ লজ্জিত হয়ে নদীর পুল ভেঙ্গে দিলেন এবং মুসলমানদেরকে উচ্চৈস্বরে আহবান জানিয়ে বললেন ঃ

"হে মানুষেরা! আবু ওবায়েদের পদাংক অনুসরণ করে জীবন দাও অথবা শত্রুর ওপর বিজয় হাসিল কর।"

আবদুল্লার এই আবেগপূর্ণ কাজে মুসলমানদেরকে আরো ক্ষতি স্বীকার করতে হয় এবং তাদের একটা বিরাট সংখ্যক ব্যাকুল চিত্তে পিছু হটতে গিয়ে পানিতে ডুবে গেল। এ সত্ত্বেও মুছান্না (রা) অন্য জানবাজদেরকে সঙ্গে নিয়ে ইরানীদের সামনে প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি মুসলমানদেরকে দ্বিতীয়বার পুল নির্মাণের নির্দেশ দিলেন এবং পলায়নকারীদের প্রতি আহবান জানিয়ে বললেন ঃ

"হে মানুষেরা! ঘাবড়ে যেয়ো না। আমি হলাম মুছান্না (রা)। দুশমন আমার লাশ অতিক্রম করেই তোমাদের দিকে আসতে পারে। ইতমিনারের সঙ্গে পুল অতিক্রম কর।"

ইত্যবসরে মুছান্নার (রা) ওপর জনৈক ইরানী বর্শা দিয়ে হামলা করলো। এর আঘাত গিয়ে লাগলো তাঁর যিরাহর ওপর এবং তার একটি অংশ তাঁর দেহে বিদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু তাতে তাঁর কদম এক মুহূর্তের জন্যও কম্পিত

হলো না এবং তিনি পুল পুনঃনির্মিত না হওয়া পর্যন্ত ময়দানে অটল রইলেন। এরপর তিনি অবশিষ্ট সৈন্যের সঙ্গে অত্যন্ত সুশৃংখল হয়ে নদীর অপর পারে নামলেন। এই দুঃখজনক ঘটনা ইতিহাসে জাসারের সংঘর্ষ অথবা পুলের যুদ্ধ নামে খ্যাত। তাতে মুসলমানদেরকে জীবনের প্রচণ্ড ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। তাদের ৯ হাজারের মধ্যে ৬ হাজার মানুষই শহীদ হয়ে যান। চরম অবস্থায় যদি মুছান্না (রা) নজীরবিহীন বীরত্ব ও অটলতার সাথে কাজ না করতেন তাহলে কোন মানুষ জীবিত থাকতো কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। যারা এই যুদ্ধে পালিয়ে যাওয়ার পথ অবলম্বন করেছিলো তারা দীর্ঘদিন যাবত মানুষের সামনে মুখ দেখাতো না। বাহমন জাদেবিয়া যদিও এই যুদ্ধে শানদার বিজয় লাভ করেছিল তবুও মুসলমানদের পিছু ধাওয়া করার ব্যাপারে তার কোন সাহসই ছিল না এবং সে নিজের বাহিনীসহ সেখান থেকেই মাদায়েন চলে যায়।

জাসারের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ে এবং আবু ওবায়েদের (র) শাহাদাতের খবর পেয়ে ফারুকে আজম (রা) খুব দুঃখিত হলেন। তিনি সমগ্র আরবে খতিব ও নকীব প্রেরণ করলেন। এসব খতিব ও নকীববৃন্দ লোকদেরকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করতেন এবং জাসারের যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আরবদের জাতীয় আবেগ উস্কে দিতেন। কিছুদিনের মধ্যেই সমগ্র আরবে যেন আগুন লেগে গেল। চারদিক থেকে কাতার বন্দী হয়ে জিহাদের আবেগে পূর্ণ আরব গোত্রসমূহ মদীনা আগমন শুরু করলো। এমনকি বনু নমর ও বনু তাগালবের খৃষ্টান সরদারও স্ব স্ব গোত্রের হাজার হাজার যোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে ফারুকে আজমের (রা) খিদমতে হাজির হলেন। তাদের নিকট এটা ছিল আরব ও আজমের জাতীয় যুদ্ধ। এই যুদ্ধে কোন আরবের অনুপস্থিত থাকার অর্থই ছিল ভীরুতা ও কাপুরুষতার নামান্তর। ঘটনাক্রমে এ সময় বাজিলা গোত্রের প্রখ্যাত সরদার হযরত জারির (রা) বিন আবদুল্লাহও স্ব গোত্রসহ মদীনা মুনাওয়ারা এসে পৌঁছেন। এরপূর্বে হযরত ওমর (রা) হযরত মুছান্নাকে (রা) আবু ওবায়েদের (র) স্থলে ইরাকে মুসলমানদের স্থায়ী সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ করেন। তিনি হযরত জারিরকে (রা) একটি বিরাট বাহিনীসহ হযরত মুছান্নার (রা) সহযোগিতার জন্য রওয়ানা করালেন। এদিকে জওয়ান হিম্মত মুছান্না (রা) সীমান্তবর্তী জেলাসমূহে নকীব প্রেরণ করে এক বড় সৈন্যবাহিনী একত্রিত করেছিলেন এবং বুয়েব নামক স্থানে তাঁবু খাটিয়েছিলেন। হয়রত জারিরও (রা) সাহায্যকারী সৈন্য নিয়ে বুয়েবে তাদের সঙ্গে এসে মিলিত হলেন।

অন্যদিকে ইরানে রোস্তম নিজের বিরোধীদের ওপর বিজয়ী হলো। সে মুসলমানদের পুনরায় একত্রিত হওয়ার খবর পেল। এ খবর শুনে সে মিহরান বিন মাহারবিয়া হামদানিকে ১২ হাজার যোদ্ধা বাহিনী দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্য প্রেরণ করলো। পথিমধ্যে ইরানী সৈন্যের আরো কয়েকটি দল এবং ইরানের সমর্থক গোত্রসমূহও এই বাহিনীতে এসে যোগ দিল। এমনিভাবে মিহরানের ঝাণ্ডাতলে এক লাখেরও বেশী সৈন্য একত্রিত হলো। মিহরান বিদ্যুতগতিতে বোয়েব পৌঁছলেন এবং ফোরাত নদীর অপর পারে মুসলমানদের সামনে তাঁবু ফেললো। দ্বিতীয় দিন মুছান্নাকে (রা) পয়গাম প্রেরণ করে জানতে চাইলো যে, তোমরা নদী পার হয়ে এদিকে আসবে, না আমরা সেদিকে যাবো? মুছান্নার (রা) জাসারের ঘটনার কথা স্মরণ ছিলো। তিনি জবাবে বলে পাঠালেন যে, আমরা নিজেদের অবস্থান ত্যাগ করবো না। তুমিই এদিকে এসে যাও।

মিহরান নদী অতিক্রম করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিজের বাহিনীকে এমনভাবে সজ্জিত করলেন যে, সর্বপ্রথম ছিল যিরাহ পরিধানকারী সৈন্য। তাদের পেছনে ছিল যোদ্ধা হাতি। এসব হাতির ওপর ছিল অভিজ্ঞ তীরন্দাজ। ডাইনে এবং বাঁয়ে ছিল সওয়ারের বাহিনী। হযরত মুছান্নাও (রা) অত্যন্ত সুশৃংখলভাবে নিজের বাহিনীর ব্যূহ রচনা করলেন এবং নিজের ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সমগ্র বাহিনী পরিদর্শন করলেন। তিনি প্রত্যেকের ঝাণ্ডার নীচে দাঁড়িয়ে মুজাহিদদের সাহস দিতেন এবং বলতেন ঃ

"আমি আশা করি তোমরা আজ আরবদের বীরত্ব ও শারাফতির ওপর কলংক লেপন করতে দেবে না। আল্লাহর কসম! আমি আজ নিজের জন্য সেই বস্তুর আকাংখী যা তোমাদের জন্য পসন্দ করি।"

মুছান্নার (রা) অগ্নিঝরা ভাষণ প্রতিটি মুসলমানের অন্তরে শাহাদাতের আকাংখার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রজ্জলিত করে দিলো। যে সময় তিনি যুদ্ধের ব্যূহ ঠিক করছিলেন সেসময় জনৈক মুসলমান জিহাদের আবেগে উদ্বেলিত হয়ে নিজের কাতার থেকে বের হয়ে ইরানীদের দিকে অগ্রসর হলো। মুছান্না (রা) নিজের বর্শা দিয়ে তাকে পেছনে ঠেলে দিলেন এবং বললেন ঃ "তোমার পিতা না থাকুক, নিজের স্থানে দাঁড়িয়ে থাকো। যুদ্ধ যখন শুরু হবে তখন মনের আকাংখা পূরণ করবে।"

ইরানীরা হামলার পূর্বে ধ্বনি দিয়ে আকাশ মাতিয়ে তুলতো। মুছান্না (রা) নিজের বাহিনীকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "এটা কাপুরুষোচিত শোরগোল। তীর ও বর্শা দিয়ে তোমরা এর জবাব দাও।" মুসলমানরা কেবলমাত্র হাতিয়ার

হাতে নিচ্ছিলেন ঠিক এমনি সময় ইরানী বাহিনী হামলা করে বসলো। হযরত মুছান্না (রা) অত্যন্ত সাহসের সাথে সৈন্য বাহিনীকে সুশৃংখল করলেন এবং নিয়ম অনুযায়ী তিন তাকবির বলে ইরানীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ইরানীদের হামলা এত তীব্র ছিল যে, মুসলমানরা হতচকিত হয়ে পড়লো এবং বনু আজলের ব্যূহসমূহ বিশৃংখল হয়ে গেল। মুছান্না (রা) তাদের নিকট পয়গাম প্রেরণ করে বললেন যে, মুসলমানদেরকে অপমানিত করো না এবং পিছু হটার চেয়ে কেটে মরাকে অগ্রাধিকার দাও। বনু আজল এই বাণী পেয়েই নিজেদেরকে সামলে নিলো এবং মজবুতভাবে লড়াই করতে লাগলো। তারপর যুদ্ধের ময়দান খুব গরম হয়ে উঠলো এবং কয়েক ঘন্টা এমন প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হলো যে, মাটি ও পাহাড় কেঁপে উঠলো। মুছান্না (রা) এত জোশের সঙ্গে লড়াই করছিলেন যে, মাথা ও পায়ের কোন খেয়াল ছিল না। তাঁর পাশাপাশি বনু তাগাল্লাব ও বনু নামারের খৃস্টান সরদার ইবনুল ফাহার তাগাল্লুবী এবং আনাস বিন হিলালও যথাযথ বীরত্ব প্রদর্শন করছিলেন।

লড়াই চলাকালীন সময়ে মুছান্নার (রা) সাহোদর মাসউদ (রা) বিন হারিছা শাইবানী প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে ঢলে পড়লেন এবং অন্তিম নিশ্বাসের সময় উচ্চৈস্বরে বললেন ঃ "হে বাকার বিন ওয়ায়েলের সন্তান সন্ততি! নিজেদের ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখো। আল্লাহ তোমাদেরকে সুমহান মর্যাদা দান করবেন। সাবধান, আমার মৃত্যুতে যেন তোমাদের পদস্খলন না ঘটে।" এ সময় মুছান্নাও (রা) মুসলমানদেরকে উচ্চৈস্বরে বললেন ঃ "হে মুসলমানরা! এভাবেই শরীফরা জীবন দিয়ে থাকে। তোমাদের ঝাণ্ডা যেন অবনত না হয়।"

ইতিমধ্যে আনাস বিন হেলালও প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। মুছান্না (রা) তাকে নিজের শহীদ সাহোদরের পাশে শুইয়ে দিলেন এবং তরবারী হাতে দুশমনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সে সময় পর্যন্ত ইরানী বাহিনীর বড় বড় অফিসার মারা গিয়েছিল। কিন্তু মেহরান খুব দৃঢ়তার সাথে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। বনু তাগাল্লাবের একজন যুবক তাকে নিশানা বানালো এবং তরবারী উচিয়ে একা একা তার ওপর গিয়ে পড়লো। মেহরান ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো। এ সময় যুবকটি লাফ দিয়ে সেই ঘোড়ার ওপর চড়ে বসলো এবং উচ্চৈস্বরে না'রা লাগিয়ে বললো যে ঃ "আমি হলাম তাগাল্লাবের আওলাদ এবং ইরানী সেনাপতির হত্যাকারী" ইরানী সৈন্যরা নিজেদের সেনাপতিকে নিহত হতে দেখে ভগ্নহৃদয় হয়ে পড়লো এবং অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় পালিয়ে গেল। মুছান্না (রা) নিজের বাহিনীর কতিপয় শক্তিশালী দল সঙ্গে নিয়ে পুলের ওপর পৌঁছে গেলেন এবং পলায়নপর ইরানীদের রাস্তা বন্ধ করে তাদেরকে হত্যা করা শুরু করলেন। ইবনে খালদুনের রেওয়ায়াত অনুযায়ী

প্রায় একলাখ ইরানী মুসলমানদের তরবারীর খোরাক হয়েছিল এবং হাজার হাজার ইরানী নদীতে ডুবে গিয়েছিল। অধিকাংশ ঐতিহাসিক লিখে থাকেন যে, বুয়েবের যুদ্ধে যে সংখ্যক ইরানী নিহত হয়েছিল সেই সংখ্যক জীবনহানি তাদের আর কোন যুদ্ধে ঘটেনি। বুয়েবের ময়দানে অনেক দিন পর্যন্ত ইরানীদের হাড়গোরের স্তুপ পড়েছিল। পথিক এই পথ দিয়ে অতিক্রমের সময় মুখ দিয়ে অযাচিতভাবে শিক্ষণীয় বাক্যাবলী নির্গত হতো।

বুয়েবের যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে জাসারের যুদ্ধের পূর্ণ জবাব ছিলো। এই যুদ্ধে একলাখ ইরানী নিহত হওয়ার মুকাবিলায় শুধুমাত্র একশ' মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন এবং একজন মুসলমান দশজন ইরানীকে হত্যা করে। এ জন্য এই লড়াইকে ইয়াওমুল আ'শারও বলা হয়ে থাকে। যুদ্ধ শেষ হলে মুছান্না (রা) নিজের ভাই মাসউদ (রা) এবং খৃস্টান সরদার আনাস বিন হেলালের লাশ জাপটে ধরলেন ও কোমল স্বরে তাদের বাহাদুরীর প্রশংসা করলেন। অতপর মুসলমান শহীদদের জানাযার নামায পড়ালেন এবং বললেন ঃ

"আল্লাহর কসম! তাঁরা নিজেদের বীরত্ব, অটলতা এবং নির্ভীকতার ঝাণ্ডা উড্ডীন করে গেছেন ও জীবনের নযরানা পেশ করে নিজেদের গুনাহর কাফ্ফারা আদায় করেছেন।"

বুয়েবের যুদ্ধের পর খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের মত সমগ্র ইরাকে মুছান্না (রা) বিন হারিছার নাম মুখে মুখে উচ্চারিত হতে লাগলো। তিনি কিছু সামরিক বাহিনীকে মাদায়েনের সম্পূর্ণ বিপরীতে সাবাতে হামলার নির্দেশ দিলেন এবং কতিপয় দল নিজের সঙ্গে নিয়ে খানাফস ও আম্বারের ওপর হামলা করলেন। সে সময় সেখানে ইরানীদের একটা মেলা বসেছিল এবং বাজার ছিল পণ্য সম্ভারে পরিপূর্ণ। প্রথম হামলাতেই ইরানীরা পালিয়ে গেল এবং বেশুমার গনিমতের মাল মুসলমানদের হস্তগত হলো। এদিকে বুয়েবের পরাজয়ের খবর মাদায়েনে পৌঁছলে সমগ্র ইরানে বিলাপ ধ্বনি উচ্চারিত হতে লাগলো এবং জাতীয় মর্যাদাবোধ প্রতিটি ইরানীকে অস্থির করে তুললো। তারা বিস্মিত হয়ে একে অপরকে জিজ্ঞেস করতো যে, অন্নহীন ও বস্ত্রহীন আরবদের মধ্যে এই সাহস কোত্থেকে সৃষ্টি হলো যে, তারা ইরানী সিংহাসনকে অপমানিত করতে কুণ্ঠাবোধ করছে না।

এরপর ইরানীরা নিজেদের মধ্যকার সকল মতবিরোধ ভুলে গিয়ে রাণী পুরানদখতকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে জওয়ান শাহজাদা ইয়াযদ গিরদকে সিংহাসনে বসালো। ইরানে সকল সাধারণ ও অসাধারণ মানুষ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল এবং জাতীয় মর্যাদা ও আবেগ সমগ্র দেশে যেন

আগুন লাগিয়ে দিল। যেসব এলাকা মুসলমানদের দখলে ছিল সেখানেও বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠলো এবং চারদিক থেকে মুসলমানদেরকে বিপদে ঘিরে ধরলো। মুছান্না (রা) পরিস্থিতি লিখে খিলাফতের দরবারে প্রেরণ করলেন। সেখান থেকে নির্দেশ এলো যে, নিজের বাহিনী গুটিয়ে আরব সীমান্তে হটে এসো এবং রবিয়া ও মুদিরের গোত্রসমূহকেও সাহায্যের জন্য ডেকে পাঠাও। মুছান্না (রা) এই নির্দেশ পালন করলেন এবং নিজের সৈন্য বাহিনীকে গুটিয়ে জুকার নামক স্থানে অবস্থান নিলেন এবং মদীনা থেকে আরো নির্দেশের অপেক্ষা করতে লাগলেন। ওদিকে খলিফাতুল মুসলিমুন ওমর ফারুক (রা) ইরাকের অবস্থা শুনে শুনে খুব বিচলিত হলেন এবং আবেগাপ্লুত হয়ে বলতে লাগলেন ঃ

"আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই আজমের সাথে আরবের লড়াই করাবো।"

তিনি আরবের সকল গোত্রে দূত প্রেরণ করলেন। দূত প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল যাতে তারা অগ্নি উপাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে আসে। তার জিহাদের ডাকে সমগ্র আরব সাড়া দিল এবং চারদিক থেকে মানুষ জিহাদের আবেগে উদ্বেলিত হয়ে মদীনা পৌঁছতে লাগলো। অবশ্য যারা ইরাক সীমান্তের সন্নিকটে ছিল তারা সরাসরি মুছান্নার (রা) নিকট জুকারে পৌঁছে গেলো। মদীনায় যখন বিরাট সংখ্যক মুজাহিদ একত্রিত হলো তখন হযরত ওমর(রা) স্বয়ং ইরানীদের মুকাবিলায় যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু সাহাবীরা (রা) তাতে বাধা দিলেন এবং তাঁর জন্য মদীনায় অবস্থানই উপযুক্ত বলে মত প্রকাশ করলেন। সুতরাং তারা হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসকে ইরাকী অভিযানের নেতৃত্ব দানের জন্য নির্বাচিত করলেন। হযরত সায়াদ (রা) ত্রিশ হাজার মুজাহিদকে সঙ্গে নিয়ে ইরাকের দিকে অগ্রসর হলেন এবং ছালাবা গিয়ে তাঁবু ফেললেন। মুছান্নার (রা) আট হাজার সৈন্যও এই বড় বাহিনীতে এসে যোগ দিচ্ছিলেন। পরে এই সৈন্য শারাফ নামক স্থানে হযরত সায়াদের (রা) বাহিনীতে এসে যোগও দিয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো যে, তাতে মুছান্না (রা) ছিলেন না।

ইবনে আছির বর্ণনা করেছেন, জাসারের যুদ্ধে মুছান্না (রা) প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন। যদিও সাময়িকভাবে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন এবং বুয়েবের যুদ্ধে আরেকবার নিজের বীরত্ব প্রদর্শন করে ইরানীদেরকে হতভম্ব করে দিয়েছিলেন। কিন্তু জুকার অবস্থানকালে তাঁর ক্ষত পুনরায় কষ্ট দেয়া শুরু করলো এবং কোন চিকিৎসাই কাজ দিলো না। মুছান্নার (রা) স্থির বিশ্বাস হয়ে গেল যে, প্রকৃত স্রষ্টার ডাক এসে গেছে। সুতরাং তিনি বশির (রা) বিন

খাসাসিয়াকে নিজের স্থলে সেনাবাহিনীর আমীর নিয়োগ করলেন এবং হযরত সায়াদের (রা) নিকট তাঁর এই পয়গাম পৌঁছে দেয়ার জন্য ওসিয়ত করলেন ঃ

"যতদূর সম্ভব হয় আরব সীমান্তের নিকট থেকে ইরানীদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। আল্লাহ যদি মুসলমানদেরকে বিজয়ী করেন তাহলে নির্দ্বিধায় ইরানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবেন এবং খোদা নাখাস্তা যদি মুসলমানরা ইরানীদেরকে পরাজিত না করতে পারে তাহলে স্বদেশের সীমান্তের অভ্যন্তরে গিয়ে পুনরায় সুসংগঠিত হয়ে হামলা করবেন।"

এই ওসিয়তের পরে বনু শাইবানের এই মহান সেনাপতি পরপারের ডাকে সাড়া দিলেন এবং জুকারের মাটি তার লাশকে আলিঙ্গন করলো। হযরত সায়াদ (রা) এবং অন্যান্য মুজাহিদ মুছান্নার (রা) ওফাতের খবর শুনে খুব দুঃখ পেলেন। কেননা এই নাজুক সময়ে তিনি তাদের অত্যন্ত শক্তিশালী বাহু হিসেবে পরিগণিত হতেন। মুছান্নার (রা) সূক্ষ্মদৃষ্টি ও দূরদর্শিতার ব্যাপারটি ছিল প্রমাণিত সত্য। হযরত সায়াদ (রা) যখন পত্রে মুছান্নার (রা) মৃত্যুর খবর হযরত ওমরকে (রা) দিলেন তখন তিনি জবাবে হযরত সায়াদকে (রা) প্রায় সেই নির্দেশই লিখে পাঠিয়েছিলেন যা মুছান্না (রা) নিজের ওসিয়তে বর্ণনা করেছিলেন।

মুছান্না (রা) বিন হারিছা যদিও বিশ্ব নবীর (সা) শেষ যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তবুও তিনি নিজের ইখলাস, ত্যাগ, কুরবানী, নির্ভীকতা, অটলতা এবং সূক্ষ্ম জ্ঞানের যে নকশা ইতিহাসের পাতায় রেখে গেছেন তাতে আমরা নির্দ্বিধায় তাঁকে ইসলামের প্রথম কাতারের মুজাহিদ ও নেতা হিসেবে পরিগণিত করতে পারি। মুহাম্মাদ হোসাইন হাইকালের ভাষায় হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ যদি নজিরবিহীন সেনাপতি ও আল্লাহর তরবারীর গৌরবে গৌরবান্বিত হতে পারেন তাহলে মুছান্না (রা) বিন হারিছার প্রথম কাতারের নেতা ও মুজাহিদ হওয়ার ব্যাপারটি অস্বীকার করা যায় না। তিনি ছিলেন একজন অভিজ্ঞ নেতা। তিনি চরম নাজুক সময়ে মুসলমানদের দায়িত্ব নিজের মাথায় তুলে নেন এবং একজন এমন পরামর্শদাতা ছিলেন যে, ধর্মীয় মতবিরোধ সত্ত্বেও ইরাকের সকল আরব বংশোদ্ভূত গোত্রের অন্তর জয় করে নিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে বুয়েবের যুদ্ধে ইরানীদের ওপর এমন আঘাত হেনেছিলেন যার কথা ইরানীরা কখনই ভুলতে পারেনি এবং তারপর আর তাদের বিজয়ের মুখ দেখার ভাগ্য হয়নি।

হযরত জিরার (রা) বিন
আযওয়ার আসাদি

অষ্টম হিজরীতে মক্কা মুয়াজ্জামার ওপর ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডীন হলো। এ সময় বাতিল মাবুদ পূজারীদের ওপর হক ভীতিতে পেয়ে বসলো। নবম হিজরীতে এত অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি দলের আগমন ঘটলো যে, বছরটির নামই হয়ে গেল "আমুল ওফুদ।" সেই বছরেরই প্রথম দিককার ঘটনা, একদিন ১০ জন বিরাট বপুধারী ও ভীতিপ্রদ মানুষ এমনভাবে মদীনা মুনাওয়ারাতে আবির্ভূত হলো যে, তাদের হাতে ছিল ঝাণ্ডা, বর্শা এবং তরবারী। তারা মসজিদে নববীর বাইরে নিজেদের উট বাঁধলো এবং এমনভাবে পা ফেলে নবীর দরবারের দিকে রওয়ানা হলো যেন মাটি তাদের পায়ের নীচে দেবে যাচ্ছিল। রহমতে আলমের (সা) খিদমতে পৌঁছে তাঁরা গৌরবপূর্ণ স্বরে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমরা হলাম বনু আসাদ বিন খাজিমার মানুষ। আপনি নিজের কোন মানুষ আমাদের নিকট পাঠাননি বরং আমরা স্বয়ং ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং অতপর দূর দূরান্তের পথ ভেঙ্গে আপনার খিদমতে এসেছি।"

বনু আসাদের লোকজন অত্যন্ত যোদ্ধা ও বাহাদুর ছিল। তারা কুফর ও ইসলামের সংঘর্ষে সবসময়ই কুরাইশদেরকে সমর্থন করেছে। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর তারা নিজেরাই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এখন তারা হুজুরের(সা) দর্শন লাভ ও বাইয়াত করার জন্য নিজেদের গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল মদীনা প্রেরণ করেছিলেন। সে সময় সেই প্রতিনিধি দল যা কিছু বলেছিল তার প্রতিটি শব্দই সঠিক ছিল। কিন্তু তাদের কণ্ঠস্বরে এমন মনে হচ্ছিল যেন তারা হুজুরের (সা) ওপর নিজেদের ইসলামের ইহসান করছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের এই আচরণ পসন্দ করলেন না এবং ইরশাদ হলো ঃ

يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا ۚ قُلْ لَّا تَمُنُّوْا عَلَىَّ اِسْلَامَكُمْ
بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ - (الحجرات : ١٧)

"[হে নবী (সা)] এরা ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে তোমার ওপর ইহসান করে। বলে দাও যে, নিজের ইসলাম গ্রহণের জন্য আমার ওপর ইহসান করো না। বরং আল্লাহ তোমাদের ওপর ইহসান করেছেন যে, সে তোমাদেরকে ঈমান আনয়নের হেদায়াত করেছেন। যদি তোমরা তোমাদের কথায় সত্য হও।" (আল হুজুরাত ঃ ১৭)

এ সময় প্রতিনিধি দলের সদস্যদের মধ্য থেকে একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ সামনে অগ্রসর হলেন এবং অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। কবিতাটির ভাবার্থ নিম্নরূপ ঃ

"আমি মদ্যপান ত্যাগ করেছি এবং মদের পাত্র ভেঙ্গে ফেলেছি—এবং সেই সত্তার দিকে এসেছি যিনি খুব বুলন্দ এবং যার মহানত্বের কোন সীমা পরিসীমা নেই। আমার সকল শক্তি ও প্রচেষ্টা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধেই ব্যয়িত হতো।"

তাঁর কবিতা শুনে রহমতে আলম (সা) মুচকি হাসি দিলেন এবং বললেন ঃ

"তোমার বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।"

এই ব্যক্তি যার ইখলাস ও কুরবানী রাসূলের (সা) দরবারে গৃহীত হওয়ার মর্যাদা পেল এবং যাঁর কর্মপদ্ধতিকে মহানবী (সা) লাভজনক বলে আখ্যায়িত করলেন—তিনি ছিলেন হযরত জিরার (রা) বিন আজওয়ার আসাদি। এই সেই জিরার (রা) বিন আজওয়ার; যাঁর বীরত্ব এবং নির্ভিকতার ঘটনাবলী ইসলামের ইতিহাসের পাতায় জ্বলজ্বল করছে। এসব ঘটনা পাঠ করে মৃত লোকদের শিরা উপশিরাতেও জীবনের উত্তাপ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

সাইয়েদেনা আবু আজওয়ার জিরার বিন মালিক আজওয়ার (বিন আওস বিন খুজায়মা বিন রবিয়া বিন মালিক বিন ছা'লাবা বিন দাওদান বিন আসাদ বিন খুজায়মা) আরবের মশহুর কবিলা বনু আসাদ বিন খুজায়মার সাঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। গোত্রটির বসতি ছিল খায়বারের উপকণ্ঠে। হযরত জিরার(রা) স্বগোত্রে সম্মান ও বিত্তের দিক থেকে খুবই মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি একাকী এক হাজার উটের মালিক ছিলেন এবং অত্যন্ত সচ্ছলতার সঙ্গে জীবন যাপন করতেন। তিনি নিজের গোত্রের রেওয়াজ অনুযায়ী তীর চালনা এবং নেযাবাজীতে পূর্ণ ধরনের পারদর্শীতা রাখতেন। তাঁর বীরত্বের কাহিনী মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হতো। কবিতা ও কাব্যেও তাঁর বুৎপত্তি ছিল। তাঁর দিন-রাত এভাবেই কাটছিলো। এমন সময় কোথাও থেকে

তিনি ইসলামের কথা শুনতে পেলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নরম অন্তর দিয়েছিলেন। ইসলামের শিক্ষায় খুব প্রভাবিত হলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি দেখতে চাইলেন যে, ইসলামের দায়ী ও কুরাইশের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের পরিণাম ফল কি দাঁড়ায়। যখন তিনি শুনলেন যে, আরবের কেন্দ্র মক্কা মুয়াজ্জামাকে হকপন্থীরা দখল করে নিয়েছেন এবং কুরাইশরা ইসলামের রহমতের ছায়ায় আশ্রয় খুঁজছে তখন তাঁর অন্তর সাক্ষ্য দিল যে, ইসলাম সত্য দ্বীন। বস্তুত তিনি আর কোন মুবাল্লিগের অপেক্ষা না করে মন প্রাণ দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। বনু আসাদের বেশীরভাগ মানুষ তাঁকে অনুসরণ করলেন। তাদের মধ্যে তোলায়হা বিন খুয়ায়েলদ এবং ওয়াবিসা বিন মাবাদের মত নামকরা মানুষও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইসলাম হযরত জিরারের (রা) জীবনে এক বিস্ময়কর বিপ্লব সৃষ্টি করলো। তিনি মদ পান থেকে চিরকালের জন্য তওবাহ করলেন এবং মদের পাত্র ভেঙ্গে খান খান করে ফেললেন। এই সঙ্গে নিজের সকল ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিলেন। সুতরাং নবম হিজরীর প্রথম দিকে যখন তিনি বনু আসাদের প্রতিনিধি দলে শামিল হয়ে রহমতে আলমের (সা) পবিত্র খিদমতে পৌঁছলেন তখন তাঁর নিকট ঈমান সম্পদ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। হুজুর (সা) তাঁর ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে ব্যয়ের অবস্থা শুনে খুব প্রশংসা করলেন। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, এই প্রতিনিধি দলের সদস্যরা হুজুরের (সা) নিকট জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! পশুদের বুলি থেকে ভাবী শুভাশুভের নিদর্শন নেয়া যায় কি?"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "এটা নাজায়েয।"

তারপর তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন ঃ "জ্যোতিবিদ্যা সম্পর্কে কি মত?"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "নিসন্দেহে এটা একটা বিদ্যা। শর্ত হলো তা জানতে হবে।"

হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) "আল ইসতিয়াব" গ্রন্থে লিখেছেন যে, হযরত জিরারের (রা) ইসলাম গ্রহণের পর বিশ্ব নবী (সা) বনু সায়েদ এবং বনু হাযিলে গিয়ে তাঁকে ইসলামের তাবলীগের কাজ শুরু করার নির্দেশ দিলেন। জিরার (রা) নবীর (সা) ইরশাদ পালনে সেই পবিত্র মিশনে রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং হুজুরের (সা) ওফাত পর্যন্ত হকের তাবলীগের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

যদিও চরিতকাররা হযরত জিরার কতদিন নবীর (সা) সরাসরি ফয়েজ লাভ করেছিলেন তা পরিষ্কার করে বলেননি। তবে, বিভিন্ন কার্যকারণে জানা যায় যে, তিনি কিছুদিন অবশ্যই হুজুরের (সা) খিদমতে থেকে দ্বীনের হুকুম-আহকাম শিখেছিলেন এবং তাবলীগের প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন। কেননা হুজুর (সা) শুধু সেই সকল সাহাবীকেই দ্বীনের তাবলীগের জন্য প্রেরণ করতেন যাঁরা তাঁর নিকট সেই কাজের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতেন এবং লোকদেরকে শুধুমাত্র ইসলামের রবকত ও ফজিলত সম্পর্কেই অবহিত করতে সক্ষম হতেন না বরং তাদেরকে সৎ ও অসৎকাজ সম্পর্কেও শিক্ষা দিতেন। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, প্রিয় নবীর (সা) শেষ যুগে তোলায়হা বিন খুয়ায়েলদ আসদী শয়তানের প্ররোচনায় এসে নবুওয়াতের দাবী করে বসলো এবং সামিরাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে মানুষকে কুপথে পরিচালনার কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়লো। বিশ্ব নবী (সা) হযরত জিরার (রা) বিন আযওয়ারকে তোলায়হার উৎখাতের জন্য নিজেদের সেসব কর্মচারী ও গোত্রের নিকট জিহাদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন যারা সামিরার কাছাকাছি ছিল। হযরত জিরার (রা) সিনান বিন আবু সিনান, আলী বিন আসাদ, কাজায়াহ এবং বনু ওয়ারকাহ গোত্রসমূহের নিকট হুজুরের (সা) পয়গাম পৌঁছিয়ে তাদের প্রতি মুরতাদদের বিরুদ্ধে সমগ্র শক্তি দিয়ে জিহাদের আহবান জানালেন। তারা হুজুরের (সা) আহবানে সাড়া দিলেন এবং হযরত জিরারের(রা) পতাকাতলে সমবেত হলেন। ওয়ারদাত নামক স্থানে মুরতাদ ও হক- পন্থীদের মধ্যে রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এই যুদ্ধে তোলায়হা ও তার সহযোগীদের শিক্ষণীয় এবং শোচনীয় পরাজয় ঘটলো। তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে গেল। হযরত জিরার (রা) বিজয়ীর বেশে মদীনা রওয়ানা হলেন। কিন্তু তিনি পথেই ছিলেন, এমন সময় রহমতে আলম (সা) ইন্তেকাল করেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতের প্রারম্ভে ধর্মদ্রোহিতার ফিতনার আগুন প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো। সিদ্দীকে আকবার (রা) মুরতাদদের উৎখাতের জন্য বিভিন্ন দিকে সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করলেন। এ সময় হযরত জিরারও (রা) হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের বাহিনীতে শামিল হয়ে গেলেন। হযরত খালিদ (রা) সর্বপ্রথম তোলায়হার প্রতি মনোযোগ দিলেন। সে হযরত জিরারের (রা) নিকট পরাজিত হয়ে বাজাখাতে অবস্থান গ্রহণ করেছিলো এবং তায়, ফাজারাহ এবং আসাদ গোত্রকে নিজেদের পতাকাতলে একত্রিত করে নিয়েছিল। হযরত খালিদ (রা) তোলায়হাকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে সিরিয়ার দিকে তাড়িয়ে[১] দিয়েছিলে। তারপর তিনি বাতাইর

পরাজিত করে সিরিয়ার দিকে তাড়িয়ে[১] দিয়েছিলে। তারপর তিনি বাতাইর দিকে অগ্রসর হলেন। এখানে বনু হানজালার সরদার এবং জাকাত আদায়কারী মালিক বিন নুয়াইরাহ দ্বিমুখী কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। সে স্বগোত্রের যাকাত খিলাফতের দরবারে প্রেরণ করেনি এবং কিছুদিন যাবত মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার সাজাহ বিনতে হারেছ তামিমিয়ার সঙ্গেও তার খুব দহরম-মহরম ছিল। সাজাহ যখন পলায়নের পথ অবলম্বন করলো তখন বনু তামিমের অধিকাংশ মানুষ দ্বিতীয়বার মুসলমান হয়ে গেল এবং মালিক বিন নুয়াইরাহও ইসলাম গ্রহণ করলো। [সাজাহ প্রথমে বনু তাগাল্লুবে আশ্রয় নিল। তারপর নিজের কওমের সঙ্গে বসরায় এলো এবং নিজের কবিলার সকলের সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর তিনি সারা জীবন পরহেজগারী ও দ্বীনদারীর সাথে অতিবাহিত করেন। আমীরে মুয়াবিয়ার (রা) শাসনকালে ওফাত পান। মশহুর সাহাবী হযরত সামুরাহ বিন জুনদুব (রা) তখন বসরার শাসক ছিলেন। তিনি তার নামাযে জানাযা পড়ান।] হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ বাতাহ পৌঁছে মুসলমানদের একটি দল এলাকার বিভিন্ন বস্তির দিকে প্রেরণ করলেন এবং সেই দলকে হেদায়াত দিয়ে বললেন যে, যে বস্তিতেই পৌঁছবে সেখানে প্রথমে আজান দেবে। জবাবে যদি তারাও আজান দেয় তাহলে তাদেরকে ছেড়ে দেবে। আর যদি তারা মৌনতা অবলম্বন করে অথবা কোন ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। সেই দল তাবলিগী ভ্রমণের সময় মালিক বিন নুয়াইরাহ এবং তার কতিপয় সাথীকে গ্রেফতার এবং তাদেরকে হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের সামনে পেশ করলো। তাদের ব্যাপারে তাবলিগী দলের সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ ছিলো। কিছু লোকের বক্তব্য ছিল যে, মালিক বিন নুয়াইরার বস্তি থেকে আজানের আওয়াজ এসেছিল। এ জন্য তাদেরকে ছেড়ে দেয়া উচিত। অন্যদের মত ছিল যে, তারা আজানের জবাবে মৌনতা অবলম্বন করে। এ জন্য তাদের গ্রেফতারী প্রয়োজন ছিল। হযরত খালিদ (রা) তাদের বর্ণনা শুনে তাৎক্ষণিকভাবে তাদেরকে আটক

---

১. আল্লাহ তায়ালা তোলায়হাকে তওবার তাওফিক দিয়েছিলেন। সিরিয়া অবস্থানকালে তিনি দ্বিতীয়বার ইসলাম গ্রহণ করেন। একবার আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতকালে তিনি ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা গমন করছিলেন। তিনি মদীনার নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ সময় জনৈক ব্যক্তি হযরত আবু বকরকে (রা) তোলায়হার গমনের খবর দিল। তিনি শুনে বললেন, এখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তার সঙ্গে সংঘর্ষ বাধানো উচিত হবে না তাকে যেতে দাও। হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে তোলায়হা মদীনা এসে হযরত ওমরের বাইয়াত করলেন এবং সে যুগের অসংখ্য যুদ্ধে বিস্ময়কর কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন।

রাখার নির্দেশ দেন। বস্তুত তাদেরকে এক তাঁবুর মধ্যে আটক রাখা হলো এবং তাদের তত্ত্বাবধানের জন্য হযরত জিরার (রা) বিন আযওয়ারকে নিয়োগ করা হলো। রাতে খুব ঠাণ্ডা পড়ছিল। হযরত খালিদ (রা) "ইদফিয়ু আসরাকুম" (অর্থাৎ নিজের কয়েদীদেরকে উষ্ণতা দান কর) এই আহবান জানালেন। আরবের কিছু গোত্রের ভাষায় এই বাক্যের-অন্য অর্থও হতো। তাহলো নিজেদের কয়েদীদেরকে হত্যা করো। জিরার (রা) বিন আযওয়ার এই অর্থই বুঝলেন। তরবারীর ঝাপ্টা দিয়ে মালিক বিন নুয়াইরাহ এবং তার সঙ্গীদেরকে হত্যা করে ফেললো।[১] মশহুর সাহাবী হযরত আবু কাতাদাহ আনসারীও (রা) সেই বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর ধারণা অনুযায়ী নিহতদের বস্তি থেকে আজানের আওয়াজ এসেছিল। এ জন্য সে ক্ষমার যোগ্য ছিল। এই ঘটনায় অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি সোজা সিদ্দীকে আকবারের (রা) খিদমতে মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছেন এবং খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন যে, তিনি মালিক বিন নুয়াইরাহকে অন্যায়ভাবে হত্যা করিয়েছেন। হযরত আবু বকর (রা) হযরত খালিদকে (রা) মদীনা ডেকে জবাব তলব করেন। তিনি যা ঘটেছিল তা সত্য সত্য বর্ণনা করলেন। সিদ্দীকে আকবার (রা) তাঁর ওজর কবুল করলেন। কিন্তু হযরত ওমর ফারুক (রা) মত দিয়ে বললেন যে, খালেদ অবশ্যই সতর্কহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। এ জন্য তাঁকে পদচ্যুত করা হোক।

সিদ্দীকে আকবার (রা) জবাবে জানালেন ঃ

"আল্লাহ তায়ালা যে তরবারীকে কাফেরদের ওপর আপতিত করেছেন আমি তাকে খাপে আবদ্ধ করতে পারি না।"

এই ঘটনার পর হযরত জিরার (রা) বিন আযওয়ার হযরত খালিদের (রা) অধীন ইয়ামামার রক্তাক্ত যুদ্ধে শরীক হন। মতান্তরপূর্ণ রেওয়ায়াত অনুযায়ী

---

১. প্রখ্যাত কবি মুতাম্মিম বিন নুয়াইরাহ মলিক বিন নুয়াইরাহর সহোদর ছিলেন। তিনি সহোদরকে সীমাহীন ভালবাসতেন। তার হত্যার পর তিনি সবসময় ক্রন্দন ও মরছিয়া পাঠ করতেন। লোকজন তার মরছিয়া শুনে অযাচিতভাবে কেঁদে দিতেন। মালিকের হত্যায় তিনি এমন দরদমাখা মরছিয়া লিখেন যে, তা শুনে সকলেই রোরুদ্যমান হয়ে উঠতো। একবার তিনি হযরত ওমরের (রা) খিদমতে হাজির হলে তিনি এই মরছিয়া শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন মুতাম্মিম মরছিয়া পাঠ করলে হযরত ওমর ফারুক (রা) অশ্রুসজল হয়ে উঠলেন এবং বললেন ঃ "হায়! আমিও যদি মরছিয়া বলতে পারতাম তাহলে নিজের ভাই যায়েদ (রা) বিন খাত্তাবের মরছিয়া বলতাম।" মুতাম্মিম বললেন, "আমীরুল মু'মিনীন! আমার ভাই যদি আপনার ভাইয়ের মত লড়াই করে শহীদ হয়ে যেতেন তাহলে আমি কখনই তার জন্য মাতম করতাম না।"

মুসায়লামা কাজ্জাব ৪০ হাজার অথবা এক লাখ সৈন্য নিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে মুকাবিলা করে। ঐতিহাসিক তাবারি বর্ণনা করেছেন যে, মুসলমানরা এ থেকে কঠিন যুদ্ধে কোন সময় লিপ্ত হয়নি। হযরত জিরার (রা) এই যুদ্ধে এতো আবেগ প্রদর্শন করেছিলেন যে, সমগ্র দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। বাঁচার কোন আশা ছিল না। কিন্তু তাঁকে দিয়ে আরো বড় দায়িত্ব আঞ্জামের পরিকল্পনা ছিল আল্লাহর। কিছুদিন পর ক্ষতগুলো শুকিয়ে গেল এবং তিনি আল্লাহর দুশমনদেরকে ধরাশায়ী করার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

আল্লামা ইবনে আছির (র) "উসুদুল গাব্বাতে" ঐতিহাসিক ওয়াকেদীর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, "হযরত জিরার (রা) বিন আযওয়ার ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত প্রাপ্ত হন। লড়াই করতে করতে তাঁর দুই পা গোছা থেকে কেটে গিয়েছিল। এ সময় তিনি হাটুর ওপর ভর করে করে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকেন। এভাবে তিনি ঘোড়ার পদতলে নিষ্পিষ্ট হন।"

জানা যায় যে, এ ব্যাপারে ওয়াকেদী কোন কারণে অস্পষ্ট বর্ণনার শিকার হয়েছেন। নিসন্দেহে হযরত জিরার (রা) ইয়ামামার যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হন। কিন্তু কয়েক বছর পর তাঁর ওফাত হয়। সকল ঐতিহাসিকই সিরিয়ার যুদ্ধসমূহে হযরত জিরারের (রা) অংশগ্রহণের কথা স্বীকার করেছেন। এমনকি স্বয়ং ওয়াকেদীও সিরিয়ার যুদ্ধসমূহে হযরত জিরারের (রা) কৃতিত্বের কথা প্রা লভাবে বর্ণনা করেছেন। এ জন্য ইয়ামামার যুদ্ধে হযরত জিরারের (রা) শাহাদাতের রেওয়ায়াত কোনভাবেই সঠিক নয়।

মুসলমানরা যখন সিরিয়ার ওপর সেনা অভিযান চালায় তখন হযরত জিরার (রা) এবং তাঁর বাহাদুর বোন খাওলা (রা) বিনতে আযওয়ারও মুজাহিদদের দলে শামিল হন। সিরিয়ার যুদ্ধসমূহে তাঁরা উভয়েই এমন বিস্ময়কর কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন যে, সে কাহিনী পড়ে রক্ত টগবগিয়ে ওঠে। লড়াইয়ের ময়দানে কখনো তিনি আপাদমস্তক যিরাহ পরিধান করতেন। আবার কখনো কুরতা খুলে ঘোড়ার খালি পিঠে চড়ে যুদ্ধগাথা পড়তে পড়তে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন। এসব কারণে তিনি রোমকদের মধ্যে "জ্বিন" হিসেবে মশহুর হয়ে গিয়েছিলেন। যে দিকেই যেতেন, রোমকরা জ্বিন এসেছে জ্বিন এসেছে বলে ভেগে যেতো। অধিকাংশ যুদ্ধ ইতিহাস লিখক বলেছেন যে, নজিরবিহীন বীরত্বের বদৌলতে হযরত জিরারকে (রা) এক হাজার আরব বাহাদুরের সমান মনে করা হতো।

তের হিজরীতে মুসলমানরা দামেস্ক অবরোধ করে। এ সময় ইসলামের সিপাহসালার হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ হযরত জিরারকে (রা)

দু'হাজার সওয়ার দিয়ে অগ্রগামী সৈনিক প্রহরীর অফিসার নিয়োগ করলেন। সকল ইসলামী বাহিনীর চার পাশে চক্কর দান এবং তাদের হিফাজত করাই ছিল তাদের প্রধান কাজ। অবরোধকালে একদিন হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ খবর পেলেন যে, অবরুদ্ধদের সাহায্যের জন্য রোমকদের একটি বাহিনী দামেস্কের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তিনি হযরত জিরারকে (রা) পাঁচশ সওয়ার দিয়ে সেই বাহিনীকে রাস্তায় যেভাবেই হোক বাধা দিতে বললেন। হযরত জিরার (রা) সঙ্গীদেরসহ তুফান বেগে সেই অভিযানে রওয়ানা হয়ে গেলেন। শত্রুবাহিনীর নিকট পৌঁছে জানতে পেলেন যে, তাদের সংখ্যা ১০/১২ হাজারের থেকে কম নয়। কয়েক জন মুসলমান সিপাহী পরামর্শ দিয়ে বললেন যে, আমাদের সংখ্যা খুবই কম। এ সময় এতোবড় দলের সাথে লড়াই করাটা মুসলিহাত বিরোধী কাজ হবে। এ জন্য আরো সৈন্য এনে তাদের ওপর হামলা করাটাই উত্তম হবে। হযরত জিরার (রা) আবেগাপ্লুত হয়ে বললেন ঃ

"আল্লাহর কসম! আমি এখান থেকে এক পাও পিছু হটবো না। যারা যেতে চায় তাদেরকে আমি যাওয়ার অনুমতি দিলাম। তারা অবশ্যই চলে যেতে পারে। কিন্তু আমিতো আমার জীবনকে আল্লাহর পথে বিক্রয় করে দিয়েছি।"

অন্য মুসলমানের আবেগও উথলে উঠলো। তারা বললো, এটা তো একটা পরামর্শ মাত্র ছিল। নচেৎ আমরাও মাথায় কাফন বেঁধে বের হয়েছি। একথা বলে সবাই নারায়ে তাকবির ধ্বনি দিল। এই ধ্বনি শত্রুর ওপর বিদ্যুৎবেগে গিয়ে আপতিত হলো। রোমকদের ধারণা ছিল যে, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তারা এই সামান্য কয়েক জনের কাজ শেষ করে দেবে। তাদের এই সুধারণা অহেতুক ছিল না। কেননা তারা সকলেই অভিজ্ঞ সিপাহী ছিল এবং তাদের নেতৃত্ব করছিল হিরাক্লিয়াসের এক নামকরা জেনারেল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলো যে, সেই সামান্য কয়েকজন জীবন উৎসর্গকারীকে পরাজিত করা খুব সহজ কাজ নয়। হযরত জিরার (রা) এসময় বীরত্বের আবেগে নিজের কুরতা খুলে ফেললেন। তারপর এক দীর্ঘ বর্শা হাতে নিয়ে বাঘের মত রোমকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং লাশের পর লাশ ফেলতে ফেলতে রোমকদের সরদার দারদানের দিকে অগ্রসর হলেন। বহু সংখ্যক রোমক যোদ্ধা নিজেদের সরদারকে রক্ষা করছিলো। তারা হযরত জিরারকে (রা) বাধা দিতে লাগলো এবং তাঁকে নিজেদের ঘেরে নিয়ে চারদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিন্তু তিনি কাউকেই তাঁর নিকট ভীড়তে দিচ্ছিলেন না। এই দলে দারদান পুত্র হামরানও শামিল ছিল। সে ছিল একজন নামকরা যোদ্ধা। সে রোমকদেরকে গালি দিয়ে বললো যে, তোমরা একজন মানুষকেও

কাবু করতে পারছো না। একথা বলেই নিজের বর্শা দিয়ে সে জিরারের (রা) ওপর হামলা করে বসলো। হামলায় তাঁর বাহুতে আঘাত লাগলো। কিন্তু এই অবস্থাতে পূর্ণ শক্তি দিয়ে নিজের বর্শা হামরানের ওপর মারলেন এবং তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে ফেলে দিলেন। রোমকরা এ সময় নিজেদের ঘেরকে ছোট করে ফেললো। কয়েকজন মুসলমান মাথা বাজি রেখে জিরারের (রা) সাহায্যের জন্য অগ্রসর হচ্ছিলেন। এমন সময় জিরারের (রা) ঘোড়া একাএকি হোঁচট খেলো এবং তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। রোমকরা তাঁকে এবং অন্য কতিপয় মুসলমানকে গ্রেফতার করলো। কয়েদীদের মধ্যে হযরত আবদুর রহমান বিন আবি বকরের (রা) আযাদকৃত গোলাম সালেমও (রা) ছিলেন। রাস্তায় তিনি কোনক্রমে নিজের বাধন খুলে রোমকদের কয়েদ থেকে পালিয়ে সোজা খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের খিদমতে পৌঁছলেন।

হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ সালেমের (রা) মুখে জিরার (রা) বিন আযওয়ারের গ্রেফতারীর কথা শুনে খুব মনোকষ্ট পেলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি মাইসারাহ (রা) বিন মাসরুককে এক হাজার সিপাহী দিয়ে দামেস্কের পূর্ব দরজাতে অবরোধের জন্য প্রেরণ করলেন এবং অবশিষ্ট সৈন্য সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে তিনি দেখতে পেলেন যে, ইসলামী বাহিনীর আগে আগে একজন নিকাবধারী লাল রংয়ের ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে যুদ্ধের ময়দানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তিনি বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়লেন যে, লোকটি কে। কিন্তু যাচাই করার সুযোগ ছিল না। সেজন্য চুপ রইলেন। যখন রোমক বাহিনীর সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ শুরু হলো তখন হযরত খালিদ (রা) দেখলেন যে, সেই নিকাবধারী এমন বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করছে যে, যেদিকে ঝুকছে সেদিকই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। আঘাতের পর আঘাত খেয়েও পিছু হটার নাম নিচ্ছে না। তিনি সঙ্গীদেরকে সেই নিকাবধারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু কেউই জবাব দিতে পারলেন না। ইত্যবসরে সেই নিকাবধারী মেরে কেটে রোমক বাহিনীর অভ্যন্তর থেকে রক্তে অবগাহন করে বেরিয়ে এলো। হযরত খালিদ (রা) নিজের ঘোড়া দৌড়িয়ে তাঁর নিকট পৌঁছলেন এবং চীৎকার দিয়ে বললেন, "হে মরদে মুজাহিদ! তুমি জীবনবাজী রাখার হক আদায় করেছ। তুমি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের (সা) সামনে সফল হিসেবে উপস্থিত হবে। তোমার মত জীবন উৎসর্গকারীর নিকাব পরিধান করা শোভা পায় না। নিজের চেহারার ওপর থেকে নিকাব বা পরদা হটিয়ে দাও। যাতে আমি দেখতে পাই যে, তুমি কোন ব্যাঘ্র বীর?"

নিকাবধারী প্রথম দিকে তো চুপ মেরে রইলেন। কিন্তু হযরত খালিদ (রা) যখন পীড়াপীড়ি করলেন তখন বললেন ঃ

"হে আমীর! আমি জিরার (রা) বিন আযওয়ারের সহোদরা খাওলা বিনতে আযওয়ার। আমি আমার প্রিয় ভাইয়ের গ্রেফতারীতে খুব অশান্তিতে আছি। আল্লাহর কসম! আমি আমার ভাইকে দুশমনের পাঞ্জা থেকে মুক্ত করিয়ে ছাড়বো অথবা সেই প্রচেষ্টায় নিজের জীবন দান করবো।"

হযরত খালিদ (রা) খাওলার (রা) বাহাদুরী দেখে বিস্মিত হয়ে পড়লেন এবং বললেন, "সাবাশ খাওলা! যে জাতির মধ্যে তোমার মত কন্যা আছে সে জাতিকে দুশমন কখনো পরাজিত করতে পারে না। বেটি তুমি মুতমায়েন থাকো যে, জিরার (রা) যদি জীবিত থাকে তাহলে ইনশাআল্লাহ আমি তাকে মুক্ত করে ছাড়বো। আর যদি সে শহীদ হয়ে চিরঞ্জীব হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আমিও তার পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলার শপথ নিয়ে রেখেছি।"

একথা বলে তিনি বাছাইকরা সৈন্যদল সঙ্গে নিলেন এবং রোমকদের ওপর "আল্লাহর তরবারী" সদৃশ হামলা চালালেন। হযরত খাওলাও (রা) সে সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন। এই সময় তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। কবিতাটির ভাবার্থ হলো ঃ

"হে আমার একমাত্র ভাই! হে আমার মায়ের পুত্র। তুমি আমার আরাম আয়েশকে মলিন করে ফেলেছ এবং আমার নিদ্রাকে করেছ হারাম। হে জিরার! তুমি কোথায়। তুমি আজ আমার এবং আমার কবিলা ও কওমের দৃষ্টিগোচর হচ্ছো না।"

খাওলার (রা) দরদমাখা কবিতা মুসলমানদের অন্তরে আগুন লাগিয়ে দিল। তারা পাগলের মত জিরারকে (রা) অনুসন্ধান করছিল। ইত্যবসরে রোমকদের একটি দল গ্রেফতার অবস্থায় হযরত খালিদের (রা) সামনে এলো। তিনি রোমকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের একজন সঙ্গী যে, ঘোড়ার শূন্য পিঠে চড়ে খালি গায়ে লড়াই করছিল সে তোমাদের হাতে গ্রেফতার হয়েছে। তাকে তোমরা কোথায় রেখেছ?"

রোমকরা জবাব দিলো, "আমাদের সরদার সেই ব্যক্তিকে একশ' সওয়ারের হিফাজতে হেমস পাঠিয়ে দিয়েছে। যাতে বাদশাহ হিরাক্লিয়াসের সামনে তাকে পেশ করে বলা যায় যে, কি ধরনের জ্বিনের সামনা সামনি আমরা হয়েছি।"

হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ তক্ষুণি রাফে' (রা) বিন উমায়রাহ তায়ীকে একশ' সওয়ারসহ দ্রুতগতিতে হিমসের পথে রওয়ানা হওয়ার এবং জিরারকে (রা) রোমকদের পাঞ্জা থেকে মুক্ত করে আনার নির্দেশ দিলেন।

রাফে' (রা) কালবিলম্ব না করে একশ' সওয়ারসহ রোমকদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। হযরত খাওলাও (রা) হযরত খালিদের (রা) অনুমতি নিয়ে সেই দলের সঙ্গে গেলেন। অনেক চেষ্টা ও দৌড়াদৌড়ির পর রোমকদের দল মুসলমানদের দৃষ্টিগোচর হলো। তারা জিরার (রা) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় উটের ওপর রেখে হেসেখেলে চলছিলো। জিরার (রা) সে সময় খুব দরদপূর্ণ ভাষায় একটি কবিতা পাঠ করছিলেন। কবিতাটির অর্থ হলো ঃ

"হে খবর দানকারী! তুমি আমার কওম ও খাওলাকে এই খবর পৌঁছে দাও যে, আমি গ্রেফতার, অসহায় এবং জিঞ্জিরাবদ্ধ অবস্থায় আছি। আমার চারপাশে রোমক জিরাহ পরিধানকারী ও অস্ত্রধারী কাফিররা রয়েছে এবং আমি তাদের মধ্যে এমন অবস্থায় আছি যে, না উল্টে ফিরে যেতে পারি। না কোন সাহায্য পেতে পারি।

অতএব, হে অন্তর! তুমি দুঃখ ও চিন্তায় মৃত হয়ে যাও এবং হে আমার চক্ষু! তুমি আমার গণ্ডদেশে প্রশ্রবণ প্রবাহিত করে দাও। হায়! আমার কওম ও খাওলা যদি আমার নিকট হতো তাহলে আমি আমার জন্য সেই নির্দেশ আবশ্যক করে নিতাম যার ওপর আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

খাওলা (রা) এই কবিতা শুনে অস্থির হয়ে পড়লেন এবং চীৎকার করে বললেন, "হে আমার ভাই! আমি এসে গেছি।" একথা বলে তিনি বাঘের মত রোকমদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অনান্য মুজাহিদও আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে রোমকদের ওপর গিয়ে পড়লো এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তাদেরকে খতম করে ফেললেন। ভাই-বোন আলিঙ্গনাবদ্ধ হলো এবং আনন্দে আত্মহারা হয়ে উভয়েই কেঁদে ফেললেন। হযরত জিরার (রা) এবং তাঁর সঙ্গীরা দুশমনের কয়েদ থেকে মুক্ত হয়ে হযরত খালিদের (রা) বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হলেন। তারা সে সময় দারদানের মুকাবিলায় নিয়োজিত ছিল। সহীহ সালামতে তারা ফিরে আসার জন্য মুসলমানরা খুব খুশী হলো এবং তাদের সাহস দ্বিগুণ হয়ে গেল। পরের দিন যুদ্ধ শুরু হলে রোমকরা খুব তাড়াতাড়ি হিম্মত হারা হয়ে পড়লো এবং নিজেদের হাজার হাজার মানুষ হত্যা করিয়ে পালিয়ে গেল। প্রভূত পরিমাণে গনিমতের মাল মুসলমানদের হস্তগত হলো এবং বিজয়ীর বেশে তাঁরা দামেস্ক প্রত্যাবর্তন করলেন।

দামেস্ক তখনো জয় হয়নি। হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ খবর পেলেন যে, হিরাক্লিয়াস একটি বিরাট বাহিনী আজনাদাইন পাঠিয়ে দিয়েছে। হযরত আবু উবায়দাহ (রা) ইবনুল জাররাহর পরামর্শ অনুযায়ী হযরত খালিদ (রা)

দামেস্কের অবরোধ সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করে নিলেন এবং আজনাদাইন রওয়ানা হয়ে গেলেন। এই সাথে অন্যান্য সেকটরের সেনাপতিকে স্ব স্ব সৈন্যসহ আজনাদাইন পৌঁছার চিঠি প্রেরণ করলেন। মুসলমানরা দামেস্ক থেকে রওয়ানা হলে হযরত খালিদ (রা) অগ্রবর্তী বাহিনীর কমাণ্ড নিজের হাতে তুলে নিলেন এবং হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) মহিলা ও শিশুদেরকে নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে সৈন্য বাহিনীর পিছু রওয়ানা হয়ে গেলেন। অবরুদ্ধ দামেস্কবাসীরা যখন দেখলো যে, মুসলমানরা ফিরে যাচ্ছে তখন সেখানকার দুই রোমক সরদারের জীবনে স্পন্দন ফিরে এলো। তারা দু'জন ছিল সহোদর। সেই সঙ্গে একই সাথে ছিল খৃস্টানদের ধর্মীয় নেতা এবং সেনাপতি। তাদের একজনের নাম ছিল পিটার এবং অপর জনের নাম ছিল পল অথবা পোলোস। উভয়ে ১৬ হাজার পদাতিক সৈন্য ও সওয়ারসহ দামেস্ক থেকে বের হলো এবং মুসলমানদের পশ্চাৎভাগের সৈন্যদের ওপর হামলা করে বসলো। বস্তুত এটা ছিল অতর্কিত হামলা। মুসলমানরা এদিকে নজর দিতে দিতে রোমকরা কিছু মুসলমান মহিলাকে গ্রেফতার ও লুটপাট করে নিয়ে গেল। সেই মহিলাদের মধ্যে জিরারের (রা) বাহাদুর বোন খাওলাও (রা) ছিলেন। রোমকরা একস্থানে যখন বিশ্রামের জন্য তাঁবু ফেললো তখন খাওলা (রা) কয়েদী বোনদেরকে বললেন ঃ

"বোনেরা আমার। আমরা বাহাদুর আরবদের কন্যা এবং হাদিয়ে বরহকের (সা) অনুসারী। এসব মুশরিকের আনুগত্য কবুলের পরিবর্তে আমাদের মৃত্যুবরণ করা উচিত।"

এসব মহিলার মধ্যে তাবা' ও হেমইয়ার গোত্রের মহিলারাও ছিলেন। বর্শা চালনা এবং ঘোড় দৌঁড়ে তাদের পুরুষদের সমান স্বীকৃতি ছিল। খাওলার (রা) অগ্নিঝরা বক্তৃতা শুনে তাদের রক্ত টগবগ করে উঠলো এবং তারা একবাক্যে ঘোষণা করলো ঃ "খাওলা (রা) তুমি ঠিকই বলেছ যে, আমাদের জীবনবাজী রেখে কাজ করা উচিত। কিন্তু অস্ত্র ও ঘোড়া ছাড়া রোমকদের মুকাবিলার কি পন্থা রয়েছে?"

খাওলা বললেন ঃ "পার্থিব সামান ছাড়া শুধুমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করে বাতিলের বিরুদ্ধে অটল হয়ে দাঁড়ানোই হলো বাহাদুরী। এসো, তাঁবুর খুঁটি তুলে নি এবং তা দিয়ে রোমকদের মাথা ফাটিয়ে দি। এভাবে যদি রেহাই পাওয়া যায় তাহলে নিজেদের বাহিনীতে গিয়ে মিলিত হওয়া যাবে। নচেৎ শাহাদাতের মর্যাদা লাভ ঘটবে।"

এরপর সকল মহিলা উঠে দাঁড়ালো এবং তাঁবুর খুঁটি তুলে লড়াই করে মরার প্রস্তুতি নিলো। খাওলা (রা) তাদেরকে একটি বৃত্তের মত করে সুশৃংখলভাবে দাঁড় করালেন। অতপর সকলেই যুদ্ধগাথা পড়তে পড়তে কাফেরদের ওপর হামলা করলো।

রোমকরা চারদিক থেকে মহিলাদেরকে ঘিরে নিল। কিন্তু তাঁরা তাঁবুর খুঁটি দিয়ে তাদের মাথা ফাটিয়ে দিতে লাগলো এবং কাউকে তাদের নিকট আসতে দিল না। বেশ কিছুক্ষণ যাবত এমনিভাবে মুকাবিলা অব্যাহত রইলো এবং কয়েকজন রোমক এই জানবাজ মহিলাদের হাতে নরক যাত্রা করলো। শেষে রোমকরা ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের ওপর এক সিদ্ধান্তমূলক হামলা করার চিন্তা করলো। এদিকে খালিদ (রা) এবং জিরার (রা) মহিলাদের গ্রেফতারীর খবর পেলেন। এ সময় তাঁরা একটি দ্রুতগতিসম্পন্ন বাহিনীসহ রোমকদের পেছনে রওয়ানা হলেন। যখন রোমকরা ইসলামের কন্যাদের ওপর শেষ হামলার জন্য অস্ত্র হাতে নিচ্ছিলো ঠিক সেই সময় তাঁরা মুসলমান ব্যাঘ্রদের ভয়াবহ আওয়াজ শুনলেন। তাদের আসমান বিদীর্ণ নারায় মাটি কেঁপে উঠছিলো। রোমকদের বীরত্ব ভাব উবে গেল এবং তারা সকল কিছু ছেড়ে ছুড়ে উল্টো পায়ে দামেস্কের দিকে পালিয়ে গেল। হযরত জিরার (রা) বিদ্যুৎবেগে অগ্রসর হয়ে পিটারকে ধরে ফেললেন এবং নিজের বর্শা তার শরীরের এপার ওপার করে দিলেন। তারপর দামেস্কের দরজা পর্যন্ত বুযদিল রোমকদের পিছু ধাওয়া করলেন।

মহিলারা এই গায়েবী সাহায্যের জন্য আল্লাহর শুকর আদায় করলেন এবং জিরার (রা) নিজের জানবাজ সহোদরার সঙ্গে মিলিত হয়ে খুব খুশী হলেন।

মহিলাদের এই ব্যাপার থেকে ফারেগ হয়ে হযরত খালিদ (রা) আজনাদাইনের দিকে অগ্রসর হলেন। সেখানে দারদার ৯০ হাজার সৈন্য নিয়ে অপেক্ষা এবং মুসলমানদেরকে পিষে ফেলার পরিকল্পনা করছিলো। হযরত খালিদ (রা) আজনাদাইন পৌঁছে নিজেদের সৈন্যকে নতুন করে সাজালেন এবং অফিসারদেরকে যথাযথ হেদায়াত দিলেন। যুদ্ধ শুরু হলে আরমেনী তীরন্দাজরা মুসলমানদের ওপর এমনভাবে তীর বর্ষণ করলো যে, ২০ জন মুসলমান আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। সে সময় হযরত জিরার (রা) একটি মজবুত ফিরাহ পরিধান করেছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের ব্যূহ থেকে বের হলেন এবং নিজের বর্শা দিয়ে আর্মেনী তীরন্দাজদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মুহূর্তের মধ্যে তিনি ৩০ জন আর্মেনীয়র বুক ছিদ্র করে ফেললেন এবং অবশিষ্টদেরকে ভেগে যেতে বাধ্য করলেন। তারপর তিনি ময়দানে

দাঁড়িয়ে গেলেন। এবং রোমকদেরকে উচ্চৈস্বরে আহবান জানিয়ে বললেন যে, যদি কোন পুরুষ থাকে তাহলে সামনে এসো। একজন রোমক অফিসার গর্জন করতে করতে তার মুকাবিলায় দাঁড়ালো। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে জিরারের (রা) বর্শা তার কলিজার এপার ওপার হয়ে গেল। তারপর আসতফান নামক এক রোমক যোদ্ধা হযরত জিরারের (রা) সামনে এলো। সে ছিল একজন অভিজ্ঞ সিপাহী। সে কোনমতেই জিরারের (রা) বর্শার আওতায় আসছিলো না। পক্ষান্তরে সে নিজের বর্শা দিয়ে জিরারের (রা) ওপর উপর্যুপরি হামলা শুরু করে দিল। তাদের দু'জনের যুদ্ধ এত দীর্ঘ সময় ধরে চলতে লাগলো যে, উভয় বাহিনীই অস্থির হয়ে পড়লো। হযরত খালিদ (রা) জিরারকে (রা) ডেকে বললেন ঃ

"জিরার (রা) কি ব্যাপার, তোমার শত্রু এখনো জীবিত রয়েছে। তুমি তোমার আরবী ঘোড়ার সাহায্য কেন নিচ্ছ না। শত্রুর চারপাশে চক্র বেঁধে হতভম্ব করে দাও।"

জিরার (রা) হযরত খালিদের (রা) হেদায়াতের ওপর আমল করলেন। এমনকি আসতুফানের ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়লো। ইত্যবসরে জিরার (রা) দেখলেন যে, একজন রোমক একটি তাজাদম ঘোড়া নিয়ে আসতুফানের সাহায্যের জন্য আসছে। জিরার (রা) ঘোড়া ছুটিয়ে তার নিকট পৌঁছে নিজের বর্শা দিয়ে তাকে শেষ করে ফেললেন। সাথে সাথে লাফ দিয়ে রোমকের ঘোড়ায় চড়ে বসলেন এবং নিজের ক্লান্ত ঘোড়াকে ইসলামী বাহিনীর দিকে হাকিয়ে দিলেন। অতপর তিনি আসতুফানের ওপর এমনভাবে হামলা করে বসলেন যে, সে সামলিয়ে উঠতে পারলো না এবং ঘোড়া থেকে পতিত হতে লাগলো। হযরত জিরার (রা) তৎক্ষণাৎ তার মাথা কেটে নিলেন। শারীরিক শক্তি এবং যুদ্ধ পারদর্শীতার ভিত্তিতে রোমকদের মধ্যে আসতুফান খুবই গণ্যমান্য মানুষ ছিলেন। তার হত্যার দৃশ্য দেখে রোমক বাহিনী চীৎকার দিয়ে উঠলো এবং মুসলমানদের তাকবির ধ্বনিতে ভূমি ও পাহাড় গুঞ্জরিত হতে লাগলো। তারপর উভয় বাহিনীর মধ্যে সাধারণ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। কিন্তু কোন ফায়সালা হলো না। পরের দিন উভয় বাহিনীর মধ্যে রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হলো। তাতে রোমক সিপাহসালার দারদান জিরারের (রা) হাতে নিহত হলো এবং ৫০ হাজার রোমকের লাশ যুদ্ধের ময়দানে পড়ে রইলো। এভাবে মুসলমানদের মহান বিজয় সাধিত হলো এবং তারা দ্বিতীয়বার দামেস্ক অবরোধ করলো। খৃষ্টানরা কিছুদিন দৃঢ়তার সঙ্গে মুকাবিলা করলো। কিন্তু তারা নিরাশ হয়ে পড়লো এবং মুসলমানদের নিকট শহর সমর্পণ করলো। দামেস্ক বিজয়েও হযরত জিরার (রা) উল্লেখযোগ্য

ভূমিকা পালন করেন এবং খৃষ্টানদের সাথে কয়েকটি যুদ্ধে নিজের বীরত্বের নৈপুণ্য দেখান।

আজনাদাইন ও দামেক বিজয়ের পর মুসলমানরা ফাহালের দিকে অগ্রসর হলো। সেখানে হিরাক্লিয়াসের জেনারেল সাকলা বিন মিখরাক একটি বিরাট বাহিনীসহ প্রস্তুত ছিল। ফাহালের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় হযরত আবু ওবায়দা (রা) [অথবা হাশিম (রা) বিন উতবা] সৈন্য ব্যূহের বাম পাশের কমাণ্ড নিজে নিলেন। খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ অগ্রবর্তী বাহিনী, শুরাহবিল (রা) বিন হাসানা অভ্যন্তর বাহিনী, আমর (রা) বিন আছ [অথবা মায়াজ (রা) বিন জাবাল] ডান পাশের, সাঈদ (রা) বিন যায়েদ পদাতিক বাহিনীর এবং জিরার (রা) বিন আযওয়ার অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার নিযুক্ত হলেন। ফাহালে মুসলমান ও রোমকদের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই সংঘটিত হলো এবং তা কয়েকদিন অব্যাহত রইলো। রাত-দিন যুদ্ধের ময়দান উত্তপ্ত থাকতো। রোমকদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। কিন্তু তারা সীমাহীন সাহাসিকতা ও অটলতার প্রমাণ দিলেন এবং অব্যাহত যুদ্ধের কারণে নিজেদের মধ্যে ক্লান্তি ও শ্রান্তির অবকাশ দিলেন না। জিরার (রা) ও তাঁর সওয়ার শত্রুর জন্য গজব হিসেবে প্রমাণিত হলো। তিনি এত সংখ্যক রোমক হত্যা করলেন যে, ময়দান লাশে পূর্ণ হয়ে গেল। শেষে তাদের সরদার সাকলাও জনৈক মুসলমানের তরবারীর আঘাতে মারা গেল এবং সাথে সাথে রোমক বাহিনী পালিয়ে গেল। এই যুদ্ধের পর জর্দানের সকল শহর এবং স্থান খুব সহজেই বিজয় হলো।

পনেরো হিজরীতে ইয়ারমুকের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এই যুদ্ধে সিরিয়ার ভাগ্য নির্ধারিত হয়। এই যুদ্ধে রোমকদের সংখ্যা বিভিন্ন মত অনুযায়ী দুই লাখ থেকে ১০ লাখের মধ্যে ছিল। তাতে অভিজ্ঞ জেনারেল ও সিপাই ছিল। উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলে প্রথমে উভয় দিক থেকে দূত গমনাগমন করলো। রোমকরা চেয়েছিল যে, মুসলমানরা অর্থ নিয়ে ফিরে যাক। কিন্তু মুসলমানরা তাতে কোনমতেই সম্মত হলো না। লড়াই শুরু হলে প্রথম দিন আরব বংশোদ্ভূত ৬০ হাজার খৃষ্টান জাবালা বিন আইহামের নেতৃত্বে মুসলমানদের ওপর হামলা করলো। হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ তাদের মুকাবিলায় শুধুমাত্র ৬০ জন মুজাহিদ প্রেরণ করলেন। তাঁরা ছিলেন আরবের স্বীকৃত অশ্বারোহী এবং তাঁদের প্রত্যেককে এক হাজার অশ্বারোহীর সমান মনে করা হতো। হযরত জিরার (রা) বিন আযওয়ারও সেসব জানবাজের মধ্যে শামিল ছিলেন। এই ৬০ জন জীবন উৎসর্গকারী গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ শুরু করলেন।

কখনো শত্রুবাহিনীর এক অংশের ওপর গিয়ে পড়তেন। আবার কখনো অন্য অংশের ওপর। এমনিভাবে তাঁরা সন্ধ্যা পর্যন্ত শত্রুকে ব্যস্ত রাখলেন এবং নিজেদের বড় বাহিনীর দিকে অগ্রসর হতে দিলেন না। এই বিস্ময়কর ও অপূর্ব যুদ্ধে শত্রু পক্ষের হাজার হাজার সিপাই নিহত হলো। পক্ষান্তরে মুসলমানদের ১০ ব্যক্তি শহীদ এবং ৫ জন যুদ্ধবন্দী হিসেবে গ্রেফতার হলেন। [পরবর্তী দিন এসব কয়েদীকে হযরত খালিদ (রা) মুক্ত করিয়ে নিলেন।]

যুদ্ধের প্রথম দিন রোমকদের জন্য অত্যন্ত তিক্ত বলে প্রমাণিত হলো। মুসলমানরা তাদের ওপর কয়েকবার জীবনবাজী রেখে হামলা করলো। কিন্তু রোমকরা সে হামলা প্রতিহত করে তাদেরকে পিছু হটিয়ে দিলো। এই যুদ্ধে মুসলমান মহিলারা প্রচণ্ড সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। একবার রোমকরা যখন হামলা করতে করতে মহিলাদের তাঁবু পর্যন্ত এসে পৌঁছলো তখন তাঁরা তাঁবুর খুঁটি উঠিয়ে নিয়ে তা দিয়ে কাফেরদের মুখ ফিরিয়ে দিলেন। যেসব মুসলমানের পা টল-টলায়মান হয়ে গিয়েছিল। তাদের মর্যাদাবোধ জাগ্রত করে মহিলারা বললেন যে, জাহেলী যুগে তোমরা হকের বিরুদ্ধে খুব লড়াই করেছ। এখন আল্লাহর পথে লড়াই করতে হচ্ছে। আর এখন তোমরা পা পিছিয়ে নিচ্ছ। একথা শুনে মুসলমানরা উল্টে দাঁড়ালো এবং এত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে লড়াই করলো যে, রোমকদেরকে পিছু হটিয়ে দিল। এসব মহিলার মধ্যে হযরত খাওলাও (রা) ছিলেন। তিনি হিন্দ (রা) বিনতে উতবা এবং অন্য মহিলাদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে যুদ্ধ গাথা পড়তেন এবং মুসলমানদেরকে যুদ্ধে উৎসাহ দিতেন। যুদ্ধের সময় মশহুর সাহাবী হযরত শুরাহবিল (রা) বিন হাসানার মুকাবিলা হলো এক বিরাট বপু সম্পন্ন রোমকের সঙ্গে। শুরাহবিল (রা) অধিক নামায ও রোযার কারণে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। রোমকরা তাকে মাটিতে ফেলে দিল এবং তার মাথা কেটে নিতে উদ্যত হলো। জিরার(রা) বিন আযওয়ার তীরের বেগে তাঁর মাথার নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং তরবারীর এক কোপেই জনৈক কাফেরের মাথা মাটিতে ফেলে দিলেন।

ঐতিহাসিক তাবারী এবং হাফেজ ইবনে কাছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, যুদ্ধকালে মুসলমানদের পরাজিত হওয়ার মত এক নাজুক অবস্থার সৃষ্টি হলো। সে সময় হযরত ইকরামা (রা) বিন আবি জেহেল সামনে অগ্রসর হয়ে উচ্চস্বরে বললেন ঃ

"হে খৃষ্টানরা! আমি কুফুরী অবস্থায় স্বয়ং রাসূলের (সা) বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। এখন আমি ইসলামের নিয়ামত লাভ করেছি। আমি কি করে তোমাদেরকে পৃষ্ঠদেশ দেখাতে পারি।"

একথা বলেই তিনি নিজের বাহিনীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন ঃ

"কে আমার হাতে মৃত্যুর বাইয়াত করবে।"

একথা শুনে চারশ' মুজাহিদ অগ্রসর হলেন। তাদের মধ্যে জিরারও (রা) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা ইকরামার (রা) হাতে মৃত্যুর বাইয়াত করলেন। অতপর তাঁরা হযরত খালিদের (রা) তাঁবুর সামনে এত উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং অটলতার সঙ্গে লড়াই করলেন যে, সেখানেই তাঁরা শহীদ হয়ে গেলেন।

এই বীরদের কুরবানী লড়াইয়ের মোড় পরিবর্তন করে দিল এবং খৃষ্টানদের বিরাট বাহিনীর এমন শিক্ষণীয় পরাজয় ঘটলো যে, তারা আর কোনদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) "ইসাবা"-তে মূসা বিন উকবা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত জিরার (রা) আজনাদাইনের যুদ্ধে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। কিন্তু তিনি এটা ব্যাখ্যা করে বলেননি যে, তিনি আজনাদাইনের কোন যুদ্ধে শহীদ হন। কেননা আজনাদাইনে দুইবার যুদ্ধ হয়। প্রথমবার হয় ১৩ হিজরীর পূর্বে ইয়ারমুকের যুদ্ধের আগে। আর দ্বিতীয়বার যুদ্ধ হয় ১৫ হিজরীতে ইয়ারমুকের যুদ্ধের পরে। কতিপয় ঐতিহাসিক যুদ্ধে হযরত জিরারের (রা) শাহাদাতের কথা একদম স্বীকারই করেন না। বরং তারা বলেন যে, ইয়ারমুকের যুদ্ধের পর হযরত জিরার (রা) হলব, ইন্তাকিয়া প্রভৃতি যুদ্ধেও বীরত্বের সঙ্গে অংশ নেন এবং অষ্টম হিজরীতে যখন সমগ্র সিরিয়ার বিজয় লাভ ঘটে তখন প্লেগ মহামারীতে ২৫ হাজার, অন্যান্য মুজাহিদের সঙ্গে তিনিও দামেস্কের নিকটে ইন্তেকাল করেন। তার বাহাদুর সহোদরা খাওলাও (রা) সেই প্লেগেই ওফাত পান। সিরিয়ার পূর্ব প্রান্তের দরজার বাইরে আজও দু'টি কবর রয়েছে। কবর দু'টি হযরত জিরার (রা) ও হযরত খাওলার (রা) বলে কথিত আছে।

হযরত আদি (রা) বিন হাতেম তাই

"আমিরুল মু'মিনীন! আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন?"

আধা বয়েসী এক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ মসজিদে নববীতে হযরত ওমর ফারুককে (রা) সম্বোধন করে একথা বলছিলেন। সেই ব্যক্তির পোশাক ছিল মলিন। চেহারায় ছিল ক্লান্তি ও বিস্ময়ের চিহ্ন। এটা ছিল ফারুকে আজমের (রা) খিলাফতের প্রথম দিকের ঘটনা। খিলাফতের বোঝা তাকে নীরব ও গম্ভীর বানিয়ে দিয়েছিল। আমিরুল মু'মিনীন সেই ব্যক্তির সঙ্গে প্রথা অনুযায়ী মুসাফিহা করলেন এতে তার সন্দেহ হলো যে, হযরত ওমর ফারুক (রা) তাকে চিনেনইনি। কিন্তু যেই তার মুখ দিয়ে প্রশ্নবোধক বাক্য উচ্চারিত হলো তখনই ফারুকে আজম (রা) তাঁর ওপর স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং খুব গম্ভীরভাবে বললেন ঃ

"হাঁ, হাঁ! আল্লাহর কসম! তোমাকে খুব ভালভাবেই চিনেছি। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে সুন্দর জ্ঞান দান করেছেন। আল্লাহর কসম! তুমি সেই সময় ঈমান এনেছ যখন বেশীর ভাগ মানুষ কুফর ও শিরকের অন্ধকারে পথভ্রষ্ট অবস্থায় ঘোরাফিরা করছিলো। তুমি সেই সময় সত্যের স্বীকৃতি দিয়েছ যখন মানুষ তা অস্বীকার করতো। তুমি সেই সময় ওয়াদা পূরণ করেছ যখন মানুষ তা করতো না। তুমি সেই সময় সামনে অগ্রসর হয়েছ যখন মানুষ পিছু হটছিলো। সর্বপ্রথম সাদকা যা রাসূল (সা) ও তাঁর সাহাবীদের মনে আনন্দের হিল্লোল বইয়ে দিয়েছিলো তা তোমার কবিলা তাই-এরই ছিল।"

আমিরুল মু'মিনীন (রা) কেবলমাত্র এতটুকুনই বলেছিলেন। এমন সময় নবাগত সাক্ষাতকারী বলে উঠলেন ঃ

"হে আমিরুল মু'মিনীন! আর বলতে হবে না—আমার জন্য এতটুকুনই যথেষ্ট।" ফারুকে আজমের (রা) সঙ্গে এই সাক্ষাতকারীর নাম ছিল আবু তোরায়েফ আদি তাই।

আবু তোরায়েফ আদি (রা) সেই প্রখ্যাত পিতার পুত্র ছিলেন যাঁর দানশীলতা, বীরত্ব, ভদ্রতা এবং অতিথি পরায়ণতার কথা সমগ্র আরব বিশ্বে সকলের মুখে মুখে ফিরতো। এটা অবশ্য ইসলামী যুগের কিছু দিনের আগের কথা। আমরা যাঁর কথা বলছি তিনি ছিলেন হাতেম তাই।

হযরত আদির (রা) গোত্র তাই দীর্ঘদিন যাবত ইয়েমেনে বসবাস করেছিলো এবং সেখানকার নেতৃস্থানীয় গোত্রসমূহের মধ্যে পরিগণিত হতো। এই গোত্র অনেক দিন যাবত খৃষ্ট ধর্ম পালন করে আসছিলো এবং খৃষ্টানদের রাকবী ফিরকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। হাতেম তাই ছিলো সেই গোত্রের সরদার। হযরত আদি (রা) বুদ্ধি হওয়ার সাথে সাথে নিজেকে অঢেল সম্পদ, শান শওকত ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের মাঝে দেখতে পেলো। রাসূলে আকরামের (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির কিছুদিন পূর্বে যখন হাতেম তাই মারা গেলো তখন তাই গোত্রের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব নিয়ম অনুযায়ী আদির (রা) ওপর ন্যস্ত হলো এবং ইসলামসূর্য অভ্যুদয়ের সময় তিনিই তাই গোত্রের সরদার ও শাসক ছিলেন। ইসলামের বিজয়সমূহ যখন সয়লাবের মত আরবের সবদিক প্লাবিত করে দিল তখন আদি (রা) নিজের ক্ষমতার সিংহাসনকে টল টলায়মান বলে অনুভব করলেন। তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হলেন যে, এই সয়লাব প্রতিরোধ করা তাঁর সাধ্যের ব্যাপার নয়। কিন্তু ক্ষমতার নেশা সহজে ছাড়ে না। সুতরাং ইসলামের ঝাণ্ডা সমুন্নত করার পরিবর্তে তিনি তখন যে কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তা তাঁর নিজের ভাষাতেই শোনা যায় ঃ

"রাসূলে আকরামের (সা) মদীনা হিজরতের পর সবদিক থেকে মানুষ ইসলামের সীমায় দাখিল হতে লাগলো। কিন্তু স্বদ্বীনের ওপর আমার পূর্ণ আস্থা ছিল। এদিকে প্রিয় নবীর (সা) বিজয়ের সীমা প্রতিদিন প্রশস্ত হতে লাগলো। তখন আমার অন্তরে নিজের হুকুমাত ও দ্বীন উভয় সম্পর্কে ভীতি সৃষ্টি হলো। সেই সময় এক দিন জনৈক ব্যক্তি মদীনা থেকে এসে আমাকে বললো যে, মুহাম্মাদ (সা) আমার সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, কোন একদিন তাই সরদার আদির হাত আমার হাতে থাকবে। আমি একথা শুনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম এবং একটি গোলামকে সবসময় সফরের সামান তৈরী রাখার নির্দেশ দিলাম। যাতে যখনই ইসলামী বাহিনীর আগমনের খবর পাবে তখনই যেন আমাকে খবর দেয়। একদিন সেই গোলাম সাত সকালে দৌড়ে আমার নিকট এলো এবং বললো যে, "প্রভু মুহাম্মাদের (সা) বাহিনী এগিয়ে আসছে।" ঘোড়ার ওপর জীন স্থাপন করা ছিলো এবং সফরের সামান বাধা ছিল। আমি আমার পরিবার-পরিজনকে সঙ্গে নিলাম এবং সোজা সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা দিলাম। সেখানে আমার খৃষ্টান ভাইয়েরা বসবাস করতো। আমি সেখানে "জাওসিয়া" (বস্তিতে) অবস্থান করলাম। বাড়ী থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় খুবই দ্রুততার সাথে কাজ করতে হয়েছিল। এ জন্য আমার বোন আমার থেকে অনেক পিছনে পড়ে গিয়েছিল এবং ইসলামী বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়েছিল।"

এই ঘটনা নবম হিজরীর সেই সময় সংঘটিত হয়েছিল যখন রাসূলে আকরাম (সা) হযরত আলীর (রা) নেতৃত্বে পঞ্চাশ জন মুজাহিদের একটি দল বনু তাইয়ের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন। গোত্র নেতা আদি ফেরার হয়ে গিয়েছিলেন। গোত্রের অন্যান্য সদস্যরা নামমাত্র বাধা দানের পর অস্ত্র সমর্পণ করেছিলো। যুদ্ধ বন্দীদের মধ্যে সাফানা (রা) বিনতে হাতেমও ছিলেন। তাদের সকলকে গনিমতের মালসহ মদীনা পৌঁছে দেয়া হয়েছিল।

মদীনায় যখন বনু তাইয়ের কয়েদীদেরকে রাসূলের (সা) খিদমতে পেশ করা হলো তখন সাফানা অগ্রসর হয়ে আরজ করলো ঃ

"হে সাহিবে কুরাইশ! আমি অসহায়ের প্রতি রহম করুন। পিতার স্নেহ ছায়া আমার মাথার ওপর থেকে সরে গেছে এবং ভাই আমাকে বন্ধু ও সাহায্যকারীহীন অবস্থায় রেখে পালিয়ে গেছে। আমার পিতা ছিলেন কবিলার সরদার। তিনি অভুক্তদের খাবার খাওয়াতেন। এতিমদের অভিভাবকত্ব করতেন। অভাবগ্রস্তদের অভাব পূরণ করতেন। প্রতিবেশীদের হক আদায় করতেন। কয়েদীদেরকে মুক্ত করাতেন। অসহায়দেরকে সাহায্য করতেন। মজলুমদেরকে সহযোগিতা দিতেন এবং জালেমদের মন্দকাজের শাস্তি দিতেন। আমি সেই হাতেম তাইয়ের কন্যা। যার নিকট থেকে কোন সায়েল শূন্য হাতে ফিরে যায়নি। হুজুর যদি উপযুক্ত মনে করেন তাহলে আমাকে মুক্তি দিতে পারেন। তাতে আমার কারণে আরবের জাতীয় কিংবদন্তীর ওপর কলংক লেপন হবে না।"

হুজুর (সা) সাফানার (রা) কথা শুনে ইরশাদ করলেন ঃ "হে মহিলা! তোমার পিতার যে গুণাবলীর কথা বর্ণনা করেছ তাতো মুসলমানদের সঙ্গেই বিশষভাবে সংশ্লিষ্ট। তোমার পিতা যদি জীবিত থাকতেন তাহলে আমি তাঁর সাথে ভাল ব্যবহার করতাম।"

অতপর তিনি সাহাবায়ে কিরামকে (রা) সম্বোধন করে বললেন ঃ "এই মহিলাকে ছেড়ে দাও। সে একজন উত্তম চরিত্রসম্পন্ন পিতার কন্যা। কোন সম্মানিত ব্যক্তি অপমানিত হলে এবং কোন বিত্তবান মানুষ অভাবী হলে অথবা কোন আলেম জাহেলদের মধ্যে ফেঁসে গেলে তাহলে তাঁর সেই অবস্থার ওপর ভীতি প্রকাশ করো।"

হুজুরের (সা) ইরশাদ অনুযায়ী সাফানাকে (রা) মুক্ত করে দেয়া হলো। কিন্তু সে স্বস্থানে দাঁড়িয়ে রইলো। হুজুর (সা) জিজ্ঞেস করলেন, "কি ব্যাপার, আর কিছু বলার আছে?"

সাফানা (রা) আরজ করলেন ঃ "হে মুহাম্মাদ! আমি যে পিতার কন্যা তাঁর এটা নিয়ম ছিল না যে, কওম মুসিবতে আপতিত হবে এবং সে সুখের নিদ্রা যাবে। আপনি যখন আমার ওপর দয়া প্রদর্শন করেছেন তখন আমার সঙ্গীদের ওপরও দয়া প্রদর্শন করুন। আল্লাহ আপনাকে প্রতিদান বা জাযা দিবেন।"

হুজুর (সা) সাফানার (রা) আবেদনে খুব প্রভাবিত হলেন এবং সকল তাই কয়েদীকে মুক্তিদানের নির্দেশ দিলেন। ফলে সাফানার (রা) মুখ দিয়ে অযাচিতভাবে একথা বেরিয়ে এলো ঃ

"আল্লাহ আপনার নেকীকে সেই ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছাবেন যে তাঁর যোগ্য। আল্লাহ আপনাকে কোন খারাব বস্তুর মুখাপেক্ষী যেন না করেন এবং কোন দানশীল বা উদার কওম থেকে যদি কোন নিয়ামত ছিনিয়ে নেয়া হয়, তা যেন আপনার মাধ্যমে ফিরিয়ে দেন।"

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, সাফানা যখন প্রথমবার হুজুরের (সা) নিকট নিজের মুক্তির জন্য দরখাস্ত করেছিল তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার অভিভাবক কে ছিল?"

জবাবে সাফানা (রা) বললো, "আদি বিন হাতেম। আমি তাঁর সহোদরা।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "সেই আদি যে আল্লাহ ও রাসূল থেকে ভেগে গেছে?"

সাফানা ইতিবাচক জবাব দিলে হুজুর (সা) কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই চলে গেলেন। পরের দিনও হুজুর (সা) এবং সাফানার (রা) মধ্যে একই ধরনের কথোপকথন হলো। কিন্তু হুজুর (সা) কোন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন না, তৃতীয় দিন সাফানা (রা) পুনরায় একই আবেদন জানালো। এবার হযরত আলীও (রা) তাঁর পক্ষে সুপারিশ করলেন। রাসূলে আকরাম (সা) এবার তাঁর দরখাস্ত কবুল করলেন এবং সাফানাকে মুক্তির নির্দেশ দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইরশাদ করলেন যে, এখন দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করো না। ইয়েমেন গমনকারী কোন বিশ্বস্ত মানুষ পাওয়া গেলে আমাকে খবর দিও।

কিছুদিন পর ইয়েমেনের বাল্লি অথবা কাজায়া গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল মদীনা এলো। সাফানা (রা) হুজুরের (সা) নিকট সেই দলের ফেরার সময় তাকে তাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেয়ার অনুরোধ জানালেন। সুতরাং হুজুর (সা) সাফানার (রা) মর্যাদা অনুযায়ী সওয়ারী, পোশাক এবং পাথেয়'র ব্যবস্থা করে তাঁকে কাফেলার সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন।

সাফানা (রা) আদির (রা) বাসগৃহ সম্পর্কে জানতেন। তিনি মদীনা মুনাওয়ারা থেকে সোজা "জাওশিয়া" পৌঁছলেন। ভাই-বোনের সাক্ষাত কিভাবে হয়েছিল তা হযরত আদির (রা) ভাষায় শোনা যাক ঃ

"একদিন জাওশিয়াতে আমাদের বাড়ীর সামনে একটি উষ্ট্রী এসে থেমে গেল। হাওদাতে একজন নিকাবপোশ মহিলা বসে ছিলো। সে আমার বোন বলে আমার সন্দেহ হলো। কিন্তু পরে ধারণা হলো যে, তাকেতো মুসলমানরা বন্দী করে নিয়ে গেছে। সে এভাবে কি করে আসতে পারে! তৎক্ষণাৎ হাওদার পর্দা উঠলো এবং এই কথা আমার কানে এলো ঃ

"জালেম, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী, তোমার ওপর থু। নিজের পরিবার পরিজন নিয়ে এসেছ এবং হাতেমের কন্যাকে একাকী রেখে এসেছ।"

বোনের কথা শুনে আমি খুব লজ্জিত হলাম। নিজের ভুল স্বীকার করলাম এবং ক্ষমা চাইলাম। বোন চুপ মেরে গেল। তারপর সওয়ারী থেকে নেমে যখন কিছুক্ষণ আরাম করলো তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ "সাহিবে কুরাইশ কেমন মানুষ?" বোন জবাবে বললো ঃ

"যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, তুমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করো। যদি তিনি নবী হয়ে থাকেন তাহলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করা তোমার জন্য গৌরবের ব্যাপার হবে এবং যদি বাদশাহও হন তাহলেও শীঘ্র সাক্ষাত তোমার জন্য মর্যাদার ওসিলা হবে।"

আমি বোনের মুখে একথা শুনেই ঘোড়ার জীন বাঁধলাম এবং সোজা মদীনা যাত্রা করলাম।

হযরত আদি (রা) মদীনা পৌঁছলেন। এ সময় অনেকেই তাঁকে চিনে ফেললেন এবং আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠলেন ঃ "আরে এতো আদি বিন হাতেম।" কেউ তাঁর সঙ্গে কোন বাদানুবাদ করলো না এবং তিনি সোজা মসজিদে নববীতে রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে হাজির হলেন। হুজুর (সা) তাঁর নাম জিজ্ঞেস করলেন এবং তারপর তাঁর হাত নিজের পবিত্র হাত দিয়ে ধরে বাড়ীর দিকে রওয়ানা করলেন। পথিমধ্যে একজন বৃদ্ধা মহিলা এবং একজন যুবক তাঁর গতিরোধ করে দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। যখন তাঁরা স্বয়ং আলোচনা শেষ করলো তখন হুজুর(সা) সামনে অগ্রসর হলেন। হযরত আদি (রা) এই ঘটনা দেখে খুব বিস্মিত হলেন এবং ধারণা করলেন যে, দুনিয়ার কোন বাদশাহ এই ধরনের আচরণ করতে পারে না। বাড়ী পৌঁছে হুজুর (সা) খুব অনুনয় ও বিনয়ের সঙ্গে

তাকে চামড়ার গদির ওপর বসালেন এবং নিজে মাটির ওপর বসে পড়লেন। হুজুরের (সা) উদার চরিত্র দেখে হযরত আদির (রা) পূর্ণ আস্থা জন্মালো যে, তিনি দুনিয়ার কোন বাদশাহ নন। তারপর বিশ্ব নবী (সা) এবং হযরত আদির (রা) মধ্যে আলোচনা শুরু হলো। সেই আলোচনার বিস্তারিত স্বয়ং হযরত আদি (রা) পরে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) ঃ "হে আদি। তুমি আজ পর্যন্ত দ্বীনে ইসলাম থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছ। অথচ এই দ্বীন প্রতিটি পদক্ষেপেই নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করে থাকে।"

আদি (রা) ঃ "আমি খৃষ্ট ধর্মের অনুসারী এবং আমার দ্বীনও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করে থাকে।"

রাসূলুল্লাহ (সা) ঃ "আমি তোমার দ্বীনকে তোমার চেয়ে বেশী বুঝি।"

আদি (রা) ঃ (বিস্মিত হয়ে) আপনি কি আমার দ্বীনকে আমার চেয়ে বেশী বুঝেন?"

রাসূলুল্লাহ (সা) ঃ "অবশ্যই। তুমি কি রুকবী নও এবং নিজের কওমের নেতা হিসেবে তাদের উৎপাদনের চতুর্থাংশ গ্রহণ কর না?"

আদি (রা) ঃ "জ্বী, হাঁ। আমি রুকবী এবং এলাকার উৎপাদনের চতুর্থাংশ ওসুল করে থাকি।"

রাসূলুল্লাহ (সা) ঃ "চতুর্থাংশ গ্রহণ কি খৃষ্ট ধর্মে বৈধ?"

হুজুরের এই প্রশ্নের কোন জবাব আমি দিতে পারিনি। কেননা চতুর্থাংশ গ্রহণ খৃষ্ট ধর্মে প্রকৃতপক্ষেই অবৈধ ছিল। তারপর রাসূলে আকরাম (সা) বললেন ঃ

"হে আদি। দ্বীনে হক গ্রহণ না করার পেছনে তোমার একটি ধারণা কাজ করছে। তুমি মনে করে থাকো যে, মুসলমানরা একটি গরীব জাতি এবং তাদের কোন সচ্ছলতা নেই। কিন্তু খুব শীঘ্রই তোমরা দেখতে পাবে যে, এই মুসলমানরাই কিসরা বিন হুরমুজের ধনাগার দখল করে নেবে।"

আমি ঃ (বিস্মিত হয়ে) কিসরা বিন হুরমুজ?

রাসূলুল্লাহ (সা) ঃ "হাঁ, কিসরা বিন হুরমুজ এবং ধন-সম্পদের এতো আধিক্য হবে যে, লোকজনকে তা দান করা হবে। কিন্তু তাঁরা তা নিতে অস্বীকার করবে এবং কিসরার কায়সরে আবইয়াজের ওপরও মুসলমানদের দখল হবে।"

[আদি (রা) বলেন, কয়েক বছর পর এসব কিছু আমার চোখের সামনে সংঘটিত হলো এবং যে বাহিনী কিসরার রাজধানী মাদায়েন ও তাঁর কাসরে আবইয়াজ দখল করলো তাতে আমি স্বয়ং শামিল ছিলাম।]

অতপর রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "হে আদি! তুমি কি হিরা দেখেছ?"

আমি ঃ "আমি কখনো হিরা যাইনি বটে। তবে, অবশ্যই তাঁর নাম শুনেছি।"

রাসূলুল্লাহ (সা) ঃ "হে আদি! সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন রয়েছে। সেই সময় আসছে যখন (ইসলামের বরকতে) একজন পর্দানশীল মহিলা (কোন মুহাফিজ ছাড়া) হিরা থেকে এসে কাবার তাওয়াফ করবে এবং কেউই তাঁর প্রতি চোখ উঠিয়ে দেখবেও না।"

[আদি (রা) বলেন, কয়েক বছর পর আমি স্বচক্ষে এই দৃশ্য অবলোকন করি। আমি দেখলাম যে, একজন পর্দানশীল মহিলা একাকী হিরা থেকে এসে কা'বা তাওয়াফ করলো এবং তারপর তেমনিভাবে স্বদেশ ফিরে গেল।]

এই আলোচনার পর হযরত আদি (রা) কালবিলম্ব না করে ইসলাম গ্রহণ করলেন। হুজুর (সা) তাঁর ইসলাম গ্রহণে খুব খুশী হলেন এবং নিজের পক্ষ থেকে তাঁর কবিলা তাইয়ের ইমারাত অর্পণ করলেন। তারপর তিনি প্রায়ই রাসূলের দরবারে হাজির হতেন এবং যতদূর সম্ভব নবীর (সা) ফয়েজে অভিষিক্ত হতেন।

বিশ্ব নবীর (সা) ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খিলাফতের আসনে সমাসীন হন। এ সময় সমগ্র আরবে কয়েকবার ধর্মদ্রোহিতার আগুন প্রোজ্জলিত হয়ে উঠে এবং অধিকাংশ গোত্র যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। হযরত আদি (রা) এই সাজুক এবং ভয়ংকর যুগে পূর্ণ অটলতা প্রদর্শন করেন। তিনি নিজেই শুধুমাত্র অটল থাকেননি বরং নিজের কবিলাকেও এই ফিতনা থেকে হিফাজত রাখেন। ফিতনা যখন চরম পর্যায়ে তখন তিনি একবার রাতের বেলা নিজের কওমের যাকাত নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছেন। কিন্তু সে সময় পদে পদে ছিল ভয়। তিনি নিজের জীবনকে মারাত্মক ঝুকির মধ্যে নিক্ষেপ করেন। তবে, যাকাত প্রেরণে বিলম্ব করাকে সহ্য করেননি।

হযরত ওমর ফারুকের (রা) শাসনামলে হযরত আদি (রা) স্বগোত্রের সঙ্গে ইরাক ও সিরিয়াতে অনেক যুদ্ধে বীরের মত অংশগ্রহণ করেন। ইরাকের

যুদ্ধসমূহ তিনি প্রথমে হযরত মুছান্না (রা) এবং তারপর হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে লড়াই করেন। তিনি সেই সকল মুজাহিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা কিসরার কোষাগার দখল করেছিলেন। এমনিভাবে তিনি রাসূলে আকরামের (সা) ভবিষ্যদ্বাণী নিজের চোখের সামনেই বাস্তবায়িত হতে দেখেন। সিরিয়ার কয়েকটি যুদ্ধে তিনি হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের সাথে বীরত্বের সঙ্গে অংশ নেন।

হযরত উসমান জুন্নুরাইনের (রা) খিলাফতকালে হযরত আদি (রা) নির্জনত্ব অবলম্বন করেন। কেননা কতিপয় ব্যাপারে হযরত উসমানের (রা) সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ছিল। তিনি প্রকৃতিগত দিক দিয়ে ছিলেন নেক স্বভাবের মানুষ। এ জন্য হাঙ্গামার পরিবর্তে তিনি রাজনৈতিক তৎপরতা থেকে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কহীন থাকাটাই উপযুক্ত মনে করলেন। অবশ্য মুরতাজার খিলাফতকালে তিনি হযরত আলীর (রা) পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। উষ্ট্রের যুদ্ধে হযরত আলীর (রা) সমর্থনে লড়াই করতে করতে তাঁর একটি চোখ ফুটো হয়ে যায় এবং মুহাম্মাদ নামক তাঁর এক পুত্র শহীদ হন। সিফ্‌ফিনের যুদ্ধেও তিনি হযরত আলী মুরতাজাকে (রা) জীবন বাজী রেখে সমর্থন করেন এবং এই প্রসঙ্গে সংঘটিত সকল যুদ্ধে এমন অটলতা ও বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন যে, স্বয়ং শেরে খোদা তাঁকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং তাঁর খিদমতের স্বীকৃতি দেন। সিফ্‌ফিনের পর খারেজীদের বিরুদ্ধে নাহরোয়ানের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধেও হযরত আদি হযরত আলীর (রা) বন্ধুত্বের হক আদায় করেন। এই যুদ্ধে তাঁর দ্বিতীয় আরেক পুত্র বীরত্ব প্রদর্শন করতে করতে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। মোটকথা তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হযরত আলীর (রা) জান নিছারদের অন্যতম ছিলেন। হযরত আলীর (রা) শাহাদাতের পর হযরত আদি (রা) কুফাতে নির্জনত্ব গ্রহণ করেন এবং ৬৭ হিজরীতে এখান থেকেই আখিরাতের সফরে যাত্রা করেন। এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল ১২০ বছর।

হযরত আদির (রা) নিকট থেকে ৬৬টি হাদিস বর্ণিত আছে। শায়খাইন(হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর) এবং হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর সাহচর্যের ফয়েজে তিনি দ্বীনি জ্ঞানে প্রচুর দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত আবেদ ও যাহেদ ছিলেন। সবসময় ওজুতে থাকতেন। নামায ও রোযায় বিশেষ আকর্ষণ ছিলো।

হযরত আদি (রা) শুধুমাত্র নিজের কওমেই সম্মানিত ছিলেন না বরং অন্যান্য গোত্রের লোকও তাঁকে সম্মান করতো। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি

যখন রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে হাজির হতেন তখন হুজুরের (সা) পবিত্র চেহারায় প্রফুল্লতা দেখা যেতো এবং তিনি তাঁর জন্য নিজের স্থান ছেড়ে দিতেন। হক কথন এবং স্পষ্টবাদিতা ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষ গুণ। হযরত আলীর (রা) পর আমীর মুয়াবিয়া (রা) তাঁর সাথে কোন ঝগড়া বিবাদ করেননি। তাসত্ত্বেও একবার তাঁর সঙ্গে হযরত আদির (রা) সাক্ষাত হলো। এ সময় তিনি তাঁকে হযরত আলীর (রা) সাহচর্যের গালি দিলেন। হযরত আদি (রা) বাস্তবত রাজনীতি থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই অপবাদ বরদাশত করতে পারলেন না এবং বজ্রপাতের মত বললেন ঃ

"আল্লাহর কসম! যে অন্তর তোমার বিরোধিতা করতেন, এখন পর্যন্ত আমার পাশে রয়েছে এবং সেই সব তরবারী যা দিয়ে আমরা তোমার বিরুদ্ধে লড়াই করেছি তাও এখন পর্যন্ত আমাদের দখলে আছে। তুমি যদি আমাদের সঙ্গে খারাপ কিছু করতে চাও তাহলে আমরা তাঁর মুকাবিলা করবো। আমরা আলী (রা) বিন আবি তালিবের বিরুদ্ধে কোন কঠোর কথা শোনার চেয়ে মৃত্যুকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি।"

আমীর মুয়াবিয়া (রা) অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও বিজ্ঞ মানুষ ছিলেন। তিনি উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"আদির কথা খুব সঠিক কথা। তা লিখে রাখো।"

অতপর তিনি দীর্ঘক্ষণ হযরত আদির (রা) সঙ্গে খুব নরম ও স্নেহপূর্ণ আলোচনা করলেন। হক কথনের সঙ্গে হযরত আদির (রা) মধ্যে সাহসিকতা ও প্রতিশ্রুতি পূরণের গুণও প্রচুর পরিমাণে ছিল। যে যুগে তিনি কুফায় নির্জনত্ব অবলম্বন করেছিলেন, সেই যুগে কুফার গভর্ণর যিয়াদ এক ষড়যন্ত্র প্রসঙ্গে তাঁর চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ বিন খলিফাতুত তাইকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিলো। তিনি হযরত আদির (রা) নিকট আশ্রয় নিলেন। যিয়াদ হযরত আদির (রা) নিকট জিজ্ঞেস করলো এবং বললো, "আবদুল্লাহকে আমার হাওয়ালা করে দাও। নচেৎ তোমার ভাল হবে না।"

হযরত আদি (রা) তাঁর চোখে চোখ রেখে জবাব দিলেন ঃ

"তুই চাস যে, আমি তাকে তোঁর হাওয়ালা করে দিই। আর তুই তাকে হত্যা করবি। আল্লাহর কসম! আমি তা কখনই করতে পারবো না।" যিয়াদ হযরত আদিকে (রা) গ্রেফতার করে জেলখানায় নিক্ষেপ করলো। তাতে জনগণের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হলো এবং একটি প্রতিনিধিদল যিয়াদের নিকট গিয়ে বললো, "এটা খুব ক্রোধের কথা যে, তুই আসহাবে রাসূল (সা) এবং

তাই কবিলার সরদারের সঙ্গে এ ধরনের আচরণ করছিস।" যিয়াদ জনগণের অসন্তুষ্টিতে ভীত হয়ে তৎক্ষণাৎ হযরত আদিকে (রা) মুক্ত করে দিলো এবং আর কোন দিন তাঁকে উত্যক্ত করেনি।

হযরত আদি (রা) পৈত্রিকসূত্রে দানশীলতা ও ক্ষমার গুণ পেয়েছিলেন। কোন সায়েল বা ভিক্ষুক তাঁর দরজা থেকে শূন্য হাতে ফিরে যেতো না। লোকদেরকে থলে ভরে ভরে দিতেন। যদি কোন ব্যক্তি তাঁর মর্যাদার চেয়ে কম পরিমাণ চাইতো তাহলে তাকে দান করতে অস্বীকৃতি জানাতেন। একবার জনৈক ব্যক্তি একশ' দিরহাম চাইলে জবাব দিলেন, "আমি হাতেম তাই'র পুত্র। আর তুমি আমার কাছে শুধুমাত্র একশ' দিরহাম চাইছো। খোদার কসম! (এত কম পরিমাণ) কখনই দেব না।"

একবার আশয়াছ বিন কায়েস ড্যাগ চাইলো। হযরত আদি (রা) পূর্ণ করে তা তাঁর নিকট প্রেরণ করলেন। আশয়াছ বলে পাঠালেন যে, সেতো খালি ড্যাগ চেয়েছিলো। হযরত আদি (রা) তাকে জবাব পাঠালেন যে, শূন্য ড্যাগ কাউকে প্রদান করা তাঁর আদত বিরোধী। মোটকথা, এক বিশ্ব তাঁর দানশীলতায় উপকৃত হতো। এমনকি পিপড়েদের জন্যও তাঁর তরফ থেকে খাদ্য নির্ধারিত ছিল। আল্লামা ইবনে আবদুল বার (র) তাঁর ব্যাপারে এই মত প্রকাশ করেছেন যে, "আদি (রা) নিজের কওমের সম্মানিতদের মধ্যে ছিলেন। তিনি ছিলেন সুবক্তা, সুশিক্ষিত এবং উপস্থিত জবাব দানকারী ও ক্ষমাশীল।"

হযরত জারির (রা) বিন আব্দুল্লাহ আল বাজলী

মক্কা বিজয় ও হুনাইনের যুদ্ধের পর (অষ্টম হিজরী) ইসলামের ইতিহাসের এক নতুন মোড় পরিলক্ষিত হয় এবং এই মোড়ে وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا - (النصر ٢) এর চিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আরবের প্রতিটি কোণ থেকে বিভিন্ন এলাকা ও কবিলার প্রতিনিধি দল (Deputations) উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে রাসূলের (সা) দরবারে উপস্থিত হতে লাগলো। কেউ আসতে লাগলো ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে। কেউ আসতে লাগলো দ্বীনের আহকাম শেখার জন্য। আবার কেউ বা এলো সন্ধি ও শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে।

দশম হিজরীর পবিত্র রমযানের একদিন তেমনি ধরনের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় এতো শান শওকতে আগমন করলো যে, তা দেখে মদীনাবাসী বিস্মিত হয়ে গেল। প্রতিনিধি দলের সকল সদস্যই অত্যন্ত সুন্দর পোশাকে সজ্জিত ছিল এবং সকলের কাঁধে মূল্যবান ইয়েমেনী চাদর শোভা পাচ্ছিল। এই দলের নেতৃত্ব করছিলেন এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের যুবক। তাঁর শরীরের রং এবং চেহারা সুরত ইঙ্গিত দিচ্ছিল যে, তিনি কোন উঁচু খান্দানের সদস্য। প্রতিনিধি দলটি রাসূলের (সা) দরবারে উপস্থিত হলে হুজুর (সা) তাদের আচার-আচরণে খুব খুশী হলেন। তাঁদেরকে আহলান সাহলান ওয়া মারহাবা বললেন এবং প্রতিনিধি দলের জন্য নিজের মুবারক চাদর বিছিয়ে দিলেন। অতপর মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"তোমাদের নিকট যখন কোন কওমের সম্মানিত ব্যক্তি আসবে তখন তাদের সম্মান করো।"

তারপর সুন্দর যুবককে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "এখানে তোমাদের আগমনের হেতু কি?" আরজ করলেন ঃ "ইসলাম গ্রহণের জন্য।"

হুজুরের (সা) পবিত্র চেহারায় উৎফুল্লতা ছেয়ে গেল এবং বললেন ঃ "ঠিক আছে, তাহলে তুমি আমার নিকট বাইয়াত করো যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যে নামায তোমাদের ওপর ফরজ করা হয়েছে তাঁর পাবন্দী কর। নির্ধারিত যাকাত যথাযথভাবে আদায় কর। সবসময়

মুসলমানদের কল্যাণ কামনা এবং সহমর্মিতা প্রকাশ কর। কেননা যে কারোর ওপর রহম করে না আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করে না। নিজের আমীরের আনুগত্য কর। যদি সে হাবশী গোলামও হয়।"

প্রতিনিধি দলের নেতা নির্দ্বিধায় বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি এসব কথার ইকরার করলাম।আপনার পবিত্র হাত এগিয়ে দিন।"

হুজুর (সা) মুচকি হেসে তাঁর বাইয়াত নিলেন এবং সেই সঙ্গে প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যও কালেমায়ে শাহাদাত পড়ে হকপন্থীদের দলে শামিল হয়ে গেলেন। যাদের ব্যাপারে রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আনহু বলা হয়েছে।

এই ভাগ্যবান যুবক, যাঁর জন্য হুজুর (সা) নিজের পবিত্র চাদর বিছিয়ে দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন হযরত জারির (রা) বিন আবদুল্লাহ আল বাজলী।

আবু ওমর জারির (রা) বিন আবদুল্লাহ আল বাজলী বাজিলা গোত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই গোত্রের লোকজন আরবের বিভিন্ন জেলায় বসবাস করতো। তিনি নিজের এলাকার বনু বাজিলার সরদার ছিলেন। জারিরের (রা) প্রপিতামহরা কোন এক যুগে ইয়েমেনের শাসক ছিলেন। এ জন্য তাঁদের শিরায় ছিল শাহী খুন এবং স্বদেশে তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো। নসবনামা হলো ঃ

জারির (রা) বিন আবদুল্লাহ বিন জাবের বিন মালিক বিন নাজার বিন ছালাবা বিন জাশাম বিন আওফ বিন খুযায়মা বিন হারব বিন আলী বিন মালিক বিন সায়াদ বিন নাযির বিন কাসার বিন আবকার বিন আনমার বিন আরাশ বিন আমর বিন গাওছ বাজলী।

রাসূলের (সা) শেষ যুগে জারির (রা) মুসলমান হয়েছিলেন। এ জন্য নবীর(সা) আমলের যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণে মাহরুম রয়ে গিয়েছিলেন। তবুও তিনি বিদায় হজ্জে রাসূলের (সা) সঙ্গে অংশ নেন এবং হুজুরের (সা) নির্দেশে একটি সারিয়্যাহ বা যুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদানের সৌভাগ্যও অবশ্যই লাভ করেন।

এই যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে মূর্তি ভাঙ্গার একটি অভিযান ছিল। যুদ্ধটি কবে সংঘটিত হয়েছিল? এ ব্যাপারে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়। তাবকাতে ইবনে সায়াদের রেওয়ায়াত অনুযায়ী এই যুদ্ধ হযরত জারিরের (রা) বাইয়াতের অব্যবহিত পরই (অর্থাৎ বিদায় হজ্জের পূর্বে) সংঘটিত হয় এবং সেই অভিযানের সাফল্যের খবর হযরত জারির (রা) স্বয়ং ফিরে এসে হুজুরকে (সা) দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে সহীহ বুখারীতে আছে যে, এই যুদ্ধ বিদায়

হজ্জের পরে সংঘটিত হয় এবং তাঁর বিজয়ের খবর হুজুরকে প্রদান করেছিলেন জারিরের (রা) দূত। তাঁর কিছুদিন পরই হুজুর (সা) ওফাত পান।

তাবকাতের বর্ণনার সংক্ষিপ্ত সার নিম্নরূপ ঃ

হযরত জারির (রা) যখন রাসূলে আকরামের (সা) নিকট বাইয়াত করলেন তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"জারির, তোমার কওমের যারা মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাঁরা নিজেদের মূর্তির সাথে কেমন আচরণ করলো?"

জারির (রা) ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ ইসলামকে বিজয় দান করেছেন। মসজিদ ও মরুভূমিতে তাওহীদের আওয়াজ (আজান) উত্থিত হয়েছে। এ সময় তাঁরা নিজেদের মূর্তিকে ভেঙ্গে ফেলেছে।"

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ "তোমাদের মন্দির জিল-খালসার কি অবস্থা?"

জারির (রা) ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! এখনো তা আছে। আমরা যখন ফিরে যাবো তখন তা ধ্বংস করে ফেলবো।"

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ "হাঁ, তোমরা যাও এবং তা ধ্বংস করে আমাকে খবর দিও।"

হযরত জারির (রা) তৎক্ষণাৎ সঙ্গীদেরসহ এই অভিযানে রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং কিছুদিন পর হুজুরের (সা) খিদমতে ফিরে এসে আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা জিল-খালসাকে ধ্বংস করে তাতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছি। এখন তা মাটির ঢিবি। কেউ আমাদের কাজে বাধা প্রদানে সাহস করেনি।"

সারওয়ারে আলম (সা) এই খবর পেয়ে খুব খুশী হলেন এবং তিনি হযরত জারির (রা) এবং তাঁর সঙ্গীদেরসহ দোয়া করলেন।

সহীহ বুখারীতে এই অভিযান সম্পর্কে দু'টি রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে। এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী যে মন্দির ধ্বংসের কাজ হযরত জারিরের (রা) হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল তাঁর নাম ছিল জিল-হালিফা। দ্বিতীয় রেওয়ায়াতে তাঁর নাম জিল-খালসা বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের নিকট সঠিক নাম জিল-খালসাই। কেননা তাতে রক্ষিত মূর্তিসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ মূর্তির নাম ছিল "খালসা।" হযরত জারির (রা) বলেন যে, জিল-খালসা খাছয়াম ও বাজিলা গোত্রের তৈরী একটি গৃহের নাম ছিল। তাতে অনেক মূর্তি ছিল এবং লোকজন তাকে কা'বায়ে ইয়ামানিয়া বলতো। একদিন আমি রাসূলে আকরামের (সা)

খিদমতে হাজির হলাম। তিনি বললেন ঃ "জারির (রা) জিল-খালসা আর কতদিন পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে। তুমি কি তা ধ্বংস করে আমাকে তৃপ্ত করবে না?" হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে তৎক্ষণাৎ আহমাস গোত্রের একশ পঞ্চাশ জন সওয়ার নিয়ে সেই অভিযানে গমনের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম। এসব মানুষ ঘোড় সওয়ারীতে খুব পটু ছিল এবং আমি ঘোড়ার ওপর মজবুতভাবে বসে থাকতে পারতাম না। আমি হুজুরের (সা) নিকট নিজের সমস্যার কথা বর্ণনা করলাম। তখন তিনি আমার বুকের ওপর নিজের পবিত্র হাত এত জোরে মারলেন যে, তাঁর আঙ্গুলের ছাপ আমার বুকের ওপর পড়ে গেল এবং তিনি দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ, তুমি তাকে (জারির) ঘোড়ার পিঠের ওপর কায়েম রেখো এবং হেদায়াত প্রাপ্ত রাহবার (হাদি এবং মাহদী) বানিয়ে দাও।" অতপর আমরা নিজেদের মনযিলে মাকসুদে রওয়ানা হয়ে গেলাম। যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন জিল-খালসাকে ফেলে দিয়ে আগুন লাগিয়ে দিলাম এবং এই খবর দানের জন্য একজন দূতকে রাসূলের(সা) খিদমতে প্রেরণ করলাম। সেই দূত [হযরত আবু আরতাত (রা)] হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! সেই আল্লাহর কসম যিনি আপনাকে সত্য রাসূল বানিয়ে প্রেরণ করেছেন। জিল-খালসাকে জ্বালিয়ে না দেয়া পর্যন্ত আমি আপনার নিকট আগমন করিনি।"

হুজুর (সা) এই সুসংবাদ শুনে খুব খুশী হলেন এবং তিনি এই অভিযানে পদব্রজে ও সওয়ারের ওপর গমনকারীর জন্য পাঁচবার বরকতের দোয়া করলেন।

বুখারীর অন্য আর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, জারির (রা) ইয়েমেনেই ছিলেন, এমন সময় রাসূলের (সা) ইন্তেকাল হয়। হুজুরের (সা) ইন্তেকালের তিন দিন পর তিনি আমর নামক একজন ইয়েমেনীর নিকট এই খবর শুনে অস্থির এবং শোকাভিভূত হয়ে পড়লেন এবং তৎক্ষণাৎ মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে কতিপয় সওয়ার মদীনার দিক থেকে আসতে দেখলেন। তাঁরা এই শোকাবহ খবরের সত্যতা স্বীকার করলেন এবং একথাও বললেন যে, হুজুরের (সা) ওফাতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খিলাফতের মসনদে আসীন হয়েছেন।

এই রেওয়ায়াত এখানেই শেষ হয়ে যায়। তবে, তা থেকে স্পষ্ট ধারণা জন্মে যে, হযরত জারির (রা) মদীনা পৌঁছে হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) বাইয়াত করেন এবং তার পর স্বদেশ ফিরে আসেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) শাসনামলে মুসলমানরা যখন ইরাক ও সিরিয়ায় সেনা অভিযান পরিচালনা করেন তখন হযরত জারির (রা) ইয়েমেন থেকে মদীনা এলেন এবং সিদ্দীকে আকবারের (রা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ

"হে রাসূলের খলিফা! আমি একবার রাসূলের (সা) নিকট আবেদন করেছিলাম যে, বিচ্ছিন্ন বাজিলা গোত্রকে একত্রিত করে তাঁর নেতৃত্ব আমার ওপর ন্যস্ত করুন। হুজুর (সা) এই আবেদন কবুল করেছিলেন। কিন্তু তা বাস্তবায়নের সুযোগ না আসতেই হুজুর (সা) ওফাত পান। আপনি যদি এখন সেই কাজ করতে পারেন তাহলে আমার কওমও জিহাদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের যোগ্য হয়ে যাবে।"

হযরত সিদ্দীকে আকবার (রা) বললেন ঃ "এখন আমরা সিরিয়া ও ইরাকের যুদ্ধে ব্যস্ত রয়েছি। এ জন্য এ সমস্যা বর্তমানে সমাধান ছাড়াই থাক।"

সুতরাং জারির (রা) ইয়েমেন ফিরে গেলেন। কিছুদিন পর সিদ্দীকে আকবার (রা) ইন্তেকাল করলেন এবং হযরত ওমর ফারুক (রা) খিলাফতের আসনে সমাসীন হলেন। তাঁর খিলাফতের প্রথম যুগে (ত্রয়োদশ হিজরীর রমযান মাসে) জাসারের দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হলো। তাতে ভুল তদবিরের কারণে ইরানীদের হাতে মুসলমানদেরকে চরম পরাজয় বরণ করতে হলো এবং সেনাপতি হযরত আবু ওবায়েদ ছাকাফীসহ (র) হাজার হাজার মুসলমান শহীদ হয়ে গেলেন। হযরত ওমর (রা) এই দুঃখজনক ঘটনার সংবাদ পেয়ে খুব দুঃখীত হলেন এবং সমগ্র আরবে তিনি খতিব ও নকীব প্রেরণ করলেন। এসব খতিব ও নকীব আগুন ঝরা বক্তৃতা দিয়ে সকল আরব গোত্রের রক্ত গরম করে ফেললেন। এমনকি খৃষ্টান আরবরাও ইরানীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়ে উঠলো এবং কিছুদিনের মধ্যেই প্রত্যেক দিক থেকে যোদ্ধা আরব গোত্রসমূহ মদীনার দিকে ঢলের মত আসতে লাগলো। সেই যুগে হযরত জারিরও (রা) হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিদমতে হাজির হলেন এবং তাঁর নিকট বনু বাজলাকে একত্রিত করার আবেদন জানালেন। হযরত ওমর (রা) সেই সময় সকল সরকারী কর্মচারীর নামে একটি নির্দেশ প্রেরণ করলেন। নির্দেশে তিনি যেখানে যেখানে বনু বাজলিয়ার লোক আছে তাদেরকে নির্দিষ্ট তারিখে জারিরের (রা) নিকট পৌঁছার কথা বললেন। বস্তুত হযরত জারির (রা) ফিরে গেলেন এবং কিছুদিন পর বনু বাজলিয়ার এক বিরাট বাহিনী সমেত পুনরায় খলিফার দরবারে উপস্থিত হলেন। আবু হানিফা আদ

দিনাওয়ারী সাহিবে "আল আখবার আত তাওয়ালের" বর্ণনা হলো যে, হযরত ওমর (রা) জারিরকে (রা) বনু বাজলিয়া সমেত সকল গোত্রের আমীর নিয়োগ করলেন এবং তাঁকে মুছান্না (রা) বিন হারিছা শাইবানীর সাহায্যের জন্য ইরাক রওয়ানা করলেন। তাঁরা আবু ওবায়েদের (র) শাহাদাতের পর ইরানীদের মুকাবিলাকারী মুসলমানদের নেতৃত্ব করেছিলেন। জারির (রা) মদীনা থেকে রওয়ানা দিয়ে ছালাবিয়া নামক স্থানে তাঁবু ফেললেন। মুছান্নাও (রা) সঙ্গীদেরসহ তাঁদের সঙ্গে এসে মিলিত হলেন। অতপর এই সম্মিলিত বাহিনী ছালাবিয়া থেকে রওয়ানা হয়ে কুফার নিকটে বুয়ায়েব নামক স্থানে তাঁবু ফেললো। এদিকে ইরান সরকার একজন অভিজ্ঞ জেনারেল মিহরান বিন মাহরবিয়া হামদানীকে এক বিরাট বাহিনী দিয়ে মুসলমানদের মুকাবিলার জন্য প্রেরণ করলো। তাঁরা বুয়ায়েব পৌঁছে ফোরাত নদীর পশ্চিম তীরে মুসলমানদের সামনে (তাঁরা পূর্ব তীরে ছিল) অবস্থান নিল। পরের দিন ইরানীরা নদী পার হয়ে মুসলমানদের ওপর হামলা করে। মুছান্না (রা) ইসলামী বাহিনীর দক্ষিণ বাহুকে সঙ্গে নিয়ে ইরানী বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলো। সেই সঙ্গে জারির (রা) বামবাহু ও অভ্যন্তরীণ দল নিয়ে ইরানীদের ওপর বিদ্যুতের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো। ইরানী বাহিনীর সকল সৈন্য নির্বাচিত যোদ্ধা ছিলেন তাঁরা এমন জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করলো যে, মুসলমানদেরকে পেছনে ঠেলে দিল। মুছান্না (রা) স্বহস্তে নিজের দাড়ি ধরে মুসলমানদের সম্ভ্রম বোধকে আহবান জানালেন। তাঁর আহবানে মুসলমানরা ঘুরে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে ইরানীদের ওপর হামলা করে বসলো। এই হামলায় মুছান্নার (রা) সহোদর মাসউদ (রা) বিন হারিছা বীরবিক্রমে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। তিনি মাটিতে পড়ে গেলে মুছান্না(রা) উচ্চৈস্বরে বলে উঠলেন ঃ

"হে মুসলমানরা! শরীফরা এভাবেই জীবন দিয়ে থাকে। দেখো, তোমাদের ঝাণ্ডা যেন অবনত না হয়।"

এদিকে জারির (রা) নিজের গোত্রকে আহবান জানিয়ে বললেন, "হে বাজলিয়ার ভাইয়েরা! এটা তোমাদের পরীক্ষার সময়। দেখো, শত্রু নিধনে অন্যরা যেন তোমাদের ওপর বাজি নিয়ে না যায়। আল্লাহ যদি তোমাদেরকে সফল করেন তাহলে এই দেশের সবচেয়ে বেশী হকদার তোমরাই হবে।"

উভয়ের আহবানে মুসলমানরা কিয়ামতের মত হামলা চালালো। তাদের হামলার প্রচণ্ডতায় হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও ইরানীরা টিকতে পারলো না। তবুও মিহরান অটলতার সঙ্গে লড়াই করে চলেছিল। তাগলুবী একজন যুবক তাকে

তাক করে সামনে অগ্রসর হয়ে তরবারীর এক কোপে তাঁর ভবলীলা সাঙ্গ করে ফেললো। মিহরানের নিহত হওয়ায় ইরানীরা সম্পূর্ণরূপে স্তম্ভিত হয়ে পড়লো এবং দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থায় পালাতে লাগলো। পলায়নরত অবস্থায় হাজার হাজার মারা গেল এবং নদীতে ডুবে নিহত হলো হাজার হাজার। কেননা মুসলমানরা সেতু দখল করে রেখেছিল। এটা ছিল জাসারের জবাব। যদিও এই যুদ্ধে বহুসংখ্যক মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন। কিন্তু ইরানীদের লাশের সংখ্যা ছিল বেশুমার। আল্লামা শিবলীর (র) বক্তব্য অনুযায়ী, "ঐতিহাসিকরা বর্ণনা করেছেন যে, কোন যুদ্ধে এত বেশুমার লাশ আর দেখা যায়নি।"

এই যুদ্ধের পর মুসলমানরা ইরাকের দূরদূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

বুয়ায়েবের পরাজয়ে সমগ্র ইরানে বিলাপ ধ্বনি উচ্চারিত হতে লাগলো। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তারা রাণী পুরান দখতকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে এক নওজোয়ান শাহজাদা বা যুবরাজ ইয়াযদ গিরদকে বাদশাহ বানালো এবং পুনরায় অত্যন্ত জোরেশোরে যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কিছুদিন পর তারা অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে উঠে দাঁড়ালো এবং মুসলমানদের সকল পরাভূত এলাকার ওপর দ্বিতীয়বার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করলো। হযরত মুছান্না (রা) এবং জারির (রা) যুদ্ধকৌশল অনুযায়ী আরব সীমান্তের দিকে পিছিয়ে এলেন। এদিকে হযরত ওমর ফারুক (রা) এই খবর পেয়ে সমগ্র আরবে দূত প্রেরণ করে মুসলমানদেরকে জিহাদের জন্য ডেকে পাঠালেন। কয়েক দিনের মধ্যেই জিহাদের আবেগে উদ্বেলিত হয়ে বহু সংখ্যক মুসলমান মদীনায় একত্রিত হলেন। হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসকে এই বাহিনীর নেতা নিয়োগ করা হলো। হযরত ওমর (রা) তাঁদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ এবং পুনরায় খুব শীঘ্র ইরাক পৌঁছার নির্দেশ দিলেন। হযরত সায়াদ (রা) যখন ইরাক সীমান্তের নিকট পৌঁছলেন তখন হযরত মুছান্না (রা) বুয়ায়েবের যুদ্ধে প্রাপ্ত আঘাতের ক্ষতের কারণে ওফাত পেলেন। তাঁর ওফাতের পর হযরত জারির (রা) নিজের সঙ্গীদের নিয়ে হযরত সায়াদের (রা) বাহিনীতে শামিল হয়ে গেলেন।

হযরত সায়াদ (রা) সামনে অগ্রসর হয়ে কাদেসিয়ার ময়দানে তাঁবু ফেললেন। সেখানেই ইতিহাসের রক্তাক্ত লড়াই সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধই ইরানীদের ভাগ্যের বেশীর ভাগ ফায়সালা করে। হযরত জারির (রা) কাদেসিয়ার যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ইরানী সেনাপতি রোস্তম বিরাট সাজ-সরঞ্জামসহ মুসলমানদের ওপর হামলা চালিয়েছিল। তিন দিনের

ভয়াবহ যুদ্ধে তাঁর যুদ্ধহাতী এবং যিরাহ পরিধানকারী সওয়াররা মুসলমানদের ওপর এমন তীব্র গতিতে হামলা চালিয়েছিল যে, তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু নিজেদের জানবাজ সরদারদের উচ্চৈস্বরের আহবানে তারা পুনরায় সামলে নিচ্ছিল। এসব সরদারের মধ্যে হযরত জারিরও (রা) ছিলেন। বাজলিয়া গোত্রের অশ্বারোহীরা এই যুদ্ধে এমন হিম্মত ও বীরত্ব প্রদর্শন করেছিল যে, ইরানী অশ্বারোহীরা তাদের মোকাবিলা করতে ইতস্তত করছিলো। যুদ্ধের তৃতীয় দিন এক সময় কয়েকটি ইরানী দল একত্রিত হয়ে একবারে বনু বাজলিয়ার ওপর এসে পড়লো। তাঁরা হযরত জারিরের (রা) নেতৃত্বে জীবনবাজী রেখে মুকাবিলা করলো। কিন্তু ইরানীরা তাদেরকে নিজেদের আয়ত্বের মধ্যে নিয়ে এলো। এই নাজুক মুহূর্তে একাকি এক নিকাবধারী সওয়ার চারদিকের ধূলোর মধ্য থেকে আবির্ভূত হলেন এবং ইরানীদের ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন যে, তাদের ব্যূহ তছনছ হয়ে গেল এবং বনু বাজলিয়া মুসিবত থেকে পরিত্রাণ পেলো। এই নিকাবধারী অশ্বারোহী ছাকিফের নামকরা বাহাদুর হযরত আবু মাহজান ছিলেন।[১] তারপর বনু বাজলিয়া বনু কান্দাহ, বনু আসাদ, নাখা এবং আরো কতিপয় গোত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে শত্রুর কেন্দ্রের ওপর এমন প্রচণ্ড জোরে হামলা করলো যে, ইরানীদের প্রতিরোধ ক্ষমতা একদম গুড়িয়ে গেল এবং তারা পালিয়ে গেল। এই বিশৃংখল অবস্থায় রোস্তমও মারা গেল। আবু হানিফা দিনাওয়ারী (র) বর্ণনা করেছেন যে, যুদ্ধের পর জারির (রা) ইরানীদের পিছু ধাওয়া করতে করতে অনেক দূর পর্যন্ত গেলেন এবং নদীর সেতুর ওপর গিয়ে ইরানীদের রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলে পলায়নরত ইরানীরা তার ওপর বর্শা দিয়ে হামলা করে বসলো এবং তিনি মাটির ওপর পড়ে গেলেন। ইত্যবসরে তাঁর

---

১. হযরত আবু মাহজান (রা) ছাকাফী নবম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। অত্যন্ত বাহাদুর ও দানশীল ছিলেন। কবিতাতেও ব্যুৎপত্তি রাখতেন। কাদেসিয়ার যুদ্ধে প্রথমে মদপানের অপরাধে নজরবন্দী ছিলেন। যখন প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছিলো ঠিক তখন তিনি হযরত সায়াদের (রা) স্ত্রী সালমার নিকট আবেদন জানিয়ে বললেন যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার বেড়ি খুলে দাও এবং সায়াদের (রা) ঘোড়া এবং অস্ত্র আমাকে দাও। যদি জীবিত বেঁচে যাই তাহলে স্বয়ং বেড়ি পরিধান করবো। [হযরত সায়াদ (রা) ফোঁড়ার কারণে নিজে যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি] সালমা অস্বীকৃতি জানালে তিনি এমন এক হৃদয়স্পর্শী কবিতা পাঠ করলেন যে, সালমার অন্তর গলে গেল এবং তিনি আবু মাহজানকে মুক্ত করে দিলেন। তিনি নিজের মুখের ওপর কাপড় দিয়ে ঢেকে হযরত সায়াদের (রা) ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এমন শানে যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছলেন যে, যেদিকে অগ্রসর হতেন সেদিকেই ইরানীদের ধ্বংস সাধন করতেন। যুদ্ধের পর হযরত সায়াদ (রা) তাঁকে মুক্ত করে দিলেন এবং তিনি মদপান থেকে তওবা করলেন।

বেঁচে যাওয়া সাথীরা পৌঁছে গেলেন এবং তারা ইরানীদেরকে তরবারী দিয়ে সাবাড় করে ফেললো। জারির (রা) তেমন মারাত্মকভাবে আহত হননি। তবে তাঁর ঘোড়া নিহত হয়েছিল। তার স্থলে তিনি একটি ইরানী টাট্টু লাভ করেন। হযরত জারির (রা) তাতে সওয়ার হলে তাকে নিজের ঘোড়ার মতই দ্রুতগতি সম্পন্ন পান।

কাদেসিয়াতে মুসলমানদের বিজয় এত শানদার ছিল যে, ইরানের সিংহাসন টলমল করে উঠলো। কাদেসিয়া থেকে মুসলমানদের চল মাদায়েন ও জালুলার দিকে অগ্রসর হয় এবং তা দখল করে নেয়। হযরত জারির (রা) চার হাজার সওয়ারসহ জালুলার হিফাজতে নিয়োজিত হন। কিছুদিন পর হযরত সায়াদ (রা) তাঁর নিকট আরো তিনহাজার সিপাহী প্রেরণ করেন এবং তাদেরকে নিকটবর্তী হালওয়ান শহরের ওপর হামলার নির্দেশ দেন। এখানে ইরানীদের এক ভীতিপ্রদ ইজতিমা চলছিল। হযরত জারির (রা) বিদ্যুৎবেগে তুফানের মত হালওয়ানের ওপর হামলা করে বসলেন। ইরানীরা এই হামলা মোকাবিলা করার সাহস পেলো না এবং এই গুরুত্বপূর্ণ শহরও মুসলমানদের করায়ত্বে এলো।

হালওয়ান দখলের পর হযরত জারির (রা) আহওয়াজ ও তাসতুরের(অথবা শোস্তর) যুদ্ধে নিজের বীরত্ব প্রদর্শন করেন। এসব যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর ইরানীরা এদিক ওদিক বেঁচে থাকা শক্তি নাহারওয়ান্দে একত্রিত করে এবং মুসলমানদেরকে ইরান থেকে বহিষ্কার করার জন্য শেষ সৈন্যটি পর্যন্ত কাজে লাগিয়েছিল। তাদের নেতৃত্ব করছিল একজন নামকরা জেনারেল মারদান শাহ বিন হুরমুজ। হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত নোমান (রা) বিন মাকরানকে ত্রিশ হাজারের বাহিনী দিয়ে ইরানীদের মুকাবিলার জন্য প্রেরণ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ওসিয়ত করলেন যে, এই যুদ্ধে যদি নোমান শহীদ হয়ে যান তাহলে তাঁর স্থলে হুজায়ফা (রা) ইবনুল ইয়ামান সেনাপতি হবেন। তিনিও যদি নিহত হন তাহলে মুগিরাহ (রা) বিন শু'বা সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দেবেন এবং তিনিও যদি মারা যান তাহলে আশয়াছ (রা) বিন কায়েস আমীর হবেন।

কাদেসিয়ার পর ইরানের মাটিতে সংঘটিত সকল যুদ্ধের মধ্যে নাহারওয়ান্দের যুদ্ধ সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধ ছিল। হযরত জারির (রা) এই যুদ্ধে পূর্ণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। হযরত নোমান (রা) শহীদ হলে হুজায়ফা (রা) ইবনুল ইয়ামান সেনাবাহিনীর সেনাপতি হলেন। জারির (রা) তাঁর নেতৃত্বে বনু বাজিলা ও অন্যান্য গোত্রকে সঙ্গে নিয়ে ইরানীদের ওপর এমন তুফানের বেগে

হামলা করলেন যে, তারা হতভম্ব হয়ে পড়লো এবং নিজেদের ২০ হাজার মানুষ নিহত হওয়ার পর পালিয়ে গেল। মুসলমানরা হামদান পর্যন্ত তাদের পিছু ধাওয়া করলেন। এই বিজয় এমন শানদার বিজয় ছিল যে, তারপর আজম আর কখনো শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি। এ জন্য মুসলমানরা তাকে "ফাতহুল ফুতুহ" বা বিজয়সমূহের বিজয় বলে আখ্যায়িত করে থাকেন।

হযরত ওমরের (রা) শাহাদাতের পর হযরত উসমান জুন্নুরাইন (রা) খিলাফতের মসনদে সমাসীন হন। এ সময় তিনি হযরত জারিরের (রা) দ্বীনী ও মিল্লী খিদমতের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে হামদানের গভর্ণর নিযুক্ত করেন। হযরত উসমান (রা) শহীদ হলে হযরত জারির (রা) কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর বাইয়াত করেন। তারপর নিজের এলাকার লোকদের নিকট থেকে হযরত আলীর (রা) বাইয়াত নিয়ে কুফায় তাঁর কাছে আসেন। আবু হানিফা দিনাওয়ারী "আল-আখবারুত তাওয়াল" গ্রন্থে লিখেছেন যে, হযরত উসমানের (রা) শাহাদাতের সময় হযরত জারির (রা) (তাঁর পক্ষ থেকে) যাহর বিন কায়েস জু'ফির সঙ্গে মিলিতভাবে জাবাল নামক স্থানের আমেল ছিলেন এবং সেই এলাকার লোকদের নিকট থেকে তাঁরা হযরত আলীর বাইয়াত গ্রহণ করেন। হযরত আলী (রা) বিভিন্ন প্রদেশের শাসকদেরকে নিজের বাইয়াতের দাওয়াত দিলেন। এ সময় সিরিয়ার গভর্ণর আমীর মুয়াবিয়ার (রা) নামেও পত্র প্রেরণ করলেন। আমীর মুয়াবিয়াকে (রা) এই পত্র পৌঁছানোর দায়িত্ব অর্পণ করা হয় হযরত জারিরের (রা) ওপর। জারির (রা) এই পত্র নিয়ে আমীর মুয়াবিয়ার (রা) নিকট দামেস্ক পৌঁছেন। সে সময় তাঁর দরবারে সিরিয়ার কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। জারির (রা) হযরত আলীর (রা) পত্র তাঁকে দিয়ে বললেন ঃ "এটা আমীরুল মু'মিনীন আলীর (রা) পত্র আপনার এবং সিরিয়াবাসীর নামে। তিনি আপনাকে তাঁর বাইয়াতের দাওয়াত দিয়েছেন। মক্কা মুয়াজ্জামা, মদীনা মুনাওয়ারা, কুফা, বসরা, ইয়েমেন, বাহরাইন, আম্মান, ইয়ামামা, ফারেস, হাম্বল, খোরাসান ও মিসর প্রভৃতি সকলেই ঐকমত্য অনুসারে তাঁকে খলিফা হিসেবে মেনে নিয়েছে। আপনার এলাকা ছাড়া এখন আর অন্য কোন এলাকা তাঁর আনুগত্যের বাইরে নেই। আর যদি হযরত আলীর (রা) বহমান উপত্যকাসমূহের কোন উপত্যকাও যদি এই অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় তাহলে এটা ডুবে যাবে।"

আমীর মুয়াবিয়া (রা) কিছুদিন নিজের সমর্থক ও সাহায্যকারীদের সঙ্গে এ ব্যাপারে মতবিনিময় করলেন। অতপর তিনি হযরত জারিরকে (রা) ডেকে

পাঠালেন এবং তাঁকে বললেন, "আপনি আপনার বন্ধুর [হযরত আলী (রা)] কাছে ফিরে যান এবং তাঁকে বলুন যে, আমি এবং সিরিয়াবাসী তাঁর বাইয়াত করবো না।"

হযরত জারির (রা) ফিরে গিয়ে হযরত আলীকে (রা) আমীরে মুয়াবিয়ার(রা) জবাব শুনালেন এবং সেই সঙ্গে তাঁকে আমীরে মুয়াবিয়ার (রা) যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পর্কেও অবহিত করলেন। তাছাড়াও তাঁরা কি কি করতে যাচ্ছে তাঁর পুংখানুপুংখ বর্ণনা দিলেন—তাতে হযরত আলীর (রা) কতিপয় সাথী আবেগাপ্লুত হয়ে উঠলো এবং তারা হযরত জারিরকে (রা) মুয়াবিয়ার (রা) পক্ষে পক্ষপাতিত্ব করার অভিযোগে অভিযুক্ত করলো। মালিক আশতার তো এতো উত্তেজিত হলো যে, তিনি প্রকাশ্যে হযরত আলীকে (রা) বললেন ঃ

"আমীরুল মু'মিনীন! যে কাজের জন্য আপনি জারিরকে (রা) প্রেরণ করেছিলেন, সে কাজে যদি আমাকে প্রেরণ করতেন তাহলে আল্লাহর কসম, আমি মুয়াবিয়ার গলা দাবানোর প্রশ্নে সামান্যতম শৈথিল্যও প্রদর্শন করতাম না এবং প্রথম থেকেই তাঁর প্রতিটি তদবির ও দলিলের তদারক করে নিতাম।"

হযরত জারির (রা) বললেন ঃ "প্রথমে যদি না যেতে পারো তাহলে এখন গিয়ে করে দেখাও।"

মালিক আশতার বললো ঃ "এখন আমি গিয়ে কি করতে পারি! তুমি সকল ব্যাপার প্রকাশ করে দিয়েছ। আল্লাহর কসম! আমারতো ধারণা, তুমি ভেতরে ভেতরে মুয়াবিয়ার সঙ্গে কোন ষড়যন্ত্র করেছ। নচেৎ তুমি আমাদেরকে তাঁর সৈন্যদের দিয়ে ভীতি প্রদর্শন করতে না। আমীরুল মু'মিনীন যদি আমাকে অনুমতি দেন, তাহলে আমি তোমাকে এবং তোমার মত অন্যান্য সন্দেহ ভাজন ব্যক্তিদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করতাম।"

মালিক আশতারের এ ধরনের আক্রমণাত্মক কথায় হযরত জারির (রা) খুব মনোকষ্ট পেলেন এবং তিনি ভগ্নহৃদয়ে নিজের খান্দানসহ রাতের মধ্যেই কুফা থেকে বের হয়ে কারকেশিয়া চলে গেলেন এবং অবশিষ্ট জীবন চুপচাপ সেখানেই কাটিয়ে দিলেন। কারকেশিয়া অবস্থানকালে দেশে কয়েকটি রাজনৈতিক উত্থান-পতন ঘটলো। কিন্তু তিনি কোনটিতেই অংশ নেননি। যদি তাঁর কোন দূরভিসন্ধি থাকতো তাহলে তিনি অত্যন্ত সহজেই আমীর মুয়াবিয়ার (রা) নিকট যেতে পারতেন। তিনি তাঁকে বড় পদ দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তিনি শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত হযরত আলীর (রা) বাইয়াত বাতিল করার জন্য অগ্রসর হননি।

হযরত জারির (রা) ৫৪ হিজরীতে কারকেশিয়াতে নির্জনত্ব গ্রহণ অবস্থাতেই শেষ সফরে যাত্রা করেন। ওফাতের সময় আমর, মানযার, আইয়ুব, ইবরাহিম এবং ওবায়দুল্লাহ নামক পাঁচ পুত্র রেখে যান।

আল্লাহ পাক হযরত জারিরকে (রা) সুন্দর সিরতের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ মাত্রার সুন্দর সুরতও দান করেছিলেন। তিনি এত সুদর্শন ছিলেন যে, হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁকে উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার ইউসুফ বলতেন। আল্লামা ইবনে আবদুল বার (র) লিখেছেন যে, তাঁর দেহের উচ্চতা ছিল ৬ গজ লম্বা। সীমাহীন সুদর্শন ছিলেন। মাথার চুল পেকে গেলে তাতে মেহেদীর খেজাব লাগাতে শুরু করেন। তাতে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও খুবসুরত আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে।

হযরত ওমর ফারুক (রা) মানুষ চেনার ব্যাপারে খুব অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি অন্তর দিয়ে হযরত জারিরের (রা) গুণাবলী স্বীকার করতেন এবং তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। একবার তিনি সাক্ষাতের জন্যে এলেন। এ সময় তিনি তাঁকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"আল্লাহ তোমার ওপর অনুগ্রহ বর্ষণ করুন। জাহেলী যুগেও তুমি ভাল নেতা বা সরদার ছিলে এবং ইসলাম গ্রহণের পরও ভাল সরদার রয়েছো।"

হযরত জারির (রা) রাসূলে আকরামের (সা) ওফাতের মাত্র ছ/সাত মাস পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এই সংক্ষিপ্ত সময়ও তিনি অব্যাহতভাবে হুজুরের (সা) খেদমতে কাটান। উপরন্তু নবীর (সা) ফয়েজে অভিষিক্ত হওয়ার জন্য যতটুকুন সময়ই তিনি পেয়েছিলেন তা তিনি সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগিয়েছিলেন। তাঁর থেকে একশ' হাদিস বর্ণিত আছে। এসব হাদিস থেকে প্রকাশ পায় যে, হযরত জারির (রা) যখনই রাসূলে আকরামের (সা) নিকট উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পেতেন তখন তিনি সর্বাবস্থায় হুজুরের (সা) সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন এবং তাঁর ইরশাদসমূহকে জপমালা বানিয়ে নিতেন। যেসব ঘটনা তাঁর সামনে ঘটতো তা একটু বিস্তারিতভাবে স্মরণ রাখতেন এবং তা হুবহু লোকদের সামনে দোহরাতেন। একবার মদীনা এলেন। এসময় নবী করিম (সা) তাঁকে ও অন্য সাহাবীদেরকে সঙ্গে নিয়ে মদীনার বাইরে গেলেন। হযরত জারির (রা) বলেন যে, আমরা সামান্য একটু এগিয়ে ছিলাম। এ সময় আমরা একটি সওয়ারীকে খুব দ্রুতগতিতে আসতে দেখলাম। হুজুর (সা) বললেন, মনে হয় যেন এই সওয়ার তোমাদের নিকটই আসছে। ইত্যবসরে সওয়ার এসে পৌঁছলো এবং সালাম করলো। আমরা তাঁর সালামের জবাব

দিলাম। হুজুর (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কোথেকে আসছো?" সে আরজ করলো, "বিবি-বাচ্চা এবং নিজের খান্দানের নিকট থেকে।"

তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ "কোথায় যেতে চাও?"

সে বললো, "আল্লাহর রাসূলের নিকট যাওয়ার ইচ্ছা।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "তাহলে তুমি মনযিলে মাকসুদে পৌঁছে গেছ।"

সে আরজ করলো ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! ঈমান কি? তা আমাকে শিখান।"

তিনি বললেন ঃ "একথার সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল। পাবন্দীর সঙ্গে নামায পড়, যাকাত দাও, রমযানের রোযা রাখো, বাইতুল্লাহর হজ্জ করো।"

সে বললো, আমি এসব বিষয়ের স্বীকৃতি দিলাম। তারপর যখন এই ব্যক্তি সেখান থেকে রওয়ানা হলো তখন তাঁর উটের পা কোন বন্য ইঁদুরের গর্তে গিয়ে পড়লো এবং উট পড়ে গেল। সেই ব্যক্তিও উটের ওপর থেকে উবু হয়ে পড়লো এবং মারা গেল। হুজুর (সা) বললেন, ঐ ব্যক্তিকে আমার কাছে ডেকে আনো। হযরত হুজায়ফা (রা) ইবনুল ইয়ামান এবং হযরত আম্মার (রা) বিন ইয়াসির (রা) তৎক্ষণাৎ তাকে ডাকার জন্য অগ্রসর হলেন। তাঁকে মাটির ওপর থেকে উঠিয়ে বসালেন। কিন্তু সে মারা গিয়েছিল। তাঁরা এসে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেই ব্যক্তিতো ইন্তেকাল করেছে। একথা শুনে হুজুর (সা) সেই ব্যক্তির পরিবর্তে অন্যদিকে দেখতে লাগলেন। অতপর তিনি বললেন, তোমরা দেখেছ যে, আমি সেই ব্যক্তির পরিবর্তে অন্যদিকে মনোযোগী হয়ে গিয়েছিলাম। আমি দেখলাম যে, দুইজন ফেরেশতা তাঁর মুখের মধ্যে বেহেশতের ফল নিক্ষেপ করছেন। তা দেখে আমি মনে করলাম যে, অবশ্যই এই ব্যক্তি অভুক্ত অবস্থায় মারা গেছে। আল্লাহর কসম! তারা সেসব লোকের মধ্যে পরিগণিত যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন, যারা ঈমান এনেছে এবং তারপর ঈমানে সামান্য পরিমাণ পাপের দাগও লাগতে দেয়নি। এরাই হলো তারা যাদের জন্য রয়েছে শান্তি এবং এরাই হলো হেদায়াত প্রাপ্ত। অতপর তিনি (সা) বললেন যে, নিজের ভাইয়ের কাফন দাফনের ব্যবস্থা করো। আমরা তাকে উঠিয়ে পানির কাছে আনলাম। গোসল দিলাম। খোশবু লাগালাম। কাফন পরালাম এবং দাফনের জন্য নিয়ে গেলাম। হুজুর (সা) কবরের এক পাশে বসে গেলেন এবং বললেন, বগলের কবর বানাও। সিন্দুকের কবর বানিও না। কেননা, আমাদের জন্য বগলের কবরই উপযুক্ত। অন্যদের জন্য সিন্দুক।

এই রেওয়ায়াতের অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, সে সময় হুজুর (সা) সেই ব্যক্তির জন্য عَمِلَ قَلِيلاً وَأُجِرَ كَثِيرًا (সে আমল কম করেছিল কিন্তু সওয়াব বেশী পেয়েছিল) এই বাক্যও বলেছিলেন।(তিবরানী, মুসতাদরাকে হাকিম ও তিরমিযী)

হযরত জারির (রা) অন্য একটি হাদিসে বলেন, "রাসূলে করিম (সা) সেনাবাহিনীর একটি ছোট দলকে খাছয়াম গোত্রের দিকে প্রেরণ করেন। গোত্রটির কিছু মানুষ সিজদাবনত হয়ে নিজেদের জীবন বাঁচাতে চাইলো। কিন্তু ইসলামী বাহিনী কালবিলম্ব না করে তাদেরকে হত্যা করে ফেললো। যখন এই ঘটনা বিশ্ব নবী (সা) জানতে পেলেন তখন তিনি তাদের শোনিতপাতের বা দিয়তের অর্ধেক আদায়ের নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, আমি প্রত্যেক এমন মুসলমান থেকে দায়িত্বমুক্ত যে মুশরিকদের মধ্যে প্রবেশ করে রয়ে গেছে। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কেন? তিনি বললেন, উভয়কে এমন দূরত্বে অবস্থান করতে হবে যে, একে অপরের আগুনের আলো চোখে পড়বে না।" (আবু দাউদ)

(হাদিসের ব্যাখ্যাকারীরা লিখেছেন যে, এই দূরত্বে অবস্থানের নির্দেশ সেই যুগের গোত্রসমূহের পরিবেশের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত ছিল। মোটকথা, মুসলমানদেরকে মুশরিকদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকা থেকে দূরে থাকতে হবে।)

হযরত জারির (রা) হুজুরের (সা) ইরশাদের ওপর কিভাবে আমল করতেন তাঁর আন্দাজ এই ঘটনা থেকে করা যায়। একবার তাঁর খাদেম তাঁর গাভীগুলোকে চরিয়ে ফিরিয়ে আনলো, এ সময় তাঁর দলে অন্য কারোর গাভীও চলে এসেছিল। হযরত জারির (রা) খাদেমকে নির্দেশ দিলেন, "তাকে বের করে দাও। আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেছি যে, অন্যের পশু শুধুমাত্র পথভ্রষ্টরা নিজের কাছে রাখতে পারে।"

হযরত জারির (রা) বিন আবদুল্লাহ আল বাজলী সেসব সৌভাগ্যবান সাহাবীর (রা) মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন যাঁদেরকে রহমতে আলম (সা) শুধুমাত্র ভালই বাসতেন না, বরং তাঁদেরকে ভক্তি ও শ্রদ্ধাও করতেন। তিনি যখন প্রথমবার হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়েছিলেন তখন তিনি তাঁকে বসার জন্য নিজের পবিত্র চাদর বিছিয়ে দিয়েছিলেন এবং লোকদেরকেও যখন কোন কওমের কোন সম্মানিত ব্যক্তি তোমাদের নিকট আগমন করলে তাঁর সম্মান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারপরও জারির (রা) যখনই হুজুরের (সা)

খিদমতে হাজির হতেন তখন তিনি তাঁকে সম্মান করতেন। তিনি মদীনা এলে হুজুর (সা) অবশ্যই তাঁকে দর্শন দিতেন।

সহীহ্ মুসলিমে আছে যে, হুজুর (সা) তাঁকে দেখলে মুচকি হেসে দিতেন এবং তাঁর চেহারায় উৎফুল্লতা ছেয়ে যেতো। কখনো যদি হুজুরের (সা) মজলিশে জারিরের (রা) উল্লেখ হতো তাহলে তিনি অত্যন্ত ভাল বাক্যে তাঁর উল্লেখ করতেন। স্বয়ং হযরত জারির (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ

"একবার আমি মদীনা মুনাওয়ারা এলাম এবং সওয়ারী বসিয়ে কাপড়ের থলে থেকে নিজের হুল্লা বের করলাম এবং তা পরিধান করে মসজিদে নববীর দিকে রওয়ানা হলাম। হুজুর (সা) সে সময় খুতবা দিচ্ছিলেন। আমি সালাম করে বসে পড়লাম। লোকজন আমার দিকে বিস্ময়কর স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। আমি আমার নিকটের লোককে জিজ্ঞেস করলাম ঃ

আবদুল্লাহ! হুজুর (সা) কি আমার কথা উল্লেখ করছিলেন?"

তিনি বললেন, "হাঁ, এইমাত্র খুতবার সময় হুজুর (সা) বললেন যে, খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই দরজা অথবা জানালার রাস্তা দিয়ে তোমাদের নিকট ইয়েমেনের সর্বোত্তম ব্যক্তি আসবেন। তাঁর চেহারায় বাদশাহীর আলামত থাকবে।"

আমি নিজের ব্যাপারে হুজুরের (সা) এই ইরশাদ শুনে খুব খুশী হলাম এবং আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম।

হযরত সাখার (রা) বিন হারব—কুরাইশ সেনাপতি

অষ্টম হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে রহমতে আলম (সা) মক্কা মুয়াজ্জামার ওপর ইসলামের পতাকা উড্ডীন করলেন। এ সময় সমগ্র আরব তাকে দ্বীনে ইসলামের সত্যতার নিদর্শন হিসেবে মেনে নিল। কিন্তু মক্কার নিকটবর্তী হাওয়াযিনের শক্তিশালী গোত্রের দুর্ভাগ্য ছিল। অথবা তাদের জ্ঞান ছিল কম। আরবের কেন্দ্র বিন্দু মক্কার ওপর হকপন্থীদের বিজয় তাদেরকে অগ্নিশর্মা করে দিয়েছিল এবং তারা ইসলামকে উৎখাত করার জন্য তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত জোরে শোরে উঠে দাঁড়ালো। তারা নিজেদের সঙ্গে নজর এবং জুশমের গোত্রদেরকেও একত্রিত করলো এবং অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে মক্কার দিকে অগ্রসর হলো। হকের ঝাণ্ডাবাহী এবং তাদের মধ্যে হুনাইন উপত্যকায় এক রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এই যুদ্ধে বনু হাওয়াযিন এবং তার মিত্রদের শিক্ষণীয় পরাজয়ের শিকার হতে হলো। তাদের অসংখ্য মানুষ যুদ্ধের ময়দানে লাশ হয়ে পড়ে রইলো এবং বিরাট সংখ্যক মুসলমানদের হাতে বন্দী হলো। অবশ্য হাওয়াযিনের কিছু মানুষ পালিয়ে তায়েফের দুর্গে একত্রিত হলো। মুশরিক বনু ছাকিফ তাদেরকে সেখানে আশ্রয় দিল। রাসূলে করিম (সা) এই খবর পেয়ে কালবিলম্ব না করে তায়েফ অবরোধ করে বসলো। এই অবরোধ কম-বেশী তিন সপ্তাহ অব্যাহত ছিল। এই সময় মুসলমানরা দুর্গের ওপর বার বার হামলা করলো। কিন্তু প্রতিবারই দুর্গবাসীদের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ ও তীর নিক্ষেপ তাদেরকে পিছু হটতে বাধ্য করলো। এমনই এক হামলায় এক বর্ষীয়ান অথচ চঞ্চল ও হৃষ্টপুষ্ট রাসূলের সাহাবী অগ্রগামী ছিলেন। এ সময় দুশমনের একটি তীর তাঁর চোখে লাগলো। তীরের আঘাতে তাঁর চক্ষুর ঢিলা অংশ চক্ষু থেকে বের হয়ে ঝুলতে লাগলো। সেই সাহাবী সেই অবস্থায় হুজুরে আকরামের (সা) খিদমতে হাজির হলেন। তিনি তাঁকে দেখে বললেন ঃ

"আপনি যদি চান তাহলে আমি দোয়া করবো। যাতে আপনার চোখ ভাল হয়ে যায়। কিন্তু আপনি যদি পসন্দ করেন এবং ধৈর্য ধারণ করেন, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিনিময়ে আপনাকে জান্নাত দিবেন।"

সেই ব্যক্তি রাসূলের (সা) ইরশাদ শুনে নিজের দুঃখের কথা ভুলে গেলেন। গণ্ডদেশে ঝুলন্ত চোখের ঢিলা অংশটুকু কেটে ফেলে দিলেন এবং আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমি জান্নাত চাই।"

এই সাহিবে রাসূল যিনি সাকিয়ে কাওছারের (সা) নিকট জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে নিজের চোখ ভাল হওয়া পসন্দ করেননি এবং ধৈর্যকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন, তিনি হলেন কুরাইশের প্রখ্যাত সরদার হযরত সাখার(রা) বিন হারবে উমুব্বী। ইতিহাসে তিনি আবু সুফিয়ান কুনিয়তে মশহুর হয়ে আছেন। তাঁর আর এক কুনিয়াত ছিল আবু হানজালা। কিন্তু এই কুনিয়াত খ্যাতি লাভ করেনি।

হযরত আবু সুফিয়ান সাখার (রা) বিন হারব কুরাইশের অত্যন্ত ক্ষমতা ও প্রভাবশালী খান্দান (শাখা) বনু উমাইয়ার সরদার ছিলেন। তিনি বিশ্ব নবীর(সা) পিতামহের সমতুল্য ছিলেন। তাঁর নসব চুতর্থ পুরুষে গিয়ে হুজুরের (সা) নসবের সঙ্গে মিলে যায়। নসবনামা হলো ঃ

১। হযরত সারওয়ারে কায়েনাত মুহাম্মাদ (সা) বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিব বিন হাশিম বিন আবদি মান্নাফ বিন কুসাই।

২। হযরত আবু সুফিয়ান সাখার (রা) বিন হারব বিন উমাইয়া বিন আবদুস শামস বিন আবদি মান্নাফ বিন কুসাই।

কুরাইশ পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে মশহুর, প্রভাবশালী, শরীফ এবং সম্মানিত পরিবার ছিল বনু হাশিমের। কা'বার অভিভাবকত্ব করা ছাড়া হাজীদের পানি পান করানোর মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনও এই খান্দানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। বনু হাশিমের পর দ্বিতীয় দরজা ছিল বনু উমাইয়ার। এই খান্দান কুরাইশের ঝাণ্ডাবহন, সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান এবং কাফেলার দলপতিত্ব করায় নিয়োজিত থাকতো। যদিও কতিপয় রেওয়ায়াত অনুযায়ী সামরিক ক্যাম্পের ব্যবস্থাপনা করার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল বনু মাখজুমের ওপর। কিন্তু নিজের মর্যাদা ও বিত্ত বৈভব, জনসংখ্যাধিক্য, সাহসিকতা, বাহাদুরী এবং বুদ্ধিমত্তার বদৌলতে সাধারণত বনু উমাইয়াই কুরাইশের জাণ্ডা বহনের সঙ্গে সঙ্গে সেনাপতিত্বের দায়িত্বও আঞ্জাম দিত। যা হোক, ঝাণ্ডাবহনের দায়িত্ব বনু উমাইয়া স্থৈর্যের সঙ্গেই করতো।কুরাইশের যুদ্ধের নিশান শুধু কঠিন লড়াইয়ের সময়ই বাইরে বের করা হতো এবং এই যুদ্ধ নিশান সবসময় বনু উমাইয়ার নেতার হাতে থাকতো। যে যুগে রহমতে আলম (সা) হকের দাওয়াত প্রদান

শুরু করেছিলেন সে সময় আবু সুফিয়ান (রা) বনু উমাইয়ার সরদার ছিলেন। এই মর্যাদার কারণে তিনি কুরাইশের ঝাণ্ডাবাহীও ছিলেন।

বনু হাশিম এবং বনু উমাইয়ার মধ্যে দীর্ঘদিন যাবত শত্রুতামূলক সংঘাত চলে আসছিলো। এই সংঘাতের শুরু হয় উভয় খান্দানের পূর্বপুরুষ আবদি মান্নাফের মৃত্যুর পরই। সংঘাতের কারণ হলো, আবদি মান্নাফের পর হাশিম পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। কেননা তাঁর বড় ভাই আবদিস শামস পিতার সামনেই মারা যায়। উমাইয়া বিন আবদিস শামস চাচার নেতৃত্ব মেনে নিতে পারলো না এবং বড় পুত্রের সন্তান হিসেবে স্থলাভিষিক্ত হওয়ার দাবী করলো। কিন্তু কুরাইশের পঞ্চায়েত হাশিমের পক্ষে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলো। সুতরাং উমাইয়া চরম ক্রোধান্বিত অবস্থায় স্বদেশকে বিদায় জানিয়ে সিরিয়া চলে গেল এবং যতদিন পর্যন্ত হাশিম জীবিত ছিলেন ততদিন ফিরে আসেনি। হাশিমের মৃত্যুর পর তার ভাই মুত্তালিব এবং আবদুল মুত্তালিবের পুত্ররা একের পর এক কা'বার মুতাওয়াল্লী হলেন। উমাইয়া ফিরে এসে কুরাইশের ঝাণ্ডা বহন, কাফেলার নেতৃত্ব প্রদান এবং সামরিক সেনাপতির পদেই তুষ্ট থাকে। তা সত্ত্বেও তার এবং তার সন্তানদের অন্তরে বনু হাশিমের বিরুদ্ধে তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর হয়নি। এই তিক্ততা বনু উমাইয়া পর্যন্ত সীমিত ছিল না। কুরাইশের অন্য গোত্র যেমন বনু মাখজুম, বনু সাহাম এবং বনু জুমাহ প্রভৃতি গোত্রেরও চক্ষুশূল ছিল বনু হাশিম। তারা বনু হাশিমকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য যাবতীয় অপচেষ্টাই করেছিল। কিন্তু লক্ষ্য হাসিলে কখনো সফল হয়নি। বেশী হলেও তারা পার্থিব বিত্ত বৈভব ও সম্মান এবং প্রভাব প্রতিপত্তির দিক থেকে বনু হাশিমের সমান বলে ধারণা করতো। কিন্তু নবীয়ে আখিরুজ্জামান যখন বনু হাশিমের মধ্যে আবির্ভূত হলেন তখন তাদের সেই ধারণা বা কল্পনাও ভেঙ্গে চুরে খান খান হয়ে গেল। তার অর্থ হলো বনু হাশিমের মান-মর্যাদা যা প্রথম থেকেই তাদের চক্ষুশূল ছিল তা এখন স্থায়ীভাবে বনু হাশিমের জন্য নির্ধারিত হয়ে গেল। এসব গোত্রের অধিকাংশ সরদার অন্তরে বিশ্ব নবীর (সা) সত্যতা স্বীকার করতেন। কিন্তু তাঁর রিসালাত মেনে নিতে সবসময় তাদের বংশীয় গোড়ামী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো।

ইবনে হিশাম এবং বাইহাকী বিশুদ্ধ উদ্ধৃতিসহ বর্ণনা করেছেন "হুজুরের(সা) নবুয়ত প্রাপ্তির পর একবার আখনাস বিন শুরাইক আবু জেহেলের নিকট হুজুরের (সা) ব্যাপারে তার মত জিজ্ঞেস করলো। সে বললো, আমাদের ও বনু আবদি মান্নাফের মধ্যে কে মর্যাদাশালী তা নিয়ে

বিবাদ ছিল। তারাও দায়িত্ব নিল এবং আমরাও দায়িত্ব বুঝে নিলাম। তারাও সাধারণ মানুষের জন্য দস্তরখান বিছালো এবং আমরাও। তারাও উদারতা প্রদর্শন করলো। আমরাও করলাম। এমনকি যখন তারা ও আমরা সমান সমান হয়ে গেলাম তখন তারা বলতে লাগলো যে আমাদের মধ্যে একজন নবী প্রেরিত হয়েছে। তার নিকট ওহী এসে থাকে। এখন আমরা এই দাবীর ব্যাপারে তাদের সঙ্গে কি মুকাবিলা করতে পারি। আল্লাহর কসম! আমরা তাদের নবীকে মানবো না।"

অন্য এক রেওয়ায়াতে আল্লামা ইবনে জারির তাবারী আবু জেহেলের সঙ্গে এই বাক্যাবলী সংশ্লিষ্ট করে থাকেন ঃ "আল্লাহর কসম! ইবনে আবদুল্লাহ সত্যবাদী। তাঁর যবান কখনো মিথ্যায় মলিন হয়নি। কিন্তু কুসাইর সন্তানরা যখন কা'বার অভিভাবকত্ব ও হাজীদের পানি পান করানোর সাথে সাথে নবুয়তের ওয়ারিশও হয়ে যান তখন অবশিষ্ট কুরাইশের জন্য আর কি থাকে?"

বাস্তবত আবু জেহেলের এই ধারণা তার গোত্রের সকল কুরাইশ সরদারের আবেগেরই প্রতিবিম্ব অনুমিত হয়। মজার ব্যাপার হলো যে, যেসব গোত্র আবদি মান্নাফের সন্তানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল না তারা ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে শুধু বনু হাশিমের সঙ্গেই নয়, বনু উমাইয়ার সাথেও শত্রুতা করতো। অবশ্য হুজুরের (সা) নবুয়ত প্রাপ্তির পর কুরাইশ নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঐক্যের মাপকাঠি ছিল ইসলাম বিরোধিতা অথবা তার প্রতি সমর্থন।

ইসলামের পূর্বে কুরাইশের সকল গোত্র নিজেদের মধ্যেকার পারস্পরিক শত্রুতা ও বিরোধ সত্ত্বেও কোন বহিঃশত্রুর মুকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেতো এবং একই ঝাণ্ডার অধীন দুশমনের মুকাবিলা করতো। এই প্রসঙ্গে কুরাইশ যুগের মশহুর যুদ্ধ দ্বিতীয় ফুজ্জারের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই যুদ্ধে এক পক্ষে বনু কায়েস আইলান ছিল। অন্য পক্ষে ছিল বনু কিনানাহ এবং কুরাইশ। কুরাইশের সকল গোত্রের নেতৃত্ব আবু সুফিয়ানের (রা) পিতা হারব বিন উমাইয়ার হাতে ছিল। ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন যে, এই যুদ্ধে রাসূলে আকরামও (সা) শরীক ছিলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ১৫ বছর। ইবনে আছির (র) সে সময় হুজুরের (সা) বয়স ১০ বছর ছিল বলে লিখেছেন এবং অন্য কতিপয় ঐতিহাসিক ২০ বছর বলে উল্লেখ করেছেন। এই যুদ্ধে হাশেমীয়দের সরদার হুজুরের (সা) বড় চাচা যোবায়ের বিন আবদুল মুত্তালিব ছিলেন এবং তাঁর অন্য চাচা আবু তালিব, হামযা (রা) এবং আব্বাসও (রা) শরীক ছিলেন। কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন, হুজুর (সা) এই যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু কারোর ওপর হাত তোলেননি। বরং শুরু থেকে শেষ

পর্যন্ত নিজের চাচাদেরকে দুশমনের তীর থেকে রক্ষা করতে থাকেন। হযরত আবু সুফিয়ানও (রা) এই যুদ্ধে হুজুরের (সা) পাশে পাশে ছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে প্রথমে বনু কায়েসের পাল্লাই ভারী ছিলো। কিন্তু পরে কুরাইশ তাদের ওপর বিজয়ী হয়। দ্বিতীয় ফুজ্জার দিবসের পর কুরাইশদেরকে আর কখনো কোন বহিঃশত্রুর হামলা মোকাবিলা করতে হয়নি। অবশ্য তাদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে বন্ধুত্ব ও শত্রুতার সিলসিলা অব্যাহত ছিল এবং পরস্পরের মধ্যে ছোটোখাটো ঝগড়া ঝাটি হতো। কুরাইশের এই ধরনের অতিবাহিত দিন-রাতের মধ্যে সেই মহান ব্যক্তিত্ব নিজের উন্নত চরিত্রসহ শৈশবকাল অতিক্রম করে যৌবনের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করছিলেন।

আবু সুফিয়ান সাখারের বয়স প্রায় ৫০ বছর। এমন সময় মক্কা মুয়াজ্জামা থেকে রিসালাত সূর্য উদয় হলো। এটা একটা সাধারণ ঘটনা ছিল না। বরং হক ও বাতিলের মধ্যে এক দীর্ঘ সংঘাতের সূচনা মাত্র ছিল। কুরাইশের সেই সব নেতা যারা মন ও অন্তর দিয়ে হুজুরের (সা) মহান চরিত্রের স্বীকৃতি দিতেন এবং যাদের যবান তাঁকে সত্যবাদী ও আমিন বলতে বলতে অস্থির হয়ে যেতো, তারাই হকের পয়গাম শুনে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো এবং নিজেদেরকে ইসলামের উৎখাত ও রহমতে আলমের (সা) বিরোধিতায় ওয়াকফ করে দিল। আবু সুফিয়ান তখন পোক্ত বয়সের মানুষ এবং বংশীয় গোড়ামী তার প্রকৃতি থেকে দূর হয়েছিল কিন্তু সে-ও ইসলাম বিরোধিদের দলের সদস্য হয়ে গেল। তবে, তার বিরোধিতার ধরন তেমন ছিল না যেমন আবু লাহাব, আবু জেহেল, উকবা বিন আবি মুয়াইত, উমাইয়া বিন খালফ, ইবনুল আসদা, নাজার ইবনুল হারিছ, আসওয়াদ বিন আবদি ইয়াগুছ, ওয়ালিদ বিন মুগিরাহ, মুনাব্বাহ ইবনুল হাজ্জাজ এবং আদি বিন হামরা প্রমুখ দুষ্ট প্রকৃতির মানুষেরা বিরোধিতা করতো। আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) তাবকাতে লিখেছেন যে, তারা হুজুরের (সা) বিরুদ্ধে এমনভাবে লেগেছিল যে, রাসূলকে (সা) কষ্ট দেয়ার নিকৃষ্টতম পন্থাও হাতছাড়া করেনি। হুজুরের (সা) পথে কাঁটা বিছানো, গলা টিপে ধরা, পিঠের ওপর উটের নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে দেয়া, গালি প্রদান, হাসি-ঠাট্টা করা এবং এ ধরনের ছ্যাচরামো ও নিকৃষ্টতম কাজ এসব লোক করতো। পক্ষান্তরে আবু সুফিয়ান, তার শ্বশুর উতবা বিন রবিয়া এবং চাচা শ্বশুর শাইবা বিন রবিয়ার মত কিছু ব্যক্তি অবশ্যই ইসলামের শত্রু ছিল। কিন্তু তারা হুজুরকে (সা) কখনো শারীরিক কষ্ট দেয়নি এবং কোন হীন তৎপরতাও চালায়নি। হাফেজ ইবনে হাজার (র) এ পর্যন্তও লিখেছেন ঃ

"নবুওয়াত প্রাপ্তির পর মুশরিকরা মক্কায় যখন তাঁর ওপর নির্যাতন চালাতো তখন তিনি তাদের হীনতৎপরতা থেকে বাঁচার জন্য আবু সুফিয়ানের বাড়ী চলে

যেতেন। সে বনু উমাইয়ার সরদার হওয়া ছাড়াও সামরিক বাহিনীর সেনাপতিও ছিল। এ জন্য মক্কাবাসী তাকে খুব ভয় করতো। তার গৃহে প্রবেশ করতেই হুজুর (সা) সকল নির্যাতন থেকে রক্ষা পেয়ে যেতেন। সে সময় আবু সুফিয়ান এবং তার পরিবারের সকল সদস্য ইসলামের দুশমন হওয়া সত্ত্বেও হুজুরের (সা) সাথে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করতো। সম্ভবত এর বিনিময়েই কয়েক বছর পর হুজুর (সা) যখন মক্কা জয় করেন তখন প্রকাশ্যে ঘোষণা দিলেন যে, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় নেবে সে নিরাপদ থাকবে।" (আল-ইসাবা)

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ননা করেছেন ঃ

"হুজুরের (সা) নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম যুগে একদিন আবু জেহেল সাইয়েদা ফাতিমাকে (রা) কোন কথার কারণে থাপ্পড় মারলো। সে সময় তার বয়স খুব কম ছিল। কাঁদতে কাঁদতে হুজুরের (সা) নিকট গেলেন এবং আবু জেহেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। তিনি তাঁকে বললেন ঃ "বেটি, আবু সুফিয়ানের নিকট গিয়ে আবু জেহেলের এই কাজ সম্পর্কে অবহিত করো।" তিনি তৎক্ষণাৎ আবু সুফিয়ানের নিকট গেলেন এবং তাকে সকল ঘটনা বর্ণনা করলেন। আবু সুফিয়ান শিশু ফাতিমার (রা) আঙ্গুল ধরলো এবং সোজা সেখানে গেল যেখানে আবু জেহেল বসেছিল। সে ফাতিমাকে বললো, বেটি, যেভাবে সে তোমার মুখের ওপর থাপ্পড় মেরেছিল, তুমিও তার মুখের ওপর থাপ্পড় মারো। (তাতে যদি সে কিছু বলে তাহলে আমি তাকে দেখে নেবো।) সুতরাং তিনি আবু জেহেলকে থাপ্পড় মারলেন এবং তারপর বাড়ী ফিরে গিয়ে হুজুরকে (সা) তা বললেন। তিনি সে সময়ই দু'হাত তুলে দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ! আবু সুফিয়ানের এই নেক আচরণ ভুলে যেও না।" হুজুরের (সা) এই দোয়ার ফলেই কয়েক বছর পর আবু সুফিয়ান (রা) ইসলামের নেয়ামতে অভিষিক্ত হলেন।

অনেক নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, আবু সুফিয়ান অন্তর থেকে রাসূলে আকরামের (সা) সত্যতা স্বীকার করতেন। কিন্তু পিতৃধর্মের ও জাহেলিয়াতের গোঁড়ামী তার ইসলাম গ্রহণে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল।

হযরত মুয়াবিয়া (রা) বিন আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে,[হুজুরের (সা) নবুয়ত প্রাপ্তির পর] একবার আমি আমার পিতা আবু সুফিয়ান ও মাতা হিন্দের সঙ্গে মরুভূমির দিকে যাচ্ছিলাম। আমার মাতা ও পিতা একটি গাধির ওপর সওয়ার ছিলেন এবং আমি অন্য আরেকটির ওপর

তাদের আগে আগে যাচ্ছিলাম। ঘটনাক্রমে পথিমধ্যে রাসূলে আকরামের (সা) সঙ্গে আমাদের সাক্ষাত ঘটলো। আমার পিতা আমাকে বললেন, মুয়াবিয়া তুমি গাধির ওপর থেকে নেমে যাও। যাতে মুহাম্মাদ (সা) তার ওপর সওয়ার হতে পারেন। সুতরাং আমি নেমে গেলাম এবং হুজুর (সা) তার ওপর সওয়ার হলেন। অতপর তিনি আমার মাতা-পিতাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "হে আবু সুফিয়ান! হে হিন্দ বিনতে উতবা! আল্লাহর কসম, তোমাদের সবার ওপর একদিন মৃত্যু আসবে। অতপর দ্বিতীয়বার জীবিত করে উঠানো হবে। সে সময় যে নেক বলে প্রতীয়মান হবে সে বেহেশতে যাবে এবং যে খারাব হবে সে জাহান্নামে যাবে। তারপর তিনি সূরায়ে হা-মিম আস সিজদার প্রথম এগারো আয়াত তাদেরকে শুনালেন। তারপর তিনি গাধি থেকে নেমে গেলেন এবং আমি তাতে সওয়ার হলাম। রাস্তায় আমার মা আমার পিতাকে বললো, "এই জাদুকর ও মিথ্যাবাদীর (নাউজুবিল্লাহ) খাতিরে তুমি আমার বাচ্চাকে সওয়ারী থেকে নামিয়েছ।" আমার পিতা বললো, "আল্লাহর কসম! এই ব্যক্তি জাদুকরও নন এবং মিথ্যাবাদীও নন।"

এমনিভাবে আরো কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে প্রকাশ পায় যে, আবু সুফিয়ান (রা) কয়েকবারই হুজুরের (সা) সত্যবাদিতার প্রকাশ্য স্বীকৃতি দেন। তা সত্ত্বেও সামষ্টিক ও রাজনৈতিক পর্যায়ে তিনি সবসময় কওমকে সমর্থন করেছিলেন ও ইসলামকে উৎখাতের সকল পরিকল্পনাতেই অংশ নিয়েছিলেন। হকের দাওয়াতের প্রথম যুগে কুরাইশের প্রতিনিধি দল একের পর এক হুজুরের (সা) বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আবু তালিবের নিকট গিয়েছিল। এই প্রতিনিধিদলে আবু সুফিয়ানও শামিল ছিলেন। নিসন্দেহে তিনি ইসলাম বিরোধিতায় নিজের কওমকে সমর্থন করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি হুজুরের (সা) সঙ্গে সবসময়ই সম্পর্ক রেখেছিলেন এবং মাঝে মধ্যে তাঁর সাথে এমন আচরণ করতেন যাতে শরাফত ও মানবিকতা প্রতিবিম্বিত হতো। যে যুগে কুরাইশ মুশরিকরা বনু হাশিম ও বনিল মুত্তালিবকে শি'বে আবি তালিবে অবরোধ করে রেখেছিল। (নবুয়তের ৭ থেকে ৯ বছর পর্যন্ত)। কখনো সখনো কোন মুসলমান অথবা রহমদিল মুশরিক চুরি করে অথবা লুকিয়ে ছুপিয়ে অবরুদ্ধদেরকে কিছু খাদ্য পৌঁছে দিত। এ ধরনের লোকদের মধ্যে এক সুন্দর অন্তরের মানুষ ছিলেন হিশাম বিন আমরুল আমেরী। তিনি রাতের বেলায় উটের পিঠে খাদ্য বোঝাই করে এবং শি'বে আবি তালিবের কাছে গিয়ে উট তাতে ঢুকিয়ে দিতেন। অবরুদ্ধরা উট থেকে খাবার নামিয়ে তা পুনরায় ফেরত পাঠিয়ে দিত। কুরাইশ মুশরিকরা একবার তাকে ধরে ফেললো এবং খুব কঠোরতার সাথে অবরুদ্ধদের সাহায্য করায় বাধা দিল। সে সময় আবু

সুফিয়ান উঠে দাঁড়ালেন এবং কুরাইশদেরকে তাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য ধমক দিলেন। তিনি বললেন, "এই ব্যক্তি যদি নিজের আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তার হক আদায় করে থাকে তাহলে তোমাদের তাতে কি আসে যায়। তাকে তা করতে দাও।"

সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ থেকে বর্ণিত আছে যে, কুরাইশ মুশরিকরা যখন রাসূলে আকরামকে (সা) খুব বেশী করে নির্যাতন করলো তখন একবার তিনি এই বলে দোয়া করেছিলেন ঃ

"হে আল্লাহ! ইউসুফের (আ) সাত সালা দুর্ভিক্ষের মত তাদের ওপরও দুর্ভিক্ষ দাও।"

বস্তুত মক্কায় এমন কঠিন দুর্ভিক্ষ পড়লো যে, লোকজন হাড়গোর এবং মুর্দা পর্যন্ত খাওয়া শুরু করলো। শেষে আবু সুফিয়ান এবং কুরাইশের অন্য কিছু নেতা হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হলেন। আবু সুফিয়ান তাদের মুখপাত্র হিসেবে বললেন ঃ

"মুহাম্মাদ (সা) তুমি লোকদেরকে আত্মীয়ের হক আদায়ের শিক্ষা দিয়ে থাকো। তোমার কওম ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তোমার খোদার নিকট দুর্ভিক্ষ দূর হওয়ার জন্য দোয়া কেন করছো না।"

যদিও কুরাইশের নির্যাতন ও অপতৎপরতা মানবতার সীমালংঘন করে গিয়েছিল তবুও আবু সুফিয়ানের কথা শুনে তৎক্ষণাৎ রহমতে আলমের (সা) পবিত্র হাত দোয়ার জন্য উঠে গেল এবং এত বর্ষণ হলো যে জল-স্থল পানিতে একাকার হয়ে গেল। এমনকি লোকজন অতিবর্ষণের কারণে অস্থির হয়ে উঠলো। এরপর তারা দ্বিতীয়বার হুজুরের (সা) নিকট বৃষ্টি বন্ধের দোয়ার আবেদন নিয়ে হাজির হলেন। তিনি দোয়া করলেন ঃ

"হে আল্লাহ! আমাদের ওপর না হয়ে আমাদের চারপাশে বৃষ্টি হোক।" তারপর আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল।

বুখারীর অন্য এক রেওয়ায়াতে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে দুর্ভিক্ষের ঘটনা এভাবে বর্ণিত আছে ঃ "এত কঠিন দুর্ভিক্ষ ছিল যে, কিছু না পেয়ে লোকজন পশম পর্যন্ত ভক্ষণ করতে লাগলো। শেষে একদিন আবু সুফিয়ান হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে ক্ষুধার ফরিয়াদ জানালো। তিনি দোয়া করলেন এবং আল্লাহ পাক এই দুর্ভিক্ষ দূর করে দিলেন।

নবুওয়াতের দশম বছরে বিশ্ব নবী (সা) হকের তাবলীগের জন্য তায়েফ তাশরীফ নিলেন। তায়েফবাসী আরবদের প্রথাগত মেহমানদারীকে উপেক্ষা

করে রাসূলের (সা) যে অসদাচারণ করে তা ইতিহাসের এক দুঃখজনক অধ্যায়। তিনি তায়েফ থেকে ফিরে খুবই পেরেশান হয়ে ওঠেন। তিনি ধারণা করতে থাকেন যে, মক্কার মুশরিকরা তায়েফের ঘটনা শুনে পূর্বের থেকে বেশী নির্যাতন চালাবে। আল্লামা ইবনে ইসহাক (র) বর্ণনা করেছেন যে, হিরার নিকটে পৌঁছে তিনি (সা) আবদুল্লাহ ইবনুল উরাইকিতের মাধ্যমে প্রথমে আখনাস বিন শুরাইক চাকাফী এবং তারপর সোহায়েল বিন আমরকে পয়গাম প্রেরণ করে বললেন যে, সে যেন তাকে পৃষ্টপোষকতা করে। তারা উভয়েই এ ব্যাপারে ক্ষমা চাইলো। তখন হুজুর (সা) বনি নওফিল বিন আবদি মান্নাফের সরদার মাতয়াম বিন আদিকেও একই পয়গাম প্রেরণ করলেন। যদিও সময়টা খুবই ভয়ংকর। মক্কার প্রতিটি অনু পরমাণু হুজুরের (সা) শত্রু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই বাহাদুর ব্যক্তি মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও সহযোগিতা ও পৃষ্টপোষকতার প্রতিশ্রুতি দিলেন। সুতরাং হুজুর (সা) মক্কায় তার গৃহে তাশরীফ নিলেন এবং তার ছ'সাতজন পুত্র সশস্ত্রভাবে তাঁকে (সা) হিফাজত করতে লাগলো। কুরাইশের অন্যান্য সরদার মাতয়ামের এই কাজে খুব কঠোরতা অবলম্বন করলো। কিন্তু আবু সুফিয়ান (রা) তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ঠাণ্ডা করে দিলেন। তিনি বললেন, মাতয়াম যাকে আশ্রয় দিয়েছে তাকে আমরাও আশ্রয় দিয়েছি। মাতয়ামের আশ্রয় দানের প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গা যায় না।

হযরত আবু সুফিয়ান (রা) যদিও মক্কা বিজয় পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত ছিলেন, তবুও তাঁর নিজের গৃহ এবং গোত্র ইসলাম থেকে সম্পর্কহীন ছিলেন না। তাঁর কন্যা রামলা (রা) (পরে যিনি উম্মুল মু'মিনীন হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং যিনি উম্মে হাবিবা কুনিয়তে প্রখ্যাত হন) নবুয়তের প্রথম যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হুজুরের (সা) ইঙ্গিতে নিজের স্বামী ওবায়দুল্লাহ বিন জাহাশের সঙ্গে হাবশা বা আবিসিনিয়া হিজরত করেন। আবু সুফিয়ানের (রা) অন্য এক কন্যা ফারেয়াও (রা) প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আবু আহমদ (রা) বিন জাহাশের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। ওবায়দুল্লাহ (রা) এবং আবু আহমদ (রা) দু'জন সহোদর ছিলেন এবং রাসূলে আকরাম (সা) তাঁদের মামাতো ভাই ছিলেন। এমনিভাবে বনু উমাইয়া খান্দানে হযরত উসমান (রা) বিন আফফান, আমর (রা) বিন সাঈদ বিন আছ এবং খালিদ (রা) বিন সাঈদ বিন আছও দাওয়াতের শুরুতে ইসলাম গ্রহণ করে সাবিকুনাল আউয়ালুনের মধ্যে পরিগণিত হন।

নবীর হিজরতের পূর্বে ইসলামের তের বছরের মক্কী যুগে আবু সুফিয়ান ইসলামের শত্রুদের দলে অবশ্যই ছিলেন। তবে, হক ও দায়ীয়ে হকের (সা)

বিরুদ্ধে তৎপরতার নেতৃত্ব সবসময় আবু জেহেল, আবু লাহাব, আছ বিন ওয়ায়েল, উমাইয়া ও আবি পসরানে খালফ এবং উকবা বিন আবি মুইত প্রমুখ অন্যান্য কুরাইশ নেতার হাতে ছিল। হিজরতের ১৯ মাস পর মক্কার কুরাইশ এবং হকপন্থীদের মধ্যে সামরিক পর্যায়ে প্রথম যুদ্ধ হয় বদর নামক স্থানে। এই যুদ্ধে কুরাইশের নেতৃত্ব দিয়ে ছিল আবু জেহেল। তার নিরাপত্তার আড়ালে কুরাইশরা হকের ঝাণ্ডাবাহীদের ওপর হামলা চালিয়েছিল। এই বিরাট কাফেলা বিভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী দেড় অথবা আড়াই হাজার উটের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। এসব উটের ওপর পাঁচ লাখ দিরহামের পণ্য বোঝাই ছিল। মক্কার কুরাইশের প্রায় প্রত্যেক খান্দানেরই তাতে অংশ ছিল। দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে সিরিয়া থেকে ফিরতি সফরকালে আবু সুফিয়ান খবর পেলেন যে, মুসলমানরা এই কাফেলার ওপর গেরিলা হামলা চালাতে পারে তিনি একজন দ্রুতগতিসম্পন্ন দূতকে মক্কাবাসীকে এই পয়গাম দিয়ে পাঠালেন যে, কাফেলার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে চলেছে। তাকে মুসলমানদের লুটতরাজ থেকে বাঁচানোর জন্য কালবিলম্ব না করে চলে এসো। এই পয়গাম পেতেই কুরাইশের এক হাজার যোদ্ধা অনেক সাজ-সরঞ্জামসহ মদীনা রওয়ানা হয়ে গেল ইত্যবসরে আবু সুফিয়ান নিজের রাস্তা পরিবর্তন করে কাফেলাকে সহিহ সালামতে মক্কা পৌঁছে দিলেন। কুরাইশ সৈন্যরাও একথা জানতে পেল। কিন্তু তারা ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে আক্রমণাত্মকভাবে সামনে অগ্রসর হতে লাগলো এবং বদরের ময়দানে গিয়ে তাঁবু ফেললো। এখানে হক ও বাতিলের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে মক্কার মুশরিকদের শোচনীয় ও শিক্ষণীয় পরাজয় ঘটে এবং আবু জেহেলসহ তাদের বড় বড় সরদার নিহত হয়। নিহতদের মধ্যে আবু সুফিয়ান তনয় হানজালা, শ্বশুর উতবা, নিসবতী ভাই ওয়ালিদ বিন উতবা, চাচা শ্বশুর শাইবা এবং আরো কয়েকজন আত্মীয় শামিল ছিল। বদরের পরাজয়ের খবর মক্কা পৌঁছলে সেখানে মাতম পড়ে গেল এবং বদরের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মক্কাবাসীরা জোরেশোরে প্রস্তুতি নিতে লাগলো। এ সময় তাদের নেতৃত্ব ছিল আবু সুফিয়ানের হাতে। তিনি কসম খেলেন যে, মুসলমানদের নিকট থেকে প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত দুনিয়ার কোন মজা গ্রহণ করবেন না। তিন মাস পর তিনি দুইশ' সশস্ত্র ও সত্তর সওয়ারসহ মদীনার ওপর অতর্কিতে হামলা চালালো। শহরের উপকণ্ঠে খেজুরের পাতার বেড়া সম্বলিত কিছু বাড়ী এবং ঘাসের স্তূপ জ্বালিয়ে ফেললো এবং দু'জন মুসলমানকে শহীদ করে দ্রুতগতিতে মক্কা ফিরে এলো। এটা সাবিকের যুদ্ধ নামে খ্যাত। কেননা এই সফরে কুরাইশের খাদ্য ছিল সাবিক অর্থাৎ ছাতু। ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় এই ছাতু ফেলে রেখেই তারা পালিয়ে গিয়েছিল। বিশ্ব নবী (সা) এই খবর পেয়ে কারকারাতুল

কদর পর্যন্ত হামলাকারীদের পিছু ধাওয়া করলেন। কিন্তু তারা পালিয়ে যেতে সফল হয়।

পরবর্তী বছর তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে আবু সুফিয়ান ওহোদের যুদ্ধে কুরাইশ মুশরিকদের নেতৃত্ব দেন। এই যুদ্ধে হকপন্থীদের ব্যাপক জীবনহানি ঘটে। (সত্তর জন মুসলমান শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন)। তবুও সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে আবু সুফিয়ান মুসলমানদেরকে পরিপূর্ণভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হননি। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে হুজুরে আকরাম (সা) আহত অবস্থায় কতিপয় জীবন উৎসর্গকারীসহ পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করেন। আবু সুফিয়ান একটি সৈন্য দল নিয়ে মুসলমানদের দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু ওপর থেকে প্রচণ্ড পাথর নিক্ষেপে তাদেরকে পিছু হটতে বাধ্য করা হয়। সামনের নিকটবর্তী কংকরময় মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি মুসলমানদেরকে ডেকে বললেন, "তোমাদের মধ্যে কি মুহাম্মাদ (সা) আছে?" হুজুর (সা) সাথীদেরকে জবাব দান থেকে বিরত থাকতে বললেন। যখন কোন জবাব এলোনা তখন আবু সুফিয়ান বুঝলেন যে, বিশ্ব নবীর (সা) শাহাদাতের খবর সঠিক ছিল। তিনি পুনরায় ডেকে বললেন, "তোমাদের মধ্যে কি ইবনে আবি কুহাফা [হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)] আছে?" তারও জবাব এলো না।" ওমর আছে কি?" এই প্রশ্নের জবাবেও সবাই চুপচাপ রইলো। ফলে তিনি বললেন, তাহলে অবশ্যই সকলে মারা গেছে। হযরত ওমর (রা) আর নিজেকে আয়ত্তে রাখতে পারলেন না। তিনি বজ্রকণ্ঠে বললেন ঃ

"এই আল্লাহর দুশমন, আমরা সবাই জীবিত রয়েছি।"

আবু সুফিয়ান উচ্চৈস্বরে বললেন ঃ "হোবল জিন্দাবাদ।" হুজুরের (সা) নির্দেশে হযরত ওমর (রা) তার জবাবে বললেন ঃ "আল্লাহু আ'লা ওয়া আজাল্লা" (অর্থাৎ আল্লাহ বুলন্দ ও সর্বশ্রেষ্ঠ)।

আবু সুফিয়ান বললেন ঃ "আমাদের নিকট আমাদের মাবুদ উজ্জা আছে। তোমাদের নিকট নেই।"

সাহাবীরা (রা) জবাব দিলেন ঃ "আল্লাহ আমাদের মাওলা এবং তোমাদের কোন মাওলা নেই।"

এবার আবু সুফিয়ান অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বললো, আজকের দিন হলো বদরের জবাব। আমার লোকেরা মুসলমানদের লাশ বিকৃত করে ফেলেছে। কিন্তু আমি এই নির্দেশ দিইনি। যা হবার তা হয়ে গেছে। তাতে দুঃখ করে আর কি লাভ।

হযরত ওমর (রা) বললেন, "মুসলমানরা শহীদ হয়ে জান্নাতে চলে গেছেন। আর তোমাদের নিহতরা জাহান্নামে গেছে।"

তারপর আবু সুফিয়ান কসম দিয়ে হযরত ওমরের (রা) নিকট জিজ্ঞেস করলেন যে, সত্য সত্য বলো, মুহাম্মাদ (সা) কি প্রকৃতপক্ষেই জীবিত আছেন? তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম, তিনি জীবিত আছেন এবং তোমাদের কথা শুনছেন। তা শুনে আবু সুফিয়ান বললো, "আমাকে ইবনে কামিয়া বলেছিল যে, আমি মুহাম্মাদকে (সা) হত্যা করে ফেলেছি। কিন্তু তোমরা বলছো যে, তিনি জীবিত আছেন। তাহলে এইটাই সঠিক হবে। কারণ তোমরা ইবনে কামিয়া থেকে বেশী সত্যবাদী।"

এই কথোপকথনের পর আবু সুফিয়ান নিজের সৈন্যদেরকে গুটিয়ে দ্রুত মক্কা রওয়ানা হয়ে গেলেন। হুজুর (সা) তাদের পিছু ধাওয়া করার জন্য সত্তর জনকে প্রেরণ করলেন এবং পরের দিন স্বয়ং হামরা উল আসাদ পর্যন্ত তাদের পিছু ধাওয়া করলেন। কিন্তু আবু সুফিয়ানের পুনরায় ফিরে হামলা করার আর সাহস হলো না।

ওহোদের যুদ্ধে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবাও অত্যন্ত তৎপরতা প্রদর্শন করেছিল। সে অন্যান্য মহিলার সঙ্গে নিজেদের পুরুষদেরকে যুদ্ধে উত্তেজিত করেছিল। রাসূলের (সা) চাচা হযরত হামযা (রা) শাহাদাত প্রাপ্ত হলে হিন্দ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তাঁর লাশ বিকৃত করে। এমনকি তাঁর কলিজা মুখে নিয়ে চিবাতে থাকে। এই ক্রোধের কারণ হলো, বদরের যুদ্ধে তার পিতা, চাচা, ভাই এবং পুত্র নিহত হয়েছিল। দু'বছর পর খন্দকের বা পরিখার যুদ্ধ সংঘটিত হলে তাতেও কুরাইশ এবং তার মিত্রদের নেতৃত্ব আবু সুফিয়ানের হাতেই ছিল। এই যুদ্ধে আরবের সকল ইসলাম দুশমন ঐক্যবদ্ধভাবে মদীনার ওপর চড়াও হয়। বিশ্ব নবী (সা) মদীনার চার পাশে নিরাপত্তামূলক পরিখা খনন করে তুফান সদৃশ্য এই মুসিবতের মুকাবিলা করেন এবং শত্রুদেরকে শহরের মধ্যে প্রবেশ করতে দেননি। হামলাকারীরা প্রায় তিন সপ্তাহ যাবত অবরোধ অব্যাহত রাখে। এই সময় আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্যে অনৈক্যের বীজ বপন করে দেন এবং এক রাতে তাদের ওপর এমন ভয়াবহ ধূলি-ঘূর্ণি প্রবাহিত করেন যে, তাদের তাঁবু উড়ে গেল। খাবারের হাড়ি পাতিল চুলার ওপর উল্টে গেল এবং ঘোড়া ভেগে গেল। এই আকস্মিক মুসিবতে কাফেরদের সাহসে ভাটা পড়লো এবং তারা সেই রাতে অবরোধ প্রত্যাহার করে রওয়ানা দিল।

৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর বিশ্ব নবী (সা) প্রতিবেশী দেশসমূহের শাসকদের নিকট পত্রাবলী প্রেরণ করে ইসলামের দাওয়াত দেন। এ সময় দাহিয়া কালবীর (রা) হাতে একটি পত্র রোমের কায়সার বা বাদশাহ হিরাক্লিয়াসের নামেও প্রেরণ করেন। তখন সে বাইতুল মুকাদ্দাস অথবা ইলিয়াতে অবস্থান করছিল। হিরাক্লিয়াস হুজুরের (সা) পত্র পেয়ে নিজের অফিসারদেরকে কোথাও হেজাজের ব্যবসায়ীকে পেলে তাকে তার নিকট হাজির করার নির্দেশ দিল। ঘটনাক্রমে সেই সময় আবু সুফিয়ান একটি বাণিজ্যিক কাফেলা নিয়ে সিরিয়া গিয়েছিলো এবং গাজাতে অবস্থান করছিলো। রোমক অফিসার সেই কাফেলাকে সঙ্গে নিয়ে হিরাক্লিয়াসের দরবারে হাজির হলো। এ সময় সে পূর্ণ দরবারে তাদের সাথে অনুবাদকের মাধ্যমে আলোচনা শুরু করলো। সর্বপ্রথম সে কাফেলার লোকদেরকে সম্বোধন করে বললো, "আরব ভাইয়েরা আমার! তোমাদের মধ্যে কে আছ সেই নবীর দাবীদারের নিকটাত্মীয়।"

আবু সুফিয়ান সামনে অগ্রসর হয়ে বললো এদের মধ্যে আমিই তার নিকটাত্মীয়। হিরাক্লিয়াস নিজের দরবারীদেরকে বললো, "এই ব্যক্তিকে আমার নিকট বসাও এবং তার সঙ্গীদেরকে তার পিছনে বসিয়ে দাও।" অতপর সে আবু সুফিয়ানের সাথীদেরকে বললেন, "আমি এই ব্যক্তির নিকট নবীর দাবীদার সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করবো। যদি সে সঠিক জবাব না দেয় তাহলে তোমরা তার মিথ্যাকে প্রকাশ করে দেবে।"

আবু সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কসম, সে সময় আমি যদি এই ভয় না করতাম যে আমার সঙ্গীরা মক্কা ফিরে গিয়ে আমার মিথ্যা কথার উল্লেখ করবে তাহলে আমি মিথ্যা বর্ণনা করতেও পিছপা হতাম না।

(এই বর্ণনা হযরত আবু সুফিয়ানের সত্যবাদিতার প্রমাণ বহন করে। ইসলাম গ্রহণের পর এই ঘটনা বর্ণনা করে তিনি লোকদেরকে এটাই বলতে চাইতেন যে, তার অন্তরে ইসলামের বিরুদ্ধে এত বিদ্বেষ ছিল যে, মিথ্যা বর্ণনাও যদি তার সাধ্যে কুলাতো তাহলে তাও তিনি করতেন। শুধুমাত্র অপবাদের ভয়ে তিনি সত্য বলতে বাধ্য হয়েছিলেন। কেননা সে সময় আরবে মিথ্যাকে সবচেয়ে বড় অপরাধ এবং গুনাহ মনে করা হতো। তারা যিনাকারী এবং হত্যাকারীর গালি সহ্য করতেন, কিন্তু 'মিথ্যাবাদী'র গালি সহ্য করতে পারতেন না।)

এরপর হিরাক্লিয়াস ও আবু সুফিয়ানের মধ্যে নিম্নলিখিত কথোপকথন হয়ঃ

হিরাক্লিয়াস ঃ "এই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে পয়গম্বরীর দাবী করে থাকে তার বংশ কেমন?

আবু সুফিয়ান ঃ "সে উচ্চ বংশের মানুষ।"

হিরাক্লিয়াস ঃ "তার পূর্বেও কি তার খান্দানের কেউ এই দাবী করেছিল?"

আবু সুফিয়ান ঃ "না।"

হিরাক্লিয়াস ঃ "তার দ্বীন যারা গ্রহণ করেছে তারা সম্মানিত ও শরীফ মানুষ, না দুর্বল ও মর্যাদাহীন।"

আবু সুফিয়ান ঃ "বেশীর ভাগ নিম্নশ্রেণীর মানুষ তাকে মানছে।"

হিরাক্লিয়াস ঃ "তার অনুসারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে না কমছে?"

আবু সুফিয়ান ঃ "দিন দিন অনুসারীর সংখ্যা বাড়ছে।"

হিরাক্লিয়াস ঃ "কোন ব্যক্তি কি তার দ্বীন গ্রহণ করার পর তা আবার পরিত্যাগ করেছে?"

আবু সুফিয়ান ঃ "না।"

হিরাক্লিয়াস ঃ "নবুওয়াতের দাবীর পূর্বে তোমাদের মধ্যে কেউ কি তাকে মিথ্যা বলতে দেখেছে?"

আবু সুফিয়ান ঃ "না।"

হিরাক্লিয়াস ঃ "সে কি কখনো নিজের ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে?"

আবু সুফিয়ান ঃ "এখন পর্যন্ত করেনি। তবে বর্তমানে আমাদের ও তার মধ্যে একটি চুক্তি চলছে। জানি না, সে তা পালন করে না ভঙ্গ করে।

হিরাক্লিয়াস ঃ "কখনো তার সঙ্গে কি তোমাদের যুদ্ধ হয়েছে?"

আবু সুফিয়ান ঃ "হাঁ, হয়েছে"।

হিরাক্লিয়াস ঃ "তার ফলাফল কি হয়েছে?"

আবু সুফিয়ান ঃ "কখনো আমরা বিজয়ী হয়েছি কখনো সে।"

হিরাক্লিয়াস ঃ "আচ্ছা, সেই ব্যক্তি কি শিক্ষা দেয়? তার পয়গাম কি?"

আবু সুফিয়ান ঃ "সে বলে, এক আল্লাহর ইবাদাত কর। কাউকে তার অংশীদার করো না। নিজের বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ কর। নামায পড়। সত্য কথা বলো। পরহেজগারী অবলম্বন কর। দান খয়রাত কর। বন্ধু বান্দব ও আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে নেকী, রহম ও উদারতাপূর্ণ আচরণ কর।"

হিরাক্লিয়াস অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন বাদশাহ ছিলেন। সে এই কথোপকথনে খুবই প্রভাবিত হলো এবং বলতে লাগলেন ঃ হে "কুরাইশ সরদার! তুমি যা বলেছ তা যদি ঠিক হয় তাহলে এই নবুওয়াতের দাবীদার নিসন্দেহে সাচ্চা পয়গম্বর। আমার এ ধারণা অবশ্যই ছিল যে, একজন পয়গম্বর আসছেন। কিন্তু এটা জানা ছিল না যে, সে আরবে জন্মগ্রহণ করবে। আমার বিশ্বাস যে, একদিন এমন আসবে যে সে আমার পদতলের এই মাটি দখল করে নেবে। আমি তার সত্যতার স্বীকৃতি দিচ্ছি। হতে পারে যে, আমি গিয়ে তার পা ধুয়ে দেব।

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হিরাক্লিয়াস একাকী হযরত দাহিয়া কালবীকে (রা) বলেছিলেন ঃ "আমি জানি, রাসূলে আরাবী (সা) তাঁর দাবীতে সত্য। কিন্তু আমি নিজের জীবন এবং রাষ্ট্রের ভয়ে প্রকাশ্যে তাঁর দ্বীন গ্রহণ করতে পারি না।"

সহীহ বুখারীতে আছে যে, হিরাক্লিয়াসের প্রতিক্রিয়া দেখে আবু সুফিয়ান দরবার থেকে বাইরে এসে নিজের সঙ্গীদেরকে বললেন ঃ "আরে, ইবনে আবি কাবশার [হুজুর (সা)] ব্যাপারটি এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, গোরা রোমক বাদশাহও তাকে ভয় করা শুরু করেছে।"

এই রেওয়াতে স্বয়ং আবু সুফিয়ানের এই বাক্যও উল্লেখ করা হয়, "ব্যাস, সেদিন থেকেই আমার আস্থা জন্মেছিল যে তাঁরই [হুজুরের (সা)] বিজয় ঘটবে। এমনকি আল্লাহ তায়ালা আমাকে ইসলামে দাখিল করিয়ে দিলেন।"

সেই বছর (৬ষ্ঠ হিজরীতে) হযরত উম্মে হাবিবা রামলা (রা) বিনতে আবু সুফিয়ানের নিকাহ রাসূলে আকরামের (সা) সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এমনিভাবে রহমতে আলমের (সা) সঙ্গে আবু সুফিয়ানের শ্বশুরের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত উম্মে হাবিবা (রা) নবুওয়াতের প্রথম যুগেই ইসলাম কবুল করেছিলেন এবং হাবশায় দ্বিতীয় হিজরীতে স্বামী ওবায়দুল্লাহ বিন জাহাশের সঙ্গে উদ্বাস্তুর জীবন গ্রহণ করেন। সেখানে দুর্ভাগ্যবশতঃ ওবায়দুল্লাহ খারাপ সাহচর্যে মুরতাদ হয়ে যায় এবং খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে মদপান শুরু করে দেয়। হযরত উম্মে হাবিবা (রা) সেই সময়েই তার থেকে পৃথক হয়ে যান। কিছুদিন পর অধিক মদ পানের জন্য ওবায়দুল্লাহ মারা যায়। এ সময় হযরত উম্মে হাবিবা একাকিনী ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত সবর ও সাহসিকতার সঙ্গে বৈধব্যের জীবন কাটাতে লাগলেন। বিশ্ব নবী (সা) এই অবস্থার কথা জানতে পেরে তাঁকে নিকাহর পয়গাম দেয়ার জন্য হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়া জুমরীকে

হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করলেন। একটি রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি (সা) হযরত আমর (রা) বিন উমায়াকে হাবশায় প্রেরণের পূর্বে আবু সুফিয়ানকে বলে পাঠালেন যে, তোমার কন্যা উম্মে হাবিবা রামলা বিধবা হয়ে গেছে। আমি তাকে নিকাহ করতে চাই। তুমিও অনুমতি দিলে ভাল হয়। আবু সুফিয়ান ইসলামের শত্রু হওয়া সত্ত্বেও চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই অনুমতি দিয়ে দিলেন। নাজ্জাশী হুজুরের (সা) পয়গাম পেয়ে নিজের দাসী আবরাহার মাধ্যমে হযরত উম্মে হাবিবার (রা) নিকট তাঁর পয়গাম পৌছালেন। তিনি অত্যন্ত খুশীর সঙ্গে হুজুরের (সা) সাথে নিকাহতে সম্মতি দিলেন এবং হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদ (মুহাজিরে হাবশা)-কে নিজের উকিল নিয়োগ করলেন।] নাজ্জাশী বিয়ের মাহফিলের ব্যবস্থা করলেন এবং ভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী তিনি স্বয়ং অথবা হযরত জাফর (রা) বিন আবি তালিব বিয়ের খুতবা দিলেন। মোহর হিসেবে বাদশাহ চারশ' দিনার হুজুরের (সা) পক্ষ থেকে খালিদ (রা) বিন সাঈদকে আদায় করলেন এবং তারপর মজলিশে উপস্থিত সকলকে খাবার খাইয়ে বিদায় করলেন। বিয়ের কিছু দিনপর হযরত উম্মে হাবিবা (রা) নৌ জাহাজের মাধ্যমে হেজাজ প্রত্যাবর্তন করেন। সে সময় রহমতে আলম (সা) খায়বারে ছিলেন।

হাফেজ জাহাবী (র) "মুনতাকাতে" লিখেছেন যে, আবু সুফিয়ান যখন এই বিয়ের খবর পেলেন তখন তার মুখ দিয়ে হুজুরের (সা) প্রশংসাসূচক কথা বের হয়ে গেল। আল্লামা ইবনে সায়াদের (র) বর্ণনা হলো যে, এই সময় আবু সুফিয়ানের মুখ দিয়ে স্বতস্ফূর্তভাবে এই বাক্য বেরিয়ে গেল ঃ "মুহাম্মাদ (সা) আমার কন্যার জন্য উত্তম।"

কতিপয় রেওয়ায়াতে হযরত উম্মে হাবিবার (রা) সঙ্গে হুজুরের (সা) বিয়ের সাল সপ্তম হিজরী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হতে পারে, ৬ষ্ঠ হিজরীর শেষ দিকে হুজুর (সা) পয়গাম প্রেরণ করে ছিলেন এবং সপ্তম হিজরীর প্রথম দিকে বিয়ে হয়েছিল। হাফেজ ইবনে কাছির (র) নিজের তাফসির গ্রন্থে লিখেছেন যে, উম্মে হাবিবার (রা) সঙ্গে বিয়ের পর আবু সুফিয়ানের (রা) অন্তর নরম হয়ে গিয়েছিল; আর তাই ভালবাসার কারণ হয়েছিল। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে, সেই যুগেই বিশ্ব নবী (সা) এবং আবু সুফিয়ানের মধ্যে কিছু তোহফা বিনিময় হয়েছিল। হাফেজ জাহাবী (র) বর্ণনা করেছেন যে, একবার হুজুর (সা) হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়াতাজ জুমুরীর হাতে কিছু খেজুর হযরত আবু সুফিয়ানকে হাদিয়া হিসেবে পেশ করেছিলেন। তিনি তার জবাবে কোন বস্তু (হাদিসে যাকে আওম বলা হয়েছে) হুজুরের (সা) নিকট হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ

করেন। অন্য আরো এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী হুজুর (সা) আওমের জন্য স্বয়ং ফরমায়েশ করেছিলেন।

মক্কা বিজয়ের কিছু দিন পূর্বে সেখানে প্রচন্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) "আল-ইসতিয়াব" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর (সা) এই দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে জানতে পেয়ে হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়ার মাধ্যমে হযরত আবু সুফিয়ানকে কতিপয় বস্তু হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করেন। অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হুজুর (সা) মক্কায় দুর্ভিক্ষ ও অভাবের খবর শুনে কয়েকশ' দিনার হযরত আবু সুফিয়ানকে প্রেরণ করেন এবং তা মক্কার অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বন্টন করে দিতে বলেন। আবু সুফিয়ান এই অর্থ গ্রহণ করেন কিন্তু হেসে বলেন ঃ

"আচ্ছা, মুহাম্মাদ (সা) কি এখন আমাদের যুবকদেরকে কিনতে চায়।"

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র) "ইজালাতুল খুলাফা আন খিলাফাতুল খুলাফা" নামক গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, হযরত উম্মে হাবিবার (রা) বিয়ের কিছু দিন পূর্বে যে আয়াত নাযিল হয় তার তরজমা হলো ঃ"আল্লাহ তায়ালা সম্ভবতঃ আপনার এবং আপনার সঙ্গে শত্রুতা পোষণকারীর মধ্যে বন্ধুত্ব করিয়ে দেবেন।"

এই আয়াত হযরত উম্মে হাবিবার (রা) শানে ছিল এবং তাতে তাঁর পিতার অন্তরে ইসলাম ও হুজুরের (সা) ব্যাপারে নরম স্থান সৃষ্টির ব্যাপারে ইঙ্গিত ছিল।।

হুদায়বিয়ার সন্ধি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, যেসব গোত্র মুসলমানদের মিত্র হতে চায় তাতে তাদের স্বাধীনতা থাকবে এবং যারা কুরাইশের সঙ্গে চুক্তি করতে চাইবে তাতেও তাদের স্বাধীনতা থাকবে। বস্তুত এই চুক্তি অনুযায়ী বনু খাযায়া রাসূলে আকরামের (সা) সঙ্গে এবং বনু বকর কুরাইশের সঙ্গে বন্ধুত্বের চুক্তি করেছিল। এখন দু'পক্ষই পরস্পরের মিত্রদেরকে কোন ধরনের কষ্ট না দেয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে তাদের দুশমনের সাহায্য না করার ব্যাপারে বাধ্য ছিল। বনু খাজায়া এবং বনু বকরের মধ্যে দীর্ঘ দিন থেকে শত্রুতা চলে আসছিল। সন্ধি বা চুক্তির পর আঠারো মাস পর্যন্ত এসব গোত্র শান্তিতেই ছিল। কিন্তু তারপর হঠাৎ করে বনু বকর বনু খাজায়ার উপর হামলা করে বসলো এবং অত্যন্ত নির্দয়ভাবে তাদের শিশু ও মহিলাদেরকে পর্যন্ত হত্যা করলো। তারা হেরেমে আশ্রয় নিল। কিন্তু বনু বকর তাদেরকে সেখানেও ছাড়লো না। ইকরামা বিন আবু জেহেল এবং বেশ কিছু অন্য কুরাইশ নেতা এ

সময় প্রকাশ্যে বনি বকরকে সাহায্য করে এবং এমনিভাবে হুদায়বিয়ার সন্ধিনামা বাস্তবতঃ ছিন্নভিন্ন করে ফেলা হয়।

বনু খাজায়া আমর বিন সালেম খাজায়ীর নেতৃত্বে ৪০ জনের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলের (সা) নিকট প্রেরণ করলো। এ প্রতিনিধি দল হুজুরের(সা) খিদমতে হাজির হয়ে অত্যন্ত দরদভরা ভাষায় তাদের ওপর সংঘটিত নির্যাতনের চিত্র পেশ করেন। সারওয়ারে আলম (সা) বনু বকর ও কুরাইশের নৃশংসতা এবং চুক্তিভঙ্গের ঘটনাবলী শুনে খুব দুঃখীত হলেন। তবুও তিনি প্রতিবাদের জন্য কুরাইশের নিকট দূত প্রেরণ করলেন এবং তিনটি শর্ত পেশ করলেন এবং তার মধ্যে যে কোন একটি মেনে নিতে বললেন ঃ

১-নিহতদের দিয়ত দিতে হবে (২) কুরাইশরা বনু বকরের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবে (৩) প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করতে হবে যে, হুদায়বিয়ার চুক্তি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।

দূত যখন কুরাইশদের নিকট পৌছলো তখন তারা অত্যন্ত অহংকারের সঙ্গে বললো "যাও, আমরা মুহাম্মাদের (সা) প্রজা নই আমরা যা ইচ্ছা তাই করেছি। চুক্তির কোন পরওয়া আমরা করি না।" সে সময় তো তারা জাহেলিয়াতের আবেগে একথা বলে ফেললো। কিন্তু দূত চলে যাওয়ার পর তারা নিজেদের যুক্তিহীন জবাব এবং তার পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করে খুব পস্তালো ও তৎক্ষণাৎ আবু সুফিয়ানকে (রা) দূত বানিয়ে মদীনা প্রেরণ করলো। যাতে তিনি হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে হুদায়বিয়ার চুক্তি নবায়ন করে আনতে পারেন।

আবু সুফিয়ান (রা) মদীনা পৌছেই প্রথমে স্বীয় কন্যা উম্মে হাবিবার (রা) ঘরে গেলেন। তিনি উম্মুল মু'মিনীন ছিলেন। তিনি রাসূলে আকরামের (সা) পবিত্র বিছানায় বসতে চাইলেন। হযরত উম্মে হাবিবা (রা) তৎক্ষণাৎ বিছানা গুটিয়ে ফেললেন। বললেন, একি? কন্যা জবাব দিলেন ঃ

"এটা রাসূলের (সা) বিছানা। আপনি যেহেতু মুশরিক সে কারণে অপবিত্র। এ জন্য এই পবিত্র বিছানায় বসতে পারেন না।"

আবু সুফিয়ান (রা) কন্যার কথা শুনে প্রায় মূর্ছা যাওয়ার অবস্থা। সে ছিল তাঁর সবচেয়ে বেশী প্রিয় কন্যা। যার সম্পর্কে তিনি একথা বলে গৌরব প্রকাশ করতেন ঃ

[আমার নিকট আরবের হাসিন ও জামিল (আমার কন্যা) উম্মে হাবিবা রয়েছে]

হাফিজ ইবনে হাজার (র) "ইসাবাতে" লিখেছেন যে, এ সময় আবু সুফিয়ান শুধু বললেন ঃ "কন্যা আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে খারাপ হয়ে গেছে।" অর্থাৎ নিজের দ্বীনের খাতিরে পিতাকে স্বামীর বিছানার ওপর বসতে দেয়নি। তারপর আবু সুফিয়ান (রা) রাসূলের (সা) দরবারে হাজির হয়ে চুক্তি নবায়নের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। হুজুর (সা) দূতের মাধ্যমে মক্কার ঘটনাবলী জানতে পেরেছিলেন। এ জন্য তিনি চুক্তি নবায়ন সমর্থন করলেন না। এরপর হযরত আবু সুফিয়ান (রা) হযরত আবু বকর সিদ্দীককে (রা) এ ব্যাপারে মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে সুপারিশ করতে রাজী হলেন না। এমনিভাবে হযরত ওমর (রা) এবং হযরত আলীও (রা) এ ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানালেন। একটি বর্ণনায় আছে যে, এ সময় তিনি হযরত ফাতিমাতুজ জোহরার (রা) নিকট উপস্থিত হয়ে আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে বললেন, বেটি; হাসান তোমার পিতার খুবই প্রিয়। তাকে দিয়ে তোমার পিতাকে বলালে তিনি চুক্তি নবায়নে সম্মত হয়ে যাবেন। কিন্তু হযরত ফাতিমাও (রা) ক্ষমা চাইলেন। অবশেষে তিনি স্বয়ং [অথবা এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত আলীর (রা) পরামর্শক্রমে] মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়ে চুক্তি নবায়নের এক পক্ষীয় ঘোষণা দিলেন এবং মক্কা ফিরে গেলেন। এদিকে বিশ্ব নবী (সা) খুব চুপিসারে মক্কার ওপর চড়াও হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। যখন সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন হলো তখন অষ্টম হিজরীর ১০ই রমযান তিনি ১০ হাজার জীবন উৎসর্গকারীকে সঙ্গে নিয়ে মদীনা থেকে মক্কা রওয়ানা হলেন।

ইসলামী বাহিনী মক্কা থেকে এক মনযিল আগে মাররুজ জাহরান নামক স্থানে রাতে তাঁবু ফেললো। কুরাইশরাও মুসলমানদের তৎপরতা এবং আনা-গোনার খবর পেল। কিন্তু তারা এটা ধারণাও করতে পারেনি যে, হুজুরের (সা) সঙ্গে এতবড় বাহিনী এসেছে। আবু সুফিয়ান (রা) বাদিল (রা) বিন ওয়ারকা এবং হাকিম (রা) বিন হাযামের সঙ্গে গোয়েন্দাগিরী করতে বের হলেন। মাররুজ জাহরানের নিকটে পৌঁছে দেখলেন যে, স্থানে স্থানে আগুন জ্বলছে এবং দূর দূরান্ত পর্যন্ত লোকজন ছড়িয়ে রয়েছে। মুসলমানদের এই অবস্থা দেখে তিনি হতভম্ব হয়ে পড়লেন। এদিকে রাসূলের (সা) চাচা হযরত আব্বাসের (রা) অন্তরে ধারণা সৃষ্টি হলো যে, মক্কায় সৈন্য প্রবেশের পূর্বে যদি মক্কাবাসীরা নিরাপত্তা কামনা না করে তাহলে তাদেরকে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। একথা চিন্তা করে তিনি সৈন্যদের থেকে বাইরে বেরুলেন। মক্কা গমনকারী কোন মানুষ যদি পাওয়া যায় তাহলে তার হাতে কুরাইশদের নিকট পয়গাম প্রেরণই লক্ষ্য ছিল। সেই পয়গামে তিনি জানাতে চেয়েছিলেন যে, মুসলমানরা মক্কার ওপর হামলা করতে যাচ্ছে। যদি ভাল চাও,

তাহলে নিরাপত্তা চেয়ে নাও। ঘটনাক্রমে তিনি সেইদিকে গেলেন যেখানে আবু সুফিয়ান নিজের সঙ্গীদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। হযরত আব্বাস (রা) কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে বলে উঠলেন, "আবু সুফিয়ান।" তিনি বললেন, "আবুল ফজল?" বললেন, "হাঁ।" আবু সুফিয়ান বললেন, "আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আপনি এখানে কেন?" হযরত আব্বাস (রা) বললেন, "এটা মুসলমান বাহিনী এবং মক্কা দখল করতে চায়।" আবু সুফিয়ান পেরেশান হয়ে পড়লেন এবং বললেন, "আপনিই তাহলে কোন পথ বাতলে দিন।"

হযরত আবুল ফজল আব্বাস (রা) এবং আবু সুফিয়ানের মধ্যে খুবই বন্ধুত্ব ছিল। আবু সুফিয়ানের ওপর তাঁর দয়া হলো। তার সঙ্গীদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন এবং স্বয়ং আবু সুফিয়ানকে (রা) নিজের খচ্চরের ওপর বসিয়ে হুজুরের (সা) নিকট নিয়ে চললেন। রাস্তায় হযরত ওমরের (রা) সঙ্গে দেখা হলো। তিনি আবু সুফিয়ানকে চিনে ফেললেন এবং এই আল্লাহর দুশমন বলে তার দিকে অগ্রসর হলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর শোকর যে, তিনি কোন দায়িত্ব ছাড়া আমাদেরকে তোমার ওপর বিজয় দান করেছেন।। কিন্তু হযরত আব্বাস (রা) তাঁকে নিয়ে খুব দ্রুততার সঙ্গে হুজুরের (সা) তাঁবুতে প্রবেশ করে আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি আবু সুফিয়ানকে আশ্রয় দিয়েছি।" ইত্যবসরে হযরত ওমরও (রা) পৌঁছে গেলেন এবং হুজুরের (সা) নিকট আবু সুফিয়ানের (রা) মাথা কেটে ফেলার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু হযরত আব্বাস (রা) তাঁর ঢাল হয়ে গেলেন। হযরত ওমর (রা) খুব পীড়াপীড়ি করলেন। এতে হযরত আব্বাস (রা) রেগে গিয়ে বললেন, "ওমর, বনু আদির (হযরত ওমরের খান্দান) কোন মানুষ যদি হতো তাহলে তুমি তাকে হত্যার জন্য এত পীড়াপীড়ি করতে না। কিন্তু তুমি বনু আবদি মান্নাফের কোন পরওয়া করছো না।"

হযরত ওমর, জবাব দিলেন, "আব্বাস! আল্লাহর কসম, আপনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন আমি এত খুশী হয়েছিলাম যে, নিজের পিতা খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণেও তা হতাম না।"

তারপর হুজুর (সা) উভয়কেই চুপ করিয়ে দিলেন এবং হযরত আব্বাসকে (রা) বললেন যে, আবু সুফিয়ানকে, এ সময় তোমার তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দাও। সকাল হলে তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।

সকাল হলে হযরত আব্বাস (রা) আবু সুফিয়ানকে (রা) সঙ্গে নিয়ে রাসূলের (সা) নিকট উপস্থিত হলেন। হুজুর (সা) তাঁকে সম্বোধন করে বললেনঃ

"আবু সুফিয়ান, একক আল্লাহর ওপর ঈমান আনার সময় কি এখনো হয়নি?"

তিনি জবাবে আরজ করলেন, "আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আপনি কত ধৈর্যশীল এবং উত্তম মানুষ। খোদার কসম, খোদা ছাড়া যদি আর কোন সত্ত্বা পূজার যোগ্য হতো তাহলে আজ আমাকে সাহায্য করতো।" অতপর ইরশাদ হলো ঃ

"আবু সুফিয়ান, কতবড় আফসোস। এখনো কি আমাকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে নেয়ার সময় আসেনি?"

আরজ করলেন ঃ "আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আপনি কত শরীফ ধৈর্যশীল এবং আত্মীয়ের হক আদায়কারী। সত্য বলতে কি এ ব্যাপারে (রিসালাত) আমার অন্তর মুতমায়িন নয়।"

আল্লামা ইবনে হিশাম (র) বলেন, এই জবাবে হযরত আব্বাস (রা) আবু সুফিয়ানকে ডাটলেন। তিনি বললেন, জাহেলী গোঁড়ামী পরিত্যাগ করো এবং আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের ওপর ঈমান আনো। একথা বলার সাথে সাথে তিনি কালেমায়ে তাওহীদ পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। সহীহ বুখারীতে আছে, আবু সুফিয়ান (রা) মক্কা বিজয়ের দু'দিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন।

হাফেজ ইবনে হাজার (র) বর্ণনা করেছেন, তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বের রাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি একটি চমকপ্রদ রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"আবু সুফিয়ান হুজুরের (সা) খিদমতে পৌছে দেখলেন যে, মুসলমান তাঁর (সা) নিকট পৌছার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করছে। সে সময় তার ধারণা হলো যে, সে-ও তাদের মুকাবিলার জন্য বিরাট এক বাহিনী একত্রিত করবে। ঠিক সেই সময় হুজুর (সা) তাঁর বুকের ওপর হাত রাখলেন এবং বললেন ঃ "তুমি যদি তা করো তাহলে আল্লাহ তোমাকে হেয়প্রতিপন্ন করবেন।" আবু সুফিয়ান বিস্মিত হয়ে পড়লেন এবং স্বতস্ফূর্তভাবে তাঁর মুখ দিয়ে বের হলো ঃ "আস্তাগফিরুল্লাহা ওয়া আতুবু ইলাইহি।" অতপর আরজ করলেন ঃ "আল্লাহর কসম! আমার অন্তরের অবস্থা আল্লাহ আপনার নিকট স্পষ্ট করে দিয়েছেন। নিসন্দেহে আপনি রাসূলে বরহক।" কিন্তু এখন পর্যন্তও আমার অন্তর সন্দেহমুক্ত ছিল না। কয়েক মুহূর্ত পর খেয়াল এলো ঃ "না জানি, মুহাম্মাদ (সা) কোন কারণে আমাদের ওপর বিজয় লাভ করছে।" সে সময় হুজুর (সা) বললেন, "আল্লাহর সাহায্যে বিজয়ী হচ্ছি।" এতক্ষণে হযরত আবু

সুফিয়ানের অন্তর সবধরনের সন্দেহ ও দোদুল্যমানতা থেকে মুক্ত হয়ে গেল এবং তিনি সত্য অন্তরে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করলেন।"

তাঁর ইসলাম গ্রহণে হুজুর (সা) খুব খুশী হলেন। তিনি শুধুমাত্র তাঁর জীবনই রক্ষা করলেন না বরং এটাও প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের (রা) গৃহে আশ্রয় নেবে তাকেও কোন কিছু বলা হবে না।

তারপর হুজুর (সা) হযরত আব্বাসকে (রা) আবু সুফিয়ানকে (রা) পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গিয়ে আল্লাহর বাহিনীর শান প্রদর্শনের নির্দেশ দিলেন। সুতরাং হযরত আব্বাস (রা) তাঁকে যথাযথ স্থানে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন। সর্বপ্রথম বনু গিফার পতাকা উড়িয়ে অতিক্রম করলো। তারপর জাহনিয়া, হুযাইম এবং সুলাইম আপাদমস্তক অস্ত্র সজ্জিত হয়ে নারায়ে তাকবির দিতে দিতে অগ্রসর হলেন। সবশেষে মদীনার আনসাররা এমন শানে আবির্ভূত হলেন যে, হযরত আবু সুফিয়ান (রা) হতভম্ব হয়ে পড়লেন এবং হযরত আব্বাসকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, "এরা কারা।" তিনি বললেন, এরা মদীনাবাসী। একথা হচ্ছিল এমন সময় আনসার সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদা ঝাণ্ডা হাতে সামনে দিয়ে অতিক্রম করলেন। হযরত আবু সুফিয়ানের ওপর নজর পড়তেই চেঁচিয়ে বললেন ঃ "আজ প্রচণ্ড যুদ্ধের দিন। আজ কা'বাকে হালাল করা হবে।"

হযরত আবু সুফিয়ান একথা শুনে ঘাবড়ে গেলেন এবং আনসারের পর যখন স্বয়ং রিসালাত সূর্যের বাহিনীর অভ্যুদয় ঘটলো তখন হুজুরকে (সা) সম্বোধন করে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! নিজের কওমের ওপর রহম করুন। আপনি নেক্কার এবং দয়ালু। সায়াদ (রা) বিন উবাদা কেবল বলে গেল যে, আজ কা'বা হালাল করে ফেলা হবে।

রহমতে আলম (সা) বললেন ঃ "সায়াদ (রা) ভুল বলেছে। আজ কা'বার মর্যাদা দ্বিগুণ হওয়ার দিন। আজ কা'বায় গিলাফ পরানো হবে।"

হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে হযরত আবু সুফিয়ান (রা) মুতমায়িন হয়ে গেলেন এবং মক্কা গিয়ে লোকদেরকে উপদেশ দিলেন যে, তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে মাহফুজ থাকবে। কতিপয় রেওয়ায়াত আছে যে, এই সময় তাঁর স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবা ক্রোধে অস্থির হয়ে পড়লো এবং স্বামীর দাড়ি ধরে উচ্চৈস্বরে গালাগালি করতে লাগলো। হযরত আবু সুফিয়ান ডেঁটে বললেন,

"আমার দাড়ি ছেড়ে দাও। আল্লাহর কসম, তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ না কর, তাহলে আমি তোমার গরদান উড়িয়ে দিব। তোমার সর্বনাশ হোক। রাসূল (সা) বরহক। ঘরে চুপচাপ বসে থাকো।"

বর্ণিত আছে যে, ইসলাম গ্রহণের সময়, হযরত আবু সুফিয়ানের (রা) বয়স ৭১ বছর ছিল। কিন্তু তিনি খুব তরতাজা ছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় তাঁর স্ত্রী এবং খান্দানের অন্যান্যরাও ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভের পর হযরত আবু সুফিয়ান (রা) সর্বপ্রথম হুনাইনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। বিশ্ব নবী (সা) গনিমতের মাল থেকে তাঁকে ৪০ আওকিয়া স্বর্ণ এবং একশ' উট প্রদান করেন। হুনাইনের পর তায়েফের যুদ্ধে তিনি হুজুরের (সা) সহগামী হওয়ার সুযোগ পান। তায়েফবাসী হুনাইনের পলাতকদেরকে আশ্রয় দিয়েছিল এবং দুর্গ বন্ধ করে বসে গিয়েছিল। হুজুর (সা) তায়েফ অবরোধ করেন। এই অবরোধ ১৮/২০ দিন অব্যাহত ছিল। এই সময় মুসলমানরা যখনই দুর্গের ওপর হামলা করতেন তখনই মুশরিকরা দুর্গের বুরুজ থেকে লোহার গরম দণ্ড, পাথর এবং তীরের বৃষ্টি বর্ষণ করতো। তার জবাবে হুজুর (সা) শহরের বাইরে মুশরিকদের আঙ্গুরের বাগান ধ্বংস করে ফেলার নির্দেশ দিলেন। তায়েফবাসীর এটাই ছিল বেঁচে থাকার একমাত্র মাধ্যম। তারা ইবনুল আসওয়াদ ছাকাফীকে হযরত আবু সুফিয়ান (রা) এবং হযরত মুগিরাহ (রা) বিন শু'বার নিকট পয়গাম পাঠিয়ে বললেন যে, মুহাম্মাদ (সা) যদি আমাদের সবুজ বাগান ধ্বংস করে দেয় তাহলে আমরা রুজী থেকে মাহরুম হয়ে যাবো। তাঁকে আল্লাহ এবং আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে আমাদেরকে বর্তমান অবস্থার ওপর ছেড়ে দেয়ার আবেদন জানাও। হুজুরের (সা) সামনে এই দরখাস্ত পেশ হলে তিনি অবরোধ আরো দীর্ঘায়িত করা সঠিক মনে করলেন না এবং "হে আল্লাহ! ছাকিফাকে হেদায়াত কর এবং তারা যাতে আমার নিকট উপস্থিত হতে পারে সেই তাওফিক তুমি তাদেরকে দাও"—এই দোয়ার সাথে অবরোধ উঠিয়ে নিলেন। এই দোয়া কবুল হয়ে গেল এবং পরের বছরই বনু ছাকিফ (তায়েফবাসী) রাসূলের (সা) নিকট হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলো।

তায়েফের যুদ্ধে হযরত আবু সুফিয়ান (রা) নিজের একটি চোখ হক পথে শহীদ করেছিলেন। এই যুদ্ধের বিস্তারিত ওপরে বর্ণিত হয়েছে। তায়েফের পর হুজুর (সা) হযরত আবু সুফিয়ান (রা) এবং মুগিরা (রা) বিন শু'বাকে মুশরিকদের একটি ভুতখানা বা মন্দির ধ্বংস করার কাজে নিয়োগ করেন। এই কাজে হুজুর (সা) বিশেষ বিশেষ সাহাবীকেই দায়িত্ব দিতেন। তাঁরা খুব

সাফল্যের সাথে সেই দায়িত্ব পালন করেন। বালাজুরী (র) লিখেছেন যে, তারপর হুজুর (সা) হযরত আবু সুফিয়ানকে (রা) নাজরানের গভর্ণর বানিয়েছিলেন। কিন্তু কতিপয় ঐতিহাসিক বিশেষ করে ওয়াকেদী এই রেওয়ায়াতকে দুর্বল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

প্রিয় নবীর (সা) ওফাতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খিলাফতের আসনে সমাসীন হন। এ সময় হযরত আবু সুফিয়ান (রা) অন্য কতিপয় সাহাবীর মত তার বাইয়াতে বিলম্ব করেন। এসব সহাবী নেক নিয়তের সঙ্গে হযরত আলীকে (রা) খিলাফতের মুসতাহিক বা যোগ্য মনে করতেন। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবু সুফিয়ান (রা) হযরত আলীকে(রা) এ পর্যন্তও বলেছিলেন যে, আবু বকর (রা) কুরাইশের সবচেয়ে ছোট গোত্রের মানুষ। আপনি যদি চান, তাহলে আমি আপনার সমর্থনে মদীনার রাস্তায় সওয়ার ও মানুষের পদভারে পূর্ণ করে দিতে পারি। হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু তাঁর কথা মানলেন না। এবং কিছুদিন পর নিজের সমর্থকদেরসহ সিদ্দীকে আকবারের (রা) বাইয়াত করে নিলেন। হযরত আবু সুফিয়ানও (রা) তাতে শামিল ছিলেন।

হযরত ওমর ফারুকের (রা) শাসনামলে তিনি নিজের পরিবার পরিজনসহ জিহাদ ফি সাবিল্লাহর জন্য সিরিয়া পৌঁছলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৮০ বছর। কিন্তু শাহাদাতের উৎসাহের কারণে ঘরে বসে থাকাটা সহ্য করতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রাক ইসলামী জীবনের ক্ষতিপূরণ করতে চাইছিলেন। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা ইয়ারমুকের যুদ্ধে হযরত আবু সুফিয়ানের (রা) জীবনবাজী রেখে যুদ্ধ করার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এই যুদ্ধ সিরিয়ার অত্যন্ত রক্তাক্ত ও সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধসমূহের অন্যতম হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। তাতে প্রায় তিন লাখ রোমকের এক বিরাট বাহিনী সাজ-সরঞ্জামসহ মুসলমানদের সামনাসামনি হলো। মুসলমানদের সংখ্যা সব মিলিয়ে ৪০ হাজারের কাছাকাছি ছিল। তার এক অংশের নেতা ছিলেন হযরত ইয়াযিদ (রা) বিন আবু সুফিয়ান (রা)। হযরত আবু সুফিয়ান (রা) সেনা বাহিনীর সেই অংশেই নিজের মুজাহিদ পুত্রের নেতৃত্বে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। লড়াই শুরুর পূর্বে হযরত আবু সুফিয়ান (রা) ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সমগ্র সৈন্য চক্কর মারলেন। তিনি প্রত্যেক পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে মুজাহিদদেরকে সাহস ও অটল থাকার উপদেশ দিলেন ঃ

"হে মুসলমানরা। তোমরা শত্রুর দেশে অবস্থান করছো এবং স্বদেশভূমি থেকে রয়েছ অনেক দূরে। তোমাদের চেয়ে শত্রুর সংখ্যা অনেক বেশী এবং

তারা তোমাদের নাম দুনিয়া থেকে চিরতরে মুছে ফেলতে চায়। কিন্তু জয়-পরাজয় সংখ্যার ওপর নির্ভর করে না এবং তা কারোর ক্রোধের ওপরও নির্ভরশীল নয়। তোমরা আরব ও ইসলামের বাহু। আল্লাহর ওপর ভরসা করে হিম্মত বাঁধো এবং যুদ্ধের ময়দানে অটল থেকো। ইনশাআল্লাহ হকের রহমত বৃষ্টির মত তোমাদের ওপর বর্ষিত হবে।"

যুদ্ধ শুরু হলে মুসলমানরা দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত অটল রইলেন। কিন্তু রোমকরা এত প্রচণ্ডভাবে হামলা চালালো যে মুসলমানদের বামবাহুতে বিশৃংখলা সৃষ্টি হলো। যেই তারা পিছু হটলো অমনি মুসলমান মহিলারা তাঁবুর খুঁটি উঠিয়ে নিল এবং চেঁচিয়ে বললো যে, যদি তোমরা পিছিয়ে এসো তাহলে আমরা খুঁটি দিয়ে তোমাদের মাথা ফাটিয়ে দেবো। এদিকের বামবাহুর অফিসার ইয়াযিদ (রা) বিন আবু সুফিয়ান, কুবাছ (রা) বিন আশিম, সাঈদ (রা) বিন যায়েদ এবং শুরাহবিল (রা) বিন হাসানাহ পাথরের মত রোমকদের রাস্তায় বাঁধা দিয়ে দাঁড়ালেন। এসব বাহাদুরের হাত থেকে তরবারী ও বর্শা ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছিল। আর অন্য মুসলমানরা দৌড়ে তাঁদের হাতে তরবারী অথবা বর্শা ধরিয়ে দিচ্ছিলেন। ঘটনাক্রমে হযরত আবু সুফিয়ান (রা) এদিকে এলেন। পুত্রকে দেখে উচ্চৈস্বরে ডেকে বললেন, "প্রাণের টুকরো আমার। তুমি মুসলমানদের অফিসার এবং সিপাহীদের তুলনায় তোমার ওপর বীরত্ব প্রদর্শনের বেশী হক রয়েছে। সংগীদের মধ্যে তোমার সবচেয়ে বেশী পরকালের আকাংখা, ময়দানে অটলতা, শত্রুর ওপর কঠোরতা এবং যুদ্ধের তীব্রতা বরদাশত করা উচিত। যদি একজন সিপাহীও যুদ্ধের ময়দানে তোমার থেকে অগ্রগামী হয় তাহলে তাহবে তোমার জন্য লজ্জার ব্যাপার।"

তারপর তিনি অত্যন্ত দরদভরা কণ্ঠে দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহর সাহায্য, তাড়াতাড়ি এসো।" ঠিক সেই সময় অদৃশ্য সাহায্য দেখা দিল এবং কায়েস (রা) বিন হাবিরাহ যিনি বামবাহুর পেছনে মোতায়েন ছিলেন নিজের সৈন্যদল নিয়ে পিছন দিক থেকে বের হলেন ও রোমকদের ওপর হামলা করে বসলেন। তারা নিজেদেরকে খুব করে সামাল দিল কিন্তু মুসলমানদের হামলা এতো প্রচণ্ড গতি সম্পন্ন ছিল যে, অল্পক্ষণেই তাদের ব্যূহ তছনছ হয়ে গেল এবং তারা অত্যন্ত বিশৃংখলভাবে পালিয়ে গেল। ঠিক যুদ্ধের সময় হযরত আবু সুফিয়ানের (রা) ভাল চোখের ওপর একটি তীর অথবা পাথর লাগলো এবং এই চোখও খোদার পথে চলে গেল। এমনিভাবে তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রকাশ্য দৃষ্টিশক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মাহরুম হয়ে গেলেন।

দুই চোখ হক পথে কুরবান করার পর হযরত আবু সুফিয়ান (রা) ঘরে বসে গেলেন। শুধুমাত্র নামায পড়া অথবা কোন জরুরী কাজের জন্য গোলামের সহায়তায় ঘরের বাইরে আসতেন। শেষ বয়সে মদীনায় মুকিম হয়ে যান। সেখানেই হযরত উসমানের (রা) খিলাফতকালে ৩৩ হিজরীর শেষ দিকে অথবা ৩৪ হিজরীর প্রথম দিকে ওফাত পান এবং বাকী' কবরস্তানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়। ওফাতের সময় তাঁর বয়স ৮৮ অথবা ৯৭ বছর ছিল। জানাযার নামাযের ব্যাপারেও দু'টি রেওয়ায়াত আছে। কেউ কেউ লিখেছেন যে, আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান (রা) জানাযার নামায পড়ান। আবার কেউ লিখেছেন আমীরে মুয়াবিয়া (রা) পড়ান। অত্যন্ত সুদর্শন, গমের রং এবং দীর্ঘদেহী মানুষ ছিলেন। চেহারা ছিল প্রশস্ত এবং মাথা এতবড় ছিল যে, এমনি এমনি সরদার বলে মনে হতো। হযরত আবু সুফিয়ানের (রা) সন্তানের মধ্যে হযরত উম্মে হাবিবা (রা), আমীর মুয়াবিয়া (রা) এবং ইয়াযিদুল খায়ের (রা) ইসলামের ইতিহাসে নামকরা ব্যক্তিত্ব। হযরত উম্মে হাবিবা (রা) আযওয়াজে মুতাহহিরাত এবং উম্মুহাতুল মু'মিনীনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আমীর মুয়াবিয়া (রা) কাতিবে ওহী বা ওহীর লিখক এবং উমাইয়া শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি আরবের জ্ঞানী গুণীদের অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইয়াযিদ (রা) দানশীলতা ও সুন্দর স্বভাবের কারণে ইয়াযিদুল খায়েরের লকবে মশহুর ছিলেন। আরবের অন্যতম বীর হিসেবে পরিচিত। সিরিয়ার বিজয়সমূহে তিনি হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ, জিরার (রা) বিন আজওয়ার, আমর(রা) বিন মাদি কারব, যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়াম, কায়েস (রা) বিন হাবিরাহ, শুরাহবিল (রা) বিন হাসানার মত প্রখ্যাত বাহাদুরদের পাশে পাশে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। প্রতিভা ও গুণের দিক থেকে তিনি আমীরে মুয়াবিয়ার চেয়ে ছোট ছিলেন না। আল্লামা শিবলী (র) আল ফারুকে লিখেছেন, সমগ্র বনু উমাইয়াতে তাঁর থেকে বেশী যোগ্য আর কেউ ছিলেন না। এ জন্য হযরত ওমর (রা) তাঁকে ফিলিস্তীনের শাসক বানিয়ে দেন। কিছুদিন দামেস্কের ইমারতের দায়িত্বও তাঁর ওপর ন্যস্ত ছিল। চরিত গ্রন্থসমূহে হযরত আবু সুফিয়ানের (রা) আরো তিন মেয়ের নাম পাওয়া যায়। একজনের নাম ছিল ফা'রিয়া (রা)। রাসূলে আকরামের (সা) ফুফাতো ভাই হযরত আবু আহমদ (রা) বিন জাহাশের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। দ্বিতীয় মেয়ের নাম হলো আমেনা। তাঁর বিয়ে হয়েছিল হযরত উরওয়া (রা) বিন মাসউদ ছাকাফীর সঙ্গে। তৃতীয় জনের নাম হলো আয্যা। সহীহ বুখারীতে আছে যে, একবার হযরত উম্মে হাবিবা (রা) ভুলবশত হুজুরকে (সা) জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার বোন আয্যাকে কেন বিয়ে করেন না।" তিনি

বললেন, "আয্যাহ হলো আমার শালি এবং স্ত্রীর জীবদ্দশায় তার বোনের সাথে বিয়ে বৈধ নয়।"

হযরত আবু সুফিয়ান (রা) কুরাইশের সেই সব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা ইসলামের আবির্ভাবকালে ভালভাবে লেখাপড়া জানতেন। তাঁর থেকে কতিপয় হাদিসও বর্ণিত আছে। এইসব হাদিস হযরত মুয়াবিয়া (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) রেওয়ায়াত করেছেন।

সাইয়েদেনা হযরত আবু সুফিয়ান সাখার (রা) বিন হারব ইসলামের ইতিহাসে এক নামকরা ব্যক্তিত্ব। তাঁর সাহাবিয়াতের মর্যাদার গুরুত্ব এ জন্য কম করা যাবে না যে, তিনি মক্কা বিজয় পর্যন্ত কুফর ও শিরকের ভ্রান্ত পথে চলাফেরা করেছিলেন এবং তাঁর জীবনের বেশীর ভাগ সময় ইসলাম বিরোধিতায় অতিবাহিত হয়। প্রকৃত ব্যাপার হলো যে, এ ব্যাপারে তিনিই শুধু একা ছিলেন না। অন্য অনেক সাহাবায়ে কিরামও (রা) এমন ছিলেন যাঁরা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলামের কট্টর দুশমন ছিলেন এবং তাঁর মূলোৎপাটনে সব ধরনের চেষ্টাই করেছেন। যেমন, হযরত ইকরামা (রা) বিন আবি জেহেল, সোহায়েল (রা) বিন আমর, সাফওয়ান (রা) বিন উমাইয়া, জোবায়ের (রা) বিন মাতয়াম, আবদুল্লাহ (রা) বিন জুবয়ারা, শাইবা (রা) বিন উসমান বিন আবি তালহা, মুগিরা (রা) বিন হারিছ [হুজুরের (সা) আপন চাচাতো ভাই ছিলেন। তাঁর কুনিয়াতও ছিল আবু সুফিয়ান] এবং অন্যান্য আরো অনেক বুজর্গ। এসব বুজর্গ সাহাবায়ে কিরামের (রা) পবিত্র জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত এবং সকল দিক থেকেই আদব ও সম্মানের যোগ্য। এটা অবশ্য পৃথক ব্যাপার যে, কুরআনে হাকিমের ফায়সালা অনুযায়ী তাঁদের মর্যাদা মক্কা বিজয় এবং বিশেষ করে হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী বুজর্গদের সমান নয়। কিন্তু ব্যাপারটি তাঁদের ও আল্লাহর মধ্যকার বিষয়। আমাদের জন্য সকল সাহাবীকে (রা) কোন বিশেষত্ব ছাড়া মর্যাদা প্রদর্শন ওয়াজিব।

কিছু মানুষ হযরত আবু সুফিয়ানের (রা) ওপর এই বলে অপবাদ দিয়ে থাকে যে, তিনি সত্য অন্তরে নয় বরং জীবনের ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তারা নিজেদের বক্তব্যের স্বপক্ষে যেসব যুক্তি পেশ করে তা এতো দুর্বল যে, কোন সুস্থ স্বভাবের কোন মানুষ তা মানতে পারে না। হযরত আবু সুফিয়ানের (রা) আন্তরিকতায় সন্দেহ পোষণকারীরা এই যুক্তি দিয়ে থাকে যে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি ইসলামের কট্টর দুশমন ছিলেন। এটা এমন কোন কথা নয় যে, এ জন্য তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করতে পারবেন না। শেষ পর্যন্ত তারাও তো ইসলামের নিয়ামতে ও সাধারণ

ক্ষমায় অভিষিক্ত হয়েছিলেন যাদেরকে হুজুর (সা) ইসলামের শত্রুতার জন্য হত্যা আবশ্যিক করে দিয়েছিলেন। স্বয়ং হুজুরের (সা) চাচাতো ভাই মুগিরা(রা) বিন হারিছ বিন আবদুল মুত্তালিব ইসলামের শত্রুতায় এতদূর বেড়ে গিয়েছিলেন যে, হুজুর (সা) তাঁর চেহারা পর্যন্ত দেখতে রাজী ছিলেন না। হযরত সোহায়েল (রা) বিন আমর, সাফওয়ান (রা) বিন উমাইয়া, আবদুল্লাহ (রা) বিন যুবয়ারা এবং এমনি ধরনের কত সাহাবী ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইসলামের মূলোৎপাটনের জন্য কত কিইনা করেছেন। যদি এসব সাহাবী সত্য অন্তরে ঈমান এনে হুজুরের (সা) স্নেহের দাবীদার হতে পারেন তাহলে হযরত আবু সুফিয়ান (রা) তাদের থেকে এমন কি বেশী অপরাধ করেছিলেন?

হযরত আবু সুফিয়ানের (রা) বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দলিল এই দেয়া হয় যে, ইসলাম গ্রহণের পর তিনি কয়েকবার ইসলাম দুশমনী প্রকাশ করেছিলেন। এই ইসলাম দুশমনী কি ছিল? হুজুরের (সা) ওফাতের পর তিনি হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুকে বলেছিলেন যে, আবু বকর (রা) কুরাইশের সবচেয়ে ছোট কবিলার মানুষ। আপনি যদি খিলাফতের দাবী নিয়ে দাঁড়ান তাহলে আমি আপনার সমর্থনে মদীনার প্রান্তর সওয়ার ও পদযাত্রী দিয়ে পূর্ণ করে দেবো। দ্বিতীয় মশহুর ঘটনা এই বর্ণনা করা হয় যে, একবার হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত বিলাল (রা), সোহায়েব (রা) ও সালমানকে (রা) কুরাইশ সরদারদের আগে স্বাক্ষাতের জন্য ভেতরে ডেকে পাঠালে তাঁরা অভিযোগ করলেন যে, আমাদের মত কুরাইশ সরদারদের ওপর গোলামদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। তৃতীয় ঘটনা হলো, হযরত উসমান (রা) খলিফা হলে তিনি বনি উমাইয়াকে সামনে অগ্রসর করানোর জন্য তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

এ ধরনের রেওয়ায়াতকে যদি ঠিক বলে মেনেও নেয়া হয় তাহলে খুব বেশী হলেও তাকে বংশীয় গোড়ামী। (ইসলাম দুশমনী নয়) বলে আখ্যায়িত করা হয়। এই প্রসঙ্গে একথা বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে, হযরত আবু সুফিয়ান (রা) কোন সাধারণ মানুষ ছিলেন না। কুরাইশের ঝাণ্ডাবাহী এবং সিপাহসালার ছিলেন। বনু উমাইয়ার সরদার পুত্র সরদার ছিলেন। তাঁর দু'পুরুষ ইমারাত ও নেতৃত্বে কাটান। যদি কোন সময় তার মুখ দিয়ে এমন কথা বেরিয়ে যায় যাতে বংশীয় গোঁড়ামী প্রকাশ পায় তাতে তাঁর নিয়তের আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দেহ করা কি করে সিদ্ধ হতে পারে? প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা তো আরো অন্য জালিলুল কদর সাহাবীর (রা) সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট রয়েছে। এখানে তার বিস্তারিত বিবরণ অনাবশ্যক। কেননা তাতে সেই সব বুজর্গের সম্মান ও মর্যাদাতে সামান্য পরিমাণ প্রভাব পড়ে না।

হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) আল ইসতিয়াবে এবং আল্লামা ইবনে আছির (র) "উসুদুল গাববাহতে" খুব শক্তিশালী ভাষায় লিখেছেন যে, হযরত আবু সুফিয়ানের (রা) সঙ্গে এমন সব অনেক ঘটনা সংশ্লিষ্ট করে দেয়া হয়েছে যার কোন ভিত্তি নেই।

সঠিক পথ হলো, সাহাবায়ে কিরামের (রা) ব্যাপারে সবসময় ভালো ধারণা রাখতে হবে। ছোটখাটো ঘটনার আড়ালে তাদেরকে অপবাদের শিকার এবং তাঁদের আন্তরিকতায় সন্দেহ করা যাবে না।

হযরত আবু সুফিয়ানের (রা) জীবনের ওপর একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে জানা যাবে যে, তিনি স্পষ্টবাদী ও বীর মানুষ ছিলেন। কুফরী অবস্থাতেও যখন মক্কার প্রতিটি অণু পরমাণু হুজুরের (সা) খুন পিপাসু ছিল তখনো তিনি তার বিরুদ্ধে বিগর্হিত কোন কাজ অথবা ছ্যাঁচরামো করেননি। হুজুরের (সা) উন্নত চরিত্রের সাক্ষ্য প্রদানে তিনি কার্পণ্য করেননি। কলিজার টুকরার হুজুরের (সা) সঙ্গে বিয়ে হলে কোন অস্থিরতা প্রকাশ করেননি বরং তাঁর (সা) প্রশংসা করেছেন। [একটু সেই ঘটনা স্মরণ করুন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রা) বিনতে যাময়ার বিয়ে হুজুরের (সা) সঙ্গে হলো। এ সময় তাঁর ভাই আবদ (রা) বিন যাময়া এই খবর শুনে নিজের মাথার ওপর মাটি রাখা শুরু করলো। যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন বলতেন যে, আমি আহমক ছিলাম। হুজুরের (সা) সঙ্গে আমার বোনের বিয়েতে আমার মাথায় মাটি নিয়ে ছিলাম।] মক্কা বিজয়ের সময় হুজুর (সা) তাঁর গৃহকে দারুল আমান বানিয়েছিলেন। হুনায়েন এবং তায়েফের যুদ্ধের সময় জীবনবাজী রেখে অংশ নিয়েছিলেন এবং হুজুরের করুণা ও দয়ার পাত্র হয়ে উঠেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধে পরিবারের সকলকে সঙ্গে নিয়ে অংশ নেন এবং বার্দ্ধক্যেও বীরত্ব প্রদর্শন করেন। সর্বোপরি নিজের চোখ দু'টির হক পথে বিলীন করে দিয়েছিলেন। এসব কথা সত্ত্বেও তাঁর আন্তরিকতায় সন্দেহ পোষণ করার কোন বৈধতা আছে কি? সঠিক কথাতো এই যে, হযরত আবু সুফিয়ান (রা) নিসন্দেহে সেই সব পবিত্র আত্মার দলে শামিল যাঁদের ব্যাপারে বলা হয়েছে ঃ

"আল্লাহ তাঁদের ব্যাপারে রাজী হয়েছেন এবং তাঁরাও আল্লাহর ব্যাপারে রাজী হয়েছেন। আল্লাহ তাঁদের জন্য এমন বাগান তৈরী করে রেখেছেন যার নীচে দিয়ে নহর প্রবাহিত এবং তারা তাঁতে সবসময় থাকবে।"

হযরত সাঈদ (রা) বিন আমের

হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে হেমসের আমীর হযরত আয়াজ (রা) বিন গানাম ওফাত পান। এ সময় হেমসের ইমারতের জন্য আমীরুল মু'মিনীন (রা) একজন যোগ্য ব্যক্তির নিয়োগের চিন্তা-ভাবনা শুরু করলেন। আল্লাহ পাক মানুষ বাছাইয়ের যোগ্যতা তাঁকে পূর্ণভাবেই প্রদান করেছিলেন। তিনি কয়েকদিন চিন্তা করলেন এবং তারপর একদিন জনৈক ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালেন। কয়েকদিন পূর্বে এই ব্যক্তি সিরিয়ার জিহাদ থেকে ফিরে এসেছিলেন এবং মদীনা মুনাওয়ারার এক কোণায় চুপচাপ জীবন অতিবাহিত করছিলেন। ফারুকে আজমের (রা) পয়গাম পেতেই ত্রিশ-পয়ত্রিশ বছর বয়সের এই ব্যক্তি মলিন কাপড় পরিধান করে তৎক্ষণাৎ খলিফার দরবারে হাজির হলেন। তাঁর চেহারা-সুরত দেখে মনে হচ্ছিল যে, তিনি একজন আবেদ এবং লজ্জাশীল মানুষ। তাঁকে দেখে ফারুকে আজমের (রা) চেহারা উজ্জল হয়ে উঠলো। অত্যন্ত মুহাব্বাত ও স্নেহের সাথে তাঁকে নিজের কাছে বসালেন এবং অতপর তাঁকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"প্রাণের ভাই আমার! তোমাকে কেন ডেকেছি, তাকি জানো?" আরজ করলেন ঃ "আপনিই ভাল জানেন"।

ফারুকে আজম ঃ "তুমি তো জানো যে, কয়েকদিন হলো আয়াজ (রা) বিন গানাম ওফাত পেয়েছেন এবং হেমসে তাঁর স্থান শূন্য পড়ে আছে। আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করে হেমসের ইমারতের জন্য তোমাকে নির্বাচিত করেছি।"

সেই ব্যক্তি আমীরুল মু'মিনীনের (রা) ইরশাদ শুনে চমকে উঠলেন এবং তৎক্ষণাৎ আরজ করলেন ঃ "না, না। আমীরুল মু'মিনীন! আমি সেই পদের যোগ্য নই। আমাকে এই ফিতনায় নিক্ষেপ করবেন না।"

ফারুকে আজম (রা) (খুব দ্রুতকণ্ঠে) বললেন, "ভাল! তোমরা খিলাফতের জিঞ্জির আমার গর্দানে চাপিয়ে রেখেছ এবং নিজেরা কোন ধরনের দায়িত্ব গ্রহণ থেকে পশ্চাদপসরণ করছো। আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি না। হেমসের ইমারতের দায়িত্ব অবশ্যই তোমাকে গ্রহণ করতে হবে।"

সেই ব্যক্তি বার বার ক্ষমা চাইলেন। কিন্তু ফারুকে আজম (রা) নিজের কথার ওপর অটল রইলেন। অনেক পীড়াপীড়ির পর তিনি সেই পদ গ্রহণে সম্মত তো হলেন। কিন্তু তিনি যখন খিলাফতের দরবার থেকে বিদায় হলেন তখন তাঁর চক্ষু দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল এবং তিনি কোন পাহাড়ের নীচে চাপা পড়ে গিয়েছেন বলে অনুভব করছিলেন।

এই আশ্চর্য ধরনের মানুষ যিনি ইসলামী খিলাফতের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশের গভর্ণর পদ গ্রহণে খুব কষ্টে রাজী হলেন, তিনি হলেন হযরত সাঈদ (রা) বিন আমের।

বিশ্ব নবী (সা) দাওয়াতে হক প্রদান শুরু করলেন। এ সময় সাঈদ বিন আমের (বিন কুদায়েম বিন সালামান বিন রবিয়া বিন সায়াদ বিন জামাহ বিন আমর বিন মুসাইস বিন কায়াব) সাত-আট বছরের বালক ছিলেন। এটা ছিল তাঁর খেলাধূলার বয়স। এ জন্য প্রথম দিকে ইসলামের দিকে অগ্রসর হননি। যৌবনপ্রাপ্ত হলেন এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করণের অনুভূতি সৃষ্টি হলে রাসূলে আকরাম (সা) হিজরত করে মদীনা তাশরীফ নিয়েছিলেন। তাসত্ত্বেও নেক স্বভাব সম্পন্ন সাঈদকে (রা) আল্লাহ পাক এই তাওফিক দিয়েছিলেন যে, তিনি খায়বারের যুদ্ধের পূর্বে মদীনা গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর খায়বার, মক্কা বিজয়, হুনাইন, তাবুক প্রভৃতি যুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে অংশ নেন। প্রিয়নবী (সা) ওফাত পেলে তিনি ভগ্ন হৃদয়ে নির্জনত্ব গ্রহণ করলেন এবং সকল সময় ইবাদাতে অতিবাহিত করতে লাগলেন। কিন্তু জিহাদের উৎসাহ তাঁকে বেশী দিন ঘরে বসে থাকতে দিল না। হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতকালে সিরিয়ায় সেনা অভিযান চালানোর সময় তিনিও মুজাহিদদের দলে শামিল হয়ে গেলেন।

আল্লামা ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, সাঈদ (রা) মহানবীর (সা) যুগে বিভিন্ন যুদ্ধে যে ধরনের বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন তাতে তাঁকে আরবের বাহাদুরদের কাতারভুক্ত করে দেয়। বস্তুত কানসারিনের যুদ্ধে হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ যখন এক বিশেষ অভিযানের জন্য দশজন অভিজ্ঞ যোদ্ধাকে নির্বাচিত করেন তখন সেই দশ জনের একজনও ছিলেন সাঈদ (রা) বিন আমের। সিদ্দীকে আকবারের (রা) ইন্তেকালের পর তিনি মদীনা অবস্থান করছিলেন। এমন সময় ইয়ারমুকের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এই যুদ্ধে রোমকরা নিজেদের সকল শক্তি একত্রিত করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। রোমকদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা খুব কম ছিল। এ জন্য সেনাপতি হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) ইবনুল জারাহ রাজধানী থেকে সাহায্য চাইলেন।

তাঁর পয়গাম পেয়েই হযরত ওমর ফারুক (রা) সাঈদ (রা) বিন আমেরকে ডেকে পাঠালেন এবং এক হাজার সওয়ার সমেত তাঁকে তৎক্ষণাৎ ইয়ারমুক রওয়ানা করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হযরত আবু ওবায়দাকে (রা) বলে পাঠালেন যে, শীঘ্রই আরো সামরিক সাহায্য আপনি পেয়ে যাবেন। ঘটনাক্রমে যে দিন হযরত আবু ওবায়দার (রা) দূত তাঁর নিকট ফিরে গেলেন সেই দিন হযরত সাঈদও (রা) এক হাজার জানবাজসহ তাঁর নিকট পৌঁছে গেলেন। তাঁদের আগমনে মুসলমানরা বেশ শক্তিশালী হলেন এবং তাঁরা খুব উৎসাহ উদ্দীপনা এবং সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। সিরিয়ার ভাগ্য নির্ধারণকারী এই ভয়াবহ যুদ্ধে হযরত সাঈদ (রা) বিন আমের বিস্ময়কর বাহাদুরী ও দৃঢ়তার পরিচয় দেন এবং প্রচণ্ডতম নাজুক মুহূর্তেও তাঁর সামান্যতম পদস্খলন হয়নি। যুদ্ধের ময়দানে তিনি কয়েকবার রোমকদের হামলার মুখে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁর তরবারী প্রতিবারই দুশমনের দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছিল এবং তিনি সহীহ সালামতে সঙ্গীদের সাথে এসে মিলিত হয়েছিলেন। ইয়ামুকের পর তিনি সিরিয়ার আরো কতিপয় যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং পুনরায় মদীনায় ফিরে এসে পূর্বের মত নির্জন ইবাদাতে বসে গেলেন। সেই সময়ই হেমসের গভর্ণর হযরত আয়াজ (রা) বিন গানাম ওফাত পান এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত করার জন্য ফারুকে আজমের (রা) দৃষ্টি হযরত সাঈদ (রা) বিন আমেরের ওপর নিবদ্ধ হলো।

হযরত সাঈদ (রা) ফারুকে আজমের (রা) পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে হেমস গেলেন। সেখানে গিয়ে গভর্ণরীর দায়িত্ব এমনভাবে পালন করলেন যে, সকলেই তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো। হযরত ওমর ফারুক (রা) সরকারী কর্মচারীদের ওপর খুব কড়া নজর রাখতেন। তাঁর কানে সাঈদের(রা) সুন্দর ব্যবস্থাপনার খবর পৌঁছলে খুব খুশী হলেন। একবার তিনি মদীনা এলে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "সাঈদ (রা) সিরিয়ার মানুষ তোমার প্রশংসা করে কেন?" তিনি আরজ করলেন, "আমিরুল মু'মিনীন! আমি রাখালীর সঙ্গেও সহানুভূতি প্রকাশ করে থাকি।" হযরত সাঈদের (রা) এই জবাবে কোন অতিশয়োক্তি ছিল না। তাঁর রাখালী এবং সহানুভূতি প্রকাশের অবস্থা এমন ছিল যে, যে বেতন পেতেন [হযরত ওমর (রা) গভর্ণদেরকে অত্যন্ত যৌক্তিক ভাতা দিতেন] তা থেকে কয়েক দিরহাম খানা-পিনার সামানের জন্য ব্যয় করতেন এবং অবিশিষ্ট সকল অর্থ আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিতেন। স্ত্রী যখন জিজ্ঞেস করতেন যে, বেতনের অবশিষ্ট অংশ কোথায় তখন বলতেন, "ঋণ দিয়ে দিয়েছি।" ঋণ প্রদানের অর্থ এই ছিল যে, সেই অর্থ আল্লাহর পথে

ব্যয় করে ফেলেছেন। কেননা, কুরআনে হাকিমে তাকে করজে হাসানা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

একবার কতিপয় ব্যক্তি প্রতিনিধি দল হিসেবে হযরত সাঈদের (রা) নিকট গেলেন এবং বললেন, "হে আমীর। আমরা আপনাকে সবসময় অসহায় ও গরীব হিসেবে দেখছি। আপনার পরিবার পরিজনেরও তো হক আছে। নিজের হাতকে এতো প্রশস্ত করবেন না এবং নিজের পরিবার পরিজনেরও খেয়াল রাখুন।"

হযরত সাঈদ (র) জবাব দিলেন, "এটা আমার ইচ্ছার ব্যাপার নয়। আমিতো দারিদ্রের ঐশ্বর্যকেই পসন্দ করে থাকি। কেননা, আমি আকায়ে নামদার (সা) থেকে শুনেছি যে, দরিদ্র মু'মিনরা অন্যান্যদের থেকে সত্তর বছর পূর্বে জান্নাতে দাখিল হবেন।"

বাস্তবিকই হযরত সাঈদের (রা) সংসার বৈরাগ্য ও অল্পে তুষ্টির অবস্থাটা এমন ছিল যে, সাধারণ গরীব ও মিসকিন এবং হেমসের গভর্ণরের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না।

একবার হযরত ওমর ফারুক (রা) সিরিয়া সফরে তাশরীফ নিলেন। হেমস পৌছে তিনি সেখানকার নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে ফকির মিসকিনের একটি তালিকা প্রস্তুত করে আনার নির্দেশ দিলেন। লক্ষ্য ছিল তাদের দৈনন্দিন জীবন চালানোর ব্যবস্থা করা।

তালিকা তৈরী হয়ে যখন ফারুকে আজমের (রা) সামনে এলো তখন তালিকা শীর্ষে সাঈদ (রা) বিন আমেরের নাম উল্লেখ পাওয়া গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এই সাঈদ (রা) বিন আমের কে?" লোকেরা বললো, "আমাদের আমীর।" আমীরুল মু'মিনীন বিস্মিত হয়ে বললেন, "তিনি যে বেতন পান তা কি করেন।" তারা বললো, "তিনি যে বেতন পান তা অন্য অভাবীদের জন্য ব্যয় করে দেন।"

একথা শুনে ফারুকে আজম (রা) অশ্রু সজল হয়ে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি এক হাজার দিনারের একটি থলে ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণ করার কথা বলে তাকে প্রেরণ করলেন। কাসিদ যখন এই অর্থ সাঈদ (রা) বিন আমেরকে প্রদান করলেন তখন তাঁর মুখ দিয়ে অযাচিতভাবে 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' কুরআনের এই আয়াত বের হয়ে পড়লো।

স্ত্রীর কানে এই আয়াত পৌছতেই দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "ভাল তো। আমীরুল মু'মিনীন ওফাত পেয়েছেন কি?" তিনি বললেন, "না, ঘটনা তার চেয়েও বড়।"

স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন ঃ "কিয়ামতের কোন আলামত দেখা দিয়েছে কি?" তিনি বললেন, "তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।"

স্ত্রী বললেন, "বলুনতো, ব্যাপারটি কি?"

হযরত সাঈদ (রা) বললেন, "এই দেখ দুনিয়া ফিতনা হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করেছে।"

স্ত্রী বললেন, "তাতে আপনি এতো অস্থির হচ্ছেন কেন। তা তদারকির কথা চিন্তা করুন।"

হযরত সাঈদ (রা) সকল অর্থ একটি বড় থলেতে রাখলেন এবং নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। সারা রাত ইবাদাতে কেটে গেল। সকালে দেখলেন যে, ইসলামী বাহিনী তাঁর বাড়ীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই অর্থ থলে থেকে বের করলেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সকল অর্থ মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

হযরত ওমর ফারুক (রা) আরেকবার এক হাজার দিনার হযরত সাঈদ (রা) বিন আমেরকে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের কথা বলে প্রেরণ করলেন। সাঈদের (রা) স্ত্রী তাঁকে বললেন, "আমাদের কোন খাদেম নেই। এই অর্থ দিয়ে একটি গোলাম খরিদ করাটাই উত্তম হবে।"

হযরত সাঈদ (বা) বললেন, "এই অর্থ কি তাদের মধ্যে বন্টন করাটা বেশী ভাল নয়, যারা আমাদের চেয়েও বেশী অভাবী ও অসহায়।"

স্ত্রীও নেকবখত ছিলেন। তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে গেলেন এবং হযরত সাঈদ (রা) এই সকল অর্থ বিধবা, ইয়াতিম, অসুস্থ এবং মিসকিনদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

একবার হেমসবাসী ফারুকে আজমের (রা) খিদমতে হযরত সাঈদ (রা) বিন আমেরের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ পেশ করলেন। তার বিস্তারিত নিম্নরূপ ঃ

(১) সকাল থেকে অনেক বেলা না হওয়া পর্যন্ত সাঈদ (রা) বাড়ী থেকে বের হন না।

(২) রাতে কেউ ডাকলে তার জবাব দেন না।

(৩) মাঝে মধ্যেই তিনি দিওয়ানা হয়ে যান।

(৪) মাসে একদিন বাড়ীর অভ্যন্তরে কাটান এবং সেদিন আর কোনক্রমেই বাইরে বেরোন না।

ফারুকে আজম (রা) এসব অভিযোগ যাচাইয়ের জন্য হযরত সাঈদকে (রা) মদীনা তলব করলেন।

সাঈদ (রা) এই অবস্থায় মদীনা পৌছলেন যে, তালি লাগানো কাপড় তাঁর গায়েছিল। এক হাতে ছিল লাঠি এবং অন্য হাতে ছিল খাওয়ার একটি পাত্র।

আমিরুল মু'মিনীন (রা) জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যস, তোমার সামান বলতে কি এই?"

তিনি আরজ করলেন, "এর চেয়ে বেশী কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। লাঠিতে পাথেয় ঝুলিয়ে রাখি। আর এই পাত্রে খাই।"

হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁর কথায় খুব প্রভাবিত হলেন এবং মনে মনে সাঈদ (রা) সম্পর্কে তিনি যে সুধারণা পোষণ করতেন তা ভুল প্রমাণিত না হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করতে লাগলেন। অতপর তিনি তাঁর সামনে হেমসবাসীর অভিযোগগুলোর কথা পুনরুল্লেখ করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ "এসব অভিযোগের তোমার জবাব কি?"

হযরত সাঈদ (রা) আরজ করলেন, "আমিরুল মু'মিনীন! আল্লাহর কসম, আমি এসব বিষয়ে কোন কিছু বলাটা পসন্দ করি না। কিন্তু আপনি যখন জিজ্ঞেস করছেন তখন প্রকৃত ব্যাপার প্রকাশ ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ জন্য নিবেদন করছি ঃ

(১) সকাল সকাল আমি বাড়ী থেকে বের হই না। কারণ, আমাদের কোন খাদেম নেই। স্ত্রীর সঙ্গে ঘরের কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকি। সে অন্য কাজ করে। আর আমি আটা গুলাই। অতপর খামিরা ওঠার অপেক্ষা করি। তারপর রুটি পাকাই এবং অতপর তাদের খিদমতের জন্য বাইরে বের হই।

(২) রাতে এজন্য জবাব দিই না যে, সারাদিন আল্লাহর সৃষ্টির সেবায় অতিবাহিত হয়ে যায় এবং নিজের রবের সামনে ইতমিনানের সঙ্গে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পাই না। অতএব রাতকে আমি আল্লাহর ইবাদাতের জন্য ওয়াকফ করে রেখেছি।

(৩) দিওয়ানা বা পাগল হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো যে, পাগল হয়ে যাওয়ার কোন রোগ আমার নেই। তবে মাঝে মধ্যে অবশ্যই আমি বেহুশ হয়ে পড়ি। তার কারণ হলো, খুবায়েব (রা) বিন আদিকে যখন শূলে চড়ানো হয়েছিল তখন আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। খুবায়েব (রা) কুরাইশ মুশরিকদের জন্য বদ দোয়া করছিলেন। সে সময় কুরাইশ মুশরিকদের

মধ্যে আমার উপস্থিতি এবং খুবায়েবের (রা) নির্যাতনমূলক শাহাদাতের অনুভূতি কোন কোন সময় আমাকে বেচাইন করে দেয় এবং আমি বেহুশ হয়ে পড়ি।

(৪) মাসে একদিন আমি বাইরে বের হই না। কারণ, আমার মাত্র এক জোড়া কাপড় রয়েছে। তা যখন ময়লা হয় তখন ধুয়ে পরিধান করি। মাসে একবার অবশ্যই কাপড় ধৌত করে থাকি। যখন তা শুকোয় তখন তা পরে বাইরে বের হই। ফলে দিনের একটি বিরাট অংশ অতিবাহিত হয়ে যায়। এজন্য লোকদের সঙ্গে মিলিত হতে পারি না।

হযরত সাঈদের (রা) জবাব শুনে ফারুকে আজমের (রা) চেহারা খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং তিনি বললেন, "সাঈদ (রা) তোমার সম্পর্কে আমার সুধারণা সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। এখন হেমসে ফিরে যাও এবং এমনিভাবে আল্লাহর সৃষ্টির সেবা করে যাও।"

হযরত সাঈদ (রা) আরজ করলেন, "আমিরুল মু'মিনীন। এখন আমাকে গভর্ণরীর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিন।"

আমিরুল মু'মিনীন (রা) ঃ "অবশ্যই নয়। আল্লাহর কসম, তোমাকে অবশ্যই হেমসে ফিরে যেতে হবে। তোমার মত রাখাল এবং সহানুভূতিশীল ব্যক্তি তারা পাবে না।"

ফারুকে আজমের (রা) পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে হযরত সাঈদ (রা) হেমসে ফিরে গেলেন। কিন্তু তিনি সেখানে ফিরে যাওয়ার পর মাত্র কিছুদিন বেঁচেছিলেন। তারপর প্রকৃত স্রষ্টার ডাক এসে উস্থিত হলো এবং ১৯ অথবা ২১ হিজরীতে তিনি ৪০ বছর বয়সে পরপারে যাত্রা করেন।

হযরত সোহায়েল (রা) বিন আমর

একাদশ হিজরীতে বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) ওফাত পান। এ সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খলিফা নির্বাচিত হন। তাঁর খলিফার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই সমগ্র আরবে ধর্মদ্রোহিতার আগুন জ্বলে উঠলো। মদীনার আনসার এবং মক্কার কুরাইশ ছাড়া আরবের এমন কোন কবিলা ছিল না যারা কোন না কোনক্রমে এই আগুনের লেলিহান শিখার শিকার হয়নি। তা সত্ত্বেও সিদ্দীকে আকবারের (রা) দৃঢ়তা ও অটলতা মুসলমানদের উৎসাহ উদ্দীপনায় ভাটা পড়তে দেয়নি। কিন্তু কিছুদিন পরই যখন মক্কায় কুরাইশদের নওমুসলিমদের মধ্যেও কানা ঘুষা শুরু হলো এবং তাদের মধ্যে বিদ্রোহের আলামত প্রকাশ পেলো তখন পরিস্থিতি সীমাহীন নাজুক হয়ে দাঁড়ালো। কুরাইশরা ছিলেন ইসলামের তরবারী ধারী বাহু। ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহের অর্থই ছিল নতুন ভূমিষ্ঠ ইসলামী খিলাফতের কিশতী আপদ-বিপদের ধাক্কায় ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়া। কুরাইশের জ্ঞানী-গুণী ও ইসলামের সত্যিকারের অনুসারীরা এই পরিস্থিতিতে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়িয়েছিল যে, কুরাইশদেরকে সঠিক পথে রাখার দায়িত্ব কে গ্রহণ করবেন? এটা ছিল খুব শক্ত কাজ। এখানে জ্ঞানের নয় বরং "ভালবাসার" প্রয়োজন ছিল।

মক্কায় কুরাইশ কবিলাসমূহের এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সেই জনসভায় নূরানী চেহারার লম্বাদেহী এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে। তাঁর লাল ও সাদা রং এবং সাদা দাড়ি তার চেহারার ঔজ্জ্বল্য দ্বিগুণ করছিল। তাঁর চেহারায় এমন এক মহিমা ছিল যে, তাতে দৃষ্টি স্থির থাকতে পারছিল না। তাঁর অর্ধ উন্মিলিত চক্ষু থেকে প্রকাশ পাচ্ছিল যে, তিনি একজন রাতজাগরণকারী আবেদ এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর সামনে মাথানত করতে প্রস্তুত নন। তিনি অত্যন্ত আস্থাপূর্ণ কণ্ঠে এবং উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে জনসভায় এই বক্তব্য পেশ করছিলেন ঃ

"কুরাইশ ভাইসব! তোমরা শুনেছ যে, আমাদের আকা ও মাওলা মুহাম্মাদ মুস্তাফাকে (সা) আল্লাহ তায়ালা নিজের নিকট ডেকে নিয়েছেন। একদিন না একদিন এই ঘটনা ঘটার ছিল। এইটিই প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু কিছুদিন হলো আমি তোমাদের মধ্যে কতিপয়ের চেহারায় পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। তা

কেন? মুহাম্মাদ মুস্তাফাতো (সা) তোমাদের মাবুদ ছিলেন না। তিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূল এবং নির্দিষ্ট সময়ে নিজের স্রষ্টার নিকট পৌছে গেছেন। তিনি সেই স্রষ্টার নিকট পৌছে গেছেন যিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী—তার ওপর কখনো মৃত্যু আপতিত হবে না। তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই হলে এমন যারা ইসলামে অগ্রগমন থেকে বঞ্চিত রয়েছো। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তোমাদের ওপর ইহসান করেছেন এবং অবশেষে তোমরা ইসলামের নিয়ামতে অভিষিক্ত হয়েছ। এখন সেই মহান নিয়ামত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়ার কোন কারণ নেই। মুহাম্মাদের (সা) ওফাতের অর্থ এই নয় যে, ইসলাম শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহর কসম। ইসলাম চিরদিন থাকবে এবং চন্দ্র ও সূর্য যেমন সমগ্র বিশ্বে নিজের আলো ছড়ায় তেমনি ইসলামের আলোতে সমগ্র বিশ্ব আলোকিত হবে। কান খুলে শুনে নাও যে, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেষ্টা চালায় তাহলে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব।"

এই বক্তৃতায় কুরাইশদের অন্তর বিগলিত হয়ে গেলো এবং তারা বলে উঠলো ঃ

"হে আমাদের বুজর্গ! আল্লাহর কসম, আপনি আমাদেরকে সকল অবস্থায় ইসলামের ওপর অটল পাবেন। আমরা হকের দুশমনকে কখনো নিজেদের ব্যূহে ঢুকতে দেব না এবং হক পথে যে কোন ধরনের কুরবানী করতে দ্বিধা করবো না।"

এই ব্যক্তি যাঁর ঈমানী জোশ ও শক্তিশালী বক্তৃতা মক্কার আকাশ বাতাস বা পরিবেশ মুহূর্তের মধ্যে পরিবর্তিত করে দিয়েছিল এবং এমনিভাবে ইসলামকে এক ভয়ানক অবস্থা থেকে বাঁচিয়েছিল তিনি ছিলেন কুরাইশের খতিব হযরত সোহায়েল (রা) বিন আমর।

হযরত সোহায়েল (রা) বিন আমর (বিন আবদি শামস বিন আবদুদ বিন নসর বিন মালিক বিন হাসাল বিন আমের বিন লুবী কারাশী আমেরি) কুরাইশের প্রভাবশালী সরদারদের অন্যতম হিসেবে পরিগণিত ছিলেন। বিশ্ব নবী (সা) হকের দাওয়াতের কাজ শুরু করলে আবু লাহাব, আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান, উকবা বিন আবি মুইত, রবিয়া পুত্র উতবা ও শাইবা, উমাইয়া বিন খালফ প্রমুখ অন্যান্য কুরাইশ সরদারের মত সোহায়েলও হক বিরোধিতা জীবনের একমাত্র কাজ হিসেবে বেছে নেন। তিনি ছিলেন একজন অনলবর্ষী ও জাদুস্পর্শী বক্তা। কাব্যেও তিনি ব্যুৎপত্তি রাখতেন এবং শক্তিশালী বক্তৃতার মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে তিনি সমগ্র জাতিকে গতিময় করে তুলতেন। তিনি

নিজের সকল যোগ্যতা ইসলাম বিরোধিতায় নিয়োজিত করেছিলেন এবং দাওয়াতে হকের পদে পদে বাধা দিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহর কৃতিত্ব দেখুন। তিনি যেভাবে ইসলামের কট্টর দুশমন ছিলেন, তাঁর সন্তানরা আবার তেমনি ইসলাম প্রেমিক ছিলেন। তাঁর দু'জন যুবক পুত্র আবু জান্দাল (রা) এবং আবদুল্লাহ (রা) ইসলামের প্রথম যুগেই রহমতে আলমের (সা) পবিত্র জামা মজবুতভাবে আকড়ে ধরেছিলেন। তেমনি তাঁর দু'জন বিবাহিত কন্যা সাহলা (রা) ও উম্মে কুলছুম (রা) স্ব স্ব স্বামীসহ [হযরত আবু হোজায়ফা (রা) এবং আবু সাবরা (রা) বিন আবি রুহুম] হক দাওয়াতের ইতিবাচক জবাব দিয়েছিলেন। এভাবে তারা সকলেই সাবিকুনাল আউয়ালুনের পবিত্র দলে অন্তর্ভুক্ত হন। সোহায়েল নিজের পুত্রদের ইসলাম গ্রহণে খুব বিচলিত হলেন এবং তাদেরকে জিঞ্জিরাবদ্ধ করে কয়েদ করে রাখলেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সোহায়েল সুযোগ পেয়ে হাবশার দ্বিতীয় হিজরীতে সেখানে চলে যান। অবশ্য হযরত আবু জান্দাল (রা) হুদায়বিয়ার সন্ধি পর্যন্ত পিতার কঠোর নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহও(রা) কিছুদিন পর হাবশা থেকে মক্কা ফিরে এলেন। এ সময় তিনি পুনরায় পিতার নির্যাতনের পাঞ্জায় ফেঁসে গেলেন। তিনি মুসলিহাতান নিজেকে পিতার আনুগত্য প্রকাশ করে মুক্তি লাভ করলেন। কিন্তু মনে মনে তিনি ইসলামেরই অনুরাগী রইলেন। বদরের যুদ্ধে তিনি মুশরিকদের সৈন্যের সঙ্গে মদীনা গেলেন এবং সেখানেই সুযোগ পেয়ে মুসলমান সৈন্যদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। ওদিকে সোহায়েল কন্যাদ্বয় এবং তাদের স্বামীরাও ইসলাম গ্রহণের অপরাধে মুশরিকদের ক্রোধের শিকার হন। বিশ্ব নবী (সা) মুসলমানদেরকে হাবশায় হিজরতের অনুমতি দেন। এ সময় তারাও মুহাজিরদের কাফিলায় শামিল হয়ে হাবশা গমন করেন এবং বছরের পর বছর ধরে উদ্বাস্তু জীবনের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে থাকেন। সোহায়েল নিজের পুত্র ও কন্যার কোন পরওয়া করতো না। ইসলাম বিরোধিতার যে পথ তিনি অবলম্বন করেছিলেন তা তিনি দাপটের সঙ্গে অব্যাহত রাখেন। ইসলাম যতই সম্প্রসারিত হচ্ছিল ইসলাম বিরোধী আবেগ তার ততই কঠোর হচ্ছিল। মোট কথা, তাঁর জীবনের দিন-রাত্রি এই কাজেই ওয়াকফ বা নিয়োজিত হয়েছিল। মুসলমানদের প্রতি তার ঘৃণার পরিমাপ একটি ঘটনা দিয়েই করা যায়। ঘটনাটি হলো, বাইয়াতে উকবায়ে কবিরার পর মদীনার আনসাররা স্বদেশে ফিরে এলেন। এ সময় খাজরাজ সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ কোন কারণে পিছে পড়েছিলেন। মক্কার মুশরিকরা মদীনাবাসীদের পিছনে ধাওয়া করতে করতে আজাখির নামক স্থানে তাদেরকে ধরে ফেললো। অতপর

তাদেরকে উটের পিঠের হাওদার চামড়া দিয়ে বেঁধে ফেললো এবং তাদের মাথার চুল ধরে মারতে মারতে মক্কা নিয়ে এলো। যে মুশরিকই আসতো সেই তাদের ওপর নির্যাতন চালাতো এবং তাদের লম্বা চুল ধরে টেনে মাটির ওপর ঘসে নিয়ে বেড়াতো। স্বয়ং হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদা (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি একজন লাল ও সাদা বর্ণের সুন্দর সুরতের মানুষকে আমার দিকে আসতে দেখলাম এবং ধারণা করলাম যে, ব্যক্তিটি রহমদিল ও যুক্তিবাদী হবে। সম্ভবত সে আমাকে এই শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি দেবে। কিন্তু আমার নিকট এসে সে আমার মুখের ওপর এত জোরে এক থাপ্পড় মারলো যে আমার মুখ ফিরে গেল। (অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী প্রচণ্ড জোরে আমাকে এক ঘুষি মারলো) আমি বুঝতে পেলাম যে, তাদের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই এবং তারা কেউই যুক্তিবাদী নয়। (থাপ্পড় অথবা ঘুষি দানকারী মানুষটি ছিল হযরত সোহায়েল বিন আমর) অবশেষে জনৈক মুশরিক (আবুল বখতরী বিন হিশাম) আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করে বললো "মক্কায় তোমার পরিচিত কেউ আছে কি?"

জবাবে আমি বললাম ঃ "হাঁ। জোবায়ের বিন মাতয়াম এবং হারিছ বিন হারব বিন উমাইয়া বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে মাঝে মধ্যে ইয়াছরাব গিয়ে থাকে। তারা আমাকে চিনে।"

সেই ব্যক্তি বললো, "সেই দু'জনের নাম নিয়ে দোহাই দাও।"

আমি তাই করলাম। অন্যদিকে সেই ব্যক্তি তাদেরকে গিয়ে বললো যে, খাজরাজের এক ব্যক্তি সায়াদ বিন উবাদা নামে এক ব্যক্তিকে আবতাহতে খুব করে মারা হচ্ছে আর সে তোমাদের নামের দোহাই দিচ্ছে।

তারা বললো, "ব্যাপারতো জটিল হয়ে গেছে। খোদার কসম, সে যা বলে তা সঠিকই বলে থাকে। সায়াদ বিন উবাদা হলেন খাজরাজের সরদার এবং আমাদের সঙ্গে তিনি সবসময় ভাল আচরণ করেছেন।" একথা বলেই তারা দৌড়ে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং সায়াদকে (রা) সেসব জালেমের নির্যাতনের পাঞ্জা থেকে মুক্তি দিলেন।

নবীর (সা) হিজরতের দুই বছর পর বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এ সময় সোহায়েল অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে অন্যান্য মুশরিকের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলেন। যুদ্ধে কুরাইশরা পরাজিত হলো। সোহায়েল হযরত মালিক (রা) বিন ওয়াখশামের হাতে গ্রেফতার হয়ে গেলেন। তাঁকে যখন হুজুরের (সা) সামনে আনা হলো তখন তাঁকে দেখে

হযরত ওমরের (রা) খুন টগবগ করে উঠলো। আজ সেই ব্যক্তি তাদের কবজায় এসেছে যে ব্যক্তি মুখ দিয়ে তেরটি বছর ধরে তাদেরকে ঘায়েল করে এসেছে। তিনি বিশ্ব নবীর (সা) নিকট আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অনুমতি দিলে সোহায়েলের সামনের দু'টি দাঁত ভেঙ্গে দি। যাতে বক্তৃতা করার শক্তি আর না থাকে। এই ব্যক্তির বাকশক্তি হকপন্থীদেরকে মারাত্মক ক্ষতি সাধন করেছে। তার দাঁত যদি ভেঙ্গে ফেলা হয় তাহলে সে আগের মত জোর ও জোশের সঙ্গে বক্তৃতা করতে পারবে না।"

রহমতে আলম (সা) হযরত ওমরের (রা) কথা মানলেন না। এবং বললেন ঃ

"রাখো, ওমর রাখো। আল্লাহ তায়ালা তাকে বক্তৃতা দানের যে যোগ্যতা প্রদান করেছেন সম্ভবত কোন সময় তা তোমাদের উপকারে আসতে পারে এবং তোমরা খুশী হয়ে যাবে।"

তারপর হুজুর (সা) সোহায়েলকে তাদের নিকট থেকে মুক্ত করে দিলেন।

কতিপয় রেওয়াতে এই ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তাতে এটা বিশ্লেষণ করা হয়নি যে, এই ঘটনা বদরের যুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়েছিল না অন্য কোন সময়। বদরের যুদ্ধের পর সোহায়েল ওহোদ ও খন্দকের যুদ্ধেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অংশ নেয়। যদিও প্রতিবারই কুরাইশরা পরাজিত হয়েছিল তবুও সোহায়েলের ওপর এই পরাজয়ের কোন প্রভাবই পড়েনি এবং সে ইসলামের মূলোৎপাটনের প্রচেষ্টায় জোরেশোরেই লেগেছিল।

৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে রাসূলে আকরাম (সা) চৌদ্দশ' সাহাবীসহ ওমরাহ করার জন্য ইহরাম বেঁধে মদীনা থেকে মক্কা রওয়ানা হয়ে গেলেন। কুরাইশরা যখন ব্যাপারটা জানতে পেলো তখন তারা মুসলমানদের মক্কা প্রবেশে বাধা দানের জন্য খুব প্রস্তুতি নিল। হুজুর (সা) যখন কুরাইশদের মনোভাব বুঝতে পারলেন তখন মক্কা থেকে এক মনযিল আগে হুদায়বিয়ার ময়দানে তাবু ফেললেন এবং কুরাইশদেরকে বলে পাঠালেন যে, তারা শুধু ওমরা করতে এসেছেন, যুদ্ধ-বিগ্রহ তাদের উদ্দেশ্য নয়। কিছুদিনের জন্য কুরাইশরা যদি আমাদের সঙ্গে সন্ধি করে নেয়, সেটাই হবে উত্তমকাজ। কুরাইশরা তার জবাবে উরওয়া বিন মাসউদ ছাকাফিকে দূত হিসেবে রাসূলের (সা) নিকট প্রেরণ করলো। তিনি ফিরে গিয়ে কুরাইশদেরকে পরামর্শ দিলেন যে, সন্ধি করাতেই কল্যাণ রয়েছে। কেননা, তিনি মুসলমানদের মধ্যে

মুহাম্মাদের (সা) জন্য মৃত্যুবরণ করার সীমাহীন আবেগ দেখতে পেয়েছেন কুরাইশরা উরওয়ার কথা মানলো না। হুজুর (সা) পুনরায় একজন দূত প্রেরণ করলেন। কুরাইশরা তাঁর সঙ্গেও অসদাচরণ এবং মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য একটি দল প্রেরণ করলো। মুসলমানরা তাদেরকে ধরে ফেললো। কিন্তু রহমতে আলম (সা) তাদের ক্ষমা করে দিলেন এবং চূড়ান্ত প্রচেষ্টার জন্য হযরত উসমানকে (রা) দূত হিসেবে মক্কা প্রেরণ করলেন। কুরাইশরা তাঁকে মক্কায় আটকে রাখলো। ওদিকে মুসলমানদের মধ্যে এই খবর মশহুর হয়ে গেল যে, উসামানকে (রা) শহীদ করে ফেলা হয়েছে। মুসলমানদের নিকট কুরাইশদের এই আচরণ ছিল অগ্রহণযোগ্য। তারা হযরত উসমানের(রা) বদলা নেয়ার লক্ষ্যে লড়াই করে মৃত্যুবরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল এবং সবাই একটি বাবলা বৃক্ষের নীচে প্রিয় নবীর (সা) পবিত্র হাতে মৃত্যুর জন্য বাইয়াত করলেন। এই বাইয়াতের নাম হলো বাইয়াতে রিদওয়ান। কেননা, এই বাইয়াতে অংশগ্রহণকারী জানবাজদেরকে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে নিজের সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিয়েছিলেন। পরে জানা গেল যে, হযরত উসমানের (রা) শাহাদাতের খবর সঠিক ছিল না। তা সত্ত্বেও মুসলমানদের উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে কাফেরদের সাহসে ভাটা পড়লো এবং তারা সন্ধির চুক্তিতে প্রস্তুত হয়ে গেল। সন্ধির শর্তাবলী নিরূপণের জন্য তারা সোহায়েল বিন আমরকে নিজেদের দূত নির্বাচন করলো। তিনি হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হলেন এবং সন্ধি চুক্তি লিখিতভাবে পেশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। হুজুর (সা) চুক্তি লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর ওপর ন্যস্ত করলেন এবং তাঁকে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" লিখতে বললেন।

সোহায়েল চমকে উঠে বললেন, "আমরা জানি না কে রহমান। তার পরিবর্তে "বিইসমিকা আল্লাহুম্মা" লিখা হোক কারণ, আল্লাহুম্মার ব্যাপারে আমরা এবং আপনারা সকলেই একমত আছি।"

এ সময় উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম (রা) আলী (রা) যা লিখেছেন তাই রাখার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন এবং বললেন, তাতে কোন পরিবর্তন হওয়া উচিত হবে না। কিন্তু হুজুরে আকরাম (সা) মুচকি হেসে হযরত আলীকে (রা) বললেন, "হে ভাই! সোহায়েল যেভাবে বলে সেভাবেই লিখে দাও।" হযরত আলী (রা) রাসূলের (সা) নির্দেশ পালন করলেন। এরপর হুজুর (সা) তাঁকে বললেন লিখো ঃ "এই প্রস্তাব মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহর (সা) পক্ষ থেকে করা হয়েছে।"

হযরত আলী (রা) এই বাক্য লিখলেন। এ সময় সোহায়েল প্রতিবাদ করলো ঃ

"সাহেব, এই বাক্য আমরা অনুমোদন করি না। আমরা যদি মুহম্মদকে (সা) রাসূল হিসেবে মেনেই নি তাহলে তো সকল বিরোধই শেষ হয়ে যায়। আপনি এখানে মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহর পরিবর্তে মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ লিখুন"।

হুজুর (সা) বললেন ঃ "আমার রিসালাত তোমার এবং তোমার মুয়াক্কিলদের স্বীকৃতির ওপর নির্ভরশীল নয়। আমি যেমন ইবনে আবদুল্লাহ তেমনি আল্লাহর রাসূলও। তবুও আমি তোমার কথা মেনে নিচ্ছি। অতপর তিনি হযরত আলীকে (রা) বললেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ শব্দ মুছে ইবনে আবদুল্লাহ লিখে নাও।"

হযরত আলী (রা) আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল। আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমিতো রাসূলুল্লাহ শব্দ মুছে ফেলার হিম্মত আমার মধ্যে পাচ্ছি না।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "ঠিক আছে, কাগজ এদিকে আনো।" যখন কাগজ তাঁর সামনে পেশ করা হলো তখন তিনি নিজের পবিত্র হাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ শব্দ মুছে ফেললেন এবং সেই স্থানে "ইবনে আবদুল্লাহ" লিখালেন। এই পর্যায়ে শেষ হলে হুজুর (সা) হযরত আলীকে (রা) বললেন ঃ "লিখো, মুসলমানদের ওমরা করার ব্যাপারে কুরাইশের কোন ওজর থাকবে না।

সোহায়েল ঃ খোদার কসম, আপনারা চলতি বছর ওমরার জন্য মক্কা প্রবেশ করবেন তা আমরা মানবো না এভাবেতো সমগ্র আরব আমাদেরকে বুযদিল বলে ভর্ৎসনা করবে। হাঁ, আগামী বছর আপনারা তাওয়াফের জন্য আসতে পারেন।"

রহমতে আলম (সা) বললেন ঃ "ঠিক আছে, তাই হবে।" সুতরাং এই শর্ত লিখা হলো।

সোহায়েল বললো ঃ "এখন লিখান যে, মক্কাবাসীর যে কেউ যদি পালিয়ে মুসলমানদের নিকট চলে যায়, সে যদি মুসলমানও হয় তাহলে তাকে কুরাইশের নিকট ফেরত পাঠাতে হবে এবং যদি কোন মুসলমান মক্কাবাসীর কবজায় চলে আসে তাহলে তাকে ফেরত পাঠানো হবে না। মুসলমানরা যদি ফেরতের দাবীও করে তবুও নয়।"

মুসলমানদের নিকট এই শর্ত খুবই আশ্চর্য ধরনের মনে হলো এবং তারা এক বাক্যে বললো, "এই শর্ত ইনসাফভিত্তিক নয় এবং আমরা তা

কোনক্রমেই অনুমোদন করি না।" এই শর্তের ব্যাপারে কথা কাটাকাটি চলছিল। এমন সময় এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে গেল। সোহায়েল তনয় আবু জানদাল (রা) যাঁকে তিনি ইসলাম গ্রহণের অপরাধে জিঞ্জিরাবদ্ধ করে রেখেছিলেন কেমন করে যেন কয়েদখানা থেকে বের হয়ে জিঞ্জির টানতে টানতে অনেক কষ্ট করে হুদায়বিয়া এসে পৌছলেন। তাঁর পায়ের গোড়ালীর হাড় এবং পায়ের গোড়ালী থেকে রক্ত ঝরছিল। পায়ে দেয়া ছিল বেড়ি এবং তিনি ডেকে ডেকে মুসলমানদের নিকট ফরিয়াদ করছিলেন ঃ

"বেরাদারানে ইসলাম, দেখো ইসলাম গ্রহণের অপরাধে আমার পিতা আমাকে এই করেছে। তোমরা কি আমাকে এই জিল্লতি থেকে মুক্তি দেবে না।"

তাঁকে এই অবস্থায় দেখে মুসলমানদের মধ্যে ক্রন্দনের রোল পড়ে গেল। কিন্তু সোহায়েল উঠে দাঁড়ালো এবং বলতে লাগলো ঃ

"হে মুহাম্মাদ! এই সন্ধিপত্র বাস্তবায়ন প্রথমে এই কুলাঙ্গারকে ফেরত দানের মাধ্যমে করতে হবে। মুসলমানদের জন্য সন্ধিনামা বাস্তবায়নের এটাই প্রথম সুযোগ"।

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ "সাহেব! এই শর্ততো এখনো লিখাই হয়নি। এ জন্য আবু জানদালের ওপর তার বাধ্যবাধকতা কি করে আরোপিত হতে পারে।"

সোহায়েল অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে জবাব দিলেন ঃ "যাই হোক, আবু জানদালকে আমাদের নিকট ফেরত না দেয়া পর্যন্ত আমরা কোন শর্তের ওপর সন্ধি করবো না।"

বিশ্ব নবী (সা) এবং সাহাবীরা (রা) তাকে বোঝানোর জন্য অনেক চেষ্টা করলো। কিন্তু সে কোনমতেই মানলো না। অবশেষে হুজুর (সা) সোহায়েলের শর্ত মেনে নিলেন এবং বললেন, "ঠিক আছে, তুমি আবু জানদালকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও।"

আল্লামা ইবনে কাইয়েম (র) যাদুল মায়াদে লিখেছেন যে, এ সময় আবু জানদাল (রা) হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন এবং উচ্চৈস্বরে বললেন ঃ

"হে মুসলমানেরা! একজন মুসলমানকে মুশরিকদের নিকট ন্যস্ত করছো। তোমরা দেখো, কিভাবে আমার শরীর থেকে রক্তের ধারা বইছে।"

প্রিয় নবী (সা) আবু জানদালকে (রা) সম্বোধন করে বললেন, আবু জানদাল! ধৈর্যধারণ কর। আমাদের কর্মপদ্ধতির ফল খুব শীঘ্রই প্রকাশ পাবে।

(এটা তিনি রূপক আকারে বলেছিলেন) আল্লাহ তোমাকে এবং অন্যান্য মজলুম মুসলমানদের জন্য কোন পথ বানিয়ে দেবেন।"

সুতরাং আবু জানদালকে (রা) পায়ে জিঞ্জির লাগানো অবস্থায় সোহায়েলের হাওয়ালা করে দেয়া হলো এবং সন্ধিনামায় স্বাক্ষর হয়ে গেল।

মহানবী (সা) ওমরা পালন ছাড়াই সঙ্গীদেরসহ হুদায়বিয়া থেকে মদীনা রওয়ানা হলেন। এমন সময় আল্লাহর তরফ থেকে ইরশাদ হলো ঃ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا (الفتح - ١) অর্থাৎ "হে পয়গাম্বর! আমরা তোমাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি।"

আল্লাহর এই ইরশাদ বাস্তবত সেই সব বিজয় ও সাফল্যের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যা ভবিষ্যতে মুসলমানরা লাভ করতে যাচ্ছিল। নচেৎ মুসলমানরা মনে করছিলো যে, তারা চাপে পড়ে এই সন্ধি করেছে।

অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে নবীয়ে আকরাম (সা) বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন। এ সময় শুধুমাত্র একটি অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে। তাতে সোহায়েল, ইকরামা বিন আবু জেহেল এবং সাফওয়ান বিন উমাইয়া আগে ভাগে ছিল। তারা বনি বকর, বনি হারিছ এবং হুযাইল প্রভৃতি গোত্রের অনেক গোঁড়া মুশরিককে সঙ্গে নিয়ে মুসলমানদের সেই সৈন্যদলকে বাধা দিয়েছিল যারা হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে মক্কায় প্রবেশ করছিলেন। মুসলমানরা তৎক্ষণাৎ মুশরিকদেরকে যথোচিত জবাব দিলেন এবং তারা নিজেদের বহু সংখ্যক মানুষকে নিহত অবস্থায় ফেলে রেখে পালিয়ে গেল। মুসলমানদের শুধু দুই ব্যক্তি শহীদ হয়েছিলেন। সোহায়েল পালিয়ে স্বগৃহে গিয়ে ঢুকেছিল। সে সময় তার যে অবস্থা ছিল তা তিনি এই ভাষায় বর্ণনা করেছেন ঃ

"রাসূলুল্লাহই (সা) মক্কায় প্রবেশ করতেই আমি ভয়ে ভীত হয়ে ঘরের অভ্যন্তরে বসে গেলাম এবং নিজের পুত্র আবু জানদালকে (রা) ডেকে বললাম ঃ "হে আমার প্রাণ প্রিয় পুত্র! যেভাবেই হোক মুহাম্মাদের (সা) নিকট সুপারিশ করে আমাকে জীবনে বাঁচাও।"

হযরত আবু জানদাল (রা) পিতার হাতে খুব নির্যাতন সহ্য করেছিলেন। কিন্তু এ সময় তিনি সবকিছু ভুলে গিয়েছিলেন এবং তিনি পিতাকে বাঁচানোর আশা পোষণ করলেন। সেখান থেকে তিনি সোজা বিশ্ব নবীর (সা) খিদমতে হাজির হলেন এবং প্রার্থনা জানালেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতাকে নিরাপত্তা দিন।" হুজুর (সা) আবু জানদালের (রা) কুরবানী সম্পর্কে সম্যক

ওয়াকিফহাল ছিলেন। কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তিনি তাঁর সুপারিশ মেনে নিলেন এবং বললেন ঃ

"সোহায়েল আল্লাহর নিরাপত্তায় রয়েছে। তিনি যেন কোন ভয়-ভীতি ছাড়াই ঘর থেকে বের হন। কোন মুসলমানের তাকে কোন ক্ষতি করার অনুমতি নেই। আমার বয়সের কসম, সোহায়েল একজন জ্ঞানী ও শরীফ মানুষ। এমন মানুষ ইসলামের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে না।" (সে সময় পর্যন্ত বয়স প্রভৃতির কসম খাওয়া নিষিদ্ধ হয়নি)।

আবু জানদাল খুশী খুশী পিতার নিকট ফিরে গেলেন এবং তাঁকে হুজুরের (সা) ইরশাদ সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন "খোদার কসম! মুহাম্মাদ (সা) শৈশবকালেও নেক্কার ছিলেন এবং বয়স্ককালেও নেককার রয়েছেন।"

এই বর্ণনাটি মুসতাদরাকে হাকিমের। হাফিজ ইবনে হাজার (র) ইসাবাতে লিখেছেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন যখন সকল মক্কাবাসী রাসূলে আকরামের(সা) সামনে এলেন; তখন হুজুর (সা) খুতবার পর তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ! আজ তোমরা আমার নিকট কি আশা করতে পার?"

এ সময় সোহায়েল (রা) কুরাইশের মুখপাত্র হিসেবে সামনে অগ্রসর হলেন এবং আরজ করলেন ঃ

"আপনি আমাদের শরীফ ভাই এবং শরীফ ভ্রাতুষ্পুত্র। আমরা আপনার নিকট ভালই আশা করি।"

রহমতে আলম (সা) বললেন ঃ

"হে কুরাইশ ভাইয়েরা। আমি আপনাদেরকে সেই কথাই বলবো যা হযরত ইউসুফ (আ) নিজের ভাইদেরকে বলেছিলেন ঃ লা তাছরিবা আলাইকুমুল ইয়াওমা অর্থাৎ আজ তোমাদের ওপর কোন জবাবদিহি বা প্রতিশোধ নেয়া হবে না।

আপনারা সকলেই মুক্ত। সোহায়েল রহমতে আলমের (সা) ক্ষমাশীলতা দেখে খুবই প্রভাবিত হলেন। কিছুদিন পর হুজুর (সা) যখন হুনাইনের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন তিনি জি'রানা নামক স্থানে পৌঁছে রাসূলের

(সা) দরবারে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। রহমতে আলম (সা) তার অন্তর জয়ের উদ্দেশ্যে হাওয়াযিনের সম্পদ থেকে একশ' উট দান করলেন। ব্যস, সেই দিন থেকে তিনি নিজের অন্তর ও জীবন রাসূলে আরাবীর (সা) ওপর উৎসর্গ করে বসলেন এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত অতীত অপরাধের ক্ষতিপূরণে ব্যস্ত ছিলেন। ইমাম বুখারী (র) এবং হাকিম (র) লিখেছেন যে, হযরত সোহায়েল (রা) হুনাইনের যুদ্ধে প্রকৃত অংশও নিয়েছিলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত সোহায়েলের (রা) জীবনে সম্পূর্ণ বিপ্লব এসে গেল। তিনি খুব বেশী বেশী নামাজ পড়তেন, রোযা রাখতেন এবং নিজের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে অকাতরে দান করতেন। আল্লামা ইবনে আছির (রা) "উসুদুল গাব্বাহ"-তে লিখেন যে, সেই সকল কুরাইশ সরদার যারা সবশেষে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে সোহায়েল (রা) বিন আমর সবচেয়ে বেশী নামায পড়তেন, রোযা রাখতেন, দান-খয়রাত করতেন এবং আমলে সালেহ বা নেক কাজ করতেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁর শরীর শুকিয়ে এবং রং পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। নিজের অতীত কর্মের কথা স্মরণ করে খুব কাঁদতেন। বিশেষ করে যখন পবিত্র কুরআন শুনতেন তখন চক্ষু দিয়ে অশ্রু দর দর করে প্রবাহিত হতো। মোটকথা, ইসলাম গ্রহণের পর তিনি একজন উদাহরণযোগ্য মরদে মু'মিন হয়ে গিয়েছিলেন। মহানবীর (সা) ওফাতের পর ধর্মদ্রোহিতার ভয়াবহ ফিতনা যখন সমগ্র আরবে কিয়ামত কায়েম করে ফেললো তখন সোহায়েলের (রা) পা এক মুহূর্তের জন্যও টলমল করেনি। বরং তিনি সেই ভয়ংকর সময়েও এমন অটলতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করেন যে, যার কোন নজীর পাওয়া যায় না। মক্কায় কুরাইশদেরকে সঠিক পথে রাখা তাঁর এমন এক মহান কৃতিত্ব ছিল যে, তাঁকে নিশ্চিন্তে ইসলামের মুহসিনদের কাতারে স্থান দেয়া যায়। ধর্মদ্রোহিতার ফিতনা নির্মূল করণে শুধুমাত্র হযরত সোহায়েলই (রা) নন বরং তাঁর পরিবারের সকলেই জীবনবাজি রেখে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে রক্তাক্ত যুদ্ধ মুসায়লামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামা নামক স্থানে সংঘটিত হয়েছিল। হযরত সোহায়েলের (রা) বড় পুত্র আবদুল্লাহ (রা) ইয়ামামার যুদ্ধে বীর বিক্রমে অংশ নেন এবং লড়াই করতে করতে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) হজ্জের জন্য মক্কা গিয়ে শোকজ্ঞাপনের জন্য হযরত সোহায়েলের (রা) বাড়ী তাশরীফ নেন। সে সময় হযরত সোহায়েল (রা) বলেছিলেন ঃ

"আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন শহীদ ব্যক্তি নিজের বংশের বা খান্দানের ৭০ ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করবেন। আমি আশা করি যে, আবদুল্লাহ সর্বপ্রথম আমার জন্য সুপারিশ করবে।"

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতকালে যখন রোমক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু হলো এবং ইসলামের মুজাহিদরা সিরিয়ার (ফিলিস্তিনসহ) দিকে অগ্রাভিযান শুরু করলো তখন হযরত সোহায়েল (রা) জিহাদের আবেগে উদ্বেলিত হয়ে নিজের খান্দানের সকলের সঙ্গে ইসলামী বাহিনীতে শামিল হয়ে গেলেন। আল্লামা ওয়াকেদী বর্ণনা করেছেন, সিরিয়ার অনেক যুদ্ধে তিনি জীবনবাজি রাখার নজীর বিহীন উদাহরণ পেশ করলেন এবং উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করলেন। সেই কালে তিনি নিজেকে হক পথে সম্পূর্ণরূপে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। সারা রাত নামায পড়তেন এবং দিনে জিহাদের ময়দানে অতিবাহিত করতেন। সিরিয়ার সবচেয়ে রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ইয়ারমুকের ময়দানে। এই যুদ্ধে হযরত সোহায়েল (রা) ইসলামী বাহিনীর একটি দলের অফিসার ছিলেন। যুদ্ধের প্রথম দিন আরবের সকল গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কশীল ৬০ হাজার খৃষ্টান যোদ্ধা জাবালা বিন আইহামের নেতৃত্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালো। এ সময় ইসলামের সিপাহসালার হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) ইবনুল জারাহর অনুমতিক্রমে হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ এমন এক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন দুনিয়ার যুদ্ধের ইতিহাসে যার কোন উদাহরণ নেই। তিনি মুসলমানদের মধ্য থেকে ৬০ জন বাছাই করা সেরা অশ্বারোহী নির্বাচন করলেন এবং বললেন যে, এর প্রত্যেক অশ্বারোহী এক হাজার মানুষের মুকাবিলা করতে পারে। এটা ছিল আত্মবিশ্বাসের এক বিরল দৃষ্টান্ত। বিশ্ব প্রত্যক্ষ করলো যে, আল্লাহর এই ৬০ সিপাহী ৬০ হাজার কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়েছেন। সেই ৬০ সেরা অশ্বারোহীর মধ্যে একজন ছিলেন হযরত সোহায়েল (রা) বিন আমর। এই বাহাদুর মানুষটি রাতের অন্ধকার বিস্তার লাভ পর্যন্ত জাবালার আরব বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করলেন। এই যুদ্ধে শত্রু পক্ষের হাজার হাজার সৈন্য নিহত হলো এবং মুসলমানদের শুধুমাত্র দশ ব্যক্তি শহীদ এবং পাঁচজন বন্দী হলেন।

হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) "ইসতিয়াব" গ্রন্থে লিখেছেন যে, হযরত সোহায়েল (রা) বিন আমর ইয়ারমুকেরই এক সংঘর্ষে বীরত্ব প্রদর্শন করতে করতে শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন তাও এক বিরল ঘটনা। তিনি লিখেছেন, হযরত সোহায়েল (রা) আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে মাটির ওপর

পড়ে গেলেন। এই অবস্থায় তার মুখ দিয়ে "পানি" "পানি" আওয়াজ বের হলো। একজন মুসলমান যিনি আহতদেরকে পানি পান করাচ্ছিলেন দৌড়ে তার নিকট পৌছলেন এবং পানির পেয়ালা তাঁর মুখে লাগিয়ে দিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে নিকটে পড়ে থাকা অন্য আরেকজন আহত ব্যক্তি পানি চাইলেন। সোহায়েল (রা) তাঁর আওয়াজ শুনলেন। তিনি পানি পান না করে পেয়ালা নিজের ঠোঁট থেকে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন যে, আগে আমার ভাইকে পান করাও। দ্বিতীয় আহত ব্যক্তির নিকট পানি নেয়া হলো। এ সময় তিনি তৃতীয় এক আহত ব্যক্তির আওয়াজ শুনলেন। তিনি বলছিলেন, "কেউ থাকলে আমাকে পানি পান করিয়ে দাও।" দ্বিতীয় আহত ব্যক্তিত্ব পানির কোন কাতরা পান না করেই বললেন, "প্রথমে আমার ভাইকে পানি পান করাও।" এমনিভাবে একের পর এক সাতজন আহত মানুষ পানি পানি করে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলেন। কিন্তু নিজের পিপাসার চেয়ে অন্যের কষ্টের কথা চিন্তা করে কেউই পানি পান করলেন না। এমনিভাবে সেই সব ত্যাগ স্বীকারকারী শহীদরা ইসলামী ভ্রাতৃত্ব এবং ঈমানের প্রতি মুহাব্বাতের এমন এক উচু স্তরের উদাহরণ পেশ করলেন যা মুসলমানদের পক্ষে চিরকালের জন্য মশাল হিসেবে কাজ করবে।

কতিপয় রেওয়ায়াতে এই ঘটনার অন্য চরিত্রের মধ্যে হযরত সোহায়েল(রা) বিন আমরের সাথে শুধুমাত্র ইকরামা (রা) বিন আবু জেহেল এবং হারিছ বিন হিশামের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য এক রেওয়ায়াতে হযরত সোহায়েলের (রা) স্থানে হযরত আয়াশ (রা) বিন আবি রাবিয়ার নাম উল্লেখ রয়েছে। এই ঈমান প্রজ্জলিত ঘটনার চরিত্রে তিনজন থাকুন অথবা সাতজন। তাতে সোহায়েল (রা) বিন আমর থাকুন অথবা আয়াশ (রা) বিন আবি রাবিয়ার নাম উল্লেখ থাকুক। তবে, এই ঘটনার সত্যতা প্রশ্নে কোন দ্বিমত নেই।

আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) এবং হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত সোহায়েল (রা) বিন আমর আমওয়াসের প্লেগ মহামারীতে (১৮ হিঃ) ওফাত পান। এই প্রসঙ্গে তাঁরা হযরত আবু সায়াদ বিন ফুজালা (রা) (কতিপয় রেওয়ায়াতে তাঁর নাম সায়াদ বিন ফুজালা উল্লেখ করা হয়েছে) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন ঃ "আমি সিরিয়ার যুদ্ধে সোহায়েল (রা) বিন আমরের সঙ্গে ছিলাম। তিনি বলতেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেছি যে, আল্লাহর রাস্তায় সামান্য সময় অবস্থান করা সমগ্র জীবনের আমল থেকে উত্তম। এজন্য আমি আমৃত্যু অব্যাহতভাবে জিহাদ করতে থাকবো এবং এখন মক্কা ফিরে যাবো না। বস্তুত তিনি নিজের ওয়াদা পূরণ করেন।

আমওয়াসের প্লেগ মহামারীর সময়ও জিহাদের ময়দান থেকে হটে যাননি এবং সেখান থেকেই আখিরাতের প্রতি যাত্রা শুরু করেন।"

হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) আল ইসতিয়াবে লিখেছেন, হযরত সোহায়েল (রা) তনয় হযরত আবু জানদালও (রা) যখন আমওয়াসের প্লেগে মারা যান সে সময় সোহায়েলের (রা) সন্তান-সন্ততির মধ্যে একটি কন্যা এবং একজন পুতি ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ ছিলেন না। এমনিভাবে তিনি নিজেও এবং প্রায় তাঁর সকল সন্তানই ইসলামের জন্য কুরবান হয়ে গিয়েছিলো।

হযরত সোহায়েল (রা) বিন আমর সেই মহান সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা হুজুরে আকরামের (সা) বর্ণনার অনুরূপ ছিলেন ঃ

"খিয়ারুকুম ফিল জাহিলিয়াতি খিয়ারুকুম ফিল ইসলাম।" অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা জাহেলী যুগে উচু মর্যাদার ছিলেন তারা ইসলামী যুগেও উচু মর্যাদায় রয়েছে।

জাহেলী যুগে হযরত সোহায়েল (রা) যেমন নিজের মর্যাদা, জমিদারী, সম্পদ এবং বক্তৃতা শক্তিকে ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিলেন তেমনি ইসলাম গ্রহণের পর তার থেকেও বেশী উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে নিজেকে হকের খিদমতে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন। তাঁর ওজস্বী বক্তৃতা কুফুরীর মুকাবিলায় তরবারী হিসেবে নিপতিত হতো এবং তাঁর অগ্নিঝরা বাণী ইসলাম ও হকপন্থীদের জন্য ঢাল হিসেবে বিবেচিত হতো। একদিন এমন ছিল যে, ইসলামের বিরুদ্ধে তাঁর সেই আগুনঝরা বক্তৃতায় অস্থির হয়ে হযরত ওমর ফারুক (রা) বিশ্ব নবীর (সা) নিকট সোহায়েলের (রা) সামনের দাঁত ভেঙ্গে ফেলার অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু রহমতে আলম (সা) বলেছিলেন, রাখো একদিন এমনও আসতে পারে যেদিন সে তোমাদেরকে খুশী করে দিতে পারে। অতপর সত্যি এমন একদিন এলো যেদিন হুজুরের (সা) এই ভবিষ্যতদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছিল। সোহায়েলের (রা) শক্তিশালী বক্তৃতা ও আগুন ঝরা বর্ণনা মক্কায় উত্থিত ধর্মদ্রোহিতার তুফানকে ধোঁয়া বানিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলো এবং সকল মুসলমান খুশী হয়ে গিয়েছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর রোযা, নামায এবং কুরআনের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক দেখে অন্যরা ঈর্ষা করতেন। তাঁর স্বভাব প্রকৃতি থেকে জাহেলী যুগের গর্ব ও অহংকার সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত এবং তিনি বিনয় ও নিরহংকারের এক ছবি হয়ে গিয়েছিলেন।

মক্কা বিজয়ের পর কুরআনের মশহুর আলেম হযরত মায়াজ (রা) বিন জাবাল আনসারী কিছুদিন মক্কা অবস্থান করলেন। হযরত সোহায়েল (রা) এই সুযোগকে খুব মূল্যবান মনে করলেন এবং তাঁর নিকট থেকে পবিত্র কুরআন

তালিম নিতে লাগলেন। তখনো তাঁর শিক্ষা পূর্ণ হয়নি এমন সময় হযরত মায়াজ (রা) মক্কা থেকে মদীনা চলে গেলেন। হযরত সোহায়েল (রা) তারপর প্রায়ই মক্কা থেকে মদীনা গমন করতেন এবং হযরত মায়াজের (রা) নিকট তালিম নিতেন। একবার হযরত জিরার (রা) বিন আযুর তাকে বললেন ঃ এই খাজরাজীর (হযরত মায়াজ) নিকট থেকে আপনার পবিত্র কুরআন শিখাটা কি খুব আবশ্যক? নিজের খান্দানের কারোর নিকট থেকে কুরআন শিক্ষা লাভে দোষ কি?"

হযরত সোহায়েল (রা) জবাব দিলেন ঃ "জিরার! এই গোঁড়ামীর কারণে আমাদের এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। আর অন্যরা কোথায় থেকে কোথায় পৌঁছে গেছে। ইসলাম জাহেলিয়াতের সকল উঁচু নীচু খতম করে দিয়েছে। আমরাও যদি দাওয়াতের শুরুতে হক কবুল করে নিতাম তাহলে আজ আমাদের মর্যাদা কয়েক মনযিল সামনে হতো। আমিতো নিজের গোষ্ঠীর সদস্য বরং নিজের গোলাম ওমায়ের (রা) বিন আবুকের ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামিতার মর্যাদাতেও আনন্দ অনুভব করি এবং মনে করি যে, তাদের দোয়ার বদৌলতেই আমার ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ ঘটেছে। নচেৎ অন্য মুশরিকের মত আমিও মুসলমানদের সঙ্গে লড়াই করে কোন যুদ্ধে মারা যেতাম। জিরার! আমি যখন হুদায়বিয়ায় আমার কর্মপদ্ধতির কথা স্মরণ করি তখন আমি রাসূলের (সা) সঙ্গে কৃতকর্মের জন্য লজ্জা অনুভব করি। আল্লাহর কসম! যাঁরা ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামিতার গৌরব লাভ করেছেন তাঁরা আমাদের চেয়ে অনেকগুণ শ্রেষ্ঠ। এ জন্য আমি অবশ্যই মায়াজের (রা) নিকট থেকে কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করবো।" তাঁর ঈমান আলোকিত জবাব শুনে হযরত জিরার (রা) নীরব ও নিথর হয়ে গেলেন এবং তারপর তিনি আর কখনো কারোর সঙ্গে এ ধরনের কথা বলেননি।

মুসতাদরাকে হাকিমে হযরত হাসান (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমরের (রা) খিলাফতকালে একবার কুরাইশের বড় বড় নেতা এবং শেখরা আমিরুল মু'মিনীনের সঙ্গে সাক্ষাত করতে এলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আবু সুফিয়ান (রা) বিন হারব, ইকরামা (রা) বিন আবু জেহেল, হারিছ (রা) বিন হিশাম এবং সোহায়েল (রা) বিন আমর। ইত্যবসরে অন্য আরও কতিপয় লোকও আমিরুল মু'মিনীনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এসে পড়লেন। তাঁদের মধ্যে হযরত বিলাল (রা) হাবশী, সালমান ফারসী (রা), আম্মার বিন ইয়াসির (রা) এবং সোহায়েব রুমীর (রা) মত সাহাবীও (যাঁরা একসময় গোলাম ছিলেন) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত ওমর (রা) এসব সাহাবীর আগমনের খবর

পেলেন। তখন তিনি সর্বপ্রথম পরে উল্লেখিত সাহাবীদেরকে ভেতরে ডেকে পাঠালেন। কেননা তাঁরা সাবিকুনাল আউয়ালুন এবং বদরের যোদ্ধা ছিলেন। হযরত ওমর (রা) তাঁদেরকে সীমাহীন শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। হযরত আবু সুফিয়ানের (রা) নিকট ব্যাপারটি অসহনীয় মনে হলো এবং বলে উঠলেন, "আমি আজকের মত জিল্লতী কখনো দেখিনি। আমরা অপেক্ষা করছি। অথচ গোলামদেরকে ভেতরে ডেকে নেয়া হচ্ছে।" হযরত সোহায়েল (রা) সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতিবাদ করলেন এবং বললেন ঃ

"তাঁদেরকে গালি দিও না। নিজেকে গালি দাও। তাঁদেরকেও দাওয়াত দেয়া হয়েছিল এবং তোমাদেরকেও। বস্তুত দাওয়াতের প্রতি তারা দ্রুত অগ্রসর হয়েছিলেন এবং তোমরা পেছনে রয়ে গিয়েছিলে।"

অতপর বললেন ঃ "ঈমান আনয়নে তারা তোমাদের থেকে অগ্রগামী হয়েছিলেন। এখন আর এমন কোন বস্তু নেই যা তোমাদেরকে তাদের ওপর অগ্রগণ্য করবে। সুতরাং তোমরা জিহাদের প্রতি মনোযোগ দাও এবং তা নিজেদের ওপর বাধ্যতামূলক করে নাও। সম্ভবত আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে শাহাদাতের নিয়ামত প্রদান করে ক্ষতিপূরণ করিয়ে দিতে পারেন।"

তারপর এসব ব্যক্তি হযরত সোহায়েল (রা) সমেত সিরিয়া (জিহাদের জন্য) চলে গেলেন। ওয়াকেদীর (র) বর্ণনা অনুযায়ী হযরত সোহায়েল (রা) হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতকালেই সিরিয়ার ওপর হামলাকারী সেনাবাহিনীতে শামিল হয়ে গিয়েছিলেন। সম্ভবত তিনি কিছু দিনের জন্য যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে এসেছিলেন এবং ইয়ারমুকের যুদ্ধের পূর্বে হযরত ওমরের (রা) খিদমতে উপস্থিত হয়ে থাকবেন। ওয়াকেদী এবং হাকিমের বর্ণনার মধ্যে এমনিভাবেই সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত সোহায়েল (রা) অধিকাংশ সময় রাসূলের (সা) দরবারে হাজির থাকতেন। তা সত্ত্বেও দেরীতে ঈমান আনার কারণে নবীর (সা) ফয়েজ লাভের সুযোগ খুব কমই হয়েছিল। এ জন্য হাদিস বর্ণনায় তিনি খুব সতর্ক থাকতেন। তবুও তিনি রাসূলের (সা) নিকট যা কিছু শুনতেন তা জীবনের জপমালা বানিয়ে নিতেন এবং উপযুক্ত সময়ে হুজুরের (সা) ইরশাদসমূহ অন্যদের নিকট পৌছে দিতেন। জিহাদ ও শাহাদাতের ফজিলত সম্পর্কে তিনি যা কিছু শুনিয়েছেন তার উল্লেখ ওপরে করা হয়েছে। মুসনাদে আবু দাউদে তাঁর থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ (সা) এমন এক উটের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন, যার পিঠ পেটের সাথে লেগেছিল। তিনি বলেন যে, হে লোকেরা! এসব বাকহীন পশুদের

ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো। যদি সওয়ার হতে চাও তাহলে পশুদেরকে ভালভাবে রাখো।"

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত সোহায়েলের (রা) জীবনের যেদিকেই দৃষ্টিপাত করা যাক না কেন তা চন্দ্র ও সূর্যের মত আলোকিত মনে হবে। এ জন্যই হাফেজ ইবনে হাজার (র) তার সম্পর্কে লিখেছেন যে, ইসলাম গ্রহণের দিন হযরত সোহায়েলের (রা) চাল চলন একজন প্রশংসাযোগ্য মুসলমানের চাল চলনের অনুরূপ ছিল।

হযরত ছাবিত (রা) বিন
কায়েস আনসারী

রাসূলের যুগের শেষ দিকের কথা। একদিন রহমতে আলম (সা) সাহাবীদের (রা) মধ্যে বসেছিলেন। কোন একটি সমস্যার ব্যাপারে আলোচনা চলছিল। আলোচনাকালে হঠাৎ করে কিছু সাহাবীর (রা) কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে উঁচু হয়ে গেল। রাসূলের (সা) দরবারে সাহাবীদের (রা) এ ধরনের উঁচু কণ্ঠস্বর আল্লাহ তায়ালা পসন্দ করলেন না এবং তৎক্ষণাৎ এই আয়াত নাযিল হলো ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُوْنَ -

"হে মানুষেরা! যারা ঈমান এনেছো; নিজের কণ্ঠস্বরকে নবীর (সা) কণ্ঠস্বর থেকে উঁচু করো না এবং নবীর (সা) সাথে উঁচু গলায় কথা বলবে না যেভাবে তোমরা পরস্পর একে অপরের সাথে করে থাকো। এমন যেন না হয় যে, তোমাদের আমলসমূহ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তোমরা সে সম্পর্কে খবরই রাখো না।" (সূরা আল হুজুরাত ঃ ২)

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবায়ে কিরাম (রা) আল্লাহর ভয়ে কেঁপে উঠলেন এবং তাঁরা প্রতিজ্ঞা করলেন যে, হুজুরের (সা) সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বরকে সবসময় নীচু রাখবেন। হাজেরিনে মজলিশে এমন একজন সাহাবী ছিলেন যাঁর কণ্ঠস্বর ছিলো খুব ঝাঁঝালো। তিনি ওপরে বর্ণিত আয়াতে এতো প্রভাবান্বিত হলেন যে বাড়ী ফিরে নির্জনত্বে বসে গেলেন এবং সবসময় তওবা এবং ইসতিগফারে ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন। অব্যাহতভাবে কয়েকদিন যখন রাসূলে আকরাম (সা) তাঁকে মজলিসে দেখতে পেলেন না তখন সাহাবীদের(রা) নিকট জিজ্ঞেস করলেন যে, সে অসুস্থ তো হয়ে পড়েনি? আওস সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজ আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাঁর খবর আনছি।"

সুতরাং তিনি সেই সাহাবীর (রা) বাড়ী গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, তিনি বিমর্ষ ও মলিনতার এক ছবির মত বসে আছেন। হযরত সায়াদ (রা) বললেন ঃ "আপনি বেশ কিছু দিন হলো নবীর মজলিশে গমন করেননি। হুজুর (সা) আজ আমাকে আপনার অবস্থা জানার জন্য প্রেরণ করেছেন।"

তিনি বললেন, "ভাল আর কি করে থাকি। আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলের (সা) সামনে উঁচু কণ্ঠে কথা বলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং সে সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শনের আয়াত নাযিল হয়েছে। আপনি জ্ঞাত আছেন যে, নবীর মজলিশে আপনাদের সবার মধ্যে আমার কণ্ঠস্বরই উঁচু হয়ে পড়ে। বর্তমানে দুশ্চিন্তায় আমার কোমর ভেঙ্গে গেছে। আমি ভাবছি যে আমার সকল আমলই বরবাদ হয়ে গেছে এবং আমি জাহান্নামী হয়ে পড়েছি।"

হযরত সায়াদ (রা) হুজুরের (সা) খিদমতে ফিরে গিয়ে সকল কথা বললেন। এ সময় তিনি বললেন ঃ "সেতো জাহান্নামী নয় বরং জান্নাতী।"

রাসূলের (সা) এই সাহাবী যাঁকে মহানবী (সা) স্পষ্টভাষায় জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন হযরত ছাবিত (রা) বিন কায়েস আনসারী।

সাইয়্যেদেনা আবু মুহাম্মাদ ছাবিত (রা) বিন কায়েস আনসারী মদীনার খাজরাজ খান্দানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তাঁর নসবনামা হলো ঃ

ছাবিত (রা) বিন কায়েস বিন সামাছ বিন যোহায়ের বিন মালিক বিন ইমরুল কায়েস বিন মালিক আয়াজ বিন ছা'লাবা বিন কায়াব বিন খাজরাজ বিন হারিছ বিন খাজরাজ আকবার।

আল্লামা ইবনে আছিরের (র) বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর মাতা তায় কবিলাভুক্ত ছিলেন।

হিজরতের পূর্বে দ্বিতীয় বাইয়াতে উকবা অথবা উকবায়ে কাবিরার পর কোন এক সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রকৃতিগতভাবেই তাঁর মধ্যে বক্তৃতা করার গুণ বিদ্যমান ছিল এবং বাকপটুত্ব ও অসাধারণ বক্তা হিসেবে মদীনাবাসীর মধ্যে তিনি এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল দরাজ। এ জন্য আনসাররা তাঁকে নিজেদের খতিব বানিয়েছিলেন। বিশ্ব নবী (সা) তাঁর যোগ্যতা ও গুণাবলী সম্পর্কে অবহিত হয়ে তিনিও তাঁকে নিজের খতিব নিয়োগ করলেন। সুতরাং তিনি রাসূলের (সা) খতিব উপাধিতে মশহুর হয়ে গেলেন।

হাফেজ ইবনে হাজার (র) "আল ইসাবা" গ্রন্থে লিখেছেন, হিজরতের পর রাসূলে আকরাম (সা) মদীনায় শুভ পদার্পণ করলেন। এ সময় মদীনার আনসারবৃন্দ এমন উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে রাসূলকে (সা) ইসতিকবাল বা অভ্যর্থনা জানালেন যে বিশ্ববাসী তা কখনো প্রত্যক্ষ করেনি। অভ্যর্থনাকারীদের মধ্য হযরত ছাবিত (রা) বিন কায়েসও ছিলেন। প্রিয় নবীর (সা) খিদমতে পৌঁছে তিনি আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর নবী! আমরা আপনাকে এমনভাবে হেফাজত করবো যেমন নিজের জীবন ও সন্তানকে হেফাজত করে থাকি। তবে আমরা তার বিনিময়ে কি পাবো?

তিনি বললেন ঃ "জান্নাত।"

একথায় সকলেই বলে উঠলেন, "আমরা সবাই রাজি আছি।"

বদরের যুদ্ধে হযরত ছাবিতের (রা) অংশ গ্রহণ প্রশ্নে মতবিরোধ রয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার (র) তাঁকে বদরের সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত করে থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ চরিত গ্রন্থে তাঁকে বদরের সাহাবী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। হযরত ছাবিত (রা) খুব মুখলিস সাহাবী ছিলেন। এ জন্যে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার ব্যাপারে বিশেষ কারণ থাকতে পারে। হয়ত তিনি অসুস্থ ছিলেন অথবা তিনি সে সময় মদীনাতে উপস্থিতই ছিলেন না।

অতপর তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নবীর (সা) সকল যুদ্ধেই বীরত্বের সাথে অংশ গ্রহণ করেন এবং প্রতিটি যুদ্ধে খুবই দৃঢ়তার পরিচয় দেন।

মুররে ইয়াসি'র (পঞ্চম হিজরী) যুদ্ধে বনু মুসতালিকের সরদার হারিছ বিন আবি জিরারের কন্যা জুয়াইরিয়াকে হযরত ছাবিত (রা) বিন কায়েস গ্রেফতার করেন। বাঁদী হিসেবে থাকাটা তাঁর সহ্য হলো না। এ জন্য হযরত ছাবিতের(রা) নিকট পরস্পর চিঠি লিখার দরখাস্ত করলেন। তিনি ১৯ আওকিয়া সোনার বিনিময়ে পত্র লিখক হওয়ার প্রস্তাব মঞ্জুর করলেন। জুয়াইরিয়া (রা) হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন যে, "তিনি সরদারে কওম হারিছ বিন আবি জিরারের কন্যা। আল্লাহ আমাকে ইসলাম কবুল করার তাওফিক দিয়েছেন। এ সময় মুসিবতে পড়েছি এবং নিজেকে আজাদ করাতে চাই। আপনি আমাকে সাহায্য করুন।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "এটা কি ঠিক নয় যে, তোমার সঙ্গে আরো ভাল আচরণ করা হবে?" জিজ্ঞেস করলেন, "তা আবার কি?" ইরশাদ হলো ঃ

"তোমার চিঠি লিখার বিনিময় আমি আদায় করবো এবং তোমাকে স্বয়ং আমি বিয়ে করবো।"

এই প্রস্তাব তিনি আনন্দ চিত্তে মঞ্জুর করে নিলেন। আর এমনিভাবে হযরত জুয়াইরিয়া (রা) উম্মুল মু'মিনীন হওয়ার মহান মর্যাদা লাভ করলেন।

প্রতিনিধিদলসমূহের বছর নবম হিজরীতে বনু তামিমের প্রতিনিধিদল খুব ঠাটবাটের সঙ্গে মদীনা এলো। সত্তর অথবা আশি ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত ছিল এই দল এবং তাতে কবিলার বড় বড় সরদার, অনলবর্ষী বক্তা এবং উচু মর্যাদার কবি শামিল ছিলেন। জাহেলী যুগে আরবদের মধ্যে পারস্পরিক গৌরবও মুকাবিলার আবেগ ছিল প্রচণ্ড এবং তারা প্রত্যেক ধরনের গুণের প্রশ্নে পরস্পর মুকাবিলা করতেন। বনু তামিমের মস্তিষ্কেও খান্দানী ফখর এবং গৌরবের নেশা পূর্ণ ছিল। তাঁরা নবীর (সা) আবাসস্থলে গিয়ে বেতমিজের মত উচ্চৈস্বরে চেঁচাতে লাগলো। "মুহাম্মাদ (সা) বাইরে এসো। আমাদের কথা শোনো।" তাদের এই আচরণ রাসূলের (সা) নিকট অসহ্য মনে হলেও তিনি ছিলেন ক্ষমার আধার। তিনি বাইরে এসে হাসি খুশীর সঙ্গে তাদের সাথে সাক্ষাত করলেন। প্রতিনিধি দলের নেতা আকরা' (রা) বিন হাবিস বললেন ঃ "আমরা আপনার সাথে পরস্পর গৌরব বা গর্বের কথা ব্যক্ত করতে চাই। তারপর হবে ইসলামের কথা।" প্রিয়নবী (সা) বললেন, আমি আত্মগৌরব প্রচার এবং কবিতা ও কাব্য ফলানোর জন্য প্রেরিত হয়নি। কিন্তু তোমরা যদি তাই চাও তাহলে আল্লাহর ফজিলতে আমরা সে ব্যাপারেও পিছিয়ে নেই।" বনু তামিমে আতারদ বিন হাজিব নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তার ভাষা ছিল সুন্দর এবং তিনি বাকপটুও ছিলেন। একবার সে নওশিরওয়ার দরবারে শক্তিশালী বক্তৃতা দিয়ে কিংখাবের খিলায়াত লাভ করেন। সর্বপ্রথম সেই দাঁড়ালো এবং এই বক্তৃতার মাধ্যমে আত্মগৌরব প্রচার শুরু করলো ঃ

"প্রশংসা সেই খোদার যিনি নিজের ফজল ও করমের মাধ্যমে আমাদেরকে সিংহাসনের মালিক বানিয়েছেন। প্রাচ্যবাসীর মধ্যে আমাদেরকে সবচেয়ে বেশী সম্মানিত করেছেন। আমাদের ধনাগার সোনা রূপায় পূর্ণ। এই ধনাগার থেকে আমরা দরাজ হাতে ব্যয় করে থাকি। মানুষের মধ্যে আমরা অতুলনীয়। আমরা কি মানুষের সরদার এবং তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নই। অন্য কেউ যদি এই দাবী করে তাহলে সামনে আসুক এবং আমাদের কথা থেকে ভাল কথা এবং আমাদের অবস্থা থেকে ভাল অবস্থা পেশ করুক। আমার যা বলার ছিল তা বলে দিয়েছি।"

আন্তারদের বক্তৃতা শেষ করে বসে পড়লো। তখন প্রিয় নবী (সা) হযরত ছাবিতকে (রা) বললেন ঃ "ছাবিত ওঠো এবং তার জবাব দাও।"

হযরত ছাবিত (রা) রাসূলের (সা) নির্দেশ পালন করলেন এবং আন্তারদের জবাবে এই খুতবা দিলেন ঃ

"প্রশংসা সেই খোদার যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তার ওপর নিজের হুকুম জারী করেছেন। নিজের কুরসী ও নিজের ইলমকে ব্যাপকতা দিয়েছেন। তিনি হলেন কাদেরে মতলক। যা কিছু ঘটে তা তারই নির্দেশ ও কুদরতে হয়ে থাকে। তার কুদরতসমূহের মধ্যে একটি হলো এই যে, নিজের মাখলুক বা সৃষ্টির মধ্য থেকে একজন পয়গাম্বর প্রেরণ করেছেন। এই পয়গাম্বর সবচেয়ে বেশী শরীফ, সবচেয়ে বেশী সত্যবাদী এবং সবচেয়ে বেশী বুলন্দ আখলাকের মানুষ। অতপর সেই পয়গাম্বরের ওপর একখানি কিতাব নাযিল করেছেন এবং নিজের সৃষ্টিকে তার আমানতদার বানিয়েছেন এবং তাঁকে আল্লাহ তায়ালা সমগ্র বিশ্ব থেকে বাছাই করেছেন এবং সমগ্র বিশ্বের সার সংক্ষেপ বানিয়েছেন। অতপর তিনি লোকদেরকে হকের দিকে আহ্বান করেছেন। তখন তার কওম ও আত্মীয় স্বজনের মধ্য থেকে প্রথম মুহাজিররা তাঁর দাওয়াত কবুল করে। যারা নসবের দিক দিয়ে আফজাল। তাদের চেহারা সবচেয়ে বেশী আলোকিত এবং তাদের আমলসমূহ সবচেয়ে ভাল। অতপর তাদের পর সমগ্র আরবে আমরা আনসারের দল হক দাওয়াতের প্রতি ইতিবাচক সাড়া দিয়েছি। অতএব, আমাদের গৌরব শুধু এই যে, আমরা হলাম আল্লাহর আনসার ও রাসূলের উজির। এবং মানুষেরা যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনবে ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ না বলবে ততক্ষণ আমরা তাদের সঙ্গে লড়াই করবো এবং যে-ই আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে (সা) মানতে অস্বীকার করবে আমরা তার বিরুদ্ধে আল্লাহর পথে জিহাদ করবো এবং জিহাদ করা আমাদের জন্য কোন কঠিন কাজ নয়। ব্যস, আমার যা বলার ছিল তা বলেছি এবং আমি এখন সকল মু'মিন ও মু'মিনাতের জন্য আল্লাহর দরবারে মাগফিরাত কামনা করছি।"

তারপর কবিতা ও কাব্যের প্রতিযোগিতা হলো। এই প্রতিযোগিতায় বনু তামিমের পক্ষে যবরকান বিন বদর এবং প্রিয়নবীর (সা) পক্ষে হযরত হাসসান (রা) বিন ছাবিত অংশ নিয়েছিলেন। কাব্য প্রতিযোগিতা শেষ হলে আকরা (রা) বিন হাবিস যিনি স্বয়ং একজন বিরাট কবি ও শক্তিশালী বক্তা ছিলেন এবং যার সঠিক মতের প্রতি সমগ্র আরব শ্রদ্ধা পোষণ করতো এমনকি

পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত গোত্রসমূহ নিজেদের বিবাদে তাঁকে সালিশ মানতো—তিনি বলে উঠলেন ঃ

"পিতার কসম! মুহাম্মাদের (সা) খতিব আমাদের খতিব থেকে আফজাল এবং তাঁর কবি আমাদের কবির চেয়ে উত্তম।"

প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যবৃন্দ তাঁর সাথে ঐকমত্য পোষণ করলেন এবং সকলেই তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলেন।

সে বছরই বনু হানিফার একটি বড় প্রতিনিধি দল মুসায়লামা কাজ্জাবের নেতৃত্বে মদীনা এলো। প্রিয় নবী (সা) হযরত ছাবিত (রা) বিন কায়েসকে সঙ্গে নিয়ে সরাসরি প্রতিনিধি দলের নিকট তাশরিফ নিলেন। আলাপকালে মুসায়লামা বললো, "আপনি যদি আপনার পর আমাকে খলীফাত্বিত নিয়োগ করেন, তাহলে এখনই আপনার হাতে বাইয়াত করি।"

এই অযৌক্তিক শর্তের কথা শুনে হুজুর (সা) ক্রোধান্বিত হলেন। তাঁর পবিত্র হাতে একটি লাঠি ছিল। তা উঠিয়ে বললেন ঃ

"খলীফাত্বিত তো অনেক বড় বস্তু। আমি তো তোমাকে এই লাঠি প্রদানও পসন্দ করি না। আল্লাহ তোমার জন্য যা ঠিক করে রেখেছেন তাই হবে। তোমার পরিণতি আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। অন্য কিছু জিজ্ঞেস করার থাকলে এই ছাবিত এখানে উপস্থিত রয়েছে। তাকে জিজ্ঞেস কর। আমি এখন চলে যাচ্ছি।"

একথা বলে তিনি হযরত ছাবিতকে (রা) মুসায়লামার সঙ্গে আলোচনার জন্য সেখানে রেখে স্বয়ং চলে গেলেন।

বিশ্ব নবীর (সা) ওফাতের পর আনসাররা সকিফায়ে বনি সায়েদাতে একত্রিত হয়ে হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাকে খলিফা বানানোর ইচ্ছা প্রকাশ করলো। একথা প্রকাশ হয়ে পড়লে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং ওমর ফারুক (রা) অন্য কতিপয় মুহাজিরকে সাথে নিয়ে আনসারদের সমাবেশে উপস্থিত হলেন। উভয় পক্ষ থেকে স্ব স্ব দিকে শক্তিশালী বক্তৃতা দেয়া হলো। এ সময় হযরত ছাবিত (রা) বিন কায়েসও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আনসারদের খিলাফতের পক্ষে এক তেজস্বী ভাষণ দিলেন। তাতে আনসারদের খিদমত ও কুরবানীসমূহের উল্লেখ করলেন এবং বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন যে, কতিপয় ব্যক্তি আনসারদেরকে খিলাফত থেকে বঞ্চিত করতে চায়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) আনসারদের খিদমতের স্বীকৃতি দিলেন। সেই সাথে তিনি শক্তিশালী যুক্তির সাথে কুরাইশদেরকে

খিলাফতের হকদার প্রমাণ করলেন। যখন সাধারণ মুসলমানরা তাঁকে খলিফা নির্বাচন করলো তখন হযরত ছাবিত (রা) বিন কায়েসও তাঁর হাতে বাইয়াত করা থেকে পিছিয়ে রইলেন না এবং মনে প্রাণে সিদ্দীকে আকবরের (রা) সমর্থক ও সহযোগিদের দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। সেই যুগেই ধর্মদ্রোহিতার ফিতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। হযরত ছাবিত (রা) তা নির্মূল করার জন্য জীবন বাজী রাখলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) যখন মশহুর মুরতাদ তোলায়হা আসাদীকে উৎখাতের জন্য মদীনা থেকে সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করলেন তখন হযরত ছাবিত (রা) তাতে শামিল হয়ে গেলেন। এই সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি ছিলেন হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ এবং আনসার সৈন্যদের নেতৃত্ব ছিল হযরত ছাবিতের (রা) হাতে। মুসলমানরা মুরতাদদেরকে ভয়ানকভাবে পরাজিত করলো এবং তোলায়হা নিজের কতিপয় সঙ্গী সমভিব্যাহারে সিরিয়ার দিকে পালিয়ে গেল [আল্লাহর কুদরত এই তোলায়হাই পরে ইসলামের এক বিরাট মুজাহিদ হয়েছিলেন। হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে তিনি দ্বিতীয়বার নিষ্ঠাপূর্ণ অন্তরে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হজ্জের জন্য মদীনা আগমন করেন। সেখানেই হযরত ওমরের (রা) হাতে বাইয়াত করেন। সে সময় আমীরুল মু'মিনীন ধর্মদ্রোহিতায় যোগদানের জন্য তাঁকে গালি দেন। তিনি আরজ করেন, "আমিরুল মু'মিনীন। এটাও কুফরী ফিতনাসমূহের অন্যতম ফিতনা ছিল। ইসলাম এ ফিতনাকে চিরদিনের জন্য খতম করে দিয়েছে।" তোলায়হা অন্যতম আরব বাহাদুর হিসেবে পরিগণিত হতেন এবং তাকে এক হাজার সওয়ারের সমান মনে করা হতো। সিরিয়ার যুদ্ধে তিনি জীবন উৎসর্গের এবং জীবন বাজী রাখার বিস্ময়কর কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।]

দ্বাদশ হিজরীতে মুসায়লামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামার রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত ছাবিত (রা) এই যুদ্ধেও অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করেন। একবার যখন মুসলমানদের ব্যূহে ফাটল ধরলো এবং তারা পিছু হটে গেল তখন হযরত ছাবিত (রা) অস্থির হয়ে পড়লেন এবং অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বললেন যে, আমরা রাসূলের যুগে এভাবে লড়াই করতাম না। অতপর তিনি হুনুতের আতর লাগালেন এবং একটি গর্তে পা ঢুকিয়ে দুশমনের মুকাবিলায় মজবুতভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন। যে মুরতাদ তাঁর দিকে আসতো তাকে তিনি তরবারী দিয়ে লাশ বানিয়ে ছাড়তেন। অবশেষে দুশমনরা সম্মিলিতভাবে রাসূলের (সা) খতিবের ওপর তরবারী ও বর্শার মেঘ বর্ষণ করলো। আর এমনিভাবে তিনি শাহাদাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হলেন।

হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ছাবিতের (রা) দেহের ওপর অত্যন্ত সুন্দর যিরাহ ছিল তাঁর শাহাদাতের পর জনৈক মুসলমান তা খুলে নিয়েছিল। অন্য আরেকজন মুসলমান স্বপ্নে দেখলেন যে, হযরত ছাবিত (রা) তাঁকে বলছেন ঃ অমুক মুসলমান ভাই আমার যিরাহ খুলে নিয়েছেন। আপনি খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদকে বলবেন তিনি যেন যিরাহটি তার নিকট থেকে ফেরত নেন। আমি এতো ঋণী। রাসূলের (সা) খলিফা এই যিরাহ বিক্রয় করে যেন আমার ঋণ আদায় এবং আমার অমুক গোলাম যেন আজাদ করে দেন। বস্তুত হযরত খালিদ (রা) এই যিরাহ ফিরিয়ে নিলেন এবং মদীনা পৌঁছে সমগ্র ঘটনা হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) নিকট বর্ণনা করলেন। তিনি হযরত ছাবিতের (রা) ওসিয়ত অনুযায়ী তাঁর ঋণ আদায় এবং গোলামও স্বাধীন করে দিলেন।

হযরত ছাবিত (রা) শাহাদাতকালে চার পুত্র ও এক কন্যা রেখে যান। তাঁর থেকে কতিপয় হাদিসও বর্ণিত আছে। এসব হাদিস তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ এবং কন্যা ছাড়া হযরত আনাস (রা) বিন মালিক ও আবদুর রহমান বিন আবি লায়লা (রা) বর্ণনা করেছেন।

হযরত ছাবিত (রা) বিন কায়েস জালিলুল কদর সাহাবী হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকেন। তাঁর চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে ছিল রাসূলের (সা) প্রতি সম্মান প্রদর্শন, আল্লাহভীতি ও জিহাদে উৎসাহ। তাঁর রাসূলের (সা) প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং খোদাভীতির একটি ঘটনা ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লামা হাকিম (র) ও ইমাম জাহাবী (র) তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ বিন ছাবিত (রা) থেকে এবং আল্লামা তিবরানী (র) তাঁর কন্যার নিকট থেকে এ ধরনের আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, সূরায়ে লুকমানের এই আয়াত যখন নাযিল হলো ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ - وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ -

"অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা কোন অহংকারীকে পসন্দ করেন না।" তখন হযরত ছাবিত (রা) আল্লাহর ভয়ে কেঁপে উঠলেন এবং ঘরে বসেই ক্রন্দন শুরু করে দিলেন। প্রিয় নবী (সা) একজন মানুষ পাঠিয়ে তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন ঃ "কি ব্যাপার?" তিনি আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমি সৌন্দর্য এবং নিজের প্রশংসা পসন্দ করে থাকি।

আমার ভয় হলো যে, এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে আমি ধ্বংস না হয়ে যাই।"

তিনি বললেন, "হে ছাবিত! তুমি কি একথায় রাজী নও যে, তুমি এমন সুন্দরভাবে জীবন অতিবাহিত করবে যে, তোমাকে প্রশংসা করা হবে এবং শাহাদাতের মৃত্যু লাভ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে?"

আরজ করলেন : "হে আল্লাহর রাসূল! একথাতো আমি খুবই পসন্দ করি।"

হুজুর (সা) হযরত ছাবিতকে (রা) খুবই ভালবাসতেন এবং তিনি তাঁকে খুবই স্নেহ করতেন। আবি ওয়ায়েদ (র) কিতাবুল আমওয়ালে লিখেছেন যে, বনি কুরায়জার যুদ্ধে, যেসব ইহুদী গ্রেফতার হয়েছিল তাদের মধ্যে হুজুর (সা) দু'জনের মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করেছিলেন। এই দু'জনের একজন ছিল যিবির বিন বাতা। হুজুর (সা) তাকে অনুরাগ হযরত ছাবিত (রা) বিন কায়েসের খাতিরে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কেননা, জাহেলী যুগে সে বুয়াছের যুদ্ধে হযরত ছাবিতকে(রা) আশ্রয় দিয়েছিল। তিনি যিবিরের ইহসানের বদলা আদায়ের জন্য তাকে হযরত ছাবিতের (রা) নিকট সোপর্দ করে দিয়েছিলেন।

হযরত ইবনে হাজার (র) তাহজিবুত তাহজিবে বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত ছাবিত (রা) অসুস্থ এবং চলাফেরায় অক্ষম হয়ে পড়লেন। প্রিয় নবী (সা) এই খবর পেয়ে তাঁর শুশ্রূষার জন্য তাশরীফ নিলেন এবং তাঁর আরোগ্য কামনা করে দোয়া করলেন।

হযরত উমায়ের (রা) বিন সায়াদ

জালাস বিন সুয়ায়েদ মদীনার শরীফদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। তিনি যখন সায়াদ বিন উবায়েদ আওসীর বিধবা পত্নীকে নিকাহ করলেন তখন তিনি মরহুম স্বামীর এক ছোট বাচ্চাও নিজের সঙ্গে আনলেন। এই শিশুর নামই ছিল উমায়ের। লোকজন তাকে জালাস কারবিব বলে ডাকতো। কিন্তু তিনি এত ভালবাসা ও স্নেহের সঙ্গে তাকে লালন পালন করেন যে আপন পিতাও এ ধরনের করতে পারতো না। এই নিষ্পাপ শিশুরও জালাসের প্রতি এমন মমতা ও ভালবাসা হয়ে গিয়েছিল যে, সবসময় আঙ্গুল ধরে তাঁর সঙ্গে চলাফেরা করতো। লোকজন ভুলেই গিয়েছিল যে উমায়ের হলো জালাস কারবিবের পালিত পুত্র। তারা তাকে তার প্রকৃত পুত্রই মনে করতো। উমায়েরের শৈশবকালেই বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা) মক্কা থেকে হিজরাত করে মদীনা মুনাওয়ারাতে শুভাগমন করেন। মদীনাবাসীর একটি বিরাট সংখ্যক মানুষ নবীর (সা) হিজরতের পূর্বেই ইসলামের নিয়ামতে অবগাহিত হয়েছিলেন। তারপর অবশিষ্টরাও আস্তে আস্তে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলেন। জালাসও একদিন শিশু উমায়েরের সাথে রহমতে আলমের (সা) খিদমতে হাজির হলেন এবং ইসলামের নিয়ামতে পরিপূর্ণ হয়ে গেলেন। চরিতকাররা জালাস (রা) ও উমায়েরের (রা) ইসলাম গ্রহণের কাল নির্দিষ্ট করেননি। কিন্তু এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, ইসলাম গ্রহণের সময় উমায়ের শিশু ছিল। তিনি আওসের আমর বিন আওফ খান্দানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন এবং পিতা সায়াদ বিন ওবায়েদ (বিন নুমান বিন কায়েস বিন আমর বিন আওফ) তাঁর শৈশবকালেই মারা যান। ইসলাম গ্রহণের সময় যদিও উমায়ের প্রাপ্ত বয়স্ক হননি তবুও আল্লাহ পাক তাঁকে অত্যন্ত সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। প্রিয় নবীর (সা) দর্শন লাভের পর তাঁর অন্তরে হুজুরের (সা) প্রতি এতো ভালবাসা ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল যে, প্রতিদিন তাঁকে না দেখলে থাকতে পারতেন না। হুজুরও (সা) তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। দিন অতিবাহিত হতে লাগলো আর রাসূলের (সা) প্রতি উমায়েরের (রা) বিশ্বাস, মুহাব্বাত ও আনুগত্য বৃদ্ধিই পেতে লাগলো।

এমনিতেই আরবে বৃষ্টি কম হয়ে থাকে। কিন্তু নবম হিজরীতে প্রচণ্ড খরা হলো এবং সমগ্র দেশে দুর্ভিক্ষ পড়ে গেল। বাগানের শহর ছিল মদীনা। কিন্তু দুর্ভিক্ষ ও গরমের প্রচণ্ডতায় মদীনাবাসীও আশ্রয় প্রার্থনা করছিল। তাদের

আশা-ভরসার একমাত্র স্থল ছিল খেজুরের বাগান। বাগানের খেজুর বৃক্ষে তখন কাঁধি কাঁধি খেজুর এসেছে এবং তা পারার সময় সম্পূর্ণ সন্নিকটবর্তী ছিল। ঠিক এমনি সময় একদিন মদীনাবাসী এই খবর শুনে চমকে উঠলো যে, রোমকদের এক বিরাট বাহিনী আরবের ওপর হামলার জন্য এগিয়ে আসছে। বিশ্ব নবী (সা) পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিলেন। তিনি মু'মিনদেরকে জিহাদের প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন এবং বললেন যে, আমরা অগ্রসর হয়ে সীমান্তে দুশমনের মুকাবিলা করবো।

মুসলমানদের জন্য এটা ছিল কঠিন পরীক্ষার সময়। খেজুরের তৈরী ফসল, ভয়াবহ গরম, উত্তপ্ত মরুভূমির সুদীর্ঘ সফরের কষ্ট, খাদ্য, পানি এবং সওয়ারীর কমতি; সবই তাদের দৃষ্টিতে ছিল। কিন্তু তারা তো নিজের জীবন, ধন-সম্পদ ও সন্তান সকল কিছুই আল্লাহর রাস্তায় বিক্রয় করেছিলেন। তাঁরা সারওয়ারে আলমের (সা) নির্দেশকে কোন যুক্তি তর্ক ও টাল-বাহানা ছাড়াই মেনে নিলেন এবং আপাদমস্তক জিহাদের প্রস্তুতিতে মশগুল হয়ে পড়লেন। এটা ছিল তাবুকের অথবা জায়শুল উসরার ভূমিকা। এ সময় ত্যাগ, কুরবানী ও নিষ্ঠার এক বিস্ময়কর দৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়েছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক(রা) নিজের সকল ধন-সম্পদ হুজুরের (সা) পায়ের ওপর এনে রেখেছিলেন এবং হুজুর (সা) যখন জিজ্ঞেস করলেন যে, "আবু বকর! তুমি নিজের সন্তান-সন্ততির জন্য কি রেখে এসেছ?" এই প্রশ্নের জবাবে তিনি আরজ করলেন যে, "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল।" হযরত উমর (রা) নিজের অর্ধেক সম্পদ নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। হযরত উসমান গনি (রা) হাওদা সমেত তিনশ' উট, একশ' ঘোড়া এবং এক হাজার দিনার হক পথে পেশ করলেন। হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ দুশ' আওকিয়া রূপা নিয়ে এসেছিলেন। হযরত তালহা (রা) বিন উবায়েদুল্লাহ মাল-দওলতের এক বোঝা সমেত হাজির হয়েছিলেন। আছেম (রা) বিন সত্তর ওয়াসাক খেজুর পেশ করেছিলেন। মহিলারা নিজেদের অলংকার খুলে আল্লাহর পথে দান করেছিলেন। মোট কথা, প্রত্যেকেই নিজের সামর্থ অনুযায়ী বরং সামর্থের চেয়ে বেশী কুরবানীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন। একদিকে মু'মিনরা এমনিভাবে ইতিহাসের পাতায় নিজেদের ইসলাম প্রেম ও ত্যাগের নজীরবিহীন উদাহরণ পেশ করছিলেন। অন্যদিকে মুনাফিকরা পাপের সামান হাজির করছিলো। তারা ঈমানদারদের অন্তর খারাপ করার কোন চেষ্টাই ছেড়ে দেয়নি। তারা কখনো বলতো, "খেজুরের ফসল সম্পূর্ণ তৈরী। তোমাদের অনুপস্থিতিতে এসব বরবাদ হয়ে যাবে এবং তোমাদেরকে কোথায়ও পাওয়া যাবে না।" কখনো বলতো, "এই ভয়াবহ গরমে তোমরা ঝলসে যাবে এবং

জীবিত ফিরে আসবে না।" কখনো রোমকদের ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতির কথা বর্ণনা করে তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার চেষ্টা করতো। তারা অধিকাংশ সময় সুইলেম নামক এক ইহুদীর বাড়ী একত্রিত হতো এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা তৈরী করতো। সেই সময়ই একদিন আল্লাহ জানেন জালাস বিন সুয়াইদের যেন কি হয়ে গেল। তিনি মুনাফিকদের ধোঁকায় পড়ে গেলেন অথবা খেজুরের অত্যন্ত উত্তম তৈরী ফসল তাঁর বোধ শক্তি খতম করে দিল। তিনি ছিলেন একজন ভাল মুসলমান। কয়েকটি যুদ্ধেও তাঁর অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে এক মজলিশে তাঁর মুখ দিয়ে এই বাক্য বের হয়ে গেল ঃ

"মুহাম্মাদ (সা) যদি নিজের দাবীতে সঠিক হন তাহলে আমরা গাধা থেকেও নিকৃষ্টতর।"

সেই মজলিশে উমায়ের (রা) বিন সায়াদও উপস্থিত ছিলেন। তিনি যদিও যুবক ছিলেন তবুও তার ললাটে সৌভাগ্য সূর্যের আলো ঝলমল করছিলো এবং অন্তরে ছিল রহমতে আলমের (সা) প্রতি ভালবাসার সামুদ্রিক গভীরতা। প্রিয় নবী (সা) সম্পর্কে জালাসের মুখ দিয়ে ওপরে বর্ণিত বাক শুনে তাঁর রক্ত টগবগ করে উঠলো। তিনি কর্কশ কণ্ঠে বললেন ঃ

"মুহাম্মাদ (সা) অবশ্যই নিজের দাবীতে সঠিক এবং তুমি অবশ্যই গাধার চেয়েও নিকৃষ্টতম।"

জালাস উমায়েরের (রা) কথা শুনে নীরব হয়ে গেলেন, এই ছেলে যে কখনো তার সামনে চোখ তুলে তাকায়নি আজ তার মুখের ওপর কথা বলে দিল। খুব রেগে গেলো এবং বললো ঃ "আমি কি তোমাকে এ জন্য পেলে-পুষে বড় করেছি। আমি আর তোমার জামিন নই। অন্য কোন স্থান তালাশ করে নাও।"

সতালো পিতার গঞ্জনা শুনে উমায়ের (রা) সোজা রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে পৌঁছলেন এবং সমগ্র ঘটনা কম-বেশী বর্ণনা করে দিলেন। হুজুর(সা) জালাসের সাহসে বিস্ময় প্রকাশ করলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাকে ডেকে পাঠালেন। সে হাজির হলে হুজুর (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"জালাস, তুমি কি অমুক মজলিশে একথা বলেছ।"

একথা স্বীকার করতে জালাসের সাহস হলো না। পরিষ্কার অস্বীকার করে বসলো। সে সময় রাসূলের (সা) মুখ দিয়ে এই আয়াত উচ্চারিত হলো ঃ

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ۚ وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۚ وَمَا نَقَمُوْا اِلَّا اَنْ اَغْنٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ

"এই লোকেরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলে যে, তারা সেই কথা বলেনি, অথচ তারা নিশ্চয়ই সেই কাফেরী কথা বলেছে। তারা ইসলাম গ্রহণের পর কুফুরী অবলম্বন করেছে, আর তারা সেসব কাজ করার ইচ্ছা করেছিল যা তারা করতে পারেনি। তাদের এসব ক্রোধ কেবল এ কারণেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল ও ধনশালী করে দিয়েছেন। এখন যদি তারা নিজেদের এই আচরণ থেকে ফিরে আসে, তবে তাদের পক্ষেই ভাল।" (আত তাওবা ঃ ৭৪)

হুজুর (সা) আল্লাহর কালাম পাঠ করে যাচ্ছিলেন আর জালাসের চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছিল। যখন তিনি খাইরাল লাহুম পর্যন্ত পৌছলেন তখন জালাস চীৎকার দিয়ে উঠলেন। অবলীলাক্রমে রহমতে আলমের (সা) পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়লেন এবং আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমি ভুল করেছি। ক্ষমা চাই। আমি ভুল করে ফেলেছি। এখন তওবা করছি। আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষমা করে দিন।"

বিশ্ব নবী (সা) ক্ষমাশীলও ছিলেন। জালাসের ওপর তাঁর রহম এসে গেল। তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন। অতপর তিনি প্রকৃতপক্ষেই মুসলমান হয়ে গেলেন এবং নিজের কোন কথা বা কাজে কখনো অভিযোগের সুযোগ দেননি। তাওবা কবুল হওয়ার আনন্দে তিনি উমায়েরকে (রা) পুনরায় নিজের জামানতে নিয়ে নিলেন এবং আজীবন তাঁকে নিজের থেকে পৃথক করেননি।

জালাসের (রা) অপরাধ বা গুনাহর স্বীকৃতি এবং তাওবা কবুলের সময় হযরত উমায়ের (রা) উপস্থিত ছিলেন। হুজুর (সা) স্নেহপূর্ণ স্বরে তার কান ধরে মুচকি হেসে বললেন ঃ "এই ছেলে, তোমার কান ঠিক শুনেছিল।"

রাসূলের (সা) যুগে হযরত উমায়ের (রা) যদিও কম বয়সী ছিলেন। তবুও, তাঁর প্রতি ছিল গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। নবীর (সা) দরবারে নিয়মিত উপস্থিতি তাঁকে ফজিলতের আধার ও পূর্ণ বানিয়েছিল এবং তিনি হয়েছিলেন ইসলামী চরিত্রের এক বাস্তব উদাহরণ। তাঁর ঈমানী আবেগ এতো প্রচণ্ড ছিল

যে, অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও জায়তুল উসরাহ'র যুদ্ধে তিনি উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নিয়েছিলেন এবং সফরকালীন সকল মুসিবত হাসি মুখে বরণ করেছিলেন। রাসূলে আকরামের (সা) ওফাতের পর তিনি এতো দুঃখ পেয়েছিলেন যে, কোথায়ও আসা-যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং সব সময় ইবাদাতে ব্যাপৃত থাকতেন। প্রকৃতিতে আল্লাহভীতি ও পরকালভীতি প্রাধান্য বিস্তার করে থাকতো। তিনি অত্যন্ত সাধনার জীবন যাপন করতেন। তবে, শুধুমাত্র সাধনাতেই ডুবে থাকতেন না বরং মানুষের সুখ-দুঃখেও সবসময় অংশ নিতেন। আল্লাহ পাক মেধা শক্তি দান করেছিলেন। জটিল জটিল মাসয়ালা বা সমস্যা মুহূর্তের মধ্যে সমাধান করে দিতেন। আল্লাহর পথে জিহাদেও সীমাহীন উৎসাহ ছিল। হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন এবং তাঁর চরিত্র ও গুণাবলীর খুব প্রশংসা করতেন। নিজের খিলাফতকালে তিনি সবসময় এমন মানুষের সন্ধানে থাকতেন যারা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব কিতাব ও সুন্নাত অনুযায়ী আঞ্জাম দিতে পারেন। তাঁর মাপকাঠিতে হযরত উমায়ের (রা) সবদিক থেকেই উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। বস্তুত তিনি উমায়েরকে (রা) ডেকে পাঠালেন এবং মুজাহিদদের এক বাহিনীর অফিসার বানিয়ে সিরিয়া প্রেরণ করলেন। সেখানে তিনি রোমকদের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করেন। কিছুদিন পর তিনি ফিরে এলেন। এ সময় হযরত ওমর (রা) তাঁকে সামরিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে হেমসের আমীর নিয়োগ করেন।

হেমসের আমীরের পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর হযরত উমায়ের (রা) সেখানকার সরকারী কাজ-কর্ম এতো সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিলেন যে, ফারুকে আজমের (রা) দৃষ্টিতে তাঁর মর্যাদা কয়েকগুণ বেড়ে গেল। তিনি উমায়েরের (রা) যোগ্যতায় বিস্ময় প্রকাশ করতেন এবং তাঁকে "উপমাহীন" উপাধিতে স্মরণ করতেন। তিনি বলতেন; উমায়েরের (রা) মত যোগ্যতা সম্পন্ন কয়েকজন মানুষ যদি আমি পেতাম তাহলে আমার খিলাফতের বোঝা হালকা হয়ে যেতো।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) বলতেন যে, উমায়ের (রা) বিন সায়াদের চেয়ে বেশী ভাল এবং যোগ্য মানুষ সিরিয়ায় আর ছিল না।

তাবকাতে ইবনে সায়াদের রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত উমায়ের (রা) বছরের পর বছর ধরে হেমসের আমীর ছিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) যখন শাহাদাতপ্রাপ্ত হলেন তখন তিনি সেই পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন এবং একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে হেমসের বাসিন্দা হয়ে গেলেন এবং

সেখানেই আমীর মুয়াবিয়ার (রা) শাসনামলে ওফাত পান। কিন্তু আল্লামা ইবনে আছির এবং অন্য কতিপয় ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হযরত ওমর ফারুকের (রা) জীবদ্দশাতেই হেমসের ইমারত পরিত্যাগ করেছিলেন এবং মদীনা মুনাওয়ারা থেকে কয়েক মাইল দূরে নিজের পরিবার পরিজনসহ এক গ্রামে বসবাস শুরু করেন। তিনি সেখানেই হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে মৃত্যুবরণ করেন এবং মদীনার কবরস্তান "বাকী' গারকাদে" তাঁর লাশ দাফন করা হয়। তাঁর ইন্তেকালের খবর শুনে হযরত ওমর (রা) খুব দুঃখ পেলেন এবং তিনি পায়ে হেঁটে "বাকী' গারকাদ" গোরস্তানে তাশরীফ নিলেন এবং হযরত উমায়েরের (রা) কবরের নিকট দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতে থাকলেন।

যেসব চরিতকার পরে উল্লেখিত বর্ণনার প্রবক্তা তাদের মতে হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত উমায়েরকে (রা) যাকাত আদায়ের অফিসার হিসাবে নিয়োগ করে হেমস প্রেরণ করেছিলেন। হেমস পৌছার পর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলো। কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে যাকাতের কোন অর্থও পাওয়া গেল না। এমনকি তাঁর কোন খবরও পাওয়া গেল না। তাতে হযরত ওমর (রা) খুব অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি নিজের আমীর এবং সরকারী কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের ওপর কড়া দৃষ্টি রাখতেন এবং তিনি চাইতেন যে, তারা যেন তাকে নিয়মমত পত্র প্রেরণ করেন। হযরত উমায়েরের (রা) দীর্ঘ নীরবতা তাঁর জন্য ছিল অসহ্য। সুতরাং তিনি উমায়েরকে (রা) একটি কঠিন পত্র লিখলেন। তাতে তিনি যত অর্থ আদায় হয়েছে তা সহ মদীনায় চলে আসার নির্দেশ দিলেন।

হযরত উমায়ের (রা) ফারুকে আজমের (রা) পত্র পেয়ে পাথেয়'র থলি কাঁধে এবং হাতে লাঠি নিয়ে পদব্রজেই মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলেন। কয়েকদিনের ক্লেশপূর্ণ সফর শেষে যখন তিনি মদীনা মুনাওয়ারা পৌছলেন তখন চুল ছিল আলুথালু, চেহারা ছিল বিমর্ষ এবং ধূলাবালিতে দেহ হয়ে গিয়েছিল ধূসরিত। খলিফার দরবারে পৌছলেন। হযরত ওমর (রা) তাঁকে এই অবস্থায় দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"উমায়ের (রা)! আমি তোমাকে একি অবস্থায় দেখছি?" উমায়ের (রা) "আমিরুল মু'মিনীন! আল্লাহর ফজলে আমি ভাল আছি। হাঁ, আমার সঙ্গে রয়েছে পার্থিব জগৎ। যার বোঝায় আমি দেবে যাচ্ছি।"

হযরত ওমর (রা) "তোমার নিকট কি ধরনের পার্থিব জগৎ রয়েছে?"

উমায়ের (রা) "আমিরুল মু'মিনীন! এই আমার থলি। এর মধ্যে আমি আমার পাথেয় রেখে রওয়ানা দিয়েছিলাম। এটা একটা পাত্র। এতে খাবার খাই অথবা তাতে পানি ভরে নিজের কাপড় ও মাথা ধৌত করি—এটা হলো আমার মশক। তাতে খাবার এবং ওজুর পানি রেখে থাকি। এ হলো আমার লাঠি। যা দিয়ে পথের কাঁটা ও দুশমনের মুকাবিলা করে থাকি। মোটকথা, এগুলোর নামইতো দুনিয়া বা পার্থিব জগৎ।"

হযরত ওমর (রা) একথা শুনে আল্লাহু আকবার বলে উঠলেন। অতপর জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"তুমি কি সকল পথ পদব্রজে সফর করেছ?"

উমায়ের (রা) ঃ "জ্বী, হাঁ।"

হযরত ওমর (রা) ঃ "কেন, সেখানে কি এমন কেউ ছিল না যে তোমার জন্য সওয়ারীর ব্যবস্থা করে দিত?"

উমায়ের (রা) ঃ "আমি কারোর নিকট দাবীও করিনি এবং কেউ সওয়ারীর ব্যবস্থাও করেনি।"

হযরত ওমর (রা) ঃ "তারা কত খারাপ মানুষ, যারা নিজেদের আমীরের তাকলিফের কথা অনুভব করেনি।"

উমায়ের (রা) ঃ "আমিরুল মু'মিনীন! এ ধরনের বলবেন না। তারা মুসলমান এবং আমি তাদের বেশী বেশী নামায পড়তে দেখেছি।"

হযরত ওমর (রা) ঃ "তুমি জানো, আমি তোমাকে কোথায় প্রেরণ করেছিলাম এবং কি ধরনের কাজ তোমার ওপর ন্যস্ত করেছিলাম।"

উমায়ের (রা) ঃ "আমিরুল মু'মিনীন! আপনি আমাকে যেখানে পাঠিয়ে ছিলেন সেখানকার আল্লাহভীতু ও আমানতদার লোকদেরকে একত্রিত করেছিলাম এবং তাদেরকে রাজস্ব আদায়ের জিম্মাদার বানিয়েছিলাম যা কিছু তারা আদায় করে এনেছিল তা তাদের প্রয়োজনে ব্যয় করে দিয়েছিল। যদি কিছু বাঁচতো তাহলে খিলাফতের দরবারেও অবশ্যই প্রেরণ করতো।"

হযরত ওমর (রা) ঃ তাঁর জবাব শুনে খুব খুশী হলেন এবং বললেন, "তোমার প্রতি আমার এই আশাই ছিল। এখন তুমি তোমার পদে ফিরে যাও।"

উমায়ের (রা) ঃ "আমিরুল মু'মিনীন! এখন আমাকে এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিন। এই বোঝা বহনের হিম্মত আমার নেই। সবসময়ই ভয়ে ভীত থাকি যে কোন কথায় আবার পরকালে ধরা পড়বো। একদিন ইমারাতের

তোড়ে এক খৃষ্টানকে বলে বসেছি যে, আল্লাহ তোকে অপমানিত করুক। সেই সময় থেকে মনটা খুব খারাপ হয়ে আছে। আমি আর ইমারতের দায়িত্ব কবুল করবো না।"

হযরত ওমর (রা) তাঁকে নিয়মমত তার কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য খুব চাপ দিলেন। কিন্তু তিনি তা মানলেন না এবং নিজের পরিবার-পরিজনসহ মদীনার কয়েক মাইল দূরে একটি গ্রামের বাসিন্দা হয়ে গেলেন।

কিছুদিন পর হযরত ওমর (রা) এক ব্যক্তিকে একশ' দিনার দিয়ে উমায়েরের (রা) গ্রামে পাঠালেন এবং বলে দিলেন যে, উমায়েরকে (রা) যদি নির্ভাবনা ও সচ্ছলতার সঙ্গে বসবাস করতে দেখ তাহলে চুপচাপ ফিরে আসবে। আর যদি অসচ্ছল অবস্থায় দেখো, তাহলে এই দিনার তাঁকে দেবে। সেই ব্যক্তি হযরত উমায়েরের (রা) আবাসস্থলে পৌঁছে দেখতে পেলো যে, তিনি একটি দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে নিজের কুরতার উকুন পরিষ্কার করছেন। সেই ব্যক্তিকে দেখে তিনি অহলান ও সাহলান বললেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কোথা থেকে তাশরীফ আনছেন।" জবাবে তিনি জানালেন, "মদীনা থেকে।" জিজ্ঞেস করলেন, "আমিরুল মু'মিনীন কেমন আছেন?" বললেন, "ভাল আছেন। আল্লাহ তায়ালার আইন-কানুন জারী করছেন।"

একথা শুনে উমায়ের (রা) নিজের হাত দোয়ার জন্য উঠালেন এবং বললেন, "হে আল্লাহ! ওমরকে সাহায্য কর। তিনি নিজের জীবন তোমার পথে ওয়াক্‌ফ করে রেখেছেন।"

দূত তিনদিন পর্যন্ত উমায়েরের (রা) বাড়ীতে অবস্থান করলেন। এ সময় তিনি দেখতে পেলেন যে, সারা দিনে বড় কষ্টে উমায়ের (রা) একটি রুটি পেয়ে থাকেন। তা তিনি মেহমানের সামনে তুলে দেন এবং নিজে অভুক্ত থাকেন। তিনদিন পর তিনি একশ' দিনার উমায়েরের (রা) সামনে রেখে দিলেন এবং বললেন, "আমিরুল মু'মিনীন এই দিনার আপনার জন্য প্রেরণ করেছেন।" উমায়ের (রা) দিনার উঠিয়ে নিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "আল্লাহর কসম! আমার এই দিনারের প্রয়োজন নেই" এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি সকল অর্থ অভাবগ্রস্ত ও এতিমদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

দূত মদীনা ফিরে হযরত ওমরকে (রা) এই ঘটনা শুনালেন। তখন তাঁর চোখ বুঁজে এলো। সেই সময়ই তিনি উমায়েরকে (রা) ডেকে পাঠালেন। তিনি যখন উপস্থিত হলেন তখন তাঁর সামনে অনেক খাদ্যদ্রব্য ও কাপড় রেখে দিলেন এবং বললেন, এসব নিয়ে যাও। উমায়ের (রা) আরজ করলেন ঃ

"আমিরুল মু'মিনীন! খাদ্যদ্রব্য আমার প্রয়োজন নেই। কেননা যখন আমি বাড়ী থেকে বের হই তখন আমার ঘরে দুই সা' যব মওজুদ ছিল। অবশ্য আমি কাপড় নিচ্ছি। কাপড় আমার স্ত্রীর প্রয়োজন রয়েছে। বেশ কিছুদিন যাবত শরীর ঢাকার জন্য পূর্ণ পোশাক সে পায়নি।"

এই ঘটনার কিছুদিন পরই উমায়ের (রা) বিন সায়াদ পরপারে যাত্রা করেন। তাঁর সন্তানের মধ্যে দু'জনের নাম চরিতগ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। তারা হলো আবদুর রহমান ও মুহাম্মাদ। হযরত উমায়ের মহান সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। তাঁর আল্লাহভীতি উদাহরণ হয়ে রয়েছে এবং হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁকে খুব সম্মান করতেন। তিনি কতিপয় হাদিসও বর্ণনা করেছেন।

হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়া জুমরী

চরিত্র ও চাল-চলনের দিক থেকে রাসূলের (সা) সাহাবীবৃন্দ এত উচু মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন যে, তাদের সত্যবাদিতা ও নিষ্ঠা, দিয়ানত এবং আমানত ও আল্লাহভীতির কসম খাওয়া যায়। আল্লাহ্ তায়ালা নিজের এসব পবিত্রতম বান্দাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বেহেশতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং তাদের দুশমনদেরকে নিজের দুশমন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সাইয়্যেদেনা হযরত আবু উমাইয়া আমর (রা) বিন উমাইয়াতাজ জুমরী এই সাহাবীদলের অন্যতম সম্মানিত সদস্য ছিলেন। মহামহিম আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে অসংখ্য গুণ দিয়ে অভিষিক্ত করেছিলেন। এসব গুণের মধ্যে রয়েছে বীরত্ব, সাহসিকতা দ্রুতগতি, মেধা ও বিচক্ষণতা। কাহিনী বর্ণনা এবং অজ্ঞতার ছদ্মাবরণে কিছু মানুষ হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়ার সেই অসাধারণ গুণাবলীকে সামনে রেখে "ওমর আইয়ার" নামক একজন আনুমানিক ব্যক্তিত্ব বানিয়ে নেয় এবং অসংখ্য তৈরী কাহিনী তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে দেয়। ফলে হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়ার আসল ব্যক্তিত্ব দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা যদিও হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়ার প্রসঙ্গে বেশী কিছু লিখেননি, তবুও বিশুদ্ধ বর্ণনাসমূহ থেকে যা কিছু পাওয়া যায় তা এটা প্রমাণে যথেষ্ট যে, হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়া প্রিয় নবীর (সা) একজন মুখলিস সাহাবী এবং হক পথে আত্মোৎসর্গকারী একজন মুজাহিদ ছিলেন। তাঁর প্রতি মহানবীর (সা) এত বেশী আস্থা ছিল যে, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত করেন। এমনকি তাঁকে একজন বিদেশী বাদশাহ'র (হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী) নিকট নিজের দূত হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। এমনি ধরনের একজন জালিলুল কদর সাহাবীর জীবনের ঘটনাবলীকে বিকৃত করে উপস্থাপন করাটা প্রচণ্ড ঔদ্ধত্য ও বেয়াদবী ছাড়া আর কি হতে পারে।

সাইয়্যেদেনা হযরত আবু উমাইয়া আমর বিন উমাইয়া বনু জুমরা গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তাঁর নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

আমর বিন উমাইয়া বিন খুয়ায়েলদ বিন আবদুল্লাহ বিন আয়াস বিন আবদ (অথবা উবায়েদ) বিন ফাশিরাহ বিন কায়াব বিন আদি বিন জুমরাহ।

বনু জুমরাহ একটি বড় গোত্র ছিল। বদরের উত্তর পাশে ছিল তাদের বসতি। অবশ্য তার একটি শাখা বনি আবদ বিন আদি মক্কায় হেরেমের

সীমানায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল। মশহুর কবিলা বনু গিফারও বনু জুমরারই একটি শাখা ছিল। ইবনে সায়্যাদ (র) ও সোহায়লীর (র) বর্ণনা অনুযায়ী দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাসে রাসূলে আকরাম (সা) বনু জুমরার সঙ্গে একটি লিখিত চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। এই চুক্তিনামায় প্রয়োজনের সময় একে অপরকে সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। কতিপয় রেওয়ায়াত অনুসারে প্রিয় নবী (সা) একবার বনু জুমরাকে প্রশংসা করেছিলেন। এ জন্য চরিতকাররা এই কবিলা বা গোত্রকে সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। হযরত আমর (রা) প্রথম বয়সেই নিজের দ্রুতগামিতা, মেধা, বীরত্ব এবং সাহসিকতার কারণে মশহুর হয়ে গিয়েছিলেন। আল্লামা ইবনে আবদুল বার (র) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি দীর্ঘদিন যাবত কুফর ও শিরকের ভ্রান্ত পথে পথভ্রষ্ট হয়েছিলেন এবং বদর ও ওহোদের যুদ্ধে মক্কার মুশরিকদের পক্ষে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র জাফর (র), ফজল (র) এবং আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কুরাইশরা যখন ওহোদ থেকে ফিরে গেল তখন আমাদের পিতা ইসলাম গ্রহণ করেন।

আল্লামা ইবনে সায়্যাদ (র) তাবকাতে কাবিরে হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়ার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে এক চিত্তাকর্ষক কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, ওহোদের যুদ্ধের পর একবার আবু সুফিয়ান বিশ্ব নবীকে (সা) মদীনায় শহীদ করার পরিকল্পনা করে এবং এ উদ্দেশ্য সাধনে আমর বিন উমাইয়াকে নির্বাচন করে। কাপড়ের নীচে একটি খঞ্জর লুকিয়ে একটি দ্রুতগতিসম্পন্ন উটে চড়ে আমর মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলেন। ৬ষ্ঠ দিনে মদীনার নিকটে জাহরুল হিরা নামক স্থানে পৌঁছলেন। সেখান থেকে জিজ্ঞেস করতে করতে মসজিদে বনু আশহালে গেলেন। সেখানে হুজুর (সা) আরাম করছিলেন। আমরের ওপর দৃষ্টি পড়তেই সেখানে উপস্থিত সাহাবীদেরকে তিনি বললেন, "দেখো, যে ব্যক্তি এলো তার নিয়ত ভাল মনে হয় না।" একথা শুনে হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়ের আনসারী উঠে দাঁড়ালেন এবং ঝাঁপিয়ে পড়ে আমরকে (রা) কাবু করে ফেললেন। তাঁর কাপড়ের তলা থেকে খঞ্জর বেরিয়ে এলো। তাতে তিনি খুব ছটফটাতে লাগলেন এবং চেঁচিয়ে বললেন ঃ "আমার রক্ত, আমার রক্ত।"

হুজুর (সা) তাকে সম্বোধন করে বললেন, "সত্যি করে বলো তুমি কে এবং কোন নিয়তে এখানে এসেছ?"

বললেন ঃ "আপনি যদি আমাকে হত্যা না করেন, তাহলে সবকিছু বলবো।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "তুমি যদি সত্যি কথা বলো, তাহলে দেখবো।"

আমর (রা) সকল ঘটনা কম-বেশী বলে দিলেন। তা শুনে রহমতে আলম (সা) মুচকি হেসে বললেন ঃ

"সে সত্য কথা বলেছে। আমি তার অপরাধ ক্ষমা করে দিলাম।"

আমর (রা) নবুওয়াতের মহিমায় প্রথমে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এক্ষণে হুজুরের (সা) শান দেখে নির্দ্বিধায় রাসূলের (সা) পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন।

অন্য কতিপয় রেওয়ায়াতে এই ঘটনা এভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তাতে হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়ার নামের ব্যাখ্যা নেই। বরং বলা হয়েছে যে, একজন গ্রাম্য মানুষ আবু সুফিয়ানের ইঙ্গিতে হুজুরকে (সা) শহীদ করার ইচ্ছায় এলো এবং ধরা পড়লো। এসব রেওয়ায়াত অনুযায়ী এই ঘটনা ৬ অথবা ৭ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। যদি এসব রেওয়ায়াত সঠিক হয় তাহলে সেই ঘটনার সাথে হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়ার ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। কেননা তিনি তৃতীয় হিজরীর শেষে অথবা চতুর্থ হিজরীর প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

এখানে একথা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) এবং আল্লামা ইবনে আছিরের (র) নিকট এ ধরনের সকল রেওয়ায়াত ভিত্তিহীন। এসব রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে যে, অমুক সময় (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) হযরত আবু সুফিয়ান (রা) হুজুরের (সা) হত্যার পরিকল্পনা করেছিল এবং অমুক ব্যক্তি তাঁকে শহীদ করার জন্য মদীনা প্রেরণ করেছিল।

কাজী মুহাম্মাদ সুলায়মান সালমান মানসুরপুরী (র) "রাহমাতুল লিল আলামীন" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন যে, হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়া ৬ষ্ঠ হিজরীতে ইসলাম কবুল করেন এবং পুনরায় মক্কা ফিরে গিয়ে ইসলামের তাবলিগ করতে থাকেন। কিন্তু কাজী সাহেব নিজের বর্ণনার সূত্র উল্লেখ করেননি। অন্যান্য রেওয়ায়াত ও কার্যকারণ এই রেওয়ায়াত ও কার্যকারণ এই রেওয়ায়াতকে সমর্থন করে না।

চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে বি'রে মাউনার বেদনাপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হলো। কতিপয় চরিতকার এই প্রসঙ্গে হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়ার উল্লেখ বিশেষভাবে করেছেন। সেই ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

চতুর্থ হিজরীতে বনু কালাবের সরদার আবু বারা আমের বিন মালেক নজদ থেকে বিশ্ব নবীর (সা) খিদমতে হাজির হলেন। হুজুর (সা) তাকে ইসলামের

দাওয়াত দিলেন। সে ইসলাম কবুল করলো না। অবশ্য রাসূলের (সা) নিকট একটি আবেদন জানালেন। আবেদনে তার সঙ্গে কতিপয় ব্যক্তিকে প্রেরণ করতে বললেন। যাতে তারা তার কওমের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিতে পারেন। হুজুর (সা) সাহাবীদেরকে (রা) তার সঙ্গে প্রেরণের ব্যাপারে চিন্তায় পড়ে গেলেন। কেননা কিছুদিন পূর্বে বনু আমেরের সরদার আমের বিন তোফায়েল (আবু বারার ভাতিজা) মুসলমানদেরকে এই বলে ধমক দিয়েছিল যে, মুহাম্মাদ (সা) আমাকে তার স্থলাভিষিক্ত করুক অথবা নরম মাটির বাসিন্দাদের ওপর সে শাসন করুক এবং কঠিন মাটিতে বসবাসকারীদের ওপর আমি শাসন করি। নচেৎ আমি বনু গাতফানের হাজার হাজার যোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে মদীনার ওপর চড়াও হবো। কিন্তু আবু বারা' হুজুরকে (সা) নিশ্চয়তা দিলেন যে, যাদেরকে আপনি আমার সঙ্গে প্রেরণ করবেন তাদের হেফাজত ও সালামতির দায়িত্ব আমার।

সহীহ বুখারীতে হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে আকরাম (সা) হযরত হারাম (রা) বিন মিলহান আনসারীর নেতৃত্বে ৭০ জন সওয়ারীকে নজদে প্রেরণ করলেন। কিন্তু ইবনে ইসহাক (র) এবং হাফেজ ইবনে কাছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, আবু বারার নিশ্চয়তা প্রদানের পর হুজুর (সা) ৪০ জন সাহাবীকে (রা) হযরত মানযার (রা) বিন আমর আনসারীর নেতৃত্বে তার সঙ্গে প্রেরণ করেছিলেন। এই ৪০ জন সাহাবীর (রা) মধ্যে হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়াও শামিল ছিলেন। এসব সাহাবীর বেশীরভাগই ছিলেন "আনসার" ও "আসহাবে সুফফা।" আল্লাহর এসব পবিত্র বান্দাহর অধিকাংশই কুরআনে কারিমের হাফেজ ছিলেন এবং "ক্বারী" লকবে মশহুর ছিলেন। বিশ্ব নবী (সা) আমের বিন তোফায়েলের নামে একটি চিঠিও সেই দলের হাতে প্রেরণ করলেন। এসব ব্যক্তি মদীনা থেকে বিদায় হয়ে "বিরে মাউনা" নামক স্থানে গিয়ে যাত্রা বিরতি করলেন এবং হযরত হারাম (রা) বিন মিলহানকে (রা) হুজুরের (সা) চিঠি আমের বিন তোফায়েলের কাছে প্রেরণ করলেন।

হযরত হারাম (রা) হুজুরের (সা) পত্র আমের বিন তোফায়েলকে প্রদান করলেন। সে সময় সেই হতভাগা তা পাঠ করার মত ধৈর্যও ধারণ করতে পারলো না এবং আরবদের প্রথাগত মেহমানদারীকে তাকে উঠিয়ে রেখে এক ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করলো। সে হযরত হারামকে (রা) পেছনের দিক থেকে এসে নেযাহ মারলো। এই নেযাহ তাঁর দেহের এপার-ওপার হয়ে গেল। হযরত হারাম (রা) আঁজলা ভরে রক্ত নিজের চেহারা ও মাথার ওপর নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, "ফুযতু ওয়া রাব্বিল কা'বা" (কা'বার রবের কসম, আমি সফল

হয়ে গিয়েছি) তারপরই মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন এবং জীবন আল্লাহর হাতে সঁপে দিলেন।

তারপর আমের বিন তোফায়েল নিজের গোত্রের (বনু আমের) লোকদেরকে অন্য মুসলমানের সঙ্গেও একই আচরণ করার কথা বললো। কিন্তু তারা আবু বারার আশ্রয়ের কারণে চিন্তিত হয়ে পড়লো। ফলে, আমের আশপাশের গোত্র রায়াল, জাকওয়ান, আসবা এবং কারাকে একত্রিত করে মুসলমানদের ওপর হামলা করে বসলো। হকপন্থীরা অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে এই হামলার মোকাবেলা করলো। তবে বিরাট সংখ্যক নজদী দাগাবাজ তাদেরকে ঘিরে ফেললো এবং হযরত কায়াব (রা) বিন যায়েদ আনসারী ছাড়া (তিনি বনি দিনার বিন নাজ্জার গোত্রভুক্ত ছিলেন) অবশিষ্ট সকলকে এক এক করে শহীদ করে ফেললো। হযরত কায়াবও (রা) মারাত্মকভাবে আহত হলেন এবং মৃত ভেবে কাফেররা তাকে ফেলে গেল। সে সময় হযরত আমর(রা) বিন উমাইয়া নিজের একজন আনসারী সঙ্গীর সাথে মুসলমানদের পশু চরানোর জন্যে গিয়েছিলেন। আকাশে শকুন উড়তে দেখলেন। তা দেখে তাঁর মনে খটকা লাগলো। তিনি মনে করলেন যে, অবশ্যই কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। তৎক্ষণাৎ তিনি বিরে মাউনার দিকে অগ্রসর হলেন। সেখানে পৌঁছে সকল সঙ্গীকে রক্তে ডোবা অবস্থায় পেলেন। দাগাবাজ দুশমনরা রক্তাক্ত তরবারীসহ তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। হযরত আমর (রা) নিজের সাথীকে বললেন, "চলো, ফিরে গিয়ে হুজুরের (সা) নিকট এই মর্মন্তুদ ঘটনার খবর দি।"

তিনি বললেন "শহীদদেরকে ছেড়ে এই স্থান থেকে চলে যেতে আমার মন চায় না। এখানে আমাদের সঙ্গীরা চির নিদ্রায় শায়িত রয়েছেন।"

সুতরাং উভয়েই তরবারী উঁচিয়ে অগ্রসর হলেন এবং যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু দু'ব্যক্তি কি করে হাজার হাজার মানুষের মোকাবিলা করতে পারে। আনসারী মুজাহিদতো লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন এবং আমর (রা) বিন উমাইয়াকে নজদীরা গ্রেফতার করলো।[১] আমের বিন তোফায়েলের মাতা কোন ব্যাপারে একটি গোলাম আযাদ করার মানত

---

১. হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়ার সঙ্গীর নাম কতিপয় রেওয়ায়াতে মানযার (রা) বিন আমর বলে উল্লেখ আছে এবং কতিপয় রেওয়ায়াতে "তাকে বনি আমর বিন আওফের একজন আনসারী বলা হয়েছে। ইবনে আছির বর্ণনা করেছেন যে, নজদীরা মানযারকে(রা) নিরাপত্তা দানের প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং যেখানে হযরত হারাম (রা) শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন সেখানে পৌঁছে যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে যান। হুজুর (সা) এই ঘটনা শুনে বললেন ঃ "তিনি স্বয়ং মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন।"

মেনেছিলেন। যখন আমর (রা) আমের বিন তোফায়েলকে বললেন যে, তিনি মুদির বংশোদ্ভূত তখন সে তার মায়ের মানত পূর্ণ করার জন্য তাঁকে আযাদ করে দিলো এবং নিজের রসম অনুযায়ী তাঁর ভ্রু কেটে নিলো। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আমর (রা) এক আধদিন মুশরিকদের গ্রেফতারীতে ছিলেন এবং সুযোগ পরে সেখান থেকে পালিয়ে যান। যাহোক, তিনি মুক্তি পেয়ে দ্রুতগতিতে মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে একজন মুশরিক রাখালের সঙ্গে সাক্ষাত হলো। সে একটি কবিতা আবৃত্তি করলো। কবিতাটির অর্থ হলো : "আমার জীবন থাকা অবস্থায় মুসলমান হবো না এবং মুসলমানদের দ্বীনও গ্রহণ করবো না।"

আমর (রা) লাফ দিয়ে পড়ে সেই রাখালকে ধরাশায়ী করে ফেললেন এবং খঞ্জরের এক কোপে তাকে জাহান্নামে প্রেরণ করলেন। সামনে অগ্রসর হলেন। রাস্তায় বনু আমেরের দু'ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হলো বিশ্ব নবী (সা) তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। কিন্তু আমর (রা) তা জানতেন না। তাঁর অন্তর ছিল বনু আমেরের বিরুদ্ধে ক্রোধে পূর্ণ। হঠাৎ করে হামলা করে সেই দুই ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেললেন [অন্য কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, উভয় ব্যক্তি ইহুদী এবং বনু কুরায়জার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। আমর (রা) তাদেরকে বনি আমেরের মানুষ মনে করে হত্যা করেন] অতপর তিনি খুব দ্রুত গতিতে মদীনা পৌঁছে প্রিয় নবীর খিদমতে হাজির হয়ে সকল ঘটনা বর্ণনা করলেন। বিরে মাউনার হৃদয় বিদারক ঘটনা শুনে হুজুর (সা) প্রচণ্ড দুঃখ পেলেন। তা সত্ত্বেও তিনি বনু আমেরের (অথবা বনু কোরায়জা) দুই ব্যক্তির হত্যায়, অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাদের দিয়াত আদায় করলেন। অজ্ঞতাবশতঃ হযরত আমর (রা) এই কাজ করে বসেছিলেন। তিনি ক্ষমা প্রার্থী হলেন এবং সবসময় এই কাজের জন্য আফসোস করতেন। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, হুজুর(সা) এক মাস পর্যন্ত বিরে মাউনার সাহাবীদের হত্যাকারীদের জন্য বদদোয়া করেছিলেন।

সেই সময়ই মুসলমানদেরকে আরেকটি দুঃখজনক ঘটনায় ক্ষত-বিক্ষত হতে হয়েছিল। প্রিয় নবী (সা) বিভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী ৬ অথবা দশ সাহাবীর একটি দল হযরত আছেম (রা) বিন ছাবিত আনসারীর নেতৃত্বে তাবলীগের জন্য বনু আজল বিকারার দিকে প্রেরণ করলেন। বনু লাহইয়ানের' দুশ' সওয়ার সেই জামায়াত বা দলকে রাজি' নামক স্থানে ঘিরে ধরলো এবং দু'জন ছাড়া সকল সাহাবীকে শহীদ করে ফেললো। হযরত খুবায়ের (রা) বিন আদি এবং যায়েদ (রা) বিন দাছনাকে সেই হতভাগারা গ্রেফতার করে মক্কার মুশরিকদের নিকট বিক্রয় করে দিল। হারাম মাসসমূহ অতিবাহিত হওয়ার পর

মুশরিকরা অত্যন্ত নির্দয়ভাবে সেই দুই হক প্রেমিককে শহীদ করে ফেললো। হযরত যায়েদের (রা) লাশতো তারা মাটিতে পুতে দিল। কিন্তু হযরত খুবায়েবের (রা) লাশ শুলির ওপর লটকে রাখলো। রাসূলে আকরাম(সা) এই ঘটনার কথা অবগত হলে খুব দুঃখিত হলেন এবং তিনি হত্যাকারীদেরকে আল্লাহর দুশমন বলে আখ্যায়িত করলেন। আল্লামা তাবারী(র) এবং হাফেজ ইবনে হাজার (র) লিখেছেন যে, বিশ্ব নবী (সা) হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়াকে মক্কায় গিয়ে খুবায়েবের (রা) লাশ শুলি থেকে নামিয়ে এখানে নিয়ে আসার চেষ্টা চালাতে বললেন। হযরত আমর (রা) হুজুরের (সা) ইরশাদ অনুযায়ী মনযিলের পর মনযিল অতিক্রম করে মক্কা পৌছলেন এবং রাতের অন্ধকারে তানয়িম উপস্থিত হলেন। সেখানেই হযরত খুবায়েবের (রা) লাশ শুলিতে লটকানো ছিলো। তিনি বৃক্ষের ওপর চড়ে শুলির রশি কেটে দিলেন এবং হযরত খুবায়েবের (রা) পবিত্র দেহ মাটিতে পড়ে গেল। হযরত আমর (রা) গাছ থেকে নীচে নামলেন। নেমে হতভম্ব হয়ে গেলেন। সেখানে তিনি লাশের কোন নাম নিশানাও দেখতে পেলেন না। হযরত আমরের (রা) মুখ দিয়ে অযাচিতভাবে বের হয়ে পড়লো, "তাহলে কি তাঁর লাশ মাটি গিলে ফেলেছে!" তাঁর বিস্ময় প্রকাশটা সঠিক ছিল। কেননা, হযরত খুবায়েবের (রা) পবিত্র দেহ প্রকৃতপক্ষেই মাটির কোলের শোভা হয়ে গিয়েছিল। এ জন্যই তাঁর উপাধি হলো "বালিয়ুল আরদ" (অর্থাৎ যাকে মাটি গিলে ফেলেছে)। হযরত আমর (রা) মদীনা ফিরে গিয়ে সকল ঘটনা বিশ্ব নবীর (সা) খিদমতে বর্ণনা করলেন।

আল্লামা মুহাম্মাদ (র) বিন সায়্যাদ কাতিবুল ওয়াকেদী হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়ার আরো একটি অভিযানের কথা "সারিয়ায়ে, আমর ইবনুজ জুমরি" শিরোনামে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই অভিযান কখন সংঘটিত হয়েছিল সে ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইবনে সায়্যাদের এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী এই অভিযান চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে সংঘটিত হয়। অর্থাৎ হযরত আমরের (রা) ইসলাম গ্রহণের অব্যবহিত পরই তিনি যখন এই অভিযান থেকে ফারেগ হয়ে মক্কা থেকে মদীনা ফিরে আসছিলেন তখন পথিমধ্যে বিরে মাউনার শহীদদের লাশ দেখে মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন। তারা তাঁকে গ্রেফতার করলো। কিন্তু ইবনে সায়্যাদের দ্বিতীয় রেওয়ায়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, এই অভিযান ৬ অথবা ৭ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। সে সময় হযরত আমর (রা) হাবশার দূতগিরির কাজ শেষে ফিরে এসেছিলেন। এই অভিযানের সংক্ষিপ্ত ঘটনা হলো ঃ একবার হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়ার মনে রাসূলের (সা) সবচেয়ে বড় দুশমন আবু সুফিয়ানকে খতম করে ফেলার

খেয়াল চাপলো। [এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত আমর বিশ্ব নবীর (সা) ইঙ্গিতে সেই অভিযানে রওয়ানা হয়েছিলেন। কিন্তু এই রেওয়ায়াত দুর্বল] সুতরাং তিনি অন্য একজন সাহাবী হযরত সালমা (রা) বিন আসলাম আনিসারীকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা পৌঁছলেন। মক্কার মুশরিকরা তাঁদেরকে দেখে ক্রোধে ফেটে পড়লো এবং একটি উত্তেজিত জনতা তাঁদেরকে পাকড়াও করার জন্য অগ্রসর হলো। হযরত আমর (রা) নিজের সাথীকে উটের ওপর সওয়ার করালেন এবং তাঁকে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে বললেন। হযরত সালমা (রা) দ্রুত গতিতে উট হাঁকিয়ে সেখান থেকে বের হয়ে যেতে পারলেন এবং আমর (রা) মুশরিকদের সামনে চক্কর মারতে লাগলেন। তিনি দুশমনদের নিকটে পৌঁছে লাফ দিয়ে এমন বিদ্যুৎ বেগে চলে গেলেন যে মুশরিকরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। আমর (রা) মক্কা থেকে বেশ দূরে গিয়ে একটি গুহায় লুকিয়ে রইলেন। ভাগ্যের ফের! উসমান (অথবা উবায়েদুল্লাহ) নামক একজন মুশরিক সেখানে এসে উপস্থিত। আমর (রা) হঠাৎ করে হামলা করে তাকে শেষ করে দিলেন এবং মদীনার দিকে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে হযরত সালমার (রা) সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাত মিললো। তাঁরা উভয়ে মদীনা আসতে আসতে আরো দু'জন মুশরিককে হত্যা এবং আরেক মুশরিককে গ্রেফতার করে মদীনায় প্রবেশ করলেন। মদীনাবাসী তাঁদের উভয়ের সহীহ সালামতে প্রত্যাবর্তনে খুব খুশী হলেন। হযরত আমর (রা) নবীর (সা) দরবারে হাজির হয়ে সকল ঘটনা বর্ণনা করলেন। ঘটনা শুনে তিনি মুচকি হেসে দিলেন এবং তাঁদের জন্য দোয়া করলেন।

৬ষ্ঠ হিজরীর শেষের দিকে মহানবী (সা) বিভিন্ন দেশের শাসকদের নিকট ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্রাবলী প্রেরণ করলেন। তিনি হযরত আমর(রা) বিন উমাইয়াকে নিজের দূত হিসেবে হাবশা প্রেরণ করেন। এই প্রসঙ্গে অধিকাংশ রেওয়ায়াত অনুযায়ী এই দূত প্রেরণের দু'টি লক্ষ্য ছিল ঃ

১. হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান।

২. হযরত উম্মে হাবিবাকে (রা) (বিনতে আবু সুফিয়ান) হুজুরের (সা) পক্ষ থেকে নিকাহর পয়গাম প্রদান। প্রখ্যাত দার্শনিক ডাঃ মুহাম্মাদ হামিদুল্লাহ স্বগ্রন্থ "রাসূলে আকরামের (সা) রাজনৈতিক জীবন" -এ লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়ার হাতে হাবশার বাদশাহকে প্রেরিত পত্রের বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ ঃ

"মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর নামে—শান্তি বর্ষিত হোক সেই ব্যক্তির ওপর যে হেদায়াতের পায়রবী করেছে।

তারপর! আমি তোমার পক্ষ থেকে সেই আল্লাহর প্রশংসা করছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। যিনি বাদশাহ থেকে অনেক পবিত্র (সমস্ত দোষ থেকে) সালামত ওয়ালা, নিরাপত্তা দানকারী ও নিগাহবান এবং আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ঈসা (আ) বিন মারয়াম হলেন রুহুল্লাহ ও কালিমাতুল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা নিজের নির্দেশকে পবিত্র মারয়ামের প্রতি অবতীর্ণ করেন। অতপর তিনি ঈসাকে (আ) পেটে ধারণ করেন। আল্লাহ তায়ালা আদমকে (আ) যেমন নিজের কুদরতী হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনি হযরত ইসাকে (আ) নিজের নির্দেশসহ সৃষ্টি করেন এবং আমি তোমাকে অংশীদারহীন একক আল্লাহর দিকে আহবান করছি ও তার আনুগত্যের জন্য বন্ধুত্বের দাওয়াত দিচ্ছি। তুমি আমাকে অনুসরণ কর, আমার ওপর যে কালাম অবতীর্ণ হয়েছে তার ওপর ঈমান আনয়ন করো। আমি আল্লাহর রাসূল (সা) এবং তোমাকেও তোমার কওমকে আল্লাহর দিকে আহবান জানাচ্ছি। আমি তোমাকে রিসালাতের পয়গাম পৌছে দিয়েছি এবং তোমাকে নসিহত করেছি। অতএব আমার নসিহত কবুল করো এবং হেদায়াত অনুসরণকারীদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।"

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, এই পবিত্র পত্রের প্রভাবে নাজ্জাশী হযরত জাফর তাইয়ারের (রা) হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু অধিকাংশ চরিতকার বলেছেন যে, নাজ্জাশী সেই সময় মুসলমান হয়েছিলেন যখন মুশরিকদের একটি প্রতিনিধি দল মুহাজির মুসলমানদেরকে হাবশা থেকে বহিষ্কারের জন্য তার নিকট গমন করেছিল। নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছরে এই ঘটনা ঘটে (৬ষ্ঠ হিজরীতে নয়) মুসনাদে আবু দাউদে হযরত আবু হুরায়রা(রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, কুরাইশ প্রতিনিধি দলের কথার জবাবে হযরত জাফর (রা) এমন হৃদয়গ্রাহী ও প্রভাবশালী বক্তৃতা করেছিলেন যে নাজ্জাশীর চক্ষু দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে গেল এবং তিনি অযাচিতভাবে বলে উঠলেন ঃ

"আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হুজুর (সা) অবশ্যই আল্লাহর রাসূল এবং তিনি সেই ব্যক্তি যাঁর স্বাক্ষ্য ঈসা (আ) বিন মার্‌য়াম (আ) প্রদান করেছিলেন।"

নাজ্জাশী আসমাহার ইসলাম গ্রহণ এবং দ্বিতীয়বার তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দানের ঘটনা দ্ব্যর্থবোধক এবং তা বিশ্লেষণের দাবী রাখে। ইমাম মুসলিম (র) লিখেছেন যে, নাজ্জাশী যিনি হযরত জাফরের (রা) হাতে মুসলমান হয়েছিলেন তিনি ৬ষ্ঠ হিজরীর পূর্বে মারা গিয়েছিলেন এবং হুজুর(সা) তাঁর স্থলাভিষিক্তের নিকট তাবলিগী পত্র প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য নেতৃস্থানীয় চরিতকারদের মধ্য থেকে অধিকাংশই বর্ণনা করেছেন যে,

নাজ্জাশী আসমাহা (রা) [যিনি হযরত জাফরের (রা) হাতে মুসলমান হয়েছিলেন) নবম হিজরীতে ওফাত পান। যেদিন তাঁর ইন্তেকাল হয় রাসূলে অকরাম (সা) সেই দিনই ওহী মারফত মৃত্যু খবর পেয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি সাহাবীদের (রা) সঙ্গে তাঁর গায়েবানা নামাযে জানাজা আদায় করেন। হাফেজ ইবনে কাইয়েম (র) মুসলিমের রেওয়ায়াতকে একদমই মানেননি এবং তা বর্ণনাকারীর ধারণা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এই ধারণাই সম্ভবত ঠিক হবে যে, হুজুর (সা) হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়ার হাতে যে পত্র নাজ্জাশীকে প্রেরণ করেছিলেন তাতে শুধুমাত্র পদ্ধতিগতভাবে ইসলামের দাওয়াত নবায়ন করেছিলেন। যাহোক, নাজ্জাশী সেই পবিত্র পত্র তাজিমের সঙ্গে গ্রহণ করলেন এবং বাইয়াতের নবায়ন করলেন (ইসলাম গ্রহণ করেননি)। এই ধারণার সমর্থন এভাবেও হয় যে, হুজুরের (সা) নির্দেশ অনুযায়ী হযরত আমর (রা) তাঁর নিকাহর নির্দেশ নাজ্জাশীর দ্বারাই হযরত উম্মে হাবিবার (রা) নিকট পৌঁছালেন।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল এবং তাবকাতে ইবনে সায়াদে আছে যে, হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়া হাবশা পৌঁছলে নাজ্জাশী নিজের দাসী আবরাহার মাধ্যমে হযরত উম্মে হাবিবার (রা) নিকট বিশ্ব নবীর (সা) পয়গাম পাঠালেন এবং বলে পাঠালেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে তোমার বিয়ের কথা লিখেছেন। তুমি নিজের কোন উকিল ঠিক করো যাতে এই অনুষ্ঠান আনজাম দেয়া যায়। হযরত উম্মে হাবিবা (রা) খালিদ (রা) বিন সাঈদ বিন আসের নিকট মানুষ প্রেরণ করে তাঁকে নিজের উকিল বানালেন এবং আবরাহাকে নিকাহর পয়গাম আনার খুশীতে রূপার দু'টি কঙ্কন, দু'টি পায়ের অলংকার এবং রূপার কয়েকটি আংটি দিলেন। যখন সন্ধ্যা হলো তখন নাজ্জাশী হযরত জাফর (রা) বিন আবি তালিব, হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদ এবং হাবশায় অবস্থানরত অন্যান্য মুসলমানকেও ডেকে পাঠালেন এবং তাদের সামনে স্বয়ং নিকাহর খুতবা পড়ে চারশ' দিনার মহরানা ঠিক করে হযরত উম্মে হাবিবার (রা) উকিল হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদকে দিলেন। হাফেজ ইবনে কাছির (র) বর্ণনা করেছেন, নিকাহর পর নাজ্জাশী উপস্থিত সকলকে খাবার খাইয়ে বিদায় করেন।

এই রেওয়ায়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আমরের (রা) হাবশা পৌঁছার পূর্বেই নাজ্জাশী মুসলমান হয়েছিলেন। নচেৎ হুজুর (সা) নিকাহর পয়গাম তাঁর মাধ্যমে প্রেরণ করতেন না। এমনিতেও এটা ধারণাতীত ব্যাপার যে, একজন নওমুসলিম নিকাহর খুতবাহ পড়লেন এবং তাতে আল্লাহর

একত্ববাদ ও হুজুরের (সা) রিসালাতের কথা অত্যন্ত সুন্দরভাবে স্বীকৃতি দিলেন। এই প্রসঙ্গে হযরত আমর (রা) ইবনুল আছের সেই রেওয়ায়াতের উল্লেখও অপ্রাসঙ্গিক হবে না, যাতে তিনি নিজের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হযরত আমর (রা) বিন আছ কুরাইশের পক্ষ থেকে নবুওয়াতের পঞ্চম ও ৬ষ্ঠ বছরে হাবশা গিয়েছিলেন এবং নাজ্জাশীর নিকট তার দেশ থেকে মুসলমানদেরকে বের করে দেয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু নাজ্জাশী তার আবেদনই শুধু বাতিল করে দেননি বরং স্বয়ং ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আমর (রা) ইবনুল আছ থেকে বর্ণিত আছে যে, খন্দকের যুদ্ধের পর আমি কুরাইশদের মধ্য থেকে নিজের হামখেয়াল লোকদেরকে একত্রিত করে বললাম, খোদার কসম! আমি মুহাম্মাদের (সা) কাজ প্রতিদিন উন্নতির দিকে যাচ্ছে বলে দেখছি। আমি এখন ঠিক করেছি যে, হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট গিয়ে বসবাস শুরু করবো। মুহাম্মাদ (সা) যদি কুরাইশদের ওপর বিজয় লাভ করে তাহলে আর ফিরে আসবে না। আর যদি কুরাইশরা বিজয়ী হয় তাহলে আমাদের জন্য শুধু ভাল আর ভাল।

লোকেরা আমার ধারণাকে সমর্থন করলো। সুতরাং আমি মক্কার পাকা চামড়া বিপুল সংখ্যায় একত্রিত করলাম এবং কতিপয় সথীর সঙ্গে তা নাজ্জাশীর খেদমতে উপঢৌকন হিসেবে পেশ করার জন্য হাবশা পৌছলাম। সেই সময়ই আমর (রা) বিন উমাইয়া রাসূলের (সা) পক্ষ থেকে দূত হয়ে হাবশা পৌছেন। আমি আমার সাথীদেরকে বললাম যে, আমরা আমরকে (রা) আমাদের হাওয়ালা করে দেয়ার জন্য নাজ্জাশীর নিকট আবেদন জানাবো। তারপর আমরা তাকে শেষ করে দেব। তাহলেই আমাদের প্রতিশোধ নেয়া হবে। তাঁরা আমার প্রস্তাব সমর্থন করলো। সুতরাং আমি নাজ্জাসীর নিকট গেলাম। সে "স্বাগতম, স্বাগতম—আমার বন্ধু" এই বলে আমাকে সম্বর্ধনা জানালো। অতপর আমি যখন মক্কা থেকে আনা চামড়া তার খিদমতে উপঢৌকন হিসেবে পেশ করলাম তখন তিনি খুব খুশী হলেন। এরপর আমি তার নিকট নিবেদন পেশ করে বললাম যে, মক্কা থেকে যে ব্যক্তির দূত আপনার নিকট এসেছে সে আমাদের শত্রু। আপনি সেই দূতকে আমাদের হাওয়ালা করে দিন। তাহলে আমরা আপনার ইহসানমন্দ হবো। নাজ্জাশী আমার কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো এবং রাগে গরগর করতে করতে সজোরে নাকের ওপর থাপ্পর মারলো। ভয়ে আমার শরীর কেঁপে উঠলো। আমি বললাম ঃ

"জাঁহাপনা! খোদার কসম, আমি জানতাম না যে, কথাটি আপনি অসহ্য মনে করবেন। নচেৎ কখনই তা মুখ দিয়ে বের করতাম না।"

নাজ্জাশী বললেন ঃ "তুমি কি আমার কাছে সেই ব্যক্তির দূত ফেরত দাবী করো, যার নিকট জিবরাঈল (আ) আগমন করে থাকে।"

আমি আরজ করলাম, "বাদশাহ সালামত, আপনিকি সত্যি এ ধরনের চিন্তা করে থাকেন?"

নাজ্জাশী বললেন, "হে আমর! তুমি ধ্বংস হও। আমার কথা মেনে নাও এবং তার আনুগত্য কর। খোদার কসম, তিনি হকের ওপর আছেন এবং নিজের শত্রুর ওপর অবশ্যই বিজয়ী হবেন।"

আমি বললাম, "আপনি কি তাঁর পক্ষ থেকে আমার ইসলাম গ্রহণের বাইয়াত নিতে পারেন?

সে বললো, "হাঁ, হাঁ" সুতরাং নাজ্জাশী হাত বাড়িয়ে দিল এবং তার হাতে ইসলামের বাইয়াত নিলাম। তা সত্ত্বেও আমি ইসলামকে গোপন রাখলাম—এমনকি মক্কা বিজয়ের কিছু দিন পূর্বে খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের সঙ্গে মদীনা গিয়ে হুজুরের (সা) হাতে বাইয়াত করলাম।"

এই রেওয়ায়াত থেকে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, নাজ্জাশী আসমাহা (রা) হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়ার দূতগিরির পূর্বেই মুসলমান হয়েছিলেন। এই দূতগিরির অব্যবহিত পরই উম্মে হাবিবা (রা) এবং অন্যান্য মুসলমান হাবশা থেকে ফিরে আসেন। এটাই ধারণা করা হয় যে, হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়াও তাঁদের সঙ্গেই ফিরে এসেছিলেন। সে সময় খায়বার বিজয় হয়ে গিয়েছিল। তাদের প্রত্যাবর্তনে মুসলমানরা দু'ধরনের খুশী হয়েছিল। প্রথমতঃ খায়বার বিজয়ের খুশী এবং দ্বিতীয় বিক্ষিপ্ত ভাইয়ের সাথে মিলিত হওয়ার খুশী।

ওপরের ঘটনাবলী ছাড়া হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়ার জীবনের কোন এবং বিশেষ ঘটনা চরিতগ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না। তবে, "তাহজিবুল কামালের" রেওয়ায়াত অনুযায়ী তিনি আমীর মুয়াবিয়ার (রা) ইমারাতের শেষ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং ৬০ হিজরীতে অথবা তার কিছু আগে মদীনায় ওফাত পান। হাফেজ ইবনে হাজার (র) লিখেছেন, মৃত্যুর সময় তিনি জাফর, ফজল এবং আবদুল্লাহ নামে তিন পুত্র রেখে যান।

হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়া থেকে ২০টি হাদিস বর্ণিত আছে। তাঁর হাদিস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তিন পুত্র ছাড়া শা'বী (র), যবরকান (র), আবুল মুহাজির (র), আবুল কালাবা জারবী (র) এবং আবু সালমা (র) বিন আব্দুর রহমান অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়া যদিও ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেননি। তবে, ইসলাম গ্রহণের পর কিছুদিনের মধ্যেই বিশ্ব নবীর (সা) আস্থা অর্জনের সম্মান লাভ করেন। এর প্রকৃত প্রমাণ হলো বি'রে মাউনার সাহাবীদের মধ্যে তার উপস্থিতি। অথচ বি'রে মাউনার কিছুদিন পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। সহীহ বুখারীতে হযরত উরওয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, বি'রে মাউনার সাহাবীরা (রা) যখন শহীদ হয়ে গেলেন এবং আমর (রা) বিন উমাইয়া জুমরী গ্রেফতার হলেন তখন তাঁর নিকট আমের বিন তোফায়েল একজন নিহত ব্যক্তির প্রতি ইশারা করে জিজ্ঞেস করলেন যে, এই ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, "তিনি হলেন আমের বিন ফাহিরাহ।" আমের বিন তোফায়েল বললেন, "আমি তার হত্যার পর দেখলাম যে, তার লাশ আকাশের দিকে উঠিয়ে নেয়া হলো, এমনকি তিনি দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তার (কিছুক্ষণ পর) তাকে মাটির উপর রেখে দেয়া হলো।"

এমনিভাবে মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল এবং তিবরানীতে রাজির ঘটনার ব্যাপারে স্বয়ং হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়া থেকে বর্ণিত আছে ঃ

"প্রিয় নবী (সা) কুরাইশের খবর নেয়ার জন্য আমাকে একাকী মক্কা প্রেরণ করলেন। সেখানে গিয়ে আমি সেই লাকড়ীর দিকে অগ্রসর হলাম যার ওপর খোবায়েব (রা) বিন আদিকে শুলিতে চড়ানো হয়েছিল এবং আমি পাহারাদারদের ব্যাপারে ভয় পাচ্ছিলাম। আমি লাকড়ীর ওপর আরোহণ করলাম এবং খোবায়েবের (রা) দেহের সাথে বাঁধা রশি কেটে দিলাম। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। আমি নীচে নেমে তার লাশ পেলাম না। মাটি যেন তাকে নিজের মধ্যে লুকিয়ে ফেলেছিল।

হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়ার হাবশায় দূতগিরি তাঁর মহান মর্যাদার প্রমাণ দেয়। এটা কোন সাধারণ ধরনের দূতগিরি ছিল না। তার একটি লক্ষ্য ছিল স্বয়ং রাসূলের (সা) একটি বিশেষ ব্যক্তিগত কাজ আঞ্জাম দেয়া। এটা স্পষ্ট যে, এ জন্য এমন ধরনের কোন ব্যক্তিকেই প্রেরণ করা যেত যার মেধা, নিষ্ঠা ও দিয়ানতের ওপর রাসূলের (সা) পূর্ণ আস্থা ছিল। এটা হযরত আমর(রা) বিন উমাইয়ার সৌভাগ্য ছিল যে, রহমতে আলম (সা) তাঁকে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। তিনি যেন হুজুরের (সা) আস্থাভাজন সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন। এমন একজন জালিলুল কদর সাহাবীর নাম বিকৃত করা এবং তার সঙ্গে কল্পকাহিনী সংশ্লিষ্ট করা নিসন্দেহে বড় গুনাহর কাজ।

হযরত আবু তালহা যায়েদ (রা)
বিন সাহাল আনসারী

নবীর (সা) যুগের এক সন্ধ্যাকাল। রহমতে আলম (সা) পতঙ্গবৎ সাহাবীদের (রা) এক দলের মধ্যে বসেছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি খুব পেরেশান অবস্থায় তাঁর খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন মুসাফির। মদীনায় থাকা ও খাওয়ার জন্য আমার কোন ব্যবস্থা নেই। আপনার সাহায্যের মুখাপেক্ষী।"

হুজুর (সা) তৎক্ষণাৎ আজওয়াজে মুতাহহিরাতকে (রা) জিজ্ঞেস করে পাঠালেন যে, ঘরে খাবার কিছু আছে কিনা। সবদিক থেকে জবাব এলো আজ সকলেই অভুক্ত। এ সময় হুজুর (সা) সাহাবীদের (রা) দিকে তাকালেন এবং বললেন ঃ

"এমন কেউ আছে কি যে আল্লাহর এই বান্দাকে মেহমান বানাবে?"

হুজুরের (সা) এই ইরশাদ শুনে গমের রঙের এক হাস্যোজ্জ্বল চেহারার যুবক, যাঁর কপাল ঈমানের আলোয় ঝলমল করছিল উঠে দাঁড়ালেন এবং আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! তাকে আমি সাথে করে নিয়ে যাবো।"

একথা বলেই তিনি বাড়ি গেলেন এবং স্ত্রীকে মেহমান আগমনের খবর অবহিত করলেন। তিনি বললেন ঃ

"বাচ্চাদের জন্য সামান্য খাবার রান্না করেছি। আল্লাহর কসম! এ ছাড়া ঘরে আর কোন খাবার নেই।"

সেই ব্যক্তি বললেন ঃ "কোন অসুবিধা নেই। বাচ্চাদেরকে ভুলিয়ে ভালিয়ে শুইয়ে দাও। যখন তারা ঘুমিয়ে পড়বে তখন আমরা তাদের খাবার মেহমানের সামনে রেখে দেবো। তুমি বাতি ঠিক করার বাহানা করে দাঁড়িয়ে তা নিভিয়ে দিবে। অন্ধকারে মেহমান খাবার খেয়ে নেবেন এবং আমরাও এমনি এমনি মুখ চালাতে থাকবো।"

মোটকথা এভাবে মেহমানকে খাবার খাইয়ে স্বামী স্ত্রী উভয়ে এবং বাচ্চারা অভুক্ত অবস্থায় রাত কাটিয়ে দিলেন। সকালে যখন এই মেযবান হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হলেন তখন রাসূলের যবানে এই আয়াত উচ্চারিত হচ্ছিল ঃ

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ –

"তারা নিজেদের চেয়ে অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। যদিও তারা অভুক্তও থেকে থাকে।"

এবং হুজুর (সা) বলছিলেন ঃ "রাতে মেহমানের সাথে তোমাদের আচরণ আল্লাহ তায়ালা খুব পসন্দ করেছেন।"

হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে তিনি এত খুশী হয়েছিলেন যে, মাটির ওপর তার পা আর থাকছিল না। অন্য একদিনও এই একই ব্যক্তি হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির ছিলেন। এমন সময়

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

"যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ না করবে ততক্ষণ তোমরা অবশ্যই কল্যাণ পাবে না।"

এই আয়াত নাযিল হলো। এই ব্যক্তি মসজিদে নববীর সামনে এক প্রশস্ত, উর্বর এবং সুষমামণ্ডিত বাগানের মালিক ছিলেন। সেই বাগানের "বিরহা" নামক কূপের পানি খুব পরিষ্কার, মিষ্টি ও সুবাসিত ছিল। প্রিয় নবী (সা) এই কূপের পানি খুব উৎসাহের সাথে পান করতেন। মদীনা মুনাওয়ারাতে এই ধরনের সম্পদ খুবই নিয়ামতের বস্তু ছিল। কিন্তু এই ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালেন এবং আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ হলো "বিরহা" আমি আল্লাহর পথে তা ওয়াকফ করছি এবং আল্লাহর কসম। একথা যদি লুকিয়ে রাখা যেত তাহলে আমি তা কখনো প্রকাশ করতাম না।"

আল্লাহর পথে তার খরচের আবেগ দেখে হুজুরের (সা) চেহারা মুবারক খুশীতে ঝলমল করে উঠলো। তার কল্যাণের জন্য দোয়া করলেন এবং বললেন যে, এই সম্পদ তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করে দাও। তিনি তৎক্ষণাত রাসূলের (সা) নির্দেশ তামিল করলেন এবং এই সকল সম্পত্তি নিজের আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

এই সাহাবী (রা) যাঁর নজীরবিহীন ত্যাগ ও কুরবানী আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিল এবং যাঁর কল্যাণের আবেগ রাসূলকে(সা) খুশী করেছিল, তিনি ছিলেন হযরত আবু তালহা যায়েদ (রা) বিন সাহাল আনসারী।

হযরত আবু তালহা (রা) যায়েদ বিন সাহাল খাজরাজের সেই খান্দানের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে ছিলেন যাকে বিশ্ব নবী (সা) আনসারের সকল খান্দানের মধ্যে উত্তম বলে অভিহিত করেছিলেন। অর্থাৎ এই খান্দানটি ছিল বনু নাজ্জার। নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে বাইয়াতে উকবায়ে কাবিরার পূর্বে তিনি ছিলেন একজন সুশ্রী যুবক। রিসালাত সূর্য ফারান পর্বতমালার ওপর দিয়ে উদিত হয়েছিল এবং তার কিরণমালা ইয়াছরাবের ভূখণ্ড পর্যন্ত এসে পড়েছিল। নবুওয়াতের ১১-১২ বছরে ইয়াছরাবের অনেক নেক প্রকৃতির মানুষ মক্কা গিয়ে রাসূলে আকরামের (সা) পবিত্র কদমে স্থান করে নিয়েছিলেন এবং ইসলামের দায়িয়ে আউয়াল হযরত মাসয়াব (রা) বিন উমায়ের তাঁদের দাওয়াতে ইয়াছরাব এসে প্রতিটি ঘরে ইসলামের আলো সম্প্রসারিত করছিলেন। কিন্তু আবু তালহা যায়েদের পানাহার ও নৃত্যগীতের মাহফিল ছাড়া অন্যদিকে মনোযোগ দানের সুযোগই হতো না। তিনি কাঠের এক মূর্তিকে নিজের মা'বুদ বানিয়ে রেখেছিলেন। সেই যুগে তিনি বনু নাজ্জারের এক বিধবা মহিলা উম্মে সুলাইম (রা) বিনতে মিলহানকে নিকাহর পয়গাম পাঠিয়েছিলেন। উম্মে সুলাইম (রা) বেশ কিছুদিন যাবত ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজের পুত্র আনাস (রা) বিন মালিককে লালন পালন করছিলেন। আনাস (রা) বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর আর কোন বন্ধু উম্মে সুলাইমের (রা) দ্বিতীয় নিকাহর পথে বাধা ছিল না। কিন্তু তিনি আবু তালহাকে বলে পাঠালেন ঃ

"আমিতো আল্লাহর সাচ্চা রাসূলের (সা) ওপর ঈমান এনেছি। তোমার জন্য দুঃখ যে তুমি কাঠের মূর্তি পূজা কর। যা কোন লাভ অথবা লোকসান করতে পারে না। আমি হলাম একক আল্লাহর ইবাদাতকারী আর তুমি হলে মূর্তিপূজারী। আমার তোমার মিল কি করে হতে পারে?"

উম্মে সুলাইমের (রা) কথা আবু তালহার অন্তরে বসে গেল। কিছুদিন চিন্তা-ভাবনা করলেন। অতপর হযরত উম্মে সুলাইমের (রা) নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করে ফেললেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণে উম্মে সুলাইম (রা) এত খুশী হলেন যে স্বতস্ফূর্ত তাঁকে বললেন ঃ

"আমি এখন তোমার সাথে নিকাহ বসতে সম্মত আছি। দুনিয়ার মোহর মাফ করে দিচ্ছি এবং নিজের মোহর তোমার ইসলামকে ধার্য করছি।"

অতপর পুত্র আনাসকে (রা) বললেন ঃ "এখন তুমি তাঁর সঙ্গে আমার নিকাহ দিয়ে দাও।"

সুতরাং হযরত আনাস (রা) নিজের মায়ের নিকাহ হযরত আবু তালহার(রা) সঙ্গে পড়িয়ে দিলেন। তিনি বলতেন "আমার মায়ের নিকাহ হযরত আবু তালহার সঙ্গে আশ্চর্য ধরনের মোহরের বিনিময়ে হয়েছিল।"

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আবু তালহার (রা) আনসারের সেই ৭৫ পবিত্র নফসের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় মর্যাদা লাভ ঘটেছিল যারা নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে মক্কা গিয়ে বিশ্ব নবীর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁরা নিজেদের জীবন, ধন-সম্পদ এবং সন্তান দিয়ে রহমতে আলমকে (সা) সাহায্য করবেন। ইতিহাসে এই বাইয়াতকে বাইয়াতে লাইলাতুল উকবা, বাইয়াতে উকবায়ে ছানিয়া এবং বাইয়াতে উকবায়ে কাবিরাহ নামে ডাকা হয়। ইসলামের ইতিহাসে এই বাইয়াত মাইল স্টোনের মর্যাদা রাখে। নেতৃস্থানীয় চরিতকারদের নিকট বাইয়াতে উকবায়ে উলা ও ছানিয়ায় অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের (রা) মর্যাদা খোলাফায়ে রাশেদীন, আজওয়াজে মুতাহহিরাত (রা) এবং প্রথম যুগের মুহাজিরদের পর অন্যান্য সকল সাহাবী (রা) থেকে আফজাল বা সর্বোত্তম।

রাসূলে আকরামের (সা) মদীনা মুনাওয়ারাতে শুভ পদার্পণের কয়েকমাস পর ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এ সময় হযরত আবু তালহাকে (রা) আমিনুল উম্মাত হযরত আবু উবায়দা (রা) ইবনুল জারাহর ভাই বানানো হয়। দ্বিতীয় হিজরীতে বদরের ময়দানে যখন হক ও বাতিলের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয় তখন হযরত আবু তালহা (রা) সেই তিনশ' তের জন হকের জানবাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যাদেরকে "আসহাবে বদর" বা বদরী সাহাবীর মহান উপাধিতে ডাকা হয় এবং যাদের মহান মর্যাদার ব্যাপারে সকল চরিতকারের মধ্যে মতৈক্য রয়েছে।

তৃতীয় হিজরীতে ওহোদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত আবু তালহা (রা) এই যুদ্ধেও অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নেন। ঘটনাক্রমে একটি ভুলের কারণে যখন যুদ্ধের গতি ফিরে গেল তখন তিনি সেই কতিপয় সাহাবীর (রা) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা শেষ পর্যন্ত রহমতে আলমের (সা) চারপাশে দাঁড়িয়ে প্রতিশোধমূলক বীরত্ব প্রদর্শন করতে থাকেন এবং কোন মুশরিককে হুজুর (সা) পর্যন্ত পৌঁছতে দেননি। হযরত আবু তালহা (রা) ঢাল নিয়ে হুজুরের (সা) সামনে দাঁড়িয়েছিলেন এবং অত্যন্ত উৎসাহের সাথে তীরের পর তীর ছুঁড়তে লাগলেন।

তাঁর তীর নিক্ষেপের প্রচণ্ডতার অবস্থা এমন ছিলো যে, পরপর তিনটি ধনু ভেঙ্গে গেল। ইত্যাবসরে প্রিয় নবী (সা) যখনই পবিত্র গরদান উঠিয়ে

কাফেরদের দিকে দেখতেন তখনই আবু তালহা (রা) আরজ করতেন "আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরআন হোক। গরদান উঠিয়ে দেখবেন না। বলা যায় না আপনার গর্দানে কোন তীর লেগে যেতে পারে। আমার বুক আপনার বুকের সামনে রয়েছে।" হুজুরকে (সা) রক্ষা করতে করতে তাঁর একটি হাত অবশ হয়ে গেল। কিন্তু তিনি উঃ র্যন্ত করলেন না। হুজুর (সা) তাঁর আত্মোৎসর্গের আবেগ দেখে খুব খুশী হলেন এবং বললেন ঃ

"সেনাবাহিনীতে আবু তালহার আওয়াজ শত মানুষ থেকেও উত্তম।"

ওহোদের যুদ্ধের পর খন্দকের যুদ্ধে এবং অন্যান্য সকল যুদ্ধেও একজন আবেগোজ্জ্বল মুজাহিদ হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। খায়বারের যুদ্ধে তাঁর উট বিশ্ব নবীর (সা) উটের পাশাপাশি চলছিল। সেই যুদ্ধেই বিশ্ব নবী (সা) তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, খুব উঁচু স্বরে মুসলমানদেরকে গাধার গোশত খাওয়া থেকে নিষেধ করে দাও। খায়বার বিজয়ের পর হুজুর (সা) মদীনা মুনাওয়ারা ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে তাঁর উট হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল এবং বিশ্ব নবী (সা) ও উম্মুল মু'মিন হযরত সুফিয়া (রা) বিনতে হাই সুমাইত উটের ওপর বসেছিলেন। তাঁরা মাটিতে পড়ে যাচ্ছিলেন। হযরত আবু তালহা (রা) নিকটেই ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের উট থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং দৌড়ে হুজুরের (সা) নিকট পৌঁছলেন। তাঁকে পাহারা দিলেন এবং অস্থির চিত্তে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল। আঘাত লাগেনিতো?"

হুজুর (সা) বললেন ঃ না, তবে মহিলার খবর নাও।"

হযরত আবু তালহা (রা) মুখের ওপর রুমাল নিক্ষেপ করে হযরত সুফিয়ার (রা) নিকট পৌঁছলেন এবং তাঁর হাওদা ঠিক করে উটের ওপর বসিয়ে দিলেন।

অষ্টম হিজরীতে হযরত আবু তালহা (রা) সেই ১০ হাজার পুণ্যাত্মার দলে শামিল হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন যাঁরা মক্কা বিজয়ের সময় প্রিয়নবীর(সা) সফরসঙ্গী ছিলেন এবং যাঁদের সম্পর্কে বহু শতাব্দী পূর্বে কিতাবে ইসতিছনাতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল।

মক্কা বিজয়ের পর তিনি নিজের স্ত্রী উম্মে সুলাইমের (রা) সঙ্গে হুনাইনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে তিনি এমন নজীরবিহীন বীরত্ব ও অটলতা প্রদর্শন করেন যে, নিজের আত্মীয় ও অনাত্মীয় সকলেই বিস্মিত হয়ে যান। বনু হাওয়াযিনের পারদর্শী তীরন্দাজরা গুপ্তভাবে বসে এত প্রচণ্ডতার সঙ্গে তীর ও পাথর নিক্ষেপ করেছিলো যে মুসলমানদের ব্যূহসমূহ একদম বিশৃংখল হয়ে

পড়েছিল। সেই সময় যেসব ব্যক্তি বিশ্ব নবীর (সা) সঙ্গে অটল পাথর হয়ে যুদ্ধের ময়দানে অবস্থান নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত আবু তালহাও (রা) ছিলেন। তিনি সেই দিন ২০-২১ জন মুশরিককে জাহান্নামে প্রেরণ করেন। যখন প্রচণ্ড যুদ্ধ হচ্ছিল তখন হযরত উম্মে সুলাইম (রা) খঞ্জর হাতে নিয়ে নবীর (সা) জন্য জীবন কুরবান করার উদ্দেশ্যে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছিলেন এবং হযরত আবু তালহা (রা) হুজুরের (সা) ডাইনে ও বাঁয়ে এমন আত্মহারা হয়ে লড়াই করছিলেন যে, কোন হুঁশ ছিল না। উম্মে সুলাইমের (রা) ওপর নজর পড়তেই হুজুরের (সা) নিকট আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! উম্মে সুলাইম (রা) খঞ্জর হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

হুজুর (সা) উম্মে সুলাইমকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "খঞ্জর দিয়ে কি করবে?"

তিনি জবাব দিলেন "ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন মুশরিক নিকটে এলে তার পেট ফেড়ে ফেলবো।"

হুজুর (সা) তাঁর জবাব শুনে মুচকি হাসি দিলেন।

দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জে হযরত আবু তালহা (রা) রহমতে আলমের (সা) সঙ্গে মক্কা গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি এক মহান নেয়ামত লাভ করলেন। হুজুর (সা) মিনায় মাথা মুণ্ডন করালেন। এ সময় পবিত্র মাথার বাম দিকের সকল পবিত্র চুল তিনি হযরত আবু তালহাকে (রা) প্রদান করলেন। এই নিয়ামত লাভের পর তিনি এতখুশী হয়েছিলেন যে, বারবার আল্লাহর শুকুর আদায় করতেন।

একাদশ হিজরীতে মহানবী (সা) ওফাত পেলেন। তখন হযরত আবু তালহার (রা) ওপর দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়লো। তাসত্ত্বেও সে সময় তিনি এমন এক মর্যাদা লাভ করলেন যে তাঁর কোন জুড়ি নেই। হুজুরের (সা) কবর মুবারক খননের কথা উঠলে সাহাবায়ে কিরামের (রা) দৃষ্টি হযরত আবু তালহা এবং হযরত আবু ওবায়দা (রা) ইবনুল জারাহর ওপর নিপতিত হলো। প্রথমজন বগলী কবর খননে এবং পরের জন সিন্দুকী কবর খননে পারদর্শী ছিলেন। উভয় ব্যক্তিকে এই খেদমত আঞ্জাম দেয়ার জন্য পয়গাম প্রেরণ করা হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে এও সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে, তাঁদের মধ্য থেকে যিনি আগে পৌছবেন তিনিই কবর খনন করবেন। বস্তুত নবী করিম (সা) বগলী কবর পসন্দ করতেন। এ জন্য সাহাবা কেরামের (রা) আন্তরিক কামনা ছিল যেন আবু তালহা (রা) আগে পৌছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের দোয়া কবুল

করলেন এবং হযরত আবু তালহা (রা) আগে পৌছে গেলেন। সুতরাং হুজুরের (সা) স্থায়ী আরামস্থল তৈরীর মর্যাদা তিনিই লাভ করলেন।

হুজুরের (সা) ইন্তেকালের পর হযরত আবু তালহা (রা) সিরিয়া চলে যান এবং সেখানেই আবাস গড়ে তোলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) শাসনকালের এবং হযরত ওমর ফারুকের (রা) শাসনকালের অধিকাংশ সেখানেই তিনি অতিবাহিত করেন এবং সে যুগের অনেক যুদ্ধে একজন আবেগ উদ্বেলিত মুজাহিদ হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। অন্তরে যখনই কোন আবেগ উত্থিত হতো তখনই মদীনা মুনাওয়ারা আসতেন এবং হুজুরের (সা) পবিত্র রওজায় হাজির হয়ে নিজের অস্থির অন্তরের শান্তির সামান সঞ্চয় করতেন। হযরত ওমরের (রা) ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলে ঘটনাক্রমে হযরত আবু তালহা (রা) মদীনায় উপস্থিত ছিলেন। নিজের স্থলাভিষিক্ত নির্বাচনের জন্য ফারুকে আজম (রা) ৬ সদস্যের মজলিশে শুরা মনোনীত করেন। হযরত আবু তালহাকে (রা) ডেকে তার পাহারাদার নিযুক্ত এবং এ প্রসংগে তাঁকে প্রয়োজনীয় ওসিয়ত করলেন। হযরত ওমর ফারুকের (রা) ইন্তেকালের পর তিনি পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে সেই ওসিয়ত পালন করলেন এবং কোন হাঙ্গামা ছাড়া হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রা) খলিফা নির্বাচিত হয়ে গেলেন।

এরপর হযরত আবু তালহা (রা) নির্জনত্ব অবলম্বন করেন এবং নিজেকে সময়ময়ের জন্য আল্লাহর ইবাদাতে ওয়াক্ফ করে দিলেন। একদিন সূরায়ে তাওবা তিলাওয়াত করছিলেন। যখন এই আয়াতে পৌছলেন ঃ

انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم فى سبيل الله

"তোমরা বের হয়ে পড়—হালকাভাবে কিংবা ভারী ভারাক্রান্ত হয়ে। আর জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল সামান ও নিজেদের জান-প্রাণ সঙ্গে নিয়ে।"

তখন অন্তরে জিহাদের উৎসাহের আগুন প্রজ্জলিত হয়ে উঠলো। পরিবার-পরিজনদেরকে নিজের জিহাদে গমনের কথা বললেন। সে সময় তাঁর বয়স প্রায় ৭০ বছর হয়ে গিয়েছিল এবং অধিক রোযা রাখার কারণে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। এ জন্য পরিবার-পরিজনরা তাঁর সফরের বন্দোবস্ত করার প্রশ্নে চিন্তা-ভাবনা করছিলো এবং বললো যে আপনি আপনার জীবনে

অনেক জিহাদ করেছেন। এখন আরাম করুন। আমরা আপনার পক্ষ থেকে জিহাদে গমন করবো। কিন্তু হযরত আবু তালহা (রা) নিজের কথার ওপর অটল রইলেন। অবশেষে ঘরের লোকজন তাঁর নির্দেশ পালন করলো এবং ৭০ বছর বয়সের এই জালিলুল কদর মুজাহিদ আল্লাহর পথে লড়াই করার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। সেই যুগে নৌবাহিনী একটি অভিযানে যাত্রা করছিলো। তিনি তাতে শামিল হয়ে জাহাজে সওয়ার হয়ে গেলেন। বার্দ্ধক্য এবং রোযার আধিক্যে শক্তি আর অবশিষ্ট ছিল না। একদিন যখন তুফানের কারণে জাহাজ প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত হচ্ছিল তখন তাঁর আত্মাপাখী দেহের খাঁচা থেকে উড়ে গেল। সাত দিন পর জাহাজটি কোন এক দ্বীপের কিনারায় গিয়ে লাগলো। সেই সাত দিন লাশ তেমনি পড়েছিল। তাতে সামান্যতম পরিবর্তনও হয়নি। লোকজন শুকনো মাটিতে নেমে সেই দীপেই তাঁর স্থায়ী আরামস্থল বানালেন। ওফাতের সাল সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। এসব রেয়ায়াতের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বস্ত রেওয়ায়াত হলো হযরত আনাস (রা) বিন মালিকের [হযরত আবু তালহার (রা) সতালো পুত্র]। সেই রেওয়ায়াত অনুযায়ী তিনি ৫১ হিজরীতে ওফাত পেয়েছিলেন। এটা ছিল আমীরে মুয়াবিয়ার (রা) শাসনকাল। ধারণা করা হয় যে, হযরত আবু তালহা (রা) সেই নৌ অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন যা আমীরে মুয়াবিয়া (রা) কাসতানতুনিয়া পদানত করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন।

হযরত আবু তালহা (রা) যায়েদ বিন সাহাল আনসারী জালিলুল কদর সাহাবীর (রা) মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। তাঁর ফজিলত ও কামালিয়াতের একটি স্বীকৃত দুনিয়া ছিল। এ জন্য মুহাদ্দিসরা তাঁকে ফুজালায়ে সাহাবার দলে শামিল করেছেন। যদিও তিনি প্রিয় নবীর (সা) বরকতপূর্ণ সুহবতে বছরের পর বছর কাটিয়েছেন তবুও হাদিস বর্ণনার ব্যাপারে খুব সতকর্তা অবলম্বন করেছেন। বস্তুত তাঁর থেকে শুধুমাত্র ৯২টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলে আকরাম (সা) তাঁর ঈমানের জোশ এবং কুরবানীর আবেগের খুব কদর করতেন। তিনিও হুজুরকে (সা) প্রচণ্ডভাবে ভালবাসতেন, তাঁর গৃহে কখনো কোন বস্তু এলে যতক্ষণ পর্যন্ত তা থেকে কিছু রাসূলের (সা) খিদমতে প্রেরণ না করতেন ততক্ষণ শান্তি হতো না। আপাদমস্তক নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ ছিল। এ জন্য হুজুর (সা) তাঁর প্রেরিত অতি সাধারণ জিনিসও গ্রহণ করতেন।

রহমতে আলম (সা) কোন নির্দেশ দিলে তা জীবনের মন্ত্র বানিয়ে নিতেন এবং তা পালন করাকে ঈমানের অংশ হিসেবে মনে করতেন। জীবন চলে যাওয়াকে তিনি বরাশত করতে পারতেন, কিন্তু রাসূলের (সা) শরীরে

সামান্যতম একটা কাঁটা বিদ্ধ হওয়াকেও তিনি সহ্য করতে পারতেন না। ওহোদ ও হুনাইনের যুদ্ধে তিনি এমন জানবাজী ও ফিদাকারীর উদাহরণ সৃষ্টি করেন যে, তা তাঁকে রাসূলের (সা) জন্য জীবন উৎসর্গকারীদের কাতারে এমন এক স্থান প্রদান করে যে, তাতে অন্যরা ঈর্ষা পোষণ করতেন। একবার মদীনায় গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, শত্রুরা হঠাৎ করে হামলা করার জন্য অমুক স্থানে ঘাপটি মেরে বসে আছে। হুজুর (সা) মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বাহাদুর ছিলেন। তিনি হযরত আবু তালহার (রা) নিকট তাঁর ঘোড়া "মানদুব"-কে চেয়ে পাঠালেন এবং তার ওপর সওয়ার হয়ে একাকী ভীতিমূলক স্থানের দিকে রওয়ানা দিলেন। হযরত আবু তালহা (রা) বেচাইন হয়ে গেলেন এবং তাঁর হেফাজতের ধারণায় পিছু পিছু চললেন। কিছুদূর যাওয়ার পর হুজুরকে (সা) ফিরে আসা অবস্থায় পেলেন। তিনি বললেন, "আবু তালহা, সেখানে তো কিছুই নেই। হাঁ, তোমার ঘোড়া খুব দ্রুতগামী।"

মদ হারাম হওয়ার পূর্বে একদিন তিনি উৎকৃষ্ট ধরনের মদ পান করছিলেন। জনৈক ব্যক্তি এসে খবর দিল যে কেবলমাত্র রাসূলের (সা) ওপর অবতীর্ণ আয়াতে মদ পান হারাম করা হয়েছে। আবু তালহা (রা) তৎক্ষণাৎ মদের পাত্র ছুঁড়ে মারলেন এবং সতালো পুত্র আনাসকে (রা) বললেন, মদের এই পাত্র ভেঙ্গে ফেলো। তিনি তা ভেঙ্গে বাইরে নিক্ষেপ করলেন। সেদিন থেকে তিনি মদের নামও শুনতে পারতেন না।

একদিন জানতে পেলেন যে, রাসূলে আকরাম (সা) অভুক্ত রয়েছেন। তাতে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন এবং বাড়ি গিয়ে স্ত্রী উম্মে সুলাইমকে (রা) বললেন, হুজুর (সা) অভুক্ত রয়েছেন। তাঁর জন্য অবিলম্বে খাবার প্রেরণ কর। তিনি পুত্র আনাসকে (রা) কিছু রুটি দিয়ে বললেন, "এক্ষুণি গিয়ে প্রিয় নবীকে (সা) খাবার খাওয়াও।" হুজুর (সা) সে সময় মসজিদে ছিলেন এবং তার চারপাশে অনেক সাহাবীর (রা) ভীড় ছিল। তিনি হযরত আনাসকে (রা) দেখে বললেনঃ

"আবু তালহা তোমাকে পাঠিয়েছেন?"

হযরত আনাস (রা) আরজ করলেন : "অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল।"

হুজুর (সা) জিজ্ঞেস করলেন : "খাওয়ার জন্য?"

তিনি বললেন : "জ্বি হ্যাঁ"।

হুজুর (সা) সকল সাহাবীকে (রা) নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং হযরত আবু তালহার (রা) বাড়ি গেলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন যে, এত মানুষের জন্য তো খাবার হবে না। হযরত উম্মে সুলাইমের (রা) নিকট নিজের সন্দেহের

কথা জিজ্ঞেস করলেন। তখন তিনি বললেন, ব্যাপারটি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (সা) বেশী বোঝেন।" তারপর যে খাবার ছিল তা আবু তালহা (রা) প্রফুল্ল চিত্তে রাসূলে করিম (সা) ও সাহাবীদের (রা) সামনে এনে রাখলেন। আল্লাহ তায়ালা তাতে এতো বরকত দিলেন যে, সকলেই একদম আসুদাহ হয়ে খেলেন। হযরত আবু তালহার (রা) স্ত্রী হযরত উম্মে সুলাইমও (রা) জালিলুল কদর মহিলা সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। পিতার দিক থেকে তিনি রাসূলের (সা) পরদাদী সালমার পুতি ছিলেন। এ কারণে তিনি হুজুরের(সা) খালা হিসেবে মশহুর ছিলেন। জালিলুল কদর সাহাবী খাদেমে রাসূল (সা) হযরত আনাস (রা) তাঁর প্রথম স্বামী মালিক বিন নাজারের ঔরষজাত ছিলেন। বিধবা হওয়ার পর তিনি হযরত আনাসের (রা) বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত একাকী তাঁর লালনপালন করেন। নবীর (সা) হিজরতের পর তিনি তাঁর কিশোর পুত্র আনাসকে (রা) হুজুরের (সা) খাদেম বানিয়ে দিলেন এবং দশটি বছর তিনি তাঁর খাদেম ছিলেন। হযরত আবু তালহা (রা) উম্মে সুলাইমের তাবলীগে মুসলমান হয়েছিলেন এবং তারপর তিনি তাঁকে নিকাহ করেছিলেন। আবু তালহার (রা) ইসলাম গ্রহণ উম্মে সুলাইমের (রা) মোহর নির্ধারিত হয়। মশহুর সাহাবী হযরত ছাবিত (রা) বিন কায়েস আনসারী বলেছেন যে, আমি কোন মহিলার মোহর উম্মে সুলাইমের (রা) মোহর থেকে উত্তম পাইনি।

হযরত উম্মে সুলাইমের (রা) গর্ভে হযরত আবু তালহার (রা) কয়েকটি সন্তান হয়। কিন্তু একমাত্র একটি পুত্র "আবদুল্লাহ" ছাড়া সকলেই শৈশবকালে মারা যান। হযরত আবদুল্লাহ (রা) জন্মগ্রহণ করলে হযরত আবু তালহা (রা) তাঁকে হুজুরের (সা) খিদমতে পেশ করলেন। তিনি খেজুর চিবিয়ে নবজাতককে তার বিচি গালে দিলেন এবং তার নাম রাখলেন আবদুল্লাহ। তিনি বড় হলে স্বয়ং হুজুরে আকরাম (সা) তাকে প্রশিক্ষণ দিলেন এবং তিনি একজন বিরাট জ্ঞানীগুণী হয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহর (রা) মাধ্যমেই হযরত আবু তালহার (রা) বংশধারা অব্যাহত থাকে।

হযরত আবু তালহা (রা) এবং তাঁর খান্দানের লোকজনের সাথে রাসূলে আকরামের (সা) গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি কখনো কখনো হযরত আবু তালহার (রা) বাড়ি তাশরীফ নিতেন এবং দ্বিপ্রহরের সময় সেখানেই আরাম করতেন। আবু তালহার (রা) একটি অল্পবয়স্ক পুত্রের নাম ছিল আবু উমায়ের। সে সুন্দর কণ্ঠস্বরের একটি পাখি পুষতো। হঠাৎ করে পাখিটি মরে গেল। তাতে শিশু আবু উমায়ের খুব কষ্ট পেল। ইত্যবসরে রাসূলে আকরাম(সা)

তাশরিফ রাখলেন। আবু উমায়েরের চেহারা মলিন দেখে হযরত উম্মে সুলাইমকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, "কি ব্যাপার, আজ আবু উমায়ের চুপচাপ যে।" তিনি আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল। আবু উমায়েরের পাখী আজ মরে গেছে। তার সাথে সে খেলা করতো। এ জন্য সে খুব বিষণ্ন।"

হুজুর (সা) আবু উমায়েরকে (রা) কাছে ডাকলেন এবং নিজের স্নেহের হাত তার মাথায় রেখে বললেন, "হে আবু উমায়ের তোমার পাখির কি হয়েছে।"

আবু উমায়ের (রা) হুজুরের (সা) কথা শুনে হেসে দিলেন। অতপর খেলা-ধূলায় মশগুল হয়ে পড়লেন। সে সময় থেকে রাসূলের (সা) এই কথা প্রবাদ বাক্য হিসেবে পরিগণিত হতে লাগলো।

সহীহ মুসলিমে আছে, হযরত আবু তালহার (রা) প্রিয় পুত্র আবু উমায়ের অল্প বয়সে ইন্তেকাল করলো। আবু তালহা সে সময় বাড়ি ছিলেন না। উম্মে সুলাইম (রা) অত্যন্ত ধৈর্য ও স্থৈর্যের সাথে কাজ করলেন এবং আবু তালাহাকে (রা) এই খবর না দেয়ার জন্য বাড়ির সবাইকে বলে দিলেন। রাতে হযরত আবু তালহা (রা) বাড়ি এলেন। উম্মে সুলাইম (রা) তাঁকে খাবার খাওয়ালেন এবং তিনি অত্যন্ত ইতমিনানের সঙ্গে বিছানায় শুলেন। রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হলো। তখন উম্মে সুলাইম (রা) তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, "তোমাকে যদি কোন বস্তু ধার দেয়া হয় এবং পরে তা ফেরত চাওয়া হয়, তাহলে তুমি কি তা দিতে অস্বীকার করবে?"

আবু তালহা (রা) জবাব দিলেন ঃ "অবশ্যই নয়। এ ধরনের কাজ করাতো ইনসাফ বিরোধী।"

উম্মে সুলাইম (রা) বললেন ঃ "তাহলে তোমাকে তোমার পুত্রের ব্যাপারেও ধৈর্য ধরতে হবে। আল্লাহ তায়ালা নিজের আমানত ফেরত নিয়েছেন।"

হযরত আবু তালহা (রা) "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পড়লেন এবং বললেন যে ব্যাপারটি আগে বলোনি কেন।

সকালে ঘুম থেকে উঠে রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে হাজির হলেন এবং সকল ঘটনা বর্ণনা করলেন। হুজুর (সা) বললেন ঃ "গতরাতে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে অনেক বরকত দিয়েছেন।" অথবা অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী হুজুর (সা) এই বলে দোয়া করেছিলেন যে, আল্লাহ তোমাকে এবং উম্মে সুলাইমকে (রা) আবু উমায়েরের বদল নিয়ামত দান করুন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আবি তালহা (রা) এই ঘটনার পর জন্ম নিয়েছিলেন।

নামাযের প্রতি হযরত আবু তালহার (রা) সীমাহীন আকর্ষণ ছিল। এত গভীরভাবে নামায পড়তেন যে, দুনিয়া ও তার সম্পর্কে কোন খবর থাকতো না। মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিকে আছে যে, একদিন বাগানে নামায পড়ছিলেন। একটি পাখী একটি ডাল থেকে উড়ে এসে তাঁর মাথার চারপাশে চক্কর মারতে লাগলো। বাগান ছিল খুব ঘন। পাখিটি বাইরে বেরোবার রাস্তা পাচ্ছিল না। হযরত আবু তালহার (রা) নামাযে বিপত্তি ঘটলো। তিনি ক' রাকায়াত নামায পড়েছেন তা ভুলে গেলেন। নামায শেষ করে তিনি সোজা রাসূলের (সা) নিকট পৌঁছলেন এবং ঘটনা বর্ণনা করে আরজ করলেন যে, এই বাগানের কারণে আমার নামাযে বিপত্তি ঘটলো। এ জন্য তা আমি আল্লাহর পথে ওয়াক্‌ফ করে দিচ্ছি। মোটকথা, হযরত আবু তালহা (রা) ছিলেন মহান চরিত্রের আধার বিশেষ।

হযরত হারিছ (রা) বিন রাবয়ী

রহমতে আলম (সা) একবার কোন এক মরুপ্রান্তরে সফর করছিলেন। তখন রাত। তাঁর চারপাশে ছিলেন এক বিরাট সংখ্যক সাহাবী। সফরকালে হুজুর (সা) কি যেন ধারণা করলেন এবং সাহাবাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে মানুষেরা! পানি সন্ধান করো। নচেৎ সকালে শুকনো ঠোটে জাগবে"।

হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে লোকেরা চমকে উঠলেন এবং পানির সন্ধানে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লেন। কিন্তু জনৈক ব্যক্তির প্রিয় নবীকে (সা) একা ফেলে যাওয়া সহ্য হলো না। তিনি হুজুরের (সা) সওয়ারীর সাথে রইলেন। বিশ্ব নবী (সা) উটের ওপর স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তিনি যখন কোন দিকে ঝুকে পড়তেন তখন সেই ব্যক্তি বিদ্যুৎ গতিতে সামনে অগ্রসর হয়ে ঠেস দিতেন। একবার গভীর তন্দ্রায় নিমগ্ন হলেন এবং কোথায়ও পড়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিল। সে সময় তিনি অগ্রসর হয়ে পূর্ণশক্তি দিয়ে রাসূলকে (সা) পাহারা দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জেগে গেলেন এবং বললেন ঃ "তুমি কে?" তিনি নিজের নাম বললেন। এ সময় হুজুর (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "কখন থেকে আমার সঙ্গে রয়েছ? আরজ করলেন ঃ সূর্য ডোবার সময় থেকে। সারওয়ারে আলম (সা) তাঁর জবাব শুনে খুশী হলেন এবং এই বলে দোয়া দিলেন ঃ "আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করুন, যেভাবে তুমি তার রাসূলকে (সা) রক্ষা করেছ।"

রাসূলের (সা) এই সাহাবী যাঁর নিষ্ঠাপূর্ণ কাজকে রাসূলে আকরাম (সা) প্রশংসা করেছিলেন এবং যাঁর জন্য রাসূলের (সা) যবান থেকে "আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করুন" বাক্য বের হয়েছিলো, তিনি ছিলেন হযরত হারিছ (রা) বিন রাবয়ী আনসারী। ইতিহাসে তিনি আবু কাতাদাহ কুনিয়াতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

সাইয়েদেনা আবু কাতাদাহ হারিছ (রা) বিন রাবয়ীর সম্পর্ক খাজরাজ গোত্রের শাখা বনু সালমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। তাঁর নসবনামা হলো ঃ হারিছ বিন রাবয়ী বিন বালদামা বিন খান্নাস বিন সিনান বিন উবায়েদ বিন আদি বিন গানাম বিন কায়াব বিন সালমা বিন যায়েদ বিন জাছাম বিন খাজরাজ।

মাতার নাম ছিল কাবশা বিনতে মাজহার। তিনিও বনু সালমার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন।

রহমতে আলম (সা) একবার হযরত আবু কাতাদাহকে (রা) সর্বোত্তম অশ্বারোহী হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। এ জন্য তিনি "রাসূলের অশ্বারোহী"র উপাধিতে মশহুর হয়ে যান। নবুওয়াতের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বছরে তিনি মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। আনসারদের মধ্যে যখন ইসলামের সূত্রপাত ঘটলো তখন তিনি অল্প বয়স্ক ছিলেন। তিনি অল্প বয়স অবস্থাতেই দ্বিতীয় বাইয়াতে উকবার পর কোন এক সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এমনিভাবে আনসারদের অগ্রগামী মুসলমানদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য তার ঘটেছিল। বয়স কম হওয়ার কারণে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। তারপর ওহোদ, খন্দক, হুনাইন প্রভৃতি সকল যুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। তিনি একজন ভাল অশ্বারোহী ছিলেন এবং নেযাবাজী ও তরবারী চালনাতেও পূর্ণ মাত্রার পারদর্শীতা রাখতেন। রাসূলের (সা) যুগটি ছিল তাঁর পূর্ণ যৌবনের সময়। যৌবনের গরম রক্ত তাঁর শিরা-উপশিরাতে প্রচণ্ড গতি এনে দিয়েছিল এবং আনসারদের মধ্যে তিনি একজন ব্যূহ ভঙ্গকারী বাহাদুর হিসেবে পরিচিত ছিলেন। মহানবীর (সা) প্রতি ছিল গভীর ভালবাসা। এ জন্য হুজুরের (সা) সামান্যতম ইঙ্গিতেই সবসময় জীবনের বাজী লাগিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকতেন।

৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে আইনিয়া বিন হাসান ফাযারী ৪০ জন সওয়ারী সঙ্গে নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে কয়েকমাইল দূরে (জিকারদ পুকুরের নিকট) গাবাহ নামক চারণভূমিতে হঠাৎ করে হামলা চালালো এবং উটের দলের রাখাল হযরত যার (রা) বিন আবু যার গিফারীকে (রা) শহীদ করে হুজুরের ২০টি দুধালো উটনী হাঁকিয়ে নিয়ে চললো। ঘটনাক্রমে হযরত সালমা (রা) ইবনুল আকওয়া এবং হুজুরের গোলাম হযরত রাবাহ (রা) ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। হযরত সালমা (রা) বিদ্যুতের গতি সম্পন্ন একজন দ্রুতগামী মানুষ ছিলেন। তিনি এই ঘটনা দেখলেন। দীনের প্রতি মর্যাদাবোধ তাঁকে আগুনের শিখায় পরিণত করলো। প্রথমত তিনি নিকটবর্তী একটি টিলার ওপর আরোহণ করে মদীনার দিকে মুখ করে "ইয়া সাবাহাহ"—এই ধ্বনি তুললেন। (আরববাসী মুসিবতের সময় সাহায্য প্রার্থনার জন্য এই ধ্বনি দিতো। তার অর্থ হলো, "হে সকালবেলার মুসিবত।") অতপর হযরত রাবাহকে (রা) ঘোড়ার ওপর সওয়ার করিয়ে হুজুরকে (সা) দেয়ার জন্য মদীনা রওয়ানা করিয়ে দিলেন এবং নিজে একা বৃক্ষের আড়াল থেকে সেই হামলাকারীদের ওপর পাথর এবং তীরের বন্যা

বইয়ে দিল। এমনকি তারা উটনীগুলো রেখে পালিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর সাহায্য নিয়ে পুনরায় এসে উপস্থিত হলো। হযরত সালমা (রা) মুকাবিলায় অটল রলেন। কিন্তু তাঁর জীবন হুমকীর সম্মুখীন হয়ে পড়লো। ওদিকে এই ঘটনার খবর পেতেই বিশ্ব নবী (সা) মুসলমানদেরকে লুটেরাদের পিছু ধাওয়া করার নির্দেশ দিলেন। হুজুরের (সা) নির্দেশ পেতেই হযরত আবু কাতাদাহ(রা), মিকদাদ (রা) ইবনুল আসওয়াদ কিন্দী এবং মুহরিয বিন নাদলাল মুলাক্কাব বিহ আখরাম আসদী (রা) ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে বদ্যুৎ গতিতে ঘটনাস্থলে পৌছলেন। বনু ফাযারার লুটেরারা মুসলমান অশ্বারোহীদেরকে দেখে পালিয়ে গেল। কিন্তু হযরত আখরাম (রা) তাদের পেছনে ধাওয়া করলেন। হযরত সালমা (রা) তাঁর ঘোড়ার বাগডোর ধরে থামালেন। তিনি বললেন, তাড়াতাড়ি করো না। রাসূলুল্লাহ (সা) এবং সাহাবীদের আগমন পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ কর। কিন্তু হযরত আখরাম (রা) তাঁর কথা শুনলেন না এবং বীরত্বের আবেগে সামনে এগিয়ে গেলেন। আবদুর রহমান ফাযারী তাঁকে বাধা দিলো। আখরাম (রা) তার ওপর নেযা দিয়ে পূর্ণভাবে হামলা করলেন। তার ঘোড়া মারা গেল। কিন্তু সে নিজে বেঁচে গেল এবং নিজের নেযা দিয়ে হযরত আখরামের (রা) বুক ছিদ্র করে ফেললো। তিনি শহীদ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। সে এই সময় তাঁর ঘোড়ার ওপর সওয়ার হলো। ঠিক সেই সময় হযরত আবু কাতাদাহ (রা) নিজের ঘোড়া দৌড়িয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। হযরত আখরামকে (রা) রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে তাঁর চোখ দিয়ে রক্ত বের হয়ে এলো। নিজের বর্শা দিয়ে আবদুর রহমানের ওপর এমন হামলা করলেন। মুহূর্তের মধ্যে সে জাহান্নামে প্রবেশ করলো। এমনিভাবে তিনি পলকের মধ্যে হযরত আখরামের (রা) প্রতিশোধ নিলেন। ইত্যবসরে হযরত সালমা (রা) এবং মিকদাদও (রা) তাঁর সঙ্গে এসে মিলিত হলেন এবং এই তিন আত্মোৎসর্গকারী লুটেরাদেরকে নিজেদের বর্শার তীক্ষ্ণ প্রান্তে এনে ফেললো। যখন হুজুরের (সা) প্রেরিত আরো কিছু সওয়ারও পৌছে গেল তখন সেই দুর্বৃত্ত লুটেরারা পালিয়ে গেল। কিন্তু ইসলামের অশ্বারোহীরা সূর্য ডোবা পর্যন্ত তাদের পেছনে ধাওয়া করা অব্যাহত রাখলেন। রাতের অন্ধকার বিস্তারের পর তাঁরা যখন জিকারদ পৌছলেন তখন সেখানে বিশ্ব নবীকে (সা) পাঁচশ' সশস্ত্র জান নিছারের সঙ্গে উপস্থিত পেলেন। হুজুর (সা) সমগ্র ঘটনা শুনে হযরত আবু কাতাদাহ (রা), সালমা (রা) ইবনুল আকওয়া, মিকদাদ (রা) এবং অন্যান্য মুজাহিদের জানবাজীর প্রশংসা করলেন। হযরত আবু কাতাদাহর (রা) ব্যাপারে বললেন, "আবু কাতাদাহ আজ সর্বোত্তম সওয়ার ছিলেন।"

৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে হযরত আবু কাতাদাহর (রা) বাইয়াতে রিদওয়ানে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য লাভ ঘটে এবং তিনি সেই পবিত্র দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা আসহাবুশ শাজারাহ নামে ডেকেছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় নিজের সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

অষ্টম হিজরীর শা'বান মাসে মহানবী (সা) খবর পেলেন যে বনু গাতফানের লোকজন নাজদের খুজরাহ নামক স্থানে বৈঠক করেছে। তারা মদীনার ওপর হামলার পরিকল্পনা আটছে। বনু গাতফান ছিল পেশাদার লুটেরা। এর পূর্বেও তারা কয়েকবার মদীনার উপকণ্ঠে অতর্কিতে হামলা চালিয়েছে। হুজুর (সা) পনেরো ব্যক্তির একটি দল দিয়ে হযরত আবু কাতাদাহকে (রা) তাদের শাস্তি দানের জন্য প্রেরণ করলেন। হযরত আবু কাতাদাহ (রা) মদীনা থেকে খুজরাহ পর্যন্ত অত্যন্ত সন্তর্পণে এমন সর্তকতার সঙ্গে অতিক্রম করলেন যে দুশমনের কান পর্যন্তও সে খবর পৌছলো না। যখন তিনি হঠাৎ করে গাতফানী দুর্বৃত্তদের মাথার ওপর গিয়ে পৌছলেন তখন তারা বিচলিত হয়ে পড়লো। কিছু লোক বাধা দানের চেষ্টা করলো। কিন্তু শীঘ্রই সাহস হারিয়ে ভেগে গেল। হযরত আবু কাতাদাহ (রা) প্রচুর গণিমতের মাল পেলেন। তার মধ্যে অনেক কয়েদী ছাড়া দু'হাজার বকরী এবং দু'শ উটও ছিল। তিনি তার এক-পঞ্চমাংশ বের করে অবশিষ্ট সব মুজাহিদদের মধ্যে সমান সমান বন্টন করে দিলেন। এই ঘটনাকে সারিয়্যায়ে মাহারিব বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। দু'সপ্তাহের মধ্যে এই অভিযান থেকে ফারেগ হয়ে হযরত আবু কাতাদাহ (রা) মদীনা পৌছলেন। হুজুর (সা) কিছুদিন পর তাঁকে আট ব্যক্তির একটি গ্রুপ দিয়ে বাতেন আখামের দিকে রওয়ানা করে দিলেন। স্থানটি মদীনা থেকে তিন মনযিল দূরে মক্কার রাস্তায় অবস্থিত। সে সময় হুজুর (সা) মক্কায় তাওহীদের ঝাণ্ডা উত্তোলনের মজবুত ইচ্ছা করে ফেলেছিলেন। কিন্তু তিনি মক্কার মুশরিকদেরকে হঠাৎ করে ঘিরে ফেলতে চেয়েছিলেন। এই অভিযান প্রেরণের লক্ষ্যও তাই ছিল। যাতে লোকজনের দৃষ্টি এদিকেই থাকে এবং মক্কায় সামরিক অভিযানের ব্যাপারে কেউ ধারণাও করতে না পারে। হযরত আবু কাতাদাহ (রা) নিজের দলসহ জি খাশাব নামক স্থানে পৌছলেন। এ সময় তাঁরা খবর পেলেন যে, বিশ্ব নবী (সা) হকের প্রতি জীবন উৎসর্গকারীদের একটি সৈন্যবাহিনীসহ মক্কার দিকে রওয়ানা হয়ে গেছেন। সুতরাং হযরত আবু কাতাদাহ (রা) সঙ্গীদেরসহ সুফিয়া নামক স্থানে হুজুরের (সা) খিদমতে পৌছে গেলেন। এমনিভাবে তাঁর সেই দশ হাজার পবিত্র নফসের মধ্যে শামিল হওয়ার মর্যাদা লাভ ঘটলো যারা আরবের কেন্দ্র মক্কায়

ইসলামের ঝাণ্ডা বুলন্দ করে সমগ্র আরবে হকের কথা জারী করে দিয়েছিলেন।

মক্কা বিজয়ের পর অষ্টম হিজরীর শওয়াল মাসে হুনাইনের রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধের শুরুতে বনু হাওয়াযিনের পারদর্শী তীরন্দাজরা নিজেদের খাত থেকে এমন প্রচণ্ডভাবে তীর বর্ষণ শুরু করলো যে, মুসলমানদের ব্যূহ বিশৃংখল হয়ে পড়লো এবং ওহোদের যুদ্ধের দৃশ্যের অবতারণা হয়ে গেল। সেই নাযুক মুহূর্তে রহমতে আলম (সা) ধৈর্য ও স্থৈর্যের অটল পাহাড়ের মত যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে রইলেন। শুধুমাত্র কতিপয় জান নিছার তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন কাতাদাহ (রা)। তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দানে বীরত্ব প্রদর্শন করতে থাকেন। যুদ্ধে এমন এক সময় এলো যে, একেকজন মুসলমান ও মুশরিক পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লো। অন্য একজন মুশরিক পেছন দিক থেকে মুসলমানদের ওপর হামলা করতে চাইলো। হযরত আবু কাতাদাহ তৎক্ষণাৎ বিদ্যুত বেগে অগ্রসর হলেন এবং সেই মুশরিকের ওপর তরবারী দিয়ে এমন এক কোপ মারলেন যে তার হাত কেটে দূরে গিয়ে পড়লো। লোকটি খুব তেজস্বী ও শক্তিশালী ছিল। অন্য হাত দিয়ে হযরত আবু কাতাদাহকে জাপটে ধরলো এবং কাহিল করে ফেললো। কিন্তু আবু কাতাদাহ (রা) ছিলেন খুব হিম্মতওয়ালা। সুযোগ পেয়ে নিজের খ র তার পেটে ঢুকিয়ে জাহান্নামে প্রেরণ করলেন এবং নিজে অন্য দিকে চলে গেলেন। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণরত মক্কার এক ব্যক্তি দেখলো যে আবু কাতাদাহ (রা) সরে গেছে তখন সে নিহত মুশরিকের সামান না নিয়ে নিজের কব্জায় নিয়ে নিল। ইত্যবসরে অন্যমুসলমানরাও উল্টে হামলা চালালো এবং মুশরিকদেরকে বর্শা ও তরবারীর খোরাক বানিয়ে ছাড়লো। শীঘ্রই মুশরিকরা পরাজয়ের স্বাদ গ্রহণে বাধ্য হলো এবং আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে সফল ও বিজয়ী করলেন। যুদ্ধের পর রাসূলে আকরাম (সা) ঘোষণা দিলেন যে, কোন মুসলমান যদি কোন মুশরিককে হত্যা করে থাকে তাহলে সে যেন তার প্রমাণ পেশ করে। তাহলে নিহত ব্যক্তির সামান তাকেই দেয়া হবে। হযরত আবু কাতাদাহ (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "আমি একজন মুশরিককে হত্যা করেছি। কে আছ যে আমার কথার সত্যতা স্বীকার করবে।" লোকজন চুপ মেরে রইলো। তিনি তিনবার এই ঘোষণা দিলেন। কিন্তু কেউই কোন জবাব দিল না। বিশ্ব নবী (সা) বললেন ঃ

"আবু কাতাদাহ (রা) কি ব্যাপার?" তিনি সমগ্র কাহিনী বর্ণনা করলেন। এ সময় এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো এবং আরজ করলো "হে আল্লাহর রাসূল। সেই

সামান আমার নিকট আছে। কিন্তু আবু কাতাদাহকে রাজী করিয়ে তা আমাকে দিইয়ে দিন।"

হযরত আবু বকর সিদ্দীকও (রা) সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন ঃ

"এটা ইনসাফের কথা নয়। কারণ, মুশরিককে মারবে আল্লাহর একজন বাঘ। আর তার মালের ওপর কব্জা জমিয়ে রাখবে মক্কার একজন কুরাইশী।"

রহমতে আলম (সা) হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) রায়ের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করলেন এবং সেই সামান আবু কাতাদাহকে (রা) দেয়ালেন। তিনি তা বিক্রয় করে বনু সালমার মহল্লায় একটি বাগান ক্রয় করলেন।

একাদশ হিজরীতে মহানবী (সা) ওফাত পেলেন। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খলিফা নির্বাচিত হলেন। এ সময় হঠাৎ করে সমগ্র আরবে ধর্মদ্রোহিতার ফিতনা ছড়িয়ে পড়লো। সিদ্দীকে আকবর (রা) এই ফিতনা নির্মূলের জন্য বিভিন্ন এলাকায় ১১টি বাহিনী প্রেরণ করলেন। হযরত আবু কাতাদাহ (রা) সেই বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। এই বাহিনীর নেতৃত্ব করছিলেন হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ। হযরত খালিদ (রা) প্রথমে তোলায়হা বিন খুয়ায়েলদ আসাদীকে পরাজিত করলেন। তারপর বাতাহ পৌছে মালিক বিন নুয়াইরাহ ইয়ারবুয়ীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। কিছুদিন পূর্বে মালিক সাজাহ বিনতে হারিছকে (মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার) সমর্থন করেছিল। কিন্তু পরে সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। হযরত খালিদ (রা) মুসলমানদের একটি দল এলাকার বিভিন্ন গ্রামের দিকে প্রেরণ করেন এবং তাদেরকে এই বলে হেদায়াত দেন যে, তারা যে বস্তিতে পৌছবে সেখানে প্রথমে আযান দেবে। জবাবে যদি সেই বস্তির মানুষও আযান দেয় তাহলে তাদের সাথে কোন সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না। যদি আযানের জবাব না দেয় অথবা তোমাদের বাধা দেয় তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে।

এই দল টহল দিতে দিতে মালিক বিন নুয়াইরাহর বস্তির নিকটে পৌছলো এবং আযান দিলো। এ সময় বস্তিবাসীর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য হয়ে গেল। কিছু মানুষ বলতে লাগলো যে, জবাবে আমরা আযানের আওয়াজ শুনেছি। অন্যরা বলছিল যে, বস্তিবাসীরা কোন জবাব দেয়নি। সুতরাং তারা মালিক বিন নুয়াইরাহ এবং তার কতিপয় সাথীকে গ্রেফতার করে ইসলামী বাহিনীতে পৌছে দিল। হযরত খালিদের (রা) সামনে ব্যাপারটি পেশ করা হলে তিনি তাদেরকে হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিলেন

এবং আগামীকাল সকালে তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে উল্লেখ করলেন। রাতে প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়েছিল। হযরত খালিদ (রা) সৈন্যবাহিনীতে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, কয়েদীদেরকে তাপে রাখো। কতিপয় আবর গোত্রের ভাষায় এই বাক্যের অর্থ কয়েদীদেরকে হত্যা করো—এও হতো। মশহুর সাহাবী হযরত জিরার (রা) বিন আযওয়ার এই অর্থেই বুঝেছিলেন এবং মালিক বিন নুয়াইরাহ এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে হত্যা করে ফেললেন। হযরত আবু কাতাদাহর (রা) নিকট এই হত্যাকাণ্ড খুবই অসহনীয় ব্যাপার ছিল। তাঁর ধারণা ছিল যে, মালিক বিন নুয়াইরাহর বস্তি থেকে আযানের আওয়াজ এসেছিল। এ জন্য তিনি ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য ছিলেন। সুতরাং তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে সোজা সিদ্দীকে আকবারের (রা) খিদমতে মদীনা পৌঁছলেন এবং খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন যে, তিনি মালিক বিন নুয়াইরাহকে হত্যা করিয়েছেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) হযরত খালিদকে (রা) মদীনায় ডেকে জবাব তলব করলেন। তিনি সকল ঘটনা বর্ণনা করলেন। সিদ্দীকে আকবার (রা) তাঁর ওজর কবুল করে নিলেন। এ সময় হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত কাতাদাহর (রা) বক্তব্য সমর্থন করলেন এবং হযরত খালিদকে (রা) অপসারণের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) একথা বলে মুয়াম্মিলা শেষ করে দিলেন যে, যে তরবারী আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের ওপর নিপতিত করেছেন তা আমি খাপে ঢুকাতে পারবো না।

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতকালের পর হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর খিলাফতকালেই হযরত আবু কাতাদাহর (রা) নাম স্পষ্টভাবে সামনে এসেছে। হযরত ওমর ফারুকের (রা) আমলে কোন জিহাদে কি তিনি অংশ নিয়েছিলেন? চরিতগ্রন্থসমূহ এ ব্যাপারে নীরব। সম্ভবত এ সময়ে তিনি মদীনায় চুপচাপ কাটিয়ে দেন। কেননা সাহাবায়ে কিরামের (রা) একটি দল এমন ছিলেন যারা আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুকের (রা) ইঙ্গিতে ধৈর্যের সাথে মদীনায় অবস্থান করছিলেন। হযরত আলী (রা) হযরত আবু কাতাদাহকে (রা) মক্কার আমীর পদে অধিষ্ঠিত করান। কিন্তু কিছুদিনের জন্য তার স্থলে কাছাম বিন আব্বাসকে (রা) এই পদ সোপর্দ করেন। উষ্ট্র ও সিফ্ফীনের যুদ্ধে হযরত আলীর (রা) পক্ষ থেকে হযরত কাতাদাহ (রা) অংশগ্রহণ করেন। ৩৮ হিজরীতে খারেজীদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। নাহারোয়ান নামক স্থানে খারেজী (তাদের নেতৃত্ব করছিল আবদুল্লাহ বিন ওয়াহাব রাসেবী) এবং হযরত আলীর (রা) বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত

হলো। এই যুদ্ধে হযরত আবু কাতাদাহকে (রা) হযরত আলী (রা) পদাতিক বাহিনীর অফিসার বানান। তিনি বীরত্বপূর্ণ হামলার মাধ্যমে খারেজীদের মত প্রচণ্ড যুদ্ধবাজদের মুখ ভেঙ্গে দিয়েছিলেন এবং সে সময়েও দৃঢ় ও অটল রইলেন যখন খারেজীদের অব্যাহত ভয়াবহ হামলায় হযরত আলীর (রা) সৈন্যের সওয়ারীদের পা টলমল করে উঠলো। হযরত আবু কাদাতাহ (রা) কায়েস বিন সায়াদ (রা), কায়েস (রা) বিন মাবিয়া এবং তাঁদের মত অন্য জানবাজদের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় পরিস্থিতি অনুকূলে এলো। প্রচণ্ডযুদ্ধের পর খারেজী বাহিনী নাস্তানাবুদ হয়ে গেল।

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবু কাতাদাহ (রা) হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর খিলাফতকালে (৪০ হিজরী) ওফাত পান। কিন্তু ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন, তিনি ৫০ ও ৬০ হিজরীর মধ্যবর্তী কোন সময়ে পরকালে যাত্রা করেন। আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) লিখেছেন, মৃত্যুকালে তাঁর চার পুত্র ছিলেন। তাঁরা হলেন ঃ আবদুল্লাহ, মা'বাদ, আবদুর রহমান ও হাবিত। তাঁর স্ত্রীর নাম হলো সালাফাহ (রা)। তিনি ছিলেন মশহুর সাহাবী হযরত বারা' (রা) বিন মা'রুর আনসারীর কন্যা। তিনি নিজেও সাহাবীয়া ছিলেন। হযরত আবু কাতাদাহ মহান সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। তাঁর থেকে ১৭০টি হাদিস বর্ণিত আছে।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে, হযরত আবু কাতাদাহ (রা) একবার জনৈক ব্যক্তিকে করজেহাসানা দিয়েছিলেন। নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর নিজের দেয়া অর্থ ফেরত চাইতে গেলেন কিন্তু সেই ব্যক্তি লুকিয়ে রইলেন। কয়েকবার এ রকম ঘটলো। একদিন সেই ব্যক্তি বাড়ি ছিল। তিনি তাকে ডাকলেন। সে চুপ মেরে রইলো। ইত্যবসরে তার শিশু পুত্র বাইরে এলো। তাকে জিজ্ঞেসের পর বললো, বাড়িতেই আছেন এবং খাবার খাচ্ছেন।

তিনি উচ্চস্বরে ডাকলেন, "আমি জেনে ফেলেছি যে তুমি খাচ্ছো এখন বের হয়ে এসো। লুকিয়ে থেকে কোন লাভ নেই।"

সেই ব্যক্তি বাইরে এলেন। তখন জিজ্ঞেস করলেন ঃ "আমি বার বার আসছি আর তুমি আমার সাথে সাক্ষাত করতে ইতস্তত করছো। এর কারণ কি?"

তিনি জবাব দিলেন ঃ "নিজের মুসিবতের কথা অন্যের নিকট বলা ঠিক নয়। বাস্তব কথা হলো, আমি নিজের মুসিবতকে দুনিয়া থেকে লুকিয়েছিলাম। আমার অবস্থা এখন খুবই খারাব। পরিবার-পরিজন লালন-পালনও খুব কষ্টের সঙ্গে করছি। আমার নিকট যদি কিছু থাকতো তাহলে করজ চুকিয়ে দিতাম।"

হযরত আবু কাতাদাহ (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "আল্লাহর কসম, সত্যি কি তোমার অবস্থা এই?"

তিনি ইতিবাচক জবাব দিলেন। তখন হযরত আবু কাতাদাহর (রা) চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো এবং বললেন ঃ "আল্লাহর কসম, আমি তোমার থেকে কিছু নেবো না। যাও, আমি তোমার ঋণ মাফ করে দিলাম।"

একবার বিশ্ব নবীর (সা) সামনে এক আনসারীর জানাযা আনা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মৃত ব্যক্তির কোন ঋণ নেই তো? লোকজন আরজ করলো, "হে আল্লাহর রাসূল! সে মাত্র দু'দিনার ঋণী।" হুজুর (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "সে মৃত্যুর সময় কোন সম্পত্তি রেখে গেছে কি?" লোকজন নেতিবাচক জবাব দিল। তিনি বললেন, তোমরা নামায পড় (আমি ঋণী ব্যক্তির জানাযার নামায পড়াতে পারি না)।

সঙ্গে সঙ্গে হযরত আবু কাতাদাহ (রা) সামনে অগ্রসর হয়ে আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! মৃত ব্যক্তির ঋণ যদি আমি আদায় করি, তাহলে কি আপনি নামায পড়াবেন?

হুজুর (সা) বললেন, "হাঁ।"

হযরত আবু কাতাদাহ (রা) সেই সময়ই গিয়ে মরহুম মুসলমানটির ঋণ আদায় করে দিলেন এবং হুজুরকে (সা) এই খবর পাঠালেন। তারপর হুজুরের (সা) ইতমিনান হয়ে গেল এবং তিনি জানাযা তলব করে নামায পড়ালেন।

হযরত আবু কাতাদাহ (রা) একবার নিজের বিবাহিত পুত্রের বাড়ি গেলেন। নামাযের সময় হলে পুত্রবধু ওজুর পানি এনেদিল। ইতিমধ্যে একটি বিড়াল এলো এবং ওজুর পাত্রে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে লাগলো। অন্য কেউ হলে বিড়ালকে মেরে তাড়িয়ে দিত। কিন্তু হযরত আবু কাতাদাহ (রা) পানির পাত্র আরো কাত করে দিলেন। যাতে বিড়াল আসানীর সাথে নিজের পিপাসা নিবৃত্ত করতে পারে। দৃষ্টি ওপরের দিকে ওঠালেন। দেখলেন পুত্র বধু বিস্ময়ের সাথে এই তামাশা দেখছে। তিনি বললেন, "বেটি, এতে বিস্ময়ের কি আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "বিড়াল অপবিত্র পশু নয়। সেতো ঘরে গমনাগমনকারী পশু।"

তিনি এতো সরল ছিলেন কদাচিৎই চুলে চিরুনী করতেন। অথচ ঘাড় পর্যন্ত চুল ছিল। একবার হুজুর (সা) তাঁর বিশৃংখল চুল দেখে বললেন ঃ

"আবু কাতাদাহ (রা) নিজের চুল ঠিক করো। কেউ যদি তার চুলের খবর নিতে না পারে তাহলে তার উচিত মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলা।"

সহীহ বুখারীতে আছে যে, হযরত আবু কাতাদাহ (রা) শিকারে খুব উৎসাহী ছিলেন। একবার মক্কা মুয়াজ্জামার সফরে রাসূলের (সা) সঙ্গে ছিলেন। পথিমধ্যে কতিপয় সাথী নিয়ে বের হয়ে গেলেন এবং নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে আরোহণ করলেন। সেখানে একটি বন্য গাধা নজরে এলো। যেহেতু সঙ্গীরা ইহরাম বেঁধে ছিলেন। এ জন্য বর্শা নিয়ে একাই গর্ধভের পিছনে দৌড়ে গেলেন এবং তা শিকার করে ছাড়লেন। কোন সঙ্গীই তা উঠিয়ে আনার ব্যাপারে সাহায্য করলেন না। একাই তা উঠিয়ে আনলেন এবং নিজেই তার গোশত পাকালেন। কিছু সাহাবী এই গোশত খেলেন না আবু কাতাদাহ (রা) হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন ঃ

"তা খাওয়া জায়েজ। তোমরা অবশ্যই খাবে। আল্লাহ তোমাদের জন্যই প্রেরণ করেছেন। থাকলে আমার জন্যও আনো।

হযরত আবু কাতাদাহ (রা) হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে খুব খুশী হলেন এবং শিকারের গোশত তাঁর খিদমতে পেশ করার সৌভাগ্য লাভ করলেন।

হযরত আবু কাতাদাহ (রা) অত্যন্ত বাগ্মীতার ধাঁচে লোকদেরকে নৈতিক শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, আমি রাসূল (সা) থেকে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি লোকদেরকে পানি পান করাবে, তার উচিত সবার শেষে পান করা। কোন ব্যক্তি যেন ডান হাত দিয়ে ইস্তিনজা না করে এবং পানির পাত্রে ফুঁ না দেয়। এমনিভাবে তিনি মহানবীর (সা) অনেক ইরশাদ উম্মত পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। যার ওপর আমল করলে দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। সহীহ বুখারী

২। সহীহ মুসলিম

৩। মুয়াত্তা ইমাম মালিক

৪। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল

৫। ফতুহুশ শাম—ওয়াকেদী

৬। ফতুহুল আজম—ওয়াকেদী

৭। তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক—তাবারী

৮। উসুদুল গাব্বাহ—ইবনে আছির (র)

৯। তারিখুল কামিল—ইবনে আছির (র)

১০। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া—ইবনে কাছির (র)

১১। আস সিরাতুন নববিয়া—ইবনে হিশাম (র)

১২। তাবাকাত—ইবনে সায়াদ কাতিবুল ওয়াকেদী

১৩। কিতাবুল ইসাবাহ—হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র)

১৪। আল ইস্তিয়াব—হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র)

১৫। রিয়াদুস সালেহীন—ইমাম নববী (র)

১৬। আল আখবারুত তাওয়াল—আবু হানিফা দিনাওয়ারী

১৭। সিরাতুন নবী (সা)—শিবলী নো'মানী (র)

১৮। আসহাবে বদর—কাজী মুহাম্মাদ সুলায়মান মনসুরপুরী

১৯। তরজুমানুস সুন্নাহ—মাওলানা বদরে আলম মিরাঠি

২০। সিরতে কুবরা—আবুল কাসেম রফিক দিলাওয়ারী

২১। আল মাশাহিদ—হাকিম রহমান আলী খান

২২। তাজকিরায়ে হুফফাজে শিয়া—সাইয়েদ আলীনকী

২৩। মুহাজিরিন (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)—শাহ্ মঈনুদ্দীন আহমদ নদবী (র)

২৪। সিয়ারে আনসার (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)—মাওলানা সাঈদ আনসারী

২৫। সিয়ারুস সাহাবা (সপ্তম খণ্ড)—শাহ্ মুঈনুদ্দীন আহমদ (র)

২৬। আল ফারুক—শিবলী নো'মানী (র)

২৭। গোলামানে ইসলাম—মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবারাবাদী

২৮। তারিখে ইসলাম—আকবার শাহ খান নজিব আবাদী

২৯। উসওয়ায়ে সাহাবা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)—মাওলানা আবদুস সালাম নদবী (র)

৩০। তারিখে ইসলাম—শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নদবী (র)

৩১। হায়াতুস সাহাবা (রা)—মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ কান্ধুলভী (র)

৩২। তারিখে ইসলাম—মুন্সী গোলাম কাদের ফসিহ।

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- **তাফহীমুল কুরআন (১-১৯ খণ্ড)**
  –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- **তরজমায়ে কুরআন মজীদ (এক খণ্ডে)**
  –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- **তাদাব্বুরে কুরআন (১-২ খণ্ড)**
  –মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী
- **শব্দে শব্দে আল কুরআন (১-১ ৪খণ্ড)**
  –মাওলানা মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান
- **সহীহ আল বুখারী (১-৬ খণ্ড)**
  –আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী র.
- **সুনান ইবনে মাজা (১-৪ খণ্ড)**
  –আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা র.
- **শারহু মাআনিল আছার (তাহাবী শরীফ) (১-২ খণ্ড)**
  –ইমাম আবু জাফর আহমাদ আত-তাহাবী র.
- **সীরাতে সরওয়ারে আলম (১-২ খণ্ড)**
  –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- **মহানবীর সীরাত কোষ**
  –খান মোসলেহ উদ্দীন আহমদ
- **বিশ্বনবীর মোযেজা**
  –ওয়ালিদ আল আযমী
- **হযরত আবু বকর রা.**
  –মুহাম্মদ হুসাইন হাইকল
- **শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দা'য়ী ইলাল্লাহ**
  –মুহাম্মদ নূরুজ্জমান
- **মাওলানা মওদূদীকে যেমন দেখেছি**
  –অধ্যাপক গোলাম আযম
- **মুন্সী মেহেরউল্লা ঃ জীবন ও কর্ম**
  –নাসির হেলাল

৫

বিশ্ব নবীর সাহাবী

তালিবুল হাশেমী

বিশ্বনবীর সাহাবী

৫ম খণ্ড

তালিবুল হাশেমী

অনুবাদ ঃ আবদুল কাদের

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা-চট্টগ্রাম-খুলনা

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন-২৩ ৫১ ৯১

আঃ প্রঃ ২১৮

১ম সংস্করণ
রবিউল আউয়াল ১৪১৭
ভাদ্র ১৪০৩
আগস্ট ১৯৯৬

বিনিময় ঃ ১০৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

BISHA NABIR SAHABI 5th Volume by Talibul Hashemy.
Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane,
Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price: Taka 105.00 Only

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। 'বিশ্বনবীর সাহাবী'র পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হলো। নানাবিধ কারণে খণ্ডটি প্রকাশে বিলম্ব ঘটলো। এজন্যে পাঠকের কাছে আমরা ক্ষমা প্রার্থী।

এ খণ্ডে ৩৯জন সাহাবীর জীবনী স্থান পেয়েছে। নক্ষত্র স্বরূপ সাহাবীদের জীবন আমাদের জীবনে আলোকবর্তিকার ভূমিকা পালন করুক, এটাই আমাদের কামনা।

অনুবাদের ক্ষেত্রে এবং মুদ্রণজনিত কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সহৃদয় পাঠকবর্গ তা অবশ্যই আমাদের গোচরীভূত করবেন। পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ তা শুধরে নেয়ার চেষ্টা করা হবে। আল্লাহ পাক আমাদের এই প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

ঢাকা, ১২ আষাঢ়, ১৪০৩ সাল।
৯ সফর, ১৪১৭ হিজরী।
২৬ জুন, ১৯৯৬ সন।

বিনায়াবনত
আবদুল কাদের

সূচীপত্র

১. হযরত আবু উবায়দাহ (রা) ইবনুল জাররাহ ৭
২. হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস ২৮
৩. হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফুজ জুহরী ৫৭
৪. হযরত তালহাতাল খায়ের (রা) ৮২
৫. হযরত জাফর তাইয়ার (রা) ১০২
৬. হযরত উমায়ের (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস ১১৯
৭. হযরত আমের (রা) বিন ফুহায়রা ১২১
৮. হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা) মাহবুবে রাসূল (সা) ১২৬
৯. হযরত শামমাছ (রা) বিন ওসমান মাখযুমী ১৩৯
১০. হযরত হাশিম (রা) বিন উতবা ১৪৩
১১. হযরত আমের (রা) বিন রবিয়াতাল আনযি ১৫১
১২. হযরত সোহায়েল (রা) বিন বাইজা ফাহরী ১৫৫
১৩. হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাব ১৫৭
১৪. হযরত আবু ফাকিহা ইয়াসার ইযদি (রা) ১৬৪
১৫. হযরত আবু কায়েস (রা) বিন হাবিছ সাহমী ১৬৬
১৬. হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন হুজাফা সাহমী ১৬৮
১৭. হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদ উমুব্বী ১৭৪
১৮. হযরত আখরাস আসাদী (রা) ১৮৪
১৯. হযরত মা'মার (রা) বিন আবদুল্লাহ আদভী ১৮৮
২০. হযরত আয়াশ (রা) বিন আবি রবিয়া ১৯১
২১. হযরত সালামা (রা) বিন হিশাম ১৯৩
২২. হযরত ওয়ালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ ১৯৪
২৩. হযরত ওহাব (রা) বিন কাবুস মুযনি ১৯৮
২৪. হযরত জুল বিজাদাইন (রা) ২০২
২৫. হযরত বুরাইদা (রা) বিন হুসাইব আসলামী ২০৭
২৬. হযরত নাঈম (রা) বিন মাসউদ আশজায়ী ২১৪
২৭. হযরত উরওয়া (রা) বিন মাসউদ ছাকাফী ২২৬
২৮. হযরত আমের (রা) বিন আকওয়া ২৩২
২৯. হযরত আসলাম হাবশী (রা) ২৩৪

৩০. হযরত আবু মাহযুরা (রা) জুমারী ২৩৬
৩১. হযরত হারিছ (রা) বিন হিশাম মাখযুমী ২৪০
৩২. হযরত নাওফাল (রা) বিন হারিছ হাশেমী ২৪৫
৩৩. হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আরকাম যুহরী ২৪৮
৩৪. হযরত আবু মিহজান ছাকাফী (রা) ২৫০
৩৫. হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মুগাফ্ফাল মুযনি ২৫৮
৩৬. হযরত হানজালা (রা) বিন রুবাই তামিমী ২৬৫
৩৭. হযরত আমর (রা) বিন মুররাহ জুহানী ২৬৯
৩৮. হযরত সায়াদুল আসওয়াদ সাহামী (রা) ২৭৫
৩৯. হযরত সূরাকা (রা) বিন জুশামু মুদলিজী ২৭৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হযরত আবু উবায়দাহ (রা) ইবনুল জাররাহ

অষ্টম হিজরীর কথা। মক্কা মুয়াজ্জামায় ইসলামের পতাকা পত পত করে উড়ছে। হুনাইনের যুদ্ধে বনু হাওয়াযিনের শিক্ষণীয় পরাজয় ঘটেছে। এ সময় সমগ্র আরব গোত্রে ইসলামের শক্তি ও জাঁকজমকের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে এবং আরবের প্রতিটি কোণ থেকে বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধি দল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে বিশ্বনবীর (সা) দরবারে উপস্থিত হচ্ছেন। কেউবা আসছেন ইসলাম গ্রহণের জন্য। আবার কেউ আসছেন সন্ধি ও নিরাপত্তা চুক্তির জন্য। নবম হিজরীতে এত বেশি সংখ্যক প্রতিনিধি দল এসেছিলেন যে, সেই বছরের নামই হয়ে যায়, "আমুল ওফুদ" বা প্রতিনিধি দলসমূহের বছর। সেই প্রতিনিধি দলে নাজরানবাসীর প্রতিনিধি দলও ছিল। ইসলামের ইতিহাসে এই প্রতিনিধি দলের অসাধারণ খ্যাতি রয়েছে। নাজরান মক্কা মুয়াজ্জামা থেকে ইয়েমেনের পথে সপ্তম মঞ্জিলে এক প্রশস্ত জেলার নাম। সেখানে আরব বংশোদ্ভূত খৃস্টানরা বাস করতেন। তারা নাজরানে এক আজিমুশ্বান গীর্জা বানিয়ে রেখেছিলেন। আরব জগতে এটা ছিল খৃস্টানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় কেন্দ্র। এই গীর্জায় খৃস্টানদের দু'জন বড় ধর্মীয় নেতা থাকতেন। যাঁদের একজনের উপাধি ছিল আকিব এবং অন্যজনের ছিল সাইয়েদ। নবম হিজরীতে ৬০ ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত নাজরানবাসীর একটি প্রতিনিধি দল আকিব ও সাইয়েদের নেতৃত্বে খুব শান-শওকতের সাথে মদীনা এলো। মহানবী (সা) তাঁদেরকে খুব সম্মান ও ইজ্জতের সাথে স্বাগত জানালেন এবং খুব বাগ্মিতার সঙ্গে তাঁদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তারা হক কবুল করার পরিবর্তে বক্র আলোচনা শুরু করে দিল। এ সময় আল্লাহ তায়ালা এই নির্দেশ নাযিল করলেন ঃ

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِمَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ قف ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ -

"এই জ্ঞান পাওয়ার পর এখন যে কেউ এই ব্যাপারে তোমার সাথে ঝগড়া করবে, হে মুহাম্মাদ, তাকে বলে দাও যে—এস, আমরা নিজেরাও আসি এবং প্রত্যেকেরই নিজ নিজ পরিবার পরিজনকেও নিয়ে বাহির হই. আর আল্লাহর নিকট দোয়া করি যে, যে মিথ্যাবাদী তার উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক।" (সূরায়ে আলে-ইমরান ঃ ৬১)

এই নির্দেশ অনুযায়ী হুজুর (সা) হযরত ফাতিমাতুজ যোহরা (রা) এবং হযরত হাসান (রা) ও হযরত হোসাইনকে (রা) নিয়ে মুবাহিলা বা দোয়ার জন্য বের হলেন। এ সময় নাজরানের সরদারদের মধ্য থেকে একজন বললো, কখনো দোয়া করবে না। এজন্য দোয়া করবে না যে, যদি সত্যিই সে নবী হয়, তাহলে আমরা চিরকালের জন্য বরবাদ হয়ে যাবো। সুতরাং নাজরানবাসী হুজুরের (সা) খিদমতে আরজ করে বললো, আমরা আপনার আনুগত্য করছি। আপনি আমাদের নিকট থেকে যত ট্যাক্স চান নিন। আমরা চিরদিনের জন্য তা দিতে থাকবো। আপনি কোন আমানতদার (আমিন) মানুষকে আমাদের সঙ্গে দিয়ে দিন।

হুজুর (সা) বললেন, "আমি তোমাদের সঙ্গে এমন একজনকে প্রেরণ করবো, যিনি চূড়ান্ত পর্যায়ের (প্রকৃত অর্থে) আমানতদার।"

হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে সেখানে উপস্থিত সকল সাহাবী (রা) অত্যন্ত উৎসুকের সাথে দেখতে লাগলেন যে, কোন্ ভাগ্যবান ব্যক্তি এই মর্যাদা লাভ করেন।

রহমতে আলম (সা) নিজের একজন জান নিছারের প্রতি স্নেহের দৃষ্টিতে তাকালেন এবং তার নাম উল্লেখ করে বললেন, "দাঁড়াও।"

দীর্ঘ অবয়ব ও ক্ষীণ শরীর বিশিষ্ট একজন সাহাবী। তাঁর চেহারায় আলোর বন্যা বয়ে যাচ্ছিল, নবীর (সা) ইরশাদ তামিলের জন্য কাল বিলম্ব না করে উঠে দাঁড়ালেন।

হুজুর (সা) সেই সাহাবীর (রা) প্রতি ইঙ্গিত করে নাজরানবাসীদেরকে সম্বোধন করে বললেন, "হাজা আমিনু হাজিহিল উম্মাতি" এ হলো এই উম্মাতের আমিন।

রাসূলের (সা) এই সাহাবী (রা) যাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের মুখ দিয়ে "আমিনুল উম্মাত"-এর মত মহান উপাধি প্রদান করেছিলেন—তিনি ছিলেন সাইয়েদেনা হযরত আবু উবায়দাহ (রা) ইবনুল জাররাহ।

সাইয়েদেনা হযরত আবু উবায়দাহ (রা) ইবনুল জাররাহ মহামানব (সা)-এর সেই সব জীবন উৎসর্গকারীদের অন্যতম ছিলেন যাঁরা উম্মাতের স্তম্ভ

হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকেন। তিনি ছিলেন আসসাবিকুনাল আউয়ালুন, মুহাজিরিনে আউয়ালিন, আসহাবে বদর, আসহাবে আশারায়ে মুবাশশিরা এবং আসহাবিশ শাজারার অন্যতম। মোটকথা, নবীর (সা) যুগের এমন কোন বড় মর্যাদা নেই যা তিনি লাভ করেননি। তার গুণাবলী ও প্রশংসাসমূহ এবং কৃতিত্বের কথা পড়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জাগরিত হয়।

তাঁর আসল নাম হলো আমের। কিন্তু নিজের কুনিয়ত আবু উবায়দাই নামেই প্রসিদ্ধ হন। এমনিভাবে পিতার নাম ছিল আবদুল্লাহ। কিন্তু তিনি দাদার নিসবতে "ইবনুল জাররাহ" নামে মশহুর হন।

হযরত আবু উবায়দাইর (রা) লকব হলো "আমিনুল উম্মাহ।" রাসূলে আকরামের (সা) পবিত্র মুখ দিয়ে প্রদত্ত হয় এই লকব এবং "আমিন" সেই উপাধি যা কুরআনে হাকিমে বড় বড় পয়গম্বরের নামের সাথে ব্যবহৃত হয়েছে। "বনু ফাহারের" সঙ্গে ছিল বংশীয় সম্পর্ক। ইবনে সায়াদের বক্তব্য অনুযায়ী "বনু ফাহার" হলো কুরাইশের শেষ শাখা। নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

আমের (রা) বিন আবদুল্লাহ বিন জাররাহ বিন হিলাল বিন আহিব বিন জুবতাহ বিন হারিছ বিন ফাহার। ফাহারে এসে নসবনামা রাসূলে আকরামের (সা) নসবনামার সঙ্গে মিলে যায়।

মাতার নাম ছিল উমাইমা (রা) বিনতে গানাম ফাহরিয়া। তিনিও ইসলাম গ্রহণ এবং মহিলা সাহাবী হওয়ায় মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত আবু উবায়দাহ (রা) নবীর (সা) হিজরতের ২৩ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ওয়াকেদীর বর্ণনা অনুযায়ী তিনি হিজরতের ৪০ বছর পূর্বে জন্ম নিয়েছিলেন। ইবনে মান্দাহ (র) ওয়াকেদীর বর্ণনাকে সঠিক বলে স্বীকার করেছেন এবং অধিকাংশ চরিতকার এবং ঐতিহাসিকও এই রেওয়ায়াতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

হযরত আবু উবায়দাই (রা) নবুয়তের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণের মর্যাদা লাভ করেন। সে সময় পর্যন্ত মাত্র আঙ্গুলে গোনা কয়েকজন বুজুর্গই হকের দাওয়াত কবুল করেছিলেন এবং রাসূলে আকরাম (সা) তখনও দারে আরকামে অবস্থান নেননি। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত আবু উবায়দা (রা) সিদ্দিকে উম্মাত হযরত আবু বকরের (রা) দাওয়াত ও তাবলীগে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। কালটা ছিল এমন যেন হক কবুলের অর্থই হলো আগুন নিয়ে খেলা করা। এই দাওয়াত গ্রহণকারী মাত্রই মুশরিকদের জুলুম

নির্যাতনের নিশানা হয়ে যেতেন এবং তাঁর জীবিত থাকাটা কঠিন হয়ে যেতো। হক বা সত্য গ্রহণের পর হযরত আবু উবায়দাহও (রা) ইসলামের নির্যাতিতদের কাতারে শামিল হয়ে গেলেন। মহানবী (সা) যখন মজলুম সাহাবীদেরকে (রা) হাবশায় হিজরতের অনুমতি দিলেন ইবনে ইসহাক (র) এবং ওয়াকেদীর (র) বক্তব্য অনুযায়ী হযরত আবু উবায়দাহও (রা) হাবশা গমনকারী মুহাজিরদের দ্বিতীয় কাফেলায় শামিল হয়ে গেলেন এবং সেখানে কয়েকবছর যাবত উদ্বাস্তুর জীবন অতিবাহিত করেন। অবশেষে হুজুরের (সা) মদীনা হিজরতের কিছুদিন পূর্বে মক্কা ফিরে যান। নবুয়াতের তের বছরে বিশ্বনবী (সা) সাহাবায়ে কিরামকে (রা) মদীনায় হিজরত করার অনুমতি দেন। এ সময় হযরত আবু উবায়দাহও (রা) অন্য মুহাজিরদের সঙ্গে মক্কার ভূমিকে বিদায় জানিয়ে মদীনা এসে গেলেন। ওয়াকেদী (র) বর্ণনা করেছেন যে, হিজরতের পর তিনি কিছুদিন কুবাতে হযরত কুলছুম (রা) ইবনুল হাদমের বাড়ীতে অবস্থান করেছিলেন।

মদীনা মুনাওয়ারায় শুভ পদার্পণের কয়েক মাস পর প্রিয় নবী (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। ইবনে ইসহাক ও হাফেজ ইবনে হাজারের (র) মত অনুযায়ী তিনি হযরত আবু উবায়দার (রা) আনসারী ভাই বানিয়েছিলেন আওস সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজকে। অধিকাংশ ঐতিহাসিক এই রেওয়ায়াতকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আবু উবায়দাহ (রা) বিন জাররাহ এবং আবু তালহার (রা) মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন।

(কিতাবুল ফাজায়েল বাবে মুয়াখাতুন নবী)

বিভিন্ন কার্যকারণে এই রেওয়ায়াতকেই সহীহ বলে মনে হয়। কেননা, ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান বর্ণনাকারী অর্থাৎ হযরত আনাসের বাড়ীতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং হযরত আবু তালহা (রা) তাঁর সতালো পিতা ছিলেন।

যুদ্ধের ধারা শুরু হলে হযরত আবু উবায়দাহ (রা) হকের পথে উৎসর্গকারী সিপাহী হিসেবে নিজেকে প্রমাণিত করেছিলেন। তিনি প্রতিটি যুদ্ধে জানবাজী এবং ফিদাকারীর হক আদায় করেছিলেন এবং নিজের ঈমানের আবেগের নজীরবিহীন চিত্রাবলী ইতিহাসের পাতায় চিরদিনের জন্য অংকিত করে দেন।

সহীহ বুখারীতে বদরের সাহাবীদের তালিকায় হযরত আবু উবায়দাহর (রা) নাম নেই। কিন্তু ইবনে সায়াদ (র) ইবনে আবদুল বার (র), ইবনে আছির (র) এবং অন্য কতিপয় চরিতকার বিস্তারিতভাবে লিখেছেন যে, হযরত

আবু উবায়দাহ (রা) কুফর ও হকের প্রথম যুদ্ধে শুধু শরীকই ছিলেন না বরং তিনি এই যুদ্ধে নিজের পিতা আবদুল্লাহ বিন জাররাহকে স্বহস্তে হত্যা করেন। সে মক্কার মুশরিকদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছিলো। অন্য কতিপয় সাহাবায়ে কিরামও (রা) এই যুদ্ধে হক পথে নিজেদের নিকটতম বন্ধুদেরকে হত্যা করেছিলেন। মুফাসসিররা লিখেছেন, এমনি ধরনের সাহাবায়ে কিরামের (রা) প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালার এই ইরশাদ নাযিল হয়েছিল ঃ

لَاتَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ رَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْا اٰبَآءَهُمْ اَوْاَبْنَآءَهُمْ اَوْاِخْوَانَهُمْ اَوْعَشِيْرَتَهُمْ ط اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ط سوره مجادله : ٢٢

"তোমরা কখনো এমন দেখতে পাবে না যে, আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার লোকেরা কখনো তাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে, যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধতা করেছে তারা তাদের পিতাই হোক কিংবা তাদের পুত্রই হোক বা ভাই-ই হোক অথবা হোক তাদের বংশ-পরিবারের লোক। তারা সেই লোক যাদের দিলে আল্লাহ তায়ালা ঈমান দৃঢ়মূল করে দিয়েছেন এবং নিজের তরফ থেকে একটা 'রূহ' দান করে তাদেরকে শক্তিশালী করে দিয়েছেন।" সূরা মুজাদালা ঃ ৩

তৃতীয় হিজরীতে ওহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত আবু উবায়দাহ (রা) তাতে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে যুদ্ধ করেন এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এমন অটলতা প্রদর্শন করেন যে, তিনি এই যুদ্ধে বিশেষ ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হন। ঘটনাক্রমে একটি ভুলের কারণে যখন যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল এবং বিশ্বনবী (সা) আহত হলেন তখন হযরত আবু উবায়দাহ (রা) অস্থির হয়ে গেলেন এবং নিজের রাসূল প্রেমের বিস্ময়কর প্রমাণ পেশ করলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক থেকে বর্ণিত আছে ঃ

"আমি দেখলাম যে, এক ব্যক্তি রাসূলে করিমকে (সা) একা পেয়ে পূর্বদিক থেকে একটি পাখির মত আকাশে উড়ে দ্রুত গতিতে হুজুরের (সা) দিকে এগিয়ে আসছে। আমিও তাঁকে (সা) হিফাজতের জন্য দ্রুত গতিতে অগ্রসর হলাম এবং বললাম হে আল্লাহ! কল্যাণ হোক। এমন সময় দেখলাম যে, সেই ব্যক্তি যিনি আমার আগে সেখানে পৌঁছেছেন তিনি হলেন আবু

উবায়দাহ (রা) ইবনুল জাররাহ। তখন জনৈক কাফেরের তরবারীর আঘাতে শিরস্ত্রানের অংশ বিশেষ রাসূলের (সা) গণ্ডদেশে ঢুকে পড়েছে। আবু উবায়দা (রা) সামনে অগ্রসর হয়ে সেই বস্তু নিজের দাঁত দিয়ে ধরে টান দিলেন এবং তা বাইরে বের হয়ে গেল। কিন্তু এই চেষ্টা চালাতে গিয়ে আবু উবায়দাহর (রা) সামনের দুটি দাঁত ভেঙ্গে গেল।" (তাবকাতে ইবনে সায়াদ)

ওহুদের যুদ্ধের পর হযরত আবু উবায়দা (রা) আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধেও বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং বনু কোরায়জার উৎখাতে তৎপরতার সাথে অংশ গ্রহণ করেন।

৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউছছানি মাসে মহানবী (সা) হযরত আবু উবায়দাহকে (রা) ছালাবা ও আনসার গোত্র উৎখাতে নিয়োগ করেন। এসব লোক প্রায়ই মদীনার চারপাশে লুটপাট করতো। হযরত আবু উবায়দাহ (রা) ৪০ জন মুজাহিদসহ সেই লুটেরাদের কেন্দ্রস্থল জিকিসসার ওপর অতর্কিতে হামলা চালালেন। তারা মোকাবিলার সাহস পেলো না এবং পালিয়ে পাহাড়ে গিয়ে লুকালো। অবশ্য এক ব্যক্তি মুসলমানদের হাতে বন্দী হলো। হযরত আবু উবায়দাহ (রা) তাকে মদীনা নিয়ে এলে সে ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলাম গ্রহণ করলো। সেই বছরই হযরত আবু উবায়দাহ (রা) বাইয়াতে রিদওয়ানে শরীক হওয়ার মহান মর্যাদা লাভ করেন। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্রে যে সকল সাহাবী স্বাক্ষী হিসেবে নিজেদের দস্তখত দিয়েছিলেন হযরত আবু উবায়দাহও (রা) তাঁদের মধ্যে শামিল ছিলেন।

সপ্তম হিজরীর প্রথম দিকে হযরত আবু উবায়দাহ (রা) খায়বারের যুদ্ধে মহানবীর (সা) সাথে সফরের সৌভাগ্য লাভ করেন এবং যুদ্ধে নিজের তরবারীর খুব কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। খায়বারের যুদ্ধের কিছুদিন পর হুজুর (সা) খবর পেলেন যে, কাজায়াহ গোত্রের লোকেরা মদীনা মুনাওয়ারার ওপর হামলার পরিকল্পনা করছে। হুজুর (সা) হযরত আমর (রা) ইবনুল আছকে তিনশ' মুজাহিদসহ তাদের নির্মূলের জন্য প্রেরণ করলেন। হযরত আমর (রা) বনু কাজায়াহর এলাকায় পৌঁছে "সালাসল" নামক একটি পুকুরের তীরে অবস্থান নিলেন এবং সেখান থেকে হুজুরকে (সা) পয়গাম প্রেরণ করে জানালেন যে, শত্রুর সংখ্যা অনেক বেশী। এজন্য আরো সৈন্য প্রেরণ করা হোক। পয়গাম পেয়েই হুজুরে আকরাম (সা) হযরত আবু উবায়দাহর (রা) নেতৃত্বে দুশ' মুজাহিদ দিয়ে সাহায্যের জন্য প্রেরণ করলেন। এই মুজাহিদদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) এবং হযরত ওমর ফারুকের (রা) মত মহান মর্যাদাবান বুজুর্গও শামিল ছিলেন। যখন এই সাহায্যকারী বাহিনী হযরত আমর (রা) ইবনুল আছের বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হলেন তখন সম্মিলিত

বাহিনীর নেতৃত্বের প্রশ্ন উঠলো। মর্যাদা ও শানের দিক দিয়ে যদিও হযরত আবু উবায়দাহ (রা) সম্পূর্ণভাবে নেতৃত্বের যোগ্য ছিলেন। কিন্তু যখন হযরত আমর (রা) ইবনুল আছ পীড়াপীড়ি করলেন যে, তিনিই সমগ্র বাহিনীর নেতৃত্ব দেবেন তখন হযরত আবু উবায়দাহ (রা) সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিলেন এবং তাঁর নেতৃত্বে অত্যন্ত বাহাদুরীর সঙ্গে দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করলেন। এমনকি দুশমনরা পরাজিত হলো। যখন বিজয়ীর বেশে তাঁরা মদীনা ফিরে এলেন এবং হুজুর (সা) নেতৃত্ব প্রশ্নে মতবিরোধ ও তাঁর আনুগত্যের অবস্থা শুনলেন তখন বললেন ঃ রাহেমাল্লাহু আবা উবায়েদ—আবু উবায়েদের (রা) ওপর আল্লাহর রহমত হোক। (মাদারিজুন নবুয়াত–দ্বিতীয় খণ্ড) ইতিহাসে এই ঘটনা "সারিয়্যাহ জাতিস সালাসিল" নামে খ্যাত হয়ে আছে।

অষ্টম হিজরীর রজব মাসে মহানবী (সা) হযরত আবু উবায়দাহকে (রা) তিনশ' সওয়ারসহ সমুদ্রোপকূলে প্রেরণ করলেন। উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশ কাফেলার গতিবিধি লক্ষ্য করা। ইতিহাসে এই অভিযান সারিয়্যাহ সাইফুল বাহার অথবা সারিয়্যাহ-এ-খাবত নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। সাইফুল বাহার (সমুদ্রের উপকূল) এই জন্য নামকরণ করা হয়েছে যে, সমুদ্রের উপকূলে মুজাহিদদেরকে অবস্থান নিতে হয়েছিল। খাবত নামকরণ এজন্য করা হয়েছে যে, এই অভিযানে রসদ শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে মুজাহিদদেরকে বৃক্ষের পাতা ভক্ষণ করে দিন গুজরান করতে হয়েছিল এবং লাঠি অথবা অন্য কিছু দিয়ে যে পাতা বৃক্ষ থেকে পারা হয় তাকে খাবত বলা হয়ে থাকে। ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত আবু উবায়দাহর (রা) অধীন বাহিনীতে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) এবং হযরত ওমর ফারুকও (রা) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সহীহ বুখারীতে হযরত জাবের (রা) বিন আবদুল্লাহ (রা) আনসারী এই অভিযানের অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সা) উপকূলের দিকে একটি অভিযান প্রেরণ করেছিলেন এবং আবু উবায়দাহ (রা)-কে এই অভিযানের আমীর বানিয়েছিলেন। মানুষ ছিলেন তিনশ' জন। আমরা রওয়ানা দিলাম। কিছু রাস্তা অতিক্রমের পর পাথেয় শেষ হয়ে গেল। শুধুমাত্র খেজুরের দু'টি থলে অবশিষ্ট রলো। আবু উবায়দাহ (রা) প্রতিদিন আমাদেরকে কিছু কিছু খেজুর দিতেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত একটি একটি করে দিতে লাগলেন। ক্ষুধায় কাতর হয়ে আমরা বৃক্ষের পাতা পেরে পেরে খেলাম। এক ব্যক্তি তিনটি উট জবেহ করালেন। পুনরায় তিনটি জবেহ করালেন। তৃতীয় দিনেও তিনটি উট জবেহ করালেন। তারপর আবু উবায়দা (রা) তাঁকে নিষেধ করলেন। সমুদ্রের তীরে অবস্থানকালে একদিন টিলা বরাবর একটি বিরাট মাছ বের হলো। সেই মাছকে আম্বর বলা হয়। আমরা অর্ধেক

মাস (অথবা ১৮ দিন) তা খেলাম এবং তার তেল গায়ে মাখলাম। এমনকি আমরা বলিষ্ঠ হয়ে গেলাম। অতপর আবু উবায়দা (রা) মাছটির দু'টি পাঁজর দাঁড় করালেন এবং একটি উটের ওপর হাওদা রেখে সৈন্যদের সবচেয়ে লম্বা মানুষটিকে তাতে বসালেন। সেই ব্যক্তি উটের ওপর বসে সেই পাঁজরের নীচ দিয়ে বের হয়ে গেলেন। আমরা যখন মদীনা ফিরে এলাম এবং রাসূলের (সা) খিদমতে এই ঘটনা বর্ণনা করলাম তখন তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য রিযিক প্রেরণ করেছিলেন। তা তোমাদের খাওয়া উচিত ছিল। তোমাদের নিকট যদি থেকে থাকে তাহলে আমাদেরকেও তা খাওয়াও। এক ব্যক্তি (কিছু গোশত) নিয়ে এলো এবং তিনি (সা) তা থেকে খেলেন।

এই রেওয়ায়াতে উট জবেহ করানেওয়ালা যে ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে তিনি হলেন হযরত কায়েস (রা) বিন সায়াদ আনসারী। তিনি প্রকৃতিগতভাবেই দাতা লোক ছিলেন।

অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে হযরত আবু উবায়দা (রা) আল-ফাতাহ যুদ্ধে প্রিয় নবীর (সা) সফরসঙ্গী হওয়ায় মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সহীহ মুসলিমের এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী মক্কায় প্রবেশকারী বাহিনীর এক অংশের নেতৃত্ব হযরত আবু উবায়দাহর (রা) হাতে ছিল। সৈন্যের এই অংশ যিরাহ পরিধানকারী মুজাহিদদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। মক্কা বিজয়ের পর হযরত আবু উবায়দাহ (রা) হুনাইন ও তায়েফের যুদ্ধে নিজের বাহাদুরীর নৈপুণ্য প্রদর্শন এবং জানবাজীর হক আদায় করেন।

নবম হিজরীতে নাজরানের প্রতিনিধি দলের আগমনের সময় হযরত আবু উবায়দাহ (রা) হুজুরের (সা) নিকট থেকে "আমিনুল উম্মাতের" আজিমুশ্বান লকব ভূষিত হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই। কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, নাজরানের প্রতিনিধি দল নবীর (সা) দরবারে দু'বার উপস্থিত হয়েছিল। হযরত আবু উবায়দা (রা) দ্বিতীয় দফা নাজরানের প্রতিনিধি দল আগমনের সময় "আমিনুল উম্মাত" উপাধি পেয়েছিলেন। সহীহ মুসলিমে নাজরানবাসীর মুখে বলা হয়েছে, "আবু উবায়দাহ (রা) আমাদেরকে সুন্নাত ও ইসলামের শিক্ষা দিতেন।" এই রেওয়ায়াত থেকে পরিষ্কার হয় যে, নাজরানবাসী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং হযরত আবু উবায়দাহ (রা) তাদেরকে দ্বীনের হুকুম আহকাম তালিমও দিতেন এবং তাদের নিকট থেকে সাদকাও ওসুল করতেন। সেই বছর নাজরান হতে ফেরার পর হযরত আবু উবায়দাহকে (রা) বাহরাইন যেতে হয়। এই প্রসঙ্গে সহীহ্ বুখারীতে হযরত আমর (রা) বিন আওফ থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে আকরাম (সা) আবু উবায়দাহকে (রা) জিযিয়া আদায়কারী হিসেবে বাহরাইন প্রেরণ করেছিলেন।

হুজুর (সা) বাহরাইনবাসীর সঙ্গে সন্ধি করে নিয়েছিলেন এবং আলা ইবনুল হাজরামীকে তাদের আমীর নিয়োগ করেছিলেন। আবু উবায়দাহ (রা) বাহরাইন থেকে ধন-সম্পদ নিয়ে এলেন। আনসাররা তাঁর প্রত্যাবর্তনের খবর পেয়ে ফজরের নামায হুজুরের সঙ্গে পড়লেন। যখন তিনি (সা) নামায পড়া শেষ করলেন তখন আনসারদের (অস্বাভাবিক) ভীড় দেখে মুচকি হেসে দিলেন এবং বললেন, সম্ভবত তোমরা আবু উবায়দাহর (রা) আগমনের খবর পেয়েছ। তাঁরা আরজ করলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। হুজুর (সা) বললেন, সুসংবাদ হলো যে, আজ আমি তোমাদেরকে খুশী করে দেব। কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের দারিদ্র ও বুভুক্ষার ভয় করি না। অবশ্যই এই ভয় আমার আছে যে, যেভাবে প্রথম জাতিসমূহের ওপর দুনিয়া প্রশস্ত করে দেয়া হয়েছিল এবং পারস্পরিক বিরোধ ও হিংসা এবং লোভ তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়। এমনিভাবে তোমাদের ওপরও যদি দুনিয়া প্রশস্ত করা হয় এবং তোমরাও পারস্পরিক বিরোধে লিপ্ত হয়ে বরবাদ হয়ে না যাও।

দশম হিজরীতে হযরত আবু উবায়দাহ (রা) বিদায় হজ্জে রহমতে আলমের (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার মর্যাদায় অভিষিক্ত হন।

একাদশ হিজরীতে মহানবী (সা) ওফাত পেলেন। হযরত আবু উবায়দাহর (রা) ওপর এ সময় শোকের পাহাড় ভেঙ্গে পড়লো। তা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও সাহসিকতার পরিচয় দিলেন। সহীহ বুখারীতে আছে যে, হুজুরের (সা) ইন্তেকালের অব্যবহিত পরই আনসাররা সাকিফায়ে বনি সায়েদাতে একত্রিত হয়ে খিলাফতের প্রশ্ন উঠালেন। এ সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা) এবং হযরত আবু উবায়দাহ (রা) আলোচনার জন্য আনসারদের নিকট গেলেন। আলোচনাকালে হযরত আবু উবায়দাহ (রা) আনসারদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে আনসারের দল! তোমরা সর্বপ্রথম ইসলামের মদদ ও সাহায্য করেছ। এখন তোমরাই বিভেদ ও মতপার্থক্যের ভিত্তি রেখো না।"

উভয় পক্ষ থেকে যখন বক্তৃতা শেষ হলো তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করে বললেন, আমি তোমাদের জন্য এই দুই ব্যক্তির [হযরত ওমর ফারুক (রা) এবং হযরত আবু উবায়দাহ (রা)] মধ্য থেকে কোন একজনকে পছন্দ করি। তোমরা এই দুজনের মধ্যে থেকে কোন একজনের হাতে বাইয়াত নিয়ে নাও। কিন্তু এই দুই বুজুর্গ ব্যক্তি হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) বর্তমানে খিলাফতের দায়িত্ব পালনে অস্বীকার করে বসলেন এবং অগ্রসর হয়ে সর্বাগ্রে সিদ্দিকে আকবারের (রা) বাইয়াত করে নেন। তাঁদের পর সমগ্র মাজমা বাইয়াতের জন্য ভেঙ্গে পড়লো।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) খিলাফতের আসনে সমাসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আরবে ধর্মদ্রোহিতার ফিতনার আগুন লেলিহান শিখায় বিস্তার লাভ করলো। সিদ্দিকে আকবার (রা) এই ভয়াবহ ফিতনা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে মুকাবিলা করলেন এবং ১০ মাসের মধ্যে তা উৎখাত করে ছাড়লেন। এই দুর্যোগপূর্ণ সময়ে হযরত আবু উবায়দাহ (রা) খলিফাতুর রাসূলের (সা) বাহুর ভূমিকা পালন করেছিলেন। ধর্মদ্রোহিতার ফিতনা মূলোৎপাটনের কিছুদিন পর সিরিয়া ও ইরানে যুদ্ধের এক দীর্ঘ ধারা শুরু হয়ে গেল। ১৩ হিজরীর শুরুতে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) সিরিয়ায় বিভিন্ন দিক থেকে সৈন্য প্রেরণের ব্যবস্থা করলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি হযরত আবু উবায়দাহকে (রা) হেমসের দিকে, হযরত আমর (রা) বিন আছকে ফিলিস্তিনে, হযরত শুরাহ বিল (রা) হাসানাকে জর্দানের দিকে এবং হযরত ইয়াযিদ বিন আবি সুফিয়ানকে (রা) দামেস্কের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এই হেদায়াতও দিলেন যে, যুদ্ধের ময়দানে যদি তোমাদেরকে একস্থানে সমবেত হতে হয় তাহলে তোমাদের সকলের প্রধান সেনাপতি হবেন আবু উবায়দাহ (রা) ইবনুল জাররাহ। হযরত ইয়াযিদ (রা) বিন আবি সুফিয়ান ও হযরত শুরাহ বিল বিন হাসানার (রা) বাহিনী রওয়ানা হওয়ার পর হযরত আবু উবায়দাহ (রা) সাত হাজার মুজাহিদসহ মা'রাকাতার পথে হেমস রওয়ানা হলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) "ছানিয়াতুল বিদা" পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে গেলেন। যখন তিনি যাত্রা শুরু করলেন তখন সিদ্দিকে আকবার (রা) তাঁকে এই ভাষায় ওসিয়ত করলেন ঃ

"আবু উবায়দাহ (রা) ভালো কাজ করো। মুজাহিদ হয়ে থেকো। শহীদের মৃত্যু বরণ করো। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের আমলনামা তোমাদের ডান হাতে দিন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের চক্ষু ঠাণ্ডা হোক। আল্লাহর কসম! আমি আশা করি যে, তোমরা সেই ব্যক্তিদের মধ্যে হবে যারা আল্লাহকে বেশী ভয় করে থাকেন। দুনিয়ার সাথে কোন সম্পর্কই তাদের নেই। তারা আখিরাতের আকাংখী। আল্লাহ তোমাদের ওপর খুব করুণা করেছেন যে, তোমরা মুসলমানদের বাহিনী নিয়ে আল্লাহর দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছো। সুতরাং যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে, তাঁর সাথে অন্যদেরকে অংশীদার বানায় এবং মিথ্যা খোদাদেরকে পূজা করে, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে।"

হযরত আবু উবায়দাহ (রা) সিরিয়া প্রবেশ করলেন। এ সময় তিনি রোমকদেরকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত পেলেন। তাদের মুকাবিলায় হযরত আবু উবায়দাহর (রা) বাহিনী আটায় লবণের সমান

ছিল। তা সত্ত্বেও হযরত আবু উবায়দা (রা) সেই স্বল্প সংখ্যক সৈন্যের সাথে বুসরা এবং মাআব পদানত করে জাবিয়া পৌঁছলেন। সেখান থেকে হিরাক্লিয়াসের ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতির কথা খলিফার দরবারে লিখে পাঠালেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) হযরত আবু উবায়দার (রা) পত্র পেতেই একদিকে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে সাহায্যকারী সৈন্য প্রেরণ করলেন। অন্যদিকে ইরাকে ইরানীদের বিরুদ্ধে জিহাদ রত হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদকে তাঁর বাহিনী সহ ইরাক থেকে সিরিয়া পৌঁছার নির্দেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা) হযরত শুরাহবিল (রা) বিন হাসানা এবং হযরত আমর (রা) ইবনুল আসকে পয়গাম প্রেরণ করলেন। এই পয়গামে তাঁদেরকেও স্ব স্ব বাহিনীসহ হযরত আবু উবায়দার (রা) নিকট পৌঁছে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। হযরত আবু উবায়দার (রা) নিকট সাহায্যকারী বাহিনী পৌঁছে গেল এবং হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদও তার সঙ্গে যোগ দিলেন। তারপর তাঁরা সর্বপ্রথম আজনাদাইনের দিকে রওয়ানা হলেন। সেখানে রোমকদের একটি বিরাট বাহিনী মুসলমানদের ওপর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তের হিজরীর ২৮শে জমাদিউল আউয়াল আজনাদাইনের নিকট উভয় পক্ষের মধ্যে মারাত্মক যুদ্ধ হলো। রোমকরা প্রচণ্ডভাবে বাধা দিল। কিন্তু মুসলমানদের ঈমানী জোশের সামনে কিছুই করতে পারলো না এবং তারা যুদ্ধের ময়দানে তিন হাজার মানুষের লাশ ফেলে রেখে পালিয়ে গেল। মুসলমানরা রোমকদের পিছু ধাওয়া করলো। এ সময় তারা পথিমধ্যে একটি অপ্রশস্ত গিরিপথ বা উপত্যকা পেলেন। এই গিরিপথে শুধুমাত্র একজন করে মানুষই অতিক্রম করতে পারতো। যেসব মুসলমান সেই স্থান অতিক্রম করে গেলেন, রোমকরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে লাগলো। মুজাহিদদের (রা) মধ্যে হযরত আমর (রা) ইবনুল আছের সহোদর হযরত হিশাম (রা) ইবনুল আছও ছিলেন। তিনি সাবিকুনাল আউয়ালুন ও দুই হিজরতের সম্মানে সম্মানিত ছিলেন। তিনি যেই সেই অপ্রশস্ত গিরিপথ অতিক্রম করতে লাগলেন সেই এক রোমকের তীর এসে তাঁকে শহীদ করে ফেললো। তারপর যে মুসলমানই সেখানে পৌঁছতো সেই হযরত হিশামের (রা) লাশের ওপর দিয়ে ঘোড়া নিয়ে যাওয়াটা সহ্য করতে পারছিলেন না এবং সেখানেই থেমে যাচ্ছিলেন। হযরত আমর (রা) ইবনুল আছ এই অবস্থা দেখে মুসলমানদেরকে উচ্চস্বরে আহবান জানিয়ে বললেন ঃ

"হে মুসলমানরা! আল্লাহ তায়ালা আমার ভাইকে শাহাদাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন এবং তার রূহ উঠিয়ে নিয়েছেন। এখানে তো শুধু তার দেহ রয়েছে, তোমরা তার লাশের ওপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে যাও এবং গিরিপথে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য উপস্থিত হও।"

একথা বলে তিনি নিজের ঘোড়া অগ্রসর করালেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্যরাও রওয়ানা দিলেন। হযরত হিশামের (রা) লাশ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু মুসলমানরাও রোমক পলায়নকারীদেরকে ছিন্নভিন্ন করে ফেললো। যুদ্ধ শেষে হযরত হিশামের (রা) লাশের অংশসমূহকে বস্তায় ভরে দাফন করা হয়।

আজনাদাইনের যুদ্ধের পর হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ এবং হযরত আবু উবায়দাহ (রা) দামেস্ক অবরোধ করলেন। দামেস্ক অবরোধ অব্যাহত ছিল এমন সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) ওফাত পেলেন এবং হযরত ওমর ফারুক (রা) খিলাফতের মসনদে সমাসীন হলেন। হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতের শুরুতেই একদিন হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ প্রাচীর টপকিয়ে ভেতরে ঢুকলেন এবং শহরের দরজা খুলে দিলেন। হযরত আবু উবায়দাহ (রা) নিজের সৈন্যসহ প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ শহরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। শহরবাসী অস্ত্র সমর্পণ করলো এবং হযরত আবু উবায়দাহর (রা) সঙ্গে সন্ধি করে নিলেন। হযরত খালিদ (রা) ব্যাপারটি জানতেন না। তিনি শহরের দ্বিতীয় অংশে খৃস্টানদের সাথে লড়াই করতে করতে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন। শহরের মধ্যবর্তী স্থানে হযরত খালিদ (রা) হযরত আবু উবায়দাহর সামনাসামনি হলেন। এ সময় হযরত আবু উবায়দাহ (রা) হযরত খালিদকে (রা) বললেন যে, তিনি শহরবাসীকে নিরাপত্তা দিয়ে দিয়েছেন। এজন্য সেও যেন হাত গুটিয়ে নেয়। হযরত খালিদ (রা) তৎক্ষণাৎ নিজের তরবারী কোষবদ্ধ করলেন। হযরত আবু উবায়দাহ (রা) হযরত খালিদের (রা) জয় করা শহরের অংশকেও সন্ধিনামার অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন এবং দামেস্কের ওপর ইসলামের পতাকা উড্ডীন করে দিলেন।

কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, হযরত ওমর ফারুক (রা) শাসন ক্ষমতা হাতে নিতেই (১৩ হিজরী) হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদকে সেনাপতির পদ থেকে অপসারিত করেন এবং তার স্থলে হযরত আবু উবায়দাহকে (রা) সিরিয়ার প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করলেন। কিন্তু আল্লামা শিবলী নুমানী এবং অন্য কয়েকজন ঐতিহাসিক বলেছেন যে, হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের অপসারণ ঘটে ১৭ হিজরীতে। উভয় পক্ষেরই বক্তব্যের সপক্ষে দলিল-প্রমাণ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শুধুমাত্র হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের অপসারনের বছর নিয়েই নয় বরং সে যুগের অনেক প্রখ্যাত যুদ্ধসমূহ সংঘটিত হওয়ায় সাল নিয়েও ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রচণ্ড মতবিরোধ রয়েছে। তা বর্তমান যুগের ঐতিহাসিকদের নিজস্ব মত ও বিশ্লেষণের ওপর নির্ভরশীল। তারা কোন্ রেওয়ায়াতকে অগ্রাধিকার দেবেন তা দেখার বিষয়। মোটকথা, সিরিয়ার যুদ্ধসমূহে হযরত আবু উবায়দাহ (রা) এবং হযরত খালিদ

(রা) বিন ওয়ালিদের আসল মর্যাদা কি ছিল ? বাস্তবকথা হলো, উভয় বুজুর্গই সিরিয়ার সকল যুদ্ধে পারস্পরিক সহযোগিতা করেছিলেন এবং উভয়ই নিজের বীরত্ব, জওয়ান-মরদী, চেষ্টা-তদবির ও নেতৃত্বের যোগ্যতার জন্য প্রশংসার পাত্র।

দামেস্কের পরাজয়ে রোমকরা প্রচণ্ডভাবে উত্তেজিত হলো এবং তারা জর্দানের শহর বাসইয়ানে একত্রিত হয়ে জবরদস্ত যুদ্ধ প্রস্তুতিতে মশগুল হলো। মুসলমানরা এই খবর পেয়ে হযরত আবু উবায়দাহর (রা) নেতৃত্বে বাসইয়ান রওয়ানা হলেন এবং তাঁরা ফাহাল নামক স্থানে তাঁবু ফেললেন। যুদ্ধের পূর্বে উভয় পক্ষের মধ্যে দূতদের মাধ্যমে আলাপ-আলোচনা হতে লাগলো। কিন্তু তাতে কোন ফল হলো না। অবশেষে রোমকরা নিজেদের দূতকে মুসলমান বাহিনীর সেনাপতি হযরত আবু উবায়দাহর (রা) সাথে সরাসরি আলোচনার জন্য প্রেরণ করলো। রোমক দূত ইসলামী বাহিনীতে পৌঁছে সকল মুসলমানকে একই রংয়ে রঞ্জিত পেলেন। লশকরের আমীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাকে বলা হলো যে, তিনি সামনে বসে আছেন। সে সময় হযরত আবু উবায়দাহ (রা) মাটির ওপর বসে তীর উলট-পালট করে দেখছিলেন। তাঁর পোশাক এবং সাধারণ মুজাহিদের পোশাকের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য ছিল না। দূত বিস্মিত হয়ে হযরত আবু উবায়দাহকে (রা) জিজ্ঞেস করলো, আপনিই কি সৈন্যের সরদার ? তিনি বললেন, হাঁ। আপনার সৈন্যরা যদি লড়াই ছাড়া ফিরে যায় তাহলে আমরা প্রত্যেককে দুই আশরাফী করে দেব। হযরত আবু উবায়দাহ (রা) দূতের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তাতে তিনি অসন্তুষ্ট হলেন এবং ধমক দিয়ে ফিরে গেলেন। হযরত আবু উবায়দাহ (রা) তৎক্ষণাৎ সৈন্যদেরকে প্রস্তুত হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। তৃতীয় দিন উভয় বাহিনীর মধ্যে রক্তাক্ত যুদ্ধ শুরু হলো। হযরত আবু উবায়দাহ (রা) সৈন্যদের মধ্যস্থানে ছিলেন এবং এক এক কাতারে গিয়ে মুসলমানদের সাহস যোগাচ্ছিলেন। পঞ্চাশ হাজার রোমকদের মুকাবিলায় মুসলমানদের সংখ্যা অর্ধেকেরও কম ছিল। কিন্তু তারা বীর দুশমনদের ওপর এমন প্রচণ্ডভাবে হামলা চালালেন যে, কয়েক ঘন্টার মধ্যে তাদের কোমর ভেঙ্গে গেল। এমনিভাবে ফাহাল ও বাসইয়ান মুসলমানদের পদানত হলো। তারপর হযরত আবু উবায়দাহ (রা) সামনে অগ্রসর হয়ে মারজির রুম দখল করে নিলেন এবং পুনরায় হেমসের দিকে রওয়ানা হলেন। হেমসবাসীরা কয়েকমাস দূর্গ বন্ধ করে মুকাবিলা করতে লাগলো। কিন্তু কোন স্থান থেকে যখন সাহায্য প্রাপ্তির আর আশা রলো না তখন জিযিয়া দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুসলমানদের আনুগত্য কবুল করে নিলো। হেমসের পর হামাত, শেযার, মুয়ারাতুন নোমান এবং আরো কতিপয় স্থানও একের পর এক অধীনস্থ হয়ে গেল। অতপর হযরত আবু উবায়দাহ (রা)

রোমকদের একটি মজবুত গঢ় লাজাকিয়ার প্রতি দৃষ্টি দিলেন এবং কঠোরভাবে তা অবরোধ করলেন। আল্লামা বালাজুরী (র) "ফতুহুল বুলদান" গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত আবু উবায়দাহ (রা) লাজাকিয়া অবরোধ কালে এক অসাধারণ কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি লাজাকিয়ার আশেপাশে অনেক গোপন গর্ত খুঁড়ান এবং দৃশ্যতর অবরোধ তুলে নিয়ে হেমসে রওয়ানা হয়ে যান। লাজাকিয়াবাসী নির্ভাবনায় বা নিশ্চিন্ত হয়ে শহরের দরজা খুলে দিল। হযরত আবু উবায়দাহ (রা) সেই রাতেই সৈন্যসহ ফিরে এসে গর্তসমূহে লুকিয়ে বসে গেলেন। সবুহে সাদিকের সময় তাঁরা মুহূর্তের মধ্যে গর্ত থেকে বের হয়ে শহরে ঢুকে পড়লেন। তা দেখে রোমকরা মূর্চ্ছা গেল এবং বিনা বাধায় অস্ত্র সমর্পণ করলো। লাজাকিয়া দখলের পর হযরত আবু উবায়দা (রা) হেমস ফিরে এলেন এবং ১৫ হিজরীর রজব মাস পর্যন্ত (যে মাসে ইয়ারমুকের সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ সংঘঠিত হয়) সেখানেই অবস্থান করেন।

একের পর এক রোমকদের পরাজয়ে হিরাক্লিয়াস চমকে উঠলো। যে কোন মূল্যে মুসলমানদেরকে সিরিয়া থেকে বের করে দেয়ার ব্যাপারে সে দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করলো। বস্তুত এই লক্ষ্যে সে আরমেনিয়া, আল-জাযিরা, কাসতানতুনিয়া প্রভৃতি স্থান থেকে সৈন্য তলব করে পাঠালেন। এসব সৈন্য ইন্তাকিয়ায় একত্রিত হলো। এই বিরাট বাহিনী বড় অভিজ্ঞ যোদ্ধা ছিল। তারা ইন্তাকিয়া থেকে রওয়ানা হলো। এ সময় মুসলমানরা পারস্পরিক পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, সিরিয়ার যে যে শহর তারা দখল করেছেন সেখান থেকে সৈন্য হটিয়ে নেবেন এবং এসব সৈন্য একস্থানে একত্রিত হবে। সাথে সাথে খিলাফতের দরবার থেকে সাহায্য চেয়ে পাঠানো হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুসলমানরা দামেস্ক, হেমস প্রভৃতি শহর খালি করালেন এবং সেখানকার বাসিন্দাদেরকে জিযিয়ার সমগ্র অর্থ ফেরত দিলেন যা তাদের নিকট থেকে উসুল করা হয়েছিল। কেননা, তখন তাঁরা সেই সব শহরের বাসিন্দাদের হেফাজত করতে পারছিলেন না। চুক্তি পালন এবং উদারতার এমন উদাহরণ দুনিয়ার অন্য কোন জাতির ইতিহাসে পাওয়া যায় না। মুসলমানদের এই নৈতিকতাই জঘন্যতম দুশমনের অন্তরও জয় করে নিয়েছিল। কথিত আছে যে, মুসলমানরা যখন রোমকদেরকে জিযিয়া ফিরিয়ে দিলেন তখন তারা কেঁদেছিল এবং দোয়া করেছিল আল্লাহ যেন তাদেরকে ফিরিয়ে আনেন।

সকল মুসলমান সৈন্য শহর থেকে বের হয়ে ইয়ারমুক নদীর তীরে একস্থানে একত্রিত হলেন। ইত্যবসরে রাজধানী থেকে সাহায্যও এসে পৌছলো। কিন্তু তবুও সমস্ত মুসলমানের সংখ্যা সব মিলিয়ে ৩০-৪০ হাজারের মাঝামাঝি ছিল। পক্ষান্তরে রোমক সৈন্যদের সংখ্যা প্রায় দু'লাখ ছিল।

প্রথমত উভয় পক্ষ থেকে দূত গমনাগমন করতে লাগলো। রোমকরা চেয়েছিল যে, মুসলমানরা অর্থ নিয়ে ফিরে যাক। কিন্তু মাসলমানদের লক্ষ্য অর্থ-সম্পদ লাভ ছিল না। এজন্য এতে তারা রাজী হলেন না। সুতরাং উভয়পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গেল। রোমকরা নির্দয়ভাবে লড়াই করলো। মুসলমানদের ওপর তারা বারবার ভয়াবহ হামলা চালালে এবং একবার তো তাদেরকে পিছু হটিয়ে দিতেই সফল হয়ে গেলো। কিন্তু মুসলমান অফিসারদের আত্মোৎসর্গের চেতনা এবং যুদ্ধ নৈপুণ্য পরিস্থিতি সামলে নিল এবং তাঁরা রোমকদের ওপর এমন গজবনাক জবাবী হামলা চালালো যে তাদের মধ্যে চরম বিশৃংখলা দেখা দিল। তাদের প্রায় ৭০ হাজার মানুষের লাশ যুদ্ধের ময়দানে পড়ে রলো। যারা জীবিত ছিল তারা পালিয়ে গেল। ইয়ারমুকের এই মহান বিজয় সিরিয়ায় ভাগ্যের ফায়সালা করে দিল। হিরাক্লিয়াস পালিয়ে কাসতানতুনিয়া চলে গেল। পুনরায় কখনো তারা সিরিয়ার দিকে মুখ করার সাহস হয়নি। ইয়ারমুকের বিজয়ের পর মুসলমানদের অগ্রযাত্রা কাননে সিরিনের দিকে চললো এবং তা পদানত করে হালব ও ইন্তাকিয়া পর্যন্ত গিয়ে পৌছলো। এসব শহরে ইসলামের ঝাণ্ডা বুলন্দ করার পর হযরত আবু উবায়দাহ (রা) বাইতুল মুকাদ্দাস পৌছলেন। এ সময় খৃস্টানরা হিম্মত হারিয়ে বসলো এবং সন্ধির আবেদন জানালো। কিন্তু সন্ধির জন্য একটি শর্ত আরোপ করলো। শর্তটি হলো হযরত ওমরকে (রা) স্বয়ং বাইতুল মুকাদ্দাসে আসতে হবে এবং স্বহস্তে তাঁকে সন্ধিনামা পূরণ করতে হবে। হযরত আবু উবায়দাহ (রা) হযরত ওমরকে (রা) চিঠি লিখলেন। চিঠিতে তিনি জানালেন যে, বিনা রক্তপাতে যদি বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করতে হয় তাহলে আপনাকে এখানে আসতে হবে। আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবু উবায়দাহর (রা) পত্র পেয়ে কয়েকজন মুহাজির ও আনসারসহ বাইতুল মুকাদ্দাস তাশরীফ আনলেন। জাবিয়া নামক স্থানে হযরত আবু উবায়দাহ (রা), হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ, হযরত ইয়াযিদ (রা) বিন আবু সুফিয়ান (রা) এবং সেনাবাহিনীর অন্যান্য অফিসার আমীরুল মু'মিনীনকে ইসতিকবাল করলেন। খৃস্টানদের প্রতিনিধিও সেখানে পৌছলো এবং সন্ধিনামা লিখার আবেদন জানালো। চুক্তিপত্র লিপিবদ্ধ হলো এবং তাতে উভয় পক্ষের স্বাক্ষর হয়ে গেল। এ সময় হযরত ওমর (রা) জাবিয়া থেকে রওয়ানা হয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস পৌছলেন এবং শহরে প্রবেশ করে সেখানে নামায পড়লেন। যেখানে বর্তমানে মসজিদে ওমর (রা) অবস্থিত। বাইতুল মুকাদ্দাস অবস্থান কালে একদিন হযরত ওমর (রা) হযরত বিলাল হাবশীর (রা) নিকট আযানের ফরমায়েশ দিলেন। হযরত বিলাল (রা) বললেন, আমি ওয়াদা করেছিলাম যে, রাসূলের (সা) ইন্তেকালের পর কখনো আযান দিব না। কিন্তু আজ আপনার নির্দেশ পালন করছি। একথা বলেই তিনি আযান দেয়া

শুরু করলেন। এ সময় সাহাবায়ে কেরামের (রা) রাসূলের (সা) মুবারাক যুগ স্মরণে এসে গেলো এবং তারা ভাবাবেশে পড়ে গেলেন। হযরত আবু উবায়দাহ (রা) এবং হযরত মুয়াজ (রা) বিন জাবাল কাঁদতে কাঁদতে অস্থির হয়ে পড়লেন এবং হযরত ওমরের (রা) হিচকী শুরু হয়ে গেল। বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ের পর হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত আবু উবায়দাহকে (রা) সমগ্র সিরিয়ার গভর্নর নিয়োগ করলেন। তিনি সেনাপতি ও সিরিয়ার গভর্নর উভয় পদেই অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত সুন্দরভাবে পালন করেছিলেন এবং লোকদের ওপর নিজের সামরিক ও প্রশাসনিক যোগ্যতার সিলমোহর অংকিত করে দিয়েছিলেন। ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, হযরত আবু উবায়দাহর (রা) নির্দেশে সিরিয়ার কয়েকটি শহরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সেখানে সাহাবীবৃন্দ (রা) লোকদেরকে কুরআন হাকিম শিক্ষা দিতেন এবং ফিকাহর মাসয়ালা বর্ণনা করতেন। একবার হিজাজে এমন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ পড়লো যে, হযরত ওমর ফারুককে (রা) নিজের সকল গভর্নরের নিকট থেকে খাদ্য তলব করতে হলো। হযরত আবু উবায়দাহ (রা) খবর পেয়ে খাদ্য বোঝাই চার হাজার উট মদীনা মুনাওয়ারা প্রেরণ করলেন (অন্য এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী তিনি স্বয়ং এই উট নিয়ে রাজধানীতে উপস্থিত হয়েছিলেন।)।

সতের হিজরীর শেষের দিকে রোমকরা সাজ-সরঞ্জামে সুসজ্জিত হয়ে হেমসের ওপর হামলা করে বসলো। হযরত আবু উবায়দাহ (রা) এদিক-ওদিক থেকে সৈন্য একত্রিত করে রোমকদের মুকাবিলা করলেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত অথচ রক্তাক্ত যুদ্ধের পর তাদেরকে পরাজিত করে ভাগিয়ে দিলেন। হযরত আবু উবায়দাহর (রা) জীবনে এইটাই ছিল সংঘটিত সর্বশেষ যুদ্ধ। তারপর রোমকরা আর কখনো মুসলমানদের দিকে অগ্রসর হওয়ার সাহস পায়নি।

১৮ হিজরীতে সিরিয়া ও ইরাকে মহামারী আকারে প্লেগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিল। ইসলামের ইতিহাসে এই মহামারী "তাউনে আমওয়াস" নামে খ্যাত। এই মহামারীতে মুসলমানদের প্রচুর ক্ষতি হয় এবং তাদের হাজার হাজার এতে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। হযরত ওমর ফারুক (রা) এই মহামারীর খবর পেয়ে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং তা থেকে পরিত্রাণের পদ্ধতি খুঁজে বের করার জন্য স্বয়ং সিরিয়া তাশরীফ নিলেন। হযরত আবু উবায়দা (রা) এবং সেনাবাহিনীর অন্যান্য অফিসার সুরগ নামক স্থানে আমীরুল মু'মিনীনের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। হযরত ওমর (রা) এসব ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তাদের অধিকাংশই সেই স্থান (আমওয়ান) থেকে সরে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু হযরত আবু উবায়দা (রা) সেই মতের বিরোধিতা করলেন। সুতরাং হযরত ওমর (রা) যখন ঘোষণা করালেন যে, আগামীকাল

সব সৈন্য আমার সঙ্গে এখান থেকে চলে যাবে তখন হযরত আবু উবায়দাহ (রা) অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন এবং তিনি হযরত ওমরকে (রা) সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে ওমর! আপনি কি আল্লাহর নির্ধারিত তাকদির থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন ?"

হযরত ওমর (রা) জবাব দিলেন ঃ

"আবু ওবায়দাহ (রা)! হায়, তোমার ছাড়া অন্য কারোর মুখ দিয়ে যদি একথা বের হতো। আমি তাকদিরে ইলাহী থেকে তাকদিরে ইলাহীর দিকেই যাচ্ছি। তুমি নিজেই বলো, তুমি যদি কিছু উটসহ এমন একটি উপত্যকা অতিক্রম কর। যে উপত্যকার এক দিক হলো বিরাণ ও বন্ধ্যা। অন্যদিক হলো শস্য শ্যামল। এই অবস্থায় শস্য শ্যামল অংশে উট চরানো কি তাকদিরে ইলাহী অনুযায়ী হবে না ?

এ সত্ত্বেও হযরত আবু উবায়দাহ (রা) নিজের মতের ওপর কায়েম রইলেন। হযরত ওমর (রা) মদীনা ফিরে গিয়ে হযরত আবু উবায়দাহকে (রা) পত্র লিখলেন। এই পত্রে তাঁকে মদীনায় আসার কথা বলা হয়েছিল। হযরত আবু উবায়দাহ (রা) বুঝলেন যে, আমীরুল মু'মিনীন তাঁকে মহামারী উপদ্রুত অঞ্চল থেকে বের করে নিতে চান। তিনি জবাবে লিখে পাঠালেন ঃ

"আমীরুল মু'মিনীন, আপনি আমাকে যে উদ্দেশ্যে মদীনা ডেকেছেন তা আমি বুঝে ফেলেছি। আমি মুসলমান সৈন্যবাহিনীতে রয়েছি এবং আমার অন্তর তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না। এজন্য আমাকে এখানেই থাকতে দিন।"

হযরত ওমর (রা) এই পত্র পাঠ করে কেঁদে দিলেন এবং হযরত আবু উবায়দাহকে (রা) আরো একটি পত্র লিখে পাঠালেন। তাতে তিনি লিখলেন যে, বর্তমানে সৈন্যরা যেখানে রয়েছে সেই স্থানটি নীচু এবং স্যাঁতসেতে। এজন্য সেনাবাহিনীসহ কোন উঁচুস্থানে স্থানান্তর হয়ে যান।

হযরত আবু উবায়দাহ (রা) তাঁর নির্দেশ পালন করলেন এবং সেনাবাহিনী নিয়ে জাবিয়া স্থানান্তর হয়ে গেলেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছতেই তিনি রোগে আক্রান্ত হলেন। অবস্থা যখন সঙ্গীন হয়ে উঠলো তখন তিনি হযরত মুয়াজ (রা) বিন জাবাল আনসারীকে নিজের স্থলাভিষিক্ত বানালেন এবং লোকদেরকে আল্লাহর আনুগত্য ও ঐক্যবদ্ধ থাকার ওসিয়ত করে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৫৮ বছর। হযরত মুয়াজ (রা) বিন জাবাল কাফন দাফনের ব্যবস্থা করলেন এবং মুসলমানদের সামনে এক দরদপূর্ণ ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি বললেন ঃ

"হে মুসলমানরা ! তোমরা আজ এমন এক মুসলমান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মুসিবতে নিপতিত হয়েছ যার উদাহরণ আমি আল্লাহর বান্দাহদের মধ্যে কাউকে দেখিনি। তিনি সবার চেয়ে বেশী ক্ষমাশীল ছিলেন। তিনি সোরগোল থেকে পবিত্র ছিলেন। মুসলমানদের সবচেয়ে বেশী কল্যাণকামী ছিলেন এবং তাদের প্রতি সবার চেয়ে বেশী স্নেহশীল ছিলেন। এজন্য তোমরা সকলেই তাঁর জন্য রহমত এবং মাগফিরাতের দোয়া কর। আল্লাহর কসম, এখন তাঁর মত কোন ব্যক্তি তোমাদের সরদার হবে না।"

অতপর হযরত মুয়াজ (রা) জানাযার নামায পড়ালেন। হযরত আমর (রা) ইবনুল আছ এবং হযরত জাহহাক (রা) বিন কায়েস কবরে নামলেন ও ইসলামের সেই সূর্যকে দাফন করে দিলেন।

হযরত আবু উবায়দাহর (রা) দাফনস্থল নিয়ে মতভেদ রয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার (র) "ইসাবাহ" গ্রন্থের একস্থানে তাঁর কবর ফাহলে থাকার কথা উল্লেখ করেছেন এবং অন্য একস্থানে বাসইয়ানে তাঁর দাফনস্থলের কথা বলেছেন। ইবনে আছির (রা) "উসুদুল গাব্বাহ"তে তাঁর দাফনস্থল" আমওয়াস বলে বর্ণনা করেছেন। আমওয়াস রামলা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসের পথে চার ফারসাখ দূরে অবস্থিত। কিন্তু তিনি 'বাসইয়ান' বর্ণনা সম্বলিত রেওয়ায়াতকে বাতিল করেননি। হযরত আবু উবায়দার (রা) পারিবারিক জীবনের অবস্থা সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী তিনি শুধুমাত্র একটি বিয়ে করেছিলেন। স্ত্রীর নাম ছিল হিন্দ (রা) বিন জাবের। তাঁর গর্ভে দু'টি পুত্র ইয়াযিদ এবং উমায়ের জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সন্তান ছাড়া মারা যান।

অন্য এক রেওয়ায়াতে তাঁর দুই স্ত্রী থাকার উল্লেখও এসেছে। তবুও তাঁর বংশধারা আর সামনে এগোয়নি বলে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেছেন। হযরত আবু উবায়দাহ (রা) থেকে বর্ণিত কতিপয় হাদীসও পুস্তকাদিতে পাওয়া যায়। এসব হাদীসের রাবীদের মধ্যে হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা), হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) এবং হযরত সুমরা (রা) বিন জুনদুবের মত জালিলুল কদর সাহাবী অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলীর দিক থেকে হযরত আবু উবায়দাহ (রা) অত্যন্ত উঁচু মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন। ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামিতা, হক পথে ত্যাগ, রাসূল প্রেম, জিহাদের প্রতি শওক, পৌরষত্ব, যুহুদ বা ভক্তি, নৈতিকতা, ধৈর্য, স্নেহপরায়ণতা, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল সবচেয়ে প্রোজ্জ্বল। তাঁর এই গুণাবলীর কারণেই রাসূলের (সা)

নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি শুধুমাত্র রাসূলের যুগের সকল মর্যাদাই লাভ করেননি। বরং "আমীনুল উম্মাতের" মত একক উপাধিও তিনি লাভ করেছিলেন। তিনি এত সুন্দর চরিত্রের অধিকারী ছিলেন যে, সকল সাহাবীই তাঁকে আন্তরিকভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। তিনি যখন মুজাহিদদেরকে সঙ্গে নিয়ে সিরিয়া রওয়ানা হচ্ছিলেন তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) আরবের মশহুর শাহ সওয়ার বা অশ্বারোহী কায়েস বিন মাকশুহকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

"আমি তোমাকে আবু উবায়দাহ (রা) আল-আমীনের নেতৃত্বে প্রেরণ করছি। তিনি এমন মানুষ যে, তাঁর সঙ্গে যদি কেউ বাড়াবাড়িও করে তাহলে তিনি তাকে বরদাশত করে নেন। কেউ তার সাথে খারাপ ব্যবহার করলে ক্ষমা করে দেন। কেউ তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলে তিনি তার সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি করেন। তিনি মুসলমানদের ওপর খুব স্নেহপরায়ণ এবং কাফেরদের ওপর খুব কঠোর। এজন্য তোমরা কোন ব্যাপারে তাঁর আনুগত্যহীনতা এবং বিরোধিতা করো না। তিনি তোমাদেরকে যে নির্দেশ দেবেন তা কল্যাণের জন্য দেবেন।"

তাবকাতে ইবনে সায়াদে আছে, একবার হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত আবু উবায়দাহ (রা) এবং হযরত মুয়াজ (রা) বিন জাবালের খিদমতে চারশ' দিনার ও চারহাজার দিরহাম প্রেরণ করলেন। হযরত আবু উবায়দাহ (রা) নিজের অংশের সকল অর্থ সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন এবং হযরত মুয়াজও কতিপয় দিরহাম ও দিনার ছাড়া সবই মুসতাহিকদের মধ্যে বিতরণ করে দিয়েছিলেন—স্ত্রীর বলার কারণে পারিবারিক প্রয়োজন পূরণের জন্য তিনি কতিপয় দিনার ও দিরহাম রেখে দিয়েছিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) যখন ব্যাপারটি জানতে পেলেন তখন সতস্ফুর্তভাবে তাঁর মুখ দিয়ে এই বাক্য উচ্চারিত হলো ঃ "আলহামদুলিল্লাহ, মুসলমানদের মধ্যে এমন মানুষও রয়েছেন, যাঁদের দৃষ্টিতে স্বর্ণ ও রোপ্যের কোন তাৎপর্যই নেই।"

হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত আবু উবায়দাহকে (রা) খুবই সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন এবং তিনি তাঁকে ভাই বলে ডাকতেন। ১৭ হিজরীতে আমীরুল মু'মিনীন বাইতুল মুকাদ্দাস তাশরীফ নিলেন। এ সময় তাঁর ইসতিকবালের জন্য সৈন্যদের নেতৃবৃন্দ প্রচণ্ড ভীড় করলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) তাদের মধ্যে হযরত আবু উবায়দাহকে দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমার ভাই কোথায় ? লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, আমীরুল মু'মিনীন, আপনি কার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছেন ? তিনি বললেন, আবু উবায়দাহর (রা) সম্পর্কে। ইত্যবসরে হযরত আবু উবায়দাহ (রা) নিজের উটনীর ওপর সওয়ার হয়ে এসে পৌঁছলেন। অন্য সাহাবীদের মধ্যে অধিকাংশই বিজয়সমূহের পর নিজেদের জীবন যাত্রার

মান পরিবর্তন করে নিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত আবু উবায়দার (রা) দেহের ওপর সেই সাদাসিধে এবং সাধারণ পোশাকই ছিল যা হযরত ওমর (রা) মদীনা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে তাঁর গায়ে দেখেছিলেন। আমার ভাই, আমার ভাই বলে তিনি, তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। অতপর কুশলাদি জিজ্ঞেসের জন্য তাঁর অবস্থান স্থলে তাশরীফ নিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি বিস্মিত হয়ে গেলেন। কারণ, তরবারী, ঢাল এবং উটের হাওদা ছাড়া সেখানে আর কোন ধরনের আসবাবপত্র ছিলো না। হযরত ওমর ফারুকের (রা) চোখ বুঁজে এলো এবং তিনি বললেন, "আবু উবায়দাহ (রা)! হায়, তুমি যদি আবশ্যকীয় সামান ঘরে রাখতে।" তিনি মুখাপেক্ষীহীনভাবে জবাব দিলেন ঃ "আমীরুল মু'মিনীন! একজন মুজাহিদের জন্য এই সামানই যথেষ্ট।"

বাইতুল মুকাদ্দাস অবস্থানকালে একদিন হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত আবু উবায়দাহকে (রা) হাসি-খুশীভাবে এবং খোশ মেযাজের সঙ্গে বললেন, "ভাই, অন্যেরাতো আমাকে দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু তুমি আমাকে দাওয়াত দাওনি। তুমিও আমাকে আজ দাওয়াত করো না।"

হযরত আবু উবায়দাহ (রা) আরজ করলেন, "আমীরুল মু'মিনীন, আমি এই ধারণায় চুপ ছিলাম যে হয়ত আপনি আমার দাওয়াত পসন্দ করবেন না। নচেৎ আমি নিজের গরীবখানায় আপনার জন্য সবসময় তাকিয়ে থাকবো।"

হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁর অবস্থান স্থলে তাশরীফ নিলেন। এ সময় হযরত আবু উবায়দাহ (রা) কয়েক টুকরো শুকনো রুটি আমীরুল মু'মিনীনের সামনে এনে দিলেন এবং আরজ করলেন ঃ

"আমীরুল মু'মিনীন, আমি তো এই খাই। দু'বেলাই এই শুকনো রুটি পানিতে ভিজিয়ে খেয়ে নিই।"

হযরত ওমর ফারুক (রা) কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, "সিরিয়া এসে সবাই বদলে গেছে। কিন্তু আবু উবায়দাহ (রা) একমাত্র তুমিই পূর্বের অবস্থায় রয়েছ।"

অন্য আরেকস্থানে হযরত ওমর (রা) তাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "কারোর মুখের ওপর প্রশংসা করাটা প্রশংসিত ব্যক্তির গর্দানে ছুরি চালানোর নামান্তর। কিন্তু আবু উবায়দা! আমি এটা না বলে পারছি না যে, তুমি ছাড়া আমাদের প্রত্যেকেই নিজেকে কিছুনা কিছু পরিবর্তন করে নিয়েছে।"

হযরত ওমর ফারুকের (রা) ওফাতের পূর্বে সাহাবায়ে কিরাম (রা) তাঁকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিয়োগের পরামর্শ দিলেন। এ সময় তিনি বললেন; হায়! আবু

উবায়দাহ (রা) জীবিত থাকলে খিলাফতের জন্য আমি তাঁর নাম প্রস্তাব করতাম। কিয়ামতের দিন আমাকে তার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে আমি বলবো, হে আল্লাহ! আমি তোমার নবীকে (সা) তার ব্যাপারে একথা বলতে শুনেছি যে, "সে [আবু উবায়দাহ (রা)] এই উম্মাতের আমিন।"

সহীহ মুসলিমের এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত ওমর ফারুকের (রা) নিকট হযরত আবু উবায়দাহর (রা) এই মর্যাদা ছিল যে, তিনি তার বিরোধিতা করাকে মাকরুহ মনে করতেন।

সিরিয়ার শক্তিধর গর্ভনর এবং প্রধান সেনাপতি হওয়া সত্ত্বেও হযরত আবু উবায়দাহ (রা) এত বিনয়ী ছিলেন যে, তিনি কখনো মূল্যবান বা স্বতন্ত্র ধরনের কোন পোশাক পরিধান করেননি এবং কোন উঁচুস্থানে বৈঠকখানা বানাননি। সাধারণ পোশাকে সিপাহীদের মধ্যে মাটির বিছানায় বসে পড়তেন। রোমকদের দূত আসতো। জিজ্ঞেস করা ছাড়া সে জানতে পারতো না যে, মুসলমানদের আমীর কে। মোটকথা, তিনি বিনয় ও সাম্যের বিস্ময়কর উদাহরণ কায়েম করেছিলেন।

একবার এক মুসলমান সিপাহী দুশমনের একজন সিপাহীকে আশ্রয় দিল হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ এবং হযরত আমর (রা) ইবনুল আছ এটা মানতে আপত্তি জানালেন। তাঁরা বললেন, এই আশ্রয় একজন সিপাহী দিয়েছে। হযরত আবু উবায়দা (রা) একথা জানতে পেরে বললেন, আমি এই মুসলমান মুজাহিদ প্রদত্ত আশ্রয়কে বাতিল করতে পারি না। কেননা আমি রাসূল্লাহ (সা) থেকে শুনেছি যে, মুসলমানদের প্রত্যেকেই সকলের পক্ষ থেকে আশ্রয় দিতে পারে।

এই বিনয় ও নম্রতা ছাড়াও তিনি নসিহত, তালকিন এবং হক কথন থেকে কখনো বিরত থাকতেন না। হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতের আসনে সমাসীন হওয়ার খবর পেয়ে তিনি সিরিয়া থেকে তাকে এক প্রভাবপূর্ণ পত্র লিখলেন। যাতে তিনি আখিরাতের দিনের ভয় দেখিয়েছিলেন এবং আদল ও ইনসাফের তালকিন দিয়ে ছিলেন।

সত্যকথা হলো যে, হযরত আবু উবায়দাহর (রা) জীবন একটি আদর্শ জীবন ছিল। তার যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা হোক না কেন তা ছিল আলোকোজ্জ্বল। তাঁর জীবন মুসলিম উম্মাহকে মনযিলে মাকসুদ নির্ধারণে পথ দেখিয়ে থাকে।

হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস

করুণার আধার মহানবী (সা) হিজরত করে মদীনায় শুভ পদার্পণ করলেন। এ সময় মুসলমানরা বিশেষ করে সেই সব মুহাজির যাঁরা মক্কায় তেরটি বছর যাবত কাফেরদের জুলুম-নির্যাতনের যাঁতায় নিষ্পেষিত হয়েছিলেন, কিছুটা শান্তির নিঃশ্বাস নিতে পারলেন। কিন্তু মদীনার ইহুদী এবং মক্কার মুশরিকরা মদীনায় মুসলমানরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে থাকুক তা কোনক্রমেই সহ্য করতে পারলো না। তাঁরা হকপন্থীদের বিরুদ্ধে শত্রুতা শুরু করে দিল। মক্কায় কুরাইশরা অন্তরের জ্বালা মিটানোর জন্য মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাইকে একটি উত্তেজনাপূর্ণ চিঠি লিখলো। এই চিঠিতে তারা মুনাফিক সরদারকে হুমকি দিল যে, সে তাদের মানুষকে আশ্রয় দিয়েছে। আশ্রিতকে হত্যা করে ফেলতে হবে অথবা মদীনা থেকে বের করে দিতে হবে। তা যদি না করে তাহলে তারা মদীনায় হামলা করে তাদেরকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে। আবদুল্লাহর যদি সাহস থাকতো তাহলে সে অবশ্যই মক্কায় কুরাইশদের কথামতো কাজ করতো। কিন্তু যখন তাকে এ ধরনের তৎপরতার পরিণাম সম্পর্কে অবহিত করা হলো তখন সে চুপ মেরে গেল। সময়টি ছিল খুবই ভীতিপ্রদ। ইসলামের দুশমনরা মদীনার ওপর হামলার পরিকল্পনা আটছিলো। এজন্য সদা সতর্ক থাকার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং সাহাবায়ে কিরাম (রা) একটি নিয়ম করেছিলেন। তাঁরা রাতেও অস্ত্র বেঁধে শুতেন এবং পালা করে জেগে জেগে পাহারা দিতেন। নবীর (সা) আবাস গৃহকে তাঁরা কখনো অরক্ষিত রাখতেন না। রাত হোক অথবা দিন হোক কোন না কোন সাহাবী (রা) অস্ত্র সজ্জিত হয়ে নবীর (সা) আবাসগৃহ অবশ্যই পাহারা দিতেন।

সেই সময়েরই একটি ঘটনা। এক রাতে হুজুরের (সা) ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘটনাক্রমে সে সময় কোন ব্যক্তি পাহারায় ছিলেন না। হুজুর (সা) বললেন ঃ "হায়! কোন নেক ব্যক্তি যদি আজ পাহারায় থাকতো।" ইতিমধ্যে অস্ত্রের ঝনঝনানি শোনা গেল। হুজুর (সা) জিজ্ঞেস করলেন, কে ? জবাব এলো, হে আল্লাহর রাসূল ! আমি সায়াদ। জিজ্ঞেস করলেন, কি জন্য এসেছ। আরজ করলেন, আমার অন্তরে হুজুরের (সা) ব্যাপারে ভয় সৃষ্টি হলো। এজন্য পাহারা দিতে এসেছি।

প্রিয়নবী (সা) এই জবাব শুনে খুশী হয়ে গেলেন। হযরত সায়াদের (রা) জন্য দোয়া করলেন এবং পুনরায় আরাম করতে গেলেন—এই সায়াদ (রা)

যাঁকে রাসূলে আকরাম (সা) "রাজুলে সালেহ" বা নেক ব্যক্তির মহান লকব প্রদান করেছিলেন। তিনি ছিলেন আবি ওয়াক্কাস মালিক বিন ওয়াহিবের পুত্র এবং কুরাইশের এক সম্মানিত শাখা বনু যাহরার নয়নমনি।

সাইয়েদেনা হযরত আবু ইসহাক সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস আসহাবে আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহ'র অন্যতম ছিলেন এবং ইসলামের ইতিহাসের মহান ব্যক্তিদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। তাঁর নসবনামা হলো ঃ

সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস মালিক বিন ওয়াহিব বিন আবদি মান্নাফ বিন যাহরাহ বিন কিলাব বিন মুররাহ।

পঞ্চম পুরুষে কিলাব বিন মুররাহ'র ওপর তাঁর নসবের সিলসিলা রাসূলে আকরামের (সা) নসবনামার সাথে মিলে যায়। হুজুরের (সা) মাতা হযরত আমেনাও বনু যাহরাহ গোত্রভুক্ত ছিলেন এবং হযরত সায়াদের (রা) পিতা আবু ওয়াক্কাস মালিকের চাচাতো বোন ছিলেন। এই দিক থেকে আবু ওয়াক্কাস মালিক সম্পর্কে হুজুরের (সা) মামা হতেন এবং হযরত সায়াদ (রা) মামাতো ভাই—হুজুর (সা) কখনো কখনো ভালোবাসা ও স্নেহের বশবর্তী হয়ে (নানার দিককার সম্পর্কের কারণে) হযরত সায়াদকেও (রা) মামা বলে ডাকতেন।

হযরত সায়াদের (রা) মাতার নাম ছিল হাসনা বিনতে সুফিয়ান বিন উমাইয়া এবং তিনি বনু উমাইয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন।

নবীর (সা) হিজরতের প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে হযরত সায়াদ (রা) মক্কা মুয়াজ্জমায় জন্মগ্রহণ করেন। সারওয়ারে আলমের (সা) নবুয়ত প্রাপ্তির সময় হযরত সায়াদ (রা) ছিলেন পূর্ণ যুবক এবং সে সময় তাঁর বয়স ছিল ১৭ কিংবা ১৯ বছর। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সুন্দর স্বভাব ও প্রকৃতিদান করেছিলেন। যেই তাঁর কানে তাওহীদের দাওয়াত এলো, তক্ষুণি কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তাতে সাড়া দিলেন এবং "সাবিকুনাল আউয়ালুনের" পবিত্র দলে শামিল হয়ে গেলেন। এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণকারী বালেগ পুরুষদের মধ্যে তিনি তৃতীয় মুসলমান ছিলেন এবং অন্য কতিপয় রেওয়ায়াত অনুসারে তাঁর পূর্বে ৬-৭ জন বুজর্গ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। যাহোক তিনি পবিত্র সেই কতিপয় নফসের অন্তর্ভুক্ত যারা দাওয়াতে হকের প্রথম সাত দিনের মধ্যে তাওহীদের ঝাণ্ডা তুলে ধরার মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

হযরত সায়াদের (রা) মাতা হামনার নিজের বাপ-দাদার ধর্মের প্রতি গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি সেই ধর্মের প্রতি দিওয়ানা ছিলেন। তিনি যখন পুত্রের ইসলাম গ্রহণের কথা শুনলেন তখন এতো দুঃখিত হলেন যে, খানা-

পিনা, কথা বলা, চলা-ফেরা সবই ত্যাগ করলেন। হযরত সায়াদ (রা) মাকে খুব গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং নিজের মাকে বিষাদপূর্ণ দেখাটা তাঁর জন্য একটা বড় ধরনের পরীক্ষার ব্যাপার ছিল। কিন্তু তিনি সেই পরীক্ষায় পুরোপুরি উত্তীর্ণ হন। মা তিন দিন পর্যন্ত ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর রলেন। তাঁর একটিই বায়না ছিল যে, এই নতুন ধর্ম পরিত্যাগ করো। কিন্তু সায়াদেরও (রা) একই জবাব ছিল ঃ

"মা, তুমি আমার সীমাহীন প্রিয়! কিন্তু তোমার দেহে যদি হাজার জীবনও থাকে এবং এক এক করে প্রতিটি জীবন বের হয়ে যায় তবুও আমি ইসলাম ত্যাগ করবো না।"

আল্লাহর দরবারে হযরত সায়াদের (রা) অটলতা ও দৃঢ়তা এমনভাবে গৃহীত হলো যে, সাধারণ মুসলমানের জন্য আল্লাহর এই ফরমান জারী হয়ে গেল ঃ

وَاِنْ جَاهَدٰاكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ لا فَلاَ تُطِعْهُمَا

"কিন্তু তারা যদি আমার সাথে এমন কোন (মাবুদকে) শরীক বানানোর জন্য—যাকে তুমি (আমার শরীক বলে) জান না—তোমার ওপর চাপ দেয়, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না।" (লোকমান ঃ ১৫)

ইসলাম গ্রহণের পর মায়ের অসন্তুষ্টি ছাড়া মুশরিকদের হাতের আরো অনেক কঠিন মুসিবত হযরত সায়াদকে (রা) সহ্য করতে হয়েছিল। তিনি কাফেরদের গালি খেয়েছেন, অপবাদ সয়েছেন এবং দৈহিক শাস্তিও বরদাশত করেছেন। কিন্তু সামান্যতম পদস্খলনও হয়নি।

দাওয়াতে হকের শুরুতে সাহাবায়ে কিরাম (রা) কাফেরদের জ্বালাতন বা অপকর্ম থেকে বাঁচার জন্য মক্কার নিকটে পাহাড়ের সুনসান গিরিপথে লুকিয়ে এক আল্লাহর ইবাদত করতেন। হযরত সায়াদও (রা) এসব পবিত্র নফসের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। একদিন তিনি অন্য কতিপয় সাহাবীর সঙ্গে এক বিরাণ গিরিপথে নামায পড়ছিলেন। এমন সময় কতিপয় মুশরিক সেখানে এসে পড়লো। তারা প্রথমত চীৎকার করলো এবং পরে মুসলমানদের ওপর হামলা করে বসলো। হযরত সায়াদের (রা) তখন ভরা যৌবন। তিনি আবেগ উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। পাশেই উটের একটি হাড় পড়েছিল। তা উঠিয়ে মুশরিকদের ওপর আক্রমণ করে বসলেন। একজন মুশরিকের মাথা ফেটে গেল এবং রক্ত বইতে লাগলো। তখন সেই দুষ্কৃতকারীরা সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়াটাই

শ্রেয় মনে করলো। আল্লামা ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস প্রথম ব্যক্তি যিনি হকের সমর্থনে রক্তাক্ত কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন।

হিজরতের পূর্বে হযরত সায়াদের (রা) জীবনের সবচেয়ে প্রোজ্জল অধ্যায় সেই তিন বছর যে তিন বছর তিনি প্রিয় নবীর (সা) সাহচর্যে শে'বে আবি তালিবে অবরুদ্ধ ছিলেন। শে'বে আবি তালিবের অবরোধ যদিও বনি হাশিম ও বনু মুত্তালিবের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। কিন্তু হযরত সায়াদ (রা) হাশেমী ও মুত্তালেবী না হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের (সা) খাতিরে বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবকে সমর্থন করেছিলেন এবং তাদের সঙ্গে তিন বছর ভয়াবহ মুসিবত বরদাশত করেছিলেন।

সে যুগে অসহায় অবরুদ্ধরা কোন কোন সময় গাছের এবং জঙ্গলের পাতা পেড়ে পেড়ে উদর পূরণ করতেন। হযরত সায়াদ (রা) বর্ণনা করেছেন যে, একবার রাতে তারা শুকনো চামড়ার একটি টুকরো কোথাও থেকে পেয়ে গেলেন। তারা তা পানি দিয়ে ধুলেন। অতপর আগুনের ওপর ভুনলেন। গুলিয়ে পানিতে মিশালেন এবং ছাতুর মত তা পান করে পেটের আগুন দূর করলেন।

নবুয়ত প্রাপ্তির একাদশ বছরে আল্লাহ তায়ালা ইয়াছরাববাসীকে ইসলামের প্রতি ঝুঁকিয়ে দিলেন। সুতরাং সে বছর ৬জন সুন্দর স্বভাবের খাজরাজী ইসলাম গ্রহণ করে ইয়াছরাব ফিরে গেলেন। পরের বছর ইয়াছরাব থেকে ১২ ব্যক্তি হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণের মর্যাদা লাভ করলেন। তার পরের বছর ৭৫ জন হকপন্থী ইয়াছরাব থেকে মক্কা পৌছে রহমতে আলম (সা)-এর পবিত্র হাতে এই প্রতিশ্রুতিসহ বাইয়াত করলেন যে, তিনি ইয়াছরাব গমন করলে তারা নিজেদের জীবন, সম্পদ এবং সন্তান দিয়ে তাকে হিফাজত করবেন। এই বাইয়াতকে "বাইয়াতে উকবায়ে কবিরাহ" বলা হয়ে থাকে। তারপর হুজুর (সা) সাহাবায়ে কিরামকে (রা) ইয়াছরাবে হিজরতের অনুমতি দিলেন। বস্তুত অধিকাংশ সাহাবী (রা) মক্কাকে বিদায় জানিয়ে ইয়াছরাব চলে গেলেন। এই মুহাজিরদের মধ্যে হযরত সায়াদ (রা) এবং তাঁর যুবক ভাই উমায়েরও (রা) শামিল ছিলেন। ইয়াছরাব পৌছে হযরত সায়াদ (রা) এবং উমায়ের (রা) নিজের বড় ভাই উতবা (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসের গৃহে অবস্থান শুরু করলেন। উতবা বুয়াছের যুদ্ধের পূর্বে মক্কায় এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলেছিলেন এবং কিসাসের ভয়ে পালিয়ে ইয়াছরাবে আশ্রয় নিয়েছিলেন। উতবা যদিও মুশরিক ছিলেন তবুও তিনি অত্যন্ত আনন্দচিত্তে নিজের দুই সহোদরকে স্বগৃহে রেখেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত উতবা দীর্ঘ দিন যাবৎ কুফর ও

শিরকের অন্ধকারে পথভ্রষ্ট অবস্থায় ঘুরপাক খেতে লাগলেন। কিন্তু ইসলামের প্রতি তার শত্রুতায় ছোট ভাইদ্বয় সামান্য পরিমাণও প্রভাবিত হলেন না এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইসলামের সাথে তাদের গভীর সম্পর্ক বজায় রলো। হযরত সায়াদের (রা) হিজরতের কিছুদিন পর মহানবীও (সা) ইয়াছরাবে শুভ পদার্পণ করলেন এবং পুরনো শহর ইয়াছরাব থেকে "মদীনাতুন্‌নবী" হয়ে গেল।

হিজরতের পর মুসলমানরা একটু শান্তি পেলেন এবং তারা কাফেরদের জুলুম নির্যাতনের হাত থেকে মাহফুজ হয়ে গেলেন। তা সত্ত্বেও মক্কায় মুশরিকদের হামলার ভয় সবসময়ই ছিল। এই ভীতির কারণে সাহাবায়ে কিরাম (রা) সবসময়ই সশস্ত্র থাকতেন এবং নবীর (সা) আবাসস্থলে নিয়ামত পাহারা দিতেন। সেই সময়ই হযরত সায়াদেরও (রা) কোন কোন সময় পাহারা দানের সৌভাগ্য হয়েছিল। মদীনার ওপর হামলার তদারক এবং মক্কার মুশরিকদের গতিবিধির প্রতি নজর রাখার জন্য হুজুর (সা) সাহাবাদের (রা) ছোট ছোট সশস্ত্র দলকে মাঝে মধ্যে মক্কার দিকে প্রেরণ করতেন। এসব অভিযানকে সারিয়্যাহ বলা হয়ে থাকে। বদরের যুদ্ধের পূর্বে যেসব সারায়া সংঘটিত হয়েছিল তার মধ্যে সারিয়্যাহ উবায়দা (রা) বিন হারিছ, সারিয়্যাহ হামযা (রা) এবং সারিয়্যাহ আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশে হযরত সায়াদ (রা) একজন সাধারণ মুজাহিদ হিসাবে অংশ নিয়েছিলেন এবং এক সারিয়্যাহতে আটজন মুজাহিদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই অভিযানকে তাঁর নামানুসারে" "সাবিয়্যাহ সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস" বলা হয়। তাতে হযরত সায়াদ (রা) নিজের আটজন সঙ্গীসহ কুরাইশের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য খারার নামক স্থান পর্যন্ত গিয়েছিলেন। কিন্তু মুশরিকদের সাথে সংঘর্ষ বাধেনি।

ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন, সারিয়্যাহ উবায়দা (রা) বিন হারিছে যদিও রক্তারক্তির ঘটনা ঘটিনি। কিন্তু হযরত সায়াদ (রা) কুরাইশদের দিকে একটি তীর চালিয়েই দিয়েছিলেন। সহীহ বুখারীতে স্বয়ং হযরত সায়াদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমিই প্রথম আরব যে আল্লাহর পথে তীর চালিয়েছিল।

সেই যুগে কতিপয় অভিযানে হযরত সায়াদ (রা) স্বয়ং বিশ্বনবীর (সা) সঙ্গী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন এটা ছিল খুব অভাবের যুগ। সহীহ বুখারীতে হযরত সায়াদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা রাসূলের (সা) সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করতাম এবং আমাদের নিকট গাছের পাতা ছাড়া খাওয়ার কোন জিনিসই থাকতো না। এমনকি আমাদের মল উট ও বকরীর লাদির মত হতো। তাতে কোন পিত্ত থাকতো না।

তাবারী বাওয়াতার (বাওয়াত) যুদ্ধে হযরত সায়াদের (রা) অংশগ্রহণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এই যুদ্ধ দ্বিতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়। তাতে দুইশ' সাহাবায়ে কিরাম (রা) হুজুরের (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন। তাদের মধ্যে হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসও শামিল ছিলেন এবং হুজুর (সা) তাকে সৈন্যের সাদা ঝান্ডা প্রদান করেছিলেন। এই পবিত্র বাহিনী কুরাইশের একটি বড় কাফেলার সাথে যুদ্ধের জন্য বাওয়াত নামক স্থান পর্যন্ত গিয়েছিলেন। কিন্তু কুরাইশের কাফেলা (যাতে দু'শ' মানুষ এবং আড়াই হাজার উট ছিল) কেমন করে যেন বেঁচে গেল।

দ্বিতীয় হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে বদরের ময়দানে হক ও কুফুরের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সময় হযরত সায়াদ (রা) অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নেন। যুদ্ধের সময় তাঁর মুকাবিলা কুরাইশের নামকরা বাহাদুর সাঈদ বিন আছের সঙ্গে হয়ে গেল। তিনি মুহূর্তের মধ্যে সাঈদকে জাহান্নামে প্রেরণ করলেন এবং তার মশহুর তরবারী জুলকাতিফার ওপর কবজা করে নিলেন। এই তরবারী নিয়ে তিনি রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে হাজির হলেন। সে সময় পর্যন্ত গণিমাতের মালের ব্যাপারে কোন হুকুম নাযিল হয়নি। এজন্য হুজুর (সা) হযরত সায়াদকে (রা) নির্দেশ দেন যে, এই তরবারী যেখান থেকে এনেছো সেখানেই রেখে দাও। হযরত সায়াদ (রা) তৎক্ষণাৎ হুকুম তামিল করলেন। কিন্তু এই তরবারী না পাওয়ার জন্য তার খুব দুঃখ হলো। তিনি তখন সামান্য দূরেই গিয়েছিলেন। এমন সময় সূরায়ে আনফাল নাযিল হলো। যাতে এই নির্দেশ ছিল ঃ

فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلاً طَيِّبًا

"অতএব তোমরা যা কিছু ধন-মাল লাভ করেছ তা খাও, তা হালাল এবং পাক।"(আনফাল ঃ ৬৯)

হুজুর (সা) হযরত সায়াদকে (রা) ডেকে পাঠালেন এবং বললেন যে, যাও এবং নিজের তরবারী নিয়ে নাও।

বদরের যুদ্ধে হযরত সায়াদের (রা) যুবক ভাই উমায়েরকে (রা) আল্লাহ পাক শাহাদাতের মর্যাদায় আসীন করেছিলেন। হযরত সায়াদ (রা) বলেন যে, যুদ্ধের আগে আমি উমায়েরকে (রা) দেখলাম যে এদিক ওদিক লুকিয়ে ছুপিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, কি ব্যাপার উমায়ের ? সে বললো ভাইজান। আমার বয়স কম। ভয় পাচ্ছি যে রাসূলে আকরাম (সা) আবার আমাকে যুদ্ধ করতে না দেন। অথচ আল্লাহর পথে লড়াই করার আমার

আন্তরিক ইচ্ছা। আল্লাহ আমার ভাগ্যে শাহাদাতের মার্যাদা লিখে রাখতে পারেন। উমায়েরের (রা) আশংকা সঠিক বলে প্রামাণিত হলো। হুজুর (সা) তাঁর বয়স কম হওয়ার কারণে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। উমায়ের (রা) কাঁদতে লাগলেন। হুজুর (সা) তাঁর উৎসাহ এবং কাঁদার কথা জানতে পেয়ে তাঁকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়ে দিলেন। হযরত সায়াদ (রা) বলেন যে, উমায়েরের ছোট হওয়া এবং তরবারী বড় হওয়ার কারণে, আমি তার চামড়ার টুকরায় গিড়া দিতাম যাতে উচু হয়ে যায়। উমায়ের (রা) বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করলেন এবং দুশমনের নামকরা পাহলোয়ান আমর বিন আবদি দাদের হাতে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। হযরত সায়াদ (রা) উমায়েরকে (রা) খুব ভালোবাসতেন। তাঁর শাহাদাত তার জন্য ছিল খুবই কষ্টের। কিন্তু তিনি "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন" পাঠ করে চুপ মেরে গেলেন। যুদ্ধে মুশরিকদের শিক্ষণীয় পরাজয় ঘটলো। তাদের ৭০ ব্যক্তি নিহত হলো এবং মুসলমানদের হাতে বন্দী হলো ৭০ জন। তাদের মধ্যে তিন জনকে (হারিছ বিন দাহরা, সালেম বিন শামমাতা এবং ফাকিহা) একা সায়াদই (রা) কয়েদ করেছিলেন।

ওহোদের যুদ্ধে (তৃতীয় হিজরী) যখন ঘটনাক্রমে একটি ভুলের কারণে লড়াইয়ের মোড় ঘুরে গেল এবং মুসলমানরা বিশৃংখল হয়ে পড়লো তখন হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সেই কতিপয় সাহাবীর (রা) মধ্যে ছিলেন যারা রাসূলকে (সা) রক্ষা করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন পারদর্শী তীরন্দাজ। কাফেররা বার বার হুজুরের (সা) ওপর হামলা করতো। আর সায়াদ (রা) নিজের তীর দিয়ে তাদের মুখ ফিরিয়ে দিতেন। সহীহ বুখারীতে আছে যে, এই নাযুক সময়ে হযরত সায়াদ (রা) হুজুরের (সা) পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। হুজুর (সা) নিজের তুনীর থেকে তীর বের করে করে তাঁকে দিতেন এবং বলতেন ঃ

يَاسَعَدَ ارمِ فِدَاكَ اَبِى اُمِّى

"হে সায়াদ! তীর চালাও আমার মাতা পিতা তোমার ওপর ফিদা হোক।"

হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি সায়াদ (রা) ছাড়া অন্য কারোর পক্ষে এমন ধরনের বাক্য রাসূলের (সা) পবিত্র যবান দিয়ে আর শুনিনি।

আল্লামা ইবনে আছির (রা) বর্ণনা করেছেন, ওহোদের যুদ্ধের দিন হযরত সায়াদ (রা) এক হাজার তীর চালিয়েছিলেন। যুদ্ধের সময় আবু সাঈদ বিন

আবিতালহা (অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী তালহা বিন আবি তালহা) নামক একজন মুশরিক মুসলমানদের ওপর খুব জোরেশোরে হামলা করছিল। হযরত সায়াদ (রা) তাক করে তার হলকে এমনভাবে তীর নিক্ষেপ করলেন যে তার জিহ্বা কুকুরের মত বেরিয়ে এলো এবং তড়পাতে তড়পাতে ঠান্ডা হয়ে গেল। অন্য আরেক জন মুশরিকও নিজের তীব্র হামলায় মুসলমানদের ওপর মুসিবত আপতিত করে রেখেছিল। হুজুর (সা) হযরত সায়াদকে (রা) নির্দিশে দিলেন যে তাকেও তোমার তীরের নিশানা বানাও। ঘটনাক্রমে সে সময়ে তুনিরে কোন তীর ছিল না। তবু৬ হযরত সায়াদ (রা) ফলা ছাড়া একটি তীর উঠিয়ে এমন নিপুণতার সঙ্গে সেই মুশরিকের কপালের ওপর মারলেন যে সে অজ্ঞান হয়ে পেছনে পড়ে গেল এবং উলঙ্গ হয়ে গেল। হুজুর (সা) হযরত সায়াদের (রা) নিপুণ তিরন্দাজী এবং সেই মুশরিকের অজ্ঞান হয়ে যাওয়াতে স্বতস্ফূর্ত ভাবে হেসে দিলেন। (কতিপয় রেওয়ায়াত অনুযায়ী এই ঘটনা খন্দকের যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল)।

আল্লামা ইবনে আছির (রঃ) বর্ণণা করেছেন যে, ওহোদের যুদ্ধের একদিন পূর্বে হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস এবং হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশ একস্থানে একত্রিত হলেন হযরত সায়াদ (রা) দোয়া করলেন ঃ

"হে আল্লাহ ! আগামীকাল যে দুশমন আমার মুকাবিলায় আসবে সে যেন বিরাট বীর এবং ক্রোধান্বিত হয় এবং আমাকে এত শক্তি দিও যেন আমি তোমার রাস্তায় তাকে হত্যা করতে পারি।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশ আমিন বললেন। অতপর তিনি এই দোয়া করলেন ঃ

"হে আল্লাহ, আগামীকাল আমার মুকাবিলা এমন দুশমনের সঙ্গে যেন হয় যে খুব যুদ্ধবাজ ও ক্রোধান্বিত হবে। তার হাতে যেন আমার শাহাদাত নসিব হয় এবং সে যেন আমার নাক কান কেটে ফেলে। আমি যখন তোমার সাথে মিলিত হবো এবং তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবে যে হে আবদুল্লাহ তোমার নাক কান কেন কাটা হয়েছে। তখন আমি বলবো যে, হে আল্লাহ, তোমার জন্য এবং তোমার রাসূলের (সা) জন্য।"

হযরত সায়াদও (রা) তাঁর দোয়ার সাথে আমীন বললেন। উভয়ের দোয়াই সত্য অন্তরে বের হয়েছিল। এজন্য তা সঙ্গে সঙ্গে কবুল হয়ে গেল। যুদ্ধে হযরত সায়াদ (রা) একজন নামকরা মুশরিককে হত্যা করলেন এবং হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশ ইবনে আখনাস ছাকাফীর হাতে শাহাদাতের

পেয়ালা পান করলেন। মুশরিকরা তাঁর লাশ বিকৃত করলো এবং কান, নাক, ঠোঁট কেটে মালা বানালো। লড়াইয়ের পর হযরত সায়াদ (রা) সেই লাশের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় স্বতস্ফূর্তভাবে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো ঃ

"আল্লাহর কসম ! আবদুল্লাহর দোয়া আমার দোয়া থেকে উত্তম ছিল।"

এটা তার হৃদয়ের উত্তাপের বহিঃপ্রকাশ ছিল। আবদুল্লাহ শাহাদাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছেন। অথচ তিনি তা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন।

ওহোদের যুদ্ধে হযরত সায়াদের (রা) বড়ভাই উতবা মুশরিকদের পক্ষ নিল এবং অত্যন্ত উৎসাহের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করলো। একবার উতবা হুজুরের (সা) ওপর একটি পাথর নিক্ষেপ করলো। তাতে তাঁর (সা) পবিত্র চেহারা জখম হয়ে গেল। উতবার এই তৎপরতা হযরত সায়াদের (রা) আজীবন স্মরণ ছিল। তিনি বলতেন,"আল্লাহর কসম ! আমি উতবার রক্তের চেয়ে বেশী অন্য কারোর রক্ত পিপাসু ছিলাম না।"

বদর এবং ওহোদের পর হযরত সায়াদ (রা) খন্দক খায়বার, মক্কা বিজয়, হুনাইন, তায়েব ও তাবুকেও রহমতে আলমের (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার গৌরব লাভ করেছিলেন এবং প্রত্যেক যুদ্ধে তরবারীর কুশলতা দেখিয়েছিলেন।

৬ষ্ঠ হিজরীতে তিনি বাইয়াতে রিদওয়ানকারী সেই ১৪শ'সাহাবীর (রা) অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন, আল্লাহ পাক যাদেরকে আসহাবুশ শাজারা উপাধিতে ভূষিত করেন এবং স্পষ্ট ভাষায় জান্নাতের সুসংবাদ দেন।

দশম হিজরীতে প্রিয় নবী (সা) বিদায়হজ্জের জন্য মক্কা মুয়াজ্জামা তাশরীফ নিলেন। এ সময় হযরত সায়াদও (রা) হুজুরের সফরসঙ্গী ছিলেন। মক্কা পৌছে হযরত সায়াদ (রা) গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হুজুর (সা) তাঁর কঠিন অসুস্থতার কথা জানতে পেয়ে, সেবা শুশ্রূষার জন্য তাশরীফ নিলেন। হযরত সায়াদ (রা) জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। হুজুরের (সা) খিদমতে আরজ করলেন "হে আল্লাহর রাসূল ! আমি বিত্তবান মানুষ এবং এক কন্যা ছাড়া অন্য কোন ওয়ারিশ নেই। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি দু'তৃতীয়াংশ সম্পদ সাদকা করে দেই এবং এক-তৃতীয়াংশ কন্যার জন্য রেখে দেই" তিনি বললেন, "না।" আরজ করলেন " দু'-তৃতীয়াংশ না হোক, অর্ধেকই দান করি।" হুজুর (সা) পুনরায় নেতিবাচক জবাব দিলেন। হযরত সায়াদ (রা) বলেন, অতপর তিনভাগের একভাগ সাদকা করার অনুমতি দিলেন। হুজুর (সা) বললেন, এক-তৃতীয়াংশও অনেক বেশী।

তুমি যদি তোমার ওয়ারিশদেরকে বিত্তবান রেখে যাও তাহলে তা ফকীর ও লোকদের নিকট হাত পাতার চেয়ে অনেক উত্তম হবে।

তারপর হযরত সায়াদ (রা) রোরুদ্যমান হয়ে আরজ করলেন, " হে আল্লাহর রাসূল ! আমি মক্কায় মারা যাচ্ছি। অথচ আমি হক পথে এই যমীনকে চিরকালের জন্য বিদায় জানিয়েছি। হুজুর (সা) তাঁকে ভরসা দিলেন এবং তাঁর চেহারা, কপাল ও পেটের ওপর পবিত্র হাত ঘুরিয়ে দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ ! সায়াদকে (রা) সুস্থ করে দাও এবং তার হিজরত পূর্ণ করে দাও।"

মহানবীর (সা) দোয়া হযরত সায়াদের (রা) জন্য আবেহায়াত হিসাবে প্রমাণিত হলো এবং তাঁর শরীর তখন থেকেই সুস্থ হওয়া শুরু হলো। এমনকি তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে মদীনা ফিরে গেলেন। হযরত সায়াদ (রা) বলতেন যে, আমি রাসূলের (সা) পবিত্র হাতের শীতলতা আজ পর্যন্তও হৃদয়ে অনুভব করি।

একটি রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত সায়াদের (রা) চিকিৎসার জন্য হুজুর (সা) প্রখ্যাত চিকিৎসক হারিছ বিন কালদাহকে ডেকে পাঠালেন। তিনি হযরত সায়াদের (রা) জন্য খেজুর ও তিসির আটার হারিরা ওষুধ হিসাবে দিলেন। বস্তুত তিনি তা ব্যবহার করেই সুস্থ হয়ে গেলেন। সহীহ বুখারীতে আছে যে, হুজুর (সা) হযরত সায়াদের (রা) শুশ্রূষার সময় তাঁকে সম্বোধন করে বলেছিলেন; "হে সায়াদ, সম্ভবত আল্লাহ তোমাকে (মৃত্যু শয্যা থেকে) উঠাবেন এবং তোমার থেকে কিছু মানুষ উপকৃত হবে ও কিছু মানুষের ক্ষতি হবে।"

হুজুরের (সা) এই সুসংবাদ হযরত সায়াদের (রা) ব্যাপারে এমনভাবে পূরণ হলো যে, তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন এবং কয়েক বছর পর তাঁর নেতৃত্বে ইসলামের মুজাহিদরা অগ্নি উপাসক ইরানের শক্তি ছিন্নভিন্ন করে ফেললো।

একাদশ হিজরীতে মহানবী (সা) ওফাত পেলেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) খিলাফতের মসনদে সমাসীন হলেন। এ সময় হযরত সায়াদ (রা) বিন আবিওয়াক্কাস নির্দ্বিধায় তাঁর বাইয়াত করেন। হযরত আবু বকর (রা) হযরত সায়াদের (রা) গুণাবলী ও যোগ্যতার স্বীকৃতি দিতেন ও প্রশংসা করতেন। তিনি হযরত সায়াদকে (রা) বনু হাওয়াযিনের প্রশাসক নিয়োগ করেন।

তের হিজরীতে হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) ওফাতের পর হযরত ওমর ফারুক (রা) খিলাফতের আসনে সমাসীন হলেন। এ সময় তিনিও হযরত সায়াদকে (রা) উক্তপদে বহাল রাখলেন। কিন্তু সর্বশক্তিমান তাঁকে দিয়ে

তা থেকেও কোন মহান কাজ নেওয়ার চিন্তা করে রেখেছিলেন। সিদ্দিকে আকবারের (রা) খিলাফতকালে ইরানের যবরদস্ত অগ্নি উপাসক শাসকের সঙ্গে মুসলমানদের সংঘর্ষ শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই সংঘর্ষের প্রথম যুগ হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) ওফাতে শেষ হয়েছিল। এটা ছিল প্রায় এক বছরের মত। এ সময় আরব ও ইরানের সীমান্তে বসবাসরত বনু শাইবানের সরদার মুছান্না (রা) বিন হারিছা এবং হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ ইরানীদেরকে মারাত্মকভাবে পরাজিত করেন। কিন্তু তের হিজরীতে হযরত খালিদ (রা) যখন সিরিয়ায় ইসলামী বাহিনীর নেতৃত্ব দানে আরবের ইরাক থেকে বিদায় হলেন তখন ইরানবাসী মুসলমানদেরকে উৎখাতের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেলেন এবং এই লক্ষ্যে খুব জোরেশোরে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। হযরত মুছান্না (রা) মদীনা পৌঁছে হযরত আবু বকর সিদ্দিককে (রা) এই অবস্থার খবর দিলেন। এই খবর পেয়ে তিনি মুসলমানদের নিরাপত্তার ব্যাপারে খুব সন্দিহান হয়ে পড়লেন। এ সময় তিনি গুরুতর অসুস্থ ছিলেন বরং জীবনের শেষ পর্যায়ে অতিক্রম করছিলেন। সেই অবস্থায় তিনি হযরত ওমর ফারুককে (রা) ওসিয়াত করলেন যে, "হে ওমর ! আমার জীবনের এখন শেষ অবস্থা আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত জীবিত থাকবো এই আশাও আমার নেই। আমার মৃত্যুর পর আগামীকালই তুমি মুছান্নাকে সাহায্য দিয়ে ইরাক রওয়ানা করে দেবে।" এই ওসিয়াতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) পরপারে যাত্রা করলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) খিলাফতের দায়িত্ব হাতে নিয়েই হযরত মুছান্নাকে (রা) সাহায্যের জন্য হযরত আবু উবায়েদ (র) ছাকাফির নেতৃত্বে এক হাজার সৈন্যের একটি দল প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে কতিপয় আরব গোত্র জিহাদে অংশগ্রহণের মর্যাদা লাভের জন্য তাদের সঙ্গে শামিল হয়ে গেলেন। এমনিভাবে আবু উবায়েদের (রা) সৈন্যের সংখ্যা কয়েক হাজারে পৌঁছে গেল। হযরত আবু উবায়েদ (র) ইরানীদেরকে নামরিক, কাসকর এবং আরো কতিপয় যুদ্ধে পরাজিত করে আরবে ইরাকের বিরাট একটা অংশ দখল করে নিলেন। এই পরাজয়ের খবর শুনে ইরানী উজিরে আজম রোস্তম বিন ফরখযাদ খুব অসন্তুষ্ট হলো এবং সে একজন বিশ্ব পর্যবেক্ষক সেনা অফিসার বাহমন জাদরিয়াকে বিরাট সৈন্য বাহিনী দিয়ে মুসলমানদেরকে মুকাবিলার জন্য প্রেরণ করলো। এই সৈন্য বাহিনী ফোরাতের তীরে "কাসসে নাতিফ" নামক স্থানে তাঁবু ফেললো। ওদিকে হযরত আবু উবায়েদ (রা) ফোরাতের অপর পারে মারোহা নামক স্থানে অবস্থান নিলেন। বাহমান জাদবিয়া তাঁকে পয়গাম প্রেরণ করে বললেন, তোমরা নদী অতিক্রম করে এপার আসবে, না আমরা যাবো। দুর্ভাগ্যবশত আবু উবায়েদের (রা) জানা ছিল না যে অপর পারে ময়দান খুব

অপ্রশস্ত এবং মুসলমানদের জন্য সেখানে কাতার বন্দী হওয়া কঠিন ব্যাপার। তিনি বীরত্বের আবেগে নিজের বাহিনীসহ নদী অতিক্রম করে ওপারে গিয়ে পৌছলেন। যুদ্ধ শুরু হলো। ইরানী বাহিনীর তিনশ' যোদ্ধা হাতি একদম কিয়ামতের অবস্থা করে ছাড়লো। বীরত্বের সাথে লড়াই করা সত্ত্বেও মুসলমানদের পা অসংলগ্ন হয়ে পড়লো। এই বিশৃংখল অবস্থায় কেউ নদীর পুল ভেঙ্গে দিল। ফল এই হলো যে. মুসলমানদের একটি বিরাট সংখ্যা নদীতে ডুবে গেল এবং অনেক সৈন্য যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়ে গেলেন। তাদের মধ্যে হযরত উবায়েদও (রা) শামিল ছিলেন। এই দুঃখজনক ঘটনা ইতিহাসে "জাসারের যুদ্ধ" অর্থাৎ "পুলের যুদ্ধ" নামে খ্যাত হয়ে আছে। হযরত মুছান্না (রা) বিন হারিছা শাইবানী খুব তাড়াতাড়ী জাসারের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়ে নিলেন এবং পরের বছর (চৌদ্দ হিজরীর রমযান মাসে) বোয়েব নামক স্থানে ইরানীদেরকে শিক্ষণীয়ভাবে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে এক লাখেরও বেশী ইরানী যুদ্ধের ময়দানে মারা যায়। বোয়েবের যুদ্ধ মুসলমানদের নিকট জাসারের যুদ্ধের পূর্ণ জবাব ছিল। এই যুদ্ধে ইরানী অগ্নী উপাসকদের মর্যাদাবোধ সম্পূর্ণরূপে পদদলিত হলো। ইরানীরা রাণী পুরান দখতকে অপসারণ করে একজন নওজোয়ান শাহজাদা ইয়াযদগিরদকে সিংহাসনে বসালো এবং সাধারণ ও অসাধারণ সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ালো। যেসব এলাকা মুসলমানরা দখল করে নিয়েছিলেন, সেসব এলাকাতেও বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠলো এবং চারদিক থেকে মুসলমানরা ভীতিপ্রদ অবস্থায় এসে দাঁড়ালো। হযরত ওমর (রা) এই পরিস্থিতির খবর পেয়ে মুছান্নাকে (রা) সমগ্র সৈন্য একত্রিত করে আরব সীমান্তে চলে যাওয়ার নির্দেশ সম্বলিত পত্র দিলেন।

সুতরাং হযরত মুছান্না (রা) নিজের সৈন্যদেরকে একত্রিত করে যুকার নামক স্থানে অবস্থান নিলেন। ওদিকে হযরত ওমর (রা) সমগ্র আরবে ঘোষণা দিয়ে দিলেন যে লোকেরা যেন জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে আসে। কিছু দিনের মধ্যেই চার দিক থেকে জিহাদের উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত মানুষের ঢল মদীনায় এসে পৌছলো। হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসও বুন হাওয়াযিনের তিন হাজার মুজাহিদ রওয়ানা করলেন। আল্লামা শিবলী নূ'মানীর বক্তব্য অনুযায়ী হযরত সায়াদের (রা) সৈন্যদের প্রত্যেকেই তরবারী ও ঝাণ্ডার মালিক ছিলেন (আল-ফারুক)। সেই বাহিনীকে দেখে হযরত ওমর (রা) খুব খুশী হলেন এবং তাদের সাথে ইরানীদের মুকাবিলায় বের হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন। কিন্তু সাহাবীরা (রা) তাতে বাধা দিলেন এবং বললেন যে, মদীনা অবস্থানই তাঁর জন্য যথোপযুক্ত হবে। অতপর প্রশ্ন দাঁড়ালো যে এই বিরাট অভিযানের নেতৃত্ব

কাকে দেয়া যাবে। সকল নেতৃস্থানীয় সাহাবী (রা) এ ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে খুব তৎপরতার সাথে পরামর্শ শুরু করলেন। এ সময় একাকি হযরত আবদুর রহমান (রা) ইবনুল আত্তফ বলে উঠলেন, "পেয়ে গেছি, পেয়ে গেছি।"

হযরত ওমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, "সে কে ?" হযরত আবদুর রহমান (রা) জবাব দিলেন, "সায়াদ ইবনুল মালিক (আবি ওয়াক্কাস)।"

সকলেই তাঁর সঙ্গে ঐকমত্য প্রকাশ করলেন। হযরত ওমর (রা) তৎক্ষণাৎ পত্র লিখে হযরত সায়াদকে (রা) নজদ থেকে ডেকে পাঠালেন। কয়েকদিন পর মদীনা পৌছলে হযরত ওমর (রা) ইরান গমনকারী সৈন্যদের নেতৃত্ব তার নিকট সোপর্দ করলেন এবং ইমারাতের ঝান্ডা তাঁর হাতে দিতে দিতে নসিহত করলেন যে, হে সায়াদ! সকল অবস্থাতেই আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের (সা) নির্দেশাবলীর ওপর আমল করবে। এছাড়া তিনি আরও অনেক অমূল্য হেদায়াত হযরত সায়াদকে (রা) প্রদান করলেন। ভবিষ্যতে এসব হেদায়াত তাঁর অনেক কাজে এসেছিল।

হযরত সায়াদ (রা) চার হাজার জানবাজকে সঙ্গে নিয়ে মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন এবং ১৮ মনযিল অতিক্রমের পর ছা'লাবা নামক স্থানে তাঁবু ফেললেন। এখানেই হযরত ওমরের (রা) প্রেরিত আরো সৈন্যদল এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিল। এমনিভাবে তাঁর সৈন্যর সংখ্যা ২২ হাজার পর্যন্ত পৌছে গেল। সে সময় হযরত মুছান্না (রা) আট হাজার সৈন্যসহ জুকারে হযরত সায়াদের (রা) আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন। হযরত সায়াদ (রা) তখনো ছালাবা ত্যাগ করেননি এমন সময় হযরত মুছান্না (রা) আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে যাত্রা করলেন। জাসারের যুদ্ধে তিনি যে আঘাত পেয়েছিলেন তার সেলাই খুলে গেল এবং কোন চিকিৎসাতেই তা আর ভালো হলো না। ক্ষতের এই অবস্থাই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে গেল। হযরত সায়াদ (রা) ছা'লাবা থেকে রওয়ানা দিয়ে শারাফ পৌছলেন। এসময় হযরত মুছান্নার (রা) আট হাজার সৈন্যও তাঁর সঙ্গে এসে একত্রিত হলো। মুছান্নার (রা) সহোদর মা'নাও (রা) বিধবা ভাবীসহ সেই বাহিনীতে ছিলেন। হযরত সায়াদ (রা) মুছান্নার (রা) ইন্তেকালের খবর শুনে খুব দুঃখীত হলেন। তিনি অন্তর জয়ের জন্য মুছান্নার (রা) বিধবা স্ত্রী সালমাকে (রা) নিকাহ করলেন এবং মা'নাকে (রা) মুছান্নার (রা) শিশুদেরকে ভালোভাবে লালন-পালন করার নির্দেশ দিলেন। শারাফে হযরত সায়াদ (রা) সৈন্যদের সম্পর্কে পর্যালোচনা করলেন। এ সময় প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্য ছিল। শারাফ থেকে রওয়ানা হয়ে হযরত সায়াদ (রা) আজিব পৌছলেন। এটা ছিল ইরানীদের

একটি সীমান্ত চৌকি। এই চৌকির রক্ষক ইরানী সিপাহীরা মুসলমানদের আগমনের খবর শুনে কোন মুকাবিলা ছাড়াই ভেগে গেল। আজিবে কিছুদিন অবস্থানের পর হযরত সায়াদ (রা) কাদেশিয়াতে তাঁবু ফেললেন। স্থানটি ছিল শষ্য শ্যামলিমায়পূর্ণ এবং হযরত ওমর (রা) হযরত সায়াদকে (রা) সেখানেই তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং এই হেদায়াতও দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন কতিপয় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোককে দূত বানিয়ে ইরানের বাদশাহর নিকট প্রেরণ করেন। তাঁরা তাকে জিযিয়া প্রদান অথবা ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেবেন। সুতরাং হযরত সায়াদ (রা) হযরত নু'মান (রা) বিন মুকরিনের নেতৃত্বে চৌদ্দ ব্যক্তির একটি প্রতিনিধিদল মাদায়েন প্রেরণ করলেন। এই প্রতিনিধি দলের সকল সদস্যই, ব্যক্তিত্ব বীরত্ব ও বক্তৃতা এবং আলোচনায় ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। তারা আরবের সাদাসিধে প্রথাগত পোশাক পরিধান করে ঘোড়ার খালি পিঠে চড়ে মাদায়েন পৌছলেন। এ সময়ে ইরানীরা তাঁদেরকে দেখে বিস্মিত হয়ে গেল যে তাঁরা কি করে তাঁদের দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছেন। ইয়াযদগিরদ ইসলামী প্রতিনিধি দলের আগমনের খবর পেয়ে খুব শান-শওকাতের সাথে দরবার সাজালো এবং আরব দূতদেরকে ডেকে পাঠালো। তারা দরবারে পৌছে ইয়াযদগিরদের সঙ্গে অত্যন্ত নির্ভিকভাবে আলাপ-আলোচনা করলেন এবং তাকে ইসলাম গ্রহণ অথবা জিযিয়া প্রদানের দাওয়াত দিলেন। তাতে ইয়াযদগিরদ অগ্নিশর্মা হয়ে গেল এবং চেঁচিয়ে বললো ঃ

"তোমরা ভুখা-নাঙ্গা মানুষেরা আমাদের দেশকে লুটে নিতে চাও। আমি তোমাদের জন্য তোমাদের উটের ওপর খাদ্য শস্য ও শুকনো খেজুর এনে দিতে পারি এবং আরবে এমন শাসক নিয়োগ করতে পারি যে, সে তোমাদের আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করবে। এছাড়া যদি তোমরা অন্য কিছু চাও তাহলে জিল্লত ও ব্যর্থতার মৃত্যু ব্যতিত কিছু পাবে না।"

তার জবাবে প্রতিনিধি দলের সদস্য হযরত কায়েস (রা) বিন যারারাহ সামনে অগ্রসর হয়ে বললেন ঃ

"হে বাদশাহ! আমরা সকলেই মর্যাদাবান আরব। তোমার এই অবজ্ঞা ও ঘৃণাসূচক কথা জবাব দানের যোগ্য নয়। তবুও শুনে নাও, আমরা সত্যি আল্লাহর সবচেয়ে খারাপ সৃষ্টি ছিলাম। কিন্তু আল্লাহ আমাদের ওপর তার রহমত বর্ষণ করেছেন এবং আমাদের মধ্যে একজন পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন। এই পয়গম্বর (সা) আমাদেরকে হেদায়াতের পথ প্রদর্শন করেছেন। তুমিও যদি এই হেদায়াত কবুল কর তাহলে আমাদের ভাই হয়ে যাবে। নচেৎ জিযিয়া অথবা তরবারী এই দু'য়ের একটি তোমাকে গ্রহণ করতে হবে।

এতক্ষণে ইয়াযদগিরদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছিল। সে ধূলি মিশ্রিত মাটি আনিয়ে মুসলমানদের সামনে নিক্ষেপ করলো এবং তিক্ত কণ্ঠে বললো, "তোমরা এই মাটি পাবে, এই মাটি। এই মাটি উঠাও এবং এখান থেকে বের হয়ে যাও।"

হযরত আছেম (রা) ইবনুল আমর নিজের চাদরে মাটি রাখলেন এবং প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যের সাথে হাসিখুশীভাবে হযরত সায়াদের (রা) খিদমতে ফিরে এলেন তারা হযরত সায়াদকে (রা) মোবারকবাদ দিলেন। তাঁরা বললেন, হে আমীর! শত্রু স্বয়ং তার মাটি আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন। আমরা এখন ইনশাল্লাহ অবশ্যই ইরানভূমি দখল করবো।"

ওদিকে এই প্রতিনিধি দল আগমনের পূর্বেই ইয়াযদগিরদের সেনাপতি রোস্তম এক বিরাট বাহিনীসহ সাবাত পৌছেছিলেন। প্রতিনিধিদল মাদায়েন যেতেই ইয়াযদগিরদ রোস্তমকে সাবাত থেকে কাদেসিয়া পৌছে মুসলমানদেরকে পিষে ফেলার নির্দেশ দিল। এই নির্দেশ পেতেই রোস্তম এক লাখ আশি হাজার সৈন্য এবং তিনশ' যোদ্ধা হাতীসহ সাবাত থেকে কাদেসিয়ার দিকে খুব শান শওকতের সাথে রওয়ানা দিল। তার প্রতিটি সৈন্য, যিরাহ পরিধান করে ছিল। যোদ্ধা হাতীদের পদভারে মাটি কেঁপে কেঁপে উঠছিলো। স্বয়ং রোস্তমের সিংহাসন ছিল সোনার। এই সিংহাসন সোনার ছাতা দিয়ে ছায়া দেয়া হতো। মোটকথা, খুব শানশওকতের সাথে রোস্তম কাদেসিয়ার সামনে আতিক নামক স্থানে তাঁবু ফেললেন। সে ছিল একজন অভিজ্ঞ জেনারেল এবং মুসলমানদের জিহাদের উদ্দীপনা সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। এজন্য সে নিজের বিরাট সামরিক শক্তি সত্ত্বেও যুদ্ধ পাশ কাটাতে চেয়েছিল। সুতরাং সন্ধির, আলোচনার জন্য সে হযরত সায়াদকে (রা) তাঁর কোন আস্থাভাজন ব্যক্তিকে প্রেরণের পয়গাম প্রেরণ করলো। হযরত সায়াদ (রা) তার ইচ্ছায় তিন অথবা চারটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু সন্ধি হলো না। মুসলমান দূতদের পরিষ্কার ও স্পষ্ট কথায় রোস্তমকে উত্তেজিত করে তুললো এবং শেষ প্রতিনিধি দলকে সে এই ঘোষণা দিয়ে বিদায় দিল যে, আগামীকাল আমরা মুসলমানদেরকে দলিত মথিত করে ছাড়বো।

পরবর্তী দিন রোস্তম অত্যন্ত শানশওকতের সাথে ফোরাত নদী থেকে তীরে নেমে মুসলমানদের সামনে ব্যূহ রচনা করলো। সে সময় দুইলাখ যোদ্ধা তার পতাকাতলে সমবেত ছিল। পক্ষান্তরে ইসলামী বাহিনীর সংখ্যা ছিল তিরিশ হাজারের মত। কিন্তু মুসলমানদের জিহাদের উৎসাহ-উদ্দীপনার

অবস্থাটা এমনছিল যে, তারা যেন এই ব্যূহ থেকে বের হয়ে পড়ে আর কি। দুর্ভাগ্যবশত এই নাযুক অবস্থায় হযরত সায়াদ (রা) কোন রোগের কারণে যুদ্ধে স্বয়ং উপস্থিত হতে অক্ষম বা মাজুর হয়ে পড়লেন। রোগটি কি ছিল ? কেউ লিখেছেন যে, তিনি সায়াটিকায় আক্রান্ত হয়ে ছিলেন। আবার কেউ লিখেছেন যে, তাঁর রানে ফোঁড়া বের হয়ে ছিল। এজন্য ঘোড়ার ওপর সওয়ার হতে পারতেন না এবং পায়ে হেঁটে চলাও ছিল মুশকিল। এই অক্ষমতা সত্ত্বেও তিনি নিজের বাহিনীকে স্বয়ং পরিচালনার সংকল্প ঘোষণা করলেন। যুদ্ধের ময়দানের নিকটই প্রাচীনকালের একটি মহল ছিল। তিনি এই মহলের দ্বিতীয় তলায় বালিশের সাহায্যে এমনভাবে বসলেন যে, যাতে সমগ্র যুদ্ধের ময়দান দৃষ্টির সামনে থাকে। তারপর তিনি খালিদ (রা) ইবনুল আরফাতা নামক একজন সামরিক অফিসারকে নিজের নিকট ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, "খালিদ, তুমি আমার অবস্থা প্রত্যক্ষ করছো। খুব কষ্টে নড়তে পারি। শত্রু মাথার ওপর এসে পড়েছে। এখন যুদ্ধ পাশ কাটানো কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। যুদ্ধের ময়দানে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে। কিছু সময় পরপর আমি কাগজের টুকরোয় হেদায়াতসমূহ লিখে তোমার নিকট প্রেরণ করতে থাকবো। সেই হেদায়াত অনুযায়ী সৈন্যদের দিয়ে যুদ্ধ করাবে।" সেই সাথে তিনি সৈন্যদের ঝান্ডাবাহীদেরকে পয়গাম প্রেরণ করলেন, "আমি এই রোগের কারণে কার্যত যুদ্ধে অংশ নিতে পারছি না। খালিদ (রা) ইবনুল আরফাতাকে আমি আমার নায়েব নিয়োগ করেছি। তার নির্দেশকে আমার নির্দেশ মনে করো এবং তার আনুগত্য করো।" হযরত সায়াদের (রা) হুকুম মুজাহিদদেরকে শোনানো হলো। এই হুকুমের সামনে সকলেই মাথা নত করে দিলেন।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে একদিকে রোস্তম ও অন্যান্য ইরানী আমীররা নিজেদের বাহিনীকে জাতীয়তার আবেগে উদ্বুদ্ধ করছিলো। অন্যদিকে আরবের মশহুর কবি ও বক্তারা ইসলামী বাহিনীর মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং নিজেদের যুদ্ধ গাথা দিয়ে মুজাহিদদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। সাথে সাথে কারীরা সুললিত কণ্ঠে সূরায়ে আনফাল তিলাওয়াত শুরু করেছিলেন। তার প্রভাবে লোকজন উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল এবং প্রত্যেক মুসলমানই শাহাদাতের আকাংখায় অস্থির হয়ে পড়লেন।

ইরানীরা সর্বপ্রথম নিজেদের যোদ্ধা হাতীদেরকে মুসলমানদের দিকে ঠেলে দিল। হাতীদের ভয়াবহ হামলা বাজিলা গোত্রের জানবাজরা রুখে দেয়ার জন্য এগিয়ে গেলেন। অনেক বাজালী মুজাহিদ জীবন দিয়ে দিলেন। কিন্তু হামলা রুখতে পারলেন না। হযরত সায়াদ (রা) এই পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করে বনু বাজিলার সাহায্যের জন্য বনু আসাদকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। বনু

আসাদ বীরত্বের সাথে হাতীদের দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু বন্য হাতীরা তাঁদেরকেও পিছনে হটিয়ে দিল। অতপর হযরত সায়াদ (রা) বর্শা ও তীর নিক্ষেপে সীমাহীন নিপুণ বনু তামিমকে পয়গাম প্রেরণ করে বললেন, হে বনি তামিম, আজ তোমাদের নিপুণতা প্রদর্শনের সময়। সামনে অগ্রসর হয়ে নিজের ভাইদেরকে সাহায্য কর। বনু তামিম নারায়ে তাকবির ধ্বনি দিয়ে এমন তীব্রভাবে হামলা করলেন যে, হাতীদের মুখ ফিরে গেল এবং তাদের ওপর সওয়ারদেরকে বর্শা ও তীর দিয়ে নীচে ফেলে দিল। এরপর উভয় বাহিনীর মধ্যে প্রচন্ড হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। মশহুর মরছিয়া বর্ণনাকারী মহিলা সাহাবী হযরত খানসাও (রা) নিজের চারপুত্রসহ জিহাদে অংশ নেয়ার জন্য কাদেসিয়া এসেছিলেন। যুদ্ধের ময়দান যখন চরমভাবে উত্তপ্ত তখন তিনি পুত্রদেরকে নির্দেশ দিলেন, "হে আমার পুত্ররা, যাও এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত হক পথে লড়াই কর।" মা'র নির্দেশ শুনতেই চার সহোদর ঘোড়ার বাগ উঠিয়ে নিলেন। যুদ্ধ গাথা পড়তে পড়তে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে একের পর এক শহীদ হয়ে গেলেন। হযরত খানসা (রা) তাদের শাহাদাতের খবর শুনে বললেন ঃ "আল্লাহর শুকর যে, আমার পুত্ররা যুদ্ধের ময়দানে পিঠ প্রদর্শন করেনি এবং আল্লাহ তাদের শাহাদাতের মর্যাদা আমাকে দান করেছেন। সেই দয়াময় সত্ত্বার নিকট আমার আশা যে তিনি নিজের রহমতের ছায়ায় আমার পুত্রদের সাথে আমাকেও স্থান দেবেন।"

এমনিভাবে আরও অনেক মুজাহিদ শাহাদাতের আকাংখায় বিস্ময়কর উদাহরণ পেশ করেন। রাতের অন্ধকার যখন গভীর হলো, তখন উভয় বাহিনীর সৈন্যরা আঘাতে জর্জরিত হয়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হলো। কাদেসিয়ার যুদ্ধের এই প্রথম দিনকে ইয়াওমুল আরমাছ বলা হয়। এদিন পাঁচ থেকে ছশ' মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন এবং হাজার হাজার ইরানী নিহত হয়।

দ্বিতীয় দিন যুদ্ধের দামামা বাজতেই হযরত কা'কা' (রা) ইবনুল আমর তামিনী সিরিয়া থেকে এক হাজার জানবাজের সাথে সেখানে পৌছে গেলেন। হযরত আবু উবায়দাহ (রা) ইবনুল জাররাহ তাঁকে হযরত সায়াদের (রা) সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। এই সাহায্য পৌছার পর মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পেল। যুদ্ধের ময়দান গরম হতেই প্রথম দিনের মত হাতীরা পুনরায় মুসলমানদের ওপর কিয়ামত সৃষ্টি করলো। হযরত কা'কা' (রা) এই মুসিবত মুকাবিলার জন্য একটি কৌশল আবিস্কার করলেন। তিনি উটের ওপর বড় বড় ঝোলা দিয়ে তাদেরকেও হাতির মত ভীতি প্রদ বানিয়ে ফেললেন, ইরানীদের

ঘোড়া তা দেখে পিছু হটে যেতো এবং মুসলমান তাদের সওয়ারকে বর্শার খোরাক বানাতে লাগলেন। রোস্তম তখন পদাতিক বাহিনীকে সওয়ারদেরকে সাহায্যের জন্য সামনে অগ্রসর করালো। এই বাহিনী অন্ধকার ও তুফানের মত মুসলমানদের ওপর হামলা করলো। মুসলমানরা খুব বীরত্বের সাথে সেই ঝড়ের বেগের হামলা রুখে দিলো। কিন্তু মুশকিলের ব্যাপার ছিল যে, মাদায়েন থেকে ইরানী বাহিনী অব্যাহতভাবে তাজা দম সৈন্য সাহায্য হিসেবে লাভ করছিল। ঠিক এমনি মুহূর্তে হযরত হাশেম (রা) ইবনুল উতবা পাঁচ হাজার জওয়ানের সাহায্যকারী সৈন্য সমেত সিরিয়া থেকে কাদেসিয়া পৌঁছে গেল। এই অদৃশ্য সাহায্য মুসলমানদের সাহস দ্বিগুণ করে দিল। কিন্তু ইরানীদের বিরাট বাহিনী কোনক্রমেই কম হচ্ছিল না। এ সময় এক আশ্চর্য ধরনের ঘটনা ঘটলো। বনু ছাকিফ গোত্রের মশহুর বাহাদুর আবু মাহজান (রা) মদ পানের অভিযোগে হযরত সায়াদের (রা) অবস্থানস্থলের নিকট হাত-পা বাধা অবস্থায় একটি কক্ষে কয়েদ ছিলেন। তিনি কয়েদখানার ছিদ্র দিয়ে যুদ্ধের দৃশ্য দেখে খুব অস্থির হয়ে পড়ছিলেন এবং বীরত্বের আবেগে নিজের ঠোঁট বার বার দাঁত দিয়ে চেপে ধরছিলেন। হযরত সায়াদের (রা) স্ত্রী সালমা (রা) নিকটেই ছিলেন। তাঁর কাছে আবেদন জানিয়ে বললেন, এখন আমাকে ছেড়ে দাও। শহীদ হয়ে গেলে উত্তম নচেৎ নিজেই এসে বেড়ি পরে নেব। সালমা (রা) হযরত সায়াদের (রা) ভয়ে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তাঁর প্রত্যাখ্যানে আবু মাহজানের অন্তর ভেঙ্গে পড়লো এবং জিহাদ থেকে নিজের বঞ্চনার জন্য অত্যন্ত দরদভরা কবিতা পাঠ করতে লাগলেন। এই কবিতা শুনে সালমার (রা) অন্তর বিগলিত হয়ে গেল এবং তিনি আবু মাহজানকে (রা) শুধু ছেড়েই দিলেন না। বরং ঘোড়া ও অস্ত্রও দিয়ে দিলেন। আবু মাহজান (রা) মুখ ও মাথায় কাপড় লেপ্টে ঘোড়া দৌড়ে দুশমনের ব্যূহের ওপর বিদ্যুতের মত আপতিত হলেন এবং তাদেরকে বিশৃংখল করে ফেললেন। তাঁর উদ্দীপনার অবস্থাটা এমন ছিল যে, কখনো যুদ্ধের ময়দানের এক দিকে থাকতেন। আবার পরক্ষণেই অন্যদিকে উপস্থিত হতেন। মুসলমানরা বিস্মিত হয়ে পড়লো যে, এই নিকাবধারী কে ? সম্ভবত আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের সাহায্যের জন্য কোন ফেরেশতা নাযিল করেছেন। স্বয়ং হযরত সায়াদ (রা) আবু মাহজানের (রা) বাহাদুরী দেখে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি মনে মনে বলছিলেন, লোকটির যুদ্ধের ধরন দেখেতো মনে হয় যে, সে আবু মাহজান (রা)। কিন্তু সেতো এখন কয়েদ। সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দান খুব গরম রলো। অন্ধকার যখন গভীর হলো এবং উভয় বাহিনী স্ব-স্ব অবস্থানস্থলে ফিরে গেল তখন হযরত আবু মাহজানও (রা) ফিরে এসে নিজের বেড়ি নিজেই পরিধান করলেন।

হযরত সায়াদ (রা) ওপর তলা থেকে নীচে নেমে এলেন এবং যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা করতে করতে সালমাকে (রা) বললেন, "আজ আল্লাহ তায়ালা যুদ্ধের ময়দানে এক আশ্চর্য ধরনের মানুষ প্রেরণ করেছিলেন লোকটি মুখের ওপর নিকাব দিয়ে রেখেছিলেন এবং উবলক ঘোড়ার ওপর সওয়ার ছিলেন। সে দুশমনের মুখ ফিরিয়ে দিয়েছে। আমি যদি আবু মাহজানকে কয়েদ করে না রাখতাম, তাহলে আমি মনে করতাম যে সেই ব্যক্তি আবু মাহজানই।"

একথা শুনে সালমা (রা) ঘটনা বর্ণনা করলেন। হযরত সায়াদ (রা) খুব প্রভাবিত হলেন এবং অশ্রু নয়নে বললেন, "আল্লাহর কসম, আমি এ ধরনের মুজাহিদকে কয়েদ রাখতে পারি না।" একথা বলেই তিনি তক্ষুণি হযরত আবু মাহজানকে (রা) মুক্ত করে দিলেন। তিনিও ছিলেন মরদে মু'মিন। মুক্তি পেতেই হযরত সায়াদকে (রা) বললেন, "হে আমীর, হদ বা শাস্তির ভীতি আমাকে মদ পান থেকে বিরত রাখতে পারেনি। কিন্তু আজ আমি আল্লাহর ভয়ে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, ভবিষ্যতে কখনো মদ স্পর্শ করবো না।"

কাদেসিয়ার যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনকে ইয়াওমুল আগওয়াছ বলা হয়ে থাকে। এদিন দশ হাজার ইরানী নিহত হয় এবং দু'হাজার মুসলমান শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন।

তৃতীয় দিন সকালে উভয় বাহিনী পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হলো। হযরত সায়াদ (রা) দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করছিলেন যে, আজ যুদ্ধের ফায়সালা করেই ছাড়বেন। বস্তুত তার হেদায়াত অনুযায়ী মুসলমানরা অগ্রসর হয়েই খুব দ্রুত গতিতে ইরানীদের ওপর হামলা করছিলেন। কিন্তু ইয়াওমুল আরমাছের মত আজও ইরানীদের হাতিগুলো প্রচন্ড ধ্বংস লীলা সাধন করলো এবং মুসলমানদেরকে সিদ্ধান্তমূলক আঘাত হানা থেকে বিরত রাখলো। পাহাড় সদৃশ দু'টো সরদার হাতি খুব বেশী ক্ষতি করছিল। হযরত সায়াদ (রা) বনু তামিম ও বনু আসাদকে হাতি দু'টোকে শেষ করার নির্দেশ দিলেন। তামিমী যোদ্ধারা হযরত সায়াদের (রা) নির্দেশ পেতেই সাদা হাতিটির ওপর হামলা করলো। হাতিটির দিকে কোন মুজাহিদ অগ্রসর হলেই শুঁড় দিয়ে ধরে পায়ের নীচে পিষে তাকে শহীদ করে ফেলতো। এমনিভাবে কয়েকজন মুজাহিদ একেরপর এক শাহাদাতের পিয়ালা পান করলেন। শেষে কা'কা' (রা) ও আছেম (রা) সেই হাতির দিকে অগ্রসর হলেন এবং তার শুঁড় কেটে দিলেন এবং চোখ অকেজো করে ফেললেন। অন্য দিকে অপর হাতিটির অবস্থাও একই ধরনের হলো। উভয় হাতি প্রচন্ড ব্যাথায় চীৎকার দিতে দিতে পেছনের দিকে ভাগলে অন্য হাতিও তাদের অনুসরণ করলো। এমনিভাবে হাতির মুসিবত থেকে আল্লাহ

তায়ালা মুসলমানদেরকে নাজাত দিলেন। ততক্ষণ সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কিন্তু হযরত সায়াদ (রা) যুদ্ধের ফায়সালা করার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। তিনি নিজের সৈন্যদেরকে নতুন করে সাজালেন এবং তারপর তাদেরকে ইরানীদের ওপর সিদ্ধান্তকর হামলা চালানোর নির্দেশ দিলেন। বীরত্বের আবেগে উদ্বেলিত মুজাহিদরা ইরানীদের ওপর এমন প্রচণ্ড হামলা চালালেন যে, তাদের পা টল টলায়মান হয়ে উঠলো। হযরত কা'কা' (রা), আছেম (রা), আমর (রা) ইবনুল মা'দিকারব, কায়েস (রা) ইবনুল আশয়াছ এবং তাদের জানবাজ সঙ্গীরা ইরানী বাহিনীর কেন্দ্রভাগ উল্টে দিলেন এবং রোস্তমের সিংহাসন পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। রোস্তমের যিরাহ পরিধানকারী হিফাজতী দল প্রচণ্ডভাবে বাধা দিল। কিন্তু মুসলমান জানবাজরা তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে ফেললো। রোস্তম গুরুতরভাবে আহত হয়ে ভেগে দাঁড়ালো এবং নদীতে ঝাঁপ দিল। হেলাল ইবনুল আলকামা নামক এক মুজাহিদ তার ঠ্যাং ধরে টেনে তুললো এবং তার মাথা কেটে নিল। তারপর সে রোস্তমের সিংহাসনের ওপর আরোহণ করে চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো, "আমি রোস্তমকে হত্যা করে ফেলেছি।" এই আওয়াজ শুনেই ইরানীদের চেতনা সম্পূর্ণরূপে লোপ পেতে শুরু করলো এবং তারা ভেড়া বকরীর মতো মারা পড়লো, যে রাতে এই রক্তাক্ত যুদ্ধ শেষ হলো তাকে " লাইলাতুল হারির" বলা হয়ে থাকে। তার পূর্বে অর্থ্যাৎ যুদ্ধের তৃতীয় দিন "ইয়াওমুল উমাস" নামে প্রসিদ্ধ। এই যুদ্ধে ৩০ হাজার ইরানী নিহত হয় এবং তাদের এমন শিক্ষণীয় পরাজয় ঘটে যে, কিসরার সিংহাসনের মূলই নড়বড়ে হয়ে গেল। এই যুদ্ধে ইরানীদের জাতীয় পতাকাও মুসলমানদের হস্তগত হয় এবং গণিমতের মালের তো কোন সীমা পরিসীমাই ছিল না। মুসলমান শহীদদের মোট সংখ্যা প্রায় ৮ হাজার ছিল।

কাদেসিয়ার মহান বিজয়ের পর হযরত সায়াদ (রা) বাবল পর্যন্ত ইরানীদের পিছু ধাওয়া করলেন এবং আশেপাশের সকল এলাকা কবজা করে নিলেন। ইরানের রাজধানী মাদায়েন নিকটেই ছিল। হযরত ওমরের (রা) হেদায়াত অনুযায়ী হযরত সায়াদ (রা) মাদায়েনের দিকে অগ্রসর হলেন। পথি-মধ্যে ইরানীরা স্থানে স্থানে বাধা দিল এবং কয়েকটি ছোটখাটো সংঘর্ষ হলো। কিন্তু সাহসী মুজাহিদরা অমিতবিক্রমে মাদায়েন পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলেন এবং তার পশ্চিম অংশ অবরোধ করে নিলেন।

এই অবরোধ দু'মাস পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। শেষে সকল ইরানী বিশেষ করে মাদায়েনে যারা দাজলা নদীর পূর্বতীরে বসবাস করতো তারা একত্রিত হলো। তারা নদীর পুল ভেঙ্গে সকল নৌকা অপর তীরের দিকে নিয়ে গেল। সে সময় নদীতে প্রচন্ড তুফান এসেছিল এবং তা অতিক্রম করা বাহ্যতঃ ছিল

অসম্ভব ব্যাপার। হযরত সায়াদ (রা) এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে আল্লাহর নাম নিয়ে নিজের ঘোড়া নদীর মধ্যে চালিয়ে দিলেন। অন্য মুজাহিদরাও তাঁকে অনুসরণ করলো। দাজলার ফুঁসে ওঠা পানির ওপর মুজাহিদরা ঘোড়ার জিনের সঙ্গে সংলগ্ন পদদ্বয় রাখার লোহার আংটির সাথে আংটি মিলিয়ে এমনভাবে অগ্রসর হতে লাগলেন যেন তারা ফুল বাগানের আঙ্গিনায় আমোদ-প্রমোদ করছিলেন। ইরানীরা তা দেখে হতভম্ব হয়ে পড়লো। বেশ কিছুক্ষণ তারা একনজরে মুসলমানদেরকে দেখতে লাগলো এবং "দেও এসেছে, দেও এসেছে" বলে পালানো শুরু করলো। ইয়াযদগিরদ নিজের হেরেম ও সম্পদের একাংশ আগেই হালোয়ান প্রেরণ করেছিল। এখন নিজেও মাদায়েনের ব্যথায় প্রাচীরের ওপর ব্যর্থতার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পালিয়ে গেল। হযরত সায়াদ (রা) মাদায়েন প্রবেশ করলেন। এ সময় চারদিকে গভীর নীরবতা ছেয়েছিল এবং কিসরার প্রাসদসমূহ অন্যান্য আজিমুশ্বান ভবনসমূহ এবং সবুজে ঘেরা বাগান-সমূহ বর্তমান অবস্থার ভাষা দিয়ে পার্থিব জগতের অস্থায়ীত্বের ঘোষণা দিচ্ছিল। এই দৃশ্য দেখে হযরত সায়াদের (রা) মুখ দিয়ে স্বতস্ফূর্তভাবে এই আয়াত জারী হয়ে গেল ঃ

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ○ وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ○ وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ○ كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ○ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ ○

"কতনা বাগ-বাগীচা, ঝর্ণাধারা, ক্ষেত ও সুরম্য প্রাসাদ রাজী ছিল, যা তারা পেছনে রেখে গিয়েছিল। কতইনা বিলাস সামগ্রী যাতে তারা আনন্দ করছিল তাদের পিছনের পড়ে রলো। এই হলো তাদের পরিণাম! আর আমরা অন্য লোকদেরকে এসব জিনিসের উত্তরাধিকারী বানালাম। অতপর না আসমান তাদের জন্য কাঁদলো, না যমীন। তাদেরকে খানিকটা অবসরও দেয়া হলো না।" (আদ-দুখান ঃ ২৫-২৮)

মাদায়ানে মুসলমানরা কোটি কোটি দিনারের গনিমতের মাল লাভ করলো। তার মধ্যে এমন এমন বিরল বস্তু ছিল যা দেখে মানুষের জ্ঞান বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ে। এসব বস্তুর মধ্যে কতিপয়ের নাম হলো ঃ

নওশিরওয়ার সোনা খচিত মুকুট, শাহানে সালফের জরি মন্ডিত খঞ্জর, যিরা এবং তরবারী, নীরেট সোনার একটি বিরাট কৃতির ঘোড়া। ঘোড়াটির বুকে ইয়াকুত জড়ানো ছিল। তার ওপর ছিল সোনায় নির্মিত একজন সওয়ার।

সওয়ারটির মাথায় ছিল হিরার মুকুট। এমনিভাবে সোনার উটনীও তার সোনার সওয়ার। কিসরার প্রাসাদের সোনার বিছানা যার আয়তন ছিল ৬০ বর্গগজ। তা ছিল মূল্যবান জওহর দিয়ে সজ্জিত।

মুসলমানরা এই মূল্যবান গনিমাতের মাল একত্রিত করার কাজে এমন বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়েছিলেন যে, বিশ্বের ইতিহাস তার উদাহরণ পেশ করতে অক্ষম। কোন মুজাহিদ যদি সামান্য একটি সুঁচও পেয়ে থাকতো অথবা মূল্যবান জওহর, তাহলে সে তা নির্দ্বিধায় আমীরের নিকট জমা দিয়ে দিত। এরা ছিল সেই আরব যাদের নিয়ে ইরানবাসীরা ভূখা-নাঙ্গা থাকার উপহাস করতো। হযরত সায়াদ (রা) গনিমাতের মালের এক-পঞ্চমাংশ মদীনা প্রেরণ করলেন এবং অবশিষ্ট সব মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

মাদায়েন বিজয়ের পর মুসলমানরা সামনে অগ্রসর হয়ে জালোলা, হালওয়ান, তাকবিত, মোসাল, হাইত এবং মাসবাজান প্রভৃতি স্থান জয় করে নিল এবং আরব ইরাকের শেষ সীমানা পর্যন্ত তাদের শাসনের বিস্তার লাভ ঘটলো। তারপর হযরত ওমর (রা) মুসলমানদেরকে সামনে অগ্রসর হওয়ায় বাধা দিলেন এবং হযরত সায়াদকে (রা) বিজিত এলাকাসমূহের গভর্নর বানিয়ে তার আইন-শৃংখলা রক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করার নির্দেশ দিলেন।

হযরত সায়াদ (রা) মাদায়েনে নিজের স্থায়ী আবাস বানিয়ে ইমারাতের দায়িত্ব এমন যোগ্যতা ও ইনসাফের সঙ্গে আঞ্জাম দিলেন যে, সকল প্রজা সাধারণ কৃতজ্ঞ হয়ে গেল। মুসলমানদের পূত-পবিত্র ও পসন্দনীয় পর্বসমূহ ইরানীদের অন্তর জয় করে নিল এবং তারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো। হযরত সায়াদ (রা) অত্যন্ত অল্প সময়ে বিজিত এলাকায় আদম শুমারী এবং ভূমির জরীপ করালেন। জমির আসল মালিকদের দখল বহাল রাখলেন এবং পতিত জমি মুসতাহিক ও যোগ্য লোকদের দখলে আনার অনুমতি দিলেন। ধন-সম্পদ ও জিযিয়ার অত্যন্ত ইনসাফপূর্ণ আইন রচনা করলেন এবং সাধারণের কল্যাণের অনেক কাজ করালেন। কিছু দিনের মধ্যেই সারা দেশে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্বচ্ছলতার যুগ শুরু হলো। এমনিভাবে সুন্দর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে হযরত সায়াদ (রা) প্রমাণ করলেন যে, তিনি শুধুমাত্র একজন যোগ্য সেনাপতিই নন বরং উত্তম গভর্নরও।

মুসলমানরা বেশ কিছু দিন মাদায়েনে অবস্থান করলেন। তারপর হযরত সায়াদ (রা) অনুভব করলেন যে, সেখানকার আবহাওয়া মুসলমানদের উপযোগী হয়নি। তিনি এই অবস্থা পত্রের মাধ্যমে হযরত ওমরকে (রা) জানালেন। সেখান থেকে নির্দেশ এলো যে, আরব সীমান্তের মধ্যে একটি উপযুক্ত স্থান খুঁজে বের করে একটি নতুন শহরের পত্তন ঘটাও। কিন্তু

সেখানকার আবহাওয়া যেন সুন্দর হয়। সুতরাং হযরত সায়াদ (রা) সতের হিজরীতে কুফা শহর আবাদ এবং রাজধানীও মাদায়েন থেকে কুফা স্থানান্তর করেন। কুফা এসে হযরত সায়াদ (রা) সাধারণের কল্যাণমূলক কাজের প্রতি আরো বেশী মনোযোগ দেন। ছোট ছোট নহর কেটে পানি সরবরাহের খুব সুন্দর ব্যবস্থা করেন। অনেক পুল ও মুসাফিরখানা বানান এবং নিজের অর্থ দিয়ে কয়েকটি মক্তব ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সৈন্যদের বেতন বন্টনের সুন্দর ব্যবস্থা এবং সৈন্য সংখ্যা ও যুদ্ধ সরঞ্জামের পরিপ্রেক্ষিতে কুফায় ইসলামী বিশ্বের সবচেয়ে বড় ছাউনী বানালেন।

হযরত সায়াদের (রা) কুফা অবস্থানকালে কুফাবাসীর একটি দল তাঁর বিরোধী হয়ে গেল এবং তারা হযরত ওমরের (রা) নিকট অভিযোগ করলো যে, হযরত সায়াদ (রা) ভালোভাবে নামায পড়ান না। হযরত ওমর (রা) হযরত মুহাম্মদ (রা) ইবনুল মুসলিমাকে প্রেরণ করে তদন্ত করালেন। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা বলে প্রমাণিত হলো। তা সত্ত্বেও হযরত ওমর (রা) একুশ হিযরীতে হযরত সায়াদকে (রা) মুসলিহাতের কারণে আমীরের পদ থেকে অপসারণ করলেন এবং তিনি মদীনা ফিরে এলেন।

২৩ হিজরীতে এক অগ্নি উপাসক গোলাম আবুলুলু ফিরোজ হযরত ওমরের (রা) ওপর হত্যামূলক হামলা করে বসলো। আঘাত এত গুরুতর ছিল যে, তাঁর বাঁচার আর আশা রলো না। সুতরাং লোকেরা তাঁর নিকট তাঁর স্থালাভিষিক্ত নিয়োগের আবেদন জানালো। ফারুকে আজম (রা) অনেক চিন্তা-ভাবনার পর ৬ জন মহান সাহাবীর নাম উল্লেখ করলেন এবং বললেন তাঁরা নিজেদের মধ্য থেকে যাঁকে ইচ্ছা খলিফা নির্বাচন করে নেবেন। এই ৬ জনের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত সায়াদ (রা)। অন্য পাঁচজন হলেন ঃ হযরত আলী (রা), হযরত ওসমান (রা), হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়াম, হযরত তালহা (রা) ইবনুল উবায়দুল্লাহ এবং হযরত আবদুর রহমান (রা) ইবনুল আওফ।

হযরত ওমর ফারুক (রা) ওফাতের পূর্বে হযরত সায়াদ (রা) সম্পর্কে বিশেষভাবে এই কথাগুলো বলেছিলেন ঃ

"আমি সায়াদকে (রা) দায়িত্বহীনতা অথবা খিয়ানতের কারণে পদচ্যুত করিনি। সায়াদ (রা) যদি খিলাফতের জন্য নির্বাচিত হন তাহলে সে তার যোগ্য এবং সে যদি নির্বাচিত না হয় তাহলে যিনি খলিফা নির্বাচিত হবেন তিনি তার নিকট থেকে সাহায্য নেবেন।"

ফারুকে আজমের (রা) ওফাতের পর মজলিশে শুরা আলাপ আলোচনার পর হযরত ওসমানকে (রা) তাঁর স্থলাভিষিক্ত নির্বাচন করলেন। তিনি খিলাফতের আসনে বসেই হযরত সায়াদকে (রা) দ্বিতীয়বার কুফার গভর্নর নিয়োগ করলেন। এবার তিনি সেই পদে তিন বছর ছিলেন। ২৬ হিজরীতে বাইতুলমালের ব্যবস্থাপক হযরত আবদুল্লাহ (রা) ইবনুল মাসউদের সঙ্গে মতবিরোধ হলে হযরত ওসমানও (রা) তাঁকে আমীরের পদ থেকে অপসারণ করেন। তারপর হযরত সায়াদ (রা) দেশের রাজনীতি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে নেন এবং মদীনা মুনাওয়ারা থেকে দশ মাইল দূরে আকীক নামক স্থানে নির্জনত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর আকীক অবস্থানের দীর্ঘ সময়ে ইসলামী বিশ্বে বড় বড় উত্থান-পতন এবং ফিতনা-ফাসাদ সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু তিনি এসব থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। হযরত ওসমানের (রা) খিলাফতের শেষের দিকে যখন মুফসিদ বা বিদ্রোহীরা খলিফার আবাসস্থল অবরোধ করলো তখন হযরত সায়াদ (রা) আকীক থেকে মদীনা তাশরীফ আনলেন এবং বিদ্রোহীদেরকে সামর্থ অনুযায়ী বোঝানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁরা হযরত সায়াদের (রা) নসিহতের কোন প্রভাব গ্রহণ করলো না এবং তিনি নিরাশ হয়ে আকীক ফিরে গেলেন। হযরত ওসমান গনির (রা) মজলুমানা শাহাদাতের পর হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু খলিফার আসনে আসীন হলেন। এ সময় হযরত সায়াদ (রা) নির্দ্বিধায় তাঁর বাইয়াত করেন। কিন্তু উষ্ট্র ও সিফ্‌ফিনের কোন যুদ্ধেই তিনি অংশ নেননি। উষ্ট্রের যুদ্ধে লোকজন তাঁকে তাদের সাথে যাওয়ার দাওয়াত দিলে তিনি বললেন ঃ "আমাকে এমন তরবারীর কথা বল যে তরবারী কাফের ও মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য সূচীত করবে।"

হাফেজ ইবনে কাছির (র) "আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া" গ্রন্থে লিখেছেন যে, ফিতনার যুগে একবার হযরত সায়াদের (রা) ভ্রাতুষ্পুত্র হাঁশিম (রা) ইবনুল উতবা তাঁকে বললেন, আপনি যদি এখন খিলাফতের দাবী করেন তাহলে একলাখ তরবারী আপনার সমর্থনের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। জবাবে তিনি বললেন, "ভ্রাতুষ্পুত্র সেই এক লাখ তরবারীর মধ্য থেকে আমি শুধু এমন একটি তরবারী চাই যা কাফেরের ওপর চালানো যাবে, কিন্তু কোন মুসলমানের ওপর চালানো যাবে না।"

হযরত সায়াদের (রা) আকীকের নির্জনত্বের জীবন দীর্ঘদিন ধরে চলার পর তাঁর ওপর বার্দ্ধক্য জেঁকে বসতে লাগলো। দেহের শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল এবং দৃষ্টিশক্তিও জবাব দিয়ে বসলো। শেষে প্রকৃত স্রষ্টার ডাক এসে উপস্থিত হলো এবং ৫৫ হিজরীতে তিনি পরপারের ডাকে সাড়া দিলেন। জানাযা মদীনায় আনা হলে সেখানে কান্নার রোল পড়ে গেল এবং চারদিক থেকে মানুষ

জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য ভেঙ্গে পড়লো। মদীনার গভর্নর মারওয়ান ইবনুল হাকাম উম্মুহাতুল মু'মিনীনের (রা) হজুরার সামনে জানাযার নামায পড়ালেন এবং ইসলামের এই মহান বীরকে জান্নাতুল বাকীতে সমাহীত করা হয়।

হযরত সায়াদ (রা) বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি বিয়ে করেছিলেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অধিক সন্তান দিয়েছিলেন। চরিতকাররা তাঁর ১৮টি পুত্র ও ১৮টি কন্যার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

ইবনে সায়াদ (রা) হযরত সায়াদের (রা) হুলিয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, তিনি ছিলেন খর্বাকৃতির, মাথা বড়, নাক চেপ্টা, মাংসল দেহ, ঘনচুল, হাতের আঙ্গুল মোটা ও মজবুত।

হযরত সায়াদের (রা) চরিত্রের বাগান বিভিন্ন রংয়ের ফুলে সুসজ্জিত ছিল। ইসলাম গ্রহণে অগ্রগমন, রাসূল প্রেম, কঠোর অবস্থায় ধৈর্য্যধারণ, দ্বীনের প্রতি সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ, সুন্নাতের অনুসরণ, যুহুদ ও তাকওয়া, বীরত্ব, বিনয়, ত্যাগ, দানশীলতা, সত্যকথন ও স্পষ্ট ভাষণ তাঁর চারিত্রিক গুণাবলীর বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি সেই সময় দাওয়াতে হকের প্রতি সাড়া দিয়েছিলেন যখন এ কাজ ছিল তরবারীর ধারের ওপর চলার নামান্তর। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলের (সা) মুহাব্বাত ও আনুগত্যকে জীবনের নিত্য সঙ্গী বানিয়ে নিয়েছিলেন। সবসময় নিজের জীবনকে হুজুরের (সা) জন্য কুরবানীর উদ্দেশ্যে প্রস্তুত থাকতেন। এই গভীর ভালোবাসার বদৌলতে তিনি নবীর দরবারে বিশেষ নৈকট্য লাভ করেছিলেন। একবার হুজুর (সা) তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন "হে আল্লাহ, তার দোয়া কবুল কর এবং তার নিক্ষেপিত তীর ঠিক রাখো।"

এ মুবারক দোয়ার বদৌলতে আল্লাহ তায়ালা, হযরত সায়াদের (রা) দোয়া কবুল করতেন। লোকজন তাঁর নিকট কল্যাণের দোয়া কামনা করতো এবং তাঁর বদদোয়াকে ভয় করতো। তিনি অসুস্থ হলে হুজুর (সা) সশরীরে তাঁর শুশ্রূষার জন্য তাশরীফ নিতেন। কঠিন অবস্থায় ধৈর্য্যধারণ সাহাবীদের বিশেষ গুণ ছিল। তিনি হক পথে এমন এমন মুসিবত সহ্য করেছেন যার কথা চিন্তা করতেও মানুষ কেঁপে উঠে। যাঁরা সাবিকুনাল আউয়ালুন ছিলেন তাঁরা তো বিশেষভাবে মুশরিকদের নির্যাতনের শিকার হতেন। হযরত সায়াদও (রা) সেই পবিত্র দলের একজন সদস্য ছিলেন। তিনি কয়েকবছর পর্যন্ত মক্কায় অন্যান্য মুসলমানের সাথে প্রত্যেক ধরনের মুসিবত বরদাশত করতেন। এমনকি শিবে আবি তালিবেও তিন বছর পর্যন্ত অবরোধের বিষবৎ মুসিবৎ স্বেচ্ছায় বরণ করেন। অথচ এই অবরোধ শুধুমাত্র বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের জন্য নির্ধারিত ছিল। দ্বীনের প্রতি সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধের অবস্থাটা এমন ছিল যে, ভয়াবহ

ভীতি সত্ত্বেও হক পথে সর্বপ্রথম একজন ইসলামের শত্রুকে উৎখাত করেন। এমনিভাবে আল্লাহর পথে সর্বপ্রথম তীর চালিয়ে ছিলেন উতবা ইবনুল আবি ওয়াক্কাস তাঁর বড়ভাইও পৃষ্টপোষক ছিলেন। কিন্তু উতবা যখন ওহোদের যুদ্ধে হুজুরকে (সা) আহত করলো তখন তিনি তার জীবনের শত্রু হয়ে গেলেন। সুন্নাত অনুসরণের এমন ব্যবস্থা ছিল যে, প্রতিটি কাজে হুজুরের (সা) আহকাম ও পন্থা সামনে রাখতেন। তিনি বলতেন, রাসূলের (সা) পবিত্র জীবন অনুকরণ ও অনুসরণের সর্বোত্তম আদর্শ যুহ্দ ও তাকওয়ার অবস্থা ছিল, সারা জীবন কখনো কোন মালদার মানুষের নিকট থেকে কোন তোহফা বা হাদিয়া গ্রহণ করেননি এবং কখনো এমন কোন লোকমা খাননি যা পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহ ছিল। পরনিন্দা বা গীবত খুবই অপসন্দ করতেন এবং তার সামনে অন্য কোন মুসলমানের খারাব বর্ণনার অনুমতি দিতেন না। সবসময় লোকদেরকে হক কথা বলার পরামর্শ এবং কপটতা থেকে দূরে থাকার হেদায়াত দিতেন। নিজের সন্তানদেরকে বেশীর ভাগ সময় অল্পে তুষ্ট থাকার ওসিয়ত করতেন।

জিহাদের প্রতি উৎসাহ এবং বীরত্ব হযরত সায়াদের (রা) জীবনের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল। বদর ও তার পরের ওহোদের যুদ্ধে তিনি যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং ফিদাকারী প্রদর্শন করেছিলেন তাতে সাইয়েদুল মুরসালিন (সা) প্রকাশ্য প্রশংসা করেছিলেন। পরবর্তী যুদ্ধসমূহেও তাঁর বীরত্ব ও জানবাজীর একই অবস্থা অব্যাহত ছিল। এই গুণের কারণেই ইরাক আভিযানের নেতৃত্ব তাঁর ওপর অর্পিত হয়। কাদেসিয়ার যুদ্ধে অসুস্থতার কারণে তিনি কার্যত যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি। তবুও তিনি যখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে মুজাহিদদেরকে জীবন বাজী রাখতে দেখতেন তখন আবেগে বাধ্য হয়ে বার বার এপাশ ওপাশ করতেন।

কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, হযরত সায়াদের (রা) জিহাদের আবেগের কারণে লোকজন তাঁকে ফারিসুল ইসলাম বা ইসলামের অশ্বারোহী বলে ডাকতো।

হযরত সায়াদ (রা) দ্বীন ও দুনিয়া প্রত্যেক দিক থেকেই অত্যন্ত উঁচু মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন। কিন্তু স্বভাবে নম্রতা, বিনয়, ধৈর্য ও স্থৈর্য্যের গুণ ছিল বেশী। গরীবদের সাথে বসা এবং তাদের সাহায্য করায় আনন্দ অনুভব করতেন। কোন শ্রমিককে বোঝার নীচে দেবে যেতে দেখলে তার বোঝা উঠিয়ে মনযিলে পৌছে দিয়ে আসতেন। কাউকে পথ হারিয়ে যেতে দেখলে তাকে সঙ্গে নিয়ে লক্ষ্য স্থলে পৌছে দিয়ে আসতেন। যদিও তিনি আকীকে একটি ভালো বাড়ী বানিয়েছিলেন। কিন্তু স্বভাবের সরলতায় কোন পরিবর্তন আসেনি। একদম

সাধারণ খাবার খেতেন এবং সাদাসিধে পোশাক পরতেন। ইবাদাত থেকে ফারেগ হয়ে নিজের পশু চরানোর জন্য জঙ্গলে নিয়ে যেতেন। আমীর থাকাকালীন অভাবগ্রস্তদের ভাতা নিজে গিয়ে বন্টন করতেন। ছোট ছোট কাজ নিজেই করতেন এবং এজন্য কোন খাদেম বা গোলামকে কষ্ট দিতেন না। দানশীলতা এবং আল্লাহর পথে খরচেও তাঁর প্রশস্ত হাত ছিল। এমন কখনো হয়নি যে, কোন ভিক্ষুক তার দরজা থেকে মাহরুম হয়ে ফিরে গেছে। গরীব মিসকিনের জন্য তাঁর ঘরের দরজা সবসময় খোলা থাকতো। মসজিদ ও মক্তব নির্মাণের জন্য প্রাণ খুলে দান করতেন। সামরিক বাহিনীর কোন সদস্য যদি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় শহীদ হয়ে যেতেন তাহলে নিজস্ব তহবিল থেকে সেই ঋণ আদায় করে দিতেন। তাঁর মধ্যে ত্যাগ ও পরমুখাপেক্ষীহীনতার গুণও পূর্ণরূপেই পাওয়া যেতো। হযরত ওমরের (রা) ওসিয়ত অনুযায়ী তিনিও খিলাফতের যোগ্য ছিলেন। কিন্তু তিনি হযরত আবদুর রহমান (রা) ইবনুল আওফের পক্ষে নিজের দাবী পরিত্যাগ করেন। ফিতনার যুগে একবার তার পুত্র আমর (বা আমের) তাঁকে নির্জনত্ব ত্যাগ করে খিলাফতের দাবী করার উৎসাহ দিয়েছিল। তাতে তিনি খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং তার বুকের ওপর হাত মেরে বলেছিলেন ঃ

"আমি রাসূল (সা) থেকে শুনেছি যে, আল্লাহ পরহেজগার, বেগরজ ও লুক্কায়িত বান্দাকে ভালোবাসেন।"

হক কথা বলার ব্যাপারে তিনি কোন বড় ব্যক্তিত্বকেও পরওয়া করতেন না। একবার আমীরে মাবিয়ার (রা) সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। গিয়ে "আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহাল মূলক" বলে সম্বোধন করলেন। তিনি বললেন, "আপনি যদি আমীরুল মু'মিনীন বলতেন তাহলে কি কোন অসুবিধা হতো ?" তিনি বললেন " আল্লাহর কসম, আপনি যে ভাবে ক্ষমতায় এসেছেন সেভাবে আমাকে দেয়া হলে আমি অবশ্যই তা গ্রহণ করা পসন্দ করতাম না।"

হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) বলেন, "সায়াদের (রা) মধ্যে বীরত্ব ও নমনীয়তার সাথে সাথে কোমলতাও ছিল।" বস্তুত তিনি কাউকে কষ্টে দেখলে চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠতো। ইবাদাতের পর দোয়ার সময় চোখ মুদে যেতো। অধিকাংশ সময় অশ্রুসজল হয়ে বলতেন, "এই নশ্বর জীবন শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে, আর আমরা পার্থিব আরাম-আয়শে মশগুল হয়ে পড়েছি।"

নেতৃস্থানীয় চরিত্রকাররা হযরত সায়াদের (রা) অন্যান্য গুণাবলী ছাড়া ইবাদাতের প্রতি আগ্রহ, আল্লাহভীতি এবং ইলম ও ফজলের উল্লেখও বিশেষভাবে করেছেন। সবসময়ই তাঁর ওপর আল্লাহভীতি ছেয়ে থাকতো। খুব

বেশী রোযা রাখতেন এবং রাতের অধিকাংশ সময় আল্লাহর স্মরণে কাটাতেন। নামাযের জন্য দাঁড়ালে আল্লাহর ভয়ে দেহ কেঁপে উঠতো এবং চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যেত। তাহাজ্জুদের নামাযের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। অধিকাংশ সময় অর্ধেক রাতের পর মসজিদে নববীতে গিয়ে অত্যন্ত খুশু ও খুজুর সঙ্গে নামায পড়তেন। নামাযের পর অত্যন্ত বিনয়ের সাথে দোয়া করতেন, "হে আল্লাহ, আমার গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং আমাকে সৃষ্টির সেবার তাওফিক দিন।" পবিত্র রমযান মাস এলে তাঁর খুশীর সীমা থাকতো না। এই পবিত্র মাসে রাত-দিন ইবাদাত ছাড়া আর কোন কাজ করতেন না। রাতের শেষ অংশ আল্লাহর ভয়ে এমনভাবে ক্রন্দন করতেন যে, দাড়ি মোবারক ও জায়নামায চোখের পানিতে ভিজে যেত। কুরআনে হাকিমের প্রতি অসাধারণ আকর্ষণ ও মনোযোগ ছিল। তিলাওয়াতে কালামে পাকে কোন শূন্যতা আসতে দিতেন না। এমন খোশ ইলহান ও দরদভরা কণ্ঠে কুরআনে হাকিম তিলাওয়াত করতেন যেন শ্রবণকারীদের ওপর যাদুমন্ত্র প্রভাব ফেলতো। হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন সায়েব বলেন, একবার হযরত সায়াদ (রা) তাঁর নিকট তাশরীফ আনলেন এবং বললেন, "আবদুর রহমান, আমি শুনেছি যে, তুমি খোশ ইলহানির সঙ্গে কুরআনে করীম তিলয়াত করে থাকো। আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেছি যে, কুরআন শিক্ষা গ্রহণের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এজন্য যখন তিলাওয়াত করবে তখন কাঁদবে। আর যদি কাঁদতে না পার তাহলে তোমার সুরতে যেন শিক্ষা গ্রহণের নমুনা প্রকাশ পায় এবং তা খোশ ইলহানির সঙ্গে তিলাওয়াত করবে।"

রাসূলের (সা) সাথে হযরত সায়াদের (রা) বিশেষ ঘনিষ্টতার কারণে তাঁর ইলম ও ফজলের মর্যাদা বৃদ্ধি হয়েছিল। তিনি বছরের পর বছর ধরে নবীর (সা) জ্ঞানের প্রস্রবণ থেকে ফয়েজ লাভ করেছিলেন। তার প্রভাবেই হুজুরের (সা) ওফাতের পর তিনি জালিলুল কদর সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে তাফাককুহ ফিদ দ্বীন বা দ্বীনের সমঝে বিশেষ নৈপুণ্য প্রদান করেছিলেন। তিনি ফকিহ সাহাবীদের সেই কাতারভুক্ত ছিলেন যাতে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা), হযরত উম্মে সালমা (রা), হযরত আনাস (রা) ইবনুল মালিক, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা), হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) এবং হযরত মুয়াজ (রা) ইবনুল জাবালের মত উম্মাহর স্তম্ভরা শামিল ছিলেন। তাঁরা অসংখ্য শাখায় জ্ঞানের মনিমুক্তায় পরিপূর্ণ ছিলেন। লোকজন মাসয়ালা জানার জন্য উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে তাঁর নিকট আসতো এবং তিনি সকলকে মুতমায়েন করে ফিরিয়ে দিতেন। কোন মাসয়ালা সম্পর্কে জানা না থাকলে সমসাময়িক সাহাবায়ে কিরাম (রা) থেকে জিজ্ঞেস করে

নেয়ায় কোন লজ্জা অনুভব করতেন না। যদিও হযরত সায়াদ (রা) হাদীস বর্ণনায় খুব সতর্কতা অবলম্বন করতেন তবুও তিনি দু' শ' পনরটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইসলামের শাহসওয়ার হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস নিসন্দেহে ইসলামের ইতিহাসে একজন বহুবিধ গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর এসব গুণাবলী অনুকরণযোগ্য। ইসলামী জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তিনি অনুকরণীয় আদর্শ রেখে গেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে রাসূল প্রেম, ধৈর্য, অটলতা ও বীরত্বের মত গুণাবলী ছাড়াও রাজনীতি, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা এবং জিহাদের নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্যতাও প্রদান করেছিলেন। ইসলামের যেখানে এবং যেভাবে প্রয়োজন পড়েছিল তিনি নিজের সকল যোগ্যতার নযরানা তৎক্ষণাৎ পেশ করেছিলেন।

হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফুজ জুহরী

৬ষ্ঠ হিজরীর শাবান মাস। এ সময় রহমতে আলমের (সা) বনু কালাবের দিকে একটি সামরিক বাহিনী প্রেরণের প্রয়োজন পড়লো। এই গোত্র দাওমাতুল জুনদুলের নিকটে বসবাস করতো এবং খুব শক্তিশালী ছিল। হুজুর (সা) চেয়েছিলেন, এই অভিযানের নেতৃত্ব এমন একজনের ওপর অর্পিত হোক, যিনি তাবলীগের দায়িত্ব আঞ্জাম ও সুন্দরভাবে দিতে পারেন। আবার যুদ্ধের প্রয়োজন হলে তারও নেতৃত্ব দিতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে হুজুরের (সা) নির্বাচনী দৃষ্টি নিজের এমন একজন জীবন উৎসর্গকারীর ওপর নিক্ষিপ্ত হলো, যে নবুওয়াত প্রাপ্তির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক সময়ই হক পথে জীবন উৎসর্গের বাস্তব প্রমাণ পেশ করেছে। তিনি একজন মানুষ প্রেরণ করে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই উজ্জ্বল লাল বর্ণের এবং দীর্ঘ আকৃতির এক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ রাসূলের (সা) নিকট উপস্থিত হলেন। লম্বা দাড়ি এবং মাথায় কান পর্যন্ত ঝাঁকড়া চুল তাঁর ব্যক্তিত্বকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। তিনি এসেই আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। এই গোলামকে কি জন্য স্মরণ করেছেন। তাকে কি কোন দায়িত্ব অর্পণ করা হবে ?"

প্রিয়নবী (সা) তাঁকে অত্যন্ত স্নেহের সাথে সামনে বসালেন। সেই অভিযানের কথা বিস্তারিত বললেন এবং অত্যন্ত স্নেহ ও ভালোবাসার সাথে (তাঁর পাগড়ী খুলে) নিজের পবিত্র হাত দিয়ে তাঁর মাথার ওপর কালো পাগড়ী বাঁধলেন। পাগড়ীটির চার আঙ্গুল বরাবর তাঁর পিঠের ওপর ছেড়ে দিলেন। অতপর তাঁকে সাতশ' মুজাহিদের নেতা নিয়োগ করলেন এবং পুনরায় হামদ ও ছানার পর তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য গমন কর। আল্লাহর নাফরমানদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। কিন্তু খেয়ানত করো না, কোন লাশ বিকৃত করো না। (দুশমনের লাশের ঠোঁট, কান, নাক প্রভৃতি কাটবে না) এবং শিশুদেরকে হত্যা করবে না। তোমাদের প্রতি এটা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এবং নবীর চরিত্র মনে করবে।"

তাঁরা নবীর (সা) ইরশাদের সামনে মাথা নত করলেন। সেই নির্দেশের ওপর আমল করার প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং সঙ্গীদেরসহ দাওমাতুল জুন্দুলে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

রাসূলের (সা) এই সাহাবী যাঁর দস্তারবন্দী বা পাগড়ী বাঁধার কাজ স্বয়ং সাইয়েদুল মুরসালিন (সা) নিজের পবিত্র হাতে সম্পাদন করেছিলেন এবং যাঁকে এক গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের নেতৃত্বের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন—তিনি ছিলেন হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফুজ জুহুরী।

সাইয়েদেনা আবু মুহাম্মদ আবদুর রহমান বিন আওফ সেই দশ জালিলুল কদর সাহাবীর (রা) অন্যতম ছিলেন যাঁদেরকে সাকিয়ে কাওছার (সা) বিশেষভাবে নাম উল্লেখ করে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছিলেন এবং যিনি "আশারায়ে মুবাশশারাহ"র "মুহতাম বিশ শান" উপাধিতে বিখ্যাত হন। হযরত আবদুর রহমান (রা) কুরাইশের "বনু যুহরা" খান্দানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তাঁর নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ আবদি আওফ (অথবা আবদি জাওফ) বিন আবদি বিন হারিছ বিন যুহরাহ বিন কিলাব বিন মুররাহ।

তাঁর নসব ৬ষ্ঠ পুরুষে কিলাব বিন মুররাহতে গিয়ে মহানবীর (সা) নসবনামার সঙ্গে মিলে যায়। হুজুরের (সা) মাতা হযরত আমেনাও বনু যুহরার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন এবং তাঁর নসবনামা যুহরাহ বিন কিলাবে গিয়ে হযরত আবদুর রহমানের (রা) নসবের সাথে মিলে যায়। যুহরাহ হুজুরের (সা) প্রপিতামহ কুসাই বিন কিলাবের ভাই ছিলেন।

হযরত আবদুর রহমানের (রা) মাতার নাম শিফা (রা) বিনতে আওফ (বিন আবদি বিন হারিছ বিন যুহরাহ) ছিল। কতিপয় রেওয়ায়াতে তাঁর নাম সুফিয়া, সফা এবং দাবায়য়াহও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু চরিতকারদের অধিকাংশই শিফা (রা) নামকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। হযরত শিফা (রা) স্বামী আওফ বিন আবদি আওফের চাচার কন্যা ছিলেন। তিনি সাহাবিয়া হওয়ার মর্যাদাও লাভ করেন।

বাইহাকী (র) এবং হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) লিখেছেন, মহানবীর (সা) জন্মের সময় দাইয়ের খিদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন হযরত শিফা (রা) বিনতে আওফ। তিনি হযরত আমেনার নিকটাত্মীয় ছিলেন।

হযরত আবদুর রহমানের (রা) জন্মসাল সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের রেওয়ায়াত রয়েছে। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হাতির বছরের

দশ বছর পর জন্মগ্রহণ করেছেন। এইদিক থেকে তিনি হুজুরের (সা) থেকে বয়সে ১০ বছর ছোট ছিলেন। কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার (র) "আল-ইসাবাতে" তাঁর বয়স সম্পর্কে যে রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর জন্মের সাল হাতির বছরের থেকে বারো বছর পর নির্ধারিত হয়।

সহীহ বুখারী অনুযায়ী হযরত আবদুর রহমানের (রা) জাহেলী নাম ছিল আবদি আমর। কিন্তু ইবনে সায়াদ (র), হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র), বালাজুরী (র) এবং হাফেজ জাহাবী (র) তাঁর জাহেলী নাম আবদুল কাবা বলে লিখেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার (র) "আল-ইসাবা" গ্রন্থে এবং ইমাম হাকিম (র) "মুসতাদরাকে" বর্ণনা করেছেন যে, যখন তিনি ঈমান আনয়ন করেন তখন হুজুর (সা) তাঁর জাহেলী নাম পরিবর্তন করে আবদুর রহমান নাম রাখেন।

হযরত আবদুর রহমান (রা) যে পরিবেশে চোখ খুলেছিলেন তা ছিল কুফর ও শিরক এবং ফিসক-ফুজুরের পঙ্কে নিমজ্জিত। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা হযরত আবদুর রহমানকে (রা) সৎ স্বভাব দান করেছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার (র) "ইসাবাতে" লিখেছেন যে, জাহেলী যুগে তিনি নিজের ওপর মদ হারাম করে নিয়েছিলেন।

হযরত আবদুর রহমানের (রা) পিতা আওফ ছিলেন ব্যবসায়ী। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, আবদুর রহমানও (রা) একজন সফল ব্যবসায়ী হবেন। সুতরাং তিনি যুবক পুত্রকে ব্যবসা-বাণিজ্যের পদ্ধতি ও গুরু রহস্য খুব ভালোভাবেই মগজে ঢুকিয়েছিলেন এবং কতিপয় বাণিজ্যিক সফরে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বাস্তব প্রশিক্ষণও দিয়েছিলেন। নবীর (সা) নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বের কথা, একবার তিনি ফাকাহ বিন মুগিরা [হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের চাচা] আফফান। (হযরত ওসমান গনির পিতা) হযরত ওসমান গনি (রা) এবং হযরত আবদুর রহমানকে (রা) সঙ্গে নিয়ে বাণিজ্যের জন্য ইয়েমেন গিয়েছিলেন। পথিমধ্যে বনু জাযিমার লোকজন আওফ এবং ফাকাহকে হত্যা করে ফেলে। আফফান, হযরত ওসমান গনি (রা) এবং হযরত আবদুর রহমান (রা) বেঁচে গেলেন। ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুর রহমান (রা) অত্যন্ত বীরত্বের সাথে দুশমনের মুকাবিলা করেন এবং নিজের পিতার হত্যাকরীকে সেখানেই শেষ করে দেন। এই রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত আবদুর রহমান প্রকৃতিগতভাবেই অত্যন্ত বাহাদুর এবং জানবাজ ছিলেন।

হযরত আবদুর রহমানের বয়স ছিল তখন ২৭ অথবা ২৩। ইসলাম-সূর্য উদিত হলো এবং হাদিয়ে বরহক (সা) রিসালাতের মানসাবে অভিষিক্ত হলেন।

হযরত আবদুর রহমানের (রা) সুন্দর স্বভাব এবং পবিত্র নফস তৎক্ষণাৎ তাঁকে ইসলামের দিকে অগ্রসর করে দিল এবং তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) তাবলীগে নবুয়তের প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। এক রেওয়ায়াতে আছে যে, ইসলাম গ্রহণকারীদের ক্রমিক নম্বরে তাঁর সংখ্যা ছিল তের। সে সময় পর্যন্ত হুজুরে আকরাম (সা) দারে আরকামে আশ্রয় গ্রহণ করেননি।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আবদুর রহমানও (রা) ইসলাম অনুসারীদের মত মক্কার কাফেরদের জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়ে যান। নবুয়তের পাঁচ বছর পর সারওয়ারে আলম (সা) মজলুম সাহাবীদেরকে (রা) হাবশায় হিজরতের নির্দেশ দিলেন। এ সময় হযরত আবদুর রহমান (রা) দশজন পুরুষ এবং চারজন মহিলার সঙ্গে হাবশা চলে গেলেন। সে সময় তাঁর দুই স্ত্রী ও কয়েকটি সন্তান ছিল। কিন্তু তিনি একা গেলেন এবং পরিবার পরিজনকে আল্লাহর ওপর ভরসা করে মক্কাতেই রেখে গেলেন। তিন-চার মাস পর হাবশার মুহাজিররা উড়ো খবর পেলেন যে, মক্কার কাফের এবং রাসূলের (সা) মধ্যে আপস হয়ে গেছে। এই খবর শুনে কতিপয় মুহাজির হাবশা থেকে মক্কা রওয়ানা হয়ে গেলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আবদুর রহমানও (রা) শামিল ছিলেন। মক্কার নিকট পৌঁছে জানতে পেলেন যে, খবরটা ছিল সেরেফ গুজব। কিন্তু তখন তাঁরা ফিরে যাওয়া ঠিক মনে করলেন না এবং প্রত্যেকেই কুরাইশের কোন না কোন প্রভাবশালী সরদারের আশ্রয় নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন। আল্লামা বালাজুরী (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুর রহমান (রা) আসওয়াদ বিনইয়াগুছের আশ্রয় নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন।

হাবশা থেকে ফিরে এসেও হযরত আবদুর রহমান (রা) এবং অন্য মুসলমানদের শান্তির সঙ্গে থাকার ভাগ্য হলো না। কেননা, হকপন্থীদের ওপর কুরাইশ মুশরিকদের জুলুম-নির্যাতন ক্রমেই কঠোর হতে লাগলো। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বনবী (সা) পুনরায় মুসলমানদেরকে হাবশা গমনের হেদায়াত দিলেন। সুতরাং নবুয়তের ৬ বছর পর আশিরও অধিক পুরুষ এবং আঠার-উনিশজন মহিলা এক কাফেলার আকারে হাবশার পথ ধরলেন। হযরত আবদুর রহমানও (রা) সেই কাফেলায় শামিল ছিলেন। এসব সাহাবী হাবশায় কয়েক বছর উদ্বাস্তুর জীবন কাটাতে লাগলেন। চরিতকাররা বর্ণনা করেছেন। হাবশার মুহাজিরদের একটি দলতো বারো বছরেরও বেশি হাবশায় অবস্থান করেছিলেন এবং খায়বারের যুদ্ধের সময় হযরত জাফর (রা) বিন আবি তালিবের সঙ্গে মদীনা মুনাওয়ারা ফিরে আসেন। অবশ্য অনেক সাহাবী হুজুরের (সা) মদীনা হিজরতের পূর্বে বিভিন্ন সময়ে মক্কা ফিরে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফও ছিলেন। নবুয়তের তেরতম

বছরে মহানবী (সা) নিজের জান নিছারদেরকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি প্রদান করেন। এ সময় হযরত আবদুর রহমানও (রা) হিজরত করে মদীনা চলে যান। এভাবে তাঁর তিনবার হিজরতের মর্যাদা লাভ ঘটেছিল। মদীনায় পৌছে হযরত আবদুর রহমান (রা) হযরত সায়াদ (রা) বিন রবি আনসারীর মেহমান হন। কয়েক মাস পর মহানবী (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত আবদুর রহমানকে (রা) হযরত সায়াদ (রা) বিন রবির ইসলামী ভাই বানানো হয় এবং এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের পর হযরত সায়াদ (রা) বিন রবি ত্যাগের এমন এক মহান উদাহরণ পেশ করলেন যে, ইতিহাসে তার কোন নজির পাওয়া যায় না। সহীহ বুখারীতে হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণিত আছে ঃ

"আমাদের এখানে আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ এলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ও সায়াদ (রা) বিন রবি'র মধ্যে ভ্রাতৃত্ব কায়েম করলেন। সায়াদ (রা) ধনী মানুষ ছিলেন। তিনি আবদুর রহমানকে (রা) বললেন, সকল আনসার জানে যে, আমি খুব ধনী মানুষ। আমি নিজের সম্পদ আধা-আধি ভাগ করে দেব। আপনার এবং আমার মধ্যে এবং আমার দুই স্ত্রী রয়েছে। আপনি তাদেরকে দেখুন। যাকে পছন্দ করেন তাকে আমি তালাক দিয়ে দেব এবং সে যখন হালাল (ইদ্দত অতিক্রম করবে) হয়ে যাবে তখন আপনি তাকে নিকাহ করবেন।

আবদুর রহমান (রা) বললেন, আল্লাহ আপনার পরিবার পরিজন ও বিত্তবৈভবে বরকত দিন। (আমার এসব বস্তুর প্রয়োজন নেই) এখানে কি কোন বাজার আছে—যেখানে ব্যবসা বাণিজ্য হয়। সায়াদ (রা) বললেন, হাঁ আছে। বাজারের নাম কাইনুকা। আবদুর রহমান (রা) সকালে বাজারে গেলেন এবং ঘি ও পনির আনলেন। অতপর পরের দিন সকালেও গেলেন। সেদিন যখন ফিরলেন তখনও কিছু ঘি ও পনির অতিরিক্ত বাঁচিয়ে এনেছিলেন।"

এই রেওয়ায়াতে যেখানে হযরত সায়াদের (রা) নজিরবিহীন ত্যাগের দৃশ্য অবলোকন করা যায় সেখানে হযরত আবদুর রহমানের (রা) মুখাপেক্ষীহীনতা ও নিজের ওপর অগাধ বিশ্বাসের প্রমাণও পাওয়া যায়।

হযরত আবদুর রহমান (রা) পিতার কাছ থেকে ব্যবসাকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন এবং তিনি ব্যবসার পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে ভালোভাবেই ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি মদীনায় ব্যবসা শুরু করলে অল্প দিনের মধ্যেই চরম উন্নতি করলেন। ইবনে সায়াদ (র) "তাবকাত"-এ স্বয়ং তাঁর এই বক্তব্য উল্লেখ করেছেন যে, "আমি যদি পাথরও উঠাতাম তাহলেও খেয়াল হতো যে তার নীচে রুপা অথবা সোনা পাবো।"

সহীহ বুখারীর একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ব্যবসা শুরুর পর কিছু সঞ্চয় হলে তিনি একজন আনসারী মহিলাকে বিয়ে করেন। হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ

"কয়েকদিন পর আবদুর রহমান এলেন। তখন তাঁর কাপড়ের ওপর হলুদ রংয়ের দাগ ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেসা করলেন, নিকাহ করেছ ? তিনি বললেন, জ্বী হাঁ। জিজ্ঞেস করলেন, কাকে ? জবাব দিলেন, একজন আনসারী মহিলাকে। বললেন, তাকে কত মোহর দিয়েছ ? আরজ করলেন, খেজুরের বীচির পরিমাণ সোনা। ইরশাদ হলো, ওয়ালিমা করো একটি বকরী হলেও।"

বুখারীতে সেই আনসারী মহিলার নাম উল্লেখ নেই। অবশ্য অন্যান্য নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা তাঁর নাম সাহলা (রা) বিনতে আছেম বর্ণনা করেছেন। তিনি বাল্লি গোত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তা ছিল কাজায়া গোত্রের শাখা এবং কাজায়া সম্পর্কে ইবনে সায়াদ (র) লিখেছেন ঃ ওয়াহুম মিনাল আনসার—অর্থাৎ তারা আনসার ছিলেন।

হযরত আবদুর রহমান (রা) নিজের বাণিজ্য সম্প্রসারনের কয়েকটি পন্থা বের করেন। তার মধ্যে সেই বাণিজ্য চুক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যা তাঁর ও মক্কার সরদার উমাইয়া বিন খালফের মধ্যে হয়েছিল। সহীহ বুখারীতে স্বয়ং তাঁর থেকে রেওয়ায়াত আছে ঃ

"আমি উমাইয়া বিন খালফকে লিখিত দিলাম যে, সে আমাকে মক্কায় রক্ষা করবে এবং আমি তাকে মদীনায় রক্ষা করবো। আমি যখন আর রহমানের উল্লেখ করলাম তখন উমাইয়া বলতে লাগলো, আমি আর রহমানকে চিনি না। তুমি তোমার জাহেলিয়াতের নাম লিখ। সুতরাং আমি আমার নাম আবদি আমর লিখলাম।"

এই রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, এই চুক্তি হযরত আবদুর রহমানের (রা) মদীনা আগমনের পর সম্পাদিত হয়েছিল এবং ব্যবসা প্রসঙ্গে হযরত আবদুর রহমান (রা) হিজরতের পরও মক্কা যাতায়াত করতেন। হাদীস ব্যাখ্যাকারীরা এই রেওয়ায়াত থেকে এই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন যে, হযরত আবদুর রহমান লিখা পড়া জানতেন।

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে বদর নামক স্থানে হক ও বাতিলের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত আবদুর রহমান (রা) তাতে খুব উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নেন। যুদ্ধের সময় তিনি দুশমনের ব্যূহে আপাদমস্তক ঢুকে পড়েন এবং কয়েক জন মুশরিককে আহত করা ছাড়া সায়ের বিন আবি রাফায়াকে

জাহান্নামে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। সহীহ বুখারীতে বদরের যুদ্ধের প্রসঙ্গে স্বয়ং হযরত আবদুর রহমান (রা) থেকে দু'টি ঘটনা বর্ণিত আছে। একটি ঘটনা হলো ঃ

"বদরের দিন আমি ব্যূহে দাঁড়িয়েছিলাম। ফিরে দেখি, আমার ডাইনে ও বাঁয়ে দুই যুবক। আমি তাদের ব্যাপারে আশস্ত হতে পারলাম না। ইত্যবসরে একজন আমাকে নীচু গলায় বললো, চাচা! আবু জেহেলকে দেখিয়ে দিন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ভ্রাতুষ্পুত্র কি করবে ? সে বললো, আমি আল্লাহর নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে তাকে হত্যা করবো অথবা সেই চেষ্টায় নিহত হবো। অন্যজনও আস্তে আস্তে আমাকে একই কথা বললো। অতপর আমি খুশী হলাম যে, আমি কোন্ দুই ব্যক্তির মাঝে দাঁড়িয়ে আছি। আমি ইঙ্গিতে আবু জেহেলকে দেখিয়ে দিলাম। তারা দু'জন বাজ পাখীর মত তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তাকে মেরে ফেললো। তাঁরা দু'জন ছিলেন আফরার (রা) পুত্র।

চরিতকারদের অধিকাংশই লিখেছেন, আবু জেহেলকে গুরুতরভাবে আহতকারী যুবকদ্বয় ছিলেন হযরত মুয়াজ (রা) এবং হযরত মুয়াব্বিজ (রা)। তাঁরা উভয়েই আফরা'র পুত্র ছিলেন (আফরার তাদের মায়ের নাম ছিল। পিতার নাম ছিল হারিছ বিন রিফায়া। তাঁর সম্পর্ক ছিল আনসারের খাজরাজ গোত্রের বনু নাজ্জারের সাথে।)

দ্বিতীয় ঘটনা ছিল উমাইয়া বিন খালফের হত্যা সংশ্লিষ্ট। উমাইয়া মুশরিক বাহিনীতে শামিল হয়ে মুসলমানদের সাথে লড়াই করতে এসেছিল। মুশরিকরা যখন পরাজিত হলো এবং তারা পালাতে শুরু করলো তখন উমাইয়া হযরত আবদুর রহমানকে (রা) দেখে ফেললো। বস্তুত বাণিজ্য চুক্তিতে হযরত আবদুর রহমান (রা) তাকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। উমাইয়া পালাতে পালাতে তাঁকে ডেকে বললো বাঁচাও। হযরত আবদুর রহমান (রা) প্রতিশ্রুতি পালনের ধারণায় তাকে বাঁচাতে চাইলেন। এটা ভিন্ন কথা যে, তিনি তাতে সফল হননি। এই ঘটনা তাঁর মুখে এইভাবে বিবৃত হয়েছে ঃ

"যখন বদরের দিন এলো তখন আমি পাহাড়ের দিকে চললাম। যাতে তাকে (উমাইয়া বিন খালফ) হিফাজত করা যায়। সে সময় লোকজন শুয়ে পড়েছিল। কিন্তু বেলাল (রা) তাকে (উমাইয়াকে) দেখে ফেললো। তিনি চলে গেলেন এবং আনসারদের এক সমাবেশে দাঁড়িয়ে বললেন, উমাইয়া বিন খালফ এখনো রয়ে গেছে। তাকে (আল্লাহর দুশমন) ছেড়ে দেয়ায় কোন কল্যাণ নেই। আনসারের একটি দল তাঁর সঙ্গে আমাদের পিছু নিলেন। আমি ভয় পেলাম যে,

তাঁরা আমাদেরকে পেয়ে যাবে। আমি তাকে (উমাইয়ার পুত্র) পেছনে ছেড়ে দিলাম। যাতে তাঁরা তার সঙ্গে মুকাবিলা করতে থাকে। তাঁরা তাকে হত্যা করে ফেললো। কিন্তু আমাদের পিছু নেয়া ত্যাগ করলো না। সে (উমাইয়া) ভারী বপুর মানুষ ছিল। (এজন্য দ্রুত চলতে পারতো না)। যখন তারা আমাদের নিকট পৌছলো আমি তখন তাকে বললাম বসে পড়। সে বসে পড়লো। আমি রক্ষার ধারণায় নিজেকে তার ওপর নিক্ষেপ করলাম। তারা (আনসাররা) আমার নীচ দিয়ে তরবারী চালালো এবং তাকে হত্যা করে ফেললো। আমার পায়েও তরবারীর আঘাত লাগলো।"

এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবদুর রহমান (রা) বদরের যুদ্ধে হাজ্জাজ ইবনুল হারিছ নামক একজন মুশরিককে কয়েদও করেছিলেন।

ওহুদের যুদ্ধেও হযরত আবদুর রহমান (রা) মাথা হাতের তালুতে রেখে যুদ্ধ করেছিলেন। ইবনে হিশাম (র) এবং হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) বর্ণনা করেছেন, তিনি ওহুদের যুদ্ধে ২১টি আঘাত পেয়েছিলেন। পায়ের আঘাত এত প্রচণ্ড ছিল যে, সারা জীবন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতেন।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, যুদ্ধের আগুন যখন দাউ দাউ করে জ্বলছিল তখন হযরত হারিছ (রা) বিন ছিম্মাহ আনসারী হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আবদুর রহমান বিন আওফকে দেখেছ ? তিনি আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি পাহাড়ের দিকে কাফেরদের ভীড়ে আটকা পড়েছিলেন। আমি সেদিকে যেতে চাইলাম। কিন্তু আপনার ওপর দৃষ্টি পড়ে গেল। এজন্য এদিকে চলে এলাম। হুজুর (সা) বললেন, আবদুর রহমানকে (রা) ফেরেশতারা বাঁচাচ্ছেন। তারপর হযরত হারিছ (রা) হযরত আবদুর রহমানের (রা) নিকট গেলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, তাঁর সামনে কাফেরদের সাতটি লাশ পড়ে রয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি তাদের সকলকেই হত্যা করেছেন। হযরত আবদুর রহমান (রা) জবাব দিলেন ঃ ইরতাত এবং অমুক অমুককে তো আমি হত্যা করেছি। অবশিষ্ট মুশরিকের হত্যাকারী আমার নজরে আসেনি। একথা শুনে হযরত হারিছ (রা) চেঁচিয়ে উঠলেন এবং বললেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পূর্ণ ঠিকই বলেছিলেন। (মিয়ারে আনসার)

ওহোদের যুদ্ধের পর হযরত আবদুর রহমান (রা) খন্দকের যুদ্ধে জীবন বাজী রেখে অংশ নিয়েছিলেন। ৬ষ্ঠ হিজরীর শাবান মাসে বিশ্বনবী (সা) হযরত আবদুর রহমানকে (রা) সাতশ' মানুষ দিয়ে দাওমাতুল জান্দালের নিকটে বসবাসরত বনু কালাব গোত্রের দিকে প্রেরণ করলেন। রওয়ানার পূর্বে হুজুর

(সা) তাঁর পাগড়ী খুলে ফেললেন এবং স্বয়ং নিজের পবিত্র হাত দিয়ে তাঁর মাথায় কালো পাগড়ী বাঁধলেন এবং পেছনের দিকে চার আঙ্গুল বরাবর শামলা ছেড়ে দিয়ে বললেন, "আবদুর রহমান (রা) পাগড়ী এভাবে বেঁধো। কেননা এটা উত্তম ও পছন্দনীয় পন্থা।"

হযরত আবদুর রহমান (রা) দাওমাতুল জান্দালে পৌছে বনু কালাবকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। প্রথম দিন তাদের ওপর কোন প্রভাব পড়লো না। দ্বিতীয় দিনও দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তারা একটুও নড়লো না। তৃতীয় দিন তাঁরা তাদেরকে পুনরায় হকের প্রতি আহবান জানালেন। এবার তাদের খৃস্টান সরদার আসবাগ বিন আমর কালবীর ওপর হযরত আবদুর রহমানের (রা) দাওয়াতের বিশেষ প্রভাব পড়লো এবং তিনি ঘাড় থেকে খৃস্টানত্বের জিঞ্জির নামিয়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গে বনু কালাবের আরো অনেক মানুষও ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন। হযরত আবদুর রহমান (রা) বিশ্বনবীকে (সা) হযরত রাফে (রা) বিন কামিতের হাতে একটি পত্র প্রেরণ করলেন। এই পত্রে তিনি আসবাগের ইসলাম গ্রহণের খবর দিলেন এবং বনু কালাবের সাথে সম্পর্ক রাখার প্রশ্নে জানতে চাইলেন। হুজুর (সা) জবাবে লিখে পাঠালেন যে, তুমি আসবাগের কন্যাকে বিয়ে কর। হযরত আবদুর রহমান (রা) হুজুরের (সা) ইরশাদ তামিলের জন্য আসবাগের (রা) কন্যা তামাজুরকে (রা) বিয়ে করলেন এবং তাঁকে রুখসত করিয়ে সঙ্গে করে মদীনা নিয়ে এলেন। হযরত আবু সালমা বিন আবদুর রহমান (রা) (হাদীসের মশহুর রাবী) হযরত তামাজুরের (রা) গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কতিপয় চরিতকার এই ধারণা পোষণ করেছেন যে, হুজুর (সা) হযরত আবদুর রহমানকে (রা) আসবাগ কন্যাকে বিয়ের পরামর্শ এজন্য দিয়েছিলেন, যাতে বনু কালাবের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক মজবুত হয়। এর পূর্বে কুরাইশ ও বনু কালাবের মধ্যে পারস্পরিক বিয়ে শাদীর সম্পর্ক ছিল না।

এক রেওয়ায়াতে এটাও এসেছে যে, হযরত আবদুর রহমান (রা) মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন। এ সময় হুজুর (সা) তাঁকে দ্বিতীয় নসিহত ছাড়াও এই হেদায়াতও দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ তোমাকে বিজয় দিলে (অথবা বনু কালাব ইসলামের দাওয়াত কবুল করলে) তুমি তাদের সরদার বা হাকিমের কন্যাকে বিয়ে করবে। এই রেওয়ায়াত ইবনে সায়াদ (র) "তাবকাতে" এবং ইবনে আছির (র) "উসুদুল গাব্বাতে" উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রথম রেওয়ায়াত যা হাফেজ ইবনে হাজার (র) এবং মুহাদ্দিস দারে কুতনী (র) বর্ণনা করেছেন তাই কিয়াসের বেশি কাছাকাছি।

সারিয়্যায়ে দাওমাতাল জান্দালের পর হযরত আবদুর রহমান (রা) মক্কা বিজয় থেকে তাবুকের যুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত সকল যুদ্ধে রাসূলের (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

এক রেওয়ায়াতে আছে, মক্কা বিজয়ের পর হুজুর (সা) হযরত আবদুর রহমানকে হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের সঙ্গে বনু জাযিমাতে ইসলামের তাবলীগের জন্য প্রেরণ করেছিলেন।

তাবুকের যুদ্ধের সময় এমন এক ঘটনা সংঘটিত হলো যে, তাতে হযরত আবদুর রহমানের মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পেল।

সহীহ মুসলিমে হযরত মুগিরাহ (রা) বিন শু'বা থেকে বর্ণিত আছে যে, "আমি রাসূলের (সা) সাথে তাবুকের যুদ্ধ করেছিলাম। তিনি যখন পবিত্রতার জন্য তাশরীফ নিলেন। আমি ফজরের নামাযের পূর্বে (পানির) পাত্র নিয়ে তাঁর সঙ্গে এলাম। তিনি যখন ফিরে এলেন তখন আমি পাত্র থেকে পানি তাঁর হাতের ওপর ঢাললাম। তিনি তিনবার দু'হাত ধুলেন। অতপর মুখ ধুলেন। অতপর নিজের জুব্বা (আস্তিন) খুলতে লাগলেন। আস্তিন ছিল খুব আঁটো-সাঁটো। খুললো না। ফলে ভেতর থেকে হাত বের করলেন এবং দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করলেন। অতপর মোজার ওপর মসেহ করলেন। অতপর রওয়ানা দিলেন। আমিও রওয়ানা করলাম।

লোকজন আবদুর রহমান (রা) বিন আওফকে ইমাম বানালো এবং তিনি নামায শুরু করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এক রাকায়াত পেলেন। তিনি লোকদের সাথে (বাজামায়াত) দ্বিতীয় রাকায়াত পড়লেন। আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ যখন সালাম ফিরালেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের নামায পূর্ণ করার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন মুসলমানরা ঘাবড়ে গেল এবং বারবার সুবহান আল্লাহ বলা শুরু করলো। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন নামায শেষ করলেন তখন বললেন, খুব করেছ, ঠিক করেছ। উদ্দেশ্য ছিল যে, সময়মত নামায পড়বে।"

এই প্রসঙ্গে মুসলিমের অপর এক রেওয়ায়াতে এ টুকুন বেশি আছে ঃ

"মুগিরাহ (রা) বলেন, আমি আবদুর রহমানকে হটিয়ে দিতে চাইলাম, কিন্তু নবী করীম (সা) বললেন, তাঁকে থাকতে দাও।"

মুসনাদে আহমদেও এ ধরনের একটি রেওয়ায়াত আছে। সেই রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ একদিন ফজরের নামায পড়ালেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের সাথে নামায পড়লেন। এই রেওয়ায়াতে এটা ব্যাখ্যা করা হয়নি যে এটা কোন সময়ের ঘটনা।

কয়েকজন চরিতকার এই ঘটনাকে হযরত আবদুর রহমানের (রা) মহান ফযীলত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নবম হিজরীর জিলকদ মাসের শেষে অথবা জিলহজ্জ মাসের শুরুতে বিশ্বনবী (সা) তিনশ' মুসলমানের এক কাফেলা মদীনা থেকে মক্কা মুয়াজ্জামা রওয়ানা করলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) এই কাফেলার আমীর এবং হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু তার নকীব ছিলেন। কুরবানীর জন্য ২০টি উট ছিল কাফেলার সঙ্গে। এই কাফেলায় হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ শামিল ছিলেন। রাসূলের (সা) যামানায় এটা মুসলমানদের প্রথম হজ্জ ছিল। কুরআনে করিমে এই হজ্জকে হজ্জে আকবার হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাতে হযরত আবু বকর (রা) লোকদেরকে হজ্জের সঠিক পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং কুরবানীর দিন দাঁড়িয়ে ইসলামের খুতবা পাঠ করেছিলেন। হযরত আলী (রা) সূরায়ে তাওবার ৪০টি আয়াত শুনিয়েছিলেন। যাতে কাফেরদের সাথে সব ধরনের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার ঘোষণা ছিল। সে সময় ঘোষণা দেয়া হয় যে, এখন থেকে কোন মুশরিককে কাবা শরীফে প্রবেশের এযাজত দেয়া হবে না এবং কেউ উলঙ্গ হয়ে হজ্জ করতে পারবে না।

দশম হিজরীতে রহমতে আলম (সা) বিদায় হজ্জের জন্য মক্কা মুয়াজ্জামা তাশরীফ নেন। তখন হযরত আবদুর রহমানও (রা) তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন।

বিদায়হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পর (একাদশ হিজরীর সফর মাসে) বিশ্বনবী (সা) রোগাক্রান্ত হলেন। তিবরানী (র) হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুজুরের (সা) ওফাতের কিছুদিন পূর্বে সাহাবীরা (রা) আরজ করলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে ওসিয়ত করুন। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে মুহাজিরদের ব্যাপারে (সুন্দর আচরণের) ওসিয়ত করছি। তোমরা যদি তা না করো তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কোন নফল এবং ফরয কবুল করবেন না।

একাদশ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মহানবীর (সা) ওফাতের পর ছাকিফায়ে বনু সায়িদায় খিলাফতের বিবাদ উত্থাপিত হলো। কতিপয় রেওয়ায়াত অনুযায়ী এ সময় হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফও হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) ও হযরত ওমরের (রা) সঙ্গে সেখানে তাশরীফ নিয়েছিলেন এবং সেই সমস্যা সমাধানে অত্যন্ত তৎপরতার সাথে অংশ নিয়েছিলেন। কথিত আছে যে, এ সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিককে (রা) বাইয়াতকারীদের মধ্যে তাঁর ক্রমিক নম্বর ছিল তিন। অথবা কমপক্ষে তিনি প্রথম বাইয়াতকারীদের মধ্যে ছিলেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) খিলাফতের আসনে সমাসীন হওয়ার পর সর্বপ্রথম সেই অভিযান পূর্ণ করার দিকে মনোযোগ দিলেন যে অভিযানে হুজুর (সা) নিজের ওফাতের পূর্বে হযরত উসামাকে (রা) নিয়োগ করেছিলেন। ইবনে জারির তাবারী বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) হযরত উসামাকে (রা) বিদায় করার জন্য তাঁবুতে তাশরীফ নিলেন। এ সময় হযরত আবদুর রহমানও (রা) সওয়ারীর সাথে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। আর হযরত আবদুর রহমান (রা) তাঁর সওয়ারীর রশি ধরে রেখেছিলেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) হযরত আবদুর রহমানকে (রা) খুব শ্রদ্ধা করতেন ও মর্যাদা প্রদান করতেন এবং তিনি অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁর নিকট থেকে পরামর্শ নিতেন। এগারো হিরজীতে সিদ্দিকে আকবার (রা) হযরত আবদুর রহমানকে (রা) আমীরুল হজ্জ বানিয়ে মক্কা মুয়াজ্জামায় প্রেরণ করেন। বারো হিজরীতে আমীরুল হজ্জ কে ছিলেন ? এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। একমত অনুযায়ী সে বছরও হযরত আবদুর রহমান (রা) আমীরে হজ্জ ছিলেন। তাবারী (র) বর্ণনা করেছেন, তের হিজরীতে ওফাতের পূর্বে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) হযরত ওমর ফারুককে (রা) নিজের স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করতে চাইলেন। এ সময় সর্বপ্রথম এই ব্যাপারে হযরত আবদুর রহমানের (রা) সঙ্গে পরামর্শ করেন। তিনি লৌকিকতা ছাড়াই আরজ করলেন, ওমর (রা) নিসন্দেহে এই পদের যোগ্য। কিন্তু তিনি খুব কঠোর প্রকৃতির মানুষ। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) বললেন, "আমি নরম ছিলাম বলেই সে কঠোর ছিল। যখন তার ওপর খিলাফতের দায়িত্ব পড়বে তখন খোদ বখোদ নরম হয়ে যাবেন।"

হযরত ওমর ফারুকও (রা) হযরত আবদুর রহমানকে খুব মান্য করতেন। তিনি যখন খিলাফতের আসনে সমাসীন হলেন তখন নিজের খিলাফতকালে আগমনকারী প্রথম হজ্জে স্বয়ং যেতে পারেননি এবং হযরত আবদুর রহমানকে (রা) আমীরে হজ্জ বানিয়ে প্রেরণ (১৩ হিজরী) করেন। তারপর তিনি হযরত আবদুর রহমানকে (রা) মজলিশে শুরার স্থায়ী সদস্য বানান। ফারুকী শাসনামলের বিভিন্ন ঘটনা থেকে জানা যায় যে, হযরত আবদুর রহমান (রা) অত্যন্ত একনিষ্ঠ এবং সুষ্ঠু মতের উপদেষ্টা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিলেন।

১৪ হিজরীতে যখন ইরাকের ওপর বাকায়দা সেনা অভিযানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তখন হযরত ওমর ফারুক (রা) সকল আরব মুজাহিদকে তলব করেন। সুতরাং জিহাদের উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত মুজাহিদদের এক বিরাট বাহিনী মদীনা মুনাওয়ারাতে একত্রি হয়ে গেল। সে সময় হযরত ওমর ফরুক (রা) নেতৃস্থানীয় সাহাবাদেরকে (রা) বললেন ঃ

"আমার ইচ্ছা, এই বাহিনীর সাথে আমি স্বয়ং যাবো। আমার অনুপস্থিতিতে আলী (রা) খিলাফতের কাজ করবেন। তালহা (রা), যোবায়ের (রা) এবং আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ আমার সঙ্গে থাকবেন। তালহা (রা) অগ্রবর্তী বাহিনীর অফিসার হবেন এবং ডান ও বাঁয়ের নেতৃত্ব যোবায়ের (রা) এবং আবদুর রহমান (রা) করবেন।"

সাধারণ মুজাহিদরা যখন আমীরুল মু'মিনীনের (রা) ইচ্ছার কথা জানতে পেলো তখন তারা খুব খুশী হলো। কিন্তু হযরত আবদুর রহমান (রা) এ ব্যাপারে মতদ্বৈততা প্রকাশ করলেন এবং বললেন ঃ

"হে আমীরুল মু'মিনীন। আপনি এখানেই অবস্থান করুন এবং সৈন্যদেরকে পাঠিয়ে দিন। খোদা নাখাস্তা যদি আপনি যুদ্ধের ময়দানে শেষ হয়ে যান অথবা আপনার উপস্থিতিতে সৈন্যরা পরাজিত হয় তাহলে মুসলমানদের প্রচণ্ড ধাক্কা লাগবে এবং ইসলাম শেষ হয়ে যাবে। আপনার অনুপস্থিতিতে যদি কোন অসম্ভব ঘটনা ঘটে তাহলে আপনি এখান থেকে তার প্রতিকার করতে পারবেন।"

অন্য নেতৃস্থানীয় সাহাবী ও (রা) হযরত আবদুর রহমানের কথার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করলেন। তখন প্রশ্ন উঠলো যে, এই গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অভিযানের নেতৃত্ব কার ওপর ন্যস্ত করা যাবে। সকলেই এই ব্যাপারে চিন্তা করছিলেন। এমন সময় হযরত আবদুর রহমান (রা) পুনরায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি পেয়েছি, আমি পেয়েছি।" হযরত ওমর ফারুক (রা) বললেন, কে ? তিনি বললেন, সায়াদ (রা) বিন মালিক (আবি ওয়াক্কাস)। আমীরুল মু'মিনীন এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় সাহাবী তাঁর নির্বাচনের সাথে একমত প্রকাশ করলেন এবং হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস এই বিরাট অভিযানের নেতৃত্বে নিয়োজিত হলেন। পরবর্তী ঘটনাসমূহ প্রমাণ করেছে যে, হযরত আবদুর রহমানের (রা) রায় কত সঠিক ও সুস্থ ছিল। ওয়াকেদী (র) এবং তাবারী (র) বর্ণনা করেছেন যে, ইয়ারমুকের যুদ্ধের সময় যখন রোমকদের প্রচন্ড যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর মদীনা পৌঁছলো তখন হযরত আবদুর রহমান (রা) এত আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন যে, তিনি মজলিশে শুরাতে হযরত ওমরকে (রা) সম্বোধন করে বললেন, "আমীরুল মু'মিনীন! আপনি স্বয়ং সেনাপতি হোন এবং আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন। আল্লাহ নাকরুন যদি আমাদের ভাইদের কোন ক্ষতি হয় তাহলে বেঁচে থেকে লাভ কি।" কিন্তু অন্য নেতৃস্থানীয় সাহাবীরা (রা) তাঁর সঙ্গে একমত হলেন না এবং সাহায্যকারী সৈন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত হলো ।

নাহাওয়ান্দের মশহুর যুদ্ধে প্রথম যখন হযরত ওমর ফারুক (রা) আহলুর রায় সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন তখন তাবারীর (র) বক্তব্য অনুযায়ী হযরত আবদুর রহমান রায় দিয়েছিলেন যে, আমীরুল মু'মিনীনকে যুদ্ধের স্থানে গমন সমীচিন হবে না।

নাহাওয়ান্দের যুদ্ধ ইরাকে আজমের সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ বলে বলা হয়ে থাকে। এজন্য আরবরা তাকে "ফাতুহুল ফুতুহ" নাম দিয়েছে। এই যুদ্ধে বেশুমার গনিমতের মাল মুসলমানদের হস্তগত হয়। গনিমতের মালের হাজার হাজার গাঁট যখন মদীনা মুনাওয়ারাতে আনা হলো তখন হযরত ওমর (রা) তা মসজিদে নববীতে রাখার নির্দেশ দিলেন এবং সেখানে বিশেষ বিশেষ সাহাবীর পাহারা মোতায়েন করলেন। তাবারী বর্ণনা করেছেন যে, তাতে হযরত আবদুর রহমানও (রা) শামিল ছিলেন।

কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত আবদুর রহমান (রা) জিহাদে অংশগ্রহণের নিয়তে এক-দু'বার সিরিয়া তাশরীফ নিয়েছিলেন। তাবারী লিখেছেন যে, বাইতুল মুকাদ্দাস জয়ের পর হযরত ওমর ফারুক (রা) এবং খৃষ্টানদের মধ্যে জাবিয়া নামক স্থানে যে চুক্তি লিপিবদ্ধ হয়েছিল তাতে স্বাক্ষী হিসেবে হযরত আবদুর রহমানও (রা) দস্তখত করেছিলেন। আমওয়াসের প্লেগের সময়ও (আঠারো হিজরী) হযরত আবদুর রহমান (রা) সিরিয়ায় ছিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) যখন সফর করতে করতে সুরগ নামকস্থানে পৌছলেন তখন তিনি খবর পেলেন যে, সিরিয়াতে প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। হযরত ওমর (রা) সেখান থেকে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হযরত আবু ওবায়দা (রা) তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করলেন। এ সময় এই সমস্যার হযরত আবদুর রহমান (রা) সমাধান দিলেন। এই প্রসঙ্গে সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) বর্ণিত আছে ঃ

"আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ এলেন। তিনি কিছু প্রয়োজনে কোথাও গিয়েছিলেন। বললেন, আমার নিকট এই (সমস্যার) ব্যাপারে এলেম আছে। আমি রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছি। তিনি বলতেন, যখন তোমরা কোন স্থানে এই প্লেগের কথা শোনো তখন সেখানে যাবে না এবং তোমরা যদি কোন স্থানে থাকো এবং সেখানে সেই মহামারীর বিস্তার লাভ ঘটে তাহলে সেখান থেকে পালিও না।"

এই পবিত্র হাদীস শুনে হযরত ওমর ফারুক (রা) বললেন ঃ "আল্লাহর শোকর! ফিরে চলো।" সুতরাং লোকদেরকে নিয়ে সেখান থেকে ফিরে গেলেন। সালেম বিন আবদুল্লাহ (রা) বলেন যে, হযরত ওমরের (রা) প্রত্যাবর্তনের কারণ ছিল শুধুমাত্র হযরত আবদুর রহমানের (রা) বর্ণিত হাদীস।

২৩ হিজরীর ২৬শে জিলহজ্জ হযরত ওমর ফারুকের (রা) ওপর হত্যামূলক হামলার ঘটনা সংঘঠিত হলো। আমীরুল মু'মিনীন (রা) ফজরের নামায পড়ানোর জন্য দাঁড়ালেন। এ সময় একজন পারসী গোলাম আবু লুলু ফিরোজ তাঁর ওপর খঞ্জর দিয়ে হামলা করে গুরুতরভাবে আহত করলো। সহীহ বুখারীতে হযরত আমর (রা) বিন মাইমুন থেকে বর্ণিত আছে ঃ

"হযরত ওমর (রা) (আহত হওয়ার পর) আবদুর রহমান (রা) বিন আওফের হাত ধরলেন এবং তাঁকে (ইমামতের জন্য) সামনে অগ্রসর করিয়ে দিলেন। যাঁরা নিকটে ছিলেন তাঁরা সবকিছু দেখছিলেন। আমিও দেখছিলাম। দূরের অবশিষ্টদের কোন খবর ছিল না (যে কি হচ্ছে)। শুধু এতুটুকুন যে হযরত ওমরের (রা) ক্ষীণ আওয়াজে লোকেরা চিৎকার করছিলেন। সুবহান আল্লাহ, সুবহান আল্লাহ। আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ তাদেরকে সংক্ষিপ্ত নামায পড়ালেন।"

নামায থেকে ফারেগ হওয়ার পর হযরত আবদুর রহমান (রা) অন্যদের সঙ্গে আহত আমীরুল মু'মিনীনকে উঠিয়ে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন।

হযরত ওমর ফারুকের (রা) যখন জীবিত থাকার আর কোন আশা রইলো না তখন লোকেরা খিলাফতের পদে কাউকে মনোনয়ন দানের জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। তাঁদের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে ফারুকে আজম (রা) এই ৬ বুজর্গের নাম পেশ করলেন ঃ

হযরত আলী (রা), হযরত ওসমান (রা), হযরত তালহা (রা), হযরত যোবায়ের (রা), হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস এবং হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ বললেন, এই ৬ ব্যক্তির মধ্য থেকে যার পক্ষে বেশী রায় পাওয়া যাবে তাকেই খলিফা নির্বাচন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) শেষ সময় পর্যন্ত তাদের সকলের ব্যাপারে খুশী ছিলেন।

আহত হওয়ার তিনদিন পর হযরত ওমর ফারুক (রা) পরপারের ডাকে সাড়া দিলেন এবং ২৪ হিজরীর ১লা মুহাররম তাঁর দাফন পর্ব সমাপ্ত হয়। যেসব বুজুর্গ এই মহান ব্যক্তিকে কবরে নামিয়েছিলেন তাদের মধ্যে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু, হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়াম, হযরত ওসমান জুন্নারাইন (রা) এবং হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস ছাড়া হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফও ছিলেন। হযরত ওমর ফারুকের (রা) ওফাতের পূর্বে এই ওসিয়তও করেছিলেন যে, খিলাফতের সমস্যা তিন দিনের মধ্যে সমাধান হওয়া উচিত। সুতরাং তাঁর দাফনের পর এই সমস্যা

নিয়ে অত্যন্ত তৎপরতার সাথে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। প্রথম দুই দিন পর্যন্ত কোন ফায়সালা হয়নি। তৃতীয় দিন হযরত আবদুর রহমান (রা) অন্যান্য (মনোনীত) বুজুর্গকে বললেন, আপনারা খিলাফতের ব্যাপারটি তিনজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখুন। তাতে হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস হযরত আবদুর রহমানের (রা) পক্ষে নাম প্রত্যাহার করে নিলেন। হযরত যোবায়ের (রা) হযরত আলীর (রা) পক্ষে এবং হযরত আবদুর রহমান (রা) হযরত ওসমানের (রা) পক্ষে মত দিলেন। অতপর আবদুর রহমান (রা) নিজের হক পরিত্যাগের কথা ঘোষণা করলেন এবং হযরত ওসমান (রা) ও হযরত আলীকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কি এই নির্বাচনের কাজটি আমার ওপর ন্যস্ত করবেন ? আল্লাহ স্বাক্ষী, আমি আপনাদের মধ্য থেকে আফজাল ব্যক্তিকে নির্বাচন করতে দ্বিধা করবো না।

উভয় বুজর্গ তাঁর কথা সমর্থন করলেন। তারপর হযরত আবদুর রহমান (রা) উভয় বুজুর্গকে পৃথক পৃথক ডেকে নিয়ে তাঁদের ফজিলত, গুণাবলী ও মর্যাদার কথা বর্ণনা করলেন এবং প্রত্যেকের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, তাঁকে যদি খিলাফতের পদ দেয়া হয় তাহলে তিনি আদল বা ইনসাফ করবেন এবং যদি তাঁর পরিবর্তে অন্যকে প্রদান করা হয় তাহলে তাঁর আনুগত্য করবেন। এই প্রতিশ্রুতির পর হযরত আবদুর রহমান (রা) (এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী সাধারণ সমাবেশে এক হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দিলেন এবং পুনরায়) হযরত ওসমানকে (রা) বললেন, "হে ওসমান হাত ওঠান।" তিনি হাত বাড়ালেন। এ সময় হযরত আবদুর রহমান (রা) সামনে অগ্রসর হয়ে তার বাইয়াত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকল মানুষ বাইয়াতের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

এই প্রসঙ্গে হাদীসের কিতাবসমূহে ও চরিতগ্রন্থে আরো কয়েকটি বর্ণনা আছে। তার মধ্যে একটি মশহুর বর্ণনা হলো, হযরত ওসমান (রা) নির্ভাবনায় শায়খাইনের আনুগত্যের ওয়াদা করেছিলেন। এজন্য হযরত আবদুর রহমান (রা) তাঁকে হযরত আলীর (রা) ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। অনেকে এই বক্তব্যকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। যাহোক, হযরত আবদুর রহমান (রা) ব্যাপারটি খুব সুন্দরভাবে সমাধান করেছিলেন এবং একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছিলেন। সহীহ বুখারীর একটি রেওয়ায়াতে জানা যায় যে, খিলাফত সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত হযরত আবদুর রহমানই (রা) মুসলমানদের ইমামত করেছিলেন। আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওসমান (রা) জুন্নুরাইনও হযরত আবদুর রহমানের (রা) মান-মর্যাদা বহাল রেখেছিলেন এবং বিভিন্ন ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ নিতেন।

সহীহ বুখারীতে আছে, চব্বিশ হিজরীতে গরমে হযরত ওসমানের (রা) নাক দিয়ে রক্ত পড়ার কারণে হজ্জে যেতে পারেননি। এ সময় তিনি হযরত আবদুর রহমানকে (রা) আমীরে হজ্জ নিয়োগ করেন। ২৯ হিজরীতে হযরত ওসমান (রা) হজ্জে গমন করেন। তখন তিনি হযরত আবদুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে যান।

হযরত ওসমানের (রা) খিলাফতের প্রথম ৬ বছর অত্যন্ত নিরাপদ ও শান্তির সাথে অতিবাহিত হলো কিন্তু তারপর থেকে ফেতনা শুরু হয়ে গেল। এটা হযরত আবদুর রহমানের (রা) জীবনের শেষ অধ্যায় ছিল। তিনি চুপচাপ নির্জনত্বে কাটাতেন। শেষে সেই মুহূর্ত এসে পৌছলো। যে মুহূর্ত প্রতিটি জীবের ওপর একদিন না একদিন এসেই পৌছে। একত্রিশ অথবা বত্রিশ হিজরীতে মহানবীর (সা) সেই বুজুর্গ সাহাবী পরপারের ডাকে সাড়া দিলেন। ইবনে সায়াদের (র) বক্তব্য অনুযায়ী যে সময় তাঁর বয়স ছিল ৭৫ বছর। কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার (র) "আল-ইসাবা" গ্রন্থে তাঁর বয়স সে সময় ৭২ বছর ছিল বলে বর্ণনা করেছেন। ইবনে সায়াদ (র) এবং হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) লিখেছেন যে, আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রা) জানাযার নামায পড়িয়েছিলেন এবং জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়েছিল।

সাইয়েদেনা হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু জানাযার পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন ঃ

"আবদুর রহমান (রা) যাও, তুমি ভালো যামানা পেয়েছিলে এবং ফিতনা থেকে বেঁচে রওয়ানা দিয়েছ।"

সাইয়েদেনা হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস জানাযায় শরীক ছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন "ওয়া আজবালাহ" "ওয়া আজবালাহ" (হায় আফসোস ! এই পাহাড় অর্থাৎ বিরাট ব্যক্তি দুনিয়া থেকে রওয়ানা দিয়েছে) সহীহ বুখারীর (কিতাবুল জানায়েজ) এক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, কতিপয় মুসলমান তাঁর কবরের ওপর তাঁবু টাঙিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) তা দেখে বললেন, এই তাঁবু উঠিয়ে নাও। তাঁর ওপর (আবদুর রহমানের) তাঁর আমল ছায়া দেবে।"

হযরত আবদুর রহমান (রা) বিভিন্ন সময় বেশ কিছু সংখ্যক বিয়ে করেছিলেন (তবে এক সময়ে চার থেকে বেশি স্ত্রী কখনো ছিল না।) স্ত্রীদের নাম হলো ঃ

উম্মে কুলছুম বিনতে উতবা বিন রাবিয়া, নাম অজানা বিনতে শাইবা বিন রবিয়া, উম্মে কুলছুম (রা) বিনতে উকবা বিন আবি মুঈত, সাহলা (রা) বিনতে

আছেম ফুজাইয়া, বাহরিয়া বিনতে হানি শাইবানিয়া, উম্মে হাবিবা (রা) বিনতে জাহাশ [উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব (রা) বিনতে জাহাশের বোন ছিলেন। এই দিক থেকে হযরত আবদুর রহমান (রা) হুজুরের (সা) ভায়রা ভাই ছিলেন] সাহলা (রা) বিনতে সোহায়েল (রা), উম্মে হাকিম বিনতে কারেজ, বিনতে আবুল হোসাইন বিন রাফে' আওসিয়া, তামাজুর (রা) বিনতে আসবাগ, আসমা বিনতে সালামা, উম্মে হারিছ মাজদ বিনতে ইয়াযিদ হুমাইরিয়া, গাযাল বিনতে কিসরা, যয়নব বিনতে সাবাহ, বাদিয়া বিনতে গায়লান ছাকাফিয়া। পুত্রোদের নাম হলো ঃ

সালেম আকবার (ইসলামের আগে মারা গিয়েছিল), মুহাম্মাদ ইবরাহিম, হামিদ, ইসমাঈল, মায়ান, ওমর, যায়েদ, উরওয়া আকবার, সালেম আসগার, আবু বকর, আবদুল্লাহ, আবু সালমা আবদুল্লাহ আসগার, আবদুর রহমান, মাসয়াব, সোহায়েল, আবুল আবিয়াজ, ওসমান, উরওয়া আসগার, ইয়াহিয়া এবং বেলাল।

কন্যাদের নাম হলো ঃ উম্মুল কাসেম, হামিদা, আমাতার রাহমান, আমাতার রাহমান সোগরা, আমিনা, মারইয়াম, উম্মে ইয়াহিয়া ও জুয়াইরিয়া।

হযরত আবদুর রহমান (রা) অন্যতম ধনী সাহাবী ছিলেন। নজিরবিহীন দানশীলতা ও আল্লাহর পথে ব্যয় ছাড়াও মৃত্যুকালে তিনি স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি ছাড়া এক হাজার উট, তিন হাজার বকরী এবং একশ ঘোড়া রেখে যান। এসব পশু বাকীতে চরে বেড়াতো। ইবনে সায়াদ এবং ইবনে কাছির বর্ণনা করেছেন, তাঁর চার স্ত্রী রেখে যাওয়া সম্পদের অষ্টমাংশ থেকে আশি হাজার দিনার করে পেয়েছিলেন। ওফাতের পূর্বে ৫০ হাজার দিনার এবং এক হাজার ঘোড়া আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করেন। তাছাড়া বদরের সাহাবীদের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য চারশ' দিনার করে দেয়ার ওসিয়ত করেন। ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন, সে সময় একশ' বদরী সাহাবী জীবিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই আনন্দের সাথে সেই ওসিয়ত থেকে উপকৃত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে স্বয়ং আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওসমানও (রা) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উম্মুহাতুল মু'মিনিনের (রা) জন্য একটি বাগান ওসিয়ত করেছিলেন। এই বাগান চার লাখ দিরহামে বিক্রী হয়।

হাফেজ ইবনে হাজার (র) এবং অন্য কতিপয় চরিতকার হযরত আবদুর রহমানের হুলিয়া এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

দেহ লম্বা ও উঁচু, রং উজ্জ্বল, নাক উঁচু ও লম্বা, প্রশস্ত চোখ, পলক ঘন ও বড়, লম্বা দাড়ি, মাথার ওপর থেকে কানের নীচে পর্যন্ত বাবরী চুল, অত্যন্ত

সুদর্শন, বাহুতে গোশত, মজবুত হাতের কব্জী, মোটা আঙ্গুল , ওহোদের যুদ্ধে আঘাত পাওয়ার কারণে পা ছিল খোঁড়া।

ইবনে আছির (র) "উসুদুল গাব্বাহতে" হযরত কাবিসা বিন জাবের (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি ওমর ফারুকের (রা) নিকট গিয়েছিলাম। তাঁর ডানদিকে অন্য আর একজন বসেছিলেন। তাঁর রং ছিল আলোর মত সাদা। তিনি ছিলেন আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ।

সাইয়েদেনা হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ-এর চরিত্র ছিল বিভিন্ন গুণাবলীর সংমিশ্রণে সমৃদ্ধ। চরিতকাররা তাঁর ইলম ও ফজল, দ্বীনের প্রতি আন্তরিকতা, কঠিন সময়ে ধৈর্য ধারণ, রাসূল প্রেম, জিহাদের প্রতি উৎসাহ, আল্লাহর পথে ব্যয়, ত্যাগ, সত্যবাদিতা ও পরিচ্ছন্নতা, খোদাভীতি, প্রতিশ্রুতি পূরণ, নরম অন্তর, সঠিক রায়, ইবাদাতের প্রতি গভীর আকর্ষণ, তাকওয়া, বিনয়, আমানত, আমর বিল মারুফ বা ভালো কাজের নির্দেশ রোগীর সেবা, সাহসিকতা এবং বীরত্বের কথা ব্যাপক আকারে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ইলম ও ফজলের আন্দাজ ওয়াকেদীর এই বর্ণনা থেকে করা যায়। তাতে বলা হয়েছে যে, তিনি সেই বুজর্গদের অন্যতম ছিলেন যাঁরা রাসূলের (সা) যুগে ফতওয়া দিতেন। তাঁর নিকট থেকে অনেক সাহাবী ও তাবেয়ীন অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারীদের মধ্যে হযরত ওমর ফারুকও (রা) শামিল ছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার (র) "ইসাবা"তে লিখেছেন, হযরত ওমর ফারুক (রা) একবার তাঁর নিকট থেকে রেওয়ায়াত করেন। তখন তিনি তাঁর সম্পর্কে "আল-আদলুর রজী" শব্দ ব্যবহার করেন। হযরত আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত হাদিসের মধ্যে জিযিয়ায়ে মাজুস (অর্থাৎ অগ্নি উপাসকদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায়) হাদ্দে খামার (মদ্যপের দণ্ড ৮০ দুররা), মাকামে তাউন (অর্থাৎ প্লেগ আক্রান্ত স্থান থেকে পলায়ন না করার এবং সেখানে না যাওয়া) এর মত হাদীসসমূহ ফিকাহর কিতাবসমূহে গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা পেয়েছে। তাঁর জ্ঞানার্জনের স্পৃহা ছিল সীমাহীন। বয়স্ক ও মর্যাদাবান হওয়া সত্ত্বেও হযরত ওমর ফারুকের (রা) শাসনামলে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের (রা) মত অল্প বয়স্ক সাহাবীর নিকট থেকেও তিনি জ্ঞান অর্জন করেন। হযরত আবদুর রহমান (রা) একটি সচ্ছল পরিবারের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন এবং গৃহে সকল ধরনের আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু তিনি সকল পরিণাম উপেক্ষা করে সেই সময় ইসলাম গ্রহণ করেন যে সময় এ ধরনের করাটা মুসিবত ও দুঃখ-দুর্দশাকে আহ্বান করার নামান্তর ছিল। তিনি তিনবার হিজরতের সৌভাগ্য লাভ করেন এবং হক পথে সব ধরনের মুসিবত বরদাশত করেছিলেন।

হযরত আবদুর রহমান (রা) বিশ্বনবীকে (সা) গভীরভাবে ভালোবাসতেন। যুদ্ধসমূহে তিনি রাসূলের (সা) ওপর নিজের জীবনকে কুরবান করার জন্য সবসময় তাঁর সফরসঙ্গী হতেন। তেমনি যখনই সুযোগ পেতেন তখনই নবীজীর (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে ফয়েজ লাভ করতেন। মুসনাদে আহমাদ, কানযুল উম্মাল, তিরমিযী এবং মুসতাদরাকে হাকিম প্রভৃতিতে স্বয়ং হযরত আবদুর রহমান (রা) থেকে বির্ণত আছে যে, আমরা রাসূলের (সা) সাহাবীদের মধ্য হতে চার অথবা পাঁচ ব্যক্তি তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতাম না। যাতে তাঁর কোন প্রয়োজন হলে তা পূরণ করতে পারি। একদিন আমি তাঁর খিদমতে হাজির হলাম। তিনি বাড়ী থেকে বের হলেন। আমি তাঁর পিছু চললাম। তিনি উঁচুস্থানে অবস্থিত একটি বাগানে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি সিজদায় অবনত হলেন এবং এত দীর্ঘ সময় সিজদায় রলেন যে, আমি ভীত হয়ে পড়লাম। মনে করলাম সম্ভবত আল্লাহ তায়ালা তাঁর রুহ কবজ করে নিয়েছেন। একথা ধারণা হতেই আমি কাঁদতে লাগলাম। হুজুর (সা) নিজের পবিত্র মাথা উঠালেন এবং বললেন, আবদুর রহমান (রা) তোমার কি হয়েছে ? আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি দীর্ঘক্ষণ সিজদায় রয়েছেন। এতে আমি মনে করলাম যে, আপনি চিরকালের জন্য আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। এজন্য আমি কাঁদছিলাম। হুজুর (সা) বললেন ঃ জিবরাইল (আ) আমাকে বললেন, আমি কি আপনাকে সুসংবাদ দেব না যে, আল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি আপনার ওপর দরুদ প্রেরণ করবে, আমি তার ওপর দরুদ প্রেরণ করবো এবং যে আপনার ওপর সালাম প্রেরণ করবে, আমি তার ওপর সালামত নাযিল করবো। আমার এই লম্বা সিজদা সিজদায়ে শুকর বা কৃতজ্ঞতার সিজদা ছিল।

তিনি অত্যন্ত নরম অন্তরের মানুষ ছিলেন। কখনো লৌকিকতা পূর্ণ খাবার সামনে এলে অশ্রু সজল নেত্রে বলতেন, "রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর পরিবার পরিজনের সারা জীবন যবের রুটিও মেলেনি।" সহীহ বুখারীতে আছে, একবার রোযা ছিলেন। সন্ধ্যায় খাবার সামনে এলে মুসলমানদের অতীত বুভুক্ষার কথা স্মরণ করে বললেন, মুসয়াব (রা) বিন উমায়ের নিহত হলেন। তিনি আমার থেকে উত্তম ছিলেন। তাঁকে এক চাদরের কাফন দেয়া হলো। তা দিয়ে মাথা ঢাকলে পা বেরিয়ে যেতো। আর পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যেত। হামযা (রা) নিহত হলেন। তিনিও আমার থেকে উত্তম ছিলেন। অতপর আমাদের জন্য দুনিয়া এত প্রশস্ত করে দেয়া হলো যে, আমরা ভীত হয়ে পড়লাম। আমরা ধারণা করলাম যে, আমাদের নেক আমলের প্রতিদান আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়াতেই দিয়ে না দেয়া হয়। অতপর ক্রন্দন শুরু করে দিলাম এবং খাওয়া ছেড়ে দিলাম।

নিজের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে এত সজাগ ছিলেন যে, বদরের যুদ্ধের সময় উমাইয়া বিন খালফের মত অকর্মাকে বাঁচাতে গিয়ে আহত হলেন।

হযরত আবদুর রহমানের (রা) সত্যবাদিতা ও ক্ষমা প্রিয়তার কথা সকলে স্বীকার করতেন। মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বলে আছে যে, একবার হযরত যোবায়ের (রা) হযরত ওসমানের (রা) আদালতে দাবী করলেন যে, আমি ওমরের (রা) পরিবারের নিকট থেকে এক টুকরো জমি ক্রয় করেছি। এই জমি ওমর (রা) ইবনুল খাত্তাবকে রাসূলুল্লাহ (সা) জাগীর হিসেবে দান করেছিলেন। কিন্তু আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ বলেন, এই জমির টুকরোয় তাঁর জমিও এসে গেছে। যা তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা) ওমরের (রা) জাগীরের সাথে দান করেছিলেন। হযরত ওসমান (রা) জবাব দিলেন, আবদুর রহমান (রা) নিজের পক্ষে অথবা বিপক্ষে যে সাক্ষ্যই দেবেন তা গ্রহণ করা হবে।

হযরত আবদুর রহমানের (রা) আমানত ও তাকওয়ার ওপর আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুকের (রা) এত আস্থা ছিল যে, উম্মুহাতুল মু'মিনীন (রা) যখন হজ্জের জন্য গেলেন তখন তিনি হযরত আবদুর রহমানকে (রা) তাঁদের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করলেন।

যোবায়ের বিন বকার (র)-এর উক্তি হলো, আবদুর রহমান (রা) রাসূলের (সা) স্ত্রীদের আমানতদার ছিলেন।

হাফেজ ইবনে হাজার (র) "ইসাবাতে" লিখেছেন, হযরত আবদুর রহমান (রা) হজ্জের সফরে আজওয়াজে মুতাহহিরাতের (রা) জন্য পর্দা ও সওয়ারীর ব্যবস্থা করতেন এবং যেখানে তাঁবু ফেলা হতো সেখানে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নামতেন।

ইবনে আছির (র) "উসুদুল গাব্বাহ"-তে এবং ইমাম সুয়ুতি (র) "জামেয়ুস সগীরে" উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা) থেকে এই রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের স্ত্রীদেরকে বলতেন, যে ব্যক্তি আমার পর তোমাদের খিদমত করবে সে হবে সত্যবাদী ও দানশীল। হে আল্লাহ ! আবদুর রহমান (রা) বিন আওফকে সালসাবিল (জান্নাতের একটি পুকুর) থেকে সতেজতা দান কর।

স্বয়ং রাসূলে আকরাম (সা) যেন ইঙ্গিত করেছিলেন যে, আমার ইন্তেকালের পর আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ আজওয়াজে মুতাহহিরাতের খিদমত করবেন এবং তিনি সত্যবাদী।

নিজের গুণাবলীর বদৌলতে হযরত আবদুর রহমান (রা) নবীর (সা) নৈকট্যলাভের মর্যাদা হাসিল করেছিলেন। কয়েকটি রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, আপনি বিভিন্ন সময়ে পবিত্র বাসস্থান থেকে বাইরে যাওয়ার সময় হযরত আবদুর রহমানকে (রা) নিজের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। সহীহ বুখারীতে আছে যে, একবার হুযুর (সা) হযরত সায়াদ (রা) বিন উবায়দাকে শুশ্রূষার জন্য তাশরীফ নেন। এ সময় হযরত আবদুর রহমানও (রা) তাঁর সঙ্গে ছিলেন। অন্য আরেক রাওয়ায়াতে আছে, হুযুরের (সা) পুত্র হযরত ইবরাহীম (রা) যখন রোগাক্রান্ত হলেন তখন তিনি হযরত আবদুর রহমানকে (রা) সাথে নিয়ে আওয়ালীয়ে মদীনায় হযরত আবু ইউসুফের গৃহে তাশরীফ নিলেন। তাঁর স্ত্রী হযরত ইবরাহীমের (রা) দাই ছিলেন। হুজুরে আকরাম (সা) হযরত ইবরাহীমকে (রা) উঠিয়ে চুমু দিলেন। যখন তাঁর শেষ নিঃশ্বাস বের হচ্ছিল তখন হুজুরের (সা) অশ্রু সজল হয়ে গেলেন। হযরত আবদুর রহমান (রা) আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কাঁদছেন ?"

ইরশাদ হলো, "হে ইবনে আওফ, এটা রহমাত।"

হযরত আবদুর রহমান (রা) নিজের কথায় পুনরুক্তি করলেন। এ সময় তিনি (সা) বললেন ঃ

"চোখ অশ্রু বহায় অন্তর দুঃখ ভারাক্রান্ত। কিন্তু আমরা তা-ই বলবো যা আমাদের রবের মর্জী। হে ইবরাহীম! তোমার বিচ্ছিন্নতায় আমরা দুঃখ ভারাক্রান্ত।"

ইবনে আসাকির (র) হযরত হাসান (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার হযরত আবদুর রহমান (রা) এবং হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের মধ্যে কোন কথায় তিক্ততার সৃষ্টি হলো [হযরত খালিদ (রা) হযরত আবদুর রহমানকে (রা) কোন কঠিন কথা বলে ফেললো]। মহানবী (সা) এ খবর পেলেন। এ সময় তাঁর (সা) নিকট হযরত খালিদের (রা) কথা অসহনীয় মনে হলো [অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত আবদুর রহমান (রা) রাসূলের (সা) নিকট হযরত খালিদের (রা) বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন] হুজুর (সা) হযরত খালিদকে (রা) ডেকে পাঠালেন এবং বললেন ঃ

"খালিদ, তুমি আমার কোন বদরী সাহাবীকে কষ্ট দিও না। কেননা তোমাদের মধ্যে, কোন ব্যক্তি যদি ওহোদ পাহাড় সমান সোনা ব্যয় করে তাহলে তাঁদের (বদরের সাহাবীদের) অর্ধেক পর্যন্তও পৌঁছাতে পারবে না।"

এই ঘটনা ইমাম মুসলিম, হাইছামী, তিবরানী এবং কতিপয় অন্য ওলামাও বর্ণনা করেছেন। যদিও ব্যাখ্যা ও বাক্যে কিছুটা মতবিরোধ রয়েছে।

এই ঘটনা থেকেই হযরত আবদুর রহমানের (রা) ত্যাগের কথা আন্দাজ করা যেতে পারে। আসহাবে শুরায় ৬ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দু'জন হযরত ওসমান (রা) এবং হযরত আলীর (রা) সমর্থক ছিলেন এবং একজন হযরত আবদুর রহমানের (রা) নাম পেশ করেছিলেন। কিন্তু তিনি খিলাফতের দাবী থেকে সম্পূর্ণ রূপে প্রত্যাহার করে নিলেন এবং পরিষ্কার বলে দিলেন ঃ

"আমি সেই ব্যক্তি নই যে, খিলাফতের ব্যাপারে তোমাদের সাথে ঝগড়া করবো।"

হযরত আবদুর রহমান (রা) অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী ছিলেন এবং পরিস্থিতির বোধগম্যতা ও মত সকলের নিকট গ্রহণীয় ছিল। এই কারণেই হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) এবং হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁকে উপদেষ্টা বানিয়েছিলেন। তার পরামর্শ অত্যন্ত সঠিক ও উম্মাতের কল্যাণের আবেগে উৎসারিত থাকতো। ইবনে জারির তাবারীর মত অনুযায়ী হযরত ওমর ফারুক (রা) নিজের ওফাতের পূর্বে তাঁর ব্যাপারে এই বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন ঃ

"আবদুর রহমান (রা) অত্যন্ত সঠিক মতের মানুষ। তার মত যুক্তিসঙ্গত এবং সঠিক হয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে (ভুল রায় থেকে) তাঁকে হেফাজত করা হয়। (সে যদি খলিফা হয়) তাহলে তোমরা তাঁর কথা শুনবে।"

ইবাদাতের প্রতি ছিল তাঁর সীমাহীন আকর্ষণ। অত্যন্ত খুশু ও খুজুর সাথে নামায পড়তেন। বিশেষ করে যোহরের ফরজের পূর্বে দীর্ঘক্ষণ যাবত নফল পড়তেন। বেশী বেশী রোযা রাখতেন এবং বেশ কয়েকবার বাইতুল্লাহর হজ্জের সুযোগ লাভ করেছিলেন।

হযরত আবদুর রহমানকে (রা) আল্লাহ তায়ালা এত অধিক ধন-সম্পদ দান করেছিলেন, যা মাত্র হাতে গোণা কয়েকজন সাহাবীরই ছিল। তিনি একজন সাহসী ও সফল ব্যবসায়ী ছিলেন এবং সম্পদ তার ওপর যেন বর্ষিত হতো। মক্কা থেকে শূন্য হাতে এসেছিলেন। কিন্তু যখন তাঁর আনসারী ভাই হযরত সায়াদ (রা) বিন রবি নিজের অর্ধেক সম্পদ পেশ করলেন তখন তিনি তা গ্রহণে ক্ষমা চাইলেন এবং দোয়া করতে করতে বাজারের রাস্তা দেখিয়ে দেয়ার জন্য তাঁর প্রতি আবেদন জানালেন। তারপর তাঁর নিজস্ব ব্যবসার এতো উন্নতি হয়েছিল যে, তার বাণিজ্যিক পণ্য শত শত উটের ওপর বোঝাই হয়ে

বাইরে যেতো এবং তেমনিভাবে বাইরে থেকে আসতো। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) বর্ণনা করেছেন যে, ব্যবসা ছাড়া তিনি ব্যাপকভাবে কৃষিকাজও করতেন। হুজুর (সা) তাঁকে খায়বারে এক বিরাট জায়গীর দান করেছিলেন। এছাড়াও তিনি নিজেও অনেক জমি ক্রয় করেছিলেন। জুরুফে তাঁর মালিকানায় জমিতে ২০টি উট পানি সেচের কাজ করতো। হযরত আবদুর রহমান (রা) ধন-সম্পদের দিক দিয়েই ধনী ছিলেন না বরং অন্তরেরও ঐশ্বর্যশালী ছিলেন এবং নিজের সম্পদকে নির্দ্বিধায় ব্যয় করতেন। তাঁর আল্লাহর পথে ব্যয় এবং দানশীলতার অসংখ্য ঘটনা চরিতগ্রন্থসমূহে মওজুদ রয়েছে। তা পাঠ করে অনুমান করা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে কেমন প্রশস্ত হাত ও কেমন কল্যাণের আবেগ দান করেছিলেন।

ইবনে আছির (র) "উসুদুল গাব্বাহতে" লিখেছেন যে, হযরত আবদুর রহমান (রা) দুইবার ৪০ হাজার করে দিনার আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করেন। জিহাদের জন্য পাঁচশ' ঘোড়া এবং পাঁচশ' উট উপস্থিত করেছিলেন। সূরায়ে তাওবা নাযিলের সময় চার হাজার দিরহাম পেশ করেন। মুসতাদরাকে হাকিমে হযরত উম্মে বকর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ নিজের একটি জমি ৪০ হাজার দিনারে বিক্রয় করেন এবং এই সমুদয় অর্থ বনি যুহরার ফকির, অভাবী ব্যক্তি এবং উম্মুহাতুল মু'মিনীনের মধ্যে বন্টন করে দেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশার (রা) নিকট যখন অংশ পৌছলো তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই অর্থ কে পাঠিয়েছে? তাঁকে বলা হলো, আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ জমি বিক্রয় করেছেন এবং সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ বন্টন করেছেন। হযরত আয়েশা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন, আমার পর তোমাদের ওপর ভালো লোক ছাড়া আর কেউ মেহেরবানী করবে না। আল্লাহ পাক ইবনে আওফকে (রা) জান্নাতের সালসাবিল থেকে সজিবতা দান করুন।

মুসনাদে আহমাদ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রা) সিদ্দিকা নিজের ঘরে ছিলেন। তিনি চেঁচামেচি শুনলেন। জিজ্ঞেস করলেন, চেঁচামেচি কিসের। লোকেরা বললো, আবদুর রহমান (রা) বিন আওফের বাণিজ্যিক পণ্যের কাফেলা সিরিয়া থেকে এসেছে। তাতে সব ধরনের সামান রয়েছে। হযরত আয়েশা (রা) বললেন, আমি হুজুর (সা) থেকে শুনেছিলাম যে, আবদুর রহমান (রা) হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। হযরত আবদুর রহমানের (রা) নিকট হযরত আয়েশার (রা) কথা পৌছলো। তখন তিনি সমগ্র বাণিজ্যিক কাফেলা (শুধু পণ্যই নয় বরং উট ও তার পালান পর্যন্ত) আল্লাহর পথে ওয়াকফ করে দিলেন।

ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, একবার হযরত আবদুর রহমান (রা) একটি সম্পত্তি (বনি নজিরের) ৪০ হাজার দিনারে কিদামাহ'র নিকট বিক্রি করলেন এবং এর সকল অর্থ আজওয়াজে মুতাহহিরাতের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। অন্য আরেক সময়ে আরেকটি জমি ৪০ হাজার দিনারে হযরত ওসমানের (রা) নিকট বিক্রি করেন এবং তাও আল্লাহর পথে বিলিয়ে দেন।

ইমাম হাকিম (র) ও হাফেজ আবু নঈম (র) বলেন, হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ (নিজের জীবনে) ত্রিশ হাজার দাস ও দাসী আজাদ করেছিলেন। এক রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি একদিনেই ত্রিশটি করে গোলাম আযাদ করতেন।

বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে মোটা অংকের অর্থ আল্লাহর পথে ব্যয় করা ছাড়াও তিনি সাধারণ দান খয়রাতের ধারা সবসময় অব্যাহত রাখতেন। ওফাতের পূর্বে তিনি যে ওসিয়ত করেছিলেন তার বিস্তারিত ওপরে আলোচিত হয়েছে।

সম্পদের আধিক্য গাফলতের কারণ না হয়ে হযরত আবদুর রহমানের (রা) জন্য আল্লাহভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আল্লাহর পথে অন্তর খুলে খরচ করা সত্ত্বেও তিনি সবসময় চিন্তান্বিত থাকতেন যে, এই বিত্ত বৈভব পরকালে ক্ষতির কোন কারণ না হয়ে বসে। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) "ইসতিয়াব" গ্রন্থে লিখেছেন, একবার তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমার (রা) খিদমতে আরজ করলেন, উম্মুল মু'মিনীন আমার আশংকা হয় যে সম্পদের আধিক্য (আখিরাতে) আমাকে ধ্বংস করে না ফেলে। তিনি বললেন, পুত্র, নিজের সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় অব্যাহত রাখো।

সংক্ষিপ্ত কথা হলো, সাইয়েদেনা হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফের জীবনের প্রতিটি দিকেই এমন উদাহরণ তুল্য ব্যক্তিত্ব বলে প্রমাণিত হবে যে, মিল্লাতে ইসলামিয়া তাঁর ওপর গৌরব করতে পারে এবং তাঁর পদাংক অনুসরণ করে কল্যাণ ও সাফল্যের মনযিলে পৌছতে পারে।

হযরত তালহাতাল খায়ের (রা)

দোজাহানের রহমত (সা) একদিন নিজের কতিপয় সাহাবীর (রা) মধ্যে বসেছিলেন। এমন সময় একজন গ্রামের মানুষ এসে উপস্থিত হলেন এবং আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! কুরআনে করিমের

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَاعَاهَدُ واللّٰهَ عَلَيْهِ ج فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ ـ

"ঈমানদারদের মধ্যে এমন লোক আছে যাঁরা আল্লাহর নিকট কৃত ওয়াদাকে সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ স্বীয় মানত পূর্ণ করেছেন আর কেউ সময় আসার অপেক্ষায় রয়েছেন।"—এই আয়াত কাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে ? –আহযাব ঃ ২৩

রহমতে আলম (সা) গ্রাম্য লোকটির প্রশ্নের কোন জবাব দিলেন না। তিনি নিজের প্রশ্নের পুনরুক্তি করলেন। কিন্তু হুজুর (সা) পুনরায়ও চুপ মেরে রইলেন। ইত্যবসরে মাঝামাঝি আকৃতির সুঠামদেহী ও উজ্জল লাল রংয়ের একজন সুদর্শন মানুষ রাসূলের (সা) দরবারে এসে উপস্থিত হলেন। হুজুর (সা) তৎক্ষণাৎ প্রশ্নকারীর প্রতি মনোযোগী হলেন এবং বললেন ঃ

"এই হলো সেই ব্যক্তি যার ব্যাপারে এই আয়াত প্রযোজ্য (অথবা তিনি সেই সকল মানুষের একজন, যাদের শানে এই আয়াত নাযিল হয়েছে।)"

এই সাহাবী ।যনি এই মহান মর্যাদা লাভ করেছিলেন। স্বয়ং সাইয়েদুল মুরসালিন ফখরে মওজুদাত (সা) তাঁকে উল্লিখিত আয়াতের স্বাক্ষী মেনেছেন। তিনি ছিলেন, হযরত তালহা (রা) বিন উবায়দুল্লাহ।

সাইয়েদেনা আবু মুহাম্মদ তালহা (রা) বিন উবায়দুল্লাহ মহান মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি সেই দশ সাহাবীর (আশারায়ে মুবাশশিরাহ) অন্যতম যাঁদেরকে সাকিয়ে কাওছার (সা) নাম উল্লেখপূর্বক জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছিলেন। হযরত তালহার (রা) সম্পর্ক ছিল কুরাইশের বনু তাইম খান্দানের সঙ্গে। নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

তালহা (রা) বিন উবায়দুল্লাহ বিন ওসমান বিন আমর বিন কা'ব বিন সায়াদ বিন তাইম বিন মুররাহ বিন কা'ব বিন লুব্বী।

মুররা বিন কা'বে গিয়ে তাঁর নসবনামা রাসূলে আকরামের (সা) নসবের সঙ্গে মিলে যায় এবং আমর বিন কা'বে গিয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) সঙ্গে মিলে যায়। হযরত তালহার (রা) দাদা ওসমান বিন আমর এবং হযরত আবু বকরের (রা) দাদা আমের বিন আমরের সহোদর ছিলেন।

হযরত তালহার (রা) পিতা উবায়দুল্লাহ ইসলামের যুগ পাননি। অবশ্য তার মাতা সা'বা (রা) (বিনতে আবদুল্লাহ হাজরামী বিন জামাদ বিন সালমা বিন কাবার) দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন। তিনি ইসলাম কবুল করেন এবং মহিলা সাহাবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। মশহুর সাহাবী হযরত আলা (রা) ইবনুল হাজরামী ছিলেন তাঁর ভাই এবং হযরত তালহার (রা) মামা।

বিশ্বনবীর (সা) নবুয়ত প্রাপ্তির প্রায় চৌদ্দ-পনেরো বছর পূর্বে হযরত তালহা (রা) জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকালেই বাণিজ্য পেশা গ্রহণ করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অত্যন্ত সৎ স্বভাব দান করেছিলেন। প্রিয়নবী (সা) দাওয়াতে হক শুরু করলেন। সেই ডাকে প্রথম যে কয়জন নেক স্বভাবের সাহাবী সাড়া দিয়েছিলেন তার মধ্যে হযরত তালহাও (রা) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এক রাওয়ায়াতে আছে যে, তিনি সেই আট সাহাবীর একজন যারা সর্বপ্রথম ঈমানের নিয়ামতে নিজেদেরকে পূর্ণ করেছিলেন। যদিও কিছু সংখ্যক আলেম এই রেওয়ায়াত মানতে চিন্তা করেছেন, কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তিনি নবীর (সা) নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন এবং তাতে তাঁর সমগোত্রীয় বুজুর্গ হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) তাবলীগ ও তালকিন প্রভুতভাবে কার্যকর ছিল। হযরত তালহার (রা) ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গে ইবনে সায়াদ (র) ইমাম হাকিম (র) এবং ইবনে আছির (র) একটি চিত্তাকর্ষক বর্ণনা স্বয়ং হযরত তালহার (রা) যবানীতে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন যে, আমি (নবীর নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম যুগে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে) বসরা (সিরিয়া) গিয়েছিলাম। সেখানে এক ইবাদাত খানায় একজন পাদরী দেখতে পেলাম। সেই পাদরী লোকদেরকে জিজ্ঞেস করছিল যে, আজ কাল মক্কা থেকে কোন লোক এসেছে কিনা। আমি বললাম হাঁ আমি সেখান থেকেই আসছি। পাদরী জিজ্ঞেস করলো যে, আহমদ নবী (সা) প্রকাশ পেয়েছেন কি? আমি বললাম, কোন্ আহমাদ (সা) ? পাদরী বললো, আহমাদ (সা) বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিব। এটাই তাঁর প্রকাশ কাল। তিনিই দুনিয়ার শেষনবী। তুমি ফিরে গিয়ে কাল বিলম্ব না করে তাঁর বাইয়াত করে নিবে। আমি বসরা থেকে মক্কা ফিরে এলাম এবং লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার অনুপস্থিতিতে কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে কি ? লোকেরা বললো, মুহাম্মাদ (সা) বিন আবদুল্লাহ নবুয়ত দাবী

করেছেন এবং ইবনে আবি কুহাফা (হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা)) তাঁর আনুগত্য কবুল করেছেন। আমি একথা শুনে আবু বকরের (রা) নিকট এলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি মুহাম্মাদের (সা) আনুগত্য কবুল করে নিয়েছেন ? তিনি বললেন, হাঁ, তিনি হকের দাওয়াত দিয়ে থাকেন। তুমিও এই দাওয়াত কবুল করে নাও। তারপর আমি পাদরীর নিকট থেকে যা কিছু শুনেছিলাম তা তাঁকে বর্ণনা করলাম। তিনি খুব খুশী হলেন এবং আমাকে সাথে নিয়ে রাসূলের (সা) খিদমতে হাজির হলেন। আমি তাঁর নিকট দরখাস্ত করলাম যে, আমাকেও আপনার দ্বীনে দাখিল করিয়ে নিন। তিনি আমার দরখাস্ত কবুল করলেন এবং আমি ঈমানের নিয়ামতে পূর্ণ হয়ে গেলাম।

চরিত গ্রন্থসমূহের অসংখ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ইসলাম গ্রহণের পর অন্য তাওহীদপন্থীর মত হযরত তালহাকেও (রা) মক্কার কাফেরদের জুলুম নির্যাতনের শিকার হতে হয়। মা তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনিও পুত্রের ইসলাম গ্রহণে খুব গোস্বা হলেন। ইমাম বুখারী (র) "তারিখুস সগীরে" হযরত মাসউদ (রা) বিন খারাশের বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে যে, "আমরা সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে চক্কর দিচ্ছিলাম। আমরা দেখলাম যে অনেক মানুষ একজন যুবককে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি? লোকেরা বললো, তালহা (রা) বিন উবায়েদ উল্লাহ বেদ্বীন হয়ে গেছে। একজন মহিলা সেই যুবকের পিছনে পিছনে শাপ শাপান্ত করতে করতে যাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম এই মহিলা কে? লোকেরা বললো, মহিলাটি তার মা সা'বা বিনতে হাজরামী।

হাফেজ ইবনে কাছির (র) "আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া" গ্রন্থে লিখেছেন, নওফিল বিন খুয়ায়েলদ আদবিয়া ছিল শেরে কুরাইশ লকবে মশহুর। হযরত তালহার (রা) ইসলাম গ্রহণে প্রচন্ড ক্রোধান্বিত হলো। সে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) এবং হযরত তালহাকে (রা) ধরে একই রশিতে বাধলো। এজন্য এই দুই ব্যক্তিকে কারিনাইন বা সঙ্গী বলা হয়। ইমাম বাইহাকী লিখেছেন যে, হুজুর (সা) তাঁদের নির্যাতিত হওয়ার খবর পেলেন। এসময় তিনি দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ, আমাদেরকে ইবনে আদবিয়ার অপকর্ম থেকে রক্ষা কর।"

ইবনে আছির (র) ও ইমাম হাকিম (র) বলেন, হযরত তালহার (রা) ইসলাম গ্রহণের কথা যখন তাঁর চাচা ও বড় ভাই (ওসমান বিন উবায়েদুল্লাহ) জানতে পেল তখন তারা হযরত তালহা (রা) ও হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) উভয়কে রশি দিয়ে বেঁধে খুব করে পেটালো। যাতে এই কঠোরতায় তারা

ইসলাম ত্যাগ করে। কিন্তু হায়! তাঁদের ধৈর্য ছিল পাহাড়ের মত। এই নির্যাতনে তাঁরা সামান্য মাত্রও টললেন না।

(উসুদুল গাব্বাহ–মুসতাদরাকে হাকিম)

এক বর্ণনায় আছে যে, মহানবী (সা) মক্কায় হযরত তালহার (রা) ভাই বানিয়েছিলেন নিজের ফুফাতো ভাই হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়ামের সঙ্গে।

কাফেরদের সকল অস্ত্রই যখন হযরত তালহাকে (রা) দ্বীনে হক থেকে হটাতে ব্যর্থ হলো তখন তারা তাঁকে নিজের ওপর ছেড়ে দিলো এবং তিনি পূর্বের মত নিজের ব্যবসার কাজে মশগুল হয়ে গেলেন। এক রেওয়ায়াতে আছে যে, যে সময় রহমতে আলম (সা) মক্কা থেকে হিজরত করেন সে সময় হযরত তালহা (রা) নিজের ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়া গিয়েছিলেন। এদিকে হুজুর (সা) মক্কা থেকে মদীনা রওয়ানা হলেন। ওদিকে হযরত তালহা (রা) নিজের বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে সিরিয়া থেকে মক্কা রওয়ানা হলেন। মদীনা পৌঁছে সেখানকার লোকদেরকে অস্থিরচিত্তে হুজুরের (সা) ইনতিজার করতে দেখলেন। সেখান থেকে মক্কা রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে বিশ্বনবী (সা) ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে সাক্ষাত হয়ে গেল। তাঁরা প্রিয়নবী (সা) ও হযরত আবু বকরের (রা) খিদমতে কিছু সিরীয় কাপড় পেশ করলেন এবং মদীনাবাসীর অস্থির চিত্তে অপেক্ষার কথা বললেন। অতপর নিজের কাফেলার সঙ্গে মক্কা চলে গেলেন। ঠিক একই ধরনের বর্ণনা সহীহ বুখারীতে হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়ামের ব্যাপারেও পাওয়া যায়। তিনিও ব্যবসায়ী মুসলমানদের এক কাফেলার সঙ্গে সিরিয়া থেকে ফিরে আসছিলেন। পথিমধ্যে বিশ্বনবীর (সা) সাথে সাক্ষাত হলো এবং তিনি হুজুর (সা) ও হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) খিদমতে কিছু সাদা কাপড় তোহাফা হিসেবে পেশ করেন। এটা একই ঘটনা, না দু'টি পৃথক ঘটনা তা জানা যায়নি (এটাও হতে পারে যে, হযরত তালহা (রা) এবং হযরত যোবায়ের (রা) উভয়ই একই বাণিজ্যিক কাফেলাতে ছিলেন। আবার এটাও হতে পারে যে, দু'জন ভিন্ন কাফেলাতে ছিলেন)।

মক্কা ফিরে এসে হযরত তালহা (রা) ব্যবসার পাটচুকিয়ে ফেললেন এবং কিছু দিন পরই নিজের মা সা'বা (রা) বিনতে আল হাজরামীকে সঙ্গে নিয়ে (তিনি সে সময় ঈমানের নিয়ামতেপূর্ণ হয়েছিলেন) মদীনা হিজরত করেন। মদীনা মুনাওয়ারাতে সাইয়েদেনা হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ আনসারী তাঁকে নিজের মেহমান বানান। কয়েক মাসপর প্রিয়নবী (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করেন। তখন হযরত তালহাকে (রা) হযরত উবাই (রা) বিন কা'ব আনসারীর ইসলামী ভাই বানান।

দ্বিতীয় হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে হক ও বাতিলের প্রথম যুদ্ধ "বদরের যুদ্ধ" সংঘটিত হয়। সহীহ জামেতে বদরের সাহাবীদের যে তালিকা দেয়া হয়েছে তাতে হযরত তালহার (রা) নাম নেই। চরিতকাররা এই প্রসঙ্গে দু'টি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ বলেন, সে সময় তিনি ব্যবসায়িক উদ্দেশে সিরিয়া গিয়ে থাকবেন। আবার অন্যরা লিখেছেন, প্রিয়নবী (সা) তাঁকে একা অথবা হযরত সাঈদ (রা) বিন যায়েদের সাথে মুশরিকদের খবর আনার জন্য সিরিয়ার দিকে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি যখন ফিরে আসেন তখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও হুজুর (সা) গনিমতের মালে তাঁর অংশও দিয়েছিলেন এবং এও বলেছিলেন, তুমি জিহাদের সওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকবে না। উভয় ধরনের বর্ণনায় একটি কথা অবশ্য পাওয়া যায়। তাহলো, অন্য মুজাহিদের মত হযরত তালহাও (রা) বদরের গনিমতের মালের অংশ পেয়েছিলেন। যেন তিনি কোন না কোনভাবে যুদ্ধে শরীক ছিলেন। কেননা গনিমতের মালের হকদার তাকেই মনে করা হতো যে কোন না কোন উপায়ে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। দুশমনের সম্পর্কে গোয়েন্দাগিরি যুদ্ধেরই অংশ হয়ে থাকে। এজন্য তাঁকেও যুদ্ধে শরীক মনে করা হয়েছে। তিনি যদি বাণিজ্য ব্যাপদেশে সিরয়া গিয়ে থাকতেন তাহলে গনিমতের মালের হকদার হতেন না। সে জন্য বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে তাঁর সিরিয়া গমনের বর্ণনাটা সন্দেহযুক্ত।

তৃতীয় হিজরীতে ওহোদের যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। হযরত তালহা (রা) এই যুদ্ধে খুব উৎসাহ -উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নেন। তাতে তিনি মহানবীর (সা) হিফাজতের জন্য নিজের জীবন বাজী লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি এই যুদ্ধের হিরো হিসেবে পরিগণিত হন। যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়ে মুসলমানরা কাফেরদেরকে পরাজিত করেছিলেন। অতপর গনিমতের মাল একত্রিত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। দূর্ভাগ্যবশত সুড়ঙ্গ পথে নিয়োজিত তীরান্দাজদেরও অধিকাংশই নিজের স্থান পরিত্যাগ করে এবং গনিমতের মাল গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এ সময় কাফেরদের এক ঘোর সওয়ার দল পাহাড় চক্কর মেরে সেই সুড়ঙ্গ পথে মুসলমানদের ওপর হামলা করে বসলো এবং তাদের ব্যূহ তছনছ করে ফেললো। উপরন্তু বিশ্বনবীর (সা) শাহাদাতের খবরের মত দূর্ভাগ্যজনক গুজবও ছড়িয়ে পড়েছিল। তাতে অনেক মুসলমানের অন্তরে খটকা লেগেছিল। ওদিকে হুজুর (সা) যুদ্ধের ময়দানে পাহাড়ের মত অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রলেন এবং কিছু মুহাজির ও আনসার যারা তাঁর নিকটে ছিলেন, তাঁরা সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে প্রত্যেক দিক থেকে তাঁকে (সা) কাফেরদের হামলা থেকে রক্ষা করছিলেন। হযরত তালহাও (রা) সেই জানবাজদের মধ্যে ছিলেন। কাফেররা বারবার রাসূলের (সা) ওপর হামলা করছিল। কিন্তু

রিসালাত প্রদীপের এইসব পতঙ্গ জীবনের বাজী লাগিয়ে তাদেরকে পিছনে হটিয়ে দিতেন অথবা সেই চেষ্টায় নিজের জীবন কুরবান করে দিতেন। তিন-চারবার এমন অবস্থা হলো যে, কাফেররা হুজুরের (সা) ওপর হামলা করলো। এসময় তিনি বললেন, কেউকি আছে যে তাদের বাধা দেবে ? হযরত তালহা (রা) প্রত্যেকবারই সামনে অগ্রসর হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাজির আছি। কিন্তু অন্য কতিপয় জানবাজ অগ্রসর হয়ে নিজের আকা ও মাওলাকে (সা) মুশরিকদের তরবারীর আঘাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেছিলেন। অতপর এমন এক সময় এলো, যখন জানবাজ সাহাবী ও হুজুরের (সা) মধ্যে কাফেররা এসে দন্ডায়মান হলো এবং শুধুমাত্র হযরত তালহা (রা) তাঁর (সা) নিকটে ছিলেন। হুজুরকে (সা) খুব ভীতিকর অবস্থায় দেখে হযরত তালহা (রা) তাঁর ওপর পতঙ্গের মত গিয়ে দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করলেন। দেহ ও জীবন তাঁর সকল মুহাব্বাত ঈমানী মুহাব্বাতে পরিবর্তিত হলো এবং তিনি ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, পেছনে প্রত্যেক দিক থেকে আঘাত তীর, বর্শা, তরবারী এবং পাথর নিজের দেহ দিয়ে বাধা দিতে লাগলেন। তাঁর দেহে ক্ষতের ওপর ক্ষত সৃষ্টি হতে লাগলো। কিন্তু হুজুরের (সা) সামনে থেকে হটে যাওয়ার কল্পনাও তাঁর অন্তরে স্থান পায়নি। বাস্তবতঃ তিনি ওহীর ধারককে (সা) বাঁচানোর জন্য নিজের সমগ্র দেহকে কিমা বানিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিলেন। তিনি রক্তে গোসল করে ফেলেছিলেন এবং কুড়িটির মত যখম তাঁর দেহকে ঝাঁঝরা করে ফেলেছিল। কিন্তু সাইয়েদুল মুরসালিনের (সা) জন্য জীবন কুরবান করার তড়পানি তাঁকে এমন শক্তি দিয়েছিল যা তাঁকে পড়ে যেতে দেয়নি। এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী সে সময় তাঁর মুখ দিয়ে একটি যুদ্ধ গাথা উচ্চারিত হয়েছিল।

ইত্যবসরে একজন মুশরিক হুজুরের (সা) নিকট পৌছে তরবারী দিয়ে আঘাত হানলো। হযরত তালহা (রা) সেই আঘাত নিজের হাত দিয়ে ঠেকালেন। তাঁর আঙ্গুলগুলো শহীদ হয়ে গেল (অথবা অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী দুই আঙ্গুলের ধমনী কেটে গেল।) সেই মুহূর্তে হুজুর (সা) একদিকে সরে দাঁড়ালেন এবং আঘাত থেকে মাহফুজ হয়ে গেলেন।

হাফেজ ইবনে হাজার (র) বর্ণনা করেছেন, এ সময় হযরত তালহার (রা) যবান দিয়ে আহ! শব্দ বেরিয়ে গেল। এর বিপরীত ইবনে সায়াদ (র) লিখেছেন, সে সময় তাঁর মুখ দিয়ে খুব হয়েছে শব্দ বের হয়েছিল। তাতে হুজুর (সা) বলেছিলেন যে, তুমি যদি এই শব্দের পরিবর্তে বিসমিল্লাহ বলতে তাহলে তোমাকে ফেরেশতারা উঠিয়ে নিতেন এবং সবার সামনে তোমাকে আসমানের ওপর নিয়ে যেতেন।

মোটকথা, হযরত তালহা মন-প্রাণ ঢেলে দিয়ে একাগ্রতার সাথে পাগলের মত মহানবীকে (সা) হেফাজতের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। ইত্যবসরে অন্য কতিপয় জীবন উৎসর্গকারী সাহাবীও তাঁর সাহায্যের জন্য এসে উপস্থিত হলেন এবং সকলে মিলে মুশরিকদেরকে হটিয়ে দিলেন। হযরত তালহা (রা) যদিও আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর হিম্মত ছিল তরতাজা। জামে' তিরমিযীতে আছে যে, হুজুর (সা) পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পবিত্র দেহের ওপর দু'টি যিরাহ ছিল (এবং তিনি আহতও ছিলেন)। এজন্য পাহাড়ে উঠায় কষ্ট মনে হচ্ছিল। হযরত তালহা (রা) (নিজের আঘাতের কথা ভুলে গিয়ে) সামনে অগ্রসর হলেন এবং হুজুরকে (সা) নিজের পিঠের ওপর বসিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেলেন। এসময় রাসূলের (সা) জবান দিয়ে উচ্চারিত হলো, তালহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে।

হাফেজ ইবনে হাজার (র) "ফতহুল বারি"তে লিখেছেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) হযরত তালহার (রা) দেহে ৭০-এর বেশী ক্ষত বা আঘাত গণনা করেছিলেন।

কতিপয় রেওয়ায়াতে তাঁর আঘাতের বিস্তারিতও দেওয়া হয়েছে। তাতে দেখা যায় যে, শুধু হাতেই ২৪টি আঘাত লেগেছিল এবং তা চিরকালের জন্য অবশ হয়ে গিয়েছিল। সারা শরীরে তরবারী, বর্শা এবং তীরের ৭৫টি আঘাত লেগেছিল। তারবারীর এক কোপে মাথাও গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল।

সহীহ বুখারীতে (কিতাবুল মাগাজিতে) কায়েস বিন আবু হাযেম (র) থেকে বর্ণিত আছে, "আমি তালহার হাত দেখেছিলাম, যা অবশ হয়ে গিয়েছিল। এই হাত দিয়ে তিনি ওহোদের যুদ্ধে নবী করিমকে (সা) রক্ষা করেছিলেন।"

হযরত তালহা (রা) ওহোদের যুদ্ধে যে নজীরবিহীন ঈমানী জোশ, বীরত্ব ও ফিদাকারী প্রদর্শন করেন তার বিনিময়ে তাকে রিসালাতের দরবার থেকে "খায়ের " এর মহান উপাধিতে বিভূষিত করা হয়। রহমতে দারাইন (সা) তাঁর দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন ঃ "এ তালহা নয়, এ হলো খায়ের।"

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, সে সময় রহমতে আলমের (সা) ইঙ্গিতে হযরত হাসসান (রা) বিন ছাবিত এই কবিতা বলেছিলেন, "এবং তালহা (রা) ওহোদের দিন মুহাম্মদকে (সা) হেফাজত করেছিলেন, এমন সময় যখন তাঁর (সা) জন্য হয়ে গিয়েছিল সবকিছু সংকুচিত ও কঠিন।

তিনি বাহু দিয়ে বর্শার সাহায্যে তাঁকে (সা) রক্ষা করেছিলেন এবং তিনি নিজের আঙ্গুল তারবারীর নীচে দিয়েছিলেন যা অবশ হয়ে গিয়েছিল।"

হযরত তালহা (রা) ওহোদের দিন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় প্রতিশ্রুতি পূরণের যে কাহিনী লিপিবদ্ধ করান তা তাঁকে অন্য সকল সাহাবীর (রা) নিকট অত্যন্ত প্রিয় ও মর্যাদাপূর্ণ বানিয়ে দিয়েছিল এবং তারা তাঁর ওপর ঈর্ষা করতো। সাইয়েদেনা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) বলতেন ঃ

"ওহোদের দিন, ওহোদের দিন ছিল না। সত্য বলতে কি সেটা ছিল তালহার (রা) দিন।"

সাইয়েদেনা হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁকে দেখে বলতেন ঃ

" হে তালহা, হে ওহোদওয়ালা, হে সাহেবে ওহোদ!"

ওহোদের যুদ্ধে হযরত তালহা (রা) যে মহান সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তার শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে নিজেও কখনো কখনো তার উল্লেখ করতেন। সহীহ বুখারীতে (কিতাবুল মাগাযি বাবে গুযওয়ায়ে ওহোদ) তাঁর থেকে বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে। এই হাদিসে তিনি ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন।

ওহোদের যুদ্ধের পর রাসূলের (সা) যুগে সংঘটিত সকল যুদ্ধেই হযরত তালহা (রা) মহানবীর সফরসঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন এবং প্রত্যেক যুদ্ধেই জীবন বাজী রাখার নৈপুন্যতা দেখিয়েছেন। তিনি বাইয়াতে রিদওয়ানেও উপস্থিত ছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর হুনাইনের যুদ্ধে যখন বনু হাওয়াযিনের অসংখ্য তীরান্দাজীতে অধিকাংশ মুসলমানের পা টলটলায়মান হয়ে গিয়েছিল তখন তিনি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দানে অটল ছিলেন। ইত্যবসরে দুশমনরা পরাজিত হয়ে গেল। তাবুকের যুদ্ধের (নবম হিজরী) সময় তিনি যুদ্ধ ব্যয় নির্বাহের জন্য বিরাট অংক দান করেছিলেন। ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন, সে সময় মহানবী (সা) তাঁকে "ফাইয়াজ" বা দানবীর উপাধিতে বিভূষিত করেন। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি নবীর (সা) অন্যান্য যুদ্ধে ব্যয় নির্বাহের জন্যও বহু পরিমাণ অর্থ দিয়েছিলেন। এক যুদ্ধে তিনি সাধারণ মুসলমানের খাওয়ার খরচ বহন করেছিলেন। এই উদারতা ও কল্যাণের আবেগের জন্য তাঁকে "দানবীর" উপাধি প্রদান করা হয়।

ইবনে হিশাম 'সিরাতুন নবী'তে লিখেছেন, তাবুকের যুদ্ধের সময় মুনাফিকরা মুসলমানদের মধ্যে অপপ্রচার করতে চেয়েছিল। এই লক্ষ্যে তারা মদীনা থেকে কিছু দূরে সুয়ায়লেম ইহুদীর বাড়ীতে একত্রিত হয়ে পরিকল্পনা আঁটতো। রাসূলে করীম (সা) তাদের এই অপকর্মের খবর পেলেন। তিনি তাদেরকে নির্মূলের জন্য হযরত তালহাকে (রা) নিয়োগ করলেন। তিনি কতিপয় লোক নিয়ে সুয়ায়লেমের বাড়ী অবরোধ করলেন এবং তাতে আগুন লাগিয়ে দিলেন। ফলে মুনাফিকদের সাহসে ভাটা পড়লো এবং তাদের ফিতনা প্রায় বন্ধই হয়ে গেল।

দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জের জন্য বিশ্বনবী (সা) মক্কা মুয়াজ্জামা তাশরীফ নিলেন। হযরত তালহাও (রা) হুজুরের (সা) সঙ্গে ছিলেন। সহীহ বুখারীতে হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সা) এবং সাহাবাবৃন্দ হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তালহা (রা) ছাড়া কারোর নিকট কুরবানীর পশু ছিল না।"

এগারো হিজরীতে রাসূলে আকরাম (সা) ওফাত পেলেন। সে সময় হযরত তালহা (রা) শোকে দুঃখে একদম অস্থির হয়ে পড়লেন এবং কয়েকদিন পর্যন্ত নির্জনত্ব যাপন করলেন। ইত্যবসরে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) খিলাফতের আসনে সমাসীন হলেন। তখন হযরত তালহাও (রা) তাঁর হাতে বাইয়াত করলেন। সিদ্দিকে আকবার (রা) তাঁকে খুব মানতেন এবং সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর নিকট থেকে পরামর্শ নিতেন।

তের হিজরীতে ইন্তেকালের পূর্বে তিনি খিলাফতের পদের জন্য হযরত ওমর ফারুককে (রা) নিয়োগ করলেন। এ সময়ে হযরত তালহা (রা) হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ

"হে রাসূলের খলিফা! ওমর হলো কঠিন মেযাজের মানুষ এবং এই কঠোরতা কয়েকবার আপনার পর্যবেক্ষণেও এসেছে। সে যদি খলিফা হয়, তাহলে আল্লাহই জানেন, আল্লাহর মাখলুকের সঙ্গে কেমন আচরণ করে। আপনি এ ব্যাপারে দ্বিতীয় বার চিন্তা করুন। কেননা আখিরাতে আপনাকে তার জবাবদিহি করতে হবে।"

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) বললেন, "আমাকে যদি এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে আমি আল্লাহকে জবাব দেবো যে, হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দাদের ওপর সেই ব্যক্তিকে আমীর বানিয়েছি যিনি তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভালো।"

হযরত ওমরের (রা) ব্যাপারে তালহার (রা) এই মত কোন ব্যক্তিগত বিরোধ অথবা স্বার্থপরতার ভিত্তিতে ছিল না বরং তিনি নেক নিয়তের ভিত্তিতে হযরত ওমরের (রা) কঠোর মেযাজ সাধারণ মুসলমানের জন্য অসহনীয় হতে পারে বলে মনে করেছিলেন। তবুও হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) যখন নিজের মতের ওপর কায়েম রলেন তখন তাঁর ওফাতের পর হযরত তালহা (রা) নির্ভাবনায় হযরত ওমর ফারুকের (রা) বাইয়াত করেন—এবং যখন তিনি নিজের চেষ্টা, দূরদৃষ্টি এবং নেক আমল দিয়ে এটা প্রমাণ করলেন যে, খিলাফতের পদের জন্য তাঁর চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি আর নেই তখন তিনি মন ও

অন্তর দিয়ে তাঁর সমর্থক এবং সাহায্যকারী হয়ে গেলেন। ফারুকে আজমের (রা) নিকটও হযরত তালহা (রা) অত্যন্ত কদর ও মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। সুতরাং তিনি তাঁকে মসলিশে শুরার সদস্য মনোনিত করলেন এবং সবসময় তাঁর পরামর্শের বিশেষ গুরুত্ব দিতেন।

অবশেষে ২৩ হিজরীতে হযরত ওমর ফারুকের (রা) শাহাদাতের ঘটনা সংঘটিত হলো। ওফাতের পূর্বে তিনি এই ৬ সাহাবীকে খিলাফতের জন্য মনোনীত করেন ঃ

হযরত ওসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত যোবায়ের (রা), হযরত তালহা (রা), হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ এবং হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস।

এসব সাহাবীকে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে খলিফা নির্বাচন করার অধিকার ছিল। হযরত তালহা (রা) ত্যাগ স্বীকার করলেন এবং হযরত ওসমানের (রা) পক্ষে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিলেন।

হযরত ওসমানের (রা) খিলাফতকালের বেশীর ভাগ সময়ই হযরত তালহা (রা) চুপচাপ অতিবাহিত করেন। শুধুমাত্র শেষ বছরে (৩৫ হিজরীতে) তাঁর নাম জনগণের মাঝে শোনা যায়। সে বছর আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওসমানের (রা) বিরুদ্ধে ফিতনা ও বিশৃংখলা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, কিছু ব্যবস্থাপনা বিষয়ে হযরত ওসমানের (রা) সাথে হযরত তাহলার (রা) মতপার্থক্য ছিল। কিন্তু আমীরুল মু'মিনীনের বিরুদ্ধে বিশৃংখলা ও বিদ্রোহ তিনি কোনক্রমেই পসন্দ করতেন না। সুতরাং যখন মিসর, কুফা ও বসরার বিদ্রোহীরা মদীনার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লো এবং তারা হযরত আলী (রা), হযরত তালহা (রা) ও হযরত যোবায়েরকে (রা) তাদের সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করলো তখন এই তিন বুজর্গ তাদেরকে ভর্ৎসনা বা দমক দিলেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল ও তাবকাতে ইবনে সা'দে আছে যে, যখন বিদ্রোহীরা খলিফার আবাসস্থল অবরোধ করলো তখন হযরত তালহা পরিস্থিতি জরিপের জন্য অবরোধকারীদের সমাবেশে তাশরীফ নিলেন। কিয়াস করা হয় যে, তিনি বিদ্রোহীদেরকে তাদের তৎপরতা বন্ধের আহবান জানিয়ে থাকবেন। সে সময় [অথবা অন্য সময় যখন হযরত তালহা (রা) অবরোধকারীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন] হযরত ওসমান (রা) নিজের বাড়ীর জানালা দিয়ে বয়স্ক সাহাবীদের প্রত্যেকের নাম ধরে ধরে ডাকলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত তালহার (রা) নামও এলো। প্রথম তো তিনি চুপ

রইলেন। কিন্তু হযরত ওসমান (রা) যখন তিনবার তাঁর নাম ধরে ডাকলেন তখন তিনি জবাব দিলেন, আমি হাজির। হযরত ওসমান (রা) হক পথে নিজের খিদমত ও ফজিলতসমূহ বর্ণনা করলেন এবং হযরত তালহার (রা) নিকট তার স্বীকৃতি চাইলেন। তিনি পূর্ণ সমাবেশে উচ্চস্বরে তার সত্যতা স্বীকার করলেন। কিন্তু বিদ্রোহী বা বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের মধ্যে তার কোন প্রভাব পড়লোনা। অসহায় তালহা (রা) ফিরে গেলেন। ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন, অবরোধ যখন ভয়ংকররূপ নিল তখন হযরত আলী (রা) ও হযরত যোবয়েরের (রা) মত হযরত তালহাও (রা) নিজের পুত্র মুহাম্মাদকে (রা) খলিফার বাসভবন রক্ষায় নিয়োগ করলেন। তাঁরা অন্যান্য সাথীদের সঙ্গে অত্যন্ত বাহাদুরীর সাথে বিদ্রোহীদের মুকাবিলা করলেন। কিন্তু তারা অন্য দিক থেকে এসে ভেতরে ঢুকে পড়লো এবং আমীরুল মু'মিনীনকে (রা) অত্যন্ত নির্দয়তার সাথে শহীদ করে ফেললো। হযরত তালহা (রা) এই হৃদয়বিদারক ঘটনা জানতে পেরে খুব দুঃখিত হলেন এবং অত্যন্ত দুঃখের সাথে বললেন ঃ "আল্লাহ তায়ালা ওসমানের (রা) ওপর রহম করুন।" লোকেরা বললো, বিদ্রোহীরা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত। হযরত তালহা (রা) বললেন "আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন।" তারপর এই আয়াত পাঠ করলে।

فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَا اِلٰى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ـ يس : ٥٠

ইবনে জারির তাবারী এই প্রসঙ্গে হযরত তালহা (রা) এবং হযরত যোবায়েরের (রা) এই বাক্যাবলীও উল্লেখ করেছেন ঃ

"আমরা শুধু এটাই চাইতাম যে, (কতিপয় ব্যাপারে) হযরত ওসমানকে (রা) তার কর্মপদ্ধতি পরিবর্তনে প্রস্তুত করা হবে। আমরা কখনো এই ধারণা করিনি যে, তাঁকে হত্যা করে ফেলা হবে। কিন্তু বেওকুফরা ধৈর্যশীলদের ওপর বিজয়ী হয়ে গেল এবং তাঁরা তাঁকে হত্যা করে ফেললো।"

সাইয়েদেনা হযরত ওসমানের (রা) শাহাদাতের পর হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু খিলাফতের আসনে সমাসীন হলেন। এটা ছিল খুব ভীতিক সময় এবং হযরত ওসমানের (রা) মজলুমানা শাহাদাতে মুসলমানদের একটি বড় শ্রেণীর মধ্যে বিরাট অশান্তি বিরাজিত ছিল। ইবনে সায়াদ কাতিবুল ওয়াকেদী বর্ণনা করেছেন, হযরত তালহা (রা), হযরত যোবায়ের (রা) এবং অন্য কতিপয় বয়স্ক সাহাবা হযরত আলীর (রা) বাইয়াত করে নিলেন। কিন্তু পরে যখন তাঁরা দেখলো যে, যাঁরা হযরত ওসমান গণির (রা) বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল তার বেশীরভাগই হযরত আলীর (রা) সৈন্যে শামিল হয়ে গেছে। তখন তাঁরা (তাবারী, ইবনে আছির, ইবনে কাছির প্রমুখের বক্তব্য

অনুযায়ী) হযরত আলীর (রা) সঙ্গে সাক্ষাত করেলন এবং বললেন যে, আমরা হদ কায়েমের শর্তে আপনার হাতে বাইয়াত করেছি। এখন আপনি হযরত ওসমান (রা) হত্যাকান্ডে শরীকদের ওপর হদ জারী করে দেন।

হযরত আলী (রা) বললেন, "ভাইসব! আপনাদের দৃষ্টিতে যেসব কথা আছে আমিও তা জানি। কিন্তু তাদেরকে কি করে পাকড়াও করা যাবে যারা এখন শক্তিশালী। বর্তমান পরিস্থিতিতে কি তাদের ওপর হদ্ জারী করা সম্ভব ?"

সকলেই বললেন, "না!" এতে হযরত আলী (রা) বললেন, "আল্লাহর কসম, আমিও আপনাদের সাথে একমত। কিন্তু পরিস্থিতি একটু ঠিক হতে দিন। যাতে অধিকার আদায় সম্ভব হয়।"

তারপর হযরত তালহা (রা) ও হযরত যোবায়ের (রা) হযরত আলীর (রা) নিকট থেকে বিদায় হয়ে মক্কা মুয়াজ্জামা গেলেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) হজ্জের জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী উম্মুল মু'মিনীন (রা) হজ্জ থেকে ফারেগ হয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন। এমন সময় রাস্তায় হযরত তালহা (রা) ও হযরত যোবায়ের (রা) তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন এবং মদীনার অবস্থা বর্ণনা করলেন। তা শুনে উম্মুল মু'মিনীন (রা) তাঁদের সঙ্গে মক্কা মুয়াজ্জামা ফিরে গেলেন। উম্মুল মু'মিনীনের (রা) সাথে পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত হলো যে, সংশোধনের ঝান্ডা বুলন্দ করতে হবে। সুতরাং তাঁরা উম্মুল মু'মিনীনের (রা) সঙ্গে বসরা রওয়ানা হলেন এবং সেখানে পৌঁছা পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ তাঁদের বাহিনীতে শামিল হয়ে গেলো। হযরত আলী (রা) এই পরিস্থিতির কথা জানতে পেরে তিনিও নিজের বাহিনী নিয়ে মুকাবিলার জন্য অগ্রসর হলেন। উভয় পক্ষে উম্মাতের শ্রেষ্ঠতম মানুষরা ছিলেন। তাঁরা যদি পরস্পর সংঘর্ষশীল না হতেন তাহলে সমঝোতার কোন পথ হয়তো বের হয়ে আসতো। কিন্তু কিছু মানুষ মিথ্যা কথা ও গুজব ছড়িয়ে সংঘর্ষ আবশ্যিক করে তুললো এবং "উষ্ট্রের যুদ্ধের" দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হলো। তাবারী, ইবনে সা'দ, ইবনে আছির, হাফেজ ইবনে হাজার, হাফেজ ইবনে আবদুল বার এবং অন্য আরো নেতৃস্থানীয় চরিতকার বর্ণনা করেছেন, যুদ্ধের শুরুতে হযরত আলী (রা) হযরত তালহা (রা) ও হযরত যোবায়েরকে (রা) পয়গাম পাঠালেন যে, আপনারা আমার নিকট এসে আলোচনা করুন। উভয় বুজর্গ হযরত আলীর (রা) নিকট গেলেন। এ সময় তিনি তাদেরকে হুজুরের (সা) কতিপয় ইরশাদ স্মরণ করালেন। তার ফল এই হলো যে, হযরত যোবায়ের (রা) যুদ্ধের ময়দান থেকে সরে পৃথক চলে গেলেন এবং হযরত তালহা (রা) প্রথম কাতারের পরিবর্তে পেছনের কাতারে গিয়ে দাঁড়ালেন। এ

সময় মারওয়ান ইবনুল হাকাম একটি বিষাক্ত তীর তাঁর প্রতি নিক্ষেপ করলেন। এই তীর তাঁর হাটুতে (অথবা পা) বিদ্ধ হলো এবং তার ব্যথায় মুসলিম উম্মাহর এই মহান ব্যক্তি শাহাদাত লাভ করেন।

এখানে প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, মারওয়ান কেন তাঁর ওপর তীর নিক্ষেপ করলো। কেননা উভয়েই একই বাহিনীতে ছিলেন। ইবনে খালদুন এবং অন্য কতিপয় ঐতিহাসিক তার জবাব এই দিয়েছেন যে, বনু উমাইয়ার সাধারণ লোকদের ধারণা এই ছিল যে, সেইসব মানুষ কোন না কোন ভাবে ওসমান (রা) হত্যার জন্য দায়ী যারা বিশৃংখলার সময় মদীনায় উপস্থিত ছিলেন। অথচ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেননি অথবা যাঁরা সাইয়েদেনা হযরত ওসমানের (রা) সঙ্গে কখনো কোন ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেছিলেন মারওয়ান হযরত তালহাকে (রা) এ ধরনের মানুষই মনে করতেন এবং তাঁর প্রতি খুব খারাপ ধারণা ছিল। এ জন্য সে তাঁর রক্তে হাত রঞ্জিত করেছিলো।

[আধুনিক যুগের কতিপয় আলেম এবং ঐতিহাসিক "উষ্ট্রের যুদ্ধ" এবং হযরত তালহার (রা) ব্যাপারে উপরেল্লিখিত বর্ণনার সমালোচনা করেছেন এবং সনদের সিলসিলার দিক থেকে তাকে দলিল হিসেবে গ্রহণীয় মনে করেননি। বিতর্ক সৃষ্টি আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যাহোক, একটা কথা পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে বলা যায় যে, হযরত তালহা (রা) যাকিছু করেছিলেন তা নেক নিয়তের সাথে করেছিলেন এবং তাতে তাঁর কোন ব্যক্তিস্বার্থ ছিল না।]

ইমাম বুখারী (র) "তারিখুস সাগীরে" লিখেছেন যে, উষ্ট্রের যুদ্ধে হযরত তালহা (রা) সর্বপ্রথম শহীদ হন। এটা ৩৬ হিজরীর ১০ই জমাদিউস সানী জুময়ার দিনের ঘটনা। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৬৪ বছর।

ইমাম জাহাবী (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু হযরত তালহার (রা) শাহাদাতে খুবই আফসোস করেছিলেন।

ইবনে সায়াদ (র) তাবকাতে লিখেছেন যে, যুদ্ধের পর হযরত তালহার (রা) এক পুত্র হযরত আলীর (রা) খিদমতে হাজির হলে তিনি তাঁকে খুব মুহাব্বাতের সাথে নিজের নিকট বসিয়েছিলেন। তাঁর সম্পত্তি তাঁকে ফেরত দেন এবং বলেন, "আমি আশা করি আখিরাতে আমার ও তোমার পিতার মধ্যে সেই মুয়ামেলা পেশ হবে যার উল্লেখ আল্লাহ তায়ালা কুরআনে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ

"আমরা তাদের অন্তর থেকে বিরক্তি দূর করে দেব এবং তারা ভাইয়ের মত একে অপরের সামনে সিংহাসনে বসে থাকবে।"(আল হিজর ঃ ৪৭)

হযরত তালহাকে (রা) যুদ্ধের ময়দানের এক কোণায় দাফন করা হলো। কিন্তু স্থানটি ছিল নীচু। বৃষ্টির সময় পানিতে ডুবে যেত। আল্লামা ইবনে আছির (র) "উসুদুল গাব্বাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, এক ব্যক্তি পরপর তিনবার হযরত তালহাকে (রা) স্বপ্নে দেখলেন। তিনি নিজের লাশকে সেই কবর থেকে স্থানান্তরের কথা বলছিলেন। সেই ব্যক্তি নিজের স্বপ্নের কথা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে (রা) বর্ণনা করলেন। এ সময় তিনি হযরত আবু বাকরাহ (রা) বিন মাসরুহর বাড়ী দশ হাজার দিরহামে কিনে তাতে কবর খুঁড়ালেন এবং হযরত তালহার (রা) লাশ সেখানে স্থানান্তর করালেন। দর্শকরা বর্ণনা করেছেন, এতদিন পরও হযরত তালহার (রা) পবিত্র দেহ সম্পূর্ণ অক্ষত ও তরতাজা ছিল। এমনকি চক্ষুতে যে কর্পর লাগানো হয়েছিল তাও সম্পূর্ণরূপে ঠিকঠাক ছিল।

হযরত তালহা (রা) নিজের জীবনে (বিভিন্ন সময়) বেশ কয়েকটি বিয়ে করেছিলেন। স্ত্রীদের নাম হলো ঃ হামনা (রা) বিনতে জাহাশ, খাওলা বিনতে কা'কা' তামিমী (রা), সা'দা বিনতে আওফ, উম্মে আবান (রা) বিনতে উতবা, উম্মে কুলছুম বিনতে আবু বকর সিদ্দীক (রা), উম্মুল হারিছ বিনতে কাসামা, ফারয়াতা বিনতে আলী তুগলাবী, রুকাইয়া (রা) বিনতে আবু উমাইয়া, ফারিয়া (রা) বিনতে আবু সুফিয়ান (রা)—হযরত তালহার (রা) চার স্ত্রী হামনা (রা), রুকাইয়া (রা), ফারিয়া (রা) এবং উম্মে কুলছুম (রা) প্রিয় নবীর (সা) শ্যালীকা ছিলেন। হামনা (রা) হযরত যয়নাব (রা) বিনতে জাহাশের, রুকাইয়া হযরত উম্মে সালামার (রা), ফারেয়া (রা) হযরত উম্মে হাবিবার (রা) এবং উম্মে কুলছুম হযরত আয়েশার (রা) বোন ছিলেন।

পুত্রদের নাম হলো ঃ মুহাম্মাদ (রা) (সাজ্জাদ), ইমরান, মূসা, ইসহাক, ইসমাঈল, ইসা, ইয়াহিয়া, ইয়াকুব, জাকারিয়া, ইউসুফ ও সালেহ।

কন্যারা হলেন ঃ আয়েশা, উম্মে ইসহাক, সা'বাহ এবং মরিয়ম।

ইবনে হাযাম বর্ণনা করেছেন যে, উম্মে ইসহাককে হযরত হাসান (রা) বিন আলী (রা) বিয়ে করেছিলেন। তাঁর ওফাতের পর হযরত হোসাইন (রা) বিন আলীর (রা) সঙ্গে বিয়ে হয় এবং তাঁর গর্ভেই হযরত ফাতিমা (রা) বিনতে হোসাইন (রা) জন্ম গ্রহণ করেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) পৌত্র আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান (রা) এবং হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়ামের পুত্র হযরত মাসয়াবও হযরত তালহার জামাতা ছিলেন।

হযরত তালহার (রা) বড় পুত্র মুহাম্মাদ (রা) সাহাবীর মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তিনি বেশী বেশী ইবাদাতের কারণে সাজ্জাদ উপাধিতে মশহুর হয়ে গিয়েছিলেন। তিনিও উষ্ট্রের যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করেন। এক পুত্র ইয়াকুব হিররার ঘটনায় শহীদ হন।

হযরত তালহা (রা) শৈশবকাল থেকেই ব্যবসাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। মদীনা এসেও তিনি এই পেশা অব্যাহত রাখেন এবং হেজাজের সফল ব্যবসায়ীদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। তাছাড়া হিজরতের পর তিনি কৃষিকাজও শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বারের একটি জায়গীরও তাঁকে দান করেন। তিনি এই জায়গীরের ওপরই ভরসা করেননি বরং ইরাকে আরো অনেক জমি খরিদ করেন। সেই সব জমির মধ্যে "কানাত" ও "সারাত" খুব প্রসিদ্ধ। এসব স্থানে তিনি ব্যাপকভাবে কৃষি কাজ করেন। ২০টি উট জমিতে পানি সেচের কাজে নিয়োজিত থাকতো। এসব জমিতে এত প্রচুর ফসল উৎপন্ন হতো যে, ইবনে সায়াদের বক্তব্য অনুযায়ী তার প্রতিদিনের আয়ের পরিমাণ ছিল এক হাজার দিনার। মোটকথা, বাণিজ্য ও কৃষির আয় তাকে অসাধারণ বিত্তশালী করেছিল। কিন্তু তিনি যে ধরনের ধনী ছিলেন তেমনি উদার ও দানশীল ছিলেন। চরিতকাররা তাঁর আল্লাহর পথে ব্যয়, মেহমানদারী কল্যাণের আবেগ এবং দানশীলতার ২০টি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তা থেকে জানা যায় যে, তিনি নিজের সম্পদ হক পথে নির্দ্বিধায় ব্যয় করতেন এবং তিনি ছিলেন দানবীরদের রাজা। হযরত কাবিসা (রা) বিন জাবের বলেছেন যে, আমি দীর্ঘদিন পর্যন্ত হযরত তালহার (রা) সঙ্গে ছিলাম এবং তাঁর থেকে বড় কাউকেই না চাইতেই সম্পদ দানকারী দেখিনি।

কায়েস বিন আবি হাযেম বর্ণনা করেছেন যে, আমি তালহার (রা) চেয়ে বেশী কাউকে না চাইতেই দান করার ব্যাপারে অগ্রগামী দেখিনি।

হযরত তালহা (রা) নবীর (সা) যুদ্ধসমূহে ব্যয় নির্বাহের জন্য মোটা অংকের অর্থ পেশ করতেন। হাফেজ ইবনে হাজার (র) বলেন যে, জি কারদের যুদ্ধের সময় তিনি মুসলমানদের প্রয়োজন অনুযায়ী পানির একটি পুকুর "বিসানে সালেহ" ক্রয় করে ওয়াকফ করেন। মুয়াত্তা ইমাম মালিকে হযরত সালমা (রা) বিন আকওয়া থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত তালহা (রা) পাহাড়ের পাদদেশে একটি কূপ ক্রয় করেন এবং লোকদেরকে খাবার খাওয়ান। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অবশ্যই হে তালহা, তুমি বড় উদার ও দানশীল।

তাবুকের যুদ্ধের ব্যয় প্রসঙ্গেও তিনি মোটা অংক ব্যয় করেন। তাঁর এ ধরনের দানশীলতার জন্য তিনি দানবীর উপাধির মুসতাহিক হয়ে গিয়েছিলেন।

এক রেওয়ায়াতে তাঁর লকব "জাওয়াদ" বলেও বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর পুত্র মূসা (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার পিতাকে ওহোদের যুদ্ধে তালহাতুল খায়ের, তাবুকে তালহাতুল ফাইয়াজ এবং হুনাইনের যুদ্ধে তালহাতুল জাওয়াদ বলেছিলেন।

একবার তিনি হাজরা মাওত থেকে সাত লাখ দিরহামের মোটা অংক পেলেন। এই সমুদয় অর্থ তিনি অভাবী মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন এবং তাঁর স্ত্রীর অংশে এলো শুধুমাত্র এক হাজার দিরহাম।

একবার নিজের একটি সম্পত্তি লাখ দিরহামে হযরত ওসমানের (রা) নিকট বিক্রি করলেন এবং এই সকল অর্থই তিনি আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিলেন।

অন্য আরেকবার চার লাখ দিরহাম তাঁর নিকট এলো। এই সমুদয় অর্থ তিনি নিজের কওম (বনু তাইম)-এর মধ্যে বন্ট করে দিলেন।

ইমাম জাহাবী (র) খাজা হাসান বাসরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত তালহা (রা) তাঁকে সাত লাখ দিরহাম দান করলেন। এত মোটা অংকের অর্থের কারণে সারারাত তিনি ঘুমুতে পারলেন না এবং সকাল হতেই তিনি এই সমগ্র অর্থ আল্লাহর পথে ভাগ করে দিলেন।

তাবকাতে ইবনে সা'দে হযরত তালহার (রা) স্ত্রী সা'দী (রা) বিনতে আওফ থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার তালহা (রা) বাড়ী এলেন। তিনি খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনি এত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কেন? আমি কোন ভুল তো করে ফেলিনি? তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম, তুমিতো উত্তম স্ত্রী। আসল কথা হলো, আমার নিকট অনেক সম্পদ জমা হয়ে গেছে এবং আমি সে'ব্যাপারেই চিন্তা করছি।"

আমি (সা'দী) বললাম, চিন্তার কি আছে। নিজের পরিবার পরিজন এবং কওমের কাছে মানুষ প্রেরণ করুন এবং এই সম্পদ তাদের মধ্যে বন্টন করিয়ে দিন। সুতরাং তিনি তাই করলেন। আমি খাজাঞ্চীকে জিজ্ঞেস করলাম, কত মাল বন্টন করেছ? সে বললো, চার লাখ।

একবার এক গ্রাম্য অভাবী ব্যক্তি তাঁর নিকট এলো এবং কোন আত্মীয়তার সূত্র উল্লেখ করে সওয়াল করলো। হযরত তালহা (রা) বললেন, "এর পূর্বে কেউ কখনো এই আত্মীয়ের সূত্র উল্লেখ করে আমার নিকট সওয়াল করেনি। আমার নিকট জমি আছে এবং হযরত ওসমান (রা) এই জমি তিন লাখ

দিরহামে ক্রয়ে আগ্রহী। চাইলে জমি নিতে পার অথবা তার মূল্যও নিতে পার।

গ্রাম্য লোকটি নগদ অর্থ নেয়াটাই পসন্দ করলো এবং হযরত তালহা (রা) তা খুশীর সাথে দিয়ে দিলেন।

হযরত তালহা (রা) নিজের গোত্রের (বনু তাইম) গরীব ও অভাবগ্রস্ত মানুষের স্থায়ী জামিন ছিলেন। ঋণগ্রস্তদের ঋণ আদায় করে দিতেন এবং গরীব মেয়ে ও বিধবা মহিলাদেরকে নিজের খরচে শাদী করিয়ে দিতেন। সাবিহা তাইমী ত্রিশ হাজার দিরহাম ঋণগ্রস্ত ছিলেন। হযরত তালহা (রা) তা জানতে পেরে তার সকল ঋণ নিজের নিকট থেকে আদায় করে দেন।

আল্লামা ইবনে সা'দ ও হাফেজ জাহাবী বর্ণনা করেছেন, হযরত তালহা (রা) উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাকে (রা) খুবই শ্রদ্ধা করতেন এবং তিনি প্রতি বছর তার খিদমতে দশ হাজার দিরহাম পেশ করতেন। সাধারণ দান-সদকা এবং গরীব মিসকিনদের অভিভাবকত্ব ছাড়া মেহমানদারীও হযরত তালহার (রা) বিশেষ অভ্যাস ছিল। তিনি মেহমানদের খিদমত করে আত্মিক আনন্দ অনুভব করতেন এবং যদি তাদের কোন কাজ আটকে থাকতো তাহলে সেই কাজ পূর্ণ করে দেয়ায় কোন অশান্তি বোধ করতেন না।

হযরত তালহা (রা) যত পরিমাণ ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করতেন আল্লাহ তায়ালা তাঁর থেকেও বেশী সম্পদ দান করতেন। সুতরাং তিনি যখন শাহাদাত পেলেন তখন পরিবার পরিজনের জন্য অনেক সম্পদ রেখে যান। একবার আমীরে মুয়াবিয়া (রা) তাঁর পুত্র মূসাকে (র) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের পিতা তোমাদের জন্য কি রেখে গেছেন। তিনি জবাবে বললেন, অনেক পরিমাণ সোনা ও রূপা ছাড়াও দু'লাখ দিনার এবং ২২ লাখ দিরহাম নগদ এবং তিনকোটি দিরহামের সম্পত্তি। এই সমুদয় মাল তিনি হালালভাবে হাসিল করেছিলেন এবং আল্লাহর পথে অকুণ্ঠ চিত্তে ব্যয়ের পরও তাঁর নিকট বেঁচে গিয়েছিল।

সাইয়েদেনা হযরত তালহা (রা) যদিও বছরের পর বছর মহানবীর (সা) সাহাবীয়াতের ফয়েজ লাভ করেছিলেন। কিন্তু হাদীস বর্ণনাতে তিনি খুব সতর্ক ছিলেন। এজন্য তাঁর থেকে খুব কম হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর রাবীদের মধ্যে হযরত জাবের (রা), সায়েব (রা) বিন ইয়াযিদ, আবদুর রহমান (রা) বিন ওসমান তাইমী, কায়েস (র) বিন আবু হাযেম, মালিক (র) বিন আবি আমের আসবাহী, আবদুল্লাহ (র) বিন শাদ্দাদ ইবনুল হাদ এবং আবু ওসমান নাহদী প্রমুখ শামিল ছিলেন। তিনি নিজের হাদীসসমূহে উম্মুহাতের মাসয়ালা এবং

দ্বীনের উসুল সম্পর্কিত মাসয়ালা বর্ণনা করতেন। যেমন সহীহ বুখারীর একটি হাদীসে বলেন ঃ

"রাসূলের (সা) নিকট নাজদের এক লোক এলো। তার চুল ছিল উসকো-খুশকো। আমরা তার বিড়বিড় আওয়াজ শুনলাম। কিন্তু কি বলছিল তা বুঝতে পারলাম না। সে যখন নিকটে এলো তখন জানতে পেলাম যে, ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, দিন-রাতে পাঁচ নামায। বললো, তাছাড়া আরো কিছু নামাযও কি আমার দায়িত্বে আছে ? তিনি বললেন, তোমার ওপর আর কোন নামায ফরজ নেই। কিন্তু, হাঁ নিজের পক্ষ থেকে পড়তে চাইলে পড়তে পারো। তারপর সে রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, রমযানের রোযা। সে বললো, আরো কিছু ? বললেন, না। তবে, হাঁ নিজের তরফ থেকে কিছু রাখতে চাইলে রাখতে পারো। অতপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে যাকাতের কথা উল্লেখ করলেন। বললো, আমার দায়িত্বে কি যাকাত ছাড়াও কিছু দান করা ফরয ? বললেন, না। তবে, হাঁ নিজের পক্ষ থেকে কিছু দিতে চাইলে দেবে। এই সওয়াল-জওয়াবের পর তিনি (সা) তাকে ইসলামের অন্য আহকামও শিখালেন। সেই ব্যক্তি যখন রওয়ানা দিল তখন একথা বলছিল, আল্লাহর কসম, তা থেকে বেশীও করবো না এবং তার থেকে কমও করবো না। (আমার পক্ষ থেকে কিছু বাড়াবোও না এবং আল্লাহ তায়ালা আমার ওপর যা ফরয করেছেন তাতে কমও করবো না)। তিনি বললেন, যদি সে ঠিক বলে থাকে তাহলে সফল হয়েছে।"

(বুখারী কিতাবুল হায়েল)

ওহোদের যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট হযরত তালহার (রা) বর্ণিত হাদীস মাগাযিতে বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। সহীহ বুখারীতে হযরত তালহা (রা) থেকে একটি ফিকাহর মাসয়ালাও বর্ণিত আছে।

আবদুর রহমান বিন ওসমান তাইমী থেকে বর্ণিত আছে যে, "আমরা তালহা (রা) বিন উবায়দুল্লাহর সাথে ছিলাম এবং ইহরাম বেঁধেছিলাম। তালহার (রা) জন্য হাদিয়া হিসেবে পাখীর গোশত এলো। তিনি সে সময় ঘুমিয়েছিলেন। আমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ সেই গোশত খেলো এবং কেউবা খেলো না। তালহা (রা) যখন ঘুম থেকে জাগলেন তখন যারা গোশত খেয়েছিল তাদের মত সমর্থন করলেন এবং বললেন আমরা রাসূলের (সা) (এ ধরনের হাদিয়া) সাথে এ ধরনের গোশত খেয়েছি।" মহানবীর (সা) প্রতি হযরত তালহার (রা) ছিল গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। তাঁর নিকট থেকে যা কিছু শুনতেন তা জীবনের জপমালা বানিয়ে নিতেন এবং তার ওপর আমলের চেষ্টা করতেন। একবার হুজুরের (সা) একটি ইরশাদ মুবারক ভুলে

গিয়েছিলেন। ফলে খুব পেরেশান হলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁকে পেরেশান ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখতে পেলেন। কি ব্যাপার, কারোর সঙ্গে ঝগড়া হয়নি তো ? তিনি বললেন, না। ব্যাপার হলো, আমি রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছিলাম যে, কোন বান্দা যদি মৃত্যুর সময় একটি কালেমা যবান দিয়ে উচ্চারণ করে তাহলে রুহ কবজের কষ্ট দূর হয়ে যাবে এবং তার চেহারা উজ্জল হয়ে যাবে। এই কালেমা আমি ভুলে গেছি। এ জন্য আমি পেরেশান হয়ে পড়েছি।

হযরত ওমর ফারুক (রা) বললেন, তুমি কি এই কালেমা থেকেও বেশী মর্যাদাবান কালেমা জানো যা হুজুর (সা) নির্দেশ দিয়েছিলেন অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। হযরত তালহা (রা) এই কালেমা শুনে খুশী হয়ে গেলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম, এই সেই কালেমা। (মুসনাদে আহমদ হাম্বল)

সাইয়েদেনা হযরত তালহার (রা) চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামিতা, কঠোর অবস্থায় ধৈর্য ধারণ রাসূল প্রেম, আত্মোৎসর্গীকৃত মনোভাব, বীরত্ব, আল্লাহর পথে ব্যয়, খিদমতে খাল্‌ক, মেহমানদারী এবং সুন্দর আচরণ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তাঁর জীবনের বেশীর ভাগ দিকই ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর সুন্দর আচরণের সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই ঘটনা থেকে পাওয়া যায়। হযরত উম্মে আবান (রা) বিনতে উতবা বিন রাবিয়াকে অনেক শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি শাদীর পয়গাম প্রেরণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত তালহাও (রা) ছিলেন। উম্মে আবান (রা) হযরত তালহা (রা) ছাড়া বাকী সকলের পয়গাম এই বলে প্রত্যাখ্যান করেন যে, আমি তালহার (রা) সুন্দর চরিত্র ও গুণাবলী সম্পর্কে ওয়াকিফ আছি। তিনি হাসতে হাসতে বাড়ী আসেন। যখন বাইরে যান তখন ঠোঁটে থাকে মুচকি হাসি। কিছু চাইলে নির্দ্বিধায় দিয়ে দেন এবং চুপ থাকলে চাওয়ার অপেক্ষা করেন না। নিজেই দেওয়ার ব্যাপারে অগ্রগামী হন। যদি কোন কাজ করে দেই তাহলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ভুল হয়ে গেলে ক্ষমা করে দেন। (কানযুল উম্মাল)।

মশহুর সাহাবী হযরত কাব বিন মালিক আনসা তাবুকের যুদ্ধে শরীক হননি। হুজুর (সা) মদীনা মুনাওয়ারা ফিরে তার সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার নির্দেশ দিলেন। যখন তাঁর তাওবা কবুল হলো এবং তিনি রাসূলের (সা) সাথে মুলাকাতের জন্য মসজিদে এলেন তখন হযরত তালহা (রা) যারপর নাই আনন্দিত হলেন। তিনি দৌড়ে গিয়ে হযরত কাবের (রা) সাথে উষ্ণ আলিঙ্গন করলেন এবং তাওবা কবুলের মোবারকবাদ দিলেন। বস্তুত আর কেউই এমনকি হযরত কাবের (রা) নিজের কওমও (আনসার) এমন অসাধারণ খুশী ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেনি। এ জন্য তাঁর উপর হযরত তালহার (রা) খুলুসিয়াত ও মুহাব্বাতের এত গভীর প্রভাব পড়লো যে, সারা জীবন তিনি তা ভুলতে পারেননি। সহীহ বুখারীতে স্বয়ং হযরত কায়াব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে ঃ

"তালহা (রা) বিন উবায়দুল্লাহ আমার দিকে দৌড়ে এলো। আমার সঙ্গে মুসাফিহা করলো এবং মুবারকবাদ দিল। আল্লাহর কসম, তিনি ছাড়া মুহাজিরদের মধ্য থেকে কেউ উঠে আমার নিকট এলো না এবং আমি তালহার (রা) এই আচরণ কখনো ভুলবো না।"(কিতাবুল মাগাযি, তাবুকের যুদ্ধ)

ফাজায়েল ও প্রশংসার দিক থেকে হযরত তালহা (রা) খুব উঁচু মর্যাদায় সমাসীন। তিনি শুধুমাত্র আশারায়ে মুবাশশারার অন্যতমই ছিলেন না, বরং ওহোদের যুদ্ধে তাঁকে ব্যক্তিগতভাবেও জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। সকল যুদ্ধেই রাসূলের (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। বাইয়াতে রিদওয়ানের সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং 'আসহাবিশশাজারাহর' মধ্যে পরিগণিত হন। রাসূলের (সা) নিকট থেকে খায়ের, ফাইয়াজ ও জাওয়াদ লকবসমূহে বিভূষিত হন। সহীহ মুসলিমে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সা) হিরা পাহাড়ের ওপর ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আবুবকর (রা), ওমর (রা), আলী (রা), ওসমান (রা), তালহা (রা) এবং যোবায়েরও (রা) ছিলেন। পাথর (চাটান অথবা পাহাড়) হেলতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, থেমে যা। তোর ওপর নবী, সিদ্দিক ও শহীদ আছে।" (কিতাবুল ফাজায়েল)

এসব বুজর্গের মধ্যে যারা সে সময় রাসূলের (সা) নিকট উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) ছাড়া অবশিষ্ট সকল বুজর্গ (হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আলী, হযরত তালহা এবং হযরত যোবায়ের) শাহাদাতের মর্যাদায় সমাসীন হন। সকল নেতৃস্থানীয় সাহাবী (রা) হযরত তালহার (রা) গুণমুগ্ধ ছিলেন এবং প্রকাশ্যে তাঁর প্রশংসা করতেন। ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, উষ্ট্রের যুদ্ধের পূর্বে হযরত আলী (রা) হযরত তালহার (রা) বিরোধিতা সম্পর্কে জানতে পেরে বললেন, এ সময় পর্যন্ত আমি চার ব্যক্তির বিরোধিতার খবর পেয়েছি। তাদের মধ্যে সবচেয়ে নেক ও দানশীল হলেন তালহা (রা)। (উসুদুল গাব্বাহ)

তিনি যখন উষ্ট্রের যুদ্ধে শাহাদাত পেলেন তখন হযরত আলী মুরতাজা (রা) যুদ্ধের পর তাঁর লাশের নিকট তাশরীফ নিলেন। চেহারার উপর থেকে মাটি পরিষ্কার করলেন এবং বললেন আবু মুহাম্মাদ! এটা আমার জন্য খুবই কষ্টদায়ক যে, তোমাকে তারা খচিত আসমানের নীচে ধূলি ধূসরিত অবস্থায় দেখতে পাবো। তারপর বললেন, হায়! আমি যদি এই ঘটনার বিশ দিন পূর্বে ইন্তিকাল করতাম। একথা বলে আমীরুল মু'মিনীন (রা) এবং তাঁর সঙ্গীরা কেঁদে দিলেন এবং খুব কাঁদলেন।

হযরত জাফর তাইয়ার (রা)

বিশ্বনবী (সা) নবুয়ত প্রাপ্তির পর প্রথম তিনবছর অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে তাবলীগের দায়িত্ব আঞ্জাম দিচ্ছিলেন। নবুয়তের চতুর্থ বছরের প্রথম দিকে যখন এই নির্দেশ অবতীর্ণ হলো ঃ

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ـ الحجره : ٩٤

"কাজেই হে নবী, যে জিনিসের হুকুম তোমাকে দেয়া হচ্ছে তা জোরে-শোরে উচ্চ কণ্ঠে বলে দাও এবং শিরককারীদের বিন্দুমাত্র পরোয়া করো না।"(আল হিজর ঃ ৯৪)

এই আয়াত নযিলের পর হুজুর (সা) লোকদেরকে প্রকাশ্যভাবে হকের দিকে আহবান শুরু করলেন। ভাগ্যবান আত্মার মানুষরা হক দাওয়াত পেতেই কালবিলম্ব না করে দাওয়াতে সাড়া দিলেন। কিন্তু সেই সব মানুষ যাদের স্বভাব-প্রকৃতিই কুফর ও শিরকের ওপর গড়ে উঠেছিল তারা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গেল। তারা সেই সব মানুষ ছিল যারা হুজুরকে (সা) সাদেক বা সত্যবাদী এবং আমানতদার বলতে কোন কুণ্ঠা করতো না। কিন্তু যখন রহমতে আলম (সা) তাদেরকে হকের দিকে আহবান জানালেন, তখন তারা প্রকাশ্যে শত্রু হয়ে গেল এবং হকপন্থীদের রক্ত পিপাসু বনে গেল। এই হতভাগারা তাওহীদ-পন্থীদের ওপর জুলুম-নির্যাতনের এমন এমন নির্মম কাহিনী সৃষ্টি করলো যে, মানবতা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। তাতে হকপন্থীদের জন্য মক্কায় জীবন কাটানোই কঠিন হয়ে পড়লো। এক বছর তো কোনমতে কাটলো। কিন্তু যখন কট্টর কুরাইশদের নির্যাতন চরম পর্যায়ে পৌছলো তখন রহমতে আলম (সা) নবুয়তের পাঁচ বছর পর রজব মাসে নিজের মজলুম জান নিছারদেরকে বললেনঃ

"তোমরা মক্কা থেকে হিজরত করে হাবশা চলে যাও। এটাই তোমাদের জন্য ভালো হবে। সেখানে এমন একজন বাদশাহ আছে যে কারোর ওপর জুলুম হতে দেয় না। তা ভালো বা কল্যাণের ভূমি। তোমরা সেখানে অবস্থান কর। ইতিমধ্যে আল্লাহ তায়ালা এই মুসিবত দূর করার কোন পরিস্থিতি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করে দেবেন।"

হুজুরের (সা) ইঙ্গিত পেয়ে ১১ জন পুরুষ ও চার মহিলার সমন্বয়ে গঠিত হকপন্থীদের একটি কাফেলা সর্বপ্রথম মক্কার মাটিকে বিদায় জানান এবং সুদীর্ঘ (জল ও স্থল) সফরের পর হাবশা গিয়ে উদ্বাস্তুর জীবন গ্রহণ করেন। এই কাফেলার রওয়ানার পরও দ'এক জন করে প্রায়ই হিজরত করে হাবশা যেতে থাকেন। নবুয়তের ৬ষ্ঠ বছরে ৮০ থেকে বেশী পুরুষ এবং ১৮-১৯ জন মহিলা

সমন্বয়ে গঠিত হকপন্থীদের অন্য একটি কাফেলা হাবশা হিজরত করেন। এমনিভাবে হাবশায় মুসলমানদের সংখ্যা বেশী হয়ে গেল এবং সেখানে তাঁরা নির্ঝঞ্ঝাট জীবন কাটাতে লাগলো। মক্কার মুশরিকরা যখন শুনতো যে হাবশায় মুসলমানরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে জীবন যাপন করছে তখন তারা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠতো। অবশেষে তারা পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নাজ্জাশী বাদশাহর নিকট একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিল। এই প্রতিনিধি দলটি সেখানে গিয়ে বাদশাহকে সেখান থেকে মুসলমানদেরকে বের করে দেয়ার জন্য উৎসাহ দেবে। বস্তুত এই প্রস্তাব অনুযায়ী তারা আমর ইবনুল আছ এবং আবদুল্লাহ বিন আবি রবিয়া (আবু জেহেলের বৈপিত্রীয় ভাই)-কে অনেক মূল্যবান উপঢৌকন (যার মধ্যে মক্কার উত্তম ফিনিশড লদার দিল) সহ হাবশা রওয়ানা করলো।

কুরাইশ প্রতিনিধিদল হাবশা পৌঁছে সর্বপ্রথম নাজ্জাশীর বড় বড় আমলাদের মধ্যে প্রাণ খুলে উপঢৌকন বন্টন করলো এবং তোষামোদের কথা বলে তাদেরকে নিজেদের সমর্থক বানিয়ে নিল। তারা কুরাইশ প্রতিনিধি দলের সাথে পাক্কা প্রতিশ্রুতি দিল যে, তারা বাদশাহর সামনে তাদের দাবীর সমর্থন জানাবে এবং মুসলমানদেরকে হাবশা থেকে বের করে দেয়ার পক্ষে জোর মত প্রকাশ করবে। তারপর আমর ইবনুল আছ ও আবদুল্লাহ বিন আবি রাবিয়া উভয়েই নাজ্জাশীর দরবারে হাজির হলো এবং অনেক মূল্যবান উপঢৌকন তার খিদমতে পেশ করে আরজ করলো ঃ

"জাঁহাপনা! আমাদের কওম কুরাইশের কতিপয় ব্যক্তি নিজের বাপ-দাদার দ্বীন পরিত্যাগ করে ও স্বদেশ ছেড়ে এখানে চলে এসেছে। তারা জাঁহাপনার দ্বীনও গ্রহণ করেনি। বরং একটি নতুন দ্বীন উদ্ভাবন করেছে। এ জন্য আমাদের কওমের বুজর্গরা আমাদেরকে হুজুরের খিদমতে এই নিবেদনসহ প্রেরণ করেছে যে, জাঁহাপনা যেন তাদেরকে স্বদেশ ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন।"

বাদশাহ তখনো তাদের কথার কোন জবাব দেননি। এমন সময় আমলারা চারদিক থেকে তাদের দাবীর সমর্থন জানাতে শুরু করলো এবং বাদশাহকে আশ্রয় গ্রহণকারীদেরকে অবশ্যই দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করতে লাগলো। তারা বললো, জাঁহাপনা! আশ্রয় গ্রহণকারীদের ব্যাপারে তাদের কওম ও স্বদেশের মানুষ আমাদের চেয়ে বেশী জানে এবং তাদের দোষত্রুটি তারাই ভালো অবহিত।

নাজ্জাশী ছিলেন একজন সুন্দর প্রকৃতি ও স্বভাবের এবং ন্যায় মেযাজের শাসক। তাঁর ওপর তাদের কথার কোন প্রভাব হলো না। তিনি বললেন ঃ

"এভাবে তো আমি তাদেরকে এদেশ থেকে বের করবো না। কারণ, তারা আমার ওপর আস্থা এনেছে এবং আমার আশ্রয়ে এসেছে। আমি তাদেরকেও এই প্রতিনিধি দলের বর্ণনা কতটুকু সত্য সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস না করে কিভাবে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারি ?"

তারপর তিনি হাবশার মুহাজিরদেরকে নিজের দরবারে ডেকে পাঠালেন। কুরাইশের প্রতিনিধি দল এবং মুহাজিররা একই সময় দরবারে হাজির হলো। কুরাইশ প্রতিনিধিরা বাদশাহকে দেখেই সিজদায় অবনত হয়ে পড়লো। কিন্তু মুহাজিরদের কেউই সিজদা করলেন না। বাদশাহ তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"তোমরা এটা কি করেছ। নিজের কওমের দ্বীনও ছেড়ে বসেছ। আমার দ্বীনও গ্রহণ করোনি এবং দুনিয়ার অন্য কোন দ্বীনেও দাখিল হওনি। শেষে তোমরা এ কোন ধরনের নতুন দ্বীন উদ্ভাবন করেছ ?"

নাজ্জাশীর কথা শুনে মুহাজিরা পরস্পরের প্রতি তাকালো এবং তাঁদের মধ্যেকার ২৫-২৬ বছরের এক অত্যন্ত সুদর্শন যুবক সামনে অগ্রসর হলেন। তাঁর কপাল সৌভাগ্যের দ্যুতিতে ঝলমল করছিল এবং চেহারা ঈমানের আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠছিল। তিনি খুব গম্ভীর আওয়াজে হাবশার বাদশাহকে এই বলে সম্বোধন করলেন ঃ

"হে বাদশাহ ! আমরা জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত একটি জাতি ছিলাম। মূর্তি পূজা করতাম। মৃত জীব-জন্তু খেতাম। লজ্জাহীনতার কাজ করতাম। আত্মীয়তার বিচ্ছেদ ঘটাতাম। প্রতিবেশীর সাথে করতাম অসদাচরণ। আমাদের মধ্যে যে মজবুত ও শক্তিশালী হতো সে দুর্বলদের খেয়ে ফেলতো। আমরা এই অন্ধকারের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছিলাম। এমন সময় আল্লাহ তায়ালা আমাদের মধ্যে স্বয়ং আমাদের থেকেই একজন রাসূল প্রেরণ করেন। এই রাসূলের নসব, সত্যবাদিতা, আমানতদারী এবং পবিত্রতা সম্পর্কে আমরা ভালোভাবে জানি। তিনি আমাদেরকে আল্লাহর দিকে ডেকেছেন। তিনি বলেছেন, আমরা যেন আল্লাহকে একক হিসেবে মানি এবং তাকেই ইবাদাত করি। মূর্তি ও পাথর পূজা যেন সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করি। এসব মূর্তি ও পাথরকে আমাদের বাপ-দাদারা ইবাদাত করতো। তিনি আমাদেরকে সত্য বলা, আমানতদারী, আত্মীয়দের খেয়াল রাখা, প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর আচরণ, হারাম কাজ ও রক্তপাত থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদেরকে বেহায়াপনা, মিথ্যা কথা বলা, ইয়াতিমের মাল খাওয়া এবং পবিত্র মহিলাদের ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ থেকে বিরত রেখেছেন। তিনি আমাদেরকে শুধুমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করা এবং কাউকে তার সাথে অংশীদার না করার

তালকিন দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে নামায পড়ার, যাকাত দানের এবং রোযা রাখার নির্দেশও দিয়েছেন। আমরা এই ব্যক্তিত্বের ওপর সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে ঈমান এনেছি এবং তার সত্যতার স্বীকৃতি দিয়েছি এবং যে দ্বীন তিনি আল্লাহর তরফ থেকে এনেছেন তার আনুগত্য করেছি। আমরা শুধু আল্লাহর ইবাদাত করে থাকি এবং কাউকে তাঁর সাথে অংশীদার করি না। তিনি যেসব বস্তু আমাদের জন্য হালাল বলে আখ্যায়িত করেছেন তাকে আমরা হালাল বলে জানি। ব্যাস, এই কথাতেই আমাদের কওম আমাদের ওপর বিগড়ে গেছে। তারা আমাদেরকে উত্যক্ত করা শুরু করলো। যাতে আমরা আল্লাহর ইবাদাতের পরিবর্তে পুনরায় মূর্তিদের পূজা করি এবং সেসব নাপাক বস্তু যাকে আমরা হালাল বানিয়ে রেখেছিলাম তাকে পুনরায় হালাল মনে করি। অবশেষে যখন তারা আমাদের ওপর কঠোরতা অবলম্বন ও নির্যাতন চালালো এবং আমাদেরকে স্বধর্মের ওপর আমল করা থেকে বিরত করার লক্ষ্যে দেশে জীবন ধারণই কঠিন করে তুললো, তখন আমরা (বাধ্য হয়ে) আপনার দেশে যাত্রা করি এবং সবকিছু পরিত্যাগ করে আপনাকে এবং আপনার প্রতিবেশীত্বকে পসন্দ করি ও আপনার আশ্রয়ে আসি—হে বাদশাহ! আমরা আপনার নিকট আশা করি যে, এখন এখানে আমাদের ওপর জুলুম হবে না।"

যুবকটির প্রভাবপূর্ণ বক্তৃতা শেষ হলো। দরবারে তখন পিনপতন নীরবতা। মনে হচ্ছিল যে, এই বক্তৃতার প্রতিটি শব্দ দরবারীদের বুকে বিদ্ধ হয়ে গেছে। নাজ্জাশী যুবকটির প্রতি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ "সেই কালামের কোন অংশ কি তোমার স্মরণ আছে যা তোমাদের নবীর (সা) ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে বলে তোমরা বলে থাকো ?"

যুবক জবাব দিলো, "জ্বী, হ্যাঁ।"

বাদশাহ বললেন, "ঠিক আছে, তা আমার সামনেও পড় দেখি।"

যুবকটি অত্যন্ত প্রভাবপূর্ণ ভঙ্গিমায় সূরায়ে মারইয়াম পাঠ শুরু করলেন। তিনি কেবল প্রথম কয়েকটি আয়াতই পাঠ করেছিলেন। এমন সময় বাদশাহর ওপর ভাবাবেশ শুরু হয়ে গেল এবং তিনি এত কাঁদলেন যে, তার দাড়ি ভিজে গেল। তার পাদরীও এত কাঁদলো যে, তার সামনে যে সহিফা ছিল তাও ভিজে গেল। সে সময় বাদশাহর মুখ দিয়ে অযাচিতভাবে এই বাক্য বের হয়ে গেল ঃ

"আল্লাহর কসম, এই কালাম এবং যে কালাম হযরত মূসা (আ) এনেছিলেন উভয়ই একই প্রস্রবণ থেকে উৎসারিত। আমি তোমাদেরকে অবশ্যই তাদের হাওয়ালা করবো না।"

তারপর তিনি কুরাইশের প্রতিনিধিদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"তোমরা এখান থেকে ফিরে যাও। আল্লাহর কসম, এটা কখনই হতে পারে না যে, আমি তাদেরকে তোমাদের হাওয়ালা করে দিব।"

এই পবিত্র ও নির্ভীক যুবক যাঁর যাদুকরী বর্ণনা একটি বিরাট সাম্রাজ্যের শাসকের অন্তর বিগলিত করে ফেলেছিল এবং যিনি নিজের উদ্বাস্তু ভাইদের দিকে আগত অগ্নিশিখাকে ফিরিয়ে দিয়ে হাবশার সামগ্রিক পরিবেশ তাঁদের জন্য উপযুক্ত করে দিয়ে ছিলেন—তিনি ছিলেন হাশেমী বংশের দেদীপ্যমান প্রদীপ সাইয়েদেনা হযরত জা'ফর (রা) বিন আবি তালিব।

সাইয়েদেনা আবু আবদুল্লাহ জাফর (রা) বিন আবি তালিব মহান মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। তাঁর হসব নসব সম্পর্কে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, তিনি রহমতে আলমের (সা) চাচাতো ভাই এবং হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর বুজর্গ সহোদর ছিলেন। হযরত জা'ফর (রা) তাওহীদের দাওয়াতের প্রথম যুগের সেই সময় তাওহীদের ঝান্ডা উঁচু করে ধরার মর্যাদা লাভ করেছিলেন যখন কেবলমাত্র ৩১-৩২ জনের এই ভাগ্য হয়েছিল। ঘটনাটি এমনি ঘটেছিল, একদিন প্রিয় নবী (সা) হযরত আলীর (রা) সাথে নামায পড়ছিলেন। হযরত আবু তালিব নিজের ভাতিজার ও পুত্রের খুশু-খুজু অর্থাৎ একাগ্রতা দেখে খুব প্রভাবিত হলেন এবং জা'ফরকে (রা) বললেন, পুত্র, তুমিও চাচাতো ভাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে যাও। হযরত জা'ফর (রা) সঙ্গে সঙ্গে হুজুরের (সা) বামদিকে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামাযে তাঁর এমন আত্মিক মজা হলো যে, নিজের মন প্রাণ রাসূলে আ'রাবীর (সা) ওপর উৎসর্গ করে বসলেন এবং হুজুরের (সা) হযরত আরকাম (রা) বিন আবিল আরকামের গৃহে আশ্রয় গ্রহণের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করে ফেললেন। তাঁর স্ত্রী হযরত আসমা (রা) বিনতে আমিসও সেই সময়ই ঈমানের মর্যাদায় পূর্ণ হয়েছিলেন। নবুয়াতের চতুর্থ বছরের প্রথম দিকে হুজুর (সা) সাধারণ লোকদেরকে প্রকাশ্যে হকের পয়গাম শুনানো শুরু করলেন। তখন মক্কার মুশরিকদের ক্রোধ ও গোস্বার অগ্নিলাভা পূর্ণ শক্তিতে বিস্ফারিত হলো এবং তারা হকপন্থীদের ওপর জুলুম-নির্যাতনের এক সীমাহীন ধারা শুরু করে দিল। হযরত জা'ফর (রা) ও তাঁর স্ত্রীও কাফেরদের নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পেলেন না। হযরত জা'ফরের (রা) আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি ছিল গভীর আকর্ষণ এবং কাফেররা তাঁর ইবাদাতে বাধা আরোপ করুক এটা তাঁর জন্য ছিল অসহনীয় ব্যাপার। নবুয়াতের পঞ্চম বছরের পর হাবশার মুহাজিরদের প্রথম কাফেলার রওয়ানার কিছু দিন পর হযরত জা'ফর (রা) একদিন প্রিয় নবীর (সা) খেদমতে হাজির হলেন এবং আরজ করলেন ঃ "হে

আল্লাহর রাসূল ! আপনি আমাকে এমন কোন দেশে চলে যাওয়ার অনুমতি দিন যেখানে নির্ভয়ে আল্লাহর ইবাদাত করতে পারি।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "তোমরাও হাবশা চলে যাও। সেটা শান্তির দেশ।"

বস্তুত হুজুরের (সা) ইরশাদ অনুযায়ী নবুয়াতের ৬ষ্ঠ বছরের পর হযরত জাফর (রা) নিজের স্ত্রী সমভিব্যাহারে হাবশার মুহাজিরদের দ্বিতীয় কাফেলায় শামিল হয়ে হাবশা পৌঁছে গেলেন।

আল্লামা তাবারী, কাসতুলানী এবং অন্য আরো কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, হযরত জা'ফর (রা) হাবশা রওয়ানা হওয়ার পূর্বে হুজুরের (সা) নিকট থেকে বিদায় নিতে এলেন। এ সময় তিনি তাঁকে হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর নামে একটি পত্র দিলেন। পত্রে তাকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার পর এও লিখলেন যে, "আমি আমার চাচাতো ভাই জাফরকে অন্য কতিপয় মুসলমানদের সাথে তোমার নিকট প্রেরণ করছি। সে যখন তোমার নিকট আসবে তখন তার মেহমানদারী করবে।" পত্রের এই কয়েকটি ছত্র থেকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, হযরত জা'ফরের (রা) সাথে হুজুরের (সা) সম্পর্ক কত গভীর ছিল। তার কারণ হলো, হযরত জাফর (রা) পূর্ণ যৌবনকালে সব ধরনের ভয়ের মুখোমুখি সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইসলাম গ্রহণের পর নবীর (সা) ফায়েজ লাভ থেকে কোন সুযোগই হাতছাড়া হতে দেননি। শুধুমাত্র নবুয়াতের প্রভাবের কারণেই তিনি ইলম ও ফজলের দিক থেকেই নয় বরং ইবাদাতের প্রতি শওক, যুহুদ ও আল্লাহভীতি এবং ত্যাগ ও পরমুখাপেক্ষী -হীনতার দিক থেকেও অত্যন্ত বুলন্দ মর্যাদায় অভিষিক্ত ছিলেন। এই গুণাবলীর জন্য হাবশার মুহাজিররাও তাঁকে অত্যন্ত ইজ্জত ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন এবং তাঁর সঠিক মত ও বুদ্ধি এবং দুরদর্শিতার ওপর আস্থা রাখতেন। সুতরাং কুরাইশ প্রতিনিধিদল যখন নাজ্জাশীর দরবারে গিয়ে হকপন্থী উদাস্তুদের শান্তি ও নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করলো তখন মুহাজিররা নিজেদের মুখপাত্র হিসেবে তাঁকেই নির্বাচিত করলেন এবং পুনরায় তিনি হকপন্থীদের মুখপাত্রের ভূমিকা এমন সুন্দরভাবে পালন করলেন যে, বিশ্ব হতবাক হয়ে গেল। হাবশার দরবারে তাঁর প্রভাবপূর্ণ বক্তৃতা মুহূর্তর মধ্যে বাতাসের গতি পরিবর্তন করে দিল। এই বক্তৃতা বা ভাষণ ইসলামের ইতিহাসের এমন এক অত্যুজ্জল অংশ যা পাঠ করে আজও নির্জীব অন্তরে ঈমানের উত্তাপ সৃষ্টি হয়ে যায়।

কুরাইশ প্রতিনিধি দলের নাজ্জাশীর দরবারে প্রথম দিনের ব্যর্থতা তাদের আস্থা ও গর্বে প্রচন্ড ধাক্কা দিল। তবুও তারা নিরাশ হলো না এবং মুহাজিরদের ওপর আর একহাত নেয়ার সংকল্প গ্রহণ করলো। আমর ইবনুল আছ নিজের

সঙ্গীকে বললো, খোদার কসম ! কাল আমি এমন একটি কথা নাজ্জাশীকে বলবো যা তাদেরকে শেষ করে দেবে। তার কথাশুনে আবদুল্লাহ বিন রবিয়ার অন্তরে মুহাজিরদের জন্য দয়ার উদ্রেক হলো এবং সে বললো, "আমর, আরে বাদ দাও। তারা আমাদের বিরোধী হতে পারে। কিন্তু তবুও আমাদের সাথে তাদের রক্তের সম্পর্ক রয়েছে এবং তারা আমাদের ওপর কিছু হকতো রাখে।"

আল্লাহর কি শান! সেই আমর ইবনুল আছ যিনি পরে ইসলামের একজন জানবাজ সিপাহী হয়েছিলেন। সে সময় স্বদেশী মুসলমানদের বিরোধিতায় এতোদূর অগ্রসর হয়েছিলেন যে, সে আবদুল্লাহ বিন রবিয়ার (রা) কথা তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখান করলো এবং বললেন, "আল্লাহর কসম, আমিতো কাল নাজ্জাশীকে অবশ্যই বলবো যে, তারা ঈসা বিন মারইয়ামকে (আ) শুধুমাত্র মানুষ মনে করে।" সুতরাং পরের দিন সে অতি প্রত্যুষে নাজ্জাশীর নিকট পৌছলো এবং বললো ঃ

"জাঁহাপনা! এই লোকেরা আপনার পয়গাম্বর ঈসা (আ) ইবনে মারইয়ামের (আ) ব্যাপারে খুব খারাব কথা বলে থাকে। আপনি তাদেরকে একটু ডেকে জিজ্ঞেস করুন যে, তারা ঈসা (আ) ইবনে মারইয়ামকে (আ) কি মনে করে থাকে ?"

আমর ইবনুল আছের কথা শুনে নাজ্জাশী মুহাজিরদেরকে দ্বিতীয় বার ডেকে পাঠালেন। হযরত উম্মে সালমা (রা) সে সময় হাবশায় অবস্থান করছিলেন। তিনি বলেন, মুহাজিরদের জন্য সময়টা ছিল খুব কঠিন। কিন্তু তাঁরা পরস্পর পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, যাকিছুই ঘটুক আমরা নাজ্জাশীর প্রশ্নের জবাবে হককথা ছাড়া কিছুই বলবো না। সুতরাং যখন তাঁরা নাজ্জাশীর দরবারে হাজির হলেন এবং সে প্রশ্ন করলো যে, তোমরা ঈসা (আ) বিন মারইয়ামের (আ) ব্যাপারে কি বলে থাকো ? এ সময় হযরত জা'ফর (রা) সামনে অগ্রসর হয়ে নিশ্চিন্তে বললেন ঃ "হে বাদশাহ! আমরা তাঁর ব্যাপারে তাই বলি, যা আমাদের নবী (সা) আমাদেরকে বলেছেন। আমাদের নবী (সা) বলেন, তিনি আল্লাহর বান্দাহ এবং তার রাসূল এবং তার পক্ষ থেকে একটি রুহ ও একটি কালেমা আছে। যা আল্লাহ পবিত্র কুমারী সতি সাধ্বী মারইয়ামের (আ) ওপর ইলকা করেছেন।"

একথা শুনে নাজ্জাশী নিজের হাত মাটির দিকে প্রসারিত করলেন এবং একটি তংকা উঠিয়ে বললো, "আল্লাহর কসম, তুমি ঈসা (আ) বিন মারইয়ামের (আ) ব্যাপারে যা কিছু বলেছো তা এই তংকার সমানও বেশী কিছু বলোনি।"

নাজ্জাশীর কথা শুনে দরবারে উপস্থিত পাদরী বকাবকি করতে লাগলো। কিন্তু নাজ্জাশী বললো, "তুমি যতই বকাবকি কর, আল্লাহর কসম, যা বলা হয়েছে তাই সত্য কথা।" অতপর সে মুসলমানদেরকে বললো, "যাও, আমার দেশে তোমাদের সবধরনের নিরাপত্তা রয়েছে। যে তোমাদেরকে খারাব বলবে তার নিকট থেকে জরিমানা আদায় করা হবে। আমি যদি পাহাড় সমান সোনাও পাই তাহলে তার বিনিময়ে সামান্যতম বাড়াবাড়ীও সহ্য করতে পারি না।"

অতপর সে নিজের আমলাদেরকে কুরাইশ প্রতিনিধিদল প্রদত্ত উপঢৌকনাদি তাদেরকে ফেরত দানের নির্দেশ দিলেন। সে বললো, এসব উপঢৌকনের আমার কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহর কসম যখন আমার দেশ আমাকে ফেরত দিয়েছিলেন তখন তিনিতো আমার নিকট থেকে কোন ঘুষ নেননি। এখন আমি আল্লাহর ব্যাপারে ঘুষ কেন নেব?

এমনিভাবে কুরাইশ প্রতিনিধি দলকে ব্যর্থমনোরথ হয়ে হাবশা থেকে ফিরে যেতে হলো।

হাবশার হিজরত প্রসঙ্গে অন্য কতিপয় বর্ণনা হযরত জা'ফরের (রা) সত্য কথন ও নির্ভীকতার আরো কিছু ঘটনাও পাওয়া যায়। এক রেওয়ায়াতে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ বলেন যে, মুহাজিরদেরকে যখন নাজ্জাশী নিজের দরবারে তলব করলো তখন হযরত জা'ফর (রা) নিজের সঙ্গীদেরকে বললেন, আজ তোমাদের পক্ষ থেকে আমি কথা বলবো। সুতরাং সকলেই তাঁর পিছনে রওয়ানা দিল। হযরত জা'ফর (রা) দরবারে প্রবেশ করে সালাম করলেন এবং নিয়ম অনুযায়ী সিজদা করলেন না। তাতে দরবারীরা বিরক্ত হলো এবং বললো, "তুমি বাদশাহকে সিজদা কেন করনি?

হযরত জা'ফর (রা) বেধড়ক জবাব দিলেন ঃ "আমরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে সিজদা করি না।"

তারপর হযরত জা'ফর (রা) অত্যন্ত সুন্দরভাবে নাজ্জাশীর প্রশ্নসমূহের জবাব দিলেন। নাজ্জাশী তাঁর সুন্দর বক্তৃতায় এত প্রভাবিত হয়েছিল যে, সে পূর্ণ দরবারে বলেছিলেন ঃ "মারহাবা সেই সত্ত্বার, যার তরফ থেকে তোমরা এসেছ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অবশ্যই তিনি আল্লাহর রাসূল এবং তিনি সেই নবী যাঁর উল্লেখ ইন্‌জিলে এসেছে এবং যাঁর সম্পর্কে ঈসা (আ) মারইয়াম (আ) সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তোমাদের মন যেখানে চায় সেখানেই তোমরা নির্দ্বিধায় অবস্থান কর। আল্লাহর কসম, আমি যদি এই রাষ্ট্রের জঞ্জালে আবদ্ধ না হতাম তাহলে আমি তাঁর খিদমতে হাজির হতাম এবং তাঁর জুতা বহনের সৌভাগ্য লাভ করতাম।"

অন্য আরেক রেওয়ায়াতে হযরত আবু মূসা আশয়ারীর বাক্য উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, স্বয়ং নাজ্জাশী হযরত জা'ফরকে (রা) জিজ্ঞেস করলো যে, তোমাকে কোন্ বস্তু আমার সামনে সিজদাবনত হতে নিষেধ করেছে।

তিনি নিঃসংকোচে জবাব দিলেন ঃ "আমরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে সিজদা করি না।"

তিবরানী (র) স্বয়ং হযরত জাফর (রা) বিন আবি তালিবের এই বর্ণনা নকল করেছেন, নাজ্জাশী ও আমাদের মধ্যে যখন সওয়াল-জওয়াব হলো তখন বাদশাহ আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলো, তোমাদেরকে কি কেউ এখানে বিরক্ত করে ? আমরা বললাম, "হা"। এতে বাদশাহ চারদিকে ঢোল-শহরত করার নির্দেশ দিলেন যে, কেউ মুসলমানদের উত্যক্ত করলে তার কাছ থেকে চার দিরহাম জরিমানা আদায় করে মজলুমকে দিতে হবে। অতপর সে জিজ্ঞেস করলো, "এই পরিমাণ জরিমানা কি যথেষ্ট ?" আমরা বললাম, না। ফলে সে জরিমানা দ্বিগুণ করে দিল। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, নাজ্জাশী হযরত জা'ফরের (রা) হাতে ইসলামের বাইয়াতও করেছিলেন।

এই ঘটনার পর মুসলমানরা অত্যন্ত শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে হাবশায় জীবন অতিবাহিত করতে লাগলো। কয়েক বছর পর (নবীর হিজরতের কিছুদিন পূর্বে) প্রায় ৪০ জন মুসলমান হাবশা থেকে মক্কা ফিরে গেলেন। কিন্তু হযরত জা'ফর (রা) মুসলমানদের একটি বড় দলের সাথে হাবশাতেই অবস্থান করতে লাগলেন। এমনকি তিনি উদ্বাস্তু জীবনের ১৩ বছর কাটিয়ে দিলেন। ইত্যবসরে মহানবী (সা) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা তাশরীফ নেন এবং বদর ওহোদ এবং খন্দকের যুদ্ধ প্রভৃতিও শেষ হলো। ৬ষ্ঠ হিজরীর শেষ দিকে হুজুর (সা) খায়বারের যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ সময় হযরত জা'ফর (রা) এবং তাঁর সঙ্গীরাও হাবশা থেকে মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলেন। হাফেজ ইবনে কাছির (র) "আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া" গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত জা'ফর (রা) হাবশা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে বিদায়ী সালাম ও প্রথাগত অনুমতির জন্য নাজ্জাশীর সাথে দেখা করতে গেলেন। সে তাঁকে সওয়ারী এবং পাথেয় দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পয়গাম্বরে আরাবীর প্রতি তার সালাম পৌছানোর আবেদন জানালেন। সেই সাথে সে মহানবীকে (সা) একথাও বলতে বললেন যে, আমি একক আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হওয়ার সাক্ষ্য দিচ্ছি। আমি তোমাদের সাথে এখানে যে আচরণ করেছি তাও যেন তাঁকে বলা হয় এবং এই আরজ করতে বললেন যে, তিনি যেন আমার মাগফিরাতের দোয়া করেন। তারপর সে হযরত জা'ফরকে (রা) আল্লাহ হাফেজ বলে বিদায় জানালেন।

হযরত জা'ফর (রা) নিজের সঙ্গীদের সাথে মদীনা মুনাওয়ারা পৌছলেন। তখন হুজুর (সা) খায়বারের যুদ্ধে তাশরীফ নিয়েছিলেন। সেই সব সাহাবীর এখন হুজুরের (সা) সাক্ষাত ছাড়া মদীনায় এক মুহূর্তও কাটানো মুশকিল ছিল। মহিলাদেরকে মদীনা রেখে সকল পুরুষ সোজা খায়বার পৌছলেন। সে সময় খায়বার বিজয় শেষ হয়েছিল এবং মুসলমানরা বিজয়ের উৎসব পালন করছিলেন। এমন সময় উদ্বাস্তু ভাইদেরকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে তাঁদের খুশী দ্বিগুণ হয়ে গেল। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সা) হযরত জা'ফরকে (রা) দেখে মহাখুশী হলেন, আলিঙ্গন করে তাঁর কপালে চুমু খেলেন এবং বললেন ঃ

"খায়বার বিজয়েই আমি বেশী খুশী হয়েছি না জা'ফর আসার কারণে, তা আমি জানি না।"

তারপর হুজুর (সা) হাবশা থেকে প্রত্যাবর্তনকারী অন্যান্য সকল সাহাবীর সাথে মুয়ানিকা করলেন এবং প্রত্যেককে আহলান সাহলান ওয়া মারহাবা বললেন।

হযরত আবু মূসা আশয়ারীও (রা) হাবশা থেকে হযরত জা'ফরের (রা) সঙ্গে এসেছিলেন। সহীহ বুখারীতে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা যখন খায়বার বিজয়ের পর নবীর (সা) খিদমতে হাজির হলাম, তখন তিনি আমাদেরকে (হাবশা থেকে প্রত্যাবর্তনকারী সাহাবীদেরকে) গনিমতের মালের অংশ দিলেন এবং অন্য কোন ব্যক্তিকে যারা এই লড়াইয়ে শরীক হয়নি তাদেরকে অংশ দেননি।

হযরত জা'ফর (রা) হুজুরকে (সা) নাজ্জাশীর সালাম পৌছালেন এবং মুহাজিরদের সঙ্গে তাঁর সদাচরণের কথাও বিস্তারিতভাবে জানালেন। অতপর তিনি নাজ্জাশীর সেই আবেদন হুজুরের (সা) নিকট পেশ করেলন যাতে তাঁর জন্য মাগফিরাত কামনার কথা বলা হয়েছিল। রহমতে আলম (সা) সেই সময়ই উঠলেন। ওজু করলেন এবং তিন বার এই দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ নাজ্জাশীকে ক্ষমা করো।" সকল মুসলমান হুজুরের (সা) দোয়ার সাথে উচ্চৈস্বরে 'আমীন' বললেন। তারপর হুজুর (সা) হযরত জা'ফর (রা) এবং অন্য মুসলমানদের সাথে মদীনা প্রত্যাবর্তন করলেন।

সপ্তম হিজরীর জিলকদ মাসে রহমতে আলম (সা) নিজের জান নিছারদের সঙ্গে ওমরাতুল কাজার জন্য মক্কা তাশরীফ নিলেন। এই পবিত্র সফরে হযরত জা'ফরও (রা) হুজুরের (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন। যেহেতু গত বছর হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় এই শর্ত স্থির করা হয়েছিলে যে, মুসলমান হাতিয়ার রেখে মক্কা

প্রবেশ করবে। এ জন্য মুসলমানরা নিজেদের সকল অস্ত্র মক্কা থেকে আটমাইল দূরে বাতান গ্রামে রেখে এসেছিলেন এবং একশ' সওয়ারের একটি দল তা হেফাজতের জন্য মোতায়েন করা হয়। অবশিষ্ট মুসলমান নিরস্ত্র অবস্থায় অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে মক্কা প্রবেশ করেন। তাঁদের মধ্যে হযরত জা'ফরও (রা) শামিল ছিলেন। প্রিয় নবী (সা) লাব্বাইক বলতে বলতে মসজিদে হারামে প্রবেশ করলেন। হাজরে আসওয়াদ চুমু দিলেন এবং তাওয়াফ করলেন। সাহাবায়ে কিরামও (রা) তাঁর অনুসরণ করলো। তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর কুরাইশরা দাবী করলো যে, হুদায়বিয়ার চুক্তির শর্ত পূরণ হয়েছে। এ জন্য মুসলমানরা এখন মক্কা থেকে বের হয়ে যাক। হুজুর (সা) এই দাবী কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই মেনে নিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মক্কা খালি করে দিলেন। মক্কা থেকে চলে যাওয়ার সময় এক বিস্ময়কর প্রভাবে প্রভাবান্বিত দৃশ্য সামনে এলো। ওহোদের শহীদ হযরত হামযার (রা) এতিম মেয়ে ওমামা (রা) হে চাচা, হে চাচা এবং অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী ভাই, ভাই বলে ডাকতে ডাকতে হুজুরের (সা) দিকে দৌড়ালেন [হযরত হামযা (রা) হুজুরের (সা) চাচাও ছিলেন এবং দুধ ও খালাতো ভাইও ছিলেন। এই দিক থেকে উমামা (রা) তাঁর (সা) চাচার কন্যাও ছিলেন এবং ভাতিজীও] হযরত আলী (রা) তাঁকে কোলে তুলে নিলেন এবং এনে হযরত ফাতিমাতুজ জোহরার (রা) কাছে সোপর্দ করে দিয়ে বললেন, এ হলো তোমার চাচার কন্যা। সহীহ বুখারীতে আছে যে, হযরত জা'ফর (রা) এবং হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছাও পৃথক পৃথকভাবে উমামার (রা) দাবী পেশ করলেন। হযরত জা'ফর (রা) বলতেন যে, এহলো আমার চাচার কন্যা এবং তার আপন খালা [আসমা (রা) বিনতে আমিস] আমার স্ত্রী। হযরত যায়েদ (রা) বলতেন যে, হামযা (রা) হলেন আমার দ্বীনি ভাই। এ জন্য তার লালনপালনের দায়িত্ব আমার। এই গৌরব ও মুহাব্বাতের বিবাদ এমন সমাজে হচ্ছিল যে সমাজে ইসলামের পূর্বে মেয়ে শিশুদেরকে জীবিত দাফন করে ফেলা হতো। মহানবী (সা) সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন যে, উমামার (রা) অভিভাবকত্বের হকদার হলো জা'ফর (রা)। কেননা তাঁর গৃহে রয়েছেন উমামার (রা) খালা এবং খালা মায়ের মর্যাদার হয়ে থাকেন। সুতরাং হুজুরের (সা) ইরশাদ অনুযায়ী হযরত জা'ফর (রা) উমামা (রা) বিনতে হামযাকে (রা) নিজের গৃহে নিয়ে এলেন এবং স্ত্রীর [উমামার (রা) খালা] সোপর্দ করলেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর মহানবী (সা) সুলতান ও আমিরদের নামে ইসলামের দাওয়াতের পত্রাদি প্রেরণ করলেন। এ সময় একটি তাবালগীপত্র হযরত হারিছ (রা) বিন উমায়ের ইয়াযদীর হাতে বসরার শাসকের নিকট পাঠালেন। এই

ব্যক্তি একটি আরব খান্দানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে এবং খৃস্টান রোমকদের পক্ষ থেকে বসরায় শাসন কাজ চালাচ্ছিল। হযরত হারিছ (রা) মাওতা নামক স্থানে পৌছলেন। তখন বালকার রইস শুরাহবিল বিন আমর গাসসানী তাঁকে শহীদ করে ফেললো। দূত হত্যা অত্যন্ত জঘন্য এবং অমানবিক অপরাধ ছিল। হুজুর (সা) তার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনহাজার মুজাহিদের একটি বাহিনী হযরত যায়েদ (রা) বিন হারেছার নেতৃত্বে পাঠালেন। এই বাহিনীতে হযরত জা'ফরও (রা) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, এ সময় হযরত জা'ফর (রা) হুজুরের (সা) খিদমতে এই আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার এটা আশা ছিল না যে, আপনি যায়েদকে (রা) আমার ওপর আমীর বানাবেন।"

হুজুর (সা) বললেন, "জা'ফর একথা রাখো। তুমি জানোনা যে, আল্লাহর নিকট উত্তম কি।"

বিশ্বনবী (সা) কিছু দূর পর্যন্ত ঐ বাহিনীর পেছনে পেছনে গেলেন এবং বিদায় জানানোর সময় বললেন যুদ্ধে যদি যায়েদ (রা) শহীদ হয়ে যায় তাহলে জাফর (রা) বাহিনীর আমীর হবেন। তিনিও শহীদ হয়ে গেলে আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা আনসারী নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন।"

এই ছোট বাহিনীর তৎপরতা সম্পর্কে বসরার শাসক জানতে পেলো। সে খুব জোরেশোরে এই বাহিনীর মুকাবিলার প্রস্তুতি নিলো এবং নিজের মিত্র গোত্রসমূহ মিলিয়ে একটি বিরাট বাহিনী একত্রিত করলো। ঘটনাক্রমে রোমের বাদশাহ হিরাক্লিয়াসও সেই এলাকায় তাঁবুতে অবস্থান করছিল। সে হাজার হাজার রোমক যোদ্ধাকে বসরার শাসকের সাহায্যের জন্য প্রেরণ করলো। এমনিভাবে এক লাখ খৃস্টান আরব ও রোমক যোদ্ধা মুসলমানদের মুকাবিলায় এসে গেল। নিজেদের সংখ্যাল্পতা সত্ত্বেও মুসলমানরা সেই ভয়াবহ আল্লাহদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়লেন এবং মাওতার ময়দানে হক ও বাতিলের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হলো। মুসলমানরা জীবন দিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু দুশমনের সংখ্যাধিক্য কোনক্রমেই কম হচ্ছিল না। যুদ্ধ যখন তুঙ্গে ঠিক সেই মুহূর্ত মুসলমান বাহিনীর আমীর হযরত যায়েদ (রা) বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। হযরত জা'ফর (রা) তাঁর শাহাদাতের সাথে সাথে সামনে অগ্রসর হয়ে ইসলামের ঝাণ্ডা নিজের হাতে নিলেন এবং ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নেমে তরবারী চালাতে চালাতে শত্রুব্যূহে ঢুকে পড়লেন। সে সময় তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হচ্ছিল একটি যুদ্ধগাথা। সেই যুদ্ধগাথার মর্মার্থ হলো। "জান্নাত কি সুন্দর! এবং তার নৈকট্য কতই না

প্রিয় ! এবং তার পানি খুব শীতল। রোমক তারা যাদের ওপর আজাবের সময় সন্নিকটবর্তী। এরা হলো কাফের এবং তাদের নসবনামায় গড়বড়ি আছে। আমার ওপর ফরজ ছিল যে, যখন তারা আমার সামনে আসবে তখন আমি তাদের ওপর আঘাত হানবো।"

কিন্তু তিনি আঘাতের ওপর আঘাত খেতে খেতে সামনের দিকেই অগ্রসর হচ্ছিলেন। সারা দেহ আঘাতে আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই অবস্থাতেও আল্লাহার যে দুশমন এই বাঘের সামনে আসছিল মুহূর্তের মধ্যেই সে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিল। শেষে দুশমনরা তাঁর একটি হাত শহীদ করে ফেললো। তিনি তৎক্ষণাৎ অন্য হাত দিয়ে ঝান্ডা আকড়ে ধরলেন। অন্য হাতও কেটে গেল। এ সময় তিনি ইসলামের ঝান্ডা বুকের সাথে লাগিয়ে ধরলেন। এই অবস্থাতেই দুশমনের একটি বর্শা তাঁর সিনা পার হয়ে গেল এবং তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। তখন তাঁর দেহের ওপর ৯০টির বেশী আঘাত ছিল। তাঁর শাহাদাতের পর হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা ঝান্ডা তুলে নিলেন। তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন। হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ ঝান্ডা হাতে নিলেন এবং নিজের নজীর বিহীন বীরত্ব ও সামরিক নৈপুণ্যের বদৌলতে ইসলামী বাহিনীকে বাঁচালেন।

সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে জা'ফরের (রা) শাহাদাতের পর তাঁর লাশ আমি দেখলাম। তাতে ৯০টির বেশী আঘাত ছিল। এসব আঘাতের একটিও পিঠে ছিল না।

হাফেজ ইবনে কাছির (র), তিবরানী ও অন্য কতিপয় চরিতকার লিখেছেন যে, হযরত জা'ফর (রা) ছিলেন প্রথম সেই ব্যক্তি যিনি নিজের সওয়ারীর পশুর কুচ হকের পথে কেটেছিলেন।

সকল নেতৃস্থানীয় চরিতকার ও যুদ্ধ বিষয়ক ঐতিহাসিক মাওতার যুদ্ধ প্রসঙ্গে এই রেওয়ায়াতটি উল্লেখ করেছেন যে, যে সময় মাওতার ময়দানে মুসলমান ও রোমকদের মধ্যে রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছিল সে সময় বিশ্বনবী (সা) সাহাবায়ে কিরামের (রা) একটি দলের মধ্যে মসজিদে নববীতে বসেছিলেন। হঠাৎ করে তিনি বলে উঠলেন ঃ

"যায়েদ ঝান্ডা হাতে নিল এবং সে শহীদ হয়ে গেল। তারপর জা'ফর (রা) ঝান্ডা ধরলো এবং সেও শহীদ হয়ে গেল। অতপর আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা ঝান্ডা তুলে নিল এবং সেও শহীদ হলো। এরপর আল্লাহর তরবারী-সমূহের মধ্য থেকে এক তরবারী ঝান্ডা উঁচু করে ধরলো।"

যুদ্ধের ময়দানের চিত্র যেন রাসূলের (সা) ঠিক সামনেই ছিল। এই ঘটনার ভিত্তিতে হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ সাইফুল্লাহ বা আল্লাহর তরবারী উপাধিতে খ্যাতি অর্জন করেন।

সে সময় আল্লাহ তায়ালা যুদ্ধের ময়দান তাঁর দৃষ্টির সামনে এনে দিয়েছিলেন অথবা জিবরাইল আমিন (আ) তাঁকে মুহূর্তে মুহূর্তে খবর পৌঁছাচ্ছিলেন ; ঘটনা যাই হোক এ ব্যাপারে সকল চরিতকার একমত পোষণ করেন যে, হুজুর (সা) হযরত যায়েদ (রা), হযরত জা'ফর (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার শাহাদাতের খবর মাওতার মুজাহিদদের প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই লোকদেরকে শুনিয়ে দিয়েছিলেন। সহীহ বুখারীতে আছে যে, হুজুর (সা) যে সময় নিজের মাহবুব জান নিছারদের শাহাদাতের খবর লোকদেরকে শুনালেন তখন তাঁর চক্ষু দিয়ে অশ্রুরধারা ঝরছিল। আল্লামা ইবনে সায়াদ বর্ণনা করেছেন যে, সে সময় হুজুর (সা) দাঁড়িয়ে প্রথম হযরত যায়েদ (রা), জা'ফর (রা) এবং আবদুল্লাহর (রা) গুণাবলী বর্ণনা করলেন এবং বললেন, "হে আল্লাহ যায়েদকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ জা'ফরকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ, আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহাকে মাফ করুন।"

হযরত জা'ফরের শাহাদাতের ঘোষণা দানের পর (অথবা অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী তার পর্বে) হুজুর (সা) হযরত জা'ফরের (রা) গৃহে তাশরীফ নিলেন। সে সময় তাঁর স্ত্রী হযরত আসমা (রা) বিনতে আমিস আটা প্রস্তুত করে বাচ্চাদেরকে গোসল করিয়ে কাপড় পরিধান করাচ্ছিলেন। হুজুর (সা) বললেন, জা'ফরের (রা) সন্তানদেরকে আমার নিকট আনো। তিনি তাদেরকে হাজির করলেন। এ সময় হুজুর (সা)-এর কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে পড়লো। তিনি তাদেরকে আদর করলেন। হযরত আসমা (রা) অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। জাফরের ব্যাপারে কোন খবর এসেছে কি ?"

হুজুর (সা) বললেন, হ্যাঁ, সে শহীদ হয়ে গেছে।

একথা শুনে হযরত আসমা (রা) চিৎকার দিয়ে উঠলেন। তাঁর কান্নাকাটির আওয়াজ শুনে মহল্লার মহিলারা তাঁর চারপাশে সমবেত হলেন এবং তাঁকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। তারপর মহানবী (সা) নিজের গৃহে গেলেন এবং আজওয়াজে মুতাহহিরাতকে বললেন, জা'ফরের বাচ্চাদের জন্য খাবার রান্না কর। আজ তার হুঁশ নেই। এক রেওয়ায়াতে আছে যে, সাইয়েদাতুন নিসা হযরত ফাতিমাতুজ জোহরা (রা) হযরত জা'ফরের (রা) শাহাদাতের খবর শুনে কাঁদতে কাঁদতে হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হলেন। হুজুর (সা) বললেন ঃ "অবশ্যই জা'ফরের মত ব্যক্তির ব্যাপারে ক্রন্দনকারীনীদের কাঁদা উচিত।"

আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) লিখেছেন, হুজুর (সা) হযরত ফাতিমাকে (রা) বললেন যে, জা'ফরের (রা) বাচ্চাদের জন্য খাবার তৈরী কর। কেননা আজ আসমা (রা) শোকে দুঃখে অস্থির রয়েছে।

তৃতীয় দিন হুজুর (সা) পুনরায় হযরত জা'ফরের (রা) গৃহে তাশরীফ নিলেন এবং হযরত আসমাকে (রা) সবরের পরামর্শ দিলেন।

অন্য আরেক রেওয়ায়াতে হযরত জা'ফরের (রা) পুত্র আবদুল্লাহ (রা) (সে সময় সে অল্পবয়স্ক ছিল) বর্ণনা করেন যে, আমার পিতার শাহাদাতের পর রাসূলে আকরাম (সা) আমাকে ও আমার ভাইদেরকে নিয়ে মসজিদে নববীতে তাশরীফ নিলেন এবং দরদ ও দুঃখ ভরা আওয়াজে মুসলমানদেরকে হযরত জা'ফরের (রা) শাহাদাতের খবর শুনালেন। অতপর তিনি আমাদেরকে নিজের সঙ্গে খাবার খাওয়ালেন। তিন দিন পর্যন্ত আমরা সেখানেই খাবার খেলাম এবং হুজুর (সা) আমাদের গৃহে নিয়মিত তাশরীফ আনতে লাগলেন।

হযরত জা'ফরের (রা) শাহাদাতের কিছু দিন পর হুজুর (সা) একদিন লোকদেরকে বললেন যে, জিবরাইল (আ) আমাকে খবর দিয়েছেন যে, আল্লাহ তায়ালা জা'ফরকে তাঁর কেটে যাওয়া দু'টি হাতের বিনিময়ে দু'টি নতুন বাহু দান করেছেন। এই নতুন বাহু সহযোগে সে জান্নাতে ফেরেশতাদের সাথে উড়ে বেড়াচ্ছে। অন্য আরেক রেওয়ায়াতে আছে, হুজুর (সা) বলেছেন, আমি জা'ফরকে জান্নাতে ফেরেশতাদের মত উড়তে দেখেছি। হুজুরের (সা) সেই ইরশাদ অনুযায়ী হযরত জা'ফর (রা) 'তাইয়ার' লকবে খ্যাত হয়ে যান। অন্য কতিপয় রেওয়ায়াতে তাঁর লকব তাইয়ারের পরিবর্তে 'জুল-জানাহাইন'ও বর্ণনা করা হয়েছে।

সাইয়েদেনা হযরত জা'ফর (রা) অত্যন্ত সুন্দর ও সুদর্শন এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা লিখেছেন যে, চেহারা সৌষ্ঠব ও অবয়বের দিক থেকে তিনি মহানবীর (সা) সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রাখতেন। শুধু সুরতেই নয় বরং সীরত ও কর্মনৈপুণ্যের দিক থেকেও তিনি নবী চরিত্রের এক সুন্দর উদাহরণ ছিলেন। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, স্বয়ং নবী করিম (সা) বলতেন, "জা'ফর তুমি সুরত ও সীরত উভয় দিক থেকেই আমার সাদৃশ্য রাখো।"

হযরত জা'ফর (রা) যদিও বিত্তবান ছিলেন না, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বিরাট পাত্র দান করেছিলেন এবং তিনি নিজের প্রয়োজনের চেয়ে আসহাবে সুফফা ও অন্য গরীব মিসকিনের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতেন।

হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) (যিনি অন্যতম আসহাবে সুফফা ছিলেন) বলেন যে, জা'ফর (রা) বিন আবি তালিব মিসকিনদের জন্য খুবই ভালো মানুষ ছিলেন। তিনি আমাদেরকে নিজের বাড়ী নিয়ে যেতেন এবং ঘরে যা থাকতো আমাদেরকে খাওয়াতেন। এমন কি ঘর থেকে মধু অথবা ঘি'র পাত্র বের করে নিয়ে আসতেন এবং (যখন তা শূন্য হয়ে যেতো) তা ভেঙ্গে ফেলতেন। পাত্রে যা লেগে থাকতো আমরা তা চেটে খেতাম।

হযরত জা'ফরের (রা) এই গরীব প্রীতি দেখে বিশ্বনবী (সা) তাঁকে "আবুল মাসাকিন" (মিসকিনদের অভিভাবক) বলতেন।

হাবশায় অবস্থানকালে হযরত আসমা (রা) বিনতে আমিসের গর্ভে হযরত জা'ফরের (রা) তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা হলেন ঃ আবদুল্লাহ (রা), মুহাম্মাদ (রা) এবং আওন (রা)। হযরত জা'ফর (রা) হাবশা থেকে ফিরে এসে নিজের যুবক পুত্র আবদুল্লাহকে (রা) হুজুরের (সা) খিদমতে পেশ করলেন। হুজুর (সা) মুচকি হেসে তাঁর বাইয়াত নিলেন এবং দোয়া করলেন। হযরত জা'ফরের শাহাদাতের পর হুজুর (সা) হযরত আবদুল্লাহর (রা) ওপর অসাধারণ স্নেহ প্রদর্শন করতেন। হাফেজ ইবনে হাজার (র) 'ইসাবা' গ্রন্থে লিখেছেন যে, একদিন হুজুর (সা) হযরত আবদুল্লাহর (রা) হাত ধরে দোয়া করলেন ঃ

"হে আল্লাহ! আবদুল্লাহকে জা'ফরের (রা) সঠিক স্থলাভিষিক্ত বানাও। তার বাইয়াতে বরকত দাও এবং আমি দুনিয়া ও আখিরাতের উভয় স্থানেই জাফর পরিবারের অভিভাবক।"

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) ও তাঁর ভাই এতিম হয়ে গেলে মহানবী (সা) তাদের লালন পালন করতেন। হুজুরের (সা) ওফাতের পর এই দায়িত্ব তাদের আপন চাচা হযরত আলী (রা) নিজের কাঁধে তুলে নেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জা'ফর (রা) জওয়ান হলে হযরত আলী (রা) নিজের প্রাণপ্রিয় কন্যা যয়নবকে (রা) তাঁর সঙ্গে বিয়ে দিলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন, কোন কোন সময় আমি চাচার [হযরত আলী (রা)] নিকট কিছু চাইলে তিনি তা দিতে অস্বীকার করতেন। কিন্তু আমি যখন নিজের পিতাকে [জা'ফর (রা)] মাধ্যম দিয়ে কিছু চাইতাম তখন অবশ্যই কিছু না কিছু দিয়ে দিতেন। হযরত জা'ফরের (রা) বংশধারা হযরত আবদুল্লাহর (রা) মাধ্যমেই অব্যাহত ছিল। অন্য পুত্ররা সন্তানহীন অবস্থায় মারা যান।

হযরত জা'ফর (রা) হাবশা থেকে প্রত্যাবর্তনের কিছু দিন পরই শাহাদাত লাভ করেন। এ জন্য তাঁর হাদীস বর্ণনার সুযোগ হয়নি। অবশ্য ইবনে

আসাকির (র) তাঁর মুখ দিয়ে এক দীর্ঘ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। এই বর্ণনায় তিনি নিজের হাবশা অবস্থান এবং সেখান থেকে মদীনা আগমনের ঘটনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। হযরত জা'ফরের (রা) ইলম ও ফজল, সমঝ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ঈমানী আবেগ এবং সত্য কথনের উচ্চতর মানের আন্দাজ সেই বক্তৃতা থেকে খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করা যায়, যা তিনি হাবশায় বাদশাহর দরবারে করেছিলেন। তারপর তিনি বিজ্ঞতার সাথে বাদশাহর প্রশ্নসমূহের জবাব দিয়েছিলেন। ফলে হাবশার বাদশাহর ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ ঘটেছিল এবং উদ্বাস্তু মুসলমানরা বছরের পর বছর হাবশায় শান্তি ও নিরাপত্তার জীবন অতিবাহিত করতে পেরেছিলেন।

হযরত উমায়ের (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে হক ও বাতিলের প্রথম যুদ্ধ বদরের ময়দানে সংঘটিত হয়। যুদ্ধ শুরুর পূর্বে সাহাবায়ে কিরাম (রা) দেখলেন যে, এক সবুজ সতেজ টগবগে কিশোর মুজাহিদদের ব্যূহসমূহের মধ্যে এদিক-ওদিক লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসের দৃষ্টি তার ওপর পড়লো। তিনি তাকে নিজের কাছে ডাকলেন এবং বললেন, "প্রাণের ভাইটি আমার ! এটা তুমি কি করছো ? কিশোর জবাব দিল, "ভাইয়া ! আমি আল্লাহর পথে লড়াই করতে চাই। সম্ভবত আল্লাহ তায়ালা আমাকে শাহাদাত নসিব করবেন। কিন্তু আশংকা হলো, প্রিয় নবী (সা) আমাকে ছোট মনে করে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি যদি না দেন।"

হযরত সায়াদ (রা) কিশোরটির কথা শুনে চুপ মেরে গেলেন। হুজুর (সা) যখন নিজের জান নিছারদের ব্যূহ পরিদর্শন করলেন তখন কিশোরটির আশংকা সঠিক বলে প্রমাণিত হলো। হুজুর (সা) তাঁকে বললেন, "বেটা ! তোমার বয়স এখনো যুদ্ধ করার মত হয়নি। এ জন্য তুমি ফিরে যাও।" হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে কিশোরটি কাঁদতে লাগলো এবং বার বার নিবেদন করে বলতে লাগলো যে, হে আল্লাহর রাসূল ! আমাকে যুদ্ধে শরীক হওয়ার অনুমতি অবশ্যই দেবেন। হয়তো আমি আল্লাহর পথে কাজে এসে যেতে পারি।"

মহানবী (সা) কিশোরটির ঈমানী জোশ ও শাহাদাতের আকাংখায় প্রভাবান্বিত হলেন এবং তাকে যুদ্ধে শরীক হওয়ার শুধুমাত্র অনুমতিই দিলেন না বরং নিজের পবিত্র হাতে তাঁর তরবারীও বেঁধে দিলেন।

এই ভাগ্যবান কিশোর যাঁর অন্তরে শাহাদাতের এমন আকাংখা ছিল, তিনি হলেন হযরত উমায়ের (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস। তিনি কুরাইশের বনু যোহরাহ খান্দানের প্রদীপ তুল্য ছিলেন এবং ইরাক বিজয়ী বীর হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসের আপন ছোট ভাই ছিলেন। তার নসবনামা হলো ঃ

উমায়ের (রা) বিন মালিক (আবু ওয়াক্কাস) বিন ওয়াহিব বিন আবদি মান্নাফ বিন যুররাহ বিন কিলাব বিন মুররাহ বিন কা'ব বিন লুব্বী বিন গালিব বিন ফাহার।

নবুওয়াতের পর প্রথম যুগে যেসব পবিত্র নফসের মানুষ ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তাদের মধ্যে হযরত উমায়েরের (রা) বড় দুই সহোদর হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস ও হযরত

আমের (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসও ছিলেন। উমায়ের (রা) সে সময় খুব কম বয়সী ছিলেন। কিন্তু যখন কিছু বুদ্ধি হলো, তখন বড় ভাইয়ের অনুসরণ করে তিনিও তাওহীদের পথে চলা শুরু করলেন এবং আল্লাহর পথে মাথা কাটানোর জন্য উদগ্রীব সময় কাটাতে লাগলেন। মক্কায় যখন হকপন্থীদের ওপর কাফেরদের জুলুম-নির্যাতন চরম পর্যায়ে পৌছলো তখন মহানবী (সা) সাহাবীদেরকে মদীনায় হিজরতের নির্দেশ দিলেন। হযরত উমায়েরও (রা) ভাইদের সাথে হিজরত করে মদীনা পৌছলেন। নবীর (সা) হিজরতের কয়েক মাস পর হুজুর (সা) যখন মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করলেন তখন হযরত উমায়েরকে (রা) আওস সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজ আশহালীর ছোট ভাই হযরত আমর (রা) বিন মায়াজের ইসলামী ভাই বানালেন।

রহমতে আলম (সা) বদরের যুদ্ধে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তখন হযরত উমায়েরকে (রা) জিহাদের আকাংখায় অস্থির করে তুললো এবং তিনিও হুজুরের (সা) সফরসঙ্গী জান নিছারদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। তাঁর অল্প বয়স্কতার প্রেক্ষিতে প্রিয়নবী (সা) তাকে যুদ্ধের অনুমতি দানের ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন জিহাদের আকাংখা ও শাহাদাত কামনার আবেগে কান্নাকাটি শুরু করলেন তখন হুজুর (সা) তাঁকে লড়াইয়ে অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়ে দিলেন। এমনিভাবে তিনি যেন সারা বিশ্বের নেয়ামতসমূহ লাভ করলেন। তরবারী চালাতে চালাতে দুশমনের ব্যূহে ঢুকে পড়লেন এবং দীর্ঘক্ষণ যাবত লড়াই চালালেন।

কাফেরদের নামকরা অশ্বারোহী আমর বিন আবদি দাদ ; সে ছিল এক হাজার আরব বাহাদুরের সমান, সেও এই যুদ্ধে মুশরিকদের দলে অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে ক্রোধোন্মত্ত হয়ে হযরত উমায়েরের (রা) ওপর হামলা চালালো এবং ইসলামের এই তরতাজা যুবককে রক্তাক্ত তরবারী দিয়ে কেটে ফেললো (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) এমনিভাবে এই সবুজ সতেজ যুবক নিজের কাংখিত লক্ষ্যে পৌছে গেলেন। হযরত উমায়ের (রা) নিজের শাহাদাতের খুন দিয়ে ইতিহাসের পাতায় যে চিত্র এঁকে দিয়েছেন তা মিল্লাতের নওজোয়ানদের চিরকাল আলোর মশাল হিসেবে গণ্য হবে।

হযরত আমের (রা) বিন ফুহায়রা

আবু আমর আমের (রা) বিন ফুহায়রা ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকার (রা) বৈপিত্রীয় ভাই তোফায়েল বিন আবদুল্লাহর গোলাম। বাহ্যিক অবয়বের দিক থেকে তিনি ছিলেন একজন কৃষ্ণাঙ্গ হাবশী। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর স্বভাব বা প্রকৃতিকে এমন নূরানী ছাঁচে ঢালাই করেছিলেন যে, অন্ধকারাচ্ছন্ন মক্কায় যেই রাসূলে আরাবী (সা) তাওহীদের প্রদীপ জ্বাললেন তখনই তিনি সেই প্রদীপের পতঙ্গ হয়ে গেলেন এবং হুজুরের (সা) দ্বারে আরকামে তাশরীফ নেয়ার পূর্বেই ঈমানের বৈভবে পূর্ণ হয়ে গেলেন।

মুশরিকরা এটা কি করে সহ্য করতে পারবে যে, একজন অসহায় গোলাম তাদের সামনে তাওহীদের কথা বলবে। তাদের ক্রোধ ও গোস্বার তুফান পূর্ণ শক্তির সাথে গিয়ে বিস্ফারিত হলো হযরত আমেরের (রা) ওপর। এমন কোন নির্যাতন ছিল না যা সেই হতভাগারা এই মরদে হকের ওপর চালায়নি। কখনো তাঁকে নির্দয়ভাবে প্রহার করা হতো। কখনো গরম বালি ও কাঁটার ওপর দিয়ে হেঁচরে টেনে নিয়ে যাওয়া হতো। আমের (রা) যদিও কৃশকায় ছিলেন, কিন্তু তাঁর সিনায় ছিল ইস্পাতের হৃদয়। তিনি অত্যন্ত অটলতা ও ইসতিকলালের সাথে সকল মুসিবত বরদাশত করেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর কদম হক পথ থেকে বিচ্যুত হয়নি।

ঘটনাক্রমে একদিন সাইয়েদেনা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) তাঁকে কাফেররা কাঁটা বিদ্ধ করছে এবং তাঁর দাড়ি ধরে থাপ্পড় মারছে—এমন অবস্থায় দেখতে পেলেন।সিদ্দিকে আকবার (রা) তাঁর ওপর এই জুলুম সহ্য করতে পারলেন না এবং তিনি সেই সময়ই তাঁকে কিনে আযাদ করে দিলেন। তারপর আমের (রা) ছিলেন। নবীর (সা) আস্তানায়। রাত-দিন শুধু একই চিন্তায় বিভোর থাকতেন যে, কি করে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের সন্তুষ্টি লাভ করা যায়।

হিজরতের সময় রহমতে আলম (সা) ও হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) ছাওর গুহায় এলেন। এ সময় সিদ্দিকে আকবার (রা)-এর পরিবারের লোকজন ছাড়া হযরত আমের (রা) বিন ফুহায়রাও এই ভয়াবহ গোপন বিষয় সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। মহানবী (সা) ও সিদ্দিকে আকবারের (রা) নিকট তিনি এমন এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, যে কোন অবস্থায় তাঁর ওপর আস্থা স্থাপন করা যায়। সহীহ বুখারীতে আছে যে, হযরত আমের (রা) বিন ফুহায়রা সারা দিন (হযরত আবু বকরসিদ্দিকের) বকরী চরাতেন এবং সন্ধ্যায় তাদেরকে গুহার

মুখে নিয়ে আসতেন। সেখানে তাদের দুধ দুইয়ে বিশ্বনবী (সা) সিদ্দিকে আকবারকে খাওয়াতেন। তিন রাত ও তিন দিনের পর যখন বিশ্বনবী (সা) ও হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) ছাওর গুহা থেকে রওয়ানা হচ্ছিলেন তখন হযরত আমের (রা) বিন ফুহায়রাও তাদের সফরসঙ্গী হন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) তাকে নিজের উটের পেছনে বসালেন এবং এমনিভাবে হিজরতের সফরে তিনি মহানবীর (সা) সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করলেন। ইবনে সায়াদ (রা) বর্ণনা করেছেন যে, এই পবিত্র কাফেলা যখন কুবা এসে উপস্থিত হলো, তখন হযরত আমের (রা) বিন ফুহায়রাকে হযরত সায়াদ (রা) বিন খাইছুমা আনসারী নিজের মেহমান বানালেন।

মদীনা আগমনের কয়েক মাস পর হুজুর (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক কায়েম করলেন। এ সময় হযরত আমের (রা) বিন ফুহায়রাকে হযরত হারিছ (রা) বিন আওসের ইসলামী ভাই বানান।

মক্কা এবং মদীনার আবহাওয়াতে অনেক তারতম্য ছিল। এ জন্য মক্কা থেকে আগত মুহাজিরদের প্রথমে মদীনার আবহাওয়া খাপ খায়নি। তাদের মধ্যে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসুস্থদের মধ্যে হযরত আমের (রা) বিন ফুহায়রাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর অসুস্থতা এত কঠিন আকার ধারণ করলো যে, তিনি জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়লেন। এই সময় তিনি বার বার একটি কবিতা আবৃত্তি করতেন। তার মর্মার্থ হলো ঃ

আমি মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছি। অবশ্যই বুযদিলের মৃত্যু তার ওপরে।

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের শক্তি অনুযায়ী চেষ্টা করে। যেমন, গরু নিজের শিং দিয়ে নিজের নাক হেফাজত করে।"

সহীহ বুখারীতে আছে, মহানবী (সা) মুহাজিরদের অসুস্থতার খবর পেয়ে দোয়া করলেন ঃ

হে আল্লাহ ! মদীনাকে আমাদের জন্য তুমি মক্কার মত অথবা তার থেকেও বেশী সুন্দর করে দাও এবং তাকে রোগ থেকে পবিত্র করে দাও।"

প্রিয় নবী (সা) দোয়া কবুল হলো মুহাজিররা সুস্থ হয়ে গেলেন এবং হযরত আমের (রা) বিন ফুহায়রাও রোগ শয্যা থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

হযরত আমের (রা) বিন ফুহায়রা দ্বীনের প্রতি নিষ্ঠা, ভক্তি ও আল্লাহভীতি, কুরআনের প্রতি গভীর আকর্ষণ ও রাসূল প্রেমের দিক থেকে একটি উদাহরণ

তুল্য মর্যাদা রাখতেন। রিসালাতের আলোকচ্ছটা তাঁর মস্তিষ্ক ও হৃদয়কে এমনভাবে আলোকিত করেছিল যে, তিনি আল্লাহর বিশেষ বান্দাদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে গিয়েছিলেন। রহমতে আলমের (সা) সঙ্গে গভীর সম্পর্ক ছিল এবং তাঁর সাধারণ ইঙ্গিতেই নিজের জীবন হক পথে কুরবানী করবার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। দ্বিতীয় হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে হক ও বাতিলের প্রথম যুদ্ধ বদরের ময়দানে সংঘটিত হয়। এ সময় হযরত আমের (রা) বিন ফুহায়রা তাতে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অংশ নেন এবং বাতিল পূজারীদের বিরুদ্ধে খুব বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

পরের বছর ওহোদের যুদ্ধেও প্রিয় নবীর (সা) সফরসঙ্গী হয়ে ছিলেন এবং অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন। চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে মহানবী (সা) আবু বারা কিলাবীর দরখাস্তে ৭০ সাহাবীর একটি দল নজদের দিকে রওয়ানা করলেন। সেই দলের অধিকাংশ সদস্য আসহাবে সুফফার মধ্যে ছিলেন এবং কুররার (কুরআন পড়নেওয়ালা) লকবে মশহুর হয়েছিলেন। হযরত আমের (রা) বিন ফুহায়রাও সেই পবিত্র দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই সাহাবীরা যখন বিরে মাউনা নামক স্থানে পৌছলেন তখন বনু কিলাবের সরদার আমের বিন তোফায়েল গাদ্দারী করলো এবং রায়াল ও জাকাওয়ান গোত্রের মুশরিকদেরকে সঙ্গে নিয়ে সেই পবিত্র সাহাবীদের ওপর হামলা করেছিল। অথচ তাঁরা তাদের হেদায়াত ও মুক্তির পথ বলতে এসেছিলেন।

হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়াতাজ জুমরী ছাড়া সকল মরদে হক মুশরিকদের তরবারীর আঘাতের শিকার হলেন এবং শাহাদাতের পোশাক পরিধান করে জান্নাতে পৌছে গেলেন। হযরত আমের (রা) বিন ফুহায়রাকে জাব্বার বিন সালাম কিলাবী নামক এক ব্যক্তি শহীদ করে। যখন সে পূর্ণ শক্তিতে নিজের বর্শা হযরত আমরের (রা) পিছনে মারলো তখন তিনি পড়ে যেতে যেতে বললেন, 'ফুযতুওয়াল্লাহ্' অর্থাৎ আল্লাহর কসম আমি সফল হয়েছি। সে সময় হযরত আমের (রা) বিন ফুহায়রার লাশ তড়পিয়ে আসমানের দিকে উত্থিত হলো এবং দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল। জাব্বার বিন সালমা এই দৃশ্য দেখে প্রচন্ডভাবে বিস্মিত হলো এবং কুফুরের অন্ধকার তার অন্তর থেকে দূরীভূত হয়ে গেল।

ইবনে সায়াদের (রা) বর্ণনা হলো যে, জাব্বার বিন সালমা এই ঘটনায় প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

সহীহ বুখারীতে আছে যে, হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়াতা জুমরীকে মুশরিকরা জীবিত গ্রেফতার করে নিয়েছিল এবং তারপর আমের বিন

তোফায়েলের মায়ের মানতপূর্ণ করার জন্য তাঁকে মুক্তি দেয়। সে তাঁর সঙ্গে নিয়ে সাহাবাদের হত্যাস্থানে গেল এবং একটি লাশের দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করলো, এই লাশ কার ? হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়া জবাব দিলেন আমের (রা) বিন ফুহায়রার। আমের বিন তোফায়েল বললো, আমি তাঁর হত্যার পর দেখলাম যে তাঁকে আসমানের দিকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। এমনকি আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানে লটকিয়ে রাখা অবস্থায় দেখতে পেলাম। তারপর তাঁর লাশ জমিনের ওপর রেখে গেলেন।

উসুদুল গাব্বাহ্ গ্রন্থে হযরত উরওয়াহর (র) বয়ান উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, বিরে মাউনার শহীদদের মধ্যে হযরত আমের (রা) বিন ফুহায়রার লাশ অনুসন্ধান করা হলো। কিন্তু পাওয়া গেল না। তাতে লোকেরা ধারণা করলো যে, তাঁর লাশ ফেরেশতারা উঠিয়ে নিয়ে গেছে। মহানবী (সা) এই হৃদয়বিদারক ঘটনার খবর শুনে খুব দুঃখ পেলেন এবং তিনি চল্লিশ দিন পর্যন্ত ফজর নামাযের পর হত্যাকারীদের জন্য বদ দোয়া করেছিলেন।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, শাহাদাতের ঘটনার পর আমের (রা) বিন তোফায়েল কালাবী হযরত আমর (রা) উমাইয়া জুমরীকে জিজ্ঞেস করলো যে, তুমি কি তোমার সকল সাথীকে চেন ? তিনি বললেন, হাঁ। সকলকেই চিনি। সুতরাং আমের বিন তোফায়েল হযরত আমরকে (রা) সঙ্গে নিয়ে শহীদদের লাশের মধ্যে ঘুরতে লাগলো। হযরত আমরের (রা) নিকট প্রত্যেক শহীদের নাম ও নসব জিজ্ঞেস করা শেষ হলো ; তখন সে হযরত আমরকে (রা) জিজ্ঞেস করলো, তাদের মধ্যে কেউ কম আছে অথবা সবার লাশ মওজুদ আছে।

হযরত আমর (রা) বললেন, তাঁদের মধ্যে আমের (রা) বিন ফুহায়রার লাশ নেই। আমের বিন তোফায়েল জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের মধ্যে সে কেমন ব্যক্তি ছিল ? হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়া বললেন ঃ তিনি আমাদের মধ্যে সকলের চেয়ে আফজাল এবং আমাদের নবীর (সা) অন্যতম প্রাথমিক যুগের সাহাবী ছিলেন।

একথা শুনে আমের বিন তোফায়েল জাব্বার বিন সালমার দিকে ইশারা করে বললো যে, সে তাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করেছিল। যখন বর্শা তার দেহ থেকে টান দিয়ে বের করে তখন এক ব্যক্তি নিহত ব্যক্তিকে উঠিয়ে আকাশের দিকে নিয়ে গেল। তারপর আমি তাকে দেখিনি। হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়া তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, তিনি হলেন আমের (রা) বিন ফুহায়রা।

আমের (রা) বিন ফুহায়রার হত্যাকারী জাব্বার বিন সালমা থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি যখন আমের (রা) বিন ফুহায়রাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করি তখন তিনি বলে উঠলেন, 'ফুযতুওয়াল্লাহি'। আমি এই কথার মর্ম বুঝতে পারলাম না। সুতরাং আমি জাহহাক (রা) বিন সুফিয়ান কালাবীর নিকট গেলাম। তিনি ছিলেন রাসূলের (সা) পক্ষ থেকে বনু কিলাবের রাজস্ব আদায়কারী। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যে, 'ফুযতুওয়াল্লাহি' বলে নিহত ব্যক্তি কি বুঝাতে চেয়েছিল। জাহহাক (রা) বলেন, তার মর্মার্থ ছিল এই যে, এভাবে শাহাদাত পেয়ে আমি জান্নাত লাভ করেছি এবং আমি জীবনের লক্ষ্যে সফল হয়েছি। অতপর জাহহাক (রা) আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিলাম। কিন্তু আমার ইসলাম গ্রহণের আসল কারণ সেই ঘটনা যা আমি আমের (রা) বিন ফুহায়রার শাহাদাতের পর স্বচক্ষে দেখেছিলাম।

শাহাদাতের সময় হযরত আমের (রা) বিন ফুহায়রার বয়স ছিল বিভিন্ন মত অনুযায়ী ৩৪ অথবা ৪০ বছর। তিনি কোন সন্তান রেখে যাননি। তার জীবন সর্বকালেই হকপন্থীদের জন্য আলোকবর্তীকা হয়ে থাকবে।

হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা)
-মাহবুবে রাসূল (সা)

একাদশ হিজরীতে রহমতে দো আলম (সা) নিজের ওফাতের কিছু দিন পূর্বে সীরিয় সীমান্তের দিকে প্রেরণের জন্য একটি বাহিনী তৈরী করলেন। সাতশ' মুজাহিদ সমন্বয়ে গঠিত এই বাহিনীতে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা), হযরত আবু উবায়দা (রা) ইবনুল জাররাহ, হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস এবং হযরত সাইদ (রা) বিন যায়েদ ছাড়া আরো অনেক মহান মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবায়ে কিরাম (রা) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁরা সকলেই শাহাদাতের আবেগে পূর্ণ ছিলেন। কিন্তু যখন মহানবী (সা) সেই বাহিনীর নেতৃত্বের জন্য আঠারো উনিশ বছরের এক যুবককে নির্বাচিত করলেন তখন কিছু ব্যক্তি বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন যে, একজন নওজোয়ান মুজাহিদকে প্রথম যুগের মুহাজিরদের ওপর অফিসারীর দায়িত্ব কি করে দেয়া হলো। হুজুর (সা) তাঁদের বিস্ময় প্রকাশের খবর জানতে পেরে অসুস্থতা সত্ত্বেও মাথায় পট্টি বেঁধে পবিত্র আবাসস্থল থেকে বাইরে তাশরীফ আনলেন এবং মিম্বরে বসে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বললেনঃ

"হে মানুষেরা ! তোমরা এই অভিযানের নেতার ব্যাপারে যা কিছু বলেছ তা আমি শুনেছি। এটা কোন নতুন কথা নয়। এর পূর্বে তোমরা তার পিতার ব্যাপারে এমন কথাই বলেছিলে। আল্লাহর কসম, সেও অফিসারীর যোগ্য ছিল। তারপর তার পুত্রও অফিসারীর যোগ্য। সে আমার খুব প্রিয় ছিল এবং এও সকল ধরনের উত্তম ধারণার যোগ্য। এ জন্য তোমরা তার সাথে উত্তম আচরণ করবে। সে তোমাদের উত্তম মানুষদের অন্যতম।"

হুজুরের (সা) পবিত্র ইরশাদ লোকদেরকে হতভম্ব করে ফেললো এবং তারা চেঁচিয়ে বলে উঠলো ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার সিদ্ধান্তে রাজী আছি এবং এই নওযোয়ানের নেতৃত্ব সকলেই মনে প্রাণে মেনে নিয়েছে।" এই সৌভাগ্যবান যুবক যাঁর ব্যাপারে সাইয়েদুল মুরসালিন ফখরে মওজুদাত খাইরুল আনাম (সা) পূর্ণ সমাবেশে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, সে অফিসারের যোগ্য এবং সব উত্তম ধারণার উপযুক্ত ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলমান। তিনি ছিলেন হযরত উসামা (রা) বিন যায়েদ (রা)।

সাইয়েদেনা হযরত উসামা (রা) বিন যায়েদ (রা) জালিলুল কদর সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। তাঁর কুনিয়ত আবু মুহাম্মাদও ছিল।

আবার আবু যায়েদও। তিনি বনু কাজায়ার শাখা বনু কালাবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন।

হযরত উসামার (রা) পিতা হযরত যায়েদ (রা) বিন হারেছা সেই একক সাহাবী যাঁর নাম পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত যায়েদ (রা) মহানবীর (সা) আযাদকৃত গোলাম, মুখে ডাকা পুত্র এবং সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী চার ব্যক্তিত্বের একজন ছিলেন। তাঁর জীবন উৎসর্গের আবেগ ও অন্য গুণাবলীর ভিত্তিতে হুজুর (সা) তাঁকে এত ভালোবাসতেন যে, তিনি "হিব্বে রাসূলুল্লাহ'র [রাসূলের (সা) প্রিয়] লকবে মশহুর হয়ে গিয়েছিলেন। হযরত উসামার (রা) মাতা বারকাতা (রা) যিনি ইতিহাসে নিজের কুনিয়ত উম্মে আইমান নামে খ্যাত। তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) শৈশবকালে খাইয়েছিলেন। এ জন্য হুজুর (সা) তাঁকে খুবই তাজিম ও শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁকে 'আমিন' বলে সম্বোধন করতেন।

আল্লামা ইবনে সায়াদ বর্ণনা করেছেন, হযরত উসামা (রা) নবুয়তের সপ্তম বছরের পর মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। মাতা-পিতা উভয়েই রিসালাত (সা) প্রদীপের পতঙ্গ ছিলেন এবং সাইয়েদুল আনাম (সা) তাঁকে নিজের পরিবারের সদস্য হিসেবে মনে করতেন। এ জন্য হযরত উসামা (রা) প্রথম দিন থেকেই ইসলামের বরকত পূর্ণ পরিবেশে লালিত-পালিত হন। হাফেজ ইবনে হাজার (র)-এর বক্তব্য অনুযায়ী তিনি ইসলাম ছাড়া আর কিছুই জানতেন না।

নবুয়তের চতুর্দশ বছরে বিশ্বনবী (সা) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা তাশরীফ নেন। সে সময় হযরত উসামার (রা) বয়স প্রায় সাত বছর ছিল। তিনি মাতা হযরত উম্মে আইমানের (রা) সঙ্গে মক্কাতেই মুকিম রলেন। অবশ্য তাঁর পিতা হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছা নবুয়তের ত্রয়োদশ বছরের শেষদিকে হুজুরের (সা) ইঙ্গিতে হিজরত করে মদীনা চলে গিয়েছিলেন। নবীর (সা) হিজরতের কয়েক মাস পর হুজুর (সা) হযরত যায়েদকে (রা) মক্কা প্রেরণ করলেন। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রা) এবং হুজুরের (সা) দুই কন্যা হযরত ফাতিমাতুজ জোহরা (রা) ও হযরত উম্মে কুলছুম (রা) ছাড়া হযরত উম্মে আইমান (রা) ও হযরত উসামাকেও (রা) নিজের সঙ্গে মদীনা নিয়ে গেলেন। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে, হযরত উসামা (রা) রাসূলের (সা) সাথেই হিজরতের মর্যাদা লাভ করেন। কিন্তু এই রেওয়ায়াত সঠিক নয়। হিজরতের সফরে হুজুরের (সা) সফর সঙ্গী হওয়ার মর্যাদা শুধু হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত আমের (রা) বিন ফুহায়রারই লাভ হয়েছিল। রিসালাতের প্রথম যুগের যুদ্ধসমূহের সময় হযরত উসামা (রা) অল্প বয়স্ক ছিলেন। তিনি এসব যুদ্ধে অংশগ্রহণের আকাংখী ছিলেন। কিন্তু অল্প বয়স্ক

হওয়ার কারণে হুজুর (সা) অনুমতি দেননি। তবুও তাঁর স্নেহের ছায়া হযরত উসামার (সা) ওপর সবসময়ই ছিল। হুজুরের (সা) দৌহিত্র হযরত হাসান (রা) তৃতীয় হিজরীতে এবং সাইয়েদেনা হযরত হোসাইন (রা) চতুর্থ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। হিজরতের পূর্বের বছর হযরত আয়েশা সিদ্দিকাও (রা) নবীর (সা) হারেমে এসেছিলেন। এরা সকলেই হুজুরের (সা) খুব প্রিয় ছিলেন। কিন্তু তিনি (সা) নিজের মুহাব্বাত ও স্নেহে হযরত উসামাকেও (রা) সবসময় শরীক করতেন। তিনি যদিও ১০-১১ বছরের হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু নবীর (সা) গৃহে স্বাধীনভাবে যাতায়াত করতেন। হুজুর (সা) কখনো কখনো স্নেহ বশত তাঁর সাথে কৌতুকও করতেন। তাবকাতে ইবনে সায়াদে আছে, একবার হযরত উসামা (রা) নবী (সা) গৃহে বসেছিলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা)-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হুজুর (সা) হযরত উসামার (রা) দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে দিলেন এবং হযরত আয়েশাকে (রা) সম্বোধন করে বললেন ঃ

"আয়েশা, এ যদি মেয়ে হতো তাহলে আমি তাকে খুব করে গহনা পরাতাম এবং খুব করে সাজাতাম। তাতে তার রূপ ও সৌন্দর্যের শোহরত হতো এবং বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষ তার সম্পর্কের জন্য পয়গাম প্রেরণ করতো।"

একবার হযরত উসামা (রা) দরজার চৌকাঠ লাফ দিয়ে পার হতে গিয়ে পড়ে গেলেন এবং তাঁর মাথা থেকে রক্ত পড়তে লাগলো। হুজুর (সা) হযরত আয়েশা সিদ্দিকাকে (রা) তার রক্ত পরিষ্কার করে দেয়ার কথা বললেন। তিনি রক্তে দুর্গন্ধ অনুভব করলেন। এ সময় তিনি স্বয়ং উঠে তা পরিষ্কার করে দিলেন এবং ক্ষতের ওপর নিজের মুখের লালা লাগিয়ে দিলেন।

মুসনাদে আহমদে স্বয়ং হযরত উসামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর (সা) আমাকে ধরতেন এবং নিজের রানের ওপর বসাতেন। তারপর হযরত হাসান (রা) বিন আলীকে (রা) ধরতেন এবং নিজের বাঁ রানের ওপর বসাতেন। অতপর আমাদের দু'জনকে মিলিয়ে দোয়া করতেন।

"হে আল্লাহ! আমি এই দু'জনের ওপর রহম করে থাকি। তুমিও তাদের ওপর রহম কর।"

সহীহ বুখারীতে আছে যে, হুজুর (সা) ওজু করতেন। এ সময় হযরত উসামার (রা) অধিকাংশ সময় পানি ঢেলে দেয়ার সৌভাগ্য লাভ ঘটতো। হুজুর (সা) অধিকাংশ সময় সফরেও তাঁকে সঙ্গে রাখতেন।

বনু মুসতালিকের যুদ্ধের সময় ইফকের দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। তাতে আবদুল্লাহ বিন উবাই এবং অন্য কতিপয় লোক হযরত আয়েশা সিদ্দিকার (রা) ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছিল। এই তোহমত আরোপে স্বাভাবিকভাবেই হুজুর (সা) দুঃখ পেয়েছিলেন। যদিও উম্মুল মু'মিনীনের নিরাপরাধ হওয়াটাই যথার্থ ছিল। তবুও অপবাদ রটনাকারীদের মুখ বন্ধ করার জন্য তদন্ত প্রয়োজন ছিল। সুতরাং তিনি এই প্রসঙ্গে কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা সাহাবীর (রা) সাথে পরামর্শ করলেন। তাদের মধ্যে ১২ বছর বয়স্ক উসামাও (রা) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যেহেতু নবীর (সা) আবাসগৃহে তিনি নিজের বাড়ীর মত আসা-যাওয়া করতেন। এ জন্য তাঁর রায় বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার ছিল। হযরত উসামা (রা) অত্যন্ত সত্যবাদী ছিলেন। তিনি খুব জোরেশোরে হযরত আয়েশা সিদ্দিকার (রা) পবিত্র হওয়া এবং উঁচু মর্যাদার সাক্ষ্য দিলেন। সাথে সাথে হুজুরের (সা) খিদমতে আরজ করলেন যে, আপনি একটুও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং অপবাদ রটনাকারীদের মিথ্যার পর্দা ছিড়ে ফেলবেন।

হযরত উসামার (রা) কিয়াস সঠিক বলে প্রমাণিত হলো এবং সূরা তাওবার আয়াত নাযিল হলো। যাতে উম্মুল মু'মিনীনের (রা) পবিত্রতার স্বীকৃতি দেয়া হলো।

সহীহ বুখারীতে আছে যে, নবীর (সা) নিকট হযরত উসামার (রা) যে বৈশিষ্ট্য ছিল তার ভিত্তিতে মুনাফিকরা তাঁকে খুব হিংসা করতো এবং তাঁর নসবে তোহমত আরোপ করতো। হুজুর (সা) পর্যন্ত তাদের কথাবার্তা পৌঁছতো। তাতে তিনি খুব দুঃখ পেতেন। সেই যুগে একদিন আরবের এক মশহুর মুখের ভাব দেখে স্বভাব বর্ণনাকারী মাযরাজ মাদালজী (অথবা আসলামী) হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হলো। সে সময় হযরত উসামা (রা) নিজের পিতা হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছার সাথে এক চাদরের নীচে শুয়েছিলেন। উভয়ের পা অবশ্য চাদরের বাইরে ছিল। মাযরাজ পা দেখে বললো, এই পা একে অন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে। একথা শুনে হুজুর (সা) খুব খুশী হলেন। হাসতে হাসতে হযরত আয়শার (রা) নিকট তাশরীফ নিলেন এবং বললেন, তুমি শুনে থাকবে যে মাযরাজ ঠিক এক্ষুণি উসামা (রা) ও যায়েদের (রা) পা দেখে বললো যে, এরা একে অপর থেকে সৃষ্টি। হাদীসের ব্যাখ্যাকারীরা লিখেছেন যে, হুজুরের (সা) খুশী হওয়ার কারণ এইটাই ছিল যে, মাযরাজ যা বলেছিল তাতে হিংসাকারীদের মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কেননা তাদের কাছে স্বভাব বর্ণনাকারীদের কথা ইলহামের মর্যদা রাখতো। নচেৎ হুজুরের (সা) শান বা মর্যাদা তার থেকে অনেক বুলন্দ ছিল।

হযরত উসামার (রা) বয়স ১৪ বছর হলে হুজুর (সা) তাঁকে যয়নব (রা) বিনতে হানজালার সাথে বিয়ে দিয়ে দিলেন। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীতে বনিবনা হলো না এবং উভয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। তারপর হুজুর (সা) তাঁর শাদী হযরত নুয়াইম বিন আবদুল্লাহর আন-নাহহাম আদবীর কন্যার সঙ্গে দিলেন। তাঁর গর্ভে ইবরাহীম বিন উসামা (রা) জন্মগ্রহণ করেন। একবার হযরত দাহিয়া কালবী (রা) কাতান কাপড় হুজুরকে (সা) হাদিয়া হিসেবে দিলেন। তিনি তা হযরত উসামাকে (রা) দিয়ে দিলেন। একদিন তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি কাতান কেন পরিধান করো না। তিনি আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমি তা স্ত্রীকে দিয়ে দিয়েছি।" তিনি বললেন, "ঠিক আছে। তাহলে তুমি তাকে বলে দিও যে, নীচে যেন সিনা বন্ধ পরিধান করে। নচেৎ শরীর দেখা যাবে।" একবার জি এযেন শিরক অবস্থায় একটি মূল্যবান হুল্লা প্রেরণ করলো। তিনি (সা) বললেন, আমি মুশরিকের হাদিয়া কবুল করি না। কিন্তু আমি এখন তোমার নিকট থেকে মূল্য দিয়ে নিচ্ছি। সুতরাং ৫০ দিনার দিয়ে কিনে নিলেন এবং তা একদিন পরিধান করে হযরত উসামাকে (রা) দিয়ে দেন।

ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন, সপ্তম হিজরীর প্রথম দিকে খায়বার জয় হলো। তখন হুজুর (সা) হযরত উসামার (রা) জন্য ভাতা ঠিক করে দিলেন। এই ভাতা ছিল সেই জমির এক অংশের ফল ও উৎপাদিত ফসল। খায়বার বিজয়ের পর হুজুর (সা) সেই জমি ফায় হিসেবে পেয়েছিলেন। এই জমির ব্যবস্থাপনার জন্য উসামা (রা) প্রায়ই সেখানে যেতেন।

হযরত উসামার (রা) বয়স ১৫ বছর হলে হুজুর (সা) তাঁকে এক বিশেষ অভিযানের আমীর বানিয়ে হুরকা (হুরকাতে জাহিনাতে) প্রেরণ করেন। ইতিহাসে এই অভিযান সারিয়্যায়ে হুরকা (হুরকাত) নামে মশহুর রয়েছে। এই অভিযানে অনভিজ্ঞতার কারণে তিনি একটি ভুল করে বসেছিলেন। সারা জীবন তিনি তাতে আফসোস ও লজ্জা প্রকাশ করতেন। সহীহ বুখারীতে স্বয়ং তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে হুরকা প্রেরণ করলেন। সকালে দুশমনের সাথে মুকাবিলা হলো। এ সময় তারা পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল। আমি এবং অন্য একজন আওতায় এসে গেল তখন কালেমায়ে শাহাদাত পড়তে লাগলো। ফলে আমার সাথী হাত গুটিয়ে নিল। কিন্তু আমি তাকে হত্যা করে ফেললাম। আমরা যখন মদীনা ফিরে এলাম এবং হুজুর (সা) এই ঘটনা জানতে পেলেন তখন তিনি আমাকে বললেন, "উসামা, তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ। অথচ সে কালেমায়ে শাহাদাত পড়ছিল।"

আমি আরজ করলাম ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! সে শুধু মাত্র জীবন বাঁচানোর জন্য এমন করেছিল।"

হুজুর (সা) আমার ওজর প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বারবার এই ইরশাদ পুনর্ব্যক্ত করতে লাগলেন যে, তুমি এক ব্যক্তিকে কালেমায়ে শাহাদাত পড়া সত্ত্বেও কতল করে ফেলেছ। তাতে আমি এত লজ্জিত হলাম যে, মনে মনে বলতে লাগলাম ঃ "হায় ! আমি যদি আজকের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ না করতাম।"

এই সারিয়্যাহ বিভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী সাত অথবা আট হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত উসামার (রা) হাতে নিহত ব্যক্তির নাম ছিল মিরদাস বিন নাহিক।

অষ্টম হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে মক্কা বিজয় হলো। তখন হযরত উসামার (রা) রহমতে আলমের (সা) ঘোড়ার পেছনে চড়ার মহান মর্যাদা লাভ হয়েছিল। সহীহ বুখারীতে আছে যে, হুজুর (সা) মক্কা মুয়াজ্জামা বিজয়ের পর বাইতুল্লাহ প্রবেশ করলেন। তখন হযরত উসামা (রা) হুজুরের (সা) সওয়ারীর (উটনী) ওপর তাঁর পেছনে বসেছিলেন এবং হযরত ওসমান (রা), হযরত তালহা (রা) ও হযরত বিলাল (রা) তাঁর পাশে ছিলেন।

মক্কা বিজয়ের পর হুজুর (সা) সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য মক্কা মুয়াজ্জামায় অবস্থান করলেন। এ সময় এক দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেল। সহীহ বুখারীতে আছে যে, বনু মাখযুমের এক মহিলা (কতিপয় রেওয়ায়াতে যার নাম বলা হয়েছে ফাতিমা বিনতে আসওয়াদ) চুরির অপরাধ করে বসলো [ভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী সে কারোর গহনা চুরি করেছিল অথবা হুজুরের (সা) আবাসস্থল থেকে একটি চাদর চুরি করেছিল] এবং তাকে ধরা হলো। বনু মাখযুমের লোকজন ঘাবড়ে গিয়ে হযরত উসামার (রা) নিকট পৌছলেন এবং তাঁর নিকট দরখাস্ত করলো যে, তিনি যেন রাসূলের (সা) নিকট সেই মহিলার জন্য সুপারিশ করেন। হযরত উসামা (রা) তাদের কথা মেনে নিলেন এবং হুজুরের (সা) কাছে সেই মহিলার ব্যাপারে রেয়ায়েত করার আশা করলেন। হযরত উসামাকে (রা) হুজুর (সা) খুব ভালোবাসতেন। কিন্তু আল্লাহর হদের ব্যাপার ছিল। এ জন্য হযরত উসামার (রা) কথা শুনে হুজুরের (সা) পবিত্র চেহারা মলিন হয়ে গেল এবং তিনি বললেন ঃ "উসামা, তুমি কি আমার নিকট আল্লাহর কায়েমকৃত হদের ব্যাপারে (রেয়ায়েত বা কনসেশনের) কথা বলো ?"

হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে হযরত উসামা (রা) কেঁদে উঠলেন এবং আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল। আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমার জন্য মাগফিরাত কামনা করুন।" সন্ধ্যা হলে হুজুর (সা) খুতবা দানের জন্য দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর হামদ ও ছানার পর বললেন ঃ

"পূর্বেকার লোকেরা এ জন্য ধ্বংস হয়েছিল যে, যখন তাদের মধ্যেকার কোন শরীফ ব্যক্তি (আমীর) চুরি করতো তখন তাকে ছেড়ে দিত এবং যখন তাদের মধ্যকার কোন সাধারণ মানুষ চুরি করতো তখন তার ওপর হদ জারি করতো। সেই সত্ত্বার কসম যার হাতে মুহাম্মাদের (সা) জীবন রয়েছে মুহাম্মাদের (সা) কন্যা ফাতেমাও যদি চুরি করতো তাহলে আমি তার হাত কেটে দিতাম।"

সুতরাং সেই মহিলার ওপর হদ জারী করা হলো এবং তার হাত কেটে দেয়া হলো। তারপর তার জীবনে সম্পূর্ণ বিপ্লব এসে গেল এবং সে অত্যন্ত পরহেজগারী ও দৃঢ়তার সাথে নিজের তাওবাকে বাস্তবায়ন করলেন।

একাদশ হিজরীতে প্রিয় নবী (সা) নিজের ওফাতের কিছু দিন পূর্বে হযরত উসামাকে (রা) সেই বাহিনীর অফিসার নিয়োগ করলেন। এই বাহিনী নিয়োগেরও উদ্দেশ্য ছিল। একতো মাওতার যুদ্ধের (অষ্টম হিজরীতে) প্রতিশোধ গ্রহণ। এই যুদ্ধে হযরত উসামার (রা) পিতা হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছা ছাড়া হযরত জা'ফর (রা) বিন আবি তালিব, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা এবং আরো কয়েকজন সাহাবী শাহাদাতের পেয়ালা পান করেছিলেন। দ্বিতীয়ত সিরিয়া সংলগ্ন সীমান্ত ফিতনা-ফাসাদ থেকে মাহফুজ রাখা। কিছু মানুষ তাঁর নেতৃত্বের জন্য বিস্ময় প্রকাশ করলে হুজুর (সা) তা অপসন্দ করলেন এবং তিনি অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও বাইরে তাশরীফ এনে অত্যন্ত জোরদার ভাষায় হযরত উসামার (রা) নেতৃত্বের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করলেন। তারপর তিনি নিজের পবিত্র হাত দিয়ে হযরত উসামাকে (রা) ঝান্ডা প্রদান করলেন এবং বাহিনীকে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন। সেই বাহিনী মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে জুরুফ নামক স্থানে তাবু ফেললেন। সেই সময় হুজুরের (সা) অসুস্থতা কঠিন রূপ ধারণ করলো। হযরত উসামা (রা) খবর পেয়ে অস্থির চিত্তে তক্ষণি মদীনা ফিরে এলেন এবং হুজুরের (সা) পবিত্র খিদমতে হাজির হয়ে তাঁর মুবারক কপালে চুম্বন দিলেন। হুজুর (সা) চুপচাপ ছিলেন। তবুও তিনি দোয়ার জন্য দস্তে মুবারক উঠালেন এবং হযরত উসামার ওপর রাখলেন। তিনি কিছুটা আশ্বস্ত হলেন এবং জুরুফ চলে গেলেন। দ্বিতীয় দিন হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হলেন। সে সময় তিনি কিছুটা সুস্থবোধ করছিলেন। তিনি হযরত উসামাকে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি ফিরে গিয়ে সৈন্য বাহিনীকে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তখনো জুরুফ থেকে রওয়ানা হয়ে পারেনি। এ সময় মদীনায় হুজুরের (সা) অসুস্থতা গুরুতর রূপ ধারণ করলো। হযরত উসামার (রা) মাতা হুজুরের (সা) পাশেই ছিলেন। তিনি হাশেমী খান্দানের অনেক ব্যক্তির শেষ সময় দেখেছিলেন।

হুজুরের (সা) অসুস্থতায় এমন কিছু লক্ষণ পেলেন যাতে তিনি নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, হুজুর (সা) এই নশ্বর জগত থেকে বিদায় নিচ্ছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ একব্যক্তিকে এই পয়গাম দিয়ে হযরত উসামার (রা) নিকট প্রেরণ করলেন যে হুজুর (সা) আমাদের থেকে বিচ্ছেদের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তুমি কালবিলম্ব না করে মদীনা ফিরে এসো। হযরত উসামা যেই এই হৃদয়বিদারক খবর পেলেন তখনই তিনি অন্য কতিপয় সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে জুরুফ থেকে মদীনা মুনাওয়ারা এসে পড়লেন। হুজুর (সা) ওফাত পেলেন। এ সময় হযরত উসামার (রা) ওপর যেন কিয়ামত নেমে এলো! তবুও খুব ধৈর্য ধারণ করলেন এবং অত্যন্ত তৎপরতার সাথে হুজুরের (সা) কাফন ও দাফনের কাজে শরীক হলেন। সহীহ বুখারীতে আছে যে, হযরত উসামা সেই সব সাহাবীর অন্যতম ছিলেন যাঁরা রাসূলে পাকের পবিত্র দেহ কবরে নামানোর সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। হুজুরের (সা) ওফাতের খবর শুনে সমগ্র বাহিনী জুরুফ থেকে মদীনা এসে গিয়েছিল এবং এই অভিযান মুলতবী হয়ে গেল।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক খিলাফতের মসনদে আসীন হলেন। তিনি বাইয়াতের দ্বিতীয় দিনেই উসামা বাহিনীকে প্রস্তুতিসহ মনযিলে মকসুদের দিকে রওয়ানা হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। খলিফাতুর রাসূলের (সা) পক্ষ থেকে ঘোষক ঘোষণা দিলেন, "উসামা বাহিনীর তৈরী হয়ে যাওয়া উচিত। তাকিদ দিয়ে বলা হচ্ছে যে, এই অভিযানে যাদেরকে মনোনীত করা হয়েছে তাদের কেউই যেন মদীনায় না থাকে এবং সকলেই স্ব স্ব তাঁবুতে জুরুফে গিয়ে একত্রিত হয়।"

বাহিনী জুরুফে একত্রিত হওয়া ও রওয়ানা হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন স্থান থেকে আরব গোত্রসমূহের ধর্মদ্রোহী হয়ে যাওয়ার খবর অব্যাহতভাবে আসতে লাগলো। এসব খবরে সাধারণ মুসলমানরা খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লো। মহানবীর (সা) তিরোধানের হৃদয়বিদারক দুঃখ তখনো তাজা ছিল। এই অবস্থায় তাঁরা দেখলো যে, ধর্মদ্রোহীদের সংখ্যা বিরাট এবং উসামা বাহিনীর সংখ্যা সেই তুলনায় খুবই কম। এ অবস্থায় তারা উসামা বাহিনীকে মদীনাতেই থাকার কথা চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন। হযরত আবদুল্লাহর বিন মাসউদ থেকে বর্ণিত আছে যে, সে সময় মুসলমানদের অবস্থা ছিল বকরীর সেই পালের মত যে পাল বৃষ্টির মধ্যে শীতে খোলা মাঠে রাখাল ছাড়া থাকে।

এসব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কতিপয় বুজর্গ সাহাবী হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) খিদমতে আরজ করলেন যে, যাঁরা উসামার (রা) বাহিনীর সঙ্গে যাচ্ছেন তাঁরা মুসলমানদের বাছাই করা ব্যক্তি। এদিকে ধর্মদ্রোহিতা যে

দ্রুতগতিতে আরবে সম্প্রসারিত হচ্ছে তাও আপনি খুব ভালোভাবে জানেন। এই অবস্থায় মদীনা থেকে উসামা বাহিনীর গমন হবে ঐক্যকে বিশৃংখলায় পার্যসিত করার নামান্তর। এই অভিযান পরবর্তী কোন সময়ের জন্য মুলতবী রাখাটাই উত্তম হবে।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) ছিলেন আস্থা ও অটলতার শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব। যে অভিযান রওয়ানার জন্য স্বয়ং রাসূলে করিম (সা) নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই অভিযান বন্ধ করাটাকে তিনি কোনক্রমেই সহ্য করতে পারছিলেন না। তিনি জবাব দিলেন, "সেই সত্ত্বার কসম, যার কব্জায় আমার জীবন রয়েছে। আমি যদি এটাও ধারণা করতাম যে, হিংস্রজন্তু আমাকে থাবা দিয়ে যাবে তবুও রাসূলের (সা) নির্দেশ পালনে উসামা (রা) বাহিনী অবশ্যই প্রেরণ করতাম। বস্তিতে যদি আমি ছাড়া এক ব্যক্তিও অবশিষ্ট না থাকতো তবুও আমি উসামা (রা) বাহিনীকে অবশ্যই পাঠাতাম।"

তারপর সাধারণ সমাবেশে সেই বিষয়ে এক প্রভাবপূর্ণ ভাষণ দিলেন এবং সৈন্য প্রস্তুতির তাকিদ দিলেন। সুতরাং হযরত বুরাইদা (রা) বিন হাসিব আসলামী ঝান্ডাসহ জুরুফ পৌঁছে গেলেন এবং অবশিষ্ট সৈন্যও যেখানে একত্রিত হলো। এই অভিযানে যেতে হযরত উসামার (রা) কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু আশংকা ছিল। তিনি মনে করেছিলেন, তার গমনের পর দুশমন মদীনার ওপর হামলা করে বসবে। এ জন্য তিনি জুরুফ থেকে হযরত আবু বকরের (রা) নিকট পয়গাম প্রেরণ করলেন। তাতে তিনি বললেন যে, রওয়ানার পর দুশমন মদীনার ওপর হামলা করে বসতে পারে বলে তার ভয় রয়েছে। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে এই অভিযান মুলতবী করে সৈন্যসহ মদীনা চলে আসতে পারি।

রাসূলের (সা) খলিফা তাঁকেও সেই জবাব দিলেন যা অন্যদেরকে দিয়েছিলেন। ইত্যবসরে আনসাররা হযরত ওমর ফারুকের (রা) মাধ্যমে হযরত আবু বকর সিদ্দিককে (রা) একটি পয়গাম প্রেরণ করলেন। তাতে বলা হলো যে, আপনি যদি সৈন্য বাহিনী রওয়ানা করতেই চান তাহলে উসামার (রা) পরিবর্তে অন্য কোন অভিজ্ঞ সাহাবীকে (রা) আমীর নিয়োগ করুন। হযরত ওমর ফারুক (রা) আনসারদের পয়গাম হযরত আবু বকর সিদ্দিককে (রা) শুনালেন তাতে তিনি ক্রোধে অস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ

"ইবনে খাত্তাব, উসামাকে (রা) স্বয়ং রাসূলে আকরাম (সা) আমীরে লশকর নিয়োগ করেছেন। কিন্তু তুমি আমাকে এই পয়গাম দিচ্ছ যে, তার পরিবর্তে অন্য কাউকে আমীর নিয়োগ করবো।"

এই জবাবের পর তিনি স্বয়ং জুরুফ তাশরীফ নিলেন এবং বাহিনীকে রওয়ানার নির্দেশ দিলেন। সৈন্য বাহিনী রওয়ানা হলো। এ সময় হযরত উসামা (রা) ঘোড়ার ওপর সওয়ার ছিলেন এবং সিদ্দিকে আকবার (রা) পদব্রজে সাথে সাথে চলছিলেন। তাঁর ঘোড়ার লাগাম হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফের হাতে ছিল। হযরত উসামা (রা) আরজ করলেন, "হে খলিফাতুর রাসূল! আপনিও সওয়ার হোন অথবা আমাকে পায়ে হেটে চলার অনুমতি দিন।" ইরশাদ হলো, "না আমার সওয়ার হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। না তোমার পায়ে হেটে যাওয়ার দরকার আছে। আমার পায়ে যদি কয়েক মুহূর্তের জন্য আল্লাহর পথে মাটি লাগে তাহলে আমার মর্যাদা কতদূর বৃদ্ধি পাবে। গাজী আল্লাহর পথে যে পা রাখে তার বিনিময়ে সাতশ' নেকী আমলনামায় লিখা হয়ে থাকে। সাতশ' গুনা মাফ হয় এবং সাতশ' দরজা বুলন্দ করা হয়।"

তারপর সিদ্দিকে আকবার (রা) উসামা (রা) বাহিনীকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "হে লোকেরা! আমি তোমাদেরকে ১০টি নসিহত করছি। তা ভালোভাবে স্মরণ রেখো। খিয়ানত করবে না। ধোঁকা দেবে না। আমীরের নাফরমানী করবে না। কোন লোকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাটবে না। কোন শিশু, বৃদ্ধ অথবা মহিলাকে হত্যা করবে না। কোন ফলবান বৃক্ষ কাটবে না। অথবা জ্বালাবে না। বকরী, গাভী অথবা উট খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া জবেহ করবে না। তোমরা এমন মানুষ পাবে যারা ইবাদাতখানাতে নির্জনত্ব অবলম্বন করে আছে। তাদের সাথে বাদানুবাদ করবে না। তোমরা এমন মানুষও পাবে যারা বিভিন্ন ধরনের খাদ্য তোমাদের সামনে পেশ করবে। এ খাবার খেয়ে (আল্লাহকে ভুলে যেও না) আল্লাহর শুকর আদায় করবে এবং তোমরা এমন এক জাতিও পাবে যাদের মাথার চুল মাঝখানে মুন্ডন করা থাকবে। তাদেরকে চাবুক মারবে। এখন আল্লাহর নাম নিয়ে রওয়ানা হয়ে যাও। আল্লাহ তোমাদেরকে দুশমনের অস্ত্র ও প্লেগ থেকে রক্ষা করুন।"

এই ভাষণ শোনার পর উসামা (রা) বাহিনী মনযিলে মাকসুদ পানে রওয়ানা হয়ে গেল। সে সময় রাসূলের (সা) ওফাতের পর মাত্র ১৯ দিন অতিবাহিত হয়েছিল। হযরত উসামা (রা) সিরিয়ার ভূমিতে দূর পর্যন্ত বিজয় সূচক হামলা করতে করতে আবনী (খানুজ যাইত) পর্যন্ত পৌছে গেলেন এবং কিছুদিন দামেস্কের নিকট আল-মুযযা নামক স্থানে অবস্থানের পর মদীনা মুনাওয়ারা ফিরে এলেন। এই অভিযানে ভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী ৪০ দিন অথবা তা থেকে কিছু বেশী সময় ব্যয় হয়েছিল। প্রত্যাবর্তনের পূর্বে হযরত উসামা (রা) বিজয়ের সুসংবাদ মদীনা প্রেরণ করেন। তাতে মুসলমানদের মধ্যে খুশীর বন্যা বয়ে গেল। কেননা এই বিজয় শুধু মাওতার যুদ্ধের জবাবই ছিল না বরং সিরিয়া পাদানত করার পটভূমিও ছিল।

উসামা (রা) বাহিনী খুব শানশওকতের সাথে মদীনা ফিরে এলো। তখন আগে আগে হযরত বুরাইদা (রা) বিন হাছিব ঝান্ডা উড়িয়ে আসছিলেন এবং তার পিছনে হযরত উসামা (রা) সৈন্য বাহিনীকে সাথে নিয়ে মাওতার শহীদ নিজের পিতা হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছার ঘোড়া সাবহার ওপর সওয়ার হয়ে আসছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) মুহাজির ও আনসারের সঙ্গে মদীনার বাইরে বেরিয়ে সেই বিজয়ী বাহিনীকে উষ্ণ সম্বর্ধনা জানালেন। হযরত উসামা (রা) মদীনায় প্রবেশ করেই মসজিদে নববীতে গেলেন এবং দু'রাকায়াত নামায পড়লেন। তারপর বাড়ী গেলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ১৯ বছর।

হযরত উসামা (রা) মহানবীর (সা) খুবই প্রিয় ছিলেন। এ জন্য হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা) এবং অন্য সাহাবায়ে কিরামও (রা) তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। তাবারী (র) বর্ণনা করেছেন যে, একাদশ হিজরীর জিলকদ মাসে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) মুরতাদ বিদ্রোহী গোত্রদেরকে উৎখাতের জন্য আল-আবরাক তাশরীফ নিলেন। তখন তিনি মদীনায় হযরত উসামাকে (রা) নিজের স্থলাভিষিক্ত করেন।

হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত উসামাকে (রা) এত বেশী ভালোবাসতেন যে, নিজের সন্তানদের চেয়ে তাঁকে অগ্রাধিকার দিতেন। ইবনে আছির 'উসুদুল গাব্বাতে' লিখেছেন যে, হযরত ওমর ফারুক (রা) নিজের খিলাফতকালে সকল সাহাবীর (রা) ভাতা ঠিক করেন। এ সময় হযরত উসামার (রা) ভাতা তিন হাজার এবং নিজের পুত্র হযরত আবদুল্লাহর (রা) ভাতা আড়াই হাজার নির্ধারণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) অভিযোগ করলেন যে, আমি কোন যুদ্ধে উসামা (রা) থেকে কখনো পিছনে ছিলাম না এবং আপনি তার পিতা যায়েদ (রা) থেকে পিছনে ছিলেন না। কিন্তু আমার ভাতা আপনি তাঁর থেকে কম নির্ধারণ করেছেন।

হরত ওমর ফারুক (রা) জবাব দিলেন, "সে রাসূলের (সা) নিকট তোমার চেয়ে বেশী প্রিয় ছিল এবং তাঁর পিতা তোমার পিতার চেয়ে রাসূলের (সা) বেশী প্রিয় ছিলেন।"

এই ঘটনার পর হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) বয়সে বড় হওয়া সত্ত্বেও সবসময় হযরত উসামাকে (রা) খুব শ্রদ্ধা করতেন। এমনকি তাঁর সন্তানদেরকেও খুব ভালোবাসতেন। হযরত উসামার (রা) ওফাতের কয়েক বছর পর একদিন তিনি মসজিদে নববীর (সা) এক কোণায় এক পবিত্র সুরতের এক যুবককে দেখলেন এবং অযাচিতভাবে তার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি

হলো। পাশেই আবদুল্লাহ বিন দিনার (র) বসেছিলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই যুবকটি কে ? এক ব্যক্তি বললেন ঃ "আবু আবদুর রহমান আপনি কি তাকে চিনেন না। এ হলো উসামা (রা) বিন যায়েদের পুত্র মুহাম্মাদ (র)।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) একথা শুনে ঘাড় নীচু করলেন এবং হাত দিয়ে মাটি তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলেন। তারপর বললেন, "রাসূলুল্লাহ (সা) যদি তাকে দেখতেন তাহলে তাকেও ভালোবাসতেন।

হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের (রা) খিলাফতকালে (শেষার্ধ) ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। তখন হযরত উসামা (রা) নির্জনত্ব অবলম্বন করলেন। তা সত্ত্বেও সবসময় অন্তরে দেশ ও মিল্লাতের কল্যাণ কামনায় উন্মুখ থাকতেন। এ জন্য মাঝে মধ্যে হযরত ওসমানকে (রা) একাকী উত্তম পরামর্শ দিতেন। কিন্তু বাস্তবত ও প্রকাশ্যে কোন তৎপরতায় অংশ নেননি। হযরত ওসমান গনির (রা) শাহাদাতের পরও তিনি সেসব সংঘর্ষ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলেন যা হযরত আলী (রা) ও আমীরে মুয়াবিয়ার (রা) মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল।

হযরত উসামার (রা) ওফারেত সময় নিয়ে মতবিরোধ আছে। কোন রেওয়ায়াতে তাঁর মৃত্যুকাল ৫৪ হিজরী বলা হয়েছে। আবার কোন রেওয়ায়াতে ৫৮ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মৃত্যুর সময় তিনি জুরুফে মুকিম ছিলেন। মদীনা মুনাওয়ারাতে দাফন করা হয়।

হযরত উসামার (রা) দু'টি বিয়ের কথা ওপরে আলোচিত হয়েছে। তাছাড়াও তিনি জীবনে কয়েকজন মহিলাকে বিয়ে করেন। তাঁদের নাম হলো, দুররাহ.বিনতে আদি (তাঁর গর্ভে মুহাম্মাদ ও হিন্দা জন্ম গ্রহণ করেন), উম্মে হাকাম বিনতে উতবা, ফাতেমা (রা) বিনতে কায়েস [তাঁর গর্ভে জাবির, যায়েদ ও আয়েশা (র) জন্ম গ্রহণ করেন], বিনতে আবি হামদান সাহমী, বুরযাহ বিনতে রাবয়ী [তাঁর গর্ভে হাসান (র) ও হোসাইন (র) জন্মগ্রহণ করেন]।

বিশ্বনবীর (সা) ইন্তেকালের সময় হযরত উসামার (রা) বয়স কেবলমাত্র ১৮ অথবা ১৯ বছর ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি নবীর (সা) ফয়েজ লাভের যথেষ্ট সুযোগ লাভ করেছিলেন। এ জন্য ইলম ও ফজলের দিক থেকে অনেক উঁচু মর্যাদায় আসীন ছিলেন। তাঁর থেকে ১২৮টি হাদীস বর্ণিত আছে। এসব হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে হযরত আবু হুরায়রা (রা), হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আব্বাস (রা), আবু ওসমান নাহদী, আবু ওয়ায়েল এবং খাজা হাসান বসরীর (র) নাম উল্লেখযোগ্য।

ফাজায়েল ও আখলাকের দিক থেকে হযরত উসামার (রা) মর্যাদা অনেক উঁচুতে। মহানবীর (সা) প্রশিক্ষণ তাঁকে একজন উদাহরণযোগ্য মর্দে মু'মিন

বানিয়ে দিয়েছিল। নিজের প্রতিটি কথা ও কাজে হুজুরের (সা) উসওয়ায়ে হাসানা সামনে রাখতেন। এ জন্য মানুষও তাঁর আমলকে নিজেদের জন্য নমুনা হিসেবে মনে করতেন।

আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি গভীর আকর্ষণ ছিল। তিনি বছরের পর বছর ধরে হুজুরের (সা) ইবাদাত দেখেছিলেন। এ জন্য বেশী বেশী ইবাদাত করাকে অভ্যাসে পরিণত করেছিলেন। শেষ বয়সেও যখন তাঁর দেহের শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিল তখনো সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। একদিন তাঁর গোলাম বললেন, এই রোযা তো ফরজ নয়। এ জন্য আপনি এই বার্দ্ধক্যের সময়ও তা পালন কেন করেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এ দু'দিন রোযা রাখতেন।

হযরত উসামার (রা) মা হযরত উম্মে আইমানের (রা) ব্যাপারে কতিপয় চরিতকার লিখেছেন যে, তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) খিলাফত-কালে ওফাত পান। কিন্তু ইবনে সায়াদ (র) মুহাম্মাদ বিন সিরিন (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি হযরত ওসমানের (রা) খিলাফতকালেও জীবিত ছিলেন এবং হযরত উসামা (রা) তাঁর সন্তুষ্টি ও মনঃতুষ্টির জন্য সামান্যতম অবহেলাও করতেন না। একবার তিনি হযরত উসামার (রা) নিকট খেজুর বৃক্ষের মাথি খাওয়ার ফরমায়েশ করলেন। সে সময় খেজুর বৃক্ষের মূল্য ছিল খুব চড়া এবং এক একটি বৃক্ষের দাম ছিল এক হাজার দেরহাম। হযরত উসামা (রা) একটি বৃক্ষের মাথি বের করলেন। লোকজন বললো, এত মূল্যবান বৃক্ষ আপনি কেন বরবাদ করছেন? তিনি জবাব দিলেন, মা'র ফরমায়েশ পূরণ করছি। তিনি যা ইচ্ছা করেন, আমি যেভাবেই হোক তা পূরণের জন্য চেষ্টা করে থাকি।

হযরত শামমাছ (রা) বিন ওসমান মাখযুমী

ওসমান বিন শুরাইদ (বিন হারমী বিন আমের বিন মাখযুম) মাখযুমী কুরাইশের অন্যতম বিত্তবান মানুষ ছিলেন এবং মক্কার সরদার রবিয়া বিন আবদি শামছের জামাতা ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে পুত্র সন্তান দান করলে তার নাম নিজের নাম অনুসারে ওসমানই রাখে। কিন্তু আল্লাহ পাক এই নবজাতকের এত রূপ দিয়েছিলেন যে, লোকজন তাকে শামমাছ (সূর্যালোক) বলে ডাকতে লাগলো। এমন কি কারোর তার আসল নাম স্মরণই রলো না।

শামমাছের তখন শৈশবকাল। এ সময় স্নেহময় পিতার ছায়া তার ওপর থেকে উঠে গেল। মাতা সুফিয়া বিনতে রবিয়ার ওপর কিয়ামত আপতিত হলো। কিন্তু শামমাছের (রা) মামা উতবা বিন রবিয়া বিধবা বোন ও ইয়াতিম ভাগনের মাথার উপর স্নেহের হাত রাখলো এবং তাঁকে ওসমান বিন শুরাইদের অভাব খুব কমই অনুভূত হতে দিল। শামমাছ মামা এবং মায়ের ছায়াতলে যৌবনে পদার্পণ করলেন। তাঁর ছিল কালো চমকপূর্ণ চুল, মতির মত স্নিগ্ধ সাদা দাঁত, রং ছিল গোরা, নাক লম্বা, প্রশস্ত চোখ, চেহারা ছিল অতি সুন্দর। তাঁর সুরত দেখে সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেত। মা ও মামা উভয়েই শামমাছের জন্য উৎসর্গীকৃত ছিল এবং তারা তাকে অত্যন্ত আদর ও যত্নে লালিত পালিত করেন। একবার মক্কায় এক সুদর্শন খৃস্টান (অথবা অগ্নি উপাসক)-এর আগমন ঘটলো। লোকদের মধ্যে তার রূপের চর্চা হতে লাগলো। এ সময় উতবা একদিন নিজের ভাগনের (শামমাছ)-কে তার পাশে এনে দাঁড় করিয়ে দিল এবং লোকদেরকে বললো, একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো যে, আমার ভাগনের রূপ ও সৌন্দর্য বিদেশীর থেকে বেশী কিনা ? উভয়কে একত্রে দেখে মক্কাবাসীর চোখ খুলে গেল। শামমাছের রূপ ও সৌন্দর্যের সামনে বিদেশীর রূপের কোন পাত্তাই ছিল না। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, ওসমান বিন ওসমান সেই দিন থেকেই শামমাছ উপাধিতে মশহুর হয়ে যান। এ উপাধি এত মশহুর হলো যে, লোকজন তার আসল নামই ভুলে গেল।

শামমাছের (রা) বয়স তখন ১৯ কিম্বা ২০ বছর ছিল। রহমতে আলম (সা) দাওয়াতে হক প্রদানের কাজ শুরু করলেন। আল্লাহ তায়ালা শামমাছকে রূপের সাথে গুণ বা সুন্দর চরিত্রও দান করেছিলেন। তাঁর কানে যেই মাত্র তাওহীদের দাওয়াত পৌছলো তৎক্ষণাৎ তিনি নির্ভাবনায় সেই দাওয়াতে সাড়া

দিলেন। মা-ও অত্যন্ত নেকবখত মহিলা ছিলেন। তিনিও সৌভাগ্যবান পুত্রের সাথে ইসলামের নিয়ামতে পূর্ণ হয়ে গেলেন। উতবা বিন রবিয়া বোন ও ভাগনেকে খুব করে বুঝালো। তাঁদেরকে বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ না করার পরামর্শ দিল। কিন্তু তাঁরা উভয়েই যে সরল ও সঠিক পথে রওয়ানা দিয়েছিলেন তা থেকে মুখ ফিরালেন না। তা থেকে মুখ ফিরানো তারা কোন অবস্থাতেই সহ্য করলেন না।

সময়টা ছিল খুবই ভীতিকর। হকের দাওয়াত কবুল করার অর্থই ছিল মুসিবতের জালে আটকে পড়ার নামান্তর। কুরাইশের মুশরিকরা মুসলমানরা শান্তিতে কাটাক তা কোনক্রমেই বরদাশত করতে পারতো না। ইসলামের দাওয়াতের যতই বিস্তৃতি ঘটতে লাগলো তাদের ক্রোধ-বহ্নি আরো তীব্র হতে লাগলো। জুলুম-নির্যাতনের সকল ধরনের অস্ত্র ও মাধ্যম তারা হকপন্থীদের ওপর পরীক্ষা করেছিল। তাদের নির্যাতনের হাত থেকে সুফিয়া (রা) বিনতে রবিয়া এবং শামমাছও (রা) রক্ষা পেলেন না। কাফেরদের নির্যাতন যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন রাসূলে আকরাম (সা) সাহাবায়ে কিরামকে (রা) হাবশার দিকে হিজরতের অনুমতি দিয়ে দিলেন। হযরত শামমাছও (রা) মা'সহ অন্যান্য মুসলমানের মত হিজরত করে হাবশা চলে গেলেন এবং কয়েক বছর সেখানে অবস্থান করে উদ্বাস্তু জীবনের মুসিবত সহ্য করতে থাকলেন।

হাবশার মুহাজিরদের মধ্যকার একটি দল হযরত জাফর তাইয়ার (রা) বিন আবি তালিবের সঙ্গে খায়বারের যুদ্ধ পর্যন্ত হাবশাতেই ছিলেন। অবশ্য ইবনে ইসহাকের (রা) রেওয়ায়াত অনুযায়ী চল্লিশ জন মুসলমান বিভিন্ন সময়ে মহানবীর (সা) মদীনা হিজরতের পূর্বে মক্কা ফিরে আসেন। এই প্রত্যাবর্তনকারীদের মধ্যে হযরত শামমাছ (রা) এবং তাঁর মা'ও ছিলেন। কিন্তু মক্কা ফিরে আসার অল্প দিন পরই মদীনা হিজরতের অনুমতি দেয়া হলো। হযরত শামমাছ (রা) তখন মা'সহ মদীনায় হিজরত করলেন। এমনিভাবে তাঁরা দুই হিজরতকারীর মর্যাদা পেয়ে গেলেন।

হযরত শামমাছ (রা) মদীনা মুনাওয়ারাতে হযরত মুবাশ্শির (রা) বিন আবদুল মানযার আনসারীর মেহমান হলেন। হিজরতের কয়েক মাস পর মহানবী (সা) যখন মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করলেন তখন হযরত শামমাছকে (রা) গাসিলুল মালায়েকা হযরত হানজালা (রা) বিন আবি আমের আনসারীর ইসলামী ভাই বানালেন।

দ্বিতীয় হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তখন হযরত শামমাছ (রা) সেই তিনশ' তের জন জীবন উৎসর্গকারীর মধ্যে শামিল

ছিলেন—যাঁরা কুফুরীর ভীতিপ্রদ আল্লাহদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে শুধুমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করে ময়দানে নেমে পড়েছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে তাঁর আপন দুই মামা উতবা বিন রবিয়াহ এবং শাইবা বিন রবিয়াহ বিরোধী ব্যূহে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু হযরত শামমাছের (রা) নিকট হক পথে পার্থিব আত্মীয়তার সম্পর্ক কোন তাৎপর্যই বহন করতো না। তিনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে এমন আবেগ ও আত্মহারা হয়ে যুদ্ধ করলেন যে, জানবাজীর হক আদায় করে ছাড়লেন।

তৃতীয় হিজরীতে সংঘটিত ওহোদের যুদ্ধেও অত্যন্ত আবেগ ও উচ্ছ্বাসের সঙ্গে অংশ নেন এবং বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন। যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ে একটি হঠাৎ ভুলের কারণে মুসলমানদের মধ্যে বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়ে এবং রাসূলের (সা) নিকট শুধুমাত্র কয়েকজন জাননিছার রয়ে গিয়েছিলেন। এ জান নিছারদের মধ্যে হযরত শামমাছও (রা) ছিলেন। কাফেররা বারংবার প্রিয় নবীর (সা) উপর হামলা করছিলো এবং তাঁর জান নিছাররা তাদেরকে তরবারীর আঘাতে পিছু হটিয়ে দিচ্ছিলেন। মহানবীকে (সা) ভীতিজনক অবস্থায় দেখে হযরত শামমাছের (রা) দেহে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠলো। তিনি রাসূলের (সা) ডাইনে-বামে, আগে ও পিছে ঘুরছিলেন এবং তাঁর তরবারী নিরাপত্তাহীন বিদ্যুত হয়ে কাফেরদের উপর আপতিত হচ্ছিল। সে সময় তিনি দুনিয়া ও তার মধ্যে কি ঘটছে সে সম্পর্কে ছিলেন বেখবর। একমাত্র ধ্যান ছিল যে, কোন মুশরিক যেন রহমতে আলমের (সা) নিকট পৌঁছতে না পারে।

হুজুর (সা) যে দিকে দৃষ্টি ফেলতেন সেদিকেই শামমাছকে (রা) কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত দেখতেন। তিনি নিজেকে হুজুরের (সা) ঢাল বানিয়ে নিয়েছিলেন এবং কাফেরদের প্রতিটি তরবারীর আঘাতকে সামনে অগ্রসর হয়ে নিজের শরীরের ওপর নিয়ে নিতেন। এই অবস্থায় আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। যুদ্ধশেষ হলে শহীদ ও আহতদের সন্ধান শুরু হলো। এ সময় শামমাছকে (রা) এই অবস্থায় পাওয়া গেল যে, তাঁর শরীরের কোন অংশই জখম ছাড়া ছিল না। কিন্তু তখনো তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস চলছিলো। হুজুর (সা) সাহাবাদেরকে (রা) নির্দেশ দিলেন যে, তাঁকে উঠিয়ে মদীনা নিয়ে যাও এবং চিকিৎসা করো। সুতরাং তাকে মদীনা আনা হলো। হযরত উম্মে সালমা মাখজুমিয়া (রা) তাঁর সেবা শুশ্রূষার দায়িত্ব পালন করলেন। কিন্তু হযরত শামমাছের (রা) অবস্থা চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার সীমার বাইরে চলে গিয়েছিল। শুধুমাত্র একদিন এবং একরাত জীবিত ছিলেন। এ সময় তিনি কিছু খাননি এবং পানও করেননি। অতপর তাঁর জীবন মহান স্রষ্টার সঙ্গে মিলিত হলো। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৩৪ বছর।

সন্তানদের মধ্যে ছিলেন এক পুত্র আবদুল্লাহ এবং এক কন্যা উম্মে হাবিব। এ দু'জনই সন্তানহীন অবস্থায় মারা যান। এ জন্য হযরত শামমাছের (রা) বংশধারা অব্যাহত থাকেনি।

হযরত শামমাছের (রা) শাহাদাতের পর তাঁর লাশ হুজুরের (সা) নির্দেশে ওহোদের ময়দানে আনা হলো এবং যে রক্তাক্ত কাপড়ে তিনি শাহাদাত পেয়েছিলেন সেই কাপড়েই ওহোদের শহীদানদের সাথে দাফন করা হলো (অন্য এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী তার দাফন হয় জান্নাতুল বাকীতে)।

হযরত হাশিম (রা) বিন উতবা

দিনটি ছিল দ্বিতীয় হিজরীর ১৭ই রমযান।

সেদিন মদীনার ৮০ মাইল দূরে বদরের ময়দানে এক ভয়াবহ দৃশ্য নজরে পড়ছিল। মক্কার মুশরিকরা বিরাট সাজ-সরঞ্জাম ও জাঁকজমকের সাথে হকপন্থীদেরকে দুনিয়া থেকে নাস্তানাবুদ করার জন্য এসেছিল। তাদের থেকে তিনভাগের এক ভাগ সাজ-সরঞ্জামহীন তাওহীদের ঝান্ডাবাহীদের হাতে জিল্লতিসূচক পরাজয় স্বীকার করেছিল। তাদের বড় বড় সরদার নিহত হয়েছিল এবং যুদ্ধের ময়দানে তাদের লাশ স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়েছিল। এরা ছিল তারা, যারা মক্কায় হকপন্থীদের জীবিত থাকাটা কষ্টকর করে দিয়েছিল এবং তাদেরকে স্বদেশভূমি থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করেছিল। আজ এখানে তাদের লাশ রক্তাক্ত মাটিতে শিক্ষণীয় উদাহরণ হিসেবে পড়েছিল। মহানবী (সা) যদি চাইতেন তাহলে তাদের লাশ চিল, শকুন ও জন্তু জানোয়ারের খোরাক বানানোর জন্য এমনিভাবে খোলা ময়দানে ফেলে রাখতেন। কিন্তু তাঁর দয়ার অন্তর এটা সহ্য করতে পারলো না। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে (রা) সেই সকল লাশ একত্রিত করে কোন উপযুক্ত স্থানে পুঁতে ফেলার নির্দেশ দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা) ময়দানে চক্কর মারলেন। এ সময় একস্থানে একটি বড় কূপ দেখতে পেলেন। কূপটি দীর্ঘ দিন যাবৎ অব্যবহৃত ছিল। তাঁরা সকল লাশ সেই কূপে নিক্ষেপ করলেন এবং মাটি ও পাথর দিয়ে তা ঢেকে দিলেন। তারপর হুজুর (সা) সেই সামষ্টিক কবরের নিকট তাশরীফ নিলেন এবং উচ্চ কণ্ঠে ইরশাদ করলেন ঃ

"হে উতবা, হে শাইবা, হে আবু জেহেল, হে অমুক, হে তমুক! তোমরা কি আল্লাহর ওয়াদা সঠিক পেয়েছ ? অবশ্যই আমার সঙ্গে যে ওয়াদা রাব্বুল ইজ্জত করেছেন তা পূর্ণ হয়েছে।"

যে সময় রাসূলের (সা) যবান দিয়ে এই বাক্য উচ্চারিত হচ্ছিল তখন সেখানে উপস্থিত হুজুরের (সা) সকল জান নিছারের চেহারায় শিক্ষাগ্রহণের ছবি ফুটে উঠেছিল। কিন্তু তাঁদের মধ্যে এক সাহাবীকে অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত মনে হচ্ছিল। তিনি ছিলেন একজন অর্ধবয়সী আকর্ষণীয় অবয়বের মানুষ। সামনের একটি দাঁত ছিল বেশী এবং একটি চোখ সামান্য টেরা ছিল। কিন্তু চেহারা ছিল মোহনীয় ও আকর্ষণীয় এবং কপাল সৌভাগ্যের আলোয় চকমক করছিল। তাঁকে দুঃখভারাক্রান্ত দেখে রহমতে আলম (সা) নিজের নিকট ডাকলেন এবং অত্যন্ত স্নেহভরে জিজ্ঞেস করলেন, "সম্ভবত তোমার পিতার

মৃত্যু তোমাকে দুঃখভারাক্রান্ত বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করেছে"—তিনি আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম, আমি আমার পিতার মৃত্যুতে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নই। বরং আমার দুঃখ এ জন্য যে, আমার পিতার হক কবুলের সৌভাগ্য হয়নি এবং সে কুফুরীর ওপর মারা গেছে। অথচ সে একজন বিজ্ঞ ও সঠিক মতের মানুষ ছিল। তার চরিত্র ছিল সুন্দর। আমার সম্পূর্ণ আস্থা ছিল যে, সে ইসলাম গ্রহণের মর্যাদায় অভিষিক্ত হবে। কিন্তু যে অবস্থায় তার শেষ পরিণতি হলো তা দেখে আমার সকল আশা ও আকাংখা ধূলায় মিশে গেছে। আমার পিতার মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের বৈভব থেকে মাহরুম থাকাটাই আমার দুশ্চিন্তা ও ব্যথিত হওয়ার কারণ।"

মহানবী (সা) তাঁর ঈমানী আবেগের প্রশংসা করলেন এবং তাঁকে দোয়ায়ে খায়ের দিলেন। দ্বীনের প্রতি সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ প্রকাশ এবং ঈমানী আবেগ প্রদর্শনকারী এই সাহাবী ছিলেন মক্কার কুরাইশের নামকরা সরদার উতবা বিন রবিয়ার (বদরে নিহত) পুত্র হাশিম। ইতিহাসে তিনি আবু হুজায়ফা কুনিয়তে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

সাইয়েদেনা হযরত আবু হুজায়ফা (রা) হাশিম বিন উতবা (বিন রবিয়া বিন আবদি শামস বিন আবদি মান্নাফ বিন কুসাই) মহান সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। তিনি এমন এক পরিবারে চোখ খুলেছিলেন যে পরিবার ছিল কুফর ও শিরকের প্রাণকেন্দ্র। তাঁর পিতা উতবা বিন রবিয়া কুরাইশের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ছিল এবং নিজের কওমে খুব প্রভাব প্রতিপত্তি রাখতো। তার পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণ শক্তি, দূরদর্শীতা এবং স্বীয় মতে অটল থাকার গুণাবলীও সকলেই স্বীকার করতো। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো যে, মহানবী (সা) যখন মক্কাবাসীকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন তখন সে কানে তুলো গুজে দিল এবং সেই সব লোকের মধ্যে শামিল হয়ে গেল যারা দ্বীনে হকের বিরোধিতা করাটাকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে বানিয়ে নিল। তবুও তার সুন্দর স্বভাব ও প্রকৃতি আবু লাহাব, আবু জেহেল, উকবা বিন আবি মুঈত, উমাইয়া বিন খালফ, ওয়ালিদ বিন মুগিরা এবং আসওয়াদ বিন আবদি ইয়াগুছ প্রভৃতির মত খারাব মানুষের কাতারভুক্ত করেনি। তারা এমন মানুষ ছিল যে, হুজুরকে (সা) নির্যাতন করার জন্য চরম নীচতম পন্থা অবলম্বন করতেও দ্বিধা করতো না। উতবা ও তার ভাই শাইবা ইসলামের শত্রু ছিল অবশ্যই কিন্তু তারা হুজুরকে (সা) নির্যাতন করার জন্য কোন নীচতম পন্থা অবলম্বন করেনি। উতবা নিজের পুত্রের লালন-পালন খুব বিত্ত বৈভবের আতিশয্যের মধ্যেই করেছিল। যখন সে যৌবনপ্রাপ্ত হলো তখন তার বিয়ে দিল কুরাইশের খতিব সোহায়েল বিন আমরের কন্যা সাহলার সাথে। হাশিমের বয়স যখন ৩০/৩২ বছর তখন

মক্কায় তাওহীদের আওয়াজ উত্থিত হলো। উতবা যদিও নিজের পুত্রকে স্বরঙে রঞ্জিত করার চেষ্টায় কোন ত্রুটি করেনি তবুও আল্লাহ তায়ালা সেই যুবককে সৎ স্বভাব দান করেছিলেন। তিনি সবধরনের ভয়-ভীতির মুখে নির্ভাবনায় হক দাওয়াতের আহ্বানে সাড়া দিলেন। নেক বখত স্ত্রী সাহলা (রা) বিনতে সোহায়েলও তাঁকে সমর্থন করলেন এবং এমনিভাবে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সাবিকুনাল আউয়ালুনের পবিত্র জামায়াতে শামিল হয়ে গেলেন। পুত্র ও পুত্রবধুর ইসলাম গ্রহণে উতবা খুব মনোকষ্ট পেল এবং সে তাঁদের ওপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো। পরিণাম এই হলো যে, তিনিও অন্যান্য মুসলমানের মত কুরাইশ মুশরিকদের জুলুম-নির্যাতনের নিশানা হয়ে গেলেন। কাফেরদের জুলুম যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন মহানবী (সা) মজলুম মুসলমানদেরকে হাবশা হিজরতের পরামর্শ দিলেন। সুতরাং নবুওয়াতের পাঁচ বছর পর ১১ জন পুরুষ ও চারজন মহিলা মক্কার মাটিকে বিদায় জানিয়ে হাবশা রওয়ানা হলেন। এ সময় তাদের মধ্যে হযরত হাশিম (রা) এবং তাঁর স্ত্রী হযরত সাহলা (রা) বিনতে সোহায়েলও শামিল ছিলেন। কুরাইশ মুশরিকদের এটাও অসহ্য ছিল যে, হকপন্থীরা এমন কোন স্থানে চলে যাক যেখানে তাদের জুলুম-নির্যাতনের হাত সম্প্রসারিত হতে না পারে। তারা সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত মুসলমানদের পিছু ধাওয়া করলো। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শুয়াইবা বন্দরে তাঁরা হাবশাগমনকারী একটি নৌকা পেয়ে গেলেন এবং তাতে চড়ে তৎক্ষণাৎ খোলা সমুদ্রে প্রবেশ করলেন। এভাবে পিছু ধাওয়াকারী মুশরিকরা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এলো।

মুহাজিররা হাবশা পৌছার পর কেবলমাত্র দু'তিন মাস অতিবাহিত হয়েছে। এমন সময় তাঁরা এক আশ্চর্য ধরনের খবর শুনতে পেলেন। কেউ তাঁদেরকে বললো যে, রাসূলে আকরাম (সা) ও মক্কার কুরাইশদের মধ্যে সন্ধি হয়ে গেছে এবং এখন হকপন্থীরা কুরাইশের জুলুম-নির্যাতন থেকে মাহফুজ ও নিরাপদ হয়ে গেছে। মুহাজিররা এই খবর শুনে বিশ্ব নবীর (সা) নিকট পৌছার জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন। সুতরাং ইবনে সায়াদের (র) বক্তব্য অনুযায়ী তারা সকলেই এবং ইবনে ইসহাকের (র) মতে তাঁদের কতিপয় মক্কা ফিরে আসলেন। যাহোক, হাবশা থেকে প্রত্যাগমনকারীদের মধ্যে হযরত আবু হুজায়ফা (রা) ও হযরত সাহলাও (রা) ছিলেন। যখন তাঁরা মক্কার নিকট পৌছলেন তখন জানতে পেলেন যে, তাঁরা যা শুনেছেন তা স্রেফ গুজব। তাতে তাঁরা পারস্পরিক পরামর্শ করলেন যে, হাবশা ফিরে যাবেন অথবা মক্কা প্রবেশ করবেন। সকলে মিলে মত প্রকাশ করলেন যে, কুরাইশ নেতাদের কারো না কারোর আশ্রয় নিয়ে শহরে প্রবেশ করতে হবে। বস্তুত তাঁদের প্রত্যেকেই কুরাইশের কোন না কোন সরদারের আশ্রয় নিলেন এবং সকলেই শহরে প্রবেশ

করলেন। আল্লামা বালাজুরী (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু হুজায়ফা (রা) এবং তাঁর স্ত্রী উমাইয়া বিন খালফের আশ্রয় নিয়ে মক্কা প্রবেশ করলেন। এসব সাহাবী (রা) এমনিভাবে স্বদেশে তো ফিরে এলেন এবং প্রিয় নবীর (সা) দর্শন লাভেও সফলকাম হলেন। কিন্তু তাঁরা দেখতে পেলেন যে, প্রতিকূল অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি এবং মুশরিকদের জুলুম-নির্যাতন ক্রমেই প্রচন্ড রূপ ধারণ করছে। ফলে হুজুর (সা) মজলুম মুসলমানদেরকে পুনরায় হাবশা হিজরতের নির্দেশ দিলেন। সুতরাং নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছরের শুরুতে পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে প্রায় একশ'র মত মুসলমানের একটি কাফেলা হাবশা রওয়ানা হয়ে গেল। আবু হুজায়ফাও (রা) হযরত সাহলার (রা) সাথে সেই কাফেলায় শামিল ছিলেন। যেন এটা তাঁদের হাবশায় দ্বিতীয় হিজরত ছিল। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কয়েক বছর হাবশায় উদ্বাস্তুর জীবন কাটাতে লাগলেন। এই সময় তাঁদের পুত্র মুহাম্মাদ (রা) বিন আবি হুজায়ফা জন্মগ্রহণ করেন। আল্লামা ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, হাবশার মুহাজিরদের একটি জামায়াত হযরত জাফর (তাইয়ার) বিন আবি তালিবের সঙ্গে ৬ষ্ঠ হিজরী পর্যন্ত হাবশা রলেন এবং খায়বারের যুদ্ধের সময় ফিরে আসেন। অবশ্য ৩৩ জন পুরুষ ও ৮জন মহিলা সমন্বয়ে গঠিত একটি দল হুজুরের (সা) মদীনা হিজরতের কিছু দিন পূর্বে হাবশা থেকে মক্কা ফিরে আসেন। হযরত আবু হুজায়ফাও (রা) নিজের স্ত্রী ও পুত্রসহ সেই দলে শামিল হয়ে মক্কা ফিরে এলেন। কিছু দিন পর হুজুর (সা) মুসলমানদেরকে মদীনা হিজরতের অনুমতি দেন। তখন হযরত আবু হুজায়ফাও (রা) স্ত্রী-পুত্র এবং আযাদকৃত গোলাম (মুখে ডাকা পুত্র) হযরত সালেমকে (রা) সঙ্গে নিয়ে মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা চলে যান। এমনিভাবে তিনি হক পথে তৃতীয়বার হিজরতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হন। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, মদীনায় হযরত উবাদ (রা) বিন বাশার আশহালী হযরত আবু হুজায়ফা (রা) এবং তার পরিবার পরিজনকে মেহমান বানালেন। রহমতে আলম (সা) মদীনায় শুভ পদার্পণের পর কয়েক মাস অতিবাহিত হলে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় হযরত আবু হুজায়ফাকে (রা) তাঁর মেযবান হযরত উবাদ (রা) বিন বাশারেরই দ্বীনি ভাই বানিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে হক ও বাতিলের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয় বদরের প্রান্তরে। এ সময় হযরত আবু হুজায়ফা (রা) সেই তিনশ' তের পবিত্র নামের অন্যতম ছিলেন যাঁরা সেই ঐতিহাসিক সময়ে বিশ্বনবীর (সা) সফর সঙ্গী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। বিপক্ষে বাতিল পূজারীদের নেতৃত্ব হযরত আবু হুজায়ফার (রা) পিতা উতবা বিন রবিয়ার হাতে ছিল। তার সঙ্গে

ছিল তার দ্বিতীয় পুত্র ওলিদ, ভাই শাইবা এবং নাতি হানজালা বিন আবি সুফিয়ান। কতিপয় নেতৃস্থানীয় চরিতকার লিখেছেন যে, উতবার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল কোনভাবে যুদ্ধকে এড়িয়ে যাওয়া। সুতরাং সে হাকিম বিন হাযামকে পয়গামসহ আবু জেহেলের নিকট প্রেরণ করেছিল। এই পয়গামে সে জানিয়েছিল যে, চাচার পুত্রের [রাসূলে আকরাম (সা)] বিরুদ্ধে মুকাবিলা থেকে সরে দাঁড়ানোই উত্তম হবে। আবু জেহেল এই পয়গাম শুনে জ্বলে উঠলো এবং বলতে লাগলো যে, উতবার এক পুত্র (আবু হুজায়ফা) মুহাম্মাদের (সা) বাহিনীতে রয়েছে। এ কারণে সে লড়াই থেকে সরে থাকতে চায়। সে চিন্তা করছে যে, যুদ্ধে যদি সে মারা যায়!

হাকিম বিন হাযাম ফিরে গিয়ে উতবাকে আবু জেহেলের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলো। তখন সে বললো, লড়াই হলে বুযদিলির কালিমা কে বহন করে, তা লোকজন দেখে নেবে। তারপর উতবা একটি লাল উটে চড়ে কুরাইশদের সামনে এক ওজস্বী ভাষণ দিলো। এই ভাষণে সে তাদেরকে লড়াই ছাড়া ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিল। কিন্তু আবু জেহেল ও অন্যান্য যুদ্ধপ্রিয় মুশরিক তার কথায় কোন আমল দিল না। যুদ্ধ শুরু হলে উতবা আবু জেহেলের অপবাদ খন্ডনের জন্য স্বীয় পুত্র আবু হুজায়ফাকে (রা) মুকাবিলার আহ্বান জানালো। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, স্বয়ং হযরত আবু হুজায়ফা (রা) ঈমানী আবেগে অস্থির হয়ে নিজের পিতাকে যুদ্ধের আহ্বান জানালেন। হযরত আবু হুজায়ফার সহোদরা হিন্দ বিনতে উতবাও পিতার সঙ্গে এসেছিল। সে সহোদরকে (আবু হুজায়ফা) পিতা এবং অন্যান্য আত্মীয়ের সামনে তরবারী হাতে দেখে ক্রোধে অস্থির হয়ে ভাইয়ের নিন্দায় একটি কবিতা আবৃত্তি করলো।

পিতা পুত্রের মুকাবিলার আহ্বানে সাড়া দেয়নি অথবা পুত্র পিতার যুদ্ধের ডাককে গ্রহণীয় বলে মনে করেননি—যাই হোক না কেন, উভয়ের মধ্যে মুকাবিলা হয়নি। অবশ্য উতবা হযরত হামযা (রা) বিন আবদুল মুত্তালিবের হাতে মারা গিয়েছিল। তার মুশরিক পুত্র ওলিদ, ভাই শাইবা এবং নাতী হানজালাও যুদ্ধে নিহত হয়। যুদ্ধের পর বিশ্বনবী (সা) মুশরিকদের লাশ একটি অন্ধ কূপে দাফন করালে সেই ঘটনা সংঘটিত হয় যা ওপরে বর্ণিত হয়েছে।

বদরের যুদ্ধে কুরাইশের যেসব ব্যক্তি মুসলমানদের হাতে গ্রেফতার হয়, তাদের মধ্যে রাসূলের (সা) চাচা হযরত আব্বাস (রা) বিন আবদুল মুত্তালিবও ছিলেন। আব্বাস (রা) পর্দার অন্তরালে মুসলমান হয়েছিলেন অথবা আন্তরিকভাবে মুসলমানদের কল্যাণকামী ছিলেন এবং মুশরিকদের বাধ্য করানোর কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। প্রিয়নবী (সা) প্রকৃত

অবস্থা অবগত ছিলেন। এই ভিত্তিতে হুজুর (সা) লড়াইয়ের পূর্বে সাহাবায়ে কিরামকে (রা) হিদায়াত দিয়ে ছিলেন যে, বনুহাশেম এবং অন্য আরো কতিপয় লোককে জবরদস্তি করে আমাদের মুকাবিলায় আনা হয়েছে। নচেৎ তারা নিশ্চিতভাবে আমাদের সঙ্গে লড়াই করতে চায়নি। এ জন্য যুদ্ধের সময় যদি হাশেমীদের কেউ তোমাদের হাতে আসে তাহলে তাকে হত্যা করবে না। আবুল বখতরী বিন হিশাম (যিনি শিবে আবি তালিবের অবরোধ ভাঙ্গার ব্যাপারে বিশেষভাবে অংশ নিয়েছিলেন)-কেও হত্যা করবে না এবং বিশেষ করে আমার চাচা আব্বাসকে হত্যা থেকে বিরত থাকবে। কেননা সে খুব অনিচ্ছা সত্ত্বেও এখানে এসেছে।

আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত আবু হুজায়ফার (রা) ঈমানী আবেগ চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল এবং তাঁর নিকট হকের মুকাবিলায় রক্ত ও বংশের সম্পর্ক এবং আত্মীয়তার কোন গুরুত্ব ছিল না। তিনি বিশ্বনবীর (সা) ইরশাদ ভালোভাবে বুঝতে না পেরে বলে উঠলেন ঃ

"এটা হক ও বাতিলের মুকাবিলা। আমরা যদি হকের খাতিরে নিজের পিতা, ভাই, পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়কে ক্ষমা না করি তাহলে বনু হাশেমকে কেন ক্ষমা করবো। আল্লাহর কসম, আমি যদি আব্বাসকে পাই তাহলে তাঁকে তরবারীর খোরাক না বানিয়ে ছাড়বো না।"

হুজুর (সা) হযরত আবু হুজায়ফার (রা) এই বক্তব্যের খবর পেলেন। এ সময় তিনি হযরত ওমর ফারুককে (রা) সম্বোধন করে বললেন ঃ

"আবু হাফস! তুমি আবু হুজায়ফার কথা শুনেছ। আমার চাচার চেহারা কি হত্যার যোগ্য ?"

হযরত ওমর (রা) আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন এবং বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি অনুমতি দেন তাহলে আবু হুজায়ফার গর্দান উড়িয়ে দেই।"

কিন্তু রহমতে আলম (সা) হযরত ওমরকে (রা) এ ধরনের কাজ থেকে বিরত রাখলেন। কেননা, হযরত আবু হুজায়ফা (রা) ছিলেন তাঁর অত্যন্ত একনিষ্ঠ জাননিছার সাহাবী।

হযরত আবু হুজায়ফার (রা) এই লজ্জা প্রকাশ দ্বীনের প্রতি তাঁর ইখলাস ও রাসূল প্রেমের বাস্তব প্রতিচ্ছবি ছিল। যদিও রাসূলে করিম (সা) তাকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, তবুও তাঁর অন্তরে সবসময় নিজের কথার কাঁটা বিধতো। এভাবেই আল্লাহ তায়ালা একদিন তাঁর শাহাদাতের আকাংখাও পূরণ করে দিলেন।

বদরের পর হযরত আবু হুজায়ফা (রা) অন্যান্য সকল গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে অত্যন্ত উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নিয়েছিলেন এবং প্রত্যেক যুদ্ধেই অত্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। একাদশ হিজরীতে বিশ্বনবী (সা) ওফাত পেলেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) খিলাফতের মসনদে সমাসীন হলেন। এ সময় সমগ্র আরবে ধর্মদ্রোহিতার ফিতনার আগুন জ্বলে উঠলো। সেই ভয়াবহ সময় হযরত আবু হুজায়ফা (রা) অত্যন্ত তৎপরতার সাথে খলিফাতুর রাসূলকে সমর্থন দিলেন। এবং মুরতাদদের উৎখাতের জন্য জীবন উৎসর্গের বাজী ধরলেন। ধর্মদ্রোহিতা প্রসঙ্গে সবচেয়ে রক্তাক্ত যুদ্ধ "ইয়ামামার" যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত। এটা ছিল লোহায় লোহায় টক্কর। এক দিকে ছিল কঠিন ধরনের আরবরা অন্য পক্ষেও ছিল আরব। কিন্তু এক পক্ষ আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের (সা) জন্য লড়াই করছিল। আর অন্য পক্ষ মুসায়লামা কাজ্জাবের নেতৃত্বে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। হকপন্থীদের কাতারে হযরত আবু হুজায়ফাও (রা) মুখে ডাকা পুত্র হযরত সালেমের (রা) সাথে শামিল ছিলেন। উভয়ে যুদ্ধে জীবন উৎসর্গের এমন নমুনা পেশ করেছিলেন যে, অসংখ্য আঘাত খেয়ে উভয় জানবাজ সিপাহী শাহাদাতের পেয়ালা পান করে জান্নাতে পৌঁছে গেলেন। হযরত আবু হুজায়ফার (রা) বয়স সে সময় ৫৪ বছর ছিল। বদরের দিন থেকে যে শাহাদাতের আকাংখা তাঁর অন্তরে চেপে বসেছিল ন' বছর পর তা ইয়ামামার ময়দানে পূর্ণ হয়ে গেল।

হযরত আবু হুজায়ফা (রা) জীবনে তিনটি বিয়ে করেছিলেন। স্ত্রীদের নাম হলো ঃ সাহলা (রা) বিনেত সোহায়েল (রা), ছাবিতা (রা) বিনতে ইয়ায়ার এবং আমেনা বিনতে আমর। সন্তানের মধ্যে দু'পুত্রের নাম পাওয়া যায়। মুহাম্মাদ (রা) বিন আবি হুজায়ফা (রা) হযরত সাহলার (রা) গর্ভ থেকে হাবশার জন্মগ্রহণ করেন এবং আছেম বিন আবি হুজায়ফা (রা) আমেনা বিনতে আমরের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মাদ ও আছেম উভয়েই নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। এ জন্য হযরত আবু হুজায়ফার বংশধারা অব্যাহত থাকেনি।

হযরত আবু হুজায়ফা হাশিমের (রা) জীবনের পাতায় ইসলামে অগ্রগামিতা, হকপথে আত্মোৎসর্গের আকাংখা, ইখলাস ফিদ্বীন, কুরবানীর আবেগ এবং ঈমানী জোশ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। গোলামদের প্রতি এত স্নেহশীল ছিলেন যে, যখন তাঁর স্ত্রী ছাবিতা (রা) বিনতে ইয়ায়ার নিজের গোলাম সালেমকে আজাদ করে দিলেন তখন তাঁরা হযরত সালেমকে (রা) নিজের মুখে ডাকা পুত্র বানিয়ে নিলেন এবং সে লোকদের মধ্যে সালেম (রা) বিন আবু হুজায়ফা নামে মশহুর হয়ে গেলেন।

কিন্তু যখন এই হুকুম নাযিল হলো অর্থাৎ লোকদেরকে তাদের পিতার নিসবত ধরে ডাকো তখন লোকেরা তাকে আবু হুজায়ফার (রা) আজাদকৃত গোলাম সালেম (রা) হিসেবে ডাকতে লাগলো।

মুসনাদে আবু দাউদে আছে যে, এই নির্দেশ নাযিল হওয়ার পর হযরত আবু হুজায়ফার (রা) নিকট হযরত সালেমের (রা) নিজের বাড়ীতে স্বাধীনভাবে যাতায়াত অসহনীয় বলে মনে হতে লাগলো। কেননা, তিনি আশংকা করছিলেন যে, সালেমের (রা) এ ধরনের যাতায়াত আল্লাহর নির্দেশের খেলাফ হয়ে যায় কিনা! তিনি এই আশংকার কথা হযরত সাহলা (রা) বিনতে সোহায়েলের নিকট প্রকাশ করলেন। তখন তিনি হুজুরের (সা) খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সালেমকে নিজেদের পুত্র মনে করতাম এবং সে শৈশবকাল থেকে আমাদের বাড়ী আসা যাওয়া করে থাকে। কিন্তু এখন আবু হুজায়ফার (রা) নিকট তার আমাদের বাড়ী স্বাধীনভাবে যাতায়াত পসন্দনীয় নয়।"

হুজুর (সা) বললেন, "তাকে নিজের দুধ পান করিয়ে দাও। তাহলে সে তোমার মুহরিম হয়ে যাবে।"

মোটকথা, এমনিভাবে হযরত সালেম (রা) হযরত আবু হুজায়ফা (রা) ও হযরত সাহলার (রা) দুধ পুত্র হয়ে গেলেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, এটা শুধু হযরত সালেমের জন্য বিশেষ অনুমতি ছিল। নচেৎ জওয়ান অবস্থায় দুধ পুত্রের সম্পর্ক স্থাপিত হয় না।

হযরত আবু হুজায়ফা (রা) সরদার পুত্র সরদার ছিলেন এবং নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব তাঁর ঘরের বাঁদী ছিল। কিন্তু তিনি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির খাতিরে আরাম-আয়েশ পরিত্যাগ, উদ্বাস্তুর জীবন গ্রহণ এবং দারিদ্র ও বুভুক্ষার জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। সত্য কথা হলো তার ব্যক্তিত্ব ছিল একটি আলোকবর্তিকা। হক পথে তাঁর জাননিছারী এবং দ্বীনে হকের প্রতি গভীর সম্পর্ক মুসলিম উম্মাহর জন্য চিরকালীন মশাল হয়ে থাকবে।

হযরত আমের (রা) বিন রবিয়াতাল আনযি

নাম আমের। কুনিয়ত আবু আবদুল্লাহ। নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

আমের বিন রবিয়া বিন কা'ব বিন মালেক বিন রবিয়া বিন আমের বিন সায়াদ বিন আবদুল্লাহ বিন হারিছ বিন রফিদাহ বিন আনায বিন ওয়ায়েল।

তাঁর খান্দান বনু আদির মিত্র ছিল। হযরত ওমর ফারুকের (রা) পিতা খাত্তাব বিন নোফায়েল আদি হযরত আমেরকে (রা) এত অধিক ভালো বাসতেন যে, সে তাঁকে নিজের পুত্র (মুখে ডাকা) বানিয়ে নিয়েছিল এবং লোকেরা তাঁকে আমের বিন খাত্তাব বলে ডাকতো। কিন্তু যখন কুরআনে করিমে اُدعُوهُم لاٰبَائِهِم। (অর্থাৎ লোকদেরকে নিজের নসবি পিতার নসব ধরে ডাকো)—এই নির্দেশ নাযিল হলো তখন লোকেরা তাঁকে নিজের প্রকৃত পিতার সম্পর্কে আমের বিন রবিয়া বলে ডাকতে লাগলো।

হযরত আমের (রা) বিন রবিয়া মহান মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। তিনি নবুওয়াতের সম্পূর্ণ প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। তখনো রহমতে আলম (সা) দারে আরকামে তাশরীফ নেননি। তাঁর স্ত্রী লায়লা (রা) বিনতে আবি হাছমা আদবিয়াও অত্যন্ত ভাগ্যবতী মহিলা ছিলেন। তিনিও স্বামীর সঙ্গে ইসলামের নিয়ামতে পূর্ণতা প্রাপ্তা হন। ইসলাম গ্রহণের পর অন্যান্য সাবিকুনাল আউয়ালুনের মত এই উভয় স্বামী-স্ত্রীও মক্কার মুশরিকদের নির্যাতনের শিকার হন। মুশরিকদের জুলুম-নির্যাতন যখন সীমা অতিক্রম করে গেল তখন বিশ্বনবী (সা) সাহাবায়ে কিরামকে (রা) হাবশা হিজরতের অনুমতি দেন। সুতরাং নবুয়তের পাঁচ বছর পর নির্যাতিত মুসলমানদের ছোট্ট একটি কাফেলা মক্কা থেকে হাবশা রওয়ানা হন। এই কাফেলায় হযরত আমের (রা) বিন রবিয়াও নিজের স্ত্রী লায়লা (রা)-সহ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অনেক চরিতকার কম বেশী বাক্যের হেরফের বর্ণনা করেছেন যে, হযরত লায়লা (রা) উটের ওপর সওয়ার হচ্ছিলেন। ঠিক এমন সময় হযরত ওমর (রা) সেখানে এসে পড়লেন। তখন পর্যন্ত তিনি ঈমান আনেননি। তিনি হযরত লায়লাকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, উম্মে আবদুল্লাহ কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?

তিনি জবাব দিলেন ঃ

"আমরা তোমাদের নির্যাতনে অস্থির হয়ে ঘরবাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আল্লাহর সাম্রাজ্য ছোট্ট নয়। যেখানে আশ্রয় পাবো, সেখানে যাবো এবং যতক্ষণ

পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে দেবেন ততক্ষণ দেশ থেকে দূরেই থাকবো।"

হযরত ওমর (রা) তাঁর কথায় খুব প্রভাবিত হলেন এবং বললেন, "আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে থাকুন"। তিনি যখন একথা বলে চলে গেলেন তখন হযরত আমের (রা) বিন রবিয়াও এসে উপস্থিত হলেন। হযরত লায়লা (রা) তাঁকে এই ঘটনা শুনালে তিনি বললেন, "ওমর সেই সময় পর্যন্ত ঈমান আনবে না যতক্ষণ পর্যন্ত খাত্তাবের গাধা ইসলাম কবুল না করবে।"

হযরত লায়লা (রা) বললেন, "আমাকে দেখে ওমরের (রা) ওপর কঠিন ভাবাবেশ জারী হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন, তাঁর অন্তর ফিরিয়ে দিন।"

হযরত আমের (রা) বললেন, "ওমর (রা) ঈমান আনুক এটা কি তুমি চাও?" তিনি বললেন, "হাঁ!"

আল্লাহ তায়ালা হযরত লায়লার (রা) আকাংখা এমনিভাবে পূরণ করলেন যে, পরবর্তী বছরই হযরত ওমর (রা) ঈমান আনার মর্যাদা লাভ করলেন এবং ইসলামের শক্তিশালী বাহুতে পরিণত হলেন।

হযরত আমের (রা) ও হযরত লায়লা (রা) হাবশায় কেবলমাত্র তিনমাসই অতিবাহিত করেছিলেন। এমন সময় মক্কার মুশরিকদের ইসলাম গ্রহণের খবর মশহুর হয়ে গেল। হাবশার মুহাজিররা এই খবর শুনে তাঁদের একটি দল নবুয়তের পাঁচ বছর পর শাওয়াল মাসে হাবশা থেকে মক্কা রওয়ানা হয়ে এলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আমের (রা) ও তাঁর স্ত্রীও শামিল ছিলেন। মক্কার নিকট পৌঁছে এসব সাহাবী জানতে পেলেন যে, খবরটি মিথ্যা ছিল। কিন্তু তখন তাঁরা উল্টো পায়ে ফিরে যাওয়াটাকে ঠিক মনে করলেন না এবং সকলেই কুরাইশের কোন না কোন সরদারের আশ্রয়ে মক্কা প্রবেশ করলেন। হযরত আমের (রা) বিন রবিয়া এবং তার স্ত্রী আছ বিন ওয়ায়েল সাহমীর আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এই ঘটনার পর মুসলমানদের ওপর মুশরিকদের জুলুম নির্যাতন আরো কঠিনতর হয়ে উঠলো। তাতে হুজুর (সা) পুনরায় মজলুমদেরকে হাবশা হিজরতের নির্দেশ দিলেন। বস্তুত নবুওয়াতের ৬ বছর পর প্রথম দিকে প্রায় একশ' মজলুম হকপন্থীর একটি কাফেলা হাবশা হিজরত করলেন। হযরত আমের (রা) বিন রবিয়া ও হযরত লায়লা (রা) বিনতে আবি হাছমাও সেই কাফেলার অন্যতম ছিলেন। হাবশায় কয়েক বছর উদ্বাস্তুর জীবন অতিবাহিত করার পর হযরত আমের (রা) ও হযরত লায়লা (রা) অন্য কতিপয় মুসলমানের সাথে হুজুরের (সা) মদীনা হিজরতের কিছু দিন পূর্বে মক্কা ফিরে

এলেন এবং পুনরায় কিছুদিন পর রাসূলের (সা) অনুমতি পেয়ে মদীনায় স্থায়ীভাবে হিজরত করে গেলেন। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত আমেরের (রা) স্ত্রী হযরত লায়লার (রা) এই মর্যাদা লাভ ঘটেছিল যে, তিনিই মুসলমান মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম হিজরত করে মদীনা পৌঁছেছিলেন।

যুদ্ধসমূহ শুরু হলে হযরত আমের (রা) বিন রবিয়া বদর থেকে তাবুক পর্যন্ত নবীর (সা) সকল যুদ্ধে মহানবীর সফরসঙ্গী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তাছাড়াও তিনি ছোট ছোট কয়েকটি অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন এবং তার পরিণাম স্বরূপ বড় বড় মুসিবত বরদাশত করেছিলেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে স্বয়ং তাঁর যবানীতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে অভিযানসমূহে প্রেরণ এবং অভাবের কারণে খাদ্য হিসেবে সামান্য খেজুর প্রদান করতেন। কোন অভিযানে যদি বেশী দিন ব্যয় হয়ে যেতো তখন এই খেজুর জনপ্রতি এক মুঠোর চেয়েও কম হতো। এমনকি একটি করেও খেজুর পাওয়া যেতো। কোন কোন সময় খেজুর সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যেতো এবং আমাদেরকে গাছের পাতা দিয়ে পেট ভরতে হতো।

মহানবীর (সা) ইন্তেকালের পর হযরত আমের (রা) বিন রবিয়া শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত মদীনায় মুকিম ছিলেন এবং অত্যন্ত নীরবতার সাথে জীবন অতিবাহিত করেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁকে খুব মান্য করতেন। নিজের খিলাফতকালে তিনি যখন বাইতুল মুকাদ্দাসে তাশরীফ নিলেন। এ সময় তিনি নিজের সঙ্গে কতিপয় আনসার ও মুহাজিরকেও নিয়ে গেলেন। তাদের মধ্যে হযরত আমের (রা) বিন রবিয়াও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর ফারুক (রা) যে বছর হযরত ওসমান জুন্নুরাইনাকে (রা) নিজের স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে হজ্জের জন্য তশরীফ নিলেন তখন হযরত আমের (রা) বিন রবিয়াও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। আমীরুল মু'মিনীন (রা) স্বয়ং তাঁকে নিজের সফরসঙ্গী নির্বাচন করেছিলেন।

হযরত আমেরের (রা) বেশীর ভাগ সময় আল্লাহর ইবাদাতে অতিবাহিত হতো। হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের (রা) খিলাফতের শেষ অধ্যায়ে ফিতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। এ সময় তিনি সম্পূর্ণরূপে নির্জনত্ব গ্রহণ করেন এবং কোন ফিতনায় জড়িয়ে পড়ার আশংকায় খুব কমই বাইরে বের হতেন। দিন-রাত ঘরের মধ্যে নামায, রোযা এবং আরো অন্যান্য দোয়া ও ওজিফাতে মশগুল থাকতেন। এক রাতে নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে দেখলেন যে, কোন এক ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নিকট সেই ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য দোয়া করতে বলছে।

হযরত আমের (রা) ঘুম থেকে জেগে তেমনিভাবে অত্যন্ত খুশু ও খুজু অর্থাৎ বিনয়ের সাথে দোয়া করলেন এবং এমন নির্জনত্ব গ্রহণ করলেন যে, কেউ আর তাঁকে ঘর থেকে বাইরে বের হতে দেখেননি। এই অবস্থাতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই অসুস্থতাই মৃত্যুরোগ হিসেবে দেখা দিল এবং হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের শাহাদাতের কিছু দিন পর তিনি পরপারের ডাকে সাড়া দিলেন। মদীনাবাসীর জানাই ছিল না যে, তিনি কবে অসুস্থ হন এবং কবে মারা যান। যখন একাকী তার জানাযাহ দেখলো তখন তাদের মূর্ছা যাওয়ার মত অবস্থা হলো এবং চারদিক থেকে মহানবীর (সা) এ জালিলুল কদর সাহাবীর শেষ আরামস্থলে পৌছানোর জন্য ভেঙ্গে পড়লেন।

ইসলামে অগ্রগমন, ইখলাস ফিদ্বীন, মুসিবত বরদাশত, রাসূল প্রেম, জিহাদের প্রতি শওক, ইবাদাতে আকর্ষণ এবং যুহুদ ও তাকওয়া হযরত আমের (রা) বিন রবিয়ার চারিত্রিক গুণাবলীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গুণ। তিনি যেভাবে মুসলমানদের গৃহযুদ্ধ ও ফিতনা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে ছিলেন তা তার মহান চারিত্রের স্পষ্ট দলিল।

হযরত সোহায়েল (রা) বিন বাইজা ফাহরী

সোহায়েল হলো নাম। আবু মূসা কুনিয়াত। কুরাইশের বনু ফাহর বিন মালেকের খান্দানভুক্ত ছিলেন। পিতার নাম ছিল ওয়াহাব। কিন্তু তিনি নিজের মা বাইজা বিনতে হাজদমের নিসবতে সোহায়েল (রা) বিন বাইজা নামে মশহুর হন। নসব নামা হলো ঃ

সোহায়েল (রা) বিন ওয়াহাব বিন রবিয়া বিন হিলাল বিন মালিক বিন জাব্বাহ বিন হারিছ বিন ফাহার বিন মালিক।

হযরত সোহায়েল (রা) সেই মহান মর্যাদাসম্পন্ন বুজর্গদের অন্তর্ভুক্ত যাঁরা দাওয়াতে হকের প্রথম তিন বছরের মধ্যে ঈমান আনায়নের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। নবুয়তের ৬ বছরের পর (৬১৫ খৃষ্টাব্দে) তিনি হক পথে স্বদেশ ভূমিকে বিদায় জানিয়ে হাবশায় উদ্বাস্তুর জীবন গ্রহণ করেন। কয়েক বছর বিদেশে কাটানোর পর নবীর হিজরতের কিছুদিন পূর্বে মক্কা প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখান থেকে মদীনা হিজরত করেন।

আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের (সা) প্রতি হযরত সোহায়েলের সীমাহীন ভালোবাসা ছিল এবং তিনি সবসময় হকপথে নিজের জীবন কুরবান করার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। এ জন্য রহমতে আলম (সা) তাঁকে খুবই ভালোবাসতেন। যুদ্ধসমূহ শুরু হলে তিনি বদর থেকে তাবুক পর্যন্ত সকল যুদ্ধে মহানবীর (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার সম্মান লাভ করেন এবং প্রত্যেক যুদ্ধেই নিজের জীবন উৎসর্গের নিপুণতা প্রদর্শন করেন।

মুসতাদরাকে হাকিমে আছে, তাবুকের সফরে স্বয়ং সাইয়েদুল মুরসালিন (সা) তাঁকে নিজের সওয়ারীর ওপর বসিয়ে নিয়েছিলেন। এটা ছিল নিসন্দেহে মহান সৌভাগ্যের ব্যাপার। রাস্তায় হুজুর (সা) তাঁকে দু'তিন বার উচ্চেস্বরে ডেকেছিলেন। তিনি প্রত্যেকবারই "লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ" বলেছিলেন। অন্য সাহাবীও হুজুরের (সা) আওয়াজ শুনে তাঁর চার পাশে একত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ এক হওয়ার সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ তার ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেবেন এবং জান্নাত তার ওপর ওয়াজিব হয়ে যাবে।"

তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পর হযরত সোহায়েল (রা) পরপারের ডাক পেলেন এবং তিনি মহানবীর (সা) সামনেই নবম হিজরীতে ওফাত পেলেন। কোন সন্তান ছিল না। মহানবী (সা) মসজিদে নিজের মাহবুব জাননিছারের জানাযার নামায পড়ালেন।

সহীহ মুসলিমে (কিতাবুল জানায়েয) আছে, কয়েক বছর পর হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসের জানাযা মসজিদে আনা হলে কিছু লোক আপত্তি করলো। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাই (রা) বললেন, লোকেরা কত তাড়াতাড়ি ভুলে যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সোহায়েল বিন বাইজার জানাযার নামায মসজিদেই পড়িয়েছিলেন।

হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাব

নবীর (সা) হিজরতের তৃতীয় বছরে ওহোদের ময়দানে হক ও বাতিলের লড়াই সংঘটিত হলো। এই যুদ্ধে বিশ্ব এক বিস্ময়কর দৃশ্য অবলোকন করলো। দীর্ঘদেহী ও গমের রংয়ের এক নূরানী সুরতের মুজাহিদ কামিস ও যিরাহ থেকে মুখাপেক্ষীহীন খালি দেহে মক্কার মুশরিকদের ব্যূহের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁকে এই অবস্থায় দেখে অস্থির হয়ে পড়লেন। সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁকে থামিয়ে দিলেন এবং বললেন, "আল্লাহর কসম, আমি আপনাকে এই অবস্থায় দুশমনের নিশানা হতে দেব না।" একথা বলে নিজের যিরাহ খুলে সেই সাহাবীকে পরিয়ে দিলেন। সে সময় তো তিনি হযরত ওমর ফারুকের (রা) কথা মেনে নিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই যিরাহ খুলে ফেলে দিলেন এবং খালি বুকে হাতে তরবারী নিয়ে দুশমনের দিকে অগ্রসর হলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) পুনরায় দৌড়ে তাঁর নিকট গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন যে, আপনি যিরাহ কেন খুলে ফেলেছেন ? তিনি বজ্রকণ্ঠে বললেন, "ওমর আমার রাস্তা থেকে সরে যাও। তুমি যদি শাহাদাতের আকাংখী হয়ে থাকো তাহলে আমার অন্তরেও শাহাদাতের আগুন জ্বলছে। যিরাহতো সেই পরিধান করে যার নিকট জীবন প্রিয়। আমি তো নিজের জীবনকে হকপথে বিক্রি করে ফেলেছি।

হযরত ওমর ফারুক (রা) চুপ মেরে গেলেন এবং মাথানত করে নিজের ব্যূহে ফিরে এলেন। ওদিকে সেই ব্যক্তি খালি দেহেই দুশমনের ব্যূহে ঢুকে পড়লেন এবং এমন আবেগ ও আত্মহারা হয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন যে, বাহাদুররা পর্যন্ত সাবাশ বলে উঠলো—এই বাহাদুর ব্যক্তি যাঁকে শাহাদাতের আকাংখা কামিস ও যিরাহ থেকে মুখাপেক্ষীহীন করে দিয়েছিল—তিনি ছিলেন হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাব।

সাইয়েদেনা হযরত আবু আবদুর রহমান যায়েদ (রা) বিন খাত্তাব জালিলুল কদর সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। তিনি কুরাইশের "বনু আদি" বংশোদ্ভূত ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ

যায়েদ (রা) বিন খাত্তাব বিন নুফায়েল বিন আবদুল উযযা বিন রাবাহ বিন আবদুল্লাহ বিন কারত বিন যিরাহ বিন আদি বিন কা'ব বিন লুব্বী।

হযরত ওমর ফারুক (রা) ছিলেন তাঁর সতালো ভাই এবং বয়সে তাঁর ছোট ছিলেন। হযরত যায়েদের (রা) মায়ের নাম ছিল আসমা বিনতে হয়াহাব এবং তিনি ছিলেন বনু আসাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। হযরত ওমর (রা) খাত্তাব বিন

নুফায়েলের দ্বিতীয় স্ত্রী খাতমা বিনতে হিশাম বিন মুগিরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সতালো হওয়া সত্ত্বেও উভয় ভাইয়ের মধ্যে পূর্ণ ভালোবাসা ছিল। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এই ভালোবাসাও অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাবকে আল্লাহ তায়ালা সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। তিনি সেই মহান মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের দলভুক্ত যারা নবুওয়াতের প্রথম তিন বছরে দাওয়াতে হকের প্রতি সাড়া দিয়েছিলেন এবং বছরের পর বছর ধরে মক্কার মুশরিকদের ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরের পর প্রিয় নবী (সা) ইসলামের অনুসারীদেরকে মক্কা মুয়াজ্জামা থেকে মদীনা মুনাওয়ারাতে হিজরত করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এ সময় হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাব মুহাজিরদের প্রথম কাফেলার সাথে হিজরত করে মদীনা এসেছিলেন। অন্য এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী তিনি মুহাজিরদের তৃতীয় কাফেলার সঙ্গে হিজরত এবং কুবাতে হযরত রিফায়াহ (রা) বিন আবদুল মানযারের বাড়ীতে অবস্থান করেন। কিছুদিন পরই প্রিয়নবীও (সা) মদীনা মুনাওয়ারাতে শুভ পদার্পণ করেন এবং এই প্রাচীন শহরের প্রাচীর নবীর (সা) শুভাগমনে ঝলমল করে উঠলো। হিজরতের ৬ষ্ঠ মাসে হুজুর (সা) হযরত আবু তালহা (রা) আনসারীর (খাদেমে রাসূল হযরত আনাস বিন মালিকের সতালো পিতা) বাড়ীতে আনসার ও মুহাজিরদেরকে একত্রিত করলেন এবং তাদের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক কায়েম করলেন।

হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর (সা) হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাবকে হযরত মায়ান (রা) বিন আদি আজলানী আনসারীর দ্বীনি ভাই বানালেন।

দ্বিতীয় হিজরীতে বদর নামক স্থানে হক ও বাতিলের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হলো। তখন হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাবের "আসহাবে বদরের" মধ্যে শামিল হওয়ার মহান মর্যাদা লাভ ঘটেছিল। পরবর্তী বছর ওহোদের যুদ্ধের সময় তিনি গভীর উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে যে বীরত্ব প্রদর্শন করেন তার উল্লেখ ওপরে এসেছে। ওহোদের পর খন্দকের যুদ্ধে আত্মোৎসর্গের হক আদায় করেন। ৬ষ্ঠ হিজরীতে তিনি হুদায়বিয়াতে বাইয়াতে রিদওয়ানে শরীক হওয়ার স্থায়ী সৌভাগ্য লাভ করেন। মক্কা বিজয়ের পর হুনাইন, আওতাস ও তায়েফের যুদ্ধ সংঘটিত হলে সেসব যুদ্ধেও তিনি সবসময় রহমতে আলমের (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন। বিদায় হজ্জেও (দশম হিজরীতে) হুজুরের (সা) সাথে ছিলেন। ইবনে সায়াদ বর্ণনা করেছেন যে, বিদায় হজ্জের সময় একদিন প্রিয় নবী (সা) হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাবের সামনে এই হাদীস বর্ণনা করেন ঃ

"তুমি যা খাও তাই নিজের গোলামকে খাওয়াও। যা পরিধান কর তাই নিজের গোলামকে পরিধান করাও। যদি সে কোন ভুল করে বসে; ভুলটা এমন যে তুমি তা ক্ষমা করতে পারো না তাহলে তাকে বিক্রি করে ফেলো।"

মোটকথা রাসূলের (সা) যুগে এমন কোন মর্যাদা ছিল না যা হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাব লাভ করেননি। তিনি খাইরুল বাশার বা উত্তম মানবের (সা) সেই জাননিছারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা হকের সমর্থনে সবসময় প্রস্তুত থাকতেন এবং কোন ধরনের চাপ, লোভ অথবা ভীতি তাঁদেরকে সেই কাজ থেকে বিরত রাখতে পারতো না।

একাদশ হিজরীতে আল্লাহ তায়ালার রিসালাত সূর্য ডুবে গেলো। এ সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) খিলাফতের আসনে সমাসীন হলেন। তখন একবারে সমগ্র আরবে ধর্মদ্রোহিতার ফিতনা জ্বলে উঠলো। মক্কার কুরাইশ, মদীনার আনসার, তায়েফের বনু ছাকিফ এবং অন্য তিন-চারটি গোত্র ছাড়া আরবে এমন কোন কবিলা ছিল না যে, এই ফিতনায় কোন না কোনভাবে প্রভাবিত হয়নি। মুসলিম উম্মাহর জন্য সময়টি ছিল খুবই নাযুক এবং মুরতাদদের মুকাবিলায় সামান্য দুর্বলতা প্রদর্শনও ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনতে পারতো। এ সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) পূর্ণ দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও মু'মিনসুলভ দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি আকস্মিক দুর্ঘটনাসমূহের সামনে অটল পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং মুরতাদদের সকল দাবী সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে তাদের নির্মূলের জন্য কোমর বাঁধলেন। এ প্রসঙ্গে হকের ঝান্ডাবাহী ও মুরতাদদের মধ্যে কয়েকটি রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এসব যুদ্ধের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ মুসায়লামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামা নামক স্থানে সংঘটিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক তাবারী এই যুদ্ধ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "মুসলমানরা এর চেয়ে কঠিন যুদ্ধের সম্মুখীন কখনো হয়নি।"

চরিতকাররা বর্ণনা করেছেন, হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাব শুরুতেই ধর্মদ্রোহিতার ফিতনা নির্মূলের জন্য জীবনের বাজী লাগিয়ে দেন এবং মুরতাদদের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে প্রচন্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নিয়েছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) যখন মুসায়লামার প্রচন্ড যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর পেলেন তখন তিনি হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদকে মুসায়লামার সাথে যুদ্ধের নির্দেশ দিলেন এবং তাঁর সাহায্যের জন্য শক্তিশালী সৈন্য পাঠালেন। এই বাহিনীতে আনসার সরদার হযরত ছাবিত (রা) বিন কায়েস এবং মুহাজিরদের আমীর হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাব ছিলেন।

ইয়ামামার নিকট আকরাবা নামক স্থানে মুসলমান ও মুসায়লামা বাহিনী সামনা-সামনি হলো। মুসায়লামা বাহিনীর সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার। আর এদিকে মুসলমানদের মোট সংখ্যা সব মিলিয়ে দশ হাজারের কাছাকাছি ছিল। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, এ সময় ইসলামী বাহিনীর ঝান্ডাবাহী ছিলেন হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাব। যখন উভয় পক্ষ যুদ্ধের ব্যূহ রচনা সমাপ্ত করলো তখন সর্বপ্রথম মুসায়লামার পক্ষ থেকে নাহহারুর রিজাল বিন আনফুয়াহ ময়দানে বেরিয়ে এলো এবং সে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের আহ্বান জানালো। সে ছিল এক জঘন্য মানুষ। ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, সে রাসূলের (সা) যুগে ইয়ামামা থেকে হিজরত করে মদীনা চলে গিয়েছিল এবং মহানবীর (সা) পবিত্র খিদমতে হাজির হয়ে তাঁর নিকট থেকে কুরআনে হাকিম ও দ্বীনী মাসয়ালার তালিম হাসিল করেছিল। যখন প্রয়োজনীয় তালিম হাসিল শেষ করলো তখন হুজুর (সা) তাকে ইয়ামামাবাসীর তালিমের জন্য নিয়োগ করলেন। এই হতভাগা ইয়ামামা পৌঁছে মুসায়লামা কাজ্জাবের সঙ্গে যোগ দিল এবং অত্যন্ত বেহায়ার মত মুসায়লামার মিথ্যা দাবীর এই ভাষায় সাক্ষ্য দিল যে, "আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহকে (সা) এই বলতে শুনেছি যে, মুসায়লামা আমার নবুওয়াতে শরীক রয়েছে।" যেহেতু নাহহার মহানবীর (সা) বরকতপূর্ণ খিদমতে ছিলেন এবং হুজুরের (সা) পক্ষ থেকেই মুয়াল্লিম ও মুবাল্লিগ হয়ে এসেছিলেন, সেহেতু হাজার হাজার মানুষ তার কথায় গুমরাহ হয়ে গেলো এবং তারা মুসায়লামার দাবী মেনে নিল। তারপর সে ময়দানে বের হয়ে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধের আহ্বান জানালো। এ সময় হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাব ক্রোধে অস্থির হয়ে পড়লেন এবং তীরের মত তার ওপর গিয়ে আছড়ে পড়লেন। নাহহার ছিল একজন অভিজ্ঞ যোদ্ধা। সে খুব সতর্কতার সাথে হযরত যায়েদের (রা) মুকাবিলা করলো। কিন্তু তার ঈমানী জোশের সামনে তার কোন কিছুই কার্যকর হলো না এবং সে হযরত যায়েদের (রা) হাতে মারা গেল। অতপর সাধারণ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। মুসায়লামার কবিলা বনু হানিফা এমন প্রচন্ডভাবে হামলা চালালো যে, মুসলমানদের পা টলটলায়মান হয়ে উঠলো। কিন্তু ইসলামী বাহিনীর নেতারা মুরতাদদের হামলা প্রতিহত করার জন্য জীবনের বাজী লাগিয়ে দিলেন। আনসার সরদার হযরত ছাবিত (রা) বিন কায়েস পিছু হটনেওয়ালাদের প্রতি উচ্চৈস্বরে আহ্বান জানিয়ে বললেন ঃ

"হে মুসলমানরা! তোমরা নিজের নফসকে খারাব অভ্যাস শিখিয়েছ। হে আল্লাহ! আমি তোমার সামনে তাদের (ইয়ামামাবাসীদের) মাবুদ থেকে এবং তাঁদের (মুসলমান) এ তৎপরতায় (যা এখন করছে) ঘৃণা প্রকাশ করছি। হে মুসলমানরা ! দেখ, হামলা এভাবে করতে হয়।"

একথা বলে তরবারী চালাতে চালাতে তিনি বীরের মত দুশমনের ব্যূহে ঢুকে পড়লেন। এক মুরতাদের আঘাতে তাঁর পা কেটে গেল। সেই কাটা পা নিয়েই তিনি এমন প্রচন্ডভাবে আঘাত হানলেন যে, শত্রুটির ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেল এবং নিজেও শহীদ হয়ে গেলেন। মুসলমানরা পিছু হটতে হটতে যখন নিজেদের তাবুরও পিছনে হটে গেলেন তখন হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাব ঈমানী আবেগে অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে মুসলমান! তাঁবু থেকে হটে কোথায় যাবে। আল্লাহর কসম, আজ আমি সেই সময় পর্যন্ত কথা বলবো না যতক্ষণ পর্যন্ত দুশমনকে পরাজিত না করবো। অথবা আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে ক্ষমা চাইবো। হে লোকেরা! মুসিবত বরদাশত কর। ঢাল হাতে তুলে নাও এবং দুশমনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়। হাঁ, হাঁ, অগ্রসর হও। হে মুসলমানরা! তোমরা আল্লাহর দল এবং তোমাদের শত্রু শয়তানের দল। সম্মান আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহর দলের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। আমার উদাহরণ অনুসরণ কর। আমি যা করি, তাই তোমরা কর।

তারপর এই বলে, "হে আল্লাহ! আমি নিজের সাথীদের পিছপার জন্য তোমার নিকট ক্ষমা চাই।" হাতে তরবারী ধরে মুরতাদদের ওপর হামলা করে বসলেন এবং তাদের ব্যূহ ভেঙ্গেচুরে অনেক দূর চলে গেলেন। অবশেষে মুরতাদরা হামলা চালিয়ে তাঁর ওপর তরবারী বর্শার ও মেঘ বর্ষিয়ে দিল। এমনিভাবে বনু আদির এই বাঘ এবং হকের জানবাজ সিপাহী শাহাদাতের পেয়ালা পান করে জান্নাতে পৌঁছে গেলেন।

হযরত যায়েদের (রা) শাহাদাতের পর আবু হুজায়ফার (রা) আজাদকৃত গোলাম হযরত সালেম (রা) এবং অন্য আরো জানবাজ মুরতাদদের প্রতিহত করার চেষ্টায় নিজেদের জীবন কুরবান করে দিলেন। এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে হযরত খালেদ (রা) বিন ওয়ালিদ নিজের বাহিনীকে নতুন করে সাজালেন এবং পুনরায় মুরতাদদের ওপর এমন জোরে হামলা চালালেন যে, তাদের পা টলে গেল। ইত্যবসরে মুসায়লামাও হযরত ওয়াহশী (রা) বিন হারব ও হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন যায়েদ আনসারীর হাতে নিহত হলো। তাতে মুরতাদদের সাহস সম্পূর্ণরূপে কমে গেল এবং তারা নিজেদের ১০ হাজার নিহতকে যুদ্ধের ময়দানে রেখে এদিক সেদিক ভেগে পালালো। ইয়ামামার যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ে ধর্মদ্রোহিতার ফিতনা প্রায়ই শেষ হয়ে গেল। এই মহাফিতনা নির্মূলের জন্য হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাব ও তাঁর মত অন্যান্য জানবাজ যে হিম্মত

বীরত্ব ও অটলতা প্রদর্শন করেছিলেন, নিসন্দেহে তা ইসলামের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হবে।

সাইয়েদেনা হযরত ওমর ফারূক (রা) হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাবকে সীমাহীন ভালোবাসতেন। এই ভালোবাসা শুধু এ জন্য ছিল না যে, যায়েদ (রা) তাঁর বুজুর্গ ভাই ছিলেন। বরং এ জন্যও যে আল্লাহ তায়ালা হযরত যায়েদকে (রা) উষ্ণ অন্তর দান করেছিলেন এবং তিনি সবসময় নিজের জীবন হকপথে কুরবান করার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। সুতরাং তিনি যখন হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাবের শহীদ হওয়ার খবর শুনলেন তখন শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। কিন্তু অস্থিরতা প্রকাশের পরিবর্তে মুখ দিয়ে এই কথা বের হয়ে এলো ঃ

"যায়েদ দুই নেকীতে আমার থেকে এগিয়ে গিয়েছিল। এক হলো ইসলাম গ্রহণ এবং দ্বিতীয় হলো শাহাদাতের পেয়ালা পান।"

তা সত্ত্বেও এই দুঃখ এতো কঠিন ছিল যে, তা কোনক্রমেই ভোলার মত ছিল না। ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলতেন "ভোরের মৃদু সমীরণ যখন প্রবাহিত হয় তখন তা থেকে যায়েদের (রা) খোশবু পেয়ে থাকি এবং তাঁর কথা স্মরণ হয়ে যায়।"

ইমাম হাকিম "মুসতাদরাকে" লিখেছেন, হযরত ওমর ফারুক (রা) যখন কোন মুসিবতের সম্মুখীন হতেন তখন বলতেন সবচেয়ে বড় মুসিবত ছিল যায়েদের (রা) বিচ্ছিন্নতা। তা বরদাশত করেছি এবং ধৈর্য ধারণ করেছি। এখন তা থেকে বেশী আর কি মুসিবত হতে পারে।

হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে একবার আরবের নামকরা কবি মুতাম্মাম বিন নবিরা তাঁর খিদমতে হাজির হলো। মুতাম্মামের ভাই মালিক বিন নুয়াইরাকে হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) খিলাফতকালে হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ ভুলের বশবর্তী হয়ে হত্যা করে ফেলেছিলেন। এই ঘটনায় সে এতো দুঃখ পেয়েছিল যে, সবসময় নিজের মাহবুব ভাইয়ের দুঃখে কাঁদতো এবং মরছিয়া বলতো। যেখানেই যেতো মানুষ তার চারপাশে একত্রিত হতো এবং তার নিকট থেকে মরছিয়া শুনতো। সে মরছিয়া পড়তে পড়তে নিজেও কাঁদতো এবং শ্রোতাদেরকেও কাঁদাতো। হযরত ওমর ফারুক (রা) তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "মুতাম্মাম, ভাইয়ের বিচ্ছিন্নতায় তুমি কেমন দুঃখ পাও ?" সে আরজ করলো ঃ "আমিরুল মু'মিনীন, কোন এক কারণে আমার একটি চোখের অশ্রু শুকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভাইয়ের দুঃখে অশ্রু এমনভাবে প্রবাহিত হয়েছে যে, তা আজ পর্যন্ত আর বন্ধ হয়নি।

হযরত ওমর (রা) বলেন, "এটা দুঃখের চরম পর্যায়। কেউ কোন মৃত ব্যক্তির জন্য এমন দুঃখ প্রকাশ করে না।" অতপর তিনি মুতাম্মামের নিকট ভাইয়ের শোকে রচিত কোন মরছিয়া শুনানোর ফরমায়েশ দিলেন। সে রোরুদ্যমান কণ্ঠে এক হৃদয়বিদারক মরছিয়া পাঠ করলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) সেই মরছিয়া শুনে খুব প্রভাবিত হলেন এবং মুতাম্মামকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "আমি যদি এমন মরছিয়া বলতে পারতাম তাহলে নিজের ভাই যায়েদের (রা) মরছিয়া বলতাম।" মুতাম্মাম আরজ করলেন, "আমিরুল মু'মিনীন, আমার ভাই যদি আপনার ভাইয়ের মত (জিহাদের ময়দানে) শহীদ হতো তাহলে আমি অবশ্যই অশ্রু ফেলতাম না।"

হযরত ওমর (রা) বললেন, "তুমি আমাকে যেভাবে শোক জ্ঞাপন করেছ তার থেকে উত্তম শোক আর কেউ কখনো জ্ঞাপন করেনি।"

হযরত যায়েদ (রা) শাহাদাতের সময় দু' স্ত্রী ও দু' সন্তান রেখে গিয়েছিলেন। স্ত্রীদের নাম হলো লুবাবা ও জামিলা। লুবাবার গর্ভে জন্ম নিয়েছিল পুত্র আবদুর রহমান। আর জামিলার গর্ভে কন্যা আসমা জন্ম নিয়েছিল।

হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাব থেকে বর্ণিত কতিপয় হাদীস হাদীসের কিতাবসমূহে পাওয়া যায়।

হযরত আবু ফাকিহা ইয়াসার ইযদি (রা)

হযরত আবু ফাকিহা ইয়াসার ইযদি (রা) কুরাইশের আবদি দার খান্দানের গোলাম ছিলেন। অসহায় ও সাহায্য সহযোগিতাহীন হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বুকে বাঘের অন্তর ছিল। গরীবদের অভিভাবক এবং অসহায়দের ত্রাণকর্তা (সা) যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন আরবে তাওহীদের মশাল জ্বালালেন তখন আবু ফাকিহা (রা) নির্ভীকভাবে সামনে অগ্রসর হলেন এবং সেই মশাল বা প্রদীপের পতঙ্গ হয়ে গেলেন। তাঁর মালিক উমাইয়া বিন খালফ নিজের গোলামের এই সাহসিকতায় ক্রোধ বহ্নিতে জ্বলে উঠলো এবং সে অসহায় আবু ফাকিহার ওপর সীমাহীন জুলুম-নির্যাতন চালানো শুরু করলো। জালেম নিজেই তাঁকে নিত্য নতুন শাস্তির নিশান বানাতো এবং নিজের পরিবারের লোকদেরকেও তাঁর ওপর নির্যাতন চালানোর সাধারণ অনুমতি দিয়ে রেখেছিল। তারা যখন ইচ্ছা তখন তাঁর ওপর নির্যাতনের অনুশীলন চালাতো। এই জালেম উত্তপ্ত বালির ওপর দ্বিপ্রহরের সময় হযরত আবু ফাকিহাকে (রা) উপুর করে শুইয়ে দিত এবং পিঠের ওপর একটি ওজনদার পাথর রেখে দিত। তিনি সাহসিকতার সাথে এই শাস্তি সহ্য করতেন। এমনকি ভয়াবহ গরম এবং অসহনীয় কষ্টে বেহুশ হয়ে যেতেন। এত কষ্ট ও নির্যাতন সত্ত্বেও তার মুখ দিয়ে শির্‌কমূলক কোন কথা উচ্চারিত হতো না।

একদিন পাষাণ উমাইয়া হযরত আবু ফাকিহার (রা) উভয় পায়েই রশি বাঁধলো এবং তাঁকে নির্দয়ভাবে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেলো। সেটা ছিল দ্বিপ্রহরের সময়। সূর্য থেকে আগুন বর্ষিত হচ্ছিল। উমাইয়া আবু ফাকিহাকে (রা) উত্তপ্ত বালুর ওপর নিক্ষেপ করলো। উমাইয়া পুত্র সাফওয়ানও পিতার পিছনে পিছনে সেখানে পৌছলো এবং আবু ফাকিহাকে (রা) সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, "আমার পিতা তোর রব নয় ?"

তাওহীদ প্রদীপের পতঙ্গ আবু ফাকিহা (রা) তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন ঃ

"অবশ্যই নয়। আমার রব হলেন আল্লাহ তায়ালা। যিনি সকলের স্রষ্টা ও মালিক এবং যিনি সকলকে রুজী দিয়ে থাকেন।"

এই জবাবে সাফওয়ান তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো এবং সে হযরত আবু ফাকিহার (রা) গলা এত জোরে চেপে ধরলো যে তাঁর জিহবা বাইরে বেরিয়ে পড়লো এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে অনুভূতিহীন ও স্পন্দনহীন হয়ে পড়লেন।

সাফওয়ান ও উমাইয়া মনে করলো যে, কারবার শেষ। কিন্তু তখনো তাঁর মধ্যে জীবনের স্পন্দন অবশিষ্ট ছিল। ঘটনাক্রমে সে সময় অসহায়দের বন্ধু হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি হযরত আবু ফাকিহার (রা) প্রতি হৃদয়-বিদারক নির্যাতনের দৃশ্য দেখলেন। তাতে তাঁর অন্তর ধরে এলো এবং তিনি তৎক্ষণাৎ আবু ফাকিহাকে (রা) উমাইয়া বিন খালফের কাছ থেকে কিনে আযাদ করে দিলেন। কিন্তু হযরত আবু ফাকিহা (রা) আজাদ হওয়া সত্ত্বেও মক্কায় মুশরিকদের জুলুম নির্যাতনের হাত থেকে মাহফুজ ছিলেন না। সুতরাং হাবশার দ্বিতীয় হিযরতে তিনিও অন্যান্য মুসলমানের সাথে হাবশা গমন করেন। হক পথে মুসিবত সইতে সইতে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল এবং দৈহিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। বদরের যুদ্ধের কিছু দিন পূর্বে তিনি পরপারের ডাকে সাড়া দেন। হযরত আবু ফাকিহা (রা) সেই সব অটল ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন যাঁরা চরম প্রতিকূল ও কঠিন অবস্থাতেও প্রকাশ্যে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতেন। ইসলাম অনুসারীদের মধ্যে তাঁর মর্যাদা অনেক উচ্চে।

হযরত আবু কায়েস (রা) বিন হারিছ সাহমী

নাম ছিল আবু কায়েস। কুনিয়াত ছিল আবু কায়েসই। কুরাইশের বনু সাহাম খান্দানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ আবু কায়েস (রা) বিন হারিছ বিন কায়েস বিন আদি বিন সায়াদ বিন সাহাম।

তাঁর দাদা কায়েস বিন আদি কুরাইশের অন্যতম সরদার ছিল এবং পিতা হারিছ বিন কায়েসও মুশরিকদের মধ্যেকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিল। তারা এমন নীচ প্রকৃতির মানুষ ছিল যে, কুরআনে করিম নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো। হাফেজ ইবনে আবদুল বার "আল-ইসতিয়াব" গ্রন্থে লিখিছেন যে, সূরায়ে হিজরের এই আয়াতসমূহ এমনি ধরনের লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল।

اَلَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ ○ فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ○

اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ ○

"যারা নিজেদের কুরআনকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। অতএব, শপথ তোমার আল্লাহর নামে, আমরা অবশ্যই এসব লোককে জিজ্ঞেস করবো যে, তোমরা কি করছিলে ? কাজেই হে নবী, যে জিনিসের হুকুম তোমাকে দেয়া হচ্ছে তা জোরেশোরে উচ্চ কণ্ঠে বলে দাও এবং শিরককারীদের বিন্দুমাত্র পরোয়া করো না। তোমার পক্ষ থেকে সে সব বিদ্রূপকারী সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমরাই যথেষ্ট।"(আল হিজর ঃ ৯১-৯৫)

হারিছ বিন কায়েসের সাত পুত্র ছিল। তারা হলো আবু কায়েস, আবদুল্লাহ, সায়েব, তামিম, মা'বাদ, হাজ্জাজ ও সাঈদ। আল্লাহর কি কুদরত ! হারিছের মত ইসলামের শত্রুর ৬ পুত্র কায়েস (রা) আবদুল্লাহ (রা), সায়েব (রা), তামিম (রা), হাজ্জাজ এবং সাঈদের (রা) ইসলাম ও হিজরতের মর্যাদা লাভ ঘটেছিল। (মা'বাদের প্রসঙ্গে চরিতগ্রন্থসমূহ নীরব) হযরত আবু কায়েস (রা) দাওয়াতে হকের প্রথম যুগে ঈমান আনয়ন করেন এবং নবুওয়াতের ৬ বছর পর হিজরত করে হাবশা চলে গিয়েছিলেন তাঁর ভাইও সঙ্গে ছিলেন। সেখানে কয়েক বছর অতিবাহিত করার পর ওহোদের যুদ্ধের পূর্বে মদিনা মুনাওয়ারা

চলে আসেন এবং ওহোদ, খন্দক, খাইবার, মক্কা বিজয়, হুনাইন, তাবুকসহ সকল যুদ্ধে মহানবীর (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার সম্মান লাভ করেন।

রহমতে আলমের (সা) ওফাতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) খলিফার মসনদে সমাহীন হলেন। এ সময় সমগ্র আরবে ধর্মদ্রোহিতার ফিতনার আগুন জ্বলে উঠলো। এই ফিতনা নির্মূলের জন্য যেসব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ও রক্তাক্ত যুদ্ধ ছিল "ইয়ামামার যুদ্ধ।" মুসায়লামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে এই লড়াই হয়েছিল। হযরত আবু কায়েসও (রা) মুজাহিদীনে ইসলামে শামিল ছিলেন। তিনি এই যুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে নিজের জীবন হক পথে কুরবান করে দিয়েছিলেন। তার ভাই আবদুল্লাহ (রা) সেই যুদ্ধে শাহাদাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছিলেন। ইবনে সায়াদ (রা) বর্ণনা করেছেন হযরত আবু কায়েসের (রা) অন্য ভাইয়েরাও বিভিন্ন যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। তামিম (রা) আজনাদাইনের যুদ্ধে, সায়েব (রা) ফাগালের যুদ্ধে, হাজ্জাজ (রা) ও সাইদ (রা) ইয়ারমুকের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন হুজাফা সাহমী

সাইয়েদেনা হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে যখন মুসলমানদের বিজয়ের প্লাবন সিরিয়ায় প্রবেশ করলো তখন রোমকদের মুসলমান বিদ্বেষের নেশা এমন পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল যে, তারা যুদ্ধ বন্দীদেরকেও অত্যন্ত নৃশংসভাবে শহীদ করে ফেলতো। আরব ঐতিহাসিকরা লিখেছেন যে, রোমকরা একটি বিরাট গাভী বানিয়ে রেখেছিল। তার পেটে যাইতুনের তেল রেখে নীচে আগুন জ্বালাতো। মুসলমান কয়েদী যদি খৃস্টধর্ম কবুল করে নিত তাহলে তাদের ছেড়ে দিত। আর যদি নিজের দ্বীন ছাড়তে অস্বীকৃতি জানাতো তাহলে তাদেরকে তেলে নিক্ষেপ করতো।

একবার সিরিয়ার এক যুদ্ধে ৮০/৮১ জন মুজাহিদ রোমকদের হাতে বন্দী হলো। এই মুসলমান কয়েদীদের মধ্যে বিরাট বপুর একজন সাহাবীও ছিলেন। তাঁর কপাল সৌভাগ্যের আলোয় ঝলমল করছিল এবং চেহারায় ছিল বিস্ময়কর ধরনের মহিমা। সিরীয় বাহিনীতে স্বয়ং রোমের বাদশাও ছিল। রোমকরা সেই সাহাবীকে (রা) গ্রেফতার করে বাদশাহর নিকট নিয়ে গেল। বাদশাহ তাকে খৃস্টধর্ম গ্রহণের দাওয়াত দিল। কিন্তু তিনি পরিষ্কারভাবে তা প্রত্যাখ্যান করলেন। বাদশাহ তাকে বললো যে, নিজের পরিণাম ভালোভাবে চিন্তা করে নাও। তুমি যদি অস্বীকার করতেই থাকো, তাহলে তোমাকে তপ্ত তেলে নিক্ষেপ করা হবে। রাসূলের (সা) সেই সাহাবী বেধড়ক জবাব দিলেন যে, যাই কর না কেন আমি আমার দ্বীন পরিত্যাগ করবো না। এরপর রোমকরা তাকে ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্য অন্য আরেক মুসলামন কয়েদীকে বাদশাহর নিকট আনলো। সে এই কয়েদীকেও ইসলাম পরিত্যাগের কথা বললো। কিন্তু সেই হকপন্থী বান্দাও স্পষ্ট অস্বীকার করে বসলো। তাতে রোমক জালেমরা তাকে তপ্ত তেলের মধ্যে নিক্ষেপ করলো এবং তিনি মুহূর্তের মধ্যে জ্বলে ভুনা কাবাব হয়ে গেলেন। রাসূলের (সা) সেই সাহাবী (রা) নিজের মজলুম সঙ্গীর পরিণাম দেখে কাঁদতে লাগলেন। রোমকরা বললো, এখন মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে কাঁদছো কেন। এখনো সময় আছে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করলে আমরা তোমাকে মুক্ত করে দিব।

রোমকদের কথা শুনে সেই সাহাবীর (রা) চোখে এক নূরানী চমক সৃষ্টি হলো এবং অত্যন্ত মহিমান্বিত কণ্ঠে বললেন, "আমি মৃত্যু ভয়ে কাঁদছি না বরং এজন্য কাঁদছি যে আল্লাহর পথে কুরবান করার জন্য আমার নিকট শুধু একটি

জীবন আছে। হায়! এক জীবনের পরিবর্তে যদি আমার প্রতিটি চুলের স্থানে এক একটি জীবন হতো এবং আমি সেই সব জীবন হক পথে বিলিয়ে দিতাম।" রোমকরা তাঁর ঈমানী শক্তি দেখে বিস্মিত হয়ে গেল এবং এমন পোক্ত ঈমান সম্পন্ন মানুষকে তাদের ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য আরো অস্থির হয়ে পড়লো।

তারা রাসূলের (সা) সেই সাহাবীকে (রা) বললো, আমাদের বাদশাহর কপালে যদি চুমু দাও তাহলে আমরা তোমাকে এখনই মুক্ত করে দেব।

তিনি ক্রুশ পূজারী বাদশাহর কপালে চুমু দানেও অস্বীকৃতি জানালো। তারপর রোমকরা তাকে ধন-সম্পদ ও সুন্দরী মহিলার লোভ দেখালো কিন্তু তিনি সব প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করলেন। অবশেষে রোমক বাদশাহ কায়সার বললো যে, আমার কপালে চুমু দাও, তাহলে সকল মুসলমান কয়েদীকে মুক্ত করে দেয়া হবে। নিজের মুসলমান ভাইদের খাতিরে সেই সাহাবী (রা) কালবিলম্ব না করে সামনে অগ্রসর হলেন এবং বাদশাহর কপালে চুমু দিলেন। এমনিভাবে ৮০ জন মুসলমানের মূল্যবান জীবন বেঁচে গেল।

রাসূলের (সা) এই সাহাবী (রা) যখন মদীনা মুনাওয়ারা আসেন এবং আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুককে (রা) এই ঘটনা শুনালে তখন তিনি আনন্দের আতিশয্যে তার কপালে চুমু দিলেন এবং অন্য মুসলমানদেরকেও তার মাথায় চুমু দানের কথা বললেন।

দৃঢ়তা ও অটলতার এই পাহাড়, যাঁর নিষ্ঠা ও ত্যাগের প্রশংসা করেছিলেন আরব ও আজমের খলিফা সাইয়েদেনা ফারুকে আজম (রা) তিনি ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন হুজাফা সাহমী।

সাইয়েদেনা আবু হুজায়ফা আবদুল্লাহ (রা) বিন হুজাফা কুরাইশের শাখা বনু সাহামের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ আবদুল্লাহ (রা) বিন হুজাফা বিন কায়েস বিন আদি বিন সায়াদ বিন সাহাম বিন ওমর বিন হামিস বিন কা'ব বিন লুব্বী।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন হুজাফাকে আল্লাহ পাক সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। তিনি নবুয়াতের প্রথম যুগে সেই সময় তাওহীদের দাওয়াতে সাড়া দিয়েছিলেন। যখন এ কাজ করাটা ছিল ভয়ংকর মুসিবত ডেকে আনার নামান্তর। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আবদুল্লাহ (রা)-ও অন্যান্য হকপন্থীর মত কাফেরদের জুলুম-নির্যাতনের নিশানা হয়ে গেলেন। কাফেরদের জুলুম-নির্যাতন যখন সীমা অতিক্রম করে গেল তখন নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছরের পর হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন হুজাফা হুজুরের (সা) ইঙ্গিতে অন্য অনেক মজলুম

মুসলমানের সাথে হিজরত করে হাবশা চলে যান এবং সেখানে কয়েক বছর উদ্বাস্তুর জীবন কাটাতে লাগলেন। তিনি হাবশা থেকে কখন ফিরে এলেন ? ঐতিহাসিকরা তার ব্যাখ্যা দেননি। একটি মত হলো যে, তিনি বদরের যুদ্ধের পূর্বে ফিরে এসেছিলেন এবং তাঁর বদরের সাহাবীদের দলে শামিল হওয়ার সৌভাগ্য লাভ ঘটেছিল। কিন্তু অধিকাংশ চরিতকার বলেছেন যে, বদরের যুদ্ধ ছাড়া তিনি নবীর (সা) অন্য সকল যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন এবং নিজের জানবাজির নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধির (৬ষ্ঠ হিজরী) পর মহানবী (সা) যখন প্রতিবেশী দেশসমূহের শাসকদের নামে ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্রাদি প্রেরণ করেন তখন তার মধ্য থেকে একটি পত্র ইরানের বাদশাহর নামেও প্রেরণ করেছিলেন। সহীহ বুখারীতে আছে যে, হুজুর (সা) পত্রটি হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন হুজাফার নিকট সোপর্দ করে তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, সে যেন তা বাহরাইনের গভর্নরের মাধ্যমে কিসরার নিকট পৌঁছে দেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন হুজাফা অত্যন্ত সুন্দরভাবে হুজুরের (সা) ইরশাদ তামিল করলেন এবং নবীর পত্র সকল ধরনের হেফাজতের সাথে বাহরাইনের শাসক পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। চরিতকাররা এটা পরিষ্কার করে বলেননি যে, বাহরাইনের শাসক এই পত্রসহ হযরত আবদুল্লাহ (রা) মাদায়েন প্রেরণ করেছিলেন অথবা নিজের কোন মানুষের হাতে তা রাজধানীতে প্রেরণ করেছিলেন। যা হোক, এই পত্র কিসরা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।

রহমতে দো আলমের (সা) প্রতি হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন হুজাফার সীমাহীন ভালোবাসা এবং রাসূলের (সা) মুখ দিয়ে নিসৃত সকল বাক্যের সত্যতা সম্পর্কে পূর্ণ আস্থাটা উদাহরণ তুল্য ছিল। সহীহাইনে হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন সূর্য ঢলে যাওয়ার পর প্রিয় নবী (সা) বাইরে তাশরীফ নিলেন এবং সাহাবীদেরকে জোহরের নামায পড়ালেন। যখন সালাম ফিরালেন তখন মিম্বরে দাঁড়িয়ে কিয়ামতের কথা উল্লেখ করলেন। এই প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখ করলেন যে, কিয়ামতের পূর্বে বড় বড় ঘটনা সংঘটিত হবে। তারপর (আবেগময়ী অবস্থায়) বললেন, যে কিছু জানতে চায় সে যেন জিজ্ঞেস করে নেয়। আল্লাহর কসম, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবো, তোমরা আমার নিকট যা জিজ্ঞেস করবে, আমি তোমাদেরকে তা বলবো। একথা শুনে লোকেরা খুব কাঁদলো। এদিকে তিনি বারবার বলছিলেন, জিজ্ঞেস করো। শেষে আবদুল্লাহ (রা) বিন হুজাফা দাঁড়ালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা কে ? তিনি বললেন, তোমার পিতা হলো হুজাফা। তারপরও তিনি একই কথা বলতে

লাগলেন যে, জিজ্ঞেস করো, আরো জিজ্ঞেস করো। তখন ওমর (রা) হাঁটুর ওপরে বসে পড়লেন এবং বললেন, আমরা আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন ও মুহাম্মদকে (সা) রাসূল মেনে সন্তুষ্ট হয়েছি। তাঁর কথা শুনে হুজুর (সা) চুপ মেরে গেলেন। তারপর বললেন, খবরদার! সেই সত্তার কসম যার কবজায় মুহাম্মদের (সা) জীবন রয়েছে। কেবলই প্রাচীরের দিকে জান্নাত ও জাহান্নাম উদাহরণ স্বরূপ আমার সামনে পেশ করা হয়েছিল। আমি ভালো ও মন্দের যেমন দৃশ্য আজ দেখেছি তা আর কখনো দেখিনি।

ইবনে শিহাব (রা) নিজের সনদসমূহে এই ঘটনার ওপর এইটুকুন বৃদ্ধি করেছেন যে, আবদুল্লাহ (রা) বিন হুজাফার মা আবদুল্লাহকে (রা) বললেন যে, তোমার মত অযোগ্য সন্তান আমি দেখিনি। তোমার নিকট একথার কি গ্যারান্টি ছিল যে, তোমার মা জাহেলী যুগের মহিলাদের মত কোন অপকর্ম করেনি। যদি এ ধরনের হতো তাহলে আজ তুমি সবার সামনে নিজের মাকে অপমানিত করতে।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন হুজাফা বলেন, আল্লাহর কসম তিনি (সা) যদি আমাকে কোন হাবশী গোলামের সন্তান বলেও আখ্যায়িত করতেন তাহলে আমি নিজেকে তার সন্তানই মনে করতাম।

কতিপয় হাদীস ব্যাখ্যাকারী লিখেছেন, এই ঘটনার পটভূমি এই ছিল যে, হুজুর (সা) লোকদেরকে অহেতুক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে নিষেধ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও কতিপয় লোক প্রশ্ন থেকে বিরত রইলো না। তাতে নবী করীমের (সা) আবেগ এসে গেলো এবং তিনি সেই অবস্থাতেই মিম্বারে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন যে, ঠিক আছে যার যা জানার থাকে তা জেনেই নাও। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন হুজাফা নিজের পিতার ব্যাপারে যে, প্রশ্ন করেছিলেন তার কারণ এই ছিল যে, কিছু মানুষ তার নসবের ব্যাপারে তোহমত লাগাতো।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, একবার রাসূলে আকরাম (সা) হযরত আবদুল্লাহ বিন হুজাফাকে কোন সারিয়াতে বা যুদ্ধে আমীর বানিয়ে প্রেরণ করেন এবং তার অধীন মুজাহিদদেরকে তাঁর নির্দেশ অমান্য না করার নির্দেশ দিলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) কোন কথায় নিজের সঙ্গীদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন এবং তাঁদেরকে লাকড়ী একত্রিত করে আগুন জ্বালানোর নির্দেশ দিলেন। তাঁরা নির্দেশ পালন করলেন। এ সময় তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করার নির্দেশ দেননি?

তাঁরা জবাব দিলেন, "অবশ্যই দিয়েছেন।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বললেন, তাহলে (আমি তোমাদেরকে আমীর হিসেবে নির্দেশ দিচ্ছি যে) এই আগুনে লাফিয়ে পড়।

প্রথমেতো সকলেই তা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। কিন্তু পুনরায় কিছু চিন্তা করে পরস্পরের প্রতি চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলেন। কেউ কেউ বললেন যে, আমীরের আনুগত্য আমাদের ওপর আবশ্যক এবং কেউ বললো আমরা আগুন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি। এ জন্য আগুনে কেন লাফ দিবো।

ইত্যবসরে আগুন নিভে গেল এবং হযরত আবদুল্লাহর (রা) ক্রোধও উপশম হয়ে এলো। এসব মানুষ যখন প্রিয় নবীর (সা) খিদমতে ফিরে এলো এবং সেই ঘটনার কথা উল্লেখ করলো তখন হুজুর (সা) বললেন, "তোমরা যদি সেই আগুনে প্রবেশ করতে তাহলে আর কখনো বের হতে পারতে না। আমীরের আনুগত্য তো ন্যায় কাজের ব্যাপারেই হয়ে থাকে। যার অনুমতি আল্লাহ দিয়েছেন।"

এই ঘটনার ব্যাপারে (যা নবম হিজরীতে সংঘটিত হয়) কতিপয় নেতৃস্থানীয় চরিতকার এই ধারণা প্রকাশ করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) নিজের সঙ্গীদের সাথে মজাক করেছিলেন। অর্থাৎ কৌতুক হিসেবে তিনি তাদেরকে আগুনে লাফিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয় যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) অত্যন্ত জিন্দাহ দিল মানুষ ছিলেন এবং প্রায়ই হাসি ও হাসানোর কথা বলতেন। ইবনে আসাকির (রা) যুহুরী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার কতিপয় সাহাবী (রা) হুজুরের (সা) নিকট অভিযোগ করলেন যে, আবদুল্লাহ (রা) বিন হুজাফা ব্যঙ্গ কৌতুকপূর্ণ কথা বলে থাকেন। তিনি বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। সে দিলে দিলে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে (সা) ভালোবাসে।

প্রিয় নবীর (সা) ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) খিলাফতকালে ইরান ও সিরিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হলে হযরত আবদুল্লাহ বিন হুজাফাও (রা) সিরিয়া গমনকারী মুজাহিদদের মধ্যে শামিল হয়ে গেলেন এবং সিদ্দিকী ও ফারুকী শাসনামলে রোমকদের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সিরিয়ার যুদ্ধসমূহের সময় একবার তিনি যে দৃঢ়তা, অটলতা এবং ঈমানী আবেগ প্রকাশ করেছিলেন তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। এই ঘটনা আরব ঐতিহাসিকরা ধারাবাহিকতার সাথে উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা বালাজুরী (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন হুজাফা মিসরের বিজয়সমূহেও হযরত আমর (রা) ইবনুল আছের সাথে মিলে

অংশ নিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বিশেষভাবে "আইনে শামছের" কথা উল্লেখ করেছেন। স্থানটি হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন হুজাফার হাতে জয় হয়। ইবনে আছির (রা) "উসুদুল গাব্বাহ"-তে লিখেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) হযরত ওসমানের (রা) খিলাফত কালে মিসরে ওফাত পান এবং সেই মাটিতে তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন হুজাফা ফযীলত ও কামালিয়াতের দিক দিয়ে খুব বুলন্দ মর্যাদার মানুষ ছিলেন। তাঁর থেকে কতিপয় হাদীসও বর্ণিত আছে।

হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদ উমুব্বী

মহানবীর (সা) নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম যুগের ঘটনা। একদিন মক্কার এক কমনীয় যুবক হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) খিদমতে হাজির হলেন। সে সময় তার পা কাঁপছিল ও চেহারায় ছেয়েছিল দুশ্চিন্তা। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) সেই সুদর্শন যুবককে এই অবস্থায় দেখে বিস্মিত হলেন। কেননা সে কোন সাধারণ পরিবারের সদস্য ছিল না। বরং বনু আবদি শামসের সেই নামকরা সরদারের পুত্র ছিল যাকে মক্কাবাসী "জুততাজ" (মুকুটওয়ালা) লকব দিয়ে রেখেছিল এবং যার পাগড়ীর শান এমন ছিল যে, কেউ সেই রংয়ের পাগড়ী নিজের মাথায় রাখতে পারতো না। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "কি ভাই, আজ এই সাত সকালে কেন আসতে হলো ?"

যুবকটি অত্যন্ত ধীর কণ্ঠে জবাব দিল ঃ হে আবু বকর! রাতে আমি এক আজিব স্বপ্ন দেখেছি। সেই স্বপ্নের তাবির কি হবে তা আমার বুঝে আসছে না। সেই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আমি আপনার নিকট এসেছি। সেই স্বপ্নের ব্যাপারে আমাকে কিছু বলুন। মক্কায় আমি আপনার চেয়ে অভিজ্ঞ আর কাউকে দেখছি না—যিনি স্বপ্নের তাবির করতে পারেন।

সিদ্দিকে আকরার (রা) বললেন, "ভাতিজা, তুমি তো তোমার স্বপ্নই বর্ণনা করোনি। বলতো দেখি তুমি কি দেখেছ ?"

যুবকটি বললো, "আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, একটি গর্তের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছি। সেই গর্তে আগুনের লেলিহান শিখা জ্বলছিল। আমার পিতা পূর্ণশক্তি দিয়ে সেই গর্তে ফেলে দিতে চাইছিল। কিন্তু মুহাম্মাদ (সা) বিন আবদুল্লাহ আমার জামার কলার খুব শক্তভাবে ধরে রেখেছেন এবং তিনি আমাকে সেই গর্তে নিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করছেন। এই দ্বন্দ্বপূর্ণ অবস্থাতেই আমি নিদ্রা থেকে জেগে গেলাম। রাতের অবশিষ্ট অংশ আমি অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় কাটিয়েছি এবং সকাল হতেই আপনার নিকট চলে এসেছি। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) যুবকটির কথা শেষ হতেই বললেন, "প্রিয় ভাইটি আমার, আমার পরামর্শ হলো, মুহাম্মাদ (সা) যে দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছেন, তা তুমি এক্ষুণি কবুল কর। তোমার স্বপ্ন থেকে প্রকাশ পায় যে, এ কাজ করলে তুমি

অগ্নিকুন্ডের গর্তে নিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে নিস্তার পাবে। অবশ্য তোমার পিতার কিসমতে এই সৌভাগ্য নেই। সে অবশ্যই সেই গর্তে পড়বে।"

হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) একনিষ্ঠ পরামর্শ যুবকের অন্তরে গেঁথে গেল। সে সেখান থেকে উঠে সোজা প্রিয় নবীর (সা) পবিত্র খিদমতে হাজির হলেন এবং আরজ করলেন, "হে ইবনে আবদুল মুত্তালিব! আপনি কোন আদর্শের দাওয়াত দিয়ে থাকেন?"

হুজুর (সা) বললেন, "আমার দাওয়াত হলো, আল্লাহ এক এবং তিনিই ইবাদাতের যোগ্য। শুধু তাঁরই ইবাদাত করো এবং আমাকে তার রাসূল হিসেবে মানো। ঐসব পাথরের মূর্তি পূজা ত্যাগ কর। যারা কাউকে কোন কল্যাণ-অকল্যাণ করার ক্ষমতা রাখে না। তারা তো একথাও জানে না যে, কারা তাকে পূজা করে এবং কারা করে না।" হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে যুবকটির চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং তার মুখ দিয়ে অযাচিতভাবে বেরিয়ে এলো "হে আল্লাহর রাসূল! আমি একক আল্লাহর ওপর এবং আপনার রিসালাতের ওপর সত্য অন্তরে ঈমান আনছি। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে রাহে হকে অটল পাবেন।"

বিত্তবান পরিবারের এই যুবক যিনি সব ধরনের আরাম-আয়েশ সত্ত্বেও হক কবুলের ভীতিপূর্ণ রাস্তা গ্রহণ করেছিলেন এবং কঠিনতম পরিস্থিতিতেও বিশ্ব নবীকে (সা) আঁকড়ে ধরেছিলেন, তিনি হলেন হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদ উমুব্বী।

সাইয়েদেনা হযরত আবু সাঈদ খালিদ (রা) বিন সাঈদ অত্যন্ত জালিলুল কদর সাহাবীদের (রা) মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। কুরাইশের বনু উমাইয়া খান্দানের সাথে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ

খালিদ (রা) বিন সাঈদ বিন আছ বিন উমাইয়া বিন আবদি শামস বিন আবদি মান্নাফ বিন কুসাই।

আবদি মান্নাফে গিয়ে তাঁর বংশধারা রাসূলে আকরামের (সা) সঙ্গে মিলে যায়। হযরত খালিদের (রা) পিতা আবু উহাইহা সাঈদ বিন আছ অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ও সৌর্যবীর্য সম্পন্ন সরদার ছিলেন এবং মক্কায় তার প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল। ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, সে যে রংয়ের পাগড়ী বাঁধতো, মক্কায় আর কেউ সেই রংয়ের পাগড়ী বাঁধার সাহস পেতো না। এজন্য সে মানুষের মধ্যে "জুততাজ" বা পাগড়ীধারী উপাধিতে মশহুর হয়ে গিয়েছিলেন। আবু উহাইহা যখন হযরত খালিদের (রা) ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পেলো তখন প্রচন্ড গোস্বায় ফেটে পড়লো। হযরত খালিদ (রা) পিতার

ক্রোধ থেকে বাঁচার জন্য কোথায়ও লুকিয়ে পড়লেন। আবু উহাইহা নিজের অন্য পুত্রদেরকে তাঁর সন্ধানে প্রেরণ করলো। তারা তাঁকে ধরে পিতার নিকট নিয়ে গেল। আবু উহাইহা খালিদকে (রা) প্রচন্ডভাবে গালাগাল করার পর এমন নির্দয়ভাবে প্রহার করলো যে, তার হাতের বেত ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। মারতে মারতে যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়লো তখন বললো, মুহাম্মাদের (সা) দ্বীন পরিত্যাগ কর। নচেৎ তোমার উপায় নেই। কিন্তু খালিদ (রা) মনে প্রাণে ইসলামের অনুরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, "অবশ্যই নয়, অবশ্যই নয়। আমার জীবনও যদি চলে যায় তবুও আমি মুহাম্মাদকে (সা) কখনো পরিত্যাগ করবো না।" আবু উহাইহা খুব ভয় দেখালেন, ধমক দিলেন। কিন্তু তিনি সামান্যও টললেন না। তাতে পিতা তাঁকে পুনরায় মারলো এবং গালাগাল দিল। তারপর বললো, খালিদ তুই নিজের চোখে দেখছিস যে, মুহাম্মাদ (সা) সমগ্র কওম থেকে পৃথক পথ বেছে নিয়েছে। সে আমাদের মা'বুদদেরকে গালি দেয় এবং আমাদের বাপ-দাদাদেরকে পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করে থাকে। তোর কি লজ্জা হয় না যে, এসব ব্যাপারে তুই তাকে সমর্থন করছিস।

খালিদ নির্ভিকভাবে জবাব দিলেন, "আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদ (সা) যা বলেন, আমি সব অবস্থাতেই তা পালন করবো।" আবু উহাইহা রেগে গিয়ে বললো, "নালায়েক কোথাকার! আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা। আমার গৃহে খাবার পাবি না।"

হযরত খালিদ (রা) অত্যন্ত ইতমিনানের সঙ্গে জবাব দিলেন, "আপনি আমার রিযিক বন্ধ করে দিলে আল্লাহ আমাকে রিযিক দিবেন।"

অতপর তিনি রহমত আলম (সা)-এর খিদমতে হাজির হলেন এবং তাঁর সঙ্গেই থাকতে লাগলেন। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, একদিন মক্কার উপকণ্ঠে তিনি এক নিরিবিলি স্থানে নামায পড়ছিলেন। আবু উহাইহা এই খবর পেলো। সে তাঁকে ডেকে পুনরায় একবার বোঝানোর চেষ্টা করলো এবং নিজের পিতৃ ধর্মে ফিরে আসার উৎসাহ দিলো। কিন্তু তিনি জবাব দিলেন যে, আমৃত্যু পর্যন্ত আমি ইসলাম পরিত্যাগ করবো না।

এই জবাব শুনে আবু উহাইহা তাঁর মাথায় লাকড়ি দিয়ে আঘাত শুরু করলো। মারতে মারতে তা ভেঙ্গে গেল। তারপর সে হযরত খালিদকে (রা) কয়েদ করলো এবং তাঁর খানাপিনা বন্ধ করে দিল। হযরত খালিদ (রা) তিনদিন পর্যন্ত ক্ষুৎ-পিপাসায় মক্কার ভয়াবহ গরমে নির্জন কয়েদীত্বের মুসিবত সহ্য করলেন। চতুর্থ দিন সুযোগ পেয়ে পালিয়ে গেলেন এবং মক্কার উপকণ্ঠে কোথাও লুকিয়ে রলেন।

কিছুদিন পর (নবুয়তের ৬ বছর পর) ইসলাম অনুসারীরা যখন দ্বিতীয় কাফেলায় হাবশা যেতে লাগলেন তখন হযরত খালিদ (রা) মক্কা ফিরে এলেন এবং নিজের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সেই কাফেলার সাথে হাবশা চলে গেলেন। চরিতকাররা হযরত খালিদের (রা) স্ত্রীর নাম উমাইনা লিখেছেন। আবার কেউবা লিখেছেন হুমাইনা। তিনি বনু খাযায়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন এবং তিনিও নবুয়তের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়ই প্রায় তের বছর পর্যন্ত হাবশায় উদ্বাস্তুর জীবন কাটান। সেখানেই তাঁর পুত্র সাঈদ (রা) এবং কন্যা উম্মে খালিদ (রা) জন্মগ্রহণ করেন। পরে উভয়েরই সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। হযরত খালিদের (রা) হাবশা অবস্থানকালে উম্মে হাবিবা (রা) বিনতে আবি সুফিয়ান (রা) বিধবা হন। তখন প্রিয়নবী (সা) তাঁকে নাজ্জাশীর (হাবশার বাদশাহ) মাধ্যমে বিবাহের পয়গাম প্রেরণ করলেন। হযরত উম্মে হাবিবা (রা) হুজুরের (সা) পয়গাম আনন্দের সাথে কবুল করে নিলেন এবং হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদকে নিজের উকিল মনোনিত করেন। নাজ্জাশী হযরত জাফর (রা) বিন আবি তালিব ও অন্য মুসলমানদেরকে ডেকে স্বয়ং হযরত উম্মে হাবিবার (রা) গায়েবানা বিবাহ হুজুরের (সা) সঙ্গে পড়িয়ে দিলেন। এ সময় হযরত খালিদ (রা) অত্যন্ত সুন্দরভাবে হযরত উম্মে হাবিবার (রা) ওকালতির দায়িত্ব আঞ্জাম দেন এবং বিবাহের অনুষ্ঠানাদির পর মজলিশে অংশগ্রহণকারীদেরকে খাবার খাইয়ে বিদায় করেন। এই ঘটনার কিছু দিন পর হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদ নিজের পরিবার-পরিজন এবং অন্য মুসলমানদের সঙ্গে হাবশা থেকে হিজরত করে মদীনা চলে আসেন। সময়টা ছিল ৬ হিজরীর শেষের দিকে অথবা সপ্তম হিজরীর শুরুর দিকে। সে সময় মহানবী (সা) খায়বারের যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদ হাবশা থেকে প্রত্যাগমনকারী অন্য সকল মুসলমান মহিলাকে মদীনা রেখে জিহাদের উৎসাহে সোজা খায়বার পৌছলেন। তখন খায়বার বিজয় হয়েছে এবং মুসলমানরা বিজয় উৎসব পালন করছিলেন। উদ্বাস্তু ভাইদেরকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে খুশী দ্বিগুণ হয়ে গেল। হুজুর (সা) তাঁদেরকে আহলান সাহলান মারহাবা বললেন এবং তাঁদের সবার সঙ্গে মুয়ানাকা করলেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) "আল ইসতিয়াবে" লিখেছেন যে, যদিও এসব সাহাবী খায়বারের যুদ্ধে বাস্তবত শরীক হতে পারেননি, তবুও বিশ্ব নবী (সা) গনিমতের মালে তাঁদের অংশ নির্ধারণ করে দিলেন।

তারপর হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদ কাজা ওমরায় রহমতে আলমের (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি

সেই দশ হাজার পবিত্র নফসের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের ব্যাপারে হাজার হাজার বছর পূর্বে কিতাবে ইসতিছনাতে ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছিল।

মক্কা বিজয়ের পর হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদ হুনাইন, তায়েফ ও তাবুকের যুদ্ধে রাসূলের (সা) বন্ধুত্বের হক আদায় করেছিলেন।

বদর, ওহোদ এবং খন্দকের যুদ্ধসমূহ হযরত খালিদের (রা) হাবশা অবস্থানকালে অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। তাতেও অংশগ্রহণের বঞ্চনায় সারাজীবন তাঁর আফসোস ছিল। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, একবার তিনি রাসূলের (সা) খিদমতে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আফসোস যে, আমরা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের মর্যাদা লাভ করতে পারিনি।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "তোমরা কি এটা পসন্দ করনি যে অন্যেরা এক হিজরতের মর্যাদা পেয়েছেন। আর তোমরা (হাবশার মুহাজির) পেয়েছ দুই হিজরতের মর্যাদা।"

হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদ কুরাইশের সেই হাতে গোনা কতিপয় মানুষের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা নবুওয়াতের সময় ভালোভাবে লিখাপড়া জানতেন। বস্তুত তিনি যখন হাবশা থেকে মদীনা এলেন তখন হুজুর (সা) তাঁকে দিয়ে প্রায়ই পত্রাদি লিখাতেন। যারকানী (র) বর্ণনা করেছেন যে, নবম হিজরীতে বনু ছাকিফ প্রতিনিধি দল রিসালাতের দরবারে হাজির হলে তাদের ও হুজুরের (সা) মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদন হয়েছিল তা হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। মুসনাদে আবু দাউদে আছে যে, হুজুর (সা) ইয়েমেনবাসীকে যে নিরাপত্তানামা দিয়েছিলেন তাও হযরত খালিদই (রা) লিখেছিলেন।

হযরত খালিদের (রা) দুই সহোদর আমর (রা) বিন সাঈদ এবং আবান (রা) বিন সাঈদও ইসলাম গ্রহণের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছিলেন। প্রিয় নবী (সা) এই তিন ভাইকে অত্যন্ত মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতেন এবং তাঁদেরকে নেতৃত্ব কর্তৃত্বের যোগ্য মনে করতেন। সুতরাং তিনি হযরত খালিদকে (রা) ইয়েমেনের, হযরত আবানকে (রা) বাহরাইনের এবং হযরত আমরকে (রা) তাইমার রাজস্ব আদায়কারী নিয়োগ করেছিলেন। তিন সহোদর হুজুরের (সা) আস্থায় পুরোপুরি উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন এবং মহানবীর (সা) ওফাত পর্যন্ত নিজেদের দায়িত্ব অত্যন্ত সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিতে থাকেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) "আল ইসতিয়াব" গ্রন্থে লিখেছেন যে, তিনজনই হুজুরের

(সা) ওফাতের খবর শুনলেন। এই হৃদয়বিদারক খবর তিন জনের উপর একই প্রভাব ফেললো এবং তিনজনই নিজেদের পদত্যাগ করে মদীনা চলে এলেন। সে সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খিলাফতের মসনদে আসীন হয়েছিলেন। তিনি তিন সহোদরকেই ডেকে বললেন, তোমাদেরক স্বয়ং রাসূলে করিম (সা) সেই সব পদে নিয়োগ করেছিলেন। এজন্য তোমরা ছাড়া আর কেউ তার বেশী যোগ্য হতে পারে না। আমি চাই যে, তোমরা পূর্বেকার মত নিজেদের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে থাকবে। কিন্তু তিন ভাইই একই জবাব দিলেন যে, আমরা রাসূলের (সা) পর অন্য কারোর আমেল হতে পারি না।

ইবনে জারির তাবারী বর্ণনা করেছেন যে, মদীনা ফিরে আসার পর হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদ দুই মাস পর্যন্ত হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) হাতে বাইয়াত করতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন। কিন্তু সিদ্দিকে আকবার (রা) এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কোন বাদানুবাদ করেননি। তারপর তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) সুন্দর চরিত্র এবং ধৈর্য ও স্থৈর্যে এত প্রভাবান্বিত হন যে, আনন্দচিত্তে তার বাইয়াত করেন। বাইয়াত গ্রহণের ব্যাপারে তার এই বিলম্বের কারণ সম্ভবত এই ছিলো যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) সম্পর্ক ছিল কুরাইশের সব চেয়ে ছোট কবিলা "বনি তাইমের" সঙ্গে এবং হযরত খালিদ (রা) নেক নিয়তের সঙ্গে মনে করতেন যে, খিলাফতের পদের জন্য এমন ব্যক্তিই যোগ্য যিনি বনু হাশিম অথবা বনু উমাইয়ার মত প্রভাবশালী কবিলার সাথে সম্পর্ক যুক্ত হবেন। কিন্তু তিনি যখন হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) ব্যক্তিত্বে সেসব গুণাবলী পেলেন যা তখন মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। সে সময় তিনি বাইয়াত করায় একমুহূর্তও বিলম্ব করলেন না।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) খিলাফতের আসনে সমাসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মদ্রোহিতার আগুন এত দ্রুততার সাথে প্রজ্জ্বলিত হলো যে, তার স্ফুলিঙ্গ দেখতে দেখতে সমগ্র আরব ভূমিকে গ্রাস করে ফেললো। হাতে গোণা কয়েকটি কবিলা ছাড়া আরবের এমন কোন কবিলা ছিল না যা এই বিরাট ফিতনায় প্রভাবিত হয়নি। এই নাযুক অবস্থায় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) অটল পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে গেলেন এবং নিজের হিম্মত, বীরত্ব, তাদবীর ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে ইসলামী খিলাফতের কিশতিকে ভয়াবহ মুসিবত থেকে সহিসালামতে তুলে নিয়ে আসলেন। ধর্মদ্রোহিতার ফিতনা নির্মূলে যেসব মানুষ জীবনের বাজী লাগিয়ে দিয়েছিলেন হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদও তাঁদের অন্যতম ছিলেন। ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, মুরতাদদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধসমূহে একবার তাঁর মুকাবিলা হলো আমর বিন মাদিকারব

যুবেয়দীর সঙ্গে। আমর বিন মাদিকারব সুঠামদেহী মানুষ ছিল এবং আরবের নামকরা বাহাদুরদের মধ্যে পরিগণিত হতো। কতিপয় রেওয়ায়াত অনুযায়ী তাকে এক হাজার সওয়ারের সমান মনে করা হতো। দুর্ভাগ্যবশত সে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার আসওয়াদ আনসীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে তার সমর্থকদের দলে শামিল হয়। হযরত খালিদ (রা) দৈহিক শক্তির দিক থেকে যদিও আমর বিন মাদিকারবের সমান ছিলেন না। কিন্তু ঈমানী জোশ তাঁর বাহুদ্বয়ে বিদ্যুত ভরে দিয়েছিল। তিনি আমর বিন মাদিকারবকে শুধু আহতই করেননি বরং তার তরবারী ও ঘোড়াও ছিনিয়ে নেন। আমর বিন মাদিকারব পালিয়ে জীবন রক্ষা করে এবং পরে পুনরায় মুসলমান হয়ে সিরিয়ার যুদ্ধে মূল্যবান খিদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন।

ধর্মদ্রোহিতার ফিতনা নির্মূল হওয়ার পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) ইরান ও সিরিয়ার অভিযানসমূহের প্রতি মনোযোগ দিলেন এবং মুসলমানদেরকে ইরান ও সিরিয়ার ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদে গমনের জন্য উৎসাহ দিলেন। হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদ সেই জীবন উৎসর্গকারীদের অন্যতম ছিলেন যাঁরা হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) জিহাদের ডাকে সর্বপ্রথম সাড়া দিয়েছিলেন। তিনি খলিফাতুর রাসূলকে (সা) সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

"আল্লাহর কসম, আমর পসন্দ হলো যে, আমি কোন উঁচু পাহাড় থেকে নীচে পড়ে যাই অথবা আসমান ও যমিনের মধ্যবর্তী স্থানে আমাকে কোন হিংস্র পাখী উঠিয়ে নিয়ে যাক কিন্তু আমি এটা পসন্দ করিনা যে, আপনি আমাকে ডাকবেন আর আমি চুপ মেরে থাকবো। আপনি নির্দেশ দেবেন, আর আমি তা তামিল করবো না। আল্লাহর কসম, না দুনিয়ার প্রতি আমার কোন মুহাব্বাত বা আসক্তি আছে, না আমি দীর্ঘ জীবন কামনা করি। তোমরা সকলে স্বাক্ষী থেকো যে, আমি, আমার আত্মীয় স্বজন এবং আমার নওকর-চাকর সকলেই হক পথে লড়াই করার জন্য ওয়াকফ হয়ে আছি। আমরা সবসময় দ্বীনের দুশনের সাথে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকবো। ততক্ষণে আল্লাহ তাদেরকে খতম করে ফেলবে অথবা আমরা সকলেই নিজের জীবন কুরবান করে দেব।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদের জন্য দোয়া করলেন এবং তাঁকে তাইমা (সিরিয়া) গমনকারী সাহায্যকারী বাহিনীর অফিসার নিয়োগ করলেন। হযরত খালিদ (রা) নিজের বাহিনী নিয়ে মদীনা থেকে রওয়ানা হতে লাগলেন। এ সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) কে সম্বোধন করে বললেন, "হে খলিফাতুর রাসূল! আপনার হাত এগিয়ে দিন।

জানিনা, আজকের পর পুনরায় এই দুনিয়ায় সাক্ষাত ঘটে কিনা। আল্লাহ যদি মুলাকাতের সুযোগ দেন তাহলে আমরা তার ক্ষমার আকাংখী থাকবো এবং আজকের পর যদি ভাগ্যে পুনরায় মুলাকাত না থাকে তাহলে আল্লাহর নিকট দোয়া হলো যে, তিনি যেন আমাকে ও আপনাকে জান্নাতে রাসূলের (সা) যিয়ারতের সৌভাগ্য দান করেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) হাত বাড়িয়ে হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদের সাথে অত্যন্ত মুহাব্বাত ও উষ্ণতার সাথে আলিঙ্গন করলেন। এই দৃশ্য এত হৃদয়গ্রাহী ছিল যে, হযরত আবু বকর (রা), হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদ এবং অন্যসব মুসলমান অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। সকলের উপরই বেশ কিছুক্ষণ ভাবাবেশ দেখাদিল। অতপর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) বললেন, "দাঁড়াও, আমরা কিছুদূর তোমাদের সাথে যাবো।" হযরত খালিদ (রা) আরজ করলেন, "আমি তা চাই না।"

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) বললেন, "কিন্তু আমি ও অন্য মুসলমানরা তাই চায়।" সুতরাং সকলে উঠে দাঁড়ালেন এবং মদীনার বাইরে পর্যন্ত হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদ ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে গেলেন।

রোমকরা তাইমার দিক থেকে হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদের অগ্রযাত্রার খবর পেলো। এ সময় তারা খুব জোরে শোরে যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করলো এবং সিরিয়ার সীমান্তে বসবাসরত কতিপয় মুরতাদ আরব কবিলাকে নিজেদের পক্ষে নিয়ে বিভিন্ন দিকে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করলো। হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদ দরবারে খিলাফতের হিদায়াত অনুযায়ী তাদের ওপর এমন প্রচন্ডভাবে হামলা চালালেন যে, সকল রোমক ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল এবং সেই সব সমর্থক আরব গোত্রসমূহ তওবা করে দ্বিতীয়বার ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিলো। তারপর রোমকদের একজন নামকরা সরদার বাহান এক বিরাট বাহিনী নিয়ে হযরত খালিদের (রা) মুকাবিলা করতে এলো। হযরত খালিদ (রা) তাকে পরাজিত করলেন এবং সে নিজের সৈন্যকে দামেস্ক হটিয়ে নিলো। হযরত খালিদ (রা) তার পিছু ধাওয়া করতে করতে অব্যাহতভাবে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন এবং দামেস্ক ও ওয়াকুসার মধ্যবর্তী একস্থানে গিয়ে তাঁবু ফেললেন। অন্যদিকে বাহান নিজের সৈন্য দলকে ইসলামী বাহিনীর চারদিকে ছড়িয়ে দিল এবং স্বয়ং একটি মজবুত বাহিনীসহ মুসলমানদের ওপর হামলার জন্য সামনে অগ্রসর হলো। পথিমধ্যে সে হযরত খালিদের (রা) পুত্র সাঈদকে (রা) একটি ছোট বাহিনীসহ পেলো। রোমকরা ঘেরাও করে হযরত সাঈদ (রা) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে শহীদ করে ফেললো। হযরত খালিদ (রা)

হঠাৎ করে পুত্রের শাহাদাতের খবর পেয়ে খুব দুঃখ পেলেন এবং শোকাভিভূত অবস্থায় তিনি নিজের বাহিনীকে নিয়ে পিছু হটে গেলেন। বাহান সামনে অগ্রসর হয়ে ইসলামী বাহিনীর ওপর চরম আঘাত হানতে চাইলো। কিন্তু মুসলমানদের এক জানবাজ সরদার ইকরামা জুলকালা (রা) বাহানকে সামনে অগ্রসর হওয়া থেকে নিবৃত্ত করলো এবং হযরত খালিদ (রা) পিছু হটতে হটতে জুলমারওয়া নামক স্থানে এসে তাঁবু ফেললেন। কিছুদিন পর সেখান থেকে মদীনা আগমন করলেন। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) তাঁর পিছু হটে আসায় অসন্তোষ প্রকাশ এবং খুব করে ভর্ৎসনা করলেন। হযরত খালিদ (রা) এই বলে ক্ষমা চাইলেন যে, পুত্রের বিচ্ছিন্নতার শোক তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছিল এবং তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) তাঁর ওজর কবুল করলেন এবং তাঁকে পুনরায় জিহাদে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদ দ্বিতীয়বার সিরিয়া গিয়ে একজন সাধারণ সিপাহীর মত হযরত আবু উবায়দা (রা) ইবনুল জাররাহর বাহিনীতে শামিল হয়ে গেলেন এবং অতীতের ভুল সংশোধনের জন্য নিজের জীবন হাতের ওপর রাখলেন। তিনি রোমকদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধে জীবনবাজী রেখে অংশ নিলেন। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকরা দামেস্ক ও ফাহালের যুদ্ধসমূহের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এসব যুদ্ধে তিনি উৎসাহ ও আত্মহারা অবস্থায় অংশ নিয়েছিলেন। সেই যুগেই হযরত খালিদ (রা) হযরত ইকরামা (রা) বিন আবি জেহেলের বিধবা পত্নী হযরত উম্মে হাকিমকে (রা) নিকাহ করেন। ফাহালের যুদ্ধের পর ইসলামী বাহিনী "মারজে সফর" পৌঁছলে হযরত খালিদ (রা) সেখানেই রুসমে উরুসী আদায়ের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। উম্মে হাকিম (রা) বললেন, দুশমন মাথার ওপর এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের পরাজিত করে ইতমিনানের সাথে এই রসম আদায় করলে ভালো হতো না।

হযরত খালিদ (রা) বললেন ঃ "এই যুদ্ধে নিজের শাহাদাতের ব্যাপারে আমার আস্থা রয়েছে।" উম্মে হাকিম (রা) চুপ মেরে গেলেন। একটি পুলের নিকট যা বর্তমানে 'কানতারায়ে উম্মে হাকিম (রা)' নামে অভিহিত, সেখানে রুসমে উরুসী আদায় হয়। হযরত খালিদ (রা) সকালে ওয়ালিমার দাওয়াতের ব্যবস্থা করেন। লোকজনের খাওয়া-দাওয়া তখনো শেষ হয়নি। এমন সময় রোমকরা হামলা করে বসলো। তাদের একজন সুঠামদেহী যুদ্ধবাজ ব্যক্তি সর্বাগ্রে থেকে মুসলমানদেরকে মুকাবিলার আহ্বান জানাচ্ছিল। হযরত খালিদ (রা) তীর বেগে তার সাথে মুকাবিলার জন্য বের হয়ে গেলেন এবং খুব বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে তার হাতে শহীদ হলেন। তারপর সাধারণ যুদ্ধ শুরু

হয়ে গেল। হযরত উম্মে হাকিম (রা) স্বামীর শাহাদাতের দৃশ্য দেখছিলেন। সেই সময় নিজের তাঁবুর খুটি উঠিয়ে রোমকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং সাত ব্যক্তিকে যমালয়ে পাঠিয়ে স্বামীর প্রতিশোধ নিলেন।

চরিতকাররা হযরত খালিদের (রা) শুধুমাত্র দুই সন্তানের কথা উল্লেখ করেছেন ঃ পুত্র আবু সাঈদ (রা) এবং কন্যা উম্মাহ অথবা উম্মে খালিদ (রা)। সাঈদ (রা) যুদ্ধের ময়দানে হযরত খালিদের (রা) সামনেই শহীদ হয়ে যান।

হযরত উম্মে খালিদ (রা) মশহুর মহিলা সাহাবীদের (রা) মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। তাঁর বিয়ে হয়েছিল হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়ামের সাথে। প্রিয়নবী (সা) তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। হাবশা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর একবার তিনি নিজের মায়ের সঙ্গে হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হলেন। হুজুর (সা) তাকে দেখে বললেন ঃ "খুব সুরত খুব সুরত।"

হুজুর (সা) হযরত উম্মে খালিদকে (রা) খুশী করার জন্য একথা বলেছিলেন।

আরেকবার হুজুর (সা) হযরত উম্মে খালিদকে (রা) বিশেষভাবে ডেকে একটি ফুল ও সুন্দর চাদর দিয়েছিলেন এবং সে সময়ও তাঁকে খুশী করার জন্য এই শব্দ ব্যবহার করেছিলেন।

হাফেজ ইবনে আবদুল্ বার (র) বলেন যে, হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদের জীবনে কর্তৃত্বমূলক আচরণ ছিল। তবুও তিনি পোশাক প্রভৃতিতে মহানবীর (সা) সাদৃশ্য রাখার চেষ্টা করতেন। নিজের আংটির ওপর তাবার্‌রুক হিসেবে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" শব্দটি খোদাই করিয়ে নিয়েছিলেন। হুজুর (সা) এই আংটি দেখে তাঁর কাছ থেকে তা নিয়ে নেন এবং নিজের কাছেই রেখে দেন।

হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদ হক কবুলে অগ্রগমন, হক পথে নির্যাতন সহ্যকরণ এবং জিহাদের শওকের যে চিত্র ইতিহাসের পাতায় অংকন করছেন তা চিরকালের জন্য তার নাম জীবিত রাখবে।

হযরত আখরাম আসাদী (রা)

আল্লাহ তায়ালা সাইয়েদেনা হযরত আবু বকর সিদ্দিককে (রা) স্বপ্ন তা'বিরের পূর্ণাঙ্গ নিপুণতা দান করেছিলেন। অধিকাংশ মানুষ তাঁর খিদমতে নিজেদের স্বপ্নের তা'বির জিজ্ঞেসর জন্য হাজির হতো। ৬ষ্ঠ হিজরীর কথা। একদিন উজ্জল লাল বর্ণের একজন সুদর্শন যুবক সাইয়েদানা সিদ্দিকে আকবারের (রা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ

"হে আবু বকর! গতরাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আসমানের দরজা আমার জন্য খুলে দেয়া হয়েছে এবং আমি উর্ধ্বজগত ভ্রমণ করে সপ্তম আসমান এমনকি সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। সেসময় গায়েব থেকে আমার কানে আওয়াজ এলো যে, এটাই তোমার অবস্থান স্থল। তারপর আমার চোখ খুলে গেল। আপনি আমাকে বলুন যে, এই আশ্চর্য ধরনের স্বপ্নের তাবির কি ?"

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) বললেন ঃ

"ভাই! আমি তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি যে, তুমি হক পথে শাহাদাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়ে গেছ। এই হলো সেই স্বপ্নের তা'বির।"

কিছুদিন পর সেই স্বপ্নের তা'বির এমনভাবে পূর্ণ হলো যে, সেই ব্যক্তি হক পথে বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন এবং সেই শাহাদাত তাকে তার স্থায়ী ঠিকানা সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছে দিল।

এই সুদর্শন ও কমনীয় যুবক যাকে আখিরাতে সিদরাতুল মুনতাহার বুলন্দ স্থান দান করা হয়েছিল তিনি ছিলেন হযরত মুহরিয (রা) বিন ফাজলা। সাধারণভাবে তাঁকে আখরাম আসাদী লকবে ডাকা হতো।

হযরত মুহরিয (রা) বিন ফাজলা মহান মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। বনু আসাদ বিন খুজাইমার সাথে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসব নামা নিম্নরূপ ঃ

মুহরিয (রা) বিন ফাজলা বিন আবদুল্লাহ বিন মুররাহ বিন কবির বিন গানাম বিন দাওদান বিন আসাদ বিন গোযায়মা।

ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, জাহেলী যুগে তাঁর খান্দান বনু আবদি শামসের মিত্র ছিল। চরিতকাররা হযরত আখরাম আসাদীর (রা) ইসলাম গ্রহণের সময় নির্ধারণ করেননি। কিন্তু সকলেই এ ব্যাপারে একমত

যে, নবুওয়াতের প্রথমেই উদ্দীপ্ত যৌবনকালে তিনি তাওহীদের দাওয়াতে সাড়া দিয়েছিলেন। এমনিভাবে তিনি আস-সাবিকুনাল আউয়ালুনের পবিত্র দলের সদস্য হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

নবুওয়াতের ১৩ বছর পর বিশ্ব নবী (সা) সাহাবায়ে কিরামকে (রা) মদীনায় হিজরতের সাধারণ অনুমতি দিয়েছিলেন—এ সময় হযরত আখরাম আসাদীও (রা) অন্যান্য সাহাবীর সাথে হিজরত করে মদীনা এসে যান। এখানে বনু নাজ্জারের খান্দান বনু আবদুল আশহাল তাকে নিজের মিত্র বানিয়ে নেন। আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, তার ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক আনসারের জালিলুল কদর সন্তান হযরত আম্মারাহ (রা) বিন হাজম নাজ্জারীর সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়।

হযরত আখরাম আসাদী (রা) শুধুমাত্র রাসূল প্রেম, দ্বীনের প্রতি নিষ্ঠা এবং ঈমানী জোশের নেয়ামতেই পূর্ণ ছিলেন তা নয়, বরং বীরত্ব, নির্ভীকতা এবং জানবাজীতেও নিজের উদাহরণ নিজেই ছিলেন। যুদ্ধের ধারা শুরু হলে তিনি সর্বপ্রথম বদরের যুদ্ধে নিজের তরবারীর নিপুণতা প্রদর্শন করেন। তারপর ওহোদ ও খন্দকের যুদ্ধে নিজের বাহাদুরী ও জীবন বাজী রাখার নমুনা পেশ করেন। রহমতে আলমের (সা) প্রতি ছিল গভীর ভালোবাসা এবং সবসময় নিজের জীবন হক পথে কুরবান করার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। এই জীবন উৎসর্গের আবেগ তাঁকে আল্লাহর খাস ব্যক্তিদের কাতারভুক্ত করে দিয়েছিলো।

৬ষ্ঠ হিজরীতে তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তার উল্লেখ ওপরে করা হয়েছে। আল্লাহর নিকট তিনি যে বিরাট মর্যাদার অধিকারী তা এই স্বপ্নেই প্রমাণিত হয়। সিদ্দিকে আকবার (রা)-এর নিকট থেকে সেই স্বপ্নের তা'বির শুনে তিনি খুব খুশী হলেন এবং তখন থেকে তাঁর সারা সময় আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য কাটতে লাগলো।

কিছুদিন পরই সেই সময় এসে গেল। সে জন্যই হযরত আখরাম আসাদী উৎসুখ হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। ৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউস্‌সানী মাসে উয়াইনিয়া বিন হাসান ফাযারী ৪০ সওয়ারীর একটি দলের সাথে গাধার চারণ ভূমিতে গুপ্তভাবে হামলা চালালো। এই গোচারণ ভূমি মদীনা থেকে কয়েক মাইল দূরে জিকারদে একটি পুকুরের সংলগ্ন ছিল এবং সেখানে রাসূলে আকরামের (সা) উটনী চরতো। ফাযারী লুটেরারা উটনীর রাখালকে শহীদ করে ফেললো এবং ২০টি দুধালো উটনী হাঁকিয়ে নিয়ে চললো। ঘটনাক্রমে হযরত সালমা (রা) ইবনুল আকওয়া আসলামী এবং হযরত রাব্বাহ (রাসূলের আযাদকৃত গোলাম) (রা) ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে ক্রোধে অস্থির হয়ে

পড়লেন। তিনি হযরত রাব্বাহকে (রা) ঘোড়ার ওপর সওয়ার করিয়ে তক্ষণি মদীনা পাঠিয়ে দিলেন। যাতে তিনি হুজুরকে (সা) খবরটি দিতে পারেন এবং নিজে একাকী ফাযারী লুটেরাদের সাথে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন খুব সাহসী ও নির্ভীক মানুষ। তিনি নিপুণ তীরন্দাজ ছিলেন। প্রথমত তিনি নিকটবর্তী একটি টিলায় চড়ে মদীনার দিকে মুখ করে তিনবার "ইয়া সাবাহা" ধ্বনি উচ্চারণ করলেন (যদি কেউ 'ইয়া সারাহ" শব্দের ধ্বনি উচ্চারণ করতেন তখন তার অর্থ দাঁড়াতো যে সে মুসিবতে নিপতিত হয়েছে অথবা যে কোন কঠিন বিষয়ের মুখোমুখি হয়েছে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য তার সাহায্যের প্রয়োজন। শব্দটির শাব্দিক অর্থ হলো "হে সকালের মুসিবত।")

এই শ্লোগান দিয়ে হযরত সালমা (রা) টিলার নীচে নামলেন এবং বৃক্ষের আড়ালে দাঁড়িয়ে লুটেরাদের ওপর পাথর এবং তীর নিক্ষেপ শুরু করলেন।

এই একাকী মরদে মুজাহিদের নিক্ষিপ্ত তীর ও পাথরের কারণে লুটেরাদের জবান বন্ধ হয়ে গেল এবং তারা হতবুদ্ধি হয়ে সকল উট রেখে পালিয়ে গেল। হযরত সালমা (রা) উটগুলো মদীনার দিকে তাড়িয়ে দিলেন এবং নিজে অব্যাহতভাবে ডাকাতদের পিছু ধাওয়া করতে থাকলেন। চাশতের থেকে সময় একটু বেশী হলে আইনিয়া বিন বদর ফাযারী কতিপয় সশস্ত্র সওয়ারের সাথে লুটেরাদের সাহায্যের জন্য এসে পৌঁছলো। তারা হযরত সালমাকে (রা) গ্রেফতার করতে চাইলো। হযরত সালমা (রা) নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করলেন এবং সেখান থেকে আহ্বান জানিয়ে বললেন ঃ

"হে আল্লাহর শত্রুরা! জানো, আমি কে। আমি হলাম আকওয়ার পুত্র। সেই সত্ত্বার কসম, যিনি মুহাম্মাদকে (সা) বুজুর্গ বানিয়েছেন। তোমাদের কারো এমন হিম্মত নেই যে আমাকে গ্রেফতার করতে পারে। তোমাদের মধ্য থেকে যদি কেউ আমার নিকট আসে তাহলে সে কখনই বেঁচে যেতে পারবে না।"

লুটেরা ফাযারী কেবলমাত্র প্রথম পা উঠানোর কথা চিন্তাই করছিলো এমন সময় দূরে ধূলা ওড়া দৃষ্টিগোচর হলো এবং বৃক্ষের ঝোপ থেকে তিনজন অশ্বারোহী বের হয়ে এলো। তারা ঘোড়ায় চড়ে ধূলো উড়িয়ে হযরত সালমার (রা) সাহায্যের জন্য এসেছিলেন। এসব ঘোড় সওয়ারকারী বাহিনীর অগ্রবর্তী দল ছিল, যাদেরকে মহানবী (সা) ডাকাতির সংবাদ পেতেই তাদের নির্মূলের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। সকলের আগে ছিলেন হযরত আখরাম আসাদী (রা)। তার পেছনে ছিলেন হযরত আবু কাতাদা আনসারী (রা) এবং তাঁর পিছনে কিছু দূরে হযরত মিকদাদ (রা) ইবনুল আসওয়াদ। এই সময় হযরত সালমা (রা) তৎক্ষণাৎ পাহাড়ের চূড়া থেকে নীচে নেমে এলেন এবং হযরত আখরামের (রা) ঘোড়ার বাকডোর ধরে বললেন ঃ

"আখরাম ! থেমে যাও। তুমি যদি সামনে অগ্রসর হও তাহলে আমার ভয় হয় যে, তোমার ওপর লুটেরারা হামলা করে বসতে পারে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, যাতে রাসূলে আকরাম (সা) এবং তাঁর সঙ্গীরা এসে পৌছেন।"

দ্বীনের প্রতি সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ হযরত আখরামকে (রা) অস্থির করে তুলেছিল এবং তিনি লুটেরাদের সাথে পাঞ্জা লড়ার জন্য উন্মুখ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বললেন ঃ

"হে সালমা! তুমি যদি আল্লাহ এবং আখিরাতের ওপর ঈমান এনে থাকো এবং মনে করে থাকো যে, জান্নাত ও জাহান্নাম হক বা সত্য তাহলে আমাকে হক পথে জীবন কুরবান করা থেকে বিরত রেখো না।"

এই বাক্যগুলো তিনি এতো উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং আবেগের সাথে বললেন যে, হযরত সালমা (রা) তাঁর ঘোড়ার বাকডোর ছেড়ে দিলেন এবং তিনি ঘোড়া দৌড়াতে দৌড়াতে লুটেরাদের দিকে অগ্রসর হলেন। ফাযারীদের নামকরা যোদ্ধা আবদুর রহমান বিন আইনিয়া সর্বপ্রথম তাঁর সামনে এলো। তিনি নিজের তরবারী দিয়ে তার ওপর সজোরে আঘাত করলেন এবং সে নিজে বেঁচে গেলেও তার ঘোড়া কেটে গেল। তারপর সে নিজেকে সামলে নিয়ে হযরত আখরামের (রা) ওপর বর্শা দিয়ে হামলা করলো। এই হামলা কার্যকর হলো এবং বর্শা হযরত আখরামের (রা) কলিজা পার হয়ে গেল। তিনি শহীদ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। আর এমনিভাবে তাঁর স্বপ্নের তা'বির পূর্ণ হয়ে গেল। স্বপ্নে তার অবস্থান স্থল সিদরাতুল মুনতাহা নির্ধারণ করা হয়েছিল ঠিক সেই সময় হযরত আবু কাতাদা (রা) ঘোড়া দৌড়াতে দৌড়াতে এসে পৌছলেন এবং নিজের বর্শা দিয়ে আবদুর রহমান বিন আইনিয়াকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়ে হযরত আখরামের (রা) প্রতিশোধ নিয়ে নিলেন। তারপর হকপন্থীরা লুটেরাদের ব্যাপারে যথার্থ সতর্কতা অবলম্বন করলেন।

ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছিলেন যে, শাহাদাতের সময় হযরত আকরামের (রা) বয়স ৩৭ অথবা ৩৮ বছর ছিল।

হযরত মা'মার (রা) বিন আবদুল্লাহ আদভী

দশম হিজরীতে রহমতে আলম (সা) বিদায় হজ্জের জন্য মক্কা মুয়াজ্জামা তাশরীফ নিলেন। হজ্জ শেষে মহানবী (সা) নিজের পবিত্র মোছ কাটানোর জন্য কোন ব্যক্তিকে তালাশ করছিলেন। রাসূলের (সা) একজন সাহাবী (রা) মোছ কাটা জানতেন। তিনি হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হলেন এবং উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে এই খিদমতের জন্য নিজেকে পেশ করলেন। তিনি যখন ক্ষুর হাতে নিলেন তখন সারওয়ারে আলম (সা) মুচকী হেসে বললেন, "ভাই আল্লাহর রাসূল তোমাকে তাঁর কানের লতির ওপর এমন অবস্থায় আধিপত্য দিয়েছেন যখন তোমার হাতে ক্ষুর রয়েছে।"

সেই ব্যক্তি অকৃত্রিমভাবে আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আল্লাহর কসম, এটা আমার ওপর আল্লাহর মহান দয়া ও ইহসান যে, তিনি আমাকে হুজুরের (সা) মোছ মোবারক কাটার মর্যাদা দান করছেন।"

রাসূলের (সা) এই সাহাবী যার বিদায় হজ্জের সময় সাইয়েদুল মুরসালিনের (সা) পবিত্র মোছ কাটার সৌভাগ্য লাভ ঘটেছিল এবং যিনি এই খিদমতকে নিজের জন্য স্থায়ী মান-মর্যাদা ও গৌরবের ব্যাপর মনে করেছিলেন, তিনি ছিলেন হযরত মা'মার (রা) বিন আবদুল্লাহ আদভী।

সাইয়েদেনা হযরত মা'মার (রা) বিন আবদুল্লাহ মহানবীর (সা) অত্যন্ত মুখলিস জাননিছার সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। তিনি কুরাইশের আদী খান্দানের আশা-আকাংখার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন। নসব নামা হলো ঃ

মা'মার (রা) বিন আবদুল্লাহ বিন নাজলা বিন আবদুল উজ্জা বিন হারছান বিন আওফ বিন উবায়েদ বিন আবিজ বিন আদি বিন কা'ব।

আল্লাহ তায়ালা মা'মারকে (রা) সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। সুতরাং নবুয়াতের প্রথম যুগে যেই তাঁর কানে তাওহীদের আওয়াজ পৌছলো তখনই তিনি নির্ভাবনায় তাতে সাড়া দিলেন এবং সাবিকুনাল আউয়ালুনের পবিত্র দলে শামিল হয়ে গেলেন। সেই ভয়াবহ যুগে ইসলাম গ্রহণের অর্থই ছিল দুঃখ-মুসিবতকে দাওয়াত দেয়ার নামান্তর। হযরত মা'মারও (রা) কাফেরদের জুলুম-নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পাননি এবং তিন-চার বছর পর্যন্ত

কাফেরদের জুলুম ও নির্যাতনের নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হয়েছিলেন। নবুওয়াতের ৬ বছর পর মুসলমানদের দ্বিতীয় কাফেলা হাবশা রওয়ানা হলেন। এ সময় হযরত মা'মারও (রা) হুজুরের (সা) ইঙ্গিতে সেই কাফেলায় শরীক হয়ে গেলেন এবং হাবশার উদ্বাস্তু জীবন গ্রহণ করলেন। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, কিছু দিন পর হযরত মা'মার (রা) হাবশা থেকে মক্কা ফিরে এলেন এবং এখানে দীর্ঘদিন অবস্থানের পর মদীনা গমন করেন। কিন্তু ইবনে হিশাম লিখেছেন যে, তিনি সেই দলে শামিল ছিলেন যাঁরা খায়বারের সময় হযরত জাফর (রা) বিন আবি তালিবের সাথে হাবশা থেকে মদীনা পৌঁছেছিলেন। এমনিভাবে তিনি দুই হিজরতের মর্যাদা লাভ করেন। যদিও চরিতকাররা এ ব্যাপারে কিছু বলেননি, তবুও এটাই স্পষ্ট ধারণা যে, খায়বারের যুদ্ধের পর সকল যুদ্ধে হযরত মা'মার (রা) হুজুরের (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার সুযোগ লাভ করেছিলেন।

বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, নিজের একনিষ্ঠতা এবং জীবন উৎসর্গের আবেগের বাদৌলতে হযরত মা'মার (রা) মহানবীর (সা) নৈকট্য লাভ করেছিলেন এবং হুজুর (সা) তাঁর ওপর খুব আস্থা রাখতেন। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা বিদায় হজ্জে তাঁর খিদমতের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এই সফরে মহানবীর (সা) সওয়ারীর বন্দোবস্ত করার দায়িত্ব তাঁর ওপরই ন্যস্ত ছিল এবং উটের পিঠের হাওদা ইত্যাদি তিনিই বাঁধতেন। একদিন জনৈক ব্যক্তি জেনে হোক বা না জেনে হোক তা ঢিলা করে দিয়েছিল। যাহোক, রাততো তেমনি কাটলো। সকাল হলে হুজুর (সা) হযরত মা'মারকে (রা) সম্বোধন করে বললো, "রাতে হাওদা ঢিলা হয়ে গেছে বলে মনে হয়েছিল।"

হযরত মা'মার (রা) খুব লজ্জিত হলেন এবং আরজ করলেন "হে আল্লাহর রাসূল! আমিতো নিয়ম মত কষেই বেঁধেছিলাম। সম্ভবত কেউ এই ধারণায় তা ঢিলা করে দিয়েছে যে, আমার নিকট থেকে যাতে এই মর্যাদা বা কাজ ছিনিয়ে নেয়া যায় এবং আপনি এই খিদমত অন্য কারোর কাছে ন্যস্ত করেন।"

হুজুর (সা) বললেন, "তুমি নিশ্চিন্ত থেকো যে, এই খিদমত তুমি ছাড়া অন্যকে সোপর্দ করবো না।" হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে হযরত মা'মার (রা) খুশী হয়ে গেলেন। সেই হজ্জের সময় তিনি হুজুরের (সা) পবিত্র মোছ কাটার মর্যাদাও লাভ করেন।

হযরত মা'মারের (রা) ওফাতের সাল সম্পর্কে সকল চরিতকারই নীরবতা অবলম্বন করেছেন। সহীহ মুসলিমের এক রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, তিনি হুজুরের (সা) উত্তম আদর্শ অত্যন্ত কঠোরভাবে মানতেন এবং এ ব্যাপারে

কোন মুসলিহাত বা ওজরের সুযোগ দিতেন না। একবার তিনি নিজের গোলামকে কিছু গম দিলেন এবং বললেন, তা বিক্রি করে যা মূল্য পাবে তা দিয়ে যব কিনে আনবে। গোলাম গম বিক্রির পরিবর্তে তা যবের সাথে বদলে নিল এবং গমের পরিমাণের চেয়ে যবের পরিমাণ বেশী নিল। হযরত মা'মার (রা) একথা জানতে পেরে গোলামের ওপর খুব ক্রোধান্বিত হলেন এবং তক্ষুণি তাকে যবের অতিরিক্ত পরিমাণ ফেরতদানের জন্য প্রেরণ করলেন। সেই সঙ্গে তাকে নসিহত করলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, খাদ্যদ্রব্য সমান পরিমাণে বদল কর।

হযরত মা'মার (রা) হাদীসও বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে দু'টি হাদীস বর্ণিত আছে।

হযরত আয়াশ (রা) বিন আবি রবিয়া

আবু আবদুর রহমান আয়াশ (রা) বিন আবি রবিয়া মাখজুমী এবং আবু জেহেল উভয়েই একই মা'র দুধ পান করেছিল। কিন্তু আল্লাহর কুদরতের কেরেশমা দেখুন যে, একভাই [আয়াশ (রা)] দ্বীনে হকের জানবাজ সিপাহী হয়েছিলেন। আর অন্যজন (আবু জেহেল) দ্বীনে হকের জঘণ্যতম শত্রু ছিল। আয়াশ (রা) বিন আবি রবিয়া সেই সব জালিলুল কদর সাহাবীর অন্যতম ছিলেন যাঁদের জন্য আস্‌সাবিকুনাল আউয়ালুনের খিতাব নাযিল হয়েছিল। তিনি ইসলাম সম্পদে সেই সময়ে পূর্ণ হয়েছিলেন যখন বিশ্বনবী (সা) হযরত আরকামের (রা) গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেননি এবং দ্বীনে হক কবুল করাটা তরবারীর ওপর চলার নামান্তর ছিল। তাঁর মা পক্ষীয় ভাই আবু জেহেল আয়াশ (রা) যাতে তাওহীদের শরাব পান করতে না পারে সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু তাতে ব্যর্থ হয় এবং আয়াশ (রা) কালেমায়ে তাওহীদ পাঠ করে মুশরিকদের জুলুম ও নির্যাতনের প্রজ্বলিত আগুনে নির্ভীকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েন। যখন সেই আগুনের প্রচন্ডতা চরম পর্যায়ে পৌছলো তখন অন্যান্য মজলুম মুসলমানের সাথে হযরত আয়াশ (রা) এবং তাঁর স্ত্রী আসমাও (রা) হুজুরের (সা) অনুমতিক্রমে হাবশা হিজরত করেন। কিছু দিন উদ্বাস্তুর জীবন অতিবাহিত করার পর মক্কা ফিরে আসেন এবং কিছু দিন পর হযরত ওমর ফারুকের (রা) সঙ্গে মদীনা হিজরতের গৌরব লাভ করেন।

নিজের ভাইয়ের ইসলাম গ্রহণে আবু জেহেল খুব বিরক্ত হয়েছিল। কিছু দিন পর সে মদীনা এলো [এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী রহমতে আলম (সা) তখনো মদীনা তাশরীফ আনেননি] এবং হযরত আয়াশের (রা) সঙ্গে সাক্ষাত করে বলতে লাগলো, "প্রিয় ভাই আমার! আমাদের বৃদ্ধা মা তোমার বিচ্ছেদের আগুনে জ্বলছে। সে কসম করেছে যে, যতক্ষণ তোমার চেহারা না দেখবে ততক্ষণ না ছায়ায় বসবে, না মাথায় তেল দেবে। একবার তাকে তোমার চেহারা দেখিয়ে এসো।" মায়ের প্রতি ছিল হযরত আয়াশের (রা) সীমাহীন ভালোবাসা। বড় ভাইয়ের কথায় একদম গলে গেলেন এবং তার সাথে মা'কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য রওয়ানা দিলেন।

হযরত ওমর (রা) আয়াশের (রা) মক্কা যাওয়ার ব্যাপারে অবহিত হয়ে তাঁর নিকট গেলেন এবং বললেন, "আয়াশ! তোমার ভাইয়ের কথা থেকে

আমি যেন প্রতারণার গন্ধ পাচ্ছি। মক্কার প্রখর রোদ যখন তোমার মাকে অস্থির করে তুলবে তখন সে নিজেই ছায়ায় চলে যাবে এবং যখন তার মাথায় জটা ধরবে বা উকুন হবে তখন তেলও দেবে এবং চিরুনীও করবে। আমার কথা শুনলে কক্ষণো মক্কা যেয়ো না।"

কিন্তু হযরত আয়াশের (রা) ওপর আবু জেহেলের কথার এমন প্রভাব পড়েছিল যে, তিনি নিজের ইচ্ছা পরিবর্তনে আগ্রহী হলেন না এবং বললেন, মা'র কসম পূর্ণ করে ফিরে আসবো।

সুতরাং তিনি আবু জেহেলের সাথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। যেই মক্কা পৌছলেন, সেই বদস্বভাবী আবু জেহেল সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেল এবং নিজের মুশরিক সাথীদের সহায়তায় প্রতারিত আয়াশকে (রা) যিন্দানখানায় নিক্ষেপ করলো। এই যিন্দানখানায় তাঁরও পূর্বে রিসালাত প্রদীপের আরেক পতঙ্গ জিঞ্জিরাবদ্ধ ছিলেন। হকপথের এই কয়েদীর নাম হলো হযরত সালমা (রা) বিন হিশাম।

হযরত আয়াশ (রা) বিন আবি রবিয়াও কয়েদ থাকার কারণে বদরের যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। তবে তিনি অন্য কয়েকটি যুদ্ধে মুজাহিদ হিসাবে অংশ নেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) শাসনামলে সিরিয়ায় সেনা অভিযান পরিচালনার সময় হযরত আয়াশও (রা) ইসলামী বাহিনীতে শরীক হয়ে গেলেন এবং খৃষ্টনাদের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে বীর বেশে অংশ নেন। ওফাত সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের রেওয়ায়াত রয়েছে। এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী ইয়ারমুকের যুদ্ধে শাহাদাত পান। অন্য এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী সিরিয়া থেকে সহীহ সালামতে মক্কা ফিরে এসেছিলেন এবং এখানেই ইন্তেকাল করেন। তাঁর থেকে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত আছে।

হযরত সালামা (রা) বিন হিশাম

হযরত সালমা (রা) বিন হিশাম আল-মাখযুমী আবু জেহেলের ভাই হতেন। তিনিও তাওহীদের দাওয়াতের প্রথম যুগে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন এবং নিজের পাষাণ হৃদয় ভাই ও অন্যান্য মুশরিকের জুলুম-নির্যাতনের নিশানা হয়ে গিয়েছিলেন। মুশরিকদের নির্যাতন যখন সীমা অতিক্রম করলো তখন তিনিও হুজুরের (সা) ইঙ্গিতে হাবশা চলে গেলেন। হাবশায় কেবলমাত্র তারা কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন, এমন সময় একটি গুজব শুনতে পেলেন যে মক্কাবাসী ইসলাম গ্রহণ করেছে। একথা শুনে তাঁরা খুব খুশী হলেন এবং অন্যান্য মুহাজিরের সাথে মক্কা ফিরে এলেন। এখানে পৌছে তাঁরা অবহিত হলেন যে, এটা ছিল ভুল খবর। সুতরাং তিনি পুনরায় হাবশা গমনের ইচ্ছা করলেন। কিন্তু আবু জেহেল বাধা দিল এবং সে তাঁর পায়ে বেড়ি দিয়ে একটি কুঠরীতে আটক করে রাখলো। খানা-পিনা বন্দ করে দিল এবং তাঁর ওপর নির্যাতন চালাতে লাগলো। কিন্তু নির্যাতন সত্ত্বেও সেই মরদে হকের হিম্মতে কোন ভাটা পড়লো না। তিনি বলতেন, "হে আল্লাহর দুশমন! আমাকে যদি মেরেও ফেলিস, তবুও হক পথে যে পা উঠেছে তা কখনো পিছু হটে আসবে না।"

দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি বিভিন্ন ধরনের হৃদয়বিদারক মুসিবত সহ্য করলেন। এমনকি তাঁর হকপন্থী সহযোগী অন্যভাই আয়াশও (রা) এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। এই দু'অটল ভাই মেহনতের কয়েদে আটক ছিলেন। এমন সময় তাওহীদের প্রতি ফিদা তৃতীয় আরেকজন সেই মুসিবতের যিন্দানখানায় বা কয়েদখানায় আসতে বাধ্য হলেন। হক পথের এই তৃতীয় মুসাফির ছিলেন ওয়ালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ।

হযরত সালমা (রা) বিন হিশাম, আয়াশ (রা) বিন আবি রবিয়া ওয়ালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ তিনজনই জালিলুল কদর সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। হযরত সালমা (রা) শ্রমমূলক কয়েদখানা থেকে নাজাত পেয়ে মদীনা পৌছলেন। এসময় বদরের যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর তিনি প্রায় সকল যুদ্ধে রাসূলে আকরামের (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন। হযরত আবুবকর সিদ্দিকের শাসনামলে সিরিয়ার যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে (১৪ হিজরীতে) মারজে রোম নামক যুদ্ধে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন।

হযরত ওয়ালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ

হযরত ওয়ালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ মুগিরাতুল মাখজুমী হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ সাইফুল্লাহর ভাই ছিলেন। ওয়ালিদ (রা) ইসলামের দাওয়াতের শুরুতে ইসলামের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত ছিলেন এবং বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়েছিলেন। মুশরিকরা যখন পরাজিত হলো তখন ওয়ালিদ (রা) হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশের হাতে গ্রেফতার হলেন। তাঁর ভাই খালিদ বিন ওয়ালিদ ও হিশাম বিন ওয়ালিদ ফিদিয়া দিয়ে তাঁকে মুক্ত করলেন এবং নিজেদের সঙ্গে মক্কা নিয়ে চললেন। এই সময় হযরত ওয়ালিদের অন্তর ঈমানের আলোয় আলোকিত হয়েছিল। জুল হুলায়ফা পৌঁছে ভাইদের দৃষ্টি বাঁচিয়ে পালিয়ে গেলেন এবং সোজা মদীনায় রাসূলের (সা) খিদমতে পৌঁছে ইসলাম গ্রহণ করলেন। [এক রেওয়ায়াতে এও আছে যে, ওয়ালিদ (রা) নবুওয়াতের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।]

হুজুর (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "ওয়ালিদ, তুমি ফিদিয়া আদায়ের পূর্বে কেন মুসলমান হওনি ?"

তিনি আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! এভাবে মুসলমান হলে কুরাইশরা বলতো যে, ফিদিয়া দেয়ার ভয়ে মুসলমান হয়ে গেছে। অথচ আমি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের (সা) সন্তুষ্টির জন্য মুসলমান হতে চেয়েছিলাম।

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি মক্কা ফিরে গেলেন। ক্রোধে পরাজিত তাঁর ভাইয়েরা তাঁকেও জিঞ্জিরা বদ্ধ করে সালমা (রা) বিন হিশাম এবং আয়াশ (রা) বিন আবি রবিয়ার সাথে আটক করে রাখলো এবং রকমারী নির্যাতন চালাতে লাগলো।

মহানবী (সা) যখন এই তিন মজলুমের সশ্রম কারাভোগের অবস্থা শুনতেন তখন পবিত্র চেহারায় দুঃখ ও দুশ্চিন্তার রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠতো এবং (সে যুগে) প্রত্যেক নামাযের পর তিনি দোয়া করতেন ঃ "হে আল্লাহ! সালমা (রা) বিন হিশাম, আয়াশ (রা) বিন আবি রবিয়া ও ওয়ালিদ বিন ওয়ালিদকে মুশরিকদের জুলুমের পাঞ্জা থেকে মুক্ত কর।"

হক পথের এই তিন কয়েদী অত্যন্ত ধৈর্য ও স্থৈর্য্যের সাথে মুসিবতের দিনগুলো অতিবাহিত করছিলেন। এমন সময় একদিন সুযোগ পেয়ে ওয়ালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ নিজেকে জিঞ্জির থেকে মুক্ত করানোতে সফল হলেন এবং লুকিয়ে ছুপিয়ে মদীনা মুনাওয়ারাতে রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে

পৌঁছলেন। হুজুর (সা) তাঁকে দেখে খুব খুশী হলেন এবং সালমা (রা) ও আয়াশের (রা) কথা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! তাঁরা খুব কঠিন মুসিবতে রয়েছেন। মুশরিকরা উভয়ের পা এক বেড়িতে বেঁধে রেখেছে এবং তাঁদের ওপর নিত্য নূতন নির্যাতন চালাচ্ছে।"

হুজুর (সা) সেই মজলুমদের অবস্থা শুনে খুব বিষণ্নবোধ করলেন এবং সাহাবীদেরকে (রা) সম্বোধন করে বললেন ঃ "তোমাদের মধ্যে এমন কোন বান্দাহ আছে কি যে সালমা ও আয়াশকে কয়েদ থেকে ছাড়িয়ে আনবে?"

হযরত ওয়ালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ দাঁড়িয়ে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! এই দায়িত্ব এই অধমকে দান করুন।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "ঠিক আছে তুমিই যাও এবং মক্কা পৌঁছে সেখানকার কামারের নিকট অবস্থান করো। সে দ্বীনে হক কবুল করেছে। তার মাধ্যমে খুব গোপনে সালমা ও আয়াশের সাথে সাক্ষাত কর এবং তাদেরকে বলো যে, আমাকে আল্লাহর রাসূল (সা) প্রেরণ করেছেন। তোমরা উভয়ে আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়।"

রাসূলে করিমের (সা) ইরশাদ অনুযায়ী হযরত ওয়ালিদ (রা) মক্কা পৌঁছলেন এবং সেখানকার মুসলমান কামারের নিকট অবস্থান গ্রহণ করলেন। সে বললো যে, "তোমার পলায়নের পর মুশরিকরা সালমা ও আয়াশের কয়েদখানা পরিবর্তন করে চলেছে। জানিনা, তারা আজ-কাল কোথায় আটক রয়েছে।"

হযরত ওয়ালিদ (রা) কয়েদখানার পাত্তা লাগানোর ফিকিরে রলেন। একদিন এক মহিলাকে মাথার ওপর খাবার নিয়ে কোথাও যেতে দেখলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "বোন, কার খাবার নিয়ে যাচ্ছ?"

সে বললো, "সালমা বিন হিশাম ও আয়াশ বিন আবি রবিয়ার। তারা ইদানিং বেদ্বীন হয়ে গেছে। তাদের খাবার দিতে যাচ্ছি।"

হযরত ওয়ালিদ (রা) বাহ্যত নিরুদ্বেগের সাথে তার কথা শুনলেন। কিন্তু সে যখন সামনে অগ্রসর হলো তখন তিনি তার দৃষ্টি বাঁচিয়ে পিছু পিছু চলতে লাগলেন। অবশেষে তিনি সেই বাড়ী দেখতে পেলেন যাতে উভয় হকপন্থীরা কয়েদ ছিলেন। অবস্থান স্থলে ফিরে এসে কামারকে সকল কাহিনী শুনালেন এবং বললেন যে, সালমা ও আয়াশের জিঞ্জির কাটার কোন পদ্ধতি বলে দাও।

সে বললো, "জিঞ্জিরের নীচে একটি মজবুত পাথর রাখবে এবং তার এক কড়ার ওপর তরবারী রেখে অন্য পাথর দিয়ে আঘাত করবে। জিঞ্জির আস্তে আস্তে কেটে যাবে।"

রাতের অন্ধকারে হযরত ওয়ালিদ (রা) নিজের পবিত্র মিশন পূর্ণ করার জন্য বের হলেন। ঘটনাক্রমে কয়েদখানা ছিল ছাদহীন। হযরত ওয়ালিদ (রা) প্রাচীর টপকে কয়েদখানার মধ্যে গিয়ে পড়লেন। মজলুম কয়েদীদেরকে হুজুরের (সা) পয়গাম দিলেন। অতপর কামারের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে জিঞ্জির কেটে ফেললেন এবং উভয়কে সঙ্গে নিয়ে বাইরে চলে এলেন। নিজের উট বাইরে বেঁধে রেখে এসেছিলেন। তিনজনে তার ওপর সওয়ার হয়ে মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলেন।

সকাল হলে কয়েদীদেরকে না পেয়ে মুশরিকরা মাথায় হাত দিয়ে বসলো। কয়েকজন দ্রুতগতি সম্পন্ন উটনীতে চেপে পিছু পিছু ছুটলো। কিন্তু ব্যর্থ হলো। কেননা হক পথের তিন মুসাফির অনেক দূর চলে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁদেরকে সহীহ সালামতে মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছে দিলেন। হুজুর (সা) তাঁদেরকে দেখে যারপর নেই খুশী হলেন এবং হযরত ওয়ালিদের (রা) জন্য দোয়া খায়ের করলেন।

হযরত ওয়ালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ এই মর্যাদার অধিকারী যে, তিনি সেই সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন যখন তাঁর মহান ভাই খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ কুফর ও শিরকের ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছিলেন। পরে এই খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদকেই মহানবী (সা) "সাইফুল্লাহ" খিতাব দিয়েছিলেন।

আল্লামা ইবনে আছির (রা) বর্ণনা করেছেন যে, ওয়ালিদ (রা) কাজা ওমরাতে রাসূলে আকরামের (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন এবং খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ কোথায়ও লুকিয়ে ছিলেন। এ সময় হুজুর (সা) ওয়ালিদকে (রা) সম্মোধন করে বলেছিলেন ঃ "খালিদ যদি আমার নিকট আসতো, তাহলে আমি তাকে সম্মান করতাম। আমার বিস্ময় লাগে যে, তার মত মেধাবী মানুষ এখনো কিভাবে ইসলাম গ্রহণ না করে রয়েছে।"

হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে হযরত ওয়ালিদ (রা) খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদকে একটি পত্র লিখলেন। তাতে তিনি তাঁকে অত্যন্ত দরদ ও আন্তরিকতার সাথে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলেন। এই পত্রই খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদকে (রা) ইসলামের দিকে অগ্রসর হওয়ার কারণ হয়েছিল।

হযরত ওয়ালিদ (রা) কাজা ওমরার কিছু কাল পরই অষ্টম হিজরীতে ওফাত পান। তাঁর মা হযরত লুবাবা (রা) তখনো জীবিত ছিলেন। জওয়ান পুত্রের মৃত্যুতে তিনি অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং একটি হৃদয় বিদারক মরছিয়া বললেন। হুজুর (সা) এই মরছিয়া শুনে তাঁকে বললেন যে, এই মরছিয়া না পড়ে বরং কুরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করো।

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ـ ق :١٩

হযরত ওয়াহাব (রা) বিন কাবুস মুযনি

সাইয়েদেনা হযরত ওমর ফারুকের (রা) সামনে কখনো ওহোদের যুদ্ধের কথা আলোচনা হলে তিনি বলতেন, "হায়! সেই মুযনির শাহাদাতের ভাগ্য যদি আমার হতো।" এমনিভাবে ফারিসুল ইসলাম ও ইরাক বিজয়ী হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসের সামনে কোন সময় ওহোদ যুদ্ধের প্রসঙ্গ উল্লেখ হলে তিনিও বলতেন, "মুযনির শাহাদাতের মত আমি আমার মৃত্যু কামনা করি।"

এই মুযনি যাঁর শাহাদাতে ফারুকে আজম (রা) ও সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসের মত উম্মাতের স্তম্ভরাও ঈর্ষা করতেন। তিনি ছিলেন বনু মুযনিয়ার আশা-আকাংখার পাদ প্রদীপ হযরত ওয়াহাব (রা) বিন কাবুস। এটা হলো আল্লাহর দ্বীন। তিনি যাকে চান বিছানা থেকে উঠিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে সিংহাসন থেকে ধূলায় নামিয়ে দিয়ে থাকেন। ওয়াহাব (রা) বিন কাবুস মরু আরবের একজন গ্রাম্য মানুষই তো ছিলেন। আখিরাতের দরজা ঠিক করার পূর্বে তিনি কোন রোযা রাখেননি এবং কোন সময় নামাযও পড়েননি। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বিরাট শান ও মর্যাদা দান করেছিলেন।

হযরত ওয়াহাব (রা) বিন কাবুসের হসব-নসব ও স্বদেশভূমি সম্পর্কে শুধু এতটুকুনই জানা যায় যে, তিনি মুযনিয়া গোত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। এই গোত্র মুজিরের মশহুর শাখা হিসেবে পরিচিত। যেহেতু বনু মুযনিয়ার অবস্থান ছিল গাতফানের কোন শহরে। এজন্য চরিতকাররা তাঁদেরকে গাতফান গোত্রের একটি শাখা হিসেবে ধারণা করেছেন ; কিন্তু একথা ঠিক নয়। বনু মুযনিয়ার সম্পর্ক হলো উবিন তানজা বিন ইলিয়াস বিন মুজিরের সঙ্গে। মশহুর কবি হযরত কা'ব (রা) বিন যোহায়েরেরও সম্পর্ক ছিল বনু মুযনিয়ার সঙ্গেই।

হযরত ওয়াহাব (রা) বিন কাবুসের জীবনী নীরবতার জীবনী। তিনি প্রথম ও শেষবার তৃতীয় হিজরীর শওয়ালে ওহোদের যুদ্ধের দিন ইতিহাসের পাতায় আবির্ভূত এবং সেই দিনই খ্যাতির শীর্ষ দেশে আরোহণ করেন ও আল্লাহর দরবারে এত উঁচু মর্যাদায় সমাসীন হন যে, ইসলামী উম্মাহ কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর জন্য গৌরব করবে।

আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওয়াহাব (রা) বিন কাবুস নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র হারিছ (রা) বিন উকবা বিন কাবুসের সাথে বকরী নিয়ে বিশেষ করে সেই দিন মদীনা মুনাওয়ারা এসেছিলেন যে দিন মহানবী (সা) নিজের জাননিসারদেরকে সাথে নিয়ে ওহোদের জন্য তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন। সর্বজ্ঞাত আল্লাহই জানেন যে, তাঁরা উভয়ে বকরী বিক্রয় করতে অথবা ইসলাম গ্রহণের জন্য মদীনা এসেছিলেন কিনা। মদীনা পৌছে তাঁরা চারদিকে নীরবতা দেখতে পেয়ে বিস্মিত হয়ে গেলেন। আওস ও খাজরাজের মহল্লায় মহিলা ও শিশু ছাড়া কোন পুরুষ লোক দেখতে পেলেন না। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঘটনাটা কি ? আজ মদীনা পুরুষ শূন্য কেন ? জবাব পেলেন যে, সকল পুরুষ মানুষ রাসূলের (সা) সঙ্গে মক্কার মুশরিকদের মুকাবিলার জন্য ওহোদ পর্বতের দিকে গেছেন। একথা শুনে চাচা-ভাতিজা দু'জনে তৎক্ষণাৎ ওহোদের ময়দানে মহানবীর (সা) খিদমতে হাজির হলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে ফেললেন। সে সময় যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। মুসলমানরা মুশরিকদেরকে অব্যাহতভাবে পিছু হটিয়ে দিচ্ছিল। হযরত ওয়াহাবও (রা) তরবারী উঠিয়ে মুশরিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শাহাদাতের আকাংখায় উন্মুখ মুসলমানরা নিজেদের আবেগপূর্ণ হামলায় শীঘ্রই মুশরিকদেরকে ভেগে যেতে বাধ্য করলো। ময়দান পরিষ্কার হয়ে গেলে অধিকাংশ মুসলমান গনিমতের মাল সংগ্রহ শুরু করলো। যুদ্ধ শুরুর পূর্বে হুজুর (সা) ওহোদের দাররাহে আইনাইনে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জোবায়ের আনসারীর নেতৃত্বে পঞ্চাশজন তীরান্দাজ নিয়োগ করেছিলেন। যাতে শত্রু সেই দাররা বা গিরিপথের পিছন দিক থেকে হঠাৎ করে মুসলমানদের ওপর হামলা করে বসতে না পারে। হুজুর (সা) এই তীরান্দাজদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যা কিছুই ঘটুক না কেন (আমরা জয়ই হই অথবা পরাজিত হই) তোমরা এই গিরিপথ ছেড়ে দেবে না। যুদ্ধে যখন মুসলমানরা বিজয়ী হলো তখন দুর্ভাগ্যবশত অধিকাংশ তীরান্দাজের হুজরের (সা) নির্দেশ স্মরণ রইলো না এবং তারা গিরিপথ ছেড়ে গনিমতের মাল সংগ্রহে মশগুল হয়ে পড়লো। শুধুমাত্র হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জোবায়ের সাত অথবা দশজন তীরান্দাজসহ গিরিপথে অবস্থান করছিলেন। ঠিক সেই সময় খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ এবং আকরামা (রা) বিন আবু জেহেল (যাঁরা তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি) নিজেদের ঘোরসওয়ার দল নিয়ে গিরিপথে এসে প্রবেশ করলো। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জোবায়ের নিজের স্বল্প সংখ্যক সঙ্গী নিয়ে খুব দৃঢ়তার সাথে মুকাবিলা করলেন। কিন্তু মুশরিকদের সংখ্যাধিক্যের সামনে তাঁরা টিকতে পারলেন না এবং হক পথের এই সকল জানবাজই এক এক করে শহীদ হয়ে গেলেন। তারপর মুশরিকরা গিরিপথ থেকে বের হয়ে মুসলমানদের বড় দলের ওপর হামলা করে বসলো।

যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে মুশরিকদেরকে হটিয়ে দিয়ে মুসলমানরা আগেই নিজেদের ব্যূহ ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। গিরিপথ দিয়ে মক্কার কুরাইশদের হঠাৎ করে তুফানী হামলা তারা সামলে নেয়ারও সুযোগ পেলেন না এবং বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে হামলাকারীদের মুকাবিলা করতে লাগলেন। সেই সময় মুশরিকদের একটি দল মুসলমানদের সেই দলের দিকে অগ্রসর হলো যাদের মধ্যে মহানবী (সা) ছিলেন। হুজুর (সা) নিজের জাননিছারদের প্রতি তাকালেন এবং বললেন, এই দলকে কে রুখবে ? হযরত ওয়াহাব (রা) বিন কাবুস নিকটেই ছিলেন। তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে বললেন "হে আল্লাহর রাসূল ! একাজের জন্য আমি হাজির।" এ কথা বলেই মুশরিকদের ওপর এমন প্রচন্ডভাবে তীর নিক্ষেপ শুরু করলেন যে, তাদের মুখ ফিরে গেল এবং পিছু হটে গেল। ইত্যবসরে মুশরিকদের আরেকটি দল সেদিকে এগিয়ে গেল। হুজুর (সা) বললেন, এর মুকাবিলা কে করবে ? হযরত ওয়াহাব (রা) পুনরায় এগিয়ে এলেন এবং আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাদের মুকাবিলা করবো।" একথা বলেই তিনি তরবারী ঘুরাতে ঘুরাতে প্রচন্ড উৎসাহের সাথে সেই দলের ওপর হামলা করলেন যে তাদের দাঁত খাটো হয়ে গেল এবং তারাও পিছু হটে গেল। এটা কেবল শেষ হয়েছিল এমন সময় কাফেরদের একটা উৎসাহী দল সেদিক থেকে হামলা করে আসছিলো বলে দৃষ্টিগোচর হলো। হুজুর (সা) বললেন, "এ দলের মুকাবিলা কে করবে ? এবারও হযরত ওয়াহাব (রা) আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাজির," হুজুর (সা) বললেন, "যাও জান্নাত তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।" এই সুসংবাদ শুনে আনন্দের আতিশয্যে হযরত ওয়াহাবের (রা) পা আর জমিনে ধরে না। কাউকে ছাড়বো না এবং নিজেও বাঁচার চেষ্টা করবো না—একথা বলে তরবারী বের করে মুশরিক সৈন্যদের মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং এত উৎসাহ ও আত্মহারা হয়ে যুদ্ধ করলেন যে, জানবাজী ও আত্মোৎসর্গের হক আদায় করে ছাড়লেন। যুদ্ধ করতে করতে এবং হত্যা করতে করতে কাফেরদের অন্যদিক দিয়ে বের হয়ে গেলেন। সামনে যখন কাউকে পেলেন না তখন পুনরায় ঘুরলেন এবং আবার মুশরিকদের ভীড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। হুজুর (সা) তাঁর যুদ্ধকে সুন্দর দৃষ্টিতে দেখছিলেন এবং বলছিলেন, "আল্লাহুম্মা আরহামহু" হে আল্লাহ তার ওপর রহম কর।

ওয়াহাব (রা) দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত এভাবে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাতে লাগলেন। শেষে মুশরিকরা তাঁকে আয়ত্বের মধ্যে এনে ফেললো এবং চারদিক থেকে তরবারী ও বর্শা বর্ষণ করতে লাগলো। হযরত ওয়াহাব (রা) অব্যাহতভাবে বীরত্বের সঙ্গে মুকাবিলা করে যেতে লাগলেন। কিন্তু মানবীয় শক্তির তো একটা সীমা আছে। অবশেষে বিশেরও অধিক আঘাত খেয়ে মাটির ওপর পড়ে গেলেন এবং তাঁর পবিত্র আত্মা পরপারে যাত্রা করলো। এমনিতেই তাঁর শরীরে এমন কোন অংশ ছিল না যেখানে আঘাত লাগেনি। কিন্তু ২০টি আঘাত এমন গুরুতর ছিল যার একটিই মানুষের মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট ছিল।

এতবড় গুরুতর আঘাত সত্ত্বেও শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত অটলভাবে যুদ্ধ করাটা ছিল বিস্ময়কর ব্যাপার। বাস্তবত এটা ছিল তার ঈমানী আবেগ। এই আবেগই তার মধ্যে বীরত্ব, সাহসিকতা এবং অটলতা ও দৃঢ়তার বিদ্যুৎপূর্ণ করে দিয়েছিলো। যেহেতু তিনি মুশরিকদেরকে প্রচন্ডভাবে হেনস্তা করেছিলেন এবং তাদের অনেক লোককে হত্যা অথবা আহত করেছিলেন; সেজন্য তারা তাদের মনের ঝাল মেটানোর জন্য হক পথের শহীদ ওয়াহাবের (রা) লাশ খুব ভয়াবহভাবে বিকৃত করেছিল (নাক, কান ও ঠোঁট কেটে ফেলেছিল এবং দেহের স্থানে স্থানে ফেড়ে ফেলেছিল) এটা এমন এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য ছিল, যা কারোর পক্ষেই দেখাটা সম্ভব ছিল না। হযরত ওয়াহাবের (রা) যুবক ভাতিজা হারিছ (রা) বিন উকবা স্নেহের চাচার লাশের এই অবস্থা দেখে অস্থির হয়ে পড়লেন এবং তরবারী উচিয়ে মুশরিকদের ওপর গিয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত হযরত ওয়াহাবের (রা) মত নির্ভীকভাবে লড়াই করতে লাগলেন। শেষে মুশরিকরা তাকেও ঘিরে ধরে শহীদ করে ফেললো। এমনিভাবে চাচা-ভাতিজা উভয়ে মানুষের নিকট বকরী বিক্রয় করার পরিবর্তে নিজেদের জীবনই হক পথে বিক্রয় করে ফেললেন।

রহমতে আলম (সা) এই দুই জানবাজের নিষ্ঠাপূর্ণ আমলে এমন প্রভাবিত হলেন যে, লড়াই শেষে তিনি স্বয়ং তাদের লাশের নিকট তাশরীফ নিলেন এবং বললেন, "আমি তেমাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছি।" কবর খোঁড়া পর্যন্ত হুজুর (সা) তাঁদের পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে রলেন। হযরত ওয়াহাবকে (রা) লাল স্ট্রাইপের অথবা লাল বুটির একটি চাদরের কাফন পরালেন। চাদরটি ছিল ছোট। পা আলগা ছিল। হুজুর (সা) তাঁর ওপর হারমালা ঘাস দিয়ে ঢেকে দিলেন এবং তারপর নিজের হাত দিয়ে দাফন করলেন।

সাইয়েদেনা হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস বলতেন, যে হিম্মত ও বীরত্ব ওয়াহাব (রা) বিন কাবুসের নিকট থেকে ওহোদের যুদ্ধে প্রদর্শিত হয়েছিল তেমন কোন যুদ্ধে কারোর নিকট থেকেই দেখা যায়নি। আমি রাসূলকে (সা) দেখলাম যে, তাঁর (সা) পবিত্র দেহে আঘাত সত্ত্বেও তিনি স্বয়ং গিয়ে ওয়াহাবকে (রা) কবরে নামালেন। তাঁর নিকট লাল স্ট্রাইপের অথবা লাল বুটির একটি চাদর ছিল। তা দিয়ে তিনি তাঁকে দাফন করেন। হায় ! আমার মৃত্যুও যদি এমন হতো।"

এমনিভাবে আরো বড় বড় সাহাবী (রা) হযরত ওয়াহাবের (রা) শাহাদাতে ঈর্ষা করতেন।

এই মরুচারী যিনি ইসলাম গ্রহণের পর দুনিয়ার মালিন্যতায় এক মুহূর্তের জন্যেও নিজেকে জড়িত করেননি এবং যাঁকে স্বয়ং রহমতে আলম (সা) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন তাঁর সৌভাগ্যে কোন মুসলমান ঈর্ষান্বিত হবে না।

হযরত জুল বিজাদাইন (রা)

রিসালাতের কেন্দ্র যখন মক্কা থেকে মদীনা স্থানান্তর হলো তখন আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হকের ঝান্ডাবাহীরা মদীনা পৌঁছতে শুরু করলেন। এসব লোক ঘরবাড়ী পরিত্যাগ করে দুনিয়ার বিত্ত বৈভব এবং আরাম-আয়েশ ছেড়ে দ্বীনের তালিমের জন্য রিসালাতের দরবারে আসতেন। তাঁরা দারিদ্র ও বুভুক্ষার জীবন শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই বেছে নিয়েছিলেন। সফরের কাঠিন্যতা, ক্ষুৎ-পিপাসার মুসিবত এবং ঠাণ্ডা ও গরমের কোন কষ্টই মোটকথা ইসলামের তালিম এবং আল্লাহর কালাম শিক্ষা থেকে তাদেরকে রুখতে পারেনি। শান্তির সময় ছিলেন তাঁরা আল্লাহর মিসকিনতম বান্দা। আর জিহাদের ময়দানে বাঘের চেয়েও ছিলেন ভয়ানক। ইসলামের এসব দরবেশের সংখ্যা প্রতিদিনই যখন বৃদ্ধি পেতে লাগলো তখন রহমতে আলম (সা) তাদের খাওয়া, অবস্থান এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে নিজেই অভিভাবক হয়ে গেলেন। তিনি তাদের স্থায়ীভাবে থাকার জন্য মসজিদে নববীর পূর্ব দিকে একটি ছাদযুক্ত চত্বর বানিয়ে দিলেন। আরবীতে ছায়াদার অথবা ছাদযুক্ত দালানকে ছুফফা বলা হয়ে থাকে। এজন্য এসব হকপন্থীরা আসহাবে ছুফফা বলে অভিহিত হতে লাগলেন। তাঁদেরকে ইসলামের মেহমান অথবা আল্লাহর মেহমানও বলা হয়।

আসহাবে সুফফার মধ্যে একজন নওজোয়ানও ছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁকে পূর্ণ পর্যায়ের ঈমানী আবেগ বা উত্তাপ প্রদান করেছিলেন। তিনি তখন পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত। কিন্তু দুনিয়ার রং-তামাশায় তাঁর কোন আসক্তি ছিল না। বিশ্ব নবীর (সা) নিকট থেকে পবিত্র কুরআন শিখতেন এবং রাতদিন অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আবেগের সাথে তা পাঠ করতেন। একদিন সাইয়েদেনা হযরত ওমর ফারুক (রা) রাসূলের (সা) নিকট আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! মনে হয় যেন এই ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য এত জোরে আল্লাহর কালাম পাঠ করে থাকে।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "ওমর ! তাকে কিছু বলো না। তারতো অন্তরে ঈমানী উত্তাপ রয়েছে এবং আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের (সা) জন্য সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে এসেছে।

এই ভাগ্যবান যুবক যার ইসলাম ও ঈমানী উত্তাপের সত্যতার কথা স্বয়ং সাইয়েদুল মুরসালিন ফাখরে মওজুদাত খায়রুল খালায়েক (সা) স্বীকার করেছেন, তিনি ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ জুল বিজাদাইন (রা)।

হযরত আবদুল্লাহ জুল বিজাদাইন (রা) মহানবীর (সা) সেই সকল জাননিছারের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন যাদের সৌভাগ্যে অত্যন্ত জালিলুল কদর সাহাবীরাও (রা) ঈর্ষা পোষণ করতেন। তিনি বনু মুযনিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ

আবদুল্লাহ বিন আবদি নাহাম বিন আফিফ বিন সাহিম বিন আদি বিন ছা'লাবা বিন সায়াদ বিন আদি বিন উসমান বিন আমর।

শৈশবকালেই হযরত আবদুল্লাহ পিতৃছায়া থেকে বঞ্চিত হন। আবদি নাহামের ভাই ইয়াতিম ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিজের স্নেহের ছায়ায় গ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে তাকে লালনপালন করেন। আল্লাহ তায়ালা এই শিশুকে সুন্দর স্বভাব ও কোমল অন্তর দান করেছিলেন। তাঁর যখন জ্ঞান চক্ষু উন্মিলিত হলো তখন মক্কায় দ্বীনে হকের আওয়াজ বুলন্দ হয়েছিল। এই দাওয়াত আবদুল্লাহর কানেও এসে পৌঁছেছিল। তিনি দ্বিধাহীন ও নিশ্চিন্তে এই দাওয়াতে সাড়া দিলেন। কিন্তু চাচা তখনো কুফর ও শিরকের জালে ফেঁসে ছিলেন। সময় অতিক্রমের সাথে সাথে আবদুল্লাহর (রা) অন্তরে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কিন্তু চাচার ভয়ে তা প্রকাশ করতেন না। আল্লাহ কখন চাচাকে হক কবুলের তাওফিক দেন সেই অপেক্ষা করছিলেন। এমনিভাবে কয়েক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। চাচার আর হক কবুলের সৌভাগ্য লাভ ঘটলো না। ইত্যবসরে মহানবী (সা) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা তাশরীফ নিলেন।

শেষে আবদুল্লাহর (রা) ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে গেল। এক দিন তিনি চাচার নিকট গেলেন এবং বললেন, "প্রিয় চাচা! আমি অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করছি যে, আপনি কখন মিথ্যা মা'বুদদের থেকে মুখ ফিরিয়ে তাওহীদের ঝান্ডা হাতে তুলে নিবেন। কিন্তু আগে যে অবস্থা ছিল আপনার এখনো তাই রয়েছে। আল্লাহ আমাকে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার তাওফিক দিয়েছেন। আপনি জেনে রাখুন যে, আমি একক আল্লাহ এবং তার সাচ্চা রাসূলের (সা) ওপর ঈমান এনেছি।"

চাচা ক্রোধান্বিত হয়ে বললো ঃ "তুমি যদি মুহাম্মাদের (সা) দ্বীন গ্রহণ করে থাকো, তাহলে তা থেকে বড় দুঃখ আর আমার নিকট কিছুই নেই। আমি কি তোমাকে সেই দ্বীনের জন্য লালনপালন করেছি যা নিজের মা'বুদদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। এটাই উত্তম যে, নতুন দ্বীনকে কালবিলম্ব না করে ছেড়ে দাও। নচেৎ উট, বকরী, মাল, কাপড় যা কিছু আমি তোমাকে দিয়েছি তা সব ছিনিয়ে নিব।" আবদুল্লাহ (রা) বেধড়ক জবাব দিলেন, "চাচাজান! এখন যদি

আমার জীবনও চলে যায়, তবুও আমি আল্লাহ ও আল্লাহর সাচ্চা রাসূল (সা) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব না।"

এই জবাব শুনে চাচা অগ্নিশর্মা হয়ে পড়লেন। সে তাওহীদে মাতওয়ালা আবদুল্লাহর (রা) নিকট থেকে সবকিছু ছিনিয়ে নিলেন। এমনকি তাঁর পরিধানের কাপড় পর্যন্ত খুলে নিলেন। দেহের ওপর শুধুমাত্র কাপড়ের একটি অংশ অবশিষ্ট থাকতে দিলো, যাতে তা দিয়ে সতর ঢাকা থাকে।

আবদুল্লাহ (রা) প্রায় ল্যাংটা অবস্থায় ল্যাংগট বেঁধে মায়ের কাছে গমন করলেন এবং তাকে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। বিধবা মায়ের ছিল নিজের সন্তানের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা। পুত্রকে যখন এই অবস্থায় দেখলো তখন অস্থির হয়ে পড়লো। তার নিকট ছিল একটি চাদর। তা তাকে দিয়ে দিল। যাতে তা দিয়ে সে দেহ ঢাকতে পারে। আবদুল্লাহ (রা) চাদর দু'টুকরো করলেন। এক টুকরো দিয়ে তহবন্দ বানালেন এবং অন্য টুকরো দিয়ে শরীর ঢাকলেন এবং মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) মদীনা মুনাওয়ারা পৌছলেন। তিনি যখন সেখানে পৌছলেন তখন ছিলো রাতের শেষ ভাগ। ফজরের নামাযের সময় হয়েছে। তিনি সোজা মসজিদে নববীতে গেলেন এবং রাসূলে আকরামের (সা) পেছনে নামায পড়লেন। নামাযের পর হুজুর (সা) যথারীতি লোকদের সঙ্গে মুসাফিহা করতে লাগলেন। এ সময় আবদুল্লাহর (রা) ওপর দৃষ্টি পড়লো। জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে ? তিনি আরজ করলেন," আমার নাম হলো আবদুল উজ্জা। একজন মুসাফির এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য উপস্থিত হয়েছি।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "আজ থেকে তোমার নাম আবদুল উজ্জা নয়। বরং আবদুল্লাহ। আর লকব হলো জুল বিজাদাইন (দুই চাদর ওয়ালা)। তুমি আমার নিকটই থাকবে।"

হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে আবদুল্লাহ খুশীতে বাগ বাগ হয়ে গেলেন এবং আসহাবে সুফফাতে শামিল হয়ে সকাল-সন্ধ্যায় নবীর (সা) আবাসস্থলে হাজিরী দেয়াকে নিয়ম বানিয়ে নিলেন। মাহবুবে রাব্বুল আলামীনের (সা) আবাসগৃহের দারোয়ানী করা তাঁর নিকট দুনিয়ার সবচেয়ে প্রিয় কাজ ছিল। হুজুরও (সা) তাঁকে খুব স্নেহ করতেন এবং তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। আল্লাহর জিকরের প্রতি হযরত আবদুল্লাহর (রা) গভীর আকর্ষণ ছিল। সবসময় হৃদয়গ্রাহী কণ্ঠে তাসবিহ, তাহলিল ও কুরআন শরীফ তিলাওয়াতে মশগুল থাকতেন। রাসূলে করিম (সা) তাঁর ইখলাস দেখে খুব খুশী হতেন।

নবম হিজরীতে মহানবী (সা) তাবুক যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হয়ে গেলেন। তখন তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন ৩০ হাজার জাননিছার। হযরত আবদুল্লাহ জুল বিজাদাইনও (রা) তাঁদের মধ্যে শামিল ছিলেন। রওয়ানার পূর্বে অথবা পথিমধ্যে রাসূলের (সা) নিকট হাজির হয়ে আরজ করলেন। হে আল্লাহর রাসূল! দোয়া করুন, যাতে আল্লাহ তায়ালা আমাকে শাহাদাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন।"

হুজুর (সা) বললেন, "যাও, কোন বৃক্ষের ছাল তুলে নিয়ে এসো।"

তিনি যখন ছাল নিয়ে এলেন তখন হুজুর (সা) সেই ছাল তাঁর বাহুতে বেধে দিলেন এবং বললেন, "আমি আবদুল্লাহর খুন কাফেরদের ওপর হারাম করছি।" হযরত আবদুল্লাহ (রা) আরজ করলেন, " হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আপনি আমার রক্ত বা খুন কাফেরদের জন্য হারাম করছেন অথচ আমি শাহাদাত লাভ করতে চাই।"

হুজুর (সা) বললেন, "তুমি যখন আল্লাহর পথে জিহাদের নিয়তে বের হয়ে এসেছ এবং যুদ্ধের পূর্বে যদি তোমার জ্বর আসে এবং সেই জ্বরে তুমি ওফাত পাও, তাহলে তুমিও শহীদই হবে।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে মুতমায়েন হয়ে গেলেন। আল্লাহর কি কুদরত! ইসলামী বাহিনী যখন তাবুক পৌছলো তখন হযরত আবদুল্লাহ (রা) প্রচন্ড জ্বরে আক্রান্ত হলেন এবং সেই জ্বরেই তিনি সামরিক ছাউনীতে পরপারে যাত্রা করলেন। রাতে তাঁর লাশ দাফন করা হলো। সে সময় বিশ্ব এক বিস্ময়কর দৃশ্য অবলোকন করলেন। হযরত বিলাল হাবশীর (রা) হাতে মশাল ছিল এবং তার আলোতেই মহানবী (সা) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) এবং হযরত ওমর ফারুকের (রা) সাথে একত্রে কবর খুঁড়ছিলেন কবর খোঁড়া শেষ হলে হুজুর (সা) নিজের দুই সাথীর সহযোগিতায় হযরত আবদুল্লাহর (রা) লাশ কবরে রাখলেন। তখন তিনি বলছিলেন, "আদবান ইলা আখাকুমা" অর্থাৎ নিজের ভাইয়ের আদব খেয়াল রেখো। কবরের ওপর যখন মাটি দেয়া হলো তখন সাইয়েদুল মুরসালিন (সা) দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ! আমি তার ওপর সন্তুষ্ট ছিলাম, তুমিও তার ওপর সন্তুষ্ট হও।"

উম্মাহর ফকীহ হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদও সে সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলের (সা) দোয়া শুনে আমার মন চাইলো যে, হায়! আবদুল্লাহ জুল বিজাদাইনের পরিবর্তে যদি আমার মৃত্যু হতো [অর্থাৎ এই কবর ওয়ালার স্থানে যদি আমি হতাম। হুজুর (সা) নিজের পবিত্র হাত দিয়ে আমাকে দাফন করতেন এবং আমার জন্য এইভাবে দোয়া করতেন।]

হযরত আবদুল্লাহ জুল বিজাদাইনের (রা) দাফন যে শানে হয়েছিল তা থেকে তাঁর মর্যাদা ও সম্মান এবং রাসূলের (সা) দরবারে তাঁর ভালোবাসার আন্দাজ করা যায়। হযরত উকবা (রা) বিন আমের থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে করিম (সা) আবদুল্লাহ জুলবিজাদাইন (রা) সম্পর্কে বলতেন যে, এই ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে সত্য অন্তরে ফরিয়াদ করে থাকে।

হযরত আবদুল্লাহ জুল বিজাদাইন (রা) নিজের ঈমানের আবেগ এবং অন্তরের উত্তাপের যে উদাহরণ কায়েম করেছিলেন, নিসন্দেহে তা আমাদের মৃত শিরাসমূহে চিরকাল জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি করবে।

হযরত বুরাইদা (রা) বিন হুসাইব আসলামী

নবুয়াতের পর রহমতে আলমের (সা) পবিত্র জীবনের মক্কী অধ্যায়টা ছিল দুঃখ-কষ্টে পূর্ণ। এই অধ্যায়ে কুরাইশ মুশরিকরা নিজেদের সকল শক্তি দিয়ে দাওয়াতে হকে বাধা দান এবং হকপন্থীদেরকে নির্যাতনের কাজে ব্যয় করতো। তারা আরববাসীকে দায়ীয়ে আজমের (সা) প্রতি ঘৃণা এবং খারাব ধারণা পোষণের জন্য মিথ্যার এক অব্যাহত অভিযান চালু রেখেছিল। আরবের বিভিন্ন অংশ থেকে মানুষ উকাজ ও মাজান্নাহ প্রভৃতি মেলায় অংশগ্রহণ অথবা হজ্জের জন্য মক্কা আগমন করলে কুরাইশের প্রতিনিধিদলসমূহ তাদের নিকট গিয়ে হুজুরের (সা) বিরুদ্ধে সবধরনের অকথ্য কথা বলতো এবং তাদেরকে এটা বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করতো যে, মুহাম্মাদের (সা) কথায় আমল দেয়ার অর্থই হলো নিজেদের তৈরী মা'বুদদের ক্রোধের দাওয়াত প্রদান।

আল্লাহর কুদরতের কেরেশমাও বিস্ময়কর! মুশরিকরা যদি এই অপবিত্র অভিযান না চালাতো তাহলে আরবের মত বিশাল দেশের দূর-দুরান্ত পর্যন্ত হক দাওয়াত পৌছতে কয়েক বছর লেগে যেতো। কিন্তু হকের বিরুদ্ধে মুশরিকদের এই তৎপরতা রহমতে আলমের (সা) পবিত্র নাম এবং তাঁর দাওয়াতকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র আরবে সুপরিচিত করে তোলে এবং কয়েকটি কবিলা এবং এলাকাসমূহের নেক স্বভাবের মানুষ হকের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠলেন। এ ধরনের কবিলা বা গোত্রের মধ্যে বনু আসলাম বিন আফসার গোত্রও ছিল। এই কবিলার সাদাসিধে এবং সুন্দর স্বভাবের মানুষ মরু বস্তি আল গামিমে বসবাস করতো। এই বস্তি সাগর উপকূলের নিকট এমন একটি রাস্তার ওপর অবস্থিত ছিল যা মক্কাকে মদীনার সঙ্গে যুক্ত করতো। নবীর (সা) হিজরতের পূর্বে এই কবিলার লোকদের নিকট পর্যন্ত তাওহীদের দাওয়াত কোন মাধ্যমে পৌছে ছিল এবং তাঁরা তাতে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

নবুয়াতের তের বছর পর বিশ্বনবী (সা) হিজরতের সফরে যখন আল-গামিমে পৌছলেন তখন গ্রামের এক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ৭০-৮০ জন মানুষের একটি দলসহ তাঁর খিদমতে হাজির হলেন। তাঁর মর্যাদাপূর্ণ আচরণ ও ব্যক্তিত্ব দেখে স্পষ্ট মনে হচ্ছিল যে, তিনি তাঁর সঙ্গীদের নেতা। তিনি আরজ করলেন ঃ

"আমরা জানতে পেরেছি যে, আপনি আপনার স্বদেশ ভূমি থেকে বের হয়ে ইয়াছরাব গমন করছেন। আপনার কওম সমগ্র আরবে এই খবর মশহুর করে দিয়েছে এবং আপনাকে গ্রেফতার করার জন্য মূল্যবান পুরস্কারও ঘোষণা করেছে। কিন্তু হে সাহিবে কুরাইশ! আমরা আপনার দাওয়াতের অবস্থা শুনেছি এবং আমাদের অন্তর সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আল্লাহ এক! আপনি তার সাচ্চা রাসূল এবং যে কথার দিকে আপনি আহ্বান করে থাকেন তা সম্পূর্ণ হক।"

হুজুর (সা) বিস্ময়ের সাথে বুদ্দু সরদারের প্রতি তাকালেন এবং বললেন, "আল্লাহর শুকর যে, তিনি তোমাদেরকে হক কবুলের তাওফিক দিয়েছেন।"

বুদ্দু সরদার সঙ্গে সঙ্গে সামনে অগ্রসর হয়ে আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনার হাতটা দিন। আমি এবং আমার সঙ্গীরা তার ওপর ইসলামের বাইয়াত করি।"

হুজুর (সা) তাঁর কথা শুনে খুব খুশী হলেন। বুদ্দু সরদার এবং তাঁর সঙ্গীদের নিকট থেকে বাইয়াত নিলেন এবং তাদের সবার কল্যাণের জন্য দোয়া করলেন। বুদ্দু সরদার এই সৌভাগ্যে এত খুশী হলেন যে, তিনি নিজের পাগড়ী খুলে বর্শার মাথায় বেঁধে নিলেন এবং তা ঝান্ডার মত উড়াতে উড়াতে হুজুরের (সা) আগে আগে রওয়ানা দিলেন। মহানবী (সা) তাঁকে বাধা দিলেন এবং বললেন ঃ

"তোমরা এখন এখানেই থাকো। উপযুক্ত সময়ে আমার নিকট চলে আসবে। অথবা আমি নিজেই তোমাদেরকে ডেকে নেবো।"

এই বুদ্দু সরদার যিনি সেই সময় প্রিয় নবীর (সা) পবিত্র সান্নিধ্য গ্রহণ করেছিলেন (যখন তিনি নিজের স্বদেশভূমি ও ঘরবাড়ী ত্যাগ করে এক অপরিচিত স্থানে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং সমগ্র আরবের বিরোধিতা প্রত্যক্ষ করে প্রকাশ্য তাঁর সাফল্যের কোন সম্ভাবনা ছিল না)—তিনি ছিলেন হযরত বুরাইদা (রা) ইবনুল হুসাইব আসলামী।

সাইয়েদেনা হযরত আবু আবদুল্লাহ বুরাইদা (রা) বিন হুসাইব মহান মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, তিনি বনু আসলাম বিন আফসার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ

বুরাইদা (রা) বিন হুসাইব বিন আবদুল্লাহ বিন হারিছ বিন আরাজ বিন সায়াদ বিন যারাহ বিন আদি বিন সাহাম বিন মাযিন বিন হারিছ বিন সালামান বিন আসলাম বিন আফসা।

বনু আসলাম প্রকৃতপক্ষে বনু খুজায়ার একটি শাখা ছিল। তারা বনু খুজায়া বংশ থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল। পক্ষান্তরে ওয়াকেদী লিখেছেন যে, হযরত বুরাইদার (রা) সম্পর্ক ছিল বনু আসলামের সঙ্গে। বনু আসলাম বনু খুজায়া থেকে বের হয়েছিল। তবুও অধিকাংশ চরিতকার ইবনে সায়াদের (রা) বর্ণনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল।

হযরত বুরাইদার (রা) ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রথম বর্ণনা হলো, তিনি ৮০টি খান্দানকে সঙ্গে নিয়ে সেই সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন যখন প্রিয় নবী (সা) মক্কা মুয়াজ্জামা থেকে মদীনা মুনায়ারা গমনকালে তাদের বস্তী আল-গামিমে অবস্থান করছিলেন। ইবনে সায়াদ (র) এবং হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) এই বর্ণনায় এই কথাও বৃদ্ধি করেছেন যে, হযরত বুরাইদা (রা) হুজুরের (সা) সঙ্গে (অথবা হিজরতের অব্যবহিত পরই) মদীনা মুনাওয়ারা এসেছিলেন এবং কিছু দিন কুরআনে হাকিমের তালিম হাসিলের পর নিজের কবিলায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

দ্বিতীয় বর্ণনা হলো, হযরত বুরাইদা (রা) বদরের যুদ্ধের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পরও তিনি স্বদেশেই অবস্থান করেন। তিনি ৬ষ্ঠ হিজরী অথবা তার কিছু পূর্বে হিজরত করে মদীনা আসেন, তারপর সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এই বর্ণনা হাফেজ ইবনে হাজার (র) "ইসাবাতে" উল্লেখ করেছেন।

ওয়াকেদী (রা) বর্ণনা করেছেন যে, প্রিয় নবী (সা) (এক সফরকালে) গাদিরুল আসতাতাহ নামক একটি পুকুরের পারে তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান করছিলেন। সেখানকার সরদার বুরাইদা (রা) বিন আল-হুসাইব তাঁর খিদমতে হাজির হয়ে নিজের কওমের সালাম পেশ করে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এই হলো আমাদের বস্তি ও পশু, কিছু মানুষ হিজরত করে মদীনা চলে গেছেন। অবশিষ্টরা এখানেই আছেন। এখন আপনি যা বলেন?"

হুজুর (সা) তাদেরকে সেখানেই অবস্থানের নির্দেশ দিলেন এবং তাঁর গোত্র বনু আসলামকে একটি পরওয়ানা প্রদান করলেন। আল্লামা ইবনে সায়াদের (র) মত অনুযায়ী নবীর সেই পরওয়ানার ভাষা ছিল এই ঃ

(১) বনু আসলাম হলো বুন খুযায়ার শাখা। তাদের জন্য যারা তাদের মধ্য থেকে ঈমান আনয়ন করেছে, নামায পড়ে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহর দ্বীনের শুভাকাংখী।

(২) তাদেরকে ইসুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করা হবে। যারা জুলুমের মাধ্যমে তাদের ওপর হঠাৎ করে হামলা করবে।

(৩) এবং তাদের ওপর রাসূলের (সা) সাহায্য আবশ্যকীয় হয়ে পড়বে যখন তাদেরকে ডেকে পাঠানো হবে।

(৪) এবং তাদের যাযাবর বুদ্দুদের জন্যও সেই অধিকার যা তাদের বস্তিতে বসবাসকারীদের জন্য রয়েছে।

(৫) এবং তারা যেখানেই থাকুক মুহাজির হিসেবেই পরিগণিত হবেন।

এই পাঠ আ'লা (রা) বিন হাজরামী লিখেন এবং সাক্ষ্য প্রদান করেন।

এই বাক্যাবলী দেখে মনে হয় যে, নবীর পরওয়ানা মক্কা বিজয়ের পূর্বে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। কেননা মক্কা বিজয়ের পর হিজরত শেষ হয়ে গিয়েছিল। চরিতকাররা এই পরওয়ানা লিপিবদ্ধ করার সময় সম্পর্কে কিছু বলেননি। কিন্তু বিভিন্ন কারণে মনে হয় যে, যখন এই পরওয়ানা লিখা হয়েছিল তখন হযরত বুরাইদা (রা) এবং তাঁর কবিলার অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ হিজরত করে মদীনা চলে গিয়েছিলেন। এই ঘটনা যেন মক্কা বিজয়ের পূর্বেকার।

হযরত বুরাইদা (রা) যখন হিজরত করে মদীনা এলেন তখন বদর ও ওহোদের যুদ্ধ অতীত হয়েছিল। ৬ষ্ঠ হিজরীতে তিনি সর্বপ্রথম সেই ১৪শ' পবিত্র নফসের মধ্যে শামিল হতে পেরেছিলেন যারা বাইয়াতে রিদওয়ানের মহান সৌভাগ্য অর্জন করছিলেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য স্পষ্টভাষায় বেহেশতের সুসংবাদ এসেছিল ঃ

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْيُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

"অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা তোমার হাতে এই বৃক্ষের নীচে বাইয়াত করছিলো।"(আল-ফাতাহ ঃ ১৮)

ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন যে, বাইয়াতে রিদওয়ানের পর হযরত বুরাইদা (রা) নবী যুগের ১৬টি গাযওয়া ও সারিয়া বা যুদ্ধে অংশ নেন। তাদের মধ্যে খায়বার, মক্কা বিজয়, হুনাইন, তায়েফ ও তাবুকের যুদ্ধসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে খায়বারের যুদ্ধ সম্পর্কে হযরত বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা খায়বার অবরোধ করেছিলাম। প্রথম দিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) ঝান্ডাবাহী ছিলেন। কিন্তু দুর্গ জয় হয়নি। দ্বিতীয় দিনও একই অবস্থায় কাটলো। লোকজন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আগামীকাল আমি এমন এক ব্যক্তিকে ঝান্ডা দেব যিনি আল্লাহ ও তার রাসূলের (সা) প্রিয় এবং তিনিও আল্লাহ এবং তার রাসূলকে (সা) ভালোবাসেন। আল্লাহ তার হাতে বিজয় দিবেন। হুজুরের

(সা) ইরশাদ শুনে লোকেরা খুশী হয়ে গেলেন। পরবর্তী দিন রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের নামায থেকে ফারেগ হয়ে ঝান্ডা চাইলেন এবং হযরত আলীকে (রা) ডেকে পাঠালেন। হুজুর (সা) তাঁকে ঝান্ডা দিলেন এবং আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে খায়বার পদানত করালেন।

মক্কা বিজয়ের সময় হযরত বুরাইদা (রা) মহানবীর (সা) সেই পবিত্র আত্মার দশ হাজার সফর সঙ্গীর মধ্যে শামিল ছিলেন যাঁদের ব্যাপারে শত শত বছর পূর্বে কিতাবে ইসতিছনাতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল।

হযরত বুরাইদা (রা) বলেন, মক্কা বিজেয়র দিন আমি দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এক ওজুতে কয়েক ওয়াক্ত নামায পড়লেন এবং মোজার ওপর মসেহ করলেন। হযরত ওমর (রা) আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর পূর্বে আপনি কখনো এমন করেননি। তিনি বললেন, "আমি ইচ্ছাকৃতভাবে এমন করছি। যাতে লোকেরা এটা জায়েজ তা জেনে নিতে পারে।" (মুসলিম)

মক্কা বিজয়ের পর হযরত বুরাইদা (রা) হুনাইন ও তায়েফের যুদ্ধসমূহে নিজের তরবারীর কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। অষ্টম হিজরীর শেষে বিশ্বনবী (সা) হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদকে (রা) মুজাহিদীনের একটি দলের সাথে তাবলীগে ইসলামের জন্য ইয়েমেন প্রেরণ করেন। তখন হযরত বুরাইদাও (রা) সেই দলে শামিল হন এবং কয়েক মাস ইয়েমেনে মুকিম থেকে তাবলিগ ও হেদায়াতের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে থাকেন।

নবম হিজরীতে রাসূলে আকরাম (সা) যাকাত ও সাদকা আদায়ের লক্ষে প্রত্যেক কবিলার জন্য পৃথক পৃথক আদায়কারী নিয়োগ করেন। তারাই ছিলেন এসব ব্যক্তি যাঁদের আমানত ও দিয়ানত, তাফাককুহ ফিদ্বীন ও অন্তর্দৃষ্টির ওপর হুজুরের (সা) বিশেষ আস্থা ছিল। এসব আদায়কারী গোত্রসমূহে সফর করে লোকদের নিকট থেকে যাকাত ও সাদকা আদায় করে রাসূলের (সা) দরবারে পেশ করতেন।

ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, হুজুর (সা) হযরত বুরাইদাকে (রা) গিফার ও আসরাম গোত্রের আদায়কারী নিয়োগ করেছিলেন। তিনি গোত্রদ্বয় থেকে যাকাত ও সাদকা আদায় করে মদীনা এলেন। এ সময় তাবুকের যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছিল। হুজুর (সা) হযরত বুরাইদাকে (রা) দ্বিতীয়বার ঐসব গোত্রে প্রেরণ করলেন। যাতে তাদেরকে জিহাদে (তাবুকের যুদ্ধে) শরীক হওয়ার দাওয়াত দেন। হযরত বুরাইদা (রা) অত্যন্ত প্রভাবপূর্ণ পদ্ধতিতে তাদেরকে ইসলামী বাহিনীতে শামিল হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। এমনকি তাদের একটি বিরাট সংখ্যা হুজুরের (সা) সফরসঙ্গী হয়ে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য

প্রস্তুত এবং অস্থির হয়ে পড়লেন। হযরত বুরাইদা (রা) তাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে নবীর (সা) দরবারে হাজির হলেন, অতপর হযরত বুরাইদা (রা) সমেত তারা সকলেই সেই ত্রিশ হাজার মুজাহিদ বাহিনীতে শামিল হওয়ার সম্মান লাভ করেছিলেন যারা রহমতে আলমের (সা) সফরসঙ্গী হয়ে তাবুকের ভয়ংকর সফরের দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছিলেন।

দশম হিজরীতে মহানবী (সা) হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুকে তিনশ' সওয়ার সহ ইয়েমেনের মাজহাজ গোত্রের দিকে প্রেরণ করেন। এই সওয়ারদের মধ্যে হযরত বুরাইদাও (রা) শামিল ছিলেন। ইয়েমেন পৌছে হযরত আলী (রা) বনু মাজহাজকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তাঁরা এই দাওয়াত কবুল করার পরিবর্তে মুসলমানদের সাথে লড়াই শুরু করে দিল। মুসলমানরা খুব জোরের সাথে মুকাবিলা করলেন এবং খুব তাড়াতাড়ি মাজহাজী যুদ্ধবাজদেরকে পরাজিত করে ফেললেন। গনিমতের মাল বন্টন করা হলো। হযরত আলী (রা) নিজের জন্য একটি দাসী রাখলেন। ব্যাপারটি হযরত বুরাইদার (রা) পসন্দ হলো না। তবুও তিনি সে সময় চুপ রলেন।

ইয়েমেন থেকে ফিরে এসে হযরত আলী (রা) ও হযরত বুরাইদা (রা) বিদায় হজ্জে শরীক হলেন। হজ্ব শেষে প্রিয়নবী (সা) মদীনা মুনাওয়ারা প্রত্যাবর্তন করলেন। সকল মুহাজির ও আনসারও তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। পথিমধ্যে গাদিরে খুম নামক স্থানে তিনি কিছুক্ষণের জন্য যাত্রা বিরতি করলেন এবং সকল সাহাবীকে একত্রিত করে একটি সংক্ষিপ্ত খুতবা দিলেন। সহীহ বুখারীতে আছে যে, ইয়েমেন থেকে ফিরে আসার পর (সম্ভবতঃ সেই সময়) হযরত বুরাইদা (রা) হুজুরের (সা) নিকট অভিযোগ করলেন যে, গনিমতের মাল থেকে আলী (রা) নিজের জন্য একটি দাসী নিয়েছেন। হুজুর (সা) তাঁর কথা শুনে বললেন ঃ "বুরাইদা! আলীর (রা) ব্যাপারে তোমার কি কোন মনোকষ্ট আছে ?"

তিনি আরজ করলেন ঃ "জ্বী হাঁ। হে আল্লাহর রাসুল!"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "আলীর (রা) বিরুদ্ধে মনে কোন কষ্ট রেখ না। এক-পঞ্চমাংশ হিসেবে সে আরো বেশী পেতো।"

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলের রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত বুরাইদার (রা) অভিযোগ শুনে হুজুরের (সা) উজ্জ্বল চেহারায় মলিনতার ছাপ পরিলক্ষিত হলো এবং তিনি বললেন, "বুরাইদা! মুসলমান কি নিজের সত্ত্বার ওপর আমার হককে অগ্রাধিকার দেয় না ?"

তিনি আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই আপনার হক সর্বোচ্চে।"

তিনি বললেন, "তাহলে শোনে., আমি যার গোলাম আলীও (রা) তারই গোলাম।"

ইমাম নাসায়ী, তিরমিযি এবং অন্য কতিপয় মুহাদ্দিস লিখেছেন যে, এ সময় হুজুর (সা) নিজের ভাষণে এই বাক্যাবলী ব্যবহার করেছিলেন। বাক্যাবলীর সারমর্ম হলো ঃ "আমি যার প্রিয়, আলীও (রা) তার প্রিয় হওয়া চাই। হে আল্লাহ! যে আলীকে (রা) ভালোবাসে, তুমিও তাকে ভালোবাসো এবং যে আলীর (রা) সাথে শত্রুতা পোষণ করে তার প্রতি তুমিও শত্রুতা পোষণা কর।"

হযরত বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুরের (সা) ইরশাদসমূহ শুনে আলীর (রা) বিরুদ্ধে আমার সকল অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে গেল। বরং আমার অন্তরে তার জন্য এমন ভালোবাসা সৃষ্টি হলো যে, তার কোন শেষ ছিল না।

একাদশ হিজরীর সফর মাসে প্রিয়নবী (সা) হযরত উসামা (রা) বিন যায়েদকে (রা) একটি সৈন্য বাহিনী দিয়ে সিরিয়া গমনের নির্দেশ দিলেন। এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল রোমকদের বিরুদ্ধে মাওতার শহীদদের প্রতিশোধ গ্রহণ। হযরত উসামা (রা) যদিও সে সময় ১৭-১৮ বছরের যুবক ছিলেন ; কিন্তু হুজুর (সা) সেই বাহিনীর নেতৃত্বের জন্য তাঁকেই নির্বাচিত করেছিলেন। অথচ তাতে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা), হযরত আবু উবায়দা (রা) ইবনুল জাররাহ, হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস, হযরত সাঈদ (রা) বিন যায়েদ এবং বহু বড় বড় সাহাবীও শামিল ছিলেন।

আল্লামা ইবনে সায়াদ বর্ণনা করেছেন, হুজুর (সা) হযরত বুরাইদাকে (রা) হযরত উসামার (রা) অধীন সেই বাহিনীর ঝান্ডাবাহী নিয়োগ করেছিলেন। সেই বাহিনী মদীনা থেকে বের হয়ে জুরুফ নামক স্থানে তাঁবু ফেললো। সেখানেই হযরত উসামা (রা) তাঁর মা উম্মে আইমানের (রা) পয়গাম পেলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এই নশ্বর জগৎ থেকে বিদায় নিচ্ছেন। কাল বিলম্ব না করে মদীনা চলে এসো।

হযরত নাঈম (রা) বিন মাসউদ আশজায়ী

খন্দকের যুদ্ধে (পঞ্চম হিজরী) আরবের সকল ইসলামের শত্রু ঐক্যবদ্ধ-ভাবে মদীনা মুনাওয়ারার ওপর হামলা করে বসেছিল এবং হকপন্থীরা নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য খন্দক বা পরিখা খননে বাধ্য হয়ে পড়েছিলেন। উপরন্তু আরো দুঃখজনক ব্যাপার হয়েছিল যে, মদীনার অভ্যন্তরে ইহুদী বনি কোরায়জা আস্তিনের সাপ হিসেবে বের হয়ে এসেছিল। এরপূর্বে তারা মুসলমানদের সাথে এই চুক্তি সম্পাদন করেছিল যে, তারা একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেবে না। কিন্তু খন্দকের যুদ্ধের সময় তারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভেঙ্গে বসলো এবং ইসলামের শত্রুদের সঙ্গে মিলে পরিকল্পনা এটেছিল যে, তারা বাইরে থেকে হামলা করবে। আর শহরের অভ্যন্তর থেকে বনু কোরায়জা মুলমানদের পেছনে খঞ্জর ঢুকিয়ে দেবে। হকপন্থীদের জন্য সময়টা ছিল খুবই নাজুক। কিন্তু তাঁরা অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। একদিকে তো তারা হামলাকারীদের সামনে শিসাঢালা প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অন্যদিকে বনু কোরায়জার তরফ থেকে কোন সম্ভাব্য ক্ষতিকর তৎপরতা বন্ধের জন্য দুশ' জানবাজকে নির্দিষ্ট করে দিলেন। অবরোধকালে কাফেররা কয়েকবার খন্দক অতিক্রম করে শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মুসলমান বাহাদুররা তাদের মুখ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। যাহোক, রহমতে আলম (সা) কাফেরদের শয়তানী আচরণ এবং বুন কোরায়জার গাদ্দারীর আশংকায় শংকিত ছিলেন। সেই ভয়ঙ্কর সময়ের কথা—একদিন মাগরিব ও এশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে একজন বুদ্দু সরদার কোন না কোন উপায়ে রাসূলের (সা) নিকট পৌছে গেলেন। হুজুর (সা) তখন নামায পড়ছিলেন। সালাম ফেরালেন। এ সময় বুদ্দু সরদারের প্রতি দৃষ্টি পড়লো। চেহারাটা পরিচিত বলে মনে হলো। জিজ্ঞেস করলেন, এখন কিভাবে এলে। বুদ্দু সরদার আরজ করলো ঃ

"হে মুহাম্মাদ ! (সা) আমি একক আল্লাহর ওপর ঈমান আনছি এবং আপনার রিসালাতের সত্যতা স্বীকার করছি। আমাকে আপনার দলে শামিল করে নিন।"

এই কঠিন সময়ে বেদুঈন সরদারের ইসলাম গ্রহণে হুজুর (সা) সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। তারপর বেদুঈন সরদার বললেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! এতদিন পর্যন্ত কুরাইশ ও বনু কোরায়জার সাথে আমার বন্ধুত্ব ছিল এবং আমার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কেউ অবহিত নয়। এই যুদ্ধ প্রসঙ্গে আমার যোগ্য কোন কাজ থাকলে তা ইরশাদ করুন। অবিনশ্বর আল্লাহর কসম! আমি তা অবশ্যই পালন করবো।"

প্রিয় নবী (সা) বললেন ঃ "গোত্রসমূহের এই সমাবেশ এবং বনু কোরায়জার ইহুদীদের সাথে তাদের কোন ষড়যন্ত্র থাকলে তা বের করবো।"

বুদ্দু বা বেদুঈন সরদার আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এই কাজ আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন। আপনি দেখবেন যে, তারা কিভাবে বিশৃংখল হয়ে পড়ে।"

এই বেদুঈন সরদার যিনি মুসলমানদের ওপর আপতিত চরম মুসিবতের সময় তাওহীদের ঝান্ডা মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন এবং হকপন্থীদেরকে আশংকামুক্ত করার জন্য এক বিরাট কাজ নিজের দায়িত্বে নিয়েছিলেন। তিনি হলেন হযরত নাঈম (রা) বিন মাসউদ আশজায়ী।

হযরত আবু সালমা নাঈম (রা) বিন মাসউদ গাতফানের আশজা খান্দানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তার নসব নামা হলো ঃ

নাঈম (রা) বিন মাসউদ বিন আমের বিন আনিফ বিন ছালাবা বিন কুনফুজ বিন হালাওয়াহ বিন সাবি' বিন বাকার বিন আশজা বিন রিছ বিন গাতফান।

স্বগোত্রে হযরত নাঈম (রা) বিন মাসউদ নেতৃস্থানীয় হিসেবে পরিগণিত হতেন। তিনি খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন এবং বনু আশজা তাকে অত্যন্ত মান্য করতো। তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তির অবস্থাটা এমন ছিল যে, একদিকে মক্কার কুরাইশ তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতো এবং অন্যদিকে মদীনার ইহুদীদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। হযরত নাঈম (রা) রাসূলে করীমের (সা) দীর্ঘ দিনের পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁর দাওয়াত সম্পর্কেও অবিহত ও প্রভাবিত ছিলেন কিন্তু এটা জানা যায়নি যে, কোন কোন কারণে তাঁর মত একজন বিজ্ঞ মানুষ খন্দকের যুদ্ধ পর্যন্ত নিজের বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করতে পারেননি। খন্দকের যুদ্ধে তিনি নিজের গোত্রের সাথে হামলাকারী বাহিনীতে শামিল ছিলেন। মদীনা মুনাওয়ারা অবরোধকালে একদিন তাঁর অন্তর গালাগালি করলো যে, তুমি মুহাম্মাদ (সা) ও তাঁর দ্বীনকে বরহক জানো। অথচ, মুশরিকদের সঙ্গে মিলে দ্বীনে হক গ্রহণকারীদেরকে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছ। এটা কোন বীরত্বের কাজ নয়। সুতরাং তিনি এক রাতে চুপচাপ হুজুরের (সা) পবিত্র খিদমতে হাজির হলেন এবং

ইসলামের নিয়ামাত পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়ে হকের শত্রুদের বিরাট বাহিনীকে বিশৃংখল করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে উঠিয়ে নিলেন। কাজটা ছিল কঠিন এবং ভয়ংকর। কিন্তু হযরত নাঈমের (রা) নিজের ওপর এত আস্থা ছিল যে, তিনি সব ধরনের ভয় থেকে বেপরোয়া হয়ে সেই কাজ পূর্ণ করার দৃঢ় সংকল্প করলেন।

হুজুরের (সা) নিকট থেকে বিদায় হয়ে হযরত নাঈম (রা) বনু কোরায়জার ইহুদীদের কাছে পৌছলেন এবং তাদেরকে একত্রিত করে এভাবে আলোচনা শুরু করলেন ঃ

নাঈম (রা) ঃ "হে বুন কোরায়জার ভাইসব! তোমরা জানো যে, আমার সাথে তোমাদের কি ধরনের মুহাব্বাত বা ভালোবাসা রয়েছে।"

বনু কোরায়জা ঃ "হাঁ, আমরা তা খুব ভালোভাবে জানি।"

নাঈম (রা) ঃ "কুরাইশ ও বনুগাতফান মুহাম্মাদের (সা) সঙ্গে লড়াই করার জন্য এসেছে।"

বনু কোরায়জা ঃ "হাঁ, আমরাও তাদেরকে সাহায্য করবো।"

নাঈম (রা) ঃ "কিন্তু তাদের সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক। তারা তো তোমাদের থেকে অনেক দূরে থাকে।"

বনু কোরায়জা ঃ "একথা ঠিক। তবে মুহাম্মাদ (সা) তাদেরও এবং আমাদেরও শত্রু। সে যদি বিজয়ী হয় তাহলে না তাদের ছাড়বে, না আমাদের ছাড়বে।"

নাঈম (রা) ঃ "একথাও চিন্তা কর যে, কুরাইশ ও গাতফান উপযুক্ত সুযোগ পেলেই মুহাম্মাদের (সা) সঙ্গে লড়াই করবে। নচেৎ ফিরে যাবে। এটা স্পষ্ট কথা যে, তারা তো তোমাদেরকে তাদের সাথে নিয়ে যাবে না। তোমাদেরকে এই স্থানেই মুসলমানদের সঙ্গে থাকতে হবে। খামাখা তাদের সাথে বিবাদ বিসম্বাদ কেন করবে?"

বনু কোরায়জা ঃ "তাহলে আমরা কি করবো?"

নাঈম (রা) ঃ "কুরাইশ ও বনু গাতফানের সঙ্গ পরিত্যাগ কর এবং যুদ্ধে কোন পক্ষই অবলম্বন করো না।"

বনু কোরায়জা ঃ "কিন্তু আমরা তো কুরাইশদেরকে কথা এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। আমরা তাদের নিকট কি করে মুখ দেখাবো।"

নাঈম (রা) ঃ "কথা ও প্রতিশ্রুতি তো তোমরা মুসলমানদেরকেও দিয়েছিলে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ যে, কুরাইশরা যদি ব্যর্থ বা পরাজিত হয়ে ফিরে যায় তাহলে তোমরা এখানে একাকী মুসলমানদের মুকাবিলা কিভাবে করবে?"

বনু কোরায়জা ঃ "নিসন্দেহে তুমি সত্য বলেছ। কিন্তু আমরা এখন এই ঝামেলা থেকে মুক্তির কি চেষ্টা করবো।"

নাঈম (রা) ঃ "তোমরা আমার খুব প্রিয়। এজন্য আমার কথা শুনলে কুরাইশ ও বুন গাতফানের কতিপয় ব্যক্তিকে জামানত হিসেবে নিজেদের কাছে রেখে দাও। যদি কুরাইশ ও বনু গাতফান প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং উদ্দেশ্য হাসিল ছাড়াই ফিরে যায় তাহলে তোমাদের কাছে তাদের মানুষ থাকবে। মুসলমানরা যদি তোমাদের দিকে অগ্রসর হয় তাহলে নিজেদের মানুষের খাতিরে তারা তোমাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে।"

বনু কোরায়জা ঃ "তাওরাত কিতাবের কসম! তোমার পরামর্শ অত্যন্ত সঠিক পরামর্শ। আমরা সে অনুযায়ীই আমল করবো।"

বনু কোরায়জার পক্ষ থেকে নিশ্চিন্ত বা মুতমায়েন হয়ে হযরত নাঈম (রা) কুরাইশ সরদার আবু সুফিয়ানের নিকট গেলেন এবং তাঁর সঙ্গে এভাবে আলোচনা করলেন ঃ

নাঈম.(রা) ঃ "মুসলমানদের সাথে আমার শত্রুতার অবস্থা আপনার জানা আছে এবং আমার ও আপনার মধ্যে বন্ধুত্বের যে সম্পর্ক বিদ্যমান তাও আপনার জানা আছে।"

আবু সুফিয়ান ঃ "হাঁ, হাঁ, আমার জানা আছে। তা বলার আবার কি প্রয়োজন পড়লো।"

নাঈম (রা) ঃ "একটি খবর আমি শুনেছি। তা আপনার কর্ণগোচর করাতে চাই।"

আবু সুফিয়ান ঃ "বলো, কি ?"

নাঈম (রা) ঃ "শর্ত হলো যে, তা গোপন রাখতে হবে। বিশেষ করে বনু কোরায়জার কানে যেন তা না যায়।"

আবু সুফিয়ান ঃ "আমরা তোমার খবর গোপন রাখবো এবং কোন অবস্থাতেই তা প্রকাশ করবো না।"

নাঈম (রা) ঃ "আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি যে, বনু কোরায়জা আপনাদের সাথে যে চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি করেছে তা তারা ভঙ্গ করেছে এবং তারা দ্বিতীয়বার মুসলমানদের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক মজবুত করতে আগ্রহী। তারা পরিকল্পনা এঁটেছে যে, কুরাইশ ও বনুগাতফানের ৭০ জনকে নিজেদের

কবজায় নিয়ে তাদেরকে মুহাম্মাদের (সা) নিকট প্রেরণ করবে। যাতে তারা তাদের গর্দান উড়িয়ে দিয়ে প্রতিশোধ নিতে পারে। এই প্রসঙ্গে তারা মুহাম্মাদের (সা) নিকট ইতিমধ্যেই পয়গাম প্রেরণ করেছে এবং সেও তাতে সম্মত আছে।"

আবু সুফিয়ান ঃ "এ ব্যাপারে তোমার মত কি ?"

নাঈম (রা) ঃ "আমার পরামর্শ হলো, বনু কোরায়জা আপনার নিকট জামানত হিসেবে কিছু মানুষ চাইলে তা স্পষ্ট অস্বীকার করবেন এবং তাদের ষড়যন্ত্রের জালে কখনই আটকা পড়বেন না।"

আবু সুফিয়ান ঃ "তোমার পরামর্শ সঠিক ও সুন্দর। আমরা তাই করবো।"

কুরাইশদের সঙ্গে খাতির পাতানোর পর হযরত নাঈম (রা) বনু গাতফানের নিকট গেলেন এবং যেসব কথা কুরাইশের নিকট বলেছিলেন তাই তাদেরকে বললেন। বস্তুত তিনি নিজেই বনু গাতফানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। এ জন্য গোত্রের সকলেই ঐকমত্য হয়ে তাকে সমর্থন জানালো।

যেদিন এসব কথা হয়েছিল, ঘটনাক্রমে তা ছিল জুমার দিন। সেই রাতেই আবু সুফিয়ান বনু কোরায়জার নিকট পয়গাম প্রেরণ করে বললেন, আমরা এখানে অনেক দিন পড়ে রয়েছি। মানুষ ও পশুদের খুব কষ্ট হচ্ছে। আজ রাতেই যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ এবং অতি প্রত্যুষে আমরা ও তোমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের সাথে সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ করাটাই উত্তম হবে। বনু কোরায়জা জবাবে জানালো যে, আগামীকাল শনিবার। এদিন আমরা কোন কাজ করি না। তারপরও আমরা সেই অবস্থায় তোমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো যখন তোমরা নিজেদের গোত্রের ৭০ জন বিশিষ্ট মর্যাদাবান ব্যক্তিকে আমাদের নিকট প্রেরণ করবে। কেননা আমাদের আশংকা রয়েছে যে, অবরোধ দীর্ঘ দিন চললে তোমরা ঘাবড়ে গিয়ে ফিরে যাবে এবং আমরা বন্ধুহীন ও সাহায্যকারী ছাড়া রয়ে যাবো। মুসলমানরা যদি আমাদের ওপর এসে পড়ে তাহলে তোমরা নিজেদের মানুষের খাতিরে আমাদের সাহায্যের জন্য আসবে। অন্যথা তোমাদেরকে এত দূর থেকে ডেকে আনা অসম্ভব হবে।

কুরাইশরা যখন বনু কোরায়জার জবাব শুনলো তখন তাদের কান খাড়া হয়ে গেল এবং বলতে লাগলো যে, খোদার কসম! নাঈম যা বলেছিল তাই সত্য হলো। সুতরাং তারা বনু কোরায়জাকে জবাবে বললো যে, আমরা কখনই আমাদের কোন লোককে তোমাদের নিকট সোপর্দ করবো না। তোমরা যদি

আমাদের সাথে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাও তাহলে ভালো। নচেৎ আমরা যখন চাইবো তখন ফিরে যাবো। অতপর তোমরা জানবে এবং মুসলমানরা বনু কোরায়জা বনু গাতফানকেও তাদের কিছুলোককে জামানত হিসেবে প্রেরণের পয়গাম প্রেরণ করলো। এই পয়গামের তারাও কড়া জবাব দিল। এখন বনু কোরায়জা প্রকাশ্যে বলতে লাগলো যে, নাঈম আশজায়ী আমাদেরকে যা কিছু বলেছিল তা সবই ঠিক বলে প্রমাণিত হলো। আমরা কুরাইশ ও গাতফানীদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কখনই মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো না। মোটকথা উভয় মিত্র পক্ষ পরস্পরের প্রতি খারাব ধারণা পোষণ করতে লাগলো এবং তাদের মধ্যে চরম অনৈক্য সৃষ্টি হলো। এ সবকিছুই হযরত নাঈমের (রা) বদৌলতে হয়েছিল। এদিকে আল্লাহর আরেক গজব এসে উপস্থিত। বুধবার এমন ভয়াবহ তুফান এলো যে, অবরোধকারীদের তাঁবু উল্টে গেল। আগুন নিভে গেল এবং ডেগগুলো চুলায় উপুর হয়ে পড়লো। কাফেররা কিছুটা এই তুফানের কারণে এবং কিছুটা পারস্পরিক খারাব সম্পর্কের কারণে অবরোধ উঠিয়ে খারাব অবস্থায় স্ব স্ব দেশের পথ ধরলো।

খন্দকের যুদ্ধের পর হযরত নাঈম (রা) বিন মাসউদ নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন। বিভিন্নভাবে জানা যায় যে, তিনি নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি খাটিয়ে স্বগোত্রের অনেক মানুষকে ইসলামের সীমায় নিয়ে আসেন। তারপর হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারা চলে যান এবং কয়েকটি যুদ্ধে প্রিয়নবীর (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, মক্কা বিজয়ের সময় তিনি নিজের গোত্র আশজাকে মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করার জন্য গিয়েছিলেন। এমনিভাবে তিনি তাবুকের যুদ্ধেও নিজের গোত্রকে উদ্বুদ্ধ করে এনেছিলেন। এসব রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত নাঈমের (রা) অন্তরেই শুধুমাত্র জিহাদের আবেগ উদ্বেলিত হতো না বরং তিনি নিজের কবিলাকেও এই কাজে অংশ নেয়ার জন্য চেষ্টা চালাতেন।

বিশ্বনবীর (সা) ওফাতের পর হযরত নাঈম (রা) বিন মাসউদ দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। এ সময় তিনি কি করতেন সে সম্পর্কে চরিতকাররা কিছু লিখেননি। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত নাঈম (রা) বিন মাসউদ হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর খিলাফত কালের শুরুতে ওফাত পান। একটি রেওয়ায়াতে এও আছে যে, তিনি উষ্ট্রের যুদ্ধে শাহাদাত পান। চরিতকাররা হযরত নাঈমের (রা) পুত্র সালমার (রা) কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনিও সাহাবী হওয়ার সম্মান লাভ করেছিলেন। তাঁর থেকে পাঁচটি হাদীস বর্ণিত আছে। তার মধ্য থেকে কয়েকটি নিজের পিতার নিকট থেকে রেওয়ায়াত করেছেন।

এই পয়গাম পেতেই হযরত উসামা (রা), হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা), হযরত আবু উবায়দা (রা) এবং অন্য কতিপয় সাহাবীর (রা) সাথে মদীনা ফিরে এলেন। হুজুর (সা) ওফাত পেলেন। এ সময় সকল সৈন্য জুরুফ থেকে মদীনা এসে গেল এবং এই অভিযান মুলতবী হয়ে গেল।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) খিলাফতের আসনে সমাসীন হলেন। তখন তিনি পুনরায় সৈন্য একত্রিত করে হযরত উসামাকেই (রা) রওয়ানার নির্দেশ দিলেন। হযরত বুরাইদা (রা) পূর্বেকার এই বাহিনীর ঝান্ডাবাহী হিসেবে নিয়োজিত হলেন। এই বাহিনী কেবলমাত্র জুরুফে পৌছেছিল। এমন সময় সমগ্র আরবে ধর্মদ্রোহিতার ফিতনার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো এবং পরিস্থিতি খুব নাজুক রূপ ধারণ করলো। কিছু সাহাবী হযরত আবু বকর সিদ্দিককে (রা) পরামর্শ দিলেন যে, এমন নাজুক অবস্থায় ইসলামের এসব জানবাজকে মদীনার বাইরে প্রেরণ করা উচিত নয়। এ জন্য এই অভিযান মুলতবী করে দিন। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) তাঁদের সঙ্গে একমত হলেন না এবং বললেন ঃ

"আল্লাহর কসম! স্বয়ং রাসূলে করিম (সা) যে অভিযানের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাতে আমি অবশ্যই বাধা দিব না। হুজুরের (সা) নির্দেশ পালনে যদি পাখীরা আমাকে নখ দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েও ফেলে তাতেও কোন পরওয়া নেই।"

তারপর খলিফাতুর রাসূল (সা) কিছু দূর পর্যন্ত পায়ে হেঁটে সেই সৈন্যদের সঙ্গে গেলেন এবং দোয়ার মাধ্যমে তাদেরকে বিদায় করলেন। এই বাহিনী উসামা (রা) বাহিনী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। দুশমনদেরকে যথাযথ শাস্তি প্রদানের পর সফল ও বিজয়ী হিসেবে ফিরে এলেন। এ সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) মুহাজির ও আনসারদেরকে সঙ্গে নিয়ে মদীনার বাইরে তাদেরকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলেন। বাহিনীর আগে আগে হযরত বুরাইদা (রা) বিন হুসাইব ঝান্ডা উড়াচ্ছিলেন এবং তাঁর পিছনে সেনাবাহিনী প্রধান হযরত উসামা (রা) নিজের পিতা যায়েদের (রা) ঘোড়া সাবহার ওপর সওয়ার ছিলেন।

এই অভিযানের পর হযরত বুরাইদা (রা) আবু বকর সিদ্দিক (রা) ও ওমর ফারুকের (রা) শাসনামলের আরো কয়েকটি যুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু চরিতকাররা তার বিস্তারিত বিবরণ দেননি।

হযরত ওমর ফারুকের (রা) শাসনামলে বসরা আবাদ হলো। এ সময় হযরত বুরাইদা (রা) অন্য বহু সাহাবীর সঙ্গে সেখানে চলে গেলেন এবং সেখানেই একটি বাড়ী নির্মাণ করেন।

হযরত ওসমানের (রা) খিলাফতকালে খোরাসানে সামরিক অভিযান চালানো হয়। তখন হযরত বুরাইদাও (রা) ইসলামী বাহিনীতে শামিল হয়ে যান এবং এই পর্যায়ে কয়েকটি যুদ্ধে অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করেন।

আল-বালাজুরী (র) ফতুহুল বুলদানে লিখেছেন যে, ৫১ হিজরীতে যিয়াদ বিন আবিয়া এক ফরমান জারী করেন। তাতে তিনি বসরা ও কুফা থেকে বেশী বেশী লোক খোরাসান গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের নির্দেশ দেন। সুতরাং বিরাট সংখ্যক মানুষ (৫০ হাজার বলা হয়) আর-রাবি' বিন যিয়াদের সঙ্গে সেই সব শহর থেকে স্থানান্তর হয়ে খোরাসানে অবস্থান গ্রহণ করলেন। তাদের মধ্যে হযরত বুরাইদা (রা) বিন হুসাইবও শামিল ছিলেন। তিনি মারো নামক স্থানের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান এবং সেখানেই ৬০ অথবা ৬২ হিজরীতে পরপারের ডাকে সাড়া দেন।

তিনি মৃত্যুকালে দুই ভাগ্যবান পুত্র আবদুল্লাহ (র) ও সোলায়মানকে (র) রেখে যান এই দুই পুত্র জালিলুল কদর পিতার নিকট থেকে কয়েকটি হাদীসও বর্ণনা করেছিলেন। হযরত বুরাইদা (রা) বিন হুসাইবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছিল ইখলাস ফিদ্বীন, রাসূল প্রেম, শওকে জিহাদ, হক কথন এবং উম্মাহর কল্যাণ কামনার আবেগ। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর শুধুমাত্র নিজেকে আপাদ মস্তক হকের তাবলীগের জন্যই ওয়াকফ করেননি বরং নিজের গোত্রের লোকদেরকেও ইসলামের সীমায় এনে তাদেরকে হকের জানবাজ সিপাহী বানিয়ে দিয়েছিলেন। রাসূলের (সা) প্রতি গভীর ভালোবাসার অবস্থাটা এমন ছিল যে, তিনি তাঁর প্রতিটি ইরশাদকে জীবনের জপমালা বানিয়ে নিয়েছিলেন এবং তার ওপর আমল করার জন্য সবসময় তৎপর থাকতেন। জীবন উৎসর্গের আবেগ এবং দ্বীনের প্রতি আন্তরিকতার বদৌলতে তিনি নবীর (সা) দরবারে বিশেষ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন এবং হুজুর (সা) তাঁর প্রতি সীমাহীন স্নেহ প্রদর্শন করতেন।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে যে, একবার হযরত বুরাইদা (রা) কোথাও যাচ্ছিলেন। এমন সময় রাস্তায় মহানবীর (সা) সাথে সাক্ষাত হয়ে গেল। হুজুর (সা) কোন লৌকিকতা ছাড়াই তাঁর হাত ধরলেন এবং তারপর তাঁর সাথে সামনে অগ্রসর হলেন। জানা যায় যে, হযরত বুরাইদা (রা) হুজুরের (সা) এই বিশেষ স্নেহ আরো কয়েকবার লাভ করেছিলেন।

হযরত বুরাইদার (রা) রাসূল প্রেমের আন্দাজ ঐ কথা থেকেই করা যায় যে, হুজুর (সা) তাঁকে নিজের দেশে অবস্থান কালেই মুহাজির আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রিয়নবী (সা) থেকে দূরে থাকাটা তাঁর কোনক্রমেই সহ্য

হলো না এবং তিনি নিজের ঘরবাড়ি ত্যাগ করে মদীনা মুনাওয়ারাতে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেলেন। কেননা নবীর (সা) ফয়েজ অব্যাহতভাবে লাভের আবেগ এভাবেই পূর্ণ হতে পারতো।

হযরত বুরাইদা (রা) ছিলেন একজন বাহাদুর ও নির্ভীক মানুষ। আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য তাঁর অন্তর সবসময় তড়পাতো। মদীনা মুনাওয়ারা আসার পর হুজুরের (সা) ওফাত পর্যন্ত সকল যুদ্ধে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অংশ নেন। তাঁর এই আবেগ ও উচ্ছ্বাস হুজুরের (সা) ইন্তেকালের পরও ছিল এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলেও তিনি জিহাদের ময়দান থেকে পিছু হটে থাকেননি। তিনি বলতেন, জীবনের আনন্দ যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়া দৌড়িয়েই লাভ করা যায়।

কাফের ও মুশরিকদের মুকাবিলায় হযরত বুরাইদার (রা) আবেগ ও উচ্ছ্বাসের কোন সীমা পরিসীমা ছিল না। কিন্তু মুসলমানদের পারস্পরিক গৃহ যুদ্ধে তাঁর তরবারী সবসময়ের জন্য ভোঁতা ছিল। তিনি সেই সব গৃহযুদ্ধ থেকে নিজের শরীরকে শুধু বাঁচিয়েই রাখেননি বরং তাতে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারেও কোন রায় কায়েম করেননি এবং উভয় পক্ষের ব্যাপারে সবমময় ভালো ধারণা পোষণ করতেন। তার কারণ এই যে, তাঁর অন্তরে সবসময় উম্মাহর কল্যাণ কামনাই স্থান পেত।

ইবনে সায়াদ (র) বকর বিন ওয়ায়েলের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি বুরাইদা (রা) হুসাইবের সঙ্গে সিজিস্তানে (জিহাদের ময়দানে) ছিলাম। একদিন আমি তাঁর সামনে হযরত আলী (রা), হযরত ওসমান (রা), হযরত তালহা (রা) এবং হযরত যোবায়ের (রা) সম্পর্কে কয়েকটি অভিযোগ উত্থাপন করলাম। উদ্দেশ্য ছিল যে, এভাবে সেই সকল সাহাবী সম্পর্কে আমি হযরত বুরাইদার (রা) মত জানতে পারবো। আমার অভিযোগসমূহ শুনে হযরত বুরাইদা (রা) একাকি কিবলামুখী হয়ে গেলেন এবং দু'হাত তুলে এই দোয়া করলেন ঃ

"হে আল্লাহ! আলী (রা) বিন আবি তালিবকে ক্ষমা কর। ওসমানকে (রা) ক্ষমা কর। তালহাকে (রা) ক্ষমা কর। যোবায়েরকে (রা) ক্ষমা কর।"

তারপর তিনি আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, "তোমার পিতা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক। মনে হয় যেন, তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও।"

আমি বললাম ঃ "আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি আপনাকে হত্যা করতে

চাই না। আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, এসব অভিযোগের মাধ্যমে তাদের ব্যাপারে আপনার রায় জানবো।"

তিনি বললেন, "ঐসব সাহাবী বা ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা সাবিকুনাল আউয়ালুন বলে আখ্যায়িত করেছেন। এখন তাদের ব্যাপার আল্লাহরই হাতে। চাইলে তিনি নেকীর বদলায় তাদেরকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন। আবার চাইলে তাদের ভুল-ভ্রান্তির শাস্তিও দিতে পারেন।"

সত্য কথনই ছিল হযরত বুরাইদার (রা) উল্লেখযোগ্য গুণ। সত্য কথা বলতে তিনি কাউকেই খাতির করতেন না। এই প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র) একটি রেওয়ায়াত নকল করেছেন। তাতে বলা হয়েছে যে, একবার হযরত বুরাইদা (রা) আমীর মুয়াবিয়ার (রা) নিকট তাশরীফ নিলেন। সে সময় অন্য আরেক ব্যক্তি তাঁর সাথে আলোচনায় মশগুল ছিলো। সে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর সম্পর্কে কিছু অনুপোযোগী কথা বললো, হযরত বুরাইদা (রা) তা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি হযরত আমীর মুয়াবিয়াকে (রা) বললেন ঃ "আমিও কি কিছু বলতে পারি ?"

তিনি বললেন, "হাঁ, খুব উৎসাহের সাথে বলতে পারেন।"

তিনি বললেন, "আমি রাসূলুল্লাহকে স্বয়ং বলতে শুনেছি যে, হাশরের দিন আমি দুনিয়ায় যত পাথর ও বৃক্ষ আছে সেই সংখ্যক মানুষের সুপারিশের আশা করি। মুয়াবিয়া! তুমি যদি এই সাধারণ সুপারিশের যোগ্য হও তাহলে আলী (রা) কেন হতে পারবে না ?"

তাঁর কথা শুনে আমীর মুয়াবিয়া (রা) চুপ মেরে গেলেন এবং সেই ব্যক্তিও সেই বিষয়ে আর মুখ খোলেনি।

হযরত বুরাইদা (রা) কয়েক বছর অব্যাহতভাবে সরাসরি নবীর (সা) ফয়েজ লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। এজন্য তাঁর ইলম ও ফজলের মাত্রা খুব বুলন্দ হয়ে গিয়েছিল। হাদীস বর্ণনার দিক থেকে হযরত বুরাইদার (রা) স্থান সাহাবায়ে-কিরামের (রা) তৃতীয় তবকায় নির্ধারিত হয়ে থাকে। তিনি ১৬৪টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হযরত বুরাইদা (রা) অত্যন্ত মজবুত আকীদার মুসলমান ছিলেন। প্রিয় নবীর (সা) নিকট থেকে যা কিছু শুনতেন তার প্রতিটি তথ্যের ওপর আস্থা রাখতেন মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে যে, হযরত বুরাইদা (রা) একদিন রাসূলের (সা) দরবারে উপস্থিত ছিলেন এবং হুজুরের (সা) ইরশাদসমূহ থেকে ফায়দা হাসিল করছিলেন। আলোচনার মধ্যে হুজুর (সা) বললেন ঃ

"সেই সময় আসছে যখন আমার উম্মাতের ওপর এক প্রশস্ত চেহারা ও ছোট ছোট চক্ষু বিশিষ্ট জাতি তিনবার হামলা করবে এবং তাদেরকে ঠেলতে ঠেলতে জাযিরাতুল আরবের মধ্যে সীমিত করে ফেলবে। তার প্রথম হামলায় যারা পালাবে তারা বেঁচে যাবে। দ্বিতীয় হামলায় কিছু বেঁচে যাবে এবং কিছু নিহত হবে। তৃতীয় হামলায় সকল মানুষ সেই মুসিবতের শিকার হবে।"

লোকেরা জিজ্ঞেস করলো ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! হামলাকারীরা কারা ? হুজুর (সা) বললেন ঃ তারা তুর্কী।" আবার বললেন, "আল্লাহর কসম! তারা নিজেদের ঘোড়াকে মসজিদে বাধবে।"

হুজুর (সা) যদিও সেই ফিতনা প্রকাশের কাল সম্পর্কে কিছু বলেননি। কিন্তু তাঁর ইরশাদ শোনার পর হযরত বুরাইদা (রা) সবসময় দুই-তিনটি উট ও পানির পাত্র নিজের নিকট রাখতেন। এর উদ্দেশ্য হলো, যদি তাঁর জীবনে ফিতনা দেখা দেয় তাহলে তিনি তা থেকে বেঁচে বাইরে চলে যাবেন।

হযরত বুরাইদা (রা) শুধুমাত্র স্বয়ং প্রিয় নবীর (সা) ইরশাদ সমূহকে নিজের জীবনের কর্মসূচীই মনে করতেন না বরং তা অত্যন্ত আগ্রহ ভরে অন্যদের নিকটও পৌঁছাতেন। তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে অধিকাংশই আকায়েদ, আখলাক ও আমলের সাথে সংশ্লিষ্ট। এসব হাদীস শুধুমাত্র কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি মাসয়ালার ওপরই আলোকপাত করে না বরং নেক আমলের দিকেও উদ্বুদ্ধ করে। তাঁর থেকে বর্ণিত কতিপয় হাদীসের মর্মার্থ হলো ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আসরের নামায ছেড়ে দিল, তার আমল মূল্যহীন হয়ে পড়লো।" (বুখারী)

"রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমাদের ও তাদের (কাফেরদের) মধ্যে যে বস্তুর ভিত্তিতে প্রতিশ্রুতি তাহলো নামায। যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দেবে সে কাফের হয়ে যাবে।" (নাসায়ী)

"রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তাদেরকে সুসংবাদ দাও যারা অন্ধকারে মসজিদের পানে যায়। কিয়ামতের দিন তার (আমলের) কারণে তারা পূর্ণ আলো পাবে।" (তিরমিযি, আবু দাউদ)।

"রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন পড়বে এবং তার মাধ্যমে লোকদের নিকট থেকে আহার করবে। (অর্থাৎ কুরআনকে দুনিয়া হাসিলের মাধ্যম বানাবে) সে কিয়ামতের দিন এমন সুরতে উত্থিত হবে যে, তার চেহারায় কোন গোশত থাকবে না। শুধুমাত্র হাড় আর হাড়ই থাকবে।"

(বায়হাকী)

"ঈদুল ফিতরের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) কিছু না খেয়ে ঈদের নামাযের জন্য যেতেন না এবং ঈদুল আযহার দিন সে সময় পর্যন্ত কিছু খেতেন না যে সময় পর্যন্ত নামায না পড়ে নিতেন।"

"রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, বিতরের নামায হক। যে ব্যক্তি বিতরের নামায পড়লো না সে আমাদের মধ্যেকার নয় (একথা তিনি তিন বার বললেন)।" (আবু দাউদ)

"রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মানুষের দেহে ৩৬০টি জোড়া আছে। মানুষের উচিত প্রত্যেক জোড়ার জন্য সাদকা দান করা। সাহাবীরা আরজ করলেন, হে আল্লাহর নবী! কে তার শক্তি রাখে? তিনি বললেন, মসজিদে পড়ে থাকা থুথুকে মাটি দিয়ে ঢেকে দেয়াও সাদকা এবং কষ্টদায়ক বস্তুকে রাস্তা থেকে উঠিয়ে সরিয়ে দেয়াও সাদকা।" (আবু দাউদ)

"এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নামাযের সময়সমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, তুমি আমার সঙ্গে নামায পড়। সুতরাং যখন সূর্য ঢলে পড়লো তখন তিনি জোহরের নামায পড়লেন। অতপর তিনি আসরের নামায পড়লেন। এ সময় সূর্য উঁচুতে ও সাদা এবং পরিষ্কার ছিল। তারপর তিনি সূর্য অদৃশ্য হওয়ার পর মাগরিবের নামায আদায় করলেন এবং যখন লালিমা অপসৃত হয়ে গেল তখন তিনি এশার নামায পড়লেন। যখন সুবাহ হলো তখন ফজরের নামায আদায় করলেন। পরের দিন তিনি জোহরের নামায সে সময় পড়লেন যখন ওয়াক্ত খুব ঠান্ডা হয়ে গেল এবং আসর সে সময় যখন সূর্য শেষ উঁচুতে ছিল। অতপর মাগরিবের নামায লালিমা অদৃশ্য হওয়ায় কিছু পূর্বে এবং এশার নামায রাতের তিন ভাগের এক ভাগ অতিক্রমের পর এবং ফজরের নামায খুব আলোকিত হওয়ার পর পড়লেন। তারপর তিনি বললেন, নামাযের ওয়াক্তসমূহ জিজ্ঞেসকারী কোথায়? সেই ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাজির। তিনি বললেন, তোমার নামাযের সময় হলো এই দুই ওয়াক্তের মধ্যবর্তী সময়।" (সহীহ মুসলিম)

হযরত উরওয়া (রা) বিন মাসউদ ছাকাফী

৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাস। প্রিয়নবী (সা) চৌদ্দশ' জাননিছার সমভিব্যাহারে ওমরার জন্য মক্কা রওয়ানা হলেন। কুরবানীর উট ছিল সাথে। হুজুরের (সা) নির্দেশ অনুযায়ী সকল মুসলমান স্ব স্ব তরবারী খাপে ভরে রেখেছিলেন। কেননা, তাদের সফরের উদ্দেশ্য ছিল একমাত্র পবিত্র কা'বার তাওয়াফ এবং যিয়ারতের মর্যাদা লাভ করা। তাতে যুদ্ধের কোন কথাই ছিল না। হকপন্থীদের এই পবিত্র দল যখন মক্কা থেকে কয়েক মাইল দূরে হুদাইবিয়া নামক স্থানে পৌছলো তখন হুজুর (সা) খবর পেলেন যে, কুরাইশরা যে কোন মূল্যে মুসলমানদেরকে মক্কা প্রবেশে বাধা দিতে বদ্ধপরিকর এবং এই উদ্দেশ্যে তারা একটি বিরাট দল একত্রিত করেছে। এই খবর পেয়ে হুজুর (সা) কুরাইশের নিকট একজন দূত প্রেরণ করলেন। দূতটির নিকট প্রেরিত পয়গামে তিনি বললেন যে, তাঁরা শুধুমাত্র ওমরা আদায়ের জন্য এসেছেন। যুদ্ধ উদ্দেশ্য নয়। এটাই সর্বোত্তম যে, কুরাইশরা একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে সন্ধি করে নেবে এবং তাদের ও কওমের ব্যাপারটি আরবদের হাতে ছেড়ে দেবে। তারা যদি বিজয়ী হয় তাহলে তা তাদের সঠিক মতের ওপর নির্ভরশীল হবে। তাঁদের জামায়াতে শামিল হও বা না হও। যদি তারা সন্ধি অনুমোদন না করে তাহলে আল্লাহর কসম, তিনি তাদের সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করবেন। হুজুরের (সা) দূত কুরাইশের নিকট গিয়ে বললেন যে, আমি মুহাম্মাদের (সা) পয়গাম তোমাদের জন্য বহন করে এনেছি। তোমরা যদি চাও তাহলে তা বর্ণনা করি ? কতিপয় আবেগপ্রবণ লোক বললো—আমাদের তা শোনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু কুরাইশের অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বললো, তুমি যে পয়গাম এনেছ তা বর্ণনা কর। দূত সেই পয়গাম বর্ণনা করলেন। তখন মুশরিকদের মধ্যকার একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও সুদর্শন মানুষ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং কুরাইশদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে কুরাইশের দল! তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কি আমার পিতৃসমতুল্য নও ?" লোকেরা বললো ঃ "কেন নয়, অবশ্যই।" তারপর সেই ব্যক্তি বললেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কি আমার সন্তানতুল্য নও ?" সকলেই জবাব দিল, " হ্যাঁ, অবশ্যই।" সেই ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, "তোমরা আমার সম্পর্কে কোন খারাব ধারণা পোষণ কর ?" কুরাইশরা একবাক্যে বললো, "কখনো নয়।" সেই ব্যক্তি বললো, "তোমাদের স্মরণে আছে যে, আমি উকাজবাসীকে তোমাদের সাহায্যের জন্য বলেছিলাম এবং যখন তারা অস্বীকার

করেছিল, তখন আমি নিজের সন্তান ও সমর্থকদেরকে সঙ্গে নিয়ে তোমাদের সাহায্যের জন্য এসেছিলাম।" কুরাইশরা জবাব দিল, "জ্বী, হ্যা। আপনার ইহসানের কথা খুব স্মরণ আছে।" যখন এই সওয়াল জবাব শেষ হলো তখন সেই ব্যক্তি বললো, " মুহাম্মাদের (সা) পয়গাম খুব যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। তোমরা যদি আমাকে অনুমতি দাও, তাহলে আমি মুহাম্মাদের (সা) সাথে সাক্ষাত করে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিব।" সকলেই রাজী হয়ে গেলো। এ সময় তিনি হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হলেন এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। সেই সাথে তিনি চারপাশের অবস্থাও খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। যখন কুরাইশদের নিকট ফিরে গেলেন তখন তাদেরকে হুজুরের (সা) সাথে তার আলোচনার বিশদ বিবরণ দিলেন এবং অত্যন্ত দরদভরা কণ্ঠে তাদেরকে বললেন, "কুরাইশ ভাইসব! দুনিয়ার বড় বড় শাসকদের দরবারে যাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে। আমি কায়সার ও কিসরার দরবার ও নাজ্জাশীর শান-শওকত দেখেছি। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি কোন ক্রয় করা গোলামকেও নিজের বাদশাহাকে এত সম্মান করতে দেখিনি, যা মুহাম্মাদের (সা) সাথী-সঙ্গীরা তাঁকে করে থাকে। মুহাম্মাদ (সা) থু থু নিক্ষেপ করলে তা তারা অগ্রসর হয়ে নিজের হাতে নেয় এবং ভালোবাসার আবেগে নিজের চেহারা ও হাতে ডলে দেয়। মুহাম্মাদ (সা) ওজু করেন তখন তারা ব্যবহৃত পানির এক কাতরার জন্য এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে যে, মনে হবে তারা পরস্পর লড়াই করে মারা যাবে। মুহাম্মাদ (সা) কোন নির্দেশ দিলে সকলেই তা পালনের জন্য দৌড়ে আসে। মুহাম্মাদ (সা) যখন কোন কথা বলে, তখন সকলের আওয়াজ ছোট হয়ে যায়। মুহাম্মাদের (সা) মহানত্ব ও মর্যাদার অবস্থাটা এমন যে, তাঁর কোন সঙ্গী তাঁর দিকে নজর উঠিয়ে দেখতেও পারে না। আমার কথা যদি মানো, তাহলে মুহাম্মাদের (সা) প্রস্তাব মেনে নাও। এটা অত্যন্ত পসন্দনীয় এবং যুক্তিযুক্ত।"

এ ব্যক্তি যিনি রক্তাক্ত যুদ্ধ ঠেকানোর লক্ষ্যে মুসলমান ও কুরাইশের মধ্যে সন্ধির জন্য অত্যন্ত ইখলাস ও দরদের সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন বনু ছাকিফের সরদার আবু মাসউদ উরওয়া (রা) বিন মাসউদ।

সাইয়েদেনা হযরত আবু মাসউদ উরওয়া (রা) বিন মাসউদ যদিও শেষ পর্যায়ের সাহাবীদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তবুও তিনি মহান সাহাবীদের (রা) মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। তিনি তায়েফের মশহুর কবিলা বনু ছাকিফের আশরাফদের মধ্যেকার মানুষ ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ

উরওয়া (রা) বিন মাসউদ বিন মালিক বিন কা'ব বিন আমর বিন সায়াদ বিন আওফ বিন ছাকিফ বিন মুনাব্বা বিন বাকার বিন হাওয়াযিন বিন আকরামা বিন খাসফা বিন কায়েস আইলান।

উরওয়া (রা) ছিলেন অত্যন্ত নেকদিল, সঠিক মত ও বাহাদুর মানুষ। বনু ছাকিফের মধ্যে তাকে অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো। মক্কার কুরাইশের সাথেও তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল এবং তিনি প্রায়ই মক্কা আসা-যাওয়া করতেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় তিনি মক্কায় উপস্থিত ছিলেন। এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী তিনি কুরাইশের আহবানে মক্কা এসেছিলেন এবং অনেকের মতে তিনি নিজেই এই ঝগড়া মিটানোর জন্য মক্কা এসেছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার এবং হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর (সা) হযরত বাছার (রা) বিন সুফিয়ান খাজায়ীকে কুরাইশদের মতামত জানার জন্য মক্কা প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তাহফিক করে আসফান নামক স্থানে হুজুরের (সা) সঙ্গে মিলিত হয়ে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! কুরাইশরা বাধা দানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।"

সহীহ বুখারীর রেওয়ায়াত অনুযায়ী সর্বপ্রথম হযরত বাদিল (রা) বিন ওয়ারকা খাজায়ী হুজুরকে (সা) কুরাইশের বাধাদানের খবর দিয়েছিলেন এবং তিনিই হুজুরের (সা) পয়গাম কুরাইশকে পৌছিয়েছিলেন।

হযরত উরওয়া (রা) বিন মাসউদ কুরাইশের দূত হয়ে হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হলেন। এ সময় তিনি তাঁর নিকটও সেই প্রস্তাবই পেশ করলেন যা নিজের দূতের মাধ্যমে কুরাইশদের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। উরওয়া (রা) মনস্তাত্বিক অস্ত্র প্রয়োগ করে কাজ হাসিল করতে চাইলেন এবং বললেন ঃ

"মুহাম্মাদ (সা) ! ধর, তুমি যদি নিজের কওমের উৎখাতে সফল হও তাহলে তুমি কি আরবের কোন মানুষের সম্পর্কে আজ পর্যন্ত শুনেছ যে, সে নিজে নিজের কওমকে ধ্বংস করেছে এবং যদি লড়াইয়ের ফল অন্য কিছু হয় তাহলে আল্লাহর কসম, তোমার চারপাশে যাদেরকে দেখছো তারা সবাই ভেগে যাবে এবং তোমাকে একাকী রেখে যাবে।"

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) উরওয়ার (রা) কথা শুনে ক্রোধে অস্থির হয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ

"আরে যা-যা ! তোর মাবুদ 'লাতের' গুপ্ত অংগ চোষেক গিয়ে। আরে আমরা মুহাম্মাদকে (সা) রেখে ভেগে যাবো এবং তাঁকে একাকী রেখে যাবো ?"

উরওয়া (রা) বললেন, "আবু বকর! তোমার কিছু ইহসান যদি আমার ওপর না থাকতো তাহলে আল্লাহর কসম, আমি তোমার কঠোর কথার অবশ্যই জবাব দিতাম।"

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবু বকরের (রা) কথা শুনে উরওয়া (রা) জিজ্ঞেস করলো যে, এ কে ? যখন তাঁকে বলা হলো যে, তিনি আবু বকর বিন আবি কোহাফা, তখন তিনি হযরত আবু বকরের (রা) পুরাতন ইহসানের উদ্ধৃতি দিয়ে কোন কঠোর জবাব দান থেকে বিরত রলেন। কিন্তু এসব রেওয়ায়াত সঠিক হওয়ার প্রশ্নে কথা আছে। কেননা, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) কুরাইশের অত্যন্ত মশহুর ও মারুফ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। চেহারা দেখে বা কণ্ঠস্বর শুনে হযরত উরওয়া (রা) তাঁকে চিনতে পারলেন না এটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল।

তারপর উরওয়া (রা) পুনরায় হুজুরের (সা) সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় মশগুল হয়ে গেলেন। আরবদের অভ্যাস বা রেওয়াজ ছিল যে, আলোচনার সময় তারা পরস্পরের দাড়ি স্পর্শ করতো অথবা তা ধরতো। উরওয়া (রা) কথোপকথনের সময় বার বার হুজুরের (সা) দাড়ি মুবারকের দিকে হাত অগ্রসর করছিলেন। হযরত মুগিরা (রা) বিন শুবা শিরস্ত্রান পড়ে তরবারী হাতে হুজুরের পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন। যেই উরওয়া (রা) হুজুরের পবিত্র দাড়ির প্রতি হাত বাড়াতেন, হযরত মুগিরা (রা) তরবারীর হাতলের ওপর তাঁর হাত মারতেন এবং বলতেন, "খবরদার! নিজের হাত হুজুরের (সা) পবিত্র দাড়ি থেকে দূরে রাখ।"

হযরত মুগিরার (রা) চেহারা শিরস্ত্রানে ঢাকা ছিল। উরওয়া (রা) ভীত হয়ে বললেন, এ ব্যক্তি কে ? লোকেরা বললো, সে হলো মুগিরা (রা) বিন শু'বা।"

উরওয়া (রা) তাঁকে সম্বোধন করে বললেন : "এই গাদ্দার! আমি কি তোমাকে অমুক গাদ্দারীর সময় সাহায্য করিনি ? [জাহেলী যুগে হযরত মুগিরা (রা) কতিপয় লোককে হত্যা করেছিল এবং তাদের মাল নিয়ে নিয়েছিল। তারপর তিনি হুজুরের খিদমতে হাজির হয়ে ইসলাম কবুল করেছিলেন। হুজুর (সা) মুগিরার (রা) ইসলাম গ্রহণকে স্বাগত জানিয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সামনে পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন যে, তুমি যে মাল লুটে এনেছ তা আমাদের প্রয়োজন নেই। সহীহ বুখারীতে আছে যে, উরওয়া (রা) বিন মাসউদ মুগিরার (রা) পক্ষ থেকে নিহতদের শোণীতপাত আদায় করেছিলেন। এ সময় তিনি সেই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন।]

হুদায়বিয়ায় নিজের দৌত্য গিরির সময় হযরত উরওয়া (রা) হুজুরের (সা) প্রতি সাহাবায়ে কিরামের (রা) গভীর ভালোবাসার যে বিস্ময়কর দৃশ্য দেখলেন তাতে তিনি খুব প্রভাবিত হলেন। ফিরে গিয়ে কুরাইশের সামনে সেই দৃশ্য অত্যন্ত প্রভাবপূর্ণভাবে বিস্তারিত বললেন এবং তাদেরকে পরামর্শ দিলেন যে,

মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে নাও এবং তাদেরকে মক্কা প্রবেশে বাধা দিও না। কুরাইশরা সে সময় তাঁর পরামর্শ মানলো না। কিন্তু বাইয়াতে রিদওয়ানের পর তারা হুদায়বিয়ার সন্ধিনামায় স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়।

অষ্টম হিজরীতে মহানবী (সা) তায়েফের যুদ্ধ থেকে ফারেগ হয়ে মদীনা মুনাওয়ারা ফিরে আসছিলেন। পথিমধ্যে হযরত উরওয়া (রা) বিন মাসউদ তাঁর খিদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তারপর তিনি আরজ করলেন।

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত প্রদানের অনুমতি আমাকে দিন।"

বনু ছাকিফ অত্যন্ত যোদ্ধা ও অহংকারী ছিল। হুজুর (সা) বললেন, "তোমার পাষাণ হৃদয় কওম তোমার সাথে লড়াই করবে" (অথবা অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী তোমার কওম তোমাকে কতল করবে) তিনি আরজ করলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল। বনু ছাকিফ আমাকে খুব সম্মান করে। এমনকি আমি শুয়ে থাকলে আমাকে জাগায়ও না। কারণ, তাতে আমার কষ্ট হতে পারে এই ভেবে। তাঁর কথা শুনে হুজুর (সা) তাঁকে হকের তাবলীগ করার অনুমতি দিয়ে দিলেন।

ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য নিয়ে হযরত উরওয়া (রা) বিন মাসউদ প্রায় এশার নামাযের সময় তায়েফ পৌছলেন। বনু ছাকিফ তাঁর আগমনের খবর শুনে মুলাকাতের জন্য এলো এবং জাহেলিয়াতের পদ্ধতি অনুযায়ী তাঁকে সালাম করলো। তিনি তাতে খুব কঠোরভাবে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন এবং বললেন যে, জান্নাতবাসীর মত তোমাদের সালাম করা উচিত এবং আস্‌সালামু আলাইকুম বলা দরকার। তারপর তিনি বনু ছাকিফকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তাতে তারা জ্বলে উঠলো এবং হযরত উরওয়া (রা) অত্যন্ত ক্লান্ত বলে চলে গেল।

সকালে হযরত উরওয়া (রা) নিজের বাড়ীর বালাখানায় দাঁড়িয়ে ফজরের আজান দিলেন। তা শুনে বনু ছাকিফ উত্তেজিত হয়ে উঠলো এবং হযরত উরওয়ার (রা) মান-সম্মানকে তাকে রেখে তাঁর ওপর তীর বর্ষণ শুরু করলো। আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, বনু মালিকের (ছাকিফের একটি শাখা) এক ব্যক্তি আওস বিন আওফ তাক করে এমন তীর মারলেন যে, তার একটি গুরুত্বপূর্ণ শিরায় বিধে গেল। এই তীরই তার মৃত্যু দূত হিসেবে প্রামাণিত হলো। যখন তাঁর জীবিত থাকার আর কোন আশা রলো না তখন তাঁর বংশধররা হাতিয়ার বেধে তাঁর নিকট এলো। এবং বললো, আমরা আপনার প্রতিশোধ অবশ্যই নিব। তাতে যদি আমাদের প্রতিটি শিশুও মারা

যায়। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত বনু মালিকের দশজন সরদারকে হত্যা না করবো ততক্ষণ আমরা আরামের সাথে বসবো না।

হযরত উরওয়া (রা) নেক নফসের দিক থেকে নজিরবিহীন ছিলেন। তিনি বললেন, "এটাতো আমার ওপর আল্লাহর বিশেষ ইহসান যে, তিনি আমাকে শাহাদাতের মর্যাদায় সমাসীন করেছেন। আমার বদলা কাউকে হত্যা করো না। আমি আমার রক্ত ক্ষমা করে দিয়েছি। আমারতো এখন শুধুমাত্র এই আশা যে, আমাকে রাসূলের (সা) সেইসব সঙ্গীর পাশে দাফন করবে যাঁরা তায়েফ অবরোধকালে শহীদ হয়েছিলেন।

অন্য এক রাওয়ায়েতে বলা হয়েছে, "আমার জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ করো না। আমি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক মুসলিহাতের জন্য নিজের রক্ত ক্ষমা করে দিয়েছি। আমার হত্যাতো আল্লাহর মেহেরবানী। তাঁর শুকর যে, তিনি আমাকে আমার জীবন হক পথে কুরবানী করার তাওফিক দিয়েছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল। যিনি আমাকে এই খবর দিয়েছিলেন যে, তোমার কওম তোমাকে হত্যা করবে।"

এই ওসিয়তের পর হযরত উরওয়া (রা) নিজের জীবন আল্লাহর হাতে সপে দিলেন। আহলে খান্দান তায়েফের গঞ্জে শহীদানে দাফন করে তাঁর শেষ আশা পূরণ করলেন।[১]

বিশ্বনবী (সা) হযরত উরওয়া (রা) বিন মাসউদের শাহাদাতের খবর পেয়ে বললেন ঃ

"উরওয়ার (রা) উদাহরণ সাহেবে ইয়াসিনের মত। তিনি নিজের কওমকে হকের দিকে আহবান করেছিলেন এবং কওম তাঁকে মেরে ফেলেছিল।"

প্রিয় নবী (সা) একবার ইরশাদ করেছিলেন যে, আমাকে নবীদের মিছালী সুরত দেখানো হয়েছে। ইবরাহীম (আ) আমার মত ছিলেন এবং হযরত ইসা মসিহ (আ) উরওয়া (রা) বিন মাসউদের সুরতের মত ছিলেন।

হাফেজ ইবনে আবদুল বার (রা) "আল ইসতিয়াবে" লিখেছেন যে, সাইয়েদেনা হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত উরওয়া (রা) বিন মাসউদের শাহাদাতে খুব দুঃখ পেয়েছিলেন এবং এই হৃদয়বিদারক ঘটনার জন্য একটি মরছিয়াও বলেছিলেন।

১। হযরত উরওয়ার (রা) হত্যাকারী আওস বিন আওফ পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি হযরত উরওয়ার (রা) পুত্র হযরত আবু মলিহ (রা) এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত কারিব (রা) বিন আসওয়াদের তরফ থেকে প্রতিশোধের খটকা ছিল। সুতরাং তিনি নিজের এই খটকার কথা হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) সামনে প্রকাশ করেছিলেন। তাতে তিনি দু'জনকে ডেকে প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে বিরত করেন এবং তাদেরকে আওস (রা) বিন আওফের গলায় গলায় মিলিয়ে দেন।

হযরত আমের (রা) বিন আকওয়া

হযরত আমের (রা) ছিলেন বনু কাময়ার একটি শাখা বুন আসলামের চোখের মণি। তাঁর নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

আমের (রা) বিন সিনান বিন আকওয়া বিন আবদুল্লাহ বিন কুছাইর বিন খুযাইমা বিন মালিক বিন সালামান বিন আসলাম।

দাদার নামের নিসবত অনুসারে আমের (রা) বিন আকওয়া নামে মশহুর হন। নামকরা সাহাবী হযরত সালমা (রা) বিন আকওয়া তাঁর আপন ভাই (অথবা দুধভাই) এবং অন্য এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন।

চরিতকাররা হযরত আমেরের (রা) ইসলাম গ্রহণের কাল সম্পর্কে কিছু বলেননি। অবশ্য এটা প্রতিষ্ঠিত বক্তব্য যে, তিনি খায়বারের যুদ্ধের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং মহানবীর (সা) প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পোষণ করতেন। তিনি একজন কবি ছিলেন এবং অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে নিজের কবিতা আবৃত্তি করতেন।

প্রিয়নবী (সা) খায়বার যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হলেন। এ সময় তাঁর সফরসঙ্গী সাহাবীদের মধ্যে হযরত আমেরও শামিল ছিলেন।

সহীহ মুসলিমে হযরত সালমা (রা) বিন আকওয়া থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা মহানবীর (সা) সাথে খায়বার রওয়ানা হলাম। সারারাত সফর করলাম। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি আমের (রা) বিন আকওয়াকে বললো, আমের আমাদেরকে কিছু শুনাবে না ? আমের (রা) ছিলেন কবি মানুষ এবং তাঁর অন্তর ছিল ঈমানী আবেগে পূর্ণ। তিনি সওয়ারী থেকে নেমে উটের গান শুনাতে লাগলেন। সেই গানের মর্মার্থ হলো ঃ

"আল্লাহর কসম! যদি তিনি (সা) না হতেন, তাহলে আমরা হেদায়াত পেতাম না। সাদকা ও খয়রাত করতাম না এবং নামাযও পড়তাম না এবং আমরা তাঁর ফজিলতে বেনেয়াজ নই। হে আল্লাহ! আমাদের ওপর ইতমিনান নাযিল করুন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা জীবিত আছি ততক্ষণ তোমার ওপর ফিদা রয়েছি। আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমরা যখন দুশমনের মুকাবিলায় দাঁড়াবো তখন আমাদেরকে অটলতা ও দৃঢ়তা দান কর।"

হুজুরের (সা) পবিত্র কানে তাঁর কণ্ঠস্বর পৌঁছলে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "এই উটের গানকারী কে ?" লোকেরা বললো, "আমের বিন আকওয়া।" তিনি

বললেন, "আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন।" হুজুরের ইরশাদ শুনে লোকদের বিশ্বাস হয়ে গেল যে, আমেরের শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ ঘটবে। কেননা, হুজুর (সা) যখন কোন মুজাহিদকে রহমতের দোয়া দিতেন তখন তিনি খুব শীঘ্র শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করতেন। সুতরাং সে সময় হযরত ওমর ফারুক (রা) আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদেরকে তাঁর বীরত্বের ফায়দা উঠাতে দিলেন না।" (অথবা অন্য এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি দোয়ায় আমেরের সঙ্গে আমাদেরকেও শরীক করে নিতেন।)

যুদ্ধকালে একদিন হযরত আমের (রা) একটি যুদ্ধগাথা পড়তে পড়তে ইহুদীদেরকে মুকাবিলার জন্য বের হলেন। ইহুদীদের নামকরা যোদ্ধা মারহাব তাঁকে মুকাবিলার জন্য সামনে অগ্রসর হলো। হযরত আমের (রা) মারহাবের ওপর তরবারী দিয়ে কোপ মারলেন। তরবারীটি ছিল ছোট। মারহাবের গায়ে লাগলো না এবং তা জোরে ঘুরে স্বয়ং তাঁর হাঁটুতে লাগলো। তার ব্যথায় তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। অন্য আরেক রেওয়ায়াত অনুযায়ী মারহাবের তরবারী হযরত আমেরের (রা) ঢালের মধ্যে ঢুকে পড়লো। তিনি তা ঝেটকি মেরে হাড়াতে লাগলেন। এ সময় তার নিজের তরবারী তাঁর গায়েই লেগে মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি করলো এবং তিনি শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন। বস্তুত তাঁর শাহাদাত নিজের তরবারী দ্বারাই হয়েছিল। এজন্য লোকেরা তাঁর প্রতি আত্মহত্যার কথাটি আরোপ করেছিল এবং তার আমল বরবাদ হয়ে গিয়েছে বলে প্রচারণা চালিয়েছিল।

হযরত মুসলিমা (রা) বলেন যে, আমি এমন ধরনের কথা শুনে কাঁদতে কাঁদতে রাসূলের (সা) দরবারে হাজির হলাম এবং আরজ করলাম ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। লোকেরা বলাবলি করছে যে, আমেরের আমল বাতিল হয়ে গেছে।"

তিনি বললেন, "কে একথা বলেছে?"

আমি আরজ করলাম ঃ "আপনার কতিপয় সাহাবী।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "তাঁরা ভুল বলেছে বরং আমের দ্বিগুণ ছওয়াব পাবে।"

হযরত আসলাম হাবশী (রা)

কেউ কেউ তাঁর নাম লিখেছেন আসলাম রায়ী (রা) বলে। প্রকৃতপক্ষে তিনি হাবশীও ছিলেন, আবার রায়ীও ছিলেন। হাবশী এজন্যে যে, তিনি হাবশার বাসিন্দা ছিলেন এবং রায়ী এজন্যে যে, তিনি খায়বারের ইহুদীদের বকরী চরাতেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি খায়বারের আমের নামক এক ইহুদীর গোলাম ছিলেন এবং তার বকরী চরাতেন।

সপ্তম হিজরীর প্রথমে মহানবী (সা) খায়বারের যুদ্ধের জন্য গমন করেন। এ সময় ইহুদীরা নিজেদের দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে বাধা দানের জন্য জোর প্রস্তুতি নিল। হযরত আসলাম (রা) ও আমের ইহুদী নাতাত দুর্গে ছিলেন। হযরত আসলাম (রা) ইহুদীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জন্য সশস্ত্র হচ্ছো। তারা বললো যে, মুহাম্মাদ (সা) নামে এক ব্যক্তি যে নিজেকে আল্লাহর নবী বলে, সে আমাদের ওপর হামলা করেছে। আমরা তার সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছি।

তাদের কথা শুনে আসলামের (রা) অন্তরে এক বিস্ময়কর ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হলো এবং তিনি অদৃশ্যভাবেই হুজুরের (সা) প্রচন্ড ভক্ত হয়ে গেলেন। যথারীতি বকরী নিয়ে দুর্গের বাইরে বেরুলাম এবং সোজা মহানবীর (সা) খিদমতে পৌছে গেলাম। অতপর রাসূলের (সা) নিকট নিবেদন করে বললেন ঃ

"হে মুহাম্মাদ! আপনি কিসের দাওয়াত দিয়ে থাকেন।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "আল্লাহ ছাড়া কাউকে মাবুদ বানিও না এবং আমাকে আল্লাহর রাসূল মানো।"

হযরত আসলাম (রা) তৎক্ষণাৎ কালেমায়ে শাহাদাত পড়ে ঈমানের সম্পদে বিত্তবান হয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! এই বকরী আমার নিকট আমানত রয়েছে। আমি তাদেরকে মালিকের নিকট পৌছে দিতে চাই।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ বকরীগুলোকে সৈন্যদের বাইরে নিয়ে গিয়ে তাড়িয়ে দাও এবং কিছু পাথর তাদের পেছনে নিক্ষেপ কর। আল্লাহ তায়লা তোমাকে সেই আমানত থেকে মুক্ত করে দেবেন।

হযরত আসলাম (রা) তাই করলেন এবং বকরীগুলো ভেগে নিজের মালিকের গৃহে প্রবেশ করলো।

যুদ্ধ শুরু হলে হযরত আসলামও (রা) অস্ত্রসহ মুজাহিদদের দলে শামিল হয়ে গেলেন এবং বীর বিক্রমে লড়াই করে শহীদ হয়ে গেলেন। হুজুর (সা) তাঁর শাহাদাতের খবর শুনে বললেন ঃ عَمِلَ قَلِيلاً وَأُجِرَ كَثِيراً অর্থাৎ আমল করেছ সামান্য কিন্তু প্রতিদান পেয়েছে বিরাট।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, মুসলমানরা হযরত আসলামের (রা) লাশ একটি তাবুতে রাখলেন। প্রিয়নবী (সা) লাশ দেখার জন্য তাবুর মধ্যে তাশরীফ নিলেন। কিন্তু তক্ষুণি বেরিয়ে এলেন এবং বললেন, আল্লাহ তায়ালা এই হাবশী বান্দাকে সম্মানিত করেছেন এবং তাকে বেহেশতে পৌঁছে দিয়েছেন। আমি দেখলাম যে, দু'জন হুর তার মাথার পাশে বসে রয়েছে। (অন্য এক রেওয়ায়াতে এই শব্দ আছে যে, তার পাশে তার হুরের মত স্ত্রী বসেছিলো।)

হে আল্লাহ ! একজন হাবশী রাখালের কি সৌভাগ্য যে, তার এক ওয়াক্ত নামায পড়ারও সুযোগ হয়নি এবং সোজা জান্নাতে ঢুকে পড়েছেন।

হযরত আবু মাহযুরা (রা) জুমাহী

অষ্টম হিজরীতে রহমতে আলম (সা) হুনাইনের যুদ্ধ শেষে ফিরে আসছিলেন। পথিমধ্যে একটি স্থানে নামাযের সময় হয়ে গেল। হুজুর (সা) নিজের মুয়াজ্জিনকে আযান দানের নির্দেশ দিলেন। ঘটনাক্রমে সেখানে মক্কার কয়েকজন উদ্ধত যুবকও উপস্থিত ছিল। তখনো তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি। হুজুরের (সা) মুয়াজ্জিনের আযান দেয়া হয়ে গিয়েছিল। এ সময় তারা ঠাট্টাচ্ছলে আযানের নকল করতে লাগলো। তাদের মধ্যেকার এক যুবকের গলার আওয়াজ ছিল খুব বুলন্দ এবং হৃদয়গ্রাহী। হুজুর (সা) সেইসব নওজোয়ানকে ডেকে পাঠালেন। তারা এলে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে খুব উচ্চস্বরে আযানের নকল করছিল। সকলে সেই যুবকের দিকে ইশারা করলো। হুজুর (সা) সেই যুবককে তাঁর সামনে আযান দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। সে বাধ্য হয়ে নির্দেশ মানার জন্য দাঁড়িয়ে গেলো। কিন্তু আযান সম্পর্কে পুরোপুরি জানা ছিল না। এজন্য হুজুর (সা) তাকে স্বয়ং আযান বলে দিতে লাগলেন। তিনি রাসূলের (সা) মুখে যে কালেমা শুনলেন তাই উচ্চারণ করলেন। যেই বাক্যগুলো দোহারাচ্ছিলেন সেই অন্তর থেকে কুফর ও শিরকের মরিচা দূর হয়ে যাচ্ছিল। আযান শেষ হওয়ার সাথে সাথে তার অন্তর পরিচ্ছন্ন হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ সাচ্চা দিলে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করতে লাগলেন। রহমতে আলম (সা) তাকে একটি থলে দান করলেন। তাতে কিছু রূপা ছিল। তারপর তিনি নিজের পবিত্র হাত যুবকের মাথা, মুখ, সিনা, পেট ও নাভি পর্যন্ত ডলে দিলেন এবং তিনবার এই দোয়া পড়লেন ঃ

بَارَكَ اللّٰهِ فِيْكَ وَبَارَكَ اللّٰهِ عَلَيْكَ

এই ভাগ্যবান যুবক যাঁকে মহানবী (সা) তিনবার বরকতের দোয়া দিয়েছিলেন—তিনি ছিলেন হযরত আবু মাহযুরা জুমাহী কারাশী।

হযরত আবু মাহযুরার (রা) নাম নিয়ে বড় মতপার্থক্য আছে। কেউ তাঁর নাম লিখেছেন সালমান। আবার কেউ লিখেছেন সালমা। কেউবা লিখেছেন সামরাহ। অবশ্য তার কুনিয়ত যে আবু মাহযুরা ছিল এ ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন এবং তিনি ইতিহাসে নিজের কুনিয়তেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কুরাইশের বনু জুমাহী খান্দানের সঙ্গে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তাঁর নসব নামা হলো ঃ

আবু মাহযুরা (রা) বিন মুঈর বিন লুজান বিন রাবিয়া বিন কোরায়েজ বিন সায়াদ বিন জুমাহ।

আবু মাহযুরা মক্কার সেইসব সচ্ছল যুবকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা তাওহীদের দাওয়াতের প্রতি কোন গুরুত্বই দেয়নি। এমনকি মক্কার ওপর হকপন্থীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাও তাদের সঠিক পথে আনতে পারেনি। তা সত্ত্বেও রাসূলের (সা) রহমতের শান হলো যে, তিনি প্রায় সকল মক্কাবাসীকেই ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, যাও আজ তোমাদেরকে আর জবাবদিহি করতে হবে না। সে সময় যারা হুজুরের (সা) দয়ায় উপকৃত হয়েছিলেন তাদেরকে তুলাকা বলা হয়। প্রিয় নবী (সা) মক্কা থেকে হুনাইন তাশরীফ নিলেন। সে সময় তাঁর সঙ্গে বিশেষ একটি সংখ্যা তুলাকাও ছিল। তাদের মধ্যে হযরত আবু মাহযুরা (রা) এবং তার ন'জন বন্ধুও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হুজুর (সা) হুনাইনের যুদ্ধ থেকে ফারেগ হয়ে ফিরতি সনের শুরু করলেন। তখন রাস্তায় সেই ঘটনা সংঘটিত হলো যার উল্লেখ উপরে করা হয়েছে। স্বয়ং হযরত আবু মাহযুরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আযানের নকল অর্থাৎ ভ্যাঙ্গানোর জন্য আমাকে এবং আমার সঙ্গীদেরকে ডেকে পাঠালেন। তিনি যখন জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমাদের মধ্যে সে কে যার আওয়াজ খুব বুলন্দ ছিল। তখন সকলেই আমার দিকে ইশারা করলো। সুতরাং, হুজুর (সা) অন্য সকলকে তো ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ নিলেন। কিন্তু আমাকে ঠেকিয়ে রাখলেন। তারপর তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, দাঁড়াও, আবার আযান দাও। সে সময় আমার অবস্থা এমন ছিলো যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যে আযান দানের নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর চেয়ে খারাব ও ক্রোধের বস্তু আমার নিকট আর কোন বস্তু ছিল না। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক আমি নির্দেশ পালনের জন্য দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি স্বয়ং আমাকে আযান বলে দিলেন। আমি যখন আযান শেষ করলাম তখন তিনি আমাকে একটি থলিতে কিছু রূপা দিলেন এবং আমার কপাল থেকে নাভি পর্যন্ত পবিত্র হাত স্পর্শ করে তিন বার বরকতের দোয়া দিলেন। হুজুরের (সা) দোয়া ও পবিত্র হাতের বরকতে আমি ঈমান সম্পদ লাভ করলাম এবং আমি রাসূলের (সা) খিদমতে আরজ করলাম যে, আমাকে মক্কা মুয়াজ্জমায় মসজিদে হারামের মুয়াজ্জিন বানিয়ে দিন। তিনি বললেন, যাও, এখন থেকে তুমি মসজিদে হারামে আযান দেবে।

হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) "আল-ইসতিয়াবে" লিখেছেন যে, তারপর হযরত আবু মাহযুরা (রা) মক্কা গিয়ে স্থায়ীভাবে আযান দেয়ার দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন। মাখদুম মুহাম্মাদ হাশেম সিন্ধী (র) নিজের কিতাব 'বাযলুল কুওয়াত'–এ বর্ণনা করেছেন যে, যে সময় হযরত আবু মাহযুরা (রা)

মক্কাবাসীর মুয়াজ্জিন হয়েছিলেন তখন তাঁর বয়স ছিল ১৬ বছর। তিনি সারা জীবন এই খিদমত আঞ্জাম দেন এবং তাঁর ওফাতের পর এই খিদমতের সৌভাগ্য তাঁর সন্তানদের মধ্যে বংশ পরম্পরা অব্যাহত থাকে।

সহীহ মুসলিমে হযরত আবু মাহযুরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আযানের উচ্চারণ স্বয়ং নবী করিম (সা) আমাকে শিখিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন বল ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

اَشْهَدُوْا اَنْ لاَّ اِلٰه اِلاَّ اللّٰهُ ـ اَشْهَدُوا اَنْ لاَّ اِلٰه اِلاَّ اللّٰهُ

اَشْهَدُوْا اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰه ـ اَشْهَدُوا اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

حَىَّ عَلٰى الصَّلٰوةِ ـ حَىَّ عَلٰى الصَّلٰوةِ ـ

حَىَّ عَلٰى الْفَلاَحِ ـ حَىَّ عَلٰى الْفَلاَحِ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ لاَ اِلٰه اِلاَّ اللّٰهُ ـ

এই রেওয়ায়াতের পরিপ্রেক্ষিতে হুজুর (সা) আবু মাহযুরা (রা) শাহাদাতের কালেমাকে দু'বারের পরিবর্তে চারবার বলিয়েছিলেন। হাদীসের ব্যাখ্যাতারা এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, সে সময় হযরত আবু মাহযুরার (রা) অন্তরে কুফর ও শিরকের মরিচা ধরে ছিল এবং তিনি ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক আযান দেয়ার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। এ জন্য হুজুর (সা) তাঁর সেই বিশেষ অবস্থার কারণে শাহাদাতের এই কালেমা তাঁকে দিয়ে চার চার বার বলিয়েছিলেন। যাতে আল্লাহ তায়ালা ঐ কালেমাগুলো নিজের এই বান্দার অন্তরে খুব ভালোভাবে বসিয়ে দেন। নচেৎ অন্য কোন সনদওয়ালা রেওয়ায়াত থেকে এটা প্রতিষ্ঠিত নেই যে, হুজুর (সা) আযানে শাহাদাতের কালেমা চার চার বার বলার নির্দেশ দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও হযরত আবু মাহযুরার (রা) ব্যাপারে অধিকাংশ চরিতকারই লিখেছেন যে, তিনি সব সময় মক্কা মুয়াজ্জামাতে তেমনি আযান দিতেন, হুজুর (সা) যেমন তাঁকে শিখিয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি শাহাদাতের কালেমাকে উল্লেখিত নিয়মের সাথে প্রত্যেক আযানে সবসময় চার চার বারই বলতেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ মনজুর নুমানী মায়ারিফুল হাদীসে লিখেছেন যে, সম্ভবত তার কারণ এই ছিল যে, হুজুর (সা) যেভাবে তাঁকে আযান বলিয়েছিলেন এবং যাঁর বরকতে তিনি দ্বীনের দৌলত পেয়েছিলেন, তাঁর প্রেমিকের মত হুবহু সেই আযান সবসময়ের জন্য দিতে চাইতেন। নচেৎ তিনি এটা অবশ্যই জানতেন যে, হুজুরের (সা) মুয়াজ্জিন বিলাল (রা) কিভাবে আযান দিয়ে থাকেন।"

হযরত আবু মাহযুরার (রা) আযানও সুমিষ্ট কণ্ঠ এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে, কবিরা তার কসম পর্যন্ত খেত।

হযরত আবু মাহযুরা (রা) আজীবন মক্কায় থেকে আযান দিতে থাকেন এবং এখানেই ৫৮ হিজরীতে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে যাত্রা করেন। মৃত্যুকালে তিনি আবদুল মালিক নামক এক পুত্র রেখে গিয়েছিলেন। হযরত আবু মাহযুরা (রা) থেকে কতিপয় হাদীসও বর্ণিত আছে।

হযরত আবু মাহযুরা (রা) যদিও শেষে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু প্রিয়নবীর (সা) দোয়ার বরকতে তাঁর অন্তর আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের (সা) ভালোবাসায় পূর্ণ ছিল। হুজুরের (সা) প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার অবস্থাটা এমন ছিল যে, তিনি নিজের মাথার সামনের অংশের (নাসিয়া) চুল কখনো কাটাতেন না। হুজুর (সা) তার ওপর নিজের পবিত্র হাত রেখেছিলেন শুধু এই কারণেই এটা করতেন। তেমনিভাবে প্রিয় নবী (সা) তাঁকে যে দায়িত্ব আঞ্জামের জন্য নিয়োগ করেছিলেন, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তা ধৈর্যের সঙ্গে পালন করে গেছেন। যে ব্যক্তিকে স্বয়ং আকায়ে দোজাহান, ফখরে মওজুদাত রহমতে আলম (সা) স্বয়ং মসজিদুল হারামের স্থায়ী মুয়াজ্জিন নিয়োগ করেছিলেন তার বুলন্দ মর্যাদা সম্পর্কে কে আন্দাজ করতে পারে।

হযরত হারিছ (রা) বিন হিশাম মাখযুমী

আবু আবদুর রহমান হারিছ বিন হিশাম [বিন মুগিরাহ বিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন মাখযুম] মাখযুমী ইসলামের মশহুর দুশমন আবু জেহেলের সহোদর ছিলেন। কিন্তু বহুরূপী যামানাকে দেখুন যে, এক ভাই (আবু জেহেল) দুনিয়া থেকে চরম অমর্যাদাকর অবস্থায় বিদায় নিয়েছিল। আবার দ্বিতীয় ভাইকে (হারিছ) আল্লাহ তায়ালা শুধুমাত্র ইসলামের নিয়ামত দিয়েই পূর্ণ করেননি বরং শাহাদাতের মর্যাদায় সমাসীন করে সন্তুষ্টির বাগানের অর্থাৎ জান্নাতের হকদার বানিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা হযরত হারিছ (রা) বিন হিশামকে ব্যাপক প্রতিভা ও প্রচন্ড সাহস দান করেছিলেন। তিনি উদারতা ও দানশীলতার দিক থেকে স্বগোত্রের হাতেম ছিলেন এবং শত শত গরীব ও মিসকিন তাঁর দস্তরখানে লালিত পালিত হতো। নিজের নজিরবিহীন উদারতা ও নরম অন্তর সত্ত্বেও তিনি মক্কা বিজয় পর্যন্ত কুফর ও শিরকের ভুল পথে ঘুরছিলেন। তাঁর দানশীলতা ও গরীব প্রিয়তা দেখে রহমতে আলম (সা) চাইতেন যে, এমন মানুষ যেন ঈমানের বৈভব থেকে মাহরুম না থাকেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) "আল-ইসতিয়াব' গ্রন্থে লিখেছেন, একদিন রাসূলের (সা) দরবারে হযরত হারিছের (রা) প্রসঙ্গ এলো। তখন হুজুর (সা) বললেন, "হারিছ হলো সরদার। কেন হবে না। তার পিতাও সরদার ছিল। হায়! আল্লাহ যদি তার হেদায়াতের রাস্তা দেখাতেন।" আল্লাহর শান দেখুন যে, আল্লাহর মাহবুবের পবিত্র যবান দিয়ে বের হওয়া এই শব্দাবলী একদিন এমনভাবে পূর্ণ হলো যে, হযরত হারিছ (রা) বিন হিশাম চিরকালের জন্য ইসলামী মিল্লাতের গর্বের বস্তু হয়ে গেলেন।

বদরের যুদ্ধে হযরত হারিছও (রা) সহোদর আবু জেহেলের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু যখন আবু জেহেল ও আরো অন্যান্য অনেক কুরাইশ সরদার জিল্লতীর সাথে মারা গেল তখন হারিছ (রা) পলায়নের পথ বেছে নেয়াটাই কল্যাণকর মনে করলেন। ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন, তিনি ওহোদের যুদ্ধেও মুশরিকদের সাথে ছিলেন।

অষ্টম হিজরীতে মক্কা মুয়াজ্জামায় ইসলামের পতাকা উড্ডীন হলো এবং রহমতে আলম (সা) নিজের জাননিছারদেরকে সঙ্গে নিয়ে শহরে প্রবেশ করলেন। এ সময় হযরত হারিছ (রা) বিন হিশাম ও যোহায়ের বিন উমাইয়া

মাখযুমী (অথবা অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী আবদুল্লাহ বিন আবি রবিয়া মাখযুমী) হুজুরের (সা) চাচাতো বোন হযরত উম্মে হানি (রা) বিনতে আবি তালিবের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন। হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু একথা জানতে পেরে তরবারী হাতে নিজের সহোদরার বাড়ী পৌঁছলেন এবং তাদের কতল করা ফরজ বলে দু'মাখযুমীকে কতল করতে চাইলেন। হযরত উম্মে হানি (রা) বললেন যে, তাঁরা তাঁর নিকট আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি তাঁদেরকে কখনই হত্যা করতে দেবেন না। তারপর নিজের দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর উম্মে হানি (রা) দুই মাখযুমীকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলের (সা) নিকট হাজির হলেন।

বিশ্বনবী (সা) হযরত উম্মে হানিকে (রা) দেখে বললেন, "মারহাবা ওয়া আহলান, হে উম্মেহানি! কি জন্য এলে?"

হযরত উম্মে হানি (রা) আরজ করলেন ঃ " হে আল্লাহর রাসূল! আমি এই দু'জনকে আশ্রয় দিয়েছি। আর আলী (রা) তাঁদেরকে হত্যা করতে চায়।"

হুজুর (সা) বললেন, "যাকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ। তাকে আমিও আশ্রয় দিয়েছি।"

হযরত হারিছ (রা) এবং যোহায়ের (রা) (অথবা আবদুল্লাহ) হুজুরের (সা) রহমতের শান দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন এবং তক্ষুণি সাচ্চা অন্তরে মুসলমান হয়ে গেলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত হারিছের (রা) জীবনে সেই অধ্যায় শুরু হয় যাতে তিনি ইসলামের একজন জানবাজ সিপাহী এবং মহানবীর (সা) অত্যন্ত মুখলিস জাননিছার হিসেবে পরিদৃষ্ট হয়েছিলেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) বলেন যে, হযরত হারিছ (রা) বিন হিশাম সেই মুয়াল্লিফাতুল কুলুব সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন যাঁরা সাচ্চা মুসলমান ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের পর তাঁদের মধ্যে এমন কোন বস্তু দেখা যায়নি যা ইসলামের সাত্যিকার চেতনার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়।

মক্কা বিজয়ের পর হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তখন হযরত হারিছ (রা) তাতে অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নিয়েছিলেন এবং খুব দৃঢ়তার সাথে লড়াই করেন। প্রিয় নবী (সা) তাঁকে গনিমতের মাল থেকে একশ' উট দান করেন।

হুনাইনের যুদ্ধের পর তিনি মক্কা চলে যান। কিন্তু কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, তিনি প্রায়ই রাসূলের (সা) দরবারে হাজির হতেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বার "ইসতিয়াবে' তাঁর কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে,

হারিছ (রা) নীরব প্রকৃতির এবং অল্প কথা বলার মানুষ ছিলেন। একবার তিনি রাসূলের (সা) খিদমতে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! এমন কোন আমলের কথা বলুন, যা সবসময় করতে পারি।"

হুজুর (সা) যবানের দিকে ইশারা করে বলেছিলেন ঃ "তাকে কাবুতে রাখ।"

হযরত হারিছ (রা) প্রথম থেকেই স্বল্পভাষী ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, এটাতো খুব সহজ কাজ। কিন্তু তিনি বর্ণনা করেছেন যে, আমি যখন তার ওপর আমল করতে গেলাম তখন তা খুব কঠিন বলে মনে হলো।

একাদশ হিজরীতে প্রিয়নবী (সা) ওফাত পেলেন। তখন হযরত হারিছ (রা) মদীনাতেই উপস্থিত ছিলেন। আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে খিলাফত প্রশ্নে মতবিরোধ হলে তিনি লোকদেরকে হুজুরের (সা) পবিত্র কথা "আল-আয়িম্মাতু মিনাল কুরাইশ" স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং বললেন যে, হুজুর (সা) যদি একথা না বলতেন তাহলে আমরা আনসারকে কখনো খিলাফত থেকে সম্পর্কহীন করতামনা। (নিজেদের কুরবানী ও জীবন উৎসর্গের ভিত্তিতে) তারা তার যোগ্য। কিন্তু রাসূলের (সা) ফরমানে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কুরাইশের মধ্যে যদি এক ব্যক্তিও অবশিষ্ট থাকতেন তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত করাতেন।

হযরত সিদ্দিকে আকবারের (রা) খিলাফতকালে সিরিয়া যুদ্ধসমূহের শুরুতে খলিফাতুর রাসূল (সা) আরবের সকল নেতৃস্থানীয় সরদারকে জিহাদে শরীক হওয়ার দাওয়াত দিলেন। এই প্রসঙ্গে হযরত হারিছ (রা) বিন হিশামকেও একটি পত্র লিখলেন। তিনি এই পত্র পেয়ে সিদ্দিকে আকবারের (রা) আহবানে বীরত্বপূর্ণ সাড়া দিলেন এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর দৃঢ় সংকল্পে মক্কা থেকে রওয়ানা দিলেন। লোকেরা জানতে পেলো যে, হারিছ (রা) মক্কা থেকে চলে যাচ্ছেন। তখন তাদের মধ্যে হাহুতাশ শুরু হয়ে গেল। তিনি ছিলেন একজন কল্যাণকামী মানুষ এবং শত শত গরীব ও অভাবীকে সাহায্য করতেন। তারা কান্নাকাটি করে তাঁকে বিদায় করতে লাগলো। হযরত হারিছ (রা) যখন বাতহার উঁচু অংশে পৌছলেন তখন কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। সে সময় অসংখ্য মানুষ তাঁর চার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলো। হযরত হারিছ (রা) তাদেরকে সম্মোধন করে বললেন ঃ

"হে মানুষেরা! আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে চলে যাচ্ছি না এবং কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যেও তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছি না। এক শহর ছেড়ে অন্য শহরে চলে যাচ্ছি তাও নয়। প্রকৃতপক্ষে এটা দ্বীনের

ব্যাপার। আল্লাহর পথে জিহাদ এক মর্যাদার বস্তু যা এর পূর্বে এমন বহু লোক হাসিল করেছেন যাঁরা হসব-নসবের দিক থেকে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন না। তাদের বিত্ত বৈভবও তেমন ছিল না। এখন যদি আল্লাহ তায়ালা আমাকে সেই মর্যাদালাভের সুযোগ দান করেন তাহলে কোন অবস্থাতেই তা হারানো উচিত হয়। আল্লাহর কসম, যদি মক্কার সকল পাহাড় সোনার হয়ে যায় এবং আমি সেই সকল সোনা আল্লাহর পথে লুটিয়ে দিই তাহলে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর এক দিনের সমানও সওয়াব পাবো না। দুনিয়ায় যদি আমরা সেই সবলোকের সমান ফজিলত নাও পাই তাহলে কমপক্ষে আখিরাতে তো তাঁদের সঙ্গে শরীক হবো। আল্লাহর খাতিরে আমি মক্কা ত্যাগ এবং হক পথে যুদ্ধ করার জন্য সিরিয়া গমন করছি।"

সিরিয়ায় মুসলমানদের সঙ্গে রোমকদের অনেক রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। তার মধ্যে কতিপয় যুদ্ধে হযরত হারিছ (রা) বীর বিক্রমে অংশ নিয়েছিলেন। ঐতিহাসিকরা এসব যুদ্ধের মধ্যে ফাহাল ও আজনাদাইনের যুদ্ধের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তারপর ইয়ারমুকের রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে হিরাক্লিয়াস তাওহীদের কয়েক হাজার সেনানীর মুকাবিলায় লাখ লাখ রোমক যোদ্ধাকে এনে দাঁড় করিয়েছিলো। কিন্তু মুসলমানরাতো জীবন আল্লাহর রাস্তায় বিক্রি করে দিয়েছিলেন। তারা কোন ক্রমেই ভীত হলেন না। আল্লাহর ওপর ভরসা করে কুফরের ভীতিকর শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ন হলেন। মুসলমান জীবন উৎসর্গকারীদের মধ্যে হযরত হারিছ (রা) বিন হিশামও শামিল ছিলেন। যুদ্ধের আগুন যখন লেলিহান শিখায় চারদিকে পরিব্যাপ্ত তখন হযরত হারিছ (রা) গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। অন্য মুজাহিদরা রোমকদেরকে পেছনে হটিয়ে দিল। এদিকে হযরত হারিছ (রা) জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে উপস্থিত হলেন। সে সময় তাঁর প্রচন্ড পিপাসা অনুভূত হলো এবং মুখ দিয়ে "পানি" শব্দ বের হলো। একজন মুজাহিদ দৌড়ে পানি আনলেন। পানির পাত্র কেবল মুখে লাগিয়েছিলেন এমন সময় আরেকজন আহত মুজাহিদের মুখ দিয়ে "পানি" শব্দ উচ্চারিত হলো। হযরত হারিছ (রা) পেয়ালা মুখ থেকে সরিয়ে নিলেন এবং সেই ভাইয়ের নিকট পানি নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। যখন পানি তাঁর নিকট পৌছলো তখন তাঁর নিকট অন্য আরেকজন আহত মুজাহিদ মূমূর্ষ অবস্থায় পানি চাইছিলেন। দ্বিতীয় মুজাহিদও পানি পান না করে নিজের পাশের আহত মুজাহিদের প্রতি ইশারা করলেন। তাঁর নিকট পানি পৌছলো। ইতিমধ্যে তাঁর প্রাণ বায়ু বের হয়ে গেছে। দ্বিতীয় আহত ও হযরত হারিছের (রা) নিকট পুনরায় পানি আনা হলো। তাঁরাও ইতিমধ্যে পরপারের ডাকে সাড়া দিয়েছেন এবং নিজের ত্যাগ ও

ভ্রাতৃত্বের আবেগে নিজেদেরকে হাওজে কাওছারের পানির মুসতাহিক বানিয়ে নিয়েছিলেন।

হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) হযরত হারিছ (রা) বিন হিশামকে উত্তম ও জ্ঞানী সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত করেছেন। তাঁর স্ত্রী হযরত ফাতিমা (রা) বিনতে ওয়ালিদ [হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ সাইফুল্লাহর সহোদরা] এবং কন্যা উম্মে হাকিম (রা) জালিলুল কদর সাহাবীয়াদের মধ্যে গণ্য হতেন। আবদুর রহমান নামে এক পুত্র ছিলেন। তিনিও ইলম ও ফজলের দিক থেকে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। হযরত হারিছের (রা) বংশধারা তাঁর মাধ্যমেই অব্যাহত ছিল এবং আল্লাহ তাতে অত্যন্ত বরকত দেন।

হযরত হারিছ (রা) বিন হিশাম যদিও শেষ পর্যায়ের সাহাবী। কিন্তু তিনি নিজের সুন্দর আমল দিয়ে অতীত জীবনের ক্ষতি পূরণ করেছিলেন।

হযরত নাওফাল (রা) বিন হারিছ হাশেমী

বদরের যুদ্ধে কাফেররা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হকপন্থীদের ওপর হামলা করে বসলো, কিন্তু আল্লাহ্ পাক তাদেরকে পরাজিত ও হকপন্থীদেরকে বিজয়ী করলেন। মুশরিকদের ৭০ জন যুদ্ধের ময়দানে লাশ হয়ে পড়ে রলো এবং প্রায় সমান সংখ্যককে মুসলমানরা আটক করলো। এসব কয়েদীকে যখন প্রিয়নবীর (সা) সামনে পেশ করা হলো তখন হুজুর (সা) দেখলেন যে, একজন কয়েদীর চেহারায় শরাফতের চিহ্ন বিদ্যমান। তবে, সে মাথা অবনত করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেন খুব লজ্জিত এবং তাঁর দৃষ্টি থেকে বাঁচতে চায়। হুজুর (সা) তাকে সম্মোধন করে বললেন ঃ

"ভাই, তুমি ফিদিয়া দিয়ে মুক্ত হয়ে যাও না কেন ?"

কায়েদী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো ঃ "আমার কাছে কি আছে যে তা দিয়ে আমি ফিদিয়া আদায় করতে পারি ?"

হুজুর (সা) বললেন, "জিদ্দা ওয়ালা বর্শা ফিদিয়া হিসেবে দিতে পারো না ?"

নবীর (সা) মুখে এই বাক্য শুনে কয়েদী মূর্চ্ছা যাওয়ার উপক্রম হলো। তার স্বপ্ন ও চিন্তায় এটা কখনো আসেনি যে সেই বশার্র কথা সে ছাড়া আর কেউ জানতে পারে। তার অন্তর নির্দ্বিধায় স্বাক্ষ দিল যে, মুহাম্মাদ (সা) সাচ্চা রাসূল। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তাঁকে গায়েবী খবর দিয়ে থাকেন। কয়েদী তৎক্ষণাৎ আল্লাহর একত্ববাদ এবং হুজুরের (সা) রিসালাতের ইকরার করলেন। বর্শা চেয়ে এনে ফিদিয়া হিসেবে দিয়ে দিলেন এবং দ্বীনের প্রতি তার ইখলাসের কথা কবিতার আকারে পেশ করলেন।

এই ব্যক্তি যাঁর জীবনে রাসূলের (সা) মুখ নিসৃত কয়েকটি বাক্য বিপ্লব এনে দিয়েছিল এবং যাঁর ঈমানী আবেগ মহানবীর (সা) প্রিয় বানিয়ে দিয়েছিল—তিনি ছিলেন হযরত নাওফাল (রা) বিন হারিছ হাশেমী। তাঁর নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

নাওফাল (রা) বিন হারিছ বিন আবদুল মুত্তালিব বিন হাশিম বিন আবদি মান্নাফ বিন কুসাই।

মাতার নাম ছিল গুযাইয়া বিনতে কায়েস এবং তিনি বনু ফাহরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন।

হযরত নাওফাল (রা) যদিও রাসূলের (সা) মক্কী যুগে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করতে পারেননি। তবে তাঁর অন্তর সবসময় মহানবীর (সা) ভালোবাসায় পূর্ণ ছিলো। তিনি কখনো হুজুরের (সা) বিরোধিতা করেননি এবং কখনো তাঁকে নির্যাতনও করেননি। ইত্যবসরে প্রিয় নবী (সা) হিজরত করে মদীনা তাশরীফ নিয়ে যান। বদরের যুদ্ধে কাফির বাহিনীতে শামিল হওয়ার ব্যাপারটি তার নিকট খুবই অপসন্দনীয় ছিল। কিন্তু মুশরিকরা এমনভাবে বাধ্য করেছিলে যে, তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের সাথে গিয়েছিলেন, সেসময়ও তার মুখে একটি কবিতা উচ্চারিত হয়েছিল। সেই কবিতার অর্থ হলো ঃ

"আমার জন্য মুহাম্মাদের (সা) সাথে যুদ্ধকরা হারাম
কেননা, মুহাম্মাদ আমার নিকটবর্তী প্রিয়জন।"

বদরের যুদ্ধে তিনি মুসলমানদের হাতে আটক হয়ে গেলেন [তাঁকে হযরত উবায়েদ (রা) বিন আওসুজ জাফরী আটক করেন] এবং এই কয়েদীত্ব তাঁর ঈমান আনয়নের একমাত্র কারণ হয়ে গেল। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত নাওফাল (রা) হামেশীদের মধ্য থেকে সবচেয়ে বেশী বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। ঈমানের নিয়ামতে পূর্ণ হওয়ার পর হযরত নাওফাল (রা) মক্কা মুয়াজ্জামা প্রত্যাবর্তন করলেন। মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পূর্বে নিজের ছোট ভাই রবিয়া (রা) বিন হারিছার সাথে হিজরতের ইরাদায় মদীনা রওয়ানা হন। আল্লামা ইবনে সায়াদ (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আবওয়া পৌছে হযরত রবিয়া (রা) মক্কা ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। হযরত নাওফালের (রা) ঈমানী মর্যাদাবোধ এটা কোনক্রমেই মেনে নিল না এবং তিনি ভাইকে বললেন, তুমি কুফর ও শিরকের সেই কেন্দ্রে ফিরে যেতে চাও যেখানকার বাসিন্দারা আল্লাহর সাচ্চা রাসূলকে (সা) মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে এবং তাঁর ওপর তরবারী উঠিয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা নিজের রাসূলের (সা) ওপর নিয়ামত বর্ষণ করেছেন এবং তাঁর ওপর ঈমান আনয়নকারীর সংখ্যা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমার সাথে চলো। সেটাই ভালো হবে। মোটকথা, দুই ভাই হিজরত করে মদীনা পৌছে গেলেন। প্রিয়নবী (সা) এই দুই সহোদরের মদীনা গমনে খুব খুশী হলেন এবং তিনি তাদেরকে নিজের অভিভাবকত্বে নিয়ে নিলেন।

ইবনে আছির (রা) "উসুদুল গাব্বাহ"তে লিখেছেন, রাসূলের (সা) চাচা হযরত আব্বাস (রা) বিন আবদুল মুত্তালিব হযরত নাওফালেরও চাচা ছিলেন। তিনি বয়সে ভাতিজার [হযরত নাওফাল (রা)] চেয়ে কয়েক বছর ছোট ছিলেন। তবুও চাচা ও ভাতিজার মাধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। প্রিয়নবী (সা) তাঁদের দু'জনের সম্পর্কের কথা জানতেন। বস্তুত হযরত আব্বাস (রা) যখন হিজরত করে মদীনা এলেন তখন হুজুর (সা) হযরত নাওফাল (রা) ও হযরত

আব্বাসের (রা) মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক কায়েম এবং থাকার জন্য দু'টি বাড়ী প্রদান করলেন। দু' বাড়ীর একটি ছিল ছানিয়াতুল বিদার সড়কের বাজারে। অপরটি মসজিদে নববী সংলগ্ন রাহবাতুল কাজাতে।

ইমাম হাকিম "মুসতাদরাকে" বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নাওফালের (রা) আর্থিক অবস্থা দুর্বল ছিল। এজন্য মহানবী (সা) সবসময় তাঁর খোঁজ খবর নিতেন। তাঁর নিকাহ করার ইচ্ছা হলে হুজুর (সা) এক মহিলার সঙ্গে শাদী করিয়ে দিলেন। একবার অর্থনৈতিক অবস্থা এতো খারাব হয়ে গেল যে, ঘরে খানা-পিনার কোন বস্তু ছিল না। হুজুর (সা) খবর পেয়ে হযরত আবু রা'ফে (রা) ও হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর (রা) মাধ্যমে নিজের যিরাহ এক ইহুদীর নিকট রেহেন রাখলেন এবং তার বিনিময়ে ৩০ সা' যব নিয়ে হযরত নাওফালকে (রা) প্রদান করলেন।

হিজরতের পর হযরত নাওফাল (রা) মক্কা বিজয়ের সময় প্রিয়নবীর (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। তারপর হুনাইনের যুদ্ধে বীরত্বের সাথে অংশগ্রহণ করেন। তিনি সেইসব সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা বনু হাওয়াযিনের প্রচন্ড তীর নিক্ষেপের সময়ও যুদ্ধের ময়দানে অটল ছিলেন। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত নাওফালের (রা) নিকট তিন হাজার বর্শা মওজুদ ছিল। তিনি হুনাইনের যুদ্ধের সময় এই সকল বর্শা মহানবীর (সা) খিদমতে পেশ করেছিলেন। হুজুর (সা) তাঁর এই কুরবানী ও ত্যাগে খুব খুশী হলেন এবং এই বর্শা মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। তারপর হযরত নাওফালকে (রা) সম্বোধন করে বললেন ঃ "আমি দেখছি যে, তোমার বর্শা মুশরিকদের কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছে।"

মহানবীর (সা) ইন্তেকালের সময় হযরত নাওফাল (রা) খুব বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এজন্য হযরত আবু বকরের (সা) শাসনামলে কোন অভিযানে অংশ নিতে পারেননি। তিনি হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতের দ্বিতীয় বছরে পরপারের ডাকে সাড়া দিলেন। আমীরুল মু'মিনীন (রা) স্বয়ং জানাযার নামায পড়িয়েছিলেন এবং জান্নাতুলবাকীতে দাফন করেন।

মৃত্যুকালে হযরত নাওফাল (রা) পাঁচ পুত্র রেখে যান। তাঁরা হলেন ঃ আবদুল্লাহ, রবিয়া, মুগিরাহ, আবদুর রহমান ও সাঈদ। আল্লাহ তাঁর বংশের অত্যন্ত বরকত দিয়েছিলেন এবং তা মদীনা মুনাওয়ারা, বসরা ও বাগদাদে বিস্তার লাভ ঘটে।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আরকাম যুহরী

মক্কা বিজয়ের পরের কথা। একবার রহমতে আলম (সা) একটি পত্র পেলেন। পত্রটির বিষয়বস্তু এমন ছিল যে, তার জবাব লিখার জন্য তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন ছিল। রাসূলের (সা) নিকট কয়েকজন সাহাবী (রা) উপস্থিত ছিলেন। হুজুর (সা) তাঁদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "এই পত্রের জবাব কে লিখবে?" সাহাবায়ে কিরাম (রা) পরস্পরের প্রতি তাকালেন এবং তারপর তাঁদের মধ্যে থেকে একজন দাঁড়িয়ে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! এই দায়িত্ব আমাকে সোপর্দ করুন। আমি তার যথার্থ জবাব লিখার চেষ্টা করবো।"

ইরশাদ হলো ঃ ঠিক আছে, তুমিই তার জবাব লিখ।

সেই ব্যক্তি জবাব লিখে হুজুরের (সা) খিদমতে পেশ করলেন। হুজুরের (সা) তা খুব পসন্দ হলো। হযরত ওমর ফারুকও (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও সেই জবাবের লিখন পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর প্রশংসা করলেন। লিখন পঠন এবং পত্রাদি লিখার আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতার অধিকারী এই সাহাবী ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আরকাম।

নবীর (সা) দরবারে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আরকামের বিশেষ মর্যাদা ছিল এবং প্রিয়নবী (সা) তাঁর ওপর খুব আস্থাশীল ছিলেন। কুরাইশের যুহরাহ খান্দানের সঙ্গে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ

আবদুল্লাহ (রা) বিন আরকাম বিন আবদি ইয়াগুছ বিন আবদি মান্নাফ বিন যুহরাহ বিন কিলাব বিন মুররাহ।

হযরত আবদুল্লাহর (রা) পিতা আরকাম হুজুরের (সা) মামাতো ভাই ছিলেন। এ আত্মীয়তা সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ (রা) মহানবীর (সা) ভাতিজা হতেন। তিনি খুব মেধাবী ছিলেন। কিন্তু কিছু কারণে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করতে পারেননি। তারপর তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নবীর (সা) খিদমতের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। এবং মদীনাতেই স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলেন। লিখন পঠনে যোগ্যতা ও অন্যান্য সুন্দর গুণের বদৌলতে তিনি খুব শীঘ্র নবীর (সা) নৈকট্য লাভ করেন। মহানবীর (সা) যখন কোন সুলতান বা আমীরকে পত্র লিখার প্রয়োজন হতো তখন তিনি তা হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আরকামকে দিয়েই লিখাতেন।

একাদশ হিজরীতে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) খিলাফতের আসনে সমাসীন হলেন। এ সময় তিনিও হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আরকামকে পত্র লিখনের দায়িত্বে বহাল রাখলেন। হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকাল এলো। তখন তিনি হযরত আবদুল্লাহকে (রা) পত্র লিখনের দায়িত্ব ছাড়াও বাইতুলমালের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করেন। উপরন্তু তাঁকে নিজের মজলিশে শুরাতেও অন্তর্ভুক্ত করে নেন। আল্লামা ইবনে আছির (র) "উসুদুল গাব্বাহ"তে লিখেছেন যে, হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁকে খুব সম্মান করতেন। একবার তাঁকে সম্মোধন করে নিজের সন্তুষ্টির প্রকাশ এই ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন যে, আবদুল্লাহ তুমি যদি ইসলামে অগ্রগমনের মর্যাদা লাভ করতে তাহলে আমি কাউকে তোমার ওপর অগ্রাধিকার দিতাম না।

হযরত ওসমান জুন্নারাইন (রা) খিলাফতের মসনদে সমাসীন হলেন। তখন হযরত আবদুল্লাহ (রা) পূর্বেকার মত পত্র লিখন ও বাইতুলমালের খাজাঞ্চীর দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে থাকলেন। কিন্তু কিছু দিন পর সেসব পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দেন। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা তাঁর ইস্তফাদানের কারণ বর্ণনা করেননি। কিন্তু কার্যকারণে মনে হয় যে, বার্দ্ধক্যের কারণে অথবা দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে যাওয়ার জন্যই তিনি ইস্তফা দিয়েছিলেন। হযরত ওসমান (রা) তাঁর ইস্তফা মঞ্জুর করে নেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন মত অনুযায়ী ত্রিশ হাজার অথবা তিন লাখ দিরহাম তাঁর খিদমতের বিনিময়ে পেশ করেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহর (রা) মুখাপেক্ষীহীনতার অবস্থাটা দেখার মত। তিনি এই বিরাট অংক গ্রহণে অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, আমি এই খিদমত শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির খাতিরে আঞ্জাম দিয়েছি এবং আল্লাহর নিকটই তার প্রতিদান চাই।

শেষ বয়সে হযরত আবদুল্লাহ (রা) দৃষ্টিশক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন। এ অবস্থাতেই পরপারের ডাক এসে উপস্থিত হয় এবং ৩৫ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। হযরত উরওয়া (র) ও আসলাম আদবী (র) তাঁর থেকে কয়েকটি হাদীসও বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবু মিহজান ছাকাফী (রা)

শস্য শ্যামলিমা, পানির প্রাচুর্য এবং সুন্দর আবহাওয়ার জন্য তায়েফকে হিজাজের জান্নাত বলা হয়। রহমতে আলমের (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় এই শহর আরবের নামকরা গোত্র বনু ছাকিফের আবাসস্থল ছিল। তারা সবুজ পাহাড়ের পাদদেশে দৃষ্টি গোচরভুক্ত বিস্তৃত আঙ্গুরের বাগানসমূহের মালিক ছিল। তারা ছিল খুব সচ্ছল ও রঙ্গীন মেযাজের মানুষ। সেই সাথে তারা ছিল বাহাদুর এবং যোদ্ধা।

নবুওয়াতের দশম বছরের পর প্রিয়নবী (সা) তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত প্রদানের জন্য তায়েফ তাশরীফ নিলেন। এ সময় তারা ঔদ্ধত্যের নেশায় শুধুমাত্র হকের দাওয়াতকে প্রত্যাখানই করলো না বরং মানবতার কল্যাণকামী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর সঙ্গে অত্যন্ত অশোভন আচরণ করলো। এই ঘটনার ১২ বছর পর নবম হিজরীতে বিশ্ববাসী এক বিস্ময়কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলো। তারা দেখলো যে, অবাধ্য ও বিদ্রোহী বনু ছাকিফই স্বয়ং নবীর (সা) দরবারে হাজির হচ্ছেন এবং ইসলামের জানবাজ সিপাহী হয়ে যাচ্ছেন। বিশ্বনবীর (সা) ইন্তেকালের পর ধর্মদ্রোহিতার ফিতনা যখন প্রায় সমগ্র আরবকে গ্রাস করে ফেলেছে তখন মক্কার কুরাইশ ও মদীনার আনসাররা ছাড়া তায়েফের এই বনু ছাকিফই সম্পূর্ণরূপে পাথরের মত ইসলামের ওপর অটল ছিল। তারপর ইরান ও সিরিয়ার সাথে যখন সংঘর্ষ শুরু হলো তখন বনু ছাকিফের জওয়ানরাই জিহাদের ময়দানে নিজেদের ত্যাগের এমন কাহিনী সৃষ্টি করলেন যা কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের রক্ত উত্তপ্ত করবে।

বনু ছাকিফের যেসব যুবক ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করেছেন তাদের মধ্যে এক মুজাহিদ হলেন আবু মিহজান ছাকাফী (রা) তাঁর প্রকৃত নাম বিভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের পাওয়া গেছে। কেউ বলেছেন তাঁর নাম হলো আমর। আবার কেউ বলেছেন আবদুল্লাহ। অনেকে বলেছেন তাঁর নাম ছিল মালিক। কিন্তু আবু মাহজান কুনিয়তের ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন। এই কুনিয়ত এত মশহুর হয় যে, লোকজন তাঁর আসল নাম ভুলেই যায়। তাঁর নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

আবু মিহজান (রা) বিন হাবিব বিন আমর বিন উমায়ের বিন আওফ বিন উকদা বিন গাইরাই বিন আওফ ছাকাফী।

ইসলামের অভ্যুদয়ের সময় হযরত আবু মিহজান (রা) বনু ছাকিফের নামকরা বীরদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। তিনি শুধুমাত্র একজন বাহাদুর,

যোদ্ধা এবং দানশীল ব্যক্তিই ছিলেন না বরং একজন উচ্চাঙ্গের কবিও ছিলেন এবং তার বীরত্ব ও কবিত্বের খ্যাতি আরবের দূরদূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি তরবারী চালনা, বর্শা ও তীর নিক্ষেপ এবং অশ্ব চালনায় নজির বিহীন ছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে তিনি শত্রুর ওপর যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তেন তার তুলনা হয় না। তাঁর অশ্ব চালনা ও হামলার ধরন দেখে লোকেরা হাজার হাজার মানুষের ভীড়ের মধ্যেও চিনে নিতেন যে, তিনি আবু মিহজান (রা)। বনু ছাকিফের এই বীর পুরুষ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নিজের গোত্রের সাথে মিলে ইসলামের বিরোধিতায় অগ্রগামী ছিলেন। হুনাইনের যুদ্ধের পর প্রিয়নবী (সা) তায়েফ অবরোধ করলেন। এ সময় আবু মিহজান (রা) অন্যান্য তায়েফবাসীর মত শহর রক্ষার কাজে জোরেশোরে অংশ নিলেন এবং অবরোধকালে যখন মুসলমান জানবাজরা শহরে হামলা করে বসলেন তখন তিনি তাঁদের ওপর তীর ও পাথরের মেঘ বর্ষণ করলেন। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রা) অবরোধের সময় একদিন আবু মিহজানের তীরেই আহত হলেন এবং তীরের এই আঘাত পরে তাঁর জীবন হরণকারী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল।

নবম হিজরীতে নিজের কবিলার সঙ্গে হযরত আবু মিহজানও (রা) ইসলাম গ্রহণের সম্মানে ভূষিত হন। বস্তুত তিনি অনেক শেষে ঈমান এনেছিলেন। এ জন্য রাসূলের (সা) যুগে কোন যুদ্ধে অংশ নেয়ার সুযোগ তাঁর হয়নি। আল্লাহর পথে জিহাদের প্রসঙ্গে তাঁর নাম সর্বপ্রথম জনসমক্ষে আসে হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে। আবু হানিফা দিনাওয়ারী "আখবারুত তাওয়ালে" লিখেছেন যে, হযরত ওমর ফারুক (রা) নিজের খিলাফতের শুরুতে হযরত আবু ওবায়েদ ছাকাফীর (র) নেতৃত্বে যে বাহিনী ইরাকে প্রেরণ করেছিলেন তাতে হযরত আবু মিহজানও (রা) শামিল ছিলেন এবং জাসারের যুদ্ধে ইসলামী বাহিনীর একটি কলামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই যুদ্ধে তাঁর ভাই কায়েস (রা) বিন হাবিবও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। কায়েস (রা) সেই যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করেন। অবশ্য আবু মিহজান বেঁচে গিয়েছিলেন। কিয়াস করা হয় যে, পরে তিনি বুয়েবের যুদ্ধে অংশ নেন এবং বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেন। এটা ছিল জাসারের যুদ্ধের জবাব।

তারপর তাঁর নাম পুনরায় নেপথ্যে চলে যায়। এই অবস্থায় শুরু হয় সেই রক্তাক্ত যুদ্ধ যা ইরানের বেশীর ভাগ ভাগ্যের ফায়সালা করে দেয়। সেই যুদ্ধের নাম হলো কাদেসিয়ার যুদ্ধ। হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে ইরানের বিরুদ্ধে এই লড়াই সংঘটিত হয়েছিল।

চরিতকাররা বর্ণনা করেছেন যে, যে যুগে হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস কাদেসিয়ার দিকে অগ্রাভিযান করছিলেন তখন হযরত আবু মিহজার ছাকাফী (রা) আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুকের (রা) নির্দেশে হাজুজা দ্বীপে নজরবন্দী ছিলেন। তাঁকে কোন অপরাধে দেশ থেকে বহিষ্কার ও বন্দীত্বের শাস্তি দেয়া হয়েছিল ? এ ব্যাপারে সাধারণ বর্ণনা এটাই যে, তিনি বার বার মদ পানের অপরাধ করেছিলেন। ঐতিহাসিকরা ধারাবাহিকতার সাথে বর্ণনা করেছেন যে, তায়েফবাসী আঙ্গুরের আধিক্যের কারণে মদের প্রতি খুব আসক্ত ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি সেই খারাব অভ্যাস ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু তবুও, কখনো কখনো কোন ছাকাফী পুরাতন অভ্যাসে জড়িত হয়ে পড়তো। তার এই তৎপরতা প্রকাশ পেলে তার ওপর হদ জারী হয়ে যেত। অর্থাৎ তাকে বেত্র দন্ড দেয়া হতো। হাফেজ ইবনে হাজার (র) হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) ইমাম বাইহাকী (র) এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় চরিতকারের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আবু মিহজানও (রা) তেমনি ধরনের মানুষের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মদ পানের অভিযোগে তাঁর ওপর কয়েকবার হদ জারী হয়ে ছিল। অবশেষে হযরত ওমর (রা) নিরুপায় হয়ে তাঁকে হাজুজা দ্বীপে অন্তরীন করে রাখেন। হযরত আবু মিহজান (রা) হাজুজাতে থাকা অবস্থায় হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসের সামরিক অভিযানের অবস্থা শুনে হক পথে লড়াই করার জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন এবং কোনভাবে পাহারাদারদের দৃষ্টি এড়িয়ে সোজা ইসলামী বাহিনীতে গিয়ে শামিল হলেন। দেশের অভ্যন্তরে যত ঘটনা ঘটতো তা হযরত ওমর ফারুক (রা) তাড়াতাড়ি পেয়ে যেতেন। তিনি হযরত আবু মিহজানের (রা) পলায়ন ও ইসলামী বাহিনীতে শামিল হওয়ার খবর জানতে পেরে হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসকে আবু মিহজানকে (রা) গ্রেফতার করে কয়েদখানায় নিক্ষেপের কথা লিখে পাঠালেন। সেসময় হযরত সায়াদ (রা) কাদেসিয়া পৌছে গিয়েছিলেন। তিনি আমীরুল মু'মিনীনের (রা) হুকুম তামিলের জন্য হযরত আবু মিহজানকে (রা) গ্রেফতার করেন এবং তাঁর পায়ে বেড়ি দিয়ে নিজের আবাসস্থলের সংলগ্ন একটি পুরাতন মহলের কামরায় আটকে রাখলেন।

কাদেসিয়ার রক্তাক্ত যুদ্ধ শুরু হলো। ইসলামের মুজাহিদদের নারায়ে তাকবির, তরবারীর ঝংকার, ঘোড়ার হ্রেষারব এবং জীবন উৎসর্গকারীদের বীরত্ব গাথা হযরত আবু মিহজানের (রা) কানে এসে বাজতে লাগলো। তখন বীরত্বের আবেগ তাঁকে উত্তেজিত করে তুললো। তিনি উড়ে গিয়ে যুদ্ধের ময়দানে পৌছতে চাইলেন। কিন্তু অসহায় ছিলেন। পায়ের বেড়ি এবং কয়েদখানার মজবুত প্রাচীর তার রাস্তা বন্ধ করে রেখেছিল। এক রেওয়ায়াতে

আছে যে, তিনি হেছড়িয়ে হেছড়িয়ে কয়েদখানার খিড়কির নিকট গেলেন এবং হযরত সায়াদের (রা) নিকট তাঁকে যুদ্ধে শরীক হওয়ার অনুমতি দানের দরখাস্ত করলেন। কিন্তু তিনি হযরত আবু মিহজানের (রা) আবেদন মঞ্জুর করলেন না। তিনি নিরাশায় হাহুতাশ করে ফিরে এসে নিজের স্থানে বসে পড়লেন যুদ্ধের প্রথম দিনতো কোনভাবে অতিক্রান্ত হলো। দ্বিতীয় দিন লড়াই শুরু হলো এবং শত্রু পক্ষ মুসলমানদের ওপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করলো। তখন কয়েদখানার বাতায়ন পথে এই দৃশ্য দেখে হযরত আবু মিহজানের (রা) ধৈর্য-শক্তি সম্পূর্ণরূপে জবাব দিয়ে বসলো। কোনভাবে আওয়াজ দিয়ে হযরত সায়াদের (রা) স্ত্রী সালমা বিনতে হেফসকে খিড়কীর নিকট ডেকে আনলেন এবং অত্যন্ত সুমিষ্ট স্বরে তার নিকট আবেদন করলেন যে, আমার বেড়ি খুলে দাও এবং হাতিয়ার সমেত একটি ঘোড়া আমাকে দিয়ে দাও। তারপর দেখো, আমি আল্লাহর দুশমনদের মুকাবিলায় কি করি। যদি জীবিত থাকি তাহলে আল্লাহর কসম, ফিরে এসে নিজেই বেড়ি পরে নিব। সালমা হযরত সায়াদের (রা) ভয়ে হযরত আবু মিহজানের (রা) কথা শুনতে অস্বীকৃতি জনালেন। তাতে তিনি নিরাশ হয়ে নিজের কুঠরীর দিকে চললেন এবং অত্যন্ত দুঃখের সাথে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন। সাথে সাথে বীরত্বের আবেগে নিজের ঠোঁট দাঁতে চাপছিলেন এবং রানের ওপর হাত মারছিলেন।

হযরত মিহজানের (রা) কবিতা শুনে সালমার (রা) অন্তর খুব কোমল হয়ে গেল। তিনি এটা সহ্য করতে পারছিলেন না যে, বনু ছাকিফের এই বীর কয়েদখানায় বেদনার্ত অবস্থায় পড়ে থাকবে। তিনি তৎক্ষণাৎ বাঁদীকে সঙ্গে নিয়ে জেলখানায় গেলেন এবং হযরত আবু মিহজানের (রা) বেড়ি খুলে দিলেন। তারপর তিনি তাঁকে জেলখানা থেকে আস্তাবলে আনলেন এবং একটি উচ্চ বংশের আরবী ঘোড়া ও হাতিয়ার তাঁর নিকট সোপর্দ করে বললেন ঃ

"আল্লাহর হাওয়ালা, যাও। আমার বিশ্বাস আছে যে, তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি যে কোন অবস্থায় পূরণ করবে।"

হযরত আবু মিহজান (রা) যেন সমগ্র বিশ্বের সম্পদ হাতে পেয়ে গেলেন। মুখ ও মাথার ওপর কাপড় জড়িয়ে নিলেন। ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে জুতার কাঁটা মেরে তাকে উত্তেজিত করলেন এবং বর্শা হাতে নিয়ে এমন শানে ইরানীদের ওপর হামলা করলেন যেন আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। যেদিকে যাচ্ছিলেন সেদিকেই ইরানীদের ব্যূহ তছনছ হয়ে যাচ্ছিল। মুসলমানদের সেই দল যারা ইরানীদের প্রচণ্ড চাপের সামনে পিছিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের জন্য যুদ্ধের ময়দানে এই বীরের আগমন অদৃশ্য সাহায্য থেকে কম ছিল না। আবু মিহজান

(রা) কখনো ইরানীদের বামে ঢুকে পড়ছিলেন। আবার কখনো ডাইনে ধ্বংসলীলা সৃষ্টি করছিলেন। এভাবে তিনি মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধের গতিই পরিবর্তন করে ফেললেন এবং মুসলমানরা নিজেদের মুকাবিলায় ইরানী সৈন্যদেরকে গাজর কাটার মত কেটে যাচ্ছিলেন। হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস সাইটিকা বা অন্য কোন রোগের কারণে নিজে যুদ্ধের ময়দানে যেতে অক্ষম ছিলেন এবং নিকটের একটি পুরাতন ভবনে বসে যুদ্ধের পূর্ণ চিত্র দেখছিলেন। এমন সময় তিনি আবু মিহজানকে (রা) দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ছিলেন এবং মনে মনে বলছিলেন যে, আবু মিহজান (রা) আটক না থাকতো তাহলে আমি এইটাই মনে করতাম যে, এই মুজাহিদ আবু মিহজানই হবেন। কারণ, এভাবে যুদ্ধ সেই করতে পারে। সম্ভবত আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের সাহায্যের জন্য কোন ফেরেশতাকে আসমান থেকে নাযিল করেছেন।

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, সালমা হযরত আবু মিহজানকে (রা) হযরত সায়াদের (রা) ব্যক্তিগত বিশেষ ঘোড়া "বালকা"কে প্রদান করেছিলেন এবং তাতে চড়েই তিনি যুদ্ধের ময়দানে বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। কিন্তু সেই সাথে যখন আমরা অধিকাংশ অন্য রেওয়ায়াতে এটা পড়ি যে, হযরত সায়াদ (রা) শেষ পর্যন্ত না আবু মিহজানকে (রা) চিনতে পেরেছিলেন এবং না ঘোড়াকে চিনতে পেরেছিলেন। তখন ধারণা হয় যে, বালকা ছাড়া ঘোড়াটি অন্য ঘোড়া ছিল। যদি এটা বালকাও হয় তাহলে যুদ্ধের ময়দানের ধূলা-বালির কারণে হযরত সায়াদ (রা) তাকে চিনতে পারেননি।

হাফেজ ইবনে হাজার (রা) ইসাবাতে লিখেছেন যে, আবু মিহজান (রা) সেদিন প্রচন্ড যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি তাকবির দিচ্ছিলেন আর কাফেরদেরকে পটকে পটকে ফেলছিলেন। লোকজন তাকে দেখে বিস্মিত হচ্ছিলেন এবং কেউ তাঁকে চিনতে পারছিলো না। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) এই রেওয়ায়াতে এটুকু বাড়িয়েছেন যে, লোকেরা তাঁকে একজন ফেরেশতা বলে ধারণা করেছিলো।

সন্ধ্যায় যুদ্ধ শেষ হলো। এ সময় হযরত আবু মিহজান (রা) নিজের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ফিরে এলেন। ঘোড়া আস্তাবলে বাঁধলেন এবং কয়েদখানায় গিয়ে নিজের পায়ে নিজেই বেড়ি লাগালেন। এদিকে হযরত সায়াদ (রা) বালাখানা থেকে নীচে নামলেন। তখন সালমা তাঁকে যুদ্ধের ময়দানের খবর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। হযরত সায়াদ (রা) বললেন ঃ

"আমরা দুশমনের সাথে লড়াই করছিলোম। এমন সময় আল্লাহ তায়ালা একটি আবলাক ঘোড়ার ওপর সওয়ার কোন মানুষকে প্রেরণ করেন। (সেই

ব্যক্তি দুশমনের সমুচিত শিক্ষা দিল) আমি যদি আবু মিহজানকে কয়েদ করে না রাখতাম তাহলে আমার ধারণা যে, সেই ব্যক্তি আবু মিহজানের অনুরূপ।"

সালমা (রা) বললেন ঃ "হে আমীর! ইনিতো আবু মিহজানই (রা) ছিলেন।"

হযরত সায়াদ (রা) বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তা কি করে হতে পারে ?"

সালমা (রা) তাঁকে সকল ঘটনা বর্ণনা করলেন। হযরত সায়াদ (রা) খুব প্রভাবিত হলেন এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে বললেন ঃ "আল্লাহর কসম মুসলমানদের জন্য যে ব্যক্তি এত নিবেদিত তাঁকে আমি কয়েদখানায় রাখতে পারি না।"

একথা বলেই তিনি তৎক্ষণাৎ আবু মিহজানকে (রা) মুক্ত করে দিলেন। আবু মিহজানও (রা) মরদে মু'মিন ছিলেন। মুক্ত হয়ে তিনি হযরত সায়াদকে (রা) বললেন ঃ

"হে আমীর! হদের (দন্ড) ভীতি আমাকে মদ পান থেকে বিরত রাখতে পারেনি। কিন্তু আমি আজ আল্লাহর ভয়ে শপথ করছি যে, ভবিষ্যতে কখনো মদ স্পর্শ করবো না।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত সায়াদের (রা) গোলামের মা যাবরা হযরত আবু মিহজানকে (রা) কয়েদ থেকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং ঘোড়াও তিনিই দিয়েছিলেন। আল্লামা বালাজুরী (র) এই বর্ণনাকে সমর্থন করেছেন। হাফেজ ইবনে কাছিরও (রা) সালমার কথা উল্লেখ করেননি। কিন্তু ইবনে জারির তাবারী এবং অন্য অনেক নেতৃস্থানীয় চরিতকার সালমার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে অনেকেতো আরো বাড়িয়ে বলেছেন, সালমা (রা) হযরত আবু মিহজানকে (রা) জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আমীর (সায়াদ) তোমাকে কেন কয়েদ করে রেখেছেন ?

তখন তিনি জবাবে বলেছিলেন ঃ

"আমাকে কোন হারাম বস্তু ব্যবহার করার কারণে কয়েদ করা হয়নি। আমি জাহেলী যুগে মদ পান করতাম এবং যেহেতু কবিও। এ জন্য অবিশ্বাসী সূরের কবিতা কোন কোন সময় মুখ দিয়ে বের হয়ে পড়ে। আর এ কারণেই আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।"

সালমা (রা) ইয়াওমুল আগওয়াছে [কাদেসিয়ার যুদ্ধের সেই দিন যেদিন হযরত আবু মিহজান (রা) জেলখানা থেকে মুক্ত হয়ে অংশ নিয়েছিলেন]-এর পর হযরত সায়াদের (রা) নিকট তাঁর ব্যাপারে সুপারিশ করলেন। তখন

হযরত সায়াদ (রা) সেই সুপারিশ মেনে নিলেন এবং আবু মিহজানকে (রা) মুক্ত করার সময় বললেন ঃ "তোমার কবিতায় যাকিছু বলেছ তার ওপর যতক্ষণ আমল করবে না ততক্ষণ আমি তোমাকে কিছু বলবো না।"

হযরত আবু মিহজান (রা) জবাব দিলেন "আল্লাহর কসম, এমন বেহুদা কথা আমার মুখে আর কখনো আসবে না।"

কাদেসিয়ার যুদ্ধের পর হযরত আবু মিহজান (রা) ইতিহাসের পাতা থেকে বিস্মৃত হয়ে যান এবং তাঁর তৎপরতা ও পেশা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। এমনকি তাঁর মৃত্যুর সাল পর্যন্ত কেউ নির্ধারণ করেননি। অবশ্য অনেক চরিতকারই লিখেছেন যে, তিনি আজারবাইজানে ইন্তেকাল করেন।

দায়েরায়ে মায়ারিফে ইসলামিয়ার "প্রথম খন্ডে" কাদেসিয়ার যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করে হযরত আবু মিহজান (রা) প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এটাও সম্ভব যে আবু মিহজান (রা) উলাইয়াসের (Vologasias) যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু ১৬ হিজরীতে হযরত ওমর (রা) তাকে পুনরায় দেশ থেকে বহিষ্কার করেন এবং নাসে' পাঠিয়ে দেন। কিছু দিন পর তিনি ইন্তেকাল করেন। বর্ণিত আছে যে, তার মাজার আজারবাইজান অথবা জারজানের সীমান্তে অবস্থিত।

এই বর্ণনার আলোকে ধারণা করা যায় যে, হযরত আবু মিহজান (রা) কাদেসিয়ার যুদ্ধের পরপরই ১৬ হিজরীতে ওফাত পান।

হযরত আবু মিহজানের (রা) নির্বাসনের কি কি কারণ ছিল ? এ ব্যাপারে "দায়েরায়ে মায়ারিফে ইসলামে"র লিখক ধারণা প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর কিছু কবিতায় মদের প্রশংসা করা হয়েছিল। হযরত ওমর ফারুক (রা) সেই সব কবিতাকে কুরআনে হাকিমের মদ হারামের নির্দেশের বিরোধী আখ্যায়িত করে কবি [হযরত আবু মিহজানকে (রা)] নির্বাসনের শাস্তি দিয়েছিলেন। (ওয়াল্লাহু আলামু বিসসওয়াব)

হযরত আবু মিহজান (রা) স্বভাবকবি ছিলেন। কাদেসিয়ার যুদ্ধের সময় যে কবিতা তিনি কয়েদখানায় পড়েছিলেন তা ছিল তাঁর স্বভাবজাত সৃষ্টি। হযরত আবু মিহজানের (রা) দিওয়ানও প্রায় একশ' বছর পূর্বে ইউরোপ এবং কায়রোতে প্রকাশিত হয়। তিনি জাহেলিয়াত ও ইসলামী উভয় যুগেই কবিতা রচনা করেছিলেন।

আল্লামা ইবনে আছির (র) হযরত আবু মিহজানের (রা) ব্যাপারে লিখেছেন যে, তিনি অত্যন্ত বাহাদুর, উদার ও দানশীল ছিলেন।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক (রা) অত্যন্ত কঠোর ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। কিন্তু হযরত আবু মিহজান (রা) তাঁর সামনেও নির্ভীকভাবে কথাবার্তা বলতেন। হাফেজ ইবনে হাজার ইসাবাতে লিখেছেন যে, একবার তিনি হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিদমতে এলেন। তখন তাঁর সন্দেহ হলো যে, তিনি মদ পান করেছেন। আমীরুল মু'মিনীন (রা) লোকদেরকে তাঁর মুখ শুঁকতে বললেন। হযরত আবু মিহজান (রা) বললেন, "এটা গোয়েন্দাগিরী এবং আপনাকে তা করতে নিষেধ করা হয়েছে।" একথায় হযরত ওমর ফারুক (রা) তাকে তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিলেন। হযরত আবু মিহজান (রা) হাদীসও বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মুগাফফাল মুযনি

নবম হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ের কথা। এ সময় সিরীয় ব্যবসায়ীদের একটি কাফেলা মদীনা মুনাওয়ারা এলো। এই ব্যবসায়ীরা মদীনাবাসীদেরকে অবহিত করলো যে, রোমের কায়সার মদীনার ওপর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং এই লক্ষ্যে সে একটি বিরাট বাহিনী একত্রিত করেছে। সেই বাহিনীতে কতিপয় অমুসলিম আরবী গোত্র যেমন লাখাম, জাযাম, গাস্সান প্রভৃতিও শামিল রয়েছে। প্রিয়নবী (সা) এই খবর পেলেন। তিনি বললেন, ইনশাআল্লাহ আমরা রোমকদেরকে আরবের মাটিতে পা রাখতে দিব না এবং সামনে অগ্রসর হয়ে আরব সীমান্তে তাদের মুকাবিলা করা হবে। একথা বলার সাথে সাথে তিনি মুসলমানদেরকে দীর্ঘ মরুভূমির সফর এবং জিহাদের প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। সে সময় খরা, দুর্ভিক্ষ এবং প্রচন্ড গরম কিয়ামতের মত অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছিল। উপরন্তু খেজুর পাকার সময়ও নিকটবর্তী হয়ে এসেছিল এবং লোকজন অস্থিরভাবে ফল পাকার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এই অবস্থায় দূরদরাজের সফর (যাতে মনযিলের পর মনযিল পর্যন্ত পানিও পাওয়া যেত না) ছিল বড় কঠিন কাজ। তবুও মু'মিনরা যেই মহানবীর (সা) নির্দেশ শুনলেন তাঁরা সবকিছু ভুলে গেলেন এবং নবীজীর (সা) আহ্বানে সাড়া দিয়ে পাগলের মত জিহাদের প্রস্তুতিতে মশগুল হয়ে গেলেন। সে সময় হুজুর (সা) যখন মুসলমানদেরকে ধন-সম্পদ কুরবানীর উৎসাহ দিলেন তখন তাঁরা ত্যাগ ও কুরবানীর এমন উদাহরণ পেশ করলেন যা বিশ্ব এর আগে আর কখনো প্রত্যক্ষ করেনি। সাইয়েদেনা সিদ্দিকে আকবার (রা) ঘরে ঝাড়ু থেকে শুরু করে সুই সূতা পর্যন্ত এনে হক পথে পেশ করলেন। সাইয়েদেনা ওমর ফারুক (রা) গৃহের অর্ধেক মাল-মাত্তা এনে রাসূলের (সা) নিকট পেশ করে দিলেন। হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রা) এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা, নশ' উট এবং একশ ঘোড়া সাজসরঞ্জাম সহ দান করে দিলেন। হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ ৪০ হাজার রৌপ্য মুদ্রা পেশ করলেন। এমনিভাবে অন্যান্য সাহাবা ও সাহাবীয়াতও (রা) আল্লাহর পথে খরচে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অংশ নিলেন। এমনকি মহিলারা নিজের গহনা পর্যন্ত খুলে দিয়ে দিলেন। কিন্তু আল্লাহর সেই পবিত্র বান্দাদের মধ্যে এমন কিছু মানুষও ছিলেন যারা নিজেদের অক্ষমতা ও বিত্ত বৈভব না থাকার কারণে যেমন সওয়ারীর ব্যবস্থা করতে পারছিলেন না তেমনি পাথেয়ও সংগ্রহ করতে পারছিলেন না। অন্যদিকে তাঁদের ঈমানী

আবেগ ও জিহাদের আগ্রহের অবস্থাটা এমন ছিল যে, ঘরে বসে থাকাটা কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। অন্যান্য মুসলমান ভাইদের যুদ্ধ প্রস্তুতি দেখে তাদের অন্তর বেদনার্ত হয়ে উঠছিল। এমনি ধরনের কিছু অসহায় সাহাবী (রা) রাসূলের (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমাদের অবস্থা আপনার অজানা নয়। আমাদের না আছে সওয়ারী । না আমরা পাথেয় সংগ্রহের ক্ষমতাও রাখি। হুজুর (সা) যদি তার বন্দোবস্ত করে দেন তাহলে আমরাও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর সৌভাগ্য লাভ করতে পারবো।"

যেহেতু সৈন্য সংখ্যা ছিল খুব বেশী এবং সওয়ারী ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম ছিল খুব কম, সেহেতু হুজুর (সা) তাঁদের দরখাস্ত অনুমোদনে ক্ষমা চাইলেন। সওয়ারী ও পাথেয় ছাড়া মরুভূমিতে দীর্ঘ সফর করাটা ছিল মানবীয় শক্তি বহির্ভূত ব্যাপার। এ জন্য প্রিয় নবীর (সা) নিকট থেকে পরিষ্কার জবাব পেয়ে তারা ভগ্ন হৃদয় হয়ে পড়লেন এবং নিজেদের বঞ্চনার জন্য নিরাশ হয়ে কাঁদতে লাগলেন। তাঁদের ইখলাসপূর্ণ জযবা আল্লাহর এতো পছন্দ হলো যে, তাঁদের পক্ষে সূরায়ে তাওবাতে আয়াত নাযিল হলো ঃ

وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ اَجِدُ مَآ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ص تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ـ

"অনুরূপভাবে তাদের সম্পর্কেও আপত্তি করার কিছু নেই—যারা নিজেরা এসে তোমার নিকট যানবাহনের ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য আবেদন করেছিল, আর তুমি বলেছ যে, আমি তোমাদের যানবাহনের ব্যবস্থা করতে পারছি না, তার ফলে তারা বাধ্য হয়ে ফিরে গেল। আর অবস্থা এই ছিল যে, তাদের চক্ষু থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল, তাদের বড় মনোকষ্ট ছিল এই কারণে যে, নিজেদের ব্যয় বহনে জিহাদে শরীক হওয়ার সামর্থ তাদের নেই।"(আত-তাওবা ঃ ৯২)

সেই মুখলিস মু'মিনদের মধ্যে মুযনিয়া গোত্রের এক ব্যক্তিও ছিলেন। ধূলি ধূসরিত মলিন পোশাক তাঁর অসহায়ত্বের কথাই প্রকাশ করছিল। কিন্তু তাঁর চেহারায় সৌভাগ্যের দীপ্তি এমনভাবে চমকাচ্ছিলো যে কেউ তা অবলোকন করে প্রভাবিত না হয়ে পারে না। তাঁর এই অসহায়ত্ব এবং চোখে

অশ্রু দেখে মদীনার নেক ও বুজুর্গ ব্যক্তি ইবনে আইমান (রা) জিজ্ঞেস করলেন যে, এই কান্নাকাটি কেন? তিনি বললেন, জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য হুজুরের (সা) নিকট সওয়ারী চেয়েছিলাম, কিন্তু তা পাইনি। আমি সফরের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করতেও সক্ষম নই। অতএব, আমার দুর্ভাগ্যের জন্য কাঁদছি।

একথা শুনে ইবনে আইমান (রা) তাঁকে একটি উট এবং কিছু খেজুর উপঢৌকন হিসেবে পেশ করলেন। আশাতীতভাবে সওয়ারী ও পাথেয় পেয়ে সেই সাহাবী (রা) এত খুশী হলেন যে, পা আর মাটিতে ধরে না। অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে ইসলামী বাহিনীতে গিয়ে শামিল হলেন এবং মদীনা থেকে তাবুক পর্যন্ত রহমতে দোআলমের (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার মর্যাদা লাভ করলেন। রাসূলের (সা) এই সাহাবী (রা) যাঁর ঈমানী জোশ এবং ইখলাসের আবেগকে আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত শক্তিশালী ভাষায় প্রশংসা করেছিলেন এবং যাঁর আন্তরিক আকাংখা পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা নিজের অন্য আরেকজন নেক বান্দাকে ওসিলা বানিয়েছিলেন—তিনি ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মুগাফ্ফাল।

সাইয়েদেনা আবু সাঈদ আবদুল্লাহ (রা) বিন মুগাফ্ফাল মুযনিয়া গোত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। মুযনিয়া গোত্র ছিল মুদিরের মশহুর শাখা। হযরত কা'ব (রা) বিন যুহায়েরও এই কবিলার মানুষ ছিলেন। তিনি একটি কবিতাতে নিজের মুযনি হওয়ার জন্য এমনিভাবে গৌরব প্রকাশ করেন ঃ

هُمُ الاصل مِنِّى حَيْثُ كُنْتُ وَاِنَّنِى

مِنَ الْمُزْنِيِّيْنَ الْمُصْفِيْنَ بِالْكَرَامِ

"যেখানেই আমি থাকবো সেখানেই তারা বুজুর্গ হবে। নিসন্দেহে আমি শরীক ও সম্ভ্রান্ত মুযনীদের একজন।"

এই কবিলা নজদে বসবাস করতো এবং হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মুগাফ্ফালও সেখানকার বাসিন্দা ছিলেন। নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

আবদুল্লাহ (রা) বিন মুগাফফাল বিন আবদি নাহাম বিন আফিফ বিন সাহাম বিন রবিয়া বিন আদি বিন ছালাবা বিন যাদিব বিন সায়াদ বিন আদি বিন ওসমান বিন মুযনিয়া।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মুগাফ্ফাল ৬ষ্ঠ হিজরীতে ইসলাম গ্রহণের মর্যাদা লাভ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের কিছু দিন পরই (৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে) প্রিয়নবী (সা) ওমরার জন্য মক্কা রওয়ানা হন। এ সফরে

চৌদ্দশ' সাহাবী (রা) রাসূলের (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন। তাদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্ফালও শামিল ছিলেন। হুজুর (সা) যখন জানতে পেলেন যে, মক্কার কুরাইশরা মুসলমানদেরকে বাধা দানের ইচ্ছা পোষণ করছে তখন তিনি হুদাইবিয়া নামক স্থানে তাবু ফেললেন। সেখানেই "বাইয়াতে রিদওয়ানের" মহান ঘটনা সংঘটিত হয়। সে সময় উপস্থিত সকল সাহাবা (রা) হুজুরের (সা) পবিত্র হাতে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে জীবন উৎসর্গ করার বাইয়াত করেন। হযরত আবদুল্লাহও (রা) এই সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং এমনিভাবে তিনি সেই ভাগ্যবান সাহাবীদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন যাঁদেরকে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট ভাষায় নিজের সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিয়েছিলেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর খায়বারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত আবদুল্লাহ (রা) এই যুদ্ধেও বীরের মত অংশ নেন। সহীহ বুখারীতে তাঁর থেকে এই ঘটনা উল্লেখ আছে যে, আমরা খায়বার অবরোধ করে রেখেছিলাম। আমিও অবরোধকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। অবরোধকালে জনৈক ব্যক্তি চর্বি ভর্তি থলি ওপর থেকে নিক্ষেপ করলো। আমি তা ওঠানোর জন্য সামনে অগ্রসর হলাম। কিন্তু যখন দেখলাম যে, প্রিয়নবী (সা) তা দেখছেন তখন আমি খুব লজ্জিত হলাম।

মক্কা বিজয়ের (অষ্টম হিজরী) সময় হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মুগাফ্ফাল সেই দশ হাজার "পবিত্র আত্মার" অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা সে সময় মহানবীর (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

সহীহ বুখারীতে তার থেকে বর্ণিত আছে যে, মক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) দেখলাম যে, তিনি উটনীর ওপর সওয়ার ছিলেন এবং সূরায়ে ফাতাহ পাঠ করছিলেন এবং তা পুনরায় পাঠ করছিলেন। বুখারীরই আরেক রেওয়ায়াতে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, মক্কা বিজেয়র দিন প্রিয় নবী (সা) মক্কা প্রবেশ করলেন। সে সময় কা'বা গৃহে ৩৬০ টি মূর্তি ছিল। তিনি তাদেরকে হাতের ছড়ি দিয়ে মেরে মেরে বলছিলেন ঃ

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ط جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يَبدأ الْبَاطِل وَمَا يُعِيدُ ط

নবম হিজরীতে তাবুকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সে সময় হযরত আবদুল্লাহ (রা) যে ইখলাস ও ঈমানী আবেগ প্রদর্শন করেছিলেন তার উল্লেখ উপরে করা হয়েছে। তিনি নিজের জীবন উৎসর্গের আবেগ এবং দ্বীনের প্রশ্নে ইসলামের জন্য নবীর (সা) দরবারে নৈকট্য হাসিল করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর

কয়েক বছর পর্যন্ত মদীনা মুনাওয়ারা অবস্থান করে নবীর ফয়েজ লাভ করতে থাকেন। এমনকি বিজ্ঞ সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে যান। একাদশ হিজরীতে মহানবী (সা) ওফাত হলে হযরত আবদুল্লাহর (রা) ওপর দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে। আল্লামা ইবনে সায়াদ বর্ণনা করেছেন যে, হুজুরের (সা) ইন্তেকালের পর হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মুগাফ্ফাল মদীনা ত্যাগ করেন এবং স্বদেশে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। হযরত ওমর ফারুকের খিলাফতকালে বসরা আবাদ হলো। সে সময় আমীরুল মু'মিনীন কতিপয় এমন মানুষ অনুসন্ধান করছিলেন যারা সেখানকার বাসিন্দাদেরকে কুরআন-হাদীস এবং ফিকাহর মাসয়ালা-মাসায়েল তালিম দিতে পারেন। তখন তাঁর দৃষ্টি পড়ে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মুগাফ্ফালের ওপর। তিনি তাঁকে অন্য আরো পাঁচজন সাহাবার (রা) সাথে বসরাবাসীকে তালিম ও প্রশিক্ষণের কাজে নিয়োগ করেছিলেন।

আমীরুল মু'মিনিনের (রা) নির্দেশ পালনার্থে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বসরাতে চলে গেলেন। কিন্তু তাঁর অন্তর সবসময় জিহাদের উৎসাহে উদ্বেলিত থাকতো। জিহাদের এই আকাংখা তাকে সুস্থির হয়ে বসে থাকতে দিত না। কিছুদিন পর ইরাক গমনকারী মুজাহিদের দলে শামিল হয়ে গেলেন এবং ইরানী বাহিনীর বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে নিজের জীবন উৎসর্গের নিপুণতা প্রদর্শন করলেন। সতের হিজরীতে বসরার শাসক হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) খুজিস্তানে সেনা অভিযান চালালেন। তখন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মুগাফ্ফালও সেই বাহিনীতে শামিল হয়ে গেলেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) "আল-ইসতিয়াবে" লিখেছেন যে, খুজিস্তানের সদর শোস্তারে মুসলমানরা যখন প্রবেশ করলেন তখন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মুগাফফাল শহরে প্রবেশকারী মুজাহিদদের মধ্যে সর্বাগ্রে ছিলেন। এমনিভাবে ইরাকের কয়েকটি যুদ্ধে সৌর্যবীর্য প্রদর্শনের পর হযরত আবদুল্লাহ (রা) বসরা ফিরে এলেন এবং পূর্বেকার নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষা প্রদান ও ফতওয়া দানের কাজে মশগুল হয়ে গেলেন। ৫৯ অথবা ৬০ হিজরীতে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। যখন বেঁচে থাকার আর কোন আশা রইলো না তখন পরিবার-পরিজনকে গোসলের শেষ পানিতে কর্পূর মেশাতে, গোসলের সময় শুধু মাত্র বন্ধু-বান্ধব উপস্থিত থাকতে এবং রাসূলের (সা) সাহাবী যেন গোসল দেয় এই ওসিয়ত করলেন। কাফনে দুই চাদর এবং একটি কামিসের কথা বললেন। কেননা, রাসূলের (সা) কাফন এমনি ছিল। জানাযার পেছনে যেন আগুন জ্বালানো না হয়, একথাও তিনি বলেছিলেন। ইবনে সায়াদ বর্ণনা করেছেন যে, সে সময় হযরত আবদুল্লাহ (রা) এই ওসিয়তও করেছিলেন যে, বসরার শাসক ওবায়দুল্লাহ যেন তাঁর নামাযে জানাযায় শরীক না হয়।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) পরপারের ডাকে সাড়া দিলে তাঁর উত্তরাধিকাররা তাঁর ওসিয়তের ওপর পুরাপুরি আমল করলো। যখন জানাযা ওঠানো হলো তখন ইবনে যিয়াদ অপেক্ষা করছিলো। তাকে হযরত আবদুল্লাহর (রা) ওসয়িত সম্পর্কে অবহিত করা হলে কিছুদূর জানাযার সঙ্গে গিয়ে ফিরে গেল। জালিলুল কদর সাহাবী হযরত আবু বুরযাহ আসলামী (রা) জানাযার নামায পড়ালেন এবং সেই মহান সাহাবীকে বসরার মাটিতে দাফন করে দেয়া হলো। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র)-এর বর্ণনা অনুযায়ী মৃত্যুর সময় তিনি সাত পুত্র রেখে গিয়েছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মুগাফ্ফাল জ্ঞান ও বদান্যতার দিক থেকে অত্যন্ত উঁচু মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন। তাঁর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বের আন্দাজ এ থেকেই করা যায় যে, হযরত ওমর ফারুকের (রা) মত ব্যক্তিত্বও তাঁকে বসরাবাসীর শিক্ষা প্রদান ও প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) থেকে ৪৩ টি হাদীস বর্ণিত আছে। তাঁর শাগরিদ বা শিষ্যদের মধ্যে হযরত খাজা হাসান বসরী (র), হযরত সাঈদ (র) বিন জোবায়ের, হযরত হামিদ (র) বিন হিলাল এবং হযরত মাতরাব (র) বিন আবদুল্লাহর নাম উল্লেখযোগ্য।

হযরত আবদুল্লাহর (রা) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রাসূল প্রেম, জিহাদের প্রতি উৎসাহ, দ্বীনের প্রতি আন্তরিকতা, রাসূলের (সা) আদর্শের প্রতি আনুগত্য এবং বিদায়াত থেকে দূরে থাকাটা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লোকদেরকে অত্যন্ত সুন্দর ও আনন্দ চিত্তে হুজুরের (সা) ইরশাদসমূহ শোনাতেন এবং সেই সব কাজ থেকে বিরত থাকতে বলতেন যা হুজুর (সা) পসন্দ করেননি। সহীহ বুখারীতে তার থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি এক ব্যক্তিকে পাথর নিক্ষেপরত অবস্থায় দেখলাম। তখন আমি তাকে বললাম যে, পাথর নিক্ষেপ করো না। রাসূলুল্লাহ (সা) এটা করতে নিষেধ করেছেন। আমি তাঁকে একথা বলতে শুনেছি যে, পাথর থেকে না শিকার মারা যায়, না কোন দুশমন আহত হয়। অবশ্য কারোর দাঁত ভেঙ্গে যাবে অথবা চোখ কানা হয়ে যাবে। কিছু দিন পর আমি তাকে পুনরায় ইট মারতে দেখলাম। এ সময় বললাম যে, আমি কি তোমাকে রাসূলের (সা) হাদীস বর্ণনা করিনি। তবুও ইট মারছো। যাও, আমি তোমার সঙ্গে এতদিন কথা বলবো না।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে (র) হযরত আবদুল্লাহর (রা) পুত্র থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি নিজের পিতা থেকে বিদয়াতকে বেশী খারাপ মনে করতে আর কাউকে দেখিনি। একবার আমি নামাযে উচ্চৈসরে বিসমিল্লাহ পড়লাম। যখন সালাম ফিরালাম তখন পিতা বললেন, বেটা, ইসলামে কথা

বাড়িও না। আমি রাসূলুল্লাহ (সা), আবু বকর (রা), ওমর (রা) এবং ওসমানের (রা) পেছনে নামায পড়েছি। তাঁদের মধ্যে কেউই নামাযে 'বিসমিল্লাহ' উচ্চে স্বরে পড়তেন না।

সুনানে আবু দাউদে হযরত আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হেদায়াত করেছেন যে, তোমাদের মধ্যে থেকে কেউই যেন অবশ্যই নিজের গোসলখানায় প্রথমে পেশাব না করে। এবং পেশাব করার পর গোসল ও ওজু না করে। কারণ বেশীর ভাগ সন্দেহ পেশাব থেকেই হয়ে থাকে। মোটকথা, হযরত আবদুল্লাহ (রা) এমনিভাবে লোকদেরকে হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনিয়ে শুনিয়ে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সচ্চরিত্র ও সুন্দর সমাজের তালিম দিয়ে গেছেন।

হযরত হানজালা (রা) বিন রুবাই তামিমী

বিশ্বনবীর (সা) নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্বে আরবের তমসাচ্ছন্ন সমাজে কয়েকজন এমন সুন্দর প্রকৃতির মানুষও ছিলেন যারা তাওহীদের প্রবক্তা ছিলেন এবং ইহুদী ও খৃষ্টানদের কথাসমূহ শুনে শেষ নবীর (সা) আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন। এই ধরনের লোকদের মধ্যে বনু তামিমের এক বুজুর্গ আকছাম বিন সাইফীও ছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ১৯০ বছর এবং নিজের হিকমত ও বিদ্যার ভিত্তিতে সমগ্র আরবে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি প্রায়ই লোকদেরকে আরবে আল্লাহর শেষ রাসূলের (সা) শুভাগমনের খবর দিতেন।

মহানবীর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির পর দাওয়াতে হক প্রদান শুরু করলেন। এ সময় আকছামের কানেও তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির খবর পৌঁছলো। তাঁর অন্তর সাক্ষ্য দিল যে, এই সেই নবী যাঁর আরব ভূমিতে আবির্ভাব হওয়ার কথা ছিল। তিনি মক্কার ইয়াতিম নবীর (সা) নিকট একটি পত্র প্রেরণ করলেন। এই পত্রে তিনি তাঁর দাওয়াতের বিস্তারিত জানতে চাইলেন। হুজুর (সা) সেই পত্রের জবাব আকছামকে প্রেরণ করলেন। তিনি এই জবাব পাঠ করে যারপর নাই আনন্দিত হলেন। তাঁর অন্তর প্রদেশের গভীরে ঈমানের আলো প্রোজ্জ্বলিত হয়ে গেল এবং তিনি সমগ্র গোত্রবাসীকে ডেকে পাঠালেন। যখন সকলে একত্রিত হলো তখন তাঁদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে আমার পুত্ররা! আমার কথা গভীরভাবে শোনো। মক্কায় কুরাইশের যে ব্যক্তি লোকদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে থাকেন এবং দাবী করেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। বাস্তবিকই তিনি আল্লাহর সাচ্চা রাসূল। তোমরা কাল বিলম্ব না করে তাঁর দিকে অগ্রসর হও এবং তাঁকে আকড়ে ধরো। তাতেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। দেখো, আরবের অন্যান্যরা যেন তোমাদের ওপর বাজী নিয়ে না যায়।"

উপস্থিতদের মধ্যে বনু তামিমের অন্যতম নেতা মালিক বিন নুয়াইরাও ছিলো। আকছামের একথা তার নিকট অসহনীয় মনে হলো। সে লোকদেরকে বললো, বুড়োর কথা শুনো না। তার খাতিরে আমরা নিজেদের পিতা ও পিতামহের ধর্ম কেন পরিত্যাগ করবো?

মালিকের কথা শুনে লোকজন বিশৃংখল হয়ে গেল। তা সত্ত্বেও আকছামের একপুত্র, এক ভ্রাতুষ্পুত্র এবং অন্য কতিপয় সুন্দর স্বভাবের তামিমী আকছামের

কথায় খুব প্রভাবিত হলো এবং তারা আকছামকে বললো যে, আপনি আমাদেরকে যে পরামর্শ দিয়েছেন তার ওপর আমরা অবশ্যই আমল করবো।

হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) বর্ণনা করেছেন যে, তারা স্বদেশ থেকে মক্কা রওয়ানা হয়ে গেলেন। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে তারা সে সময় মহানবীর (সা) নিকট পৌছতে পারেননি। অবশ্য কিছু দিন পর আকছাম বিন সাইফীর ভ্রাতুষ্পুত্র কোন না কোন উপায়ে রহমতে আলমের (সা) খিদমতে পৌঁছে গেলেন এবং অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে ঈমান আনয়ন করলেন। বনু তামিম গোত্রের আকছাম বিন সাইফীর এই সৌভাগ্যবান ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন হযরত হানজালা (রা) বিন রুবাই।

সাইয়েদেনা হযরত হানজালা (রা) বিন রুবাই জালিলুল কদর সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। তাঁর কুনিয়ত ছিল আবু রাবয়ী। তিনি হাকিমে আরব আকছাম বিন সাইফী তামিমীর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ হানজালা (রা) বিন রুবাই বিন সাইফী বিন রিয়াহ বিন হারিছ বিন মাখাশিন বিন মাবিয়া বিন শরীফ বিন জারওয়া বিন উসাইদ বিন আমর বিন তামিম।

হযরত হানজালার (রা) ইসলাম গ্রহণের কাল সম্পর্কে নির্ভরতার সাথে কিছু বলা যায় না। তবুও চরিতকাররা ধারণা প্রকাশ করেছেন যে, তিনি নবীর (সা) নবুয়াতের প্রাথমিক যুগে ঈমান আনয়ন করেছিলেন। কেননা, আকছাম বিন সাইফী দীর্ঘদিন থেকে তাদের পরিবারের লোকজনের নিকট প্রিয় নবীর (সা) আবির্ভাবের খবর দিয়ে আসছিলেন।

হযরত হানজালা (রা) নিজের স্বদেশভূমি পরিত্যাগ করে কোন্ সময় হতে মদীনায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন ? চরিত গ্রন্থসমূহেও এই প্রশ্নের কোন স্পষ্ট জবাব পাওয়া যায় না। অবশ্য সকল ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার সাথে একথা বর্ণনা করেছেন যে, হযরত হানজালা (রা) লিখাপড়ায় খুবই যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন এবং মহানবী (সা) তাঁর ওপর গভীর আস্থা পোষণ করতেন। ইবনে আছির (র) "উসুদুল গাব্বাহ"-তে লিখেছেন যে, প্রিয় নবী (সা) হযরত হানজালাকে (রা) লিখনীর দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন এবং তিনি রাসূলের (সা) পক্ষ থেকে শাসক, সরদার এবং অন্যান্য লোকের নিকট প্রেরিত পত্রাবলী লিখতেন। এ জন্য তিনি কাতিবে রাসূল বা রাসূলের লিখক উপাধিতে মশহুর হয়ে গিয়েছিলেন। অন্যান্য চরিতকাররাও রাসূলের দরবারের লিখকদের মধ্যে হযরত হানজালার (রা) নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

হযরত হানজালা (রা) শুধুমাত্র কলমই পিষতেন না। বরং হক পথের একজন জানবাজ মুজাহিদও ছিলেন। চরিতকাররা যদিও তাঁর তরবারী দিয়ে

যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ দেননি। তবুও কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি কয়েকটি যুদ্ধে রহমতে আলমের (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে স্বয়ং হযরত হানজালা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা রাসূলের (সা) সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করতাম। এক যুদ্ধে আমরা দেখলাম যে, একজন মহিলা নিহত হয়ে পড়ে রয়েছে। লোকজন মহিলাটির লাশের চারপাশে ভিড় জমিয়েছে। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে তাশরীফ নিলেন। এ সময় লোকজন একদিকে সরে গেলো। হুজুর (সা) লাশ দেখে বললেন, "এই মহিলাতো যুদ্ধে শরীক ছিল না।" অতপর তিনি এক ব্যক্তিকে দিয়ে হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের নিকট এই নির্দেশ প্রেরণ করলেন যে, যুদ্ধে মহিলা ও শিশুদেরকে কখনো হত্যা করো না।

ইবনে আছির বর্ণনা করেছেন যে, তায়েফের যুদ্ধের পূর্বে রাসূলে আকরাম (সা) হযরত হানজালাকে (রা) এই দায়িত্ব অর্পণ করেন যে, তিনি তায়েফ-বাসীর নিকট গমন করবেন এবং মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করতে প্রস্তুত কিনা সে ব্যাপারে তাদের মনোভাব যাচাই করবেন। হযরত হানজালা (রা) তায়েফ গিয়ে সেখানকার নেতৃস্থানীয় লোকদের সঙ্গে মিলিত হলেন। কিন্তু তিনি তাদেরকে ঘোড়ার ওপর সওয়ার অবস্থায় পেলেন। হযরত হানজালা (রা) ফিরে এসে হুজুরের (সা) নিকট তাদের বিদ্রোহমূলক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করলেন। তখন তিনি (সা) তায়েফ অবরোধের নির্দেশ দিলেন। এই রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত হানজালা (রা) একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন। এ জন্য সাইয়েদুল আনাম (সা) দূতগিরীর মত নাযুক কাজের দায়িত্ব তাঁর কাঁধে অর্পণ করে ছিলেন।

আল্লাহ তায়ালা হযরত হানজালাকে (রা) অত্যন্ত অনুভূতিশীল স্বভাব দান করেছিলেন। সহীহ মুসলিম ও মিশকাতে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, (একবার) হযরত আবু বকরের (রা) সাথে আমার সাক্ষাত হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হানজালা কি অবস্থা ? আমি বললাম, হে আবু বকর (রা), (কি বলবো) আমার তো মনে হয় যে, আমি মুনাফেকীর রোগে গ্রেফতার হয়ে গেছি। হযরত আবু বকর (রা) বিস্মিত হয়ে বললেন যে, সুবহান আল্লাহ, এটা তুমি কি বলছো। আমি বললাম, (ঠিকই বলছি কেননা) আমরা যখন রাসূলের (সা) খিদমতে হাজির হই তখন মনে হয় যে, জান্নাত ও দোজখ যেন আমাদের সামনে রয়েছে এবং আমরা তার দৃশ্যাবলী নিজের চোখ দিয়ে অবলোকন করছি। কিন্তু আমরা যখন তাঁর মজলিস থেকে উঠে বাইরে গমন করি তখন পুনরায় বিবি, বাচ্চা এবং ধন-সম্পদের কিস্‌সায় মেতে উঠি এবং তাঁর (সা) ইরশাদ ভুলে যাই।

একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা) বললেন ঃ আল্লাহর কসম, এ ব্যাপার তো আমার বেলায়ও প্রযোজ্য। তারপর আমি ও আবু বকর (রা) দু'জনেই রাসূলের (সা) নিকট রওয়ানা দিলাম এবং তাঁর পবিত্র খিদমতে উপস্থিত হলাম। আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! হানজালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার ? আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যখন আপনার খিদমতে হাজির হই এবং আপনি আমাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দেন তখন অনুভব করি যেন আমরা তা নিজের চোখে দেখছি। কিন্তু যেই আপনার নিকট থেকে উঠে যাই তখন পুনরায় সেই বিবি-বাচ্চা এবং জমির আকর্ষণে ডুবে যাই এবং আপনার ইরশাদ ও হেদায়াতের বেশীর ভাগই ভুলে যাই। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "সেই সত্ত্বার কসম, যার হাতে আমার জীবন রয়েছে, সবসময় যদি তোমাদের এই অবস্থা থাকে যা আমার মজলিশে হয় তাহলে ফেরেশতা তোমাদের বিছানা ও রাস্তায় প্রকাশ্যে মুসাফা করবে। কিন্তু হে হানজালা, সময় সময়েরই কথা (সাআতান ওয়া সাআতান) এই বাক্য তিনবার ইরশাদ করলেন।"

হাদীসের ব্যাখ্যাকারীরা লিখেছেন, হযরত হানজালা (রা) মজলিশে নববীতে অবস্থানকালে নিজের অন্তরের অবস্থার যে চিত্র পেশ করেছেন শরীয়াতের পরিভাষায় তাকে ইহসান বলা হয়। যা বাস্তবত ইয়াকিনেরই একটি মনযিল। তারপর আর কোন মনযিল নেই। তারপর যত সোপান পাওয়া যায় তা ইহসানের মর্যাদাতেই পাওয়া যায়। সাইয়েদুল মুরসালিনের (সা) পবিত্র সুহবত বা সাহচর্যে ইহসানের মর্যাদা প্রথম কদমেই হাসিল হয়ে যেত। হুজুর (সা) এটা পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন যে, আমার সাহচর্যে তোমাদের অন্তরে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তা যদি স্থায়ী হয় তাহলে তোমরা তা বরদাশত করতে পারবে না। এভাবে তোমরা মানুষের দুনিয়া থেকে বের হয়ে ফেরেশতার দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। অথচ শরীয়াতের লক্ষ্য হলো মনুষত্বের পূর্ণতা দান। মূল কলব বা অন্তর নয়। তোমাদের ওপর বিবি-বাচ্চারও অধিকার রয়েছে।

বিশ্বনবীর (সা) ওফাতের পর হযরত হানজালা (রা) কলম পরিত্যাগ করে তরবারী হাতে তুলে নেন এবং জিহাদের ময়দানে পৌঁছে যান। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে কাদেসিয়ার রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে হযরত হানজালা (রা) জীবন বাজী রেখে অংশ নেন। কুফা আবাদ হলে তিনি সেখানে বসবাস শুরু করেন। উষ্ট্রের যুদ্ধের পর কুফা থেকে কারফেসা চলে যান এবং সেখানেই হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার (রা) শাসনকালে পরপারে যাত্রা করেন। হযরত হানজালা (রা) থেকে আটটি হাদীস বর্ণিত আছে।

হযরত আমর (রা) বিন মুররাহ জুহানী

নবুয়াত প্রাপ্তির প্রথম যুগের কথা। একদিন এক বেদুইন বিশ্বনবীর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে এই আরজ করলেন ঃ

"হে ইবনে আবদুল মুত্তালিব! আমি গত হজ্জের সময় মক্কা এলে এক বিস্ময়কর ধরনের স্বপ্ন দেখেছিলাম। শুয়ে আমি এই দৃশ্য দেখলাম যে, একটি নূর বা আলো কা'বা থেকে বের হয়ে ইয়াছরাবের পাহাড় পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে এবং জুহাইনা কবিলাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। অতপর আমি সেই নূর থেকে একটি আওয়াজ শুনলাম যে অন্ধকারের মেঘ সরে গেল। আলো ছড়িয়ে পড়লো। শেষ নবী তাশরীফ নিলেন। তারপর এক দ্রুত গতিসম্পন্ন আলোর আবির্ভাব ঘটলো। সেই আলোতে হিরার মহল এবং মাদায়েনের সাদা মহল দেখা যেতে লাগলো। সে সময় আমার কানে এই আওয়াজ এলো যে ইসলামের আগমন ঘটেছে। মূর্তি ভেঙ্গে পড়েছে এবং আত্মীয়তার বন্ধনের যুগ এসে গেছে।"

এই স্বপ্ন দেখে আমার ওপর ভীতি ছেয়ে গেল এবং আমি নিজের কওমের লোকদের (যারা আমার সাথে হজ্জের জন্য মক্কা এসেছিল) নিকট স্বপ্নের বৃত্তান্ত বর্ণনা করলাম। তারাও খুব বিস্মিত হলো। হজ্জ শেষে আমরা যখন নিজেদের গোত্রে ফিরে গেলাম তখন শুনতে পেলাম যে, আপনি লোকদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে থাকেন এবং মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। এখন আমি আপনার নিকট এটা জানতে এসেছি যে, আপনি কিসের দাওয়াত দিয়ে থাকেন।

হুজুর (সা) বেদুঈনের কথা খুব মনোযোগের সাথে শুনলেন এবং বললেন ঃ

"ভাই! আমি প্রেরিত নবী এবং আল্লাহর সকল বান্দাকে ইসলামের দিকে ডাকার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া মূর্তিপূজা পরিত্যাগ ও একক আল্লাহর ইবাদাত করা এবং আত্মীয়তার বন্ধন মজবুত করার নির্দেশ দানের জন্যও আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি এই দাওয়াত কবুল করবে যে জান্নাতের হকদার হবে এবং যে তা প্রত্যাখ্যান করবে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। তোমরা আমার দাওয়াত কবুল করলে জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে যাবে।"

হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে বেদুঈন নির্ভাবনায় আরজ করলো ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার ওপর ঈমান এনেছি এবং যে দাওয়াত আপনি দিয়ে থাকেন তা আমি সত্য অন্তরে গ্রহণ করছি। যদিও আরবের সকল স্থানে তার বিরোধিতা চলছে।"

এই বেদুঈন যিনি সেই সময় তাওহীদের ঝাণ্ডা উঁচু করে ধরেছিলেন—তিনি ছিলেন হযরত আমর (রা) বিন মুররাহ জুহানী।

হযরত আবু মরিয়ম আমর (রা) বিন মুররাহর সম্পর্ক ছিল বনু জাহনিয়ার সঙ্গে। নসবনামা হলো ঃ

আমর (রা) বিন মুররাহ বিন আবাস বিন মালিক বিন হারিছ বিন মাযিন বিন সায়াদ বিন মালিক বিন রিফায়াহ নাসার বিন মালিক বিন গাতফান বিন কায়েস বিন জুহনিয়াহ।

হযরত আমর (রা) স্বগোত্রের নেতৃস্থানীয় মানুষ হিসেবে পরিগণিত হতেন এবং লোকজন তাঁকে খুব মান্য করতো। কবিতা রচনার ক্ষমতাও রাখতেন। ইসলামের মহান নিয়ামতে পূর্ণ হওয়ার পর হুজুরের (সা) সামনে একটি কবিতা পাঠ করেন। কবিতাটি হলো ঃ

شهدت بان اللّه حق وانني لا لهة الاحجار اوّضل تارك

فشمّرتُ عَن ساق الازارَمُهاجر اليك اَدُبُّ الغور بعد الدكادك

لاصحب خير النّاس نَفسًا ووالدًا رسولُ مليك الباس فوق الحبائك

"আমি একথার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ এক এবং আমি পাথরের মাবুদদেরকে সর্বপ্রথম পেছনে নিক্ষেপ করছি। আমি অত্যন্ত তৎপরতার সাথে আপনার দিকে হিজরত করেছি। (অথবা আমি হিজরতের জন্য লুঙ্গি পায়ের গোছার ওপরে তুলে নিয়েছি।) আমি কঠিন রাস্তা দিয়ে আপনার দিকে অগ্রসর হচ্ছি যাতে সেই সত্ত্বার নৈকট্যের মর্যাদা লাভ ঘটে। যে সত্ত্বা স্বয়ং এবং বংশের দিক থেকেও সকল লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম। যমীন ও আসমানের মালিকের রাসূল (সা)। যিনি সকল নেকী থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ।"

এ কবিতা শুনে মহানবীর (সা) পবিত্র চেহারায় খুশীর হিল্লোল বয়ে গেল এবং তিনি বললেন ঃ "হে আমর ! তোমার শুভ হোক (অথবা শাবাস হে

আমর)।" হযরত আমর (রা) আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আপনি আমাকে নিজের কওমে গিয়ে তাবলীগ করার অনুমতি প্রদান করুন। সম্ভবত আল্লাহ তায়ালা আমার মাধ্যমে তাদের ওপর ইহসান করতে পারেন। যেমন তিনি আপনার মাধ্যমে আমার ওপর ইহসান করেছেন।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "হাঁ, তুমি নিজের কওমকে হেদায়াতের দাওয়াত দিতে পার।"

হযরত আমর (রা) হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে খুব খুশী হলেন। যখন হুজুর (সা) থেকে বিদায় হচ্ছিলেন তখন তিনি বললেন ঃ "আমর (রা) আমার কয়েকটি কথা স্মরণ রাখবে এবং সকল অবস্থাতেই তার ওপর আমল করবে। কথাগুলো হলো ঃ সবসময় নরম ব্যবহার করবে। কঠোরতা করবে না। কারোর সাথে বিদ্বেষ পোষণ করবে না। স্বার্থপরতা ও তাকাব্বরী থেকে দূরে থাকবে। নিজের আলোচনায় তিক্ত মেজাজ ও অভদ্র আচরণ করবে না।"

হযরত আমর (রা) হুজরের (সা) ইরশাদসমূহের ওপর আমলের প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং নিজের কওমের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

হযরত আমর (রা) স্বগোত্রে পৌঁছে সর্বপ্রথম তিনি সেই মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেন যে মূর্তি পূজা করতেন। তারপর তিনি সকল মানুষকে একত্রিত করলেন এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে বনু রুফায়া, হে বনু জুহানিয়া, আমি তোমাদের নিকটে আল্লাহর রাসূলের (সা) পক্ষ থেকে দূত হয়ে এসেছি এবং তোমাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। হত্যা, লুট এবং রক্তাক্ত ঘটনা পরিত্যাগের পরামর্শ দিচ্ছি। পরস্পর আত্মীয়তার বন্ধন মজবুত কর। একক আল্লাহর ইবাদাত কর এবং মূর্তিদেরকে পরিত্যাগ কর। যে আমার দাওয়াতে সাড়া দেবে তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত রয়েছে। আর যে তা প্রত্যাখ্যান করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। হে আমার জুহানি ভাইয়েরা! আরব গোত্রসমূহে এখনো তোমাদের একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। অন্যরা দু'সহোদরাকে এক সাথে স্ত্রী করে রাখে এবং পিতার মৃত্যুর পর পুত্র সতালো মা'কে শাদী করে থাকে। কিন্তু তোমরা সবসময় এসব বস্তুকে খারাপ মনে করে আসছো। এখন তোমরা আল্লাহর সাচ্চা রাসূলের (সা) আনুগত্য করলে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ তোমাদের অংশে আসবে।"

হযরত আমরের (রা) কথায় এমন কিছু তাছির ছিল যে, এক ব্যক্তি ছাড়া সমগ্র কবিলা কিছু দিনের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করে ফেললো। এই ব্যক্তি খুব কঠোর হৃদয়ের মানুষ ছিল। হযরত আমরকে (রা) বলতো ঃ

"হে আমর বিন মুররাহ, তোর জীবন দুঃখপূর্ণ হয়ে যাবে। তুই কি আমাদের মাবুদদেরকে পরিত্যাগ করতে বলিস। তুই কি চাস যে, আমরা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাই। তুই কি চাস যে, আমরা নিজেদের পিতা ও পিতামহের দ্বীনের বিরোধিতা করি। তিহামার এই বাসিন্দা কুরাশী [মুহাম্মাদ (সা)] আমাদেরকে কিসের দিকে আহ্বান করে থাকে। যাতে না আছে কোন কারামত এবং না আছে কোন শরাফত।"

"আমর বিন মুররাহর কথা শান্তিকামী মানুষেরা পসন্দ করবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমর বিন মুররার কথা ও কাজ একদিন ভুল বলে প্রমাণিত হবে। যদিও তা প্রমাণিত হতে কিছু সময় লাগবে।

—সে আমাদের অতীত বুজর্গদেরকে বেওকুফ ঠাওরাতে চায় এবং যে অতীত বুজর্গদের সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করে সে কখনো কল্যাণের মুখ দেখতে পারে না।"

হযরত আমর (রা) বিন মুররাহ সেই অকর্মা লোকের কথার জবাবে বলেছিলেন ঃ

"আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী হবে, আল্লাহ তার আরাম আয়েশকে দুঃখে পূর্ণ, তার চোখকে অন্ধ এবং তাকে বোবা করে দেবেন।"

হাফেজ ইবনে কাছির নিজের "ইতিহাসে" স্বয়ং হযরত আমর (রা) বিন মুররাহর এই বর্ণনা নকল করেছেন যে, আল্লাহর কসম, এই ব্যক্তি সেই সময় পর্যন্ত মরেনি যতক্ষণ পর্যন্ত সে বোবা, কালা এবং অন্ধ হয়নি এবং তার মুখ গলে গলে খসে পড়েনি। এটা তার জন্য এমন মুসিবতের ছিল, যা তাকে খাবার খাওয়া থেকেও বঞ্চিত করে রেখেছিল।

কিছুদিন পর হযরত আমর (রা) বিন মুররাহ নিজের গোত্রকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলের (সা) দরবারে হাজির হলেন। হুজুর (সা) তাদের জীবনের বরকত ও রিযিকে প্রশস্ততা দানের দোয়া করলেন এবং তাঁদের জন্য একটি ফরমান লিখে দিলেন। সেই ফরমানের সার সংক্ষেপ হলো ঃ

"হে জুহাইনার মুসলমানেরা! তোমাদের জন্য জুহাইনার সমগ্র যমীন নরম এবং প্রস্তরময়, ঝরণা ও প্রান্তরে পূর্ণ হবে। তোমরা যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিজেদের পশু চরাও এবং যেখানে পানি পাও তা ব্যবহারে আনো। শর্ত হলো গনিমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ দেবে এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে থাকবে এবং ভেড়া-বকরীর দুই পাল একত্রিত হলে (অর্থাৎ একশ বিশ বকরী হলে) দুই বকরী বের করে নেয়া হবে। আর যদি এক পাল হয়, তাহরে ৪০

থেকে এক বকরী বের করে নেয়া হবে। জমিতে কর্ষণকারী গরুর ওপর কোন সাদকা নেই এবং কোন কূপ থেকে জমিতে পানি দানকারী উটের ওপরও কোন সাদকা নেই।"

এই ফরমান থেকে স্পষ্ট হয় যে, তা সেই সময় লিখা হয়েছিল যখন হুজুর (সা) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা তাশরীফ নিয়েছিলেন এবং ইসলাম একটি বিজয়ী শক্তির রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এখানে প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, হযরত আমর (রা) বিন মুররাহর ইসলাম গ্রহণের সঠিক সময় কোনটা ছিল? আল্লামা ইবনে আছির (রা) উসুদুল গাব্বাহতে লিখেছেন যে, তিনি নবীর হিজরতের পূর্বে মক্কা এসে সেই সময় ঈমান আনায়নের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন যখন মুশরিকরা ইসলাম বিরোধিতার তুফান সৃষ্টি করে রেখেছিল। কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার (র) "ইসাবাতে" এই বর্ণনা করেছেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আমর (রা) বিন মুররাহ সাইয়েদেনা হযরত মুয়াজ (রা) বিন জাবালের নিকট থেকে পবিত্র কুরআন শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং তারপর নিজের কবিলাতে ফিরে গিয়ে লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। তাঁর তাবলিগী প্রচেষ্টার ফলে সমগ্র কবিলা কিছু দিনের মধ্যেই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন। যদি হাফেজ ইবনে হাজারের (র) রেওয়ায়াত সঠিক বলে মনে করে নেয়া হয় তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় যে, হযরত আমর (রা) বিন মুররাহ নবীর হিজরতের পর মদীনা এসে ইসলাম কবুল করেছিলেন। এই দুই রেওয়ায়াতের সামঞ্জস্য এভাবে হতে পারে যে, হযরত আমর (রা) বিন মুররাহ নবীর হিজরতের পূর্বে মক্কা গিয়ে ইসলাম কবুল করেন এবং স্বদেশে ফিরে যান। নবীর হিজরতের পর তিনি পুনরায় হুজুরের (সা) খিদমতে মদীনা আসেন। হযরত মুয়াজ (রা) বিন জাবাল থেকে কুরআন তালিম হাসিল করেন এবং পুনরায় নিজের কবিলায় ফিরে গিয়ে তাকেও মুসলমান বানান। তারপর নিজের গোত্রকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলের দরবারে উপস্থিত হন এবং ওপরে উদ্ধৃত ফরমান লাভ করেন।

নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা হযরত আমর (রা) বিন মুররাহর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা রাসূলের (সা) যুগে হযরত আমর (রা) বিন মুররাহর অন্যান্য তৎপরতার উল্লেখ করেননি। অবশ্য "তাবকাতুল কাবিরে" আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) কাতিবুল ওয়াকেদী এতটুকুন লিখেছেন যে, আমর (রা) বিন মুররাহর আল্লাহর পথে জিহাদের সৌভাগ্যেও হয়েছিল। তা থেকে এই উপসংহারই টানা যায় যে, হযরত আমর (রা) বিন মুররাহ নবীর কতিপয় যুদ্ধে অবশ্যই অংশ নিয়ে থাকবেন। মাখদুম মুহাম্মাদ হাশেম সিন্ধী (র) নিজের পুস্তক "বাজলুল কুওয়াত"-এ লিখেছেন, হুজুর (সা)

সপ্তম হিজরীতে এক অভিযানে হযরত আমর (রা) বিন মুররাহর নেতৃত্বে নিজের চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ান বিন হারিছ বিন আবদুল মুত্তালিবের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। তিনি জুহাইনাহ ও মুযনিয়ার কিছু বন্ধুর সাথে সেই অভিযানে গিয়েছিলেন এবং বিরোধী পক্ষকে পরাজিত করে ফিরে এলেন। (আবু সুফিয়ান মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।) হযরত ওমর ফারুকের (রা) শাসনামলে সিরিয়া বিজয় হয়। তখন অনেক সাহাবায়ে কিরাম (রা) সিরিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আমর (রা) বিন মুররাহও শামিল ছিলেন। সিরিয়ায় তাঁর জীবনের দিন-রাতগুলো লোকদেরকে কুরআন-সুন্নাত এবং ন্যায় ও অন্যান্য সম্পর্কে শিক্ষা দিতে দিতেই কাটতো। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অত্যন্ত কোমল হৃদয় দান করেছিলেন। আল্লাহর সৃষ্টির সেবা ও কল্যাণ কামনাকে নিজের ঈমানের অংশ হিসেবে মনে করতেন। হাফেজ ইবনে হাজার (র) "ইসাবাতে" লিখেছেন, একবার তিনি আমীরে মুয়াবিয়ার (রা) নিকটে গিয়ে এই হাদীস বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূল (সা) থেকে শুনেছি যে, যে ইমাম (শাসক) অভাবগ্রস্ত, বন্ধু এবং দরিদ্রদের জন্য নিজের দরজা বন্ধ করে দেবে তাহলে আল্লাহ তায়ালাও তার অভাব ও দোয়ার জন্য আসমানের দরজা বন্ধ করে দেবেন।

আমীর মুয়াবিয়া (রা) এই হাদীস অত্যন্ত গভীরভাবে শুনলেন এবং তৎক্ষণাৎ এক বিশেষ অফিসার নিয়োগ করলেন। সেই অফিসার লোকদের প্রয়োজন বা অভাব সম্পর্কে জানতেন এবং তা পূরণ করতেন।

হযরত আমর (রা) বিন মুররাহ দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন এবং উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের শাসনামলের কোন এক সময় পরপারের ডাকে সাড়া দেন।

হযরত আমর (রা) বিন মুররাহর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দ্বীনের প্রতি আন্তরিকতা ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক। নিজের কবিতায় অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে ইসলামের গৌরব প্রকাশ করতেন। একটি কবিতায় তিনি বলেছেন ঃ

"আমি তাকওয়ার হাওজে সাতার কেটেছি এবং জীবনের সমস্যাসমূহ থেকে সহীহ সালামতে বের হয়ে এসেছি। আমি ধৈর্যের পোশাক পরিধান করেছি এবং পথভ্রষ্টতার মা আমার ইচ্ছার নিকট নিরাশ হয়ে গেছে।"

হযরত সায়াদুল আসওয়াদ সাহামী (রা)

দয়ার সাগর বিশ্বনবী (সা) নিজের কয়েকজন জাননিছারের মজলিসে তাশরীফ রেখেছিলেন। এমন সময় কুৎসিত ও বিশ্রী চেহারার একজন কৃষ্ণকায় ব্যক্তি ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় তার খিদমতে হাজির হলো এবং আরজ করলো ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! যেমন আপনি দেখছেন। আমি একজন বিশ্রী ও কৃষ্ণকায় মানুষ। লোকজন আমাকে দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়। আমার মত দেখতে কুৎসিত মানুষও কি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে ?"

মহানবী (সা) তাঁর ওপর স্নেহ ও দয়ার দৃষ্টিতে তাকালেন এবং বললেন ঃ "সেই সত্তার কসম, যার কুদরতী কব্জায় আমার জীবন রয়েছে। তোমাকে তোমার বিশ্রী চেহারা এবং কৃষ্ণবর্ণ জান্নাতে প্রবেশে অবশ্যই বাধা দেবে না। কিন্তু শর্ত হলো যে, আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার রিসালাতের ওপর ঈমান আনো।"

হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে সেই ব্যক্তির চেহারা আনন্দের আতিশয্যে ঝলমল করে উঠলো এবং তাঁর মুখ দিয়ে অযাচিতভাবে কালেমায় শাহাদাত উচ্চারিত হয়ে গেল। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি রাসূলের (সা) নিকট আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার কি কি অধিকার রয়েছে ?"

তিনি বললেন ঃ "অন্য মুসলমানের যে যে অধিকার আছে সেই সেই অধিকার তোমারও রয়েছে এবং তোমার ওপর সেই সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে যা অন্যান্য মুসলমানের আছে এবং তুমি তাদের ভাই হও।"

এই কৃষ্ণকায় বিশ্রী চেহারার মানুষ ইসলাম গ্রহণের কারণে যাকে স্বয়ং সাইয়েদুল মুরসালিন (সা) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন—তিনি হলেন হযরত সায়াদুল আসওয়াদ (রা)।

হযরত সায়াদুল আসওয়াদের আসল নাম তো ছিল সায়াদ। কিন্তু অসাধারণ কালো হওয়ার কারণে লোকেরা তাকে "সায়াদুল আসওয়াদ" অথবা "আসওয়াদ" বলতেন (যেমন আমাদের দেশে কৃষ্ণকায় মানুষকে লোকেরা কালো অথবা কালা বলে সম্বোধন করে থাকে)। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা হযরত সায়াদুল আসওয়াদের (রা) নসবনামা বর্ণনা করেননি। অবশ্য

ধারাবাহিকতার সাথে একথা লিখেছেন যে, তিনি কুরাইশের বনু সাহাম গোত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন [প্রখ্যাত সাহাবী মিসর বিজেতা হযরত আমর (রা) ইবনুল আছও এই কবিলাভুক্ত ছিলেন]। তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাল সম্পর্কেও কোন পুস্তকে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি। তবে, বিভিন্ন কার্যকারণ সম্বন্ধে জানা যায় যে, তিনি সেই সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন যখন হুজুর (সা) হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারা তাশরীফ নিয়েছিলেন এবং গাযওয়া ও সারিয়্যা শুরু হয়েছিল।

আল্লামা ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর (সেই মজলিসেই অথবা অন্য এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী কিছু দিন পর) হযরত সায়াদুল আসওয়াদ (রা) রাসূলের (সা) নিকট আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমি বিয়ে করতে চাই। কিন্তু কোন ব্যক্তি আমার বিশ্রী চেহারার কারণে মেয়ে দিতে সম্মত হয় না। আমি অনেক লোকের নিকট শাদীর পয়গাম প্রেরণ করেছি। কিন্তু সকলেই তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তাদের মধ্যে কিছু এখানে উপস্থিত আছে এবং কিছু অনুপস্থিত রয়েছে।"

প্রিয় নবী (সা) জানতেন যে, এই কৃষ্ণকায় ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা নূরানী স্বভাব দান করেছেন এবং ঈমানী আবেগ ও দ্বীনের প্রতি আন্তরিকতার দিক থেকেও তার মর্যাদা অনেক উচ্চে।

হুজুর (সা) ছিলেন আপাদমস্তক রহমতের আধার। অসহায় ও অভাবগ্রস্তদের তিনি ছিলেন আশ্রয়স্থল। নিজের একজন জাননিছারের অসহায়মূলক নিবেদন শুনে তার দয়ার প্রকৃতি স্থির থাকতে পারলো না। তিনি এটা মেনে নিতে পারলেন না, বাহ্যিক রূপ ও সৌন্দর্য না থাকার কারণে লোকজন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করছে। তিনি বললেন ঃ "সায়াদ, ঘাবড়ে যেয়ো না। আমি নিজে তোমার বিয়ের বন্দোবস্ত করছি। তুমি এক্ষুণি আমর (রা) বিন ওয়াহাব ছাকাফীর গৃহে যাও এবং সালামের পর তাকে বলো যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আপনার কন্যার বিয়ে আমার সঙ্গে দিয়ে দিয়েছেন।"

হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে হযরত সায়াদুল আসওয়াদ (রা) আনন্দ চিত্তে হযরত আমর (রা) বিন ওয়াহাবের বাড়ীর দিকে চললেন।

হযরত আমর (রা) বিন ওয়াহাব ছাকাফী নতুন মুসলমান হয়েছিলেন। তখনো তার মেযাজে জাহেলী যুগের রুক্ষতা বিদ্যমান ছিল। হযরত সায়াদ (রা) তার বাড়ী পৌঁছে তাকে মহানবীর ফরমান সম্পর্কে অবহিত করলেন। তাতে তিনি খুব বিস্মিত হলেন। তিনি চিন্তা করলেন যে, তার মেধাবিনী ও সুন্দরী কন্যার বিয়ে এ ধরনের বিশ্রী চেহারার মানুষের সঙ্গে কি করে হতে

পারে ? তিনি কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই হযরত সায়াদের (রা) পয়গাম প্রত্যাখ্যান করলেন এবং অত্যন্ত কঠোতার সাথে তাকে ফিরে যেতে বললেন। ভাগ্যবতী কন্যা হযরত সায়াদ (রা) ও নিজের পিতার আলাপ-আলোচনা শুনে ফেলেছিল। যেই হযরত সায়াদ (রা) ফিরে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালেন, তক্ষুণি তিনি দরজার কাছে এলেন এবং বললেন ঃ "আল্লাহর বান্দাহ, ফিরে এসো। যদি বাস্তবিকই রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে প্রেরণ করে থাকেন, তাহলে আমি আনন্দের সাথে তোমার সঙ্গে বিয়ের জন্য প্রস্তুত আছি। যার ওপর আল্লাহ এবং তার রাসূল (সা) সন্তুষ্ট, আমিও তার ওপর সন্তুষ্ট আছি।"

ইত্যবসরে হযরত সায়াদ (রা) সামনে অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি কন্যার কথা শুনেছিলেন কি শুনেছিলেন না তা জানা যায়নি। যাহোক, রাসূলের (সা) দরবারে হাজির হয়ে সমগ্র ঘটনা বর্ণনা করে দিলেন। ওদিকে তাঁর চলে যাওয়ার পর নেক বখত কন্যা নিজের পিতাকে বললেন ঃ "আব্বা, প্রথম কথা হলো আল্লাহ আপনাকে অপমানিত করুন। আপনি আপনার নাজাতের চেষ্টা করুন। আপনি অত্যন্ত খারাপ কাজ করেছেন যে, আপনি রাসূলের (সা) ফরমানের পরওয়া করেননি এবং হুজুরের (সা) প্রেরিত ব্যক্তির সাথে কঠোর আচরণ করেছেন।"

আমর (রা) বিন ওয়াহাব কন্যার কথা শুনে নিজের অস্বীকৃতির জন্য খুব লজ্জিত হলেন এবং ভীত কম্পিত হৃদয়ে নবীর দরবারে হাজির হলেন। হুজুর (সা) তাকে দেখে বললেন ঃ

"তুমিই আমার প্রেরিত ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলে।" আমর (রা) বিন ওয়াহাব আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল, অবশ্যই আমি সেই ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এই ভুল অজ্ঞতার কারণে হয়ে গেছে। আমি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জানতাম না। এ জন্য তার কথার ওপর আস্থা আনতে পারিনি এবং তার প্রস্তাব মঞ্জুর করিনি। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি আমার কন্যার বিয়ে সেই ব্যক্তির সঙ্গে আনন্দের সাথে মঞ্জুর করছি।"

হুজুর (সা) হযরত আমর (রা) বিন ওয়াহাবে ওজর কবুল করে নিলেন এবং হযরত সায়াদুল আসওয়াদকে (রা) সম্বোধন করে বললেন ঃ

"সায়াদ আমি তোমার আকদ বিনতে আমর বিন ওয়াহাবের সঙ্গে করে দিয়েছি। এখন তুমি নিজের স্ত্রীর নিকট গমন কর।"

বিশ্বনবীর ইরশাদ শুনে হযরত সায়াদ (রা) যারপর নাই খুশী হলেন। নবীর (সা) নিকট থেকে উঠে সোজা বাজারে গেলেন এবং নববধূর জন্য কিছু উপঢৌকন কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু তখনো কিছু কিনেননি। এমন

সময় তার কানে একজন আওয়াজ দানকারী আওয়াজ দিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ "হে আল্লাহর অশ্বারোহী, জিহাদের জন্য সওয়ার হয়ে যাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর।"

সায়াদ (রা) ছিলেন যুবক। নতুন নতুন বিয়ে হয়েছে। অন্তরে হাজার ধরনের কামনা-বাসনা ও আশা-আকাংখা ছিল। বারবার নিরাশার পর শাদীর আনন্দের খবর কানে শুনেছিলেন। কিন্তু আওয়াজ দানকারীর আওয়াজ শুনে সকল আবেগের ওপর ঈমানী আবেগ বিজয়ী হলো এবং বধূর জন্য উপঢৌকন কেনার ধারণা সম্পূর্ণরূপে উবে গেল। যে অংকের অর্থ এ জন্য সঙ্গে এনেছিলেন তা দিয়ে ঘোড়া, তরবারী ও বর্শা ক্রয় করলেন এবং মাথায় পাগড়ী বেধে মহানবী (সা) নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধে গমনকারী মুজাহিদদের দলে শামিল হয়ে গেলেন। এর পূর্বে তাঁর কাছে না ছিল ঘোড়া, বর্শা ও তরবারী। তিনি কখনো এমনভাবে পাগড়ীও বাঁধেননি। এ জন্য কেউ জানতেও পারেননি যে তিনি সায়াদুল আসওয়াদ (রা)। জিহাদের ময়দানে পৌছে সায়াদ (রা) এমন আবেগ ও বীরত্বের সাথে লড়াই করলেন যে, বড় বড় বাহাদুরও তার পেছনে পড়ে গেলেন। একবার ঘোড়া দাঁড়িয়ে গেল। এ সময় তিনি তার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়লেন এবং আস্তিন গুটিয়ে পায়ে হেঁটেই যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। সে সময় হুজুর (সা) তার হাতের কালো রং দেখে চিনে ফেললেন এবং "সায়াদ" বলে ডাক দিলেন। কিন্তু সায়াদ (রা) সে সময় দুনিয়ায় কি ঘটছে সে সম্পর্কে ছিলেন বেখবর। তিনি এমন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে লড়াই করছিলেন যে, মহানবীর (সা) আওয়াজ বা ডাকও তিনি শুনতে পেলেন না। এমনিভাবে লড়াই করতে করতে তিনি শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন এবং নববধূর পরিবর্তে জান্নাতের হুরদের কোলে পৌছে গেলেন।

প্রিয় নবী (সা) হযরত সায়াদের (রা) শাহাদাতের খবর পেয়ে তাঁর লাশের পাশে তশরীফ নিলেন। তার মাথা নিজের কোলে রেখে মাগফিরাত কামনা করলেন এবং বললেন ঃ "আমি সায়াদের (রা) আকদ বা বিয়ে আমর বিন ওয়াহাবের কন্যার সাথে দিয়েছিলাম। এ জন্য তার পরিত্যক্ত সামানের মালিক সেই কন্যাই হবে। সায়াদের (রা) হাতিয়ার ও ঘোড়া তার নিকটই পৌছে দাও এবং তার পিতা-মাতার নিকট গিয়ে বলো যে, এখন আল্লাহ তোমাদের কন্যার চেয়ে উত্তম কন্যা সায়াদকে দিয়েছেন এবং জান্নাতে তার বিয়ে হয়ে গেছে।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত সায়াদুল আসওয়াদ (রা) এই নশ্বর জগতে অল্পদিনই ছিলেন। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি নিজের ঈমানী জোশ ও আমলের আন্তরিকতার যে চিত্র ইতিহাসের পাতায় রেখে গেছেন তা উম্মতে মুসলিমার জন্য চিরকাল মশাল হয়ে থাকবে।

হযরত সুরাকা (রা) বিন জু'শামু মুদলিজী

রহমতে আলম (সা) হুনাইন ও তায়েফের যুদ্ধ (অষ্টম হিজরী) থেকে ফারেগ হওয়ার পর জি'রালা নামক স্থানে কয়েকদিন অবস্থান করলেন এবং তারপর মদীনা প্রত্যাবর্তন করলেন। সেই সময় বিরাট বপু বিশিষ্ট এক বেদুঈনের মদীনা আগমন ঘটলো। এই ব্যক্তি সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজের অতীত জীবনের ক্ষতিপূরণের জন্য প্রিয় নবীর (সা) ফয়েজ ও বরকত থেকে যতদূর সম্ভব উপকৃত হতে চেয়েছিলেন। সুতরাং তার বেশীরভাগ সময় রাসূলের (সা) নিকট কাটতো এবং তিনি প্রায়ই হুজুরের (সা) নিকট দ্বীনি মাসয়ালা-মাসায়েল জিজ্ঞেস করতেন। মহানবীও (সা) তাঁকে খুব স্নেহ করতেন এবং তাঁর তালিম ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। একবার তিনি (সা) তাঁকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"জাহান্নামী এবং জান্নাতীর আলামত কি তা জানো ?"

তিনি আরজ করলেন, "আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আপনিই বলুন।"

মহানবী (সা) বললেন, "সেই ব্যক্তি হলো জাহান্নামী যে তাকাব্বরী করে। যার মেজাজ রুক্ষ এবং যে অহংকারের সাথে চলাফেরা করে। আর জান্নাতী সেই (ঈমানদার ব্যক্তি) যে দুর্বল ও অভাবগ্রস্ত।"

আরো একবার সেই ব্যক্তি হুজুরের (সা) নিকট জিজ্ঞেস করেছিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার উটের জন্য একটি হাওজে পানি ভরেছি। এমন সময় যদি কোন পথভ্রষ্ট উট আমার হাওজের ওপর এসে পড়ে তাহলে সেই পথভ্রষ্ট উটকে পানি পান করানোতে আমার কি কোন সওয়াব হবে ?"

হুজুর (সা) বললেন ঃ " কেন নয়। যে কোন জীবিত প্রাণীকে পানি পান করানো সওয়াবের কারণ হয়ে থাকে।"

মোটকথা সেই ব্যক্তি অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে নবীর (সা) ফয়েজ লাভের ধারা অব্যাহত রাখলেন। এমনকি আল্লাহ তায়ালার রিসালাত সূর্যের স্নেহ ছায়ায় বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন—এই রাসূলের (সা) সাহাবী যার অন্তরে দ্বীনের শিক্ষা লাভের এমন বাসনা ছিল এবং যাকে মহানবী (সা) অসাধারণ স্নেহ প্রদর্শন করেছিলেন তিনি হলেন হযরত সুরাকা (রা) বিন জু'শামু মুদলিজী।

হযরত সুরাকা (রা) জু'শামু ইসলামের ইতিহাসে এক নামকরা ব্যক্তিত্ব। তার পিতার নাম ছিল মালিক এবং দাদার নাম জু'শামু। যেহেতু আরবে পিতার পরিবর্তে দাদার দিকে পুত্রত্বের সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট করার প্রথাও রয়েছে সে জন্য চরিতকারগণ তার নাম সুরাকা (রা) বিন মালিক এবং সুরাকা (রা) বিন জু'শামু দু'ভাবেই লিখেছেন। স্বয়ং হযরত সুরাকা (রা) থেকে যে রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে তাতে তিনি নিজেকে সুরাকা (রা) বিন জু'শামুই বলেছেন। হযরত সুরাকার (রা) কুনিয়ত বা ডাক নাম আবু সুফিয়ান ছিল এবং তার সম্পর্ক কিনানার শাখা বনু মুদলিজের সাথে ছিল। নসব নামা নিম্নরূপ ঃ

সুরাকা (রা) বিন মালিক বিন জু'শামু বিন মালিক বিন আমর বিন তাইম বিন মুদলিজ বিন মুররাহ বিন আবদি মানাত বিন আলী বিন কিনানা।

মক্কা-মদীনার সড়কে কাদিদের নিকটে বনু মুদলিজ এলাকা অবস্থিত ছিল। সুরাকা (রা) স্বগোত্রের সরদার এবং বিরাট বপুর মানুষ ছিলেন। কাব্য ও কবিত্বের জ্ঞানও রাখতেন এবং তার বীরত্ব ও অশ্বারোহণের খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত ছিল। বনু মুদলিজ ছিল মূর্তিপূজার সরদার। তারা "লাত"-কে নিজেদের মহান মা'বুদ বানিয়ে রেখেছিল। রহমতে আলম (সা) তের বছর পর্যন্ত মক্কাবাসী ও আরবের অন্যান্য গোত্রকে তাওহীদের দাওয়াত প্রদান করেন। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে খুব কম মানুষেরই হক কবুলের সৌভাগ্য লাভ ঘটেছিল। এই সময় হুজুর (সা) আরবে "সাহিবে কুরাইশ" লকবে মশহুর হয়ে গিয়েছিলেন। বনু মুদলিজও হুজুরের (সা) নবুয়তপ্রাপ্তি সম্পর্কে জানতে পেরেছিল এবং তাদের কানেও তাঁর দাওয়াত গিয়ে পৌঁছেছিল। কিন্তু তারা নিজেদের বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করাটা মেনে নিতে পারলো না এবং কুফর ও শিরকের ভ্রান্ত পথে পথভ্রষ্ট অবস্থায় চলতে লাগলো।

নবুয়াতের চতুর্দশ বছরে প্রিয়নবী (সা) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) এবং হযরত আমের (রা) বিন ফাহিরা সহ হিজরতের সফর শুরু করলেন। আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের চোখের ওপর পট্টি লাগিয়ে দিলেন এবং হুজুর (সা) তাদের মধ্য থেকে বের হয়ে মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলেন। মক্কার কাফেররা যখন তাঁর হিজরতের খবর জানতে পেল তখন ছটফট করতে লাগলো এবং তারা তাঁকে খুঁজে বের করার জন্য রাত-দিন একাকার করে ফেললো। যখন নিজেদের অনুসন্ধান ও চেষ্টায় ব্যর্থ হলো তখন তারা মক্কা থেকে মদীনা পর্যন্ত যত পরিচিত ও অপরিচিত রাস্তা এবং তাতে আবাদ বস্তিসমূহে ঘোষণা করে দিল যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সা) ও আবু বকরকে (রা) জীবিত গ্রেফতার করে আমাদের হাওয়ালা করে দেবে অথবা তাঁদেরকে হত্যা

করে আমাদেরকে ইতমিনান করে দেবে তাহলে তাদের প্রত্যেককে পূর্ণ দিয়্যত দেয়া হবে।"(অর্থাৎ শত শত উট পুরস্কার হিসেবে দেয়া হবে।)—সহীহ বুখারী

মক্কার কুরাইশদের কাসিদরা বনু মুদলিজ পর্যন্তও এই ঘোষণা পৌছে দিল। এ সময় সুরাকা (রা) নিজের গোত্র বনু মুদলিজের মজলিশে বসে ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি দৌড়াতে দৌড়াতে এসে বললো, এক্ষুণি আমি সমুদ্রোপকূলে কিছু ছায়া দেখেছি। আমার ধারণা, সে মুহাম্মাদের (সা) সাথী হবে। সুরাকা (রা) ছিলেন খুব ধীসম্পন্ন ও দূরদর্শী মানুষ। তিনি বুঝে ফেললেন যে, ঐ লোকটির ধারণা সঠিক। তা সত্ত্বেও তিনি মুসলিহাতান সেই ব্যক্তির বক্তব্যের স্বীকৃতি দিলেন না। বরং তিনি একথা বলে প্রত্যাখ্যান করলেন যে, তারা অমুক অমুক ব্যক্তি হবে। কিছুক্ষণ পূর্বে তারা আমাদের সামনে দিয়েই চলে গেছে। এই প্রত্যাখ্যানের উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি নিজের কবিলার অন্য কোন মানুষকে শরীক করা ছাড়া একাই পুরস্কার লাভ করতে চেয়েছিলেন। সুতরাং মজলিসে কিছুক্ষণ বসার পর বাড়ী গেলেন। অস্ত্র সজ্জিত হয়ে নিজের ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে চুপিসারে বাড়ীর খিড়কী দরজা দিয়ে সমুদ্রোপকূলের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। অন্য আরেক রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি নিজের বিশ্বস্ত দাসীকে বললেন, আমার ঘোড়া তৈরী করে এবং তুনীর বেঁধে অমুক স্থানে নিয়ে চলো। অতপর বর্শা হাতে নিয়ে চুপি চুপি বাড়ীর খিড়কী দরজা দিয়ে রেব হয়ে দাসীর নিকট থেকে ঘোড়া নিয়ে হুজুরের (সা) পেছনে পেছনে রওয়ানা হয়ে গেলেন। কথিত আছে যে, হুজুর (সা) সে সময় রাবিগের দুর্গ ও সমুদ্রোপকূলের মধ্যবর্তী ময়দান দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। সুরাকা (রা) ঘোড়া বাঁকিয়ে হুজুরের (সা) দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এমন সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) তাঁকে দেখে ফেললেন। অস্থির হয়ে হুজুরের (সা) খিদমতে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! শত্রু আমাদের মাথার ওপর এসে পৌছেছে।" হুজুর (সা) বললেন, 'দুশ্চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।" ইত্যবসরে সুরাকা (রা) হুজুরের (সা) নিকটে পৌছে গেলেন। সে সময় তাঁর ঘোড়া হোঁচট খেলো এবং তিনি নীচে পড়ে গেলেন। তিনি নিজের তুনীর থেকে তীর বের করলেন ও শুভাশুভ দেখলেন। তা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেল। তা সত্ত্বেও তিনি তার কোন পরওয়া করলেন না। দ্বিতীয়বার ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে হুজুরের (সা) পেছনে ধাওয়া করলেন এবং এত নিকটে পৌছে গেলেন যে, হুজুরের (সা) তিলাওয়াতের আওয়াজ তাঁর কানে পৌছতে লাগলো। আল্লাহর মহিমা ! এক মুহূর্তের মধ্যে তাঁর ঘোড়ার পা মাটিতে রান পর্যন্ত দেবে গেলো এবং তিনি মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। হযরত বারা' (রা) বিন আজেব স্বয়ং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন

যে, সে সময় আমরা খুব শক্ত জমিনের ওপর দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। আমি হুজুরের (সা) খিদমতে অনুরোধ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আমাদের পিছনে ধাওয়াকারী আমাদের খুব নিকটে এসে গেছে। তাতে হুজুর (সা) আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন এবং সুরাকার ঘোড়া মাটিতে পেট পর্যন্ত দেবে গেল। হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, সে সময় হুজুর (সা) তাকে মাটিতে ফেলে দেয়ার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করেছিলেন। দ্বিতীয়বার পড়ে যাওয়ার পর সুরাকা পুনরায় শুভশুভ নির্ধারণ করলেন। কিন্তু এবারও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেল। তিনি ঘোড়ার পা যমিন থেকে বাইরে বের করে আনার জন্য অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু ব্যর্থই হলেন। শেষে নিরাশ হয়ে চীৎকার দিয়ে উঠলেন ঃ "হে মুহাম্মাদ আমার ওপর যা কিছু ঘটেছে তাতে আমার চোখ খুলে গেছে। আপনি দোয়া করুন যাতে আমার ঘোড়া যমিন থেকে বের হয়ে আসে। আল্লাহর কসম, আমার পক্ষ থেকে আপনার কোন ক্ষতি হবে না।" মহানবীর (সা) তাঁর প্রতি খুব দয়া হলো এবং তিনি দোয়ার হাত তুললেন। ঠিক তক্ষুণি ঘোড়ার পা যমিন থেকে বের হয়ে এলো। তারপর সুরাকা চেচিয়ে বললেন যে, আমি হলাম সুরাকা বিন জু'শাম এবং আপনাকে কিছু বলতে চাই। আল্লাহর কসম, আমি আপনাকে কোন ক্ষতি করবো না এবং এমন কথাও বলবো না যা আপনি অপসন্দ করেন। অতপর তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে হুজুরকে (সা) বললেন যে, মক্কার কুরাইশরা আপনার জন্য দিয়্যতের কথা ঘোষণা করেছে এবং পুরস্কারের লোভে লোকজন আপনার খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছে। আপনি আমার এই তীর চিহ্ন হিসেবে গ্রহণ করুন। অমুক স্থানে আপনি কিছু গোলাম পাবেন। তারা আমার উট চড়াচ্ছে। তাদের মধ্য থেকে যত গোলাম এবং উটের প্রয়োজন হবে নিজের সঙ্গে নিয়ে যাবেন। অন্য আরেক রেওয়ায়াতে আছে যে, সুরাকা (রা) হুজুরকে (সা) পথের পাথেয় এবং সরঞ্জাম দানের প্রস্তাব করলেন। কিন্তু তিনি বললেন, আমাদের কোন বস্তুর প্রয়োজন নেই। অবশ্য তুমি আমাদের খবর কাউকে দিও না। হযরত সুরাকা (রা) কসম খেয়ে বললেন, আমি দুশমনদের অনুসন্ধানকে আপনার পক্ষ থেকে ব্যর্থ করে দেবো। তারপর তিনি হুজুরের (সা) নিকট দরখাস্ত করলেন যে, আমাকে একটি আমাননামা প্রদান করুন। চিহ্ন হিসেবে এই আমা নামা আমার নিকট থাকবে।

হুজুর (সা) হযরত আমের (রা) বিন ফাহিরা এবং অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত আবু বকর সিদ্দিককে (রা) তাঁকে আমাননামা প্রদানের নির্দেশ দিলেন। তিনি চামড়ার এক টুকরায় লিখে তাঁর দিকে ফেলে দিলেন। সুরাকা (রা) সেই আমাননামা নিজের তোশাদানে রেখে দিলেন এবং ফিরতি পথে

রওয়ানা দিলেন। পথে তিনি যাকেই হুজুরের (সা) সন্ধানে আসতে দেখতেন তাকেই ফিরে যেতে বলতেন। তিনি আরো বলতেন, "আমি সবদিক দেখে শুনে এসেছি। তিনি সেদিকে নেই। তোমরা সবাই জানো যে, দ্রুত দৃষ্টি এবং অনুসন্ধানের কাজে আমার চেয়ে পারদর্শী এই এলাকাতে আর কেউ নেই।"

এসব রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত সুরাকা (রা) নিজের আল্লাহ প্রদত্ত দূরদর্শিতা থেকে অবহিত হতে পেরেছিলেন যে, হুজুর (সা) আল্লাহর রাসূল এবং একদিন অবশ্যই বিজয়ী হবেন। এ কারণেই তিনি ভবিষ্যত চিন্তা করে হুজুরের (সা) নিকট থেকে আমাননামা লাভ করেছিলেন। এই ঘটনার ব্যাপারে হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে যে রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে তাতে হযরত সুরাকা (রা) থেকে এই বাক্য সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। "হে আল্লাহর নবী আপনি যা চান তা আমাকে নির্দেশ দিন।" তাতে হুজুর (সা) বলেছিলেন, "তুমি নিজের স্থানে অবস্থান কর এবং কাউকে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছতে দিও না। বস্তুত তিনি তাঁর ইরশাদের ওপর আমল করেছিলেন।"

হযরত সুরাকার (রা) ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুর রহমান বিন হারিছ (বিন মালেক বিন জুশামু) এই ঘটনা একটু ভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

"সুরাকা শরীরের ওপর অস্ত্র সজ্জিত করে, মাথায় শিরস্ত্রাণ বেঁধে বর্শা টানিয়ে নিজের ঘোড়ীর (উজ) ওপর সওয়ার হয়ে রাসূলের (সা) পিছু ধাওয়া করার জন্য রওয়ানা হলো। যখন হুজুরের (সা) ওপর দৃষ্টি পড়লো তখন মনে করলো যে সফল হয়ে গেছে। মাদি ঘোড়া একাকি হাঁটু গেরে পড়ে গেল। তখন সুরাকাও পড়ে গেল। পুনরায় উঠলো। ঘোড়ী উঠিয়ে সওয়ার হলো। রাসূলুল্লাহ (সা) কুরআনে হাকিম তিলাওয়াত করতে করতে ইতমিনানের সঙ্গে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তাকে শত্রু নিকটে পৌঁছার খবর দেয়া হলো। তিনি দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচাও। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ীর পা যমীনে দেবে গেল। সুরাকা মাটিতে পড়ে গেল এবং বুঝে ফেললো যে, আল্লাহ যাকে হিফাজত করছে তার ওপর বিজয়ী হওয়াটা অসম্ভব ব্যাপার। সে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে নিরাপত্তা চাইলো। সে তা পেয়ে গেল। তারপর তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে আরজ করলেন, এখন আমি প্রত্যেক পিছু ধাওয়াকারীকে পেছনেই থামিয়ে রাখবো। তারপর তাঁর দরখাস্ত অনুযায়ী হুজুর (সা) হযরত আমের (রা) বিন ফাহিরাকে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি আমাননামা বা নিরাপত্তা পত্র লিখে সুরাকার (রা) হাওয়ালা করে দিলেন।"

(সহীহ বুখারী)

এই ঘটনার কিছুদিন পর সুরাকা (রা) মক্কা গেলেন। তখন আবু জেহেলের সাথে সাক্ষাত হয়ে গেল। সে জেনে ফেলেছিল যে, সুরাকা (রা) ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলে আকরামকে (সা) ছেড়ে দিয়েছে। সুতরাং সে অভিযোগের দফতর খুলে বসলো। হযরত সুরাকা (রা) আবু জেহেলের অভিযোগ সমূহের জবাব এই কবিতার মাধ্যমে প্রদান করেছিলেন। কবিতাটির অর্থ হলো ঃ

"হে আবুল হাকাম! (আবু জেহেল) হায়, তুমি যদি আমার ঘোড়ার অবস্থা দেখতে! কিভাবে তার হাঁটু যমীনের মধ্যে দেবে গিয়েছিল। তাহলে তুমি বিস্মিত হতে এবং এ ব্যাপারে তোমার কোন সন্দেহ থাকতো না যে, মুহাম্মাদ (সা) নবী এবং হিদায়াতের চিহ্ন। অতপর কে আছে যে, তাঁর অবস্থা গোপন রাখতে পারে। তোমার কওমের উচিত তাঁর সঙ্গে বিবাদ না করা। আমি প্রত্যক্ষ করছি যে, তাঁর বিজয় ও উত্থানের আলামত শীঘ্র দুনিয়াব্যাপী প্রকাশ পেতে থাকবে।"

নবীর হিজরতকালে হযরত সুরাকার (রা) ওপর যা কিছু ঘটেছিল সেই ভিত্তিতে প্রিয় নবীর (সা) সত্যতা সম্পর্কে তার আস্থা জন্মেছিল। কিন্তু এমন কি বস্তু ছিল যে, তিনি পুরো ৮ বছর নবীর (সা) দরবারে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে সক্ষম হননি, তা জানা যায়নি। অষ্টম হিজরীতে মক্কার ওপর ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডীন হলো। তখন তার খবর আরবের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে গেল এবং হকের দুশমনদের ওপর ভীতি ছেয়ে গেল। এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী মক্কা বিজয়ের পর যখন হুজুর (সা) বাইতুল্লাহতে তাশরীফ রাখলেন এবং অন্য এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী যখন তিনি (সা) হুনাইন ও তায়েফের যুদ্ধসমূহ থেকে ফারেগ হয়ে কিছুদিনের জন্য জি'রানায় অবস্থান করলেন তখন সুরাকা (রা) রাসূলের (সা) খিদমতে হাজির হলেন। সে সময় হুজুর (সা) নিজের উটনীর ওপর সওয়ার ছিলেন এবং তাঁর চারপাশে কতিপয় আনসারী জাননিছার দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরা সুরাকাকে (রা) হুজুরের (সা) দিকে অগ্রসর হতে দেখে বাধা দিয়ে বললেন, কোনদিকে যাচ্ছো ? সুরাকা (রা) সেই আমাননামা যা তিনি হিজরতের সময় লাভ করেছিলেন তা হাতে নিয়ে উঁচু করে ধরলেন এবং নিবেদন করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমি সুরাকা (রা) বিন জু'শুম এবং এই হলো আপনার প্রদত্ত আমাননামা।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "আজ প্রতিশ্রুতি পূরণের এবং সাধারণ ক্ষমার দিন। কাছে এসো।"

সুরাকা (রা) হুজুরের (সা) নিকটে গেলেন এবং কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করলেন।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) "আল ইসাবাতে" লিখেছেন যে, হযরত সুরাকার (রা) হাতের কব্জীর ওপর ঘন চুল ছিল।। হুজুর (সা) তা দেখে বললেন ঃ "সুরাকা সে সময় তোমার কি অবস্থা হবে যখন তুমি নিজের এই গোছাদার চুলে লেপ্টে থাকা কব্জীতে কিসরার কংকন পরিধান করবে।"

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত সুরাকা (রা) বেশীর ভাগ সময় মদীনাতে কাটিয়েছিলেন এবং নবীর (সা) ফয়েজে পূর্ণ হতে থাকেন। এই সময় তাবুকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ধারণা করা হয় যে, তিনি এই যুদ্ধে হুজুরের (সা) অবশ্যই সফরসঙ্গী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তারপর তিনি বিদায় হজ্জে শরীক হন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে যে, বিদায় হজ্জের সফরে হুজুর (সা) আসফান নামক স্থানে পৌছলে হযরত সুরাকা (রা) নবীর (সা) দরবারে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে সেই নবজাতক কওমের মত তালিম দিন যার আবির্ভাব যেন কেবল ঘটেছে। আমাদের এই উমরা কি এই বছরের জন্য না চিরকালের জন্য।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "না, চিরকালের জন্য।"

মহানবীর (সা) ইন্তেকালের পর হযরত সুরাকা (রা) কোথায় এবং কি অবস্থায় ছিলেন চরিত গ্রন্থসমূহ এ ব্যাপারে নীরব। অবশ্য অনেক নেতৃস্থানীয় চরিতকার এই ঘটনা ধারাবাহিকতার সাথে বর্ণনা করেছেন যে, কয়েক বছর পর হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফত কালে ইরানের রাজধানী মাদায়েন জয় করা হলো এবং কিসরার কোষাগার মুসলামানদের হাতে এলো। তাতে কিসরার তাজ বা টুপি, অলংকার, পোষাক এবং অন্যান্য শাহী মালপত্রও ছিল। এসব বস্তু গনীমতের মালের সেই অংশের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়েছিল যা খিলাফতের দরবারে প্রেরণ করা হয়েছিল। হাফেজ ইবনে হাজার (র) "ইসাবাতে" বর্ণনা করেছেন যে, গনীমতের মাল বণ্টন হতে লাগলো। এ সময় হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত সুরাকাকে (রা) ডেকে কিসরার টুপি তাঁর মাথায় রাখলেন এবং শাহী কংকন তাঁর হাতে পরিয়ে শাহী কোমরবন্ধনী তাঁর কোমরে বাঁধলেন। ইমাম সুহায়লী "রাওজুল উনূফ" গ্রন্থে লিখেছেন যে, সে সময় হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত সুরাকাকে (রা) সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

"হে সুরাকা! হাত তোলো এবং বলো যে, প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি এসব বস্তু সেই কিসরা বিন হুরমুয থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন যার দাবী ছিল যে, আমি মানুষের রব এবং তা বনু মুদলিজের এক বেদুঈন সুরাকা বিন মালিক বিন জু'শামুকে পরিয়ে দিয়েছেন।"

হাফেজ ইবনে কাইয়েম (র) "যাদুল মি'আয়াদ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত সুরাকাকে (রা) কিসরার কংকন পরিয়ে বললেন ঃ "হে সুরাকা! এই গনিমতেরমালে এই কংকন তোমার অংশে এসেছে।"

মুহাম্মাদ হুসাইন হাইকাল মিসরী নিজের পুস্তক "ওমর ফারুক আজম (রা)"-এ এই ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ সুরাকা (রা) বিন জু'শামুকে ডাকা হলো। হযরত ওমর (রা) কিসরার পোষাক তাঁকে পরানোর নির্দেশ দিলেন। যখন তিনি পোষাক পরে, অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এবং টুপি মাথায় দিয়ে দাঁড়ালেন তখন ফারুকে আজম (রা) বললেন ঃ পেছনে হটো। তিনি পেছনে হটে গেলেন। তারপর বললেন ঃ সামনে অগ্রসর হও এবং তিনি সামনে অগ্রসর হলেন। অতপর ইরশাদ হলো, আল্লাহর কি শান, বনু মুদলিজের এক বেদুঈন এবং তার দেহে কিসরার এই পোশাক! হে সুরাকা (রা) বিন মালিক! এমন দিন কখন কখন আসে যা তোমার শরীরে কিসরা ও কিসরা পরিবারের এই লৌকিকতা পূর্ণ শাহী লেবাস। যা তোমার ও তোমার কওমের জন্য মর্যাদার কারণ হয়ে যায়।"

হাফেজ ইবনে হাজারের (র) বর্ননা অনুযায়ী হযরত সুরাকা (রা) বিন জু'শুম ২৪ হিজরীতে ওফাত পান। এটা ছিল হযরত ওসমানের (রা) খিলাফতকাল।

সমাপ্ত

গ্রন্থপঞ্জী

১। সহীহ বুখারী

২। সহীহ মুসলিম

৩। মুয়াত্তা ইমাম মালিক

৪। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল

৫। ফতুহুশ শাম—ওয়াকেদী

৬। ফতুহুল আজম—ওয়াকেদী

৭। তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক—তাবারী

৮। উসুদুল গাব্বাহ—ইবনে আছির (র)

৯। তারিখুল কামিল—ইবনে আছির (র)

১০। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া—ইবনে কাছির (র)

১১। আস সিরাতুন নববিয়া—ইবনে হিশাম (র)

১২। তাবাকাত—ইবনে সায়াদ কাতিবুল ওয়াকেদী

১৩। কিতাবুল ইসাবাহ—হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র)

১৪। আল ইস্তিয়াব—হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র)

১৫। রিয়াদুস সালেহীন—ইমাম নববী (র)

১৬। আল আখবারুত তাওয়াল—আবু হানিফা দিনাওয়ারী

১৭। সিরাতুন নবী (সা)—শিবলী নো'মানী (র)

১৮। আসহাবে বদর—কাজী মুহাম্মাদ সুলায়মান মনসুরপুরী

১৯। তরজুমানুস সুন্নাহ—মাওলানা বদরে আলম মিরাঠি

২০। সিরতে কুবরা—আবুল কাসেম রফিক দিলাওয়ারী

২১। আল মাশাহিদ—হাকিম রহমান আলী খান

২২। তাজকিরায়ে হুফফাজে শিয়া—সাইয়েদ আলীনকী

২৩। মুহাজিরিন (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)—শাহ্ মঈনুদ্দীন আহমদ নদবী (র)

২৪। সিয়ারে আনসার (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)—মাওলানা সাঈদ আনসারী

২৫। সিয়ারুস সাহাবা (সপ্তম খণ্ড)—শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ (র)

২৬। আল ফারুক—শিবলী নো'মানী (র)

২৭। গোলামানে ইসলাম—মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবারাবাদী

২৮। তারিখে ইসলাম—আকবার শাহ খান নজিব আবাদী

২৯। উসওয়ায়ে সাহাবা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)—মাওলানা আবদুস সালাম নদবী (র)

৩০। তারিখে ইসলাম—শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নদবী (র)

৩১। হায়াতুস সাহাবা (রা)—মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ কান্দুলুভী (র)

৩২। তারিখে ইসলাম—মুন্সী গোলাম কাদের ফসিহ।

প্রধান কার্যালয়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ২৫ ১৭ ৩১

বিক্রয় কেন্দ্র
- ১০, আদর্শ পুস্তক বিপণী, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
- ৫৫, খানজাহান আলী রোড, তারের পুকুর, খুলনা
- ৪৩, সেওয়ানজী পুকুর লেন, সেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম

৬

বিশ্ব নবীর সাহাবী

তালিবুল হাশেমী

বিশ্বনবীর সাহাবী

৬ষ্ঠ খণ্ড

তালিবুল হাশেমী

অনুবাদ ঃ আবদুল কাদের

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা-চট্টগ্রাম-খুলনা

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ২৩ ৫১ ৯১

আঃ প্রঃ ২৩৫

১ম সংস্করণ

রবিউস সানি	১৪১৮
ভাদ্র	১৪০৪
আগষ্ট	১৯৯৭

বিনিময় ঃ ১১০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

BISHA NABIR SAHABI 6th Volume by Talibul Hashemy.
Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane,
Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price: Taka 110.00 Only.

অনুবাদকের কথা

'বিশ্বনবীর সাহাবী' গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে আমি বিনয়াবনত চিত্তে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে মুনাজাত করছি, তিনি যেন আমাদের এই প্রয়াস কবুল করেন।

সাহাবী কারা ছিলেন ? এবং তাদের মর্যাদাই বা কি ? বিশ্বনবীর (সা) সঙ্গী-সাথীরা ছিলেন সাহাবী। তাদের সম্পর্কে মহানবী (সা) স্বয়ং বলেছেন, "আসহাবী কাননুজুম বিআইয়্যিহিম ইকতাদাইতুম ইহতাদাইতুম" অর্থাৎ আমার সব সাথী তারকা সদৃশ। অতএব, তোমরা তাদের কাউকে অনুসরণ করলে হেদায়াত পাবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে বিশ্বনবীর সাহাবীদের জীবনী অনুসরণ করার তৌফিক দিন এবং হেদায়াত প্রাপ্তির সুযোগ দিন।

'বিশ্বনবীর সাহাবী' গ্রন্থের ছ'টি খণ্ডে ২২০জন সাহাবীর (রা) জীবনী স্থান পেয়েছে। পূর্ববর্তী পাঁচটি খণ্ড পাঠকদের নিকট সমাদৃত হয়েছে। আশা করি এই খণ্ডটিও সমাদৃত হবে। গ্রন্থটির মূল লেখক তালিবুল হাশেমীকে আল্লাহ তা'য়ালা মহান প্রতিদান দিন।

অনুবাদের ক্ষেত্রে এবং মুদ্রণজনিত কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সহৃদয় পাঠকবর্গ তা অবশ্যই আমাদের গোচরীভূত করবেন। পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ তা শুধরে নেয়ার চেষ্টা করা হবে।

বিনয়াবনত
আবদুল কাদের

ঢাকা, ১২ই ভাদ্র, ১৪০৪ সাল
২৩শে জমাদিউস সানি, ১৪১৮
২৭শে আগষ্ট, ১৯৯৭ সন।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. হযরত ইকরামা (রা) বিন আমর মাখযুমী	১১
২. হযরত ওসমান (রা) বিন আবিল আছ ছাকাফী	২৭
৩. হযরত ফিরাসুল (রা) আকরা' তামিমী	৩৪
৪. হযরত কা'ব (রা) বিন যুহায়ের মুযনি	৪৪
৫. হযরত লাবিদ (রা) বিন রবিয়াহ আমেরী	৫৭
৬. হযরত মিহজা' (রা) বিন সালেহ	৬১
৭. হযরত সা'দ (রা) বিন খাওয়াল্লী	৬২
৮. হযরত খুনাইস (রা) বিন হুজাফাহ সাহমী	৬৩
৯. হযরত দিমাদুল আযদী (রা)	৬৪
১০. হযরত মুসলিম (রা) বিন হারিছ তামিমী	৬৬
১১. হযরত যাহির (রা) বিন হারাম আশজায়ী	৬৮
১২. হযরত আমর (রা) বিন সুরাকাহ আদভী	৬৯
১৩. হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ আনসারী	৭০
১৪. হযরত জাকওয়ান (রা) বিন আবদি কায়েসুজ জুরকি আনসারী	৮৯
১৫. হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিত আনসারী	৯১
১৬. হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা) আনসারী	১০৪
১৭. হযরত নুমানুল আ'রাজ (রা) আনসারী	১২৪
১৮. হযরত বারা' (রা) বিন মা'রুর আনসারী	১২৫
১৯. হযরত বিশর বিন বারা' আনসারী (রা)	১২৯
২০. হযরত আওস (রা) বিন ছাবিত আনসারী	১৩১
২১. হযরত আনাস (রা) বিন মালিক আনসারী	১৩২
২২. হযরত মুবাশশার (রা) বিন আবদুল মানযার আনসারী	১৫৪
২৩. হযরত নুমান (রা) বিন মালিক আনসারী	১৫৬
২৪. হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ সায়েদী আনসারী	১৫৭
২৫. হযরত হারিছ (রা) বিন সিমমা আনসারী	১৭৪
২৬. হযরত বারা' (রা) বিন আযেব (রা) আনসারী	১৭৭
২৭. হযরত আনাস (রা) বিন নযর আনসারী	১৮৬
২৮. হযরত আবাদ (রা) বিন বিশর আনসারী	১৮৯
২৯. হযরত জাব্বার (রা) বিন সাখার আনসারী	১৯৪
৩০. হযরত হারিছাহ (রা) বিন সুরাকাহ আনসারী	১৯৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
৩১. হযরত আবুল ইয়াসার কা'ব (রা) বিন আমর আনসারী	২০০
৩২. হযরত মাহমুদ (রা) বিন মাসলামাহ আনসারী	২০৪
৩৩. হযরত আসেম (রা) বিন ছাবিত আনসারী	২০৫
৩৪. হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জুবায়ের আনসারী	২১১
৩৫. হযরত খাওয়াত (রা) বিন জুবায়ের আনসারী	২১৩
৩৬. হযরত কুতবাহ (রা) বিন আমের আনসারী	২১৪
৩৭. হযরত খাল্লাদ (রা) বিন সুয়ায়েদ আনসারী	২১৬
৩৮. হযরত খারিজাহ (রা) বিন যায়েদ আনসারী	২১৮
৩৯. হযরত ইতবান (রা) বিন মালিক আনসারী	২২০
৪০. হযরত হাব্বাব (রা) বিন মানযার আনসারী	২২৪
৪১. হযরত জালবিব (রা) আনসারী	২২৬
৪২. হযরত সালমাহ (রা) বিন সালামাহ আনসারী	২২৯
৪৩. হযরত হানজালা (রা) বিন আবি আমের আনসারী	২৩৩
৪৪. হযরত মুনযির (রা) বিন আমর আনসারী	২৩৪
৪৫. হযরত আমর (আল উছাইরিম) (রা) বিন ছাবিত আশহালী	২৩৬
৪৬. হযরত মায়ান (রা) বিন আদি বালবী	২৪০
৪৭. হযরত তালহা (রা) বিন আল বারা' আনসারী	২৪৩
৪৮. হযরত কায়েস বিন সায়াদ সায়েদী (রা)	২৪৬
৪৯. হযরত সায়াদ (রা) বিন খাইছুমা (রা) আনসারী	২৫৬
৫০. হযরত যায়েদ (রা) বিন দিছনা আনসারী	২৫৮
৫১. হযরত কা'ব (রা) বিন আজুরাহ বালবী	২৬০
৫২. হযরত সায়াদ (রা) বিন হাবতা (রা) বাজলী	২৬৪
৫৩. হযরত উয়ায়েম (রা) বিন সায়েদাহ আনসারী	২৬৬
৫৪. হযরত ইবাদ (রা) বিন কায়েস আনসারী	২৭০
৫৫. হযরত আমর (রা) বিন আখতাব আনসারী	২৭১
৫৬. হযরত ছাবিত (রা) বিন দাহদাহ বালবী	২৭৩
৫৭. হযরত উমায়ের (রা) বিন হুমাম আনসারী	২৭৭
৫৮. হযরত যিয়াদ (রা) বিন সাকান আশহালি	২৭৯
৫৯. হযরত আম্মারাহ (রা) বিন যিয়াদ (রা) আশহালি	২৮০
৬০. হযরত ছা'লাবা (রা) বিন গানমাহ আনসারী	২৮১
৬১. হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন যায়েদ (রা) আনসারী	২৮২
৬২. হযরত আবু উসায়েদ (রা) আনসারী	২৮৬
গ্রন্থপুঞ্জি	২৮৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হযরত ইকরামা (রা) বিন আমর মাখযুমী

অষ্টম হিজরীর পবিত্র রমযানে মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সা) কিছুদিন মক্কায় অবস্থান করলেন। সেই সময়ের কথা। একদিন অর্ধবয়েসী এক ব্যক্তি সংশয় চিত্তে বিশ্বনবীর (সা) পবিত্র আবাসস্থলে হাজির হলেন। তাঁর ওপর দৃষ্টি পড়তেই প্রিয় নবীর (সা) পবিত্র চেহারা হাস্যোজ্বল হয়ে উঠলো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন এবং সেই ব্যক্তির দিকে এত দ্রুততার সাথে অগ্রসর হলেন যে, পবিত্র চাদর শরীর থেকে পড়ে গেল। অতপর তিনি অত্যন্ত আবেগের সাথে তাকে আলিঙ্গন করলেন এবং বললেন ঃ

"হে বিদেশী সওয়ার সুস্বাগতম
হে বিদেশী সওয়ার সুস্বাগতম।"

সেই ব্যক্তি পাশে দন্ডায়মান এক নিকাব পোশ মহিলার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন ঃ

"হে মুহাম্মাদ ! সে জানতে পেরেছে যে, আপনি আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ " সে সত্য বলেছে। তোমার জন্য নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে।"

হুজুরের ইরশাদ শুনে তিনি খুব আনন্দিত হলেন। তিনি লজ্জায় মাথা নীচু করলেন এবং কোমল স্বরে এই আরজ করলেন ঃ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ এক। তার কোন অংশীদার নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অবশ্যই আপনি তার বান্দাহ ও রাসূল। আল্লাহর কসম, আপনি সকল মানুষের মধ্যে উত্তম, সবচেয়ে বেশী সত্যবাদী ও আমানতদার এবং সবচেয়ে বেশী কথা ও প্রতিশ্রুতি পূরণকারী। নিসন্দেহে আপনি আমাদেরকে সবসময় হকের প্রতি আহ্বান করেছেন। হে আল্লাহর রাসূল! এর পূর্বে আমি বহুবার নিজের কঠোরতা ও ইসলাম দুশমনীর প্রমাণ দিয়েছি। আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ও নির্যাতনের জন্য আমি সকল কিছুই করেছি। এখন আমার আশা, আজ পর্যন্ত আমি আপনার সাথে যে শত্রুতা করেছি, যত যুদ্ধ আপনার বিরুদ্ধে লড়েছি, হক পথে যত বাধা আরোপ করেছি এবং যেসব অকথ্য কথা আপনার সামনে ও পেছনে বলেছি তা সব আপনি ক্ষমা করে দিন এবং আমার জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাত কামনা করুন।"

রহমতে আলম (সা) সেই সময়ই হাত তুললেন। আসমানের দিকে তাকালেন এবং আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে এই দোয়া করলেন ঃ

"হে আল্লাহ! এই ব্যক্তি যত ধরনের শত্রুতা আমার সাথে করেছে তার সেই সকল প্রচেষ্টা ও সেনা অভিযান যা তোমার নূরকে নিভিয়ে দেয়ার জন্য করেছে এবং তার সেই সকল কথা যা সে আমার সামনে ও পেছনে আমার সম্মান হানির জন্য বলেছে তা সব ক্ষমা করে দাও।"

প্রিয় নবীর (সা) পবিত্র মুখে এই দোয়া শুনে সেই ব্যক্তির চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং আরজ করলো ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জানামতে যে কথা আমার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে, আল্লাহর ওয়াস্তে তা আমাকে শিখিয়ে দিন। যাতে আমি সবসময় তার ওপর আমল করতে পারি।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "সত্য অন্তরে (অর্থাৎ নিজের কথা ও কাজে) আল্লাহর ওয়াহদানিয়াত বা একত্ববাদ ও আমার আবদিয়াত ও রিসালাতের সাক্ষ্য দিতে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করতে থাকো।"

সেই ব্যক্তি অত্যন্ত আবেগের সাথে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম, আমি আজ পর্যন্ত যত সম্পদ দাওয়াতে হক প্রসারে বাধা দানের জন্য ব্যয় করেছি তার চেয়ে দ্বিগুণ এখন আল্লাহর পথে ব্যয় করবো এবং যত লড়াই আমি হকের বিরুদ্ধে লড়েছি এখন আল্লাহর পথে তার থেকে দ্বিগুণ জিহাদ করবো।"

প্রিয় নবী (সা) তাঁর এই প্রতিশ্রুতি ও আবেগের প্রশংসা করলেন এবং তাঁর ধৈর্য ও স্থৈর্যের জন্য পুনরায় দোয়া করলেন। যখন সেই ব্যক্তি রাসূলের (সা) নিকট থেকে বিদায় নিলেন তখন তাঁর চক্ষু দিয়ে বিগলিত ধারার অশ্রু এবং তার চেহারা ঈমানী নূরে এমন উজ্জ্বল ছিল যে তার ওপর দৃষ্টি রাখা যাচ্ছিল না।

এই ব্যক্তি যাঁর ইসলামের আস্তানায় উপস্থিতিতে প্রিয় নবীর (সা) সীমাহীন আনন্দ ও খুশীর কারণ হয়েছিল এবং যার মাগফিরাতের জন্য সাকিয়ে কাওসার (সা) নির্ভাবনায় দোয়ার হাত প্রসারিত করেছিলেন—তিনি ছিলেন ইসলামের মশহুর দুশমন আবু জেহেল তনয় ইকরামা (রা)।

হযরত ইকরামা (রা) সেইসব সাহাবায়ে কিরামের (রা) মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন যারা জাহেলী যুগে ইসলামের শত্রুতায় নজিরবিহীন ছিলেন। কিন্তু

ইসলাম গ্রহণের পর নিজের ঈমানী আবেগ, আন্তরিকতাপূর্ণ আমল এবং ত্যাগ ও কুরবানীর এমন চিহ্ন বা ছাপ ইতিহাসের পাতায় এঁকে দিয়েছেন যে তার আলো আজ পর্যন্ত বিশ্বে ঝলমল করছে।

কুরাইশের মশহুর শাখা বনু মাখযুমের সাথে হযরত ইকরামা (রা) সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। জাহেলী যুগে কুরাইশরা যে সামরিক ব্যবস্থা কায়েম করেছিল তাতে সেনাবাহিনীর সৈনাপত্য এবং সামরিক ক্যাম্পের ব্যবস্থাপনা ও দেখাশুনা করার দায়িত্ব বনু মাখযুমের সাথেই সংশ্লিষ্ট ছিল। এদিক থেকে ইমারাত ও হুকুমাত হযরত ইকরামার (রা) ঘরের বাদী ছিল। নসবনামা হলো ঃ

ইকরামা (রা) বিন আমর (আবু জেহেল) বিন হিশাম বিন মুগিরা বিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন মাখজুম বিন ইয়াকজা বিন মুররা বিন কা'ব বিন লুব্বী।

হযরত ইকরামা (রা) ইসলামের সেই দুশমনের ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন যে ছিল কুরাইশ মুশরিক নেতা। মুশরিকদের পক্ষ থেকে 'আবুল হিকাম' লকব শুনে সেই দিমাগী ব্যক্তির গর্ব এবং অহংকার আরো বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু বদ দিমাগ, গর্ব, অহংকার এবং ইসলামের শত্রুতার কারণে হক পন্থীরা তাঁকে "আবু জেহেল" খিতাব দিয়েছিলেন। সেই খিতাব এমনভাবে মশহুর হয় যে, আবু জেহেলের আসল নাম আমর বিন হিশাম সম্পর্কে খুব কম মানুষই অবহিত। আবু জেহেল মহানবীর (সা) ওপর নির্যাতন চালানো এবং হকের আওয়াজ দাবিয়ে দেয়ার জন্য অব্যাহতভাবে তেরটি বছর পর্যন্ত যে ঘৃণ্য তৎপরতা চালিয়েছিল তা তার কঠোর হৃদয় ও দুর্ভাগ্যের বাস্তব প্রমাণ এবং ইতিহাসের এক দুঃখজনক অধ্যায়। আবু জেহেলের জীবনের এই পটভূমি ছিল যে, বদরের যুদ্ধে যখন সে নিহত হলো এবং তার অপবিত্র মাথা হুজুরের (সা) সামনে আনা হলো তখন তিনি অকৃতিমভাবে তাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "আলহামদু লিল্লাহিল্লাজি আখযাকা ইয়া আদুয়াল্লাহ (সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি হে আল্লাহর দুশমন তোকে অপমানিত করেছেন।)" তারপর তিনি বললেন ঃ "মাতা ফিরআ'উনু হাজিহিল উম্মাতি" অর্থাৎ এই উম্মাতের ফিরআ'উন মারা গেছে। হযরত ইকরামা (রা) সেই আল্লাহর দুশমন পিতার প্রশিক্ষণে লালিত পালিত হয়েছিলেন। স্পষ্টত তিনি কুফর ও শিরকপূর্ণ পরিবেশে অবধারিতভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। পিতা শুধুমাত্র স্বগোত্রের সরদারই ছিল না বরং একজন সফল ব্যবসায়ীও ছিলো এবং তার গৃহে ছিল চিত্ত-বৈভবের ছড়াছড়ি। সে ইকরামাকে (রা) অত্যন্ত আদর যত্নে লালন পালন

করলো এবং তাঁকে নিজের রঙে রঞ্জিত করার জন্য সামান্যতম ত্রুটিও করলো না। সেই সঙ্গে সে তার পুত্রের দৈহিক ও সামরিক প্রশিক্ষণ এমনভাবে প্রদান করলেন যে, যখন তিনি বড় হলেন তখন পাহলোয়ানী, তীরন্দাজী, তরবারী চালনা, বর্শা চালনা এবং অশ্বারোহণে নিজের গোত্রের গর্ব হিসেবে পরিগণিত হতেন। ইসলাম দুশমনিতেও তিনি নিজের পিতার বাহু হিসেবে প্রমাণিত হলেন এবং বছরের পর বছর পর্যন্ত তাঁর দৈহিক শক্তি, বীরত্ব এবং যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শীতা হক উৎখাতে ব্যয় হয়েছিল। বদরের যুদ্ধে তিনি পিতার সাথে গিয়েছিলেন এবং অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নিয়েছিলেন। প্রচন্ড যুদ্ধের সময় হযরত মুয়াজ (রা) বনি হারিছ আনসারী [যাঁকে মুয়াজ (রা) বিন আফরাও বলা হয়] আবু জেহেলকে গুরুতরভাবে আহত করলেন। এ সময় ইকরামা (রা) পিতার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য হযরত মুয়াজের (রা) ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তরবারী দিয়ে তার বাহু কেটে ফেললেন। হযরত মুয়াজ (রা) সেই অবস্থায় ইকরামার মুকাবিলায় রুখে দাঁড়ালেন। ইকরামা তাঁর ঈমানী আবেগ সহ্য করতে না পেরে নিজের ঘোড়া দৌড়িয়ে অন্যদিকে চলে গেলেন।

বদরের যুদ্ধের পর যারা মক্কার মুশরিকদেরকে বদরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য উত্তেজিত করেছিল তাদের মধ্যেও ইকরামা (রা) অগ্রগামী ছিলেন। বস্তুত ওহোদের ময়দানে তিনি মুশরিক বাহিনীর নেতৃস্থানীয় অফিসারদের অন্যতম ছিলেন। ওহোদের গিরিপথে হুজুর (সা) পঞ্চাশজন তীরন্দাজকে এই লক্ষ্যে মোতায়েন করেছিলেন যে, মুশরিকরা সেই পথ অতিক্রম করে মুসলমানদের পেছনের দিক থেকে যাতে হামলা করে বসতে না পারে। যুদ্ধের প্রথম দিকে মুশরিকরা পরাজিত হলো এবং গিরিপথে মোতায়েন অধিকাংশ তীরন্দাজ স্ব স্ব স্থান ছেড়ে দিল। তখন এই ইকরামা (রা) ও খালিদই (রা) ছিলেন যারা মুসলমানদের সেই দুর্বলতাকে আঁচ করতে পেরেছিলেন এবং স্ব বাহিনীসহ সেই গিরিপথ অতিক্রম করে মুসলমানদের ওপর প্রচন্ডবেগে হামলা করে বসলো। সেই হঠাৎ হামলার কারণে হকপন্থীদেরকে মারাত্মক ক্ষতি স্বীকার করতে হলো। কথিত আছে যে, ওহোদের যুদ্ধে ইকরামা (রা) মুশরিকদের বাম দিকের অফিসার ছিলেন এবং তিনি নিজের স্ত্রীকেও হাওদায় সওয়ার করিয়ে যুদ্ধের ময়দানে সঙ্গে এনেছিলেন।

পঞ্চম হিজরীতে আরবের মুশরিক ও ইহুদীরা ষড়যন্ত্র করে ইসলামের কেন্দ্র মদীনা মুনাওয়ারার ওপর হামলা করে বসলো। তখন ইকরামাও (রা) বনু কিনানাকে উত্তেজিত করে নিজের সঙ্গে নিয়ে গেলেন এবং খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে খুব উৎসাহের সাথে অংশ নিলেন।

৬ষ্ঠ হিজরীতে মহানবী (সা) ও মক্কার কুরাইশদের মধ্যে হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্র লিখিত হয়। সেই সন্ধিপত্রের একটি শর্ত এও ছিল যে, কোন কবিলা যদি উভয় পক্ষের মধ্য থেকে কারোর মিত্র হয়ে যায় তাহলে অপর পক্ষ তাকে কোন ক্ষতি করবে না এবং মুকাবিলায় তার দুশমনেরও সাহায্য করবে না। এই চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বনু খাযায়া মহানবীর (সা) সমর্থন লাভ করলো এবং বনু বকর সমর্থন পেলো কুরাইশের। এই দুই গোত্রের মধ্যে দীর্ঘদিন থেকে শত্রুতা চলে আসছিলো। ১৮ মাস তারা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে অতিক্রম করলো। কিন্তু তারপর বনি বকর একদিন হঠাৎ করে বনু খাযায়ার উপর হামলা করে বসলো এবং অত্যন্ত নৃশংসতার সাথে তাদের শিশু ও মহিলাদের পর্যন্ত হত্যা করলো। এমনকি হেরেম শরীফে আশ্রয় গ্রহণকারীদেরকেও তারা তরবারীর আঘাত থেকে রেহাই দিল না। এই হত্যা ও লুটতরাজে কুরাইশের কয়েকজন সরদার বনু বকরকে সাহায্য করলো। এই সরদারদের মধ্যে ইকরামাও (রা) ছিলেন। এমনিভাবে তারা হুদায়বিয়ার সন্ধিনামা বাস্তবত ভেঙ্গে ফেলেছিল। তাদের এই তৎপরতা মক্কায় মুসলমানদের আক্রমণ করার কারণ হয়েছিল। অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে মহানবী (সা) মক্কা মুয়াজ্জামাতে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করলেন। তখনো ইকরামা (রা) কতিপয় সঙ্গীসহ একত্রিত হয়ে মুসলমানদের একটি দলকে বাধা দান করে। কিন্তু ইসলামী বাহিনীর প্রবল স্রোতের সামনে তারা টিকতে পারলো না এবং নিজেদের ২৪ জনের লাশ ফেলে রেখে পিছু হটে গেল। মক্কা মুয়াজ্জামা জয়ের পর হুজুর (সা) চাইলে কুরাইশ মুশরিকদেরকে কেটে কুচি কুচি করাতে পারতেন। কারণ, এরাতো সেই লোকই ছিলো যারা বিশ্বনবী (সা) ও তাঁর সঙ্গীদের ওপর নির্যাতন চালানোর প্রশ্নে সামান্যতম দ্বিধাও করেনি। বিশ্বনবীকে (সা) দেশ থেকে বহিষ্কার করেছিল। তারপর মদীনাতেও সাত বছর পর্যন্ত হকপন্থীদেরকে শান্তির সাথে বসতে দেয়নি। কিন্তু তিনি ছিলেন দয়ার সাগর এবং রাহমাতুল্লিল আলামীন। তাঁর দয়ার আত্মা তাদের ধ্বংস করাকে সহ্য করতে পারলো না। বরং তাঁর করুণা তাদের ওপর এমনভাবে বর্ষিত হলো যে, সাধারণ ও অসাধারণ সকলেই সামর্থ অনুযায়ী ফয়েজ প্রাপ্ত হলেন। এসব লোকের মধ্যে ইকরামার (রা) স্ত্রী উম্মে হাকিম (রা) বিনতে হারিছও ছিলেন। মক্কা বিজয়ের অব্যবহিত পরই তিনি রহমতে আলমের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। কিন্তু স্বয়ং ইকরামা (রা) হুজুরের (সা) সামনে আসতে সাহস পাননি। নিজের অতীতের প্রেক্ষাপটে কোনক্রমেই তাঁর এই আশা ছিল না যে, বিশ্বনবী (সা) তাঁকে জীবিত ছেড়ে দেবেন। সুতরাং নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য তিনি মক্কা থেকে পালানোর রাস্তা গ্রহণ করলেন এবং ইয়েমেন যাওয়ার নিয়তে সমুদ্রোপকূলে পৌঁছে গেলেন।

হযরত ইকরামার (রা) স্ত্রী উম্মে হাকিম (রা) বিনতে হারিছ তাঁর চাচার কন্যা ছিলেন এবং তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। মক্কা বিজয়ের পর তিনি ইসলামের অলংকারে অলংকৃত হলেন। তখন তিনি ইকরামার (রা) চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়লেন। ইকরামা (রা) কুফর ও শিরকের অন্ধকারে পথভ্রষ্ট অবস্থায় ঘুরতে থাকুক এটা যেমন তিনি চাইতেন না তেমনি জিল্লতীর মৃত্যুবরণ করুন তাও চাইতেন না। তিনি রাসূলের (সা) নিকট আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার চাচার পুত্র ও স্বামী জীবনের ভয়ে আত্মগোপন করেছে। আপনি যদি তার নিরাপত্তা দেন তাহলে আমি খুঁজে তাকে আপনার নিকট নিয়ে আসতে পারি।"

হুজুরের (সা) রহমতের দরিয়ায় তখন ঢেউ খেলছিল। তিনি বললেন ঃ "তোমার স্বামীর নিরাপত্তা দিলাম। তাকে নিয়ে এসো।"

ওদিকে হযরত ইকরামা (রা) একটি কিশতিতে সওয়ার হয়ে গিয়েছিলেন। কিছুদূর গিয়ে এই কিশতী উল্টোমুখী প্রবল বাতাসের মুখে পড়লো এবং সামনে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে পিছু হটতে লাগলো। প্রচন্ড বাতাস তাকে ধাক্কার পর ধাক্কা দিতে লাগলো। মনে হচ্ছিল এই ডুবে আর কি। এই নাজুক মুহূর্তে হযরত ইকরামা (রা) লাত ও উজ্জাকে ডাকা শুরু করে দিলেন। মাঝি ও কিশতীর অন্যান্য লোকেরা বললো, লাত ও উজ্জা এখানে কোন কাজে আসবে। এখনতো আল্লাহকে ডাকার সময়।

হাফেজ ইবনে হাজার (র) "ইসাবাতে" লিখেছেন, মাঝিদের কথায় হযরত ইকরামার (রা) অন্তরের ওপর খুব প্রভাব ফেললো। তার দিব্যচক্ষু খুলে গেল এবং স্বতস্ফূর্তভাবে তার মুখ দিয়ে বের হয়ে পড়লো ঃ

"হে আল্লাহ! আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, যদি এই তুফান থেকে বাঁচি তাহলে আমি নিজেকে মুহাম্মাদের (সা) সামনে পেশ করবো। সে খুব দয়ালু। আমার নিকট কোন জবাবদিহি চাইবে না।"

আল্লাহর কুদরত, তাঁর কিশতী পিছু হটতে হটতে কিনারের ঠিক সেই স্থানে এসে লাগলো যেখান থেকে রওয়ানা দিয়েছিল। ইত্যবসরে হযরত উম্মে হাকিমও (রা) স্বামীর অনুসন্ধানে উপকূলে এসে পৌঁছলেন। অন্য আরেক রাওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত ইকরামার কিশতী ঘূর্ণাবর্তে নিক্ষিপ্ত হলো এবং তিনি মাঝিদের পরামর্শে আল্লাহকে ডাকলেন। তখন কিশতী ঘূর্ণাবর্ত থেকে বের হয়ে এলো। ঠিক তক্ষুণি হযরত উম্মে হাকিমও (রা) উপকূলে পৌঁছে গেলেন। তিনি তীরে দাঁড়িয়ে নিজের চাদরকে ঝান্ডা বানিয়ে তা দুলিয়ে দুলিয়ে কিশতী ফিরে আসার আহ্বান জানাতে লাগলেন। কিশতী নোঙ্গর ফেললো

এবং হযরত ইকরামা (রা) একটি ছোট নৌকাতে চড়ে তীরে ফিরে এলেন। হযরত উম্মে হাকিম (রা) তাঁকে বললেন, "আমি সেই ব্যক্তির (সা) নিকট থেকে আসছি যিনি সকল মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে বেশী আত্মীয়তার বন্ধন মজবুতকারী। তুমি অন্যায়ভাবে নিজেকে দেশ থেকে বহিষ্কারের মুসিবতে নিক্ষেপ করেছ। আমি তাঁর নিকট থেকে তোমার নিরাপত্তা লাভ করেছি। এখন আমার সাথে তাঁর খিদমতে চলো।" বস্তুত হযরত ইকরামা (রা) নিজের ভাগ্যবতী স্ত্রীর সঙ্গে বিশ্বনবীর (সা) খিদমতে হাজির হলেন। তাঁর আগমনে হুজুর (সা) সীমাহীন খুশী হলেন এবং তিনি তাঁকে আন্তরিক স্বাগত জানালেন। তখন হযরত ইকরামা (রা) ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন এবং সত্য অন্তরে অতীতের ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেন। তার বিস্তারিত ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম হাকিম (র) 'মুসতাদরাকে' লিখেছেন যে, হযরত ইকরামা (রা) যদিও সত্য অন্তরে ইসলাম গ্রহণ এবং রহমতে আলম (সা) তাঁর ক্ষমার জন্য দোয়াও করেছিলেন। কিন্তু লোকজন তাঁর পিতা ও তাঁর ইসলাম দুশমনীর সময়ের কথা কোনক্রমেই ভুলতে পারতো না এবং তারা হযরত ইকরামাকে (রা) আল্লাহর দুশমনের পুত্র বলে ডাকতো। হুজুরের (সা) পবিত্র কানে একথা পৌঁছলে তিনি লোকদেরকে একত্রিত করে বিশেষ ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বললেন, "হে লোকেরা ! শুনে নাও, জাহেলী যুগে যে সম্মানিত ছিল ইসলামেও সে সম্মানিত। কোন কাফেরের কারণে কোন মুসলমানের অন্তরে দুঃখ দিও না।" হুজুরের (সা) এই ভাষণের পর লোকজন সতর্ক হয়ে গেল এবং আর কখনো কেউ তাঁকে "আল্লাহর দুশমনের পুত্র" হওয়ার গালি দেয়নি ও বিদ্রূপ করেনি।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত ইকরামার (রা) জীবনে সম্পূর্ণ রূপে বিপ্লব এসে গেল এবং তিনি উদাহরণ যোগ্য চরিত্র ও কর্মের সুন্দর চিত্র হয়ে গেলেন। জিহাদের শওক, আল্লাহর পথে ব্যয়, ভক্তি ও ইবাদাত এবং কুরআনের সাথে গভীর সম্পর্ক জীবনের এই অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল। তখন তার একমাত্র চিন্তাই দাঁড়িয়েছিলো যে, কি করে জাহেলী যুগের ক্ষতিপূরণ করা যায়। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) "ইসতিয়াবে" লিখেছেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর তিনি বেশী বেশী নামায পড়তেন এবং প্রায় সময়ই তাওবা ও ইসতেগফারে ব্যাপৃত থাকতেন। অন্তরে এমন পেলবতা ও কোমলতা সৃষ্টি হয়েছিল যে, কাউকে দুঃখ কষ্টে দেখলে চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠতো। কুরআনে হাকিমের সঙ্গে এমন গভীর সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল যে, গভীর আকর্ষণের কারণে অস্থির চিত্তে মুখের ওপর রাখতেন এবং আমার আল্লাহর কিতাব, আমার আল্লাহর কিতাব বলে কাঁদতেন। অত্যন্ত গভীরতার সাথে

কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তিলাওয়াতের সময় চোখ দিয়ে টপ টপ করে অশ্রু ঝরে পড়তো।

মক্কা বিজয়ের পর হুনাইন, তায়েফ ও তাবুকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এসব যুদ্ধে হযরত ইকরামা (রা) প্রিয় নবীর (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তিবরানীর (র) বর্ণনা অনুযায়ী দশম হিজরীতে হুজুর (সা) হযরত ইকরামাকে (রা) সাদকা আদায়ের জন্য রাজস্ব আদায়কারী বানিয়ে হাওয়াযিন গোত্রে প্রেরণ করেছিলেন। একাদশ হিজরীতে মহানবীর (সা) ওফাত হলো। এ সময় হযরত ইকরামা (রা) ইয়েমেনের একটি শহর তাবালাতে ছিলেন। রিসালাত সূর্যের আল্লাহর রহমতের ছায়ায় ডুবে যাওয়া এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতের আসনে সমাসীন হওয়ার খবর দেশের চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে একবারে সমগ্র আরবে ধর্মদ্রোহিতার ফিতনার আগুন জ্বলে উঠলো। সেই ভয়ংকর সময়ে শুধুমাত্র মুহাজির ও মদীনার আনসার, মক্কার কুরাইশ ও বনু ছাকিফ সামগ্রিকভাবে অত্যন্ত মজবুতভাবে ঈমানের ওপর কায়েম রলো। পরিস্থিতি যদিও খুব নাজুক ছিল তবুও খলিফাতুর রাসূল (সা) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ধৈর্য, স্থৈর্য দৃঢ়তা এবং ঈমানী শক্তির অটল পাহাড় ছিলেন। তিনি মুরতাদেরকে কোন প্রকারের কনসেশন বা রেয়ায়াত দানের ব্যাপারে পরিষ্কার অস্বীকৃতি জানালেন এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ১১টি সেনা বাহিনী তৈরী এবং তাদেরকে বিভিন্ন এলাকার মুরতাদদেরকে উৎখাতের জন্য নিয়োগ করলেন। তাদের মধ্যে একটি বাহিনীর নেতৃত্ব হযরত ইকরামার (রা) হাতে সোপর্দ করা হলো। তিনি মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য ইতিমধ্যেই মদীনা পৌঁছে গিয়েছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) হযরত ইকরামাকে (রা) মুসায়লামা কাজ্জাবকে উৎখাতের জন্য ইয়ামামার দিকে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি রওয়ানা হয়ে গেলে হযরত শুরাহবিল (রা) বিন হাসানাকে তার সাহায্যার্থে প্রেরণ করলেন। হযরত ইকরামা (রা) মুসায়লামার শক্তির সঠিক আন্দাজ না করেই বীরত্বের আবেগে সাহায্যকারী সৈন্য না পৌঁছতেই তার সাথে যুদ্ধ শুরু করে দিল। মুসায়লামার বিরাট সংখ্যক সৈন্য তার ওপর এমন প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করলো যে, হযরত ইকরামা (রা) পিছু হটে যেতে বাধ্য হলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এই খবর পেয়ে অসন্তুষ্ট হলেন এবং শুরাহবিল (রা)-এর পৌঁছার পূর্বে তাঁর যুদ্ধ শুরু করাটা ঠিক হয়নি বলে লিখে পাঠালেন। তবে যা হবার তা হয়েছে একথা বলে তিনি তাঁকে সামনে অগ্রসর হয়ে হুজায়ফা (রা) বিন মিহসান এবং আরফাজা (রা) বিন হারছুমার সঙ্গে মিলিত হতে আম্মান ও মিহরার মুরতাদদের মুকাবিলা করার নির্দেশ দিলেন।

সেখানকার কাজ শেষ করে নিজের বাহিনীসহ মুহাজির (রা) বিন ওমাইয়ার নিকট ইয়েমেন ও হাজারে মাওত চলে যাওয়ার কথাও বললেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) নির্দেশ পেতেই হযরত ইকরামা (রা) আম্মান পৌঁছে হযরত হুজায়ফা (রা) ও হযরত আরফাজার (রা) সঙ্গে মিলিত হলেন। আম্মানের মুরতাদের (বনু ইযদ) সরদার লকিত বিন মালিক একটি বিরাট বাহিনীসহ দবা শহরে অবস্থান করছিলো। সুতরাং ইসলামী বাহিনীও দবার দিকে অগ্রসর হলো। এই বাহিনীর অগ্রবর্তী সৈন্যদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন হযরত ইকরামা (রা)। যুদ্ধ শুরু হলো। মুসলমানরা ছিলো নীচু ভূমিতে। আর মুরতাদরা ছিল উঁচুতে। এজন্য মুসলমানদের অবস্থা ছিল খুবই ভয়াবহ। কিন্তু হযরত ইকরামা (রা) সামনের দিকে অগ্রসর হলেন। লকিত বিন মালিক মুসলমানদের এই সাহস দেখে সেও নিজের ঘোড়া সামনের দিকে অগ্রসর করালো। সে সময় তার এক হাতে ঝান্ডা এবং অন্য হাতে ছিল বর্শা এবং নিজের বাহিনীকে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছিল। অতপর উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচন্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ঠিক তক্ষুণি নাখিয়া ও আবদুল কায়েস গোত্রের মুজাহিদরা মুসলমানদের সাহায্যের জন্য এসে পৌঁছলেন। ফলে মুসলমানদের শক্তি দ্বিগুণ হয়ে গেল এবং তাঁরা মুরতাদদেরকে শিক্ষণীয়ভাবে পরাজিত করলো। লকিত বিন মালিক ও তার অনেক সঙ্গী যুদ্ধের ময়দানে নিহত হলো এবং হাজার হাজার মুরতাদকে মুসলমানরা গ্রেফতার করলো। এক রেওয়ায়াত আছে যে, এই যুদ্ধে ১০ হাজার মুরতাদ নিহত হয় এবং খুমুস বা এক-পঞ্চমাংশ গনিমাতের মালের সাথে যে সংখ্যক কয়েদী খলিফার নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল শুধু তার সংখ্যাই ছিল আটশ'। এই পরাজয়ের পর ইযদ কবিলার অবশিষ্ট মুরতাদ পুনরায় ইসলাম কবুল করে নিল।

আল্লামা বালাজুরী (র) বর্ণনা করেছেন যে, ইযদ গোত্র উৎখাতের পর হযরত ইকরামা (রা) গনিমাতের মাল ও কয়েদী নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছলেন। তাঁর চলে যাওয়ার পর আম্মানের অন্য কতিপয় কবিলা মুরতাদ হয়ে গেল এবং তারা শাহারকে নিজেদের কেন্দ্র বানিয়ে নিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাদেরকে উৎখাতের জন্যও হযরত ইকরামাকে (রা) রওয়ানা করালেন। তিনি কিছু দিনের মধ্যেই তাদের সকলকে উৎখাত করে ছাড়লেন।

কিন্তু ইবনে খালদুন (র) এবং ইবনে আছির (র) লিখেছেন যে, লকিত বিন মালিককে পরাজিত করার পর হযরত ইকরামা (রা) সোজা মিহরা চলে যান। সে সময় নিজের বাহিনী ছাড়া নাহিয়াহ, আবদুল কায়েস, সাম্মদাহ এবং রাসেব গোত্রসমূহের লোকজনও তাঁর সাথে ছিলেন। মিহরাবাসী তখন

রিয়াসাত ও ইমারাতের প্রশ্নে দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। এক অংশের নেতা ছিল সাখরীত। অন্য অংশের ছিল মিসবাহ। হযরত ইকরামা (রা) উভয় পক্ষকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সাখরীত এই দাওয়াত কবুল করলেন এবং নিজের সমর্থক গোত্রসমূহের যাকাত আদায় করে দিলেন। কিন্তু মিসবাহ ইসলামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলো। সুতরাং হযরত ইকরামা (রা) নিজের সাথী ও সাখরীত সমর্থকদেরকে সঙ্গে নিয়ে মিসবাহর ওপর হামলা করলো। প্রচন্ড একটি যুদ্ধের পর মিসবাহ নিহত হলো। এবং তার সঙ্গীরা পালিয়ে গেল। মুসলমানরা অনেক দূর পর্যন্ত পিছু ধাওয়া করে স্থানে স্থানে তাদের লাশ বিছিয়ে দিল এবং তাদের মাল ও আসবাবের ওপর কবজা করে নিল। তারপর হযরত ইকরামা (রা) ইসলামের তাবলীগে মশগুল হয়ে গেলেন এবং খুব তাড়াতাড়ি আশেপাশের সকল গোত্রকে ইসলামের সীমায় নিয়ে এলেন। সেই সময় হযরত মুহাজির (রা) বিন উমাইয়া নাজরান ও সানয়ার মুরতাদদেরকে খতম করে ফেলেছিলেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁকে যিয়াদ (রা) বিন লবিদ আনসারীর সাহায্যের জন্য ইয়েমেন পৌছার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হযরত ইকরামাও (রা) হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) নির্দেশ অনুযায়ী মিহরাহ, আবদুল কায়েস, নাহিয়া ইযদ, কিনানা ও আম্বর গোত্রসমূহকে সাথে নিয়ে হযরত মুহাজিরের (রা) সঙ্গে মিলিত হলেন। অতপর এই সম্মিলিত বাহিনী কিন্দাহর দিকে অগ্রসর হলো। হযরত যিয়াদ (রা) বিন লবিদ সেখানে খুব কঠিন পরিস্থিতির মুকাবিলা করছিলেন। তিনি প্রথম দিকে ইয়েমেনের মুরতাদ গোত্রসমূহের ওপর প্রচন্ডভাবে হামলা করেছিলেন। কিন্তু পরে কিন্দী সরদার আশয়াছ বিন কায়েস তাঁর ওপর হামলা করে অনেক মাল ও সরঞ্জাম ছিনিয়ে নিয়ে ছিল এবং সকল মুরতাদ কয়েদী ছাড়িয়ে নিয়েছিল। হযরত যিয়াদ (রা), হযরত মুহাজির (রা) এবং হযরত ইকরামার (রা) সম্মিলিত বাহিনী আশয়াছ বিন কায়েসকে ঘেরাও করে ফেললেন এবং একটি রক্তাক্ত যুদ্ধের পর তাকে পরাজিত করলেন। সে পালিয়ে নাহইয়ার দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লো। মুসলমানরা সেই দুর্গের ওপর অবরোধ কঠোরভাবেই আরোপ করলেন। অবরোধে আশয়াছ খুবই বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়লো। তখন সে নিজের কবিলার জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করলো। হযরত যিয়াদ (রা) বিন লবিদ তা মঞ্জুর করে নিলেন এবং বলে পাঠালেন যে, আমান নামা লিখে আনো। সে আমান নামা লিখে আনলো এবং হযরত যিয়াদ (রা) তার ওপর নিজের সীলমোহর মেরে দিলেন। দুর্ভাগ্য বশত আশয়াছ বিন কায়েস আমান নামায় নিজের নাম লিখতে ভুলে গিয়েছিল। হযরত ইকরামা (রা) আমান নামাটি পড়লেন। তাতে আশয়াছের নাম ছিল না। সুতরাং তিনি তাকে গ্রেফতার করলেন এবং অন্য কয়েকজন কয়েদীর সাথে মদীনা নিয়ে এলেন। সেখানে পৌছে আশয়াছ বিন

কায়েস ধর্মদ্রোহিতা থেকে তাওবা করে ইসলাম কবুল করেন। সে ছিল একজন বাহাদুর ও দানশীল মানুষ। এজন্য হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সংক্ষিপ্ত কথা হলো যে, হযরত ইকরামা (রা) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধর্মদ্রোহিতার ফিতনা নির্মূলের জন্য জিহাদে তৎপর ছিলেন। যখন এই ফিতনার সমাপ্তি ঘটলো তখন তিনি শান্তির নিঃশ্বাস নিলেন। এসব যুদ্ধে তিনি সকল ব্যয় নিজের তহবিল থেকে নির্বাহ করেছিলেন এবং বাইতুলমাল থেকে এক পয়সাও গ্রহণ করেননি।

ধর্মদ্রোহিতার ফিতনা নির্মূলের পর সিরিয়া ও ইরানের সাথে যুদ্ধের এক দীর্ঘ সিলসিলা শুরু হয়ে গেল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) সিরিয়া অভিযানে সর্বপ্রথম হরত আবু উবায়দা (রা) ইবনুল জাররাহ, হযরত মুয়াজ (রা) বিন জাবাল, হযরত ইয়াযিদ (রা) বিন আবু সুফিয়ান (রা) এবং হযরত শুরাহবিল (রা) বিন হাসানাকে প্রেরণ করলেন। তারপরও অব্যাহতভাবে সিরিয়ার মুজাহিদদেরকে সাহায্য পাঠাতে লাগলেন। এই প্রসঙ্গে পরামর্শের জন্য তিনি মক্কার শরীফদেরকেও ডেকে পাঠালেন। এ সময় হযরত ওমর ফারুক (রা) সিদ্দীকে আকবরের (রা) খিদমতে আরজ করলেন যে, তাঁরা নিজেদের জীবনের বড় অংশ ইসলাম বিরোধিতায় কাটিয়েছে এবং হকের রাস্তা বন্ধ করার জন্য সব ধরনের তৎপরতাই চালিয়েছেন। আল্লাহ তাদেরকে পরাজিত করেছেন। এ জন্য এখন তাঁদেরকে অগ্রগামী মু'মিনদের সাথে পরামর্শে শরীক করানো ঠিক হবে না।

মক্কার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও কুরাইশ সরদারগণ হযরত ওমরের (রা) কথা জানতে পেলেন। তখন হযরত ইকরামা (রা), হযরত হারিছ (রা) বিন হিশাম এবং হযরত সোহায়েল (রা) বিন আমর খলিফার দরবারে হাজির হলেন এবং সকলে কেঁদে কেঁদে আরজ করলেন যে, ইসলামের পূর্বে আমাদের সাথে এ ধরনের আচরণ বৈধ ছিল। কিন্তু এখন আমাদের সাথে এ ধরনের কঠোরতা ইনসাফ বিরোধী ব্যাপার। হযরত ওমরও (রা) তখন খলিফার দরবারে উপস্থিত ছিলেন। হযরত ইকরামা (রা) তাঁকে সম্বোধন করে এ পর্যন্ত বলে ফেললেন, "এখন আপনি আমাদের চেয়ে বেশী তাদের শত্রু নন যারা ইসলাম অস্বীকারকারী ও মুসলমানদের বিরোধী।" হযরত ওমর (রা) বললেন, "আল্লাহর কসম, আমি খলিফাতুর রাসূলের (সা) খিদমতে যা কিছু বলেছি তা শুধু মাত্র সাবিকুনাল আউয়ালিনের কল্যাণ কামনা এবং তোমাদের মধ্যে ও তোমাদের চেয়ে আফজাল মুসলমানদের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বলেছি।" একথার ওপর কুরাইশের তিন সরদারই অগ্নিঝরা বক্তৃতা করলেন। তাতে তারা নিজেদের সকল কিছু হক পথে কুরবানী করে দেয়ার দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করলেন। এ সময় হযরত ইকরামা (রা) বক্তৃতা দিতে গিয়ে বললেন ঃ

"হে জনতা ! সাক্ষ্য থেকো যে, আমি আমার জীবন, আমার সঙ্গীদের জীবন এবং আমার সকল সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে দিয়েছি। আমরা কোন সময়ই জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিব না এবং সিপাহীদের মত জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইসলামী ঝান্ডার অধীন লড়াই করতে থাকবো। কার হাতে এই ঝান্ডা রয়েছে তার কোন তারতম্য করবো না।"

বক্তৃতা শুনে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাদের জন্য দোয়া করলেন এবং হযরত ওমরও (রা) খুশী হয়ে গেলেন। তারপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) হযরত আমর (রা) ইবনুল আছকে একটি শক্তিশালী সৈন্য বাহিনীসহ সিরিয়া গমনের নির্দেশ দিলেন। হযরত ইকরামাও (রা) নিজের স্ত্রী উম্মে হাকিম (রা) এবং দুই পুত্রসহ সেই বাহিনীতে যোগ দিলেন। সৈন্যবাহিনী রওয়ানার পূর্বে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তা পরিদর্শনের জন্য তাশরীফ নিলেন। পরিদর্শনের সময় তিনি একটি তাঁবুর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এই তাঁবুর চার পাশে শুধু ঘোড়া আর ঘোড়া পরিদৃষ্ট হলো এবং বর্শা, তরবারী ও অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জামও বিপুল পরিমাণ সেখানে মওজুদ ছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁবুর অভ্যন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। সেখানে তিনি হযরত ইকরামাকে (রা) দেখতে পেলেন। এসব সরঞ্জাম তিনি নিজের অর্থ দিয়ে ক্রয় করেছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁকে সালাম করলেন এবং বললেন, "ইকরামা, তুমি যুদ্ধ সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছ। তুমি এই সকল অর্থ অথবা তার কিছু অংশ বাইতুলমাল থেকে নিয়ে নাও এটা আমি চাই।"

হযরত ইকরামা (রা) আরজ করলেন, "হে খলিফাতুর রাসূল! আমার নিকট এখনো দু' হাজার দিনার নগদ রয়েছে এবং আমি আমার সম্পদ হক পথের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছি। আমাকে বায়তুলমালের ওপর বোঝা আরোপে মা'জুর রাখুন।"

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) আল্লাহর রাস্তায় তাঁর ব্যয়ের আবেগ দেখে খুব প্রভাবিত হলেন এবং তাঁর জন্য পুনরায় দোয়া করলেন।

হযরত আমর (রা) ইবনুল আছ হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) হেদায়াত অনুযায়ী সর্বপ্রথম ফিলিস্তিন অভিমুখে যাত্রা করলেন। সে যুগে ফিলিস্তিন সিরিয়ার একটি অংশ ছিলো এবং রোমক বাদশাহ হিরাক্লিয়াসের সাম্রাজ্যের অধীন ছিলো। মুসলমানদের হামলার খবর পেয়ে হিরাক্লিয়াস এক লাখ সৈন্য সমন্বয়ে গঠিত একটি বাহিনী ফিলিস্তিন প্রেরণ করলো। রোমক এবং ইসলামী সৈন্যদের মধ্যে কয়েকটি রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এ সকল

যুদ্ধের প্রত্যেকটিতেই রোমকদেরকে পরাজয়ের মুখ দেখতে হলো। এসব যুদ্ধে হযরত ইকরামা (রা) বিস্ময়কর দৃঢ়তা ও জীবন উৎসর্গের নিদর্শন দেখালেন এবং কয়েকবার ইসলামী বাহিনীর অগ্রগামী দলের নেতৃত্বও প্রদান করেন। সেই যুগে হযরত আমর (রা) ইবনুল আছ দামেস্ক থেকে হযরত আবু উবায়দার (রা) পত্র পেলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন যে, "আজনাদাইনে রোমকদের এক বিরাট বাহিনী রয়েছে। আমি তাদের মুকাবিলার জন্য আজনাদাইন যাচ্ছি। তুমিও তোমার সৈন্যসহ সেখানে পৌছে যাও।

এই পত্র পেয়েই হযরত আমর (রা) ইবনুল আছ আজনাদাইনের দিকে রওয়ানা হলেন। হযরত ইয়াযিদ (রা) বিন আবু সুফিয়ান (রা) এবং শুরাহবিল বিন হাসানও (রা) নিজের বাহিনী নিয়ে হযরত আবু উবায়দার (রা) নিকট আজনাদাইন পৌছে গেলেন। মুসলমানদের সেই সম্মিলিত বাহিনী এবং রোমকদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। এই যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হলেন। তাতেও হযরত ইকরামা (রা) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই করেছিলেন। আজনাদাইন বিজয়ের পর হযরত আমর (রা) ইবনুল আছ ফিলিস্তীন প্রত্যাবর্তন করলেন এবং হযরত আবু ওবায়দা (রা) দ্বিতীয়বার অত্যন্ত কঠোরতার সাথে দামেস্ক অবরোধ করে নিলেন। এই অবরোধ মুসলমানদের সাফল্যের নিয়ামক হিসেবে দেখা দিল এবং তাঁরা দামেস্ক দখল করে নিলেন। তারপর মুসলমানরা জর্দানের ফাহল নামক স্থানের দিকে রওয়ানা দিলেন। সেখানে নিকটেই বিসান নামক স্থানে ৮০ হাজার রোমক যোদ্ধা মুসলমানদের সাথে লড়াই করে মরার জন্য একত্রিত হয়েছিল। এই বিরাট বাহিনীর সাথে মুকাবিলার জন্য সকল মুসলমান সৈন্য পুনরায় আরেকবার ফাহালে একত্রিত হলো। ইত্যবসরে রোমকরা চার পাশের নদী-নালার বাধ ভেঙ্গে দিলো। ফলে বিসান ও ফাহাল এলাকা পানিতে ডুবে গেল এবং কর্দমাক্ত হয়ে উঠলো। এ জন্য ফাহাল থেকে সামনে অগ্রসর হওয়াটা মুসলমানদের পক্ষে হয়ে উঠলো কঠিন ব্যাপার। এবং তারা দীর্ঘকালীন সময় পর্যন্ত ফাহালে তাঁবু খাটিয়ে পড়ে রইলেন। একদিন রোমকরা মুসলমানদেরকে গাফেল ভেবে রাতের অন্ধকারে অত্যন্ত জোরেশোরে তাদের ওপর হামলা করে বসলো। কিন্তু মুসলমানরাও একদম বেখবর ছিলেন না। তাঁরা খুব দৃঢ়তার সাথে মুকাবিলা করলো। সারা রাত এবং পরের দিন ও রাত পর্যন্ত অব্যাহতভাবে যুদ্ধের ময়দান উত্তপ্ত রলো। আল্লামা ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইকরামা (রা) এ যুদ্ধে জীবনবাজী রেখে অংশ নিলেন। যেদিকেই অগ্রসর হতেন সেদিকেই লাশ আর লাশ দৃষ্টিগোচর হতো। একবার যুদ্ধ করতে করতে দূর পর্যন্ত দুশমনের ব্যূহে ঢুকে পড়লেন। সারা শরীর

আঘাতে আঘাতে ছিদ্র হয়ে গেল। লোকরা বললো, ইকরামা আল্লাহর ভয় করো। এভাবে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত করো না এবং আবেগকে বুদ্ধির ওপর বিজয়ী হতে দিও না।

তিনি জবাব দিলেন, "হে লোকেরা! আমি লাত উজ্জার খাতিরে জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতাম। আজ আল্লাহ ও রাসূলের (সা) জন্য জীবন বিলিয়ে দেবো না ? আল্লাহর কসম, তা কখনো হবে না।"

শেষে রোমকরা হিম্মতহারা হয়ে পড়লো এবং তারা পিছপা হতে শুরু করলো। ব্যাকুল অবস্থায় তারা কাদায় আটকে গেল এবং ৮০ হাজার সৈন্যের মধ্যে কতিপয় ছাড়া আর কেউ বাঁচতে পারলো না। সেখানেই প্রায় সকল সৈন্য মুসলমানদের হাতে শেষ হয়ে গেল। ফাহালের পর হযরত ইকরামা (রা) হেমসের যুদ্ধে নিজের তরবারীর পারদর্শীতা প্রদর্শন করলেন তারপর ইয়ারমুকের জিহাদের ময়দানে পৌছে গেলেন।

সিরিয়ায় মুসলমানরা যেসব যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল তার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধ ছিল ইয়ারমুকের। তাতে রোমক বাদশাহ হিরাক্লিয়াস কয়েক লাখ রোমক যোদ্ধাকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এনে দাঁড় করালো। রোমকদের সংখ্যার ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। একটি সতর্ক আন্দাজ অনুযায়ী তাদের সংখ্যা দু'লাখ থেকে পাঁচ লাখের মধ্যে ছিল। সিরিয়ায় উপস্থিত সকল মুসলমান সৈন্যের সংখ্যা মিলিয়ে ৪০ হাজারের কাছাকাছি ছিল। আল্লাহর এই চল্লিশ হাজার সৈন্য চারদিক থেকে একত্রিত হয়ে ইয়ারমুকের ময়দানে এসে পৌছলো এবং রোমকদের ভয়াবহ যুদ্ধ শক্তির সামনে দাঁড়িয়ে গেলো। এই যুদ্ধে মুজাহিদরা যে ত্যাগ, ধৈর্য ও অটলতার সাথে রোমকদের মুকাবিলা করেছিল তাও নজিরবিহীন ঘটনা। হযরত ইকরামা (রা) ইয়ারমুকের যুদ্ধে একটি সামরিক দলের অফিসার ছিলেন। তিনি নিজেও জীবন হাতে রেখে লড়াই করেছিলেন এবং নিজের দলকেও এমনভাবে লড়াইতে লাগিয়েছিলেন যে, অফিসারীর হক যথাযথভাবে পালন করেছিলেন। একবার রোমকরা অত্যন্ত জোরেশোরে হামলা করলো এবং মুসলমানদের ওপর এমন কঠিন চাপ প্রয়োগ করলেন যে, তাদের পা টলটলায়মান হয়ে উঠলো। তা দেখে হযরত ইকরামার (রা) আবেগ উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। তিনি নিজের ঘোড়া সামনে অগ্রসর করালেন এবং উচ্চ স্বরে বললেন ঃ

"হে রোমকরা ! আমি কোন এক সময় (কুফুরী অবস্থায়) স্বয়ং রাসূলের (সা) সাথে লড়াই করেছি। আজ কি তোমাদের মুকাবিলায় আমার কদম পিছু হটতে পারে ? আল্লাহর কসম, এমনটি কখনো হবে না।"

তারপর নিজের বাহিনীর দিকে তাকালেন এবং ডেকে বললেন, "এসো, কে আমার হাতে মৃত্যুর বাইয়াত করবে ?"

তাঁর ডাকে চার ব্যক্তি সামনে অগ্রসর হলেন এবং তাঁর হাতে মৃত্যুর বাইয়াত করলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত ইকরামা (রা) দুই পুত্রও ছিলেন। অতপর সেই সব জানবাজ হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের তাঁবুর সামনে মরণপণ লড়াই শুরু করে দিলেন। এমনকি তাঁরা এক এক করে শহীদ হয়ে গেলেন অথবা গুরুতরভাবে আহত হয়ে লড়াই করতে অক্ষম হয়ে পড়লেন। হযরত ইকরামা (রা) এবং তাঁর দুই পুত্র মারাত্মকভাবে আহত হলেন। পুত্রদের অবস্থা ছিল গুরুতর। হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ তাঁদেরকে দেখতে এলেন। একজনের মাথা নিজের রানের ওপর এবং অপরের মাথা পায়ের গোছার ওপর রাখলেন। অতপর তাঁদের চেহারার ওপর থেকে রক্ত মুছলেন এবং হলকে পানি দিতে শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলতে লাগলেন ঃ

"আল্লাহর কসম, ইবনে হানতামার [হযরত ওমর ফারুকের (রা)] ধারণা সঠিক প্রমাণিত হয়নি। কারণ তাঁর ধারণা ছিল যে আমরা (বনু মাখজুম) শাহাদাত লাভ করতে চাই না।"

অন্য আরেক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত ইকরামার (রা) লাশ নিহতদের স্তূপে পাওয়া গিয়েছিল। তখনো নিঃশ্বাস অবশিষ্ট ছিল। হযরত খালিদ (রা) তাঁর মাথা নিজের উরুর পর রাখলেন এবং হলকে পানির ফোটা দিতে দিতে উল্লিখিত কথাগুলো বলেছিলেন। (আল-ফারুক—শিবলী নুমানী)। এ কথাগুলোর পটভূমি এই ছিল যে, কুফুরীকালে মাখজুমীরা ইসলাম দুশমনীতে যে তৎপরতা দেখিয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে কোন এক সময় হযরত ওমর ফারুক (রা) এই ধারণা প্রকাশ করেছিলেন যে, সম্ভবত মাখজুমীদের শাহাদাত লাভের ভাগ্য হবে না। এ সময় হযরত খালিদ (রা) হযরত ওমরের (রা) সেই ধারণার দিকে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন এবং প্রচণ্ড আবেগে তাঁর নাম তাঁর মায়ের (হানতামার) নিসবতের সাথে নিয়েছিল।

কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, হযরত ইকরামার (রা) যখন শ্বাসকষ্ট চলছিলো তখন তিনি পানি চাইলেন। এক ব্যক্তি দৌড়ে পানি আনলো। যেই তিনি পেয়ালা মুখে লাগালেন পাশে থেকে অন্য আরেক আহত ব্যক্তি পানি চাইলো। হযরত ইকরামা (রা) পেয়ালা তাঁর দিকে এগিয়ে দিলেন এবং নিজে চিরনিদ্রায় শায়িত হয়ে গেলেন। দ্বিতীয় আহত ব্যক্তি তখনো পানি পান করেনি। এমন সময় সে অন্য আরেক আহত ব্যক্তিকে পানি পানি বলে চিৎকার করতে শুনলো। সেও পেয়ালা নিজের মুখ থেকে হটিয়ে তার কাছে পাঠিয়ে

দিল। এমনিভাবে সাত আহত মুজাহিদ একের পর এক পানির এক কাতরা পানের পূর্বেই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলেন। প্রত্যেকেই নিজের পিপাসার ওপর অন্যের পিপাসাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন এবং ত্যাগ ও স্বার্থহীনতার এমন এক উদাহরণ সৃষ্টি করলেন যা চিরকাল মুসলমানদের জন্য মশাল হয়ে থাকবে।

হযরত ইকরামা (রা) যে মহান মর্যাদাবান ছিলেন তার প্রমাণ মহানবীর (রা) বাণী, তিনি দু'দু'বার তাঁকে বেহেশতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। এক রেওয়ায়াতে আছে যে, একবার কুফুরী অবস্থায় হযরত ইকরামা (রা) একজন মুসলমানকে শহীদ করে ফেলেন। হুজুর (সা) এই খবর পেয়ে মুচকি হেসে দিলেন। সাহাবারা (রা) বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মাতা পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। আপনার মুচকি হাসার কারণ কি।

তিনি বললেন, আমি (অদৃশ্য জগতে) দেখলাম যে, হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই একে অপরের হাত ধরে জান্নাতে যাচ্ছেন।

অন্য আরেক রেওয়ায়াতে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন যে, আমি স্বপ্নের জগতে জান্নাতে গেলাম। সেখানে আমি খেজুরের একটি বৃক্ষ দেখলাম। বৃক্ষটি অন্য সকল বৃক্ষ থেকে ভালো মনে হচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কার বৃক্ষ। আমাকে বলা হলো যে, এটা আবু জেহেলের বৃক্ষ। আমি বিস্মিত হলাম যে, আবু জেহেলের মত ইসলাম দুশমনের বৃক্ষ জান্নাতে? এই ঘটনার কয়েক বছর পর যখন হযরত ইকরামা (রা) ইসলাম গ্রহণের মর্যাদা লাভ করলেন তখন হুজুর (সা) খুশী হয়ে বললেন, ইকরামা (রা) আবু জেহেলের সেই বৃক্ষ যা আমি স্বপ্নে (বেহেশতে) দেখেছিলাম।

হযরত ওসমান (রা) বিন আবিল আছ ছাকাফী

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তায়েফের বনু ছাকিফ প্রচণ্ড অবাধ্য ও খারাব প্রকৃতির ছিল। দ্বীনে হকের প্রতি তাদের শত্রুতা ও বিদ্রোহের অবস্থাটা এমন ছিল যে, নবুয়াতের দশম বছরের পর প্রিয় নবী (সা) হকের তাবলীগের জন্য তাদের নিকট তাশরীফ নিলেন। এ সময় তারা আরবদের প্রথাগত মেহমান দারীকে তাকে তুলে রাখলো এবং তাওহীদের দাওয়াতের জবাবে হুজুরকে (সা) শুধুমাত্র হাসি ঠাট্টা ও বিদ্রূপের নিশানাই বানালো না। বরং তাঁর ওপর পাথর পর্যন্ত নিক্ষেপ করলো। এমনকি মহানবী (সা) আহত অবস্থায় তায়েফ থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য হলেন। অতপর অষ্টম হিজরীতে হকপন্থীরা তায়েফ অবরোধ করে নিলে বনু ছাকিফ প্রচন্ডভাবে বাধা দিল এবং পাথর ও তীর বর্ষণ করে কয়েকজন মুসলমানকে শহীদ করে ফেললো। কিন্তু আল্লাহর কুদরত বিস্ময়কর ধরনের হয়ে থাকে। সেই ঘটনার পর তখনো খুব বেশী দিন অতিবাহিত হয়নি। এমন সময় আল্লাহ তায়ালা তায়েফবাসীর অন্তর ফিরিয়ে দিলেন এবং নবম হিজরীতে তাঁরা স্বয়ং ইসলামের আস্তানার সামনে মাথা নত করে দিলেন। এ বছর বনু ছাকিফের একটি প্রতিনিধি দল আবাদী ইয়ালাইলের নেতৃত্বে মদীনা মুনাওয়ারা এলেন। হযরত মুগিরা (রা) বিন শু'বা ছাকাফী যিনি পূর্বেই ইসলামের নিয়ামতে অভিষিক্ত হয়ে মদীনাতে অবস্থান করছিলেন, তিনি হুজুরের (সা) ইঙ্গিতে সেই প্রতিনিধি দলকে মসজিদের আঙ্গিনায় তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান করালেন এবং তাদেরকে খুব খাতির যত্ন করলেন। এই প্রতিনিধি দল মদীনা মুনাওয়ারাতে দীর্ঘ সময় অবস্থান করেছিল। এ সময় প্রতিনিধি দলের নেতা আবদী ইয়ালাইল হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে রেওয়ায়াতের দরখাস্ত করলো। এই রেয়ায়েত বা কনসেশনের মধ্যে নামায ত্যাগ, মদপান এবং সুদী লেন-দেনের ইজাযত ছাড়া জিহাদ থেকে বাদ রাখার কনসেশনও অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহানবী (সা) প্রথম তিন রেয়ায়েত প্রদানে সরাসরি অস্বীকার করে বসলেন। অবশ্য তাদেরকে সাময়িকভাবে জিহাদ থেকে বাদ দিলেন এবং সাহাবাদেরকে (রা) বললেন যে, ইসলাম যখন তাদের অন্তরে মজবুত হয়ে যাবে তখন তারা নিজেরাই জিহাদের জন্য বের হবেন। তায়েফবাসী নবীর (সা) ইরশাদের সামনে মাথা নত করে দিলো এবং কালেমায়ে তাওহীদ পাঠ করে হুজুরের (সা) হাতে বাইয়াত করার মর্যাদা লাভ করলেন।

বনু ছাকিফের প্রতিনিধি দলে একজন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী যুবকও অন্তর্ভুক্ত ছিলো। বয়সে সে ছিল সবচেয়ে ছোট। কিন্তু অত্যন্ত সুন্দর স্বভাবের ও বুদ্ধিমান

ছিলো। তার কপাল সৌভাগ্যের আলোয় ঝলমল করছিল এবং সে ইসলাম গ্রহণের জন্য খুবই বেচাইন ছিল। এই যুবক মদীনায় এসেই প্রতিনিধি দল থেকে পৃথক হয়ে গেল এবং পৃথক অবস্থায় হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলো। প্রতিনিধি দলের নেতৃবৃন্দ তো বিভিন্ন ধরনের সমস্যার ব্যাপারে হুজুরের (সা) সঙ্গে আলোচনায় ব্যাপৃত হয়ে গেলেন এবং সেই যুবক তাদেরকে লুকিয়ে প্রথমে রাসূলের (সা) নিকট থেকে কুরআনে হাকিমের কিছু অংশ পড়লো এবং পুনরায় অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে হযরত উবাই (রা) বিন কা'ব আনসারীর নিকট কুরআনে হাকিমের তালিম হাসিল করতে লাগলো। একদিন সাইয়েদেনা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তার জ্ঞানের উৎসাহ দেখে বললেন, "এই ছেলে তাফাককুহ ফিদ্বীন এবং কুরআন তালিমে খুবই আগ্রহী।"

মহানবীও (সা) এই যুবকের জ্ঞান অর্জনের উৎসাহ এবং উঁচু যোগ্যতাসমূহ সম্পর্কে অবহিত হয়ে গেলেন। সুতরাং বনু ছাকিফের প্রতিনিধি দল যখন বিদায় হওয়ার সময় হুজুরের (সা) নিকট দরখাস্ত করলো যে আমাদের জন্য কোন ইমাম নিয়োগ করে দিন তখন তিনি সেই যুবকের হাত ধরে বললেন, "এ জ্ঞানী মানুষ এবং এ-ই তোমাদের আমীর ও ইমাম হবে।"

প্রতিনিধি দলের সকলেই হুজুরের (সা) ইরশাদের সামনে মাথা নত করে দিলেন। অতপর তিনি সেই যুবককে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"নামায পড়ানোর সময় লোকদের অবস্থার খেয়াল রাখবে। তাদের মধ্যে বৃদ্ধ, শিশু, অসুস্থ, দুর্বল এবং ব্যবসায়ী সকল শ্রেণীর মানুষ থাকে।"

এই নেককার জওয়ান যাঁর জ্ঞান অর্জনের এত আগ্রহ ছিল এবং অল্প বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও রিসালাতের দরবার থেকে যাঁকে শুধুমাত্র জ্ঞানী হওয়ার সার্টিফিকেটই প্রদান করা হলো না বরং বনু ছাকিফের মত জবরদস্ত গোত্রের ইমারত ও ইমামতও প্রদত্ত হলো তিনি ছিলেন হযরত ওসমান (রা) বিন আবিল আছ ছাকাফী।

সাইয়েদেনা হযরত আবদুল্লাহ ওসমান (রা) বিন আবিল আছ মহানবীর (সা) সেই সব সাহাবীর (রা) মধ্যে পরিগণিত হতেন যাঁরা আসমানী জ্ঞানের চন্দ্র ও সূর্য ছিলেন এবং জিহাদের শওক, বীরত্ব ও পৌরুষত্বের দিক থেকে নজীরবিহীন ছিলেন।

হযরত ওসমানের (রা) সম্পর্ক ছিল মশহুর কবিলা বনু ছাকিফের সঙ্গে। তিনি ছিলেন তায়েফের সুন্দর পরিবেশ ও শ্যামলিমাপূর্ণ শহরের অধিবাসী।

হযরত ওসমান (রা) সেই শহরেই জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই যৌবন প্রাপ্ত হন। নসবনামা হলো ঃ

ওসমান (রা) বিন আবিল আছ বিন বাশার বিন দাহমান বিন আবদুল্লাহ বিন হুমাম বিন আবান বিন ইয়াসার বিন মালিক বিন খাতিত বিন জাশম ছাকাফী।

বনু ছাকিফ অত্যন্ত কঠোর ও কর্কশ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কিন্তু হযরত ওসমান (রা) অত্যন্ত সুন্দর স্বভাব ও নরম প্রকৃতির যুবক ছিলেন। যৌবন প্রাপ্তির পর তিনি তাওহীদের দাওয়াতের চর্চা শুনলেন। এ সময় নেকীর দিকে নিজের প্রাকৃতিক আকর্ষণের কারণে তিনি তাতে খুব প্রভাবিত হলেন এবং হকের মহান দায়ীর (সা) দর্শন লাভ এবং ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হওয়ার জন্য অশান্তিতে থাকতে লাগলেন। সুতরাং তায়েফের যুদ্ধের পর বনু ছাকিফের প্রতিনিধি দল যখন নবীর দরবারে হাজেরীর জন্য মদীনা রওয়ানা হলো, তখন তিনিও সেই প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন এবং মদীনা পৌছে সর্বপ্রথম ঈমান আনয়ন করলেন। হুজুর (সা) বরকত হিসেবে তাঁকে কিছু কুরআন পড়ালেন এবং তারপর তিনি অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে মদীনা অবস্থানকালে হযরত উবাই (রা) বিন কাবের নিকট কুরআন করিম এবং দ্বীনি মাসায়েল শিখতে লাগলেন। নিজের জ্ঞানার্জনের আগ্রহ এবং দ্বীনের প্রতি নিষ্ঠার কারণে তিনি খুব শীঘ্র মহানবীর (সা) স্নেহের পাত্র হয়ে যান এবং অবশেষে প্রিয়নবীর (সা) নিকট থেকে বনু ছাকিফের ইমারাত ও ইমামতের মর্যাদা লাভ করেন।

একাদশ হিজরীতে মহানবীর (সা) ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খিলাফতের মসনদে সমাসীন হলেন। এ সময় হঠাৎ করে সমগ্র আরবে ধর্মদোহিতার ফিতনার আগুন জ্বলে উঠলো। এই আগুনের উত্তাপ তায়েফ পর্যন্ত গিয়ে পৌছলো। তখন হযরত ওসমান (রা) বিন আবিল আছ অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি সকল বনি ছাকিফকে একত্রিত করলেন এবং তাঁদের সামনে এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা করলেন। তাতে তিনি বললেন, "হে ছাকিফের লোকেরা! তোমরা ইসলামে অগ্রগামিতায় বঞ্চিত থেকেছ এবং সে সময় এই নিয়ামত লাভ করেছ যখন আরবের অন্যান্য সকল কবিলা তাতে পূর্বেই অভিষিক্ত হয়েছিল। সেই দেরীর ক্ষতিপূরণ এই নাযুক সময়ে তোমরা দ্বীনে হকের ওপর অটল থেকে করতে পারো। গোমরাহীর এই তুফানের প্রভাব গ্রহণ করা তোমাদের শোভা পায় না। দেখো, এ সময় তোমাদের পা অবশ্যই যেন টলটলায়মান না হয়।" হযরত ওসমানের (রা) প্রভাবপূর্ণ বক্তৃতার ফল এই দাঁড়ালো যে, তায়েফের ওপর ধর্মদ্রোহিতার মেঘ দেখা দিতে না দিতেই

তা মুহূর্তের মধ্যে কেটে গেল এবং বনু ছাকিফ ধর্মদ্রোহীদের ফিতনা খুব দৃঢ়তার সাথে মুকাবিলা করলো।

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) সম্পূর্ণ খিলাফতকালে হযরত ওসমান (রা) বিন আবিল আছ তায়েফের আমীর রলেন। হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতের প্রথম যুগেও তিনি সেই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। চতুর্দশ হিজরীতে হযরত ওমর ফারুক (রা) বসরা শহর আবাদ করালেন। তখন সেখানকার লোকদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রশ্নে তাঁর দৃষ্টি পড়লো হযরত ওসমান (রা) ছাকাফীর ওপর। সুতরাং তিনি হযরত ওসমানকে (রা) বসরা প্রেরণ করলেন। এক বছর পরই হযরত ওমর ফারুকের (রা) মানুষ চেনার দৃষ্টি হযরত ওসমান (রা) বিন আবিল আছকে বাহরাইন ও আম্মানের গবর্নরীর জন্য নির্বাচিত করলো। হযরত ওসমান (রা) আম্মানকে নিজের স্থায়ী আবাস বানালেন এবং সহোদর হাকাম (রা) বিন আবিল আছকে নিজের নায়েব বানিয়ে বাহরাইন প্রেরণ করলেন।

আল্লামা বালাজুরী (র) "ফতুহুল বুলদান" গ্রন্থে লিখেছেন যে, ওসমান (রা) বিন আবিল আছ কিছুদিন পর একটি নৌবহর তৈরি করলেন এবং তা হিন্দুস্তানের ওপর হামলার জন্য প্রেরণ করলেন। এই নৌবহর গুজরাট ও কোকন বোম্বাইয়ের সীমান্তে অবস্থিত বন্দর থানা পর্যন্ত পৌছেছিলো। ইসলামের মুজাহিদরা সেই শহর দখল করে। কিন্তু তার ওপর দখল বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। কেননা, তার উদ্দেশ্য ছিল নৌ ডাকাতি বন্ধ এবং হিন্দুস্তানের অবস্থান জানা। সুতরাং তিনি কিছুদিন পর থানা থেকে প্রচুর গনিমাতের মালসহ আম্মান ফিরে গেলেন। ঐতিহাসিকরা বর্ণনা করেছেন যে, হিন্দুস্তানের (গুজরাট কাঠিওয়ার) ওপর আরবদের এইটাই প্রথম হামলা ছিল।

হযরত ওসমান (রা) এই নৌবহর প্রেরণের সময় হযরত ওমর ফারুকের (রা) অনুমতি নেননি। এ জন্য তিনি যখন খিলাফতের দরবারে নিজের সাফল্য ও গনিমাতের মাল লাভের খবর পাঠালেন তখন আমীরুল মু'মিনীন তার সেই অভিযান পছন্দ করলেন না। কেননা তার ধারণায় হযরত ওসমান (রা) মুসলমানদের জীবনকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। সুতরাং তিনি হযরত ওসমানকে (রা) একটি কঠোর পত্র প্রেরণ করলেন। তাতে লিখেছিলেন যে ঃ

"হে আমার ছাকাফী ভাই! তুমি তো সৈন্য প্রেরণ করোনি, বরং যেন একটি পতঙ্গকে কাঠের ওপর বসিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছিলে। তারা যদি মুসিবতে ফেসে যেতো তাহলে আল্লাহর কসম, আমি তোমার এবং তোমার কওমের নিকট থেকে তার জবাবদিহি করতাম।"

হযরত ওমর ফারুকের (রা) এই সতর্কতামূলক পত্র সত্ত্বেও হযরত ওসমান (রা) বিন আবিল আছ হিন্দুস্তানের নৌ হামলার ধারা অব্যাহত রাখলেন। কেননা তার নিকট সেখানকার স্থানীয় পরিস্থিতিই এ ধরনের হামলার দাবী করতো। আল্লামা বালাজুরী (র) বর্ণনা করেছেন যে, দ্বিতীয়বার হযরত ওসমান (রা) নিজের ভাই মুগিরা (রা) বিন আবিল আছকে একটি নৌবহর দিয়ে হিন্দুস্তান পাঠিয়েছিলেন। তিনি সিন্ধুর মশহুর শহর দেবেল পৌঁছেন এবং শত্রুদেরকে পরাজিত করে গনিমাতের মালসহ বাহরাইন ফিরে আসেন। একটি রেওয়ায়াতে এও আছে যে, মুগিরা দেবেলে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। তৃতীয়বার হযরত ওসমান (রা) নিজের অন্য আরেক ভাই হাকাম (রা) বিন আবিল আছকে একটি নৌবহরের অফিসার বানিয়ে হিন্দুস্তান রওয়ানা করেন। তিনি ভারুচ পদানত করে ফিরে যান।

কতিপয় ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন যে, এসব হামলার লক্ষ্য ছিল শুধুমাত্র সেই নৌ লুটেরাদের উৎখাত যারা আরবদের জাহাজ লুটপাট করে সিন্ধু ও কাঠিয়াদারের বন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করতো। হযরত ওসমান (রা) এসব হামলার মাধ্যমে এই লক্ষ্য অনেকাংশেই হাসিল করেছিলেন এবং জাহাজের নৌ ডাকাতদের লুটতরাজ থেকে বহুলাংশেই নিষ্কৃতি লাভ ঘটেছিলো।

একুশ হিজরীতে হযরত ওসমান (রা) বিন আবিল আছের জীবনের সেই উদ্যমপূর্ণ অধ্যায় শুরু হয়—যাতে তিনি ফারুক ও ওসমানী খিলাফত আমলের নামকরা সিপাহসালারদের কাতারে দন্ডায়মান পরিদৃষ্ট হয়। সেই বছরে হযরত ওমর ফারুক (রা) ইরানের ওপর সাধারণ সামরিক অভিযানের সংকল্প নেন। তিনি নিজের হাতে বেশ কিছু ঝান্ডা তৈরি করেন এবং তা নিজের কয়েকজন মশহুর অফিসারের নিকট সোপর্দ করে বিভিন্ন শহর ও এলাকা পদানত করার কাজে নিয়োগ করেন। এসব অফিসারের মধ্যে হযরত ওসমান (রা) বিন আবিল আছও ছিলেন। তাঁকে আসতাখার জয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। আসতাখার পারস্যের খুবই গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল এবং তার ওপর সামরিক অভিযানের অর্থই ছিল পারস্যের ওপর সামরিক অভিযান। পারস্যবাসীও প্রতি মুহূর্তের খবর পাচ্ছিলো। তারা তাওজকে কেন্দ্র বানিয়ে অত্যন্ত জোরেশোরে মুসলমানদের মুকাবিলার প্রস্তুতি নিলো। হযরত ওসমান (রা) আবরকাওয়ান দ্বীপ জয় করে তুফানের মত তাওজের দিকে অগ্রসর হলেন এবং ইরানীদের সকল প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা পদদলিত করে তাওজের ওপর ইসলামের ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিলেন। তারপর তিনি সেই শহরে কিছুদিন অবস্থান করে মসজিদ বানালেন এবং আরবের অনেক গোত্র আবাদ করলেন [এক রেওয়ায়াতে আছে যে, আবরকাওয়ান দ্বীপ ও তাওজ হযরত ওসমানের (রা) সহোদার হাকাম

(রা) বিন আবিল আছের হাতে জয় হয়]। অতপর হযরত ওসমান (রা) ইসলামী সৈন্যদেরকে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দিলেন। প্রত্যেক স্থানেই ইরানীদেরকে পরাজয়ের মুখ দেখতে হলো। সাবুর, ইরদশির এবং আসতাখার প্রভৃতি অনেক গুরুত্বপূর্ণ শহর পর্যায়ক্রমে জয় হলো। সে সময় পারস্যের গভর্নর ছিল "শাহরাক" নামক একজন ইরানী সরদার। মুসলমানদের অগ্রগমন প্রতিরোধের জন্য সে এক বিরাট বাহিনী একত্রিত করলো এবং রামশহরে ছাউনি ফেলালো। হযরত ওসমান (রা) সাওয়ার বিন হুমাম এবং নিজের ভাই হাকাম (রা) বিন আবিল আছকে শাহরাকের মুকাবিলার জন্য রওয়ানা করালেন। শাহরাক অত্যন্ত বিন্যস্তভাবে ব্যূহ রচনা করলো এবং ঘোষণা দিল যে, যে ব্যক্তি পা পিছু হটাবে তাকে হত্যা করা হবে। ওদিকে মুসলমানদের উৎসাহ-উদ্দীপনারও কোন সীমা পরিসীমা ছিল না। মোটকথা উভয় পক্ষের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ হলো। শাহরাক অত্যন্ত বীরত্বের সাথে মুকাবিলা করলো। কিন্তু আবেগে উদ্বেলিত মুসলমানদের হামলার সামনে সে কোনক্রমেই তিষ্ঠাতে পারলো না। ইরানীদের মারাত্মক পরাজয় হলো এবং শাহরাক যুদ্ধের ময়দানে নিহত হলো। রামশহর পদানত করার পর হযরত ওসমান (রা) হিরাম (র) বিন হাইয়ান আবদীকে শের দুর্গের ওপর চড়াও হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি সেই দুর্গ জয় করে নিলেন। স্বয়ং হযরত ওসমান (রা) জারাহ, কাজদারান, নওবন্দ খান এবং তার উপকণ্ঠসমূহ জয় করলেন। সেই সময়ই হযরত ওমর ফারুক (রা) বসরার গভর্নর হযরত আবু মূসা আশয়ারীকে (রা) পারস্য পদানত করার জন্য হযরত ওসমান (রা) বিন আবিল আছকে সাহায্যের নির্দেশ প্রেরণ করলেন। সুতরাং হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) হযরত ওসমানের সাহায্যের জন্য বসরা থেকে মাঝে মধ্যেই সাহায্যকারী দল পাঠানো শুরু করেন। কিছুদিন পর তিনি স্বয়ং একটি সৈন্য দল নিয়ে হযরত ওসমানের (রা) নিকট চলে এলেন এবং উভয়ে মিলে শিরাজ, আরজান, সিননির প্রভৃতি স্থান পদানত করলেন। এরপর হযরত ওসমান (রা) নিজের সৈন্য বাহিনীসহ হিসান জানায়া, দারাবে জারদ, জাহাম এবং ফাসাপরের ওপর হামলা চালিয়ে ইসলামী খিলাফতের অনুগত বানিয়ে নিলেন। ২৩ হিজরীতে তিনি পারস্যের রাজধানী সাবুরের ওপর চড়াও হলেন। সে সময় পারস্যের গভর্নর ছিল নিহত শাহরাকের ভাই। সে মুসলমানদের সাথে মুকাবিলা করার সাহস পেলো না এবং সে হযরত ওসমানকে (রা) সন্ধির পয়গাম প্রেরণ করলো। তিনি কতিপয় শর্তে তা মঞ্জুর করলেন। এমনিভাবে সমগ্র পারস্যের কিছু অংশ তরবারীর জোরে এবং কিছু অংশ সন্ধির মাধ্যমে হযরত ওসমানের (রা) হাতে জয় হয়।

পারস্য জয়ের সাথে সাথে অথবা তার অব্যাহতির পর হযরত ওমর ফারুক (রা) শাহাদাত পেলেন এবং হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রা) খিলাফতের

আসনে সমাসীন হলেন। হযরত ওসমান (রা) বিন আবিল আছের সামরিক তৎপরতা তার যুগেও অব্যাহত রলো। আল্লামা বালাজুরী (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের (রা) খিলাফতের কেবলমাত্র শুরু হয়েছিল। এমন সময় সাবুরবাসীরা ইসলামী হুকুমাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসলো এবং নিজেদের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে বসলো। ২৬ হজিরীতে হযরত ওসমান (রা) বিন আবিল আছ এবং হযরত আবু মূসা (রা) সাবুরের ওপর খুব জোরে হামলা করলেন ও বিদ্রোহীদেরকে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করে সাবুরের ওপর পুনরায় ইসলামের পতাকা উড়িয়ে দিলেন। ইবনে জারির তাবারীর (র) বর্ণনা অনুযায়ী আসতাখারবাসীও সেই যুগে বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল। ২৭ হিজরীতে হযরত ওসমান (রা) বিন আবিল আছ দ্বিতীয় বার হামলা করে তাদেরকে অনুগত বানিয়ে নিয়েছিলেন। আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওসমান জুন্নুরাইন আসতাখার জয়ের খবর পেয়ে খুব খুশী হলেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বারের (র) রেওয়ায়াত অনুযায়ী তিনি হযরত ওসমান (রা) বিন আবিল আছকে বিরাট পরিমাণের জমি পুরস্কার হিসেবে প্রদান করলেন। আসতাখার বিজয়ের পর হযরত ওসমান (রা) বিন আবিল আছের তৎপরতা সম্পর্কে চলিত গ্রন্থসমূহ নীরব রয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) "তাহজীবুত তাহজীব" গ্রন্থে লিখেছেন যে, সমকালীন সেই মহান ব্যক্তি ৫৫ হিজরীর কাছাকাছি সময়ে আখিরাতের সফরে যাত্রা করেছিলেন। স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি সম্পর্কিত চরিতকাররা নীরব রয়েছেন।

হযরত ওসমান (রা) বিন আবিল আছ অন্যতম মহান সাহাবী হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকেন। যদিও তিনি রাসূলের (সা) সাহচর্যে বেশী দিন ফয়েজ লাভের সুযোগ পাননি তবুও তাঁর থেকে ২৯টি হাদীস বর্ণিত আছে। তার হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব, নাফে বিন জাবির, মূসা বিন তালহা এবং ইবনে সিরিনের (র) মত মহান তাবেয়ী অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। হযরত খাজা হাসান বসরী (র) হযরত ওসমান (রা) বিন আবিল আছের সীমাহীন প্রশংসাকারী ছিলেন। তিনি বলতেন, ওসমান (রা) জ্ঞান ও কামালিয়াতে নজিরবিহীন ছিলেন। বাস্তবত হযরত ওসমান (রা) বিন আবিল আছের ব্যক্তিত্ব ছিল ইলম ও আমলের সংমিশ্রণ। তিনি দ্বীনের প্রতি আন্তরিকতা এবং হক পথে কুরবানীর যে চিত্র ইতিহাসের পাতায় এঁকে দিয়েছেন, তা চিরকাল জীবন্ত থাকবে।

হযরত ফিরাসুল (রা) আকরা' তামিমী

মক্কা বিজয় ও হুনাইনের (অষ্টম হিজরী) যুদ্ধের পর সমগ্র আরব ইসলামের আস্তানার সামনে মাথা অবনত করলো এবং আরবের প্রতিটি স্থান থেকে প্রতিনিধি দল মদীনা যাত্রা করলো। এসব প্রতিনিধি দলের অধিকাংশই ইসলামের মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে হাজির হয়েছিলেন। যাঁরা পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হুজুরের (সা) দর্শন লাভ ও বাইয়াত করার জন্য এসেছিলেন। এমনও কিছু ছিল যারা হকপন্থীদের সাথে সন্ধি ও নিরাপত্তা চুক্তি সাধনের জন্য মদীনা মুনাওয়ারা এসেছিলেন। তাদের মধ্যে কোন কোন প্রতিনিধি দল ইসলামের প্রকৃতি সম্পর্কে অনবহিত হওয়ার কারণে ইসলাম গ্রহণ অথবা আনুগত্য প্রকাশের পূর্বে আশ্চর্য ধরনের শর্ত আরোপ করেছিলেন। মহানবী (সা) এসব শর্তের যথাযথ জবাব দিয়েছিলেন। এমনি ধরনের একটি প্রতিনিধি দল ছিল বনু তামিম। ৭০ অথবা ৮০ জনের সমন্বয়ে গঠিত এই প্রতিনিধি নবম হিরজীতে (প্রতিনিধি দলের বছর) অত্যন্ত ঠাট-বাটের সঙ্গে মদীনা এসেছিল। তাদের মধ্যে গোত্রের বড় বড় সরদার ও জ্ঞানী-গুণী মানুষ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা ছিল খুব দেমাগী মানুষ এবং নিজেদের ভাষা, বক্তৃতা ও কাব্য জগত প্রশ্নে কাউকে কোন পাত্তা দিত না। তারা রাসূলের (সা) দরবারে হাজির হয়ে বললো, মুসলমানরা আগে আমাদের সাথে কীর্তিগাথা বর্ণনা করবে। যদি তারা তাতে জয়ী হয়, তাহলে ইসলামের কথা হবে।

হুজুর (সা) তাদের জবাবে বললেন, আমি গর্ব বা অহংকার প্রকাশ এবং কবিতাবাজীর জন্য প্রেরিত হইনি। কিন্তু তোমরা যদি তাতে পীড়াপীড়ি করো তাহলে আমরা সে ব্যাপারেও দুর্বল ও সামর্থহীন নই। অনুমতি পেয়ে বনু তামিমের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম আতারফ বিন হাজিব উঠে দাঁড়ালেন। তিনি এক ওজস্বী বক্তৃতা দিলেন। তাতে তিনি স্বগোত্রের মান-মর্যাদা, ক্ষমতা ও প্রভাব, উচ্চ বংশ গৌরব, বিত্ত-বৈভব, বীরত্ব এবং মেহমানদারীর কথা অত্যন্ত প্রভাবপূর্ণ ভাষায় উল্লেখ করলেন। যখন তাঁর বক্তৃতা শেষ হলো তখন হুজুর (সা) হযরত ছাবিত (রা) বিন কায়েস আনসারীকে তার জবাব দানের নির্দেশ দিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে প্রথমে আল্লাহ তায়ালার হামদ বা প্রশংসা বর্ণনা করলেন। অতপর মহানবীর (সা) নবুওয়াত, দাওয়াতে হকের বিস্তারিত, কুরআন অবতীর্ণ হওয়া এবং মুহাজির ও আনসারের ফজিলত এমন অলংকারপূর্ণ ভাষায় বাগ্মীতার সাথে বর্ণনা করলেন যে মজলিস সম্পূর্ণরূপে নিশ্চুপ হয়ে গেল।

তারপর বনু তামিমের পক্ষ থেকে যবরকান বিন বদর কবিতার মুকাবিলার জন্য উঠে দাঁড়ালেন এবং অত্যন্ত শক্তিশালী কবিতা পাঠ করলেন। তাতে স্বগোত্রের উচ্চমার্গীয় প্রশংসা স্থান পেয়েছিল। তিনি যখন বসলেন, তখন হুজুর (সা) হযরত হাসসান (রা) বিন ছাবিতকে তার জবাব দানের জন্য উঠে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিলেন। হযরত হাসসান (রা) নির্দেশ পালন করলেন এবং এমন প্রভাবপূর্ণ কবিতা পাঠ করলেন যে, তার সামনে যবরকান বিন বদরের কবিতা ম্লান হয়ে গেল। যেই তিনি নিজের জবাবী কবিতা শেষ করে বসলেন, সেই বনু তামিমের প্রতিনিধি দলের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মাথার চুল উড়ছিলো এবং একটি পা ছিল খোঁড়া। কিন্তু তাঁর চেহারা ও চাল-চলনে ছিল নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও বুদ্ধিমত্তার ছাপ এবং এটা পরিষ্কার জানা যাচ্ছিল যে, তিনি কবিলার নেতা ছিলেন। তিনি প্রতিনিধি দলের সদস্যদেরকে সম্বোধন করে উচ্চৈস্বরে বললেন ঃ

"পিতার কসম মুহাম্মাদের (সা) খতিব আমাদের খতিব থেকে আফজাল এবং তাঁর কবি আমাদের কবি থেকে উত্তম। তাঁদের কণ্ঠস্বরে আমাদের কণ্ঠস্বর থেকে বেশী চিত্তাকর্ষক ও মিষ্টি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ ইবাদাতের যোগ্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল। এর পূর্বে যা কিছু হয়েছে তা তাঁকে কোন ক্ষতি করতে পারেনি।"

প্রতিনিধি দলের সকল সদস্য তাঁর কথার জবাবে এক বাক্যে বলে উঠলেন, "আপনি সত্য কথা বলেছেন, আপনি সত্য কথা বলেছেন," এবং তৎক্ষণাৎ সকল তামিমী নিজের হাত মহানবীর (সা) পবিত্র হাতে দিয়ে দিলেন।

এই ব্যক্তি যিনি পারস্পরিক অহংকার প্রকাশে স্বগোত্রের পরাজয়কে প্রকাশ্যে মেনে নিলেন এবং সকল কবিলাবাসীকে ইসলামের সীমায় নিয়ে এলেন তিনি ছিলেন হযরত ফিরাসুল আকরা' তামিমী (রা)।

হযরত ফিরাসুল আকরা' (রা) যাঁকে ইতিহাসে সাধারণত আকরা' (রা) বিন হাবিসের নামে স্মরণ করা হয়। তিনি ছিলেন আরবের মশহুর কবিলা বনু তামিমের বাহাদুর ও নামকরা সরদার। নসবনামা হলো ঃ

ফিরাস (রা) (আকরা') বিন হাবিস বিন আবকান অথবা (আ'কাল) বিন মুহাম্মাদ বিন সুফিয়ান বিন মাজাশি' বিন দারিম বিন মালিক বিন হানজালা বিন মালিক বিন যায়েদ বিন মানাত বিন তামিম।

চরিতকাররা হযরত ফিরাসের (রা) তিনটি লকব বর্ণনা করেছেন। তাহলো আল-আকরা', আল-আ'রাজ এবং জিরার। আল-আকরা' এ জন্য যে তাঁর মাথার চুল ফুরফুর করে উড়তো। আল-আরাজ এ জন্য যে, তাঁর একটি পা

খোঁড়া ছিল। জিরার (অর্থাৎ একহাজার সৈন্যের নেতৃত্ব দানকারী) এ জন্য যে, তিনি খুব বাহাদুর ছিলেন। জাহেলী যুগের যুদ্ধ ইয়াওমুল কিলাবুল অওয়াল অথবা (আছ-ছানীতে) তিনি বনু হানজালার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। নসবের দিক থেকে হযরত ফিরাসুল আকরা'কে (রা) আত-তামিমা ছাড়া আল-মাজাশেয়ী, আদ-দারেমী এবং আল-হানজালাও বলা হয়ে থাকে।

হযরত আকরা'(রা) বিন হাবেস অত্যন্ত বাহাদুর এবং তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। ইবনে আছির বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কাব্য সাহিত্যেও বুৎপত্তি রাখতেন। তিনি শুধুমাত্র নিজের ক্ষেত্রেরই নেতা ছিলেন না বরং সমগ্র আরবে তাঁর ইজ্জত ও শরাফতের স্বীকৃতি ছিলো। হাফেজ ইবনে হাজার (র) "আল ইসাবাতে" এবং মুহাম্মাদ বিন হাবিব (র) "কিতাবুল মুহাব্বারে" লিখেছেন যে, হযরত আকরা' (রা) বিন হাবেস জাহেলী যুগে আরব জ্ঞানী, সালিশ ও নেতাদের মধ্যে পরিগণিত হতেন।

আল্লামা মুজাদ্দিদুদ্দিন ফিরোযাবাদী সাহিবিল কামুস বর্ণনা করেছে যে, জাহেলী যুগে ওকাজের মেলার সময় আরব গোত্রসমূহের পারস্পরিক বিবাদ মেটানোর দায়িত্ব ছিল বনু তামিমের ওপর। বনু তামিম আরববাসীর সালিশ অথবা বিচারক ছিলো। ইসলামের আত্মপ্রকাশের সময় এই পদ ছিলো হযরত আকরা' বিন হাবেসের করায়ত্বে। ইসলাম গ্রহণের পরও হযরত আকরা'র (রা) পার্থিব মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত রলো। মানুষ সবসময়ই তাঁকে একজন শরীফ, বিজ্ঞ ও প্রভাবশালী সরকার হিসেবে মান্য করতো।

হযরত আকরা' (রা) ঈমান আনয়নের সৌভাগ্য কখন লাভ করেছিলেন? সে ব্যাপারে দু'টি ভিন্ন ধরনের মত রয়েছে। এক মত অনুযায়ী, তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি একজন মুসলমান মুজাহিদ হিসেবে মক্কা বিজয়, হুনায়েন ও তায়েফের যুদ্ধে মহানবীর (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন (ইবনে হাযম এই মত পোষণ করেন)। দ্বিতীয় মতের প্রবক্তা হলেন ইবনে আছির (র)। তিনি "উসুদুল গাব্বাহ"তে লিখেছেন, হযরত আকরা' (রা) নবম হিজরীতে বনু তামিম প্রতিনিধি দলের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। তবুও একথা স্বীকৃত যে, তিনি মক্কা বিজয়, হুনাইন এবং তায়েফে হুজুরের (সা) সাথে ছিলেন এবং হুজুর (সা) তাঁর সঙ্গে "মুয়াল্লিফাতুল কুলুব"-এর মত আচরণ করেছিলেন। (মুয়াল্লিফাতুল কুলুবে নওমুসলিম অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং অমুসলিমও। তারা ইসলামে প্রভাবান্বিত ছিল।) ইবনে আছিরের (রা) মত যদি সঠিক বলে মেনে নেয়া হয় তাহলেও এটা অস্বীকার করা যায় না যে, হযরত আকরা' (রা) মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলামের প্রভাবে অবশ্যই প্রভাবান্বিত

হয়েছিলেন এবং সেই প্রভাবের কারণেই তাঁকে যুদ্ধের ময়দানে হুজুরের (সা) সমর্থন এনে দাঁড় করিয়ে ছিল।

হুনাইনের যুদ্ধে বিজয়ের পর প্রিয় নবী (সা) গনিমতের মাল বন্টন করলেন। এ সময় হযরত আকরা'কে (রা) তালিফে কলব হিসেবে একশ' উট প্রদান করেছিলেন। প্রখ্যাত কবি সাহাবী হযরত আব্বাস (রা) বিন মিরদাস সালমার হযরত আকরা'র (রা) সাথে বিশেষ আচরণে অত্যন্ত ঈর্ষা হলো। কেননা তিনি কম উট পেয়েছিলেন। সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ কিছু কবিতা রচনা করলেন। এই কবিতায় মনের ব্যথা প্রকাশ পেয়েছিল। হুজুর (সা) এই কবিতা শুনে হযরত আলীকে (রা) বললেন। "তার জিহ্বা কেটে দাও।" হযরত আলী (রা) আব্বাস (রা) বিন মিরদাসের হাত ধরলেন এবং বললেন যে, আমার সঙ্গে চল। তিনি রাস্তায় হযরত আলীকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, আলী, আমার জিহ্বা কি কেটে ফেলবে ? হযরত আলী (রা) বললেন, তুই আমার সাথে আয়। আমি রাসূলের (সা) নির্দেশ পালন করবো।

এভাবে কথা বলতে বলতে হযরত আলী (রা) আব্বাস (রা) বিন মিরদাসকে উটের পালে নিয়ে গেলেন এবং তাঁকে বললেন, "একশ' উট এই পাল থেকে নিজের পছন্দ অনুযায়ী বেছে নে।" হযরত আব্বাস (রা) একশ' উট বেছে নিলেন এবং খুশী হয়ে গেলেন।

নবম হিজরীতে বনু তামিমের প্রতিনিধি দলের মদীনা আগমন রাসূলের (সা) যুগের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেননা সে সময় কুরআনে হাকিমের কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছিল। যদিও সে বছর আরবের প্রতিটি কোণা থেকে নবীর (সা) দরবারে প্রতিনিধি দল উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু ইমাম বুখারী (র) এবং হাফেজ ইবনে কাইয়েমের বক্তব্য অনুযায়ী বনু তামিম প্রতিনিধি দলের মদীনা আগমনের একটি কারণ ছিল। কারণটি হলো, নবম হিজীর মুহাররাম মাসে রাসূলে আকরাম (সা) আইনিয়া বিন হাসান ফাজারীকে ৫০টি সওয়ার সমেত বনু তামিমের একটি বংশ বনু আম্বরকে উৎখাতের জন্য প্রেরণ করেন। কেননা তারা অন্যান্য গোত্রকে উত্তেজিত করে খিরাজ প্রদানে নিষেধ করেছিল। তারা ইসলামী বাহিনী দেখে পালিয়ে গেল। মুসলমানরা তাদের ৬২ ব্যক্তিকে ধরে মদীনায় নিয়ে এলেন। এই ৬২ ব্যক্তির মধ্যে ১১ জন পুরুষ, ২১ জন মহিলা ও ৩০টি শিশু ছিল। বনু তামিম এই কয়েদীদেরকে মুক্ত করার জন্য নিজেদের নেতৃস্থানীয় লোকদের একটি প্রতিনিধি দল গঠন করলো। এই প্রতিনিধি দলে আকরা' (রা) বিন হারেসও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই প্রতিনিধি দল মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছে কয়েদীদের মধ্যে

নিজেদের মহিলা ও শিশুদেরকে দেখে খুব অস্থির হয়ে পড়লো। প্রতিনিধি দলের সকল সদস্য মহানবীর (সা) আবাসস্থলের বাইরে দাঁড়িয়ে গেল। আকরা' (রা) অস্থিরচিত্তে উচ্চৈস্বরে বললেন, "হে মুহাম্মদ ! বাইরে বের হয়ে আমাদের কথা শোনো।" কতিপয় মুফাস্সির লিখেছেন, সে সময় এই আয়াত সমূহ অবতীর্ণ হয় ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَايَعْقِلُوْنَ ○ وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ـ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

"(হে নবী!) যেসব লোক তোমাকে হুজরাগুলোর বাহির থেকে ডাকাডাকি করে তাদের মধ্যে অধিকাংশই নির্বোধ। তোমার বের হয়ে আসা পর্যন্ত তারা যদি ধৈর্য ধারণ করতো তাহলে এটা তাদের জন্যই ভালো ছিল। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল এবং করুণাময়।"–(সূরায়ে আল হুজুরাত ঃ ৪-৫)

মওলবী সাইয়েদ আমীর আলী (র) "মাওয়াহিবুর রহমান" তফসীরে স্বয়ং হযরত আকরার (রা) কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, সে সময় আমার মধ্যে অজ্ঞতা ও মরুচারিতা বিদ্যমান ছিল এবং আমি নিজের অভদ্রতার মাধ্যমে হুজরার বাহির থেকে চেঁচিয়ে বলেছিলাম যে, হে মুহাম্মদ (সা) ! বেরিয়ে আমাদের নিকট এসো।

অহমিকার প্রতিযোগিতার পর যখন বনু তামিম নিজের পরাজয় স্বীকার করে নিলো তখন হযরত আকরা' (রা) কয়েদীদের মুক্তির সুপারিশ করলেন। হুজুর (সা) তাদের সুপারিশ মেনে নিলেন এবং কয়েদীদের মুক্তির নির্দেশ দিলেন। সেই সঙ্গেই বনু তামিমের প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন। হাফেজ ইবনে কাইয়েম (র) "যাদুল মায়াদ" গ্রন্থে লিখেছেন যে, হুজুরে আকরাম (সা) প্রতিনিধি দলের সদস্যদেরকে প্রচুর ইনয়াম প্রদান করেন।

সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, বনু তামিমের প্রতিনিধি দল রাসূলের (সা) দরবারে হাজির হলে হযরত আবু বকর (রা) হুজুরের (সা) খিদমতে আরজ করলেন যে, কা'কা বিন মাবাদকে তাদের আমীর বানিয়ে দিন। হযরত ওমর (রা) বললেন, আকরা' বিন হাবেসকে আমীর নিয়োগ করুন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) [হযরত ওমরকে (রা) সম্বোধন করে] বললেন, তুমি তো ব্যস আমার বিরোধিতা করার জন্যই কোমর বেঁধে লেগেছ। হযরত ওমর (রা) জবাব দিলেন যে, আমি

আপনার বিরোধিতা করি না। (বরং এটা আমার রায় বা মত) এই আলোচনায় উভয়ের কণ্ঠস্বর অনেক চড়া হয়ে গেল। তাতে এই আয়াত নাযিল হলো ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ـ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَاتَشْعُرُوْنَ ○

"হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আগে অগ্রসর হয়ে যেও না। আর আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ সবকিছু শুনেন, সবকিছু জানেন। হে ঈমানগ্রহণকারী লোকেরা, নিজেদের কণ্ঠস্বর নবীর চেয়ে উচ্চ করো না। নবীর সাথে উচ্চ কণ্ঠে কথাও বলো না, যেমন তোমরা নিজেরা পরস্পরে করে থাকো। তোমাদের সৎকাজসমূহ যেন বরবাদ হয়ে না যায় এমনভাবে যে, তোমরা তা টেরও পাবে না।"–(সূরায়ে আল হুজুরাত ঃ ১-২)

"ফাতহুল বারীতে" হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এসব আয়াত নাযিলের পর আমি রাসূলের (সা) খিদমতে আরজ করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমি কসম খেয়েছি যে এখন আমি আপনার সাথে এমন আস্তে আস্তে কথা বলবো যেমন কেউ গোপন কথা বলে।

পক্ষান্তরে হযরত নাফে'র (রা) বক্তব্য অনুযায়ী হযরত ওমর ফারুকের (রা) অবস্থাটা এমন ছিল যে, তিনি রাসূলের (সা) দরবারে খুব আস্তে আস্তে কথা বলতে লাগলেন। আস্তেও এমন আস্তে যে যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর থেকে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস না করতেন, কিছুই বুঝতে পারতেন না যে তিনি কি বলছেন।

হযরত আকরা' (রা) নিজের বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, সঠিক মত, বংশীয় মর্যাদা এবং হকের সমর্থনে সবসময় প্রস্তুত থাকার কারণে নবীর দরবারে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিলেন। মহানবী (সা) তাঁকে খুব স্নেহ করতেন এবং তাঁকে মুয়াল্লিফাতুল কুলুবের মধ্যে পরিগণিত করে গনিমতের মাল ও সাদকা থেকে নিয়মিত অংশ প্রদান করতেন। এটা ছিল আল্লাহর সেই ইরশাদ ঃ

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ ـ

"এই সাদকাসমূহ মূলত ফকীর ও মিসকীনদের জন্য, আর তাদের জন্য যারা সাদকা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত এবং তাদের জন্য যাদের মন জয় করা হলো উদ্দেশ্য।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ৬০)

হাফেজ ইবনে হাজার "আল-ইসাবা" গ্রন্থে লিখেছেন যে, ইসলাম গ্রহণের পরও হযরত আকরা'র (রা) ইজ্জাত ও শরাফত স্বীকৃত ছিল এবং তিনি ঈমান ও ইসলামেও মজবুত ছিলেন।

বিদায় হজ্জের পূর্বে মহানবী (সা) হযরত আলীর (রা) নেতৃত্বে ইয়েমেনে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। সেখান থেকে হযরত আলী (রা) কিছু স্বর্ণ হুজুরের (সা) খিদমতে প্রেরণ করলেন। তিনি এই স্বর্ণ চার ব্যক্তির মধ্যে বন্টন করে দিলেন। স্বর্ণ প্রাপক চার ব্যক্তির মধ্যে হযরত আকরা' (রা) বিন হাবেসও ছিলেন। ইমাম বুখারী (র) নিজের "সহীহ" গ্রন্থে এই ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"আলী (রা) বিন আবি তালিব ইয়েমেন থেকে রাসূলের (সা) খিদমতে কিছু স্বর্ণ (স্বর্ণের পাত) পাকা চামড়ার মধ্যে রেখে প্রেরণ করলেন। এই স্বর্ণ তাঁর নিকট পৌঁছার সাথে সাথে তিনি আইনিয়া (রা) বিন বদর, আকরা' (রা) বিন হাবেস, যায়েদুল খায়েল (রা) এবং আলকামা (রা) অথবা আমের (রা) বিন তোফায়েল নামক চার ব্যক্তির মধ্যে বন্টন করে দিলেন। সাহাবীদের (রা) মধ্য থেকে একজন বললেন, আমরা তাঁদের তুলনায় বেশী হকদার। তিনি একথা জানতে পেরে বললেন, তোমরা আমাকে আমানতদার মনে করো না। অথচ আমি আসমানবাসীর আমানতদার। আমার নিকট সকাল-সন্ধ্যায় আকাশের খবর আসে।"–(বুখারী কিতাবুল মাগাযি)

আল্লামা বালাজুরী (র) আনসাবুল আশরাফে লিখেছেন, নবী করীম (সা) হযরত আকরা' (রা) বিন হাবেসকে বনু দারিম বিন মালিক বিন হানজালার সাদকা আদায়কারী নিয়োগ করেছিলেন।

আল্লামা বালাজুরী (র) "ফতুহুল বুলদানে" বর্ণনা করেছেন, নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধি দল যখন মদীনা মুনাওয়ারা এলো তখন হুজুর (সা) একটি প্রতিশ্রুতি পত্র লিখিয়ে তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়ে দিলেন। সেই চুক্তিপত্রে যেসব সাক্ষী সই করেন তাঁদের মধ্যে হযরত আকরা' (রা) বিন হাবেসও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

এসব রেওয়ায়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, হযরত আকরা (রা) হুজুরের (সা) পূর্ণ আস্থাভাজন ছিলেন।

হযরত আকরা' (রা) অধিকাংশ সময় রাসূলের (সা) দরবারে উপস্থিত থেকে নবীর ফয়েজে অভিষিক্ত হতেন। তিবরানী হযরত সায়েব (রা) বিন ইয়াযিদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত আকরা' (রা) নবীর দরবারে উপস্থিত ছিলেন। হযরত হাসান (রা) খেলতে খেলতে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। হুজুর (সা) ভালোবাসার আধিক্যে তাঁর মুখ ও মাথায় চুমু দিলেন। হযরত আকরা' (রা) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার দশটি পুত্র রয়েছে। আমি কখনো কারোর মাথা ও মুখে চুমু দিইনি। হুজুর (সা) বললেনঃ "আল্লাহ তার ওপর রহম করেন না যে মানুষের ওপর রহম করে না।"

এই রেওয়ায়াত কিছু শব্দের ভিন্নতাসহ সহীহ বুখারীতেও স্থান পেয়েছে। অন্য এক রেওয়ায়াতে হুজুরের (সা) সাথে এসব শব্দ সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে ঃ "আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তর থেকে ভালোবাসা ছিনিয়ে নেন তাহলে আমি কি করবো।" এমনিভাবে হুজুর (সা) হযরত আকরা'কে (রা) এই শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, সন্তানকে ভালোবাসা এবং তার মুখ ও মাথায় চুমু দেয়াও তার অধিকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

হাফেজ ইবনে কাইয়্যেম "যাদুল মায়াদে" একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তা থেকে জানা যায় যে, হযরত আকরা' (রা) অত্যন্ত প্রভাব প্রতিপন্ন সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। ঘটনাটা ছিলো, এক অভিযানে আমের বিন আজবাতুল আশজারী কোন ভুলের কারণে হযরত মাহলাম (রা) বিন জাসামাতাল লায়েসীর হাতে মারা যায়। বনু আশজা' হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে কিসাস দাবী করলো। তিনি দিয়্যত দিতে চাইলেন। কিন্তু তারা তাতে সম্মত হলো না। শেষে হযরত আকরা' (রা) যখন তাদেরকে বুঝালেন তখন তারা দিয়্যত গ্রহণে রাজী হয়ে গেল।

একাদশ হিজরীতে প্রিয় নবীর (সা) ওফাতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খিলাফতের আসনে সমাসীন হলে একবারে সমগ্র আরবে ধর্মদ্রোহিতার ফিতনার আগুন জ্বলে উঠলো। এটা ছিল কঠিন পরীক্ষার সময়। কেননা মদীনার আনসার, মক্কার কুরাইশ এবং বনু ছাকিফ ছাড়া এমন কোন কবিলা ছিল না যারা এ ফিতনায় জড়িত হয়নি। হযরত আকরা' (রা) বিন হাবেস সেই দুর্যোগপূর্ণ সময়ে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ইসলামের সঠিক পথে অটল ছিলেন এবং হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের সঙ্গী হয়ে ইয়ামামার রক্তাক্ত যুদ্ধে মুরতাদদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত বাহাদুরীর সাথে লড়াই করেছিলেন। (আল-ইসাবা)

হাফেজ জাহাবী (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত আকরা' (রা) হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে ইরানীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধসমূহে নিজের

তরবারীর নিপুণতা প্রদর্শন করেছিলেন। মুসলমানরা আম্বারের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। হযরত আকরা' (রা) এ সময় অগ্রবর্তী বাহিনীর অফিসার ছিলেন। (তাজরিদে আসমাউস সাহাবা)

ইমাম বুখারী (র) "তারিখে সগিরে" লিখেছেন, একবার হযরত আকরা' (রা) বিন হাবিস আইনিয়া বিন হাসান সমভিব্যাহারে হযরত আবু বকরের (রা) খিদমতে হাজির হয়ে জায়গীরের আবেদন জানালেন। হযরত ওমরও (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হযরত আকরা'কে (রা) সম্বোধন করে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তোমার তালিফে কলব করতেন। কিন্তু এখন তোমার পরিশ্রম করা উচিত।

প্রখ্যাত মিসরীয় লিখক মুহাম্মাদ হুসাইন হায়কাল স্বলিখিত গ্রন্থ "ওমর ফারুকে আজম (রা)" এই ঘটনা বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খিলাফতের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন। এ সময় তিনি রাসূলের (সা) যুগের সকল দান বা উপঢৌকন বহাল রাখলেন। কিছুদিন পর আইনিয়া বিন হাসান এবং আকরা' (রা) বিন হাবিস খলিফার দরবারে হাজির হলেন ও জমি দাবী করলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) জমির ব্যাপারে তাদেরকে লিখিত নির্দেশ দিয়ে দিলেন। হযরত আবু বকরের (রা) ওফাতের পর উভয় ব্যক্তিই হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিদমতে হাজির হয়ে হযরত আবু বকরের (রা) নির্দেশ অব্যাহত রাখার নিবেদন জানালেন। কিন্তু হযরত ওমর (রা) তাদের নিবেদন এই বলে প্রত্যাখান করলেন যে, আল্লাহ ইসলামের উত্থান ঘটিয়েছেন এবং তোমাদের থেকে মুখাপেক্ষী হীন করে দিয়েছেন। এখন তোমরা (জায়গীর ও উপঢৌকন ছাড়া) ইসলামের ওপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়ে যাও। নচেৎ আমাদের ও তোমাদের মধ্যে তরবারীই ফায়সালা করবে। অতপর হযরত ওমর (রা) "মুয়াল্লিফাতুল কুলুব" নামে পরিচিত সকল মানুষকে সাধারণ মুসলমানের দলে অন্তর্ভুক্ত করে দিলেন।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুকের (রা) এই সিদ্ধান্তে হযরত আকরা' (রা) কিছুই মনে করলেন না এবং অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে জিহাদের ময়দানে বীরত্ব প্রদর্শন করতে লাগলেন ও জিহাদ করতে করতেই তিনি শাহাদাতের পিয়ালা পান করলেন।

হযরত আকরা'র (রা) শাহাদাতের বছর ও স্থানের ব্যাপারে চরিতকারদের মধ্যে মতভেদ আছে। রাজিউশশাতিবির মত অনুযায়ী তিনি ইয়ারমুকের যুদ্ধে (১৫ হিজরী) নিজের ১০ পুত্রসহ শাহাদাত প্রাপ্ত হন। কিন্তু হাফেজ জাহাবী (র) এবং আল্লামা বালাজুরী (র) লিখেছেন, হযরত ওসমান গনির (রা)

খিলাফতকালে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আমের হযরত আকরা'কে (রা) সেনাবাহিনীর প্রধান বানিয়ে খোরাসানের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করেছিলেন। সেখানে তিনি কয়েকটি যুদ্ধে অংশ নেন। জাওযানের গুরুত্বপূর্ণ শহরও তাঁর হাতেই জয়লাভ করে। কিন্তু যুদ্ধে তিনি এমন মারাত্মক আঘাত পান যে, আর সুস্থ হননি এবং শাহাদাতের পেয়ালা পান করে চিরঞ্জীব হয়ে যান।

হাফেজ ইবনে হাজার (র) এই রেওয়ায়াতকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং আমরাও এটাকেই সঠিক বলে মনে করি।

হযরত কা'ব (রা) বিন যুহায়ের মুযনি

তায়েফ যুদ্ধের (অষ্টম হিজরী) কিছুদিন পরের কথা। একদিন রহমতে আলম (সা) মসজিদে নববীতে কতিপয় জাননিছার সঙ্গীসহ বসেছিলেন। তিনি তাঁদেরকে নিজের বাণী শুনাচ্ছিলেন। হঠাৎ করে মসজিদের দরজায় একটি উটনী এসে থামলো। শরীরে দাগপড়া এক ব্যক্তি উটনী থেকে নামলেন। তাঁর মাথা থেকে মুখ পর্যন্ত কাপড়ের পট্টি বাঁধা ছিল। তিনি ধীরে ধীরে মহানবীর (সা) খিদমতে এসে বসলেন। হুজুর (সা) তাঁর প্রতি মনোযোগী হলেন। সে সময় সেই ব্যক্তি অত্যন্ত মিষ্টিস্বরে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর সত্য রাসূল ! আমি সত্য অন্তরে ইসলাম গ্রহণ করছি। আপনার মুবারক হাত সম্প্রসারিত করুন। যাতে আমি বাইয়াতের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারি।"

হুজুর (সা) নিজের পবিত্র হাত প্রসারিত করলেন। সেই ব্যক্তি যখন বাইয়াত করলেন, তখন প্রিয় নবী (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে ?"

নবাগত নিজের নাম বললেন এবং সাথে সাথে মুখের কাপড় খুলে আরজ করলেন, "হে আল্লাহ রাসূল! আমি কি নিরাপদ ?"

তাঁর চেহারা দেখেই তরবারী হাতে এক আনসার সামনে অগ্রসর হলো এবং বললো, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আল্লাহর এই দুশমনের মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলার অনুমিত দিন।"

রহমতে আলম (সা) বললেন, "না, এই কাজ করো না। এই ব্যক্তি তাওবা করে এসেছে। এখন তার সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।"

প্রিয় নবীর (সা) পবিত্র এরশাদ শুনে খুশীতে সেই ব্যক্তির চেহারা ঝলমল করে উঠলো এবং তিনি রাসূলের (সা) দরবারে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে একটি দীর্ঘ কাসিদা পাঠ শুরু করলেন। যখন তিনি কাসিদার এই স্থানে পৌঁছলেন ঃ

اِنَّ الرَّسُوْلَ لَنُوْرٌ يَسْتَضَاءُ بِهٖ

مُهَنَّدٌ مِّنْ سُيُوْفِ اللّٰهِ مَسْلُوْلُ

তখন মহানবী (সা) নিজের মুবারক চাদর খুলে ইনয়ামস্বরূপ তাঁকে প্রদান করলেন।

এই সেই ব্যক্তি যাঁর কবিতা শুনে প্রিয় নবী (সা) খুশী হয়েছিলেন এবং যাঁকে সাইয়েদুল আনাম (সা) নিজের মুবারক চাদর দান করেছিলেন তিনি ছিলেন হযরত কা'ব (রা) বিন 'যুহায়ের মুযনি'।

হযরত আবু উকবা কা'ব (রা) বিন যুহায়েরের সম্পর্ক ছিল মুদার গোত্রের শাখা মুযনিয়ার সাথে। মায়ের নাম ছিল কাবশা বিনতে বাশামা। তিনি বনু গাতফানের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

হযরত কা'বের (রা) পিতা যুহায়ের বিন আবি সুলমা জাহেলী যুগের অন্যতম প্রখ্যাত কবি ছিলেন। তিনি সেই সাতজন প্রখ্যাত কবির অন্যতম ছিলেন যাদের কাসিদা লিখে কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে টাঙ্গিয়ে রাখা হতো। সাইয়েদেনা হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁকে "আশয়ারু শুয়ারাউল আরব" অর্থাৎ সবচে বড় আরবী কবি বলে আখ্যায়িত করতেন।

হযরত কা'বের (রা) খান্দান নজদে বসবাস করতো এবং কাব্য সাহিত্যে সমগ্র আরবে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিল। পিতা যুহায়ের ব্যতীত তাঁর দাদা আবু সুলমা রবিয়া, নানা, ভাই এবং ফুফুরা সকলেই কাব্য ও ভাষা সমুদ্রের সাঁতারু ছিলেন। বংশীয় প্রভাবের কারণেই শৈশবকালেই কা'ব কাব্য জগতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। পিতা যখন একথা জানতে পেলেন, তখন তিনি তাঁকে কবিতা রচনা করতে নিষেধ করলেন। কেননা, তার ধারণায় অপ্রাপ্ত বয়সে রচিত কবিতার দুর্বলতা প্রখ্যাত কবি বংশের খ্যাতিতে কালিমা লিপ্ত করতে পারে। কিন্তু কবিতা রচনার যোগ্যতা কা'বের (রা) প্রকৃতিতে পূর্ণভাবেই বিদ্যমান ছিল। তিনি কবিতার অনুশীলন অব্যাহত রাখলেন। ঘটনাক্রমে একদিন তাঁর কিছু কবিতা পিতার দৃষ্টিতে পড়লো। পিতা তা পাঠ করে মুগ্ধ হলেন এবং তাঁর কাব্য যোগ্যতার স্বীকৃতি দিলেন। সুতরাং তিনি তাঁকে কবিতা রচনার অনুমতি প্রদান করলেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, পিতা তাঁর কঠিন পরীক্ষা নিলেন। এই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হলেন। তাতে খুশী হয়ে তাঁকে কাব্য রচনার অনুমতি দিলেন। এই কা'বই (রা) একদিন সমগ্র আরবে এক শক্তিধর কবি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

কা'বের (রা) প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে চরিতকাররা সাধারণত তেমন কিছু বলেননি। খুব বেশী হলেও এতটুকুন জানা যায় যে, শৈশবকাল থেকে

যৌবনকাল পর্যন্ত তিনি বনি গাতফান এলাকায় অতিবাহিত করেছেন। এই যুগে তিনি নিজের পিতা ও অন্যান্য বুজর্গের তত্ত্বাবধানে কবিতা রচনার অনুশীলন করতেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) "আল-ইসাবা" গ্রন্থে লিখেছেন, মশহুর মাখজারামী কবি হাতিয়া (আবু মালিকা জাবদাল বিন আওস আবাসী) ও কা'বের (রা) সহপাঠি ছিল এবং দু'জনই যুহায়ের বিন আবি সুলমার কাছ থেকে সাহায্য নিতেন।

বিভিন্ন কার্যকারণ থেকে জানা যায় যে, কা'ব (রা) সমর সংক্রান্ত অনেক বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন এবং জাহেলী যুগে নিজের গোত্রের যুদ্ধসমূহে অংশ নিতেন। কুরাইশের বনু মুযনিয়া, বনু তাই এবং খাজরাজের বিরুদ্ধে যেসব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, কা'ব (রা) তাতে নিজের গোত্রের পক্ষ থেকে অংশ নিয়েছিলেন এবং বীরত্ব ব্যঞ্জক কবিতা পাঠ করে করে যুদ্ধে স্বপক্ষীয় জওয়ানদেরকে উদ্বুদ্ধ করতেন।

হযরত কা'ব (রা)-এর পিতা যুহায়ের প্রিয় নবীর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির সামান্য কিছুদিন পর মারা যান। এ সময় কা'ব (রা) এমন ধরনের শোকগাথা রচনা করতেন যে, যে শুনতো তারই চোখ অশ্রুসজল হয়ে পড়তো।

যে যুগে কা'বের (রা) কাব্যখ্যাতি নজদ থেকে আরবের দূর-দূরান্তের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লো, সে সময় ইসলামের হেদায়াতের আলোও আরবের সমগ্র অঞ্চলে আলোকিত করতে শুরু করেছিল। কা'ব (রা) এবং তার ভাই বুজায়েরের (রা) কান পর্যন্তও দাওয়াতে হকের আওয়াজ পৌঁছলো। কিন্তু তিনি তার প্রতি আকৃষ্ট হলেন না। ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর দুইভাই স্বদেশ থেকে বের হয়ে আবরাকুল আজজাফ নামক স্থানে এলেন। এখানে পৌঁছে বুজায়ের (রা) কা'বকে (রা) বললেন, তুমি এখানেই অবস্থান কর এবং নিজের ভেড়া-বকরী হেফাজত করতে থাকো। আমি একটু ইয়াছরাব গিয়ে সাহিবে কুরাইশের (রাসূলে আকরাম) নিকট জেনে আসি যে, তিনি কিসের দাওয়াত দিয়ে থাকেন।

বুজায়ের (রা) রহমতে আলমের (সা) খিদমতে হাজির হলেন এবং তাঁর সুন্দর চেহারা এবং পবিত্র বাণীতে এমন প্রভাবিত হলেন যে, চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করলেন এবং মদীনা মুনাওয়ারাতেই রয়ে গেলেন।

কা'ব (রা) বুজায়েরের (রা) ইসলাম গ্রহণ ও মদীনা মুনাওয়ারাতে স্থায়ীভাবে অবস্থানের খবর পেলেন। এ সময় তিনি খুব ক্রোধান্বিত হলেন এবং রাগত অবস্থায় মহানবী (সা) ও হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) শানে

কতিপয় ঔদ্ধত্যপূর্ণ কবিতা বলে ফেললেন এবং মদীনা গমনকারী এক ব্যক্তির মাধ্যমে এসব কবিতা হযরত বুজায়েরের (রা) নিকট পৌঁছে দিলেন।

হযরত বুজায়ের (রা) রিসালাত প্রদীপের পতঙ্গ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নিজের আকা ও মাওলার (সা) শানে ঔদ্ধত্য কি করে বরদাশত করতে পারেন। তিনি ভগ্ন হৃদয়ে হুজুরকে (সা) এই কবিতাবলী সম্পর্কে অবহিত করলেন। কা'বের (রা) এই তৎপরতায় রাসূলে করিম (সা) খুব কষ্ট পেলেন এবং বললেন ঃ

"মান লাকা কা'বান ফাল ইয়াকতুলুহু" অর্থাৎ কা'বকে যে দেখবে সেই যেন তাকে হত্যা করে ।

কিছু নেতৃস্থানীয় চরিতকার এই মত প্রকাশ করেছেন যে, শুধুমাত্র এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ কবিতাই কা'বকে হত্যাযোগ্য বলে ঘোষণা দানের কারণ ছিল না বরং তার আরো অনেক কারণ ছিল। তাহলো, কা'ব আবরাকুল আজজাফ থেকে মক্কা চলে গিয়েছিলেন এবং মক্কায় কুরাইশদের সাথে এক হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক তৎপরতায় অংশ নিয়েছিলেন। তিনি নিজের কবিতার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে বিদ্রূপ এবং মুশরিকদেরকে হকপন্থীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতেন।

এক বর্ণনায় এও বলা হয়েছে যে, তিনি আবরাকুল আজজাফে নিজের ভাইয়ের সাথে মিলে হুজুরকে (সা) শহীদ করার পকিল্পনা বানিয়েছিলেন এবং সেই লক্ষ্যেই বুজায়েরকে (রা) মদীনা প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু বুজায়ের (রা) যখন মদীনা পৌঁছে ইসলাম গ্রহণ করে বসলেন এবং এই ষড়যন্ত্র প্রকাশ পেয়ে গেল তখন হুজুর (সা) কা'বের রক্ত বৈধ করে দিলেন।

অধিকাংশ রেওয়ায়াত থেকে এটাই প্রকাশ পায় যে, এই ঘটনা হযরত বুজায়েরের (রা) ইসলাম গ্রহণের অব্যবহিত পরই (৬ষ্ঠ হিজরীর দিকে) সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন যে, এই ঘটনা মহানবী (সা) তায়েফ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সংঘটিত হয় যা হোক, এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, হযরত বুজায়েরের (রা) ইসলাম গ্রহণের পর দু'ভায়ের পথ ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

বুজায়ের (রা) হক পথের এক জানবাজ সিপাহী হয়ে গেলেন এবং কা'ব ইসলাম বিরোধিতাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করে নিলেন।

ইবনে হিশাম লিখেছেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর সংঘটিত যুদ্ধসমূহে যেমন খায়বার, মক্কা বিজয়, হুনাইন ও তায়েফে হযরত বুজায়ের (রা) প্রিয় নবীর

(সা) সাথে সফরসঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এ সকল যুদ্ধে তিনি জীবনবাজি রাখার কৃতিত্বও প্রদর্শন করেন। এসব যুদ্ধে তিনি হক ও ন্যায়ের পক্ষে অত্যন্ত শক্তিশালী কবিতা রচনা করেন। এসব কবিতা পাঠ করে জানা যায় যে, তিনি শুধুমাত্র একজন ভালো কবিই ছিলেন না বরং ইসলামের প্রতি ভালোবাসা তাঁর প্রকৃতিতে একাকার হয়ে গিয়েছিল।

বিশ্বনবী (সা) তায়েফের যুদ্ধ শেষ করে যখন মদীনা মুনাওয়ারা তাশরীফ আনলেন তখন হযরত বুজায়ের (রা) পত্র লিখে কা'বকে অবহিত করলেন যে, প্রিয় নবী (সা) হাতে গোণা দু' চারজন হকের দুশমন ছাড়া সকল মক্কাবাসীকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। হত্যা তালিকার মধ্যে ইবনে খাতালও ছিল। সে হুজুরের (সা) শানে বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করতো। অন্য বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনাকারীদের মধ্যে ছিল হাবিরা বিন আবি ওয়াহাব ও ইবনে যাবয়ারা। তারা মক্কা থেকে পালিয়ে ইয়েমেনে আশ্রয় নিয়েছিল। এ সত্ত্বেও ইবনে যাবয়ারা তাওবা করে রাসূলের (সা) দরবারে হাজির হলো। তখন হুজুর (সা) তাকেও ক্ষমা করে দিলেন। পত্রে হযরত বুজায়ের (রা) লিখলেন, তোমার জীবনও বাঁচতে পারে যদি তুমি আমার পত্র পাওয়া মাত্র ইসলাম গ্রহণ কর এবং রাসূলের (সা) দরবারে হাজির হয়ে নিজের অতীত ভুল-ভ্রান্তির জন্যে লজ্জা প্রকাশ কর। হুজুরের (সা) অন্তর বড় প্রশস্ত। তিনি ভুল-ভ্রান্তিকারীদেরকে ক্ষমা করে থাকেন।

কা'ব হযরত বুজায়েরের (রা) পত্র পেয়ে প্রথমে নিজের ভাইয়ের পরামর্শ মুতাবেক আমল করলেন না এবং বিভিন্ন গোত্রে আশ্রয় নিতে চাইলেন। কিন্তু কোন গোত্রই তাঁকে আশ্রয়দানে সম্মত হলেন না। এমনকি নিজের গোত্র মুযনিয়াও তাকে আশ্রয়দানে অস্বীকৃতি জানালো। অতপর তাঁর চোখ খুললো এবং হুজুরের (সা) নিকট আশ্রয় গ্রহণকেই তিনি নিজের জন্যে সর্বোত্তম বলে বিবেচনা করলেন।

ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন, কা'বকে ইসলামের প্রতি অনুরাগী করে তোলার কারণ ছিল সেই কবিতাবলী যা হযরত বুজায়ের (রা) তাঁকে লিখে পাঠিয়ে ছিলেন। এসব কবিতা ছিল কা'বের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কবিতাবলীর জবাব। সিরাতে ইবনে হিশামে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

مَن مُبلِغٌ كَعبًا فَهَل لَكَ فِي الَّتِي ـ تَلُومُ عَلَيهَا بَاطِلاً وَّهِي اَحزَمُ

اِلَي اللّهِ (لاالعزى ولا الات) وَحدهُ ـ فَتَنجُو اِذَا كَانَ النَّجَاءُ وَتَسلِمُ

لَدَى يَومٍ لا يَنجُوا وَلَيسَ بِمَفلِتٍ ـ مِنَ النَّاسِ الاَّطَاهِرُ القَلبُ مُسلِمُ

فَدِينُ زُهَيرٍ وَّلاَءِ شَيئٌ دَينه ـ وَدِينَ اَبِى سُلمى عَلَىَّ مُحَرَّمُ

অর্থ ঃ ১। কোন ব্যক্তি কা'বের কাছে গিয়ে আমার পয়গাম দেবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করবে যে, যে দ্বীনকে তুমি গালি দাও তাতে খারাব কোন্ বস্তুটা রয়েছে ? সেই দ্বীন তো ভালো।

২। মুক্তি সড়ক হলো আল্লাহর রাস্তা। লাত উজ্জার রাস্তা নয়। যদি মুক্তি ও নিরাপত্তা চাও তাহলে আল্লাহর রাস্তায় চলে তা লাভ করো।

৩। সেদিন অবশ্যই আসবে যেদিন পাকবাজ ও পাক নফস মুসলমান ছাড়া কেউই মুক্তি লাভ করতে পারবে না।

৪। যুহায়েরের দ্বীন ছিল অবাস্তব এবং এমনিভাবে আবু সুলমার দ্বীনও আমার ওপর ছিল হারাম।

ইসলামের ব্যাপারে অন্তর খুলে যাওয়ার পর কা'ব (রা) কিভাবে রাসূলের (সা) দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন ? এই প্রসঙ্গে পাঁচটি বর্ণনা রয়েছে ঃ

এক ঃ হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) "আল-ইসাবাতু ফি তামাইয়িজুস সাহাবা" গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত কা'ব (রা) মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছে সোজা মসজিদে নববীর পথ ধরলেন। নবী করিম (সা) সেখানে কিছু সাহাবীর মধ্যে বসেছিলেন। কা'ব (রা) নিজের উটনীকে মসজিদের দরজায় বসালেন। অতপর নিজের কিয়াস অনুসারে অথবা বিশেষ আলামতসমূহ হুজুরকে (সা) পৌঁছালেন এবং কাতারসমূহ অতিক্রম করে তাঁর পবিত্র খিদমতে গিয়ে উপস্থিত হয়ে বসে পড়লেন। তারপর প্রথমে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন এবং এই আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমি হলাম কা'ব বিন যুহায়ের। আমি নিরাপত্তা কামনা করি।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "আচ্ছা, তুমি সেই ব্যক্তি যে সেই কবিতাবলী রচনা করেছিলেন ?" অতপর তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দীককে (রা) সম্বোধন করে বললেন, "একটু সেই কবিতাগুলো পাঠ করুন তো।" নবীর (সা) ইরশাদ শুনে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এই কবিতাবলী পাঠ করলেন ঃ

اَلاَ اَبلَغَا عَنّى بُجَيرًا رِسَالَةً ـ عَلى اَىّ شَيىءٍ وَيبَ غَيرِكَ دَلَّكَا

عَلى خُلُقٍ لَم تَلفَ اُمَّ وَلاَ اَبًا ـ عَلَيهِ وَلَم تُدرِكُ عَلَيهِ اَخَالَكَا

سَقَاكَ اَبُو بَكرٍ بِكَاسٍ رَوِيَّةٍ ـ فَانهَلَكَ المَامُورُ مِنهَا وَعَلَّكَا

অর্থ ঃ ১। বুজায়েরকে আমার এই পয়গাম পৌঁছে দাও যে, শেষ পর্যন্ত কোন্ বস্তু তোমাকে অন্যের ধ্বংস নিজের মাথায় নিতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

২। এই পথ না ছিল তোমার পিতামাতার। তোমার ভাইও এই পথ অবলম্বন করেনি।

৩। আবু বকর (রা) তোমাকে পূর্ণ পাত্র পান করিয়েছে এবং "মানুষ" তো তোমাকে সেই পাত্র থেকে খুব করে পান করিয়েছে।

হযরত আবু বকর (রা) যখন কবিতার তৃতীয় লাইনের দ্বিতীয় পংক্তি পাঠ করলেন তখন কা'ব (রা) আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! এই পংক্তিতো এ রকম হওয়া উচিত।

فَانهَلَكَ المَامُونَ مِنهَا دَعَلَّكَا

অর্থাৎ মামুন সেই পেয়ালা থেকে খুব করে পান করিয়েছে।

রহমতে আলম (সা) বললেন ঃ "মামুনুন ওয়াল্লাহি" (হাঁ, আল্লাহর কসম! মামুনই ঠিক)।

অতপর ইরশাদ হলো ঃ "তুমি নিরাপদ এবং তুমিও মামুন।"

মুশরিকরা নিজেদের গোপন মালিন্য প্রকাশের জন্য কোন কোন সময় হুজুরকে (সা) "মামুর" বলতো শব্দটির অর্থ হলো জ্বিনের অনুগামী হওয়া। বস্তুত এই শব্দ দিয়ে খারাব দিক প্রকাশ পেতো। এ জন্যে হযরত কা'ব (রা) তাকে "মামুন" (নির্ভীক, মাহফুজ) শব্দ দিয়ে পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন।

ইবনে হিশামের বক্তব্য অনুযায়ী হযরত কা'ব (রা) নিজের কবিতায় বাস্তবিকই "মামুন" শব্দই ব্যবহার করেছিলেন।

দুই ঃ ইবনে কুতাইবা "আশ শিয়রু ওয়াশ শুয়ারাউ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, হযরত কা'ব মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছে প্রথম হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিদমতে হাজির হলেন। ফজরের নামাযের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) কা'বকে (রা) মহানবীর (সা) খিদমতে হাজির করলেন। সে সময় কা'ব (রা)

মুখের ওপর কাপড়ের পট্টি বেঁধে রেখেছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! এই ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতে চায় এবং আপনার বাইয়াতে সৌভাগ্যমণ্ডিত হওয়ারও আকাংখা রাখে।"

প্রিয় নবী (সা) নিজের মুবারক হাত সামনে প্রসারিত করলেন। কা'ব (রা) বাইয়াত করে ফেলেছেন। এমন সময় তিনি নিজের মুখের ওপরকার কাপড়ের পট্টি খুলে ফেললেন এবং আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমি হলাম কা'ব বিন যুহায়ের এবং নিরাপত্তা প্রার্থনাকারী।"

হাফেজ ইবনে হাজার (র) এই বর্ণনায় মশহুর তাবেয়ী হযরত সাঈদ (র) বিন মুসাইয়্যেবের উদ্ধৃতি দিয়ে এটুকুন বেশী বলেছেন যে, কা'ব (রা) মদীনা পৌঁছে লোকদেরকে সাইয়েদুল আনামের (সা) সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং নরম অন্তর সাহাবীর (রা) নাম জিজ্ঞেস করলেন। তারা হযরত আবু বকরের (রা) নাম বললেন। কা'ব (রা) তাঁর খিদমতে হাজির হলেন এবং সুপারিশ কামনা করলেন। সুতরাং সিদ্দীকে আকবার (রা) তাঁকে সাথে নিয়ে রাসূলের (সা) দরবারে উপস্থিত হলেন।

তিন ঃ সিরাতে ইবনে হিশামে উল্লেখ আছে, কা'ব মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছে বনু জাহিনার এক ব্যক্তির নিকট রাত্রি যাপন করলেন। ব্যক্তিটি তাঁকে চিনতেন। সেই ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর কাব'কে (রা) মহানবীর (সা) সামনে পেশ করলেন। কা'ব ইসলাম কবুল এবং হুজুরের (সা) হাতে বাইয়াত করলেন।

হুজুর (সা) তাঁকে চিনতে পারলেন না। সুতরাং কা'ব (রা) আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! কা'ব বিন যুহায়ের তাওবা করে এবং ঈমান আনয়নপূর্বক আপনার খিদমতে হাজির হতে চায় এবং নিরাপত্তার প্রত্যাশা করে। আমি যদি তাকে হাজির করি তাহলে কি আপনি তাকে ক্ষমা করে দেবেন ?"

মহানবী (সা) বললেন ঃ "হ্যাঁ যদি সে সত্য অন্তরে ঈমান আনে এবং অতীত ভুল-ভ্রান্তির ব্যাপারে তাওবা করে তাহলে সে নিরাপদ।"

একথা শুনে কা'ব (রা) আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমিই হলাম কা'ব বিন যুহায়ের।"

চার ঃ আবু যায়েদ আল-কারাশী "জামহারাতু আশয়ারুল আরাব" গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত কা'ব (রা) মদীনা মুনাওয়ারা গিয়ে সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) নিকট আশ্রয় চাইলেন। কিন্তু তিনি একথা বলে ক্ষমা চাইলেন যে, আল্লাহর রাসূলের (সা) মর্জীর বিরুদ্ধে তিনি তাকে আশ্রয় দিতে পারেন না। অতপর কা'ব (রা) হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিদমতে গেলেন এবং আশ্রয়ের আবেদন জানালেন। তিনিও অস্বীকার করলেন। তারপর তিনি হযরত আলীর (রা) নিকটে গেলেন। তিনিও আশ্রয় দানের সাহস পেলেন না। অবশ্য তিনি তাকে হুজুরের (সা) পেছনে গিয়ে নামায পড়ার পরামর্শ দিলেন। তিনি যখন নামায থেকে ফারেগ হবেন তখন এভাবে আরজ করবে, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। এখন আপনার বাইয়াত করতে চাই।" হুজুর (সা) নিজের পবিত্র হাত সামনে অগ্রসর করে দিবেন। এ সময় হাত ধরে নিরাপত্তা চাইবে। আশা করি, রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে ক্ষমা করে দেবেন।

হযরত কা'ব (রা) হযরত আলীর (রা) পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করলেন এবং ক্ষমা পেলেন।

পাঁচ ঃ ইবনে আছির (র) স্বয়ং হযরত কা'বের (রা) মুখে এই ঘটনা এভাবে উদ্ধৃত করেছেন, "আমি মসজিদে নববীর (সা) দরজায় নিজের উটনী বসালামা এবং মসজিদে প্রবেশ করলাম। সে সময় রাসূলুল্লাহ (সা) একটি চত্বরের ওপর বসেছিলেন এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা) দল বেধে তাঁর চার পাশে বসেছিল। হুজুর (সা) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিকে সম্বোধন করে কথা বলছিলেন। আমি তাঁর খিদমতে গিয়ে বসে পড়লাম এবং কালেমা পড়ে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলাম। অতপর আমি নিরাপত্তা চাইলাম। হুজুর (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তুমি কে ?" আমি আরজ করলাম ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমি কা'ব বিন যুহায়ের।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "আচ্ছা, তাহলে সেই কবিতা তুমিই বলেছিলে ?" তারপর তিনি হযরত আবু বকরকে (রা) সেই কবিতা পাঠ করতে বললেন। হযরত আবু বকর (রা) কবিতা পাঠ করতে করতে যখন "আল-মামুর" শব্দ উচ্চারণ করলেন তখন আমি আরজ করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আল-মামুর, নয়, বরং শব্দটি হবে আল-মামুন। এ সময় তিনি বললেন ঃ "মামুনুন ওয়াল্লাহি" অর্থাৎ আল্লাহর কসম মামুনই হবে।

ইবনে হিশাম আল্লামা ইবনে ইসহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, যখন লোকজন জানতে পেল যে, নিরাপত্তা বা আশ্রয় প্রার্থনাকারী সেই কবি কা'ব

বিন যুহায়ের। যাকে হুজুর (সা) ক্ষমা করে দিয়েছেন। এ সময় একজন আনসার সামনে অগ্রসর হয়ে তাকে হত্যা করতে চাইলো এবং এই উদ্দেশ্যে হুজুরের (সা) অনুমতি প্রার্থনা করলো। দয়ার সাগর মহানবী (সা) বললেন ঃ না, কা'ব তাওবাহ করে এসেছে। তার সাথে কোন বিবাদ করা যাবে না। একথা শুনে কা'ব খুশী ও নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন এবং রাসূলের (সা) নিকট আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি কাসিদা রচনা করেছি। অনুমতি পেলে পেশ করতে পারি।"

হুজুর (সা) বললেন, "হাঁ, তোমার কবিতা শুনাও।"

অতপর কা'ব (রা) অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে নিজের সেই কাসিদা পাঠ শুরু করলেন যা ইতিহাসে "কাসিদায়ে বানাত সুয়াদ" নামে খ্যাত হয়ে আছে এবং মহানবীর (সা) দরবারে তিনি ঈর্ষাপূর্ণ স্থান লাভ করলেন। এই কাসিদা ৫৮টি চরণ সম্বলিত ছিল।

কাসিদার শুরু ছিল এভাবে ঃ

بَانَت سُعَادُ فَقَلبِى اليَومَ مَتبُولُ ـ مُتيَّمُ اِثرَهَا لَم يُفدَ مَكبُولُ

"সুয়াদ আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এ জন্য আমার অন্তর পীড়িত এবং সে এমন গোলাম ও কয়েদী যাকে (প্রেমের কয়েদ) কেউ ফিদিয়া মুক্ত করাতে পারে না।"

কাসিদা পড়তে পড়তে যখন তিনি এই চরণসমূহে পৌছলেন ঃ

اُنبئتُ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ اَوعَدَنِى ـ وَالعَفوُ عِندَ رَسُولِ اللّهِ مَامُولُ

"আমাকে খবর দেয়া হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে হত্যার ধমক দিয়েছেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে আমি তো রাসূলের (সা) নিকট ক্ষমার আশা করি।"

اِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُستَضَاءُ بِه ـ مُهَنَّدُ مِن سُيُوفِ اللّهِ مَسلُولُ

"অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সা) এমন একটি আলো বা নূর যা থেকে আলো লাভ করা যায় এবং আল্লাহর তরবারীসমূহের মধ্যে একটি খোলা বা উন্মুক্ত হিন্দী তরবারী।"

فِى عُصبَةٍ مِّن قُرَيشٍ قَالَ قَائِلُهُم ـ بِبَطنِ مَكَّةَ لَمَّا اَسلَمُو زَولُوا

"আপনি কুরাইশ দলভুক্ত। যখন এই দল মক্কায় ইসলাম এনেছিল তখন তাদের মধ্য থেকে একজন বললো এখান থেকে হিজরত করে চলে যাও।

এই কাসিদা পাঠের পর হুজুর (সা) বললেন ঃ এই কবিতাবলী মনোযোগের সাথে শোনো। কতিপয় বর্ণনা অনুযায়ী সেই সময় আবার কোন বর্ণনা মতে কাসিদা পাঠ যখন শেষ হলো তখন হুজুর (সা) চাদর খুলে হযরত কা'বের (রা) কাঁধের উপর রেখে দিলেন।

এটা ছিল বিরাট সম্মান বা গৌরবের ব্যাপার। কা'ব (রা)-এর নিকট সমগ্র দুনিয়ার নিয়ামত সমূহও এই তুলনায় ছিল নগণ্য। তিনি আজীবন সেই পবিত্র চাদর বুকে জড়িয়ে রেখে দিলেন এবং দরিদ্রতা সত্ত্বেও কোন মূল্যেই তা হাতছাড়া করেননি।

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) "তারিখুল খুলাফা" গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা) পবিত্র চাদরটি দশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে কা'বের (রা) নিকট থেকে কিনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সেই মহান ও প্রিয় সম্পদ বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

তাঁর ওফাতের পর তাঁর পুত্র উকবাতুল মুজাররাস সেই পবিত্র চাদরটি হযরত আমীর মুয়াবিয়ার (রা) নিকট বিভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী, বিশ, ত্রিশ অথবা চল্লিশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

বনু উমাইয়ার পর পবিত্র চাদরটি বনি আব্বাসের খলিফারা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হন। ঐতিহাসিক আবুল ফিদা এবং ইমাম সুয়ূতি (র) বর্ণনা করেছেন, বাগদাদের পতনের পর তাতারীরা যখন লুটতরাজ চালায় তখন সেই পবিত্র চাদরটি হারিয়ে যায়। কিন্তু কতিপয় ঐতিহাসিক ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তারা বলেছেন, আব্বাসী বংশের যেসব ব্যক্তি তাতারীদের লুটতরাজ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন তাঁরা পবিত্র চাদরটি নিজেদের সঙ্গে করে প্রথমে সিরিয়া এবং পরে মিসর নিয়ে গিয়েছিলেন।

প্রখ্যাত বাদশাহ আল-মুলুকুজ জাহের বেবিরস মিসরে আব্বাসী খিলাফত পুনরুজ্জীবিত করেন। তারা বিশেষ বিশেষ সময় সেই পবিত্র চাদরটি গায়ে দিতেন।

তুর্কীরা মিসরীয় শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটানোর পর পবিত্র চাদরটি কাসতানতুনিয়া চলে যায় এবং আজও ইস্তাম্বুলের সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ নির্মিত মহল "তোপ কাপির" ১২ নম্বর কক্ষে একটি সিন্দুকে তা সুরক্ষিত রয়েছে।

"চাদর প্রদান" ঘটনার পর হযরত কা'বের (রা) জীবনের দিন-রাত্রি কেমনভাবে কেটেছিল, সে ব্যাপারে শুধু এতটুকুনই জানা যায় যে, তিনি কাসিদা রচনাকে জীবিকার মাধ্যম বানাননি। যা কিছু সম্পদ ছিল তার ওপর নির্ভর করেই জীবন কাটিয়ে দিলেন। তা সত্ত্বেও পবিত্র চাদর হিসেবে যে সম্পদ তিনি লাভ করেছিলেন তার তুলনায় অঢেল বৈভবকেও তিনি কোন পাত্তা দেননি।

ভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত কা'ব (রা) সাইয়েদেনা হযরত ওসমানের (রা) খিলাফতের প্রথম দিকে (২৪হিঃ) অথবা হযরত আমীর মুয়াবিয়ার (রা) শাসনকালের শুরুতে (৪২ হিঃ) ওফাত পান। তিনি দুই পুত্র রেখে যান। তারা হলো উকবাতুল মুজাররাব এবং আল-আওয়াম। তারা দু'জনই কবি ছিলেন।

"বানাত সুয়াদু" কাসিদা ছাড়া হযরত কা'বের (রা) স্মরণীয় গ্রন্থ হলো 'দিওয়ান'। এই গ্রন্থে কিছু পূর্ণ এবং কিছু অপূর্ণ কাসিদা ও বিভিন্ন ধরনের কবিতা রয়েছে। এই দিওয়ান জার্মানী, পোল্যান্ড, মিসর ও লেবানন থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

হযরত কা'ব (রা) বিন যুহায়ের দু' যুগের কবি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন অর্থাৎ তিনি জাহেলিয়াত এবং ইসলাম দু' যুগই পান। এ কারণেই তাঁর কাব্য দু'যুগের বৈশিষ্টই বিধৃত আছে। অবশ্য জাহেলী যুগের প্রাধান্যই বেশী। কারণ, তিনি মহানবীর (সা) শেষ যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

বানাত সুয়াদু একটি খ্যাতিমূলক কাসিদা। এ কাসিদাকে "কাসিদাতুল বুরদা" এবং "কাসিদাতুল উমাইয়া"ও বলা হয়। এই কাসিদা হযরত কা'বের (রা) শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এই সাকিদা অধিকাংশ বর্ণনা শক্তি, রচনারীতি ও ধ্যান ধারণার দিক থেকে জাহেলী যুগের প্রতিচ্ছবি বলা যায়। তার কারণ হলো, ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনার যে মূল প্রেরণা সে সম্পর্কে তিনি এই কাসিদা রচনার সময় সম্পূর্ণ রূপে অনবহিত ছিলেন। তিনি এই কাসিদা ইসলাম কবুলের পূর্বে রচনা করে এনেছিলেন। এ জন্য তাকে সেই প্রেক্ষাপটেই গ্রহণ করা উচিত।

কাব্য বিচারে হযরত কা'বের (রা) কাব্য নিসন্দেহে উচ্চাঙ্গের কাব্য ছিল। চরিতকার ও সাহিত্য পণ্ডিতরা তাঁর কাব্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ হাফেজ ইবনে আবদুল বার বলেছেন, কা'ব (রা) অত্যন্ত বড় মর্যাদার কবি ছিলেন। (আল-ইসতিয়াব)

ইমাম নববী (র) বলেন, "এই বংশের কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কবি হলেন যুহায়ের বিন আবি সুলমা এবং তারপর কা'ব (রা)।"

ইবনে কুতাইবার (র) মত হলো, কা'ব (রা) সুন্দর বর্ণনার এবং শক্তিশালী কবি ছিলেন।

আল্লামা যারেকালি (র) লিখেছেন, "কাব নাজদের শীর্ষ স্থানীয় অন্যতম কবি ছিলেন। তিনি জাহেলী যুগের অন্যতম খ্যাতিমান কবি হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকেন। প্রকৃত কথা হলো কাব্য ও কবিতায় তাঁর ভিত্তি ছিল সকলের চেয়ে মজবুত এবং তিনি উঁচু বংশ মর্যাদা ও শারাফতের মালিক ছিলেন। (আল-আ'লাম)

আবুল ফারাজ ইস্পাহানী বলেন, "কা'ব হলেন মাখজারাসী এবং অন্যতম শীর্ষস্থানীয় কবি।" (কিতাবুল আগানী)।

"বানাত সুয়াদু" কাসিদা কাব্য গুণে গুণান্বিত একটি অসাধারণ কবিতা। এই কাসিদার কবি স্বয়ং তা মহানবীর (সা) দরবারে পাঠ করেন এবং প্রিয় নবী (সা) পবিত্র চাদর প্রদান করে তাঁর সন্তুষ্টির সনদ দান করেন। এ জন্য এই কাসিদা প্রতি যুগেই অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এমনকি দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষায় কাসিদাটির ২০টি ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ রয়েছে। এদিক থেকে ইমাম বুসায়রীর (র) "কাসিদায়ে বুরদা" ছাড়া অন্য কোন কাসিদাকে সামনে আনা যায় না।

আরবী সাহিত্যের সুপণ্ডিত ডঃ যুবায়েদ আহমদ ঠিকই বলেছেন, "রচনাশৈলী ও ভাষাগত দিক থেকে কাসিদায়ে বানাত সুয়াদু নজিরবিহীন কাসিদা।"

এ কাসিদার তিনটি অংশ রয়েছে। দৃশ্যত তিনটি অংশ বিচ্ছিন্ন অংশ বলেই মনে হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিন অংশের মধ্যে সুন্দর মিল রয়েছে। প্রথম অংশে জীবন সঙ্গিনী অথবা প্রেমিকা সুয়াদের বর্ণনা রয়েছে। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে জীবন সঙ্গিনীর নাকা সফরের প্রশংসা।

তৃতীয় অংশে আছে রাসূলে আকরামের (সা) প্রশংসা ও নাতিয়া কালাম। তাতে সাহাবায়ে কিরামের (রা) প্রশংসাও বর্ণিত হয়েছে। আর এই তৃতীয় অংশই এই কাসিদার সার বস্তু। এ জন্যই তা সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে। কাসিদাটির জনপ্রিয়তা দেখে অন্যান্য আরব কবিও "বানাত সুয়াদু" নামে কাসিদা লিখেছিলেন। কিন্তু তাদের কেউই হযরত কা'বের (রা) কাসিদার ধারেকাছেও পৌছতে পারেনি।

হযরত লাবিদ (রা) বিন রবিয়াহ আমেরী

আরবের জাহেলী যুগের অন্যতম খ্যাতনামা কবি ছিলেন আবু আকিল লাবিদ (রা) বিন রবিয়াহ আমেরী। তিনি মান-ইজ্জত ও খ্যাতির দিক থেকে সূর্যের দ্যূতি ছড়িয়েছিলেন। কাব্য সাম্রাজ্যে তিনি ইমরুল কায়েস, নাবিগাহ জুবিয়ানী, যুহায়ের বিন আবি সালমা, আমর বিন কুলছুম, আ'শা বিন কায়েস এবং তারাফাহ ইবনুল আবিদের মত খ্যাতনামা কবি ছিলেন। লাবিদের (রা) মহানত্বের বড় প্রমাণ হলো স্বয়ং বিশ্বনবী (সা) তার কতিপয় কবিতা পছন্দ করেছিলেন। তিনি সেই সাত কবির একজন ছিলেন, যাঁদের কাসিদা জাহেলী যুগে মক্কাবাসী কা'বা শরীফে টাঙিয়ে রাখতেন। লাবিদের নসবনামা হলো ঃ

লাবিদ (রা) বিন রবিয়াহ বিন আমের বিন মালিক বিন জাফর বিন কিলাব বিন রবিয়াহ বিন আমের বিন সা'সা'হ আমেরী।

লাবিদের (রা) পিতা রবিয়াহ বিন আমের ছিলেন স্বগোত্রের সরদার। আর তিনি ছিলেন নজিরবিহীন দাতা। বিশ বিশটি গরীব ও মিসকিন সবসময় তার বাড়ীতে লালিত-পালিত হতো। এই উদারতা, মহানত্ব ও দানশীলতার জন্য তিনি কওমের পক্ষ থেকে "রবিয়ুল মুফতারিন" উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। লাবিদ (রা) ছিলেন সেই পিতার যোগ্যতম উত্তরসুরী। দানশীলতা ও দরিদ্র প্রতিপালন তিনি পিতার নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন এবং আজীবন অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে দানশীলতা অব্যাহত রেখেছিলেন। উপরন্তু তিনি বীরত্ব, অশ্বারোহণ, নির্মল প্রকৃতি এবং ন্যায়পরতার মত গুণে গুণান্বিত ছিলেন। জীবনের প্রথম পর্যায় থেকেই কাব্যজগতের প্রতি ছিল তার অপরিসীম আকর্ষণ। যৌবনকালে তিনি একবার নিজের চাচাদের সাথে নোমান আবু কাবুসের দরবারে গিয়েছিলেন। সেখানেই জাহেলী যুগের মহান কবি নাবেগাহ জুবিয়ানীর সাথে সাক্ষাত হয়েছিল। তিনি তাঁর কবিতা শুনে খুব প্রশংসা করেছিলেন এবং বনি আমের ও বনু কায়েসের সকল কবির চেয়ে কাব্যগুণে তিনি এগিয়ে গেছেন বলে মন্তব্য করেছিলেন। অতপর তিনি ধীরে ধীরে আরবের জাহেলী কবিদের প্রথম কাতারে চলে আসেন এবং সমগ্র আরবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

জাহেলী যুগে লাবিদ (রা) প্রায়ই মক্কা যাতায়াত করতেন। নিজের কবিত্বগুণে তিনি কুরাইশের নিকট অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ইবনে

আছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, নবুওয়াত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পর একবার তিনি মক্কা এলেন। এ সময় মক্কাবাসী তাঁকে খুব সম্মান করলো। সে সময় পর্যন্ত তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। অতএব, পূর্বেকার মতই তিনি কাব্য মাহফিল গরম করে চললেন। একদিন এমনি এক মাহফিলে নিজের কাসিদা শুনাচ্ছিলেন। যখন এই পংক্তি পাঠ করলেন ঃ

الاكل شيءٍ ما خلا اللّه باطِل

" সতর্ক থেকো। আল্লাহ ছাড়া সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।"

এ সময় এই মজলিশে উপস্থিত জালিলুল কদর সাহাবী হযরত ওসমান (রা) বিন মাজউন অযাচিতভাবে বলে উঠলেন ঃ "তুমি ঠিকই বলেছ।" কিন্তু যখন তিনি দ্বিতীয় পংক্তি পাঠ করলেন ঃ

وَكُلُّ نَعِيمٍ لاَّمُحَالَة زَائِلُ

"এবং প্রত্যেক নিয়ামত নিসন্দেহে নিঃশেষ হয়ে যাবে।"

এ সময় হযরত ওসমান বলে উঠলেন ঃ "এটা ভুল কথা। জান্নাতের নিয়ামতসমূহ চিরস্থায়ী এবং কখনো তা নিঃশেষ বা ধ্বংস হবে না।"

একথায় সারা মজলিশে হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। লোকেরা হযরত ওসমান (রা) বিন মাজউনকে গাল-মন্দ দিতে লাগলো এবং লাবিদকে পুনরায় পংক্তিদ্বয় পাঠের ফরমায়েশ করলো। তিনি কবিতাটির পংক্তিদ্বয় পুনরায় পাঠ করলেন। হযরত ওসমানও (রা) নিজের মন্তব্য পুনরুক্তি করলেন। তাতে লাবিদ খুব ক্রোধান্বিত হলেন এবং কুরাইশদেরকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন ঃ

"হে কুরাইশ ভাইয়েরা! আল্লাহর কসম, পূর্বে তোমাদের মজলিশের এই অবস্থা ছিল না। সেই মজলিশে বসতে কেউই লজ্জা অনুভব করতো না এবং সেখানে কোন ধরনের বেয়াদবীও প্রদর্শিত হতো না। এই ব্যক্তি যদি আমাকে এভাবে বাধা দিতে থাকে তাহলে আমি আমার কবিতা শুনাতে পারবো না।"

লাবিদের কথা শুনে মুশরিকরা ক্ষেপে গেল এবং তারা হযরত ওসমান (রা) বিন মাজউনকে গাল-মন্দ দিয়েই ক্ষান্ত হলো না বরং তার গায়েও তারা হাত তুললো। এ সময় যা হবার তা হলো। কিন্তু সেই ঘটনার ১৫-১৬ বছর পর যখন আল্লাহ পাক লাবিদ (রা) বিন রবিয়াহকে ইসলামের দিকে ঝুঁকিয়ে দিলেন তখন তাঁর অন্তর সাক্ষ্য দিতে লাগলো যে, ওসমান (রা) বিন মাজউন যা কিছু বলেছিলেন তা অবশ্যই সত্য ছিল।

হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) "আল-ইসতিয়াবে" লিখেছেন, মহানবী (সা) লাবিদের (রা) লিখিত এই পংক্তি খুবই পছন্দ করতেন ঃ

الاكل شئ ماخلا اللّٰهُ باطل

"সতর্ক থেকো ! আল্লাহা ছাড়া সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।"

হুজুর (সা) বলতেন, কবিদের কবিতার মধ্যে লাবিদের এই কবিতা খুব ভালো।

লাবিদের (রা) পিতা ইসলামের যুগ পাননি। স্বয়ং লাবিদই (রা) নবীর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। স্বভাবগত দিক থেকে তিনি যদিও সুন্দর স্বভাব এবং শরীফ মানুষ ছিলেন কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো যে, রিসালাতের শেষ দিকে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে পিতৃধর্ম অথবা আকীদা-বিশ্বাস পরিবর্তন খুব কঠিন হওয়ার কারণেই সম্ভবত তিনি এমনটি করেছিলেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) এবং কতিপয় চরিতকার লিখেছেন, হযরত লাবিদ (রা) বিন রবিয়াহ নবম হিজরীতে বনু জাফর বিন কিলাব গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলের (সা) দরবারে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সে সময় তাঁর বয়স মতান্তরে ৯০ অথবা ১১৩ বছর ছিল। আল্লামা ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত লাবিদ (রা) বিন রবিয়াহ ৪১ হিরজীতে ১৪৫ বছর বয়সে কুফায় ইন্তেকাল করেন। এই হিসেব অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণের সময় (অর্থাৎ ৯ হিজরীতে) তাঁর বয়স ১১৩ বছরের কাছাকাছি হয়। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ৩২ বছর জীবিত ছিলেন বলে মনে হয়। পক্ষান্তরে "ইসাবা" ও "আগানি"র বর্ণনা অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ৫৫ বছর জীবিত ছিলেন। এই হিসেব মতে ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স ৯০ বছর ধরাটাই ঠিক হয়। আল্লাহ পাকই ব্যাপারটি ভালো জানেন।

অধিকাংশ চরিতকারই লিখেছেন, ঈমান আনার পর হযরত লাবিদ (রা) কবিতা রচনা ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত এক অথবা দু'টি কবিতা ছাড়া আর কোন কবিতা রচনা করেননি। এ ব্যাপারে তিনি বলতেন, আল্লাহ পাক কবিতার বিনিময়ে আমাকে সুরায়ে বাকারা ও আলে ইমরান প্রদান করেছেন। কথিত আছে যে, হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁর শাসনামলে একবার হযরত লাবিদকে (রা) জিজ্ঞেস করে পাঠালেন যে, ইসলামী যুগে আপনি কোন কবিতা রচনা করেছেন। এই প্রশ্নের জবাবে তিনি যখন জানালেন যে, কবিতার বিনিময়ে আল্লাহ তাঁকে বাকারাহ এবং আলে ইমরান প্রদান করেছেন তখন

হযরত ওমর (রা) এত খুশী হলেন যে, তাঁর ওজিফা বা ভাতা বৃদ্ধি করে দু' হাজার করে দিলেন।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, আমীর মুয়াবিয়া (রা) নিজের শাসনামলে একবার হযরত লাবিদকে (রা) বললেন, "লাবিদ আমার এবং তোমার ওজিফা সমান সমান। আমি তোমার ভাতা বা ওজিফা কমিয়ে দেব।"

তিনি বললেন, "কিছুদিন অপেক্ষা করুন। অতপর আমার ওজিফাও আপনিই নিয়ে নিবেন।" (এটা তার বার্ধক্যের প্রতি ইঙ্গিত)।

আমীর মুয়াবিয়া (রা) সম্ভবত ঠাট্টা করে ওজিফা কমানোর কথা বলেছিলেন। হযরত লাবিদের (রা) জবাব শুনে তিনি চুপ মেরে গিয়েছিলেন এবং ওজিফার অংক হ্রাস করেননি।

হযরত লাবিদ (রা) ছিলেন অত্যন্ত উদার ও দানশীল। এ জন্য যুক্তিযুক্ত ওজিফা প্রাপ্তির পরও অভাব লেগেই থাকতো। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (রা) বর্ণনা করেছেন, জাহেলী যুগে তিনি ওয়াদা করেছিলেন যে, প্রতি প্রত্যুষে তিনি পশু জবেহ করে লোকদেরকে খাওয়াবেন। এই প্রতিশ্রুতি তিনি আজীবন পালন করে গেছেন। কথিত আছে, লোকেরা তাঁর অভাবের কথা জানতে পেরেছিলেন। সুতরাং যখনই ভোর হতো তখনই তারা উট এনে তাঁকে উপঢৌকন অথবা হাদিয়া হিসেবে দিতেন এবং তিনি তা জবেহ করে লোকদেরকে খাইয়ে দিতেন। এমনিভাবে তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন হতো।

নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা হযরত লাবিদ (রা) বিন রবিয়ার সুন্দর চরিত্রের ভূয়শী প্রশংসা করেছেন এবং লিখেছেন, তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার, দানশীল, অশ্বারোহী, বীর এবং সত্যবাদী। জাহেলী ও ইসলামী উভয় যুগেই তিনি ছিলেন সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত।

হযরত লাবিদ (রা) বিন রবিয়ার দিওয়ান প্রকাশিত হয়েছে এবং জার্মান ভাষায় তার ব্যাখ্যা ও সমালোচনাও লিখা হয়েছে।

হযরত মিহজা' (রা) বিন সালেহ

তিনি ছিলেন ইয়েমেনের কোন গ্রামের বাসিন্দা। একবার লুটেরারা তাঁদের গ্রামের ওপর হামলা চালায় এবং তাঁকে ধরে মক্কা নিয়ে আসে। হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁকে কিনে আযাদ করে দেন। আল্লাহ পাক তাঁকে সুন্দর স্বভাবে বিভূষিত করেছিলেন। মক্কায় অবস্থান কালে তাওহীদের ধ্বনি তিনি শুনতে পান। তাওহীদের ধ্বনি কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক মুহূর্তও তা গ্রহণে দ্বিধা করেননি এবং সকল ধরনের পরিণাম সম্পর্কে বেপরওয়া হয়ে ইসলাম অনুসারীদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। নবুওয়াত প্রাপ্তির ত্রয়োদশ বছর পর মহানবী (সা) সাহাবায়ে কিরামকে হিজরাতের অনুমতি দেন। এ সময় তিনি অন্যান্য সাহাবীর সাথে হিজরাত করে মদীনা গমন করেন। তিনি ইসলামের প্রথম কাতারভুক্ত বা সাবেকীন এবং মুহাজেরীনে মুয়ালী বনু আছির মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন।

দ্বিতীয় হিজরীতে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সময় হযরত মিহজাও' (রা) বিশ্বনবীর (সা) সঙ্গী ছিলেন এবং বদরী সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, যুদ্ধের ময়দানে তিনি নিজের কাতার থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে প্রতিপক্ষের কাউকে মুকাবিলার আহ্বান জানালেন। এ সময় শত্রুপক্ষ কুরাইশের নামকরা যোদ্ধা আমের বিন হাজরামি যুদ্ধের জন্য বের হয়ে এলো। হযরত মিহজা' অত্যন্ত বীরত্বের সাথে তার সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। কিন্তু অবশেষে আমেরের হাতে শাহাদাতের পিয়ালা পান করে জান্নাতের রিজওয়ান নামক বাগানে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

ইবনে সায়াদ (র) ছাড়া ইবনে জারির তাবারী (র) এবং কতিপয় অন্য নেতৃস্থানীয় চরিতকার বর্ণনা করেছেন, হযরত মিহজা' (রা) যখন মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন তখন হঠাৎ করে কোন শত্রুর তীর তাঁকে আঘাত হানে এবং এই আঘাতেই তিনি শাহাদাত লাভ করেন। কতিপয় রেওয়ায়াতে তাঁকে বদর যুদ্ধের সর্বপ্রথম শহীদ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত সা'দ (রা) বিন খাওয়াল্লী

হযরত সা'দ (রা) বিন খাওয়াল্লী প্রখ্যাত সাহাবী হযরত হাতিব (রা) বিন আবি বুলতায়ার গোলাম ছিলেন। তাঁর নসবনামা হলো ঃ

সায়াদ (রা) বিন খাওয়াল্লী বিন সাবরাহ বিন দারিম বিন কায়েস বিন মালিক বিন আমিরাহ বিন আমেরুল কালবী লাখমী।

হযরত হাতিব (রা) বনি আসাদ বিন আবদুল উজ্জা কারাশীর মিত্র ছিলেন। বস্তুত প্রত্যেক গোত্রের গোলাম ও মিত্র সেই গোত্রভুক্ত হিসেবেই পরিগণিত হয়ে থাকতো। এ জন্য হযরত সা'দ (রা) বিন খাওয়াল্লী কুরাইশ মুহাজির বনি আসাদভুক্ত হয়ে আছেন। তিনি নবুওয়াত প্রাপ্তির প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হিজরাতের অনুমতি প্রদানের পর তিনিও হযরত হাতিবের (রা) সাথে হিজরাত করে মদীনা মুনাওয়ারা আগমন করেন। সর্বপ্রথম তিনি বদরের যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করেন। অতপর ওহোদের যুদ্ধে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নেন এবং এই যুদ্ধেই বাহাদুরীর সাথে লড়াই করতে করতে শাহাদাত প্রাপ্ত হন।

এক বর্ণনায় আছে, হযরত সা'দের (রা) হত্যাকারী ছিল বনি কিনানার যিরাহ পরিধানকারী মুশরিক "ইবনে উয়াইমির।" সে যখন হযরত সা'দের (রা) ওপর তরবারীর আঘাত হানছিল তখন আনা ইবনে উয়াইমির (আমি উয়াইমিরের পুত্র) এই শ্লোগান দিয়েছিল। হযরত সায়াদ (রা) তার তরবারীর আঘাতে দ্বিখন্ডিত হয়ে গিয়েছিলেন। পাশেই আনসার বনি মুয়াবিয়ার গোলাম রশিদ ফারসী (রা) দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ইবনে উয়াইমিরের দিকে অগ্রসর হলেন এবং "খুজহা ওয়া আনাল গুলামুল ফারসি"(অর্থাৎ তাকে ধরো এবং আমি হলাম ফারসীর গোলাম) একথা বলে পূর্ণ জোরের সাথে তরবারীর আঘাত হানলো। তার তরবারী যিরাহ ভেদ করে ইবনে উয়াইমিরের কাঁধে দেবে গেল এবং নিহত হয়ে মাটিতে পতিত হলো। মহানবী (সা) এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিলেন। তিনি হযরত রশীদকে (রা) সম্বোধন করে বললেন ঃ "হে রশীদ! তুমি "খুজহা ওয়া আনাল গুলামুল আনসারী"–এ কথা কেন বললে না। ইত্যবসরে ইবনে উয়াইমিরের ভাই শিকারী কুকুরের মত এগিয়ে এসে হাক ছাড়লো, "আমি হলাম ইবনে উয়াইমির।" হযরত রশীদ (রা) তার ওপরও তারবারীর পূর্ণ আঘাত হানলেন। এই আঘাতে তার কাজ শেষ হয়ে গেল এবং মাথা দু'ভাগ হয়ে মাটিতে পড়লো। সে সময় হযরত রশীদ (রা) তাকরীর দিলেন, "খুজহা ওয়া আনাল গুলামুল আনসারী।"

হুজুর (সা) এই দৃশ্য দেখে মুচকি হাসলেন এবং বললেন ঃ 'মারহাবা! হে আবা আবদাল্লাহ।"

সেই দিনই হযরত রশীদের (রা) কুনিয়ত আবু আবদুল্লাহ হিসেবে মশহুর হয়ে গেল। প্রকৃতপক্ষে আবদুল্লাহ নামের কোন পুত্র তাঁর ছিল না।

হযরত খুনাইস (রা) বিন হুজাফাহ সাহমী

হযরত খুনাইস (রা) বিন হুজাফাহ সাহমী কুরাইশের বনু সাহাম গোত্রভুক্ত ছিলেন। তাঁর নসবনামা হলো ঃ খুনাইস (রা) বিন হুজাফাহ বিন কায়েস বিন আদি বিন সা'দ বিন সাহাম বিন আমর বিন হাছিছ বিন কা'ব বিন লুববী।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা) বিনতে ওমর ফারুকের (রা) প্রথম বিয়ে তাঁর সাথেই হয়েছিল। আল্লাহ তায়ালা হযরত খুনাইসকে (রা) অত্যন্ত সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। তিনি সেই সব প্রথম মুসলমানের একজন ছিলেন যাঁরা মহানবীর (সা) হযরত আরকাম (রা) বিন আবিল আরকামের গৃহে আশ্রয় গ্রহণের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। কুরাইশের মুশরিকরা যখন হকপন্থীদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুললো তখন বিশ্বনবী (সা) সাহাবায়ে কিরামকে হাবসা বা আবিসিনিয়া হিজরাতের অনুমতি প্রদান করেন। হযরত খুনাইসও (রা) দ্বিতীয়বার হিজরাতে হাবশায় গমন করেন এবং কয়েক বছর সেখানে অতিবাহিত করে হুজুরের (সা) মদীনা হিজরাতের কিছুদিন পূর্বে মক্কা ফিরে আসেন। সেখান থেকে মদীনা হিজরাত করেন। মদীনায় হযরত রিফায়াহ (রা) বিন আবদুল মানযার আনসারী তাঁকে নিজের মেহমান হিসেবে আশ্রয় প্রদান করেন। ইবনে সা'দ (র) বর্ণনা করেছেন, হুজুর (সা) তাঁকে হযরত আবি আবাস (রা) বিন জাবিরের ইসলামী ভাই বানিয়ে ছিলেন।

যুদ্ধের ধারা শুরু হলে হযরত খুনাইস (রা) প্রথম বদরের যুদ্ধে অংশ নেন এবং বীরত্বের পরিচয় দেন। তারপর তৃতীয় হিজরীতে ওহোদের যুদ্ধে অংশ নেন এবং অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হন এবং সে কারণেই কিছুদিন পর মারা যান। মহানবী (সা) জানাযার নামায পড়ান এবং আবুস সায়িব হযরত ওসমান (রা) বিন মাজউনের পাশে দাফন করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর কোন সন্তান ছিল না। তাঁর বিধবা স্ত্রী হযরত হাফসা (রা) কয়েক মাস পর বিশ্বনবী (সা) স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।

হযরত দিমাদুল আযদি (রা)

নাম দিমাদ। পিতার নাম ছিল ছা'লাবা। চরিতকাররা তাঁর নসবনামা লিপিবদ্ধ করেননি। কিন্তু ধারাবাহিকতার সাথে তাঁরা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আযদি শুনওয়াহ গোত্রের আশা আকাংখার প্রদীপ ছিলেন এবং ঝাড়-ফুঁক ও চিকিৎসা কাজ আঞ্জাম দিতেন। দিমাদকে (রা) শুধুমাত্র নিজের গোত্রেই মান-ইজ্জত ও সম্ভ্রমের চোখে দেখা হতো না বরং মক্কার কুরাইশদের মধ্যেও তাঁর মর্যাদা ছিল অনেক উঁচুতে। তিনি মাঝে মধ্যেই মক্কা যাতায়াত করতেন। তিনি ইসলামের ইতিহাসে সেইসব সৌভাগ্যবান ব্যক্তির অন্যতম ছিলেন যাঁরা ইসলাম গ্রহণের বেশ আগেই বিশ্বনবীর (সা) সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের সুযোগ পেয়েছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার (র), হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র), হাফেজ ইবনে হাব্বান এবং ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন, দিমাদ (রা) জাহেলী যুগে মহানবীর (সা) বন্ধু ছিলেন। মুসলিম, নাসায়ী, বায়হাকী এবং অন্য কতিপয় আলেম লিখেছেন যে, নবুওয়াত প্রাপ্তির কিছুদিন পর তিনি কোন কাজ উপলক্ষ্যে মক্কা আগমন করেন। এ সময় মুশরিকরা অপপ্রচার করে রেখেছিল যে, মুহাম্মাদ মজনুন বা পাগল (নাউজুবিল্লাহ) হয়ে গেছে। দিমাদ (রা) যখন একথা শুনলেন তখন মানসিকভাবে আঘাত পেলেন। কেননা হুজুর (সা) তাঁর বন্ধু ছিলেন। মনে মনে চিন্তা করলেন যে, তিনি অন্যদের চিকিৎসা করে থাকেন। যদি তাঁর ঝাড়-ফুঁক ও চিকিৎসা পুরাতন বন্ধুর উপকারে না আসে তাহলে তার কি লাভ ? তিনি লোকদেরকে বললেন, মুহাম্মাদ এখন কোথায়। আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো। সম্ভবত আমার চিকিৎসায় সে সুস্থ হয়ে উঠবে। সুতরাং তিনি মহানবীর (সা) নিকট উপস্থিত হলেন এবং বললেনঃ মুহাম্মাদ (সা), আমি ঝাড়-ফুঁকের কাজ করে থাকি এবং আমার হাতে অধিকাংশ রোগী সুস্থ হয়ে থকে। আমার কাছে এটা অসহনীয় ব্যাপার যে, আমি থাকতে আপনি অসুস্থ থাকবেন। আসুন, আমি আপনার চিকিৎসা করি। হুজুর (সা) তাঁর সহানুভূতিসূচক পরামর্শের জবাবে প্রথমে কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করলেন। তারপর আল্লাহর প্রশংসা করলেন অতপর কিছু কথা বললেন। (অথবা অনেকের মতে কুরআন হাকিমের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করলেন)।

হুজুরের (সা) কথা দিমাদের (রা) খুব ভালো লাগলো। তিনি তাঁকে তা পুনরায় পড়তে বললেন। রাসূলে করীম (সা) তিনবার তা পাঠ করলেন। অতপর দিমাদ (রা) অযাচিতভাবে বলে উঠলেন, "আমি গণকদের কথা

শুনেছি, যাদুকরদের যাদুর বর্ণান শুনেছি, কবিদের কাব্য শুনেছি কিন্তু আজ আপনার নিকট থেকে যা কিছু শুনছি তা পূর্বে আর কারো কাছ থেকে শুনিনি। এই বাণী তো সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। আমি এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়ন করছি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর খাঁটি রাসূল।" ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নিজের ও নিজের কওমের পক্ষ থেকে হুজুরের (সা) বাইয়াত করলেন এবং স্বদেশে চলে গেলেন। ধারণা করা হয় যে, তিনি স্বজাতিকেও ইসলামে এনেছিলেন।

হযরত দিমাদ (রা) সম্পর্কে এর চেয়ে বেশী আর চরিত গ্রন্থে পাওয়া যায় না। অবশ্য সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মুসলমানরা হযরত দিমাদের (রা) কারণে তাঁর গোত্রকে খুব সম্মান করতো। কোন অভিযানকালে যদি এই গোত্রের কোন বস্তু ভুলবশত কোন মুসলমান হস্তগত করতো তাহলে প্রকৃত অবস্থা জানার পর তা ফিরিয়ে দেয়া হতো।

হযরত দিমাদুল আযদির (রা) জীবন কাহিনী যদিও ইতিহাসের আবর্তে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। তবুও তাঁর জন্য এটাও কম মর্যাদার বিষয় নয় যে, তিনি প্রিয় নবীর (সা) দোস্ত ও অনুরক্ত ছিলেন।

হযরত মুসলিম (রা) বিন হারিছ তামিমী

হযরত মুসলিম (রা) বিন হারিছ তামিম গোত্রের আশা-আকাংখার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন। ঐতিহাসিকরা তাঁর ইসলামী যুগের কথা বিস্তারিত কিছু বলেননি। তবে, দ্বীনের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সীমাহীন প্রশংসা করেছেন।

আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) লিখেছেন যে, একবার মহানবী (সা) কোন শত্রু গোত্রে অভিযানের জন্য একটি দল প্রেরণ করেছিলেন। মুজাহিদদের মধ্যে হযরত মুসলিমও (রা) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। দুশমনরা যখন মুসলমানদের সৈন্য প্রেরণ সম্পর্কে অবহিত হলো তখন দুর্গ বন্ধ করে বসে পড়লো। অবরোধকালে একদিন অবরুদ্ধরা খুব চেঁচামেচি করলো। হযরত মুসলিম (রা) তাদের নিকট গেলেন এবং অত্যন্ত নরম ও আন্তরিকতার সাথে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং এও বললেন যে, ইসলাম গ্রহণই তোমাদের বাঁচার একমাত্র পথ। তাঁর তাবলীগে প্রভাবিত হয়ে দুর্গের সকল বাসিন্দা ইসলাম গ্রহণ করলো। এই ঘটনায় হযরত মুসলিমের (রা) কিছু সঙ্গী, যারা গনিমাতের মালের আকাংখা করতো তারা তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন যে, তিনি তাদেরকে এমনি এমনি ছেড়ে দিয়েছেন। মদীনা মুনাওয়ারা ফিরে গিয়ে তাঁরা রহমতে আলমের (সা) নিকট সকল ঘটনা পেশ করলেন। এ সময় মহানবী (সা) অত্যন্ত খুশী হলেন এবং হযরত মুসলিমের (রা) খুব প্রশংসা করলেন। সাথে সাথে তিনি তাদেরকে এই সুসংবাদ দিলেন যে, দুর্গের প্রতি লোকের বিনিময়ে তারা এতো এতো প্রতিদান পাবে।

দয়ার সাগর প্রিয় নবী (সা) খুন-খারাবি পছন্দ করতেন না। এ জন্য তিনি হযরত মুসলিমের (রা) কাজে এতো খুশী হয়েছিলেন যে, ভবিষ্যতের খলিফা ও ইমামদের নামে তাঁকে একটি সুপারিশ পত্র প্রদান করেছিলেন। এই পত্রে তিনি নিজের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন এবং সেই পত্র পাঠকারীকে হযরত মুসলিমের (রা) সাথে সুন্দর আচরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ইবনে আছির (র) "উসুদুল গাব্বা" গ্রন্থে লিখেছেন, সে সময় মহানবী (সা) হযরত মুসলিমকে (রা) একটি দোয়া অথবা ওজিফা শিখিয়ে দিয়েছিলেন এবং তা ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর সাতবার পড়তে বলেছিলেন। এটা করলে তিনি উপকৃত হবেন বলেও বলেছিলেন।

হযরত মুসলিম (রা) মহানবীর (সা) জীবদ্দশায় কোন্ কোন্ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন সে সম্পর্কে ইতিহাস গ্রন্থগুলো নীরব রয়েছে। অবশ্য উপরের ঘটনায় জানা যায় যে, তিনি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই জিহাদে অংশ নিতেন এবং দারিদ্রতা সত্ত্বেও গনিমাতের মালের কোন পরওয়াই করতেন না।

ইবনে সা'দ (র) লিখেছেন, হযরত মুসলিম (রা) দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন এবং বনু উমাইয়ার শাসনামলের কোন এক সময় ওফাত পান। তিনি চার খলিফার সামনে বিশ্বনবীর (সা) মুবারক ফরমান পেশ করেছিলেন এবং তাঁরা সকলেই তাঁকে অনেক কিছু দিয়ে রুখসত করেছিলেন।

আল্লামা ইউসুফ বিন আজ-জাক্কিউল মিজ্জি (র) "তাহজীবুল কামাল" গ্রন্থে লিখেছেন যে, হযরত মুসলিম (রা) বিন হারিছের পুত্র হারিছ (র) বিন মুসলিম (রা) নিজের পিতার নিকট থেকে কতিপয় হাদীসও বর্ণনা করেছিলেন।

ইবনে সায়াদের (র) বক্তব্য অনুযায়ী একবার হযরত ওমর বিন আবদুল আজীজ (র) হযরত হারিছকে (র) ডেকে তাঁর নিকট থেকে হাদীস শুনলেন এবং খুলাফায়ে রাশেদীন যেমন তাঁর পিতার সাথে আচরণ করতেন তেমনি তিনিও তাঁকে কিছু দিয়ে রুখসত বা বিদায় করেন।

হযরত মুসলিম (রা) বিন হারিছ এ ব্যাপারে একক সম্মানের অধিকারী ছিলেন যে, সাইয়েদুল মুরসালিন ফখরে মওজুদাত (সা) তাঁকে তাঁর সন্তুষ্টির লিখিত সার্টিফিকেট প্রদান করেছিলেন।

হযরত যাহির (রা) বিন হারাম আশজায়ী

হযরত যাহির (রা) বিন হারাম আশজা' গোত্রের নীচু ও কুৎসিত দর্শন একজন গ্রাম্য মানুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্য নিসন্দেহে দর্শনীয়। প্রিয় নবীর (সা) মাহবুব সাহাবীদের মধ্যে তিনি পরিগণিত হতেন। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, তিনি হিজরাতের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর তিনি বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের মহান সৌভাগ্য লাভ করেন।

হযরত যাহির (রা) গ্রামে বসবাস করতেন। তিনি মহানবীকে (সা) এত শ্রদ্ধা করতেন এবং ভালোবাসতেন যে, যখনই নিজের গ্রাম থেকে হুজুরের (সা) খিদমতে উপস্থিত হতেন তখনই নিজের সাথে অবশ্যই গ্রামের কোন তোহাফা সঙ্গে নিয়ে আসতেন। মহানবী (সা) বলতেন, প্রত্যেক শহরবাসীরই কোন না কোন গ্রামীণ বন্ধু বা দোস্ত থাকে। আলে মুহাম্মাদের (সা) গ্রামীণ দোস্ত হলো যাহির (রা) বিন হারাম। ইবনে আছির (র) "উসুদুল গাব্বাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, তিনি যখনই প্রিয় নবীর (সা) কাছ থেকে বিদায় নিতেন তখন তিনিও তাঁকে কোন না কোন বস্তু অবশ্যই প্রদান করতেন।

হযরত যাহিরের (রা) সাথে মহানবীর (সা) অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি তার সাথে মাঝে মধ্যে ঠাট্টাও করতেন। একদিন হযরত যাহির (রা) মদীনা মুনাওয়ারার বাজারে কিছু বিক্রি করছিলেন। ঘটনাক্রমে মহানবী (সা) সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি হযরত যাহিরকে (রা) দেখলেন এবং পেছনের দিকে গিয়ে তার চোখের ওপর নিজের পবিত্র হাত রাখলেন এবং বললেন ঃ

"এই গোলামকে কে কিনবে ?"

হযরত যাহির (রা) মহানবীকে (সা) চিনতে পারলেন এবং বললেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! এই বাণিজ্যে আমার মূল্য তো কম হবে।"

রহমতে আলম (সা) বললেন, "না, আল্লাহর নিকট তোমার মূল্য অনেক বেশী।"

ইতিহাস গ্রন্থসমূহে হযরত যাহির (রা) সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। অবশ্য একটি রেওয়ায়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, তিনি শেষ বয়সে কুফা গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। বিশ্বনবীর (সা) ওফাতের পর সম্ভবত তিনি দীর্ঘ দিন জীবিত ছিলেন।

হযরত আমর (রা) বিন সুরাকাহ আদভী

তিনি কুরাইশের বনু আদী বংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তাঁর নসবনামা হলো ঃ

আমর (রা) বিন সুরাকাহ বিন মু'তামির বিন আনাস বিন আদাহ বিন রাযাহ বিন আদি বিন কা'ব বিন লুববী।

হযরত আমর (রা) বিন সুরাকাহ সেই সব সৌভাগ্যবান সাহাবীর অন্যতম ছিলেন যাঁরা তাওহীদের দাওয়াতের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলেন। নবুওয়াত প্রাপ্তির পর ১৩ বছর পর্যন্ত তিনি অব্যাহতভাবে মক্কায় অবস্থান করে কুরাইশ মুশরিকদের নির্যাতন সইতে থাকেন। যখন মদীনায় হিজরাতের অনুমতি মিললো তখন মক্কাকে বিদায় জানিয়ে মদীনা চলে আসেন। ইবনে সা'দের বক্তব্য অনুযায়ী হযরত রিফায়াহ (রা) বিন আবদুল মানযার আনসারী তাঁকে নিজের বাড়ীতে স্থান দেন।

বিশ্বনবীর (সা) মদীনা শুভাগমনের পর যুদ্ধের ধারা শুরু হয়ে গেল। এ সময় তিনি বদর থেকে তাবুক পর্যন্ত সকল যুদ্ধেই হুজুরের (সা) সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি সকল যুদ্ধেই অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ গ্রহণ এবং বীরত্ব প্রদর্শন করেন। ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, কতিপয় যুদ্ধে তিনি খুব কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হন। কিন্তু জিহাদের উৎসাহে তাঁর ভাটা পড়েনি। হযরত আমের (রা) বিন রবিয়াহ থেকে বর্ণিত আছে, এক যুদ্ধে আমর (রা) বিন সুরাকাহ আমাদের সঙ্গে ছিলেন। পথিমধ্যে খাদ্য শেষ হয়ে গেল এবং আমরা অব্যাহতভাবে অভুক্ত থাকতে লাগলাম। আমর (রা) দীর্ঘদেহী হাল্কা-পাতলা মানুষ ছিলেন। তার অবস্থা এত নাজুক হয়ে গেল যে, পেটে পাথর বেঁধে তাঁকে পথ চলতে হয়েছিল। হাসিমুখে তিনি এই কষ্ট স্বীকার করেছিলেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত ওমর ফারুকের (রা) শাসনামলে হযরত আমরের (রা) বিস্তারিত অবস্থা ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া যায়নি। ইবনে সায়াদ (রা) লিখেছেন, তিনি হযরত ওসমানের শাসনামলে ওফাত পান। তাঁর কোন সন্তান সন্ততি ছিল না।

হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ্ আনসারী

বিশ্বনবী (সা) হকের দাওয়াত দিয়ে চলেছেন। এভাবে দশ দশটি বছর কেটে গেল। কিন্তু মক্কাবাসীদের দুর্ভাগ্য তাদের অধিকাংশই এই মহান নিয়ামত থেকে বঞ্চিত রয়ে গেল। অথচ এই নিয়ামত তাদের নিজের ঘরেই অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা হক দাওয়াত তো গ্রহণ করলোই না। পক্ষান্তরে তারা এই পথে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলো, গালাগাল, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, মার-পিট, জেল-জুলুম, সামাজিক বয়কট মোটকথা জুলুম-নির্যাতনের সকল পন্থাই তারা প্রিয় নবী (সা) ও তাঁর সঙ্গীদের উপর পরীক্ষা করলো। কিন্তু সব ধরনের জুলুম নির্যাতন সত্ত্বেও মহানবী (সা) আল্লাহর সৃষ্টি মানবকুলকে হিদায়াতের পথ প্রদর্শন অব্যাহত রাখলেন। এই সুদীর্ঘ সময়ে মহানবী (সা) উকাজ, মাজান্নাহ এবং জিল-জাযের মেলায় ও হজ্জের সময় আরবের বিভিন্ন গোত্রের অবস্থান স্থলে তাশরীফ নিতেন। তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিতেন। তিনি তাদেরকে বলতেন, কে তাঁকে সাহায্য করবে এবং কে তাঁকে তার নিকট আশ্রয় দেবে। যাতে তিনি আল্লাহর পয়গাম জনগণের কাছে পৌঁছাতে পারেন এবং তাঁর সাহায্যকারী এর বিনিময়ে জান্নাতের হকদার হবে। বনু বকর বিন ওয়ায়েল, আমের বিন ছাছা, বনু শাইবান, বনু সুলাইম, বনু আবাস, বনু নাজার, বনু ফাজারাহ, বনু মাহারিব, বনু মুররাহ, বনু কালাব এবং বনু হানিফা মোটকথা আরবের প্রায় সকল গোত্রের নিকটই তিনি হকের দাওয়াত পৌঁছালেন। কিন্তু কোন গোত্রই তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে সাহস করলো না।

নবুওয়াত প্রাপ্তির ১১ বছরের হজ্জের মৌসুমের কথা। তিনি যথারীতি হকের তাবলীগের জন্য মিনা তাশরীফ নিলেন। এখানে আরবের প্রত্যেক স্থান থেকে হজ্জের জন্য আগতরা তাঁবুর শহর বানিয়ে রেখেছিল। প্রিয় নবী (সা) ভাগ্যবানদের তালাশে জুমরায়ে উকবার নিকট পৌঁছলেন। এ সময় তিনি দেখতে পেলেন যে, একটি তাঁবুতে ৬ জন সুদর্শন ও সুন্দর প্রকৃতির লোক আলাপ-আলোচনায় মশগুল রয়েছেন। এই লোকগুলো তিনশ' মাইল দূর ইয়াসরাব থেকে এসেছিলেন। বিশ্বনবী (সা) তাঁদেরকে সালাম দিলেন এবং বললেন, "আপনারা কি আমার কথা শুনবেন?"

তাদের সবাই সমস্বরে জবাব দিলেন, "অবশ্যই অবশ্যই।"

হুজুর (সা) তাঁদেরকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে আল্লাহ পাকের পয়গাম শুনালেন। তাওহীদের দাওয়াত গ্রহণের উৎসাহ দিলেন এবং বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহর বান্দাহদেরকে হিদায়াতের পথপ্রদর্শনে নিয়োজিত রয়েছি।

তাঁরা তাঁর কথা বা ইরশাদ অত্যন্ত গভীরভাবে শুনলেন। অতপর তাঁর নিকট নিবেদন করে বললেন ঃ "আল্লাহ যে কালাম আপনার উপর অবতীর্ণ করেছেন তার কিছু অংশ আমাদেরকে শুনান।"

সে সময় মহানবীর (সা) পবিত্র যবানে সূরায়ে ইবরাহীম উচ্চারিত হলো। তিনি কেবলমাত্র কয়েকটি আয়াতই তিলাওয়াত করেছিলেন। কুরআনে করিমের নজীরবিহীন ফাসাহাত ও বালাগাত এবং অপূর্ব বর্ণনাভঙ্গীতে তাদের অন্তর বিমুগ্ধ হয়ে গেল। তারা পরস্পরের প্রতি চাওয়া-চাওয়ি করলো এবং বললো ঃ "আল্লাহর কসম! এতো সেই নবী যাঁর উল্লেখ সবসময়ই আমাদের শহরের ইহুদীদের মুখে শুনা যায়। ইহুদীরা আবার আমাদের চেয়ে ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী হয়ে না যায়।" অতপর তাঁরা অত্যন্ত উৎসাহের সাথে আরজ করলেন ঃ

"হে মুহাম্মাদ (সা)! আমরা আপনার দাওয়াত মন-প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করছি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ এক ও আপনি তাঁর সত্য রাসূল। আপনি বলুন, আপনি আমাদের নিকট কি চান ?"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "তোমরা আমাকে তোমাদের কাছে নিয়ে চলো এবং নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও আমার সাহায্য-সহযোগিতা ও হিফাজত করো যাতে আমি বেশী বেশী লোকের নিকট হকের দাওয়াত পৌঁছাতে পারি।"

আল্লাহর সেইসব নেক স্বভাব বান্দারা সত্য অন্তরে হুজুরকে (সা) সত্য রাসূল হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। এখন তারা কোন কথা হুজুরের (সা) নিকট গোপন রাখতে চাইছিলেন না। অত্যন্ত বিনয় ও আদপের সাথে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর নবী! আমরা সবদিক থেকেই আপনাকে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত রয়েছি। আমাদের কাছে যদি আপনি তাশরীফ রাখেন তাহলে আমরা আপনার হিফাজতের জিম্মাদার হবো। কিন্তু হে আল্লাহর রাসূল! বর্তমানে আমাদের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধের কারণে প্রচণ্ড শত্রুতা বিরাজ করছে। আমরা আমাদের বিবাদ মিটিয়ে ফেলি। তারপর আমরা আপনাকে তাশরীফ নেয়ার দাওয়াত দিব। বিবাদ-বিসম্বাদ ও বিশৃংখলার এই পরিবেশে সেখানে সাফল্যের আশা খুবই কম। ইনশাআল্লাহ, আগামী বছর আমরা পুনরায় আপনার খিদমতে হাজির হবো।"

হুজুর (সা) বললেন, "খুব ভালো কথা।"

অতপর একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও সুদর্শন যুবক সামনে অগ্রসর হয়ে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আপনার পবিত্র হাত সম্প্রসারিত করুন। আমি এই হাতে ইসলামের বাইয়াত করছি।"

মহানবী (সা) নিজের মুবারক হাত এগিয়ে দিলেন এবং সেই সৌভাগ্যবান যুবক অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে তাঁর বাইয়াত করলেন। তাঁর পাঁচজন সঙ্গীও তাঁর অনুসরণ করলেন। বিশ্বনবী (সা) তাদের বাইয়াতে সীমাহীন খুশী হলেন। তাদের জন্য দোয়া করলেন এবং ফিরে এলেন।

ইয়াসরাবের এই ভাগ্যবান যুবক যিনি সর্বপ্রথম মহানবীর (সা) বাইয়াতের মহান মর্যাদা লাভ করেছিলেন তিনি হলেন হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ।

সাইয়েদেনা হযরত আবু উমামাহ আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ হেদায়াতের অত্যন্ত দেদীপ্যমান তারকাসমূহের মধ্যে পরিগণিত হতেন। খাজরাজের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত খান্দান বনু নাজ্জারের সাথে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তাঁর নসবনামা হলো ঃ

আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ বিন আদাস বিন উবায়েদ বিন ছালাবা বিন গানাম বিন মালিক বিন নাজ্জার বিন ছালাবা বিন আমর বিন খাজরাজ।

হযরত আসয়াদ (রা) আল্লাহ প্রদত্ত অত্যন্ত নেক স্বভাব লাভ করেছিলেন। জাহেলী যুগেই তিনি মূর্তি পূজাকে ঘৃণা করতেন এবং তাওহীদ স্বীকারকারী হয়ে গিয়েছিলেন। ইয়াসবারের ইহুদীদের নিকটে যখনই শেষ নবীর (সা) কথা শুনতেন তখনই মনে মনে আকাংখা পোষণ করতেন, হায়! তিনিও যদি সেই নবীর যুগ দেখার সৌভাগ্য লাভ করতেন। যখন হুজুরের (সা) দর্শন লাভ করলেন তখন তাঁর কান শেষ নবী (সা) এবং তার দ্বীনে হক সম্পর্কে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল না। তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে দু'ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। আল্লামা ইবনে সা'দ (র) বর্ণনা করেছেন, নুবওয়াতের ১১ বছর পর তিনি হযরত উকবা (রা) বিন আমের, আওফ (রা) বিন হারিছ বিন আফরা, রাফে (রা) বিন মালিক, কুতবা (রা) বিন আমের এবং জাবের (রা) বিন আবদুল্লাহ নামক পাঁচজন নেক স্বভাব সঙ্গীসহ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আল্লামা ইবনে আছির (র) 'উসুদুল গাব্বাতে' লিখেছেন যে, তিনি তার আগেই হযরত জাকওয়ান (রা) বিন আবদি কায়েসের সাথে ইসলাম গ্রহণে সৌভাগ্য লাভ করেন। ঘটনাটা হলো ঃ হুজুরের (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির পর একবার হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ এবং জাকওয়ান বিন আবদি কায়েস মক্কা আসেন এবং কুরাইশ সরদার উতবাহ বিন রাবিয়ার বাড়িতে মেহমান হন। আলোচনা-

কালে উতবাহ মেহমানদেরকে জানালেন যে, বনু হাশিমের এক যুবক মুহাম্মাদ (সা) বিন আবদুল্লাহ রিসালাত দাবী করছে। সে আমাদের মূর্তিদের নিন্দা করে। আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে গুমরাহ বা পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করে এবং আমাদের এক আল্লাহর ইবাদাত করা উচিত বলে থাকে।

জাকওয়ান (রা) কয়েকবার হযরত আসয়াদকে (রা) বলেছিলেন, হায়! মৃত্যুর পূর্বে দ্বীনে হক লাভের সৌভাগ্য যদি তার হতো! তারা যখন উতবাহ বিন রাবিয়ার নিকটে বিশ্বনবী (সা) কথা শুনলেন তখন হযরত আসয়াদকে (রা) সম্বোধন করে বললেন, "তুমি যে দ্বীনের অনুসন্ধান করছিলে এটিই সেই দ্বীন।" হযরত আসয়াদ (রা) তৎক্ষণাৎ রাসূলের (সা) দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং আল্লাহর ওয়াহদানিয়াত ও হুজুরের (সা) রিসালাতের সত্যতার স্বীকৃতি দিলেন। কথিত আছে যে, হযরত জাকোয়ান (রা) বিন আবদি কায়েসও সেই সময়ই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। যা হোক, যে বর্ণনাই সঠিক হোক তবে, এ ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন যে, আনসারের সাবিকুনাল আউয়ালের মধ্যে হযরত আসয়াদের (রা) স্থান অত্যন্ত উঁচুতে ছিল। এটা হযরত আসয়াদের (রা) ঈমানের আবেগ এবং ইসলাম ফি দ্বীনের ফল বলা যায়।

হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ এবং তাঁর পাঁচসাথী ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভের পর ইয়াসরাব প্রত্যাবর্তন করলেন। এ সময় তাদের অন্তর ঈমানী আবেগে পূর্ণ ছিল এবং আস্থার প্রদীপ হৃদয়ের কন্দরে প্রোজ্জ্বল রূপ নিয়েছিল। এই আলোয় ইয়াসরাববাসীর অন্তর আলোকিত করার আকাংখায় তাঁরা অস্থির ছিল। সুতরাং তারা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে আওস ও খাজরাজের মধ্যে হকের তাবলীগের কাজ শুরু করলেন। তাদের তাবলীগের ফলে অল্প সময়ের মধ্যে ইয়াসরাবের ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা শুরু হয়ে গেল এবং কতিপয় নেক চরিত্রের ইয়াসরাবী প্রকাশ্যভাবে ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন। পরবর্তী বছর নবুওয়াত প্রাপ্তির ১২ বছর পর হজ্জের মওসুম এলো। এ সময় ইয়াসরাবের ১২ জন মুসলমান বিশ্বনবীর (সা) দর্শন লাভের জন্য মক্কা পৌছালেন। তাদের ১০ জন ছিলেন খাজরাজের সাথে সম্পর্ক যুক্ত এবং বাকী দু'জন ছিলেন আওস গোত্রভুক্ত। খাজরাজীদের মধ্যে হযরত আসয়াদও (রা) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মহানবী (সা) তাদের আগমনের খরব পেলেন। খরব পেয়ে তিনি রাতে মিনা তাশরীফ নিলেন। উকবার গিরি পথে উপস্থিত হলেন। এখানেই গত বছর ৬ খাজরাজীর সাথে তাঁর স্বাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি তাদের সাথে মিলিত হলেন। মহানবীকে (সা) নিজেদের মধ্যে পেয়ে তাদের আনন্দের

সীমা পরিসীমা ছিল না। তারা অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে হুজুরের (সা) হাতে বাইয়াত করলেন এবং এসব প্রতিশ্রুতি দিলেন ঃ

১। আমরা শিরক করবো না, ২। চুরি করবো না, ৩। যিনা করবো না, ৪। নিজের কন্যা সন্তান হত্যা করবো না, ৫। কারোর প্রতি তোহমত বা মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবো না, ৬। রাসূলুল্লাহর (সা) নাফরমানী করবো না এবং সর্বাবস্থায় তাঁর নির্দেশ পালন করবো, ৭। সর্বাবস্থায় হককথা বলবো এবং এ ব্যাপারে কারোর গালির ভয়ে ভীত হবো না, ৮। দেশ শাসনের ব্যাপরে শাসকদের সাথে ঝগড়া বিবাদ করবো না। অবশ্য প্রকাশ্য কুফরী দেখলে তার প্রতিবাদ করা হবে।

বাইয়াত নেয়ার পর হুজুর (সা) এসব সাহাবীকে (রা) বললেন, "তোমরা যদি প্রতিশ্রুতি পূরণ কর, তাহলে জান্নাতের হকদার হবে। আর যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কর তাহলে আল্লাহ চাইলে তোমাদেরকে শাস্তিও দিতে পারেন অথবা ক্ষমাও করে দিতে পারেন।"

এই বাইয়াত ইতিহাসে "বাইয়াতে উকবায়ে উলা" বা উকবার প্রথম বাইয়াত হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কেউ কেউ একে "বাইয়াতে নিছা" হিসেবেও চিহ্নিত করেছেন। কেননা এই বাইয়াতের শর্তাবলী সেই শর্তাবলীর সাথে মিলে যায় যা কয়েক বছর পর মুসলমান মহিলাদের নিকট থেকে নেয়া হয়েছিল ।

আল্লামা তাবারী এবং ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন, মক্কা থেকে ফিরে যাওয়ার সময় এসব সাহাবী হুজুরের (সা) নিকট তাদেরকে কুরআন পড়ানো এবং দ্বীনের কথা শিক্ষা দেয়ার জন্য একজন মুয়াল্লিম বা শিক্ষক প্রদানের দরখাস্ত করেছিলেন। এ দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে হুজুর (সা) হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়েরকে এই দায়িত্ব অর্পণ এবং তাঁকে এই পবিত্র কাফেলার সাথে ইয়াসরাব প্রেরণ করেন। অন্য কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে, এসব সাহাবী ইয়াসরাব পৌছে হুজুরের (সা) নিকট পত্র লিখলেন অথবা দু' ব্যক্তিকে প্রেরণ করে হুজুরের (সা) নিকট এমন একজন ব্যক্তি প্রেরণের দরখাস্ত করলেন যিনি তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতে পারবেন। এই আবেদনে সাড়া দিয়ে হুজুর (সা) হযরত মুসয়াবকে (রা) ইয়াসরাব গমনের নির্দেশ দিলেন। হযরত মুসয়াব (রা) কাফেলার সাথে গিয়ে থাকুন অথবা পরে এ ব্যাপারে চরিতকাররা একমত যে, ইয়াসরাবে হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহই তাঁকে নিজের মেহমান হিসেবে গ্রহণ করেন এবং হযরত মুসয়াব (রা) তাঁর বাড়ীতেই কেন্দ্র বানিয়ে তালিম ও হেদায়াত এবং দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুরু করেন।

হযরত মুসয়াবের (রা) পবিত্র ব্যক্তিত্ব এবং বিজ্ঞতাসুলভ তাবলিগী প্রক্রিয়া ২০ জন ইয়াসরাবের অন্তরে ইসলামের শিখা প্রজ্জোলিত করে দিল এবং আওস ও খাজরাজ গোত্রের এমন কোন গৃহ অবশিষ্ট রলো না যেখানের কোন না কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত রলেন। কিন্তু সে সময় পর্যন্তও সেসব গোত্রের সরদার বা নেতা ইসলাম সম্পর্কে ছিল অজ্ঞ। এ জন্য ইসলাম প্রচারের কাজে বাধা সৃষ্টি হতে লাগলো। আল্লাহ পাক সেই বাধা দূরীকরণে আশ্চর্য ধরনের ব্যবস্থা করে দিলেন। একদিন হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়েরকে সঙ্গে নিয়ে বনি জাফর এবং বনু আবদুল আশহালের মহল্লার দিকে গেলেন। এ দুইগোত্র আওসের বন্ধু ছিল। তারা সেখানে বনি জাফরের একটি বাগানের কূপের (মারক কূপ) ওপর বসলেন। আরো অনেক মুসলমান সেখানে পৌঁছে গেল। ইত্যবসরে জনৈক ব্যক্তি বনু আবদুল আশহালের সরদার হযরত সা'দ (রা) বিন মায়াজকে গিয়ে খবর দিলেন যে, মুসলমানরা তোমাদের মহল্লায় এসে লোকদেরকে প্ররোচিত করছে। সা'দ (রা) বিন মায়াজ এই খবর শুনে প্রচণ্ডভাবে ক্রোধান্বিত হলেন এবং অস্ত্র সজ্জিত হয়ে সেখানে গমনের ইচ্ছা পোষণ করলেন। কিন্তু যখন শুনলেন যে, মুসলমানদের মধ্যে আসয়াদ (রা) যুরারাহও আছেন তখন থেমে গেলেন। কেননা আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ ছিলেন তার খালাতো ভাই। তা সত্ত্বেও তিনি চাচাতো ভাই উসায়েদ (রা) বিন হুজায়েরকে বললেন ঃ

"উসায়েদ! তুমি গিয়ে তাদেরকে নিষেধ করো যে, তারা যেন ভবিষ্যতে আমাদের লোকদেরকে নষ্ট করার জন্য আওসের মহল্লায় না আসে। আসয়াদ বিন যুরারাহ যদি সেখানে না থাকতো তাহলে আমি স্বয়ং যেতাম।"

হযরত উসায়েদও (রা) বনু আবদুল আশহালের অন্যতম নেতা এবং একজন টগবগে যুবক ছিলেন। তিনি বর্শা হাতে নিলেন এবং মারক কূপের দিকে দ্রুত রওয়ানা দিলেন। হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ তাঁকে এমনভাবে আসতে দেখে হযরত মুসয়াবকে (রা) বললেন ঃ "এই ব্যক্তি আওস গোত্রের দু'জন বড় সরদারের একজন। আজ আপনাকে তার নিকট আল্লাহর পয়গাম পৌঁছানোর হক ঠিকভাবে আদায় করতে হবে।" হযরত মুসয়াব (রা) বললেন ঃ "তাকে একটু বসেত দাও। আমি কথা বলছি। দেখা যাক আল্লাহ কি করেন।"

উসায়েদ (রা) সেখানে পৌঁছেই ক্রোধান্বিত স্বরে দ্রুত কথা বলা শুরু করে দিলেন এবং হযরত মুসায়াবকে (রা) সম্বোধন করে বললেন ঃ "তুমি এখানে কি উদ্দেশ্যে এসেছ ? আমাদের দুর্বল লোকদেরকে বেওকুফ বানানোর জন্য ?

জীবনের প্রতি যদি সামান্য মায়াও থাকে তাহলে কালবিলম্ব না করে এখান থেকে চলে যাও এবং আর কখনো এদিকে আসবে না।"

হযরত মুসয়াব (রা) তাঁর দ্রুত ও কর্কশ কথা অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে শুনলেন এবং অত্যন্ত নরমভাবে বললেন ঃ "প্রিয় ভাই! আপনি কিছু সময় অপেক্ষা করে আমার কথা শুনুন। পছন্দ হলে তা গ্রহণ করবেন। অন্যথা প্রত্যাখ্যান করবেন।"

মুসয়াবের (রা) ধৈর্যপূর্ণ কথা উসায়েদের (রা) ক্রোধের ওপর যেন পানির ছিটার কাজ করলো। তিনি নিজের বর্শা মাটিতে গেড়ে এই বলে বসে পড়লেন ঃ "হাঁ, তুমি ইনসাফের কথা বলেছ। বলো কি বলতে চাও।"

মুসয়াব (রা) অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীভাবে ইসলামের উসুল বা মৌলিক কথা বর্ণনা করলেন, অতপর কুরআনে হাকিমের কতিপয় আয়াত পাঠ করলেন। উসায়েদ (রা) অযাচিতভাবে বলে উঠলেন ঃ

"এটা কতই না ভালো দ্বীন এবং কতই না সুন্দর কালাম, তোমরা এই দ্বীনে দাখিল হওয়ার সময় কি করো ?"

ইবনে হিশাম হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহর এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন ঃ "আমি এবং মুসয়াব সে সময় উসায়েদ (রা) বিন হুজায়েরের চেহারায় বিস্ময়কর আভা ও প্রফুল্লতা লক্ষ্য করেছি। তাঁর কথার ধরন দেখে আমরা বুঝে ফেলেছিলাম যে, তিনি ইসলামে প্রভাবিত হয়ে পড়েছেন। আমরা তাঁকে গোসল করা এবং পবিত্র কাপড় পরিধানের উপদেশ দিলাম। তিনি গোসল করে কাপড় পরিবর্তন করে এলেন। তারপর তাঁকে কালেমায়ে শাহাদাত পড়ানো হলো এবং ইসলামের গন্ডীতে নিয়ে আসা হলো। অতপর দুরাকায়াত নামায পড়ানো হলো।"

হযরত উসায়েদ (রা) ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভের পর হযরত মুসয়াবকে (রা) বললেন, "পেছনে আরো এক ব্যক্তি রয়ে গেছেন। সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে সমগ্র গোত্র মুসলমান হয়ে যাবে। কেননা তার গোত্রে এমন কোন ব্যক্তি নেই যে তার কথা না শোনে। আমি তাকে এখনই তোমাদের নিকট প্রেরণ করছি।"

একথা বলেই তিনি সোজা সা'দ (রা) বিন মায়াযের নিকট পৌঁছলেন। সে সময় তিনি নিজের গোত্রের অনেক মানুষ নিয়ে বসে ছিলেন। উসায়েদকে (রা) দেখে বললেন ঃ "আল্লাহর কসম! যখন এখান থেকে সে গিয়েছিল তখন তার চেহারা গোস্বায় ভরপুর ছিল। কিন্তু এখন বরং তো দেখি অন্য ধরনের।"

উসায়েদ (রা) তাঁর নিকট পৌঁছলেন। এ সময় সা'দ (রা) বিন মায়াজ জিজ্ঞেস করলেন ঃ "বল মিয়া, কি করে এলে ?"

হযরত উসায়েদ (রা) জবাব দিলেন ঃ "আমি ঐ দু' ব্যক্তির সাথে কথা বলেছি। আল্লাহর কসম! আমি তাঁদের নিকট থেকে ভয়ের কোন ব্যাপার অনুভব করিনি। আমি তাঁদের কথা থামিয়ে দিয়েছিলাম। এ সময় তাঁরা বললেন, আমাদের কথা শুনুন। তারপর গ্রহণ করা না করা আপনার ইচ্ছা। যে কাজ আপনাদের পছন্দনীয় নয় তা আমরা করবো না। উসায়েদ (রা) কিছুক্ষণ থামলেন। তারপর বললেন ঃ

"কেবলই আমি শুনতে পেয়েছি যে, বনি হারিছার লোকেরা আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহকে হত্যা করার জন্য বের হয়েছে। সে আপনার খালাতো ভাই হয়, এই কারণেই তারা এই কাজ করে আপনাকে অপমানিত করতে চায়।"

একথা শুনেই সায়াদ (রা) বিন মায়াজ অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। হাতে বর্শা নিয়ে মারক কূপের দিকে অগ্রসর হলেন এবং বললেন ঃ "উসায়েদ! আল্লাহর কসম, যে কাজের জন্য তোমাকে প্রেরণ করেছিলাম তাতো হয়ই নি রবং তুমি নতুন এক মুসিবত নিয়ে এসেছো।"

হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ সা'দ (রা) বিন মায়াজকে আসতে দেখলেন। এ সময় তিনি হযরত মুসয়াবকে (রা) বললেন ঃ "এ ব্যক্তি স্বজাতির সবচেয়ে বড় প্রভাবশালী নেতা। কোন ব্যক্তিই তার কথা অমান্য করতে পারে না। যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে সমগ্র গোত্রই তার অনুসরণ করবে।"

হযরত সা'দ (রা) বিন মায়াজ সায়াদ (রা) ও মুসয়াবকে (রা) নিশ্চিন্তে বসে থাকতে দেখলেন। সেখানে বনু হারিসার কোন ব্যক্তির চিহ্নও তিনি দেখতে পেলেন না। তিনি বুঝতে পেলেন যে, উসায়েদ (রা) নতুন চাল চেলেছেন। তাকে এখানে প্রেরণ করে তাদের কথা শুনাতে চান। তিনি ক্রোধান্বিত অবস্থায় হযরত মুসয়াব (রা) ও হযরত আসয়াদের (রা) নিকট গিয়ে দাঁড়ালেন এবং হযরত আসয়াদকে বললেন ঃ

"আবু উমামা! আল্লাহর কসম, তোমার ও আমার মধ্যে যদি আত্মীয়তা না থাকতো তাহলে তুমি কোনক্রমেই আমাদের বাড়ী এসে আমাদের ওপর সেই কথা চাপিয়ে দেয়ার সাহস করতে না যা আমরা খারাব মনে করে থাকি।"

হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ কোন সাধারণ ব্যক্তি ছিল না। তিনি সা'দ (রা) বিন মায়াজের কথার জবাব সেই আন্দাজেই দিতে পারতেন। কিন্তু

তিনি হকের তাবলীগের খাতিরেই সেখানে এসেছিলেন। এ জন্য খালাতো ভাইয়ের তেতো কথা শুনে শুধু হেসে দিলেন। অবশ্য সায়াদ (রা) মুসয়াবকে (রা) বললেন ঃ "মুহতারাম বা শ্রদ্ধেয় ভাই! একটু বসে আমাদের কথা শুনুন। পছন্দ হলে মেনে নিবেন। অন্যথা আমরা চলে যাবো এবং এমন কথা বলবো না যা আপনার স্বভাব বিরুদ্ধ।"

অন্য আরেক রেওয়ায়াতে আছে, সে সময় হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহই তাকে হযরত মুসয়াবের (রা) কথা শোনার জন্য উৎসাহ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ভাইটি আমার! তাঁর কথা কিছু শুনুন। যদি তা অপছন্দনীয় হয় তাহলে তা মানবেন না। আর যদি কোন কথা পছন্দ হয় তাহলে তা মেনে নিবেন।"

জবাবে হযরত সায়াদ (রা) বললেন ঃ "কায়দা করে তুমি কথাটি বললে।" একথা বলে তিনি মাটিতে বর্শা গেড়ে বসে গেলেন। হযরত মুসয়াব (রা) তাঁর সামনে ইসলামের সৌন্দর্যাবলী বর্ণনা করলেন এবং সূরায়ে যুখরুফ অথবা হামীম–এর কিছু আয়াত পড়ে শুনালেন।

হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ এবং হযরত মুসয়াব (রা) বলেন, পবিত্র কুরআন শুনতেই সায়াদ (রা) বিন মায়াজের চেহারার কাঠিন্যতা পরিবর্তিত হয়ে হাসিখুশীতে ভরে গেল এবং তিনিও সেই কথাই জিজ্ঞেস করলেন যা হযরত উসায়েদ (রা) জিজ্ঞেস করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি জানতে চেয়েছিলেন যে এই দ্বীনে কিভাবে দাখিল হতে হয় ? তাঁরা গোসল করা এবং পবিত্র কাপড় পরিধান করার উপদেশ দিয়েছিলেন। সায়াদ (রা) গোসল করে এবং পবিত্র কাপড় পড়ে এলেন। তখন তাঁরা প্রথমে তাঁকে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করালেন। অতপর দু' রাকায়াত নামায পড়ালেন। অতপর সায়াদ (রা) নিজের বর্শা উঠিয়ে নিজের গোত্রে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁকে দেখে গোত্রের কিছু লোক বলে উঠলো ঃ "আল্লাহর কসম! আমরা সায়াদকে পরিবর্তিত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। যে চেহারা নিয়ে তিনি গিয়েছিলেন, সেই চেহারা এখন আর তার নেই।"

হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজ সমগ্র বনু আবদিল আশহালকে একত্রিত করলেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"হে বনি আবদিল আশহাল ! তোমরা আমাকে কেমন মনে করে থাক ?"

"আপনি আমাদের সরদার ! আমাদের সবার থেকে আপনি সঠিক মতের অধিকারী, জ্ঞানী ও বিচক্ষণ।" সকলেই সমস্বরে কথাগুলো বললো।

সায়াদ বললেন ঃ তাহলে শোনো, তোমাদের পুরুষ ও মহিলাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার কথা বলা হারাম যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের ওপর ঈমান না আনবে।"

হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজের ঘোষণা শুনে বনু আবদিল আশহালের বেশীরভাগ মানুষ তৎক্ষণাৎ ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিলো। যারা অবশিষ্ট রলো তারাও সন্ধ্যানাগাদ মুসলমান হয়ে গেলো। শুধুমাত্র আল উসাইরিম বিন ছাবিত ইসলাম গ্রহণ করলো না। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ালো যে মদীনার আনাচে কানাচে ইসলামের তাকবীরে গুঞ্জিরিত হতে লাগলো। (ওহোদের যুদ্ধের সময় আল্লাহ তায়ালা আল উসাইরিমকেও হক কবুলের তাওফিক দান করেন এবং তিনি সেই যুদ্ধেই বীরত্বের সাথে লড়াই করে শাহাদাত বরণ করেন।)

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজ হযরত মুসয়াবকে (রা) নিজের মেহমান বানিয়েছিলেন এবং হযরত মুসয়াব (রা) ও হযরত আসয়াদের (রা) সাথে মিলে হকের তাবলিগে দিন-রাত একাকার করে দিয়েছিলেন। ফলশ্রুতিতে তিন চারটি ছাড়া আনসারের সকল পরিবারেই ইসলাম প্রসার লাভ করেছিল। খাজরাজ গোত্রের সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ এবং তাঁর পরিবার পরিজনও ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণকারীদের মধ্যে শামিল হয়ে যান। এমনিভাবে আওস ও খাজরাজের প্রায় সকল নেতৃস্থানীয় এবং নেক স্বভাবের মানুষ ইসলামের স্তম্ভে পরিণত হন।

সে যুগেই হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ আরো একটি মহান মর্যাদার অধিকারী হন। তিনি সর্বপ্রথম ইয়াসরাবে জুময়ার নামায পড়িয়ে ছিলেন। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত কা'ব (রা) বিন মালিকের পুত্র হযরত আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, বৃদ্ধকালে আমার পিতার দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছিল। আমি তাকে ধরে ধরে জুময়ার নামাযের জন্য নিয়ে যেতাম। আযানের আওয়াজ যখন তাঁর কানে আসতো তখন আবু উমামাহ আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহর জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি সবসময় কেন এমন করেন ? তিনি বলতে লাগলেন ঃ "বেটা" তিনি প্রথম সেই ব্যক্তি যিনি আমাদেরকে হিররা বনি বিয়াজাহ-তে (বাকীউল খাজমাত) রাসূলে করিমের (সা) আগমনের পূর্বে জুময়া পড়াতেন।" আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ "সেই যুগে সংখ্যায় আপনারা কতজন ছিলেন ?" জবাব দিলেন, "চল্লিশ।"

ইবনে সিরিন (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তখনও জুময়ার নামাযের হুকুম নাযিল হয়নি। মদীনার মুসলমানরা পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সপ্তাহে

একদিন একস্থানে একত্রিত হয়ে জামায়াতের সাথে নামায পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। যেহেতু ইহুদীদের পবিত্র দিন ছিল শনিবার এবং খৃষ্টানদের ছিল রোববার। এ জন্য তাদের থেকে পার্থক্য সূচীত করার জন্য তাঁরা জুময়ার দিন ধার্য করে দিলেন। সে যুগে এই দিনকে ইয়াওমে আরবিয়া বলা হতো। সর্বপ্রথম জুময়া হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ বাকীউল খাজমাত নামকস্থানে পড়িয়েছিলেন। তাতে ৪০ জন মুসলমান শরীক ছিলেন।

আল্লাহ তায়ালার আনসারীদের এই সিদ্ধান্ত এত পছন্দ হয়েছিল যে, জুময়ার নামায সকল মুসলমানদের উপর ফরয করে দেয়া হয়েছিল। নবীর হিজরতের পূর্বে জুময়ার নামাযের হুকুম যখন নাযিল হলো তখন মক্কায় তা আদায় করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং হুজুর (সা) হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়েরকে মদীনায় চিটি লিখলেন এবং জুময়ার ইমামতের নির্দেশ দিলেন যে কাজটি আনসাররা নিজেরা শুরু করেছিলেন তা এখন সকল মুসলমানের ওপর ফরয হয়ে গেল।

নবুওয়াত প্রাপ্তির ১৩ বছর পর হজ্জের মওশুমে ইয়াসরাব থেকে পাঁচশ লোকের একটি কাফেলা হজ্জের জন্য মক্কা রওয়ানা হলো। এই কাফেলায় হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহসহ আওস ও খাজরাজের ৭৫ জন এমন পবিত্র ব্যক্তিত্বও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা ইতিমধ্যেই ঈমান আনয়নের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তাঁরা মহানবীকে (সা) ইয়াসরাবে নিয়ে যাওয়ার জন্য ছিলেন অস্থির। তাঁদের মধ্যে ইয়াসরাবে ইসলামের প্রথম দায়ী মুসয়াব (রা) বিন উমায়েরও কাফেলায় শরীক ছিলেন।

হজ্জ সমাপনের পর বিশ্বনবী (সা) আনসারদের সাথে সাক্ষাতের সেই রাত নির্ধারিত করলেন যার সকালকে ইয়াওমুন নফর নামে অভিহিত হয়ে থাকে। তিনি তাদের প্রতিনিধিদেরকে উকবার নিম্নভূমিতে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ এবং সেখানে আসার পূর্বে ঘুমন্ত কাউকে জাগাতে নিষেধ ও কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা না করার নির্দেশ দিলেন।

ইয়াসরাবের হকপন্থীরা হুজুরের (সা) নির্দেশ পালন করলেন এবং নির্ধারিত রাতে চুপিসারে এক এক দুই দুই জন করে, উকবার উপত্যকায় এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে তাঁরা সারওয়ারে আলমের (সা) সাথে তাঁর চাচা হযরত আব্বাস (রা) বিন আবদুল মুত্তালিবকেও পেলেন। হযরত আব্বাস (রা) তখন পর্যন্ত প্রকাশ্যত ইসলাম গ্রহণ করেননি। কিন্তু কতিপয় রেওয়ায়াত অনুযায়ী তিনি পর্দার আড়ালে বা ভেতরে ভেতরে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি একথাও জানতেন যে, ইয়াসরাব থেকে আগত কিছু সংখ্যক নওমুসলিম মহানবীকে (সা) ইয়াসরাব তাশরীফ নেয়ার জন্য দাওয়াত দিতে এসেছেন।

এখানে উপস্থিত হযরত কা'ব (রা) বিন মালিক আনসারী বলেন, সর্বপ্রথম হযরত আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব আলোচনা শুরু করলেন। তিনি ইয়াসরাববাসীকে সম্মোধন করে বললেন ঃ

"হে ইয়াসরাবের ভ্রাতৃবৃন্দ! মুহাম্মাদ (সা) নিজের খান্দানে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত মানুষ। কুরাইশের মুশরিকরা তাঁর জীবনের শত্রু। তা সত্ত্বেও বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব সবসময়ই দুশমন থেকে তাঁকে রক্ষা করেছেন এবং ভবিষ্যতেও সামর্থ অনুযায়ী তা করে যাবে। কিন্তু সে তোমাদের নিকট যাওয়া ছাড়া আর কোন কথায় রাজী নয়। অতপর তোমরা চিন্তা করে দেখ। যদি তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ কর এবং আমৃত্যু তাকে রক্ষা করতে পার তাহলে আলোচনা কর। যদি নিজেদের কাছে ডেকে নেয়ার পর সামান্যতম সন্দেহও হয় যে কোন সময় তোমরা তাঁকে সাহায্য করতে পারবে না এবং তাঁকে দুশমনের নিকট ছেড়ে দিতে হবে তাহলে তাঁকে এখানেই যেভাবে আছেন সেভাবেই থাকতে দাও।"

হযরত আব্বাসের (রা) বক্তৃতা শুনে খাজরাজের এক সরদার হযরত বারা (রা) বিন মারুর আবেগাপ্লুত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ

"হে আব্বাস! আমরা তোমার কথা শুনলাম। তুমিও স্মরণ রেখ যে, আমরা দুর্বল নই। আমরা তরবারীর ছায়াতেই লালিত পালিত হয়েছি।"

হযরত আবুল হাইছাম (রা) ইবনুত তাইহান তাঁর কথায় বাধা দিয়ে বললেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! ইহুদীদের সাথে আমাদের মৈত্রী চুক্তি রয়েছে। বাইয়াতের পর এই চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। বিজয় লাভের পর আপনি আমাদেরকে পরিত্যাগ করে নিজের কওমের মধ্যে ফিরে আসবেন—এমন যেন না হয়।"

হুজুর (সা) মুচকি হেসে বললেন ঃ

না; এমনটি হবে না। আমার রক্তই তোমাদের রক্ত। আমার দাফনের স্থান তোমাদেরও দাফনের স্থান। আমি তোমাদের এবং তোমরাও আমার। আমি তাদের সাথে লড়াই করবো যাদের সাথে তোমরা লড়াই করবে এবং আমি তাদের সাথে সন্ধি করবো যাদের সাথে তোমরা সন্ধি করবে।"

হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে আনসারদের অন্তর আনন্দে ভরে গেল। তাঁরা আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল। আমরা কোন্ কোন্ বিষয়ে আপনার বাইয়াত করবো, তা ইরশাদ করুন।"

হুজুর (সা) বললেন, "আমি তোমাদের নিকট থেকে বাইয়াত নিচ্ছি তোমরা সব অবস্থাতেই নির্দেশ পালন করবে এবং আনুগত্যের মাথা অবনত করে দেবে। আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। আল্লাহর ব্যাপারে সবসময় হক কথা বলবে এবং কোন গালাগালকারীর পরওয়া করবে না। সৎকাজের নির্দেশ এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখাকে অভ্যাসে পরিণত করবে এবং আমি যখন তোমাদের নিকট যাবো তখন আমাকে এমনভাবে রক্ষা করবে যেমনভাবে নিজের পরিবার পরিজনকে করে থাকো। এর বিনিময়ে তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।"

এই ইরশাদের পরই সকল আনসার দাঁড়িয়ে হুজুরের (সা) দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ লাফ দিয়ে আগে গিয়ে মহানবীর (সা) পবিত্র হাত নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বললেন ঃ "ইয়াসরাফবাসীরা দাঁড়াও! আমরা এই সফরে উটের কলিজা শুধু এই আস্থার ভিত্তিতে ছিদ্র করেছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। তাঁকে আমাদের কাছে নিয়ে যাওয়ার অর্থ হলো সকল আরবের শত্রুতা কিনে নেয়া। এর পরিণতিতে তোমাদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ নিহত হতে পারেন এবং বিরোধীদের তরবারী তোমাদেরকে খন্ড-বিখন্ড করে ফেলতে পারে। এসব মুসিবত বরদাশত করার শক্তি যদি তোমরা রাখো তাহলে মহানবীকে (সা) নিজেদের কাছে নিয়ে চলো এবং তোমাদের কাজের প্রতিদান আল্লাহ পাক দেবেন। কিন্তু যদি কোন ভয়-ভীতি অনুভব কর তাহলে তাঁকে নিজের ওপর ছেড়ে দাও এবং পরিষ্কারভাবে ক্ষমা চেয়ে নাও। এই সময়ের ক্ষমা প্রার্থনা আল্লাহর নিকট বেশী গ্রহণযোগ্য হবে।"

হযরত আসয়াদের (রা) কথা শুনে সকলেই এক বাক্যে বললেন ঃ

"আসয়াদ তুমি পেছনে সরে এসো। আল্লাহর কসম, আমরা অবশ্যই বাইয়াত করবো এবং তা কখনই ভঙ্গ করবো না।"

একথার পর তৎক্ষণাৎ হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ রহমতে আলমের (সা) বাইয়াত করলেন। এই সৌভাগ্য তিনি তৃতীয় অথবা চতুর্থ বার লাভ করেন। অন্যান্য আনসারও তাঁর অনুসরণ করলেন এবং সকলেই অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে একের পর এক হুজুরের (সা) হাতে বাইয়াত করলেন। এই বাইয়াতকে ইতিহাসে বাইয়াতে লাইলাতুল উকবা, বাইয়াতে উকবায়ে ছানিয়া, বাইয়াতে উকবায়ে কবিরা প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই বাইয়াত ইসলামের ইতিহাসে মাইল স্টোনের মর্যাদা রাখে। প্রকৃতপক্ষে এই বাইয়াত আরব ও আজম, জ্বিন ও ইনসানের সাথে আল্লাহর

সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করার বাইয়াত ছিল। সময়টাও এমন ছিল যখন আরবের প্রতিটি ধূলিকণা হকের ঝান্ডাবাহীদের রক্ত পিপাসু ছিল। ইয়াসরাব ভূমির এই পবিত্র মানুষেরা মাথা তুলে দাঁড়ালেন এবং নিজের জান, মাল ও সন্তান-সন্ততিকে মক্কার ইয়াতিম নবীর (সা) পায়ের কাছে এনে রাখলেন।

আল্লাহর লাখ লাখ সালাম বর্ষিত হোক সেই সব মুবারক ব্যক্তিদের উপর যাঁরা নিজেদের সবকিছু হকপথে বিলীন করে দিয়েছিলেন এবং কোন ভয়ভীতির তোয়াক্কা করেননি। এই বাইয়াত আনসারদেরকে এমন এক মর্যাদায় ভূষিত করেছিল যে, যার ওপর তারা সবসময় ফখর করতেন। ইবনে ইসহাক (রা) বর্ণনা করেছেন, একবার আনসারদের মধ্যে এই বিতর্ক শুরু হয়ে গেল যে, লাইলাতুল উকবায় কোন্ ব্যক্তি সর্বপ্রথম হুজুরের (সা) হাতে বাইয়াত করেছিলেন। বনু নাজ্জারের লোকেরা বলতো আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহই এই সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলেন। বনু সালমার লোকেরা বলতো যে, সর্বপ্রথম কা'ব (রা) বিন মালিক বাইয়াত করেছিলেন। বনু আবদিল আশহালের লোকেরা দাবী করতো যে, আবুল হাইছাম (রা) ইবনুত তাইহান সবার আগে বাইয়াত করেছিলেন। সর্বশেষে ব্যাপারটি হযরত আব্বাস (রা) বিন আবদুল মুত্তালিবের সামনে পেশ করা হলো। তিনি বললেন ঃ "সর্বপ্রথম আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ বাইয়াত করেছিলেন। তাঁর পর বারা' (রা) বিন মারুর এবং তাঁর পর উসাইদ (রা) বিন হুজাইর।"

হযরত আব্বাসের (রা) এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আনসারের অগ্রবর্তী সাহাবীদের (রা) মধ্যে হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহর স্থান তালিকাশীর্ষে উঠে আসে।

বাইয়াতের পর বিশ্বনবী (সা) ইয়াসরাববাসীদেরকে বললেন, "মূসা (আ) ইহুদীদের বারোজন নকীব নির্বাচন করেছিলেন। তোমরাও দ্বীনি বিষয়দি সংরক্ষণের জন্য নিজেদের মধ্য থেকে ১২ জন নকীব নির্বাচিত করে নাও।"

ইয়াসরাবের মুসলমানরা সর্বসম্মতভাবে ১২ জন নকীব নির্বাচন করলেন। তাদের মধ্যে ৯ জন ছিলেন খাজরাজ গোত্রের এবং বাকী তিনজন আওস গোত্রের। খাজরাজের নকীবদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ। তিনি আরো ভিন্ন ধর্মী মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। রহমতে আলম (সা) তাঁকে "নকিবুন নুকাবা" খিতাব প্রদান করেছিলেন।

অতপর হুজুর (সা) আনসারদেরকে চুপি চুপি বিদায় হয়ে যাওয়ার হেদায়াত দিলেন এবং বললেন, যখন আল্লাহর নির্দেশ হবে তখন তিনি হিজরত করে ইয়াসরাবে তাদের নিকট পৌঁছে যাবেন।

উকবায়ে কবিরার বাইয়াতের পর হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ ইয়াসরাব ফিরে গেলেন এবং খুব উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে দাওয়াত ও তাবলিগের কাজে মশগুল হয়ে পড়লেন। আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, সে যুগে আসনারদের মধ্যে মূর্তি ভাঙ্গার কাজ খুব জোরে শোরে চলছিল এবং কোন কোন উৎসাহী মুসলমানদের স্ব স্ব গোত্রের মূর্তি ভাঙ্গার ব্যাপারে অগ্রগামী ছিলেন। ইয়াসরাবের মুশরিকদের ওপর মুসলমানদের প্রভাব এমনভাবে বিস্তার লাভ করেছিল যে, তাদের পক্ষে মূর্তি উৎপাটনকারী ভাইদের মুকাবিলা করার সাহস ছিল না এবং তারা স্বহস্তে নির্মিত মাবুদদের ধ্বংসের প্রশ্নে চুপ মেরে থাকতো।

নবুওয়াত প্রাপ্তির ১৩ বছর পর হজ্জের মওসুমে বাইয়াতে উকবায়ে কবিরা সংঘটিত হয়। নবুওয়াতের ১৪ বছর পর রবিউল আউয়াল মাসে বিশ্বনবী (সা) মক্কা ভূমিকে বিদায় জানান এবং ইয়াসরাবের উপকণ্ঠের মহল্লা (অথবা গ্রাম) কুবাতে শুভ পদার্পণ করেন। এখানে হযরত কুলছুম (রা) ইবনুল হাদাম তাঁর মেযবানীর সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি আওস খান্দান বনু আমর বিন আওফের শাখা বনু উবায়েদের একজন সম্ভ্রান্ত বুজর্গ ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং বার্দ্ধক্য অবস্থায় ঈমানের সম্পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। সে যুগে ইসলামের বরকতে যদিও আওস এবং খাজরাজের পারস্পরিক বিবাদ থেমে গিয়েছিল তবুও তারা একে অপরের মহল্লায় গমনা-গমনে ইতস্তত করতো। মহানবী (সা) কুবাতে আওসের এক পরিবারে অবস্থান করছিলেন। এ জন্যে খাজরাজের জনগণ সেখানে আসতে কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিল। কিন্তু হুজুরের (সা) সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ তাদেরকে শান্তির সাথে বসে থাকতে দিল না এবং তাদের নেতারা অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে নবীর (সা) নিকট উপস্থিত হতে লাগলেন। উপস্থিতদের মধ্যে হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ ছিলেন না। মহানবী (সা) লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ কোথায়?" হযরত রিফায়াহ (রা) বিন আবদিল মানযার, হযরত মুবাশশির (রা) বিন আবদিল মানযার এবং হযরত সায়াদ (রা) বিন খাছিমা আওসী আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আসয়াদ (রা) বুয়াছের যুদ্ধে আমাদের এক নেতা নাবতাল বিন হারিছকে হত্যা করেছিলেন। এ জন্য সম্ভবত তিনি এখানে আসতে ভয় পেয়ে থাকতে পারেন।"

ওদিকে হযরত আসয়াদ (রা) মহানবীর (সা) দর্শন লাভের জন্য এত অস্থির হয়ে গিয়েছিলেন যে, রাতে মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে মুখে কাপড় দিয়ে বিশ্বনবীর (সা) খিদমতে এসে হাজির। হুজুর (সা) তাকে দেখে খুব খুশী হলেন। হযরত আসয়াদ (রা) সারা রাত হুজুরের (সা) নিকট অবস্থান

করলেন এবং খুব ভোরে ফিরে গেলেন। তাঁর চলে যাওয়ার পর রহমতে আলম (সা) সায়াদ (রা) বিন খাছিমা এবং আবদুল মানযারের পুত্র মুবাশশির (রা) ও রিফায়াকে বললেন ঃ "আমি চাই, তোমরা আসয়াদ (রা) বিন যুরারাকে আশ্রয় দেবে।"

এই তিন জাননিছার সাহাবী আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সম্পূর্ণরূপে আপনার নির্দেশ পালন করবো।"

হযরত সায়াদ (রা) বিন খাছিমা কাল বিলম্ব না করে হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহর বাড়ী পৌছলেন এবং হাত ধরে তাঁকে স্বগোত্র বনু আমর বিন আওফ নিয়ে এলেন। গোত্রের অন্যান্য নেতা যখন হুজুরের (সা) ইচ্ছার কথা জানতে পেলেন তখন সকলেই তাঁর খিদমতে হাজির হলেন এবং আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা সকলেই আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহকে আশ্রয় দিচ্ছি। সে নির্দ্বিধায় এখানে আসতে পারে।"

মহানবী (সা) তাদের জন্য দোয়া করলেন এবং হযরত আসয়াদ (রা) নির্ভয়ে মহানবীর (সা) খিদমতে আসা যাওয়া শুরু করলেন।

কুবায় কিছুদিন অবস্থানের পর মহানবী (সা) ইয়াসরাবে শুভ পদার্পণ করলেন। এ সময় মদীনার আনসাররা আনন্দে আত্মহারা হয়ে মহানবী (সা) এমন উৎসাহ-উদ্দীপনাপূর্ণ সম্বার্ধনা জানিয়েছিলেন যা ইতিহাসে নজিরবিহীন হয়ে আছে। বিশ্বনবীকে (সা) সম্বর্ধনাকারীদের মধ্যে হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ সর্বাগ্রে ছিলেন। হুজুরের (সা) প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ইশকের পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছিল।

ইয়াসরাবে যেদিন মহানবীর (সা) শুভাগমন হয়েছিল সেদিন থেকেই এই শহর "মদীনাতুন্নবী" নামে আখ্যায়িত হয়। আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, মদীনা মুনাওয়ারাতে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) যেমন বিশ্বনবীর (সা) মেযবান হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তেমন হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ হুজুরের (সা) উটনী কাসওয়ার মেযবান হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। বলা বাহুল্য যে, হযরত আবু আইয়ুব (রা) হযরত আসায়াদ (রা) উভয়েই বনু নাজ্জার গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন।

হযরত আবু আইয়ুবের (রা) বাড়ীতে অবস্থানের কিছুদিন পর মহানবী (সা) মদীনা মুনাওয়ারাতে আল্লাহর ঘর বা মসজিদ তৈরীর সংকল্প ঘোষণা করলেন। হযরত আবু আইয়ুবের (রা) বাড়ীর সামনে একটি পতিত জমি পড়েছিল। এখানে এসেই তার উটনী বসে পড়েছিল। বিশ্বনবী (সা) এই জমিতেই মসজিদ তৈরীর সিদ্ধান্ত নিলেন। সেই জমিতে কয়েকটি কবর ও

খেজুর বৃক্ষ ছিল এবং হুজুরের (সা) শুভাগমনের পূর্বে হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ নিজের মুসলমান ভাইদের সাথে এখানেই নামায পড়তেন। সেই জমির মালিক ছিল বনু নাজ্জারের দুই এতিম শিশু। তাদের নাম হলো সাহাল (রা) ও সোহায়েল (রা)। তাদের অভিভাবক ছিলেন হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ। বিশ্বনবী (সা) সেই দুই এতিম শিশুকে জমির মূল্য জিজ্ঞাসা করলেন। শিশু দু'টি বললো, "হে আল্লাহর রাসূল ! এই জমি আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আপনাকে দান করে দিচ্ছি।"

হুজুর (সা) বললেন, "আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে সুন্দর প্রতিদান দিন। আমি এই জমি মূল্য ছাড়া গ্রহণ করবো না।"

অতপর মহানবী (সা) আনসার নেতৃবৃন্দের পরামর্শক্রমে সেই জমির মূল্য নির্ধারণ করলেন দশ মিছকাল স্বর্ণ এবং বিভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী তা আদায় করিয়ে দিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) অথবা হযরত আবু আইয়ুব আনসারীকে (রা) দিয়ে। (ফাতহুল বারি ও মাদারিজুননবুয়াহ) কিন্তু যারকানী (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ (রা) নিজের অভিভাবকাধীন শিশুদের কাছ থেকে এই জমি মসজিদ নির্মাণের জন্য নিয়ে হুজুরকে (সা) দিয়ে দেন এবং তার বিনিময়ে বনু বিয়াজায় অবস্থিত নিজের একটি বাগান শিশুদেরকে দেন।

প্রিয় নবীর (সা) প্রতি হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ (রা) পূর্ণ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ দিতেন। যেদিন মহানবী (সা) মদীনা এসেছিলেন সেদিন থেকে বেশীর ভাগ সময় তাঁর নিকটই কাটাতো। হুজুর (সা) তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং তাকে অন্যতম প্রিয় জাননিছার হিসেবে গণ্য করতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় মহানবীর (সা) সত্যিকার আশেককে রিসালাত-কালে শুধুমাত্র কয়েক মাসই দেখা গিয়েছিল। মদীনায় আনসারদের মধ্যে যেমন তিনি হুজুরের (সা) নিকট বাইয়াত গ্রহণে অগ্রগামী ছিলেন তেমনি এই নশ্বর দুনিয়াকে বিদায় জানানোর ব্যাপারেও অগ্রগামী হয়েছিলেন।

প্রথম হিজরীর শওয়াল মাসে প্রিয় নবী (সা) তখনো মসজিদ নির্মাণ কাজ শেষ করেননি। এমন সময় হযরত আসায়াদের (রা) কণ্ঠনালিতে প্রচণ্ড ব্যথা উঠলো। হুজুর (সা) তাঁর অসুস্থতার খবর পেয়ে অস্থির হয়ে পড়লেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর শুশ্রূষার জন্য গেলেন। ব্যথায় কাতর দেখে তিনি নিজের পবিত্র হাত দিয়ে তাঁর মাথা বুলিয়ে দিলেন। কিন্তু কোন আরাম হলো না এবং সেই অবস্থাতেই তিনি পরপারে যাত্রা করলেন। ওফাতের পূর্বে তিনি মহানবীর (সা) নিকট আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল ! আমি দু'টি অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ে

রেখে যাচ্ছি। তারা আল্লাহ এবং আপনার হাওয়ালায় রইলো। তারা আপনার স্নেহের আকংখী থাকবে।"

হযরত আসয়াদ (রা) আনসারদের মধ্যে মহানবীর (সা) সবচেয়ে বড় খাদিম এবং ইসলামের সবচেয়ে তৎপর সাহায্যকারী ছিলেন। ইহুদীরা এজন্য ওফাতের সাথে সাথে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক ভাষা প্রয়োগ শুরু করলো। আল্লামা ইবনে জারির তাবারি (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত আসয়াদের (রা) ওফাতে মহানবী (সা) খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন। এই অবস্থায় ইহুদীদের বিদ্রূপাত্মক কথা শুনে তিনি বললেন, "ইহুদীরা বলে থাকে মুহাম্মদ যদি আল্লাহর রাসূল হতো তাহলে তার এত বড় তৎপর সহকর্মী মরতো না। অথচ মুখাপেক্ষীহীন আল্লাহর ইচ্ছার সামনে কারো কোন কথাই খাটে না।"

বিশ্বনবী (সা) স্বয়ং হযরত আসয়াদ (রা)-এর জানাযার নামায পড়ালেন। অতপর তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হলো। নবীর (সা) হিজরতের পর সর্বপ্রথম হযরত কুলছুম (রা) ইবনুল হাদম কুবাতে ওফাত পেয়েছিলেন। তাঁর ইনতিকালের কিছুদিন পরেই মদীনা মুনাওয়ারাতে হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ মারা যান। ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সা) সর্বপ্রথম জানাযার নামায হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহই পড়েছিলেন। মদীনার আনসারদের ধারণা ছিল যে, হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহই সর্বপ্রথম মুসলমান ; যাঁকে জান্নাতুল বাকীর মাটি নিজের বুকে স্থান দিয়েছিল, কিন্তু আল্লামা ইবনে আসয়াদ (রা) লিখেছেন, বাকীর গোরস্তানে সর্বপ্রথম হযরত উসমান (রা) বিন মাজউন দাফন হয়েছিলেন। তাঁর ওফাত হয়েছিল দ্বিতীয় হিজরীর (বদরের যুদ্ধের) শেষে। যদি ইবনে সায়াদের (র) বর্ণনা সঠিক হয় ; তাহলে হযরত আসয়াদের (রা) শেষ আশ্রয়স্থল অন্য কোন স্থানে হয়েছিল। সেই স্থানের সন্ধান এখন আর পাওয়া যায় না।

হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ বনি নাজ্জারের নকিব ছিলেন। তাঁর ইনতিকালের পর বনু নাজ্জার মহানবীর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলো ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি অবগত আছেন যে, আমাদের মধ্যে আসয়াদের (রা) কি মর্যাদা ছিল। আপনি তাঁর স্থলে আমাদের মধ্য থেকে কাউকে নকীব নিয়োগ করুন। যাতে তাঁর ইনতিকালে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা কিছু হলেও পূরণ হয়।"

রাসূলে করিম (সা) বললেন ঃ "তোমরা আমার মাতৃকুলের আত্মীয় এবং আমি তোমাদেরই একজন। অতএব, এখন আসয়াদের (রা) স্থলে আমিই তোমাদের নকীব হয়ে গেলাম।"

বনি নাজ্জার গোষ্ঠী নিজেদের এই সম্মান প্রাপ্তিতে অত্যন্ত খুশী হয়ে গেল। তারা সবসময় গৌরব প্রকাশ করে বলতো যে, রাসূলে করিম (সা) স্বয়ং তাদের নকীব হয়েছিলেন।

রহমতে আলম (সা) হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহর ইয়াতিম শিশু কন্যাদেরকে সীমাহীন ভালোবাসতেন এবং তাদেরকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। হাফেজ ইবনে হাজার (র) ইসাবাতে লিখেছেন, হুজুর (সা) মতি জোড়ানো স্বর্ণের বালি তাদের কানে পরিয়েছিলেন।

আল্লামা ইবনে আছির (র) উসুদুল গাব্বাহ গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত আসয়াদ (রা)-এর এক মেয়ের নাম ছিল ফারিয়া। বালেগা হলে হযরত নাবিত (রা) বিন জাবেরের সঙ্গে মহানবী (সা) তার বিয়ে দেন।

সাইয়েদেনা হযরত আবি উমামাহ আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ যদিও ইসলামের মাদানী যুগের প্রথম দিকে ওফাত পেয়েছিলেন ; তবুও নিজের ঈমানী আবেগ ও নেক আমলের যে উদাহরণ স্বল্প সময়ের মধ্যে ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ করেয়িছিলেন তা ইসলামের অনুসরীদেরকে চিরকালের জন্য মনযিলে মাকছুদের পথ দেখাতে থাকবে। স্বয়ং মহানবী (সা) তাঁর নেক চরিত্রের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে "খায়ের" উপাধিতে ভূষিত করেন এবং তাঁর স্থলে নিজেকে বনি নাজ্জারের নকিব নিয়োগ করেন।

হযরত জাকওয়ান (রা) বিন আবদি কায়েসুজ জুরকি আনসারী

হযরত জাকওয়ান (রা) ছিলেন খাজরাজের যুরায়েক বংশোদ্ভূত। তাঁর নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

জাকওয়ান (রা) বিন আবদি কায়েস বিন খালদাতা বিন মুখাল্লাদ বিন আমের বিন যুরায়েক।

আল্লাহ পাক হযরত জাকওয়ান (রা)-কে নেক স্বভাব দান করেছিলেন। তিনি মহানবীর (সা) নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্বেই তাওহীদপন্থী হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মদীনার ইহুদীদের নিকট থেকেই শেষ নবীর (সা) কথা শুনেছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁকে যেন শেষ নবীর (সা) যুগ অবলোকন করান—এটা ছিল তাঁর আন্তরিক কামনা। আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন ঃ প্রথম বাইয়াতে উকবার পূর্বে তিনি একবার বন্ধু হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহর সহচরসঙ্গী হয়ে মক্কা গিয়েছিলেন এবং প্রখ্যাত কুরাইশ সর্দার উতবাহ বিন রবিয়ার বাড়ীতে অবস্থান করেন। উতবা তাঁর কাছে বিশ্বনবী (সা) সম্পর্কে বললেন। (অন্য বর্ণনা অনুযায়ী এর পূর্বে তিনি উতবার সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। তিনি অন্যদের কাছে রাসূলে আকরাম (সা) সম্পর্কে শুনেছিলেন।) তাতে তিনি খুব প্রভাবান্বিত হলেন এবং হযরত জাকওয়ান (রা) স্বতস্ফূর্ত হযরত আসয়াদকে (রা) বললেন ঃ رونك هذا بينك অর্থাৎ তুমি যে বস্তু খুঁজছিলে তা সমুপস্থিত। এখন তা গ্রহণ কর।

বস্তুত তাঁরা দু'জনেই সেখান থেকে উঠে মহানবীর (সা) দরবারে উপস্থিত হলেন এবং তাওহীদ ও রিসালাতের স্বীকৃতি প্রদান করে মু'মিনের মর্যাদায় অভিষিক্ত হলেন।

বিশ্বনবীর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির দ্বাদশ বছরে তিনি মদীনায় সেই ১২জন ঈমানদারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন, যাঁরা মক্কা গমন পূর্বক মহানবীর (সা) হাতে বাইয়াত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। পরবর্তী বছর তিনি পুনরায় বাইয়াতে উকবায়ে কবিরায় মদীনায় ৭৪জন মু'মিনের সাথে এই সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এই ঘটনার সময় মদীনার আনসাররা মহানবী (সা)-কে মদীনায় তাশরিফ নেয়ার দাওয়াত এবং তাঁকে জান-প্রাণ দিয়ে সাহায্য ও সহযোগিতার ঘোষণা প্রদান করেছিলেন। চরিতকাররা বর্ণনা করেছেন ঃ এই বাইয়াতের পর হযরত জাকওয়ান (রা) মদীনা থেকে এসে মক্কায় স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান এবং

কিছুদিন পর অন্য মুহাজিরদের সাথে মক্কা থেকে হিজরত করেন। এ জন্য তাকে মুহাজেরী আনসার বলা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত জাকওয়ান (রা) এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের মহান সৌভাগ্য অর্জন করেন। পরবর্তী বছর ওহোদের যুদ্ধেও অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নেন এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধে বীর বিক্রমে লড়াই করে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন।

হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিত আনসারী

নবম হিজরীতে মহানবী (সা) ছাদকা ও যাকাত আদায়ের এক পূর্ণাঙ্গ বিধান প্রণয়ন করেন। তিনি আরবের প্রত্যেক গোত্রের নিকট পৃথক পৃথক আদায়কারী প্রেরণ করেন। এসব আদায়কারী প্রতিটি গোত্র সফর করে জনগণের কাছ থেকে যাকাত ও খিরাজ আদায় করে মহানবীর (সা) খিদমতে পেশ করতেন। এই উপলক্ষে তিনি একজন জাননিছার বা আত্মোৎসর্গকারী আনসারীকেও ডেকে পাঠালেন। দীর্ঘ দেহী এবং দোহারা গড়নের এই সুপুরুষ রাসূলের (সা) খিদমতে হাজির হলেন। এ সময় তিনি তাঁর পদ ও দায়িত্বের কথা বর্ণনা করে বললেন ঃ "নিজের দায়িত্ব পালনকালে আল্লাহকে ভয় করবে। কিয়ামতের দিন কোন চতুষ্পদ জন্তুও যেন তোমার বিরুদ্ধে কোন ফরিয়াদ বা অভিযোগ নিয়ে না আসে।"

মহানবীর (সা) ইরশাদ শুনে সেই ব্যক্তির চোখ অশ্রুতে ভরে উঠলো এবং আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সা) ! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আল্লাহর কসম ! দু'জন মানুষের রাজস্ব আদায়কারী বা শাসক হওয়ার ইচ্ছাও আমার নেই।"

তাঁর কথা শুনে মহানবী (সা) খুব খুশী হলেন। কেননা যে ব্যক্তি স্বয়ং কোন পদের আকাংখা করতেন, তাঁকে মহানবী (সা) সেই পদ বা রাজস্ব আদায়কারী হিসেবে নিয়োগ করতেন না। বিশ্বনবীর (সা) এই সাহাবী যিনি দুনিয়ার পদসমূহ থেকে এ ধরনের মুখাপেক্ষীহীন ছিলেন এবং যাঁর এই মুখাপেক্ষীহীনতা মহানবীকে (সা) খুশী করেছিলো—তিনি ছিলেন সাইয়েদেনা হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিত আনসারী।

হযরত আবুল ওয়ালিদ উবাদাহ (রা) বিন সামিত ইসলামের ইতিহাসে এক মহান মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব ছিলেন তাঁর এই মর্যাদা সম্পর্কে মুসলমানদের সকল ধরনের গবেষকরা ঐকমত্য পোষণ করে থাকেন। বস্তুত তাঁর মর্যাদা এত উদ্যমপূর্ণ যে তা পড়ে ঈমানে উষ্ণতা সৃষ্টি হয়।

হযরত উবাদাহ (রা) সম্পর্কে খাজরাজ বংশের বনু সালেম শাখার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। নসবনামা হলো ঃ উবাদাহ (রা) বিন সামিত বিন কায়েস বিন আসরাম বিন ফাহর বিন কায়েস বিন ছা'লাবা বিন গানাম বিন সালিম বিন আওফ বিন আমর বিন আওফ বিন খাজরাজ।

মাতার নাম ছিল কুররাতুল আইন (রা) বিনতে উবাদাহ (বিন নাযলাহ বিন মালিক বিন আজলান)। তিনিও পুত্রের হাতে ইসলাম গ্রহণ এবং মহিলা সাহাবী (রা) হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

হযরত উবাদাহর (রা) নবোদ্ভিন্ন যৌবনকালে ইসলাম সূর্য উদিত হয়। নবুওয়াত প্রাপ্তির একাদশ বছরে মদীনার ভাগ্যবান স্বভাবের খাজরাজ বংশোদ্ভূত ৬ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ পূর্বক মক্কা থেকে ফিরে এলেন। অতপর মদীনাতেও সেই আলোকবর্তিকা ছড়িয়ে পড়লো। উবাদাহ ছিলেন একজন নেক্কার যুবক। তাঁর কর্ণকুহরে হকের দাওয়াত পৌছামাত্র নির্দ্বিধায় তাতে সাড়া দিলেন। পরবর্তী বছর হজ্জের সময় হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিত খাজরাজ গোত্রের ৯জন এবং আওসের অপর দু'জন মুসলমানের সঙ্গে মক্কা গিয়ে উকবাহ নামক স্থানে মহানবীর (সা) পবিত্র খিদমতে হাজির এবং তাঁর হাতে বাইয়াত হলেন। ইতিহাসে এই বাইয়াত "বাইয়াতে উকবায়ে উলা" অথবা "বাইয়াতে নিসা" নামে খ্যাত। স্বয়ং হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিত থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে করিম (সা) আমাদের নিকট থেকে এসব কথার উপর বাইয়াত নিয়েছিলেন ঃ

"আমরা কাউকে আল্লাহর সাথে শরীক করবো না। চুরি করবো না। যিনা করবো না। নিজের সন্তান হত্যা করবো না। কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিব না। কোন ভালো কাজের নির্দেশে রাসূলের (সা) নাফরমানী করবো না এবং তাঁর হুকুম শুনবো ও মানবো। সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় এবং আমাদের পসন্দ ও নাপসন্দ অবস্থায় আমরা রাসূলের (সা) নির্দেশ মানবো। আমাদের কাউকে আমাদের ওপর প্রাধান্য দিলেও রাসূলের (সা) হুকুম তামিল করবো। রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে আমরা রাষ্ট্র পরিচালকদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করবো না। (যদি আমরা বুঝিও যে রাষ্ট্র পরিচালনায় আমাদের অধিকার রয়েছে।) কিন্তু আমরা যদি প্রকাশ্য কুফুরী অবলোকন করি তাহলে তার বিরোধিতা করবো এবং আমরা যেখানে এবং যে অবস্থাতেই থাকি না কেন হক কথা বলবো ও ভর্ৎসনাকারীকে কখনো ভয় করবো না।"

অতপর মহানবী (সা) বলেছিলেন ঃ "তোমাদের মধ্যে কেউ এসব ওয়াদা পূরণ করলে তার জন্যে জান্নাত অবধারিত। আর কেউ যদি এসব খারাপ কাজের কোন একটি করে বসে এবং দুনিয়াতেই তার শাস্তি পায় তাহলে এই শাস্তি তার জন্য গুনাহর কাফফারা হয়ে যাবে। দোষ গোপনকারী আল্লাহ পাক যার গুনাহ গোপন করবেন তার পরিণাম ফল আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। তিনি চাইলে ক্ষমাও করে দিতে পারেন।"

এই বাইয়াতকে "বাইয়াতে নিসা"এ জন্যে বলা হয়ে থাকে যে, এর শব্দাবলী সেই শব্দাবলীর সদৃশ যা কয়েক বছর পর কুরআনে হাকিমে (সূরায়ে মুমতাহিনাতে) মুসলমান মহিলাদের বাইয়াত গ্রহণের জন্যে আল্লাহর তরফ থেকে নাযিল হয়েছিল।

মহানবীর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির ১৩ বছর পর বাইয়াতে উকবায়ে কবিরার (অথবা লাইলাতুল উকবাহ) মহান ঘটনা সংঘটিত হয়। এই ঘটনা ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তাতে মদীনার ৭৫জন ঈমানদার ব্যক্তি উকবার ঘাঁটিতে প্রিয় নবীর হাতে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে বাইয়াত করেন। এই বাইয়াতে তাঁরা উল্লেখ করেছিলেন যে, মহানবী (সা) মদীনা তাশরীফ আনলে তাঁরা তাঁকে জান ও মাল দিয়ে এমনভাবে হিফাজত ও সাহায্য করবে যেমন নিজের জীবন এবং পরিবার-পরিজনকে করা হয়ে থাকে।

এ সময় বিশ্বনবী (সা) সেই ৭৫জন ঈমানদারকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ "(এমন ধরনের অবশ্যই হবে না যে, আমি শত্রুর ওপর বিজয়ী হলে তোমাদেরকে ফেলে রেখে নিজের কওমে ফিরে আসবো। বরং) তোমাদের রক্ত আমার রক্ত, তোমাদের আবাদি আমার আবাদি এবং তোমাদের বরবাদি হবে আমার বরবাদি। তোমরা আমার এবং আমি তোমাদের। তোমরা যার সাথে সন্ধি করবে ; আমি তাদের সাথে সন্ধি করবো। যার সাথে তোমরা লড়াই করবে তার সাথে আমি লড়াই করবো। মোটকথা, আমার জীবন ও মৃত্যু তোমাদের সাথেই সম্পৃক্ত হবে।"

এই ৭৫জন ঈমানদারদের মধ্যে হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিতও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি সেই মহান ব্যক্তি ছিলেন যিনি সে সময় মহানবী (সা)-কে মদীনা গমনের দাওয়াত প্রদান এবং নিজের জান-মালসহ তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অথচ সারা আরব ভূমি তখন রিসালাত প্রদীপ নিভিয়ে দেয়ার কাজে ছিল মহাব্যস্ত। তিনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন যে, এই নাজুক সময়ে মক্কার ইয়াতিম নবীকে (সা) সাহায্য করার অর্থই হলো সমগ্র আরবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর। তার পরিণতিতে তিনি ভয়ংকর বিপদের সম্মুখীন হতে পারেন। এসব সত্ত্বেও তিনি বীরত্বের সাথে নিজের হাত মহানবীর (সা) মুবারক হাতে তুলে দিলেন এবং নিজের ভবিষ্যত ও তাকদির তাঁর সাথে একাকার করে নিলেন। এই নজিরবিহীন সাহসিকতা চার খলিফা (রা) ও আজওয়াজে মুতাহহিরাত (রা) এবং প্রথম যুগের মুহাজিরদের (রা) পর উকবাহবাসীদের (রা) অন্যান্য সকল সাহাবীদের (রা) [বদরের যুদ্ধে অংশ-গ্রহণকারী সাহাবী (রা) সহ] ওপর তাঁর মর্যাদা স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট করে দিল।

বাইয়াতের পর মহানবী (সা) আনসারদের বললেন, নিজেদের ধর্মীয় বিষয়াদি সংরক্ষণের জন্যে নিজেদের মধ্য থেকে ১২জনকে নকীব হিসেবে নির্বাচিত করে নাও। এই নির্দেশ অনুযায়ী আনসাররা পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে ১২জন নকীব নির্বাচন করলেন। তাদের মধ্যে ৯জন খাজরাজ এবং ৩জন আওস বংশোদ্ভূত ছিলেন। খাজরাজী নকীবদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিত। মহানবী (সা) তাঁকে বনি কাওয়াফিল-এর নকীব নিযুক্ত করেছিলেন। অতপর বিশ্বনবী (সা) আনসারদেরকে মদীনা ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেছিলেন।

হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিত বাইয়াতে উকবায়ে কবিরাহ সমাপ্ত করে মদীনা ফিরে এলেন। এ সময় তাঁর ঈমানী আবেগ ছিল তুঙ্গে। সর্বপ্রথম তিনি নিজের মাতা কুররাতুল আইন (রা)-কে ইসলামে দীক্ষা দিলেন। তারপর নিজের গোত্রের সব মূর্তি পূজারীর বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদের মূর্তি ভাঙ্গা শুরু করলেন। বাল্লী খান্দান বনি কাওয়াফিলের মিত্র ছিল। এই গোত্রের কা'ব (রা) বিন আজরাহ ছিলেন হযরত উবাদাহর (রা) বন্ধু। তিনি নিজের ঘরে এক বিরাট মূর্তি স্থাপন করে রেখেছিলেন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তার পূজা করতেন। হযরত উবাদাহ (রা) একদিন সুযোগ পেয়ে কাবের বাড়ী গেলেন এবং তার মূর্তিকে খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন। অতপর কাবকে বুঝালেন যে, এই মূর্তি যে নিজেকেই রক্ষা করতে পারে না সে তোমার কি কাজে আসবে। কাবের অন্তরে এই কথা গেথে গেল এবং অল্প সময় পর সেও ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করলো। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে (র) বর্ণিত আছে যে, বাইয়াত থেকে ফিরে আসার পর হযরত উবাদাহ (রা) সবসময় মহানবীর (সা) দিদার প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে থাকতেন। সুতরাং বিশ্বনবীর (সা) হিজরতের পূর্বে সামান্য দিনের বিরতি দিয়ে তিনি দু'বার মক্কা গিয়ে রাসূলের দর্শন লাভ করে এসেছিলেন।

মহানবী (সা) হিজরতের পর মদীনা মুনাওয়ারাতে শুভ পদার্পণ করলেন। তাতে যেন হযরত উবাদাহর (রা) সমগ্র দুনিয়ার নিয়ামত প্রাপ্তি ঘটলো। বেশীর ভাগ সময়ই প্রিয় নবীর (সা) সান্নিধ্যে কাটাতে লাগলেন এবং নবীর ফয়েজে সমৃদ্ধ করলেন। এমনকি তিনি ইলম ও ফজিলতের দিক দিয়ে এত উচ্চাসনে সমাসীন হয়েছিলেন যে, আসহাবে সুফফাহর জন্যে প্রতিষ্ঠিত ইসলামের প্রথম শিক্ষালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

হিজরতের পাঁচ মাস পর মহানবী (সা) হযরত আনাসের (রা) বাড়ীতে মুহাজির ও আনসারদেরকে একত্রিত করলেন এবং তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব কায়েম করেছিলেন। মুসতাদরাকে হাকিমে বর্ণিত আছে যে, হুজুর (সা) এ সময়

হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিতকে জলিলুল কদর মুহাজির সাহাবী হযরত আবু মুরছাদ গানুবীর (রা) দ্বীনী ভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন।

ইলম হাসিলের সাথে সাথে হযরত উবাদাহ (রা) হক পথে জান-মালের কুরবানী পেশ করাকে জীবনের মহান লক্ষ্য হিসেবে মনে করতেন। তিনি ছিলেন একজন আপাদমস্তক ত্যাগী মুজাহিদ। মৃত্যু ভয় কখনো তার দৃঢ় সংকল্পের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতো না। যুদ্ধ শুরু হলে তিনি বদর থেকে শুরু করে তাবুক পর্যন্ত সকল যুদ্ধেই মহানবীর (সা) সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং প্রতিটি যুদ্ধেই বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে বীরত্বের হক আদায় করেন।

বিশ্বনবীর (সা) মদীনা আগমনের পর মদীনার ইহুদীদের সাথে শান্তি ও সন্ধির এক লিখিত চুক্তি সম্পাদন করেন। দ্বিতীয় হিজরীর মাঝামাঝি সময়ে ইহুদীদের বনি কাইনুকা চুক্তি ভঙ্গ করলো এবং বাস্তবতঃ এই চুক্তি থেকে সরে দাঁড়ালো। মদীনার অন্যান্য ইহুদী গোত্রের তুলনায় বনি কাইনুকা বেশী মজবুত ও শক্তিশালী ছিল। এই গোত্রের মানুষ সাধারণত শিল্প ও কৃষি কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। কর্মকারী ও স্বর্ণকারী ছিল তাদের বিশেষ পেশা। ধন-সম্পদ ও বিত্ত বৈভব এবং অস্ত্রের আধিক্যে তারা ছিল গর্বিত ও অহংকারী। সুতরাং কোন মুসলমান তাদের মহল্লা অথবা বাজারে গেলে খুব ঠাট্টা-মশকরা করতো। এমনকি একবার তারা একজন মুসলমান মহিলাকে শ্লীলতাহানি করে বসলো। ফলে মুসলমান এবং ইহুদীদের মধ্যে ঝগড়া হয়ে গেল। তাতে একজন মুসলমান শহীদ ও একজন ইহুদী মারা গেল। মহানবী (সা)-কে তাদের এই অপতৎপরতা সম্পর্কে খবর দেয়া হলো। তিনি তাদেরকে সঠিক পথে ফিরে আসার পরামর্শ দিলেন। জবাবে তারা বড়াই করে বললো, মুহাম্মাদ (সা) তো কুরাইশদের ওপর বিজয়ী হয়েছে। কিন্তু তারাতো সমরবিদ্যা কি তা জানে না। মুহাম্মাদের (সা) সাথে যদি আমাদের লড়াই বাধে ; তাহলে তারা বুঝতে পারবে যে যুদ্ধ কি বস্তু এবং আমরা কিভাবে যুদ্ধ করে থাকি।

বনি কাইনুকার জবাব তাদের অতৎপরতার অন্তর্নিহিত বস্তুর প্রতিচ্ছবি ছিল। তাছাড়া সময়ও এসে গিয়েছিল তাদের চুক্তি ভঙ্গ এবং অশান্তি সৃষ্টির যথাযথ শাস্তি প্রদানের। মহানবী (সা) তাদের মহল্লা ঘেরাও করার নির্দেশ দিলেন। পনেরো দিন অবরোধেই তাদের সকল শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল এবং তারা নিঃশর্ত আনুগত্য কবুল করে নিল। কিন্তু মহানবী (সা) বললেন, তারা মদীনায় অবস্থান করতে পারবে না। তাদেরকে অস্ত্র পরিত্যাগ করে তিনদিনের মধ্যে মদীনা ত্যাগ করতে হবে। প্রিয় নবী (সা) তাদের মদীনা ত্যাগের কাজ তত্ত্বাবধানের জন্যে হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিতকে নিয়োগ করলেন। এর

আগে তাদের সাথে হযরত উবাদাহর (রা) মিত্রতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু যখন "হে মুসলমানরা ! ইহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধু বানিও না" কুরআনে হাকিমের এই নির্দেশ নাযিল হলো, তখন তিনি মুহূর্তের মধ্যে বনি কাইনুকার সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেললেন এবং অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে তাদের শহর থেকে বহিষ্কারের দায়িত্ব পালন করলেন।

৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে বাইয়াতে রিদওয়ানের মহান ঘটনা সংঘটিত হলো। হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিতও সেই ১৪শ সাহাবীর (রা) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা সে সময় বিশ্বনবীর (সা) পবিত্র হাতে মৃত্যুর বাইয়াত করেছিলেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে "আসহাবুশ শাজারাহ" উপাধিও প্রকাশ্য ভাষায় জান্নাত নসিবের সুসংবাদ পেয়েছিলেন।

অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময় হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিত মহানবীর (সা) সেই দশ হাজার জানবাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের ব্যাপারে হাজার হাজার বছর পূর্বে "ইসতিসনা কিতাবে" নিম্নলিখিত ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছিল ঃ

"খোদাবন্দ সিনা থেকে এলেন এবং শায়ীর থেকে তাদের ওপর উদিত হলেন। ফারান পাহাড়ে তিনি পরিদৃশ্যমান হলেন। দশ হাজার নেক লোকের সাথে এলেন এবং তাঁর হাতে ছিল একটি প্রোজ্জ্বল শরীয়াত।"

মোটকথা এমন কোন যুদ্ধ ছিল না যাতে হযরত উবাদাহ (রা) ত্যাগ ও বিশ্বস্ততার প্রমাণ পেশ করেননি এবং মহান নবীর (সা) যুগে এমন কোন সম্মান বা মর্যাদা ছিল না যা তিনি লাভ করেননি। আবেগ ও ত্যাগ এবং অন্যান্য সুন্দর গুণাবলীই হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিতকে প্রিয় নবীর (সা) বন্ধু বানিয়ে দিয়েছিল।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে (র) আছে, একবার হযরত উবাদাহ (রা) রোগশয্যায় শায়িত হয়ে পড়লেন। এ সময় স্বয়ং বিশ্বনবী (সা) কতিপয় সাহাবী সমভিব্যাহারে তাঁর শুশ্রূষার জন্যে তাশরীফ নিলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ "উবাদাহ ! শহীদ কে তাকি জানো ?" তিনি স্ত্রীকে বললেন, বালিশে হেলান দেয়ায়ে আমাকে একটু বসিয়ে দাও। অতপর তাঁকে বসিয়ে দেয়া হলো। তিনি আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! শহীদ তিনিই যিনি কানায় কানায় ঈমানে পরিপূর্ণ, আল্লাহর পথে হিজরত করেছেন এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে জিহাদের কাজে এসেছেন। একথা শুনে হুজুর (সা) বললেন ঃ "এ অবস্থায় শহীদের সংখ্যাতো খুব কম হবে। খুন হওয়া, পানিতে ডুবে মরা, কলেরায় মৃত্যু বরণ করা, মহিলাদের প্রসবলকালীন ব্যথায়

মারা যাওয়া এ ধরনের সকল মৃত্যুই শাহাদাতের মৃত্যু এবং এভাবে মৃত্যু বরণকারীরা শহীদ।"

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে যে, একাদশ হিজরীতে বিশ্বনবী (সা) আখিরাতের সফরের পূর্বে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এ সময় হযরত উবাদাহ (রা) আশ্চর্য ধরনের অবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় শুশ্রূষার জন্যে মহানবীর (সা) পবিত্র খিদমতে হাজির হতেন। সে সময়ই প্রিয় নবী (সা) একদিন হযরত উবাদাহকে (রা) একটি দোয়া শিখিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে দোয়াটি হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁকে শিখিয়েছিলেন।

বিশ্বনবীর (সা) ওফাতের পর হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিত জীবনের বেশীর ভাগ সময় শিক্ষা ও ফতওয়া প্রদান, ওয়াজ এবং হেদায়াত ও কিছু রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ দয়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেন। তা সত্ত্বেও তাঁর অন্তর জিহাদের দ্যুতিতে পরিপূর্ণ ছিল। যখনই সুযোগ হতো তখনই সশরীরে জিহাদের ময়দানে গিয়ে পৌছতেন। হযরত আবু বকরের (রা) খিলাফতকালে সিরিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করা হলো। এ সময় হযরত উবাদাহ (রা)ও ইসলামের মুজাহিদদের কাতারে শামিল হয়ে গেলেন এবং কয়েকটি যুদ্ধে নিজের বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন। অসাধারণ বীরত্ব এবং জানবাজীর কারণে হযরত উবাদাহ (রা) আরবের বীরদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করেছিলেন এবং তাঁকে এক হাজার অশ্বারোহীর সমান বলে মনে করা হতো। হযরত ওমর ফারুকের (রা) শাসনকালেও তিনি কয়েকটি যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। ২১ হিজরীতে ইসকান্দারিয়া বিজয়কালে তিনি যে ধরনের সাহসিকতা ও দৃঢ়তা, ভয়হীনতা এবং বাহাদুরী প্রদর্শন করেছিলেন তার উল্লেখ ঐতিহাসিকরা বিস্তারিতভাবেই করেছেন। মিসর অভিযানকালে হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত আমর (রা) ইবনুল আসকে নিয়োগ করেছিলেন। তিনি কিছুদিনের মধ্যেই মিসরের বাবুল ইয়াওন, আরিশ, বালবিস, ফুসতাত প্রভৃতি শহর জয় করে নিলেন। অতপর ইসকান্দারিয়ার দিকে অগ্রসর হলেন। মিসরীয়রা কিল্লা বন্দী হয়ে প্রচণ্ডভাবে মোকাবিলা করলো। তাতে মুসলমানদের অগ্রযাত্রা থেমে গেল। কয়েক মাসেও যখন ইসকান্দারিয়া বিজয় করা সম্ভব হলো না তখন হযরত আমর (রা) ইবনুল আস রাজধানীর কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) চার হাজার সৈন্যকে সাহায্যের জন্যে প্রেরণ করলেন। এই চার হাজার সৈন্য চারজন অফিসারের অধীন ছিল। সেই চারজন অফিসার হলেন ঃ হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়াম, হযরত মিকদাদ (রা) বিন আসওয়াদ কিন্দি, হযরত মুসলিমাহ (রা) বিন মুখাল্লাদ এবং হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিত। সমগ্র আরবে তারা সমর বিশারদ হিসেবে পরিগণিত ছিলেন। এই সৈন্য প্রেরণের সময় হযরত ওমর ফারুকের

(রা) মত মহান ব্যক্তিত্ব হযরত আমর (রা) ইবনুল আসকে লিখেছিলেন যে, এসব অফিসারের প্রত্যেকেই এক হাজার মানুষের সমান। এই ভিত্তিতে এই সেনাবাহিনীর সংখ্যা চার হাজার নয় ; বরং আট হাজার। হযরত ওমর (রা) হযরত আমর (রা) ইবনুল আসকে এই হেদায়াতও দিয়েছিলেন যে, যে সময় তুমি আমার এই পত্র পাবে তখন লোকদেরকে একত্রিত করে তাদের সামনে জিহাদের ফজিলত বর্ণনা করবে এবং যে চারজন অফিসারকে আমি প্রেরণ করেছি তাদেরকে সৈন্যদের সামনে নিয়ে জুময়ার দিনে হামলা করবে।

হযরত আমর (রা) ইবনুল আসের নিকট এই সামরিক সাহায্য পৌঁছলো। তিনি সৈন্যদের সামনে হযরত ওমর ফারুকের (রা) চিঠি পড়লেন। হযরত ওমরের (রা) পত্র শুনে মুজাহিদদের মধ্যে প্রচন্ড উৎসাহ সৃষ্টি হলো। জুময়ার দিন হযরত আমর (রা) ইবনুল আস সৈন্য সাজিয়ে ইসকান্দারিয়ার ওপর পূর্ণভাবে হামলার ইচ্ছা করলেন। তিনি হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিতের কাছ থেকে তার বর্শা নিলেন এবং তার ওপর নিজের পাগড়ী লটকিয়ে তাকে বললেন, পতাকা নিন এবং এই সৈন্য বাহিনীর নেতৃত্ব দিন। আপনিই আজ সেনাপতি। হযরত উবাদাহ (রা) অত্যন্ত উদ্দীপনার সাথে এমন প্রচণ্ডভাবে হামলা চালালেন যে, রোমকদের প্রতিরক্ষা শক্তি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল এবং তারা হয়ে পড়লো হিম্মতহারা। জল ও স্থল পথে যেদিকে পথ পেল সেদিকে পালিয়ে গেল এবং মুসলমানরা বিজয়ীর বেশে ইসকান্দারিয়ায় প্রবেশ করলো। হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিত যে যুগে এই কৃতিত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেয় তখন তার বয়স প্রায় ৬০ বছর ছিল। এই বয়সে এত বীর বিক্রমে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া সেই ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব যে অসাধারণ সাহস ও হিম্মতের অধিকারী ও বীরত্বের ক্ষেত্রে নজিরবিহীন হয়।

হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত উবাদাহর (রা) বীরত্ব ও জানবাজীরই স্বীকৃতি প্রদান করতেন না, বরং তাঁর জ্ঞান ও মর্যাদা এবং অন্যান্য প্রশংসিত গুণাবলী অন্তর দিয়ে স্বীকার করতেন। তিনি নিজের খিলাফতকালে হযরত উবাদাহ (রা)-কে ফিলিস্তিনের কাজী নিয়োগ করেছিলেন। সে যুগে এই প্রদেশের আমীর ছিলেন হযরত আমীর মাবিয়া (রা)। কোন ব্যাপারে তাঁর সাথে কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। আমীর মাবিয়া (রা) কিছু কঠিন কথা বলে ফেললেন। সে কথা হযরত উবাদাহর (রা) অসহনীয় মনে হলো। এই অবস্থায় তিনি ফিলিস্তিন ছেড়ে মদীনা চলে এলেন এবং আসার সময় বলে এলেন, 'ভবিষ্যতে আপনি যেখানে থাকবেন, আমি সেখানে থাকবো না।'

হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁর মদীনা প্রত্যাবর্তনের খবর পেলেন। তিনি তাঁকে একা একা ফিরে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি ঘটনা বর্ণনা

করলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) বললেন ঃ "আমি আপনাকে কোনক্রমেই সেখান থেকে সরিয়ে আনবো না। দুনিয়াটা আপনাদের মত বুজর্গদের কারণেই টিকে আছে। যেখানে আপনাদের মত লোক থাকবে না আল্লাহ সেই জমিনকে খারাপ ও ধ্বংস করে দেবেন। আপনি আপনার স্থানে ফিরে যান। আমি আপনাকে মাবিয়ার (রা) অধীনতা থেকে পৃথক করে নিলাম।"

একই সঙ্গে তিনি আমীর মুয়াবিয়াকে (রা)ও একই ভাষায় চিঠি লিখে দিলেন।

আল্লামা বালাজুরী (র) বর্ণনা করেছেন, সেই যুগে সিরিয়ার আমীর হযরত আবু উবাদাহ (রা) ইবনুল জাররাহ হযরত উবাদাহ (রা)-কে হেমসের দায়িত্ব অর্পণ করেন। দায়িত্ব পালনকালে তিনি লা-জকিয়াহ জয় করেন। এই অভিযানকালে তিনি বড় বড় গর্ত খোঁড়ান। সেই গর্তে একজন মানুষ তার ঘোড়াসহ খুব ভালোভাবেই লুকিয়ে থাকতে পারতো। এই কৌশল সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে ছিল অত্যন্ত কার্যকর। ইউরোপিয়রাও দীর্ঘদিন যাবৎ এই কৌশল অবলম্বন করেছিল।

হেমসের দায়িত্ব পালন শেষে হযরত উবাদাহ (রা) ফিলিস্তিনে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করলেন। সে যুগে ফিলিস্তিনের এলাকা সিরিয়ারই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ জন্যে কেউ কেউ তাঁর স্থায়ী বসতি হিসেবে সিরিয়ার কথাই লিখেছেন। সিরিয়াতে তিনি সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধের দায়িত্ব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অত্যন্ত উৎসাহের সাথেই আঞ্জাম দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি হকে নাঙ্গা তরবারী ছিলেন এবং [illegible]পোষের সামান্যতম ছোঁয়াও তাঁর গা স্পর্শ করেনি। সিরিয়াতে তিনি দেখলেন যে, জনসাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ে এবং লেন-দেনে শরীয়াতের সীমা ও নির্দেশাবলী পালন করছে না। তাতে তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়লেন এবং এক জনসমাবেশে ভাষণ দিলেন। এই ভাষণ শুনে জনগণও উত্তেজিত হয়ে পড়লো। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে বর্ণিত আছে যে, আমীর মুয়াবিয়াও (রা) সেই জনসভাস্থলে ছিলেন। তিনি বললেন ঃ "আপনি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে রাসূলের (সা) যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতো হুজুর (সা) বলেননি।" একথা শুনে হযরত [illegible]দাহ [illegible] ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলেন। কেননা, তিনি সবদিক থেকেই আমীর মুয়াবিয়ার (রা) চেয়ে মর্যাদাবান ছিলেন। অত্যন্ত আবেগের সাথে বললেন, "মুয়াবিয়ার (রা) সাথে থাকার পরওয়া আমি করি না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলে করিম (সা) একথাই বলেছিলেন, যা আমি আপনাদের সামনে বর্ণনা করেছি।"

এ ধরনের আরো কিছু ঘটনা হযরত উবাদাহ (রা) এবং আমীর মাবিয়ার (রা) মধ্যে মতপার্থক্যের কারণ ঘটিয়েছিল। হযরত ওমর ফারুক (রা) নিজের

খিলাফতকালে এই মতপার্থক্য বাড়তে দেননি এবং উভয় বুজর্গের কাজের সীমানা ভিন্ন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত ওসমান গনির (রা) খিলাফত-কালে আমীর মাবিয়া (রা) যখন সমগ্র সিরিয়ার ওপর ক্ষমতাবান গবর্নর হলেন তখন দরবারে খিলাফতে অভিযোগ লিখে পাঠালেন। তিনি লিখলেন যে, উবাদাহ (রা) বিন সামিতের বক্তৃতা ও ভাষণ জনগণকে উত্তেজিত এবং বিশৃংখল করে তোলে। তাঁকে সিরিয়া থেকে প্রত্যাহার করে নিন। তা নাহলে আমি সিরিয়ার শাসন কাজ পরিত্যাগ করবো। হযরত ওসমান (রা) হযরত উবাদাহ (রা)-কে সিরিয়া থেকে ডেকে পাঠালেন। তিনি খিলাফতের দরবারে পৌছলেন। সে সময় সেখানে বিপুল জনসমাগম ছিল। তিনি চুপি চুপি এক কোণায় গিয়ে বসে পড়লেন। হঠাৎ করে হযরত ওসমান (রা) ওপরের দিকে তাকালেন। এ সময় হযরত উবাদাহকে (রা) সামনে দেখতে পেলেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "বলুন, এটা কি ব্যাপার?" আমীরুল মু'মিনের ইরশাদ শুনে হযরত উবাদাহ (রা) হক কথনের আবেগ উথলে উঠলো। তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং সমাবেশকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে মানুষেরা ! রাসূলে করিম (সা) বলেছেন, আমার পর আমীরেরা সৎকে অসৎ এবং অসৎকে সতে পরিবর্তন করবে। অবৈধ কাজকে বৈধ মনে করতে থাকবে। কিন্তু গুনাহর কাজে কারোর আনুগত্য জায়েজ নয়। তোমরা অবশ্যই অসৎ কাজ থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখবে।"

হযরত আবু হুরাইরা (রা) সেখানে বসেছিলেন। তিনি এই বক্তব্যে কিছু বাধা দিতে চাইলে বললেন ঃ

"আমরা যে সময় রাসূলের (সা) সঙ্গে বাইয়াত করেছিলাম তখন তুমি সেখানে ছিলে না। আমাদের বাইয়াতের সময় শর্ত ছিল যে, সুস্থতা ও অসুস্থতা সকল অবস্থাতেই আমরা মহানবীর (সা) নির্দেশ পালন করবো। সচ্ছলতা এবং অসচ্ছলতা উভয় অবস্থাতেই নিজের মাল দিয়ে তাঁকে (সা) সাহায্য করবো। লোকদেরকে ভালো কথা পৌছাতে থাকবো এবং খারাপ কথা থেকে বিরত রাখবো। হক কথনে কারো ভয়ে ভীত হবো না। মহানবী (সা) মদীনায় তাশরীফ নিলে তাঁর দেখা[illegible]ত এমনভাবে করবো যেমন নিজের জান-মাল এবং সন্তানকে করা হয়। এসব শর্ত পূরণের বিনিময়ে জান্নাত পাওয়া যাবে। বস্তুত এই বাইয়াত মহানবীর (সা) সাথে করা হয়েছিল। ওয়াদা পূরণ আমাদের আবশ্যিক কর্তব্য কাজ। যে তা করবে না, সে নিজের দায়িত্বে তা করবে।"–(মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল)

হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিত নিজের উদ্যমপূর্ণ জীবনের ৭৩ বছর অতিক্রম করার পর কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। লোকজন যখন তার

অসুস্থতার খবর পেলো, তখন শুশ্রূষার জন্যে ব্যস্তসন্ত্রস্ত হয়ে তার বাড়ী গেলো। তাদের মধ্যে বড় বড় সাহাবী এবং তাবেয়ীও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। রোগ যদিও খুব কষ্টদায়ক ছিল এবং সুস্থ হওয়ার কোন আশা ছিল না ; তবুও তার মুখ দিয়ে সবসময় আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন অব্যাহত থাকতো। জালিলুল কদর সাহাবী হযরত শাদ্দাদ (রা) বিন আওস আনসারী কিছু লোকের সাথে শুশ্রূষার জন্যে এসেছিলেন, এ সময় তিনি তাঁকে বললেন ঃ আল্লাহর ফজিলতে ভালো আছি। ইমাম বায়হাকী (র) এবং ইবনে আসাকির উবাদাহ বিন মুহাম্মাদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিতের ওফাতের সময় ঘনিয়ে এলো তখন তিনি বললেন, আমার গোলাম, খাদেম, প্রতিবেশী এবং সেইসব ব্যক্তি যারা প্রায়ই আমার কাছে আসতো তাদেরকে ডেকে নিয়ে এসো। তাদেরকে হযরত উবাদাহর (রা) নিকট আনা হলো। তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, সম্ভবত এটাই আমার শেষ দিন এবং আজকের রাত আমার আখিরাতের প্রথম রাত হতে পারে। তোমাদের সাথে আমার হাত অথবা যবান যদি কোন কঠোর আচরণ করে থাকে তাহলে আমার জীবন বায়ু বেরিয়ে যাওয়ার পূর্বেই একে একে এসে তার প্রতিশোধ নিয়ে নাও এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ আমার থেকে প্রতিশোধ নেবেন। লোকেরা আরজ করলেন ! আপনি তো আমাদের পিতৃতুল্য ছিলেন এবং আমাদেরকে আদব ও শিষ্টাচার শিখিয়েছেন। হযরত উবাদাহ (রা) বললেন, তোমরা কি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছ ? সবাই বললো, হ্যাঁ ক্ষমা করে দিয়েছি। হযরত উবাদাহ বললেন, হে আমার আল্লাহ ! সাক্ষী থেকো। অতপর বললেন, যদি কেউ প্রতিশোধ না নাও এবং সবাই ক্ষমা করে দিয়ে থাকো তাহলে আমার ওসিয়ত মুতাবেক কাজ করবে। আমার মৃত্যুর পর কেউ কাঁদবে না। বরং মৃত্যুর পর তোমরা সবাই ভালোভাবে ওজু করে মসজিদে যাবে এবং নামায পড়ে আমার জন্য মাগফিরাত কামনা করবে। আমার কবরের দিকে তাড়াতাড়ি নিয়ে যাবে। আমার পেছনে আগুন নিয়ে যাবে না এবং আমার নীচে বেগুনি রং-এর কাপড় রাখবে না। (সে যুগে জাহেলদের মধ্যে মৃত ব্যক্তির পেছনে পেছনে আগুন নিয়ে যাওয়ার প্রচলন ছিল।)

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে যে, ওফাতের পূর্বে পুত্র আরজ করলো, আমাকে কিছু ওসিয়ত করুন। বললেন, আমাকে উঠিয়ে বসাও। বসে বললেন, "তকদিরের ওপর ইয়াকিন রেখো। নচেৎ, ঈমানের জন্য ভাল হতে পারে না।"

এই অবস্থায় তাঁর নামকরা শিষ্য প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত আবু আবদুল্লাহ আবদুর রহমান বিন আসিলাস সানাবাজী সেখানে উপস্থিত হলেন। মহান উস্তাদের মৃত্যু পূর্ব অবস্থা দেখে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে কাঁদতে লাগলেন। হযরত

উবাদাহ (রা) বললেন, আমি তো তোমার ওপর সন্তুষ্ট আছি। তুমি কেঁদো না। ইনশাআল্লাহ শাফায়াতের প্রয়োজন হলে শাফায়াত করবো। শাহাদাত বা সাক্ষ্যের প্রয়োজন হলে সাক্ষ্য দেবো। মোটকথা, যতটুকু পারি তোমাকে সাহায্য করবো। তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছ থেকে যা কিছু শুনেছিলাম, তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। অবশ্য একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়নি। এখন তা বর্ণনা করছি। হাদিসটি বর্ণনা করেই শেষ নিঃশ্বাস নিলেন এবং এভাবেই হেদায়াত সূর্য ৩৪ হিজরীতে আল্লাহ তায়ালার স্নেহ ছায়ায় অস্তমিত হয়ে গেল। এই ঘটনা ছিল হযরত ওসমানের (রা) খিলাফত কালের। তাঁর দাফন স্থল নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ লিখেছেন বাইতুল মাকদাস। আবার কেউ বলেছেন, রামলাহ। মৃত্যুকালে হযরত উবাদাহ (রা) তিন পুত্র রেখে যান। তারা হলেন ঃ ওয়ালিদ, আবদুল্লাহ এবং দাউদ।

সাইয়েদেনা হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিত সাইয়েদুল আনাম (সা)-এর একজন একনিষ্ঠ প্রেমিক এবং হক পথের একজন মুজাহিদই ছিলেন না ; বরং জ্ঞান ও ফজিলতের দিক থেকেও তাঁর মর্যাদা এত উঁচু ছিল যে, তিনি উম্মাহর অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে পরিগণিত হতেন। তিনি ফকিহ সাহাবীদের মধ্যে বিশেষ স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সেই পাঁচ সাহাবীর একজন ছিলেন, যাঁরা মহানবীর (সা) সামনেই পুরা পবিত্র কুরআন হেফজ করেছিলেন এবং স্বয়ং মহানবীর (সা) নিকট থেকে এত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে দ্বীনি তালিম গ্রহণ করেছিলেন যে, হাদিস ও ফিকাহতে কামালিয়াতের দরজায় পৌঁছে গিয়েছিলেন এই ভিত্তিতে তিনি একক এক মর্যাদা লাভ করেছিলেন। মর্যাদাটি হলো ইসলামী দুনিয়ায় সবেচেয়ে পবিত্র ও সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তিনি ছিলেন মুহতামিম ও শিক্ষক। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মহানবী (সা) আসহাবে সুফফার জন্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আহলে সুফফাহর বড় বড় মর্যাদাবান সাহাবী তাঁর নিকট থেকে শিক্ষা নিতেন এবং লিখা-পড়া করতেন। ইমাম হাকিম (র) ইমাম বায়হাকী (র) ও তিবরানী (র) হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিত থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা) অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতেন। এ জন্যে যখন কোন ব্যক্তি হিজরত করে তাঁর নিকট আসতো, তখন তিনি তাকে আমাদের মধ্যে কারো কাছে সোপর্দ করতেন। আমরা তাকে কুরআন শিখাতাম। সুতরাং বিশ্বনবী (সা) একজনকে আমাকে দিলেন। এই ব্যক্তি আমার ঘরেই থাকতো। আমি তাকে কুরআন পড়াতাম এবং সন্ধ্যার সময় খাবারও খাওয়াতাম। সে যখন চলে যাচ্ছিল তখন ধারণা করলো যে, আমার প্রতি তার কিছু হকও রয়েছে। সে একটি ধনুক আমাকে হাদিয়া স্বরূপ দিল। আমি কাঠের এত সুন্দর ধনুক আর কখনো দেখিনি। আমি বিশ্বনবীর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে এই ঘটনা পেশ করলাম। মহানবী (সা) বললেন ঃ

"তোমার দু' বাহুর মাঝখানে আগুনের স্ফুলিঙ্গ রয়েছে। যদি তুমি তা তোমার ঘাড়ে নাও।" এই বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত উবাদাহ (রা) লোকদেরকে বিনা মজুরীতে শুধু শিক্ষাই দিতেন না বরং তাদেরকে খাবারও খাওয়াতেন।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) "ইসাবা" গ্রন্থে ইমাম বুখারীর (র) উদ্বৃতি দিয়ে লিখেছেন, "ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা) হযরত ওমর (রা)-কে লিখলেন, সিরিয়াবাসীর এমন ব্যক্তির প্রয়োজন, যে তাদেরকে কুরআনে কারিমের শিক্ষাদান করবে এবং ফিকাহর হুকুম-আহকাম বর্ণনা করবে। হযরত ওমর (রা) উবাদাহ (রা) বিন সামিত, মুয়াজ (রা) বিন জাবাল এবং আবুদ দারদাকে (রা) সিরিয়া রওয়ানা করালেন। উবাদাহ (রা) ফিলিস্তিনে অবস্থান করলেন।" হযরত ওমর ফারুকের (রা) নিকট সম্ভবত কুরআন ও ফিকাহতে হযরত উবাদাহর (রা) ইলমি যোগ্যতা গ্রহণযোগ্য ছিল। সেই সাথে তিনি তার বীরত্বের স্বীকৃতি দানকারী ও প্রশংসাকারী ছিলেন। হযরত আমর (রা) ইবনুল আস মিসর প্রবেশের সৈন্য সাহায্য চাইলে সাহায্যকারী সৈন্যদের জন্যে যে চারজনকে অফিসার নিয়োগ করা হয়েছিল, তার মধ্যে একজন ছিলেন হযরত উবাদাহ (রা)। আমীরুল মু'মিনিন হযরত আমর (রা) ইবনুল আসকে লিখলেন, এই ব্যক্তি এক হাজার লোকের সমান।

হযরত উবাদাহ (রা) বিন সামিত থেকে ১৮১টি হাদিস বর্ণিত আছে। এসব হাদিস বর্ণনাকারীদের মধ্যে বড় বড় জালিলুল কদর সাহাবী ও তাবেয়ী অন্তর্ভুক্ত রয়েছিল। হাদিস বর্ণনা করার সময় বিশেষভাবে এই কথার ওপর জোর দিতেন যে, হাদিসটি অন্য কারোর মাধ্যম দিয়ে তার নিকট পৌঁছেনি ; বরং তা তিনি স্বয়ং রাসূলে করিমের (সা) পবিত্র মুখ থেকে শুনেছেন। আমর বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকার প্রশ্নে সবসময় তৎপর থাকতেন। বাড়ীতে হোক অথবা বাইরে, মসজিদে হোক অথবা কোন মজলিসে হোক ; সকল স্থানেই অত্যন্ত সুন্দরভাবে হুজুরের (সা) বাণীসমূহ মানুষের কাছে পৌঁছাতেন। এমনকি গীর্জাতে গিয়েও খৃষ্টানদের সামনেও মহানবীর (সা) ইরশাদসমূহ পুনরাবৃত্তি করতেন। "তাফাক্কুহ ফিদ দ্বীনেও" তিনি ছিলেন নজীরবিহীন। মানুষ তাঁর নিকট অত্যন্ত জটিল সমস্যা নিয়ে আসতো এবং তিনি মুহূর্তের মধ্যে তার সমাধান করে দিতেন। প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত জুনাদাহ (র) বিন আবি উমাইয়াহ বলেছেন, হযরত উবাদাহ (রা) দ্বীনে হকের ফকিহ ছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার (র) "ইসাবাহ" গ্রন্থে ইবনে হাজমের এই বর্ণনা উদ্বৃত করেছেন যে, হযরত উবাদাহ (রা) ফতওয়ার একটি কিতাব প্রণয়ন করা যায়।

হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা) আনসারি

ওহোদের যুদ্ধ (তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে) সংঘটিত হওয়ার কিছুদিন পরের ঘটনা। বিশ্বনবী (সা) একদিন নিজের একজন মাদানী সাহাবীকে বললেন, আজ তিনি তার বাড়ীতে যাবেন। রাসূলের (সা) এই সাহাবী মহানবীর (সা) কথা শুনে এত আনন্দিত হলেন যে, মাটির ওপর আর পা রাখতে পারছিলেন না। দৌড়ে দৌড়ে বাড়ী গেলেন এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে মহানবীর (সা) মেহমানদারীর ব্যবস্থা করলেন। অতপর স্ত্রীকে বললেন ঃ

"দেখ ! রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের গরীবখানায় তাশরীফ আনছেন। তুমি নিজের কাজে ব্যস্ত থেকো। কথাবার্তা বলে মহানবীকে (সা) কষ্ট দিও না।"

কিছুক্ষণ পর প্রিয় নবী (সা)-এর শুভাগমন ঘটলো। এ সময় মেযবান ও তার স্ত্রী সূর্যতুল্য মহানবীর (সা) নিজেদের বাড়ীতে আগমন দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন এবং হুজুরের (সা) সামনে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে বিছানা পেতে দিলেন। বিছানা পেড়ে তার ওপর বালিশও রাখলেন। অতপর মহানবীকে (সা) কিছুক্ষণ আরাম করার আরজী পেশ করলেন। তিনি (সা) বিছানায় শুয়ে পড়লেন। এ সময় মেযবান নিজের গোলামকে বললেন, বকরীর সেই বাচ্চাটি জবেহ করে রান্না করে নিয়ে এসো। তিনি (সা) ঘুম থেকে জেগে হাত মুখ ধুয়ে না খেয়েই যেন চলে না যান।

বিশ্বনবী (সা) ঘুম থেকে জেগে হাত-মুখ ধুলেন। সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাঁর সামনে দস্তরখান বিছিয়ে দিলেন এবং অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে প্রিয় নবীর (সা) পবিত্র খিদমতে গোশত, খোরমা এবং পানি পেশ করলেন। হুজুর (সা) অত্যন্ত খুশী হলেন। তিনি মেযবান বা বাড়ীওয়ালাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"সম্ভবত তুমি জানো যে, আমি খুব আগ্রহের সাথে গোশত খেয়ে থাকি।"

তিনি আরজ করলেন ঃ "হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল।

বাড়ীওয়ালার গোত্রের লোকেরা জানতে পারলো যে, মহল্লার একটি বাড়ীতে মহানবীর (সা) শুভ পদার্পণ ঘটেছে। তখন তারা তাঁকে দর্শনের জন্যে ভেঙ্গে পড়লো। কিন্তু তাদের আবার এ ধারণাও ছিল যে, তারা যদি মহানবীর (সা) কাছে যায় তাহলে তিনি অসহ্য মনে করতে পারেন। এ জন্যে দূর থেকে তাকে দেখেই ফিরে যেতে লাগলেন।

খাওয়া শেষে মহানবী (সা) রওয়ানা দিলেন। এ সময় মেযবানের স্ত্রী ঘরের অভ্যন্তর থেকে বললেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমার স্বামী ও আমার ওপর দরুদ পড়ুন।"

বিশ্বনবী (সা) নির্ধিধায় মেযবান ও তার স্ত্রীর ওপর দরুদ পাঠ করে বললেন, "আল্লাহ্ তোমার ও তোমার স্বামীর ওপর রহমত নাযিল করুন।" অতপর হৃষ্টচিত্তে চলে গেলেন।

মদীনা মুনাওয়ারার এই সৌভাগ্যবান সাহাবী যাঁর ওপর স্বয়ং মহানবী (সা) দরুদ পাঠ করেছিলেন ; তিনি ছিলেন হযরত জাবের (রা) বিন আবদুল্লাহ আনসারী। আর তার ভাগ্যবতী স্ত্রী ছিলেন হযরত সোহায়লা (রা) বিনতে মাসউদ।

সাইয়েদেনা হযরত আবু আবদুল্লাহ জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা) অত্যন্ত মর্যাদাবান সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। খাজরাজ গোত্রের বনু সালমা শাখার সাথে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

জাবির (রা) বিন আবদুল্লাহ (রা) বিন আমর বিন হারাম বিন কা'ব বিন গানাম বিন সালমাহ।

বনু সালমার বসবাস হাররাহ ও মসজিদে কিবলাতাইন পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। কিন্তু স্বয়ং হযরত জাবির (রা) বিন আবদুল্লাহ (রা) খান্দান কবরস্থান ও একটি ছোট মসজিদের মধ্যবর্তী স্থানে বসবাস করতো। হযরত জাবিরের (রা) দাদা আমর বিন হারাম এবং পিতা আবদুল্লাহ (রা) বিন আমর নিজের কবিলার অন্যতম নেতা ছিলেন। আইনুল আরযাক নামক একটি ঝর্ণা ও কয়েকটি দুর্গ তাদের মালিকানাধীন ছিল। তা সত্ত্বেও হযরত জাবিরের (রা) পিতা প্রায়ই ঋণগ্রস্ত থাকতেন। কেননা তিনি অধিক সন্তান ও দাতা মানুষ ছিলেন। প্রিয় নবীর (সা) হিজরতের প্রায় ১৯ বছর পূর্বে হযরত জাবের (রা) জন্মগ্রহণ করেন। আল্লাহ্ পাক তাঁকে নেক স্বভাব দান করেছিলেন। অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় চরিতকার বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বাইয়াতে উকবায়ে কবিরার (নবুওয়াত প্রাপ্তির ১৩ বছর পর) সময় পিতার সাথে ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৯ বছর। কিন্তু অন্য একটি বর্ণনা থেকে স্পষ্ট যে, তিনি পিতা হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আমরের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র) এবং তিবরানী (র) স্বয়ং হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, "বাইয়াতে উকবায়ে কবিরার পূর্বে আনসারদের এমন কোন মহল্লাহ ছিল না যাতে মুসলমানদের একটি দল না পাওয়া যেত। একদিন আমরা সবাই একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমরা আর বিশ্বনবীকে (সা) দীর্ঘদিন যাবৎ মক্কায় বন্ধুহীন ও

সাহায্যকারী হিসেবে রাখবো না। তারপর আমরা হজ্জের সময় মক্কা গেলাম এবং প্রিয় নবীর (সা) সঙ্গে উকবায় মিলিত হলাম।"

বাইয়াতে উকবায়ে কবিরাহ ইসলামের ইতিহাসে এক মহান মর্যাদাকর ঘটনা। এই ঘটনায় যাঁরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাঁরা হলেন বিশেষ মর্যাদার সাহাবী। তাঁরা ছিলেন সেই পবিত্র আত্মার মানুষ যাঁরা সমগ্র আরবের প্রকাশ্য বিরোধিতা সত্ত্বেও মহানবীকে (সা) ইয়াসরাব আগমনের দাওয়াত দিয়েছিলেন। এই দাওয়াতের সময় পূর্ণ প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছিলেন যে, তাঁরা নিজেদের জান-মাল এবং সন্তান দিয়ে মহানবীকে (সা) রক্ষা ও সাহায্য করবেন। এই বাইয়াত বা চুক্তির ফলশ্রুতিতেই কয়েক মাস পর রহমতে আলম (সা) নিজের বাড়ী-ঘর ছেড়ে ইয়াসরাব গমন করেছিলেন এবং সেই ইয়াসরাবই "মদীনাতুন নবী (সা)" হিসেবে সুপরিচিত হয়। বাইয়াতে উকবায়ে কবিরায় অংশগ্রহণকারীরা যেন ইতিহাসের ধারা ও মোড় পাল্টে দিয়েছিলেন। এ কাজ করে তাঁরা এমন সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন যে, তাদের আর কোন জুড়ি ছিল না।

দ্বিতীয় হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে হক ও বাতিলের মধ্যে বদরের ময়দানে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সময় হযরত জাবিরও (রা) যুদ্ধের জন্যে রওয়ানা দিলেন। কিন্তু পিতা হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আমর তাঁকে যেতে দিলেন না। তিনি বললেন, বাড়ীতে থেকে ছোট বোনদের দেখা শুনা করো। বস্তুত তিনি ছিলেন ৯ অথবা ১০ বোনের একমাত্র ভাই। এ জন্যে পিতার নির্দেশ মানলেন। স্বয়ং হযরত আবদুল্লাহ (রা) হুজুরের (সা) সাথে যুদ্ধে গমনের সৌভাগ্য অর্জন এবং বদরের যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। ইমাম বুখারী (র) স্বলিখিত ইতিহাসে লিখেছেন, হযরত জাবির (রা) যদিও যুদ্ধে অংশ নেননি। তবুও বদরে পৌঁছেছিলেন এবং মুসলমানদেরকে পানি পান করিয়েছিলেন। পরবর্তী বছর কুরাইশরা বদরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য অত্যন্ত জোরেশোরে মদীনা মুনাওয়ারার ওপর চড়াও হলো এবং ওহোদের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। সহীহ বুখারীতে আছে যে, যুদ্ধের এক রাত আগে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আমর, হযরত জাবিরকে (রা) ডাকলেন এবং বললেন ঃ

"আমার অন্তর বলছে যে, এই যুদ্ধে সর্বপ্রথম আমার শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য হবে। নিজের জান-মাল এবং সন্তান ও সকল বস্তু থেকে আমি প্রিয় নবীকে (সা) বেশী ভালবাসি। মহানবীর (সা) পর তুমি আমার বেশী প্রিয়। তোমাকে ওসিয়ত করছি যে, বাড়ীতে থেকে নিজের বোনদের ভালোভাবে খোঁজ-খবর ও তত্ত্বাবধান করবে এবং আমার ওপর যে ঋণ রয়েছে তা আদায় করবে।"

হযরত জাবির (রা) যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু পিতার নির্দেশে মজবুর বা বাধ্য হয়ে পড়লেন। কেননা বোনদের মধ্যে ৬জন খুব ছোট ছিল। তিনিও যদি যুদ্ধে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়তেন তাহলে বাড়ী সম্পূর্ণ খালি হয়ে যেত।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আমর ওহোদের ময়দানে বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে শাহাদাত বরণ করলেন। এমনিভাবে তাঁর অন্তরের সাধ পূরণ হলো। পাষাণ হৃদয় মুশরিকরা তার লাশ বিকৃত করে ফেললো (নাক, কান এবং ঠোঁট কেটে ফেললো)। লড়াই শেষ হলে মুসলমানরা লাশ কাপড় দিয়ে ঢেকে দিল। হযরত জাবির (রা) পিতার শাহাদাতের খবর পেয়ে ওহোদের ময়দানে পৌঁছলেন। পিতার লাশের মুখ থেকে কাপড় সরালেন। তার অবস্থা দেখে হুহু করে কেঁদে উঠলেন। ইত্যবসরে তাঁর ফুফু হযরত হিন্দ (রা) বিনতে আমর বিন হারামও এসে পৌঁছলেন। ভাইয়ের লাশ এই অবস্থায় দেখে তিনিও চীৎকার দিয়ে কেঁদে ফেললেন। এই অবস্থায় রহমতে আলম (সা) তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"তোমরা কাঁদো অথবা নাই কাঁদো। ফেরেশতারা নিজের পর্দা দিয়ে আবদুল্লাহর ওপর ছায়া বিস্তার করে রেখেছে।"

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে বর্ণিত আছে যে, হযরত জাবিরের (রা) বোনেরা মদীনা থেকে একটি উঁট প্রেরণ করলেন। তাতে পিতার লাশ উঠিয়ে মদীনা আনা এবং বনু সালামার বংশীয় কবরস্থানে দাফন করার ইচ্ছা ব্যক্ত করা হয়েছিল। হযরত জাবিরও (রা) তাই করতে চাইলেন। কিন্তু মহানবী (সা) অনুমতি দিলেন না এবং হযরত আবদুল্লাহকে (রা) তাঁর ভগ্নিপতি হযরত আমর (রা) ইবনুল জানুই-এর সঙ্গে ওহোদের গনজে শহীদানে একই কবরে দাফন করলেন।

তিরমিযি শরীফে আছে যে, ওহোদের যুদ্ধের পর হযরত জাবির (রা) অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। হুজুর (সা) তাঁকে এই অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এত চিন্তান্বিত কেন ? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! পিতা শহীদ হয়ে গেছেন। অনেক ঋণ রয়ে গেছে। অনেক শিশু সন্তান রেখে গেছেন। সেই চিন্তাই করছি।

হুজুর (সা) বললেন ঃ আল্লাহ পাক তোমার পিতার শাহাদাতের পর তাঁর সাথে সরাসরি এবং বিনা পর্দায় কথাবার্তা বলেছেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা কারোর সাথে পর্দা ছাড়া কথাবার্তা বলেন না। তিনি তোমার পিতাকে নিজের সামনে ডেকে বললেন, হে আমার বান্দাহ ! তোমার যা ইচ্ছা, তা চাও। সে

আরজ করলো, হে আমার পরওয়ারদিগার ! তুমি আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দাও। যাতে আমি আবার তোমার দুশমনদের সাথে লড়াই করতে পারি এবং শাহাদাত প্রাপ্ত হই। আল্লাহ তায়ালা বললেন, এটা আমার অকাট্য সিদ্ধান্ত ; যে দুনিয়া থেকে আসবে তাকে আর ফেরত পাঠানো হবে না। আবদুল্লাহ (রা) আরজ করলেন, হে আমার আল্লাহ ! আমার অবস্থার খবর আমার উত্তরাধিকারদের কাছে পৌঁছে দিন। একথা বলার পর আল্লাহর এই আয়াত নাযিল হলো ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হন তাঁকে মৃত মনে করো না। বরং সে জীবিত।"

মহানবীর (সা) ইরশাদ শুনে হযরত জাবিরের (রা) মনে হলো যেন, তার ক্ষতস্থানের ওপর আরামদায়ক মলম লেপন করে দেয়া হলো। এই ঘটনার কিছু দিন পর মহানবী (সা) সকালে হযরত জাবিরের (রা) বাগানে তাশরীফ নিলেন এবং তার দুই বাগান থেকে জমা করা খেজুরের স্তুপের ওপর বসে গেলেন। তার পূর্বে বিশ্বনবী (সা) হযরত জাবিরের (রা) ইহুদী ঋণ প্রদানকারীকে অনুগ্রহ করে কিছুকম নেয়া অথবা দুই কিস্তিতে তা আদায় করার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু সে পরিষ্কার ভাষায় তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। প্রিয় নবী (সা) এখন হযরত জাবিরকে (রা) খেজুর বন্টন শুরুর নির্দেশ দিলেন। তিনি খেজুর বন্টন শুরু করলেন এবং প্রিয়নবী (সা) দোয়ায় ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন। আল্লাহর কি কুদরত ! খেজুরে এত বরকত হলো যে, সমস্ত ঋণ পরিশোধের পরও অনেক বেঁচে গেল। হযরত জাবির (রা) ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত হয়ে অত্যন্ত খুশী হলেন। মহানবীও (সা) আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন যে, তাঁর (সা) একজন একনিষ্ঠ সাহাবী সবসময়ের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেল। সহীহ বুখারী এবং মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে এই ঘটনাকে প্রিয় নবীর (সা) মুজিজার মধ্যে পরিগণিত করা হয়েছে।

খেজুর বন্টনের পর হযরত জাবির (রা) হুজুরকে (সা) নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর (সা) সামনে গোশত, খুরমা এবং পানি পেশ করলেন। এ সময় প্রিয় নবী (সা) হযরত জাবির (রা) ও তাঁর স্ত্রীর ওপর দরূদ পড়লেন। এই ঘটনার উল্লেখ ওপরে করা হয়েছে।

হযরত জাবির (রা) বদর এবং ওহোদের যুদ্ধে পিতার নিষেধের কারণে অংশ নিতে পারেনি। তারপর তিনি রাসূলের (সা) যুগে সকল যুদ্ধে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ গ্রহণ করেন। ইমাম আহমদ (র) বিন হাম্বলের বর্ণনা মুতাবিক তিনি ১৯টি যুদ্ধে মহানবীর (সা) সফর সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা কতিপয় যুদ্ধের প্রসঙ্গে তাঁর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এবং কোন না কোন বিশেষ ঘটনা তাঁর সাথে

সংশ্লিষ্ট করেছেন অথবা তাঁর যবানীতে তার বর্ণনা করেছেন। এসব ঘটনার কয়েকটি নির্বাচিত ঘটনা নিম্নরূপ ঃ

পঞ্চম হিজরীতে আহযাব বা পরিখার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের জন্যে বিরাট পরীক্ষা। হক বিরোধী আরবের সকল শত্রু একত্রিত হয়ে মদীনার ওপর হামলা করে বসে। এদিকে মুসলমানদেরকে নিজেদের হেফাজতের জন্যে কঠিন পাথরের ভূমিতে খন্দক খুঁড়তে হয়। উপরন্তু খাদ্যের এত ঘাটতি ছিল যে, মুসলমানদেরকে পেটে পাথর বাঁধতে হয়েছিল। হযরত জাবিরও (রা) অন্যান্য মুসলমানের সাথে খন্দক খোঁড়ার কাজে অংশ নিয়েছিলেন। সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা খন্দক বা পরিখা খনন করছিলাম। একটি কঠিন পাথর সামনে পড়লো। লোকেরা মহানবীর (সা)-এর খিদমতে আরজ করলো যে, পরিখায় একটি বড় কঠিন পাথর দেখা যাচ্ছে। প্রিয় নবী (সা) বললেন, আমি খন্দকে অবতরণ করছি, বস্তুত তিনি কোদাল হাতে নিয়ে দাঁড়ালেন। সে সময় তাঁর পবিত্র পেটে (প্রচণ্ড ক্ষুধার কারণে) একটি পাথর বাঁধা ছিল। আমরা তিনদিন ধরে খন্দক খুঁড়ছিলাম। এই সময়ের মধ্যে সামান্য দানাও আমাদের পেটে পড়েনি। বিশ্বনবী (সা) কোদাল দিয়ে পাথরের ওপর আঘাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আমি প্রিয় নবীর (সা) নিকট বাড়ি যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দিলেন। আমি বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে বললাম, মহানবীকে (সা) আজ এমন অবস্থায় দেখেছি যে, আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। ঘরে কি কোন খাদ্য বস্তু আছে ? সে জবাব দিল যে, সামান্য যব এবং বকরীর একটি বাচ্চা আছে। আমি বকরীর বাচ্চাটি জবেহ করলাম এবং তার গোশত হাঁড়িতে রেখে পাকাতে দিলাম। স্ত্রী যব পিষে আটা বানালো। তারপর আমি প্রিয় নবীর (সা) খেদমতে হাজির হলাম এবং আরজ করলাম যে, আমার বাড়িতে তাশরীফ এনে কিছু খাদ্য গ্রহণ করুন। তিনি দাওয়াত কবুল করলেন এবং মুহাজির ও আনসারদেরকে ডেকে বললেন ঃ হে খন্দকবাসী ! আজ জাবের তোমাদেরকে খাওয়ার দাওয়াত দিয়েছে। সুতরাং তোমরা তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে বললেন, তোমার স্ত্রীকে বলো, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি না যাবো ততক্ষণ যেন চুলার ওপর থেকে হাঁড়ি না নামানো হয় এবং উনুন থেকে রুটি বের করা না হয়। আমি খুব পেরেশান হলাম এবং মনে মনে বললাম, প্রিয় নবী (সা) এক বিরাট দলকে এক সা যব এবং বকরীর একটি বাচ্চা খাওয়ার জন্যে ডেকে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে বললাম, আজ তুমি আমাকে লজ্জিত করে ছেড়েছ। বিশ্বনবী (সা) খন্দক-বাসীদেরকে সঙ্গে নিয়ে খাওয়ার জন্যে তাশরীফ আনছেন। স্ত্রী জিজ্ঞেস করলো, প্রিয় নবী (সা) কি তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন ? আমি বললাম হাঁ ;

তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তোমার নিকট কতটুকু খাবার আছে। স্ত্রী বললো ঃ আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সা) বেশী অবহিত আছেন। অতপর মহানবী (সা) সাহাবা (রা) সমেত তাশরীফ আনলেন। তিনি রুটি ছিঁড়ে ছারিদ (এক ধরনের আরবীয় খাবার) বানাতে লাগলেন। চামচ দিয়ে তাতে গোশত উঠিয়ে দিতে লাগলেন এবং গোশত দিয়ে রুটি ঢেঁকে দিতে লাগলেন। তিনি অব্যাহতভাবে এ ধরনের করতে লাগলেন এবং লোকদের সামনে তা পেশ করলেন। পরিবেশিত এই খাবার সবাই আসুদা বা পেট পুরে খেলেন এবং তিনিও খেলেন। তারপরও সেই খাবার বেঁচে গেল। এ সময় তিনি আমার স্ত্রীকে বললেন, তুমিও খাও এবং লোকদেরকেও প্রেরণ করো। কেননা, লোকজন অভুক্ত রয়েছে।"

সহীহ বুখারীর রেওয়ায়াত মুতাবিক, যারা এ সময় খাবার খেয়েছিলো তাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার। কতিপয় অন্য রেওয়ায়াতে এই সংখ্যা তিনশ' এবং ৮শ' উল্লেখ করা হয়েছে। এই ঘটনাও মহানবীর (সা) মশহুর মুজিযার মধ্যে শামিল করা হয়ে থাকে।

খন্দকের যুদ্ধের পর হযরত জাবির (রা) বনু মুসতালিকের যুদ্ধে হুজুরের (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। রওয়ানার পূর্বে হযরত জাবির (রা) কোন কাজে গিয়েছিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি ফিরে না এলেন ততক্ষণ পর্যন্ত মহানবী (সা) যাত্রার নির্দেশ দেননি।

এই ঘটনায় প্রকাশ পায় যে, মহানবী (সা) হযরত জাবিরকে (রা) কত ভালোবাসতেন।

মুসতালিক যুদ্ধের পর হযরত জাবির (রা) আনমারের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। সহীহ বুখারীতে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি আনমারের যুদ্ধে প্রিয় নবীকে (সা) সওয়ারীর ওপর বসে কিবলামুখী হয়ে নামায আদায় করতে দেখেছি।

আনমারের যুদ্ধের পর বাইয়াতে রিদওয়ানের (৬ষ্ঠ হিজরী) মহান ঘটনা সংঘটিত হয়। এই বাইয়াতে অংশগ্রহণকারী ভাগ্যবানদেরকে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট ভাষায় নিজের সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের বা বেহেশতের সুসংবাদ দিয়েছেন। হযরত জাবিরও (রা) সেই সৌভাগ্যবান সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মুসনাদে আহমদে আছে, বাইয়াতে রিদওয়ানের সময় হযরত ওমর ফারুক (রা) রাসূলে আকরাম (সা)-এর এবং হযরত জাবির (রা) হযরত ওমর ফারুকের (রা) পবিত্র হাত ধরে ছিলেন। সহীহ বুখারীর এক বর্ণনা অনুযায়ী সে সময় হুজুর (সা) সেখানে উপস্থিত সাহাবীদেরকে (রা) সম্বোধন করে বললেন, "তোমরা সমগ্র দুনিয়া থেকে উত্তম।"

বাইয়াতে রিদওয়ানের সৌভাগ্য অর্জনের পর হযরত জাবির (রা) খায়বারের যুদ্ধ এবং জাতুর রাকা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। জাতুর রাকা যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় হযরত জাবির (রা)-এর উট একাকি থেমে গেল। হুজুর (সা) তা দেখে বললেন, তার কি হলো। তিনি আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল ! জানি না, কেন এ রকম বিগড়ে গেল। কোনভাবেই চলার নাম পর্যন্ত করছে না।"

বিশ্বনবী (সা) উটকে একটি কোড়া মারলেন এবং দোয়া করলেন। উটটি আগের চেয়েও বেশী দ্রুততার সাথে দৌড়াতে লাগলো। হুজুর (সা) বললেন, আমার কাছে উটটি বিক্রয় করে দাও।

তিনি আরজ করলেন, "আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। বিক্রি করবো না। বরং আপনাকে দিয়ে দিলাম।"

হুজুর (সা) বললেন, না, অবশ্যই দাম দেয়া হবে।

তিনি দরখাস্ত করলেন যে, মদীনা পর্যন্ত তার ওপর যাওয়ার অনুমতি দিন। হুজুর (সা) বললেন, ঠিক আছে।

মদীনা পৌঁছে উটের রশি ধরে রাসূলের (সা) দরবারে হাজির হয়ে আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল ! এই উট গ্রহণ করুন।"

মহানবী (সা) উটের চারপাশে ঘুরছিলেন এবং বলছিলেন, কত সুন্দর উট, কত ভালো উট।

অতপর হযরত বিলালকে (রা) নির্দেশ দিলেন যে, হযরত জাবিরকে (রা) এত আওকিয়া স্বর্ণ মেপে দাও। তিনি স্বর্ণ মেপে দিলেন। তারপর হুজুর (সা) আরো কিছু দিলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তুমি কি উটের মূল্য পেয়েছ ? আরজ করলেন, "হাঁ, আল্লাহর রাসূল ! মহানবী (সা) বললেন, "যাও, উটও নিয়ে যাও। আমার পক্ষ থেকে এটা তোমার প্রতি উপহার।"

অষ্টম হিজরীর রজব মাসে প্রিয়নবী (সা) হযরত আবু উবায়দাহ (রা) ইবনুল জাররাহ-এর নেতৃত্বে সমুদ্রোপকূলের দিকে একটি অভিযান চালান। এই অভিযানের নাম হলো সারিয়্যাহ সাইফুল বাহর অথবা জাইশুল খাবত। এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল কুরাইশের গমনাগমন বা চলাচলের খবর নেয়া। এই অভিযানে তিনশ' লোক অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাতে হযরত জাবিরও (রা) ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত পথিমধ্যে রসদ খতম হয়ে গেল এবং সৈন্যদেরকে কিছুদিন যাবৎ গাছের পাতা ঝেড়ে ঝেড়ে খেতে হয়েছিল। ইত্যবসরে সমুদ্রের ঢেউ এক বিশাল মাছ কূলে তুলে দিল। সৈন্যবাহিনী একে আল্লাহর পুরস্কার হিসেবে গ্রহণ

করলো এবং ১৫ দিন পর্যন্ত তা খেল। সহীহ বুখারীতে হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এই মাছের নাম ছিল আম্বর। লোকজন তার মাছও খেয়েছিল এবং শরীরে তার তেলও ব্যবহার করেছিল। মাছটি এত বড় ছিল যে, হযরত আবু উবায়দাহ (রা) তার একদিক ধরে উঁচ করলেন এবং সেনাবাহিনীর সবচেয়ে লম্বা ব্যক্তিকে উটের ওপর বসিয়ে তার নীচ দিয়ে যেতে বললেন। সে চলে গেল। মুসনাদে আহমদে আছে যে, হযরত জাবির (রা) পাঁচ ব্যক্তিসহ সেই মাছের চোখের হাড়ের মধ্যে বসে গেলেন। কিন্তু কেউ তা বুঝতে পারলো না।

অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময় হযরত জাবির (রা) সেই দশ হাজার পবিত্র ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা রহমতে আলমের (সা) সফর সঙ্গী ছিলেন। তাদের ব্যাপারে হাজার হাজার বছর পূর্বে কিতাবে ইসতিসনাতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল।

মক্কা বিজয়ের পর হযরত জাবির (রা) হুনাইনের যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করেন। পরবর্তী বছর অর্থাৎ নবম হিজরীতে তিনি তাবুকের যুদ্ধের কঠিন সফরে মহানবীর (সা) সফর সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। বিদায় হজ্জেও (দশম হিজরী) প্রিয় নবীর (সা) সাথে ছিলেন।

একাদশ হিজরীতে রিসালাত সূর্য আল্লাহ তায়ালার রহমতের ছায়ায় অস্তমিত হলে হযরত জাবির (রা) দুশ্চিন্তায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং মসজিদে নববীতে বসে একাগ্রচিত্তে পঠন-পাঠনে মশগুল হয়ে পড়লেন। অধিকাংশ সময়ই তিনি লোকদেরকে পবিত্র কুরআন পড়ানো এবং হুজুরের (সা) বাণীসমূহ তাদের নিকট পৌছানোতে ব্যয় করতে থাকেন। দূর দূরান্ত থেকে লোকজন তাঁর খিদমতে হাজির হতেন এবং তাঁর জ্ঞানের সাগর থেকে উপকৃত হয়ে প্রত্যাবর্তন করতেন। হযরত জাবির (রা) মহানবীর (সা) পবিত্র মুখে শুনেছিলেন যে, শিক্ষালাভ ও শিক্ষাদান-এর মর্যাদা জিহাদের মর্যাদার সমান। এ জন্যে শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদান এবং ফতওয়া প্রদানে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। বছরের পর বছর ধরে অব্যাহতভাবে নিজের জ্ঞানের ফয়েজ তিনি জনগণকে প্রদান করেছিলেন। হযরত আলী (রা) কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু-এর খিলাফতকালে হযরত আমীর মাবিয়া (রা) বিরোধী তৎপরতা শুরু করলে হযরত জাবির (রা) হযরত আলীর (রা) প্রতি জোরেশোরে সমর্থন জ্ঞাপন করলেন। ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হযরত আলীর (রা) বাহিনীতে শামিল হয়ে সিফফিনের যুদ্ধে আমীর মাবিয়ার (রা) বিরুদ্ধে পূর্ণভাবে অংশ নিয়েছিলেন। তারপর আবার মদীনা মুনাওয়ারা এসে শিক্ষা ও ফতওয়া প্রদানে ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। এটা ছিল ৩৭ হিজরীর ঘটনা। তিন বছর পর আমীর মাবিয়ার (রা) পক্ষ থেকে বছর বিন আবি আরতাত মদীনা মুনাওয়ারার শাসক নিযুক্ত হয়ে

এলো। এ সময় ঘোষণা করা হলো যে, যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত জাবির (রা) আমির মাবিয়ার (রা) আনুগত্য বা বাইয়াত না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত বনু সালমা নিরাপত্তা পাবে না। হযরত জাবির (রা) উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমার (রা) সাথে পরামর্শ করলেন এবং নিরুপায় চিত্তে বছর বিন আবি আরতাতের নিকট গিয়ে আমীর মাবিয়ার (রা) শাসনের আনুগত্য প্রকাশ করলেন। ইয়াযিদের শাসনকালে (৬১ হিজরীর মহররম মাসে) কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনা সংঘটিত হলো। তাতে হযরত জাবির (রা) সীমাহীন কষ্ট পেলেন। যখন শুনলেন যে, ইয়াযিদ কারবালার শহীদানের উত্তরাধিকাদেরকে হযরত নোমান বিন বশীরের (রা) তত্ত্বাবধানে দামেশক থেকে মদীনা প্রেরণ করেছে, তখন কঠিন বার্ধক্য সত্ত্বেও বনু হাশেমের কিছু লোকের সাথে কারবালা পৌছলেন। উদ্দেশ্য ছিল শোকার্ত কাফেলাকে মদীনা নিয়ে আসা। রাসূল (সা) বংশের মুসিবত যাদাহ কাফেলা যখন দামেশক থেকে কারবালা পৌছলো তখন হযরত জাবির (রা) অশ্রু পূর্ণ নয়নে ও ভাঙ্গা হৃদয়ে তাদেরকে ইসতিকবাল করলেন। হযরত যয়নব (রা) বিনতে আলী (রা) বনু হাশেম-এর লোকদেরকে এবং হযরত জাবিরকে (রা) সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে বনু হাশেম ! তোমাদের চাঁদ ডুবে গেছে। হে আমার নানার (সা) সাহাবী ! তুমি যে শিশুকে হযরত হোসাইন মহানবীর (সা) পবিত্র কাঁধের ওপর সওয়ার করিয়েছিলে ; তার পবিত্র দেহকে ঘোড়ার খুরের তলায় পিষ্ঠ করা হয়েছে।"

হযরত জাবির (রা) এবং সেখানে উপস্থিত অন্যান্য মানুষ হযরত যয়নবের (রা) কথা শুনে দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে কাঁদতে লাগলেন। তারপর তিনি সেই মুসিবত যাদাহ কাফেলার সাথে মদীনা পৌছলেন এবং যতদূর সম্ভব হয়েছিল রাসূলের (সা) মজলুম বংশকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

৭৪ হিজরীতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছাকাফী মদীনা মুনাওয়ারার আমীর নিযুক্ত হয়ে এলো। এ সময় সে এমনসব লোকের ব্যাপারে পুংখানুপুংখ রূপে অনুসন্ধান চালালো যাঁরা হযরত আলীকে (রা) জোরেশোরে সমর্থন দিয়েছিলেন। এই সমর্থকদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক জালিলুল কদর সাহাবীও (রা) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হাজ্জাজ মহানবীর (সা) সেইসব জাননিছার সাহাবীর (রা) মান-মর্যাদার প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে বরং তাদের গর্দান ও হাতে কড়া পরিয়ে দিয়েছিলো। ইবনে আছির (র) "উসদুল গাব্বাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, হাজ্জাজ হযরত জাবিরের (রা) হাতে কড়া পরিয়ে দিল। সে সময় তার বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। চোখে দেখতেন না। অত্যন্ত দুর্বল ও রোগা হয়ে গিয়েছিলেন। প্রথম যুগের সাহাবীদের (রা) মধ্যে তিনিই শুধু জীবিত ছিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পর পরপারের ডাক এলো এবং ইসলামী বিশ্বের সেই মহান ব্যক্তিত্ব তাতে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন। এক বর্ণনা অনুযায়ী হাজ্জাজ নামাযে জানাযা পড়ালো এবং অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত উসমান জুন্নুরাইনের (রা) পুত্র আমার (রা) নামাযে জানাযা পড়িয়েছিলেন এবং জান্নাতুল বাকীতে তাঁর লাশ দাফন করা হয়েছিল।

হযরত জাবির (রা) দুই বিয়ে করেছিলেন। প্রথম স্ত্রীর নাম ছিল সোহায়লাহ (রা) বিনতে মাসউদ। তিনি আনসারের জাফর গোত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। হযরত সোহায়লার (রা) প্রথম স্বামী ওহোদ যুদ্ধের আগে মারা গিয়েছিলেন। হযরত জাবিরের (রা) পিতা হযরত আবদুল্লাহ (রা) ওহোদের যুদ্ধে শাহাদাত পান। এ সময় তিনি হযরত জাবির (রা) ছাড়া ৯ অথবা ১০জন অল্প বয়স্কা মেয়ে রেখে গিয়েছিলেন। সম্ভবত হযরত জাবির (রা)-এর মা ইন্তিকাল করেছিলেন। এ জন্যে তিনি বোনদের দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধানের জন্যে হযরত সোহায়লাহ (রা) বিনতে মাসউদকে বিয়ে করেন। মহানবী (সা) যখন জানতে পারলেন তখন তিনি হযরত জাবিরকে (রা) বললেন ঃ "জাবির তুমি একজন বিধবাকে বিয়ে করেছ। যদি একজন কুমারীকে বিয়ে করতে তাহলে উভয়েই আনন্দ করতে পারতে।

তিনি আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! বোনরা ছিল অল্প বয়েস্কা। এজন্যে কোন হুশিয়ার মহিলা প্রয়োজন ছিল। যে তাদের চুল ছেটে দিতে উকুন বাছতে এবং কাপড় সেলাই করে পরিধান করাতে পারতো।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "তুমি ঠিক করেছ।"

হযরত জাবির (রা) দ্বিতীয় বিয়ে করেন উম্মে হারিছাকে। উম্মে হারিছ ছিলেন জালিলুল কদর সাহাবী হযরত মুহাম্মাদ (রা) বিন মাসলামাহ আনসারীর কন্যা।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে বর্ণিত আছে যে, বিয়ের পূর্বে হযরত জাবির (রা) চুপিসারে উম্মে হারিছকে দেখেছিলেন। কেননা ইসলামে মেয়ে দেখে বিয়ে করার অনুমোদন রয়েছে।

হযরত জাবিরের (রা) এই দুই স্ত্রীর তিন ছেলে ও তিন মেয়ে ছিল। তারা হলো ঃ আবদুর রহমান (অথবা আবদুল্লাহ) আকিল, মুহাম্মাদ, মাইমুনা, হামিদা এবং উম্মে হাবিবা।

হযরত জাবির (রা) সেইসব সাহাবীর (রা) মধ্যে পরিগণিত যাঁরা ইলম ও মর্যাদার দিক থেকে উম্মাহর স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। তিনি বছরের পর বছর ধরে রাসূলের (সা) খিদমতে হাজির থেকে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার

সাথে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করেন। এ ছাড়া তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা), হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু (রা), হযরত তালহা (রা), হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) বিন জাররাহ (রা), হযরত আবু হুরাইরা (রা), হযরত মায়াজ (রা) বিন জাবাল, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা), হযরত উম্মে শুরায়েক (রা), হযরত উম্মে মালিক (রা) এবং আরো অনেক জালিলুল কদর সাহাবী (রা) ও মহিলা সাহাবী (রা) থেকে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। এভাবে তিনি জ্ঞানের ভাণ্ডার ও সাগরে পরিণত হন। কুরআন, হাদীস ও ফিকাহতে তার বিশেষ পাণ্ডিত্ব ছিল। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা বর্ণনা করেছেন যে, শুধুমাত্র মদীনাবাসীই নন বরং এই জ্ঞান সূর্যের আলো থেকে মক্কা মুয়াজ্জমা, ইয়েমেন, ইরাক এবং মিসরের লোকেরা পর্যন্ত আলোকিত হয়েছিলেন। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত জাবির (রা) সেইসব সাহাবীর অন্যতম ছিলেন যাঁরা মদীনা মুনাওয়ারাতে ফতওয়া প্রদান করতেন এবং তাঁদের ফতওয়ার ওপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা যেত।

হাদীস বর্ণনার দিক থেকে হযরত জাবির (রা) সাহাবায়ে কিরামের (রা) প্রথম শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হতেন। তার থেকে এক হাজার পাঁচশ' চল্লিশটি হাদীস বর্ণিত আছে এবং বর্ণিত হাদীসের সংখ্যার দিক থেকে শুধুমাত্র হযরত আবু হুরাইরা (রা) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা), উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) তাঁর থেকে বেশী হাদীস বর্ণনা করেছেন। অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করা সত্ত্বেও হযরত জাবির (রা) হাদীস বর্ণনায় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে সকল ধরনের তাবেয়ীই উপকৃত হয়েছেন। অবশ্য যাঁরা তাঁর খাস শাগরিদদের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন তাঁদের কতিপয় হলেন ঃ

ইমাম মুহাম্মাদ বাকের (র), মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হাসান (রা), আছিম বিন ওমর বিন কাতাদাহ (রা), মু হাম্মাদ বিন মুনকাদার (র), হাসান বিন মুহাম্মাদ হানিফাহ (র), সাঈদ বিন আবি বেলাল (র) ও সায়াদ বিন মিনার (র)।

হযরত জাবিরের (রা) জ্ঞান ও মর্যাদা সমকালীনদের মধ্যে স্বীকৃত ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি অন্যদের কাছ থেকে জ্ঞানার্জনে লজ্জাবোধ করতেন না।

ইমাম বুখারী (র) "তারিখুস সগীরে" হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমাকে কোন একজন বললো, কিসাসের ব্যাপারে হুজুরের (সা) একটি হাদীস আবদুল্লাহ (রা) বিন আনিসের নিকট রয়েছে। তিনি সে সময় সিরিয়াতে ছিলেন। আমি একটি উট কিনলাম এবং সেই হাদীস শ্রবণের জন্যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সিরিয়া পৌছলাম। সেখানে আবদুল্লাহ (রা) বিন আনিসের বাড়ি পৌছলাম এবং তাঁকে বলে পাঠালাম যে জাবির আপনার সাথে

সাক্ষাত করতে এসেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন জাবির, আবদুল্লাহ (রা) পুত্র ? আমি বললাম, জ্বী হাঁ। একথা শুনে তিনি এই অবস্থায় ঘর থেকে বের হলেন যে, তার গায়ের চাদর পায়ের তলায় পড়ে যাচ্ছিল। তিনি আমার সাথে আলিঙ্গন করলেন। অতপর আমি বললাম যে, আমি জানতে পেরেছি যে, আপনার নিকট কিসাস সম্পর্কিত মহানবীর (সা) একটি হাদীস রয়েছে। আমি এই হাদীস শুনতে আপনার নিকট এসেছি। হযরত আবদুল্লাহ বিন আনিস বললেন, আমি রাসূল (সা) থেকে শুনেছি যে, তিনি বলতেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা বান্দাহদেরকে একত্রিত করবেন। সবাই উলঙ্গ ও খাতনাবিহীন অবস্থায় থাকবে এবং বুহম হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বুহমের অর্থ কি ? তিনি বললেন, কারোর নিকট কিছুই থাকবে না। অতপর আল্লাহ তায়ালা ডেকে বলবেন, আমি বদলা দিব। আমিই মালিক। আমি যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক জান্নাতীকে প্রত্যেক দোজখী থেকে এবং প্রত্যেক দোজখী থেকে প্রত্যেক জান্নাতীকে হক আদায় করে না দিব ততক্ষণ পর্যন্ত কাউকে জান্নাতে অথবা দোজখে নিক্ষেপ করবোন না। এমনকি একটি সাধারণ থাপ্পড়ের কিসাস বা বদলাও আদায় করে দেব। আমরা সবাই (উপস্থিত) আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ! এই বদলা কিভাবে দেয়া হবে। কারণ, আমরা তখন সবাই উলঙ্গ ও শূন্য হস্ত থাকবো। হুজুর (সা) বললেন, নেকী ও বদী দিয়ে ফায়সালা করা হবে। এই হাদীস শোনার পর হযরত জাবির (রা) মদীনা মুনাওয়ারা ফিরে এলেন।

তিবরানী "আল আওসাত"–এ বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত জাবির (রা) বিন আবদুল্লাহ (রা) একটি হাদীস শোনার জন্যে হযরত মাসলামাহ (রা) বিন মুখাল্লাদ আনসারীর নিকট মিসরেও গিয়েছিলেন। হযরত মাসলামাহ (রা) যখন তাঁকে বললেন ঃ "আমি প্রিয় নবী (সা) থেকে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের দোষ ঢেকে রাখে, সে যেন জীবিত কবর দেয়া কন্যাকে জীবিত করলো।" একথা শুনে হযরত জাবির (রা) খুব খুশী হলেন এবং মিসরে অবস্থান ছাড়াই মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এই হাদীসের শব্দাবলী এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"যে ব্যক্তি নিজের মুসলমান ভাইকে পর্দাপুশি বা ঢেকে রাখে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাকে ঢেকে রাখবেন।"

হযরত জাবির (রা)-এর কম-বেশী দশ বছর পর্যন্ত অব্যাহতভাবে মহানবীর (সা) সান্নিধ্য ও বন্ধুত্বের সৌভাগ্য লাভ ঘটেছিল। এ সময় তিনি প্রিয় নবীর (সা) পবিত্র যবান থেকে যা কিছু শুনেছেন তাই জীবনের মন্ত্র বানিয়ে নিয়েছিলেন। এমনিভাবে বিশ্বনবীর (সা) যুগে যেসব ঘটনা তাঁর চোখের সামনে সংঘটিত হয়েছিল তা তিনি খুব ভালোভাবেই সংরক্ষণ করেছিলেন।

তিনি এ ধরনের ঘটনাবলী এবং হুজুরের (সা) ইরশাদসমূহ অত্যন্ত বিনয় ও আনন্দচিত্তে মানুষের সামনে বর্ণনা করতেন। তাঁর থেকে বর্ণিত কতিপয় হাদীস এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

❑ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা) একটি বকরীর মৃত বাচ্চার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এই মৃত ছাগ শিশুর নাক ও কান কাটা ছিল। তিনি (সা) লোকদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে এই মৃত ছাগ শিশুকে এক দিরহামের বিনিময়ে কিনবে ? লোকেরা আরজ করলো, আমরা তো তা বিনা পয়সাতেও নিতে পারি না। এখনতো তা মৃত। যখন জীবিত ছিল তখনো দোষযুক্ত হওয়ার কারণে এক দিরহামের বিনিময়ে তা ছিল চড়া দামের। একথা শুনে মহানবী (সা) বললেন, আল্লাহর কসম ! এই মৃত বকরীর বাচ্চা তোমাদের নজরে এত নগণ্য নয় যত নগণ্য এই দুনিয়া আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে। (সহীহ মুসলিম)

❑ প্রিয় নবী (সা) একবার খুতবায় বলেছিলেন, আমি স্বয়ং মুসলমানদের থেকে বেশী তাদের কল্যাণকামী। যদি কোন মুসলমান মারা যায় এবং সম্পদ রেখে যায়। তাহলে তার ওয়ারিশ তার আত্মীয়রা হবেন। কিন্তু ঋণ অথবা গরীব মুহতাজ আত্মীয় রেখে গেলে তা আদায় ও গরীব আত্মীয়ের প্রতিপালন আমার দায়িত্বে। (মুসলিম)

❑ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির ওপর রহম করেন যে কোন জিনিস কেনা-বেচার সময় নরম হয়। উপরন্তু দাবী করার সময় নরম হয়ে থাকে। (সহীহ বুখারী)

❑ মহানবী (সা) থেকে কখনো এমন কিছু চাওয়া হয়নি যে, তিনি (সা) তার জবানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন। (সহীহ বুখারী)

❑ প্রিয় নবী (সা) বলেছেন, প্রত্যেক রোগের ঔষধ আছে। যখন কোন রোগের ঔষধ পৌঁছে যায়, তখন আল্লাহ পাকের নির্দেশে সে সুস্থ হয়ে যায়।

❑ আমি মহানবীর (সা) সাথে জোহরের নামায আদায় করলাম। অতপর তিনি (সা) নিজের বাড়ীর দিকে রওয়ানা দিলেন। আমিও তাঁর সাথে গেলাম। সামনে কয়েকটি শিশু এসে পড়লো। তিনি তাদের প্রত্যেকের গণ্ডদেশে হাত রেখে আদর করলেন। যখন আমার পালা এলো তখন তিনি আমার দুই গণ্ডদেশেই হাত রেখে আদর করলেন। এ সময় আমি তাঁর পবিত্র হাত খুব ঠাণ্ডা মনে করলাম এবং সুগন্ধি অনুভুব করলাম। মনে হলো যেন এইমাত্র আতর বিক্রেতা আতরের পাত্র থেকে তার হাত বের করেছে। (সহীহ মুসলিম)

❑ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মানুষের মৃত্যুর সময় আল্লাহ তায়ালার কাছে সুন্দর ধারণা রাখতে হয় (অর্থাৎ তার রহমতের ওপর পূর্ণ ভরসা করা উচিত)। (সহীহ মুসলিম)

❑ রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে মুসলমান কোন মুসলমানের সাহায্য করা থেকে এমন সময় পিছু হটে যায় যখন তার মান-সম্মান পদদলিত করা হয়। তাহলে আল্লাহপাকও এই নাজুক সময়ে তার সাহায্য-সহযোগিতা পরিত্যাগ করে। অথচ তিনি চান যে, কেউ তার সাহায্যে এগিয়ে আসুক। এবং যে মুসলমান কোন মুসলমানের সাহায্যের জন্যে এমন সময় দাঁড়িয়ে যায় যেখানে তার মান-ইজ্জত পদদলিত করা হয় ; তাহলে আল্লাহ তায়ালাও এমন স্থানে তাকে সাহায্য করে। যেখানে তিনিও চান যে কেউ তাকে সাহায্য করুক। (মুসনাদে আবু দাউদ)

❑ আমরা এক যুদ্ধে রাসূলের (সা) সাথে ছিলাম। (হাদীসের ব্যাখ্যাকারীরা লিখেছেন যে, এটা ছিল বনি আল-মুসতালিকের যুদ্ধ) এমন সময় একজন মুহাজির একজন আনসারীকে লাথি মারলো। এই ঘটনার পর মুহাজির ব্যক্তিটি অন্যান্য মুহাজিরকে সাহায্যের জন্যে ডাকালো এবং আনসারীও অন্যান্য আনসারীকে ডাকলো। তিনি (সা) এই শোরগোল শুনে বললেন, এটাতো জাহেলী যুগের আওয়াজের মত শোনা যাচ্ছে। লোকেরা আরজ করলো, এক মুহাজির কোন এক আনসারীকে লাথি মেরেছে (তাতে কিছু হাঙ্গামা হয়েছে)। হুজুর (সা) বললেন, এই আশোভন কথাবার্তা পরিত্যাগ করো। এই ঘটনার কথা (মুনাফিক সরদার) আবদুল্লাহ বিন উবাইও শুনলো। সে বললো, কি একজন মুহাজির এই কাজ করেছে ? ঠিক আছে মদীনা পৌঁছতে দাও। ইজ্জত ওয়ালা গোষ্ঠী নীচু সম্প্রদায়ের লোকদেরকে অপমান করে বের করে দেবে। হযরত ওমর (রা) ইবনে উবাই-এর কথা জানতে পারলেন। এ সময় তিনি হুজুরের (সা) খিদমতে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি অনুমতি দিলে আমি এই মুনাফিকের গরদান উড়িয়ে দিতে পারি। তিনি (সা) বললেন, রাখো ; লোকজন বলবে যে, আমি নিজের লোকদেরকেও কতল করে থাকি। ইবনে উবাই-এর ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথায় তার পুত্র আবদুল্লাহ (রা) পিতাকে বললেন ঃ আল্লাহর কসম ! তুই মদীনায় সেই সময় পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারবি না যতক্ষণ নিজের মুখে স্বীকার না করবি যে তুই নিজে নীচ এবং মহানবী (সা) সম্মানিত ব্যক্তি। শেষে সে তা স্বীকার করলো। (তিরমিযি)

❑ আমি এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে নজদের দিকে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে আমরা এমন এক উপত্যকায় পৌঁছলাম যেখানে অসংখ্য কাঁটাদার বৃক্ষ পেলাম। হুজুর (সা) স্বয়ং এক বাবলা গাছের তলায় নামলেন। সেনাবাহিনী

অন্যান্য সদস্য বিভিন্ন গাছের ছায়ায় পৌছার জন্যে এদিক-ওদিক চলে গেলেন। হুজুর (সা) নিজের তরবারী সেই বাবলা গাছে ঝুলিয়ে দিলেন। অতপর বাহিনীর সকল সিপাহী ঘুমিয়ে গেলেন। হঠাৎ করে আমরা মহানবীর (সা) কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। তিনি আমাদেরকে ডাকছিলেন। আমরা উপস্থিত হয়ে দেখলাম যে, একজন গোঁয়াড় বা গ্রাম্য মানুষ তাঁর (সা) সামনে দাঁড়ানো। তিনি (সা) বললেন, আমি শুইতে যাচ্ছিলাম। এমন সময় এই ব্যক্তি আমার ওপর তরবারী উঁচু করে ধরলো এবং বললো যে, আমার হাত থেকে তোকে কে বাঁচাতে পারে ? আমি বললাম, আল্লাহ। তারপর তার হাত থেকে তরবারী পড়ে গেল। আমি এই তরবারী উঠিয়ে তাকে বললাম, এখন তোমাকে কে বাঁচাতে পারে ? তাতে সে লজ্জা প্রকাশ করলো এবং ক্ষমা চাইলো। হুজুর (সা) সেই ব্যক্তিকে ছেড়ে দিলেন এবং কোন শাস্তি দিলেন না। সেই ব্যক্তি যখন স্বজাতির কাছে ফিরে গেল তখন বলতে লাগলো যে, আমি এমন এক ব্যক্তির নিকট থেকে আসছি, যে সবচেয়ে উত্তম মানুষ। (সহীহ বুখারী)

❑ হযরত মুয়াজ (রা) বিন জাবাল একদিন নিজের কওমকে নামায পড়াতে গিয়ে সূরায়ে বাকারাহ পড়া শুরু করলেন। (তাঁর লম্বা কিরাতের কারণে) এক ব্যক্তি আলাদা হয়ে হাল্কাভাবে নামায পড়ে নিল। হযরত মুয়াজ (রা) ঘটনা জানতে পেরে বললেন, এই ব্যক্তি মুনাফিক। সে ব্যক্তি একথা শুনে হুজুরের (সা) খিদমতে পৌছে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা শ্রমজীবি মানুষ। স্বহস্তে মজদুরী করি এবং উটের মাধ্যমে পানি ভরি। আজ রাতে মুয়াজ (রা) আমাদের নামায পড়িয়েছে এবং তাতে সূরায়ে বাকারাহ পড়া শুরু করে দেয়। এ জন্যে আমি প্রথৃকভাবে নিজের নামায পড়েছি। তাতে মুয়াজের ধারণা যে আমি মুনাফিক। মহানবী (সা) [হযরত মুয়াজকে (রা) ডেকে] বললেন ঃ মুয়াজ ! ফিতনা সৃষ্টি করতে চাও ? তিনবার এই বাক্য উচ্চারণ করলেন। শুধু ওয়াসশামছি ওয়া দুহাহা এবং সাব্বিহিসমি রাব্বিকাল আ'লা-এর মত সূরা পাঠ করবে। (সহীহ বুখারী)

❑ হুদাইবিয়াতে লোকজন পিপাসার্ত হয়ে পড়লো। নবীয়ে আকরামের (সা) সামনে ছোট একটি পাত্র দিল। এই পাত্র দিয়ে তিনি ওজু করছিলেন। লোকজন ঘাবড়াতে ঘাবড়াতে তাঁর কাছে এলো। তিনি (সা) জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার ? সাহাবারা আরজ করলেন, আমাদের কাছে পান করার এবং ওজু করার পানি নেই। তিনি (সা) নিজের সামনের বরতনে বা পাত্রে নিজের পবিত্র হাত রাখলেন। এ সময় পানি তাঁর (সা) আঙ্গুলের মধ্য দিয়ে এমনভাবে প্রবাহিত হতে লাগলো যেভাবে ঝরণা দিয়ে প্রবাহিত হয়। সেই পানি আমরা পান এবং ওজু করলাম। সে সময় আমরা ১৫০০ মানুষ ছিলাম।(সহীহ বুখারী)

হযরত জাবিরের (রা) নৈতিক ও চারিত্রিক বাগানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ফুল হলো ইসলামে অগ্রবর্তীতা, রাসূল প্রেম, ঈমানী আবেগ, সহজ-সরলতা, জ্ঞানের প্রতি চরম আকর্ষণ এবং হক কথন। এসব সুন্দর গুণের কারণে তিনি মহানবীর (সা) নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। যেভাবে তিনি মহানবীকে (সা) গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং পদে পদে তাঁর আনুগত্য, সম্মান ও সন্তুষ্টির প্রতি দৃষ্টি রাখতেন তেমনি মহানবীও (সা) তাঁকে সীমাহীন স্নেহ ও ভালোবাসতেন।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে যে, কোন সময় মহানবীর (সা) ঋণের প্রয়োজন হলে কোন লৌকিকতা ছাড়াই হযরত জাবিরের (রা) নিকট থেকে তা নিয়ে নিতেন। একবার ঋণ আদায়ের সময় সন্তুষ্টি প্রকাশের নিমিত্তে কিছু বেশীই দিয়ে দিলেন।

যখনই সুযোগ হতো তখনই হযরত জাবির (রা) বিশ্বনবীকে (সা) দাওয়াত দিতেন এবং তিনিও (সা) সন্তুষ্টচিত্তে তা কবুল করতেন। পরিখার যুদ্ধে তিনি যে ইখলাসের সাথে প্রিয় নবীকে (সা) দাওয়াত দিয়েছিলেন তার বিবরণ চরিতকাররা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। হুজুর (সা) একবার হযরত জাবিরের (রা) গৃহে তাশরীফ নিলেন। খাওয়ার পর তিনি তার ও তার স্ত্রীর ওপর দরূদ পড়লেন। অন্য আরেকবার হুজুর (সা) হযরত জাবিরের (রা) গৃহে তাশরীফ রাখলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ একটি মোটাতাজা বকরীর বাচ্চা জবেহ করতে চাইলেন। হুজুর (সা) তা দেখে বললেন, বংশ এবং দুধ কেন বিচ্ছিন্ন করছো ? তিনি আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! এখনো বাচ্চা হলেও খুব মোটাতাজা। তারপর তা জবেহ করে গোশত পাকানো হলো এবং মহানবীকে (সা) খাবার খাইয়ে বিদায় দিলেন।

একদিন হুজুরের (সা) খিদমতে উন্নত ধরনের খেজুর পেশ করলেন। এই খেজুরের মধ্যে বিচি ছিলো না। হুজুর (সা) বললেন, আমি একে গোশত মনে করেছি। তৎক্ষণাৎ তিনি বাড়ি গেলেন এবং বকরী জবেহ করে স্ত্রীকে দিয়ে গোশত রান্না করিয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে মহানবীর (সা) খিদমতে পেশ করলেন।

একবার ঢালু স্থানে খেজুর নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে প্রিয় নবীর (সা) সাথে সাক্ষাত হলো। হযরত জাবির (রা) হুজুরের (সা) খিদমতে খেজুর পেশ করলেন। তিনি (সা) তা কবুল করলেন।

মুসনাদে আহমদে আছে যে, স্বয়ং বিশ্বনবীও (সা) কখনো কখনো স্নেহস্বরূপ হযরত জাবিরকে (রা) দাওয়াত করতেন এবং কোন সময় অন্য

কোন স্থানে দাওয়াত হলে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। একদিন মহানবী (সা) তাঁর হাত ধরে নিজের বাড়ি নিয়ে এলেন এবং পর্দা উঠিয়ে ঘরের লোকদেরকে ডাকলেন। ভেতর থেকে তিনটি রুটি এলো। সেই সাথে একটি পাত্রে সিরকা ছিল। হুজুর (সা) দেড়টি করে তিন রুটি ভাগ করলেন এবং বললেন, সিরকাও কি সুন্দর তরকারী, সিরকাও কি সুন্দর তরকারী। হযরত জাবির (রা) অত্যন্ত উৎসাহের সাথে খাবার খেলেন এবং সারা জীবন সিরকা অত্যন্ত ভালোবাসতেন।

একবার রাসূলে আকরাম (সা) ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। হযরত জাবির (রা) একথা শুনে অস্থির হয়ে পড়লেন। সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে মহানবীর (সা) শুশ্রূষার জন্য গিয়ে উপস্থিত হলেন।

জাতুর রাকা যুদ্ধে হুজুর (সা) হযরত জাবিরের (রা) নিকট থেকে উট কিনলেন এবং মূল্য ছাড়া কিছু অতিরিক্ত অংশও দিলেন। অতপর উটও উপহার স্বরূপ তাঁকে ফেরত দিয়ে দিলেন। হুজুর (সা) তাঁকে বখশিশ হিসেবে যে অংশ দিয়েছিলেন তা তিনি তাবাররুক মনে করে একটি থলিতে সংরক্ষণ করেন। বছরের পর বছর অতিবাহিত হওয়ার পর হিররার ঘটনার সময় সিরিয়াবাসী তার বাড়ির ওপর হামলা চালিয়ে অন্যান্য সামানের সাথে সেই থলিও নিয়ে যায়।

একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে হুজুর (সা) স্বয়ং শুশ্রূষার জন্যে তাশরীফ নিলেন। হযরত জাবির (রা) তখন অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। হুজুর (সা) ওজু করে মুখের ওপর পানির ছিটা মারতেই জ্ঞান ফিরে এলো। সে সময় পর্যন্ত তাঁর কোন সন্তান ছিল না। মাতা-পিতা ওফাত পেয়েছিলেন। ইসলামে এ ধরনের ব্যক্তিকে কালালাহ বলা হয়ে থাকে। মহানবীকে (সা) তাঁর মাথার কাছে বসা দেখে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমি মারা গেলে আমার ওয়ারিশ কে হবে ? আমি কি আমার মিরাছ থেকে দুই-তৃতীয়াংশ বোনদেরকে দিয়ে দেব ? হুজুর (সা) বললেন, ঠিক আছে দিয়ে দাও। পুনরায় তিনি আরজ করলেন, যদি অর্ধেক দেই ? বললেন, দিতে পারো। একথা বলে মহানবী (সা) বাইরে চলে গেলেন। কিন্তু শীঘ্রই ফিরে এসে বললেন, জাবির ! তুমি এই অসুস্থতায় মারা যাবে না। হাঁ, তোমার প্রশ্নের জবাব হিসেবে আল্লাহ তায়ালার এই নির্দেশ নাযিল হয়েছে ঃ

"(হে পয়গাম্বর) তোমার কাছে লোকেরা কালালাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে থাকে। তুমি বলে দাও যে, এ সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ হলো, তোমরা বোনদেরকে দুই-তৃতীয়াংশ দিতে পারো।"

একবার হুজুর (সা) তাঁকে বললেন, যদি বাহরাইন অঞ্চল থেকে সম্পদ আসে তাহলে আমি তোমাকে এতো এতো দেবো। কিন্তু সম্পদ আসার পূর্বেই মহানবীর (সা) ওফাত হয়ে গেল। হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফত -কালের প্রারম্ভে বাহরাইন থেকে সম্পদ এলে রাসূলের (সা) খলিফা ঘোষণা করলেন যে, যে ব্যক্তির সাথে রাসূল (সা) কোন ওয়াদা করেছেন অথবা তাঁর (সা) দায়িত্বে কোন ঋণ রয়েছে ; সে যেন আমার নিকট আসে। হযরত জাবির (রা) বলেন, আমি হযরত আবু বকরের (রা) খিদমতে হাজির হলাম এবং তাঁকে বললাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, আমি তোমাকে এতো এতো দেবো। হযরত আবু বকর (রা) দু' হাত মিলিয়ে দিরহাম পূর্ণ করে আমাকে দিলেন। আমি তা গুণে দেখলাম পাঁচশ' দিরহাম। হযরত আবু বকর (রা) বললেন, এও তোমার এবং তা থেকে দ্বিগুণ আরো নিয়ে নাও। (বুখারী)

বিশ্বনবীর (সা) প্রতি হযরত জাবিরের (রা) ভালোবাসা ও আস্থা এমন তুঙ্গে পৌঁছেছিল যে, তাঁর (সা) ইন্তিকালের পরও নিজের সকল কাজে হুজুরের (সা) বাণীসমূহ ও আমল সামনে রাখতেন। বরং কোন কোন সময় এমন সব কাজেও তাঁর (সা) আনুগত্য করতেন যাতে তাঁর (সা) আনুগত্য তার প্রতি ওয়াজিব নয়। একবার শুধু এক কাপড় পরিধান করে নামায পড়লেন। শিষ্যরা আরজ করলো, আপনার নিকট চাদরও ছিল। তা কেন গায়ে দিলেন না। তাহলে তো দু' কাপড় হয়ে যেত। তিনি বললেন, আমি একবার স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এক কাপড় পরিধান করে নামায পড়তে দেখেছি। এখন আমি হুজুরের (সা) আনুগত্য এ জন্যে করেছি যে, তোমাদের মত বেওকুফ হুজুরের (সা) এই রুখসত কাজকে দেখে অভিযোগ উত্থাপন করতে পারো।

মহানবী (সা) একবার মসজিদে ফাতাহতে পরপর তিন দিন (সোম, মঙ্গল ও বুধবার) দোয়া করেছিলেন। তৃতীয় দিন আল্লাহপাকের তরফ থেকে দোয়া কবুলের সুসংবাদ পেলেন। ফলে বিশ্বনবীর (সা) পবিত্র চেহারা খুশীতে ঝলমল করে উঠলো। এ ঘটনা হযরত জাবিরের (রা) সামনে সংঘটিত হয়েছিল। সুতরাং যখনই কোন মুশকিল সামনে আসতো তখনই মসজিদে ফাতাহতে গিয়ে দোয়া করতেন। আল্লাহ তায়ালা এই মুশকিল আসান করে দিতেন।

তিনি অত্যন্ত সাদাসিদে এবং বিনয়ী ছিলেন। মুসলমানদের কল্যাণের আবেগ সবসময়ই অন্তরে প্রবহমান থাকতো। কারোর অসুস্থতার কথা শুনলে অস্থির হয়ে পড়তেন এবং শুশ্রূষার জন্যে তাশরীফ নিতেন। পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে কেউ কোন সফর থেকে ফিরে এলে তার সাথেও আগেভাগে সাক্ষাত করতেন। মেহমানের আগমন ঘটলে ঘরে যা কিছু থাকতো তাই অত্যন্ত

আনন্দচিত্তে তার সামনে পেশ করতেন এবং তাঁকে লৌকিকতা থেকে বাঁচার পরামর্শ দিতেন।

হক কথন প্রশ্নে এমন ছিলেন যে, কোন রকমের আপসকামীতা তাঁকে হক কথা বলা থেকে বিরত রাখতে পারতো না। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছাকাফী মদীনার গবর্ণর হয়ে এলো। এ সময় সে নামাযের সময়ে কিছু পরিবর্তন করতে চাইল। হযরত জাবির (রা) শুনে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যোহরের নামায দ্বিপ্রহরের পর, আসর সূর্য পরিষ্কার ও আলোময় থাকা পর্যন্ত, মাগরিব সূর্য ডোবার পর এবং ফজর অন্ধকারের মধ্যে পড়তেন। এশার সময়ে মানুষের জন্যে অপেক্ষা করতেন। লোকজন যদি তাড়াতাড়ি এসে যেতো তাহলে তাড়াতাড়ি পড়ে নিতেন। তা না হলে দেরী করে পড়তেন। হাজ্জাজ তাঁর ফতওয়া শুনলো এবং সেই অনুযায়ী কাজ করলো।

একবার এক ব্যক্তি (এক বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর পুত্র) নিজের বাগানের ফল তিন বছরের জন্যে বিক্রি করে দিলেন। হযরত জাবির (রা) তা জানতে পেরে কিছু লোক নিয়ে মসজিদে এলেন এবং সবার সামনে বর্ণনা করলেন যে, হুজুর (সা) এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত ফল পেকে খাওয়ার উপযুক্ত না হয় ; ততক্ষণ তা বিক্রয় করা জায়েজ নয়।

হযরত জাবিরের (রা) গৃহ মসজিদে নববী থেকে এক মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। কিন্তু তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে এসে পড়তেন। যত গরম বা প্রখর রোদ হোক না কেন তার কোন পরওয়া করতেন না। একবার মসজিদে নববীর নিকটে কয়েকটি বাড়ি খালি হলো। হযরত জাবির (রা) সেখানে চলে আসতে চাইলেন। কিন্তু হুজুর (সা) যখন বললেন যে, নামাযে আসার লক্ষ্যে প্রত্যেক কদমে সওয়াব হয়। এ জন্যে দূর থেকে আসায় বেশী সওয়াব হয়ে থাকে। ফলে তিনি তার ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এক মাইল দূর থেকে এসে মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতেন। এমনকি যখন চোখে দেখতে পেতেন না তখনো কারোর সাহায্য নিয়ে নামাযের জন্য মসজিদে আসতেন।

হযরত নুমানুল আ'রাজ (রা) আনসারী

নুমান নাম। লকব হলো আ'রাজ। পা খোঁড়া হওয়ার কারণে এই লকব বা উপাধি ছিল। নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

নু'মান বিন মালিক বিন ছা'লাবা বিন আহরাম (অথবা আছরাম) বিন ফাহর, বিন ছা'লাবা বিন গানামুল খাজরাজী।

ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ বিন আম্মারাহ (র) বর্ণনা করেছেন, বদরের যুদ্ধে তিনি বিশ্বনবীর (সা) সফর সঙ্গী ছিলেন। পরবর্তী বছর ওহোদের যুদ্ধেও শরীক হন। কথিত আছে যে, ওহোদের দিন নিজের শাহাদাতের আকাংখা এমনিভাবে বর্ণনা করেন ঃ হে আল্লাহ ! তোমার কসম, সূর্য ডুবে যাওয়ার আগে নিজের এই খোঁড়া পা নিয়ে সবুজ-শ্যামলিমা জান্নাতে চলা-ফিরা করতে চাই।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই দোয়া কবুল করলেন। তিনি যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাতের পিয়ালা পান করে জান্নাতে পৌঁছলেন।

বিশ্বনবী (সা) হযরত নু'মানের (রা) শাহাদাতের কথা শুনে বললেন ঃ "নু'মানুল আ'রাজ আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করেছিলেন। আল্লাহ পাক তার ধারণা অনুযায়ী কাজ করেছেন। আমি নু'মানকে জান্নাতে চলা-ফেরা করতে দেখলাম এবং তার পায়ে ল্যাংরাপনা ছিল না।"

হযরত বারা' (রা) বিন মা'রুর আনসারি

রহমতে আলম (সা) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা মুনাওরায় শুভ পদার্পণ করলেন। এ সময় মদীনার আনসাররা অন্তর খুলে তাঁর (সা) সামনে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু হুজুর (সা) তাদের মধ্যে একজন জাননিছার আনসারীকে দেখতে পেলেন না। এই আনসারী বাইয়াতে উকবায়ে কবিরাতে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে তাঁর (সা) বাইয়াত করেছিলেন এবং উচ্চস্বরে আল্লাহর কসম খেয়ে এই প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছিলেন যে, হুজুর (সা) মদীনা তাশরীফ নিলে সে নিজের জীবন ও সন্তান-সন্ততি সহ তাঁকে (সা) হেফাজত করবে। হুজুর (সা) তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বলা হলো, তিনি এক মাস পূর্বে পরপারে যাত্রা করেছেন। বিশ্বনবী (সা) এই খবর শুনে খুব কষ্ট পেলেন। তিনি (সা) সাহাবীদেরকে (রা) সঙ্গে নিয়ে তাঁর কবরে তাশরীফ রাখলেন এবং চার তাকবিরের সাথে জানাযার নামায পড়লেন। এই সৌভাগ্যবান রাসূলের (সা) সাহাবী (রা) যাঁর কবরে সাইয়েদুল মুরসালিন, শাফিউল মুজনাবিন বিশ্বনবী (সা) স্বয়ং তাশরীফ নিয়েছিলেন এবং নিজের ২০জন সাহাবী সমেত তাঁর মাগফিরাত কামনা করেছিলেন—তিনি ছিলেন হযরত বারা' (রা) বিন মারুর আনসারী।

সাইয়েদেনা আবু বিশর বিন বারা' (রা) বিন মারুর-এর সম্পর্ক ছিল খাজরাজ খান্দানের 'বনু সালমাহ' গোত্রের সাথে। নসবনামা হলো ঃ বারা' বিন মারুর বিন ছাখার বিন সাবিক বিন সানান বিন উবায়েদ বিন আদি বিন গানাম বিন কা'ব বিন সালমাহ বিন সায়াদ বিন আলী বিন আসাদ বিন সারওয়াহ বিন ইয়াযিদ বিন জাশম বিন খাজরাজ।

মাতার নাম ছিল রুবাব বিনতে নুমান। তিনি ছিলেন সাইয়েদুল আওস হযরত সা'দ (রা) বিন মায়াজ-এর আপন ফুফু। হযরত বারা' (রা) বনু সালমার নেতা এবং কয়েকটি দুর্গের মালিক ছিলেন। ইমারত ও নেতৃত্বের সাথে সাথে আল্লাহ পাক তাঁকে নেক স্বভাব দান করেছিলেন। নবুওয়াতের ১২ বছর পর হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়ের মদীনা মুনাওয়ারা আসেন এবং নিজের তাবলিগী প্রচেষ্টা দ্বারা যাঁদেরকে মুসলমান বানিয়েছিলেন তাদের মধ্যে হযরত বারা' (রা) বিন মারুরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে মদীনার যে ৭৫জন ঈমানদার ব্যক্তি মক্কা গিয়ে বাইয়াতে উকবায়ে কবিরার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন ; হযরত বারা' (রা) বিন মারুর তাদের মধ্যে শুধু শামিলই ছিলেন না বরং তিনি সে সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র) এবং ইবনে হিশাম মুহাম্মাদ বিন ইসহাকের (রা)

উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত কা'ব (রা) বিন মালিক আনসারীর এই রেওয়ায়েত নকল করেছেন যে, আমরা স্ব কওমের মুশরিকদের সাথে হজ্জে রওয়ানা হয়ে গেলাম, আমাদের (মুসলমান) সাথে আমাদের বুজর্গ এবং সরদার বারা' (রা) বিন মারুরও ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি বললেন, আমার একটি মত আছে। জানি না, তোমরা সেই মতের সাথে ঐকমত্য পোষণ করবে ; না দ্বিমত প্রকাশ করবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, মতটা কি ? তিনি বললেন, আমার মত হলো, আমি কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়ি এবং সেদিকে পিঠ না দিই। আমরা বললাম, আমরা তো জানি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সিরিয়ার (বাইতুল মুকাদ্দাস) দিকে মুখ করে নামায পড়ে থাকেন। আমরা তো তাঁর (সা) তরিকার খিলাফ কাজ করবো না। কিন্তু বারা' (রা) বিন মারুর কা'বার দিকে মুখ করেই নামায পড়তে লাগলেন এবং আমরা তাকে এ কাজে বাধা দিতে লাগলাম। আমরা যখন মক্কা পৌঁছলাম তখন বারা' (রা) আমাকে বললেন ঃ

"ভ্রাতুষ্পুত্র, চলো রাসূলের (সা) খিদমতে হাজির হই এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করি যে, কা'বার দিকে মুখ করে আমার নামায পড়া জায়েজ না নাজায়েজ ? কেননা তোমাদের মতবিরোধের কারণে আমার অন্তরে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে।"

সুতরাং আমরা দু'জন মক্কার এক ব্যক্তির নিকট থেকে তাঁর (সা) ঠিকানা জেনে হেরেম শরীফ গেলাম। সেখানে তিনি (সা) নিজের চাচা আব্বাস (রা) সহ উপস্থিত ছিলেন। আমরা তাঁকে সালাম করলাম। তিনি (স) আব্বাসকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এই দু'জনকে চিনেন ? আব্বাস (রা) বাণিজ্য ব্যাপদেশে আমাদের এখানে আসতেন এবং আমাদেরকে চিনতেন। তিনি বললেন, হাঁ। ইনি হলেন বারা' (রা) বিন মারুর, আর ইনি হলেন কা'ব (রা) বিন মালিক। বারা' (রা) তাঁকে (সা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহ আমাকে ইসলামের পথ দেখিয়েছেন এবং সফর করে আমি এখানে এসেছি। আমার ধারণা হলো, আমি কা'বার দিকে পিঠ না দিয়ে বরং সেদিকে মুখ করে নামায পড়ি এবং আমি এভাবেই নামায পড়ে থাকি। কিন্তু আমার সঙ্গীরা এর বিরোধী। এ ব্যাপারে আপনার নির্দেশ কি ? বিশ্বনবী (সা) বললেন, "তুমি এক কিবলার ওপর নিশ্চয়ই রয়েছ। তবে, এখনো ধৈর্য ধরতে হবে। সুতরাং বারা' (রা) তাঁর (সা) আনুগত্যে বাইতুল মুকাদ্দাস এর দিকে মুখ করে নামায পড়তে লাগলেন।"

আইয়ামে তাশরীকের মধ্যবর্তী দিনে বিশ্বনবী (সা) হযরত আব্বাসের (রা) সমভিব্যাহারে উকবা তাশরীফ আনলেন। এখানে মদীনার সকল হকপন্থী (মুশরিকদের) থেকে পৃথক হয়ে একত্রিত ছিলেন। কিছুক্ষণ মহানবী (সা) এবং আনসারদের মধ্যে আলোচনা হলো। সে সময় যখন আনসাররা বললেন যে,

আপনি (সা) আপনার জন্যে যে প্রতিশ্রুতি আমাদের কাছ থেকে নিতে চান, তা নিয়ে নিন। তখন হুজুর (সা) বললেন ঃ

"আমি তোমাদের নিকট থেকে এই প্রতিশ্রুতি বা বাইয়াত নিচ্ছি যে, তোমরা আমাকে সেইভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকবে যেভাবে স্বয়ং নিজের পরিবার-পরিজনকে করে থাকো।"

ইমাম আমহদ (র) এবং ইমাম বায়হাকী (র) লিখেছেন, হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে হযরত বারা' (রা) বিন মারুর হুজুরের (সা) পবিত্র হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে আরজ করলেন ঃ

"জ্বী হ্যাঁ। আল্লাহর কসম ! যিনি আপনাকে হকের সাথে প্রেরণ করেছেন। আমরা আমাদের জীবন ও সন্তান-সন্তুতির মত আপনাকে হেফাজত করবো। হে আল্লাহর রাসূল ! আমাদের নিকট থেকে বাইয়াত নিন। আমরা যুদ্ধ অভিজ্ঞ মানুষ এবং তা নিজেদের বাপ-দাদার উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি।"

ওয়াকেদী এক বর্ণনায় সে সময়ে হযরত বারা' (রা) বিন মারুর-এর এই বাক্যাবলী উদ্বৃত করেছেন ঃ

"আমরা অনেক যুদ্ধ সরঞ্জাম ও লড়াই-এর শক্তি রাখি। আমাদের এই অবস্থা তখন ছিল যখন আমরা মূর্তিপূজক ছিলাম। ভালো, এখন আমাদের অবস্থা কি হবে। এখনতো আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেদায়াত করেছেন। এই হেদায়াত থেকে অন্যরা রয়েছে বঞ্চিত এবং মুহাম্মাদ (সা)-এর মাধ্যমে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন।"

ইবনে সায়াদ এক বর্ণনায় বাইয়াতে উকবার সময় হযরত বারা' (রা) বিন মারুরের প্রতি এই বাক্যাবলী আরোপ করেছেন ঃ

"হে আব্বাস, আমরা আপনার কথা শুনেছি (অর্থাৎ তোমরা খুব চিন্তা-ভাবনা করে নাও যে, সমগ্র আরবের বিরোধিতার মোকাবিলা করার শক্তি তোমাদের আছে কি না)। আল্লাহর কসম ! আমাদের অন্তরে অন্য কিছু থাকলে তা পরিষ্কার করে বলে দিতাম। কিন্তু আমরা তো রাসূলের (সা) সাথে সত্যিকার ওয়াদা পূরণ এবং তাঁর (সা) জন্যে জীবন দান করতে চাই।"

এই বর্ণনা থেকে হযরত বারা' (রা) বিন মারুরের নিষ্ঠা এবং ঈমানী আবেগের আন্দাজ করা যায়। এই আলোচনার পর মদীনার সকল হকপন্থী হুজুরের (সা) হাতে বাইয়াত হয়ে গেলেন। ইতিহাসে এই বাইয়াত উকবায়ে কবিরা অথবা লাইলাতুল উকবা নামে প্রসিদ্ধ।

বাইয়াতের পর হুজুর (সা) আনসারদেরকে বললেন, নিজেদের মধ্য থেকে ১২জন নকিব নির্বাচন করে দাও। এসব নকিব স্ব স্ব কবিলার দায়িত্বশীল

হবেন। সুতরাং আনসাররা ১২জন নকিব নির্বাচন করলেন। তাদের মধ্যে ৯জন ছিলেন খাজরাজি এবং ৩জন আওস-এর। খাজরাজের ৯জন নকিবের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত বারা' (রা) বিন মারুর। তাঁকে বনু সালমার নকিব নির্বাচিত করা হয়েছিল।

বাইয়াতে উকবায়ে কবিরার সৌভাগ্য মণ্ডিত হয়ে হযরত বারা' (রা) বিন মারুর মদীনা ফিরে এলেন এবং প্রতিদিন হুজুরের (সা) প্রতীক্ষায় অস্থিরতার মধ্য দিয়ে কাটাতে লাগলেন। কিন্তু আফসোস ! এই দুনিয়ায় মহানবীর (সা) চেহারা মুবারক দেখার আর ভাগ্য হলো না। প্রিয়নবী (সা) হিজরতের এক মাস পূর্বে সফর মাসে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। বাঁচার আর যখন আশা রইলো না তখন ওসিয়ত করলেন যে, কবরে যেন তাকে কিবলামুখী রাখা হয় এবং যখন মহানবী (সা) মদীনা তাশরীফ আনেন তখন তার সকল সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ যেন তাঁর খিদমতে পেশ করা হয়। তারপর নিজের মুখ কিবলামুখী করলেন এবং সেই অবস্থাতেই মহান আল্লাহর নিকট নিজের জীবন সপে দিলেন।

বিশ্বনবী (সা) মদীনা তাশরীফ আনার পর তাঁর কবরে গমন করলেন এবং তার জন্যে মাগফিরাত কামনা করলেন। হযরত বারা'র (রা) ওসিয়ত অনুযায়ী তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ হুজুরের (সা) খিদমতে পেশ করা হলো। তিনি তা গ্রহণ করলেন এবং তার উত্তরাধিকারদের নিকট ফেরত দিয়ে দিলেন।

হযরত বারা' (রা) বিন মারুর বিশার (রা) নামক একজন পুত্র এবং সালাফাহ (রা) নাম্নী একজন মেয়ে রেখে যান। তাঁরা উভয়েই সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

হযরত বারা' (রা) বিন মারুর যদিও বিশ্বনবীর (সা) মদীনা হিজরতের আগেই ওফাত পেয়েছিলেন ; তবুও তিনি মহান মর্যাদাবান সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। কেননা তিনি লাইলাতুল উকবাতে যে ঈমানী আবেগ প্রদর্শন করেছিলেন। তা ছিল নজিরবিহীন। চরিতকাররা তাঁকে মুত্তাকী, সম্মানী এবং ফকিহ এর লকবে স্মরণ করে থাকেন।

হযরত বিশর বিন বারা' আনসারী (রা)

সাইয়েদেনা হযরত বিশর (রা) জালিলুল কদর সাহাবী হযরত বারা' (রা) বিন মারুরুল আনসারী আল-খাজরাজী আস সালমী আল-উকবান নকিব-এর পুত্র ছিলেন। নসবনামা হযরত বারা' (রা) বিন মারুর-এর জীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত বিশর (রা) মহানবীর (সা) হিজরতের এক বছর পূর্বে পিতার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতপর নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে হজ্জের সময় তাঁর সঙ্গে মক্কা গিয়ে বাইয়াতে উকবায়ে কবিরার মহান সৌভাগ্য লাভ করেন। হযরত বারা' (রা) রহমতে আলম (সা)-এর মদীনা শুভ পদার্পণের এক মাস পূর্বে ইনতিকাল করেছিলেন। তিনি তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ হুজুরের (সা) পক্ষে ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন। হুজুর (সা) মদীনা মুনাওয়ারা তাশরীফ নিলেন। এ সময় হযরত বিশর (রা) এই সম্পদ মহানবীর (সা) খিদমতে পেশ করলেন। হুজুর (সা) তা গ্রহণ করে পুনরায় হযরত বিশরকে (রা) ফেরত দিয়ে দিলেন।

হযরত বিশর (রা) আনসারদের অন্যতম বাহাদুর যুবক ছিলেন। মহানবীর (সা) প্রতি ছিল তার অকৃত্রিম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ এবং প্রিয় নবীও (সা) তাকে খুব স্নেহ করতেন। এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত বারা' (রা) বিন মারুর-এর ওফাতের পর বনু সালমার এক মালদার ব্যক্তি জাদ বিন কায়েস তাদের সরদার হয়ে গেল। হুজুর (সা) মদীনা মুনাওয়ারা তাশরীফ নিলেন। এ সময় তিনি বনু সালমার লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এখন তোমাদের সরদার কে ? তারা আরজ করলেন, জাদ বিন কায়েস। হুজুর (সা) বললেন, তাকে তোমরা সরদার বানিয়েছ কেন ? তারা আরজ করলো, শুধু মালদার হওয়ার কারণেই তাকে সরদার বানানো হয়েছে। সে একজন নিম্নশ্রেণীর বখিল। হুজুর (সা) বললেন, "ভালো, বখিলা থেকে বড় কোন রোগ আছে ? সে তোমাদের সরদার হতে পারে না।"

বনু সালমার আনসাররা আরজ করলো, তাহলে আপনিই ইরশাদ করুন ঃ আমাদের নেতা কে হবেন ? তিনি বললেন, তোমাদের নেতা বা সরদার হলো বিশর (রা) বিন বারা' (রা) বিন মারুর। সুতরাং সেদিন থেকে হযরত বিশর (রা) বনু সালমার সরদার নির্ধারিত হলেন।

বাইয়াতে উকবার মর্যাদা লাভের পর হযরত বিশর (রা) বদরী সাহাবী হওয়ারও সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তারপর তিনি ওহোদ এবং খন্দকের যুদ্ধে

বীরত্বমূলক খিদমত আঞ্জাম দেন। খায়বারের যুদ্ধেও বিশ্বনবীর (সা) সঙ্গী ছিলেন। খায়বার বিজয়ের পর যয়নব বিনতে হারিছ নাম্নী একজন মহিলা মহানবীর (সা) সামনে বিষ মিশ্রিত বকরীর গোশত রাখলো। সে সময় যত সাহাবী সেখানে উপস্থিত ছিলেন সকলকেই হুজুর (সা) তাতে শরীক করলেন এবং সর্বপ্রথম নিজেই খাওয়া শুরু করলেন। কিন্তু এক লোকমাহ মুখে দিয়েই হাত টেনে নিলেন এবং বললেন, এই খাবারে বিষ আছে। একথা শুনতেই সকল সাহাবী (রা) খাওয়া থেকে বিরত থাকলেন। ইত্যবসরে হযরত বিশর (রা) কয়েক লোকমা খেয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর বর্ণনা হলো, এই খাবারের স্বাদ তার নিকটও খারাব মনে হয়েছিল। কিন্তু তিনি রাসূলে আকরামের (সা) সামনে খাবার উগড়ে ফেলাটা বেয়াদবী মনে করলেন। যার পরিণতিতে বিষক্রিয়ায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী তিনি সেখানেই ইনতিকাল করেছিলেন। কিন্তু কেউ কেউ লিখেছেন যে, এক বছর অসুস্থ থাকার পর তিনি ওফাত পেয়েছিলেন।

যয়নব বিনতে হারিছের পরিণতি কি হয়েছিল সে সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনা মতে, হুজুর (সা) তাকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। এ সময় সে নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করেছিল। সে বলেছিল, এজন্যে সে খাদ্যে বিষ মিশিয়েছিল যে, যদি তিনি পয়গম্বর হন তাহলে বিষ তাঁর ওপর ক্রিয়া করবে না। আর যদি তিনি পয়গম্বর না হন তাহলে তারা তার থেকে নাজাত পেয়ে যাবে। এখন সে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আপনি সত্যিকার পয়গম্বর। অতপর সে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করলো। হুজুর (সা) তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে, হুজুর (সা) তাকে হযরত বিশরের (রা) কিসাসে হত্যা করিয়েছিলেন।

তৃতীয় বর্ণনা হলো, হুজুর (সা) যয়নবকে হযরত বিশরের (রা) উত্তরাধিকারদের কাছে সোপর্দ করে দিয়েছিলেন। ওয়াল্লাহু আ'লামু বিস সাওয়াব (এ ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন)। হযরত বিশর (রা) জালিলুল কদর সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন।

হযরত আওস (রা) বিন ছাবিত আনসারী

খাজরাজের "বনু নাজ্জার" খান্দানের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ আওস (রা) বিন ছাবিত বিন মানযির বিন হারাম বিন আমর বিন যায়েদ বিন মানাত বিন আদি বিন আমর বিন মালিক বিন নাজ্জার বিন ছা'লাবা বিন আমর বিন খাজরাজ।

হযরত আওস (রা) রাসূলের (সা) কবি হাসসান (রা) বিন ছাবিতের বৈপিত্রীয় ভাই ছিলেন। তাঁর দাদারা কবিলার সরদার পরিগণিত হতেন। হযরত আওস (রা) মহানবীর (সা) হিজরতের পূর্বে ঈমান আনার সৌভাগ্য এবং নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে হজ্জের মওসুমে মক্কা গিয়ে বাইয়াতে উকবায়ে কবিরায় শরীক হওয়ার মহান মর্যাদা লাভ করেন। এই ব্যাপারে তিনি নিজের শ্রদ্ধেয় ভাই হযরত হাসসান (রা) বিন ছাবিত-এর চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন।

রহমতে দো আলম (সা) মদীনায় শুভ পদার্পণ এবং কয়েক মাস পর মুহাজির ও আনসারদের ভ্রাতৃত্ব কায়েম করলেন। এ সময় আওসকে (রা) হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের (রা) দ্বীনি ভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন। তার আগে হযরত ওসমান (রা) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা এসেছিলেন। তখন হযরত আওসই (রা) তাঁকে নিজের মেহমান বানিয়েছিলেন।

হযরত আওস (রা) একজন সাহসী পুরুষ ছিলেন এবং তিনি নিজের জীবন আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের (সা) সন্তুষ্টির জন্যে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। সর্বপ্রথম তিনি বদরের যুদ্ধে জীবন উৎসর্গের নমুনা প্রদর্শন করেছিলেন। তারপর ওহোদের যুদ্ধে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নেন এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হন।

হযরত আনাস (রা) বিন মালিক আনসারী

রহমতে আলম (সা) মক্কা থেকে হিজরত করে ইয়াছরাবে শুভ পদার্পণ করলেন। এ সময় খেজুর বৃক্ষে ঘেরা এই পুরাতন শহরে নব বসন্তের আবির্ভাব ঘটলো। শহরটি ইয়াছরাব থেকে "মদীনাতুন নবী" শহরে পরিবর্তিত হলো। তার অলি-গলি নবুওয়াতের আলোয় ঝল-মলিয়ে উঠলো। প্রতিটি আনাচে-কানাচে রিসালাতের সুবাসে সুরভিত হয়ে গেল। সে যুগেরই কথা, একদিন মদীনা মুনাওয়ারার এক সম্ভ্রান্ত মহিলা রাসূলের (সা) খিদমতে হাজির হলেন। তাঁর সাথে ছিল ৯-১০ বছরের একটি সুদর্শন কিশোর। কিশোরটির কপাল সৌভাগ্যের বিভায় আলোকজ্জল ছিল। মহিলাটি অত্যন্ত আদবের সাথে হুজুর (সা)-কে সালাম করলেন। তারপর সেই কিশোরের হাত ধরে এভাবে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। এ হলো আমার কলিজার টুকরা। তাকে আপনার কাছে অর্পণ করলাম। তাকে আপনি গ্রহণ করুন। সে আপনার খিদমত করবে।"

বিশ্বনবী (সা) মহিলার নিষ্ঠাপূর্ণ আবেগের প্রশংসা করলেন। কিশোরটির মাথায় হাত দিয়ে স্নেহের পরশ বুলালেন। তার কল্যাণ কামনা করে দোয়া করলেন। অতপর মহিলাটির আকাংখা অনুযায়ী কিশোরটিকে নিজের রহমতের ছায়ায় স্থান দিলেন।

মদীনা ভূমির এই সৌভাগ্যবান কিশোর ও ন'/দশ বছর বয়সে সে সারওয়ারে কায়েনাত, ফখরে মওজুদাত সাইয়েদুল মুরসালিন সাহিবে কাবা কাওসাইন (সা)-এর খাদিম হওয়ার মহান মর্যদা লাভ করেছিল এবং যে ব্যক্তি হুজুর পুরনূর (সা)-এর ওফাত পর্যন্ত মন ও অন্তর দিয়ে তাঁর (সা) খিদমতের হক আদায় অব্যাহত রেখেছিলেন ; তিনি ছিলেন হযরত আনাস (রা) বিন মালিক আনসারী।

হযরত আনাস (রা) বিন মালিক সেই সকল মহান সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে উম্মাহর স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়ে থাকে। তাঁর কুনিয়ত আবু হামযাহ এবং আবু ছুমামাহ উভয়ই ছিল। লকব ছিল "খাদিমে রাসূলুল্লাহ।" তিনি খাজরাজের সম্ভ্রান্ততম খান্দান "বনু নাজ্জারের" সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ

আনাস (রা) বিন মালিক বিন নাজ্জার বিন জামজাম বিন জায়েদ বিন হারাম বিন জুন্দুব বিন আমের বিন গানাম বিন আদি বিন আন-নাজ্জার।

হযরত আনাস (রা)-এর মাতার নাম ছিল উম্মে সুলাইম (রা)। তিনি মহান মহিলা সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। নবীর (সা) হিজরতের দু'-তিন বছর পূর্বে হযরত আনাসের (রা) বয়স যখন ৭-৮ বছর ; তখনই মদীনায় ইসলামের চর্চা এবং বিস্তার ঘটতে থাকে। তাঁর নেক স্বভাব মা নির্ধিধায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সাথেই হযরত আনাসের (রা) চাচা হযরত আনাস (রা) বিন নজর, খালা হযরত উম্মে হারাম (রা) এবং মামা হযরত হারাম (রা) বিন মিলহানও মুসলমান হয়েছিলেন। হযরত উম্মে সুলাইম (রা) নিজের শিশু পুত্র আনাসকেও (রা) নিজের রঙে রঞ্জিত করতে চাইলেন। তিনি তাকে কালেমা পড়াতেন এবং ইসলামী শিষ্টাচার শিখাতেন। দুর্ভাগ্য বশত হযরত আনাসের (রা) পিতা মালিক বিন নজর শুধুমাত্র পৈত্রিক ধর্মের ওপরই অটল রইলেন না বরং হযরত উম্মে সুলাইমের (রা) ইসলাম গ্রহণেও খুব অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁকে নিজের পুত্র আনাসকে (রা) কালেমা পড়াতে নিষেধ করলেন। কিন্তু ইসলামের নেশাতো এমন ছিল না যে ভয়-ভীতি বা উৎসাহের মাধ্যমে তা দূর করা যেতে পারে। হযরত উম্মে সুলাইম (রা) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ইসলামের ওপর কায়েম রইলেন এবং শিশু আনাসকেও (রা) সেই রাস্তায় চালাতে লাগলেন। ফল এই দাঁড়ালো যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হলো। মালিক বিন নজর নারাজ হয়ে মদীনা থেকে সিরিয়া চলে গেলেন এবং সেখানেই মারা গেলেন। (এক বর্ণনা অনুযায়ী কোন শত্রু তাঁকে হত্যা করে।) এটা ছিল বাইয়াতে উকবায়ে উলার পূর্বেকার ঘটনা। হযরত উম্মে সুলাইম (রা) বিধবা হয়ে গেলেন এবং তাঁর শিশু পুত্র হয়ে গেল ইয়াতিম। কিছুদিন পর চারদিক থেকে বিয়ের পয়গাম আসতে লাগলো। কিন্তু তিনি প্রত্যেক পয়গাম বা প্রস্তাবের জবাবে একই কথা বললেন যে, যতদিন পর্যন্ত আনাস (রা) মজলিসসমূহে উঠা-বসা এবং আলোচনা করার যোগ্য না হবে ততদিন পর্যন্ত আমি কাউকে বিয়ে করতে পারবো না।

হযরত আনাসের (রা) বয়স প্রায় ৯ বছর ছিল। এ সময় তার কবিলার আবু তালহা (রা) নামের এক ব্যক্তি হযরত উম্মে সুলাইমকে (রা) বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। আবু তালহা (রা) সে সময় মুশরিক ছিলেন এবং কাষ্ঠ নির্মিত একটি মূর্তির পূজা করতো। হযরত উম্মে সুলাইম (রা) জবাবে বলে পাঠালেন যে, আমি এক আল্লাহ এবং তার সত্য রাসূলের ওপর ঈমান এনেছি এবং তুমি হলে একজন স্বনির্মিত কাঠের মূর্তির পূজারী। এই মূর্তি কারোর কোন ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না। এই অবস্থায় জীবন সফরে তুমি আমার সঙ্গী কি করে হতে পারো ?

আবু হালহা (রা) হযরত উম্মে সুলাইমের (রা) কথাগুলো ভালোভাবে চিন্তা করে দেখলেন। কথাগুলো তাঁর নিকট খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো। কিছুদিন পর তিনি হযরত উম্মে সুলাইমের (রা) নিকট এলেন এবং বললেন, আমার ওপর হক পরিষ্কার হয়ে গেছে এবং আমি তোমার দ্বীন কবুল করতে প্রস্তুত।

হযরত আবু তালহার (রা) কথা শুনে হযরত উম্মে সুলাইম (রা) খুব খুশী হলেন এবং স্বতস্ফূর্তভাবে বললেন ঃ

"অতপর তোমাকে বিয়ে করার ব্যাপারে আমার আর কোন আপত্তি নেই। তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, এইটেই আমার মহরানা।"

হযরত আবু তালহা (রা) কোন চিন্তা-ভাবনা না করে ইসলাম গ্রহণ করলেন। ইবনে সায়াদ এবং হাফেজ ইবনে হাজার (র)-এর বক্তব্য অনুযায়ী হযরত আনাস (রা) নিজের মায়ের বিয়ে হযরত আবু তালহার (রা) সাথে পড়িয়েছিলেন। জালিলুল কদর সাহাবী হযরত ছাবিত (রা) বিন কায়েস আনসারী বলতেন, আমি কোন মহিলার মহর উম্মে সুলাইমের (রা) মহর থেকে ভালো শুনিনি। আবু তালহার (রা) সাথে বিয়ের পর হযরত উম্মে সুলাইম (রা) হযরত আনাসকে (রা) তাঁর বাড়িতেই নিয়ে গেলেন এবং হযরত আনাস (রা) সেখানেই বড় হতে লাগলেন।

বিশ্বনবী (সা) মদীনা মুনাওয়ারাতে শুভ পা রাখলেন। এ সময় যাঁরা তাঁকে সুস্বাগত জানিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত আনাসের (রা) পিতা-মাতাও ছিলেন। হযরত আনাসও (রা) অন্যান্য বালকের সাথে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গাইতে লাগলেন جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰه جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰه [রাসূল (সা) তাশরীফ এনেছেন, রাসূল (সা) তাশরীফ এনেছেন]। তাঁরা শহরময় আনন্দ উল্লাস করে ঘুরে বেড়ালেন। এই আনন্দপূর্ণ দিনটি সারা জীবন তাঁর স্মরণে ছিল। তিনি বলতেন আমি ঐদিন থেকে বেশী মুবারক ও আনন্দপূর্ণ দিন আর দেখিনি যেদিন প্রিয়নবী (সা) মদীনায় শুভাগমন করেছিলেন। সেদিন মদীনা মুনাওয়ারার অলি-গলি আলোয় আলোকিত হয়ে গিয়েছিল।

নবীর (সা) হিজরতের কিছুদিন পর হযরত উম্মে সুলাইম (রা) নিজের কলিজার টুকরাকে হুজুরের (সা) খাদেম বানিয়ে দিয়েছিলেন। এক রাওয়ায়েতে এও বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত আনাসকে (রা) স্বামী হযরত আবু তালহার (রা) সাথে মহানবী (সা) নিকট পাঠিয়েছিলেন। তিনি রাসূলের (সা) খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল। আপনার কোন খাদেম নেই। আনাস (রা) একজন তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন এবং হুশিয়ার ছেলে। তাকে আপনার খিদমতের জন্য এনেছি। হুজুর (সা) হযরত আবু তালহার (রা) নিষ্ঠাপূর্ণ

আবেগ দেখে হযরত আনাসকে (রা) নিজের খিদমতের জন্য গ্রহণ করলেন। দিনটি—হযরত আনাসের (রা) জীবনের সবচেয়ে বড় "সৌভাগ্যের দিন" ছিল। এই দিন তাঁর জীবনের সেই পবিত্র অধ্যায়ের সূচনা করেছিল ; যা তাঁর অল্পবয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও মহান সাহাবীদের কাতারে এনে শামিল করেছিলেন। তিনি ১০ বছর পর্যন্ত সার্বক্ষণিক অব্যাহতভাবে রহমতে দো আলম ফখরে মওজুদাত সাইয়্যেদুল মুরসালিনকে (সা) জান-প্রাণ দিয়ে খিদমত করেছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ে প্রিয় নবীর (সা) স্নেহদৃষ্টি তাঁর উপর ঝমঝম করে বর্ষিত হয়েছিল।

হযরত আনাস (রা) নিজের মালিক ও মাওলার (সা) সম্মতি অনুযায়ী সময়কে এভাবে সাজিয়ে দিলেন ঃ ফজরের পূর্বে মহানবীর (সা) খিদমতে হাজির হতেন এবং দ্বিপ্রহরে সামান্য সময়ের জন্য নিজের বাড়ী ফিরে যেতেন। মধ্যাহ্নে দ্বিতীয়বার প্রিয় নবীর (সা) কাছে উপস্থিত হতেন এবং আসর পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করতেন। আসরের নামায আদায় করে বাড়ী ফিরে আসতেন। কোন কোন সময় সারা রাত মহানবীর (সা) খিদমতে উপস্থিত থাকতেন।

মহানবীর (সা) বিশেষ খাদেম হওয়ার কারণে হযরত আনাস (রা) হুজুরকে (সা) একদম কাছ থেকে দেখেছিলেন এবং নিজের কর্মক্ষমতা ও আনুগত্য দিয়ে তাঁকে (সা) সন্তুষ্ট করার প্রশ্নে সামান্যতম কার্পণ্যও করেননি। সহীহ বুখারীতে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি দশ বছর আমার আকা ও মাওলার (সা) খিদমত করেছি। কিন্তু হুজুর (সা) আমার ওপর কোন সময় অসন্তুষ্ট হননি এবং কোন সময় আমার ওপর ডাঁট ও দাপটও দেখাননি। এমনকি কোন সময় এমন কথাও বলেননি যে, অমুক কাজ কেন করেছ বা অমুক কাজ কেন করোনি।

বাইহাকী (র) "শুয়ুবুল ঈমানে" তাঁর কথা এভাবে উদ্বৃত করেছেন ঃ "যদি কোন সময় আমার দ্বারা কোন ক্ষতিও হয়ে যেত, তাতেও তিনি আমাকে কোন সময় গালি দিতেন না। বাড়ীর অন্য কেউ যদি কোন সময় কিছু বলতো তাহলে তিনি (সা) বলতেন ঃ রাখ, কিছু বলো না। তকদিরে যদি ক্ষতি না থাকতো তাহলে এটা হতো না।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে, একবার হযরত আনাস (রা) প্রিয় নবীর (সা) কাজ শেষ করে নিজের বাড়ী রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে একস্থানে ছেলেরা খেলা করছিল। হযরত আনাস (রা) সেখানে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং খেলা দেখতে লাগলেন। ইত্যবসরে বিশ্বনবী (সা) সেখানে তাশরীফ আনলেন। এক বর্ণনা অনুযায়ী হুজুর (সা) তাঁকে কোন কাজের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি বালকদের খেলাধূলায় মশগুল হয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ অতিবাহিত

হওয়ার পর মহানবী (সা) তাঁর অনুসন্ধানে বাইরে তাশরীফ আনলেন। বালকেরা দূর থেকে হুজুরকে (সা) দেখলেন। এ সময় হযরত আনাসকে (রা) বললো, রাসূলুল্লাহ (সা) আসছেন। হযরত আনাস (রা) ঘাবড়ে গিয়ে পালানোর পরিবর্তে আদবের সাথে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। হুজুর (সা) নিকটে এসে তাঁর হাত ধরলেন এবং কোন কাজে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। হযরত আনাস (রা) যতক্ষণ পর্যন্ত সেই কাজ শেষ করে ফিরে না এলেন, হুজুর (সা) এক প্রাচীরের ছায়ায় বসে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। সেই কাজ শেষ করতে তাঁর অনেক দেরী হয়ে গেল। বাড়ী পৌঁছলে মা হযরত উম্মে সুলাইম (রা) বিলম্বের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, প্রিয় নবীর (সা) এক কাজে ব্যস্ততার জন্য দেরী হয়ে গেছে। হযরত উম্মে সুলাইম (রা) জিজ্ঞেস করলেন, কাজটা কি ছিল। হযরত আনাস (রা) জবাব দিলেন, হুজুর (সা) এ ব্যাপারে কাউকে বলতে নিষেধ করেছিলেন। হযরত উম্মে সুলাইম বললেন, পুত্র ! একথা কাউকে বলবে না, বস্তুত হযরত আনাস (রা) একথা আমৃত্যু নিজের অন্তরের অন্তস্থলে হেফাজত বা আমানত রেখেছিলেন এবং মহানবী (সা) তাঁকে কোন্ কাজের জন্য পাঠিয়েছিলেন তা কখনো কাউকে বলেননি।

হযরত আনাসের (রা) অধিকাংশ সময়ই এই সৌভাগ্য ঘটতো যে, তিনি ফজরের নামাযের পূর্বে প্রিয় নবীর (সা) ওজুর সরঞ্জাম কাছে এনে দিতেন। হযরত উম্মে সুলাইম (রা) যদি কোন কিছু মহানবীর (সা) খিদমতে পেশ করতে চাইতেন, তাহলে প্রায় সময়ই হযরত আনাসের (রা) হাতেই প্রেরণ করতেন। একবার হযরত আবু তালহা (রা) বাড়ীতে এলেন এবং হযরত উম্মে সুলাইমকে (রা) বললেন, বিশ্বনবী (সা) অভুক্ত রয়েছেন। কিছু খাদ্য তাঁর (সা) খিদমতে পাঠিয়ে দাও। তিনি কয়েকটি রুটি হযরত আনাসকে (রা) দিলেন এবং বললেন, এক্ষণি গিয়ে হুজুরকে (সা) খাইয়ে দাও। হযরত আনাস (রা) যখন মসজিদে নববীতে পৌঁছলেন তখন সেখানে হুজুরের (সা) চারপাশে সাহাবীদের ভিড় লেগেছিল। প্রিয় নবী (সা) হযরত আনাসকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, "আবু তালহা তোমাকে পাঠিয়েছে ?" তিনি আরজ করলেন, "জ্বী, আল্লাহর রাসূল।" অতপর জিজ্ঞেস করলেন, "খাওয়ার জন্য ?" তিনি বললেন, "জ্বী, হাঁ।"

হুজুর (সা) উপস্থিত সকল সাহাবীকে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং হযরত আনাসের (রা) বাড়ী তাশরীফ রাখলেন। হযরত আবু তালহা (রা) চিন্তায় পড়লেন। তিনি ভাবলেন এত মানুষের জন্য খাবারে কুলোবে না। হযরত উম্মে সুলাইমকে (রা) বললেন, এসব সাহাবীর জন্য খাবারের ব্যবস্থা কি করে হবে। তিনি অত্যন্ত ইতমিনানের সঙ্গে বললেন, এটা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (সা) ভালো বোঝেন। অতপর যতটুকুন খাবার ছিল তা তিনি রাসূলে আকরাম

(সা) ও সাহাবীদের সামনে হাজির করলেন। আল্লাহ পাক এই খাবারে এত বরকত দিলেন যে, সবাই পেট পুরে খেলেন।

একদিন হযরত আনাস (রা) নিয়ম অনুসারে ফজরের নামাযের পূর্বে বিশ্বনবীর (সা) খিদমতে হাজির হলেন। এ সময় প্রিয় নবী (সা) তাঁকে বললেন, আজ আমি রোযা রাখতে চাই। কিছু খাইয়ে দাও। হযরত আনাস (রা) তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন এবং কিছু খেজুর ও পানিসহ উপস্থিত হলেন। হুজুর (সা) সেহরী খেলেন এবং অতপর ফজরের নামাযের জন্য প্রস্তুত হলেন।

হযরত আনাস (রা) যেমন মহানবীকে (সা) সীমাহীন ভালোবাসতেন তেমিন প্রিয় নবীও (সা) তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। যে সময় তিনি হুজুরের (সা) খিদমত করতে এসেছিলেন সে সময় তাঁর কোন পারিবারিক নাম বা ডাকনাম ছিল না। প্রিয় নবী (সা) জানতে পেলেন যে, আনাস (রা) "হামযাহ" নামক এক ধরনের সবজী খুব পসন্দ করে থাকেন। এজন্য তিনি (সা) তাঁর ডাকনামই "আবু হামযাহ" রেখে দিলেন। বিশ্বনবী (সা) হযরত আনাসকে (রা) স্নেহ করে "বেটা" অথবা "আনিস" বলে ডাকতেন এবং প্রায়ই স্নেহাধিক্যে তাঁর মাথার ওপর নিজের স্নেহের হাত বুলাতেন। কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, মহানবী (সা) তাঁর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারেও বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন এবং অত্যন্ত স্নেহ ও ভালোবাসার সাথে তাঁকে নেক কথা শুনাতেন। তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলেছেন, হে আমার ছোট শিশু ! যতদূর সম্ভব নিজের দিন ও রাত এমনভাবে কাটাও যে, তোমার অন্তরে যেন কপটতা না আসে। এটা আমার সুন্নাত এবং যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালোবাসে সে আমাকে ভালোবাসে এবং যে আমাকে ভালোবাসে সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।

হুজুর (সা) কখনো কখনো হযরত আনাসের (রা) সাথে হাসি-ঠাট্টামূলক কথাও বলতেন। একবার কৌতুক করে বললেন, "হে দুই কান ওয়ালা।"

আল্লামা বালাযুরী "আনসাবুল আশরাফে" লিখেছেন, হযরত আনাসের (রা) পিতা মালিক বিন নজর-এর মিষ্টি পানির কূপ ছিল। হুজুর (সা) তার পানি পান করতেন। হযরত আনাস (রা) প্রায়ই সেই কূপের পানি মহানবীর (সা) খিদমতে পেশ করার সৌভাগ্য লাভ করতনে।

হযরত আনাসের (রা) সতালো পিতা হযরত আবু তালহা (রা) প্রিয় নবীর (সা) অত্যন্ত মুখলিস ও জাননিছার সাহাবী ছিলেন। এমনিভাবে তাঁর মা হযরত উম্মে সুলাইমও (রা) প্রিয় নবীকে (সা) পূর্ণমাত্রায় শ্রদ্ধা করতেন এবং ভালোবাসতেন। তিনি হুজুরের (সা) পরদাদী সালমার ভাইয়ের পুতি ছিলেন। এই নিসবতে তিনি ও তাঁর বোন হযরত উম্মে হারাম (রা) মহানবীর (সা)

খালা হিসেবে মশহুর হয়ে যান। যদিও এই সম্পর্ক দূরের সম্পর্ক ছিল, কিন্তু বিশ্বনবীর (সা) নিকট ছিল তা অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি (সা) স্নেহবশত হযরত উম্মে সুলাইম (রা) এবং হযরত উম্মে হারাম (রা) উভয়ের বাড়ীতেই গমন করতেন। হিজরতের কয়েক মাস পর হুজুর (সা) হযরত উম্মে সুলাইমের (রা) বাড়ীতেই মুহাজির এবং আনসারদেরকে ডেকে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। চরিতকাররা বর্ণনা করেছেন, প্রিয় নবী (সা) প্রায়ই হযরত উম্মে সুলাইমের (রা) বাড়ী তাশরীফ নিতেন। খেজুর অথবা যে কোন খাবার পেতেন তা খেতেন। দুপুরের সময় হলে আরাম করতেন। নামাযের সময় হলে সেখানেই চাটাই-এর ওপর নামায আদায় করতেন। মহানবীর (সা) প্রতি হযরত উম্মে সুলাইমের (রা) ভালোবাসার প্রকৃতিটা এমন ছিল যে, তিনি (সা) যখন তাঁর গৃহে আরাম করতেন তখন সে তাঁর গায়ের পবিত্র ঘাম ও পড়ে যাওয়া পবিত্র গোফ একটি শিশিতে তাবাররক হিসেবে একত্র করতেন। মুসনাদে আবু দাউদে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমার মাথায় চুলের গোছা ছিল। আমার শ্রদ্ধেয় মা বলেন, আমি তা (কখনো) কাটবো না, (অথবা কাটতে দিব না) কেননা প্রিয় নবী (সা) (ভালোবেসে) তা টানতেন এবং হাত বুলাতেন।

একবার প্রিয় নবী (সা) হযরত উম্মে সুলাইমের (রা) গৃহে তাশরীফ নিলেন। এ সময় তিনি আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমার পুত্র আনাসের জন্য দোয়া করুন। হুজুর (সা) দীর্ঘক্ষণ দোয়া করলেন এবং শেষে বললেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَهٗ وَوَلَدَهٗ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ -

"হে আল্লাহ ! তুমি তার সম্পদ ও সন্তান বৃদ্ধি কর এবং তাকে জান্নাতে দাখিল কর।"

এই দোয়া কবুল হয়েছিল। হযরত আনাস (রা) ধন-সম্পদে সকল আনসারকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। সন্তান আধিক্যের ব্যাপারটা এমন ছিল যে, মৃত্যুর সময় তাঁর পুত্র-কন্যা এবং নাতি-নাতনীর সংখ্যা একশ'র ওপর ছিল।

দ্বিতীয় হিজরীতে হক-বাতিলের প্রথম যুদ্ধ বদরের ময়দানে সংঘটিত হয়। এ সময় হযরত আনাসের (রা) বয়স ছিল ১২ বছর। কম বয়স হওয়ার কারণে যুদ্ধে যোদগানের যোগ্য ছিলেন না। কেননা মহানবী (সা) যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বয়স সীমা কমপক্ষে ১৫ বছর নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। বয়স কম হওয়া সত্ত্বেও তিনি বদরের ময়দানে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং হুজুরের (সা) খিদমতের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছিলেন। কতিপয় ব্যক্তি বদরে তাঁর অংশগ্রহণ সম্পর্কে

সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন। তাদের সন্দেহের কারণ হলো সে সময় তাঁর বয়স ১৫ বছরের কম ছিল। কিন্তু একবার যখন স্বয়ং তাঁর কাছে এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা চাওয়া হলো তখন তিনি বললেন, বদরে আমি কি করে অনুপস্থিত থাকতে পারতাম ? বস্তুত বদরের যুদ্ধের কতিপয় ঘটনা তাঁর থেকে বর্ণিত রয়েছে।

তৃতীয় হিজরীতে ওহোদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সময়ও হযরত আনাসের (রা) বয়স যুদ্ধের যোগ্য হয়নি। কিন্তু এবারও তিনি অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে মহানবীর (সা) সঙ্গী হওয়ার মর্যাদা অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি এই যুদ্ধের চোখে দেখা ঘটনাবলী মানুষকে শুনাতেন। সহীহ বুখারীতে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, আমার চাচা, যাঁর নামও আমার মত আনাস [অর্থাৎ আনাস (রা) বিন নযর] ছিল। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশ নেননি। এ ব্যাপারে তিনি একবার মহানবীর (সা) খিদমতে আরজ করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম যে যুদ্ধে আপনি অংশ নিয়েছেন ; তাতে আমি উপস্থিত ছিলাম না। কিন্তু এখন যদি মুশরিকদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ আপনার সাথে বাধে তাহলে আল্লাহ পাক জানবেন যে, আমি কি করি। অতপর যখন ওহোদের যুদ্ধের সময় এলো এবং মুসলমানদের পরাজয় ঘটলো তখন আমার চাচা আনাস (রা) এই দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ ! আমি এই ময়দান থেকে হটে যাওয়া মুসলমানদের জন্য তোমার কাছে ক্ষমা চাই এবং বিরোধী মুশরিকদের জুলুম-নির্যাতন ও সীমালংঘন প্রশ্নে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করছি।"—একথা বলে তিনি মুশরিকদের দিকে অগ্রসর হলেন। সামনে পেলেন সাহাবী হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজকে। তিনি তাঁকে বললেন, হে সায়াদ (রা) বিন মায়াজ ! এখনতো জান্নাত লাভের সুযোগ এসেছে। আল্লাহর কসম ! আমিতো ওহোদের দিক থেকে জান্নাতের সুগন্ধি পাচ্ছি। (একথা বলে তরবারী চালাতে চালাতে কাফের বাহিনীর অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।) আমরা তাঁর শরীরে ৮০টিরও বেশী জখম পেয়েছিলাম। এসব আঘাত তরবারী, নেযা ও তীর দিয়ে করা হয়েছিল। শত্রুরা তাঁর কান, নাক ইত্যাদি কেটে নিয়েছিল। আমরা তো তাঁকে চিনতেই পারিনি। তাঁর সহোদরা [রুবাই (রা) বিনতে নযর] তাঁর আঙ্গুলের একটি গিরা দেখে তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে তিনি বলেন, ওহোদের দিন যখন মুসলমানরা এদিক-ওদিক বিশৃংখল হতে লাগলো তখন শুধুমাত্র হযরত আবু তালহা (রা) নিজের ঢাল দিয়ে মহানবীকে (সা) রক্ষা করে রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ। তাঁর ধনুকের ছিলা ছিল অত্যন্ত শক্ত। সেদিন দুই অথবা তিনটি ধনুক ভেঙ্গে গিয়েছিল। যখন হুজুর (সা) পবিত্র মাথা উঁচু করে দুশমনদের প্রতি তাকাচ্ছিলেন তখন আবু তালহা (রা) আরজ করেছিলেন, হে আল্লাহর নবী ! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। মাথা

ওপরে ওঠাবেন না। যদি কোন তীর এসে লাগে ! আমার সিনা আপনার সিনার আগে রয়েছে। সে সময় আমি দেখলাম যে, হযরত আয়েশা (রা) এবং উম্মে সুলাইম (রা) মশক ভরে পানি আনছেন। তাঁদের পায়ের গহনা দেখা যাচ্ছিল। তাঁরা আহতদের মুখে পানির ছিটকা দিচ্ছিলেন। পানি শেষ হয়ে গেলে আরো এনে আহতদের মুখে দিচ্ছিলেন।

ওহোদের পর হযরত আনাস (রা) পঞ্চম হিজরীতে সংঘটিত খন্দকের এবং অব্যবহিত পরই বনু কোরায়জার যুদ্ধে মহানবীর (সা) সঙ্গী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

৬ষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়া নামকস্থানে বাইয়াতে রিদওয়ানের ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। এ সময় যেসব সাহাবী (রা) বিশ্বনবীর (সা) পবিত্র হাতে হাত রেখে মরা ও মারার বাইয়াত করেছিলেন ; তাদেরকে আল্লাহ পাক প্রকাশ্য ভাষায় তাঁর সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিয়েছিলেন। হযরত আনাসও (রা) এসব সাহাবীর অন্যতম ছিলেন।

বাইয়াতে রিদওয়ানের পর হযরত আনাস (রা) খায়বারের যুদ্ধে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করেন। মুসনাদে আবু দাউদে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি খায়বারের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহকে (সা) একটি গাধার ওপর সওয়ার দেখলাম। গাধাটির বাগ খেজুরের ছাল দিয়ে বানানো হয়েছিল। এই রেওয়ায়াতেই তিনি বলেন, প্রিয় নবী (সা) গাধার ওপরও সওয়ার হয়ে যেতেন। পশমের তৈরী কাপড়ও পরিধান করতেন এবং গোলামের দাওয়াতও কবুল করতেন।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে যে, বিজয়ের পর (খায়বরে প্রবেশের সময়) হযরত আনাস (রা) হযরত আবু তালহার (রা) সাথে উটের ওপর সওয়ার ছিলেন। তাদের উট এবং প্রিয় নবীর (সা) সওয়ারী এত নিকটবর্তী ছিল যে, তাদের পা হুজুরের (সা) পবিত্র পা স্পর্শ করে গেল। তাড়াতাড়ী নিজেরা পা পিছু হটিয়ে নিলেন। এ সময় পা প্রিয় নবীর (সা) পবিত্র ইযারের সাথে জড়িয়ে গেল। ফলে ইযার মুবারকে টান পড়ায় মহানবীর (সা) পবিত্র উরুর একাংশ মানুষের নজরে পড়ে গেল। সাধারণ অবস্থায় হুজুর (সা) নিজের পবিত্র উরু কাপড়হীন হয়ে যাওয়াটা কোনক্রমেই সহ্য করতেন না। কিন্তু এ সময় তিনি ক্ষমা করে দিলেন এবং হযরত আনাসকে (রা) কিছুই বললেন না।

সপ্তম হিজরীর জিলকদ মাসে রহমতে আলম (সা) ওমরাহ কাযা করার জন্য মক্কা তাশরীফ নিলেন। এ সময় যেসব জাননিছার তাঁর সঙ্গী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন তাদের মধ্যে হযরত আনাসও (রা) ছিলেন। অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময়ও তিনি বিশ্বনবীর (সা) সফর সঙ্গী ছিলেন।

অতপর তিনি হুনাইন ও তায়েফের যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করেন। নবম হিজরীতে হযরত আনাস (রা) হুজুরের (সা) সাথে গা ঝলসে দেয়া আগুন ঝরা গরমে তাবুকের দীর্ঘ সফরের পীড়াদায়ক মারাত্মক কষ্ট সহ্য করেছিলেন। তারপর দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। একাদশ হিজরীতে বিশ্বনবীর (সা) ওফাত হলে হযরত আনাসের (রা) ওপর শোকের পাহাড় ভেঙ্গে পড়লো। তিরমিযী শরীফে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে, যেদিন মহানবী (সা) মদীনা প্রবেশ করেছিলেন সেদিন সমগ্র মদীনা আলোকিত হয়ে গিয়েছিল এবং যেদিন তাঁর ওফাত হয়েছিল সেদিন মদীনা অন্ধকারে ছেয়ে গিয়েছিল।

স্নেহপরায়ন আকা ও মাওলার (সা) বিচ্ছেদ শোকের পাহাড় হযরত আনাস (রা) অত্যন্ত ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে বরদাশত করেছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের সাথে সাথে হযরত আনাস (রা) নিশ্চিন্তে রাসূলের (সা) খলিফার বাইয়াত করেন। সে সময় তাঁর বয়স কেবলমাত্র ২০ বছর হয়েছিল। কিন্তু ১০ বছর যাবৎ মহানবীর (সা) অব্যাহত সাহচর্যে তাঁকে প্রভুত যোগ্যতাসম্পন্ন করে তুলেছিল। সুতরাং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) হযরত ওমর ফারুকের (রা) পরামর্শে তাঁকে বাহরাইনের রাজস্ব আদায়কারী নিয়োগ করেছিলেন। কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত আনাস (রা) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর শাসনামলে মুরতাদ বিরোধী কয়েকটি যুদ্ধেও অংশ নিয়েছিলেন। এই সিলসিলার সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ইয়ামামা ময়দানে মুসায়লামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধে হযরত আনাসের (রা) ভাই হযরত বারা (রা) বিন মালিক অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। বিভিন্ন কারণে এটা স্পষ্ট হয় যে, হযরত আনাসও (রা) এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। হাফিজ ইবনে হাজার (র) "আল ইসাবাহ" গ্রন্থে হযরত আনাসের (রা) এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন ঃ হযরত বারা (রা) মুসায়লামার যুদ্ধের দিন বাগান ওয়ালাদের ওপর (অর্থাৎ মুরতাদদের ওপর যারা বাগানের চার প্রাচীরের অভ্যন্তরে মোচা তৈরী করে রেখেছিলেন) একাকী তীর নিক্ষেপ এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছিলেন। ফলে তারা বাগানের দরযা খুলে দিতে বাধ্য হয়েছিল। সে সময় তাঁর শরীরে তীর ও তরবারীর ৮০টি আঘাত পাওয়া গিয়েছিল। তাঁকে সেখানে চিকিৎসার লক্ষ্যে নিজের তাঁবুতে পাঠানো হয়েছিল এবং তার সেবা-শুশ্রূষার জন্য হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদকে সেখানে এক মাস অবস্থান করতে হয়েছিল।

ত্রয়োদশ হিজরীতে হযরত ওমর ফারুক (রা) খিলাফতের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। এ সময় জিহাদের জযবা হযরত আনাসকে (রা) অস্থির করে তুলেছিল। তিনি আমীরুল মু'মিনিনের (রা) অনুমতি নিয়ে ইরানের যুদ্ধ ময়দানে পৌছে গেলেন এবং ফারুকী যুগের অনেক যুদ্ধে বীরত্বের চরম পরাকাষ্ঠা

দেখিয়েছিলেন। তাঁর জানবাজ ভাই হযরত বারা'কে (রা) বিন মালিকও এসব যুদ্ধে তাঁর সাথে ছিলেন। আল্লামা বালাজুরি (র) "আনসাবুল আশরাফ" গ্রন্থে লিখেছেন, সেই যুগে হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত আনাস ও বারা' (রা) বসরাতে হযরত আবু মুসা আশয়ারীর (রা) সাথে হযরত মুগিরাহ (রা) বিন শুবার বিরুদ্ধে হযরত আবু বাকরাহ (রা) উত্থাপিত অভিযোগ তদন্তের জন্য নিয়োগ করেছিলেন।

অধিকাংশ ঐতিহাসিক হারিক যুদ্ধ এবং সুস্তার (তিস্তার) বিজয় প্রসঙ্গে হযরত আনাস (রা) ও হযরত বারা'র (রা) কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তিবরানী (র) এবং হাফেজ ইবনে হাজার (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত আনাস (রা) বিন মালিক এবং তাঁর সহোদর বারা' (রা) বিন মালিক ইরাকের হারিক নামক স্থানে দুশমনের এক দুর্গ অবরোধে শরীক ছিলেন। দুশমনেরা গরম জিঞ্জিরে লোহার আংটা লাগিয়ে মুসলমানদের দিকে নিক্ষেপ করতো। এ সময় যে মুসলমান দুর্গের প্রাচীরের নিকট থাকতো তাকে ওপরে টেনে নিতো। এক সময় হযরত আনাস (রা) প্রাচীরের নিকটে গিয়েছিলেন অথবা প্রাচীরের ওপর ওঠার চেষ্টা করেছিলেন। তখন তিনিও দুশমনের আংটায় ফেঁসে গিয়েছিলেন। তারা তাঁকে ওপরে টেনেই নিচ্ছিলেন। এমন সময় হযরত বারা'র (রা) দৃষ্টি পড়লো সেদিকে। তিনি লাফ দিয়ে সেদিকে গেলেন এবং জিঞ্জিরকে এমন জোরে টান মারলেন যে, ওপরের রশি ছিঁড়ে গেল এবং হযরত আনাস (রা) মাটির ওপর এসে পড়লেন। গরম জিঞ্জির টান দেয়ার কারণে হযরত বারা'র (রা) হাতের সকল গোশত জ্বলে গেল এবং হাড় বের হয়ে পড়লো। যেহেতু হযরত আনাস (রা) বেশী উঁচু থেকে পড়েননি ; এ জন্যে সাধারণ আঘাত পেয়েছিলেন।

সুস্তার যুদ্ধে হযরত আনাস (রা) পদাতিক বাহিনীর অফিসার ছিলেন এবং হযরত বারা' (রা) ছিলেন দক্ষিণ বাহুর অফিসার। সুস্তার অবরোধ দীর্ঘদিন অব্যাহত ছিল। এ সময় ইরানীদের সাথে মুসলমানদের কয়েক দফা সংঘর্ষ বাধে। এসব সংঘর্ষে হযরত আনাস (রা) এবং হযরত বারা' (রা) চরম বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং প্রত্যেকবারই ইরানীদেরকে দুর্গে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। অবরোধকালে একদিন হযরত আনাস (রা) হযরত বারা'র (রা) তাঁবুতে গেলেন। এ সময় তিনি সূর করে কিছু কবিতা পাঠ করছিলেন। হযরত আনাস (রা) তাঁকে বললেন, ভাই আমার ! আল্লাহ পাক আপনাকে কুরআন শরীফ দান করেছেন। কুরআন শরীফ এসব কবিতা থেকে উত্তম। তা সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করুন। তিনি বললেন, আনাস (রা) ! সম্ভবত তুমি ভয় পাচ্ছো যে, আমি বিছানাতেই মারা যাব। কিন্তু আল্লাহর কসম ! এমনতরো হবে না। আমি মরলে ময়দানেই মরবো।

আল্লাহ পাক হযরত বারা'র (রা) কসম এমনিভাবে পূরণ করলেন যে, তিনি সেই যুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই করে ইরানী সিপাহসালার হুরমুযানের হাতে শহীদ হয়ে গেলেন। যাহোক, হযরত বারা' (রা) এবং অন্যান্য মুজাহিদদের জীবনের বিনিময়ে ইরানীদের অপমানজনক পরাজয় ঘটলো এবং হুরমুযান নিজের পরিবার-পরিজনসহ মুসলমানদের হাতে বন্দী হলো। তাকে ইসলামী বাহিনীর সিপাহসালার হযরত আবু মূসা আশয়ারীর (রা) সামনে পেশ করা হলো। এ সময় তিনি তাকে হযরত আনাসের (রা) সাথে খিলাফতের দরবারে প্রেরণ করলেন। এই সফরে হুরমুযানের হিফাজতের জন্য তিনশ' সওয়ার হযরত আনাসের (রা) অধীন ছিল। হযরত আনাস (রা) হিফাজতের সাথে হুরমুজানকে মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছে দিলেন। হুরমুযান মদীনা পৌঁছে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

হযরত আনাস (রা) শুধুমাত্র যুদ্ধের ময়দানেই বাঘ ছিলেন না, বরং তিনি জ্ঞানের আকাশেরও চাঁদ ছিলেন। বসরা আবাদ হওয়ার কিছুদিন পর হযরত ওমর ফারুক (রা) অনুভব করলেন যে, সেখানকার মানুষের ফিকাহর তালিমের জন্য কিছু মুয়াল্লিম আবশ্যক। এই লক্ষ্যে তিনি মর্যাদাবান সাহাবীদের মধ্য থেকে একটি দল নির্বাচন করলেন। এই দলে হযরত আনাসও (রা) শামিল ছিলেন। আমীরুল মু'মিনিন ৯ অথবা ১০জন সাহাবী সমন্বয়ে গঠিত এই দলকে জরুরী হিদায়াতসহ বসরা প্রেরণ করলেন। হযরত আনাস (রা) বসরা পৌঁছে সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেলেন এবং জীবনের অবশিষ্টাংশ সেখানেই অতিবাহিত করেছিলেন।

হযরত ওমর ফারুকের (রা) শাহাদাতের পর হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রা) খেলাফতের দায়িত্ব পান। এ সময় হযরত আনাস (রা) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর অনুগত এবং কল্যাণকামী ছিলেন। তাঁর খেলাফতের শেষ যুগে বিদ্রোহীরা চরম ফিতনা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে বসলো। এমনকি তারা মদীনা পৌঁছে খলীফার বাড়ী অবরোধ করলো। এসব ঘটনার খবর বসরায় পৌঁছলে হযরত আনাস (রা), হযরত ইমরান (রা) বিন হাসিন (রা) এবং সেখানে উপস্থিত অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম অস্থির হয়ে পড়লেন। তাঁরা বসরা-বাসীদেরকে আমীরুল মু'মিনিনের (রা) সাহায্যের জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। কিন্তু এই সাহায্য মদীনা না পৌঁছতেই আমীরুল মু'মিনিনের (রা) শাহাদাতের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে গেল। এই হৃদয়বিদারক ঘটনার পর হযরত আলী কাররামাল্লাহু খেলাফতের দায়িত্ব পেলেন। তাঁর খেলাফতের প্রথম দিকেই উষ্ট্রের যুদ্ধের দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হলো। তারপর হযরত আলী (রা) এবং আমীরে মুয়াবিয়ার (রা) মধ্যে যুদ্ধের এক দীর্ঘ সিলসিলা শুরু হলো। সেই ভয়ংকর যুগে হযরত আনাস (রা) নির্জনত্ব গ্রহণ করলেন এবং কোন যুদ্ধ অথবা বাদ-বিসম্বাদে অংশ নেননি। হযরত আলীর (রা) শাহাদাতের পরও

তিনি অনেক দিন বেঁচে ছিলেন। কিন্তু সাধারণত একাকীত্বেই কাটিয়েছেন। ইমাম জাহবী (রা) বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়েরের (রা) যুগে তিনি কিছু দিন বসরাবাসীদের ইমামতি করেছিলেন। আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের খেলাফতকালে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সাকাফী বসরার আমীর নিযুক্ত হন। এ সময় সে হযরত আনাসের (রা) ওপর নির্যাতন চালালো। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে, হাজ্জাজ হযরত আনাসের (রা) বিরুদ্ধে বনু উমাইয়ার সমর্থনের অভিযোগ আরোপ করলো এবং মানুষের কাছে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য তার ঘাড়ে মোহর লাগিয়ে দিল। হযরত আনাস (রা) অত্যন্ত ধর্যের সাথে এই শাস্তি বরদাশত করলেন। কিন্তু বাড়ী এসে খলিফা আবদুল মালিককে একটি পত্র লিখলেন। এই পত্রে তিনি হাজ্জাজের জুলুম ও হুমকির বিবরণী বর্ণনা করেছিলেন। আবদুল মালিক "খাদিমে রাসূলের (সা)" পত্র পাঠ করে থরথর করে কেঁপে উঠলেন এবং তিনি হাজ্জাজকে কঠোর ভাষায় একটি চিঠি লিখলেন। এই চিঠিতে তিনি তাকে অবিলম্বে হযরত আনাসের (রা) কাছে পৌঁছে ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দিলেন। খলিফার পত্র পেয়েই হাজ্জাজ নিজের দরবারীদের সঙ্গে নিয়ে হযরত আনাসের (রা) খেদমতে উপস্থিত হলো এবং অত্যন্ত মিষ্টিস্বরে ক্ষমা চাইলো। আল্লাহ পাক হযরত আনাসকে (রা) গভীর দূরদৃষ্টি প্রদান করেছিলেন। তিনি শুধুমাত্র তাকে ক্ষমাই করে দেননি বরং তার দরখাস্তে আবদুল মালিককে নিজের সন্তুষ্টির চিঠিও লিখে দিলেন।

৯৩ হিজরীতে হযরত আনাস (রা) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সে সময় তার বয়স হয়েছিল ১০৩ বছর। পরিবার-পরিজন গুণগ্রাহী এবং শিষ্যরা চিকিৎসাও সেবা-শুশ্রূষার কমতি করেননি। কিন্তু দুর্বলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগলো। যখন জীবনের আর কোন আশা রইলো না তখন খাস শাগরিদ ছাবিত বানানীকে (র) বললেন, আমার জিহবার নীচে আল্লাহর রাসূলের (সা) পবিত্র গোফ রেখে দাও। তিনি নির্দেশ পালন করলেন। এই অবস্থায় পবিত্র রূহ উর্ধজগতে উড়ে গেল (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। সে সময় হযরত আবু তোফায়েল (রা) ছাড়া আর কোন সাহাবী এই ধরা ধামে জীবিত ছিলেন না। হযরত আনাসের (রা) ইনতিকালের খবর ছড়িয়ে পড়লে অসংখ্য মানুষ নামাযে জানাযায় অংশগ্রহণের জন্য এসে উপস্থিত হলো। কাতান (র) বিন মদরক কালাবী জানাযার নামায পড়ালেন। অতপর হাজার হাজার মানুষ ইসলামের এই মহান সন্তানকে বসরার নিকট তাফ নামক স্থানে দাফন করলো।

হযরত আনাস (রা) অধিক সন্তানের পিতা ছিলেন। চরিতকাররা বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ৮০টি ছেলে এবং তিনটি মেয়ে দান করেছিলেন। এছাড়া মৃত্যুকালে ২০জনের বেশী পুত্রও ছিলেন। হযরত আনাসের (রা) কয়েকজন সাহেবজাদা হাদীস শাস্ত্রে শেখ এবং ইমামের মর্যাদায় সমাসীন

ছিলেন। প্রখ্যাত বসরী মুহাদ্দিস আবু উমায়ের আবদুল কবির বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন হাফছ বিন হিশামও (২৯১ হিজরীতে ওফাত প্রাপ্ত) তাঁর সন্তানদের মধ্যে ছিলেন। হযরত আনাস (রা) নিজের সন্তানদেরকে খুবই ভালোবাসতেন এবং তিনি নিজের ছেলে-মেয়েদেরকে স্বয়ং শিক্ষা দিতেন।

হযরত আনাস (রা) হেদায়াত আকাশের সেইসব প্রোজ্জ্বল তারকারাজির মধ্যে পরিগণিত হতেন যাদের জ্ঞান ও মর্যাদার আলো সমগ্র ইসলামী দুনিয়াকে আলোকিত করে রেখেছিল। হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে তিনি সাহাবায়ে কিরামের (রা) মধ্যে প্রথম তবকার সাহাবী রূপে পরিগণিত হতেন। তিনি ১২৮৬টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এসব হাদীসের মধ্যে সহীহ বুখারীতে ৮০টি এবং সহীহ মুসলিমে ৭০টি হাদীস পৃথকভাবে স্থান পেয়েছে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে ১৮০টি ঐকমত্যের (মুত্তাফাকুন আলাইহি) হাদীস আছে। হযরত আনাস (রা) ওহির প্রস্রবণ থেকে উপকৃত হওয়া ছাড়াও নীচের জালিলুল কদর মহান সাহাবী ও মহিলা সাহাবীদের (রা) নিকট থেকেও জ্ঞান পিপাসা নিবারণ করেছিলেন ঃ

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা), হযরত ওসমান গণি (রা), হযরত ফাতিমাতুজ জোহরা (রা) বিনতে রাসূল (সা), হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ, হযরত আবু যর গিফারী (রা), হযরত উবাই (রা) বিন কা'ব, হযরত মায়াজ (রা) বিন জাবাল, হযরত উবাদাহ (রা) বিন ছামেত, হযরত আবু তালহা (রা), হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা, হযরত ছাবিত (রা) বিন কায়েস, হযরত উম্মে সুলাইম (রা) (মা), হযরত উম্মে হারাম (রা) (খালা) এবং হযরত উম্মুল ফজল (রা) [হযরত আব্বাসের (রা) (রাসূলের (সা) চাচা) স্ত্রী]।

হযরত আনাসের (রা) জ্ঞান সাগরে যারা অবগাহন করেছিলেন তাদের সংখ্যাও অনেক। কতিপয় প্রখ্যাত ছাত্রের নাম হলো ঃ

হযরত খাজা হাসান বসরী (র), সোলায়মান তাইমী (র), ছাবিত নাবানী (র), কাতাদাহ (র), আবু কালাবাহ (র), হামিদুত তাবিল (র), ছামামাহ বিন আবদুল্লাহ বিন আনাস (রা), ইসহাক বিন আবি তাহলাহ (র), আবু ওসমান (র), জায়াদ (র), আবু বকর বিন আবদুল্লাহ মুযনি, ইয়াহিয়া বিন সাঈদ (র), মুহাম্মাদ বিন সিরিন (র), আনাস বিন সিরিন (র), রবিয়াতুর রায় (র), সাঈদ বিন জাবির (র) এবং সালমাহ বিন দরদান (র)।

মুসনাদে আহমদে (র) বর্ণিত আছে। হযরত আনাস (রা) হাদীস বর্ণনায় অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। যখন হাদীস বর্ণনা করতেন তখন চূড়ান্ত সতর্কতা হিসেবে বলতেন ঃ اَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص [অথবা যেমন রাসূলুল্লাহ (সা)

বলেছেন] যেসব হাদীস বুঝতে লোকদের ভুল ধারণা হতে পারতো হযরত আনাস (রা) সেসব হাদীস বর্ণনাই করতেন না। তাছাড়া তিনি হাদীস বর্ণনা করার সময় পরিষ্কার করে বলে দিতেন যে, আমি এই হাদীস সরাসরি রাসূলের (সা) নিকট থেকে শুনেছি অথবা রাসূলের (সা) অমুক সাহাবীর কাছ থেকে।

হাদীস শাস্ত্র ছাড়া হযরত আনাস (রা) ফিকাহ শাস্ত্রেও সাগরের মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। বিভিন্ন দ্বীনি মাসয়ালা-মাসায়েল সম্পর্কে তাঁর অসংখ্য ফতওয়া ও ইজতিহাদ কিতাবসমূহে পাওয়া যায়। এসব ফতওয়া এবং ইজতিহাদ তাঁর তাফাককুহ ফিদ্বীন বা দ্বীনের সমঝ-এর স্পষ্ট প্রমাণ। তিনি সাহাবীদের (রা) মধ্যে সেই কতিপয় ফকীহ সাহাবীর অন্যতম ছিলেন যাদেরকে হযরত ওমর ফারুক (রা) বসরাতে ফিকাহর তালিম দানের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন। বসরায় হযরত আনাসের (রা) শিক্ষা প্রদানের এত জনপ্রিয়তা ও সুখ্যাতি হয়েছিল যে, সমগ্র ইসলামী বিশ্ব থেকে জ্ঞান পিপাসুরা সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। এমনকি মক্কা মুয়াজ্জমা ও মদীনা মুনাওয়ারা থেকেও ছাত্ররা বসরা এসে তাঁর ছাত্রের দলে শরীক হতেন। হযরত আনাস (রা) নিয়ম অনুসারে এবং ধারা পরম্পরা বজায় রেখে বছরের পর বছর লোকদেরকে শিক্ষা দিতেন। তিনি অত্যন্ত বাগ্মীতার ঢং-এ শিক্ষা প্রদান করতেন। পাঠদান অনুষ্ঠানে যদি কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করতেন তাহলে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় তার জবাব দিতেন। হযরত আনাসের (রা) জীবনের ৬০-৭০ বছর জ্ঞানের প্রবাহ ধারা হিসেবে প্রবাহমান ছিল। জ্ঞান পিপাসুরা সাধ্য অনুযায়ী নিজেদের জ্ঞানের পাত্র পূর্ণ করেছিলেন।

হযরত আনাসের (রা) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রাসূল (সা) প্রেম, সুন্নাতের অনুসরণ, জ্ঞান পিপাসা, বীরত্ব, জিহাদের আকাংখা, ন্যায় কাজের নির্দেশ এবং সত্য কথন সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য ছিল। হযরত আনাসের (রা) জ্ঞান হওয়ার সাথে সাথে নিজের বাড়ীতে প্রথমদিন থেকেই ইসলামের আলোক রশ্মির ঝলমল রূপ দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর মা হযরত উম্মে সুলাইম (রা), সতালো পিতা হযরত আবু তালহা (রা), চাচা হযরত আনাস (রা) বিন নযর, সহোদর হযরত বারা' (রা) বিন মালিক, খালা হযরত উম্মে হারাম (রা) এবং মামা হযরত হারাম (রা) মিলহান সকলেই বিশ্বনবীর (সা) মুখলিস প্রেমিক ছিলেন। বংশে সবসময় মহানবীর (সা) এবং তাঁর দাওয়াতের চর্চা হতো। এই পবিত্র পরিবেশে কিশোর আনাসের (রা) অন্তরে হুজুরের (সা) প্রতি ভালোবাসার বীজ অংকুরিত হয়েছিল। তারপর তিনি অব্যাহত দশ বছর পর্যন্ত রহমতে দো আলমের (সা) খিদমতের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এ সময় তাঁকে প্রিয়নবীর (সা) নজীরবিহীন উন্নত চরিত্র এমনভাবে প্রভাবান্বিত করেছিলেন যে, তিনি নিজের স্নেহপরায়ণ আকা ও মাওলার (সা) সত্যিকার

আশেক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি প্রতিটি মুহূর্ত হুজুরকে (সা) এত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে খিদমত করেছিলেন যে, তিনি (সা) সবসময় তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকতেন। বিশ্বনবীর (সা) ওফাত হলে হযরত আনাসের (রা) দুনিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল। কিন্তু নিজের আকার (সা) ইরশাদ অনুযায়ী অস্থিরচিত্ত না হয়ে তিনি ধৈর্য ধারণ করলেন এবং নিজেকে মহানবীর (সা) শিক্ষা ও ইরশাদ উম্মাতের কাছে পৌঁছানোর জন্যে ওয়াক্‌ফ করেছিলেন। তবুও রহমতে আলমের (সা) স্মরণ তাঁকে সবসময় ব্যথিত করে রাখতো। তাঁর এমন কোন মজলিশ ছিল না যাতে হুজুরের (সা) উল্লেখ হতো না। নবী যুগের কোন ঘটনা কারো কাছ থেকে শুনতেন অথবা নিজে বর্ণনার সময় চোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতো। একদিন বিশ্বনবীর (সা) হুলিয়া মুবারক-এর বর্ণনা দিচ্ছিলেন। "আমি কখনো কোন রেশম রাসূলের (সা) হাতের তালু থেকে বেশী নরম পাইনি এবং কোন খোশবু বা সুগন্ধি হুজুরের (সা) বদন মুবারক থেকে বেশী খোশবুদার পাইনি।" এভাবে বর্ণনা করতে করতে ভালোবাসার আধিক্যে বেকারার হয়ে কাঁদতে লাগলেন এবং অযাচিতভাবে মুখ দিয়ে একথা বেরিয়ে এলো ঃ

"কিয়ামতের দিন রাসূলের (সা) যিয়ারত নসিব হলে আরজ করবো, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনার নগণ্য গোলাম আনাস উপস্থিত।"

মহানবীর (সা) প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার প্রভাব এমন ছিল যে, প্রায় সময়ই স্বপ্নে মহানবীর (সা) যিয়ারত লাভ ঘটতো।

আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (সা) তাঁর নিকট দুনিয়ার প্রত্যেক বস্তু থেকে প্রিয় ছিল। সহীহ বুখারীতে স্বয়ং তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তিন বস্তু এমন ; যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে তা পাওয়া যায় তাহলে সে যেন ঈমানের মর্যাদাই পেয়ে গেল। প্রথম হলো, আল্লাহ এবং তার রাসূল ব্যক্তিটির নিকট সমগ্র দুনিয়া থেকেও প্রিয়। দ্বিতীয় হলো, যাকে সে ভালোবাসবে তাকে যেন আল্লাহর খাতিরেই ভালোবাসবে। তৃতীয়, ইসলাম গ্রহণের পর কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন সে এমনভাবে অপসন্দ করবে যেমন আগুনে পড়ে যাওয়াকে অপসন্দ করে।

অন্য আরেক রেওয়ায়াতে বর্ণনা করেছেন, কোন এক ব্যক্তি মহানবীকে (সা) জিজ্ঞেস করলো ; কিয়ামত কবে আসবে। তিনি (সা) বললেন, তুমি কিয়ামতের জন্য কি সামান সংগ্রহ করেছ। আরজ হলো, হে আল্লাহর রাসূল ! আমিতো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে (সা) ভালোবাসি। তিনি (সা) বললেন, ঠিক আছে, যাকে ভালোবাসো তার সাথে তোমার হাশর হবে। হুজুরের (সা) এই ইরশাদ শুনে আমরা যতখানি খুশী হয়েছিলাম কখনো অন্য কথা শুনে

ততখানি খুশী হইনি। আমার আশা যে, নবী (সা), হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত ওমরের (রা) প্রতি ভালোবাসার কারণে তাঁদের সাথে থাকবো। প্রকৃতপক্ষে আমার আমল তাঁদের আমলের মত নয়।

নিজের সন্তান এবং সাধারণ মানুষের প্রশিক্ষণের জন্য প্রিয় নবীর (সা) মহান চরিত্রের উল্লেখ অত্যন্ত বিনয়ের সাথে করতেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর থেকে বর্ণিত কতিপয় হাদীস এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

❑ মহানবী (সা) কখনো কোন খাদ্যদ্রব্যের ত্রুটি বের করেননি। যদি তিনি পসন্দ করতেন তাহলে খেয়ে নিতেন। যদি পসন্দ না হতো তাহলে তা খেতেন না। –সহীহ বুখারী

❑ প্রিয় নবীর (সা) নিকট যখন কোন ব্যক্তি কোন জিনিস চাইতেন তখন তিনি তাঁকে সেই জিনিস দিয়ে দিতেন। একবার এক ব্যক্তি মহানবীর (সা) নিকট এলো। তিনি (সা) এক মরুদ্যানে বিচরণরত (নিজের সকল) বকরী তাকে দিয়ে দিলেন। সেই ব্যক্তি নিজের কওমে ফিরে গিয়ে বলতে লাগলো যে, মুহাম্মাদ (সা) তো এমন ব্যক্তির মত দান করে, যার দারিদ্রতার কোন ভয়ই নেই। কোন কোন সময় কোন ব্যক্তি শুধু সম্পদ হাসিলের জন্য মুসলমান হতো। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই ইসলাম তার কাছে দুনিয়া ও তার মধ্যেকার সকল বস্তু থেকে প্রিয় হয়ে যেতো। –সহীহ মুসলিম

❑ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা নিজের বান্দার প্রতি সেই কথায় সন্তুষ্ট হয়ে যান, যখন সে কোন লোকমা খায় এবং তা খাওয়ার পর আল্লাহর প্রশংসা করে এবং যখন পানির ঢোক পান করে তখনো আল্লাহর প্রশংসা করে। –সহীহ মুসলিম

❑ প্রিয় নবী (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার রিযিকের প্রশস্ততা এবং তার মৃত্যুর পর তার কথা অবশিষ্ট থাকুক তা চায় ; তাহলে সে যেন আত্মীয়দের সাথে সুন্দর আচরণ করে। –সহীহ বুখারী

❑ মহানবী (সা) বলেছেন, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের জন্য যা পসন্দ করে তা নিজের ভাইয়ের জন্য পসন্দ না করে। –সহীহ বুখারী

❑ প্রিয় নবী (সা) আমাকে বলেছেন, বেটা ! যখন তুমি নিজের গৃহে প্রবেশ কর তখন ঘরের লোকদের সালাম কর। এই সালাম তোমার এবং তোমার ঘরের লোকদের জন্য বরকতের কারণ হবে। –তিরমিযি শরীফ

❑ বিশ্বনবী (সা) কতিপয় শিশুর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিনি (সা) তাদেরকে সালাম জানালেন। প্রিয় নবীর (সা) এই মুবারক অভ্যাসই ছিল। –সহীহ বুখারী

❑ মহানবীর (সা) এটা পবিত্র অভ্যাস ছিল যে, যখন তিনি নিজের বিছানায় যেতেন তখন এই দোয়া করতেন ঃ "সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যেই যিনি আমাদেরকে খাইয়েছে এবং পান করিয়েছেন ও আমাদের জরুরাত পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে আরাম করার স্থান দিয়েছেন। কয়েক ধরনের মানুষ আছে, যাদের না প্রয়োজন পূরণ হয়েছে। না তারা আরামের স্থান পেয়েছে।

–সহীহ মুসলিম

বিশ্বনবীর (সা) পবিত্র জীবন সবসময়ই হযরত আনাসের (রা) দৃষ্টিতে থাকতো। এজন্য নিজের সকল কাজেই হুজুরের (সা) অনুসরণের চেষ্টা থাকতো। ইবাদাত হোক অথবা মুয়ামালাত সকল কাজেই রাসূলের (সা) উত্তম আদর্শের ওপর আমল করতেন। নামাযে খুশু-খুজুর অবস্থা এমন ছিল যে, দুনিয়া ও তার মধ্যেকার সকল বস্তু সম্পর্কে বেখবর হয়ে যেতেন। একবার হযরত আবু হুরাইরা (রা) তাঁকে নামায পড়তে দেখে বললেন, আমি ইবনে উম্মে সুলাইমের (রা) [আনাস (রা)] চেয়ে বেশী কাউকেই রাসূলের (সা) মত করে নামায পড়তে দেখিনি।

সুন্নাত অনুসরণের আগ্রহ হযরত আনাসের (রা) মধ্যে এতবেশী ছিল যে, কখনো কোন কাজ রাসূলকে (সা) একবার করতে দেখলেও তা অনুসরণের চেষ্টা করতেন। একবার তিনি দেখলেন যে, প্রিয় নবী (সা) শিশুদেরকে আগেই সালাম দিলেন। তারপর তিনি সারাজীবন এমনকি বার্ধক্য কালেও শিশুদেরকে আগে সালাম দিতেন।

একবার সফরে নামাযের সময় হলো। তিনি উটের পিঠেই নামায পড়ে নিলেন। উট কিবলামুখী ছিল না। শিষ্যরা এতে বিস্ময় প্রকাশ করলো। তিনি বললেন, আমি রাসূলকে (সা) একবার এভাবে নামায পড়তে দেখেছিলাম।

একবার একই কাপড়ে নামায পড়ছিলেন। ইবরাহিম বিন রবিয়াহ (র) তাঁকে এভাবে নামায পড়তে দেখে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। হযরত আনাসের (রা) নামায শেষ হলে ইবরাহিম (র) জিজ্ঞেস করলেন আপনি এক কাপড়ে নামায পড়েন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি হুজুরকেও (সা) এক কাপড়ে নামায পড়তে দেখেছিলাম। [মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে যে, হুজুর (সা) সর্বশেষ নামায হযরত আবু বকরের (রা) পেছনে পড়েছিলেন এবং তা এক কাপড়েই আদায় করেছিলেন।]

হযরত আনাসের (রা) জ্ঞানার্জনের এত আগ্রহ হচ্ছিল যে, তিনি শুধু মাত্র নবীর (সা) সাহচর্যেই অব্যাহতভাবে ১০ বছর কাটাননি বরং মহান সাহাবীদের (রা) নিকট থেকে যথাসাধ্য জ্ঞান অর্জন করেছেন। ফল স্বরূপ তিনি ইলম ও ফজলের "মাজমাউল বাহরাইন" বা দুই সাগরের সমাগমে পরিণত হন।

অতপর এই ইলম বা জ্ঞানকে নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং সারা জীবন তা বিস্তারের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন।

বীরত্ব এবং সাহসিকতাতেও হযরত আনাস (রা) যুবক আনসারদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। অত্যন্ত পারদর্শী ও উঁচু ধরনের অশ্বারোহী ছিলেন। ঘোড় দৌড়ের প্রতিযোগিতায় আগ্রহের সাথে অংশ নিতেন। শৈশবকালে এত দ্রুত বেগে দৌড়াতেন যে, একবার বন্য খরগোশ-এর পিছনে দৌড়ে তাকে ধরে ফেলেন। অথচ তাঁর সকল সমবয়সী বালক তাতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। হযরত আনাস (রা) নিজের সন্তানদেরকে দ্বীনি শিক্ষা প্রদান ছাড়া তীর চালনার প্রশিক্ষণও দিতেন। তাদের নিশানা ভুল হলে স্বয়ং এমনভাবে তাক করে নিশানা লাগাতেন যে, তীর নির্ভুলভাবে যথাস্থানে গিয়ে লাগতো। জিহাদে এত উৎসাহ ছিল যে, বয়স না হওয়া সত্ত্বেও মহানবীর (সা) যুগে ৯টি যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন এবং প্রিয় নবীর (সা) ওফাতের পর হযরত ওমর ফারুকের (রা) শাসনামলে অনেক যুদ্ধে নিজের তরবারীর পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছিলেন। ভালো কাজের নির্দেশ এবং সত্য কথন প্রশ্নে হযরত আনাস (রা) কোন সমালোচক বা বড় বড় ব্যক্তিত্বের কোন পরোয়া করতেন না। ভুল কাজ থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে বাধাদান এবং হক কথা বলার প্রশ্নে কোন সংকোচ-সংশয় প্রকাশ করতেন না। একবার মাসয়াব বিন যোবায়ের (রা) বসরা শাসনকালে শহরের একজন সম্মানিত আনসারীকে ষড়যন্ত্রের সন্দেহে গ্রেফতার করেন। হযরত আনাস (রা) একথা জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ দারুল ইমারাতে গিয়ে পৌঁছলেন। মাসয়াব আমীরের আসনে বসেছিলেন। হযরত আনাস (রা) তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, মহানবী (সা) আমীর ও শাসকদেরকে ওসিয়ত করেছিলেন যে, আনসারদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করতে হবে। তাদের মধ্যে যারা ভালো তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে এবং যারা খারাপ তাদের ব্যাপারে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি রাখতে হবে।

মাসয়াব "খাদিমে রাসূল (সা)" থেকে এ হাদীস শুনে আসন থেকে নেমে নিজের মুখমণ্ডল ফরাশের ওপর রেখে বললেন, রাসূলের (সা) ইরশাদ শিরোধার্য আমি তাঁকে মুক্ত করে দিচ্ছি।

হযরত আনাস (রা) একবার উমাইয়া হুকুমাতের এক আমীর হাকাম বিন আইয়ুবের বাড়ী গেলেন। সেখানে দেখলেন যে, লোকজন একটি মুরগীর পা বেঁধে তার ওপর নিশানা ঠিক করছে। যখন তীর লাগছে তখন মুরগী ফড়ফড় করে উঠছে। হযরত আনাস (রা) ক্রোধে অস্থির হয়ে পড়লেন এবং বললেন, প্রিয় নবী (সা) এ ধরনের কাজ নিষেধ করেছেন। যবানহীন পশুদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সাকাফীর পুত্র একবার বসরার কাজী হওয়ার খাহেশ করলো। হাজ্জাজ তাকে সেই পদে অধিষ্ঠিত করতে চাইছিলো। হযরত আনাস (রা) একথা জানতে পারলেন। তিনি হাজ্জাজের কাছে তাশরীফ নিলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি ইমারতের কাজী পদ লাভের খাহেশ করে ; রাসূলুল্লাহ (সা) এ ধরনের ব্যক্তিকে সেই পদে নিয়োগদানে নিষেধ করেছেন।

কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনার পর হযরত ইমাম হোসাইনের (রা) পবিত্র মাথা ইরাকের গবর্ণর উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের সামনে আনা হলো। এ সময় হযরত আনাসও (রা) দরবারে উপস্থিত ছিলেন। উবায়দুল্লাহ নিজের হাতের ছড়ি সাইয়েদেনা হোসাইনের (রা) পবিত্র চোখের ওপর মেরে তাঁর (রা) মুখমণ্ডল সম্পর্কে অশোভন এবং অপমানকর উক্তি উচ্চারণ করলো। হযরত আনাসের (রা) পবিত্র চেহারা ক্রোধে লাল হয়ে গেল এবং তিনি বললেন ঃ

"তুমি কি জানো এই [সাইয়েদেনা হোসাইন (রা)] চেহারার সাথে মহানবীর (সা) আলোকজ্জল চেহারার সাদৃশ্য রয়েছে।"

একবার উমুব্বী খলিফা আবদুল মালিক হযরত আনাসকে (রা) আনসারের একটি দলের সাথে দামেস্ক ডেকে পাঠালো। সেখান থেকে ফিরতি সফরে ফাজ্জুন নাকাহ নামক স্থানে আসরের সময় হলে হযরত আনাস (রা) দুই রাকায়াত নামায পড়িয়ে নিজের তাঁবুতে চলে গেলেন। তাঁর সঙ্গীরা চার রাকায়াত পুরো করলেন। হযরত আনাস (রা) একথা জানতে পেরে খুব নাখোশ হলেন এবং বললেন, লোকদের কি হয়েছে যে, আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহ থেকে উপকৃত হয় না। আমি রাসূল (সা) থেকে শুনেছি, সেই যামানা আগত যখন মানুষেরা দ্বীনের চুলচেরা বিশ্লেষণ করবে অথচ বাস্তবত তারা দ্বীনের রূহ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে।

হযরত ওমর (র) বিন আবদুল আজীজ শাহজাদা অবস্থায় উমাইয়া হুকুমতের পক্ষ থেকে মদীনা মুনাওয়ারার গভর্নর নিয়োজিত হলেন। সে সময় হযরত আনাসও (রা) মদীনা অবস্থান করছিলেন।

হযরত ওমর (র) বিন আবদুল আজীজ শাহী খান্দানে লালিত পালিত হয়েছিলেন এবং দ্বীনি মাসয়ালা-মাসায়েল সম্পর্কে খুব বেশী জ্ঞাত ছিলেন না। লোকদেরকে নামায পড়ানোর সময় কোন না কোন ভুল হয়ে যেতো। হযরত আনাস (রা) তাঁকে সবসময় শুধরে দিতেন। তাঁর বার বার ভুল শুধরানোর জন্য হযরত ওমর (র) বিন আবদুল আজীজের মেযাজ খিটখিটে হয়ে গেল। একদিন

হযরত আনাসকে (রা) বললেন, আপনি আমার পেছনে কেন লেগে রয়েছেন এবং আমার বিরোধিতায় সবসময় কোমর বেঁধে লেগে থাকার কারণ কি।

হযরত আনাস (রা) বললেন, "আমি রাসূলকে (সা) যেভাবে নামায পড়তে দেখেছি, আপনি যদি সেইভাবে নামায পড়ান তাহলে আমার চেয়ে কেউ বেশী খুশী হবে না। নচেৎ আমি আপনার সাথে নামায পড়াই ছেড়ে দেব।"

হযরত ওমর (র) বিন আবদুল আজীজ অত্যন্ত চরিত্রবান ও সুন্দর স্বভাবের মানুষ ছিলেন। হযরত আনাসের (রা) ইরশাদে খুব প্রভাবিত হলেন এবং তাকে দ্বীনের রহস্য সম্পর্কে তালিম প্রদানের জন্য তার কাছে দরখাস্ত করলেন। এ ব্যাপারে তাঁর আর কি ওজর থাকতে পারতো। তিনি অত্যল্প সময়ে হযরত ওমর (র) বিন আবদুল আজীজকে শরীয়াতের রহস্য সম্পর্কে জ্ঞান দান করলেন। অতপর সে সুন্দর ভারসাম্যপূর্ণ নামায পড়াতে লাগলেন। হযরত আনাস (রা) এই ভাষায়, স্বীকৃতি দিলেন যে, এখন এই যুবকের নামায নবী করীমের (সা) নামাযের সাথে পূর্ণ সাদৃশ্য রয়েছে।

একবার ইরাকের গভর্নর উবায়েদুল্লাহ বিন যিয়াদের মজলিশে হাওজ-কাউসার-এর উল্লেখ হলো, সে হাউজ-কাউসারের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ এবং সংশয় প্রকাশ করলো। হযরত আনাস (রা) এ খবর জানতে পেরে অস্থির হয়ে পড়লেন। উঠে সোজা উবায়েদুল্লাহর দরবারে গেলেন এবং তাকে হাউজ-কাউসার সম্পর্কিত মহানবীর (সা) বাণীসমূহ অবহিত করলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত সে হাওজ কাউসারের অস্তিত্ব মেনে না নিল ততক্ষণ তিনি সেখান থেকে ফিরে এলেন না।

একবার আসরের নামাযের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এমন সময় সাক্ষাতের জন্য কিছু লোক এলো। তারা জিজ্ঞেস করলো কোন্ সময়ের নামাযের প্রস্তুতি বললেন, আসরের। তারা বললো, আমরাতো কেবল জোহর পড়ে আসছি।

হযরত আনাস (রা) খুব অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন, লোকজন বেকার বসে থাকে এবং নামাযের জন্য উঠেনা। যখন সময় খুব কম হয়ে যায় তখন তাড়াতাড়ি উঠে মোরগের মত চার ঠোঁট মেরে নেয়। এ ধরনের নামায হলো মুনাফিকের—মুমিনের নয়।

হযরত আনাসকে (রা) আল্লাহ পাক যেমন অত্যন্ত পবিত্র চরিত্র দান করেছিলেন। তেমনি তাঁকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও পবিত্র সুরতও দান করেছিলেন। চোহরা ছিল সুন্দর কমনীয় এবং আলোকোজ্জল। মিযাযে ছিল অতি পবিত্রতা। চুলে মেহেন্দি লাগাতেন এবং সুগন্ধিবস্তু খুব পছন্দ করতেন। খলুক নামক এক ধরনের খোশবু বা সুগন্ধি সবসময় হাতে লাগাতেন। বার্ধক্যের সময়, দাঁত নড়-বড় করতে শুরু করলো। এ সময় তিনি তা সোনার তার দিয়ে বাঁধলেন।

আংটি পরতেন এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সুন্দর পোশাক পরিধান করতেন। এই প্রসঙ্গে তিনি এই হাদীস সামনে রাখতেন যাতে বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহ তোমাকে তার নিয়ামতসমূহ প্রদান করেছেন। অতএব এমন লেবাস বা পোশাক পরিধান কর যাতে আল্লাহর নিয়ামতের প্রকাশ পায়। খোলা আবহাওয়া খুব পসন্দ করতেন। এজন্য বসরার উপকণ্ঠে তিফ নামক গ্রামে এক আলিশান প্রশস্ত বাড়ী তৈরী করিয়েছিলেন এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। সেখানেই খুব উৎসাহের সাথে একটি বাগান রচনা করেছিলেন। এই বাগানে ফলের চারা ও ফুল প্রভূত পরিমাণে হতো। বাগানটির গাছ থেকে বছরে দু'বার ফল পাওয়া যেত এবং তাতে এক ধরনের এমন ফুল হতো যা থেকে মিশকের সুগন্ধি সুবাসিত হতো। অত্যন্ত সুন্দর খাবার খেতেন। দস্তরখানে প্রায় সময়ই চাপাতি ও গোশত থাকতো। কোন কোন সময় গোশতে তরকারীও দেয়া হতো। লাউয়ের মওসূমে প্রায়ই লাউ দিয়ে গোশত পাকানো হতো। কেননা, তাঁর আকা ও মাওলা (সা) লাউ খুব ভালোবাসতেন। অত্যন্ত দানশীল ব্যাক্তি ছিলেন। খাওয়ার সময় যত ছাত্র উপস্থিত থাকতেন ! পীড়াপীড়ি করে তাদেরকে খাওয়ায় শরীক করিয়ে নিতেন।

অত্যন্ত সুন্দর এবং পরিষ্কারভাবে কথা বলতেন। সাধারণত প্রতিটি বাক্য তিনবার বলতেন। মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে, কারো বাড়ী তাশরীফ নিলে ভেতরে যাওয়ার জন্য তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করতেন।

সীমাহীন ধৈর্যশীল ও বিনয়ী ছিলেন। যদিও তিনি উঁচু মর্যাদার সাহাবী, সরদার এবং জ্ঞান গরিমার অধিকারী ছিলেন। তবুও সাধারণ মানুষের সাথে সকল স্থানে এবং সবসময় লৌকিকতাহীনভাবে মেলামেশা করতেন। এমনি-ভাবে শাগরিদ বা ছাত্রদের সাথেও খোলামেলা মিশতেন এবং তাদেরকে তার তা'জিমের জন্য উঠে দাঁড়ানো থেকে বাধা দিতেন। প্রায়ই বলতেন যে, আমরা বসে থাকতাম এবং প্রিয় নবী (সা) তাশরীফ আনতেন। এ সময় আমাদের কেউই তা'জিমের জন্য উঠে দাঁড়াতো না। এটা এজন্য যে, প্রিয় নবী (সা) এ ধরনের লৌকিকতা অপসন্দ করতেন। নচেৎ তাঁর চেয়ে বেশি আমাদের প্রিয় অন্য কেউ ছিল না। মোটকথা হযরত আনাস (রা) সুন্দর চরিত্রের এক আধার ছিলেন। তিনি চরিত্র ও গুণ মাধুর্যের যে নিদর্শন ইতিহাসের পাতায় রেখে গেছেন তা আজও আমাদের আলোকবর্তিকা হয়ে রয়েছে।

হযরত মুবাশশার (রা) বিন আবদুল মানযার আনসারী

তিনি আওস গোত্র শাখা বনু আমর বিন আওফ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। নসব নামা হলো ঃ মুবাশশার (রা) বিন আবদুল মানযার বিন যানবার বিন যায়েদ বিন উমাইয়াতা বিন যায়েদ বিন মালিক বিন আওফ বিন আমর বিন আওফ বিন মালিক বিন আওস। মাতার নাম ছিল নুসাইবাহ। সেও বনু আমর বিন আওফের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। ইবনে সায়াদ (রা) তাঁর নসবনামা এভাবে দিয়েছেন ঃ নুসাইবাহ বিনতে যায়েদ বিন জাবিয়াহ বিন যায়েদ বিন মালিক বিন আওফ বিন আমর বিন আওফ। বিশ্বনবীর (সা) হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর পরিবারের বসবাস ছিল কুবাতে। হিজরতের পর প্রিয় নবী (সা) কুবাতে শুভ পদার্পণ করলে আমর বিন আওফ-এর গোত্রই তাঁর মেযবানীর সৌভাগ্য অর্জন করেন। কুবায় অবস্থানকালে মদীনার সকল খাজরাজী নেতা হুজুরের (সা) খেদমতে হাজির হন। কিন্তু তাতে বনু নাজ্জারের নকিব হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ [যিনি মহানবীর (সা) অত্যন্ত মুখলিস সাহাবী] ছিলেন না। প্রিয় নবী (সা) কুবাবাসীদের নিকট তাঁর সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তখন হযরত মুবাশশার (রা) বিন আবদুল মানযার, তাঁর সহোদর আবু লুবাবাহ রাফায়াহ (রা) বিন আবদুল মানযার এবং হযরত সায়াদ বিন খাইছুমা আওসী (রা) আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! সায়াদ বুয়াসের যুদ্ধে আমাদের কবিলার একজন সরদার নাবতাল বিন হারিছকে হত্যা করেছিল। সেজন্য সে এখানে আসতে ইতস্তত করছে।" দ্বিতীয় দিন হুজুর (সা) এই তিনজনকে ডেকে বললেন, "আমার ইচ্ছা হলো, তোমরা আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহকে আশ্রয় দেবে।" তাঁরা আরজ করলেন, আপনি এটা চাইলে আমরা অবশ্যই তা করবো। সুতরাং হযরত সায়াদ (রা) বিন খাইছুমা (রা) তৎক্ষণাৎ হযরত আসয়াদের (রা) বাড়ী গেলেন আবং তাঁর হাত ধরে নিজেদের গোত্রে নিয়ে এলেন। বনু আমর বিন আওফ এর অন্যান্য সদস্যরা যখন মহানবীর (সা) ইচ্ছা সম্পর্কে জানতে পেলেন তখন তাঁরা সকলেই হযরত আসয়াদকে (রা) আশ্রয় দিলেন। কয়েক মাস পর হুজুর (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করলেন। এ সময় হযরত মুবাশশারকে (রা) হযরত আকিল (রা) বিন আবি বাকিরের দ্বীনি ভাই বানিয়ে দিলেন।

দ্বিতীয় হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। হযরত মুবাশশার (রা) এই যুদ্ধে অত্যন্ত উৎসাহ এবং আবেগের সাথে অংশ নিলেন এবং জীবন বাজি রেখে লড়াই করতে করতে আবুছুর নামক একজন মুশরিকের হাতে শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন।

কেউ কেউ লিখেছেন যে, তিনি ওহোদে নিঃসন্তান অবস্থায় শহীদ হন। এক রেওয়ায়াতে এও আছে যে, তিনি খায়বারে শাহাদাত পিয়েছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ চরিতকারই লিখেছেন, তিনি বদরের যুদ্ধেই শহীদ হয়েছিলেন।

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু লুবাবাহ রাফায়াহ (রা) হযরত মুবাশশার (রা) এর সহোদর ছিলেন।

হযরত নু'মান (রা) বিন মালিক আনসারী

তাঁর সম্পর্ক ছিল খাজরাজের "বনু কাওকাল"-এর সঙ্গের নসবনামা হলোঃ নু'মান (রা) বিন মালিক বিন ছা'লাবা বিন রায়াদ বিন ফাহার বিন ছা'লাবা বিন গানাম বিন আওফ বিন খাজরাজ।

অত্যন্ত মুখলিস এবং আবেগোদ্দীপ্ত মুসলমান ছিলেন। সর্বপ্রথম বদরের যুদ্ধে তরবারীর নিপুণতা দেখিয়েছিলেন। তৃতীয় হিজরীতে মহানবী (সা) ওহোদের যুদ্ধে রওনা হলেন। এ সময় হযরত নোমানও (রা) হুজুরের (সা) সঙ্গে ছিলেন। রওয়ানার প্রাককালে তিনি রাসূলের (সা) খিদমতে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহর কসম আমি অবশ্যই জান্নাতে দাখিল হবো।"

হুজুর (সা) বললেন, "তা কেমন করে ?" আরজ করলেন ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আপনি (সা) আল্লাহর রাসূল । আমি যুদ্ধ থেকে কখনো ভেগে যাবো না।" হুজুর (সা) বললেন ঃ "তুমি সত্য বলেছ।"

যুদ্ধ শুরু হলে হযরত নুমান (রা) জীবন বাজী রাখার হক আদায় করলেন এবং অবশেষে শাহাদাতের পেয়ালা পান করে জান্নাতে পৌছে গেলেন। এভাবে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কসম রক্ষা করলেন। এক রেওয়ায়াতে আছে যে, ছাফওয়ান বিন উমাইয়া তাঁকে শহীদ করেন।

কতিপয় চরিতকার হযরত নুমান (রা) বিন মালিক এবং হযরত নু'মানুল আরাজকে (রা) একই ব্যক্তি বলে ধারণা করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দু'জন পৃথক ব্যক্তিত্ব। যদিও উভয়ের দাদা ছিলেন একজন। নু'মানুল আরাজ (রা)-এর পরদাদার নাম ছিল আহরাম (আছরাম) বিন ফাহার এবং নু'মান (রা) বিন মালিকের পর দাদার নাম ছিল রায়াদ বিন ফাহার। তাছাড়া নু'মানুল আরাজ (রা) আল্লাহকে নিজে জান্নাতে দাখিল করার জন্য কসম দিয়েছিলেন। আর নু'মান (রা) বিন মালিক স্বয়ং কসম খেয়ে ছিলেন যে, তিনি জান্নাতে দাখিল হবেন।

হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ সায়েদী আনসারী

রহমতে আলম (সা) একদিন মসজিদে নববীতে (সা) বসেছিলেন। কয়েকজন জাননিছার সাহাবীও প্রিয় নবীর (সা) পাশে উপস্থিত ছিলেন এবং হুজুরের (সা) মহান বাণী শ্রবণ করছিলেন। ইত্যবসরে একজন এসে খবর দিল যে, আপনার (সা) একজন মাদানী সাহাবী কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। হুজুর (সা) এই খবর শুনে বেচাইন হয়ে পড়লেন এবং সাহাবায়ে কিরামকে (রা) সঙ্গে নিয়ে শুশ্রূষার জন্য তাঁর বাড়ী তাশরীফ নিলেন। এর আগে হুজুর (সা) কখনো তাঁর বাড়ী তাশরীফ নিলে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে মহানবীকে (সা) ইসতিকবাল করার জন্য রাস্তায় বিছানা বিছিয়ে দিতেন। কিন্তু আজ হুজুর (সা) তাঁর গৃহে পদার্পণ করলেন। অথচ তাঁর কোন খবর নেই। কঠিন ব্যাথায় দুনিয়া ও তাঁর মধ্যকার কোন বস্তু সম্পর্কেই তাঁর কোন খবর ছিল না। এমন বেহুশ ছিলেন যে, তাঁকে দেখে কেউ কেউ মৃতুই মনে করছিলেন। কেউ বললেন, ওফাত পেয়েছেন । কেউ বললেন, শুধু নিশ্বাসটুকু বাকী রয়েছে। হুজুর (সা) তাঁর এই অবস্থা দেখে খুব কষ্ট পেলেন। তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। মহানবীর (সা) এই অবস্থা দেখে উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামও (রা) কাঁদতে লাগলেন। এ সত্ত্বেও হুজুর (সা) সবাইকে ভরসা দিলেন। রুগীর রোগ মুক্তির জন্য দোয়া করলেন এবং অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে ফিরে গেলেন। রাসূলের এই রুগ্ন সাহাবী যাঁর সঙ্গে সাইয়েদুল আনামের (সা) এমন আন্তরিক সম্পর্ক ছিল—তিনি ছিলেন সাইয়েদেনা হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ সায়েদী আনসারী। সাইয়েদেনা হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ মহান মর্যাদাবান সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। তিনি খাজরাজ-এর শাখা "বনু সায়িদাহর" আশার আলো ছিলেন এবং ইমারত ও রিয়াসত তাদের গৃহের দাসী ছিল। এজন্য সাইয়েদুল খাজরাজ উপাধিতে মশহুর ছিলেন। কুনিয়াত বা ডাকনাম আবু কায়েসও ছিল। আবার আবু ছাবিততও ছিল। নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ বিন দুলাইম বিন হারিদাহ বিন আবিখুযাইমাহ বিন ছা'লাবাহ বিন তোরাইফ বিন খাজরাজ বিন সায়িদাহ বিন কায়াব বিন খাজরাজ আকবার।

মাতার নাম ছিল উমরাহ (রা) বিনতে মাসদি। তিনিও ইসলাম গ্রহণ এবং মহিলা সাহাবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। হযরত সায়াদের (রা) দাদা

দুলাইম এবং পিতা উবাদাহ নিজের সায়িদাহ খান্দানের সরদার এবং খাজরাজ গোত্রের প্রতিপত্তিশালী নেতা ছিলেন। তারা শুধু নামের সরদারই ছিলেন না বরং অন্তরেরও সরদার ছিলেন এবং তাদের দস্তরখানে হাজার হাজার মানুষ প্রতিপালিত হতো। দুলাইমের আমলে তাঁদের খান্দানে একটি নিয়ম ছিল। নিয়মটি হলো প্রতিদিন দুর্গের ওপর থেকে এক ব্যক্তি এই মর্মে ঘোষণা দিত যে, কোন ব্যক্তি যদি উত্তম ও সুস্বাদু খাবার গোশত এবং তেল কামনা করে সে যেন আমাদের এখানে আগমন ও অবস্থান করে। দুলাইমের এই সাধারণ দাওয়াতে মুসাফির ও স্থানীয় সকল ধরনের মানুষই উপকৃত হতেন। এজন্য দূর-দূরান্ত পর্যন্ত তাঁদের এই বদান্যতা ও দানশীলতার কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁদের খান্দানী মূর্তির নাম ছিল মানাত। প্রতি বছর মক্কা গিয়ে ১০টি উট তার মান্নত হিসেবে জবেহ করা হতো। দুলাইমের পর উবাদাহ এবং উবাদাহর পর সায়াদ (রা) ও নিজেদের খান্দানী রীতি বজায় রেখেছিলেন এবং নিজেদের দানশীলতা ও বদান্যতা জোরেশোরেই অব্যাহত ছিল। ইসলামপূর্ব যুগে আরবে মানুষ সাধারণত জাহেল ছিল এবং খুব কম সংখ্যক মানুষই লেখাপড়া জানতো। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ মদীনার সেই অল্প সংখ্যক মানুষের অন্যতম ছিলেন যারা জাহেলী যুগে ও অত্যন্ত সুন্দরভাবে আরবী লিখতে পারতেন। তিনি শুধুমাত্রই লিখন-পঠনেই পারদর্শী ছিলেন না বরং একজন অভিজ্ঞ তীরন্দাজও ছিলেন। এজন্য লোকদের মধ্যে তিনি "কামিল" উপাধিতে মশহুর ছিলেন।

নবুওয়াতের ১১ বছর পর মদীনার ৬জন ভাগ্যবান খাজরাজী মক্কা থেকে মুসলমান হয়ে ফিরে এলেন। এ সময় খাজরাজের ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা হতে লাগলো। আল্লাহ তা'য়ালা হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাকে নেক স্বভাব দান করেছিলেন । তিনিও সেই যুগে ইসলাম গ্রহণের মর্যাদায় অভিশিক্ত হয়ে ছিলেন। যদিও কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি বাইয়াতে উকবায়ে কবিরাতে (নবুয়াতের ত্রয়োদশ বছরে) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সঠিক মত হলো, তিনি তার আগেই ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। নবুওয়াতের তের বছর পর মদীনাবাসীদের একটি বড় কাফেলা হজ্জের জন্য মদীনা থেকে মক্কা রওয়ানা হচ্ছিল। এ সময় হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ সমেত ৭৫জন ঈমানদার ব্যক্তিও সেই কাফেলায় শামিল হয়ে গেলেন। তাঁরা সেই বুলন্দ হিম্মত ও বাহাদুর ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা একটি নির্ধারিত রাতের অন্ধকারে মুশরিক সঙ্গীদের থেকে পৃথক হয়ে উকবা গিরিপথে বিশ্বনবীর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে তাঁর (সা) হাতে বাইয়াত করেছিলেন। এ সময় তাঁরা আরেকটি প্রতিশ্রুতি করেছিলেন। প্রতিশ্রুতিতে তাঁরা মহানবীকে (সা) মদীনা তাশরীফ নেয়ার দাওয়াত দিয়ে ছিলেন এবং বলেছিলেন মহানবী (সা) মদীনা

গেলে তাঁরা তাদের জান-মাল এবং সন্তানসহ তাঁকে (সা) হিফাজত ও সাহায্য করবেন। বাইয়াতের পর মদীনাবাসী হুজুরের (সা) ইরশাদ অনুসারে নিজেদের মধ্য তেকে ১২জন নকিব নির্বাচন করেছিলেন। এই ১২জনের মধ্যে ৯জন ছিলেন খাজরাজী এবং ৩ জন আওসী। খাজরাজী নকিবদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ। ইতিহাসে এই মহান ঘটনা বাইয়াতে উকবায়ে ছানিয়া, বাইয়াতে উকবায়ে কবিরা অথবা বাইয়াতে লাইলাতুল উকবা নামে খ্যাত। এই ঘটনা বিশ্বনবী (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের (রা) মদীনায় হিজরতের ভূমিকা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। যদিও বাইয়াতে উকবায়ে কবিরার ঘটনা সম্পূর্ণরূপে সংগোপনে ঘটেছিল। তবুও মক্কার মুশরিকদের কানে কোন না কোনভাবে তার আওয়াজ গিয়ে পৌঁছে ছিল। তারা প্রত্যুষে কাফেলাওয়ালাদের কাছে গেল এবং তাদেরকে বললো ঃ

"হে খাজরাজের দল ! আমরা জানতে পেরেছি যে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মুহাম্মাদের (সা) কাছে বাইয়াত করেছ।" ইয়াসরাবের (মদীনা) মুশরিকরা এই বাইয়াত সম্পর্কে কিছুই জানতো না। তারা কসম খেয়ে বললো, এমন ধরনের কোন কথা হয়নি। তাদের সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাই বললো, এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটলে আমার কাছে তা গোপন থাকতো না।

কুরাইশ নেতৃবৃন্দ এই জবাবে মুতমায়েন হয়ে ফিরে চলে গেল। কিন্তু শীঘ্রই তারা প্রকৃত ঘটনা জানতে পেলো। তখন তারা কাফেলার পেছনে ছুটলো। কাফেলা তো ইতিমধ্যে চলে গেছে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ এবং হযরত মুনযির (রা) বিন আমর কাফেলা থেকে পেছনে পড়ে গেছে। মুশরিকরা তাঁদেরকে আজাখির (অথবা হাজিয) নামক স্থানে গিয়ে ধরে ফেললো। মুনযির (রা) কোনভাবে তাদের হাত থেকে ছুটে যেতে পারলেন। কিন্তু হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ তাদের নির্মম হাতে গ্রেফতার হয়ে গেলেন। জালেমরা উটের হাওদার চামড়ার লম্বা টুকরার সাথে তাঁর হাত গর্দান পেঁচিয়ে বেঁধে দিলো এবং তাঁকে মারতে মারতে এবং মাথার চুল ধরে টেনে হিঁচড়ে মক্কা নিয়ে এলো। অতপর যে কেউ সেখানে আসতো সেই তাঁর ওপর নির্যাতন চালাতো এবং তার মাথার চুল ধরে টানা হেঁচড়া করতো। হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ বর্ণনা করেছেন, "আমি যখন মক্কায় কুরাইশদের নির্যাতনের নিশানা ছিলাম তখন গৌরাঙ্গ ও আলো ঝলমল চেহারার এক ব্যক্তিকে আমার দিকে আসতে দেখলাম। এই ব্যক্তি ছিলেন সোহায়েল বিন আমর। (তিনি মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেন।) আমি মনে মনে চিন্তা করলাম যে, আমি যদি কারো কাছ থেকে উত্তম ব্যবহারের আশা করি তাহলে এই ব্যক্তির কাছ থেকেই করতে পারি। কিন্তু যখন সে

আমার কাছে এলো তখন এতো জোরে আমার মুখের ওপর ঘুঁষি মারলো যে, আমার মুখ ঘুরে গেল। তখন আমি বুঝলাম যে এরা সবাই জালেম এবং কালো দিলের মানুষ। ইত্যবসরে আরো এক ব্যক্তি এলো (সে ছিল আবুল বখতার বিন হিশাম। সে বললো, "আরে ভাই ! এভাবে আর কত দিন মার খেতে থাকবে। মক্কায় তোমার পরিচিত কেউ নেই ?" আমি বললাম হাঁ, আমি হারিছ বিন উমাইয়া (বিন আবদি শামছ বিন আবদি মানাফ) ও জুবায়ের বিন মাতয়িন বিন আদিকে চিনি। এই দুই ব্যক্তি বাণিজ্য উপলক্ষে আমাদের ইয়াসরাব শহরে যাতায়াত করে থাকেন। আমি বহুবার তাঁদের বাণিজ্যিক কাফেলার হিফাজত করেছি—একথার পরিপ্রেক্ষিতে সে বললো, তাহলে ঐ দুই ব্যক্তির নাম নিয়ে দোহাই দাও এবং লোকদেরকে বলো যে তোমার ও তাদের মধ্যে কি সম্পর্ক রয়েছে। আমি এভাবেই বললাম। ওদিকে সেই ব্যক্তি শহরে গেল এবং তাদের উভয়কে কা'বার হেরেমে উপস্থিত পেয়ে বললো, খাজরাজের এক ব্যক্তি 'আবতাহ'-তে মক্কাবাসীদের হাতে মারাত্মকভাবে পিটুনী খাচ্ছে এবং সে তোমাদের দু'জনের-নামের দোহাই দিচ্ছে ও বলছে তার এবং তোমাদের মধ্যে আশ্রয়ের (প্রতিবেশীর) সম্পর্ক রয়েছে। তাঁরা জিজ্ঞেস করলো, সে তার নাম কি বলে ? সে বললো, সায়াদ বিন উবাদাহ। তাঁরা বললো, গজব হয়ে গেছে। এই সায়াদ তো খাজরাহ গোত্রের মহান নেতা এবং আল্লাহর কসম ! সে যা কিছু বলছে তা সবই ঠিক। সবসময় সে আমাদেরকে আশ্রয় দিয়ে থাকে এবং সে ইয়াসরাবে কাউকে আমাদের ওপর জুলুমের ইজাজত দেয়নি। অতপর তারা দৌড়াতে দৌড়াতে এলো এবং আমাকে ঐ সব জালেমদের পাঞ্জা থেকে নাজাত দিল।"

হযরত সায়াদ (রা) মুক্তি পেয়ে মদীনার দিকে রওয়ানা দিলেন। ইতিমধ্যে পথে তিনি নিজের আনসার ভাই মক্কার দিকে ফিরে যাওয়া অবস্থায় পেলেন। সে তাঁর খোঁজেই আসছিল। এখন তাঁকে সাথে নিয়ে মদীনায় রওয়ানা হয়ে গেলেন।

হিজরতের পর রহমতে আলম (সা) মদীনায় শুভ পদার্পণ করলেন। এ সময় আনসাররা অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে তাঁকে উষ্ণ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলো। হযরত সায়াদও (রা) তাদের মধ্যে ছিলেন। মহানবী (সা) বনু সায়িদার মহল্লা অতিক্রম করছিলেন। এ সময় হযরত সায়াদ (রা) সামনে অগ্রসর হয়ে আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল ! এটা আমার গরীব খানা। এখানে শুভ পদার্পণ করুন।" হুজুর (সা) তাঁকে দোয়া খায়ের করলেন। এবং বললেন, "আমার উটনীকে চলতে দাও! যেখানে নির্দেশ আছে সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়বে।"

বিশ্বনবীর (সা) মেযবানীর মর্যাদা আল্লাহ তায়ালা হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর (রা) ভাগ্যে লিখে রেখেছিলেন। সুতরাং মহানবীর (সা) উটনী তার দরজার সামনে গিয়ে বসে পড়লো এবং আবু আইয়ুবের গৃহ মহানবীর (সা) আলোয় ঝলমল করে উঠলো। ইবনে সায়াদ (রা) বর্ণনা করেছেন, বিশ্বনবী (সা) আবু আইয়ুবের (রা) গৃহে অবস্থানের সাথে সাথে আনসারদের বাড়ী থেকে বিভিন্ন ধরনের খাবার তাঁর খিদমতে পৌছা শুরু হলো। হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহর বাড়ী থেকে ছুরায়েদ (এক ধরনের মূল্যবান সুস্বাদু খাবার) ভর্তি একটি বড় পাত্র রাসূলের (সা) খিদমতে পৌছলো। হাফেজ ইবনে হাজার (র) "আল-ইসাবাহ" গ্রন্থে লিখছেন যে, হযরত সায়াদ (রা) প্রায়ই হুজুরের (সা) খিদমতে খাবার প্রেরণ করতেন। হিজরতের প্রথম বছরের শেষে অথবা দ্বিতীয় বছরের প্রথম দিকে প্রিয় নবী (সা) আবওয়া যুদ্ধে গমন করেন। এ সময় তিনি হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহকে মদীনা মুনাওয়ারাতে নিজের স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে যান।

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে বদরুল কুবরা যুদ্ধের আগে হুজুর (সা) মক্কা থেকে কুরাইশ বাহিনীর রওয়ানার খবর পেলেন। এ সময় তিনি দুশমনের সাথে মোকাবিলা প্রশ্নে নিজের জাননিছারদের সাথে পরামর্শ করলেন। মুহাজিরদের মধ্য থেকে কতিপয় সাহাবী অত্যন্ত আগুন ঝরা বক্তৃতা করলেন এবং মহানবীকে (সা) নিশ্চয়তা দিলেন যে, তারা হকপথে জীবন বাজি লাগিয়ে দেবেন। তাদের কুরবানীর আবেগ দেখে প্রিয় নবী (সা) খুব খুশী হলেন। তা সত্ত্বেও তিনি বললেন এখন অন্য সাহাবীরাও মত প্রকাশ করবেন। এই ইরশাদের লক্ষ্য ছিল আনসারদের মত জানা। কেননা আনসাররা বাইয়াতে লাইলাতুল উকবাতে শুধু এই ওয়াদা করেছিল যে, তারা মদীনা মুনাওয়ারাতে তাঁর (সা) হিফাজত ও সাহায্য করবে। একথা বলেননি যে, তারা মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বাইরে বের হয়েও মহানবীর (সা) সাহায্যে লড়াই করবেন। হযরত সায়াদ (রা) হুজুরের (সা) ইচ্ছা বুঝতে পারলেন। তিনি দাঁড়িয়ে আরজ করলেন।

"হে আল্লাহর রাসূল! সম্ভবত আপনি আমাদের ইচ্ছার কথা জানতে চান।"

হুজুর (সা) বললেন "হাঁ" হযরত সায়াদ (রা) আরজ করলেন।

"হে আল্লাহর রাসূল (সা) সেই সত্তার কসম, যার কুদরতি হাতে আমার জীবন রয়েছে, যদি আপনি আমাদেরকে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন তাহলে আমরা নির্দ্বিধায় সমুদ্রে লাফিয়ে পড়বো। আর যদি শুকনো স্থানে নির্দেশ হয় তাহলে আমরা বারকুল গামাদ (ইয়ামেনের এক দূরবর্তী স্থান) পর্যন্ত পৌছতে উটের কলিজা গলিয়ে ফেলবো।"

এক বর্ণনা অনুযায়ী এই বাক্যাবলী আওস সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজ আশহালি আনসারির মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল। হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ ও হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজ উভয়েই স্ব স্ব গোত্রের উঁচুপর্যায়ের নেতা ছিলেন। এজন্য হতে পারে যে, উভয়েই নিজেদের আবেগ ও ত্যাগের কথা একই ধরনের ভাষা দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। যাহোক, বিশ্বনবী (সা) তাঁর আবেগপূর্ণ কুরবানীর ঘোষণায় খুবই খুশী হয়েছিলেন। আনন্দে মহানবীর (সা) চেহারা আলোকোজ্জল হয়ে উঠেছিল। তিনি (সা) প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন।

ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ বদরের যুদ্ধে গমনের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু কুকুরে কামড় দেয়। ফলে তিনি প্রিয় নবীর (সা) সফর সঙ্গী হওয়া থেকে বঞ্চিত হন। মহানবী (সা) এ খবর শুনে দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, যুদ্ধে শরীক হওয়ার ব্যাপারে তাঁর বড় আশা ছিল। তবুও তিনি (সা) তাঁকে বদরের সাহাবীদের মধ্যে শামিল করলেন এবং গনিমতের মাল থেকে তাঁকে অংশ দিলেন। ইবনে সায়াদের (র) বিপরীত ইমাম বুখারী (র) ও ইমাম মুসলিম (র)-এর নিকট হযরত সায়াদ (রা) বদরের যুদ্ধে কার্যত শরীক ছিলেন।

পরবর্তী বছর তৃতীয় হিজরীতে ওহোদের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। হযরত সায়াদ (রা) অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনাসহ তাতে অংশ নিলেন। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, মক্কার কাফেদের হামলার খবর ছড়িয়ে পড়লো। এ সময় মদীনাবাসী শহরের চারপাশে সশস্ত্র পাহারা বসিয়েছিল। এ সময় বিশ্বনবীর (সা) বাড়ীর হিফাজতের দায়িত্ব নিলেন হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ। তিনি কতিপয় ব্যক্তিসহ সশস্ত্র হয়ে মসজিদে নববীতে পৌঁছে গেলেন এবং সারারাত প্রিয় নবীর (সা) বাড়ী পাহারা দিলেন। পরবর্তী দিন মহানবী (সা) যুদ্ধের ময়দানের দিকে রওয়ান হলেন। এ সময় খাজরাজের ঝান্ডা হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহকে প্রদান করলেন। তিনি এবং আওস সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজ ঝান্ডা উঁচিয়ে সেনাবাহিনীর আগে আগে চলতে লাগলেন। যুদ্ধ শুরু হলে হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দানে বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। তিনি যখন রাসূলে আকরামের (সা) আহত হওয়ার খবর পেলেন তখন অস্থির হয়ে হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হলেন। সে সময় হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজ হযরত আবু উবায়দাহ (রা) ইবনুজ জাররাহ এবং অন্য কতিপয় সাহাবীও হুজুরের (সা) নিকট পৌঁছে গিয়েছিলেন তাঁরা সবাই মিলে মহানবীর (সা) শুশ্রূষা ও হেফাজতের দায়িত্ব আঞ্জাম দিলেন।

ওহোদের যুদ্ধের কয়েক মাস পর বনু নজিরের ইহুদীরা বিশ্বাসঘাতকতার জন্য কোমর বেঁধে লাগলো। এসময় মহানবী (সা) তাদেরকে অবরোধ করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাদের শক্তি শেষ হয়ে গেল এবং পরাজয় স্বীকার করে নিল। (হুজুর (সা) তাদেরকে মদীনা থেকে শুধুমাত্র বহিষ্কারই করলেন) বনু নজির অবরোধকালে হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ নিজের খরচে মুজাহিদদের মধ্যে খেজুর বন্টন করেছিলেন।

পঞ্চম হিজরীর শাবান মাসে প্রিয় নবী (সা) বনু মুসতালিককে উৎখাতের জন্য মাররে ইয়াসি তাশরীফ নিলেন। এ সময় হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহও তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন। এবার সকল আনসার (আওস এবং খাজরাজ উভয়)-এর ঝান্ডা তাঁর কাছে ছিল।

সে বছরই খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এই যুদ্ধে আরবের সকল মুশরিক ও ইহুদীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মদীনা মুনাওয়ার ওপর হামলা করে বসলো। মুসলমানদের জন্য এটা ছিল কঠিন পরীক্ষার সময়। কিন্তু তারা নিজেদের ঈমানী শক্তির বলে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো। যুদ্ধকালে এক সুযোগে মহানবী (সা) বনু গাতফানের নেতৃস্থানীয়দেরকে কাফেরদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য গাতফান সরদারকে আলোচনার জন্য ডাকলেন। তারা দাবী করলো যে, মদীনায় উৎপাদিত শস্যের এক-তৃতীয়াংশ তাদেরকে দিলে তারা ফিরে যাবে। হুজুর (সা) পরামর্শের জন্য হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ, হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজ এবং হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়েরকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁদেরকে গাতফানীদের দাবী সম্পর্কে অবহিত করলেন। এই তিনজন আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! এ ব্যাপারে আল্লাহর তরফ থেকে কোন হুকুম নাযিল হয়নি তো ? হুজুর (সা) বললেন ঃ "না" অতপর তিনজন একবাক্যে বললেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! এই গাতফানীদেরকে তো আমরা জাহেলী যুগেও কোন সময় ঘাসও দেইনি এখন তো আল্লাহ তায়ালা আপনার সাহায্যে আমাদেরকে হেদায়াতের রাস্তা দেখিয়েছেন এবং ইসলাম আমাদের মাথা উঁচু করে দিয়েছে। এখন কেন আমরা তাদেরকে খিরাজ দিব ? তাদের জন্য তো আমাদের তরবারীই আছে এবং তাই যথেষ্ট।"

বিশ্বনবী (সা) তাদের দ্বীনি মর্যাদাবোধ দেখে খুব খুশী হলেন এবং তাদের জন্য দোয়া খায়ের করলেন।

ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, খন্দকের যুদ্ধেও আনসারদের ঝাণ্ডা হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদার নিকট ছিল।

খন্দকের যুদ্ধের পর হুজুর (সা) বনু কোরায়জার ইহুদীদেরকে অবরোধ করলেন। অবরোধকালে হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ অবরোধকারী মুজাহিদদের রসদপত্তর নিজের কাছ থেকে সরবরাহ করেছিলেন।

৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউস সানীতে বনু গাতফান ও বনু ফাযারার লুটেরারা মদীনার কয়েক মাইল দূরে গাব্বাহ নামক স্থানে হুজুরের (সা) উটগুলো লুটে নিল। এ সময় তিনি (সা) তাদের উৎখাতের জন্য জি কারদ তাশরীফ নিলেন। তখন প্রিয় নবী (সা) হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহকে মদীনা মুনাওয়ারাতে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত এবং তিনশ' মুজাহিদকে শহর রক্ষার জন্য তাঁর অধীনে দিয়ে যান। ইবনে সায়াদ (র) লিখেছেন, সফরকালে হুজুর (সা) রসদপত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। তখন তিনি (সা) হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাকে খবর পাঠালেন। তিনি মদীনা থেকে ১০টি উট ও খেজুরের অনেকগুলো বস্তা প্রেরণ করলেন। হুজুর (সা) জি কারদ নামক স্থানে এগুলো পেয়েছিলেন।

৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে হুদাইবিয়া নামক স্থানে "বাইয়াতে রিদওয়ানের" মহান ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। এ সময় হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ সেই ১৪শ' মাথা বিক্রিকারী সাহাবায়ে কেরামের (রা) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যারা হুজুরের (সা) পবিত্র হাতে "মৃত্যুর" বাইয়াত করেছিলেন এবং যারা প্রকাশ্য ভাষায় আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির সুসংবাদ পেয়েছিলেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর বিশ্বনবী (সা) খায়বারের যুদ্ধের জন্য রওয়ানা দিলেন। এ সময় ইসলামী বাহিনীকে তিনটি ঝাণ্ডা প্রদান করলেন। এর মধ্যে একটি ঝাণ্ডা তিনি (সা) হযরত সায়াদকে (রা) দিলেন।

অষ্টম হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে রহমতে আলম (সা) মক্কা বিজয়ের ইরাদা করলেন। এ সময় তিনি খাস নিজের ঝাণ্ডা হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদার হাতে সোপর্দ করলেন। মুসলমানরা শহরে প্রবেশ করলো। তখন হযরত সায়াদ (রা) ঝাণ্ডা উড়িয়ে অত্যন্ত শান-শাওকতের সাথে আনসারদের আগে আগে চলছিলেন। সে সময় তাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনার এক আশ্চর্যজনক অবস্থা ছিল। কুরাইশ সিপাহসালার আবু সুফিয়ানের ওপর দৃষ্টি পড়তেই তাঁর সীমাহীন আবেগ মুখ দিয়ে যুদ্ধ গাথায় প্রকাশ পেল ঃ

اليوم يوم الملحمد اليوم تستحل الحرمه

(আজ কঠিন রক্তাক্তের দিন আজ কা'বা হালাল হয়ে যাবে।)

হযরত আবু সুফিয়ান এই যুদ্ধ গাথা শুনে কেঁপে উঠলো। হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহর পর হুজুরের (সা) বিশেষ বাহিনী তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করলো। এ সময় আবু সুফিয়ান চেঁচিয়ে বললো ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি কি আপনার কওমকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর কসম, এই কওমের ওপর রহম করুন। সায়াদ (রা) বিন

উবাদাহ্ এখনই এই হুমকি দিয়ে অতিক্রম করে গেল যে, আজ কঠিন রক্তা-রক্তির দিন, আজ সম্মান ভুলুণ্ঠিত করা হবে এবং কুরাইশদেরকে বরবাদ করা হবে। আমি আপনাকে (সা) আপনার কওমের ব্যাপারে আল্লাহর ওয়াস্তে দিচ্ছি। আপনি তো (সা) সকল মানুষের মধ্যে উত্তম এবং সেফায়েল রেহেমী বা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রেখে থাকেন।"

এ সময় হযরত ওসমান গনি (রা) এবং হযরত আবদুর রহমান বিন আওফও হুজুরের (সা) খিদমতে আরজ করলেন, আমরা ভয় পাচ্ছি যে, সত্যি সায়াদ (রা) কুরাইশদের ওপর তরবারী চালিয়ে না দেন। ঠিক সেই সময় এক ব্যক্তি জিরার বিন খাত্তাবের দরদে ভরা কবিতা হুজুরের (সা) সামনে পড়া শুরু করে দিলেন। এই কবিতায় মহানবীর (সা) নিকট ফরিয়াদ করে বলা হয়েছিল যে, সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ মক্কাবাসীদের কোমর ভেঙ্গে দিতে চায়। এ সময় আপনি (সা) ছাড়া কুরাইশকে আর কেউ আশ্রয় দানকারী নেই। তাদের জন্যে জমীন ছোট হয়ে গেছে। এবং আকাশ তাদের শত্রু।

হুজুর (সা) এসব শুনলেন। তাঁর রহমতের দরিয়া আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লো। বললেন ঃ "সায়াদ ভুল বলেছে। আজ কা'বার মর্যাদা দ্বিগুণ হবে। আজ রহম বা ক্ষমার দিন। আজ কুরাইশকে ইজ্জত দেয়া হবে। আজ কা'বাকে গিলাফ পরানো হবে।"

অতপর তিনি (সা) হযরত আলীকে (রা) হযরত সায়াদের (রা) নিকট প্রেরণ করলেন। বলে দিলেন ঝাণ্ডা তাঁর কাছ থেকে নিয়ে তাঁর পুত্র কায়েসের (রা) কাছে দিতে হবে। হযরত সায়াদ (রা) ঝাণ্ডা প্রদানে ইতস্তত করছিলেন। তিনি বললেন, আমি যতক্ষণ পর্যন্ত প্রমাণ না পাবো যে প্রকৃতপক্ষেই হুজুর (সা) আমার নিকট থেকে ঝাণ্ডা নিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, ততক্ষণ আমি ঝাণ্ডা কাউকে দিব না। হুজুর (সা) এই খবর পেলেন। তিনি নিজের পাগড়ী মোবারক হযরত সায়াদের (রা) নিকট প্রেরণ করলেন। তারপর তিনি ঝাণ্ডা নিজের পুত্র কায়েসের (রা) হাওয়ালা করে দিলেন। অতপর হুজুরের (সা) খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আমার ভয় হয় যে, কায়েসও (রা) কুরাইশের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে দাঁড়িয়ে না যায়।" একথায় হুজুর (সা) হযরত কায়েস (রা)-এর কাছ থেকেও ঝাণ্ডা নিয়ে নিলেন এবং তা হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়ামের কাছে সোপর্দ করে দিলেন।

মক্কা বিজয়ের পর হযরত সায়াদ (রা) হুনাইনের রক্তাক্ত লড়াইয়ে হুজুরের (সা) সঙ্গী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, হুনাইনের যুদ্ধে খাজরাজের ঝাণ্ডাবাহী হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহই ছিলেন।

হুনাইনের যুদ্ধের পর হুজুর (সা) গনীমতের মাল বন্টন করলেন। এ সময় কতিপয় নওমুসলিমের মন যোগানোর জন্য বিশেষভাবে বড় বড় অংশ প্রদান করা হলো। তাতে আনসার যুবকরা মনোক্ষুণ্ন হলো এবং তাদের মধ্যে এ ধরনের কানাঘুষা শুরু হলো যে, মুশরিকদের রক্ত এখনো আমাদের তরবারী বেয়ে পড়ছে। অথচ গনীমতের মাল কুরাইশ ও তার মিত্রদেরকেই দেয়া হচ্ছে। হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ এসব কথা শুনলেন এবং হুজুরের (সা) নিকট গিয়ে বলেদিলেন। তিনি তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, সকল আনসারকে অমুক তাঁবুতে একত্রিত কর। যখন সবাই একত্রিত হলো তখন হুজুর (সা) তাদেরকে বললেন, এমন এমন কথা শুনলাম। তাদের মধ্যে কেউ আরজ করলেন ঃ "হে রাসূল ! বয়স্ক লোক এবং আমাদের নেতারা এমন ধরনের কথা বলেননি। অবশ্য যুবকরা বয়সের কারণে অবশ্যই এ ধরনের কথা বলেছে।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "হে আনসাররা ! এটা কি সত্য নয় যে, তোমরা প্রথমে পথভ্রষ্ট ছিলে। আমি তোমাদেরকে কুফর ও শিরকের অন্ধকার গহ্বর থেকে বের করে হক পথে এনেছি এবং জান্নাতের হকদার বানিয়েছি। তোমরা একে অপরের রক্ত পিপাসু ছিলে। আমি তোমাদের মধ্যে একতা সৃষ্টি করেছি। আরব গোত্রসমূহে তোমাদেরকে অবজ্ঞার চোখে দেখা হতো। আমি তোমাদেরকে সম্মানিত স্থানে সমাসীন করেছি।"

আনসাররা আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমরা আর কি আরজ করবো।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "তোমরাই বলো ! তোমাকে স্বগৃহে থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল ; আমরা আশ্রয় দিয়েছিলাম। তোমার কোন সাহায্যকারী ছিল না। আমরা তোমাকে সাহায্য করেছি। তুমি সহায়সম্বলহীন ছিলে। আমরা তোমাকে ধনী বানিয়েছি। সমগ্র বিশ্ব তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। আমরা তোমাকে সত্য বলেছি। তোমরা এই জবাব দিয়ে যাবে এবং আমি বলে যাব যে, তোমরা সত্য বলছো। কিন্তু হে আনসাররা ! তোমরা কি এটা পসন্দ কর না যে, অন্যান্য মানুষ উট, বকরী এবং ধন-সম্পদ স্বগৃহে নিয়ে যাক। আর তোমরা মুহাম্মাদকে (সা) আপন ঘরে নিয়ে যাও।"

হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে আনসারদের অন্তর ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল। কাঁদতে কাঁদতে তাদের শ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এলো এবং অযাচিতভাবে বলে উঠলো ঃ "আমরা শুধু মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহকে (সা) চাই।"

তারপর হুজুর (সা) বললেন ঃ "আনসাররা আমার এবং আমি আনসারদের। হে আল্লাহ ! আনসার ও আনসার পুত্রদের ওপর রহম কর। হে

আনসারের দল ! কুরাইশদেরকে এ জন্য বেশী মাল দেয়া হয়েছে যাতে তাদের মন যোগানো হয়। কেননা কেবলমাত্র তারা মুসলমান হয়েছে। এর অর্থ এটা নয় যে, তাদের হক বেশী।"

আনসাররা বিশ্বনবী (সা) সহ স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলো। এ সময় আনন্দের আধিক্যে তাদের পা যেন আর মাটিতে ধরছিলো না।

নবম হিজরীতে হুজুর (সা) মুসলমানদেরকে তাবুকের যুদ্ধের প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন এবং এই প্রসঙ্গে তিনি তাদেরকে আল্লাহর পথে খরচের উৎসাহ দিলেন। এ সময় ত্যাগ ও কুরবানীর বিস্ময়কর দৃশ্য প্রতিভাত হলো। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ঘরের সুঁই সূতা পর্যন্ত এনে মহানবীর (সা) খিদমতে পেশ করলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) গৃহের অর্ধেক মাল-আসবাব নিয়ে এলেন। হযরত ওসমান গনি (রা) পালানসহ এক হাজার উট এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ পেশ করলেন। এমনিভাবে অন্যান্য সাহাবীও (রা) উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নিলেন। কথিত আছে যে, এ সময় হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ বিরাট অংকের অর্থ দান করেছিলেন। তারপর তিনি তাবুকের কঠিন সফরে হুজুরের (সা) সঙ্গী হয়েছিলেন।

একাদশ হিজরীতে বিশ্বনবী (সা) ওফাত পেলেন। মুসলমানদের ওপর তখন দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়লো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ চিন্তাও এলো যে, মুসলিম উম্মাহর সামান্য সময়ের জন্যও নেতৃত্বহীন থাকাটা ঠিক নয়। সুতরাং হুজুরের (সা) ওফাতের খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে খিলাফতের প্রশ্ন উঠে দাঁড়ালো। আনসাররা সাকিফায়ে বনু সায়িদাহ নামক স্থানে একত্রিত হলো। স্থানটির মালিক ছিলেন হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ। হযরত সায়াদ (রা) কিছুটা অসুস্থ ছিলেন। তবুও লোকজন তাঁকে ধরে ইজতিমা স্থলে নিয়ে এলো। সেখানে তিনি কাপড় উড়িয়ে বালিশ ঠেস দিয়ে বসে গেলেন। তারপর তিনি একটি ওজস্বী বক্তৃতা দিলেন। তাতে তিনি আনসারদের কুরবানী ও মর্যাদার বর্ণনা দিলেন। তিনি গৌরব প্রকাশ করে বললেন যে, রাসূলে আকরাম (সা) সবসময় আনসারদের ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন। বক্তৃতার শেষে তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বললেন যে, আনসাররাই খিলাফাতের সবচেয়ে বেশী হকদার। এজন্য তারা যেন নিজেদের মধ্য থেকে কাউকে খলীফাতুর রাসূল নির্বাচন করে নেয়।

অন্য কতিপয় বুজর্গ আনসারও হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহর মতের পক্ষে বক্তৃতা করলেন এবং সংখ্যাধিক মতে এটাই সিদ্ধান্ত হলো যে, আনসারদের মধ্যে খিলাফতের সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি হলেন হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ। ইত্যবসরে মুহাজিররাও এই ইজতিমার খবর পেলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) হযরত ওমর ফারুক (রা) এবং হযরত আবু উবায়দাহ

(রা) ইবনুল জাররাহকে সঙ্গে নিয়ে তৎক্ষণাৎ সাকিফায়ে বনু সায়িদাহতে পৌছে গেলেন। অনেক বাদানুবাদ ও আলোচনা এবং সমস্যার সকল দিক বিবেচনার পর অধিকাংশ সাহাবী (রা) হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) হাতে খিলাফতের বাইয়াত করলেন। এই সময় হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ কি কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন ? অনেক নেতৃস্থানীয়, চরিতকার এবং ঐতিহাসিক যেমন ইবনে আছির, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) এবং ইবনে কুতাইবা (র) বলেছেন, হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) বাইয়াত করেননি এবং মনোক্ষুণ্ন হয়ে হাওরান (সিরিয়া) চলে গিয়েছিলেন। ১৫ হিজরীতে সেখানে তাঁকে কেউ শহীদ করে ফেলেছিল। ইবনে আবদুর রাব্বিহির "ইকদুল ফরিদ" গ্রন্থে কালবি থেকে এমনকি এটাও বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি সায়াদ (রা) বিন উবাদাহকে এজন্যই হত্যা করেছিল যে, তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) [এবং তাঁর পর হযরত ওমর ফারুক (রা)]-এর বাইয়াতের অস্বীকৃত জানিয়েছিলেন। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে কিছু এমন রেওয়ায়াতও আছে যে, হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) যুক্তিতে মুতমায়েন হয়ে মুহাজিরদের খিলাফতের হকদার হওয়ার ব্যাপারটি স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং সিদ্দীকে আকবারের (রা) হাতে বাইয়াত করেছিলেন। ইবনে জারির তাবারি নিজের ইতিহাস গ্রন্থে হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহর বাইয়াতের উল্লেখ অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় করেছেন। তিনি লিখেন ঃ

تتابع القوم على البيعد وبايع سعد

"কওম বাইয়াতে পরস্পরের অনুসরণ করলো এবং সায়াদও (রা) বাইয়াত করলেন।"

তাবারিরই অন্য এক রেওয়ায়াতে স্বয়ং হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহর মুখে তাঁর বাইয়াতের স্বীকৃতি উল্লেখ রয়েছে এবং এ বর্ণনাও রয়েছে যে, যদি তিনি বাইয়াত না করতেন তাহলে লোকজন তাঁকে সিরিয়া গমনের জন্য জীবিত রাখতো না।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলের একটি মুরসাল রেওয়ায়াত থেকেও প্রমাণিত হয় যে, হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ সন্তুষ্ট চিত্তে আবু বকর সিদ্দীকের (রা) বাইয়াত করেছিলেন। সেই রেওয়ায়াতের বাক্যাবলী নিম্নরূপ ঃ

"হামিদ (রা) বিন আবদুর রহমান হুমায়রী বলেন, রাসূলের (সা) যখন ওফাত হলো তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) মদীনার কোন্ অংশে ছিলেন। এই হৃদয়বিদারক মৃত্যুর খবর শুনে তিনি হুজুরের (সা) পবিত্র দেহের

পাশে এলেন এবং তাঁর (সা) চেহারা মোবারক থেকে চাদর উঠিয়ে বললেন, আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক, আপনি জীবিত অবস্থাতেও এবং ওফাতের পরও কত সুন্দর। তারপর বললেন, কা'বার রবের কসম ! মুহাম্মাদ (সা) এই নশ্বর দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন। অতপর হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা) দ্রুততার সাথে আনসারদের নিকট গেলেন। হযরত আবু বকর (রা) ভাষণ দিলেন এবং তাতে আনসারদের প্রতি সেই মর্যাদার উল্লেখ করলেন যা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। অথবা রাসূলে করীম (সা) যা বর্ণনা করেছেন। তারপর বললেন, অবশ্যই রাসূল (সা) বলেছেন, যদি সকল মানুষ এক উপত্যকার দিকে যায় এবং আনসাররা অন্য কোন উপত্যকার দিকে ; তাহলে আমি আনসারের উপত্যকাকে গ্রহণ করবো। এবং হে সায়াদ ! (বিন উবাদাহ) তুমিও সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলে। যখন রাসূল (সা) বলেছিলেন যে, কুরাইশরা খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। লোকদের মধ্যে যারা ভালো তারা কুরাইশদের মধ্যেকার ভালো লোকদেরকে আনুগত্য করবে এবং লোকদের মধ্যে যারা খারাপ তারা কুরাইশের খারাপ লোকদের আনুগত্য করবে। হযরত সায়াদ (রা) (বিন উবাদাহ) বললেন, অবশ্যই আপনি সত্য বলেছেন। আমরা আনসাররা হলাম উযির বা মন্ত্রী এবং আপনারা হলেন আমীর।"

মুহাদ্দিস হাইছামী (র) এই রেওয়ায়াতকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। মশহুর শাফেয়ী ফকীহ ইবনে হাজার হাইতামী (র) নিজের গ্রন্থ "আস সাওয়ায়িকিল মাহরিকা"তে হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহর বাইয়াত না করার ধারণাকে ভুল বলে আখ্যায়িত করেছেন। কানযুল উম্মালের লিখকও হযরত সায়াদের (রা) বাইয়াত করার রেওয়ায়াতকে গ্রহণ করেছেন এবং তা নিজের গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন।

সাহাবীদের (রা) মহান মর্যাদা সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের ঐকমত্য ভিত্তিক ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে কোন মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সাহাবাদের (রা) সম্পর্কে সুধারণা পোষণই সর্বোত্তম পন্থা। এ জন্য আমরা সেইসব রেওয়ায়াতকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি যার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) বাইয়াত করে নিয়েছিলেন।

হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহর ওফাতের সাল বিভিন্ন রেওয়ায়াতে ১১, ১৪ এবং ১৫ হিজরী বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু জমহুরে ওলামা ১৫ হিজরীর রেওয়ায়াতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর ওফাত কিভাবে হলো ? সে ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু পাওয়া যায়নি। এক বর্ণনায় আছে, কোন ব্যক্তি তীর মেরে শহীদ করে ফেলেছিল। অন্য এক বর্ণনায় আছে, কোন ব্যক্তি শহীদ করে ঘরের

গোসলখানায় নিক্ষেপ করেছিল। বাড়ীর লোকজন যখন দেখলো তখন দেহ নীল বর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তাঁকে কে শহীদ করেছিল এবং এই নিষ্ঠুরতার কি উদ্দেশ্য ছিল ? এ ব্যাপারেও কিছু জানা যায়নি।

হযরত সায়াদের (রা) স্ত্রীর নাম ছিল ফাকিহাহ (রা) বিনতে উবায়েদ আনসারী। তিনি হযরত সায়াদের (রা) চাচার কন্যা ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মুখলিস মহিলা সাহাবী। এক বর্ণনায় আছে, অষ্টম হিজরীতে তিনি হুজুরের (সা) ইঙ্গিতে নিজের গোলামকে মসজিদে নববীর জন্য মিম্বর তৈরীর নির্দেশ দিয়েছিলেন। বস্তুত তাঁর গোলাম গাব্বার ঝাউ কাঠ দিয়ে মিম্বর বানিয়েছিলেন।

মৃত্যুকালে হযরত সায়াদ (রা) তিন পুত্র রেখে গিয়েছিলেন। তারা হলেন ঃ কায়েস (রা), সাঈদ ও ইসহাক। তাদের মধ্যে হযরত কায়েস (রা) মহান মর্যাদাবান সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। দেহাকৃতি লম্বা ও সুঠাম দেহী ছিলেন। তিনি প্রায়ই বিশ্বনবীর (সা) খিদমতে হাজির থাকতেন এবং বিশেষ করে মদীনায় (শহরে) "পুলিশের" দায়িত্ব আঞ্জাম দিতেন।

হযরত সায়াদ (রা) থেকে কতিপয় হাদীসও বর্ণিত আছে। তাঁর হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে হযরত কায়েস (রা) বিন সায়াদ (রা), হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) এবং হযরত সাঈদ (রা) বিন মুসাইয়্যিবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক বর্ণনায় আছে, হযরত সায়াদ (রা) হুজুরের (সা) কতিপয় ইরশাদ লিখে রেখেছিলেন।

হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহর চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে ইসলামে অগ্রগমন, রাসূল প্রেম, ঈমানের জোশ জিহাদের আবেগ, আল্লাহর পথে ব্যয় এবং দান ও বদান্যতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিজের কুরবানীর জযবাহ এবং অন্যান্য নেক গুণাবলীর কারণে তিনি রাসূলের (সা) নৈকট্যলাভে সক্ষম হয়েছিলেন। হুজুর (সা) তাঁকে এত ভালোবাসতেন যে, প্রায়ই তাঁর বাড়ী তাশরীফ নিতেন। কোন সময় অসুস্থ হয়ে পড়লে এবং হুজুর (সা) তাঁর অসুস্থতার খবর পেলে বেচাইন হয়ে যেতেন। তৎক্ষণাৎ শুশ্রূষার জন্য তিনি তাঁর বাড়ী তাশরীফ নিতেন। হযরত কায়েস (রা) বিন সায়াদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার হুজুর (সা) তাঁর জন্য এই দোয়া করেন ঃ

"হে আল্লাহ ! আপনার বরকত ও রহমত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহর পরিবারের ওপর নাযিল করুন।"

অন্য আরেক সময়ও তিনি (সা) এই দোয়া করেছিলেন ঃ "আল্লাহ ! আনসারদেরকে কল্যাণকর প্রতিদান দিন। বিশেষ করে আবদুল্লাহ (রা) বিন আমর বিন হারাম ও সায়াদ (রা) বিন উবাদাহকে।"

বিশ্বনবী (সা) হিজরতের পর মদীনা মুনাওয়ারা তাশরীফ আনলে হযরত সায়াদ (রা) প্রায়ই তাঁর (সা) খিদমতে খাবার প্রেরণ করতেন। তাছাড়া কোন কোন সময় বিশেষভাবেও মহানবীকে (সা) দাওয়াত করতেন। ইবনে আসাকির (র) হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ রাসূলে আকরাম (সা)-কে দাওয়াত এবং তাঁর (সা) সামনে রুটি ও খেজুর পেশ করলেন। হুজুর (সা) তা খেলেন। এ সময় তাঁর খিদমতে দুধের একটি পেয়ালা পেশ করা হলো। হুজুর (সা) তা পান করলেন এবং বললেন ঃ তোমার খাবার ভালো মানুষ খাবে ও তোমার নিকট রোযাদার ইফতার করবে এবং ফেরেশতারা তোমার জন্য দোয়া করবে।

অন্য আরেক রেওয়ায়াতে হযরত আনাস (রা) বলেন যে, সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ হুজুরের (সা) খিদমতে খাবার পেশ করলেন। এই খাবারের মধ্যে তেল ও খেজুর ছিল।

ইবনে আসাকির স্বয়ং হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহর এই বর্ণনা উল্লেখ করেছেন ঃ "আমি রাসূলের (সা) খিদমতে উটের মজ্জাস্থির একটি বড় পেয়ালা পূর্ণ করে আনলাম। তিনি (সা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু ছাবিত ! এটা কি ? আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আমি আজ ৪০টি বড় কলজে ওয়ালা উট জবেহ করেছি। আমার অন্তরে আপনাকে এই উটের মজ্জাস্থি খাওয়ানোর সাধ জাগলো। এই পেয়ালায় সেই মজ্জা রয়েছে। রাসূলে আকরাম (সা) তা খেলেন এবং আমার জন্য দোয়া করলেন।"

নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদার উদারতা, ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিভংগী, দানশীলতা ও বদান্যতার অনেক কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এসব বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি সমসাময়িক যুগের একজন বড় দানশীল ছিলেন এবং এ কারণে তিনি খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। ইবনে সায়াদ (র) হযরত উরওয়ার (রা) এই বর্ণনা উল্লেখ করেছেন ঃ

"আমি সায়াদ (রা) বিন উবাদাহকে নিজের হাভেলীর দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চৈস্বরে ডাকতে শুনেছি। তিনি ডেকে ডেকে বলতেন, কেউ যদি চর্বি অথবা গোশত পসন্দ করে তাহলে সে যেন উবাদার নিকট আসে।"

হযরত সায়াদ (রা) এই বদান্যতা নিজের পিতা ও দাদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। তারপর তার পুত্র হযরত কায়েসও (রা) নিজের এই বংশীয় রীতি কায়েম রাখেন। একবার হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন ওমর (রা) হযরত সায়াদের (রা) হাভেলীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। সে সময় হযরত সায়াদের (রা) আম দাওয়াতের দৃশ্য তাঁর চোখে ভেসে উঠলো এবং তিনি বললেন, এটা হলো সায়াদের (রা) সেই হাভেলী যেখানে তিনি লোকদেরকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডেকে আনতেন।

আসহাবে সুফফার না ছিল বাড়ী এবং কোন জীবিকা। এ জন্য তারা আল্লাহর মেহমান হিসেবে পরিগণিত হতেন। বিত্তশালী সাহাবায়ে কিরাম (রা) আসহাবে সুফফার মধ্য থেকে একজন অথবা দু'জন করে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন এবং তাদেরকে খাবার খাওয়াতেন। কিন্তু হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৮০ ব্যক্তির খাবার প্রেরণ করতেন।

মুসনাদে আহমদে (র) বর্ণিত আছে যে, হযরত সায়াদের (রা) মা হযরত উমরাহ (রা) বিনতে মাসউদ পঞ্চম হিজরীতে ইনতিকাল করেন। এ সময় তিনি মায়ের ইসালে সওয়াবের জন্য পানির একটি খাল কাটেন। মদীনা মুনাওয়ারাতে আজও এই খাল "সিকায়াহ আলে সায়াদ" নামে মওজুদ রয়েছে।

অষ্টম হিজরীতে সাইফুল বাহর অথবা জাইশুল খাবত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই অভিযানের নেতা ছিলেন হযরত আবু উবায়দাহ (রা) ইবনুল জাররাহ এবং তিনশ' সদস্যের বাহিনীতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত ওমর ফারুক (রা) ছাড়া হযরত সায়াদের (রা) পুত্র হযরত কায়েসও (রা) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অভিযানকালে রসদপত্তর শেষ হয়ে গেল এবং মুজাহিদরা কঠিন মুসিবতে নিপতিত হলেন। এ সময় হযরত কায়েস (রা) উট ধার নিয়ে নিয়ে জবেহ করা শুরু করলো। যখন ৯টি উট জবেহ হলো তখন হযরত আবু বকর (রা) এবং হযরত ওমর (রা) হযরত আবু ওবায়দাহকে (রা) বললেন, কায়েসকে (রা) থামান। নচেৎ সে নিজের বাপের সম্পদ এখানেই খরচ করে ফেলবে। হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) তাঁকে আরো উট জবাই করা থেকে বিরত রাখলেন। হযরত কায়েস (রা) মদীনা ফিরে এসে হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহকে মুসলমানদের মুসিবতের কাহিনী বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, উট জবেহ করতে। হযরত কায়েস (রা) বললেন, আমি তিনবার এ রকম করেছি। কিন্তু তারপর আমাকে বাধা দেয়া হয়েছে। যখন হযরত সায়াদ (রা) এই ঘটনা জানলেন। হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা) অমুক কথা বলেছেন, তখন তিনি গভীরভাবে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন। ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মহানবীর (সা) পেছনে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ

"ইবনে আবু কুহাফাহ এবং ইবনে খাত্তাব-এর পক্ষ থেকে কেউ জবাব দিক যে, তারা আমার পুত্রকে বখিল কেন বানাতে চায় ?"

বিশ্বনবীর (সা) প্রতি হযরত সায়াদের (রা) ছিল গভীর শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা। হুজুর (সা) তাঁর বাড়ীতে শুভপদার্পণ করলে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়তেন। প্রিয় নবী (সা) তার বাড়ী থেকে চলে আসতে চাইলে হযরত সায়াদ (রা) নিজের গাধার ওপর চাদর বিছাতেন এবং তা মহানবীর (সা) সওয়ারী হিসেবে পেশ করতেন। অতপর নিজের পুত্র হযরত কায়েসকে (রা) হুজুরের (সা) সঙ্গী হওয়ার নির্দেশ দিতেন। মহানবীও (সা) হযরত

সায়াদকে সম্মান করতেন। সহীহ্ বুখারীতে আছে, যুদ্ধের পূর্বে একবার হযরত সায়াদ (রা) রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। হুজুর (সা) এই খবর পেলেন এবং তার শুশ্রূষার জন্য সওয়ারীর ওপর রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে এক স্থানে মুসলমান ও মুনাফিকরা এক বৈঠকে বসেছিলেন। তাদের মধ্যে মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাইও ছিল। এ ছিল সেই ব্যক্তি যাকে মহানবীর (সা) হিজরতের পূর্বে মদীনাবাসী (আওস ও খাজরাজ) নিজেদের বাদশাহ বানানোর প্রশ্নে ঐকমত্যের কথা ঘোষণা করেছিলো এবং তার জন্য তাজও তৈরী করিয়েছিলো। কিন্তু বিশ্বনবী (সা) মদীনা তাশরীফ আনার পর এসব তৎপরতা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। ব্যাপারটি আবদুল্লাহ বিন উবাই খুব কঠিনভাবে গ্রহণ করেছিল এবং সে হুজুরকে (সা) তার পথের কাঁটা হিসেবে বিবেচনা করছিলো। হুজুরের (সা) সওয়ারীর চারপাশে ধূলা উড়ছিল। তাতে সে অভদ্রজনোচিত ভাষায় বললো ঃ "মুহাম্মাদ ! তোমার গাধা আস্তে চালাও। তার দুর্গন্ধ আমার দিমাগ পেরেশান করে দিয়েছে। একথার জবাবে হুজুর (সা) মসলিশে উপস্থিত সকলকে সালাম করলো এবং সওয়ারী থেকে নেমে আল্লাহর ওয়াহদানিয়াতের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। ইবনে উবাই খিটখিটে মেজাজে বললো ঃ "তোমার কথা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তাদেরকে বলো যারা স্বয়ং তোমার কাছে গিয়ে থাকে।" এ সময় কথা এতদূর গড়ালো যে, মুসলমানও মুনাফিকদের মধ্যে তরবারী চলার আশংকা সৃষ্টি হয়ে গেল। কিন্তু হুজুর (সা) উভয় পক্ষকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করলেন। এরপর তিনি (সা) হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদার বাড়ী তাশরীফ নিলেন এবং আলোচনাকালে তাঁকে বললেন ঃ "সায়াদ (রা) ! তুমি শুনেছ যে, আজ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (আবু হুবাব) আমাকে এই এই কথা বলেছে।"

তিনি আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি তার কথায় কোন আমলই দিবেন না। তাকে আমরা আমাদের বাদশাহ বানাতে চেয়েছিলাম। আল্লাহ পাক আপনাকে (সা) হক-এর সাথে প্রেরণ করলেন। তখন আমরা সেই ইচ্ছা পরিত্যাগ করি। ইবনে উবাই-এর কথা বাদশাহী থেকে মাহরুম হওয়ার ফলশ্রুতি। আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন।" হযরত সায়াদের এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হুজুর (সা) ইবনে উবাইকে ক্ষমা করে দিলেন।

একবার হুজুর (সা) হযরত সায়াদকে (রা) সাদকা আদায়ের অফিসার হিসেবে মনোনীত করলেন। কিন্তু তিনি যখন এই জিম্মাদারী গ্রহণে ওজর পেশ করলেন তখন হুজুর (সা) তাঁর ওজর কবুল করলেন।

হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহর মর্যাদা ও স্থান নির্ণয়ের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সাইয়েদুল আনাম ফখরে মওজুদাত (সা) তার জন্য বারবার দোয়া করেছিলেন এবং অনেকবার তাঁর বাড়ী গমন করেছিলেন।

হযরত হারিছ (রা) বিন সিমমা আনসারী

সাইয়েদেনা হযরত আবু সাইদ হারিছ বিন সিমমা খাজরাজের সম্ভ্রান্ততম খান্দান নাজ্জারের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

হারিছ (রা) বিন সিমমা বিন আমর বিন আতিক বিন আমর বিন আমের (মাবযুল) বিন মালিক বিন নাজ্জার।

মহানবীর (সা) হিজরতের পূর্বেই তাঁর পূত-পবিত্র স্বভাব তাঁকে তাওহীদের দিকে এগিয়ে দিয়েছিল এবং তিনি নবুওয়াতের একাদশ থেকে ত্রয়োদশ বছরের মধ্যে কোন এক সময় ইসলাম গ্রহণ করেন।

বিশ্বনবীর (সা) মদীনা মুনাওয়ারা তাশরীফ আনার কয়েক মাস পর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় হযরত হারিছ (রা)-কে হযরত সোহায়েব রুমীর (রা) ইসলামী ভাই বানান।

দ্বিতীয় হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে মহানবী (সা) বদরের যুদ্ধের জন্য মদীনা মুনাওয়ারা থেকে রওয়ানা হলেন। তখন হযরত হারিছও (রা) মহানবীর (সা) সঙ্গী ছিলেন। পথিমধ্যে রুহা নামক স্থানে তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হন। আঘাতটি গুরুতর ধরনের ছিল। তিনি আর যুদ্ধ করার যোগ্য রইলেন না। সুতরাং হুজুর (সা) তাঁকে মদীনা ফেরত পাঠালেন। তা সত্ত্বেও তাঁকে বদরের গনীমতের মালের অংশ প্রদান করেছিলেন। এ জন্য তিনি বদরী সাহাবী হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকেন।

পরবর্তী বছর ওহোদের যুদ্ধে বীরবিক্রমে অংশ নেন এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধের ময়দানে অটল ছিলেন। চরিতকাররা এই যুদ্ধে আনসারদের মধ্যে যারা অটল ছিলেন তাঁদের মধ্যে তাঁর নাম অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। এই যুদ্ধে তিনি কুরাইশের এক বাহাদুর ওসমান বিন আবদুল্লাহ বিন মুগিরাহকে হত্যা করেন। হুজুর (সা) নিহতের সকল সাজ-সরঞ্জাম তাঁকে প্রদান করেন। তাঁকে ছাড়া হুজুর (সা) অন্য কোন মুসলমানকে কোন কাফেরের সাজ-সরঞ্জাম প্রদান করেননি।

এক বর্ণনায় আছে যে, যুদ্ধের তখন চরম পর্যায়। হযরত হারিছ (রা) হুজুরের (সা) খিদমতে উপস্থিত হলেন। মহানবী (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আবদুর রহমান (রা) বিন আওফকে দেখেছ ?" তিনি আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল ! তিনি পাহাড়ের দিকে কাফেরদের ভীড়ের মধ্যে ছিলেন। আমি তাঁর সাহায্যের জন্য যেতে চাইলাম। কিন্তু আপনার ওপর নজর পড়তেই

এদিকে চলে এসেছি।" হুজুর (সা) বললেন, "আবদুর রহমানকে (রা) ফেরেশতারা বাঁচাচ্ছেন।" অতপর হযরত হারিছ (রা) হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফের নিকট গেলেন। এ সময় দেখলেন যে, মুশরিকদের ৭টি লাশ তাঁর সামনে পড়ে রয়েছে। তিনি হযরত আবদুর রহমানকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, "এদের সকলকেই কি আপনি হত্যা করেছেন ?" তিনি জবাব দিলেন, "আরতাত এবং অমুক অমুককে তো আমি খতম করেছি। অবশিষ্ট মুশরিকদের হত্যাকারী আমার নজরে পড়েনি।" একথা শুনে হযরত হারিছ (রা) বলে উঠলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পূর্ণ সঠিক বলেছিলেন।"

চতুর্থ হিজরীতে বিরে মাউনার মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হলো। তার প্রেক্ষাপট হলো ঃ হুজুর (সা) আবু বারা' আমের বিন মালেকের আবেদন অনুযায়ী ৭০জন মুবাল্লিগের একটি দলকে নজদের দিকে রওয়ানা করালেন। হযরত হারিছ (রা) বিন সিমমাও এই পবিত্র দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বিরে মাউন্না নামক স্থানে হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়ার সাথে গবাদি পশু চরানোর জন্য গেলেন। এমন সময় বনু আমেরের সরদার আমের বিন তোফায়েল নজদী কতিপয় মুশরিক গোত্রকে সঙ্গে নিয়ে মুসলমানদের ওপর হামলা করে বসলো এবং সবাইকে এক এক করে শহীদ করে ফেললো। যখন হযরত হারিছ (রা) এবং আমর (রা) বিন উমাইয়া নিজেদের সাথীদের লাশ মাটি ও রক্তে একাকার অবস্থায় দেখতে পেলেন। তখন হযরত হারিছ (রা) হযরত আমরকে (রা) বললেন, "এখন কি করা যাবে ?"

আমর (রা) বিন উমাইয়া বললেন, "রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে সকল ঘটনা বর্ণনা করা প্রয়োজন।"

হারিছ (রা) বললেন, "যে স্থানে মানযার (রা) নিহত হয়েছেন, সেই স্থান থেকে আমি কি করে চলে যেতে পারি ?" একথা বলে তরবারী হাতে তুলে নিলেন এবং আমর (রা) বিন উমাইয়াকে সঙ্গে নিয়ে মুশরিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মুশরিকরা তীরের বর্ষা বইয়ে দিলো। হযরত হারিছের (রা) দেহ ঝাঁঝরা হয়ে গেল। তিনি শাহাদাতের পেয়ালা পান করে আল্লাহর দরবারে গিয়ে হাজির হলেন। হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়াকে মুশরিকরা গ্রেফতার করলো।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত হারিছ (রা) মুশরিকদের ওপর হামলা এবং দু'জনকে হত্যা করলেন। এ সময় মুশরিকরা চারদিকে জড়ো হয়ে হারিছ (রা) এবং ওমর (রা) দু'জনকেই গ্রেফতার করে নিল। অতপর তারা হযরত হারিছকে (রা) বললো, "আমরা তোমাদেরকে হত্যা করতে চাই না ; তোমরা

যা চাও তাই করবো।" হযরত হারিছ (রা) বললেন, "তোমরা আমাকে মানযার (রা) এবং হারাম (রা) বিন মিলহানের হত্যা স্থলে পৌছে দাও।" মুশরিকরা তাঁকে সেখানে পৌছে দিল। হযরত হারিছ (রা) শাহাদাত কামনায় অস্থির ছিলেন। তিনি কাফেরদের ওপর হামলা করে বসলেন। ইত্যবসরে তাদের দু' একজন নিহত হলো। এ সময় তারা হযরত হারিছকে (রা) চারদিক থেকে ঘিরে ধরলো এবং এমনিভাবে তিনি শাহাদাতের পিয়ালা পান করে নিজের প্রকৃত সৃষ্টিকর্তার নিকট গিয়ে পৌছলেন।

হযরত হারিছ (রা) শাহাদাতের সময় দু'পুত্র রেখে যান। তাঁরা হলেন ঃ আবু জাহাম (রা) এবং সায়াদ (রা) তাঁরা দু'জনই সাহাবী ছিলেন।

বিরে মাউনার মর্মান্তিক ঘটনায় যেসব সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন তাঁরা অত্যন্ত পবিত্র, ইবাদাত গুজার এবং জ্ঞানী-গুণী মানুষ ছিলেন। কুরআনের সঙ্গে গভীর সম্পর্কের কারণে তাঁরা 'ক্বারী' হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। এ থেকেই হযরত হারিছের (রা) মর্যাদা অনুমান করা যায়।

অন্যান্য কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, কাব্য চর্চাতেও তার দখল ছিল।

হযরত বারা' (রা) বিন আযেব (রা) আনসারী

বিশ্বনবীর (সা) ওফাতের পর বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু মদীনা মুনাওয়ারার একজন রাসূলের (সা) সাহাবী হুজুরের (সা) কথা নিজের অন্তরে এমনভাবে অন্তস্থ করে নিয়েছিলেন যে, এক মুহূর্তের জন্যও তাঁকে ভুলতেন না। তিনি নিজের কথা ও কাজে সবসময় মহানবীর (সা) উত্তম আদর্শ সামনে রাখতেন। এমনকি মহানবীর (সা) ছোট ছোট কথাকেও অনুসরণ করাকে নিজের জন্য গৌরবের মনে করতেন। অথচ এসব কথা হুজুর (সা) অনুসরণের নির্দেশ দেননি। একবার তাঁর একজন শিষ্য মুলাকাতের জন্য উপস্থিত হলেন। এ সময় তিনি স্বয়ং অগ্রসর হয়ে শিষ্যকে সালাম করলেন এবং তাঁর হাত নিজের হাত দিয়ে ধরে খুব হাসলেন। অতপর তাঁকে বললেন ঃ "জানো আমি এমন কেন করলাম ?"

তিনি আরজ করলেন, "আপনিই বলুন।" বললেন ঃ আমি একবার রাসূলকে (সা) এমনিই করতে দেখেছি। সে সময় তিনি (সা) ইরশাদ করেছিলেন, যখন দু'জন মুসলমান এমনিভাবে মিলিত হয় এবং তাদের কোন ব্যক্তিস্বার্থ পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত না হয়, তাহলে আল্লাহ উভয়কেই ক্ষমা করে দেন।"

রাসূলের (সা) এই সাহাবী, যার রাসূল অনুসরণের জযবা এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন যে, যদি কোন কাজ রাসূলকে (সা) একবারও করতে দেখতেন, তাহলে তার অনুসরণ নিজের ওপর ওয়াযিব করে নিতেন। তিনি ছিলেন সাইয়েদেনা হযরত বারা' (রা) বিন আযেব (রা) আনসারী।

হযরত আবু আম্মারাহ বারা' (রা) বিন আযেব (রা) আনসারি জালিলুল কদর সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। তাঁর সম্পর্ক ছিল আওস শাখার বনু হারিছার সঙ্গে। নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

বারা' (রা) বিন আযেব (রা) বিন হারিছ বিন আদি বিন জাশাম বিন মাজদায়াহ বিন হারিছাহ বিন হারিছ বিন খাজরাজ বিন আমর বিন মালিক বিন আওস।

হযরত বারা'র (রা) বংশে ইসলামের চর্চা হযরত আবু বুরদাহ (রা) বিন নিয়ারের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। এই ব্যক্তি ছিলেন তাঁর মামা এবং বাইয়াতে লাইলাতুল উকবাতে (নবুয়াতের ১৩ বছর পর) তিনি মুসলমান হওয়ার

সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তিনি বাল্লী গোত্রভূক্ত এবং মদীনা মুনাওয়ারাতে বনু হারিছার মিত্র ছিলেন। তিনি বদর, ওহোদ, আহযাব এবং নবীর (সা) অন্যান্য যুদ্ধে জীবন বাজী রেখে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি মহান মর্যাদাপূর্ন সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। তাঁরই প্রভাব ও তাবলীগের বদৌলতে হযরত বারা'র (রা) পিতা আযেব (রা) বিন হারিছও ইসলাম গ্রহণের ও সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। সহীহ বুখারীর এক রেওয়ায়াতে থেকে জানা যায় যে, মহানবীর (সা) সঙ্গে হযরত আযেবের (রা) গভীর সম্পর্ক ছিল। এই রেওয়ায়াতেই আছে, একবার হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) হযরত আযেবের (রা) নিকট থেকে উটের পালান ক্রয় করলেন এবং তাঁকে সেই পালান পুত্র মারফত উঠিয়ে তাঁর বাড়ীতে পৌছে দেয়ার কথা বললেন। হযরত আযেব (রা) আরজ করলেন, "হে রাসূলের (সা) হিরা গুহার বন্ধু ! মেহেরবানী করে প্রথমে হিজরতের কিসসা শুনান। তারপরই আমি আপনাকে যেতে দিব।"

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তার ইচ্ছা দেখে হেসে দিলেন এবং অত্যন্ত বিনয় ও আনন্দের সঙ্গে হিজরতের ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করলেন। হযরত আযেব (রা) এই কাহিনী শুনে খুশী হলেন এবং পুত্র হযরত বারা'কে (রা) পালান উঠিয়ে হযরত আবু বকরের (রা) বাড়ী রেখে আসার নির্দেশ দিলেন। যুবক বারা' (রা) তৎক্ষণাৎ পালান উঠালেন এবং আনন্দের সঙ্গে হযরত আবু বকরের (রা) বাড়ী পৌছে দিয়ে এলেন।

হযরত আবু বুরদাহ (রা) বিন নিয়ার এবং হযরত আযেব (রা) মহানবীর (সা) হিজরতের পূর্বেই ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। হযরত বারা'ও (রা) মামা ও পিতার অনুসরণ করলেন। মহানবীর (সা) মদীনা মুনাওয়ারায় শুভ পদার্পণের পূর্বে হযরত মাসয়াব (রা) বিন উমায়ের এবং হযরত ইবনে উম্মে মাকতুমের (রা) নিকট থেকে কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ শুরু করে দিলেন।

সহীহ বুখারীতে আছে, যখন রাসূলে আকরাম (সা) মদীনায় শুভ পদার্পণ করলেন, তখন হযরত বারা' (রা) সূরায়ে 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লার' দারস নিচ্ছিলেন। জ্ঞান অর্জনের এমনি আকাংখা ছিল। আর এই জ্ঞানই হযরত বারা'কে (রা) খনি বানিয়ে দিয়েছিল এবং একদিন তিনি জ্ঞানের আকাশে সূর্যের মত দেদিপ্যমান হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে হক ও বাতিলের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয় বদরের ময়দানে। এ সময় হযরত বারা' (রা) বিন আযেব অত্যন্ত উৎসাহ-

উদ্দীপনার সঙ্গে রাসূলের (সা) খিদমতে হাজির হন এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করেন।

বিশ্বনবী (সা) তাঁর আবেগ ও উৎসাহের প্রশংসা করলেন। কিন্তু যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দিলেন না। কেননা তাঁর বয়স ছিল ১৫ বছরের কম। সহীহ বুখারীতে আছে, হুজুর (সা) সাধারণত সেইসব যুবককে যুদ্ধে অংশ-গ্রহণের অনুমতি দিতেন যাদের বয়স কমপক্ষে ১৫ বছর পর্যন্ত পৌঁছতো। সুতরাং হযরত বারা' (রা) কম বয়সের ভিত্তিতে বদরের যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি। তৃতীয় হিজরীতে ওহোদের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। সে সময় তাঁর বয়স ১৫ বছর পূর্ণ হয়েছিল। অত্যন্ত উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সঙ্গে যুদ্ধে শরীক হলেন এবং খুব বীরত্ব প্রদর্শন করলেন।

পঞ্চম হিজরীতে সমগ্র আরবের হকের শত্রুরা ঐকবদ্ধ্যভাবে মদীনা মুনাওয়ারার ওপর হামলা করে বসলো। তা সত্ত্বেও হকপন্থীরা খন্দক বা পরিখা খনন করে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে নিজেদেরকে রক্ষা করেছিল। সেই কঠিন সময়ে বিশেষ করে মদীনা মুনাওয়ারার অভ্যন্তরে বনি কুরায়জার ইহুদীরা মুসলমানদের পেছন দিক থেকে খঞ্জর ঢুকিয়ে দেয়ার অর্থাৎ পেছন থেকে হামলার পরিকল্পনা করে। হকপন্থীদের জন্য এটা ছিল কঠিন পরীক্ষার ব্যাপার। কিন্তু তাদের অন্তরে শাহাদাতের আকাংখার আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছিল। কোন হকপন্থীরই সেই কঠিন মুহূর্তে সামান্যতম পদস্খলনও ঘটেনি। আল্লাহ তা'য়ালার সাহায্য ও সহযোগিতায় তারা সেই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

হযরত বারা' (রা) বিন আযেবও (রা) সেই জানবাজ দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত তৎপরতার সাথে যুদ্ধে শরীক ছিলেন এবং অন্যান্য মুসলমানদের মত অবরোধের সকল মুসিবত হাসিমুখে বরদাশত করেন।

৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে রহমতে আলম (সা) ওমরার জন্য মক্কা রওয়ানা হলেন। এই সফরে ১৪শ' সাহাবী হুজুরের (সা) সঙ্গী ছিলেন। তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন হযরত বারা' (রা) বিন আযেবও। পথিমধ্যে হুজুর (সা) খবর পেলেন যে, কুরাইশরা মক্কায় মুসলমানদের প্রবেশের ব্যাপারে সম্মত নয়। এ জন্য কুরাইশদের প্রচণ্ড বাধা অতিক্রম করা ছাড়া ওমরাহ করা সম্ভব নয়। বিশ্বনবীর (সা) এই প্রসঙ্গে রক্তারক্তির অভিপ্রায় ছিল না। সুতরাং তিনি (সা) মক্কা মুয়াজ্জমা থেকে কয়েক মাইল দূরে হুদাইবিয়া নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন করলেন এবং মক্কার কুরাইশদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন। এই আলোচনা প্রক্কালে হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রা) হুজুরের (সা) পয়গাম বা বার্তা নিয়ে

মক্কা গেলেন। তখন মক্কার কুরাইশরা তাঁকে সেখানে আটকে রাখলো। তাঁর ফিরতে দেরী হচ্ছিল। এ সময় মুসলমানদের মধ্যে তাঁর শাহাদাতের খবর ছড়িয়ে পড়লো। এই খবরে মুসলমানদের মধ্যে প্রচণ্ড আবেগ সৃষ্টি হলো। হুজুর (সা) বললেন, ওসমানের (রা) খুনের বদলা নেয়া ফরয। অতপর তিনি (সা) একটি বাবলা বৃক্ষের নীচে বসে পড়লেন এবং সেখানে উপস্থিত সকল সাহাবীর (রা) নিকট থেকে জীবন উৎসর্গের বাইয়াত গ্রহণ করলেন। আল্লাহ পাক এসব সাহাবীর (রা) এই ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি অত্যন্ত পসন্দ করলেন। তিনি স্পষ্ট ও প্রকাশ্য ভাষায় তাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিলেন। এজন্য ইতিহাসে এই মহান ঘটনা "বাইয়াতে রিদওয়ান" নামে খ্যাতিলাভ করে। যেসব সাহাবী (রা) বাইয়াতে রিদওয়ানে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন তাদের মধ্যে হযরত বারা' (রা) বিন আযেবও (রা) শামিল ছিলেন। এই বাইয়াতের পর জানা গেল যে, হযরত ওসমানের (রা) শাহাদাতের খবর সঠিক নয়। কিন্তু মুসলমানদের আবেগ-উদ্দীপনা ও সত্যবাদিতার প্রভাবে মক্কার কুরাইশদের হিম্মতে ভাটা পড়লো এবং তারা মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি প্রশ্নে এগিয়ে এলো। সুতরাং মুসলমান ও কুরাইশদের মধ্যে সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো।

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর খায়বারের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। হযরত বারা' (রা) বিন আযেব এই যুদ্ধেও জীবন বাজী রেখে অংশ নিয়েছিলেন। অষ্টম হিজরীতে তিনি মক্কা বিজয়ের সময় বিশ্বনবীর (সা) সঙ্গে ছিলেন। একই বছরে হুনাইনের রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধের শুরুতে বনু হাওয়াযিন লুকায়িত স্থান থেকে মুসলমানদের ওপর এমন প্রচণ্ডভাবে তীর বর্ষণ করলো যে, তাদের ব্যূহ চুরমার হয়ে গেল। ইসলামী বাহিনীতে মক্কার দু' হাজার নওমুসলিমও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পেছন দিকে এমনভাবে হটে এলেন যে, বেশীর ভাগ অন্যান্য মুসলমানও পিছ পা হতে বাধ্য হয়ে পড়লেন।

এই নাযুক সময়ে বিশ্বনবী (সা) পাহাড়ের মত দৃঢ়তা নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়েছিলেন এবং সাহাবায়ে কিরামের (রা) একটি ছোট্ট দল তাঁর (সা) চারপাশে জীবন বাজী রাখার নৈপুণ্য প্রদর্শন করছিলেন ; সহীহ বুখারীর এক রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, এই দৃঢ়চিত্ত জাননিছারদের মধ্যে হযরত বারা' (রা) বিন আযেবও শামিল ছিলেন। সেই রেওয়ায়াতে আছে, জনৈক ব্যক্তি হযরত বারা'কে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হুনাইনের যুদ্ধে আপনিও কি পিছটানকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ? তিনি জবাব দিলেন, আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) পিছটান দেননি। অবশ্য দ্রুতগামী মানুষেরা অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলেন।

হাদীস বেত্তারা তাঁর এই বর্ণনা থেকে এই অর্থই গ্রহণ করেছেন যে, তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত ছিলেন। যদি ময়দান থেকে হটে যেতেন তাহলে যুদ্ধে সংঘটিত ঘটনাবলী বর্ণনা করতে পারতেন না।

মুসলমানদের বিশৃংখলভাব খুব শীঘ্রই শেষ হয়ে গেল। যখন মহানবীর (সা) নির্দেশে হযরত আব্বাস (রা) মুহাজির ও আনসারদেরকে উচ্চৈস্বরে ডেকে বললেন ঃ "হে আনসারের দল—হে আসহাবিশ শাজারাহ (অর্থাৎ হে বাইয়াতে রিদওয়ান সম্পন্নকারী লোকেরা) এই আহবানের সঙ্গে সঙ্গে সকল মুসলমান একবারে ফিরে দাঁড়ালেন এবং কাফেরদেরকে তরবারী দিয়ে উচিত শিক্ষা দিলেন।"

হুনাইনের যুদ্ধের পর হযরত বারা' (রা) বিশ্বনবীর (সা) সঙ্গে তায়েফ অবরোধে শরীক হন।

তায়েফের যুদ্ধের কিছুদিন পর হুজুর (সা) হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদকে একটি সেনাদলসহ ইয়েমেন রওয়ানা করালেন। এই দলে হযরত বারা' (রা) বিন আযেবও (রা) ছিলেন। তাদের পিছু পিছু মহানবী (সা) হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুকে ইয়েমেন প্রেরণ করলেন। তাঁকে প্রেরণের সময় এই নির্দেশ দিলেন যে, খালিদের সঙ্গীদের মধ্যে যিনি মদীনা ফিরে আসতে চান তিনি ফিরে আসতে পারেন এবং যিনি তোমাদের সঙ্গে ইয়েমেনে অবস্থান করতে চান তিনি সেখানে অবস্থান করতে পারেন। হযরত বারা' (রা) হযরত আলীর (রা) সঙ্গে ইয়েমেনে অবস্থান করাটাকেই পসন্দ করলেন। সহীহ বুখারীতে আছে, ইয়েমেন অবস্থানকালে তাঁর অংশে অনেক গনীমাতের মাল এসেছিল।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত বারা' (রা) বিন আযেব (রা) মহানবীর (সা) যুগে সংঘটিত ১৫টি যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। এসব যুদ্ধ ছাড়া তিনি আরো তিনবার হুজুরের (সা) সঙ্গে সফর করার গৌরব অর্জন করেছিলেন।

একাদশ হিজরীতে বিশ্বনবী (সা) ওফাত পেলেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খলিফা নির্বাচিত হলেন। এ সময় হযরত বারা' (রা) কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই সিদ্দীকে আকবারের বাইয়াত করলেন এবং খিলাফতে সিদ্দীকীর প্রথম ঘনঘোর দুর্যোগপূর্ণ সময়ে উত্থিত ফিতনার মূলোৎপাটনে নিজের পূর্ণশক্তিসহ রাসূলের (সা) খলিফাকে (রা) সাহায্য করেন। ধর্মদ্রোহিতার ফিতনা খতমের পর সিরিয়া ও ইরানে যুদ্ধের জন্য সৈন্য প্রেরণ শুরু হলো। তখন হযরত বারা' (রা) বিন আযেবও (রা) যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছে গেলেন।

সে সময় তাঁর বয়স ২৫ বছরের কাছাকাছি ছিল এবং অন্তরে শাহাদাতের আকংখার আগুন জ্বলছিল।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে কয়েকটি যুদ্ধে তিনি জীবন বাজী রেখে অংশ নিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকরা "রে" এবং "তাসতার" (শোস্তার)-এর যুদ্ধের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এসব যুদ্ধে তিনি হযরত নাঈম (রা) বিন মাকরান এবং হযরত আবু মূসা আশআরীর (রা) সঙ্গে ইরানীদের বিরুদ্ধে নিজের তরবারীর নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন।

হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর খিলাফতকালে আমিরে মুয়াবিয়ার (রা) বিরুদ্ধে যেসব যুদ্ধ সংঘটিত হয় ; তাতে হযরত বারা' বিন আযেব (রা) হযরত আলীর (রা) পক্ষ অবলম্বন করে পূর্ণশক্তিতে যুদ্ধ করেন। এই যুগেই তিনি কুফায় বাড়ী তৈরী করেন এবং সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। বিভিন্ন কার্যকারণে মনে হয়, হযরত আলীর শাহাদাতের পর তিনি নিজেকে রাজনৈতিক হাঙ্গামা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন এবং অবশিষ্ট জীবন শিক্ষা প্রদানের ব্যস্ততায় অতিবাহিত করেন। ৭৩ হিজরীতে বয়স যখন ৮৫ বছরে উত্তীর্ণ হয় তখনই শেষ ডাক এসে উপস্থিত হয় এবং সমসাময়িক সেই মহান ব্যক্তি কুফাতেই পরপারের ডাকে সাড়া দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে গিয়ে হাজির হন। ওফাতকালে তিনি পাঁচ পুত্র যথাক্রমে ওবায়েদ, সওতা, রবি, সুয়ায়েদ এবং ইয়াযিদকে রেখে যান। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, সুয়ায়েদ আম্মানের আমীর নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং তিনি নিজের দায়িত্ব এত সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিয়েছিলেন যে, জনগণের অন্তর জয় করে ফেলেছিলেন। মুসনাদে আহমদ হাম্বল অনুযায়ী আম্মানের ইমারতের দায়িত্ব ইয়াযিদ বিন বারা'র (রা) ওপর অর্পিত হয়। ঐতিহাসিকরা এই দুই বর্ণনার সামঞ্জস্য বিধান এভাবে করেছেন যে, সম্ভবত দুই ভাই একের পর অন্যজন আম্মানের আমীর নিযুক্ত হয়েছিলেন।

হযরত বারা' (রা) বিন আযেব (রা) মর্যাদাবান সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। তিনি ৩০৫টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে ২২টি হাদীস সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম উভয় গ্রন্থেই স্থান পেয়েছে। হযরত বারা' (রা) রাসূলে আকরাম (সা) থেকে সরাসরিও হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা), হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) এবং হযরত বিলাল হাবশীর (রা) মত মহান সাহাবীর নিকট থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর হাদীসের মজলিশে কোন কোন সময় সমকালীন

সাহাবায়ে কিরামও (রা) শরীক হতেন। হযরত বারা' (রা) হাদীস বর্ণনায় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) "তাবকাত" গ্রন্থে লিখেছেন যে হযরত বারা' (রা) বলতেন ঃ

"আমি যে হাদীস বর্ণনা করি, তার সবই আমি রাসূলের (সা) নিকট থেকে শুনে করি তা নয়। আমাকে উটও চরাতে হতো। এ জন্য রাসূলের (সা) খিদমতে সবসময় উপস্থিত থাকতে পারতাম না। সুতরাং আমি অনেক হাদীস সাহাবাদের (রা) নিকট থেকে বর্ণনা করে থাকি।"

হযরত বারা'র (রা) শাগরিদদের মধ্যে ইবনে আবি লায়লা (র), আবু ইসহাক (র), মাবিয়া বিন সুয়ায়েদ (র) এবং আবু বুরদাহর (র) মত মহান তাবেয়ীও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হযরত বারা' (রা) পবিত্র কুরআনের জ্ঞান এবং ফিকাহর মাসয়ালাতেও গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর সামনে কোন সমস্যা পেশ করা হলে তিনি মুহূর্তের মধ্যে তার সমাধান করে দিতেন। একবার জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন ঃ

لاتلقوا بايديكم الى التهلكة

"নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।"

আয়াতটির প্রয়োগ মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও করা যায়। হযরত বারা' (রা) বললেন, অবশ্যই নয়। এর অর্থ হলো, জিহাদে ক্ষতি এবং ধ্বংস নেই। বরং জিহাদ থেকে দূরে সরে থাকার মধ্যেই ধ্বংস অনিবার্য। তোমরা যদি একথা ভেবে জিহাদে অংশ না নাও যে, তাতে কায়-কারবার এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্ষতি হবে অথবা সম্পদ খরচ করতে হবে, তাহলে তোমরা তোমাদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করে ফেলেছ। এই আয়াতে এটাই বলা হয়েছে যে, বস্তুগত স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে জিহাদ থেকে পিছটান দিও না।

হযরত বারা' (রা) রাসূলে আকরাম (সা) থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করার সময় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র) নিজের মুসনাদে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা) হযরত বারা' (রা) বিন আযেবকে (রা) একটি দোয়া শিখিয়ে দিয়েছিলেন। এই দোয়ার এক স্থানে 'বি নাবিয়্যিকা' শব্দটি ছিল। হুজুর (সা) হযরত বারা'র (রা) নিকট এই দোয়া পড়ে শুনাতে বললেন। দোয়াটি পড়তে পড়তে যখন তিনি 'বি নাবিয়্যিকা'-র স্থানে এলেন তখন 'বিরাসুলিকা' পাঠ করলেন। হুজুর (সা) তৎক্ষণাৎ বাধা দিলেন এবং বললেন, যে শব্দ আমি তোমাকে বলেছি ঠিক সেই শব্দ পড়।

এই হিদায়াতের ফলশ্রুতিতে হাদীস বর্ণনার সময় তিনি হুজুরের (সা) বর্ণিত শব্দাবলীতে কোন ধরনের কম-বেশী অথবা পরিবর্তন করতেন না। তাতে যদি অর্থ অথবা মর্মার্থের কোন পার্থক্য সূচীত না হতো তবুও তিনি তা করতেন না। তিনি ছিলেন পূর্ণ বিনয়ী মানুষ এবং সমসাময়িক সাহাবাদের নিকট থেকে কোন মাসয়ালা জিজ্ঞেস করতে লজ্জা অনুভব করতেন না। একবার আবদুর রহমান (র) বিন মাতয়াম জিজ্ঞেস করলেন, একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কি দিরহাম বিক্রয় করা যায় ? হযরত বারা' (রা) বললেন, রাসূলে করীম (সা) যখন মদীনা মুনাওয়ারা তাশরীফ আনলেন তখন আমরা মদীনাবাসীরা এমনি ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতাম। কিন্তু হুজুর (সা) ইরশাদ করলেন যে, হাতে হাতে দিরহাম ও দিনার বিক্রয় জায়েয। কিন্তু ঋণ নাজায়েয। আমি যা কিছু বলেছি তার সত্যতা যায়েদ (রা) বিন আরকামের নিকটও যাচাই করে নাও। কেননা তাঁর ছিল বিশাল বাণিজ্যিক কারবার।

আবদুর রহমান (র) হযরত যায়েদ (রা) বিন আরকামের নিকট গেলেন। তিনি হযরত বারা'র (রা) কথার সত্যতা স্বীকার করলেন।

হযরত বারা' বিন আযেবের (রা) চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামিতা জিহাদের আকাংখা এবং শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ ছাড়াও রাসূল প্রেম ও সুন্নাতের আনুগত্য সবচেয়ে আলোকোজ্জল অধ্যায় হিসেবে পরিগণিত হয়ে আছে। হুজুরের (সা) কথা এমন মর্যাদা ও ভালোবাসার সাথে উল্লেখ করতেন যে, মুখ দিয়ে যেন মতি নিঃসৃত হতো। সহীহ মুসলিমে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি লাল পোশাকে কোন দীর্ঘ কেশধারী ব্যক্তিকে রাসূলের (সা) থেকে বেশী সুন্দর দেখিনি। তাঁর (সা) পবিত্র লম্বা কেশ কখনো কাঁধেও এসে পড়তো। তাঁর (সা) দুই কাঁধের মধ্যে কিছু দূরত্ব ছিল। তিনি যেমন খুব লম্বা ছিলেন না। আবার তেমনি বেঁটেও ছিলেন না।

এই হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যশীল সহীহ বুখারীতেও একটি হাদীস রয়েছে ঃ "একবার জনৈক ব্যক্তি বললেন যে, প্রিয় নবী (সা) চেহারা মুবারক তরবারীর মত (ঔজ্জল্য) ছিল। তিনি বললেন, না ; হুজুরের (সা) চেহারা মুবারক চাঁদের মত ছিল। (বুখারী)

হযরত বারা' (রা) বলতেন, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বাহাদুর তাকেই মনে করা হতো ; যে যুদ্ধের সময় রাসূলের (সা) নিকট দাঁড়িয়ে থাকতেন। (মুসলিম)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, আমি প্রিয় নবীকে (সা) এশার নামাযে সূরায়ে "ওয়াততীন ওয়ায যাইতুন" পড়তে শুনলাম। আমি তাঁর (সা) থেকে সুকণ্ঠের কাউকে পাইনি।

ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত বারা'র (রা) আঙ্গুলে স্বর্ণের আংটি থাকতো। মানুষেরা এতে আপত্তি জানালো। আপত্তির জবাবে তিনি

বলতেন যে, এই আংটি প্রিয়নবী (সা) তাঁর পবিত্র হাত থেকে খুলে আমাকে পরিয়ে ছিলেন। সে জন্য আমি তা পরি। এ প্রসঙ্গে ঘটনা হলো ঃ একবার তিনি (সা) গনীমাতের মাল বন্টন করলেন। শুধুমাত্র এই আংটি বন্টন করা বাকী রয়ে গেল। তিনি (সা) এদিক-ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। অতপর আমাকে ডেকে বললেন, নাও, এটা পরিধান করো। আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল এটা তোমাকে পরিয়েছেন। এখন তোমরা চিন্তা করো যে, যে বস্তু আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (সা) আমাকে পরিধান করিয়েছেন তা আমি কি করে খুলতে পারি।

সহীহ মুসলিমে হযরত বারা' (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন আমরা রাসূলের (সা) পেছনে নামায পড়তাম তখন আমরা হুজুরের (সা) ডানদিকে দাঁড়ানো পসন্দ করতাম।

হুজুরের (সা) ওফাতের পরও তিনি এই কর্মপদ্ধতি সারা জীবন মেনে চলেছেন।

হযরত বারা' (রা) বলতেন, নবীয়ে আকরামের (সা) রুকূ' এবং সিজদা ও দুই সিজদার মধ্যে বৈঠক এবং রুকূ' থেকে ওঠা এই চার বিষয়ে সময়ের পরিমাণ সমান সমান হতো। তবে কিয়াম ও কুয়ুদ এর বাইরে থাকতো। একবার তিনি বাড়ীর সকল লোককে একত্রিত করলেন এবং তাদেরকে বললেন, জীবনের কোন ভরসা নেই। কত সময় বেঁচে আছি জানি না। আমি আজ তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা) কেমন করে ওজু করতেন এবং নামায পড়তেন তা দেখিয়ে দিতে চাই। অতপর তিনি বাড়ীর সবার সামনে ওজু করলেন এবং জোহর থেকে এশা পর্যন্ত সব নামায সকলের সঙ্গে পড়লেন।

একবার পরিবারের সকলকে সিজদার পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এভাবে সিজদা করতেন এবং নিজে সিজদা করে দেখালেন। যাতে সকলে ভালোভাবে বুঝে নিতে পারেন।

প্রকৃতিগত দিক দিয়ে হযরত বারা' (রা) অত্যন্ত অনুভূতি ও আবেগপ্রবণ ছিলেন। রাসূলের (সা) ইন্তেকালের পর তিনি মুসলমানদেরকে কতিপয় ফিতনায় জড়িয়ে পড়তে দেখেছিলেন এবং তাতে খুব অস্থির ও উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। একবার জনৈক ব্যক্তি বললেন, আপনি কতবড় সৌভাগ্যবান যে, রাসূলের (সা) পবিত্র দেহ দর্শনে নিজের চোখ আলোকিত করেছেন এবং বাইয়াতে রিদওয়ানের সৌভাগ্যও লাভ করেছেন। তিনি বললেন, ভ্রাতুষ্পুত্র তোমরা জানো না যে, মহানবীর (সা) তিরোধানের পর আমরা কি করেছি।

কতিপয় ফিকহী ও দ্বীনী মাসয়ালা প্রশ্নে হযরত বারা' (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বের অধিকারী। তিনি নামায, হজ্জ, কুরবানী, কবরের অবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে হুজুরের (সা) যেসব ইরশাদ উম্মাহর নিকট পৌঁছিয়েছেন তা চিরকাল মুসলমানদেরকে পথ প্রদর্শন করবে।

হযরত আনাস (রা) বিন নযর আনসারী

ওহোদের যুদ্ধের কিছুদিন পূর্বেকার ঘটনা। একদিন রাসূলের (সা) দরবারে একটি মোকদ্দমা পেশ হলো। জনৈক আনসারী মহিলা। নাম তাঁর রুবায়্যি (রা)। তিনি আনসারেরই আরেক বালিকার দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। সেই বালিকার উত্তরাধিকাররা কিসাস দাবী করে নবীর (সা) আদালতে মামলা করলেন। বিশ্বনবী (সা) সব শুনলেন। শুনে ফায়সালা শুনালেন। ফায়সালায় বললেন, "দাঁতের পরিবর্তে দাঁত। রুবায়্যির দাঁত ভাঙ্গা হবে।"

সেই মহিলার ভাইও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বোনকে সীমাহীন ভালোবাসতেন। যদিও তিনি একজন সাচ্চা মুসলমান এবং বিশ্বনবীর (সা) সত্যিকার অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু বোনের ভালোবাসার আবেগে পরাভূত হয়ে অযাচিতভাবে বলে ফেললেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহর কসম, রুবায়্যির দাঁত ভাঙ্গা যাবে না।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "ভাই, আল্লাহর হুকুম এটাই। হাঁ, বালিকার উত্তরাধিকাররা দিয়ত বা শোনিপাতের মূল্য নিয়ে নিজেদের দাবী প্রত্যাহার করে নিলে অন্য কথা।"

সে সময় আল্লাহর রহমত জোশ মেরে উঠলো এবং বালিকার উত্তরাধিকাররা দিয়ত গ্রহণে সম্মত হয়ে গেল। এভাবে রাসূলের (সা) সেই সাহাবীর স্নেহাস্পদ বোনের দাঁত রক্ষা পেল। রহমতে আলম মহানবী (সা) বললেন ঃ "আল্লাহর কতিপয় বান্দাহ এমন আছেন যে, যখন কসম খেয়ে বসেন তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কসম পূরণ করে দেন।"

রাসূলের (সা) এই সাহাবী (রা) যাঁর কসমের মূল্য মহান আল্লাহ পাক রেখেছিলেন এবং রাব্বুল আলামীনের প্রিয় নবী (সা) যাঁকে আল্লাহর খাছ ব্যক্তি বলে অভিহিত করেছিলেন—তিনি ছিলেন হযরত আনাস (রা) বিন নযর আনসারী।

হযরত আনাস (রা) বিন নযর খাজরাজের নাজ্জার বংশোদ্ভূত ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ

আনাস (রা) বিন নযর বিন জমজম বিন যায়েদ বিন হারাম বিন জুন্দুব বিন আমের বিন গানাম বিন আদি বিন নাজ্জার।

বিশ্বনবীর (সা) পরদাদী সালমা বিনতে আমর (হযরত আবদুল মুত্তালিব-এর মাতা)ও এই বংশোদ্ভূত ছিলেন এবং আত্মীয়তার দিক থেকে হযরত

আনাস (রা) বিন নযর এর ফুফু হতেন। এই সম্পর্কের দিক থেকে হযরত আনাসের (রা) রাসূলের (সা) খান্দানের সাথেও সম্পর্ক ছিল। জালিলুল কদর মহিলা সাহাবী হযতর উম্মে সুলাইম (রা) হযরত আনাস (রা) বিন নযরের বড় ভাবী এবং খাদিমে রাসূল (সা) হযরত আনাস (রা) বিন মালিক তাঁর সহোদর ছিলেন। হযরত আনাস (রা) বিন নযর বনু নাজ্জারের অন্যতম সরদার হিসেবে পরিগণিত হতেন। দুনিয়ার বিত্ত বৈভব ছাড়া আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। মহানবীর (সা) মদীনা শুভাগমনের পূর্বেই তিনি ঈমান এনেছিলেন। কোন কারণবশত বদরের (দ্বিতীয় হিজরী) যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি। হক ও বাতিলের এই প্রথম যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারার মনোবেদনা ছিল তাঁর প্রচণ্ড। বিশ্বনবীর (সা) পবিত্র খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আমার বড় দুঃখ ও আফসোস হলো যে, আমি আপনার প্রথম যুদ্ধে আপনার সফর সঙ্গী হতে পারিনি। কিন্তু যদি জীবিত থাকি তাহলে দুনিয়া প্রত্যক্ষ করবে যে, ভবিষ্যতে কি করি।"

তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে ওহোদের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। হযরত আনাস (রা) বিন নযর তাতে অত্যন্ত আবেগ ও উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করেন। যখন ঘটনাক্রমে কোন এক ভুলের কারণে যুদ্ধের গতি বদলে গেল এবং শুধু কতিপয় ব্যক্তি বিশ্বনবীর (সা) সঙ্গে ময়দানে রয়ে গেলেন ; তখন হযরত আনাস (রা) বিন নযর অত্যন্ত অস্থির হয়ে কাফেরদের দিকে এগুলেন। রাস্তায় দেখা হলো হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজের সাথে। তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, সায়াদ কোথায় যাচ্ছো। ঐতো জান্নাত। আল্লাহর কসম ! ওহোদের দিক থেকে আমি জান্নাতের সুঘ্রাণ বা খোশবু পাচ্ছি।

অন্য আরেক রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলে আকরামের (সা) শাহাদাতের খবর শুনে কতিপয় সাহাবী ভগ্ন হৃদয়ে যুদ্ধ ছেড়ে দিয়ে পৃথকভাবে গিয়ে বসেছিলেন। হযরত আনাস (রা) বিন নযর তাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা যুদ্ধ ছেড়ে এখানে কেন বসে আছ ? তাঁরা বললেন, আফসোস ! রাসূলুল্লাহ (সা) শহীদ হয়ে গেছেন। হযরত আনাস (রা) বললেন, তাহলে তোমরা জীবিত থেকে কি করবে ? ওঠো এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করে মরে যাও। যেমনিভাবে হকের খাতিরে রাসূলুল্লাহ (সা) জীবন দিয়ে দিয়েছেন। একথা বলে তিনি অত্যন্ত উদ্দীপনার সাথে তরবারী চালাতে চালাতে কাফেরদের ভীড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত তরবারীর নিপুণতা প্রদর্শন করলেন। অবশেষে মুশরিকরা চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে তাঁর উপর তীর, তরবারী এবং বর্শার তুফান ছুটিয়ে দিল। এই অবস্থায় তিনি আল্লাহর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলেন। যদিও তাঁর দেহ আঘাতে আঘাতে ক্ষত-

বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল তবুও কাফেরদের ক্রোধের আগুন নেভেনি। তারা তাঁর লাশ বিকৃত করে ফেললো। লড়াই শেষ হওয়ার পর শহীদ ও আহতদের সন্ধান শুরু হলো। এ সময় হযরত আনাসের (রা) লাশ সনাক্ত করার উপায় ছিল না। অত্যন্ত কষ্ট করে তাঁর বোন রুবায়্যি বিনতে নযর একটি আঙ্গুল দেখে তাঁর লাশ সনাক্ত করেন। কথিত আছে যে, হযরত আনাসের (রা) আঙ্গুলে একটি তিল ছিল। এই তিল দেখে হযরত রুবায়্যি চিনতে পেরেছিলেন। কতিপয় বর্ণনায় আছে, তিনি হযরত আনাসের (রা) সুন্দর দাঁত অথবা আঙ্গুলের গিরা দেখে লাশ সনাক্ত করেছিলেন। যা হোক, সবাই এ ব্যাপারে একমত প্রকাশ করেন যে, হযরত আনাস (রা) বিন নযর হক পথে জীবনদানের সময় সমগ্র দেহ ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় ছিল। হযরত আনাস (রা) বিন মালিক খাদিমে রাসূল (সা) বলেছেন যে ঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ۔

এই আয়াত তাঁর শানে নাযিল হয়েছিল। আয়াতটির অর্থ হলো ঃ "ঈমানদারদের মধ্যে অনেক এমন মানুষ আছেন যারা আল্লাহর নিকট কৃত ওয়াদা সত্য করে দেখিয়েছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের মানত পুরো করেছেন। আবার কেউ কেউ সময়ের অপেক্ষায় রয়েছেন।

হযরত আবাদ (রা) বিন বিশর আনসারী

রহমতে আলম (সা) একবার উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রা) হুজরা মুবারকে আরাম করছিলেন। রাতের দ্বিতীয়াংশে তিনি (সা) তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য উঠলেন। এ সময় তিনি আল্লাহর কালাম পাঠ শুনতে পেলেন। তিনি তাঁর এই রাত জাগরণ এবং ইবাদাত প্রিয়তায় খুব খুশী হলেন। তিনি বললেন ঃ "আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ক্ষমা করুন।"

রাসূলের (সা) এই সাহাবী যার রাত্রি জাগরণ সাইয়েদুল মুরসালিনকে খুশী করেছিলো এবং রাসূলের (সা) যবানীতে যার মাগফিরাত কামনা করা হয়েছিল—তিনি ছিলেন হযরত আবাদ (রা) বিন বিশর আনসারী।

সাইয়েদেনা হযরত আবাদ (রা) বিন বিশর উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীদের (রা) মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। তাঁর কুনিয়ত বা ডাক নাম ছিল আবু রাফে এবং আবু বিশরও। তিনি আওস গোত্রের আবদুল আশহাল খান্দানের নয়ন মনি ছিলেন। নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

আবাদ বিন বিশর বিন দাকশ বিন যা'নাবা বিন যাউরা' বিন আবদুল আশহাল।

নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরে হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়ের ইসলামের প্রথম মুবাল্লিগ হিসেবে মদীনা এলেন। এ সময় তাঁর তাবলিগী প্রচেষ্টার ফলে আওস এবং খাজরাজের অনেক পরিবারে ইসলামের ব্যাপক চর্চা হতে লাগলো। তাদের মধ্যে বনু আবদুল আশহালের পরিবারও ছিল। যেদিন এই কবিলার সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজ ইসলাম গ্রহণ করলেন সেইদিনই গোত্রের সকল পরিবার তাঁর অনুসরণে ইসলাম গ্রহণের মর্যাদায় অভিষিক্ত হলেন। হযরত আবাদ (রা) বিন বিশরও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

রহমতে আলম (সা) মদীনা মুনাওয়ারাতে শুভ পদার্পণ করলেন। হযরত আবাদ (রা) বিন বিশর যেন দোজাহানের সকল নেয়ামতই পেয়ে গেলেন। বেশীর ভাগ সময়ই তিনি রাসূলের (সা) দরবারে অতিবাহিত করতেন এবং আশানুযায়ী নবীর (সা) ফয়েজ লাভের প্রচেষ্টায় লেগে থাকতেন। হুজুর (সা)-এর প্রতি নিজের আস্থা, ভালোবাসা ও জ্ঞান অর্জনের সীমাহীন আকাংখার কারণে স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি নবীর (সা) নৈকট্য অর্জনে সক্ষম হন। হিজরতের কয়েক মাস পর প্রিয় নবী (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক সৃষ্টি করেন। এ সময় হযরত আবাদ (রা)-কে হযরত আবু

হুজায়ফা (রা) বিন উতবার দ্বীনী ভাই বানালেন। যুদ্ধের সিলসিলা শুরু হলে হযরত আবাদ (রা) বদর থেকে শুরু করে তাবুক পর্যন্ত সকল যুদ্ধে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অংশগ্রহণ এবং প্রতিটি যুদ্ধেই নিজের বাহাদুরী ও জীবন বাজী রাখার নিপুণতা প্রদর্শন করেন।

ইমাম বুখারী (র) ইবনে সায়াদ (র) এবং অন্য কতিপয় চরিতকার লিখেছেন, বদরের যুদ্ধের পর মদীনার একজন প্রভাবশালী ইহুদী কা'ব বিন আশরাফ মুসলমানদের বিরোধিতা করাকে জীবনের মিশন বানিয়ে নিয়েছিলেন। সে একজন মৃদু বাক কবি ছিল। নিজের কবিতায় সে শুধুমাত্র রাসূলকেই (সা) নিন্দা করতো না বরং কাফেরদেরকে হকপন্থীদের বিরুদ্ধে উসকিয়েও দিত। সেই আবেগেই মক্কা পৌছলো এবং নিজের অগ্নিঝরা কবিতার মাধ্যমে কুরাইশদের মধ্যে প্রতিশোধের আগুন আরো প্রজ্জলিত করলো। অতপর মদীনা ফিরে এসে নিজের তৎপরতা আরো জোরদার করলো। হুজুর (সা) তার এই ফিতনা সৃষ্টির ব্যাপারে অবহিত হলেন। তিনি সাহাবায়ে কিরামের (রা) একটি দলকে এই ফিতনা নির্মূলের নির্দেশ দিলেন। হযরত মুহাম্মাদ (রা) বিন মুসলিমাহ আনসারী হযরত আবাদ (রা) বিন বিশর ও আরো কতিপয় জানবাজকে নিজের সঙ্গে নিলেন এবং কা'ব বিন আশরাফের বাড়ী গিয়ে তার জীবনের যবনিকাপাত ঘটালেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) বর্ণনা করেছেন যে, এ সময় হযরত আবাদ (রা) কতিপয় কবিতা পাঠ করেছিলেন। এই কবিতায় তিনি খুশী প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে ইসলামের একজন বড় দুশমনকে খতম করার তৌফিক দান করেছেন। এই বর্ণনা থেকে প্রকাশ পায় যে, হযরত আবাদ (রা) বিন বিশর কাব্য চর্চাতেও ব্যুৎপত্তি রাখতেন।

পরিখার যুদ্ধে (পঞ্চম হিজরী) আরবের সকল ইসলাম দুশমন ঐক্যবদ্ধভাবে মদীনা মুনাওয়ারার উপর হামলা করেছিল এবং মদীনার অভ্যন্তরে বনী কুরাইজার ইহুদীরা গাদ্দারী করার জন্য কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছিল। সময়টা অত্যন্ত নাযুক সময় ছিল। সাহাবায়ে কিরাম (রা) সবসময় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকতেন। তাদের ভয় ছিল কোন সময় যেন কোন ইসলাম দুশমন বিশ্বনবীকে (সা) আহত করে না ফেলে। ইবনে সায়াদ (রা) বর্ণনা করেছেন, সেই যুগে হযরত আবাদ (রা) বিন বিশর অন্য কয়েকজন আনসারী সাহাবী সমভিব্যাহারে প্রতিরাতে হুজুরের (সা) আবাসস্থল পাহারা দিতেন।

৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে রহমতে আলম (সা) চৌদ্দশ' জাননিছারকে সঙ্গে নিয়ে বাইতুল্লাহর যিয়ারত ও তাওয়াফের জন্য মদীনা মুনাওয়ারা থেকে রওয়ানা হলেন। কুরাইশরা এই খবর পেয়ে হকপন্থীদের বাধাদানের সংকল্প

ব্যক্ত করলো এবং খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদকে দু'শ' সওয়ার সমেত মুসলমানদের রাস্তা বন্ধ করার জন্য সামনে প্রেরণ করলো। হযরত আবাদ (রা) বিন বিশর ২০জন জানবাজ সমেত এই বাহিনীর মুকাবিলা এবং তাদের অগ্রযাত্রায় বাধাপ্রদান করলেন। ইত্যবসরে সারওয়ারে আলম (সা) রাস্তা পরিবর্তন করে হুদাইবিয়া নামক স্থানে এসে উপস্থিত হলেন এবং কুরাইশদেরকে এই মর্মে পয়গাম প্রেরণ করলেন যে, আমরা শুধুমাত্র ওমরাহ করার জন্য এসেছি। যুদ্ধের জন্য আসিনি। মক্কাবাসী ও মুসলমানদের মধ্যে স্বল্প মেয়াদী সন্ধি করে নেয়াটাই উচিত হবে। কিন্তু কুরাইশরা বাধাদানের ব্যাপারেই অটল রইলো। অবশেষে হুজুর (সা) হযরত ওসমান জুন্নুরাইনকে (রা) সন্ধির ব্যাপারে উৎসাহ প্রদানের জন্য কুরাইশের নিকট প্রেরণ করলেন। কুরাইশরা তাঁকে মক্কায় আটকে রাখলেন। তাতে মুসলমানদের মধ্যে দুশ্চিন্তা বেড়ে গেল এবং এ ব্যাপারে কেউ কেউ ঘৃতাহুতি ছিল। তারা গুজব ছড়িয়ে দিল যে, কুরাইশরা হযরত ওসমানকে (রা) শহীদ করে ফেলেছে। এই গুজব শুনে মুসলমানরা ক্রোধে অস্থির হয়ে পড়লেন। এ সময় বাইয়াতে রিদওয়ানের মহান ঘটনা সংঘটিত হয়। তাতে ১৪শ' সাহাবী (রা) হুজুরের (সা) পবিত্র হাতে লড়াই করে মৃত্যুবরণ এবং হযরত ওসমানের (রা) হত্যার বদলা নেয়ার বাইয়াত করেন। আল্লাহ তা'য়ালা হক পথের এসব জানবাজকে প্রকাশ্য বাক্যে নিজের সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেন। এই ভাগ্যবান জওয়ান মরদদের মধ্যে হযরত আবাদ (রা) বিন বিশরও শামিল ছিলেন।

অষ্টম হিজরীতে হযরত আবাদ (রা) বিন বিশর সেই দশ হাজার পবিত্র আত্মার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। যারা মক্কা বিজয়ের সময় মহানবীর (সা) সঙ্গী ছিলেন। অতপর তিনি হুনাইন ও তায়েফের যুদ্ধে বীরের নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, তায়েফের যুদ্ধের পর হুজুর (সা) হযরত আবাদ (রা) বিন বিশরকে বনু সুলাইম ও বনু মুযনিয়ার কাছ থেকে সাদকা আদায়ের জন্য নিয়োগ করেছিলেন। এই দায়িত্ব পালন শেষে ফিরে এলে হুজুর (সা) একই কাজের জন্য তাঁকে বনু মুসতালিকের নিকট প্রেরণ করলেন। সেখানে তিনি ১০দিন অবস্থান করলেন। এ সময় তিনি সাদকাও আদায় করলেন এবং লোকদেরকে কুরআনে হাকিম ও শরীয়াতের আহকামও তালিম দিলেন।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত আবাদ (রা) বিন বিশর, হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়েরের সঙ্গে রাসূলের (সা) দরবারে হাজির হলেন এবং হুজুরের (সা) ইকতিদাতে এশার নামায পড়লেন। বেশ দেরী করে বাড়ী ফিরলেন। গভীর অন্ধকার রাত ছিল। উভয়ের হাতেই ছিল লাঠি।

বিশ্বনবীর (সা) সান্নিধ্য থেকে যখন রুখসত হলেন তখন একজনের লাঠি আলোকোজ্জ্বল হয়ে গেল। তার আলোতেই চলতে লাগলেন। যখন উভয়ের রাস্তা পৃথক হয়ে গেল তখন উভয়ের লাঠিই আলোকিত হয়ে উঠলো। চরিতকাররা বর্ণনা করেছেন যে, এটা ছিল বিশ্বনবীর (সা) মু'জিযা এবং এই দুই বুজর্গের কারামত।

জাতুর রুকার যুদ্ধের (সপ্তম হিজরী) সময়কার ঘটনা। হযরত আবাদ (রা) বিন বিশর ও হযরত আম্মার (রা) বিন ইয়াসির রাতে হুজুরের (সা) অবস্থানস্থলের পাহারায় নিয়োজিত ছিলেন। দু'জনে পরস্পরে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, একজন রাতের প্রথমার্ধ এবং অপরজন দ্বিতীয়ার্ধ পাহারা দেবেন। সিদ্ধান্ত মুতাবেক প্রথমার্ধের পালা এলো হযরত আবাদের (রা) ওপর। তিনি নামাযের নিয়ত বেঁধে সূরায়ে কাহাফ তেলাওয়াত শুরু করলেন এবং হযরত আম্মার (রা) ঘুমিয়ে গেলেন। ইত্যবসরে জনৈক কাফের হযরত আবাদ (রা) বিন বিশরকে তীর মারলো.। তীরের আঘাতে রক্তের ফোয়ারা ছুটলো। তারপর একের পর এক আরো দু'টো তীর লাগলো। তা সত্ত্বেও তিনি নামায ছাড়লেন না। তবে রক্ত যখন বেশী বইতে লাগলো তখন তিনি সালাম ফিরিয়ে আম্মাররকে (রা) ঘুম থেকে জাগালেন। হযরত আম্মার (রা) বললেন, আল্লাহর বান্দাহ ! তুমি আমাকে প্রথম তীরের পরই জাগিয়ে দিতে। হযরত আবাদ (রা) বললেন, আমি সূরায়ে কাহাফ তেলাওয়াত করছিলাম। মন চায়নি তা বন্ধ করে দেই।

নবম হিজরীতে তাবুকের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। বছরটা ছিল অনাবৃষ্টি ও প্রচণ্ড গরমের। তা সত্ত্বেও ৩০ হাজার জানবাজ হুজুরের (সা) সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন এবং অত্যন্ত প্রফুল্লমুখে উপবাস, পিপাসা, গরম এবং দীর্ঘ কঠিন সফরের কষ্ট স্বীকার করলেন। আল্লাহর এই পবিত্র বান্দাহদের মধ্যে হযরত আবাদ (রা) বিন বিশরও শামিল ছিলেন। তাঁর প্রতি মহানবীর (সা) এত আস্থা ছিল যে, তাঁকে সকল পাহারাদারের অফিসার নিয়োগ করেছিলেন। বস্তুত তিনি রাতের বেলায় সকল সৈন্যের চারপাশে ঘুরে ঘুরে তাদের হিফাজত করতেন।

একাদশ হিজরীতে রহমতে আলমের (সা) ওফাতের পর হযরত আবু বকর (রা) খলীফা নির্বাচিত হলেন। এ সময় ধর্মদ্রোহিতার ফিতনা এবং মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদারদের কারণে নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। কিন্তু তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তুলনাহীন সাহস ও দৃঢ়তার সাথে কাজ করলেন এবং মুরতাদদের সামনে নত হওয়া অথবা তাদের কোন রকম প্রশ্রয়দানে স্পষ্টভাবে অস্বীকৃতি জানালেন। শুধু তাই নয়, বরং তিনি মুরতাদদের নির্মূল করার জন্য ১১টি বাহিনী সাজালেন এবং

যথোপযুক্ত হেদায়াতসহ তাদেরকে বিভিন্ন দিকে রওয়ানা করে দিলেন। ইসলামের মুজাহিদরা কিছুদিনের মধ্যেই মুরতাদদের মুরোদ খতম করে দিলেন। এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে বেশী রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল মুসায়লামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামা নামক স্থানে। ইসলামী বাহিনীতে হযরত আবাদও (রা) শামিল ছিলেন। মুরতাদদের বিরুদ্ধে তিনি জীবন হাতের উপর রেখে লড়াই করেছিলেন এবং মুরতাদের উচিত শিক্ষা দিয়েছিলেন। অবশেষে বহু-সংখ্যক মুরতাদ তাঁকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে এবং তাঁর উপর তীর, তরবারী ও বর্শার তুফান বইয়ে দেয়। শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত হযরত আবাদ (রা) হাত থেকে তরবারী ছাড়েননি এবং বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে শাহাদাতের পেয়ালা পান করে মহান আল্লাহর সাথে মিলিত হন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল ৪৫ বছর। শাহাদাতকালে কোন সন্তান রেখে যাননি। তিনি অত্যন্ত মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) তাঁকে আনসারের তিন উত্তম ব্যক্তির মধ্যে একজন হিসেবে গণ্য করতেন। অপর দু'জন হলেন হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজ ও হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়ের।

হযরত আবাদ (রা) বিন বিশরের চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে ইসলামে অগ্রগমন, দ্বীনের প্রতি খুলুসিয়ত, ত্যাগের আবেগ, রাসূল প্রেম, দিয়ানত ও আমানত, জিহাদের আকাংখা এবং ইবাদাত প্রিয়তা ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক। ফরযসমূহ আদায়ের সাথে সাথে লোকদেরকে কুরআন ও শরীয়াতের শিক্ষা প্রদান, সারা রাত জেগে জেগে বিশ্বনবী (সা) ও অন্যান্য মুসলমানকে হিফাজত করা অথবা আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল থাকা অতপর দিনের বেলায় জিহাদে শরীক হওয়ার মত গুণাবলী তার ছিল। এ ধরনের গুণ খুব কম লোকের মধ্যেই পাওয়া যায়।

হযরত জাব্বার (রা) বিন সাখার আনসারী

হযরত আবু আবদুল্লাহ জাব্বার (রা) বিন সাখার খাজরাজের সালমাহ খান্দানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ

জাব্বার (রা) বিন সাখার বিন উমাইয়াতা বিন খানিস বিন সানান বিন উবায়েদ বিন আদি বিন গানাম বিন কা'ব বিন সালমাহ।

মাতার নাম সায়াদ বিনতে সালমা। তিনি ছিলেন খাজরাজের শাখা জাশাম বিন খাজরাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

হাফেজ ইবনে কাছির (র) "আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া" গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত জাব্বারের (রা) পিতা সাখার বিন উমাইয়াও সাহাবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন বদরী সাহাবীর একজন। কিন্তু অন্যান্য নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা বদরের সাহাবীদের যে তালিকা প্রদান করেছেন তাতে সাখার বিন উমাইয়ার নাম নেই। কেউ কেউ তো তাঁর সাহাবী হওয়ার ব্যাপারে কথাও বলেছেন।

আল্লাহ তায়ালা হযরত জাব্বারকে (রা) সুন্দর স্বভাব এবং চরিত্র প্রদান করেছিলেন। মহানবীর (সা) হিজরতের পূর্বেই দাওয়াতে হক-এর উপর ঈমান এনেছিলেন এবং নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে মক্কা গমন পূর্বক বাইয়াতে উকবায়ে কবিরার সৌভাগ্য অর্জন করেন। হিজরতের পর বিশ্বনবী (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় হযরত জাব্বারকে (রা) হযরত মিকদাদ (রা) বিন আসওয়াদের ভাই বানিয়েছিলেন। যুদ্ধ শুরু হলে হযরত জাব্বার (রা) বদর থেকে তাবুক পর্যন্ত সংঘটিত সকল যুদ্ধে রহমতে আলমের (সা) সঙ্গী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

খায়বার বিজয়ের পর বিশ্বনবী (সা) হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহাকে সেখানে ফলের পরিমাপ করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। অষ্টম হিজরীতে মাওতার যুদ্ধে শহীদ হন। এ সময় হুজুর (সা) এই দায়িত্ব অর্পণ করেন হযরত জাব্বার (রা) বিন সাখারের উপর এবং তিনি তা বছরের পর বছর ধরে অত্যন্ত সুন্দরভাবে পালন করেন।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে বর্ণিত আছে, বিশ্বনবী (সা) মক্কা মুয়াজ্জমা রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে সাহাবীদেরকে (রা) বললেন, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ ইছাবা গিয়ে পানির বন্দোবস্ত করুক। হযরত জাব্বার (রা) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমি যাই। সুতরাং তিনি সেখানে পৌঁছে

এদিক-ওদিক থেকে পাথর একত্রিত করে হাউজ বানালেন এবং তাতে নিকটবর্তী চশমা অথবা কূপ থেকে পানি ভরলেন। কাজ শেষ হলে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লেন। হুজুর (সা) সেখানে পৌঁছে বললেন, হে হাউজের মালিক ! তোমার হাউজ থেকে উটকে পানি পান করানোর অনুমতি আছে কি ? হযরত জাব্বার (রা) হুজুরের (সা) আওয়াজ চিনতে পেরে আরজ করলেন ঃ অবশ্যই আছে, হুজুর (সা) উটকে পানি পান করালেন এবং তাকে বসিয়ে ওজু করতে চাইলেন। হযরত জাব্বার (রা) হুজুরকে (সা) ওজু করালেন এবং হুজুরের (সা) বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে গেলেন। মহানবী (সা) তাঁর হাত ধরে ডান দিকে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং নামায আদায় করলেন।

বিশ্বনবীর (সা) ইন্তিকালের পর খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলেও খায়বারের ফল পরিমাপের দায়িত্ব নিয়ম মত তাঁর উপরই অর্পিত ছিল। উপরন্তু হিসাব-কিতাবের পদটিও তাঁর নিকটই ছিল।

হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে খায়বারের ইহুদীরা পুনরায় ফিতনা শুরু করলো এবং নিত্য-নতুন অপকর্ম চালাতে লাগলো। খায়বারে অবস্থানকারী হযরত আবদুল্লাহ বিন আমরকে (রা) তারা ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দিল। তাতে তিনি আহত হলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁদের অপকর্ম সম্পর্কে অবহিত হলেন। এ সময় তিনি সাধারণ্যে দাঁড়িয়ে এসব কর্মের কথা বর্ণনা করলেন এবং ইহুদীদেরকে খায়বার থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন। অতপর কিছু মুহাজির ও আনসারকে সাথে নিয়ে এই সিদ্ধান্তের বাস্তব রূপদানের জন্য খায়বার তাশরীফ নিলেন। হযরত জাব্বার (রা) বিন সাখারও এই সফরে হযরত ওমর ফারুকের (রা) সঙ্গী ছিলেন।

হযরত জাব্বার (রা) হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের (রা) খিলাফতকালে ৩০ হিজরীতে ওফাত পান। সে সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৬০ বছর। মুসনাদে আহমদে তাঁর থেকে বর্ণিত কতিপয় হাদীসও রয়েছে।

কতিপয় বর্ণনায় আছে যে, হযরত জাব্বার (রা) বিন সাখার হিসাব-কিতাবে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও সন্তানাদি সম্পর্কে কোন পুস্তকে কিছু পাওয়া যায়নি।

হযরত হারিছাহ (রা) বিন সুরাকাহ আনসারী

বদরের যুদ্ধের কিছুদিন পূর্বেকার কথা। একদিন খুব ভোরে মদীনা মুনাওয়ারার এক যুবক আপন চিন্তায় বিভোর হয়ে কোথাও যাচ্ছিলো। পথিমধ্যে হঠাৎ করে রহমতে আলম (সা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত হয়ে গেলো। ভাগ্যবান যুবক বিশ্বনবীকে (সা) অত্যন্ত আদবের সাথে সালাম করলো এবং সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলো। হুজুর (সা) অত্যন্ত প্রফুল্ল মুখে তার সালামের জবাব দিলেন এবং অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"বলতো ভাই, তোমার দিন-রাত কেমন কাটছে।" যুবকটি আরজ করলো ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। দুনিয়ার প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। রাতে আল্লাহকে স্মরণ করে করে কাটাই এবং দিনে রোযা রাখি। ঠিক এই মুহূর্তের অবস্থা হলো নিজকে আরশের দিকে উড়ন্ত বলে অনুভব করছি। জান্নাত ও দোযখ আমার সামনে পরিদৃশ্য হচ্ছে এবং লোকদেরকে তাতে দলে দলে যোগদান করতে দেখতে পাচ্ছি।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "আল্লাহ তা'য়ালা যে বান্দাহর অন্তর আলোকিত করে দেন ; সে পুনরায় আল্লাহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না।"

যুবকটির চেহারা প্রথম থেকেই সৌভাগ্যের আলোয় চমকিত ছিল। দয়ার নবীর (সা) ইরশাদ শুনে চেহারা আরো ঝলমল করে উঠলো। তিনি অযাচিতভাবে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! দোয়া করুন, আল্লাহ তা'য়ালা যেন আমাকে শাহাদাত নসিব করেন।"

হুজুর (সা) তৎক্ষণাৎ পবিত্র হাত উঠালেন এবং আল্লাহর দরবারে যুবকটির আশা পূরণের জন্য দোয়া করলেন।

এই রাত জাগরণকারী এবং স্থায়ী রোযা পালনকারী সালেহ যুবক, যে নিজের জীবন হক পথে কুরবানী করার জন্য এত আকাংখিত ও অস্থির ছিলেন যে, স্বয়ং মহানবীকে (সা) দিয়ে নিজের শাহাদাতের দোয়া করিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বদরের যুদ্ধে আনসারের সর্বপ্রথম শহীদ হযরত হারিছাহ (রা) বিন সুরাকাহ আনসারী।

হযরত হারিছাহ (রা) বিন সুরাকাহর সম্পর্ক ছিল খাজরাজের সম্ভ্রান্ত শাখা বনু নাজ্জারের সঙ্গে। নসবনামা হলো ঃ

হারিছাহ (রা) বিন সুরাকাহ বিন হারিছ বিন আদি বিন মালিক বিন আদি বিন আমের বিন গানাম বিন নাজ্জার। মাতার নাম ছিল রুবায়্যি (রা) বিনতে নযর। তিনি খাদিমে রাসূল (সা) হযরত আনাস (রা) বিন মালিকের আপন ফুফু, ওহোদের শহীদ হযরত আনাস (রা) বিন নযরের সহোদরা এবং নিজেও জালিলুল কদর মহিলা সাহাবী ছিলেন। ভাই-বোনের মধ্যে সীমাহীন ভালোবাসা ছিল। সহীহ বুখারীতে আছে, একবার হযরত রুবায়্যি (রা)-এর হাতে এক আনসারী বালিকার দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল। তার পরিবারের লোকেরা কিসাস দাবী করে বসলো। বিশ্বনবী (সা) তাদের দাবীর পক্ষে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। কেননা দাঁতের বদলে দাঁত কানের বদলে কান এবং জানের বদলে জানই হলো আল্লাহর বিধান। হাঁ, আঘাতপ্রাপ্ত অথবা নিহতদের উত্তরাধিকাররা যদি রক্তের (দিয়্যত) বদলা নিতে সম্মত হয় তাহলে কিসাস পরিবর্তিত হয়ে যায়।

হযরত আনাস (রা) বিন নযরও সে সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানলেন যে, তার প্রিয় বোনের দাঁতও ভেঙ্গে ফেলা হবে। ভালোবাসার আবেগে তখন তাঁকে অস্থির করে ফেললো এবং অযাচিতভাবে নবীর (সা) দরবারে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহর কসম, রুবায়্যির দাঁত ভাঙ্গা যাবে না।" হুজুর (সা) বললেন, "ভাই, এটাই আল্লাহর নির্দেশ।"

আল্লাহর কুদরত ! আঘাতপ্রাপ্ত বালিকার পরিবারের লোকেরা হযরত আনাসের (রা) ভালোবাসার আবেগ দেখে খুব প্রভাবিত হলেন এবং দিয়্যত গ্রহণে সম্মত হয়ে গেলেন। এমনিভাবে হযরত রুবায়্যি (রা) কিসাস থেকে বেঁচে গেলেন। এ সময় হুজুর (সা) বললেন, আল্লাহর এমনো কিছু বান্দাহ আছেন, যারা কোন ব্যাপারে কসম খেয়ে বসলে আল্লাহ তাদের কসম পূরণ করে দেন।

হযরত রুবায়্যির (রা) বিয়ে হয়েছিল সুরাকাহ বিন হারিছের সঙ্গে। তাঁরই ঔরষে হযরত হারিছাহ (রা) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সুরাকাহ মহানবীর (সা) হিজরতের পূর্বে মারা গিয়েছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করতে পারেননি। অবশ্য হযরত রুবায়্যি (রা) এবং হারিছাহ (রা) উভয়েই স্ববংশের (বনু নাজ্জার) অন্য অনেক লোকের সঙ্গে নবীর (সা) হিজরতের কিছুদিন পূর্বে অথবা হিজরতের অব্যবহিত পরই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। মা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে হযরত হারিছার (রা) লালন-পালন করেন এবং তাকে পিতার কমতি অনুভব হতে দেননি। হযরত হারিছাহ (রা) বিষয়টি খুব ভালোভাবেই অনুভব করতেন। সুতরাং তিনি মায়ের অত্যন্ত অনুগত ও খিদমত গুজার ছিলেন এবং তাঁর খুশীকে নিজের খুশীর উপর সবসময় অগ্রাধিকার

দিতেন। আর এ কারণেই মা'ও তাকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। এবং সবসময় ভাগ্যবান পুত্রের কল্যাণে দোয়া করতেন। তাঁর দোয়ার ফলশ্রুতিতেই পূর্ণ যৌবনকালেই হারিছাহ (রা) দুনিয়ার সকল সাধ-আহলাদ থেকে দূরে সরে গিয়ে আল্লাহর সঙ্গে এমন সম্পর্ক স্থাপন করেন যে, আল্লাহ পাক তাকে কবুল করেন। আল্লাহ তাঁর চোখের সামনে থেকে অনেক পর্দা তুলে দিয়েছিলেন। এ কারণেই তিনি জান্নাত ও জাহান্নামের দৃশ্য দেখতে পেতেন।

দ্বিতীয় হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে রহমতে আলমের (সা) তিনশ' তেরজন জাননিছারসহ বদরের যুদ্ধে অংশ নেন। আল্লাহর এসব পবিত্র দেহ সম্পন্ন বান্দাদের মধ্যে হযরত হারিছাহ (রা) বিন সুরাকাহও শামিল ছিলেন। এই অল্প সংখ্যক মানুষের একটি দল শুধুমাত্র আল্লাহরই উপর ভরসা করে কাফেরদের ভীতিপ্রদ তাগুতি শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বের হয়েছিলেন। তাদের সাজ-সরঞ্জামের অবস্থা ছিল আরো করুন। সমগ্র বাহিনীর নিকট ছিল মাত্র দু'টো ঘোড়া এবং ৭০টি উট। এই দুই ঘোড়ার মধ্যে একটিতে সওয়ার ছিলেন হযরত হারিছাহ (রা) বিন সুরাকাহ। হুজুর (সা) তাঁকে সেনাবাহিনী পাহারাদারের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি যুদ্ধের ময়দানে হাউজের পানি পান করার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। ঠিক এমনি মুহূর্তে হাব্বান ইবনুল আরকা নামক এক মুশরিক তাক করে একটি তীর তাঁর দিকে মারলো। এই তীর তাঁর গলায় বিঁধে গেলো এবং এই ব্যথাতেই তাঁর পবিত্র রূহ জান্নাতুল ফেরদাউসে গিয়ে উপস্থিত হলো। এমনিভাবে হযরত হারিছার (রা) অন্তরের আকাংখা পূরণ হয়ে গেল। আর হবেই বা না কেন। এ জন্য তো মহানবীই (সা) দোয়া করেছিলেন।

হযরত হারিছার (রা) শাহাদাতের খবর মদীনায় পৌছলে হযরত রুবায়্যি (রা) নিজের সৌভাগবান সন্তানের স্থায়ী বিচ্ছিন্নতার জন্য খুবই দুঃখিত হলেন। কিন্তু তিনি পূর্ণ পর্যায়ের ধৈর্যধারণ করলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম, যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূল (সা) তাশরীফ না আনবেন এবং আমি তাঁর নিকট থেকে ঘটনার বিবরণ জেনে না নেবো ততক্ষণ পর্যন্ত অবশ্যই কান্নাকাটি বা আহ-উহ করবো না।

বিশ্বনবী (সা) বদরের ময়দান থেকে ফিরে এলেন। হযরত রুবায়্যি (রা) হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! হারিছাহ (রা) আমার অত্যন্ত অনুগত ও প্রিয় সন্তান ছিল। তার বিচ্ছিন্নতার যে দুঃখ আমার অন্তরে রয়েছে তা আপনি ভালোভাবেই জানেন। আমি তাঁর দুঃখে কান্নাকাটি করতে চেয়েছিলাম। তবুও আমি মনে মনে বলেছি যে, হারিছাহ (রা) এখন কেমন আছে তা রাসূলের (সা) নিকট

থেকে না জেনে তা করবো না। যদি সে জান্নাতে থাকে তাহলে অবশ্যই আমি কান্নাকাটি করবো না এবং ধৈর্যধারণ করবো। আর যদি জাহান্নামে থাকে তাহলে বুক ফাটিয়ে মাথার চুল ছিড়ে কান্নাকাটি করে জীবন ধ্বংস কিভাবে করতে হয় তা দেখতে পাবেন।"

রহমতে আলম (সা) বললেন, "তুমি কি বলছো। জান্নাততো একটা নয়, অসংখ্য। তার মধ্যে একটি হলো জান্নাতুল ফেরদাউস এবং অবশ্যই হারিছাহ (রা) সেই জান্নাতেই রয়েছে।"

হুজুরের (সা) মুবারক ইরশাদ শুনে হযরত রুবিয়্যা (রা) খুব খুশী হয়ে গেলেন। তারপর তিনি আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! এখন আমি আর হারিছার (সা) জন্য কাঁদবো না।"

অধিকাংশ চরিতকার লিখেছেন, হযরত হারিছাহ (রা) বিন সুরাকাহ বদরের যুদ্ধে আনসারের সর্বপ্রথম শহীদ। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে, বদরের যুদ্ধের সময় হযরত হারিছার (রা) বয়স ১৩-১৪ বছর ছিল। সে সময় তার উপর জিহাদ ফরয ছিল না। তিনি শুধু যুদ্ধের তামাশা দেখার জন্য বদরের ময়দানে গিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে শহীদ হয়ে যান। এসব কথার সত্যতার ব্যাপারে আমাদের কথা আছে। কেননা বেশীর ভাগ চরিতকার তাঁকে বদরের শহীদদের মধ্যে ব্যাপকভাবে স্থান দিয়েছেন।

বাস্তবত ১৩-১৪ বছরের একজন বালকের কাছ থেকে অবশ্যই এটা আশা করা যায় না যে, সে শুধুমাত্র যুদ্ধের তামাশা দেখার জন্য বাড়ী থেকে ৮০ মাইল দূরে যাবে। সহীহ কথা এটাই যে, বদরের যুদ্ধের আগেই হযরত হারিছাহ (রা) শুধুমাত্র বয়প্রাপ্তই হননি বরং নবীর (সা) প্রচুর ফয়েজও লাভ করেছিলেন এবং ইবাদাতের প্রতি অসাধারণ আকর্ষণের কারণে আল্লাহর নৈকট্যও লাভ করেছিলেন। তিনি হুজুরের (সা) সন্তুষ্টি এবং অনুমতিক্রমেই বদরের ময়দানে তাশরীফ নেন ও সেখানেই শাহাদাতের পেয়ালা পান করে জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান লাভ করেন।

হযরত আবুল ইয়াসার কা'ব (রা) বিন আমর আনসারী

৬ষ্ঠ হিজরীর শেষ দিকে (অথবা সপ্তম হিজরীর প্রথম দিকে) রহমতে আলম (সা) খায়বারের যুদ্ধে তাশরীফ নিলেন। এ সময় খায়বারের ইহুদীরা অবরুদ্ধ হয়ে নিজেদের দুর্গে বসে পড়লো। অবরোধকালে একদিন মহানবী (সা) দেখলেন যে, ইহুদীদের অনেক ছাগল একটি দুর্গে প্রবেশ করছে। তিনি (সা) সাহাবায়ে কিরামকে (রা) সম্বোধন করে বললেন ঃ

"আজ কে আমাকে এই বকরীর গোশত খাওয়াবে।" রাসূলের (সা) বেঁটে আকৃতির একজন সাহাবী (রা) উঠে দাঁড়িয়ে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক ; আমি এ কাজ করবো।"

একথা বলেই তিনি তীরের গতিবেগে বকরীদের দিকে ধাবিত হলো। তিনি এ ব্যাপারে কোন পরওয়া করলেন না যে, অবরুদ্ধ দুশমনের কোন তীর অথবা পাথর তার জীবনহানি করতে পারে। তিনি দু'টো বকরী ধরলেন এবং তা মহানবীর (সা) কাছে নিয়ে এলেন। সাহাবায়ে কেরাম (রা) তৎক্ষণাৎ বকরী দু'টো জবেহ করলেন এবং তার গোশত রান্না করে হুজুরের (সা) খিদমতে পেশ করলেন। বিশ্বনবী (সা) এই সাহাবীর (রা) তৎপরতায় খুব খুশী হলেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করলেন। রাসূলের (সা) এই সাহাবী (রা) যিনি মহানবীর (সা) সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করে এই কাজ করেছিলেন —তিনি ছিলেন হযরত আবুল ইয়াসার কা'ব (রা) বিন আমর আনসারী।

সাইয়েদেনা আবুল ইয়াসার কা'ব (রা) বিন আমর অত্যন্ত মর্যাদাবান সাহাবীদের (রা) মধ্যে পরিগণিত হতেন। তিনি খাজরাজের বনু সালমাহ বংশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন এবং আনসারদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামীদের মধ্যে ছিলেন। নসবনামা ঃ

কা'ব (রা) বিন আমর বিন উবাদ বিন আমর বিন সওয়াদ বিন গানাম বিন কা'ব বিন সালমাহ বিন সায়াদ বিন আলী বিন আসাদ বিন সারদাহ বিন ইয়াযিদ বিন জাশম বিন খাজরাজ।

মাতার নাম ছিল নসিবাহ বিনতে আযহার এবং তিনিও বনু সালমাহর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা হযরত কা'বকে (রা) সুন্দর স্বভাবদান করেছিলেন।

নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরের পর হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়ের ইসলামের প্রথম মুবাল্লিগের মর্যাদায় মদীনা মুনাওয়ারাতে তাশরীফ আনলেন এবং মদীনাবাসীদেরকে হকের দিকে আহ্বান জানাতে শুরু করলেন। এ সময় হযরত কা'ব (রা) বিন আমর বনু সালমাহর অন্য কতিপয় সৎচরিত্রের যুবকের সঙ্গে নিশ্চিন্তে ইসলামের ডাকে সাড়া দিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৮ বছরের মত। পরবর্তী বছর তিনি মদীনার অন্য ৭৪জন হকপন্থীর সঙ্গে মক্কা গমন করেন এবং লাইলাতুল উকবাতে রহমতে আলমের (সা) হাতে বাইয়াত হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তাঁরাই সেই সাহাবী (রা) ছিলেন যারা হুজুরকে (সা) মদীনা তাশরীফ নেয়ার দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং নিজের জান-মাল ও সন্তানসহ হুজুরকে (সা) সাহায্য-সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই প্রতিশ্রুতির পর যখন তারা মদীনা ফিরে গেলন তখন ঈমানের জোশ তাদেরকে চুপ-চাপ বসে থাকতে দিল না এবং তারা অত্যন্ত তৎপরতা ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বাতিলের মূলোৎপাটন ও হকের প্রচার এবং প্রসারে ব্যাপৃত হয়ে পড়লে। তাদের এই তৎপরতায় আওস ও খাজরাজের ঘরে ঘরে ইসলামের বাণী পৌঁছে গেল।

বাইয়াতে লাইলাতুল উকবার প্রায় চার মাস পর রহমতে আলমও (সা) হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারা তাশরীফ নিলেন এবং ইসলামের মাদানী যুগের শুরু হলো।

দ্বিতীয় হিজরীর পবিত্র রযমান মাসে বদরের ময়দানে হক ও বাতিলের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এই যুদ্ধে হযরত কা'ব (রা) বিন আমর অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি জীবন হাতে রেখে লড়াই করেছিলেন এবং মক্কার কুরাইশ ঝাণ্ডাবাহী আজীজ বিন উমায়েরের হাত থেকে ঝাণ্ডা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। এক বর্ণনায় আছে, তিনি মুশরিকের এক নেতা মামবাহ বিন হাজ্জাজকেও মৃত্যুর দরজায় পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং রাসূলের চাচা হযরত আব্বাস (রা) বিন আবদুল মুত্তালিবকে গ্রেফতার করেন। (তিনিও মক্কার কুরাইশের সঙ্গে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এসেছিলেন।) তিনি যখন হযরত আব্বাসকে (রা) সঙ্গে নিয়ে হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হলেন তখন মহানবী (সা) বিস্মিত হলেন যে, এই খর্বাকৃতির মানুষ আব্বাসের মত দীর্ঘদেহী লোককে কি করে গ্রেফতার করলো। সুতরাং তিনি বললেন ঃ

"আব্বাসকে গ্রেফতারের ব্যাপারে কোন ফেরেশতা নিশ্চয়ই আবুল ইয়াসারকে সাহায্য করে থাকবে।"

বদরের যুদ্ধের পর হযরত কা'ব (রা) অন্যান্য সকল যুদ্ধেও মহানবীর (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন এবং প্রতিটি যুদ্ধেই জীবন বাজি রেখে বীরত্ব প্রদর্শন করেন। খায়বারের যুদ্ধে তিনি যেভাবে হুজুরের (সা)

সন্তুষ্টি অর্জন করেছিলেন তার বিস্তারিত বর্ণনা আগেই দেয়া হয়েছে। মহানবীর (সা) ওফাতের পর তাঁর সামরিক তৎপরতার প্রমাণ হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর খিলাফতকালে পাওয়া যায়। চরিতকাররা বর্ণনা করেছেন, তিনি সিফ্‌ফিন এবং অন্যান্য যুদ্ধে হযরত আলীর (রা) বাহিনীতে শামিল হয়ে নিজের তরবারীর নিপুণতা খুব ভালোভাবেই প্রদর্শন করেছিলেন। হযরত আলীর (রা) শাহাদাতের পর তিনি নির্জনত্ব অবলম্বন করেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে বর্ণিত আছে, বৃদ্ধকালে খায়বারের ঘটনা বর্ণনা করে কাঁদতেন এবং লোকদেরকে বলতেন যে, মদীনায় একমাত্র তিনিই জীবিত রয়েছেন ; যিনি রাসূলের (সা) সাহচর্যের ফয়েজ লাভ করেছিলেন। অতএব, আমার জীবন প্রদীপ নিভে যাওয়ার পূর্বে যারা আমার নিকট থেকে উপকৃত হতে চাও তারা এসো।

হযরত আবুল ইয়াসার কা'ব (রা) বিন আমরের বয়স যখন ৭০ বছরের কিছু বেশী হয়েছিল তখনই পরপারের ডাক পেলেন এবং তিনি স্রষ্টার সান্নিধ্যে উপনীত হলেন। কতিপয় বর্ণনায় আছে, তিনি বদরের সাহাবীদের মধ্যে সর্বশেষে মারা যান। মৃত্যুকালে আম্মার নামক একটি ছেলে রেখে যান। হাদীস বর্ণনায় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তা সত্ত্বেও তাঁর থেকে বর্ণিত কতিপয় হাদীস হাদীসগ্রন্থে পাওয়া যায়। সহীহ মুসলিমে মশহুর তাবেয়ী হযরত উবাদাহ (র) বিন ওলিদ থেকে বর্ণিত আছে, একবার হযরত কা'ব বিন আমর আমার থেকে দু'টি হাদীস এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, চোখের ওপর হাত রেখে বলতেন যে এই চোখ এই ঘটনা দেখেছে অতপর কানে হাত রেখে বলতেন যে এই কান রাসূলের (সা) পবিত্র যবান থেকে শুনেছেন।

রাসূলে করীমের (সা) পবিত্র জীবনের প্রতিটি কাজ ছিল হযরত কা'বের (রা) জন্য হেদায়াতের আলোকবর্তিকা এবং তিনি সেই আলোতেই প্রতিটি কাজ আঞ্জাম দিতেন।

সহীহ মুসলিমে আছে যে, একবার উবাদাহ বিন ওলিদ (র) তাঁর খিদমতে হাজির হয়ে দেখলেন যে তাঁর গোলামের নিকট পুস্তকাদির বোঝা এবং সেও হুবহু হযরত কা'বের (রা) পোশাক পরিধান করে রয়েছে। এই পোশাক দুই ভিন্ন ধরনের কাপড়ের ছিল। উবাদাহ আরজ করলেন, আপনারা উভয়েই যদি এক একটি কাপড় একে অপরের সঙ্গে পরিবর্তন করিয়ে নেন তাহলে এক রংয়ের হয়ে তা পূর্ণ জোড়া হয়ে যায়। হযরত কা'ব (রা) একথা শুনে তার মাথায় হাত ঘুরালেন, দোয়া করলেন এবং বললেন, "রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, গোলামদেরকে তাই খাওয়াও যা নিজে খাও এবং তাই পরাও যা নিজে পরো।" অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে উভয়ের কাপড় সম রং-এর তো হয়ে যায়। কিন্তু তাতে কাপড়ের মধ্যে পার্থক্য সূচীত হয় এবং সাম্যতা দূর হয়। এই পার্থক্য হযরত কা'বের (রা) নিকট অসহনীয় ছিল।

একবার হযরত কা'বের (রা) আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল হয়ে পড়লো এবং অন্য এক সাহাবী হযরত সুমরাহ (রা) বিন রবিয়ার নিকট থেকে কিছু কর্জ বা ঋণ নিলেন। তিনি ঋণ আদায়ের জন্য এলেন। এ সময় হযরত কা'বের (রা) নিকট ঋণ আদায়ের পরিমাণ অর্থ ছিল না। লজ্জা থেকে বাঁচার জন্য এদিক-ওদিক চলে গেলেন। হযরত সুমরাহ (রা) ফিরে যেতে লাগলেন। তখন হযরত কাবের (রা) সামনাসামনি হয়ে গেলেন। ঋণের অর্থ চাওয়ার পূর্বেই হযরত কা'ব (রা) বললেন, "সুমরাহ (রা) তুমি কি রাসূল (সা) থেকে শোনোনি যে, যে ব্যক্তি গরীবকে মুহলত বা সময় দেবে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে নিজের ছায়ায় নিয়ে নিবেন ?" তিনি বললেন ঃ "অবশ্যই আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, আমি একথা রাসূলের (সা) নিকট থেকে শুনেছি।" অতপর ঋণ আদায় ছাড়াই তিনি ফিরে গেলেন।—(আল ইসাবাহ ইবনে হাজর)

আল্লামা ইবনে আছির (র) "উসুদুল গাব্বাতে" লিখেছেন, হযরত আবুল ইয়াসার এক ব্যক্তির কাছে ঋণের অর্থ পেতো। অর্থের তাগাদার জন্য তিনি তার বাড়ী গেলেন। তখন সেই ব্যক্তি দাসীকে বললো যে, বলে দাও, বাড়ী নেই। হযরত আবুল ইয়াসার (রা) তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। ডেকে চেঁচিয়ে বললেন, বেরিয়ে এসো। আমি তোমার আওয়াজ শুনে ফেলেছি। সে বাইরে এলে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এমনটি কেন করলে ? সে বললো, দারিদ্রতায় বাধ্য হয়ে। তিনি বললেন, যাও আমি তোমার ঋণ মাফ করে দিলাম। আমি রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি গরীবকে সময় দেয় অথবা ঋণ মাফ করে দেয়, কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর ছায়ায় থাকবে।

সহীহ মুসলিমে এ ধরনের ঘটনাকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ বনু হারামের এক ব্যক্তি হযরত আবুল ইয়াসারের নিকট থেকে ঋণ নিয়েছিল। ঋণ আদায়ের জন্য তিনি তার বাড়ী গেলেন। বাড়ী গিয়ে জানতে পেলেন যে, সে বাড়ী নেই। ইত্যবসরে তার ছোট ছেলে বাইরে এলো। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বাপ কোথায় ? সে বালকসুলভ স্পষ্ট ভাষায় বললো, মা'র চৌকির নীচে লুকিয়ে বসে আছে। হযরত আবুল ইয়াসার (রা) ডেকে বললেন, বাইরে বের হয়ে এসো। তুমি কোথায় আছ তা আমি জেনে ফেলেছি। সে বাইরে এলো এবং নিজের দারিদ্রতার অবস্থা শুনালো। হযরত আবুল ইয়াসার (রা) তৎক্ষণাৎ ঋণপত্র চেয়ে নিয়ে তার সকল লিখা মুছে দিলেন এবং বললেন ঃ

"যদি সামর্থ হয় তাহলে আদায় করো। অন্যথা আমি মাফ করে দিলাম।"

হযরত মাহমুদ (রা) বিন মাসলামাহ্ আনসারী

হযরত মাহমুদ (রা) বিন মাসলামাহ্ আনসারী আওস গোত্রের শাখা বনু হারিছের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত মুহাম্মাদ (রা) বিন মাসলামা তাঁর সহোদর ছিলেন। নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

মাহমুদ (রা) বিন মাসলামাহ বিন সালমাহ্ বিন খালিদ বিন আদি বিন মাজদায়াহ বিন হারিছাহ বিন খাজরাজ বিন আমর বিন মালিক বিন আওস।

চরিতকাররা তাঁর ইসলাম গ্রহণের সময়ের কথা লিখেননি কিন্তু কিয়াস হলো যে, নবীর (সা) হিজরতের প্রায় এক বছর পূর্বে তিনি ঈমান এনেছিলেন। কেননা তাঁর সহোদর হযরত মুহাম্মাদ (রা) বিন মাসলামাহ সে সময়েই হযরত মাসয়াব (রা) বিন উমায়েরের তাবলীগের ফলশ্রুতিতে মুসলমান হয়েছিলেন।

হযরত মাহমুদ (রা) সর্বপ্রথম ওহোদের যুদ্ধে শরীক হন। তারপর খন্দকের যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করেন। ৬ষ্ট হিজরীতে তিনি হুদাইবিয়াতে বাইয়াতে রিদওয়ানের সম্মান লাভ করেছিলেন। তারপর মহানবীর (সা) সফর সঙ্গী হয়ে খায়বারের যুদ্ধে তাশরীফ নিয়েছিলেন এবং সেই যুদ্ধে অত্যন্ত দৃঢ়তা এবং অটলতার সঙ্গে অংশ নেন। যুদ্ধকালে একদিন লড়াইয়ের ভয়াবহতায় এবং অস্ত্রের বোঝায় ক্লান্ত হয়ে নাযেম প্রাচীরের ছায়ায় বিশ্রাম নেয়ার জন্য বসে পড়লেন। জনৈক ইহুদী (কতিপয় বর্ণনা অনুযায়ী কিনানা বিন আবিল হুকাইক অথবা মারহাব) একটি ভারি পাথর তার মাথায় নিক্ষেপ করলো। তাতে তিনি গুরুতর আহত হলেন এবং কপালের চামড়া মুখের উপর এসে পড়লো। লোকজন ধরাধরি করে হুজুরের (সা) খিদমতে নিয়ে গেলো। মহানবীর (সা) নিজের পবিত্র হাত দিয়ে চামড়া যথাস্থানে নিয়ে কাপড়ের পট্টি বেঁধে দিলেন। হযরত মুহাম্মাদ (রা) বিন মাসলামাহ তাঁর অবস্থা দেখে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন। হুজুর (সা) তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন, ইনশাআল্লাহ তোমার ভাইয়ের উপর পাথর নিক্ষেপকারী আগামীকাল মৃত্যুর দরজায় পৌঁছে যাবে। মহানবীর (সা) পবিত্র যবান দিয়ে নিঃসৃত কথা পরবর্তী দিন পূর্ণ হলো। হযরত মাহমুদের (রা) উপর পাথর নিক্ষেপকারী ইহুদী পরের দিন মারা গেলো। হযরত মাহমুদও (রা) আহত হওয়ার তিনদিন পর জান্নাতুল ফেরদাউসের পথে রওয়ানা দিলেন।

হযরত আসেম (রা) বিন ছাবিত আনসারী

বদরের যুদ্ধের দিন যখন হকের ঝাণ্ডাবাহী এবং আল্লাহদ্রোহী শক্তির পূজারীরা পরস্পরের বিরুদ্ধে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালো। যুদ্ধাস্ত্রের ঝনঝনানি শুরুর পূর্বে বিশ্বনবী (সা) নিজের আনসারী জাননিছারের প্রতি সম্বোধন করে বললেন ঃ "তুমি দুশমনের সঙ্গে কেমন করে যুদ্ধ করবে ?"

তিনি আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! যখন দুশমন ২শ' গজ দূরত্বে থাকবে তখন আমরা তাদের ওপর তীর বর্ষণ করবো। যখন তারা সামনে অগ্রসর হয়ে বর্শার আওতায় আসবে তখন আমরা বর্শা দিয়ে লড়াই করবো এবং যখন আরো সামনে আসবে তখন আমরা তরবারী দিয়ে তাদের মুকাবিলা করবো।"

তাঁর জবাব শুনে হুজুরের (সা) পবিত্র চেহারায় প্রফুল্লতা ছেয়ে গেল এবং তিনি বললেন ঃ "হাঁ, যুদ্ধের এটাই সঠিক পদ্ধতি। তোমরা এভাবেই যুদ্ধ করবে।"

রাসূলের (সা) এই সাহাবী যার বর্ণিত যুদ্ধ পদ্ধতি স্বয়ং মহানবী (সা) অনুমোদন করেছিলেন—তিনি ছিলেন সাইয়েদেনা হযরত আসেম (রা) বিন ছাবিত আনসারী।

সাইয়েদেনা হযরত আবু সালমান আসেম (রা) বিন ছাবিত মহান মর্যাদাবান সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। আনসারের আওস কবিলার সঙ্গে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ

আসেম (রা) বিন ছাবিত বিন আবি আফলাহ কায়েস বিন আসমাতা বিন নুমান বিন মালিক বিন আমাতাহ বিন দাবয়িআহ বিন যায়েদ বিন মালিক বিন আওফ বিন আমার বিন আওফ বিন মালিক বিন আওস।

আল্লাহ তা'য়ালা হযরত আসেমকে (রা) সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। হযরত মাসয়াব (রা) বিন উমায়েরের তাবলীগী প্রচেষ্টার ফলে যখন ইয়াসরাবের ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা হতে লাগলো তখন হযরত আসেমও (রা) নির্দ্বিধায় দাওয়াতে হকের প্রতি সাড়া দিলেন। এভাবে নবীর (সা) হিজরতের পূর্বেই তিনি মহান নিয়ামত ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করলেন। যেদিন রহমতে আলম (সা) মদীনা মুনাওয়ারা তাশরীফ আনলেন সেদিন ছিল হযরত আসেমের (রা) জীবনের সবচেয়ে বড় খুশীর দিন। তিনি

নিজের কুরবানীর আবেগ, ঈমানের জোশ এবং পবিত্র চরিত্রের বদৌলতে অনতিবিলম্বে রাসূলের (সা) দরবারের নৈকট্যলাভ করে ফেললেন। তিনি তীরান্দাজী, নেযাবাজী এবং তরবারী পরিচালনায় পূর্ণ মাত্রায় নিপুণতা রাখতেন এবং অন্যতম বীর আনসার হিসেবে পরিগণিত হতেন। সুতরাং বদরের যুদ্ধের দিন তিনি যখন রাসূলের (সা) প্রশ্নের জবাবে যুদ্ধের পদ্ধতি বর্ণনা করলেন তখন এক বর্ণনা অনুযায়ী হুজুর (সা) অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামকে (রা) সম্বোধন করে বললেন ঃ "যারা লড়াই করতে চায়, তারা যেন আসেমের মত যুদ্ধ করে।"

যুদ্ধ শুরু হলে হযরত আসেম (রা) এমন উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে লড়াই করলেন যে, জানবাজীর হক আদায় করলেন। আল্লাহ তা'য়ালা মুসলমানদেরকে প্রকাশ্য বিজয় দান করলেন। মক্কার কুরাইশদের ৭০জন নিহত এবং অপর ৭০জন মুসলমানদের হাতে গ্রেফতার হলো। এই বন্দীদের মধ্যে দ্বীনের মশহুর দুশমন উকবাহ বিন আবি মুয়িতও ছিলেন। এই ব্যক্তি মক্কায় রহমতে আলমকে (সা) উত্যক্ত করার ব্যাপারে কোন ত্রুটি করেনি। এই সেই কুলাঙ্গার যে একদিন প্রিয় নবীর (সা) পবিত্র পিঠের উপর মসজিদে হারামে নামাযে সিজদারত অবস্থায় উটের অপবিত্র নাড়িভুড়ি রেখে দিয়েছিল। যুদ্ধের পর হুজুর (সা) বদর থেকে রওয়ানা হয়ে সাফরা নামক স্থানে পৌঁছে হযরত আসেম (রা) বিন ছাবিতকে উকবাহ বিন আবি মুয়িতকে কবর ভূমিতে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। ইবনে জারির তাবারি বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আসেম (রা) যখন তাকে হত্যার জন্য অগ্রসর হলেন, তখন সে চেঁচিয়ে বললো ঃ "মুহাম্মাদ ! আমার সন্তানদের জামিন কে হবে ?"

মহানবী (সা) বললেন ঃ "জাহান্নাম।" জাহান্নাম শব্দ থেকে মহানবী (সা) এই অর্থই প্রকাশ করেছিলেন যে, স্বয়ং তুমি তো জাহান্নামে যাবে। পরে তোমার সন্তানদের তকদিরে যে হাশর রয়েছে তা অবশ্যই হবে।

হযরত আসেম (রা) তরবারীর এক আঘাতেই দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিল।

তৃতীয় হিজরীতে ওহোদের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এই যুদ্ধেও হযরত আসেম (রা) বিন ছাবিত জীবন হাতে রেখে লড়াই করলেন। এই যুদ্ধে তিনি সেইসব বিশেষ মহান সন্তানদের মধ্যে ছিলেন যারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অটল থেকে লড়াই করেছিলেন। যুদ্ধের সময় কুরাইশের একজন নামকরা যোদ্ধা মাসাফি বিন তালহা বিন আবি তালহা ঝাণ্ডা উঁচু করে হুংকার দিয়ে ময়দানে এলো। হযরত আছিমের (রা) নযর তার উপর পড়লো। তিনি তার উপর তীর নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন ঃ "এই নাও, আমি হলাম ইবনে

আবিল আফলাহ।" তীর তার উপর কার্যকর হলো না। তিনি অগ্রসর হয়ে নিজের তরবারী দিয়ে আঘাত করে মাটি ও রক্তে মিশিয়ে দিলেন। মাসাফির পর তার ভাই হারিছ বিন তালহা বিন আবি তালহা গর্জন করতে করতে এগিয়ে এলো। হযরত আসেম (রা) তাকেও জাহান্নামে পাঠিয়ে দিল। এক বর্ণনায় আছে উভয়ের মা সালাফাহও মক্কা থেকে মুশরিকদের সঙ্গে এসেছিলেন এবং যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত ছিল। মাসাফির ধড়ে তখনো জীবন বায়ু অবশিষ্ট ছিল। তাকে উঠিয়ে সালাফাহর নিকট নিয়ে যাওয়া হলো। সে পুত্রকে জিজ্ঞেস করলো ঃ "পুত্র, তোমাকে কে মেরেছে ?" সে বললো, "আমার হত্যাকারী তীর চালনার সময় বলেছিল আমি হলাম ইবনে আবিল আফলাহ।" একথা শুনে সালাফাহ মানত মানলো যে, আমি ইবনে আবিল ফালাহর মাথার খুলিতে শরাব পান করবো এবং যে ব্যক্তি তার মাথা কেটে আনবে তাকে একশ' উট পুরস্কার দেব। ওহোদের যুদ্ধের পর যেন হযরত আসেম (রা) মক্কার মুশরিকদের চোখে কাঁটার মত বিঁধতে লাগলো। এই যুদ্ধে যদিও মুসলমানদের মারাত্মক জীবনহানি ঘটেছিল ; কিন্তু তাদের মনোবল ছিল তুঙ্গে। এজন্য মুশরিকরা মদীনার উপর হামলা করার সাহস পেলো না এবং তারা মুসলমানদের ব্যাপক জীবনহানি ঘটানোকেই গনীমত মনে করে ওহোদের ময়দান থেকে মক্কা রওয়ান হয়ে গেল। পরবর্তী দিন বিশ্বনবী (সা) নিজের জাননিছারদের সঙ্গে নিয়ে "হামরাউল আসাদ" নামক স্থান পর্যন্ত কুরাইশ বাহিনীর পিছু ধাওয়া করলো। কিন্তু তারা কোন মতে বেঁচে গেল। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, মক্কার কাফেরদের নামকরা কবি আবু আযযাহ আমর বিন আবদুল্লাহ ঘটনাক্রমে পিছে পড়ে গিয়েছিল। মুসলমানরা তাকে গ্রেফতার করলো। এই ব্যক্তি বনু জামুহ্-এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল এবং নিজের কবিতায় ইসলামের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় দুর্নাম করতো। বদরের যুদ্ধেও সে মুশকিরদের সঙ্গে এসেছিলো এবং মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিল। যখন তাকে ফিদিয়াদানের কথা বলা হলো, তখন সে নিজের দারিদ্রতার ওজর পেশ করলো এবং তার পাঁচটি মেয়ে থাকার কথা বললো। ভবিষ্যতে কখনো সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধে অংশ নেবে না এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে মহানবী (সা) তাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। ওহোদের যুদ্ধের সময় সে তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এখানে গ্রেফতার হয়ে প্রিয় নবীর (সা) সামনে এলো। সে খুব কাঁদলো এবং জীবন ভিক্ষার দরখাস্ত করলো। কিন্তু বিশ্বনবী (সা) বললেন ঃ "মু'মিনকে এক ছিদ্র পথ দিয়ে দু'বার দংশন করা যায় না। তুমি মক্কা ফিরে গিয়ে হিজর নামক স্থানে বসে এবং দাড়িতে হাত বুলিয়ে এবং মোচে তা দিয়ে বলবে যে আমি মুহাম্মাদকে (সা) দ্বিতীয়বার ধোঁকা দিয়েছি। এটা হতে পারে না।" তারপর তিনি হযরত আসেমকে (রা) নির্দেশ দিলেন যে, তার গর্দান উড়িয়ে দাও। তিনি দাঁড়িয়ে তৎক্ষণাৎ তার মাথা উড়িয়ে দিলেন।

চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে 'রাজি' নামক স্থানে এক মর্মন্তুদ ঘটনা সংঘটিত হলো। এই মর্মান্তিক ঘটনার পটভূমি কি ছিল ? এই ব্যাপারে তিনটি ভিন্ন ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। এক বর্ণনায় জানা যায়, ওহোদের যুদ্ধের পর বনু হাযিলের সরদার সুফিয়ান বিন খালিদ একটি হীন ষড়যন্ত্র আঁটে। সে কতিপয় ব্যক্তিকে মদীনা মুনাওয়ারায় হুজুরের (সা) খিদমতে প্রেরণ করে। তারা সুফিয়ানের নির্দেশ অনুযায়ী মহানবীর (সা) নিকট একটি নিবেদন পেশ করে। এই নিবেদনে তারা কতিপয় মুসলমানকে ইসলামের তাবলীগের উদ্দেশ্যে তাদের কবিলায় প্রেরণের অনুরোধ জানায়। হুজুর (সা) তাদের নিবেদন বা দরখাস্ত কবুল করলেন এবং কতিপয় ইসলামের মুবাল্লিগকে সঙ্গে দিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় বর্ণনায় বলা হয়, ওহোদের যুদ্ধে নিহত তালহা বিন আবি তালহার স্ত্রী এবং নিহত মাসাফি ও হারিছের মা সালাফাহ বিনতে সায়াদ সুফিয়ান বিন খালিদ হাযলীকে কোন বাহানায় মদীনা মুনাওয়ারা গিয়ে কতিপয় মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে আশার জন্য প্ররোচনা দিল। তাদের মধ্যে যাতে আসেম বিন ছাবিত বিন আবিল আফলাহও থাকে সে ব্যবস্থাও করতে বললো। কারণ, আসেম বিন ছাবিত এলে তাকে হত্যা করে নিজের স্বামী ও পুত্রদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারবে। এর বিনিময়ে সে সুফিয়ানকে একশ' উট এনাম দিবে। সঙ্গে সঙ্গে এই কসমও খেলো যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতিশোধ আগুন ঠাণ্ডা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মাথায় তেল দেবে না এবং বিছানায় শয়ন করবে না। সুফিয়ান বিন খালিদ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো যে, সে যা চায় তা অবশ্যই করা হবে। সুতরাং সে কতিপয় ব্যক্তিকে মদীনা পাঠালো। তারা নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে প্রকাশ করলো এবং কিছুদিন মুসলমানদের মেহমান হয়ে ইসলামের তালিম গ্রহণ করলো। তারপর তারা রহমতে আলমের (সা) নিকট তাদের সঙ্গে কতিপয় সাহাবী (রা) প্রেরণের দরখাস্ত পেশ করলো। এসব সাহাবী (রা) তাদের ও তাদের কবিলার অন্যান্য সদস্যকে ইসলামের আহকাম এবং আকায়েদ শিক্ষা দেবে—এই মর্মে তারা দরখাস্তে উল্লেখ করেছিল। হুজুর (সা) তাদের দরখাস্ত মঞ্জুর করলেন এবং দশজন সাহাবী (রা) সমন্বয়ে গঠিত একটি দল তাদের সঙ্গে দিয়ে দিলেন। (এই বর্ণনা সহীহ বুখারীর বর্ণনা। অন্যান্য চরিতকার এই দলে অন্তর্ভুক্ত সাহাবীর সংখ্যা ৬ বলে উল্লেখ করেছেন।) এই দলের নেতা কাকে বানিয়েছিলেন ? এ ব্যাপারে দু'টি মত পাওয়া যায়। এক মতে নেতা হয়েছিলেন হযরত মুরছাদ (রা) বিন আবি মুরছাদ গুনুবী। অপর মতে হযরত আসেম (রা) বিন ছাবিতকে নেতা নিয়োগ করা হয়েছিল। এই দল যখন (মক্কা ও আসফানের মধ্যবর্তী হাদ্দাহ থেকে সাত ক্রোশ দূরে) 'রাজি' নামক স্থানে পৌছলেন তখন গাদ্দাররা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলো এবং নিজেদের কবিলাসমূহের (বনু লাহইয়ান, আদল এবং কারাহ) মধ্য থেকে একশ' (অন্য

বর্ণনা অনুযায়ী দু'শ') সশস্ত্র ব্যক্তিকে ডেকে আনলো। হযরত আসেম (রা) নিজের তীক্ষ্ণ অন্তর্বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে সক্ষম হলেন যে, তাদের নিয়ত ভালো নয়। তারা তাদেরকে হত্যা অথবা গ্রেফতার করতে চায়। তা সত্ত্বেও তাঁরা সাহস ও ধৈর্য হারা হলেন না এবং নিজের সঙ্গীদের নিয়ে একটি পাহাড়ে উঠে পড়লেন। মুশরিকরা পাহাড়ের চারপাশে ঘিরে নিল এবং মুসলমানদের আশ্রয়দানের কথা বলে নীচে নেমে আসতে বললো।

হযরত আসেম (রা) সঙ্গীদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "হে মুসলমানরা! আমি কোন মুশরিকের আশ্রয় নেব না।" একথা তিনি মুশরিকদেরকেও উচ্চৈ স্বরে বললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ ! আমাদের অবস্থার খবর রাসূলকে (সা) দিয়ে দিন।" তারপর দুশমনরা তাদের উপর বৃষ্টির মত তীর বর্ষণ করলো। মুজাহিদরাও দৃঢ়তা এবং অটলতার সঙ্গে মুকাবিলা করলেন এবং অনেক কাফেরকে জাহান্নামে পৌঁছে দিলেন। কিন্তু শত্রু সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। তাদের তীরের আঘাতে হযরত আসেম (রা) বিন ছাবিত এবং তাঁর সাতজন সঙ্গী শাহাদাতের পেয়ালা পান করলো এবং দু'জন [হযরত খুবাইব (রা) বিন আদি এবং হযরত যায়েদ (রা) বিন দিছনা] কাফেরদের হাতে আটক হয়ে গেলেন। [লাহইয়ান বিশ্বাসঘাতকরা হযরত খুবাইব এবং হযরত যায়েদকে (রা) মক্কার মুশরিকদের নিকট বিক্রয় করে দিল। তারা উভয়কেই কয়েদ করলো এবং হারাম মাস অতিবাহিত হওয়ার পর অত্যন্ত নির্মমভাবে দু' মজলুমকে শুলে চড়িয়ে শহীদ করে ফেললো।]

আল্লামা ইবনে আছির (র) "উসুদুল গাব্বাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, শাহাদাতের পূর্বে হযরত আসেম (রা) বিন ছাবিত অত্যন্ত খুশু ও খুজুর সঙ্গে রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে দোয়া করে বলেছিলেন, "হে আল্লাহ ! আমাকে এমনভাবে হেফাজত করো যাতে আমি যেন কোন মুশরিককে স্পর্শ না করি এবং কোন মুশরিক যেন আমাকে স্পর্শ করতে না পারে।"

আল্লাহ তায়ালা তাঁর আকাংখা পূরণ করেছিলেন। তিনি যখন শহীদ হন তখন মৌমাছির (অথবা নেকড়ে) একটি বিরাট দলকে আল্লাহ পাক তাঁর লাশের উপর প্রেরণ করেন। এই মৌমাছি কোন মুশরিককে তাঁর লাশের নিকট পৌঁছতে দেয়নি। অবশেষে তারা ক্লান্ত হয়ে সিদ্ধান্ত নিল যে, রাতে যখন মৌমাছি (অথবা নেকড়ে) চলে যাবে তখন তারা আসেমের (রা) মাথা কেটে নেবে। আল্লাহর কুদরাত। রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টি হলো। বৃষ্টির পানি বন্যার রূপ পরিগ্রহ করলো হযরত আসেমের (রা) পবিত্র লাশ বন্যায় ভেসে গেল। মুশরিকরা তন্ন তন্ন করে তাঁর লাশ তালাশ করলো। কিন্তু সফল হতে পারলো না। এভাবে আল্লাহ তায়ালা তার এক পবিত্র বান্দাহর কথা রক্ষা করলেন।

এক বর্ণনায় হযরত আসেমের (রা) এই বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে ঃ যেদিন আমি ইসলাম গ্রহণ করি সেইদিন থেকেই ওয়াদা করেছিলাম যে, আজ থেকে কোন কাফের ও মুশরিকের সঙ্গে হাত মিলাবো না, তাকে স্পর্শ করবো না, আমার দেহ তাকে স্পর্শ করতে দিব না, কোন মুশরিকের নিরাপত্তা গ্রহণ করবো না এবং তার জিম্মীও হবো না। বস্তুত নিজের এই ওয়াদা তিনি সারা জীবন পালন করেছিলেন এবং তাঁর শাহাদাতের পর আল্লাহ তায়ালা তার দেহকে রক্ষা করেছিলেন। কয়েকটি বর্ণনায় আছে, যেদিন হযরত আসেম (রা) শাহাদাত প্রাপ্ত হন ; সেদিন মেঘের সামান্যতম টুকরাও আকাশে ছিল না। কিন্তু রাতের বেলা সমগ্র আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল এবং মুষলধারে বৃষ্টিপাত হলো। অবস্থাটা এমন হলো যে, চারদিকে শুধু পানি আর পানি। সাইয়েদেনা হযরত ওমর ফারুক (রা) বলতেন, আসেমের (রা) মৃত্যুর পর আল্লাহ তায়ালা তাঁকে কাফেরদের হাত থেকে এমনভাবে হিফাজত করেছিলেন যেভাবে তিনি জীবিত অবস্থায় কাফেদেরকে স্পর্শ করা থেকে দূরে থাকতেন।

হযরত আসেম (রা) শাহাদাতের সময় একটি ছেলে ও একটি মেয়ে রেখে যান। তাঁর কন্যার নাম ছিল জামিলা এবং তিনি হযরত ওমর ফারুকের (রা) বাগদত্তা ছিলেন। তাঁর গর্ভে আল্লাহ হযরত ওমর ফারুককে (রা) সন্তান দান করেছিলেন। তিনি এই সন্তানের নাম নিজের জালিলুল কদর শশুর (এবং পুত্রের নানা)-এর নামানুসারে আসেম রেখেছিলেন। হযরত আসেম (রা)-এর পুত্রের নাম ছিল মুহাম্মাদ (র)। আরবের প্রখ্যাত কবি আহওয়াস মুহাম্মাদ (র) বিন আসেমের (রা)ই সন্তান ছিলেন।

সাইয়েদেনা হযরত আসেম (রা) বিন ছাবিত নিজের ঈমানের আবেগ, নিষ্ঠাপূর্ণ আমল, রাসূল প্রেম, জানবাজী এবং পবিত্রতার যে নকশা ইতিহাসের পাতায় রেখে গেছেন, তা মুসলমানদের জন্য চিরকাল আলোকবর্তিকা হিসেবে পথ দেখাবে।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জুবায়ের আনসারী

আওস কবিলার আমর বিন আওফ খান্দানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

আবদুল্লাহ (রা) বিন জুবায়ের বিন নু'মান বিন উমাইয়াতা বিন ইমরুল কায়েস বিন ছা'লাবা বিন আমর বিন আওফ বিন মালিক বিন আওস।

আমর বিন আওফের বংশের এই যুবককে আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত নেক স্বভাব দান করেছিলেন। হিজরতে নববীর প্রায় এক বছর পূর্বে ইসলাম গ্রহণের মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। অতপর নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছর পর লাইলাতুল উকবায় শরীক হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।

ইবনে সায়াদ ওয়াকেদীর উদ্বৃতি দিয়ে হযরত উয়ায়েম (রা) বিন সায়িদার বর্ণনা উল্লেখ করে বলেছেন, আমরা যখন (মদীনার ঈমানদাররা) মক্কা পৌছলাম তখন আবদুল্লাহ (রা) জুবায়ের, মায়ান (রা) বিন আদি এবং সায়াদ (রা) বিন খাইছুমা আমাকে বললেন, চলো রাসূলের (সা) খিদমতে গিয়ে তাঁকে সালাম করি। কেননা আমরা তাঁর উপর ঈমান এনে ফেলেছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত তাঁর দর্শন হয়নি। সুতরাং আমরা আব্বাস (রা) বিন আবদুল মুত্তালিবের বাড়ী গেলাম। সেখানে হুজুর (সা) উপস্থিত ছিলেন। আমরা তাঁকে সালাম দিলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, আপনার সঙ্গে আমাদের (মদীনাবাসী) মুলাকাত কবে ও কোথায় হবে ? হযরত আব্বাস (রা) বললেন, তোমাদের সঙ্গে তোমাদের কওমের সেইসব মানুষও রয়েছে যারা তোমাদের বিরোধিতা করে থাকে। এজন্য নিজেদের ব্যাপারটি গোপন রাখো। হজ্জে আগত লোকজন এদিক-সেদিক চলে যাক। অতপর মহানবী (সা) মুলাকাতের জন্য সেই রাতের প্রস্তাব করলেন যে রাতের সলককে ইওয়ামুন নাফায়িল আখির বলা হয়। এবং মুলাকাতের স্থান উকবার নিম্ন ভূমির অংশে নির্দষ্ট করে দিলেন।

এই বর্ণনায় জানা যায় যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জুবায়ের সেইসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা বাইয়াতের পূর্বেই হুজুরের (সা) দর্শনলাভের সুযোগ পেয়েছিলেন।

বিশ্বনবী (সা) মদীনা মুনাওয়ারাতে শুভ পদার্পণ করলে অন্যান্য ঈমানদারদের সঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ (রা) জুবায়েরও অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে হুজুরকে (সা) ইসতিকবাল বা স্বাগত জানালেন।

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে রহমতে আলম (সা) বদরের যুদ্ধে গমন করলেন। এ সময় হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জুবায়েরও তাঁর সফরসঙ্গী

ছিলেন। এই যুদ্ধে তিনি জীবনবাজী রেখে লড়েছিলেন। এক বর্ণনা অনুযায়ী মহানবীর (সা) জামাতা হযরত আবুল আছ (রা) বিন রবিকে (যিনি অনন্যোপায় হয়ে কাফিরদের সঙ্গে এসেছিলেন) হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জুবায়েরই আটক করেছিলেন। [কতিপয় বর্ণনায় তাঁকে আটককারী হিসেবে হযরত খারাশ (রা) বিন সামাতার নাম উল্লেখ করা হয়েছে।]

তৃতীয় হিজরীতে ওহোদের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এই যুদ্ধেও হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জুবায়ের খুব উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নেন। যুদ্ধ শুরুর পূর্বে বিশ্বনবী (সা) তাঁকে ৫০জন তীরান্দাজ দিয়ে ওহোদ পাহাড়ের নিকটবর্তী জাবালে আইনাইনে (জাবালির রুমাত) মোতায়েন করেন এবং মুসলমানদের জয় হোক অথবা পরাজয় হোক কোন অবস্থাতেই তারা যেন সেই স্থান পরিত্যাগ না করে—এই নির্দেশ দিলেন। দুশমন যদি কানাত উপত্যকার পথ (অর্থাৎ ওহোদ পাহাড় এবং জাবালে আইনাইনের মধ্যবর্তী পথ) দিয়ে মুসলমানদের উপর হামলা করার জন্য কোন দল প্রেরণ করে তাহলে তাকে বাধা দেয়ারও নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

যুদ্ধের ময়দান উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। মুজাহিদীন ইসলামের জানবাজির কারণে হামলাকারীদের পা শীঘ্রই উৎপাটিত হয়ে গেল এবং মুসলমানরা গনীমতের মাল সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আইনাইন পাহাড়ে মোতায়েনরত তীরন্দাজরা কাফিরদের পিছ পা হতে দেখে তাদের অধিকাংশ নিজেদের মোর্চা ত্যাগ করে ময়দানে এসে পড়লো এবং গনীমাতের মাল একত্রিত করার জন্য চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জুবায়ের নিজেদের স্থান পরিত্যাগ না করার জন্য তাদেরকে অনেক নিষেধ করলেন। কিন্তু তাঁরা জবাব দিলেন যে, মুসলমানদের বিজয় হয়ে গেছে। এখন এখানে থেকে কি লাভ? শুধুমাত্র আট অথবা দশজন তীরান্দাজ হযরত আবদুল্লাহর (রা) সঙ্গে রইলেন এবং সারফরোশ বা মাথা বিক্রয়কারী এই ছোট দল বরাবর মোর্চায় অটল রইলেন। যখন মুশরিকদের একটি ঘোর সওয়ার দল চক্কর মেরে আইনাইন গিরিপথ দিয়ে মুসলমানদের উপর হামলা করে বসলো তখন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জুবায়ের এবং তাঁর জানবাজ সঙ্গীরা প্রচণ্ডভাবে তার মুকাবিলা করলো। এমনকি এক এক করে সকলে শহীদ অথবা গুরুত্বরভাবে আহত হলেন।

জনৈক মুশরিক হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জুবায়েরকে এমনভাবে তীর মারলো যে, তা তাঁর পেট পার হয়ে গেল এবং নাড়িভুড়ি বের হয়ে পড়লো। মুশরিকরা তার লাশ বিকৃত করলো (নাক-কান ইত্যাদি অঙ্গ কেটে ফেললো) এমনিভাবে হক পথের এই জানবাজ সিপাহী নিজের আকা ও মাওলার (সা) নির্দেশ পালন করতে করতে জান্নাতে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

হযরত খাওয়াত (রা) বিন জুবায়ের আনসারী

ডাক নাম ছিল আবু আবদুল্লাহ এবং আবু সালেহ। তিনি ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জুবায়েরের শহীদের সহোদর (তাঁর বর্ণনা এর আগে দেয়া হয়েছে) ভাইয়ের মত তিনিও অত্যন্ত সচ্চরিত্রবান ছিলেন। বিশ্বনবীর (সা) মদীনা তাশরীফ আনার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে বিশ্বনবী (সা) বদরের যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হয়ে গেলেন। এ সময় হযরত খাওয়াতও (রা) হুজুরের (সা) প্রতি জীবন ফিদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সাফরা নামক স্থানে পৌঁছার পর পায়ে পাথর লাগলো। এ কারণে চলা-ফেরা করতে অযোগ্য হয়ে পড়লেন। হুজুর (সা) চিকিৎসার জন্যে তাঁকে মদীনা ফেরত পাঠালেন। তা সত্ত্বেও বদরের গনীমাতের মালে তাঁর পুরো অংশই দেয়া হয়েছিল। তারপর তিনি ওহোদ এবং অন্যান্য যুদ্ধে জীবন বাজী রেখে অংশ নিয়েছিলেন। ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি অত্যন্ত বাহাদুর ছিলেন।

কবিতা এবং কাব্যেও বুৎপত্তি ছিল। কণ্ঠস্বর ছিল অত্যন্ত সুন্দর। হাফেজ ইবনে হাজার (র) "ইসাবাহ"-তে বর্ণনা করেছেন, একবার হযরত ওমর ফারুক (রা), হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ এবং হযরত আবু উবায়দাহ (রা) ইবনুল জাররাহ-এর সঙ্গে হজ্জের জন্য রওয়ানা হলেন। রাস্তায় লোকেরা জিরারের কবিতা শুনানোর ফরমায়েশ করলেন। কিন্তু হযরত ওমর ফারুক (রা) বললেন, না ; নিজের কবিতা শোনাও। সুতরাং তিনি সারারাত সুমধুর স্বরে নিজের কবিতা শুনালেন। ভোর হয়ে এলে হযরত ওমর ফারুক (রা) বললেন, "খাওয়াত এখন বন্ধ কর, ভোর হয়ে গেছে।"

হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু এবং হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার (রা) পারস্পরিক ঝগড়ায় হযরত খাওয়াত হযরত আলীর (রা) অন্যতম প্রবল সমর্থক ছিলেন এবং সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে হযরত আলীর (রা) বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

চল্লিশ হিজরীতে ৭৪ বছর বয়সে মদীনা মুনাওয়ারাতে ওফাত পান। ইন্তেকালের সময় ছালেহ নামক এক পুত্র রেখে যান। হযরত খাওয়াত (রা) থেকে কতিপয় হাদীসও বর্ণিত আছে। ইমাম বুখারী (র) তাঁর একটি কওল উল্লেখ করেছেন। কওল বা বাণীটি হলো ঃ "দিনের প্রথম অংশে ঘুমানো হলো বেতমিযী, মধ্যাংশে ঘুমানো মুনাসিব এবং শেষাংশে আহমকী।"

হযরত কুতবাহ (রা) বিন আমের আনসারী

সাইয়েদেনা হযরত আবু যায়েদ কুতবা (রা) বিন আমের ইসলাম গ্রহণকারী আনসারদের অগ্রগমনকারীদের অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। তাঁর সম্পর্ক ছিল খাজরাজ কবিলার বনু সালমাহ শাখার সঙ্গে। নসবনামা হলো ঃ

কুতবাহ (রা) বিন আমের বিন হাদিদাহ বিন আমর বিন সাওয়াদ বিন গনম বিন কা'ব বিন সালমাহ।

হযরত কুতবাহ (রা) মদীনার সেইসব জালিলুল কদর বুজর্গের কাতারে শামিল ছিলেন যারা নবুওয়াতের ১১, ১২ এবং ১৩ বছরে পর পর তিনবার মক্কা গমন পূর্বক আকাবাহ নামক স্থানে রাসূলের (সা) হাতে বাইয়াত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং তাঁরা হুজুরকে (সা) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি মদীনা গমন করলে তাঁরা তাদের জান, মাল এবং সন্তান দিয়ে তাকে হেফাজত করবেন।

প্রিয় নবী (সা) মদীনা মুনাওয়ারাতে শুভ পদার্পণ করলেন। এ সময় হযরত কুতবাহ (রা) যেন দোজাহানের নিয়ামত লাভ করলেন। মহানবীর (সা) সঙ্গে এত গভীর ভালোবাসা ছিল যে, প্রত্যেক দিন যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর দর্শণলাভ না হতো ততক্ষণ স্বস্তি পেতেন না।

যুদ্ধসমূহের সূচনা হতে তিনি বদর থেকে তাবুকে পর্যন্ত প্রতিটি যুদ্ধেই হুজুরের (সা) সঙ্গী হয়ে জীবন বাজী রাখার হক আদায় করেন। ঈমানী আবেগ এতবেশী ছিল যে, বদরের যুদ্ধে মুশরিক এবং মুসলমানদের কাতারের মাঝে একটি পাথর নিক্ষেপ করে উচ্চৈস্বরে বললেন ঃ

"আল্লাহর কসম, যতক্ষণ পর্যন্ত এই পাথর না পালায় ; ততক্ষণ আমি যুদ্ধের ময়দান থেকে সরে দাঁড়াবো না।"

সুতরাং মুশরিকদের পরাজয় না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দানে অকুতোভয় সৈনিকের বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। এই যুদ্ধে তিনি মালিক বিন আবদুল্লাহ তামিমীকে গ্রেফতারও করেছিলেন। ওহোদের যুদ্ধে তিনি ৯টি আঘাত পেয়েছিলেন।

তিনি সেই ১০ হাজার পবিত্র আত্মার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা মক্কা বিজয়ের সময় রহমতে আলমের (সা) সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। মক্কায় এমন মর্যাদার সঙ্গে প্রবেশ করলেন যে, বনু সালমাহর ঝাণ্ডা তাঁর হাতে ছিল।

ঝাণ্ডা বহনের এই সম্মান স্বয়ং সাইয়েদুল মুরসালিন (সা) তাঁকে প্রদান করেছিলেন।

সুন্নাতে নববীর (সা) উপর চলার বিশেষ অধ্যবসায় ছিল। জাহেলী যুগে আনসারদের মধ্যে এক আশ্চর্য ধরনের প্রথা ছিল। ইহরাম বাঁধা অবস্থায় তারা দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতেন না। বরং পেছন দিয়ে অথবা ছাদের উপর থেকে লাফিয়ে ঘরে প্রবেশ করতেন।

মক্কার কুরাইশদের মধ্যেও এই প্রথা ছিল। কিন্তু কতিপয় খান্দান এর ব্যতিক্রম ছিলেন। একদিন বিশ্বনবী (সা) ইহরাম বাঁধা অবস্থায় কোন এক বাগানে তাশরীফ নিলেন। হযরত কুতবাহও (রা) ইহরাম বেঁধে হুজুরের (সা) সঙ্গে ভেতরে চলে গেলেন। লোকেরা বললো, "হে আল্লাহর রাসূল ! এই ব্যক্তি গুনাহর কাজ করে বসেছে। ইহরাম অবস্থায় সে দরজা দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে।"

হুজুর (সা) হযরত কুতবাহকে (রা) সম্বোধন করে বললেন ঃ "কুতবাহ ! তুমি ইহরাম বেঁধে ভেতরে কেন এলে ?"

তিনি আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আপনাকে দেখে ভেতরে এসে পড়েছি।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "আমি তো আহমাসি (অর্থাৎ আমার গোত্র এই প্রথার পাবন্দ নন।)

আরজ করলেন ঃ দ্বিনী দ্বিনুকা অর্থাৎ আপনার যে দ্বীন, তাই আমার দ্বীন।"

এই সময় এই আয়াত নাযিল হলো ঃ

لَيسَ البِرَّ بِاَن تَاتُو البُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ البِرَّ مَنِ التَّقى -

وَاتُوا البُيُوتَ مِن اَبوَابِهَا ص

"এটা কোন নেকী নয় যে, তুমি ঘরের পেছন দিক থেকে এসেছ। কিন্তু নেকী পরহেজগারীতে রয়েছে এবং ঘরে দরজা দিয়ে প্রবেশ কর।"

সম্ভবত স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা হযরত কুতবাহর (রা) কর্মপদ্ধতি সমর্থন করলেন। তারপর এই প্রথা চিরকালের জন্য শেষ হয়ে গেল। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা বলেছেন, এই প্রথা পরিত্যাগ প্রশ্নে প্রথম মর্যাদার অধিকারী ছিলেন হযরত কুতবাহ (রা)। হযরত কুতবাহ (রা) বিন আমের হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের (রা) খিলাফতকালে ওফাত পান।

হযরত খাল্লাদ (রা) বিন সুয়ায়েদ আনসারী

তিনি ছিলেন খাজরাজের বনু হারিছ বিন খাজরাজ বংশোদ্ভূত। নসবনামা হলো ঃ

খাল্লাদ (রা) বিন সুয়ায়েদ বিন ছা'লাবা বিন আমর বিন হারিছাহ বিন ইমরাউল কায়েস বিন মালিক আয়াজ বিন ছা'লাবা বিন কা'ব বিন খাজরাজ বিন হারিছ ইবনুল খাজরাজুল আকবার।

মদীনায় ইসলামের প্রথম মুবাল্লিগ হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়েরের তাবলীগী প্রচেষ্টায় ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছর পর মক্কা গমন পূর্বক রহমতে আলম (সা)-এর বাইয়াতে অভিষিক্ত হন। (বাইয়াতে আকাবায়ে ছানিয়া অথবা কবিরাহ।)

বিশ্বনবীর (সা) মদীনায় শুভাগমন ঘটলো এবং যুদ্ধের সিলসিলা শুরু হলো। হযরত খাল্লাদ (রা) বদর, ওহোদ এবং খন্দক তিন যুদ্ধেই বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। খন্দকের যুদ্ধের পর হুজুর (সা) বনু কোরায়জার ইহুদীদেরকে অবরোধ করলে তিনিও এ সময় মহানবীর (সা) সঙ্গে ছিলেন। অবরোধকালে ইহুদীদের দুর্গের প্রাচীরের ছায়ায় বসে ছিলেন। এমন সময় নাবানা নাম্মী এক ইহুদী মহিলা যাঁতার পাথর তাঁর মাথার উপর দুর্গের উপর থেকে ফেলে দিল। এই আঘাতে তার মাথা ফেটে গেল এবং শহীদ হয়ে গেলেন। হুজুর (সা) তাঁর প্রসঙ্গে বললেন ঃ "তিনি দু' শহীদের সওয়াব পাবেন।"

লড়াই শেষ হওয়ার পর বুন কোরায়জার লোকজন গ্রেফতার হয়ে হুজুরের (সা) খিদমতে পেশ হলে তিনি নাবানাকে খুঁজে বের করে হত্যা করালেন। এই ঘটনায় ইহুদীদের অন্যান্য মহিলা হত্যা হওয়া থেকে বেঁচে গেল।

হযরত খাল্লাদ (রা) শহীদ হওয়ার সময় দু'জন পুত্র রেখে যান। তারা হলেন ঃ ইবরাহীম (রা) ও সায়িব (রা)। তাঁরা উভয়েই সাহাবী ছিলেন।

মুসনাদে আবু দাউদে আছে, তাঁর মা হযরত খাল্লাদের (রা) শাহাদাতের খবর পেয়ে বিস্তারিত জানার জন্য হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হলেন। এ সময় তাঁর চেহারার উপর নেকাব ছিল। কেউ একজন বললো ঃ

"বিবি, তোমার পুত্র নিহত হয়েছে। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, এই মুসিবতের সময়ও তুমি মুখের উপর নিকাব দিয়ে রেখেছ।" তিনি অত্যন্ত ইতমিনানের

সঙ্গে জবাব দিলেন ঃ "আমি আমার পুত্রকে খুইয়েছি, হায়া ও শরম তো খুইনি।"

এ সময় বিশ্বনবী (সা) তাঁকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "তোমার পুত্র দ্বিগুণ সওয়াব পাবেন। কেননা আহলি কিতাব তাঁকে হত্যা করেছে।"

এই প্রসঙ্গে কতিপয় চরিতকার উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ (রা) থেকে একটি চিত্তাকর্ষক বর্ণনা উদ্বৃত করেছেন। তিনি বলেন, বনু কোরায়জার যুদ্ধের পর বুন কোরায়জার এক মহিলা আমার পাশে বসে হাসছিল। ইত্যবসরে বাইরে থেকে কে একজন ডাক দিলো, অমুক মহিলা কোথায় ?

সেই মহিলা বললো, আমি এখানে।

যিনি ডাক দিলেন তিনি বললেন, এদিকে এসো, বাইরে এসো।

সেই মহিলা তেমনি হাসতে হাসতে এবং খিল খিল করতে করতে উঠলো এবং বললো, আমাকে হত্যার জন্য ডাকা হচ্ছে। আমি বললাম, মহিলাদেরকে হত্যা করার তো নিয়ম নেই। তোমাকে কেন হত্যা করা হচ্ছে।

সে বললো, আমার স্বামী আমাকে খুব ভালোবাসতো। অবরোধকালে একদিন সে আমাকে বললো মুসলমানরা আমাদের উপর বিজয়ী হলে আমাদের পুরুষদের হত্যা এবং মহিলাদেরকে দাসী বানাবে।

আমি তাকে বললাম, তোমার বিচ্ছিন্নতা আমি বরদাশত করতে পারবো না।

আমার স্বামী বললো, তুমি সত্যি বলছো। তাহলে যাঁতার অংশ সেই মুসলমানদের মাথার উপর ফেলে দাও, যারা দুর্গের প্রাচীরের নীচে বসে আছে। যদি তাতে কেউ মারা যায় তাহলে মুসলমানরা এই কিসাসে তোমাকে হত্যা করবে এবং তুমি আমার সঙ্গে এসে মিলিত হবে। আমি এমনি করেছি এবং একজন মুসলমান মারা গেছে। তারই কিসাসে আমাকে হত্যার জন্য ডাকছে।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, অনেকদিন চলে গেছে, কিন্তু হত্যার জন্য সেই মহিলার হাসার কথা আমি ভুলতে পারিনি।

হযরত খারিজাহ (রা) বিন যায়েদ আনসারী

হযরত খারিজাহ (রা) বিন যায়েদ খাজরাজের হারিছ বিন খাজরাজ (অথবা আগার)-এর বংশভুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ

খারিজাহ (রা) বিন যায়েদ বিন আবি যুহায়ের বিন মালিক ইমরাউল কায়েস বিন মালিক আগার বিন ছা'লাবা বিন কা'ব বিন খাজরাজ বিন হারিছ বিন খাজরাজ আকবার।

নিজের খান্দান আগার-এর সরদার এবং অত্যন্ত নেক স্বভাবের মানুষ ছিলেন। নবীর (সা) হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে মক্কা গিয়ে লাইলাতুল উকবায় রহমতে দো আলমের (সা) হাতে বাইয়াত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) হিজরত করে মদীনা তাশরীফ আনলেন। এ সময় তিনি হযরত খারিজার (রা) বাড়ীতেই অবস্থান করেছিলেন। [অন্য এক বর্ণনায় তাঁর মেযবানের নাম খুবাইব (রা) বিন আসাফ বলা হয়] কয়েক মাস পর হুজুর (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক কায়েম করলেন। এ সময় হযরত খারিজাকে (রা) হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) ইসলামী ভাই বানালেন। তিনি নিজের কন্যা হাবিবাহকে (রা) হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত হাবিবাহর (রা) গর্ভে সিদ্দীকে আকবারের (রা) কন্যা উম্মে কুলসুম জন্মগ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় হিজরীতে হযরত খারিজাহ (রা) "বদরের সাহাবীদের" অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। এই যুদ্ধে তিনি মশহুর মুশরিক উমাইয়া বিন খালফকে অন্য কতিপয় সাহাবীর (সা) সঙ্গে মিলে হত্যা করেন। তৃতীয় হিজরীতে ওহোদের যুদ্ধে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নিয়ে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেছিলেন। আঘাতের পর আঘাত খেয়েও পিছ পা হননি। সারা শরীর যখন বল্লমের আঘাতে ছিদ্র হয়েগিয়েছিল তখন মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন। বদরের যুদ্ধে নিহত উমাইয়া বিন খালফের পুত্র সাফওয়ান তাঁকে চিনে ফেলে এবং পিতার হত্যার বদলা নেয়ার জন্য ঠোঁট, কান, নাক ও অন্যান্য অঙ্গ কেটে নেয়। হযরত খারিজার (রা) ভাতিজা হযরত সায়াদ (রা) বিন রাবি-ও এই যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। হুজুর (সা) চাচা-ভাতিজা উভয়কেই একই কবরে দাফন করান।

হযরত খারিজাহ (রা) এক কন্যা হাবিবাহ (রা) এবং এক পুত্র যায়েদ (রা)-কে রেখে গিয়েছিলেন। যায়েদ (রা) হযরত ওসমানের খিলাফতকালে ওফাত পান।

অন্য কতিপয় বর্ণনায় তাঁর আরেক পুত্র সায়াদের (রা) নামও পাওয়া যায়। তিনি ওহোদের যুদ্ধে পিতার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন।

হযরত খারিজাহ (রা) বিন যায়েদ জালিলুল কদর সাহাবীদের (রা) মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন।

হযরত ইতবান (রা) বিন মালিক আনসারী

বদরের যুদ্ধের (দ্বিতীয় হিজরীর পবিত্র রমযান মাস) কিছুদিন পরের কথা। একদিন একজন অন্ধ মানুষ বিশ্বনবীর (সা) পবিত্র খিদমতে হাজির হলেন। এই ব্যক্তি যদিও চোখের আলো থেকে বঞ্চিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর কপাল সৌভাগ্যের আলোয় ঝলমল করছিল। তিনি রাসূলের (সা) দরবারে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। আপনি প্রত্যক্ষ করছেন যে, আমি অন্ধ এবং মাজুর। এই অবস্থায় আমি কি নিজের বাড়ীতে নামায পড়তে পারি ?"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "তোমার কানে কি আযানের আওয়াজ পৌঁছে ?"

তিনি আরজ করলেন ঃ "হাঁ, আল্লাহর রাসূল, পৌঁছে।"

ইরশাদ হলো ঃ "তাহলে তুমি মসজিদে এসে নামায পড়ো।"

এই ব্যক্তি নবীর (সা) ফরমানকে জীবনের মন্ত্র বানিয়ে নিলেন এবং সারা জীবন মসজিদে এসে পাঞ্জেগানা নামায আদায় করতেন। রাসূলের (সা) এই সাহাবী অন্ধ এবং মাজুর হওয়া সত্ত্বেও যার নবীর (সা) ফরমানের প্রতি এত সমীহ ছিল—তিনি ছিলেন হযরত ইতবান (রা) বিন মালিক আনসারী।

সাইয়েদেনা হযরত ইতবান (রা) বিন মালিকের সম্পর্ক খাজরাজের বনু সালিম বংশের সঙ্গে ছিল। নসবনামা হলো ঃ

ইতবান (রা) বিন মালিক বিন আমর বিন আজলান বিন যায়েদ বিন গানাম বিন সালিম বিন আমর বিন আওফ বিন খাজরাজ।

হযরত ইতবান (রা) নিজের কবিলার সরদার এবং অত্যন্ত সুন্দর স্বভাবের মানুষ ছিলেন। বিশ্বনবী (সা) তখনও মদীনায় শুভ পদার্পণ করেননি। এই অবস্থায় তিনি তাওহীদের আহ্বান শুনতে পেলেন। তিনি নিশ্চিন্তে তাতে সাড়া দিলেন এবং আনসারদের সাবিকুনাল আউয়ালুনদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে গেলেন। হুজুর (সা) যখন মক্কা থেকে মদীনা তাশরীফ নিলেন তখন তাঁকে উষ্ণ সম্বর্ধনা প্রদানকারীদের মধ্যে হযরত ইতবান (রা) বিন মালিকও শামিল ছিলেন। হুজুর (সা) কয়েকদিন কুবাতে অবস্থানের পর সোজা মদীনার দিকে রওয়ান দিলেন। এ সময় পথিমধ্যে বনু সালিমের মহল্লা পড়লো। হযরত ইতবান (রা) বিন মালিক এবং হযরত আব্বাস (রা) বিন উবাদাহ বনু সালিমের নেতাদের মধ্যে ছিলেন। তাঁরা উভয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে মহানবীকে (সা) আহলান-সাহলান অর্থাৎ সুস্বাগতম জানান এবং অবস্থানের জন্য স্বস্ব

বাড়ী পেশ করলেন। কিন্তু এই সৌভাগ্য হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর (রা) ভাগ্যে লিখা ছিল। এ জন্য হুজুর (সা) তাদেরকে দোয়া দিতে দিতে সামনে অগ্রসর হয়ে গেলেন।

হিজরতের কয়েক মাস পরে রহমতে আলম (সা) মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব কায়েম করলেন। এ সময় হযরত ইতবান (রা) বিন মালিককে সাইয়েদেনা হযরত ওমর ফারুকের (রা) দ্বীনি ভাই বানালেন। এই উভয় ভাইয়ের মধ্যে আজীবন নিষ্ঠা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজমান ছিল।

দ্বিতীয় হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে হক এবং বাতিলের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ বদরের ময়দানে সংঘটিত হয়। হযরত ইতবান (রা) বিন মালিক তাতে খুব উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নেন এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

বদরের যুদ্ধের পর হযরত ইতবান (রা)-এর চোখ খারাপ হওয়া শুরু হলো। কিছুদিন পর তিনি অন্ধই হয়ে গেলেন। এজন্য বদরের পর সংঘটিত যুদ্ধসমূহে অংশ নিতে পারেননি।

হযরত ইতবান (রা) নবীর (সা) দরবারে নৈকট্যলাভ করেছিলেন এবং বিশ্বনবী (সা) তাঁকে বনু সালিমের মসজিদের ইমাম নিয়োগ করেছিলেন। সহীহ মুসলিমে আছে, হুজুর (সা) ইমাম নির্বাচনের লক্ষ্যে এই নীতিমালা ঠিক করেছিলেন ঃ

(ক) যিনি সবচেয়ে বেশী আল্লাহর কালাম পড়েছেন—যদি তাতে সকলেই সমান সমান হন তাহলে—

(খ) যিনি সবচেয়ে বেশী সুন্নাত সম্পর্কে ওয়াকিফ—যদি তাতেও সমান সমান হন তাহলে—

(গ) যিনি প্রথম হিজরত করেছেন—যদি তাতেও সকলে সমান সমান হন তাহলে—

(ঘ) যার বয়স সবচেয়ে বেশী হবে।

হুজুর (সা) হযরত ইতবানকে (রা) ইমামতের জন্য নির্বাচন করাটা নিসন্দেহে তাঁর মহান মর্যাদারই প্রমাণ বহন করে।

মহানবীর (সা) ফয়েজ থেকে মহিমান্বিত হওয়ার আকাংখা ছিল হযরত ইতবানের (রা) তীব্র, বস্তুত তাঁর বাড়ী মহানবীর (সা) আবাসস্থল ও মসজিদে নববী থেকে দু'তিন মাইল দূরে ছিল এবং প্রতিদিন যাতায়াতে খুব কষ্ট হতো। এ জন্য তিনি নিজের দ্বীনি ভাই হযরত ওমর ফারুকের (রা) সঙ্গে পালাক্রমে

হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সুতরাং একদিন হযরত ওমর ফারুক (রা) সারাদিন রাসূলের (সা) দরবারে হাজির থাকতেন এবং ওহীর আহকাম ও নবীর (সা) ইরশাদসমূহ শুনতেন। সন্ধ্যাকালে এ সকল আয়াতে কুরআন এবং হাদীসসমূহ হযরত ইতবানের (রা) নিকট পৌছে দিতেন। পরের দিন হযরত ইতবান (রা) নবীর (সা) দরবারে হাজির হতেন এবং নিজের আঁচল কুরআন-হাদীসের মনিমুক্তায় পূর্ণ করে নিয়ে যেতেন এবং হযরত ওমর ফারুকের (রা) নিকট পৌছে দিতেন।

সহীহ বুখারীতে আছে, হযরত ইতবান (রা)-এর বাড়ী এবং মসজিদের মধ্যে একটি নিম্নভূমি ছিল। বৃষ্টি হলে সকল পানি সেখানে জমা হয়ে যেত। চোখ খারাপ হওয়ার কারণে হযরত ইতবানের (রা) পক্ষে সেই পানি অতিক্রম করে মসজিদে পৌছা অত্যন্ত কঠিন ছিল। এ জন্য তিনি এই পরিস্থিতিতে বাড়ীতেই নামায পড়ে নিতেন। একদিন তিনি প্রিয় নবীর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! বৃষ্টি হলে মসজিদ ও আমার বাড়ীর মধ্যবর্তী স্থানে গভীর পানি দাঁড়িয়ে যায়। আমার দৃষ্টিশক্তি সেই পানি অতিক্রম করে আমাকে মসজিদে পর্যন্ত পৌছার অনুমতি দেয় না। এ জন্য বাধ্য হয়ে এই অবস্থায় ঘরে নামায পড়ে নেই। যদি কোনদিন হুজুর (সা) আমার বাড়ী পৌছে নামায পড়িয়ে দেন, তাহলে সেই স্থানে সিজদার স্থল বানিয়ে নিতে পারি।"

হুজুর (সা) বললেন, "খুব ভালো কথা, আমি আসবো।"

পরবর্তী দিন বিশ্বনবী (সা) হযরত আবু বকর সিদ্দীককে (রা) সঙ্গে নিয়ে হযরত ইতবানের (রা) বাড়ী তাশরীফ নিলেন এবং তিনি কোথায় নামায পড়তে চান তা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বৃষ্টির দিনে যেখানে সবসময় নামায পড়েন সেই স্থানের কথা বললেন। হুজুর (সা) সেখানেই দু' রাকায়াত নামায আদায় করলেন। তারপর কিছুক্ষণ সেখানে কাটালেন। হযরত ইতবান (রা) হুজুরের (সা) খিদমতে ভুনা গোশত পেশ করলেন। তিনি (সা) হযরত আবু বকরকে (রা) সঙ্গে নিয়ে তা খেলেন এবং ফিরে এলেন।

এই ঘটনার পর হযরত ইতবান (রা) অন্ধত্বের ওজরে হুজুরের (সা) নিকট বাড়ীতে নামায পড়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু হুজুর (সা) তাঁর দরখাস্ত অনুমোদন করলেন না। কারণ, তাঁর কানে আযানের আওয়াজ পৌছতো।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে, খাদেমে রাসূল (সা) হযরত আনাস (রা) বিন মালিক হযরত ইতবানের (রা) এই ঘটনা সম্পর্কিত হাদীসকে

হাদীসের খনির অন্যতম হাদীস হিসেবে গণ্য করতেন এবং নিজের পুত্র আবু বকরকে (রা) এই হাদীস স্মরণ রাখার জন্য তাকিদ দিতেন।

হযরত ইতবান (রা) শেষ বয়স পর্যন্ত মসজিদে বনু সালিমের ইমামতি করেছিলেন। সহীহ বুখারীতে মাহমুদ বিন রাবি (রা) থেকে বর্ণিত আছে (আমীর মুয়াবিয়ার শাসনকালে ৫২ হিজরীতে) যে, আমি কামতানতুনিয়া যুদ্ধ থেকে ফারেগ হয়ে মদীনা এসে হযরত ইতবানের (রা) খিদমতে হাজির হলাম। সে সময় তিনি বার্ধক্যজনিত কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। অন্ধ ছিলেন এবং নিজের মসজিদে ইমামতি করতেন।

হযরত ইতবান (রা) ৫২ হিজরীর পরই কোন এক সময় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

হযরত ইতবান (রা) বিন মালিক মর্যাদাবান সাহাবীদের (রা) মধ্যে পরিগণিত হতেন। তাঁর থেকে বর্ণিত অনেক হাদীস সহীহহাইন, মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল এবং মুসনাদে আবু দাউদে রয়েছে। তাঁর হাদীস বর্ণনা-কারীদের মধ্যে হযরত আনাস (রা) বিন মালিক, আবু বকর (রা) বিন আনাস (রা) এবং মাহমুদ বিন রাবি (র)-এর মত সম্মানিত ব্যক্তি উল্লেখযোগ্য।

তাঁর পরিবার-পরিজন সম্পর্কে চরিত গ্রন্থে কিছু পাওয়া যায় না।

হযরত হাব্বাব (রা) বিন মানযার আনসারী

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে রহমতে আলম (সা) বদরের যুদ্ধে তাশরীফ নিলেন এবং বদরের সন্নিকটে এক স্থানে তাঁবু ফেললেন। এ সময় এক আনসারী জাননিছার আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! এই স্থানে তাঁবু ফেলার নির্দেশ কি আল্লাহ পাক দিয়েছেন ; না, এটা আপনার ব্যক্তিগত মত।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "এটা আমার ব্যক্তিগত মত।"

তিনি আরজ করলেন ঃ আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক, এটাই কি উত্তম হবে না যে, আমরা পানির পাশে তাঁবু ফেলবো এবং সকল কূপ দখল করে একটি হাউজ বানিয়ে নিব। এভাবে আমাদের বাহিনী আসানির সঙ্গে পানি পাবে এবং দুশমনরা পানির কমতিতে পেরেশান হয়ে পড়বে।

হুজুর (সা) অন্যান্য সাহাবাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "এই ব্যক্তি ঠিক বলেছেন (এই কর্মপদ্ধতিই উত্তম)।"

সুতরাং তিনি (সা) নিজের জাননিছারদের সঙ্গে বদরের কূপের পাশে তাঁবু ফেললেন।

রাসূলের (সা) এই সাহাবী (রা) যার সঠিক মতের স্বীকৃতি মহানবী (সা) প্রদান করেছেন—তিনি ছিলেন হযরত হাব্বাব (রা) বিন মানযার আনসারী। তাঁর নসবনামা হলো ঃ

হযরত আবু ওমর হাব্বাব (রা) বিন মানযার বিন জামুহ বিন যায়েদ বিন হারাম বিন কা'ব বিন গানাম বিন কা'ব বিন সালমাহ। তাঁর সম্পর্ক ছিল খাজরাজের সালমাহ খান্দানের সঙ্গে।

হযরত হাব্বাবের (রা) চাচা আমর বিন জামুহ বনু সালমার সরদার এবং বংশীয় মূর্তির মুতাওয়াল্লী ছিলেন। কিন্তু ভাতিজা ছিলেন ভাগ্যবান। তিনি নবীর হিজরতের পূর্বেই মূর্তিপূজা সম্পর্কে তিন বাক্য লিখে পাঠিয়ে ঈমানের সম্পদে প্রাচুর্যবান হয়ে গিয়েছিলেন।

রহমতে আলম (সা) মদীনা মুনাওয়ারায় শুভ পদার্পণ করলে হযরত হাব্বাব (রা) নিজের জীবন হকের সহযোগিতা ও দোজাহানের নবীর (সা) সাহায্যের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। যুদ্ধসমূহ শুরু হলে তিনি বদর থেকে তাবুক পর্যন্ত সকল যুদ্ধে রহমতে আলমের (সা) সঙ্গী হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। তিনি অত্যন্ত মেধা সম্পন্ন এবং সঠিক রায়ের অধিকারী ছিলেন। বদরের যুদ্ধে তাঁর পরামর্শেই রাসূলে করীম (সা) বদরের কূপের পাশে তাঁবু

ফেলেছিলেন। ওহোদের যুদ্ধে মক্কায় কুরাইশদের আসার খবর ছড়িয়ে পড়লে হুজুর (সা) নিজের দু'জন জাননিছার সাহাবী (রা)-কে গোয়েন্দাগিরীর জন্য প্রেরণ করলেন। তারপর হযরত হাব্বাব (রা) বিন মানযারকে রওয়ানা করালেন। ইবনে আছির (রা) বর্ণনা করেছেন, হযরত হাব্বাব (রা) নিজের দায়িত্ব সুন্দরভাবে আনজাম দেন এবং দুশমনের সংখ্যা অস্ত্র-শস্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে কার্যকর তথ্য রাসূলের (সা) নিকট পৌঁছান। কতিপয় বর্ণনায় আছে যে, এই যুদ্ধে (সকল) খাজরাজ (অথবা তার একাংশ)-এর ঝাণ্ডা হযরত হাব্বাবের (রা) নিকট ছিল। এমনিভাবে খায়বারের ও হুনাইনের যুদ্ধেও তিনি খাজরাজের ঝাণ্ডাবাহী ছিলেন।

একাদশ হিজরীতে বিশ্বনবী (সা) ওফাত পেলেন এবং সাকিফায়ে বনু সায়েদাতে খিলাফত প্রশ্ন আলোচনায় এলো। এ সময় তিনি সাইয়েদুল খাজরাজ হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাকে খলিফাহ বানানোর প্রস্তাব সমর্থন করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি দু'টি জোরালো ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে আনসারদের ফযিলত বর্ণনা এবং খেলাফতে তাদের হক প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালান। এক ভাষণে তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন ঃ

"আমি কওমের বিশ্বস্ত মানুষ এবং লোকজন আমার রায়ে উপকৃত হয়ে থাকেন।"

তাঁর কথায় মনে হয়, তিনি আনসারদের মধ্যে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদাবান ছিলেন। তাঁর জোরালো ভাষণসমূহের পরও মুহাজিররা যখন তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না তখন তিনি দুই খলিফা হওয়ায় প্রস্তাব পেশ করেন। দুই খলিফার একজন হবেন মুহাজির এবং অপরজন আনসার। হযরত ওমর ফারুক (রা) এই প্রস্তাবও অসম্ভব বলে নাকচ করে দিলেন। হযরত হাব্বাব (রা) এই সময় যা কিছুই বলেছিলেন তা নেক নিয়তের ভিত্তিতেই বলেছিলেন এবং তাতে কারো ব্যক্তি স্বার্থ জড়িত ছিল না। সুতরাং সাধারণ মুসলমানরা যখন হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) বাইয়াত করলেন তখন তিনিও সকলের অনুসরণ করলেন।

হযরত হাব্বাব (রা) ১৯ হিজরীতে ওফাত পান। তখন তাঁর বয়স ছিল ৫০ বছর।

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়, হযরত হাব্বাব (রা) অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন এবং শুধুমাত্র একজন সুবক্তাই ছিলেন না, বরং কাব্য ও কবিতাতেও ব্যুৎপত্তি রাখতেন। তিনি হাদীসও বর্ণনা করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা হলো, তিনি একজন সত্যিকার আশেকে রাসূল (সা) ছিলেন এবং বাতিলের বিরুদ্ধে মোকাবিলার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন।

হযরত জালবিব (রা) আনসারী

কতিপয় বর্ণনায় তাঁর নাম "জালইয়াবিব" হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে। নসবনামা ও বংশের পরিচয় জানা যায়নি। কিন্তু নেতৃস্থানীয় চরিতকারদের নিকট এটা স্বীকৃত যে, তিনি মদীনার বাসিন্দা এবং আনসারের কোন কবিলার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। যদিও তিনি ছিলেন বেঁটে আকৃতির মানুষ ; তবুও অন্তরের পবিত্রতা, নেক নিয়ত, বীরত্ব, দ্বীনের প্রতি একাগ্রতা ও নিষ্ঠা এবং রাসূল (সা) প্রেমের দিক থেকে উদাহরণ তুল্য ছিলেন। এ জন্য রাসূলে করীমের (সা) অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। মুসনাদে আহমদ (র) বিন হাম্বলে হযরত আবু বুরযাহ আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, জালবিবের (রা) প্রকৃতিতে কৌতুক প্রিয়তা ছিল। এমনকি তিনি মহিলাদের সঙ্গেও কৌতুক করতেন। যা অনেকেই পসন্দ করতেন না। তা সত্ত্বেও হুজুর (সা) তার সচ্চরিত্রের প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখতেন এবং তিনি তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। আনসারদের রীতি ছিল, তাদের কোন মহিলা বিধবা হয়ে গেলে প্রিয় নবীর (সা) নিকট জিজ্ঞেস না করে তার দ্বিতীয় বিয়ে দিতেন না। একবার হুজুর (সা) এক আনসারীকে বললেন ঃ "তোমার বিধবা কন্যার বিয়ে আমাকে করতে দাও।" তিনি আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! এটাতো বিরাট মর্যাদার ব্যাপার।" হুজুর (সা) বললেন ঃ "আমি স্বয়ং তাকে বিয়ের ইচ্ছা পোষণ করি না।" আনসারী আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! তাহলে আপনি কার সঙ্গে আমার কন্যার সম্পর্ক করতে চান ?"

হুজুর (সা) বললেন, "জালবিবের সাথে।"

আনসারী আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল ! আমি আমার স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করতে চাই।" হুজুর (সা) বললেন ঃ "তাতে দোষের কিছু নেই।"

আনসারী নিজের স্ত্রীর সঙ্গে এ ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। স্ত্রী একদিকে হযরত জালবিবের (রা) সুন্দর চেহারা না থাকা এবং অন্যদিকে তার কৌতুক প্রিয়তার জন্য আত্মীয়তার সম্পর্ক করতে দ্বিধাগ্রস্ত হলেন। কন্যাটি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন এবং মুখলিস মু'মিনা। সে যখন একথা জানতে পারলো তখন পিতা-মাতাকে এই নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিলেন, "যখন আল্লাহ এবং রাসূল (সা) কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে দেন তখন কোন মুসলমানের তাতে চুঁ-চারা করার সুযোগ নেই।" তারপর বললেন, "আপনারা রাসূলের (সা) ইরশাদ বা নির্দেশ বাতিল করতে চান, এটা কখনো হতে পারে না। আপনারা আমাকে হুজুরের (সা) হাওয়ালা করে দিন। তিনি আমাকে কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হতে

দেবেন না। আমার ইচ্ছা হুজুরের (সা) ইচ্ছার অনুগত এবং আমি মহানবীর (সা) ইরশাদ বা নির্দেশ সর্বাবস্থায় মেনে থাকি।"

কন্যার পিতা রাসূলের (সা) দরবারে হাজির হয়ে সমগ্র ঘটনা বর্ণনা করলেন। হুজুর (সা) তা শুনে কন্যার আচরণে খুব খুশী হয়ে এই দোয়া করলেন ঃ

"হে আল্লাহ ! এই মেয়ের উপর কল্যাণ বর্ষণ কর এবং তার জীবনকে পংকিল করো না।"

অতপর তিনি হযরত জালবিবকে (রা) বললেন, অমুক মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিলাম।

তিনি আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। আপনি আমার মধ্যে খুঁত পাবেন।"

হুজুর (সা) বললেন, "না। আল্লাহর নিকট তোমার মধ্যে খুঁত নেই।"

তারপর তিনি সেই মেয়ের সঙ্গে হযরত জালবিবের (রা) নিকাহ দিয়ে দিলেন। হুজুরের (সা) দোয়ার আছরে আল্লাহ তায়ালা তাদের পারিবারিক জীবনকে জান্নাত বানিয়ে দিলেন এবং তারা সচ্ছল হয়ে গেলেন। চরিতকাররা লিখেছেন, আনসারদের মধ্যে কোন মহিলা সেই মহিলার তুলনায় উদার হাতে ব্যয়কারী ছিলেন না।

হযরত আবু বুরদাহ (রা) বলেন, বিশ্বনবী (সা) এক যুদ্ধে তাশরীফ নিলেন (চরিত গ্রন্থসমূহে সেই যুদ্ধের বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি)। হযরত জালবিবও (রা) হুজুরের (সা) সাথে ছিলেন। আল্লাহ পাক যখন মহানবীকে (সা) বিজয় দিলেন এবং গনীমাতের মাল তাঁর (সা) সামনে পেশ করা হলো তখন তিনি (সা) সাহাবাদেরকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "আমাদের কোন্ কোন্ ব্যক্তি লাপাত্তা রয়েছে ?"

সাহাবারা (রা) কতিপয় ব্যক্তির নাম বললেন। হুজুর (সা) দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বার একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। সাহাবারা (রা) কতিপয় ব্যক্তির নাম বলতেন। জালবিবের (রা) প্রতি কারোর খেয়ালই গেল না। তখন হুজুর (সা) বললেন ঃ "আমিতো জালবিবকে (রা) দেখছি না।"

সাহাবায়ে কিরাম (রা) নবীর (সা) ইরশাদ শুনে চমকে উঠলেন এবং তৎক্ষণাৎ হযরত জালবিবের (রা) খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। কিছুদূর গিয়ে দেখলেন নিহত সাতজন মুশরিকের লাশ পড়ে আছে এবং তার নিকটেই জালবিবের (রা) দেহও রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। হুজুর (সা) এই খবর

পেয়ে স্বয়ং সেখানে তাশরীফ নিলেন। এই আশ্চর্য দৃশ্য দেখে খুবই প্রভাবিত হলেন। হযরত জালবিবের (রা) পবিত্র দেহের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ

قَتَلَ سَبعَةً ثُمَّ قَتَلُوه هذَا مِنِّى وَاَنَا مِنهُ ! هذَا مِنِّى وَاَنَا مِنهُ

"সাতজনকে হত্যা করে নিহত হয়েছে। সে আমার থেকে এবং আমি তার থেকে। সে আমার থেকে এবং আমি তার থেকে।"

সহীহ মুসলিমে আছে, তারপর সাইয়েদুল মুরসালিন (সা) হযরত জালবিবের (রা) পবিত্র দেহ নিজের হাতে উঠালেন এবং কবর খুড়ে নিজের পবিত্র হাত দিয়ে তা দাফন করলেন। এই মাইয়্যেতকে তিনি গোসল দেননি।

হক পথের যে শহীদের জন্য রহমতে দোআলম (সা) বার বার বলেছেন, "সে আমার থেকে এবং আমি তার থেকে" এবং যার দেহ ছাকিয়ে কাওসার (সা) নিজের পবিত্র হাত দিয়ে উঠিয়ে শাহাদাত স্থল থেকে কবর পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন—তাঁর উচ্চ মর্যাদার আন্দাজ কে করতে পারে ?

হযরত সালমাহ (রা) বিন সালামাহ আনসারী

আওসের সম্ভ্রান্ত বংশ "বনু আবদুল আশহালের" সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ সালমাহ (রা) বিন সালামাহ বিন ওয়াকশ বিন যাগবাতাহ বিন যাওরা বিন আবদুল আশহাল। ডাক নাম ছিল আবু আওফ। মাতার নাম ছিল সালমা বিনতে সালমাহ বিন খালিদ বিন আদি। তিনি ছিলেন আওসের বনু হারিছা বংশোদ্ভূত এবং মহিলা সাহাবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

আল্লাহ তায়ালা হযরত সালমাহকে (রা) সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। তিনি মহানবীর (সা) হিজরতের পূর্বে পূর্ণ যৌবনকালে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরের পর মক্কা গিয়ে উকবায়ে কবিরাতে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন। নিজের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে স্বয়ং হযরত সালমাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি সাবালগ হতে যাচ্ছিলাম। এ সময় একবার স্বগোত্র আবদুল আশহালের কতিপয় লোকের মধ্যে বসেছিলাম। সেখানে একজন ইহুদী আলেমের আগমন ঘটলো। সে আমাদের সামনে কিয়ামত, হিসাব, মিযান এবং জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা শুরু করলো এবং বলতে লাগলো যে, মুশরিক ও মূর্তিপূজকদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারা ভালো ও মন্দ কাজের প্রতিদান পাবে। ইহুদী আলেম বললো, হাঁ, এই হলো আমার আকীদা এবং এই আকীদা সঠিক। তারা জিজ্ঞেস করলো, কিয়ামতের আলামত কি কি ? সে মক্কা এবং ইয়েমেনের দিকে ইশারা করে বললো, ঐ শহরের দিকে শেষ নবীর জন্ম হবে।

তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তার আগমন কবে ঘটবে ?

ইহুদী আলেম আমার দিকে ইঙ্গিত করে বললো, যদি এই বালক জীবিত থাকে তাহলে সে এই নবীকে দেখতে পাবে।

হযরত সালমাহ (রা) বলেন, একথা শুনে আমি মোহিনী শক্তিতে আবদ্ধ হয়ে পড়লাম এবং সেই ঘটনার কয়েক বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই মহানবীর (সা) প্রকাশ ঘটলো। যেই আমরা তাঁর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির খবর শুনলাম, তখনি ঈমান আনলাম। সেই ইহুদী আলেম তখনো জীবিত ছিল। কিন্তু শত্রুতার কারণে ইসলাম গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হলো। আমরা তাকে বললাম, তুমিইতো আমাদেরকে শেষ নবীর (সা) আবির্ভাবের খবর শুনাতে। আর এখন তুমিই তাঁকে অস্বীকার করছো। সে বললো যে, এ সেই নবী নন, যার কথা আমি বলতাম। শেষে সেই হতভাগা কুফুরী অবস্থাতেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়।—(সিরাতে ইবনে হিশাম)

হিজরতের পাঁচ মাস পর বিশ্বনবী (সা) হযরত আনাসের (রা) বাড়ীতে আনসার ও মুহাজিরদের এক সমাবেশ ডাকলেন এবং তাতে ভ্রাতৃত্ব কায়েম করলেন। এ সময় তিনি (সা) হযরত সালমাহ (রা)-কে নিজের ফুফাতো ভাই এবং জালিলুল কদর মুহাজির সাহাবী হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়ামের দ্বীনী ভাই বানালেন।

হযরত সালমাহ (রা) অত্যন্ত সাহসী মানুষ ছিলেন এবং বিশ্বনবীকে (সা) খুব ভালোবাসতেন। যুদ্ধসমূহ শুরু হলে তিনি বদর থেকে শুরু করে তাবুক পর্যন্ত প্রত্যেকটি যুদ্ধে হুজুরের (সা) সফর সঙ্গী হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং প্রত্যেক যুদ্ধেই বীরত্বের নিপুণতা প্রদর্শন করেছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) "ইসাবাতে" বর্ণনা করেছেন, বনু মুসতালিকের যুদ্ধে মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বিশ্বনবীর (সা) ও মুহাজিরদের শানে বেআদবীমূলক বাক্য উচ্চারণ করেছিল। এ সময় হযরত ওমর ফারুক (রা) হুজুরের (সা) খিদমতে সালমাহকে আবদুল্লাহর মাথা কেটে আনার জন্য প্রেরণের অনুরোধ করলেন। কিন্তু হুজুর (সা) ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে তা দেখলেন।

হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত সালমাহকে (রা) খুব মান্য করতেন। তিনি নিজের খিলাফতকালে হযরত সালমাহকে (রা) ইয়ামামার গবর্নর নিযুক্ত করেছিলেন।

হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের (রা) খিলাফতকালে ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে হযরত সালমাহ (রা) নির্জনত্ব বেছে নিলেন এবং সারাক্ষণ আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল হয়ে গেলেন। তিনি ৭৪ বছর বয়সে ৪৫ হিজরীতে মদীনায় ইন্তেকাল করেন।

হযরত সালমাহর (রা) কতিপয় বর্ণনা হাদীস গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত সালমাহর (রা) নিকট রান্না করা (অথবা এমন বস্তু আগুন যার রঙ পরিবর্তন করে দিয়েছে) খাবার খেলে ওজু প্রয়োজন হবে। একবার কারো ওয়ালিমার দাওয়াতে তাশরীফ নিলেন এবং খাবার খেয়ে ওজু করলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আপনি তো খাওয়ার পূর্বে ওজু করেছিলেন, এখন আবার কেন? তিনি বললেন, রাসূলের (সা) জীবনেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছিল এবং তিনিও করেছিলেন।

হযরত হানজালা (রা) বিন আবি আমের আনসারী

মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাইর ভগ্নিপতি আবু আমের যদিও একজন ভালো মানুষ ছিলো এবং হকের সন্ধানে নির্জনত্ব বেছে নিয়েছিল ; কিন্তু ইসলামের সূর্য যখন ফারান পাহাড়ে উদিত হলো এবং মদীনা মুনাওয়ারার অলি-গলি সাইয়েদুল মুরসালিনের (সা) শুভাগমনে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠলো তখন আবু আমেরের মস্তিষ্কের ওপর পাথর চাপা দিল। সে ইসলাম ও দায়িয়ে ইসলামের (সা) শত্রুতাকে জীবনের একমাত্র মন্ত্র বানিয়ে নিল। আল্লাহর শান, সেই আবু আমেরের পুত্রকে আল্লাহ তায়ালা অন্তর্দৃষ্টি দান করেছিলেন। তিনি নিশ্চিন্তে হকের দাওয়াতে সাড়া দিলেন এবং রহমতে আলমের (সা) জাননিছারদের দলভুক্ত হয়ে গেলেন। তার পিতার ইসলাম দুশমনি যখন চরম সীমায় পৌছলো তখন তার ঈমানী মর্যাদাবোধ আর ধরে রাখতে পারলেন না। একদিন রাসূলের (সা) নিকট হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! অনুমতি দিলে নিজের পিতার মাথা কেটে আনতে পারি।"

রহমতে আলম (সা) বললেন ঃ "না, আমরা তার সঙ্গে অসদাচরণ করবো না।"

আবি আমেরের এই ভাগ্যবান পুত্র যিনি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের (সা) জন্য নিজের দুশমন পিতাকে খতম করে দেয়ার জন্য তৈরী হয়ে গিয়েছিলেন—তিনি ছিলেন হযরত হানজালা (রা)। ইতিহাসে তিনি তাকি এবং "গাসিলুল মালায়িকা" লকবে মশহুর হয়েছিলেন।

হযরত হানজালার (রা) সম্পর্ক ছিল আওসের আমর বিন আওফ বংশের সঙ্গে। নসবনামা হলো ঃ

হানজালা (রা) বিন আবি আমের আমর বিন সাইফি বিন মালিক বিন উমাইয়া বিন দাবিয়াহ বিন যায়েদ বিন আওফ বিন আমর বিন আওফ বিন মালিক বিন আওস।

হানজালার (রা) পিতা আবি আমের গোত্রের অত্যন্ত সম্মানিত এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলো। সে তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবের আলেম এবং শেষ যমানার পয়গাম্বরের (সা) আগমনের প্রবক্তা ছিলেন এবং প্রায় সময়ই দ্বীনে হানিফের উল্লেখ করতো। এ ধরনের ধারণাই তাকে বস্তুবাদী দুনিয়া ত্যাগের দিকে ধাবিত করেছিলো। সে ক্যানভাস বা চটের পোশাক পরিধান করে

নির্জনত্ব গ্রহণ করেছিলো এবং দিন-রাত আধ্যাত্মিক সাধনায় মশগুল থাকতে লাগলো। জাহেলী যুগে মদীনাবাসীর নিকট সে একজন ধর্মীয় নেতার মর্যাদা রাখতো এবং তারা তাকে 'রাহিব' বা সন্যাসী উপাধিতে ডাকতো। এই রাহিব বা সন্যাসির দুর্ভাগ্য দেখুন, যখন (নবুওয়াতের একাদশ বছরে) মদীনায় ইসলামের দাওয়াতের চর্চা হলো তখন সে হকের আলোর প্রতি চোখ বন্ধ করে নিলো এবং ইসলাম সম্পর্কে আবোল-তাবোল বলতে লাগলো। বিশ্বনবী (সা) হিজরতের পর মদীনায় পদার্পণ করলেন। তখন আবু আমের হুজুরের (সা) উপর ঈমান আনার পরিবর্তে তাঁর সঙ্গে কঠোর শত্রুতা করতে লাগলো। সে লোকদেরকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে রাখা এবং হুজুরের (সা) বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদানে সব ধরনের চেষ্টাই করেছে। আল্লাহর শান ! এই হতভাগার পুত্রকে তিনি ঈমানের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন এবং এমন ঈমানী আবেগ প্রদান করেন যে, তিনি নিজের পিতাকে হত্যা করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। কিন্তু রহমতে আলম (সা) তাঁকে সেই কাজের অনুমতি দেননি। আবু আমের হিংসার জ্বালায় মদীনা অবস্থান ত্যাগ করে মক্কা চলে গেল এবং ওহোদের যুদ্ধে কুরাইশের মুশরিকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে হকপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এলো। হকের প্রতি এমনি দুশমনির জন্য হুজুর (সা) তাকে "ফাসিক" উপাধিদানের প্রস্তাব করেছিলেন। তারপর সে মক্কা ফিরে যায়। অষ্টম হিজরীতে মক্কার উপর ইসলামের পতাকা উড্ডীন হলে সে রোমের বাদশাহ হিরাক্লিয়াসের নিকট কাসতান তুনিয়া চলে গেল এবং নবম হিজরীতে সেখানেই মারা যায়। কথিত আছে যে, হিরাক্লিয়াস তার পরিত্যক্ত জিনিস-পত্র কিনানা বিন আবদি ইয়ালিল ছাকাফিকে দিয়ে দেয়।

হযরত হানজালা (রা) অত্যন্ত মুখলিস মুসলমান ছিলেন এবং নবীর (সা) দরবার থেকে 'তকি' খেতাব পেয়েছিলেন। বদরের যুদ্ধে কোন কারণে অংশ নিতে পারেননি। ওহোদের যুদ্ধের দিন স্ত্রীর সঙ্গে নির্জনে ছিলেন। এমন সময় আহ্ববানকারীর আওয়াজ কানে এলো। তিনি মুসলমানদেরকে জিহাদের ডাক দিচ্ছিলেন। তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন। গোসলের খেয়ালই রইলো না এবং সশস্ত্র হয়ে যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে পৌঁছলেন। সে সময় যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। যেতেই সামনে পড়লো কুরাইশের সিপাহসালার আবু সুফিয়ান (রা)। তিনি আবু সুফিয়ানের (রা) ঘোড়ার পা কেটে ফেললেন এবং তাঁকে নিজের তরবারীর সীমায় নিয়ে এলেন। এমন সময় শাদ্দাদ বিন আসওয়াদ লাইছি সামনে অগ্রসর হয়ে হানজালার (রা) উপর তরবারী দিয়ে এমন আঘাত হানলো যে, তিনি শহীদ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

যুদ্ধের পর বিশ্বনবী (সা) যুদ্ধের ময়দানের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ "হানজালাকে ফেরেশতারা গোসল দিচ্ছেন।"

হযরত আবু উসায়েদ সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে হানজালার (রা) লাশের নিকট গিয়ে দেখলাম যে, তাঁর মাথা থেকে ফোটায় ফোটায় পানি পড়ছে। আমি তৎক্ষণাৎ হুজুরের (সা) খিদমতে ফিরে এলাম এবং এই ঘটনা বর্ণনা করলাম। ইরশাদ হলো, তার স্ত্রীর নিকট জানবে যে কি ব্যাপার ছিল ? আবু উসায়েদ (রা) বলেন, আমরা যখন মদীনা ফিরে এলাম তখন হুজুর (সা) হযরত হানজালার (রা) স্ত্রীর নিকট কাউকে পাঠিয়ে জানলেন যে, হানজালা (রা) কোন্ অবস্থায় জিহাদের জন্য রওয়ানা হয়েছিলেন ? তিনি বলেন ঃ তাঁর গোসলের প্রয়োজন ছিল। হুজুর (সা) বলেন, এজন্য ফেরেশতারা তাঁকে গোসল দিচ্ছিলেন। সেই দিন থেকে তিনি "গাসিলুল মালায়িকা" উপাধিতে মশহুর হয়ে গেলেন।

হযরত হানজালা শাহাদাতের সময় সাত বছর বয়সী একটি পুত্র রেখে যান। তাঁর নাম ছিল আবদুল্লাহ। তিনি হিররার ঘটনার (৬৩ হিজরী) সময় নিজের পুত্রদের সঙ্গে শহীদ হন।

আওস গোত্রের জন্য হযরত হানজালার (রা) ব্যক্তিত্ব চিরকালীন গৌরবের বস্তু হয়ে গেল। কতিপয় চরিতকার লিখেছেন, একবার আওস ও খাজরাজীরা স্বস্ব মর্যাদা বর্ণনা করছিলো। উভয় পক্ষই সে সময় স্বস্ব জালিলুল কদর সাহাবীর নাম পেশ করলো। আওস বংশোদ্ভূতরা যেসব সাহাবীর নাম নিলেন তাদের এক নম্বরে ছিলো হযরত হানজালার (রা) নাম।

হযরত মুনযির (রা) বিন আমর আনসারী

খাজরাজ গোত্রের সায়েদাহ বংশের চোখের মনি ছিলেন। নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

মুনযির (রা) বিন আমর বিন খানিস বিন হারিছাহ বিন লওজান বিন আবদুদ বিন যায়েদ বিন ছা'লাবা খাজরাজ বিন সায়েদাহ বিন কা'ব বিন খাজরাজুল আকবার।

হযরত মুনযির (রা) বিন আমর অত্যন্ত মহান মর্যাদাবান সাহাবীদের (রা) মধ্যে পরিগণিত হতেন। তিনি আনসারের সেই কতিপয় লোকের মধ্যে ছিলেন যারা জাহেলী যুগে আরবী ভাষা লিখতে-পড়তে পারতেন। আল্লাহ পাক তাঁকে সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। নবীর (সা) হিজরতের পূর্বে তাওহীদের দাওয়াতের আওয়াজ কানে পৌছতেই তৎক্ষণাৎ তাতে সাড়া দেন। নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছর পর মক্কা গিয়ে বাইয়াতে উকবায়ে কবিরায় অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। বাইয়াতের পর বিশ্বনবী (সা) বাইয়াতে অংশগ্রহণকারীদেরকে নিজেদের মধ্য থেকে ১২জন নকীব নির্বাচনের নির্দেশ দিলেন। তাঁরা খাজরাজ থেকে ৯জন এবং আওস থেকে ৩জন নকীব নির্বাচিত করলেন। খাজরাজী নকীবদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত মুনযির (রা) বিন আমর।

হিজরতের পর প্রিয় নবী (সা) মদীনা তাশরীফ আনলেন। এ সময় তাঁকে সম্বর্ধনা দানকারীদের মধ্যে হযরত মুনযির (রা) বিন আমরও শামিল ছিলেন। এটা পৃথক কথা যে, বিশ্বনবীর (সা) মেযবানীর মহান মর্যাদা পেয়েছিলেন হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা)।

কয়েক মাস পর হুজুর (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক কায়েম করেন। এ সময় হযরত মুনযিরকে (রা) নিজের ফুফাতো ভাই তালিব (রা) বিন উমায়েরের ইসলামী ভাই বানান [তিনি হুজুরের (সা) ফুফু আরদা বিনতে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র ছিলেন।] অন্য এক বর্ণনা মতে হুজুর (সা) তাঁকে হযরত আবু যর গিফারীর (রা) ইসলামী ভাই বানিয়ে ছিলেন।

যুদ্ধসমূহ শুরু হলে সর্বপ্রথম হযরত মুনযির (রা) বদরের যুদ্ধে নিজের তরবারীর নিপুণতা প্রদর্শন করেন। তারপর ওহোদের যুদ্ধে অত্যন্ত উদ্দীপনার সঙ্গে শরীক হন। এই যুদ্ধে মহানবী (সা) তাঁকে ইসলামী বাহিনীর বাম দিকের অফিসার নিয়োগ করেন।

চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে আবু বারা' আমের বিন মালিক নজদীর আবেদন অনুযায়ী হুজুর (সা) ৭০জন মুবাল্লিগ সমন্বয়ে গঠিত তাবলীগে হকের একটি দলকে নজদ প্রেরণ করেন। এই ৭০জন সাহাবী অত্যন্ত ইবাদাত গুজার, মুত্তাকী এবং কুরআন-হাদীসের আলেম ছিলেন এবং ক্বারীর লকবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। হুজুর (সা) এই দলের নেতা হিসেবে হযরত মুনযির (রা) বিন আমরকে নিয়োগ করেন। এসব ব্যক্তি যখন বি'রে মাউনা বা মাউনা কূপ নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন নজদবাসীরা গাদ্দারী করলো ও রাল, জাকওয়ান, বনি সলিম প্রভৃতি গোত্রের লোকেরা তাদেরকে ঘেরাও করে ফেললো এবং হযরত মুনযির (রা) বিন আমর ও আমর (রা) বিন উমাইয়া ছাড়া সকলকে শহীদ করে ফেললো। বনি আমেরের সরদার আমের বিন তোফায়েল হযরত মুনযিরকে (রা) বললেন, যদি তুমি চাও তাহলে তোমাকে নিরাপত্তা দেয়া যেতে পারে। তিনি বললেন, আমাকে সেই স্থানের কথা একটু বলে দাও, যেখানে তোমরা হারাম (রা) বিন মিলহানকে শহীদ করেছ। মুশরিকরা তাঁকে সেখানে নিয়ে গেলে তিনি নিজের তরবারী বের করলেন এবং আমের বিন তোফায়েলকে সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের নিরাপত্তা আমার অবশ্যই প্রয়োজন নেই। তোমরা আমার ভাইকে অন্যায়ভাবে শহীদ করেছ। আমি তার ছাড়া বেঁচে থেকেই কি করবো। অতপর তরবারী চালাতে চালাতে মুশরিকদের মধ্যে ঢুকে গেলেন এবং দু'জনকে জাহান্নামে প্রেরণ করে স্বয়ং শাহাদাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হলেন। হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়া জুমরী (যাঁকে আমের বিন তোফায়েল নিজের মাতার একটি মানত পুরো করার জন্য মুক্তি দিয়েছিল) মদীনা গিয়ে যখন এই খবর হুজুরকে (সা) শুনালেন তখন তিনি খুব দুঃখ পেলেন। হযরত মুনযিরের (রা) শাহাদাতের ঘটনা শুনে তিনি বললেন, সে মৃত্যুর দিকে অগ্রগমন করেছে। সে সময় থেকে হযরত মুনযিরের (রা) লকব "আল মুয়ান্নিক লিল মওত" হিসেবে মশহুর হয়ে যায়।

এই উপাধি একথার নিদর্শন যে, হযরত মুনযির (রা) বিন আমর হক পথে আগুয়ান হয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে নিয়েছিলেন।

হযরত আমর (আল উছাইরিম) (রা) বিন ছাবিত আশহালী

সাইয়েদেনা হযরত আবু হুরাইরার অন্তর ছিল নবীর (সা) হাদীসের ভাণ্ডার। তিনি নিজের মজলিশে জ্ঞানের মুক্তা বিতরণ করতেন। এই জ্ঞানের মুক্তা কি ছিল ? নবী যুগের পবিত্র ঘটনাবলী অথবা মহানবীর (সা) ইরশাদসমূহ তিনি অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে নিজের শিষ্য ও মজলিশে উপস্থিত অন্যান্যদেরকে শুনাতেন। কখনো মনে উচ্ছ্বাস সৃষ্টি হলে শিষ্যদেরকে পরীক্ষামূলকভাবে জিজ্ঞেস করতেন ঃ

"এমন কোন ব্যক্তির নাম করো, যিনি এক ওয়াক্ত নামাযও পড়েননি ; অথচ সোজা বেহেশতে চলে গেছেন।"

সকল শাগরিদ বা শিষ্য এক বাক্যে জবাব দিতেন ঃ "আল উছাইরিম —আবদুল আশহাল।" যদি শিষ্যরা চুপ থাকতো তাহলে নিজেই বলতেন ঃ "এই ব্যক্তি ছিলেন আল উছাইরিম—আবদুল আশহাল।"

এই আল উছাইরিম আবদুল আশহাল আওস গোত্রের বনু আবদুল আশহাল শাখার চোখের মনি ছিলেন। আসল নাম ছিল আমর। ছাবিত (রা) বিন ওয়াকশ (বিন যাগবাহ বিন যাউরা' বিন আবদুল আশহাল)-এর কলিজার টুকরা ছিলেন। মাতার নাম ছিল লাইলা বিনতে হাছিলুল ইয়ামান (রা) এবং তিনি মুহরিমে আসরারে নবুওয়াত হযরত হুজাইফাহ (রা) বিন হাছিলুল ইয়ামান (রা)-এর সহোদরা ছিলেন। আল উছাইরিম আমর বিন ছাবিত যে অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেন তারপর যেভাবে হক পথে নিজের জীবন কুরবান করেছিলেন তা ছিল এক বিস্ময়কর ঘটনা। এই ঘটনা সাহাবায়ে কেরামের (রা) মস্তিষ্কে ছবির মত বিদ্যমান ছিল। তাদের মজলিশে কখনো ওহোদের যুদ্ধের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেই আল উছাইরিম (রা)-এর ঈমানী আবেগ ও সারফরোশীর কথাও অবশ্যই এসে যেত।

নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরে হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়েরের তাবলীগী প্রচেষ্টায় সাইয়েদুল আওস হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজ আশহালী ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু শুধুমাত্র তিনি নিজে ইসলাম গ্রহণ করেই সুস্থির থাকতে পারলেন না বরং তিনি যে ঈমানী নিয়ামতে অভিষিক্ত হয়েছিলেন তা তাঁর কবিলা আবদুল আশহালের মধ্যেও ছড়িয়ে দেয়ার প্রচেষ্টায় তৎপর হলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর বাড়ী ফিরে গেলেন। কবিলার সকলকে একত্রিত করলেন এবং সম্বোধন করে বললেন ঃ "আমার সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা ?"

সবাই বললো ঃ "আপনি আমাদের সরদার এবং আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বিজ্ঞ এবং সঠিক রায়ের অধিকারী।"

হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজ বললেন ঃ "তাহলে শুনে নাও, আমি আল্লাহ ও তার রাসূলে বরহকের উপর ঈমান এনেছি। তোমরাও যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনবে ততক্ষণ তোমাদের পুরুষ ও মহিলাদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা বলা হারাম।"

হযরত সায়াদ (রা) নিজের গোত্রে অসাধারণ প্রভাবশালী মানুষ ছিলেন। তাঁর ঈমানী আবেগ দেখে একজন যুবক ছাড়া কবিলার সকলেই সন্ধ্যার পূর্বেই ইসলামের নিয়ামতে পূর্ণ হয়ে গেলেন। ঈমানের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত এই যুবক ছিলেন আল উছারিম আমর বিন ছাবিত। তাঁর পিতা ছাবিত (রা) বিন ওয়াকশ, চাচা রাফায়াহ (রা) বিন ওয়াকশ, নানা হাছিলুল ইয়ামান (রা), নানী বুবাব (রা) বিনতে কা'ব এবং মামা হুজাইফা (রা) ইবনুল ইয়ামান সকলেই ইসলাম গ্রহণ করলেন। কিন্তু যুবক আমর (রা) বিন ছাবিতের অন্তর নরম হলো না এবং সে যথানিয়ম নিজের পুরাতন ধর্মের ওপর কায়েম রইলো। বনু আবদুল আশহালের সম্মানিত ব্যক্তি হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজ, হযরত উসাইদ (রা) বিন হুজাইর এবং খান্দানের অন্যান্য ব্যক্তি তাঁকে খুব ভালভাবে বুঝালেন যে, সেও যেন হক দ্বীন কবুল করে। কিন্তু তিনি তা মানেননি এবং এমনিভাবে চার বছর কাটিয়ে ছিলেন। সেই সময় রহমতে আলম (সা) হিজরত করে মদীনা তাশরীফ আনলেন এবং বদরের যুদ্ধও অতিক্রান্ত হয়ে গেল।

ওহোদের যুদ্ধে (তৃতীয় হিজরীর শওয়াল মাসে) বিশ্বনবী (সা) জাননিছার সাহাবীদের সমভিব্যাহারে ময়দানে তাশরীফ নিলেন। এ সময় আমর বিন ছাবিত মদীনা উপস্থিত ছিলেন না। ফিরে এসে দেখলেন যে, মহল্লা সুনসান পড়ে রয়েছে। বাড়ী গিয়ে মহিলাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের খান্দানের লোকজন কোথায় গেছে ? জবাব পেলেন ঃ "রাসূলের (সা) সঙ্গে ওহোদ গেছে।"

একথা শুনে অন্তরে হক এবং সত্য সম্পর্কে আবেগ সৃষ্টি হলো। তৎক্ষণাৎ যিরাহ পরিধান করলেন। নিজে তা মাথার ওপর রাখলেন। অস্ত্রে দেহ সজ্জিত করলেন এবং ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে যুদ্ধের ময়দানের দিকে রওয়ানা দিলেন। তখনও যুদ্ধ শুরু হয়নি। আমর (রা) নবীর (সা) নিকট পৌঁছে আরজ

করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! যুদ্ধের ময়দান গরম হওয়ার উপক্রম। বলুন, আগে ইসলাম গ্রহণ করবো অথবা আগের মতই আপনার সাহায্যের জন্য যুদ্ধ করবো।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "উভয় কাজই করো। প্রথমে ইসলাম গ্রহণ কর এবং তারপর আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করো।"

আরজ করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! আমি এক রাকায়াত নামাজও পড়িনি। যুদ্ধে যদি শেষ হয়ে যাই তাহলে কি আমার পূর্বেকার গুনাহ মাফ হবে ?"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "হাঁ, ইসলাম গ্রহণের পূর্বেকার সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা বড় গফুরুর রাহীম।"

একথা শুনে তৎক্ষণাৎ কালমায়ে শাহাদাত পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলেন।

যুদ্ধ শুরু হলে তিনিও তরবারী হাতে ময়দানে পৌছলেন। বনু আবদুল আশহাল তাঁর কঠিন অন্তরের কথা জানতেন এবং তাঁরা একথা জানতেন না যে, কিছুক্ষণ পূর্বে সে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আমর (রা)-কে নিজেদের ব্যূহে বা কাতারে দেখে ক্রোধান্বিত হলেন এবং তাঁকে সেখান থেকে চলে যেতে বললেন। কোন কাফেরের সাহায্য তাদের প্রয়োজন নেই—একথাও তারা বললেন। উছাইরিম (রা) অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে পড়লেন এবং বললেন, আমিও মুসলমান।

তারপর তরবারী চালাতে চালাতে বীরবিক্রমে কাফেরদের কাতারে ঢুকে পড়লেন এবং এমন বাহাদুরীর সঙ্গে লড়াই করলেন যে, কাফেরদের মুখ ফিরিয়ে দিলেন। শেষে অনেক মুশরিক হামলা করে গুরুতর আহত করলেন এবং তিনি অস্থির হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। যুদ্ধের পর বনু আবদুল আশহালের লোকজন নিজেদের শহীদ ও আহতদেরকে উঠাতে লাগলেন। এ সময় তাঁর উপরও নজর পড়লো। তখনও কোনক্রমে শ্বাস-প্রশ্বাস চলছিল। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ "জাতীয় চেতনা তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে কি ?"

তিনি বললেন ঃ "না, আমি মুসলমান হয়ে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের (সা) জন্য লড়াই করেছি।"

এ অবস্থায় তাকে উঠিয়ে বাড়ী আনা হলো। সমগ্র বনু আবদুল আশহালে এই খবর ফের মশহুর হয়ে গেল। আওস সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজ সে সময় আল উছাইরিমের (রা) সুপ্রসন্ন ভাগ্যের ঈমানের উপর আনন্দপূর্ণ বিস্ময় প্রকাশ করলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর বাড়ী তাশরীফ নিলেন

এবং আল উছাইরিমের (রা) সহোদরার নিকট থেকে সকল ঘটনা শুনলেন। ইত্যবসরে আল উছাইরিম (রা) শেষ নিঃশ্বাস নিলেন এবং জান্নাতের পথ ধরলেন। বিশ্বনবী (সা) তাঁর শাহাদাতের খবর শুনে বললেন ঃ

اِنَّهُ لَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ

"অবশ্যই তিনি অন্যতম জান্নাতবাসী।"

عَمِلَ قَلِيلاً وَاُجِرَ كَثِيرًا

"সে আমল কম করেছে, কিন্তু সওয়াব পেয়েছে অনেক।"

হযরত আল উছাইরিম আমর বিন ছাবিত (রা)-এর খান্দান বনু আবদুল আশহাল আগে থেকেই কম সম্ভ্রান্ত ছিলো না। এই ঘটনা তার মর্যাদা আরো উঁচুতে তুলে দিলো। বনু আবদুল আশহাল আল উছাইরিমের (রা) উপর গৌরব প্রকাশ করতো। তিনি একটি সিজদাও দেননি। কিন্তু বেহেশতে দাখিল হয়ে গেছেন।

হযরত মায়ান (রা) বিন আদি বালবী

একাদশ হিজরীতে মহানবী (সা) ওফাত পেলেন। এ সময় সাহাবায়ে কিরামের (রা) উপর কিয়ামত ভেঙ্গে পড়লো এবং তাঁরা মহাশোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। তাদের নিকট দুনিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, হায় ! আমরা যদি রাসূলের (সা) সামনে মরে যেতাম, তাহলে আমাদেরকে এই সময় দেখতে হতো না। এখন আল্লাহই জানেন, মহানবীর (সা) পর আমরা কোন্ কোন্ মুসিবতের সম্মুখীন হই। রাসূলের (সা) একজন সাহাবী (রা) একথা শুনে লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"ভাইয়েরা ! আমি তো মহানবীর (সা) সম্মুখে মরে যেতে অপসন্দ করি। আমার তো আকাংখা হলো আমি মহানবীর (সা) সম্মুখে যেভাবে তাঁকে (সা) সত্য বলেছি ; হুজুরের (সা) ওফাতের পরও তাঁকে সেভাবেই সত্য বলবো।"

এই মরদে মু'মিন যাঁর অন্তরে হাদিয়ে বরহক (সা)-এর ওফাতের পরও তাঁকে সত্য বলা প্রশ্নে উন্মাদনা ছিল—তিনি ছিলেন হযরত মায়ান (রা) বিন আদি।

সাইয়েদেনা হযরত মায়ান (রা) বিন আদির সম্পর্ক কাজায়াহ গোত্রের বাল্লী খান্দানের সঙ্গে ছিল। এই খান্দান আওস গোত্রের আমর বিন আওফের খান্দানের মিত্র ছিল। নসবনামা হলো ঃ

মায়ান (রা) বিন আদি বিন আল জাদ্ বিন আজলান বিন হারিছাহ বিন জায়াল বিন আমার বিন ছাওম বিন জুবিয়ান বিন হামিম বিন জাহাল বিন বাল্লী।

হযরত মায়ান (রা) বিন আদির বড় ভাই ছিলেন হযরত আছিম (রা) বিন আদি। তিনি বনু আজলানের সরদার ছিলেন। জাহেলী যুগে হযরত মায়ান (রা) বিন আদি শুধুমাত্র শিক্ষিত ব্যক্তিত্বই ছিলেন না বরং আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সুন্দর স্বভাবও দান করেছিলেন। নবুওয়াতের দ্বাদশ বছর পর মদীনা মুনাওয়ারাতে ইসলামের প্রথম দায়ী হযরত মাসয়াব (রা) বিন উমায়েরের তাবলীগি প্রচেষ্টায় ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে হযরত মায়ান (রা) বিন আদিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। নবুয়াতের ত্রয়োদশ বছর পর হজ্জের যামানায় তিনি মদীনা মুনাওয়ারার ৭৫জন ঈমানদারের সঙ্গে মক্কা মুয়াজ্জমা গমন করেন এবং "বাইয়াতে উকবায়ে কবিরা"তে রহমতে আলমের (সা) বাইয়াতের মর্যাদা

লাভ করেন। সেই প্রতিশ্রুতিময় বাইয়াতে যেসব ব্যক্তি শরীক হয়েছিলেন তাঁদের বীরত্ব, নির্ভীকতা এবং ইখলাস ফিদ্বীন-এর এমন নিদর্শন ইতিহাসের পাতায় রেখে গেছেন যার স্মৃতি আজও প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরকে আলোকজ্জল করে তোলে। সময়টা ছিল এমন যে, যখন আরবের সকল স্থান থেকে দ্বীনে হকের বিরোধিতার আওয়াজ উত্থিত হচ্ছিল। ইয়াসরাবের সেই বীর পুরুষের একটি ছোট্ট দল নিজেদেরকে মক্কার ইয়াতীম নবীর (সা) রহমতের আঁচলের সঙ্গে সংযুক্ত করে নেন এবং তাঁর সঙ্গে এই পবিত্র প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন যে, তিনি (সা) ইয়াসরাবে তাশরীফ নিলে তাঁরা তাদের নিজের জীবন ও সন্তানসহ তাঁকে সাহায্য এবং হিফাজত করবেন। অতপর যখন হুজুর (সা) শুভ পদার্পণের মাধ্যমে ইয়াসরাবকে ধন্য করেছিলেন তখন তাঁরা নিজেদের প্রতিশ্রুতিকে সত্য প্রতিপন্ন করে দেখালেন এবং এমন কুরবানী বা ত্যাগ ছিল না যা তারা হক পথে পেশ করেনি। হযরত মায়ান (রা) বিন আদি সেই হক পুরুষদের অন্যতম ছিলেন।

হিজরতের কয়েক মাস পর বিশ্বনবী (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় হযরত মায়ান (রা) বিন আদিকে হযরত ওমর ফারুকের (রা) বড় ভাই হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাবের দ্বীনি ভাই বানালেন। সেই যামানায় হযরত মায়ানের (রা) বড় ভাই হযরত আছিম (রা) বিন আদিও ইসলাম গ্রহণ করেন। এভাবে দুই সহোদর ইসলামের শক্তিশালী বাহুতে পরিণত হন। যুদ্ধসমূহ শুরু হলে হযরত মায়ান (রা) বদর, ওহোদ, খন্দক এবং অন্যান্য সকল যুদ্ধে মহানবীর (সা) সফর সঙ্গী ছিলেন। তিনি সকল যুদ্ধেই নিজের বীরত্ব প্রদর্শন করেন। মহানবীর (সা) ইন্তেকালের পর আনসাররা সকিফায়ে বনু সায়েদাতে একত্রিত হয়ে হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাকে খলিফা বানাতে চাইলে হযরত মায়ান (রা)-এর মত তাঁদের বিরুদ্ধে ছিল এবং তিনি কুরাইশ মুহাজিরদের মধ্য থেকেই খলিফা নির্বাচন হওয়ার প্রস্তাবের সমর্থক ছিলেন। সুতরাং তিনি তাঁর সমর্থক আনসারী হযরত উয়ায়েম (রা) বিন সায়েদাহর সঙ্গে উঠে সেখান থেকে চলে গেলেন। পথিমধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা) এবং অন্যান্য কতিপয় মুহাজিরের সঙ্গে সাক্ষাত হলো। উভয় বুজর্গই তাঁদেরকে আনসারদের সমাবেশ এবং ইচ্ছার কথা অবহিত করলেন এবং তাদেরকেই (মুহাজিরদের) খিলাফতের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। তা সত্ত্বেও মুহাজিররা সকিফায়ে বনু সায়েদাতে যাওয়াটা উচিত মনে করলেন এবং সেখানেই হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) রাসূলের (সা) খলিফা নির্বাচনের সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়। এই প্রসঙ্গে সহীহ বুখারীতে হযরত ওমর ফারুক (রা) থেকে এক বর্ণনা পাওয়া যায়। তাতে তিনি বলেছেন ঃ

"আমরা যখন সকিফায়ে বনু সায়েদার দিকে যাচ্ছিলাম তখন পথিমধ্যে আনসারের দুই নেক ব্যক্তির সাক্ষাত পেলাম। তাঁরা আমাদেরকে আনসারদের সমাবেশ ও ইচ্ছা সম্পর্কে অবহিত করেন।"

"দুই নেক ব্যক্তি" বলতে হযরত ওমর ফারুক (রা), হযরত মায়ান (রা) বিন আদি এবং হযরত উয়ায়েম (রা) বিন সায়েদাকেই বুঝিয়েছিলেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করতেই সমগ্র আরবে ধর্মদ্রোহিতার আগুন ছড়িয়ে পড়লো। এই সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এমন বুলন্দ হিম্মত এবং দৃঢ়তা প্রদর্শন করলেন যে, তার উদাহরণ ইতিহাসে আর পাওয়া যায় না। তিনি মুরতাদদের কোন ধরনের প্রশ্রয় দানে পরিষ্কারভাবে অস্বীকৃতি জানালেন এবং বললেন, আমি তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবো যতক্ষণ তারা দ্বীনে হকের সকল হুকুম-আহকাম সম্পূর্ণরূপে না মানবে। সুতরাং তিনি মুরতাদদের নির্মূলের জন্য ১১টি বাহিনী তৈরী করলেন। অভিজ্ঞ জেনারেলদের নেতৃত্বে এসব বাহিনীকে বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করলেন। কয়েক মাস পর্যন্ত মুরতাদদের সঙ্গে রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হলো। অবশেষে মুরতাদরা লজ্জাজনক পরাজয় বরণ করলো। এই প্রসঙ্গের সবচেয়ে রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ইয়ামামার ময়দানে মুসায়লামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে। সে সময় ইসলামী বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ এবং হযরত মায়ান (রা) বিন আদিও এই বাহিনীতে শামিল ছিলেন। হযরত খালিদ (রা) তাঁকে দু'শ সওয়ার দিয়ে প্রথমেই ইয়ামামার দিকে প্রেরণ করেছিলেন। যখন সাধারণ যুদ্ধ শুরু হলো তখন হযরত মায়ান (রা) মাথা হাতে রেখে যুদ্ধ করলেন। মুরতাদদের একটি দল তার ওপর হামলা করে তীর, তরবারী এবং নেযার বর্ষা বইয়ে দিলো। আর এমনিভাবে সেই জানবাজ মরদ শাহাদাতের রক্তের কাফন পরে প্রকৃত স্রষ্টার নিকট গিয়ে হাজির হলেন। তিনি এ সময় কোন সন্তান রেখে যাননি।

হযরত তালহা (রা) বিন আল বারা' আনসারী

প্রথম বাইয়াতে উকবার পর হযরত মাসয়াব (রা) ইবনুল উমায়ের ইসলামের মুবাল্লিগ হিসেবে ইয়াসরিব তাশরীফ নেন। তাঁর তাবলিগী প্রচেষ্টার ফল স্বরূপ ইয়াসরাবের ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা এবং অলি-গলিতে তাওহীদের আওয়াজ বুলন্দ হতে লাগলো।

আওস সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজ ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তিতে আওসের এমন কোন পরিবার ছিল না যে, ইসলাম নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। কিন্তু বারা' বিন উমায়ের (বিন ওয়াবরাহ বিন ছা'লাবাহ বিন গানাম বিন সাররি বিন সালমাহ বিন আনিফ)-এর জ্ঞানের উপর জাহেলীর মোটা পরদা পড়েছিল। সে হক দাওয়াতের আওয়াজ শুনতে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলো। সে বাল্লি গোত্রের একজন মর্যাদাবান মানুষ ছিল এবং তার বংশ ছিল আমর বিন আওফের মিত্র। তার খান্দানের বেশীর ভাগ মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু বারা' যথাযথভাবে নিজের পিতৃ ধর্ম আঁকড়ে পড়ে রইলো। এদিকে বারা'র যুবক পুত্র তালহার অবস্থা অন্য ধরনের ছিল। তালহা ছিল এক কমনীয় যুবক এবং স্বগোত্রের ভূষণ। আল্লাহ তায়ালা তাকে সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। সে আওস ও খাজরাজের যুবকদেরকে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে সামনে অগ্রসর হয়ে ইসলাম গ্রহণের মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে দেখলো। তাতে তার অন্তরেও দ্বীনে হকের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ সৃষ্টি হলো। এমনকি তিনি নবীর (সা) হিজরতের পূর্বেই প্রকাশ্যে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা বলতে শুরু করলেন। বিশ্বনবী (সা) মক্কা থেকে ইয়াসরাব হিজরতের ইরাদাহ করলেন। এ সময় ইয়াসরাবের প্রতিটি ধূলিকণাও ইয়াতীম নবীর (সা) আগমন অপেক্ষায় ইনতিজার করতে লাগলো। বৃদ্ধ, যুবক, মহিলা ও শিশু সকলেই রহমতে আলমের (সা) এরূপ দর্শনাকাংখী ছিলেন যে, চারদিকে শুধু ব্যস্ততা আর ব্যস্ততা। তালহাও (রা) নবী (সা) দর্শন প্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন এবং অত্যন্ত অস্থিরতার সঙ্গে সাইয়েদুল মুরসালিনের (সা) শুভ পদার্পণের অপেক্ষায় ছিলেন।

সাইয়েদুল আনাম খাইরুল খালায়েক রহমতে আলমের (সা) ইয়াসরাব শুভাগমন হলে এই পুরাতন শহরের ভাগ্য জেগে উঠলো। এই শহর ইয়াসরাব থেকে "মদীনাতুন নাবীতে' পরিণত হলো। শহরটির অলি-গলি মহানবীর (সা)

শুভাগমনে ঝলমল করে উঠলো এবং চারদিকে বসন্তের সমীরণ বইতে লাগলো। আনসারদের খুশীর সীমা-পরিসীমা ছিল না। আনন্দে মাটিতে পা ধরে না। বিশ্বনবীকে (সা) নিজেদের মধ্যে পেয়ে তারা নিজকে সারা দুনিয়ার মালিক মনে করতে লাগলো। নওজোয়ান তালহা (রা) রাসূলের (সা) নিকট হাজির হতেই হুজুরের (সা) পবিত্র আলোকজ্জল চেহারা নজর পড়লো এবং তা দেখেই আত্মহারা অবস্থায় হুজুরের (সা) পবিত্র হাত চুম্বন করে আরজ করলেন ঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি আমাকে যে নির্দেশ দিবেন তা পালন করবো এবং আপনার নির্দেশ পালনে অবশ্যি অবশ্যি সামান্যতম কসুরও করবো না।"

রহমতে আলম (সা) তাঁর বিশ্বাসের আবেগ দেখে মুচকি হেসে দিলেন এবং বললেন, "যাও এবং নিজের পিতাকে হত্যা করো।"

তালহা (রা) আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! এক্ষুণি আপনার ইরশাদের তামিল করছি। একথা বলেই তিনি বাড়ীর দিকে রওয়ানা দিলেন।

বিশ্বনবী (সা) তৎক্ষণাৎ আওয়াজ দিলেন ঃ "তালহা ফিরে এসো। আমি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার জন্য প্রেরিত হইনি।"

প্রথম পরীক্ষাতেই তালহা (রা) উত্তীর্ণ হলেন। এই ঘটনার পর হযরত তালহা (রা) ইবনুল বারা' বিশ্বনবীর (সা) সাহচর্য এবং খিদমতের কোন সুযোগই হাতছাড়া হতে দিতেন না। মহানবীর (সা) প্রতি তাঁর গভীর সম্পর্ক ও ভালোবাসা উন্নততর পর্যায়ে পৌছেছিল। প্রিয় নবীও (সা) তাঁর প্রতি ছিলেন সীমাহীন স্নেহপরায়ণ এবং সবসময় তাঁর প্রতি খেয়াল রাখতেন। আফসোস ! সময়টা ছিল খুবই কম !

কিছুদিন পর হযরত তালহা (রা) কঠিন অসুখে পড়লেন। এমনকি রাসূলের (সা) দরবারে উপস্থিত হতেও অক্ষম হয়ে পড়লেন। মহানবী (সা) এই খবর পেয়ে শুশ্রূষার জন্য তাশরীফ নিলেন। তাঁর অবস্থা দেখে নিশ্চিত হলেন যে, ইন্তেকালটা সময়ের ব্যাপার মাত্র। ফিরে আসার সময় তাঁর আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে পৃথকভাবে মিলিত হয়ে বললেন, তালহার (রা) বাঁচার আর কোন আশা নেই। যখনই তার ইন্তেকাল হবে তখনই যেন আমাকে খবর দেয়া হয়। আমি নিজে নামাযে জানাযা পড়াবো এবং তার কাফন-দাফনে যেন বিলম্ব না ঘটে। কারণ, মুশরিকদের মধ্যে একজন মু'মিনের লাশ পড়ে থাকুক তা আমি চাই না।

এদিকে হযরত তালহার (রা) ইখলাস ও রাসূলের (সা) প্রতি ভালোবাসার অবস্থাটা এমন ছিল যে, রাত এলো এবং তার শেষ সময় সন্নিকট দেখে বাড়ীর সবাইকে বললো ঃ

"তোমরা নিজেরাই আমাকে তাড়াতাড়ী দাফন করবে, যাতে আমি আমার রবের সঙ্গে শীঘ্র মিলিত হতে পারি এবং প্রিয়নবীকে (সা) আর খবর দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। পথিমধ্যে কোন ইহুদী অথবা কোন পশু তাকে (সা) কষ্ট দিতে পারে।"

এই ওসিয়াতের পর তিনি পূর্ণ যৌবনকালে মহাকালের দিকে পাড়ি দিয়ে আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হলেন।

বাড়ীর লোকজন রাতেই তার লাশ দাফন করলো। সকালে মহানবী (সা) তাঁর ইন্তেকালের খবর পেলেন। তখন সাহাবায়ে কিরাম (রা) সমভিব্যাহারে হযরত তালহার (রা) কবরে তাশরীফ নিলেন। জানাযার নামায পড়লেন এবং হাত উঠিয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন ঃ

"হে আল্লাহ ! তালহার সঙ্গে এমনভাবে মিলিত হও যে, তুমি তাকে এবং সে তোমাকে পেয়ে হাসতে হাসতে মিলিত হয়েছে।"

হযরত তালহা (রা) ইবনুল বারা' খুব কম বয়স পেয়েছিলেন। কিন্তু নিজের ইখলাসের আবেগ এবং নিজেকে কুরবানী করার যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তা ইতিহাসে চিরকালের জন্য স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকবে।

হযরত কায়েস বিন সায়াদ সায়েদী (রা)

খাজরাজ সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ বিশ্বনবীর (সা) প্রিয় জাননিছার সাহাবী ছিলেন। একবার হুজুর (সা) তাঁর সঙ্গে মুলাকাতের জন্য তাশ্‌রীফ নিলেন। প্রিয় নবীর (সা) নিয়ম ছিল যে অনুমতি ছাড়া কারোর বাড়ী প্রবেশ করতেন না। সুতরাং তিনি (সা) হযরত সায়াদের (রা) বাড়ীর দরযাতে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।" হযরত সায়াদ (রা) হুজুরের (সা) সালামের জবাব এত নীচু করে দিলেন যে, তা তাঁর (সা) পবিত্র কান পর্যন্ত পৌঁছলো না। সুতরাং বিশ্বনবী (সা) দ্বিতীয়বার বললেন ঃ "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।" হযরত সায়াদ (রা) পুনরায় খুব আস্তে সালামের জবাব দিলেন। হুজুর (সা) তৃতীয়বার বললেন ঃ "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।" এবারও প্রিয় নবীর (সা) সালামের জবাবে হযরত সায়াদ (রা) নিজের স্বর অত্যন্ত নীচু রাখলেন। হুজুর (সা) খেয়াল করলেন যে, সায়াদ (রা) তাঁকে অনুমতি দানে চিন্তা-ভাবনা করছেন। অতএব, তিনি (সা) ফিরে যেতে লাগলেন। হযরত সায়াদ (রা) তৎক্ষণাৎ বাইরে এসে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। আমি আপনার সালাম শুনছিলাম এবং আপনার সালামের জবাব এজন্য আস্তে আস্তে দিচ্ছিলাম যে, আপনি আমাকে বেশী করে সালাম দিবেন।"

হযরত সায়াদের (রা) কথা শুনে হুজুর (সা) মুচকি হেসে দিলেন এবং তাঁর ঘরের মধ্যে তাশরীফ নিলেন। হযরত সায়াদ (রা) হুজুরের (সা) জন্য গোসলের ব্যবস্থার নির্দেশ দিলেন। সুতরাং তিনি (সা) গোসল করলেন। তারপর হযরত সায়াদ (রা) তাঁর (সা) খিদমতে মোটা কাপড়ের একটি চাদর পেশ করলেন। চাদরটি জাফরান অথবা দরস (এক ধরনের খোশবুদার ঘাস)-এর রঙের ছিল। তিনি (সা) তা নিজের পবিত্র দেহে জড়িয়ে নিলেন এবং হাত উঠিয়ে দোয়া করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلٰوتَكَ وَرَحْمَتَكَ عَلٰى سَعْدٍ ـ

"হে আল্লাহ ! তুমি তোমার রহমত ও মেহেরবানী সায়াদের উপর নাযিল কর।"

তারপর প্রিয় নবী (সা) খাবার খেলেন এবং ফিরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। হযরত সায়াদ (রা) নিজের গাধা আনালেন এবং তার পিঠে চাদর

বিছালেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজের পুত্রকে বললেন, হুজুরের (সা) সঙ্গে যাও। হুজুর (সা) গাধার উপর সওয়ার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাধা চলা শুরু করলো। রহমতে আলম (সা) সায়াদ (রা) পুত্রকে বললেন, আমার সঙ্গে সওয়ার হও। তিনি এটাকে আদব ও শিষ্ঠাচার বিরোধী মনে করলেন এবং প্রিয় নবীর (সা) সঙ্গে বসার প্রশ্নে ওজর পেশ করলেন। হুজুর (সা) বললেন, সওয়ার হও অথবা ফিরে যাও। তিনি হুজুরের (সা) সঙ্গে বসার সাহস না করে ফিরে চলে গেলেন। হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহর এই ভাগ্যবান পুত্র সাইয়েদুল আনামকে (সা) এত আদব ও সম্মান দিতেন—তিনি ছিলেন হযরত কায়েস (রা) বিন সায়াদ (রা)।

সাইয়েদেনা আবুল ফজল হযরত কায়েস বিন সায়াদ (রা) মহান মর্যাদাবান সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। তাঁর সম্পর্ক ছিল খাজরাজের বনু সায়েদা বংশের সঙ্গে। নসবনামা হলো ঃ

কায়েস (রা) বিন সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ বিন ছাইম বিন হারিছাহ বিন হাযাম বিন খুজাইমাহ বিন ছালাবাহ বিন তুরায়েফ বিন খাজরাজ বিন সায়েদাহ বিন কা'ব বিন খাজরাজ আকবার।

মাতার নাম ফাকিহাহ (রা) বিনতে উবায়েদ বিন ছুলায়েম ছিল। তিনিও বনু সায়েদার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং হযরত কায়েসের (রা) পিতার চাচার কন্যা ছিলেন।

হযরত কায়েসের (রা) সম্মানিত পিতা হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ খাজরাজের মহান নেতা এবং রাসূলের (সা) সভাসদের অন্যতম বিশেষ সদস্য ছিলেন। তিনি শুধুমাত্র একজন মহান মর্যাদাবান সাহাবীই ছিলেন না বরং তাঁর মাতা [হযরত উমরাহ (রা) বিনতে মাসউদ] এবং স্ত্রীও (হযরত ফাকিহাহ) সাহাবী হওয়ার গৌরব লাভ করেছিলেন। হযরত কায়েস (রা) এই পরিবারেই বয়োপ্রাপ্ত হন এবং মাতা-পিতার মত নবীর (সা) হিজরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে যে, বিশ্বনবী (সা) হিজরতের পর মদীনা মুনাওয়ারাতে শুভ পদার্পণ করলেন। এ সময় হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ একদিন হযরত কায়েসকে (রা) সঙ্গে নিয়ে রাসূলের (সা) নিকট হাজির হলেন এবং হুজুরের (সা) খিদমতে আরজ করে বললেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! এ আমার পুত্র কায়েস। আমি তাকে আপনার হাওয়ালা করছি। আপনি তার থেকে কাজ নিন।"

হযরত কায়েসও (রা) জান-প্রাণ দিয়ে নিজেকে বিশ্বনবীর (সা) খিদমতের জন্য ওয়াকফ করে দিলেন এবং এমনিভাবে তিনি মহানবীর (সা) স্নেহের পাত্রে

পরিণত হয়ে গেলেন। চরিতকাররা লিখেছেন, নবুওয়াতের দরবারে তাঁর নৈকট্যের বিশেষ মর্যাদা ছিল। তার প্রমাণ মেলে সহীহ বুখারীর হযরত আনাস (রা) বিন মালিকের বর্ণনায়। তাতে বলা হয়েছে, কায়েস (রা) রাসূলের (সা) দরবারে সেই মর্যাদা রাখতেন যে মর্যাদা কোন বাদশাহর নিকট সর্বোচ্চ পুলিশ অফিসারের হয়ে থাকে।

হযরত কায়েস (রা) বিন সায়াদ লম্বা ও স্থূলদেহী ছিলেন। গাধার পিঠে চড়লে পা মাটিতে ঠেকে যেত। প্রকৃতিগতভাবে মুখে দাড়ি ছিল না। মদীনাবাসী ঠাট্টা করে বলতেন, হায় ! তার জন্য যদি একটি দাড়ি কেনা যেত। অত্যন্ত সুদর্শন ছিলেন। বাহ্যিক চেহারা যেমন সুন্দর ছিল তেমনি অন্তরও ছিল সুন্দর। অত্যন্ত বাহাদুর, পবিত্র, তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন এবং সঠিক মতের অধিকারী ছিলেন। উদারতা ও দানশীলতার মত গুণাবলী বাপ-দাদার নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন এবং তিনি আরবের দরিয়া দিল মানুষদের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। প্রচণ্ড জিহাদের আবেগ ছিল। রাসূলের (সা) যুগের অধিকাংশ যুদ্ধে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে শরীক হয়েছিলেন। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা সারিয়্যাহ সাইফুল বাহর অথবা জাইশুল খাবত (অষ্টম হিজরীর রজব মাসে সংঘটিত) এবং বিজয় যুদ্ধে (অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে) তাঁর অংশগ্রহণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। সাইফুল বাহর অভিযানের নেতৃত্ব বিশ্বনবী (সা) হযরত আবু উবায়দাহ (রা) ইবনুল জারাহ-এর উপর অর্পণ করেছিলেন। তার সঙ্গে তিনশ'জন মুহাজির ও আনসার ছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা) এবং হযরত কায়েস (রা) বিন সায়াদও ছিলেন। এই অভিযান বনু জাহিনাহর এলাকার দিকে কুরাইশের কাফেলার খোজ-খবর নেয়া অথবা তাদের মনোযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। এলাকাটি মদীনা তাইয়্যেবা থেকে পাঁচ দিনের দূরত্বে সমুদ্রপোকূলে অবস্থিত ছিল। এজন্য তাকে সারিয়্যাহ (সাইফুল বাহর বলা হয়ে থাকে। (সাইফুল বাহর অর্থ সমুদ্রের কূল।) জাহিশুল খাবাত অথবা সারিয়্যাহ খাবাত তাকে এজন্য বলা হয়ে থাকে যে, এই অভিযানকালে রসদ খতম হয়ে যাওয়ার কারণে মুসলমানদেরকে গাছের পাতা পেড়ে খেতে হয়েছিল। খাবাত বলা হয় বৃক্ষের সেই পাতাকে যা লাঠি প্রভৃতি দিয়ে পাড়া হয়। সহীহ বুখারীতে আছে, মুজাহিদরা সমুদ্রোপোকূলে অবস্থান নিয়েছিল। তাদের রসদ-পত্তর শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং তারা গাছের পাতা পেড়ে খেতে বাধ্য হয়েছিলেন। হযরত কায়েস (রা) এই অবস্থা দেখে তিনবার তিন তিনটি উট ধার নিয়ে জবেহ করান এবং সৈন্যবাহিনীর জন্য খাদ্য সরবরাহ করেন। আল্লামা ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত আবু উবায়দাহকে (রা) বললেন, তাকে

বাধা দিন। নচেৎ সে নিজের পিতার সম্পদ এভাবেই ব্যয় করে ফেলবে। সুতরাং হযরত আবু উবায়দাহ (রা) তাঁকে আরো উট জবেহ করানো থেকে নিষেধ করে দিলেন।

হযরত জাবের (রা) বিন আবদুল্লাহ আনসারী থেকে বর্ণিত আছে, এই অভিযানকালে যখন পাতা খেয়ে খেয়ে আমাদের কলজে জখম হয়ে গেল তখন একদিন সমুদ্রের ঢেউ এক বিরাট জলজ জন্তু আমাদের দিকে কিনারায় নিক্ষেপ করলো। তাকে আম্বর বলা হয় (এটা ওয়াহিল অথবা দ্বিতীয় কোন বড় মাছ ছিল)। আমরা (সংখ্যায় তিনশ') অর্ধ মাস পর্যন্ত সেই প্রাণীর গোশত খেয়ে কাটিয়েছিলাম এবং আমরা সকলেই হৃষ্ট-পুষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। সেই মাছের দেহটার অবস্থা এমন ছিল যে, হযরত আবু উবায়দাহ (রা) তার লেজ তুলে ধরতে নির্দেশ দিলেন এবং সবচে দীর্ঘ দেহী মানুষ (হযরত কায়েস বিন সায়াদ)-কে সবচে দীর্ঘ দেহী উটের ওপর সওয়ার করিয়ে তার নীচ দিয়ে যেতে বললেন। তিনি বিনা বাধায় অতিক্রম করে গেলেন এবং লেজ তাঁর মাথা থেকে উপরেই রয়ে গেল। একদিন হযরত আবু উবায়দাহ (রা) লোকদেরকে মাছটির চোখের গর্তে বসার নির্দেশ দিলেন। সুতরাং ১৩জন সাহাবী সহজভাবেই তাতে বসে গেলেন। মদীনা প্রত্যাবর্তনকালে আমরা বেঁচে যাওয়া গোশত পাথেয় হিসেবে সঙ্গে নিলাম। মদীনা পৌঁছে আমরা রাসূলে আকরাম (সা)-এর খিদমতে সমগ্র ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উদর পূর্তির জন্য তা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। যদি তার কিছু গোশত সঙ্গে এনে থাকো তাহলে আমাকেও খাওয়াও। আমরা হুজুরের (সা) খিদমতে গোশত পেশ করলাম এবং তিনি তা খেলেন।

হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) "আল ইসতিয়াব" গ্রন্থে লিখেছেন, সারিয়্যাহ সাইফুল বাহর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সাহাবীরা (রা) হযরত কায়েস (রা) বিন সায়াদ (রা)-এর উট জবেহ করানোর ঘটনা হুজুরের (সা) নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ "উদারতা এবং দানশীলতা সেই পরিবারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।"

সহীহ বুখারীতে আছে, সাইফুল বাহর অভিযান থেকে ফিরে এসে হযরত কায়েস (রা) নিজের পিতা হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহকে মুসলমানদের উপবাসের অবস্থার কথা শুনালেন। শুনে তিনি বললেন, উট জবেহ করাতে। জবাব দিলেন, আমি তাই করিয়েছি। কিন্তু দ্বিতীয় দিন মুসলমানদের সেই একই অবস্থা দাঁড়ায়। হযরত সায়াদ (রা) বললেন, আরো উট জবেহ করাতে। আরজ করলেন, আমি তাই করিয়েছি। কিন্তু তারপর মুসলমানরা পুনরায়

উপবাসে লিপ্ত হয়ে পড়লো। তিনি বললেন, আবার জবেহ করাতে। হযরত কায়েস (রা) বললেন, আমাকে বাধা দেয়া হয়েছে।

আল্লামা ইবনে আছির (র) "উসুদুল গাব্বাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, জাহিশুল খাবাত প্রসঙ্গে কোন এক ব্যক্তি হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহকে বললেন যে, হযরত কায়েসকে (রা) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর ইঙ্গিতে আরো উট জবেহ করানো থেকে বিরত রাখা হয়েছিল। কেননা, তাঁরা বলেছিল যে, সে নিজের পিতার সম্পদ এভাবে ব্যয় করে ফেলবে। একথা শুনে হযরত সায়াদ (রা) বিন উদাবাহ তৎক্ষণাৎ বিশ্বনবীর (সা) পবিত্র খিদমতে হাজির হলেন এবং তাঁর (সা) পবিত্র পিঠের পেছনে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ

"ইবনে আবি কোহাফাহ এবং ইবনে খাত্তাবের পক্ষ থেকে কেউ জবাব দিক যে, তারা আমার পুত্রকে কেন বখিল বানাতে চায় ?"

অষ্টম হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে হযরত কায়েস (রা) বিন সায়াদ সেই দশ হাজার পবিত্র মানুষের মধ্যে শামিল হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন যাঁরা মক্কা বিজয়ের সময় রহমতে আলমের (সা) সফর সঙ্গী ছিলেন। হযরত কায়েসের (রা) পিতা হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ নবীর (সা) দরবারে বিশেষ স্থানের অধিকারী ছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন হুজুর (সা) নিজের ঝাণ্ডা তাঁর নিকট রেখেছিলেন। তিনি সেই ঝাণ্ডা উঁচিয়ে অত্যন্ত শান-শওকতের সঙ্গে আনসারদের আগে আগে চলছিলেন। রাস্তায় একস্থানে হযরত আব্বাস (রা) আবু সুফিয়ানকে (রা) সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হযরত সায়াদ (রা)-এর নজর হযরত আবু সুফিয়ানের (রা) উপর পড়লে অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে এই কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন ঃ

اليوم يوم الملحمل ـ اليوم تسحل الحرمه

"আজকের দিন হলো রক্তাক্ত (কঠিন যুদ্ধ) দিন। আজ কা'বা (হারাম) হালাল করা হবে। (অথবা আজকের দিন সম্মান পদদলিত করা হবে)।"

বিশ্বনবীকে (সা) এই খবর দেয়া হলো। বলা হলো, হযরত আবু সুফিয়ান (রা) এবং অন্যান্য সাহাবী (রা) প্রদত্ত খবর মুতাবিক সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ এই এই বলছেন। তখন তিনি (সা) বললেন, সায়াদ ভুল বলেছে। আজ কা'বার মর্যাদা দ্বিগুণ হবে। আজ কা'বার গিলাফ পরানো হবে। অতপর মহানবী (সা) ঝাণ্ডা সায়াদ থেকে নিয়ে তাঁর পুত্র কায়েসকে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। সুতরাং রাসূলের (সা) ঝাণ্ডা হযরত কায়েসের (রা) হাতে এলো।

তখন হযরত সায়াদ (রা) হুজুরের (সা) খিদমতে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আপনার ঝাণ্ডা কায়েস ছাড়া অন্য কারোর কাছে সোপর্দ করুন। আমার ভয় হলো, কুরাইশের বিরুদ্ধে কায়েসের প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে না উঠে।"

হুজুর (সা) হযরত সায়াদের (রা) কথা মেনে নিলেন এবং হযরত কায়েসের (রা) নিকট থেকে ঝাণ্ডা নিয়ে হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়ামের হাওয়ালা করে দিলেন।

মহানবীর (সা) ইনতিকালের পর হযরত কায়েস (রা) বিন সায়াদ (রা)-এর রাজনৈতিক ও সামরিক তৎপরতার সন্ধান হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর খিলাফতকালে পাওয়া যায়। তিনি প্রথম থেকেই হযরত আলীর (রা) সঙ্গে একনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং ভালোবাসা পোষণ করতেন। সাইয়েদেনা আলী মুরতাজাও (রা) তাঁকে সম্মান করতেন। তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর হযরত কায়েসকে (রা) মিসরের গবর্নর নিয়োগ করেন। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মিসরের প্রশাসন চালালেন। কিন্তু কুফাবাসী নানা কারণে মিসরে হযরত কায়েসের (রা) গবর্নরী পসন্দ করেনি। তারা হযরত আলীর (রা) সামনে মিসরের অবস্থা এমনভাবে তুলে ধরলো যে, আমীরুল মু'মিনিন (রা) হযরত কায়েসকে (রা) মিসরের গবর্নরী থেকে সরিয়ে দিলেন এবং তাঁর স্থলে মুহাম্মদ বিন আবি বকরকে (রা) মিসরের গবর্নর নিয়োগ করলেন। হযরত কায়েস (রা) মিসর থেকে মদীনা চলে এলেন। কিন্তু মারওয়ান ইবনুল হাকাম মদীনায় তাঁর উপস্থিতি পসন্দ করলো না। সুতরাং তিনি কুফা চলে গেলেন এবং ইবনে আছিরের (র) বর্ণনা মুতাবিক সেখানেরই স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেলেন। হযরত কায়েস (রা) হযরত আলীর (রা) অত্যন্ত উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। উষ্ট্রের যুদ্ধের পর সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে শরীক হন এবং কয়েকবার হযরত আলীর (রা) বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। সিফ্‌ফীনের যুদ্ধের পর খারেজীরা শক্তিশালী হয়ে উঠলো। তখন হযরত আলী (রা) তাদের নির্মূলের জন্য সম্মুখে অগ্রসর হলেন। এই প্রসঙ্গে নাহরওয়ানের রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হলো। সেই যুদ্ধে হযরত কায়েস (রা) নিজের সকল গোত্রের সঙ্গে হযরত আলীর (রা) বাহিনীতে শামিল ছিলেন। যুদ্ধ শুরুর পূর্বে হযরত আলী (রা) হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) এবং হযরত কায়েসকে (রা) আলোচনা বা যুদ্ধ প্রদর্শনের জন্য খারেজীদের নিকট প্রেরণ করলেন। উদ্দেশ্য ছিল, বুঝিয়ে শুনিয়ে তাদের পথ ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করা। আলোচনাকালে খারেজী সরদার আবদুল্লাহ বিন সানজার বললো, আমরা আপনাদেরকে সমর্থন করতে পারছি না। অবশ্য যদি ওমর (রা) বিন খাত্তাবের মত কোন ব্যক্তি হলে তার খিলাফত

আমরা মানতে পারি। হযরত কায়েস (রা) বললেন, "আমাদের মধ্যে আলী (রা) বিন আবি তালিব মওজুদ রয়েছেন। তোমরা তাঁর মর্যাদার কোন ব্যক্তিকে পেশ করো।" আবদুল্লাহ বিন সানজার বললো, আমাদের মধ্যে ঐ মর্যাদার কোন ব্যক্তিত্ব নেই। হযরত কায়েস (রা) বললেন, তাহলে তোমরা অবিলম্বে নিজেদেরকে সংশোধন করে নাও। আমার যেন মনে হয় তোমাদের অন্তরে ফিতনা শিকড় নিচ্ছে। এই আলোচনার পর উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। তাতে খারেজীদের শিক্ষণীয় পরাজয় ঘটলো।

৪০ হিজরীতে হযরত আলী কাররামাল্লাহ ওয়াজহাহু শাহাদাত পেলেন এবং সাইয়েদেনা হযরত হাসান (রা) খিলাফতের আসনে সমাসীন হলেন। এ সময় হযরত কায়েস (রা) তাঁর হাত হয়ে গেলেন।

সাইয়েদেনা হযরত হাসানের (রা) খিলাফতকালের প্রথম দিকে আমীর মুয়াবিয়া (রা) এক বিরাট বাহিনী সিরিয়া থেকে ইরাক প্রেরণ করলেন। হযরত কায়েস (রা) এই খবর পেয়ে পাঁচ হাজার অমিত বিক্রম যোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে সিরীয় বাহিনীকে বাধাদানের জন্য আম্বার পৌছলেন। এসব যোদ্ধা মাথা কামিয়ে রেখেছিল এবং মৃত্যুর বাইয়াত করে প্রস্তুত ছিল। সিরীয় বাহিনী আম্বারের চারপাশ ঘিরে নিল। ইত্যবসরে ইমাম হাসান (রা) এবং আমীর মুয়াবিয়ার (রা) মধ্যে সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। হযরত হাসান (রা) হযরত কায়েসকে (রা) লিখে পাঠালেন যে, আম্বার সিরীয়দের হাওয়ালা করে মাদায়েনে আমার নিকট এসে যাও। হযরত কায়েস (রা) এই পত্র পেয়ে খুব মনোকষ্ট পেলেন। তিনি সঙ্গীদেরকে একত্রিত করে বললেন, এখন আমাদের দু'টোর মধ্যে একটি গ্রহণ করতে হবে। হয় ইমামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অথবা আমীর মুয়াবিয়ার (রা) বাইয়াত। সকল সঙ্গী একবাক্যে বললেন, বর্তমান অবস্থায় আমীর মুয়াবিয়ার (রা) বাইয়াত করাটাই উত্তম। অতএব, হযরত কায়েস (রা) তাদের জন্য আমীর মুয়াবিয়ার (রা) নিকট থেকে আমান বা নিরাপত্তা গ্রহণ করলেন এবং সকলকে নিয়ে মাদায়েন চলে এলেন। কিছুদিন পর মাদায়েন থেকে মদীনা মুনাওয়ারার দিকে রওয়ানা করলেন। সফরকালে প্রতিদিন সঙ্গীদের জন্য নিজের একটি করে উট জবেহ করাতেন। মদীনা পৌছে তিনি সকল ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতা থেকে বিচ্ছিন্নতা গ্রহণ করলেন এবং নির্জন প্রকোষ্ঠে বসে আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল হয়ে গেলেন। ৬০ হিজরীতে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মদীনার অনেক মানুষ তাঁর নিকট ঋণগ্রস্ত ছিলেন। তাদের মধ্যে অধিকাংশই ঋণ পরিশোধের সামর্থ রাখতেন না। এজন্য হযরত কায়েসের (রা) শুশ্রূষার জন্য আসতে লজ্জা পেতেন। হযরত কায়েস (রা) তাঁদের অক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত হলেন এবং তাঁদের ঋণের ক্ষমা সম্পর্কিত

ঘোষণা প্রদান করালেন। এবং বললেন যে, কারোর কাছ থেকেই তিনি ঋণের অর্থ নেবেন না। এই ঘোষণা শুনে শহরবাসী সকলেই তাঁর শুশ্রূষার জন্য ভেঙ্গে পড়লেন। হযরত কায়েস (রা) বালাখানাতে অবস্থান করছিলেন। মানুষের প্রচণ্ড ভীড়ে বাসভবনের সিঁড়ি ভেঙ্গে পড়লো। হযরত কায়েসের (রা) এই অসুস্থতা দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল। অতপর তিনি মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে যাত্রা করলেন। ইনতিকালের সময় এক পুত্র রেখে গিয়েছিলেন। তাঁর নাম ছিল আমের। তিনি নিজের পিতার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত কায়েস (রা) ছিলেন মর্যাদাবান সাহাবীদের (রা) অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁর থেকে বর্ণিত কয়েকটি হাদীস হাদীসগ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। এসব হাদীস বর্ণনাকারীর মধ্যে হযরত আনাস (রা) বিন মালিক, হযরত আবু মাইসারাহ (রা), হযরত আবদুর রহমান বিন আবি লায়লা (র) এবং শা'বীর (র) মত উম্মাহর বিজ্ঞজনরা রয়েছেন।

হযরত কায়েসের (রা) চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে ছিল ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামিতা। রাসূল প্রেম, উদারতা এবং দানশীলতা, ইবাদাতের প্রতি গভীর আকর্ষণ, দক্ষতা, বিজ্ঞতা ও কৌশল প্রিয়তা এবং বীরত্ব। মহানবীর (সা) হিজরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। বিশ্বনবীর (সা) প্রতি এত আদব প্রদর্শন করতেন যে, তাঁর (সা) বরাবর বসতেনও না। হুজুরের (সা) প্রতি ছিল অসীম ভালোবাসা এবং তাঁর (সা) খিদমতকে নিজের সৌভাগ্য বলে মনে করতেন। এ কারণেই মহানবীর (সা) নৈকট্যলাভ করতে পেরেছিলেন। উদারতা এবং দানশীলতায় বাপ-দাদার সত্যিকার উত্তরাধিকার ছিলেন। চরিতকাররা এ ব্যাপারে একমত যে, উদারতা এবং দানশীলতায় তিনি ছিলেন উদাহরণ স্বরূপ। স্বয়ং মহানবী (সা) তাঁর দানশীলতার প্রশংসা করেছেন। হযরত কায়েসের (সা) পরদাদা দুলায়েম, দাদা উবাদাহ পিতা সায়াদ (রা) এবং স্বয়ং নিজে সমকালের মশহুর দাতা ছিলেন। এক বর্ণনায় আছে, দুলায়েম নিজের জীবিতকালে এক ব্যক্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছিলো। এই ব্যক্তি বনু সায়েদার দুর্গ থেকে তাদের পক্ষ থেকে ডেকে ডেকে বলতো যে, যদি কারোর ভালো খাবার, গোশত এবং তেল খাওয়ার ইচ্ছা হয় তাহলে সে যেন তাদের দুর্গে যায়। বস্তুত তাদের বাড়ী আম মেহমানখানা হয়ে গিয়েছিল। দুলায়েম-এর পর উবাদাহ, উবাদাহর পর সায়াদ (রা) এবং সায়াদের (রা) পর হযরত কায়েস (রা) সেই প্রথা তেমনি কায়েম রেখেছিলেন।

একবার এক বৃদ্ধা তাঁর নিকট এলো এবং নিজের দারিদ্রতার কথা এভাবে প্রকাশ করলো যে, তার ঘরে কোন আনাজ নেই। বললেন, ঠিক আছে। যাও, এখন তোমার ঘরে শুধু আনাজ আর আনাজই দেখতে পাবে। সেই সঙ্গে

খাদেমদেরকে তার বাড়ী খাদ্য, তেল এবং অন্যান্য খাবার বস্তু দিয়ে পূর্ণ করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) লিখেছেন, কাছির বিন সালত আমীর মুয়াবিয়ার (রা) নিকট ঋণগ্রস্ত ছিলেন। তিনি মারওয়ানকে লিখলো যে, তুমি কাছিরের বাড়ী কিনে নাও। যদি সে বিক্রি করতে অস্বীকার করে তাহলে আমার কাছ থেকে নেয়া ঋণের অর্থ ফেরতদানের দাবী করো। যদি সে ঋণ দিয়ে দেয় তাহলে তো ভালো। নচেৎ বাড়ী বিক্রি করে দেবে। মারওয়ান কাছিরকে ডেকে তিনদিনের মধ্যে ঋণ পরিশোধের নির্দেশ দিলেন নচেৎ বাড়ী বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করতে বললেন। সে বাড়ী বিক্রি করতে চাচ্ছিল না এবং ঋণ পরিশোধের জন্য ৩০ হাজার পরিমাণ প্রয়োজন ছিল। অত্যন্ত পেরেশানী অবস্থায় হযরত কায়েসের (রা) নিকট পৌছলেন এবং তাঁর নিকট ত্রিশ হাজার ঋণ চাইলো। তিনি নির্দ্বিধায় তা দিয়ে দিলেন। সে এই অর্থ নিয়ে মারওয়ানের নিকট এলো। তখন মারওয়ানের অন্তর বিগলিত হলো এবং সে অর্থ ও বাড়ী উভয়ই তার হাওয়ালা করে দিল। সে সেখান থেকে সোজা হযরত কায়েসের (রা) নিকট গেলো এবং ৩০ হাজার পরিমাণ অর্থ তাঁকে ফিরিয়ে দিল। তিনি এই অর্থ নিতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, আমি যা দিয়েছি তা আর ফেরত নেই না।

হযরত কায়েসের (রা) পিতা হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ হযরত আবু বকরের (রা) খিলাফতকালের শুরুতে সিরিয়া চলে গিয়েছিলেন। রওয়ানার পূর্বে তিনি নিজের সকল সহায়-সম্পদ সন্তানদের মধ্যে বন্টন করে দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ইনতিকালের পর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করলো। তার অংশতো তিনি বন্টন করে যাননি। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত কায়েসকে (রা) পরামর্শ দিয়ে বললেন, সায়াদ (রা) সহায়-সম্পদ যেভাবে বন্টন করে গেছেন তা বাতিল করে নতুন করে ভাগ করুন। হযরত কায়েস (রা) বললেন, পিতা যেভাবে বন্টন করে গেছেন তা ঠিক থাকবে। অবশ্য আমি নিজের অংশ ছেড়ে দিচ্ছি। তা নবজাতককে দেয়া হোক।

তাঁর দানশীলতা এবং উদারতার আরো অনেক ঘটনা রয়েছে। ইবাদাতের প্রতি আকর্ষণ এমন ছিল যে, বেশীর ভাগ সময়ই আল্লাহর স্মরণে কাটিয়ে দিতেন। সাইয়েদেনা হযরত হাসান (রা)-এর খিলাফতের পর ইবাদাতের ব্যস্ততা আরো বেড়ে গিয়েছিল। ফরজ ছাড়া নফলও অত্যন্ত পাবন্দীর সঙ্গে আদায় করতেন। বেশী বেশী নফল রোযা রাখতেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে, আশুরার দিনে রোযা রাখাকে তিনি নিজের নিয়ম বানিয়ে নিয়েছিলেন।

তাদবির ও হিকমত প্রশ্নে তিনি আরবের নির্বাচিত কয়েকজনের একজন ছিলেন। ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন, এই প্রশ্নে তিনি হযরত আমির মুয়াবিয়া (রা), হযরত আমর (রা) ইবনুল আছ, হযরত মুগিরাহ (রা) বিন শু'বা এবং হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন বাদলের (রা) সমকক্ষ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। নিজের বিজ্ঞতা, দানশীলতা এবং অন্যান্য সুন্দর গুণের বদৌলতে তিনি বনু সায়েদাতে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন এবং আনসারের অন্যান্য খান্দানও তাঁকে খুব সম্মান করতেন।

মহানবীর (সা) উত্তম আদর্শকে নিজের জন্য পথের মশাল হিসেবে জানতেন। একবার কাদেসিয়ায় হযরত সাহাল (রা) বিন হুনাইফার সঙ্গে বসেছিলেন। এমন সময় একটি জানাযাহ অতিক্রম করলো। হযরত কায়েস (রা) দাঁড়িয়ে গেলেন। লোকেরা বললো, আপনি অহেতুক দাঁড়িয়ে গেছেন। এটাতো একটা অমুসলিমের (জিম্মী) জানাযাহ। তিনি বললেন, রাসূলও (সা) এক ইহুদীর জানাযাহ দেখে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। যখন তাঁকে (সা) বলা হয়েছিল যে, এটাতো ইহুদীর জানাযাহ। তখন নবীয়ে আকরাম (সা) বলেছিলেন, তাতে দোষের কি। সেও তো একজন মানুষ।

বীরত্ব ও বাহাদুরীর ব্যাপারে শুধু এতটুকুন বলাই যথেষ্ট যে, মহানবীর (সা) যুগেও এবং তারপরও অসংখ্য যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং প্রতিটি যুদ্ধেই বীর বিক্রমে লড়াই করেছিলেন। মোটকথা, হযরত কায়েসের (রা) জীবনের সকল দিকই ছিল প্রোজ্জ্বল।

হযরত সায়াদ (রা) বিন খাইছুমা (রা) আনসারী

রহমতে দো আলম (সা) বদরের যুদ্ধের জন্য মদীনা মুনাওয়ারা থেকে রওয়ানা দিলেন। এ সময় মদীনার এক গৃহে বিশ্বপ্রকৃতি এক বিস্ময়কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলো। হক পূজারী এক বৃদ্ধ পিতা এবং এক যুবক পুত্রের মধ্যে কথা কাটাকাটি হচ্ছিল। পিতা পুত্রকে বলছিলেন, "পুত্র বাড়ীতে আমরা দুজন ছাড়া আর কোন পুরুষ নেই। এ জন্য আমাদের দু'জনের একজন বাড়ী অবস্থান এবং অপরজনের জিহাদে শরীক হওয়া উচিত। তুমি যুবক এবং বাড়ী দেখা শুনার কাজ ভালোভাবে তুমিই করতে পার। এজন্য তুমি এখানে থাকো এবং আমাকে রাসূলের (সা) সঙ্গে যেতে দাও।" তার জবাবে ভাগ্যবান পুত্র পিতাকে বলছিলো, "আব্বাজান ! জান্নাত ছাড়া যদি অন্য কোন ব্যাপার হতো, তাহলে বাড়ীতে অবস্থানের ব্যাপারে আমার কোন আপত্তি ছিল না। আল্লাহ পাক আমাকে এতটুকুন শক্তি দিয়েছেন যে, তা দিয়ে আমি মহানবীর (সা) সফর সঙ্গী হওয়ার হক আদায় করতে পারি। এজন্য আপনি বাড়ী থাকুন এবং আমাকে জিহাদে গমনের অনুমতি দিন। আল্লাহ তায়ালা সম্ভবত আমাকে শাহাদাতের মর্যাদা দিতে পারেন।"

অনেক তর্কাতর্কির পর পিতা লটারী করার সিদ্ধান্ত দিলেন এবং তাতে যার নাম উঠবে সেই লড়াইতে যাবে এবং অন্যজন বাড়ী থাকবে ফায়সালা হলো। পুত্র পিতার নির্দেশের সামনে মাথা নত করে দিলেন। লটারীতে পুত্রের নাম উঠলো। সে এত খুশী হলো যে, মাটিতে আর পা ধরে না। শাহাদাতের আবেগে উদ্বেলিত এই নেক পুত্রের নাম ছিল সায়াদ (রা) আর শ্রদ্ধেয় পিতার নাম ছিল খাইছুমা (রা)।

হযরত সায়াদ (রা) বিন খাইছুমার (রা) সম্পর্ক ছিল আওসের আমর বিন আওফের খান্দানের সঙ্গে। নসবনামা হলো ঃ

সায়াদ (রা) বিন খাইছুমা (রা) বিন হারিছ বিন মালিক বিন কা'ব বিন নুহাত বিন কা'ব বিন হারিছা বিন গানাম বিন সালাম বিন ইমরাউল কায়েস বিন মালিক বিন আওস।

হযরত সায়াদকে (রা) আল্লাহ তায়ালা সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। মহানবীর (সা) হিজরতের কিছুদিন পূর্বে যে তাঁর নিকট তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছলো তখনি কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তাতে সাড়া দিলেন। নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছর পর সেই ৭৫জনের দলে শামিল হয়ে মক্কা গমন করেন যাঁরা বাইয়াতে উকবায়ে কবিরার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং রহমতে আলমকে (সা)

ইয়াসরাব তাশরীফ আনার দাওয়াত দিলেন। হুজুর (সা) এ সময় হযরত সায়াদকে (রা) আমর বিন আওফ কবিলার নকিব নিয়োগ করলেন। তাঁর পিতাও সেই যুগেই ইসলাম গ্রহণের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। হিজরতের পর বিশ্বনবী (সা) কুবা আগমন করলেন। তখন আমর বিন আওফ গোত্রেরই এক বুযুর্গ হযরত কুলছুম (রা) ইবনুল হাদাম কয়েকদিনের জন্য মহানবীর (সা) মেযবান হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। সে যুগে যেসব ব্যক্তি হুজুরের (সা) সঙ্গে মুলাকাত করতে আসতেন তাদের সঙ্গে মহানবী (সা) হযরত সায়াদ (রা) বিন খাইছুমার (রা) বাড়ীতে মিলিত হতেন। হযরত সায়াদ (রা) অত্যন্ত নেককার ছিলেন। এজন্য তাঁকে সায়াদুল খায়ের নামে ডাকা হতো। বিশ্বনবীর (সা) সঙ্গে তাঁর গভীর ভালোবাসা ছিল। বদরের যুদ্ধের সময় যখন লটারীতে তাঁর নাম উঠলো তখন অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে হুজুরের (সা) সঙ্গী হয়ে বদর পৌছলেন এবং কাফেরদের সঙ্গে প্রচন্ড বিক্রমে লড়াই করলেন। যুদ্ধের ময়দানে দুশমনের এক সওয়ার তাঁর উপর হামলা করলো। তিনি যদিও মাটিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছিলেন তবুও অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে হামলাকারীর জবাব দিচ্ছিলেন। হযরত আলী (রা) তাঁর সাহায্যের জন্য অগ্রসর হলেন। কিন্তু ইত্যবসরে দুশমনের আঘাত কার্যকর হয়ে গেল এবং হযরত সায়াদ (রা) শাহাদাতের পেয়ালা পান করে চিরস্থায়ী জীবন লাভ করলেন। কতিপয় রেওয়ায়াতে তাঁর হত্যাকারীর নাম তায়িমা বিন আদি এবং অন্য কতিপয় রেওয়ায়াতে আমর বিন আবদিদুদ পাওয়া গেছে। সন্তানের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এক বর্ণনায় আছে যে, শাহাদাতের সময় তাঁর কোন সন্তান ছিল না। তবে কতিপয়ের কথামতে তিনি আবদুল্লাহ নামক এক শিশু পুত্র রেখে যান।

হযরত যায়েদ (রা) বিন দিছনা আনসারী

খাজরাজ গোত্রের বিয়াদাহ খান্দানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ

যায়েদ (রা) বিন দিছনা বিন মাবিয়া বিন উবায়েদ বিন আমর বিন বিয়াদাহ বিন আমের যুবায়েক বিন আবাদি হারিছা বিন মালিক বিন জাশাম বিন খাজরাজ।

চরিতকাররা তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাল সম্পর্কে বিস্তারিত বলেননি। কিন্তু সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, তিনি বদরী সাহাবী ছিলেন। সম্ভবত তিনি নবীর (সা) হিজরতের প্রথমে অথবা অব্যবহিত পরই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বদরের পর তিনি ওহোদের যুদ্ধে বিশ্বনবীর (সা) সঙ্গী হয়েছিলেন।

ওহোদের যুদ্ধের কিছুদিন পর আজল ওয়াকারা গোত্রের কতিপয় ব্যক্তি মহানবীর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে সাহাবীদের (রা) মধ্য থেকে কয়েকজনকে দ্বীনি শিক্ষা প্রদানের জন্য তাদের নিকট প্রেরণের জন্য নিবেদন করলো। হুজুর (সা) তাঁদের নিবেদন বা দরখাস্তের প্রেক্ষিতে মতান্তরে ছ' সাত অথবা দশ সাহাবী সমন্বয়ে একটি দল তাদের সঙ্গে দিয়ে ছিলেন। এই দলে হযরত যায়েদ (রা) বিন দিছনাও শামিল ছিলেন। যখন এই দল রাজি' নামক স্থানে পৌঁছলো তখন আজল ওয়াকারার লোকেরা গাদ্দারী করে বসলো এবং একশ' তীরান্দাজ দিয়ে এই দলের উপর হামলা করালো। মুসলমানরা এই গাদ্দারদের সঙ্গে বীর বিক্রমে মুকাবিলা করলো। কিন্তু হযরত খুবায়েব (রা) বিন আদি এবং যায়েদ (রা) বিন দিছনা ছাড়া সকলেই শহীদ হয়ে গেলেন। হযরত খুবায়েব (রা) এবং যায়েদকে (রা) মুশরিকরা বন্দী করলো এবং মক্কা এনে কুরাইশদের নিকট বিক্রি করে দিলেন। হযরত যায়েদ (রা) বিন দিছনাকে বদরে নিহত উমাইয়া বিন খালফের পুত্র সাফওয়ান পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ৫০টি উটের বিনিময়ে কিনে নিল। এই ঘটনা যেহেতু হারাম মাসে (আশহারে হুরম) সংঘটিত হয়েছিল সেহেতু সাফওয়ান হযরত যায়েদকে (রা) নিজের গোলাম নাস্তাসের সোপর্দ করে দিল এবং হারাম মাসসমূহ অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত তার জিম্মায় রাখার নির্দেশ দিল। এই জিম্মায় থাকাকালীন অবস্থায় হযরত যায়েদ (রা) সারারাত ইবাদাতে ব্যস্ত থাকতেন এবং দিনের বেলা রোযা রাখতেন। খাদ্যবস্তু যা তাঁকে দেয়া হতো তা থেকে গোশত না খেয়ে শুধু দুধ পান করতেন।

সাফওয়ান একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, গোশত কেন খাও না। তিনি বললেন, যে জন্তু আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নামে জবেহ করা হয় তার গোশত আমি হারাম মনে করি।

হারাম মাসসমূহ অতিক্রান্ত হয়ে গেলে মক্কার কাফেররা হযরত খুবায়েব (রা) এবং হযরত যায়েদ (রা) উভয়কেই শুলে চড়ানোর বন্দোবস্ত করলো। সুতরাং তারা হক পুরুষদেরকে তানয়িম নামক স্থানে নিয়ে গেল। সেখানে তারা দু'টো শুল লটকিয়ে রেখেছিল। যখন সেখানে উভয় মজলুমের পারস্পরিক সাক্ষাত হলো তখন তারা পরস্পর বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং একে অপরকে মুসিবতে ধৈর্য ধারণের ওসিয়ত করলেন। অতপর কাফেররা উভয়কে পৃথক করলো। হযরত যায়েদকে (রা) যখন শুলে চড়ানো হচ্ছিল তখন আবু সুফিয়ান তাঁকে সম্বোধন করে বললো ঃ

"হে যায়েদ তোমার খোদার কসম ! সত্য সত্য বলতো, তোমার স্থানে যদি মুহাম্মাদের (সা) গর্দান উড়িয়ে দেয়া হয় এবং তুমি তোমার পরিবার-পরিজনসহ আরাম-আয়েশে থাকো—তাকি তুমি পসন্দ করবে ?"

একথার জবাবে এই হক পুরুষ যে ঈমান পূর্ণ জবাব দিয়েছিলেন তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে সংরক্ষিত রয়েছে। তিনি বলেন ঃ খোদার কসম ! মুহাম্মাদের (সা) পবিত্র পায়ে যদি কাঁটা ফোটে আর আমি নিজের ঘরে আরাম করে বসে থাকবো—তাও আমি সহ্য করতে পারবো না।"

মুশরিকরা এই জবাবে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো এবং আবু সুফিয়ানের (রা) মুখ দিয়ে অযাচিতভাবে বেড়িয়ে পড়লো ঃ "মুহাম্মাদের (সা) সঙ্গীরা তাঁকে যতখানি ভালোবাসেন দুনিয়ায় আর কোন মানুষ এ রকম ভালোবাসা পান না।"

তারপর জালেমরা হযরত যায়েদকে (রা) শুলে চড়ালো এবং তাঁর পবিত্র দেহকে বর্শার আঘাতে আঘাতে ঝাঁঝরা করে ফেললো। এভাবে এ মরদে মু'মিন আল্লাহর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলেন।

হযরত কা'ব (রা) বিন আজুরাহ বালবী

মহানবীর (সা) হিজরতের কয়েক বছর পরের কথা। একদিন রাসূলের (সা) এক সাহাবী (রা) রিসালাতের দরবারে হাজির হলেন। তিনি বিশ্বনবীর (সা) পবিত্র চেহারার ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। ক্ষুধার্ত হওয়ার কারণে মহানবীর (সা) পবিত্র চেহারায় পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। মহানবী (সা) কতক্ষণ থেকে ক্ষুধার্ত রয়েছেন তা চিন্তা করে বেচাইন হয়ে গেলেন। কিন্তু নিজেও ছিলেন অক্ষম ব্যক্তি। স্বগৃহে এমন কোন বস্তু ছিল না যা এনে হুজুরের (সা) খিদমতে পেশ করতে পারেন। তারপরও হুজুর (সা) ভুখা থাকুন তা সহ্য করতে পারলেন না। তৎক্ষণাৎ কোন বস্তুর সন্ধানে তিনি উঠে গেলেন। পথিমধ্যে এক ইহুদীর সঙ্গে দেখা। ইহুদীটি নিজের উটের পানি পান করাতে চাচ্ছিলো। তিনি তার নিকট কূপ থেকে পানি তুলে দেয়ার বিনিময়ে প্রতি বালতিতে এক ছোহারাহ দেয়ার প্রস্তাব দিলেন। সে এই প্রস্তাব মঞ্জুর করলো। সুতরাং তিনি কয়েক বালতি পানি তোলার পর কয়েকটি ছোহারাহ জমা হলো। এ সময় তিনি দৌড়ে দৌড়ে হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে ছোহারাহগুলো পেশ করলেন। হুজুর (সা) খুব খুশী হয়ে এই ছোহারাহ খেয়ে তাঁর জন্য দোয়া করলেন। রাসূলের (সা) এই সাহাবী—যিনি মহানবীকে (সা) এত ভালো-বাসতেন এবং নিজের অক্ষমতা ও দারিদ্রতা সত্ত্বেও তাঁকে (সা) ভুখা দেখা অসহ্য ছিল—তিনি ছিলেন হযরত কা'ব (রা) আজুরাহ।

হযরত আবু মুহাম্মাদ কা'ব বিন আজুরাহর সম্পর্ক ছিল বাল্লী (কাজায়াহ) কবিলার সঙ্গে এবং এই কবিলা আনসারের মিত্র ছিল। নসবনামা হলো ঃ

কা'ব (রা) বিন আজুরাহ বিন উমাইয়া বিন আদি বিন উবায়েদ বিন খালেদ বিন আমর বিন আওফ বিন গানাম বিন সওয়াদ বিন মারি বিন ইরাছাহ বিন আমের বিন উবাইলা বিন কাসিল বিন ফাররান বিন বাল্লি বিন আমর বিন হারিছ বিন কাজায়াহ।

হযরত কা'ব (রা) হিজরতে নববীর পর ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর নবী (সা) যুগে সংঘটিত প্রায় সকল যুদ্ধে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে শরীক হন এবং প্রতিটি যুদ্ধেই জীবনবাজি রেখে লড়াই করেন। ইবনে সায়াদ (রা) বর্ণনা করেছেন, এক যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করার সময় তাঁর একটি হাত শহীদ হয়ে যায়।

সহীহাইনে হযরত কা'ব (রা) বিন আজুরাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি হুদায়বিয়া ছিলাম এবং মক্কায় প্রবেশ করিনি ; এমন সময় আমার নিকট দিয়ে

মহানবী (সা) অতিক্রম করলেন। আমি সে সময় ইহরাম বাঁধা অবস্থায় ছিলাম এবং হাঁড়ির নীচে আগুন জ্বালাচ্ছিলাম। উকুন ঝরঝর করে আমার চেহারার উপর পড়ছিল। হুজুর (সা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, উকুন কি তোমাকে কষ্ট দেয়। আমি বললাম, জ্বী হাঁ। তিনি (সা) বললেন, "মাথা টাক করে ফেলো এবং এক ফরক খাদ্য (তিন সাতে এক ফরক হয়) ৬জন মিসকিনকে খাইয়ে দাও। অথবা তিনটি রোযা রাখো অথবা একটি জানোয়ার জবেহ করার যোগ্য হলে জবেহ করে দাও।"

হযরত কা'ব (রা) হুজুরের (সা) নির্দেশ তামিল বা পালনার্থে নিজের মাথা টাক করে ফেললেন। অর্থাৎ চুল চেঁছে ফেললেন। এর ফিদিয়াতে তিনি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন সহীহাইনে (বুখারী ও মুসলিম শরীফ) তা পরিষ্কার করা হয়নি।

মুসনাদে আহমাদে (র) বর্ণিত আছে যে, একদিন বিশ্বনবী (সা) খুতবা দিলেন। এই খুতবা বা ভাষণে তিনি ভবিষ্যতে মুসলমানদের মধ্যেকার গৃহ যুদ্ধের কথা উল্লেখ করলেন। হযরত কা'বও (রা) শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন। তিনি হুজুরের (সা) খুতবায় খুব প্রভাবিত হলেন এবং এমন অনুভব করলেন যে, গৃহযুদ্ধের ভয়ংকর যুগ যেন তাঁর সামনে এসে গেছে। ইত্যবসরে জনৈক ব্যক্তি চাদর উড়িয়ে সেখানে এলেন। হুজুর (সা) তাঁর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, সেদিন এই ব্যক্তি হকের উপর থাকবেন। কা'ব (রা) একথা শুনে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন এবং সেই ব্যক্তির বাহু ধরে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল ! এই ব্যক্তি ?"

হুজুর (সা) বললেন, হাঁ। এতক্ষণে হযরত কা'ব (রা) তাঁর চেহারার দিকে তাকালেন। তাকিয়ে দেখলেন যে, সেই ব্যক্তি হলেন হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রা)।

বিশ্বনবীর (সা) ওফাতের পর হযরত কা'ব (রা) বিন আজুরাহ মদীনা মুনাওয়ারাতেই মুকিম ছিলেন। হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে কুফাতে বসতি স্থাপিত হলে তিনি সেখানে চলে যান এবং সেখানেই স্থায়ী হন। তকদির লেখক তার ওফাত লিখে রেখেছিলেন হাবিবের (সা) গৃহে। ৫১ হিজরীতে তিনি মদীনা আসেন এবং এখানেই ইনতিকাল করেন। ইনতিকালের সময় চার পুত্র ইসহাক, মুহাম্মাদ, রবি এবং আবদুল মালিককে রেখে যান।

হযরত কা'ব বিন আজুরাহ মহান মর্যাদাবান সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। তাঁর থেকে ১৪৭টি হাদীস বর্ণিত আছে। তাঁর হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা), আবদুল্লাহ বিন আমর

(রা) বিন আস, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা), জাবের (রা) বিন আবদুল্লাহ (রা), তারিক বিন শিহাব (র), আবদুর রহমান বিন আবি লায়লা (র), ইবনে সিরিন (র) এবং মুহাম্মাদ বিন কা'ব কারজি (র)-এর মত জালিলুল কদর সাহাবী শামিল ছিলেন।

হযরত কা'ব (রা) বিন আজুরাহ থেকে বর্ণিত অনেক হাদীস ইবাদাত ও আখলাক বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সেসব হাদীসের মধ্যে কতিপয় ঃ

(১) রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কতিপয় বাক্য আছে যা প্রতি ফরয নামাযের পর উচ্চারণকারী সওয়াব প্রাপ্তি থেকে নিরাশ হয় না। সেসব বাক্য হলো ঃ ৩৩বার সুবহান আল্লাহ, ৩৩বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪বার আল্লাহু আকবার বলা।

(২) রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, তোমাদের মধ্য থেকে যখন কেউ ওজু করে সে যেন ভালোভাবে ওজু করে। তারপর নামাযের ইরাদাতে মসজিদের দিকে গমন করবে এবং নামাযের মধ্যে আঙ্গুলের মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে খেলা করবে না। তাহলে এই খেলাটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নামাযই মনে করা হবে।

(৩) একবার মহানবী (সা) বনু আবদুল আশহালের মসজিদে তাশরিফ নিলেন এবং সেখানে মাগরিবের নামায পড়লেন। লোকেরা যখন মাগরিবের নামায পড়া শেষ করলো তখন হুজুর (সা) দেখলেন যে, সে নফল পড়ছে। মহানবী (সা) বললেন, এই নামায (নফল) বাড়ীতে পড়ার বস্তু।

(৪) একবার রাসূলে আকরাম (সা) বাড়ী থেকে বের হয়ে আমাদের নিকট তাশরীফ রাখলেন। আমরা আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনার উপর সালাম প্রেরণ তো আমরা জেনেছি। কিন্তু আপনার উপর দরূদ কিভাবে প্রেরণ করা যাবে। তিনি (সা) বললেন এভাবে বলো ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

(৫) একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ সকলে মিম্বরের নিকট এসো। সুতরাং আমরা সবাই হাজির হলাম। তিনি যখন মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে পা

রাখলেন তখন আমীন বললেন। তারপর যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখলেন তখন আমীন বললেন। তারপর তৃতীয় সিঁড়িতে চড়লেন তখন আমীন বললেন। তিনি যখন মিম্বর থেকে অবতরণ করলেন তখন আমরা আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা আজ আপনার নিকট থেকে এমন কথা শুনেছি যা আমরা শুনিনি। তিনি বললেন, (যখন আমি প্রথম সিঁড়িতে পা রাখি) জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম আমার সামনে এলেন এবং বললেন, সেই ব্যক্তি ধ্বংস হয়েছে যে, রমযানের মাস পেয়েছে অথচ তাকে ক্ষমা করা হয়নি। আমি বললাম, আমীন। আমি যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখলাম তখন জিবরাঈল (আ) বললেন, সেই ব্যক্তি ধ্বংস হোক যার নিকট আপনার কথা উল্লেখ করা হয় আর সে আপনার উপর দরূদ প্রেরণ করে না। আমি বললাম, আমীন। আমি যখন তৃতীয় সিঁড়িতে উঠলাম তখন জিবরাঈল (আ) বললেন, সেই ব্যক্তি ধ্বংস হবে যে ব্যক্তি বার্ধক্য অবস্থায় নিজের মাতা-পিতাকে পেল অথবা তাদের মধ্যে একজনকে পেল এবং সেই মাতা-পিতা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারলো না। আমি বললাম, আমীন। (হাকীম ইবনে হাব্বান এবং তিবরানী)

(৬) মহানবী (সা) বলেছেন, বরতন বা পাত্র ভেঙ্গে ফেলার কারণে বাঁদী বা দাসীদেরকে মার-পিট করো না। কারণ, তোমাদের বয়সের মত বরতনের বয়সও নিকৃষ্ট থাকে। [মুসনাদে আল ফিরদাউস লিদদায়লামী (র)।]

হযরত সায়াদ (রা) বিন হাবতা (রা) বাজলী

খন্দকের যুদ্ধ (পঞ্চম হিজরী) মুসলমানদের জন্য ছিল এক বিরাট পরীক্ষা। কিন্তু মুসলমানদের প্রতিটি পুরুষ, নারী, বৃদ্ধ, যুবক ও শিশু এই পরীক্ষায় সম্পূর্ণ সফল হয়েছিলেন। তারা নিজেদের সংকল্প, অটলতা ও ধৈর্যের এমন উদাহরণ ইতিহাসের পাতায় রেখেছিলেন যা চিরকালের জন্য তাওহীদপন্থীদের পথের মশাল হিসেবে কাজ করবে। সেই যুদ্ধে ১৫ বছরের এক যুবক এমন উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে লড়াই করেছিল যে, লোকজন বিস্মিত হয়ে পড়েছিল। বিশ্বনবীও (সা) তাঁর বাহাদুরী এবং জীবন উৎসর্গের আবেগের প্রশংসা করেছিলেন এবং কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার নাম কি ? তিনি নিজের নাম বললে হুজুর (সা) বললেন, "আল্লাহ তোমাকে ভাগ্যবান করুন।" অতপর অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে তাঁর মাথার উপর পবিত্র হাত বুলালেন।

রহমতে দো আলমের (সা) ভাগ্যবান হওয়ার দোয়া প্রাপ্ত এই সৌভাগ্যবান যুবক ছিলেন হযরত সায়াদ (রা) বিন হাবতা। (ইবনে আছির)

হযরত সায়াদ (রা) যিনি ইবনে হাবতা নামে মশহুর ছিলেন। তিনি বাজিলা গোত্রভুক্ত ছিলেন এবং বনি আমর বিন আওফের মিত্র ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ

সায়াদ (রা) বিন বুজায়ের বিন মাবিয়া বিন মুফায়েল বিন সাদুস বিন আবদি মান্নাফ বিন আবি উসামাহ বিন লাহমাহ বিন সায়াদ বিন আবদুল্লাহ বিন কাজাজ বিন মাবিয়া বিন যায়েদ বিন গাওছ বিন আনমার বিন আরাশ।

হযরত সায়াদের (রা) পিতা বুজায়ের ইসলামের যুগ পাননি। অবশ্য তাঁর মাতা হাবতা (রা) বিনতে মালিক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং মহিলা সাহাবী হওয়ার মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছিলেন। তিনি আওস কবিলার আমর বিন আওফ বংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত সায়াদ (রা) তাঁর নামের নিসবতেই ইবনে হাবতা (রা) নামে মশহুর হয়েছিলেন। যে যুগে তাঁর মাতা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সে সময় তাঁর ছিল শৈশবকাল। তা সত্ত্বেও তিনি মায়ের সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন।

হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) বর্ণনা করেছেন, ইবনে হাবতা (রা) বদর ও ওহোদ কম বয়স হওয়ার কারণে অংশ নিতে পারেননি। খন্দক বা পরিখার যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ১৫ বছর হয়ে গিয়েছিল। এজন্য হুজুর (সা) যুদ্ধে শরীক হওয়ার অনুমতি দেন। খন্দকের পর তিনি অন্যান্য যুদ্ধেও হুজুরের (সা) সঙ্গী ছিলেন।

ইবনে হাবতা (রা) একজন বাহাদুর সিপাহী ও ভালো ঘোড় সওয়ার ছিলেন।

হাফিজ ইবনে হাজার (র) "ইসাবাতে" লিখেছেন, ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর উয়াইনিয়া বিন হাছান ফাযারী মদীনা থেকে কয়েক মাইল দূরে এক চারণভূমিতে হামলা করে হুজুরের (সা) উটনীগুলো ভাগিয়ে নিয়ে চললো। ঘটনাক্রমে মশহুর সাহাবী হযরত সালমা (রা) ইবনুল আকওয়া এবং অন্য একজন সাহাবী সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। হযরত সালমা (রা) প্রথমে নিজের সঙ্গীকে এই ঘটনার খবর দেয়ার জন্য মদীনা পাঠালেন এবং এক টিলার ওপর উঠে ইয়া ছাবাহাহ (হে সকাল বেলার মুসিবত) স্বরে আওয়াজ দিলেন। অতপর একাই ফাযারী লুটেরাদের মুকাবিলায় লেগে গেলেন। আরববাসী "ইয়া ছাবাহাহ"-র নারা বা ধ্বনি তখনই দেয় যখন তারা কোন মুসিবতে নিপতিত হয় এবং সাহায্য প্রার্থনা করে।

হযরত সালমার (রা) নারার আওয়াজ সর্বপ্রথম বনু আমর বিন আওফের মহল্লায় পৌঁছলো। সেখান থেকে হযরত আবু কাতাদাহ (রা) এবং ইবনে হাবতা (রা) ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে তৎক্ষণাৎ হযরত সালমার (রা) সাহায্যের জন্য পৌঁছে গেলেন এবং লুটেরাদেরকে নিজেদের বর্শার খোরাক বানালেন। ইত্যবসরে আরো কিছু সওয়ারও পৌঁছলো। তাদেরকে হুজুর (সা) মদীনা থেকে প্রেরণ করেছিলেন। এসব বীর লুটেরাদেরকে ভেগে যেতে বাধ্য করলেন। হযরত সালমা (রা) দূর-দূরান্ত পর্যন্ত তাদের পিছু নিয়ে হুজুরের (সা) উট নিয়ে ফিরে এলেন।

বিশ্বনবীর (সা) ইনতিকালের পর হযরত সায়াদ (রা) বিন হাবতা মদীনা মুনাওয়ারাতেই মুকিম ছিলেন। অবশ্য যখন হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর শাসনকালে কুফা আবাদ হলো তখন তিনি কুফাতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং কয়েক বছর পর সেখানেই আখিরাতের সফরে যাত্রা করেন। হযরত যায়েদ (রা) বিন আরকাম জানাযার নামায পড়ান এবং ইসলামের এই মহান ব্যক্তিকে কুফার মাটিতে দাফন করা হয়।

ইনতিকালের সময় হযরত সায়াদ (রা) বিন হাবতা চার সন্তান রেখে যান। তাদের মধ্যে তিনজন ছিলেন পুত্র এবং একজন কন্যা হযরত ইমাম আবু হানিফার (র) জালিলুল কদর শাগরেদ হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (র) সায়াদ (রা) বিন হাবতার বংশধরদের মধ্যেই ছিলেন।

হযরত সায়াদ (রা) বিন হাবতা (রা) থেকে বর্ণিত কতিপয় হাদীসও গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়।

হযরত উয়ায়েম (রা) বিন সায়েদাহ্ আনসারী

মহানবীর (সা) হিজরতের পরের ঘটনা। একদিন রহমতে আলম (সা) কতিপয় জাননিছার সাহাবী (রা) সহ বসেছিলেন এবং তাদেরকে নিজের পবিত্র অমিয় বাণী শুনাচ্ছিলেন। হুজুর (সা) তাদেরকে এই অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন যে, কোন মাসয়ালার ব্যাপারে তাঁরা যদি কোন অসুবিধার সম্মুখীন হন তাহলে তাঁরা নির্দ্বিধায় তাঁর নিকট তার ব্যাখ্যা চাইতে পারেন। এই মজলিসে এক ব্যক্তি মসজিদে কুবা প্রসঙ্গে নাযিলকৃত। (সূরায়ে তাওবাহর) এই আয়াত পড়লেন ঃ

"তাতে সেইসব লোক রয়েছেন যারা পবিত্রতাকে খুব ভালোবাসে এবং আল্লাহও এমন পবিত্র মানুষকে ভালোবেসে থাকেন।"–(সূরা আত তাওবা)

অতপর হুজুর (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা যেসব লোকের দিকে ইশারা করেছেন ; তারা কারা ?"

ইরশাদ হলো ঃ "তাদের মধ্যে একজন মরদে সালেহ হলেন উয়ায়েম (রা) বিন সায়েদাহ।"

সাইয়েদেনা আবু আবদুর রহমান উয়ায়েম (রা) বিন সায়েদাহ-এর আল্লাহর মাহবুব বা প্রিয় হওয়া সম্পর্কে স্বয়ং সাইয়েদুল মুরসালিন (সা) সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। তিনি আনসারের সাবিকুনাল আউয়ালুন এবং মহান সাহাবীদের (রা) মধ্যে পরিগণিত হতেন। আওস কবিলার আমর বিন আওফ শাখার সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ

উয়ায়েম (রা) বিন সায়েদাহ বিন আয়েশ বিন কায়েস বিন নু'মান বিন যায়েদ বিন মালিক বিন আওফ বিন আমর বিন আওফ বিন মালিক বিন আওস।

আমর বিন আওফ খান্দানের বসতি ছিল কুবাতে। এই খান্দান মহান সৌভাগ্য অর্জন করেছিলো। বংশটির বেশীর ভাগ সদস্য মহানবীর (সা) হিজরতের পূর্বেই ইসলামের নিয়ামতে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত উয়ায়েম (রা) বিন সায়েদাহও ছিলেন। নবুয়াতের ত্রয়োদশ বছর আগের

একটি ঘটনা। এই বছরের পর হজ্জের মওসুমে মদীনা মুনাওয়ারার ৭৫জন ঈমানদার ব্যক্তি মক্কা গেলেন এবং রহমতে আলমের (সা) হাতে বাইয়াত করলেন। এই প্রোজ্জ্বল বাইয়াত ইতিহাসে "বাইয়াতে উকবায়ে কবিরা" "বাইয়াতে লাইলাতুল উকবা" এবং "বাইয়াতে উকবায়ে ছানিয়া" নামে মশহুর হয়ে আছে। এই বাইয়াতে মদীনার সেই ৭৫জন জওয়ান মরদ মক্কার দুররে ইয়াতিম নবীর (সা) মদীনা আগমনের দাওয়াত দিলেন এবং পবিত্র প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তাঁরা মহানবীকে (সা) জান, মাল ও সন্তানসহ সাহায্য এবং হেফাজত করবেন। এই কাজ করতে তাঁরা সমগ্র আরবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পিছ পা হবেন না বলেও ঘোষণা প্রদান করেন। হযরত উয়ায়েম (রা)-ও সেই হকপন্থীদের একজন ছিলেন।

বিশ্বনবী (সা) প্রথমে কুবা এবং তারপর মদীনা মুনাওয়ারাতে শুভ পদার্পণ করলেন। এ সময় হযরত উয়ায়েমও (রা) অন্যান্য আনসারের সঙ্গে হুজুরকে (সা) ইসতিকবাল করার জন্য সামনে সামনে ছিলেন। কিছুদিন পর হুজুর (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করলেন। তখন হযরত উয়ায়েম (রা) বিন সায়েদাকে হযরত হাতিব (রা) বিন বালতায়ার দ্বীনি ভাই বানালেন।

যুদ্ধসমূহ শুরু হলে বদর থেকে শুরু করে তাবুক পর্যন্ত এমন কোন যুদ্ধ ছিল না যাতে হযরত উয়ায়েম (রা) বিন সায়েদা প্রিয় নবীর (সা) সফর সঙ্গী হননি। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের (সা) প্রতি তাঁর ভালোবাসা এমন এক পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছেছিল যে, তিনি হক পথে জীবনের বাজি নাগানোর লক্ষ্যে সবসময় প্রস্তুত থাকতেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কোন ঝাণ্ডা উঁচু করতেন ; উয়ায়েম (রা) বিন সায়েদাহ সবসময় তার ছায়ায় থাকতেন।

রাসূল (সা) প্রেম ও জিহাদের প্রতি উৎসাহ ছাড়া হযরত উয়ায়েম (রা)-এর যে বৈশিষ্ট্য তাঁকে মহানবীর (সা) দরবারে প্রিয় করে রেখেছিল, তাহলো তাঁর চূড়ান্ত পর্যায়ের পরিচ্ছন্ন প্রিয়তা। সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতেন। এক বর্ণনায় আছে, মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি ইসতিনজাতে পানি ব্যবহার করেছিলেন। তাঁকে দেখে অন্যান্য মুসলমানও তাঁর অনুসরণ করতে লাগেন। আল্লাহর দরবারে তাঁর এই কাজ কবুল হয় এবং তিনি প্রকাশ্য ভাষায় তাঁকে তার সন্তুষ্টির সুসংবাদ প্রদান করেন। সে সময় বিশ্বনবী (সা) হযরত উয়ায়েম (রা) বিন সায়েদাহ এবং তাঁর মত অন্যান্য পরিচ্ছন্ন প্রিয় সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"তোমরা তাহারাত বা পবিত্রতার জন্য কি পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকো। আল্লাহ জাল্লে শানুহু তোমাদের প্রশংসা করেছেন ?"

তাঁরা আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আমাদের নিয়ম হলো আমরা জানাবাতের সময় গোসল করি এবং পানি দিয়ে ইসতিনজা করে থাকি।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "এটা খুব ভালো কার্যপদ্ধতি এবং সকলকেই এই পদ্ধতি মানা দরকার।"

অন্য আরেক সময় কেউ হুজুরকে (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তাঁরা কারা যাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা প্রিয়তার জন্য আল্লাহ প্রশংসা করেছেন। এ সময় মহানবী (সা) জবাবে হযরত উয়ায়েম (রা) বিন সায়েদার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। এ থেকে হযরত উয়ায়েমের (রা) মর্যাদা সম্পর্কে ভালোভাবেই আন্দাজ করা যায়।

একাদশ হিজরীতে মহানবীর (সা) ইনতিকালের পর আনসাররা সাকিফায়ে বনি সায়েদাতে একত্রিত হলেন। তাঁদের বেশীর ভাগের মত ছিল সাইয়েদুল খাজরাজ হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহকে খলিফা বানানো হোক। মুহাজিররা এই খবর পেয়ে একত্রিত হলেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা) ও কতিপয় অন্য সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে সাকিফায়ে বনি সায়েদার দিকে রওয়ানা দিলেন। সহীহ বুখারীতে হযরত ওমর ফারুক (রা) থেকে বর্ণিত আছে, পথিমধ্যে আমাদের সঙ্গে দু'জন নেক্কার আনসার দেখা করলেন। তাঁরা আনসারদের সমাবেশ ও তাদের ইচ্ছা সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ "আপনারা কোথায় যাচ্ছেন ?" আমি বললাম, আমরা আমাদের আনসার ভাইদের নিকট সাকিফা যাচ্ছি। তাঁরা বললেন, সেখানে গিয়ে আপনারা কি করবেন ? খিলাফতের প্রশ্নে আপনারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিন। আমি বললাম, না, আমরা সেখানে অবশ্যই যাবো।

মুহাজিররা সাকিফায়ে বনি সায়েদা পৌঁছতেই পরিবেশ বদলে গেল এবং কিছুক্ষণ তর্ক-বিতর্কের পর জমহুর বা সাধারণ মুসলমান হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফত প্রশ্নে ঐকমত্য ঘোষণা করলেন। ইমাম জুহরী (র) এবং অন্য কতিপয় মুহাদ্দিস লিখেছেন, যে দু' ব্যক্তি বনি সায়েদার রাস্তায় মুহাজিরদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন তাঁরা ছিলেন হযরত উয়ায়েম (রা) বিন সায়েদাহ এবং হযরত মায়ান (রা) বিন মা'দী। তারা আনসারদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও খিলাফতের ব্যাপারে মুহাজিরদেরকে আনসারদের

উপর অগ্রাধিকার দিতেন। এ কারণেই তাঁরা আনসার সমাবেশ থেকে পৃথক হয়ে অন্য কোন দিকে যাচ্ছিলেন। এই ঘটনা হযরত উয়ায়েম (রা) বিন সায়েদার সঠিক মত সম্পন্ন হওয়া এবং দূরদর্শিতার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।

ধর্মদ্রোহিতার ভয়ংকর যুগে হযরত উয়ায়েম (রা) বিন সায়েদা খলিফাতুর রাসূল (সা) হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) বাহু হিসেবে কাজ করেন এবং অন্যান্য আনসারের সঙ্গে মিলে মদীনা মুনাওয়ারার হিফাজতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। ইসলামের এই মহান ব্যক্তি হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে মহাকালের দিকে যাত্রা করেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৬৫ বছর। আমীরুল মু'মিনিন (রা) জানাযায় শরীক ছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ "এ সময় দুনিয়ায় কোন ব্যক্তিই (কতিপয় বৈশিষ্টের পরিপ্রেক্ষিতে) তাঁর থেকে উত্তম হওয়ার দাবী করতে পারে না।"

হযরত উয়ায়েম (রা) ইনতিকালের সময় দু' পুত্র রেখে যান। একজন হলেন উতবাহ এবং অপরজন উবাইদাহ। তাঁর থেকে একটি হাদীসও বর্ণিত আছে।

হযরত উয়ায়েম (রা) বিন সায়েদার গুণাবলীর মধ্যে ছিল ইসলামে অগ্রগামিতা, জিহাদের আকাংখা, রাসূল প্রেম, পরিচ্ছন্নতা প্রিয়তা, সঠিক রায় এবং সুন্দর স্বভাব সম্পন্ন হওয়া। এক রেওয়ায়াতে আছে রহমতে আলম (সা) একবার তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন ঃ "সে আল্লাহর নেক বান্দাহ এবং পরহেজগার ব্যক্তি।" হযরত উয়ায়েম (রা) বিন সায়েদার মহানত্বের ব্যাপারে এর থেকে বড় দলিল আর কি হতে পারে যে, মহানবী (সা) তাঁকে "নেক ও পরহেজগার" বান্দাহ হিসেবে নিজের জবানে সম্বোধন করেছেন।

হযরত ইবাদ (রা) বিন কায়েস আনসারী

কেউ কেউ তাঁর নাম উবাদও লিখেছেন এবং কেউ কেউ আব্বাদ। খাজরাজ গোত্রের আদি বিন কা'ব বংশোদ্ভূত। নসবনামা হলো ঃ

ইবাদ (রা) বিন কায়েস বিন আবসাহ বিন উমাইয়া বিন মালিক বিন আমের বিন আদি বিন কা'ব বিন খাজরাজ।

আনসারের সাবিকুনাল আওয়ালীন বা প্রথম অগ্রগামীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইবনে হিশাম তাঁর নাম সেই ৭৫জন সাহাবায়ে কিরামের তালিকাভুক্ত করেছেন যারা নবুওয়াতের তের বছর পর মক্কা গিয়ে লাইলাতুল উকবাতে মহানবীর (সা) হাতে বাইয়াত হওয়ার গৌরবলাভ করেছিলেন এবং হুজুরকে (সা) মদীনা তাশরীফ আনার দাওয়াত দিয়েছিলেন।

ইবাদ (রা) হক পথের একজন জানবাজ সিপাহী ছিলেন। যুদ্ধসমূহ শুরু হলে সর্বপ্রথম তাঁর তরবারি বদরের যুদ্ধে বাতিলের বিরুদ্ধে খাপ থেকে বের হয়। তারপর তিনি ওহোদ, খন্দক, খায়বার প্রভৃতি যুদ্ধে বিশ্বনবীর (সা) সঙ্গী হন এবং প্রতিটি যুদ্ধেই বীরত্বের নিপুণতা প্রদর্শন করেন। অষ্টম হিজরীতে মাওতার রক্তাক্ত যুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করতে করতে শহীদ হন।

মশহুর ফকিহ সাহাবী হযরত আবুদ দারদা (রা) হযরত ইবাদ (রা) বিন কায়েসের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন।

হযরত আমর (রা) বিন আখতাব আনসারী

মহানবীর (সা) হিজরতের পরের কথা। একদিন বিশ্বনবী (সা) জাননিছার সাহাবীদের (রা) এক বৈঠকে বসেছিলেন। সেখানে দ্বীন ও দুনিয়ার আলোচনা হচ্ছিল। আলোচনাকালে হুজুরের (সা) পিপাসা লাগলো। তিনি (সা) সাহাবীদের (রা) নিকট পানি চাইলেন। একজন সুদর্শন সাহাবী (যিনি সামান্য খুঁড়িয়ে হাটতেন) তাড়াতাড়ী করে উঠলেন এবং পাত্র ভরে পানি আনলেন। তিনি এই পানিতে একটি চুল দেখতে পেলেন। তাড়াতাড়ী তিনি তা বের করে ফেলে দিলেন এবং পরিষ্কার পানি হুজুরের (সা) খিদমতে পেশ করলেন। বিশ্বনবী (সা) খুব খুশী হলেন এবং সেই সাহাবীর মাথাও চেহারার ওপর পবিত্র হাত বুলিয়ে দিয়ে দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ ! তাকে তুমি সুদর্শন করে দাও।"

মাহবুবে রব জুল জালালের (সা) দোয়ায় এই তাছির হলো যে, বার্ধক্যেও সেই ব্যক্তির চেহারায় যৌবনের দীপ্তি এবং একশ' বছর বয়সেও তাঁর মাথা এবং দাড়ির সকল চুল কালো ছিল।

সাইয়েদুল মুরসালিনের (সা) সুদর্শন হওয়ার দোয়া প্রাপ্ত এই ভাগ্যবান সাহাবী ছিলেন হযরত আমর (রা) বিন আখতাব আনসারী। সাইয়েদেনা হযরত আবু যায়েদ (রা) বিন আমর বিন আখতাবের সম্পর্ক ছিল খাজরাজ গোত্রের সঙ্গে। নসবনামা হলো ঃ

আমর (রা) বিন আখতাব বিন রাফয়াহ বিন মাহমুদ বিন ইয়াসির বিন আবদুল্লাহ বিন সায়েফ বিন বায়াম্বর বিন আদি বিন ছালাবাহ বিন আমর বিন আমের মাউসসামা।

হযরত আমর (রা) বিন আখতাব মহানবীর (সা) হিজরতের পর ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনে বিস্ময়কর বিপ্লব ঘটে। তিনি সবসময় হক পথে নিজের জীবন কুরবান করার জন্য অস্থির থাকতেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে, তিনি রাসূলের (সা) যুগে ১৩টি যুদ্ধে অংশ নেন এবং প্রতিটি যুদ্ধেই অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তিনি মহানবীকে (সা) সীমাহীন ভালোবাসতেন এবং মর্যাদা প্রদর্শন করতেন। যখনই সময় পেতেন তখনই প্রিয় নবীর (সা) ফয়েজ লাভের জন্য রাসূলের (সা) দরবারে হাজির হতেন। জীবন উৎসর্গের আবেগ, দ্বীনের প্রতি নিষ্ঠা এবং ঈমানী আবেগের কারণে তিনি হুজুরের (সা) স্নেহের পাত্র হয়ে যান। মুসনাদে

আহমদেরই এক বর্ণনায় আছে, একদিন হুজুর (সা) নিজের পবিত্র পিঠ থেকে কুরতা উঠিয়ে বললেন, আমর ! আমার পিঠের ওপর তোমার হাত বুলাও। তিনি নবীর (সা) ইরশাদ বা নির্দেশ পালন করলেন। পবিত্র পিঠের ওপর হাত মহরে নবুওয়াতের ওপর পৌঁছতেই তা ভালোভাবে দেখে নিজের চোখকে আলোকিত করলেন।

বিশ্বনবীর (সা) ইনতিকালের পর কয়েক বছর মদীনা অবস্থান করেন। বসরা বসতি স্থাপিত হলে সেখানে গিয়ে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান এবং সেখানেই ১২০ বছর বয়সে ওফাত পান। সে সময় মাথার মাত্র কয়েকটি চুল পেকেছিল। ওফাতের সময় এক পুত্র এবং এক কন্যা রেখে যান।

হযরত আমর (রা) বিন আখতাব থেকে কতিপয় হাদীসও বর্ণিত আছে। এসব হাদীস সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে পাওয়া যায়।

হযরত ছাবিত (রা) বিন দাহদাহ বালবী

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর (৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাস) রহমতে আলম (সা) মদীনা মুনাওয়ারা ফিরে এলে একদিন এক মাদানী জাননিছার সাহাবীর (রা) ওফাতের খবর পেলেন। এই খবর শুনে প্রিয় নবী (সা) গভীর শোক ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং সাহাবীদের সহ (রা) জানাযার জন্য তাশরীফ নিলেন। যখন তাঁর দাফন সম্পন্ন হলো তখন ঘোড়া তলব করে সওয়ার হলেন এবং বললেন ঃ

"বেহেশতে ছোহারার যত শাখা আছে তার সবই ইবনে দাহদার জন্য ঝোলানো হয়েছে।"

এই ইবনে দাহদাহ (রা) যাঁর জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ মহানবী (সা) নিজের পবিত্র মুখ দিয়ে দিয়েছেন। তিনি হলেন হযরত ছাবিত (রা) বিন দাহদাহ।

হযরত আবুদ দাহদাহ ছাবিত (রা) বিন দাহদার স্থান অত্যন্ত মর্যাদাবান সাহাবীদের মধ্যে নিরুপিত হয়ে থাকে। তাঁর সম্পর্ক ছিল বাল্লী গোত্রের আজলান অথবা আনিফ খান্দানের সঙ্গে। এই খান্দান আওস কবিলার শাখা আমর বিন আওসের মিত্র ছিল। নসবনামা হলো ঃ

ছাবিত (রা) বিন দাহদাহ বিন নায়িম বিন গানাম বিন আয়াস [কতিপয় বর্ণনায় হযরত ছাবিতের (রা) পিতার নাম আদ-দাহদাহও বলা হয়েছে]।

হিজরতের পর মহানবী (সা) মদীনা মুনাওয়ারা শুভ পদার্পণ করলে আওস ও খাজরাজ এবং তাদের মিত্রদের মধ্যে যারা তখনো ইসলামের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তারাও দ্রুততার সঙ্গে ইসলামের বেষ্টনীতে প্রবেশ করতে লাগলেন। হযরত ছাবিত (রা) বিন দাহদাহও সেই যুগে ইসলামের মর্যাদায় অভিষিক্ত হলেন। কোন বর্ণনায় এটা পাওয়া যায় না যে, তিনি বদরের যুদ্ধের পূর্বে অথবা পরে মুসলমান হয়েছিলেন। যা হোক, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তাঁর নাম নেই। তৃতীয় হিজরীতে ওহোদের যুদ্ধ সংঘটিত হলে হযরত ছাবিত (রা) বিন দাহদাহ জীবন বাজি রেখে অংশগ্রহণ করেন এবং বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। যে সময় কোন একটি বিচ্যুতির কারণে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং মুসলমানদের মধ্যে বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়লো তখন হযরত ছাবিত (রা) সামনে অগ্রসর হলেন এবং উচ্চস্বরে বললেন ঃ

"হে আনসাররা ! এদিকে এসো, এদিকে এসো। আমি হলাম ছাবিত বিন দাহদাহ। প্রিয় নবী (সা) যদি শহীদ হয়ে যান, তাহলে আল্লাহ জীবিত আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তোমাদের ফরয হলো দ্বীনের জন্য লড়াই করা। আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে বিজয় দান এবং সাহায্যদানকারী।"

হযরত ছাবিতের (রা) কণ্ঠস্বর শুনে কয়েকজন আনসার জানবাজ তাঁর চারপাশে একত্রিত হলেন এবং সকলে মিলে মুশরিকদের হামলা প্রতিহত করলেন। অন্যদিক থেকে আরেকটি হামলা এলো। তাতে খালিদ বিন ওয়ালিদ ইকরামা বিন আবু জেহেল, জিরার বিন খাত্তাব এবং আমর বিন আস-এর মত কুরাইশের নামকরা যোদ্ধা শামিল ছিলেন। তারা আনসার জানবাজদেরকে ঘিরে নিলেন। হযরত ছাবিত (রা) এবং তাঁর সঙ্গীরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে মুকাবিলা করলেন। ইত্যবসরে খালিদ বিন ওয়ালিদ অগ্রসর হয়ে হযরত ছাবিতের (রা) উপর বর্শা নিক্ষেপ করলেন এবং গুরুতর আহত হয়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। এক বর্ণনায় আছে, তিনি তৎক্ষণাৎ শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন এবং তিনি ছিলেন ওহোদের যুদ্ধের সর্বশেষ শহীদ। কিন্তু অন্য মজবুত দলিল সম্পন্ন বর্ণনায় সে সময় তাঁর শাহাদাতের ঘটনা প্রমাণিত হয়নি। এসব বর্ণনা অনুযায়ী যুদ্ধের পর আহত ও শহীদদের অনুসন্ধান চালানো হলে লোকেরা দেখলো যে, হযরত ছাবিত (রা) যদিও গুরুতর আহত হয়েছেন তথাপি তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস চলছিল। সুতরাং তাঁকে উঠিয়ে মদীনা মুনাওয়ারা নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসার পর দৃশ্যত ক্ষত শুকিয়ে যায় এবং কয়েক বছর তিনি সুস্থ এবং ভালো ছিলেন। কিন্তু হুদাইবিয়ার সন্ধির পর একদিন এই ক্ষত পুনরায় দেখা দিল এবং তার ব্যাথায় তিনি ওফাত পান। ওফাতের সময় কোন সন্তান জীবিত ছিল না এবং সম্ভবত স্ত্রীও ইনতিকাল করেছিলেন। এজন্য হুজুর (সা) সম্পত্তি তাঁর ভাগিনা হযরত আবু লুবাবাহ রাফায়াহ (রা) বিন আবদুল মান্যারকে দিয়ে দিয়েছিলেন।

হযরত ছাবিত (রা) বিন দাহদাহর চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে ইখলাস ফি দ্বীন, ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ, ঈমানী আবেগ ও জীবন কুরবানী করার স্পৃহা উল্লেখযোগ্য। নিজের এসব গুণের কারণে তিনি মহানবীর (সা) দরবারে প্রিয় হতে পেরেছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে বর্ণিত আছে, যখন এই আয়াত নাযিল হলো ঃ

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ۝

"কে আছে যে, আল্লাহকে ভালো কর্জ দেবে। যাতে আল্লাহ তাকে কয়েক গুণ বর্ধিত করে তা ফেরত দেবেন এবং তার জন্য উত্তম প্রতিদান রয়েছে।"

–(সূরা আল হাদীদ ঃ ১১)

এ সময় হযরত ছাবিত (রা) বিন দাহদাহ হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহ তায়ালা কি আমাদের নিকট কর্জ চান ?"

হুজুর (সা) বললেন, "হাঁ, আবু দাহদাহ।"

তিনি আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! অনুগ্রহ করে আপনার পবিত্র হাত আমাকে দেখান।"

হুজুর (সা) নিজের পবিত্র হাত তাঁর দিকে এগিয়ে দিলে তিনি হুজুরের (সা) পবিত্র হাত নিজের হাতে নিয়ে বললেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আমি আমার বাগান আল্লাহ তায়ালাকে কর্জ দিলাম।"

এই বাগান যা হযরত ছাবিত (রা) হকপথে সাদকাহ করে দিলেন তা কোন সাধারণ বাগান ছিল না। বরং তাতে ছশ' খেজুর গাছ ছিল এবং তাতেই তাঁর বাড়ী ছিল। হুজুর (সা)-এর সঙ্গে একথা বলে তিনি সোজা বাড়ী পৌছলেন এবং স্ত্রীকে ডেকে বললেন ঃ

"দাহদাহর মা, ঘর থেকে বের হয়ে এসো। আমি এই বাগান আমার রবকে কর্জ দিয়ে দিয়েছি।"

তাঁর স্ত্রী [হযরত উম্মে দাহদাহ (রা)] বললেন ঃ "আবু দাহদাহ তুমি লাভজনক ব্যবসা করেছ।" একথা বলে নিজের সামান ও শিশুকে (দাহদাহ) নিয়ে বাগানের বাইরে বের হয়ে এলেন। এই বর্ণনা থেকে এটাও জানা যায় যে, হযরত ছাবিত (রা)-এর দাহদাহ নামক একটি পুত্র ছিল। পরে সে তাঁর সামনেই মৃত্যুবরণ করে।

হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণিত অপর এক বর্ণনায় এই ঘটনা অন্য আরেকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বলেন এক ব্যক্তি রাসূলের আকরামের (সা) খিদমতে আরজ করলেন ; "হে আল্লাহর রাসূল ! আমি আমার বাড়ীর প্রাচীর তুলতে চাই। মধ্যখানে অমুক ব্যক্তির খেজুর বৃক্ষ রয়েছে। আপনি যদি ঐ ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেন যে, সে এই বৃক্ষ আমাকে দিয়ে দেবে ; তাহলে আমি আমার প্রাচীর বৃক্ষের সঙ্গে লাগিয়ে খুব সহজে নির্মাণ শেষ করতে পারি।

হুজুর (সা) সেই ব্যক্তিকে বললেন, তুমি তোমার বৃক্ষ তাকে দিয়ে দাও। তার বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে জান্নাতে খেজুর বৃক্ষ দান করবেন।

সেই ব্যক্তি বৃক্ষ দানে ওজর করলো। হযরত আবুদ দাহদাহ (রা) [ছাবিত (রা)] একথা জানতে পেরে সেই ব্যক্তির নিকট গেলেন এবং বললেন ঃ

"ভাই ! তুমি তোমার খেজুর গাছ আমাকে দাও এবং বিনিময়ে আমার খেজুরের বাগান নিয়ে নাও।"

সেই ব্যক্তি এই কথায় রাজী হয়ে গেল। তারপর হযরত ছাবিত (রা) বিশ্বনবীর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আমি সেই ব্যক্তির নিকট থেকে সেই খেজুর বৃক্ষ আমার বাগানের বিনিময়ে কিনে নিয়েছি। এখন আমি তা আপনাকে দান করছি। আপনি বাড়ীর প্রাচীর তৈরীকারী ব্যক্তিকে তা দিয়ে দিন।"

একথা শুনে হুজুর (সা) খুব খুশী হলেন এবং কয়েকবার বললেন ঃ "আবুদ দাহদাহর জন্য জান্নাতে খেজুরের কত বড় এবং ভারী কাঁধি রয়েছে।"

তারপর হযরত ছাবিত (রা) স্ত্রীর কাছে পৌঁছলেন এবং তাঁকে বললেন ঃ "হে উম্মে দাহদাহ ! এই বাগান থেকে বের হয়ে এসো। আমি এই বাগান জান্নাতের খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করে ফেলেছি।"

ভাগ্যবতী স্ত্রী বললেন ঃ "এটাতো খুব লাভজনক ব্যবসা হয়েছে।"

আল্লামা ইবনে আছির (র) "উসুদুল গাব্বাহ" গ্রন্থে লিখেছেন যখন সূরায়ে আল হাদীদের উপরে বর্ণিত আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন হযরত ছাবিত (রা) হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আল্লাহ তায়ালা কি আমাদের নিকট কর্জ বা ঋণ চান ?"

হুজুর (সা) যখন ইতিবাচক জবাব দিলেন তখন তিনি নিজের মাল সাদকা করে দিলেন।

এই বর্ণনায় মালের ব্যাখ্যা করা হয়নি। হতে পারে যে, হযরত ছাবিত (রা) বাগান ছাড়াও অন্য মাল সাদকা করেছিলেন। যাহোক, এসব বর্ণনা হযরত ছাবিত (রা) বিন দাহদাহর ঈমানী আবেগ এবং দ্বীনের প্রতি একনিষ্ঠতার প্রমাণ বহন করে।

হযরত উমায়ের (রা) বিন হুমাম আনসারী

বিশ্বনবীর (সা) হিজরতের পূর্বে এবং অব্যবহিত পর মদীনাবাসীদের যেসব লোক ঈমান আনার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তাদের মধ্যে একটি বিরাট সংখ্যক খাজরাজের বনু সালমা বংশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলো। সেই সালমা সাহাবীদের মধ্যে হুমাম বিন জামুহর (বিন যায়েদ বিন হারাম) ভাগ্যবান পুত্র উমায়েরও (রা) ছিলেন। ইসলাম তাঁর মধ্যে শাহাদাতের রূহ ফুঁক দিয়েছিল এবং তিনি মহানবী (সা)-এর সেইসব জাননিছারের মধ্যে শামিল হয়ে যান যাঁরা তাঁর (সা) সামান্য ইঙ্গিতেই জীবন কুরবান করাকে নিজের জন্য গৌরবের বিষয় বলে মনে করতেন। আনসার ও মুহাজিরদের ভ্রাতৃত্ব কায়েম হলে হুজুর (সা) হযরত উমায়ের (রা) বিন হুমামকে জালিলুল কদর মুহাজির হযরত উবায়দাহ (রা) ইবনুল হারিছের দ্বীনি ভাই বানিয়ে ছিলেন। বদরের যুদ্ধে হযরত উমায়ের (রা) সেই ৩১৩ পবিত্র আত্মার মধ্যে শামিল ছিলেন ; সে সময় যাঁরা রহমতে দো আলমের (সা) সঙ্গী হওয়ার মর্যাদা পেয়েছিলেন।

লড়াই শুরুর পূর্বে বিশ্বনবী (সা) সাহাবায়ে কিরামের (রা) সামনে খুতবা দিলেন। তিনি বললেন ঃ

"আল্লাহ বুজর্গ বরতরের কসম, যার কুদরতি কবজায় মুহাম্মাদের জীবন রয়েছে ! যে কেহ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হকের দুশমনের সঙ্গে লড়াই করে মারা যাবে, তার বেহেশত নসিব হবে।"

হযরত উমায়ের (রা) বিন হুমাম হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে নিজের কাতার থেকে বের হয়ে হুজুরের (সা) সামনে অত্যন্ত আদবের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহর পথে শহীদ হওয়াতে কি সেই জান্নাত পাওয়া যাবে যে ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন, তার লম্বা ও প্রশস্ততা আসমান এবং যমিনের সমান হবে।"

ইরশাদ হলো ঃ "হাঁ, উমায়ের ! সেই জান্নাত যার সম্পর্কে আরদুহাস সামাওয়াতু ওয়াল আরদু" বলা হয়েছে।"

একথা শুনে হযরত উমায়েরের (রা) মুখ দিয়ে অযাচিতভাবে বাহ বাহ শব্দ বের হয়ে পড়লো এবং তিনি পুনরায় আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আমি কি সেই জান্নাতের হকদার হতে পারি।" হুজুর (সা) বললেন ঃ "তুমি অবশ্যই সেই জান্নাতে দাখিল হবে।"

সে সময় হযরত উমায়ের (রা) খেজুর খাচ্ছিলেন। যেই মাত্র মহানবীর (সা) যবান দিয়ে এই বাক্য বের হলো তখনি তিনি খেজুর ফেলে দিয়ে বললেনঃ

"আমার জন্য এখন সেই সময়টুকুও কষ্টকর যা খেজুর খাওয়ার জন্য ব্যয় হবে। আমার এবং জান্নাতের মধ্যে এখন কোন জিনিস বাধা হতে পারে না।"

অতপর তরবারি চালাতে চালাতে বীরবিক্রমে যুদ্ধের ময়দানে প্রবেশ করলেন এবং কুরাইশের মিত্র খালিদ ইবনুল আলমের হাতে শাহাদাতের পেয়ালা পান করে জান্নাতুল ফেরদাউসে পৌঁছে গেলেন।

হযরত যিয়াদ (রা) বিন সাকান আশহালি

হযরত যিয়াদ (রা) বিন সাকান আনসারদের সাবিকুনাল আউয়ালিনদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। অর্থাৎ যেসব আনসার প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তিনি তাদের অন্যতম। তিনি আওস গোত্রের বনু আবদুল আশহাল বংশের নয়ন মনি ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ

যিয়াদ (রা) বিন সাকান বিন রাফে' বিন ইমরাউল কায়েস বিন যায়েদ বিন আবদুল আশহাল।

হযরত যিয়াদ (রা) বিশ্বনবীকে (সা) সীমাহীন ভালোবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন। ইবনুল কালবির বক্তব্য মতে তিনি বদরী সাহাবী ছিলেন। ওহোদের যুদ্ধেও হুজুরের (সা) সফর সঙ্গী ছিলেন। ঘটনাক্রমে একটি ভুলের কারণে যখন মুসলমানদের মধ্যে বিশৃংখলার সৃষ্টি হলো তখন এক নাজুক মুহূর্তে হুজুর (সা) বললেন ঃ "কে আছে যে আমার জন্য নিজের জীবন আল্লাহর রাস্তায় বিক্রি করবে।" হযরত যিয়াদ (রা) বিন আস সাকান কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। যেই তাঁর কানে হুজুরের (সা) কথা প্রবেশ করলো অমনি তিনি চারজন আনসার সাথীসহ এই বলে লাফ দিয়ে আগে অগ্রসর হলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা হাজির।" অতপর তিনি হুজরের (সা) ওপর হামলাকারী মুশরিকদের দলে ঢুকে পড়লেন এবং এমন জীবনবাজি রেখে লড়াই করলেন যে, মুশরিকদের মুখ ফিরে গেল। কিন্তু এই প্রচণ্ড সংঘর্ষে হযরত যিয়াদ (রা) গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। বিশ্বনবী (সা) তাঁকে নিজের পবিত্র পায়ের সঙ্গে ভর দিয়ে দাঁড় করালেন। সে সময় হযরত যিয়াদ (রা) শেষ নিঃশ্বাস নিলেন এবং নিজের জীবন মহান আল্লাহর নিকট সপে দিলেন।

হযরত আম্মারাহ (রা) বিন যিয়াদ (রা) আশহালি

হযরত আম্মারাহ (রা) হযরত যিয়াদ (রা) ইবনুস সাকানের ভাগ্যবান পুত্র ছিলেন। তিনিও বুজর্গ পিতার সঙ্গে ওহোদের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তার পূর্বে তিনি বদরের যুদ্ধেও অংশ নেয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। ওহোদের দিন এমন বিক্রমের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন যা নজীরবিহীন। তেরটি আঘাত পেয়েছিলেন, কিন্তু যুদ্ধের ময়দান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি। অবশেষে ১৪তম আঘাতের পর শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায় এবং অজ্ঞান অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। লোকজন মনে করলো যে, শহীদ হয়ে গেছেন। হুজুরকে (সা) খবর দেয়া হলে তিনি বললেন ঃ "আম্মারাহর (রা) লাশ আমার নিকট আনো।" সাহাবীরা (রা) তৎক্ষণাৎ তাঁর দিকে দৌড় দিলেন। গিয়ে দেখলেন যে, তখনও শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে। উঠিয়ে এনে হুজুরের (সা) সামনে রাখলেন। কথা বলার শক্তি ছিল না।

হুজুর (সা) তাঁর মাথা নিজের পবিত্র কদমের উপর রাখলেন এবং তিনি নিজের মুখমণ্ডলকে মহানবীর (সা) পবিত্র পায়ের উপর রেখে জান্নাতের দিকে যাত্রা করলেন।

আল্লাহ ! আল্লাহ !! ভক্তি শ্রদ্ধার এই আবেগ ! সৌভাগ্য কাকে বলে ! শেষ নিঃশ্বাস বের হয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে মাথা রয়েছে মাহবুবের পায়ের ওপর। মাহবুব কে ছিলেন ? ফখরে মওজুদাত মহানবী (সা)।

কতিপয় বর্ণনায় আছে হযরত আম্মারাহ (রা) বিন যিয়াদ বদরের যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করেছিলেন।

হযরত ছা'লাবা (রা) বিন গানমাহ্ আনসারী

খাজরাজ গোত্রের সালমাহ খান্দানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ

ছা'লাবাহ (রা) বিন গানমাহ বিন আদি বিন হানি বিন আমর বিন সওয়াদ বিন গানাম বিন কা'ব বিন সালমাহ।

মহানবীর (সা) হিজরতের পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছর পর মদীনার অন্যান্য হকপন্থীর সঙ্গে হজ্জের লক্ষ্যে মক্কা গমন করেন। সে সময়ই বাইয়াতে উকবায়ে কবিরা (লাইলাতুল উকবা) সংঘটিত হয়। এই বাইয়াতের সময় তিনি রহমতে আলমের (সা) দর্শন লাভ করে নিজের চোখকে আলোকিত করেন এবং তাঁর (সা) বাইয়াতের সৌভাগ্য অর্জন করেন। মক্কা মুয়াজ্জামা থেকে মদীনা ফিরে আসার পর ঈমানী আবেগ এমন ছিল যে, অন্যান্য যুবকের সঙ্গে মিলে স্বগোত্রের মূর্তি ভেঙ্গে বেড়াতেন। চরিতকাররা তাঁর সাথীদের মধ্যে হযরত মায়াজ (রা) বিন জাবাল এবং হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আনিসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। বিশ্বনবী (সা) মদীনায় শুভাগমন হলে অন্যান্য আনসারের সঙ্গে হযরত ছা'লাবাও (রা) হুজুরের (সা) কাছে নিজের মন-প্রাণ ঢেলে দিলেন।

দ্বিতীয় হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে হযরত ছা'লাবা (রা) বদরের যুদ্ধে বিশ্বনবীর (সা) সফর সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। পরবর্তী বছর তিনি ওহোদের যুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে অংশ নেন। খন্দকের যুদ্ধেও অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে যোগ দেন এবং এই যুদ্ধেই বীরবিক্রমে লড়াই করতে করতে নিজের জীবনকে হকপথে কুরবানী করে দেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন যায়েদ (রা) আনসারী

(ছাহিবুল আযান)

রহমতে আলম (সা) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা শুভ পদার্পণের কিছুদিন পর মসজিদে নববী নির্মাণের ব্যবস্থা করলেন। মসজিদ নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার পর মহানবী (সা) একটি জিনিসের বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করলেন। জামায়াতের সঙ্গে নামায আদায়ের জন্য সাধারণ মুসলমানকে নামাযের সময়ের কিছু সময় আগে কিভাবে খবর দেয়া যায় তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন। হুজুর (সা) সাহাবায়ে কিরামের (রা) সঙ্গে পরামর্শ করলেন যে, এই লক্ষ্যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা ঠিক হবে ? কেউ আরজ করলেন যে, কোন উঁচু স্থানে আগুন জ্বালিয়ে আলো করা যায়। আবার কেউ বা মত দিলেন যে, নামাযের সময় সন্নিকটে হলে মসজিদের ওপর ঝাণ্ডা উঁচু করে দেয়া যায়। অন্য কেউ পরামর্শ দিলেন যে, ইহুদী-খৃষ্টানরা যেমন তাদের ইবাদাতখানায় সিঙ্গা ফুঁকায় তেমনি আমরাও নামাযের ঘোষণার জন্য করতে পারি। কিন্তু বিশ্বনবী (সা) তাদের কারোর প্রস্তাবের ওপরই মুতমায়েন হলেন না এবং এই প্রসঙ্গে চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন। তা সত্ত্বেও সাময়িকভাবে তিনি সিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার প্রস্তাব মঞ্জুর করলেন। তখনো সেই প্রস্তাব কার্যকর হয়নি। পরবর্তী দিন খুব ভোরে আনসারী সাহাবী (রা) মহানবীর (সা) নিকট হাজির হলেন এবং এই আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! রাতে স্বপ্নে আমার সামনে এক ব্যক্তি এলো। তার হাতে ছিল সিঙ্গা। আমি তাকে বললাম, "হে আল্লাহর বান্দা ! তুমি এই সিঙ্গা বিক্রয় করো ?" সে বললো, "তুমি সিঙ্গা কি করবে ?" আমি বললাম, "আমরা তা বাজিয়ে লোকদেরকে নামাযের জন্য ডাকবো।" সে বললো, "আমি কি তোমাকে এমন বস্তুর কথা বলবো না, যা এই লক্ষ্যে সিঙ্গা বাজানোর পরিবর্তে উত্তম হবে ?" আমি বললাম, হাঁ, অবশ্যই বল।" সে বললো বলো ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ - اَشْهَدُ اَنَّ

مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ - حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ - حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ - حَيَّ

عَلَى الْفَلَاحِ ـ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ـ اَللّٰهُ اَكْبَر اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

এই সম্পূর্ণ কালাম বলে সেই ব্যক্তি আমার থেকে কিছুটা পিছু হটে গেল এবং কিছুক্ষণ পর সে বললো ঃ অতপর যখন নামায কায়েম করবে তখন এভাবে ইকামাত বলবে ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَشْهَدُ اَن لَّااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ـ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهُ ـ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ـ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ـ قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةُ ـ قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَر اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ [১]

বিশ্বনবী (সা) এই স্বপ্নের কথা শুনে বললেন, "এটা সত্য স্বপ্ন। ইনশাআল্লাহ ! তুমি বেলালের (রা) সঙ্গে দাঁড়িয়ে এই বাক্যসমূহ রপ্ত করিয়ে দাও। যেসব কালেমা তুমি স্বপ্নে দেখেছ এবং সে আযান দেবে। কেননা তার কণ্ঠস্বর তোমার থেকে উঁচু।" তাঁরা হুজুরের (সা) হুকুম তামিল করলেন এবং সেই দিন থেকে এই আযান কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামী রীতিতে পরিণত হয়েছে। রাসূলের (সা) এই সাহাবী (রা), যিনি এই মহান মর্যাদা লাভ করেছিলেন যে সাইয়েদুল মুরসালিন ফখরে মওজুদাত (সা) তাঁর স্বপ্নকে সত্য স্বপ্ন বলে আখ্যায়িত করে চিরকালের জন্য তাঁর ওপর আমল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন —তিনি ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন যায়েদ আনসারী। তিনি এই সম্মানের ভিত্তিতে "ছাহিবুল আযান" উপাধিতে মশহুর হয়েছিলেন।

---

১. এই বর্ণনা সুনানে আবি দাউদ এবং মুসনাদে দারেমী থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। সহীহাইনে হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণিত আছে, এক হাদীসেও ইকামাতের বাক্য একবারই বলার কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নিসায়ী, মুসনাদে দারেমী, সুনানে ইবনে মাজাতে হযরত আবু মাহযুরার (রা) এই বর্ণনাও পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা) আমাকে ইকামাতের ১৭টি কালেমা শিখিয়েছেন। আল্লাহু আকবার চার বার, আশহাদু আললা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দু'বার, আশহাদু আননা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ দু'বার, হাইয়্যা আলাস সালাহ দু'বার, হাইয়্যা আলাল ফালাহ দু'বার, কাদকামাতিস সালাহ দু'বার, আল্লাহু আকবার দু'বার এবং লাইলাহা ইল্লাল্লাহ একবার।

ইমাম আবু হানিফা (র), ইমাম সুফিয়ান ছওরী (র), আবদুল্লাহ বিন মুবারক (র) এবং কুফার অন্যান্য ফকিহ এই মতের ওপরই আমল করেছেন। তাদের মত হলো, যেসব হাদীসে ইকামাতের কালেমা একবার বলার কথা উল্লেখ রয়েছে তা সেই প্রাথমিক যুগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। সে সময় কেবলমাত্র আযান ও ইকামাতের প্রচলন শুরু হয়েছিল। বেশ কিছুদিন এই কার্যপদ্ধতিই চালু ছিল। কিন্তু সাত-আট বছর পর (অষ্টম হিজরীর শওয়াল মাসে) হুনাইনের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর হুজুর (সা) হযরত আবু মাহযুরাহ (রা)-কে আযান এবং ইকামাতের তালকিন দেন। এই তালকিনে তিনি (সা) ইকামাতেও প্রতিটি কালেমা দু' দু'বার বলার শিক্ষা দিলেন। এজন্য পরের নির্দেশ হওয়ার কারণে এই মতকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

হযরত আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ (রা) বিন যায়েদের সম্পর্ক ছিল খাজরাজের হারিছ বিন খাজরাজ খান্দানের সঙ্গে। নসবনামা হলো ঃ

আবদুল্লাহ (রা) বিন যায়েদ বিন ছা'লাবা বিন আবদি রাব্বিহি বিন ছা'লাবা বিন যায়েদ বিন হারিছ বিন খাজরাজ।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) অত্যন্ত নেক ও পবিত্র অন্তরের মানুষ ছিলেন। মহানবীর (সা) হিজরতের পূর্বে তাঁর কানে হকের দাওয়াত পৌঁছে। তখন তিনি চিন্তা-ভাবনা না করে মন-প্রাণ দিয়ে তা কবুল করে নেন। নবুয়াতের ত্রয়োদশ বছরের পর হজ্জের মওসুমে মক্কা গিয়ে লাইলাতুল উকবাতে হুজুরের (সা) হাতে বাইয়াতে ধন্য হন।

রহমতে আলম (সা) মদীনা মুনাওয়ারা তাশরীফ নিলে মসজিদে নববী নির্মাণের পর হযরত আবদুল্লাহ (রা) "ছাহিবুল আযান" হওয়ার মহান সম্মানে ভূষিত হন। সুনানে আবি দাউদ এবং মুসনাদে দারেমীতে এই ঘটনা স্বয়ং তাঁর জবানীতে উল্লেখ রয়েছে। তাতে অতিরিক্ত একথাও আছে ঃ [যখন বেলাল (রা) তাঁর তালকিন অনুযায়ী আযান দিয়ে ফেললেন] তখন ওমর (রা) ইবনুল খাত্তাব নিজের ঘর থেকে চাদর হিচড়াতে হিচড়াতে বের হয়ে প্রিয় নবীর (সা) খিদমতে আরজ করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! সেই পবিত্র সত্তার কসম, যিনি আপনাকে হক সহ প্রেরণ করেছেন। আমিও তেমন স্বপ্নই দেখেছি যেমন আবদুল্লাহ (রা) বিন যায়েদ দেখেছেন। প্রিয় নবী (সা) তখন বললেন, "ফালিল্লাহিল হামদু।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিশ্বনবীর (সা) অত্যন্ত মুখলিস জাননিছার ছিলেন এবং হকপথে নিজের জান ও মাল কুরবানী করার অদম্য আকাংখা সবসময়ই তাঁর অন্তরে জাগরুক থাকতো। যুদ্ধসমূহ শুরু হলে বদর, ওহোদ, খন্দক এবং অন্যান্য সকল যুদ্ধে রহমতে আলমের (সা) সঙ্গী ছিলেন। প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি বীরত্ব দেখিয়েছেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) "আল ইসতিয়াব" গ্রন্থে লিখেছেন, মক্কা বিজয়ের সময় হুজুর (সা) হারিছ বিন খাজরাজ কবিলার ঝাণ্ডা হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন যায়েদকে প্রদান করেছিলেন।

বিদায় হজ্জের সময় হযরত আবদুল্লাহ (রা) আরো একটি মহান সম্মানের অধিকারী হন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে, বিদায় হজ্জে বিশ্বনবী (সা) অনেক বকরী লোকদের মধ্যে বন্টন করেছিলেন। হযরত আবদুল্লাহও (রা) হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে কোন বকরী দেননি। তারপর মহানবী (সা) পবিত্র গোফ কাটালেন। এই গোফের কিছু হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন যায়েদকে দিলেন। মেহেন্দীতে রঞ্জিত এই পবিত্র গোফ

হযরত আবদুল্লাহর (রা) জন্য এমন এক নিয়ামত ছিল যে দুনিয়া জাহানের সম্পদ তার সামনে কিছুই ছিল না। তিনি স্বয়ং সারাজীবন এই পবিত্র গোফ নিজের বুকে লাগিয়ে রেখেছিলেন এবং তারপর তাঁর খান্দান এই মহাসম্পদ নিজেদের নিকট বরকত স্বরূপ সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন।

আল্লাহ তায়ালা হযরত আবদুল্লাহকে (রা) উদারতা এবং দানশীলতার গুণেও গুণান্বিত করেছিলেন। ইবনে আছির (র) "উসুদুল গাব্বাহ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন যায়েদের নিকট সাধারণ ধরনের মাল-মাত্তা ছিল। তা দিয়ে নিজের ও পরিবার-পরিজনের পেট পালতেন। কিন্তু তিনি যখন আল্লাহর পথে খরচের সওয়াব ও প্রতিদানের বিষয় জানতে পেলেন নিজের সকল মাল-মাত্তা হকের পথে দান করে দিলেন। তাঁর পিতা হযরত যায়েদ (রা) বিন ছা'লাবাও সাহাবী ছিলেন। তিনি রাসূলের (সা) নিকট হাজির হয়ে এই ঘটনা বিবৃত করলেন। হুজুর (সা) হযরত আবদুল্লাহকে (রা) ডেকে পাঠালেন। তিনি হাজির হলে বললেন ঃ "আল্লাহ তায়ালা তোমার দান কবুল করেছেন। কিন্তু এখন পিতার উত্তরাধিকারের নামে তোমাকে ফেরত দিচ্ছেন —তা গ্রহণ করো।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) ৩২ হিজরীতে হযরত ওসমান গনির (রা) শাসনকালে ওফাত পান। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৬৪ বছর। আমীরুল মু'মিনিন হযরত ওসমান (রা) নামাযে জানাযা পড়ান এবং এই মহান মর্যাদাবান সাহাবীকে কবরে নামান। মৃত্যুকালে হযরত আবদুল্লাহ (রা) একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে রেখে যান।

ইমাম বুখারী (র) ও ইমাম তিরমিযী (র)-এর নিকট হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন যায়েদের থেকে শুধু একটি হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসটি আযানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু হাফিজ ইবনে হাজর (র) তাহজিবুত তাহজিব গ্রন্থে তাঁর থেকে বর্ণিত সাতটি হাদীস স্থান দিয়েছেন।

হযরত আবু উসায়েদ (রা) আনসারী

নাম ছিল মালিক। আবু উসাইদ কুনিয়াত বা ডাক নাম। তিনি ডাক নামেই প্রসিদ্ধ হন। খাজরাজের বনি সায়েদাহ বংশোদ্ভূত ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ

মালিক (রা) বিন রবিয়াহ বিন বদন বিন আমের বিন আওফ বিন হারিছা বিন আমর বিন খাজরাজ বিন সায়েদা বিন কা'ব বিন খাজরাজ আকবার।

প্রিয় নবীর (সা) হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। সে সময় তিনি ছিলেন যুবক। বিশ্বনবী (সা) মদীনায় তাশরীফ নিলে হযরত আবু উসায়েদ (রা) যেন সাতরাজার ধন হাতে পেলেন। নবীর (সা) ফায়েজে খুব করে অভিষিক্ত হলেন। মহানবীকে (সা) খুব ভালোবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন এবং সবসময় তাঁর (সা) জন্য জীবন কুরবানী করার লক্ষ্যে প্রস্তুত থাকতেন। সর্বপ্রথম তাঁর তরবারীর চমক প্রদর্শিত হয় বদরের ময়দানে। তারপর ওহোদ, খন্দক প্রভৃতি অন্যান্য যুদ্ধেও তিনি মহানবীর (সা) সফর সঙ্গী ছিলেন এবং প্রতিটি যুদ্ধেই জীবন হাতে রেখে লড়াই করেছেন। মক্কা বিজয়ের সময় প্রিয় নবী (সা) তাঁকে বনু সায়েদার ঝাণ্ডা প্রদান করেছিলেন। বিশ্বনবীর (সা) ওফাতের পর তিনি কি করতেন ? চরিত গ্রন্থসমূহ এ ব্যাপারে কিছু বলেনি। হাঁ, এতটুকুন জানা যায় যে, তিনি ৬০ হিজরীতে পরপারে যাত্রা করেন। সে সময় বয়স ছিল ৭৮ বছর এবং সকল বদরী সাহাবী তাঁর আগেই ওফাত পেয়েছিলেন। যেন তিনি হক ও বাতিলের প্রথম সংঘর্ষে বা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী শেষ সাহাবী ছিলেন এবং তাঁর ওফাতে বদরের যুদ্ধের শেষ নিশানাও দুনিয়া থেকে বিদায় নিল। হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের (রা) খিলাফতকালে তাঁর দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেতে থাকে। ওফাতের সময় হামিদ, যোবায়ের, মানযার এবং হামযা নামক চার পুত্র রেখে যান। হাদীসের কিতাবসমূহে তাঁর থেকে বর্ণিত কতিপয় হাদীসও পাওয়া যায়। এসব হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে হযরত আনাস (রা) বিন মালিক, হযরত সাহাল (রা) বিন সায়াদ, আবু সালমা (রা) এবং ইবরাহীম বিন সালমার (র) নাম উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জি

১. সহীহ বুখারী (র)
২. সহীহ মুসলিম (র)
৩. মুওয়াত্তা ইমাম মালিক (র)
৪. মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল (র)
৫. মুসনাদে আবু দাউদ (র)
৬. জামে' তিরমিযী (র)
৭. মুসতাদরাকে হাকিম (র)
৮. সিয়রে আলামুন নুবলা—হাফেজ জাহাবী (র)
৯. আল মাগাযি—ওয়াকেদী (র)
১০. ফতহুশ শামস—ওয়াকেদী (র)
১১. আত তাবকাতুল কুবরা—ইবনে সায়াদ (র)
১২. তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক—তাবারি (র)
১৩. আল কামিল—ইবনে আছির (র)
১৪. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া—হাফেজ ইবনে কাছির (র)
১৫. আস সিরাতুন নববীয়া—ইবনে হিশাম (র)
১৬. উসুদুল গাব্বাহ—ইবনে আছির (র)
১৭. ফতুহুল বুলদান—বালাজুরি (র)
১৮. আনসাবুল আশরাফ—বালাজুরি (র)
১৯. আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব—হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র)
২০. আল ইসাবা ফি তামাইয়িযুস সাহাবা (রা)—হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র)
২১. তাহজিবুত তাহজিব—হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র)
২২. আল আখবারুত তাওয়াল—আবু হানিফা দিনাওয়ারী
২৩. দায়েরায়ে মায়ারিফি ইসলামিয়া—পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়
২৪. তারজুমানুল সুন্নাহ—মাওলানা বদরে আলম মিরাঠি (র)
২৫. হায়াতুস সাহাবাহ (রা)—মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ কান্দুলভী (র)
২৬. মিশকাতুল মাসাবিহ—শেখ ওয়ালিউদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ খতীব উমরি
২৭. সিরাতে কুবরা—মাওলানা আবুল কাসিম রফিক দিলাওয়ারী (র)

২৮. আল মাশাহিদ—হাকিম রহমান আলি খান মরহুম

২৯. মুহাজিরিন (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)—শাহ মুয়িনউদ্দীন আহমত নদভী (র)

৩০. সিয়রে আনসার (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) মাওলানা সাঈদ আনসারি মরহুম

৩১. আল ফারুক—শিবলি নুমানী (র)

৩২. আহলি কিতাব সাহাবা (রা) ওয়া তাবেয়ীন—হাফিজ মুজিবুল্লাহ নদভী (র)

৩৩. সিয়ারুস সাহাবা (সপ্তম খণ্ড)—শাহ মুয়িনুদ্দীন আহমদ নদভী (র)

৩৪. উসওয়ায়ে সাহাবা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) মাওলানা আবদুস সালাম নদভী (র)

৩৫. তারিখে ইসলাম—মুনশী গোলাম কাদের ফসিহ মরহুম

৩৬. তারিখে ইসলাম—শাহ মুয়িনদ্দীন আহমদ নদভী (র)

৩৭. রাহমাতুল লিল আলামীন (দ্বিতীয় খণ্ড)—কাজী মুহাম্মাদ সোলায়মান মানসুরপুরি (র)

প্রধান কার্যালয়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ২৫ ১৭ ৩১

বিক্রয় কেন্দ্র
- ১০, আদর্শ পুস্তক বিপণী, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
- ৫৫, খানজাহান আলী রোড, তারের পুকুর, খুলনা
- ৪৩, সেওয়ানজী পুকুর লেন, সেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম